কালো কেশের
কোমল শোভা
সুন্দর কেশ তনুশ্রীকে বিশেষ
একটি মাধুর্য দান করে।
তাই রূপ-চর্চায় চিরদিন কেশের
এত আদর। কেশের স্বাস্থ্য
ও শ্রী বাড়াতে হলে
নিয়মিত ব্যবহার করুন
জুয়েল আমলা।
ইহা একটি আদর্শ ভারতীয়
ভেষজ কেশতৈল।
জুয়েল আমলা
শ্রেষ্ঠতম
ভেষজ
কেশ-তৈল
জুয়েল অফ্ ইণ্ডিয়া পারফিউম কোং প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৩৪।

শারদীয় শুভেচ্ছা
পূর্ব রেলওয়ে

আজই 'বাঘ' মার্কা সুপ্রারেজ ব্যাটারী কিনে আপনার টর্চে ভ'রে নিন। এতে আলোর তীব্রতা অনেক বেশী। বিশেষ প্রণালীতে এই ব্যাটারীটি তৈরী করা হ'য়েছে, এবং বহুদিন ব্যবহারেও অল্প শক্তি নষ্ট হয়, অথচ দামেও সস্তা।
অন্ধকারে অদ্বিতীয় সহায় 'বাঘ' মার্কা সুপ্রারেজ ব্যাটারী
SUPRARAYS
SUPER POWERED FLUID FREE CELL
সুপ্রারেজ
টর্চ ব্যাটারী
ইন্ডিয়া প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা।
সোল সেলিং এজেন্টস্ : হাজী হাসেম হাজী আবদুল্লা প্রাঃ লিঃ
৫, আমড়াতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১

সূচীপত্র

সূচীপত্র

রঞ্জন ফ্যান
নিখুঁত, নির্ভরযোগ্য ও আরাম
সর্বাধুনিক সুদৃশ্য ডিজাইন ও সুন্দর পরিপাটো প্রস্তুত
রঞ্জন ফ্যান দামের তুলনায় অনেক বেশী স্বাচ্ছন্দ্য দেয়
ডি, জি এস্ এ্যান্ড ডি-এর সহিত মূল্যে চুক্তিবদ্ধ
সিলিং, • টেব্‌ল, • পেডেষ্টাল, • এয়ার সার্কুলেটার • এক্সষ্ট্
প্রস্তুতকারক — জি, টি, আর কোং (প্রাইঃ) লিঃ ৩৭, দমদম রোড, কলিকাতা-৩০ ফোন :— ৫৭-২০৭৬ ৫৭-২৫৫৩
সিটি সেলস অফিস : ১২, নেতাজি সুভাষ রোড, কলিকাতা-১ ফোন—২২-১৩৯৬

সূচীপত্র

শ্রীঅতুল বসু অঙ্কিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতি বেঙ্গল ইমিউনিটির সৌজন্যে প্রাপ্ত

দাম : আড়াই টাকা

আপনার অলঙ্কার আপনার রুচি ও
আভিজাত্যের পরিচায়ক।
পি·সি·চন্দ্র এণ্ড সন্স
১২৭।১এ, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলি-১২
ফোন—৩৪-৪৬১৯
জুয়েলার্স্

এখনও আকাশ তার মেঘস্পর্শ সরিয়ে নেয়নি, এখনও সেই চিক্কণ কিরণ রেখা দেখা দেয়নি। তবু কাল রাত্রি থেকে আশ্বিনের ঝড়ের মতো বাতাস বইতে আরম্ভ করেছে এবং কী যে এক আশ্চর্য সূক্ষ্ম অনুভূতি আকাশে ছড়াচ্ছে জানি না। কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পারছি কে যেন বাতাসের জলকণাগুলি তার চঞ্চল কোমল হাতে মুছে নিয়ে যাচ্ছে, পাখীরা যেমন ক'রে থেকে থেকে ডানার জলরেণু রৌদ্রে ও হাওয়ায় নিক্ষেপ করতে থাকে, তেমনি একটা ব্যাপার চলছে চতুর্দিকবর্তী বায়ু-আন্দোলিত সমস্ত অস্থিরতার মধ্যে। গাছের পাতাগুলি থেকে জল ঝরে ঝরে নিঃশেষ হচ্ছে। স্ফটিকের উজ্জ্বলতা ধীরে ধীরে আকাশে দেখা দিচ্ছে এবং এই কলকাতায় সহস্র গাড়ির উদ্গার, মোবিলের ধোঁয়া, ধুলোর কাদায় সিক্ত রাজপথ, এরই মধ্যে বুঝতে পারছি তাঁর আগমন সময় আসন্ন হয়েছে।

তবু এখনও আনন্দের স্পষ্ট চিহ্ন এই নগরীর জীবনে অনুপস্থিত। কারখানায় বোনাসের দাবী উদ্যত, সংবাদপত্রে "ঘেরাও আন্দোলন" শিরোনামা ভেদ করে দেখা দিচ্ছে। দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির নিঃশব্দ যাতনা বিধানসভার একবার মাত্র সামান্য স্ফুট প্রতিবাদ জানিয়েছিল, কিন্তু এখন সে গৃহস্থ সংসারগুলিতে বোবা মেয়ের মতো করুণ দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এবার প্রসন্ন শস্যের সংবাদ গ্রামের খামার থেকে আসেনি। পচা পাটের বর্ণে গ্রামের ডোবাগুলি শুধু নীলবর্ণ ধারণ করেছে, বাতাস দুর্গন্ধবহ হয়েছে, তথাপি [illegible] এবং নৈহাটি-বাঁশবেড়িয়ার জুট মিলে পাটের মূল্য নিম্নগামী। পাটকলের শ্রমিকেরা ছাঁটাইর আসন্ন সম্ভাবনায় স্তব্ধ, চব্বিশ পরগণার চাষীরা বিনষ্ট আমনের ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। যে সময়ে তারা বর্ষার জলধারা চেয়েছিল, সে সময় প্রকৃতি স্নেহবর্ষণে বিমুখ ছিলেন। আজ শরৎ দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু প্রকৃতির নিষ্করুণ বর্ষণ এখনও থামেনি। সমস্ত গ্রাম-বাংলা যেন স্তব্ধ, কর্মহীন একটি বিষণ্ণ মুখ নিয়ে দাওয়ায় বসে আছে, [illegible] মাঝে মাঝেই তার সম্মুখের আকাশ ছেয়ে অন্ধকার নামছে বৃষ্টির নির্মম জলধারা নিয়ে।

নিজের মনের মধ্যে তাকিয়ে দেখতে পাচ্ছি বহু জায়গায় নিরুদ্ধ অভিমানের বাষ্প পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। গত এক বৎসরের বেদনা সেখানে সারি সারি নিঃশব্দে অপেক্ষ-মাণ—সেখানে দেখতে পাচ্ছি, আসামের গৃহবিতাড়িত নারীর মুখ। কাছাড়ের অশ্রু ও রক্তসিক্ত যুবকেরা সেখানে ভিড় করে আছে। বেরুবাড়ির আসন্ন বিসর্জনের করুণ প্রস্তুতি শুনতে পাচ্ছি। তার উপরে দারিদ্র্যের সমস্ত সঞ্চিত বঞ্চনা, বেকারীর হতাশা এবং জীবনের যত নিষ্ফল প্রত্যাশা সব স্তূপীকৃত হয়ে আছে। সেইজন্যই যে চোখ তুলে তোমার দিকে তাকাব, মাগো সে চোখ আমার অভিমানে ভরা।

অবশ্য জানি, যে মুহূর্তে তোমার সংকেত আসবে ওমনি ঐ আকাশ তার রুদ্ধ মেঘাবরণ খুলে নেবে, অকস্মাৎ রৌদ্র-সচকিত শরতের পরিপূর্ণ দিন দিগন্ত জুড়ে ছড়িয়ে পড়বে। জানি, প্লাবনের জল সরে গেলে পর মৃত্যুকে অস্বীকার ক'রে চিক্কণ তৃণরেখা পুনরায় জীবনের উদ্ধত অহংকার ঘোষণা করে। কাজেই এই আকাশ আবার তোমার কিরণরাশির আশীর্বাদ নিয়ে যেমনি এসে দাঁড়াবে, তখনি এই মৃত্যুর আবরণ ভেদ ক'রে প্রাণের চঞ্চল বেগ চতুর্দিক থেকে উদ্যত হয়ে উঠবে। যে জীবন অনাদ্যন্ত এবং অমৃতাভিলাষী, তার বলিষ্ঠ, প্রখর, আহ্বান শুনতে পাব। কারণ, তখন তোমার সহস্র স্বর্ণালঙ্কারমণ্ডিত উদ্দীপ্ত আশ্চর্য মুখ নতনেত্রে সন্তানের দিকে তাকাবে। তখন আকাশ-জোড়া ঐ রৌদ্রে, জলস্নাত ঐ সতেজ শ্যামশ্রীর কম্পনে, দূরাগত ঐ বায়ুপ্রবাহে—মাগো, তোমার বাক্যহীন নীরব স্নেহ-স্পর্শ এই ক্লান্ত হৃদয়ের উপরে বর্ষিত হবে। তখন একথা সুনিশ্চিত যে, সমস্ত হতাশা ও অবসাদ অস্বীকার ক'রে, পুঞ্জ পুঞ্জীভূত সমস্ত ক্লেদ সরিয়ে দিয়ে নূতন জীবনের আমন্ত্রণ প্রবল ঘোষণায় এসে উপস্থিত হবে।

শ্বেতপাথরের আতস্-ঘড়ি,
ফাট্-ধরা তার চক্রটা,—
—আঙগুরী সরাবের ছোপ্ লাগানো,
পাথরে গাঁথা নক্সাকাটা চবুতরা,—
—জাল দিয়ে ঘেরা
হেলে পড়েছে অতল একটা ভাগানের বুকে,
রোদ হেলে এদিকটায় এবেলা ওবেলা
চাঁদ ঝলে এ পহর ও পহর॥

কাঁটায় কাঁটায় কাঁটাফুলে ভর্তি
মালঞ্চ এখন শুকিয়ে যাওয়া,
এখানে ওখানে দেখছি শুধুই
মালঞ্চের মালিকের মৎলবটাই,—
শেওলা-সবুজ সানে বাঁধানো চৌরাস্তা
একটু দেখা যায় এখনো,
দুটি ধারে পাতাঝরানো পারীজাত
আছে উদয় অস্ত আবোর ঘেরা একজাটি।

সময়ে অসময়ে বসন্তের স্বপ্ন দিয়ে বয় যেন
গুলরুঃ বাতাস পরীস্তানের,
হঠাৎ খুলে যেন দক্ষিণ দুয়ার শীতের রাত্রে
ফুলবোনা-কিংখাবের পর্দ্দার ভাঁজ সরিয়ে
এসে পেঁছিয় বাতাস
—সোনার পিঁজরাতে মাণিকে গড়া খেলনা বুলবুলির কাছে,
পরীস্তানের বুলবুল সে
ঘুম জানে না নেচেই চলে
বলে অবিরত পীও পীও পীও॥

* (শ্রীবীরেন্দ্র মল্লিকের সৌজন্যে)

আসামে কী হয়েছিল তার বিবরণ দিতে দিতে একটু হেসে দাদা বললেন বৌদিকে, "ওগো, মনুকে সেই গল্পটা বল। সেই যেটা শুনে এসেছি আমরা চা বাগানে।"

বৌদি দাদার দিকে চেয়ে একটু সলজ্জভাবে হাসলেন। বললেন, "কোন্ গল্পটা। সাত যোগিনীর গল্প? শুনবে, মনু? সে এক বিচিত্র গল্প।"

দাদার চোখে কৌতুকের আভা। এতক্ষণ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। আসামের পুঞ্জ পুঞ্জ ঘটনার ঘনঘটা। এইবার বিজলীর ঝিলিক খেলে গেল।

মনু বলল, "কামরূপে তো কোনো দিন যাইনি। গেলে ভেড়া বনে যাবার ভয়। দূর থেকে শোনাই নিরাপদ। শুনি বৌদির মুখে।"

দাদার দিকে আড়চোখে চেয়ে বৌদি বললেন সহাস্যে, "তোমার দাদা যখন ভেড়া বনে যাননি তখন তোমারও ভেড়া বনবার বয়স নেই, মনু। তুমিও একবার আসাম ঘুরে এলে পারতে। সত্যি, আশ্চর্য দেশ!"

আশ্চর্য দেশ সে কথা বলতে! ছেলেবেলায় একদল বাজীকর এসেছিল রাজবাড়ীতে। তাদের হাতে ছিল একটা হাড়। বলে "কাউঁরি হাড়"। সেটা চোখে ছুঁইয়ে দিতেই তিন তিনজন বাজীকরের তিন তিনজোড়া চোখের তারা সোনার গুলি হয়ে গেল। মনু ছিল সেখানে দর্শকদের সারিতে। বিশ্বাস না করে পারে! অমন একখানা কাউঁরি হাড় তারও চাই। খোঁজ নিয়ে জানতে পেলো কাউঁরি হচ্ছে কামরূপী। কামরূপ হলো কুহকের দেশ। ওরা যে কেব[illegible] ভেড়া বানায় তা নয়। সোনাও বানায়।

এর পর দু'চার ক[illegible]র পর বৌদি বলতে আরম্ভ করলেন—

আসামে যাবার ক[illegible] আমরাও কোনোদিন ভাবিনি। কিন্তু [illegible]সেইসব মর্মান্তিক ঘটনার খবর শুনে [illegible]চুপ করে থাকতে পারলুম না। চুপ ক[illegible]র উল্টোটা হলো মুখ খোলা। সেটাও [illegible]মরা করলুম না। নিঃশব্দে উপস্থিত [illegible]লুম ঘটনাস্থলে। যা দেখবার দেখলুম, [illegible] শোনবার শুনলুম, যা করবার তা স[illegible]থামতো করলুম। অবস্থা কতকটা শান্ত [illegible]লে মনে হলো। তাই স্বস্থানে ফিরে[illegible] জানিনে কদিনের জন্যে। শান্তিসেনার [illegible] কর্মীরা সব সময় প্রস্তুত।

পদযাত্রার প[illegible] পড়ল একটা চা বাগান। ওড়িশা[illegible] থেকে আমরা এসেছি শুনে বাগা[illegible] ওড়িয়া ভাইবোনেরা আমাদের [illegible]টক করল। একটা দিন কাটাতে হ[illegible] ওদের বসতিতে। ওদের সর্দারের [illegible]।

সর্দা[illegible]র নাম বিদ্যাধর। বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ [illegible]ঙ্গী বললে আমরা যা মনে করি তা নয়। আসামে বসবাস করছে দু'কুড়ি বছরের উপর। আর দেশে ফিরে যায়নি। কেন য[illegible]ব? কিসের অভাব? সোনার দেশ আসাম [illegible] জবরজারি এড়াতে পারলে লক্ষ্মী [illegible]চলা হয়ে বসেন। বিদ্যাধরের লক্ষ্মীমন্[illegible] অবস্থার সাক্ষ্য চারদিকে।

লক্ষ্য [illegible]করলুম ওর দুই বৌ। একটি আরেকটির চেয়ে অনেক ছোট। দু'জনে মিলে মিশে বেশ আছে। আর চার হাতে স্বামীর সেবাযত্ন করছে। বিদ্যাধরকে কিছু মুখ ফুটে চাইতে হয় না। দুই মহাবিদ্যা সব আপনি হাজির করে দেয়। আরামে আছে বিদ্যাধর। দুই সতীনে এমন সদ্ভাব কখনো দেখিনি।

একটু পরিহাস করে বললুম, "দুই রানী নিয়ে আনন্দে রাজত্ব করছ বিদ্যাধর। বাপ পিতামহর ভিটেমাটি তোমার মনে পড়বে কেন?"

বিদ্যাধর যেন বিনয়ের অবতার। হাত জোড় করে বলল, "আপনারাই আমার গর্ভধারী পিতামাতা। আপনারা বিচার করে বলুন কোন্‌খানে আমার অপরাধ হলো।"

তা শুনে উনি বললেন, "কামরূপে এলে ভেড়া বনে যায় তা কি এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া যায়, বিদ্যাধর? দু'কুড়ি বছর তুমি দেশে যাওনি। তার কারণ কি এই নয় যে, কামরূপের দুই কন্যা তোমাকে ভেড়া বানিয়ে রেখেছে? ওরা যে কাউঁরি বিদ্যা জানে তা তো প্রত্যক্ষ দেখছি।"

এর উত্তরে বিদ্যাধর যা বলল, তার মর্ম তার বৌ দুটি অসমীয়া নয়, উৎকলীয়া। বিদ্যাধর তাদের দেশ থেকে নিয়ে আসেনি, পেয়েছে আসামেই। বহুকাল হতে ওড়িয়াদের একটি সমাজ রয়েছে বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন চা বাগানে। জাতের বিচার নেই। দেশে ফিরে গেলে তো আবার জাতে উঠতে হবে। এদের ও এদের ছেলেমেয়েদের কী দশা হবে! আসামের চা বাগানই সত্যিকার শ্রীক্ষেত্র।

একটু একটু করে বিদ্যাধর তার আত্মকাহিনী শোনায়।

জন্ম তার কটকের দক্ষিণে এক গ্রামে। বাপ সৎচাষী। হাল-লাঙল চারখানা।

ছেলের বয়স যখন বারো কি তেরো বছর বাপ ধরে বসল তার বিয়ে দেবে। শারিয়া বলে একটি "টোকি"র সঙ্গে। বিয়েতে কন্যাপণ কম লাগে, যদি খুকীর সঙ্গে হয়। নইলে খরচ বাড়ে।

মা বলে, "বাপের কথা শোন্। বিয়ে কর শারিয়াকে।" ঠাকুমা বলে, "বাপের কথা শোন্। শারিয়াকে বিয়ে কর।" পাড়ার লোকেরও সেই পরামর্শ। কিন্তু বিদ্যাধর ওকে বিয়ে করবে না। কাউকেই বিয়ে করবে না। বাবাজী হবে। বাবাজীদের উপর তার প্রগাঢ় ভক্তি। তাঁদেরি একজন না হতে পারলে জীবন বৃথা।

বারো বছর বয়সের সেই বালক একদিন বাড়ী থেকে পালিয়ে গেল। সে বয়সে মনে হতো অতি সুদূর। প্রায় বিদেশ বললেও চলে। কটক জেলারই উত্তরাংশে ছতিয়া গ্রামে। সেখানকার মঠ প্রসিদ্ধ। দেখেছ কখনো? ছেলেবেলায় দেখেছ।

সেই সুদর্শন বালকটিকে ছতিয়ার মোহন্ত মহারাজ স্নেহভরে আশ্রয় দিলেন। কিন্তু দীক্ষা দিলেন না। বললেন দীক্ষার বয়স হয়নি। আগে সৎ অসৎ বিচারবুদ্ধি হোক। বিদ্যাধর সাধুসেবা করে। সাধুদের মুখে বড় বড় তত্ত্বকথা শোনে। প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে শেখে। বই পড়তে হয় না শিক্ষার জন্যে।

চার পাঁচ বছর পরে কেন জানে না মোহন্ত মহারাজ তাকে হঠাৎ ডেকে পাঠালেন। বললেন, "বিদ্যাধর, তুমি ইন্দুমতীকে বিয়ে কর।"

হতভম্ব হলো বিদ্যাধর। সে কি কোনো অপরাধ করেছে না জেনে? কই, কখনো তো কোনো বালিকার দিকে চুরি করে তাকায়নি।

মোহন্ত মহারাজ তাকে আরো কয়েকবার এই কথা বলায় সে বিদ্রোহ করল। বলল, "বিয়ে করতে মন নেই বলে বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছি বাপ-মাকে কাঁদিয়ে। বিয়ে যদি করতে হয় তো বাড়ী ফিরে যাব না কেন?"

মহারাজ তাকে কিছুতেই বাগ মানাতে পারলেন না। মঠে একজন মহাস্থবির ছিলেন। তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তিনিও বললেন, "বিদ্যাধর, তুমি ইন্দুমতীকে বিয়ে কর। মহারাজের অবাধ্য হোয়ো না।"

বিদ্যাধর নত হলো না। বলল, বাবাজী হবার জন্যেই আমি এখানে এসেছিলুম। সংসারী হবার জন্যে নয়। দীক্ষা না দিয়ে বিয়ে দেওয়া হবে জানলে কি আসতুম আমি এখানে?

মহাস্থবির [illegible]লেন, "বিদ্যাধর, কার পক্ষে কোন[illegible] [illegible] সে শুধু আমরাই জানি। কা[illegible] [illegible]ক্ষা দিই। কারো বিবাহ দিই। তুমি [illegible]দের শরণ নিয়েছ। আমরা তো[illegible] সাধনার পথ নির্দেশ করছি। অম[illegible] [illegible]নুকূলে সহচরী আর পাবে না। [illegible] তোমাকে নামাবে না। বরং তুলবে। ওই[illegible]ড়।"

তখন বি[illegible]াধরের কতই বা বয়স। সে বুঝতে পার[illegible] না এসব কথার মানে কী। আর ইন্দুম[illegible] তো বয়সে আরো ছোট। কো[illegible] তার চেয়ে বড়?

বিদ্যা[illegible] [illegible]কে প্রণাম করে বলল, "আমাকে [illegible] [illegible]তি দিতে আজ্ঞা হোক। আমি বিদায় [illegible]য় চলে যাই।"

মহাস্থবির জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় যাবে [illegible]? জন্মদাতার কাছে?"

বিদ্যাধর উত্ত[illegible] দিল, "না মহারাজ। দীক্ষাগুরুর খোঁজে।"

সাধুবাবা ক্রুদ্ধ [illegible]য়ে বললেন, "তোকে সাত যোগিনীতে খা[illegible]ব।"

বিদ্যাধর ভয়ে [illegible]ঠ হয়ে গেল। এ কী মারাত্মক অভিশাপ [illegible]দিলেন মহারাজ! এ যদি সত্যি হয় তা [illegible]লে কি সে বাঁচবে! ডাকিনী যোগিনী[illegible]র সম্বন্ধে তার আতঙ্ক ছিল। ছেলে বেলা থেকেই সে শুনে আসছে লো[illegible]ক যার উপর দারুণ রাগ করে তাকে বলে তোকে যোগিনীতে খাক। তোকে ডাকি[illegible]তে খাক। পাজী হতভাগা বদমায়েস[illegible] বলে 'যোগিনী-খিয়া' বলে গালাগা[illegible] দেয়। তার বাঁকা অর্থ শ্মশানের মড়া[illegible]

"মহারাজ, এত ব[illegible] অভিশাপ আমাকে দিলেন!" বিদ্যাধর তা[illegible] পায়ে ধরে বলল।

মহারাজ রহস্যময় [illegible]রে বললেন, "না রে, তা নয়। সে তুই প[illegible] বুঝবি।"

বিদ্যাধরকে এর প[illegible] আর খুঁজে পাওয়া গেল না। না কটক [illegible]জেলায়, না ওড়িশায়। কলকাতায় সে এ[illegible] পান্ডার পাল্লায় পড়ে। পান্ডা বলে, [illegible] কামাখ্যা-দেবীর নাম শুনেছ? চল, আমি তোমাকে কামাখ্যা তীর্থে নিয়ে যাব। সেখ[illegible] বহু সাধু-সন্ন্যাসী দেখবে। সদ্গুরুর [illegible]শন পাবে। এই জন্মেই মুক্তি লাভ কর[illegible]।

লোকটা ছিল আসলে এক আড়[illegible]ঠি। চা বাগানের জন্যে কুলী পাক[illegible]াত। কামাখ্যাদেবীর মন্দির দেখিয়ে তার পরে চা বাগানে চালান দিত। বিদ্যা[illegible] অত জানত না। মন্দির দর্শন করতে [illegible]য় সে পান্ডাকে জিজ্ঞাসা করল, "এরা [illegible]?"

পান্ডা বলল, "অষ্টাদশ [illegible]ভৈরব ও চৌষট্টি যোগিনী।"

যোগিনী শুনে বিদ্যাধর ভয়ে বিবর্ণ। চম্পট দিতে যাচ্ছিল, পান্ডা তাকে যেতে দিল না। বাসায় নিয়ে গিয়ে সিদ্ধি খাইয়ে বেহোঁশ করে রাতারাতি পার করে দিল চা বাগানে। পরের দিন থেকে সে কুলী।

সেকালে সাহেব মালিকদের দোর্দণ্ড প্রতাপ। একবার কুলী হয়ে ঢুকলে আর উদ্ধার নেই। তবে উন্নতি আছে। উঠতে উঠতে সর্দার হতে পারো। যতবার খুশি বিয়ে করতে পারো। দুটি তিনটি বৌ থাকলেও ক্ষতি নেই। বরং তাতেই লাভ। ওরাও তো খাটে।

কী আর করবে বিদ্যাধর। যার অদৃষ্টে যা লেখা আছে তাই তো হবে। সৎচাষীর ছেলে সে। গ্রহের দোষে চা-বাগানের কুলী। একেবারে তলা থেকে শুরু হলো তার নূতন জীবন। পূর্ব-পুরুষের সুকৃতের ফলে সে ধীরে ধীরে উপরে উঠল। বরাতে ছিল, তাই একদিন সর্দার হলো। এর মধ্যে এলো ধর্মঘটের যুগ। বিদ্যাধর অটল। সে থাকতে ধর্মঘট হবার জো আছে? মালিকরা তাই তাকে কত সমীহ করেন। সর্দারজী বলে ডাকেন। বিস্তর উপহার, বিস্তর পুরস্কার পেয়েছে। জমিজমা হালগরু হাঁস-মুরগী কোনো কিছুর অভাব নেই। না, মুরগী বা তার ডিম নিজে খায় না। হুজুরদের ভেট পাঠায়।

ওদিকে সাধুবাবার সেই অভিশাপ তো না ফলে যায় না। সিদ্ধপুরুষ তিনি, অব্যর্থ তাঁর বাক্য। হাঁ, সাত যোগিনীতে তাকে খেয়েছে। সাত সাতবার তার বিয়ে হয়েছে। সকলের বড় আর সকলের ছোট এই দুটি বৌ তাকে ছাড়েনি। আর পাঁচটি তাকে ছেড়ে যে যার পতি নিয়ে ঘর করছে। সেও বেঁচেছে। এই যে বড়টি এটা তাকে বড় ভালোবাসে। আর এই [illegible] ছোটটা, এটাও বুড়ো হাড়ে কী যে সোয়াদ পায়! কাঁচ হাড়ের মায়ায় মজে না। এরা তাকে চিবিয়ে চিবিয়ে নিঃসত্ত করে দিয়েছে। বেঁচে আছে তবু সে এদের জন্যেই। এদেরি হেফাজতে।

এখন তাকে "যোগিনীখিয়া" বলে গালমন্দ দিলে তার বোধহয় মিষ্টিই লাগবে। ভেড়া বানানো হয়েছে বললেও সে বোধকরি মানহানির মামলা আনবে না। এরা কিন্তু কেউ কামরূপিণী নয়। সাতজনেই উৎকলিনী। তা কামরূপিণী নয়ই বা কেন? কামরূপে জন্ম, কাম-রূপেই অবস্থান। এরাও কামাখ্যাদেবীর মন্দিরগাত্রের যোগিনীমূর্তি।

শেষেরটুকু বৌদির উক্তি নয়। দাদা তাঁর মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে সমাপ্ত করে দেন। মাঝে মাঝে কণ্ঠক্ষেপ যে না করেছেন তা নয়। রসের কথা বৌদির

মুখে বেধে যায়। দাদা তখন পাদপূরণ করেন।

মনু এতক্ষণ নীরবে শুনছিল। গল্পটা সত্যি বিচিত্র। কিন্তু কেমন যেন তার মনে হচ্ছিল কাহিনীটা তার অজানা নয়। তারই কোনো এক বন্ধুর জীবনের সঙ্গে প্রচ্ছন্ন মিল আছে। একটু একটু করে মনে পড়ছিল সেই বন্ধুটির জীবনকাহিনী। যতটুকু তার অবিদিত নয়।

"বৌদি", মনু বলল তারিফ করে, "খাসা গল্প! বিদ্যাধরের নিয়তি তাকে টেনে নিয়ে যায় কামরূপে, যাতে ত্রিকাল-দর্শী সিদ্ধপুরুষের ভবিষ্যদ্বাণী সিদ্ধ হয়। চমৎকার! অপূর্ব!"

গয়লানী যেমন নিজের দইয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, বৌদিও তেমনি নিজের গল্পের। "এমন গল্প কেউ কখনো শোনেনি। অদ্বিতীয়!"

"না, বৌদি," সবিনয়ে নিবেদন করল মনু, "অদ্বিতীয় নয়। এর জুড়ি আছে। শুনতে চাও তো শোনাতে পারি।"

বৌদি বললেন, "অবাক করলে, মনু। সাত যোগিনীর জুড়ি আছে?"

দাদা টিপে দিলেন, "এবার সাত যোগিনী নয়, সাত ডাকিনী।"

মনু বলল, "আগে থেকে ফাঁস করছিনে। শোন সবটা।"

কলেজে একটি নতুন ছেলে এলো। মনুর নিচের ক্লাসে। কেমন করে আলাপ হয়ে যায়। মনুর কাছ থেকে কন্টিনেন্টাল উপন্যাস নিয়ে পড়ে। রোমান্টিক ভাবে ভরপুর। একদিন তো জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকতে থাকে, "সাবিন! ও সাবিন!" রমাঁ রলাঁর উপন্যাসের অন্যতম নারী চরিত্র।

ছেলেরা তাকে ক্ষ্যাপায়, "সাবিন! ও সাবিন!" কেউ কেউ তাকে সেই নামেই ডাকতে শুরু করে দেয়, "ওহে সাবিন! কেমন আছো হে?" সে যে তাতে অখুশী তা নয়। তার স্বভাবটা ঠাণ্ডা। সে কখনো রাগে না। তার চোখ দুটি আয়ত। চোখের তারা ভাবময়। তার অর্ধেক সৌন্দর্য তার চোখে। সে যেন জেগে স্বপ্ন দেখছে। বাস করছে উপন্যাসের লোকে।

পরিচয় যখন ঘনিষ্ঠ হলো তখন সে তার বাল্য-প্রণয়ের কাহিনী শোনাল মনুকে। মেয়েটি তাকে কথা দিয়েছিল যদি বেঁচে থাকে বিয়ে করবে। কিন্তু দুঃসাধ্য রোগ। জলের মতো টাকা খরচ করেও বড়লোক বাপ তাকে ধরে রাখতে পারলেন না। সেই থেকে সলিলের অন্তরে-বাইরে বিষাদ। বাইরের বিষাদ কালে কমবে, অন্তরের [illegible] অক্ষয়। সারা জীবন এ বিষাদ [illegible] করে চলবে। বিয়ে করবে না।

বছর কয়েক পরে [illegible] আবার তার সঙ্গে দেখা। মাঝখানে [illegible] অদর্শন। বলল, "বিলেত আসার খরচ [illegible] জোটাতে পারছিলুম না। এক ভদ্রলোক দয়া করলেন এই শর্তে যে, তাঁর [illegible] তিনটি মেয়ের থেকে একটিকে বিয়ে করতে হবে। বড়টি সবচেয়ে বুদ্ধিমতী, ছোটটি সবচেয়ে রূপবতী। আর মেজটি [illegible] নরম স্বভাবের। সংসারে শান্তি [illegible] এমনি শান্তপ্রকৃতির বধূই শ্রেয় [illegible] বল, মনুদা?"

টাকার জন্যে বিয়ে [illegible] মনুর আন্তরিক আপত্তি ছিল [illegible] নীরবে প্রতিবাদ করল।

বিলেতে সলিল মাসে [illegible] একবার করে প্রেমে পড়ে। সব প্রেম নিকষিত হেম নয়। গন্ধটা বন্ধুদের নাকে যায়। সলিলকে নীরবে ভর্ৎসনা করলে সে ভিজে বেড়ালটির মতো বলে, "আমি কী করব। ওরাই আক্রমণশীলা।" চড় মারতে ইচ্ছে করে। কিন্তু এমন করুণ দুটি চোখ যার তার গালে চড় মারবে কোন্ পাষাণ! সম্পর্ক কাটানো উচিত ছিল, কিন্তু মনু তার বন্ধুদের কখনো ছাড়ে না। সুমতির জন্যে প্রতীক্ষা করে।

"তোমার বৌ আছে," মনু বলে, "সে কী মনে করবে!"

"বিয়ে ত করছিনে। আমার নীতি হচ্ছে এক স্ত্রী, এক সন্তান।" সলিল উত্তর দেয় অবিচল প্রত্যয়ের সঙ্গে। ইংরেজীতে বলে, "ওয়ান ওয়াইফ। ওয়ান চাইল্ড।"

হাসি পায় মনুর। "এক স্ত্রী বেশ কথা। এক সন্তান কেন?"

সলিল লোকটি হিউমার বর্জিত। গম্ভীরভাবে বলে, "ঐ একটিই যথেষ্ট। পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা বড় বেশী বেড়ে গেছে। আমাদের প্রত্যেকেরই শপথ নেওয়া উচিত যে একটি সন্তানেই সন্তুষ্ট হব।"

আরো বছর কয়েক অদর্শন। তার পর আকস্মিকভাবে পাশাপাশি তাঁবুতে একসঙ্গে থাকা। মনু সপরিবারে হিমালয় থেকে ফিরছিল। সলিল একটি তহশিলে ক্যাম্প করছিল। সেও সপরিবারে। শুধু স্ত্রী নয়, স্ত্রীর কোলে একটি পুত্রসন্তান। এই তো কেমন "ওয়ান ওয়াইফ ওয়ান চাইল্ড।"

মনু খুশী হয়ে বলে, "তুমি তোমার কথা রেখেছ, সলিল। তুমি নিশ্চয় সন্তুষ্ট। তবে তোমার স্ত্রী সন্তুষ্ট হবেন কি না এখন থেকে বলা শক্ত।"

"নো মোর। নো মোর।" সলিল বলে দৃঢ়তার সঙ্গে।

মনু লক্ষ্য করল যে, সলিলের স্ত্রী মোতির সঙ্গে তার বোন পান্নাও এসেছে ক্যাম্পে। এই সেই রূপসী ছোট বোন। মেয়েটি চুপচাপ থাকে। বড় একটা বার হয় না। এখনো বিয়ে হয়নি। পড়াশুনো করছে, কিন্তু এ সময় কলেজে হাজিরা না দিয়ে তাঁবুতে বসে আছে কেন বোঝা যায় না। ক্যাম্প তো সারা শীতকাল চলবে।

মনু এ নিয়ে কাউকে কোনো প্রশ্ন করেনি। একদিন সন্ধ্যাবেলা সলিলই প্রসঙ্গটা তুলল। নির্জন পথে বেড়াতে বেড়াতে। বলল "মনুদা, তোমাকে একটা বিষয়ে একটু সাহায্য করতে হবে। পান্নাকে শান্তিনিকেতনে পাঠাতে চাই। এ দেশে ওর পড়াশুনো হবার নয়। জানো না বোধহয়, ওর বাবা মারা গেছেন, কিছুই রেখে যাননি। তোমাকে বলিনি যে আমাকেও তিনি ফাঁকি দিয়েছেন। বিলেতে খরচ দেননি। বন্ধুদের কাছে ধার করে চালাতে হয়েছে। এবার ধীরে ধীরে শুধছি। এ রকম হবে জানলে কি বিয়ে করতে রাজী হতুম কখনো? এ বিবাহ প্রতারণামূলক?"

মনু তাকে বলতে পারত যে টাকার জন্যে বিয়ে করতে যাওয়াটাই অন্যায় হয়েছে। কিন্তু তাতে তার সমস্যার সমাধান হতো না। বলল, "বিয়ে যখন হয়ে গেছে একবার তখন আর নড়ন চড়ন নেই। মোতির কী দোষ! খোকনের কী দোষ! এদের তুমি সাজা দিতে চাও না নিশ্চয়। ভাই সলিল, এ ভুল শোধরানো যায় না। একে ঠিক-এ পরিণত করতে হবে।

এমনভাবে জীবনটা কাটাতে হবে যাতে ভুল হয়ে যাবে ঠিক।"

সলিল মেনে নিতে নারাজ। বলল, "তা হলে প্রতারকেরই জয় হবে। ওঃ সে যে কী জঘন্য প্রবঞ্চক তা তুমি কল্পনা করতে পারবে না, মনুদা। আমি স্বপ্নচারী মানুষ, কী করে জানব কার মনে কী আছে! লোকটা ছিল এক দেশীয় রাজ্যের দেওয়ান। রাজার নাবালক অবস্থার সুযোগ নিয়ে বহু ধন-রত্ন সরায়। শুধু কি তাই! মৃত রাজার রানীদেরও ভোগ করে। স্ত্রী আত্মঘাতিনী হন। কলকাতায় ওর প্রাসাদ আছে, তবু ওর ছোট মেয়ে পান্নাকে হতে হয় মেজদির গলগ্রহ। একেই বলে আয়রনি অফ ফেট।"

"একটু আগেই তো বললে কিছুই রেখে যাননি।" মনু মনে করিয়ে দিল।

"মেয়েদের জন্যে কিছুই রেখে যাননি। কিন্তু উপপত্নীদের জন্যে সর্বস্ব উৎসর্গ করে গেছেন। আমি তখন বিলেতে। কেমন করে জানব যে তিনি তাঁর পাপের সম্পত্তি প্রায়শ্চিত্তে নিয়োগ করে যাচ্ছেন। মোতিটা এক নম্বর বোকা। জানত না, জানায়নি। জানালেই বা আমি করতুম কী ছাই। কেরিয়ার নষ্ট করে দেশে ফিরে আসতুম না নিশ্চয়। সামান্য কিঞ্চিৎ অলঙ্কার ও নগদ কিছু টাকা রেখে গেছেন হীরা-পান্নার জন্যে। তা দিয়ে আজকাল একটা কেরানীর সঙ্গেও বিয়ে হয় না। এই দুই উচ্চাভিলাষিণীর এখন কী উপায়।"

"আপাতত পড়াশুনা। তার পর চাকরি।" ফতোয়া দিল মনু।

"হীরাদি সেই চেষ্টায় আছে। ও পারবে। কিন্তু পান্নার কেবল রূপই সার। ওর পড়াশুনায় চাড় আছে বলে মনে হয় না। শান্তিনিকেতনে গেলে হয়তো বিয়ের সুরাহা হবে। নাচতে গাইতে ছবি আঁকতে শিখলে ভালো বিয়ের সম্ভাবনা। আর চাকরি? ও মেয়ে কোনো দিন চাকরি করবে! ও যে দেওয়ানের মেয়ে! কলকাতায় ওদের প্রাসাদ আছে। যদিও সেখানে প্রবেশ নেই।" সলিল বলল সখেদে।

মনু ভেবেছিল কথাবার্তা সেদিনকার মতো শেষ। তা নয়। হঠাৎ ফস করে বলে বসল সলিল, "মনুদা, পানুকে বাঁচাতে চাও তো ওকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে যাও।"

মনু চমকে উঠল। সে যা ভয় করেছিল তাই। সলিল স্বীকার করল যে পান্নার দিক থেকে ভাবনার কারণ আছে। ও মেয়ের চোখে মুখে কামনার শিখা জ্বলছে। তাতে পুড়ে খাক হচ্ছে ওর নিজে[illegible]রি। মাসের অর্ধেক দিন বিছা[illegible]য়ে থাকে। একটা না একটা অসু[illegible]ক্তার ওষুধ দিয়ে যায়। জোর করে [illegible]লে বমি করে দেয়। অসুখটা যে আ[illegible]লে কী তা এতদিনে ধরা পড়ে গেছে[illegible] মোতি বেচারি বোনকে নিয়ে করবে কী! কাছে রেখে সোয়াস্তি নেই। দূরে পাঠালে কে জানে কী করে বসবে। আত্মী[illegible]রা খুবই গরিব। তাদের সংসারে পান্না[illegible] মতো অভিজাতকন্যার মানাবে [illegible]

[illegible] নির্বোধের মতো বলল, "বেশ তো। [illegible] মেয়ে কাকে ভালোবাসে তা জেনে [illegible]স ওর বিয়ে দিয়ে দাও।"

"ও [illegible]য়ে কাকে ভালোবাসে তা কি তুমি টের [illegible]ওনি, মনুদা?" সলিল বলল দীর্ঘনিঃশ্[illegible] ফেলে। "যাকে ভালোবাসে তার সঙ্গে [illegible] দিয়ে দেবার জো আছে?"

মনুর [illegible]চোখ থেকে পর্দা সরে গেল। সে স্তম্ভিত হয়ে বলল, "বুঝেছি।"

সেদিন [illegible] ছোট ভাইটিকে বিস্তর হিতোপদেশ [illegible]দিল মনু। বলল, "শান্তিনিকেতনে [illegible]চিঠিপত্র লেখ। কিন্তু জুলাইয়ের আ[illegible]গে ওরা ভর্তি করবে না। ততদিন সাবধ[illegible]ন থেকো। এই ক'টা মাস তুমি ঠিক থা[illegible]কতে পারলে হয়। বিয়ে করে যে ভুল করেছ সে ভুল একদিন ঠিক হবে। কি[illegible]ন্তু এ ভুল কখনো ঠিক হবে না। কা[illegible]জেই তোমাকে প্রাণপণে ঠিক থাকতে হবে।"

এর দু[illegible]'চারদিন পরে মনু চলে গেল নিজের জা[illegible]য়গায়। চাকরির ধান্দায় সলিলের ক[illegible] ভুলে গেল। শান্তিনিকেতনে খোঁজ[illegible]খবর নেওয়া হলো না। এক মুহূর্ত অ[illegible]বসর থাকলে তো!

মাস কয়েক [illegible]র কার সঙ্গে যেন দেখা হয়ে যায় ক[illegible]লকাতায়। কে যেন তাকে একটা মুখরো[illegible]চক সংবাদ শোনায়। "ওহে তোমার বন্ধু স[illegible]লিলের যে আবার বিয়ে হয়ে গেল। জানো [illegible]না? কালীঘাটে লুকিয়ে বিয়ে। শালীর [illegible]সঙ্গে। না করে নাকি উপায় ছিল না।"

তার মানে? তার মা[illegible]নে পরিষ্কার হলো আরো কয়েক মাস বা[illegible]দে। পান্নারও একটি পুত্রসন্তান হয়েছে। সলিলের ও মনুর উভয়ের বন্ধু বিমল। সেই জানায় মনুকে। সমর্থন করতে বলে তাকে। মনু বলে, "না। সমর্থন ক[illegible]রব না। তবে করুণা করব।'

তা শুনে সলিল বা[illegible] চটে। করুণা! বন্ধুর কাছে করুণা! তা সে গ্রহণ করবে না। দুই বিয়ে কি কেউ কোনো দিন করেনি? ওটা এমন কী একটা মারাত্মক অপরাধ যে বন্ধুও বাম হবে! মনুও তাকে মনে করিয়ে দেয় না তার নিজের উক্তি "ওয়ান ওয়াইফ ওয়ান চাইল্ড।" বন্ধুমহলে ওর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে শালিবাহন রাজা বলে। সলিল নানাসূত্রে ওটা শুনে থাকবে। নইলে চিঠিপত্র লেখা একদম বন্ধ করে দেবে কেন? মনুও চিঠি লেখে না। লিখতে রুচি হয় না। তার হিতোপদেশ মাঠে মারা গেছে।

বছর কয়েক পরে কানে এলো সলিল আবার বিয়ে করেছে। কাকে? বড় শালীকে? সেই বা কেন বাকী থাকে? না, তাকে নয়। সম্পূর্ণ অন্য একটি পরিবারে। এবার সবাইকে নিয়ে এক অন্নে থাকা নয়। শ্বশুর মশায় কড়া হাকিম। তিনি কড়ার করিয়ে নিয়েছেন যে প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষকে ঘর থেকে বিদায় করে দিতে হবে, কোনো দিনই ঘরে ঢুকতে দেওয়া হবে না। এবং কোনো-কালেই ওদের কাছে যাওয়া বা ওদের সঙ্গে মেশা চলবে না। সলিল অবশ্য ওদের খোরপোষ পাঠায়। ওরা থাকে দূরে একটা শহরে একই ভাড়াটে বাড়ীতে।

শালিবাহন রাজার আজব বিচার। মনু তাজ্জব বনে। এমন লোকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে কে? কিন্তু মনু তার বন্ধুদের কখনো ত্যাগ করে না। কে জানে একদিন হয়তো সলিলের সুমতি হবে। কিন্তু সুমতি হলেই বা হবে কী? একজনকে সুখী করতে গেলে তো আর দুটিকে অসুখী করতে হবেই। তালাক দিলেই বা তারা যাচ্ছে কোথায়! দ্বিতীয় বিবাহের কতটুকু সম্ভাবনা! তার পর ওই নিরীহ শিশুগুলি?

মাকে আর বাবাকে একসঙ্গে না পেলে কি আনন্দ হয়? বাপ থাকতে বাপের কাছে যেতে পারে না, এ কী ভয়ানক দণ্ড! সেকালের ধ্রুব একালে জন্মেছে। ট্র্যাজিক।

তা হলেও মনু তার বন্ধু সলিলের বিচার করবে না। একজন মানুষের বিচার আরেকজন মানুষ করতে পারে না। মানুষ কোন্ অবস্থায় পড়ে কী করে তা একমাত্র বিধাতাই জানেন, বিচার করবেন তিনিই।

মনু আপনার কাজে মন দেয়। শিব ঠাকুরের তিন বিয়ের প্রসঙ্গ এড়িয়ে যায়। কিংবা গম্ভীরভাবে বলে, "একটা ভুল শোধরাতে গিয়ে আরেকটা ভুল করা ইতিহাসে এই প্রথম নয়। আশা করি এই শেষ। পারো তো ওর জন্যে প্রার্থনা কর।"

তাঁবুতে সেই যে দেখা হয়েছিল তার পরে আবার দেখা হয় আট নয় বছর বাদে পাটনায়। গভর্নরের শাসন। সলিল তাঁর দক্ষিণ হস্তের দক্ষিণ হস্ত

বললেও চলে। একরাশ শত্রু সৃষ্টি করেছে কংগ্রেসে ও সরকারী মহলে। সমাজেও কেউ ওর পক্ষে নয়। এমন লোকের অতিথি হতে সাধ করে কে চায়। তবু হতেই হলো অনিবার্য কারণে। একদিনের জন্যে। সপরিবারে। সলিল কিন্তু কথা শুনল না, আটক করল তিন চার দিন।

পদবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মেদবৃদ্ধি ঘটেছে। অমন যে সুশ্রী সুপুরুষ তার দিকে তাকাতে গেলে চোখ ধাক্কা খায়। চুল কাঁচা পাকা। বয়স ছত্রিশ সাঁইত্রিশ বছর বলে বিশ্বাস হয় না। ভাবপূর্ণ ওই যে দুটি চোখ ওতে উচ্চাভিলাষের সলতে জ্বলছে, আর প্রতিফলিত হচ্ছে একটি ঘোর বাস্তববাদী কাজের লোকের আত্মা। কথাবার্তায় মালুম হয় না যে ষোল সতেরো বছর আগে সে ছিল এক স্বপ্নচারী তরুণ।

বৌটিকে দেখতে তার মেয়ের মতো। কচি বয়সে বিয়ে হয়েছে। মা হয়েছে। সুন্দরী। সপ্রতিভ। সামাজিক গুণ-সম্পন্ন। কোথায় যেন লাট সাহেব ওদের অতিথি হন। সাহেবকে সাহেবী কেতায় আপ্যায়ন করে। কেউ কোনো খুঁৎ ধরতে পারে না। তবে স্টেশনের মহিলারা হিংসায় নিন্দাবাদ করেন।

সলিলের পূর্বজন্মের প্রসঙ্গ সে নিজেও পাড়ে না, মনুও না। মোতি-পান্না এখন আর কেউ নয়। শুধু খোর-পোষের অধিকারী। পুরোনো চাকরকেও তো মনিবেরা পেন্‌সন দেন। জানতে ইচ্ছা করে ছেলে দুটোও কি কেউ নয়? শুধু আর্থিক সাহায্যের অধিকারী?

"যাক, এরা চারজনে তো সুখে আছে। জগতে ওই চারজনের দুঃখটাই কি চরম? এই চারজনের সুখ কিছু নয়?" মনু বলে তার গৃহিণী কেতকীকে। কেয়াকে।

"না। এরাও খুব সুখে নেই। সলিল ভিতরে ভিতরে ভেঙ্গে যাচ্ছে। লক্ষ্য করেছ কি না জানিনে, ওর চোখে অপূরণীয় অফুরন্ত কামনা। রত্নার জন্যে ভাবনা হয়। সে কি পারবে এই হুতাশনকে তৃপ্ত দিতে? শুধু কড়া শাসনে রাখলেই কি পুরুষ বশ মানে!" কেয়ার কথাগুলো মনুকেও বিঁধল।

"ভিতরে ভিতরে ভেঙ্গে যাচ্ছে সেজন্যে নয়," মনু ভেবে বলে, "আর দুটি ছেলেকে দেখতে পাচ্ছে না, মানুষ করতে পারছে না বলে। রত্না যদি শাসনটা একটু শিথিল করত তা হলে এই ভাঙনটা রোধ করা যেত। কিন্তু শিথিল করবে সে কোন্ সাহসে? ও কি শুধু ছেলেদের দেখতে গিয়ে সেইখানে ক্ষান্ত হবে?"

যে সমস্যার সমাধান নেই তা [illegible] কাঁহাতক মাথা ঘামানো যায়। মনু [illegible] ছেড়ে দেয়। দূর থেকে শুভে[illegible] জানায়।

কংগ্রেস আবার গদি ফিরে [illegible] সলিল কিংবা তার চীফ বো[illegible] হিসাবের মধ্যে আনেননি। চীফ চলে[illegible] দিল্লী। সলিলও চলল তাঁর সঙ্গে[illegible] দিল্লীতেও একটা পটপরিবর্তন আস[illegible] হলো। বড় বড় ইংরেজভক্তরা রাতারাতি কংগ্রেসভক্ত বনে গেলেন। অথবা লী[illegible] ভক্ত। বেধে গেল কংগ্রেসের সা[illegible] লীগের। তখন ভক্তরাই হলেন দু'পা[illegible] লেঠেল। যে যতবেশী সাম্প্রদায়িক [illegible] ততবেশী পেয়ারের। সলিল আ[illegible]ই হোক সাম্প্রদায়িক নয়। রাতারাতি [illegible]ল ফিরিয়ে সাম্প্রদায়িক হতে অনিচ্ছু[illegible]।

দেখতে দেখতে দেশ [illegible] গেল দুভাগ। আর চরমে উঠল [illegible] দাঙ্গা-হাঙ্গামা। সলিল এর জন্য প্র[illegible]স্তুত ছিল না। হতভম্ব হলো।

যারা আইন ভঙ্গ করবে [illegible]রা সাজা পাবে। এই হলো তার শিক্ষা ও সংস্কার। যারা আইন ভঙ্গ করেনি তা[illegible] শুধুমাত্র মুসলমান বলেই সাজা পাবে [illegible] কী রকম বিচার! হতে পারে তারা প্র[illegible]চ্ছন্ন পাকি-স্থানী। কিন্তু আইন যতক্ষণ না তাদের মেরে তাড়িয়ে দিতে বলছে [illegible]মা ততক্ষণ তাদের গায়ে হাত দিতে প[illegible]রা না। সরল মানুষ সলিল। এই হ[illegible]লা তার যুক্তি। যুক্তিটা যে ধর্ম নয় [illegible] অতবড় বাস্তববাদী হয়েও সে ভুলে [illegible]ল।

তামাশা দেখ। বেছে বে[illegible] তাকে ও তার মতো কয়েকজনকে দে[illegible]য়া হলো দাঙ্গা দমনের ডিউটি। দা[illegible] দমন বলতে সে বুঝল দুষ্টের [illegible]ন ও শিষ্টের পালন। তখনকার দিনের অভিধানে কিন্তু উলটো মানে। সলিল মনে করেছিল সোজা মানে। জীবন[illegible]র যে ভুল করে

এসেছে সে আবার একটা ভুল করে বসল। সশস্ত্র হিন্দু পুলিশম্যান নিরস্ত্র পথ-চারী মুসলমানকে বেধড়ক গুলী করে মারছে দেখে সে থানায় গিয়ে রিপোর্ট করল লোকটার বিরুদ্ধে। তখন লোকটা করল কী, না সলিলকেই বিনাবাক্যে গুলী করল।

চার ঘন্টা কি পাঁচ ঘন্টা ধরে আহত সলিল পড়ে আছে রাজপথে। রক্ত ঝরছে ক্ষত থেকে। একজনও তাকে তুলে নিয়ে হাসপাতালে পাঠায় না, কিংবা খবর দেয় তার দপ্তরে। ঐখানেই সে মরে যেত। কী ভাগ্যি একজন বাঙালী অফিসার সেই পথ দিয়ে মোটরে করে ফিরছিলেন। তাকে হাসপাতালে পৌঁছে দিলেন। হাসপাতালে কিন্তু না আছে ডাক্তার, না আছে নার্স। তাদের ডাকবার কথাও কারো মাথায় আসে না। সেই বাঙালী অফিসার স্বস্থানে চলে গেছেন। সলিলও কাউকে ডেকে নির্দেশ দিতে অপারগ। সেই অবস্থায় কেটে যায় আরো তিন চার ঘন্টা। রক্ত কিন্তু সমানে ঝরে চলেছে।

অবশেষে ডাক্তারও এলেন, নার্সও এলো, টেলিফোন পেয়ে রত্নাও এসে হাজির। মিনিট পনেরো দেরি করলে আর তাকে দেখতে পেত না। সেই ক'টি মিনিট সলিল শান্তিতে কাটায়। তখনো তার জ্ঞান ছিল। ক্ষীণকণ্ঠে কানে কানে বলে, "ডার্লিং, তোমাকে আমি বড়ই ভালোবাসি। বড়ই ভালোবাসি।"

রক্ত ক্ষতিপূরণের আয়োজন চলছিল। রত্না বলে, "ভয় কী। তুমি বাঁচবেই।"

সলিল প্রশান্তভাবে বলে, "ভয় আমার একটুও নেই। ভয় ভেঙ্গে গেছে মরণের মোহানায় এসে। তোমাকে দেখব বলেই এতক্ষণ অপেক্ষা করেছি। দেখা হলো, এবার তবে আসি। বাই বাই, ডার্লিং।"

হান্স ও হ্যামলেট

বুদ্ধদেব বসু

জানলার বাইরে খাল, য়োরোপের নদীর মতোই চওড়া, খালের দুই তীর বাঁধানো, উপর দিয়ে মস্ত পুল ঝুলন্ত, জলে চলেছে ফেরি-বোট, মোটর-বোট অগ্নুনতি; আর দিনের মধ্যে আট-দশ-বার, দুই দিকে লম্বা ট্র্যাফিক দাঁড় করিয়ে দিয়ে, পুলের দুই অংশ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে উপর দিকে উঠে যাচ্ছে, কোনো গর্বিত সমুদ্রগামী জাহাজকে পথ দেবার জন্য। জাহাজ চ'লে যায় সমুদ্র বা বন্দরের দিকে, পুলের দুই দিক ধীরে নেমে এসে মুখে-মুখে আটকে যায়; গতি ফিরে পায় ট্র্যাম, মোটর, স্কুটারের সারি, কোনো টুরিস্ট-বোঝাই সাধের তরণী ঝকঝকে কাচের দেহ নিয়ে জলে ভাসলো। বাইরে এই সব, আর ভিতরে—অনুপম পরিচ্ছন্নতা, আরামদায়ক মনোমুগ্ধকর আসবাব, বোতাম টিপলে যে-পরিচারিকা এসে দাঁড়ায় সে সুশ্রী, মনোযোগী, সেবায় ও ইংরেজি বলায় পটু, প্রাতরাশের সঙ্গে নানা ছাঁদের ও নানা স্বাদের যে-পরিমাণ রুটি এনে দেয়, তাতে আমার মতো দশজনের বুভুক্ষা-নিবারণ সম্ভব। এ-ই কোপেনহেগেন, ক্যোবেনহাভন বা বণিকবন্দর; হোটেল য়ুরোপার জানলা থেকে তার সঙ্গে চেনা ক'রে নিচ্ছি; দেখছি তার আকাশ কেমন ম্লান, রোদ কেমন ঠাণ্ডা হ'য়ে জলের উপর শুয়ে আছে, গাছপালার সবুজ কেমন সবুজতর, আর ভাবছি কেমন ক'রে, ক্ষুদ্র আয়তন ও স্বল্প প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে, পরাক্রান্ত প্রতি-বেশীদের দ্বারা অনেকবার নির্জিত হ'য়েও, এই উপনিবেশহীন আত্মসম্বল দিনেমারদেশ এমন সম্পদের অধিকারী হ'লো। হয়তো এই অটুট স্বাবলম্বিতাই তার কারণ।

মহানগর নয় কোপেনহেগেন; যদি না আপনি পুরাতত্ত্বে উৎসাহী হন তাহ'লে প্রধান দ্রষ্টব্যগুলি একদিনেই দেখে নিতে পারবেন। আমাদের হোটেল থেকে পাঁচ মিনিট হাঁটলে চিত্রশালা; সেখানে অবাক হ'তে হয় রদাঁর সংগ্রহ দেখে; ফরাশি ইম্প্রেশনিস্টরাও সদলে উপস্থিত; এডভার্ড মুঙ্ক-এর কয়েকটা মূল ছবি দেখতে পেয়ে আমার বহু-কালের একটি আকাঙ্ক্ষা পূরণ হ'লো। সমৃদ্ধ, কিন্তু বিশাল নয় চিত্রশালা, ঘণ্টা তিনেকে তাকে আয়ত্তের মধ্যে আনা যায়, আর সেই তিন ঘণ্টায় প্রতীতি জন্মায় যে দিনেমারদেশ শিল্পচর্চায় পিছিয়ে নেই। আরো দশ মিনিট দূরে টিভোলি পার্ক, সেটা ছাড়িয়ে রাস্তার ওপারে টাউনহল, আর তার সংলগ্ন চত্বরে পায়রা, ফোয়ারা, বাহুবন্ধ তরুণ-তরুণীরা রোদ পোহাচ্ছে, গৃহিণীরা সওদা ক'রে বাড়ি ফিরছেন, রেলিঙে হেলান দিয়ে আড্ডা জমিয়েছে ছাত্ররা। এই খোলা চত্বর, যাকে প্যারিসে বলে প্লাস, আর রোমে পিয়াৎসা, আর ঐ দুই নগরে যার সবচেয়ে গরীয়ান রূপ দ্রষ্টব্য, তা য়োরোপের একটি নিখিলনাগরিক সামান্য লক্ষণ, আর তার দ্বারা প্রতি দেশের নগরলক্ষ্মী যে কী-পরিমাণে শ্রীমতী হয়েছেন তা কলকাতায় ব'সে কল্পনা করা অসম্ভব। তা নেই শুধু ইংলণ্ডে, অতএব তা কলকাতায় বা বম্বাইতেও নেই, যদিও আমাদের এই উষ্ণমণ্ডলে তার উপযোগিতা স্বতঃ-সিদ্ধ। কোপেনহেগেনের কেন্দ্র এই নগর-চত্বর, এর এক প্রান্তে দোকান-পাটের ভিড়, আশে-পাশে গির্জে অথবা অট্টালিকার মিনার উঠেছে আকাশের দিকে, আর তারই গা ঘেঁষে যে-রাজপথটি সোজা চ'লে গেছে তার নাম এইচ. সি. আণ্ডেরসেন বুলভার; আমাদের হোটেলও এই রাস্তারই উপর।

'কুচ্ছিৎ পাতিহাঁস', 'ছোট্ট জলকন্যা', 'নাইটিঙ্গেল', 'রাজার নতুন পোশাক'—এই সব অমর কাহিনী যাঁর রচনা, তাঁর স্বাদেশিক নাম 'এইচ. সি আণ্ডের-সেন'; কিন্তু, কোনো এক অজ্ঞাত কারণে, ইংরেজ বন্ধুদের কাছে চিঠি লিখতে হ'লে তিনি 'হান্স ক্রিশ্চান আণ্ডেরসেন' ভিন্ন অন্য কোনো স্বাক্ষর করতেন না। ফলত ইংরেজিভাষী জগতে (আর দৈবাৎ আমরাও তার অন্তর্ভূত হ'য়ে গেছি) তাঁর নাম দাঁড়িয়ে গেছে হান্স ক্রিশ্চান, বা সংক্ষেপে হান্স আণ্ডেরসেন। যদি কেউ জিগেস করেন, কোন দু-জন সাহিত্যিকের নাম নিখিল-ভুবনে সর্বসাধারণের সবচেয়ে বেশি পরিচিত, তাহ'লে শেক্সপীয়রের পরেই এই নামটি উচ্চারণ করতে হবে আমাদের; আর যদি লোকপ্রিয়তাকে নিরিখ ব'লে মানতে হয়, তাহ'লে এমনকি এরই স্থান প্রথম হবে হয়তো। কেননা আণ্ডেরসেনের মৃত্যুর পরে এখনো পুরোপুরি একশো বছরও কাটেনি, অথচ এরই মধ্যে সকলেই মেনে নিয়েছে যে তাঁর রচনা সর্বজাতির সামান্য সম্পদ। অসংখ্য অনুবাদ, অসংখ্য সংস্করণ, নানা দেশের শিল্পীর হাতে চিত্রণ প্রায় অন্তহীন, পাঠকসংখ্যা অনবরত বিবর্ধমান—আর তা শুধু য়োরোপীয় প্রবল ভাষাগুলোতেই নয়, এমন সব প্রাচ্য ভাষাতেও যাতে অনু-বাদের সুযোগ এখনো সংকীর্ণ। বাংলাতেই, ধরা যাক না, শেক্সপীয়র আজ পর্যন্ত অনুবাদসাপেক্ষ, তাঁর প্রতিভা বিষয়ে ধারণা পেতে হ'লে বাঙালিকে ইংরেজি (বা জর্মান) ভাষায় ব্যুৎপন্ন হ'তে হবে; কিন্তু আমাদের পক্ষেও আণ্ডেরসেন আজ ঘরের মানুষ।

সব দেবতার দোহাই দিয়ে বলছি, কোনো পাঠক যেন আণ্ডেরসেন ভাবতে হলিউডের চলচ্চিত্রটি মনে না আনেন। সেখানে যাঁকে দেখানো হয়েছিলো, তিনি নন এক অসুখী, অকৃতী, উচ্চাভিলাষী, আত্মসচেতন ভাবাশিল্পী, তিনি শতকরা একশো পরিমাণে ড্যানি কে—আণ্ডের-সেন যা-কিছু ছিলেন না, তিনি তা-ই। গরিবের ছেলে, বাবার জীবিকা পাদুকো-নির্মাণ, মা বাড়ি-বাড়ি ঘুরে কাপড় কাচেন; যেমন সাধারণ তার 'হান্স' নাম, তেমনি সাধারণের চেয়েও খারাপ তার চেহারা। স্কুলের পড়া সাঙ্গ না-হ'তেই লড়াই-ফেরতা বাপের মৃত্যু হ'লো। মা আবার বিয়ে করলেন; মা ঠাকুমা দু-জনেই বললেন এবার তাকে কোনো-একটা হাতের কাজ শিখে নিতে—তার অবস্থার হিশেবে সেটাই সুপরামর্শ ছিলো তাতে সন্দেহ কী। কিন্তু হান্স সে-কথায় কান দিলে না; স্নেহের বন্ধন, জন্ম-স্থান ওডেন্সে-র চেনা বাতাস—সব ছেড়ে চোদ্দ বছর বয়সে চ'লে এলো কোপেনহেগেনে। সেখানে আত্মীয়ের আশ্রয় নেই, কিন্তু রয়্যাল থিয়েটার আছে; জীবিকা সেখানে অনিশ্চিত, কিন্তু সম্ভাবনা বিশাল। তার মনে এক অদ্ভুত অসুখ, এক অবিশ্বাস্য আশা—সে 'বড়ো' হবে, সে বিখ্যাত হবে। পুতুল নিয়ে নাটক-নাটক খেলা করেছে ছেলে-বেলায়, গলা ছেড়ে গান গেয়েছে নদীর ধারে একলা দাঁড়িয়ে,

একবার 'হ্যামলেটে'র অভিনয় দেখে চমকে গিয়েছিলো। অনেক চেষ্টায় চাকরি হ'লো রাজধানীর থিয়েটারে, কিন্তু টিকলো না। অশোভন চেহারা, শিক্ষার অভাবে উচ্চারণ দুষ্ট,—কেমন ক'রে সে অভিনেতা হবে? কিন্তু কোথাও কোনো একটা স্ফুলিঙ্গ ছিলো ঐ 'ঢ্যাঙা আর অদ্ভুত' ছেলেটার মধ্যে; থিয়েটারের কর্তাদের মধ্যেই একজনের তা চোখে পড়লো; তিনি তাকে নতুন ক'রে স্কুলে ভর্তি ক'রে দিলেন। 'একটু লেখাপড়া শেখো, নয়তো কিছুই হবে না তোমার।' নিচু ক্লাশ, সহপাঠীরা বয়সে অনেক ছোটো, পড়ায় মন বসলো না, কিংবা হয়তো বোকাসোকাই ছিলো ছেলেটা—স্কুলের পরীক্ষা পাশ করতে বিস্তর বেগ পেতে হ'লো। এ-রকম ছেলে বই লিখে নাম করতে পারবে, এটা আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে স্বাভাবিক বলে না, কিন্তু যা অসাধারণ, এমনকি যা অস্বাভাবিক, সেই প্রতিভা বস্তুটিও কালে-ভদ্রে দেখা দেয় বইকি, আর তা কখন কার মধ্যে কী-ভাবে দেখা দেবে তা কোনো পণ্ডিত গণনা ক'রে বলতে পারেন না। কেননা এর পর থেকেই ছাপার অক্ষরে বেরোতে লাগল এইচ, সি, আন্ডেরসেনের লেখা : প্রথমে কবিতা, তারপর হাসির গল্প, ভ্রমণকাহিনী, কিছু পাঠকও জুটলো না তা নয়। হান্সের বয়স যখন তিরিশ তখন বেরোলো ছোট্ট একটি চটি বই—'ছোটো-দের জন্য গল্প', তাতে গল্পের সংখ্যা মাত্র চার, কিন্তু তারপর থেকে প্রত্যেক বছর একটি ক'রে 'রূপকথা'র বই বেরোতে লাগলো।

মৃত্যুর আগে আন্ডেরসেন কি জেনে-ছিলেন যে তাঁর সেই গেঁয়ো পুকুর-পাড়ের কুচ্ছিৎ, নিষ্কর্মা, বাসন-মাজা ঝিয়ের লাথি-খাওয়া হাঁসের বাচ্চা—গল্পে নয়, বাস্তব জীবনেও দিগন্তজয়ী মরালে রূপান্তরিত হয়েছে? কিন্তু গল্প আর জীবন কি পৃথক? কল্পনা ও বাস্তব কি অনাত্মীয়? তাঁরই আত্মজীবনীর চিত্রপ[illegible] তো ঐ কাহিনী, অনাগতের স্বজ্ঞাপ্রসূ[illegible] উচ্চারণ। এবং কল্পনার তাপে ত[illegible] অন্তরে যা প্রতিভাত হয়েছিলো, ত[illegible] উত্তরজীবনে বহির্জগতেও তিনি প্র[illegible]ক্ষ করতে পেরেছিলেন। অন্যান্য ভা[illegible]য় অনুবাদক্রিয়া তাঁর আয়ুষ্কালেই আ[illegible]ভ হ'লো, অনুরাগী বন্ধু পেলেন চা[illegible]স ডিকেন্সকে, জর্মানির রাজন্যেরা ত[illegible]কে আতিথেয়তা দিলেন, স্বদেশের [illegible]জা [illegible]ফিরলেন সম্মানিত; তাঁর সংবর্ধনার জন্য [illegible]ীপালোকিত ওডেন্সে শহরে মশাল-[illegible]ী শোভাযাত্রা বেরোলো। কিন্তু এই [illegible]ভিনন্দিত পুরুষটিকে তাঁর রচনার [illegible] আমরা খুঁজে পাই না। যে-মানুষ [illegible]ন-তিনবার প্রেমে প'ড়ে ব্যর্থ হলেন, [illegible]শে-বিদেশে পশ্চাদ্ধাবন ক'রেও সুই-[illegible]শ গায়িকা জেনি লিন্ড-এর মন যিনি [illegible]াতে পারলেন না, ছাতা আর লাঠি [illegible]বল ক'রে বার-বার সারা য়োরোপ ভ্রমণ [illegible]লেন যিনি, জীবন ভ'রে কে জানে কী [illegible]জে বেড়ালেন, আর, অবশেষে—নিঃসঙ্গ, [illegible] স্ত্রীপুত্রহীন, নিজের সার্থকতা [illegible] সব সত্ত্বেও অনিশ্চিত—এক বৎসল [illegible]দুর গৃহে যাঁর মৃত্যু হলো, ঘুরে-ফিরে [illegible]সই মানুষেরই সঙ্গেই বার-বার দেখা হয় আমাদের, আমরা যখন তাঁর কাহিনী-পর্যায় পড়ি অথবা স্মরণ করি। ভ্রান্তি থেকে প্রতিভাবানেরও মুক্তি নেই; যে-সব উপন্যাস ও নাটকের উপর আন্ডেরসেন বেশ বড়ো মাপের ভরসা রেখেছিলেন, আর যাদের আপেক্ষিক অনাদর তাঁকে কষ্ট দিয়েছিলো, আজ সেগুলো শুধু তাঁরই নামাঙ্কিত ব'লে ঔৎসুক্য জাগায়; আর যে-সব তথাকথিত রূপকথা তিনি লিখেছিলেন কিছুটা খেলাচ্ছলে, কিছুটা

হয়তো নিজেকে সান্ত্বনা দেবার জন্য, তাঁর মৃত্যুর আগেই জগৎ বুঝে নিয়েছিলো যে সেগুলোই তাঁর অমরতার ভিত্তি।

দিনেমার সমালোচকদের এক ক্লান্তিহীন অভিযোগ এই যে আন্ডেরসেনের অনুবাদকেরা তাঁকে পরিণত করেছেন নেহাৎই একজন শিশুপাঠ্য লেখকে, কিংবা এক লোক-কথার সংকলন কর্তায়। এই অভিযোগে কিছুটা সত্য নেই তা নয়, কিন্তু তা সম্পূর্ণ সত্য হ'লে আমরা কি তাঁর গুণগ্রাহীদের তালিকায় ডিকেন্স অথবা হুইটম্যানের নাম খুঁজে পেতাম, না কি অস্কার ওয়াইল্ড অনুকরণে রচনা করতেন ইংরেজি ভাষায় শ্রেষ্ঠ কয়েকটি কাহিনী? আসল কথা যেমন 'সকলেই কবি নয়, কেউ-কেউ কবি', তেমনি পাঠকদের মধ্যেও শুধু 'কেউ-কেউ' এমন থাকে যারা চিনতে পারে প্রতিভার বিকিরণ, বুঝে নিতে পারে কবির সংকেত ও গূঢ় অভিপ্রায়; আর তাঁরা, কোনো কালে বা কোনো দেশেই, এই দিনেমার কবির ছদ্মবেশ দ্বারা প্রতারিত হননি। আজকের দিনে এ-কথা বোধহয় না-বললেও চলে যে আন্ডেরসনের গল্প 'ছোটোদের জন্য' লেখা হয়নি, এবং তা 'রূপকথা'ও নয়। খাঁটি রূপকথা হ'লো মৌখিক লোকসাহিত্য, তা সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ ক'রে অনেক লেখক বিখ্যাত হয়েছেন; কিন্তু আন্ডেরসেন লোক-সাহিত্যের সংগ্রাহক বা সম্পাদক ছিলেন না; জার্মানির গ্রিম্-ভ্রাতাদের দিনেমারি প্রকরণ তিনি নন। তাঁর কাহিনী-সঞ্চয়নের মধ্যে তিনটি—মাত্রই তিনটি গল্প বাদ দিয়ে, সবই তাঁর আপন উদ্ভাবন, তাঁর প্রাতিস্বিক কল্পনার সৃষ্টি। আর এক লক্ষণ : খাঁটি রূপকথা কখনো শোকান্তিক হয় না, কিন্তু আন্ডেরসনের দেশলাইওয়ালি উত্তরদেশের পাখিদের মতোই শীতে ম'রে যায়, জলকন্যা শোণিতের মূল্যেও পায় না তার প্রিয়তমকে, নিজেরই দেহচ্যুত ছায়ার চক্রান্তে বিদেশী পন্ডিতের প্রাণদন্ড ঘটে। আমরা তাই অবাক হই না যখন শুনি যে, প্রথম প্রকাশের পর, এই 'রূপকথা'গুলিতে স্বদেশীয় সমালোচকেরা আবিষ্কার করেছিলেন অশ্লীলতা, দুর্নীতি ও ধর্মদ্রোহ। মৌলিকতার সামনে এই হ'লো প্রথম সনাতন প্রতিক্রিয়া, তাই অবাক হই না। শুধু বিস্ময় জাগে এই কথা ভেবে যে যদিও এমন কোনো জাতি নেই যার আবহমান লৌকিক রূপকথা না আছে, পৃথিবীতে এমন লেখক একজনের বেশি জন্মালেন না যিনি পারলেন নতুন রূপকথা সৃষ্টি করতে, তার প্রাচীন প্রচ্ছদে সঞ্চারিত করলেন আধুনিক আত্মার দ্বন্দ্ববেদনা। আর জন্মালেন সেই দেশেই, বাসা বাঁধলেন সেই নগরেই, বেঁচে থাকলেন সেই কালেই—যে-কাল, যে-দেশ ও যে-নগর আধুনিক অস্তিত্ব-বাদের প্রতিষ্ঠাভূমি। জগতের কাছে দিনেমার দেশের এই দু-জনই আজ প্রতিভূ : কীর্কেগড় ও হান্স আন্ডেরসেন, কিন্তু যেহেতু আমার রক্তে সেই চিন্তাই সহজে মেশে, যার প্রকাশের বাহন চিত্র-কল্প, তাই কোপেনহেগেনে পা দেয়ামাত্র আমার আন্ডেরসেনকেই প্রথম মনে পড়লো।

আর সত্যিও, এই নগর যেন আন্ডেরসেনের ভাবনারই প্রতিচ্ছবি—[illegible]নে, রূপে ও শৈলীর দিক থেকে তা-ই। [illegible]পান সবই ধরা দিয়েছে তাঁর কাহিনীতে —পরিণত ও সচেতন মানুষের প্রেম ও [illegible]শ্রম, তার আশা, চেষ্টা, বাসনা ও বাসনাজনিত যন্ত্রণা, কিন্তু ধরা দিয়েছে মৃদু হ'য়ে, মধুর হ'য়ে, একটি কোমল সকৌতুক আচ্ছাদনের মধ্যে সব বয়সের ও [illegible] জাতির পাঠকের পক্ষে সহনীয় হ'য়ে তেমনি কোপেনহেগেনে সবই যেন ছোটো মাপের, কোনো-কিছুরই খুব উঁচুতে তার বাঁধা হয়নি; অত্যন্ত বৃহৎ নয় কোনো অট্টালিকা, সরণি বা উদ্যান; প্রমোদ নয় তীব্র; ট্র্যাফিক নয় অশেষ ও উত্তাল। সব স্নিগ্ধ আকাশের আলো যেন কুয়াশায় ভেজা, ঋতু করুণাশীল। ব্যবসার ও বিলাসের মধ্যে ভেদরেখা স্পষ্ট নয় এখানে, অবকাশ ও কর্ম যেন সহজ[illegible]। বিকেলবেলা বন্দরের দিকে বেড়াতে গিয়ে দেখি সেটা বন্দর না উদ্যান [illegible] বোঝা যায় না; সমুদ্র ঘিরে আছে [illegible] হ'য়ে তটরেখাকে, ছোটো, শান্ত, অ[illegible]সর সমুদ্র; জলে জাহাজ, মাটিতে [illegible]-ছায়া-মাখা বেঞ্চি, ঘাস ঘন ও তরুপল্লব [illegible]চুর, জলে একটি শিলার উপরে ব'সে আছেন আন্ডেরসেনের জলকন্যা। শিল্পকর্ম হিশেবে হয়তো তেমন বিশিষ্ট নয় এই মূর্তি, কিন্তু যেখানে এবং যে-ভাবে তা [illegible]নো আছে, তারই জন্য এটি দ্রষ্টব্য ও স্মরণীয়। খোলা হাওয়ায় শ্যাওলার [illegible]তো সবুজ হ'য়ে গেছে তার বর্ণ, যেন জলজ লতাগুল্মে জড়িত হ'য়ে এইমাত্র সমুদ্র থেকে উঠে এলো। তরুণ তার [illegible]বন, দেহটি ক্ষীণ, পিঠে লুটিয়ে আছে বেণী, বসেছে ভারতীয় গায়িকাদের ধরনে হাঁটু মুড়ে, তার জংঘা শেষ হয়েছে চরণে নয়, পুচ্ছে; তার দৃষ্টি দূরের দিকে নিবদ্ধ। দেখে মনে পড়ে সেই মুহূর্তটি যখন দূরে থেকে নাচিয়ে রাজপুত্রকে দেখে-দেখে নারীর কামনায় প্রহত হ'লো এই মৎস্যকুমারী; মৃত্যুর মূল্যেও প্রার্থনা করলে সে চরণ, মানবিক প্রেম ও আত্মার জন্য তৃষিত হলো।

বন্দরে গাড়িকে ছেড়ে দিয়ে, আমরা মোটর-বোটে শহরে ফিরলাম। বোঝা গেলো, আমস্টার্ডামের মতো নিবিড়ভাবে না হোক, কোপেনহেগেনও জলবেষ্টিত শহর। খালের দুই দিকে সৌধশ্রেণী মাঝে-মাঝে ছোটো-ছোটো সাঁকো, মোড়ে মোড়ে তরণীর ভিড়, নাবিক আমাদের চিনিয়ে দিচ্ছে কোনটা পার্লামেণ্ট, কোনটা বিশ্ববিদ্যালয়, ইত্যাদি। লম্বা নর্ডিক চেহারার পুরুষ, চোখ তীক্ষ্ণ ও নীল গায়ের রং রোদে জলে গাঢ় হ'য়ে গেছে আমাদের জিগেস করলে আমরা বম্বাই থেকে আসছি কিনা; উত্তরে কলকাতার নাম শুনে তার চোখে খুশির ঝিলিক লাগলো। 'Fine city—আমি অনেকবার গিয়েছি সেখানে, একটা রেস্তোরাঁয় খুব যেতাম—সেটা কি আছে এখনো?—নামটা ঠিক মনে পড়ছে না—হ্যাঁ, ব্রিস্টল! আছে এখনো?'

খালের ধারে-ধারে কয়েকটা নাম জাদা ও পুরোনো রেস্তোরাঁ; মাছের রান্না এগুলোর বৈশিষ্ট্য। তারই একটাতে সান্ধ্যভোজ সমাধা করা গেলো। স্ক্যান্ডিনেভীয়রা—উত্তর য়োরোপে শুধু তারাই—রন্ধনপটু ও ভোজনবিলাসী এদের 'স্মরগাসবড' ভোজনে পঞ্চাশ রকম মাছ মাংস শাকসব্জি ও দুগ্ধজাত দ্রব্য টেবিলে থরে-থরে সাজানো থাকে আপনি যেটা ইচ্ছে যতটা ইচ্ছে তুলে নিতে পারেন; ভেবে দেখুন ঔদরিকের কী অপূর্ব সুযোগ, আর যাদের ক্ষুধা ক্ষুদ্র তাদেরও চোখ ও মনের পক্ষে কী রকম তৃপ্তির সম্ভাবনা। বেঁচে থাকার জন্যই আহার, এই শীর্ণ নীতিতে আমার মন সায় দেয় না; আহার্য বিষয়ে বিকল্পের বাহুল্য আমার মনে হয় সভ্যতার একটি প্রধান লক্ষণ, এবং এ ব্যাপারে চীনেদের মতো সিদ্ধিলাভ যদিও অন্য কোনো জাতির ভাগ্যে ঘটেনি তবু দিনেমারদেশ অন্ততপক্ষে প্রতিযোগীর তালিকায় নাম লেখাতে পারে কেননা এরা উদ্ভাবন করেছে একশো প'চাত্তর রকম স্যান্ডুইচ, আর কত রকম পনির ও পেস্ট্রি, তা কেউ গুনে বলতে পারে না এই বৈচিত্র্যের আসল অর্থ—ঔদরিকতা নয়—ব্যক্তিগত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রুচি বৈষম্যের স্বীকৃতি ও তার তৃপ্তিসাধনের চেষ্টা; আর সভ্য জগতে এই চেষ্

নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়। আমাদের 'খুড়ো থেকে প্যারেস' পর্যন্ত বাঙালি ভোজেও এই ঔদার্য ছিলো না তা নয়; কিন্তু মানতেই হবে আমাদের রান্নায় সম্প্রতি একটিও নতুন উদ্ভাবন হয়নি, আর পুরোনো অনেক সূক্ষ্ম জিনিশ লুপ্ত হ'য়ে গেছে বা যাচ্ছে; তার কারণ মেয়েরা আজকাল সম্ভব হ'লেই—এবং সংগত-ভাবে—রান্নাঘর পরিহার করছেন, অথচ পেশাদার, বিশেষজ্ঞ, উদ্ভাবননিপুণ ও সম্মানিত পুরুষের হাতেও আমাদের রন্ধনশিল্প এখনো ন্যস্ত হয়নি।

* * *

ঘরের দেয়ালে ছবি ঝুলছে, হিয়ালমার সেই ছবির মধ্যে ঢুকে গেলো। খোলা মাঠ, গাছপালার ফাঁকে-ফাঁকে ঝ'রে পড়ছে রোদ্দুর, ঐ দেখা যাচ্ছে জল। দৌড়ে চ'লে এলো হিয়ালমার সেই জলের ধারে, লাফিয়ে উঠলো ছোট্ট নৌকোটিতে। লালে আর শাদায় রঙিন সেই নৌকো, পালগুলো ঝলমলে; তাকে টেনে নিয়ে চললো ছয়টি সুন্দর রাজহাঁস, তাদের মাথায় একটি ক'রে নীল তারা জ্বলছে, গলায় দুলছে সোনার মুকুটের ঝালর। দুই দিকে সবুজ বন, ফুলেরা বলছে পরিদের গল্প, গাছেদের গল্প ডাকাত আর ডাইনিবুড়ির; জলে সাঁৎরে বেড়াচ্ছে সোনালি মাছ, রুপোলি মাছ; পাখিরা সার বেঁধে উড়ছে দুই দিকে, লাল পাখি, নীল পাখি, অনেক পাখি; পোকার দলও নেচে-নেচে সঙ্গে চলেছে, তাদেরও আছে গল্প, তারাও চায় গল্প শোনাতে। কখনো বন আঁধার হ'য়ে আসে, কিছু দেখা যায় না; আবার কখনো রোদ, ফুল, সুন্দর বাগান; কাচে আর পাথরে তৈরি প্রাসাদ কখনো দেখা যায়, বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন রাজকন্যারা, রাজার ছেলেরা পাহারা দিচ্ছেন সোনার তলোয়ার হাতে ক'রে—তাঁরা ছুঁড়ে দিচ্ছেন হিয়াল-মারকে টফি, টিনের সেপাই, মিষ্টি কেক; আবার অরণ্য আসে কালো হ'য়ে, মস্ত শহর পার হ'য়ে এলো, অবশেষে তার দাই-মার বাড়ি, যে তাকে ছেলেবেলায় কোল দিয়ে-দিয়ে ঘুম পাড়াতো।......

এ-ই হচ্ছে অ্যাণ্ডেরসেনের মায়া-দর্পণ, যাকে বলা যায় তাঁর জাদুবিদ্যা, এই যে তাঁর কাহিনীতে জড় হ'য়ে ওঠে চেতন, ইচ্ছাশক্তি থেকে পেন্সিল কিংবা টেরণ্ডুটিও বঞ্চিত হয় না, এই যে পটে-আঁকা দৃশ্য চঞ্চল হ'য়ে উঠে শিশুর স্বপ্নে সিন্ধু-স্বর্গের অবিকল উদ্ভাস এনে দেয়। আর যেন এই কল্পনাই পুঁথির পাতা ছেড়ে, আমাদের চোখের সামনে প্রজ্বল্যমান দৃশ্য হ'য়ে উঠেছে—রাত্রে টিভোলি পার্কে এসে তা-ই মনে হ'লো আমার। দিনের বেলায় এই উদ্যান যা, তার জুড়ি অনেক দেশে অনেক আছে, কিন্তু সন্ধ্যার পরে এর রূপান্তর দেখে বিদেশীকে বিস্মিত হ'তে হয়। আলো, সারি-সারি আলো, স্তরে-স্তরে পরতে-পরতে সাজানো, বিচিত্র তার বর্ণ ও বিন্যাস, শুধু আলো দিয়ে আঁকা হ'য়ে আছে এক-একটি প্রমোদভবনের পরি-লেখ, দেয়াল আর ছাদ প্রায় চোখেই পড়ে না। ছেলেবেলায়, আমার ছোটো শহরে, আমার অজ্ঞান শৈশবের চোখে, দেয়ালির রাত্রিটি যেমন প্রায় অলৌকিক লাগতো, যেমন মনে হ'তো মানুষের দীপ আকাশ পর্যন্ত জ্বলছে, এর প্রথম অভিঘাত কিছুটা যেন সেই রকম। অথচ এটি বিশেষ কোনো উৎসব নয়, এদের প্রাত্য-হিক আয়োজন, সর্বসাধারণের অবকাশ-রঞ্জনের ব্যবস্থা। লোকেরা আসছে, যাচ্ছে, বসছে, দাঁড়িয়ে থাকছে, তাদের [illegible] স্বচ্ছন্দ সঞ্চরণের পথে-পথে আকর্ষণও কিছু কম ছড়িয়ে নেই। আছে ফোয়ারা, কুঞ্জ, জলাশয়, জলের উপর নানা রঙের আলোর খেলা, জলের ধারে-ধারে ছোটো-বড়ো শস্তা-দামি নানান ধরনের পানশালা ও রেস্তোরাঁ, আছে পুতুল-নাচ, কৌতুক-অভিনয়, গীতবাদ্য; আছে নৌকো, নাগর-দোলা, মোটর দৌড়, আরো যে কত রকমের ক্রীড়া ও আমোদের আয়োজন, আমাদের পক্ষে অল্প সময়ে তার হিশে পাওয়াই দুঃসাধ্য হ'লো। কোনো আমোদই উগ্র নয়, নয় প্যারিসের মতো ফেনোচ্ছল বা লন্ডনের মতো বিবেক-পীড়িত; কিন্তু প্রত্যেকটি উদ্ভাবনে নিপুণ, প্রসাধনে পরিচ্ছন্ন ও ব্যবস্থাপনায় ত্রুটিহীন। আমরা একটা যন্ত্রচালিত নৌকোতে চ'ড়ে বসলুম, সেটা চললো এঁকে-বেঁকে পাতালের পথে, গুহা কোথাও অন্ধকার, কোথাও বা নীলচে আলো চুঁইয়ে পড়ছে, জলে ভাসছে প্রকাণ্ড বড়ো-বড়ো শালুক পাতা, ফুটেছে লাল রঙের ফুল, কাচের মতো গা নিয়ে মস্ত বড় ফড়িং ব'সে আছে, বিকট সাপ হাঁ ক'রে আছে ওখানে, এবার বুঝি ঠোকর খেয়ে নৌকো উল্টেই গেলো;— কিন্তু ভয় নেই, এই আমরা বেরিয়ে এসেছি, খেলা শেষ হ'লো। আর এক জায়গায় মোটরগাড়ি প'ড়ে যাচ্ছে পাহাড় থেকে, কিংবা তাকে তাড়া করেছে নেকড়ে বাঘ, সে-বিপদ যদি বা উদ্ধার হ'লো সামনে দেখা গেলো দাউ-দাউ আগুন, আবার তারপরেই বনের মধ্যে পাখির কাকলি শোনা গেলো- এমনি কিছুক্ষণের উত্তেজনার পরে আমরা হিয়ালমারের মতোই স্বপ্ন থেকে বাস্তবে

জেগে উঠি। সব মিলিয়ে এক ছেলেমানুষি তা বলতেই হ'বে (কেননা সাহিত্যকে যা মূল্য দেয় সেই ইঙ্গিতের কোনো স্থান নেই এখানে, যা চো দেখা যাচ্ছে এটা শুধু সেটুকুই); ছেলেমানুষিটা ভারি উজ্জ্বল ও মনো দীপমালার দিকে অনেকক্ষণ তাকি থাকলে মনে হয় যেন এই প্রমোদ বিকশিত হ'লো এক বিশাল ক্রিসম তরুতে, যেন সুখে ও আশ্বাসে ঝল করছে তার সর্বাঙ্গ, ডালে-ডালে ঝুলে আছে উপহার; তার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে উত্তরের শীতের রাত্রে শিশুদের চোখ যখন ঘুমে ঢুলে আসে, ই পলাতক, অস্পষ্ট ও স্বপ্নগর্ভ মু টিকে যেন দীর্ঘায়িত ক'রে তোলা হয়ে এই আলো, বর্ণ, ছায়া ও প্রতিচ্ছায়ার সমন্বয়ে।

* * *

পথ তেলের মতো মসৃণ, দুই দিকে বড়ো-বড়ো গাছের সারি মাথার উপরে তুলে দিয়েছে তোরণ, কাচের বাইরে অরণ্য স'রে-স'রে যাচ্ছে। যত সবুজ কল্পনা করা যায় তত সবুজ, যত স্নিগ্ধ কল্পনা করা যায় তত স্নিগ্ধ, সবুজ আভা, সবুজের ছায়া, কিংবা যেন এক স্বচ্ছ, সবুজ অন্ধকার ছড়ানো। বন্ধুর সঙ্গে বেরিয়েছি অনেকক্ষণ হ'লো। রেডিওর বক্তৃতা, এক সাহিত্যিকের বাড়িতে আধ ঘন্টা, 'মৃগ-কাননে' উনিশ-শতকী ঘোড়ায় টানা ল্যান্ডোতে ভ্রমণ, লুইসিয়ানাতে সমুদ্র দেখতে-দেখতে চা। এক ধনী তাঁর পল্লীভবন শিল্পচর্চার জন্য দান ক'রে গেছেন, তারই নাম লুইসিয়ানা। সামনে বাঁকারেখা সমুদ্র, চারদিকে ব্যাপ্ত উদ্যান, উদ্যানে নানা দেশের বিরল গাছ, কাঠ, কাচ আর ইটের তৈরি বাড়িটিতে দিনেমার শিল্পের ক্রম-বিকাশ উৎকলিত। এবং, বলা হয়তো বাহুল্য, বাড়িটি নিজেই একটি শিল্প-কর্ম। এর আগে আমেরিকায় দেখেছিলুম লয়েড রাইটের দু-একটি স্থাপত্যের নমুনা : প্রকান্ড এক পাখি যেন এইমাত্র পাখা মেলে উড়ে যাবে, উইস্কনসিনে এমনি চেহারার গির্জে, ক্যালিফোর্নিয়ার যে-স্থলটিকে 'প্যাসিফিক বাঁক' বলে, ঠিক সেই মোড়ে, মহাসমুদ্রের মুখোমুখি, কোয়েকার সম্প্রদায়ের এক নিরাভরণ উপাসনা-ভবন। সে-সব কাজ দূর থেকে চোখে পড়ামাত্র চোখ বিস্মিত হয়, কিন্তু লুইসিয়ানা বাইরে থেকে ধারণা দেয় যেন সে নিতান্ত সাধারণ, আর ভিতর থেকে ধীরে-ধীরে মনের উপর পাপড়ি মেলে ধরে। প্রথমে মনে হয় যেন যেখানে-সেখানে যা খুশি তা-ই ফেলে রেখেছে, কিন্তু তার বিন্যাসের প্রতিভা বেশিক্ষণ গোপন থাকে না; আমরা বুঝতে পারি দিনেমারি গৃহসজ্জার এত খ্যাতি কেন, আর কী হিশেবে তা বিশেষভাবে বিশ শতকের প্রতিভূ। আধুনিক শিল্পীরা যেমন জগৎটাকে ভেঙে দিয়ে, তারপর—সাদৃশ্যের দ্বারা নয়—শুধু ছন্দের দ্বারা তাকে বেঁধে রেখেছেন, তেমনি এখানেও কোথাও কোনো প্রতিসাম্য নেই, কোনো-একটা জিনিশ অন্য কোনোটার সঙ্গে মেলে না, আলাদা ক'রে দেখলে প্রতিটি বস্তু যেন খাপছাড়া ও একলা—অথচ সব মিলিয়ে যে-প্রভাব পাচ্ছি সেটা সংহতির, সেটা এক বিনয়ী কিন্তু নির্ভুল সামঞ্জস্যের। ঘর যেন দৌড়ে যাচ্ছে বারান্দাকে ধরতে, বারান্দা ঝুঁকে পড়ছে চাতালে, চাতাল ছড়িয়ে গেলো উদ্যানে, উদ্যান বাইরের ভূদৃশ্যের মধ্যে অদৃশ্য হ'লো, আর ভূদৃশ্য ধীরে-ধীরে গ'লে গেলো সমুদ্রে, আর উপরের আকাশে, আর ওপারের দিগন্তরেখায়। তেমনি, দেয়াল আর দেয়ালের ছবি, জানলা আর জানলার বাইরে পুকুর ও গাছপালা, মেঝে আর মেঝেতে রাখা চেয়ার অথবা ভাস্কর্যকর্ম, এগুলো যেন পরস্পরকে অবলম্বন ক'রেই স্থিরতা পেয়েছে, যেমন শাগালের ছবিতে গির্জে চাঁদ মানুষ মাঠ সব-কিছু টলমল করছে অথচ কিছুই প'ড়ে যাচ্ছে না, ভাবখানা কিছুটা সেই রকম। ঘরের সঙ্গে বাইরের ভেদ স্পষ্ট নয়, শিল্পের সঙ্গে প্রকৃতির ভেদও অমিত, কিংবা প্রকৃতিকেই শিল্পের প্রয়োজনে ব্যবহার করা হচ্ছে; কোথায় মানুষের তৈরি উদ্যান শেষ হ'য়ে স্বাভাবিক নিসর্গ আরম্ভ হয়েছে তা ঠাহর করা যায় না; যা-কিছু শিল্পিত তারও চেহারা আঁকাড়া ও আপাতদৃষ্টিতে অর্ধসমাপ্ত;— অর্থাৎ, যা-কিছু এখানে দেখা যাচ্ছে, দেয়াল মেঝে ছবি মূর্তি আসবাব থেকে আরম্ভ ক'রে গাছগুলো জল আকাশ দিগন্ত পর্যন্ত—সব মিলিয়ে একটাই ঘটনা যেন, এক চতুর ও গোপন শিল্পে সব-কিছুকে একই পরিকল্পনার অন্তর্ভূত করা হয়েছে।

একদিকে সারি-সারি বাড়ি—উদ্ধত নয়, কিন্তু মনোরম ও মূল্যবান, আর—একদিকে সমুদ্র, কোপেনহেগেন শহর থেকে বেরোবার পর এমনি কিছুক্ষণ পথ চলেছিলো আমাদের। লুইসিয়ানার পর থেকে অরণ্যভূমিতে প্রবেশ করেছি। কিন্তু যাকে অরণ্য বলছি তা যে এদের 'মৃগ-কাননে'র মতোই উদ্যান নয় তা কেমন ক'রে বলবো? এরা তো কিছুই স্বাধীন প্রকৃতির হাতে ফেলে রাখেনি মানুষের বুদ্ধি ও ক্ষমতাকে সর্বত্র প্রয়োগ করেছে—বলতে গেলে পুরে দেশটাকেই ক'রে তুলেছে এক সাজানে বাগান। শুধু ডেনমার্ক নয়, মোটের উপ সমগ্র প্রতীচী বিষয়ে, আর জাপা বিষয়েও, এ-কথা সত্য; সবখানে দেখেছি, মানুষের হাতের পরিচর্যার ফ প্রকৃতি কেমন নম্র ও সুমিত হ'য়ে বিরাজ করছে। দৃশ্য যেখানেই নয়নমোহন—এ শহর থেকে যত দূরেই হোক না, হো না যাকে বলে একেবারে 'প্রকৃতির মাতৃ ক্রোড়ে'—সেখানেই হোটেল আছে রেস্তোরাঁ আছে, আছে ছবি কার্ড ও অন্যান্য স্মরণীয় দোকান পথিক সেখানে ক্লান্তি কাটা পারে, রাত হ'য়ে গেলে ঘুমো পারে আরামে, পারে দু-আনার এক ছবি কিনে দেশে কাউকে পাঠিয়ে দিতে একে 'ব্যবসাদারি' ব'লে নিন্দে কর গেলে ভুল হবে, কেননা এটা সেই ধরনে বাণিজ্য, যাতে মানুষ নিজেও লাভবা হয়, এবং অন্যকেও উপকৃত করে। আম যারা হিমালয়বাসী সন্ন্যাসী নই, আমাদে মানতেই হবে যে প্রাকৃতিক দৃশ্য তখন সবচেয়ে হৃদয়গ্রাহী, যখন আমরা বিশ্রা ও ক্ষুৎপিপাসারহিত, অতএব দেশে দেশে সেই স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের ভার যা নিয়েছে তারা আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজ

আমাদের যাত্রার শেষ ল হেলসিংগর, বা এলসিনোর, আর সেখা আমরা যাচ্ছি শুধুমাত্র এই কারণে শেক্সপীয়র 'হ্যামলেট' নামে একখা নাটক লিখেছিলেন। দিনেমার ইতিবৃ যে-রাজার নাম হাম্লেট বা হামনেট, ত দুর্গ অবশ্য এলসিনোরে ছিলো প্রোফেসরের কাছে পরীক্ষা দিতে হ অতথ্যের জন্য শেক্সপীয়রের নম্বর ক যেতো; কিন্তু জগতের লোক ভুলটাকেই সত্য ব'লে মেনে নিয়ে লোকের মুখে মুখে এর নাম হ'য়ে গে 'হ্যামলেটের প্রাসাদ'। এই দুর্গে নির্মাণক্রিয়া যখন আরম্ভ হয়, ত শেক্সপীয়রের বয়স ছিলো দ সমাপ্তির আঠারো বছর পরে এ 'হ্যামলেট' ছাপা হ'য়ে বেরোলো। রাজা সেটি নির্মাণ করেছিলেন তাঁর আজকের দিনে অল্প লোকেই জা এলসিনোর বলতে এক বিবেকপা চিন্তামগ্ন, চৈতন্যপীড়িত, আর্তি যুবরাজকেই আমাদের মনে পড়ে।

খালে ঘেরা, মস্ত উঁচু লাল র দেয়ালে ঘেরা, অংশত রেনেসাঁস ও অং মধ্যযুগধর্মী এই দুর্গ বা প্রাসাদ। ধরনের দুর্গ সাধারণত যা হ'য়ে থাকে

ঠিন ও বৃহৎ, এও তা-ই ; কিন্তু দুর্গের মতো ভীষণ ব'লে না। খালে টলমল করছে খেলছে রাজহাঁস, গাছগুলো ধারে-ধারে, সরু সবুজ মিনারগুলোতে শাসম খুব য়। সিংহদ্বারে শেক্সপীয়রের ও স্মারকলিপি পেরিয়ে ভিতরকার প্রাঙ্গণে এসে প্রাসাদটি এখন দিনেমারি বাণিজ্যের জাদুঘর হিশেবে য়, কিন্তু এই প্রাঙ্গণটি অমর দেশে উৎসর্গিত। ইংলণ্ড থেকে, নানা দেশ থেকে, প্রতি বছর সেন শ্রেষ্ঠ অভিনেতারা, যুব-স্তহীন বিলাপ তৃপ্তিহীন-স্তি করেন—নানা ভাষায়, নানা শ্রোতাদের হৃদয়তন্ত্রীতে মূর্ছনা তুলে। সেই প্রাঙ্গণ য়ে, কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে আমাদের যেখানে নিয়ে এলেন উঁচু, খোলা, চতুষ্কোণ, রা মণ্ডপ, তার ঠিক তলাতেই সমুদ্র নয়, নোনা জলের সরু ল, যেন উত্তরসাগর আঙুল স্ক্যান্ডিনেভিয়ার মূল দেহ ডেনমার্ক'কে বিচ্ছিন্ন ক'রে আবার ডেনমার্কে'র মূল থেকে এই জীল্যান্ডকে। সুইডেন, তার তটে বাড়িঘর যায়, আর-একদিকে নরোয়ের মণ্ডপে বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে যুবক সান্ত্রী, কয়েক মিনিট দূরবীন তুলে সমুদ্রের দিকে ; ভাবখানা এই রকম— জাহাজ এগিয়ে আসছে না বাহুল্য, এই সতর্কতা এখন নাবশ্যক, এটা একটা অনু-পুরোনো প্রয়োজনীয় প্রথার মৃত। কিন্তু এই মণ্ডপে সমুদ্র আর সান্ত্রীটিকে দেখতে মার মন বিস্ময়ে ভ'রে গেলো। এইজন্যে যে জায়গাটা যেন শেক্সপীয় থেকে উঠে এসেছে। 'প্ল্যাটফর্ম', যেখানে উন্মো-যবনিকা, উন্মোচিত হ'লো হাস। অন্তত আমার তা-ই কয়েক মিনিটের জন্য আমি নাটে'র প্রথম দৃশ্যটিকে মনে-করলুম ; তাকে বাস্তবের বাতাসের বেগ, নির্জনতা, দাঁড়িয়ে-থাকা তরুণ বেলা তখন বিকেলের ত, আকাশ ঝাপসা, উপর আলো অস্থির। দূরে দিগন্ত ম্লান, সামনে দুর্গের পাষাণময়, রহস্যময় স্তব্ধতা। এখানকার চাইতে আর কোন স্থান প্রেতের আবির্ভাবের পক্ষে অধিক উপযোগী? মনে হয় না শেক্সপীয়র জানতেন যে এলসিনোর সমুদ্রতীরবর্তী, কিন্তু এটুকু-মাত্র অনুপুঙ্খ ছাড়া এলসিনোরে আর যেন কিছুই নেই যা তাঁর অজানা ছিলো, —কেমন ক'রে জেনেছিলেন? শেক্সপীয়র তাঁর 'দৃশ্যে'র বর্ণনা করতেন না—তা অনর্থক হ'তো তাঁর কালের অপরিণত মঞ্চশিল্পে—কিন্তু সংলাপের মধ্য দিয়েই পরিবেশকে এমন জীবন্ত ক'রে তুলতেন যে আজ তাঁকে স্মরণ না-ক'রে ভ্রমণ প্রায় অসম্ভব। এডিনবরা থেকে হাইল্যান্ডের দিকে যেতে-যেতে কার না মনে পড়বে ম্যাকবেথকে ; পাহাড়, হ্রদ, জলা, বিস্তীর্ণ অমিত্র চেহারার 'হীথ', গ্রীষ্মের দুপুরেও আলো অস্পষ্ট, আমাদের মনের ডাইনিকে বাইরে দেখতে হ'লে এ-ই তো ঠিক পটভূমিকা। আরো আশ্চর্য : সুদূরে নীলনদী, মিশরের আলো আর আকাশের বিস্তার, ধূমলত্বক লাস্যময়ী নারী—এই সব অনুষঙ্গ শেক্সপীয়র আমাদের এমন ক'রে জপিয়েছেন যে কাইরোর অত্যাধুনিক হোটেলে কৃষ্ণাঙ্গী ও কৃষ্ণনয়না পরি-চারিকাকে দেখামাত্র আমাদের দুর্নিবারভাবে ক্লিওপ্যাট্রাকেই মনে প'ড়ে যায়। কী মানুষ, [illegible] আশ্চর্য মানুষ এই শেক্সপীয়র অতীত ও সমকালীন [illegible] ক'রে তিনি শোষণ ক'রে নিয়েছিলেন, ষোলো-শতকের মফস্বলি [illegible] বসে-ব'সে, মনে হয় যেন বিনা চেষ্টায়, মনে হয় যেন নিজেরই অজান্তে! তাঁর তল্পি ছিলো মাত্র কয়েকখানা পুঁথি, কিছু ইতিহাস, তার চেয়ে বেশি কিংবদন্তী ও নাবিকদের গালগল্প ; [illegible] তারই রচনায় জীবন্ত হ'য়ে উঠলো স্কটল্যান্ড থেকে মিশর পর্যন্ত পৃথিবী। কিন্তু আসলে এই 'অথচ'টাই ভুল কথা ; তাঁর যে আরো বেশি [illegible]বার সুযোগ ছিলো না সেটাই তাঁর [illegible] ছিলো হয়তো ; জানা ও অজানার মধ্যবর্তী এক অস্পষ্টতা তাঁকে ঘিরে ছিলো ব'লেই তাঁর কল্পনা এমন সার্বভৌম ও বিশ্বম্ভর হ'তে পেরেছিলো। আধুনিক কবিকে বেশি না-জেনে উপায় নেই, সেই বেশিটা তাঁর পক্ষে বড্ড বেশি ; অনবরত তাঁকে পরিশ্রম করতে হয় জ্ঞানের বোঝা ফেলে দেবার জন্য, নিজের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে-ক'রে হ'তে হয় কবি। এরই জন্য আধুনিক কবিতা এমন ঘন, এমন কুটিল, আর পূর্বের তুলনায় এমন স্বল্পভাষী ও অপ্রচুর।

পূজার দিনে
লক্ষ্মী ঘি
বাংলার ঘরে ঘরে
আনন্দের
বার্তা বহন
করে আনে
LAKHMI
LAKHMIDAS PREMJI
লক্ষ্মী ঘি
বিশুদ্ধ, সুস্বাদু ও হৃদ্য
স্বাদে ও গন্ধে অতুলনীয়
লক্ষ্মীদাস প্রেমজী, কলিকাতা-১২

অঙ্গুলি

চিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

ছাড়বি কেন ?' ভবনাথ গর্জে
কি অন্যায় কথা !'
চুপ করে রইল।
ছাড়বার কি হয়েছে ?'
টা ছোট।'
মানে ? এত বড় ফার্মের
ইম্পর্টেন্ট পোস্ট—'
কম।' ম্লান রেখায় হাসল
মোটে পাঁচশো।'
শো কম হল ?' ভবনাথ
ঃ 'একেবারু ফুঁ দিয়ে
র মত ?'
ফিগার তো আর নয়। ফোর
লে কি সম্ভ্রান্ত দেখায় ?'
ব ফিগার হবে আস্তে-
াধের সুর আনল ভবনাথ ঃ
াতির স্কোপ তো আছে।'
ভবিষ্যৎ। এই মুহূর্তেই
ছ না। এই মুহূর্তেই তো
হাজার নয়।' জানলার
ণ একবার তাকাল কৃষ্ণেন্দু ঃ
শ্চিত। ভবিষ্যতের কথা কে

মাগে একটা হাজার টাকা
র জোগাড় কর।' কণ্ঠস্বরে
তে পারছে না ভবনাথ ঃ
ছেড়ে দে।'

'আমাকে কে দেবে হাজার টাকা ?'

'না দেবে তো, তুই হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলবি কেন ?'

'লক্ষ্মী কি হাতে থাকে ? লক্ষ্মী থাকে বাক্সে। বাক্স ভাঙা দেখে লক্ষ্মী নিজেই চলে গেছে বাবা, পায়ে ঠেলতে হয়নি।' দিব্যি হাসল কৃষ্ণেন্দু।

এমন অযৌক্তিক কেউ হতে পারে ভাবতে পারে না ভবনাথ। এমন তো ছিল না কৃষ্ণেন্দু ! কী হয়েছে ছেলেটার ?

অবস্থার উন্নতি করতে চাস তো ভালো কথা। তাই বলে তুই হাতের পাখি ছেড়ে দিয়ে ঝোপের পাখি ধরতে যাবি ? আগে ঝোপের পাখি একটা ধর, তারপর না হয় হাতের পাখি উড়িয়ে দে। এমন সৃষ্টিছাড়া কথা তো কখনো শুনিনি।

যদি তোর হাজার টাকার মুরোদ নেই জানিস, তবে পাঁচশো টাকা তোর কম হল ? তুই একলা মানুষ, তোর কত লাগে ? আমি, তুই আর নীলা।—এই তো আমাদের সংসার। তোর মা তো কবেই পরলোকে। তা নীলারও বিয়ে হয়ে গেল গত বছর। এখন শুধু বাপ আর ছেলে—আমরা দুজনে। আমার জন্যে ভাবনা নেই। একতলা থেকে যা ভাড়া পাই তাই আমার যথেষ্ট।

একটি বউ আনিস এই আমার স্বপ্ন। তা না হলে আমাকে দেখবে-শুনবে কে ? দিন-দিন আমি অথর্ব হয়ে যাচ্ছি না ? আর কত দিন বাঁচব ? ধূসর মরুভূমিতে ছোট্ট একটি সবুজের রেখা ছিল নীলা, গৃহান্তরে চলে গিয়েছে। ভেবেছিলাম তুই এবার এই ধূসরকে শস্যায়িত করে তুলবি। কিন্তু এ তোর কি মতিচ্ছন্ন !

নিজের বাড়ি, পাঁচশো টাকায় অক্লেশে তুই বিয়ে করতে পারিস। কিন্তু কেন যে তোর কোনো কিছুতেই মন ওঠে না বুঝে উঠতে পারি না। শুধু শুধু তুই আমাকে বিরক্ত করে মারিস। তুই আমার কত আপন, আমার মত আর জানে কে। তোর দাদারা সব অকালে মরে গেল, তুই শুধু শিবরাত্রির সলতের মত মিটমিট করছিস। তোর মা চলে গেল কিন্তু আমি তোকে প্রদীপ্ত না দেখে চোখ বুজব না। কিন্তু মানুষের ঔজ্জ্বল্য কি টাকায় ? শুধু মাস-মাইনেয় ?

'না, তোর চাকরি ছাড়া হবে না কিছুতেই।' হঠাৎ হুমকে উঠল ভবনাথ।

'ছাড়া হবে না কি ! ছেড়ে দিয়েছি।' মুখ নিচু করল কৃষ্ণেন্দু।

'ছেড়ে দিয়েছিস ?' যেন সমস্ত

শরীর ছেড়ে দিল ভবনাথ। একটা চেয়ার ধরে কোনোমতে সামলাল নিজেকে।

'ওরকম বস-এর সঙ্গে চাকরি করা যায় না। বদ, বোকা, বুলি—'

আর কারণ জেনে কী হবে! কী হবে ফিরিস্তি নিয়ে? যখন বন্দুকের থেকে গুলি একবার বেরিয়ে গিয়েছে, তখন জেনে আর কী হবে কী করে বেরুল!

তবু কৃষ্ণেন্দুর আপিসে ভবনাথ গেল খোঁজ নিতে।

কই কিছু ঝগড়া হয়নি তো! কোনো কথা কাটাকাটিই হয়নি। আর হবেই বা কেন? কী নিয়ে?

তবে কোনো অপরাধ করেছে? বেআইনি গাফিলতি? তহবিল তছরুপ?

তাহলে তো থানা-পুলিশ হত।

তবে কি ধর্মঘটের আওয়াজ? কোনো ইউনিয়নী কারসাজি?

তাও তো কিছু শুনিনি।

তবে?

এই দেখুন না লেটার অফ রেজিগনেশানটা। নিজের চোখেই দেখে যান। আমার এখানে পোষাচ্ছে না। উত্তমতর, উন্নততর জীবনের আশায় ছেড়ে দিচ্ছি। সংকীর্ণকে ছেড়ে উন্মুক্তের সন্ধানে।

'আর কোনো কারণ নেই? চেয়ার ধরে আবার নিজেকে সামলাল ভবনাথ। তারপর অসহায় চোখে তাকাল চার দিকে : 'আচ্ছা আপনারা কেউ অনুমান করতে পারেন?'

কে একজন বললে, 'মাথা খারাপ।'

শ্মশান থেকে লোকে যেমন ফেরে তেমনি ফিরল ভবনাথ।

আশ্চর্য, চাকরি খোয়াল ছেলে, আর যত দুঃখ তার? সত্যি, তার ভাবনা কি? সে কি ছেলের তোয়াক্কা রাখে? ধার ধারে? তার বাড়ি আছে, বাড়ি ভাড়া আছে। ছেলের সে মুখাপেক্ষী নয়। তার কিসের মাথা ব্যথা?

এখন তবে কী করবি? তবু না জিগগেস করে পারল না ভবনাথ।

কৃষ্ণেন্দু বললে, 'ব্যবসা করব।'

'ব্যবসা করবি?'

'হ্যাঁ, বড় লোক হব। যত বড়ই চাকরি হোক, বড় লোক হতে হলে বাণিজ্য।'

টলা পায়ে খানিক পাইচারি করল ভবনাথ। বললে, 'ব্যবসা করতে হলে তো টাকা লাগবে!'

'তা লাগবে।' সহজেই সায় দিল কৃষ্ণেন্দু।

'পাবি কোথায়?' ভীত তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল ভবনাথ।

'আমার কাছে সামান্য কিছু আছে। বাকিটা তুমি দেবে।'

'আমি দেব? আমি দেব কোত্থেকে?' চিৎকারে প্রায় ফেটে পড়ল ভবনাথ।

'তোমার কাছে কি কিছুই নেই?' প্রায় দরদ মাখিয়ে জিগগেস করল কৃষ্ণেন্দু।

'তা যৎসামান্য থাকলেই বা। তা তোকে আমি দিতে যাব কেন? অস্ফুটে বুঝি একটা কটু কথাও ভবনাথের মুখে এল।

কিছু কানে তুলল না কৃষ্ণেন্দু। বললে, 'তুমি মরে গেলে ও টাকা তো আমিই পাব।'

উত্তরে, ক্ষণকালের জন্যে, ভবনাথ বোবা হয়ে গেল।

এতটুকু কুয়াশা নেই, দিব্যি সরাসরি জিগগেস করল কৃষ্ণেন্দু, 'কত টাকা আছে বাবা?'

'কত আর থাকবে!' তবু সামলে নিয়ে ঢোক গিলে বলতে হল ভবনাথকে: 'প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে আর গ্র্যাচুয়িটিতে যা পেয়েছিলাম তার প্রায় সবটাই গেছে বাড়ি করতে। সামান্য একটা তলানি শুধু পড়ে আছে। বলবার মত কিছু নয়।'

'না হোক, ওটা আমাকে দাও।' দিব্যি হাত পাতল কৃষ্ণেন্দু।

'তোকে দেব?' ভবনাথ সুরে ক্রুদ্ধ বিদ্রুপ আনতে চেয়েও বুঝি পারল না আনতে।

'হ্যাঁ, তোমার ভাবনা কি। নিচের তলার ভাড়া থেকেই তো সংসার চলে যাচ্ছে। চলে যাচ্ছে তোমার নিজের খরচ। তোমার ও টাকাটা মিছিমিছি তবে পচবে কেন ব্যাঙ্কে?'

'বা, আমার আপদ-বিপদের সময় কাজ দেবে।' তড়পে উঠল ভবনাথ।

'আপদ-বিপদের সময় তো আমিই আছি।' কৃষ্ণেন্দুকে অদ্ভুত শান্ত শোনাল।

ভবনাথের মনে বুঝি ভিজে হাওয়ার ছোঁয়াচ লাগল। বললে, 'বড়লোক না হলেই কি হত না? তোর যা সঙ্গতি ছিল তাতেই কি পেতাম না মা-লক্ষ্মী?'

'পেতে না, বাবা। তোমাকে ওল্ড ফুল বলত।'

হেসে উঠল ভবনাথ।

'তোমার সঙ্গে থাকতেই চাইত না। আলাদা বাড়ি করতে চাইত।'

'সে কি, আমি আর কত দিন!'

'তাই তো বলি, টাকাটা তুলে নিয়ে এস।' আবার কেমন কৃষ্ণেন্দুকে হৃদয়-হীন শোনাল : 'যা এক দিন আমার হবে তা আটকে রেখে লাভ কী? এখন হাতে পেলে কত আমার উপকার হয়। লাগতে পারি ব্যবসাতে। আর সংসারে বড়লোক হবার সিঁড়িই ব্যবসা। দেখাতে পারি আমিও উঠতে পারি সিঁড়ি বেয়ে—'

আর্ত মুখে নিজের ঘরে ফিরে গেল ভবনাথ।

তবে কি সত্যিই ছেলেটার মাথা খারাপ হয়েছে?

নীলাকে ডাকাল ভবনাথ।

'তোর দাদার কী হয়েছে, রে, নীলা?'

'মাথা খারাপ হয়েছে।'

'মাথা খারাপ হয়েছে?' চমকালো ভবনাথ : 'তার মানে?'

'তার মানে দাদা মদ খেতে শুরু করেছে।' ঘৃণায় নাকটা ছোট করল নীলা।

'কী যে বলিস তার ঠিক নেই।'

'ঠিক নেই মানে?' ঝলসে উঠল নীলা : 'তার ঘরে গিয়ে দেখেছি বোতল থেকে গ্লাশে মদ ঢেলে ঢেলে খাচ্ছে।'

'ঘরে বসে খাচ্ছে। ওটাকে খাওয়া বলে না, সিপ্ করছে।' ছেলের দোষ দেখতে চায় না ভবনাথ : 'যারা ব্যবসা করে তারা অমনি এক-আধটু সিপ্ করে।'

'ব্যবসা না হাতি! কিছু করছে না।'

'বা, অতগুলো টাকা দিয়ে সেদিন যে কি কতগুলো মেসিন-পার্টস কিনল—কোথাকার কোন ফার্মকে কি সাপ্লাই করবে বলে—'

'সব ধোঁয়া!' হাত ঘুরিয়ে ধোঁয়া দেখাল নীলা। 'সব নস্যি।' নস্যি দেখাল আঙুলে।

'সমস্ত টাকাটাই জলে গেল?' সামনেই একটা অন্ধকার গহ্বর দেখছে এমনি চোখ করল ভবনাথ।

'তাই তো বললে। বললে, আমি সর্বস্বান্ত। ইংরিজিতে বললে, 'বিদ্রুপে ঠোঁট ওল্টাল নীলা : 'আই য়্যাম রুইন্ড।

'তার মানে আমার অতগুলো টাকা ও নষ্ট করল?' হায়-হায় করে উঠল ভবনাথ।

'তোমার টাকা?' নীলা কৌতূহলে কর্কশ হল : 'তোমার টাকা মানে?'

'বা, কিছু টাকা আমার ব্যাঙ্কে এখনো পড়ে ছিল না?'

'ও! ছিল বুঝি? তা, সব টাকাটাই তুমি ওকে দিলে?' যেন কৈফিয়ৎ তলব করছে এমনি ভাব নীলার।

'কত কী বলল আমাকে। কত কী স্তোক দিল!' প্রায় চুল ছেঁড়ার মত অবস্থা ভবনাথের : 'বললে, ব্যবসা করে বড়লোক হবে। বড়লোক না হলে এ রাজত্বে মান নেই, স্থান নেই। তাই ভুলে গেলাম। এক বাক্যে দিয়ে দিলাম টাকাটা।'

'কিন্তু ও টাকার সবটাই তো ওর নয়।' নীলার দাঁড়াবার ভঙ্গিটা সহসা কঠিন হয়ে গেল।

'ওর নয়—এ আবার তুই কী বলছিস?'

'মানে, পৈত্রিক সম্পত্তিতে তো মেয়েদেরও আজকাল সমান অংশ।' নীলা এগিয়ে এল এক পা : 'তাই ও টাকায় তো আমারও আট আনা।'

এত দুঃখেও হাসি পেল ভবনাথের। বললে, 'তুই নতুন আইনটার কথা বলছিস? তা আমি আগে মরি, তবে তো ওয়ারিশি পাবি।'

'ও, তাই বুঝি?' বোকা-বোকা মুখ করল নীলা।

'যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি ততক্ষণ ও টাকা তো আমারই টাকা। আমি তা দিয়ে যা খুশি করতে পারি। ইচ্ছে করলে দিতে পারি বিলিয়ে। তাতে কার কী বলবার আছে?'

'তা হলে তুমি ইচ্ছে করলে বাড়িটাও সম্পূর্ণ দাদাকে দিয়ে যেতে পার?' নীলার দুচোখে রাগ যেন ঝলসে উঠল।

একটুও ভালো লাগল না ভবনাথের। সেই একফোঁটা মেয়ে, তার মুখে এ সব কী কথা! কই এমনটি তো সে ছিল না। মোটে বছর খানেক বিয়ে হয়েছে, এরই মধ্যে জেগেছে বিষয়বুদ্ধি?

ভবনাথ কথা বলল না।

'তা হলে পারো আমাকে বঞ্চিত করতে?'

'এত খরচ করে তোকে বিয়ে দিলাম, গয়নাগাটি জিনিসপত্র দিলাম—তোর আবার কী চাই!'

'বা, আইন যদি আমাকে অধিকার দেয় তা হলে সে অধিকার তুমি কাড়বে কেন?' প্রায় ফণা তুলল নীলা।

এই এক বছরের মধ্যে কী রকম দুষে গিয়েছে মেয়েটা। বিষয়ের জ্বর ধরেছে গায়ে। মাথায় শুরু হয়েছে ছুরুনি।

কে এমন নষ্ট করল মেয়েটাকে? বাপের মুখের সামনে দাঁড়িয়ে কথা

আমি দেব? আমি দেব কোত্থেকে?

কইছে? আওয়াজ তুলছে? আইন দেখাচ্ছে?

ভবনাথ উত্তেজিত হল না। শান্ত-স্বরে বললে, 'যার সম্পত্তি, আইনই তাকে অধিকার দিয়েছে, যেমন খুশি সে দান বিক্রি করতে পারে। যতক্ষণ সে মালিক ততক্ষণ সব তার নিজের এক্তিয়ার। তাই যতক্ষণ বেঁচে আছি ততক্ষণ আমিই সর্বেসর্বা। মরে যাবার পর অবিশ্যি—'

নীলা কথাটা শেষ করতে দিল না। ঝামটা মেরে বললে, 'তখন যেন না দেখি যে উইল করে সর্বস্ব ঐ অপদার্থকেই দিয়ে গেছ।'

একটা যেন ছোরার ঘা খেল ভবনাথ। বললে, 'তুই তোর দাদাকে অপদার্থ বলিস?'

এতটুকু দমল না নীলা। বললে, 'অপদার্থকে অপদার্থ বলব না তো কী বলব! আসল ব্যাপারটা তো জানো না কিছু। আমি জেনেছি।'

'কী ব্যাপার?' দিশেহারার মত তাকাল ভবনাথ।

'কেন দাদার এই ছন্ন মতি। কেন দাদা চাকরি ছাড়ল। কেন মদ ধরেছে?'

নীলাটা এমনি করে বলছে, শত্রুর মত, বিপক্ষের মত! মামলার বিবাদীর মত!

'তোকে কে বলল? তুই কোত্থেকে জানলি?' তবু একবার ধৈর্য হারাতে চাইল ভবনাথ।

'দাদাই বলেছে।'

নীলার মুখে কৃষ্ণেন্দুর নিন্দা শুনবে ভাবতেই বুকের ভিতরটা ম্লান হয়ে গেল ভবনাথের। কত ভাব ছিল দুজনে, কত ভালোবাসা! একে অন্যের জন্যে প্রাণ দিতে পারত! দাদা বলতে নীলা অজ্ঞান আর নীলু চাইলে কিছুই অদেয় ছিল না কৃষ্ণেন্দুর। সেই নীলা এবার গাল দেবে দাদাকে। তার তাই চুপ করে শুনবে ভবনাথ।

বিয়ে করে সমর্থ স্বামী পেয়ে কী অহঙ্কার হয়েছে মেয়েটার।

তবু কানে যা আসে শুনে রাখা ভালো। যদি কোনো প্রতিকারের হদিস পায়।

'একটা মেয়ের প্রেমে পড়েছিল দাদা। ইংরেজিতে যাকে বলে ওভার হেড অ্যান্ড ইয়ার্স। লোকে হাবুডুবু খায়, উনি একেবারে তলিয়ে গিয়েছিলেন—'

ভাষাটাও কেমন বিশ্রী হয়ে গিয়েছে নীলার! কেমন বর্বর! নির্বোধ!

'শেষে চাইল মেয়েটাকে বিয়ে করতে।'

'বেশ তো, করত।' প্রায় লাফিয়ে উঠল ভবনাথ : 'যে কোনো দেশের হোক,

যে কোনো জাতের হোক, আমি বাধা দিতাম না।'

'মেয়েটাই চাইল না বিয়ে করতে।'

'চাইল না?'

'না। মেয়েটা ঘোর বিষয়ী।'

যেন কোনো অবিষয়ী মেয়ে আছে! একটু বুঝি করুণ রেখায় হাসল ভবনাথ। বললে, 'কী বললে মেয়েটা?'

'বললে, তার পাঁচশো টাকায় পোষাবে না। অন্তত হাজার-দু হাজার চাই। ফোর ফিগার চাই। আর নিচের ঘরে ভাড়াটে, উপরে তিনখানা ঘরের মধ্যে একখানাই শ্বশুরের দখলে. আর যে শ্বশুর কিনা বুড়ো হাবড়া. সেকেলে, সে বাড়ি তার কণ্টক।'

'কেন, আলাদা ফ্ল্যাট নিয়ে থাকত!'

'টাকা কই?' দিব্যি আঙুলে বাজাল নীলা : 'রেস্ত?'

'কী আশ্চর্য, আমাকে বললে না কেন?' মুহূর্তে আবার শান্ত হল ভবনাথ। বললে, 'তারপর কী হল?'

'মেয়েটা প্র্যাকটিক্যাল. এক দেড় হাজারী কভেনেন্টেড অফিসারকে বিয়ে করলে। ফ্ল্যাট নিলে পার্ক স্ট্রিটে। আর উনি', কী নিষ্ঠুরের মত শোনাল নীলাকে. 'অভিমানে. বড়লোক হবার স্বপ্নে চাকরি ছেড়ে দিলেন। সোনার হরিণ ছেড়ে দিয়ে গেলেন সোনার কুমিরের সন্ধানে। নর্দমায় পড়লেন। মদের নর্দমায়।'

ছি ছি, এতটুকু কল্পনাশক্তি নেই মেয়েটার। সম্বন্ধ করে গোছগাছ করে সাজানো ঘরে বিয়ে দেওয়া হয়েছে কিনা, তাই সাধ্য নেই বোঝে এই যন্ত্রণা। কল্পনাশক্তি না থাক. বাস্তব বুদ্ধিটা তো থাকবে। শ্রদ্ধা না করুক অন্তত করবে তো একটু সহানুভূতি।

'তা আমাকে বললে না কেন? ওদের এ বাড়ি ছেড়ে দিয়ে আমি চলে যেতাম অন্য কোথাও!' প্রায় উন্ময়ের মত বললে ভবনাথ : 'তারপর আস্তে আস্তে ওরা ভাড়াটেদের উৎখাত করে দিত। গোটা বাড়ি নিয়ে নিত দখলে। গোটা বাড়ির মোট ভাড়া পাঁচশো টাকা কোন না হত। পাঁচশো-পাঁচশো মোট আয় সেই ফোর ফিগারই তো হত কুক্ষেন্দুর। আমাকে বললে না কেন? আমি দিতাম সব ব্যবস্থা করে।'

'আবার সেই কথা?' নীলা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল।

স্তব্ধ হয়ে গেল ভবনাথ।

'ষোল আনা বাড়ি সেই তবে দাদাকেই দিতে? কেন, আমি কি বানের জলে ভেসে এসেছি?' চোখে জল আনবার চেষ্টা করল নীলা : 'বানের জলে ভেসে এসেছি তো আইন আমাকে আট আনা অংশ দেয় কেন?'

ভবনাথ কথাটা গায়ে মাখল না। আপন মনে বললে, 'তাছাড়া, বয়েস হয়েছে, ক'দিন আর আছি সংসারে। পড়ব আর মরব একদিন ঝপ করে। তখন তখন ওই তো, ওরাই তো—'

মুখের কথা কেড়ে নিল নীলা। বললে, 'ও রকম যাওয়াই তো আইডিয়াল। চুপচাপ চলে যাওয়া। সময় পেয়ে ভেবেচিন্তে উইল করে চলে যাওয়াটাই বিচ্ছিরি—'

'দেখি। অমিতাভকে একবার পাঠিয়ে দিস।'

অমিতাভ ঘরের বাইরেই ছিল কান পেতে।

নীলা বেরিয়ে আসতেই অমিতাভ বললে, 'এই সঙ্গে সেই কথাটাও বললে না কেন?'

'কোন কথাটা?'

'সেই যে একটা মর্টগেজ দলিল তৈরি করে তাতে বুড়োর সই নেবার জন্যে তোমার দাদা চেষ্টা করছে—'

'ও সব মর্টগেজ-ফর্টগেজ আমি বুঝি না। সে সব তুমি জামাই, তোমাকে ডেকেছেন পরামর্শে. তুমি বোলো। আমি আইনের কথাটা মোটা করে বলেছি। আইন আমার জন্যে যা ধার্য করেছে তা থেকে আমি বঞ্চিত হতে পারব না। না. কিছুতেই না।' জয়ের আনন্দে আকাশে প্রায় পাখা মেলল নীলা।

সিঁড়ির মুখেই কুক্ষেন্দুর সঙ্গে দেখা। মাতাল হয়ে টলমলে পায়ে ঘরে ঢুকছে। মুখে বোধহয় এক কলি সিনেমার গান।

'এ সব কী?' গর্জে উঠল ভবনাথ।

কুক্ষেন্দু পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে গেল। দেয়ালের সঙ্গে চাইল মিশে যেতে।

'বুড়ো বয়সে সইব না এ কেলেংকারি। বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা বাড়ি থেকে।' ভবনাথ সর্বাঙ্গে কাঁপতে লাগল।

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল কুক্ষেন্দু। বলতে লাগল, 'আমি কিন্তু আমার বুড়ো বাপকে ছাড়তে পারব না। ও যতই কেননা বলুক, ওল্ড ফুল, আমি বলেছি সেই ওল্ড ফুলই আমার আপনার লোক। যদি সংসার বলে আমার কিছু থাকে, কিছু হয়, তবে বাপকে নিয়ে, বাপকে ছেড়ে দিয়ে নয়। ও কত বলেছে বুড়োকে ছেড়ে একা বেরিয়ে এস, আমি রাজি হইনি। বলেছি, আমার ভারি সাধ তুমি আমার বাবার সেবা করো. আর যে মা-নাম সংসার থেকে উঠে গিয়েছে, বাবার মুখে তোমার উদ্দেশে আবার সেই মা-নাম শুনি।'

কিন্তু এত মদ যে খাচ্ছে. পয়সা পাচ্ছে কোত্থেকে? নগদ যা কিছু ছিল তা তো শেষ-পাই পর্যন্ত উধাও। ধার করছে? ধারই বা মিলবে কত দিন? রাহাজানি করছে? তা হলে থানা-পুলিশ বরদাস্ত করছে কেন?

অমিতাভই রহস্যোদ্ধার করে দিল।

নিচে ঘেঁষাঘেষি করে তিন ঘর ভাড়াটে। সত্তর-আশি করে ভাড়া। তাদের একজনের সঙ্গে দিব্যি ষড় করেছে কুক্ষেন্দু। পঞ্চাশ টাকা মতন নিয়ে পুরো ভাড়ার রসিদ কাটছে। আপনার হয়ে 'ফর' দিয়ে সই করে দিচ্ছে। এক বাড়িতে থাকা ছেলে বাপের এজেন্ট নয় এ কেউ মানবে না। ঠিক উশুল দেবে আদালত।

ডেকে জিগগেস করুন ভাড়াটেকে।

ভাড়ার জন্যে তাগাদা করতেই ভাড়াটে কুক্ষেন্দুর দেওয়া রসিদ দেখাল। ন্যাকা সেজে বললে, 'পুরো টাকাই নিয়েছেন আদায় করে।'

'কোনোদিন আমার ছেলেকে ভাড়া দিয়েছেন?' ধমকে উঠল ভবনাথ।

'তা আমরা কী জানি। উনি যে আপনার লোক নন তা কী করে বুঝব!'

ভবনাথ মাথায় হাত দিয়ে বসল। 'কী সর্বনাশ!'

'তবু তো মোটে একজনের সঙ্গে ষড় করেছে। আরো দু'জনকে যদি হাত করে—' বললে অমিতাভ।

'তা হলে তো না খেতে পেয়ে মারা যাব।' ভবনাথ চারদিক অন্ধকার দেখল।

'তা ছাড়া আরো একটা কুমতলব ওর আছে বলে শোনা যাচ্ছে।' অমিতাভ ঘন হল।

হতবুদ্ধির মত তাকিয়ে রইল ভবনাথ।

'বাড়িটা মর্টগেজ দেবার তালে আছে। একটা স্ট্যাম্প কাগজে দলিল চড়িয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কোনো কায়দায় আপনার সই নেবে বলে।'

'কী ভয়ংকর কথা! এ যে দেখি দিনে ডাকাতি!'

তবু সাহস করে কুক্ষেন্দুকে ডাকাল ভবনাথ। দিনের বেলায় যখন সে সাদা চোখে। আর আশ্চর্য, দুটো অভিযোগই সে স্বীকার করলে। যখন হাতে পয়সা-কড়ি নেই তখন এক-আধটা ভাড়াটে থেকে এক-আধ মাসের ভাড়া আদায় না করে উপায় কী! আর যখন সে ব্যবসাই

করবে তখন বাড়ির মর্টগেজ ছাড়া ক্যাপিট্যাল পাবার আশা কোথায়! প্রথম বারের ব্যবসাটা তছনছ হয়ে গিয়েছে, এবারু আর শৈথিল্য হবে না. অভিজ্ঞতাই বনেদের কাজ করবে। আর, সুদিনের মুখ দেখতে এবার আর দেরি করতে হবে না. বছর খানেকের মধ্যেই বাড়িটা খালাস হতে পারবে।

'তোর ব্যবসার জন্যে তুই আমার বাড়ি মর্টগেজ দিবি?' প্রায় লাঠি ও'চাল ভবনাথ।

'আহা, আমি দেব কেন? তুমিই দেবে। আমার জন্যে দেবে। যেহেতু এ বাড়ি আমার হবে।'

'একলা তোর হবে? কেন, নীলার অংশ নেই?'

'তা নীলাকে তুমি তা দেবে কেন? তুমি উইল করে আমাকে ষোল আনা দিয়ে দেবে। বিয়ের পর মেয়ে তো পর, শত্রু, বিদেশী,—তাকে কি কেউ দেয়?'

'তোমাকে দেব, আর তুমি তা উড়িয়ে পুড়িয়ে মর্টগেজ-সেল করিয়ে শেষ করে দেবে!' হুঙ্কার ছাড়ল ভবনাথ: 'বেরো আমার বাড়ি থেকে, কে শত্রু আমাকে চিনিয়ে দিতে হবে না।'

'আমার জিনিস রাখলেও আমিই রাখব, পোড়ালেও আমিই পোড়াব।' অবাক হবার ভাব করল রুক্মেন্দু: 'তাতে কার কী মাথাব্যথা? আর তখন তুমি কোথায়? মানুষই থাকে না, তা তার বাড়ি-ঘর!'

ভবনাথ আর কোনো বাক্যব্যয় করল না, ডান হাতের তর্জনী দরজার দিকে তীক্ষ্ণ করে রাখল।

অনেক রাতে মাতাল হয়ে তবু বাড়িতেই ফিরতে এসেছিল রুক্মেন্দু, ভবনাথ নিজের হাতে দরজা বন্ধ করে দিল।

'এই ভালো হল,' অমিতাভ বললে 'এবার যাঁদ শোধরায়! ঘা না খেলে মানুষ ফেরে না।'

তারপরেই ভবনাথ পড়ল।

কিন্তু এক কোপে গেল না। কুচি কুচি হতে লাগল।

অমিতাভ স্ত্রীকে বললে, 'এবার বাপের সেবা করো। বাবার বাড়িতে গিয়েই থাকো।'

'তা আর বলতে।' নীলা গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দশ হাতে সেবা করতে লাগল।

ভবনাথ বললে, 'আমাকে নার্সিং হোমে পাঠিয়ে দে। তোর সেবায় আমাকে কেন চাইছিস মামায় বাঁধতে। যেতে দে তাড়াতাড়ি।'

সে কি আর শোনবার? অমিতাভ চিকিৎসার বিস্তৃত ব্যবস্থা করে। আর রাত নেই দিন নেই, শিয়রে বা পদতলে বসে আছে নীলা, মূর্তিমতী শুশ্রূষা।

'উইল কিছু করেছ বাবা?'

'না, মা।'

'তবে?'

'তুই-ই তো বলেছিলি, চুপচাপ চলে যাওয়া। তাই যাব। কোনো কিছু লেখা-পড়া করব না। যা হবার তাই হবে।'

এ কি আর এখন বলা চলে? এত পরিচর্যা, এত অর্থব্যয়ের পর? তাছাড়া, চুপচাপ গেলে, ফলটা কী দাঁড়াবে? দাদা আট আনা নীলা আট আনা পাবে। একত্র থাকা তো অসম্ভব, দুজনের দুই সংসার। তা ছাড়াই ঐ মাতাল দুশ্চরিত্রের সঙ্গে একত্রবাসও অসঙ্গত। সর্বক্ষণই গোলমাল আর বিসম্বাদের ভয়। আরো কথা, ঐ ছন্নমতি তার অংশকে নিটুট রাখবে নাকি? মদের পিপাসায় গিলে খাবে, বিক্রি করে দেবে। আর সেই নিষ্ঠুর ক্রেতা ভাগ-বাঁটোয়ারা চাইবে, তার মানে নীলাকেই ভোগ করতে দেবে না, সর্বাংশে গ্রাস করবে। বাবার ছেলে-মেয়ে কেউ এ বাড়িতে থাকতে পাবে না। আর মায়ের নামে যে বাড়ির নাম ছিল, 'সুধা সৌধ' তাই হয়ে দাঁড়াবে বাগারিয়া কি চামারিয়া হাউস।

কিংবা বাড়িটার হয়তো অস্তিত্বই থাকবে না। এটুকু যোগ করল অমিতাভ। ভেঙে ফেলে নতুন প্যাটার্নে তৈরি হবে।

তা ছাড়া দুশ্চরিত্র ছেলেকে বাপ ত্যাগ করে এ আর নতুন কী! সম্পত্তির নিরাপত্তার জন্যেই ত্যাজ্য করে।

'ওর কোনো খবর পাস?' ক্ষীণস্বরে জিগগেস করে ভবনাথ।

'কোনো খবর নেই বাবা।' আদর ঢেলে দরদ ঢেলে বলে নীলা। 'উনি কত খোঁজাখুঁজি করছেন, কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, তবু পাত্তা নেই।'

ক্ষীয়মান সমস্ত শক্তিকে যেন শ্রুতির বিন্দুতে সংহত করে ভবনাথ। এই বুঝি কোনো শব্দ শুনতে পাবে। রাতে থামা-থামা কড়া নাড়ার শব্দ, সিঁড়িতে টলটলে শিথিল পায়ের শব্দ কিংবা সেই সিনেমার এক কলি উড়ুক্কু গান।

এ ভাবে রাখাটা ঠিক হবে না। সত্য কথাই সেদিন তাই বললে অমিতাভ।

'রুক্মেন্দুর দেখা পেলাম।'

চোখ মেলে তাকাবার চেষ্টা করল ভবনাথ।

'ঘোড়াবাগান বস্তিতে আছে।' একটু বা ব্যঙ্গ মেশাতে চাইল অমিতাভ: 'জন-গণের কাজ করছে।'

ঘোলাটে চোখ চাইল বুঝি উজ্জ্বল হতে।

'বললাম আপনার অবস্থার কথা। কত আসতে বললাম। বললে যে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে সে বাড়িতে আমি যাই না।'

'শেষ দেখা দেখে যাবার কথা কত বললেন উনি।' নীলা খোনকারি করল: 'উত্তরে বললে যেখানে সব শেষ হয়ে গিয়েছে সেখানে আবার শেষ কী!'

বিকৃত ভঙ্গিতে ঠোঁট নড়ে উঠল ভবনাথের। গালাগাল দিলে। পাজি, পাজির পা-ঝাড়া—

ভবনাথের চেয়ে নীলা বেশি অস্থির। আর নীলার চেয়েও বেশি অস্থির অমিতাভ।

'তোকেই সব দিয়ে যাব নীলু।'

কিন্তু মুখে বললে তো হবে না। দলিল চাই।

'মুখে বললে শুধু আট আনা হবে।' বললে নীলা।

'মুখে না বললেও আট আনা হবে।' ব্যাখ্যা জুড়ল অমিতাভ।

সুতরাং দলিল চাই। আর দলিল মানে উইল নয়। কেননা এক বেলার উইল আরেক বেলায় বাতিল হতে পারে। তাই পাকা একটি দানপত্র দরকার। নির্ব্যূঢ় হস্তান্তর।

ছেলে চরিত্রহীন, উদ্ধত, উন্মাদ। আর মেয়েটিই বশংবদা, সেবাপরায়ণা। বাপের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই হবে মেয়েকে দান করবার। এ দানে যোগসাজসের কিছু নেই। খুবই ন্যায্য, খুবই বৈধ।

'আর উইল করলেই বা কী। বদলাবার সময় কোথায়? শোক-শোক মুখ করল নীলা: 'ডাক্তার বলেছে আর বড় জোর আটচল্লিশ ঘণ্টা।'

অক্সিজেন চলেছে।

'একটা স্ট্যাম্প-কাগজে ছাপানো দান-পত্রের দলিল নিয়ে ঘোরাঘুরি করছে অমিতাভ।

নাকের নলটা সজোরে ছুঁড়ে ফেলতে চাইল ভবনাথ। চাইল পাশ ফিরতে। বললে, 'আমাকে শান্তিতে যেতে দে।'

শান্তিতে যেতে হলে দলিলটা যে সই করে দিতে হয়।

'সেই যে বলছিলে বাবা, ষোল আনাই আমাকে দেবে।' মমতার কপালে গালে হাত বুলোল নীলা: 'তা হলে

দলিলটা যে সজ্ঞানে সই করতে হয়। তোমার বাড়িটা নিটুট থাকবে, মায়ের স্মৃতিটুকু ম্লান হবে না। যাবার সময় এই-ই তো তোমার শান্তি।'

'কই দে, সই করে দি।' হাত বাড়াল ভবনাথ।

বালিশ উঁচু করে তুলে ধরল দুজনে, নীলা আর অমিতাভ। সজ্ঞানে সুস্থ মনে অন্যের বিনানুমতিতে সই করে দিল ভবনাথ।

কিন্তু আটচল্লিশ ঘণ্টা কেটে গেল, ভবনাথ মরল না।

আরো আটচল্লিশ ঘণ্টা।

ডাক্তার বললে, 'মির‍্যাকলস ডু হ্যাপেন। এ যাত্রা বেঁচে গেলেন বাবা।' বিনা ফি-তে সার্টিফিকেট দিল নীলাকে ঃ 'যা অমানুষিক সেবা করলেন, দেবতাদের দেখবার মত।'

মুখ উজ্জ্বল করল নীলা। শুধু শুধু ম্লান করবে কেন? বাবা বাঁচুন বা মরুন, কিছুতেই কিছু আর আসে যায় না। পাশার দান পড়ে গিয়েছে। থলি দিয়ে ফেলেছে তার সমস্ত সম্ভার।

বাবা যখন ভালো হয়েই উঠলেন তখন এ বাড়িতে থাকবার আর কী দরকার! নীলা তার নিজের বাড়ি, শ্বশুর বাড়ি, চলে গেল।

আর আটচল্লিশ দিন পার হবার আগেই একদল মেয়ে পুরুষ তাদের হাঁড়িকুঁড়ি লটবহর নিয়ে দোতলায় একেবারে ভবনাথের ঘরে এসে ঢুকল।

'এ কী ব্যাপার?' চেঁচিয়ে উঠল ভবনাথ।

'আমাদের দোতলাটা ভাড়া দিয়েছেন। সেলামি নিয়েছেন ভারি হাতে।'

'কে ভাড়া দিয়েছে?'

'যার বাড়ি সে—অমিতাভবাবু।'

'কে অমিতাভ?' আরো গলা চড়াল ভবনাথ।

'আপনার জামাই। আমাদের দলিল দেখিয়েছেন। আপনার মেয়ে নীলা দেবী এ বাড়ির একা মালিক। আর দেবীও যা দেবাও তাই।' ভাড়াটেরা বললে।

আশ্চর্য, এ দুরূহ মুহূর্তে স্ট্রোক হল না ভবনাথের। শানে আছড়ে পড়ল না। দিব্যি খাড়া রইল।

দিব্যি বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

কোথায় ঘোড়াবাগান বস্তি, খুঁজতে খুঁজতে সন্ধের দিকে এসে হাজির হল ভবনাথ।

ডাকল ঃ কৃষ্ণ, কৃষ্ণেন্দু।

এ কী, বাবা! পাগলের মত ছুটে এল কৃষ্ণেন্দু।

'শান্তিতে চুপচাপ মরতে দিল না ওরা।' ছেলের বাহুর মধ্যে ভেঙে পড়ল ভবনাথ ঃ 'দলিল করিয়ে নিল। শেষে দিল তাড়িয়ে বাড়ি থেকে।'

'কেন, আমার এ বস্তিই তো আছে।' কৃষ্ণেন্দু বললে, 'আমার ঘরে, আমার কাছেই তুমি থাকো। কে কাকে তাড়ায়। এক দরজা বন্ধ হয় তো আরেক দরজা খোলে। কেন তুমি ভেঙে পড়ছ? ভয় কি, আমি—আমিই তো তোমার আছি।'

কল্পতরু

মনোজ বসু

বাস্ মল্লিক গার্হস্থ্য আশ্রমের নাম। সে নামের উল্লেখ নিষেধ। ইদানীং পরিব্রাজক শ্রীমৎ বাসবানন্দ স্বামী। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী অবধি পায়ের নিচে। কাগজে খবর বেরোয়, পরিব্রাজক মহারাজ আজ অমুক জায়গায়, কাল তমুক জায়গায়। ভক্তদল মুকিয়ে থাকেন, কলকাতা শহরে আবার কবে পদরজ পড়বে। এবং কোন ভক্তগৃহ ধন্য করবেন এবারে।

যে পাড়ায় যার বাড়িতে পরিব্রাজক মহারাজের আস্তানা—আগেভাগে থানায় এত্তেলা দিতে হয়। মেলা জমে। ট্রাফিক পুলিশ হিমসিম খেয়ে যায় মোটর চলাচলের বিধিব্যবস্থায়। বন্যা-স্রোতের মতো মানুষের স্রোত সেই মুখো। রাত থাকতে শুরু করে সন্ধ্যা অবধি। সন্ধ্যার পরে মহারাজ ধ্যানঘরে আশ্রয় নেন, তখন আর কেউ থাকতে পায় না। ফুলের দাম চড়ে গিয়ে দুনো তেদুনো হয় সেই অঞ্চলে। দু-গাছি করে মালা নিয়ে আসেন ভক্তেরা, মহারাজকে পরিয়ে দেন। মহারাজ তার মধ্যে একটি খুলে ভক্তের গলায় পরান। আশীর্বাদি মাল্য। ভববন্ধন মোচনের উপদেশ দেন মহারাজ। দুই কানে সেই উপদেশামৃত পানের জন্য ভক্তেরা দূর-দূরান্তর থেকে ছোটে। কী মধুর কণ্ঠস্বর, সানাই কোথায় লাগে! গীতা ও ভাগবত পাঠ হয়, শৌরি মিঞার গান তার কাছে নস্যি।

কিছুকাল থেকে পরিব্রাজক মহারাজ বরানগরে বেচু শিকদারের বাড়ি এসে উঠছেন। বেচু ইদানীং প্রধান শিষ্য। ছায়ার মতো সাথে সংগে ঘোরে। উপদেশামৃত বর্ষণের মুখটায় বেচু ঝকমকে রুপোর থালা পেতে দেয় মহারাজের সামনে। মুষলধারে নোট পড়তে থাকে। মোহর পড়ে, হীরার আংটি পড়ে, মবচেন পড়ে, কাঁচা টাকাও পড়ে কিছু কিছু। এ ছাড়া বিদঘুটে মানত থাকে কারও কারও—সোনার কেয়ূর-কঙ্কন দিলেন এবারে একজন। এক বিধবা দিলেন সোনার কাজ-করা লপেটা জুতো। মহারাজের সামনে এনে নিবেদন করেন, যদি তিনি একটু-খানি স্পর্শ দেন। কী বিদঘুটে আশা বিবেচনা করুন—ঐহিক বস্তুতে অংগ ঠেকাবেন মহারাজ!

ভক্তেরা অগত্যা বলে, জিনিষগুলো আসনের উপর রেখে দাও বেচু, আলটপকা নজর যাতে পড়ে।

মহারাজ বিষম বেজার ভক্তদের ব্যাপারে। মাঝে মাঝে ক্ষেপে যান : এ সমস্ত কি! ঠাকুরের নাম করতে বসি, চোখের উপর তোমরা ছাই-মাটির পাহাড় করে রাখ। এমন অত্যাচার করলে হিমালয়ের গুহায় ডুব দেব। কোনদিন আর দেখতে পাবে না।

বেচু শিকদার পাকা লোক। মহারাজকে কী করে সামলাতে হয় সে জানে! সমান তেজে বেচুও বলে, ছাই বলুন মাটি বলুন, এক কাচ্চাও তো ঘরে থাকে না। সুর্য হয়ে যদি টেনে নিলেন, বৃষ্টির জলে সমস্ত ঢেলে দিয়ে অবসর। কতই তো দিয়েছে এযাবৎ ভক্তজনে, একখানা আস্ত সিকি বের করুন দিকি তবিল থেকে। তবে বুঝব।

মুখের মতন জবাব পেয়ে মহারাজের আর রাগ দেখানোর উপায় থাকে না। হেসে ফেললেন : কথাই তো তাই। কিছুই যখন থাকে না, ভুতের বোঝা কেন এমন বাঁধাছাঁদা কর? খেটেখুটে কার জন্য লিস্টি করছ?

কানে কথা না নিয়ে বেচু অবিচল-ভাবে কাঁচা টাকা গুণে গুণে থাক দিচ্ছে। আংটি ও মোহর কতগুলো পড়ল, লিস্টি করে যাচ্ছে।

কথা শোন বেচারাম। ভক্তদের মানা করে দাও। খালি হাতে যেন সকলে আমার কাছে আসে।

বেচু মুখ তুলে প্রশ্ন করে, যখন কল্পতরু হবেন তখনকার উপায় কি? অন্য-লোকে থাকেন তো আপনি, কিছু টের পান না। আমাদেরই ভাবতে হয়। অভাবী লোক কাতর হয়ে এসে হাত পাতবে, কী দেবেন তাদের হাতে?

জবাব দেবার কিছু নেই। বেকুব হয়ে মহারাজ মৃদু মৃদু হাসেন।

জো পেয়ে গিয়ে বেচু শিকদার ফলাও করে বলে, ধনীরা ভক্তিভরে দিয়ে যান, দরিদ্র লাভবান হয়। আপনি নিমিত্ত হয়ে করেন, আমরা মাঝে পড়ে একটু খেটেখুটে দিই। হেন অবস্থায় কেমন করে আপনার আপত্তি মানতে পারি, বলুন।

বাসবানন্দ বলেন, বিচার করে দেখলে তাই বটে। কিন্তু কী জান, ঐশ্বর্যের ছায়ামাত্র দেখলে মন আমার কুঁকড়ে আসে। অস্বস্তি জাগে। সেখানে যুক্তি-বিবেচনার ঠাঁই নেই। কথা দাও তবে, যত কিছু জমা হয় কল্পতরুর সময়টা সমস্ত হাতের কাছে ধরে দেবে তুমি। পাইপয়সার বস্তু ঘরে থাকবে না। তুমি যদি দায়িত্ব নাও, সেই বিশ্বাসে যা-হোক করে সামলে নেব।

পরহিতের জন্য বেচারাম শিকদারকে সেই কঠিন দায়িত্ব নিতে হয়েছে। ভক্তেরা যা দিয়ে যাচ্ছে, কাল তার তিলেকমাত্র অবশিষ্ট থাকবে না। সমস্ত কল্পতরুতে চলে যাবে।

এতক্ষণের বাগবিতণ্ডায় মন বিক্ষিপ্ত হয়েছে। মহারাজ ধ্যানঘরে ঢুকে দরজা দিলেন।

মহারাজ যা-ই বলুন, ভক্তকুল বড় প্রসন্ন বেচুর উপর : তুমি আছ বেচারাম, তাই রক্ষে। নইলে এই যত প্রণামী [illegible]র মহারাজ হয়তো আস্তাকুড়ে ছুঁড়ে দিতেন।

বেচারাম বলে, দিয়ে হিমালয়ে পাঠাতেন। হিমালয়-হিমালয় করে বড্ড ঝুঁকেছেন। আমি ঠেকিয়ে আসছি। নরলোকের কল্যাণে ওঁকে ধরে রাখতেই হবে। এত যে প্রণামী দেখছ, কাল সকালে কিছুই নেই—কল্পতরু হয়ে দানসত্র করে দিয়ে ফোকতারাম।

কল্পতরুর ব্যাপারটা সবিশেষ জানবার জন্য ভক্তরা বেচারামকে চেপে ধরে : কী রকম অবস্থা হয় তখন? কি করেন?

লক্ষণাদির যথাযথ বর্ণনা দিল বেচারাম। বলে, সেই অবস্থায় যে যা চাইবে, সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেবেন। এতকাল ধরে এত যে পুণ্যফল জমিয়েছেন, জোর করে চাইলে তা-ও বোধ হয় দিয়ে দেবেন।

আমাদের রাতুলকৃষ্ণ ইতিমধ্যে ভক্তদলের মধ্যে জেঁকে বসেছে। সে জিজ্ঞাসা করে, এইসব আংটি-মোহর যদি চেয়ে বসে, দিয়ে দেবেন?

তা-ই তো চায় যত ঐহিক মানুষ। আসল বস্তু চাইতে তো দেখলাম না কাউকে। প্রণামীর থালাখানা সেই সময় সামনে নিয়ে ধরি। যে যা চায়, মহারাজ দশার ঘোরে হরির লুঠের মতো ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেন।

রাতুলও সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলে : যায় যাকগে ছাইভস্ম জিনিষ। আসলের কপর্দক যাচ্ছে না—তা হলেই হল।

আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে জিজ্ঞাসা করে, সমস্ত দিয়েথুয়ে দেন, একেবারে কিছু রাখেন না?

সগর্বে বেচু শিকদার বলে, সমস্ত। নতুন আবার না পড়ল তো খোদ মহারাজকেই নিরম্বু উপোসি থাকতে হবে। হর্ষবর্ধনের সেই দানযজ্ঞের মতো। একদিন কী হল—থালার উপরে প্রণামী পড়ে, সেই থালা অবধি দান করতে যাচ্ছেন। আন্দাজ পেয়ে আমিই প্রতিগ্রাহী হয়ে থালাখানা ভিক্ষে নিলাম। আমার জিনিষ এখন, ওঁর দানের এক্তিয়ার নেই।

রাতুলকৃষ্ণ তারিপ করে : খুব কায়দা করে আটকেছেন কিন্তু জিনিষটা। সত্যিই তো, ভক্তজনের প্রণামী পড়বে, জায়গা একটা চাই তার জন্যে। থালা না থাকলে কিসের উপর সবাই দেবে?

পরিব্রাজক মহারাজের কল্পতরু হয়ে বসার কথা মুখে মুখে অনেক দূর অবধি রটনা। নানা জনে এসে বেচুকে জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা, কোন সময়টা হয় বলুন দিকি?

বেচারাম উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বলে, পাঁজিপুঁথি দেখে তিথিনক্ষত্র ধরে হয় না তো! স্বেদ-কম্পন ইত্যাদি শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ সহ দশাপ্রাপ্ত হন হঠাৎ। চেহারা দেখতে দেখতে ভিন্ন রকম হয়ে যায়। আমরা বুঝতে পারি, এইবার—

রাতুল পরমোৎসাহে বলে, বটে, বটে! রোজই একবার করে হয় অন্তত।

তার কোন মানে নেই। একদিনে হয়তো দু-বার—তিনবার। আবার কোনদিন হলই না।

মুশকিল তো!

বলে রাতুল তৎক্ষণাৎ সামলে নিয়ে বলে, ধুলোমাটি জিনিষের আমি কোন পরোয়া করিনে। মহারাজের সেই আধ্যাত্মিক অবস্থা একটিবার শুধু চোখে দেখবার বাঞ্ছা।

রাতুলকৃষ্ণ যে ইস্কুলে পড়েছে, বনমালী ভট্টাচার্য সেখানে সেকেন্ড পণ্ডিত ছিলেন। রিটায়ার করার পর বড় অর্থসংকটে আছেন। তার উপরে কন্যাদায়। বিয়ে ঠিকঠাক, কিন্তু খরচার জোগাড় হচ্ছে না। একদিন এসে রাতুলকে ধরলেন : তুমি একটা উপায় কর বাবা। কি করি, বলে দাও।

রাতুল বলে, আজে-বাজে জায়গায় ঘুরে কী হবে! বাসবানন্দকে গিয়ে ধরুন—কল্পতরুর সময়টা। শুনেছি, যে যা চায় পেয়ে যায়। শ-পাঁচেক টাকাও যদি অন্তত বাগাতে পারেন—

পণ্ডিত বলেন, আমিও সেই রকম শুনেছি। চেষ্টা ঢের করেছি, কিন্তু সময়টা ধরতে পারছি নে। কত ভক্তজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, সকলের এক গতিক। একজনে বললেন, তাঁর ফসকে গেছে অতি অল্পের জন্যে। টাটকা দশা ভেঙেছে মহারাজের—তখনও বেশ আছে। চক্ষু রক্তবর্ণ। আবোল-তাবোল বকছেন, স্বাভাবিক জ্ঞান আসেনি। বেচারাম ধরে তাঁকে ধ্যানঘরে পুরে ফেলল।

বলেন, আমি হদ্দ চেষ্টা করেছি বাবা। বেচারামের সঙ্গে খাতির জমিয়ে রাত থাকতে গিয়ে বসেছি। দুপুরে গড়িয়ে যায়। বেচা বলে, দেরি আছে পণ্ডিত মশায়। অভুক্ত আছেন আপনি, খেয়েদেয়ে আসুনগে। নাকে-মুখে গুঁজে পৌনে দুটোর মধ্যে ছুটেছি। বেচা বলে, এই যাঃ, এক্ষুণি তো হয়ে গেল!

ইতস্তত করে পণ্ডিত মশায় বলেন, মহাপুরুষের ব্যাপার—বলতে নেই—কিন্তু প্রত্যক্ষদ্রষ্টা আজ অবধি একজনকেও পেলাম না। পাপমনে এক এক সময় সন্দেহ জাগে—

রাতুল হেসে ঘাড় নাড়ে : সন্দেহের কিছু নেই। পারমার্থিক তত্ত্ব মহারাজ ঢালাও দান করে যান। কিন্তু ঐহিক বস্তু সে রকম নয়, একবারের বেশি দু-বার কাউকে দেন না। আর ঐ একবার যে পেয়ে গেল, ঈশ্বর-লাভের জন্য সে আর ঘোরাঘুরি করে না। একেবারে হাওয়া।

বনমালী পণ্ডিত রাতুলের হাত জড়িয়ে ধরলেন : তুমি ভক্তমানুষ। সর্বদা যাতায়াত তোমার ওখানে। এই কাজটা আমার করে দাও, বড্ড ঠেকে গেছি। যা তুমি বললে—খান পাঁচেক একশ' টাকার নোট অন্তত।

রাতুল একটু ভেবে বলে, দেখা যাক কতদূর কী করা যায়। সময় ঠিক বের করে ফেলব। আপনি এখন আসুনগে পণ্ডিত মশায়।

দিন দুই কেটেছে। মিথ্যা ভরসা দেয় না রাতুল। বেচুর কাছে কিছুই পাওয়া যাবে না—বেচুর বাড়িতেও নয়, এদিক-সেদিক খুব ঘোরাঘুরি করেছে, সুলুকসন্ধান নিয়েছে। দুইদিন পরে রাত্রি ন'টার সময় সে ট্যাক্সি নিয়ে বনমালীর বাড়ি চলে এল : উঠে পড়ুন পণ্ডিত মশায়। এক্ষুনি।

বনমালী ভট্টাচার্য রাত্রে যৎসামান্য ছানা-চিনির ফলার করেন। সবে কেবল আচমন করে বসেছেন। রাতুল বলে, খেতে গেলে ফসকে যাবে। উঠে আসুন শিগগির। ট্যাক্সিতে উঠুন।

ট্যাক্সিতে উঠে বনমালী জিজ্ঞাসা করেন, কল্পতরু লেগে গেল বুঝি?

হুঁ—। বলে রাতুল ট্যাক্সিওয়ালাকে তাড়া দিচ্ছে : জোরে—খুব জোরে। এক টাকা বেশি ধরে দেব।

পণ্ডিতকে একবার বলল, বৃদ্ধ মানুষ আপনি। মহারাজের চেয়ে বয়সে বড়। তায় ব্রাহ্মণ। পা ধরতে যাবেন না, হাত জড়িয়ে ধরবেন আমি যখন ইসারা করব। পা ধরলে মহারাজ চটে যাবেন, কিছুই হবে না।

বেচারামের বাড়ির অদূরে ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে টিপিটিপি দু-জনে বৈঠকখানায় বড় আলমারির আড়ালে হয়ে দাঁড়াল। একটি ভক্ত আর এখন নেই। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু সকলের কাজকর্ম মিটিয়ে সন্ধ্যাকালে একটু ভ্রমণে বেরোন। আর একবার গঙ্গাস্নান করে শুচিশুদ্ধ হয়ে ফেরেন। ফিরে এসে নিঃশব্দে ধ্যানঘরে ঢুকে পড়েন। আজকে এখনো

প্রত্যাগমন হয়নি, সে খোঁজ রাতুল নিয়ে এসেছে।

আহারে ভণ্ডুল ঘটেছে বনমালীর সেজন্য কিছু ক্ষোভ আছে। বললেন,

থতমত খেয়ে বনমালী পণ্ডিত রাতুলের দিকে তাকান। রাতুল অবিরত ইঙ্গিত করছে। শুভক্ষণ সমাগত। এক্ষুনি—এই মুহূর্তে হাত ধরতে হবে।

হাত উঁচিয়ে বনমালী ভট্টাচার্য সত্যি সত্যি এগিয়ে আসেন।

বাসবানন্দ ত্বরিত বেগে ঘুরে দাঁড়িয়ে ব্যস্ত হয়ে বলেন, কত চাই জিজ্ঞাসা কর বেচারাম। টাকার অঙ্কে বলুন।

বনমালী শেখানো কথা বললেন, পাঁচ-শ টাকা—

দিয়ে দাও বেচারাম। আমি বলছি. শিগগির নিয়ে এস।

বনমালী আবার বলেন, আর আংটি একটা বরের জন্য।

কল্পতরু অবস্থা চলছে বাসবানন্দের। বললেন, ভাল দেখে একটি আংটিও নিয়ে এস বেচারাম।

মহারাজ ঘুরে দাঁড়িয়ে আছেন তেমনি। এঁরাও ধ্যান-ঘরের দরজায়। বেচারাম ভিতর থেকে টাকা এনে গুণে গুণে পাঁচশ' মিলিয়ে দিল। তারপর ঠকাস করে আংটিটা টেবিলের উপর ঠুকে বলে, হল তো! বিদেয় হন।

আশীর্বাদ নিয়ে ভক্তদ্বয় দরজা ভেজিয়ে নিষ্ক্রান্ত হলেন। দাঁতে দাঁত ঘষে বেচারাম বলে, আপদ!

মহারাজ বলেন, পা ধরলে ক্ষতি ছিল না। হাত ধরবার বায়নাক্কা মাথায় কে ঢুকিয়ে দিল রে! ইন্দ্রত্ব চাইলেও তো না দিয়ে উপায় ছিল না। দুয়োর এঁটে দাও বেচু, আবার এসে কেউ না জ্বালায়।

"এই যাঃ এক্ষুণি তো হয়ে গেল।"

কল্পতরু শুরু হয়েছে বলে ছুটোছুটি করে নিয়ে এলে। মহারাজেরই তো খবর নেই।

রাতুল বলে, এসে পড়বেন এক্ষুনি, সময় হয়ে গেছে। গাড়ি থেকে নামবেন একেবারে কল্পতরু অবস্থায়। কিন্তু ঐ যা বললাম—পা ধরবেন না কদাচ। অনেকে পা ধরে পড়ে বলে মহারাজ বিরক্ত হন। হাত ধরে ফেলবেন আপনি। বেচু শিকদার হুমকি দিতে পারে। কানে নেবেন না।

বলতে বলতেই মোটরগাড়ি এসে থামল। বেচারামের টু-সীটার গাড়ি—চালাচ্ছে বেচারাম নিজেই। মহারাজ নেমে পড়ে বৈঠকখানায় ঢুকলেন। বনমালী চক্ষের পলকে ধ্যান-ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। রাতুল তাঁর পাশে।

বাইরে থেকেই বেচু হুংকার দিয়ে ওঠে: আঁ, কী চাই তোমাদের? সারাদিন ধরে এই কাণ্ড চলেছে! স্বামিজী নিজের কাজে বসবেন একটু, ধ্যানঘরে যাবেন। সেই ফাঁকটুকুও দেবে না?

ছুটে ঘরের মধ্যে এসে বলে, বেরিয়ে যান। দরকার থাকে, কাল সকালবেলা আসবেন।

আগের শেখানো কথাগুলো বনমালী আবৃত্তি করে যান: আমি যাব না মহারাজ। মেরে ফেললেও নড়ব না। মেয়ের বিয়ে আসন্ন। আপনাকে হাত ধরে বলছি—

বেচু শিকদার চিৎকার করে ওঠে: স্বামিজীর হাত ধরবে, এত বড় আস্পর্ধা! রামকৃপাল সিং—

বেচারাম দরজায় খিল দিল, হুড়কো তুলে দিল। মহারাজের হাতে বিলাতি কারণবারি—এক বোতল হুইস্কি। পশমি অঙ্গবাসের নিচে ঢাকা। গুরু আর প্রধান শিষ্য অতঃপর ধ্যানঘরে প্রবেশ করলেন।

দু-গাছি করে মালা নিয়ে আসেন ভক্তেরা...

ইস্পাত
ভারতের
শিল্পায়ণের
বনিয়াদ
দুর্গাপুর
ইস্পাত কারখানা
আপনাকে দেবে
পুল এবং ইমারত
নির্মাণের জন্য
ইস্পাত,
কৃষিকার্যের
সরঞ্জাম,
রেলওয়ের জন্য
স্লীপার, ফিশপ্লেট
এবং হুইল সেট।

রামু ঠাকুর

মণিহারীঘাটের প্রায় ক্রোশখানেক পশ্চিমে খেয়াঘাট। মণিহারীঘাট হইতে যে জাহাজ ছাড়ে তাহা একেবারে সাক্রিগলিঘাটে গিয়া উপস্থিত হয়। যাহাদের সাক্রিগলি যাওয়া দরকার, কিম্বা সাক্রিগলিতে ট্রেণ ধরিয়া অন্যত্র যাওয়ার প্রয়োজন তাঁহারাই সাধারণত জাহাজে যান। সাক্রিগলিতে ঘাট-ট্রেণ ধরিয়া সাহেবগঞ্জ জংশনে যাওয়া যায় এবং সেখান হইতে পৃথিবীর সর্বত্র। জাহাজ থাকা সত্ত্বেও কিন্তু মণিহারীতে একটি খেয়াঘাট আছে গ্রামবাসীদের দৈনিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য। এ পারের অনেকের জমি গঙ্গার ঠিক ওপারে আছে, তাহারা প্রত্যহ সেখানে কাজ করিতে যায়। অনেকে আবার চর পার হইয়া পায়ে হাঁটিয়া সোজা-পথে সাহেবগঞ্জে গিয়া উপস্থিত হয় বাজার করিবার জন্য। ইহাতে তাহাদের ভাড়া কম লাগে, সময়েরও সংক্ষেপ হয়। ভোরে বাহির হইলে সন্ধ্যা নাগাদ তাহারা বাড়ি ফিরিয়া আসিতে পারে। মালপত্র বহিয়া আনিবার জন্য অনেকে সঙ্গে ঘোড়াও লইয়া যায়। সুতরাং জাহাজে যাওয়া অপেক্ষা নৌকায় যাওয়াই অনেকের পক্ষে বেশী সুবিধাজনক। খেয়াঘাটের এপারেও বালির চর, ওপারেও তাই। বালির চরের উপরই পায়ে-হাঁটা পথ হইয়া গিয়াছে একটা। গঙ্গার জল যখন বাড়ে তখন সে পথ লুপ্ত হইয়া যায়, নূতন পথ সৃষ্ট হয় আবার।

ওপারে খেয়াঘাটে এই পথের ধারেই রাম ঠাকুরের দোকান। তাহার গলায় এক-গাছা ময়লা পৈতা আছে, সুতরাং মনে হয় সে ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ বলিয়া নিজের পরিচয়ও দেয় সে। কিন্তু সে বাঙালী, কি বিহারী তাহা বুঝিবার উপায় নাই। দুইটি ভাষাই অনর্গল বলিতে পারে। যখন বাংলা বলে' তখন তাহাকে বাঙালী বলিয়া মনে হয়। কিন্তু পর মুহূর্তেই যখন 'ঠেট' হিন্দীতে, বা 'ছেকাছেনি' ভাষায় সে কথা কহিয়া ওঠে তখন তাহাকে বিহারী ছাড়া অন্য কিছু ভাবা শক্ত। রাম ঠাকুরের ঠিক পরিচয় কেহ জানে না। কাহাকেও নিজের কথা সে বলে নাই, বলিতে চায়ও না। তাহার একমাত্র পরিচয়, সে 'রাম ঠাকুর'। গঙ্গার ওই ধু-ধু চরে নিজের ছোট দোকান ঘরটিতে সে একা বাস করে। বাহিরের জগতের সহিত তাহার দুইবার মাত্র দেখা হয়। যখন খেয়া পারাপার করে তখন। অনেক যাত্রী তাহার দোকানে তখন যায়। রাম ঠাকুরের দোকানটি খাবারেরই দোকান। সাধারণ খাবারই রাখে সে। চিঁড়া, মুড়ি, রাম-দানার লাড্ডু, ছাতু, গুড়, নুন লঙ্কা। গুড়ে ঈষৎ বৈচিত্র্য আছে, ঝোলা গুড় আর ঢেলা গুড়।

দইও মাঝে মাঝে রাখে। দিয়া হইতে লছমনিয়া গোয়ালিনী মধ্যে মধ্যে আসিয়া দই দিয়া যায়। ক্রোশ দুই দূরে চরের মধ্যে তাহাদের বাথান আছে। প্রায় শত-খানেক মহিষ আছে সেখানে। লছমনিয়ার বাবা শিউগোবিন গোয়ালা সেই বাথানের মালিক। সেখানে যে দই হয় তাহার অধিকাংশই চলিয়া যায় সাহেবগঞ্জের বাজারে। মাঝে মাঝে উদ্বৃত্ত হইলে লছমনিয়া তাহা রাম ঠাকুরকে দিয়া যায়। নগদ দাম চায় না, বলে, 'বেচি কে দিহ'— অর্থাৎ বেচে দাম দিও। লছমনিয়া আসে হঠাৎ এক ঝলক বসন্তের হাওয়ার মতো। কবে আসিবে কিছুই ঠিক থাকে না, হঠাৎ একদিন আসিয়া পড়ে। বড় ভালো লাগে রাম ঠাকুরের। যেদিন সে আসে রাম ঠাকুর অনেক আগে বুঝিতে পারে।

দূর চরের দিগন্তে তাহার লাল শাড়ি পরা মূর্তিটি দেখা যায়। আরও কাছে যখন আসে তখন দেখা যায় মাথায় ঝুড়িটি। ঝুড়িতে শুধু দুধের কেঁড়ে এবং দইয়ের মালসাই থাকে না, তাহার কাপড়-জামাও থাকে। তেলও থাকে এক শিশি, নারিয়েল তেল, নারিকেলের তেল। বাম হাতে মাথার ঝুড়িটি ধরিয়া ডান হাত দুলাইতে দুলাইতে আসে। আর একটু কাছে আসিলে তাহার হাতের 'মেচিয়া'ও (বালা) দেখা যায়। আসল রুপার, রোদ লাগিয়া চকচক করে। মেচিয়ার ইতিহাস রাম ঠাকুর শুনিয়াছে। তাহার স্বামী বিক্রম তাহাকে লুকাইয়া কিনিয়া দিয়াছিল নগদ পঁচিশ টাকা খরচ করিয়া। কিন্তু ব্যাপারটা বেশী দিন লুকানো থাকে নাই, থাকা সম্ভবও নয়,—ইহা লইয়া তাহার শাশের (শ্বাশুড়ী) কি রাগ, ভৈসুরের (ভাসুরের) কি বকাবকি। লছমনিয়ার শুধু 'মেচিয়া'ই নাই, পৈঁছি, হাঁসুলি, নাকছাবি, মলও আছে। এ সব সে অবশ্য পাইয়াছিল বিবাহের সময়। যখন আসে তখন বক্-বক্ করিয়া অনেক গল্প করে লছমনিয়া। অধিকাংশ গল্পই শ্বশুর বাড়ীর গল্প। তাহার এখনও 'গওনা' (দ্বিরাগমন) হয় নাই। শ্বশুর-বাড়ির লোক বার বার খবর পাঠাইতেছে, কিন্তু বাবুজি এখন তাহাকে শ্বশুড়বাড়ি পাঠাইতে চাহিতেছে না। লছমনিয়ার আশঙ্কা শেষে এই লইয়া একটা মারপিট না হয়। শ্বশুর, ভৈসুর দুইজনেই দাঙ্গা-বাজ লোক। ক্ষেতের সীমানা লইয়া গাঙ্গোতাদের সহিত হরদম লাঠিবাজি চলিতেছে। লছমনিয়া প্রথমেই আসিয়া হাঁক দেয়—'চাচা, লে, উতারো'—কাকা, নাও, নামাও এটা। রাম ঠাকুর তাড়াতাড়ি আসিয়া মাথার ঝুড়িটা নামাইয়া দেয়। তাহার পর শাড়ির আঁচল দিয়া মাথার ঘামটা মুছিয়া ফেলে সে। মুছিয়া বসিয়া পড়ে প্রায় হাঁটু অবধি শাড়িটা তুলিয়া। বেশ বাহারে শাড়ি পরিয়াই প্রতিবার আসে। লাল রংই বেশী পছন্দ, লালের উপর হলুদ রঙের ফুল কাটা ছাপা শাড়ি। বসিয়া গঙ্গার দিকে চাহিয়া থাকে, মাথার কাপড় খসিয়া পড়ে, গঙ্গার হাওয়ায় কানের পাশের হাল্কা চুলগুলি উড়িতে থাকে। রাম ঠাকুর তাহার দিকে এক নজর তাকাইয়া মালসা সুদ্ধ দইটা ওজন করিতে বসে। যাহা ওজন হয় উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে তাহা। কিন্তু লছমনিয়া শুনিয়াও শোনে না, গঙ্গার দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে। কিছু-ক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর হঠাৎ তড়াক করিয়া লাফাইয়া ওঠে—যেন কি একটা দরকারী কথা মনে পড়িয়া যায়। টুকরি হইতে শাড়ি গামছা, জামা এবং তেলের শিশি বাহির করিয়া ঘাড় ফিরাইয়া রাম ঠাকুরের দিকে চাহিয়া হাসে একবার, তাহার পর দূরের ঝাউ-ঝোপের দিকে চলিয়া যায়। ওখানে স্নানের ঘাট আছে—একটা এবং সবচেয়ে সুবিধা কয়েকটা ঝাউয়ের ঝোপ ঘাটটাকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। ফেরে প্রায় আধ ঘন্টা পরে। কাচা কাপড়-জামা মাথায় করিয়া লইয়া আসে। লছমনিয়া সব জিনিষই মাথায় করিয়া লইতে ভালবাসে। আসিয়াই দোকানের সামনে বসিয়া হুকুম করে—'দ', খানে দাও। রাম ঠাকুর চারটি রাম-দানার লাড্ডু বাহির করিয়া আনে একটা শালপাতার ঠোঙ্গায়। তাহার পর কাঁসার একটি ছোট ঘটিতে জল আনিয়া রাখে। লছমনিয়া কোনও কথা বলে না, নিবিষ্ট চিত্তে খায়। যখন খায় তখন রাম ঠাকুর একদৃষ্টে তাহার মুখের পানে চাহিয়া বসিয়া থাকে। তাহার গালে কানের পাশে ছোট একটি নীল শিরা আঁকিয়া-বাঁকিয়া উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে। গৌর বর্ণের পট-ভূমিকায় সুন্দর দেখায়। ওই নীল শিরাটি লছমনিয়ার মুখের বৈশিষ্ট্য। খুব কম মেয়ের মুখে দেখা যায়। রামদানার লাড্ডু চারটি শেষ করিয়া সে আলগোছে খানিকটা জল খাইয়া ফেলে। তাহার পর খানিকটা জল লইয়া 'কুল্লা' (কুলকুচু) করে। ফের আবার খানিকটা জল আলগোছে খায়। এটাও লছমনিয়ার বৈশিষ্ট্য। জল খাইতে খাইতে মাঝখানে একবার 'কুল্লা' করিয়া লয়। সব শেষ করিয়া লছমনিয়া বলে,—'চলি অব'—এবার চলি। টুকরি মাথায় লইয়া চলিয়া যায়। সোজা চলিয়া যায়, একবার পিছু ফিরিয়া তাকায়ও না। যতক্ষণ দেখা যায় রাম ঠাকুর দেখে। ভাবে, আবার করে আসিবে কে জানে। বাথানে দই বেশী না হইলে তো আর আমাকে মনে পড়িবে না। রাম ঠাকুরের নিঃসঙ্গ জীবনে লছমনিয়া একটা প্রধান আকর্ষণ।

কিন্তু একমাত্র নয়। অন্য আকর্ষণও আছে কয়েকটি কিন্তু তাহারা মানুষ নয়, তাহার দোকানে খাবারও খায় না। একটি সাপ গঙ্গা সাঁতরাইয়া ওপার হইতে এপারে আসে। মধ্যে মধ্যে এপারের চরেও তাহাকে দেখা যায়, বালির ভিতর দিয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিয়াছে। সম্ভবত শিকারের সন্ধানে আসে। দিয়ার চরে ছোট ছোট পাখী অনেক। সাপটা যখন এপারে আসে রাম ঠাকুর কখনও তাহাকে মারিবার চেষ্টা করে নাই। অনুসরণ করিয়াছে কি করে দেখিবার জন্য। কিন্তু একদিনও দেখিতে পায় নাই। সাপ কিছু দূরে গিয়াই মরীচিকার মতো বিলুপ্ত হইয়া যায়। তাহার দ্বিতীয় আকর্ষণ প্রকাণ্ড একটা ঘড়িয়াল। চারদিক যখন নির্জন নিস্তব্ধ হইয়া যায় তখন ঘড়িয়ালটা তাহার নাকের অগ্রভাগটুকু জলের উপর বাহির করিয়া ভাসিতে থাকে। তাহার পর প্রায় তাহার সমস্ত দেহটাই ধীরে ধীরে ভাসিয়া ওঠে জলের উপর। প্রখর রৌদ্রালোকে গঙ্গার তরঙ্গে ধীরে ধীরে দোল খায়। কিছুক্ষণ পরে আবার ধীরে ধীরে ডুবিয়া যায়। ঘড়িয়ালের আবির্ভাব ও তিরোভাব রাম ঠাকুরের প্রাত্যহিক জীবনে একটা মস্ত ঘটনা। মধ্যাহ্ন সূর্য পশ্চিম দিগন্তের দিকে হেলিয়া পড়িলেই রাম ঠাকুর গঙ্গার দিকে বার বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। দৈবাৎ কোনদিন ঘড়িয়ালটার দেখা না পাইলে তাহার মন খারাপ হইয়া যায়। তাহার তৃতীয় আকর্ষণ কতকগুলো পাখী। দুই জাতের দুই রকম মাছ-রাঙ্গা পাখী রোজ আসে। একটার গায়ে অনেক রকম রং—নীলেরই প্রাধান্য বেশী। আর একটা শাদার উপরে কালোর মিহি কাজ। দুইটাই চমৎকার। ঝাউগাছের উপর বসিয়া থাকে গঙ্গার উপর একাগ্র দৃষ্টি মেলিয়া। তাহার পর ঝপ করিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে। শাদায়-কালায় পাখীটা উড়িয়া উড়িয়াও বেড়ায়। মাঝ গঙ্গার উপর শূন্যে মাঝে মাঝে স্থির হইয়া থামিয়া যায়। পাখা দুটি তখন নাড়িতে থাকে কেবল, তাহার পর সহসা জলে ঝাঁপাইয়া আবার তৎক্ষণাৎ উড়িয়া যায়। কখনও মাছ পায়, কখনও পায় না। কিন্তু ক্লান্তি নাই। রাম ঠাকুর নিজের দোকানের কাছে গঙ্গার জলে দুই-তিনটা ছোট ছোট ডাল একটা শুকনো বাঁশ পুঁতিয়া দিয়াছিল, যদি উহারা তাহার উপর আসিয়া বসে। কিন্তু একদিনও বসে নাই। তাহার কাছে কেহ বসিতে চায় না। গাছের ডালগুলো আর বাঁশটাও মা গঙ্গা ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছেন। ভালই করিয়াছেন। মাছ রাঙ্গারাই যদি না বসিল ও আবর্জনা থাকা না থাকা সমান। মাছরাঙ্গা ছাড়া আর এক রকম পাখী গঙ্গার উপরে ওড়ে। সর্বদা উড়িয়া বেড়ায়। এপার-ওপার করে না, গঙ্গার স্রোত ধরিয়া ওড়ে। একবার এদিকে যায় আবার ও

দিকে। মাছরাঙ্গার মতো কোথাও কখনও স্থির হইয়া উঁচু জায়গায় বসে না। বসে দূরে চড়ায় বালির উপর। অনেক সময় দল বাঁধিয়া। রাম ঠাকুর একবার তাহাদের কাছে যাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু পারে নাই। কাছাকাছি গেলেই উড়িয়া যায় এবং ক্রমাগত উড়িতে থাকে। সহজ সাবলীল কি সুন্দর ওড়ার ভঙ্গী। দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়। দেখিতেও সুন্দর, সারা দেহটা ঈষৎধূসর সাদা, মাথার উপরে কালো টুপির মতো, ঠোঁট হলদে রঙের। পা দুইটি লাল। ল্যাজটা ফিঙে পাখীর ল্যাজের মতো দ্বিধাবিভক্ত। লোকে বলে গাং চিল। কিন্তু চিলের মতো দেখিতে নয় তো। এই চরে রামু ঠাকুরকে অন্যমনস্ক করিয়া দেয় আর একদল পাখী। কয়েকটা কাক, শালিক, ফিঙে আর নীলকণ্ঠ। "এরা সব ওপার হইতে আসে আর সারাদিন বালির চরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িয়া উড়িয়া বেড়ায়। রামু ঠাকুর কাক আর শালিকগুলোর সহিত ভাব করিয়াছে। মুড়ি ছড়াইয়া দিলে উহারা আসে, কিন্তু ফিঙে আর নীলকণ্ঠ আসে না।

প্রতিদিন দুইবার খেয়া-পারাপার হয়, তখন নির্জন চর খাণিকক্ষণের জন্য মুখরিত চঞ্চল হইয়া ওঠে, তাহার পর সব চুপচাপ। যাত্রীদের অনেকের সঙ্গেই মুখচেনা আছে, কিন্তু প্রায় কাহারও সঙ্গেই অন্তরঙ্গতা নাই। যাত্রীদের নিকট যে লোকটি পারানি আদায় করে, সেই লোকটিই মাঝি। যাত্রীদের সহিত সে-ও যাতয়াত করে। এপারে তাহার নিজের বাড়ি, ওপারে শ্বশুর বাড়ি। ইহারা কেহ কেহ রাম-ঠাকুরের দোকানে খায়। ইহার বেশী আর সম্পর্ক নাই।

খেয়া-পর্ব শেষ হইয়া গেলে রামু ঠাকুর কিছুক্ষণ দিগন্তবিস্তৃত বালু-রাশির দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। তাহার পর সে যাহা করে তাহা অপ্রত্যাশিত। সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয় সে। তাহার পর গঙ্গা হইতে তুলিয়া তুলিয়া সর্বাঙ্গে গঙ্গা মাটি মাখে, বিশেষ করিয়া দুই উরুর উপর ঘসিয়া ঘসিয়া মাখে। তাহার পর আসিয়া রোদে বসিয়া থাকে, আর সূর্য প্রণাম করে। গায়ের সমস্ত মাটি যখন শুকাইয়া যায় তখন গঙ্গায় নামিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া স্নান করে। ইহা তাহার প্রাত্যাহিক কর্ম। ইহার জন্যই সে নির্জন চরে আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছে।

তাহার এই বৈচিত্র্যহীন জীবনে হঠাৎ একদিন একটু বৈচিত্র্য দেখা দিল। চর ভাঙ্গিয়া এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী আসিয়া হাজির হইল তাহার দোকানের সামনে। তাহার কপালে প্রকান্ড সিন্দুর-বিন্দু, হস্তে ত্রিশূল। রামু ঠাকুর একটু ভড়কাইয়া গেল। সন্ন্যাসী হিন্দীতে তাহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। আমরা সেগুলির বাংলা করিয়া দিলাম।

"ওরে, নৌকো কখন ছাড়বে"

"সন্ধের পর"

"সমস্ত দিন এখানে বসে' থাকতে হবে?"

"তাছাড়া উপায় কি—"

"আমার খুব খিদে পেয়েছে। খাওয়ার কোন ব্যবস্থা আছে?"

"আছে—"

"তুই তো দেখছি ভক্ত লোক। সন্ন্যাসীকে ভালো করে' খাওয়া তাহলে—"

"কি খাবেন বলুন—"

"ভাল করে' ময়ান দিয়ে লুচি কর। মুখরোচক করে' আলুর দমও কর খানিকটা। তারপর হয় হালুয়া, না হয়
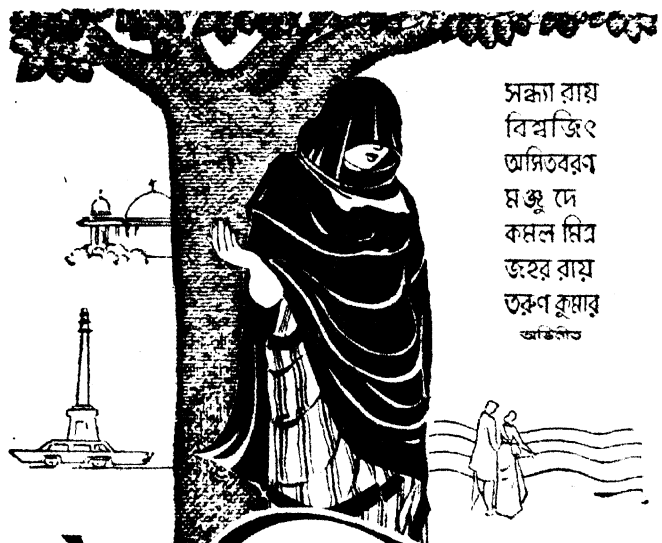
গোটাকতক রসগোল্লা. দিয়ে মিষ্টিমুখ করা যাবে।"

"আমি ওসব দিতে পারব না'

"তাহলে সর চিড়ে, ভাল দই কিছু কলা আর গোটা কয়েক প্যাড়া দে। ওতেই চালিয়ে নেব কোন রকমে—"

"তা-ও নেই ঠাকুর। আমার দোকান খুব ছোট।"

"কি আছে তোর দোকানে—"

"কিছু শুকনো মুড়ি আছে। গুড়ও দিতে পারি একটু—"

"নেই গুড়-মুড়ি নেহি খায়েংগে"

ক্রোধ-ভরে সাধু চলিয়া গেল। চর ভাঙ্গিয়া দূরের ঝাউ-বনের ওপারে অন্তর্ধান করিল। ক্ষুধার্ত সাধু এভাবে রুষ্ট হইয়া চলিয়া যাওয়াতে রামু-ঠাকুর মনে মনে ভয় পাইল একটু। কিন্তু উপায়ই বা কি। সাধু যাহা চাহিতেছে তাহা যে তাহার নিকট নাই। রামুর স্নানাহার হইয়া গিয়াছিল, সাধু না আসিলে একটু ঘুমাইয়া লইত, কিন্তু সাধু আসাতে ঘুমের আমেজ কাটিয়া গেল। গঙ্গার দিকে চাহিয়াই বসিয়া রহিল সে একাকী। ঘড়িয়ালের নাকটা ধীরে ধীরে দেখা গেল। দুইটি গাংচিল স্বচ্ছন্দ লীলায় গঙ্গার উপর উড়িতেছিল, স্রোতের জল ছুঁইয়া ছুঁইয়া চলিতেছে যেন। ঘড়িয়ালটার কাছাকাছি আসিয়া তাহারা দুই জনেই একটু উপরে উড়িয়া গেল। রামু ঠাকুরের মনে পড়িল তাহার মেয়েকে। রুণু এখন কত বড় হইয়াছে? লছমনিয়ার মতোই হইবে। তাহাকে এখনও মনে রাখিয়াছে কি? কে জানে। গঙ্গার দিকে চাহিয়া চাহিয়া আবার তাহার ঘুম পাইতে লাগিল। একটা দমকা হাওয়া উঠিয়া চরের বালিও উড়িতে শুরু করিল। একটু পরেই চতুর্দিক অন্ধকার হইয়া যাইবে। রামু ঠাকুর তাড়াতাড়ি উঠিয়া দোকানের ভিতর ঢুকিয়া ঝাঁপ বন্ধ করিয়া দিল। তাহার পর নিজের বিছানায় শুইয়া পড়িল সে।

"এ-দোকানদার, এ-দোকানদার, উঠো—"

রামু ঠাকুর ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্বর।

"দেও খানে দেও—"

"আমার কাছে তো বাবা, মুড়ি ছাড়া কিছু নেই—"

"ভুখ লাগলে সে সাধু মুড়ি ভি খায়। দেও—"

গঙ্গাজলে ভিজাইয়া ঢেলা গুড়-সহযোগে সাধু প্রচুর মুড়ি খাইল। বস্তুতঃ রামু ঠাকুরের দোকানের যত মুড়ি সব সে খাইয়া ফেলিল। তাহার পর বলিল—" তেরা উপর খুব প্রসন্ন হুয়া। এক পঞ্চমুখী শংখ তে কো দেংগে। কন্যাকুমারী সে লায়া হ্যায়। দাম লাগে কা পাঁচ রূপেয়া। মগর শ রূপেয়া খরচ করে নে সে ভি ইহ নেহি মিলে গা। হুঁ—" গেরুয়া ঝোলা হইতে বাদামী রঙের শাঁক বাহির করিল একটি। শাঁখটির সর্বাংগে গাঁট-গাঁট। ইহা ছাড়া অন্য কোন বৈশিষ্ট্য রামু ঠাকুরের চোখে পড়িল না।

"সাধুবাবা, পাঁচ টাকা তো আমি দিতে পারব না। অত টাকা আমার নেই, আমি গরীব মানুষ"

"কেতনা দে সকে গা—"

"আট আনার বেশী পারব না"

"আমার কাছে তো বাবা, মুড়ি ছাড়া কিছু নেই—"

"আচ্ছা লে লে। তু ভক্ত হ্যায়। লে লে—"

"এ শাঁখের উপকারিতা কি সাধু-বাবা"

"ঘর মে রহ্ নে সে মঙ্গল হোগা। বিমারি হোনে সে বিমারি লুট্ যায়ে গা—"

"অসুখও সেরে যাবে?"

"জরুর—"

একটু পরেই খেয়া-ঘাটের মাঝি আসিল। অন্যান্য কয়েকটি যাত্রী, কয়েকটি ছাগল এবং দুইটি মালবাহী ঘোড়াও জুটিল। তাহাদের সহিত সন্ন্যাসী ঠাকুর নৌকায় চড়িয়া ওপারে চলিয়া গেলেন। রামু ঠাকুর একা পশ্চিম দিগন্তের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। সন্ধ্যার মেঘে তখনও রং লাগিয়া আছে, শুকতারাটা দপ দপ করিয়া জ্বলিতেছে।

পরদিন দ্বিপ্রহরে রামু ঠাকুর উলঙ্গ হইয়া যাহা করিতে লাগিল তাহা অদ্ভুত। পঞ্চমুখী শাঁখটা সে উরুতের উপর ঘসিতে লাগিল। দুই উরুতেই সাদা সাদা গোল গোল দাগে ভরতি। চিমটি কাটিলে লাগে না। কুষ্ঠ হইয়াছে। ডাক্তার বলিয়াছিল, ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের কাছে আসিতে দিও না। তোমার মেয়েকে কোলে করিও না। এ রোগে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাই সহজে আক্রান্ত হয়। অনেকদিন ঔষধ খাইয়াছিল, কিছু হয় নাই। একজন সাধু উপদেশ দিয়াছিলেন প্রত্যহ গায়ে গঙ্গামাটি মাখিয়া সূর্য পূজা করিবে, তাহার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া গঙ্গাস্নান করিবে। নিষ্ঠাভরে যদি করিতে পার, সারিয়া যাইবে কুট। দশ বৎসর পূর্বে রামু ঠাকুর বাড়ি হইতে লুকাইয়া পলাইয়া আসিয়া এই নির্জন চরের খেয়াঘাটে বাসা বাঁধিয়াছে। সাধুর উপদেশ বর্ণে বর্ণে পালন করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু কই? উপকার হইয়াছে কি?

পঞ্চমুখী শাঁখটা সে উরুতের উপর প্রাণপণে ঘসিতে লাগিল। ছড়িয়া গিয়া রক্ত বাহির হইয়া পড়িল, তবু ছাড়িল না।। ঘসিতেই লাগিল।

রূপার বই

সাম্প্রতিক প্রকাশনা

চীনা মাটি

[চীনা ছোটগল্প সংকলন]

অনুবাদ ঃ মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়
অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর

চীনদেশের আধুনিক কালের বিখ্যাত রচয়িতাদের লিখিত গল্প ও রম্যরচনার একটি সংগ্রহ আজকের দিনে বাঙালী পাঠকমণ্ডলীর কাছে পৌঁছে দেবার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমাদের মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীতে চীনা মানুষকে চেনবার ও তার সাহিত্য দর্শন ও শিল্পকে জানবার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে চীনাভবন স্থাপন করেন। সংকলন-অন্তর্গত রচনাগুলি অনুধাবন করে পাঠক চীনা আধুনিক সাহিত্যের গতি বিষয়ে ওয়াকিবহাল হবেন। গল্প-সাহিত্য ও রম্যরচনার জগতে প্রবেশ করা মাত্র চীনা লেখকেরা কি অসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গে বিশ্বের দরবারে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছেন তা দেখে চমৎকৃত এবং তাঁদের সৃষ্ট রসে পূর্ণপাত্র আকণ্ঠ পান করে পাঠক পরিতৃপ্ত হবেন। দাম ঃ ৬.০০

অপমানিত ও লাঞ্ছিত। ডস্টয়েভস্কি

অনুবাদ ঃ সমরেশ খাসনবিশ
সম্পাদনা ঃ গোপাল হালদার

নায়ক আইভান। লেখক। নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসে নাতাশাকে। এদিকে নাতাশা বিয়ে করল এক ধনীর পুত্রকে। দুই পুরুষ ও এক নারীর ত্রিকোণ প্রেমের দ্বন্দ্ব আর নাটকীয় সংঘাতে আবেগময় এর আখ্যানভাগ। ডস্টয়েভস্কির অধিকাংশ রচনার মত এই উপন্যাসটিতেও তাঁর ব্যক্তিজীবন অন্তরঙ্গতায় চিহ্নিত। সাইবেরিয়া নির্বাসনের শেষ পর্যায়ে তিনি ছিলেন সেমিপালাতিনস্কে। সেখানে পরিচয় হয় মারিয়ার সঙ্গে। ডস্টয়েভস্কি, মারিয়া আর স্থানীয় পাঠশালার তরুণ শিক্ষক—এই তিনের কাহিনী পরবর্তী কালে রূপ পরিগ্রহ করে 'অপমানিত ও লাঞ্ছিত'-র মধ্যে। দাম ঃ ৮.০০

স্তেফান জ্বোয়াইগের গল্প-সংগ্রহ [দ্বিতীয় খণ্ড]

অনুবাদ ঃ দীপক চৌধুরী

য়ুরোপীয় সংস্কৃতির অনাবিল প্রাণপ্রবাহ এবং সমগ্রভাবে মানব-সত্তের অশেষ অনুসন্ধিৎসাই জেবায়াইগ-এর সাহিত্যকর্মকে মহিমান্বিত করেছে। হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তির সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের সার্থক সমন্বয়েই তাঁর অসামান্য কৃতিত্ব। শিল্পসুষমার উৎকর্ষে চরিত্রচিত্রণের নিপুণতায় ও কাহিনীর মনোহারিত্বে স্তেফান জেবায়াইগ-এর এই গল্প-সংগ্রহের প্রতিটি রচনাই চিরকালীন সাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ। দাম ঃ ৫.০০

অন্যান্য গ্রন্থ

স্তেফান জেবায়াইগের গল্প-সংগ্রহ [প্রথম খণ্ড] ৫.০০
অনুবাদ ঃ দীপক চৌধুরী

ডাক্তার জিভাগো। বরিস পাস্টেরনাক ১২.৫০
অনুবাদ ঃ মীনাক্ষী দত্ত ও মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
কবিতার অনুবাদ ও গদ্যাংশ সম্পাদনা ঃ বুদ্ধদেব বসু

এক যে ছিল রাজা। দীপক চৌধুরী ৫.০০

অনেক বসন্ত দুটি মন। চিত্তরঞ্জন মাইতি ৩.৫০

মোনা লিসা।
আলেকজান্ডার লারনেট-হলেনিয়া ২.৫০
অনুবাদ ঃ বাণী রায়

শেষ গ্রীষ্ম। বরিস পাস্টেরনাক ৩.০০
অনুবাদ ঃ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
অনুবাদ ঃ পরিমল গোস্বামী

সুখের সন্ধানে। বারট্রান্ড রাসেল ৫.০০

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা—১২

বড় জটিল গল্প
এটা। আমার অন্য সব
গল্পের চেয়ে জটিল।
জটিলও বটে আবার
আ লা দা ও বটে।
আবার গল্প একটু
জটিল না হলে
পাঠকেরও ভাল লাগে
না তেমন। যে গল্প
যত জ টি ল সে
গল্প লেখা তত
বিপজ্জনক। যে সাপ
যত বিষাক্ত, সে সাপ
ধ র তে সাপুড়েদের
তত সতর্কতা দরকার।
কিন্তু সাপই হোক
আর গল্পই হোক,
আসলে বিপদ না
থাকলে আনন্দও যে
থাকে না। গল্পের
জট্ ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে
আনন্দের চরম পরি-
ণতিতে পৌঁছে যখন
লেখক তার পূর্ণচ্ছেদ
টানে, তখন জটিলতা
উ
প
ন্যা
স
বিমল মিত্র

আর জটিলতা থাকে না। তখন পূর্ণ তৃপ্তি। গায়ক যখন মালকোষে তান ধরে, তখন উদ্বিগ্ন হয় শ্রোতা। ঠিক সমে এসে পড়বে তো? পা পিছলে রসহানি ঘটবে না তো? এদিকে গলার কসরৎ, আর তানের বিস্তার যত জটিলতর হয়, ওদিকে তত উদ্বেগ বাড়ে শ্রোতার। কিন্তু সেই গানই যখন শেষ পর্যন্ত সমে এসে নিঃশ্বাস ছাড়ে, তখন শ্রোতারও যত আনন্দ, গায়কেরও তত। দুর্গমকে সুগম করাই তো শিল্পীর কাজ। জটিলকে সরল।

বলেছি, জটিল গল্প এটা। সত্যিই জটিল। জানি না সমে এসে সঙ্গমে মিলতে পারবো কি না, কিন্তু এখন আর পেছোবার উপায় নেই। সামনের যবনিকা উঠে গেছে। সামনে আমার অসংখ্য শ্রোতা। এপাশে তাকিয়া, ওপাশে বালিশ। আর সামনে আমার মাইক্রোফোন। আপনারাও উদ্‌গ্রীব।

এবার আপনাদের অনুমতি নিয়ে আরম্ভ করি।

সবিনয় নিবেদন,

আপনি আমাকে চিনিতে পারিবেন না। আমিও আপনাকে প্রত্যক্ষভাবে চিনি না। চিনি আপনার লেখার মারফৎ। গল্প উপন্যাস আগে পড়িতাম। পড়িতে ভালোই লাগিত। এখন আর ভাল লাগে না। নানা কারণেই ভাল লাগে না। সে-জন্য গল্প-উপন্যাসের দোষ দিই না. দোষ দিই আমার এই মনটিকেই। যে মন থাকিলে অপরের মস্তিষ্ক প্রসূত কল্পিত-কাহিনী পড়িয়া আনন্দ পাওয়া যায়, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সে মনটিকেই আমি হারাইয়া ফেলিয়াছি। তবু আপনাদের আমি শ্রদ্ধা করি। বিশেষ করিয়া আপনাকে। কেন, বিশেষ করিয়া আপনাকেই শ্রদ্ধা করি তাহা বুঝাইয়া বলিতে পারিব না। আমার অত বিদ্যা নাই। আমি নির্জন এবং নিঃসঙ্গ মানুষ। নিঃসঙ্গ বরাবর ছিলাম না কিন্তু এখন নিঃসঙ্গ হইয়াছি। বাধ্য হইয়াই হইয়াছি। আর নিঃসঙ্গতা ছাড়া উপায় নাই বলিয়াও নিঃসঙ্গ হইয়াছি। সে-সব কথা পরে সাক্ষাতে হইতে পারে। আপাততঃ এই-টুকু মাত্র অনুরোধ আপনার নিকট যে আমি আপনার সাক্ষাৎ-প্রার্থী। আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া একবার দিনকয়েকের জন্যে আমার গৃহে পদধূলি দেন তো আমি চির-কৃতার্থ হইব। আমার শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্য থাকিলে আমি স্বয়ংই আপনার নিকট গিয়া সাক্ষাৎ করিতাম, কিন্তু আমি অপারগ। অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন না থাকিলে আপনার মূল্যবান সময়ের অপচয়ের কথা তুলিতাম না। সে-কথা একমাত্র সাক্ষাতেই বলা চলে। ইতি—

ভবদীয়

সুহাসরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

গল্পের সূত্রপাতে ছিল এই সামান্য একখানা মাত্র চিঠি। এত সামান্য চিঠি যে এতে কোনও সম্ভাবনার ইঙ্গিত মাত্রও ছিল না। কিন্তু সামান্যই মাঝে-মাঝে তো অসামান্য হয়ে ওঠে। সুহাস-বাবুকে দেখেও কিন্তু তাকে অসামান্য মানুষ বলে আমার মনে হয়নি সেদিন। বেশ হৃষ্টপুষ্ট মানুষটি। অর্থবান। কোথাও কোনও শারীরিক বা মানসিক অসুস্থতার লক্ষণও দেখতে পাইনি। যেমন আর পাঁচজন সাধারণ ভদ্রলোক সংসারে থাকেন তিনিও তাঁদের মধ্যে একজন। তবে সারাদিনই একলা থাকেন। নিজের বাড়ির ভেতর নিজেকে নিয়েই আবদ্ধ থাকেন। পৃথিবীতে যে প্রতিদিন এত ঘটনা এবং এত দুর্ঘটনা ঘটছে তার কোনও খবরই রাখেন না। কত দেশে কত রাষ্ট্রের পতন-অভ্যুদয় ঘটছে তার খবর রাখারও প্রয়োজন মনে করেন না। তিনি মনে করেন কেবল একলা তিনিই আছেন তাঁর পৃথিবীতে এবং আছে তাঁর পরলোকগত স্ত্রী। সকালে ঘুম থেকে উঠে তিনি সামনে বারান্দায় এসে ইজি-চেয়ারটায় বসেন। সামনে অবারিত মাঠ। সকালবেলার সূর্যটা এসে পৌঁছেছে সবে দিগন্তরেখায়, তখন তিনি চেয়ে থাকেন সেই দিকে। তারপর সূর্যটা যখন আরো ওপরে ওঠে তখন আরো তন্ময় হয়ে যান্। নিজেকে নিয়েই তন্ময় হয়ে যান। তলিয়ে যান নিজের মনের তলায়। মনের তলায়ই বা তাঁর কী এত ভাবনা? কবে একদিন একটা কালো কুচকুচে বেরাল দেখে ভয় পেয়েছিলেন তিনি। সেই কথা। অনেক ছোটবেলার কথা। যশোরের একটা ছোট গ্রাম। গ্রামের নামটাও আজ কষ্ট করে মনে করতে হয়। নলচিটা। বেরালটা চুপি চুপি ঘরে এসেছিল দুধ খেতে। দুধের কড়া থাকত খাটের তলায় ঢাকা। সেই দুধের লোভে। বেরাল মাঝে মাঝে কালো কুচকুচে হয়। কিন্তু সেই বেরালটা সত্যিই বড় কালো ছিল। আর চোখ দুটো বড্ড ধারালো। বিষের চেয়েও ধারালো যেন।

কেন যে হঠাৎ তার কালো বেরালের কথা মনে পড়ে যায় কে জানে। কোনও কারণ নেই। এমনি। সেই নলচিটা। নলচিটার বাড়িটার সামনে একটা পেয়ারা গাছ ছিল। বাঁজা পেয়ারা গাছ। কস্মিন-কালেও পেয়ারা হতো না তাতে। এক-একজন মেয়ে মানুষের মত পেয়ারা গাছও যে বাঁজা হয়, তা সেই প্রথম আর শেষ দেখা তাঁর।

এত বছর পরে, প্রায় এক যুগ পরে কেন যে হঠাৎ সেই পেয়ারা গাছটার কথা মনে পড়ে গেল, আশ্চর্য! সে কত বছর আগের কথা হবে? হয়ত চল্লিশ বছর আগেকার কথা! চল্লিশ বছর পরে হঠাৎ মনে পড়বার কারণটাই বা কী?

কিম্বা এক-একদিন মনে পড়ে যায় আগের রাত্রে দেখা স্বপ্নটার কথা। তিনি যেন কাটনি রেল-স্টেশনের ধারে লাইনের ওপর দিয়ে যাচ্ছেন, হঠাৎ সামনে দেখলেন একটা সাপ মরে পড়ে আছে। কী সাপ ওটা; মরা সাপের দিকে চেয়ে দেখতে কোনও বিপদ নেই, কিন্তু দেখলেন সাপ নয়, একটা মাধবী-লতার ডাল। ট্রেনের তলায় পড়ে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে। যেই সেটার পাশ দিয়ে চলতে আরম্ভ করবেন তখনি ফণা তুলে ধরেছে। আসলে সাপই ওটা—। সাপের ভয়ে আঁৎকে উঠে চিৎকার করে উঠতে গেছেন—সঙ্গে সঙ্গে ঘুমটা ভেঙ্গে গেছে।

আশ্চর্য্য! কাল রাত দুটোর সময় দেখা স্বপ্নটা এত দেরিতে কেন মনে পড়লো। আর সাপের স্বপ্ন দেখলেনই বা কেন? আসলে তিনি তো গ্রামের লোক। তাঁর তো সাপ দেখে ভয় পাবার কথা নয়। সাপ অমন অনেক দেখেছেন নলচিটায়। সাপ নিয়ে খেলা করেছেন। সাপের ভয় ছিল কাজলের। কাজল কলকাতার মেয়ে কি না!

—বাবু!

চমকে উঠে পেছন ফিরতেন সুহাসবাবু।

—কী রে?

—খাওয়া-দাওয়া করবেন না?

সুহাসবাবু রেগে যেতেন। বলতেন —এই সকাল আটটার সময় খাবো কী রে, এত সকাল-সকাল আমি খাই কখনও?

—আজ্ঞে বেলা হয়েছে খুব, বেলা পুইয়ে গেছে।

—কেন? কটা বেজেছে?

—আজ্ঞে, বেলা দুটো বেজে গেছে যে?

বেলা দুটো! কখন এত বেলা হলো! এই তো সবে মাত্র ঘুম থেকে উঠে ইজি-চেয়ারে এসে বসলেন! এই তো সূর্যটা উঠলো আকাশে। এই তো সবে চা খেয়েছেন। এই একটু আগে। কখন সূর্যটা মাথার ওপর দিয়ে পশ্চিমে ঢলে পড়েছে, কিছুই টের পাননি তো তিনি। কখন যে বেলা হয়ে যায়, কখন যে বয়েস বাড়ে, কখন যে রাত কেটে সকাল হয়— এ এক আশ্চর্য ব্যাপার পৃথিবীতে। অথচ অঙ্গে প্রত্যেকটি মিনিট, প্রত্যেকটি সেকেন্ড, প্রত্যেকটি পল-দণ্ড পর্যন্ত গুণে গুণে তিনি অনুভব করেছেন।

খেতে বসেও আবার অন্যমনস্ক হয়ে যান।

কানাই বলে—মাছের তরকারিটা খেলেন না?

—মাছ? মাছ রেঁধেছিস আজকে?

তারপর হঠাৎ নজরে পড়ে। মাছের বাটিটা চোখের সামনেই রয়েছে, অথচ এতক্ষণ দেখতেই পাননি।

—মাছ রেঁধেছিস তা আমাকে বলিস নি কেন? মাছ কোথায় পেলি?

কানাই বলে—আজ্ঞে, আজ বাজারে মাছ এসেছিল—

খাওয়া-দাওয়ার পর তখন নিজের ঘরে গিয়ে বসেন সুহাসবাবু। তখন আর বারান্দায় নয়। নিজের ঘরে। কখনও নিজের খাটের ওপর। কখনও টেবিলের সামনে, চেয়ারে। আবার কখনও দাঁড়িয়ে থাকেন জানালাটার সামনে। ঘরের ভেতরে অন্ধকার হয়ে আসে বেলা পড়বার সংগে সংগে।

—কানাই, কানাই!

দোতলার ওপর থেকে ডাক ছাড়েন সুহাসবাবু। নিচের রান্নাঘরের কোণে বসে কানাই তখন খাচ্ছে। সবে হয়ত খেতে বসেছে। হঠাৎ বাবুর গলা কানে যায়। বলে—যাই বাবু—

হাতটা মুখটা তাড়াতাড়ি ধুয়ে নিয়ে ওপরে আসে। বাবুর ঘরের ভেতর তখন অন্ধকার। অন্ধকারের ভেতরে বাবুকে স্পষ্ট দেখা যায় না। বাইরে দাঁড়িয়ে বলে —আলো জ্বালিয়ে দেব বাবু?

—না!

—তবে আমায় ডাকছিলেন কেন?

সুহাসবাবু বলেন—আমার সেই চিঠিটা কী হলো?

কী চিঠি! কীসের চিঠি. কিছুই পরিস্কার করে বলবেন না কখনও। সব কথা ইংগিতেই বুঝে নিতে হবে। স্পষ্ট করে কথা বলা স্বভাব নয় বাবুর।

—আজ্ঞে কোন্ চিঠিটার কথা বলছেন?

—সেদিন যে চিঠিটা ডাক বাক্সে ফেলতে দিয়েছিলুম, সেটার কী হলো?

কানাই বললে—আজ্ঞে, আমি তো সেটা তখনই ফেলে দিয়েছিলাম—

—তার উত্তর এল না কেন তবে এখনও?

এর উত্তর কিছু নেই। আর কথা বাড়ালেই তো কথা বাড়ে। কথা বলায় কোনও লাভ নেই বাবুর সংগে। বাবুর সংগে কানাই তাই বেশি কথা বলেও না। বাবু যখন ডাকেন, বাবু যখন বকেন, তখন কানাই সব অপরাধ মাথা পেতে নেয়। প্রতিবাদ করলে এই চাকরি ছেড়ে চলে যেতে হয়। এ-চাকরি করা ছাড়া তার উপায়ও নেই আর। এতদিন বাবুর কাছে কাজ করে করে এই এত বুড়ো বয়েসে আবার কোথায় যাবে সে! কোন্ চুলোয় যাবে? অন্ধকার বাড়িটাতে একলা-একলা তার সময় যেন আর কাটতে চায় না। সকাল বেলা বাবু যখন ঘুম থেকে ওঠে, তখন চা করে দিতে হয়। তারপর বাজার। বাজার থেকে আসে আলু, বেগুন, কুমড়ো, লাউ। কখনও কখনও মাছ। তারপর রান্না। রান্না হবার পর বাবুকে খেতে ডাকবারও অধিকার নেই তার। বাবু তখনও বসে আছেন। চুপচাপ বাইরের মাঠটার দিকে চেয়ে বসে আছেন বটে, কিন্তু যেন কোনও দিকেই চেয়ে নেই। বাইরে যেন সমস্ত ঝাপসা দেখছেন, সমস্ত ঝাপসা। বাবুর চোখের দিকে চেয়ে দেখলেই বোঝা যায় যেন তিনি কোথাও কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। তখন ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে ডাকে—বাবু—

—কী রে?

—খাওয়া-দাওয়া করবেন না?

বাবু যেন অবাক হয়ে যান। বলেন—এই সকাল আটটার সময় খাবো কি রে? এত সকাল-সকাল আমি খাই কখনও?

—আজ্ঞে, বেলা হয়েছে খুব, বেলা পুইয়ে গেছে—

—কেন? ক'টা বেজেছে?

—আজ্ঞে বেলা দু'টো বেজে গেছে যে!

তখন বাবুর হুঁশ হয়। তখন বাবুকে উঠিয়ে ভাত খাইয়ে দিতে হয়। আর ভাত খাওয়া হলেই যে ছুটি তা নয়। সারাদিন ডাকেন না। কিন্তু কখন যে আবার বাবু ডাকবেন, তারও ঠিক নেই। এমনি করেই সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত কাটে, এমনি করেই দিন কাটে, মাস কাটে, বছরও কাটে। এমনি করেই বাবু যেন আরো দিন দিন কেমন হয়ে যান।

তখন দুপুর। খাওয়া-দাওয়া সারা হয়ে গেছে। সুহাসবাবু বিছানায় বসে ছিলেন স্থির হয়ে। বাবু অমন বসে থাকেন মাঝে মাঝে। ঘন্টার পর ঘন্টা এমন অসাড় হয়ে মানুষ বসে থাকতে পারে, কী করে, কে জানে! কানাই তো পারে না। ও বয়েস হলে বোধহয় এই রকমই হয় মানুষের। কানাইও হয়ত বুড়ো হলে এই রকমই হবে! আর মা মারা যাবার পর থেকেই এমনি হয়েছে বাবুর। যেন কেমন অগোছালো, যেন কেমন চুপচাপ, যেন কেমন বোবা হয়ে গেছেন।

সুহাসবাবু উঠলেন আস্তে আস্তে। তারপর টেবলের কাছে গিয়ে বসলেন

চেয়ারটায়। কলম নিয়ে আবার লিখতে লাগলেন।

সবিনয় নিবেদন,

মাস কয়েক আগে আপনাকে একখানি পত্র দিয়েছিলাম। আশা করি পাইয়াছেন। আপনার নিকট হইতে কোনও জবাব না পাইয়া অত্যন্ত চিন্তিত আছি। জানি, আপনাকে অনেক মূল্যবান কার্যে ব্যস্ত থাকিতে হয়। সব-সময়ে সকলের পত্রের জবাব দেওয়া আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু আমি যে-প্রয়োজনে আপনাকে পত্র লিখিতেছি, তাহা নিতান্ত তুচ্ছও নয়। আমি একজন নিঃসহায় নিঃসম্বল ব্যক্তি। অর্থের দিক দিয়া নিঃসম্বল না হইলেও পরমার্থের দিক দিয়া তো বটেই। কারণ আমি মানুষের কাছে একজন মহাপাতক, ঈশ্বরের কাছেও তাই। আপনাকে আমি আর কী লিখব। আপনি আমা অপেক্ষা অনেক জ্ঞানী, অনেক গুণী। তবু নিজের কথা কিঞ্চিৎ না প্রকাশ করিলে আপনি সম্যক সমস্ত উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। পৃথিবীর সমস্ত মানুষের আত্মা বলিয়া একটা জিনিষ আছে। দেহ বা মন অপেক্ষা আত্মার প্রয়োজনীয়তা অধিক বলিয়া স্বীকার করিবেন কিনা জানি না— কিন্তু আমি স্বীকার করি। আত্মা নাকি অবিনশ্বর। আত্মার নাকি মৃত্যু নাই। কিন্তু আমি এতই হতভাগ্য যে আমি আমার সেই আত্মা হইতেই বঞ্চিত। আমি জীবিত আছি, কিন্তু আত্মাহীন, আমার দেহ আছে মন আছে, আত্মা নাই। আপনি হয়ত শুনিয়া অবাক হইবেন যে আমি আমার সেই আত্মাকেই হত্যা করিয়াছি। আর আমি নিজেই হত্যা করিয়াছি। স্বহস্তে। এত কথা শুনিয়াও যদি আপনার এতটুকু করুণা হয় তো অনুগ্রহ করিয়া একবার আসিবেন—আসিয়া আমার আতিথ্য গ্রহণ করিবেন। আপনি অনুমতি-পত্র দিলেই আমি ডাকযোগে আপনার পাথেয় পাঠাইয়া দিব। আপনি গ্রহণ করিয়া আমাকে বাধিত করিবেন এবং আমার পুনর্জীবন দান করিবেন। ইতি—

ভবদীয়

সুহাসরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

ওপর থেকে বাবুর ডাক পেয়েই কানাই দৌড়ে গেল। ঘরের ভেতরে তখন বেশ অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যেই বসে বসে বাবু কী সব করছিলেন। কাছে গিয়ে বললে—আমায় ডাকছিলেন বাবু?

—হ্যাঁ, কখন থেকে ডাকছি তোকে! কোথায় গিয়েছিলি?

—আমি তো যাইনি কোথাও, নিচেই ছিলুম।

—এই চিঠিটা স্ট্যাম্প লাগিয়ে এখুনি ডাক-বাক্সে ফেলে দিয়ে আয়—যেন ঠিক বাক্সের ভেতরে পড়ে, ভেতরে হাত ঢুকিয়ে ফেলবি—

এর পর থেকে রোজই ডাকেন কানাইকে। উঠতে বসতে নাইতে খেতে আর বিরাম নেই। কানাই বলে—এ এক ভারি জ্বালা হলো তো?

বাবু জিজ্ঞেস করেন—কী রে, চিঠিটা ঠিক ফেলেছিলি তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ফেলেছিলুম ঠিক।

বাক্সের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে ফেলেছিলি তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, বাক্সের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে ফেলেছিলুম।

—তবে উত্তর আসছে না কেন?

এরপর আর কোনও উত্তর দেবার থাকে না। আর কোনও কথা না বলে বোবার মত দাঁড়িয়ে থাকে কানাই। বাবুও তার দিকে চেয়ে থাকেন, কানাইও তাঁর দিকে চেয়ে থাকে। দুজনেই যেন নিরুত্তর হয়ে যায় কিছুক্ষণের জন্যে। কানাই-এর কেমন একটা দুঃখ হয় বাবুর দিকে চেয়ে। সোনার চেহারা বাবুর, কী হয়ে গেল। দেখতে দেখতে মানুষটা কেমন যেন অন্যরকম হয়ে গেল। যেন বাবুকে আর চেনাই যায় না এই কদিনের মধ্যে। কী যে হলো সংসারে। এই কার্টনিতে এই বাড়িতে আসার পর থেকেই যেন সব ওলোট-পালট হয়ে গেল। তারপর আস্তে আস্তে বাবুর সামনে গিয়ে দাঁড়াল কানাই। বাবু তখনও তার দিকে চেয়ে আছেন একদৃষ্টে। কানাই গিয়ে বাবুর হাতটা ধরলে। বললে—আপনি একটু ঠাণ্ডা হোন, একটু ঠাণ্ডা হোন, আপনি ভাববেন না, আমি চিঠিটা ফেলেছি ঠিক, নিশ্চয় উত্তর আসবে—দেখবেন—আপনি শুয়ে পড়ুন—

আস্তে আস্তে শুয়ে পড়েন সুহাসবাবু। বলেন—উত্তর আসবে, না রে? উত্তর আসবে, কী বল্?

হ্যাঁ বাবু, নিশ্চয় উত্তর আসবে। নিশ্চয়ই—

বলে সুহাসবাবুকে শুইয়ে দেয় কানাই বিছানায়। তারপর আস্তে আস্তে ঘর থেকে চলে আসে বাইরে। আর তারপর নিচে গিয়ে নিজের ঘরখানাতে নিজেই শুয়ে পড়ে। দিন গড়িয়ে রাত হয়। রাত গড়িয়ে আবার সকালও হয়। আবার চলে সেই পুনরাবৃত্তি। এমনি চলে দুজন নির্জন নিঃসঙ্গ মানুষের জীবন-যাত্রা।

সেদিন হঠাৎ খট্‌খট্ করে সদর দরজার কড়া নড়ে উঠলো। সদর দরজার কড়া এমন করে নড়ে না কখনও। এই নির্বান্ধব দেশে যেদিন থেকে বাবুর সঙ্গে কানাই এসেছে, সেদিন থেকেই একেবারে নিঃশব্দে জীবন-যাত্রা চলেছে। বাজার যাবার সময়ও কানাই বাইরে থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে চলে যায়। ফিরে এসে আবার তালা খুলে ভেতরে ঢোকে। গয়লা এসে দুধ দিয়ে যায় ভোরবেলা, কাঠওয়ালা কাঠ দিয়ে যায় রান্নার, তা-ও সকালবেলা। সকলকেই বলা আছে—দেরি করে এসো না বাপু তোমরা— দেরি করে এলে দরজা খুলবো না—। আমাদের বাড়িতে দরজা খুলে দেবার লোক নেই কেউ—

তারপর সারাদিনে আর কাজ কী? কোনও কাজই নেই কানাই-এর। কোনও দায়িত্বই নেই। মা যতদিন ছিল, কাজ ছিল। সে তো কলকাতায়। কলকাতার পাট তো কবেই চুকে বুকে গেছে। কলকাতার সঙ্গে সব সম্পর্ক ঘুচেই গেছে একেবারে। মা যখন ছিল, তখন কতলোক আসতো। দিনরাত আসা-যাওয়া লেগেই ছিল। দিনরাতই চা-কফি-জলখাবার করতে হতো। মা-ও নেই, মা-র সঙ্গে সঙ্গে সেসব কাজকর্মও চুকে-বুকে গেছে।

মা বলতো—কানাই, চা তো আজকে ভালো হয়নি তোর—

সেদিন কানাই চা করেনি। করেছিল ঠাকুর। মা বললে—ঠাকুরকে ডাক তো একবার—

ঠাকুর এল—মা বললে—তুমি চা পর্যন্ত করতে শেখনি? তোমার জন্যে আজ সকলের সামনে কী-রকম অপদস্থ হতে হলো বলো দিকিনি।

তারপর মা বললে—যাও, তোমাকে আর কাজ করতে হবে না, যাও-তোমার মাইনে যা পাওনা আছে নিয়ে আজই সরে পড়ো—

ঠাকুর হাত-জোড় করে মিনতি করতে লাগলো। বললে—দুধে একটু ধোঁয়ার গন্ধ হয়ে গিয়েছিল—

মা বললে—ও-সব আমি শুনবো না, আজই তোমার চাকরি খতম হয়ে গেল। কাল সকালে বাবু থাকবেন, তখন তোমার পাওনা টাকা এসে নিয়ে যেও—

তা সেইদিনই ঠাকুর বরখাস্ত হয়ে গেল। সেইদিন মা নিজেই রান্নাঘরে গিয়ে

হাঁড়ি কড়া ধরতে গিয়েছিল। কিন্তু কানাই দেয়নি ধরতে।

কানাই বলেছিল—আপনি সরুন মা, আমি তো আছি—আমি থাকতে আপনাকে রান্নাঘরে ঢুকতে দেব না—

—তুই রান্না করতে পারবি?

মা'রও যেন বিশ্বাস হয়নি যে কানাই রান্না করতে পারবে। কানাই বলেছিল—আমি তো যাদ্দিন ধরে রান্নার জোগাড় দিয়ে আসছি, আর রান্নাটা করতে পারবো না?

পরদিন কিন্তু রান্না খেয়ে মা অবাক। বললে—বাঃ কানাই তো আমার বেশ রাঁধতে পারে। তবে আর ঠাকুরের খোসামোদ করে লাভ কী! ও-ই রাঁধুক।

বাবুও খাচ্ছিল একই টেবিলে। বাবু বেশি কথা বলেন না কোনও কালেই। বললে—তা রাঁধুক—

সেই থেকেই কানাই চাপরাশিকে-চাপরাশি, ঠাকুরকে-ঠাকুর, চাকরকে-চাকর একাধারে সমস্ত। কানাই একলাই সংসারের মালিক হয়ে গেল। কেউ বাড়িতে মার সঙ্গে দেখা করতে এলে কানাই-ই এসে দরজা খুলে দিত। নাম জিজ্ঞেস করতো। একটা শ্লেটের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল মা। বলেছিল—এই শ্লেটটাতে নাম-ধাম লিখে নিবি, নিয়ে আমাকে দেখাবি, তবে আমি দেখা করবো—

কলকাতায় তখন খুব নাম-ডাক মা'র। মা'র তখন অনেক কাজ। মাকে ছাড়া কোনও কাজই হয় না। অনবরত লোকে দেখা করতে আসে মা'র সঙ্গে। দলে দলে মেয়েরা আসে। বড় বড় গাড়ি আসে বাড়ির সামনে।

কানাই এগিয়ে যায় দরজা খুলে। শ্লেটটা এগিয়ে দেয় সামনে। বলে—কার সঙ্গে দেখা করতে চান?

মিসেস মুখার্জির সঙ্গে।

কানাই বলতো—এই শ্লেটে আপনাদের নাম-ধাম লিখে দিন, কী কাজ, তাও লিখে দিন—

তারা নাম-ধাম লিখে দিত নিজেদের, কী কাজে তাঁরা এসেছে তাও লিখে দিত। তারপর সেই শ্লেটখানা নিয়ে গিয়ে দেখাত মাকে। মা হয়ত শ্লেটের ওপরে লেখা দেখেই চমকে উঠতো। বলতো—করেছিস কী তুই, আরে যা যা শিগ্গির ভেতরে ডেকে নিয়ে আয়—

মা তখন সবে গা ধুয়ে সাজছে-গুজছে। বসবার ঘরে তাড়াতাড়ি এনে বসাতো তাদের।

মা তাড়াতাড়ি মুখে পাউডার ঘষেই একেবারে তর-তর করে নেমে এসেছে বসবার ঘরে। একজন ভদ্রলোক আর একজন মেয়েমানুষ।

মেয়েমানুষটা বললে—কাজলদি, এ আপনার কী-রকম ব্যাপার, একটা শ্লেট, রেখেছেন নাম-ধাম লেখবার জন্যে?

মা বলতো—কী করবো ভাই, অনেক রকম লোক আসে দেখা করতে—

—তা শিলপ্ সিস্টেম করলেই পারো। থাকো সাহেবি-পাড়ায়, আর ফ্যাশানটা করেছ শ্যামবাজারের—

সত্যিই মা-ও যেন লজ্জায় পড়ে যেত। বলতো—আরে, সাহেবি-পাড়ায় থাকি বলে কি সাহেবই হয়ে গেছি সত্যি-সত্যি—

—না না, কাজলদি, এ সিস্টেম তোমার বদলাও—। লোকে কী মনে করবে বলো তো!

—লোকে যদি মনে করে তো আমি কী করবো বল্? আচ্ছা ঠিক রইল—

এবার থেকে তোকে আর শ্লেটে নাম লিখতে হবে না। তারপর থেকে চিনে নিয়েছিল কানাই। মা বলেছিল—দ্যাখ্ কানাই, এই তোর বীণা-মাসীমাকে চিনে রাখ্, যেবার এই মাসীমা আসবে তোর, এ'কে আর নাম লিখতে বলবি না, বুঝলি—

তা শেষ পর্যন্ত যখন সবাই আপত্তি করেছিল তখন কাউকেই আর শ্লেটে নাম লিখতে হতো না। তারপর শ্লেটটাই একদিন কী করে হঠাৎ হাত থেকে পড়ে গিয়ে ভেঙে গেল। চুকে গেল ল্যাঠা। সেই থেকে নিয়ম হলো শ্লিপ্। শেষে তাও উঠে গেল। বীণা-মাসীমা যখন-তখন হুট করে আসতো। যখন-তখন এসে একেবারে মা'র শোবার ঘরে ঢুকে যেত। মা থাকলেও আসতো, না থাকলেও আসতো। বাবু সাহেব-পাড়ায় বাড়ি-ভাড়া নেবার পর থেকেই এমনি উৎপাত চলতে লাগলো।

শেষে একদিন যা-ঘটবার ঘটে গেল।

তখন রাত অনেক হয়েছে। সাহেব-পাড়ায় সন্ধ্যে থেকেই মাঝ-রাত হয়। কানাই তখন নিজের ঘরটাতে বসে বসে ঝিমোচ্ছে। বাবু বাড়িতে নেই। বাড়ির সামনে বাগান। বড়-বড় গাছ বাগানটিতে। গেটের সামনে একটা মস্ত আলো-জ্বলতো সারা রাত। গেট থেকে লম্বা খোয়া বিছানো ঘোরানো রাস্তা। রাত তখন অনেক হয়েছে বৈ কি। রাস্তার মোড়ের বড় গীর্জাটার ঘড়িতে ঢং ঢং করে কয়েকবার বেজে গেল। একটু বোধ-হয় তন্দ্রা এসেছিল কানাইয়ের। ঘরের মধ্যেই বসে বসে ঝিমোচ্ছিল। কখন মা ডাকে তার তো ঠিক নেই।

এখনও মনে পড়লে বুকটা থর থর কেঁপে ওঠে।

সেদিন আবার বিপদের ওপর বিপদ। বাড়িতে বাবুও ছিল না। আপিসের কাজে বাবুকে যেমন বাইরে যেতে হতো মাঝে মাঝে তেমনি গিয়েছেন। সঙ্গে আর্দালী গেছে। পাঁচু আর্দালী বাবুর সঙ্গেই বাইরে যেত বরাবর। ওদিকে আবদুল রান্নাঘর নিয়ে ব্যস্ত। বিবি তখনও শোবারঘরে বিছানা-পাতছে। অর্থাৎ বৈঠকখানায় যে কী ঘটছে তা আর কারো জানবার কথা নয় আসলে।

হঠাৎ বন্দুকের গুলির শব্দ হলো দুম্ দুম্ করে।

দুম্ দুম্ দুম্।

কানাই বন্দুকের আওয়াজটা পেয়েই চমকে উঠেছে। কে যেন সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলো। একটা বিকট চিৎকার। সমস্ত নিঃঝুম অন্ধকার সাহেব পাড়াটা সঙ্গে সঙ্গে একেবারে চমকে উঠলো। কানাই দৌড়ে এসেছে। আবদুল রান্নাঘর থেকে দৌড়ে এসেছে, বিবি ছিল শোবার ঘরে। সে-ও শব্দ শুনে দৌড়ে এসেছে। আসলে বন্দুকের আওয়াজ নয় পিস্তলের আওয়াজ। তখনও ধোঁয়া উঠছে পিস্তলের মুখ দিয়ে। সেই ধোঁয়ার গন্ধ নাকে লাগতেই কানাই দৌড়ে বাইরে এল ঘর থেকে। এসে দেখে এক কাণ্ড......

ঠিক বাগানের খোয়া বিছানো রাস্তার ওপরেই পড়ে আছে কোট-প্যান্ট পরা...

কানাই আর দেখতে পারলে না চোখ দিয়ে। চোখে যেন তার ধাঁধাঁ লেগে গেছে ততক্ষণ আবদুলও এসে গেছে সেখানে, বিবিও এসে গেছে। আশে-পাশের বাড়ির আয়া-খানশামা-আর্দালী সবাই আসতে সুরু করেছে। দেখতে দেখতে ভিড় হয়ে গেল একগাদা।

তারপর খবর পেয়েই পুলিশ এসে গেল থানা থেকে।

এ-ঘটনা আমি পরে জানতে পেরে-ছিলাম। কলকাতায় বসে এ-ঘটনা জানার আমার কোনও সুযোগই ছিল না। কারণ এ-সব কুড়ি-পঁচিশ বছর আগেকার ঘটনা। কলকাতার খবরের কাগজে হয়ত এ-সব বেরিয়েছিল তখন। তখনই হয়ত পড়েছিলুম। কিন্তু তারপর অন্যান্য ঘটনার গোলমালে সব মন থেকে মুছে গিয়েছিল। এতদিন পরে আবার এই ঘটনার মুখোমুখি হবো—এই বা কেমন করে জানবো?

ভাবলাম একজনকে চিঠিটা দেখাবো। কিন্তু আবার মনে হলো হয়ত এই চিঠির আড়ালে কোনও গোপন কাহিনী থাকতে পারে। যে ভদ্রলোক দুঃখ থেকে মুক্তি পাবার আশায় চিঠিটা লিখেছেন, তা আর পূর্ণ হবে না, কত মানুষের কত গোপন বেদনা থাকে, বাইরের সমাজের চোখ থেকে তা আড়ালে রাখতে চান। হয়ত একজন বিশেষ কাউকে না বলতে পারলে মনে শান্তি পাচ্ছেন না। এতদিন এ পৃথিবীতে বেঁচে থেকে অনেক অদ্ভুত চরিত্রই তো দেখলাম। এই সুহাসরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ও হয়ত তাদেরই মত একজন!

আর তা ছাড়া এই ঘটনার আগে পর্যন্ত আমি শুধু আমাদের নিজের সমাজকেই একটু সামান্য চিনতে পেরেছি। এই যে-সমাজে আমি মানুষ হয়েছি। যে-সমাজে আমার আত্মীয় বন্ধু বান্ধব সচরাচর চলাফেরা করে। আমরা, অর্থাৎ আমাদের সমাজের লোকেরা মধ্য-বিত্ত পাড়ায় থাকি। মধ্যবিত্ত সমাজের মন জানি। ট্রামে-বাসে চড়ি, কেরাণীগিরি করি বা অবসর সময়ে তাস খেলি। আর খুব বেশি সমাজ সেবা যদি করি তো সকাল-বিকেলে খবরের কাগজের রাজ-নীতি নিয়ে তর্ক করি। বাঙলা দেশে এর চেয়ে মহৎ ভূমিকা আমাদের নেই।

কিন্তু সুহাসবাবু তো মধ্যবিত্ত সমাজের লোক নন্। কাজল মুখো-পাধ্যায়ও ঠিক মধ্যবিত্ত সমাজের মহিলা নয়। যখন গল্প সুরু হয়েছে তখন সুহাসবাবু ক্লাশ ওয়ান গভর্ণমেন্ট অফিসার। নিজের গাড়ি চড়েন, নিজের উর্দি পরা ড্রাইভার আছে। বাড়িতে খানশামা, বাবুর্চি, আয়া, মালী সবই আছে। বৃটিশ আমলের যা কিছু লিগেসি সবই পুরো দমে ভোগ করছেন মিস্টার আর মিসেস মুখার্জি।

মিস্টার মুখার্জির উড্‌ল্যাণ্ড স্ট্রীটের নিরিবিলি বাড়িটাতে তখন সন্ধ্যেবেলা রোজই সোসাইটি জমায়েত হয়। কল-কাতা সহরের কেষ্টরা আসে সেখানে। কফি চলে, সিগ্রেট চলে অনেক সময় মাইল্ড ড্রিংকস্‌ও চলে। ড্রিংকস্ চলতো বিশেষ বিশেষ অকেশনে। অর্থাৎ যেদিন কোনও রেসপেক্টেবল্ ফরেনার হাজির হতো, সেইদিন। মিস্টার আর মিসেস্ হাচিন্স্ এসেছিলেন একদিন। মিস্টার আর মিসেস তারেয়া এসেছিলেন একবার। তাছাড়া মিস্টার চৌধুরী, মিস্টার গাংগুলী, মিস্টার ব্যানার্জি'রা তো হামেশাই আসতো।

বাইরে থেকে রাস্তা দিয়ে যদি কেউ হেঁটে যেত তো শুনতো, মিস্টার মুখার্জির বাড়ির বাগানের ভেতরে জমায়েতে আলোচনার সাবজেক্ট ছিল বিচিত্র। লণ্ডনের ফগ্ থেকে সুরু করে চার্চিলের চুরোট পর্যন্ত পৃথিবীর যাবতীয় বিষয় সেখানে কফি আর সিগ্রেটের ধোঁয়ার সঙ্গে হাওয়ায় উড়তো। আর বিচিত্র এই যে, সে-সভায় ইণ্ডিয়ার পভার্টি নিয়েও আলোচনা হতো গম্ভীর সুরে। ইণ্ডিয়ার পভার্টি'র জন্যে কারা দায়ী, তার কী কী প্রতিকার, তারও একটা ফতোয়া দিতেন তাঁরা। তারই মধ্যে খবরের কাগজে কোনও অনাহারে মৃত্যুর খবর পড়লে এক-একজন সমবেদনাও জানাতেন। বলতেন—পুওর সোল্—

মিস্টার হাচিন্স বলেছিলেন—ইণ্ডিয়ানরা বড় লেজি ফেলো—

মিস্টার মুখার্জি বলেছিলেন আই কনুকার মিস্টার হাচিন্স্—বড় লেজি—

—আর এই লেজিনেস্-এর জন্যেই আজ ব্রিটিশের স্কেভারি করছে—

মিস্টার চৌধুরী কাফতে চুমুক দিয়ে সিগ্রেট টানতে টানতে বলতো—ইউ আর পারফেক্ট্লি রাইট্ মিস্টার হ্যাচিন্স্—

এর জন্যে প্রপার এজ্‌কেশন দরকার, এজ্‌কেশন্ পেলে সব ঠিক হয়ে যাবে—

এরই মধ্যে মিসেস মুখার্জি মোলায়েম গলায় মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করতো—মোর কফি মিস্টার হ্যাচিন্স্?

মিস্টার হ্যাচিন্স্ সসম্ভ্রমে বলতো—নো থ্যাংকস্ মিসেস মুখার্জি—

মাঝে মাঝে বীণাও আসতো পার্টিতে। অর্থাৎ মিসেস সান্ন্যাল। মিস্টার সান্ন্যাল রেলওয়ে অফিসার। যখন কলকাতায় থাকতো, আসতো এখানে।

আর আসতো মিস্টার আচারিয়া। আচার্য। মিসেস মুখার্জি আর মিসেস সান্ন্যালের পুরোন জীবনের বন্ধু। মিস্টার আচারিয়াকে ডাকতে হতো না। হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই, একদিন এসে হাজির হতো। তার হঠাৎ আবির্ভাবে অবাক হয়ে মিস্টার মুখার্জি জিজ্ঞেস করতো—এত-দিন কোথায় ছিলেন মিস্টার আচারিয়া? আফ্‌টার সাচ্ এ লং টাইম—

—সিঙ্গাপুরে।

অদ্ভুত কেরিয়ার এই মিস্টার আচারিয়ার। আজ সিঙ্গাপুরে, কাল পেনাঙ, পরশু জাভা, তারপর দিন হয়ত একেবারে স্ট্রেট ইউ-কে। মস্ত বড় নামজাদা ফার্ম ম্যাকলাউড কোম্পানীর ইন্টারন্যাশনাল কমিশন এজেন্ট্। কখনও গাড়ি হাঁকিয়ে আসে, কখনও ট্যাক্সি, কখনও স্টেশন-ওয়াগনে।

—কোথা থেকে এলেন?

—গভর্ণরস্ হাউসে টী-পার্টি ছিল।

তারপর একে একে যখন সবাই চলে যেত, উড্‌ল্যান্ড পার্কের বাইরের রাস্তা থেকে গাড়িগুলো একে একে চলে যেত, তখন যেত মিসেস সান্ন্যাল। মিস্টার সান্ন্যাল রেলওয়ে অফিসার। এমন কিছু কাজ নেই তাঁর বাড়িতে যে সকাল-সকাল ফিরে যেতে হবে। ছেলেটা ভাল। ভাল স্টুডেন্ট ছিল কলেজে। রীতিমত কম্পীটিটিভ্ একজামিনেশন দিয়ে পাশ করে সার্ভিস পেয়েছে। বলতে গেলে সমাজে উঠেছে। সমাজে উঠতে গেলে যা যা ভার্চুজ্ সবই আয়ত্ত করেছে। প্রথম প্রথম মিস্টার সান্ন্যাল সিগ্রেট খেত না। তারপর খেতে সুরু করলো। টার্ফ্ ক্লাবের মেম্বার হলো। তারপর সামান্য ছোট-খাটো

ঢেউয়ের মাথায় একশ মানিক ফটোঃ আলোরাণী রায়

ককটেল্-পার্টি থেকে সুরু করে বড় বড় ডীনারে গিয়ে হুইস্কি খেতেও শিখেছে। কিন্তু তখনও ভাল করে পার্টির ম্যানার্স শিখতে পারেনি। রাত্তির হলে হাই তুলতে সুরু করে। সারাদিন রেলের অফিসে খাটুনির পর রেস্ট্ নিতে ইচ্ছে করে। মিসেস সান্ন্যালের জন্যে তাও সম্ভব হয় না। আসলে সান্ন্যালের জন্যেই এই সব করা। এই সিগ্রেট্ এই ককটেল, এই হুইস্কি।

—তুমি বাড়ি যাবে না?

মিসেস মুখার্জি বলতো—আপনি যান মিস্টার সান্ন্যাল, আমরা দুই বন্ধুতে মিলে একটু গল্প করি। সত্যি, বহু দিনের বন্ধু মিসেস মুখার্জি আর মিসেস সান্ন্যাল। বিয়ের আগে থেকেই দুজনের বন্ধুত্ব। যখন সবাই চলে যায়, মিস্টার মুখার্জি'ও ঘুমোতে যান নিজের ঘরে, তখন দুই বন্ধুতে আলাপ হয় নিরিবিলি।

কানাই এসে দাঁড়ায়। বলে—মা—

মিসেস্ মুখার্জি বলে—তুই শুতে যা কানাই, আর তোকে দরকার নেই—আবদুলকে বল্ সেও শুয়ে পড়ুক—

এই সব নিরিবিলি আড্ডাগুলোই মিসেস মুখার্জি আর মিসেস সান্ন্যালের বড় প্রিয়। কত ছোটবেলা থেকে দুজনে একসঙ্গে মেলা মেশা করেছে। তখন কি কাজল জানতো একদিন সে মিসেস মুখার্জি হবে আর বীণাই কি জানতো যে সে হবে মিসেস সান্ন্যাল! ভাগ্যের পেন্ডুলামের দোলায় ডাইনে-বাঁয়ে ধাক্কা খেতে খেতে কত লোক কত দিকে তলিয়ে যায়, কত ঢেউএর তলায় চাপা পড়ে। কিন্তু এদের বেলায় তা হয়নি। কেন হয়নি সেইটেই এর কাহিনী।

সে বহুদিন আগেকার কথা। তখনও কাজল মিসেস মুখার্জি হবার স্বপ্ন দেখেনি। বীণাও কল্পনা করেনি সে একদিন মিসেস সান্ন্যাল হবে। অন্ধকার মেস্-বাড়ির একটা ঘরে দুজনে থাকতো। দশ টাকা সিট্-রেন্ট্। আর কুড়ি টাকা খাওয়া খরচ। স্কুল টীচার। সকালে বেরিয়ে যেত স্কুলে, আর ফিরতো স্কুলের পর। কোনও মাসে কিছু দেনা হতো, আবার পরের মাসে তা শোধ হয়ে যেত।

রাত্রে ছাদ দিয়ে জল পড়তো এক-একদিন। বৃষ্টি হলেই দুজনে এক তক্তপোষে শুতে হতো।

কাজল বলতো—এ-জীবন আর ভাল লাগে না ভাই—

বীণা বলতো—আমারও—

এক-একদিন ছুটি হলে সিনেমায় যেত। তখনকার দিনে বেশি রাত করে রাস্তায় ঘোরা ছিল বিপজ্জনক। আবার তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসতো। তারপর আবার সেই দুজনে একলা। মেসের অন্য মেয়েদের সঙ্গে তত মিল ছিল না তেমন। অন্য মেয়েরা বলতো—মানিক-জোড়—

সস্তা দামের শাড়ি আর সস্তা চটি দিয়ে সাজিয়ে দোকানের শো-কেসের সামনে গিয়ে দাঁড়াত।

কাজল বলতো—ওই শাড়িটা দেখ্ ভাই,—

বীণা বলতো—ওর অনেক দাম—

কলেজ স্ট্রীটের দোকানের শো-কেসগুলোর ভেতরে শাড়ি দিয়ে সাজানো

পুতুল নির্বাক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতো তাদের দিকে। আর তার গায়ে লেখা দামের টিকিটগুলো দেখে তখনি চলে যেতে হতো সেখান থেকে মুখ বুজে। স্কুলের টীচারদের অত সখ ভালো নয়। কাজল বলতো—ও-সব বড়লোকদের জন্যে—আমাদের জন্যে নয়—

বাবাও তাই বলতো। কলকাতা থেকে শেয়ালদ স্টেশনে ট্রেনে উঠে তবে দেশে যেতে হতো। দেশের বাড়িতে বাবা প্রথমে আপত্তি করেছিল কলকাতায় আসবার সময়। বিদেশ-বিভূঁই। জানাশোনা নেই কারো সঙ্গে। সেখানে গেলে কি টিঁকতে পারবে। কলকাতা যে বড় ভয়ঙ্কর জায়গা। কিন্তু দরখাস্তের উত্তর তখন এসে গিয়েছে। তিরিশ টাকা মাইনে, আর কিছু নয়। তিরিশ টাকা থেকে কত টাকাই বা সে বাঁচাবে আর কত টাকাই বা বাবাকে পাঠাবে! তা হোক। তিরিশ টাকা চিরকাল তিরিশ টাকায় দাঁড়িয়ে থাকবেনা। তিরিশ টাকাই একদিন, ভাগ্যে থাকলে, পঞ্চাশ টাকায় দাঁড়াতে পারে! বাবাই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল এখানে। ওই শেয়ালদ' স্টেশনে এসে নেমে কালিঘাটে গ্রামের এক লোকের বাড়িতে উঠেছিল। তারপর এই মেসটার সন্ধান পাবার পর বাবা চলে গিয়েছিল আবার দেশে।

মেসটায় তখন বেশি মেয়ে ছিল না। মেসের কাছেই ছিল স্কুলটা। প্রাইমারী মেয়ে স্কুল। করুণাময়ী বালিকা বিদ্যালয়। সকাল বেলা হেঁটে হেঁটে স্কুলে পড়াতে যাওয়া আর বিকেল বেলা মেসে ফিরে এসে চুপ-চাপ শুয়ে থাকা। আর রোজ বাবাকে একটা করে চিঠি লেখা।

বাবা চিঠি লিখতো—

মা কাজল, প্রত্যহ একটা করিয়া চিঠি লিখিবে। তোমাকে কলিকাতায় রাখিয়া আসিবার পর হইতেই আমি বড় উদ্বেগে দিন কাটাইতেছি। রাত্রে তোমার কথা চিন্তা করিয়া আমার ঘুম হয় না। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তুমি সর্বদা সর্বাঙ্গীন কুশলে থাকো। আমার দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে। যাইবার আগে তোমার বিবাহ দিয়া যাইতে পারিলে নিশ্চিন্ত হইতে পারিতাম। কিন্তু তোমার লেখা-পড়া করার ইচ্ছা, তাই তোমার ইচ্ছায় বাধা দিই নাই। কিন্তু তোমার মা নাই, তাই আমাকেই তোমার ভবিষ্যতের কথা ভাবিতে হইতেছে। আমি ইতিমধ্যে ভাল পাত্রের সন্ধানে আছি। দু'একটি ভাল পাত্রের সন্ধানও পাইয়াছি। বিবাহের পরও লেখাপড়া লইয়া থাকিতে পারিবে। ইতিমধ্যে তোমার স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখিও—

ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কথা। বাবার স্নেহের শেষ ছিল না। জীবনে অর্থের অভাব আর আসেনি কখনও কাজলের। মিস্টার মুখার্জির সঙ্গে বিয়ে হবার পর অর্থের অভাব মিটে গিয়েছিল তার। কিন্তু স্নেহ? স্নেহের পাট শেষ হয়ে গিয়েছিল বাবার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই।

সেই মেসের জীবনেই প্রথম আলাপ হলো বীণার সঙ্গে। বীণা এসে উঠলো তারই ঘরে। ছোট্ট বেঁটে খাটো মেয়েটি। মিসেস সান্যালকে দেখলে সেই সেদিনকার বীণাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

সেই বীণাই একদিন মিস্টার আচারিয়ার নাম করেছিল প্রথম। তখনও মিসেস মুখার্জি আচারিয়াকে দেখেনি।

কাজল জিজ্ঞেস করেছিল—তোর সঙ্গে আলাপ হলো কী করে?

বীণা বলেছিল—ট্রেনে—

ট্রেনেই আলাপ। তারপর ট্রেন থেকে ছাড়াছাড়ি হবার পর কলকাতার রাস্তায় আর একবার দেখা। সাধারণ বেকার লোক নয় মিস্টার আচারিয়া। কেরাণী নয়, ব্যবসাদার নয়। অদ্ভুত এক পেশা তার। আজ সিঙ্গাপুর, কাল পেনাঙ, পরশু জাভা। তারপর দিন হয়ত একেবারে স্ট্রেট্ ইউ-কে। বীণা একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল এই লোকের সঙ্গে পরিচয় করে। সামান্য থার্ড ক্লাশ কম্পার্টমেন্টে সেই সুবিখ্যাত লোক যে কী করতে উঠেছিল কে জানে! কলকাতার নামজাদা ফার্ম ম্যাক্লাউড্ এন্ড কোম্পানীর কমিশন্ এজেন্ট্-এর ফার্স্ট ক্লাসে না চড়ে থার্ড ক্লাস কম্পার্টমেন্টে কী দরকার থাকতে পারে তা কল্পনা করতে পারেনি।

—আপনি বুঝি কলকাতায় যাচ্ছেন?

বীণা বলেছিল—হ্যাঁ—

মিস্টার আচারিয়া জিজ্ঞেস করেছিল—কলকাতায় আগে কখনও গিয়েছেন?

বীণা বলেছিল—না—

মিস্টার আচারিয়া তখন সাবধান করে দিয়েছিল—কলকাতায় ওঠবার জায়গা ঠিক আছে তো?

বীণা বলেছিল—হ্যাঁ, শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের এক মেসে—

মিস্টার আচারিয়া বলেছিল—খুব সাবধানে থাকবেন কলকাতায়। মেয়েদের পক্ষে বড় ভয়ের জায়গা। সেখানে কাউকে বিশ্বাস করলেই ঠকতে হবে।

সেই কলকাতায় আসবার দিনই ভাল লেগেছিল বীণার। মিস্টার আচারিয়ার মত একজন সম্ভ্রান্ত লোকের সহানুভূতি পাওয়া সহজ নাকি!

প্রথম প্রথম কাজল কিছুই জানতো না, কিছুই বলতো না বীণা। কিন্তু বহুদিন এক বাড়িতে থেকে, এক স্কুলে কাজ করেও, এক-একবার মনে হতো বীণা যেন কেমন-কেমন। কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে থাকে এক এক সময়। কলতলায় গিয়ে গুণ্ গুণ্ করে গান গাইতো।

কাজল বলতো—কি রে, মনে বুঝি খুব আনন্দ হয়েছে তোর?

বীণা বলতো—না কাজলদি, আনন্দ আসবে কোত্থেকে বলো?

—কিন্তু এত গান কোত্থেকে আসে মনে?

এর পর আর কিছু বলতো না বীণা, মুখ টিপে টিপে হাসতো। এড়িয়ে যেত কথাগুলো। যা মাইনে পেত তাই দিয়েই সস্তা পাউডার ক্রীম কিনে আনতো, এনে টিনের আয়নাটার সামনে মুখ রেখে দেখতো নিজেকে।

কাজল জিজ্ঞেস করতো—কি হয়েছে তোর বলতো? তোর যেন কেমন পরিবর্তন দেখছি—

বীণা বলতো—পরিবর্তন আর কি হবে কাজলদি,—

—তুই প্রেমে পড়েছিস নাকি? আমার যেন কেমন সন্দেহ হচ্ছে ভাই—

বীণা খিল্ খিল্ করে হেসে উঠতো। বলতো—তুমি যে কি বলো কাজলদি তার ঠিক নেই, তিরিশ টাকার ইস্কুল-মাস্টারনীর আবার প্রেম কোত্থেকে জুটবে—

কথাগুলো প্রথম-প্রথম বিশ্বাস হতো কাজলের। মনে হতো বীণাও বুঝি ঠিক তারই মত। তারই মত গরীব ঘরের মেয়ে। নিজের চাকরি আর নিজের লেখাপড়া নিয়েই মেতে আছে।

কিন্তু একদিন ধরা পড়ে গেল।

ক'দিন থেকেই বীণা যেন ছট্ফট্ করছিল। কেবল বলছিল—আমার কোনও চিঠি এসেছে কাজলদি? কোনও খাম কি পোস্টকার্ড?

—কেন রে? কার চিঠি তোর চাই? কে চিঠি লিখবে তোকে? কে আছে তোর শুনি?

তা চিঠি লেখবার কি আর লোক নেই পৃথিবীতে। কাজলের মত নির্বিকার হয়ে আর কে জন্মেছে পৃথিবীতে। সংসারে বাবা ছিল। বাবা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। দেশ ছেড়ে বাবা আসতে চাইত না কখনও। অত যজমান রয়েছে দেশে। তার পাওনা-গণ্ডা আদায়-পত্র সব তো দেশেই। দেশ ছেড়ে চলে এলে কে তাকে প্রণামী পাঠাবে? কিন্তু কাজল এ-যুগের মেয়ে। বাবা বলেছিল—তোমাকে আমি বাধা দেব না মা, তোমাকে এ-যুগের সাথে তাল রেখেই চলতে হবে, তুমি যদি মনে করো লেখা-পড়া শিখলে ভালো হবে, তবে তাই করো। আমি যেমন করে পারি তোমাকে সাহায্য করবো—আমার বড়লোক যজমানরা আছে, তারা আমি হাত পাতলে এখনও না করতে পারবে না—

কালীঘাটের এক জানাশোনা প্রতি-বেশীর বাড়িতে যেদিন বাবা এসে প্রথম তুলে দিয়ে গিয়েছিল, সেদিনও বলে-ছিল—তোমরা কাজলকে একটু দেখো বাবা, কলকাতায় ও আগে কখনও আসেনি ও, বিপদ-আপদে তোমরাই আছ ওর, আর কে দেখবে বলো?

বুড়ো মানুষের যা কিছু করবার, যা কিছু বলবার, তার কিছুই বাকি রাখেনি। তারপর দেশে ফিরে গিয়ে প্রতি হপ্তায় একখানা করে চিঠি দিত। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিত কাজল। কাজল লিখতো—

পরম পূজনীয় বাবা,

তোমার পত্র পেয়েছি। আমার জন্যে বেশি চিন্তা করিও না। আমি শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের মেসটাতে বেশ আরামেই আছি। খাওয়া-দাওয়ার কোনও অসুবিধাই হচ্ছে না। আশে পাশে ভদ্র-গৃহস্থদের বাড়ি। চারিদিকে ভদ্র আবহাওয়া। আমার ঘরে আর একটি আমার মতই মেয়ে আছে। আমরা দুটিতে এক সঙ্গেই কাটাই। তোমার কোনও ভয় নেই। তোমার শরীর কেমন আছে এখন জানাবে! ইতি সেবিকা—

কাজল—

কিন্তু সেই বাবার মৃত্যুর সময়েও কাজল কাছে হাজির থাকতে পারেনি। বাবা যে এত শিগগির চলে যাবে কে ভাবতে পেরেছিল। কি চমৎকার স্বাস্থ্য ছিল বাবার। বাবা একটা আস্ত কাঁঠাল একলা খেতে পারতো। ছ' ফুট লম্বা চেহারার মানুষ। লম্বা আজানুলম্বিত বাহু যাকে বলে। গ্রামের লোক বলতো—পণ্ডিত মশাই—

সেই পণ্ডিত মশাই-এর মেয়েই এই কলকাতা সহরে এসে একদিন স্কুলের টিচারি করবে, সে-কথা সেদিন গ্রামের কোনও লোকই বিশ্বাস করতে পারেনি। কাজল নিজেও অবাক হয়ে যেত। কাজল যে এই কলকাতা সহরের মধ্যে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে একদিন নিজের জন্য

নিয়ে লড়াই করতে পারবে, এ-কথা যেন সে বিশ্বাসই করতে পারেনি এতদিন।

বাবার মৃত্যুর পর বীণা যেন আরো আপনার হয়ে গিয়েছিল। আরো কাছে এসে গিয়েছিল কাজলের।

সে-রাত্রে দুজনেই ঘুমোয়নি।

বীণা বলেছিল—তাতে কি হয়েছে কাজলদি, বাবা কি কারো চিরকাল থাকে?

সত্যি, বীণারও কেউ ছিল না। কলকাতা সহরের অগণিত অসংখ্য মানুষের ভিড়ে কত কাজল কত বীণা ছড়িয়ে আছে, কে তার হিসেব রাখে! বাঁচার প্রতিযোগিতায় কত ছেলে কত মেয়ে গলে পচে পিষে থেঁতলে যাচ্ছে প্রতিমুহূর্তে, তারও হিসেব থাকে না ক্যালকাটা কর্পোরেশনের রেকর্ড সেকশানের খতিয়ানে। কত বাড়ি গড়ে, কত ভাঙে, কত গুঁড়ো হয়ে ধুলো হয়ে যায়, আবার কত গজিয়ে ওঠে, বীণা আর কাজলের মত কত বাবার মেয়ে এখানে এসে মাথা তুলে বাঁচতে চায়, তার রেকর্ড কেউ জানতেও চায় না। স্রোতের পর স্রোত আসে মানুষের, সে-স্রোত সহরের সমুদ্রে এসে মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। গ্রামের মানুষ, বস্তির মানুষ, বিদেশের মানুষ—মানুষে-মানুষে আসলে তখন কোনও পার্থক্য থাকে না আর। তখন সব মানুষ মিলে রূপান্তর হয় জনতায়। সেই জনতার ভিড়েই কাজল আর বীণা এসে একদিন মিশেছিল। তারপর তারা একাকার হয়ে গিয়েছিল সহরের আত্মার সঙ্গে।

এই রকম যখন অবস্থা, তখনই পরিচয় হয়ে গিয়েছিল মিস্টার আচারিয়ার সঙ্গে।

মিস্টার আচারিয়া, নামটা শুনে কে আর বাঙালী বলে ভুল করবে?

বীণা জানতো, বীণা দেখেছিল, বীণার সঙ্গে গোয়ালন্দর ট্রেণে আলাপ হয়েছিল, তাই বীণা জানতো।

কাজল বলেছিল—তা কোথা থেকে এত চিঠি লেখে সে তোকে?

বীণা বলেছিল—এখন এসেছে সিঙ্গাপুর থেকে।

সিঙ্গাপুর। সিঙ্গাপুরের নাম বাঙালীরা পড়েছে ভূগোলের পাতায়। আর শুধু সিঙ্গাপুরই নয়, পেনাং, জাভা, ইউ-কে, সব জায়গায় যেতে হয় মিস্টার আচারিয়াকে। ম্যাকলাউড্ এন্ড কোম্পানীর ইন্টারন্যাশনাল কমিশন এজেন্ট।

কাজল জিজ্ঞেস করলে—কি রকম দেখতে? কত বয়েস?

বীণার কাছে তখন মিস্টার আচারিয়া ছিল গড। কিম্বা গডের চেয়েও বড় যদি কিছু থাকে, তাই।

বীণা বলতো—তুমি বিশ্বাস করবে না কাজলদি, আচারিয়া তিন হাজার টাকা মাইনে পায়—

—তিন হাজার?

কাজল তখন মাইনের অঙ্কটা শুনে চমকে যেত। কোথায় তিরিশ আর কোথায় তিন হাজার।

—হ্যাঁ রে, মাসে না বছরে?

বীণা বলতো—বছরে কি কাজলদি, মাসে। আমাকে সেদিন একটা ব্রোকেডের শাড়ি কিনে দিতে চেয়েছিল দোকান থেকে, কিন্তু আমি নিই নি কাজলদি, আমার যেন কেমন ভয় করছিল।

কাজল বলেছিল—না, নিসনি, না-নেওয়াই ভালো। কলকাতা সহরে এ-রকম অনেক লোক আছে। তারা মেয়েদের জিনিষ পত্তোর দিয়ে ভুলিয়ে দিতে চায়। বাবা আমাকে গোড়াতেই বারণ করে গিয়েছিল—

বীণা বলতো—না কাজলদি, আচারিয়া সে-রকম নয়, সে-রকম লোক হলে আমি এতদিনে ধরতে পারতুম না?

এত দিন এক সঙ্গে কতো ঘুরেছি, কত রেষ্টুরেণ্টে গিয়েছি, কত সিনেমায় গিয়েছি, কিন্তু বলতে নেই, কোনও দিন কোনও অভদ্র আচরণ করেনি—

—কিন্তু তোর সঙ্গে এত মেলামেশা করবার আসল মতলবটা কি?

বীণা মুখ টিপে হাসতো। বলতো—কি আর, এমনি—

—এমনি মানে?

—বারে, এমনি বেটাছেলেদের মেয়েদের সঙ্গে মিশতে ভালো লাগে না? বেটাছেলেরা তো মেয়েদের সঙ্গে মিশতে চাইবেই।—

কাজল বলতো—তা হয়ত চাইবেই, কিন্তু ওটা বড় রিস্কি, যদি কিছু য়্যাক্সিডেন্ট্ ঘটে যায়, তখন?

—যাঃ, কি যে বলো তুমি কাজলদি! আমি কি সেই রকম? আমাকে কি তুমি সেই রকম ভাবো নাকি? আমার কি বুদ্ধি বিবেচনা নেই একটা? এবার সিঙ্গাপুর থেকে এলেই আমি আচারিয়ার সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেব, দেখবে কি পারফেক্ট্ জেন্টেলম্যান, এত ভালো ম্যানার্স জানো, তোমাকে কি বলবো! আচারিয়ার সঙ্গে আমি চৌরঙ্গীর বড় বড় হোটেলে গিয়ে ঢুকেছি, জানো। আমার একটুও ভয় করে না ওর সঙ্গে—

কাজল বলতো—কিন্তু ওখানে তো মদ খেতে দেয়, শুনেছি—

বীণা বলতো—না কাজলদি, তুমি কি বলছো? আমি কি মদ খেতে পারি? আমায় আচারিয়া কত বলেছে, আমি কিছুতে খাইনি। আচারিয়া বলে—মদ খেলে কোনও দোষ নেই, সাহেব-মেমসাহেবরা সবাইকে বসে বসে মদ খেতে দেখি, কিন্তু আমি কিছুতেই খাই না কাজলদি, আমার কেমন ঘেন্না-ঘেন্না করে—

সব শুনে-টুনে কাজল জিজ্ঞেস করেছিল—তা কোথায় আলাপ হয়েছিল তোর ওর সঙ্গে প্রথম?

—ট্রেণে কাজলদি, অর্থাৎ যখন আমি কলকাতায় আসছিলাম নতুন।

সব শুনে কাজল সাবধান করে দিয়েছিল বীণাকে। বলেছিল—কিন্তু খুব সাবধান ভাই, এ-রকম মেলামেশা বড় ডেঞ্জারাস, আজকাল শুনেছি বহু মেয়ের এই রকম করে সর্বনাশ হয়ে গেছে—

বীণা তবু মানতে চাইতো না। বলতো—এবার সিংগাপুর থেকে ফিরে এলে আমি ঠিক তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব কাজলদি, দেখবে কত ভালো লোক আচারিয়া। আর তাছাড়া, তোমার সঙ্গেও আলাপ করতে চায় সে—

আমার সঙ্গে?

কাজল অবাক হয়ে যেত।

—আমার সঙ্গে আলাপ করতে চায় কেন? তুই আমার কথা বলেছিস নাকি?

বীণা অবাক হয়ে যেত। বলতো—বা রে, তোমার কথা আমি বলবো না? তোমার কথা তো আমি সবাইকে বলি কাজলদি, তুমি যে আমার ইন্টিমেট্ ফ্রেণ্ড, এ সববাই জানে—

সব শুনে কাজল বলতো—না ভাই, আমি আলাপ করবো না, ও-সব লোকের সাথে আমার আলাপ করতে ভয় করে, শেষকালে কি থেকে কি হবে!

কিন্তু আলাপ শেষ পর্যন্ত হয়েছিল। হয়েছিল একটা হোটেলে। বীণা ছাড়েনি কিছুতেই। জোর করে অনেক বুঝিয়ে-সুজিয়ে নিয়ে গিয়েছিল বীণা, বলেছিল—আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি কাজলদি, তোমার কিছুই ভয় নেই—আচারিয়া সে-রকম ছেলে নয়—

তা সত্যিই 'সে-রকম' ছেলে নয় আচারিয়া। হোটেলের সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল আচারিয়া। লম্বা টাই, ট্রপিক্যাল

স্যুট পরনে। দূর থেকেই বীণা দেখতে পেয়েছে আচারিয়াকে।

বীণা বললে—ওই দেখ কাজলদি, আচারিয়া দাঁড়িয়ে আছে আমাদের জন্যে—

কাজলও চেয়ে দেখলে। সত্যিই সুন্দর দেখতে আচারিয়াকে। কাছে যেতেই মাথা নুইয়ে নমস্কার করলে আচারিয়া।

বললে—আপনিই তো বীণার কাজল-দি? আমি ঠিক ধরেছি—

বীণা বললে—জানো, কাজলদি মোটে আসতে চায় না, আমি জোর করে ধরে এনেছি কিন্তু। কাজলদিকে একটু বেশি করে খাতির কোর কিন্তু—

আচারিয়া বললে—তোমার কাজলদি, তাহলে তো আমারও কাজলদি—

বীণা বললে—এই কাজলদি ছিল বলেই আমি তবু বেঁচে আছি আচারিয়া, কাজলদি না থাকলে আমাকে আবার দেশে ফিরে যেতে হতো!

আচারিয়া বললে—দেশে? দেশে কী করতে যাবে তুমি?

তারপর কাজলের দিকে ফিরে বললে—আচ্ছা কাজলদি, আপনিই বলুন তো, বীণা কেবল বলে দেশে ফিরে যাবে। দেশে গিয়ে কোথায় যাবে বলুন তো! কে এমন আছে দেশে যে কেবল দেশে যাবার নাম করে—

কয়েক মিনিটের মধ্যেই কাজল যেন একেবারে আত্মীয় হয়ে উঠলো আচারিয়ার। আচারিয়ার কথা, আচারিয়ার পোষাক, আচারিয়ার ব্যবহার, আচারিয়ার চাকরি, সব তার জানাই ছিল যেন। এতদিন তাকে না-দেখেও যেন দেখা হয়ে গিয়েছিল। আচারিয়ার অদ্ভুত গুণ ছিল। বিশেষ করে মেয়েদের ব্যাপারে। এক মিনিটের মধ্যে আপন করে নেবার ক্ষমতা ছিল তার অসাধারণ।

আচারিয়া বললে—আচ্ছা কাজলদি, আপনিই বলুন তো, আমি যদি বীণাকে একটা ব্রোকেডের শাড়ি কিনে দিই তো কিছু অন্যায় হয়? আপনিই বলুন?

বীণা বললে—আচ্ছা কাজলদি, তুমিই বলো, আমি কেন শাড়ি নিতে যাবো? আমার কি শাড়ি নেই?

আচারিয়া বললে—সে তো অর্ডিনারি শাড়ি। তোমার পোষাকী শাড়ি কই? নিজের বাবা মা কি ভাই থাকলে তো তারাই দিত? তখন নিতে না?
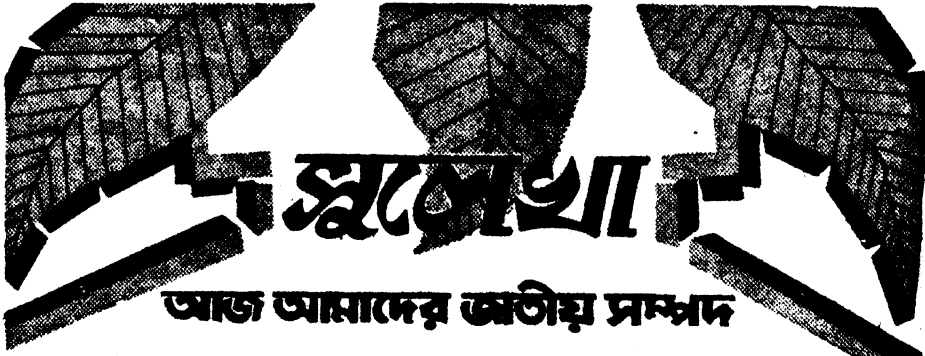
বীণা বললে—তাবলে, তোমার কাছ থেকে কি নেওয়া যায়?

আচারিয়া বললে—কেন নেওয়া যায় না? আমি তোমার কী এমন পর যে আমার কাছ থেকে কিছু নেওয়া যায় না? এ-রকম পর-পর মনে করলে কি কারো ভালো লাগে, আপনিই বলুন তো কাজলদি?

বীণা বললে—না না, সে বড় খারাপ দেখাবে। আর কাজলদি যদি বলে তবে নিতে পারি—

আচারিয়া বললে—কাজলদি, আপনি বীণাকে বলুন তো একটা শাড়ি নিতে—

কাজল বললে—আপনিই বা শাড়ি

নিতে অত পীড়াপীড়ি করছেন কেন মিস্টার আচারিয়া? না-ই বা নিলে ও।

আচারিয়া বললে—কিন্তু, নিলে কি দোষ! প্রেজেন্টেশন্ তো লোকে দেয়ই—

চারদিকে চেয়ে দেখতে দেখতে কাজল সেদিন অবাক হয়ে যাচ্ছিল। এত বড় হোটেলের ভেতর এত বড় হল্। চারদিকে কেবল চেয়ার টেবিল ছড়ানো। একটা করে ছোট টেবল্ আর চারপাশে চারটে চেয়ার। সাহেব মেমসাহেবদের ভিড়ই বেশি। মেমসাহেবদের সত্যিই লজ্জা নেই। পিঠটা আগাগোড়া খোলা, ফরসা লাল টুকটুকে পিঠ। পুরুষদের সংগে সমান তালে গল্প করে চলেছে, সিগারেট খাচ্ছে। কোন লজ্জা-সরমের বালাই নেই। ওপাশে একজন মেমসাহেব উঁচু প্ল্যাটফরমের ওপর দাঁড়িয়ে পেত্নীর মত গলায় এক নাগাড়ে গান গেয়ে চলেছে। পাঁচ ছ'জন লোক কত রকম বাজনা বাজাচ্ছে। খানশামা বয় বাবুর্চিরা ঘুরে ঘুরে খাবার দিয়ে বেড়াচ্ছে। এ এক অদ্ভুত জগৎ সত্যি! এতদিন বাইরে থেকে এই হোটেলটা দেখেছে। বাসে-ট্রামে যেতে যেতে চেয়ে দেখেছে এদিকে কতদিন। আজ এই প্রথম ঢুকলো বীণার কল্যাণে। ভেতরে যে এমন, তা জানা ছিল না কাজলের। শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের মেসের ভাঙা-চোরা বাসা-বাড়িটার সংগে যেন এর আকাশ-পাতাল তফাৎ। অবাক হয়ে চেয়ে দেখছিল কাজল চারদিকে।

কাজল বললে—ওরা সবাই মদ খাচ্ছে নাকি?

আচারিয়া বললে—হ্যাঁ—

কাজল আবার জিজ্ঞেস করলে—আপনিও মদ খান নাকি?

আচারিয়া বললে—আমি? আমি মদ খেতে যাবো কেন কাজলদি? কত লোক মদ খেতে পীড়াপীড়ি করে আমাকে মদ খাবার জন্যে, তবু আমি খাইনা, চোদ্দ বছর আমি মদ আর মাছ-মাংস খাওয়া ছেড়েছি—

কাজল অবাক হয়ে গিয়েছিল কথাটা শুনে। বলেছিল—সে কি! আপনি আগে খেতেন নাকি!

আচারিয়া বললে—খেতাম চোদ্দ বছর আগে। আমাকে তো নানান লোকের সংগে মিশতে হতো। একবার এক মাতালের কাণ্ড দেখে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, জীবনে আর মদ কখনও খাবো না।—

কাজল সত্যিই সেদিন আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল আচারিয়াকে দেখে। এত টাকা মাইনে পায়, এত বড় চাকরি করে, ইচ্ছে করলেই তো সব কিছু করতে পারে কিন্তু কত সংযমী।

আচারিয়া বললে—এই তো কাল ইউ-কে যাচ্ছি, অফিস থেকে আমাকে রোজ তিরিশ টাকা করে খাই-খরচ দেবে, কিন্তু তিরিশ টাকা আমার পুরো খরচ হয় না, কোম্পানীর লাভ হয় আমাকে পাঠিয়ে—

সেদিন হোটেল থেকে বেরিয়ে বীণা জিজ্ঞেস করেছিল—কেমন দেখলে কাজলদি আচারিয়াকে?

কাজল বলেছিল—খুব ভাল রে, খুব ভাল, এত ভাল আমি ভাবিনি—

বীণা বলেছিল—দেখলে তো, কী-রকম মর‍্যাল ক্যারেকটার! আমি তো এতদিন ওর সংগে মিশছি, একদিনের জন্যেও ওকে আমি মদ খেতে দেখিনি—ও-সব বিষয়ে ও খুব গোঁড়া কাজলদি—

তারপর একটু থেমে বলেছিল—এই তো ইউ-কে যাচ্ছে, যাবার পথে রোজ আমাকে একটা করে চিঠি লিখবে। অথচ আমি ওর তুলনায় কী, বলো? আমার

চেয়ে কত সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে ইচ্ছে করলেই মিশতে পারে।

কাজল জিজ্ঞেস করেছিল—চিঠি কী লেখে?

বীণা বলেছিল—কী আবার, আমার কথা দিন-রাত মনে পড়ে, এই সব—

—তোকে বিয়ে করতে চায় নাকি?

বীণা বললে—তা কোনওদিন বলেনি কিন্তু—! কেবল দেখা হলেই আমাকে সাড়ি-গয়না এই সব কিনে দিতে চায়—

—তা সেই কথাটা জিজ্ঞেস কর্! শুধু শুধু দিনের পর দিন মিশে কী হবে! আর এ-রকম মেলা-মেশাও তো ভাল নয় তোদের! শেষকালে যদি কোনও বিপদ ঘটে যায়, তখন? তখন তোকে বিপদের মুখে ফেলে দিয়ে ও হয়ত পালিয়ে যাবে—

বীণা বলতো—ছি ছি, তুমি যে কী বলো কাজলদি! আচারিয়া কি সেই রকম লোক! আচারিয়াকে দেখেও কি তোমার তাই মনে হলো?

অবশ্য, আচারিয়া সে-রকম ছেলে নয় তা কাজল বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু তবু কিছু তো বলা যায় না। কলকাতা সহরে কত লোক কী মতলবে ঘুরে বেড়ায় বলা যায় না। কার মনে কী আছে কে জানে! একটু সাবধান হওয়া ভাল।

কাজল বলেছিল—একটু সাবধান হয়ে চলিস্ তবু—

বীণা বলেছিল—আমি খুব সাবধানেই থাকি কাজলদি—

—তুই ওকে জিজ্ঞেস করিস তোকে বিয়ে করবে কি না?

বীণা বলেছিল—তাই কি কখনও জিজ্ঞেস করা যায়?

—তা জিজ্ঞেস করতে দোষ কী?

বীণা বলেছিল—না, না, ছি, সে বড় লজ্জার কথা, মেয়েমানুষে কি তাই জিজ্ঞেস করতে পারে নাকি কখনও?

ক'দিন পরেই মিস্টার আচারিয়া ইউ-কে চলে গেল। যাবার আগের দিন বীণার সঙ্গে দেখা করে গেল। কিন্তু যাবার পর দিন থেকে বীণার সে কী অস্বস্তি! কেবল চিঠির জন্যে ছটফট্ করে। সকাল বেলা স্কুল থেকে এসেই খোঁজ নেয় চিঠি এসেছে কিনা। একে জিজ্ঞেস করে, ওকে জিজ্ঞেস করে।

কাজলকে বললে—আচ্ছা কাজলদি, এখনও চিঠি দিলে না কেন বলো তো?

কাজল বলে—এটা কিন্তু তোর একটু বাড়াবাড়ি ঃ লোকটা কাজে গেছে সেখানে, তার নিজের কাজ-কর্ম করবে না তোকে চিঠি দেবে!

—কিন্তু কাজলদি, আমাকে যে বলে গেল, গিয়ে পৌঁছেই চিঠি দেবে!

কাজল তখন বীণার কান্ড দেখে হাসতো। একেই বোধ হয় প্রেম বলে। এই রকম ছট্‌ফটানি, এই চিঠির জন্যে ঘুম খাওয়া দাওয়া সব ত্যাগ করা। বীণার কান্ড দেখে কাজল তখন বেশ মজা পেত। সমস্ত রাত ঘুম নেই। একই ঘরে পাশাপাশি তক্তপোষে শুয়ে কাজল এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়তো। মাঝ রাত্রে ঘুম ভেঙে যেতেই দেখতো বীণা ঘরের মধ্যে পায়চারি করছে।

কোন একটা ক্লাবের কী একটা ফাংশান হবে। চ্যারিটির ব্যাপার। বন্যাপীড়িতদের জন্যে একটা গান-বাজনার আয়োজন হয়েছে ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে, তারই টিকেট বিক্রীর ব্যাপার।

স্কুল তখন ছুটি হয়ে গেছে। কাজলও তখন বাড়ি যাবার বন্দোবস্ত করছে। সবে স্কুল কম্পাউন্ড পার হবে এমন সময় সুহাস এসে বলেছিল—আচ্ছা, আপনাদের স্কুলের হেড্ মিস্ট্রেস আছেন?

হঠাৎ এক অচেনা ছেলের মুখোমুখি হওয়াতে কাজল প্রথম থমকে উঠেছিল। তারপরেই একটু সোজা হয়ে বলেছিল—স্কুল তো ছুটি হয়ে গিয়েছে, আপনি কাল সকাল বেলা আসবেন—

তারপর সুহাস বলেছিল—কাল কখন আসবো?

কাজল বলেছিল—এই ধরুন সকাল ন'টা সাড়ে ন'টার মধ্যে!

তারপরেই উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার করে খুলে বলেছিল সুহাস। ফরিদপুরে বুঝি বন্যা হচ্ছিল সে-সময়ে। স্যার পি, সি, রায় একটা সঙ্কট-ত্রাণ সমিতি করেছেন, দেখেছেন বোধ হয়। সেই জন্যেই সকলের কাছ থেকে চাঁদা তুলছি আমরা। বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে যার যথাসাধ্য সংগ্রহ করছি। আর এই সঙ্গে একটা গান-বাজনার বৈঠক হচ্ছে, এর যদি টিকিট কেনেন আপনারা তো বহু লোকের উপকার হয়।

উপলক্ষ্যটা এই রকম সামান্যই।

প্রথমে সব ব্যাপারেরই উপলক্ষ্যটা সামান্য থাকে। সেই চাঁদা তোলার ব্যাপারেই কাজল একটু সাহায্য করেছিল সুহাসকে।

স্কুলের হেড্ মিস্ট্রেসকে বলে প্রত্যেক ছাত্রীর কাছ থেকে কিছু-কিছু চাঁদা আদায় হয়েছিল। যেটুকু হয়েছিল তা শুধু কাজলের জন্যেই বলতে পারা যায়।

সুহাস বলেছিল—বাইরে আর কোথাও কি আপনার সোর্স আছে? আপনার আত্মীয় স্বজন কেউ?

কাজল বলেছিল—আমি তো থাকি মেসে, আমার কোনও আত্মীয়-টাত্মীয় নেই—। তবে আপনি যখন বলছেন তখন আমি নিজেও আলাদা একটা কিনতে পারি—

—আপনার মেসে কেউ কিনবে না?

কাজল হেসে ফেলেছিল। বলেছিল—আমাদের মেসে সকলের আমার মতই অবস্থা, ধার করে করে মাস চালাতে হয়, তাদের কষ্ট দিতে চাই না—

তবু কাজল দু'টাকার টিকিট কিনেছিল শুধু সুহাসের জন্যে।

সুহাস বলেছিল—আপনার খুব ক্ষতি করে দিলাম তো? আপনার বোধহয় টানাটানি করতে হবে—

কাজল বলেছিল—এ আমাদের প্রত্যেক মাসেই টানাটানি করে চালাতে হয়—একটা মাস না হয় সৎকাজের জন্যে টানাটানি করলাম—

তা ফাংশানটা ভালোই লেগেছিল কাজলের। কে. সি. দে গান গেয়েছিলেন। কিন্তু কী গলা। আর কী দরদ।

কে. সি. দে, নজরুল ইসলাম, নলিনীকান্ত সরকার—যে-সব লোকের গানই শুনেছে এতদিন, চেহারা দেখেনি, সেই সবাই এসেছিল। যখন আসর শেষ হলো, সুহাস এসে জিজ্ঞেস করলে—আপনি একলা বাড়ি যেতে পারবেন তো?

কাজল বলেছিল—অনেক রাত হয়ে গেছে, না?

সুহাস বলেছিল—চলুন আপনাকে পৌঁছিয়ে দিই—

কাজল বলেছিল—কিন্তু আপনি চলে গেলে এখানে অসুবিধে হবে না তো?

—না না, অসুবিধে আর কী, আপনার জন্যে অনেক উপকার হয়েছে আমাদের, আপনি অনেক টাকার চাঁদা তুলে দিয়েছেন।

তা শেষ পর্যন্ত সুহাস শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের মেস পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। অনেক রাত্রে বীণা দরজা খুলে দিয়েছিল ঘরের। বীণা বলেছিল—ওমা, তুমি একলা এলে নাকি এত রাত্তিরে?

কাজল বলেছিল—না, একজন পৌঁছে দিয়ে গেল—

—কে, কাজলদি?

কাজল বলেছিল—ওই ওদের সমিতির একজন মেম্বর—

কিন্তু ফাংশান শেষ হয়ে গিয়েও মেলা-মেশা শেষ হয়ে যায়নি। নানা ব্যাপারে দেখা হয়ে যেত রাস্তায় যেতে আসতে।

কাজল একদিন জিজ্ঞেস করেছিল—অনেক দিন যে দেখিনি আপনাকে?

সুহাস বলেছিল—চাকরির খোঁজ করছি,—খুব ঘোরাঘুরি করতে হচ্ছে চারদিকে—

—তবে যে বলেছিলেন ব্যবসা করবেন?

সুহাস বলছিল—ব্যবসা করতেই তো স্যার বলেন, কিন্তু ব্যবসা করি কী করে বলুন তো! স্যার বলেছেন ব্যবসা করলে ক্যাপিট্যাল দেবেন আমাকে। বলেছেন—যে-কোনও ব্যবসা করতে, একটা পান-বিড়ির দোকান করে বেহারীরা কত টাকা রোজকার করছে, আর বাঙ্গালীরা চাকরি বলতে অজ্ঞান—

তা একটা পান-বিড়ির দোকানই করুন না!

সুহাস তখন খুব ছেলেমানুষ ছিল। সুহাস হেসে ফেলেছিল।

কাজল বলেছিল—আপনি পান-বিড়ির দোকান করলে আমাকে খদ্দের পেতে পারেন।

—আপনি বিড়ি খাবেন নাকি?

কথাটায় সুহাসও হেসেছিল, কাজলও হেসেছিল। হাসতেই হাসতেই তাদের আলাপ এগিয়ে চলেছিল। সুহাস একদিন বলেছিল—শেষকালে পুলিশের চাকরিতে একটা দরখাস্ত করে দিয়েছি, জানেন—

কাজল বলেছিল—শেষকালে এত চাকরি থাকতে, পুলিশ?

সুহাস বলেছিল—কিন্তু কী করবো বলুন, আর যে কোথাও পাচ্ছি না। মার্চেন্ট অফিসের চাকরি হয়ত খুঁজলে একটা পাওয়া যায়, কিন্তু কেরাণীর চাকরি আর ভাল লাগে না।

—কিন্তু কোনদিন যদি স্বদেশী আপনাকে খুন করে ফেলে?

সুহাস বলতো—করবে, করবে! আর করলেই বা কী করছি! কিছু-না-করার চেয়ে কিছু করা ভাল! আর তা ছাড়া আমি খুন হলে আমার জন্যে কেউ অনাথা হবার ভয় নেই—

কাজল বলতো—ওমা, এখন না-হয় বিয়ে করেননি, কিন্তু একদিন তো বিয়ে করবেনই—

সুহাস বলতো—বিয়ে আমি করবো না!

—কেন? বিয়ের ওপর এত বিরাগ কেন?

সুহাস বলতো—আমার নিজের বিরাগ না থাকলেও, অন্য মেয়েদের তো আমাকে বিয়ে করায় বিরাগ থাকতে পারে? পুলিশকে বিয়ে করতে কে আর চাইবে বলুন?

কাজল বলতো—মেয়েরা না চাক্, মেয়েদের অভিভাবকরা চাইতে পারে।

—কিন্তু কোন্ মেয়ের বাপের প্রাণ এত পাষাণ যে জেনে শুনে মেয়ের বৈধব্য কামনা করবে?

কাজল বলতো—তাহলে এমন মেয়ে খুঁজে বার করুন না যার কোনও বাপ-মা আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই?

সুহাস বলতো—তেমন কোনও মেয়ে যদি কোথাও জানা থাকে আপনার তো খবর দিন না, একটু চেষ্টা করে দেখি!

কাজল বলতো—বা রে, বিয়ের ঘট্‌কালি করা আমার কাজ নাকি?

হঠাৎ সুহাস বলেছিল—আচ্ছা শুনেছিলাম আপনারও তো কোনও অভিভাবক নেই, আপনিই তো বলেছিলেন—

কাজল এর পরে আর দাঁড়ায়নি সেখানে। বলেছিল—আপনি দেখছি ভদ্রতার সীমা রাখতেও জানেন না—

কিন্তু সুহাস তাতেও পেছপাও হয়নি। তাড়াতাড়ি পেছনে গিয়ে বলেছিল—শুনুন—

সত্যিই রাগ হয়ে গিয়েছিল কাজলের। স্কুলের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছিল।

সুহাসের ডাকে একবার পেছন ফিরলো।

সুহাস বললে—দেখুন, আপনি যদি পুলিশের চাকরি অপছন্দ করেন তো পুলিশের চাকরি করবো না, আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি—

এর পরে আর কয়েকদিন দেখাই নেই। স্কুলে যাওয়া-আসার পথে বার-বার এদিক-ওদিক চেয়েও কোনও হদিস মিলতো না সুহাসের। কাজল যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যেত।

বীণা বলতো—কাজলদি, কী হলো তোমার?

কাজল বলতো—কই, কিছু হয়নি তো—

—তাহলে তুমি কিছু খেলে না যে?

কাজল বলতো—আজকে শরীরটা ভালো নেই আমার—

বীণা বলতো—কিন্তু তোমাকে তো এত অন্যমনস্ক দেখিনি কখনও আগে?

কাজল বলতো—বা রে, তা বলে শরীর খারাপও হবে না মানুষের!

বীণা বলতো—কিন্তু ক'দিন থেকে দেখছি তুমি আমাকে না নিয়েই একলা-একলা বেরিয়ে যাচ্ছো, একলা-একলা ইস্কুল থেকে চলে আসছো, রেবাদি বলছিল তুমি নাকি ভালো করে ক্লাশে পড়াচ্ছো না— তোমার হলো কী কাজলদি?

কাজল বলতো—তুই রেবাদিকে বলে দিস আজকে আমি স্কুলে যেতে পারবো না, আমার বড্ড মাথা ধরেছে—

বীণা বলতো—মাথা যদি ধরে থাকে তো ওষুধ নিয়ে আসছি, খেয়ে নাও না—

কাজল বলতো—আমার মাথা ধরার জন্যে তোকে ভাবতে হবে না, আমি ওষুধ আনিয়ে নেব, তুই যা—

বীণা শেষ পর্যন্ত চলে গেল। কিন্তু সেদিন কাজলও বেশিক্ষণ চুপ-চাপ ঘরের মধ্যে শুয়ে থাকতে পারেনি, স্কুল নেই, তাই সমস্ত কিছুই ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। প্রথমে শ্রীগোপাল মল্লিক লেন থেকে বেরিয়ে কোথায় যাবে তাই-ই ঠিক ছিল না। তারপর মুক্তারামবাবু স্ট্রীটে, তারপর কলেজ স্কোয়ার, তারপর ইনস্টিটিউটের সামনে গিয়েও খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক চেয়ে দেখেছিল। তারপর আর বেশিক্ষণ সেখানে দাঁড়াতে সাহস হয়নি। দুপুর-বেলার কলকাতা সহরের রাস্তার চেহারাটা দেখা তো অভ্যেস নেই। তাই কেমন নতুন লেগেছিল সব। এদিক-

ওদিক চাইতে চাইতে মনে হয়েছিল—ওই বুঝি সুহাস। ওই বুঝি সুহাস আসছে।
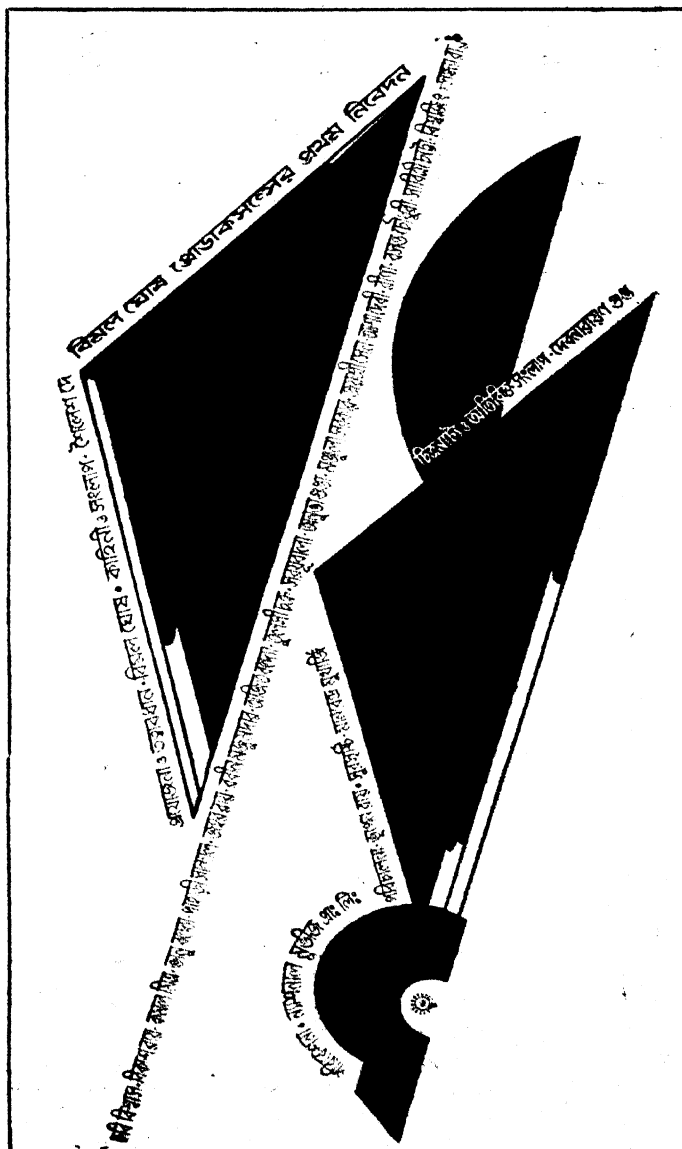
কিন্তু কোথায় কে? সুহাস হয়ত ততক্ষণ তার নিজের হোস্টেলে বসে তাস খেলছে কিম্বা ঘুমোচ্ছে। সুহাস জানতেও পারছে না যে কাজল সারাদিন স্কুলেই গেল না তার জন্যে। সুহাসের জন্যেই কাজল রাস্তায় বেরিয়েছে অকারণে। কিন্তু কলকাতা সহরের ভিতরে কোথায় পাওয়া যাবে সুহাসকে।

বীণা বিকেলবেলা এসেই জিজ্ঞেস করলে—কেমন আছো কাজলদি?

কাজল কথাও বললে না, মাথাও তুললে না।

বীণা কাজলের কপালে ঘাড়ে হাত দিয়ে বললে—কই, জ্বর-টর তো হয়নি দেখছি, সেদিন অনেক রাত করেছিলে সেই জন্যেই হয়ত—

সেদিন অবাক কাণ্ড! সত্যিই অবাক হবার মত ঘটনা ঘটালে সুহাস।

ঠিক স্কুলে যাবার পথে একটা রাস্তার বাঁকের মুখে নিরিবিলি দাঁড়িয়ে ছিল সুহাস একলা। কাজলের হাতে একগাদা সেলাই-এর কাপড় আর পরীক্ষার খাতা! চোখ পড়তেই চোখ সরিয়ে নেবার কথা ভাবছিল কাজল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী বলবে ভেবে পেলে না।

সুহাস বললে—আমার ওপর রাগ করেছেন জানি, কিন্তু কলকাতা থেকে চলে যাবার আগে আপনাকে বলে না-যাওয়াটা ঠিক নয়, তাই বলতে এলাম—

—কলকাতা থেকে চলে যাবেন?

সুহাস বললে—হ্যাঁ, চাকরি পেয়েছি—

কাজলের মুখটা বোধহয় একটু শুকিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তখনি সামলে নিয়েছে নিজেকে। বললে—কোথায় পেলেন? কলকাতা থেকে দূরে?

সুহাস বললে—হ্যাঁ, অনেক দূরে—

কাজল জিজ্ঞেস করলে—স্যারের মত আছে?

সুহাস বললে—স্যারকে বলিনি। স্যারকে বললে তিনি চাকরি নিতেই দিবেন না। তিনি নিজে আট শো টাকা মাইনে পান, হাতে চল্লিশ টাকা রেখে আর সব দিয়ে দেন, তাঁর কথা আলাদা। তিনি তো বলেন, বাঙালীরা চাকরি করে করেই সব গেল—

—তা'হলে?

সুহাস বললে—তিনি বুড়ো হয়ে গেছেন, আমার মত অনেক ছাত্রই তাঁর মতের বিরুদ্ধে কাজ করেছে, তাই তাঁর জন্যে আমার তত ভাবনা নয়, যত ভাবনা আপনার জন্যে—

—আমার জন্যে ভাবনা?

কাজল অবাক হয়ে গেল।

সুহাস বললে—শুধু ভাবনা নয়, ভয়ও বটে—

—ভয়? আমাকে আবার আপনার ভয় কীসের?

সুহাস বললে—পুলিশের চাকরি আপনি ঘেন্না করেন যে!

কাজল বললে—আমার ঘেন্নায় আপনার কী আসে যায়!

সুহাস বললে—আসে যায় বলেই তো যাবার আগে আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে এলাম। আপনি তো পুলিশের চাকরি নিতে বারণ করেছিলেন!

কাজল হেসে ফেললে এবার। বললে—আমি আপনার কে যে আমার বারণ আপনি শুনবেন—

সুহাস বললে—তা জানি না, তবে মনে হলো এতে আপনার সায় নেই। আর আজকাল তো পুলিশের চাকরিতে তেমন সম্মান নেই! কিন্তু বিশ্বাস করুন, একদিন আমিই স্যারের কথায় নিজের হাতে চরকা কেটে জামা-কাপড় তৈরী করিয়ে পরেছি। কিন্তু জীবন-যুদ্ধে আর পারছিলাম না—

কাজল বললে—কিন্তু আপনি তো সংসারে একলা, একলার জন্যে আবার জীবন-যুদ্ধটা কী!

—বা রে, একলা বলে বুঝি আর জীবন-যুদ্ধ থাকে না! আপনি নিজেও তো একলা, আপনাকেও তো জীবিকার জন্যে যুদ্ধ করতে হচ্ছে দিনরাত?

কাজল বললে—আমার কথা ছেড়ে দিন—

—কেন, আপনার কথা ছাড়বোই বা কেন? আপনিও তো এই সহরের একজন বুদ্ধিজীবী মানুষ। আপনাকেও তো আপনার ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হয়—

কাজল বললে—আমার আবার ভবিষ্যৎ, স্কুল মাষ্টারাণীর আবার ভবিষ্যতের ভাবনা—

সুহাস বললে—আচ্ছা, কিছু যদি মনে না করেন তো একটা কথা আপনাকে বলবো!

কাজলের বুকটা থর থর করে কেঁপে উঠলো। ভয়ে ভয়ে বললে—কী কথা?

সুহাস যেন সেই রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে একটু অন্তরঙ্গ হতে চেয়েছিল। বলেছিল—আমার অনেক দিন থেকেই বলার ইচ্ছে, কিন্তু বলতে সাহস হয় না...

এর পর আর দাঁড়াবার সাহস হয়নি কাজলের। বললে—আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে, আমি আসি—

বলে কাজল আর দাঁড়ায় নি। সুহাসও আর ভয়ে তার অনুসরণ করেনি। কাজল যেন সেদিন তাদের স্কুলের কম্পাউণ্ডের মধ্যে ঢুকে আত্মরক্ষা করে বেঁচেছিল।

এর পরে আর ব্যাপারটা চাপা থাকেনি। এর পরই চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল কাজল। একেবারে বিয়ের আগের দিন বীণা জানতে পারলে। জেনে যেন আকাশ থেকে পড়লো।

বললে—সে কি কাজলদি? তোমার বিয়ে? কাল? কখন হলো? কার সঙ্গে? আমি তো কিছুই টের পাইনি!

বীণার কথায় কাজল সেদিন মনে মনে হেসেছিল। যেন কাজল নিজেই জানতো! যেন জীবনে আগে থেকে সব জানা সম্ভব! জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে-বিচিত্র নক্সা পাতা আছে, তার রাজপথ অলি-গলি সব যদি জানতেই পারবে মানুষ তো জীবন এত জটিল হয় কখনও? জীবনে রং কখন ধরে আর কখন বদলায় কেউ কি আগে থেকে জানতে পারে? কাজলও জানতে পারেনি। আর জানতে পারেনি বলেই আজ আমাকে এই গল্প লিখতে হচ্ছে—

এ শুধু কাজলের গল্পই নয়, সুহাস-রঞ্জন মুখোপাধ্যায়েরও গল্প। আর শুধু দুজনেরই বা কেন? আচার্যিরা, বীণা, তাদের গল্পও বটে। উনিশ শো তিরিশ-একত্রিশ-বত্রিশ যারা জীবন-যুদ্ধ আরম্ভ করেছিল, যারা যুদ্ধের আগের আদর্শ সামনে রেখে জীবন-যুদ্ধে নেমেছিল তাদেরও গল্প। সেই সব দিন, যখন ছেলেরা চাকরি পায় না, মেয়েরা বিয়ে করতে বর পায় না, চার টাকা মণ চালের যুগেও যারা আধা উপোষ করে, যুগ বদলের পরে সেই সব মানুষের নিগ্রহ আর নির্যাতনের গল্প।

কোথায় গেলেন সেই স্যার পি সি রায়। সুহাস রঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সেই স্যার। যিনি বাঙালীর ভবিষ্যৎ দিব্য চক্ষে দেখতে পেয়ে বার বার সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করতেন। কোথায়ই বা গেল সেই পাড়ায় পাড়ায় লাঠিখেলা আর কুস্তীর ক্লাব। কোথায় গেল সেই সব স্কুলের শিক্ষক, পাড়ার অভিভাবকদল। শুভানুধ্যায়ী মানুষেরা একে একে সব কোথায় অন্তর্ধান করলেন।

সুহাসরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সেই যুগের ছেলে। সেই যুগের প্রতিনিধি। ছোটবেলায় দেশে বিধবা মাকে রেখে স্যার পি-সি-রায়ের দাতব্যের ওপর নির্ভর করে কলকাতায় এসেছিল। এসে খদ্দর পরেছে। কুস্তীর ক্লাবে কুস্তী শিখেছে, ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে গিয়ে বক্তৃতা শুনেছে। বন্যার সময় কাঁধে কম্বল আর মাথায় চালের বস্তা নিয়ে সেবাব্রত করেছে, শরীর ঠিক রেখেছে, মন ঠিক রেখেছে, স্বামী বিবেকানন্দর "ব্রহ্মচর্য" বই পড়েছে, নারীকে মা বলে জ্ঞান করেছে। সি-আর-দাস, গান্ধী আর সুভাষ বোস, জে-এন-সেনগুপ্তের বক্তৃতা পড়েছে খবরের কাগজে। দেহে মনে পবিত্রতার আদর্শ নিয়ে এগিয়ে চলেছে। শেষকালে সেই ছেলেই কিনা আবার জীবন-যুদ্ধে অপারগ হয়ে পুলিশের চাকরি নিয়েছে।

প্রথম প্রথম মনে কষ্ট হয়েছিল সুহাসের। যেন বিশ্বাসঘাতকতা করেছে সে স্যারের কাছে যেন পুলিশের চাকরি নিয়ে সে সমস্ত বাঙালীর মুখে চুণ-কালি লেপে দিয়েছে।

সুহাস বলতো—জানো কাজল, আজ সুভাষ বোস এখানে এসেছিলেন মীটিং-এ, আর আমারই ডিউটি পড়েছিল—

সান্ত্বনা দিল কাজল। বলতো—তাতে কী হয়েছে, অত লজ্জা করবার কী আছে? তোমার মত আরো অনেক লোকই তো পুলিশের চাকরি করছে—

সুহাস বলতো—কিন্তু তারা তো কেউ আমার মত খদ্দর পরেনি এককালে—

প্রথম প্রথম সুহাসকে সান্ত্বনা দিয়ে চাপা করে রেখেছিল বলেই চাকরিতে তার উন্নতি হয়েছিল তাড়াতাড়ি। কত স্বদেশীদের লাঠি মারতে হয়েছে, জেলে পুরতে হয়েছে। নুনের সত্যাগ্রহের সময় নিরীহ গোবেচারী সত্যাগ্রহীদের ধরে নিয়ে গিয়ে থানায় পুরেছে। সে-সব দিনে সুহাস মাঝে মাঝে বড় মুষড়ে পড়তো। রাত্রে এসে বিছানায় শুয়ে একমনে চুপ করে থাকতো। মফঃস্বলের সদরে তখন চাকরি করছে সুহাস। চারদিকে স্বদেশীরা বোমা-গুলী-বারুদ নিয়ে আন্দোলন জুড়ে দিয়েছে। সেই সব দিনে পুলিশের চাকরি করা যে কী বিপজ্জনক, তা আজকালকার পুলিশরা কল্পনাও করতে পারে না। ধোপা-নাপিত বন্ধ হয়েছে। গয়লা দুধ পর্যন্ত দিতে আসে না—পুলিশের কোয়ার্টারে। একলা বউ তখন বাড়ির মধ্যে। আর বুড়ি বিধবা শাশুড়ি।

শাশুড়ির তখন খুব বয়েস হয়েছে। শাশুড়ি বলতো—বৌমা, খোকা আজ এখনও বাড়ি আসেনি?

সুহাসকে এক-একদিন সমস্ত দিন সমস্ত রাত বাড়ির বাইরে থাকতে হতো ডিউটিতে, দু'টো কনেস্টবল আর একটা রিভলবার ভরসা। সুহাসকে হাজার-হাজার লক্ষ লক্ষ কংগ্রেসীদের সামনে এগিয়ে যেতে হতো বুক ফুলিয়ে। এরই নাম পুলিশের চাকরি, এরই নাম পুলিশের ডিউটি। কেমন আত্ম-মর্যাদায় আঘাত লাগলো তখন। বিবেকের সঙ্গে লড়াই করতে হতো।

আর কাজল সেই নতুন জায়গায়, নতুন পরিবেশে একমাত্র বুড়ি শাশুড়িকে নিয়ে দিন কাটিয়েছে। সুহাসকে বুঝতেই দেয়নি তার নিজের মনের কথা। সুহাস যখনই সারাদিনের পর বাড়ি ফিরে এসেছে, কাজল হাসি মুখে সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

সুহাস বলেছে—ভয় করছে না তো তোমার?

কাজল বলেছে—না, না, ভয় করবে কেন? তুমি তো আছো?

সুহাস বলেছে—আমি তো তোমাকে বলেছিলাম, এ-চাকরি আমার পোষাবে না, বিবেকের বিরুদ্ধে আর কত যুদ্ধ করবো?

কাজল বলেছে—না না, তুমি অত ভেবো না, ভগবানের ওপর বিশ্বাস রেখে কাজ করে যাও—কখনও অন্যায় কিছু না করলেই তো হলো!

সুহাস বলেছে—কিন্তু এও তো অন্যায়, এই কংগ্রেসীদের ধরে ধরে জেলে পোরা। তারা তো দেশের স্বাধীনতার জন্যেই প্রাণ দিচ্ছে—

এর পর কাজলের আর কিছু করবার থাকতো না। এর পর সুহাসের মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না।

বিয়ের দিন কেউই তো আসেনি। আসলে কে-ই বা ছিল সুহাসের যে আসবে। এসেছিল সুহাসের দু'চারজন বন্ধু। যারা একসঙ্গে হোস্টেলে থাকতো। মা দেশে ছিল, তাঁকে খবরটাই দেওয়া হয়েছিল শুধু, কিন্তু সঙ্গে করে নিয়ে আসবার সময়ও ছিল না, লোকও ছিল না। কারণ তাড়াতাড়ি বিয়েটা সেরে ফেলেই চাকরিতে গিয়ে জয়েন করতে হবে মফঃস্বলে।

বীণার জন্যেই দুঃখ হয়েছিল কাজলের।

পেশীবহুল
তুটি হাত দৃঢ়ভাবে
লাঙ্গল ধরেছে মাটির বুকে—
কঠিন ইস্পাতের ফলা ধরিত্রীর বুক
গভীর ভাবে কেটে চলেছে। ইস্পাতের
তাড়নায় উদ্বেল মাটি বীজ ধারণের জন্য
উন্মুখ হয়ে উঠেছে। পদ্ধতিটি পুরা-
কালের সন্দেহ নেই কিন্তু আজ নবীন
ইস্পাত এসে যোগ দিয়েছে
কৃষিকর্মে। পুরনো ভঙ্গুর কাঠের
লাঙ্গলের স্থান গ্রহণ করেছে
ইস্পাতের লাঙ্গল। কম পরিশ্রমে
বেশী ফসল এনে দিচ্ছে চাষীর ঘরে।
শীঘ্রই ট্র্যাক্টরের প্রচণ্ড শক্তির
সাহায্যে মাটির বুক ভরে উঠবে
ফসলের প্রাচুর্যে। এই সমৃদ্ধি
চাষী-কর্মী নির্বিশেষে দেশের
জনসাধারণের জীবনধারণের
মান উন্নত করে তুলবে।
প্রত্যেকের জন্য আরও বেশী
ইস্পাত—এই একটি মাত্র
উদ্দেশ্য সাধনেই 'ইস্কো'র সমস্ত
শক্তি আজ নিয়োজিত।
আপনাদের সেবার মাধ্যমে সমগ্র
জাতির সেবা আমরা করছি ;
আমাদের গর্ব তো সেখানেই।
ইস্পাত
মানেই
আরো খাদ্য
দি ইণ্ডিয়ান আয়রন
অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানি
লিমিটেড
INDIAN IISCO STEEL

বীণা বলেছিল—তুমি ছিলে কাজলদি তবু কাটতো এক রকম করে। কিন্তু তুমি চলে গেলে যে কী করে কাটাবো!

কাজল জিজ্ঞেস করেছিল—কেন, তোর আচারিয়ার খবর কী?

—সে তো পেনাঙ্-এ।

—ওমা, এই তো সেদিন শুনলাম ইউ-কে'তে, আবার কবে পেনাঙ্-এ গেল!

বীণা বললে—আজকাল বড্ড কাজ পড়েছে ওর অফিসের। খুব খাটিয়ে খাটিয়ে মারছে—

—কিন্তু তোদের বিয়ের কী হলো শেষ পর্যন্ত?

বীণার মুখটা শুকিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল—কী জানি কাজলদি, কথা তুললেই কেবল বলে—এবার ঘুরে এসেই একটা কিছু ঠিক করে ফেলবো!

বিয়ের আগে যতদিন কাজল কলকাতায় ছিল ততদিন বীণার মুখটা কেমন শুকনো শুকনো দেখাতো। সেই শুকনো মুখ আরো শুকিয়ে গেল কাজলের বিয়ের পর। সামান্য কয়েকজন লোকের নেমন্তন্ন হয়েছিল, কিন্তু বীণার মুখখানার দিকে চেয়েই কাজল নিজের বিয়েটা ভালো করে উপভোগ করতে পারেনি। ছোট একটা বাড়ির দুখানা ঘর ভাড়া করে আরো ছোট একটা বিয়ের উৎসব সম্পন্ন হয়েছিল। সবাই যখন খাওয়া-দাওয়ার পর বিদায় নিয়ে যে-যার বাড়ি চলে গিয়েছিল, তখন বীণা এসেছিল কাছে। একান্তে কাজলের পাশে বসে বলেছিল—আমাকে যেন ভুলে যেও না কাজলদি—

কাজল বীণাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছিল। বলেছিল—তুই কী বলছিস্ মুখপুড়ী, তোকে আমি ভুলে যেতে পারি?

বীণার চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়তে সুরু করেছিল।

বলেছিল—আমার আর মেসে ফিরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না, কাজলদি! রাত্তিরে একলা-একলা আমার ঘুমই আসবে না—আমি কী করে যে থাকবো সেখানে—

কাজল সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল—তুই কিছু ভাবিসনি ভাই, আমি সেখান থেকে তোকে প্রায়ই চিঠি লিখবো—

বীণা বলেছিল—কিন্তু তোমার চিঠি নিয়ে আমার কী হবে কাজলদি, তোমাকে তো আর পাবো না—

কাজল বলেছিল—এখন তুই তাই বলছিস বটে কিন্তু দেখবি তোর বিয়ে হয়ে গেলে একেবারে অন্যরকম হয়ে যাবি—

বীণা বলেছিল—না কাজলদি, তুমি দেখো, আমি কিছুতেই অন্যরকম হয়ে যাবো না—

কাজল বলেছিল—যখন আচারিয়ার সঙ্গে ইউ-কে আর সিঙ্গাপুরে আর পেনাঙ ঘুরে ঘুরে বেড়াবি, তখন আমার কথাটা ভাবিস্ একবার—

—নিশ্চয় ভাববো কাজলদি, নিশ্চয় ভাববো, আমাকে তুমি তেমন পাওনি।

রাত্রে সুহাস বলেছিল— এই বুঝি তোমার বন্ধু বীণা?

কাজল বলেছিল—হ্যাঁ, ওর কথাই তোমাকে বলেছিলুম, আমাকে বড্ড ভালবাসে, আজকে একেবারে কেঁদে ভাসাচ্ছিল—আজ থেকে বেচারী একেবারে একলা হয়ে যাবে। আমার মত ও-ও একলা সংসারে। আমার কেউ-ই নেই, কিন্তু ওর সবাই থেকেও কেউ নেই—? ওর আপন মামারা ওকে এখানে পাঠিয়ে দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে, একটা খবরও কেউ নেয় না, ও বেঁচে আছে কি মরে গেছে—

—ও বিয়ে করবে না?

কাজল বলেছিল—সবাই কি আমার মত ভাগ্যবতী?

সত্যিই কাজল মনে করতো সে বড় ভাগ্যবতী! সুহাসের সঙ্গে কলকাতার বাইরে মফঃস্বলে প্রথম সংসার করতে গিয়ে বার বার নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করেছিল সে। কেমন গুছিয়ে কেমন মানিয়ে-গুণিয়ে সংসার পেতেছিল কাজল। তা সুহাসের আজো মনে আছে। কী অশান্তির দিন সে-সব। প্রাক্ যুদ্ধের বাঙলা দেশ। ঘরে ঘরে স্বদেশী, ঘরে ঘরে বিলিতি-বয়কট, ঘরে-ঘরে 'বন্দে-মাতরম্'। ঘরে ঘরে বোমা, পিস্তল, বন্দুক। বাঙলা দেশের মেয়েরা পর্যন্ত নেমেছিল সেদিন দেশের কাজে। গান্ধীজীর ডাকে সভা-সমিতিতে মেয়েরা হাসিমুখে সোনার চুড়ি খুলে দিয়েছে। আর পুলিশের চাকরি নিয়ে সুহাস বিবেকের গলা টিপে নিজের দাসত্ব-দায় মোচন করেছে। পৃথিবীর কোথাও যখন সান্ত্বনার রেখাটুকুও দেখা যায়নি, অফিসের কর্তাদের কাছেও যখন সহানুভূতির শেষ চিহ্নটুকু নিঃশেষ হয়ে গেছে, তখন ঘরের কোনে তার জন্যে ছিল অপার মমতা, অসীম সান্ত্বনা।

কাজল বলতো—মন দিয়ে চাকরি করাও তো একরকমের পুণ্যি! যারা তোমাকে খেতে পরতে দিচ্ছে তাদের বিশ্বাসঘাতকতা করাটা কি তোমার উচিত?

সুহাস বলতো—এক-একবার ভাবি এ-চাকরি ছেড়ে দেব, কিন্তু চাকরি ছেড়ে দিলেও যে পার নেই, আমার পেছনে স্পাই লাগবে, আমার জীবন নিয়েই তখন টানাটানি—

কাজল বলতো—অত অধৈর্য হচ্ছো কেন, চিরকাল এ-রকম থাকবে না, একদিন তো স্বরাজ হবেই দেশে—

—সে কবে হবে তার কি ঠিক আছে?

কিন্তু এই রকম দোটানার মধ্যেই একদিন যুদ্ধ বেধে গেল পৃথিবীতে। এতদিনের ধ্যান-ধারণা, এতদিনের তপ-তপস্যা সব ভেঙে গুঁড়িয়ে পিষে থেতলে গেল। নর্থ পোল থেকে সাউথ পোল পর্যন্ত পৃথিবীর সমস্ত স্তরে বিপর্যয় বেধে গেল রাতারাতি। স্যার পি সি রায়ের এতদিনের তপশ্চর্যার সমাধি হয়ে গেল রাতারাতি। যারা অসাধু তারা অসাধু হয়ে গেল, যারা সাধু তারাও আর সাধু রইল না। রাতারাতি রং বদলে গেল মানুষের, আর রং বদলে মানুষের মনের আর মানুষের চেহারার।

আর ঠিক এই ডামাডোলের মধ্যে সুহাস বদলি হয়ে এল কলকাতায়।

আর শুধু বদলি নয়, একেবারে প্রমোশন নিয়ে চলে এল কলকাতা শহরে। আবার সেই আগেকার কলকাতা। যে-কলকাতায় একদিন ছাত্রজীবন কেটেছে, যে-কলকাতায় একদিন সংকট-ত্রাণ সমিতি করেছে। এই কলকাতার পথে পথেই একদিন বন্যার্তদের জন্যে চাঁদা আদায় করে বেড়িয়েছে। আর এই কলকাতার রাস্তাতেই একদিন কাজলের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। শুধু মা'ই দেখতে পেলে না ছেলের এই উন্নতি। যশোরের কোন্ এক অজ সাব-ডিবিশন সেটা। মুড়াগাছা। নামেও যা, কাজেও তাই। সেই মুড়াগাছার ছোট পুলিশ-কোয়ার্টারে গিয়ে প্রথম কাজলও মুষড়ে পড়েছিল আর মা-ও মুষড়ে পড়েছিল।

মা বলেছিল—এ কোথায় নিয়ে এলি বাবা আমাকে?

সুহাস বলেছিল—চিরকাল কি আর এখানে থাকতে হবে মা, দু'এক বছর পরেই বদলি হয়ে যাবো অন্য কোথাও—

কাজলও প্রথম মুষড়ে পড়েছিল। কিন্তু মুখে কিছু বলতো না। মুখে বলতো—কই, আমার তো কোনও কষ্ট হচ্ছে না,
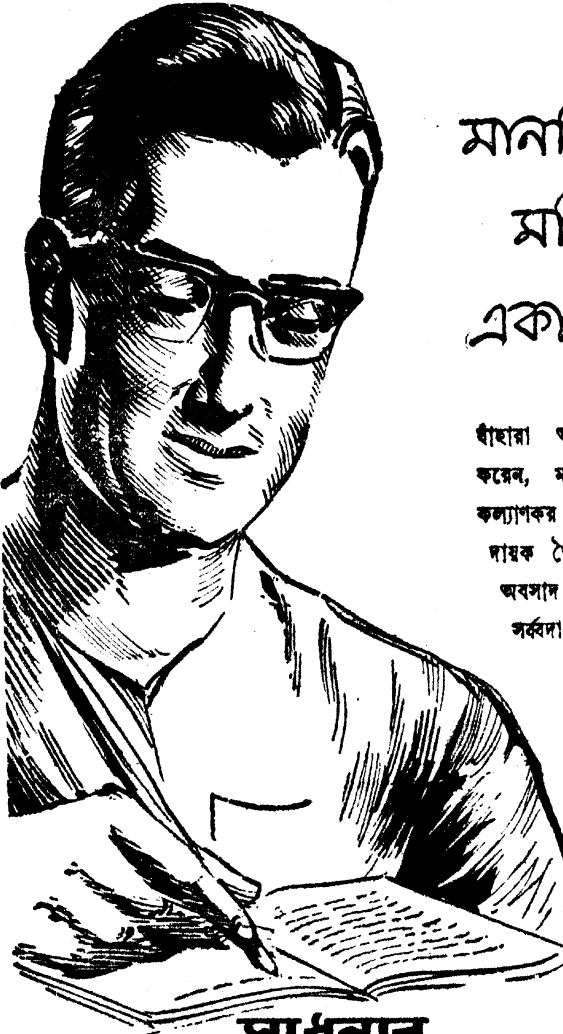
মানসিক পরিশ্রমে
মস্তিষ্কের যত্ন
একান্ত প্রয়োজন !
যাঁহারা অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করেন, মহাভৃঙ্গরাজ তাঁহাদের পরম কল্যাণকর। এই স্নিগ্ধকর ও আরাম-দায়ক তৈল সর্ব্বপ্রকার ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে, দেহ ও মনকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল ও কর্ম্মক্ষম রাখে
সাধনার
মহা ভৃঙ্গরাজ
তৈল
সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
সাধনা ঔষধালয় রোড কলিকাতা-৪৮
SADHANA AUSADHALAYA
Maha Bhringaraj
Taila
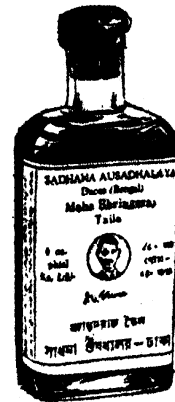
আমার তো ভাল লাগছে, আমার তো বেশ ফাঁকা-ফাঁকা লাগছে এখানে।

আরো বলতো—কলকাতাতে সেই ঘিঞ্জির মধ্যে হাঁপিয়ে উঠেছিলুম, এখন এখানে এসে একটু বেঁচেছি—

সুহাস প্রথম-প্রথম মন খারাপ করলে কাজলই বোঝাতো।

বলতো—আমরা কত সুখে আছি বলো তো? অন্য সব লোকেদের কথা ভাবো, যারা মাসে-মাসে নিয়ম করে মাইনে পায় না, যারা দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পায় না। তাদের তুলনায় আমরা কত সুখী বলো তো?

কিছুদিন থাকতে থাকতে মা'রও সহ্য হয়ে গিয়েছিল। মা'র শরীরটাও ভাল হয়ে গিয়েছিল। শীতকালের দিনে মা রোদে বসে রোদ পোয়াতো। বাড়ির সামনে সুহাস ফুলের বাগান করেছিল। লাউগাছ পুঁইগাছ পুঁতেছিল। কী মিষ্টিই যে লেগেছিল সেই-সব তরকারী। সারাদিন বাড়ির বাইরে থেকে মনটা যখন বিবেকের মাঝে লড়াই করে করে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে আসতো, তখন বাড়ি ফিরে এসে সংসারের আনন্দের মধ্যে আবার মনে হলো সে সুখী হয়েছে। হয়ত একদিন যে শিক্ষায় মানুষ হয়েছিল সুহাস, সে-শিক্ষার সুযোগ নিতে পারেনি। হয়ত স্যার পি-সি-রায়ের মুখ পুড়িয়ে দিয়েছিল সে, কিন্তু সংসারের চার-দেয়ালের গণ্ডীর মধ্যে এসে তা আর তার মনে থাকতো না। সত্যিই মনে হতো সে সুখী। সাংসারিক লোক যাকে সুখী হওয়া বলে, সে-সুখ সে পেয়েছে।

কিন্তু দুঃখ থেকে গিয়েছিল মা'র জন্যে!

মা'র স্বাস্থ্য ভালোই হচ্ছিল মুড়াগাছাতে। দেশ থেকে আসার পর স্বাস্থ্য ভালো হয়েছিল, মন ভালো হয়েছিল। ছেলের চাকরি হয়েছে, ছেলের বউ মনের মত হয়েছে, বুড়ো মানুষের জীবনে আর কী আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে?

মাঝে-মাঝে মা বলতো—বৌমা, আমি আর বেশিদিন বাঁচবো না—

কাজল বলতো—আপনি ও-কথা বলবেন না,—ওতে আমাদের অকল্যাণ হয়—

—কিন্তু তোমার একটা ছেলে হলো না, সেই-ই আমার দুঃখু,—আমি এখানকার মঙ্গলচণ্ডী তলায় গিয়ে পুজো দিয়ে এসেছি; জানো—

এমনি আবোল-তাবোল বুড়ো মানুষের কথা সব। কাজলকে সবই শুনতে হতো। কিন্তু বুড়ো মানুষ শেষ পর্যন্ত মনের সাধ অপূর্ণ রেখেই চলে গেল। মৃত্যুর আগের দিনে বলেছিল—বৌমা, খোকাকে বোল, সে যেন ডাক্তার-টাক্তার দেখায়—

কিন্তু তারপরেই যুদ্ধ বেধেছিল। আর তারপরেই কলকাতায় বদলি হওয়া।

বীণা প্রায়ই চিঠি লিখতো। লিখতো—আমি এখনও সেই মেসটায় আছি কাজলদি, তুমি চলে যাবার পর থেকে আমি একলাই আছি সেই ঘরটাতে। একটু বেশি খরচ হচ্ছে—কিন্তু কী করবো? কাউকেই আর ভালো লাগে না। একলা-একলা সারাদিন কাটাই। তুমি কবে কলকাতায় আসবে?

কাজলও সান্ত্বনা দিত চিঠিতে।

লিখতো—আমি যাবো শিগ্‌গির, কিন্তু শাশুড়িকে একলা ফেলে যেতে পারছি না। বুড়ো মানুষ, ভাল করে চোখে দেখতে পান না, সব সময় কাছে-কাছে থাকতে হয় আমাকে—

তারপর যখন যুদ্ধ বাধলো, তখন বীণা লিখলে—যুদ্ধ বেধেছে, তুমি বেশ
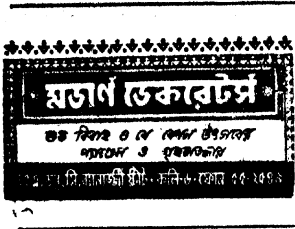
আরামে আছে কাজলদি, আমি কোথায় যাবো বুঝতে পারছি না—

কাজল লিখলে—তুই চলে আয় এখানে, আমার কোনও অসুবিধে হবে না—

কিন্তু বীণা লিখেছিল—না, কাজলদি, এখন তো আমার ছুটি নেই। আর তা ছাড়া সময় কাটাবার জন্যে দু'একটা টুইশানি নিয়েছি, তাদের ছেড়ে যাই-ই বা কী করে?

কাজল লিখেছিল—যেদিন তোর খুশী চলে আসবি, আমি স্টেশনে গিয়ে হাজির থাকবো—

কিন্তু তবু বীণা সময় করে উঠতে পারেনি। কিম্বা হয়ত যেতে সংকোচ হয়েছে। কাজলদি সুখে আছে, তার মধ্যে আবার কেন সে গিয়ে ব্যাঘাত করবে।

কাজল লিখেছিল—কই, অনেক দিন তোর খবর পাইনি, তুই আসবি বলেছিলি, তার কী হলো? আর আচারিয়ার বা খবর কী? সে এখন কোথায়?

আচারিয়ার কথা একবারও লিখতো না বীণা। কাজল তখনই একটু অবাক হয়েছিল। এত ঘনিষ্ঠতা তাদের, এত পরিচয়। একদিন চিঠি না পেলে যে-মেয়ে অত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতো, সেই মেয়ে একবার আচারিয়ার নাম পর্যন্ত উল্লেখ করে না।

কাজল পরের বার জোর তাগাদা দিয়ে লিখলে—বার বার করে তোকে আচারিয়ার খবর জানাতে লিখছি, তবু কেন লিখিস না? তার খবর কী? কোথায় সে? তার সঙ্গে কি দেখা হয় না? এর জবাব নিশ্চয়ই দিবি।

উত্তরে বীণা লিখলে—আচারিয়ার খবর জানতে চেয়েছ, কিন্তু সে-কথা চিঠিতে লেখা যায় না। যদি কোনওদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয়, তখন তোমাকে সব জানাবো।

এই চিঠিটা পেয়ে কাজল একটু অবাক হয়ে গিয়েছিল। নিশ্চয়ই একটা কিছু ঘটেছে। নইলে বীণা তো এমন চিঠি লেখবার মেয়ে নয়!

এমনি করে মাসের পর মাস বছরের পর বছর কেটে গিয়েছিল। আসল খবরটা জানা যায়নি। আর তা ছাড়া কাজলেরও তো সংসারের কাজকর্ম আছে। তাকেও তো বুড়ো শাশুড়ি স্বামী—সবাইকে নিয়ে সংসার করতে হয়। সুতরাং কাজলও আগেকার মত আর ঘন-ঘন চিঠি লিখতে পারতো না। যা-ও লিখতো তা-ও ছোট-ছোট। কাজল কলকাতা থেকে বিচ্ছিন্নই হয়ে গিয়েছিল বলতে গেলে। তার জীবনের পরিবর্তনের সংগে সংগে হয়ত মনেও কিছু রং বদলেছিল। রং তো সকলেরই বদলায়। মন থাকলেই মনের রং বদলায়। তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ছোট ছোট চিঠি পেয়ে কিম্বা দেরিতে চিঠি পেয়ে বীণা কিছু মনে করা ছেড়ে দিয়েছিল। বীণা জানতো তার কাজলদি বিয়ের পর বদলে যাবে। বদলে যাওয়াই স্বাভাবিক। বদলে না গেলেই বরং বুঝতে হবে বেঁচে নেই মানুষ। এই বদল, এই পরিবর্তন—এই-ই তো মানুষের জীবন।

এর পরেই বদলি হবার খবর এল।

কাজল লিখলে—তুই বোধহয় শুনে সুখী হবি, কলকাতায় আমরা বদলি হয়ে যাচ্ছি শিগ্‌গির—

বীণা লিখেছে—কাজলদি, তুমি কলকাতায় আসছো শুনে কী খুশী যে হয়েছি কী বলবো? আবার যে তোমার সংগে আমার কোনওদিন দেখা হবে তা কল্পনাও করিনি। তুমি এলে সব বলবো তোমাকে, অনেক কথা জমে আছে মনে। তোমাকে না-বলতে পেরে আমার ঘুম হচ্ছে না। তুমি কবে আসবে, লেখোনি কেন? কবে আসবে, নিশ্চয় পরের চিঠিতে জানাবে।

সুহাসের মনে আছে সেই দিনটার কথা। সেই প্রথম দিন। যেদিন বদলি হয়ে এল কলকাতায়। ট্রেনটা এসে শেয়ালদ' ষ্টেশনে পৌঁছেছিল সকাল সাড়ে দশটায়।

তখন সবে যুদ্ধ বেধেছে। সে-শেয়ালদ' ষ্টেশন যেন আর নেই। সে চেহারা যেন আমূলে বদলে গিয়েছে, খাকি পোষাকে ভরা চারিদিক। পুলিশ-পাহারার ব্যবস্থা হয়েছে। লোকে-লোকারণ্য। মাত্র ক'বছরের ব্যবধান। তারই মধ্যে আরব্য উপন্যাসের মত সমস্ত জায়গাটার যেন রূপান্তর ঘটে গেছে।

ডিস্ট্যান্ট সিগন্যালের কাছাকাছি আসতেই মুখ বাড়িয়ে দেখলে কাজল। আর কিছুক্ষণ। আর একটু পরেই কলকাতা।

সুহাসও দেখছিল। বললে—আবার যে এখানে আসতে পারবো তা ভাবাই যায়নি,—

কাজল বললে—জানো, বড় ভাল লাগছে আমার—

সুহাস বলেছিল—আমারও ভাল লাগছে—

কাজল বলেছিল—আমার ভাল লাগছে অন্য কারণে—

—কী কারণে?

সুহাস বললে—কারণ এখানে ভাল কোয়ার্টার পাবো, সেই পাড়াগাঁয়ের ছোট বাড়ির মধ্যে তোমাকে বন্ধ থাকতে হবে না, এখানে কত কী আছে! কলকাতা সহর লাইফকে একঘেঁয়ে লাগতে দেয় না—

—কই, আমার তো একঘেয়ে লাগতো না সেখানে!

সুহাস বললে—মুখে, না বললেও, আমি বুঝতে পারতুম তো। তাই অনেক চেষ্টা করে এখানে বদলি হয়েছি। কাজল বললে—কিন্তু তোমার ধারণা মিথ্যে, আমার সেখানে মোটে খারাপ লাগতো না। তুমি যেখানে থাকবে, সেখানেই আমার ভাল লাগবে। তোমার ভাল লাগলে সব জায়গায় যেতে রাজি আছি—

বকতে বকতে প্ল্যাটফরমে এসে পৌঁছোল ট্রেনটা। মাথায় লাল পাগড়ী বাঁধা কুলীর দল সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। লোক গিশ্ গিশ্ করছে প্লাট-ফরমের ওপর। একটা অদ্ভুত গুম গুম আওয়াজ করতে করতে ট্রেনটা ঢুকলো।

জিনিষ-পত্র গুছিয়ে নামতে একটু সময় লাগলো।

সুহাস জিজ্ঞেস করলে—তোমার সব নিয়েছ তো? কিছু ফেলে যাওনি তো?

কিন্তু কাজল তখন প্ল্যাটফরমের ওপর বীণাকে দেখে একেবারে দৌড়ে কাছে গিয়েছে।

বললে—এ কী চেহারা হয়েছে তোর ভাই?

বীণা বললে—কাজলদি, তুমি? আমার যে বিশ্বাস হচ্ছে না কিছুতেই—

এদিকে সুহাসের আর্ডালি কানাই তখন এসে গেছে। সে থার্ড ক্লাশে ছিল। সংগে আরো পুলিশ কনস্টেবল ছিল। তারাও এসে গেল। মালপত্র নামাবার কোনও অসুবিধে হলো না।

বীণা বললে—কাজলদি, তুমি আরো সুন্দর হয়ে গেছো, সত্যি—

কাজল বললে—তোকে আর খোসামোদ করতে হবে না, বিয়ে হলে তুইও সুন্দর হয়ে যাবি—

আজ এতদিন পরে সেই সব দিনগুলোর কথা যেন নতুন করে ভাবতে ভাল লাগে সুহাসরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের। আজকের সুহাসরঞ্জন মুখোপাধ্যায়—তখন লোকে বলতো মিস্টার মুখার্জি, পুলিশের চাকরিতে মিস্টার মুখার্জির আগে আর কেউ এমন প্রমোশন নাকি পায়নি। গ্রেড্ কমপ্লিট না হতেই আর একটা গ্রেডে প্রমোশন পাওয়া। লোকে বলে চাকরিতে প্রমোশন পেতে গেলে মেরিটটা বড় কথা নয়, ফ্ল্যাটারিটাই আসল। অর্থাৎ খোসামোদ না করলে চাকরিতে উন্নতি নাকি হয় না কারো।

তা কই, মিস্টার মুখার্জির মনে পড়ে না কবে কাকে খোসামোদ করেছে।

কমিশনার ছিল তখন গার্লিক। মিস্টার গার্লিক।

মিস্টার গার্লিক বলতো—আর ইউ হ্যাপি মুখার্জি?

মিস্টার মুখার্জি বলতো—ইয়েস স্যার—

ওয়ারের সময়, তখন ক্রাইমের সংখ্যা বেড়ে গেছে সহরে। এখানে চুরি, ওখানে ডাকাতি। সমস্ত কলকাতা পাগল তখন টাকা নিয়ে। দুহাতে টাকা লুটতে হবে। পৃথিবীতে যত টাকা আছে সব টাকা চাই আমার। আমার যদি টাকা না থাকে তো কারোর টাকা থাকা চলবে না। তোমার যদি টাকা থাকে তো আমাকে তার ভাগ দিতে হবে। নইলে তোমাকেও আমার মত নিঃস্ব হতে হবে। আর শুধু টাকা নয়, তোমার স্ত্রীর মত আমারও নারী চাই। তোমার গাড়ির মত আমারও গাড়ি চাই। তোমার বাড়ির মতও আমার বাড়ি চাই। সব চাই আমার। তোমার যা আছে, আমারও তাই চাই।

মিস্টার গার্লিক বললে—মুখার্জি, দিস্ মাস্ট বি স্টপড্—এ আর টলারেট করা যায় না, এ কাজ করতেই হবে—

ঠিক হলো মিস্টার মুখার্জিকে স্পেশ্যাল পাওয়ার দেওয়া হবে। থানার ইনচার্জ নয়। সমস্ত বেঙ্গলের থানার ইনচার্জ। পোস্টটাও স্পেশ্যাল। মিস্টার মুখার্জির অবাধ ক্ষমতা। শুধু ওয়ার-পিরিয়ডের জন্যে এ পোস্টটা তৈরি হলো। দিল্লী থেকে কনফিডেন্সিয়াল অর্ডার এসেছে। হোল ইণ্ডিয়ার পুলিশ অর্গানিজেসনের মধ্যে থেকে লোক বাছাই করে পোস্ট করতে হবে। কোনও সিলেক্শন নয়, কোনও ইন্টারভিউ নয়—একেবারে খাঁটি নমিনেশনের ব্যাপার।

কলকাতাতে সুহাসের ওপর প্রীতির নজর পড়লো মিস্টার গার্লিকের।

বললে—সার্ভিভিশনের কাজে আমি স্যাটিসফায়েড মুখার্জি, আই নমিনেট্ ইউ—তোমার কিছু আপত্তি আছে?

রাত্রে কাজলকে বলতেই কাজল জিজ্ঞেস করলে—তা তুমি কী বললে? তুমি রাজি হয়েছ তো?

সুহাস বললে—না রাজি হয়নি—তোমাকে জিজ্ঞেস না করে রাজি হই কী করে?

কাজল বললে—বা রে, তোমার চাকরির ব্যাপারে আমি কী বুঝি? তোমার যাতে উন্নতি হবে তাতেই মত দেওয়া উচিত—

—তবু তোমাকে না জিজ্ঞেস করে কি আমি রাজি হতে পারি? সব কাজই তো তোমাকে জিজ্ঞেস করে তবে করি।

আমি দু'দিন সময় নিয়েছি মিস্টার গার্লিকের কাছে—

কাজল বলেছিল—মাইনে বাড়বে তো?

সুহাস বলেছিল—মাইনে তো বাড়বেই কিন্তু মাইনেটাই তো সব নয়—আরো অনেক ব্যাপারই তো ভাবতে হবে!

—আর কী ব্যাপার?

সুহাস বললে—মাঝে মাঝে বাইরে যেতে হতে পারে—

কাজল বললে—তা যাবে!

—কিন্তু তুমি বাড়িতে একলা কী করে থাকবে?

কাজল বলেছিল—বা রে, আমি একলা থাকতে পারবো না। কলকাতা সহরে একলা থাকার অসুবিধে কী? মুড়াগাছায় সেই বন-জঙ্গলের মধ্যে একলা থেকেছি আর কলকাতা সহরে থাকতে পারবো না? এমন চাকরি কি কেউ হাত-ছাড়া করে?

—তাহলে নেব বলছো?

—নিশ্চয়ই নেবে! এ আবার জিজ্ঞেস করছো? এ-সুযোগ ক'জন পায়?

বাইরে সুহাস ছিল ইউনিফর্ম পরা ক্রস-বেল্ট্ আটা অফিসার। খাকি পোষাকে বাইরে থেকে দেখলে ভয় হতো, শ্রদ্ধা হতো, মাথা নিচু করতে ইচ্ছে করতো। কিন্তু আসলে কাজলের কাছে এলেই কেমন অন্য মানুষ। শিশুর মত কোমল, মেয়ে-মানুষের মত নরম।

কাজল বলতো—আচ্ছা, তোমাকে ভয় করে তোমার স্টাফ্‌রা?

—কেন, এ-কথা বলছো কেন?

—তোমাকে দেখলে তো মনেই হয় না, কেউ ভয় পায়। কেউ মানে তোমাকে?

সুহাস বলতো—বা রে, তাহলে আমার প্রমোশন এই রকম? না মানলে কাজ চালাচ্ছি কী করে?

—আমার তো ভয় করে না!

সুহাস হাসতো, বলতো— তোমার কাছে কি আমি পুলিশ যে তোমার ভয় পাবে? তোমার কাছে তো আমি সুহাস?

সত্যিই সুহাস এক একদিন বাড়ি থেকে কোথায় চলে যেত। কখনও ময়-মনসিং, কখনও ঢাকা, আবার কখনও বর্ধমান। আবার কখনও চব্বিশ পরগণা। সঙ্গে থাকতো কনেস্টবল, সঙ্গে থাকতো অন্য সব সরঞ্জাম। যুদ্ধের সময় তখন। একলা-একলা বাড়িতে থাকতে একটু ভয় ভয় করতো। বাড়িটা ছিল সাহেব-পাড়ার মধ্যে। বাড়ির মধ্যে কেউ খুন করে গেলেও কারো টের পাবার কথা নয়।

বড় বড় গাছ চারদিকে। তারই মধ্যে কোয়ার্টার, ওপাশে কানাই থাকতো আউট হাউসে। আবদুলও থাকতো আউট-হাউসে। বিবিকে কাজল রেখে দিত নিজের শোবার ঘরের পাশে। বাগানে কয়েকটা গুলমোহর গাছ। কয়েকটা পাম্। আর বড় বড় কয়েকটা অশথ।

দিনের বেলা জায়গাটা ছায়া-ছায়া, কিন্তু রাত্রে চাঁদের আলো পড়লে ভারি ভাল লাগতো। একলা-একলা ওইখানে বেড়াতে ভাল লাগতো। অনেক দিন গল্প করতো বিবির সঙ্গে।

কাজল বলতো—জানিস্ বিবি, আমি এই কলকাতাতেই আগে ছিলুম—

বিবি নেপালী মেয়ে—বলতো—আমি আগে কলকাতা দেখিনি মাইজী—এই প্রথম দেখলুম—

কাজল জিজ্ঞেস করতো—এখন কলকাতা চিনে গেলি তো?

—হ্যাঁ মাইজী, কলকাতা আমার জানা হয়ে গেল!

কাজল জিজ্ঞেস করতো—এ-ছাড়া আরো একটা বড় কলকাতা আছে, জানিস?

—কোথায় মাইজী?

কাজল বলতো—সে জায়গার নাম বউবাজার। সে এ-রকম জায়গা নয়। সেখানে বাড়িগুলো ঘেঁষাঘেঁষি। সন্ধ্যে-বেলা ধোঁয়ার জ্বালায় টেঁকা যায় না সেখানে। সেখানে রাস্তায় ময়লা জমে পাহাড় হয়ে থাকে।, সেখানে এত গাছ নেই—তুই যে-রকম আউট-হাউসে থাকিস, ওই রকম বড়লোকের বাবু-বিবিরা ছেলে-মেয়ে নিয়ে ঘর-সংসার করে—সেখানে মেস আছে। মেসের মধ্যে মেয়েরা থাকে। ইস্কুলের যারা মাষ্টারণী তারা সেখানে খুব কষ্টে দিন চালায়—জানিস?

বিবি অবাক হয়ে যেতো। বিবি সে-কলকাতা দেখেনি। বলতো—সে-ও কলকাতা সহর?

কাজল বলতো—হ্যাঁ রে, সেখানে যারা যাবে তারা যে-ট্যাক্সো দেয়। এখান-কার সাহেবরাও সেই একই ট্যাক্সো দেয়—

বিবি অবাক হয়ে সব শুনতো। গল্প করতে করতে ওদিকে হঠাৎ গেট-খোলার শব্দ হতো। আর ঘোরানো মোরাসের রাস্তায় কার পায়ের শব্দ হতো।

কাজল বলতো—দেখ তো বিবি, বীণা দিদিমণি এল বোধহয়—

সত্যিই বীণা। বীণা না-হলে হঠাৎ এ-সময়ে আর কে আসবে।

কাজল বলতো—কী রে বীণা, তুই যে হঠাৎ? আজ ছুটি নাকি?

বীণার সেই আগেকার মতই চেহারা। হাঁফাতে হাঁফাতে এসে একেবারে কাজলের পাশের চেয়ারে বসে পড়েছে। যেন খুব ক্লান্ত, যেন খুব বিব্রত। খানিকক্ষণ কোনও কথাই বলতে পারলে না।

কাজল জিজ্ঞেস করলে—কী রে, আচারিয়ার চিঠি এসেছে?

বীণা বললে—কাজলদি, সর্বনাশ হয়েছে, তুমি আমাকে বাঁচাও কাজলদি, বাঁচাও—

বলতে বলতে বীণা একবারে ভেঙে পড়লো কাজলের কোলের ওপর। কাজল বললে—কী হলো তোর? হলো কী?

বীণা আর কথা বলতে পারে না। কেবল কাঁদছে তখন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কোলের ভেতর মুখ গুঁজে।

প্রথম দিন এটা বুঝতে পারেনি কাজল। যেদিন প্রথম সুহাস কলকাতায় বদলি হয়ে এসেছিল। শেয়ালদ' ষ্টেশন থেকেই সোজা এসেছিল এই নতুন কোয়ার্টারে।

বীণা বলেছিল—না, কাজলদি তোমরা আগে নতুন কোয়ার্টারে গিয়ে ওঠো, তখন একদিন যাবো—আজ আর তোমাদের বিরক্ত করবো না—

কাজল ছাড়েনি। সুহাসকে বলেছিল—তুমি একটু বলো না ওকে যেতে, তুমি না বললে যাবে না বলছে? এ আমার বন্ধু বীণা—

সুহাস নমস্কার করেছিল। বীণাও নমস্কার করেছিল।

সুহাস বলেছিল—চলুন না আপনি আমাদের সঙ্গে, আমাদের কোনও অসুবিধে হবে না—

বীণা বলেছিল—কিন্তু আজকেই আপনারা এলেন, এখন সব জিনিষ-পত্র গোছাতে হবে—

কাজল বলেছিল—সে-সব তোকে ভাবতে হবে না, সে আমাদের লোকজন সব রেডি আছে, পুলিশের চাকরিতে লোকের অভাব—

বাড়ী দেখে বীণা অবাক হয়ে গিয়েছিল। কাজলও অবাক হয়ে গিয়েছিল, সুহাসও অবাক হয়ে গিয়েছিল। মিস্টার গার্লিক মিস্টার মুখার্জির জন্যে এই ব্যবস্থা করে রেখেছিল আগে থেকে। স্পেশ্যাল স্কোয়াড্ পুলিশ। সাহেবের নিজের নমিনেটেড্ করা লোক। দিশী পাড়ায় থাকলে কাজের নাকি অসুবিধে হয়। ঠিক অর্ডিনারি পুলিশ নয়। আসলে মিলিটারি-কাম্-পুলিশ কাম্-ওয়ার ডিপার্টমেন্ট। খানিকটা সিক্রেট ওয়ার্ক। মুভমেন্টও তার সিক্রেট থাকা উচিত। সত্যিই কাজলদি'র কী সৌভাগ্য! একই ঘরে দু'জন একই মেসে থাকতো, একই গ্রেডে চাকরি করতো। একই স্কুলে পড়াতো দু'জনে।

বীণা বললে—ভাই কাজলদি, আমার যে কী ভালো লাগছে কী বলবো—সত্যি—

কাজল বললে—তুই থেকে যা আজ বীণা—এখানেই থাক্—

বীণা বললে—আজকে মেসে বলে আসিনি—আর একদিন আসবো বরং—

কাজল বললে—আরেক দিন নয়, কাল, কালই তোকে আসতে হবে—

সত্যিই পরের দিন এল বীণা। এসে বললে—জানো কাজলদি—রেবাদি কনকদি মলিনাদি সবাই আসতে চাইছিল তোমার কাছে, তাদের দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছি বাইরে—

কাজল অবাক হয়ে গিয়েছিল। বললে—সে কী রে, তাদের ভেতরে নিয়ে আয়,—

বলে কাজল নিজেই বাইরে গিয়ে সকলকে ডেকে নিয়ে এসেছিল। সেই রেবাদি কনকদি মলিনাদি। একদিন এক সঙ্গে কাজ করেছে। তখনও কারোরই বিয়ে হয়নি, সবাই ঠিক সেই রকমই আছে। সেই আগেকার মত। কাজল যেন বিয়ে করে তাদের চেয়ে অনেক বড় হয়ে গিয়েছে হঠাৎ। অনেক উঁচু।

কাজলের ঐশ্বর্য দেখে সবাই সেদিন অবাকই হয়ে গিয়েছিল। কাজলের বাড়ি, কাজলের স্বামী, কাজলের চাপরাশি, কাজলের আয়া, কাজলের খানসামা। আবদুল, বিবি, কানাই সবাই মিলে সেদিন কাজলের বন্ধুদের আপ্যায়ন করেছিল। একদিনেই ঘরটা সাজিয়ে ফেলেছে।

রেবাদি বললে—তুমি যে আমাদের মনে রেখেছ তাতেই আমরা কৃতার্থ ভাই, আমরা তো ভাই প্রথমে ঢুকতেই সাহস পাইনি—

কনকদি, মলিনাদি তারাও সবাই সেই এক কথাই বলেছিল।

কাজল বলেছিল—আপনারা কিন্তু আসবেন রেবাদি মাঝে-মাঝে, আপনারা এলে আমি সত্যিই খুব খুশী হবো—সবে তো নতুন এসেছি কাল, আপনাদের কিছু খাতির করতে পারলাম না ভালো করে—

কণকদি বলেছিল—তুমিও যেও কিন্তু ভাই—

—নিশ্চয়ই যাবো, নিশ্চয়ই যাবো।

পরের দিন বীণা আবার এসেছিল। বললে—সবাই খুব খুশী কাজলদি তোমার ওপর, বলছিল তোমার ভাগ্যটা খুব ভালো, কিন্তু বলছিল তোমার ছেলে-মেয়ে কিছু হয়নি কেন—

—ও কথা থাক্—আচারিয়ার কথা বল্—আচারিয়ার কথা বলছিস না কেন তুই?

বীণা বলেছিল—আমার কি-রকম যেন সন্দেহ হচ্ছে কাজলদি, আচারিয়া যেন অন্যরকম হয়ে গেছে—

—অন্যরকম হয়ে গেছে মানে?

বীণা বললে—কী জানি, সে-রকম যেন আর নেই।

—কেন? তার চাকরি আর নেই?

—না, তা আছে, কিন্তু আগে তুমি যেমন দেখেছিলে তেমন যেন আর নেই। তেমন করে যেন আর আগেকার মত ভালবাসে না আমাকে। একটুখানি দেখা

করেই চলে যায়। বেশিক্ষণ থাকতে চায় না। বলে—কাজ আছে—

কাজল জিজ্ঞেস করলে—বিয়ের কথা জিজ্ঞেস করলে কী বলে?

ও কথা তুলতেই দেয় না, তুললেই অন্য কথা এনে ফেলে। তোমাকে এ-সব কথা চিঠিতে লিখতেও আমার খারাপ লাগতো কাজলদি, আগে কত ঘন-ঘন চিঠি দিত, এখন আমি দু'তিন খানা চিঠি দেবার পর একখানা দেয়—

—চিঠিতে কী লেখে?

বীণা বললে—লেখে আমি কেমন আছি, এই সব। আসল কথাটা একবারও লেখে না। কেবল এড়িয়ে যায়।

কাজল খানিকক্ষণ ভেবেছিল। তারপর ভেবে বলেছিল—কিন্তু কেন বিয়ে করতে চায় না, বল্‌তো? তুই কিছু আন্দাজ করতে পারিস?

বীণা বলেছিল—না, কাজলদি, আমি কিছুই বুঝতে পারি না, আমার মনে হয়, আচারিয়া বদ্‌লে গেছে, আচারিয়ার কাছে আমি পুরোণ হয়ে গেছি। আর মেয়েমানুষ হয়ে বার বার নিজের মুখে নিজের কথা বলতেই কি পারা যায়?

কাজল বললে—আচ্ছা, তুই এক কাজ কর, তুই একবার আমার সঙ্গে তার দেখা করিয়ে দে—

বীণা যেন হাতে স্বর্গ পেয়েছিল। বলেছিল—তুমি দেখা করবে কাজলদি, সত্যিই তুমি দেখা করবে?

—নিশ্চয়ই দেখা করবো। তোর জন্যে আমি সব করতে পারি বীণা। তুই বোকা, তাই তুই আচারিয়াকে এখনও জব্দ করতে পারলি না। আমি হলে ওকে এতদিনে কবে স্বীকার করিয়ে ছাড়তুম। নিশ্চয় ওর কোনও বদ্‌ মতলব আছে—

বীণা অতটা ভাবতে পারেনি। কিম্বা অতটা ভাববার সাহসই হয়নি তার। বললে—না কাজলদি, তুমি ঠিক বুঝছো না, আচারিয়া অত খারাপ নয়, কিছুতেই অত খারাপ হতে পারে না—আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না, আমি এত বছর ধরে ওকে দেখে আসছি—ও কত বড় চাকরি করে, কত কাজে ব্যস্ত থাকে—

—কিন্তু তোকে বিয়ে করবে কি করবে না, সেটা তো খুলে বলবে?

—না কাজলদি তুমি ওর ওপর রাগ কোর না, সত্যিই ও সময় পাচ্ছে না। এত কাজ ওর যে আমার কথা ইচ্ছে থাকলেও ভাবতে পারছে না। বিয়ে করতেও তো সময় লাগবে, সেই সময়ই নেই যে ওর। সারা ওয়ার্লড্‌ ঘুরতে হচ্ছে ওকে, মোটে সময়ই পাচ্ছে না—

কাজল বললে—কিন্তু এখন তো যুদ্ধ চলছে। এখন কোথায় যাচ্ছে ও?

—কিন্তু অফিস ওকে যে এখনও খাটাচ্ছে, এখনও বাইরে পাঠাচ্ছে ওকে, চাকরি ওর প্রাণ বার করে দিচ্ছে কাজলদি, চাকরিটা ছাড়তেও পারছে না, তিন হাজার টাকা মাইনের চাকরি এত হট্‌ করে ছাড়া যায়, তুমিই বলো?

—কিন্তু বিয়ে করেও তো ও-চাকরি করা যায়। সবাই-ই তো তাই করে। সুহাসও তো করছে। দেখছিস না কী খাটুনি খাট্‌তে হচ্ছে সারা দিন-রাত! কতদিন বাড়িতে আসতে পারে না—। তার সঙ্গে বিয়ের কি সম্পর্ক?

বীণা বললে—না কাজলদি আচারিয়া তো মিথ্যে কথা বলবে না, মিথ্যে কথা বলবার লোক নয় ও, নিশ্চয় ওর কোনও অসুবিধে হচ্ছে—

কাজল বললে—তুই আর ওকে সাপোর্ট করিসনি বীণা, আমার কী রকম

যেন সন্দেহ হচ্ছে, তুই একদিন নিয়ে আয় ওকে—

—তোমার এখানে নিয়ে আসবো?

হ্যাঁ আমি ওকে সব খোলাখুলি জিজ্ঞেস করবো।

—কিন্তু ওকে যেন কোনও কড়া কথা শুনিয়ে দিও না কাজলদি, ও ভাববে আমি হয়ত তোমাকে সব বলেছি। একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে বোল—

কাজল বলেছিল—সে আমি যা-বলবার বলবো, তোকে কিছু ভাবতে হবে না, কবে নিয়ে আসবি বল? কালকে?

—ওমা, কালকে কী করে আনবো? সে যে এখন বর্মায়—

—কবে বর্মা থেকে আসবে?

—শিগ্‌গিরই আসবার কথা আছে, এলেই তোমার কাছে নিয়ে আসবো।

সেদিন এই পর্যন্ত কথা হয়েছিল। কিন্তু এর পরেই কাণ্ডটা ঘটলো।

সুহাস চলে যেত নিজের কাজে। এক-একবার দশ-বারো দিন একসঙ্গে বাইরে থাকতে হতো। আবার হঠাৎ এসে পড়তো। কোনও ঠিক-ঠিকানা ছিল না যাওয়া-আসার। তার চাকরিটাই এমনি। কাজলের কোনও অসুবিধেই ছিল না। রেবাদি কণকদি মলিনাদি তারা আসতো মাঝে-মাঝে।

বলতো—সত্যি ভাই, তোমার কাছে এসে কিছুক্ষণ কাটালে আমরা সব ভুলে যাই—

—তা আসেন না কেন রোজ? আমি তো একলাই থাকি সারাদিন, আমার তো কোনও কাজ নেই—

—তোমার মতন ভাগ্য করে তো আমরা আসিনি ভাই—। অনেক ভাবনা ভাবতে হয় আমাদের,—তুমি তো সবই জানো।

কাজল বলতো—কিন্তু আপনারা এলে আমি যে কী খুশী হই কী বলবো!
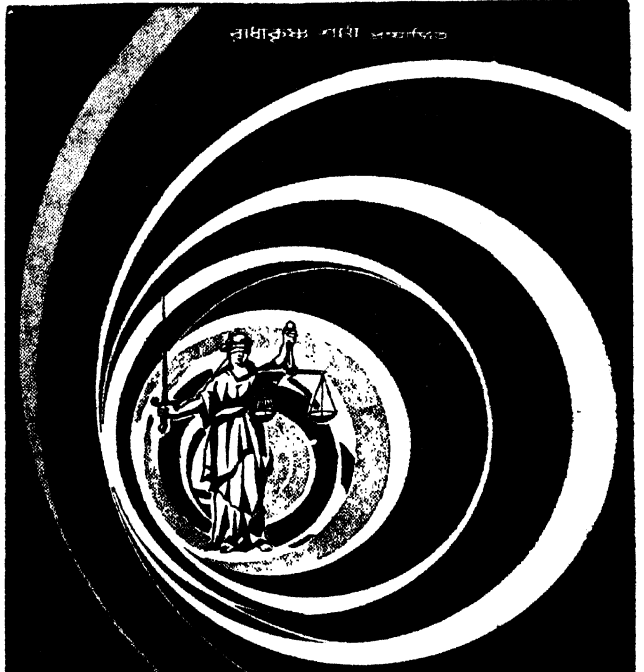
তারা জিজ্ঞেস করতো—কী করে সময় কাটাও তুমি?

—কী আর করি, এই ঘর গুছোই, রান্নার জোগাড় করি, আর বীণা মাঝে-মাঝে এলে গল্প করি বসে বসে তার সঙ্গে—ও-ও তো রোজ আসতে পারে না। আর তারপর বাগান আছে আমার, বাগানে কত গাছ লাগিয়েছি। ফুলের গাছ লাগিয়েছি, ওদিকে লাউ-কুমড়ো শাকও লাগিয়েছি—

সবাই চলে গেলে বিবি জিজ্ঞেস করতো—ওরা কে মাইজী? তোমার রিস্তাদার?

কাজল বলতো—মারে বিবি, রিস্তা-দার আমার কেউ নেই পৃথিবীতে—ওরা সব আমার বন্ধু, ওদের সঙ্গে আমি একসঙ্গে চাকরি করেছি—

বিবিও অবাক হয়ে যেত শুনে। বলতো—মাঈজী, আপনার কাছ ছেড়ে আমি কোনওদিন অন্য জায়গায় যাবো না—

—কেন রে? অন্য জায়গায় যদি বেশি মাইনে পাস?

—তবুও যাবো না মাঈজী। আমি যতদিন বাঁচবো ততদিন আপনার কাছে কাজ করবো।

আশ্চর্য মানুষের মন। আশ্চর্য মানুষের মায়া-মমতা করবার ক্ষমতা। কেন যে মানুষ একজনকে এমন করে ভালবাসতে পারে, আবার কেনই বা এত ঘৃণা করতে পারে। যে-মানুষ আকর্ষণ করে, সেই মানুষই আবার দূরে ঠেলেও ফেলে। সুহাস এতদিন চাকরি করেছে, এত অসংখ্য মানুষের সংস্পর্শে এসেছে, তবু মনে হয়েছে এতদিনের শেখা যেন তার সব মিথ্যে। এতদিনের জানা যেন তার সব ভেজাল। মানুষকে যদি চিনতেই পারবে, তবে গল্প এত উপন্যাস লেখা হলো কেন পৃথিবীতে। অথচ সেই কাজল উপন্যাস লিখতে সুরু করেছিল একদিন।

সুহাস একদিন জিজ্ঞেস করেছিল—কী করে সময় কাটাও তুমি?

—কী করে আর কাটাবো? তোমার কথা ভেবে ভেবে সময় কাটাই—

সুহাস হেসেছিল কথাটা শুনে। কাজলও হেসেছিল। আসলে কথাটা যে সত্যি তা দু'জনেই জানতো। সুহাস যেখানেই থাকুক কাজলের কথা মন থেকে কি দূরে করতে পারতো। কাজলও যখন একা-একা ব্যালকনিতে চেয়ারটা এনে বসতো—বসে আকাশের দিকে চেয়ে থাকতো, তখনও সুহাসের কথা ভাবতো।

একদিন হঠাৎ দুপুরবেলাই সুহাস এসে পড়েছিল বাড়িতে। সামনের ব্যালকনির একটা টেবিলে লেখার কাগজ-পত্র। অনেক কিছু লেখা রয়েছে কাগজ-গুলোতে। এক বাণ্ডিল কাগজ। কাগজগুলো দেখে কিছুই বুঝতে পারেনি সুহাস। কাউকে চিঠি লেখছে নাকি এত বড়-বড়?

কাজল এসে পড়তেই সুহাস বললে—এগুলো কী গো? চিঠি?

—ওমা, তুমি কখন এলে?

—এই তো এখনি। কিন্তু এগুলো কী লিখছো গো?

কাজল বলেছিল—ও কিছু না, ও-সব তুমি দেখো না—

বলে কাগজগুলো গুটিয়ে ফেলবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সুহাস ছাড়েনি। বললে—এত বড় চিঠি লিখছো কাকে তুমি?

শেষ পর্যন্ত বলতেই হয়েছিল। কাজল বলেছিল—গল্প—

সুহাস অবাক হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল—গল্প লিখছো তুমি? এত বড় গল্প?

কাজল বলেছিল—বসে থাকি তো সারাদিন, কোনও কাজই থাকে না দুপুরবেলা, তাই.....

—তুমি গল্প লিখতে নাকি কোন কালে?

কাজল বলেছিল—লিখি না, তবে গল্পের বই তো পড়েছি, সেই রকম করে লেখবার চেষ্টা করছি—

—কী নিয়ে লিখছো?

কাজল বলেছিল—আমার এক বন্ধুর জীবন নিয়ে—

—কোন্ বন্ধুর?

কাজল বলেছিল—সে তুমি চিনবে না—

সুহাস যখন আসতো সে-কদিন আর কোনও ভাবনা ছিল না কাজলের। কোথা দিয়ে সময় কেটে যেত, টের পেত না কেউ। কাজের কি শেষ আছে! সমস্ত দিন ধরে গল্প করেও ফুরতো না—আবদুল বিবি কানাই—ওরাও যেন কেমন খুশী হয়ে উঠতো সে-কদিন। কিন্তু যুদ্ধ যত বাড়তে লাগলো, সুহাসের কাজ যেন দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে চলতে লাগলো। সারা পৃথিবীর মানুষের বিরুদ্ধে যেন সারা পৃথিবীর মানুষই যেন উঠে পড়ে লেগেছে।

গার্লিক সাহেব বলতো—মুখার্জি, আরো স্টাফ বাড়াতে হবে, আমাদের স্টাফের সর্টেজ হচ্ছে—

যুদ্ধের যারা বিপক্ষে তাদেরই শায়েস্তা করা কাজ স্পেশ্যাল স্কোয়াডের। গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে জাল পেতে ফেলেছিল গার্লিক সাহেবের ডিপার্টমেণ্ট। য়্যান্টি স্পেশ্যাল এলিমেণ্ট কোথাও দেখলেই তাদের ধরে চালান দিতে হবে। তারপর যখন সময় হবে, তখন বিচার হবে, কিম্বা বিচার হবে না। কিন্তু যুদ্ধের কাজে বাধা দেওয়া চলবে না। ন্যাশন্যাল ওয়ার ফ্রণ্টের কাজে সাহায্য করে যাবে এই পুলিশের স্পেশ্যাল পুলিশ স্কোয়াড্।

যখন সুহাস অনেক দিন পরে বাড়ি আসতো, কাজল আনন্দ দিয়ে, সমবেদনা দিয়ে তার সব ক্লান্তি দূর করতে চেষ্টা করতো। তারপর আবার একদিন বাইরে যাবার নির্দেশ আসতো। আবার একদিন ব্যাগ-ব্যাগেজ গুটিয়ে নিয়ে আর্দালি কনেস্টবল নিয়ে বেরিয়ে পড়তো সুহাস। কখনও সাত দিন, কখনও পনেরো দিন। বাঙলা দেশে কোনও জেলা, কোনও গ্রাম দেখতে আর বাকি থাকেনি সুহাসের।

কাজল জিজ্ঞাসা করতো—আর কত-দিন চলবে তোমার এই রকম ঘোরা-ঘুরি?

সুহাস বলতো—যুদ্ধ যতদিন চলবে—

—আর কতদিন যুদ্ধ চলবে?

সুহাস বলতো—যুদ্ধ চলে গেলে আমার এই স্পেশ্যাল চাকরিও তো চলে যাবে—আবার যে-কে-সে—

হয়ত ভালোই হয়েছে। সুহাসের মনে হতো হয়ত এ ভালোই হয়েছে। এ না হলে তো আবার তাকে সেই সাব-ডিভিসনের চার্জ নিয়ে গ্রামে যেতে হবে। সেখানে কোথায় থাকবে এই কোয়ার্টার, কোথায় থাকবে কাজলের এই মানসিক আরাম। যে-ক'বছর কলকাতায় আছে, সেই ক'বছরই তবু কাজল আবার তার পুরোন বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে পারবে, তাদের সঙ্গে হাসি-গল্প করতে পারবে। কাজলের সুখটাই তো বড় কথা। কাজলের আনন্দই তো তার আনন্দ।

বীণা এলেই কাজল জিজ্ঞেস করতো—কী রে, এল আচারিয়া?

বীণা বলতো—না কাজলদি, কী যে করবো বুঝতে পারছি না—চিঠিও পাচ্ছি না বহুদিন ধরে—

—কিন্তু বর্মায় তো যুদ্ধ চলছে! এ-সময়ে সেখানে গেল কেন?

—আর কেন কাজলদি, চাকরির জন্যে?

—কিন্তু চাকরিটা বড় না জীবন বড়ো?

বীণা বলতো—যখন গিয়েছিল সেখানে, তখন তো যুদ্ধ বাধেনি, এখন এমন হবে কে জানতো?

—এখন হয়ত সেখানে আটকে গেছে, তাই আসতে পারছে না। আর সেইজন্যেই হয়ত চিঠিও লিখতে পারছে না!

বীণা বলতো—তাই হবে হয়তো—

কাজল বলতো—তা সে যাই হোক, এখানে এলে একবার তুই নিশ্চয় নিয়ে আসিস আমার কাছে, আমি সব খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে নেব—কী চায় সে—

কিন্তু সেদিন এক অবাক কাণ্ড ঘটলো!

সুহাস সেদিনও বাড়ি নেই। সন্ধ্যে-বেলা কাজল বিবির সঙ্গে বসে বসে আজে-বাজে গল্প করছে। কোথায় কাজলের দেশ ছিল, দেশে কে কে ছিল, কোথায় চাকরি করতো—এই সব গল্প।

বিবি বলছিল—আমি আপনার নোকরি ছেড়ে কোথাও যাবো না মাঈজী—

এমন সময় গেট খোলার একটা মড় মড় শব্দ হলো।

কাজল বললে—কেউ বোধহয় এল বিবি—দেখ তো কে? বীণা, দিদিমণি বোধহয়—

কানাই ছিল কাছে। সেও দৌড়ে গেছে গেট-এর দিকে। সে-ও এসে বললে—বীণা দিদিমণি এসেছে মা—

বীণা বাগানের ঘোরানো রাস্তাটা দিয়ে একেবারে সামনে এসেই পাশের চেয়ারটাতে বসে পড়েছে। বসে পড়েই হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠেছে—আমার সর্বনাশ হয়েছে কাজলদি, সর্বনাশ হয়েছে আমার—

কাজল তাড়াতাড়ি সামলে নিয়েছে বীণাকে। তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে বসালো তাকে। তারপর বাইরের দরজাটা বন্ধ করে দিলে। বললে—কী হয়েছে বল্ তো?

কানাই ভেবেছিল প্রত্যেকদিন যেমন বীণা-দিদিমণি আসে আর তাকে চায়ের জন্যে হুকুম করে মাঈজী, সেই হুকুম করবে। আবদুল তৈরিই ছিল। আবদুল কানাইকে জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ রে কানাই, চা করতে হবে না?

বিবিও অবাক হয়ে গিয়েছিল। সে ছাড়া কাজলের এক দণ্ড চলে না। দিনের মধ্যে যতক্ষণ কাজল জেগে থাকে ততক্ষণ বিবি তার সঙ্গে থাকে। কখনও গল্প করে, কখনও কাজলের চুল বেঁধে দেয়, কখনও আলতা পরিয়ে দেয়, নখ কেটে দেয়। সে-ও অবাক হয়ে গিয়েছিল মাঈজীর ঘরের দরজা বন্ধ দেখে।

দরজা খুললো শেষ পর্যন্ত। কিন্তু সে অনেকক্ষণ পরে। অনেকক্ষণ পরে মাঈজী বেরোল। বীণা-দিদিমণিও বেরোল।

বেরিয়ে মাঈজী বললে—বিবি, আমি বেরোব, আমার শাড়ি ব্লাউজ বার করে দে—

শাড়ি ব্লাউজ বার করে দিলে বিবি। তারপর গাড়িতে করে বেরিয়ে গেল দু'জনে। কোথায় গেল কে জানে! মাঈজীর মুখের চেহারা দেখে জিজ্ঞেস করতেও সাহস হলো না কোথায় যাবে মাঈজী, কখন আসবে। কখন খাবে তাও জিজ্ঞেস করতে পারলে না কেউ। ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। কাজল আর বীণা দু'জনেই তাতে উঠে চলে গেল।

আবদুল কানাইকে জিজ্ঞেস করলে—কোথায় গেল মাঈজী?

কানাই বললে—আমাকে জিজ্ঞেস করছো কেন? আমি তার কী জানি? মাকে জিজ্ঞেস করলে না কেন?

কিন্তু মা'তো এমন করে বেরোয় না কোনওদিন। কোনওদিন এমন করে দরজা বন্ধ করে কারোর সঙ্গে কথাও বলে না। কলকাতায় আসার পর সেই-ই বোধহয় প্রথম মা একলা একলা বেরোল। আগে কখনও বেরোয় নি তা নয়। নতুন বাড়িতে এসে জিনিস-পত্র কেনা-কাটা নিয়ে কতদিন বেরিয়েছে সাহেবের সঙ্গে। আবার একসঙ্গে দু'জনে বাড়ি ফিরে এসেছে। ফিরে এসে কোনওদিন খাওয়া-দাওয়া সেরে রেডিও শুনেছে, গল্প করেছে। তখন আবদুল, বিবি, কানাই যে-যার ঘরে গিয়ে খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়েছে। অনেক রাত পর্যন্ত সাহেবের ঘরে আলো জ্বালা দেখেছে। তারপর কখন আলো নিভে গেছে, কখন কে ঘুমিয়ে পড়েছে কেউ খোঁজ-খবর রাখেনি।

যুদ্ধের সময় ব্ল্যাক্-আউটের রাতে বাহিরে থেকে আলো দেখা যেত না। সেই তখনও কানাই অনেক রাত পর্যন্ত বাবু আর মা'র গলা শুনতে পেয়েছে। বোঝা যেত ভেতরে দু'জনের খুব জোরে-জোরে কথা হচ্ছে। বাইরে থেকে শুনলে মনে হতো যেন ঝগড়া করছে বাবু আর মা। কিন্তু সকালবেলা বোঝা যেত না কিছুই।

কাজল বলতো—আর এক কাপ চা দেব তোমাকে?

সুহাস বলতো—না, আর নয়, দু'কাপ তো খেয়ে ফেলেছি এরই মধ্যে—

সেদিন হঠাৎ সুহাস এসে পড়েছে মফঃস্বল থেকে। আর্ডার্লি, কনেস্টবল, সবাই মিলে হুটু করে এসে পড়েছে।

কানাই ছিল নিজের ঘরে। গেট-খোলার শব্দ হতেই একটু দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়েছে। কে? কে এল? মা নাকি?

আবদুলও খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে নিজের বিছানাটা বিছিয়ে শুয়ে পড়েছে। একটু তন্দ্রা মতন এসেছিল সবে। হঠাৎ বাইরে শব্দ শুনে বুঝলো মাঈজী এল।

বিবিও ঝিমোচ্ছিল। শব্দ পেয়েই ধড়-ফড় করে উঠে দাঁড়ালো। মাঈজী এসে গেছে। মাঈজী এসে খাওয়া-দাওয়া করলে

তবে তার কাজ শেষ। তবে সে গিয়ে নিজের ঘরে ঘুমোতে পারবে।

কিন্তু সাহেবের গলার শব্দ পেয়েই সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে।

কানাইকে সামনে পেয়েই বাবু জিজ্ঞেস করলে—মা কোথায় রে কানাই? বাড়ি নেই?

কানাই আমতা আমতা করে বললে—না, বাড়ি নেই—

—বাড়ি নেই তো কোথায় গেছেন?

কানাই বললে—আজ্ঞে, তা তো বলে যান নি—

—কখন বেরিয়েছেন?

—সেই সন্ধ্যেবেলা।

সন্ধ্যেবেলা! সন্ধ্যেবেলা থেকে বেরিয়েছে। সন্ধ্যেবেলা থেকে এই এতক্ষণ! সুহাস ঘড়িটা দেখলে একবার। এতক্ষণ ধরে কোথায় আছে কাজল!

আবার জিজ্ঞেস করলে—কখন আসবেন কিছু বলে গেছেন?

—আজ্ঞে না তো!

সুহাস আবার জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা বিবিকে জিজ্ঞেস করতো—

কানাই বিবিকে জিজ্ঞেস করে এল। সেও জানে না। আবদুলকে জিজ্ঞেস করে এল, সে-ও জানে না। এমন তো কখনও হয়নি। কলকাতায় এতদিন হলো এসেছে। কখনও হয়নি। তা ছাড়া এই ব্ল্যাক-আউটের রাত্রে কোথায় গেল সে!

নতুন করে আবার রান্না করলে আবদুল। খেয়ে-দেয়ে নিলে। তারপর চুপ-চাপ বসে রইল ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে। হেলান দিয়ে ক্লান্তিতে বোধহয় একটু ঘুমিয়েই পড়েছিল। হঠাৎ কাজলের গলার শব্দে তন্দ্রা ভেঙে গেল।

—ওমা, তুমি কখন এলে?

সুহাস চোখ খুলতেই দেখলে কাজল সেজে-গুজে ঘরে ঢুকেছে। গায়ে সেন্টের গন্ধ। কপালে একটা টিপ্ পরেছে। ঠোঁট দুটোতে যেন পান খেয়ে রাঙা করা।

কাজল বসে পড়লো একেবারে পাশ ঘেঁষে। বললে—আমি তো ভাবতেই পারিনি তুমি আজকেই আসবে!

—এমনি কাজটা মিটে গেল আর এসে পড়লুম।

কাজল বললে—তোমার খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে?

সুহাস শুধু বললে—হ্যাঁ—

কাজল একটু হেসে আরো কাছে সরে এল। বললে—কই, তুমি তো জিজ্ঞেস করলে না আমি কোথায় গিয়েছিলুম?

সুহাস বললে—সত্যি, কোথায় গিয়েছিলে এত রাত পর্যন্ত?

কাজল বললে—বলো তো কোথায়?

—তোমার সেই সব পুরোনো বন্ধুদের কাছে বুঝি? সত্যি, একলা-একলা তোমার থাকতে ভালোই বা লাগবে কেন? আমি না-হয় কাজে ব্যস্ত থাকি, আমার সময় এক-রকম করে কেটে যায়। তোমারই অসুবিধে। তুমি তো এখনও খাওনি?

কাজল বললে—না, বিকেল বেলা তো অনেক পেট ভরে খেয়ে গিয়েছিলুম, তাই আর খিদে ছিল না।

—কিন্তু এত রাত করলে কেন? ব্ল্যাক্-আউটের রাতে এতক্ষণ কি বাইরে থাকা ভাল?

তারপর খাওয়া-দাওয়ার শেষে সরজা বন্ধ করে দিয়ে বাবু আর মা অনেকক্ষণ ধরে কথা-বার্তা বলেছে। কানাই আবার গিয়ে আউট-হাউসের ভেতর শুয়ে পড়েছে। আবদুলও শুয়েছে, বিবিও ঘুমের ঘোরে ঢুলছিল, সেও অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে কখন। মাঝরাত্রে কানাই একবার ঘুম থেকে উঠেছিল। দেখলে জানালার ভেতর দিয়ে তখনও ঘরের ভেতর আলো জ্বলছে। তখনও যেন বাবু আর মা'র কথার শব্দ শোনা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে খুব জোরে-জোরে কথা বলছে। বাইরে থেকে কান পেতে শুনলে মনে হয় যেন দু'জনে ঝগড়া করছে।

কিন্তু সকাল বেলা মুখ দেখে আর কিছু বোঝবার উপায় নেই।

কাজল টী-পট থেকে চা ঢালতে ঢালতে বললে—আর এক কাপ চা দেব তোমাকে?

সুহাস বললে—না, আর নয়, দু'কাপ তো খেয়ে ফেলেছি এর মধ্যে—আর খাবো না—

সে-কটা বছর যে কোথা দিয়ে কেটে গিয়েছিল। কানাই-এর কাছে যেন স্বপন বলে মনে হয়। বাবু কোথায় কোথায় বেরিয়ে যেত, আর হুট্ করে একদিন চলে আসতো। সাহেব-পাড়ার সেই নিরিবিলি বাড়িটাতে কানাই-এর বলতে গেলে কোনও কাজই ছিল না।

বীণা সেদিন আবার এল হঠাৎ।

বললে— কাজলদি, আচারিয়া কলকাতায়—

—কলকাতায়? বলছিস্ কী রে? সে বর্মায় ছিল বলেছিলি?

বীণা কেঁদে ফেললে। বললে—আমি তাকে হঠাৎ রাস্তায় দেখলুম আজ—

—রাস্তায়? তাহলে কবে এল সে?

বীণা আর কথা বলতে পারলে না খানিকক্ষণ। তারপর বললে—আর এক জন মেয়ের সাথে দেখলুম তাকে আজ—

—মেয়ে? মেয়েটা কে? কোথাকার মেয়ে? চিনিস্ তুই?

বীণা বললে—না কাজলদি দেখে মনে হলো য়্যাংলো-ইন্ডিয়ান, আমাকে দেখতে পায়নি। আমি টুইশ্যানি সেরে ফিরছি হঠাৎ বাস থেকে দেখতে পেলুম বোবাজার স্ট্রীট দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলেছে—

কাজল বললে—তাহলে বর্মায় যায়নি? এখানেই ছিল এতদিন?

—তা জানিনা কাজলদি, আমার যেন কেমন সন্দেহ হচ্ছে!

কাজল বললে—তা তুই তখুনি বাস থেকে নেমে কথা বললি না কেন?

বীণা বললে—আমার কেমন ভয় করতে লাগলো কাজলদি, আমি সোজা বাস থেকে নেমে উল্টো দিকের বাস ধরে তোমার এখানে চলে এলাম—

—তা এখন কী করবি? তুই আচারিয়ার বাড়ি চিনিস? কোন্ হোটেলে থাকে জানিস?

বীণা বললে—জানলেও সেখানে আমি একলা যেতে পারবো না, সেইজন্যেই তোমার কাছে পরামর্শ নিতে এলাম, কী করি বলো দিকিনি?

কাজল বললে—চল্, আমি যাচ্ছি তোর সঙ্গে—

—তুমি যাবে?

তারপর বিবিকে ডাকলে কাজল। বিবি এল। নতুন ধোয়ানো শাড়ি-ব্লাউজ্ বার করে দিলে। আবার গাড়ি বেরোল। যাবার সময় বলে গেল—ফিরতে দেরি হবে, আবদুল কানাই সবাই যেন খেয়ে নেয়—

মাঈজী বেরিয়ে যাবার পর আবদুল জিজ্ঞেস করলে—কোথায় গেল রে মাঈজী?

কানাই বললে—আমি কী জানি? আমাকে কি বলে গেছে?

বাবু হঠাৎ সেদিন রাত ন'টার সময় হাজির হলো। সঙ্গে তার আর্ডালি কনস্টেবল সবাই। গেট খোলার শব্দ পেয়েই কানাই দৌড়ে গেছে।

বাবু জিজ্ঞেস করলে—মা কোথায় রে কানাই?

—আজ্ঞে মা তো বেরিয়েছেন।

—কোথায় বেরিয়েছেন?

কানাই বললে—তা তো জানি না বাবু! আমাকে কিছু বলে যান্ নি,

—আবদুল জানে? বিবি? বিবি কিছু জানে?

তাদের কাছে জিজ্ঞেস করে এসে কানাই বললে—আজ্ঞে না বাবু, ওরাও কেউ জানে না—

সেদিনও খাওয়া-দাওয়া সেরে ইজি চেয়ারটায় হেলান্ দিয়ে বসেছিল সুহাস। কানাই চলে গেছে। আবদুলও খাওয়া-দাওয়া সেরে নিজের ঘরে গিয়ে ঘিমোচ্ছে। সুহাসেরও ক'দিনের ক্লান্তির পর একটু বোধহয় একটু তন্দ্রা এসেছিল। হঠাৎ কাজলের গলার শব্দে তন্দ্রা ভেঙে গেল—

—ওমা, তুমি? তুমি কখন এলে? তোমার তো হঠাৎ আসার কথা ছিল না? খাওয়া হয়েছে তোমার?

সুহাস বললে—হ্যাঁ—

কাজল বললে—তুমি তো জিজ্ঞেস করলে না, আমি কোথায় গিয়েছিলুম?

সুহাস বললে—সত্যি, কোথায় গিয়েছিলে এত রাত পর্যন্ত?

—বলো তো কোথায়?

সুহাস বললে—তোমার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে বুঝি? সত্যি, একলা-একলা তোমার বাড়িতে থাকতেই বা ভালো লাগবে কেন? ভালোই করেছ একটু বেড়িয়ে এসেছো—

তারপর কানাই মাঝ-রাত্রে ঘুম ভেঙে উঠে একবার দেখেছে তখনও আলো জ্বলছে বাবুর ঘরে। বাবু আর মা দুজনের কথা শোনা যাচ্ছে বাইরে থেকে। জানালার পাশে গিয়ে শুনেছে কানাই বাবু আর মা দুজনে যেন ঝগড়া করছে। কথাগুলো বেশ জোরে জোরে বলছে দুজনে। তারপর আবার কানাই শুতে গেছে।

কিন্তু সকাল বেলা আর কিছু বোঝা যায় না। আবার দু'জনের বেশ হাসি-হাসি মুখ। আবার দু'জনে এক-সঙ্গে চা খেতে বসেছে ব্যালকনিতে।

এই বাড়িতেই একদিন হঠাৎ উৎসবের আনন্দ মুখর হয়ে উঠলো। বেশ রীতিমত জোরদার উৎসব। বর এল বরযাত্রী এল। সানাইও বেজেছিল। আবদুল সেদিন বেশ মোগলাই সাজে সেজেছিল। কানাইও তাই। বিবিও নতুন সাড়ি পেয়েছিল।

প্রথমে কিছুই জানতো না কানাই।

মা বলেছিল—কানাই, বিয়ে হবে বীণা-দিদিমণির, জানিস তো? খাটা-খাটুনি করতে হবে তোকে, পারবি তো তুই? অনেক লোক-জন খাবে, অনেক বরযাত্রী আসবে—

আগে সেই সাহেব পাড়ায় কখনও এমন করে দিশী বিয়ে হয়নি। মটর-গাড়িটা ফুল দিয়ে সাজিয়ে তার ভেতরে বর এসেছিল। ব্ল্যাক আউটের জন্যে আলোর বাহার হয়নি বেশি। চারদিক ঢাকা সুহাসের নিজের অনেক বন্ধু-বান্ধব এসেছিল নেমতন্ন খেতে। পরিবেশন করতে করতে হিম্-শিম্ খেয়ে গিয়েছিল কানাই। আর কানাই তো একলা নয়। আরো অনেক ভাড়া করা লোক এসেছিল। শানাই-এর শব্দে গম্-গম্ করছে তখন সমস্ত সাহেব-পাড়াটা।

তখন সরোজ এসে পৌঁছোয়নি। সরোজ নিজে বর, সরোজের সঙ্গেই বরযাত্রীর দল আসবার কথা।

কাজলের শোবার ঘরে মাথার ওপরে পাখা ঘুরছে। তারই নিচে বসে কাজল নিজের হাতে সাজিয়ে দিয়েছিল বীণাকে। জরির ফিতে দিয়ে বীণার মাথায় বেণীটা জড়িয়ে দিয়েছিল। কুমকুমের টিপ্ পরিয়ে দিয়েছিল কপালে। মুখে পাউডার-স্নো-লাগিয়ে দিয়েছিল।
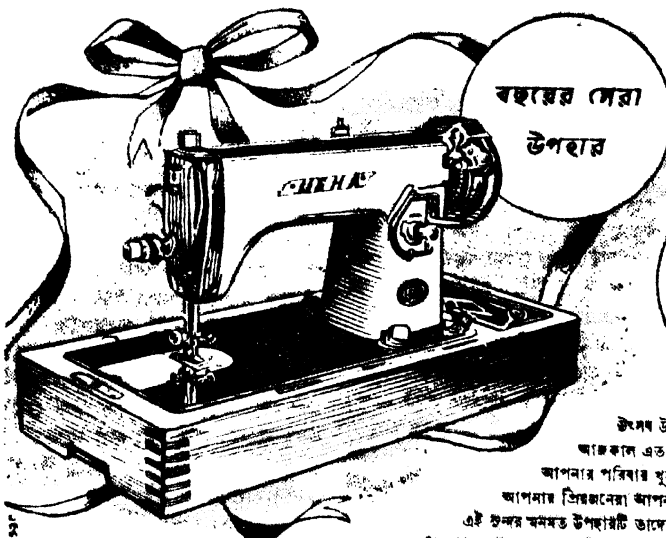
কাজল বলেছিল—এবার তোকে চমৎকার দেখাচ্ছে ভাই—

বীণা চুপি চুপি বলেছিল—আমার বড় ভয় করছে কাজলদি—

—ও-সব কথা মোটে আর ভাবিসনি!

বীণার তবু ভয় যায়নি। যত ঘামছিল, তত থর থর করে কাঁপছিল। একটা অপ্রকাশ্য আতঙ্কে সমস্ত শরীরটা মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছিল। যদি জানতে পারে। যদি সে...

কাজল বলেছিল—তুই কিছু ভাবিস নি। সমস্ত দায়িত্ব আমার, আমার ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে দিবি। যদি কিছু বলে তো বলবি, কাজলদি সব করেছে—

—কিন্তু তুমি তো জানো কাজলদি, আমার কোন দোষ নেই, আমি তো সুখী হতেই চেয়েছিলুম! আমি তো সব অপমান নিজের মাথাতেই তুলে নিতে চেয়েছিলুম। তবু কেন সে এমন করলে?

কাজল বীণার চোখ মুছিয়ে দিয়েছিল নিজের শাড়ির আঁচল দিয়ে। বলেছিল—ছিঃ, আজকের দিনে অমন কথা বলতে নেই অমন কথা মনে আনাও পাপ—

বীণা বলেছিল—কিন্তু কাজলদি, সত্যি বলো তো তুমি আমার কোনও দোষ ছিল?

কাজল বলেছিল—আবার ওই সব হচ্ছিস্? সরোজ যদি শোনে, কী ভাববে বল্ তো?

বীণা বলেছিল—আমিও তো তাই ভাবি কাজলদি, সরোজ যদি জানতে পারে এ-সব, কী ভাববে সে?

—খবরদার যেন এ-সব কথা বলিসনি তুই!

—আমি তো বলবো না, কিন্তু যদি কখনো জানতে পারে?

তারপর ঘরের মধ্যে অনেক লোক-জন ঢুকে পড়েছিল, আর কিছু কথা হয়নি। আর কোনও কথা হবার সুযোগ হয়নি। তখন সরোজ এসে গেছে। চার-দিকে বরযাত্রীর ভিড়। বরকে বসাবার জন্যে সুহাস বাগানের মধ্যে ভালো ব্যবস্থাই করেছিল। একটা বিরাট সিংহাসন। সিংহাসনের উপর ভেলভেটের চাদর। পেছনে টবের ওপর কয়েকটা পাম। সামনের ফুলদানিতে ফুলের ঝাড় আর সুধু তাই-ই বরযাত্রীদের প্রত্যেকের জন্যে একটা করে বেলফুলের গোড়ে মালা। গোলাপফুল আর গোলাপ জলের ছড়াছড়ি। চৌরঙ্গীর হোটেল থেকে খাবারের কনট্র্যাক্ট দিয়ে আনিয়ে-ছিল মিষ্টি।

বীণা বলেছিল—আমার জন্যে এত খরচ করতে গেলে কেন কাজলদি?

কাজল বলেছিল—ও-সব আমার জন্যে নয় ভাই, তোর জামাইবাবুর সখ্।

সত্যিই, সুহাসই নিজের ঘাড়ে সমস্ত খরচটা নিয়েছিল। গার্লিকে সাহেবের কাছ থেকে ছুটি নিয়েছিল পনেরো দিনের। অনেকের বাড়িতে অনেক রকম উৎসবেই খেয়ে আসে সুহাস। এতদিনে এই উপলক্ষ্যে সকলকে নিজের বাড়িতে ডেকে খাওয়ানো ভালো! সবাই জিজ্ঞেস করেছিল—উপলক্ষ্যটা কীসের?

সুহাস বলেছিল—উপলক্ষ্যটা একটা বিয়ে?

সবাই জিজ্ঞেস করেছিল—আপনার আবার কার বিয়ে মিস্টার মুখার্জি! আপনার তো ছেলে-মেয়ে কেউ নেই। ভাইবোনও নেই শুনেছি—

সুহাস বলেছিল—আমার স্ত্রীর এক বন্ধুর বিয়ে—

স্ত্রীর বন্ধুর বিয়ে! তা জিনিষটা এমন কিছু অস্বাভাবিকও নয়। আজ-কাল এ-রকম হয়েই থাকে। স্ত্রীর বন্ধুর আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই, তাই সব বন্দোবস্তটা মিসেস মুখার্জিকেই করতে হচ্ছে।

কিন্তু আসল প্রশ্নটা তা-ও নয়। সরোজ আসলে সুহাসেরই ছোট বয়সের বন্ধু! সরোজ সান্যাল স্কুলে একসঙ্গে পড়ছে। সে-ও ছিল পি-সি-রায়ের ছাত্র। কবে মফঃস্বলে ডিউটি করতে গিয়ে দেখা হয়ে গিয়েছিল। সেখানেই বারো তেরো বছর পরে দেখা। সুহাসকে দেখেই চিনতে পেরেছিল কিন্তু।

বলেছিল—তুমি?

সুহাসও বলেছিল—তুমি?

দুই বন্ধুতে বহুদিন পরে দেখা। তারপরে ফেরবার সময় কলকাতার বাড়িতে নেমন্তন্ন করে এসেছিল সুহাস। সেই সূত্র ধরে একদিন সরোজ কলকাতার বাড়িতে এসেছিল। এসে দু'জনে অনেক গল্প হয়েছিল ছোট বেলার। কোথাকার আদর্শ কেমন করে সব বদলে যায়, তারই কাহিনী দু'বন্ধুর আর শেষ হতে চায় না।

কাজল বলেছিল—আপনি বিয়ে করেন নি কেন মিস্টার সান্যাল?

সরোজ বলেছিল—হয়ে ওঠেনি আর কি?

কাজল বলেছিল—এইবার একটা বিয়ে করে ফেলুন—

সরোজ হাসতে হাসতে বলেছিল—বিয়ে করলেই তো হলো না মিসেস মুখার্জি, মেয়ে কোথায়?

কাজল বলেছিল—মেয়ের অভাব? বলছেন কী? খুব ভালো মেয়ে আছে বিয়ে করবেন?

সরোজ বলেছিল—আপনি যদি রেকমেন্ড্ করেন, নিশ্চয়ই করবো—

তারপর সবই সহজ হয়ে গিয়েছিল। বীণাকে এনে দেখিয়ে দিয়েছিল কাজল। ব্যাপারটা বীণা আগে শোনেনি। এসেছিল যথারীতি বেড়াতে। আর সেই থেকেই সূত্রপাত।

সুহাস বলেছিল—মিসেস মুখার্জির একেবারে ছোটবেলার বন্ধু, এক সঙ্গে একই স্কুলে চাকরি করতো—কে জানে কেন, মিস্টার সান্যালের সেই প্রথম দিনেই পছন্দ হয়ে গেল।

কাজল বলেছিল—আমি দায়িত্ব নিচ্ছি আপনার মিস্টার সান্যাল, আমরা একসঙ্গে এক ঘরে এক ছাদের তলায় বহুদিন কাটিয়েছি, আমি বলছি আপনারা সুখী হবেন—বীণা সুখী হলে আমিও সুখী হবো—

কোথায় কে ছিল আচারিয়া, কোথায় ইউ-কে, সিঙ্গাপুর, পেনাঙ, আর বার্মা ঘুরে বেড়াবে, তা নয় সরোজ সান্যালের সঙ্গে মফঃস্বলে মফঃস্বলে ঘুরে বেড়ান। সরোজ এসেছিল বেড়াতে, এক-বারে বউ নিয়ে ফিরে গেল। আর বদলির চাকরী যখন, তখন চিরকালই যে মফঃস্বলে থাকতে হবে তার কোনও মানে নেই। আবার হয়ত ঘটনা-চক্রে সুহাসের মত কলকাতাতেও চলে আসতে পারে। তখন আবার দুই-বন্ধুতে ঘন-ঘন দেখাও হবে, আবার দু'জনে ঘরের ভেতর পাশাপাশি বসে গল্প করতেও পারবে।

কাজলও তাই বলেছিল—তুই ভাবিসনি কিছু, দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে—জীবনে সবই সহ্য হয়ে যায়—

—কিন্তু কাজলদি, দেখো, কিছু যেন জানাজানি না হয়ে যায়?

কাজল সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল—খবরদার যেন সরোজকে তুই কিছু বলিস্ নি এ-সম্বন্ধে—

বীণা বলেছিল—না কাজলদি, আমি কেন বলতে যাবো মিছিমিছি—

—না, ভালবেসে ফেললে তখন তো আর কারো মতির ঠিক থাকে না!

বীণার বিয়ের সময়েও রেবাদি, কণকাদি, মলিনাদি এসেছিল। তারাও খাওয়া-দাওয়ার পর বাড়ি যাবার আগে কাজলের কাছে এসে বলেছিল—আসি ভাই তাহলে?

কাজল বলেছিল—তোমাদের পেটভরে খাওয়া হয়েছে তো রেবাদি, আমি তো কিছুই দেখতে পারলাম না—

রেবাদি বলেছিল—তুমি যা করলে ভাই এ কোনও মেয়ের জন্যে কোনও মেয়ে করে না—

সত্যিই সবাই অবাক হয়ে গেছে। নইলে কী আর এমন সম্পর্ক। সামান্য কটা বছরের মাত্র আলাপ। এক ঘরে এক ছাদের তলায় একসঙ্গে কয়েকটা বছর কাটিয়েছে। একসঙ্গে কলকাতার রাস্তায় ঘুরে ঘুরে দুজনের সুখ-দুঃখের আলোচনা করেছে। শো-কেসের সামনে দাঁড়িয়ে দুজনেই শাড়ি আর ব্লাউজের দাম নিয়ে হা-হুতাশ করেছে। সেই দুজনেই আবার সেই শাড়ি কিনে পরেছে, সেই ব্লাউজ কিনে গায়ে দিয়েছে।

কলকাতা চলে যাবার দিন বীণা আনন্দে একেবারে কেঁদে ফেলেছিল। কাঁদতে কাঁদতে একেবারে কাজলকে জড়িয়ে ধরেছিল। বলেছিল—তুমি আমার জন্যে যা করলে কাজলদি, তা পৃথিবীতে কেউ কারোর জন্যে করে না—

কাজল মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলেছিল—বেনারসীটা তোর পছন্দ হয়েছে রে?

বীণা বলেছিলো—তোমার সব মনে ছিল কাজলদি?

—মনে থাকবে না? একদিন এই শাড়ি কেনবার জন্যে তোর কত লোভ হয়েছিল মনে আছে? আমি সুহাসকে বলে তাই এই শাড়িই কিনে আনালাম—

যা-যা বীণা ভালবাসতো তাই-ই কাজল দিয়েছিল বীণার বিয়েতে। কাজলের নিজের বিয়ে যখন হয়েছিল তখন কারোরই টাকা ছিল না। না কাজলের না সুহাসের। তাই কোনও উৎসবই হয়নি বলতে গেলে। এমন করে লোক খাওয়ানো হয়নি, এমন করে বর সেজেও আসেনি সুহাস, এমন করে কনে সেজে বেনারসীও পরেনি কাজল। বীণার বিয়েতে কাজলেরই যেন নতুন করে বিয়ে হলো। নতুন করে বিয়ে করে স্বামীর সঙ্গে মফঃস্বলে চলে গেল।

কানাইয়ের মনে আছে সেইদিনের কথা। বীণা দিদিমণি তারপর থেকে আর আসতো না। কিন্তু সে-বাড়িতে আরো অন্য লোকের আনাগোনা চলতে লাগলো। কত বন্ধু, বাবুর বন্ধু, মা'র বন্ধু আসতো। এলেই আবদুলকে চা করতে হতো, খাবার করতে হতো। আসলে কানাই-এর চা-ই মা বেশি পছন্দ করতো।

মা বলতো—এ চা কে করেছে রে কানাই? তুই, না আবদুল?

কানাই বলতো—আমি মা—

—বাঃ, তুই তো বেশ চা করতে শিখেছিস? এবার থেকে তুই-ই আমার চা করবি—

তারপর থেকে মা কেবল কানাই-এর হাতেই চা খেত। বলতো—তুই ভাত রুটি তরকারী করাটা শিখে নে, এবার থেকে তোর রান্নাই খাবো—

সত্যি, তখন থেকে আবদুল রাঁধতো বিলিতি রান্নাগুলো। আবদুল চপ করতে পারতো, কাটলেট করতে পারতো, কোর্মা কালিয়া করতে পারতো। বাইরে থেকে সাহেব মেমরা এলে আবদুলই তাদের খাবার তৈরি করে খাওয়াতো। একসঙ্গে দশ-বারোজনের রান্না করে খাওয়াতে পারতো আবদুল। আবদুল জানতো হাজার রকম রান্না। এককালে আবদুলের বাবা ছিল কোন্ হোটেলের হেড কুক। তার বাবার কাছে থেকেই এসব শিখেছিল সে। কানাই জীবনে কখনও ভাত-ডাল ছাড়া রাঁধেনি কিছু। কিন্তু তবু দেখে দেখে হাত পুড়িয়ে পুড়িয়ে যে-সব রান্না শিখেছিল তারই তারিফ পেয়েছিল। এই শুক্তুনি, ঘণ্ট, ডালনা—এ-সব খেয়ে মা প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ। বাবুকে বলতো—দেখো, কানাই-এর রান্না খেয়ে দেখো—

বাবু বলতো—সত্যিই তো, এবার থেকে কানাই-ই রাঁধুক—

তা রান্নাঘরের কাজ নিয়ে থাকলে তো কানাই-এর চলতো না। অত বড় বাড়ি, অত ঘর। বিবি তো কেবল দিনরাত পটের বিবি সেজে মা'র পাশে পাশে ঘুরতো। আর আবদুল? আবদুল তো রান্না ছাড়া জানতোই না কিছু। বাকী যা কিছু কাজ তো সব কানাইকেই করতে হতো! সেই অতগুলো ঘর, ঝাঁট দেয় কে? বাগানে না-হয় মালী আছে, কিন্তু সে কাজ করছে কিনা তা কে দেখে? সারা বাড়িটাতে এতগুলো লোক, তারা কে কেমন কাজ করছে তা-ও তো দেখা দরকার! কানাই ছাড়া সে-সব আর কে দেখবে?

তারপরে বাবুর কাজ কী কিছু কম? বাবু বাড়িতে থাকুক, আর না-থাকুক, বাবুর কাজ তো করতেই হবে। বাবুর জামা-কাপড় কোট-প্যান্ট তার হিসেব রাখাই তো একটা মস্ত কাজ। বাবু তো বাড়ি এসেই বলবে—কানাই এটা দে, কানাই ওটা দে! তখন যদি হাতের সামনে হাজির করতে না পারে তো তখন কে দায়ী হবে?

মা বলতো—বাবুর সব জিনিষ-পত্তোর ঠিক আছে তো কানাই?

কানাই বলতো—আমাকে আর তা বলতে হবে না মা, আমার কাজে খুঁত পাবেন না আপনি—

মা বলতো—দেখো কানাই, শেষে যেন আবার বকাবকি না-শুনতে হয়—

মা বলতো—বাবুর বন্দুক, রিভলবার, গুলীর বাক্স? চাবি বন্ধ আছে তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ মা, সে-চাবি আপনাকে তো আমি দিয়েছি, আপনি যে আমার হাত থেকে নিলেন আজ্ঞে—

ওটি কানাই-এর কাছ থেকে পাবে না। কেউ যে বলবে কানাই-এর সব ভাল, কিন্তু কাজে বড় গাফিলতি, সেটি হবে না। বাবু যেই বাড়ি থেকে বেরোবেন, কানাই আগে বন্দুক-রিভলবারের বাক্সটিতে চাবি বন্ধ করে মা'র হাতে দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত। বাবুর ছাড়া জামা-কাপড় সব ধোপার বাড়িতে দিয়ে তবে কানাই বসবে, তার আগে নয়। বাবু চাইতে-না-চাইতে হাতের কাছে জিনিষ পেয়ে যাবে, তাকেই তো বলে চাকর।

মা বলে—হ্যাঁ রে কানাই, আমার কোনও চিঠি আছে?

বীণা দিদিমণির বিয়ে হয়ে চলে যাবার পর থেকেই চিঠির জন্যে বসে থাকতো মা। আর চিঠি পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে দৌড়ে দিয়ে আসতো মা'কে। চিঠিটা পেয়েই মা উঠে বসতো।

কানাই জিজ্ঞেস করতো—কা'র চিঠি মা?

চিঠি পড়তে মা তখন ব্যস্ত। বলতো—তোর অত খবরে দরকার কী বল্ তো? তুই কাজ করগে যা—

বীণার চিঠি পেলেই কাজল খুলে পড়তো মন দিয়ে।

বীণা লিখতো—

কাজলদি,

তোমার চিঠি পেয়ে যে কী খুশী হলুম, তা লিখে জানাতে পারবো না। তুমি আমার জন্যে যা করেছ, তা নিজের মায়ের পেটের বোনও কখনও করে না। জীবনে যদি কোনও দিন কারো কাছে নিজের জীবন ফিরে পাওয়ার জন্যে কৃতজ্ঞ থাকতে হয় তো সে একলা তুমি কাজলদি আর কেউ নয়। তুমি শুনে বোধহয় সুখী হবে যে সরোজ শিল্প

বদলি হয়ে কলকাতাতে যাচ্ছে—গেলে তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে রোজ—ইতি—

এমনি একখানা চিঠি নয়। এক-একদিন দু'টো চিঠি এসে হাজির হয়।

চিঠিগুলো পড়ে টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দেয় কাজল। তারপর কাগজের টুকরোগুলো গুলী পাকিয়ে আবদুলকে দেয় উনুনে পোড়াবার জন্যে।

আবদুল বলে—এগুলো সবই উনুনে দেব মাইজী?

কাজল বলে—হ্যাঁ, একটাও যেন বাইরে পড়ে না থাকে—

সুহাস এসে বলে—কই, তোমার সেই উপন্যাসটা কতদূর হলো? শেষ হয়ে গেছে?

কাজল লজ্জায় পড়ে. বলে—ও কিছু না, সময় কাটে না, তাই লিখতুম—

সুহাস তবু উৎসাহ দেয়। বলে—লেখো না, শেষকালে হয়ত লিখতে লিখতে লেখিকা হয়ে উঠতে পারো—

কাজল হাসে। বলে—লেখিকা হয়ে আমার লাভ কি! পুলিশের বউ হয়ে আমার তার চেয়ে অনেক লাভ হয়েছে?

সুহাস বিগলিত হয়ে যায়। বলে—সত্যি বলছো লাভ হয়েছে?

বলে আরো ঘনিষ্ঠ হতে আসে। কিন্তু কাজল তাড়াতাড়ি ছাড়িয়ে নেয় নিজেকে। বলে ছাড়ো, ছাড়ো, কী যে করো, ওই বিবি রয়েছে ওখানে—

শেষ পর্যন্ত সরোজ বদলি হয়ে এল। বীণাও এল সঙ্গে। কিন্তু কলকাতায় নয়, করাচীতে।

সুহাস বললে—একেবারে সেই করাচীতে? অত দূরে?

কাজল চেয়ে চেয়ে দেখলে। বড় খুশী মনে হলো ওদের। আড়ালে বীণাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে—কিরে, তার মনের মত হয়েছে তো?

বীণা বললে—সত্যি কাজলদি, এর চেয়ে বেশী সুখ কাকে বলে আমি জানি না—

কাজল বললে—ওদের একদিন নেমন্তন্ন করলে কেমন হয় গো?

সুহাস বললে—তা নেমন্তন্ন করে খাইয়ে দাও না, আমারও তো সময় রয়েছে—

কাজল বললে—ওদের সঙ্গে আরো কয়েকজনকে বলো না—অনেকদিন তো কাউকেই খাওয়ানো হয়নি—

অশোকের বাড়িতেই পার্টিতে খেয়ে খেয়ে এসেছে। এবার এই সুযোগে আবার সকলকে শোধ দেওয়ার সুযোগ রয়েছে।

তা সুহাসেরই উৎসাহটা যেন বেশী. সুহাসই এক এলাহি কাণ্ড করে বসলো। বাজারের সেরা সেরা জিনিষ আনিয়ে নিলে নিজের পছন্দ মত। আবার যেন বিয়ে বাড়ি হয়ে উঠলো। লিস্ট দেখে দেখে সবাইকে নেমন্তন্ন করে এলো দু'জনে মিলে। সুহাসের বিয়েতে বলতে গেলে কিছুই হয়নি। বীণার বিয়েতে অবশ্য সবাই এসেছিল। কিন্তু গার্লিক সাহেব তখন কলকাতায় ছিল না। আসতে পারেনি।

গার্লিক সাহেব অবাক হয়ে গেল মুখার্জিকে দেখে। বললে—অকেশনটা কী?

কাজল বললে—কোনও অকেশন নয়, এমনি—

শুধু গার্লিক সাহেব নয়, মিসেস গার্লিককেও বললে কাজল। অপূর্ব স্বামী-স্ত্রী খুব হাসি-খুশী মানুষ।

গার্লিক সাহেব বললে—আমি ইন্ডিয়ান ডিশ খাবো কিন্তু মিসেস মুখার্জি—

কাজল বললে—তাহলে আমি নিজে রান্না করবো মিস্টার গার্লিক—

সত্যি নিজে রান্না করলে কাজল সারাদিন ধরে। কানাই আর নিজে। আর আবদুল রক্ষা করেছিল অন্যগুলো। বীণা আর সরোজ সকাল-সকালই এসে পড়লো। বীণা একেবারে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লো রান্নাঘরে।

—ওমা, তুমি নিজে রান্না করছো কাজলদি?

কাজল বললে—কানাই-এর হাতে সব ভার ছেড়ে দিতে সাহস হলো না ভাই—

—কিন্তু এত এলাহি কাণ্ড করতে গেলে কেন মিছিমিছি?

কাজল বললে—আমাকে বলে কি হবে, তুই ওকে বল—

সুহাসও দাঁড়িয়ে ছিল পেছনে। হাসতে লাগলো কথা শুনে। বললে—নুন খাইয়ে দিচ্ছি, নইলে সরোজ আবার আমার গুণ গাইবে না—

বীণা বললে— আপনি তো জানেন না সুহাসবাবু, রোজ সকালে আপনাদের গুণ না গেয়ে জল গ্রহণ করি না আমরা—তা জানেন?

সুহাস বললে—ওই শোন কাজল, তোমার বন্ধু কী বলছেন শোন—

কাজল বললে—ওর কথা ছেড়ে দাও, ও আমার কোনও দোষই দেখতে পায় না—

বীণা বললে—আচ্ছা বলুন তো সুহাসবাবু, কোনও দোষ থাকলে তো দেখবো? কাজলদির দোষ যে বার করতে পারবে সে এখনও জন্মায়নি পৃথিবীতে—

কাজল হাসলো। সুহাসও হেসে উঠলো। কাজল বললে—সরোজের কাছে থেকে থেকে দেখছি বীণাটা কথা শিখেছে খুব আজকাল—

সরোজও শেষ পর্যন্ত এসে পড়লো রান্নাঘরে। বললে—বাঃ বৌদি আপনি নিজেই হাতা-খুন্তি ধরেছেন?

কাজল বললে—না ধরে কি আর উপায় আছে ভাই, শেষকালে যদি তোমরা নিন্দে করো?

সরোজ বললে—নিন্দে তো করবোই, আপনারা আমাদের এত উপকার করবেন আর আমরা আপনার একটু নিন্দেও করতে পারবো না? এত অধম আমরা?

কাজল বললে—তা নিন্দে করুন, করাচীতে বসে বসে যত ইচ্ছে নিন্দে করুন, আমরা শুনতে যাচ্ছি না—

বীণা বললে—সত্যি কাজলদি, কত আশা করেছিলুম কলকাতায় থাকতে পারবো, তা না কোথায় ঠেলে পাঠিয়ে দিলে সাত সমুদ্র তের নদী পারে—

কাজল বললে—ভালোই তো, তবু একটা বেড়াবার জায়গা হলো, নেমন্তন্ন করলেই চলে যাবো, তখন আমাকে নিজের হাতে রান্না করে খাইয়ে দিস—

সত্যি তুমি যাবে কাজলদি? সত্যি বলছো, যাবে?

কাজল বললে—তা যাবো না কেন? কিন্তু আমাকে একলা নেমন্তন্ন করলে চলবে না, ওকেও নেমন্তন্ন করতে হবে, দু'জনে গিয়ে একসঙ্গে তোদের অন্ন-ধ্বংস করে আসবো—

রাত্রে সবাই এসে হাজির হলো একে-একে। মিস্টার হাচিন্স, মিসেস হাচিন্স। সুহাসের অন্য দু'চারজন বন্ধু-বান্ধব সস্ত্রীক। শেষকালে এলেন মিস্টার আর মিসেস গার্লিক।

মিঃ গার্লিক এসেই বললেন—কই মিসেস মুখার্জি, আপনার ইন্ডিয়ান ডিশ রেডি তো!

আর এসে হাজির হলো মিস্টার আচারিয়া। মিস্টার আচারিয়া আসতেই কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠলো বীণা। কিন্তু কাজল এক মুহূর্তেই সমস্ত অবস্থাটা সামলে নিয়েছে।

—কাজল এগিয়ে গেল। হাসতে হাসতে সাদর অভ্যর্থনা করে বললে—আসুন, আসুন মিস্টার আচারিয়া—

মিস্টার আচারিয়াও অপ্রস্তুত হবার লোক নয়। বললে—আমার একটু দেরি হয়ে গেল মিসেস মুখার্জি।

সকলের সংগে পরিচয় করিয়ে দিলে কাজলই। সুহাস চিনতো না। হ্যান্ড শেক করলে মিস্টার আচারিয়ার সংগে।

কাজল বললে—আমার বন্ধু মিস্টার আচারিয়া—

আচারিয়া নিজেই নিজের যোগ্যতার পরিচয় সূত্রটা ধরিয়ে দিলে—আমি হচ্ছি ম্যাকলাউড কোম্পানীর ইন্টার ন্যাশন্যাল কমিশন এজেন্ট—

—আর ইনিই মিস্টার মুখার্জি—আজকের হোস্ট্—

—খুব আনন্দ হলো আপনার সংগে পরিচয় হয়ে মিস্টার মুখার্জি!

শুধু মিস্টার মুখার্জি নয়, একে একে সকলের সংগেই সকলের পরিচয় হয়ে গেল। সরোজের কাছে এসে কাজল বললে—ইনি মিস্টার সান্যাল—করাচীতে ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছেন কালকেই—

আর ইনি মিসেস সান্যাল—

বীণা হাতটা বাড়িয়ে দিলে। বোধহয় থর থর কাঁপছিল বীণার হাতটা। মিস্টার আচারিয়া বীণার হাতটা নিলে। সেটাকে শক্ত করে ধরে একটা ঝাঁকুনি দিলে আচারিয়া। কাজল বীণার দিকে চেয়ে সাহস দিচ্ছিল। তবু হ্যাণ্ড শেক্ করবার পরেই যেন বীণার শরীরটা অবশ হয়ে এল ক্লান্তিতে।

আচারিয়া বললে—আপনি অসুস্থ নাকি মিসেস সানিয়াল?

বীণা সে-কথার উত্তরই দিতে পারলে না মুখ ফুটে।

সরোজ জিজ্ঞেস করলে—কী হলো তোমার? অমন করছো কেন তুমি? কী-রকম যেন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে।

—কই না তো! বলে বীণা রুমাল দিয়ে মুখটা মোছবার ভাণ করলে।

হয়ত বীণার দিকেই সকলের দৃষ্টি পড়তো, কিন্তু মিস্টার গার্লিক তখন জমিয়ে তুলেছেন আসর। বিলেতের কোথায় কোন সহরে একবার কোন্ ইণ্ডিয়ান ডিশ খেয়েছিলেন, তারই বর্ণনা দিচ্ছিলেন। মিস্টার গার্লিক পুলিশের বড় কর্তা হলে কী হবে, অমায়িকতায় তাঁর জুড়ী নেই।

মিস্টার হাচিন্সও যোগ দিলেন। যে-যে ছিল সবাই যোগ দিলে আলোচনায়। জমে উঠলো আসর এক মিনিটেই। আচারিয়াও গল্প জমাতে বেশ পটু। আচারিয়া পেনাঙ-এ গিয়ে কী খেয়েছিলেন তার বর্ণনা দিলে। খেতে-খেতে হাসতে-হাসতে সরগরম হয়ে উঠলো সন্ধ্যেটা।

এক ফাঁকে বীণা উঠে গিয়ে পাশের ঘরে কাজলকে ধরেছে—কাজলদি, ওকে কেন তুমি নেমতন্ন করলে ভাই; ওই হতভাগাটাকে?

কাজল বললে—ওমা, আমি কেন নেমন্তন্ন করতে যাবো? ও তো এমনিই এসেছে—

—তা ওকে ঢুকতে দিলে কেন? তাড়িয়ে দিতে পারছো না?

কাজল বললে—অত জোরে কথা বলিসনি, শুনতে পাবে কেউ—

—কিন্তু তুমি জানো না কাজলদি, আমার কী অবস্থা, আমি বোধহয় তখুনি অজ্ঞান হয়ে যেতাম—

কাজল বললে—ছি, ছি, তুই চোখ মুছে ফেল্—

বলে নিজেই নিজের রুমাল দিয়ে বীণার চোখ দুটো মুছিয়ে দিলে। বললে—যা, ওঘরে যা, সবাই বসে আছে, তুই এতক্ষণ এ-ঘরে থাকলে সন্দেহ করবে কিছু আর সরোজের কথাটাও ভাব দিকিনি একবার ও যদি জানতে পারে, তাহলে কী সর্বনাশটা হবে বল দিকিনি?

বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আবার কাজল পাঠিয়ে দিলে পাশের ঘরে।

গার্লিক সাহেব তখন একমনে গল্প বলে যাচ্ছেন। সবাই তাই শুনতেই ব্যস্ত। কেউ আর লক্ষ্য করলে না কিছু।

তারপর যখন আরো রাত বাড়লো তখন একে একে চলে গেল সবাই। কাজলের হাতের ইণ্ডিয়ান ডিশ্ খেয়ে তারিফ করলেন খুব মিস্টার গার্লিক। যাবার সময় বললেন—এবারেই যেন শেষ না-হয় মিসেস মুখার্জি, আমি ভোজন-রসিক লোক, আমি আবার খেতে আসবো আপনার হাতের রান্না ইণ্ডিয়ান ডিশ্—

কিন্তু মিস্টার গার্লিক তো জানতেন না, কাজলের হাতের রান্না খাওয়ার সুযোগ তাঁর জীবনে আর আসবে না। শুধু মিস্টার গার্লিক কেন, সুহাসও জানতো না। বীণাও জানতো না, সরোজও জানতো না। এমন কি কাজল নিজেও তা জানতো না। জানতো বোধহয় কেবল সুহাস আর কাজলের ভাগ্য-বিধাতা।

অনেক রাত্রে যখন সবাই চলে গেল, তখনও রইল মিস্টার সান্যাল আর মিসেস সান্যাল। আর রইল মিস্টার আচারিয়া। আচারিয়া উঠতেই চায় না, গল্প তার আর ফুরোয়ই না। ইউ. কে. সিঙ্গাপুর, পেনাঙ, জাভা আর বার্মার গল্প।

সরোজের খুব ভালো লাগলো মিস্টার আচারিয়াকে।

বললে—আপনি আসবেন মিস্টার আচারিয়া: যে ক'দিন আছি, বেশ আনন্দ করা যাবে—

নিজের ঠিকানাও দিলে সরোজ। বললে—আমার ওখানেও একদিন আসুন—

আচারিয়া বললে—আমি নিশ্চয়ই যাবো মিস্টার সানিয়াল আপনার বাড়িতে, নিশ্চয়ই যাবো—

সরোজ বললে—আমি শিগ্‌গির চলে যাচ্ছি করাচিতে, তার আগেই আসুন—

কাজল কথা ঘুরিয়ে দেবার অনেক চেষ্টা করলে। কিন্তু মনে হলো সরোজের যেন বড় ভাল লেগেছে আচারিয়াকে। আর সরোজ যত আসতে বলছে আচারিয়াকে, বীণা তত কাঠ হয়ে উঠছে আতঙ্কে।

শেষ পর্যন্ত কাজলই জোর করে সরোজ আর বীণাকে উঠিয়ে দিলে। বললে—যাও তোমাদের রাত হচ্ছে—

একেবারে শেষকালে গেল আচারিয়া। যেন যাবার ইচ্ছে ছিল না তার। যেন অনেক কথা বলবার ছিল তার মিসেস মুখার্জিকে। কিন্তু সুহাসের সামনে সব কথা বলা যেন তার ইচ্ছে নয়।

অন্ধকার ব্ল্যাক-আউটের মধ্যে আচারিয়ার চেহারাটা যখন মিলিয়ে গেল, যখন গেট বন্ধ করার শব্দ হলো, তখন যেন নিশ্চিন্ত হলো কাজল।

সুহাস জিজ্ঞেস করলে—ও আচারিয়া কে? আগে তো দেখিনি?

কাজল বললে—ও আমার পুরোন এক বন্ধু—বহুদিন আগের—

আর কিছু কথা হলো না সেদিন!

সে-সব দিনের কথা কানাই-এর মনে আছে। বীণা-দিদিমণিরা চলে গেল একদিন। যাবার দিন সান্যাল সাহেব এসেছিল, বীণা-দিদিমণিও এসেছিল। বাবু সেদিন বাড়ি ছিল না। ডিউটিতে বেরিয়ে গিয়েছিল। কানাই বিকেল বেলা ঘর পরিষ্কার করেছে। বাবুর বন্দুকের বাক্সে চাবি বন্ধ করে চাবিটা মা'র হাতে দিয়েছে। তারপর বাবুর ছাড়া জামা-কাপড়গুলো ধোপার বাড়ি দিয়ে এসেছে। টেবিল-চেয়ার আলমারি জানালা দরজা ঝাড়া-মোছা করেছে। বিবি তখন মার চুল বেঁধে দিচ্ছে। চুল বাঁধার পর মা কলঘরে গেল। কলঘর থেকে বেরোলে বিবি পাটভাঙা সাড়ি ব্লাউজ বার করে দেবে। মা সেইসব পরে চা খাবে টেবিলে বসে বসে। তখন হয়ত বাইরের বাগানে এসে একটু বেড়াবে, ফুল গাছের চারাগুলো কেমন গজাচ্ছে দেখবে। তারপর খানিকক্ষণ বেড়ানোর পর গাড়ি-বারান্দার তলায় টেবিলের সামনে বসবে। বিবি আলো জেলে দেবে। সেখানে বসে কাগজ

কলম নিয়ে কী সব লিখবে পাতার পর পাতা।

এমনি করেই সাধারণতঃ মা'র দিনগুলো কাটতো। তারপর বীণা-দিদিমণি চলে যাবার পর আর কেউ বড় একটা আসতো না। কখনো সখনো একজন-দুজন এলে চা করতে হতো কানাইকে।

কিন্তু সেদিন সন্ধ্যেবেলা একজন ভদ্রলোক এলো।

লোকটাকে আগে দেখেছিল কানাই একদিন। মনে হলো যেন সেই লোকটাই। সেই লম্বা চেহারা। লম্বা-লম্বা কোট-প্যান্ট্। এসেই একেবারে সোজা বাগানে ঢুকেছে।

কানাই এগিয়ে গেল। বললে— কাকে চাই?

ভদ্রলোক বললে—মিসেস মুখার্জিকে।

—কী নাম বলবো?

—বলো মিস্টার আচারিয়া।

তাড়াতাড়ি মাকে গিয়ে খবর দিতেই মা বললে—এখানে বাবুকে নিয়ে আয়—

মিস্টার আচারিয়া আসতেই মা বললে—আসুন মিস্টার আচারিয়া—

মিস্টার আচারিয়া বললে— আপনি আমায় দেখে অবাক হয়ে গেছেন তো?—

—না না অবাক হয়ে যাবো কেন? আসুন, বসুন এখানে। কী খবর বলুন—

তারপর মা কানাইকে চা করতে বলে আবার গল্প করতে আরম্ভ করেছে। যখন কানাই চা আর বিস্কুট এনে দিলে তখন দেখলে বেশ জোরে জোরে কথা হচ্ছে দুজনে। কানাই কাছে আসতেই গলার শব্দ একটু নামলো।

চা দিয়ে কানাই চলে গিয়েছিল বাইরে। বাইরে থেকেও দুজনের অনেক কথা হচ্ছিল। কী-সব কথা; কিছুই বুঝতে পারেনি। মাঝে মাঝে হাসির শব্দও হচ্ছিল। মা আর আচারিয়া সাহেব কথা বলতে বলতে খুব হাসছিল। তারপর আবার একবার কানাইকে ডাকলে মা। কানাই যেতেই মা বললে—আর এক কাপ চা কর তো কানাই—

আবার চা করে দিয়ে এল ঘরে। আবার গল্প হতে লাগলো দুজনে।

রাত সাতটা বাজলো। আটটা বাজলো। তখনও গল্প ফুরোয় না দুজনের।

তারপর রাত ন'টার সময় মা ড্রাইভারকে গাড়ি বার করতে বললে। গাড়ি বেরোতে আচারিয়া সাহেব আর মা দুজনে গিয়ে উঠলো তাতে। তারপর গাড়ি চলে যেতেই দারোয়ান গেট বন্ধ করে দিয়েছিল।

এমনি পর-পর দু'তিন দিন চললো। বেরিয়ে যায় রাত আটটা-নটার সময়, আর আসে সেই দশটার সময়। কখনও-কখনও রাত এগারোটা বেজে যায়।

ততক্ষণ না খেয়ে বসে থাকে কানাই। না খেয়ে বসে থাকে আবদুল, বিবি সবাই। মা যখন আসে তখন মা পান খাচ্ছে। এক মুখ পান। এমনিতে মা পান খেত না। আচারিয়া সাহেবের সঙ্গে বেরুলেই পান খেত।

বাড়ি ফিরে এলেই বিবি বলতো—মা, টেবিল লাগাবো?

মা বললে—না রে, আমি খেয়ে এসেছি—তোরা এখনও খাস্ নি!

মা আবার বললে—তোরা দেখলি আমার দেরি হচ্ছে, খেয়ে নিলেই পারতিস্—

তারপর বিবি মা'র জামা-কাপড় বদলে দিয়েছে, বিছানার বেড-কভার তুলে দিয়েছে। মা শুয়ে পড়তেই মায়ের আলো নিভিয়ে দিয়ে চলে গেছে।

সেদিন সুহাস এসে গেল আবার হঠাৎ। তখন সন্ধ্যে সাতটা।

কানাই দৌড়ে গিয়ে খবরটা দিলে। বললে—মা, বাবু এসেছে—

সুহাস এসে ঘরে ঢুকলো। একেবারে সোজা মফঃস্বল থেকে। ঘরে এসে একটু অবাক হয়ে গেল। বললে—মিস্টার আচারিয়া, না?

আচারিয়া উঠে দাঁড়াল। সবিনয়ে নমস্কার করে বললে—নমস্কার মিস্টার মুখার্জি—

—কতক্ষণ এসেছেন?

—এই তো আপনি আসার আধ ঘণ্টা আগে!

কাজল বললে—তুমি তৈরি হয়ে নাও; তাড়াতাড়ি, একসঙ্গে চা খাবো।

তারপর কানাইকে ডেকে গরম জল দিতে বললে। শুধু গরম জল নয়, বাবু এলেই কানাই-এর অনেক কাজ থাকে। সুটকেস, বিছানা সব গোছাতে হয়। বাবুর সঙ্গে যে-বন্দুকটা থাকে তা গাড়ি থেকে নিয়ে আবার বাক্সে পুরে ফেলতে হয়। বাবুর ছাড়া জামা-কাপড়গুলো ডাইং ক্লিনিং-এ দিতে আসবার জন্যে আলাদা করে রাখতে হয়। অনেক কাজ তখন কানাই-এর।

সুহাস তৈরি হয়ে এসে বসলো। বললে—এখন কোথায় আছেন মিস্টার আচারিয়া?

আচারিয়া বললে—মার্কেট খুব মিস্টার মুখার্জি, আমাদের তো জানেন ইণ্টারন্যাশনাল বিজনেস, ফরেন মার্কেট তো প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার যোগাড়!

—তাহলে কলকাতাতেই এখন থাকতে হচ্ছে? বাইরে যাওয়া বন্ধ!

আচারিয়া বললে— অটোমেটিকেলি! আমাকে তো আর ছাড়তে পারছে না কোম্পানী, মাসে মাসে মাইনে গুণে যেতে হচ্ছে! আমার কিছু লস্ নেই, কোম্পানীরই লস্—

চা এসে গেল। মিস্টার আচারিয়ার দিকে কাপ এগিয়ে দিলে কাজল। বললে —নিন্ মিস্টার আচারিয়া—

চা খেতে খেতে অনেক আজে-বাজে গল্প করতে লাগলো আচারিয়া। আগে ইউ-কে'তে কী দেখেছে, আবার এখন কী দেখেছে। আমিই লণ্ডনের মেয়েদের লম্বা ফ্রক্ পরতে দেখেছি এককালে, আবার সেই ফ্রকই আস্তে আস্তে ছোট হতে দেখলুম। হাই-হিল থেকে লো-হিল্। বুট থেকে স্লিপার। কত চেঞ্জ হচ্ছে ওয়ার্লডে। জিওগ্রাফি বদলে যাচ্ছে রাতারাতি। অত কথা কী, মানুষের মনই কত বদলে যেতে দেখলুম মিস্টার মুখার্জি। মানুষই কি কম চেঞ্জ হচ্ছে?

—অল্‌রাইট্ মিস্টার মুখার্জি, আপনি অনেকদিন পরে বাড়িতে এলেন, একটু রেস্ট্ নিন্, আমি উঠি মিসেস মুখার্জি।

আচারিয়া উঠলো। তারপর আস্তে আস্তে বাগানের ঘোরা পথ দিয়ে গেট খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল।

—কী গো, তোমার মুখ যে অত গম্ভীর-গম্ভীর?

কাজল হাসতে হাসতে পাশে সরে এল।

—কই, গম্ভীর নয় তো। হয়ত খুব টায়ার্ড, তাই—

তারপর অনেকক্ষণ চুপচাপ। সুহাস খানিক পরে বললে—ও প্রায়ই আসে বুঝি?

কাজল বললে—না তো, সেই পার্টির দিন এসেছিল আর আজকে এল!

সুহাস বললে—লোকটাকে আমার তত সুবিধের মনে হয় না—

কাজল বললে—আমারও ভাল লাগে না, কিন্তু বাড়িতে এলে তো আর তাড়িয়ে দিতে পারি না—

সুহাস শুধরে নেয়। বলে—না না, তাড়াবার কথা বলছি না, যা মনে হলো তাই বলছি—

আশ্চর্য, তখনও জানতো না সুহাস, আচারিয়া তার জীবনে শনি হয়েই এসেছিল। সুহাসের শান্তির জীবনে এক অদৃশ্য রন্ধ্র দিয়ে আত্মপ্রবেশ করেছিল!

বাবু বোধহয় দিন দশেক ছিল কলকাতায়। আবার একদিন লটবহর নিয়ে

সাঙ্গ-পাঙ্গ সমেত বেরিয়ে গেল। আবার কানাই বাবুর ছাড়া জামা-কাপড়গুলো কাচতে দিয়ে এল দোকানে। আবার বন্দুকের বাক্সে চাবি বন্ধ করে চাবিটা মা'র জিম্মায় দিয়ে এল। আবার ঘর-দোর-বিছানা সাফ্ করে রেখে দিলে। বিবি রোজকার মত সেদিনও মা'র চুল বেঁধে দিলে। মা কলঘরে গা ধুতে ঢুকলো। তারপর কলঘর থেকে বেরিয়ে মা'র পাট-ভাঙা শাড়ি-ব্লাউজ বার করে দিলে বিবি। মা সেজে-গুজে বাগানে এল। একটু এদিক-ওদিক ঘুরে-ঘুরে ফুলগাছের চারাগুলো দেখলে। তারপর কয়েকটা ফুল ছিঁড়ে নিয়ে মাথার খোপায় গুঁজলে। তারপর গাড়ি-বারান্দার তলাটায় এসে বসলো। তারপর আলো জেলে দিলে কানাই। মা কাগজ-কলম নিয়ে কী যেন লিখতে লাগলো পাতার পর পাতা।

আর সেই সময় আবার সেই কোট-প্যান্ট পরা ভদ্রলোক এলো। আচারিয়া সাহেব।

তখন আর নাম জিজ্ঞেস করতে হয় না। তখন রোজ রোজ এসে এসে চেনা-লোক হয়ে গিয়েছে। মা আচারিয়া সাহেবকে নিয়ে ঘরের ভেতরে গিয়ে বসলো। কানাইকে ডাকলে চা দিয়ে যাবার জন্যে।

কানাই-এর মনে হলো দু'জনে যেন খুব জোরে-জোরে কথা বলছে। খানিক-ক্ষণ পরে আবার হাসির শব্দও এল। কানাই চা দিতে আসতেই গলাটা যেন নিচু করলে আচারিয়া। আচারিয়াকে দেখে সেদিন ভয় করতে লাগলো কানাই-এর। আচারিয়া কি মদ খায় নাকি?

আর তারপরেই গাড়ি বার করতে বললে মা।

গাড়ি বেরোতেই দু'জনে বেরিয়ে গেল।

সেদিনও যখন ফিরে এল তখন অনেক রাত। রাত প্রায় এগারোটা। মা'র মুখে পান খাওয়ার দাগ।

—কীরে, তোরা এখনও খাসনি? আমি খেয়ে এসেছি আজ—আর খাবো না—

তারপর বিবি জামা-কাপড় এগিয়ে দিলে মা'কে। মা বললে—হ্যাঁ রে, আমার কোনও চিঠি আসেনি?

রাত্রে আবার চিঠি আসবে কী! মা'র যেন খেয়ালই ছিল না।

বললে—ও, তা তো বটেই—

বলে মা শুয়ে পড়লো। কিন্তু ভোর বেলা উঠেই আবার বললে—আমার নামে কোনও চিঠি এলেই আমার কাছে নিয়ে আসবি। দেরি করিস নি—

বাবু পরের দিন এল। কানাই এসে গাড়ি থেকে জিনিস-পত্র নামিয়ে নিলে। বন্দুকটা নিয়ে বন্দুকের বাক্সে পুরে রেখে দিয়ে এল। ছাড়া জামা-কাপড়গুলো একপাশে জড়ো করে রাখলে। কাচতে দিতে হবে। তারপর চা করে নিয়ে এল। আবদুল নতুন করে আবার রান্না চড়ালে। গরম জল করে দিলে।

দু'জনে চা খেতে লাগলো বসে বসে।

কথায় কথায় সুহাস জিজ্ঞেস করলে—সেই আচারিয়া আর এসেছিল নাকি?

—কোন্ আচারিয়া?

যেন ভুলেই গিয়েছিল কাজল। তার-পরেই হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেছে এমনি ভাব দেখিয়ে বললে—ও, সেই আচারিয়ার কথা বলছো? সে আর আসেনি। সেই তুমি যেদিন এসেছিলে সেদিন এসেছিল, তারপর আর আসেনি—

তারপর রাত্রে খেয়ে দেয়ে বাবু আর মা দু'জনে শুয়েছে। আবদুলও রান্না-বান্না সেরে খেয়ে-দেয়ে ঘুমোতে গেছে নিজের ঘরে। বিবিও ঘুমিয়েছে। কানাই মাঝ-রাত্রে একবার উঠেছিল, তখনও দেখছিল ঘরের জানালার ফাঁক দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। তখনও দু'জনের কথা শোনা যাচ্ছে—

তারপর আর জানে না কানাই। কানাই আবার গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে নিজের ঘরে।

গার্লিক সাহেব সেদিন একটা স্পেশ্যাল কাজ দিয়েছিল। কলকাতায় নয়, কলকাতা থেকে একটু দূরে চব্বিশ পরগণায় শেষ প্রান্তে। একেবারে ডায়মণ্ড-হারবারের গঙ্গার ধারে। স্পেশ্যাল স্কোয়াডের দলবল নিয়ে হানা দিতে হয়েছিল সুহাসকে। কাজ দু'দিন আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। দু'দিন আগেই কলকাতায় ফিরে গার্লিক সাহেবের বাড়িতে রিপোর্ট দিতে গিয়েছিল।

গার্লিক সাহেব ভারি খুশী। বললে—ওয়েল ডান্, চ্যাপ্—ভেরি ওয়েল ডান্—

তারপর সাহেবের পীড়াপীড়িতেই একটা হোটেলে গিয়ে উঠতে হয়েছিল।

সুহাস বলেছিল—আমি বাড়ি যাই স্যার, মিসেস মুখার্জি একলা আছেন—

—তাহলে মিসেস মুখার্জিকেও গিয়ে নিয়ে এস—

সুহাস বলেছিল—তার দরকার নেই, তারও অনেক কাজ আছে সংসারে. বাড়িতে থাকতেই মিসেস মুখার্জি বেশি ভালবাসে—

গার্লিক সাহেব বলেছিল—তুমি খুব ভালো ওয়াইফ্ পেয়েছ মুখার্জি, সী মাস্ট্ বি এ ভেরি গুড্ হ্যাসিফ—তোমার ওয়াইফের হাতের ইন্ডিয়ান ডিশ্ আমি এখনও ভুলতে পারিনি—

সারা দিনের পরিশ্রমের পর হোটেলে গিয়ে গার্লিক সাহেব একটু ড্রিঙ্ক করতে চেয়েছিল। ঠান্ডা বিয়ার কি সামান্য দু'এক পেগ হুইস্কি।

—তুমি কী নেবে মুখার্জি? বিয়ার না হুইস্কি?

এমনিতে এ-সব কিছুই খায় না সুহাস। এ-সব খাওয়া পছন্দও করে না।

—তাহলে বিয়ার খাও একটু, ঠান্ডা বিয়ার।

সাহেবের সঙ্গে বসে বসে অনেক কথা হচ্ছিল। দিল্লী থেকে কন্‌ফিডান্‌সিয়াল চিঠি এসেছে। স্কোয়াড আরো বড় করা হবে। আমি তোমাকে এস-পি করে দেব মুখার্জি, ইন্ নো টাইম্। য়্যান্টি-সোশ্যাল এলিমেন্টে দেশ ছেয়ে গেছে। সবাই ভেতরে ভেতরে প্রো-জাপানীজ্। সবাই চায় জাপান আসুক দেশে। ব্রিটিশ প্রেস্টিজ্ আপ্‌হোল্ড করবার জন্যেই আমরা চাকরি নিয়েছি। এখানে যে বাধা দিতে আসবে, তাকেই নির্মমভাবে য়্যারেস্ট করতে হবে। নিজের ভাই হলেও তাকে শাস্তি দিতে হেজিটেট করলে চলবে না। অনেক কথা শোনাচ্ছিল মিস্টার গার্লিক, আর সারা দিনের পরি-শ্রমের পর মন দিয়ে সব শুনেছিল। এক-দিন স্যার পি-সি-রায়ের ছাত্র হিসেবে দেশ-উদ্ধারের ব্রত নিয়েছিল সুহাস, আর আজ চাকরির জন্যে সেই সুহাসকেই সব উপদেশ সব বাণী হজম করতে হচ্ছিল।

—দরকার হলে তুমি তোমার নিজের আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে যেতে পারবে মুখার্জি?

সুহাস বলেছিল—আমি ঠিক বুঝতে পারছিনা, আপনি কী বলতে চাইছেন?

সাহেব বললে—ধরো জাপানীরা এল এখানে, এসে কাণ্ট্রি অকুপাই করে নিলে, তখন আমরা কয়েকজন লিমিটেড্ লয়্যাল সিটিজেনই সমস্ত শক্তি দিয়ে তার প্রতি-রোধ করবো, পারবে না?

কথাগুলি শুনছিল সুহাস মন দিয়ে। হঠাৎ নজরে পড়লো একটা অদ্ভুত জিনিস।

সুহাস বার দুই নিজের চোখ দুটো রুমাল দিয়ে মুছে নিলে। ঠিক দেখছে তো সে? ভুল দেখেনি তো!

সাহেব আবার জিজ্ঞেস করলে—কী ভাবছো? পারবে না?

কিন্তু সুহাস তখন অন্যমনস্ক। কাজলই যেন হোটেলের এক কোণে বসে-বসে কার সঙ্গে গল্প করছে। ঠিক যেন

কাজল। অনেকগুলো মানুষের মাথা পেরিয়ে অনেক দূরে ঠিক কাজলের মতই একটা রঙিন শাড়ি পরে বসে বসে কার সঙ্গে কথা বলছে। আচারিয়া না? আচারিয়ার সঙ্গে কাজল এখানে এসেছে? সামনে যেন গ্লাস রয়েছে। কয়েকটা ডিশ্‌ও আছে। কী যেন খাচ্ছে চামচ দিয়ে আর গল্প করছে মশগুল হয়ে! কিন্তু সত্যিই কি কাজল? আর সত্যিই কি লোকটা আচারিয়া?

সুহাসের সমস্ত শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল।

কেন কাজল এখানে এল? কেন আচারিয়ার সঙ্গে এই হোটেলে এসে খাচ্ছে! তবে কি প্রায়ই আসে? প্রায়ই এখানে এসে গল্প করে?

সুহাসের মনে হলো একটা সরীসৃপ যেন তার সর্বাঙ্গে কিলবিল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অদ্ভুত এক অনুভূতি তার মনের চেতনায় সঞ্চারিত হয়ে গেল এক মুহূর্তে। সে কোথায় বসে আছে, সে কেন এসেছে এখানে তাও ভুলে গেল। মনে হলো কাজল কেন এল এখানে এমন করে? কই, সুহাসের সঙ্গে তো কোনও-দিন আসতে চায় না এখানে, কতবার সুহাস বলেছে—চলো, আজকে বাইরে কোনও হোটেলে খেয়ে আসি—

কিন্তু কাজল প্রত্যেকবারই এড়িয়ে গেছে। বলেছে—না না, হোটেলে খেয়ে কী হবে? বাড়ির খাওয়া কি খারাপ?

তবে ঃ তবে কেন কাজল এল।

গার্লিক তখনও জিজ্ঞেস করছে—পারবে না মুখার্জি, পারবে না?

সুহাস কোনও উত্তর দেবার আগেই সাহেব আবার বলতে লাগলো—তোমার ওপর আমার বিশ্বাস আছে মুখার্জি, আই রিলাই আপ্‌-অন্‌ ইউ, ইন্ডিয়াকে হাত-ছাড়া করলে চলবে না মুখার্জি, হোল্‌ সাউথ-ইস্ট্‌-এশিয়ার ভাগ্য নির্ভর করছে এই ইন্ডিয়ার ওপর। ইন্ডিয়ার জিওগ্র্যাফিক্যাল পোজিশন্‌ বড় স্ট্যাটে-জিক্‌—এ আমরা হাত-ছাড়া করতে পারবো না—

সুহাস তখনও একদৃষ্টে চেয়ে দেখ-ছিল কাজলের দিকে। মনে হলো কাজল যেন বড় খুশী। কই, সুহাসের সঙ্গে তো এমন করে প্রাণ খুলে কখনও হাসে না! সুহাসের সঙ্গে বেরোবার সময় তো এমন করে কখনও সাজেও না!

হঠাৎ মিস্টার গার্লিকের যেন দৃষ্টি পড়লো এদিকে।

বললে কী দেখছো মুখার্জি? আর ইউ টায়ার্ড? ইউ লুক ভেরি সিক্‌।

হঠাৎ যেন এতক্ষণে সম্বিত ফিরে এল সুহাসের। মিস্টার গার্লিকের দিকে ফিরে বললে—কী বলছিলেন স্যার?

—তোমাকে কেমন অন্যমনস্ক দেখছি! ভেরি আন্‌মাইন্ডফুল!

—কই, না!

সাহেব বললে—তোমার মুখ চোখ দেখে মনে হচ্ছে তোমার যেন কেমন অস্বস্তি লাগছে, তুমি বাড়ি যেতে চাও?

সুহাস কী বলবে কিছু বুঝতে পারলে না।

—একটু ব্র্যান্ডি নেবে? বেশ সুস্থ হয়ে উঠবে! ইউ উইল ফীল ফ্রেশ্‌!

সুহাস দাঁড়িয়ে উঠলো এবার। সেই দিকে আবার চেয়ে দেখলে। কই, কোথায় গেল! কখন তারা নিঃশব্দে হোটেল থেকে চলে গেছে টেরই পায়নি সুহাস। কোথা দিয়ে গেল? কখন গেল!

—আমি আসি স্যার।

—অল্‌রাইট্‌! লেট্‌স্‌ গো—

বলে মিস্টার গার্লিকও উঠলো। বললে—তোমার বাড়ি ফিরে যাওয়াই উচিত! মিসেস মুখার্জি বোধহয় লোন্‌লি ফীল করছে—তোমারও বোধহয় তার কাছে যাওয়া দরকার—আমি ওল্ড্‌ ম্যান্‌, আমি ঠিক বুঝতে পারিনি, তোমাকে আর ডিটেন্‌ করবো না—

বলে সাহেব আবার পুরোন প্রসঙ্গের জের টেনে বলতে লাগলো—এ ওয়ার আমাদের পক্ষে একটা ক্রুশিয়াল প্রব্‌লেম্‌ মুখার্জি, এ-সম্বন্ধে আমি আরো আলোচনা করবো পরে—

কিন্তু তখন আর শোনবার মতো মনের অবস্থা নয় সুহাসের।

সাহেব বললে—চলো, তোমাকে আমি লিফ্‌ট্‌ দিচ্ছি—

বাড়ির দরজার সামনে সুহাসকে নামিয়ে দিয়ে সাহেব চলে গেল গাড়ি চালিয়ে। সুহাস নিঃশ্বাস বন্ধ করে নিজের বাড়ির গেটের সামনে যেতেই দরোয়ানটা সেলাম করলে। এতক্ষণ দরোয়ানটা চুপচাপ বসে ঝিমোচ্ছিল। সাহেবকে দেখেই য়্যাটেন্‌শন্‌ হয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে।

তারপর রাস্তাটা পেরোতে গিয়েই কানাই-এর সঙ্গে মুখোমুখি। কানাইও অবাক হয়ে গিয়েছিল। হাতের ব্যাগটা তাড়াতাড়ি নিয়ে দৌড়োচ্ছিল। অনেক কাজ এখন তার। সাহেবের পুরোন ছাড়া-জামা-কাপড় গোছোতে হবে। তার-পর বন্দুকটা রেখে দিতে হবে বাক্সের ভেতরে। তারপর বাক্সের চাবিটা দিতে হবে মা'র কাছে।

সুহাস ডাকলে কানাই, মা কোথায়?

—আজ্ঞে, মা তো এখ্‌খুনি এল—

—মা কখন বেরিয়েছিল?

কানাই বললে—সেই সন্ধ্যেবেলা—

—কার সঙ্গে বেরিয়েছিল রে!

কানাই বললে—আচারিয়া সাহেব!

—আচারিয়া সাহেব কি রোজ আসে?

কানাই বললে—আজ্ঞে উনি তো রোজই আসেন।

—রোজ এসে কী করেন?

কানাই বললে—রোজ এসেই মা'কে গাড়িতে করে নিয়ে যান্‌—

—আচ্ছা তুই যা।

ঘরের মধ্যে তখন কাজল ঠিক রোজ-কার মত কাগজ-কলম নিয়ে লিখছে। সুহাসকে দেখেই অবাক হয়ে গেল। বললে—ওমা, তুমি যে!

সুহাস বললে—এই এখনি এলাম!

—কাজ শেষ হয়ে গেল বুঝি?

—হ্যাঁ দু'দিন আগেই সব শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাই চলে এলাম।

কাজল তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে উঠলো। বললে—তোমার গরম-জল করতে বলি। চা খাবে তো?

—তুমি চা খেয়েছ?

কাজল বললে—না, একসঙ্গেই খাবো—

তারপর যথারীতি গরম-জলের ব্যবস্থা করে দিলে আবদুল। কানাই চা করতে গেল। সুহাস তৈরি হয়ে এসে বসতেই কাজল বললে—তুমি ছিলে না, বড্ড একলা-একলা লাগছিল, তাই লিখ-ছিলুম—

—কত দূর হলো তোমার উপন্যাস?

কাজল বললে—প্রায় অর্ধেকের বেশি হয়ে গেছে—

—কবে শেষ হবে?

কাজল বললে—ও-সব কথা থাক্‌, একলা-একলা থাকি তাই সময় কাটাবার জন্যে লিখি, নইলে লেখিকা হবার ইচ্ছে নেই—

—দেখি না, কতদূর লিখলে?

কাজল বললে—না না, ও-সব তোমাকে দেখাবার মত নয়—

সুহাস হঠাৎ বললে—আমি যখন থাকি না, তখন মাঝে মাঝে বাইরে বেড়াতে বেরোও না কেন?

—বারে, আমার বুঝি সংসারের কোনও কাজ নেই? আমার বাইরে বেড়ালে চলে?

সুহাস তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখতে লাগলো কাজলকে। এতদিনের চেনা কাজলকে যেন হঠাৎ তার বড় অচেনা মনে হলো। বললে—আজকে সারাদিন কী করলে?

কাজল বললে—কী আর করবো, সারাদিন বাড়িতেই কাটালুম ?

—কোথাও বেরোলে না কেন ?

কাজল বললে—কোথাও বেরোতে ভাল লাগে না—

সুহাস আবার জিজ্ঞেস করলে—কেউ আসেনি আজকে ?

কাজল বললে—না—

তারপরেই বললে—হঠাৎ এত কথা জিজ্ঞেস করছোই বা কেন ?

—না, এমনি।

সুহাস আর কোনও কথা বললে না।

কাজল বললে—তোমাকে যেন আজকে কেমন অন্যরকম দেখাচ্ছে, শরীর খারাপ নাকি তোমার ?

সুহাস বললে—না—

তাহলে খুব টায়ার্ড বুঝি ? দেখি, জ্বর এসেছে নাকি ?

বলে কাজল সুহাসের কপালে নিজের হাতটা ঠেকালে। বললে—না, গা তো গরম নয়,

তারপর আরো কাছে এসে বললে—তুমি বরং শুয়ে পড়ো, আমি তোমার মাথাটা টিপে দিই—

বলে সত্যি-সত্যিই কাজল জোর করে সুহাসকে বিছানায় শুইয়ে দিলে। তারপর নিজেই পাশে বসে সুহাসের মাথাটা টিপে দিতে লাগলো। সুহাস চোখ বুজে চুপ করে পড়ে রইল। কিন্তু মনে হলো যেন শরীরের সমস্ত কোষে কোষে তার আগুনের শিখা বিচ্ছুরিত হয়ে যাচ্ছে। কী শান্ত প্রশান্ত কাজলের মুখের চেহারা, মিথ্যে কথা বলতে এতটুকু দ্বিধা নেই। এতটুকু জড়তা নেই। তার মনে হলো তার এতদিনের সংসার করা, এতদিনের প্রীতি-আনন্দ, এতদিনের কর্ম, এত প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা সব যেন মিথ্যে, সব যেন অভিনয়। সব যেন ছলনা। সে এতদিন শুধু স্তোক-বাক্যে ভুলে এসেছে, এতদিন শুধু চাতুরীতে প্রতারিত হয়ে এসেছে : কেন সে এই সংসার করতে নেমেছে। তাহলে সেই-ই তো তার ভাল ছিল, সেই দোরে দোরে চাঁদা চেয়ে বেড়াতো আর সংকট-ত্রাণ করে মফঃস্বলে মফঃস্বলে ঘুরে বেড়াতো। তাহলে কেন সে বিবেকের গলা টিপে এই ছায় মিথ্যের ভিতের ওপর নিজের ভবিষ্যৎ-জীবনের আনন্দের সৌধ গড়ে তুলতে গেল। কী প্রয়োজন ছিল তার। সুহাস চারদিকে চেয়ে দেখলে। এই আসবাব-পত্র এই সৌখীন বিলাস-সামগ্রী, এই চাকর-আয়া-খানসামা, এই চাকরি, এ-সব কিছুই তো কিছু নয়! কেন এমন করে প্রতারিত করলে তাকে কাজল! কী অপরাধ সে করেছে তার কাছে ?

কাজল বললে—একটু আরাম হচ্ছে!

মনে হলো কাজল যেন তাকে চাবুক মারলে। সুহাস কোনও উত্তর দিলে না। চোখ দুটো বুজিয়ে ফেললে যন্ত্রণায়। তার মনে হলো কাজলের হাতটা যেন কাঁটার মত তার কপালে বিঁধছে। তারপর বললে—হ্যাঁ, আরাম হচ্ছে—

তারপর রাত আরো বাড়লো। টেবিল তৈরি হলো। আবদুল খাবার দিলে। বিছানা করে দিলে বিবি। সুহাস নির্জীবের মত প্রাত্যাহিক জীবনের রুটিনগুলো সব নিয়মমাফিক সারলে।

কাজল পাশে শুয়ে কানের কাছে মুখ এনে বললে—এখন একটু আরাম হচ্ছে ?

সুহাসের মনে হলো এক প্রচণ্ড আঘাত করে কাজলকে। সারা জীবনের মত বিশ্বাসঘাতকতার চরম দণ্ড দেয় চূড়ান্ত একটা আঘাত দিয়ে। কিন্তু তবু কেমন দ্বিধা হলো!

কাজল বললে—তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি, তুমি ঘুমোও—

সুহাস কোনও আপত্তি করলে না। কাজল তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। সুহাস চোখ-কান-মুখ বুজে সমস্ত অব্যক্ত যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করতে লাগলো। তারপর কখন কাজলই ঘুমিয়ে পড়েছে। কাজলের বিলম্বিত তালের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ আসতে লাগলো। কাজলের হাতও থেমে গেছে এক সময়। অলস অবশ হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে কাজল :

খানিক পরে সুহাস উঠলো। উঠে আস্তে আস্তে বাথরুমের আলোটা জ্বাললে।

এবার স্পষ্ট দেখা গেল কাজলকে। বিছানার একেবারে কাছে এসে দাঁড়াল সুহাস। ঘুমে অচৈতন্য কাজল। শাড়িটা সরে গেছে গা থেকে। ঠোঁটে একটা পাতলা হাসি আলগা হয়ে ঝুলছে। যেন বলছে—আমাকে ধরতে পারবে না তুমি। আমাকে ধরা যায় না। আমি অধরা—

সুহাসও বললে—আমি তোমাকে বেঁচে থাকতে দেব না। তুমি আমার জীবন নষ্ট করেছ—

—কিন্তু কেমন ঠকিয়েছি তোমাকে: তুমি চিনতে পারোনি আমাকে। আমি জীবনে যা চেয়েছিলুম সব পেয়েছি—আমি সব কূল বজায় রেখেছি সকলকে খুশী করেছি, আমি সুখী হয়েছি—

ঘুমের ঘোরে কাজল যেন একবার নড়ে উঠলো। সুহাস চমকে উঠে এক-পা সরে এসেছিল। কিন্তু কাজল আবার স্থির হলো। আবার ঘুমের কোলে এলিয়ে দিলে নিজেকে।

সুহাস আর সহ্য করতে পারলে না। কাজলের আঁচল থেকে চাবিটা খুলে নিয়ে নিঃশব্দে রিভলবারের বাক্সটা খুলে ফেললে। তারপর সন্তর্পণে রিভলবারটা বার করে এনে বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল। লোড করাই ছিল সেটা। তারপর একদৃষ্টে কাজলকে দেখতে লাগলো। তোমাকে আমি ভালবাসি কাজল। তুমি আমাকে এত বছর নিরবিচ্ছিন্ন শান্তি দিয়েছ, এত বছর আনন্দ দিয়েছ, তার জন্যে আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে চরম বিশ্বাস ঘাতকতা করেছ। আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছ। আমার ভালবাসার অপমান করেছ তুমি...

হঠাৎ কাজল যেন একটু নড়ে উঠলো। ঘুমের ঘোরে প্রথমে কিছু বুঝতে পারেনি। অস্পষ্ট ছায়ার মত কী যেন সামনে নড়ে উঠলো। বললে— কে ?

সুহাস বাঘের মত টিপি টিপি পায়ে তৎক্ষণে দূরে সরে গেছে।

—কে ? আলো জ্বাললে কে ?

সুহাস বললে—আমি—

—কী করছো, ওখানে ?

সুহাস বললে—বড় জল তেষ্টা পেয়েছে, একটু জল খাচ্ছি—

কাজল বললে—তা আমাকে বললে না কেন ? আমিই দিতে পারতুম—

সুহাস তাড়াতাড়ি বাক্সের মধ্যে রিভলবারটা রেখে চাবি বন্ধ করে আবার এসে পাশে শুলো। কাজল সুহাসের গায়ে হাত দিতে যাচ্ছিল। বললে—তুমি অত দূরে কেন, আরো সরে এসো না—

সুহাস বললে—থাক্, আমার বড় ঘুম পাচ্ছে—

হঠাৎ যেন কাজলের খেয়াল হলো। বললে—আমার চাবিটা কোথায় গেল ? আমার আঁচলে বাঁধা ছিল যে—

হন্তদন্ত হয়ে উঠলো কাজল। উঠে আলো জ্বাললে। আলো জ্বেলে এদিক-ওদিক খুঁজতে লাগলো। বললে—দেখ তো, শোবার সময় তাড়াতাড়িতে চাবিটা আঁচলে বোধহয় না-বেঁধেই ঘুমিয়ে পড়েছি—

তারপর টেবিলের উপর পাওয়া গেল। তাড়াতাড়ি আঁচলে সেটা বেঁধে নিয়ে আবার এসে শুলো। বললে—চাবিটা আঁচলে না-বাঁধলে আমার ঘুমই আসে না, জানো—

সুহাস কোনও কথারই একটাও উত্তর দিলে না। চোখ বুজে নির্জীবের মত পড়ে রইল বিছানার এক পাশে। তারপর কাজল আবার কখন ঘুমিয়ে পড়েছে, আবার তার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ একতালে বয়ে চলেছে। সব কানে এল

সুহাসের। বাইরের পৃথিবীর, ভেতরের পৃথিবীর, অন্তরাত্মার পৃথিবীর সমস্ত শব্দ সমস্ত কোলাহল স্পষ্ট শুনতে পেলো সুহাস। তার চেতনায় যেন দানবের নৃত্য সুরু হয়েছে। তারপর সকাল হলো এক-সময়ে। জানালা দিয়ে নীল আকাশ দেখা গেল। হোল ভোর। বিছানা ছেড়ে উঠলো। উঠে কী করবে, কোথায় যাবে, কার কাছে গিয়ে সব বলবে ঠিক করতে পারলে না।

—ওমা, তোমার এত সকাল-সকাল ঘুম ভেঙে গেছে?

তাড়াতাড়ি কানাই চা দিয়ে গেল। সুহাস ততক্ষণে তৈরি হয়ে নিয়েছে। তার ইউনিফর্ম পরেছে। কলঘর থেকে বেরিয়ে এসে কাজল সুহাসকে দেখে অবাক হয়ে গেল। বললে—তুমি আবার কোথাও বেরোবে নাকি?

সুহাস বললে—কোথায়?

—সব কথা তোমাকে বলতে হবে নাকি?

কাজল চুপ করে গেল। কাল থেকেই যেন কেমন অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে সুহাসকে। যথারীতি বেরিয়ে গেল সুহাস। যাবার আগে অন্য দিনের মত একবার ভাল করে কথাও বলে গেল না। সুহাসের মনে হলো যেন চিরকালের মত সে চলে যাচ্ছে, আর দেখা হবে না কারো সঙ্গে।

কিন্তু রাত্রেই ফিরলো সুহাস। তখন রাত বোধহয় ন'টা। কিন্তু না ফিরলেই বোধহয় ভালো হতো। চিরকালের মত সমস্ত যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেত সে।

অথচ কোথায় যাবারও ছিল না সুহাসের। সে দিনটা ছুটি। ভোরবেলা বেরিয়েছে। শেয়ালদা ষ্টেশনের সামনে গাড়িটা ছেড়ে দিলে।

ড্রাইভার জিজ্ঞেস করলে—কবে আবার আসবো হুজুর?

—ঠিক নেই।

কথাটা বলে সুহাস প্লাটফরমের দিকেই গেল। কিন্তু আবার ফিরে এল বাইরে। গাড়ি নিয়ে ড্রাইভার তখন চলে গেছে। রাস্তায় ট্রাম-বাস-গাড়ি চলেছে সার বেঁধে। এতদিন যেন এ-পৃথিবীটাকে দেখা হয়নি সুহাসের। সেদিন যেন সব কিছু নতুন লাগলো তার চোখে। এত বৈচিত্র্য, এত মানুষ, এত কাজ চারিদিকে। ছেঁড়া-জামা-কাপড় পরা ভিখিরি, সার্ট-পাঞ্জাবী পরা ডেলি প্যাসেঞ্জার, সকলের মুখে-চোখে ব্যস্ততা, সবাই ছুটছে, জীবিকার তাড়নায় ছুটছে পাগলের মত।

খানিকক্ষণ দাঁড়াল গিয়ে ডালহৌসী স্কোয়ারে। অফিস-পাড়ার মানুষের চেহারা দেখে তার কেমন মনে হলো সেই একই দৃশ্য, সেই একই বৈচিত্র্য। কিছুই যেন ভালো লাগলো না। পৃথিবীতে কোথায়ও যেন আশ্রয় নেই সুহাসের। সুহাস নিরাশ্রয়ের মত ভেসে বেড়াতে লাগলো কলকাতার জন-সমুদ্রে।

একজন হঠাৎ চেনা-লোকের গলা শোনা গেল।

—এ কি স্যার, আপনি এখানে? ডিউটিতে বুঝি?

সুহাস সে-কথার কোনও উত্তর না দিয়ে আবার ট্যাক্সি ধরলে একটা।

—কিধার সাব?

সুহাস বললে—সিধা!

ট্যাক্সিটা সোজা চলতে লাগলো চৌরঙ্গী ধরে। আরো আরো দূরে, আরো বিচ্ছিন্ন হতে ইচ্ছে হলো। মনে হলো আকাশের ওই শেষ সীমানার কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারলে যেন ভালো হতো। একেবারে ডায়মন্ডহারবারের সমুদ্রের ধারে গিয়ে থামলো ট্যাক্সিটা। ট্যাক্সি-ড্রাইভার জিজ্ঞেস করলে—আবি কিধার সাব?

আর কোথায় যাবে এখন? আর কোথায় গেলে বিচ্ছিন্ন হওয়া যাবে। সুহাস বললে—এখানে রাখো, আমি নামবো—

সুহাস গাড়ি থেকে নেমে একেবারে সোজা জলের ধারে গিয়ে দাঁড়াল। পায়ের জুতোর ওপর জলের ঢেউ এসে লাগতে লাগলো। আস্তে আস্তে সূর্য অস্ত গেল জলের তলায়। তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে আছে সুহাস। ট্যাক্সিটা তখনও দাঁড়িয়ে ছিল। ড্রাইভারটাও অবাক হয়ে গিয়েছিল সাহেবের কান্ড দেখে। হঠাৎ পেছনে গলার শব্দ পেয়ে পেছন ফিরতেই ড্রাইভারটা বললে—হুজুর, লৌটেঙ্গে নেহি?

—হাঁ, চলো—

আবার ট্যাক্সিতে উঠলো সুহাস। আবার সেই নির্জন দীর্ঘ রাস্তা। অন্ধকার হয়ে গেছে চারদিকে। দু'পাশের জলা-জমি থেকে ব্যাঙ্ ডাকার শব্দ আসছে। বড় আরাম লাগলো এতক্ষণে। মনে হলো চারিদিকের এই অন্ধকারই যেন চেয়েছিল সে জীবনে। সংসার চায়নি, শান্তি চায়নি, অর্থ, গৌরব, প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা, কিছুই যেন সে চায়নি সারা-জীবন। যা সে পেয়েছে, তা যেন সে চায়নি কখনও। চেয়েছিল শুধু অন্ধকার। এই অন্ধকারের মধ্যেই যেন এই পৃথিবীর এই মানুষের আদি রূপ আত্মগোপন করে আছে। এই অন্ধকারই যেন ভালো, এখান থেকে যেন আর যেতে ইচ্ছে করছে না। এ অন্ধকার যেন আর না দূরে হয়, এ অন্ধকার যেন ভোর না হয়। এ অন্ধকার যেন চিরস্থায়ী হয় তার জীবনে।

কখন নিজেরই অজ্ঞাতে কলকাতা সহরের মধ্যে এসে পড়েছে সুহাসের জ্ঞান ছিল না।

ড্রাইভার জিজ্ঞেস করলে আবার—কিধার সাব?

এতক্ষণে যেন সম্বিত ফিরে এল সুহাসের। আবার সেই কলকাতা। আবার সেই কলকাতার জীবনের ধোঁয়া, কালি, গোলমাল, বিশ্বাসঘাতকতা। আবার সেই সংসার, সেই চাকরি, প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা। আবার সেই প্রতিযোগিতা। সুহাসের সমস্ত মনটা যেন বিষাক্ত হয়ে উঠলো। কেন সে ফিরে এল কলকাতায়? কাজল থাকু না তার সংসার আর সম্পত্তি নিয়ে। সুহাস চলে যাবে অনেক দূরে, একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তার জীবন থেকে। সেই-ই তো ভালো!

কিন্তু আবার মনে হলো—না। একবার কাজলের মুখোমুখি হওয়া ভাল। একবার জিজ্ঞেস করা ভাল—কেন এমন হলো? কার দোষে এমন ঘটলো?

কিন্তু আশ্চর্য, বাড়ির সামনে আসতেই ঘটনার বিপর্যয়ে চমকে উঠলো সুহাস! এত লোক কেন তার বাড়ির সামনে? এত ভীড় কেন? এত লোক তার বাড়ির ভেতরে বাগানে ঢুকে পড়েছে। সেই ব্ল্যাক-আউটের রাতে শুধু মাথা দেখা গেল অসংখ্য! অসংখ্য লোক ভিড় করেছে তার বাগানের ভেতর। এক দিনে অনুপস্থিতির মধ্যে হঠাৎ এ কী বিপর্যয় ঘটে গেল?

বাবুকে দেখেই ভিড় একটু সরে গেল। দারোয়ান অন্ধকারে অতটা চিনতে পারেনি। সুহাস জিজ্ঞেস করলে—ক্যা হুয়া? কী হয়েছে এখানে? এত লোক কেন?

দারোয়ান যা বললে তার মাথামুণ্ডু কিছু বোঝা গেল না। সুহাসের রক্তের সমুদ্রে তখন তুফান চলেছে।

কানাই দৌড়ে এল বাবুকে দেখে। বললে—বাবু, খুন হয়ে গেছে একটা লোক—

—কে খুন হয়েছে?

কানাই বললে—আচারিয়া সাহেব!

আচারিয়া সাহেব! আচারিয়া সাহেব আবার এসেছিল? কখন এসেছিল? কানাই বললে—সন্ধ্যেবেলা এসেছিল, মা'র সঙ্গে গল্প করছিল হুজুর, আমি চা করে দিয়ে বাইরে আমার ঘরে গিয়ে একটু বসেছি, হঠাৎ দুম্ দুম্ করে বন্দুকের শব্দ হলো—

—তারপর?

—তারপর বন্দুকের শব্দ শুনেই আমি বাইরে বাগানে ছুটে এসেছি। আবদুল, বিবি-ওরাও ছুটে এসেছে। অন্ধকারের মধ্যে নজরে পড়লো আচারিয়া সাহেব দৌড়তে দৌড়তে বাইরের ঘর থেকে বাগানে বেরিয়ে আসছে, আসতে আসতে আরো দু'একবার শব্দ এলো বন্দুকের আর আচারিয়া সাহেব মাটিতে লুটিয়ে পড়লো—

সুহাস তাড়াতাড়ি ভীড় সরিয়ে দেখলে। আচারিয়া অজ্ঞান-অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে—। পিঠ দিয়ে গল্ গল্ করে রক্ত বেরোচ্ছে। রক্তে ভেসে গেছে জায়গাটা।

—কে খুন করলে, দেখেছিস?

কানাই বললে—না হুজুর, কিছু দেখতে পাই নি, শুধু দেখলুম বাইরের ঘরের দরজার কাছটা থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে খুব—

জিজ্ঞেস করলাম—তারপর?

আমি এ-সব কথা কিছুই জানতাম না। সুহাসরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের নামও কখনও শুনিনি। এ-সব অনেক দিন আগের ঘটনা। আমি তখন লিখতেও শুরু করিনি। কলকাতা শহরের খবরের কাগজে অন্যান্য অনেক রাহাজানি-ডাকাতি-খুন-জখমের কাহিনীর মধ্যে এ-রকম একটা বেরিয়েছিল কি না তাও আমার মনে থাকবার কথা নয়। আর চিঠি লিখছিলেন সুহাসরঞ্জন মুখোপাধ্যায় কাটনী থেকে। সি-পি'র ছোট-খাটো একটা সহর কাটনী। বম্বে যাবার পথে ষ্টেশনটা অনেকবার দেখেছি—এই পর্যন্ত। সেই কাটনী থেকে চিঠি পেয়ে আমি প্রথমে গা করিনি। শেষকালে যখন তিনি আসা-যাওয়ার খরচ পাঠালেন তখন গেলাম।

ট্রেন থেকে নেমে ভেবেছিলাম কেউ দেখা করতে আসবে। কিন্তু কেউই আমার জন্যে ষ্টেশনে আসেনি দেখে একটু রাগও হয়েছিল মনে মনে। ঠিকানা খুঁজে খুঁজে দু'একজনকে জিজ্ঞেস করে শেষ পর্যন্ত যখন দরজায় গিয়ে কড়া নাড়লাম, তখন ভেতর থেকে কে একজন বৃদ্ধ গলায় জিজ্ঞেস করলে—কে?

শেষ পর্যন্ত যখন শুনলে আমি কলকাতা থেকে এসেছি তখন দরজা খুলে দিয়েছিল।

কানাই বললে—আপনার চিঠির জন্যে বাবু এ ক'মাস খুব ভেবেছেন—

বললাম—বাবু কোথায়?

—ভেতরে। কিন্তু তাঁর খুব শরীর খারাপ হুজুর। আর উঠতে পারেন না বিছানা থেকে—

শেষ পর্যন্ত কানাই আমাকে নিয়ে গিয়েছিল সুহাসরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের কাছে। তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে আছেন দেখলাম। আমাকে দেখে উঠে বসতে যাচ্ছিলেন আনন্দে। কানাই থামিয়ে দিলে। তিনি এককালে স্বাস্থ্যবান ছিলেন, তা চেহারা দেখেই বোঝা গেল।

বললেন—আপনি আসাতে যে কী আনন্দ পেয়েছি, তা আর কী বলবো! আপনার জন্যেই বোধ হয় আমি এখনও বেঁচে আছি—

তারপর অনেক কথা হলো। ঘরের দেওয়ালে দেখলাম একটি মহিলার ছবি টাঙানো।

কানাই বললে—ওই আমার মায়ের ছবি—

তখনও কিছুই জানি না কেন আমাকে ডেকেছেন সুহাসরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। কে তিনি, আমার সঙ্গে কেন সম্পর্ক পাতাতে চাইছেন। খেতে বসে কানাইকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম—আমাকে কেন ডেকেছেন, তুমি জানো কিছু?

কানাই বলেছিল—না হুজুর—

—বাবু এখানে একলা থাকেন কেন? বাবুর কেউ নেই?

কানাই বলেছিল—বাবু পুলিশের মস্ত চাকরি করতেন এককালে, তারপরে হঠাৎ একদিন চাকরি ছেড়ে দিয়ে এখানে চলে এসেছেন। আমারও তো কেউ নেই, তাই আমিও চলে এলুম বাবুর সঙ্গে—

—তা বাবু তোমার পুলিশের চাকরি ছেড়ে দিলেন কেন, হঠাৎ?

কানাই বললে—তা জানি নে বাবু, বাবুর কী যে মতি হলো, বাবু একদিন অফিসের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে এখানে এসে উঠলেন, সেই থেকে আমিও রয়েছি, আর আমার এই কর্মভোগ চলছে—

—কেন, কর্মভোগ কেন?

—কর্মভোগ নয় তো কী বাবু, বাবুর নিজেরও কোনও মতিস্থির নেই, আমাকে সময়-সময় পাগল করে ছাড়েন! নইলে দেখলেন তো বাবুর চেহারা! ইয়া চেহারা ছিল বাবুর, রাতারাতি চোখের ওপর যেন বুড়ো হয়ে গেলেন, মাথার চুলগুলো সব পেকে গেল, গায়ের চামড়া ঝুলে গেল, এখন দেখলে মনে হয় যেন সত্তর-আশী বছর বয়েস!

—কিন্তু কেন এমন হলো?

প্রথম দিন কয়েক কোনও কাজের কথাই হলো না। ডাক্তার আসে আর দেখে যায় সুহাসবাবুকে। আমিও দিন কতক বেড়িয়ে বেড়াতে লাগলাম আশে-পাশের জায়গাগুলোতে। কখনও ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমে গিয়ে ট্রেন আসা-যাওয়া দেখি, কখনও বাজারের ভেতরে গিয়ে নতুন দেশের লোকজন দেখি।

সেদিন সুহাসবাবু বললেন—আপনার সময় নষ্ট করে দিচ্ছি জানি, কিন্তু আমার স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে আমায় মার্জনা করবেন আশা করি—

বললাম—আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমি হাতে অনেক সময় নিয়েই এসেছি—

সুহাসবাবু বললেন—অনেক দিন থেকেই আপনার আসার প্রতীক্ষা করছিলাম, কিন্তু কে আর আমার জন্যে নিজের কাজ-কর্ম ছেড়ে এখানে আসবে বলুন! আমি প্রতিদিন আপনার চিঠির অপেক্ষায় থাকতুম, শেষে আমার স্বাস্থ্য ভেঙে গেল—

—কিন্তু স্বাস্থ্য ভাঙলোই বা কেন হঠাৎ? আপনি তো পুলিশে চাকরি করতেন!

কে বললে আপনাকে?

বললাম—কানাই। কানাই আমাকে কিছু কিছু বলেছে, আপনি নাকি হঠাৎ চাকরি ছেড়ে দিয়ে এখানে চলে এসেছেন!

সুহাসবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। বললেন—কানাই আর কতটুকু জানে, আর কতটুকুই বা সে আপনাকে বোঝাতে পারবে! একজন মানুষ কি আর একজন মানুষকে বুঝতে পারে? কোনও স্বামীই কোনও স্ত্রীকে বুঝতে পারে না! বলে তিনি চুপ করলেন হঠাৎ!

আমি বললাম—আমাকে কী জন্যে আপনি ডেকেছিলেন তা কিন্তু এখনও বলেন নি আমাকে!

—তাহলে শুনুন আপনি হয়ত শুনে আমার ওপর অসন্তুষ্ট হবেন। কিন্তু এ বলতে না পারলে আমিও শান্তি পাবো না। ওই দেখুন, দেওয়ালে আমার স্ত্রীর ছবি টাঙানো রয়েছে, আমার পরলোকগতা স্ত্রী—

দেখলাম। বললাম—কানাই আমাকে প্রথম দিনেই তা বলেছে—

—তাহলে অনেক কিছুই শুনেছেন দেখছি। জানিনা আপনি কতটুকু শুনেছেন আর কতটুকু শোনেন নি। কিন্তু এটা শুনেছেন কি না জানি না যে আমি আমার স্ত্রীকে ভালবেসে বিয়ে করেছিলাম। আমার স্ত্রী সাধারণ একজন স্কুল-মিস্ট্রেস ছিলেন!

—তা শুনেছি!

—এটা কি শুনেছেন যে আমার বাড়িতে আচারিয়া বলে একজন ভদ্রলোক খুন হয়ে যায়?

—তাও শুনেছি!

সুহাসবাবু বললেন—কেন খুন হয় তা শুনেছেন কী?

বললাম—না—

সুহাসবাবু বললেন—আমিও তা জানতাম না। আমার সংসার, আমার প্রতিষ্ঠা, আমার প্রতিপত্তি, আমার সম্মান সমস্ত কিছু সেই খুনের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল—তাও শুনেছেন কি?

বললাম—না, তা শুনিনি—

—আমার স্ত্রী একটা উপন্যাস লিখতে সুরু করেছিল, কিন্তু তা আর শেষ হয়নি, তা-ও শুনেছেন কি?

বললাম—শুনেছি কানাই-এর কাছে, যে আপনার স্ত্রী মাঝে-মাঝে কাগজ-কলম নিয়ে কী সব লিখতেন—

—সে উপন্যাস তিনি শেষ পর্যন্ত আর শেষ করে যেতে পারেন নি। জানি না কী-রকম সে লেখা। আমি পুলিশের লোক, ছাত্রজীবনে স্যার পি-সি--রায়ের কাছে বিজ্ঞান শিখেছি, তাঁর সঙ্গে মিশে সংকট-ত্রাণ সমিতির কাজ করেছি, সাহিত্য-টাহিত্যের কথা কখনও ভাবিনি, তিনি কি লিখেছেন, কেন লিখেছেন তাও বুঝতে পারি না—হয়ত বেঁচে থাকলে বইটা শেষ করে যেতে পারতেন! কিন্তু আমি চাই যে আপনি সেটা শেষ করে দিন—

—আমি?

—হ্যাঁ, আপনাকে আমি অনুরোধ করছি, আমি আর বেশি দিন বাঁচবো না, আমি চলে যাবার আগে দেখে যেতে চাই যে বইটা ছাপা হয়ে বেরিয়েছে! আর......

কী যেন আরও বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু থেমে গেলেন।

বললাম—বইটা কোথায়?

—এই যে আমার কাছেই আছে।

বলে হাতে লেখা একটা মোটা খাতা বিছানার তলা থেকে বার করলেন। বললেন—এটা সব সময়েই কাছে রাখি, কাছে রাখলে তবু খানিকটা আমার স্ত্রীর সান্নিধ্য পাই, মনে হয় কাজল আছে, কাজল বেঁচে আছে এখনও—

জিজ্ঞেস করলাম—কী নাম দিয়েছিলেন বইটার?

সুহাসবাবু বললেন—রং বদলায়—।

তারপর একটু থেমে বললেন—কীসের রং তা জানি না। জীবনের না মনের, যৌবনের না বয়সের তাও জানি না। হয়ত সব জিনিসেরই রং বদলায়। আমরা দেখতে পাই না বাইরে থেকে, বাইরে থেকেই আমরা শুধু বিচার করি মানুষের।

তারপর একটু থেমে আবার বললেন—তা সে-সব কথা যাক্, আপনি বইটা পড়ুন আগে, যদি খারাপ হয়েও থাকে, তবু ছাপাবার মত করে দিন। আমি ছাপাবার সমস্ত খরচ দেব, আমার যা কিছু জমানো টাকা আছে সব দেব আপনাকে, আপনি শেষটা লিখে দিয়ে ছাপিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন—

নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বইটা পড়তে লাগলাম। নিতান্ত কাঁচা হাতের লেখা। কিন্তু মনে হলো কোথায় যেন একটা সত্য সন্ধানের চেষ্টা রয়েছে। মেয়েলি হাতের গোটা-গোটা অক্ষর। মহিলাটির নিজস্ব একটা ভাবনা ছিল। সংসার সম্বন্ধে, পৃথিবী সম্বন্ধে, স্বামী সম্বন্ধে, সন্তান সম্বন্ধে, বিবাহ সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট দৃঢ় প্রত্যয় ছিল, সেই প্রত্যয়ের ব্যাখ্যার জন্যেই হয়ত গল্প লিখতে সুরু করেছিলেন।

বিকেল বেলাই আবার ডেকে পাঠালেন। কানাই এসে ডাকলে। বললে—বাবু আপনাকে একবার ডেকেছেন—

সামনে যেতেই সুহাসবাবু বললেন—পড়লেন?

বললাম—সবটা পড়া হয়নি। কিন্তু আমি যে বইটা শেষ করবো, তার আগে আপনার স্ত্রীর সম্বন্ধে আমার কতগুলো কথা জানা দরকার—

—কী কথা বলুন?

বললাম—আপনার স্ত্রীর মনোবৃত্তি-টাও আমার জানা দরকার, তাহলে আমার লিখতে সুবিধে হবে। যে-রাত্রে মিস্টার আচারিয়া খুন হন্, সে-রাত্রে আপনি কি আপনার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—কেন তিনি খুন করলেন আচারিয়াকে?

—হ্যাঁ জিজ্ঞেস করেছিলাম! কিন্তু সে-সব কথাও কি আপনার জানা দরকার?

আমি বললাম—তা না জানলে লেখার অসুবিধে হবে! লেখককে জানলে তার লেখার বিচার সোজা হয়—

কথাটা শুনে সুহাসবাবু কিছুক্ষণ অসহায়ের মত চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন—তবে তাই বলি। কিন্তু এক মিস্টার গার্লিক ছাড়া আর কাউকে আমি বলিনি সে-কথা—শুনুন—

সেদিনকার সেই ব্ল্যাক-আউটের রাত! সুহাস যেন পাগলের মত ছট্-ফট্ করে উঠেছিল। বাগানে অত ভিড়। আচারিয়া তখনও সেইখানে পড়ে আছে। আর সারা শরীর রক্তে ভেসে গেছে। সুহাস তাড়াতাড়ি গিয়ে ঢুকলো নিজের ঘরে। তখনও বারুদের গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে। ঘরে ঢুকেই খিল লাগিয়ে দিলে দরজায়। ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে ছিল কাজল। কাজলের মুখে-চোখে অস্বাভাবিক ভীতি। সুহাস একেবারে কাছে গিয়ে কাজলের দু'টো হাত ধরে ফেললে। বললে—এ কী করলে তুমি?

কাজল থর থর করে কাঁপছিল তখনও।

সুহাস আবার জিজ্ঞেস করলে—কেন তুমি ওকে খুন করলে? কী হবে এখন?

কাজল শান্ত চোখে চাইলে সুহাসের দিকে শুধু। তারপর বললে—ও স্কাউণ্ড্রেলটা মরেছে?

সুহাস বললে—মরেছে। কিন্তু কেন মারতে গেলে ওকে অমন করে? এখুনি যে পুলিশ আসবে। এখুনি যে তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে? কী সর্বনাশ করলে তুমি বলো তো কাজল? এখন আমি কী করি?

কাজল কিছু উত্তর দিলে না।

সুহাস বললে—জবাব দাও কথার, পুলিশ যে তোমার কাছেই জবাব চাইবে?

কাজল বললে—ওর মরাই উচিত, ও অনেকদিন ধরে আমাকে জ্বালাচ্ছিল, আমার অসহ্য হয়ে উঠেছিল, আমি আর পারিনি—

—কিন্তু সন্ধ্যেবেলাই তো তোমাকে দেখেছি চৌরঙ্গীর হোটেলে ওর সঙ্গে, তুমি হাসছো, কথা বলছো!

কাজল অবাক হয়ে চাইলে সুহাসের দিকে। সুহাস বললে—বল, উত্তর দাও। শিগ্‌গির, এখুনি পুলিশ আসবে—

কাজল অনেকক্ষণ পরে বললে—ও আমাকে ব্ল্যাক মেইল্ করতে চেয়েছিল—

কেন? কী জন্যে তোমাকে ব্ল্যাক-মেইল করতে চেয়েছিল? কী করেছিলে তুমি? ওর সঙ্গে তোমার কীসের সম্পর্ক? বলো, বলো—

কাজল বললে—ওকে আমি অনেক টাকা দিয়েছি, এ ক'বছরে, ওকে আমি দশ হাজার টাকা দিয়েছি, তবু ওর লোভ মেটেনি!

—কীসের লোভ?

টাকার!

সুহাস জিজ্ঞেস করলে—কিন্তু তোমার কাছে টাকা চাইবার সাহস ওর হলো কী করে? কী করেছিলে তুমি? বলো?

তখন অত সময় নেই আর। কাজল আর পারলে না। কাঁদতে কাঁদতে সুহাসের বুকের ওপর ঢলে পড়লো।

আর দেরি করা চলে না। তাড়াতাড়ি কাজলকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে সুহাস মিস্টার গার্লিককে টেলিফোন করলে।

—আমি মুখার্জি কথা বলছি স্যার। আপনি এখনি দয়া করে আমার বাড়িতে চলে আসুন। একটা ভীষণ য়্যাক্‌সিডেণ্ট হয়ে গেছে, কথা বলবার সময় নেই আর—

সে-রাত্রে সুহাসের মনে হয়েছিল তার যেন সর্বস্ব হারিয়ে গেছে। একটা অবধারিত বিপর্যয়ের মুহূর্তে যেন সুহাস তার সম্মান, প্রভাব, প্রতিপত্তি, সংসার সব হারিয়ে ফেলেছে সুহাস।

গার্লিক সাহেব এসে জিজ্ঞেস করেছিল—কিন্তু মিসেস মুখার্জি কেন এ-কাজ করতে গেল? আচারিয়ার সঙ্গে মিসেস মুখার্জির কি অন্য কোনও সম্পর্ক ছিল?

—আপনি জিজ্ঞেস করুন না স্যার?

কাজল তখনও কঠিন পাথরের মত গুম্ হয়ে মুখ বুজে শুয়েছিল।

গার্লিক সাহেব কাজলকে জিজ্ঞেস করেছিল—কেন এ কাজ করতে গেলেন মিসেস মুখার্জি? কেন নিজের হাতে আইন তুলে নিতে গেলেন? আচারিয়া কি আপনাকে অপমান করেছিল?

কাজল মুখ তোলেনি। কোনও কথাও বলেনি।

সাহেব আবার জিজ্ঞেস করেছিল—একটা কিছু জবাব তো আপনাকে দিতেই হবে মিসেস মুখার্জি? আপনি কি নিজেকে ডিফেণ্ড্ করার জন্যে মেরেছিলেন?

কাজল বললে—ও একটা স্কাউণ্ড্রেল—

—কিন্তু কী করেছিল ও আপনার?

—ও ব্ল্যাক-মেইল করতে চেয়েছিল। আমি অনেক টাকা দিয়েছি ওকে। এ ক'বছরে আমি দশ হাজার টাকা দিয়েছি ওকে, তবু আরো টাকা চাইত, আরো ভয় দেখাতো?

—কীসের ভয়?

—আমার অসম্মানের ভয়! আমার সংসার নষ্ট করতে চেয়েছিল ও। আমার সুখ ওর সহ্য হচ্ছিল না, আমার এই স্বামী, আমার এই ঐশ্বর্য, কিছুই সহ্য করতে পারছিল না ও—

সাহেব আবার জিজ্ঞেস করলেন—কিন্তু আপনাকে ভয় দেখাতো ও কোন্ সাহসে? আপনার কোনও দুর্বলতা ছিল? আপনি কখনও কোনও অন্যায় করেছিলেন? নিজের কোনও গোপন-কথা ওকে বলেছিলেন কখনও?

কাজল এ কথার কোনও উত্তর দেয়নি। হাজার প্রশ্ন করার পরও কোনও উত্তর দেয়নি। মিস্টার গার্লিক বাইরে পাশের ঘরে সুহাসকে ডেকে এনে বলেছিল—তোমার স্ত্রীর সঙ্গে কি আচারিয়ার আগেই পরিচয় ছিল মুখার্জি?

সুহাস বলেছিল—হ্যাঁ স্যার—

—তোমার সঙ্গে বিয়ের আগে থেকেই?

সুহাস বলেছিল—হ্যাঁ, তাই তো শুনেছি—

মিস্টার গার্লিক সব শুনে নিলে। আগে মিসেস মুখার্জি কোন্ গার্লস্ স্কুলের মিস্ট্রেস ছিল। তখন থেকেই পরিচয় ছিল ওদের। সব শুনে সাহেব বললে—তাহলে এর মধ্যে কিছু গোলমাল আছে মুখার্জি—

তাহলে কী হবে স্যার?

মিস্টার গার্লিক বলেছিল—আমার মনে হচ্ছে মিসেস মুখার্জি গিল্টি—

—কিন্তু তার তো কোনও প্রমাণ নেই!

—প্রমাণ না থাকলেও কোর্টে কেস উঠলেই প্রমাণ হয়ে যাবে। আমি বুঝতে পারছি না, কীভাবে তোমাকে হেল্প্ করবো।

বললাম—তারপর?

সব মানুষের জীবনেই এমন এক-একটা ঘটনা ঘটে, যখন সারা জীবনের বাঁধা রুটিনেরও হঠাৎ ব্যতিক্রম হয়। সব কিছু ওলোট-পালোট হয়ে যায় রাতারাতি। সামান্য একখানা বই কারো জীবনে নতুন পরিচ্ছেদ এনে দেয়। সুহাসের জীবনেও এই ঘটনা সেই রকম। মিস্টার গার্লিক ছিল, তাই শেষ পর্যন্ত সব চাপা পড়ে গেল। সে সেই যুদ্ধের সময়। যখন পুলিশের হাতে অপ্রতিহত ক্ষমতা। মিস্টার গার্লিক কাকে টেলিফোন করে দিলেন। কাজল ধরা পড়লো। দু'-একদিন লক-আপেও থাকতে হলো তাকে। অপরিসীম লজ্জা আর অনপনেয় কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে সে-কদিন মুখ লুকিয়ে বেড়িয়েছে সুহাস। কখনও সারাদিন ট্যাক্সি করে ঘুরে বেড়িয়েছে, কখনও অন্ধকার রাস্তায় ছোটলোকদের ভিড়ের মধ্যে আত্মগোপন করে বেড়িয়েছে। কানাই দেখতো, কাছে আসতো। বলতো—খাবার দেব বাবু?

সুহাস বলতো—না—

এ-রকম করে না-খেয়ে থাকলে যে শরীর টিঁকবে না বাবু?

সুহাস চিৎকার করে উঠতো। বলতো—না তুই, বেরো এখান থেকে—বেরিয়ে যা—

কতদিন যে খায়নি সুহাস, কতদিন যে রাত্রে ঘুমোয়নি, তার হিসেব কোথাও লেখা নেই। কেউ জানতে পারেনি সে-ই ইতিহাস। কাজলের কলঙ্ক যে সুহাসের নিজের জীবনেরই কলঙ্ক। সুহাস যেখানে যেত, মনে হতো সবাই যেন ওর দিকে আঙুল দিয়ে নির্দেশ করছে—ওই যে, ওই লোকটা—

শেষ পর্যন্ত হয়ত পাগলই হয়ে যেত সে। সারা দিনের মধ্যে বাড়ি আসবার সাহসটুকুও যেন হারিয়ে ফেলেছিল। বাড়িতে এলেই যেন দম্ আটকে মারা যাবে সে। বাড়ির আবহাওয়াতে যেন কাজলের সর্বনাশা বিশ্বাসঘাতকতার বিষ-বাষ্প মেশান ছিল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তেমন কিছুই হলো না। খবরটা খবরের কাগজেও ছাপা হতে পারলো না। মিস্টার গার্লিক একদিন ডাকলেন মুখার্জিকে। সুহাস গিয়ে হাজির হলো সাহেবের বাড়িতে। সুহাসের চেহারা দেখেই সাহেব বললেন—এ কী হয়েছে তোমার? এ রকম মনমরা হয়ে গেলে কেন?

সুহাস চুপ করে বসে রইল সাহেবের সামনের চেয়ারে বোবার মত।

—লাইফে এইটুকু দুঃখ সইতে পারো না? জীবনের মানে কি এই? শুধু একটানা সুখ পাওয়া?

তারপর আরো বোঝাতে লাগলো সাহেব। বললে—তোমার স্ত্রী শিগ্গিরই ছাড়া পাবে।

—কিন্তু ও স্ত্রীকে নিয়ে আমি কী করবো স্যার?

সাহেব অনেক সান্ত্বনা দিলে। অনেক যুক্তি দিয়ে বোঝালে। বললে—দেখ মুখার্জি, সব মানুষেরই একটা গোপন হিস্ট্রি থাকে, সে হিস্ট্রি সে কারোর কাছে প্রকাশ করতে পারে না। হাজব্যাণ্ড্ ওয়াইফের কাছে প্রকাশ করতে পারে না, ওয়াইফও হাজব্যাণ্ডের কাছে প্রকাশ করতে পারে না—ওটা ভুলে থাকাই ভালো—

—কিন্তু ভুলতে যে পারছি না।

সাহেব বললে—পারবে, পারবে, চেষ্টা করলেই ভুলতে পারবে! নিজের ছেলের মৃত্যু-শোক পর্যন্ত মা ভুলে যায়, আর তুমি পারবে না ভুলতে?

—কিন্তু ওই স্ত্রীর সঙ্গে এর পর একসঙ্গে বাস করবো কী করে? আমি যে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতুম আমার স্ত্রীকে—

সাহেব বললে—তুমি একলা কেন? সবাই প্রাণ দিয়েই ভালবাসে নিজের স্ত্রীকে—

—কিন্তু আমার এই আনচেস্ট্ স্ত্রীকে নিয়ে আমি কী করে থাকবো এক বাড়িতে?

সাহেব হঠাৎ বললে—কিন্তু একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করি, তোমাদের কোনও সন্তান হয়নি কেন মুখার্জি? কোনও ডাক্তার দেখিয়েছিলে?

সুহাস বললে—না, সন্তান আমিই চাই নি স্যার। ভেবেছিলুম আমরা দু'জন, আমরা দু'জনেই যথেষ্ট—আমরা দু'জনেই আমাদের সংসারের পক্ষে যথেষ্ট—আর কারো দরকার হবে না—

—ভুল করেছিলে মুখার্জি। আমার মনে হয় তোমার স্ত্রীর কোথায় একটা অভাব ছিল, তা তুমি জানতে চেষ্টা করোনি!

সুহাস জিজ্ঞেস করেছিল—কিন্তু এখন আমায় কী করতে বলেন আপনি? আমি কি করতে পারি?

—কিছু না। যেন কিছুই ঘটে নি। তোমার স্ত্রী দু'একদিন বাদেই ছাড়া পাবে। তুমি নিজে গিয়ে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে বাড়িতে। কোনও কথা জিজ্ঞেস করবে না। কেন খুন করেছিল কী জন্যে খুন করেছিল, কার কোন্ দোষে খুন করেছিল, কিছু জিজ্ঞেস করবে না! যেন কিছুই হয়নি, কিছুই ঘটে নি। ঠিক আগেকার মত সহজভাবে থাকবে। তবেই সমস্ত ঠিক হয়ে যাবে। তোমরা ইণ্ডিয়ান, তোমরা হিন্দু, তোমরা জানো না তোমাদের ম্যারেজ-লাইফ আমাদের চেয়ে কত সুখী। আমরা মনে মনে তোমাদের হিংসে করি, তা জানো?

তারপর হঠাৎ সুহাসের পিঠ চাপড়ে দিলে।

বললে—বাক্ আপ্ বয়, নো ফিয়ার, লাইফ ইজ্ বিটার বাট্ সুইট্ টু—মনে কোর না জীবনটা শুধু কষ্টের হয়—জীবনে সুখও আছে, এটা ভুলে যেও না—

সাহেবের বাড়ি থেকে বেরিয়ে সুহাসের কেমন মনে হয়েছিল তার জীবনেও আবার সুখ আসবে। আবার সুখী হবে সে! আবার বেঁচে উঠবে, আবার সংসার করবে, আবার ভালবাসবে!

তারপর একদিন ছাড়া পেলে কাজল। জেলখানার হাজত থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল বাইরে। বাইরের আলোর পৃথিবীতে! দূরে থেকে সুহাস দেখছিল। কাজলের চেহারাটা যেন এই ক'দিনেই রোগা হয়ে গেছে। গাড়িটা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল দূরে। প্রথমে দেখা হলে কী কথা বলবে সেইটেই ভাবছিল। তারপর সামনের দিকে এগিয়ে গেল। হাতটা বাড়িয়ে দিলে। বললো—এসো—

কাজলের চোখ দিয়ে জল পড়ছিল।

সুহাস জিজ্ঞেস করলে—খুব কষ্ট হয়েছিল?

কাজল মুখ নিচু করে শুধু বললে—না—

তারপরে পাশাপাশি এক গাড়িতে বসে অনেকক্ষণ কাটলো। গাড়িটা এ'কে-বে'কে অনেক রাস্তা পরিক্রমা করে এসে পৌঁছলো বাড়িতে। কানাই দৌড়ে এল। এসেই হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলো মা'র পায়ের কাছে বসে পড়ে। কাজল কিছু কথা বললে না। নিজেই কেঁদে ফেললে। আবদুল এসে দাঁড়াল। বিবিও এল। এসে প্রতিদিনকার মত বললে—মাইজী, চুল বেঁধে দিই তোমায়—

বিবি চুল বেঁধে দিলে কাজলের। কাজল গা ধুতে গেল কলঘরে। কলঘর থেকে বেরিয়ে নতুন পাট-ভাঙা শাড়ি-ব্লাউজ পরলে। তারপর ঘরে এসে বসলো।

সেদিনের কথা সব মনে আছে সুহাসের। জীবনের স্মরণীয় দিন সেটা। তারপর থেকে একই বাড়িতে, একই ছাদের তলায় দু'জনে বাস করতে লাগলো দিনের পর দিন, কিন্তু কারো সঙ্গে কারো কথা নেই। এ এক অদ্ভুত সংসার।

কাজল একদিন জিজ্ঞেস করেছিল—কই, তুমি আর কথা বলো না তো?

সুহাস শুধু বলেছিল—এবার থেকে বলবো!

সেই এবার আর আসেনি সুহাসের জীবনে। ক্ষমা বড় জিনিস, মহৎ জিনিস। ক্ষমার তুল্য বড় ধর্ম নেই সংসারে। ও-সব বইতে পড়া আছে। ও-সব বইতে লেখা থাকাই ভালো। মানুষ ওতে মহৎ হবে। জগৎ ওতে সুখের জায়গা হবে। কিন্তু মিস্টার গার্লিক যা-ই বলুক, সুখ নেই পৃথিবীতে। সুখ যাকে বলি, সে তো দুঃখেরই রকমফের। উপদেশ দেওয়া ভালো, উপদেশ শোনাও ভালো। কিন্তু উপদেশ পালন করতে যারা পারে, তারা হয় মহাপুরুষ, নয় পশু। বাস্তব জীবনে উপদেশের কোনও দাম নেই। নইলে স্যার পি-সি-রায়ের অত উপদেশে কিছুটা অন্ততঃ কাজ হতো!

মিস্টার গার্লি একদিন জিজ্ঞেস করেছিল—কবে চাকরিতে রিজিউম করবে?

সুহাস বলেছিল—আরো কিছুদিন বিশ্রাম চাই স্যার, এখনও মনটাকে ঠিক বশে আনতে পারি নি।

সত্যি, দিনের পর দিন কাটতো আর এক অস্বাভাবিক দম্পতি বাস করতো একটা ছাদের তলায় অস্বাভাবিক ভাবে। একই সঙ্গে খেত, একই বিছানায় শুতো, কিন্তু একজনের কাছ থেকে আর একজন যেন শত যোজন দূরে চলে গিয়েছিল। চোখের সামনে থেকেও যেন চোখের আড়ালে থাকা। কোথায় যে সারাদিন কাটতো সুহাসের, কোথায় কোন্ নগণ্য বস্তির আশেপাশে, আবার কখনও শহরের জনারণ্যে। পা আর চলতে চাইত না। সকালবেলা পা-জোড়া চালিয়ে দিত সুহাস নিরুদ্দেশ যাত্রার উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু সন্ধ্যেবেলা কেমন করে আবার ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে ফিরে আসতো নিজের বাড়িতে। সেই বাগান ছিল, সেই মালী ছিল, সেই দরোয়ান ছিল, সেই বিবি, আবদুল, কানাই সবাই ছিল। তবু মনে হতো কিছুই যেন নেই সুহাসের। একেবারে যেন নিঃস্ব হয়ে গেছে সুহাস। তার মনে যেন ফুটো হয়েছে, তার মনে যেন ফাট্ ধরেছে।

এই কানাই-এর জন্যেই তখন সুহাসের বেশি কষ্ট হতো। কানাই বলতো—বাবু, আপনি আজকেও খেলেন না?

আশ্চর্য, সারাদিন ঘুরে ঘুরে ক্ষিদেও পেত না সুহাসের। কতদিন যে খায়নি, কত রাত যে ঘুমোয়নি, তা কেউ জানতো না, কেউ দেখতোই না, কেউ ভাবতোই না।

শেষকালে সেই অবধারিত কাণ্ডটা ঘটলো।

বললাম—তারপর?

সুহাসবাবুর বেশি কথা বলতে শেষকালে কষ্ট হতো। খানিকক্ষণ কথা বলার পর একটু বিশ্রাম নিতেন। যে ক'দিন ছিলাম কাটনীতে, সে-ক'দিন অনেক কাহিনী শুনেছি। সুহাসবাবুর কোনও সঙ্গীই ছিল না। একলা-একলাই এতদিন কাটিয়েছেন। আমি যেতে তবু একজনের সঙ্গে কথা বলে বাঁচলেন যেন। কিন্তু তখন তাঁর বাঁচার মেয়াদ বোধহয় শেষ হয়ে এসেছে।

খালি বলতেন—আপনি যে আমার কি উপকার করলেন, আপনি নিজেও তা জানেন না।

একদিন বলেছিলেন—একদিন আমি স্যারের কথা খেলাপ করেছি, স্যার আমাকে বড় ভালবাসতেন। জীবনে আমি তাঁকে আমার মুখ দেখাতে পারিনি। যেদিন তিনি মারা গেলেন, আমি শ্মশানে গেলাম তাঁকে দেখতে। মনে হলো তিনি যেন আমাকে বকছেন। আমাকে ভর্ৎসনা করছেন। বলছেন—এখন ভালো করে ভুলের খেসারৎ দে—

তাই সারা জীবনে ভুলের খেসারতই দিয়ে গেলাম। সেই জন্যেই আপনাকে আমি ডেকেছি। আপনি কাজলের ওই বইটা শেষ করে আমাকে ভুলের খেসারত দেবার সুযোগ করে দিন দয়া করে।

জিজ্ঞেস করলাম—আপনার স্ত্রী কোথায়?

—ওই যে!

বলে দেয়ালের গায়ে ঝোলানো ছবিটার দিকে দেখালেন। বললেন—ওই আমার স্ত্রী, ওই আমার ভুল।

—কেন? ভুল কেন বলছেন? আপনার অপরাধ কোথায়?

সুহাসবাবু বললেন— অপরাধটা আমারই! তবে সমস্ত ঘটনাটা শুনুন, আমি বলছি—

তারপর সুহাসবাবু একটু জল খেয়ে বলতে লাগলেন—এ-ঘটনার অনেক দিন পরে একদিন হঠাৎ আমার কী খেয়াল হলো। তখন বাগান নেই, বাগানের মালীও নেই, তখন আমার শরীরও খারাপ হয়ে গেছে। আমি পাগলের মত বাড়িতে বাস করছি। রাত অনেক হয়ে গেছে। কাজল তার বিছানায় ঘুমিয়েছে। আমি আর ঘুমোতে পারলাম না। আমি বিছানা ছেড়ে উঠলুম। উঠে একবার ভাবলুম, এ-বাড়িতে আর বেশি দিন থাকলে আরো পাগল হয়ে যাবো। আমি আস্তে আস্তে কাজলের আঁচল থেকে চাবির তাড়াটা নিলাম। নিয়ে বাক্স-দেরাজ-আলমারী সব খুললাম। হঠাৎ কাজলের একটা নিজের আলমারী খুলতেই কেমন অবাক হয়ে গেলাম। সেটা কখনও আমি খুলিনি আগে। তার নিজের জিনিষ-পত্রই থাকতো তাতে। আমি ও-সব কিছুই দেখতাম না কখনও। কোথায় কার কী জিনিষ থাকতো, তা-ও দেখতাম না। কাজলই সমস্ত গুছিয়ে বার করে দিত আমাকে। দেখলাম—একটা সিল্কের রুমালে জড়ানো কী একটা রয়েছে তাতে। আগ্রহ হলো দেখতে। দেখলাম—এক তাড়া চিঠি। একটা নয়, দুটো নয়, একশো-দুশো চিঠি। খুব যত্ন করে তারিখ মিলিয়ে সাজিয়ে সাজিয়ে রাখা। চিঠিগুলো পড়তে গিয়ে মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো। দেখি কোনওটা লেখা লণ্ডন থেকে, কোনওটা সিঙ্গাপুর থেকে, কোনওটা পেনাঙ থেকে, কোনওটা বর্মা থেকে।

সেই রাত্রেই একটার পর একটা সব চিঠি পড়ে গেলুম। প্রত্যেকটি কাজলের বিয়ের আগেকার চিঠি। লিখেছে আচারিয়া। পড়তে পড়তে চোখের সামনে সব ঝাপ্‌সা হয়ে গেল। এতদিন এ-কথা কিছুই জানতাম না আমি। এতদিন আমাকে এমন করে প্রতারণা করে এসেছে—

বিছানার কাছে এসে দেখলাম কাজল ঘুমে অচৈতন্য। তালে-তালে নিঃশ্বাস পড়ছে। আমার রক্তের মধ্যে আগুন জ্বলে উঠলো। আমি উন্মাদ হয়ে গেলাম সেই মুহূর্তে।

জিজ্ঞেস করলাম—তারপর?

—তারপর এক কাণ্ড হলো। আমি তখন বাড়িতে। তখনও চাকরিতে রিজিউম করিনি। একদিন বীণা এল। কাজলের বন্ধু। করাচী থেকে কলকাতায় এসেছিল। সরোজ আর্সেনি ছুটি পায়নি বলে। বীণা এসেই ছুটে এসেছে আমাদের বাড়িতে।

এসেই জিজ্ঞেস করলে—কাজলদি? কাজলদি কোথায়?

কানাই বলেছিল—মা তো নেই—

—তাহলে জামাইবাবু? জামাইবাবু আছেন?

আমার কাছে এসে আমার চেহারা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। বললে—এ কী চেহারা হয়েছে আপনার? কাজলদি কোথায়?

বললাম—আপনি শোনেন নি? কাজলদি তো নেই!

—নেই মানে?

বললাম—নেই মানে, নেই—

কী হয়েছিল, শেষকালে কোন্ ডাক্তার দেখছিল, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জিজ্ঞেস করলে। তারপর কাঁদতে লাগলো। তার কান্না দেখে আমার চোখ দিয়েও জল পড়তে লাগলো।

বীণা বললে—অনেক দিন আমি খবর নিতে পারিনি, দু'-একখানা চিঠি লিখেছিলুম, তারও জবাব পাইনি, তাই কলকাতায় পৌঁছেই দৌড়ে এসেছি।

তারপর চলে যাবার আগে বললে—একটা কথা ছিল—

বললাম—বলুন,—

বীণা বললে—আমার নিজের অনেক-গুলো চিঠি কাজলদির কাছে রেখে গিয়েছিলুম, সেগুলো কোথায় আছে জানলে নিয়ে যেতাম—

বললাম—কার চিঠি?

বীণা বললে—আমারই চিঠি! বহু-দিন আগে একজন আমাকে লিখেছিল, প্রায় একশো-দুশো চিঠি। একটা সিল্কের রুমালে জড়ানো ছিল, কাজলদি তার নিজের আলমারীতে যত্ন করে রেখে দিয়েছিল সেগুলো—

আমার মাথায় তখন রক্ত টগবগ্ করে ফুটছে—

আমি যেন ভুল শুনেছি।

বললাম—কার চিঠি বললেন?

বীণা বললে—এক ভদ্রলোক আমাকেই লিখেছিলেন চিঠিগুলো বিয়ের আগে, সেগুলো আমি কাজলদির কাছে রেখে দিয়ে গিয়েছিলাম, যাতে কেউ দেখতে না পায়—আপনি একটু খুঁজে দেখুন না—

বললাম—তারপর?

সুহাসবাবু বলতে লাগলেন—তার-পর পরে আরো যা শুনলাম, তাতে আমার বাক্‌রোধ হয়ে এল। শুনলাম বিয়ের আগে আচারিয়া বীণার চরম সর্বনাশ করেছিল—

—চরম সর্বনাশ মানে?

সুহাসবাবু বললেন—বিয়ের আগেই বীণার এক সন্তান হয়েছিল, কুমারী জীবনের চরম লজ্জার অঘটন ঘটেছিল, সেই কলঙ্কের সুযোগ নিয়ে আচারিয়া দিনের পর দিন কাজলের কাছে এসে টাকা চাইতো, কাজলকে ব্ল্যাক-মেইল করতে চাইত, শেষকালে কোনও উপায় না দেখেই কাজল এই চরম পথ বেছে নিয়েছিল—

এর পর আপনাকে আর আমি কিছু বলতে পারবো না। আমি যে এখনও বেঁচে আছি, এ বোধহয় আমারই পাপের ভোগ। তাই আপনাকে বার বার চিঠি লিখেছিলাম আসতে।

আর বেশি দিন বাঁচেন নি সুহাস-বাবু। বোধহয় আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই এতদিন টিঁকে ছিলেন।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম—আপনি নিজের স্ত্রীকে শেষ পর্যন্ত খুন করেছিলেন?

সুহাসবাবু বলেছিলেন—নিজের স্ত্রীকে নয়, আমি আসলে আমাকেই খুন করেছিলাম সেদিন—আমি আত্মহত্যাই করেছিলাম বলতে গেলে—

—কিন্তু কী করে তা সম্ভব হলো? কী করে খুন করলেন?

সুহাসবাবু বলেছিলেন—স্বদেশী যুগে যেভাবে পুলিশ টেররিস্টদের জেলে পুরে আস্তে আস্তে কষ্ট না দিয়ে, তাদের বুঝতে না দিয়ে খুন করতো, আমিও তেমনিভাবে খুন করেছিলাম। সে ঠিক খুন নয়, সেও একরকমের আত্মহত্যা! আমি সত্যিই আর বেঁচে নেই। আমার অদৃশ্য আত্মা আপনার সঙ্গে কথা বলছে শুধু,—আমি মরেই গেছি—

শেষ জীবনে সুহাসবাবুর যা-কিছু সম্পত্তি ছিল সবই তিনি দিয়ে গিয়ে-ছিলেন ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিকে। স্যার পি সি রায়ের নামে কোনও কিছু স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থার জন্যে। আসলে তার কী হয়েছে আমি খবর রাখি না। আমার কাছে এখনও সেই পাণ্ডুলিপিটা আছে। কাজল দেবীর লেখা অসমাপ্ত উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি—রক্ত বদলার। সে আর আমার শেষ করা হয়নি। বোধহয় শেষ করার মত নয়ও তা।

॥ সমাপ্ত ॥

যুগান্তর

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী
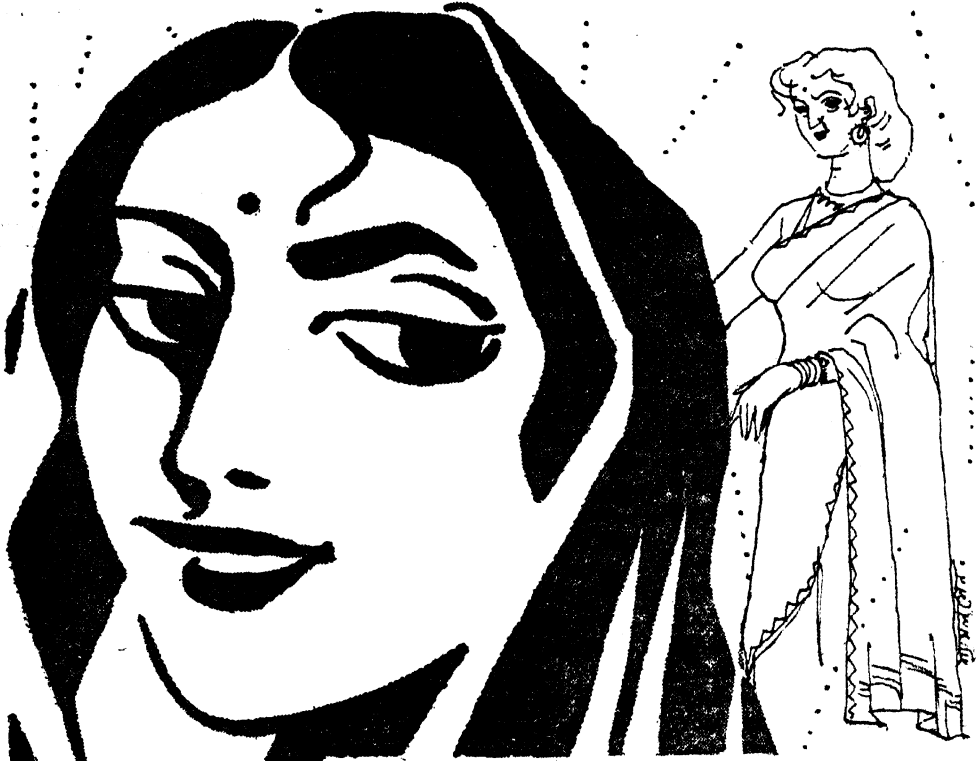
ম্যাথুগঞ্জের বিরাট রেলকারখানার অন্যতম ইঞ্জিনিয়ার অংশুপ্রকাশ মুখোপাধ্যায়ের পত্নী রেবাদেবী প্রসাধনে বসেছেন।

সামনে সুদৃশ্য ড্রেসিংটেবল, তারই আয়নার দিকে প্রায় কাঁচে মুখ ঠেকিয়ে প্রসাধন চলেছে। দিনের আলো প্যাঁট প্যাঁট করছে, তা সত্ত্বেও মাথার উপর দু'শ শক্তির বিজলী বাতি জ্বলছে। ঘন্টাখানেক ধরে মুখে চুনকাম, ভ্রূযুগলে বুরুশ, অক্ষিকোটরে কালিমা ও ওষ্ঠাধরে লালিমা লেপন পর্ব শেষ করে একটা হাঁপ ছেড়ে তিনি কপালে সিঁদুরের টিপ কাটা সুরু করলেন।

রেবাদেবীর বয়স চাল্লশের কাছাকাছি হলেও তিনি নিত্যনিয়মিত বৈকালে প্রসাধনের সময় কপালে টিপ পরতেন। কারণ তিনি জানতেন তাঁর বিরাট ললাটের অন্তত খানিকটা জায়গা টিপ দিয়ে ভর্তি করতে না পারলে মুখখানা মোটেই মানানসই হয় না। ওদিকে আবার তাঁর মসীবিনিন্দিত চকচকে চামড়ার পটভূমিতে লাল সিঁদুর তেমন খোলে না। তাই সিঁদুরের সঙ্গে অভ্র, তিলকমাটি ইত্যাদি মিলিয়ে তিনি এমন একটি রঙ আবিষ্কার করেছিলেন যা তাঁর চামড়ার সঙ্গে বেশ খাপ খায়।

খুব মনোযোগের সঙ্গে মাথাটা প্রায় আয়নার গায়ে ঠেকিয়ে কপালে সিঁদুরের কাঠিটি সবে ছুঁইয়েছেন এমন সময়ে তাঁর মেয়ে চন্দ্রমা নাচতে নাচতে এসে মাকে জিজ্ঞাসা করলে—হ্যাঁ মা, কোন ফ্রকটা আজ পরব?

আচমকা মেয়ের আওয়াজে তাঁর তন্মনস্কতায় আঘাত লাগল, কিছু সিঁদুর কপাল থেকে ঝরে নাকের উপর পড়ল। তিনি বিরক্ত হয়ে মেয়ের দিকে চাইলেন।

চন্দ্রমার দু'হাতে দুটি ফ্রক। সে দেখতে প্রায় তার মায়েরই মতো—কালো, ছিপছিপে গড়ন, চোখ দুটো কোটরগত, নাকটা বেশ লম্বা, মায়েরই মতো বিরাট

কপাল—বয়স পনেরো ষোলো। মা ফিরতেই মেয়ে বললে—তুমি বেছে দাও, নইলে—

রেবাদেবী কর্কশ কণ্ঠে বললেন—তোমাকে আর কত শেখাব বাছা! এই রকম হাল্কা রঙের ফ্রক পরে রাত্তিরের পার্টিতে যাওয়া যায় কখনও?

সেদিন সন্ধ্যেবেলা মুখুজ্জে পরিবারে প্রসাধনের এই রকম হুড়োহুড়ি পড়ে যাওয়ার বিশেষ কারণ ছিল। রাত্রে তাঁদের অন্যতম প্রতিবেশী পটস্ পরিবারে ছিল তাঁদের নৈশভোজনের নিমন্ত্রণ।

পটস্‌রা জাতিতে ফিরিঙ্গি। স্বাধীনতা পাওয়ার পর গুদোমঝাড়া যে সব ফিরিঙ্গি এদেশে থেকে গিয়েছিলেন, পটস্ ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। অংশুপ্রকাশের মতো তিনিও সেখানকার রেলকারখানার ইঞ্জিনিয়ার। পটস্ দম্পতির অনেকগুলি সন্তান, প্রায় প্রতি-মাসেই একটি না একটি জন্মদিন লেগেই আছে। পটস্‌দের ওখানে খাওয়া-দাওয়া হতো চলনসই বটে কিন্তু বেলা চারটে থেকে হুল্লোড় সুরু হতো—শেষ হতো রাত্রি প্রায় বারোটায়। পটস্‌দের অনেক বন্ধু এবং বান্ধবী এই সব উপলক্ষ্যে পুত্র-কন্যাসহ কলকাতা থেকে এসে উপস্থিত হতেন। তাঁদের ঘরের সফেন শ্যাম্পেন অনেক তৃষ্ণার্ত ব্যক্তিকেই আকর্ষণ করত। সন্ধ্যে থেকেই গ্রামোফোনে নাচের বাদ্যির সঙ্গে জোড়ায় জোড়ায় নৃত্য সুরু হতো। অনেক খাঁটি ভারতীয় মহিলা ও পুরুষ এই সব নাচে যোগ দিতেন। পটস্ নিজে ছিলেন অসম্ভব রকমের মোটা আর পটস্ পত্নী ছিলেন অসম্ভব রকমের রোগা। কিন্তু উভয়েই ছিলেন নৃত্যবিলাসী। যখন তাঁরা জোড়ায় নাচতেন তখন মনে হতো যেন কোলাব্যাঙ ও গঙ্গাফড়িঙে জোট লেগে গেছে।

অংশুপ্রকাশদের অন্যতম প্রতিবেশী ছিলেন মিস্টার ওয়াটসন। আসলে তিনি ছিলেন খাঁটি চীন দেশের লোক। ওয়াট-সনের পিতা দেশে থাকতেই খৃষ্টধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন; পরে কলকাতায় এসে বাঁশের ও বেতের ঝুড়ি বাক্স ইত্যাদির ব্যবসা করে বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হয়েছেন। তিনি ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষা দিয়েছিলেন।

মিস্টার ওয়াটসন ফিরিঙ্গি মেয়ে বিয়ে করেছিলেন। তাঁরা স্বামী-স্ত্রী নৃত্য-বিলাসী ছিলেন না বটে, কিন্তু তাঁরা ছিলেন ভোজনবিলাসী। বিশ্বের কোথায় কি ভালো খাবার পাওয়া যায়, কোন জাতি কোন বস্তু ভালো রান্না করতে পারে সে সম্বন্ধে ওয়াটসনের জ্ঞান ছিল অদ্ভুত। তিনি নিজেও ছিলেন ভালো পাচক আর স্ত্রীকেও এই বিদ্যেটি ভালো করেই শিখিয়েছিলেন। অবশ্য বাড়ীতে তাঁর দু'-জন ভালো খানসামা ছিল। খাদ্য সম্বন্ধে ওয়াটসন যখন আলোচনা করতেন তখন বেশ বোঝা যেত, অন্নই যে ব্রহ্ম সে সম্বন্ধে তাঁর ধারণা সুস্পষ্ট। চব্য চোষ্য লেহ্য পেয়ের মধ্যে যে রস লুকিয়ে আছে তাকেও যে ব্রহ্মানন্দসহোদর নাম দিতে পারা যায় তা যুক্তি-তর্ক দিয়ে তিনি যে কোনো সময় প্রমাণ করে দিতে পারতেন।

উপনিবেশের আর এক দিকে থাকতেন মিস্টার লাল—সপরিবারে। তাঁরা ছিলেন পাঞ্জাবী ও সুন্দরের ঝাড়। কর্তা গিন্নী দুই কন্যা ও এক পুত্র—সকলেই দেখতে খুবই সুন্দর এবং এইজন্যে তাঁরা ছিলেন বিশেষরূপে গর্বিত। লাল সাহেব স্পষ্টই বলতেন—পাঞ্জাবের তুল্য দেশ নেই, পাঞ্জাবীদের মতো ভালো রান্না ভারত-বর্ষের আর কোথাও হয় না ইত্যাদি ইত্যাদি। নৈবেদ্যের চুড়োর ওপরে সন্দেশের মতো লালসাহেব ছিলেন আবার বিলেতফেরত। তবে এই ধরণের গর্বপ্রকাশের মধ্যে কখনও অসৌজন্য প্রকাশ পেত না বলে উপনিবেশের সকল পরিবারের সঙ্গে তাঁদের ছিল বিশেষ হৃদ্যতা। উপনিবেশের মধ্যে আরও দু'ঘর বাঙালী ছিলেন—সেখানেও খাওয়া-দাওয়া আনন্দোৎসব কিছু কম হতো না।

সে বছর চন্দ্রমা প্রথম বিভাগে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল। অংশুপ্রকাশের ইচ্ছে ছিল মেয়েকে কলকাতায় তাঁর বাপের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে কোনো ভালো কলেজে লেখাপড়া শেখাবেন। অংশুপ্রকাশের পিতা অংশু-মৌলি বড় সরকারী চাকুরে ছিলেন। তাছাড়া তাঁর পৈত্রিক ধনসম্পত্তিও প্রচুর ছিল। একটি মাত্র ছেলের সন্তান দুটিকে কাছে রেখে মানুষ করেন এই সাধ তাঁর বহুদিনের। কিন্তু রেবাদেবী ছেলে-মেয়েকে কাছ ছাড়া করতেন না।

অংশুপ্রকাশের মা ছিলেন দারুণ শুচিবাইগ্রস্ত লোক। সকাল থেকে বাড়ী-ঘর ঝাঁটপাট, কল-মাজা, দরজা-জানলা-চৌকাঠ গোবর আর গঙ্গাজল দিয়ে ধোয়া ইত্যাদি অতি উচ্চশ্রেণীর কাজগুলি সারতে তাঁর বেলা দুটো অবধি কেটে যেত। সন্ধ্যে অবধি বাকি সময়টা কাটত পুজো ও স্নানে। সন্ধ্যেবেলা তিনি নিজ হাতে প্রত্যেকটি কয়লা গোবরজলে ধুয়ে উনুনে আগুন দিতেন। তারপর আধসের দুধ দিয়ে এক জামবাটি চা পান ক'রে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতেন। রাত্রি আটটা নাগাদ নিজ হাতে খান কয়েক বিশুদ্ধ গব্য ঘৃতে ভাজা লুচি ও একটি তরকারী রান্না ক'রে আহার করতেন। ভাত মোটেই খেতেন না কারণ সেটা না কি ভীষণ সকড়ি। তাঁর এই কৃচ্ছ্রসাধন দেখে সকলেই মনে করেছিল তিনি অচিরেই মোক্ষলাভ করবেন; কিন্তু দিনের পর দিন তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে লাগল। স্ত্রীর মোক্ষলাভ সম্বন্ধে হতাশ হয়ে বাড়ীরই এক কোণে আলাদা করে তাঁর নিজের খাওয়া-দাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা করলেন। এতে গিন্নীর আপত্তি ছিল না; তবে বাড়ীতে মাছ ঢুকলে গিন্নী ভয়ানক গোলমাল করতেন—মাংসের কথা ছেড়েই দেওয়া যাক। গিন্নীর শিবু নামে একটি প্রিয় চাকর ছিল। সে গিন্নীর কথা অনুসারে দিনে চারবার স্নান করত। তাঁরই মতো সমস্ত দিন অনাহারে থেকে রাত্রিতে গিন্নীর দেওয়া চারখানি লুচি দিয়ে উদরপূরণ করত। তার কাজের মধ্যে ছিল রোজ রিক্সা ক'রে তিন কলসী গঙ্গাজল ও এক ঝুড়ি শক্ত গোবর আহরণ করে আনা। এই কাজে শিবুর রোজ এক টাকার ওপরে আয় হতো। শুধু তাই নয় গঙ্গাজল ও গোবর আনার ফাঁকে সে বাইরে এক জায়গায় বেশ করে আহার করে আসত।

গিন্নী মাসে মাসে দু'বার করে গঙ্গা-স্নান করতে যেতেন। বেলা দুটোর সময় তিনি গাড়ীতে উঠতেন বটে কিন্তু সকাল দশটায় ট্যাক্সি এসে দরজায় দাঁড় করানো হতো। এই সময়টা মিটার চড়তে থাকত আর তারই ফাঁকে ফাঁকে গিন্নীর আজ্ঞা মতো শিবু চাকর গঙ্গাজল ও গোবর দিয়ে তিনবার গাড়ীকে শোধন করে আসত।

এই সম্পর্কে একদিনের একটি ঘটনা স্মরণীয় হ'য়ে আছে। সেদিন সকাল হ'তে না হ'তে গাড়ী ডাকা হয়েছিল। সিংজী দরজার কাছে গাড়ী নিয়ে বসে থেকে থেকে ঢুলতে লাগল। ঘন্টাখানেক বাদে শিবু এসে এক-বার সিংজীর অগোচরে গাড়ী-খানাকে শোধন করে গেল। ঘন্টাদুয়েকের মধ্যে সিংজী রাত্রিজাগা শরীরটিকে সিটের ওপর বসিয়ে দিয়ে নাসিকা গর্জন করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে শিবু একটা পেতলের গামলায় গোবর ও গঙ্গাজলের মিক্সচার নিয়ে এসে হাজির। সিংজীর অগোচরে সে বেশ ক'রে পেছনকার সিট পরিশোধন করতে আরম্ভ করেছিল; বোধহয় সেবারকার মিক্সচারটা কিছু কড়া ছিল। বিশ্রী গন্ধে সিংজীর চটকা ভেঙে যেতেই সে ধড়মড় করে উঠে শোধনরত শিবুকে দেখে গাড়ী থেকে টেনে আগে তাকে বার ক'রে দিলে। তারপর গামলা-

সুদ্ধ গোবরজল তার মাথায় ঢেলে দিয়ে গালে ঠাস ঠাস করে দুই চড় লাগিয়ে দিয়ে বললে—তোমাদের সোয়ারি আমি নেব না—আমার এই তিন ঘণ্টা ওয়েটিং চার্জ আমায় দিয়ে দাও, আমি চলে যাই।

শিবু তো এক হাত গালে দিয়ে আর এক হাতে গামলা ধরে চীৎকার করতে করতে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়ল। পেছন পেছন সিংজীও বাড়ীর মধ্যে ঢুকে চীৎকার করতে আরম্ভ ক'রে দিলে।

গিন্নী তখন সবেমাত্র কলঘরে ঢুকেছেন—ঘন্টা তিনেকের দায় নিশ্চিন্ত। অংশুমৌলি দুপুরবেলা খেয়েদেয়ে একটু নিদ্রার আয়োজন করছিলেন। এমন সময় চীৎকার শুনে বেরিয়ে এসে দেখেন—শিবুর ঐ মূর্তি। তিনি আর কি করবেন—টাকা দিয়ে সিংজীকে থামিয়ে বিদেয় ক'রে দিলেন।

এ হেন স্থানে কোনো মা-বাবা তাঁদের মেয়েকে পাঠিয়ে দিতে পারেন! অংশুপ্রকাশের স্ত্রী প্রকাশ করলেন, ও জায়গায় মেয়েকে পাঠানো যা আর যমের বাড়ী পাঠানোও তা। অংশুপ্রকাশ হেসে বললেন—গিন্নী, তুমি ভুল করছ। যমের বাড়ী থেকে ফিরে এসেছে এমন নজীর আমাদের দেশে একাধিক পাওয়া যাবে। কিন্তু স্বয়ং যম যদি মা'র পাল্লায় পড়েন তাহ'লে তাঁকে আর ফিরতে হবে না।

সে বছর অংশুপ্রকাশের ছেলেও ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছিল। স্থির করা হলো, কলকাতায় এসে কোনো হোস্টেলে থেকে সে পড়বে। চন্দ্রমাকে অবশ্য তাঁরা হোস্টেলে রাখা পছন্দ করলেন না। তার বেলায় ব্যবস্থা হলো সে তাঁদেরই কাছে থেকে প্রাইভেট ইন্টারমিডিয়েট পড়বে।

বছর দুয়েক বাদে সিতাংশুমৌলি এবং চন্দ্রমা দুজনেই ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে বেরিয়ে গেল। পড়াতে হ'লে মেয়েকে আর কাছে রাখা যায় না। চন্দ্রমাকে কোনো ভাল হোস্টেলে রেখে কলকাতাতেই পড়ানো যায় কি না তারই খোঁজ-পত্র চলছিল এমন সময় একটা কান্ড ঘটে গেল।

একদিন কারখানা থেকে ফিরে এসে অংশুপ্রকাশ দেখলেন তাঁর নামে সরকারী লম্বা খামের এক চিঠি এসেছে। চিঠি পড়ে জানা গেল যে, তাঁর আশাতীত পদোন্নতি হয়েছে এবং অবিলম্বে কলকাতায় গিয়ে সেখানকার আপিসের চার্জ বুঝে নিতে হবে।

চিঠিখানা তাঁদের পরিবারে হরিষে-বিষাদ নিয়ে এল। আশাতীত পদোন্নতিতে কারুর আপত্তি করবার কিছু ছিল না। কিন্তু কলকাতায় যাওয়া—এতকালের ম্যাথুগঞ্জ—পটস্, ওয়াটসন, লাল ঘোষ প্রভৃতি পরিবার—যাদের সঙ্গে প্রায় এই বিশ বৎসর কাল পরমানন্দে দিন কাটিয়েছেন—যাদের জন্যে চাকরিকে চাকরি বলে মনে হয়নি—সেই নাচ-গান হাসি-হুল্লোড় হৈ-চৈ ইত্যাদি ছেড়ে কলকাতায় যাওয়া—কারই বা মন চায়!

তাছাড়া কলকাতায় যাবেনই বা কোথায়! সেখানে বাড়ী ভাড়া পাওয়া যাবে না, নিজেদের বাড়ীতে গিয়ে ওঠা—সে তো যমের বাড়ী যাওয়ারই সামিল। অগত্যা উপায়ান্তর না দেখে অংশুপ্রকাশ তাঁর বাবার কাছে এ সম্বন্ধে পরামর্শ চেয়ে পাঠালেন। বাবা অংশুমৌলি উত্তরে লিখলেন—তুমি কলকাতায় বদলি হয়েছ এতে আমার আনন্দ হওয়ারই কথা; কিন্তু কলকাতার পরিস্থিতি যে রকম তাতে একটা নর্দমাও ভাড়া পাবার উপায় নেই। এদিকে তোমার মায়ের শুচিতা প্রায় সমস্ত বাড়ীখানিকেই আশ্রয় করেছে। তোমারা এসে যদি জোর করে খান কয়েক ঘর দখল ক'রে বসতে পার তাহ'লে বাড়ীখানা আর সেই সঙ্গে আমিও খানিকটা বেঁচে যাই। ঘর-দখল করার কথায় লজ্জা পাবার কিছু নেই কারণ আজকাল জবর-দখলের দিনই পড়েছে। আগে থাকতে কোনো কথা তোমার মাকে জানানো সমীচীন নয়।

অংশুপ্রকাশ পিতার ইঙ্গিত বুঝতে পেরে যাবার তোড়জোড় করতে লাগলেন। ক'দিন ধরে শুভেচ্ছা ও শুভবিদায়ের উৎসব শেষ ক'রে অংশুপ্রকাশ সপরিবারে ম্যাথুগঞ্জ পরিত্যাগ করলেন।

হঠাৎ বলা-কওয়া নেই—ছেলেকে সগোষ্ঠী উপস্থিত হ'তে দেখে গিন্নী তো প্রথমটা হকচকিয়ে গেলেন। নাতি নাতনী পুত্র পুত্রবধূ—সকলকে প্রণাম করতে উদ্যত দেখে তিনি চীৎকার ক'রে উঠলেন—থাক, থাক, আমাকে ছুঁয়ো না, তোমাদের কি কাপড় তার ঠিক নেই; আমি এইখান থেকেই তোমাদের আশীর্বাদ করছি।

প্রণাম করতে হলো না দেখে চন্দ্রমা, সিতাংশু ও রেবা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। তাঁর সেই গোবরে স্নাত দেহ ছুঁতে তাদের ঘেন্নাই হচ্ছিল।

এবার গিন্নী ঝাঁকড়ে উঠলেন—হ্যাঁ রে প্রকাশ, তা সপরিবারে এখানে আসছ—একথা আমাদের একটু জানাতে নেই?

অংশুপ্রকাশ বললে—নিজের বাড়ীতে আসব, তা আবার জানাবো কি! আমরা এখন এইখানেই থাকব।

গিন্নী আবার ঝঙ্কার দিলেন—এখানে কোথায় থাকবে বাছা?

অংশুপ্রকাশ মায়ের কথার কোনো জবাব না দিয়ে এদিক, ওদিক ঘুরে বাড়িখানা দেখে বেড়াতে আরম্ভ করলে।

মনে পড়ল তার মায়েরই আব্দারে বাড়ীর লম্বা লম্বা বারান্দা ও বড় বড় ঘরগুলি প্রথম শ্রেণীর কালো ও সাদা মর্মরে মন্ডিত হয়েছিল। আজ সেই সব মর্মরের ওপরে এক ইঞ্চি গোবরের প্রলেপ পড়েছে। তার সেই ছিম-ছিমে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সুবেশা মায়ের আজ কি পরিণামই না হয়েছে!

পিতা অংশুমৌলি নির্বিকার, উদাসীন। তিনি বাড়ীর এক কোণে একখানি ছোট ঘর নিয়ে বাস করেন। সৌখিন, ভোজনবিলাসী পিতা এখন দুবেলা নিজের হাতে ইকমিক কুকারে রান্না ক'রে খান। মাছ-মাংস যে কতদিন খাননি তার ঠিকানা নেই। বয়সের তুলনায় এককালে তিনি সুস্থ ও সবলই ছিলেন। অংশুপ্রকাশের মনে হলো—পিতা যেন আরো বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন।

এক সময় অংশুপ্রকাশকে ডেকে তিনি বলে দিলেন—মাছ-মাংস রান্নার হাঙ্গামা আর তোমরা কোরো না। ওগুলো বাইরে থেকেই খেয়ে এসো। তারপর একটু হেসে বললেন—এই দেখ না, মাছ-মাংস না খেয়ে আমি বেশ ভালোই আছি।

অংশুপ্রকাশ হেসে বললে—ভালই যে আছেন তা চেহারা দেখেই বুঝতে পারা যাচ্ছে। আজ থেকে আপনি আমাদের সঙ্গে খাবেন।

অংশুমৌলি বললেন—না না, এতে শান্তি বিঘ্নিত হবার সম্ভাবনা আছে। ও যেমন চলছে তেমনি চলতে দাও, সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে। অংশুপ্রকাশ শেষ পর্যন্ত সপরিবারে বাড়ীতেই রয়ে গেলেন। কিন্তু কথা রইল—মাছ কিংবা মাংস রান্না করা কিংবা বাইরে থেকে এনে খাওয়াও চলবে না।

প্রথম দিনকয়েক একরকম চলল। কিন্তু চীনে ওয়াটসনের টেবিলে খাদ্য, কুখাদ্য, অখাদ্য ও নিষিদ্ধ সমস্ত প্রকার মাংস খাওয়াই তার পরিবারের সকলেরই অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। এতদিন বাদে শুধু নিরামিষ তরকারী দিয়ে ভাত তাঁদের মুখে বেশিদিন রুচবে কেমন করে? তাই মধ্যে মধ্যে সন্ধ্যের ঝোঁকে বাইরে থেকে চপটা কাটলেটটা আনা চলতে লাগল। বাড়তে বাড়তে মাংসের ঝোলও আসতে লাগল। প্রথমটা খুব সাবধানেই এই ক্রিয়া চলছিল কিন্তু ক্রমেই সাবধানতা শিথিল হ'য়ে এল। ফলে একদিন গিন্নী কি করে যে টের পেয়ে

গেলেন—বাড়ীতে রীতিমত মাংসাদি খাওয়া চলছে—।

সেদিন সকালে শ্রীমতী স্বামীকে সন্ধেবেলায় আসবার সময় মাংস আনতে দেওয়ার জন্যে টাকা বার করছেন এমন সময় ওপর থেকে এ্যাটম বোমার নিনাদে সকলে চমকে উঠলেন।

তাড়াতাড়ি সকলে বারান্দায় বেরিয়ে এসে দেখলেন—অংশুপ্রকাশের মা—তাঁর দুই হাতে কনুই অবধি গোবর লিপ্ত—একখানি গামছা দিয়ে দেহ আবৃত করে তারস্বরে পুত্রবধূকে গালাগালি দিচ্ছেন। পুত্রবধূও ছাড়বার পাত্র নয়। সে ও দোতলার বারান্দা থেকে সমান-তালে শাশুড়ির উদ্দেশে পাল্টা বোমা ছাড়তে লাগল। অংশুপ্রকাশ নিজের স্ত্রীকে নিরস্ত্র করবার দু'একটা ক্ষীণ চেষ্টা করে অপারগ হয়ে নিচে নেবে গেল।

বাড়ীর কর্তা অংশুমৌলি নিজের ঘরে কি কাজ করছিলেন—হঠাৎ ওপর থেকে হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন বোমার আওয়াজ পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে গিন্নীকে জিজ্ঞাসা করলেন—কি হয়েছে?

গিন্নী চীৎকার করে বললেন— কি হয়েছে তা তোমার ঐ অমাবস্যে বৌকে জিজ্ঞেস কর।

পুত্রবধূ পালটা ঝাড়লেন—এই অমাবস্যের বাপের টাকাতে একদিন যে চার চাঁদিনি দেখেছিলে—ভুলে গেছ?

অংশুমৌলির অংশু ততক্ষণ মাথা থেকে পায়ে চলে পড়েছে। তিনি তাড়াতাড়ি ছেলেকে নিজের ঘরের মধ্যে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন—বৎস, যদি নিজ হিত চাও, তবে অবিলম্বে এই স্থান ত্যাগ কর। নচেৎ যুদ্ধের আরম্ভেই যা ব্যাপার দেখছি তাতে ভবিষ্যৎ বিশেষ সুবিধের নয় বলে মনে হচ্ছে।

অংশুপ্রকাশ বাড়ী খুঁজতে লাগলেন। শোনা যায় তেমনভাবে খোঁজ করলে কলকাতায় ষাঁড়ের দুধ ও বাঘের ডিমও পাওয়া যায়। হলোও তাই। খুঁজতে খুঁজতে বাড়ীও পাওয়া গেল। তবে যা পাওয়া গেল তাকে আর বাড়ী বলা যায় না— মাথা গোঁজবার একটুখানি জায়গা বললেই হয়।

মধ্য কলকাতায় এক গলির মধ্যে মজুমদারদের বাড়ী—খুবই উচ্চ এবং অভিজাত পরিবার তাঁরা। একশ বছর আগে তাঁদের কে একজন ব্যবসা করে ধনী হয়েছিলেন এবং সেই সময় সহরের কয়েকটি বড় ঘরের সংগে বৈবাহিক সূত্রে সম্বন্ধও হয়েছিলেন। ধন নেমে এসে এখন একেবারে তলিয়ে গেলেও বংশটা কিন্তু উঁচুই রয়ে গেল। অবশ্য এ কথা অন্য লোকে না জানলেও বংশধরেরা বুক ঠুকে সে কথা সর্বদাই জাহির করে থাকেন।

এই নতুন বাড়ীর মালিকেরা তিন-চারটি সরিক; তারমধ্যে একজন বিবাহ করেছেন। সকলেই অবশ্য চাকরি করেন কিন্তু চাকরির অর্থে বাড়ী মেরামত করা, ট্যাক্স দেওয়া প্রভৃতি খরচ কুলোয় না। কাজেই একতলার গুটি তিনচার ঘর ভাড়া দিতে হচ্ছে। একসময় এই ঘর-গুলির কোনোটিতে গোয়াল, কোনোটিতে খড়ের গুদোম ইত্যাদি ছিল। এখন চার-পেয়ে গরু গিয়েছে—দু-পেয়ে গরুরা পয়সা খরচ করে এই ঘর আশ্রয় করেছে। অংশুপ্রকাশ পাঁচশ টাকা সেলামি ও মাসে মাসে একশ টাকা করে তিনমাসের ভাড়া আক্কেলসেলামি অগ্রিম দিয়ে সপরিবারে এসে এই ঘরগুলিতে আশ্রয় নিলেন।

অংশুপ্রকাশ সকালবেলায় খেয়ে দেয়ে আপিসে চলে যান। ছেলেমেয়েরাও খেয়ে-দেয়ে যে যার কলেজে চলে যায়। রেবা-দেবী থাকেন একলা পড়ে। কাজেই বাড়ীওলাদের বৌমাটিকে নিয়ে এসে গল্প-গাছা করে সময় কাটাতে হয়। কর্তারা সবাই গত হয়েছেন—এখন শুধু ছেলে-ছোকরার দল। বউটির বয়স বেশি নয়, বছর দু'তিন হলো তার বিয়ে হয়েছে—এখনও কাচ্চা-বাচ্চা এসে পৌঁছয়নি।

রেবাদেবী ঘুরে ঘুরে ঘর দেখেন। এটি তাদের ঘর, এটি তার দেওরের ঘর, এটি একটি জ্যাঠতুতো দেওরের ঘর ইত্যাদি। একটি ঘরে তালা বন্ধ দেখে রেবাদেবী জিজ্ঞাসা করলেন—এ ঘরে কে থাকে? সব সময়েই তালাবন্ধ দেখি?

বউটি বললে—এটি আমার এক খুড়তুতো দেওরের ঘর। সে এতদিন মামার বাড়ীতেই থাকত। কিছুকাল আগে এসে তার নিজের ঘর দখল করেছে। তাকে বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। তার কারণ সকাল ন'টার সময় সে আপিসে বেরিয়ে যায়—আপিসের পর যায় মামার বাড়ী—সেখান থেকে ফেরে প্রায় রাত্তির দশটায়। তার খাবার চাপা দেওয়া থাকে—এসে খেয়ে দেয়ে নিজের ঘরে শুয়ে পড়ে।

ঘরের বাসিন্দার ইতিহাস শুনে অংশুপ্রকাশ-গিন্নী কিছু কৌতূহল অনুভব করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, ছেলেটির নাম কি?

বৌমা বললেন—সুকল্যাণ।

দিন কাটতে থাকে। অংশুপ্রকাশদের পরিবারের সকলের সংগেই বাড়ীওয়ালা-দের বেশ ভাব জমে উঠল—তারা সকলেই ভালো লোক। খায় দায়, চাকরী করে। সুকল্যাণের সংগেও তাদের আলাপ হলো—কিন্তু সে বড়ো একটা বাড়ীতে থাকে না বলে আলাপ তেমন জমে না।

একদিন—সেদিন বোধহয় রবিবার—সকালবেলাটা সুকল্যাণ বাড়ীতেই ছিল। ঘরের আসবাব-পত্র ঝাড়তে ঝাড়তে হঠাৎ মুখ তুলে দেখতে পেলে চৌকাঠের ওধারে চন্দ্রমা দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যে দেখছে। চন্দ্রমার দিকে সুকল্যাণের চোখ পড়তেই সে বললে—সোজা ভেতরে চলে এসো এখানে ঢুকতে টিকিট লাগবে না।

চন্দ্রমাও সপ্রতিভ মেয়ে, সেও সোজা ঘরের মধ্যে ঢুকে চারদিক চেয়ে বললে—বাঃ আপনার ঘরটিতো বেশ সাজানো!

সুকল্যাণ প্রত্যুত্তরে বললে—সোজা ঘর থেকে বেরিয়ে যাও।

চন্দ্রমা চমকে বললে—কেন, কি হল?

সুকল্যাণ বললে—চৌকাঠ পেরিয়ে যখন ভেতরে এসেছ, তখন আপনি আজ্ঞে পরাজ্ঞে—ওসব করা চলবে না। আমি যেমন সহজেই তোমাকে 'তুমি' বললুম, তুমিও তেমনি সহজে আমাকে 'তুমি' বলবে।

বলা বাহুল্য সেইদিনই চন্দ্রমার সংগে সুকল্যাণের ভাব জমে গেল। পরেরদিন থেকে চন্দ্রমা সময় পেলেই সুকল্যাণের ঘরে এসে গল্প করে। সুকল্যাণও ক্রমেই বাইরের আড্ডা কমিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরে। সুকল্যাণের মনে হয়—কালো হ'লেও চন্দ্রমার মুখশ্রী সুন্দর।

সে মাঝে মাঝে চন্দ্রমার কররেখা দেখে। এমনই চলেছে, একদিন সুকল্যাণ ব'লে ফেললে—চন্দ্রমা, তুমি আমাকে বিয়ে করবে?

চন্দ্রমা চমকে উঠল। সে বললে—বিয়ে? তারপর একটু চুপ করে থেকে বললে—তা কি ক'রে হবে?

সুকল্যাণ জিজ্ঞাসা করলে—কেন হবে না?

চন্দ্রমা ঢোঁক গিলতে গিলতে বললে তোমরা কায়স্থ, আমরা ব্রাহ্মণ। এ বিয়েতে বাবা-মা রাজী হবেন কেন?

সুকল্যাণ বললে—বাবা-মা না হোল, তুমি রাজী আছ কি না? আমরা রেজেস্ট্রী করে বিয়ে করবো।

চন্দ্রমা বললে—কিন্তু জাতের গন্ডী কাটিয়ে ওঠা সহজ নয়।

সুকল্যাণ বিদ্রূপের হাসি হেসে বললে—বল কি চন্দ্রমা! গ্যাগারিণ পৃথিবীর গন্ডী ছাড়িয়ে বেরিয়ে গেল আর তুমি জাতের গন্ডীর কথা বলছ?

গ্যাগারিণ যদি ভিন্ন জাতের মেয়ে বিয়ে করত তাহলে তাকে ঐ পৃথিবীর

গণ্ডীর চারিদিকেই ঘুরতে হতো—আর দেশে ফিরতে হতো না।

কথাটা বলেই চন্দ্রমা ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। চন্দ্রমা ঐ রকম করে বেরিয়ে যেতে সুকল্যাণ ভড়কে গেল। তার মনে হতে লাগল—চন্দ্রমা এখন যদি গিয়ে তার বাপ-মাকে এই কথা জানায়—ব্যাপারটা যে কতদূর গড়াতে পারে—তা ভাবতে ভাবতে সুকল্যাণ দস্তুরমত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। সে উঠে তাড়াতাড়ি জামা গায় দিয়ে দরজার তালা বন্ধ করে বেরিয়ে গেল।

অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরে চুপি চুপি খেয়ে দেয়ে সুকল্যাণ শুয়ে পড়ল। পরের দিন সকালবেলা নির্দিষ্ট সময়ে চন্দ্রমা তার ঘরে এল না দেখে সুকল্যাণের মনে হল চন্দ্রমা তার ওপর রাগ করেছে। একবার দূরে থেকে চোখাচোখি হয়েছিল কিন্তু তার মনে হল যেন চন্দ্রমা মুখটা ফিরিয়ে নিলে। সুকল্যাণ ভাবলে যাক গে, চন্দ্রমা বাড়ীর কারুকে জানায়নি, নইলে এতক্ষণ হাংগামা বেড়ে যেত।

পরের দিন নির্দিষ্ট সময়ে চন্দ্রমা সুকল্যাণের ঘরে দেখা দিলেই সুকল্যাণ জিজ্ঞাসা করলে—কি গো রাগ পড়েছে?

চন্দ্রমা অবাক হয়ে বললে—রাগ? কিসের রাগ।

সুকল্যাণ বললে—আমি ভাবছিলুম আমার কথায় বুঝি রাগ করেছ।

চন্দ্রমা বললে,—না, তোমার কথাটা নিয়েই ভাবছিলুম। সামনেই পরীক্ষা তার একটা ভাবনা আছে, তার ওপর তুমি একটা ভাবনা চাপিয়ে দিয়েছ।

সুকল্যাণ বললে—এত ভাবনার কি আছে?

চন্দ্রমা বললে,—না, আমাকে কিছুদিন ভাবতে দাও।

চন্দ্রমা ভাবতে লাগল। আর সুকল্যাণ আশায় দিন গুনতে লাগল।

একদিন ভোর পাঁচটার সময় সুকল্যাণের দরজায় ঘা পড়তেই সে ধড়-মড় করে উঠে দরজা খুলে দিয়ে দেখল—চন্দ্রমা দাঁড়িয়ে আছে।

চন্দ্রমা একরকম ছুটেই ঘরে ঢুকে বললে—আমি স্থির করে দেখেছি। বিয়ে করব। তুমি আজই নোটিস দিয়ে দাও।

সুকল্যাণ উৎফুল্ল হয়ে চন্দ্রমার একটা হাত ধরে বললে,—আঃ, তুমি আমায় বাঁচালে চন্দ্রমা।

সে দেখলে চন্দ্রমার দুই চোখ জবল-জবল করছে আর ঠোঁট দুটো স্ফুরিত হচ্ছে।

সুকল্যাণ বললে—তুমি বোসো একটু, ততক্ষণ চা তৈরী করি।

চন্দ্রমা বললে—না, আজ আমার পরীক্ষা আরম্ভ হবে, আমি যাই।—বলে সে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সুকল্যাণ স্টোভ পাম্প করতে করতে গুনগুনিয়ে গান ধরলে—

নয়নে তার এ কোন ভাষা,
অধরে তার এ কোন গীতি
আজ ভোরে মোর ঘুম ভাঙায়ে
অজানা সে কোন অতিথি।

যথা সময়ে চন্দ্রমার পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল। নোটিসের নির্দিষ্ট কাল অতীত হবার পরেই সুকল্যাণ ও সে একদিন রেজিস্ট্রারের ওখানে গিয়ে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হলো। রেজিস্ট্রারের আপিস থেকে বেরিয়ে সুকল্যাণ বললে— কেমন দিব্বি বিয়ের কল বানিয়েছে বলত—ঢুকলুম অবিবাহিত, আধ ঘন্টার মধ্যেই বেরোলুম বিবাহিত হয়ে।

তারা উভয়েই ঠিক করলে—ব্যাপারটা এখন খুবই গোপনে রাখা হবে। তারপর সময় ও সুবিধা বুঝে আস্তে আস্তে প্রকাশ করলেই হবে।

গোপন তথ্য কিংবা গোপন বিষয়ের মধ্যে ফাঁস হয়ে যাবার বীজ লুকিয়ে থাকে। সুকল্যাণ ও চন্দ্রমার বিয়ের গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে গেল। একদিন সকালবেলায় চন্দ্রমার ভাই সীতাংশু সিনেমার টিকিট কাটতে গিয়ে কোথা থেকে সংবাদটি শুনে এসে বাড়ীতে প্রকাশ করে দিলে।

সুসংবাদটি শোনা মাত্রই রেবাদেবী উগ্রচন্ডী মূর্তিতে ডাক দিলেন—চন্দ্রমা—কি শুনেছি সব! এ কি সত্যি?

চন্দ্রমা জানালে—সব সত্যি!

তারপরে একতরফা যা বলতে লাগল সে আর ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। রেবাদেবী শেষকালে বললেন—বেরোও আমাদের বাড়ী থেকে।

চন্দ্রমা আস্তে আস্তে সুকল্যাণের ঘরে গিয়ে সব কথা বললে। সুকল্যাণ বললে—আমাকে কিছুই বলতে হবে না, আমি সব কথা শুনেছি।

বাক্স আগেই গুছানো ছিল, সেটি তুলে নিয়ে ঘরের দরজায় চাবি লাগিয়ে তারা বেরিয়ে পড়ল।

রেবাদেবী সারাদিন কান্নাকাটি করলেন—অবিশ্যি নীরবে কারণ চোরের মার চেঁচিয়ে কাঁদবার উপায় নেই।

সীতাংশু না খেয়েই সিনেমা দেখতে চলে গেল। অংশুপ্রকাশ ছুটলেন বাপের কাছে সবকথা বলতে। অংশুপ্রকাশের বাবা সব শুনে বললেন—আমার নাতনী শেষকালে একটা কেরাণীকে বিয়ে করলে!

সেদিনে অংশুপ্রকাশদের রান্নাবাড়া না হলেও পরদিন আবার উনুনে আগুন পড়ল। অংশুপ্রকাশ নিয়মিত আপিসে বেরিয়ে গেলেন, সীতাংশু কলেজে চলে গেল। সারাদিন দরজা বন্ধ করে রেবা-দেবী কাঁদতে লাগলেন।

দিন দুয়েক বাদে বাড়ীওলাদের বড় ছেলে জানালে—ব্যাপারটা তো অনেকদিন থেকেই চলছিল—চন্দ্রমাকে দিনরাতই তো সুকল্যাণের ঘরে দেখা যেত। কৈ, আপনারা বারণ করেননি তো? আমরা মনে করেছিলুম—এতে আপনাদের সম্মতিই আছে।

অংশুপ্রকাশ জিজ্ঞাসা করলেন—তারা কোথায় আছে?

—তারা এখন সুকল্যাণের এক বন্ধুর বাড়ীতে আছে। আপনারা এখান থেকে না গেলে তারা আসতে পারছে না।

অংশুপ্রকাশ উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—তা হলে?

হ্যাঁ, আপনারা অন্যত্র চলে যাওয়ার ব্যবস্থা করুন।

পরের দিন থেকে অংশুপ্রকাশ আবার বাড়ী দেখতে সুরু করলেন। দিন দুয়েক পরে সকালের দিকে অংশুপ্রকাশ এক-খানি সরকারী চিঠি পেলেন তাতে লেখা রয়েছে দু'দিনের মধ্যে তিনি ম্যাথুগঞ্জের কারখানার ভার যেন গ্রহণ করেন। তাঁকে সেখানকার কারখানার সর্বময় কর্তা অর্থাৎ চীফ্ ইঞ্জিনীয়ার নিযুক্ত করা হয়েছে।

চিঠিখানা হাতে করে অংশুপ্রকাশের দুই চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। রেবাদেবী সে দৃশ্য দেখে ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—কি গো, কি হয়েছে?

চিঠিখানা স্ত্রীর হাতে দিয়ে তিনি চোখ মুছতে লাগলেন।

রেবাদেবী বললেন, কোন মুখ নিয়ে সেখানে যাবো? পরের দিন সন্ধ্যেবেলা মজুমদারদের দরজায় একখানা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। সন্ধ্যার অন্ধকারে নিজেদের লুকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে অংশুপ্রকাশ ও রেবাদেবী গাড়ীতে গিয়ে উঠলেন। সীতাংশু আগেই কলেজ হোস্টেলে চলে গিয়েছিল।

পরের দিন প্রত্যুষে মজুমদারদের দরজায় আর একখানা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। দেখা গেল—চন্দ্রমা ও সুকল্যাণ হাসতে হাসতে গাড়ী থেকে নামছে। নবারুণ আলোকসজ্জাতে তাদের বদন উদ্ভাসিত।
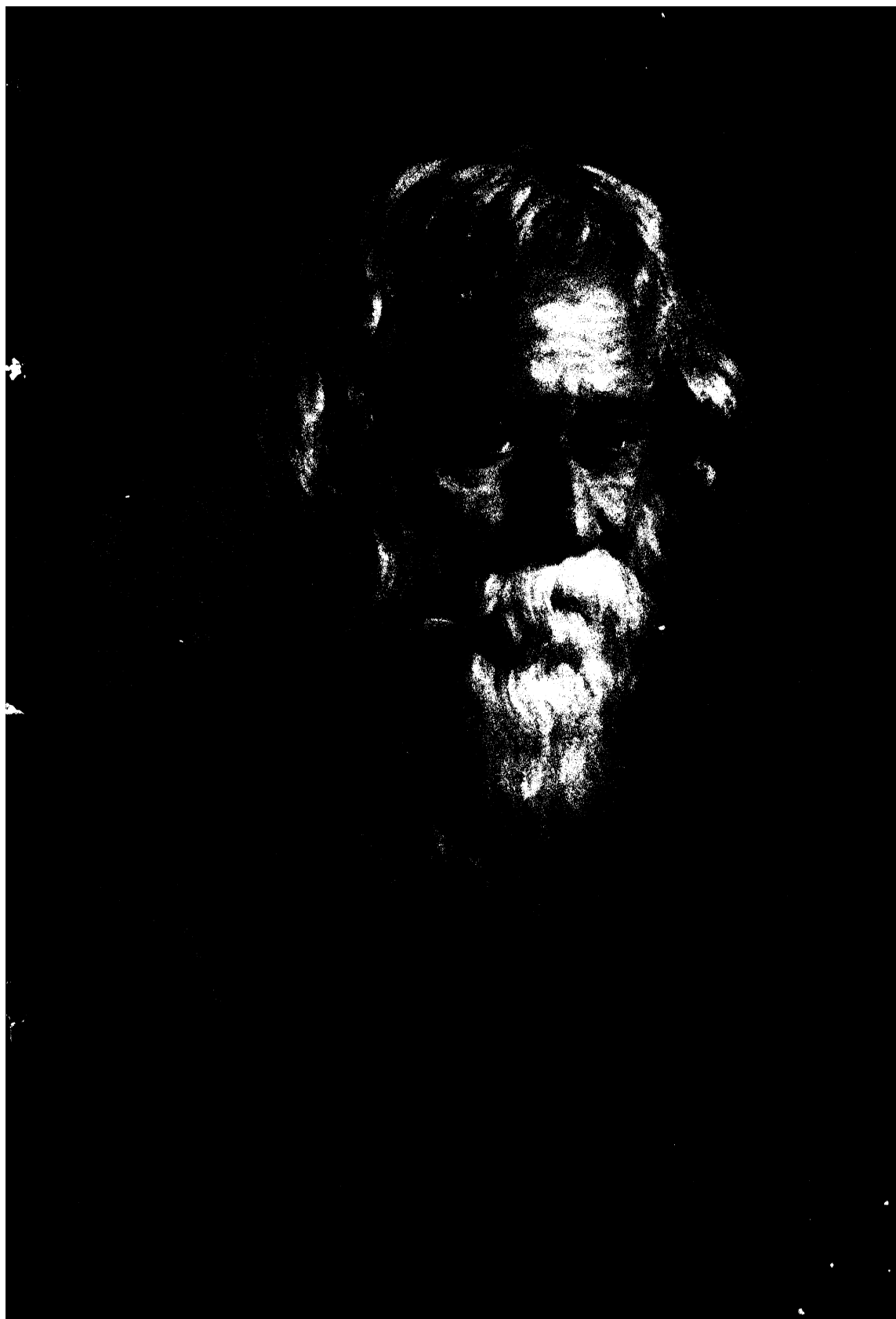
কোল্‌স্‌ওয়ার্দি গ্র্যান্ট

বিনয় ঘোষ

বাংলাদেশের জনজীবনের সঙ্গে 'গ্র্যান্ট' উপাধিধারী একাধিক ইংরেজের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সংযোগ ছিল—চার্লস গ্র্যান্ট, জেমস্ গ্র্যান্ট, জন পিটার গ্র্যান্ট প্রভৃতি—কিন্তু শিল্পী কোল্‌স্‌ওয়ার্দি গ্র্যান্টের মতন জনপ্রীতিধন্য আর কেউ হতে পেরেছিলেন কি না সন্দেহ। তাঁর এক বড় ভাই ছিলেন, নাম জর্জ গ্র্যান্ট, খুব ভাল ঘড়ির কাজ জানতেন। তখন ঘড়িরও কদর ছিল খুব, বিদেশ থেকে আমদানি ঘড়ি দেখার জন্যে বড়লোকদের ঘরে লোকের ভিড় হত। ঘড়ির ভাগ্যবান মালিকদের মতন, ঘড়ির বিদেশী কারিগররাও দর্শনীয় জীব ছিলেন। স্বনামধন্য ইংরেজদের মধ্যে মানবদরদী শিক্ষাব্রতী ডেভিড হেয়ার ছিলেন ঘড়ি-ব্যবসায়ী। জর্জ গ্র্যান্ট স্বনামধন্য না হলেও, সেকালের সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত মহলে তাঁর বেশ খানিকটা খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল, এবং সেটা তিনি নিজের প্রতিভাবলে অর্জন করেছিলেন। গ্র্যান্টের পিতাও একজন সেকালের দক্ষ কারিগর ছিলেন, এবং স্বদেশে ইংলন্ডে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নির্মাণের কাজে তাঁর বেশ সুনাম হয়েছিল। অবশ্য যন্ত্রের নীরস কাজে মনঃসংযোগ করা তাঁর পক্ষে বেশী দিন সম্ভব হয়নি। যন্ত্রপাতি ছেড়ে অবশেষে অভিনয়ের দিকে তিনি ঝুঁকেছিলেন। ইংলন্ডে তখন থিয়েটারের স্বর্ণযুগ, কাজেই অভিনয়ের নেশাকে সহজেই তিনি পেশাতে পরিণত করলেন। অল্পদিনের মধ্যে কৌতুকাভিনয়ে সুরসিক শিল্পী হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। অভিনয় শিক্ষা দেওয়ার, বিশেষ করে অভিনেতাদের কণ্ঠস্বর তালিম দেওয়ার ভার পড়ল তাঁর উপর। এবিষয়ে তাঁর পারদর্শিতা দেখে চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেল।

পিতার প্রতিভা উত্তরাধিকারসূত্রে দুই ভাই-ই পেয়েছিলেন এবং দু'দিকে দু'রকমভাবে তার বিকাশ হয়েছিল। জর্জ গ্র্যান্ট সবদিক দিয়েই ছিলেন পিতার প্রতিকৃতি। একদিকে ঘড়ির মতন যন্ত্রের সূক্ষ্ম কলকব্জা নাড়াচাড়ায় দক্ষতা যেমন তাঁর ছিল, অন্যদিকে কণ্ঠস্বরের লীলাকৌশলেও তাঁর কৃতিত্ব কম ছিল না। শোনা যায়, হরবোলার মতন নানাকণ্ঠের বিচিত্র বুলি শুনিয়ে তিনি তাঁর কলকাতার ক্লায়েন্টদের বশ করে ফেলতেন। কেবল ঘড়ির জন্যে নয়, তাঁর কণ্ঠের বোল্ শোনার জন্যেও ঘড়ির দোকানে লোকের ভিড় হত। দোকানটি ছিল বর্তমান ডালহৌসি স্কয়ার অঞ্চলে। ছোটভাই কোল্‌সওয়ার্দি আসার কয়েক বছর আগেই জর্জ গ্র্যান্ট কলকাতায় এসে ঘড়ির ব্যবসা আরম্ভ করেছিলেন। সুপ্রীম কোর্টের জজ, কোম্পানির বড় বড় সাহেব ও মার্চেন্ট, জাহাজের কাপ্তেন, অনেকে জর্জকে বিশেষ প্রীতির চোখে দেখতেন এবং তার দোকানেও নিয়মিত আসতেন। সকলে যে ঘড়ির তাগিদে আসতেন তা নয়, অনেকে তাঁর হরবোলার বুলি শুনতে আসতেন, আবার কেউ কেউ আসতেন তাঁর কাছে অভিনয়ের তালিম নিতে।

কোল্‌সওয়ার্দি গ্র্যান্ট

তখনকার হিন্দু কলেজের বাঙালী ছাত্ররা ইংরেজী নাটক অভিনয়ে যে সুনাম অর্জন করেছিলেন, আজকাল তা অনেকেরই ঈর্ষার উদ্রেক করবে। জর্জ গ্র্যান্ট ছিলেন হিন্দু কলেজের অন্যতম অভিনয়-শিক্ষক। ডিরোজিওর যুগে। যাঁদের 'ডিরোজীয়ান' বলা হয়, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধানাথ শিকদার, রসিক কৃষ্ণ মল্লিক প্রভৃতি, তাঁরা অনেকেই জর্জের কাছে ইংরেজী অভিনয় শিখেছেন। একজন ঘড়ি-ব্যবসায়ী ডেভিড হেয়ার হিন্দু কলেজের ছাত্রদের প্রগতিশীল চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ করেছেন, আর-একজন ঘড়ি-ব্যবসায়ী জর্জ গ্র্যান্ট তাঁদের শিক্ষা দিয়েছেন আধুনিক অভিনয় কলা। কোল্‌সওয়ার্দি গ্র্যান্টের আমলে হিন্দু কলেজ হয়েছিল প্রেসিডেন্সী কলেজ, এবং তিনি সেখানে ছাত্রদের শিক্ষা দিয়েছেন চিত্রকলা ও অঙ্কনবিদ্যা। শিবপুরের বর্তমান বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের তিনিই অঙ্কনবিদ্যার আদিগুরু, তাৎকালিক প্রেসিডেন্সী কলেজের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের 'প্রফেসার অফ্ ড্রয়িং'।

রামমোহন রায়ের ইংলন্ড যাত্রার বছর দেড়েক পরে কোল্‌সওয়ার্দি গ্র্যান্ট ইংলন্ড থেকে ভারতযাত্রা করেন এবং বাংলাদেশে কলকাতা শহরে এসে পৌঁছন ১৮৩২ সালে। তখন তাঁর বয়স উনিশ বছর। কলকাতা শহর কেন্দ্র করে তখন নবজাগরণের জোয়ার এসেছে। হিন্দু কলেজের ছাত্রদের কার্যকলাপে সোরগোল পড়ে গেছে সমাজে। প্রথম জোয়ারের তরঙ্গও প্রায় বাঁধ ভাঙ্গার মতন উত্তাল, উচ্ছ্বাসের ফেণা ও বুদ্‌বুদ্ তাতে প্রচুর। বছর দুই-আড়াই আগেকার সতীদাহপ্রথা আইনতঃ নিষিদ্ধ করার আঘাত তখনও রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ ভুলতে পারেনি। একদিকে তাদের ধর্মসভার তম্বিগম্বি; অন্যদিকে হিন্দু কলেজের তরুণ ছাত্রদের তর্জন-গর্জনে কলকাতার নয় শুধু, সমগ্র বাংলার আকাশ বিদীর্ণ হবার উপক্রম। এমন সময় তরুণ কোল্‌সওয়ার্দি এসে ...

কাতায় পৌঁছলেন। সামাজিক পরিবেশের ভীতিপ্রদ বিদ্যুৎ-চমকানি দেখে স্বভাবতঃই তাঁর বিচলিত হবার কথা। কলকাতা শহরও তখন বেশ বড় হয়েছে, সেই গ্রাম্য চেহারা ভাব আর নেই। লটারী কমিটির উন্নয়ন-পরিকল্পনার কল্যাণে তার পথঘাট পাকা ও প্রশস্ত হয়েছে, হাটবাজার দোকানপাট বসেছে, লোকবসতিও বেড়েছে। নানারকমের ঘোড়ার গাড়ি সব পাকা রাস্তার উপর ছুটোছুটি করছে। আগেকার গরুর গাড়ির চেয়ে তার চলার গতি বহুগুণ বেশী। যানবাহনের গতি বেড়েছে, সমাজেরও গতি বেড়েছে। একটা ঘুমন্ত সমাজ প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে জেগেছে, যুগ-যুগান্তের সব অটল-অচল ধ্যান-ধারণা সচল হয়েছে। কোল্সওয়ার্দি এই

সচলতার প্রাথমিক আবর্তের মধ্যে এসে পড়লেন।

একে বিদেশী, তার উপর বয়সে তরুণ, মনটাও শিল্পীর মন। কোথায় যাবেন, কি করবেন, ঠাহর করা মুশকিল হল। রক্ষা যে একেবারে অকূল পাথারে পড়তে হয়নি তাঁকে। জ্যেষ্ঠ জর্জ গ্রান্ট তখন থাকতেন ওয়েলিংটন স্কয়ার অঞ্চলে ক্রীক রো-তে বাসা করে। ওয়েলিংটনে তখন ট্যাঙ্ক ছিল, স্কয়ার ছিল না এবং লটারী কমিটি নতুন ট্যাঙ্ক কেটে ঐ অঞ্চলের পথঘাট তৈরী করে উন্নতি করেছিলেন। ক্রীক রো-টা একটা পূবে-পশ্চিমে বরাবর টানা বেশ বড় খাল ছিল, সেই খালে জেলেদের নৌকা বাঁধা থাকত, তাই পাশেই 'জেলেপাড়া'। খালের নাম ছিল 'ডিঙ্গাভাঙ্গা খাল'। কবে কার ডিঙ্গি হয়ত ভেঙ্গে গিয়েছিল ঐ খালে, তাই ডিঙ্গাভাঙা, যেমন উল্টাডিঙ্গি। খাল বুজিয়ে ভরাট করে যখন রাস্তা হল তখন তার প্রথম নাম হল 'ডিঙ্গাভাঙা স্ট্রীট', পরে হয়েছে ক্রীক রো, ইংরেজী 'ক্রীক' কথাটি পুরনো খালের স্মৃতি বহন করছে। কোল্সওয়ার্দি ডিঙ্গাভাঙা স্ট্রীটে দাদার বাসায় এসে উঠলেন। তাঁর প্রথম লক্ষ্য হল স্বাস্থ্য-রক্ষা করা। তার জন্য ডাম্বেল মুগুর কিনে তিনি নিয়মিত সকালে-বিকালে ভাঁজতে আরম্ভ করলেন। ভোরবেলা উঠে ডিঙ্গাভাঙা থেকে স্ট্র্যাণ্ডে গঙ্গার ধার পর্যন্ত লম্বা একটা চক্র দিয়ে আসাও তাঁর প্রাত্যহিক কাজ ছিল। এই ডাম্বেল-মুগুর-ভাঁজা হাতেই তিনি একদিন তুলি-কলম ধরে ছবি এঁকে সকলকে তাক্ লাগিয়ে দিয়েছিলেন। একবার বেকায়দায় পড়ে গিয়ে তাঁর মেরুদণ্ডে অত্যন্ত জোরে আঘাত লাগে। তারপর থেকে তিনি আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে বা চলতে পারতেন না, একটু নেংচে ও খুঁড়িয়ে চলতেন। তার জন্যে কেউ কেউ হয়ত তাঁকে খোঁড়া সাহেব শিল্পী বলতেন।

শিল্পীজীবনের কাজ কোল্সওয়ার্দি অল্পদিনের মধ্যেই শুরু করে দিলেন কলকাতায়। ইণ্ডিয়ান রিভিউ, ক্যালকাটা মান্থলি জার্নাল, ইণ্ডিয়া মেডিক্যাল, ক্যালকাটা ক্রীশ্চান অবজারভার, বেঙ্গল স্পোর্টিং প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি ধারাবাহিকভাবে ছবি আঁকতে আরম্ভ করলেন। অধিকাংশ ছবির উপাদান সংগ্রহ করতেন তিনি বাইরের প্রকৃতি ও সমাজ থেকে। আমাদের দেশের নানা-জাতের মানুষের মুখাকৃতি, পোষাক-পরিচ্ছদ এবং সেকালের বহু স্বনামধন্য ব্যক্তির প্রতিকৃতি থেকে আরম্ভ করে বিস্ময়কর প্রকৃতির বিচিত্র সব গাছপালা, জীবজন্তু পর্যন্ত সর্ববিষয়ে তাঁর অনুরাগ ছিল গভীর। ঠিক বিদেশীর চোখ দিয়ে নয়, শিল্পীর চোখ দিয়ে তিনি শিল্পবস্তুর বিচার করতেন।

কিন্তু তাঁর শিল্পচর্চার কথা বলার আগে অন্য দু'একটি কীর্তির কথা বলা প্রয়োজন। আপাতঃদৃষ্টিতে হয়ত মনে হবে যে এইসব কীর্তির সঙ্গে তাঁর শিল্পকর্মের কোন প্রত্যক্ষ যোগ নেই। সেকথা ঠিক নয়। কলকাতা শহরে 'মেকানিক্স ইনস্টিটিউশান (১৮৩৯) এবং 'ক্যালকাটা সোসাইটি ফর দি প্রিভেনশান অফ ক্রুয়েল্টি টু এনিম্যাল্স' (সি, এস, পি, সি, এ, ১৮৬১) নামক প্রতিষ্ঠানের আদি-পরিকল্পক ও প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে কোল্সওয়ার্দি অন্যতম। হাতে-কলমে কারিগরদের কাজকর্ম শিক্ষা দেওয়ার জন্যে, এবং নানাবিধ বৈজ্ঞানিক বিদ্যার সঙ্গে তাদের পরিচিত করার জন্যে ইংলণ্ডে যন্ত্রশিল্প-বিপ্লবের পর মেকানিকদের শিক্ষায়তন গড়ে উঠতে থাকে। আমাদের দেশে শিল্পবিপ্লবের মতন কোন ঘটনা না ঘটলেও, সমুদ্র পারি

কলকাতায় ধনিক গৃহের হলঘর

দিয়ে কারিগরিবিদ্যার এই আদর্শ সমাজে এসে পেঁছয়। রেভারেন্ড বোয়াজ ও ডকটর কর্বিন সর্বপ্রথম কলকাতায় এই জাতীয় একটি মেকানিকদের প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কথা চিন্তা করেন। এই উদ্দেশ্যে ২৬শে ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯, স্যার জন পিটার গ্র্যান্টের সভাপতিত্বে কলকাতার টাউন হলে একটি সভা হয়। সভায় বিচারপতি গ্র্যান্ট এবিষয়ে একটি দীর্ঘ বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন : "ইউরোপের নানাস্থানে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে প্রধানত কারিগরদের আধুনিক বিজ্ঞানের কলা-কৌশল ও নিয়মাদি শিক্ষা দেওয়ার জন্যে। এদেশে শিল্পকর্ম সম্বন্ধে ভদ্রলোকদের একটা ভুল ধারণা আছে এই যে কাজটা ছোটলোকের কাজ এবং এই সব কাজ করলে লোকচক্ষে সামাজিক ইজ্জত হারাতে হয়। নব্যশিক্ষিত বাংলার তরুণদের মন থেকেও এ ধারণা আজও দূর হয়নি। তবে অদূর ভবিষ্যতে হয়ত হবে। কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে ছাত্ররা এখন নিজেদের হাতে শবব্যবচ্ছেদ করছে। কুসংস্কার কেটে যাচ্ছে। আধুনিক শিক্ষার প্রসার হলে, হাতের ও যন্ত্রপাতির কাজকর্মের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা বাড়বে। তা ছাড়া লেখাপড়া শিখে সকলেই যদি সুপ্রিম কোর্টের জজ হতে চায়, অথবা মুন্সেফি, সদর আমিনী বা ওকালতি করতে চায়, তাহলে সমাজের অন্য সব প্রয়োজনীয় কাজকর্ম কারা করবে? সমাজের শ্রী ও জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য জজ-উকিলের চেয়ে অনেক বেশি দরকার বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনিয়ার ও কারিগর। একথা আজ এ দেশের লোকের বিশেষ করে বোঝার দরকার। মেকানিকস্ ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য হল, এই বোধশক্তি এ দেশের লোকের মনে ধীরে ধীরে জাগিয়ে তোলা।" এরপর আরও অনেকে এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন, সকলেই ইংরেজ। সভার সম্মতিক্রমে মেকানিকস্ ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এদেশীয় ও ইয়োরোপীয় ভদ্রলোকদের নিয়ে একটি কমিটিও গঠিত হয়। স্যার জন পিটার গ্র্যান্ট সভাপতি হন, জর্জ ও কোলসওয়ার্দি গ্র্যান্ট দুই ভাই হন যুগ্ম-সম্পাদক।

প্রতিষ্ঠানের কোন নিজস্ব গৃহ ছিল না। গৃহ থেকে গৃহান্তরে তার কাজকর্ম চলত। বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য গুণী ব্যক্তিদের ডাকা হত। প্রধানত তত্ত্ব-বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান বিষয়েই বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হত। তার মধ্যে 'ডিজাইন' ও 'ড্রয়িং'-এরও একটা বিশেষ

TO

THE CHERISHED MEMORY

OF

MY MOTHER.

Endeared to remembrance by

"——— the tender solicitude—
The never wearied affection—
The generous nature and disposition—
The pure warm heart—
The piety and the rectitude—
The quiet sweetness in prosperity—
The cheerful fortitude in adversity—
And the calm resignation in suffering;"*

who, living, owned her children's fondest affection and admiration, and being removed, now claims their lasting veneration and gratitude,—

THIS HUMBLE VOLUME,

begun for her gratification—its sole end, and best apology, is most affectionately

DEDICATED.

* From her Tablet in Newington Church-Yard.

"অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ডোমেস্টিক স্কেচ" গ্রন্থের উৎসর্গপত্র
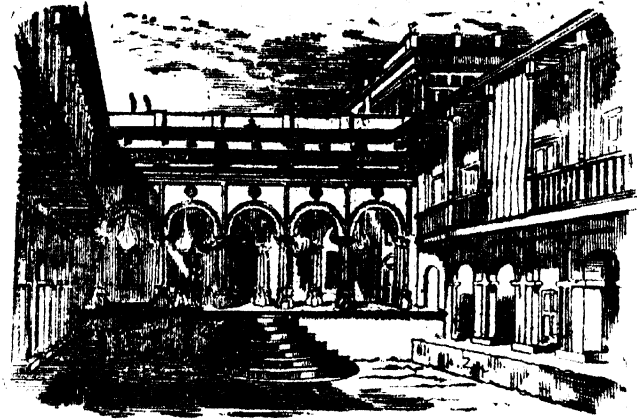
ওয়েলিংটনের বাবু দুর্গাচরণ দত্তের বাড়ির অন্দরমহল

গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। জর্জ ও কোলসওয়ার্দি দুই ভাই এই বিষয়টিকে এক রকম অধিকার করে রেখেছিলেন বলা চলে। ডিজাইনের বৈশিষ্ট্য, গুরুত্ব এবং পরিপ্রেক্ষিত বিষয়ে প্রথমে বড় ভাই জর্জ গ্র্যান্ট ইনস্টিটিউশনে একটি বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাটি ছোট ভাই কোলসওয়ার্দির অধীনে নিয়মিত একটি 'ডিজাইন, ড্রয়িং ও পার্সপেক্‌টিভ' বিষয়ে ক্লাস খোলার প্রস্তাবনা বলা চলে। বক্তৃতার শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র এবং তাঁর পাশে বসেছিলেন 'বোর্ড অফ রেভিনিউ'-এর সদস্য ওয়েব স্মিথ। স্মিথ নিজে শিল্পচর্চাও করতেন। জর্জের বক্তৃতার তিনি তারিফ করেন খুব এবং সেটা গবর্ণর-জেনারেল অকল্যাণ্ডের কাণে পর্যন্ত পেঁছয়। এর পর ময়াট সাহেব মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন এবং ক্যাপ্টেন বয়েলো 'ঝুলন্ত সেতু' সম্বন্ধে বলেন। জর্জ টমসন বিলেত থেকে দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে এদেশে এসে ইনস্টিটিউশনে ধারাবাহিক কয়েকটি বক্তৃতা দেন। তার ফলে ঝিমন্ত প্রতিষ্ঠান আবার বেশ চাঙ্গা হয়ে ওঠে। পর পর 'লেকচার' চলতে থাকে। এই সময় কোলসওয়ার্দি সপ্তাহে দুদিন করে ড্রয়িং ও ডিজাইনের ক্লাস খোলেন। ক্লাস হত সন্ধ্যায়, বুধবারে সাধারণ ড্রয়িং-এর ক্লাস এবং শনিবারে পরিপ্রেক্ষিত বিষয়ে ক্লাস। সন্ধ্যা ছ'টা থেকে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত সময় ছিল ক্লাসের। ৮ই এপ্রিল ১৮৪১, কোলসওয়ার্দি তাঁর ছাত্রদের জন্য প্রাথমিক ড্রয়িং, ডিজাইন ও পরিপ্রেক্ষিত বিষয়ে নিয়মাবলী প্রকাশ করেন। এদেশের ছাত্রদের আধুনিক ড্রয়িং ও ডিজাইন শিক্ষার আদিগুরু কোলসওয়ার্দির কাজ আরম্ভ হয় এই-ভাবে, কলকাতার মেকানিকস্‌ ইনস্টিটিউশন থেকে। পরে হাওড়ার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ড্রয়িং-এর শিক্ষক এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ড্রয়িং-এর অধ্যাপক পদে নিয়োগ তাঁর খুবই যোগ্য পুরস্কার বলা চলে। তখন এ বিষয়ে অধ্যাপনা করার মতন তাঁর চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি আর কেউ ছিলেন কিনা সন্দেহ।

কোলসওয়ার্দি আরও একটি কাজ করেছিলেন যার সঙ্গে তাঁর শিল্পী-জীবনের সম্পর্ক বাইরে থেকে সুদূর হলেও, ভিতর থেকে গভীর। তৎকালে কলকাতা শহরে যান্ত্রিক যান-বাহন বলতে কিছুই ছিল না। পাল্কি ছিল, নানা রকমের ঘোড়ার গাড়ি ছিল, আর ছিল সনাতন গরু-মহিষের গাড়ি। বোঝা বহনের জন্যে কুলি মজুর ছিল বটে, তবে গাড়ি-বোঝাই মাল বহনের জন্যে একালের মতন বড় বড় লরি বা ট্রাক ছিল না। গরু-মহিষকেই গাড়ি টেনে তা বহন করতে হত। গাড়োয়ান ও ঠিকাদাররা তাদের ওপর নিষ্ঠুর অত্যাচার করত। অতিরিক্ত মাল বোঝাই করে, অমানুষিক বেত্রাঘাত করে, অর্ধভুক্ত রেখে বাক্‌শক্তিহীন গরু-মহিষের ঘাড়ে চেপে নিজেদের মুনাফা লুটে নেওয়াই ছিল তাদের কাজ। কোলসওয়ার্দি এই দৃশ্য কলকাতার পথেঘাটে দেখতেন। বোঝার ভারে, ক্লান্তিতে ও কশাঘাতে কত গরু-মহিষকে কলকাতার রাজপথে সটান শুয়ে পড়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে যে তিনি দেখেছেন তার ঠিক নেই। আরও অনেক শত শত লোক এ-দৃশ্য দেখেছেন, কিন্তু তাদের মধ্যে দরদী শিল্পী ক'জন? তাঁরা দেখেছেন চিরাভ্যস্ত দৃষ্টি দিয়ে উদাসীন দর্শকের মতন, কোলসওয়ার্দি দেখেছেন শিল্পীর গভীর বেদনা, মমতা ও অনুভূতি দিয়ে। অসহায় মানুষের উপর মানুষের অত্যাচার যেমন অন্যায়, অসহায় জীবজন্তুর উপর মানুষের অত্যাচার তার চেয়ে বেশি ছাড়া কম অন্যায় নয়। মানুষ অন্তত কথা বলতে পারে, দুঃখের কথা দুঃখীকে জানাতে পারে, গরু মহিষ তাও পারে না। এই অন্যায়ের প্রতিকার করার জন্যে কোলসওয়ার্দি সচেষ্ট হলেন।

দীর্ঘদিন আন্দোলন করার পর কয়েকজন মাত্র ব্যক্তির সহানুভূতি ও সহযোগিতা লাভে তিনি সমর্থ হলেন। ভারতীয়দের মধ্যে ছিলেন রুস্তমজী, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিং বাহাদুর, মৌলবী আবদুল লতিফ ও প্যারীচাঁদ মিত্র। এঁদের সকলকে নিয়ে এক সভা ডাকা হল এবং ৪ঠা অক্টোবর ১৮৬১ সালে কলকাতা শহরে জীবজন্তুর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ নিবারণোদ্দেশ্যে একটি সোসাইটি

কসাইতলার (বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীট) চীনা দোকান

(সি, এস, পি, সি, এ) প্রতিষ্ঠিত হল। প্রধানত এই সোসাইটির উদ্‌যোগে প্রাণী-নির্যাতন-বিরোধী অধিকাংশ আইন প্রচারিত হয়েছে বলা চলে। প্রতিষ্ঠাবধি ১৮৮০ সালে মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় আঠার-উনিশ বছর কোল্‌সওয়ার্দি এই সোসাই-টির অবৈতনিক সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও আন্ত-রিকতার জন্যেই সোসাইটির প্রতিপত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। অধ্যাপনা, শিল্পকর্ম ও অন্যান্য আরও অনেক দায়িত্ব পালন করেও এই প্রতিষ্ঠানের কর্তব্য পালনে তাঁর ত্রুটি হয়নি কোনদিন।

কলকাতার পাল্কি-বেয়ারা

বিভিন্ন পত্রিকায় ছবি ও নক্‌সা প্রকাশিত হবার পর অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর বেশ খ্যাতি হল। প্রতিকৃতি অংকন ও নক্‌সাচিত্রে তাঁর কুশলতা দেখে সকলে মুগ্ধ হলেন। 'ইন্ডিয়া রিভিউ' পত্রিকা (জুন ১৮৩৪) লিখলেন, "মিঃ গ্রান্টের তুলির দক্ষতা ও ক্ষমতা দেখে আমরা বিস্মিত হয়েছি। তিনিই ভারতবর্ষে চিত্রকলা চর্চার ভিত্‌ প্রতিষ্ঠা করছেন বললে অতিশয়োক্তি হবে না।" তাঁর নক্‌শা চিত্র-সম্বলিত যে কয়েকখানি বই তখন প্রকাশিত হয়েছিল তার মধ্যে প্রধান এইগুলি :

An Anglo-Indian Domestic Sketch.
Rural Life in Bengal.
Lithographic Sketches of Public Characters of Calcutta, 1838-1845.
Oriental Heads.

প্রথম ও দ্বিতীয় বইখানি পত্রাকারে লেখা। ভারতবর্ষের ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতের ও শ্রেণীর জীবনযাত্রা হল তাঁর পত্রসাহিত্যের বিষয়বস্তু। সাহিত্যিক বর্ণনার সংগে তুলি-কলমের রেখাচিত্রে এই জীবনযাত্রার রূপ তিনি নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। পত্রগুলি ইংলণ্ডে তাঁর মা-বোন ও আত্মীয়-স্বজনের কাছে লেখা। এ দেশের সমাজ, লোকজন, আচার-ব্যবহার, হাট-বাজার, আহার্য ও ব্যবহার্য সামগ্রী, শিল্পদ্রব্য ও পণ্য, এমন কি প্রকৃতির গাছপালা, ফলমূল, জীবজন্তু পর্যন্ত সমস্ত কিছুর বিবরণ মা-বোনদের জানানো তাঁর উদ্দেশ্য। কেবল এ দেশের সমাজের ও লোকের কথা নয়, বিদেশী সাহেবরা এ দেশে এসে কি ধরণের বিচিত্র সমাজ ও জীবন-যাত্রা গড়ে তুলেছে, তার পরিচয়ও তাঁর পত্রাবলীর মধ্যে পাওয়া যায়। কেবল ভাষার সাহায্যে অজানা অপরিচিত দেশের সমাজচিত্র ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয় বলে কোল্‌সওয়ার্দি তুলি-কলমের অপূর্ব রেখাচিত্রের ভিতর দিয়ে তা প্রকাশ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। ফলে তাঁর প্রথম বই দু'খানির মধ্যে উনিশ শতকের মধ্যভাগের বাংলাদেশের সমাজ-জীবনের সুন্দর একটি ছবি ফুটে উঠেছে। এই ছবি আমাদের ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ।

কোল্‌সওয়ার্দি'র দৃষ্টি যে কত সজাগ, কত খুঁটি-নাটির সন্ধানী, তা তাঁর প্রথম বই দু'খানি না পড়লে বা না চোখে দেখলে বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয়। 'অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ডোমেস্টিক স্কেচ' বই থেকে দু-একটি বিষয়ের উল্লেখ করছি। এ দেশের মাদুর, বেড়া ও টাটির বর্ণনা আছে বইতে, বুনুনির পরিষ্কার নক্‌শাসহ। হাড়িকুড়ির যে বিস্তারিত বিবরণ আছে তা এদেশের কুম্ভকার ও পাকা গিন্নীদের পক্ষেও দেওয়া সহজ নয়। যত রকমের হাড়ি, ডেক্‌চি, কুঁজো, খুরি, বদ্‌না, ঢাক্‌না, মায় ডাল-ঘুটনি পর্যন্ত এদেশে আছে, কোল্‌সওয়ার্দি তার বর্ণনা দিয়ে, ছবি এঁকে মাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন চিঠিতে। 'ঘাঁতা' নামে এদেশের সনাতন যন্ত্রটির নাম দেওয়া
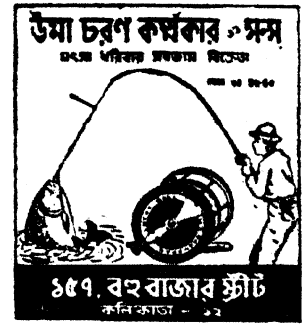
ঘাণিজ্যোদ্দেশ্যে সর্বজাতির মিলনক্ষেত্র কলকাতার বড়বাজার

হয়েছে 'এশিয়াটিক হ্যাণ্ড-মিল।' কেবল রন্ধনপাত্রের নয়, নানা রকমের দুগ্ধপাত্রের ও ঝুড়িরও বর্ণনা আছে চিঠির মধ্যে। ভারতের বহু জাতির মতন ভারতীয়দের বোঝা বইবার বিচিত্র সব ঝুড়ির বর্ণনা। ঝাঁকা-মুটের ঝোড়া, চ্যাঙ্গারি, টুকরি, চুবড়ি, ধামা, খুচি, কুলো, ধুচুনি প্রভৃতি কিছুই বাদ নেই। গাড়ীঘোড়া, ঘরবাড়ী, দরজা-জানলা, চাল ও ছাদ, সব বাইরে ও ভিতর থেকে কি রকম দেখায় তা এঁকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাড়ির গ্রাউণ্ড-প্ল্যান পর্যন্ত বাদ যায়নি। গাছ লতাপাতা ও ফলমূলের রেখাচিত্র দেখলে মনে হয় বিনা রঙেও সেগুলি চিনতে কারো কষ্ট হবে না। নারকেল সুপুরি তাল খেজুর কলা প্রত্যেকটি গাছ কেবল কলমের আঁচড়েই সজীব হয়ে উঠেছে, তার উপর রঙের টান পড়লে যে কি হত তা সহজেই কল্পনা করা যায়।

'রুরাল লাইফ ইন বেঙ্গল' বইখানি কেবল রেখাচিত্রের দিক থেকে নয়, বিষয়বস্তুর দিক থেকেও মূল্যবান। 'ডোমেস্টিক স্কেচের' মতন এ বইতেও এদেশের জীবনযাত্রার চিত্র লিখে-এঁকে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু গ্রাম্যজীবনের উপর এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বেশি। দাঁড়িমাঝি, নানা রকমের নৌকা, জেলেদের মাছ ধরার বিভিন্ন রকমের জাল এবং বাংলার চাষীদের কৃষিকর্মের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে গ্রান্ট বাংলার গ্রাম্য সমাজের আসল রূপটি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল নীল-চাষ বিষয়ে ৯ নম্বর চিঠিখানি। বাংলাদেশে নীলচাষ কেমন করে করা হয়, নীলকুঠিতে নীল তৈরী হয় কি পদ্ধতিতে, কত রকমের আমলা কর্মচারী কুলি মজুর নীলকুঠিতে কাজ করে, তাদের বেতন ও মজুরী কি, কাজ কি এবং দস্তুরিই বা কি, সমস্ত বিবরণ কোলসওয়ার্দি পুংখানুপুংখরূপে সংগ্রহ করে দিয়েছেন। কলকাতা শহরে কেদারায় বসে কেতাব পাঠ করে সংগ্রহ করেননি, নিজে গ্রামে গিয়ে, গ্রামে বাস করে, গ্রামের লোকজনের সংগে মেলামেশা করে সংগ্রহ করেছেন। সংগৃহীত তথ্যের সত্যমিথ্যা যাচাই করে নিয়েছেন এদেশের অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ বন্ধুদের কাছ থেকে। প্যারীচাঁদ মিত্র লিখেছেন যে, এই দুটি বই লেখার সময় কোলসওয়ার্দি সর্বদা তাঁর সংগে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন।

কলকাতার বিখ্যাত ব্যক্তিদের লিথোগ্রাফ চিত্রের সংকলনটির মধ্যে যদিও অধিকাংশই বিদেশীদের চিত্র সন্নিবেশিত হয়েছে, তাহলেও আলেখ্য-নিদর্শন ও ইতিহাসের উপাদান হিসাবে তার যথেষ্ট মূল্য আছে। এমন সব ঐতিহাসিক ব্যক্তির চিত্র তিনি এঁকে রেখেছেন যা আর কোথাও নেই, থাকলেও সহজলভ্য নয়। প্রায় ১৬৭ খানি চিত্রের মধ্যে মাত্র ছ'জন ভারতীয়ের চিত্র আছে—জাল প্রতাপচাঁদ, মুর্শিদাবাদের নবাব, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসময় দত্ত, মহারাজা কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ও রুস্তমজী কাওয়াজী। 'ওরিয়েণ্টাল হেডস' বইখানিতে প্রায় ৭৮ খানি চিত্র সংগৃহীত হয়েছে, সবগুলিই প্রাচ্যদেশীয় বিভিন্ন জাতির প্রতিমূর্তি। আরমেনিয়ান পুরোহিত, মালাবারী পণ্ডিত, পাঠান, ওড়িয়া বেয়ারা, ইস্পাহানী হাজীমির্জা, বাঙালী গুরুপ্রসাদ বসু, নাগা গিরিসন্ন্যাসী, আরব শেখ, রোহিলখণ্ডী হাফিজ, জৌন পুরী
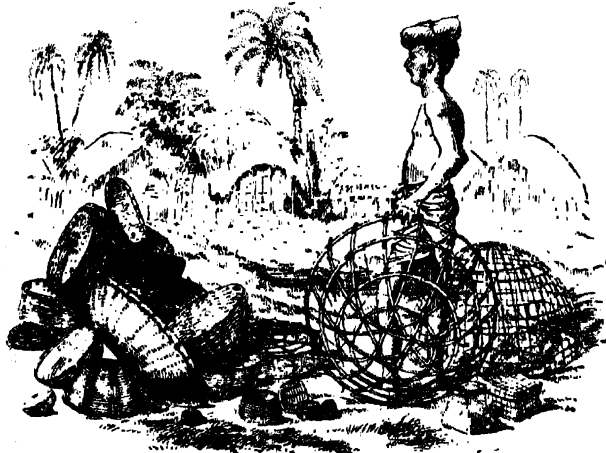
কলকাতার মুটিয়া ও নানাপ্রকারের ঝুড়ি

কিরামৎউল্লা, পার্সী ব্যবসায়ী রুস্তমজী, শিক্ষিত বাঙালী তারাচাঁদ চক্রবর্তী, ব্রাহ্মণ কানুনগো রমাপ্রসাদ দুবে, ইহুদী পুরোহিত মোজেস কোহেন, মাড়োয়ারী বণিক তিলকচাঁদ সাহু, বাণারসী মহাজন বাবু ছোটেলাল, গুজরাটী বণিক রঘুনাথজী মনোহরদাস, কাবুলেরআমীর দোস্ত মহম্মদ খাঁ, বাঙালী হিন্দু পরিবারের মেয়েরা, যোগী, ঠগ ও ডাকাত, কুলী ও ধাঙ্গড়, বর্মী হিরাতী রাজপুত সিংহলী গারো কারেন নাগা প্রভৃতি প্রাচ্যদেশের বিভিন্ন জাতির ও পেশার লোকের মূর্তিচিত্র আঁকতে কোল্সওয়ার্দি যে কতখানি কষ্ট স্বীকার করেছেন তা বলাই বাহুল্য। শিল্পীদের কাছে তো বটেই, নৃবিজ্ঞান ও জাতিবিজ্ঞানের ছাত্রদের কাছেও কোল্সওয়ার্দির 'ওরিয়েণ্টাল হেডস' স্থায়ী সম্পদরূপে গণ্য হবার যোগ্য। কিন্তু বইখানি এত দুষ্প্রাপ্য যে একবার চোখে দেখতে পাওয়াও কঠিন।

প্রেসিডেন্সী কলেজে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে এবং পরে শিবপুরের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ড্রয়িং ও ডিজাইনের অধ্যাপনা করে কোল্সওয়ার্দির হাতে অন্য কোন কাজ করবার সময় বিশেষ থাকত না। তার কারণ তাঁর অধ্যাপনা কেবল চাকুরীগত পাপক্ষয় করা ছিল না। শিল্পকলা যেমন তাঁর নিজের সাধনার বস্তু ছিল, তেমনি সাধনার বস্তু তা ছাত্রদেরও হোক, এই ছিল তাঁর কাম্য। ড্রয়িং, ডিজাইন ও রেখাঙ্কনে যে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের, বিশেষ করে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্রদের কতখানি পারদর্শী হওয়া দরকার তা তিনি বিলক্ষণ জানতেন। তাই ছাত্রদের সঙ্গে ছাত্রের মতন মিলেমিশে তিনি কেবল তাদের ছবি আঁকতে প্রলুব্ধ করতেন, আর বলতেন যে ড্রয়িং ও ডিজাইনে 'মাস্টার' না হলে ভাল ইঞ্জিনিয়ার হওয়া যায় না। তিনি এত মিষ্টভাষী, সদালাপী ও শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন যে ছাত্ররা ছায়ার মতন তাঁকে অনুসরণ করত। তাদের ডাকতে হত না, স্কেচবুক পেনসিল নিয়ে এস বলতে হত না, নিজেরাই আসত, ছবি আঁকত। শিবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ ডাউনিং প্যারীচাঁদ মিত্রকে লিখে জানান যে, কোল্সওয়ার্দি গ্রাণ্টের মতন কর্তব্যপরায়ণ ও কষ্টসহিষ্ণু শিক্ষক কদাচিৎ দেখা যায়। মানুষ ও শিল্পী হিসেবে তাঁর মতন হৃদয়বান ব্যক্তিও সমাজে দুর্লভ। ছাত্রদের কাছ থেকে এত গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা খুব কম শিক্ষকেরই ভাগ্যে জোটে।

অধ্যাপনার সঙ্গে নিজের শিল্পচর্চা, সি. এস. পি. সি-এর কাজকর্ম অবিশ্রান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে জীবনের প্রায় শেষদিন পর্যন্ত কোল্সওয়ার্দি করে গেছেন। এদেশে কারিগরীবিদ্যার শিক্ষায়তন মেকানিকস্ ইনস্টিটিউশন থেকে যে কাজ তিনি শুরু করেন তার সমাপ্তি ও স্বাভাবিক পরিণতি হয় শিবপুরের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শিক্ষকতায়। বাংলাদেশের ও ভারতবর্ষের প্রথম যুগের ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে অনেকে তাঁর কাছে অঙ্কনবিদ্যা শিক্ষা করেছেন। কেবল এজন্য অবশ্য তিনি স্মরণীয় নন। ১১শে মে, ১৮৮০ সালে তাঁর মৃত্যু হয়, ৫৭ বছর বয়সে। অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে যায়। মৃত্যুর কয়েক মাস আগে তিনি কলেজ থেকে বিদায় নেন। ছাত্রদের কাছে বিদায় ভাষণের সময় তাঁর কণ্ঠস্বর জড়িয়ে আসে, চোখ দিয়ে জল ঝরতে থাকে। ছাত্ররাও অশ্রু সম্বরণ করতে পারে না। তার কয়েক মাস পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। শিক্ষক হিসেবে অবশ্যই তিনি স্মরণীয়। কিন্তু আরও একটি কারণে তিনি অবিস্মরণীয়—তিনি বাংলাদেশকে ভালবেসেছিলেন। বাংলার মানুষ, বাংলার লোকশিল্প, বাংলার নিসর্গ তাঁর শিল্পীচিত্ত এমনভাবে অধিকার করেছিল যা বাংলার নিজের সন্তানদেরও করে কিনা সন্দেহ।

[illegible] থেকে

(রহস্যোপন্যাস)

॥ এক ॥

আমরা যে-শহরে থাকি সেটা খুবই ছোট জায়গা। বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত বটে, কিন্তু কলকাতা থেকে দূরে। এখানকার সামাজিক জীবনপ্রবাহ অত্যন্ত শান্ত এবং ধীর গতিতে চলে। প্রত্যেকেই কাজকর্ম করেন, অথচ কর্ম-চাঞ্চল্যের অনাবশ্যক উন্মত্ত আস্ফালন নেই। আমাদের জীবনের ওপর কলকাতার প্রত্যক্ষ প্রভাব সুস্পষ্ট নয়। পরোক্ষ প্রভাব অবশ্যই আছে। খবরের কাগজ এবং সাময়িকপত্রের দ্বারা মাঝে মাঝে আমাদের জীবনপ্রবাহ আলোড়িত হয়ে ওঠে। শহরটা ছোট বটে, কিন্তু সিনেমা হাউস আছে দুটি। একটায় প্রধানতঃ- বাংলা ছবি দেখানো হয়, অন্যটায় হিন্দী। দুটি হাউসেই সমান ভিড়। বছর দশেক আগে এই অঞ্চলে হিন্দী ভাষার সঙ্গে কারো পরিচয় ছিল না। এখন এখানকার ছেলে-মেয়েরা হিন্দী-ফিল্মের মারফৎ ভাষাটা শিখে

ফেলেছে বললেই হয়। রাস্তার-ঘাটে আজকাল হিন্দী গানের চলতি সুরগুলো প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়।

ছোট শহর বলেই প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের চেনা-পরিচয় আছে। মন্মথবাবুকে আমিও চিনতুম। জেলা আদালতের পেশকার। অত্যন্ত অমায়িক স্বভাবের মানুষটি বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। সাধারণ মানুষদের ধারণা, পেশকাররা ঘুষ নিয়ে থাকেন। মনিবের চেয়ে রোজগার তাঁদের বেশি। কিন্তু আমরা জানি মন্মথবাবু ঘুষ নেন না—ধর্মভীরু এবং সাধুচরিত্রের মানুষ।

পুত্র সন্তান ছিল না তাঁর। একটি মাত্র মেয়ে। ডাকনাম মীনা, ভাল নাম মীনাক্ষী মন্মথবাবু আর তাঁর স্ত্রী দুজনেরই অগাধ ভালবাসা মেয়েটির ওপর। তাই বলে মেয়েটিকে আশকারা দেননি কোনোদিনও। মধ্যবিত্তের সংসার হলেও, মীনাক্ষীর লেখাপড়ার জন্য খরচ করতে কার্পণ্য করেননি মন্মথবাবু। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন মেয়ের ওপর।

রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁরা। অসাধারণ সুন্দরী ছিল মীনা। শুধু সুন্দরী বললেই সবটুকু বলা হল না। পটল-চেরা চোখ তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই চোখ দুটি ছিল ভাব ও ভঙ্গীতে ভরপুর। কথা না বলেও
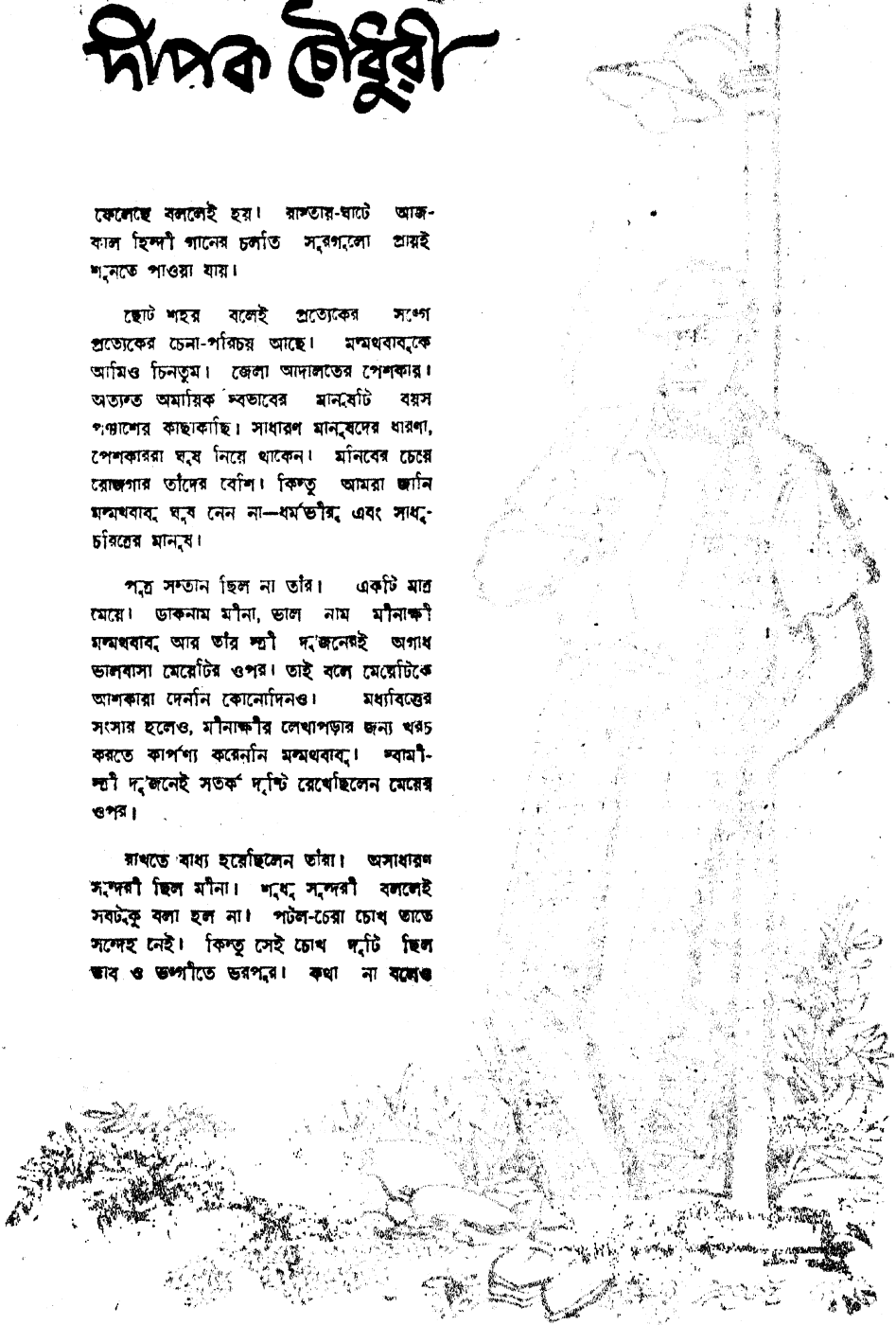
চোখের ভঙ্গীতে ভাব প্রকাশ করতে পারত। মুখের চেয়েও চোখের ভাষা ছিল অধিকতর অর্থপূর্ণ। সবারই ধারণা ছিল, এমন একটা ছোট জায়গায় মীনাক্ষী পথ ভুল করে চলে এসেছে। এখানে ওকে মানায় না। বড্ড বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

যৌবনে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে শহরের শান্ত পরিবেশে ঝড় উঠল। শহরের সর্বত্র এবং সবার মুখে মীনাক্ষীর সৌন্দর্য নিয়ে আলোচনা চলতে লাগল। রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী' কবিতাটি যাঁরা পড়েছেন তাঁরা বলেন, মীনার রূপের কাছে উর্বশী দ্বিতীয় স্তরের। এই ধরনের মন্তব্যের মধ্যে হয়তো অত্যুক্তির দোষ আছে। কবিতা-বর্ণিত উর্বশীকে কল্পনায় দেখতে হয়। কিন্তু মীনাকে দেখতে পায় চোখের সামনে। সেই কারণে, মন্তব্যগুলো একটু বাড়িয়ে-বলার মতো শোনায়। অতি অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের এই ছোট্ট শহরটায় পুরুষবার সংখ্যা বাড়তে লাগল। মীনাকে সবাই পেতে চায়। যারা বিবাহিত তাদেরও অবচেতন মনে মীনার উপস্থিতি আগুন জ্বালিয়ে রাখে। শয্যাসঙ্গিনীর মুখে ভেসে ওঠে মীনার প্রতিচ্ছবি। আমাদের এই ছোট শহরের প্রশান্ত জীবনস্রোতে মীনাই প্রথম অশান্তির ঢিল ছুঁড়ল।

আমিও যে মীনাক্ষীর রূপের দ্বারা আকৃষ্ট হইনি তেমন কথা অস্বীকার করতে পারি না। হওয়াই স্বাভাবিক। হয়তো বা স্ত্রী-রূপেও কল্পনা করে থাকব। অচেতন মনের লীলা-রহস্য মানুষের নিয়ন্ত্রণ-সাধ্য নয়। প্রত্যক্ষ পাপ না করলে মানুষকে পাপী বলবে কে?

কিন্তু আমি তো মারোয়াড়ীদের গদিতে সামান্য একটা চাকরি করি—বেহানী কোম্পানীর হিসেব-রক্ষক। মাসিক মাইনে একশো পঁচিশ টাকা। তবে বাড়িভাড়া দিতে হয় না। মৃত্যুর পূর্বে বাবা একটা দোতলা বাড়ি তৈরি করে রেখে গিয়েছিলেন। মা নেই। ভাই-বোনও কেউ নেই। একতলাটা ভাড়া দিয়ে দিয়েছি ট্রেজারী-অফিসার রামসদয় সরকারকে। তাতে মাসে মাসে আরও পঞ্চাশটা করে টাকা আসে। তবুও বিয়ের কথা ভাবতে ভয় পাই। মীনাক্ষীকে বিয়ে করার কথা চিন্তা করতে গেলে শরীরের রক্ত জল হয়ে আসে। লজ্জাও পাই মনে মনে। তখন ভাবি, দোতলার ঘরে বসে রোমান্টিক স্বপ্নে ওঠাই বুদ্ধিমানের কাজ। দোতলা বাড়িটা আমার যতোই উঁচু হোক না কেন, চাঁদে হাত দেওয়ার মতো উঁচু নিশ্চয়ই নয়।

মন্মথবাবুর সঙ্গে একদিন পথের মাঝখানে দেখা হয়ে গেল। একথা-সেকথার পর মীনার আলোচনাটা উঠে পড়ল। ওঠালেন মন্মথবাবু নিজেই। বললেন, "ওহে ভাস্কর, তোমরা তো আমাদের হিতৈষী। একটা উপকার করবে?"

"কি বলুন তো—"

"মীনার জন্য একটি পাত্র খুঁজে দাও।"

"বিয়ে দেবেন না কি ওর?"

"এতো তাড়াতাড়ি?"

"আঠারো বছর বয়স, তাড়াতাড়ি কি হে?"

"হ্যাঁ!"

মুহূর্তের জন্য নীরব হয়ে গেলুম আমি। বোধ হয় নিজের কথাই ভাবছিলুম। নিজেকেই পাত্র হিসেবে কল্পনা করছিলুম আমি। প্রস্তাবটা উত্থাপন করতে যাব এমন সময় মন্মথবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "সুপাত্রের সন্ধান দিতে পার?"

"সুপাত্র সম্বন্ধে কি রকম ধারণা আপনার তাই আগে বলুন।"

"ছেলেটি সুশিক্ষিত হওয়া চাই। সরকারী চাকুরে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই ধরো শ দুই টাকা মাইনে পেলে খুশী হবো আমরা।"

"মাত্র!" আফসোসের স্বর বেরুলো আমার গলা দিয়ে।

মন্মথবাবুর মনে কোনো দ্বিধা ছিল না। তিনি পূর্বেই সব কথা ভেবে রেখেছেন। স্পষ্টভাবেই বললেন এবার, "আমরা মধ্যবিত্ত। থাকিও ছোট শহরে। উচ্চাকাঙ্ক্ষার সীমা আয়ত্তের মধ্যে থাকা চাই। সুখ কে না চায় বলো? কিন্তু মনে যদি শান্তি না থাকে তা হলে কোটি টাকার বোঝা বয়ে লাভ কি?

বিনীতভাবে বললুম আমি, "আপনার ধারণা হয়তো মিথ্যা নয়। কিন্তু মীনার মতো মেয়েকে ছোট শহরে আটক রাখবেন না। কলকাতায় নিয়ে যান। বড় ঘর থেকে বড় চাকুরের সন্ধান করুন। ওকে লুফে নেবে। যশ লাখে এমন একটি মেয়ে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। তা ছাড়া মীনার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে যতোটুকু বুঝতে পেরেছি তাতে মনে হয়, ওরও উচ্চাকাঙ্ক্ষা খুব প্রবল। অনেক উঁচুতে উঠতে চায় সে।"

"কিসের জোরে?" প্রশ্ন করলেন মন্মথবাবু।

"সৌন্দর্যের।" জবাব দিতে দেরি করলুম না আমি।

মৃদু হাসি দুলে উঠল তাঁর ঠোঁটের ওপরে। তিনি বললেন, "রূপের খ্যাতি ওর প্রচণ্ড তা আমি জানি। রূপ যেমন মানুষকে ভোলায়, তেমনি আবার তার আগুনে নিজেও পোড়ে। শুধু গুণ থাকলেই হয় না, সংযমের দড়ি দিয়ে তাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হয়। এই ফাল্গুনেই মীনার বিয়ে আমি দিয়ে দেব।"

"তাড়াহুড়ো করবেন না।" অনুরোধ করলুম আমি।

"তাড়াহুড়ো না করলে মেয়েটা বিপদে পড়তে পারে। পরেশবাবুকে তুমি কি চেনো?"

"কোন্ পরেশবাবু?"

এখানকার গভর্ণমেন্ট ইস্কুলের শিক্ষক।"

"ও হ্যাঁ, নাম শুনেছি বটে। খুব সৎ বলেই তো জানি। সাক্ষাৎ পরিচয় এখনো হয়নি। বাংলা মাসিকে নাকি খুব উঁচু দরের কবিতা লেখেন ভদ্রলোক।"

"তাঁর সঙ্গেই মীনার বিয়ের প্রস্তাব করেছি। আজকাল তো শিক্ষকদের মাইনে বেড়েছে। অস্বাভাবিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে খানিকটা দমন করে রাখতে পারলে সুখে-শান্তিতে জীবন কাটাতে পারবে। রূপ এবং শিক্ষা একসঙ্গে মিলিত হলে ফলাফল সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। কি বলো তুমি?"

"আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু ব্যাপারটা খুবই তাড়াতাড়ি ঘটে যাচ্ছে না? কেমন যেন দৃষ্টিকটু ঠেকছে। মীনা তো একেবারে ছেলেমানুষ নয়। তাকে একবার জিজ্ঞেস করবেন না?" আমি যেন মরীয়া হয়ে উঠলুম।

মন্মথবাবু বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা পথ আমিও এগিয়ে গেলুম। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার মূলে আমার

উদ্দেশ্য ছিল দুটো। প্রথম হচ্ছে এক বিতর্কের দ্বারা মীনার বিয়েটাকে পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে, বাড়ির কাছে গিয়ে পেঁছতে পারলে মীনার সঙ্গে হয়তো একবার দেখা হ'য়ে যেতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোনো উদ্দেশ্যই আমার সফল হ'ল না। মাঝপথে দাঁড়িয়ে গেলেন মন্মথবাবু। আমার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, "কেন ওর তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে চাই জানো?"

"না। আপনি বলুন—?"

মানুষটি বড় সরল প্রকৃতির। আমি যুবক, শহরে নিজস্ব বাড়িঘরও আছে। বেকার নই। যা হোক চাকরিও একটা করি। মন্মথবাবুদের স্বজাত। মফঃস্বলের লোক হিসেবে চেহারাও আমার খারাপ নয়। তা সত্ত্বেও পাত্র হিসেবে তিনি আমায় উপযুক্ত মনে করেন না। এমন কি মীনাকে যে আমি ভালবাসতে পারি এমন সন্দেহ পর্যন্ত তাঁর মনে আসে না।

মন্মথবাবু বললেন, "সেদিন হঠাৎ মীনার কাণ্ড দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। ওর জন্য একটা আলাদা ঘর আছে। দরজাটা একটু ফাঁক করা ছিল। কি মনে ক'রে উঁকি দিলাম আমি। কি অদ্ভুত ব্যাপারটাই না দেখলাম আমি!"

"কি রকম?" মীনার গোপন খবরটা শুনবার জন্য আগ্রহের চাপে ঝুঁকে দাঁড়ালাম মন্মথবাবুর দিকে। খড়কে দিয়ে দাঁতের ফাঁক থেকে সুপারির কুচি বার করতে করতে তিনি বললেন, "টেবিলের ওপরে দেখলাম কোন্ এক সিনেমা অভিনেত্রীর ছবি রয়েছে। ছবির সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে জামাকাপড় পরেছে মীনা। তাতেও সে পুরোপুরি সন্তুষ্ট হয়নি। একটা ফিতে দিয়ে নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো মেপে মেপে দেখছে। ফিল্মের একটা বিলিতী পত্রিকা ছিল টেবিলের ওপরে। মনে হল সেই কাগজটাতে শরীরের মাপজোপ সব লেখা রয়েছে। তারপর দেখলাম—"হঠাৎ কথা বন্ধ ক'রে মন্মথবাবু আমার দিকে চেয়ে রইলেন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে। আমার গল্প শোনার তন্ময়তা বোধ হয় তাঁর চোখে বাড়াবাড়ি ঠেকছিল।

হঠাৎ যেন আমার সম্বিৎ ফিরে এল। জিজ্ঞাসা করলাম, "তারপর কি করল মীনা?"

"ছবিটাকে উদ্দেশ ক'রে অভিনয় করতে লাগল সে। হিন্দীতে ডায়লগ্ বলছে......শুনতে কিন্তু ভাল লাগছিল আমার।"

"ভাল অভিনয় করতে পারলে এ-লাইনে আজকাল পয়সার ছড়াছড়ি।" দৃষ্টান্ত দেওয়ার জন্য দু' একজন অভিনেত্রীর নাম করলুম আমি।

মন্মথবাবুর চোখেমুখে ভয়ের ছায়া পড়ল। চিন্তান্বিতভাবে তিনি বলতে লাগলেন, "হ্যাঁ পয়সার ছড়াছড়ি! আগুন দেখলে পতঙ্গদের কপাল পোড়ে—পুড়ে ছাই হ'য়ে যায়। পরেশের যদি আপত্তি না থাকে তা হ'লে এই ফাল্গুনেই মীনার বিয়ে দিয়ে দেব। আমার তো লোকজন কেউ নেই, তুমি এসে কাজের বাড়িতে খানিকটা সাহায্য করবে তো?"

"আপনার আমন্ত্রণ না পেলেও করব। চললেন?"

"কেন, আরও কথা আছে না কি?"

"বলছিলুম কি, আর কিছুদিন অপেক্ষা করলে পারতেন। পাত্র হিসেবে পরেশবাবু ভালই। কিন্তু মীনার জন্য আরও ভাল পাত্র যোগাড় করা অসম্ভব হবে না। একটু চেষ্টা করুন। আমরাও না হয় খোঁজ-খবর নেব। খানিকটা সময় দিন আমাদের।"

"দ্যাখো চেষ্টা ক'রে। পরেশের বাবার কাছ থেকে এখনো চিঠি পাইনি।" মন্মথবাবু সদর দরজা দিয়ে নিজের বাড়িতে প্রবেশ করলেন।

দরজার বাইরে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে রইলুম আমি। কেন দাঁড়িয়ে রইলুম তার কারণটা আমার কাছে অজ্ঞাত ছিল না। ভাবছিলুম, মীনাকে হয়তো দেখতে পাব। ওর সঙ্গে দেখা হ'লে বিয়ের ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করবার ইচ্ছে ছিল। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, মন্মথবাবু ভুল করছেন। মীনাকে বিয়ে করার যোগ্যতা পরেশবাবুর নেই। তা ছাড়া, মীনার মতো একটা লকলকে আগুনের শিখাকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে রাখা তাঁর সাধ্যি কুলিয়ে উঠবে না। সংসারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেও পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবেন।

মন্মথবাবুর বাড়ির সামনে বার দুই পায়চারি করলুম। নিজে হাতে বাগান তৈরি করেছেন তিনি। ফটকের দু'ধারে দুটো নারকেল গাছ। কয়েক পা ভেতরের দিকে হেঁটে গেলেই ফুলের কেয়ারি-গুলো চোখে পড়ে। দেয়ালের গা ঘেঁষে ঘেঁষে কৃষ্ণচূড়ার গাছ। একতলা বাড়ি। অনেকগুলো লতাগাছ বাড়িটার ছাদ পর্যন্ত উঠে গিয়েছে। বাইরে থেকে মনে হয় বেশ শান্তিপ্রিয় মানুষ এঁরা। অল্পতে সন্তুষ্ট। ছোট শহরে বাস করবার যোগ্য নাগরিক। দুশো টাকা মাইনের সরকারী চাকুরে হ'লেই হ'ল—তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে আপত্তি নেই মন্মথবাবুর।

না, মীনার সঙ্গে দেখা হবে না। আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করলে মন্মথবাবুর সঙ্গে আবার দেখা হ'য়ে যাবে। জলখাবার খেয়ে তিনি বাগানে বেরিয়ে আসেন। গাছের গোড়ায় জল দেন। খুরপী দিয়ে বুনো ঘাস পরিষ্কার করেন। এখনো আমি বাড়ির সামনে হাঁটাহাঁটি করছি—দেখতে পেলে তাঁর মনে নানা রকমের সন্দেহের উদ্রেক হ'তে পারে। হয়তো মীনার বিয়েতে কাজ করবার জন্য ডাকবেন না আমায়। একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মন্মথবাবুর বাড়ির সামনে থেকে সরে এলুম আমি।

নদীর দিকটা একটু ফাঁকা। সেই দিকেই পথ ধরলুম। মনে মনে উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছি আমি। মন্মথবাবু সৎ লোক তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বোকা। সাংসারিক জ্ঞানবুদ্ধির অভাব। পরেশবাবুর চেয়ে আমার যোগ্যতা কম নয়। টাকা-পয়সার ব্যাপারে আমার অবস্থা তাঁর চেয়ে ভাল। পরেশবাবুর চালচুলো কিছু নেই। আমার দোতলা বাড়ি আছে। শুধু একতলা থেকেই মাসিক পঞ্চাশ টাকা ভাড়া আসে। বাড়ির পেছন দিকে পাঁচ বিঘের বাগান। আম-কাঁঠালের গাছ গুনে শেষ করা যায় না। তা থেকেও বছরে হাজার টাকা রোজগার হয়। এই জেলাটা আমের জন্য প্রসিদ্ধ। হ্যাঁ, এম-এ পাস আমি নই। আই-এ পরীক্ষার পর আমি আর পড়িনি। পড়লে আমিও এম-এ পাস করতে পারতুম। তা ছাড়া পরেশবাবুর চেয়ে চেহারা আমার ভাল। মীনার পাশে আমাকে খুব বেমানান ঠেকবে না। কথাগুলো ভাবতে ভাবতে ঘেমে উঠলুম আমি। একটা কিছু ব্যবস্থা করা দরকার। মীনার কাছে সোজাসুজি প্রস্তাবটা উত্থাপন করব কি? কিংবা পরেশবাবুকে যদি সরিয়ে দেওয়া যায়? শহরের গুণ্ডা ক'টি তো আমারই হাতের লোক। বিশ-পঞ্চাশ টাকা খরচ করলে ওরা ধমকে দিতে পারে, ভয় দেখাতে পারে—ব'লে দিতে পারে পরেশবাবুকে যে, মীনাকে যেন তিনি বিয়ে না করেন। মীনা অন্য একজনকে ভালবাসে। আমার নামটা যদি ওরা পরেশবাবুর কাছে

উল্লেখ করে তাতেও আমি আপত্তি করব না।

ভুল পথে চ'লে এসেছি। এটা নদীর ধারে যাওয়ার পথ নয়। আমি চ'লে এসেছি শহরের মধ্যে। 'রুপালী' সিনেমার কাছে। এই মাত্র দুপুরের শো ভাঙল। 'হাউস ফুল' লেখা সাইন-বোর্ডের দিকে নজর পড়ল আমার। সেই দিকেই চেয়েছিলুম। হঠাৎ আমার নাম ধরে কে যেন ডেকে উঠল। পেছন ফিরে দেখি দাঁড়িয়ে রয়েছে মীনাক্ষী। একটু হেসে সে বলল, "এই যে ভাস্করদা—চলুন আমায় বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবেন।"

"তুমি কি সিনেমা-হাউস থেকে বেরুলে?"

"হ্যাঁ। ছবিটা আপনার একবার দেখা উচিত। বোম্বেতে শুধু একটা হাউসেই ত্রিশ সপ্তাহ চলেছে।"

ঠাট্টার সুরে জিজ্ঞাসা করলুম, "তুমি কি বোম্বে গিয়েছিলে?"

"যাইনি। ভাগ্যে থাকলে একদিন যাব......যাবই।"

"হ্যাঁ, পরেশবাবুকে সঙ্গে নিয়ে যেও।"

"পরেশবাবু কে?" ভুরু কোঁচকালো মীনাক্ষী।

"চলো, বলছি।"

মীনাক্ষীদের বাড়ির দিকে পথ ধরলুম। মীনাক্ষী বলল, "চলুন একটু ঘুরে যাই। নদীর ধারে এখন ভিড় নেই বোধ হয়।"

খানিকটা পথ আমরা নিঃশব্দেই এলুম। আমি বেশ বুঝতে পারছিলুম রাস্তায় লোকেরা মীনার দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে রয়েছে। মীনাক্ষী সবাইকে টানে। এমন কি বুড়োমানুষদেরও দৃষ্টি পড়ে ওর ওপর।

সন্ধ্যের ছায়া পড়ছে নদীর জলে। কেমন একটু ঘোলাটে ঘোলাটে ভাব। মাঘের এখন মাঝামাঝি সময়। একটা মণিপুরী শাল দিয়ে দেহটাকে ঢেকে রেখেছে মীনাক্ষী। লাল টুকটুকে শালের ওপর কালো বুটি। নদীর ধারে পৌঁছে মীনাক্ষী প্রশ্ন করল, "পরেশ-বাবু কে, ভাস্করদা?"

"এখানকার সরকারী ইস্কুলের মাষ্টার। নতুন চাকরি নিয়ে এখানে এসেছেন। তোমার বাবা তাঁর সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে চান।"

"বাবা বললেন বুঝি?"

"একটু আগেই কথা হ'ল। পরেশ-বাবুর বাবার কাছে প্রস্তাব ক'রে চিঠি লিখেছেন মন্মথবাবু। সম্মতি পেলেই ফাল্গুনের মধ্যে বিয়েটা শেষ ক'রে ফেলবেন।"

"কই আমি তো কিছুই জানি না।" বিস্ময় আর প্রতিবাদের ভঙ্গী স্পষ্ট হ'ল মীনাক্ষীর চোখে-মুখে। একটু থেমে সে আবার বলতে লাগল, "মালদা শহরে আমি থাকব না, থাকব না—কিছুতেই থাকব না।"

নদীর ধারে দাঁড়িয়ে মীনাক্ষী যেন অভিনয় করতে লাগল। প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রীও এতো সুন্দরভাবে মনের কথা প্রকাশ করতে পারত না।

একটু উস্কে দিলুম আমি, "তোমার বিয়ে হওয়া উচিত বড়মানুষের সঙ্গে। তা ছাড়া এতো সাত তাড়াতাড়িতে বিয়ে হওয়ার দরকারই বা কি?"

"আমি এখন বিয়ে করব না।"

ওদের বাড়ির সামনে এসে পড়লুম। গেটের চারদিকে আধো-অন্ধকার। মীনাক্ষী গেট খুলে ভেতরে প্রবেশ করল। বাইরে দাঁড়িয়ে আমি বললুম, "আমরা তোমার পেছনে আছি। শোনো—" গেটের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললুম, "তোমার যা রূপ আর গুণ আছে তাতে একজন মাস্টারের সঙ্গে বিয়ে হওয়া তোমার সাজে না। তুমি একদিন ভারত-বর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হবে। তোমায় আমি চিনি মীনা। কাল একবার এসো... আমি তো একাই থাকি বাড়িতে। পরা-মর্শ করা যাবে।"

মতামত প্রকাশ করল না মীনাক্ষী। আধো-অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে চলে গেল সে। আরও মিনিট দুই অপেক্ষা করলুম আমি। মনে হ'ল কেয়ারির ফুলগুলো ঝরে ঝরে প'ড়ে যাচ্ছে। লতাগাছগুলোর দিকে দৃষ্টি দিলুম। সেখানেও যেন অশান্তির ঝড় উঠেছে। কার্নিশের গা থেকে লতা গাছগুলো ঝুলে পড়ল নিচের দিকে। মুহূর্তের মধ্যে মন্মথ-বাবুর বাড়িটা অত্যন্ত রুক্ষ্ম দেখাতে লাগল। মৃত বটগাছের মতো প্রাণহীন বাড়িটা পীড়া দিতে লাগল আমায়। কয়েক মিনিটের জন্য আমি বোধ হয় মন্মথবাবুদের ভবিষ্যৎটা দেখতে পেয়ে-ছিলুম।

রাস্তাটা পূর্ব দিকে এগিয়ে গিয়ে বাঁ দিকে মোড় ঘুরেছে। ঐ কোণায় দাঁড়িয়ে মন্মথবাবুদের বাড়িটা দেখতে পাওয়া যায়। মোড়ের কাছে এগিয়ে আসতেই দেখা হ'য়ে গেল পেড্রোর সঙ্গে। মনে হ'ল এই মোড়ে দাঁড়িয়ে পেড্রো মন্মথ-বাবুর বাড়ির ওপর সতর্ক দৃষ্টি ফেলে রেখেছিল। বুকের রক্ত জল হ'য়ে এল আমার।

এই শহরের সবচেয়ে বড় গুণ্ডা হচ্ছে পেড্রো। নামটার একটা ইতিহাস আছে। নীলকরদের আমলে এদের পরি-বারটা খৃষ্টধর্ম অবলম্বন করে। এর ঠাকুরদা ছিলেন ধর্মযাজক। বাবা অবিশ্যি সরকারী চাকরি করতেন। কিন্তু শহরের সবাই তাঁকে পাদ্রীবাবু ব'লে ডাকতেন। বাবা মারা যাওয়ার পর পারিবারিক নামটা বহন করতে লাগল পেড্রো। ছেলেছোকরা সবাই তাকে সম্বোধন করে, "পাদ্রীদা।" সাম্প্রতিক কালে নামটা উল্টেপাল্টে হ'য়ে দাঁড়িয়েছে পেড্রো। অনেকে পেড্রোসাহেব ব'লেও ডাকে।

বছর পঁচিশ বয়স ওর। অটুট স্বাস্থ্য। ওর সাহসিকতার গল্পগুলো কিংবদন্তীর মতো লোকের মুখে মুখে আলোচিত হয়। ওর যখন বছর বারো বয়স তখন এই শহরের ইংরেজ পুলিশ-সাহেবরা পর্যন্ত ওকে ভয় করতেন।

লেখাপড়া বেশি করেনি পেড্রো। কিন্তু ইংরেজীতে কথা বলে ভাল। ছেলেবেলা থেকে শরীরচর্চা করেছে মনোযোগ দিয়ে। তারপর বাবা মারা যাওয়ার পর খুবই অভাবে প'ড়ে যায়। মা কিংবা ভাইবোন কেউ নেই। ব্যায়াম করলে খিধে বাড়ে বলে শরীরচর্চা ছেড়ে দিল পেড্রো।

ওর একটা মস্তবড় গুণ ছিল। খুবই পরোপকারী ছিল সে। গরীব-দুঃখীদের সাহায্য করবার জন্য পেড্রো জীবনপণ করেছে বহুবার। তবুও পুলিশের খাতায় ওর একমাত্র পরিচয় হচ্ছে: মারাত্মক গুণ্ডা।

স্বাধীনতার পর কোন এক রাজনৈতিক দল ওকে দিয়ে কাজ করিয়েছে অনেক। নির্বাচনের সময় পেড্রো ছিল ওদের দক্ষিণ হস্ত।

তারপর কাজ উদ্ধার হয়ে গেলে দলের কাছে পেড্রোর আর দাম রইল না। নারকেলের ছিবড়ের মতো পরিত্যক্ত হ'ল শহরের পাদ্রীদা। তাকেই আজ আমি দাঁড়িয়ে থাকতে

দেখলুম রাস্তার মোড়ে। আমি এগিয়ে যেতেই মাথায় পেলো টুপি আর লম্বা প্যান্ট-পরা মানবমূর্তিটা একদিকে একটু স'রে দাঁড়াল। মোড় পর্যন্ত এগিয়ে আসতেই আমি দেখলুম, ল্যাম্পপোস্টের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছে পেড্রো।

জিজ্ঞাসা করলুম, "এখানে দাঁড়িয়ে কি করছিস রে?"

"তোমাদের দেখছিলাম, ভাস্করদা।"

"আমাদের?" কথাটা যেন বুঝতে পারিনি আমি।

"হ্যাঁ। তোমাকে, আর......মনমটোবাবুর মেয়েটাকে।" ভেংচে উঠল পেড্রো। তারপর জ্বলন্ত সিগারেটের মুখটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে বাকী অংশটুকু বুক-পকেটে রেখে মৃদু হেসে বলল সে, "তুমি একা একাই মজা লুটবে, ভাস্করদা? আমায় একটু পেসাদ দেবে না?" ইচ্ছে ক'রেই ট্রাউজারের ডান পকেটে হাত ঢোকাল পেড্রো। আমি দেখলুম, পকেটের ফাঁক দিয়ে একটা ছোরার মুখ রয়েছে বেরিয়ে। চকচক করছে মুখটা। বেশ বড় ছোরা। চওড়াও কম নয়। অন্তত ইঞ্চি তিন তো হবেই। ছোরার মুখে হাত বুলোচ্ছিল পেড্রো।

আমি একটু স'রে দাঁড়ালুম দূরে। সে আবার আমায় জিজ্ঞাসা করল, "একটু পেসাদ আমায় দেবে না, দাদা?"

"তোর একলার ক্ষমতা তো কম নয়, আমার কাছে ভিক্ষে চাইছিস কেন?"

"তোমরা হচ্ছ গিয়ে ভদ্দরলোক...... মনমটোবাবুও ভদ্দরলোক—" হি হি শব্দে হেসে উঠল গুণ্ডাটা।

পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বার ক'রে বললুম, "নে, এটা রাখ তোর কাছে।"

"এ কি দিচ্ছো, ভাস্করদা? পয়সা আমি চাই নে।"

"কেন, ব্যাঙ্ক লুঠ করেছিস না কি?"

"না। চাকরি পেয়েছি আমি।"

"কি চাকরি?"

"রুপোলী সিনেমার গেট আগলানোর কাজ।"

"ও, তাই বল্। আমি ভাবলুম, জজ-ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি পেয়েছিস বুঝি।"

"রাগ ক'চ্ছো তুমি? দাও তা হ'লে—" ফস ক'রে আমার হাত থেকে পাঁচ টাকার নোটখানা ছোঁ মেরে নিয়ে নিল পেড্রো। আমি জানতুম যতো বড় চাকরিই না সে করুক, পাঁচটা টাকা হাতছাড়া করবে না। রুপোলী সিনেমার গেট-কীপার হয়েছে পেড্রো। ব্যাপারটা একটা হেঁয়ালির মতো ঠেকছে। দুপুর, সন্ধ্যেতে রুপোলী সিনেমার গেট আগলে ব'সে থাকবার ছেলে সে নয়। ত্রিশ-চল্লিশ টাকার বেশি মাইনেও সে পাবে না। তবে সে হঠাৎ কেন চাকরিটা নিতে গেল? প্রায় প্রত্যেকদিনই ছবি দেখতে যায় মীনাক্ষী। একই ছবি বার বার দেখে সে। তবে কি মীনার ওপর চোখ পড়েছে পেড্রোর? যদি প'ড়েই থাকে তা হ'লে আমি তো মীনাকে রক্ষা করতে পারব না। পেড্রোর হাতে পড়ার চেয়ে পরেশ-বাবুর সঙ্গে তাড়াতাড়ি বিয়ে হ'য়ে যাওয়া ভাল। পেড্রোর হাত আর বাঘের থাবা একই জিনিস। একবার দাগ লাগলে সে দাগ আর উঠবে না। মেয়েটার ভবিষ্যৎ যাবে নষ্ট হ'য়ে। সামাজিক সম্ভ্রম হারিয়ে ফেলবে মীনা। মধ্যবিত্ত কিংবা উঁচু সমাজের কেউ ওকে আর বিয়ে করতে চাইবে না। কাজটা ভাল করিনি। একটু আগেই মীনাক্ষীর কল্পনার আগুনটাকে খুঁচিয়ে দিয়ে এলুম আমি। ভারতবিখ্যাত অভিনেত্রী হওয়ার দরকার নেই ওর। পরেশবাবুর সঙ্গে নিরিবিলিতে বসে ঘর-সংসার করুক। ধন-দৌলত এবং খ্যাতির পরিমাণ যতোই হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত মানুষ শান্তির পেছনেই ছোটে। কালই মন্মথ-বাবুর সঙ্গে দেখা করব আমি। তাঁকে বলব, পরেশবাবু শিক্ষিত লোক এবং পাত্র হিসেবে মীনাক্ষীর পক্ষে উপযুক্তই হবে। ফাল্গুন পর্যন্ত অপেক্ষা করার দরকার কি? মাঘের শেষে গোটা দুই বিয়ের তারিখ আছে। হাত-পা চালিয়ে কাজ এবং কেনাকাটা করলে ঐ দুই তারিখের মধ্যে যে-কোনো একটা তারিখে বিয়ে হ'য়ে যেতে পারে।

জিজ্ঞাসা করলুম, "ভাল চাকরি পেয়েছিস। পকেটে ছোরা রেখেছিস কেন?"

"ভয় দেখাবার জন্য।" আধ-পোড়া সিগারেটের অংশটা বার করল পেড্রো।

"কাকে ভয় দেখাতে চাস?"

"মনমটোবাবুকে।"

"কেন?"

"তুমি তো আমার সব কিছু জানো, ভাস্করদা। আমরা হচ্ছি গিয়ে নীলচাষের সময়কার খৃষ্টীয়ান।"

বাধা দিয়ে প্রশ্ন করলুম, "যীশু-খৃষ্টকে ভক্তিটক্তি করিস?"

"আগে করতাম। তারপর খিদের জ্বালায় যখন ব্যায়ামচর্চা ছেড়ে দিলাম তখন থেকে আর করি না। এই ছোরাটাই হচ্ছে গিয়ে আমার যীশুখৃষ্ট। কিন্তু মনমটোবাবুই বা কি রকমের হিন্দু?"

"কেন, তিনি তোর কি করলেন? তোর তো একদানাও পাকা ধান নেই, অতএব মই দেওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।"

ফক্ ফক্ ক'রে সিগারেটে টান মারল বার কয়েক। তারপর সে বলল, "আমরা হচ্ছি গিয়ে ধর্মযাজকের বংশ। মিছে কথা বলি না। কিন্তু মনমটো-বাবু? তিনি মিছে কথা বলেন। পুলিশের কাছে আমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করেছেন।"

"কেন, কি করেছিলি তুই?"

"মেয়েটার রূপ দেখে একদিন আমি হাঁ করে তার দিকে চেয়েছিলাম। মেয়েটা যে কবে বড় হয়ে উঠল, আমি তা টেরই পাইনি। বুঝলে ভাস্করদা, ওর প্রেমে প'ড়ে গেলাম। কিন্তু মনমটোবাবু রিপোর্ট করলেন যে, আমি নাকি তার গায়ে হাত দিয়েছি।"

"তিনি জানলেন কি ক'রে?"

"রাস্তার ভদ্দরলোকদের কাছ থেকে। তারা নাকি গায়ে হাত দিতে দেখেছে। বুঝলে ভাস্করদা, তোমরা যখন মেয়েটাকে দেখো তখন কোনো দোষ হয় না। শুধু আমার বেলায় পুলিশের কাছে মিথ্যে রিপোর্ট দাও তোমরা। ভাবছি, এই শহরে আর থাকব না।"

"কি করবি?"

"হিরোর পার্ট করব ফিল্মে। আর গোটা পাঁচেক টাকা দিয়ে যাও তো ভাস্করদা—" হাত বাড়াল পেড্রো।

ওর হাতে টাকা দিয়ে বললুম, "তোর যা চেহারা ফিল্ম কোম্পানী লুফে নেবে তোকে।"

"ঠিক বলচো?"

"ঠিক বলছি। যাওয়ার আগে আর একদিন দেখা ক'রে যাস। বুঝলি? আরও গোটা কুড়ি টাকা দিয়ে দেব।"

সিগারেটের টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রুপালী সিনেমা হাউসের দিকে পথ ধরল পেড্রো।

ওর একটা কথাও বিশ্বাস করলুম না আমি। পরের দিন আদালতে গিয়ে মন্মথবাবুকে সব কথা খুলে বললুম। পেড্রোর মতো সাংঘাতিক চরিত্রের লোক যা তা ক'রে বসতে পারে। পুলিশের কাছে আগে কোনো সাহায্য পাওয়া যাবে না। অপরাধ না করলে পেড্রোর গায়ে হাত দেবে না তারা। তা ছাড়া, পুলিশের মধ্যে অনেকের সঙ্গেই ভাব এবং বন্ধুত্ব আছে ওর। মোদ্দা কথা হচ্ছে এই যে, মাঘের শেষেই মীনাক্ষীর বিয়ে হওয়া উচিত।

মন্মথবাবু বিস্মিত বোধ করলেন। গতকাল আমি তাঁকে উল্টোকথাই বলেছিলাম। তাতে তাঁর সন্দেহ হয়েছিল যে, মীনাকে বোধ হয় আমিই বিয়ে করতে চাই।

সব কথা শুনে তিনি বললেন, "পরেশের সঙ্গে যদি কোনো কারণে বিয়ে না হয়, তা হ'লে তুমি কি মীনাকে বিয়ে করতে রাজী আছ?"

"কৃতার্থ বোধ করব আমি।" পা-এর ধুলো নিলুম মন্মথবাবুর।

পঁচিশে মাঘ বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে। পরেশবাবু ছুটি নিয়ে বালুরঘাট গিয়েছেন তাঁর বাবার কাছে। সেখান থেকেই তাঁরা পঁচিশে তারিখ সকালবেলা এসে পৌঁছবেন। কেনাকাটার ব্যাপারে মন্মথবাবুকে সাহায্য করলুম আমি। মীনার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ পাব বলেই কাজের মধ্যে প্রাণ ঢেলে দিলুম। মন্মথবাবু খুশী হয়েছেন খুব। আমি যে অসৎ লোক নই সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েছেন তিনি। মীনার বিয়েতে আমার স্বার্থ কিছু নেই, তবুও অফিস কামাই ক'রে কাজ করছি। মীনার সঙ্গে বার করেক দেখা হয়েছে। চোখ দুটো ফোলা ফোলা। বোধহয় ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে কান্নাকাটি করছে। মাঝে মাঝে বলে সে, "ভুল করছেন বাবা। মস্তবড় ভুল। এ-বিয়েতে আমার মত নেই।"

শহর ছেড়ে গিয়েছে পেড্রো। বিয়ের দিন পাঁচেক আগে থেকে আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। পুলিশের দু'একজন লোকের সঙ্গে আমারও চেনা ছিল। ছোট দারোগাসাহেব বললেন, "আমরা ভয় দেখিয়েছিলাম। তাই সে শহর ছেড়ে চ'লে গিয়েছে।"

পরেশবাবুর সঙ্গে মীনাক্ষীর বিয়ে হ'য়ে গেল। বিয়ে দেখবার জন্য পুরো শহরটাই ভেঙে পড়েছিল মন্মথবাবুর বাড়িতে। আমার বিশ্বাস, বারো আনা লোকই মনে মনে এ-বিয়ে অনুমোদন করেনি। এই বারো আনার মধ্যে আমিও ছিলুম।

প্রায় মাসখানিক পর পরেশবাবু আমায় একদিন ডেকে পাঠালেন। তাঁর বাড়িতেই গেলুম আমি। বসতে বললেন না তিনি। হঠাৎ আমায় প্রশ্ন করলেন, "মীনা কোথায়?"

"তার মানে?" আকাশ থেকে পড়লুম আমি।

"দু' সপ্তাহ হ'ল মীনাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

বিনা অনুমতিতেই চৌকির ওপর ব'সে পড়লুম আমি।—

॥ দুই ॥

পরেশবাবুর ব্যবহার দেখে সেদিন অবাক হয়েছিলুম খুবই। গোড়া থেকেই তিনি আমায় সন্দেহ করতে লাগলেন। চৌকির ওপর ব'সে প'ড়ে মাথা নিচু ক'রে রেখেছিলুম অনেকক্ষণ পর্যন্ত। মুখে কথা জোগায়নি। তারপর জিজ্ঞাসা করেছিলুম, "আপনি আমায় সন্দেহ করছেন কেন?"

পরেশবাবুকে উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। প্রশ্নের জবাব দিতে দেরি করতে লাগলেন। প্রশ্নটা দ্বিতীয়বার উত্থাপন করতেই তিনি বললেন, "অনেকেই বলছে মন্মথবাবুর মেয়েকে আপনি ভালবাসতেন।"

"দু'-একজনের নাম বলুন—"

"নাম শুনে আপনার কি লাভ? এর মধ্যে সত্যিই যদি কোনো রহস্য থাকে আমাকে খুলে বলুন। মীনাক্ষীর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল তা ঠিক। কিন্তু এতো অল্প সময়ের মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক কিছু সৃষ্টি হয়নি। অতএব ভেতরের রহস্য জানতে পারলেও কষ্ট পাব না আমি। আপনি কি মীনাকে ভালবাসতেন?"

"সে তো কাল্পনিক ভালবাসা। শহরের শত শত লোক কল্পনায় ভালবাসত ওকে। মীনা তার খবর রাখত না। দু' সপ্তাহ তো আপনার সঙ্গে বাস করেছে সে। আপনি নিজে কিছু টের পাননি?"

পরেশবাবু উসখুস করতে লাগলেন। অস্বস্তি বোধ করছেন তিনি। মীনার প্রতি তাঁর ভালবাসা জন্মায়নি বটে, কিন্তু তিনি যে ওর স্বামী সেই সত্যটা তাঁকে পীড়া দিচ্ছে নিশ্চয়ই। বিবাহিত জীবনের দুটো সপ্তাহের ইতিহাস প্রকাশ করতে লজ্জা পাচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি বলতে লাগলেন, "অপরের প্রতি প্রেমাসক্তা ব'লে টের পাইনি। আমার সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে কথাবার্তা বলত। আমি ভেবেছিলাম, নতুন ব'লেই দূরত্ব বজায় রাখা স্বাভাবিক। দু'-এক মাস পরেই স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা সহজভাবেই প্রতিষ্ঠিত হবে। এর বাইরে আর কিছু সন্দেহ করিনি।"

"কোনো চিঠিপত্র লিখে রেখে যায়নি?"

"হ্যাঁ।" টেবিলের ওপর থেকে এক টুকরো কাগজ তুলে এনে আমার দিকে এগিয়ে ধ'রে বললেন, "নিন, পড়ুন।"

দু' লাইনের চিঠি। মীনা লিখেছে: আমায় আপনি ক্ষমা করবেন। খোঁজ করবার চেষ্টা করবেন না। বাবার হাত থেকে মুক্তি দিয়েছেন ব'লে ধন্যবাদ।

হতবাক হ'য়ে ব'সে রইলুম। পরেশবাবু আমাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তাঁর চোখে সন্দেহের দৃষ্টি। মনটা বিষিয়ে উঠল আমার। যতো দোষ, নন্দ ঘোষ। গায়ে প'ড়ে উপকার করতে গিয়েছিলুম। মন্মথবাবুর উচিত ছিল তাঁর জামাই-এর মন থেকে সন্দেহ দূর ক'রে দেওয়া। তা তিনি দেননি। তবে কি মন্মথবাবুও আমাকে সন্দেহ করছেন? আমি একরকম মরীয়া হ'য়ে পরেশবাবুকে বললুম, "পুলিশের সাহায্য নিন।"

"না। জোর ক'রে আমি তাকে ফিরিয়ে আনতে চাই নে। আমার যা বিপদ তা হচ্ছে সামাজিক। শহরের কেউ এখনো টের পায়নি। একদিন তো অবশ্যই টের পাবে সবাই। জিজ্ঞাসা করলে কি বলব তাই শুধু ভাবছি।"

পরেশবাবুর গলার সুর ভিজে উঠল। চোখ দুটোও ছল ছল করছে। তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। মীনার সঙ্গে যখন ভালবাসার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়নি তখন সামাজিক ইজ্জতের কথাটা তাঁর চোখে বড় হয়ে উঠবেই। পাঁচজনের

প্রশ্নের জবাব তাঁকে একদিন-না-একদিন দিতে হবেই।

একটু পরেই পরেশবাবু বন্ধুর মতো ব্যবহার করতে লাগলেন। আমাকে আর শত্রু ব'লে বিবেচনা করছেন না। আমার সহযোগিতা চাইলেন তিনি। জিজ্ঞাসা করলেন, "মন্মথবাবুর মেয়ে অন্য কাউকে ভালবাসত ব'লে কি আপনার বিশ্বাস হয় না?"

"আমি নিজে চোখে কোন দিনও কিছু দেখিনি।"

"তবে গেল কেন?"

"সেই কথাই তো ভাবছি। তবে হ্যাঁ, ফিল্মের অভিনেত্রী হওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল মীনার। প্রায় প্রতিদিনই ছবি দেখত। দেশী এবং বিলেতী ফিল্মের ম্যাগাজিন কিনত রাশি রাশি। কিন্তু একা একা মালদা শহর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সাহস ওর না থাকাই উচিত। এখন মনে হচ্ছে মীনা নিশ্চয়ই লুকিয়ে লুকিয়ে অন্য কাউকে ভাল-বাসত। আপনার সন্দেহ মিথ্যে নয়। এসম্বন্ধে মন্মথবাবু কি বলেন?"

"মীনার চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা কিছু হয়নি। তিনি বলেন পুলিশের সাহায্য নিতে। এজাহার একটা লিখিয়ে আসবার জন্য পেড়াপিড়ি করছেন। দেখুন ভাস্করবাবু, ব্যাপারটা আমি আপাতত গোপন রাখতে চাই।"

"কেন? উদ্দেশ্যটা কি?"

"নিজের ভুল বোঝবার সময় ওকে দিতেই হবে।"

বই-পড়া মানুষের মতো কথা বলতে লাগলেন পরেশবাবু। প্রেমের এ্যাকা-ডেমিক ব্যাখ্যা নিয়ে মেতে উঠলেন তিনি। প্রাচীন ইতিহাস থেকে দৃষ্টান্ত উল্লেখ ক'রে আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, হাঙ্গাম-হুজ্জত ক'রে মেয়েদের মনে প্রেমের সৃষ্টি করা যায় না। পুরুষ যদি তার চারিত্রিক দৃঢ়তার দ্বারা মেয়েদের মন জয় করতে না পারে তাহ'লে পুলিশ তাকে সাহায্য করবে কি ক'রে? করলেও ফল তার ভাল হয় না।

জিজ্ঞাসা করলুম, "নিজের ভুল বোঝবার জন্য মীনাকে কতোদিন সময় দেবেন ব'লে ভাবছেন?"

"দু'-এক মাস দেখাই যাক না। অপরের প্রতি ওর প্রেম যদি সত্যিই খাঁটি হ'য়ে থাকে তাহ'লে আমিই বা তেমন স্ত্রীর সঙ্গে ঘর করব কেন? ভাবছি, এখানে থেকে বদলি হ'য়ে অন্য ইস্কুলে চ'লে যাব। আমার তো বদলির চাকরি।"

হ্যাঁ, কথাটায় যুক্তি আছে। তিনি যদি শহর ছেড়ে চ'লে যান তাহ'লে মীনাক্ষীর নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারটা চোখে পড়বে না কারুর। পরেশবাবুর কথায় সায় দিলুম আমি। সরলচিত্ত মানুষটির জন্য দুঃখ অনুভব করলুম। আমার নিজের জীবনে যদি এই ধরনের ঘটনা একটা ঘটত তাহ'লে লজ্জায় এবং অপমানে আমিও বোধ হয় ভেঙে পড়তুম। এখন মনে হচ্ছে, মীনার সঙ্গে বিয়ে হ'লে আমার কপালেও লাঞ্ছনার শেষ থাকত না। অনুরূপ শোকাবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হ'তো। ওকে বিয়ে করবার জন্য আমিও তো মনে মনে ক্ষেপে উঠেছিলুম। ভগবান আমায় রক্ষা করেছেন।

একটু পরেই পরেশবাবুর নির্জীব মনটা যেন নতুন উদ্যমে সজীব হ'য়ে উঠল। ঘরের মধ্যে বার দুই পায়চারি করলেন। তারপর আমার ঘাড়ের ওপর চাপ দিয়ে বললেন, "আপনি যদি ওকে অন্য কোথাও লুকিয়ে রেখে থাকেন তাহ'লেও আমি লড়াই করতে যাব না। আমি ইস্কুল-মাস্টার বলে ভাববেন না যে, এক বছরের মধ্যে ভেড়া ব'নে গিয়েছি। যাই বলুন না কেন, মন্মথ-বাবুর মেয়ে ট্রয়নগরীর হেলেন নয়। খাকী-পোশাকপরা পুলিশ বাহিনী নিয়ে আপনার গুপ্তস্থানটি আক্রমণ করতে যাব না। মীনাক্ষীর সঙ্গে আমার দৈহিক কিংবা আত্মীক সম্পর্ক কিছু হয়নি। আপনাদের প্রেম যদি সাচ্চা হয় তাহ'লে কবুল করুন, মীনাকে মুক্তি দিয়ে দিচ্ছি আমি। বিবাহ-বিচ্ছেদের আইন আজকাল সহজ হয়েছে।"

আবার যেন আকাশ থেকে পড়লুম আমি! লোকটা এখনো আমাকে অবিশ্বাস করছে। সরলচিত্ত মানুষদের চরিত্র এই রকমই হয়। একবার যদি কোনোক্রমে মনে তাদের সন্দেহ ঢোকে তাহ'লে সহজে সেই সন্দেহের ভূতটা মন থেকে তাড়িয়ে দেওয়া যায় না। আমি ভাবলুম, এই সন্দেহের মূলে আছেন মন্মথবাবু। তিনি নিশ্চয়ই এমন কোনো কথা বলেছেন যাতে পরেশ-বাবু ভেবে নিয়েছেন মীনার সঙ্গে আমার প্রেম-প্রণয়ের সম্পর্ক ছিল। তা যদি হবে, মীনাকে আমি বিয়ে করতে নিশ্চয়ই দিতুম না। বিয়ের আগেই নিখোঁজ হ'য়ে যেত সে।

পরেশবাবুর কথায় আহত বোধ করা স্বাভাবিক। উঠে পড়লুম আমি। আমার সঙ্গে সঙ্গে তিনি রাস্তা পর্যন্ত এলেন। তাঁর ডান হাতটা টেনে নিয়ে বললুম, "আমি একটু লাজুক প্রকৃতির মানুষ। প্রেম-প্রণয়ের ব্যাপারে তো বটেই। বিশ্বাস করুন, মীনাক্ষীর খবর আমি জানি না।"

অবিশ্বাসের হাসি ফুটে উঠল পরেশবাবুর মুখে। রাগ হ'ল আমার। আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগল খুব। অপরের বউ-চুরির অভিযোগ স্বীকার করতে রাজী নই আমি। আত্মাভিমান এতো প্রবল হ'য়ে উঠল যে, মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেললুম। প্রতিজ্ঞা ক'রে বসলুম, "আমি যে নির্দোষ তা আমি প্রমাণ করব—করবই।"

হন হন ক'রে রাস্তা পার হয়ে যাচ্ছি। দৃষ্টি স্বচ্ছ নয়। কি ক'রে প্রমাণ করব তার পথ আমার জানা নেই। তবু প্রতিজ্ঞা ক'রে বসলুম। রাগের মাথায় হেস্তনেস্ত করে ফেলেছি তা হোক, কথা আমায় রাখতেই হবে। ইস্কুলটা বাঁ দিকে রেখে ডান দিকের পথ ধরলুম। মন্মথবাবুর সঙ্গে এক্ষুণি একবার দেখা করা দরকার। তাঁর মনো-ভাবটা আমার জানা চাই। তিনিও কি আমায় সন্দেহ করেন?

নিশ্চয়ই করেন। নইলে পরেশবাবুর সাহস এতো বেশি বাড়তে পারত না। বার বার ক'রে একই কথা বলতে পারতেন না তিনি। কিন্তু মীনাক্ষী একা একাই বা পালিয়ে যাবে কি করে? ছেলেবেলা থেকেই তো দেখছি ওকে। অভিনেত্রী হওয়ার শখ ওর সাম্প্রতিক। বছর দুই আগেও এতো ঘন ঘন ছবি দেখতে কিংবা ফিল্ম-ম্যাগাজিন কিনতে ওকে দেখি নি। মাত্র দু' বছরের মধ্যে এতো বেশি দুঃসাহস সঞ্চয় করল কোথা থেকে? পেছনে কেউ নিশ্চয়ই আছে। লুকিয়ে লুকিয়ে অন্য কাউকে ভালবাসত সে। পরেশবাবুর কাছ থেকে শুনে এলুম, শাড়ি-গহনা কিছু রেখে যায়নি মীনা। মন্মথবাবুর একটি মাত্র মেয়ে। প্রায় দশ হাজার টাকার গহনা দিয়েছিলেন। সারা-জীবনের গচ্ছিত টাকা সবই ঢেলে দিয়ে-ছিলেন মেয়ের বিয়েতে। সব নষ্ট হয়ে গেল আজ। শাড়ি-গহনা সব নিয়েই

নিখোঁজ হয়েছে মীনা। এর পেছনে প্রেম, না ডাকাতির অভিসন্ধি? ফুসলে-ফাসলে মেয়েটাকে বার ক'রে নিয়ে মেরে ফেলেনি তো?

পেড্রোকে সন্দেহ করা অসম্ভব। অন্তত সোজাসুজি দায়ী করা যায় না। বিয়ের আগে থেকেই শহর ছেড়ে গিয়েছে সে। তা ছাড়া, পুলিশের ধারণা, পেড্রো গুণ্ডা হ'তে পারে—গুণ্ডাই সে, কিন্তু খুনের প্রবৃত্তি ওর মধ্যে নেই। যারা ওর ভেতরটা ভাল ক'রে চেনে তারা বলে, পেড্রোর মনটা অত্যন্ত নরম—বালকোচিত। তাছাড়া, পেড্রোর সঙ্গে মীনাক্ষীর যোগাযোগ থাকলে আমার দৃষ্টি ওরা এড়িয়ে যেতে পারত না। আজ আমার স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে, গুপ্তচরের মতো মীনার ওপর নজর রেখেছিলুম আমি। অফিসের কাজ ফেলে মিথ্যা অজুহাতে দুপুরবেলা বেরিয়ে যেতুম। সিনেমার আশপাশ দিয়ে ঘোরাফেরা করতুম। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও পেড্রোর সঙ্গে ওকে কথা বলতে দেখিনি। মীনার ওপর পেড্রোর লোভ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু ফুসলে-ফাসলে তাকে ঘরের বাইরে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা ওর নেই। মীনার চিঠি প'ড়ে মনে হয়, স্বইচ্ছায় এবং চতুর্দিক দেখেশুনেই ভবিষ্যতের পথ বেছে নিয়েছে সে। পূর্ব-পরিকল্পনার আভাবও পাওয়া যায়। মন্মথবাবুকে ভয় করত সে। আইনত বাবার হা'ত থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিল। ইস্কুলের মাস্টার যতো তেজী মানুষই হোক না কেন, পয়সা খরচ ক'রে ওকে খুঁজতে বেরুতে পারবে না। এখন স্মরণ হচ্ছে, বিয়ের দু' দিন আগে এই ধরনের একটা মন্তব্য করেছিল মীনাক্ষী। বলেছিল, "অল্প মাইনের মাস্টারের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ভালই করলে, ভাস্করদা।"

জিজ্ঞাসা করেছিলুম, "কেন?"

"শাপে বর।"

পেড়াপীড়ি সত্ত্বেও ভাবার্থটা পরিষ্কার করেনি মীনা। মন্মথবাবুর বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে সেদিনের কথাগুলো মনে পড়তে লাগল আমার। পূর্ব-পরিকল্পনার পথ ধরেই নিখোঁজ হয়েছে সে। এখন ভগবানের কাছে শুধু প্রার্থনা করতে লাগলাম, "মেয়েটা যেন অক্ষত থাকে, বেঁচে থাকে।" সোনার পরিমাণটা একটু বেশি। প্রেমিকটি যদি দুর্বৃত্ত হয়, তা হ'লে লোভ সামলাতে কষ্ট হবে।

বাগানে ব'সে মন্মথবাবু খুরপি দিয়ে বুনো ঘাস তুলছিলেন। মুখের ওপর তাঁর উদ্বেগের চিহ্ন দেখলুম না। প্রকৃতপক্ষে খুবই শান্ত এবং ঠাণ্ডা মেজাজে কাজ করছেন ব'লে মনে হ'ল আমার। আমাকে দেখে বুনো ঘাস উৎপাটন করা বন্ধ করলেন না। মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হে, খবর কি, ভাস্কর?"

বিনীত স্বরে বললুম, "পরেশ-বাবুর বাড়ি থেকে আসছি।"

"কি খবর তার?" নির্লিপ্ত ভঙ্গী মন্মথবাবুর।

"বড্ড কষ্ট পাচ্ছেন তিনি?"

'কেন?" গলার স্বরে হেঁচকা টান মারলেন।

"মীনা হঠাৎ নিখোঁজ হ'য়ে গেল, তাই।"

"তুমি নিজে কিছু সন্ধান দিতে পার না?"

যা সন্দেহ করেছিলুম তাই ঘটেছে। মনের ভারসাম্য এবার আমি বজায় রাখলুম। উত্তেজনা-তুরঙ্গের বল্গাটাকে ধ'রে রাখলুম শক্ত ক'রে। একটু ঢিলে দিলেই তুরঙ্গটা ছুটবে। মুখ থুবড়ে প'ড়ে যেতেও পারি। শান্ত এবং সমাহিত সুরে পাল্টা প্রশ্ন করলুম, "আমি সন্ধান দেব কি ক'রে?"

"তোমার সঙ্গেই তো যা একটু ভাব ছিল ওর।"

"আপনি ঠিক জানেন?"

"জানি।"

"শহরের আর কারো সঙ্গে কি মীনা কথাবার্তা বলত না?"

"চোখে পড়েনি এবং শুনিওনি।"

অপমানে দুটো কানই লাল হ'য়ে উঠল আমার। কড়া কথা দু' একটা শুনিয়ে দেওয়া দরকার। বললুম, "আপনি তো দুপুরবেলা দপ্তরে ব'সে সরকারী কাজ করতেন। মীনা যেতো ছবি দেখতে। দুনিয়ার যতো রাবিশ ছবি তাও সে বাদ দিত না। ওর যাওয়া আসার পথটা তো আপনি আগলে ব'সে থাকতেন না, চ্যাটার্জিমশাই?"

খুরপীটা ঘাসের ওপর ফেলে রেখে এবার উঠে দাঁড়ালেন মন্মথ চ্যাটার্জি। মুখের ওপর দেখলুম, গাম্ভীর্যের আস্তর টানা। একটা মাটির ঢেলা পা দিয়ে একদিকে সরিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, "আমার মেয়েকে আমি চিনি।"

"তা হ'লে আমি বলব, আমাকে আপনি চেনেন না। পরের বউ লুঠ করবার মনোবৃত্তি আমার নেই।"

"কি ক'রে বুঝব?" লঘু সুরে প্রশ্ন করলেন মন্মথবাবু।

"বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি আমি।'

অপেক্ষা করলুম না আর। কথা কাটাকাটি ক'রে লাভ হ'তো না কিছুই। মীনাকে খুঁজে বার না করতে পারলে এ'দের মন থেকে সন্দেহ দূর করা যাবে না। মনের সঙ্কল্প আমার ক্রমশই দৃঢ়তর হচ্ছে। মীনাকে খুঁজে বার করতেই হবে। সোনার গহনা আত্মসাৎ করবার জন্য ওকে যদি খুন ক'রে ফেলেও থাকে, তবুও তার শবদেহটাকে খুঁজে আনব আমি। মহানন্দার জলে স্রোতের বেগ খুব কম। ভাসতে ভাসতে যতো দূরেই চ'লে যাক না কেন, শবদেহটার হদিস পাওয়া চাই। কিন্তু আমার বিশ্বাস, মীনাক্ষী বেঁচে রয়েছে। বাগানের বাইরে বেরিয়ে এসে বললুম, "ওর খোঁজ না আনতে পারলে মালদা শহরে ফিরে আসব না আর। নমস্কার।"

মন্মথবাবু হতভম্বের মতো তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে।

এর পর আরও এক মাস কেটে গেল। নিজের ভুল বুঝতে পারলে মীনাক্ষী এতো দিনে ফিরে আসত। গতকাল পরেশ চক্রবর্তী মালদা শহর ত্যাগ ক'রে চ'লে গিয়েছেন। বদলি হয়েছেন নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর সরকারী ইস্কুলে। কারো সঙ্গেই তিনি দেখা ক'রে যাননি। এমনকি মন্মথ-বাবুর সঙ্গেও না।

মীনার নিখোঁজ হওয়ার সংবাদ গোপন নেই। ক্রমে ক্রমে খবরটা সবারই কানে গিয়ে পৌঁচেছে। শহরটা গরম হ'য়ে ওঠবার একটু আগেই স্থান ত্যাগ করলেন পরেশবাবু।

দিন সাতেক পর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে মন্মথবাবুও বেরিয়ে পড়লেন তীর্থ করতে। দু' মাসের ছুটি নিয়েছেন। শুনলুম, কাজে যোগ দেওয়ার আর ইচ্ছে নেই। মালদা শহরে একা পড়লুম আমি। ঘটনাটা এখানেই ঘটেছে

বটে, কিন্তু পরিণতির দৃশ্যটা উন্মোচিত হ'ল অন্য জায়গায়। কি বিচিত্র কাহিনী! পরিণতির দৃশ্যটাও কি করুণ! রূপ শুধু ভোলায় না, নিয়ন্ত্রণের বাঁধুনি আলগা হ'লে নিজেকেও পোড়ায়। মীনাক্ষীর জীবনচরিত্র সেই কথাই প্রমাণ করে। ছোট শহরের কাহিনী উচ্চাকাঙ্ক্ষার ট্রেনে চেপে দুরন্ত গতিতে ছুটে চলল বড় শহরে।

আমাকে আরও কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতে হ'ল। বেহানী কোম্পানীর চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছি। বাড়িটা বিক্রি ক'রে দিলুম। ত্রিশ হাজার টাকায় বিক্রি হ'য়ে গেল। আর কিছু দিন অপেক্ষা করলে আরও হাজার দশেক বেশি পাওয়া যেত।

এক দিন সবার অগোচরে বেরিয়ে পড়লুম মালদা শহর থেকে। কেউ টের পেল না।

চলেছি কলকাতা।

॥ তিন ॥

আগেও বার কয়েক কলকাতা এসেছিলুম। কিন্তু কোনোবারই দিন সাতেকের বেশি থাকিনি। রাস্তাঘাট চেনা ছিল না। প্রত্যেকটা রাস্তাই দেখতে এক রকমের মনে হ'তো। কলকাতা পৌঁছে শেয়ালদার কাছেই একটা আস্তানা খুঁজে নিলুম। 'পান্থনিবাস' নামে বোর্ডিং-এর পুরো একটা ঘর ভাড়া করলুম। ঘরটা ছিল দুই সীটের। ম্যানেজার শশীকান্ত ধর বললেন, "দুই সীটের ভাড়া আপনাকে দিতে হবে। খাওয়া খরচ অবিশ্যি একজনের হিসেবে দিলেই চলবে।"

বড় অদ্ভুত ধরনের মানুষটি। প্রথম দর্শনে ধারণা জন্মাল, শশীকান্ত ধর আমাদের মতো মানুষ নন, একটি মূর্তিমান জল্লাদ। যেমন মোটা, তেমনি কালো। মাথাটা ভূ-গোলকের মতো, উত্তর ও দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা। চোখদুটো সব সময়েই জ্বল জ্বল করছে। চোখের মণি শাদা নয়, রক্তাভ। রক্তের চাপ বেশি, না অতিরিক্ত মদ্যপান করেন, প্রথম ক'দিনের আলাপে তা বুঝতে পারিনি। অফিস ঘরটাই তাঁর শোবার এবং খাবার ঘর। ঘরের এক দিকে একটা চৌকি ফেলা আছে। দেয়ালের সঙ্গে ঘেঁষা। চৌকির দুটো পা আমার চোখে পড়ল। অর্ডার দিয়ে তৈরি না করালে চৌকির পা এমন মোটা এবং শক্ত হ'তো না। ম্যানেজারবাবুর ভার বহনের জন্য সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়েছে। যে-চেয়ারটায় তিনি বসেন সেটাও বাজারের চলতি সাইজের চেয়ার নয়।

হাত-পা নাড়াতে কষ্টই হয় তাঁর। টেবিলের গায়ে বুক ঠেকিয়ে ব'সে হিসেবপত্র লেখেন। একবার লেখেন বেলা বারোটায়, আবার লেখেন রাত দশটায়। বাকী সময়টা চেয়ারের গায়ে হেলান দিয়ে ব'সে থাকেন। হাত বাড়িয়ে টেলিফোনের রিসিভারটাও ধরতে ইচ্ছে করে না। চাকরবাকর কেউ কাছে থাকলে তারাই তুলে এনে তাঁর কানের কাছে ধ'রে রাখে। কখনো কখনো চিৎকার ক'রে ডাকেন, "কই রে নেতাই-নেতাই—" নিতাই ছুটে আসে। তিনি বলেন, "হাতটা আমার তুলে দে টেবিলের ওপর।"

একদিন রাত্রি বেলা ব'সে গল্প করছিলুম ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে। মাঝে মাঝে তিনি দেয়াল-ঘড়ির দিকে চোখ তুলে সময় দেখছিলেন। দশটা বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নরহরি ব'লে একটা চাকরকে ডাকতে লাগলেন ম্যানেজারবাবু।

"কই রে নরহরি, শিগগীর আয়।"

নরহরি এল। ঘরে ঢুকে সে বলল, "দশ নম্বরের বাবু খাবেন না। বাইরে থেকে খেয়ে এসেছেন।"

"তিনি জানেন তো না খেলেও চার্জ দিতে হবে?"

"জানেন।"

নরহরি দেখলুম নিঃশব্দে টেবিলটা পরিষ্কার করতে লাগল। খাতা ক'খানা সরিয়ে রাখল শেলফের ওপর। টেলিফোনটা তুলে নিয়ে ফেলে রাখল চৌকির এক পাশে। ইত্যবসরে নিতাই এল জলের গেলাস নিয়ে। দুটো গেলাস। ভাবলুম, ধরমশাই বোধ হয় পর পর দু' গেলাস জল খান। একটু পরেই নরহরিও ফিরে এল। তার দু হাতের চেটোর ওপর দুটো থালা। নিতাই থালা দুটো নামিয়ে রাখল টেবিলের ওপর। ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে আমি ব'লে উঠলুম, "আমি তো ন'টার আগেই খেয়ে নিয়েছি, ম্যানেজারবাবু। আবার এরা খাবার নিয়ে এল কেন?"

"আমার জন্য।"

"দু' থালা ভাত কেন?"

"দশ নম্বরের বাবুটি তো খাবেন না। ওরে ও নেতাই, আজ কি তোরা রাবড়ি দিসনি?"

"দিয়েছি বাবু।"

"তবে এক বাটি রাবড়ি দিলি কেন?"

"নরহরি আনতে গেছে। বাবুরা সব একসঙ্গে খেতে বসেছেন আজ। বাটি আর খালি নেই। আপনি খেতে আরম্ভ করুন—রাবড়ি এসে যাবে।"

ব্যাপারটা পরিষ্কার হ'ল। বুঝতে পারলুম কেন তিনি দু' থালা ভাত খেতে বসেছেন। দশ নম্বরের বাবুটিকে তো চার্জ দিতেই হবে। অতএব তাঁর বরাদ্দ অংশটা ম্যানেজারবাবু খেয়ে নিচ্ছেন।

জিজ্ঞাসা করলুম, "যদি দু'জন বাবু আজ বাইরে থেকে খেয়ে আসতেন তা হ'লে তাঁর খাবারটা খেত কে?"

"আমি।" জবাব দিতে সঙ্কোচ বোধ করলেন না শশীকান্ত ধর। পোনা মাছের এক খণ্ড পেটি মুখের মধ্যে টেনে নিয়ে তিনি বলতে লাগলেন, "না খেলে সন্ধ্যের মধ্যে খবর দিতে হয়। তা হ'লে একবেলার চার্জ লাগে না। তা দেখুন ভাস্করবাবু, আপনি এতো অবাক হচ্ছেন কেন? সংসারে জন্ম নেওয়া কিসের জন্য? খাওয়ার জন্যেই তো। এই যে কলকাতার লোকগুলো ট্রামে-বাসে দিন-রাত পাগলের মতো ছোটাছুটি করছে তার কারণ কি?" হঠাৎ তাঁর মুখ দিয়ে একটা ঢেঁকুর বেরিয়ে এল। আওয়াজটা হ'ল সোডার বোতল খোলার মতন। উদরস্থ বায়ুর পরিমাণ এতো জোরে বেরিয়ে এল যে, গেলাসের জলটা নড়ে উঠল একটু। লজ্জা পেলেন না শশীকান্তবাবু। স্বাভাবিক সুরে আবার তিনি বলতে লাগলেন, "মানুষের সুখ-দুঃখের মূলেও এই খাওয়া।"

"কিন্তু একটা পরিমাণ থাকা চাই তো!"

"আপনি যাকে যোগ্য পরিমাণ মনে করেন আমার কাছে তা পাখীর আহার মনে হয়। পরিমাপ করবার একমাত্র যন্ত্র হচ্ছে উদর।"

"তা হোক, তবুও ফলাফলের দিকে নজর রাখতে হবে। মোফতে পাওয়া গেল ব'লেই খেতে হবে তার কি মানে আছে? খাচ্ছেন, অথচ হাতখানা নাড়াতে গেলেই

কষ্ট পান। মেদ বাহুল্য তো স্বাস্থ্য-হীনতার লক্ষণ।"

"স্বাস্থ্য দিয়ে কি করব আমি?"

প্রশ্নটার মধ্যে যেন রহস্যের সুর শুনতে পেলুম আমি। নিঃশব্দে খেতে লাগলেন ম্যানেজারবাবু। নরহরি দ্বিতীয় বাটি রাবড়ি নিয়ে এসেছে। সে দাঁড়িয়ে ছিল দরজার আড়ালে। সেই কারণে রহস্য জানবার চেষ্টা করলুম না আমি। চুপ ক'রে ব'সে তাঁর খাওয়া দেখতে লাগলুম।

রাবড়ির বাটি দুটো একদিকে সরিয়ে রেখে তিনি ডাকলেন, "নরহরি—"

"আজ্ঞে—"

"আজ আর রাবড়ি খাব না। তোরা খেয়ে নিগে যা। বুঝলেন ভাস্করবাবু, বছর পাঁচেক আগেও আমি রোগা ছিলাম।" তোয়ালে দিয়ে হাত-মুখ মুছে তিনিই বললেন, "আপনার চেয়েও রোগা ছিলাম। হ্যাঁ রে নরহরি, তুই তো পুরনো লোক, বল্ সত্যি বলছি কি না?"

"যথার্থ। একটুও বাড়িয়ে বলা নয়। কেঁদুলীর মেলায় গিয়েই তো সেবার সব্বোনাশ হ'ল।" রহস্যের গুটনো সুতোর মুখটা একটু খুলে দিয়ে নরহরি এঁটো বাসন নিয়ে চ'লে গেল ঘর থেকে। লম্বা সাইজের বিড়ি বার করলেন শশীকান্ত ধর। ছোট বিড়ির অর্ধেকটা মোটা ঠোঁটের মধ্যে গ'লে যায় ব'লে তিনি অর্ডার দিয়ে লম্বা বিড়ি তৈরি করিয়ে আনেন। প্রত্যেক দিনই নরহরি কিংবা নিতাই এসে দেশলাই জ্বালিয়ে দেয়। আজ আমি ছিলুম ব'লে উঠে গিয়ে দেশলাই জ্বালিয়ে তাঁর মুখের কাছে ধরলুম। বার দুই বিড়িতে টান মেরে তিনি বলতে লাগলেন, "আজ আর হিসেবপত্র লিখব না।"

"কেন?"

"দিল নেই। পুরনো ব্যামো বড্ড বেশি দিক্ দিচ্ছে। গল্পটা শুনবেন না কি?"

"বলুন না শুনি।"

"হ্যাঁ, না ব'লেও তো উপায় নেই। ঐ শালা নরহরি তো গল্পটা ধরিয়ে দিয়ে গেল। কেঁদুলীর মেলায় কখনো গিয়েছেন?"

"আজ্ঞে না।"

"যত শালা নেড়া-নেড়ীর ভিড় সেখানে। তা হ'লে প্রথম থেকেই শুরু করি। বজবজে আমার দেশ। লেখাপড়া করেছি ইস্কুল পর্যন্ত। কয়েক বিঘে চাষের জমি ছিল। তাই দিয়ে সংসার চ'লে যেত। তারপর মাগ্গীর বাজারে বাবা বললেন, এবার আর ঘরে ব'সে থাকলে চলবে না। চাকরি-বাকরির খোঁজ করো। আমার বয়স তখন কুড়ি। পনরো বছর বয়সে বিয়ে করেছিলাম। মনোরমার বয়স ছিল দশ। বাবার হুকুম শুনে তো ভড়কে গেলাম। মনোরমা এই সবে পনরোয় পড়ল, বেশ ডাগরডোগর হয়েছে। চাকরি খুঁজতে কলকাতা যাই কি ক'রে? তবু যেতে হ'ল। এলাম কলকাতা। চাকরি পাওয়া তো সোজা কথা নয়। এটা-ওটা ক'রে সময় কাটতে লাগল। প্রায়ই বদলির কাজ পেতাম। এইভাবে বছর খানিক কেটে গেল। পেট ভ'রে খেতে পেতাম না। মাঝে মাঝে বাবা আবার টাকার সাহায্য চেয়ে চিঠি লিখতেন।"

"এই এক বছর কি বাড়ি যাননি?"

"গিয়েছি। হয়তো দু' তিনবারের বেশি নয়। যেতে ইচ্ছে করত না। বাড়ি গেলেই মনোরমা শাড়ি গহনা চাইত। ভাত জুটত না। শাড়ি গহনা দেব কোত্থেকে? পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে মাঝে-সাজে বায়স্কোপ দেখতে যেত। নজর বদলাতে লাগল মনোরমার। আমার এই রোগা-পটকা চেহারা আর ভাল লাগছে না ওর। প্রায়ই বলত, 'চেহারার এ কি হাল হয়েছে? দেখে এসো গিয়ে পবন-কুমারের চেহারা—কি সুন্দর! প্রেমে পড়তে ইচ্ছে করে।' জিজ্ঞাসা করতুম, 'পবনকুমারটি কে?' যেন আর্তনাদ ক'রে উঠত মনোরমা, 'ওমা, সে কি কথা! তার নাম শোনোনি? তোমার বিষ খেয়ে মরা উচিত। পবনকুমার হচ্ছে এ্যাক্টর।' বুঝলেন ভাস্করবাবু, মনোরমার কথা শুনে অনেক দিন দেশে যাইনি। একটা ভাল চাকরির খোঁজ করতে লাগলাম। 'পান্থনিবাসের' মালিক আমাদের দেশের লোক। তাঁর সঙ্গে একদিন পথের মাঝ-খানে দেখা হ'য়ে গেল। বোর্ডিং-হাউস দেখাশোনা করবার জন্য একজন বিশ্বাসী লোক খুঁজছিলেন। তাঁকে এখন অনেক-গুলো ব্যবসা চালাতে হয়। নিজে দেখা-শোনা করবার সময় পান না। আমায় তিনি একশো টাকা মাইনে দেবেন। খাওয়া এবং থাকা ফ্রী। সেই দিনই চাকরি নিলাম। মাসের তখন মাঝামাঝি সময়। যেখানে চল্লিশ টাকা মাইনেতে চাকরি করছিলাম সেখানে আর গেলামই না। পনরো দিনের টাকা সেখানেই প'ড়ে রইল। বাবাকে লিখলাম আমার উন্নতির কথা। মনোরমাকেও লিখলাম, শাড়ি পাঠাচ্ছি। দু' মাস পর গহনা গড়িয়ে দেব। নিজেও ভাল ক'রে খাওয়া-দাওয়া করতে লাগলাম। রোগা-পটকা ব'লে গাল দিয়েছে মনোরমা। মাস দুই পরে ওকে তাক লাগিয়ে দেব। মনে মনে কতো রকমের 'ডায়লগ' তৈরি করতে লাগলাম —প্রথম সাক্ষাতের সময় কি রকম ভাষায় কথা বলব আমি।" হাঁপিয়ে পড়লেন শশীকান্ত ধর। আমি বললুম, "একটু না হয় জিরিয়ে নিন। একটা বিড়ি ধরাবেন কি?"

"না। আপনি বরং স্নানঘর থেকে তোয়ালেটা এনে দিন।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়।" উঠে গিয়ে একটা শুকনো তোয়ালে এনে দিলুম। বড্ড বেশি ঘেমে গিয়েছিলেন। গলগল ক'রে ঘাম পড়ছিল কপাল আর গলা থেকে। আট-দশটা রুমাল ভিজে যেতে এক মুহূর্তও সময় লাগত না। একটা বড় সাইজের টার্কিশ তোয়ালে এনে তাঁর ঘাড়ের ওপর ফেলে রাখলুম।

ঘাড়-গর্দানের ঘাম মুছে ম্যানেজার-বাবু গল্প বলতে শুরু করলেন, "মনোরমার সঙ্গে সাক্ষাৎ আর হয়নি।"

"বলেন কি?" পা তুলে জড়োসড়ো হ'য়ে চেয়ারের ওপর উঠে বসলাম।

"হ্যাঁ, দু' মাস পরে শাড়ি-গহনা নিয়ে দেশে যাব ভাবছি এমন সময় বাবার কাছ থেকে একটা টেলিগ্রাম এল: শিগগীর চ'লে এসো। ভাবলাম, মনো-রমার কিংবা বাবারই অসুখ করেছে খুব। যাওয়ার মুখে মালিক এসে আরও শ-দুই টাকা আমার হাতে গুঁজে দিলেন। দুর্গানাম জপতে জপতে বজ-বজের দিকে রওনা হ'য়ে গেলাম। মনে মনে যে-সব ডায়লগ ঠিক ক'রে রেখে-ছিলাম তার একটা কথাও আর মনে রইল না। রাস্তা থেকে বাড়ির সদর দরজাটা আমাদের দেখা যায়। আমি দরজার দিকে চাইতে পারলাম না। ভয় করছিল। শাড়ি আর গহনার পুঁটলিটা বগলের তলায় চেপে মাথা নিচু ক'রে 'হাঁটি-হাঁটি পা পা' ক'রে এগিয়ে যেতে লাগলাম বাড়ির দিকে। দরজার কড়া নাড়তে হ'ল না। বাবা বেরিয়ে এলেন। বেশ শক্তসমর্থ দেখাচ্ছিল তাঁকে। ভেতরে নিয়ে আমায় তিনি বললেন "বৌমা নেই।"

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি হ'ল?' হাতের চেটো দিয়ে চোখ মুছে জবাব দিলেন তিনি, 'কেঁদুলীর মেলায় গেছলাম

বৌমাকে নিয়ে। পরদিন ঘুম থেকে উঠে দেখি সে নেই। বোষ্টমরা বললে যে, নদীর জলে ডুবে মরেছে।' নিজের অজ্ঞাতসারে প্রশ্ন করলাম, 'নদী?' তিনি বললেন, 'বিশ্বাস করিনি। ঐ গৌরাঙ্গর সঙ্গে পালিয়েছে। ঐ ছোঁড়াটা এখানে ঘন-ঘন আসত। বড় সুন্দর ছিল রে গৌরাঙ্গ। একতারা বাজিয়ে নেচে নেচে গান করত। এখানকার লোকদের পাগল ক'রে দিয়েছিল। গৌরাঙ্গই আমাদের নিয়ে মেলায় গিয়েছিল। ভেতরে ভেতরে ওদের মধ্যে সোহাগের সম্পর্ক ছিল আমি আর তা কি ক'রে জানব বল্? কাঁদিসনি—সব ঠিক ক'রে ফেলেছি। আমাদের নগেন দাসের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে তোর পাকা ক'রে ফেলেছি। বৌমার মৃত্যু-সংবাদ শুনে আজ দু' দিন থেকে নগেন এসে আমার পা-এ তেল মাখাচ্ছে ঘন ঘন। কয়েক শো টাকা নগদ দেবে রে—ও কি কোথায় চললি?'

"বুঝলেন ভাস্করবাবু, হাঁ ক'রে বাবা তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। আমি রাত্রের ট্রেন ধ'রে ফিরে এলাম কলকাতায়।"

"বৌকে আর খুঁজে পেলেন না?"

"না। চার বছর হ'য়ে গেছে।"

"চেষ্টা করেননি?"

"আফিম-খাওয়া চিঁড়িয়া যতোদিন না নেশা কাটছে ততোদিন তাকে ফিরিয়ে আনা যাবে না। মাঝখান থেকে ভাত খেয়ে খেয়ে দেহের ওজন বাড়িয়ে ফেললাম মণ দুই।"

"এখন তা হ'লে কি করছেন?"

"বউ-এর ফোটো পুজো করছি। এই গতর নিয়ে নগেন দাসের কাছে উপস্থিত হ'লে জুতিয়ে আমায় লাস বানিয়ে দেবে।"

"পুলিশে খবর দিয়েছিলেন কি?"

"ব'লে রেখেছি মশাই—" বিড়ি বার করলেন শশীকান্ত ধর। পকেট থেকে তাড়াতাড়ি দেশলাই বার ক'রে বিড়িটা তাঁর ধরিয়ে দিলুম। তিনি বললেন, "আপনি সিগারেট খান জানি। আজ না হয় একটু বিড়ির ধোঁয়া টানুন মশাই। সিগারেট টেনে ভেতরের জ্বলুনি কমে না।"

তাঁকে সঙ্গ দেওয়ার জন্যই বিড়ি ধরিয়ে টানতে লাগলুম আমি। দু'-এক টান দিতেই দম আটকে আসবার উপক্রম। আগেই সন্দেহ করেছিলুম, বিড়ির মধ্যে শুধু তামাক পাতা নেই। আমাকে কাসতে দেখে তিনি হেসে ফেললেন।

জিজ্ঞাসা করলুম, "হাসছেন যে?"

"বড্ড ছেলেমানুষ আপনি! বুকের তলাটা এখনো তুলতুলে রয়েছে। আমার

"বড্ড ছেলে মানুষ আপনি। বুকের তলাটা এখনো তুলতুলে রয়েছে।..."

মতো খামা নয়......বুঝলেন কি না তামাকের সঙ্গে একটু গাঁজা মেশানো আছে।"

আমার সন্দেহটা মিথ্যে হয়নি। হাঁসের ডিমের মতো বড় বড় চোখ দুটো তাঁর সর্বক্ষণই লাল হ'য়ে থাকে। ভেবেছিলাম মদ খান নিশ্চয়ই। তারপর মাঝে মাঝে গাঁজার গন্ধও পেয়েছি। কিন্তু সঠিকভাবে বুঝতে পারিনি কিছুই। এখন ম্যানেজার শশীকান্ত ধরের স্বীকারোক্তির মধ্যে বিন্দুমাত্র অনিশ্চয়তা রইল না।

আমার দু' আঙুলের ফাঁকে বিড়িটা জ্বলতে জ্বলতে নিবে গেল। মাথা ঘুরছিল আমার। চোখ বন্ধ ক'রে ব'সে রইলুম খানিকক্ষণ। ম্যানেজারবাবুর শেষের কথাটা স্মরণ করবার চেষ্টা করছিলুম। সব গুলিয়ে যাচ্ছিল। একটু সুস্থির হওয়ার পর বললুম, "বড্ড কড়া নেশা।"

"হ্যাঁ, শুকনো নেশা তো। আজ দুটো টানই যথেষ্ট, কাল আবার ট্রাই নেবেন। দিন সাতেক পর নেশার মজা মালুম হবে। তা ছাড়া—" কথা বন্ধ ক'রে শূন্য দৃষ্টিতে সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, "তা ছাড়া বুকের হাড়েও জ্বলুনি থাকা চাই। নইলে কোনো নেশাই তেমন জমে না।"

রাত এগারোটা বাজল। দেয়াল-ঘড়িতে টং টং ক'রে আওয়াজ হ'ল এগারো বার। গল্পটা শেষ হয়নি। ঠিক কোন্ জায়গায় এসে যে থেমে গিয়েছিলেন মনে পড়ছে না। আমি তাই জিজ্ঞাসা করলুম, "চারটে বছর ঘরে ব'সেই নষ্ট করলেন? খোঁজাখুঁজি করলেন না?"

"বলে রেখেছি মশাই।"

"কাকে ব'লে রেখেছেন?"

"ইনস্পেক্টর লাহিড়ীকে। দুঁদে সি-আই-ডি। আমাদের বজবজের লোক। ইস্কুলে আমরা এক বছর এক ক্লাসে

পড়েছিলাম। প্রতি ক্লাশে দু' বছর ক'রে পড়তে হ'তো আমায়।"

জিজ্ঞাসা করলুম, "তিনি এখানে আসেন না?"

"প্রায়ই আসে। ভারি আড্ডাবাজ লোক। হয়তো এই অঞ্চলে সে ডিউটি দিতে আসে। হোটেলের ওপর নজর রাখে। আমাদের এই পান্থনিবাসটিকে কিন্তু পবিত্র হিন্দু হোটেল ব'লে ভুল করবেন না, ভাস্করবাবু। স্বামী-স্ত্রী পরিচয় দিয়ে কতো রং বেরং-এর চিড়িয়া এসে বাসা বাঁধে এখানে।"

"তাই না কি?"

"হ্যাঁ। সেদিন তো ইনস্পেক্টর লাহিড়ী এসে এক জোড়া চিড়িয়াকে সাত নম্বর ঘর থেকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে গেল। লরহরি এসে বললে যে, মেয়েটা না কি ঐ লোকটার বউ নয়।"

"বলেন কি শশীবাবু?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার অফিস ঘরের সামনে দিয়ে নিয়ে গেল। ছোঁড়াটাকে দেখে মনে হ'ল কুস্তিটুস্তি করে। পাকা পোনা মাছের মতো লাল টুকটুকে গায়ের রং। শহরে বোধ হয় নতুন। পবন-কুমার কেউ এল—"

"মেয়েটাকে দেখেননি?"

"ভাল ক'রে দেখিনি। প্রায়ই দেখতাম ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢাকা। লেতাই শালা বলত, খাসা দেখতে। আমার সামনে দিয়ে নিয়ে গেল ওদের। চেয়ারে ব'সে শিস দিয়ে গান ধরলাম আমি—বিদায় সঙ্গীত। দশ দিনের আগাম টাকা আগেই আদায় ক'রে রেখেছিলাম। বড় দুঃখের রাজত্বে ম্যানেজারি করছি, দাদা!! ম্যানেজারি করছি আর মোটা হচ্ছি।"

মনের ভেতর দুরাশার ঢেউ উঠল। তবে কি ঘোমটা-দেওয়া মেয়েটি মীনাক্ষী? সঙ্গের লোকটা তা হ'লে কে? পেল্লো খুব জোয়ান তা ঠিক। কিন্তু তার গায়ের রং তো পাকা পোনার মতো লাল নয়। জিজ্ঞাসা করলুম, "ছেলেটি কি মাথায় টুপি পরত? এই ধরুন যাকে আমরা পোলো টুপি বলি?"

"না টুপি পরতে কখনো দেখিনি।" সন্দেহের দৃষ্টিতে ম্যানেজারবাবু আমার দিকে চেয়ে রইলেন। হয়তো ভাবছেন, মেয়েটি নিশ্চয়ই আমার স্ত্রী। কিন্তু তাঁকে তো আমি আগে একদিন বলেছিলাম, আমি বিবাহিত নই। বোধ হয় কথাটা ভুলে গিয়ে থাকবেন। কারো বউ পালিয়ে গেলে যে তাঁর মনে আনন্দের ঢেউ ওঠে তাতে আর সন্দেহ নেই। মৃদু মৃদু হাসছিলেন তিনি। আমোদ উপ-ভোগ করছেন।

আমি বললুম, "ইনসপেক্টর লাহিড়ীর সঙ্গে আমায় একদিন পরিচয় করিয়ে দেবেন।"

"কেন বলুন তো? আপনারও বউ চুরি গিয়েছে না কি?"

"আজ্ঞে না, আমার এক বন্ধুর। আমি অ-বিবাহিত। আজ চলি।"

বাইরে বেরিয়ে এলুম। ম্যানেজার-বাবুর ঘরে বিরাট একটা আওয়াজ উঠল। তিনি হাসছিলেন। অতো মোটা মানুষের এতো জোরে হাসা নিরাপদ নয়। দাঁড়িয়ে গেলুম আমি। হাসি থামবার পর তিনি গান ধরলেন :

কি বুকে দারুণ ব্যথা।
সে দেশে যাইব যে দেশে না শুনি
পাপ পীরিতির কথা।
সই কে বলে পীরিতি ভাল—

গান শেষ ক'রে হাঁক দিলেন ম্যানেজার শশীকান্ত ধর, "কই রে লরহরি, এক কুঁজো জল নিয়ে আয়—বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। দাদা, এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন? এসো, একটু নেশা ক'রে যাও।"

বুঝলাম, আমি যে অবিবাহিত তা তিনি বিশ্বাস করেননি। আর অপেক্ষা করলুম না, সাত নম্বর ঘরে ফিরে এলুম। এই ঘরটারই ইতিহাস একটু আগে শুনে এলুম আমি।

॥ চার ॥

দেখতে দেখতে ছ'টা মাস কেটে গেল। কলকাতার রাস্তা-ঘাট মোটামুটি চিনে ফেলেছি। টালিগঞ্জের স্টুডিও-গুলোতে যাওয়া-আসা করছি। চৌরঙ্গীর বড় হোটেলেও মাঝে মাঝে যাই। আমাকে আর মফঃস্বলের লোক ব'লে মনে হয় না। ধুতি-পাঞ্জাবির সঙ্গে সম্পর্ক নেই। প্যান্ট-কোট প'রে সাহেব বনে গিয়েছি। থাকি অবিশ্যি পান্থ-নিবাসে।

ইনসপেক্টর লাহিড়ীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। ক্রমে ক্রমে বন্ধুত্ব মজে উঠল। মীনাক্ষী সম্বন্ধে সব কথাই খুলে বলেছি তাঁকে। এই ব্যাপারের সঙ্গে আমার স্বার্থের সীমাটুকু পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দিয়েছি। সবচেয়ে দরকারী কথাটা বুঝতে পেরেছেন তিনি। শান্তি-প্রিয়, শিক্ষিত এবং সৎ বংশের একটি মেয়ে ভুল পথে পা বাড়িয়েছে। জীবনটা নষ্ট হ'য়ে যাওয়ার আগে তাকে উদ্ধার করা চাই। সামাজিক কর্তব্য সম্পাদন করাই তো পুলিশের সব চেয়ে বড় দায়িত্ব। পঙ্কিল পরিবেশকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করবেন তাঁরা।

একদিন ইনস্পেক্টর লাহিড়ী এসে বললেন, "ফিল্ম কোম্পানীর লোকদের কাছ থেকে দু'-একটা খবর সংগ্রহ করেছি।"

"তাই না কি?"

"হ্যাঁ। তবে ঠিক মতো হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। তদন্তের ব্যাপারে কোনো খবরই তুচ্ছ নয়।" প্রশান্ত লাহিড়ী স্বইচ্ছায় আমাকে সাহায্য করছেন। এটা তাঁর সরকারী কাজ নয়। অতএব চব্বিশ ঘণ্টাই মীনাক্ষীর সন্ধানে সময় দিতে পারেন না।

আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম, "কি ধরনের খবর পেলেন, প্রশান্তবাবু?"

"মেয়েটা কলকাতায় এসেছে, অন্য কোথাও যায়নি। ফিল্মে অভিনয় করবার জন্য চিত্র-পরিচালকদের সঙ্গে দেখাও করেছে। তার একটা ফোটো আমায় দেখাতে পারেন, ভাস্করবাবু?"

ফোটো আমার কাছে ছিল না। স্মরণশক্তি থেকে মীনাক্ষীর চেহারার বর্ণনা দিতে লাগলুম। আরও বার কয়েক বর্ণনা আমি দিয়েছি। কিন্তু প্রশান্ত লাহিড়ীর চোখের সামনে মীনাক্ষীর ছবিটা স্পষ্ট হয়নি। এ আমার নিজেরই অক্ষমতা। মীনাক্ষীর স্বামী পরেশবাবু কবিতা লেখেন। তিনি হয়তো এ-কাজটা সুন্দরভাবে সম্পাদন করতে পারতেন। কিন্তু তাঁকে তো আর হাতের কাছে পাওয়া যাচ্ছে না।

নোট বই বার ক'রে প্রশান্ত লাহিড়ী বললেন, "ফাল্গুন মাসের দশ তারিখে একটি মেয়ে পরিচালক দাশরথি রায়ের সঙ্গে দেখা করেছিল। একাই গিয়েছিল সে। হ্যাঁ, সুন্দরী তাকে বলা চলে। মফঃ-স্বলের মেয়ে তাতেও তাঁর সন্দেহ নেই। ফিল্মে অভিনয় করবার জন্য খুবই চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিল। দাশরথিবাবুর যতদূর মনে পড়ে মেয়েটি নাম বলেছিল রূপকুমারী—"

"রূপকুমারী?"

"হ্যাঁ। হাসলে বাঁ দিকের গালে টোল পড়ে।"

"ঠিক, এই তো মীনাক্ষী—" লাফিয়ে উঠলুম আমি। জিজ্ঞাসা করলুম, "তারপর কি হ'ল, প্রশান্তবাবু?"

"তারপর দাশরথিবাবুর কাছে আর যায়নি সে। ফিল্ম জগতের ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। তিনি যতদূর খবর রাখেন তাতে মনে হয়, ঘন ঘন হাত বদলাচ্ছে। শিক্ষানবিশীর সময় স্টুডিও-তে কাজ থাকে না। হোটেল-রেস্তরাঁয় ঘুরে বেড়াতে হয়। এর অর্থ যে কি তা আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, ভাস্করবাবু?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। উচ্চাকাঙ্ক্ষার পথটা তো সরল নয়। তা ছাড়া এ হচ্ছে গিয়ে শিল্পের জগৎ।"

শেষের কথাটার মধ্যে বোধ হয় ব্যঙ্গোক্তির সুর মেশানো ছিল। তাই প্রশান্ত লাহিড়ী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন নির্বাক হ'য়ে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "কি করে ওর সন্ধান পাওয়া যায়?"

"ঠিকানাটা বার করতে হবে।"

"আমার মনে হয় মীনাক্ষীর সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ পেলে আমি ওকে এই শিল্পের জগৎ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারব।"

ইন্সপেক্টর লাহিড়ী মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে দুটো টিকিট বার ক'রে আমায় বললেন, "রূপকুমারীকে আজ আমরা দেখতে যাব।"

"কোথায়?"

"নিউ এমপায়ারে। আজ সাড়ে ছ'টায় সেখানে একটা বিচিত্রানুষ্ঠান হচ্ছে। রূপকুমারী নাচ দেখাবে—"

"কিন্তু মীনাক্ষী তো নাচতে জানত না!"

"প্রতিভা থাকলে দু' দশটা মুদ্রা তুলতে ক'টা দিন সময় লাগে বলুন? একেবারে প্রথম সারিতে টিকিট কিনেছি—প্রতি টিকিটের দাম দশ টাকা।"

"তা হোক। এ খরচা আমার—" পার্স থেকে টাকা বার করতে গেলুম। প্রশান্ত লাহিড়ী আমার হাতটা টেনে নিয়ে বললেন, "জানি, ত্রিশ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে রেখেছেন। ওটা এখন আপনার কাছে থাক। পরোপকার করতে পথে বেরিয়ে পড়েছেন, ত্রিশ হাজার টাকা গলে যেতে বেশি দিন সময় লাগবে না।"

"কিন্তু তাই ব'লে আপনি কেন কুড়ি টাকা খরচ করতে যাবেন? এটা তো আপনার নিজের কাজ নয়—"

"নয় কেন, ভাস্করবাবু? মীনাক্ষীকে রক্ষা করা আমি সামাজিক কর্তব্য ব'লে মনে করি। চলুন, বেরিয়ে পড়া যাক। ম্যানেজারবাবুকে আগে থেকে খবর দিয়ে দিন, আজ রাত্রে এখানে খাবেন না। এক-বেলার চার্জ বেঁচে যাবে।"

হাসতে হাসতে আমি বললুম, "চার্জটা বড় কথা নয়। ম্যানেজারবাবুকে অতিরিক্ত খাদ্যের লোভ থেকে রক্ষা করাই হচ্ছে আসল কাজ।"

সাড়ে ছ'টার পাঁচ মিনিট আগে আমরা নিউ এমপায়ারে এসে উপস্থিত হলুম। প্রেক্ষাগার পূর্ণ হ'য়ে গিয়েছে। ইনসপেক্টর লাহিড়ী আমায় বললেন, "আলো নিবে যাওয়ার আগে ভাল ক'রে একবার নজর দিয়ে দেখুন তো এখানে সেই লোকটি আছে কি না।"

"কোন্ লোকটি?" মীনাক্ষীর চিন্তায় মনটা আমার ভরপুর হ'য়ে ছিল।

"আপনাদের সেই পেড্রোর কথাই বলছি।"

"ও হ্যাঁ—" প্রেক্ষাগারের চারদিকটা দেখলুম, না, লম্বা প্যান্ট আর পোলো টুপি দেখতে পাচ্ছি না।"

"এখানে এসে হয়তো ধুতি পাঞ্জাবি পরেছে। ভাল ক'রে দেখুন।"

প্রথম সারির দিকে এগুতে এগুতে দু' দিকেই দৃষ্টি ফেললুম, কিন্তু পেড্রোকে দেখতে পেলুম না। নিজেদের আসন দখল ক'রে ব'সে পড়লুম আমরা। প্রথম দু' সারিতে আমরা ছাড়া বাঙালী আর কেউ নেই। প্রশান্ত লাহিড়ীর পাশে একজন বিদেশী, মনে হয় গুজরাটী ভদ্রলোক ব'সে ছিলেন। হঠাৎ তিনি এদিকে ঘাড় ফিরিয়ে ব'লে উঠলেন, "আরে প্রশান্তবাবু যে? কি ব্যাপার, আপনিও দেখছি নাচ-গানা পছন্দ করেন। এখানে ডিউটি দিচ্ছেন না কি?"

"আমরা কি চব্বিশ ঘণ্টাই ডিউটি দিই, খান্দুভাই? আপনাদের মতো আমাদেরও গান-বাজনা শোনবার শখ আছে।"

বিচিত্রানুষ্ঠানের প্রথম আইটেম হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের একটি নৃত্য-নাটিকা। অর্কেস্ট্রা বেজে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে প্রেক্ষাগারের আলো গেল নিবে। অভিনয় শুরু হ'ল। প্রশান্ত লাহিড়ী আমার দিকে ঝুঁকে ব'সে ফিসফিস সুরে বলতে লাগলেন, "প্রথম সারিটায় যাঁরা বসেছেন তাঁরা সব এ-লাইনের মার্কা-মারা লোক।"

"কোন্ লাইনের, প্রশান্তবাবু?"

"স্ফূর্তির লাইন। সবাই বেশ ধনী। খান্দুভাই বাংলা এবং হিন্দী ফিল্মে প্রচুর টাকা খাটান। ইনি হচ্ছেন ফাইনেন-শিয়ার। বোম্বেতেও বড় কারবার এঁর।"

মনোযোগ দিয়ে নৃত্য-নাটিকাটি দেখবার ভান করছিলেন ইনস্পেক্টর লাহিড়ী। প্রকৃতপক্ষে আশপাশের দিকে সতর্ক নজর রেখেছিলেন তিনি। এবং যাঁরা নিজেদের মধ্যে নিচু সুরে বাক্যালাপ করছিলেন তাঁদের কথাবার্তা শোনবার চেষ্টা করছিলেন প্রশান্তবাবু।

নাটিকাটি শেষ হ'তে প্রায় পঁয়-তাল্লিশ মিনিট লাগল। বাইরে থেকে আমি একটা প্রোগ্রাম কিনে এনেছিলুম। পাতা উল্টে দেখলুম, অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় আইটেম হচ্ছে রূপকুমারীর ভারতীয় নৃত্য।

পর্দা ওঠবার আগে প্রথম সারিতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'ল। আমিও একটু নড়েচড়ে বসলুম। কনুই দিয়ে গুঁতো মারলেন লাহিড়ীবাবু। অস্ফুট স্বরে বললেন, "চুপ ক'রে বসুন। অতো নড়া-চড়া করছেন কেন?"

পর্দা উঠে গেল। রঙ্গমঞ্চে আলো নেই। মুহূর্তের নৈঃশব্দ্য। তারপর শুরু হ'ল সেতারের টুং টাং আওয়াজ। খান্দুভাই পা গুটিয়ে চেয়ারের ওপর উঠে বসেছেন। হঠাৎ দেখি টর্চ লাইটের মতো সরু একটা আলোর রেখা রঙ্গ-মঞ্চের মাঝখানে এসে পড়ল। ওড়না দিয়ে মাথা ঢেকে রূপকুমারী উপুড় হ'য়ে প'ড়ে রয়েছে রঙ্গমঞ্চের ওপর। বাজনার সঙ্গে সঙ্গে দেহে প্রাণ এল তার। নাচের ভঙ্গীতে উঠে বসল সে। হাতে মুদ্রা তুলল। মুখটা দেখা যাচ্ছে না। পূর্ণোদ্যমে নাচতে লাগল রূপকুমারী। সেই সরু আলোটার রং বদলাচ্ছে বটে, কিন্তু স্পষ্ট কিছু দেখা যাচ্ছে না। ইনসপেক্টরসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, "চিনতে পারছেন?"

"না।"

"কেন?"

"আলো কই? তার উপরে রং মেখে মুখের চেহারা পাল্টে ফেলেছে। মাথায়

উপরে দেখছি শজারুর মতো এক গাদা চুল। ওর তো এতো বেশি চুল থাকার কথা নয়!"

"বাঙাল আর কাকে বলে! ও তো নকল চুল মশাই—"

"দাঁড়ান ভাল ক'রে দেখছি।"

দেখবার চেষ্টা করলুম বটে, কিন্তু মীনাক্ষী ব'লে নিঃসন্দেহ হ'তে পারলুম না। রঙ্গমঞ্চটা পুরোপুরি আলোকিত হ'ল না। সারা জায়গা জুড়ে নেচে বেড়াচ্ছে রূপকুমারী। নাচের গতিও গেল বেড়ে, অথচ ওড়ণাটা এক মুহূর্তের জন্যও মুখ থেকে খুলে পড়ছে না। আধো-অন্ধকারে ঢাকা রইল ওর মুখ। আলো-ছায়ার খেলা চলতে লাগল শেষ পর্যন্ত—প্রায় মিনিট পনরো হবে। তারপর হঠাৎ আলো জ্বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে নেমে এল যবনিকা। বোকা সেজে নিঃশব্দে ব'সে রইলুম আমি। ইনসপেক্টর লাহিড়ীর মুখের দিকে তাকাতে ভয় করতে লাগল। রেগে গিয়েছেন তিনি। কুড়িটা টাকাই জলে ফেলে দেওয়া হ'ল।

নৃত্য-শেষে করতালির হুল্লোড় প'ড়ে গেল। শুধু খান্দুভাইকে দেখলুম, গালে হাত দিয়ে ব'সে রয়েছেন। কোনো-রকম উচ্ছ্বাস প্রকাশের চেষ্টা নেই। মাঝে মাঝে শুধু প্রশান্ত লাহিড়ীর দিকে চোরাদৃষ্টি নিক্ষেপ করছিলেন। বোধ হয় এই ভাবে মিনিট পাঁচেক কেটে গেল। তারপর তৃতীয় আইটেম শুরু হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে প্রেক্ষাগার অন্ধকার হ'য়ে গেল। আমরা দেখলুম, খান্দুভাই উঠে পড়লেন। দু' সারি চেয়ারের মাঝখান দিয়ে চ'লে গেলেন তিনি। আমি বললুম, "বোধহয় বাথরুমে গেলেন খান্দুভাই।"

"না—আমার পেছু পেছু আপনিও চ'লে আসুন ভাস্করবাবু!" প্রশান্ত লাহিড়ী উঠে পড়লেন। সেই একই পথ ধ'রে বেরিয়ে এলেন বাইরে। আমি দেখলুম নিউ এমপায়ারের সামনে মস্ত বড় একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। খান্দুভাই গাড়িতে গিয়ে উঠে বসলেন। তারপর কোথা থেকে সেই রূপকুমারী এসে উপস্থিত হ'ল গাড়িটার সামনে। দরজাটা খুলে রেখেছিলেন খান্দুভাই। রূপ-কুমারীও উঠে বসল গাড়িতে। প্রশান্ত লাহিড়ীর হাত চেপে ধ'রে সহসা ব'লে উঠলুম আমি, "ঐ—ঐ তো মীনাক্ষী!"

গাড়ি টা বেরিয়ে গেল। মীনাক্ষীও আমায় দেখতে পেয়েছিল। প্রশান্ত লাহিড়ী শুধু হেসে বললেন, "চলুন, এবার পেট ভরে খেয়ে নেয়া যাক। কুড়ি টাকা খরচ করা বৃথা হয় নি। কি বলেন?"

আমি কিছু বললুম না, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে লাগলুম চৌরঙ্গীর দিকে।

উচ্চাকাঙ্ক্ষার সিঁড়ি বেয়ে কতো উঁচুতে উঠেছে মীনাক্ষী আমি তা আন্দাজ করতে পারলুম না। চেহারাটা পুরোপুরি বদলে গিয়েছে। মফস্বলের মেয়ে ব'লে আর কেউ ভুল করবে না। নাচ শিখেছে মীনাক্ষী। দু'-একজনের মুখে রূপকুমারীর প্রশংসাও শুনেছি। কারো কারো ধারণা, ভবিষ্যতে নাম করবে সে। রূপকুমারীর পরিচয় সম্বন্ধে যে-সব গল্প প্রচলিত আছে তার প্রত্যেকটাই মিথ্যা। দু' একজনের মুখে এমন কথাও শুনেছি, "রূপকুমারী বাঙালী নয়।" মীনাক্ষী যদি বিশ্ববিখ্যাত হ'য়ে ওঠে কোনোদিন তাতেও আমি খুশী হবো না। আমি জানি বিশ্ববিখ্যাত হওয়ার আগে ওর ব্যক্তিগত জীবনটা ভেঙেচুরে শত টুকরো হ'য়ে যাবে। এর চেয়ে কম দাম দিয়ে বিশ্ববিখ্যাত হওয়া অসম্ভব।

কিন্তু সিঁড়ি বেয়ে বেশি দূরে পৌঁছতে পারবে ব'লে মনে হয় না আমার। গুজবের মধ্যেও এক পয়সার সত্যি আমি আবিষ্কার করেছি। খান্দু-ভাই-এর কবলে পড়েছে মীনা। কয়েক ধাপ ওপরে ওঠবার পর ওকে নিচের দিকে টেনে রেখেছেন খান্দুভাই। মাঝা-মাঝি জায়গায় ঝুলে রয়েছে রূপকুমারী।

মীনাক্ষীর ঠিকানা খুঁজে বার করতে পারেন নি ইনসপেক্টর লাহিড়ী। খান্দুভাই-এর হেপাজতেই আছে সে, কিন্তু ঠিক কোন্ জায়গায় যে বাস করছে তার হদিস পাওয়া গেল না। মাঝে মাঝে বোম্বে যাওয়া-আসা করছে তেমন খবরও কানে এল। কলকাতার বড় বড় হোটেল আর রেস্তরাঁয় গিয়ে প্রায়ই উঁকি দিই। মীনাক্ষীর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হ'য়ে যেতে পারে ব'লে আশা ক'রে থাকি। এমনিভাবে আরও তিন মাস কেটে গেল কলকাতায়।

প্রশান্ত লাহিড়ী আশা ছাড়েন নি। যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন তিনি। অফি-সিয়েল কাজ এটা নয় তাঁর। শুধু বন্ধুত্বের খাতিরেই পরিশ্রম করছেন। তা ছাড়া তাঁর আত্মাভিমানেও আঘাত লেগেছে। মফস্বলের একটি বাঙালী মেয়ের ঠিকানা খুঁজে বার করতে না পারলে লজ্জার আর সীমা থাকবে না। নিউইয়র্ক কিংবা লণ্ডনের মতো বড় জায়গা এটা নয়। শ্যামবাজার থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত সবটুকুই তাঁর চেনা। যে-কোনো রাস্তার যে-কোনো বাড়ির নম্বর বললে তিনি মোটামুটি একটা ধারণা ক'রে নিতে পারেন।

আজ একটু রাত ক'রে পান্থনিবাসে এলেন ইনস্পেক্টর লাহিড়ী। বোধ হয় ন'টা বেজেছে। আমার খাওয়া-দাওয়া শেষ হ'য়ে গিয়েছিল। বিছানার চিৎ হ'য়ে শুয়ে সিগারেট টানছিলুম। ঘরে ঢুকে তিনি বললেন, "একটা হিন্দী ছবি দেখে এলুম। এগুলোকে ফাইটিং ছবি ব'লে। বড় বড় সিনেমা হাউসে এ সব ছবি দেখানো হয় না।"

"হঠাৎ কেন ফাইটিং ছবি দেখতে গেলেন?"

"আপনার ঐ 'পাদ্রীদা-'র গল্প শুনে সন্দেহ হচ্ছে মীনাক্ষীর পেছনে সেই ছেলেটাই আছে। পেড্রোই তাকে শোষণ করছে।"

"কি রকম?"

"এই ধরুন ভাড়া খাটাবার মতো।"

মনটা খারাপ হ'য়ে গেল। বাজে কথা বলবার লোক তিনি নন। তদন্ত করতে গিয়ে কোথাও নিশ্চয়ই মীনাক্ষীর সঙ্গে যোগাযোগ তাঁর নজরে পড়েছে।

ঘরের এককোণায় একটা ইজি-চেয়ার ছিল। সেখানে পা ছড়িয়ে দিয়ে বসে ধূমপান করছিলেন প্রশান্ত লাহিড়ী। হিন্দী ছবি দেখার ব্যাপারটা শোনবার জন্য অপেক্ষা করছিলুম। এমন সময় তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি জানেন ভাস্করবাবু পেড্রো বোম্বেতে আছে?"

"না।"

"সেখানে গিয়ে এই সব ফাইটিং ছবিতে অভিনয় করছে সে। হিরো হয়েছে। এক শ্রেণীর লোকের কাছে পেড্রো অত্যন্ত প্রিয়। তরোয়াল চালায় ভাল। দূর থেকে ছোরা চালাবার দক্ষতা না কি অসাধারণ। আজ সেই লোকটিকে দেখে এলাম আমি।"

বিস্মিত বোধ করলুম। কিন্তু মনে মনে খুশীও হলুম খুব। রূপোলী সিনেমার গেট-কীপারী করার চেয়ে ফাইটিং ছবির হিরো হওয়া ভাল। মালদা টাউনে উৎপাত তো কম করে নি। আমার ধারণাটা প্রকাশ করলুম প্রশান্ত

লাহিড়ীর কাছে। হেসে ফেললেন তিনি। বললেন, "গেট-কীপার হওয়ার পেছনে উদ্দেশ্য ছিল ওর।"

"কি ?"

"মীনাক্ষীর সঙ্গে ঐখানেই ওর দেখা হ'তো। হয়তো দু'জনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে।"

"একথা বলছেন কেন আপনি ?"

"এক মাস হ'ল মীনাক্ষী এখানে নেই। সে বোম্বে গিয়েছে। খান্দ্‌ভাই আর ওকে টাকাপয়সা দেন না। বত্রিশ ঘাটের জল যদি না খেতে হয় তা হ'লে পেড্রোর ওপর নির্ভর করতে হবে মীনাক্ষীকে। অভাবে স্বভাব নষ্ট হয় তা তো আপনি জানেন। একবার যাবেন না কি বোম্বে ? শহরটা দেখে আসবেন ?"

"আপনি যাবেন কি করে, প্রশান্তবাবু ?"

"মাস খানিকের ছুটি নেব। ছুটি আমার পাওনা আছে।"

"যেতে পারি, কিন্তু খরচপত্র সব আমার। আপনাকে একটি পয়সাও খরচ করতে দেব না।"

প্রশান্ত লাহিড়ী বোধ হয় প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় ঘরে ঢুকল পেড্রো। হাসতে হাসতে দস্যুর মতো লাফ মেরে এগিয়ে এল আমার কাছে। বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরল আমাকে। বলল সে, "ভাস্করদা ,আমি জানি কেন তুমি এখানে এসেছ ?"

"কেন ?"

"সেই মন্মটোবাবুর মেয়েটাকে খুঁজতে।"

"কি করে জানলি ?"

"মালদা গিয়েছিলাম। সেখানে শুনে এলাম তোমার সব কাণ্ড। বাড়ি-ঘর বেচে দিয়েছ। তুমি কি মন্মটোবাবুর মেয়েটার সঙ্গে প্রেমে পড়েছ ভাস্করদা ?"

"সে কথার জবাব পরে দিব। কিন্তু আমার এখানকার ঠিকানা জানলি কি ক'রে পেড্রো ?"

হি হি শব্দে হেসে উঠল পেড্রো। আমার চিবুকটা হাত দিয়ে চেপে ধরে বলল, "মালদা থানার ছোট দারোগা সাহেবকে চিঠি লিখেছ না তুমি ?

দারোগাসাহেব চিঠিখানা আমার দেখালেন।"

"দেখালেন !"

"হ্যাঁ। তুমি তাঁকে আমার খবর জানাতে লিখেছ।" পেড্রোর গলার স্বরটা শেষের দিকে গম্ভীর হয়ে এল।—হাসি-খুশী ভাবটাও আর নেই। জিজ্ঞাসা করল, "কি চাও তুমি ভাস্করদা ?"

"মীনাক্ষীকে।"

"কেন ?"

জবাব আমি তোকে দেব না। আগে স্বীকার কর, মীনাকে তুই ভাগিয়ে নিয়ে গেছিস। বল্‌ সত্যি কি না ?"

জবাব না দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল পেড্রো। হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়ল প্রশান্ত লাহিড়ীর দিকে। যেন চমকে গেল একটু। ইনসপেক্টর লাহিড়ী উঠে পড়লেন। বললেন, "আজ চলি, ভাস্করবাবু।"

"পা-এর ধুলো দিয়ে যান, দাদা—" সত্যি সত্যি পেড্রো হাত নামিয়ে দিল প্রশান্তবাবুর পা-এর দিকে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার সঙ্গে আমার কি আগে কখনো দেখা হ'য়েছে ?"

"দেখা হয় নি, কিন্তু বাঁশী শুনেছি —" সশব্দে হাসতে হাসতে ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল পেড্রো। পান্থনিবাসের চাকর-বাকররা ওকে বেরিয়ে যেতে দেখল।

যাওয়ার আগে ইনসপেক্টর লাহিড়ী বললেন, "এ বড় সাংঘাতিক চরিত্রের লোক। আগে কখনো খুনের মামলায় জড়িয়ে পড়েছিল কি ?"

"না।"

আর কোনো কথা বললেন না, ইনস্‌পেক্টর সাহেব। গম্ভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন যেন। তারপর ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সারাটা রাত ঘুম এল না আমার। পেড্রো হঠাৎ কেন এসে উপস্থিত হ'ল তার কারণটা বুঝতে পারলুম না। সে কি আমায় ভয় দেখাতে এসেছিল ? তা যদি হয়, তবে মীনাক্ষীর নিখোঁজ হওয়ার মূলে ওরই হাত রয়েছে। এখন বুঝতে পারছি, প্রশান্তবাবুর সন্দেহটাকে হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পেড্রোর সঙ্গে মীনাক্ষীর প্রেমের সম্পর্ক থাকাও অসম্ভব নয়। খুবই বিচিত্র ব্যাপার মনে হচ্ছে। কিন্তু বিচিত্র ব্যাপার সত্য হয় না তাই বা কেমন যুক্তি ?

ভয় পেলুম আমি। পেড্রোর হঠাৎ-আগমনটা আমার চোখে ভাল লাগল না। এই অঞ্চল থেকে উঠে যেতে হবে। বালিগঞ্জের দিকে একটা নতুন আস্তানা খুঁজে নেয়ার সংকল্প করলুম। আপাততঃ বিছানা থেকে উঠে গিয়ে দরজার খিল লাগিয়ে দিলুম।

পরের দিন হোটেল থেকে বাইরে বেরুলাম না। প্রশান্ত লাহিড়ীর সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে বাসা-বদল করা ঠিক নয়। কিন্তু দুটো দিন তিনি অনুপস্থিত রইলেন। ভয়ের মাত্রা বাড়ল আমার। পর পর দু'দিন কখনো অনুপস্থিত থাকেন নি প্রশান্তবাবু। ম্যানেজারবাবুও তাঁর কোনো হদিস দিতে পারলেন না।

চতুর্থ দিন সকালবেলা ইনসপেক্টর লাহিড়ী এসে উপস্থিত হলেন। একটু উত্তেজিত মনে হ'ল তাঁকে। ইজি-চেয়ারে ব'সে সিগারেট ধরালেন। নিঃশব্দে আমি তাঁর দিকে তাকিয়েছিলুম। অপেক্ষা করছিলুম ভয়ংকর কিছু একটা শোনবার জন্য। এমন চাপা-উত্তেজনায় কষ্ট পেতে আগে কখনো তাঁকে দেখি নি।

একটু বাদেই তিনি বললেন, "জিনিসপত্র সব চটপট গুছিয়ে নিন। আজই রওনা হ'তে হবে—ফ্লাই করব।"

"কোথায় ?" অবশ্যই ভয় পেলুম আমি।

"বোম্বে। খুনের দায়ে ধরা পড়েছে রূপকুমারী।"

"তার মানে ? মীনাক্ষী খুন করেছে ?"

"করেছে কি না তদন্ত ক'রে বার করতে হবে। আপাতত বোম্বের পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার ক'রে রেখেছে।"

"পেড্রো ? তাকে গ্রেপ্তার করে নি ?"

"তাকেও করেছে। কিন্তু খুনের রাতে পেড্রো কলকাতায় ছিল। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, ঠিক খুনের সময়টাতে পেড্রো আপনার ঘরে ব'সে গল্প করছিল। আমরাই তার সাক্ষী। ঘটনাটা কি গতকালের কাগজে আপনি পড়েন নি ?"

"না তো।"

"বোম্বের শহরতলীতে একটি মহিলা তাঁর নিজের বাগান বাড়িতে বাস করতেন। গুজরাটী। লাখ তিনেক টাকা ছিল তাঁর। সন্তান কিংবা স্বামী নেই। খান্দুভাই-এর মাসীমা। রূপকুমারীকে তিনি ভালবাসতেন খুব। খান্দুভাই

পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। মাস ছয় আগের ঘটনা। খান্দুভাইকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে।"

"কেন?"

"পুলিশ সন্দেহ করছে ঐ তিন লাখ টাকার লোভে লক্ষ্মী দেবীকে খুন করিয়েছেন তিনি। বছর খানিক থেকে খান্দুভাই-এর ব্যবসা ভাল চলছিল না। বহু টাকা লোকসান দিয়েছেন। একটা বুড়ো চাকর ছিল লক্ষ্মী দেবীর। এই সংগে তাঁর পারিবারিক ডাক্তারকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ডাক্তার প্যাটেল। প্রায় বছর পনরো ধ'রে তিনি লক্ষ্মী দেবীর চিকিৎসা করতেন। তাঁর ওপর লক্ষ্মী দেবীর বিশ্বাস ছিল অগাধ। এক চাকরটিকে ছাড়া আর সবাইকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।"

"কিন্তু, খান্দুভাই-এর অবস্থা খারাপ হ'ল কি ক'রে? মীনাক্ষীর ওপর টাকার বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন না কি?"

এ-লাইনের লোকদের কিছু ঠিক নেই। আজ রাজা, কাল ফকীর। আবার পরশু দিনই হয়তো রাজা হ'য়ে বসবে। যাক। এখন কি করবেন আপনি? যাবেন তো আমার সংগে?"

"নিশ্চয়ই।" তক্ষুণি আমি জামা-কাপড় গুছতে লাগলুম। সারা শরীরে কাঁপুনী উঠেছে। এই ধরনের একটা বিপদের মধ্যে যে মীনাক্ষী পা ফেলতে পারে তেমন আশঙ্কা আমার ছিল। বিশেষ ক'রে সেই রাত্রে পেড্রোর ভাব-ভংগী দেখে আশংকা আমার অমূলক নয় ব'লে ভেবে রেখেছিলুম আমি। শুধু ব'সে ব'সে সময় গুণছিলুম।

ইনসপেক্টর লাহিড়ী বললেন, "সংগে কিছু টাকা নেবেন। প্লেনের টিকিট আমি কেটে ফেলেছি।"

"কতো টাকা নেব?"

"হাজার দুই নগদ থাকলেই চলবে। কতোদিন সেখানে থাকতে হবে তা এখন বলা শক্ত। আমি যাচ্ছি গভর্ণ-মেণ্টের তরফ থেকে। পশ্চিমবাংলা সরকারের কাছে তাঁরা একজন অভিজ্ঞ সি-আই-ডি অফিসারের সাহায্য চেয়ে-ছিলেন। আমাদের বড় সাহেব বললেন, 'তুমিই যাও লাহিড়ী। খুনের সংগে একটি বাঙালী মেয়ে জড়িয়ে পড়ল—একটু দেখেশুনে যত্ন নিয়ে তদন্ত করবে। হত্যাকারের আসামীকে ধরা চাই।' ভাস্করবাবু, আপনার হাত-পা অতো কাঁপছে কেন? তা হ'লে কি বোম্বে যাওয়ার ইচ্ছে নেই আপনার? মনের কথাটা খুলে বলুন তো—"

"ইচ্ছে আমার ষোল আনা, প্রশান্ত-বাবু। সারা জীবনে একটিও খুনের গল্প পর্যন্ত পড়ি নি। তাই প্রথমটায় খুবই ঘাবড়ে গিয়েছিলুম। বিশেষ ক'রে মীনাক্ষীর বিপদের কথা ভেবে বুকের রক্ত আমার শুকিয়ে গিয়েছে। যাক, প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিয়েছি। ক্রমে ক্রমে সুস্থ হ'য়ে উঠব।" একটু থেমে আমিই আবার বললুম, "মীনাক্ষী কখনো খুন করতে পারে না। পেড্রোই ওকে বিপদে ফেলেছে।"

প্রশান্ত লাহিড়ী হেসে উঠলেন। মতামত কিছু প্রকাশ করলেন না। যাওয়ার আগে শুধু ব'লে গেলেন, "এই নিন আপনার টিকিট। আর আমি আসব না। একেবারে বিমানঘাটিতে দেখা হবে।"

সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সাত নম্বর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন ডিটেকটিভ প্রশান্ত লাহিড়ী।

॥ পাঁচ ॥

বোম্বে পুলিশের একজন সি-আই-ডি অফিসার ইনস্পেক্টর দেশাই সান্টা ক্রুজ বিমান ঘাঁটিতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমাদের জন্য হোটেল ঠিক ক'রে রেখেছিলেন। এই অঞ্চলটার নাম প্যারেল। ধনীলোকদের বসবাসের পাড়া এটা নয়। হোটেলটা অবিশ্যি ভালই। আমাদের দু' জনের জন্য আলাদা আলাদা ঘর। ইনসপেক্টর দেশাই-এর সংগে প্রশান্ত লাহিড়ী আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, "ইনি আমার বন্ধু, ভাস্কর আচার্য। দুটি আসামীকে ইনি চেনেন।" আমার সংগে করমর্দন করলেন ইনসপেক্টর দেশাই।

এক টেবিলে ব'সেই আমরা ব্রেক-ফাস্ট খেলুম। ডাইনিং-রুমে আর কেউ ছিল না। কথা প্রসংগে প্রশান্ত লাহিড়ী জিজ্ঞাসা করলেন, "শহরতলীটা এখান থেকে কত দূর?"

"মাইল পনরো। আমাদের এক বন্ধুর একটা মোটর গাড়ি ঠিক ক'রে রেখেছি। বেলা দশটা থেকে সন্ধে সাতটা পর্যন্ত ড্রাইভার ডিউটি দেবে। মাঝখানে একটা নাগাদ এক ঘন্টার জন্য ছুটি দিলেই চলবে। দেশমুখ নামে একটি ছেলেকেও সংগে দেব আপনার। রাস্তা-ঘাট সব আপনাকে চিনিয়ে দেবে সে।" বললেন ইনসপেক্টর দেশাই।

চা-এর পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে প্রশান্ত লাহিড়ী বললেন, "গাড়ির দরকার নেই। আমি ট্যাক্সি চেপেই যাওয়া-আসা করব। দেশমুখ ছেলেটিকে চেনা করিয়ে দেবেন। মাঝে মাঝে তার সাহায্য আমি নেব। লক্ষ্মীদেবীর চাকরটি এখন কোথায়?"

"শহরতলীর বাড়িতেই আছে।"

"তাকে গ্রেপ্তার করেন নি কেন?"

"বহুদিনকার পুরনো লোক—খুবই বুড়ো। সংসারে তার কেউ নেই। তা ছাড়া আমরা লক্ষ্য রেখেছি বাইরের কোনো লোকের সংগে তার দেখা সাক্ষাৎ হয় কিনা। তার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখেছি।"

সিগারেট ধরিয়ে বসলেন প্রশান্ত লাহিড়ী। চোখ বুঁজে বার কয়েক টান মারলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, "লক্ষ্মীদেবীর ওয়ারীশ কেউ ছিল না?"

"একটি ভাইপো আছে আহমদাবাদে। এখনো নাবালক। আগামী বছর জুলাই মাসে সাবালক হবে।"

"কোনো উইল রেখে গিয়েছেন কি লক্ষ্মীদেবী?' '

হ্যাঁ। সব টাকা-পয়সা এবং শহর-তলীর বাড়িটা ভাইপো-কে দিয়ে গিয়েছেন। হাজার পঞ্চাশ টাকার শেয়ার ছিল। সেগুলো তাঁর মৃত্যুর পর খান্দু ভাই পাবেন ব'লে ঘোষণা ক'রে গিয়ে-ছিলেন। এই প্রসংগে একটা কথা আপনার জানা দরকার। লক্ষ্মীদেবীর যে তিন লাখ টাকা ছিল তা কেউ জানত না।"

"আপনারা জানলেন কি করে?"

ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের কাছ থেকে। তিনি বললেন যে, সাত দিন আগে টাকা-গুলো ভল্ট থেকে বার ক'রে নিয়ে গিয়ে-ছিলেন লক্ষ্মীদেবী।"

"ব্যাঙ্কের ম্যানেজার কোন্ দেশীয় লোক?"

"গুজরাটী।"

"লক্ষ্মীদেবীর সংগে আত্মীয়তা ছিল কি?"

"তা অবিশ্যি খোঁজ করি নি আমরা।"

হঠাৎ উঠে গিয়ে প্রশান্ত লাহিড়ী ডাইনিং-রুমের একটা জানলা খুলে

দিলেন। রেডিওতে রবীন্দ্র সংগীত হচ্ছিল। তিনি জানালার দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রইলেন। বোধ হয় মিনিট খানিক পর গানটা শেষ হ'য়ে গেল। জানলার কাছ থেকে ফিরে এসে বললেন, "কলকাতা স্টেশন থেকে কেউ নিশ্চয়ই রবীন্দ্র সংগীত গাইছে।"

ইনসপেক্টর দেশাই মাথা নাড়িয়ে অস্বীকৃতি জানালেন, "না, বোম্বে স্টেশন থেকেই গান গাইছে—"

"কে? ভারি মিষ্টি গলা তো! বাঙালী মেয়ে নিশ্চয়ই?"

ইনসপেক্টর দেশাই মৃদু হেসে জবাব দিলেন, "আজকাল অনেক গুজরাটী মেয়েরা রবীন্দ্র-সংগীত গায়। বোধ হয় ভালই গাইতে পারে।"

"হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে।" পায়চারি করতে লাগলেন প্রশান্ত লাহিড়ী।

আমি জানতুম গানবাজনা পছন্দ করেন তিনি। সংগে ক'রে একটা গ্রামোফোন নিয়ে এসেছেন। গুটি তিন রেকর্ডের বাক্সও এনেছেন। বার কয়েক পায়চারি করবার পর আবার এসে ব'সে পড়লেন চেয়ারে। অনুরোধ করলেন ইনসপেক্টর দেশাইকে, "খুন সম্বন্ধে কি ভাবছেন আপনারা একটু বলুন না, শুনি—অতোগুলো লোককে গ্রেপ্তারই বা করলেন কেন, বুঝতে পারছি না। ডাক্তারের ব্যাপারটা কি?"

"তাঁকে গ্রেপ্তার করতে হয়েছে টাকার ব্যাপারটা আবিষ্কৃত হওয়ার পরে। প্রথম দু' দিন আমরা কেউ বুঝতে পারি নি যে, খুনের উদ্দেশ্য ছিল টাকা। তারপর যখন লক্ষ্মীদেবীর সলিসিটার উইলটা বার করলেন তখন তিন লাখ টাকার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ওয়াকীবহাল হলাম আমরা। লক্ষ্মীদেবীর শোবার ঘরে একটা সিন্দুক ছিল। টাকাটা তিনি সেই সিন্দুকেই রেখেছিলেন ব'লে অনুমান হয়। তাঁর চাকর বাবু রাও-এর কথা যদি মিথ্যে না হয়, তা হ'লে লক্ষ্মীদেবীর শয়ন-কামরায় তিনজন ছাড়া অন্য কেউ ঢুকতে পারত না। ওর অন্তত কোনদিনও চোখে পড়েনি। ডাক্তার প্যাটেল রূপকুমারী আর বাবুরাও ছাড়া অন্য কারো ঢুকবার হুকুম ছিল না। ঢোকেও নি কোনো দিন।'"

"খান্দুভাই?"

"না, তাঁকেও শয়ন কামরায় ঢুকতে দেখে নি সে। খুনের দিন বিকেলবেলা রূপকুমারীর সংগে খান্দুভাই গিয়েছিলেন লক্ষ্মীদেবীর বাড়ি। কিন্তু ড্রইং-রুমে ব'সে তাঁরা গল্প ক'রে গিয়েছেন।"

ডাইনিং-রুমে কয়েকজন লোক এসে গেল। প্রশান্ত লাহিড়ী উঠে পড়লেন। আমাদের দিকে চেয়ে বললেন তিনি, চ'লুন মিস্টার দেশাই, আমার ঘরে ব'সে গল্প করি।"

ডাইনিং-রুমটা ছিল দোতলায়। আমাদের জন্য ঘর ঠিক হয়েছে তিনতলায়। ওপরে উঠছিলুম আমরা। দাঁড়িয়ে গেলেন প্রশান্ত লাহিড়ী। কান খাড়া ক'রে গান শুনতে লাগলেন। এবারও রবীন্দ্র সংগীত হচ্ছিল। দেশাইকে উদ্দেশ ক'রে বললেন, "আজ তো রবিবার। কলকাতার স্টেশন ধরেছে কেউ। এই অঞ্চলে বাঙালী কেউ থাকে না কি?"

ইনসপেক্টর দেশাই সংগে সংগে জবাব দিলেন, "হ্যাঁ, প্যারেলে বাঙালীর সংখ্যা কিছু আছে বৈ কি।'"

"পেড্রোর আসা যাওয়া ছিল না? দু' চারজন বাঙালীর সংগে বন্ধুত্ব জমে ওঠাও অসম্ভব নয়। খোঁজ নিয়েছেন?"

"নিয়েছি।"

"দু' একজনের বাড়ি সার্চ ক'রে দেখেছেন নিশ্চয়?"

"না।"

"তিন লাখ টাকা পেড্রো যদি নিয়ে থাকে তা হ'লে ব্যাংকে নিশ্চয়ই রাখবে না।" একটু থেমে প্রশান্তবাবুই বললেন, "অবিশ্যি পেড্রো যে খুন করে নি সে সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ। খুনের রাত্রে সে কলকাতায় ছিল তার সাক্ষী তো আমি নিজেই। অতএব অ্যালিবাই-এর অজুহাতে অন্যত্র থাকার দাবি সে না করলেও পারে। তবে হ্যাঁ, রূপকুমারী আর পেড্রোর সংগে যদি তৃতীয় ব্যক্তি কেউ থেকে থাকে—"

একেবারে ওপরের সিঁড়িতে উঠে ইনসপেক্টর দেশাই বললেন, "সেই জন্যই আপনার সাহায্য আমরা চেয়ে পাঠিয়েছিলাম। বাংলাদেশে এদের কীর্তিকলাপ কিছু আছে কি না আপনি আমাদের চেয়ে বেশি জানবেন। এদের সংগে তৃতীয় ব্যক্তি একজন আছে ব'লেই আমরা নিঃসন্দেহ হয়েছি।"

নিঃসন্দেহ হয়েছেন?" ভুরু কোঁচকালেন প্রশান্ত লাহিড়ী।

"হ্যাঁ, আগামীকাল যখন ডাক্তার প্যাটেলের জন্য জামীন চেয়ে দরখাস্ত করবে ওরা আমরা তা'তে আপত্তি তুলব না। খান্দুভাইকেও জামীনে খালাস দিতে হবে। ধ'রে রাখা যাবে না।"

প্রশান্ত লাহিড়ীর ঘরে এসে বসলুম আমরা। তিনি আমাদের বসতে ব'লে একটা বড় সাইজের ক্যানভাসের ব্যাগ খুলতে লাগলেন। ব্যাগ থেকে একটা গড়গড়া বার করলেন। হেসে বললেন, 'সিগারেট টেনে টেনে গলাটা তেতো হ'য়ে উঠেছে। একটু তামাক সেজে নিই। গড়গড়া টানতে টানতে মিস্টার দেশাইয়ের গল্প শোনা যাবে।"

টিকে, তামাক, কল্কে সবই তাঁর সংগে ছিল। আগে আমি কখনো তাঁকে তামাক খেতে দেখি নি। রবীন্দ্র সংগীতের সংগে তামাকটা যেন কেমন বে-মানান ঠেকল আমার চোখে। যতদূর খবর রাখি তাতে মনে হয় সংগে করে তিনি একটিও ক্লাসিকেল সংগীতের রেকর্ড আনেননি। ডিটেকটিভ লাহিড়ীর মনের কাঠামোটা আমি বোধহয় আজও পুরোপুরি দেখতে পাইনি।

গড়গড়া টানতে টানতে প্রশান্তবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "লক্ষ্মী দেবীর বয়স কতো হয়েছিল?"

"পঞ্চাশ। বেশ শক্ত সমর্থ ছিলেন তিনি।"

"রাত্রে দরজা বন্ধ করে শুতেন নিশ্চয়ই?"

"হ্যাঁ। সেদিন রাত্রেও ঘরের দরজা বন্ধ ছিল। খুনীটা ঢুকেছিল স্নানঘরের জানলা দিয়ে।"

"জানালা ভেংগে?"

"না। এখানেও একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছিল। সেদিন রাত্রে স্নানঘরের জানলাটার ছিটকিনি খুলে রেখেছিল কেউ। আমাদের বিশ্বাস, ছিটকিনি খুলে রাখার কাজটা করেছে রূপকুমারী।"

"অবিশ্বাস করা কঠিন। ম্যাজিস্ট্রেট যেন কোনোক্রমেই রূপকুমারীকে জামীন না দেন। আচ্ছা—"আমার দিকে চেয়ে প্রশান্ত লাহিড়ী জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা ভাস্করবাবু, আপনি আমায় বলেছিলেন না যে, নিখোঁজ হওয়ার

সময় শ্রীলক্ষ্মী হাজার দশেক টাকার গহনা নিয়ে এসেছিল?

বললুম, "বেশি ছাড়া কম নয়। তা কি আর আছে? এতোদিনে পেড্রোর হাতে পড়ে গলে গিয়েছে সব।"

ইনসপেক্টর দেশাই বাধা দিয়ে বললেন, "যেসব কোম্পানীতে পেড্রো কাজ করত সেখানে আমরা খোঁজ নিয়েছিলাম। সেখান থেকে রোজগার ওর ভালই হতো। আরও গোটা তিন ছবিতে কনট্রাক্ট ছিল পেড্রোর। তবে হ্যাঁ, মারামারি কাটাকাটির প্রতি ঝোঁক ছিল খুব। খুনের দৃশ্যগুলো এতো নিখুঁতভাবে করত যে, অভিনয় বলে বোঝা যেত না।"

"আপনার কথা মিথ্যা নয়। আমি নিজেও সেদিন কলকাতায় ওর একটা ছবি দেখে এলাম। প্রতিদ্বন্দ্বী নায়কের পেটে এমনভাবে তরোয়াল চালিয়ে দিলে পেড্রো যে, আমিও ভয় পেয়ে গেলাম। আচ্ছা মিস্টার দেশাই, খুনীর ছোরাটা আপনি দেখেছেন কি?"

"এখানেও একটা মস্তবড় রহস্য লুকনো আছে।" ইনসপেক্টর দেশাই-এর মুখে অস্বস্তির আলোড়ন। চিন্তান্বিত-ভাবে বলতে লাগলেন তিনি, "দুবৃত্ত তার নিজের ছোরা ব্যবহার করে নি। লক্ষ্মী দেবীর বালিশের তলায় একটা ছোরা থাকত সব সময়েই। মনে হয় তিনি কাউকে বিশ্বাস করতেন না। তাঁর ছোরা দিয়েই তাঁকে হত্যা করেছে। নিজের ছোরা কাজে লাগায় নি খুনী।"

"হয়তো হত্যা করার উদ্দেশ্য ছিল না।—" গড়গড়ার নলটা হাতের মুঠোতে ধরে রেখে প্রশান্তবাবু বললেন, "হয় তো শুধু টাকাটাই চুরি করতে এসেছিল...... তারপর হয়তো লক্ষ্মী দেবীর ঘুম ভেঙ্গে গেল......তিনি চোরটাকে চিনেও ফেললেন......এমন হওয়াও বিচিত্র নয় যে, লক্ষ্মীদেবীই আগে তাকে আক্রমণ করেছিলেন......"

"কোনো কিছুই অস্বীকার করা যায় না। তবে, দিন সাতেক থেকে তিনি অসুখে ভুগছিলেন। হার্টের ব্যারাম। পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট দেখলে আপনিও বুঝতে পারবেন। আক্রমণ করবার মতো শক্তি তাঁর না থাকাই উচিত। শত্রুর সঙ্গে ধস্তাধস্তির কোনো চিহ্ন আমরা খুঁজে পাই নি।"

"হাত পা-এর ছাপ যা যা নেয়া দরকার, নিয়েছেন তো?"

"হ্যাঁ, অভিযুক্ত আসামীদের কারো সঙ্গে মিলছে না। ছোরার বাঁটে শুধু লক্ষ্মী দেবীরই হাতের ছাপ পাওয়া যায়। এর দ্বারা মনে হয়, খুনীর হাতে অবশ্যই গ্লাভস্ লাগানো ছিল।"

"তা হলে ধস্তাধস্তি একটু হওয়াই স্বাভাবিক। জানলায় পা-এর ছাপ পান নি কারো?"

"পেয়েছি। এদের সবার চেয়ে পা-এর ছাপ বড়। এদেশে মানুষের জুতো বড় পা সাধারণত দেখতে পাওয়া যায় না। নকল জুতো, অর্থাৎ বড় সাইজের জুতো পরে এসেছিল বলে আমাদের বিশ্বাস।"

"ছোরাটা কোথায়?"

"লেবরেটারিতে। রক্ত-মাখানো অবস্থায় রেখে দেওয়া হয়েছে।"

প্রশান্ত লাহিড়ীর স্মরণ শক্তি যে কী প্রচণ্ড তা আমি জানি। খুঁটিনাটি ব্যাপারও তিনি ভোলেন না। মনে রাখবার একটা বিশেষ ধরণের পদ্ধতি অবলম্বন করেন তিনি। কথা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকেন। ঈষৎ পূর্বের আলোচিত কথাগুলো সেই সময় আবার তিনি নিজের মনে আগাগোড়া আলোচনা করেন। স্মরণ শক্তির মধ্যে প্রত্যেকটি কথা আঠার মতো লেগে থাকে। এখন তিনি ঘরের মধ্যে বার কয়েক পায়চারি করবার পর জিজ্ঞাসা করলেন, "ডাক্তার প্যাটেল কি খুব বড় ডাক্তার? অর্থাৎ, রোজগার কেমন?"

"নাম আছে খুব। বিদ্বান তো বটেই। বিয়ে করেন নি।"

"বয়স কতো?"

"আটচল্লিশ।"

"পুরুষের পক্ষে আট চল্লিশ এমন কিছু বেশি বয়স নয়।" মন্তব্য করলেন প্রশান্তবাবু। তারপর তিনিই আবার বলতে লাগলেন, "রূপকুমারীর সঙ্গে তাঁর নিশ্চয়ই পরিচয় ছিল। ঐ দিক দিয়েও একটা ষড়যন্ত্রের আভাস পাওয়া যেতে পারে। লক্ষ্মী দেবীর বাড়িতে ডাক্তার প্যাটেলের শেষ ভিজিট কবে?"

"খুনের দিন সকালবেলা।"

"আচ্ছা মিস্টার দেশাই, সিন্দুকের চাবিটা থাকত কোথায়?"

"বালিশের তলায়।"

"বরাবর?"

"বাবুরাও তো তাই বলে।"

"চাকরটা দেখছি সব খবরই রাখে... অথচ ঐ লোকটাকে আপনারা গ্রেপ্তার করেন নি। পুরনো হলেই কি তার সাত-খুন মাপ? আজ আপনি ফ্রী আছেন নিশ্চয়ই। দেশমুখকে এখন দরকার নেই। আপনাকে সঙ্গে নিয়েই দুপুরের দিকে আমরা একবার লক্ষ্মী দেবীর বাড়ি যেতে চাই। কি বলেন? অসুবিধে হবে না কি আপনার?"

"কিছু না। আপনার কথাবার্তা শুনে আমার এখন মনে হচ্ছে, তদন্তের শুরুতেই অনেক ভুল করেছি আমরা। ক'টার সময় আসব বলুন?"

"খাওয়াদাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করে এই ধরুণ বেলা দুটো নাগাদ এলেই চলবে। ট্যাক্সি নিয়ে আসবেন। খুব বেশি জানাশোনা ড্রাইভার যদি হয় তাকে আনবেন না। অপরিচিত ট্যাক্সি-ড্রাইভার হলেই ভাল হয়। শহরতলীতে পৌঁছবার মাইল খানিক আগে তাকে ছেড়ে দিতে চাই।"

"বেশ, তাই হবে।" ইনসপেক্টর দেশাই উঠে পড়লেন। দরজা পর্যন্ত এগিয়েও গেলেন। হঠাৎ আবার তাঁকে দাঁড়াতে বললেন প্রশান্ত লাহিড়ী। জিজ্ঞাসা করলেন, "খান্দুভাই সম্বন্ধে কিছু বললেন না তো? তাঁর কলকাতার অফিস থেকে কয়েকটা খবর আমি সংগ্রহ করে এনেছি। এখানকার ব্যবসা তাঁর কেমন চলছে?"

"খারাপ। দুটো হিন্দী ছবিতে প্রায় দশ লাখ টাকা মার খেয়েছেন। কিন্তু তাঁর কাছে দশ লাখ টাকা তো দশ টাকার সমান। ঐ ব্যাঙ্কেই খান্দুভাই-এর মোটা একাউন্ট ছিল—"

"একটু দাঁড়ান। ব্যাঙ্কের কোন্ ব্রাঞ্চে? যেখানে লক্ষ্মী দেবীর টাকা ছিল সেখানে তো?"

ইনসপেক্টর দেশাই যেন বোকা বনে গেলেন। হতবাক হয়ে মিনিট দুই দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। তারপর বললেন, "হ্যাঁ, সেই একই ব্রাঞ্চে।"

"তা হলে লক্ষ্মী দেবীর তিন লাখ টাকার খবর খান্দুভাই-এর জানা খুব অসম্ভব ব্যাপার নয়। যাতায়াত যখন ছিল তখন কেরানীদের মারফৎ খবরটা তিনি বার করে নিয়েছেন বলে আমরা অন্তত সন্দেহ করতে পারি। বলুন, পারি কি না?"

"পারি—অবশ্যই পারি।"

"তাহলে সেখানেও একটা তদন্তের পথ খোলা রয়েছে। রূপকুমারীর পেছনে কতো টাকা তিনি ঢেলেছেন বলে আপনার মনে হয়, মিস্টার দেশাই?"

"গুজব তো অনেক। কিন্তু যারা রূপকুমারীকে জানে, তারা বলে খান্দুভাই ওকে পান নি। আসলে সে ভালবাসে পেড্রোকে। আমি খবর পেয়েছি, খান্দুভাই-এর সঙ্গে মেলামেশা করা পেড্রো পছন্দ করত না। অনেকবার নাকি কলকাতা গেছে শুধু খান্দুভাইকে

শাসিয়ে আসবার জন্য। মেয়েটার না কি টাকার খাঁই খুব বেশি। বোম্বে এলে রূপকুমারী থাকত তাজমহল হোটেলে। খরচ দিতেন খান্দুভাই। এ'দের পিছু পিছু ঘুরে বেড়াত পেড্রোর ছায়া।"

"তা হলে ডাক্তার প্যাটেলের জামীনের বিরুদ্ধে 'মুভ' করার দরকার নেই। তাঁকে ছেড়ে দিন। খান্দুভাই আর মীনাক্ষীর যোগাযোগটার ওপর সতর্ক নজর রাখতে হবে। পেড্রোকেই বা ধরে রেখে লাভ হবে কি? বেচারীর কনট্রাক্ট নষ্ট হচ্ছে। তার হয়ে কেউ জামীন চাচ্ছে না?"

"হ্যাঁ—ফিল্ম কোম্পানী ব্যারিস্টার দাঁড় করিয়েছে। তা ছাড়া পেড্রোর ব্যাঙ্কে হাজার দশেক টাকাও আছে।"

ইনসপেক্টর দেশাই গেলেন। তাঁর পিছু পিছু আমিও বেরিয়ে যাচ্ছিলাম। প্রশান্ত লাহিড়ী বললেন, "খাওয়া-দাওয়াটা একটু আগে আগে সেরে নেবেন, ভাস্করবাবু। তারপর ঘুমিয়ে পড়ুন। এতো বেশি উত্তেজনা আপনার পক্ষে ভাল নয়। শহরতলীতে আপনার যাওয়ার দরকার নেই। অবিশ্যি বেকার বসিয়ে রাখব না আপনাকে। কাজ দেব।"

"কি কাজ, এখুনি বলুন।"

"প্যারেলে যে-সব বাঙ্গালীরা থাকেন তাঁদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করুন। পেড্রোর খবর পাবেন তাঁদের কাছ থেকে। এমন কি মীনাক্ষীর খবর পাওয়াও অসম্ভব হবে না।"

"বেশ, তাই করব। দেখুন প্রশান্ত-বাবু, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই।"

"বলুন কি কথা?"

"পেড্রোকে আপনি জামীনে খালাস দেওয়ার কথা বললেন। ওর ওপর আপনার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আপনার কথাবার্তা শুনে এমন ধারণা জন্মেছে আমার যে, পেড্রোর প্রতি আপনার সহানুভূতি জন্মেছে। কিন্তু কেন? ওর আজীবনের ইতিহাসে গুন্ডামীর তথ্য ছাড়া আর কিছু নেই। টাকার জন্য পেড্রো অনায়াসেই খুন করতে পারে।"

"সে তো তদন্তসাপেক্ষ, ভাস্করবাবু।"

"মীনাক্ষীর বেলায় কি সেই যুক্তি খাটে না? অথচ, সে যেন জামীনে খালাস না পায় তার জন্য ইনসপেক্টর দেশাইকে আপনি সতর্ক থাকতে বললেন।"

মিষ্টি হাসি ফুটে উঠল প্রশান্ত লাহিড়ীর মুখে। মিষ্টি হাসির মধ্যে দুষ্টুমীর আভাস পেলুম আমি। তিনি বললেন, "এমন নিঃস্বার্থভাবে কোনো পুরুষ যে মেয়েদের ভালবাসতে পারে তার প্রমাণ আগে কখনো চোখে পড়েনি আমার।"

"কার কথা বলছেন মিস্টার লাহিড়ী?"

"আপনার।"

লজ্জায় মুখ আমার লাল হয়ে উঠল। আর অপেক্ষা করলুম না। মীনাক্ষীর জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠা স্বাভাবিক। কিন্তু আমার উদ্বেগের মাত্রা হয়তো স্বাভাবিকতার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তাই আর প্রশান্ত-বাবুর সঙ্গে আলোচনার দরকার বোধ করলুম না। তাঁর কাছে ধরা পড়ে গিয়েছি। মনে মনে আমি কি তবে মীনাক্ষীকে ভালবাসি?

বেলা দুটোর সময় ইনসপেক্টর দেশাই এলেন। সঙ্গে এসেছে দেশমুখ। সি-আই-ডি পুলিশের হয়ে সংবাদ সংগ্রহ করে—ইনফরমার। প্রশান্তবাবুর ঘরে আমিও ছিলুম। ইনসপেক্টর দেশাই বললেন, "আপনার আন্দাজ ঠিকই হয়েছে মিস্টার লাহিড়ী। প্যারেলের একটি বাঙালী পরিবারের সঙ্গে পেড্রোর বন্ধুত্ব হয়েছে—প্রায় প্রত্যেক দিনই সেখানে যাওয়া আসা করত সে। দেশমুখ খবর এনেছে।"

"কোথায় দেশমুখ?"

"বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।"

"ডাকুন তাকে।"

ঘরে ঢুকল দেশমুখ। প্রশান্ত লাহিড়ী জিজ্ঞাসা করলেন, "ঐ বাড়িতে কি যুবতী স্ত্রীলোক কেউ আছেন?"

"আজ্ঞে না, স্যার। প্রদীপ রাহা ব'লে এক ভদ্রলোক থাকেন। তিনি বিবাহিত। আপাতত স্ত্রী তাঁর কলকাতায় আছেন। বছর পঞ্চাশ বয়স প্রদীপবাবুর। এখানে তিনি খান্দুভাই-এর অফিসের হিসাব-রক্ষক।"

"পেড্রোর সঙ্গে কতোদিনের আলাপ?"

"তা প্রায় এক বছর হবে।"

"প্রদীপবাবুর সঙ্গে পেড্রোর বয়সের তো অনেক ফারাক দেখছি......যুবতী স্ত্রীলোকও কেউ নেই। তবে কেন সে এখানে প্রতিদিনই যাওয়া আসা করত? হিসাব-রক্ষকরা সাধারণত গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। পেড্রোর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বটা একটু অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে না, মিস্টার দেশাই?"

"এখন তো তাই মনে হচ্ছে—"জবাব দিলেন দেশাই সাহেব।

প্রশান্ত লাহিড়ীর মুখ দেখে মনে হ'ল আমার, খুবই বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। তদন্তের ব্যাপারে বোম্বে পুলিশের শৈথিল্য নজরে পড়েছে তাঁর। (আসামী-দের পক্ষ থেকে কেউ কি তদ্বির করছে গোপনে? খান্দুভাই-এর প্রভাব ও প্রতিপত্তি কম নয়। দশ-বিশ লাখ টাকার লোকসান তাঁর পক্ষে কিছুই না।) দুপুরবেলা খাবার টেবিলে ব'সে প্রশান্ত লাহিড়ী তবু বলেছিলেন যে, খান্দুভাই-এর আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে নির্ভুল খবর পাওয়া দরকার। এ'দের টাকা-পয়সার জগতটা অত্যন্ত জটিল। এখন বুঝলুম, দেশমুখের খবরটা তাঁর কাজে লাগবে। প্রদীপবাবুর কাছ থেকে দু' একটা তথ্য খুঁজে বার করতে পারবেন। বলা যায় না, খুনের রহস্যটা আবিষ্কার করার পথ হয়তো প্রদীপবাবুর বাড়ি থেকে শুরু হয়েছে। পেড্রোর গুপ্তহাত এখানেই মিলিত হয়েছে খুনীর হাতের সঙ্গে। তিন লাখ টাকার দেনাপাওনা মিটে গিয়েছে প্রদীপ রাহার মারফৎ।

তামাক খাওয়া শেষ হ'ল প্রশান্ত লাহিড়ীর। গড়গড়ার নলটা খুলে নিয়ে গুটিয়ে রাখলেন। আমার দিকে চেয়ে বললেন, "চলুন ভাস্করবাবু, আপনিও চলুন। দেশমুখের আসবার দরকার নেই। সে বরং প্রদীপ রাহার ওপর দৃষ্টি রাখুক।"

পথে বেরিয়ে প্রশান্তবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "ডাক্তার প্যাটেল বিয়ে করেননি কেন?"

ট্যাক্সিতে ব'সে ইনসপেক্টর দেশাই জবাব দিলেন, "তাই তো, সে সম্বন্ধে কোনো তদন্ত করা হয়নি!"

"আর তো বিয়ের বয়সও নেই—" পকেট থেকে একটা নোট বই বার ক'রে পাতা উল্টাতে উল্টাতে প্রশান্তবাবু বললেন, "আটচল্লিশ বছর বয়স। টাকা রোজগার করেন প্রচুর......আচ্ছা, লক্ষ্মী-দেবীর সঙ্গে তাঁর কোনো প্রেমের কাহিনী জড়িয়ে নেই তো?"

"কি রকম?" প্রশ্ন করলেন ইনসপেক্টর দেশাই।

"এই ধরুন, যৌবনে ডাক্তার প্যাটেল লক্ষ্মীদেবীকে ভালবাসতেন। কিন্তু বিয়ে হ'ল না। লক্ষ্মীদেবীর বাবা কাপড়ের কলের মালিকের সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিলেন। বিয়ে হওয়ার পর ডাক্তার

প্যাটেলের সংগে পুরনো সম্পর্কটা আবার তিনি......এমন কি অবৈধ যোগা-যোগ থাকাও অসম্ভব নয়। বাবুরাও অবিশ্যি এই সম্বন্ধে খবর রাখবে তা হ'লে। তাকে আপনারা কেন যে গ্রেপ্তার করেননি, বুঝতে পারলাম না।"

"আমরা বারো ঘণ্টা এক নাগাড়ে জেরা করেছি ওকে, পেটে কিছু থাকলে ব'লে ফেলত। আমাদের বড়সাহেব মিস্টার ড্রাইভার নিজেও ছিলেন জেরার সময়। তাঁর হুকুম মতোই বাবু রাওকে ছেড়ে দিতে হ'ল।"

"বড়সাহেবের নিশ্চয়ই অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে।" কথা শেষ ক'রে সিগারেট ধরালেন প্রশান্ত লাহিড়ী।

লক্ষ্মীদেবীর বাড়ি পেঁৗছবার এক মাইল আগেই ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিলুম আমরা। ফেরবার মুখে চলন্ত ট্যাক্সি পাওয়া যাবে ব'লে আশ্বাস দিলেন ইনসপেক্টর দেশাই। রাস্তাটা নির্জন নয়। গাড়ি যাওয়া আসা করছে। পা-এ হেঁটেও লোক চলেছে। সাইকেলের সংখ্যাও অনেক। এখান থেকে খানিকটা দূরেই একটা মস্ত বড় ইণ্ডাস্ট্রিয়েল নগর গড়ে উঠছে। শ্রমিকদের ব্যারাক-গুলো দেখা যায়। বাইনাকুলার চোখে লাগিয়ে প্রশান্ত লাহিড়ী আশ-পাশটা ভাল ক'রে দেখলেন।

বাড়িটার নাম লক্ষ্মী বিল্ডিংস। বেশ বড় বাড়ি। গাছপালা আছে অনেক। যত্নের অভাবে জঙ্গলাবৃত মনে হয়। ফুলের বাগান নজরে পড়ল না। বোধ হয় ফুলের শখ ছিল না লক্ষ্মীদেবীর। ইনসপেক্টর দেশাই বললেন যে, মাস দুই-এর জন্য লক্ষ্মীদেবী প্রতি বছরই শিমলা গিয়ে থাকতেন। শরীর খারাপ না হ'য়ে পড়লে ডাক্তার প্যাটেলকে সেখানে ডেকে পাঠাতেন না তিনি।

বাগানের জন্য মালী কেউ নেই। বাইরের ফটকে দারওয়ান বসত না কখনো। একমাত্র বাবু রাও ছাড়া অন্য কাউকে কাছে রাখেননি লক্ষ্মীদেবী। তবে হ্যাঁ, জমাদার একজন আছে। সকাল-বেলা সে আসে। ঝাড়পোঁছ ক'রে দিয়ে সকালবেলায়ই চ'লে যায়। মাস ছয় আগে পর্যন্ত রান্নার লোক একজন ছিল। মহারাষ্ট্রীয়। দু' মাসের ছুটি নিয়ে দেশে গিয়েছিল, আর ফিরে আসেনি।

বাগানটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন প্রশান্ত লাহিড়ী। চারদিকে বেশ উঁচু দেয়াল। তবে লাফিয়ে পার হ'য়ে যাওয়া যায়। বাড়ির পেছন দিকে এসে প্রশান্ত-বাবু প্রাচীরের ওপর উঠে পড়লেন। বাইনাকুলার চোখে লাগিয়ে দেখলেন, ঐ দিকেও একটা রাস্তা আছে। বড় সুন্দর রাস্তাটি। আঁকাবাঁকা নয়, লম্বা।

প্রাচীর থেকে নেমে প'ড়ে প্রশান্ত-বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "বাথরুমটা কোন্ দিকে? যেখান দিয়ে খুনীটা ঢুকেছিল ব'লে আপনাদের বিশ্বাস?"

বাড়িটার পুব দিকে আমরা এলুম। একটা ঘোরানো লোহার সিঁড়ি উঠে গিয়েছে দোতালার বাথরুম পর্যন্ত। জমাদারদের ওঠা নামার পথ এটা। প্রশান্তবাবু উঠে গেলেন সিঁড়ি দিয়ে। জানালা ঠিক নয়। ছোট দরজা এটা। হাত দিয়ে ধাক্কা মারলেন তিনি। খুলল না। ভেতর থেকে নিশ্চয়ই খিল লাগানো আছে। নিচে দাঁড়িয়ে আমরা দেখলুম, লাহিড়ী মশায় মিনিট দুই ধ্যানমগ্ন হয়ে রইলেন।

নিচে নেমে এসে বললেন, "চলুন, এবার ভেতরে ঢোকা যাক। বাবু রাও কোথায়? তাকে ডাকুন। দাঁড়ান, আগে চলুন ওর শোবার ঘরটা দেখে আসি।"

বাবু রাও তার নিজের ঘরেই ছিল। মনে হ'ল একটু আগেই সে ঘুম থেকে উঠেছে। যতটা বুড়ো মনে হয় সেই অনুপাতে তার বয়স কম। ইনসপেক্টর দেশাই বলেছিলেন, ষাট বছর বয়স। আমাদের কিন্তু দেখে মনে হ'ল সত্তরের কম নয়। বাবু রাও-এর মুখের ওপর দুশ্চিন্তার ছায়া পড়েছে। ছায়াটা সত্যি সত্যি দুশ্চিন্তার, শোকের নয়। লোকটিকে দেখে আমার ভাল লাগল না। অবিশ্যি প্রশান্ত লাহিড়ীর কথা শুনে শুনে আমি তো চারজন আসামীকেই খুনী ব'লে ভেবে রেখেছি। যখন যার কথা বলেন তাকেই খুনী ব'লে ধারণাটা জন্মায়।

বাবু রাও-এর বিছানার গায়ে একটা ইলেকট্রিক বালব লাগানো রয়েছে। নিচু হ'য়ে প্রশান্তবাবু পরীক্ষা ক'রে দেখলেন, ইলেকট্রিকের তার খাটের গা দিয়ে উঠে এসেছে ওপরে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "একেবারে মাথার ওপরে একটা বালব লাগিয়েছ কেন?"

"আমি লাগাইনি, হুজুর। মিস্ত্রী লাগিয়েছে।"

"তা আমি জানি—" একটু যেন ধমকে উঠলেন প্রশান্ত লাহিড়ী, "এটার উদ্দেশ্য কি?"

"এটা কলিং-বেল, হুজুর। মাতাজীর খাটের গায়ে সুইচ আছে। দরকার পড়লে তিনি আমায় বিছানায় শুয়েই ডাকতে পারতেন। আমার ঘুম একটু বেশি, তাই কানের কাছে ঘণ্টা বাজার ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি।"

"যে-রাত্রে তাঁকে খুন করা হয় সেই রাত্রে তিনি তোমায় ডাকেননি?"

"না, হুজুর।"

"কখন টের পেলে যে তাঁকে খুন করা হয়েছে।"

"বেলা আট-টায়। অতো বেলা পর্যন্ত তিনি ঘুমতেন না। দরজায় ধাক্কা দিলুম অনেকবার—জমাদারকেও বললুম ধাক্কা মারতে। কিন্তু মাতাজীর সাড়া পাওয়া গেল না। টেলিফোন ক'রে পুলিশকে খবর দিতে গিয়ে দেখি, ওটা খারাপ হয়ে গিয়েছে।"

"খারাপ হ'য়ে গিয়েছে?" ভুরু কোঁচকালেন প্রশান্ত লাহিড়ী।

"আজ্ঞে। টেলিফোনের তার কেটে রেখে গিয়েছিল খুনী। তারপর জমাদারকে বসতে ব'লে আমি খবর দিতে গেলুম থানায়।"

"মাতাজীর ঘরে যে তিন লক্ষ টাকা ছিল তা কি তুমি জানতে?"

"আজ্ঞে না, হুজুর।"

"মিস্টার দেশাই, চলুন এবার লক্ষ্মী-দেবীর ঘরটা দেখে আসি।"

আমাদের আগে দোতালায় উঠে গেল বাবু রাও। জানালা-দরজাগুলো খুলে দিল সে। প্রথমে ড্রইং-রুমে ঢুকলুম আমরা। বাবু রাও বলল, খুনের দিন বিকেলবেলা খান্দুভাই আর রূপকুমারী এখানে ব'সে গল্প করে গিয়েছেন। ডাক্তারসাহেব এসেছিলেন সকালবেলা। প্রায় প্রত্যেক দিনই আসতেন তিনি।

প্রশান্ত লাহিড়ী জিজ্ঞাসা করলেন, "সন্ধ্যেবেলা কখনো আসতেন না ডাক্তার প্যাটেল?"

"আসতেন?"

"কতক্ষণ পর্যন্ত থাকতেন?"

"আটটা ন'টা—"

"তার বেশি নয়?"

বাবু রাও মাথা নিচু ক'রে ফেলল। প্রশ্নটা দ্বিতীয়বার উত্থাপন করলেন প্রশান্ত লাহিড়ী। বোধ হয় অবৈধ প্রেমের পথটা আবিষ্কার করতে চান

তিনি। মনে মনে একটা প্রেমের সম্পর্ক নিশ্চয়ই গ'ড়ে তুলেছেন ইনসপেক্টর লাহিড়ী। ভেবেচিন্তে বাবু রাও বলল, "হ্যাঁ, কখনো সখনো একটু বেশি রাত হ'য়ে যেত। বিশেষ ক'রে মাতাজী যেদিন তাঁকে খাবার নেমন্তন্ন করতেন।"

"রাত কাটাননি কখনো?"

"মনে পড়ছে না।"

"মনে করবার চেষ্টা করো। কাল আবার আসব আমরা। ঘটনার দিন রূপকুমারী কতোক্ষণ ছিল এখানে?"

মাথার চুলে হাত বুলতে লাগল বাবুরাও। মাত্র পাঁচদিন আগের ঘটনা। তবুও যেন স্মরণ করতে কষ্ট হচ্ছিল ওর।

"রূপকুমারী রাত আট-টা পর্যন্ত ছিলেন। কিন্তু খান্দুভাই চলে গিয়েছিলেন সন্ধ্যের আগে।"

"খান্দুভাই-এর কথা তোমায় জিজ্ঞেস করিনি।" প্রশান্ত লাহিড়ীর গলার স্বর গম্ভীর হ'য়ে গেল। দু' এক মিনিট বিরতির পর আবার তিনি প্রশ্ন করলেন, "রূপকুমারী ফিরে গেল কার সঙ্গে?"

"পাদ্রী সাহেবের সঙ্গে।"

ইনসপেক্টর দেশাই এবার সামনে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "কই, তোমার প্রথম জবানবন্দিতে এই কথাটার উল্লেখ নেই তো?"

"ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম—কি বলতে কি বলেছি মনে পড়ছে না। আমি তো লিখতে পড়তে জানি না......কি লিখছেন আপনারা কি ক'রে বলি......"

বিস্মিত বোধ করলেন ইনসপেক্টর দেশাই। প্রথম দিন খুবই সরল প্রকৃতির ব'লে মনে হয়েছিল। কথার মধ্যে বিন্দুমাত্র মারপ্যাঁচ ছিল না। আজ কিন্তু উল্টো ধারণা জন্মাল। বাবু রাওকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে ইনসপেক্টর দেশাই বললেন, "তুমি সেখানে বলেছ, খান্দুভাই-এর সঙ্গে রূপকুমারী সন্ধ্যের আগেই চ'লে গিয়েছিল।"

"বুড়ো হয়ে গিয়েছি, কালকের শোনা-কথা আজ মনে থাকে না।"

"বটে?" শাসিয়ে উঠলেন প্রশান্ত লাহিড়ী। "কোন্‌টা তা হ'লে সত্যি? ঠিক ক'রে বলো—তোমার কোনো ভয় নেই।"

"পাদ্রী সাহেবের সঙ্গেই গিয়েছিলেন রূপকুমারী।" জবাব দিতে দ্বিধা করল না বাবু রাও।

ইনসপেক্টর দেশাই বললেন যে, পুরো জবানবন্দির মধ্যে লোকটা একবারও পেড্রোর নাম উল্লেখ করেনি। ব্যাপারটা পরিষ্কারভাবে বুঝবার জন্য তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "পেড্রো এখানে এসেছিল তা তুমি আমায় বলোনি কেন, বাবু রাও?"

"এখানে তিনি আসেননি, রাস্তা থেকে গাড়িতে বসে হর্ণ বাজিয়েছিলেন। রূপকুমারী মাতাজীকে বললেন যে, পেড্রো এসেছে। আমি তখন বসবার ঘরেই ছিলাম। মাতাজীকে পান দোক্তা দিচ্ছিলাম।"

লোকটিকে আর সরল প্রকৃতির বলে মনে হল না আমাদের। ড্রইং-রুম থেকে এবার আমরা শোবার ঘরে এলুম। লাগালাগি ঘর নয়। মাঝখানে একটা করিডোর আছে। করিডোরের একধারে টেলিফোনটা নজরে পড়ল আমাদের। খুনের রাত্রে টেলিফোনের তারটা কাটা ছিল। এখন সেটা মেরামত করা হয়েছে।

শোবার ঘরটির প্রতিটি জিনিস পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা ক'রে দেখতে লাগলেন প্রশান্ত লাহিড়ী। স্নান ঘরেও ঢুকলেন তিনি। পেছন দিকের ছোট দরজাটা খুললেন। লোহার সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে আবার তিনি বাগানের চারদিকে দৃষ্টি ফেলতে লাগলেন। ডাক্তার যেমন মনোযোগ দিয়ে রোগীর রোগ নির্ণয়ের চেষ্টা করেন, প্রশান্তবাবুও তেমনি খুনের রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য গভীর মনোযোগ দিয়ে ঘরের ধূলিকণাটি পর্যন্ত পরীক্ষা ক'রে দেখছিলেন।

শোবার ঘরে ফিরে এসে পকেট থেকে ম্যাগনিফাইং গ্লাস বার করলেন তিনি। বিবর্ধক কাচ। এই কাচের মধ্য দিয়ে দ্রষ্টব্য পদার্থকে বড় দেখায়। হঠাৎ তিনি পুব দিকের দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেলেন। আমরা দেখলুম, দেয়ালের গায়ে রক্তের দাগ লেগে রয়েছে। কাদার মতো রং—কালচে বললেই ঠিক বলা হবে। চোখে কাচ লাগিয়ে প্রশান্ত লাহিড়ী বেশ খানিকক্ষণ দাগটা পরীক্ষা করলেন। ইনসপেক্টর দেশাইকে ডেকে বললেন, "বিছানা থেকে দেয়ালটার দূরত্ব কম নয়। লক্ষ্মীদেবী বিছানায় শুয়ে ছিলেন। আপনারা বলছেন, আততায়ীর সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয়নি। তা যদি সত্যি হয়, তবে এতদূর পর্যন্ত রক্ত এল কি করে? ফিনকি দিয়ে রক্ত

চোখে কাচ লাগিয়ে প্রশান্ত লাহিড়ী বেশ খানিকক্ষণ দাগটা পরীক্ষা করলেন

বেরুলেও দেয়ালের গায়ে ঠিক এই ধরণের দাগ পড়ত না। মিস্টার দেশাই, আমরা যদি আপাতত কল্পনা ক'রে নেই যে, আততায়ীর হাতটা কোনোক্রমে দেয়ালের সঙ্গে লেগে গিয়েছিল তা হ'লে কি ভুল হবে? দেয়ালের বেশ উঁচু দিকেই দাগটা রয়েছে। তা যদি হয় তবে লোকটি যে লম্বা সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। শুধু লম্বা নয়, আততায়ীর সঙ্গে ধস্তাধস্তি হ'য়েছিল বলেও ধরে নিতে পারি আমরা।"

তাঁর কথা শুনে বাবু রাও চোখ নিচু করল। ত্রাসের সঞ্চার হ'ল তার মনে। সে বেশ লম্বা মানুষ। বাবু রাও-এর দিকে ঘুরে প্রশান্ত লাহিড়ী জিজ্ঞাসা করলেন, "কলিং বেল যখন ছিল, তখন লক্ষ্মী-দেবী কি তোমায় ডাকেননি একবারও? সুইচটা তো দেখছি খাটের গায়ের সঙ্গে লাগানো রয়েছে। হাত বাড়ালেই সুইচ।"

"আজ্ঞে না, ডাকেননি। মেইন-সুইচটা বন্ধ ক'রে দিয়েছিল খুনী।"

"মেইন-সুইচটা কোথায়?"

"একতলায়।"

"সেখানে সে গেল কি ক'রে?"

"ঢোকবার পথ আছে।"

"খুবই জানাশোনা লোক—" প্রশান্ত লাহিড়ী পকেট থেকে একটা ছোট ছুরি বার করলেন। নোট বই থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে দেয়ালের গা থেকে রক্তের দাগটা খুঁড়তে লাগলেন। পুরো দাগটাই চেঁছে তুলে ফেললেন তিনি। তারপর মোড়কটা পকেটে রেখে দিয়ে বললেন, "চলুন, এবার যাওয়া যাক।"

বেরুবার মুখে প্রশান্তবাবু অন্য দিকে আর দৃষ্টি দিলেন না। মাথা নিচু ক'রে চিন্তা করতে করতে বেরিয়ে এলেন রাস্তায়। আমরা তাঁর পিছু পিছু হাঁটতে লাগলুম।

খানিকটা দূর এগিয়ে আসবার পর কে একটা লোক এসে ইনসপেক্টর দেশাইকে স্যালুট করল। আমরা তিন-জনেই দাঁড়িয়ে গেলুম। মিস্টার দেশাই জিজ্ঞাসা করলেন, "কি খবর? বাবু রাও-এর সঙ্গে কেউ দেখা-সাক্ষাৎ করতে এসেছিল কি?"

না, সার। তবে বাবু রাও সকালবেলা প্রত্যেক দিনই একবার বাইরে আসে। ঐ দোকান থেকে চাল ডাল কেনে—"

"প্রত্যেক দিনই চাল ডাল কেনে কেন? দোকানীর ওপর চোখ রেখো। হয়তো দোকানীটাই সংবাদ আদান-প্রদানের কাজ করে।"

"আচ্ছা, সার।"

ফেরবার মুখে প্রশান্তবাবু বললেন, "প্রদীপ রাহার সঙ্গে একবার দেখা করে গেলে ভাল হতো। আজ তো রবিবার, বাড়ি থাকা সম্ভব।"

প্রদীপ রাহা বাড়িতেই ছিলেন। ইনসপেক্টর দেশাই আর অপেক্ষা করলেন না। তিনি বললেন, "কাল তা হ'লে কোর্টে একবার আসছেন তো?"

"হ্যাঁ, ডাক্তার প্যাটেলকে একবার দেখতে চাই। কোর্ট থেকে বেরিয়ে আপনাকে নিয়ে একবার লেবরীটারিতে যাব।"

প্রদীপ রাহা আমাদের পরিচয় পেয়ে খুশী হলেন। প্রশান্তবাবু নিজের কথা গোপন করলেন না। পুলিশ বিভাগে চাকরি করেন তাও বললেন তিনি। লক্ষ্মীদেবীর খুনের মামলা সম্পর্কে তদন্ত করতে এসেছেন শুনে প্রদীপ-বাবু বললেন, "হ্যাঁ, অপরাধীকে খুঁজে বার করা খুবই দায়িত্বপূর্ণ কাজ। দেখুন চেষ্টা করে। আমাদের মালীক খান্দুভাইকে পুলিশ কেন গ্রেপ্তার করল বুঝতে পারছি না।"

"তাঁর কাছে আপনি কতদিন ধ'রে চাকরি করছেন?"

"বছর দশ হ'ল। প্রকাণ্ড ধনী লোক।" শেষের কথাটা যেন অবান্তর বলে মনে হল আমাদের। আমরা চুপ করে রইলুম। প্রদীপবাবু আবার বলতে লাগলেন, "তিন লক্ষ টাকা চুরির উদ্দেশ্যে যদি লক্ষ্মীদেবীকে খুন করে থাকে তা হ'লে খান্দুভাই যে নির্দোষ তেমন কথা আমি জোর ক'রেই বলতে পারি। তা ছাড়া খান্দুভাই হচ্ছেন গিয়ে স্ফূর্তিবাজ লোক—সুন্দরী স্ত্রীলোক-দের নিয়ে মজে থাকতেই ভালবাসেন। এই ধরণের লোকেরা পৃথিবীতে আসেন মজা লুটতে, খুন করতে নয়।"

"রূপকুমারীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা কি রকমের ছিল, মিস্টার রাহা? জিজ্ঞাসা করলেন ইনসপেক্টর লাহিড়ী।

"হ্যাঁ, প্রশ্নটা অপ্রাসঙ্গিক নয়। বাংলার মেয়ে তো. যত নিচেই নামুক, সহজে সে ইজ্জত হারাতে চায় না। আমার যতদূর ধারণা, রূপকুমারীকে খান্দুভাই নষ্ট করতে পারেননি।"

"এর কারণ কি? রূপকুমারীর পেছনে টাকা ঢালতে তো কার্পণ্য করেন নি খান্দুভাই। এখানে তাজমহল হোটেলে এসে ওঠে রূপকুমারী। খরচ দেন তিনি। তবে কেন রূপকুমারীকে পেলেন না খান্দুভাই?"

"ব্যাপারটা তা হ'লে আপনাদের খুলেই বলি—" জড়োসড়ো হয়ে বসলেন প্রদীপ রাহা। "গোড়া থেকেই তিনি পেড্রোকে ভয় করতেন। লোকে বলে, পেড্রো রূপকুমারীকে ভাড়া খাটাচ্ছে। কিন্তু আসল ব্যাপারটা তা নয়। টাকার দরকার নেই পেড্রোর। রূপকুমারীকে ভালবাসে সে। এমন ভালবাসার তুলনা নেই! মেয়েটা শুধু উড়তে চায়—টাকার খাঁই প্রচণ্ড। বিশ্ববিখ্যাত অভিনেত্রী হতে চেয়েছিল। কিন্তু—" থেমে গেলেন প্রদীপবাবু। ভেবেচিন্তে তারপর তিনিই বলতে লাগলেন, "কপালে না থাকলে কেউ কিছু হ'তে পারে না মশাই। বেশি নাম করে ফেললে হাতছাড়া হয়ে যাবে ভেবে আমাদের মালিক ওকে ঝুলিয়ে রাখলেন বোম্বে-কলকাতার মাঝখানে। পেড্রো গিয়ে কাকুতি-মিনতি করে : এ-লাইন ছেড়ে দাও, তুমি, মীনা। চলো, মালদা ফিরে যাই। নয়তো অন্য কোথাও গিয়ে নিরিবিলিতে ব'সে ঘর-সংসার করি। মেয়েটা রেগে ওঠে। ধমকে দেয় পেড্রোকে। বলে : আর এসো না তুমি আমার কাছে। প্রাদ্রীদা, তোমায় আমি ভালবাসি না। বুঝলেন মশাই, ছেলেটা তবু যাওয়া-আসা করে। অপমান ক'রে তাড়িয়ে দেয় ওকে। পেড্রো তবু আঠার মতো লেগে থাকতে চায়। একদিন তো মশাই দুজনে ঝগড়া করতে করতে ট্যাক্সি থেকে নেমে এল। আমি তো থ মেরে ব'সে রইলুম এই ঘরে। পেড্রো বললে : চলো, তোমার স্বামীর কাছে পৌঁছে দিয়ে আসি। খেঁকিয়ে উঠল রূপকুমারী : কেন যাব তাঁর কাছে? পেড্রো বলল : আমায় যখন আর ভাল-বাস না, তখন স্বামীর কাছেই তো ফিরে যাওয়া উচিত। মেয়েটা বলে : না যাব না। খান্দুভাই-এর কাছে থাকব। ফস্ করে পকেট থেকে একটা ছোরা বার করে বলে ওঠে পেড্রো : এটা দেখিয়েছি খান্দুভাইকে। দরকার হয় তোমাদের দুজনকে শেষ করে দিয়ে ফাঁসিতে লটকে যাব। বুঝলেন মশাই, আমি তো থর থর করে কাঁপতে লাগলাম। বললাম ওকে, 'হ্যাঁ রে পেড্রো, তুই না খৃষ্টান—তুই খুন করবি? ফেলে দে ছোরা।' মিষ্টি

হেসে জবাব দেয় সে, 'এই তো আমার যীশুখৃষ্ট রাহাবাবু।' এই রকমই ওদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি চলছিল। এমন সময় দুম ক'রে বিনা নোটিশে আকাশ থেকে বোমা ফেলে দিল খুনী। লক্ষ্মীদেবী খুন হ'য়ে গেলেন। ধরা পড়ল সবাই। আমার তো বিশ্বাস, খুনের সঙ্গে এ'রা কেউ জড়িত নেই। আমি আবার বলছি, টাকার জন্য পেড্রো কখনো কাউকে খুন করবে না।"

জিজ্ঞাসা করলুম আমি, "কেন করবে না?"

"ওর নিজের রোজগার ভাল। ক্রমশই আয় বাড়ছে।"

যুক্তিটা তাঁর মেনে না নিয়ে বললুম, "মালদা শহরের সবচেয়ে বড় গুন্ডা ছিল সে। তিন লাখ টাকার জন্য একটা বুড়ীকে পেড্রো অনায়াসেই খুন করে ফেলতে পারে। ভদ্র বংশের একটি মেয়েকে ভাগিয়ে আনতে পারল, আর একটা সামান্য স্ত্রীলোককে খুন করতে পারবে না? অতি সাংঘাতিক গুন্ডা—"

আমার যুক্তিও মনঃপূত হল না প্রদীপ রাহার। মাথা নেড়ে ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন তিনি, "পৃথিবীতে আজ গুন্ডার সংখ্যা কিছু কম নয়। প্রতি-দিনই বাড়ছে। কিন্তু প্রত্যেকটা গুন্ডাই খুনী নয়। বিরূপ সামাজিক অবস্থায় পড়ে অনেকেই গুন্ডামী করে। এই জন্য সামাজিক অবস্থাকে খানিকটা দায়ী করা চলে। যতদূর বুঝতে পেরেছি, পেড্রোর রক্তে খুনের নেশা নেই। অর্থের নেশাও প্রবল নয়।"

"কি রকম?" কৌতূহল জাগল আমার।

"প্রথম যখন পেড্রো আর মীনাক্ষী বোম্বে এল, তখন টাকার অভাব ছিল খুব। মীনাক্ষী তার গহনাগুলো বেচে ফেলবার জন্য পাগল হ'য়ে উঠল। দু' এক হাজার টাকার গহনা নয় মশাই, আজকের বাজারে অন্তত পনরো হাজার তো হবেই। পেড্রো বেচতে দিল না। বললে সে, 'তোমার বাবার দেওয়া গহনা বেচতে দেব না। কুলীর কাজ ক'রে তোমায় খাওয়াব।' বুঝলেন ভাস্করবাবু, একদিন দেখি গহনার পুঁটলিটা পেড্রো নিয়ে এসেছে আমার কাছে। আমার হাতে তুলে দিয়ে বললে সে, 'রাহাবাবু, এটা তোমার কাছে রেখে দাও। মীনা চাইলেও দেবে না। মন্মথবাবুর কত্তো কষ্টের টাকা!' সেই থেকে গহনাগুলো আমার কাছেই প'ড়ে রয়েছে।

মীনা অবিশ্যি কোনোদিনও চাইতে আসে নি। শুধু দিন সাতেক আগে খান্দুভাই একদিন আমায় বলেছিলেন, 'রূপকুমারীর গহনাগুলো শুনেছি আপনার কাছে আছে। কাল অফিসে আসবার সময় সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসবেন।'

"নিয়ে গিয়েছিলেন কি?" জিজ্ঞাসা করলেন প্রশান্ত লাহিড়ী।

"না। দু' দিন অফিস কামাই করলাম। খোঁজাখুঁজি ক'রে পেড্রোকেও ধরতে পারলাম না। তারপর তো একদিন খবরের কাগজ খুলে দেখি খান্দু-ভাইকেও গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।"

"তিনি গহনাগুলো কেন চেয়ে-ছিলেন?"

"বলতে পারি না। কোটিপতি লোক—"

"কোটিপতি লোকেরাও তো শুনেছি কখনো কখনো অল্প টাকার জন্য বিপদে পড়েন। বিশেষ ক'রে এ-লাইনের লোকদের তো হামেশাই টাকার দরকার।" প্রশান্ত লাহিড়ী কৌতূহলের দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন প্রদীপ রাহার দিকে। জবাব কিছু দিতে পারলেন না তিনি। উঠে পড়লেন সহসা। আমাদের উদ্দেশ ক'রে বললেন, "দেখুন চেষ্টা ক'রে। ব্যবসা-বাণিজ্যের রাজত্বে গর্তের অভাব নেই। ব্যাঙের সন্ধান করতে গিয়ে সাপের খোঁজ পাওয়া যায়। নমস্কার।"

অস্বস্তির হাসি ফুটে উঠল প্রদীপ রাহার মুখে।

॥ সাত ॥

পরের দিন জামীনে মুক্তি পেলেন ডাক্তার প্যাটেল, খান্দুভাই আর পেড্রো। মীনাক্ষীর জন্যও জামীনের আবেদন করেছিলেন ব্যারিস্টার ভগত। আপত্তি তুললেন সরকারী পক্ষের উকিল। আরও পনরো দিনের সময় চাইলেন এ'রা। ম্যাজিস্ট্রেট শুনানীর দিন ধার্য করলেন পনরো দিন পরে। এবং সেই সঙ্গে তিনি এ'দের সতর্ক ক'রে ব'লে দিলেন যে, ঐ তারিখে পুরো রিপোর্ট তাঁর কাছে পেশ করা চাই।

আমরাও গিয়েছিলাম আদালতে। দর্শকদের ভিড় হয়েছিল খুব। ম্যাজি-স্ট্রেটের ঘরে আর তিল ধারণের জায়গা ছিল না। দর্শকদের মধ্যে সবাই দেখলুম রূপকুমারীর প্রতি সহানুভূতিশীল। তাকে জামীন দেওয়া হ'ল না ব'লে ম্যাজিস্ট্রেটের ওপর ক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠল এরা। বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করতেও দ্বিধা করল না। আমিও ভিড়ের মধ্যে ছিলুম। ইনসপেক্টর লাহিড়ী বসেছিলেন অন্য জায়গায়। আদালত উঠে যাওয়ার পর আমি আর তাঁকে দেখতে পাই নি।

কাঠগড়াটা দেখতে খাঁচার মতো। দু'খানা বেঞ্চ পাতা ছিল। একটাতে বসেছিল মীনাক্ষী। অন্যটায় ও'রা তিন-জন। কারো মুখেই লজ্জা ভয় কিংবা দুঃখের চিহ্ন নেই। প্রত্যেকেরই ধারণা, পুলিশ ভুল ক'রে এ'দের ধ'রে নিয়ে এসেছে। আসল খুনী নিরাপদে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাইরে বাইরে।

কিন্তু পেড্রোই শুধু ভয় পেয়েছে দেখলুম। পাঁচ ছ'দিনের মধ্যে শুকিয়ে যেন অর্ধেক হ'য়ে গিয়েছে। দাড়ি কামায় নি। মাথার চুল উসকোখুসকো। ওকে দেখবার জন্য শহরের একশ্রেণীর লোক ভিড় জমিয়েছে আদালত ঘরে। পেড্রো এদের কাছে একজন মস্তবড় হিরো। আলাপ-আলোচনা থেকে বুঝলুম, পেড্রোকে এরা 'ক্যাপটেন পেড্রো' ব'লে ডাকে। সমস্তটা সময় সে মুখ নিচু ক'রে রেখেছিল। বোম্বের একজন বিখ্যাত ব্যারিস্টার মিস্টার অ্যাডেরী যখন ওর হ'য়ে জামীনের আবেদন করছিলেন তখনও সে একবারের জন্যও মুখ তুলে চেয়ে দেখে নি। ও যাতে আমাকে দেখতে পায় তার জন্য বার দুই চেষ্টা করে-ছিলুম আমি, কিন্তু চেষ্টা আমার ব্যর্থ হ'ল।

মীনাক্ষী আমায় দেখেছে। বিন্দুমাত্র লজ্জা পেল ব'লে মনে হ'ল না আমার। সারা মুখে ঔদ্ধত্যের ছাপ। যেন কাঠ-গড়ায় ব'সে মীনাক্ষী বিশ্ববিখ্যাত হওয়ার গৌরব বোধ করছে। গতকাল চিঠি লিখেছি পরেশবাবুকে। তিনি কৃষ্ণনগর সরকারী ইস্কুলে বদলি হ'য়ে গিয়েছেন। একটা কথাও গোপন করি নি। সে যে মালদা থেকে পেড্রোর সঙ্গে পালিয়ে এসেছিল তাও জানিয়েছি তাঁকে। পরেশবাবুর সন্দেহ যে অমূলক সেই কথাটাই প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছি বার বার। মীনাক্ষী কি ক'রে রূপকুমারী হ'ল তার একটা তথ্যমূলক ধারাবাহিক ইতিহাস লিখেছি তাঁর কাছে।

মন্মথবাবু এতদিন নিশ্চয়ই মালদা ফিরে গিয়েছেন। গতকাল তাঁকেও চিঠি লিখেছি। পরেশবাবুর কাছে লেখা চিঠি

খানার কার্বন কপির মতো। প্রায় একই রকমের চিঠি।

ব্যারিস্টার ভগতের আবেদন নামঞ্জুর হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব উঠে পড়লেন। পাশের দরজা দিয়ে চ'লে গেলেন খাসকামরায়। মীনাক্ষীকে নিয়ে দু'জন সেপাই বেরিয়ে এল বারান্দায়। আমিও পেছনে পেছনে ছুটে গেলুম ওর। কিন্তু কাছে ঘেঁষতে পারলুম না। জনতাকে রুখে রাখবার জন্য একাধিক পুলিশের লোক মোতায়েন ছিল বারান্দায়। দূরে দাঁড়িয়ে আমি দেখলুম, একটা কালো রং-এর আবদ্ধ গাড়িতে গিয়ে উঠে পড়ল রূপকুমারী।

ডাক্তার প্যাটেল চ'লে গেলেন ট্যাক্সি চেপে। খান্দুভাই-এর নিজের গাড়িটা অপেক্ষা করছিল কোর্টরুমের সামনে। বহু ধনী লোক এসেছেন তাঁকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সবাই এসে তাঁর সঙ্গে করমর্দন করছিলেন। দৃশ্য দেখে মনে হচ্ছিল আমার, খান্দুভাই বুঝি মুক্তি পেয়ে গিয়েছেন। তিনি যে জামীনে খালাস পেলেন সেকথা বুঝি ভুলে গিয়েছে সবাই।

মনে মনে রাগ হ'ল প্রশান্ত লাহিড়ীর ওপর। খুনীর সঙ্গে দেখা নেই, অথচ রূপকুমারীকে ধ'রে রাখলেন তিনি! ডাক্তার প্যাটেল, খান্দুভাই আর পেড্রোকে জামীনে খালাস ক'রে দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছিলেন। ব্যস্ততার মাত্রা আমার চোখে খুব বেশি ব'লে মনে হয়েছিল। তাঁর এই ব্যস্ততার মূলে হয়তো কারণ একটা আছে। কিন্তু তাই ব'লে মীনাক্ষীকে ক'টা দিনের জন্য ছেড়ে দিলে তদন্তের মহাভারত তাঁর অশুদ্ধ হ'য়ে যেত কি? ডিটেকটিভ লাহিড়ীর কি যে মনোবাঞ্ছা বুঝতে পারলুম না।

পেড্রোর পেছনে পেছনে জনতা বেরিয়ে এল। বাইরে এসে জনতা চিৎকার ক'রে উঠল, "ক্যাপটেন পেড্রো জিন্দাবাদ!" দু' হাত দিয়ে মুখ ঢাকল সে। চারজন আসামীর মধ্যে ওর কেন সবচেয়ে বেশি লজ্জা বোধ হচ্ছে তার অর্থ আমি বুঝতে পারলুম না। প্রকৃতপক্ষে পেড্রো হচ্ছে কাণকাটা সেপাই। লজ্জা-শরমের বালাই ওর থাকবার কথা নয়। অথচ লজ্জার বোঝা মাথায় নিয়ে কোর্ট-রুমের বাইরে এসে দাঁড়াল সে। জনতার প্রীতি-সম্ভাষণে কৃতার্থ বোধ করল না একটুও।

ফিল্ম কোম্পানীর মালীক করীমভয় ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন সামনে। বললেন, "আপনার গাড়ি নিশ্চয়ই গ্যারেজে বন্ধ আছে। চলুন আমার গাড়িতে। পৌঁছে দিয়ে আসি।"

জনতার মধ্যে থেকে চার পাঁচজন ট্যাক্সিওয়ালা একসঙ্গে ব'লে উঠল, "ক্যাপটেন সাহাব, মেরা ট্যাক্সিমে তস্রিফ লাইয়ে—"

ভড়কে গেলাম! বলে কি, এরা সবাই পেড্রোর পা-এর ধুলো ভিক্ষা করছে! আমি আর আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলুম না। আমি যে ক্যাপটেন সাহেবকে চিনি সেটা প্রমাণ করতে না পারলে যেন ট্যাক্সিওয়ালাদের চেয়েও ছোট হ'য়ে যাচ্ছিলুম। ভিড়ের মধ্যে দিয়ে পথ কেটে চ'লে এলুম ওর সামনে। ফাইটিং ছবির হিরোর ঘাড়ের ওপর হাত রেখে বললুম, "চল্, আমার হোটেলে চল্ পেড্রো।"

চমকে উঠল পেড্রো। আমার দিকে মুখ তুলে বলল, "এ কি ভাস্করদা যে! তুমি বোম্বে পর্যন্ত পৌঁছে গেছ?"

"কি করি বল্—সারা দেশ জুড়ে তোরা যা কাণ্ড ক'রে বেড়াচ্ছিস! না এসে পারলুম না। খুশী হয়েছি রে পেড্রো। তোর একটা মোটরগাড়ি আছে শুনলুম। না কিনলেও পারতিস। ট্যাক্সিওয়ালারা সবাই তোর গুণগ্রাহী—ফ্যান। বিনে ভাড়ায় তোকে ওরা ট্যাক্সিতে তুলতে পারলেও নিজেদের ভাগ্যবান মনে করবে। এদিকে মীনাক্ষী তো দেখছি ভারত-বিখ্যাত অভিনেত্রী হ'য়ে বসেছে। জামীন পর্যন্ত পেলে না। কোথায় চললি?"

"চলো ভাস্করদা, আমার বাড়ি চলো।"

"ও, তোর একটা বাড়িও আছে দেখছি! হ্যাঁ, গাড়ি যখন আছে তখন বাড়িও একটা থাকবে। কতো টাকায় কিনেছিস রে?"

"ভাড়ার ফ্ল্যাট। তাও ভাড়া আমি দিই না, দেয় ফিল্ম কোম্পানী।

ভাস্করদা, যাবে আমার ওখানে?"

"হ্যাঁ, চল্ যাই—দেখে আসি। খুনের মোকদ্দমায় আমি আবার তোর মতো জড়িয়ে না পড়ি।"

করীমভয়-এর গাড়িতে উঠে বসলুম আমরা। আশে পাশে কোথাও প্রশান্ত লাহিড়ীকে দেখতে পেলুম না। এমন কি ইনসপেক্টর দেশাই পর্যন্ত নেই। আবার আমার রাগ হ'ল প্রশান্তবাবুর ওপর। এখানকার পুলিশকেও বোধ হয় ভুল বোঝাচ্ছেন তিনি। পেড্রোর ওপর যে চোখ রাখা প্রয়োজন তা তিনি মনে মনে স্বীকার করছেন না। ছোক্‌রাটা যে কী ভীষণ প্রকৃতির গুণ্ডা তা কি ইনসপেক্টর লাহিড়ী এখনো বুঝতে পারেন নি? কি যে তিনি করছেন একমাত্র ভগবান জানেন। কাল তো লক্ষ্মী দেবীর শোবার ঘরে গিয়ে দেয়াল চেঁছে খানিকটা আস্তর নিয়ে এলেন। সারা ঘরে আরও কতো জায়গায় বাসি রক্তের দাগ ছিল। কিন্তু হঠাৎ তিনি দেয়ালটা চাঁছতে গেলেন কেন? প্রশান্ত লাহিড়ী সি-আই-ডি, কিন্তু বাঙালী। হয়তো নিজের মনে মনে সুন্দর একটা গল্প তৈরি করছেন। শেষ পর্যন্ত গল্পটা হয়তো সুন্দরই হবে, কিন্তু সত্যিকার খুনীটা ধরা পড়বে না। নীরবে, নিভৃতে তিন লাখ টাকা ভোগ ক'রে যাবে সে। উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে কলকাতা ফিরে যাবেন প্রশান্ত লাহিড়ী। চাকরির উন্নতিও হবে তাঁর। মীনাক্ষী জেল খাটবে। কালক্রমে ক্যাপটেন পেড্রো আরও বড় হবে—জেনারেল পেড্রো সেজে ভারতবর্ষের বুকের ওপর দিয়ে সদর্পে হেঁটে বেড়াবে সে। প্রশান্ত লাহিড়ীর তদন্তের নমুনা দেখে নিরাশ হ'য়ে পড়লুম আমি। আমি জানতুম, মনে অশান্তি নিয়ে তিনি খুনীর সন্ধান করতে বোম্বে এসেছেন। আসবার আগের দিন ছোট মেয়েটা তাঁর অসুখে পড়ল। একশো দু' ডিগ্রী জ্বর দেখে এসেছেন। বোধ হয় সেই কারণে চিন্তাধারা তাঁর জট পাকিয়ে গিয়েছে! লক্ষ্মী দেবীর খুনের ব্যাপারে যে পেড্রোর হাত আছে সে সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

কিন্তু বাবুরাও লোকটাও তো নির্ভরযোগ্য নয়। গতকাল সে একটা ডাহা মিথ্যে কথা বলেছে। খুনের দিন পেড্রো এসে রূপকুমারীকে লক্ষ্মী দেবীর বাড়ি থেকে নিয়ে গিয়েছিল ব'লে বিবৃতি দিল! সেদিন পেড্রো যে বোম্বে ছিল না তার সাক্ষী তো আমরাই। অবিশ্যি বাবুরাও বলেনি যে, পেড্রোকে সে দেখেছে। গাড়িতে ব'সে হর্ণ বাজিয়েছিল। পেড্রোর গাড়ির হর্ণ-টা ওর চেনা থাকাই উচিত। এখন তা হ'লে প্রশ্ন উঠছে : পেড্রোর গাড়িটা কে নিয়ে এসেছিল লক্ষ্মী দেবীর বাড়ির সামনে? এর জবাব একমাত্র রূপ-কুমারীই দিতে পারে। পেড্রো বোকা লোক নয়। নিজে হাতে সে খুন করবে না। হয়তো অন্য কাউকে খুন করবার জন্য নিয়োগ করেছিল পেড্রো। ঐ দিন

কলকাতা থাকার অর্থই হচ্ছে অ্যালিবাই প্রমাণ করা।

করীমভয়-এর গাড়িটা এসে পৌঁছল একটা অতি সুন্দর রাস্তায়। বড়লোকদের পাড়া ব'লে নিঃসন্দেহ হলুম আমি। এটাই হচ্ছে বোম্বের বিখ্যাত মালাবার হিলস্। কোটিপতিদের বাড়িঘর সব এইখানে। পেড্রোর ফ্ল্যাট কি তবে এই মালাবার হিলস্-এ? করীমভয়-কে প্রশ্নটা করলুম আমি। তিনি বললেন যে, পেড্রো সাহেবের জন্য অতি কষ্টে এখানে একটা ফ্ল্যাট জোগাড় ক'রে দিতে হয়েছে। বিস্ময়ের চাপে বিমূঢ়ের মতো নির্বাক হ'য়ে গেলুম আমি! পেড্রো থাকে মালাবার হিলস্-এ! মালদা শহরে তো ওর মাথার ওপর ছাদ ছিল না। অন্য লোকের রকে শুয়ে ঘুমত। নিজের বাড়ি ব'লে কোনো ঠিকানা ছিল না। ওর নিজের মুখেই শোনা গল্প। পেড্রোর এক মেশোমশাই ছিলেন চক্রধরপুরে। তাঁর নাম ছিল রবার্ট পুরেকায়েস্থ। ট্রেনের ইঞ্জিন চালক ছিলেন। পেড্রোকে না কি মাঝে মাঝে পোস্টকার্ড লিখতেন। ঠিকানা দিতেন: কেয়ার অব ভুবন চ্যাটার্জির রোয়াক। মালদা শহরের নামী লোক ছিলেন ভুবনবাবু। তাঁর বাড়ির ফটকের বাইরে দু' দিকে দুটো মঞ্চের মতো রোয়াক ছিল। দিনের বেলা শহরের ছেলেরা ওখানে ব'সে আড্ডা মারত। আড্ডার সর্দার ছিল পেড্রো। পিওনদের মধ্যে অনেকেই ছিল ওর বন্ধু। অতএব রোয়াকের ঠিকানায় লেখা পোস্টকার্ড পেড্রোর হাতে পৌঁছে যেত যথাসময়ে।

গাড়িবারান্দার তলায় এসে মোটরটা থেমে গেল। বিমূঢ়ের মতো গদির গায়ে হেলান দিয়ে ব'সে আছি দেখে পেড্রো বলল, "নেমে এসো, ভাস্করদা। এই বাড়িটাতেই আমার ফ্ল্যাট।"

স্বপ্নের ঘোর ঘনতর হচ্ছে। নেমে পড়লুম গাড়ি থেকে। করীমভয় পেড্রোকে বললেন, "দুটো দিন বিশ্রাম করুন। বুধবার থেকে শুটিং আরম্ভ হবে। এটা কোন্ বই-এর শুটিং, আপনি জানেন তো?"

"না—ভুলে গিয়েছি।"

"বাগদাদ কা খুনী।" হাসতে হাসতে আনন্দের ঢেউ তুলে করীমভয় গাড়িতে গিয়ে উঠে বসলেন। বাগদাদের খুনী হাজত থেকে ফিরে এসেছে। বুধবার থেকে শুটিং আরম্ভ হবে। লক্ষ্মী দেবীর খুনীটিকে খুঁজে পাওয়ার আগে বইটা তিনি শেষ ক'রে ফেলতে পারবেন।

লিফ্‌টে চেপে চারতলায় উঠে এলুম আমরা। আঠারো নম্বর ফ্ল্যাটের সামনে এসে বেল্ টিপল পেড্রো। জিজ্ঞাসা করলুম, "ঘরে আবার কাকে রেখে গিয়েছিলি রে? সুন্দরী আয়াটায়া না কি?"

"আমার রান্নার লোক একজন আছে। হোসেন। সব কাজই করে সে।" পেড্রোর গাম্ভীর্য এখনো অটুট রয়েছে।

ঘরে ঢুকে আরও বেশি স্তম্ভিত হ'য়ে গেলুম। ঘরগুলো যে শুধু চলতি নিয়মে সাজানো-গুছনো তা নয়, রুচি-সম্মতও বটে। মেয়েদের স্পর্শ আছে ব'লে মনে হ'ল আমার। মীনাক্ষী যে এখানে আসত তাতে আর সন্দেহ নেই। হয়তো সে এসে পেড্রোর ঘর-দোর সব সাজিয়ে দিয়ে গিয়েছে।

পেড্রো বলল, "ভাস্করদা, এটা তোমার নিজের বাড়ি ব'লে মনে ক'রো। তুমি ব'সো। আমি চট ক'রে স্নানটা সেরে আসছি। ক'দিন তো চানটান কিছু হয় নি। হোসেন—"

"জী—" দরজার ও-পাশ থেকে বেরিয়ে এল হোসেন।

"খাবার কিছু আছে তো?"

"জী। সব তৈয়ার হ্যায়।"

"কি ক'রে জানলি আমি আসব?"

"সুবামে করীম সাব বোলে থে।"

মালদা শহরের পেড্রো গুণ্ডা স্নান-ঘরে গিয়ে ঢুকে পড়ল। বিস্ময়ের ঘোর আমার কেটে গিয়েছে। স্বপ্নের ফ্ল্যাট এটা নয়। ক্যাপটেন পেড্রোর বাসস্থান এটা। ফ্ল্যাটে তিনখানা ঘর। একটা বসবার, একটা খাবার, অন্যটা শোবার। ইংরেজী 'এল' অক্ষরের মতো নক্‌শা। প্রথম দুটো ঘর পাশাপাশি, এক লাইনে। শোবার ঘরটার অবস্থান দ্বিতীয় লাইনে। কোণাটা পার হ'য়ে এলে ছোট্ট একটা করিডোর চোখে পড়ে। তারপর বাবুর্চি-খানা। মাঝখানে দরজা আছে। বন্ধ ক'রে দিলে বাবুর্চিখানাটা ঐ তিনখানা ঘর থেকে আলাদা হ'য়ে যায়। বন্দোবস্তটা আমার কাছে ভাল লাগল খুব। আমিও তো মফস্বলের লোক। ভাল জিনিস দেখবার সুযোগ এই তো আমার প্রথম।

ঘুরে ঘুরে ঘরগুলো দেখতে লাগলুম আমি। শোবার ঘরে দেখলুম একখানা খাট, একজনের শোয়ার মতন। দু'জনের ব্যবস্থা রাখে নি পেড্রো। ছোঁড়াটার চরিত্র ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না আমার। এই সব ফ্ল্যাটগুলো তো সমাজ-সংসারের বাইরে। নীতি-দুর্নীতির বিতর্ক এখানে নেই। ফ্ল্যাটের অভিধানে ঐ দুটো কথার অস্তিত্ব পর্যন্ত থাকার কথা নয়। অথচ পেড্রোর শয়ন-কামরায় ঢুকে মনে হ'ল, কোনো একটা পবিত্র পীঠস্থানে প্রবেশ করলুম বুঝি কোনো জিনিসেই উচ্ছৃঙ্খলতার তিলমাত্র চিহ্ন নেই। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—ঝক্-ঝক্ করছে সব। দেয়ালের গায়ে দুটো ফোটো রয়েছে। একটা ওর ঠাকুরদার। অন্যটা বাবা-মায়ের। বিলেতী সিনেমার লাস্য-ময়ী অভিনেত্রীদের ছবি একটাও নেই! এমন কি মীনাক্ষীর ছবিও দেখতে পেলুম না আমি।

পশ্চিম দিকের জানলাটা খুলে দিলুম। সমুদ্র দেখা যায় এখান থেকে। কী সুন্দর দৃশ্য! ঝির ঝির ক'রে হাওয়া ঢুকতে লাগল জানলা দিয়ে। এ হাওয়ার বুকে ধুলোকালি নেই। শয়নকামরায় ওর যদি ক্লেদের চিহ্ন থাকত তা হ'লে হাওয়ার পুণ্যে পরিষ্কার হ'য়ে যেত তা। পেড্রোর ঘরটাকে পৃথিবীর নবতম আশ্চর্য ব'লে ধারণা জন্মাল আমার। কোথায় ভুবন চাটুজ্যের রক, আর কোথায় এই মালাবার পাহাড়ের ফ্ল্যাট! আমার মনের হিসেবে ভুল বেরুতে লাগল। এমন ঘরে যে বাস করে সে কেন যাবে খুন করতে? পেড্রোর পক্ষে তিন লাখ টাকা রোজগার করাও অসম্ভব নয়।

মিনিট পনরো পর স্নানঘর থেকে বেরিয়ে এল পেড্রো। জিজ্ঞাসা করলুম, "দাড়ি কামিয়ে এলি না কেন?"

"ওটা এখন রাখব ভাস্করদা।"

"কেন রে?"

"ওটা শোকের চিহ্ন। যতদিন না লক্ষ্মী দেবীর খুনীটা ধরা পড়ে ততদিন আমি আর দাড়ি কামাব না।"

"তার মানে, তুই বলতে চাস, খুনের ব্যাপারে তোর হাত একেবারে সাফ?"

"হ্যাঁ।"

"পরের বউকে ভাগিয়ে আনতে পারলি, আর একটা বিধবা স্ত্রীলোককে খুন করতে পারবি না কেন?"

"পরের বউকে আমি ভাগিয়ে আনি নি। পরের বউটি ভাগিয়ে এনেছে আমায়। ভাস্করদা চলো, খাবার টেবিলে ব'সে গল্প করি।"

"ও, হ্যাঁ চল্—আজকাল তো তুই টেবিলে ব'সে ভাত খাস—"

"তোমাদের কাণ্ড দেখে ভাবছি, মাজদা শহরে ফিরে যাব আবার। ভুবন চাটুজ্যের রকে শুয়ে ঘুমব। ভাত খাব পাইস-হোটেলের কলাপাতায়।"

"কেন, কেন একথা বলছিস?"

"আমার উন্নতি তোমরা কেউ সহ্য করতে পারছ না, ভাস্কর দা।"

খাবার টেবিলে এসে বসলুম আমরা। যে-হোটেলে উঠেছিলুম আমরা তার চেয়ে ব্যবস্থা অনেক ভাল। চেয়ারে বসলেই খিদে বেড়ে যায়। খাওয়ার প্রতি একটা অদ্ভুত ধরনের সম্ভ্রম জন্মায়। মাজদা শহরে আমরা তো রান্নাঘরে পিঁড়ি পেতে খেতে বসি। হাপুস-হুপুস ক'রে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে উঠে যেতে পারলে যেন বেঁচে যাই। সেখানে খাওয়াটা হচ্ছে কর্তব্যের বোঝা—এখানে আনন্দ।

পেড্রো বলল, "তুমিও কিছু খাও, ভাস্করদা।"

"না রে। হোটেল থেকে আমি খেয়ে বেরিয়েছি।"

"সে তো সকালবেলা। হজম হ'য়ে গিয়েছে। এখন ক'টা বেজেছে জানো? দুটো। সকালে আমি সাধারণত ভাত খাই না। ভাত খেলে ঘুম পায়। স্টুডিওতে গিয়ে কাজ করতে ইচ্ছে করে না।

হোসেন—" হাঁক দিল পেড্রো।

"জী—" আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল হোসেন।

"সাহেবও খাবেন।"

পেড্রোর সঙ্গে সঙ্গে আমিও খেতে লাগলুম। মাছ, মাংস আর শবজী। ভাত নেই। পাউরুটি আর পরোটা ছিল টেবিলে। চমৎকার রান্না করে হোসেন। মনোযোগ দিয়ে খাচ্ছিলুম। হঠাৎ সামনের দিকে চেয়ে দেখি খাওয়া শেষ ক'রে পেড্রো সিগারেট ধরালো। জিজ্ঞাসা করলুম, "ওকি রে, পাঁচ মিনিটের মধ্যে খাওয়া শেষ হ'য়ে গেল? অতো কম খেলে বাঁচবি কেমন ক'রে? তা ছাড়া তুই হচ্ছিস গিয়ে ফিল্ম-জগতের ক্যাপটেন পেড্রো। স্বাস্থ্যই হচ্ছে তোর মূলধন। খা—মাংসটুকু খেয়ে নে।"

"না ভাস্করদা, আর খাব না আমি।" একটু হেসে পেড্রোই আবার বলল, "বেশি খেলে তুমি হয়তো বলবে, এতোদিন খেতে পাস নি কিনা, তাই রাক্ষসের মতো খাচ্ছিস এখন। সত্যি কথা বলতে কি, তুমি তো জানো, ভাস্করদা, বাবার মৃত্যুর পর বহুদিন পেট ভ'রে খেতে পাই নি। খিদে বাড়ে ব'লে ব্যায়ামচর্চাও ছেড়ে দিয়েছিলাম। কী সাংঘাতিক দিন গিয়েছে আমার! লেখাপড়া শিখতে পারলাম না, তাও তো টাকার অভাবের জন্যই। মালদায় ধনীলোকের সংখ্যা তো কম নয়—এমন কি ভুবনবাবুর কাছে গিয়েছিলাম টাকার সাহায্য চাইতে। ক্লাস সেভেনে পড়ছি তখন। ইস্কুলের মাইনে বাকী পড়েছে। ভুবনবাবু বললেন, 'তুই তো খৃস্টীয়ান, তোর নিজের সমাজের কাছে হাত পাত গে যা।' ভাস্করদা, জীবনে আমি দু'বার কেঁদেছি। একবার যখন ক্লাস সেভেন থেকে বই আর খাতা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলাম—অন্যবার, যেদিন ব্যায়ামচর্চা ছেড়ে দিলাম। সে কি কান্না আমার। অতো বড় একটা জোয়ান ছেলে ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদছে দেখে পাইস হোটেলের মালীক গদাই শিকদার হাসতে হাসতে লুটোপুটি খেতে লাগলেন। হাসি থামবার পর বললেন, 'নেকাপড়ার মুখে ঝেঁটা! কাল থেকে এখানে বাসন-কোসন ধুয়ে দিস, দু' বেলা পেট ভ'রে খেতে দেব।' তাই করতে লাগলাম, ভাস্করদা। কিন্তু দুপুরবেলা খাওয়ার সময় একদিন বললেন, 'করছিস কি পাদ্রী? মাছ খাচ্ছিস কেন? তিনটের লগ্নে যদি খদ্দের এসে যায়?' ঝপ ক'রে সত্যিসত্যি থালার ওপর থেকে মাছের টুকরোটা তুলে নিয়ে গেলেন গদাই শিকদার। বাসন মাজার কাজও ছেড়ে দিতে হ'ল। মাঝখানের ইতিহাসটুকু তো তুমি স্বচক্ষেই দেখেছ। যেটুকু তুমি দেখ নি সেটুকু বলছি এখন। চলো বসবার ঘরে গিয়ে বসি। টেবিলটা সাফ ক'রে ফেলুক হোসেন। এক পেয়ালা কফি খাবে, ভাস্করদা?"

"কফি? সে কি জিনিস রে? কোনো দিন তো খাই নি। নেশা-টেশা হবে না তো?"

"হ'লই বা নেশা, পুরুষমানুষ একটু নেশা করলে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। হোসেন, কফি নিয়ে আয়।"

বসবার ঘরে এসে বসলুম আমরা। পশ্চিমদিকের জানলাটা খুলে দিল পেড্রো। এখান থেকেও সমুদ্রের জল দেখা যায়। পেড্রোর প্রতি ঈর্ষায় আমি জ্বলে-পুড়ে মরতে লাগলুম। কী সুখেই না গুণ্ডাটা বাস করছে মালাবার পাহাড়ে!

ঘুরে দাঁড়িয়ে পেড্রো বলল, এই সব আসবাবপত্র আমার নয়। করীম সাহেব দিয়েছেন। গোড়া থেকেই তিনি আমায় সাহায্য করছেন। তাঁর দয়াতেই রুজি-রোজগার হচ্ছে আমার। প্রথম ছবিটায় পুরো টাকাই লোকসান দিয়েছিলেন। তবু তিনি নিরাশ হন নি। এখন অবিশ্যি বহু টাকা লাভ করছেন। নেমকহারামী করি নি। অন্য কোম্পানী বেশি টাকা দিতে চায়। যাই নি তাদের কাছে। যাক। একদিন হঠাৎ মীনাক্ষীর সঙ্গে পরিচয় হ'ল আমার। মেয়েটার এমন চেহারা যে প্রথম দৃষ্টিতেই প্রেমে পড়লাম। কাছে যেতুম না ওর, যদি না সে ডেকে পাঠায়।"

"তোকে ডাকতে যাবে কেন মীনাক্ষী?" প্রতিবাদ ক'রে উঠলাম আমি।

"মীনাক্ষীও আমায় ভালবাসত কি না, তাই।"

"গাঁজা! মায়ের কাছে মাসীর খবর বলতে আসিস নে, পেড্রো। ভাবছিস, আমি বুঝি মারোয়াড়ীদের গদিতে ব'সে ওদের হিসেব দেখতুম শুধু? মীনার ওপর আমি সর্বক্ষণই চোখ রাখতুম। কই কোনোদিন তো দু'জনকে তোদের একসঙ্গে দেখি নি?"

"সে তোমার দোষ, ভাস্করদা। মীনাক্ষীর বুদ্ধির কাছে হেরে গিয়েছিলে তুমি। মীনার প্রতি যে তুমি আকৃষ্ট তা সে টের পেয়েছিল। তোমার নজর এড়াবার জন্য কতো দিন সে আমায় নিয়ে গিয়েছে তোমারই বাড়ির পেছন দিকে—আমবাগানটায়। মীনা বলত, 'এখানে ভাস্করদার দৃষ্টি পেঁৗছবে না।' তুমি যে ওকে তোমার বাড়ি যেতে বলেছিলে তাও আমি জানি।"

পেড্রোর কাছে খুবই ছোট হ'য়ে গেলুম। হ্যাঁ, কথাটা মিথ্যে নয়। মীনাক্ষী না বললে এই খবরটা পেড্রো কিছুতেই জানতে পারত না। ধরা পড়লুম ব'লে ওর প্রতি মনোভাব আমার বদলাতে লাগল। সহানুভূতি প্রকাশের আকাঙ্ক্ষাও হ'ল। মীনাক্ষীকে দেখেছি অনেকবার, কথাও বলেছি ওর সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কিন্তু ওর চাতুর্য সম্বন্ধে আমার কোনো জ্ঞান ছিল না। আসল কথা, মীনাক্ষীর চরিত্রের কিংবা মনের খবর আমি রাখতুম না। শুধু জানতুম, অভিনেত্রী হ'তে চায় সে।

বিলেতী সিগারেটের টিন বার ক'রে আমার দিকে এগিয়ে ধরল পেড্রো।

স্মৃতি মন্থনে মোহাচ্ছন্ন হ'য়ে আছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, অন্যমনস্ক। সিগারেটের টিনটা আমার নাকের ডগা পর্যন্ত তুলে ধরল সে। বললুম, "বড্ড বেশি চিন্তা করছিস। তারপর কি হল বল।"

"বুদ্ধির খেলায় আমিও হেরে গেলাম, ভাস্করদা। মীনাক্ষীর সংস্পর্শে এসে আমার মন থেকে অসৎ বুদ্ধি সব ক্রমে ক্রমে লোপ পেতে লাগল। আমি যে লেখাপড়া শিখি নি তার জন্য অনুতাপের আর অন্ত রইল না। পুরনো, ছেঁড়া ক্লাস সেভেনের বইগুলো খুঁজে বার করলাম একদিন। তোমারই বাগানে ব'সে বললাম ওকে, 'আমি আবার লেখাপড়া করতে চাই। তোমার যোগ্য হ'তে চাই, মীনা।' আমার ঘাড়ে হাত রেখে বলল সে, 'বি-এ, এম-এ পাশ লোকগুলোকে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। পাদ্রীদা, তুমি যেমন আছ তেমনি থাক। তোমার মতো জোয়ান পুরুষ তো মালদা শহরে দ্বিতীয় কেউ নেই। তুমি যখন আমায় এক হাত দিয়ে হাল্কা বেলুনের মতো শূন্যে তুলে ফেল তখন আমার মনে হয়, তোমার মতো যোগ্য পাত্র এই শহরে আর কে আছে? বিয়ে করা কিসের জন্য, পাদ্রীদা? তোমাদের ঐ এম-এ পাশ প্যাকাটি বাবুকে আমি দেখেছি। যেমন রোগা, তেমন বেঁটে। একটু অপেক্ষা করো বাবাকে আমি শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব। আমার অমতে তিনি এম-এ পাশ পরেশবাবুর সঙ্গে বিয়ে ঠিক করছেন। ফুঃ! আমার ধারণা ছিল, বিয়ের পর মীনাক্ষীর মনের খেদ যাবে মিটে। আমি জানতাম না, ফিল্মে অভিনয় করবার জন্য মনে মনে জ্বলে-পুড়ে মরছে সে। এই ব্যাপারটা আমার কাছে পুরোপুরি গোপন করে গিয়েছিল। তার বিয়ের তিন দিন পর, বাবার বাড়ি যাচ্ছি ব'লে বেরিয়ে এল মীনা। তোমারই বাগানে ব'সে অপেক্ষা করছিলাম আমি। এসেই বললে, 'কলকাতা যাওয়ার বন্দোবস্ত করো।' জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন? পরেশবাবু তো খুব ভাল লোক।' নাকটা উ'চু ক'রে ব'লে উঠল সে, 'আরে রাম, রাম! বিছানায় শুয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম এসে পড়ে। পাদ্রীদা, তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে ভালবাসা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তিন দিন তো চেষ্টা ক'রে দেখলাম।' জিজ্ঞাসা করলাম, 'তা হ'লে বিয়ে করতে গেলে কেন?' ধৈর্য হারিয়ে ফেলল মীনাক্ষী। বললে, 'মালদা শহর থেকে তুমি এখন সরে পড়ো। তুমি যে এখানে নেই তা তো পুলিশ জানেই। নদীর ওপারে তুমি অপেক্ষা করবে, মঙ্গলবার সকালে আমি গিয়ে পৌঁছব। বুঝলে?' বললাম, 'না, আমি তোমায় ভাগিয়ে নিয়ে যেতে পারব না। মাপ করো।' ধমকে উঠলে মীনা, 'অশিক্ষিত খৃষ্টীয়ান' প্রেম করবার সময় সাহসের তো অভাব হয় নি?' তবু বললাম আমি, 'গালাগাল দাও আপত্তি করব না। কিন্তু পরের বউকে ভাগিয়ে নিয়ে যেতে পারব না।' ভাস্করদা, আমার গালে একটা দড়াম ক'রে চড় বসিয়ে দিয়ে বলল মীনাক্ষী, 'গুণ্ডা না আরশুলো! চলো, আমিই তোমায় ভাগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। কাওয়ার্ড! ছোট শহরে সাহস দেখিয়ে চ্যাঙড়াদের কাছে 'হিরো' সাজতে পারো, আর আমার মতো একটি রূপকুমারীর জন্য জীবন দিতে পারো না?' রাজী হ'য়ে গেলাম। ও যে ফিল্মে অভিনয় করবে ব'লে এরই মধ্যে নাম পাল্টে ফেলেছে তাও আমার জানা ছিল না। কলকাতা চলে এলাম আমরা।"

অনেকক্ষণ আগেই কফি দিয়ে গিয়েছিল হোসেন। পেয়ালাটা মুখ পর্যন্ত তুলে আবার নামিয়ে রেখেছিলুম। গন্ধটা সহ্য করতে পারি নি। এখন আবার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখি, কফিটা ঠাণ্ডা হ'য়ে গিয়েছে। পেড্রো বলল, "থাক তোমার কফি খাওয়ার দরকার নেই। হোসেনকে চা আনতে বলছি।"

চা আনবার হুকুম দিয়ে পেড্রো আবার গল্প বলতে শুরু করল, "কলকাতা পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে গোটা তিন ঠিকানা বার করল মীনাক্ষী। চিত্র পরিচালকদের নামও লেখা ছিল কাগজটায়। প্রত্যেক দিনই তাঁদের কাছে নিয়ে যেতে লাগলাম ওকে। প্রায় দিনই আমাকে অফিসের বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে যেত। কি যে কথাবার্তা হচ্ছে জানতে পারতাম না। কয়েকদিন পর আমি বুঝতে পারলাম, ফিল্মে অভিনয় করবার উদ্দেশ্যেই পালিয়ে এসেছে সে। ভালবাসার কাহিনীটা মিথ্যে। আমাকে সে বডি গার্ড হিসেবে নিযুক্ত করেছে। ফিল্ম-কোম্পানীর অফিসে যাতায়াত করতে করতে খান্দুভাই-এর সঙ্গে পরিচয় হয় ওর। একদিন সে ফিরে এসে বলে, 'বোম্বে যাচ্ছি নাচ শিখতে।' জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমি কি করব?' সুটকেস কাপড়-চোপড় গুছতে গুছতে বললে সে, 'তুমিও চলো। খান্দুভাই-এর ওপর চোখ রাখবে। লোকটা মজেছে। কোটিপতি লোক। কালকের প্লেনে রওনা হবো। এই নাও টাকা। তুমিও সেই প্লেনের টিকিট কাটবে।' হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে এক তাড়া নোট বার করল মীনাক্ষী। চলাফেরা করছে এবং কথা বলছে সাংঘাতিক দ্রুতগতিতে। আমি তাল রাখতে পারছি না ওর সঙ্গে। মরীয়া হ'য়ে ব'লে ফেললাম, 'বোম্বে যেতে পারব না।' মুখ ভেংচে প্রশ্ন করল, 'কেন, কি করবেন আপনি?' বললাম, মালদা ফিরে যাব। রূপালী সিনেমার গেট-কিপারী করব।' হাত তুলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সামলে নিয়ে মীনাক্ষী বলল, 'ছিলে বাগ্দী কিংবা মুদ্দাফরাশ—হয়েছে খৃষ্টীয়ান। বুদ্ধি এখনো পাকে নি। বোম্বে গেলে দেখবে বরাত খুলে যাবে। এখানকার হোটেলের পয়সা সব আজ রাত্রেই মিটিয়ে দিয়ো। ওতে সবসুদ্ধ হাজার টাকা আছে। গেট-কীপারী যদি করতে চাও তা হ'লে ছোট শহরে কেন? খান্দুভাই তোমায় বোম্বে গিয়ে গেট-কীপারের চাকরি একটা জুটিয়ে দেবেন।' হঠাৎ সে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে বললে সে, 'খান্দুভাই তোমাকে ভীষণ ভয় পান, পাদ্রীদা। বলেন, ডাকু। আজ রাত্তিরে খাবো না। বড় হোটেলে ডিনার খাচ্ছি। রাত দশটার পর মেম সাহেবদের নাচ দেখানো হবে। তুমি যাবে না কি? তা হ'লে তুমি আলাদাভাবে ঢুকে প'ড়ো সেখানে। মাঝে মাঝে খান্দুভাইকে তোমার চেহারাটা দেখিয়ো। লোকটা কিন্তু বদমায়েস।' জিজ্ঞাসা করলাম, 'তা হ'লে যাচ্ছ কেন?' মুখে পাউডার ঘসতে ঘসতে জবাব দিল মীনা, 'তিন তাসের জুয়া খেলতে ব'সে তিন টেক্কা কে না চায়? খান্দুভাই-এর সঙ্গে দু'জন নাম-করা ডিরেক্টারও আসছেন।' হ্যাণ্ডব্যাগটা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল মীনা। ভাস্করদা, চা ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে।"

"ও, হ্যাঁ তাই তো—হোসেন চা দিয়ে গিয়েছে দেখছি।" চা-এর পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বললুম, "কী সাংঘাতিক মেয়ে! আমরা মফঃস্বলের লোক, এ সব গল্প শুনতেও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।"

'আমার মতো গুণ্ডা পর্যন্ত হটে গেল রূপকুমারীর কাছে। হাল ছেড়ে দিলাম। মাস দুই পর্যন্ত কলকাতা-বোম্বে ছোটাছুটি করলাম ওদের সঙ্গে। খান্দুভাই ওকে আশার-বেলুনে চাপিয়ে আকাশে ভাসিয়ে রাখলেন। হাতছাড়া করতে চান না। অভিনয় করবার সুযোগ পেলে হয়তো সে নাম করতে পারত। কিন্তু আমার অবস্থা তখন শোচনীয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এক টাকার জন্যও

মীনার কাছে হাত পাততে হয়। তিন মাস পার হ'য়ে গিয়েছে। এমন সময় উড়ো জাহাজে বোম্বে যাওয়ার পথে আলাপ হ'ল করীম সাহেবের সঙ্গে। আমার চেহারা দেখে নিশ্চয়ই তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কি কাজ করি। বললাম, 'রূপকুমারীর বডি গার্ড। আগে গুণ্ডামী করতাম। দূর থেকে ছোরা চালাতে পারি। এক সময়ে বুক দিয়ে মোটার গাড়ি রুখে দিতে পারতাম।' করীমভয় লুফে নিলেন আমায়। আমার বুকের ক্ষমতার কথাটা বোধহয় বিশ্বাস করেন নি। পাশে ব'সে আমার বাইসেপসের মাংসটা টিপে দেখে বললেন, 'এক তাল লোহা!' লোহার কারবারই করীমভয়-এর সবচেয়ে বড় ব্যবসা। তাঁর ফিল্ম-কোম্পানীতে চাকরি হ'য়ে গেল আমার। মীনাক্ষী আমার ছবি দেখে নি বটে, কিন্তু খবর রাখে। ফুরসৎ পেলেই কলকাতা গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা ক'রে আসতাম। দু' একবার ওর হ'য়ে খান্দুভাইকে শাসিয়েও এসেছি। কিন্তু কাজ হয় নি। অভিনয় করবার সুযোগ পায় নি মীনাক্ষী। হতাশ হ'য়ে পড়েছিল সে। খান্দুভাই-এর হতাশার পরিমাণও কম নয়। যেমনভাবে মীনাক্ষীকে পেতে চেয়েছিলেন তিনি, তেমনভাবে পান নি ওকে। আমার তো তাই মনে হয়। মাস-খানিক আগে টাকার অভাবেও পড়েছিল মীনা। আমার টাকায় সে হাত দেয় না। ভাস্করদা, ফিল্ম-কোম্পানীর লোকেদের কাছে শুনেছি, খান্দুভাই-এরও নাকি খুবই টাকার অভাব যাচ্ছে। আমার নিজের সন্দেহ, মীনাক্ষীকে বিপদে ফেলেছেন তিনি। নিজের অজ্ঞাতসারে এমন কাজ করেছে সে যার জন্য পুলিশ ওকে জামীন পর্যন্ত দিতে চায় নি। ভাস্করদা, তুমি কি আমার কোনো কথা অবিশ্বাস করলে?"

"আমি তো পুলিশের লোক নই, আমি অবিশ্বাস করলেও তোর কোনো ক্ষতি হবে না। দুটো সংসার নষ্ট হ'য়ে গেল শুধু সেই কথাই ভাবছি। একটা প্রশ্ন করব তোকে, সত্যি জবাব দিবি কি?"

"তোমার কাছে কোনো কথাই গোপন করি নি, মিথ্যে বলব কেন?"

"তুই কি মীনাকে ভালবাসিস?"

"হ্যাঁ।"

"বিয়ে করতে পারলে সুখী হবি?"

"সুখের কথা কি ক'রে বলি—"

"কিন্তু তোর কাহিনী শুনে মনে হ'ল, মীনা তোকে ভালবাসে না।"

"আমার ধারণাও সেই রকমের। জানো, আজ পর্যন্ত মীনা একবারও আমার এখানে আসে নি?"

এই সময় কলিং-বেল বেজে উঠল। একটু পরেই হোসেন এসে খবর দিল, প্রদীপ রাহা এসেছেন। তাঁকে ডেকে নিয়ে আসতে বলল পেড্রো। ডাকবার আগেই তিনি এসে ঢুকে পড়লেন ড্রইং-রুমে। পেড্রোর হাতে একটা প্যাকেট দিয়ে বললেন, "এটা তোমার কাছেই রেখে দাও ভাই। পরের গহনা আমি আর রাখতে পারব না।"

"কেন, কি হ'ল রাহা বাবু?" জিজ্ঞাসা করল পেড্রো।

"কি জানি ভাই, মামলা-মোকদ্দমা শুরু হ'য়েছে। কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে না পড়ে। তা ছাড়া, খান্দু-ভাই একদিন গহনাগুলো চেয়ে পাঠিয়ে-ছিলেন।"

"কেন?" অপরিমিত বিস্ময় পেড্রোর চোখে-মুখে, "তিনি কি ক'রে খবর পেলেন, রাহাবাবু?"

"বোধ হয় রূপকুমারী ব'লে থাকবে।"

"কিন্তু হঠাৎ ওদের গহনার দরকার পড়ল কেন.........মাত্র তো হাজার পনরো টাকার গহনা...... তবে কি খান্দুভাই-এর হাতে নগদ টাকা কিছু নেই........." ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল পেড্রো। পায়চারি করছে আর ভাবছে। আমি বললুম, "আজ চলি রে। আবার দেখা হবে। আমার হোটেলের ঠিকানা তো তুই জানিস। ভাল কথা। কলকাতা থেকে ইনসপেক্টর লাহিড়ী এসেছেন। তাঁর সঙ্গে এক হোটেলেই আছি।"

আমি যে বেরিয়ে এলুম, তাও লক্ষ্য করল না পেড্রো। গভীর চিন্তায় ডুবে গিয়েছিল সে।

॥ আট ॥

সেদিন পেড্রোর বাড়ি থেকে নেমে আসতে বার দুই পা হড়কে প'ড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। আসামীদের চেয়ে হতাশার পরিমাণ আমারই ছিল বেশি। এক হাত দূরের পথটাও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলুম না। মীনাক্ষীর গল্প শুনে আমি যেন অর্ধ-মৃতের অবস্থায় একতলায় নেমে এসেছিলুম। হোটেলে ফিরে এসে শুয়ে পড়েছিলুম আমি। মনে হয়েছিল, এতো দীর্ঘপথ জীবনে বোধ হয় আর কোনো দিনও অতিক্রম করতে হবে না। অবচেতন মনের লুকনো সত্য বিশ্লেষণ করতে লাগলুম। চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে এতদূর পর্যন্ত ছুটে এসেছি কেন? পৈতৃক বাড়িখানাও আর নেই। জীবনের স্বাভাবিক গতিটা ভুল পথে চালিত হওয়ার মূলে আমারই অবচেতন মনের প্ররোচনা ছিল। মীনাক্ষীর জন্য লোভের আমার সীমা নেই। হয়তো পেড্রোর চেয়েও বেশি। নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারে আমি যে জড়িত নেই শুধু সেই কথাটা প্রমাণ করবার জন্য এতদূরে ছুটে আসি নি। সত্যি কথা বলতে কি, আমি চেয়েছিলুম মীনা বিপদে পড়ুক। অবস্থা জটিল হ'য়ে উঠুক। তারপর আমি গিয়ে ওর পাশে দাঁড়াব। ভালবাসার পরীক্ষা দেওয়ার একটা সুযোগ খুঁজছিলুম মনে মনে। মীনাক্ষীর গ্রেপ্তার হওয়ার খবর শুনে প্রশান্ত লাহিড়ীর সামনে উদ্বেগের নানা-বিধ প্রমাণ দিয়েছিলুম বটে, কিন্তু মনে মনে খুশী হয়েছিলুম খুব। মীনাক্ষীর জীবনটা যদি ভেঙেচুরে যায় তা হ'লেই ওকে পাব আমি। এখন মনে হচ্ছে, এতোগুলো লোকের মধ্যে আমার চেয়ে বড় ক্রিমিনাল আর কেউ নেই।

বাকী দিনটা বিছানায় শুয়ে কাটিয়ে দিলুম। ইনসপেক্টর লাহিড়ী কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন জানি না। জান-বার যেন ইচ্ছাও নেই আর। পেড্রোর ইতিহাসটা শুনবার পর ওকে আর খুনী বলে সন্দেহ হচ্ছে না। পেড্রো যদি খুন না ক'রে থাকে তা হ'লে এই ব্যাপারের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে লাভ কি? আমি তো পেড্রোকেই শাস্তি দেওয়ার জন্য বোম্বে এসেছিলুম ছুটে। ওকে সরিয়ে দিতে পারলে রঙ্গমঞ্চটা আমার দখলে আসবে ব'লে ভেবে রেখেছিলুম। আমি যে প্রবল ঈর্ষার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছিলুম তাতে আর সন্দেহ নেই। এখন মনে হচ্ছে, সবার ওপর দিয়ে পেড্রোই টেক্কা মেরে বসল। সত্যিকারের 'হিরো' হ'য়ে বসেছে সে। এমন কি একটি আদর্শ চরিত্র ব'লে ধারণা জন্মেছে আমার। সাধারণ একটা গুণ্ডা ব'লে আর ওকে হেয় করা চলবে না।

ওকে ছোট ক'রে রাখবার মূলে বোধ হয় আমরাই ছিলুম—ছিল মালদা শহরের পুরো সমাজটা। আমরা কেউ সামাজিক কর্তব্য সম্পাদন করি নি। ওকে তলিয়ে যেতে দেখেও এগিয়ে আসি নি সাহায্য করতে। যারা আজ রকে বসছে

কিংবা গুণ্ডামী করছে তাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো পেড্রোর মতো উপেক্ষিত। সমাজের এই আধুনিক সমস্যাটা আজ আমার চোখে নতুন ধরনের আলোকপাত করল। আশে-পাশে যাঁরা সাধু ও সৎ ব'লে পরিচিত তাঁদের অপরাধের মাত্রা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হলুম। সমাজ-বিজ্ঞানের লুকনো দিকটা চোখে পড়ল আমার। আমি অপরাধী। মালদা শহরের ভুবন চাটুজ্যের অপরাধ আমার চেয়েও বেশি।

পরের দিন বেলা দশটার সময় ঘরে ঢুকলেন ইনসপেক্টর লাহিড়ী। হাসি-খুশী ভাব। সত্যিকার খুনীটাকে ধ'রে ফেলেছেন না কি? এ'দের অবিশ্যি দেখে কিছু বোঝা যায় না। গাম্ভীর্যের তলায় হাসির ঢেউ থাকে লুকনো। হাসির অন্তরালে গাম্ভীর্যের বরফ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করলেও বোঝা যায় না কিছু। বড় অদ্ভুত জীব এ'রা।

প্রশান্ত লাহিড়ী জিজ্ঞাসা করলেন, "অতো মুষড়ে পড়েছেন কেন, ভাস্করবাবু?"

"না তো! মুষড়ে পড়ব কেন?"

হেসে উঠলেন তিনি। অর্থাৎ আমার কথাটা বিশ্বাস করলেন না। বললেন, "রূপকুমারী জেলে আছে বটে, কিন্তু আছে খুব সুখে। তাজমহল হোটেলের মতো বন্দোবস্ত। কংগ্রেসী আমলের জেল কি আপনি কখনো দেখেছেন?"

"না, সৌভাগ্য হয় নি।"

"যাবেন না কি দেখতে?"

বলে কি লোকটা! খুনের ব্যাপারে আমাকেও সন্দেহ করতে লাগলেন নাকি প্রশান্তবাবু? ঠাট্টা করছেন, না সত্যি-সত্যি বলছেন যে, আমাকেও জেল খাটতে হবে?

বললুম, "কপালে থাকলে একদিন বাসিন্দে হ'য়ে যাব জেলখানার। কি বলেন?"

"নাঃ, মেজাজ আপনার ভাল নেই। চলুন, বেরুতে হবে।"

"কাল তো সারাটা দিন ঘুরে ঘুরে বেড়ালেন। কিছু বুঝতে পারলেন কি?

হ্যাঁ মশাই, কাল যে দেয়াল চেঁছে আস্তর নিয়ে এলেন তার কি হ'ল? এমন গম্ভীরভাবে চাঁছতে আরম্ভ ক'রে দিলেন যে, আমি ভাবলুম খুনীটা বুঝি আস্তরের তলায় লুকিয়ে রয়েছে। সত্যি, আপনাদের কাণ্ড দেখলে মাঝে মাঝে এত হাসি পায় যে, চেপে রাখতে পারি না। শুনেছি বিলেতের ডিটেকটিভরা এই রকমের আজগুবী কাণ্ড করতে ভালবাসে।"

আমার কথা শুনে আবার তিনি হাসতে লাগলেন। বললেন, "রেগে গিয়েছেন আপনি। কি করব এই অবস্থায় রূপকুমারীকে জামীনে খালাস দেওয়া যায় না।"

"রূপকুমারীর জন্য আমার অতো মাথা ব্যথা নেই, মশাই।"

"কবে থেকে? প্রশান্ত লাহিড়ীর মুখে দুষ্টুমীর হাসি, "কাল তো পেড্রোর বাড়ি গিয়েছিলেন—"

"আপনি কি ক'রে জানলেন?"

"রাত্তিরে প্রদীপ রাহার সংগে দেখা হয়েছিল। তদন্তের জন্য তাঁর বাড়ি যেতে হয়েছিল আবার। পেড্রোর কথা-বার্তা শুনে কিছু বুঝতে পারলেন কি ভাস্করবাবু?"

"এখন তো মনে হচ্ছে ছোঁড়াটা একটি আদর্শ চরিত্রের মানুষ। দেশের অন্যান্য প্রাতঃস্মরণীয়দের পাশে বসিয়ে দিলে বেমানান ঠেকবে না। মানবচরিত্রের রহস্য বোঝা আমার কর্ম নয়। চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বাড়িঘর বেচে মানবচরিত্র বোঝবার জন্য বোম্বে আসবার দরকার ছিল না। কি যে করলুম ঘোড়ারডিম কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার বাড়ির পেছন দিকে পাঁচ বিঘের একটা বাগান ছিল। আম আর কাঁঠাল গাছের সংখ্যা ছিল অনেক। ওখানে ব'সেই শুনলুম ওরা প্রেমাভিনয় করেছে!"

"বলেন কি?"

"হ্যাঁ মশাই। অতো কাছে থেকেও মানব চরিত্র দুটি দেখতে পেলুম না। বোম্বে এসে কি আর দেখব ছাই, বলুন? ভাবছি, কালই আমি কলকাতা ফিরে যাব। চাকরিবাকরির জন্য চেষ্টা করতে হবে।"

"বড্ড বেশি দমে গিয়েছেন। কথায় বলে, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। দু-দিনের মধ্যে অতো হতাশ হয়ে পড়লে চলবে কেন? চলুন, বেরিয়ে পড়া যাক।"

"কোথায় যাবেন?"

প্রথমে খান্দুভাই-এর কাছে। তারপর ডাক্তার প্যাটেলের বাড়ি।" আমার হাতে ধরে টান মারলেন প্রশান্ত লাহিড়ী।

অফিসেই ছিলেন খান্দুভাই। বহু-লোক এসেছেন তাঁর সংগে দেখা করতে। সবাই এ'রা শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তি। কেরাণীরা কাজকর্ম বন্ধ করে যার যার চেয়ারে চুপ করে বসে রয়েছে। প্রদীপ রাহাকেও দেখলুম আমরা। একটা মোটা আকারের 'চেক-বই' তাঁর হাতে। পাতা ওল্টাচ্ছিলেন। আমরা গিয়ে তাঁর সামনেই দাঁড়ালুম। ব্যস্তভাবে উঠে পড়লেন তিনি, বললেন, "বসুন, বসুন। মালিকের ঘরভর্তি লোক।

"খান্দুভাইয়ের সংগে দেখা করতে চান নিশ্চয়ই?"

"হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি কিছু নেই।" বললেন প্রশান্ত লাহিড়ী।

"আমি নিজেই যাচ্ছি, খবর দিয়ে আসি। আপনাকে তিনি চেনেন তো?

"চেনেন। ব্যস্ত মানুষ তিনি। ভুলে যেতেও পারেন। বলবেন যে, কলকাতার প্রশান্ত লাহিড়ী। নামটা লিখে দেব কি?

"কিছু দরকার নেই। একটু বসুন আপনারা।"

প্রদীপ রাহা অন্তর্হিত হওয়ার সংগে সংগে চেক-বইটা খুলে ফেললেন প্রশান্তবাবু। চকিতের মধ্যে কি যেন দেখে নিলেন একবার। দেখতে বোধ হয় এক সেকেণ্ডও লাগল না। একটু পরেই ফিরে এসে প্রদীপ রাহা বললেন, "আসুন আপনারা।"

বড় হল-ঘরটা পার হয়ে এলুম আমরা। চওড়া একটা বারান্দা অতিক্রম করে পৌঁছলুম এসে মস্ত বড় একটা ড্রইংরুমে। প্রদীপ রাহা বললেন, "খান্দু-ভাই-এর প্রাইভেট ড্রইং-রুম। এখানেই আপনাদের বসতে বললেন। মিনিট দশ পর তিনি আসবেন। কি খাবেন আপনারা? চা, না কফি?"

"কিচ্ছু না। হোটেল থেকে এইমাত্র খেয়ে বেরিয়েছি।" বললেন প্রশান্তবাবু।

প্রদীপ রাহা বেরিয়ে যাওয়ার পর ঘরটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন ইনসপেক্টর লাহিড়ী। দেয়ালের গায়ে ভারত বিখ্যাত অভিনেতা আর অভিনেত্রীদের ছবি টাঙ্গানো ছিল। রূপ-কুমারীর ছবিও একটা দেখলুম আমরা।

ড্রইং-রুমের সংলগ্ন স্নানঘর আছে। সেখানে ঢুকে পড়লেন, প্রশান্ত

লাহিড়ী। ভেতর দিকে অন্য একটা দরজা নজরে পড়ল তাঁর। ধাক্কা দিতেই দরজাটা খুলে গেল। ছোট্ট একটা ঘর রয়েছে সেদিকে। অন্ধকার। জানালাটা বন্ধ। পকেট থেকে এক ব্যাটারীর টর্চ বার করলেন প্রশান্তবাবু। ক্ষিণ আলোতেও ঘরখানার সব কিছু দেখতে পাওয়া গেল। আসবাবপত্র কিছু নেই। শুধু একটা খাট রয়েছে। বড় খাট। তাতে বিছানা পাতা। খাটের পাশে খুব ছোট সাইজের একটা টি-পয়। তার ওপরে ফুলদানিটা চোখে পড়ল আমাদের। টাটকা ফুলের গন্ধও পেলুম। ফুল-দানির তলায় রূপকুমারীর একটা পাস-পোর্ট সাইজের ফোটো।

ফিরে এলুম ড্রইং-রুমে। জিজ্ঞাসা করলুম, "এসব জায়গা সার্চ করে নি পুলিশ?"

"এদের কান্ড দেখে মনে হয়, করে নি।"

"তোশকের ওপর টিপে টিপে কি দেখছিলেন আপনি?"

"তিন লাখ টাকার বান্ডিলটা হাতে ঠেকে কি না।"

"আপনার কি বিশ্বাস খান্দুভাই টাকা চুরি করেছেন?"

"বিশ্বাস নয়, শুধু সন্দেহ। চেক-বইতে দেখলাম, শেষ চেক কাটা হয়েছে কুড়ি দিন আগে। ভাবছি, এতবড় ব্যবসা যাঁরা করেন তাঁরা কুড়ি দিন পর্যন্ত চেক না কেটে থাকতে পারেন কি না।"

"অসম্ভব। তা হলে অফিস চলতে পারে না।" কথাটা বলে ফেলে হেসে ফেললুম আমি। বললুম আবার, "আপনার কথা শুনলে প্রত্যেকের ওপরই সন্দেহ আসে। আজ সকালে তো ভেবে-ছিলুম আপনি আমাকে সন্দেহ করছেন।"

"তাই না কি?" প্রশান্ত লাহিড়ীও হাসতে লাগলেন আমার সঙ্গে সঙ্গে।

ঝড়ের বেগে এসে উপস্থিত হলেন খান্দুভাই। কাকুতি মিনতি করে বললেন, "মাপ করবেন লাহিড়ীবাবু। অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি আপনাদের। কি করব। পাঁচ দিন তো আপনারা ধরে রাখলেন। কোনো কাজ কর্ম করতে পারি নি। কাজ সব জমে গিয়েছে। ও কি আপনাদের চা দেয় নি?"

"দিতে চেয়েছিলেন। আমরাই বারণ করলুম। চা-এর দরকার নেই। একটু তাড়াতাড়ি বেরুতে হবে। অন্য জায়গায় কাজ আছে। ক'টা কথা শুধু আপনাকে জিজ্ঞেস করতে এলাম।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়। জিজ্ঞেস করুন।"

"বুঝতে পারছেন কি খান্দুভাই, আমরা এসেছি আপনার মাসীমার খুনের ব্যাপার সম্পর্কে তদন্ত করতে?"

"অবশ্যই বুঝতে পারছি। নইলে আপনার মতো যোগ্য অফিসার কেন ছুটে আসবেন কলকাতা থেকে? আপনি যে ঘুষ খান না সে খবর এদিকের ধনী-লোকেরাও জানে।"

"আমাকে নিয়ে আপনাদের মধ্যে খুব আলোচনা হচ্ছে বুঝি?"

"একটু-আধটু হচ্ছে বৈ কি। সবাই জানে আপনি আমার জান্-পছান্ আদমি। আপনার সোংগে খুব ভাব আছে।" একা একাই হেসে উঠলেন খান্দুভাই। পাঁচ দিন হাজতবাসের পর মুখের রেখাগুলো ভেঙ্গে গিয়েছে। হাসির মধ্যে প্রফুল্লতা নেই। উদ্বেগের গভীরতাও লক্ষ্য করা যায়।

প্রশান্তবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, লক্ষ্মী দেবীর যে তিন লাখ নগদ টাকা ছিল তা কি আপনি জানতেন?"

"জানতাম।"

"কি করে?"

"মাসীমা নিজেই আমায় বলেছিলেন।"

"তিনি কি কোনো উইল রেখে গিয়েছেন?"

প্রশ্ন শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন খান্দুভাই। বললেন, "উইলের খবর তো সবাই জানে।"

"কি করে?"

"খবরের কাগজ পড়ে।"

"সে তো লক্ষ্মী দেবীর মৃত্যুর পর সবাই জেনেছে। আমি জানতে চাইছি, তাঁর মৃত্যুর আগে আপনি জানতেন কি না।"

"জানতাম।"

"মাসীমা বলেছিলেন কি?"

একটু ভেবে নিয়ে খান্দুভাই জবাব দিলেন, "না, মাসীমা তাঁর উইলের ব্যাপারটা আমার কাছে গোপন রেখেছিলেন।"

"তা হলে আপনি জানলেন কি করে?"

"তাঁর সলিসিটার জীবরাজ মেহটার কাছ থেকে।"

"মক্কেলের গোপন খবর তিনি আপনাকে বলতে গেলেন কেন?"

"সে তো জীবরাজ বলতে পারে—"

"এই তিন লাখ টাকার মধ্যে একটি পয়সাও যে তিনি আপনাকে দেন নি তা কি আপনি জানতেন না?"

"জানতাম। জীবরাজই বলেছে। তিন লাখ কি পাঁচ লাখ টাকা যে আমার কাছে কিছুই না জীবরাজ তা বুঝতে পারত বলেই মাসীমার উইল নিয়ে আমার সঙ্গে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করত।"

"কি রকম?"

"বলত,—ওরে খান্দু, মাসীমা তোকে কলা দেখিয়েছেন উইলে। শুধু হাজার পঞ্চাশ টাকার শেয়ারের খুদকুঁড়ো দিয়ে গেছেন তোকে।"

সিগারেট ধরালেন প্রশান্ত লাহিড়ী। বোধহয় জেরার পয়েন্টগুলো মনে মনে ঠিক করে নিচ্ছিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন আবার, "গত ছ'মাস কত টাকা লোকসান দিয়েছেন, খান্দুভাই?"

"আমার কর্মচারীরা বলতে পারবে।"

"যদি বলি বিশ লাখেরও বেশি?"

"অসম্ভব নয়। আমাদের ব্যবসায়ে তুলোর মতো টাকা ওড়ে। বিশ-ত্রিশ লাখ টাকার লোকসানের খবর আমার কাণ পর্যন্ত পৌছয় না, প্রশান্তবাবু।"

"কতো লাখ পর্যন্ত লোকসান হলে আপনার কাণে এসে পৌছবে বলে আপনি মনে করেন?"

"এই ধরুণ লাখ পঞ্চাশ হলে আমায় ওরা বলবে।"

"খান্দুভাই, আমার বিশ্বাস তার চেয়েও বেশি লোকসান আপনি দিয়েছেন। আপনার কোনো ব্যাংকেই আজকের তারিখে নগদ টাকা কিছু নেই।"

"আমার কর্মচারীরা বলতে পারবে। নগদ টাকা মানে কি? কোটি টাকার ক্রেডিট আছে আমার।"

"তাও নেই। ব্যাংক আপনাকে আর বিশ্বাস করে না। পাঁচ হাজার টাকার চেক কাটলেও ব্যাংক টাকা দেবে না আপনাকে।"

"আমার কাছে এটা গল্পের মতো শোনাচ্ছে।"

"মিছে কথা বলছেন থান্দুভাই। গত কুড়ি দিনের মধ্যেও আপনার অফিসের চেক বই থেকে চেক কাটা হয় নি। যেসব স্ত্রীলোকদের নিয়ে আপনি সময় কাটান তারাও কেউ টাকা পায় নি। আপনার পাটরাণী রূপকুমারীকে তাজমহল হোটেলে রেখেছেন। এক মাসের বিল বাকী তার। এসব কথা থাক। আপনার মাসীমা যে ভল্ট থেকে টাকা নিয়ে এসেছিলেন তা কি আপনি জানতেন?"

"না।"

"সিকিউরিটি বিভাগের একটি কেরাণীকে আমরা আজ সকালে গ্রেপ্তার করেছি। জবানবন্দিতে সে বলেছে, আপনি জানতেন। তাকে আপনি একশো টাকা ঘুষ দিয়েছেন খবরটা জানবার জন্য। এবার বলুন, লক্ষ্মী দেবীকে খুন করেছে কে? আপনি, না রূপকুমারী? কার ওপর সন্দেহ হয় তাও বলতে পারেন।"

"আমার সন্দেহ পেড্রোর ওপর। ডাক্তার প্যাটেলও তাই বলেন।"

উঠে পড়লেন ইনসপেক্টর লাহিড়ী। হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন, "পেড্রোর ওপর আপনার খুব রাগ, তাই না? তাকে আপনি ভয় পান।"

"আমাকে সে অনেকদিন ছোরা দেখিয়েছে।"

"সেইজনাই তো রূপকুমারীর সর্বনাশ করতে পারেন নি। দেহসম্ভোগের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। ওর ওপর আপনার রাগ হওয়া স্বাভাবিক। আজ চলি, থান্দুভাই।"

"ছোরা দেখানোটা অপরাধ নয়?" চেঁচিয়ে উঠলেন থান্দুভাই।

"পেড্রো ছোরা দেখায়, মারে না।"

পথে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলুম, "থান্দুভাইকে ছেড়ে দিলেন কেন? খুনীকে তো পেয়েই গেলেন?"

"না, পাই নি ভাস্করবাবু।"

হতবুদ্ধির মতো তাঁর পাশে পাশে হাঁটতে লাগলুম। তাঁর জেরা শুনে আমার তো বিশ্বাস হয়ছিল, আসল অপরাধীকে ধরে ফেলেছেন প্রশান্তবাবু। কিন্তু বাইরে বেরিয়ে এসে তিনি আবার উল্টো কথা বলছেন! তদন্তের নাম করে তিনি কি ছেলেখেলা করছেন? আমি কিন্তু প্রশান্ত লাহিড়ীর ওপর আর বিশ্বাস রাখতে পারলুম না। বোধ হয় সি-আই-ডি অফিসার হিসেবে ইন্সপেক্টর দেশাই প্রশান্তবাবুর চেয়ে অধিকতর চতুর। তাঁর হাতেই তদন্তের দায়িত্বটা থাকলে ভাল হতো।

রাস্তা থেকে ট্যাক্সি ধরলেন ইনসপেক্টর লাহিড়ী। জিজ্ঞাসা করলুম, "এখন কোথায় যাচ্ছি আমরা?"

"ডাক্তার প্যাটেলের বাড়ি।"

"আর কেন দাদা, ছোটাছুটি করছেন? এদের মধ্যে কেউ আসামী নন। আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপটি তো আপনার পকেটেই রয়েছে।"

"কি বলুন তো?"

"ঐ যে সেই মোড়কটা—যাতে এক চামচ আস্তর মুড়ে রেখেছেন।"

"ঠাট্টা করছেন, না ভাস্করবাবু?"

"ঠাট্টা নয় দাদা হাঁপিয়ে পড়েছি। একবারটি তো রূপকুমারীর সঙ্গে দেখা করতে পারতেন। তাও করলেন না। এত দূর এলুম, দু-একটা কথা না বলে যাই কি করে? এর পর তো লটকে দেবেন মেয়েটাকে।"

"আপনার ব্যথা যে কোথায় তা কি আমি বুঝি নি? দু একটা দিন সবুর করুন। রূপকুমারীকে আপনার কাছে পৌঁছে দেব।"

"বলেন কি, মীনা মুক্তি পাবে?"

"যদি সে খুনের সঙ্গে জড়িত না থাকে।"

"ও—বুঝেছি। এই ধরণের কথা তো আপনি প্রথম থেকে বলে আসছেন।"

চার্চগেটের কাছে এসে ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়লুম আমরা। এই অঞ্চলেই থাকেন ডাক্তার প্যাটেল। খোঁজাখুঁজি করলেন না প্রশান্তবাবু। বোধহয় গতকালই বাইরে থেকে বাড়িঘর তাঁর দেখে গিয়েছেন। চারতলায় উঠে এলুম। দরজার পাশে পেতলের ওপর নাম লেখা রয়েছে। কলিং-বেলটা নেম-প্লেটের ঠিক তলায়। ডাক্তার প্যাটেলের নামের পেছনে বিলেতী ডিগ্রীর বাহুল্য। বড় ডাক্তার। একটি লোক দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। বিহারী বলে মনে হল আমার। হাতে লাল রং-এর জাবেদা খাতা।

প্রশান্তবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "ডাক্তার সাহেব কি বাড়ি নেই?"

"আছে, হুজুর। বুড়ো চাকরটা ভারি বদমায়েস। যখনি আসি তখন সে বলে, সাহেব বাড়ি নেই।"

"তার মানে কি, শেঠজী?"

"আমি শেঠ নই, হুজুর। ছোট একটা মুদী দোকান খুলেছি। ছ' মাস ধরে ঘুরছি একটা টাকাও আদায় করতে পারছি না। প্রায় শ দুই টাকার জিনিস বাকীতে নিয়ে এসেছে চাকরটা। এখন শুনছি, দুধওয়ালাকেও টাকা দেন নি ডাক্তার সাহেব। আরও অনেক পাওনাদার ঘোরাঘুরি করছে।"

"সে কি!" গলা দিয়ে আমার একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল। আমার গায়ে খোঁচা মেরে প্রশান্তবাবু বললেন, "চুপ চুপ করুন ভাস্করবাবু।" ঐ লোকটির দিকে ঘুরে বললেন, "এখন তুমি যাও, পরে অন্য সময় এসো।"

"আপনারাও কি পাওনাদার?"

"না।"

"আচ্ছা যাচ্ছি। আর আসব না। এবার কেস্ ঠুকে দেব। কত বড় ডাক্তার প্যাটেল সাহেব দেখে নেব আমি।" লোকটি গালাগাল করতে করতে চলে গেল লিফটের দিকে।

প্রশান্তবাবু বেল টিপলেন। প্রায় মিনিট দুই পরে দরজা খুলল ডাক্তার প্যাটেলের ভৃত্য। আমাদের পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভাল করে দেখে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কাকে চাই?"

"ডাক্তার সাহেবকে।"

"কি বলব তাঁকে?"

"বলো যে পুলিশের লোক এসেছেন দেখা করতে।"

পলক না ফেলতেই দরজাটা সে বন্ধ করে দিল। ফিরে আসবে কি না তাও সে বলে গেল না। প্রশান্ত লাহিড়ী বললেন, "আসবে। মণিবকে জিজ্ঞেস করতে গেছে।"

"কিন্তু বড় অদ্ভুত ঠেকছে সব। মুদীর টাকা পর্যন্ত বাকী ফেলেছেন। গয়লার বিল বাকী। বিলেতী ডিগ্রীর সংখ্যা তো কম নয়—থাকেনও ভাল জায়গায়। ডাক্তার প্যাটেলের কি প্র্যাকটিস নেই?"

"তদন্ত করবার জন্যেই তো এলাম এখানে। দেখা যাক।"

"আমার কিন্তু বড্ড ভয় করছে, প্রশান্তবাবু।"

"কেন?"

"কি জানি আপনার সঙ্গে ঝগড়া না লেগে যায়। লোকটাকে দেখে কাল আমার ভাল লাগে নি।"

"আমার সঙ্গে সার্চ ওয়ারেন্ট আছে, ভয় কি? আপনার যা অভিজ্ঞতা হচ্ছে, এরপর পুলিশ বিভাগে আপনাকে একটা চাকরি জোগাড় করে দেব। বেহানী কোম্পানীর গদিতে ফিরে গিয়ে কি করবেন?"

চাকরটা আসে নি। এসেছেন ডাক্তার প্যাটেল নিজেই। খুব অমায়িক প্রকৃতির মানুষ। মিষ্টি হেসে আমাদের আমন্ত্রণ জানালেন। বললেন, "দয়া করে ভেতরে আসুন।"

আমাদের নিয়ে তিনি তাঁর চেম্বারে ঢুকলেন। রোগীদের ওয়েটিং রুমের মধ্য দিয়ে যেতে হল আমাদের। বসবার জন্য গুটি কয়েক চেয়ার পড়ে রয়েছে। খুবই অগোছাল। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় অনেকদিন ধরে এখানে কোনো রোগী এসে বসে নি। ওয়েটিং-রুমটা অব্যবহৃত রয়েছে। সেন্টার টেবিলের ওপর কতকগুলো ম্যাগাজিন আছে দেখলুম। সেগুলো কিন্তু গোছানো। কেউ হাত দিয়েছে বলে মনে হয় না।

ডাক্তার প্যাটেলের চেম্বারে ঢুকে প্রশান্তবাবু বললেন, "আমি ইন্সপেক্টর লাহিড়ী। ইনি মিস্টার আচার্য।"

"দয়া করে বসুন আপনারা।"

"দেখুন ডাক্তার প্যাটেল, আমরা এসেছি আপনার সহযোগিতা প্রার্থনা করতে। লক্ষ্মী দেবীর চিকিৎসক ছিলেন আপনি। অতএব তাঁর এই আকস্মিক মৃত্যুসম্বন্ধে দু'একটা প্রশ্ন করব আপনাকে। আশা করি আপনি ক্ষুণ্ণ হবেন না। আমাদের সাহায্য করবেন।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়, আপনাদের আমি এই প্রথম দেখলাম। মনে হচ্ছে বোম্বের লোক আপনারা নন। আপনাদের আইডেন্টিটি কার্ড সঙ্গে এনেছেন কি? অর্থাৎ পরিচয়-নির্দেশক-পত্র?"

"অবশ্যই এনেছি। নইলে আপনিই বা যার তার সঙ্গে কথা বলতে যাবেন কেন? খুনের ব্যাপারে যথাসাধ্য সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। সঙ্গে আমার সার্চ ওয়ারেন্ট আছে।"

"সার্চ তো একবার হয়ে গিয়েছে।" একটু যেন ঘাবড়ে গেলেন ডাক্তার প্যাটেল। পরিচয়-নির্দেশক পত্রটা ভাল করে দেখলেনও না। প্রশান্তবাবুর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, "তা হলে আগে সার্চ করে নিন।"

"না, না—সার্চ এখন করতে চাই না আমি। আপনাকে শুধু জানিয়ে রাখলাম। আপনার মতো সাবধানী লোকের সবকিছু জানা দরকার। আপনি এবার বসুন, ডক্টর।"

"হ্যাঁ, বসছি। একটু চা আনতে বলি?"

"ধন্যবাদ। এখন আর চা খাব না।"

একটু হেসে ডাক্তার বললেন, আমরাও রোগীর বাড়ি গিয়ে কখনো কিছু খাই না।—অন্ প্রিন্সিপল্। আপনার লাইনে আপনিও হচ্ছেন গিয়ে ডাক্তার। আমি আপনার রোগী। তা বেশ, রোগ ধরবার চেষ্টা করুন এবার। অর্থাৎ কি জানতে চান, বলুন।"

প্রশান্ত লাহিড়ী দেরি করলেন না। তদন্ত শেষ করে দিয়ে তাড়াতাড়ি কলকাতা ফিরে যেতে চান। মেয়েটার অসুখ দেখে এসেছেন। ইতিমধ্যে ভয় আমার কেটে গিয়েছে। আমিও যে একজন পুলিশের লোক সেটা প্রমাণ করবার জনাই ঘরের চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি ফেলতে লাগলুম। আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকলে ডাক্তার প্যাটেলের সন্দেহ উদ্রেক হতে পারে।

ইন্সপেক্টর লাহিড়ী বলতে লাগলেন, "প্রথমেই ধরে নিচ্ছি লক্ষ্মী দেবীর খুনের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক নেই। এক সময়ে, অর্থাৎ ছাত্রজীবনে লক্ষ্মী দেবীর সঙ্গে আপনার প্রেম-প্রণয়ের সম্পর্ক ছিল। ছিল তো?

"ও—ইয়েস। অস্বীকার করব কি করে?" ডান হাতের আঙ্গুলগুলো তাঁর একটু কেঁপে উঠল যেন। নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। নিশ্চয়ই। প্রায় বিশ বছর আগের ঘটনাটা কলকাতার বাঙ্গালী ডিটেকটিভ টের পেল কি করে তাই ভেবে খানিকটা হয়তো হকচকিয়ে গিয়েছেন। আমি নিজেও যারপরনাই বিস্মিত বোধ করলুম। বিস্মৃতির ভস্মস্তূপ থেকে প্রেম-প্রণয়ের কাহিনীটা আবিষ্কার করার সংবাদ এই আমি প্রথম শুনলুম।

প্রশান্ত লাহিড়ী বললেন, "অতএব আপনার প্রণয়িণীর হত্যাকারী ধরা পড়ে তা আপনি নিশ্চয়ই চান। নয় কি?"

"ও—ইয়েস। অবশ্যই চাই।"

"তা হলে বলুন, পেড্রোর ওপর আপনার সন্দেহ হয় কি না?"

"না। ছেলেটাকে বার কয়েক দেখেছি আমি। তা ছাড়া লক্ষ্মীর ওখানে যে টাকা আছে সে খবর ওর জানবার কথা নয়।"

"আমারও সেই রকমের ধারণা। বাবুরাও সম্বন্ধে মনে মনে কোনো কিছু ভেবে দেখেন নি আপনি?"

"দেখেছি, মিস্টার লাহিড়ী। কিন্তু ওর একলার পক্ষে এমন সাংঘাতিক কাজ করা অবিশ্বাস্য মনে হয়।"

"রূপকুমারীর সঙ্গে যদি হাত মিলিয়ে থাকে?"

"তিন লক্ষ টাকা বেমালুম হজম করা উভয়ের পক্ষেই অসম্ভব।"

"যদি তিনজনের হাত একসঙ্গে মিলিত হ'য়ে থাকে?"

"হ্যাঁ, তিনজনের হাত মিলিত হয়েছে বলেই আমার বিশ্বাস।" ঘাড়ের মাংস দুলিয়ে ডাক্তার প্যাটেল ডান হাতটা ফেলে রাখলেন টেবিলের ওপর। নিশ্চিন্ত বোধ করার ভঙ্গীটা সুস্পষ্ট হ'ল।

প্রশান্ত লাহিড়ী বললেন, "তৃতীয় ব্যক্তি বলতে তো বাকী থাকেন খান্দুভাই।"

"ও, গড্! তাঁর কথাই তো প্রথম দিন থেকে মনে পড়ছে আমার।" চেয়ারের গায়ে এলিয়ে পড়লেন ডাক্তার প্যাটেল।

"কেন বলুন তো?" প্রশ্ন করলেন ইনসপেক্টর লাহিড়ী।

"লোকটার সাংঘাতিক টাকার অভাব যাচ্ছে।"

"কি ক'রে জানলেন?"

"চারদিকেই শুনতে পাচ্ছি।"

"একটা দিকের নাম বলুন দয়া ক'রে।"

"ব্যাঙ্কের ম্যানেজার সেদিন বলছিলেন কথায় কথায়। অদ্ভুত যোগাযোগ হ'ল। ব্যাঙ্কে আমারও একটা একাউণ্ট আছে।"

একটু নড়ে চড়ে বসলেন প্রশান্ত লাহিড়ী। সিগারেটের প্যাকেট বার ক'রে এগিয়ে ধরলেন ডাক্তার প্যাটেলের দিকে। ধূমপানের অভ্যাস নেই ব'লে

সিগারেট তিনি নিলেন না। শুধু ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন।

প্রশান্ত লাহিড়ী জিজ্ঞাসা করলেন, "লক্ষ্মী দেবী তিন লাখ টাকা হঠাৎ কেন বাড়ি নিয়ে এলেন তার কারণ কিছু আপনি জানেন কি?"

"না। এটাও আমার কাছে একটা মস্তবড় বিস্ময়। তবে হ্যাঁ, ক'মাস থেকে শরীরটা ওর ভাল যাচ্ছিল না। এন্‌জাইনা পেক্টোরিস। একবার হার্টের ওপর একটা আক্রমণ হ'য়ে গিয়েছে। হয়তো ভেবেছিল, টাকার অভাবের জন্য চিকিৎসার অসুবিধা ঘটতে পারে। হাতের কাছে নগদ টাকা রাখা দরকার। কিংবা—"

বাধা দিয়া প্রশান্ত লাহিড়ী প্রশ্ন করলেন, "এই তিন লাখ টাকার কথা আপনি কি জানতেন না?"

"জানতাম ব্যাঙ্কে আছে। লক্ষ্মী নিজেই আমায় বলেছে। ইদানিং খান্দুভাই-এর ঘন ঘন যাওয়া-আসা দেখে কেমন একটু সন্দীহান হ'য়ে উঠেছিলাম। সব সময়েই রূপকুমারী তাঁর সঙ্গে থাকত। লক্ষ্মীকে এর কারণ সম্বন্ধে প্রশ্নও করেছি। পরিষ্কার জবাব কিছু দেয় নি সে। শুধু বলত, আত্মীয়-স্বজনেরা দেখতে আসবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে।"

"অশেষ ধন্যবাদ, আপনার সাহায্যের কথা মনে থাকবে আমার—"

মনে হ'ল প্রশান্ত লাহিড়ী বুঝি উঠে পড়ছেন। কিন্তু তা নয়, ঝুঁকে ব'সে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন দু' একটা আমায় দিতে পারেন কি, ডাক্তার প্যাটেল?"

"অব কোর্স—কেন দেখাতে পারব না?" ডান দিকের ড্রয়ার খুলে তিনি একটা ফাইল বার করলেন। ইনস্‌পেক্টর লাহিড়ীর দিকে ফাইলটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, "দেখুন।"

পাশে ব'সে আমিও রিটার্নগুলো দেখতে লাগলুম। বেশ মোটা টাকা ইন্‌কাম ট্যাক্স দেন ডাক্তার প্যাটেল। গত দু' বছরের ট্যাক্সের পরিমাণটা খুব বেশি। কিন্তু তার আগে যা দিতেন তা অত্যন্ত সামান্য।

প্রশান্তবাবু ফাইলের দিকে চোখ রেখে বললেন, "গত দু' বছর থেকে আপনার প্র্যাকটিস খুব বেড়ে গিয়েছে দেখছি। অথচ তার আগে আপনার ইনকম খুবই কম। বছর পাঁচ আগে তো কোনো ট্যাক্সই আপনি দেন নি। এতোগুলো বিলেতী ডিগ্রী কাজে লাগে নি বুঝি?"

জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলেন না ডাক্তার প্যাটেল।

ফাইলটা রেখে দিয়ে প্রশান্তবাবু বললেন, "আপনার ডাইরী বইগুলো একবার দিন তো। আশা করি আপনার কোনো অসুবিধে হবে না?"

"কিছু না। আপনাদের সঙ্গে তো সার্চ ওয়ারেন্ট আছেই।" ডাক্তার প্যাটেল উঠে গিয়ে শেল্‌ফের ওপর থেকে তিনখানা ডায়েরী বই নিয়ে এলেন। গত তিন বছর ধ'রে যে-সব রোগী দেখেছেন তাঁদের নাম-ঠিকানা লেখা আছে এতে।

ইন্‌কাম ট্যাক্সের হিসেবের জন্য লিখে রাখতে হয়। ডাক্তার প্যাটেলের টাকা পয়সার হিসেব দেখবার জন্য প্রশান্ত লাহিড়ী কেন এতো ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন বুঝতে পারছিলুম না। বিলের টাকা সময়মতো না দেওয়ার অভ্যাস অনেকেরই থাকে। বিশেষ ক'রে যাঁদের অভাব নেই তাঁরাই বিলের টাকা দিতে গণ্ডগোল করেন বেশি। এই ধরনের লোক মালদা শহরেও আমি দেখেছি। এ'রা ধনী লোক ব'লেই ইজ্জতের ভয় করেন না। যাঁদের আর্থিক অবস্থা ভাল না তাঁরাই ইজ্জত রক্ষার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে ওঠেন। বিলের টাকা শোধ ক'রে দেওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন।

মরক্কো চামড়া দিয়ে বাঁধানো ডায়েরী বই তিনখানা খুব মনোযোগ সহকারে দেখলেন প্রশান্ত লাহিড়ী। তাঁর মুখের ভাব দেখে মনে হ'ল গুটি কয়েক রোগীর নাম-ঠিকানা মুখস্থ করছেন বুঝি। আমি ধৈর্য হারিয়ে ফেলছিলুম। ব'সে প্রশান্ত লাহিড়ীর গাম্ভীর্যপূর্ণ তদন্ত-পদ্ধতি নিরীক্ষণ করতে আর ভাল লাগছিল না। বিলেতী ডিটেকটিভ উপন্যাস প'ড়ে বোধ হয় লোকটি চতুর হওয়ার চেষ্টা করছেন। উপন্যাসে যা ঘটে বাস্তবক্ষেত্রে তার পুনরাবৃত্তি হয় কি?

ডাইরী বইগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে প্রশান্ত লাহিড়ী বললেন, "কয়েকজন রোগীর নাম দেখছি প্রায় প্রতি মাসেই লেখা আছে। তিন বছর ধ'রেই চিকিৎসা করছেন। এ'দের ব্যাধিটা কি?"

"হঠাৎ স্মরণ করা মুশকিল।"

"তা ঠিক। দেখুন, লক্ষ্মী দেবীর নাম তো কোথাও দেখছি না?"

"তাঁর কাছ থেকে কখনো আমি ফী নিই নি।"

"ও, হ্যাঁ। যাঁকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসা যায় তাঁর কাছ থেকে ফী নেওয়া অসম্ভব। বড় বড় ডাক্তাররা তো শুধু চিকিৎসক নন, মানুষও। ধন্যবাদ ডাক্তার প্যাটেল। আজ আমরা উঠছি। তদন্তের ব্যাপারে আপনি আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করলেন। দরকার হ'লে আবার আসব।"

"অবশ্যই আসবেন। দুপুর বেলাতেই আমি একটু ফ্রী থাকি। সকাল-সন্ধ্যায় রোগীর ভিড় এতো বেশি হয় যে, কথা বলার ফুরসৎ থাকে না। নমস্কার।"

দরজা পর্যন্ত ডাক্তার প্যাটেল এলেন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে। দ্বিতীয়বার নমস্কার বিনিময় হ'ল। তারপর দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন তিনি।

করিডোর ধ'রে ডান দিকে এগিয়ে গেলুম আমরা। ঠিক সেই সময় লিফট-টা উঠে এল ওপরে। একজন ইয়োরোপীয়ান চারতলায় উঠেছেন। লিফ্‌টম্যান আমন্ত্রণ জানালো, "আইয়ে সাব।" লিফ্‌টের মধ্যে ঢুকে পড়লুম আমরা।

লিফ্‌টম্যানটি বিহার প্রদেশের লোক। বকবক করার বদ অভ্যাস আছে। জিজ্ঞাসা করল, কোথায় গিয়েছিলুম আমরা। প্রশান্ত লাহিড়ী সহসা যেন নতুন আলোর সন্ধান পেলেন। সংবাদ সংগ্রহের যোগ্য লোক ব'লে লিফ্‌ট-ম্যানটির সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় মত্ত হ'য়ে উঠলেন। আলাপ-আলোচনা করতে করতে সে ব'লে উঠল, "উ ডাগ্‌তর নেহি, চোট্টা।"

"চোট্টা?" গভীর বিস্ময়ের ভান ক'রে প্রশ্ন করলেন প্রশান্তবাবু।

"জী, হাঁ।"

"কেন, টাকা পয়সা তো বহুত রোজগার করেন—"

"কুছ নেহি। সব ঝুট্‌ হ্যায়।"

"কেন রোগী আসে না এখানে?"

"হাম্‌ তো কভি দেখ্‌তা নেহি। শুনা হ্যায় ডাগ্‌তর সাহেব কো একঠোই রোগী থে.........উ তো আভি খুন হো গিয়া।"

আমরা বেরিয়ে এলুম রাস্তায়। খান্দুভাই-এর অফিস থেকে যে-মনোভাব নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলুম, এখনকার

মনোভাবও ঠিক সেই ধরনের। তখন ভেবেছিলুম, আসল অপরাধী হচ্ছেন খান্দুভাই। এখন ভাবছি, খান্দুভাই নন, ডাক্তার প্যাটেল।

আমার চারদিকের জগতটাকে সত্যিই বিচিত্র মনে হ'তে লাগল। লক্ষ টাকার বিনিময়েও এমন অভিজ্ঞতার স্বাদ পাওয়া যায় না।

॥ নয় ॥

রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে নোট বইতে কি যেন লিখলেন ইনস্‌পেক্টর লাহিড়ী। যে কাজই করেন সেটাই যেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব'লে মনে হয়। আমি ভাবি, এবার নিশ্চয়ই রহস্য-সমাধানের সূত্রটা খুঁজে পেলেন প্রশান্তবাবু। কিন্তু পর মুহূর্তেই ভুল ভেঙে যায় আমার। তাঁর কথা শুনে ধারনা জন্মায়, গোলকধাঁধার পথটা খুঁজে পান নি।

ট্যাক্সিতে উঠে প্রশান্ত লাহিড়ী বললেন, "ডাক্তার প্যাটেলের দু' একটি রোগীর সঙ্গে দেখা ক'রে আসি, চলুন।"

"তাঁরাও এই খুনের সঙ্গে জড়িত ব'লে সন্দেহ করছেন না কি?"

"তদন্ত করতে নেমে আমরা সবাইকে সন্দেহ করি। ব্যাপারটা তা নয়। ডাক্তারের ডায়েরী বইতে দেখলাম, কয়েক-জন রোগী গত তিন বছর ধরে ক্রমাগত চিকিৎসা করাচ্ছেন। রোগ সারছে না, অথচ একই ডাক্তারকে ডেকে পাঠাচ্ছেন তাঁরা—কেমন একটু অস্বাভাবিক ঠেকছে না?"

"না, মশাই আমি আর কোনো মতা-মত প্রকাশ করব না। বড় সাংঘাতিক লোক আপনি। আমাকে বোকা বানাবার জন্য সব সময়েই প্রস্তুত হ'য়ে আছেন। যদি বলি অস্বাভাবিক, তার পরের মুহূর্তেই প্রমাণ ক'রে দেবেন এইটেই স্বাভাবিক।"

আমার কথা শুনে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন প্রশান্তবাবু। মধ্য-বয়সী ভদ্র-লোকটি যখন হাসতে থাকেন তখন তাঁকে অত্যন্ত সরল প্রকৃতির একটি ভালমানুষ ব'লে মনে হয়। দুঁদে সি-আই-ডি ব'লে ভাবা যায় না। মানবচরিত্রের স্ব-বিরোধী দিকগুলো প্রতিদিনই চোখে পড়ছে আমার। পেড্রো তো ইতিমধ্যেই বোকা বানিয়ে দিয়েছে আমাকে। মীনাক্ষীর গল্প যা শুনে এলুম তাতেও বিস্মিত বোধ করেছি। মনে হয়েছে, মালদা [illegible] মন্মথবাবুর মেয়ে এ নয়। অন্য কেউ হবে বুঝি। পেড্রোর মতো একটা দুর্ধর্ষ গুণ্ডাকে ভাগিয়ে আনবার ক্ষমতা রাখে সে। মালদা শহরের মতো ছোট জায়গায় যারা বাস করে তাদের বোধ হয় কোনোকালেই বুদ্ধি পাকে না। আজীবন তারা ছেলেমানুষ থাকে। মানবচরিত্রের জটিলতা আমরা বুঝতে পারি না। কল-কাতার 'পান্থনিবাস'-এ কয়েক মাস বাস করলেই সারাজীবনের অজ্ঞতা লোপ পেয়ে যায়। ট্যাক্সিতে ব'সে হঠাৎ আজ ম্যানেজার বাবুর কথা মনে পড়ল। পরেশবাবুর মত শিক্ষিত লোক তিনি নন। গৌরাঙ্গ বাউলের সঙ্গে বউ তাঁর পালিয়ে গিয়েছে। নিজের ভুল বুঝে স্ত্রী তাঁর একদিন ফিরে আসবে তেমন দার্শনিক মনোভাব নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে দিন কাটাতে পারেন নি তিনি। হোটেলের ঘরে ব'সে তিলে তিলে মর-ছেন। এক ঘণ্টার জন্যও ঘরটার বাইরে আসেন না। সংসারের কারো সঙ্গেই সম্পর্ক রাখেন নি। পান্থনিবাস-এর মধ্যেই সারা বিশ্বটা সীমাবদ্ধ হ'য়ে গেছে। তিনি মনে মনে সত্যিই বিশ্বাস করেন, তাঁর বন্ধু ইনস্‌পেক্টর লাহিড়ী একদিন-না-একদিন বউকে তাঁর খুঁজে এনে দেবেন। শশীবাবুর এই ভ্রান্ত ধারনাটা ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা আমি করি নি।

ট্যাক্সিওয়ালা ব'লে উঠল, "আন্ধেরী আ গিয়া।"

"ও, তাই না কি? চলুন ভাস্করবাবু, এখানেই নেমে পড়ি। তরপর বাড়ির ঠিকানাটা খুঁজে বার করা যাবে।"

নেমে পড়লুম আমরা।

যা ভেবেছিলুম তাই। পুরনো রোগীর ঠিকানা খুঁজছেন প্রশান্তবাবু। আমি রাস্তায় অপেক্ষা করতে লাগলুম। সন্ধ্যে হ'য়ে এসেছে। অফিসের ভিড় চোখে পড়ল আমার। কিন্তু কোথাও কোনো হৈ-হুল্লোড় নেই। গায়ের ওপর লাফিয়ে পড়ছে না কেউ। শৃঙ্খলাবদ্ধ ভিড়। কলকাতার ঠিক উল্টো।

প্রায় আধঘণ্টা পর ফিরে এলেন প্রশান্ত লাহিড়ী। বললেন, "না, ডাক্তার প্যাটেলের রোগী এখানে কেউ নেই। ডায়েরী বইতে মিথ্যে নাম আর ঠিকানা লিখে রেখেছেন ব'লে সন্দেহ হচ্ছে আমার। খবর নিলাম, এই ঠিকানায় ডাক্তার প্যাটেলের রোগী কোনোদিনই বাস করে নি।"

"এর অর্থ কি?"

"ক্রমে ক্রমে অর্থটা পরিষ্কার হবে। এখন ভাবছি, রোজগার তাঁর কিছুই নেই।"

"অতো টাকা ইন্‌কামট্যাক্স দেন কি ক'রে?" প্রশ্ন করলুম আমি।

"একটা পূর্ব-পরিকল্পনার আভাস পাচ্ছি। ইন্‌কাম নেই, অথচ ইন্‌কাম ট্যাক্স দিয়ে যাচ্ছেন—ব্যাপারটা একটু সন্দেহজনক মনে হচ্ছে না আপনার?"

"না মশাই, আমি আর কাউকে সন্দেহ করব না। নিজেকে বোকা বানাবার ইচ্ছে নেই আমার।" হাসতে লাগলুম আমি।

"তা হ'লে চলুন একবার মালাবার হিল্‌সে যাই। সেখানেও একজন রোগীর ঠিকানা আছে।" ট্যাক্সি ডাকলেন প্রশান্ত লাহিড়ী।

গাড়িতে উঠে জিজ্ঞাসা করলুম, "কাল তো রূপকুমারীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। জেরা করতেও ছাড়েন নি। সে কি বলে?"

"প্রথমে তো কথা বলতে চায় না, শুধু রেগে ওঠে। বড্ড বদমেজাজী। মিষ্টি কথা ব'লে শেষ পর্যন্ত ঠাণ্ডা করলাম। আপনি যে এসেছেন এখানে তা সে জানে। আদালতে দেখেছে আপনাকে। জানতে চেয়েছিল, বাবা কিংবা পরেশ-বাবুও এসেছেন কি না। বললাম, না তাঁরা আসেন নি। হাজত-বাসের পর মনে হ'ল খানিকটা লজ্জাবোধ এসেছে রূপ-কুমারীর। খান্দুভাই সম্বন্ধে প্রশ্ন করলাম তাকে। সে বললে যে, ঘটনার দিন খান্দুভাই ওকে নিয়ে গিয়েছিলেন লক্ষ্মীদেবীর কাছে। লক্ষ্মীদেবী শোবার ঘরে ছিলেন। সে গিয়ে সোজাসুজি ঢুকে পড়েছিল সেইখানে। বাবুরাওকেও সে দেখেছিল। বাড়ির সামনে ঘোরাঘুরি করছিল। সেদিন তিনি নিজেই গাড়ি চালিয়ে এসেছিলেন, সঙ্গে ড্রাইভার ছিল না। বাবু রাও-এর সঙ্গে কথা বললেন খান্দুভাই। একটা কথাও বুঝতে পারে নি রূপকুমারী। কারণ, গুজরাটি ভাষায় কথাবার্তা হচ্ছিল। তবে হ্যাঁ, সেদিন বাবু রাও-কে একটু চিন্তিত দেখাচ্ছিল। মনে হয়েছিল, সে যেন খান্দুভাই-এর জন্যই অপেক্ষা করছিল বাড়ির সামনে। যাই হোক, সন্ধ্যের সময় একলাই ফিরে গিয়েছিলেন তিনি। লক্ষ্মী দেবীর অনু-রোধে রূপকুমারী থেকে গেল। ট্যাক্সি ক'রে ওকে তাজমহল হোটেলে পাঠিয়ে দেবেন ব'লে কথা দিলেন লক্ষ্মী দেবী।"

"ফিরে গিয়েছিল কার সঙ্গে?" জিজ্ঞাসা করলুম আমি।

"সেইটেই একটা রহস্য। রূপকুমারী বলছে খান্দুভাই ড্রাইভার দিয়ে গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। হর্ণ বাজিয়েছেন

ড্রাইভার। কিন্তু আপনি তো জানেন, বাবু রাও কালকে অন্য কথা বলেছে। কেউ একজন মিথ্যে কথা বলছে। এখানেই নেমে পড়ি আসুন—"

যেখানে নামলুম আমরা সেখান থেকে পেড্রোর বাড়িটা কাছেই। বোধহয় দু'খানা বাড়ি পরে। এবারেও আমি রাস্তায় অপেক্ষা করতে লাগলুম। নোট বই বার ক'রে ঠিকানাটা একবার দেখে নিলেন প্রশান্তবাবু। আমি পায়চারি করতে লাগলুম। হাঁটতে হাঁটতে একবার চ'লে গেলুম পেড্রোর বাড়ির দিকে। হ্যাঁ, ঠিকই হয়েছে। দুটো বাড়ির পরেই পেড্রোর বাড়িটা দেখতে পেলুম। গাড়ি-বারান্দাটার তলায় একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখলুম। ওটা কি পেড্রোর গাড়ি না কি? নতুন গাড়ি ব'লেই তো মনে হচ্ছে। আবার আমার বুকের হাড়ে জ্বলুনী আরম্ভ হ'ল। মালদার পেড্রো গুণ্ডার কথা কিছুতেই ভুলতে পারছি না। সেখানে চালচুলো কিছু ছিল না, এখানে সে মালাবার পাহাড়ে থাকে! পরিবর্তনটা বড্ড বেশি আকস্মিক। ভগবানের লীলা-রহস্য বোঝা মুশকিল। লগ্ কেবিন থেকে হোয়াইট হাউসের গল্পটা শুনেছি। এখন মালদা থেকে মালাবার-এর গল্পটা ছবির মতো চোখের ওপর ভেসে উঠল। পেড্রোর আর অভাব কিছু নেই। শুধু মীনাক্ষীকে পেলে ষোল আনা আশা ওর পূর্ণ হয়। জেল থেকে মুক্তি পেলে মীনা কি করবে বুঝতে পারছি না। যদি সে পেড্রোকে ভাল না বাসে তাহ'লে কার কাছে যাবে? পরেশবাবু নিশ্চয়ই ওকে আর গ্রহণ করবেন না। মন্মথবাবুর মতো শান্তি-প্রিয় মানুষ কি একটি লকলকে আগুনের শিখাকে ঘরে রেখে মালদা শহরে বাস করতে পারবেন? তা ছাড়া অতো বড় উচ্চাকাঙ্ক্ষা বুকের তলায় চেপে রেখে মীনাক্ষীর পক্ষেও ছোট শহরে বাস করা অসম্ভব হবে। তবে সে যাবে কোথায়? ছাই ফেলতে ভাঙা কুলোর মতো আমি অবিশ্যি ওর সামনেই পড়ে রয়েছি। মীনাকে আশ্রয় দেওয়ার লোভ আমারই বোধহয় সবার চেয়ে বেশি। ঘরবাড়ি ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়বার দৃষ্টান্তটা কি চোখে পড়বে না মীনার?

ফিরে এলুম নিচুর দিকে। প্রশান্ত-বাবু অপেক্ষা করছিলেন। ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করলুম, "কি হ'ল?"

"ঐ নামে কোনো লোক এখানে নেই। কোনোদিনই ছিল না। খুনের রহস্যটা ক্রমশই জট পাকিয়ে যাচ্ছে। এখন আপনি কি করবেন, ভাস্করবাবু? আমি একবার

সি-আই-ডি বিভাগের বড় সাহেব মিস্টার মাইতারের সঙ্গে দেখা ক'রে যাব। সাড়ে ছ'টায় তাঁর সঙ্গে দেখা করার কথা।"

"আমি হোটেলে ফিরে যাব।"

এই সময় একটা গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে পড়ল আমাদের পাশে। পোলো টুপী পরা মাথাটা গাড়ির বাইরে বার ক'রে দিয়ে পেড্রো জিজ্ঞাসা করল, "এখানে কি করছ, ভাস্করদা? আরে, দাদা যে!" গাড়ি থেকে নেমে প্রশান্ত লাহিড়ীর পা-এর ধুলো নিতে যাচ্ছিল পেড্রো। কিন্তু বাধা দিয়ে তিনি বললেন, "থাক, থাক। এতো ভক্তি তোমার তো থাকবার কথা নয়।"

"তা ঠিক, আমি তো গুণ্ডা—" গম্ভীর হ'য়ে গেল পেড্রো।

প্রশান্ত লাহিড়ী বললেন, "আমি চলি। ঐ একটা ট্যাক্সি আসছে।"

চ'লে গেলেন ইনস্পেক্টর লাহিড়ী।

গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে সিগারেট ফুঁকছিল পেড্রো। এই দৃশ্যটা মালদা শহরের গলির অন্ধকারে কতবার চোখে পড়েছে। কতদিন ভয় পেয়ে আঁৎকে উঠে লাফিয়ে স'রে গিয়েছি দূরে। হো হো ক'রে হেসে উঠেছে পেড্রো। আগে সে পা'-জামা পরত। মাথায় লাগাত পোলো টুপী। তারপর কোথা থেকে একটা খাকী ট্রাউজার জোগাড় করল। এখন সন্দেহ হচ্ছে, খাকী ট্রাউজার কেনবার পয়সা দিয়েছিল মীনাক্ষী। এক মেয়ে ব'লে মন্মথবাবু মীনাক্ষীর হাতে টাকা দিতে কার্পণ্য করেন নি কখনো।

গাড়ির গায়ে হাত বুলতে লাগলুম আমি। বললুম, "খাসা গাড়ি কিনেছিস পেড্রো। তোর দেহের মতো মজবুত। কতো পড়ল রে?"

"বারো হাজার। প্রথম পাঁচ হাজার নগদ দিয়েছি। তারপর কিস্তী চলছে। চলো না ভাস্করদা, বোম্বে শহরটা ঘুরিয়ে নিয়ে আসি তোমায়। যাবে?"

"মাগনা মদ বামুনেও খায়। যাব নিশ্চয়ই। হ্যাঁ রে পেড্রো, রূপকুমারীকে পাশে বসিয়ে হাওয়া খেতে যাস নি কখনো?"

"না।"

"কেন?"

"সে বলত, গুণ্ডার সঙ্গে মেলামেশা করলে লোকে অপবাদ দেবে। আমার কপালে একটা দাগ দেখছ, ভাস্করদা?" পোলো টুপীটা মাথা থেকে আলগা ক'রে তুলে ধরল সে। আমি দেখলুম, কপালে ওর সত্যি সত্যি একটা দাগ রয়েছে। আধ ইঞ্চির মতো লম্বা। বললুম, "হ্যাঁ, দাগ তো একটা দেখতে পাচ্ছি। রাজটিকা না কি রে? কই আগে তো কখনো দেখি নি?"

"আগে ছিল না। রাজটিকাই বটে! মীনাক্ষী একদিন জুতো ছুঁড়ে মেরেছিল। তাজমহল হোটেলে গিয়েছিলাম দেখা করতে। সেখানে গেলে ভীষণ রেগে যেত সে। বলত, বয়বাবুর্চিরা দেখতে পেলে নিন্দে করবে।"

জিজ্ঞাসা করলুম, "তা হ'লে যেতিস কেন?"

"মীনাক্ষী একদিন চিঠি লিখে জানিয়েছিল টাকার অভাবে পড়েছে। তাই টাকা দিতে গিয়েছিলাম। আমাকে দেখেই ব'লে উঠল সে, 'বর্বর খৃষ্টীয়ান, লোক দিয়ে কিংবা মণিঅর্ডার ক'রে টাকাটা পাঠাতে পারলে না? তোমার অনুগ্রহ আমি চাই না। পনরো হাজার টাকার গহনা তুমি রেখে দিয়েছ। সেটা বাঁধা রেখে আমায় হাজার পাঁচেক টাকা এনে দাও।' আমি দু' হাজার টাকা ওর দিকে এগিয়ে ধ'রে বললাম, 'গহনাগুলো হাত-ছাড়া ক'রো না। টাকা লাগে আমি আরও দেব।' টাকার বাণ্ডিলটা আমার হাত থেকে ছোঁ মেরে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠল মীনা, 'এতো বড় আস্পর্দার কথা! আমি তোমার রক্ষিতা না কি? বেরিয়ে যাও এখান থেকে—' তবু দাঁড়িয়ে রইলাম ব'লে পা থেকে জুতো খুলে নিয়ে ফস ক'রে মেরে বসল আমায়। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোতে লাগল। চ'লে যাচ্ছিলাম। বললে সে, 'নিরক্ষর চাষা, একটু দাঁড়াও।' ছুটে গিয়ে বাথরুম থেকে তুলো আর আইডিন নিয়ে এল। আমার কপালে আইডিন লাগাতে লাগাতে বলল, 'জুতোর গোড়ালিতে কতো ধুলোমাটি থাকে। সেপ্‌টিক হয়ে যেতে পারে তাও কি জানো না? ক্লাস সেভেনে তুমি স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান পড়ো নি, পাদ্রীদা? অশিক্ষিত মেষপালক আর কাকে বলে! যাও, মাঠে গিয়ে এবার ভেড়া চড়াও গে যাও। এখানে আর কখনো এসো না, বুঝলে?' আর কোনো দিনও তাজমহল হোটেলে যাই নি, ভাস্করদা। মাস খানেক আগের ঘটনা।"

"ভাল করেছিস না গিয়ে। রূপকুমারী তোকে ভালবাসে না রে—এতো অপমান তুই সহ্য করিস কি বলে, পেড্রো?"

সিগারেটের টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পেড্রো বলল, "আমি ওকে ভালবাসি কি না......তাই মান অপমানের প্রশ্ন কখনো আমার মনে ওঠে না। ভাস্করদা, আমায় তুমি আহাম্মক ভাবছ, তাই না?"

"তোর চেয়ে বড় আহাম্মক সংসারে আর দ্বিতীয়টি নেই। চল, এবার বোম্বে শহরটা একবার ঘুরিয়ে নিয়ে আয়। রূপালী সিনেমার মালিকদের গিয়ে বলব সব কথা।"

গাড়িতে স্টার্ট দিল পেড্রো।

দিন দুই হোটেল থেকে বাইরে বেরুলেন না প্রশান্ত লাহিড়ী। যখনি তাঁর ঘরে গিয়ে ঢুকি তখনি তিনি বলেন, "তদন্ত শেষ হয়েছে। মনে মনে গল্পটাকে সাজাচ্ছি এখন। খুনীটাকে ধরেছি ব'লে আশা হচ্ছে। কিন্তু চোরটা এখনো জালে পড়ছে না।"

"তার মানে? খুনী আর চোর দুজন আলাদা আলাদা লোক নাকি?"

"সেই রকমই সন্দেহ হচ্ছে।"

"তবে কি টাকার জন্য লক্ষ্মীদেবীকে খুন করেনি?"

"টাকা চুরি করাটাই যে আসল উদ্দেশ্য তাতে আর সন্দেহ নেই।"

"না মশাই; আপনার ধাঁধার উত্তর আপনিই ঠিক করুন। আমার মাথায় ওসব কিছু ঢুকছে না। এই যে ইনস্পেক্টর দেশাই এসে গিয়েছেন। দুটিতে বসে দরজা বন্ধ ক'রে ভাবুন। পরে আমি শুনব সব।"

তৃতীয় দিনও প্রশান্তবাবু হোটেলেই রইলেন। সকালবেলা ইনসপেক্টর দেশাই একবার এসেছিলেন। সঙ্গে দেশমুখও ছিল। দরজা বন্ধ ক'রে কি যে ও'রা আলাপ-আলোচনা করলেন জানি না। জানবার আকাংখা আমার আর নেই। আমি শুধু ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করছি। মীনাক্ষী মুক্তি পেলেই হ'ল। ওর জন্যই তো আমার বোম্বে আসা।

সন্ধ্যার পর প্রশান্ত লাহিড়ী আমার ঘরে এলেন। বললেম যে, সকালের ডাকে কলকাতা থেকে চিঠি এসেছে। মেয়েটার জ্বর আরও বেড়েছে। ডাক্তার সন্দেহ করছেন, টাইফয়েড।

জিজ্ঞাসা করলুম, "তদন্তের কাজ যখন শেষ হয়েছে, তখন বাকী কাজটুকু

দেশাই-এর ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে কেমন হয়?"

"বাকীটুকুর জন্যই তো বোম্বে এসেছি। অর্থাৎ অপরাধীকে জল থেকে ডাঙায় তুলে আনতে হবে। প্রত্যেকটি আসামী তো দেখছি গভীর জলের মাছ। পেড্রো নিশ্চিন্ত মনে শুটিং-এ যোগ দিচ্ছে। খান্দুভাই অফিস নিয়ে ব্যস্ত। ডাক্তার প্যাটেলও বাড়ি থেকে বাইরে আসেন না। বাবু রাও দিব্যি রান্নাবাড়া ক'রে খেয়েদেয়ে আরামে ঘুম লাগাচ্ছে। আমরা শুধু ও'দের ওপর চব্বিশ ঘণ্টা চোখ রাখবার ঝামেলা পোয়াচ্ছি।"

"এই যে কাল বললেন, খুনীটার হদিস পেয়েছেন?"

"মনে মনে তো পেয়েছি। কিন্তু সাক্ষী-প্রমাণের তো দরকার। তা ছাড়া চোরটাকেও খুঁজে বার করা চাই।"

একটু পরে ইনসপেক্টর দেশাই এলেন। আমার ঘরে ব'সেই গল্প-গুজব চলতে লাগল। ও'দের মধ্যে মাঝে মাঝে তর্ক বিতর্ক হচ্ছিল। ইনস্পেক্টর দেশাই-এর বিশ্বাস, এর মধ্যে অন্য একটা অদৃশ্য হাত লুকনো আছে। কিন্তু ইনসপেক্টর লাহিড়ী বলেন, "না, এ'দের মধ্যেই খুনী, এ'দের মধ্যেই চোর।" প্রশান্তবাবুর এই যুক্তিটাও মেনে নেননি ইনসপেক্টর দেশাই। তাঁর ধারণা, যে খুনী সেই চোর।

রাত প্রায় দশটা। উঠে পড়েছিলেন ইনস্পেক্টর দেশাই। এমন সময় আমার দরজার ফাঁক দিয়ে দেখলুম, ওপাশে সেই পোলো টুপী পরা গুণ্ডাটি এসে উপস্থিত হ'ল। বাইরে থেকে জিজ্ঞাসা করল, "আসতে পারি কি, ভাস্করদা?"

"আয়, আয়। কি ব্যাপার এত রাত্রে? প্রশান্তবাবু, পেড্রো এসেছে।"

ভেতরে এল পেড্রো। উত্তেজনায় মুখের রেখা ভাঙাচোরা। সে বলল, "খান্দুভাই আর ডাক্তার প্যাটেল এক সঙ্গে লক্ষ্মীদেবীর বাড়ির দিকে গেলেন। খান্দুভাই গাড়ি চালাচ্ছিলেন, আর ডাক্তার প্যাটেল তাঁর দিকে ঝুঁকে ব'সে রয়েছেন দেখলাম।"

"কোথা থেকে আসছিলেন ও'রা?" জিজ্ঞাসা করলেন প্রশান্ত লাহিড়ী।

"তা তো আমি দেখিনি।"

"আর দেরি করবেন না, মিস্টার দেশাই। ওহে পেড্রো সাহেব তোমার সঙ্গে গাড়ি আছে কি?" জিজ্ঞাসা করলেন প্রশান্ত লাহিড়ী।

"আছে।"

"তা হ'লে তোমার গাড়িতেই যাই। ডাক্তার প্যাটেল কিংবা খান্দুভাই তোমার গাড়িটাকে চেনেন?"

সেখানে যাওয়ার। তবে লক্ষ্মীদেবীর বাড়ি পর্যন্ত যাওয়া যায় না। খানিকটা মাঠ পার হ'য়ে দেওয়াল টপকে তবে ভেতরে প্রবেশ করা যায়। প্রশান্ত লাহিড়ী বললেন, "সেই পথই আমাদের ধরতে হবে। পেড্রো সাহেব, আরও একটু জোরে চালাও। ভাগ-বাটোয়ারা হ'য়ে যাওয়ার পর যদি স'রে পড়ে তা হ'লে ওখানে গিয়ে লাভ হবে না।"

"এতো বড় আস্পর্দার কথা। আমি তোমার রক্ষিতা না কি?"

"বোধ হয় না।"

"মিস্টার দেশাই আপনি একবার বড়সাহেবকে ফোন ক'রে বলুন, আমরা ওখানে যাচ্ছি।"

জিজ্ঞাসা করলুম, "আমায় সঙ্গে নেবেন না?"

"বেশ তো, চলুন না—"

যে-রাস্তা দিয়ে প্রথমদিন আমরা লক্ষ্মীদেবীর বাড়ি গিয়েছিলুম, সেই রাস্তাটা এড়িয়ে যেতে বললেন প্রশান্ত লাহিড়ী। অন্য একটা রাস্তাও ছিল

গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিল পেড্রো। যেখান থেকে রাস্তাটা দু'দিকে আলাদা হ'য়ে গিয়েছে সেইখানে পৌঁছতেই ইনসপেক্টর দেশাই বললেন, "একটু দাঁড়াও, পেড্রো সাহেব। ঐ কে যাচ্ছে সাইকেলে চেপে? দেশমুখ না?"

হ্যাঁ, দেশমুখই বটে। সাইকেল থেকে নেমে প'ড়ে দেশমুখ বলল, "আপনাকে টেলিফোন করতে যাচ্ছিলাম, স্যার।"

"কেন, কি ব্যাপার?"

একটু আগে খান্দুভাই আর ডাক্তার প্যাটেল বাড়ি থেকে নামলেন। খান্দুভাই

আগে আগে আর ডাক্তার প্যাটেল পেছনে। খান্দুভাই-এর পিঠে পিস্তলের মুখটা ঠেকিয়ে রেখেছেন ব'লে খবর দিল আমাদের ওখানকার ইন্‌ফরমার।"

"তা হ'লে ডাক্তার প্যাটেল তাঁকে জোর ক'রে ধরে এনেছেন—এ তো দেখছি আবার নতুন গণ্ডগোলের সৃষ্টি হ'ল। আমরা যা ভেবেছিলাম তা নয়। চলো, পেড্রো সাহেব—শিগ্‌গীর।" তাড়া দিলেন প্রশান্ত লাহিড়ী।

রাস্তাটা পার হ'য়ে এল পেড্রো। তারপর মাঠ। এক মুহূর্তের জন্যও দ্বিধা করল না সে। গাড়িটা নামিয়ে দিল মাঠের মধ্যে। প্রশান্তবাবু বললেন, "এ কি করছ, গাড়িটা নষ্ট হয়ে যাবে না?"

"যায়, যাক।" বে-পরোয়াভাবে জবাব দিল পেড্রো।

পুরো মাঠ-টা গাড়িতে বসে অতিক্রম করা গেল না। মাঝখানে নেমে গেলুম আমরা। ছুটতে লাগলুম সবাই। প্রশান্ত লাহিড়ী সবার আগে। আমি অবিশ্যি একটু পেছনে প'ড়ে গিয়েছিলুম। পেড্রো আমার হাত চেপে ধরল। জিজ্ঞাসা করল, "কষ্ট হচ্ছে না কি, ভাস্করদা?"

"তা একটু হচ্ছে বৈ কি। তোরা হ'চ্ছিস গিয়ে গুণ্ডা আর পুলিশ। চড়াই-উৎরাই লাফিয়ে পার হ'য়ে যাওয়া তোদের অভ্যেস আছে। ও কি, অতো জোরে টানছিস কেন? ছাড়, ছেড়ে দে—আমি একাই যেতে পারব।" পেড্রো তবু আমার হাত ছাড়ল না। টানতে টানতে নিয়ে এল আমায়। প্রশান্ত লাহিড়ী আর দেশাই অবলীলাক্রমে উঠে গেলেন প্রাচীরের ওপর। পেড্রো তার ঘাড়টা নিচু করে দিয়ে বলল, "এখানে পা রেখে উঠে পড়ো তুমি, ভাস্করদা।"

আপত্তি জানাবার সময় নেই। আমি দেখলুম, ও'রা দু'জন প্রাচীরের ও-পাশে নিঃশব্দে নেমে পড়লেন। পেড্রোর ঘাড়ের ওপর উঠে পড়লুম আমি। খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। প্রাচীরটা টপকাতে কষ্ট হ'ল না আর। এক মুহূর্তের মধ্যে পেড্রোও নেমে এল লক্ষ্মীদেবীর বাগানে।

এবার ইনসপেক্টর দেশাই চললেন আগে আগে। পথঘাট তাঁর চেনা। পা টিপে টিপে পথ চলছিলুম আমরা। ইনসপেক্টর দেশাই দেখলুম পকেট থেকে রিভলবারটা বার করে হাতে রাখলেন। ব্যাপার দেখে আমার মনে হল, এটা বোধ হয় পেড্রোর ফাইটিং পিক্‌চারের রিহারসেল হচ্ছে। এই ছবিটার নাম কি 'বাগদাদ কা খুনী?'

লক্ষ্মীদেবীর বাবুর্চিখানাটা পেছন দিকে। পর পর তিন চারখানা ঘর ব্যারাকের মতো পাশাপাশি। এর মধ্যে একটা ঘরে বাবু রাও থাকে। জানলাটা এখন খোলা রয়েছে। আমরা এসে ঐ জানলার কাছে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলুম। সাধারণ বাঙালীর চেয়ে প্রশান্ত লাহিড়ী লম্বা। গোড়ালীর ওপর ভর দিয়ে তিনি বাবু রাও-এর ঘরের দৃশ্যটা দেখে নিলেন একবার। তারপর আমরাও এক এক ক'রে ঘরের ভেতরটা দেখলুম।

সত্যই নাটকীয় ব্যাপার। ডাক্তার প্যাটেল খান্দুভাই-এর বুকের সঙ্গে পিস্তলের মুখটা ঠেকিয়ে রেখেছেন। চৌকির ওপর ব'সে বাবু রাও ভয়ে ঠক ঠক ক'রে কাঁপছে। ডাক্তার প্যাটেল বললেন, আমি জানি লক্ষ্মীর টাকার সন্ধান আর কারো জানা ছিল না। টাকাটা আপনারাই নিয়েছেন। স্বীকার করুন খান্দুভাই—নইলে আজ আপনারা আমার গুলী খেয়ে মরবেন। আমি ঘড়ি দেখছি, আর দু' মিনিটের সময় দিলাম—"

বাইরে দাঁড়িয়ে আমরাও মিনিট গুনতে লাগলুম। কী সাংঘাতিক উৎকণ্ঠাপূর্ণ অনিশ্চয়তা! প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছে দু' মিনিট ফুরিয়ে গেল বুঝি। এবার বোধ হয় গুড়ুম গুড়ুম আওয়াজ হবে। আওয়াজ হ'ল কিন্তু কান্নার। বাবু রাও কাঁদছে। ভয় পেয়েছে সে। মৃত্যুকে ভয় কে না করে? টিক টিক ক'রে সেকেণ্ডের কাঁটা ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে। ইনস্‌পেক্টর দেশাই-এর হাত থেকে রিভলবারটা নিয়ে নিলেন প্রশান্ত লাহিড়ী। জানলার গরাদের ফাঁক দিয়ে নলটা ঢুকিয়ে রেখে তিনিও ঘরের দৃশ্য দেখতে লাগলেন। আমার সারা শরীর ঘেমে উঠেছে। বাগদাদ কা খুনী'র নায়কটির কোমরটা যে কখন আমি জড়িয়ে ধ'রে রেখেছিলুম টের পাই নি তা। নিজের অজ্ঞাতসারে আর কি কি যে করেছি আজ আর তা মনে করতে পারছি না।

ডাক্তার প্যাটেলের কণ্ঠ থেকে সতর্ক-ধ্বনি উচ্চারিত হ'ল, "আর আধ মিনিট আছে, খান্দুভাই। বলুন, লক্ষ্মীর টাকা চুরি করেছে কে?"

এবার ভেউ ভেউ ক'রে কেঁদে উঠল বাবু রাও। কানে আঙুল দিলুম আমি। গুলীর শব্দটা শুনতে চাই না। থিয়েটার-ফিল্মে চার-পাঁচটা মৃত্যু ঘটলে আসে যায় না কিছু। ভয়ে আমার বুকের রক্ত জল হ'য়ে গিয়েছে। দেহের বাইরে এবং ভেতরে দুই স্তরেই জল। লক্ষ্মী দেবীর বাগানে আজ জোনাকীর অভাব নেই। অন্ধকারের ঘনত্ব ওরাই খানিকটা হাল্কা ক'রে দিচ্ছে। মৃত্যুর পরে লক্ষ্মী দেবী আবার হয়তো জন্মগ্রহণ করেছেন। এই অসংখ্য জোনাকীর মধ্যে একটা জোনাকী বোধ হয় তিনি নিজেই। আমাদের সঙ্গে লুকিয়ে লুকিয়ে তিনিও কি আজ এই দৃশ্যটা দেখতে এসেছেন? তাঁরই প্রেমাস্পদ ডাক্তার প্যাটেলকে দেখবার সাধ হয়েছে নিশ্চয়ই। একটা জোনাকী তার পুচ্ছদেশ থেকে আলোক বিকিরণ করতে করতে উঠে গেল জানলা পর্যন্ত।

খান্দুভাই-এর গলার সুর চিনতে পারলুম আমি। কম্পিত কণ্ঠে বললেন তিনি, "হ্যাঁ, টাকাটা আমিই চুরি করেছি।"

হেসে উঠলেন ডাক্তার প্যাটেল। হাসি থামতে সময় লাগল। তারপর তিনি দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন, "কখন নিলেন এবং কবে?"

"খুনের দিন সন্ধেবেলা। রূপকুমারী যখন মাসীমার সঙ্গে গল্প করছিল সেই সময় বাবু রাও স্নানঘরের জানলা দিয়ে টাকার বাণ্ডিলটা ফেলে দিয়েছিল বাগানে।"

"রূপকুমারী এ খবর জানে?"

"না। মাসীমাকে অন্য ঘরে ব্যস্ত রাখার কৌশলটা সে ধরতে পারে নি।"

ডাক্তার প্যাটেল আরও মিনিট দুই নীরব রইলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, "লক্ষ্মীকে খুন করল কে?"

"আমরা কেউ নই।"

"পুলিশ তা কখনো বিশ্বাস করবে না। ঘর থেকে পালাবার চেষ্টা করবেন না, খান্দুভাই। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ ক'রে দিচ্ছি। পুলিশকেও টেলিফোনে খবর দিয়ে আসি।"

"একটু দাঁড়ান, ডাক্তার প্যাটেল। লক্ষ্মী দেবীর সঙ্গে আপনার অবৈধ প্রণয় ছিল তা আমরা জানি। অনেক কিছু বাবু রাও স্বচক্ষে দেখেছে। মাসীমার টাকাটা আপনি একাই পাবেন ব'লে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করেছেন।

আসুন, তিন লাখ টাকা আমরা ভাগ করে নিই। আমরা যখন কেউ খুন করি নি, তখন ভয় করব কাকে? আপনি নিন দেড় লাখ, আমি এক লাখ আর বাবু রাও নিক পঞ্চাশ হাজার। রাজী?"

"টাকাটা কোথায়?"

"আমার গাড়ির পেছনের সীটের তলায়।"

আবার মিনিট দুই তিনের নৈঃশব্দ্য। গল্পটা শুনতে এবার আমার মজা লাগছিল। ভয়ের ভাবটা কেটে গিয়েছে। জোনাকীটাও দেখলুম, জানলা থেকে স'রে যাচ্ছে দূরে। চোরটাকেই বোধ হয় দেখতে এসেছিলেন তিনি। খুনীর সঙ্গে মোলাকাত তাঁর নিশ্চয়ই হয়েছিল। অন্তত প্রশান্ত লাহিড়ীর সেই রকমই বিশ্বাস।

ডাক্তার প্যাটেল বললেন, "খুনীটাকে না ধরতে পারলে, পুলিশের তদন্ত বন্ধ হবে না।"

খান্দুভাই বললেন, "রূপকুমারী আর পেড্রোর ওপর সন্দেহটা সৃষ্টি করতে পারা যায়...... যদি হাজার পঞ্চাশ টাকা পেড্রোর গাড়ির মধ্যে কোথাও রেখে আসতে পারেন। সেই সঙ্গে নোটের নম্বর লেখা লিস্টটাও থাকবে। তারপর পুলিশের কাছে একটা উড়ো চিঠি ছেড়ে দেওয়া...... দেখুন ডাক্তার প্যাটেল, আপনার এবং আমার দু'জনেরই টাকার দরকার খুব। এ মাসে আমার কর্মচারীরা মাইনে পায় নি এখনো। এবং আমরা বাঁচতেও চাই।"

"হ্যাঁ, প্ল্যানটা মন্দ নয়। আমাকে বরং আপনি এক লাখ টাকাই দিন। বাকী পঞ্চাশ হাজার পেড্রোর গাড়িতে রাখুন।" একটু থেমে ডাক্তার প্যাটেলই বললেন, "কিন্তু লক্ষ্মীকে সত্যি সত্যি খুন করল কে সেটাও তো জানা চাই খান্দুভাই।"

লক্ষ্মী মাসীমার তো হার্টের ব্যারাম ছিল। হঠাৎ কোন্ দিন টেঁসে যেতেন। আপনার জীবনটা তো মাসীমা নষ্ট ক'রে দিয়েছেন। তিন লাখ টাকার লোভ দেখিয়ে সারাটা জীবন প্র্যাকটিস করতে দেন নি। আপনার যৌবনটাও নষ্ট করেছেন তিনি। বিয়ে-সাদি পর্যন্ত করতে দিলেন না। যে ফ্ল্যাটে থাকেন আপনি তার ভাড়া বাকী পড়েছে ছ' মাসের। আপনার বাড়িওয়ালা আমার বন্ধু। যে-স্ত্রীলোক আপনার এতবড় সর্বনাশ ক'রে গিয়েছে তার হত্যাকারীর নাম জেনে আমাদের কি লাভ?"

"এ-সব গোপন খবর আপনি কার কাছে শুনলেন?"

"বাবু রাও সব জানে। ঐ দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকটি সব বলত বাবু রাওকে। আমার বিশ্বাস, পাপিষ্ঠাকে যে খুন করেছে সেও টাকার খবরটা জানত। আমাকেও চিনত সে। মাসীমার বাড়িতে ইদানিং ঘন ঘন আসছিলাম কি না—

সত্যই নাটকীয় ব্যাপার। ডাক্তার প্যাটেল খান্দুভাই-এর বুকের সঙ্গে পিস্তলের মুখটা ঠেকিয়ে রেখেছেন।

ভেবেছিল টাকাটা সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছি। তারপর ঘটনাসমূহের এমন যোগাযোগ ঘটল যে, খুনীটা সিন্দুক খুলে দেখে, টাকাটা বেহাত হ'য়ে গিয়েছে! আমার এমন ধারণা জন্মেছিল, মাসীমা নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছিল খুনীটাকে। সেইজন্য খুনীটা খুন করতে বাধ্য হ'ল তাকে। ডাক্তার প্যাটেল, এবার ভেবে দেখুন কী সাংঘাতিক একজন নষ্ট চরিত্রের স্ত্রীলোকের খপ্পরে পড়েছিলেন। আমার তো মনে হয় খুনীটা পুণ্য-কাজ ক'রে গিয়েছে। সে যে টাকাটা পেল না, খার্ড পারসন হিসেবে আমার ভা-রী কষ্ট তার জন্য। এবার চলুন, টাকাটা ভাগ ক'রে নিয়ে স'রে পড়ি আমরা। বাবু রাও-এর ভাগটা আমি রেখে দেব। মোকদ্দমা মিটে গেলে তুমি আমার অফিসে চ'লে এসো, বাবু রাও। বুঝলে?"

এই সময় জোনাকীটা আবার কোথা থেকে উড়ে এসে উঠে গেল জানলা পর্যন্ত। আমি নিঃসন্দেহ হলুম, জোনাকীটাই লক্ষ্মী দেবী। লুকিয়ে লুকিয়ে নিজের অতীত ইতিহাস শুনছেন। সুবিখ্যাত ঘোমপোটির মুখ থেকে লুকনো ইতিহাসটা শুনতে তাঁর ভাল লাগবে না জানি। কিন্তু উপায় কি? তাঁর বিশ্বাসী ভৃত্য বাবু রাও পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। পাপ ক'রে এ-জগৎ থেকে স'রে পড়লেও রক্ষা নেই। জোনাকী হ'য়েও নিজের পাপ-কাহিনী শুনবার জন্য ছুটে আসতে হয়। জীবন কাটাতে হয় জঙ্গলের অন্ধকারে। দিনের আলো সহ্য করতে পারে না এরা।

প্রাচীরের ও-পাশে দাঁড়িয়ে আমরা বুঝলুম, তিনটি চরিত্রই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। রিভলবারটা হাতে নিয়ে

প্রশান্ত লাহিড়ী জংগলের পাশ দিয়ে চ'লে গেলেন আগে আগে। আমরাও তাঁর পিছু নিলুম। সামনের দিক থেকে মিস্টার ড্রাইভার এসে উপস্থিত হলেন। সংগে তাঁর দেশমুখ। আমাদের তিনটি দল একই সংগে মিলিত হ'য়ে গেল গাড়ি-বারান্দার তলায়। এ যেন গল্প-উপন্যাসের মতো অলীক মনে হচ্ছে। সত্যিকার জীবনের ঘটনা এ নয়।

প্রশান্ত লাহিড়ীই কথা বললেন প্রথম, "বাবু রাও, বসবার ঘরের আলো জ্বালিয়ে দাও। আসুন আপনারা ডাক্তার প্যাটেল। আপনাদের গল্প আমরা শুনেছি।"

বসবার ঘরে ঢুকে ডাক্তার প্যাটেল সোৎসাহে ব'লে উঠলেন, "গল্পটা তা হ'লে শুনেছেন! দেখুন আপনাদের হ'য়ে চোরটাকে ধ'রে দিলুম আমি। বাড়ির সামনে থেকে খান্দুভাই-এর পেটে পিস্তলের নল্ ঠেকিয়ে এতদূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে এলুম।"

ঘটনাটা যে কি ঘটেছে বড় সাহেব মিষ্টার ড্রাইভার আন্দাজ করতে পারলেন না। হাঁ ক'রে ব'সে রইলেন স্বর্গীয়া লক্ষ্মী দেবীর ড্রইং-রুমে। প্রশান্ত লাহিড়ী অল্প কথায় ব্যাপারটা সব বুঝিয়ে দিলেন তাঁকে। তারপর ইনস্‌-পেক্টর দেশাইকে বললেন, "একটা টাকাও খরচ হয় নি। খান্দুভাই-এর গাড়ি থেকে টাকার বাণ্ডিলটা নিয়ে আসুন। খান্দুভাইকে সংগে নিয়ে যান।"

ঘরের আবহাওয়াটা ঠাণ্ডা হয়েছে। হাত পা সব কেমন যেন আড়ষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল। ঘটনাগুলো এতো দ্রুতগতিতে ঘটে যাচ্ছিল যে, অনুধাবন করতে কষ্ট হচ্ছিল আমার। তবে একটা কথা আমায় স্বীকার করতেই হ'ল। প্রশান্ত লাহিড়ীর কৃতিত্ব সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না আমার। হ্যাঁ, দুঁদে সি-আই-ডি নিশ্চয়ই।

ও'দের টাকা নিয়ে ফিরে আসতে বোধ হয় মিনিট পাঁচেকও লাগল না। এই গাড়িটা ছাড়া পুলিশ আর সব জায়গাই সার্চ করেছিল। গাড়ির গদির তলায় যে তিন লাখ টাকা লুকিয়ে রাখতে পারেন খান্দুভাই তেমন অনুমান এ'রা করতে পারেন নি। খান্দুভাই নিজেই গিয়ে টাকাটা বার ক'রে আনলেন ব'লে পাঁচ মিনিটের বেশি সময় লাগল না। বড্ড ঘাবড়ে গিয়েছেন তিনি। ডাক্তার প্যাটেল তাঁকে খুনী সাব্যস্ত করবার চেষ্টা করছেন। মুহূর্তের মধ্যে রঙ্গমঞ্চের দৃশ্য গেল পাল্টে।

খান্দুভাইকে প্রশ্ন করেন নি কেউ, তা সত্ত্বেও তিনি হাতজোড় ক'রে বলতে লাগলেন, "বাবা বিশ্বনাথের দিব্বি, খুন আমরা করি নি। আমাদের কোনো দোষ নেই। এটা তো আমার আপন মাসীমার টাকা। তাঁকে না ব'লে টাকাটা নিয়েছি, এই যা দোষ। তিনি বেঁচে থাকলে আমার বিরুদ্ধে নালিশ করতেন না।"

হো হো শব্দে হেসে উঠলেন ডাক্তার প্যাটেল। বলতে লাগলেন, "খুন আপনি করেন নি, তবে করল কে? বাবু রাওকে দিয়ে আপনিই খুন করিয়েছেন—"

প্রশান্ত লাহিড়ী ডাক্তার প্যাটেলের পকেট থেকে ঝপ ক'রে পিস্তলটা বার ক'রে নিয়ে বললেন, "আপনার মনের অবস্থা এখন উন্মাদভাবাপন্ন—বেপরোয়া হ'য়ে উঠেছেন। এটা সরিয়ে নিলুম। খুন করেছেন আপনি।"

দুম্ ক'রে একটা বোমা পড়ল ঘরে! বড় সাহেব মিস্টার ড্রাইভার উৎফুল্ল হ'য়ে উঠলেন। নড়ে-চড়ে বসলেন একটু। পাইপ ধরালেন তিনি।

প্রশান্ত লাহিড়ী বলতে লাগলেন, "আয় কিছু ছিল না, তবু ইনকাম ট্যাক্স দিতেন। তিন লাখ টাকাটার ওপর ভীষণ লোভ ছিল আপনার। লক্ষ্মী দেবী আশা দিয়েছিলেন টাকাটা আপনাকে দিয়ে যাবেন ব'লে। অথচ লোকের কাছে কথাটা গোপন রাখতে চেয়েছিলেন আপনি। অত বড় বিলেত ফেরৎ ডাক্তার রক্ষিতার টাকায় ধনী হয়েছেন শুনলে লোকে কি বলবে? অতএব রোজগারের পুরো টাকাটাই গভর্ণমেণ্টকে দিয়ে দিচ্ছিলেন আপনি। সত্যি কি না বলুন?"

"এ আপনি কি ক'রে জানলেন?' জিজ্ঞাসা করলেন মিস্টার ড্রাইভার।

"ডাক্তার প্যাটেলের বুড়ো চাকরটি সব জানে, সার। লক্ষ্মী দেবী যে ভল্ট থেকে টাকাটা তুলে এনেছিলেন তাও ইনি জানতেন। সিকিউরিটি বিভাগের সেই কেরাণীটি এ'দের দু'জনের কাছ থেকেই ঘুষ খেয়েছে।"

ডাক্তার প্যাটেল অবিশ্বাসের হাসি হাসতে হাসতে বললেন, "তাতে কি প্রমাণ হয় আমি খুন করেছি?"

"না, তা হয় না—" প্রশান্ত লাহিড়ী উঠে গিয়ে ডাক্তার প্যাটেলের বাঁ হাতের আস্তিনটা ওপর দিকে তুলে ধ'রে বললেন, "এই দেখুন সার, ঘা এখনো শুকোয় নি। লক্ষ্মী দেবী এ'কে নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছিলেন। এবং ছোরা দিয়ে তিনি এ'কে আঘাত করেছিলেন প্রথম। ডাক্তার প্যাটেল, সত্যি কি না বলুন?"

"হ্যাঁ।" স্বীকার করলেন ডাক্তার প্যাটেল। তারপর নিজে থেকেই বলতে লাগলেন, "প্রায় বিশ বছরের ব্যর্থতার ইতিহাস রয়েছে এর পেছনে!! তবু লক্ষ্মীকে আমি খুন করতে চাই নি। টাকাটা নিতেই ঢুকেছিলাম সেইখানে—সে আমায় চিনে ফেলল। ছোরা দিয়ে আঘাত করল আমায়। চেঁচিয়ে উঠল, চোট্টা, ডাকু—আরও কতো কি!......... বিলেত থেকে ফিরে এসে দেখি, লক্ষ্মী বিধবা হয়েছে। ছেলেবেলাকার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। লক্ষ্মী আবার আমার কাছে আসা-যাওয়া আরম্ভ করল...... প্রায় বিশ বছরের সম্পর্ক...... বিয়ে করতে চেয়েছি বহুবার...... কিন্তু তবু আমি খুন করতে চাই নি। সংগে আমার কোনো অস্ত্রই ছিল না। লক্ষ্মীই আমায় আঘাত করল প্রথম...... তারপর সিন্দুক খুলে দেখি, টাকার বাণ্ডিলটা উধাও হয়েছে। মিস্টার লাহিড়ীকে ধন্য-বাদ না দিয়ে পারছি না...... আমার পুরনো চাকরটিকে পর্যন্ত ঘুষ দিয়েছেন—"

"গরিব লোক, ছ' মাস থেকে মাইনে পাচ্ছে না সে।" বললেন প্রশান্ত লাহিড়ী।

"হ্যাঁ, আপনার কৃতিত্ব অস্বীকার করা অসম্ভব। যাক, এ ভালই হ'ল। বেঁচে থাকাটাও আমার পক্ষে বিড়ম্বনা হ'য়ে উঠেছিল। ব্যর্থতার সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়েছিলাম অনেক নীচে। আমার মৃত্যু হওয়াই উচিত।" ম্লান হাসি হেসে ডাক্তার প্যাটেল বললেন, "চোরটাকে ধরতে পারছিলেন না আপনারা। আমিই ধরিয়ে দিলাম।"

ইনস্‌পেক্টর দেশাই জিজ্ঞাসা করলেন, "স্নান ঘরের ছোট দরজাটা খুলে রেখে-ছিল কে?"

"আমি জানতাম না ওটা খোলা আছে। এখন অবিশ্যি বুঝতে পারছি, টাকার বাণ্ডিলটা ওখান থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার পর ওটা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিল বাবু রাও। মরবার আগে একটা কথা জেনে গেলাম...... পাপের বাণিজ্যে লাভ হয় না কোনো পক্ষের। লক্ষ্মীর হয় নি, আমারও হ'ল না। চলুন, জল নামবার আগে আগে এখান থেকে বেরিয়ে পড়ি—বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আকাশে ঘন মেঘ। লক্ষ্মীর দু' চোখ ভরা জল!" সোফার গায়ে এলিয়ে

পড়লেন ডাক্তার প্যাটেল। ডান হাতের আঙুলগুলো মটকাতে লাগলেন তিনি।

প্রশান্ত লাহিড়ী এবার পকেট থেকে একটা কাগজ বার ক'রে বড়সাহেবের দিকে এগিয়ে ধ'রে বললেন, "সার, এটা রিপোর্ট। পরীক্ষা ক'রে দেখা গেল, দেয়ালের গায়ে যে-রক্তটা লেগে ছিল সেটা লক্ষ্মী দেবীর নয়। এটার গ্রুপ আলাদা। আমার ষোল আনা বিশ্বাস, এটা ডাক্তার প্যাটেলেরই রক্ত। তাঁর বাঁ হাতটা ধস্তাধস্তির সময় কখন যে দেয়ালের গায়ে লেগে গিয়েছিল টের পান নি তিনি। কাল এঁর রক্ত নিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখলেই সঠিকভাবে নিঃসন্দেহ হওয়া যাবে।"

লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু ক'রে রাখলুম আমি। এই আস্তর নিয়ে কতো ঠাট্টা-ইয়ার্কী করেছি প্রশান্তবাবুর সঙ্গে!

সেই রাত্রে এঁদের সবাইকে গ্রেপ্তার করা হ'ল।

॥ দশ ॥

গল্প লিখতে ব'সে পাঠক-পাঠিকাদের মতো আমার নিজের মনেও একটা প্রশ্ন উঠছে : রূপকুমারীর কি হ'ল?

পুলিশ তদন্ত ক'রে দেখল, রূপকুমারীর কোনো দোষ নেই। নিজের অজ্ঞাতসারে সে খান্দুভাইকে সাহায্য করেছে বটে, আইনের চোখে তা অপরাধ নয়।

সোমবার দিন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে রূপকুমারীকে উপস্থিত করা হ'ল। সেদিন অবিশ্যি আদালতে ভিড় ছিল না। আমি গিয়েছিলুম আদালত বসবার আগেই। সঙ্গে আমার মন্মথবাবু ছিলেন। তিনি রবিবার সকালে এসে বোম্বে পৌঁছেছেন। উঠেছেন আমার হোটেলেই। পনরো দিনের ছুটি নিয়ে এসেছেন তিনি। লক্ষ্মী দেবীর খুন সম্পর্কে গল্পটা বলেছি তাঁকে। তিনি বুঝতে পেরেছেন, এই ব্যাপারের সঙ্গে মীনাক্ষীর প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ যোগাযোগ কিছু নেই। তা হ'লেও মালদা-শহরের সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে খুনের গল্পটা শোনবার জন্য। খবরের কাগজের বিক্রি বেড়ে গিয়েছে। লজ্জায় কারো কাছে মুখ দেখাতে পারেন না মন্মথবাবু। পাদ্রীর ওপর ক্ষেপে রয়েছে শহরের লোক।

মন্মথবাবুকে বুঝিয়ে বললুম যে, পেড্রোর দোষ নেই। থাকলেও খুব সামান্য। মন্মথবাবু বিশ্বাস করলেন না। মালদার লোকেরাও বিশ্বাস করবে না জানি। সেই জন্যই আজ আমি গল্পটা লিখে ফেললুম। বই আকারে যখন বেরুবে তখন পেড্রোকে চিনতে পারবে সবাই। বোধ হয় এই গল্পের মধ্যে পেড্রো-চরিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ না ঘটলে কাহিনীটা আমি লিখতুমই না। খবরের কাগজের বিশেষ সংবাদদাতা বোম্বে থেকে যা লিখে পাঠাতেন তাই প'ড়েই পাঠক-পাঠিকাদের কৌতূহল মিটে যেত।

সোমবার বেলা এগারোটার সময় রূপকুমারীকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে উপস্থিত করল পুলিশ। রূপকুমারীর জন্য সেদিন আর কোনো উকিল-ব্যারিস্টার আসেন নি। সবাই জানেন, খান্দুভাইকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ফী দেওয়ার লোক নেই। আগে থেকেই উকিল-ব্যারিস্টারেরা সাবধান হ'য়ে গিয়েছেন।

অবিশ্যি উকিল-ব্যারিস্টারের দরকারও ছিল না। পেড্রো তবু তার নিজের ব্যারিস্টার মিস্টার ভগতকে নিয়ে এসেছে আদালতে। আজ ওর নিজেরও মুক্তির দিন। ওর বিরুদ্ধেও অভিযোগ প্রত্যাহার করেছে পুলিশ।

মন্মথবাবু আদালতের ভেতরে ঢুকলেন না। তিনি নিজেও পেশকার। সারাজীবন আদালতের মধ্যেই জীবন কাটিয়েছেন। আসামী-ফরিয়াদী দেখবার কৌতূহল তাঁর নেই।

সেই কাঠগড়াটার মধ্যেই রূপকুমারী এসে বসল। আজও দেখলুম, চারদিকে পাহারাওয়ালাদের ভিড়। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সতর্কতা ওদের অবলম্বন করতেই হয়। ইনস্পেক্টর দেশাই ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তাঁর নিজের বক্তব্য পেশ করলেন। এবং বললেন, "ইওর অনার, আসামী রূপকুমারীর বিরুদ্ধে আমাদের কোনো অভিযোগ নেই।"

পেড্রোর সম্বন্ধেও সেই একই কথা বললেন তিনি। এদের মুক্তির কথা ঘোষণা ক'রে ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর অর্ডার লিখলেন।

আমি মীনাক্ষীর দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে ছিলুম। খাঁচার মধ্যে ব'সে কি যে সে ভাবছিল জানি না। মালদা শহরটাকে চিরকালই সে গ্রামের মতো ক্ষুদ্র জায়গা ব'লে সমালোচনা করত। বিদ্রূপ করতেও ছাড়ে নি। ভাগ্যের কী অদ্ভুত পরিহাস আজ প্রায় তেরো-চোদ্দ দিন ধ'রে হাজতে বাস করছে সে। ঐ স্বল্প আয়তনটুকুর

মধ্যে একটা তুলনামূলক ছবি কি ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে নি? হাজতের তুলনায় মালদা শহরটাকে কি বিরাট বড় ব'লে মনে হয় নি ওর? কি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে মীনাক্ষী জানি না। বল্গা-বিহীন তুরঙ্গের মতো উচ্চাকাঙ্খার তুরঙ্গটিকে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। তা হ'লে সে পথে-বিপথে ছুটে বেড়ায়। বল্গাটিকে শক্ত ক'রে ধ'রে রাখা চাই। এই জন্য হয়তো শিক্ষার প্রয়োজন আছে। পিতার কর্তব্য সম্পাদনে মন্মথবাবু যে অত্যন্ত শিথিল ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

প্রশান্ত লাহিড়ী শনিবার দিনই প্লেন ধ'রে চ'লে গিয়েছেন কলকাতা। যেবার মুখে তাঁর বাড়ি যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন বার বার। এমন সুন্দর একটি সামাজিকতাপ্রিয় পুলিশ অফিসারের সঙ্গে আমার আগে কখনো পরিচয় হয় নি।

আদালতের বাইরের বারান্দায় এসে মীনাক্ষী বলল, "কাপড়-চোপড় বদলাতে হবে। আগে একবার তাজমহল হোটেলে চলো, ভাস্করদা।"

বললুম, "সেখানে তোমার কাপড়-চোপড় নেই।"

"কেন?"

"অনেক টাকা বাকী ছিল। বহুদিন থেকে বিলের টাকা শোধ করতে পারছিলেন না খান্দুভাই। তোমার ঘরটাকে খালি ক'রে দিতে হ'ল।"

"কে করল খালি?"

"পেড্রো। প্রায় হাজার পাঁচেক টাকার বিল জমে গিয়েছিল।"

"টাকা শোধ করল কে?"

"পেড্রো।"

"খান্দুভাই এখন কোথায় ভাস্করদা? তাঁকে তো দেখছি না?"

"তিনি আবার হাজতে ঢুকেছেন। লক্ষ্মী দেবীর তিন লাখ টাকা তিনিই চুরি করেছিলেন। কিন্তু মহিলাটি খুন হয়েছেন ডাক্তার প্যাটেলের হাতে। মীনা, এ'দের নামগুলো এখন তোমায় ভুলে যেতে হবে। হয়তো এখানকার জগতটা খুবই বড়—হ্যাঁ, স্বীকার করছি বিরাট। কিন্তু এই জগতে বাস করবার জন্য তুমি তৈরি হও নি।"

কথাগুলো আমায় চুপ ক'রে শুনল মীনাক্ষী। তারপর জিজ্ঞাসা করল, "পাদ্রী দা কোথায়?"

"ঐ তো এগিয়ে গিয়েছে—চলো, তোমার বাবা এসেছেন।"

"আর কেউ আসে নি?"

চমকে উঠলুম আমি। আর কে আসবে ব'লে আশা করছে মীনাক্ষী? পরেশবাবুর কথা ভাবছে না কি সে? তাঁর নামটা উচ্চারণ করতে সাহস পেলুম না আমি। চুপ ক'রে রইলুম। খানিকটা দূরে এগিয়ে আসবার পর দেখা হ'ল মন্মথবাবুর সঙ্গে। দু' চোখ দিয়ে তাঁর জল গড়িয়ে পড়ছিল।

পেড্রো এসে তাঁর সামনে দাঁড়াল। পোলো টুপীটা মাথা থেকে একটু তুলে সম্মান দেখাল মন্মথবাবুকে। মীনাক্ষীর দিকে মুখ ক'রে বলল, "এই যে তোমার গহনার প্যাকেট—"

"বাবার হাতে দাও।"

হাত বাড়িয়ে প্যাকেট-টা নিয়ে নিলেন মন্মথবাবু। তারপর পেড্রো আবার বলল, তোমার যে-সব জিনিসপত্র তাজমহল হোটেলে ছিল, সবই পৌঁছে দিয়ে এসেছি ভাস্করদার হোটেলে। শুধু তোমার সেই এক পাটি জুতো ফিরিয়ে দিই নি। আমি চলি মীনা, বাই বাই—" মাথাটা নিচু করল একটু। তারপর ধীরে ধীরে হাঁটিতে লাগল ওর নিজের গাড়িটার দিকে।

আমার নিজের চোখ আর শুকনো ছিল না। রুমাল বার ক'রে চোখ মুছতে লাগলুম। ঐ গুণ্ডাটা শেষ পর্যন্ত আমায় না কাঁদিয়ে বিদায় নিতে পারল না।

মন্মথবাবু বললেন, "পরেশ এসেছে। বোধ হয় পরেশ। দ্যাখো তো।" আমরা তিনজনেই একসঙ্গে পূব দিকে দৃষ্টি দিলুম। হ্যাঁ, পরেশবাবুই তো। গাছ-তলায় দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। হাতে একটা চটের ব্যাগ রয়েছে। বোধ হয় জামা-কাপড় এনেছেন শুতে ক'রে। মাস্টার মানুষ, চটের থলিটা দেখতে খারাপ কি সুন্দর ভেবে দেখেন নি। রোগা মানুষটিকে আরও বেশি শীর্ণ দেখাচ্ছে। মাথার চুল সব উসকো-খুসকো। সম্ভবত স্টেশন থেকে সোজা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন তিনি। পরেশবাবু যে আসবেন, তাঁকে স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন হ'তো। আমরা হাঁটিতে লাগলুম গাছতলার দিকে। মীনাক্ষীও এল আমাদের সঙ্গে সঙ্গে। এতদিন পর হয়তো জীবনের সত্য পথটা দেখতে পেল। ভগবান ওদের মঙ্গল করুন, শুধু এই প্রার্থনাটাই আমি পৌঁছে দিলুম তাঁর কাছে।

আদালতের প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলুম আমরা। মন্মথবাবু বললেন, "আজই আমরা চ'লে যাব, ভাস্কর। তুমি কি করবে?"

"দু' চার দিন থাকব এখানে।"

"বেশ। মালদা গিয়ে দেখা ক'রো।"

ও'রা তিনজন সামনে, আমি পেছনে। শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যটা অভিনীত হ'য়ে গেল। যা স্বাভাবিক তাই ঘটল। স্বামীর পাশে গিয়ে দাঁড়াল মীনাক্ষী। ইচ্ছে ক'রেই পিছিয়ে পড়লুম আমি। আমার ও মীনাক্ষীর মাঝখানে যবনিকার কালো পর্দাটা মুহূর্তের জন্য দুলে উঠে আবার স্থির হ'য়ে গেল।

গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে-ছিল পেড্রো। আমি ভাবলুম, টুপী খুলে ও'দের বুঝি স্যালুট করল সে। তা নয়, কপালের সেই কাটা দাগটার ওপর হাত রেখে বিনয়ে, ভক্তিতে এবং ভালবাসায় মাথাটা নিচু ক'রে রাখল পেড্রো।

অশিক্ষিত খৃষ্টীয়ানটা 'কলসীর কাণা' হজম ক'রে ফেলেছে। প্রেম বিতরণে পরাঙ্মুখ নয়।
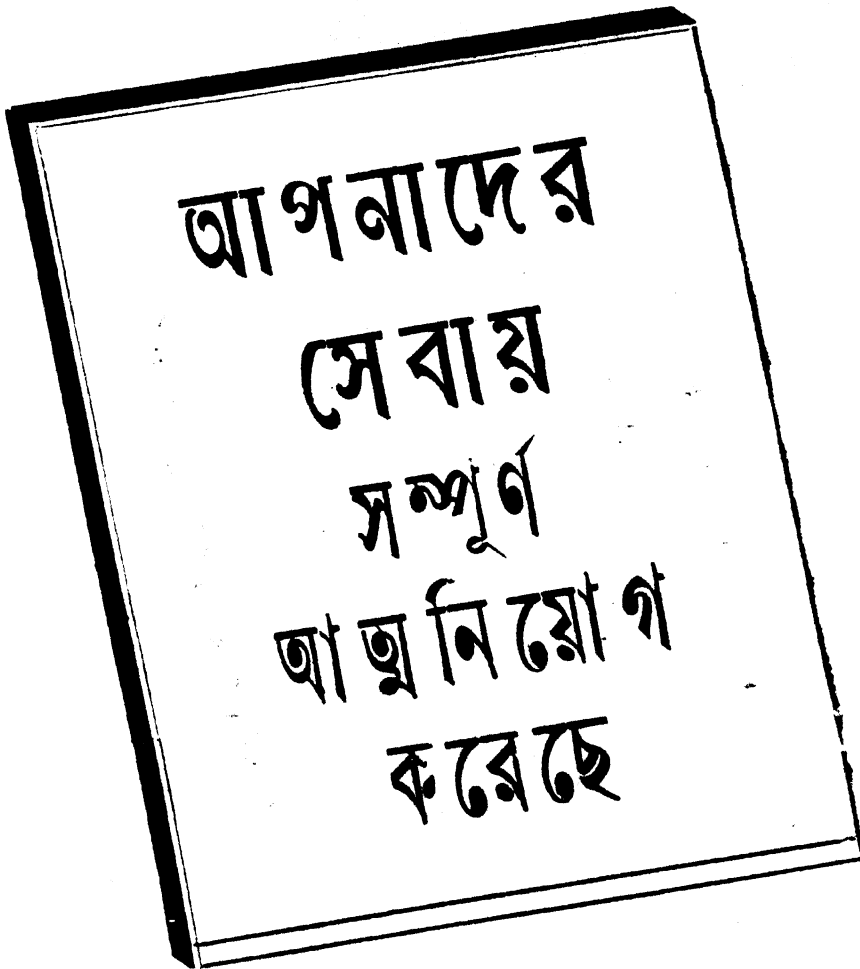
দূরে দাঁড়িয়ে আমিও আজ ওকে নমস্কার করলুম।

সমাপ্ত

আপনাদের
সেবায়
সম্পূর্ণ
আত্মনিয়োগ
করেছে

কোয়ার্টারে কথাবার্তার শব্দ ছাপিয়ে উঠেছে। তার সঙ্গে হরেক রকমের নিশাচর পাখির ডাক—এর আগে সে ধরণের আওয়াজ কখনও শুনিনি। সবটা জড়িয়ে মনে হচ্ছে যেন নিশীথ রাত্রি।

রাগ এবং বিরক্তি—এঁদের ওপর এবং আমার বন্ধুর ওপর তো বটেই—নিজের ওপরও বড় কম হচ্ছিল না। অন্য কোন সভ্য জায়গা হলে নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে গাড়ি ডেকে চলে যেতাম। কিন্তু এখানে নিরুপায়। অজানা অচেনা জায়গা, জঙ্গলের পথ—মানবসভ্যতা থেকে বহু দূরে। এঁরা দয়া করে গাড়ি না দিলে যাওয়ার কোন উপায় নেই। সুতরাং বসে বসে সে বিরক্তি পরিপাক করা ছাড়া আর কিছু করবার নেই।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কথা সত্য করে উদ্যোক্তারা দেখা দিলেন ঠিক সাড়ে সাতটার সময়। অবশ্যই যাঁরা গাড়ি নিয়ে আমাকে নিতে গিছলেন তাঁরা আসেননি, বুদ্ধি করে গা-ঢাকা দিয়েছিলেন।

'একটু স্যার দেরি হয়ে গেল। মানে এমন মুস্কিল— আজই য়্যাসিষ্ট্যান্ট ম্যানেজার আটকে রাখলে—শালা পাঞ্জাবী তো, এসব সাহিত্য সভাটভা অত বোঝে না! ওদের কাছে কাজের দামটাই সব চেয়ে বড়। কিছু মনে করবেন না স্যার। এটুকু মেকাপ্ করে দেব—'

কতকগুলো চড়া কথা বললাম। কিন্তু সে কেবল ভস্মে ঘি ঢালা তা বলতে বলতেই বুঝতে পারলাম। তারপর বললাম, 'আমাকে কিন্তু আগেই ছেড়ে দিতে হবে! আপনাদের ফাংশন থাকে পরে যা হয় করবেন—আমি অতক্ষণ থাকব না !'

'সে তো নিশ্চয়ই। সে কথা বলতে! নটার মধ্যে ছেড়ে দেব আপনাকে!'

আশ্বাস দিয়ে উঠলেন তিনচার জন।

ছাড়লেন তাঁরা ঠিক সাড়ে দশটায়।

উপায়ও নেই। উদ্বোধন সঙ্গীত ও সমাপ্তি সঙ্গীত ছাড়া দুটি মাত্র 'আইটেম'। একটি সঙ্গীতালেখ্য আর একটি নৃত্যনাট্য। সঙ্গীতালেখ্যটির কথা সবাই জানেন, কতকগুলো প্রলাপের সঙ্গে কয়েকটি গান বাঁধা। গানটা গাওয়াই উদ্দেশ্যে কিন্তু শুধু গান দিলে যারা গাইতে পারে না তাদের কিছু দেবার থাকে না। তাতেই প্রলাপগুলোর অবতারণা। একজন লেখে, তার কাছ থেকে মোটা চাঁদা পাওয়া যায়—আগে একজনই পড়ত, এখন পড়ে বহু লোকে। সবাই খুশী হয়।

আমার অনুমতির কেউ অপেক্ষা করলনা—বলা বাহুল্য। সভাপতিকে আজকাল সভা পরিচালনা করতে হয়না—করে অন্য লোকে, প্রধানত উদ্যোক্তারা। (নইলে চাঁদা ওঠে না, যিনি মাইকে ঘোষণা করবেন—তিনি সম্ভবত বেশ কিছু দেন!) সুতরাং সভাপতিবরণের পরই সঙ্গীতালেখ্য ঘোষণা করা হ'ল। এক ঘণ্টার ওপর চলল সে যন্ত্রণা, শেষের দিকে একজনকে ডেকে বললাম যে 'এবারেই আমার বক্তৃতার ব্যবস্থা করুন—নৃত্যনাট্য পরে হবে!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, সে আর আপনাকে বলতে হবে না, সব ঠিক আছে!'

কিন্তু সঙ্গীতালেখ্য শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই নৃত্যনাট্য ঘোষিত হয়ে গেল, হারমোনিয়ামে সুর উঠল এবং কতকগুলি ফুলের মালা পরা কিশোরী নাচতে নাচতে বেরিয়ে এল।

অগত্যা 'চিত্রার্পিতের মত' বসে থাকা ছাড়া আর আমার কী করবার থাকতে পারে?

রাগ এতই হয়েছিল যে চালে একটা বড় ভুল ক'রে ফেললাম। বক্তৃতা দিতে উঠে কিছু মনের ঝাল ঝাড়লাম উদ্যোক্তাদের সম্বন্ধে। ফলে হয়তো তাঁরা চটে রইলেন এবং আমাকে জব্দ করবার কথা ভাবতে লাগলেন।

যাইহোক, সভা থেকে বেরিয়ে আবার সেই টিনের বাংলোর বাইরের ঘরটিতে এসে বসলাম। বড় বড় গাংফড়িং, বীভৎস চেহারায় 'মথ্' ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গুবরে পোকায় ভরে গেছে ঘর—তার সঙ্গে সেই লম্বা লম্বা ভয়াবহ ধরণের আরশুলা।

বললাম, 'আমি খাওয়া দাওয়া কিচ্ছু করব না—দয়া ক'রে আমাকে এখনই ছেড়ে দিন!'

সকলে হাঁ-হাঁ ক'রে উঠলেন।

'সবই প্রস্তুত, একটু কিছু মুখে না দিলে এঁরা বড় দুঃখ পাবেন যে স্যার!'

'আর কতক্ষণই বা। গাড়ি যখন তৈরী আছে—তখন ব্যস্ত হয়ে লাভ কী! এখন রাত্রিবেলা, পথ ফাঁকা—তিন কোয়ার্টারের মধ্যে শহরে পৌঁছে যাবেন!' ইত্যাদি, ইত্যাদি—

কিন্তু আমি বেঁকে দাঁড়ালাম।

আমি বসবও না, খাবও না। এখনই আমার গাড়ি চাই।

আবারও সেই স্পষ্টবাদী বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি আমার গায়ে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিলেন। এগিয়ে এসে বললেন, 'গাড়িতো আমাদের এখানের নয়, গাড়ি হল পালছেঁড়া চা-বাগানের ম্যানেজারের। আপনাকে পেঁাছে দিয়ে তাঁর ফ্যামিলিকে আনতে গিয়েছিল—তাঁরা সবাই ফাংশানে ছিলেন—তাঁরই পাঁচ মেয়ে, দুজন নাচল, তিনজন গানে ছিল। এখন তাঁদের পেঁাছতে গেছে—সাত মাইল সাত মাইল চৌদ্দ মাইল। ফিরে না এলে কোন উপায় নেই!'

অসহ্য রাগে এবং নিজের অসহায় অবস্থা বুঝতে পেরে দুঃসহ ক্ষোভে মাথা ধরে উঠল; চোখে যেন জল এসে যেতে লাগল বিরক্তিতে। কিন্তু সবই হজম ক'রে এসে বসলাম। লুচি ও মুরগীর মাংসেও হাত দিতে হ'ল। রাত হয়েছে, অবিরাম চা খেয়ে খেয়ে শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়েছে—কিছু না খেলে আরও ভেঙে পড়বে। ওদের ওপর রাগ ক'রে নিজেকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি?

খেতে খেতে হঠাৎ সব আলো নিভে গেল।

'ওরে হ্যারিকেন রে, হ্যারিকেন জ্বাল। শিগগির! দ্যাখ দ্যাখ—গোলমালে বড্ড ভুল হয়ে গেছে।'

গৃহকর্তা, সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির ছেলে চেঁচামেচি শুরু ক'রে দিলেন।

কিন্তু ব্যাপারটা কী?

শোনা গেল, এখানে প্রত্যহই রাত সাড়ে এগারোটায় কারেন্ট বন্ধ হয়ে যায়। তারপর ফ্যাক্টরীর কাজ চালু হয়। ডায়নামো থেকে কারেন্ট তৈরী হয়—তার এত শক্তি নেই যে বাড়ি ও রাস্তার সব আলো জ্বালিয়েও ভারী ভারী মোটর চালায়। এঁরা নাকি ম্যানেজারকে অনুরোধ করেছিলেন, অন্তত ঘণ্টাখানেক বেশী আলো জেবলে রাখার, সাহেব ম্যানেজার রাজীও হয়েছিলেন, কিন্তু এখন তিনি নেই। বিজলীঘরের ইনচার্জ বলছে যে, যেহেতু সে কোন লিখিত অর্ডার পায় নি—সেহেতু নিয়মের ব্যতিক্রম সে করতে পারবে না।

এখন উপায় আছে য়্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারকে গিয়ে বলার কিন্তু সে দেখলাম কেউই এগোতে চান না।

অগত্যা হ্যারিকেনের আলোতেই ভোজন পর্ব শেষ ক'রে আবার বাইরে এসে বসলাম।

চারদিকে ঘুট ঘুট করছে অন্ধকার। সামান্য বসতি—বোধহয় পঁচিশ-ত্রিশটি

কোয়ার্টার হবে সব জড়িয়ে—সব নিশুতি হয়ে এসেছে। একটা হ্যারিকেন বা প্রদীপের চিহ্নও কোথাও দেখা যায় না। ওদিকে সম্ভবতঃ মেঘ ঘনিয়ে এসেছে খুব, কারণ গুরু গুরু শব্দ হচ্ছে থেকে থেকে।

আকাশের দিকে চেয়ে বোঝার উপায় নেই। বড় বড় গাছে আকাশ ঢেকে আছে। তাছাড়া এত জোনাকি যে, কোনটা তারার আলো আর কোনটা জোনাকি বোঝা মুস্কিল।

এ বাড়ির এঁরাও সব শুয়ে পড়লেন। শুধু গৃহস্বামী বসে বসে হাই তুলছেন আর বিড়ি খাচ্ছেন। আরও আছেন তিন-চারটি তরুণ ছেলে। নেহাৎ ঘাড়ে পড়ে রয়েছি—বিদায় না ক'রে যেতে পারছেন না।। তাঁরা যেতে চাইলেও এ বাড়ির ইনি সহজে ছাড়বেন না—তা তাঁর মুখ-ভাব দেখেই বোঝা গেল।

এত স্থানাভাব যে বাকী রাতটুকু শুয়ে যেতে বলবারও সাহস নেই এঁদের। এই বাইরের ঘরেব একটি সংকীর্ণ বিছানাতেও দুটি ছেলে এসে শুয়েছে ইতিমধ্যেই, শুনলাম গৃহস্বামীও ওখানেই শয়ন করবেন। সেটা কি ক'রে সম্ভব, তা আজও ভেবে পাই নি।

বারোটা, ক্রমে সাড়ে বারোটাও বেজে গেল।

এঁরাও চিন্তিত হয়ে উঠলেন এবার।

এত দেরি তো হবার কথা নয়।

তবে কি—

ফিসফিস ক'রে যা কথা হ'ল ওঁদের নিজেদের মধ্যে—তাতে ক'রে বুঝলাম গুর্খা ড্রাইভার হয়তো নেশা করে ঘুমিয়ে পড়েছে—গাড়ী আনবার কথা মনে নেই। তখন কথা হ'ল যে সাইকেল ক'রে কেউ যাবে নাকি?

চোদ্দ মাইল উঁচু-নীচু পাহাড়ে-রাস্তা—কে যাবে এই অন্ধকারে, ফিরবেই বা কখন?

এঁদের এতক্ষণের প্রশান্তি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে সেই আমার যা শান্তি। নইলে আমার তখন অবর্ণনীয় কষ্ট হচ্ছে, একটু শুতে পেলেই বেঁচে যাই আমি। শোবার মত একটা নিরিবিলি ভাল জায়গার জন্যে আমি তখন কুড়ি-পঁচিশ টাকা খরচ করতেও রাজী ছিলাম।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল আমার। যে গাড়ীতে এসেছিলাম সে গাড়ীর ইঞ্জিনে গোলমাল আছে। আসবার সময় দুবার তিনবার দাঁড়িয়েছে। এই অন্ধকার বিজন পথে যদি একেবারেই বিগড়ে যায়?

ওধারে তো বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল।

বেশ বড় বড় ফোঁটায় জল পড়ছে। মেঘেরও যে ডাক, —তাতে খুব অল্পে ছাড়বে বলে মনে হচ্ছে না।

ডুয়ার্সের বৃষ্টি—নামলেই প্রবল ধারা শুরু হয়ে যায়।

কথাটা বললাম খুলে।

এঁদের মুখ যেন একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'তাহলে একটু কষ্ট ক'রে লরীতে যাবেন স্যার? লরী কিন্তু একটা হাতের মধ্যেই আছে।

এই বৃষ্টিতে খোলা লরী!'

'না, মানে ড্রাইভারের পাশে বসলে খুব জল লাগবে না। বরং একটা বর্ষাতি দিয়ে দিচ্ছি, ড্রাইভারের হাতে ফেরৎ দেবেন। বলেন, তো আমরাও কেউ সঙ্গে যেতে পারি!'

অগত্যা তাতেই রাজী হলাম। আর উপায় কি? তখন রাত একটা বাজে। আমি আর বসতে পারছি না।

গৃহস্বামী তো চেয়ারে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছেন—অনেকক্ষণ।

মুখের কথা খসাতেই একজন ছুটে বেরিয়ে পড়লেন—সেই জলের মধ্যেই।

তারপরও আধ-ঘণ্টাটাক সেই দুঃসহ প্রতীক্ষা।

বাড়ীওলা তো অনেকক্ষণ ধরেই ঘুমোচ্ছেন, এতক্ষণে ঘুমটা বোধ করি গাঢ় হয়ে এল। বিছানা থেকে একটা ছেলের নাক ডাকা শোনা যাচ্ছে। যে দুটি তরুণ কর্মকর্তা আমার জন্যে আটকে ছিলেন, তাঁরাও বেশ ঢুলতে শুরু করেছেন।

শুধু ঘুম নেই আমার চোখেই। ঘুম আসা সম্ভবও নয়। যন্ত্রণায় কোমর-পিঠ খসে যাচ্ছে। বসে বসে হাঁটুতে ব্যথা শুরু হয়ে গেল, চোখ দুটো করকর করছে, দুটো রগেই অসহ্য টনটনানি। এ অবস্থায় কি ঘুম আসে?

অগত্যা বসে বসে বৃষ্টির শব্দ শুনতে লাগলাম। শোনবার মতই শব্দ। মেঘ ডাকছে মুহুর্মুহু, যেন ভারি ভারি রোলার চালিয়েছে কে আকাশের পথে—গুরু-গুরু গুম-গুম শব্দ। বিদ্যুতের শিখার সঙ্গে সঙ্গে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত গড়িয়ে যাচ্ছে; সে শব্দ এই নিস্তব্ধ অরণ্যে দূরে পাহাড়ে পর্যন্ত ভয়াবহ প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করছে। বৃষ্টির ফোঁটা পড়বার আওয়াজও কম নয়—কারণ আশেপাশে সব কোয়ার্টারেই টিনের চাল। বৃষ্টির ফোঁটাই তো বেশ বড়, তার ওপর তার অধিকাংশই গাছপালায় পড়ে আরও বৃহত্তর জলবিন্দু রচিত হয়ে পড়ছে। সে শুধু শব্দ নয়—তাকে কোলাহল বলাই উচিত।

অবশেষে দূরে গাড়ীর আওয়াজ শোনা গেল। মোটরের এবং হর্ণের শব্দ। সচকিত হয়ে উঠলেন এঁরা। একটু ক্ষীণ আশা আমার মনেও দেখা দিল।

সকলে মিলে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম।

হ্যাঁ, ঐ তো আলোও দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু এ যে দুজোড়া আলো, দুদিক থেকে!

লরী আর গাড়ী প্রায় একসঙ্গেই এসে পৌঁছল।

ড্রাইবার বাহাদুর ভোলেওনি, নেশাও করে নি—গাড়ীটাই পথে বিগড়েছিল—গাড়ী সারিয়ে নিয়ে আসতে দেরী হয়ে গেছে। সঙ্গে অন্য লোক তো নেই, তায় এই অন্ধকার পথ—নিজেই টর্চ ধরে সারানো এক হাতে—সুতরাং দেরি তো হতেই পারে।

এখন কিসে যাবো—গাড়ীতে না লরীতে?

দুই ড্রাইভারই আশা ও আশঙ্কায় আকুল হয়ে আমার মুখের দিকে চাইল। দুজনেরই ইচ্ছা আমি অপর যান ব্যবহার করি।

আমি এঁদের দিকে ফিরে বললাম, 'দেখুন আপনারা আমাকে ঢের কষ্ট দিলেন, এবার আপনাদের একটু কষ্ট করা উচিত। আমি গাড়ীতেই যাচ্ছি, কিন্তু আপনাদের কেউ লরী নিয়ে আমাদের সঙ্গে চলুন। এই ভয়াবহ পথ, গাড়ী যদি বিগড়োয় তো কি অবস্থা ভাবুন দিকি! গাড়ীর অবস্থা তো বোঝাই যাচ্ছে, লরী কেমন তাই বা কে জানে। একটা সেকেন্ড লাইন অফ ডিফেন্স সঙ্গে থাকা ভাল!

হ্যারিকেনের আলোতে মুখভাব খুব ভাল ক'রে দেখা যায় না—তবু ঠিক খুশী যে কেউ হলেন না কথাটা শুনে, সেটুকু বেশ বোঝা গেল।

নিঃশব্দে কিছুক্ষণ তিনজনে তিন-জনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকার পর একজন বললেন,

তাই হোক তাহলে, অভিজিৎ তুমিই বরং সঙ্গে যাও, তুমি তো কল-কব্জা একটু বোঝ-সোঝ।

অভিজিৎ অভিহিত ছোকরাটি প্রবল বেগে ঘাড় নাড়ল, 'যেতে আমি পারি কিন্তু একা যাব না। আপনারাও সঙ্গে চলুন।'

'কিন্তু ড্রাইভারের পাশে তিনজন তো ধরবে না—'

তৃতীয় জন বলে উঠলেন, 'আমার বোনের টাইফয়েড তা তো জানেনই সুশীলদা, আমি কি ক'রে যাই বলুন?'

সুশীলদা সামান্য একটু চুপ ক'রে থেকে শুষ্ককণ্ঠে বললেন, 'বেশ, আমিই যাচ্ছি অভিজিতের সঙ্গে।...... এই উপলক্ষে তোমার রুগ্ন বোনের কথা যদি মনে পড়ে থাকে তো সেই তবু একটা লাভ। কবে যেন, হ্যাঁ, আজই বোধহয়—তোমার বাবা দুঃখ করছিলেন যে, পাড়ার লোক এসে রাত জাগছে, যার বোন সে খবরও রাখে না! যাক গে—'

এ অভিযোগের অবশ্যই কোন উত্তর এল না। যাকে প্রয়োজন সিদ্ধ করতে হবে, তাকে সব সময় সব কথার উত্তর দিতে গেলে চলে না।

আর আমি তো একেবারেই নীরব শ্রোতা। কথা কইতে গেলেই নানা বিবেচনার কথা উঠবে, কিন্তু এক্ষেত্রে আমি কোন বিবেচনা করতে প্রস্তুত নই। যা পাইনি—তা আমিই বা দিতে যাব কেন?

অগত্যা অভিজিৎ আর সুশীলবাবুকে তৈরী হতে হ'ল। সেও এক পর্ব। বর্ষাতি টর্চ প্রভৃতি ঘুমন্ত প্রতিবেশীদের ডেকে সংগ্রহ করে বাড়িতে খবর দিয়ে প্রস্তুত হ'তে হ'তে আরও পনেরো মিনিট কেটে গেল।

তারপর এক সময় সত্যি-সত্যিই সেই দুঃসহ প্রতীক্ষার অবসান ঘটল। আমাদের দুটি গাড়ীই, ঘোরতর নৈশ দুর্যোগের মধ্যে সুপ্তিমগ্ন ছোট্ট গ্রামটিকে উচ্চকিত ক'রে প্রবল শব্দে স্টার্ট দিল ও অকারণেই হর্ণ দিতে দিতে চারিদিক প্রতিধ্বনিত শব্দের কোলাহল তুলে এসে এক সময় পাকা সরকারী রাস্তায় উঠল।

এরপর আর কোন হাঙ্গামা নেই; শুধুই চলা। পর পর দুটো কী চা-বাগান এলাকার বিরল জনবসতি পেরিয়ে গিয়ে একটানা ঘন বন শুরু হ'ল। মেঘাচ্ছন্ন রাত্রের অন্ধকারে অরণ্য বসতি একাকার হয়ে গিয়ে সবই নিবিড় বন বলে মনে হচ্ছে অবশ্য—নেহাৎ হেড লাইটের তীব্র আলোতে দুটো সাইন বোর্ড দেখেই চা-বাগানের অস্তিত্ব টের পেয়েছিলাম। কদাচিৎ কোন ভিজে করোগেটের ছাদে আলোটা পিছলেও পড়েছিল দু-একবার। কিন্তু এখন আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না বন ছাড়া; গাছ পালায়, লতায় জড়াজড়ি নিরন্ধ্র জঙ্গল শুধু।

আমাদের গাড়ীটা আগে আগে যাচ্ছে, লরীটা পিছনে। তার হেড লাইটের আলো আমাদের পিছন দিক থেকে এসে গাড়ীর মধ্যেটা আলোকিত করছে—আমি নিশ্চিন্ত আছি।

অবশ্য মধ্যে মধ্যে পিছনের আলোটা সরে যাচ্ছে, পিছনের অন্ধকারে লুকিয়ে যাচ্ছে কোথায়। তবে তাতে চিন্তার কোন কারণ বোধ করি নি, কারণ উঁচু-নীচু পাহাড়ে-পথ, বাঁকও অজস্র, সব সময় দুই গাড়ী এক লাইন ধরে চলা সম্ভব নয়।

কিন্তু একবার মিনিট পাঁচেকের মধ্যেও আলোটার পুনরাবির্ভাব না ঘটায় সচেতন হয়ে উঠলাম। বাহাদুরের মনোযোগ আকর্ষণ ক'রে বললাম, 'একটু দাঁড়াবে নাকি বাহাদুর, ওরা যেন বড্ড পিছিয়ে পড়েছে বলে মনে হচ্ছে—!'

ঘ্যাচাং ক'রে সশব্দে ব্রেক কষল বাহাদুর।

'পিছিয়ে পড়েছে, না পিছন ফিরেছে?'

কণ্ঠে নিদারুণ সংশয় বাহাদুরের, ঈষৎ ব্যঙ্গও যেন উঁকি মারছে তার সঙ্গে।

সংশয়টা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মনে জেগেছে আমারও। সন্দেহ জিনিসটা বুঝি এমনিই মারাত্মক।

কিন্তু সত্যিই—সরে পড়বার এই তো চমৎকার সুযোগ। এতক্ষণে সোজা পিছন দিকে দৌড় মেরেছে নিশ্চয় ওদের লরী। এতটা পথ যে বৃথা ওদের পশ্চাদ্ধাবন করব না এটা তো ঠিক।

'কী করব?' প্রশ্ন করল বাহাদুর।

'একটু গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে দেখবে নাকি? ধরো পথে যদি কোথাও বিগড়ে-টিগড়ে গিয়ে থাকে?'

আসলে নিজের নিরাপত্তার চেয়েও ওদের জব্দ করবার নেশা প্রবল হয়ে উঠেছে। তেড়ে গিয়ে যদি ধরতে পারি তো এবার ওদের আগে দিয়ে নিজে পিছনে থাকব। রাত দুটো বাজে—আমার ঘুমের দফা তো শেষ হয়েই গেছে, কাল ভোরেই আর একটা সভা, হয়তো পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্তুত হবার প্রশ্ন উঠবে। এ ক্ষেত্রে ওদের এখন ফিরে গিয়ে আরাম করার চেষ্টাটা যদি পণ্ড করতে পারি, সেইটেই বড় লাভ।

বাহাদুর পূর্ববৎ প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের সুরে বলল, 'তাহলে হর্ণ দিত ওরা—অনেক আগেই।'

'হয়ত দিয়েছে। যা ঝড়-জলের শব্দ আর মেঘ ডাকছে, তোমার তো জানলার সব কাঁচ আঁটা—শুনতে পাও নি হয়ত।'

বাহাদুর কয়েক মুহূর্ত কী ভেবে নিল। তারপর বলল, 'দেখুন সত্যিই যদি ওরা ফিরে গিয়ে থাকে তো এতক্ষণ বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে। তাহ'লে ওদের ধরতে হ'লে আবার সোজাসুজি কল্যা-চিনিতেই ফিরে যেতে হবে। কী লাভ হবে তাতে? তার চেয়ে চলুন, যেমন যাচ্ছি তেমনি গিয়ে আপনাকে তো পৌঁছে দিই। যে বর্ষা নেমেছে তাতে হয়ত খানিকটা পরে শহরে পৌঁছনোই যাবে না। শহরে ঢোকবার মুখে জায়গাটা নিচু, বড্ড জল জমে!'

ওর কথায় যে যুক্তি আছে তা মানতেই হ'ল। আমিও একটু ভেবে নিয়ে বললাম, 'তাহলে চল যেমন যাচ্ছিলে! এখন দেখছি ওদের কাউকে এ গাড়িতেই নেওয়া উচিত ছিল। ওরা দলছাড়া হয়ে থাকবে—এত বিবেচনা করতে যাওয়া ঠিক হয় নি।'

'তাহলে অন্তত আমার আ[illegible] সময়টা কষ্ট হ'ত না। এই পথে একা আজ আর ফিরতেই পারবনা। বাকী রাতটা ওখানেই এই গাড়িতে বসে কোথাও কাটিয়ে দিতে হবে!'

বেশ স্পষ্ট অনুযোগের সুর বাহাদুরের কথায়। কিন্তু তখন আর এসব কথায় লাভই বা কি? অগত্যা চুপ ক'রে রইলাম।

বাহাদুরও আবার স্টার্ট দিল।

অর্থাৎ দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু গাড়ি আর নড়ল না। প্রথমটা অত কিছু ভাবিনি, পুরনো গাড়ি, ছাড়তে একটু দেরিই হয়—তবে যখন তিনচার মিনিট ধস্তাধস্তি করার পরও কোন ফল হ'ল না—তখন হঠাৎ এখানে এই মধ্য-পথে গাড়ি অচল হওয়ার সম্ভাব্য ফলাফল কল্পনা ক'রে ব্যাকুল হয়ে উঠলাম।

'কী হ'ল বাহাদুর?'

'কী হ'ল তাইতো বুঝতে পারছিনা বাবু। এরকম তো হবার কথা নয়।

'খুলে দ্যাখো না একটু—'

বোধকরি কণ্ঠস্বর অকারণেই তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

'দেখব কি করে?' বাহাদুরও ঝেঁঝে' ওঠে, 'এই বৃষ্টিতে কে আলো ধরবে কে কাজ করবে! একজন একটা বর্ষাতি দিয়ে ঢেকে দাঁড়িয়ে টর্চ ফেললে তবে হয়। তা আপনার সঙ্গে তো একটা ছাতি পর্যন্ত নেই!'

ওর মেজাজ খারাপ হবার যে অত্যন্ত সংগত কারণ আছে তা বুঝি। ওর সাহিত্য-প্রীতি নেই, সভাসমিতির উদ্যোক্তা নয় ও—এমন কি এ বাগানের লোকও নয়। মিছিমিছি ওর এ দুর্ভোগ কেন!

সুতরাং ভয়ে ভয়ে ঈষৎ অনুনয়ের ভঙ্গীতেই বলি, 'তা আমিই না হয় নেমে টর্চ ধরছি, তুমি দ্যাখো কোথায় কী বিগড়েছে। একটু ভিজব হয়ত, তা আর কি করা যাবে। গরজ বড় বালাই।'

বাহাদুর দেখলাম সংকোচের বিশেষ ধার ধারে না। সে বললে, 'একটু নয় বেশ ভিজবেন। কিন্তু আপনি ভিজলেও কোন সুবিধে হবে না। এই জলের মধ্যে ইঞ্জিন খুলে কাজ করব কি করে? ওপরে একটা কিছু আড়াল দরকার। আমার এই একটি পুরনো বর্ষাতি ভরসা। এ যদি ঢাকা দিই তো আমি গায়ে দেব কি? আমি ভিজতে পারব না, তিন মাস আগেই আমার নিমোনিয়া হয়েছিল।'

এবার আর তিক্ততা চেপে রাখতে পারি না। বলি, 'বেশ হয়েছিল। তবে আর কি, আপদের শান্তি। সারা রাত গাড়িতেই বসে কাটাই, সকালে যদি কেউ এদিকে আসে তো ভাল, নইলে হেঁটেই ফিরতে হবে।...অবশ্য তার আগে যদি বাঘ-ভালুকে খেয়ে না শেষ করে।'

'গাড়িতে বসে থাকলে বাঘ-ভালুকে খেতে পারবে না, সে সব কিছু ভাববেন না। জানলার কাঁচ ভেঙ্গে বাঘে ধরে নিয়ে গেছে এ কখনও শুনিনি। তবে হাতীর কথা আলাদা। তেমন বজ্জাত হাতী হ'লে গাড়ি সুদ্ধ উলটে দিয়ে যাবে...তা কৈ, এদিকে তো এতদিন গাড়ি চালাচ্ছি, হাতীর পালে তো পড়ি নি কোন দিন।'

খুব যে ভরসা পেলাম না তা বলা বাহুল্য—তবে বললামও না আর কিছু। কিই বা বলব। অদৃষ্ট ছাড়া এখন তো আর পথও নেই। যা আছে অদৃষ্টে তাই হবে।...তাছাড়া সত্যি কথা বলতে কি, রাগে বিরক্তিতে দৈহিক কষ্টে চোখে আমার তখন জল এসে গিয়েছে—কথা বলার মতো অবস্থাও নেই।

বাহাদুর বোধ হয় আমার অবস্থাটা বুঝল। হয়ত তার মায়াও হ'ল একটু। সে বলল, 'আপনি মিনিট কতক একা বসতে পারবেন? আমি তাহলে একটু খোঁজ করে দেখি ওদের। যদি সত্যিই কোথাও আটকে গিয়ে থাকে—। ওদের পেলে গাড়িটাও মেরামত হয়, চাই কি লরীতে বসে চলেও যেতে পারেন আপনি।'

'একা বসতে পারবেন' এ প্রশ্নটার মধ্যে যে চ্যালেঞ্জ ছিল তা গ্রহণ করা ছাড়া আমার গত্যন্তর কি? 'কলকাতার বাবুদের দুর্ণাম প্রমাণিত করতে রাজী নই আমি।...তা ছাড়া যদিই একটা উপায় হয়, এই অকুল সমুদ্র থেকে রক্ষা পাওয়ার—সেটাও বিবেচ্য। সুতরাং উত্তর দিলুম, 'তা আর পারব না কেন, লক্ ক'রে বসে থাকব। তুমি থাকলেই বা কতটা আটকাবে? তবে তুমি কত দূর এই জলে হাঁটবে?'

'না, বেশী দূর কি আর পারব? যদি দু-চারশ' গজের মধ্যে থাকে, কি মাইলটাকের মধ্যে—। ঐ আগের বাঁকটার আড়ালে থাকলেও এখান থেকে টের পাওয়া মুস্কিল, বুঝলেন না?'

বলতে বলতেই সে বর্ষাতিটা গুছিয়ে গায়ে দিয়ে টর্চ নিয়ে নেমে পড়ল। তারপর শুধু তার হাতের আলোটা ছাড়া আর কিছু দেখা সম্ভব নয়, দেখা গেলও না। পিছনের সেই নিবিড় কালো আঁধার আর দৃষ্টিনাশা প্রবল বর্ষণের মধ্যে তার টর্চের আলোটা একটি সূক্ষ্ম রেখার মতো এ'কে বে'কে যেতে যেতে ক্রমশ সূক্ষ্মতর হয়ে হয়ে একসময়ে সেই অন্ধকারেই মিলিয়ে গেল। অতঃপর নিঃসীম নিশ্চিহ্নতার মধ্যে সম্পূর্ণ মিশে গেলাম আমি। এমন কি গাড়িটার অস্তিত্বও হাত দিয়ে অনুভব করতে হচ্ছে—দেখার কোন উপায় নেই।

কোথাও এতটুকু আলো নেই। ওপরে আকাশেরও কোন অস্তিত্ব টের পাচ্ছি না। আকাশে অরণ্যে পথে সব একাকার হয়ে গিয়েছে। যেন মনে হচ্ছে সৃষ্টির আদি যুগে, জীব সৃষ্টিরও আগে যে প্রলয়ঙ্কর বর্ষণের কথা ইতিহাসে পড়ি, হঠাৎ সেই যুগেই গিয়ে পড়েছি আমি—একটি মাত্র জীবিত প্রাণী। শুধু মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকের ফলে এক একবার বর্তমান সভ্যতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠছি—সামনে পিছনে বিসর্পিত টারম্যাক রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে। তাও শুধু ঐ রাস্তাটাই, তাছাড়া তো সেই দুদিকে নিরন্ধ্র বন এবং ওপরে স্লেট রঙের ক্রুদ্ধ আকাশ। আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। মানুষ তো দূরের কথা—অপর কোন প্রাণীর চিহ্ন পেলেও বাঁচতাম। সে সময়ে মনে হচ্ছিল একটা বাঘ-ভালুকের দেখা পেলেও মন্দ হ'ত না। তবু বিশ্বাস হ'ত যে আমি বেঁচে আছি।

চুপ ক'রে স্থানুর মতো বসে থাকা—তার ওপর এই অপরিসীম শারীরিক ক্লান্তি, তাই কখন নিজের অজ্ঞাতসারেই তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি টের পাইনি। একেবারে হঠাৎ কানের কাছে একটা কাশি কিম্বা গলা খাঁকারির শব্দ পেয়ে ধড়মড়িয়ে চমকে জেগে উঠলাম।

'কে, কে—বাহাদুর? প্রশ্ন করি বটে কিন্তু গলাটা নিজের কাছেই কেমন অদ্ভুত শোনায়।

আর প্রশ্ন করার সঙ্গে-সঙ্গেই প্রশ্নের ব্যর্থতা ধরা পড়ে; কারণ গাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁচে যে টোকা দিচ্ছে সে বাহাদুর নয়। অত কাছে বলে তার সাদা পোশাকটা অন্ধকারেও দেখা যাচ্ছিল—বাহাদুরের স্পষ্ট মনে আছে খাঁকি শার্ট ছিল গায়ে—তাছাড়া ঠিক সেই সময় একবার বিদ্যুৎ চমকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই দেখলাম সাহেবী পোশাক পরা লোক একজন এবং সম্ভবত সাহেবই।

নিমেষে ভয়ে যেন আড়ষ্ট হয়ে গেলাম। এই বিজন অরণ্যে, লোকালয় থেকে অন্তত সাত-আট মাইল দূরে—ঘোর বর্ষায় সাহেব কোথা থেকে এল?

কিন্তু সে ঐ নিমেষ মাত্র। পরক্ষণেই এই আতঙ্কের ছেলেমানুষীটা নিজের কাছেই ধরা পড়ল। নিশ্চয় সাহেবও এই পথে যাচ্ছিল—আমার গাড়ি অন্ধকারে এমন নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে খোঁজ করতে নেমেছে। ওদের জাতে এ ভদ্রতা খুব আছে।

আশ্বস্ত হয়ে—বোধ হয় আনন্দের চোটেই তাড়াতাড়ি জানলাটা ইঞ্চি দুই নামিয়ে দিই। সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা দমকা ঝোড়ো বাতাস আর খানিকটা জল ঢুকে যায় ভেতরে। সেই সঙ্গে পুরোপুরি ইংরেজী কণ্ঠে প্রশ্ন আসে Well can I do anything for you gentleman? হামি আপনাকে কোন সাহায্য করিতে পারি?'

সে কে কোথা থেকে এল এবং তার গাড়িই বা কোথায়—এ সব খবর নেবার কথা মাথাতেই এল না। এতক্ষণে একটা মানবকণ্ঠে শুনে এবং বলিষ্ঠ ইংরেজকে

হাতের কাছে পেয়ে মনের আনন্দে গল-গল ক'রে সব দুঃখ খুলে বললাম। অবশ্যই সংক্ষেপে—কারণ ঐটুকু খোলা দিয়েই জল এসে রীতিমত ভিজিয়ে দিচ্ছিল আমায়।

সব শুনে সাহেব একটা প্রবল সহানুভূতিসূচক স্ স্ স্ শব্দ ক'রে বলল, 'দেখি কি ব্যাপার ইঞ্জিনের—'

তারপর আর বিন্দুমাত্র বিলম্ব না ক'রে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে ইঞ্জিনের ঢাকাটা খুলে ফেলল। সেই অন্ধকারে সেই মুষলধারা বৃষ্টির মধ্যে কি দেখল আর কি করল কে জানে—একটু পরেই ঢাকাটা আবার বন্ধ ক'রে সামনের দরজাটা খুলে ভিতরে বসে গাড়িতে স্টার্ট দিল।

এতক্ষণের নীরব মৃতপ্রায় যন্ত্র যেন কোন্ মায়াবী জাদুকরের ছোঁয়ায় প্রাণ পেয়ে গর্জন ক'রে উঠল, রুদ্ধগতি গাড়ি কাঁপতে লাগল থরথর ক'রে ইঙ্গিতের অপেক্ষায়।

'নাও, এখন পারফেক্টলি অল রাইট হয়ে গেছে—। চল বরং তোমাকে পোঁছে দিয়ে আসি। আলিপুর যাবে তো?'

বলার সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ি ছেড়ে দিল সে। অনুমতির অপেক্ষাও করল না।

প্রথমটা খুশীই হয়েছিলাম, কি হচ্ছে ভাল ক'রে তলিয়ে না বুঝে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাসও ফেলেছিলাম। কিন্তু একটু খানি যাবার পরই সবটা যেন ভাল ক'রে মনে পড়ে গেল।

'কিন্তু বাহাদুর? বাহাদুর যে পড়ে রইল।'

দাঁতে দাঁত চেপে সাহেব বলল, 'চুলোয় যাক বাহাদুর। সে তার ব্যবস্থা ক'রে নেবে এখন। তার ভাবনা ভাবতে হবে না, তুমি তোমার ভাবনা ভাবো।'

সচেতন হবার সঙ্গে সঙ্গেই আরও একটা জটিল সংশয় দেখা দিয়েছিল মনে। বললাম, 'কিন্তু তোমার গাড়ি কোথায়? তুমি কোথায় যাচ্ছিলে? সে গাড়ির কি হ'ল? কৈ দেখলাম না তো!'

'আঃ, তুমি বড্ড পরের জন্যে মাথা ঘামাও বাবু, আগে নিজে বাঁচো তার-পর পরের চিন্তা ক'রো!'

এই বলে একটু শব্দ ক'রে হাসল সে।

সামান্য হাসি, অতি ক্ষীণ একটা ধাতব শব্দের মতো—কিন্তু তাতেই বুকের মধ্যেটা যেন কেমন অকারণ আতঙ্কে গুরগুর ক'রে উঠল।

আর সেই সময়েই আর একটা কথা মনে পড়ল। বাইরে প্রলয়কাণ্ড চলছে, এ রকম বর্ষণ, এত বড় বড় জলের বিন্দু আমরা শহরের লোক দেখা তো দূরে থাক কল্পনাই করতে পারি না। এই বৃষ্টিতে লোকটা বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল, তাতে তো ভিজে ন্যাতা হয়ে যাবার কথা, কিন্তু যতদূর মনে হচ্ছে সে রকম জলের আভাস তো টের পাচ্ছি না—

"......প্রাণপণে চেষ্টায় বিকট চিৎকার করে উঠলাম, থামাও থামাও"

কথাটা ভাবছি এমন সময় আর একবার বজ্রগর্জনের সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকাল। বেশ অনেকক্ষণ ধরে, আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত জ্বালিয়ে দিয়ে গেল সে বিদ্যুৎ। তারই আলোতে স্পষ্ট দেখলাম—আমারই চোখ থেকে বোধ হয় মাত্র এক হাত দূরে, দেখার কোন অসুবিধাও নেই—তার সাদা পোশাক নি-ভাঁজ ইস্ত্রির সমস্ত গৌরব নিয়ে অনার্দ্রই রয়েছে!!

একটা দিক্-দিশাহারা আতঙ্কে কিছুক্ষণের জন্য না রইল কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাড়বার ক্ষমতা আর না রইল কথা কওয়ার শক্তি। বিমূঢ় জড়ের মত বসে রইলাম। তারপরই বোধ হয় প্রাণপণ চেষ্টায় বিকট চিৎকার ক'রে উঠলাম, 'থামাও, থামাও। গাড়ি থামাও, এখনই। আমি আর যাব না, আমি নেমে যাব!!

কোন উত্তর এল না সামনে থেকে। শুনতে পেলে কিনা তাও বোঝা গেল না। কিন্তু গাড়িও থামল না, বরং মনে হ'ল যেন তার গতি বেড়ে গেল আরও।

কি করব? দরজা খুলে রাস্তায় লাফিয়ে পড়ব?

কিন্তু সে তো নিশ্চিত মৃত্যু!

ওর গলাটা টিপে ধরব?

উত্তর প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে নিজের মনেই পেলাম—সে সাহস হবে না।

তবে?

তবে যে কি করব সেইটেই ভেবে ঠিক করতে পারলাম না। কিছুই ঢুকল না মাথায়। অসহায়ভাবে বাইরের দিকে চেয়ে বসে রইলাম শুধু!

হু হু ক'রে ছুটে চলতে লাগল গাড়ি। এত জোরে যে, হেড্‌লাইটের তীব্র আলোতেই সামনের গাছপালা গুলো একাকার আবছা মেঘের মতো

মনে হ'তে লাগল। কিছুই বোঝা যায় না, কিছুই দেখা যায় না। ক্রমে বেগ এত বাড়ল, যেন মনে হ'ল চাকাগুলো আর মাটি স্পর্শ ক'রে চলছে না, এরোপ্লেনের মতো বাতাসে ভর দিয়ে ছুটছে।

কি একটা বলতে চেষ্টা করলাম আবারও—পারলাম না। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, কোন মতেই স্বর ফুটল না তাতে। ঘামে সমস্ত কাপড় জামা ভিজে গায়ের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে, হাতে পায়ে কোন জোর নেই।

তবে কি অন্তিমযাত্রাতেই চলেছি।

জীবনের এপারে কি কোথাও এ-চলার শেষ হবে না?

আমাকে নিয়ে যাবার জন্যেই কি প্রকৃতির এ প্রলয়ায়োজন?

কত কি এলোমেলো চিন্তা মাথাতে আসতে লাগল। কত কি নিরুত্তর প্রশ্ন।

ভয়ে কি পাগল হয়ে গেলাম নাকি?......

অসাড় অনড় হয়েই বসে আছি, অকস্মাৎ সামনে দূরে আর একটা কী সাদামতো নজরে পড়ল।

বহু দূরে। কি পদার্থ, গরু কি মানুষ কি অন্য কোন বস্তু, কিছুই ঠাওর হ'ল না। কিন্তু সাহেব আর একবার হেসে উঠল। সেই মৃদু অথচ কঠিন ধাতব শব্দ পাওয়া গেল একটা।

আবারও কাঁটা দিয়ে উঠল সর্বাঙ্গে। শির্‌শির ক'রে উঠল সমস্ত দেহটা।

কিন্তু ততক্ষণে গাড়ি আরও এগিয়ে গেছে। সেই সাদামতো পদার্থটা কাছে এসেছে। আর বুঝতে কোন বাধা নেই। দেখতেও না—আলোটা সম্পূর্ণই ওর ওপর পড়েছে।

মেয়েছেলে!

তরুণী বাঙালীর মেয়ে একটি। ঘরোয়া ধরণের শাড়ি পরে স্থির অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে আছে, পথের ঠিক মাঝখানে। এই দিকেই চেয়ে আছে।

আরও কাছে আসতে বোঝা গেল, বেশ সুশ্রী মেয়ে, ভদ্র বংশের তো বটেই।

কিন্তু গাড়ি যে সোজা ওর দিকেই ছুটে চলেছে!

আরে, ও যে নড়ে না।

'সাহেব হর্ণ দাও—দেখতে পাচ্ছ না?'

নিজের অজ্ঞাতসারেই কণ্ঠে স্বর ফুটেছে কখন—উৎকণ্ঠায় আতঙ্ক গেছি ভুলে। নিজের অবস্থার কথা মনে নেই আর, এই আসন্ন সর্বনাশ, শোচনীয় দুর্ঘটনাটাই প্রবল ও প্রধান হয়ে উঠেছে তখন।

সাহেব আর একটু হাসল শুধু।

মেয়েটাই বা সরছে না কেন?

ও কি তাহ'লে মরতেই চায়?

এই গহন বনে ও-ই বা এল কোথা থেকে?

তবে কি—

কিন্তু আর কিছু ভাবার সময় নেই তখন। আর কোন সময়ই নেই। ওকে বাঁচাবারও না। গাড়ি সোজা নক্ষত্র বেগে ওর দিকেই এগিয়ে চলেছে। ওর ওপরই এসে পড়ল যে!

আর সামান্য, আর চার হাত।

আর না। আর বাঁচানো গেল না।

মেয়েটা যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল গাড়ির সামনে— নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে।

আতঙ্কে দুঃখে ক্ষোভে প্রাণপণে চিৎকার ক'রে উঠলাম।......

প্রচণ্ড নাড়া খেল গাড়িটা, তীব্র ঝাঁকানি লাগল একটা—বোধ হয় ঐ মেয়েটার দেহে ধাক্কা খেয়েই—তারপর সেও আর্তনাদের মতো একটা দারুণ শব্দ ক'রে গেল থেমে। আর সঙ্গে সঙ্গে সম্ভবত সেই প্রবল ধাক্কাতেই হেড্‌লাইট দুটোও গেল নিভে।

তারপর সব আবার চুপচাপ। আবার সেই নিঃসীম নিরন্ধ্র অন্ধকার। শুধু একটানা বৃষ্টির রিমঝিম শব্দ। আর মধ্যে মধ্যে দূরাগত মেঘ গর্জন, গুরগুর গুমগুম।

তখন কিছু ভাবছি না ঠিক, কিছু করার তো উপায়ই নেই। সব শক্তি গেছে নিঃশেষ হয়ে, সব চেতনা গেছে হারিয়ে। চুপ ক'রে বসে আছি শুধু—

এমন সময় আবারও গাড়ির ঠিক পাশে কার একটা কাশির শব্দ হ'ল। একটা যেন সূক্ষ্ম আলোর রেখার মতোও কি চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল এক নিমেষে!

ব্যস্ আর আমার কোন জ্ঞান নেই। ঠিক কি ভেবেছি কি করেছি তা আর আজ বলতে পারব না—তবে নাকি বিকট একটা চিৎকার ক'রে দরজা খুলে

লাফ দিয়ে পড়েছিলাম রাস্তায়—অন্তত বাহাদুর তাই বলেছিল।

'বাবু বাবু ও কি করছেন? এই যে আমি, আমি বাহাদুর। চিনতে পারছেন না আমায়? ভয় পেলেন নাকি?'

হয়তো বাইরের ঠাণ্ডা বাতাসে, হয়তো বৃষ্টির জলে অথবা বাহাদুরের কণ্ঠস্বরে—কিসে জানি না, যেন প্রকৃতিস্থ হলাম একটু।

ভীত কম্পিত কণ্ঠে বললাম, 'বাহাদুর? তুমি কোথা থেকে এলে? কেমন ক'রে এলে? এতক্ষণ কোথায় ছিলে? আমি তো বহু দূর চলে এসেছি, কি ক'রে ধরলে আমায়?'

'কি বলছেন বাবু যা তা? ভয়ে পাগল হয়ে গেলেন নাকি? এই জন্যেই তখন আগে বাজিয়ে নিয়েছিলাম যে থাকতে পারবেন কিনা!...আপনারা শহরের লোক, আপনাদের দৌড় তো আমি জানি!...নিন উঠুন গাড়িতে!'

বাহাদুরের বিদ্রূপে ও তিরস্কারে আরও অনেকটাই প্রকৃতিস্থ হয়ে গেলাম। লজ্জিতভাবে তাড়াতাড়ি দোর খুলে গাড়িতে উঠে পড়লাম। কিন্তু ঐটুকুতেই ভিজতে আর কিছু বাকী রইল না।

বাহাদুরও উঠে বসল গাড়িতে। বর্ষাতিটা খুলে নিচে ফেলে দিয়ে বলল, 'আরও আপনার ভাবনাতেই আমি বেশী দূরে যেতে পারলাম না। কত—বড় জোর পনেরো কুড়ি মিনিট তো গেছি। তাতেই এত ভয় পেয়ে গেলেন?'

স্পষ্ট অবজ্ঞা আর বিদ্রূপ তার কথায়।

কিন্তু পনেরো কুড়ি মিনিট! লোকটা বলে কি? সত্যিই কি আমি ভয়ে পাগল হয়ে গেছি?

আস্তে আস্তে প্রশ্ন করি, 'ওদের পাত্তা পেলে?'

'না। তারা এতক্ষণে ঘরে ফিরে গিয়ে দরজা দিয়ে শুয়ে পড়েছে!' তিক্ত কণ্ঠে উত্তর দেয় বাহাদুর, 'আমারই দুর্ভোগ। এখন সারা রাত এইখানে বসে কাটাই, কালও আট মাইল না হাঁটলে উপায় হবে না। এক যদি কোন চলতি ট্রাক কি লরী এসে পড়ে তো তবু বাঁচোয়া।'

একটুখানি চুপ ক'রে থেকে বাহাদুরকে বলি, 'একবার স্টার্ট'টা দেখবে এখন চলছে কিনা?'

'মাথা খারাপ নাকি বাবু। তখন অত ধস্তাধস্তি করলুম তাই চলল না, এখন তো সব ঠাণ্ডা হয়ে বসে আছে!'

ওর ভাবভঙ্গী দেখে বার বারই মনে হচ্ছিল যে আর কিছু না বলাই উচিত। তবু কি মনে হ'ল—প্রায় মরিয়া হয়েই বলে ফেললাম, 'তবু একবার দ্যাখোই না। আমি বলছি—একবার চেষ্টা করো। তোমার তো কোন কষ্ট নেই—এটুকু তো বসে বসেই পারবে!'

বিরক্তি চাপবার কোন চেষ্টা করল না বাহাদুর, তবে কথাটা শুনল। বোধ হয় আমাকে অপ্রতিভ করবার জন্যই—পরে অনেক বেশী অপমান করতে পারবে এই ভরসায়। নিতান্ত তাচ্ছিল্যভরে সুইচটা টিপে ক্লাচে হাত দিল—

আর সঙ্গে সঙ্গে সেই অনড় অচল যন্ত্রটা যেন প্রবল গর্জন ক'রে উঠল, গাড়িটা কাঁপতে লাগল থরথর ক'রে। ইঞ্জিন যে স্টার্ট নিয়েছে সে সম্বন্ধে আর কোন রকম সন্দেহের অবকাশ রইল না।

'আরে! বহুত তাজ্জব বাত!'

একটা বিস্ময়সূচক ধ্বনি ক'রে চমকে ওঠে বাহাদুর। অবাক হয়ে বলে, 'এ কি ব্যাপার বাবু? আপনি কি কিছু ক'রেছিলেন? আপনি কি জানেন এ সব মেরামতির কাজ? তাহ'লে তখন বললেন না কেন?'

'বলছি বলছি। তার আগে তুমি এখান থেকে একটু এগিয়ে যাও দিকি!'

এবার আর বাহাদুর কোন আপত্তি করল না, বিনা বাক্যব্যয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল।

খানিকটা চলবার পর মনে জোর পেলুম খানিকটা, মনের মধ্যে কিছু পূর্বের অভিজ্ঞতাটাও ভেবে একটু গুছিয়ে নিতে পারলুম। তখন ইঙ্গিতে ওকে থামতে বলে একে একে সব বললুম।

শুনতে শুনতেই যে বার কতক শিউরে উঠল ও, তা এই অন্ধকারেই টের পাওয়া গেল। দু হাত নিজের কানে ও নাকে ঠেকিয়ে হাত জোড় ক'রে প্রণাম করল কাকে, তারপর রীতিমত কম্পিত কণ্ঠে বলল, 'জয় রামজীকি, জয় শিউজীকি! মা কালী আর আপনার গুরুজীর বহুত কৃপা তাই আজ প্রাণে বেঁচেছেন। নইলে এই আঁধেরা রাত আর আপনি একা—আপনার তো অপঘাত হবারই কথা।...হ্যাঁ ওরা এখানেই থাকে, আমি শুনেছি বহুত বার তবে কথাটা মনে ছিল না। নইলে আপনাকে ছেড়ে যেতাম না। অবশ্য আমি কখনও দেখি নি, আর দেখবই বা কি ক'রে—আমি তো এত রাত্রে কখনও গাড়ি চালাইনি এ-পথে।...ওরা এই রাত দুটো-তিনটের সময়ই নাকি পথে বেরোয়!'

'কিন্তু ওরা কারা? এমনভাবে এখানে ঘুরে বেড়ায় কেন? এখানেই বা এল কি ক'রে? একজন তো দেখলাম সাহেব—তার সঙ্গে ও বাঙ্গালীর মেয়ে? সে-ও কি অপদেবতা? যা দেখলাম সবই মায়া? আচ্ছা গাড়ি তুমি যেখানে ছেড়ে গিয়েছিলে সেখানেই পেলে?

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রশ্ন করি অনেকগুলো।

'ঠিক সেখানেই পেয়েছি বাবু। একটা বড় শিরীষ গাছ চিহ্ন করা ছিল। ওখানটায় মস্ত বাঁক বলে সরকার থেকে সাদা দাগ দিয়ে দিয়েছে কাঠের গুঁড়িতে।

তারপর একটু হেসে শুরু করল, 'হ্যাঁ বাবু, ওরা দুজনেই ভূত। শুনবেন ওদের গল্প?'

প্রশ্ন করল বটে তবে সম্মতির অপেক্ষা করল না।

বাহাদুর যা বলল তা সংক্ষেপে এই :

ঐ জায়গাটায় এর আগে একটা বড় চা-বাগান ছিল, ডাইনীমারা চা-বাগান। সাহেবের বাগান, সাহেবই ম্যানেজার থাকত। বেশী দিনের কথাও নয়, চল্লিশ বছর আগে ঐ সাহেব আসে এদেশে, রোল্যান্ড সাহেব, নতুন ম্যানেজার হয়ে। মালিকের ভাগ্নে, সুতরাং ঠিক সাধারণ মাইনে করা কর্মচারীর মতো নয়—মালিকের মতোই যা-খুশী তাই করত।

অত্যন্ত মদ্যপ আর লম্পট ছিল লোকটা। এখানে এসে চা-বাগানের মেয়েদের কারুরই সর্বনাশ বাকী রাখে নি। কিন্তু ওদের নিয়েই চলছিল, ভদ্রলোকদের দিকে হাত বাড়ায় নি। হঠাৎ ওখানকার বড়বাবুর মেয়ে রাণী সাহেবের চোখে পড়ে গেল। সাহেব পাগল হয়ে উঠল, রাণীকে তার চাই। তিনি লোক দিয়ে বড়বাবুকে বিস্তর টাকা কবুল করলেন—একটা রাত পেলেই চলবে তাঁর, তার জন্য হাজার টাকা পর্যন্ত দিতে রাজী আছেন। বড়বাবু ছিলেন সাত্বিক প্রকৃতির লোক, প্রাচীন ব্রাহ্মণ বংশের ছেলে। তিনি ঘৃণার সঙ্গে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তখন শুরু হ'ল নানা রকমের জুলুম। পাহাড়ে দেশ হ'লে কিম্বা আগেকার দিন হ'লে জোর ক'রেই কাজ উদ্ধার করত সাহেব কিন্তু এ-ক্ষেত্রে সোজাসুজি জোর করতে পারল না। অন্য দিক দিয়ে জব্দ

করবার চেষ্টা করতে লাগল। শেষে বিরক্ত হয়ে বড়বাবু চাকরি ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় চলে যেতে চাইলেন। শিকার হাতছাড়া হয় দেখে সাহেব এক মহা শয়তানী করল, তহবিল তছরুপের দায়ে জড়িয়ে ও'কে গ্রেপ্তার করল। সাহেবের টাকা ছিল, আর সে সময় এদেশে সাধারণ কেরাণীদের মধ্যে ও জিনিসটির তেমন স্বচ্ছলতা ছিল না। টাকা খাইয়ে বড়বাবুরই জন দুই য়্যাসিস্‌টান্টকে সাক্ষী খাড়া করল। খাতাপত্রও রাতারাতি পাল্‌টে দেবার ব্যবস্থা হ'ল।

প্রথমটা বড়বাবু অত ভয় পান নি। শেষে গতিক দেখে প্রমাদ গুণলেন। স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের বলে পাঠালেন, সব ফেলে রেখে কোন মতে প্রাণ নিয়ে এখান থেকে পালাতে—তাঁর অদৃষ্টে যা আছে তা তো বোঝাই যাচ্ছে কিন্তু যে জন্যে এত কান্ড সেই মেয়ের ইজ্জৎটাও না যায় শেষ পর্যন্ত।

ওর স্ত্রী সেই চেষ্টাই করতে লাগলেন। তবে তাও যে সম্ভব হবে না, গোড়া থেকেই সেটা বোঝা গেল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে রাণীর জন্য এত, সেই রাণীই সব ওলট পালট ক'রে দিলে।

সে এবার ব্যাপারটা নিজের হাতে তুলে নিলে। সটান সোজা সাহেবের বাংলোয় গিয়ে বললে যে সে নিজেই এসে ধরা দিতে প্রস্তুত আছে যদি সাহেব তার বাবার নামে নালিশ তুলে নিয়ে সসম্মানে মুক্তি দেয় এবং প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা মাইনের টাকা সব মিটিয়ে দিয়ে আরও দু হাজার টাকা বেশী দেয়।

সাহেব তখনই রাজী হয়ে গেল। শুধু বললে, 'জামিন?'

রাণী জবাব দিলে, 'জামিন আমি! আমি আমার মার নামে দিব্যি গেলে যাচ্ছি—এ কথার নড়চড় হবে না। সন্ধ্যার মধ্যে তুমি তোমার কাজ শেষ কর আমি রাত অন্টার মধ্যে তোমার বাংলোয় হাজির হব!'

সাহেব তো মহা খুশী, আনন্দে শীস দিয়ে উঠল।

তবে সে-ও বাহাদুর ছেলে। সেই দিনই অবশিষ্ট ক ঘন্টার মধ্যেই ওদের চুক্তির তার শর্ত নিঃশেষে পালন করলে। এমন কি সকলের সামনে বড়বাবুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে। জানালে সে অনুতপ্ত।

সকলেই সেই কথা জানল, এমন কি বড়বাবুও। কারণ রাণীর এই ব্যাপার কেউ জানত না। তবুও বড়বাবু যাত্রার তোড়জোড় শুরু করলেন, এখানে বেশী দিন থাকা নিরাপদ নয়। কে জানে মাতালটার মতি বদলাতে কতক্ষণ?

কেউই কিছু জানল না। তখন এদিকে বিজলীর আলো হয়নি, হ'লেও কিছু রাস্তায় আলো থাকত না। কালো কাপড় পরে বেরিয়ে কখন সাহেবের বাংলোয় গিয়ে আধ ঘন্টার মধ্যে ফিরে এসেছিল রাণী তা কেউ টের পায় নি। ওর কথামত সমস্ত ঝি চাকরকে সে সময়টা সরিয়ে দিয়েছিল সাহেব, কথাটা ছড়াবে সে সম্ভাবনা ছিল না।

সাহেব খুব খুশী, ব্যাপারটা ভালয় ভালয় মিটে গেছে বলে নিশ্চিন্তও। খুশী মনেই ফুর্তি করতে সহরে গিয়েছিল। বহু রাত্রি পর্যন্ত ক্লাবে চেঁচামেচি হল্লা ক'রে মদ খেয়ে বাগানে ফিরছিল সে স্বপ্নেও ভাবে নি যে রাণীর মনে এই ছিল!

ঘটনাটা ঘটেছিল ঠিক ঐ জায়গাটাতেই, আমাদের গাড়ি যেখান ছিল। রাণী একটা বড় গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল ওরই অপেক্ষায়। পুরো স্পীডে গাড়ি আসছে এমন সময় পথের মাঝখানে এসে দাঁড়াল সে। সাহেবের তখন মদে আচ্ছন্ন দৃষ্টি, যখন বুঝল এবং চিনতে পারল তখন আর ব্রেক কষবার সময় ছিল না. ওরই গাড়ির চাকার তলায় পিষে গেল রাণী।

এরপর যে কি হ'ল—যেন একেবারে জন্তু হয়ে গেল সাহেব। তারপর বেঁচেও ছিল মোটে সাত-আটটা দিন। একদিন গভীর রাত্রে সেই বড় গাছটারই একটা ডালে গলায় ফাঁস লাগিয়ে মরল সে। তারপর থেকেই নাকি ওরা দুজন এখানে আছে। দৈবাৎ কোন দিন রাত্রে একা এপথে কেউ গেলে ওদের দেখতে পায়—বেশ বড় বড় কটা দুর্ঘটনাও ঘটেছে এখানে। গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে চুর হয়ে গেছে গাড়ি—অকারণেই বলতে গেলে।

'তারপর থেকেই এখানকার চা-বাগানটা নষ্ট হয়ে গেছে' জানালো বাহাদুর, 'অনেকে চেষ্টা করেছে কিন্তু কেউ নাকি টিকতে পারেনি। এমন সব উপদ্রব হ'তে লাগল যে বাঙ্গালী তো বাঙ্গালী, সাহেবরা পর্যন্ত পালাতে পথ পেলে না—বাগান ছেড়ে। তবু তো সেই গলায়-দড়ি গাছটা ওরা কেটে পুড়িয়ে দিয়েছিল—কিছু কিছু যাগ হোমও করেছিল। কিন্তু সাহেবের বাগান সাহেবেরা তো আর ও সব করবে না, তা সম্পত্তি থাক আর যাক।...গেলই অবশ্য, এমনি পড়ে পড়েই যন্ত্রপাতি সব গেল নষ্ট হয়ে, বাড়িঘর গেল ভেঙ্গে। সকলকার মনেই এমন ভয় ঢুকে গেল যে অত দামী দামী জিনিস পড়ে পড়ে নষ্ট হ'ল তবু কোন চোর পর্যন্ত এল না চুরি করতে। এখনও জঙ্গলের মধ্যে খোঁজ করলে হয়ত সে-সব জিনিস খুঁজে পাবেন।'

এই পর্যন্ত বলে একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলল বাহাদুর, কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে বসে রইল সে।

আমি ঘড়িটা দেখে নিয়ে বললাম, 'এবার গাড়িটা ছাড় বাহাদুর, রাত তো পুইয়ে গেল প্রায়। চারটে বাজে, এখনই ফরসা হয়ে যাবে। যা দেশ তোমাদের!'

'এই যে ছাড়ি বাবু!' সে আবারও স্টার্ট দিয়ে বললে, 'তবে একটা কথা বাবু, আপনার কিন্তু সত্যিই খুব বরাত জোর। আপনার কোন অনিষ্ট তো করেই নি—উল্‌টে গাড়িটা সত্যিই খুব ভাল সারিয়ে দিয়ে গেছে। খাসা হাত ব্যাটার, তা মানতেই হবে!'

রোশনাই

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

দোতলার বারান্দার কোণে মিট্-সেফের সামনে দাঁড়িয়ে ভিজে কাপগুলো মুছে রাখছিল বাসন্তী। এক নজর তাকিয়েই সুধীর দেখল, জামা-কাপড় বদলে তৈরি হওয়া দূরে থাক, এখনো বৈকালিক গা-হাতই ধোয়া হয়নি তার। তক্ষুনি বুঝে নিল সমাচার কুশল নয়। ইশারায় জিজ্ঞাসা করল, কি হল?

ইশারায় কারণ, আধা-আধি দরজা ভেজানো সামনের ঘরে কর্তাব অবস্থান সম্বন্ধে নিঃসংশয় সে।

হাসি চেপে বাসন্তী গম্ভীর মুখে মাথা নাড়ল। তারপর তেমনি ইশারায় বাবার ঘরটা দেখিয়ে কল্পিত কলম দিয়ে শূন্য বাতাসে লিখল কিছু। অর্থাৎ, হবে না। ও-ঘরে হিসেব কষা চলছে—

সুধীর বুঝল। বুঝে বিরস বদনে পা টিপে শেষের ঘরে ঢুকে হাত পা ছড়িয়ে চৌকির ওপর বসে পড়ল। ছুটির দিন। দুজনে সিনেমায় যাওয়ার কথা ছিল। হয়ে গেল। না, টিকিট কিনে আনেনি সে। টিকিট আর আগে থেকে কেনে না। কর্তার ওই হিসেবের ধাক্কায় অনেকবার অনেক টিকিট নষ্ট হয়েছে। আজকাল আর সুধীর এ-সব নিয়ে রাগ করে না। বাসুকে বরং এক একসময় জিজ্ঞাসা করে, কর্তার খাবারের সঙ্গে কিছু কবরেজের বড়ি আর মাথার তেলের সঙ্গে কিছু কবরেজি তেল মিশিয়ে রাখলে কি হয়।

বাসু অর্থাৎ বাসন্তী কখনো হাসে, কখনো জবাব দেয়, মাথা আর একটু ঠান্ডা হয় তাহলে, হিসেবটা আরো একটু ভালো খোলে।

বাবা! থাক্ থাক্—

সকাল সন্ধ্যায় বা ছুটির দিনে খুঁটিনাটি হিসেবের ব্যাপার এ বাড়িতে লেগেই আছে। কিন্তু কর্তা শম্ভুবাবু ঘরের দরজা আবজে হিসেবে বসেন যখন, বাড়ির হাওয়া অন্য রকম। বাসুর দুরন্ত ছোট ভাই বোনগুলোও তখন একটা অদৃশ্য হিসেবের ছকে আটকে পড়ে যায়। সকলকেই তখন হিসেব করে চলতে হয়, হিসেব করে কথা কইতে হয়, হিসেব করে হাসতে হয়। তখন কোনো কিছুর আধিক্য হিসেবের গন্ডী ছাড়িয়ে বাড়তি খরচ করে ফেলার মতই অশোভন।

বাসুর ধারণা, এই হিসেবের ধকলটা সব থেকে বেশি যায় তার ওপর দিয়েই। কখন মৃদু গম্ভীর ডাক আসে সেই ভয়ে সদা সন্ত্রস্ত। বাবার হাতে কাগজ পেন্সিল দেখলেই বুক দুরু দুরু। ডাক তো হামেশাই আসে। ওকে ছাড়া বাবা ডাকবেনই বা কাকে। কোন্ ব্যাপারে কত খরচ হল না হল জিজ্ঞাসা করেন। সে তবু এক রকম জবাব দেওয়া যায়, কারণ খরচ তো হয়েই গেছে। খরচ বেশি হয়েছে শুনলেও বাবা মুখের ওপর খুব যে রাগ করেন বা কটু কথা বলেন তা নয়। গলা ফাটিয়ে রাগারাগি চেঁচামিচি বরং মায়ের সঙ্গে করতেন। ওকে শুধু বলেন, একটু বুঝেশুনে চলিস. অফিসের কাজ তো হয়ে এলো, কটা দিন আর—

কিন্তু বাসুর সব থেকে বিপদ, বাবা যখন জিজ্ঞাসা করেন, কোন্ ব্যাপারে কত লাগবে বা লাগতে পারে। কিছু লাগবে না, এমনিতেই সব হয়ে যাবে বলতে পারলে বোধহয় সব থেকে খুশি হত বাসু। বাবা চড়া গলায় জিজ্ঞাসা করেন না। ঠান্ডা সুর, ঠান্ডা প্রতীক্ষা। কিন্তু তাইতেই সর্বাঙ্গ ঠান্ডা হয়ে যাবার উপক্রম বাসুর। থতমত খেয়ে এক-এক সময় এমন একটা শীর্ণ অঙ্ক বলে বসে যে বাবাও হেসেই ফেলেন। কিন্তু অখুশি হন না বোঝা যায়। বলেন, তোর কোনো কান্ডজ্ঞান যদি থাকত—নে, এই টাকা রাখ্, এর মধ্যে চালিয়ে নিস্—

যা চাওয়া হয়েছে, তার থেকে অনেক বেশি দেবার তৃপ্তি লাভ করেন শম্ভুবাবু। কিন্তু বাসুর সব থেকে মুশকিল হয়, এই বেশি অঙ্কটাও যখন নির্ধারিত সময়ের আগেই শূন্যে মিলিয়ে যায়। তখন নিজে আর সামনে আসে না বড়। ভাই বোন কারো মারফৎ আবেদন পেশ করে, টাকা ফুরিয়ে গেছে, আরো কিছু লাগবে। বাবা টাকা দেন, কিন্তু তার পরেই ভয়ানক গম্ভীর। বাসু প্রাণপণ চেষ্টা করে বাবা যা দেন তার থেকে কিছু বাঁচাতে। কিন্তু তার হাতে এলে টাকাগুলোর যেন পাখা গজায়। কোথা দিয়ে কি হয় হদিসই পায় না। তার ওপর বাবা আবার এক সময় ডেকে জিজ্ঞাসা করেন, খরচটা বেশি হল কিসে। বাসু বোবা তখন।

মায়ের ওপরেই ভারি রাগ হয় বাসুর, অভিমান হয়। ওকে জব্দ করার জন্যেই যেন মা অসময়ে দুনিয়া পাড়ি দিয়েছে। মা মারা যাবার পর এই চার চারটে বছর কি করে কাটল সে-ই জানে। কবরেজের তেল খানিকটা বাবার বদলে ওর মাথায় পড়লে ঠিক হয়। তাও তো চলছে এখনো, ছ' মাস বাদে কি হবে ভাবতে গেলে এখন থেকেই বাসুরও মাথা গরম হয়ে যায়।...ছ' মাস বাদে বাবার চাকরি শেষ। এখনই যা, তখন কি আর মুখের দিকে তাকানো যাবে।

...অবশ্য আরো ছ'মাস হয়ত বাসু এ-বাড়ির কর্তৃত্ব নিয়ে থাকবে না। ওদিকে তো এখন থেকেই হাঁ করে দিন গুনছে একজন। বাসুর পরের ভাইটা সবে কলেজে ঢুকেছে। ওটার অবস্থাই কাহিল হবে আর কি। বাবা বাসুকে আজকাল ধমক ধামক না করলেও ভাই বোনগুলোকে ছাড়েন না।

যাই হোক, খরচের সমস্যায় পড়লে অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ের আগে টাকা ফুরোলে বিড়ম্বনাটা বাসুর মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। সুধীর অন্তত বোঝে। যে মাসে দুই একদিন আগে অন্তত টাকা ফুরোয়েই। তার জেরায় পড়ে সমস্যাটা ফাঁস হয়ে যায়। গোপনে সদাই-পত্র করে সুধীরই তখন চালিয়ে দেয়। প্রথম প্রথম সঙ্কোচ হত বাসুর, আপত্তি করত। সুধীর উল্টে চোখ রাঙাতো, মাসের মধ্যে যে কুড়িদিন রাতে খাই এখানে তার খরচা ধরলে কত হয়? কম পড়বেই তো, সে-টাকা তো আর কর্তা হিসেব করে ধরে দেন না তোমাকে! বাসুর রাগ দেখে হাসে কখনো, বলে, দু'দিন বাদে তো নির্বিবাদে পকেট ফাঁক করবে—এখন থেকেই অভ্যেস হোক।

অভ্যেস হয়েছিল। মাসের শেষে সুধীন নিজে থেকেই জিজ্ঞাসা করত, কি অবস্থা?

বাসু জবাব দিত, অবস্থা ভালো না, ডাক্তার লাগবে।

কিন্তু একবার ধরা পড়ে গেল। আর ধরা পড়ে দুজনেরই অবস্থা কাহিল। সেবারে কর্তা বেশ কিছু কমই দিয়েছিলেন মেয়ের হাতে। শেষের দিকে অফিস থেকে বাড়তি টাকা পাবেন কিছু। ভেবে রেখেছিলেন, টাকাটা পেলে বাকিটা দিয়ে দেবেন। কিন্তু খেয়াল করে সেটা আর বলেননি মেয়েকে।

তৃতীয় সপ্তাহ শেষ না হতে মেয়ের চক্ষু স্থির। ট্রাঙ্কের তবিলের দিকে চেয়ে কান্না পাচ্ছিল তার। কি দিয়ে কি হয়ে গেল টাকাগুলো মাথা খুঁড়েও ঠাওর করতে পারল না। সমাচার অবগত হয়ে সুধীর আশ্বাস দিতে চেষ্টা করল, আছে গৌরী সেন, তোমার ভাবনা কি!

বাসুর মেজাজ খারাপ।—যাও ভালো লাগে না, বাবা এমনিতেই দুজনকে সমান উড়ন-চন্ডী ভাবে আমাদের।

সুধীর প্রতিবাদ করল।—কথাটা ঠিক হল না,...আমাকে উড়ন-শিব ভাবেন বোধহয় আর তোমাকে উড়ন-চন্ডী।

ঠিক দুদিন বাদেই বাবার ঘরে ডাক পড়ল বাসন্তীর। জিজ্ঞাসা করলেন, হাতে কি আছে রে, আর কত লাগবে?

একটু অবাক হলেও সুবোধ মেয়ের মত বাসু বলল, আর লাগবে না বাবা, কুলিয়ে যাবে—

কিন্তু শুনে বাবা যেন আকাশ থেকে পড়লেন।—কুলিয়ে যাবে কিরে, মাস চলে যাবে?

বাসু ভয়ে ভয়ে মাথা নাড়ল।

ফলে হাতে যা আছে এনে দেখাতে হল তাঁকে, এ-পর্যন্ত কত খরচ করেছে না করেছে সব দাখিল করতে হল। কারণ এ-রকম সুবাঞ্ছিত অঘটনই বা শম্ভুবাবু বিশ্বাস করবেন কি করে। বলা বাহুল্য, মেয়ের হিসেবের সঙ্গে টাকার অঙ্ক আদৌ মিলল না। বাসুর প্রাণান্ত সঙ্কট।

শেষে বিরক্ত হয়ে মেয়ের মুখের দিকে ভালো করে তাকাতেই শম্ভুবাবুর চকিতে একটা সন্দেহের ছায়া পড়ল মনে। সুধীরকে অনেকদিন এটা সেটা হাতে করে নিয়ে আসতে দেখেন, সখ করে রাতের বাজারও যে এক একদিন করে নিয়ে আসে তাও দেখেন। শম্ভুবাবু এ-সব তেমন পছন্দ করেন না, কিন্তু দুঃখ পাবে ভেবে কিছু বলেন না।

সুধীরের কাছ থেকে টাকা নিয়েছিস?

মেয়ের মনে হচ্ছিল মাটি দুফাঁক হলে তার মধ্যে ঢুকে বাঁচে।

শম্ভুবাবু হতভম্বের মত চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর যথার্থই রেগে গেলেন।—আর কত বেশি দিলে তোর চলবে? তুই এভাবে অপমান করিস আমাকে?

ভাবী জামাইয়ের কাছ থেকে কত নেওয়া হয়েছে জেনে নিয়ে টাকাটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন তিনি।

কিন্তু হিসেব করা বন্ধ হল না। ছ' মাস বাদে রিটায়ার করবেন, দিনের পর দিন হিসেবের জটিলতা বাড়তেই থাকল।

সম্ভাব্য তহবিলের আয়তনটা টানলে বাড়বে না, সেটা মোটামুটি নির্দিষ্ট। অতএব ব্যয়ের খসড়াটাই সুক্ষ্মতর বিস্তার লাভ করছে ক্রমশঃ।...একুশ হাজার টাকার লাইফ ইন্সিওরেন্স আটাশ হাজারে দাঁড়াবে। সরকার হাতে না নিলে তিরিশ হাজারই হত, তা ওনারা তো যাতে হাত দিয়েছেন তাই ঝাঁঝরা। গ্র্যাচুইটি পাবেন চৌদ্দ হাজার—হল বিয়াল্লিশ। প্রভিডেন্ড ফান্ডে জমেছে বাইশ হাজার—মোট চৌষট্টি। ব্যাঙ্কে হাজার দেড়েক আছে সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়—বুড়ো বয়সের অসুখ বিসুখ আছে, অনেক কিছু আছে। সর্বসাকুল্যে শেষ সম্বল ওই চৌষট্টি—এ ছাড়া পেনশন বলতে এক পয়সাও নেই।

আগের দিন হলে শম্ভুবাবুর আর ভাবনার কি ছিল। টাকার দাম তো দিনকে দিন নয়া পয়সার দিকে গড়াচ্ছে। ...পাঁচটি সন্তানের মধ্যে সবার ছোট দুই মেয়ে। তাদের বিয়ে নমো-নম্যো করে সারতে হলেও আট হাজার করে লাগবে। তিনি থাকুন আর না-ই থাকুন টাকা তো লাগবেই। সেই দিনের বাজারটা অনুমান

করতে পারছেন না বলেই মোটামুটি আট হাজার করে ষোল হাজার ধরে রেখেছেন। তার ওপর ওদের বি-এ পর্যন্ত পাস করিয়ে তুলতেও খুব কম করে আরো দু' হাজার দু' হাজার চার হাজার। লেখাপড়া না শেখালে ভালো বিয়ের আশায় ছাই আজকাল, বড় মেয়েকেও দু' বছর হল বি, এ পাস করিয়ে ছেড়েছেন তিনি। গেল কুড়ি। ছোট দুই মেয়ের ওপরে দুই ছেলে। একটি আই, এ পড়ছে, আর একটি ইস্কুলের মাঝামাঝি। আগে তাদের পড়াশুনার ব্যয় বাবদ একটা মোটামুটি হিসেব ধরেছিলেন। সম্প্রতি বছর গুনে খরচের ছক কেটেছেন। তাতেও দেখা গেছে একজনের তিন হাজার আর তার ওপরের জনের দু' হাজার লাগবে—ছেলেদের মোটামুটি ভালো করেই মানুষ করার ইচ্ছে তাঁর। গেল পঁচিশ। বড় মেয়ের বিয়ের খরচটা একটু বিশ্লেষণসাপেক্ষ—তবে তাতেও পাঁচ ধরেছেন। হল তিরিশ। তারপর মফঃস্বলের আদ্যিকালের পুরনো ভাড়াটে বাড়িতে আছেন বলেই এই ভাড়ায় থাকতে পারছেন। তাও প্রতিমাসে বাড়িওয়ালা ভাড়া নেবার সময় খোঁজ নেয়, কবে পর্যন্ত বাড়িটা ছাড়া পাওয়া সম্ভব।

ধারে কাছে জমি একটা দেখেই রেখেছেন শম্ভুবাবু—টাকাগুলো হাতে পেলেই ওটা কিনবেন। তারপর মাথা গোঁজবার জায়গাও করবেন একটা। কিন্তু যে বাজার, কিছু না কিছু না করেও হিসেব করে দেখেছেন বাইশ হাজার লাগবে জমি আর বাড়িতে। তাও যদি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে করতে পারেন। তিরিশ আর বাইশে বাহান্ন। হাতে থাকলো বারো। এই বার হাজারে ছেলে দুটো মানুষ না হওয়া পর্যন্ত সংসার নির্বাহ ,জামা-কাপড়, ডাক্তার, ওষুধ,—সব। শম্ভুবাবুর চোখে বারো হাজার টাকা বারো হাজার নয়া পয়সার মতই প্রায়। অনেক হিসেব করেও বারো হাজারকে তের হাজারে টেনে তুলতে পারছেন না তিনি, বরং মনে মনে জানেন, ওর থেকে আরো কমই থাকবে হাতে। তাছাড়া টেনেটুনে (ছেলে-মেয়ের লেখা-পড়ার খরচ বাদে—সেটা আগেই ধরা আছে) মাসে আড়াইশয় সংসার চালালেও চার মাসে হাজার টাকা, বছরে তিন হাজার টাকা—চার বছরে বারো হাজার খতম।

তারপর? তারপর কি হবে?

যত দিন যায়, এই তারপরের চিন্তায় মাথা গরম শম্ভুবাবুর।

এখানে বড় মেয়ের বিয়ের হিসেবের প্রসঙ্গ। সেটা একেবারে সমূহ বলেই ফর্দ করে টাকার অঙ্ক ফেলতে পেরেছেন তিনি। তবে তারও অদল-বদল হয়েছে এবং হচ্ছে।

বিয়ে আরো ছ'সাত মাস আগেই হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। এ-বাড়িতে সুধীরের যাতায়াত কলেজে পড়তে। তার বাবা আর শম্ভুবাবু বাল্য বন্ধু ছিলেন। ছেলেটাকে পথে ভাসিয়ে বন্ধু অকালে চোখ বুজেছিলেন। সুধীর পড়াশুনায় ভালো বলে কলেজে বিনে পয়সায় পড়তে পেরেছিল। শম্ভুবাবুর নির্দেশে রোজ সন্ধ্যায় সুধীর তখন এ-বাড়ির এক চৌকি ছেলেমেয়ে পড়াত। বাসুরও পড়ার কথা তার কাছে, কিন্তু পরীক্ষা না এলে সে বিশেষ পড়ত না—কারণ তাকে পড়াতে গেলেই শেষ পর্যন্ত ঝগড়া-ঝাঁটি হয়ে বসত। তবে পরীক্ষা এলে, বিশেষ করে উঁচুর দিকের পরীক্ষার সময় বাসুই আবার সুধীরকে একটু তোয়াজ করে চলত। যাই হোক, ছেলেমেয়ের পড়ানোর বিনিময়ে শম্ভুবাবু সুধীর আর তার বিধবা মায়ের খরচটা এক রকম চালিয়ে দিতেন। অবশ্য বেশি লাগতও না তখন।

এম-এ'তে খুব ভালো রেজাল্ট হওয়ার দরুন সুধীর মফঃস্বলের এই সরকারী কলেজে সহজেই লেকচারারের কাজ পেয়েছিল। বরাত জোরে আবার এরই মধ্যে প্রমোশন পেয়ে প্রফেসারও হয়ে বসেছে। শম্ভুবাবু বাসুর সঙ্গে ওর বিয়ের প্রস্তাবটা তার মায়ের কাছে তার আগেই করে রেখেছিলেন। সুধীরের মা আনন্দে কেঁদেছিলেন সেদিন। মাঝে ভাদ্র আশ্বিন না পড়লে বিয়েটা হয়ে যেত। কিন্তু ছেলের বিয়ে দেখা কপালে ছিলই না ভদ্রমহিলার। শরীর বরাবরই রুগ্ন—আচমকা সাত দিনের জ্বরে চোখ বুজলেন তিনি। গুরুদশার দরুন এক বছরের মত বিয়ে পিছিয়ে গেল।

সুধীর কলেজ হস্টেলে একটা ঘর নিয়ে থাকে এখন। চারটি ভাবী শালা-শালিকে পড়াবার অছিলায় এখনো প্রতি সন্ধ্যায় হাজিরা দেয়। পড়াতে বসেও। কিন্তু পড়ানো যা হয় সেটা সকলেই জানে। শম্ভুবাবুও জানেন। গল্প-গুজব করে, সিনেমা দেখে, নয়ত বেড়িয়ে আর প্রায়ই রাতের আহারটা এখানেই সেরে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে হস্টেলে ফেরে সে।

শম্ভুবাবুর গোড়ার ফর্দে মেয়ের বিয়ের খরচের অংকটা ছ'হাজারে উঠেছিল। কিছুদিন আগে কাট-ছাঁট করে সেটা সাড়ে পাঁচ হাজারে দাঁড়িয়েছিল। সম্প্রতি এক আঁচড়ে সেটা পাঁচে নেমেছে। খরচ বাবদ সুধীরের হাতে তিনি দেড় হাজার নগদ দেবেন ধরে রেখেছিলেন। সেটা কেটে এক করেছেন। ফলে পাঁচশ টাকা কমেছে। দেড় হাজারই দিতেন, কিন্তু সুধীরের হাতে টাকা দেওয়া আর টাকা জলে ফেলা এই দুইয়ের মধ্যে খুব তফাত দেখেন না তিনি। মাইনে-কড়ি আজকাল কম পায় না, কিন্তু ক'টা পয়সা হাতে রাখে সন্দেহ আছে শম্ভুবাবুর। প্রফেসার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোটা টাকার একটা ইন্সিওরেন্স করিয়ে দিয়েছিলেন। সুধীর তখন মুখ কাঁচুমাচু করে বলেছিল, কিছু কম করলে হত, মাসে অতগুলি টাকা প্রিমিয়াম দেওয়া......

শম্ভুবাবু কমাননি, কিছু বলেনও নি। কিন্তু অবাক হয়েছিলেন। ছেলেটা টাকাগুলো নিয়ে করে কি!

বাবার অনুপস্থিতিতে ঘর গোছাতে এসে প্রায় সব হিসেবই বাসুর চোখে পড়ে। উল্টেপাল্টে দেখে আবার রেখে দেয়। নিজের বিয়ের খরচের ফর্দ'টাও সে অনেকবার দেখেছে। প্রত্যেকটা হিসেবের তালিকায় সুধীরের খরচ বাবদ দেড় হাজার ধরা দেখেছে। এই শেষের তালিকায় সেটা কেটে হাজার করাটা তার চোখ এড়ালো না।

রাতে হাসতে হাসতে সুধীরকে জানালো খবরটা। বলল, আগের সব লিস্ট-এ বিয়ের খরচ বাবদ তোমার নামে দেড় হাজার টাকা ধরা ছিল, নতুন লিস্টে দেখলাম সেটা কাটা গিয়ে হাজার হয়েছে।

খরচ বাবদ হাত পেতে এক পয়সাও নেবে না সেটা সুধীরই জানে শুধু। আর মনে মনে বাসুও জানে হয়ত। কিন্তু শুনে সুধীর ছদ্ম-চিন্তার ছায়া টেনে আনল মুখে। বলল, বিয়ের দিন পর্যন্ত উল্টে হাজার টাকা চাইবেন না তো শেষে? তারপর হাসতে হাসতে বলল, ওই হাজারটাও তুমি বরং কেটে দিয়ে এসো—হাজার টাকার হিসেব দিতে গিয়ে মাথার চুল শাদা করবে কে?

ভাবী জামাইয়ের খরচের হাত দেখে শম্ভুবাবু অনেক সময় ভিতরে-ভিতরে গজগজ করেন। মেয়েটাও হয়েছে তেমনি, কোথায় একটু রাশ টেনে চলার পরামর্শ দেবে তা না উল্টে এক কাঠি ওপর দিয়ে চলে। কিন্তু এ নিয়ে সরাসরি সুধীরকে এ পর্যন্ত তেমন কিছু বলেন নি।

ফেলে আসা দিন — ফটো: হীরেন চৌধুরী

শরৎ — ফটো: অলক দে

রাজা ও রাণী ফটোঃ সুধীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী

কড়ি ও কোমল ফটোঃ অসিত মুখোপাধ্যায়

সেদিন বলতে হল। বলা দরকার বিবেচনা করলেন শম্ভুবাবু।

এ-বাজারে অফিস-ফেরত রান্না-ঘরের চৌকাঠের ওধারে রুপোর তালের মত চকচকে প্রায়-গোল মস্ত একজোড়া গঙ্গার ইলিশ দেখলে খুশিতে কার না ভিতরটা উপছে ওঠে? কিন্তু শম্ভুবাবু আঁতকে উঠলেন একেবারে। ট্রেন থেকে নেমে খেয়াঘাট পর্যন্ত আসার পথে শস্তা তরি-তরকারী পেলে মাঝে-মাঝে কিনে নিয়ে আসেন তিনি। পরদিনের বাজারের অর্ধেক কাজ হয়ে যায়। সেদিন একটা গাড়ি আগেই ফিরেছিলেন আর হাতে করে নিয়েও এসেছিলেন কিছু। থলেটা রান্নাঘরে মেয়ের হাতে দিতে গিয়ে এই দৃশ্য।

বাবাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে বাসুর অবস্থা কাহিল। এই দুর্মূল্যের বাজারে একজোড়া এতবড় মাছ আনার জন্যে ও নিজেই সুধীরকে বকাবকি করেছে। তারপর বাবা ফেরার আগেই কেটেকুটে কিছু রেঁধে আর কিছু সাঁতলে রাখবে ভেবেছিল। তাহলে ক'টা মাছ এসেছে আর কতবড় মাছ তা অন্তত গোপন করা সম্ভব হত।

একেবারে বমাল সমেত ধরা-পড়া গোছের মুখখানা হল বাসুর।

শম্ভুবাবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন খানিক। এ মাছ কে এনেছে জিজ্ঞাসা করার দরকার হল না। দামও তিনি সহজেই অনুমান করতে পারেন। ...... একজোড়া পনের-ষোল টাকার কম নয়। কেনা দূরের কথা, কেনার ইচ্ছেটা কেমন করে হয় তাই আশ্চর্য।

কত হয়েছে এ দুটো?

বাবার মুখের অবস্থা দেখেই বাসুর মুখ শুকনো। কণ্ঠস্বর শুনে প্রমাদ গুনল। মাথা নাড়তে চেষ্টা করল একটু, অর্থাৎ সঠিক জানে না।

জানারও দরকার মনে করিস না তাহলে? ওর টাকা-পয়সা আজকাল খুব বেশি হয়ে গেছে, কেমন?

এরপর মাছ পাতে দিতে গেলে বাবা ছুঁড়ে ফেলে দেবেন কিনা বাসুর সেই ত্রাস। তাড়াতাড়ি দুদিক বজায় রাখতে চেষ্টা করল সে। —আমি মন্দ বলেছি। বলল, পরীক্ষার খাতা দেখার অনেক-গুলো টাকা পেয়ে গেল হাতে, তাই.........

ক' লক্ষ টাকা পেয়েছে পরীক্ষার খাতা দেখে?

বাসু নিরুত্তর। শুকনো জিবে করে শুকনো ঠোঁট দুটো একবার ঘষে নিল শুধু।

শম্ভুবাবু ওপরে উঠে গেলেন। খানিক বাদে সুধীরের ডাক পড়ল তাঁর ঘরে। বাসু ভয়ে ভয়ে তাকে ইশারা করল, যা বলেন চুপচাপ শুনে এসো লক্ষ্মীটি, বাবার মেজাজ খুব খারাপ—

মুখখানা যথাসম্ভব করুণ করে ভাবী শ্বশুরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সুধীর। এদিকে বাসুই বা নিশ্চিন্ত থাকে কি করে? তাড়াতাড়ি সে-ও দোতলায় উঠে দরজার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। বাবার নির্দেশ কানে এলো, বোসো—

সুধীর বসল।

শম্ভুবাবু বললেন, তোমার বাবা নেই, থাকলে তিনি যা বলতেন আমি তাই বলছি ভেবো। ......এখন থেকে তুমি যদি একটু বুঝেশুনে চলতে না শেখো আর শিখবে কবে? দুদিন বাদে দায়িত্ব নিতে যাচ্ছ, এ-সব কথা তোমাকে আমার বলে দিতে হবে কেন?

জবাব নেই। জবাব চানও না। বললেন, এ-বয়সে একটু-আধটু খরচ করার ইচ্ছে সকলেরই হয়, তা' বলে হাতে টাকা এলে পাগলের মত খরচ করতে হবে? মাছ কেনার ইচ্ছে হয়েছিল, একটা কিনতে পারতে, আরো ছোট কিনতে পারতে—চোখের নেশাকে এত প্রশ্রয় দেওয়ার দরকার কি!

থামলেন একটু, একেবারে নয়। রোজ বলা যাবে না যখন একদিনেই ভালো করে সমঝে দেওয়া দরকার। — মাছের জন্যে নয়, কথাটা তোমাকে আমি অনেক দিনই বলব ভেবেছি। তুমি এভাবে খরচ করবে কেন? অভাব কাকে বলে তুমি খুব ভালো করেই জানো, দুর্দিনে পড়লে ক'জন পাশে এসে দাঁড়ায় তাও দেখেছ—তোমার অন্তত একটু ভেবে চিন্তে চলা দরকার। ......আচ্ছা যাও, খারাপ কথা কিছু বলিনি, তুমি বুদ্ধিমান ছেলে, তোমার বোঝা উচিত।

বুদ্ধিমান ছেলেটি ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে তার মুখের দিকে চেয়ে বাসুর মুখে কথা নেই, চোখেও ভাষা নেই। সুধীর নিঃশব্দে নীচে নেমে গেল। বাসুর হঠাৎ বাবার ওপরেই রাগ হয়ে গেল। বাবার সবেতে বাড়াবাড়ি। তার-পর এই লোকটার ওপরেও রাগ হল, সব জেনে-শুনেও যা করার করবেই, বেশ হয়েছে!

শম্ভুবাবু সকালে খেয়ে যান। ফেরেন সন্ধ্যায়। মাঝে সামান্যই টিফিন করেন। কাজেই রাতের রান্না হলেই বাসু সবার আগে তাঁর খাবারটা গুছিয়ে ওপরে দিয়ে আসে। সেদিনও দিয়ে এলো। তিনি খেতে বসতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। একদিক হল, এরপর আর এক দিক সামলানো আছে। .... সেই থেকে বিনুর পড়ার ঘরে মুখ গোঁজ করে বসে আছে, দেখেছে।

বাবার খাওয়া শেষ হয়ে আসতে নীচে এসে ভাই-বোনদের আগে বসিয়ে দিল। এও চুক্তিবদ্ধ নিয়ম একটা। সুধীর যে-দিন খেয়ে যায়—সকলের খাওয়া হয়ে গেলে ওরা একসঙ্গে বসে দুজনে। ভাই-বোনদের খাওয়া হতে বাসুর ইঙ্গিতে পরের বোনটা গিয়ে তাড়া দিল, সুধীরদা চটপট, দিদি ভাত বেড়ে রেডি—

সুধীর উঠে এলো।

—বোসো। বাসু ভাতের থালা রাখল।

মুখ কালো করে সুধীর মাথা নাড়ল। অর্থাৎ বসবে না।

খাবে না? বাসুর মুখ লাল হয়ে উঠছে।

সুধীর মাথা নাড়ল। না।

বাসু ঝাঁঝিয়ে উঠল, দেখো ভালো হবে না বলছি, সব ফেলে ছড়িয়ে একা-কার করে দেব আমি!

সুধীর তবু গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে।

—বসবে না?

—বসতে পারি............এক সর্তে।

সর্তটা অনুমান করছে বাসু। বলবে ইলিশ মাছ খাবে না। জবাব না দিয়ে ক্রুদ্ধ চোখে চেয়ে রইল শুধু।

সুধীর বলল, জামাইকে কোনো শ্বশুরে এভাবে বকে না। তাও জামাই হইনি এখনো—আরো বেশি আদর পাবার কথা। তার বদলে অপমান! গুনে গুনে মোটা-মোটা ছ'টুকরো মাছ দাও যদি তবে বসব—তার কমে রাগ যাবে না।

বাসু হেসে ফেলল। এতক্ষণের গুমোট্ এক মুহূর্তে তরল। বলল, আচ্ছা, বোসো—

সুধীর গম্ভীর মুখে গ্যাট হয়ে পিঁড়িতে বসল।

কিন্তু ঠিক সেই সময়ের দোতলার খবরটি তারা কেউ জানে না। সুধীর খেতে বসছে টের পেয়ে শম্ভুবাবু দোতলা থেকে নীচে নেমে আসছিলেন। তিনি চটি পরেন না। ছেলেটাকে কটু কথা বলা হয়েছে, তাই একটু অনুতাপ হয়েছিল বোধহয়। খাবার সময় সামনে গিয়ে দাঁড়ালে খুশি হবে, স্নেহ বুঝবে। কিন্তু নীচের কথা-বার্তা কানে আসতে

সিঁড়ির বাঁকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়েছিল তাঁকে। খাবে না শুনে ভুরু কুঁচকে গিয়েছিল। সর্ত শুনে সোজা আবার ওপরে উঠে গেছেন। তাঁর সমঝে দেওয়াটা যে এমন নিষ্ফল হতে পারে, ভাবেন নি।

ঘরে বসে চুপচাপ দুর্যোগের ছায়া দেখছেন তিনি। অসময়ে চোখ বুজলে ওই জামাই-ই ভরসা। ......সে-ই দেখা-শুনো করবে, ছেলে-মেয়েগুলো ভেসে যাবে না। কিন্তু আজই প্রথম মনে হল, এর হাতে দেখাশুনোর ভার পড়লে সেই অঘটন আরো অনেক আগেই ঘটে যাবে। নিজেরা সুদ্ধু সদলবলে ভাসবে।

শম্ভুবাবু ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর চাকুরে। কলকাতায় অফিস। ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করেন। আগে খেয়া নৌকোয় গঙ্গা পার হতে হয়। এপারের খেয়া-ঘাটের লাগোয়া বাসা তাঁর। এদিকের লাইনে সোজা ট্রেনেও কলকাতায় যাওয়া যায়। কিন্তু তাহলে দশ মিনিট হেঁটে বাস ধরতে হয়, তারপর তিন মাইল ঠেঙিয়ে স্টেশান। বেশি বর্ষায় বা দুর্যোগে তাই করেন। নইলে বার-মাস খেয়া পারাপারটাই পছন্দ। ও-পার থেকে অবশ্য সাত-আট মিনিট হাঁটলে স্টেশান। তবু এদিকে হাঁটা আর বাস ঠেঙানো থেকে অনেক ভালো।

জানা না থাকলে তাঁর বেশবাস দেখে নৌকোর যাত্রীরা কেউ বুঝবে না প্রায় হাজার টাকা মাইনের চাকুরে তিনি। পুরনো কোটের এক পকেটে থলেটা টোপলা হয়ে থাকে। অন্য পকেটে হলদে ছোপ-লাগা টিফিন-বাক্সটার মাথা উঁচিয়ে থাকে। পান চিবুতে চিবুতে খেয়ানৌকায় উঠে বসেন। বেশির ভাগ দিনই গঙ্গুর নৌকোয় ওঠেন। প্রায় প্রত্যহ। তাঁর যাওয়া আসার সময় ধরেই গঙ্গু মাঝি তার পারাপারের সময় ঠিক করে নিয়েছে। গঙ্গু আর শম্ভুবাবু ছেলে বেলার বন্ধু। একেবারে সেই ছেলে বেলার। একসঙ্গে খেলা হত, মাছ ধরা হত, পাখির বাসা পাড়া হত, ফল চুরি করা হত। গঙ্গুর বাবাও মাঝি ছিল। নতুন বয়সের গোড়া থেকে গঙ্গু বাপের পেশায় হাত পাকিয়েছে।

গঙ্গু আগে নাম ধরে আর তুই করে ডাকত। এখন তুমি বলে আর শম্ভুবাবু বলে। শম্ভুবাবু কত বড় চাকুরে আর কেমন গণ্যমান্য ব্যক্তি সেটা সে জানে। আর পাঁচজন যাত্রীর কাছে গল্পও করে। দিনান্তে খেয়া পারাপার তো আর কম-বার করতে হয় না তাকে। শম্ভুবাবুর এতবড় ভক্ত আর কেউ না।

শম্ভুবাবু আজও মনে মনে পছন্দই করেন লোকটাকে। হেলাফেলা করে না। যাত্রীর ভীড় না থাকলে গল্প-গুজব করেন। গল্পটা ফেরার সময়েই জমে ভালো। তবে লোকটার পয়সার খাঁইটা তেমন পছন্দ নয় শম্ভুবাবুর। তিনি নৌকোয় উঠলেই অন্য যাত্রী থাক না থাক গঙ্গু জিজ্ঞাসা করে, নৌকোটা ছাড়ি শম্ভুবাবু, কি বলো?

অর্থাৎ দুই-একটা পয়সা বাড়তি দিলেই আর অন্য যাত্রীর প্রতীক্ষায় বসে থাকতে হবে না। রিজার্ভ যাত্রীর মতই নিয়ে যাবে। কিন্তু বলার উদ্দেশ্যটা অনুক্ত থাকে। হাঁ বলা মানেই বাড়তি পয়সা বার করা। শম্ভুবাবু প্রায়ই জবাব দেন, হাতে সময় আছে, তাড়া নেই কিছু —একটু দেখ, দু-চারজন এসে পড়বে। আবার সপ্তাহে দুই-একবার দেনও পয়সা। এটুকু বাদ দিলে অসম-পর্যায়ের এই দুটি মানুষের মধ্যে অদৃশ্য একটু হৃদ্যতা আছেই।

গঙ্গু মাঝি শম্ভুবাবুর ঘরের খবর রাখে, আর নিজের ঘরের খবরও তাঁকে বলে। হাজার টাকার মাইনের চাকুরের সঙ্গে কোন্ মাঝি এত গল্প করার সুযোগ পায়? শম্ভুববুর মুখখানা ইদানীং বেশ শুকনো সেটা সে-ও লক্ষ্য করেছে। কথায় কথায় কারণও বুঝে নিয়েছে। ফলে তারও মন খারাপ। এতকালের এত বছরের দেখা-সাক্ষাতে ছেদ পড়ে যাবে। অবসর নিলে শম্ভু-বাবু ছ'মাসে একবার কলকাতা যাবেন কিনা সন্দেহ।

রিটায়ারমেন্টের আর মাস দুই বাকি।

মাঝে একটু আশার আলো দেখা গিয়েছিল। কাজের চাপের দরুন পুরনো পদস্থ অফিসারদের আরো এক-বছর করে চাকরির মিয়াদ বাড়ানো হবে শুনেছিলেন। ইন্সিওরেন্স প্রতিষ্ঠান সরকারের কবলে গিয়ে না পড়লে সেই রেওয়াজ তো ছিলই। দু'চার-ছ' বছরও এক্সটেনশন পাওয়া যেত।

জন কয়েক অফিসারের চাকরির আয়ু ছ'মাস বা এক বছরের জন্য বাড়ল ঠিকই। কিন্তু শম্ভুবাবুর কিছু হল না। কারণ শম্ভুবাবু হৈ-চৈ করে নিজের কাজের গুরুত্ব জাহির করতে জানেন না, কোট-প্যান্ট টাই ঝুলিয়ে গট-গটিয়ে চলা ফেরা করেন না, অল্প বয়সী ওপরওয়ালাদের মন জুগিয়ে চলার চেষ্টা করেন না।

অন্ধকারে হঠাৎ একটু আলো ঝলসে আবার নিভে গেলে অন্ধকারটা আরো বেশি লাগে। শম্ভুবাবুরও সেই রকমই লাগছে। শুভার্থীজনেরা তাঁকে পরামর্শ দিচ্ছেন, আর কেন মিছি-মিছি খেটে মরা, এই দুটো মাস ছুটি নিয়ে নিলেই তো হয়—তাঁর ছুটি তো সব হেজে-পচে গেল। শম্ভুবাবু জবাব দেন না. এই নিরবচ্ছিন্ন ছুটির শূন্যতাই যে তাঁর বুকে চেপে বসে আছে সে আর কাকে বলবেন তিনি।

শরীর মন ভাল ছিল না সেদিন। কোন দিনও থাকে না। মাথাটা ভার-ভার, কপালটির রগদুটো টিপ-টিপ করছে। ট্রেনটারও যেন ঝিমুনি ধরেছে। এখনো আধ ঘণ্টার ধাক্কা। বিরক্তির একশেষ।

স্টেশনটা দেখে নিয়ে চোখ বুজে আবার জানালায় ঠেস দিলেন। কিন্তু চোখ বুজলেই যত রাজ্যের হিসেব কিলিবিলিয়ে ওঠে মগজের মধ্যে। এই ক'মাসে হিসেব যেন তাঁকে আরো পেয়ে বসেছে। নাওয়া-খাওয়া এমন কি ঘুমের মধ্যেও অদৃশ্য একটা হিসেবের হিজিবিজি কাটা-ছেঁড়া চলতে থাকে। এ-ধকল আর যেন সহ্য হয় না। সর্বদা ক্লান্তি একটা,আর সেই ক্লান্তির তলায়-তলায় হিসেব। শম্ভুবাবু এখন ক'টা দিনের জন্যে অন্তত হিসেব ভুলতে চান।

যাক্, স্টেশন এলো। শম্ভুবাবু নামলেন। বাইরে এলেন। সন্ধ্যা গিয়ে প্রায় রাত তখন। ফাঁকা রাস্তায় একটু হাঁটলেই মাথাটা ছাড়বে ভেবে-ছিলেন। খেয়াঘাট পর্যন্ত হাঁটা-পথটা একেবারে কম নয়।

কিন্তু রাস্তার অবস্থা দেখেই শম্ভু-বাবু বিরক্তিতে অস্ফুট কটূক্তি করে উঠলেন। বিয়ের মিছিল চলেছে একটা। বাঙালীর নয়। যতদূরে চোখ চলে ঠাসাঠাসি ভিড়। গোটা রাস্তাটা আলোয়-আলোয় একাকার। এরই মধ্যে আবার গাড়ি-ঘোড়া, বাদ্য-বাজনা, ব্যান্ড পার্টি। দু'ধারে সারি সারি আলোর ত্রিভুজ, মাঝে বড় বড় আলোর ঝাড়।

দম-বন্ধ ভীড়ের মধ্যে ভাসতে-ভাসতে শম্ভুবাবু এক সময় খেয়াঘাটে এসে দাঁড়ালেন।

ঘাটের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে সাগ্রহে মিছিল দেখছিল গঙ্গু-মাঝি। শম্ভু-বাবু তার গা ঘেঁষে নেমে গেলেন তাও খেয়াল করল না। অতএব শম্ভুবাবু ঘুরে দাঁড়িয়ে চাপা বিরক্তিতে ডাকলেন, যাবে নাকি হে?

নৌকোয় উঠে বসলেন শম্ভুবাবু। আর দ্বিতীয় যাত্রী নেই। আরো স্বল্প-ক্ষণ মিছিল দেখে গঙ্গু নৌকোয় আসতেই শম্ভুবাবু বললেন, ছাড়তে বলো, আর ভালো লাগে না—

নৌকো ছাড়া হল। খানিকটা এগিয়ে গঙ্গু পাল খাটিয়ে দিল। জ্যোৎস্না-ভরা আকাশ, ফুরফুরে বাতাস। গঙ্গুর জোয়ান সাকরেদের হাতে হাল। নৌকো কোনাকুনি স্রোতের মুখে আপনিই গাঙ পাড়ি দিচ্ছে। শম্ভুবাবু বাইরের পাটাতনে বসেছিলেন। তামাকের কল্কেয় ফুঁ দিতে দিতে গঙ্গু কাছেই এসে বসল। শম্ভুবাবু ভিতরে ভিতরে বিরক্ত আবারও, এক্ষুনি বকর বকর সুরু হবে।

হল। গঙ্গু বলল, মিছিলটা দেখলে শম্ভুবাবু, জবর আলো দিয়েছে, না?

শম্ভুবাবু নিরুত্তর।

কবে কোথায় এর থেকেও ঢের ঢের বড় আলোর মিছিল দেখেছিল, গঙ্গু সেই গল্প ফেঁদে বসল। নৌকো তখন মাঝ-নদিতে।

খানিক আপন মনে তামাক টেনে গঙ্গু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, ও-রকম আলো দিয়ে সাজাতে ওদের কত টাকা আন্দাজ লেগেছে?

জানি না।

গঙ্গু একটু কাছে ঝুঁকে সাগ্রহে চাপা গলায় বলল, ছেলেটার বিয়েতে আমারও ওমনি একটু করার ইচ্ছে আছে, বুঝলে? ......অতটা না হোক, একটু কিছু করা—কিন্তু ছোঁড়াটাকে বদ মতলব দিচ্ছে তার ইয়ার বন্ধুরা, আমি যেখানে বলি সেখানে বিয়ে করতে নারাজ। আমার কথা না শুনলে কিচ্ছু করব না। তবে শোনে যদি, দেখ'খন.........

অর্থাৎ সকলের দেখার মতই একটা কিছু করবে গঙ্গু মাঝি। সেই সম্ভাবনার আনন্দে তার কালো মুখ হাসি-হাসি দেখাচ্ছে।

ভুরু কুঁচকে শম্ভুবাবু আর এক-দিকে মুখ ফেরালেন। বললেন, ওর সিকি করতেও বহু খরচ।

মনের মত একজনের কাছে যে-ভাবে মনের কথা ব্যক্ত করা চলে সেইভাবেই চাপা আনন্দে বলল গঙ্গু মাঝি, সেকি আর জানি না। আছে—

শম্ভুবাবু সবিস্ময়ে ঘাড় ফেরালেন এবার। যে-ভাবে আছে বলল, তাতে দুনিয়ার যত টাকা সব তার হাতে আছে মনে হয়। জিজ্ঞাসা করলেন, কি আছে? ও-রকম মিছিল বার করার মত টাকা আছে?

জ্যোৎস্নায় আর কল্কের আলোয় গঙ্গু মাঝির কালো মুখ রহস্যময় দেখাচ্ছে। কিন্তু ভিতরের আনন্দটা ভাগ করে দিতে না পারলে ভালো লাগে না। গলার স্বর আরো খাটো করে গঙ্গু বলল, ও-রকম কেন, ইচ্ছে করলে একটা দিন অন্তত এই গোটা সহরটাই আলোর রোশনাইয়ে শাদা করে দিতে পারি—রেখেছি কিছু, তুমি বোলো না যেন আবার কাউকে!

শম্ভুবাবু তাজ্জব। লোকটার মাথার ঠিক আছে কিনা বুঝছেন না। —কি রেখেছে? কি আছে তোমার?

গঙ্গু মাঝি হাসছে মিটি-মিটি। সত্যিই যেন গুপ্ত ধনের ভান্ডার আছে কিছু তার আয়ত্তে। শম্ভুবাবুর মত আপনজনের কাছেও সেটা ফাঁস করতে

কালোমুখে এত তৃপ্তি আর এমন আনন্দের ছটা দেখে শম্ভুবাবু ভুলেই গেলেন কার সঙ্গে কথা বলছেন। অধীর আগ্রহে নিজেও চাপা গলাতেই বলে উঠলেন, আঃ, কি আছে তাই বলো না—কি করে পারো?

কিন্তু শম্ভুবাবু ঠিক শুনছেন কি? আরো কাছে সরে এসে উদ্দীপনায় ভর-পুর গঙ্গু মাঝি ফিসফিসিয়ে যা বলছে, ঠিক শুনছেন কি তা! ....ঠিকই তো শুনছেন। আটশ টা-কা আছে গঙ্গু-মাঝির, কড়-কড়ে থোক আটশ—দুপয়সা চার পয়সা করে জমিয়ে জমিয়েই হয়েছে ওই টাকাটা—হবে না কেন, কখনো অপব্যয়ও করেনি পরিশ্রমেও পিছ্‌ পা হয়নি—কেউ জানে না, ছেলে পর্যন্ত না, ছেলের মা-ও না—শম্ভুবাবু এই প্রথম জানলেন, শম্ভুবাবুকে আর বলতে বাধা কি! কিন্তু শম্ভুবাবু যেন

চাপা আনন্দে বলল গঙ্গু মাঝি, সেকি আর জানি না......।

লজ্জা। বলল, কিছু না থাকলে কি আর এই বয়সে এত নিশ্চিন্দি হয়ে নৌকো চালাচ্ছি, ভগমানের আশীর্ব্বাদে ভালই কেটে যাবে গো। অপবায় করা উচিত কাজ নয় বলে, নইলে একটা রাত অন্তত ওদের দেখিয়ে দিতে পারি রোশনাই কাকে বলে—

কাউকে না বলেন, কারো কাছে গল্প না করে ফেলেন—

শম্ভুবাবু স্থাণুর মত বসে। কতক্ষণ ঠিক নেই। এক সময় খেয়াল হতে দেখলেন, গঙ্গু মাঝি উঠে নৌকোর পাল খুলছে। নৌকো তীরের দিকে এসে গেছে। জ্যোৎস্না ছাওয়া আকাশটায়

দিকে তাকালেন শম্ভুবাবু। ....এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়......... দূর! ক'টা তারা আবার গোনা যায়। হঠাৎ নতুন ধরনের একটা হিসেব উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে শম্ভুবাবুর মগজে। কিন্তু এই হিসেবে যাতনার লেশমাত্র নেই। .... কত টাকা থাকলে পাঁচটি সন্তানের আর নিজের ভবিষ্যত নিরঙ্কুশ ভাবতে পারেন তিনি?

এক লক্ষ, দু'লক্ষ, পাঁচ লক্ষ...... কিন্তু সব অঙ্কের পরেও একটা করে অঙ্ক কাছে ভিড়তে চায়। না শেষ নেই। যে পারে না, সে আট লক্ষ থাকলেও নিশ্চিন্ত হতে পারে না, আর যে পারে সে আটশ ছেড়ে আট টাকাতেও পারে হয়ত। নিশ্চিন্ত থাকার সঙ্গে হিসেবের কোনো যোগ নেই নাকি?......সেই রকমই যেন লাগছে। হিসেব জিনিসটা আলাদা। ওটা একটা ব্যাধির মত।

মাথাটা কখন ছেড়ে গেছে শম্ভুবাবু টের পাননি। অদ্ভুত হালকা লাগছে। কতকালের কত বছরের একটা হিসেবের নাগ-পাশ থেকে যেন মুক্তি পেয়ে গেছেন তিনি। ভিতর থেকে কতগুলো স্নায়ু টেনে-ধরা বাঁধন যেন বাষ্প হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে।

কোটের পকেট থেকে দু'আনা পয়সা গঙ্গু মাঝির হাতে গুঁজে দিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে পড়লেন শম্ভুবাবু। গঙ্গুর বিস্ময়ের মুখোমুখি দাঁড়াতে চান না। কিন্তু সিঁড়ি ধরে উঠতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়লেন আবার। ওই কোনের দিকটায় কতগুলো লোক হুমড়ি খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গঙ্গার ইলিশ কেনা-বেচা হচ্ছে। মাছের দর নয় তো সোনার দর, চিরাচরিত অভ্যস্ততায় ভুরু কুঁচকে মুখ ফিরিয়ে নিতে গিয়েও পারলেন না শম্ভুবাবু। পা দুটো ওদিকেই টানছে। আস্তে আস্তে সেখানে এসে পা উঁচিয়ে সকলের কাঁধের ওপর দিয়ে দেখতে চেষ্টা করলেন তিনি।

সুধীর সেই থেকে রান্নাঘরে খুনসুড়ি করছে বাসুর সঙ্গে। বাসু ধমকাচ্ছে তাকে, ওদের পড়াতে এসে থাকলে ও-ঘরে গিয়ে পড়াও গে যাও না, এখানে কি—

সুধীর পাল্টা চোখ রাঙাচ্ছে, স্বামীকে, বিশেষ করে ভাবী স্বামীকে এভাবে ঘর থেকে তাড়ানোর কস্মিনকালে কোনো নজির নেই—

হঠাৎ সন্ত্রস্ত দুজনেই। তারপরেই অবাক বিস্ময়ে হতভম্ব একেবারে।

সুধীরকে একেবারে রান্নাঘরে দেখবেন ভাবেন নি শম্ভুবাবু। তিনিও লজ্জা পেলেন কেমন একটু। তাঁর হাতে একজোড়া ইলিশ, নেহাৎ ছোট নয় একেবারে।

মেয়ের সামনে মাছ জোড়া রেখে বিব্রত মুখে প্রায় কৈফিয়ত দেবার মত করে বললেন, পেয়ে গেলাম...। ভালো করে রেঁধে সুধীরকে দিস বেশি করে।

দু'জোড়া বিমূঢ় দৃষ্টি এড়ানোর জন্যেই তাড়াতাড়ি ঘর থেকে প্রস্থান করলেন তিনি।

ওরা দুজন দুজনের মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে। মাঝখানের মাটিতে রুপোর তালের মত চকচকে জোড়া ইলিশ।
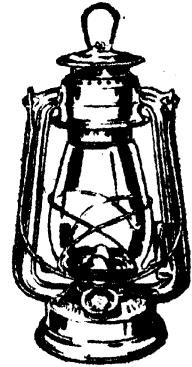
নদী সদাগর পাথুরে পোল

প্রেমেন্দ্র মিত্র

হয়ত সে নদী আছে
কোনদিন ছোঁয়নি যা ঘাট,
ধরেনি পালের ছায়া
দেখে নি কোথাও হাট বাট।

শুধু ধু ধু তেপান্তর
এঁকে বেঁকে পার হয়ে যেতে
আপনার মনে একা একা
মেঘ পাখি নিয়ে থাকে মেতে।

একদিন সে নদীও
সদাগর খুঁজে পাবে কেউ,
তারপর বাঁধ দিয়ে
বেঁধে দেবে তার নীল ঢেউ।

ভাসাবে হাজার দাঁড়ী
ব্যাপারীর বজরা তার বুকে।
গঞ্জ ও নগর সব
বসাবে পাথর ঠুকে' ঠুকে।

তখনও সে নদী বুঝি
কিছুতেই মানবে না'ক হার।
আঁধার নিশুতি রাতে
কুয়াশায় ঢেকে চারিধার
গান গাবে ছলছল
—বোবা তার হৃদয়ের গান,
পোলের পাথুরে থামে
বুক ভেঙে হোক খান্ খান্!

*
* *

চৌকাঠ

অজিত দত্ত

এই চৌকাঠ পেরুলেই ঘন অরণ্য
শ্বাপদকুলের শরণ্য।
বীণাকণ্ঠিনী, কন্ঠ তোমার কোন্ পর্দায় ওঠে?
ঘোর অরণ্যগর্জ্জন তাতে চাপা পড়ে না তো মোটে।
ওখানে ভীষণ দংষ্ট্রার সারি অহরহ প্রস্তুত,
ক্ষণেক ভোলাবে তাদের এমন নেশা জানো অদ্ভুত?
তোমার প্রণয় এমনি হাল্‌কা, থামে না বুকের কাঁপা,
অত উজ্জ্বল আলো কই, যাতে তমিস্রা পড়ে চাপা?
যত চুম্বন আলিঙ্গনের মোহজাল পাতো কন্যে,
জানি চৌকাঠ পেরুলেই ছিঁড়ে শতধা করবে বন্যে।

দণ্ডের নেশা পলেই ফতুর এম নি তোমার জাদু!
আমার রক্তে যে-স্বাদ, তোমার প্রেম কই তত স্বাদু?
দিগন্ত-ছোঁয়া কান্তার-মাঝে বিলাস-লীলার হর্ম্ম্য,
সমুখে ত্রিশূল উদ্যত, বুকে প্রণয়লিপির বর্ম্ম!
প্রেমাশ্রু-সাথে মদের মেশালে নেশা জমে বটে বেশ,
তবু সে-নেশার বহ্নিশিখাটি এক ফুঁয়ে নিঃশেষ!
যতই মায়ার নীলাঞ্জনের কালো চোখে ডাকো কন্যে,
জানি চৌকাঠ পেরুলেই ছিঁড়ে শতধা করবে বন্যে॥

আগুন

বিষ্ণু দে

হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠো, ঐ তো আগুন!

পথ বেয়ে উঠে চলি,
চড়াই-এর মোড়ে দেখি দিব্য আবির্ভাব
শৌখীন বাগানে কার শালপ্রাংশু রূপালি প্রসূণ
ইউক্যালিপটস্ বেয়ে ওঠে বহু বুগেনভিলিয়া
লাল তামা কমলা হলদে মিলে
জেলে দেয় উঁচু উঁচু আকাশের টানে লেলিহ আগুন।

তখন মাঘের শেষ, শীত আর বসন্ত বেজোড়ে
গদ্যছন্দে লেখা, কারণ বাগানে স্মিত তখনও গোলাপ
একটি তোড়ায় বাঁধে মাঘ ও ফাল্গুনে।

আবার আজকে দেখি সেই দৃশ্য রঙের সম্ভারে
সেই সতেজ গৌরব।

উদ্ভিদ্ অমর প্রাণ, চিরন্তন তাদের সম্ভাব।

অথচ হৃদয় বুঝি বর্ষভোগ্য জীবনের ভারে
মাঘফাল্গুনের পাতা, ঝ'রে যায়, কিংবা ফুল,
ম'রে যায় প্রিয়া?

রাত্তিরের হাট ভাঙবে

অরুণ মিত্র

রাত্তিরের হাট এইবার ভাঙবে।
ছোট ছোট বাতির সামনে ছায়ার নিবিষ্টতা,
ফলমূলের পসরার উপর হাতগুলো স্তিমিত হয়,
কথার মাঝখানে কুয়াশা নামে,
গুটিকয়েক ভঙ্গী তীব্র হতে গিয়ে প্রতিবিম্বে ছড়িয়ে যায়।

এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ডাক আসে,
কারো নাম বলে না, কোনো সন্ধান করে না,
কেবল এক দূরত্বের স্বরে শূন্য ধ্বনিত হয়,
আরও অন্ধকারে যাবার জন্যে ব্যগ্রতার এক ভাষা।

নোঙর তুলে ভেসে পড়ো,
চলো সেই শহরের কিনার দূরে রেখে
যেখানে নিষ্ঠুর পাথর জ্বলছিল,
সেই মস্ত ক্ষেতের উপর দিয়ে
যেখানে উত্তাপের এত মুহূর্ত জমাট হ'য়ে ছিল:
তারপর হিমের আকাশ জুড়ে
অন্য দেশের রাত।

সমস্ত মুখ ছায়ায় নুয়ে পড়ে,
কেউ আর অন্ধকারকে ঠেকায় না।
হাটের সারা জায়গাটা বাতাস লেগে টলমল করে।

দুর্মর

সুকান্ত ভট্টাচার্য

হিমালয় থেকে সুন্দরবন, হঠাৎ বাংলা দেশ
কেঁপে কেঁপে ওঠে পদ্মার উচ্ছ্বাসে,
সে কোলাহলের রুদ্ধস্বরের আমি পাই উদ্দেশ।
জলে ও মাটিতে ভাঙনের বেগ আসে।
হঠাৎ নিরীহ মাটিতে কখন
জন্ম নিয়েছে সচেতনতার ধান,
গত আকালের মৃত্যুকে মুছে
আবার এসেছে বাংলা দেশের প্রাণ।
'হয় ধান নয় প্রাণ' এ শব্দে
সারাদেশ দিশাহারা,
একবার মরে ভুলে গেছে আজ
মৃত্যুর ভয় তা'রা।
সাবাস্ বাংলা দেশ, এ পৃথিবী
অবাক তাকিয়ে রয়
জ্বলে-পুড়ে-মরে ছারখার
তবু মাথা নোয়াবার নয়।
এবার লোকের ঘরে ঘরে যাবে
সোনালি নয়কো, রক্তে রঙিন ধান,
দেখবে সকলে সেখানে জ্বলছে
দাউ দাউ ক'রে বাংলা দেশের প্রাণ॥

৩রা মার্চ, '৪৭

হঠাৎ দেখা

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

উৎসব বাড়ির এক দিকে
উচ্ছিষ্ট নিয়ে ভিখিরি-কুকুরে দাঙ্গা।
অন্য দিকে তকমা-পরা ড্রাইভার, বেনারসীর খসখস,
প্যারিস সুগন্ধী আর শানাই
মন বলছে পালাই-পালাই।
সেই শুভক্ষণে
হঠাৎ দেখা।
পা ভারি—চলতে চায় না
জিভ আড়ষ্ট, যেন কোনো কালে কোনো কথা কয়নি
মনে নানা ভাবনার ভিড়ঃ
কয়লার দাম বাকি
অন্তত একটা গেঞ্জি না-কিনলেই নয়
কালকে আপিস অব্যর্থ, হলেও প্রলয়।
এই শুভক্ষণে
হঠাৎ দেখা।
মন বলছে পালাই-পালাই
উৎসব বাড়ির দেউড়ি থেকে।
এই শুভক্ষণে
হঠাৎ দেখার চাবুক। শরীরের অসহায় ত্বক থেকে
ঘাম ঝরছে।
প্যারিস সুগন্ধী ছড়িয়ে-ছড়িয়ে মিশছে
পচা উচ্ছিষ্টের সঙ্গে।
হঠাৎ হঠাৎ দেখা
হায় ঈশ্বর, কেন নই একেবারে একা?

প্রার্থিত স্বজন

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

শুধু প্রতিধ্বনি হয়ে থেকো না হৃদয়। চারপাশে
প্রচলিত শব্দ বর্ণ রঙের আড়ালে একবার
খুঁজে দ্যাখো কোন্খানে প্রার্থিত স্বজন। চেতনার
আদিম সমুদ্রে ঢেউ। দিকে দিকে প্রসন্ন আশ্বাসে

প্রগাঢ় স্থৈর্যের তরী প্রথাসিদ্ধ জীবনের টানে
অস্থির, প্রবহমান। আর দ্যাখো, বৃক্ষের স্বভাবে
পরিশুদ্ধ নির্লিপ্ততা। শাখানদী সমুদ্র-আহ্বানে
ক্ষিপ্রবেগ, আবর্ত-জটিল। অদৃশ্য অনন্য অনুভবে

প্রার্থিত স্বজন আজো কেউ আছে দিনের চিন্তায়
এবং নিসর্গ দৃশ্যে দিকভ্রান্ত আকাঙ্ক্ষার পাশে
প্রত্যহের আয়ুর গভীরে। দ্যাখো, শব্দময়তায়

সমস্ত সর্জিত দৃশ্যে নিষ্ঠুরতা যেহেতু সবাই
শুধুই বিষন্ন প্রতিধ্বনি। প্রীত অন্তরঙ্গতায়
কেউই কোকিল নয়, কথাগুলো শুধু প্রতিধ্বনি

তিমিরনিবিড় ঢেউ। রম্যদৃশ্যে সাজানো বাগানে
কেউ কেউ সুখী ফুল; কিন্তু তুমি, আমার হৃদয়,
শুধুমাত্র প্রতিধ্বনি হয়ে আর থেকো না এখানে

অস্বস্তির দীর্ণলোকে। থাকো মগ্ন স্বজন-সন্ধানে
আপন ধ্বনির সেই প্রার্থিত ও নির্ভীক রণনে
যা ঐশ্বর্য, যা আপন, তোমার স্ফরিত ধমনীর॥

আপাতিক

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

যদিও প্রকৃতি হাসে চিরাভ্রান্ত শাশ্বতিক সেই চেনা হাসি
সকালে সন্ধ্যায় নিত্য মালঞ্চের ক্ষণজীবী কুসুমের মুখে
জীবন তবুও কেন হারায় সর্বার্থ, হয় দুঃখ অবিনাশী?
জরতী পৃথিবী কেন দিন দিন ম্রিয়মাণ অজ্ঞাত অসুখে?

অন্ধবিশ্বশৃঙ্খলার কী এমন অত্যাশ্চর্য দুর্ঘটনামূলে
কে জানে কী ক'রে হলো এ-জগতে অঙ্কুরিত আদিতম প্রাণ—
প্রাণবীজ—প্রাণপঙ্ক—চিৎ কিংবা জড় কোন প্রকৃতির ভুলে—
সেই ভুল আমাদের ধমনীতে বুঝি হয়ে আছে স্রোতস্বান?

মহাশূন্য সীমাহীন এ কথা তো জানা তবু—তারই সব অসীমতা নিয়ে
আমাদের ক্ষুদ্র বুক আত্মিক উত্তাপে গড়ে তার যত আবেগের সীমা—
মেঘে আর কুয়াশায় জগতের সব নীল বিনিঃশেষে গেলেও মিলিয়ে
শিশুর দু'ফোটা চোখে প্রতিভাত হয়ে থাকে আকাশের অগাধ নীলিমা।

কী ভূমিকা আছে বলো আমাদের? প্রকৃতি যে চিরদিনই পুতুল নাচায়
তুমি নাচো, আমি নাচি, সমুদ্র পাহাড় নাচে, হিল্লোলিত নাচে দূর বন—
বিবর্তন-চক্র ঘোরে জন্মে-জন্মে দ্যাখোনি কি আমাদের 'অনন্ত বাঁচা'-য়?
রক্তে তবু খেলা করে এ-সৃষ্টির আদিকাম—কবেকার সমুদ্র-লবণ।

* * *

সমারোহ

চিত্ত ঘোষ

আয়োজনে ত্রুটি নেই, সমারোহ নির্ভুল গণিত
খুঁজে আনি অরণ্যের গন্ধ কাঠ, সাজাই পরিধি
নীলিমায় ন্যস্ত করি উড্ডীনতা, রৌদ্রের মঞ্জরী
প্রবল মধ্যাহ্নে ঝরে, তাপে কাঁপে উজ্জ্বল বাতাস।

ধৌত করি মনোভূমি, জলস্রোতে ভাসাই পল্লব
যুক্ত করি অভিলাষ, বোধ, বর্ণ একাগ্র বিন্দুতে
দিন জ্বালি, রাত্রি ঢালি, ভোর বেলা অশ্রু সরোবরে
মুখ রাখি, স্মৃতি দেহ উন্মোচিত করি অন্ধকারে।

ছিন্ন করি নিদ্রার পালক। প্রতিচ্ছবি দেখিনা কখনো
দু দিকে মূর্তির ছায়া, পদধ্বনি, অতর্কিত রোল
কত কাল রক্তে রোগ নিরাময় করবে না, স্বভাব
কত কাল এ জ্বলন্ত ক্ষতচিহ্নে তোমার উজ্জ্বল অবহেলা!

নিত্য এই মুখচ্ছবি, নিত্য এই নিষ্ফল পাথার ঃ
প্রত্যহের প্রতিধ্বনি প্রত্যহ মিলায় অন্ধকারে—
রক্ত ঝরে কণ্ঠে, বুকে বেদনার নিভৃত পাহাড়
অনসূয়া, কেন আয়োজিত এই নিপুণ দুর্গতি।

স্রোতে, অন্ধকারে

তরুণ সান্যাল

চম্পকেরা প্রতিকূল, অবশিষ্ট কলিগুলি স্থূলে
আঙুলের এলোমেলো জাফরি, জাল, পাতার আড়ালে,
জল ধুয়ে যায় মূল, জল জল, এবং যে-ফুল
আমাদের সময়ের প্রকৃতির রমণীয় ডালে
লোলুপ উদ্ভিদে ফেটে, কিংবা ফুটে কেশদাম ঘিরে
—এসো না হে ফুলমালা, হে ফুল ও ফুলের প্রলয়,
জলস্রোতে শুয়ে আছি, অন্ধকার অসুখে, গভীরে,
ফুল হোক ইন্দ্রপ্রস্থ, কে চায় রে পুষ্পিত বলয়!

জ্যোৎস্না আছে পলায়নে, নতজানু তমালবীথিকা,
কে দোলায় রাধাঅঙ্গ একান্তে, বিপিনে, সর্বনাশে,
ঘিরে আসে বনস্থলি চতুর্দিকে নক্ষত্রের শিখা
কোথায় ঘুমাবো, সখি, চঞ্চল তরঙ্গ কলভাষে
ডাকে, ডাকে, শিল্পু হয়ে চকিত নিসর্গপারাবারে—
চম্পকেরা প্রতিকূল, আছি জলে, স্রোতে, অন্ধকারে॥

ছায়াতরু

দিনেশ দাস

ডালপালা কাটা গেল কালের কুঠারে
গুঁড়িটা দাঁড়িয়ে থাকে।
আমার ধূসর ছায়া শূন্য মাঠে কাঁদে অসহায়,
শিকড় এখনো আছে মাটির গুহায়,
সেখানে এখনো এক সত্তা জাগে স্থূল অন্ধকারে।

আবহাওয়া আমার কাছে অর্থহীন ঃ
শীতে আর নেই পাতাঝরানোর পালা
বিরাম বিহীন।
আমার ছায়ারা কাঁদে
অঝোরে, অবাধে ঃ
পুরোনো ভাবনাগুলি এখনো অক্ষত,
ঘোরে পুনর্গমনে ঋতুবদলের মত।

কোন্ দূর পাখির অরণ্য কাঁপে ডানার হাওয়ায়,
সে-বাতাস ঈশ্বরের ভর্ৎসনার মতই শোনায়।
মাটির ঢেউয়ের নীচে আমার অসাড় প্রাণ নেমে চলে
দিশাহারা ডুবুরীর মতই অতলে—
নেমে যাই ঘুম হতে গাঢ়তর ঘুমের তিমিরে—
আমার ছায়ারা দেখি নেমে আসে আমাকেই ঘিরে॥

* * *

আমার প্রেমিককে

কবিতা সিংহ

দু হাতে যে মুখ নিলে: কোন মুখ? তাহাদের চিনিনা
দর্পণে সে মুখ নেই, কারো দৃষ্টিকোণে কারো চোখে
তোমার হাতে যে পদ্ম তার কোনো লাবণ্যের মীনা
বয়স, ব্যাধির হাত ছেড়ে গেছে অমল আলোকে:

কোনো সাধা শিল্পে, কোনো অপমানে, কোনো প্রসাধনে
লেজের নরম আভা দিয়ে ঢাকা যৌবনের আয়ু
চোখ, চুল, ওষ্ঠ ফের, রক্ত ক্লেদ, স্বেদ, বিষ ব্রণে
কি প্রেমে ভাসালে বলো হে ফোয়ারা! সহস্র সুবাহু

দু হাতে যে মুখ নিলে, সেই মুখ তোমার রচনা
দর্পণে সে মুখ নেই, হৃদয়ে সে মন নেই যারে,
ভালোবেসে ভাসালে এ খেত জোড়া ফসলের সোনা,
কি ক্ষতি পুতুল যদি, হৃদয়-প্রতিমা জানো যারে?

পরিব্রজ্যা

দক্ষিণারঞ্জন বসু

এ মাটির স্বর্গে আমি আবাসিক অর্ধ শতাব্দীর
পরিব্রজ্যা তীর্থে তীর্থে আগ্রা থেকে নায়গ্রা অবধি
শুধু একই সুরের সন্ধানে। ঘুরে ফিরে দেখিলাম
একই মন, হৃদয়ের একই খেলা এখানে ওখানে;
জীবনের শাশ্বত সঙ্গীত এক তানে এক লয়ে
সর্বলোকে বাঁধা। রাইন বা সেইন বা টেমস
পটোম্যাক ডার্লিং নাইল ভলগা গঙ্গা সিন্ধু
ইরাবতী—একইরূপ ইহাদের দান দেশে দেশে;
মাতৃরূপা অন্নদাত্রী ধনদাত্রী নদী সর্বকালে
কৃষিধর্মে বাণিজ্যবিস্তারে।
যৌবনের সিংহাসন কণ্টকিত ফণিমনসায়;
সে বিষ-কাঁটার ঘায়ে, তৃষ্ণাতুর মধুকর মন
সর্বদাই যন্ত্রণা-জর্জর। সিংহদ্বারে প্রায়শঃই
ঝুড়ি ঝুড়ি ঝড় বিষণ্নতা বয়ে আনে উৎসব
অঙ্গনে। দ্রবীভূত হৃদয়ের রূপাশ্রয় প্রেমাশ্রু
কণিকা; অন্ধকার অন্তর আকাশ দীর্ঘশ্বাস
জমে জমে পুঞ্জীভূত মেঘে। যুগ থেকে যুগান্তর
তবু তার আকর্ষণ ত্রিভুবন জুড়ে। ভাবকবি
হোমারে বা গার্সিলাসোয় রবীন্দ্র ঠাকুরে একই
সত্য বারংবার ধ্বনিত ঘোষিত।
তারও চেয়ে কঠিন স্বীকৃতি ঃ প্রগতির রূপরেখা,
তবু—নগর কসাইখানা কদর্য বৈশিষ্ট্য এই বিংশ
শতাব্দীর। তারই সঙ্গে দীর্ঘায়িত আর সেই
আফিসের দুঃসহ সাধনা। ছিন্নভিন্ন উচ্চকিত
বহু অভিলাষ। মোহময় ইন্দ্রজালে আজো জানি
ঘেরা ভবিষ্যৎ। আমার জীবনমঞ্চে সম্ভাবিত
আরো নাট্য যত জানি না আদৌ তাহা সার্থকতাবহ
হবে কিনা। অবশ্যই অপ্রকাশ ইতিহাস দেবতার
লীলা যতক্ষণ অসংঘটিত। তবু এ মুহূর্তে আমি
এই যাত্রা রেখে যেতে চাই, বেঁচে থেকে অমৃতের
বিন্দু স্বাদ পেয়ে যেন যাই!
বিজ্ঞানের বিজয় যাত্রায় রহস্যের ঘনঘন
যবনিকা পাত। অনুত্তর তবু থাকে অনেক জিজ্ঞাসা।
যখনি প্রবেশ ঘটে অকস্মাৎ মনের গহ্বরে,
চোখে পড়ে মিশরীয় অজান্তা বা মায়া চিত্র মেলা
বিচিত্র বিভাগে। প্রত্নতত্ত্ব গবেষণা নয় অনর্থক,
সামান্য সান্ত্বনা আনে অতীতের প্রকাশ্য ঘোষণা।
আনন্দ ও উল্লাসেরই পাশাপাশি স্বার্থ-দ্বন্দ্ব
হিংস্রতা-ক্রূরতা, মানুষের জগতের আলো-অন্ধকার।
(আমি কবি কথাচিত্রী সে দুয়েরই সমান সমান)
বিবর্তিত ধর্মচক্র, দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তর ঘটে বার বার।
সমস্যার বহু ভিড়ে নানা ক্ষেত্রে নিজেরে হারিয়ে
অপ্রস্তুত মন। আর এও সত্য কথা বিনিষ্ট তপস্যাহীন
আমিতো প্রার্থক। কখনো কখনো ভাসি সংবাদের
তৃষ্ণাটুকু মেটানোর পর কী কী আর করার থাকে।
সারাটা সকালই যদি কুয়াশার চাদর জড়ানো,
ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। কে জানে কতোটা রৌদ্র কিংবা
পাবো কতোটুকু ছায়া? পরিমিত পরমায়ু নিয়ে
আমাদের এ জীবনও পূর্ণ নয় খণ্ড সত্য শুধু,
নিশ্চিত মৃত্যুর পথে প্রস্তুতির অনির্দিষ্ট কাল;
অজ্ঞাত সে অনন্ত মিছিলে কখনো প্রশান্ত ছবি,
কখনো ভয়াল।

সাগরের দ্বীপ

বীরেন্দ্র মল্লিক

দেখেছ কি সাগরের দ্বীপ?
চারিদিকে থৈ থৈ জল আর জল
শুধু নীল জল,
অন্তহীন বাধাহীন সীমাহীন অকূল অতল,
মেঘের আকাশ তলে আরো এক জলের আকাশ,
তার মাঝে ছোট এক সীমা
মৃত্তিকার!
দেখেছ কি সাগরের দ্বীপ?

হাট আর বাজারের সার,
লোক ও লস্করে ভাই গম্‌গম্‌ করে চারিধার,
কল আর কারখানা,
কি বিচিত্র সুসজ্জিত লক্ষ ইমারত,
সুবিস্তীর্ণ আঁকাবাঁকা কত রাজপথ।
এক ফোঁটা মৃত্তিকার কি দুর্মদ স্বপ্ন তবু!

আমি ত প্রলাপ এক এই মৃত্তিকার!
যদিও নিশ্চয় জানি
আমার বিদ্রোহ সে ত শুধু পরিহাস
নিজেকেই,
নিজেকেই ব্যঙ্গ করে শুধু বেঁচে থাকা;
শতাব্দী যেখানে বিন্দু
সময়ের সিন্ধুতীরে শুধু মাত্র কয়টি বছর
আলো জেলে রাখা;
সে-দর্পণে লিখি পড়ি পথ হাতড়াই,
জীবনের এক মানে বুঝি খুঁজে পাই,
'বুঝেছি বুঝেছি সব'
এই দম্ভে কতবার সকলেরে বোঝাবারে যাই;
সীমিত এ শীর্ণ পরিসরে
আদিগন্ত আঁধারের করি অনুবাদ
লভি এক পরিতৃপ্তি পরম প্রসাদ।

ওদিকেতে ঢেউ তুলে সিন্ধু হাসে
খলখল শুধু খলখল,
বালুকাবেলায় পরে
শোনা যায় অবিশ্রাম প্রতিধ্বনি তার
ছলছল ছলছল ছলছল।
দেখেছ কি সাগরের দ্বীপ?

জল পড়ে পাতা নড়ে

গোবিন্দ চক্রবর্তী

উঠলে সজল হাওয়া
শন শন পাইনের বনে—
মাঝরাতে বিছানায়
এখনো কি উঠে বস!

এবং আঁধার বাতায়নে ঃ
নোয়ানো বকুল শাখে
একটি কি পাখি ডাকে,
নদী বয় যে-কাঁদনে
হঠাৎ নয়নে?
সেই আমি এবং সে তুমি
কত-না নিশুতি মৌসুমী
বার বার হয়েছি যে পার!
যখন ঝড়ের হাহাকার,
আকাশ মেঘের পারাবার,
বিদ্যুৎ থেকে থেকে চমকেছে—আর।
চমকেছে, চমকেছে শ্রাবণের রাত ঃ
সেখানেই নামে না কি নায়েগ্রা প্রপাত?
ভিজে চামেলীর ঝাঁঝে
ঝাঁ ঝাঁ করে ঘর ঃ
কথা না বলাই সব কথার উত্তর,
তারই মাঝে কখন যে নিয়তির মত
এসেছ নিবিড় হ'য়ে কাছে।
অন্ধকারে একমুঠো আলোর আকাশ ঃ
কী-আশ্চর্য বাঁধভাঙা চাঁদ উঠিয়াছে।

ও-মুখে রাখব না কি মুখ ঃ
যখন প্রহরগুলি গুণেছি উৎসুক,
তুমিই দিয়েছ আগে সে তীব্র যৌতুক ঃ
শাঁখের মতন দু'টি বুক,
এ দেহে চকিত দেহ মেলে;
ফিসফাস কাণে-কাণে বলেছ কি যেন গানে ঃ
'এলে? তাব সত্যিই এলে?'
আসে শ্রাবণের রাত,
এসে কত ভেসে চলে যায়—

জল পড়ে, পাতা নড়ে কামিনী-কেয়ায়।
মেঘ করে, ঝড় বয়,
বৃষ্টি দেয় জানলায় টোকা—

কোথায় পুরোনো কাঠে বাসা বাঁধে পোকা;
'ভাসে'র রজনী গন্ধা ঝরে ঝরে যায় ঃ
এখন কোথায় তুমি অনামিকা রায়!

* * *

মধ্যরাতে কয়েকজন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

দূরে কারা কথা বলে সপ্রতিভ বিমল জ্যোৎস্নায়?
বিশাল স্তম্ভের মত ছায়া এসে পড়ে আছে
আমার শিয়রে
দূরে নদী; স্টীমারের গম্ভীর শব্দের মূর্চ্ছনায়
মনে হয়, কবরের থেকে উঠে ঐ যে কারা যেন
পৃথিবীর বেঁচে থাকা মানুষের জন্য আজ রাতে
মেতেছে মহতী শোক সভায়।

ওরা সব হেসে উঠলো, দগ্ধ কুসুমের গন্ধ জ্যোৎস্নায় সরব
কয়েকটি ধূসর রঙ্, কুকুরের ভয়ংকর স্বর
নিস্তব্ধতা ভাঙতে গিয়ে ব্যর্থ ফিরে আসে, কিছুকাল
রমণীকে রত্ন জেনে লক্ষ লক্ষ রক্তের উৎসব
যেন এই পৃথিবীর দীপ্তি নাশ করে
প্রচণ্ড ধিক্কারে হাসে দূরে ঐ কয়েকটি কঙ্কাল।

হাওয়া আসে দূর থেকে, কেঁপে ওঠে স্তম্ভকায় ছায়া
ইচ্ছে হয়, শিয়রের পাশে রাখা সুলভ বিদ্যুতে
খণ্ডিত ঘুমের মধ্যে কোন এক চমৎকার অভিধান খুলে
এ সব দুরূহ স্বপ্ন শব্দে গন্ধে ছুঁতে —
আমিও সবার মত পাশ ফিরে রমণীয় শরীরের ভাঁজে, বুকে
অধরোষ্ঠে, চুলে
ঘুমোই মুখ লুকিয়ে, দূরে প্রহরীর মত নদী।

* * *

মানুষের মুখ

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

হয়তো সে মানুষের মুখ
দেখতে পেলে কঠিন অসুখ
সেরে যেতো তোর : ভোর বেলা
আকাশ-কে পাথরের ঢেলা

মনে ক'রে ঘরের বাতাস
বন্ধ করতি না। বারো মাস
বুক তোর ভাঙছে অন্ধকার
ভূতগুলি! স্মৃতি, হাহাকার

আজ তোকে মারে! তাকে পেলে
হয়তো সকল শোক ঠেলে
খুলতি তুই স্বপ্নের জানালা
দরজাগুলি: সন্ধ্যার নিরালা

ধুয়ে দিয়ে সকল যন্ত্রণা
হয়তো ক'রতো তোকে সোনা॥

আগমনী

অনিল ভট্টাচার্য

শিব-লোকের দেউল ছেড়ে
আয় মা মাটির পূজোর ঘরে
আঁধার পথে আয় মা উমা
আলোর লীলা কমল করে॥

আনন্দিনী পাষাণী মেয়ে
তোমার চরণ পরশ পেয়ে
আগমনীর ছন্দ-গীতে
আনন্দেরি ঝরণা ঝরে॥

শেফালিকা কুন্দ-কলি
থল কমলের বনের পথে
এস রূপের দুলালী গো
অরুণ সোনার আলোর রথে—

মায়ের মত আয় শিবানী
জানিস না কি তুই ভবানী
ধূলো-মাটির জীর্ণ-কুটির
মাকে পেয়ে স্বর্গ গড়ে॥

* * *

প্রেমের হোমাগ্নি

হরেন্দ্রনাথ সিংহ

মনের শূন্যতা ল'য়ে বিশ্বের নয়নে
অনিমেষ চেয়ে থাকি কিসের আশায়,
কে দেখায় বিশ্বরূপ মোহিনী মায়ায়;
ধরিতে বাসনা তা'রে জীবনে মরণে।
সীমার মাঝারে তাই অসীম চরণে—
তীর্থে তীর্থে গিয়া কাঁদি প্রেমের পূজায়,
যেথায় প্রকৃতি দেবী আভাসে জানায়;
শুভ ফল সাধনার কুসুম চয়নে।

আশা নিরাশায় যায় জীবনের দিন,
অনন্ত চলার পথে আলোকে আঁধারে।
ভ্রমি, একা "হিমাচলে" বিষাদে মলিন,
বিরহ ব্যাকুল হিয়া ব্যথার পাথারে।

প্রেমের হোমাগ্নি একী উজলে হৃদয়,
জীবনে মরণে নাহি বিচ্ছেদের ভয়।

মোছেনা সমস্ত ছবি

রাম বসু

মোছে না সমস্ত ছবি
অভিজ্ঞতা অমোঘ নিষাদ
রক্তাক্ত সর্বাঙ্গ; নিশীথিনী
তুমি পরিণত নারী
ছিঁড়ে ফেলে নিষ্ফল নির্মোক
আমাকে ডুবিয়ে দাও নিগূঢ় অতলে।

ঝরে গেছে কপালের বিশাল গোলাপ
নিষ্পত্র গাছের নিচে শায়িত নিয়তি
রক্ত, ভস্ম, ব্যর্থতার স্তূপে
জোড়ায় জোড়ায় ওড়ে তন্ময় জোনাকি।
শিকড়ের সাম্রাজ্যের চিত্রিত বেদীতে
স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্ন সব করেছি অর্পণ।

নিঃস্ব নগ্ন দৃশ্যে আমি সুন্দর রিক্ততা
দূরতর সংকেতের ভারে অবনত
তৃষ্ণার নিখাদ দাহ বিহঙ্গ বুকের
রোমাঞ্চিত করে স্বচ্ছ দৃষ্টির আকাশ।

অনিশ্চিত বলে এত বিপন্ন সংঘাত
তুমি নৈশ নিশ্চয়তা
নিটোল সংগীতে গাঁথো গ্রহ, বিশ্বলোক
এলোমেলো খোঁচাগুলি সমতল বোধে, করুণায়
কুহক ঐক্যের দিকে অবিরল সত্তার প্রবাহ।

আমি মগ্ন নিবেদিত তোমার ভিতরে
সমগ্রতা অস্তিত্বে এখন
কেন্দ্রের উপলমণি আকীর্ণ কাঁকরে।

*

অজস্র গুলমোর

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

কেউ শুধু সুখ খোঁজে, দুঃখ নিয়ে কেউ শান্ত থাকে।
বরঞ্চ সুখেই থাকো, এসোনাক দুঃখের দাহনে,
ষাক্‌পটু চটুল যুবা স্তাবকেরা জুটুক মৌচাকে
কলাপী-বাহারে ওরা কলরব করুক প্রাঙ্গণে।

ততক্ষণ আমি যাই—ছুটে যাই বাগানের দিকে,
বুক ভরে নিই হাওয়া, পান করি রক্তের ভিতরে;
কী নিবিড় মুক্তি ওরে! সব স্বত্ব ছেড়ে কি প্রান্তিকে
তাকে পাবে—যে আনন্দে এ বাগান ভরেছে গুলমোরে?

মখ্‌মল ত্বকের স্পর্শে, স্পর্শাতুরা কামিনীকে নয়,
মানুষীর চোখে আমি ধ্রুবতর আরো কিছু খুঁজে
ভোগবতী পারে এসে, ডুবে গেছি আকণ্ঠ সবুজে;
হাড়ের প্রার্থনা নয়, আরো এক চূড়ান্ত বিস্ময়
রোদ্দুরের শিখা হয়ে হৃদয়ের অন্ধকার ঘরে
ফুটেছে আমার রক্তে পুঞ্জ পুঞ্জ অজস্র গুলমোরে।

আসন্ন

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

প্লাবিত জ্যোৎস্নায় ও কে মাউথ-অর্গ্যান
বাজায় প্রকাশ্য রাজপথে?
লঘু সুরে কাকে অর্ঘ্যদান
করবে অদূরভবিষ্যতে?

জানালায়-জানালায় রুদ্ধশ্বাস উৎকণ্ঠায়
মেয়েরা দাঁড়িয়ে শোনে সুর;
যেমন আঙুলে ওর অর্ধভাগ, বাকি কাজ ওষ্ঠাগ্রে ঘনায়,
তেম্‌নি দুদিকে দুই ফুটপাত,
যথাক্রমে জীবনের এবং মৃত্যুর।

যে-কোনো মুহূর্তে ওকে দুই বিকল্পের একদিকে
নিয়ে যাবে, তিনকোণা পার্কের বৃক্ষের নাগালে
নিকটস্থ বাড়িটার পর্দা-টানা জানলার আড়ালে
একা এক সপ্তদশী সেই লঘু সুরের শক্তিকে

এখনো উপেক্ষা করছে; শ্রবণের গর্ভে তিলে-তিলে
অবৈধ শিশুর মতো সে-সুরের স্বরলিপি বাড়ে,
ফাটলে-ফাটলে জল—তবু ভাবে অকূলপাথারে
গুরুজন বাতিঘর, মরবে না স্বখাত সলিলে॥

*

শিল্পের ধমনী

মণীন্দ্র রায়

জন্মের চেয়েও মৃত্যু দয়াময়ী। কারণ মৃত্যুই
স্মৃতি, চলমান তৃষ্ণা, শরীরের পাড় ঘেঁষে ঘেঁষে।
এবং জীবন, সে তো প্রতিদিনই বিদেশবিভুঁই,
যদি-না সে অনস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয় ভালোবেসে।

আমি তাই দুঃখ খুঁজি, যে আমার নিয়তির মতো
কেন্দ্রশায়ী চেতনায় ব'সে আছে স্তব্ধ অনালোকে।
অগ্নিহীন দীপে তার অঙ্গারিত বাসনায় ক্ষত
বুঝি-বা আমারই স্পর্শে জ্বলে শুধু শিখর ঝলকে।

জন্মে আমি কী পেয়েছি? জননী ও জায়ার হৃদয়,
স্তন্যের সুনিদ্রা আর বনাতর ঘুমের আসব।
বরং মৃত্যুও ভালো: প্রতিদিন বাঁচার সময়
প্রতিটি মুহূর্ত যেন মৃত বলে করি অনুভব।

কারণ যা নেই তাই স্মৃতি, তাই সুপেয় পিপাসা:
এবং তৃষ্ণাই শান্তি, কারণ সে গতির সরণি।
অনেক মরণে ম'রে তবু যদি মেটে এই আশা,—
আমিও বেতালসিদ্ধ, ছুঁয়ে যাব শিল্পের ধমনী॥

পকেট থেকে কাগজের টুকরোটা বার করে আর একবার দেখে নিল অশোক।

হ্যাঁ, ঠিক পথেই চলছে গাড়ী। আশা হচ্ছে এতক্ষণে। ঠিকানাটা লেখা আছে, কিন্তু দেশটা অজানা, পথটা অজানা। উপায়ের মধ্যে পথচারিদের প্রশ্নবাণে বিন্ধ করে করে জেনে নেওয়া। তাই বা এদিকে তেমন পথচারি কই? ডাক্তার সাহেবের বাংলো তো তেপান্তরের মাঠে! শহর ছাড়িয়ে প্রায় সীমান্ত রেখায় সৈন্যদের ছাউনি, তারই কাছ ঘেঁসে মিলিটারী ডাক্তারের কোয়ার্টার্স।

কাঁটাতারের বেড়া ঘেরা দু' একর জমির মাঝখানে রাজকীয় বাংলো। বিস্তীর্ণ সেই কম্পাউণ্ডে ফুলের কেয়ারি, ফলের বাগান, আর দেশী-বিলেতি যাবতীয় আনাজ পাতির ক্ষেত। ডাক্তার সাহেবের ক্ষেতেতে যা আনাজি পাতি ফলে সে নাকি একজিবিশনে দেবার মত। হবে না কেন, ভাল বীজ, ভাল সার, উচিত মত তোয়াজ, যথোপযুক্ত জল। যেটা এদিকে প্রায় দুর্লভ।

কম্পাউণ্ডের মধ্যেই বিরাট ইঁদারা, তাতে ইলেকট্রিক পাম্প বসানো, পাইপ চালিয়ে জল সরবরাহের ব্যবস্থা।

এ সব তথ্য সরবরাহ করে এক দেহাতি বুড়ো।

এটা হাটতলা।

এটাও প্রায় পল্লীর সীমান্তে, বসতি শেষ হয়ে যেখানে ধূ-ধূ প্রান্তর সুরু হয়েছে, বড় হাটটা সেখানেই বসে। সপ্তাহে একদিন।

আজ হাটবার নয়, হাটের চালাটা যেন সদ্য বিপত্নীকের হৃদয়ের শূন্যতা নিয়ে পড়ে আছে। মাঝে মাঝে দু'-একটা ছাগল ওই চালার ছায়ায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এখানে ওখানে দু'-একটা মানুষ আর কুকুর রৌদ্রতপ্ত পৃথিবীর কাছ থেকে সরে এসে এই ছায়ায় নেতিয়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে।

দেখে কে বলবে দুদিন আগেই ঠিক এই সময় এইখানে লোক ধরছিল না, হাটের হট্টগোল কথাটার তাৎপর্য কি তা' টের পাওয়া যাচ্ছিল। আনাজ-পাতি থেকে সুরু করে হাঁস মুরগী মাছ মাংস বাসনপত্র কাপড় জামা জুতো ছাতা কুলো ডালা কলসী কুঁজো—কি না আসে এখানে! সন্ধ্যা অবধি বেচাকেনা চলে। আজ সব ফাঁকা।

অশোক মনে মনে একটু হাসল বুঝি বা। ভাবল—আমারও এখন শূন্য হাটেরই পালা কি না!

হাটতলাতেই প্রকাণ্ড এক ইঁদারা।

জনসাধারণের প্রয়োজনেই বোধ করি। জল দেখে গাড়ীটা থামিয়েছিল অশোক। অনেকক্ষণ চলে চলে গাড়ীটা গরম হয়ে উঠে জল খাই জল খাই করছিল।

বুড়োটা ছিল ইঁদারার ধারে। ওর কাছেই জল চাইল অশোক, আর চাইল মিলিটারী ডাক্তার এম এন দত্তর আস্তানার সন্ধান।

তা' বুড়ো শুধু আস্তানার সন্ধানই দিল না, দিল ওই সব তথ্য—যতক্ষণ অশোক গাড়ীতে জল নিল, নিজে মুখে মাথায় জল দিল, আর গাড়ীতে বসে থাকা বছর তিনেকের ছেলেটাকে নামিয়ে তার মুখ চোখ ঠাণ্ডা জলে ধুইয়ে দিল।

বেলা চারটে বাজে, তবু কি অসম্ভব রোদ। সঙ্গের ফ্লাস্কের জলটা তো খেতে খেতে কখন সাবাড়। স্টেশন থেকে ন' মাইল দূরে ওর গন্তব্যস্থল। তাও অজানা। ঘুরতে হয়েছে অনেক।

যাক আর ঘুরতে হবে না। বুড়ো আশ্বাস দিয়েছে আর একটু গেলেই পাওয়া যাবে।

এ সাহেব তো নতুন এসেছে, বুড়ো জানায়, এ হচ্ছে বাঙালী সাহেব। এর আগে ছিল এক পাঞ্জাবী সাহেব, তাদের অনেক ছেলেমেয়ে, ভারী দুরন্ত। ওই দু' একর জমির মধ্যবর্তী বাংলোও কখনো নিথর থাকত না। বাগানের সব

ফল তরকারি খেয়ে ছিঁড়ে শেষ করতো। খেতোও তেমনি! বুড়ো সব জানে।

এ ডাক্তার সাহেবের তো বাচ্চা টাচ্চা কিছুই নেই, মেমসাহেবের মন বহুৎ খারাব। অত বড় বাগান অত বড় বাড়ী, মেমসাহেব যেন কয়েদীর মত থাকে ওখানে।

বেরোয় না? বেরোবে কখন? ডাক্তার সাহেবের সময় কোথা? আর এখানে বেড়াবার জায়গায়ই বা কোথা?

বাগানের এত ফল তরকারি, খাবার লোক নেই!

কে খাবে? শুধু তো সাহেব আর মেমসাহেব। চাকর বাকর আর কতই খাবে?

বিক্রী করে বুঝি সাহেব?

আঃ ছি ছি ছি, সাহেব কি ছোট-লোক?

তা'হলে সবই বিলোয়?

বিলোয়! বিলোবে আবার কা'কে? আছে কে ধারে কাছে? পড়শী বলতে তো গুর্খা সৈনাদল। তা' ওরা এ সব খায় নাকি? খাবার মধ্যে মাংস ডিম আলু পিয়াজ। বড়জোর টমেটো কি লেটুস শাক।

মেমসাহেবের ঢালা হুকুম চাকর বাকর মালি জমাদার যত পারে উঠিয়ে নিয়ে বিলিয়ে আসুক গ্রামে, ওদের আপন জনকে। সাহেব টের না পেলেই হ'ল। তা' উঠিয়ে ওরা আনে, বুড়ো হেসে হেসে বলে তবে আপন জনকে বিলোতে নয়। আনে হাটবারে।

মেমসাহেব বোঝেন সবই, কিছু বলেন না। ভারী মায়ার শরীর। সাহেবের মত কড়া নয়।

বুড়ো সব জানে, সাহেবের হেড মালি যে বুড়োর ভাইপো।

গাড়ীর ষ্টার্ট দিল অশোক।

বুড়ো বলল 'পাশ' না হলে চলবে না। গেট পাশ আছে তো?

অশোক হাসল। ছাড়পত্র তার নেই। কিন্তু তার নামটাই কি ছাড়পত্রের মর্য্যাদা পাবে না, শিলপে লিখে যদি পাঠিয়ে দেয়?

তা' মর্য্যাদা পেল বৈ কি।

না পেলে খানিকক্ষণ পরেই ডাক্তার সাহেবের ড্রইংরুমে হাতখানেক পুরু গদি আঁটা সোফায় ডুবে অমন আরাম করে বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে কি করে অশোককে?

ওর তিন বছরের ছেলেটাকে তো প্রায় খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না ওই সুকোমল খাদের মধ্যে থেকে।

ভিতরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে ড্রইংরুমে এলেন মেমসাহেব, সঙ্গে সুসজ্জিত ভৃত্যের হাতে সুদৃশ্য বেতের ট্রেতে অতি সৌখিন কাঁচের গ্লাশে ঠাণ্ডা শরবৎ।

বাচ্চা ছেলেটা অধীর আগ্রহে দু' হাতে চেপে ধরেই মুখ ডোবালো গ্লাশটায়। তেষ্টায় কাতর হয়েছিল সে।

তেষ্টা অশোকেরও পেয়েছিল বৈ কি। বাচ্চা ছেলেটার চেয়ে কিছু কম না। তারও ইচ্ছে হচ্ছিল টুটুর মতই অমনি গ্লাশটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে ঠাণ্ডা পানীয়টা গলায় ঢালে।

কিন্তু বড়রা কে কবে ঠিক ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে পারে? করলে গাঁইয়া ভূত অসভ্য বিটকেল কি না বিশেষণ দেওয়া হয় তাকে।

অতএব ইচ্ছে পূরণ হ'ল না।

বরং উজ্জয়িনীর ওই শরবতের চাইতেও ঠাণ্ডা চেহারাটার দিকে তাকিয়ে উল্টো কথাই বলল সে। বলল, 'তোমার আচরণ দেখে মনে হচ্ছে আমি সেই পাঁচশো মাইল দূর থেকে ছুটে এসেছি তোমার এই শরবৎটা খাবার জন্য।'

উজ্জয়িনী মৃদু হেসে বলে, 'এসে যখন নামলে তখন কিন্তু ঠিক ওই কথাটাই মনে হল। ভয়ানক পিপাসার্ত হয়ে ছুটে এসেছ।'

'মনে হল।'

সহসা অদ্ভুত এক পাল্টানো গলায় গভীর সুরে বলে ওঠে অশোক, 'সত্যি তোমার তাই মনে হ'ল উজ্জয়িনী?'

'হল তো! মরুপথিকের মত দেখাল যে।'

'সত্যি বড় কষ্ট হয়েছে। অশোক ফের সুর পাল্টে নিয়ে সহজভাবে বলে 'একে অজানা জায়গা, তায় তেমনি রোদ। অথচ এখন দেখ, তোমার বাগানে নেমেছে অপরাহ্নের স্নিগ্ধছায়া। আগুন বাতাস প্রায় মলয় বাতাসে পরিণত হয়েছে।'

'বোধ হয় আমার গুণে।' উজ্জয়িনী হাসে।

'তা' সেটা মিথ্যে' বলে উড়িয়ে দিতে পার না। বলে এবার শরবতে চুমুক দেয় অশোক।

'ডাক্তার সাহেব কোথায়?' অশোকই আবার কথা বলে।

'বাড়ীতেই।

'বাড়ীতেই?'

'হ্যাঁ দিবানিদ্রার জের চলছে।'

'বল কি, এখনও? এই পড়ন্ত বেলায়?'

'তা'তে কি? কারো কারো রাতকে দিন আর দিনকে রাত করে তোলবার আশ্চর্য কৌশল জানা থাকে।'

'তোমায় দেখে কিন্তু মনে হয় না। ডাক্তার সাহেবের তেমন গুণ আছে।

'দেখে যা মনে হয়, তাই কি সব সময় ঠিক? চোখ কি সব সময় সত্যি খবর দেয়?'

'তা' বটে! ডাক্তার হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে আমাদের দেখে অবাক হয়ে যাবেন বোধ হয় কি বল?'

'হওয়াই স্বাভাবিক। আমিই তো প্রথমে মনে করেছিলাম না ঘুমিয়েই স্বপ্ন দেখছি।' দিবাস্বপ্ন।

'আমার অবশ্য চিঠি দিয়েই আসা উচিত ছিল', অশোক বলে, 'কিন্তু তার সময় ছিল না, সিদ্ধান্তটা আকস্মিক।'

'সিদ্ধান্ত!'

অশোক মৃদু হেসে বলে 'তা' সিদ্ধান্তই বলা চলে। শুধু তোমাকে একবার দেখতে পাঁচশো মাইল দূরে থেকে ছুটে এলাম বলতে পারলে শুনতে ভারী সুন্দর হ'ত অবশ্যই, কিন্তু সুন্দর কথা জীবনে ক'টাই বা বলতে পাই আমরা বল?

উজ্জয়িনী চট করে টুটুর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, 'কি খাবে বল তো টুটুবাবু?'

টুটু গম্ভীরভাবে বলে, 'শরবৎ খেয়ে তো পেট ভরেই গেল।'

'ওরে বাস! কি বিজ্ঞ ছেলে! হেসে ওঠে উজ্জয়িনী—'তা' তোমার ডাক-নামটাই তো শুধু জানলাম, পোষাকী নাম কি বাবু?'

'প্রিয়বাদী রায়?'

'বাঃ ভারী সুন্দর নাম তো! কে রেখেছে?'

'জানি না তো' টুটু অজ্ঞতাটুকু প্রকাশ করেই তাড়াতাড়ি সামলে নেয়, 'যখন নাম হল, তখন আমি খুব বাচ্চা ছিলাম কিনা। দেখতেই পাইনি।'

'ছেলে—বুদ্ধিতে তোমায় হারাবে এর পর।' উজ্জয়িনী হাসে। 'আচ্ছা প্রিয়বাদী, তোমার বাবার নাম কি বল তো?

টুটু ভুরু কুঁচকে বলে, 'বাবার নাম তুমি জানো না?'

'কই না তো?'

'বাঃ তবে বাবা তোমার বাড়ী এল কেন?'

'কেন এল তাইতো ভেবে পাচ্ছি না।'

টুটু পূর্ব প্রশ্নের উত্তর দেয় 'বাবার নাম অশোক রায়।'

'অশোক? শুধু অশোক?' উজ্জয়িনী নিরিহ স্বরে বলে 'না বোধ হয়। বোধ হয় চন্ডাশোক।'

'ধ্যেৎ, এমন ভুল ভুল বলছ কেন?' টুটু ধিক্কার দিয়ে ওঠে।

অশোক গভীর স্বরে বলে, 'ভুল নয় রে টুটু ঠিক।'

'তবে তুমি নিজের নাম ভুল বল কেন?'

'ভুল করাই আমার স্বভাব যে!'

'ঠিক ঠিক। তাই তুমি খালি রাস্তা ভুল করছিলে।' টুটু হাততালি দিয়ে ওঠে।'

'রাস্তা আবার ভুল করলে কখন?' উজ্জয়িনী প্রশ্ন করে।

'করলাম? জীবনের প্রারম্ভে।'

'সেই খবরটা দেবার জন্যেই কি এত দিন পরে এত ক্লেশ স্বীকার করে আসা?

'নাঃ সেটা দেবার মত খবর নয়।'

'তবে বল শুনি এত দিন পরে হঠাৎ আমার জন্য কোন অসুন্দর কথা উপহার নিয়ে এলে!

'অসুন্দর কথা?'

অশোক অবাক হয়, বোধ করি ক্ষণপূর্বের প্রসঙ্গ ভুলে গিয়ে।

'বাঃ ওই যে তুমি বললে সুন্দর কথা বলবার ভাগ্য নিয়ে আসনি।'

'ওঃ তাই। কিন্তু উজ্জয়িনী, আমি আজ কোন কথা নিয়ে আসিনি, এসেছি একটা ভিক্ষে নিয়ে।'

'পরিহাসেরও একটা সীমা থাকে অশোক!' আরক্ত মুখে বলে ওঠে ঠান্ডা চেহারা মানুষটা।

'তা থাকে।' অশোক প্রায় হেসে উঠে বলে, 'কিন্তু ধৃষ্টতার বোধ হয় সীমা থাকে না। তাই এই ছেলেটাকে তোমার কাছে নিয়ে এসেছি উজ্জয়িনী, একে তুমি নেবে বলে, তোমার কাছে রাখবে বলে।'

'ছেলেটাকে আমি নেব বলে, আমার কাছে রাখব বলে!' উজ্জয়িনী অশোকের কথাটাই উচ্চারণ করে বলে', 'আমি আবারও তোমায় মনে করিয়ে দিচ্ছি অশোক, পরিহাসের সীমা থাকা উচিত।'

'বিশ্বাস কর উজ্জয়িনী, এটা অন্ততঃ পরিহাস নয়।'

'তাহলে তার মানে হয় ভিক্ষা চাওয়ার ছলে ভিক্ষা দিতে এসেছ?' উজ্জয়িনী সহসা উত্তেজিত হয়ে ওঠে, 'জীবন আমাকে যা দিতে পারেনি, তুমি তাই দিতে এসেছ আমায়?'

'না উজ্জয়িনী তা নয়। সত্যিই বিশ্বাস কর বিপদে পড়ে প্রার্থী হয়েই এসেছি তোমার কাছে। অফিস এক বছরের জন্যে আমাকে বাইরে পাঠাতে চাইছে। এই দীর্ঘকাল মাতৃহীন শিশুটাকে কার কাছে রেখে যাবো ভাবতে গিয়ে বারে বারে শুধু তোমার কথাই মনে এল। এত নিশ্চিন্ত আর কার কাছে রেখে হবো বলো?

কল্পনার অগোচর প্রস্তাব।

অশোককে দেখে তার আসার কারণ নিয়ে অনেক কথা ভেবেছে উজ্জয়িনী, শুধু ভাবতে পারে নি সত্যি কারণটা।

তাকাল ছেলেটার দিকে।

রোগা পাতলা, তবু যেন ননী দিয়ে মাজা গড়ন। টিকলো নাক, উজ্জ্বল চোখ, ঠোঁটের রেখায় সেই বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যেমন বৈশিষ্ট্য একদা উজ্জয়িনীকে উদ্‌ভ্রান্ত করতো, উন্মনা করতো, স্বপ্নের স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যেত।

যেন একটি ছোট মাপের অশোক!

উজ্জয়িনী চোখ তুলে বলল, 'শুধু এক বছরের জন্যে! যদি একেবারে নিয়ে নিই, যদি আর ফেরত না দিই?'

অশোকও সেই চোখের ওপর চোখ রেখে বলে 'যদি সত্যিই তেমন ভাগ্য ওর হয়, ছেলের দখলিস্বত্ব নিয়ে তোমার নামে নালিশ ঠুকতে ছুটব না।'

'তা' হয়তো করবে না,' উজ্জয়িনী বলে 'না করাটাই তোমার পক্ষে স্বাভাবিক। সম্পত্তি রক্ষার ব্যাপারে যে তোমার মন একেবারে মোহমুক্ত উদাসীন, সে নজীর জানা আছে। তবু জিগ্যেস করছি অশোক, তোমার প্রস্তাবটা কি সত্যিই বাস্তব?'

অশোক শান্ত সুরে বলে, 'তোমার কি একেবারে অবাস্তব বলে মনে হচ্ছে? তা যদি হয় তো তোমাকে পীড়ন করবো না, তবু তোমার কাছে রাখতে পেলে সত্যিই স্বস্তি পেতাম উজ্জয়িনী!'

উজ্জয়িনী বিষন্ন হেসে বলে, 'মরু-পথের পথিকের হাতে একপাত্র জল ধরে দেওয়া, তাকে পীড়ন করা নয় অশোক! তবু ভেবে দেখ, আকাশের চাঁদকে যদি হঠাৎ কেউ তোমার পকেটে জায়গা দিতে বলে, সে প্রস্তাব কি চট করে বাস্তব বলে মনে হবে তোমার? সে সৌভাগ্য বিনা দ্বিধায় হাত পেতে নিতে সাহস হবে?'

'দ্বিধা যদি শুধু ওইটুকুই হয়, তাহলে বলছি উজ্জয়িনী ও দ্বিধা ত্যাগ করতে পারো। যাকে আকাশের চাঁদ ভেবে ভয় পাচ্ছো, আসলে সে একটু ধুলোর মাণিক বৈ আর কিছু নয়। দুঃখী, বেচারা একেবারে দুঃখী! জ্ঞান হয়ে যে মা দেখেনি, তার থেকে হত-ভাগ্য আর কে আছে বল? বাপ বড়-জোর নিজের প্রাণের আকুলতা দিতে পারে, শিশুর প্রাণের অভাব পূর্ণ করতে পারে না। জীবনের কয়েকটা দিন দাও না ওকে সেই পূর্ণতার স্বাদ? তোমার পক্ষে তো সেটা খুব শক্ত হবে না? জানি তো তোমার মন কত কোমল, আর এ ও জেনেছি সে মন তোমার এখনো মরে যায়নি। হয়তো চেষ্টা করলে ওকে আমি কোন শিশু বোর্ডিংয়ে রাখতে পারতাম, হয়তো মোটা টাকা খরচ পাঠালে ছেলে রাখবার মত আত্মীয়স্বজনেরও অভাব হ'ত না, কিন্তু আমার কাছ ছাড়া হয়ে থাকতে ওর মনে যে অভাবের সৃষ্টি হবে, তার পূরণ কোথায় হবে বল?'

উজ্জয়িনী ওই সুকুমার অথচ বুদ্ধি উজ্জ্বল ছোট্ট মুখটির দিকে তাকায়, তাকায় তার ছোট ছোট নরম আঙুলগুলির দিকে, সোনালি সোনালি চুলে ভরা সুডৌল মাথাটির দিকে, আর অজানিত এক আকাঙ্ক্ষার উন্মাদনায় মনটা ভরে ওঠে।

অশোক মাতৃহীন শিশুর মনের অপূর্ণতার কথা বলছিল না?

ওই ছোট্ট মানুষটিকে বুকের ভিতরে ভরে নিলে কি শুধু ওরই প্রাণের পূর্ণতা?

একটা অতৃপ্ত ক্ষুধায় জর্জরিত হাহাকারে ভরা শূন্য নারী হৃদয়ের পূর্ণতা নয়?

একটি শিশু!

ফুলের মত, মাখনের মত, ছোট্ট একটুখানি পাখীর মত কোমল এতটুকু স্পর্শ স্বাদ। এক টুকরো স্বর্গের মালিকানা লাভের সুখ। বিবর্ণ হয়ে যাওয়া পৃথিবীতে আকাশ থেকে এসে পড়া এক ঝলক আলোর রং।

একটি শিশু!

উজ্জয়িনী তার থেকে বঞ্চিত।

শুধু এখনো পর্যন্তই নয়, ভবিষ্যতের কল্পনা থেকেও বঞ্চিত।

মিলিটারী ডাক্তার এম এন দত্ত উজ্জয়িনীকে দু' একর জমি ঘেরা রাজকীয় বাংলো দিতে পারবে, অনেক ফুল আর অনেক ফলের বাগান দিতে পারবে, সুসজ্জিত ভৃত্য, সুশীতল পানীয়, আরাম আয়েস আড়ম্বর অলঙ্কার, সব কিছুই দিতে পারবে,

পারবে না শুধু ওইটুকু। ওই স্বর্গসুখ, ওই স্পর্শস্বাদ। উশৃংখল কর্মজীবনের অমিতাচারে জীবনের মূলধন হারিয়ে বসে আছে সে।

নিজেকে হারিয়েছে বলেই বুঝি এম এন দত্তর ওই মুঠোয় চাপা মানুষটাকে নিয়েও এত হারাই হারাই ভয়। প্রহরী রেখে স্বস্তি হয় না ওর, তার ওপর আবার নিজে প্রহরা দিতে আসে আকস্মিক আবির্ভাবের কূটজাল ফেলে।

এই প্রাণ হাঁপানো পরিবেশের মধ্যে একটি শিশু কি দুর্লভরত্ন! দিনের সমস্ত অর্থহীন অবকাশ ভরে উঠতে পারবে একটি সংগীতের ছন্দে।

এক বছর!

অনেক দিন আর অনেক রাত দিয়ে গড়া সে জিনিসটা! এই আশাতীত সৌভাগ্যের ভার বইতে পারবে তো উজ্জয়িনী?

আর তারপর?

যদি মাতৃহারা শিশুটা মাতৃস্নেহ রসে বিভোর হয়? যদি আঁকড়ে ধরে থাকতে চায় সেই পরম পাওয়া টুকুকে!

অশোক বলেছে 'ছেলের দখলি সত্ত্ব নিয়ে নালিশ ঠুকতে ছুটবো না তোমার নামে।'

তবু কথা আছে। কথা থাকে।

রুদ্ধ গলায় বলে উজ্জয়িনী 'আমার ওপর এত বিশ্বাস করে থেকে জন্মাল?'

'বিশ্বাস? সে কি নতুন করে জন্মাবে? আমার জিনিসকে তুমি যত্নে রাখবে, এটা তো একটা প্রশ্নের অতীত কথা।'

'আরো আগে কেন এলে না অশোক!' উজ্জয়িনী আরো রুদ্ধস্বরে বলে, 'যখন এতটুকু ছিল, যখন শুধু এক মুঠো ফুলের মত ছিল, যখন প্রথম চোখ মেলে শুধু আমাকেই দেখত। ওর মা তো কবে ফেলে চলে গেছে! তখন কেন দিলে না? এখন ও কি আমাকে চিনতে চাইবে? ভাল-বাসতে চাইবে? অনেক দূরে চলে যাবে তুমি, হয়তো তোমার জন্যে কাঁদবে।'

'বাঃ কাঁদব কেন?' টুটুই কথার মাঝখানে বিজ্ঞের মত বলে ওঠে, 'বাপী তো এরোপ্লেন চড়ে হুস্ করে আকাশে উড়ে বিলেত চলে যাবে, আমি এতটুকু ছেলে আমি কি পারি তা?' যখন বড় হব তখন তো নিজে একলাই যাবো বিলেতে লেখাপড়া শিখতে। এখন তোমার কাছেই থাকব। বাপীকে চিঠি লিখতে শিখিয়ে দেবে তুমি।'

এতক্ষণ মন দিয়ে দুজনের বাক্য বিনিময় শুনে এটুকু বুঝেছে টুটু আলোচনাটা তাকে নিয়েই।

'এ সব পাঠ বুঝি আগেই দেওয়া হয়ে গিয়েছে?' উজ্জয়িনী হাস্যস্ফুরিত মুখে বলে, 'খুব তো চালাক দেখছি। কিন্তু টুটুর বাপীকে চিঠি লেখা শেখাই এত বিদ্যে কি আছে আমার?'

'বারে, তুমি তো বি-এ পাশ, তোমার আবার বিদ্যে নেই?'

উজ্জয়িনী এক জোড়া কালো পাখীকে নীল আকাশে স্থির রেখে বলে, 'আমার সম্বন্ধে আর কি কি তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে ছেলেকে?'

'ছেলের কাছেই টের পেয়ে যাবে। অপরাধের প্রমাণপত্র তো রেখেই যাচ্ছি।'

'টুটু আমার কাছে থাকতে পারবি?'

'পারবো না কেন, তুমি তো আমার মাসী হও।'

'মাসী হই একথা তোকে কে বললে?'

'বাপী বলেছেন। আবার কে বলবে!'

'তা' সত্যি, এমন ডাহা মিথ্যে আর কেই বা বলবে? কিন্তু কি আশ্চর্য, আমি পাগল নাকি? এখনো পর্যন্ত টুটুকে কিছু খেতে না দিয়ে—'

আহা—টুটু তো তোমার কাছেই থাকছে, খাইও যত পারো। আমাকে বরং আপাততঃ বিদায় দাও ট্যাক্সী ড্রাইভারটার সংগে কন্ট্রাক্ট আছে সন্ধ্যের মধ্যে স্টেশনে ফিরে যেতে হবে।'

'তোমাকে এক্ষুণি বিদায় দেব? আমার কাছে খাবে না কিছু?'

হতাশ শোনায় উজ্জয়িনীর কণ্ঠ।

'তোমার কাছে তো খেলাম। ভয়ংকর তেষ্টার সময় শীতল পানীয়, আর কিছু চাই না।'

'ডাক্তারের সংগে দেখা করবে না?'

'করা উচিত বটে' অশোক চিন্তিত মুখে বলে 'কিন্তু তিনি তো এখনো দিবানিদ্রায়। এদিকে দিবা অবসানের ঘন্টা বাজতে চাইছে।'

'আচ্ছা একটু বোস। দেখি।'

উজ্জয়িনী ক্ষিপ্র লঘু পায়ে আবার ভিতর ঘরের পর্দা সরিয়ে ঢুকে যায়।

'টুটু থাকতে পারবি?'

ছেলেকে একান্ত সন্নিকটে টেনে নেয় অশোক।

টুটুর এখন বীর পুরুষের ভূমিকা, তাই জল টলটল চোখে সতেজ কণ্ঠে বলে ওঠে, 'কতবার বলবো, পারবো! মাসীকে তো আমার খুব ভালই লেগেছে। ঠিক আমার ছবির মার মতন ভাল। আচ্ছা—অন্য সব ছোট্ট ছেলে নেই বাপী এ বাড়ীতে?

'এই তো, তুই-ই তো রইলি।'

'আমি তো আগে ছিলাম না।'

'তোর মাসীরও আগে কিছু ছিল না।'

'তুমি বিলেত থেকে ফিরে এসে মাসীকে আর আমাকে নিয়ে যাবে, তাই না বাপী?'

'বাঃ মাসীকে নিয়ে যাব কেন? ও তো এদের বাড়ীর লোক।'

'তখন আমাদের বাড়ীর লোক হবে।' টুটু উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, মাসীকে যে আমার ভাল লেগেছে।'

'মুফতে একটা ছেলে পাওয়া যাচ্ছে?' সদ্য ঘুম ভাঙা চোখে হাই তুলে ডাক্তার সাহেব বলেন, কথাটার মানে তো ঠিক বুঝতে পারলাম না।

'উজ্জয়িনী বলে—'মা-মরা ছেলে!' ছেলের বাপ বিদেশে যাচ্ছে বছর খানেকের জন্যে, তাই কোনও বিশ্বস্ত ব্যক্তির কাছে রেখে যেতে চায়।

ডাক্তার আর একবার হাই তুলে বলেন, 'চাওয়াটা উত্তম সন্দেহ নেই, কিন্তু তোমাকেই 'বিশ্বস্ত' বলে ঠাওরালো, এমন সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন বাপটি কে বল দিকি?'

'উজ্জয়িনী স্থির স্বরে বলে, 'অশোক।'

'আরে তাই বল। ডাক্তার হে হে করে হেসে উঠেন, 'এতক্ষণ বলতে হয়! চাপছো কেন?'

'চাপবো কেন।' উজ্জয়িনী বিরক্ত কণ্ঠে বলে, 'তোমার শোনবার সময় হলে তো? সন্ধ্যে অবধি ঘুমুচ্ছো! ভদ্রলোক যে কি ভাবল—'

কিছু না কিছু না! বরং আমার সদ্বিবেচনার তারিফ করল।' ডাক্তার তাঁর কাইজারি প্যাটার্ণের গোঁফটা পাকাতে পাকাতে বলেন, 'নিরবচ্ছিন্ন রসালাপের মধ্যে গিয়ে পড়ে ছন্দ পতন ঘটালে অভিসম্পাত দিত।'

উজ্জয়িনী তীক্ষ্ন স্বরে বলে, 'সব সময় অসভ্যতা করার মানেটা কি, তুমিই জানো। ছেলেটাকে রাখবো, কি রাখবো না?'

'আরে ছি ছি সে কি! এই কি একটা প্রশ্ন হল? রাখবে না মানে? সে বেচারা মা-মরা ছেলেকে এমন একটি

বিশ্বস্ত হৃদয়ের কাছে সঁপে দিতে এসেছে!'

'দেখা করবে অশোকের সঙ্গে।'

'আহা আমার আবার দেখা করার কি আছে?'

'বসিয়ে রেখেছি দেখা করার জন্যে। বাড়ীতে এল ভদ্রলোক—'

'আরে এর পর তো আসবেই মাঝে মাঝে। আসতেই থাকবে। ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখে যাচ্ছে যখন।'

পাগলের মত কথা বলছো কেন? বললাম না ও বিলেত যাচ্ছে।'

'ও হো হো, আমি আবার একটু মনে রাখতে পারি কম। চল চল।'

চটি পায়ে গলান ডাক্তার।

অশোক উঠে নীরবে হাত তুলে নমস্কার করলো।

ডাক্তার কিন্তু হৈ চৈ করে উঠলেন, 'কি মশাই শুনলাম নাকি এই অভাগার দর্শন আশায় অপেক্ষা করছেন। ডেকে দিতে হয় এতক্ষণ? বহু দিন পরে দেখা! অবশ্য আমার সঙ্গে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

এইটুকুই শুধু বলে অশোক।

'তারপর মশাই, বছর খানেকের জন্যে নাকি বিলেত চলে যাচ্ছেন? আপনি তো বেরসিক! যাবার বেলায় এত দিনের নিভু নিভু আগুনকে আবার জ্বালিয়ে যেতে এলেন! এখন এই এক বছর আপনার প্রেয়সী বিরহানলে জ্বলতে থাকুক!

অশোক উঠে দাঁড়াল। বুঝতে দেরী হয় না লোকটা এই দিনের বেলাতেও নেশার ঘোরে রয়েছে।

ওর ওই কাইজারি গোঁফ মণ্ডিত গোল মুখ, চুলে ভরাট ছোট্ট মাথাটা, রক্তাভ চক্ষু, সব কিছুর দিকে তাকিয়ে দেখল অশোক, আর তাকিয়ে দেখল উজ্জয়িনীর ফ্রীজিডেয়ারে রাখা সরবতের মত নিস্তরঙ্গ ঠাণ্ডা চেহারাটা। তারপর দু' হাত জোড় করে বলল ছেলেটিকে আপনাদের আশ্রয়ে রেখে গেলাম! মস্ত একটা উৎপাত করা হচ্ছে বুঝতে পাচ্ছি—তবু—'

'আহা হা উৎপাত কিসের—' ডাক্তার সহৃদয়তায় গলে পড়েন, 'আপনার বান্ধবীটি বেঁচে যাবে। বুঝতেই পারছেন বাঁজা মেয়েছেলের সামনে মাতৃহীন শাবক, যেন দুর্ভিক্ষপীড়িতের সামনে রাজভোগ রসগোল্লা! কি ব'ল মিসেস, উপমাটা ঠিক দিইনি? আচ্ছা আপনারা বসুন; আমি—'

'আর বসবো না, আমি এবার উঠছি—' নমস্কারের ভঙ্গীতে বলে অশোক, 'কাল সকালে আমি তা'হলে আর একবার আসছি উজ্জয়িনী, টুটুর জিনিসপত্র নিয়ে। সবই তো স্টেশনের ক্লোকরুমে পড়ে আছে।'

ডাক্তার হাঁ হাঁ করে ওঠেন 'তার মানে আপনিও এখন স্টেশনের ওয়েটিং রুমে পড়ে থাকতে চললেন! আ ছি ছি! মিসেস্ তুমি তোমার অতিথিকে অন্ততঃ একটা রাতের জন্যে নেমন্তন্ন করছো না কি বলে?... ও আপনার জিনিস আনতে কাল সকালে যাবেন মশাই, আজ থাকুন, খাওয়া-দাওয়া করুন, বান্ধবীর আদর-যত্ন খান। মিসেস্ তুমি বল।'

'না না; আমার কাজ আছে—' উজ্জয়িনীর পাথরের মত মুখের দিকে তাকায় অশোক, 'এখন যেতেই হবে।'

ডাক্তার হতাশ-নিশ্বাস ফেলে বলেন, 'যেতেই যদি হয়, কি আর করা! কী নাম আপনার ছেলের?'

'টুটু বলি। ভাল'—

উত্তর শোনেন না ডাক্তার, শুনতে চানও না। অকারণে হেসে বলে ওঠেন, 'একটা আশ্চর্য মজা দেখেছ মিসেস, অশোকবাবুর ছেলের মুখটা অবিকল তোমার মত।'

'অবিকল আমার মত! উজ্জয়িনী ভুরু কুঁচকে তাকায়, 'তার মানে? আমার মত কেন হতে যাবে?'

ডাক্তার হা-হা করে হেসে ওঠেন— 'কেন হতে যাবে' এ কি একটা কথা হল মিসেস? জগতে কত ভৌতিক দৈবিক আকস্মিক নানা কাণ্ড ঘটে যায়, কে তার কারণ নির্ণয় করতে যাচ্ছে?'

'না, ও মোটেই আমার মত দেখতে নয়,' উত্তেজিত উজ্জয়িনী উত্তর দেয়।

'আহা চটে উঠছ কেন? এতে চটবার কি আছে?' ডাক্তার দরাজ গলায় বলে ওঠেন 'ছেলের আপনার কত বয়েস হল অশোকবাবু, বছর তিনেক বোধহয়! তাই না মিসেস? যে বছর আমি জাপান গেলাম এক বছরের জন্যে, তুমি কলকাতায় বাপের বাড়ী থাকলে—'

উজ্জয়িনী হঠাৎ খুব বেশী ঠাণ্ডা হয়ে গিয়ে বলে, 'তার সঙ্গে এর সম্পর্ক কি? আমি কলকাতায় থাকাকালীন সেখানে যত ছেলেমেয়ে জন্মেছে, সবাই আমার মত দেখতে হবে?'

'আহা সবাই কি আর?' ডাক্তার হ্যা হ্যা করে হাসেন। 'বললাম তো দৈবিক, আকস্মিক—কত কি ব্যাপার আছে জগতে!'

মাতালের প্রলাপোক্তি! অশোক এই প্রলাপোক্তির অর্থ নিয়ে মাথা ঘামায় না, শুধু আর একবার ভাবে—লোকটা কী বেহেড্! এই দিনের বেলাতেও—!

তারপর বলে, 'টুটুসোনা, যাচ্ছি তা' হলে? লক্ষ্মী হয়ে থেকো। কাল তোমার জিনিসপত্তর—'

কথা শেষ করতে পায় না অশোক, সহসা ওর কথার ওপর তীক্ষ্ন একটা হাসির লহর ছড়িয়ে পড়ে। লহরে লহরে হেসে বলে উঠে উজ্জয়িনী, 'আরে তুমি কি সত্যিই ওকে রেখে যাচ্ছ না কি? কী কাণ্ড! পাগলা-টাগলা হয়ে গেছ না কি বলত? আমি মনে করছি 'রেখে যাব রেখে যাব' করে ক্ষ্যাপাচ্ছো ছেলেকে! সত্যি রেখে যাবে ভাবলে কি করে— তাই তো ভেবে পাচ্ছি না।'

গোধূলির আলো মিলিয়েছে, তবু একেবারে অন্ধকার নামেনি। এম এন দত্তর বিরাট বাগানের গাছপাতাগুলোকে আলাদা করে আর চেনা যাচ্ছে না বটে, তবু দেখা যাচ্ছে। কিন্তু উজ্জয়িনীর দৃষ্টিটা একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে কেন, কিছু কেন দেখতে পাচ্ছে না সে?

গাড়ীর ধুলোয়? যে গাড়ীটা এই একটু আগে চলে গেছে দ্বিতীয়বার ফিরে আসবার সমস্ত সম্ভাবনা বিলুপ্ত করে দিয়ে।

কিন্তু এখানে ধুলো কোথা?

বাগানের মাঝখানের ফুলের কেয়ারি করা রাস্তায় তো দুবেলা জল পড়ছে।

এম এন দত্তর এলাকা পার হয়ে মেঠো রাস্তায় পড়ে যদি ধুলো উড়িয়েই থাকে, সে ধুলো কি এত দূর উড়ে আসবে?

টুটুর জন্যে খানা পাকাবার নির্দেশ দিয়ে এসেছিল উজ্জয়িনী বাবুর্চিকে। সে এখন পরিপাটি করে টেবিলে লাগাচ্ছে সেই খানা।

ওটা নামিয়ে ফেলতে হবে।

আবার খানিক পরেই নতুন করে টেবিল সাজানো হবে বহুবিধ আহার্যের আয়োজনে ঝলমলিয়ে। সেখানে মুখো-মুখি খেতে বসবেন সাহেব আর মেম-সাহেব।

সমর্পিতা

প্রাণতোষ ঘটক

অনেক মেয়ের আসা যাওয়া। যেমন সাজপোষাক, তেমনি আদব কায়দা।

হালফ্যাশনের আধুনিকাদের হাসির ফোয়ারা ওঠে জেনারেল ম্যানেজারের শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে। প্রসাধনী সুগন্ধের আমেজ ছড়িয়ে থাকে। সাজের বাহারে চোখ ঝলসে যায়। ফিনফিনে পাৎলা শাড়ী নানা রঙের। পরণে আঁটসাঁট খাটো ব্লাউজ। লজ্জা নিবারণ হয় না। যার চোখ পড়ে তারই লজ্জা বরং। হিল-উঁচু জুতো সিমেন্টের মেঝেয় শব্দ তোলে মৃদুমন্দ। কেরাণীদের চোখ ধাঁধিয়ে যায়। নিরাসক্ত চোখে দেখে প্রায় সকলেই। মেয়েরা আসে হাসতে হাসতে, যখন ফিরে যায় তখনও তাদের মুখে হাসি। সত্যিকার না নকল হাসি, দূর থেকে ধরা যায় না।

টাইপিস্ট ছায়া চৌধুরী ভয়ে ভয়ে দিন কাটায়।

জেনারেল ম্যানেজার হয়তো ছায়াকে সরিয়ে বসিয়ে দেবেন তাঁরই মনোনীতা একজনকে। এই আশঙ্কায় সদাক্ষণ অস্থির হয়ে থাকে ছায়া। কাজে মন বসে না। কথা বলে না আর, কারও সঙ্গে। আগের মত কথায় কথায় আর হাসি দেখা যায় না ছায়ার অনিন্দ্যসুন্দর মুখে। ভাঙামনে গম্ভীর ছায়াকে দেখলেই বোঝা যায়, নিদারুণ এক অশান্তির মধ্যে দিন কাটছে তার। দুশ্চিন্তায় ডুবে আছে যেন।

চার্জশীট পেয়েছে ছায়া। অভিযোগ-পত্র পেয়েছে জেনারেল ম্যানেজারের। কড়া ভাষায় লেখা চিঠি পেয়ে চিঠির উত্তরে ছায়া জানিয়ে দিয়েছে তার বক্তব্য, নরম নরম সুরে। এবারের মত শুধু মাত্র ওয়ার্ণিং দিয়ে ছায়াকে রেহাই দেওয়া হয়েছে। দয়া-দাক্ষিণ্য দেখিয়েছে যেন সুব্রত। কৃপা করেছে। চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, কোম্পানী ভবিষ্যতে আর কোন রকম বিবেচনা করবে না। দোষ-ত্রুটির পুনরাবৃত্তি হ'লে চাকরীর মায়া কাটাতে হবে। বিদায় নিতে হবে।

বেয়ারা লিফটম্যান থেকে প্রায় প্রত্যেকটি কর্মচারী আর কেরাণী—সকলেই যেন ভয়ে আর আতঙ্কে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। জেনারেল ম্যানেজারের কখন যে কি মর্জি হয় কেউ বলতে পারে না। কবে যে কার ওপর কোপ পড়বে, কে জানে। সুব্রত যতক্ষণ অফিসে থাকে ততক্ষণ এমনই নিঃশব্দ্য যে একটা আলপিন পড়লেও শোনা যায়। কাজ চলতে থাকে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের মত। ষ্টার্টার চালিয়ে দিলেই চলতে থাকে কাজ। কাজে ফাঁক নেই কারও, তাই ফাঁকি দেওয়ার উপায়ও নেই। টেবল থেকে মুখ তোলে না কেউ। এক নাগাড়ে কলম চালিয়ে যায়। অফিসের চেহারা হয়ে থাকে পরীক্ষার হলের সামিল। যেন নীরব পরীক্ষার্থীর দল লিখে চলেছে একান্ত মনোযোগের সঙ্গে। যেন তেন প্রকারে পাশ করতেই হবে নয়তো ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

যার পোষাবে না, সে পথ দেখতে পারে। তাকে বিদায় দিতে বিলম্ব করে না সুব্রত। হাসতে হাসতে হাতিয়ে দেয় সার্টিফিকেট। বলে,—গুড্‌বাই।

কিন্তু চরম আর্থিক সংকটের দিনে একটা বাঁধা চাকরী, গেলে আবার একটা জুটিয়ে নেওয়া যে কি কষ্টকর, ভুক্ত-ভোগীরাই জানে। কাজের জন্য দুয়োরে দুয়োরে ধর্ণা দিতে হবে। চাকরীর ভিক্ষাপাত্র তুলে ধরতে হবে।

আর নয়, ছায়া টাইপের কী-বোর্ড থেকে আর চোখ ফেরাবে না।

একটি বাজে কথা বলবে না। কথায় কথায় আগের মত আর হাসবে না ছায়া চৌধুরী। ভাল মেয়ের মত আসবে, কাজ করবে, ছুটির পর বেরিয়ে পড়বে। সহকর্মীদের কাছে ঘেঁষতে দেবে না।

জেনারেল ম্যানেজারের পায়ে রবারের জুতো। চলা-ফেরায় শব্দ নেই।

চোরের মত সজাগ সুব্রত। সাপের চেয়ে সাবধান বেশী। হঠাৎ শীতের দেশ থেকে বেরিয়ে পড়ে। চোখের দৃষ্টি বুলিয়ে নেয় সারা অফিস-হলে। প্যান্টের পকেটে দুই হাত। মুখে জ্বলন্ত পাইপ। সঙ্গে সঙ্গে গরমের দেশের একেক ঝলক উষ্ণ হাওয়া এসে ছোঁয়া দেয়। তার প্রশস্ত কপালে অসহ্য গরমে বিরক্তির কুঞ্চনরেখা

ফুটে ওঠে। দেখতে থাকে, কাজ ঠিক ঠিক চলছে না ব্যাহত হচ্ছে।

সহসা যমের আবির্ভাব হয় যেন। ছেলে আর মেয়ে কেরাণীদের বুক দুরু দুরু করতে শুরু হয়। কখন যে বাঘ কাকে কামড়ে মারবে, কেউ বলতে পারে না। একটা ইনডিসিপ্লিন কিছু দেখলেই সুব্রতর তিরস্কার, লাঞ্ছনা, ভৎর্সনা শুনতে হবে। স্ম্যাবিংএর চোটে যাকে ধরবে তাকে কাঁদিয়ে দেবে সে। দয়ামায়ার লেশ নেই যেন। হৃদয়হীন নিষ্ঠুর ব্যবহার। পদে পদে অপমান আর অসম্মান। স্থান কাল পাত্র বিচার করতে চায় না।

বৈকালিক সূর্য যখন পশ্চিমে ঢ'লে পড়ে, যখন অফিসে অফিসে ছুটির পালা, তখন নেতাজী সুভাষ রোডের তেরোতলা আকাশ-চাঁচা ম্যানশনের সুউচ্চ এক কক্ষে কলকাতার ব্যবসামহলে বিখ্যাত মেহেরা এণ্ড টমসন কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার সুব্রত সান্যাল, যাকে সকলে বাঘের মত ডরায়, উচ্চ আসনের প্রতিপত্তি আর দাপটে সদাই গম্ভীর থাকতে থাকতে হঠাৎ হাসির হুল্লোড়ে মেতে ওঠে। বিশুষ্ক, মরা ঝর্ণা, শ্রাবণ-বর্ষার কোথাময় বইতে থাকে হঠাৎ যেন। দেখলে তখন চেনা যায় না সুব্রতকে। না দেখলে চোখে, বিশ্বাস করা যায় না।

বেপরোয়ার মত। কারও ধার ধারে না। কাউকে তোয়াক্কা করে না। কুসুম-কোমল পেলব হাতে হাত ভিড়িয়ে সুব্রত শিষ দিতে দিতে অফিস ত্যাগ করে। এক একদিন একেকজন। আজকে যে কালকে সে নয়। প্রাত্যহিক নিত্য নতুন রেশিপির পাকাপাকি ব্যবস্থা থাকে আগেভাগে।

গঙ্গার অন্য প্রান্তে, হাওড়া-শালিমারের ওপরের আকাশে তখন বিকালের অস্তমান লাল সূর্য। নেতাজী সুভাষ রোডের তেরোতলা থেকে দেখা কলকাতা শহরের বিরাট অংশ। রুপোলী রঙের হাওড়া ব্রীজে রক্ত আভা। মুঠো মুঠো সিঁদুর কারা যেন ছড়িয়ে দিয়েছে। শেষরশ্মি পড়েছে রক্তিম।

সায়াহ্নের পাংশু অন্ধকারে তাই বাঘের মুখে হাসি ফোটে। হাসতে হাসতে বেরিয়ে যায় এক একদিন। রয়্যাল বেঙ্গল বেরিয়ে যায়, শিকার সঙ্গে নিয়ে। মাংসের লোভে লোভে।

কানাকানি হয় অনেক রকম। ফিরেও দেখে না সুব্রত। কানে তোলে না তুচ্ছ কথা। পুরুষ মানুষেরই প্রয়োজন হয় নারীকে। এই না কি চিরকালের রীতি। সেই গুহার আমল থেকে।

সুব্রতর পৌরুষের বলিদানের যূপ-কাষ্ঠে পড়লো টাইপিষ্ট ছায়া চৌধুরী।

সেদিন হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে শিকারী বিড়ালের মত শব্দহীন পদক্ষেপে চুপি চুপি এগোতে থাকে সুব্রত। যারা তাকে দেখতে পায় তারা আর মুখ তোলে না খাতা থেকে। কলম থামায় না। নিঃসাড়ে কাজ চালিয়ে যায় নতমুখে। সুশীল সুবোধ ছাত্রছাত্রী যেন সব। পরীক্ষার্থী।

সকলেই অনুমান করে, এখনই একটা বড় রকমের ঝড় উঠবে অফিস-হলে। জেনারেল ম্যানেজার স্বয়ং হাতেনাতে একজনের ফাঁকি ধ'রে ফেলেছেন। হয়তো অনেক দিন থেকে ছিলেন তাকে তাকে। আজ এসেছে এক সুবর্ণসুযোগ। হেলায় যা হারাণো যায় না। ক্রেপসোলের পদধ্বনি অশ্রুত থেকে যায়। এক পা এক পা এগিয়ে চলে সুব্রত। হাতের পাইপটা ঠোঁটে হেলিয়ে দেয়। মুখে হিংস্র হাসি ফুটেছে। মরদানবের মত দুই হাতে এখনই যেন শিকারের টুঁটি চেপে ধরবে।

একজনের পিছনে দাঁড়িয়ে পড়লো সুব্রত। চলতে চলতে থামলো হঠাৎ। স্রেফ নাগালের মধ্যে পেয়ে গেছে শিকারকে। এখন খানিক খেলাবে চরম আঘাতের আগে।

সহকর্মীদের কেউ যে সাবধান করবে ঐ অসাবধানীকে, তারও উপায় নেই। সুব্রতর চোখে ধরা পড়লে চার্জে জড়িয়ে দেবে। চার্জশীট দিয়ে দেবে কড়া।

আর যেন সবুর সহ্য হয় না। সুব্রত কথা ধরলে ঝাঁজালো সুরে, মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে। বললে,—অফিস আর ড্রইং রুম এক নয় মিস চৌধুরী। ভুলে গেছেন বোধ হচ্ছে।

শিউরে শিউরে উঠলো টাইপিষ্ট। যমের কণ্ঠস্বর কানে এসেছে যেন।

সামলাতে সময় নেয় কিছু। ছায়া চৌধুরী নিজেকে সামলে হাতের কাজ শুরু করে ভয়ে ভয়ে। খট খট খট—

নরম নরম হাত, নাচতে থাকে যেন টাইপরাইটারের কী-বোর্ডে। চাঁপার কলির মত আঙুল, যন্ত্রের বুকে শব্দ তোলে পুতলায়ে।

একজন কেরাণীর সঙ্গে কি একটি কথায় হাসাহাসি করছে তখন ছায়া, এমন সময়ে তার শীতের দেশ থেকে বেরিয়েছে সুব্রত। বন থেকে যেন বাঘ বেরিয়েছে।

—আঁচল যে লুটিয়ে পড়ছে ধুলোয়!

আবার কথা বললে জেনারেল ম্যানেজার। সপ্তমে সুর। সকলে যেন শুনতে পায়, তাই সজোরে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছে। কথার শেষে মুখে পাইপ তোলে।

পিঠ থেকে লুটানো আঁচল সামলায় ছায়া চৌধুরী। সলজ্জায়। তার হাসি হাসি মুখে নামে শ্রাবণের কালোমেঘ। সঙ্কোচের জড়তায় কাঁপছে সে। অপরাধের কলঙ্ক-চিহ্ন ফুটেছে যেন মুখে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ছায়া, বুক-ভাঙা। অনুশোচনায়।

জোরালো কণ্ঠ গর্জে ওঠে তার কানের কাছে। সুব্রত সুর চড়িয়ে বললে, আবার,—দেখছি, আজকাল ছেলেদের চেয়ে মেয়েরাই বেশী ফাঁকিবাজ। মাথা খাচ্ছে ছেলেদের। লজ্জা শালীনতা বলতে কিছু আর রইলো না।

—আই এ্যাম সরি স্যর। বেগ ইওর পার্ডন।

কাঁপা কাঁপা কথা বললে ছায়া। অপমানের বাক্যযন্ত্রণায় আর স্থির থাকতে পারে না। ক্ষমা চাইলে যদি আর শুনতে না হয় কাটা কাটা কথা, তাই বললে ভয়-কাঠ গলায়।

আমি দুঃখিত। ক্ষমা করুণ আমাকে।

দোষ-স্বীকার আর ক্ষমা-প্রার্থনা শুনেও ক্ষান্ত হয় না জেনারেল ম্যানেজার। কর্ণপাত করতে চায় না কথায়। সুব্রত বললে,—মুখে বললে চলবে না মিস চৌধুরী। লিখে জানাতে হবে। রেকর্ড রাখতে হবে আমাকে। ফর সাম ফিউচার রেফারেন্স।

তার মানে কালো খাতায় নাম উঠে যাবে। ব্ল্যাক লিস্টের আওতায় থাকবে ছায়া চৌধুরী।

—আমাকে ক্ষমা করুন।

শেষবারের মত বলে টাইপিষ্ট, মিনতির সুরে আবেদন জানায়।

আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা নয়। সুব্রত মার্চের ভঙ্গীতে পা ফেলতে ফেলতে নিজের কামরায় চলে গেল। গরমের দেশ থেকে শীতের রাজত্বে।

খট খট খট খট—

কাজ শুরু করেছে ছায়া। কেউ দেখতে পায় না পিছু থেকে, তার চোখ ছলছল। কোমল বুকের স্তর কাঁপছে থরথরিয়ে। মাথার মধ্যে ঝিমঝিম। এখনই যেন অজ্ঞান হয়ে যাবে অব্যক্ত কষ্টে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটেছে। পাশেই প'ড়ে আছে ছায়ার ভ্যানিটি ব্যাগ। রুমালখানা বের ক'রে চোখ মুখ মুছবে, সাহস হয় না যেন।

সকলের দৃষ্টি পড়বে, ছায়ার অশ্রুসিক্ত চোখে।

সারা অফিস হলে একটা অস্ফুট গুঞ্জন ওঠে। সুব্রতর কথার চাপা একটা প্রতিবাদ মেয়ে মহল থেকে পাক খায়। মেয়েদের সম্পর্কে জেনারেল ম্যানেজারের বিরুদ্ধ মন্তব্য। সমগ্র নারী জাতির অপমান।

কলিং বেল গোঙানি ধরে। তীব্র আওয়াজে অফিস হল কেঁপে ওঠে যেন। লাল আলো জ্বলেছে। সুব্রতর দুয়োরের শীর্ষে।

বেয়ারা দেখা দিতেই জি এম বললে টেবলে পাইপ ঠুকে,—স্টেনোগ্রাফার।

মেয়েদের প্রতিবাদ বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। যে যার কাজে মন দেয়। সংসারের ভরণ পোষণের ভার ঘাড়ে পড়েছে। চাকরী গেলে অনাহারে মরতে হবে। যাকে বলেছে সে প্রতিবাদ জানাক। পরের জন্য মাথা ব্যথা কেন।

ডিক্‌টেশন দিতে থাকে সুব্রত। সাংকেতিক অক্ষরে লিখে যায় স্টেনোগ্রাফার। একটিও আজেবাজে কথা নয়। আইন বাঁচিয়ে চিঠি লিখতে হয়। টাইপিস্টের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ যেন মিথ্যা প্রমাণ না হয়। পাইপের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে, ভেবে ভেবে বলতে থাকে সুব্রত। অকাঠ্য যুক্তির সঙ্গে কড়া ভাষা মিশিয়ে।

আমি দুঃখিত। আমাকে ক্ষমা করুন। ছায়া চৌধুরীর উক্তিগুলি মনে পড়লে দাঁতে দাঁত চাপে সুব্রত। প্রতিহিংসার জ্বালা ধরে যেন মাথায়। সহানুভূতির বিবেচনা উঠে যায় মন থেকে। সুব্রত যেন পাষাণ। নির্দয় নিষ্ঠুর।

—মিস চৌধুরী।

নাতিউচ্চ কণ্ঠে ডাক দেয় স্টেনোগ্রাফার। পিছনে দাঁড়িয়ে। হাতে তার প্যাড আর পেন্সিল। মুখে হতাশা।

চোখ ফেরাতেই ছায়ার হাতে ধরিয়ে দেয় স্টেনোগ্রাফার, প্যাডের কাগজ। বলে,—জেনারেল ম্যানেজারের আদেশ, এই চিঠিখানি সব আগে টাইপ হওয়া চাই। দেরী হ'লে চলবে না। তিন কপি চাই।

চিঠির খসড়া হাতে নিয়ে কাগজের মাথা থেকে পা পর্যন্ত এক নিঃশ্বাসে পড়তে থাকে ছায়া চৌধুরী। তারই বিরুদ্ধে অভিযোগ। কাজে অমনোযোগ, গাফিলতি, অফিসের নিয়ম-কানুন ভঙ্গ হওয়ার লিখিত প্রতিবাদ। উত্তর চাই এক সপ্তাহের মধ্যে।

হাত কাঁপতে থাকে ছায়ার। মাথায় রিমঝিম শব্দ হয়। বক্ষে কম্পন। চিঠির খসড়া তো নয়, যেন আত্মহত্যার বিষ দিয়েছে তার হাতে। খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু। কেউ বাঁচাতে পারবে না। ছায়াকে লেখা চিঠি, ছায়াকে টাইপ ক'রে দিতে হবে, এমনই ট্র্যাজিডি।

একখানি আয় ও ব্যয়ের স্টেটমেন্ট কয়েক পৃষ্ঠাব্যাপী, টাইপের কাজে ব্যস্ত ছিল ছায়া। স্টেটমেন্ট রেখে দিয়ে চিঠিতে মন দিতে হয় তাকে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও। কার্বন কাগজ খুঁজতে থাকে ছায়া। তিন কপি চাই।

এক কপি পাবে ছায়া। এক কপি যাবে সরকারী লেবার অফিসারের কাছে। এক কপি থাকবে রেকর্ডে। খট খট খট খট—হাত চলতে থাকে টাইপিস্টের। আড়ষ্ট আঙুল, চলতে চায় না। থেমে যায় বার বার। চোখে ঝাপসা দেখে। চিঠির খসড়া, মনে হয় হিজিবিজি লেখা। ভাষা দুর্বোধ্য। বিষয়বস্তু অর্থহীন প্রলাপ যেন। তবুও টাইপ করতে হবে। অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে। একটি শব্দ বাদ না পড়ে।

—আমাকে দোষ দেবেন না। আমি নিরুপায়। জানেন তো কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। ফিসফিস কথা বললে স্টেনোগ্রাফার। সমবেদনার সুরে। ম্লান হাসি মুখে।

—তবু আমি ক্ষমা চেয়েছি। দোষ স্বীকার করেছি। রেহাই নেই তাতেও। ছায়া বললে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে। কাঁপা কাঁপা কথা।

স্টেনোগ্রাফার ইদিক সিদিক দেখে আবার ফিসফিস বললে,—আপনি যে বড্ড বোকা আর ভাল মানুষ! দেখছেন তো চাকরী রাখতে হ'লে করতে হয় কি কি।

—কি করতে হয় বলুন তো? শুধোয় ছায়া, কিংকর্তব্য হারিয়ে।

হেসে ফেললে স্টেনোগ্রাফার। পেন্সিল কামড়ে ধরে দাঁতে। বলে,—কি আর বলবো বলুন। দেখতে পাচ্ছেন তো মিস দাস, মিসেস সেন, মিস ডরোথি পার্কারকে! ওরা কেমন তুষ্ট রেখেছে আমাদের জি, এমকে। যখন যা বলছে তাই হচ্ছে। মাইনেও বেড়ে চলেছে ওদের। ধাপে ধাপে।

লজ্জার লাল ফুটে ওঠে ছায়ার ফর্সা গালে। চোখের পল্লব নত হ'তে থাকে ধীরে ধীরে। কেমন একটা ঘৃণার উদ্রেক হয় মনে। মন সায় দিতে চায় না। দেহ সাড়া দেয় না। দেহ আর মন বিদ্রোহের সুর তোলে যেন।

চিঠি টাইপ করতে থাকে ছায়া। যেন নিজের মৃত্যুর সার্টিফিকেট, নিজেই লিখছে। ঝাপসা দেখছে চোখে।

খট খট খট খট—

সাংকেতিক ভাষা অস্পষ্ট আর দুর্বোধ্য ঠেকছে। তবুও হাত চালাতে হয়। চাঁপার কলির মত আঙুল, নাচতে থাকে কী-বোর্ডে। এখন আর তাল নেই, ছন্দ নেই। বেসুরো শব্দ তোলে টাইপরাইটার। যন্ত্রটাও যেন অসম্মতি জানায়।

না না না। পারবে না ছায়া, ওদের অনুকরণ করতে। মিস দাস, মিসেস সেন, মিস ডরোথি পার্কারকে জীবনের আদর্শ, কল্পনা করতেও পারে না যেন। শুনতে পাওয়া যায়, মিস দাস না কি একবার কি এক দুরারোগ্য গোপন ব্যাধিতে ভুগতে ভুগতে কোন রকমে রক্ষা পেয়েছে। মিসেস সেনকে তার স্বামী না কি পরিত্যাগ করেছে। তার নামে আদালতে মামলা চলছে তার স্বামীর পক্ষ থেকে। সেপারেশন চাইছে মিসেস সেনের সাত-পাকে-বাঁধা মিস্টার সেন। প্রধানতম অভিযোগ 'বিগামি'। স্বামী জলজ্যান্ত বেঁচে থাকতেও অন্য পুরুষদের সঙ্গ চাওয়া কেন? শোনা যায় মিস ডরোথি পার্কার, কুখ্যাত পল্লীর মেয়ে। দিনে চাকরী করে। আর রাত্তিরে?

একটা একটা দুঃস্বপ্ন, ছায়ার চোখে ভেসে ওঠে। হাতের তালু হিম হয়ে যায়। কণ্ঠ শুকিয়ে যায় কম্পিত আতঙ্কে। বুকের মধ্যে বিবেকের দংশন। ছায়া পারবে না, নীচে নামতে। স্বর্গ থেকে নরকে, যেতে চায় না সে। থাক তার ভাগ্য পাথরচাপা। দরকার যদি হয়, চাকরীতে ইস্তাফা দিয়ে দেবে। ভাঙবে তবু মচকাবে না। অনাহারে থাকতেও সে যেন প্রস্তুত। এমন কি উদ্বন্ধনে আত্মহত্যায়।

ভাসা ভাসা মনে পড়লো ছায়ার। চাকরীতে এসে প্রথম দিকের একটা তুচ্ছ ঘটনা।

ছুটির ঠিক মধুমুহূর্তে ডাক পাঠালেন জেনারেল ম্যানেজার। প্রায় সাড়ে তিন পৃষ্ঠায় একটি স্টক রিটার্ণ, এগিয়ে দেয় সুব্রত। বলে,—মিস চৌধুরী, ভেরী ভেরী আর্জেন্ট, আজই চাই। প্লীজ, ডু ইট'।

মৌমাছির মত ভ্রুপ্রাকৃতি কব্জি-ঘড়ি তুলে ধরে ছায়া। ম্লান হাসির সঙ্গে বললে,—এ যে অনেক। সময়ও অনেক নেবে। রাত আটটা বেজে যাবে শেষ হ'তে। শুধু ফিগার আর ফিগার। স্টক রিটার্ণ অঙ্কের ব্যাপার, যদি ভুল হয়ে যায় তাড়াতাড়িতে? কাল ফার্স্ট আওয়ারে দিলে চলবে না স্যার?

—কাল ফার্স্ট আওয়ারে আমাকে ব্যাংকে পাঠাতেই হবে। ম্যানেজার

ডাইরেক্টরের নির্দেশ। কথার শেষে মুখে পাইপ তোলে সুব্রত। ধূমায়মান পাইপ, ঝুলিয়ে ধরে কুকুরদাঁতে। বলে,—স্টক-রিটার্ণের শেষ দিন আগামীকাল। ব্যাংক ওভারড্রাফ্ট বন্ধ ক'রে দিতে পারে, সময়ে না পেয়ে।

—মিস দাসকে বলুন। আমি যে অনেক দূরে থাকি। ছায়া একটা কারণ শুনিয়ে বলে। যদি পরিত্রাণ পাওয়া যায়। লাজুক হাসি তার মুখে।

—মিস দাস চলে গেছেন আজ, এক ঘন্টা আগে।

—মিসেস সেনকে বলতে পারেন স্যার। তিনি তো আছেন এখনও।

—তিনি আবার ফিগার টাইপ করতে পারেন না। ধোঁয়া মাখানো একটা একটা কথা মুখ থেকে বেরিয়ে আসে। রিভলভিং চেয়ারে এলিয়ে পড়ে সুব্রত। বলে,—মিসেস সেন ভীষণ ভুল করেন। রিটাইপ করাতে হয়, হুইচ ইজ এ্যাবসোলিউটলি ইমপশিব্ল্।

—মিস পার্কারকে ডেকে দিই তবে স্যার? ছায়া বললে সন্ত্রাসের সুরে। বললে,—আপনি ডেকে বললে মিস পার্কার—

—উঁহু। ডাইনে বাঁয়ে মাথা দোলায় সুব্রত। তার এ্যালবার্ট চুলের চূর্ণকুন্তল লাফিয়ে পড়ে কানের পাশে। মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে বিজাতীয় সুরে বলে,—নো নো। সি ইজ টু-উ-উ-উ স্লো। রাত্রি কাবার হয়ে যাবে।

অগত্যা আর ডাক পড়তে পারে না ছায়া ভিন্ন অন্যকে। কেমন একটা সন্দেহের চাউনি ফুটে উঠলো ছায়ার ডাগর ভীরু চোখে। দেখলো এক নজরে জেনারেল ম্যানেজারের মুখখানা। দেখলো, কি আছে সেখানে। কি লেখা আছে সেই মুখে—যা মনে মনে টাইপ ক'রে নিতে থাকে যেন ছায়া। সুব্রত তাকিয়েও আছে নির্লাজ দৃষ্টিতে। দেখছে ছায়া চৌধুরীকে। তার আপাদমাথা দেখতে দেখতে সুব্রতর এক জোড়া চোখ শুধু নয়, সুব্রতর মনের চোখও যেন থমকে থাকলো ছায়ার ঈষৎ ভারী বুকে। দক্ষিণ ভারতীয় লাল চোলীর ব্লাউসে শ্বাসের উত্থান পতন। ছায়ার গলায় সোনার সরু হার, চিক চিক করছে ঘরের নিওন আলোয়। হারের আবেষ্টন থেকে পাহাড়ী ঢল নেমে এসেছে দুই দিকে। চুণীর লকেট যেখানে মিশেছে, সেখানে যেন একটা তীরের ফলার মত ত্রিকোণের সৃষ্টি হয়ে আছে।

চোখে চোখ রাখতে পারে না ছায়া। সলজ্জায় অন্য দিকে তাকায়। সাহসে বুক বেঁধে বলে,—কাল ব্যাঙ্কে সাবমিট করা হবে কখন স্যার?

—ধরুন বেলা সাড়ে দশটার মধ্যে?

—ব্যাঙ্কিং আওয়ার্স বেলা দুটো পর্যন্ত, তার মধ্যে দিলে চলবে না? আমি বেলা বারোটার মধ্যে আপনার টেবলে পোঁছে দেবো, যদি আপনি অনুমতি দেন। অনেক দূরে স্যার থাকতে হয়। বাসে যেতেও প্রায় দেড় ঘন্টা টাইম লাগে।

—যদি কিছু মনে না করেন, আমার গাড়ী আজ আপনাকে পোঁছে দিয়ে আসবে। কোথায় থাকা হয় শুনি? আই ক্যান হ্যান্ড ইউ এ লিফ্ট।

—কলকাতা থেকে বেশ দূরে?

—কোথায়? মুনে না মার্শে না ভেনাশে? যেতে হয় কিসে? স্পুৎনিকে? হেসে হেসে কথা বলে সুব্রত। ঠোঁট বেঁকিয়ে। ব্যঙ্গের সুরে।

হাসতে চেষ্টা করে ছায়া। পারে না। হাসি যেন সাড়া দিতে চায় না। বলে,—থাকি সোনারপুরে। ঠিক আছে, আমি টাইপ শেষ ক'রেই যাবো।

চাপা ক্ষোভের সঙ্গে বললে ছায়া। ঘর থেকে বেরিয়ে গেল হাতে-লেখা তিন পৃষ্ঠার স্টক-রিটার্ণ টেবল থেকে তুলে নিয়ে। বিদেশী কি সেন্টের গন্ধ রেখে যায় ঘরে। ছায়ার সঙ্গে মেশানো যেন, এই বিশেষ একটা মিষ্টি সুগন্ধ। ফরাসী এসেন্স।

—বেয়ারা। বাইরে পা দিয়েই ডাকলো ছায়া। বিরক্তির সুরে। হিল উঁচু জুতোর ঠুক ঠুক শোনা যায় শুধু প্রায় শূণ্য অফিস-হলে। কেরাণীদের পাত্তা নেই আর ছেলে মেয়ে কেউ নয়। বেয়ারা কটা আছে এখনও। বড়সাহেব না উঠলে তাদের ছুটি হবে না।

নিজের চেয়ারে আসন নিতে হয় আবার। টাইপরাইটারের রোলার ঘুরিয়ে দিতে দিতে বলে,—বেয়ারা, এক পেয়ালা চা এনে দিতে হবে। এক স্লাইস রুটি।

কথার শেষে ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে পার্শ বের করে ছায়া। চা আর রুটির দাম দিয়ে দেয়। খট খট খট খট —

কাজে লাগতে হয় আবার, দিনের শেষে। সূর্যাস্তের পরে। বাইরে পাৎলা অন্ধকার নেমেছে। গঙ্গার অন্য তীর অস্পষ্ট হয়ে গেছে। হাওড়া ব্রীজ আর দেখা যায় না। দেখা যায় ব্রীজের দুই মাথায় জোড়া জোড়া লাল আলো জ্বলছে। দানবের রক্তচক্ষু যেন।

খাদ্য চাই সামান্য যা হোক। লোহার যন্ত্রের বুকে সারাদিন ঘা মেরে মেরে নরম আঙুল কটা ব্যথা করছে এখন। হাত চলতে চাইছে না আর। বাহু কনকন করছে। নির্দিষ্ট সময় কাজ করেও কাজ থেকে মুক্তি নেই। ছুটির পরেও ছুটি মিললো না এখনও।

খট খট খট খট—

স্পীড তুলেছে ছায়া। ধীরে সুস্থে টাইপের সময় নয় এটা। অস্ফুট অভি-মানে ছায়া হাত চালায় দ্রুতলয়ে। বিরক্তির চাউনি ফুটে থাকে মুখে। বাঁকানো ভুরু যেন সরল হতে চায় না আর। সেই সাড়ে দশটা থেকে একভাবে বসে টাইপ করতে করতে এখন পেটে-কোমরে মৃদু মৃদু ব্যথা লাগছে। কন-কন করছে থেকে, থেকে ছায়ার মেরুদণ্ড। চোখে ঝাপসা দেখছে মাঝে মাঝে।

শীতার্ত ঘরে তখন সুব্রত বিদেশী থ্রিলার খুলে পড়ছে। হাতে কাজ না থাকলে সুব্রত রহস্য-রোমাঞ্চ পড়ে সময় কাটায়। ডজন খানেক চিকেন স্যান্ডুইচ্ আর এক পেয়ালা চা, শেষ হয়ে যায় পড়তে পড়তে। এক হাতে খোলা বই, অন্য হাতে খাওয়া। চুরি, ডাকাতি, খুন জখম, হাতাহাতি মারামারি আর প্রতি কথায় রিভলভার দাগছে যখন তখন—পড়া ধরলে আর ছাড়া যায় না যেন। পরিণতিতে না পোঁছে কৌতূহল আর আগ্রহ থামে না। বিচিত্র চরিত্রের পুরুষ আর নারী ডিটেকটিভ কাহিনীতে। যাকে মনে হচ্ছে সম্পূর্ণ নির্দোষী, শান্তশিষ্ট—হয়তো দেখা [illegible] শেষে, সেই খুন করেছে। ষড়যন্ত্রের মধ্য-মণি সে।

সময় যে কত এখন, জানতে পারে না সুব্রত। একাগ্র মনে পাতার পর পাতা পড়ে চলেছে। পাইপ ধরাতে ভুলে থাকে কতক্ষণ। পাইপের মিনমিনে আগুন নিভে যায় বার বার। রুদ্ধশ্বাসে পড়তে হয় সুব্রতকে।

কাগজ রেখে যায় বেয়ারা। খেয়াল হয় না যেন। সুব্রতর মন আর চোখ থ্রিলারের পাতায় আবদ্ধ। টেবলে কাগজ রেখে দিয়ে যায় বেয়ারা। ভারী কাগজ-চাপার তলায়।

যখন খেয়াল হয় অনেক দেরী হয়ে গেছে। বই পড়া শেষ হতেই গভীর এক ঘুম থেকে যেন উঠে পড়লো সুব্রত। ছিল সে অন্য এক জগতে, পৃথিবীতে এই মাত্র এসেছে। কলিং বেল টিপতে থাকে হঠাৎ। হাত-ঘড়ি দেখতে দেখতে। দেখলো রাত আটটা বেজে গেছে।

বেয়ারা এসে দাঁড়ালো চকিতের মধ্যে সুব্রত বললে,—টাইপিস্ট মিস চৌধুরী। —

—চলা গিয়া টাইপিস্ট। বেয়ারা বললে সসম্ভ্রমে। নম্রকণ্ঠে।

—কুছ কাগজ দে গিয়া? শুধোয় সুব্রত। ব্যগ্র আগ্রহে। কথার শেষে চোখ

ষ্টক কত? আণ্ডার প্রসেসই বা কত? গোডাউনে মাল আছে কি কতটা? ফ্যাক্টরীতে গেছেই বা কি।

—বেয়ারা। ডাক দেয় সুব্রত। বলে,

ঠিক আছে, আমি টাইপ শেষ করেই যাবো।

পড়ে নিজের টেবলে। দেখতে পায় টাইপ্‌ড কাগজ, ষ্টক-রিটার্ণ। ক্রিষ্টালের কাগজ চাপার তলায়। মেজাজ বিগড়ে যায় সুব্রতর। বেয়ারার কথা শুনে। টাইপিস্ট চলে গেছে। ষ্টক-রিটার্ণ হাতে তুলে নিয়ে মূললিপির পাশাপাশি ফেলে মিলিয়ে নিতে থাকে ফিগারগুলি কাঁচামালের পরিমাণ আর মূল্য। এ্যাকচুয়াল

—কাল এই রিটার্ণ সই হোনা মাংতা। বহুৎ জরুরী হায়। সবের সাড়ে দশ বাজে কা ভিতর ম্যানেজিং ডাইরেক্টরকো টেবল মে দেনা পড়েগা। দেখো, ভুলো মাৎ।

—কভি নেহি সাব্। বেয়ারা বলে ভয়ার্ত স্বরে। সুব্রতর উদ্যত হাত থেকে নিয়ে নেয় জরুরী কাগজ।

—টাইপিস্ট ক'বাজে নিকালা? প্রশ্ন করলে সুব্রত। পাইপের তামাকের চতুষ্কোণ আধার পকেটে পুরতে থাকে। ফোর স্কোয়ার টোবাকো।

—পাক্কা, সাড়ে সাত বাজে।

—কুছ বোলা?

—নেহি সাব। কুছ নেহি। এহি কাগজ দে গিয়া থা। গলার টাই আলগা করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে সুব্রত। মিথ্যা আর কালক্ষেপ কেন? অহেতুক সময় নষ্ট কেন? পাখী উড়ে গেছে।

সুব্রতর চোয়াল কঠিন হয়ে উঠেছে। ক্রোধের অভিব্যক্তি তার নিরাশ মুখে। আশার জলাঞ্জলি পড়েছে। বেয়াদপ মেয়েটা, বসিয়ে রেখে পালিয়ে গেছে। মেহেরা এণ্ড টমসন কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার সুব্রত সান্যালের প্রস্তাব উপেক্ষা করেছে ছায়া চৌধুরী, এমনই তার দুঃসাহস। সোনারপুর, কত দূরে! গাড়ীতে লিফ্‌ট দেওয়ার স্বপ্ন সার্থক না হওয়ার আপশোসে সুব্রত দাঁতে দাঁত চাপে। রাগে গর গর করতে থাকে। হাতের মুঠো কঠোর হয়ে ওঠে।

কেমন একটা অপমানের অন্তর্দাহে সুব্রত যেন জ্বলে উঠছে থেকে থেকে। অন্যদিন লিফটম্যানের সেলামের প্রতিদানে মাথা দোলায়, ফিরেও দেখলো না সেদিন। ক্ষুন্নমনে ফিরে গেল। ফাঁদ পাতাই সার হ'ল।

আজ মনে পড়ছে ছায়ার। সেদিনের একটা একটা ঘটনা আর কথা, ভেসে উঠছে তার ছল ছল চোখ। কানে ভাসছে জেনারেল ম্যানেজারের একেক উক্তি। ছায়াকে সেদিন মোটরে লিফ্‌ট দেওয়ার আবেদন জানিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন জেনারেল ম্যানেজার। আজ মনে হয়, সেদিন ভুল হয়ে গেছে বিরাট একটা। সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, ভাবতে পারলো না ছায়া। ভাবলো না একবার, তার ভবিষ্যৎ আঁধারাচ্ছন্ন হয়ে থাকবে এই একটি ভুলের ফলে। অন্য অন্য মেয়েরা কেমন চতুরা আর বুদ্ধিমতী। তাই তারা আছে জেনারেল ম্যানেজারের সুনজরে। ভাল খাতায়। কালো খাতায় নয়। মিস দাশ, মিসেস সেন, মিস পার্কার—এরা তো বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছে। কাজের মধ্যে হাসছে, কথা বলছে এর তার সঙ্গে। হাসতে হাসতে কাজ করছে। ফাঁকি পেলেই ফাঁকি দেয়। জি, এম দেখেও দেখতে পান না। দেখেও মাইনে বৃদ্ধির সুপারিশ করেন ডাইরেক্টরদের মিটিং-এ। কোম্পানীর এক্সট্রা অর্ডিনারী মিটিং-এর এজেণ্ডায় নাম ঢুকিয়ে রাখেন আগে-

ভাগে। বছরে বছরে ওদের বেতনের হার বেড়ে চলে চন্দ্রকলার মত। আর ছায়া পড়ে থাকে পেছনে। সবচেয়ে কম দিয়ে সবচেয়ে বেশী কাজ পায় কোম্পানী। ছায়ার ভাগ্য এমনই।

আজ তাকে চার্জশীট টাইপ করতে হচ্ছে—যা সে নিজেই হয়তো পরমুহূর্তে গ্রহণ করবে হাত পেতে। খট খট খট—

মাঝে মাঝে চোখে ঝাপসা দেখছে ছায়া। চিঠির খসড়া দুর্বোধ্য ঠেকছে যেন। সাঙ্কেতিক ভাষা, পড়তে পারে না সহজে। মনে হয় সরল আর বক্র রেখায় হিজিবিজি কেটেছে স্টেনোগ্রাফার। কিউবিজিম ছবি এঁকেছে যেন হাসির ছলে।

জোড়া জোড়া চোখের ব্যাকুল দৃষ্টি-বান পড়ছে ছায়ার পিঠে। সহকর্মীদের সহানুভূতির, সমবেদনার নীরব আশ্বাসের চাউনি থেমে আছে: ফিরে দেখতে পায় না ছায়া। মিসেস সেন হতাশায় ভেঙে পড়লেন বান্ধবীর দুরবস্থায়। মিস পার্কার হায় হায় করতে থাকে। মিস দাস কেমন যেন নির্বিকার। তার চোখ দুটি কণ্টকরুণ।

খট খট খট খট—

আত্মহত্যার বিষ নিজের হাতে তৈরী করে যেন ছায়া। নিজের চার্জসীট নিজেকেই টাইপ করতে হয়। নিজেকে হাস্যকর ঠেকে। সজোরে একবার হাসতে পারলে যেন সকল জ্বালার লাঘব হয় ছায়ার। অট্টহাসি হাসবে, নিজেকে ধিক্কার দিতে।

বেল্ বাজালো ছায়া। একবার মাত্র। বেয়ারা আসতেই তার হাতে ধরিয়ে দেয় টাইপড্ কপি। বলে,—জি, এম-কে দিয়ে এসো।

যায় আর আসে। সুব্রত খস খস সই করে দেয় চিঠির শেষে। এক লহমায় দেখে নেয় চিঠির আদ্যোপান্ত। যথাযথ আছে, না বাদ গেছে কিছু। টাইপের ভুল। বেয়ারার হাতে চিঠি ফিরিয়ে দেয় সুব্রত। বলে,—মিস চৌধুরীকা দেনা হার। এ্যাকনলেজমেন্ট লে লেও। পুরা সহি। আউর আজকো তারিখ।

সই করে ছায়া। না বলতেই পুরা নাম লিখলো প্রাপ্তিপত্রে। কেউ দেখতে পায় না পিছন থেকে। চিঠিখানা খুলে পড়ে না আর ছায়া। দু'ফোঁটা গরম জল, চোখ ঠিকরে চিবুকে নামতে থাকে। কান্না আসে, অসম্মান আর অপমানে। সামান্য দোষে, নগণ্য এক ত্রুটিতে এ কি শাস্তিভোগ। লঘুপাপে গুরুদণ্ড যেন। মা কি জেনারেল ম্যানেজারের প্রতিশোধের একটা নমুনা মাত্র। ভাগ্যে আরও যে কি আছে, কে জানে।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো আবার। নীরব অনুশোচনায়। ছায়া বেশ জানে, আর কখনও, আর কোনদিন আর ডাকবে না সুব্রত। লিফ্‌ট দেওয়ার প্রস্তাব আর কদাপি করবে না।

ছায়ার মাথায় ঝিম-ঝিম শুরু হয়েছে। এই অফিস হল, জানলার বাইরের শুভ্র আকাশ, এই নেতাজী সুভাষ রোড, রৌদ্র-উজ্জ্বল হাওড়া ব্রীজ—সবই যেন বোঁ বোঁ ঘুরছে, পাক খেয়ে খেয়ে। সারা কলকাতা যেন ঘূর্ণায়মান দেখছে চোখে।

আবার মনে হয়, ছায়া রয়েছে এখন হাসপাতালে। লোহার সাদা খাটে। কি এক অস্ত্রোপচার হয়েছে তার দেহে। নিজেকে যেন ঠেকছে দুর্বলতম। শরীরে রক্তকণার চিহ্ন নেই। অপারেশনের পরের অবস্থা এখন তার। থেকে থেকে কোথায় যেন তীব্র বেদনা বোধ করছে। তার নাকের কাছে অক্সিজেনের টিউব। গ্যাসের চেম্বার দাঁড়িয়ে আছে ষ্টীলের ফ্রেমে। একটা রকেটের মত দেখছে ছায়া। মুখোসধারী নার্সদের দেখায় যেন গ্রহান্তর-যাত্রী।

আর ভাল লাগছে না এক মুহূর্ত, অফিসে থাকতে। ইউনিয়নকে একবার জানালে কেমন হয়। ভাবছে ছায়া। এখন খানিক মুক্ত বাতাস চাই। কাজের ভীড় থেকে কোথাও একটু ফাঁকায়। আকাশ-ছোঁয়া এই তেরোতলা অফিস-ম্যানশনের ছাদে উঠে যেতে পারে ছায়া। সারা কলকাতা একবার চোখ বুলিয়ে দেখে আসতে পারে সে। বৃত্তাকার কলকাতা। সেই টালার ট্যাঙ্ক থেকে ওদিকে চৌরঙ্গীর শেষ বরাবর ছাড়িয়ে কলকাতার আধুনিক দক্ষিণাঞ্চল।

কিন্তু ঐ ছাদে উঠলে ছায়ার মাথা ঘুরতে থাকে যেন। একদিন তারা সখ ক'রে গিয়ে দেখে এসেছে। ছাদের পাঁচিলে দাঁড়িয়ে ঝাঁপ দিতে ইচ্ছা হয় যেন মনের অবচেতনায়। ছাদ থেকে সোজা রাস্তায়। নেতাজী সুভাষ রোডে পড়বে দেহটা। হাজারো লোকের ভীড় জমে যাবে সঙ্গে সঙ্গে। বিরাট বিরাট বিজনেশ ম্যাগনেটের বিশাল বিশাল মোটর দাঁড়িয়ে পড়বে সহসা। ট্রাফিক বন্ধ থাকবে কতক্ষণ।

—দিদিমণি। বেয়ারা ডাক দেয় পাশ থেকে। অফিসের একজন পুরানো বেয়ারা। ভাল মানুষ।

চোখ না ফিরিয়ে সাড়া দেয় ছায়া। বলে,—কি বল'।

—আজ তো চা চাইলেন না এখনও? জল-খাবার, তাও নয়।

—না। তুমি এই চিঠিখানা জি, এমকে দিয়ে এসো। ছায়া একটি চিরকুট দেয় বেয়ারার হাতে। বলে যেন ফিস-ফিসিয়ে। কানে কানে।

—আগে চা দিই আপনাকে। তার-পর। অভ্যাস আছে আপনার, চা না খেয়ে মাথা ধরবে।

—না, আগে দিয়ে এসে চা দাও। হেসে ফেললে ছায়া। কণ্টমলিন হাসি। কি খেয়াল হয়েছে কে বলবে, ছায়া চির-কুট পাঠালো দু' ছত্রের। লিখেছে সরল ইংরেজীতে—যার মর্মার্থ : মহাশয়, আপনি অফিস ত্যাগের পূর্বে আমাকে একবার ডাকতে অনুরোধ জানাই। আপনার বিশ্বস্ত ইত্যাদি—

বেয়ারা চা দিয়ে যায়। বলে,—জি, এম বলেছে তোমাকে ডাকবে। যেন চ'সে মেওনা সেখারের মত।

হলভর্তি অফিসে আর তিলধারণের ঠাঁই নেই।

কাউণ্টার আর ডিপার্টমেণ্টে ছেয়ে গেছে যেন। টেবলের পর টেবল। চেয়ার সারি এখানে সেখানে। ষ্টীলের সেফ্, র‍্যাক আর আলমারিরা। রাশি রাশি ফাইল আর লেজার। কেরাণীদের কালো কালো মাথা। মেয়েদের খোঁপা। রঙীন শাড়ী। খাকিপোষাকের বেয়ারা এক দল। কড়িকাঠে ঝুলন্ত বিজলী পাখার লাইন। সাদা রঙ। পাখনা-মেলা শ্বেতবলাকা যেন এক সার। দেওয়াল-ঘড়ি চলছে অদূরে। গোলাকার যন্ত্র, সভ্য মনুষ্যজাতিকে চালনা করছে।

দেওয়াল ঘড়ির দিকে চোখ পড়ে সওদাগরী কেরাণীদের। আসতে যেমন, যেতেও তেমন। ঠিক টাইমে আসায় অফিসের কর্তৃপক্ষের যেমন কড়াকড়ি, ঠিক টাইমে যাওয়াতে তেমনই কেরাণী-দের প্রবল ব্যস্ততা। চারটের পর থেকেই ঘড়ির সঙ্গে ভাব জমে যেন। প্রণয়ের সম্পর্ক। বারে বারে দেখাদেখি তাই।

হঠাৎ পিছু ফিরে তাকায় একবার ছায়া। দেখলো, জনতা কোন্ হাওয়াতে এখন। তার যত সব সহকর্মী? দেখলো অফিস হল খাঁ খাঁ করছে প্রায়। দেওয়াল-

ঘড়ি চোখে পড়লো। ঘড়ির তলায় বড় আখরের দিন-তারিখ। ঘড়িতে বেজেছে প্রায় পাঁচটা। আর পাঁচ মিনিট বাকী। কেশিয়ার ক্যাশ্ কাউণ্টারে তহবিল মিলিয়ে নিচ্ছে। ক্যাশে আর চেকে। কি গেল আর কি এলো। ক্যাশ ইন্ হ্যান্ডই বা রইলো কত?

পাখা নিভতে থাকে একে একে। বেয়ারার দল হাফ ছেড়ে বাঁচে যেন। ফাইফরমাশ আর শুনতে হবে না আপাততঃ আগামীকাল বেলা দশটা পর্যন্ত। ছোটাছুটি করতে হবে না ফাইল আর লেজার বইতে হবে না দফায় দফায়। ডিপার্টমেন্ট আর বাবুদের নাম আর মাথায় রাখতে হবে না গন্ডায় গন্ডায়।

—দিদিমণি। বেয়ারা ডাকলো পাশ থেকে। সেই পুরানো লোকটি। বললে, —বড়সাহেব ডাকছেন।

যেন নিশির ডাক। সাড়া দেবে কি দেবে না, ভাবতে থাকে ছায়া। যে সাড়া দেয় সে না কি আর রেহাই পায় না। তবুও এই মুহূর্তটির প্রতীক্ষায় এতক্ষণ মিনিট গুণছে ছায়া। মনে মনে হাসলো সে। তার ডাকে সাড়া দিয়েছে জেনারেল ম্যানেজার। দিতেই হবে সাড়া। ছায়াকে কালো খাতা থেকে সাদা খাতায় নাম তোলাতে হবে।

ক্ষণেকের মধ্যে নিজেকে সাবলীল আর স্মার্ট ক'রে তোলে ছায়া। মুখে যেন লাবণ্য আনতে চেষ্টা করে, হাসির আভায় ফুটিয়ে। বুকের তারে তরঙ্গ ওঠে স্বতঃস্ফূর্ত।

—কি বক্তব্য? বললে সুব্রত। দাঁতে পাইপ কামড়ে। বললে,—ক্ষমা চাই?' না কি ভবিষ্যতে আর কখনও হবে না?

নিশ্চুপ ছায়া। উত্তর যোগায় না মুখে। লজ্জানম্র চোখে শুধু ভীরু চাউনি।

—চিঠি লিখে জানাতে হবে মিস চৌধুরী। কথা রেকর্ড করা যায় না। টেপ-রেকর্ড সঙ্গে নেই আমার।

—হ্যাঁ জানাবো স্যর। আগামীকাল জানতে পাবেন। —কিন্তু—

কিন্তু? সবুর সইতে চায় না সুব্রত। বলে,—কিন্তু পরে কি তাই শুনি।

লিনোকাট শিল্পী—সুব্রত ত্রিপাঠী

—আজ আমি স্যর পার্শ আনতে ভুলে গেছি। আমাকে আজ আপনি একটা লিফ্ট দিন। শরীরটা সুস্থ বোধ করছি না।

সুব্রতর মুখাকৃতিতে পরিবর্তন আসে হঠাৎ। কি এক মানবতার তাগিদে বললে,—নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। সিওরলি। আই মাস্ট্। অফিসের বাইরে আই অ্যাম এ্যাট্ ইওর সার্ভিস।

তখন কলকাতার আকাশে সন্ধ্যাতারা ফুটফুট করছে।

জেনারেল ম্যানেজারের হাল-মডেলের গাড়ীর এক কোনে ছায়া চৌধুরী। ভীরু পাখীর মত। ভয়ের চাউনি লাজুক চোখে। বুকের স্তর কাঁপছে থরথর। গাড়ীর স্পীড ধীরে ধীরে তুলতে তুলতে চৌরঙ্গী ছাড়িয়ে কথা বলে সুব্রত। বলে,—মোনায়েমপুরে কিন্তু এক্ষুনি যাচ্ছি না।

হেসে ফেললো ছায়া। নিজের আরো বুকে সবুজ ছোঁয়া। বলে,—যেখানে খুশী।

হেস্টিংস ও তাঁর প্রণয়িনী

বিশু মুখোপাধ্যায়

১৭৬৯ সালে বাংলার শাসনকর্তারূপে ওয়ারেন হেস্টিংস আবার ফিরে এলেন ভারতবর্ষে। এই আসার পেছনে তাঁর ব্যক্তিগত কারণই ছিল প্রধান। তিনি তাঁর পৈতৃক বাসভবন 'ডেলস্‌ফোর্ড'টি কিনতে চান, এবং তার জন্যে তাঁর প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এই প্রাসাদতুল্য অট্টালিকাটির উপর হেস্টিংসের অত্যন্ত মমতা ছিল। তাঁর জন্মের পূর্বেই দেনার

দায়ে বাড়িটি বিক্রি হয়ে যায়; হেস্টিংসদের অবস্থা তখন খুবই খারাপ ছিল। সে কারণ, এই বাড়িটির পুনরুদ্ধারের প্রশ্ন হেস্টিংসকে সর্বক্ষণই পীড়া দিত। এবার ভারতবর্ষের উপার্জন থেকে অর্থ জমিয়ে তিনি ঐ বাড়ি কেনার ব্যবস্থা করবেন স্থির করেছিলেন।

হেস্টিংস তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে বহু আঘাত পেয়েছিলেন সত্য, কিন্তু সবচেয়ে মর্মান্তিক আঘাত পেয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের মৃত্যুতে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী হিসাবে হেস্টিংসের জীবনে প্রচুর সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু বিখ্যাত সেনানায়ক রবার্ট ক্লাইভের ইংলন্ড প্রত্যাবর্তনের পর, হেস্টিংস তাঁর সমসাময়িক সহকর্মীদের অর্থলালসা দেখে অত্যন্ত বিরক্ত হন এবং চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে স্বদেশে ফিরে যান।

দ্বিতীয়বার ভারতে আসার মুখে হেস্টিংস ভারতের শাসন ব্যাপারে বিশেষ কোন উন্নতির আশা দেখতে না পেলেও, এবার শাসনকর্তা হিসাবে তিনি এই সংকল্প নিয়েই আসেন যে, ভারতে পৌঁছে যেমন কোরেই হোক এবার অবিবেচক মুনাফাখোরদের তিনি সায়েস্তা করবেন।

এই ভারত-যাত্রায় কলকাতায় আসার পথে জাহাজে এক সুন্দরী স্ত্রীলোককে দেখে হেস্টিংসের কঠিন হৃদয়েও চাঞ্চল্য দেখা দেয়। এই সুন্দরী মহিলাটির নাম মারিয়ান—তিনি তাঁর স্বামী কার্ল-এর সঙ্গিনী। কিন্তু প্রথম সাক্ষাতের সঙ্গে-সঙ্গেই উভয়ের প্রতি উভয়ের আকর্ষণ সৃষ্টি হলেও, সুচতুর হেস্টিংসের বুঝতে দেরি হয়নি যে, এঁদের স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধটা কেমন যেন একটু আলগা ধরণের, এবং এ কথার সত্যতা আলাপের কয়েকদিনের মধ্যেই মারিয়ানের স্বীকারোক্তি থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল হেস্টিংসের কাছে। তাছাড়া তিনি এ কথাও জানতে পেরেছিলেন যে, কার্ল তাঁর স্ত্রীর সৌন্দর্যের সুযোগ নিয়ে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে ব্যবসা করেন।

মারিয়ানের জীবনের এই রহস্য হেস্টিংসকে যথেষ্ট কষ্ট দিলেও, তিনি মারিয়ানের উপর সম্পূর্ণ দোষারোপ করতে পারলেন না। ভালবাসার ধর্মই এই। এরপর মারিয়ান নিঃশব্দে একদিন হেস্টিংসের শয়নকক্ষে প্রবেশ করলে, কার্ল গোপনে তা লক্ষ্য করে হেস্টিংসের উপর দোষারোপ করেন যে, হেস্টিংস তাঁর স্ত্রীকে গোপনে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু মারিয়ান আন্তরিকতার সঙ্গে এই অভিযোগের প্রতিবাদ করতে এতটুকুও কুণ্ঠিত হলেন না। এ ব্যাপারে হেস্টিংসও কার্লকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে, এমন কোন কথাই তিনি ক্ষমা করতে রাজী নন, যাতে তাঁর সম্মান ক্ষুণ্ণ হতে পারে।

এই সময় জাহাজে কয়েক দিনের জন্য হেস্টিংস হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। মারিয়ান কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না-করে, আন্তরিক সেবা-যত্নে হেস্টিংসকে সুস্থ ক'রে তোলেন। নারী হৃদয়ের এই মোহিনী শক্তি হেস্টিংসের হৃদয়কেও অভিভূত করে ফেলে। এই ঘটনার পর মারিয়ানের উপর হেস্টিংসের অগাধ বিশ্বাস ফিরে আসে এবং উভয়ের মধ্যে গভীর ভালবাসার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। হেস্টিংস মনে মনে মারিয়ানকে জীবনের শাশ্বত সঙ্গিনী হিসাবে গ্রহণ করার সংকল্প করেন—কিন্তু তা কি ক'রে সম্ভব?

যে জাহাজে হেস্টিংসের জীবনের এই অবিস্মরণীয় ঘটনার বীজ সংক্রামিত হয়েছিল, সে জাহাজখানি মাদ্রাজ বন্দরে না দাঁড়িয়ে, সরাসরি বঙ্গোপসাগরের মধ্যে দিয়ে ক্রমশঃ কলকাতার দিকে অগ্রসর হতে লাগল। শান্ত সমুদ্র, বিস্তৃত জলরাশির উপর প্রখর সূর্যের দীপ্তিময় প্রভা। গ্রীষ্মের খর-উষ্ণ আবহাওয়ায় তাঁরা প্রবেশ করছেন; জলের দিকে তাকানো যায় না—চোখ যেন ঝলসে যায়।

হুগলী নদীতে প্রবেশ করে, গঙ্গার দু'ধারের বিস্ময়কর দৃশ্য দেখে তাঁরা মুগ্ধ হলেন। চতুর্দিকে শ্যামল শস্যক্ষেত্র মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। জাহাজ এগিয়ে চলেছে। তাঁরা লক্ষ্য করলেন, জঙ্গল কুঁড়েঘর পরিবেষ্টিত ফলতার জনশূন্য দ্বীপ। হেস্টিংসের মনে পড়ে গেল এই সে-দিনের কথা—তাঁকে একদিন ঐ দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছিল সিরাজের শ্যেনচক্ষুর হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য।

হেস্টিংস ও মারিয়ান পাশাপাশি বসেছেন নানা গল্প হচ্ছে তাঁদের মধ্যে। হেস্টিংস মারিয়ানকে বীভৎস অন্ধকূপ হত্যার গল্প বললেন,—কিভাবে তিনি তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে এসেছিলেন সে-কথাও জানালেন। ব্যক্তিগত জীবনের বহু সুখ-দুঃখের স্মৃতি ভেসে উঠতে লাগল হেস্টিংসের মানস-পটে।

মারিয়ান হেস্টিংসকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনিও যুদ্ধ করেছিলেন?' হেস্টিংস মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। তিনি আরও বললেন, 'আমাদের মধ্যে প্রত্যেক যোগ্য ব্যক্তিকেই সেদিন সঙ্গীণ ঘাড়ে করে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছিল। সংখ্যায় আমরা শত্রুদের তুলনায় কম ছিলুম, তাছাড়া জঙ্গলে যুদ্ধ করা তো খুব সহজ ব্যাপার নয়—তবুও আমরা জয়ী হয়েছিলুম!'

কলকাতা এক বৃহৎ চিত্তাকর্ষক শহর—ক্লাইভের নতুন কেল্লা ছিল শহরের প্রধান আকর্ষণ। জলপথে তাঁরা বিস্তৃত নদীর বিপুল জলরাশির উপর দিয়ে কলকাতায় এসে পৌঁছলেন। বিস্তীর্ণ পথগুলি গাড়ি-ঘোড়ায় পূর্ণ। গাড়ির টুং-টুং শব্দ, চালকদের চীৎকার, পুরোহিতদের মন্ত্রোচ্চারণ আর ভিক্ষুকদের কাতর ক্রন্দন—এই সব মিলে-মিশে এক অপূর্ব 'সিম্‌ফনির' সৃষ্টি হয়েছে শহরের মধ্যবিন্দুতে লতাগুল্ম পরিবেষ্টিত একটি মনোরম পার্ক। তারই সন্নিকটে একটি ক্ষুদ্র জলাশয়। আর সেই জলাশয়ের চারপাশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অনেকগুলি অফিস-কাছারী পুরাতন কেল্লার ধ্বংসাবশেষ তখনও নবাগত পথিকদের কলকাতার যুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

কূলে অবতরণের সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকজন ইংরেজ কর্মচারী হেস্টিংসকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। এই কর্মচারীদের নায়ক ছিলেন রিচার্ড বারওয়েল। তিনি অন্তরঙ্গভাবে প্রথমেই এগিয়ে এসে হেস্টিংসের সঙ্গে করমর্দন করলেন। বারওয়েলের কথাবার্তার মধ্যে স্কটীশ টান।

হেস্টিংস মারিয়ান ও কার্ল-এর সঙ্গে বারওয়েলের পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং তাঁর সেক্রেটারী যুবক ইলিয়টকে নির্দেশ দিলেন যে, উপস্থিত কার্ল এবং মারিয়ান অতিথি হিসাবে তাঁর গৃহেই বাস করবেন। এই নির্দেশ দিয়েই হেস্টিংস বারওয়েলের সঙ্গে লাট-প্রাসাদের দিকে রওনা হলেন। রাস্তায় যেতে যেতে হেস্টিংস বারওয়েলকে প্রশ্ন করলেন, 'এখন এখানকার খবর কি?' উত্তরে বারওয়েল বললেন, 'আপনি যখন এদেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, তার চেয়েও বর্তমান অবস্থা অনেক ভাল; তবে এখনও এমন অনেক বাজে দুষ্টু লোক আছে, যারা ভারতীয়দের দুর্বলতার সুযোগ নেয়। হেস্টিংস বললেন, 'ভারতীয়রা শিশুর মত সরল, তাদের দুর্বলতার সুযোগ নেওয়া অত্যন্ত অন্যায়।'

বারওয়েল হেস্টিংসের এই উক্তিতে চিন্তিত হলেন। তিনি অপলক দৃষ্টিতে হেস্টিংসের দিকে চেয়ে আবার প্রশ্ন করলেন, 'ভারতের শাসন ব্যাপারে আপনি কি কোন মৌলিক পরিবর্তনের কথা ভাব্‌ছেন?—ক্লাইভের কথা সম্ভবতঃ আপনার স্মরণ আছে, তিনি লোভী বণিক-সম্প্রদায়কে তাড়িয়েছিলেন, ফলে দেশে গিয়ে তাঁকে যথেষ্ট বিড়ম্বনা ও দুর্গতি ভোগ করতে হয়েছিল। আমি আশা করি সে ভুল আর আপনি করবেন না?'

'না।' হেস্টিংস দৃঢ়ভাবে বললেন, 'কেউই ভুল করতে চায় না।'

বারওয়েল আবার বললেন, 'দেখুন, আমরা সবাই এদেশে এসেছি লাভের জন্যে, কে কি পেল-না-পেল সেদিকে আমাদের নজর না রাখাই ভাল।'

'আমিও তো তাই বলছি, কিন্তু ডিক্ (বারওয়েলের ডাকনাম), ভুলে যেও না, ব্যবসায় ন্যায্য মুনাফা এক বস্তু আর লুট অন্য বস্তু।' উত্তর দিলেন হেস্টিংস।

বারওয়েল বললেন, 'আমরা যদি লুটতরাজের সুযোগ না নিই, তবে অপরে সে সুযোগ অবশ্যই নেবে।'

'অপরে অন্যায় করবে বলে আমরাও অন্যায় করব, এটা কোন যুক্তিই নয়। ধর এই নিরীহ লোকগুলি (ভারতবাসী) সহস্র বৎসর ধরে পরের দাসত্ব করে আসছে, আমরা তা জানি, কিন্তু তাই বলে দাসত্ব ভারতীয়দের জন্মগত অধিকার একথা বলা যুক্তিসঙ্গত নয়। এদের অবস্থার উন্নতির জন্য আমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করতে হবে।'

সদর রাস্তা ধরে গাড়িখানি সোজা গবর্ণমেন্ট হাউসে গিয়ে প্রবেশ করল। হেস্টিংস বললেন, 'ইংলন্ডে থাকাকালীন আমি এ বিষয়ে যথেষ্ট ভেবেছি। আমার বিশ্বাস ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী যদি ভারতীয়দের কোন উন্নতিবিধান না করে, তাহলে আমাদের সরকারের এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত। আমি পার্লামেন্টারী কমিশন-এ সাক্ষী দেওয়ার সময় একথার স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছি।' আলাপ করতে করতে দুজনেই তাঁরা গাড়ি থেকে নেমে বাইরে এলেন, তারপর বড় বড় সিঁড়ি দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন। দুধারের ভারতীয় নফররা মাথা নীচু করে তাঁদের সেলাম করে যেতে লাগল।

এই সময় বারওয়েল হঠাৎ বললেন, 'দেখুন, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি,—আপনাদের জাহাজ ছাড়বার পরই আর একখানা জাহাজ লন্ডন থেকে এখানে রওনা হয়। আপনাদের জাহাজ খানিকে পেছনে ফেলে সেই জাহাজখানি এগিয়ে এসেছে। তাতে কতকগুলি জরুরী চিঠিপত্তর এসেছে। আমি সেগুলি আপনার ডেস্কে রেখে দিয়েছি।'

হেস্টিংস কালবিলম্ব না ক'রে চিঠিগুলি দেখবার জন্য সোজাসুজি অফিসঘরে ডেস্কের দিকে এগিয়ে গেলেন, তারপর চিঠিগুলি হাতে নিয়ে নিঃশব্দে পড়তে লাগলেন। হঠাৎ একখানি চিঠি পড়তে গিয়ে তাঁর চোখ দুটি বড় বড় হয়ে উঠল, রঙীন মনের ছাপ ঝলমল করে ফুটে উঠল চোখে-মুখে। হ্যাঁ, তাঁর স্বপ্ন এবার সত্যিই সফল হতে চলেছে। চিঠিটি আর কিছুই নয়, একটি জরুরী ঘোষণা। ঘোষণাটি হচ্ছে : 'বাংলার গভর্ণরের পদ তুলে দেওয়া হয়েছে এবং বর্তমানে আইনসভা স্বয়ং ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেছেন। এই শাসন পরিচালনার জন্য একটি সর্বোচ্চ শাসন-পরিষদ গঠন করা হয়েছে এবং সেই পরিষদ হেস্টিংসকে ভারতবর্ষের প্রথম প্রধান শাসনকর্তা নিয়োগ করেছেন।' কিন্তু তখন কি কেউ জানত যে এই আশীর্বাদের মধ্যেই হেস্টিংসের জীবনের মর্মন্তুদ ইতিহাস লুকিয়ে আছে?

বারওয়েলের দিকে তাকিয়ে হেস্টিংস এই ঘোষণার কথা বললেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও জানালেন যে, 'এই ঘোষণার অর্থ হচ্ছে : এতদিন যা ছিল আমার জীবনের স্বপ্ন তা আজ বাস্তবে রূপায়িত হতে বসেছে। 'গভর্ণর জেনারেলকে নিয়ে এই উচ্চ পরিষদে পাঁচজন সদস্য থাকবে। আমরা দুজন (বারওয়েল ও হেস্টিংস), আর

তিনজন আইন সভা কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে প্রেরিত হবে।

এই তিনজনের মধ্যে ইতিপূর্বেই দু'জন যে জাহাজে এই ঘোষণাপত্র এসেছে, সেই জাহাজেই এসে পোঁছেছেন।

সেদিন বৈকালেই নব-নিযুক্ত দু'জন সদস্যকে ডাকলেন গভর্ণর জেনারেল। এই দু'জনের মধ্যে একজন হলেন জেনারেল ক্লেভারিং, পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক বদমেজাজী জেনারেল। তিনি ভারতবর্ষে পূর্বে কখনও আসেননি এবং ভারতের সব কিছুকেই ঘৃণা করেন। দ্বিতীয় জন হলেন কর্ণেল মনসন। ইনি লর্ড মনসনের পুত্র, দুর্বল প্রকৃতির লোক, ভারতের অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। পূর্ব থেকেই তিনি জেনারেলের প্রভাবে প্রভাবিত।

প্রথম দর্শনেই পরস্পর পরস্পরকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন, সমুদ্রযাত্রার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে গতানুগতিক আলাপ-আলোচনা হ'ল। এরপর হেষ্টিংস যখন জানতে পারলেন যে, তাঁরা সবাই তাঁদের স্ত্রীকে নিয়ে এসেছেন, তখন পরের দিনই তিনি তাঁদের সকলকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করলেন এবং প্রসংগত বারওয়েলকে বললেন, 'আমি অনেক দিন মেরিকে দেখিনি, তাকে দেখবার জন্য আমি উদগ্রীব হয়ে আছি।'

পরের দিন সন্ধ্যায় সকলেই একত্রে ভোজসভায় মিলিত হলেন। মিসেস বারওয়েল সূক্ষ্ম রুচিসম্পন্না স্ত্রীলোক; তিনি এই আসরে কৃত্রিম ভর্ৎসনা করে হেষ্টিংসকে বললেন, 'ডিক্ এখন আর বাইরে যেতে পারবে না—এই বৎসর শেষ হওয়ার পূর্বেই আমরা স্কটল্যান্ড ফিরে যাব আশা করছি। এই ভোজসভার মারিয়ান এবং কার্লও উপস্থিত ছিলেন গভর্ণর জেনারেলের অতিথি হিসাবে।

জেনারেল ক্লেভারিং-এর স্ত্রীর মুখশ্রী গম্ভীর, সম্ভ্রান্ত ও ওজস্বিনী। কিন্তু তাঁর আচরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। ঐ থেকে মনে হয় বদমেজাজী স্বামীকে সব সময় শান্ত রাখার জন্য তিনি মনের দিক দিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।

কর্ণেল মনসন-এর স্ত্রী লেডি মনসন স্থূলকায়া মহিলা—শিকার সম্পর্কে তাঁর কৌতূহল ছিল অত্যধিক। এই ভোজসভায় মেয়েদের মধ্যে সকলেই মারিয়ানকে বিশেষ ঔৎসুক্যের সঙ্গে লক্ষ্য করছিলেন। ক্লাস্ট এরস্কুন সামরিক পদস্থ কর্মচারী, এই সংবাদ জানার পর বারওয়েল কার্লকে প্রশ্ন করলেন, 'তিনি সেনানিবাসে বাস করেন না কেন?'

'আমার স্ত্রীর সংগে একত্রে থাকার অনুমতি কি আমি পেতে পারি না?' কার্ল জিজ্ঞাসা করলেন।

ক্লেভারিং উত্তরে ব'লে বসলেন, 'সেটা ভেবে দেখতে হবে; সব কিছুই এখন বড্ড ঢিলেঢালা হয়ে গেছে দেখছি।'

এইসব কথাবার্তার মধ্যে মারিয়ান লক্ষ্য করলেন, জেনারেলের মুখে কোন বিরক্তির ভাব নেই।

লাট-ভবনের সন্নিকটে একশ' গজ দূরে মারিয়ান ও কার্লের জন্য বাড়ির ব্যবস্থা হয়েছিল। লাল রঙের বাড়ি, বড় বড় ঘর আর সেই ঘরে অনেকগুলি ক'রে জানালা। বেশ খোলামেলাই বলা যায় বাড়িটিকে। জাহাজে এক সংগে আসবার সময় হেষ্টিংস মারিয়ানকে বলেছিলেন যে, তিনি ব্যারোনেস হলেও ভারতবর্ষে তাঁকে দরিদ্রের মত থাকতে হবে। কিন্তু এখন হেষ্টিংস তাঁকে খুলেই বললেন যে, তাঁর আর্থিক ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত উন্নতি হয়েছে, অর্থাৎ এখন থেকে তিনি গভর্ণর জেনারেল হিসাবে বছরে পঁচিশ হাজার পাউন্ড করে পাবেন।

এই কথা শোনার পর মারিয়ান হেসে বললেন, 'হেষ্টিংসের ডেলস্‌ফোর্ডের স্বপ্ন তাহলে সফল হতে চলেছে বলুন? হেষ্টিংসের এই বিরাট পরিবর্তনের জন্য তিনি নিজেই নিজের পথ পরিষ্কার করে এসেছিলেন। পার্লামেন্ট কমিশনে সাক্ষী দেবার সময় তিনি জানিয়েছিলেন যে, সর্বোচ্চ পদস্থ কর্মচারীরা যদি স্বল্প বেতন পায়, তাহলে যথেষ্ট বিপদের সম্ভাবনা থাকে। কারণ, তারা সকল সময়েই সচেষ্ট থাকবে নিজেদের আয় বাড়াবার জন্যে।

কলকাতা মারিয়ানকে মুগ্ধ করল। বিরাট শহর, বহু মাইল বিস্তৃত; বিচিত্র আয়োজন আর প্রাসাদতুল্য সব বাড়ি। কোন কোন বাড়ির বয়স একশ' বৎসরেরও অধিক। ইংলন্ডে এত বড় জমকালো বাড়ি সাধারণতঃ দেখা যায় না। প্রত্যহ খুব ভোরের দিকেই মারিয়ান, হেষ্টিংস ও কার্ল একসংগে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেরুতেন। গ্রীষ্মের প্রখর সূর্যতাপে মারিয়ানের মুখ তামাটে হয়ে যেত; আবার শীতের ঝিরঝিরে হিম-শীতল বাতাস মারিয়ানের কাছে খুবই মনোরম মনে হ'ত—তাঁর মন ডুব দিত ইংলন্ডের বসন্তকালীন আরামদায়ক স্মৃতির মধ্যে।

কার্ল ছিলেন একজন দুর্ধর্ষ অতিযানেচ্ছু ঘোড়সওয়ার। তিনি নির্বিচারে ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে যেতেন। বড় বড় গর্ত ও বিপজ্জনক সুড়ঙ্গ পার হয়ে যেতেন এক লাফে। কখনও কখনও নীচু গাছের নীচে এসে, ঘোড়া সমেত লাফিয়ে উঠে গাছের ডালপালা ভেঙে ফেলতেন। অপর দিকে মারিয়ান ও হেষ্টিংস ধীরে ধীরে গল্প করতে করতে এগিয়ে চলতেন পাশাপাশি একসংগে। সর্বদাই তাঁদের এই একসংগে থাকাটা সাধারণ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। এই দৃশ্য দেখে দুষ্টু লোকেরা নানা রকম গল্প করত, একটু-আধটু অশ্লীল কানাঘুষাও যে না হ'ত তা নয়। ক্রমশঃ কার্লের মধ্যে একটা পরিবর্তন এল। তিনি শহরের নানা বৈচিত্র্যের সংগে নিজেকে মিশিয়ে দিলেন। কখনও তিনি সহরের অন্যান্য মেয়েদের সংগে নাচগান হৈহুল্লোড় করতেন, আবার কখনও বা ঘুরে বেড়াতেন নিঃসংগ একাকী।

সকালের দিকে হেষ্টিংস ও মারিয়ানের ঘোড়ায় চড়া ছিল যেমন প্রাত্যহিক নিয়মের মত, তেমনি সন্ধ্যার দিকে প্রত্যহ তাঁরা গাড়িতে ক'রে নদীর ধারে বেড়াতে যেতেন। নানা বিচিত্র দৃশ্য তাঁদের কৌতূহল বাড়িয়ে তুলত। বহু দেব-দেবীর মন্দির, পীঠস্থান ও যেখানে হিন্দুরা মৃত দেহগুলি দাহ করার জন্য নিয়ে আসত—এমনি সব শ্মশান ঘাটের সিঁড়ি ও স্থানগুলি তাঁরা অবাক হয়ে দেখতেন। শ্মশানভূমির নীলাভ ধূসর রঙের ধোঁয়া কুন্ডলী পাকিয়ে-পাকিয়ে ঊর্ধ্বাকাশে মিলিয়ে যেত, আর মেয়েরা তাদের প্রিয়জনের বিয়োগ-ব্যথায় বুক চাপড়ে কাঁদত—এই করুণ দৃশ্য তাঁদের মনকে পীড়া দিত। কখনও তাঁরা চলে যেতেন সেই সুদূর প্রান্তরে, যেখানে ঊর্ধ্বাকাশে তারকারাজি টিপটিপ করে জ্বলত, আর নীচে জোনাকী-গুলি তাদের অকিঞ্চিৎকর নীলাভ স্বপ্ন-আলো নিয়ে নেচে বেড়াত। সেই অদ্ভুত রোমাঞ্চকর রহস্য-ঘেরা পরিবেশের মধ্যে মারিয়ান হেষ্টিংসের কাছে ঘেঁষে বলতেন; তাঁর মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলতেন, 'এ জায়গাটা আমার বড় ভাল লাগে—প্রেমের যে একটা রহস্য আছে, সে রহস্যের দ্বার যেন এখানে খুলে গিয়েছে।'

হেষ্টিংস উত্তরে বলতেন, মানুষ যখন অন্তরে সুখ অনুভব করে তখন বাস্তব থেকে সবই ভিন্ন মনে হয়। মুহূর্তের জন্য তাঁর মন মারিয়ানের দিকে ছুটে যেত, ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইত;

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হেস্টিংস কেমন যেন হয়ে যেতেন, একটা করুণ বিষাদের সুর ধ্বনিত হ'ত তার কানে—নিজেকে সংকুচিত করে নিতেন তিনি।

সর্বোচ্চ শাসন-পরিষদের প্রথম সভায় পাঁচজন সদস্যের মধ্যে চারজন উপস্থিত ছিলেন, কারণ পঞ্চম ব্যক্তি তখনও এসে পৌঁছননি। হেস্টিংস এই সভায় প্রস্তাব করলেন যে, তাঁরা প্রথমে সারা ভারতবর্ষের একটা পূর্ণাঙ্গ জরিপ করবেন। সম্পূর্ণ ফরাসী ভূখণ্ডের ন্যায় একটা বৃহৎ ভূখণ্ড আমাদের অধিকারে এসেছে, কাজেই সর্বাগ্রে তার পরিমাপ করা বিশেষ প্রয়োজন। আর এই জরিপ-কার্য যখন সম্পূর্ণ হবে তখন যোগ্য ভারতবাসীর উপর প্রতি জেলার শাসন-ভার অর্পণ করা হবে।

হেস্টিংসের এই প্রস্তাবে ফ্রেন্ডারিং বাধা দিয়ে বললেন, 'এ ভাবে কাজ করলে আমরা আমাদের মূল উদ্দেশ্য থেকে সরে যাব। আমাদের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার। এ ছাড়াও আমার আরও একটা আপত্তি আছে,—আপনি ভারতীয়দের দায়িত্বশীল পদে নিয়োগ করার কথা বলছেন, সেটা কিরূপ?'

'ভারতীয়রা যদি যোগ্য হয় তবে দায়িত্বশীল পদে নিয়োগ করবার পক্ষে আপত্তি কি?' হেস্টিংস প্রশ্ন করলেন।

'আপত্তি হচ্ছে এই যে, আমরা এদেশ জয় করেছি, আমরা এদেশের রাজা; সুতরাং সমস্ত বড় চাকরী আমরা আমাদের হাতে রাখব।' উত্তরে ফ্রেন্ডারিং বললেন।

'এ ধরণের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমাদের কাজে অগ্রসর হওয়া ঠিক হবে না। মুষ্টিমেয় ইংরেজ এই বিশাল দেশের উপর এভাবে প্রভুত্ব করতে সক্ষম হবে কি?' হেস্টিংস বললেন।

'আমি আপনার সঙ্গে একমত নই।' জেনারেল জবাব দিলেন। এ ছাড়া তিনি আরও বললেন যে, 'ভারতবাসীরা শাসন ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। তারা মিথ্যা কথা বলে এবং প্রতারক। আপনি তাদের এক বিন্দুও বিশ্বাস করতে পারেন না। আমি সর্ব ক্ষেত্রেই ইংরেজ নিয়োগের পক্ষপাতী।'

হেস্টিংস বাধা দিয়ে বললেন, 'ইংরেজরাও নানাবিধ মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে ও প্রতারণা করছে, জেনারেল! অবশ্য তাদের মাথায় সাদা পাগড়ী নেই আর তাদের মুখ কালো নয়।'

'একি মারাত্মক কথা আপনি বলছেন?' জেনারেল জোরের সঙ্গে বলে ইলিয়টের দিকে তাকালেন। ইলিয়ট হেস্টিংসের পেছনে বসে সমূহ আলাপ-আলোচনা নোট করছিলেন। জেনারেলের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল, যে সব নিরপরাধ ব্যক্তি টানা-পাখা টানছিল তাদের উপর। তিনি অহেতুক তাদের এক ধমক দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিয়ে নিজের পৌরুষ বজায় রাখলেন।

হেস্টিংস বললেন, 'সে যাই হোক, আমি প্রস্তাব করি আমরা শীঘ্রই ভারত-ব্যাপী জরিপের কাজ আরম্ভ করব, সময়সাপেক্ষ হলেও, যতটা পূর্ণাঙ্গ হয় সে দিকে আমরা নজর রাখব।'

জেনারেল বললেন, 'জরিপের কাজ আপনি আরম্ভ করতে পারেন, সে সম্পর্কে আমার বলার কিছুই নেই, কিন্তু আপনার অন্যান্য প্রস্তাব আমি সমর্থন করি না। তারপর মনসন-এর দিকে চেয়ে বললেন, 'মনসন, তুমি আমার সঙ্গে একমত?'

মনসন ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন।

বারওয়েল এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললেন, 'আমি গভর্ণর জেনারেলের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।'

ফ্রেন্ডারিং চীৎকার করে উঠে বললেন, 'তাহলে দেখছি ভোট দুই-দুই সমান হয়ে গেল,—এ তো এক অচল অবস্থা!'

'ভুলে যাবেন না, আমার একটা কাস্টিং ভোট আছে।' হেস্টিংস জোর দিয়েই বললেন কথাগুলি।

'কোম্পানীকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাওয়াটা খুব বড় বাহাদুরী নয়, হেস্টিংস—আমি কোম্পানীর পরিচালকদের নিকট এর প্রতিবাদ জানাব।' এই বলে অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে ফ্রেন্ডারিং সভাকক্ষ ত্যাগ করলেন।

কয়েক দিন পরে একদিন রাতে খাওয়ার টেবিলে জেনারেল ফ্রেন্ডারিং আবার সেই কথা তুলে চিন্তিত হয়ে বললেন, 'আমি এটা মোটেই পছন্দ করি না—যেমন করেই হোক হেস্টিংসকে আমাদের নিবৃত্ত করতেই হবে। কিন্তু কি করে যে তা করা সম্ভব তা আমরা জানি না। তবে যে নতুন লোকটিকে আইন পরিষদ শাসন-পরিষদে পাঠাচ্ছে, তাঁর যদি এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান থাকে, তাহলে তিনি নিশ্চিত আমাদের পক্ষ সমর্থন করবেন।'

মনসন সম্মতি জানাল।

নানা ধরণের কথার সঙ্গে এই সময় লেডী অ্যানে বলে বসলেন, 'আচ্ছা, আপনারা কি লক্ষ্য করেছেন যে, আমাদের গভর্ণর জেনারেল সুন্দরী যুবতী মারিয়ানের সঙ্গে কতটা অন্তরঙ্গ?—তাঁরা একসঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে প্রতিদিনই সকালে বেড়াতে যান এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁর স্বামী তাঁর সঙ্গে থাকেন না।'

এই কথা শোনা মাত্রই ফ্রেন্ডারিং খুব বিরক্ত হয়ে বললেন, 'ব্যারোনেসের সঙ্গে আরও খানিকটা ঘনিষ্ঠতা হোক না'...

লেডী অ্যানে বললেন, 'আমার কথা হচ্ছে গবর্ণর জেনারেলের মত পদস্থ ব্যক্তির এ ধরণের আচরণ অত্যন্ত অশোভন। কারণ, এখানে আমরা সামান্য মুষ্টিমেয় ইংরেজ সহস্র সহস্র মাইল দূরে নির্বাসিতের ন্যায় বাস করছি।'

তাঁর কথা শেষ হবার পূর্বেই উত্তেজিতভাবে চীৎকার করে উঠলেন জেনারেল, 'এ ভয়ঙ্কর ভীষণ অন্যায়!'

এদিকে হেস্টিংস ভারতের শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধনে বদ্ধপরিকর হলেন, আর অপর দিকে ভারতবর্ষে ইংরেজ বণিক সম্প্রদায় হেস্টিংসের উপর বিশেষ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। হেস্টিংসের শাসন-সংস্কার বণিক সম্প্রদায়ের সুযোগ-সুবিধা অনেকখানি সীমাবদ্ধ করল এবং ব্যবসায় তাদের লাভের অংক অনেকখানি হ্রাস পেল।

বণিক সম্প্রদায় যখন হেস্টিংসের শাসন ক্ষমতা কোন প্রকারে খর্ব করতে সক্ষম হ'ল না, তখন তারা গভর্ণর জেনারেলের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে নানা প্রকার কুৎসা রটনা করতে লাগল। মারিয়ানের সঙ্গে হেস্টিংসের অন্তরঙ্গ ভাব অনেকেই সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে লাগল এবং হেস্টিংসের নৈতিক জীবন কলঙ্কিত করার জন্য তারা সংঘবদ্ধ হতে লাগল। এমন কি, গভর্ণর জেনারেলের অপসারণের জন্য বিলেতে পরিচালক-বৃন্দের নিকট দরখাস্ত করাই উচিত বলে সাব্যস্ত করল।

বারওয়েল এই ঘটনায় বিশেষ বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি একদিন দ্রুত লাটভবনে উপস্থিত হয়ে হেস্টিংসকে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'ওয়ারেন একটি একান্ত ব্যক্তিগত প্রশ্নের জবাব দেবেন? ব্যক্তিগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা অবশ্য উচিত নয়, তবে বহুদিন আপনার সঙ্গে একসঙ্গে আছি, সেই কারণে একমাত্র দীর্ঘদিনের বন্ধু হিসাবেই এ প্রশ্ন করা যায়,—তা না হ'লে এ প্রশ্ন আপনাকে করতে আমি মোটেই সাহস করতাম না।'

'কি এমন কথা ডিক?' হেস্টিংস ঔৎসুক্যভরে প্রশ্ন করলেন।

'প্রশ্নের জবাব ঠিক ঠিক দেওয়া না-দেওয়া সম্পূর্ণ আপনার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।' বারওয়েল হেস্টিংসের চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'ব্যারোনেসের প্রসঙ্গ নিয়ে লোকে আপনার সম্পর্কে যে কথা বলে তা কি সত্য?'

হেস্টিংস হঠাৎ যেন ফেটে পড়লেন। সামনের টেবিলের উপর হাত চাপড়ে বললেন, 'না, কখনও না; তারা মিথ্যা কথা বলে!'

বারওয়েল হেস্টিংসের এই উত্তরে অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন এবং বললেন, 'এ আমি জানি ওয়ারেন, তারা এখন সত্য-মিথ্যা বিচার করে না—তবে তাদের এই রকম বিশ্বাস।'

এই কথায় হেস্টিংস উষ্মা প্রকাশ করে বললেন, 'তাদের নিজেদের ঘর নিজেরা সামলাক।'

বারওয়েল তাঁর কুঞ্চিত ভ্রূ-যুগল সংযত করে বললেন, 'আমি দুঃখিত ওয়ারেন, তবে তারা যে-সব মেয়েমানুষ রাখে তারা সবই দেশী এবং অধিকাংশেরই জাতের ঠিক নেই। উপরন্তু তারা বাজারের বাইরে থাকে, শহরে তাদের দেখা-সাক্ষাৎ মেলে না, আর আমাদের জাতের মেয়েদের কাছ থেকে তাদের সব সময় আলাদা করে রাখা হয়।'

হেস্টিংস শুনে বললেন, 'আমি স্পষ্টই বলছি বারওয়েল, তারা যা বলছে সবই মিথ্যে।'...

বারওয়েল তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, 'মিথ্যে হোক, কিন্তু আপনি যা মনস্থ করেছেন,— জনসাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, তাদের মঙ্গল, আপনার নিজের পৈতৃক বাস্তুভিটার পুনরুদ্ধার—এ সবই কি ঐ মেয়েটার জন্যে আপনি নষ্ট করতে চান?'

হেস্টিংস বিষণ্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকালেন বারওয়েলের দিকে। বারওয়েল বললেন, 'হেস্টিংস, আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য আপনি মারিয়ানকে সরিয়ে দিন।'

'মারিয়ানকে সরিয়ে দেব!' হেস্টিংস কাতর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন।

'হাঁ, তাঁকে মাদ্রাজে পাঠিয়ে দিন।' বারওয়েল উত্তর দিলেন।

'মাদ্রাজ যেতে এক মাস সময় লাগে, দু'মাস লাগবে চিঠিপত্র আদান-প্রদান করতে, যদি অবশ্য জাহাজ থাকে... না ডিক্, আমি এ চিন্তা করতেও পারি না!' ধরা, ভারী গলায় বললেন হেস্টিংস।

'তাঁকে সরিয়ে দেওয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।' বারওয়েল আবার বললেন।

'না তা কখনই সম্ভব নয়!' হেস্টিংসের গলায় উত্তেজনা প্রকাশ পেল।

বারওয়েল আর কোন কথা বলতে সাহস করলেন না। তিনি শুধু মনে মনে একবার ভাবলেন যে, হেস্টিংসের মত প্রাজ্ঞ ব্যক্তিও গভীর ভালবাসার ক্ষেত্রে কিভাবে বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। প্রেম অন্ধ।

এক মাস পরে শাসন-পরিষদের অন্যতম সদস্য হিসাবে ফ্রান্সিস ফিলিপ কলকাতায় পদার্পণ করলেন। অল্পবয়স্ক যুবক, সুশ্রী, সুসজ্জিত, বলিষ্ঠ চেহারা। তিনি জাহাজ থেকে অবতরণ করেই চতুর্দিকে তাকালেন এবং লক্ষ্য করলেন যে, তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারীই আসেন নি। তার কারণ কোন্ জাহাজে তিনি আসবেন এ সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত সংবাদ কারু জানা ছিল না।

মাটিতে নেমেই একটি লোককে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'গভর্ণর জেনারেল এখানে আসেন নি?' লোকটি তাড়াতাড়ি চতুর্দিকে তাকিয়ে বললে, 'না, কই গভর্ণর জেনারেলকে তো এখানে দেখছি না।'

'সদস্যদের মধ্যেও তো কারুকে দেখছি না—কি সুন্দর ব্যবস্থা!' ফ্রান্সিস বিরক্ত হয়ে বললেন।

একটি অল্পবয়স্ক যুবক এগিয়ে এল তাঁর কাছে, এসে বললে, 'আমি কি আপনার জন্যে একটা ফিটন্ গাড়ি নিয়ে আসব—আপনি কি গভর্ণর জেনারেলের কুঠিতে যাবেন?'

'না। তবে ফ্রান্সিস ফিলিপের থাকার জন্যে কোন বাড়ির ব্যবস্থা হয়েছে কিনা, দয়া করে বরং সেই খবরটা একবার নেবার চেষ্টা করো।'

'এখুনি খবর নিচ্ছি।' লোকটি বললে।

—'আর হেস্টিংসকে এ খবরও দিয়ো যে, ফ্রান্সিস ফিলিপস্ এসে পৌঁচেছেন, কিন্তু তাঁর অভ্যর্থনার জন্য কোন ব্যবস্থাই করা হয়নি—এটা ভদ্রতা নয়।'

ফ্রান্সিসের আগমন-বার্তা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই হেস্টিংস ফ্রান্সিসের বাড়িতে গেলেন। তিনি দেখলেন, ফ্রান্সিস পেছনে হাত দিয়ে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি যে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তা তাঁর মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। বিরক্তিতে ভরা সেই মুখের কাছে এগিয়ে হেস্টিংস করমর্দনের জন্য হস্ত প্রসারিত করলেন। কিন্তু ফ্রান্সিস তা প্রত্যাখ্যান করলেন।

ফ্রান্সিসকে অভ্যর্থনা জানিয়ে হেস্টিংস বললেন, 'আপনার আগমনের সংবাদ যদি আমরা পূর্বে জানতাম, তাহলে আপনাকে অভ্যর্থনা করার জন্য অবশ্যই আমরা জাহাজ-ঘাটায় যেতাম। অন্যান্য সদস্যরাও আপনাকে অভ্যর্থনা করতে পারলে খুশিই হতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোন সংবাদই আমরা পূর্বে পাই নি।'

কিন্তু ফ্রান্সিসের রাগ তাতে কমল না, তিনি বললেন, 'হেস্টিংস দয়া করে আপনি এখানে না এসে যদি জাহাজ-ঘাটে যেতেন, তাহলে আমাকে এখানে একাকী কষ্ট করে আসতে হ'ত না।' এবং এই কথা বলেই তিনি পেছন ফিরে দেখলেন, তাঁর দরজার সামনে জেনারেল ক্লেভারিং ও মনসন দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ফ্রান্সিস তাঁদের দিকে এক পা এগিয়ে গেলেন এবং হাসামুখে বললেন, 'আরে... কর্ণেল না জেনারেল ক্লেভারিং?' বলেই তিনি তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন তাঁদের দিকে।

'আমি জেনারেল ক্লেভারিং, আর ইনিই আমার সঙ্গে কর্ণেল মনসন।' ব'লে তাঁরা পরস্পরে করমর্দন করলেন।

হেস্টিংসের দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস বললেন, 'আপনি আমার জন্যে যে বাড়ির ব্যবস্থা করেছেন তা আমি মোটেই পছন্দ করি না—স্থানীয় দৃশ্যটা মোটেই মনোরম নয়। আসবার সময় রাস্তায় আমি অনেক সুন্দর সুন্দর বাড়ি দেখেছি।'

'আপনার নিজের পছন্দমত বাড়ি পরিবর্তনের স্বাধীনতা আপনার আছে।' হেস্টিংস বললেন।

'বাড়ি পরিবর্তনের অধিকারকে স্বাধীনতা বলা যায় না।' ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিলেন।

পরের দিনটা ছিল রবিবার। গবর্ণর জেনারেল ও অন্যান্য সদস্যরা পুরাতন কেল্লার একটি বৃহৎ ঘরে উপাসনার জন্য জমায়েত হলেন। সেণ্ট অ্যানের গির্জাটি ধ্বংস হওয়ার পর থেকেই এই ঘরটি রবিবারের উপাসনার জন্য ব্যবহৃত হ'ত। ফ্রান্সিস নিজের আসন থেকে গভর্ণর জেনারেল ও অন্যান্য সদস্যদের আশে-পাশে সুন্দরী, সুসজ্জিতা মহিলা ও ধনী বণিকদের হাবভাব দেখতে লাগলেন। ঠিক তাঁর পেছনেই একটি অনিন্দ্যসুন্দরী মহিলা বসে ছিলেন। ফ্রান্সিস বার বার মহিলাটির দিকে তাকাচ্ছিলেন। মহিলাটি আর কেউ নয়,

সেই রূপসী, লীলাময়ী, চটুল-চপল মারিয়ান।

গীর্জার কাজ শেষ হওয়ার পর, ফ্রান্সিস বাইরে যাবার সময় দরজার পাশে এসে একটু থমকে দাঁড়ালেন। তারপর মারিয়ানকে লক্ষ্য করে যেন নিজের মনেই বললেন, 'এই গীর্জায় আমার কোন আকর্ষণ নেই—তার চেয়ে আমার মনে হয়, শহরের অন্যান্য আকর্ষণ অধিকতর মনোরম।'

থাকতে না পেরে, পাশ থেকে মারিয়ানও কথা বলে ফেললেন। বললেন, 'আমার স্বামী কার্ল এ বিষয়ে আপনাকে অনেক কিছু সংবাদ দিতে পারবেন।' কথা ক'টি কোন রকমে যেন উগরে দিয়েই মারিয়ান এগিয়ে চলে গেলেন।

হেস্টিংস মারিয়ানের সমস্ত গতি-বিধিই লক্ষ্য করছিলেন। তাঁর সমস্ত মুখটা যেন অধিকতর রক্তিম হয়ে উঠল,—মনে হ'ল, কে যেন হঠাৎ তাঁর শরীরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু অন্তরে যন্ত্রণাবোধ করলেও, মুখে তিনি এমন ভাব করলেন যেন কোন কিছুই ঘটেনি। শান্তভাবেই এগিয়ে চললেন কোন দিকে না তাকিয়ে—গীর্জা-প্রত্যাগত ধার্মিক ব্যক্তিদের ভঙ্গিমায়।

পরিষদের প্রথম দিনের সভা যেদিন বসল, সে দিনই ফ্রান্সিস হেস্টিংসকে বাধা দিলেন। মিড্লটনকে অযোধ্যার রাজধানী লক্ষ্ণৌতে বৃটিশ রেসিডেন্ট হিসাবে নিয়োগ করবেন ব'লে হেস্টিংস প্রস্তাব করায় ফ্রান্সিস অসম্মতি জানালেন। এ ব্যাপারে ক্লেভারিং আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। তিনি মনে করলেন তাঁরই কৌশল যেন সার্থক হতে চলেছে।

হেস্টিংস ভারতবর্ষের প্রধান শাসন-কর্তা হলেও, পরিষদের সংখ্যাধিক্য-স্বীকৃত কোন মতামতকে নাকচ করার ক্ষমতা তাঁর নেই। উভয় পক্ষ সমান হলে, একমাত্র কাস্টিং ভোটই তিনি ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু ফ্রান্সিস ক্লেভারিং-এর গোষ্ঠীতে যোগ দেওয়ায় বিরোধীদলের স্পষ্ট সংখ্যাধিক্য হ'ল।

হেস্টিংস ফ্রান্সিসের এই ব্যবহারে নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলেন।

জেনারেল ক্লেভারিং ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, 'আজ পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছে—সবই ঘটেছে তাঁর এবং মনসনের ঘোরতর আপত্তি থাকা সত্ত্বেও। সুতরাং আমি প্রস্তাব করি, হেস্টিংসের সমস্ত আদেশ ও নির্দেশ অতঃপর পুনর্বার বিবেচনা করা হোক।'

ভোট গ্রহণ করা হ'ল। হেস্টিংস পরাজিত হলেন। যদিও তিনি প্রতিবাদ জানালেন এবং বললেন, 'এ সব করতে গেলে অনেক জরুরী কাজের ক্ষতি হবে।' কিন্তু তাতে বিরোধী পক্ষের কেউই কর্ণপাত করলেন না।

তিনজন বিরোধী সদস্যের প্রত্যাবর্তনের পর বারওয়েল চিন্তিত হয়ে বললেন, 'এ এক স্থায়ী অচল অবস্থার সৃষ্টি হ'ল; আমাদের এখন আর কোন কিছুই করবার নেই।'

হেস্টিংস এতক্ষণ এক দৃষ্টে টেবিলের দিকে চেয়ে কি যেন ভাবছিলেন। হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন, 'বারওয়েল, সারা ভারতে আজ যেন ঘোষণা করা হ'ল—হেস্টিংসের ক্ষমতার অবসান ঘটেছে, তার শাসনের যবনিকা পড়ে গেছে, এবং নতুন যে ব্যক্তিটি ভারতবর্ষে এসেছেন, এখন তাঁরই জয়-জয়কার।' হেস্টিংসের জীবনের পট পরিবর্তন হ'ল।

মারিয়ান এ সংবাদ শুনলেন। তিনি দেখলেন হেস্টিংসের মুখমণ্ডলে চিন্তার বলিরেখা—তিনি যেন কিছুই দেখছেন না, কিছুই বলছেন না। তাঁর মুখ বিবর্ণ, ঠোঁট দুটি যেন চিন্তার সঙ্গে জড়িয়ে এক হয়ে গেছে।

মারিয়ান নতজানু হয়ে হেস্টিংসের পাশে এসে বসেন। তাঁর হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে হেস্টিংসের লম্বা লম্বা স্পর্শকাতর আঙুলগুলির উপর হাত বুলোতে থাকেন। সে এক করুণ দৃশ্য। হেস্টিংস ধীরে ধীরে মারিয়ানের মুখের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'এই জন্যেই কি আমি ভারতবর্ষের প্রথম গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হয়েছিলুম!' একটা অস্পষ্ট মৃদু হাসি তাঁর চোখের কোণে চকিতে ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল।

'আপনি কি পদত্যাগ করার কথা ভাবছেন?' মারিয়ান প্রশ্ন করলেন।

দৃঢ়তার সঙ্গে হেস্টিংস জবাব দেন, না।' তারপর বলেন, 'আমি যদি করি তাহলে ওদের বাধা দেবার আর কেউ থাকবে না। ভারতবর্ষ সম্পর্কে ওদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাব থাকায়, ওরা ক্ষমতার অপব্যবহার করবে।'

মারিয়ান সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'হেস্টিংস, তোমার দিন আবার আসবে।' হেস্টিংস মাথা নীচু ক'রে মারিয়ানের হাতের আঙুলগুলি নিজের ঠোঁটের উপর চেপে ধরলেন।

অল্পকালের মধ্যেই ক্ষমতা পরিবর্তনের সংবাদ শহরের সর্বত্র রাষ্ট্র হয়ে গেল। যেখানেই লোকজন জমায়েত হয়, তারা এই ক্ষমতা পরিবর্তনের বিষয় আলোচনা করে। ফ্রান্সিস ও তাঁর মিত্রদ্বয় এই সংবাদ প্রচারের সুযোগ নষ্ট করলেন না। ফ্রান্সিস প্রকাশ্যেই বলে বেড়াতে লাগলেন যে, শীঘ্রই হেস্টিংস গভর্ণর জেনারেলের আসন থেকে পদত্যাগ করবেন; কারণ তাঁর এখন আর করণীয় কিছুই নেই। ফলে, যে-সব লোক হেস্টিংসের অনুগ্রহপ্রার্থী ছিল, তারা এখন আর হেস্টিংসের কাছে যায় না—এমন কি তাঁকে অভিনন্দন জ্ঞাপনও করে না। সংসারের এই স্বতঃসিদ্ধ চিরাচরিত নিয়ম এখানেও প্রকাশ পেল।

মহিলা মহলের ধারণা হ'ল, মারিয়ানের সংস্পর্শে আসার জন্যই হেস্টিংসের এই অধঃপতন। তাঁরা সকলেই অত্যন্ত তীব্র ভাষায় হেস্টিংসের আচরণের নিন্দা করতে লাগলেন। একমাত্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যেই এ ধরনের অশোভনীয় আচরণ সম্ভব। তাঁরা মারিয়ানকে 'ভ্রষ্টা' আখ্যা দিতেও কসুর করলেন না।

বারওয়েল তাঁর বন্ধু হেস্টিংসকে পুনর্বার অনুরোধ করলেন, 'মারিয়ানকে আপনি কিছু দিনের জন্যেও কোথাও পাঠিয়ে দিন।'

'মারিয়ানকে কোথাও পাঠিয়ে দিলে আমার অবস্থার কি পরিবর্তন হবে?' হেস্টিংস জিজ্ঞাসা করলেন।

'তাহলে অন্ততঃ মারিয়ানের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করা বন্ধ করুন।' বারওয়েল বললেন। তিনি আরও বললেন, 'ওয়ারেন, আপনি একবার ভেবে দেখুন, আজ আপনার সবই নষ্ট হতে বসেছে—যে 'ডেলসফোর্ড' আপনার জীবনের স্বপ্ন, সেই বাস্তুভিটের কথা একবার ভেবে দেখুন।'

হেস্টিংস তাঁর পুরাতন বাস্তুবাটীর ছবির দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। বাড়িখানির সংস্কার সম্ভবতঃ এতদিনে সম্পূর্ণ হয়েছে। হেস্টিংস একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। এলোমেলো বহু স্মৃতি তাঁর মানসপটে ভেসে উঠতে লাগল। বারওয়েলের দিকে তাকিয়ে হেস্টিংস বললেন, 'মারিয়ানের এই অপমানের আমিও অংশীদার না হয়ে, তাকে কি একাকী, বান্ধবহীন, নিঃসঙ্গ অবস্থায় ফেলে পরিত্যাগ করতে পারি?'

'না, আমি তা বলছি না।' বারওয়েল বললেন, 'তোমাদের দুজনকে এক সঙ্গে না দেখলে আমার বিশ্বাস ফ্রান্সিসের মনের পরিবর্তন হবে।'

'আমি তার কোন সম্ভাবনা দেখছি না—এতে আমার কোন সুবিধা হবে না।' হেস্টিংস বললেন।

সেদিন সন্ধ্যায় মারিয়ানও ঠিক বারওয়েলের মত একই ধরণের প্রস্তাব করলেন হেস্টিংসের কাছে। তাঁরা তখন দু'জনে গভর্ণর জেনারেলের বোটে গঙ্গায় বেড়াচ্ছিলেন। দু'জন পাগড়ী-পরা দেশী লোক দাঁড় টানতে টানতে এগিয়ে চলেছিল। তাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ যেন মন্ত্রোচ্চারণের মত শোনাচ্ছিল—সে এক অদ্ভুত পরিবেশ।

'যদি আমি তোমার কাছ থেকে একটু দূরে যাই তাহলে ভালই হবে বলে আমার মনে হয়। তবে আমি মাদ্রাজে যেতে চাই না, কারণ তোমার কাছ থেকে অত দূরে আমি থাকতে পারব না। আমি নিকটে কোন এক গ্রামাঞ্চলে থাকতে চাই।' মারিয়ান হতাশায় ভেঙে পড়েই যেন বললেন কথাগুলি।

হেস্টিংস অতি সহজভাবেই জবাব দিলেন, 'তুমি একা সেখানে থাকতে পারবে না।'

'ফ্রান্সিস তাহলে শান্ত হয়ে যাবে।' মারিয়ান একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আবার বললেন, 'মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, আমি যেন একটা বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছি তোমার কাছে।'

'বোঝা কাকে বলে তা আমি ভালভাবেই জানি। তবে তুমি নিজেকে বোঝা মনে করলে স্বতন্ত্র কথা।' হেস্টিংস কাতরভাবেই বললেন কথাগুলি।

তারপর উভয়েই নিঃশব্দে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার মিলিয়ে গেছে—গভীর রাত্রি নিঃশব্দ পদবিক্ষেপে এগিয়ে আসছে। পাড়ের তালগাছগুলি দৈত্যের মত যেন অন্ধকারের বুক চিরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। নক্ষত্ররাজীর ক্ষীণ আলোক-রশ্মিতে তাদের দেখা যাচ্ছে মধ্যে মধ্যে। অশ্রান্ত জলস্রোত দুর্নিবার চলেছে, হৃদয়ের অশান্ত চিন্তাস্রোতের মত।

হেস্টিংস মারিয়ানের একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিলেন। তারপর ঠোঁটের কাছে নিয়ে গিয়ে একটির পর একটি আঙুল চুম্বন করলেন। মারিয়ান তাঁর বিষণ্ণ মুখখানিকে হেস্টিংসের মুখের কাছে এগিয়ে দিলেন। চারিদিকে ঘোর অন্ধকার, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সেই গভীর অন্ধকারের মধ্যে হেস্টিংস কেবলমাত্র মারিয়ানের চোখের জলের স্পর্শ পেলেন।

"স্মরণের বালুকাবেলায়........." ফটোঃ প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

'হে আমার প্রিয়,' মারিয়ান বললেন, 'তুমি আমার অন্তরতম—তুমি আমার অন্তরে পরিপূর্ণ হয়ে থাক,—এখন আর আমাদের কিছুই করবার নেই।'

'আমি এখন সব সময়ে একটা জিনিস ভাবছি মারিয়ান,' হেস্টিংস গম্ভীরভাবে বললেন, 'ভারতবর্ষে এসে আমি একটি শিক্ষা লাভ করেছি, একটি সত্য উপলব্ধি করেছি, সে হচ্ছে 'ধৈর্য'। কালের পরিমাপ দিন গুনে বা সপ্তাহ মেপে হয় না—শতাব্দীর গর্ভে সে সত্য নিহিত আছে।'

'তার বহু পূর্বে আমরা আর ইহলোকে থাকব না!' মারিয়ান বললেন, 'কিন্তু আমার ভালবাসা?'

হেস্টিংস উত্তরে বললেন, 'সে চিরকাল অক্ষয় হয়ে থাকবে। সৃষ্টির পরিকল্পনা বিচিত্র, ভাগ্য নামে অভিহিত এই পরিকল্পনার মধ্যে তুমি আর আমি দুটি ক্ষুদ্র জীব মাত্র।'

মারিয়ান স্ত্রীলোক, তিনি হেস্টিংসের এই মহানুভবতাকে প্রশংসা করলেন কিন্তু তাকে গ্রহণ করতে পারলেন না। হেস্টিংসকে তিনি ভালবাসেন এবং হেস্টিংসও যে তাঁকে ভালবাসেন তা তিনি জানেন। কিন্তু তিনি হেস্টিংসের জীবনের অংশীদার হতে চান,—বিশেষ করে সেই সময় যখন তাঁর জীবনে দুর্ভাগ্য এসেছে।

কিন্তু এ কি সম্ভব? সম্ভবতঃ নয়, মারিয়ান বিবাহিত, কার্লের সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছে সত্য, তবে হেস্টিংসের পরিণাম কি?

স্বয়ংবৃতা

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

চাকরিটা পেল বটে বিপাশা, কিন্তু বেশ স্বস্তি অনুভব করছে না। মেয়ে শর্টহ্যান্ড টাইপিস্টের জায়গা, তাঁর জন্যে বয়স জানতে চেয়েছে, ফটো পাঠাতে বলেছে, বিবাহিত কি অবিবাহিত—তাও জানাতে বলেছে। এইতেই কেমন বোধ হয়, তার ওপর আছে মাইনেটা। টাইপিস্টের পোস্ট, কি আর এমন, তার জন্যে আরম্ভই করছে দু'শ পঁচাত্তর টাকা দিয়ে পরে উঠবে চারশ পর্যন্ত।

চাকরিটা পেলে যেভাবে তাতেও মনটা খুঁৎ-খুঁৎ করছে। সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা নয়, কিছু নয়, একেবারে নিয়োগ পত্র, 'জরুরী' ছাপ মারা। যেন হাতছাড়া হয়ে না যায়, এই ভাব।

অবশ্য, যা আশংকা করছে তা ছাড়া অন্য কারণও হতে বাধা নেই। হয়তো স্বাস্থ্যবতী কর্মক্ষম টাইপিস্ট চায়, হয়তো অভিজ্ঞতায় দেখেছে বিবাহিতা হলে, তার স্বামী-সংসার, ছেলেপুলে নিয়ে বখেরা অনেক, কাজে ব্যাঘাত হয়। এ সবও সম্ভব, তবু কেমন যেন একটা হরিষে-বিষাদের ভাবই যাচ্ছে, চিঠিটা সকালে

পেয়ে পর্যন্ত। ফার্মটার নামে বোধহয়—যেন কোনও বম্বেওলার; সেখানও একটা অপরিচয়ের আশংকা।

তবু নিল, যা নিতে হোল বলাই ঠিক। বছর খানেকের মধ্যে জীবনে হঠাৎ একটা মস্ত বড় পরিবর্তন হয়ে গেছে।

গ্রামের মেয়ে। বাবা কলকাতার একটা সওদাগরি অফিসে মেসে থেকে কাজ করতেন, হপ্তাশেষে একদিনের জন্য বাড়ির অতিথি। বিপাশা ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করলে কলকাতার একটা কলেজে ভর্তি করে দিলেন হোস্টেলে থেকে আই-এ পড়তে লাগল। বেশ চলছিল, তিনি হঠাৎ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হওয়ায় সব ওলট-পালট হয়ে গেল। ছুটি-ছাটার ওপর যে কটা মাস মাইনে পাওয়া গেল, তার জোরে পাসটা করে ফেলল বিপাশা। তার পরই ছাত্রী থেকে একেবারে গৃহী-সংসারীর পর্যায়ে উঠে পড়ল। বাড়িতে মা, পক্ষাঘাতগ্রস্ত বাবা, দুটি ভাই স্কুলে পড়ছে, একটি আগামী বৎসর স্কুল ফাইনাল দেবে, উপার্জন এক পয়সা নেই।

হোস্টেল সুপার রেবাদিদির সহায়তায় একটা গার্লস স্কুলে নীচের দিকে শিক্ষয়িত্রীর কাজ জুটিয়ে নিল। ক্রমে দুটি টুইশনিও। অনেকটা সামলে আনছিল, এই সময় রেবাদি একটা মফস্বল স্কুলে ভালো কাজ পেয়ে চলে যাওয়ায় আবার একটা সংকট উপস্থিত হোল।

অনেক খুঁজে পেতে মেয়ে হোস্টেল একটা পেল বিপাশা। চার্জ বেশি, আরও টুইশনি না জোগাড় করতে পারলে বাড়ি—কলকাতা দুদিক সামলানো যাবে না, কিন্তু একটা বড় সুবিধা হোল, জীবনের একটা বড় দিক-চক্রবাল খুলে গেল বিপাশার দৃষ্টির সামনে। গুটি দশ মেয়ে একটি ছোট পার্কের সামনে মেস করে রয়েছে। তার মধ্যে মাত্র দুটি স্কুল-কলেজের ছাত্রী, বড় বোনের সঙ্গে থেকে পড়ে, বাকি সবাই অন্য স্তরের। দুটি নার্স, একটি মেডিকেল কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ে, বাকি সবাই চাকরে, রেলে আছে, গভর্ণমেণ্টে আছে। দিন কতক দুদিক সামলাতে বেশ বেগ পেতে হোল, কিন্তু সবাইকে দেখে শুনে মনে আশা জাগল, বেশ সাহস বাড়ল। এক সময় যেটা বড় খারাপ বোধ হোত, বেশি বয়সে অপেক্ষাকৃত নীচু ক্লাসের ছাত্রী হয়ে থাকা, পাড়াগাঁয়ের মেয়ে বলেই সেটা হয়েছিল। সেটাও এ পরিবেশে বেশ মানানসই-ই হয়ে গেল। বিপাশা এখানে জন-চারেকের বিপু দিদি, জন-তিনেকের সমবয়সী। সুন্দরী সে বেশই সেটা চাকরির ইতিহাস থেকেই টের পাওয়া যায়। এর ওপর আর একটা যে গুণ ছিল, চাপে প'রে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, সেটাও আবার স্ফূর্ত হয়ে উঠল আস্তে আস্তে মেলা-মেশার সঙ্গে; বড় আমুদে মেয়ে বিপাশা, একটু হৈ-চৈ, হাসিখুশী নিয়ে থাকতে, জীবনটা হাল্কাভাবে নিতেই ভালোবাসে। হোস্টেলে সবার প্রিয়পাত্রী হয়ে উঠল। বেশ চলল। জীবনের সঙ্গে ব্যাপকতর পরিচয়। সঙ্গিণীরা মেডিকেলে পড়ছে, রাইটার্স বিল্ডিং-য়ে কাজ করছে; নিজেরও পা বাড়াতে ইচ্ছা হয়।

রাইটার্স বিল্ডিঙের নন্দিতা দিদিই ওকে পরামর্শ দিল—'তুমি শর্টহ্যাণ্ড টাইপটা শিখে নাও।' স্কুলে ভর্তি হয়ে ভালোভাবেই শিখে ফেলল বিপাশা। তারপর এই চাকরিটাও পেয়ে গেছে; স্কুলের পয়শাট্টি থেকে একেবারে দু'শ প'চাত্তর।

হরিষে-বিষাদ। হর্ষের যেটুকু বা ছিল, গ্রহণের বলয়গ্রাসের মতো বিষাদ তার প্রায় সমস্তটুকুই গ্রাস করে ফেলেছে। সকালের স্কুল-কলেজ, অফিসের ব্যস্ততার মধ্যে সবার মুখেই প্রশ্ন—'বিপু দিদির আজ মুখটা এমন ভার ভার কেন?......গাঁয়ের খবর ভালো তো বিপাশা, বাবা ভালো আছেন তো?......স্কুলে কিছু হয়নি তো? প্রাইভেট স্কুল, হলেই হোল।'

মেডিকেলের ছাত্রী সমবয়সী মনীষা বলে,—'সিজন চেঞ্জ করছে বিপা। বলিস তো একটা ওষুধ লিখে দি, কিনে নে গিয়ে।

একে একে সবাই চলে গেল। হস্টেল খালি হয়ে গেল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত অনিশ্চিতভাবে বসেই রইল বিপাশা নিজের ঘরে। অনেক ইতস্তত করল, শেষ পর্যন্ত একটা চিন্তাই ওর সব সংশয় কাটিয়ে ওকে সংকল্পে দৃঢ় করে তুলল। বাবা ভালোর দিকে, দুদিন আগে চিঠি পেয়েছে, তাঁকে বায়ু পরিবর্তনের পরামর্শ দিয়েছেন ডাক্তারে। এখন সমর্থ নয়, তবে আশা করছেন মাস খানেকের মধ্যে হয়ে উঠবেন যাত্রার উপযোগী।

একটা উৎসাহ এসে গেছে। পারতে হবে, ছায়াকে ভয় করলে চলবে না, এগিয়ে দেখতে হবে কায়াটা আসলে কি। যে বাপ-মায়ের ছেলে নেই উপযুক্ত, তার মেয়েকে হতে হবে ছেলে। এ যুগ সেটা সম্ভব করেছে।

কুলুঙ্গিতে একটি কালীঘাটের কালীর পট থাকে, পায়ের কাছে দুটো ক'রে ফুল রেখে দেয় রোজ, কোথাও বেরুলেই সামনে একটু দাঁড়িয়ে যায়।

আজ দাঁড়াতে গিয়ে একঠায় অনেক-ক্ষণ দাঁড়িয়েই রইল বিপাশা।

ভাবছে। তারপর স্থির করেই ফেলল। কালীঘাটটা একবার ঘুরেই যাবে, ভালো-মন্দর দায়িত্বটা আর নিজের ওপর নিয়ে উঠতে পারছে না। অনেকটা ঘুর-পথ হয়ে যাবে, দেরি হয়ে যাবে; তা যাক। চাকরিটা যদি তাইতেই না হয় তো বুঝবে হওয়ার ছিল না।

বেরিয়ে পড়ল বিপাশা।

সন্ধ্যার সময় হোস্টেলে ফিরল যে, তাও কালীঘাট হ'য়েই। গাটা একটু ছমছম করছে, তবু তারই মধ্যে বাসার কাছে যতই এগুচ্ছে মুখে একটা কৌতুকের ভাবই স্পষ্ট হয়ে আসছে।

উঠানে পা দিতেই প্রথমে সদুর সঙ্গে দেখা হোল। হোস্টেলে সবার ছোট স্কুলের ছাত্রী।

'এই যে বিপু-দি, আজ এত......'

তারপরই থমকে গিয়ে মুখের দিকে চেয়ে বিস্মিত প্রশ্ন করল—'কে আপনি?

'আমি বিপাশার দিদি।'—উত্তরটা প্রস্তুতই ছিল বিপাশার, প্রশ্ন করল—'আছে সে বাড়িতে?'

সদু উত্তর না দিয়ে দুড়দুড় ক'রে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল। বিপাশা চাপা গলার আওয়াজ শুনল—'ও মেজদি, বিপুদির দিদি এসেছেন! দাঁড়িয়ে আছেন নীচে!'

কমলা হোস্টেলের সবচেয়ে সিনিয়ার মেম্বার, সদুদের মেজদিদি থেকে আরও সবারই। 'বিপুর দিদি! কৈ বলে নি তো কখনও!'

—একটু নীচু গলায় বলতে বলতেই বারান্দায় বেরিয়ে এসে বলল,—'নীচে দাঁড়িয়ে কেন? উঠে আসুন। বিপু এখনও ফেরেনি।'

বিপাশা গিয়ে সামনে দাঁড়াতে ভ্রূ দুটো কুঁচকে আরম্ভ করেছিল—'আপনি বিপুর......'

'পোড়া কপাল! দিদি পাব কোথায়?' —হেসেই উঠল বিপাশা।

আরও অনেকে এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছে, কমলা বলল,—'মরণ! তা রঙ্গ করবারও তো একটা সীমা থাকবে?......কপালে সিঁদুর কেন—'

'বিয়ে হলে সিঁদুর থাকবে না? হিঁদুর মেয়ে...'

'বিয়ে!!'

—আর সবাই রুদ্ধবাক হয়েই দাঁড়িয়েছিল, কমলার সঙ্গে চিৎকার করেই উঠল একরকম। কমলা বলল,—'তুই বলা নেই কওয়া নেই—খামোকা বিয়ে করলি কোথায়।'

প্রশ্নের বান ছুটল। মনীষা বলল,—'তা বর কৈ?'

'থামো, এতগুলো সোঁদা মেয়ের মধ্যে নিয়ে আসি তাকে!

'তা ইস্কুলে......'

'তাই তো ছেড়ে দিলাম স্কুল। মাগীর দল, লোকে যে দেখে-শুনে একটা বিয়ে করবে...... তা একি অবিচার! বিয়ের কনে, একটু যে ডেকে বসিয়ে আদর অভ্যর্থনা করবে......'

কমলাই বলল,—'ভেতরে আয়। 'সদুকে বলল,—'ঠাকুরকে শীগ্গির চা করে দিয়ে যেতে বল আগে, দুখীরাম গিয়ে খাবার নিয়ে আসুক—নোন্তা, মিষ্টি মিলিয়ে টাকা খানেকের......'

'আমরা হাঁ করে দেখি।' একটু আড়ালে মুখ ঘুরিয়ে ছায়া বলল, মনীষা নাকি সুরেই অনুযোগ করল—'একে তো বিয়েও হোল না!'

একটা হাসি উঠে আসরটা জমে উঠল। কমলা ড্রয়ার খুলে মাথা ঘুরিয়ে আন্দাজ করে নিয়ে তিনটে টাকা বের করে হাতে

গাঁয়ের মেয়ে

ফটো: সন্তোষ ঘোষ

বাংলার চাষী

ফটো: অমিয় সাধু

ফটো : সলিল বসু

ফটো : দাশ স্টুডিও

ফটো : পি, রায়চৌধুরী

ফটো : পি, রায়চৌধুরী

ফটো : এইচ, চৌধুরী

ফটো : জি, ঘোষ

দিল সদুর, চেয়ারে বসে বিপাশার দিকে চেয়ে বলল 'আগে তোর কাহিনী শোনা। উদ্ভট ব্যাপার যত? সকালে বেরুলে মুখ গোমড়া করে, ফিরল খড়দার গোসাইমার মতন কপালে এক গাদা সি'দুর!'

সকলে বিছানা, চেয়ার, মোড়ায় গুছিয়ে বসলে আরম্ভ করল বিপাশা—

"গোমড়া মুখ নিয়ে সকালে বেরুবার কথা যে বললে কমলাদি', তখন আমাতে আর আমি আছি কি? নতুন চাকরির চিঠি পেয়েছি, তা কোথায় যে......"

"নতুন চাকরি!......এই যে বললে বিয়ে!...... চাকরি, তা সি'দুর কেন! চাকরির সর্ত নাকি বিয়ে?......"

—একসঙ্গে জড়াজড়ি করে প্রশ্নের গাদা উঠতে বিপাশা এ্যাপীলের দৃষ্টিতে কমলার দিকে চাইল, বলল—"নিন, ওদের কথার জবাব দিই, কি, আপনার কাহিনী বলি বলুন কমলাদি।"

কমলা ওদের বারণ করে দিল—"ওকে বলে যেতে দাও আগে।"

ওকে বলল—"তুইও যে একেবারে মাঝখান থেকে আরম্ভ করলি!"

"একটা দরখাস্ত করে দিয়েছিলাম কমলাদি' লোভে প'ড়ে, তোমাদের না জিগোস করেই। বম্বে-ওলার ফার্ম, স্টেনোগ্রাফারের পোস্ট, দু'শ প'চাত্তর টাকা মাইনে—শিউরো না, শিউরোবার ঢের বাকি আছে এখনও...... ফটো চেয়েছে, কুমারী হওয়া চাই, তারপর ফটো দেখেই এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার—ভাবনায় মুখ কালো ক'রে বেরুতে হয় কিনা তুমিই বলো না......"

'ভয়ানক রিস্‌ক্‌ নিয়েছ কিন্তু!"—নন্দিতা সেন না মন্তব্য করে পারল না।

"রিস্কটা চাপিয়ে দিলাম মা-কালীর ওপর। মনে করলাম রোজকার মতন শুধু কুলঙ্গির মা-কালীর ওপর নির্ভর না করে, যদি একবার কালীঘাটটুকু ঘুরে যাই তো হয়তো মা একটু সজাগ থাকতে পারবেন বেশি ক'রে। তা মা যেন একেবারে হুংকার দিয়ে সজাগ হয়ে উঠলেন।...... এই দ্যাখো! শোনই না আগে।...... জুতো প'রে রয়েছি, কোথায় রাখব, সেবারের মতন হারালেই মুশকিল, আমি আর মন্দিরে উঠলাম না। জুতো জোড়া খুলে পাশে রেখে মন্দিরের রকেই মাথা ঠেকিয়ে প্রণামটা সেরে নিচ্ছি, হঠাৎ মনে হোল কে যেন সি'থির মাঝামাঝি ক'টা আঙুলে চেপে ওপরের দিকে টেনে দিলে। এক সেকেণ্ডের ব্যাপার, তক্ষুনি মাথা তুলে দেখি, ও কমলাদি', মা যেন নিজে মন্দির থেকে নেমে এসেছেন! লাল শাড়ি পরা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে ত্রিশূল। কিছু বুঝে ওঠবার আগে হৈ-চৈও উঠে গেল। সধবা-বিধবা-কুমারী মিলিয়ে আর একটি দল—বড় ঘরেরই মনে হোল—চাকরের জিম্মায় জুতো ছেড়ে রেখে ওপরে যাওয়ার ব্যবস্থা করছিল—যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে এলোধাবাড়ি সবার কপালে সি'দুরের হাত টেনে দিতে লাগল। এক বুলি মুখে—মার কাছে এসেছে, সি'দুর নেই কপালে! প্রথমটা হকচাকিয়ে গিয়ে মারমুখো হয়ে উঠেছে সবাই—সধবা-বিধবা-কুমারী—কিছুই তো বাছে নি—আমিও কপালে হাত দিয়ে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে দাঁত-মুখ খি'চিয়েই এগিয়ে যাব—গায়ে আগুন ধ'রে গেছে তো—চারিদিক থেকে সবাই ছুটে এসে পড়ল—'দেখছেন পাগল মানুষ, ওকে মারধোর করা চলে?...... মার স্থান, ওতে দোষ লাগে না—যার রাখবার নয়, আদি-গঙ্গার জলে ধুয়ে ফেলুন গে।'... পাগলীর অবশ্য ভ্রূক্ষেপ নেই, যারা যারা বোঝাতে এসেছে, লাফিয়ে লাফিয়ে তাদেরও কপাল লেপে দিতে চায়—হাসি-বকাবকিতে একটা রীতিমতো হুল্লোড় পড়ে গেছে, আমি আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলাম। আদি-গঙ্গায় ধোব কি? একেবারে পাকা ব্যবস্থা, তেলের সঙ্গে গোলা সি'দুর, জলহাত পড়লেই আরও নেবড়ে যাবে।' চাকরি করতে যাওয়া তো মাথায় উঠল, এ-অবস্থায় বাড়ি ফিরব কি ক'রে সেই এক ভাবনা দাঁড়াল। এমনি পথ চলতেও কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ হচ্ছে, অনভ্যেসের ফোঁটা তো, শেষে একটা বুদ্ধি জোগাল কমলাদি', একটা ছোট মনোহারী দোকানের সামনে দিয়ে আসতে। একটা ছোট গোল আরশি কিনে নিলাম, তারপর ওদিক থেকে সরে এসে একটা ট্যাক্সির ওপর উঠে ব'সে বাড়ির ঠিকানা দিলাম। ঠিক করলাম পথে যেতে যেতে রুমাল দিয়ে মুছে নোব, রুমালে না কুলোয় শাড়ি দিয়েই।

খানিকটা বেরিয়ে এসে আরশিটা নীচু ক'রে ধ'রে রুমালটা আঙুলে জড়িয়ে মুছতে যাব, হঠাৎ আর একটা বুদ্ধি এসে জুটে গেল, এবার দুর্বুদ্ধিই বলতে হবে। দরকার কি সি'দুর মুছে? বাড়িই বা ফিরতে যাই কেন? এইভাবেই আফিসে গিয়ে দেখি না অবস্থাটা কি দাঁড়ায়। বড় রাস্তায় উঠে মোড় নিতে যাবে, বললাম—যাক্‌,. চল ধর্মতলার দিকে। তখনও একটু দোমনাই হয়ে রয়েছি, একেবারে ঠিকানাটা আর দিলাম

না, ভাবলাম—যেতে-যেতে মাথাটা আগে একটু পরিষ্কার ক'রে নি।

প্রায় সাড়ে দশটার সময় আফিসের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ট্যাক্সিটা। ভাড়া চুকিয়ে লিফ্‌টে করে চারতলায় উঠে গেলাম।"

"কপালে ঐ এক ধ্যাবড়া সিঁদুর নিয়ে!"—মনীষা চোখ বড় বড় ক'রে প্রশ্ন করল।

"এক ধ্যাবড়া আর কোথায়, এ্যাঁ কমলাদি' ?" সাক্ষী মানল বিপাশা। "ট্যাক্সিতে ব'সে আঙুলে রুমাল জড়িয়ে আমি তত্ক্ষণে দিব্যি মানানসই করে নিয়েছি তো। একেবারে মিহি, আধুনিক, আছে—কি-না আছে সে আর ইচ্ছে ক'রে করলাম না। একটা মৎলব তত্ক্ষণে এ'টে ফেলেছি তো।"

"মতলবটা শুনতে পাই না?"—মনীষাই প্রশ্ন করল।

"একটা প্রোকেট্‌শন্‌ তো।"

—কমলাই বলল, বাধা দেওয়ার জন্য একটু ধমকের টোনেই। বিপাশাকে বলল—"হ্যাঁ, তারপর ?"

"জায়গাটা লোয়ার চিৎপুরের পেছন দিকটায়। একদিকে বৌবাজারের বাঙালী পাড়া, একদিকে চিনে-পট্টি, ইম্‌প্রুভমেণ্ট ট্রাস্টে জায়গাটা পরিষ্কার করছে, নতুন প্যাটার্ণের উঁচু উঁচু বাড়ি সব উঠছে এখানে-ওখানে। লিফ্‌ট থেকে বেরিয়ে একটা করিডোর দিয়ে আফিসটার সামনে এলাম। আমাদের আফিসে বার কয়েক গিয়ে একটা আন্দাজ হয়ে গেছে তো, গা'টা একটু যে ছমছমে করছে না, এমন নয়, তবু সহজভাবেই ঢুকে গেলাম। একটা বেশ বড় হলঘর, তাইতেই আফিস, অনেকগুলো লোক—নিজের নিজের টেবিলে কাজ করছে......"

"থেমে থেমেও যাচ্ছে তাদের হাত..." —মনীষা কথাটা ব'লে মুচকি হেসে মুখটা ঘুরিয়ে নিল একটু। বিপাশা অনুযোগ করল—"দ্যাখো কমলাদি'। না, আমি বন্ধ করলাম।...... বেশ হোল, চা-খাবারও এসে গেছে।"

নিজের নিজের প্লেট আর চায়ের কাপ-পিরিচ গুছিয়ে নিতে একটু যে বিরতি এসে গেল তাতে মন্তব্য উঠল কিছু কিছু—

"সত্যিই বড় একটা রিস্‌ক্‌ নিয়েছ কিন্তু বিপু, বেশ, বলো, সবটা শুনি আগে।...... ভয় নেই, দেখো তোমরা, ও মা-কালীই ছিলেন নিশ্চয়।......সাহস আছে তোর বিপা, আমার তো শুনেই ভির্মি খাওয়ার মতন হয়েছে!......ইস্‌! ভির্মি যাবে! আজকালকার যুগে! তুমি ঢুকেছ। এবার আমায় টেনে নিও বিপাদি, আমি একবারে হলের মাঝখানটায় গিয়ে ব'সে হাঁক দোব—'কোই হ্যায়!"

—শেষেরটা চম্পার। মোটা শরীর, একটু মকুলেও এমন ক'রে থিয়েটারি ঢঙে বুক চিতিয়ে চোখ পাকিয়ে বলল, একটা হাসির হর-রা উঠে গেল। নন্দিতা চায়ে চুমুক দিয়ে বলল,—"মরণ!"

কমলা বলল—"তুই বল্‌ বিপু, চুপ করো সবাই।"

"সবাই টেবিলে যে-যার কাজ করছিল"—একবার বক্র দৃষ্টিতে চাইল বিপাশা মনীষার দিকে, বলল—"কার কাজ বন্ধ হয়ে গেল, কার চালু রইল, অত গ্রাহ্য না করে আমি গটগট করে টেবিলের সামনে গিয়ে বললাম—"আমি মিস্টার চুড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা করব।"

'কি দরকার ?'

চিঠিটা বের করেই রেখেছিলাম, বললাম—'এই এপয়েন্টমেণ্ট লেটারটা তাঁর আফিস থেকে পেয়েছি।'

মিথ্যে বলব না, লোকটা একবার চাইল আমার কপালের দিকে, একটু যেন বলতেই যাচ্ছিল কি, সামলে নিয়ে একটা আর্দালীকে ডেকে তার হাতে একটা স্লিপ্‌ দিয়ে বলল—'চেম্বার-মে।'

আমায় বলল—'আপনি যান ওর সঙ্গে।'

হলের এক পাশে কাঠের একটা মাঝারি গোছের চেম্বার। লোকটা এগিয়েই গিয়েছিল একটু, আমি পেঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে এসে বেশ খাতির ক'রেই সেলাম দিয়ে বলল—'অন্দর যাইয়ে।'

মাঝামাঝি একটা স্প্রিঙের কপাট, ঠেলে ভেতরে গিয়ে দাঁড়লাম আমি..."

"চক্ষু চড়কগাছ!"—মন্তব্যটা ক'রে হেসে মুখটা ঘুরিয়ে নিল মনীষা। বিপাশা বলল—"তা সত্যি বলছি কমলাদি', সিনেমা বলো, থিয়েটার বলো, অমন মুখের ভাব আমি আর কোনখানেই দেখিনি—এত আশ্চর্য হয়ে গেছে...আর

"আর এত নিরাশ!"

—মনীষাই আবার। বিপাশা আবার অনুযোগ করতে কমলা বলল—"নাঃ, বড্ড বাড়াবাড়ি করছিস মণি!"

"বাঃ, আর সে-বেচারির দুঃখ কেউ বুঝবে না!"—এবার মাথায় একটা বেশ ঝাঁকুনি দিয়ে মনীষা বলে উঠতে আবার একটা হাসির দমক উঠল। বাদ গেল না বিপাশাও। তার মাঝেই—"আঃ, শোনই না!" বলে আরম্ভ করল—

"বেশ মোটা-সোটা, বয়স পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন হবে, মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি—পাক ধ'রেছে দাড়ি-গোঁফে, গায়ে খদ্দরের লম্বা পার্শি কোট। হ্যাঁ, শৌখীন বৈকি; বেশ ছিমছাম, বুক-পকেট থেকে একটা নীল রুমালের কোণ বেড়িয়ে রয়েছে। একটা হাল্কা গন্ধও রয়েছে ঘরটাতে। ভাঙা-ভাঙা বাংলা জানে; সেটা আমি সোজা বলে যাচ্ছি। একটু যেন হতভম্ব হয়ে চেয়ে থেকে—

'আপনি ?'

চিঠিটা সামনে এগিয়ে দিয়ে বললাম —'এই লেটার অফ্‌ এ্যাপয়েন্ট্‌মেন্ট পেয়েছি আপনার আজ।'

চিঠিটার দিকে চেয়ে থেকে চোখ তুলে বললে—'কিন্তু আপনি তো বিবাহিত, আমি কুমারী টাইপিষ্ট চেয়েছিলাম।'

বললাম—'একরকম কুমারীই, তাই দরখাস্ত করেছিলাম।'

'তার মানে ?'

'কোর্টে রেজেস্টারি করে বিয়ে। আমরা বাঙালীরা ওটাকে তো বিয়ের মধ্যে ঠিকমতো ধরি না।'

"কী ধড়িবাজ মেয়ে বাবা!"—ছায়া মুখটা গোল করে বলে উঠল। মনীষা বলল—"'আহা, পেঁচিয়ে কাটা বেচারিকে!" ক্ষণে আশা ক্ষণে নিরাশা ?

বিপাশা ঠোঁটে একটু হাসি টিপে নিয়ে বলল—"একটা পেন্সিল তুলে নিয়ে ব্লটিং-প্যাডের ওপর তারমুখটা টিপে ঘোরাল একটু, তারপর আবার চোখ তুলে বলল—"কিন্তু আপনার কপালে সিঁদুর রয়েছে তো।"

বললাম—'ওটা একটা প্রসাধন মাত্র, পাকা বিবাহের মূল্য নেই ওতে।'

হাঁ করে চেয়ে রইল একটু......

মনীষা বলল—"বোধ হয় রুজ-লিপষ্টিক্‌ খুঁজছিল বেচারি।"

"নাঃ, আমি এই ছেড়ে দিলাম কমলাদি'।" —টেবিলে হাতদুটো একবার আছড়ে ফেলে টেনে নিয়ে চুপ ক'রে বসল বিপাশা। ছায়া বলল—"থাক্‌ ওসব, আমি জিজ্ঞেস করছি—তোমার একটুও ভয় করছিল না বিপা, আশ্চর্য!"

"না, ভয় কি আর করছিল! তা, বলতে দেবে তবে তো।"

নন্দিতা বলল—"তোরও যে অন্যায় রাগ বাছা। বিয়ে করে এলি, বাসর জাগতে পারল না কেউ বর-কনে নিয়ে; দুটো কথা বলেও সাধ মেটাবে না ?"

বিপাশা একেবারে খিলখিল করে হেসে উঠল, ওরা একেবারে হকচকিয়ে গেছে, বলল—“যেও না, যেও বরের সংগে বাসর জাগতে, কার কত বুকের পাটা দেখব একবার......”

বলতে বলতেই হাতের আঁজলায় মুখ ঢেকে হাসিতে দুলে দুলে উঠতে লাগল।

কমলা বলল—“দ্যাখো কী জবালা! নিজের কথায় নিজেই হেসে কুটি-কুটি—কি ব্যাপার বলবি তো?”

হাসিতে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেছে। মুছে নিয়ে একটু গুছিয়ে বসে আবার আরম্ভ করল বিপাশা—হাসিটা খুক্ খুক্ করে বেরিয়েই পড়ছে মাঝে মাঝে—

“বলে—ভয় করবে না! ভয়ে পা দুটো কাঁপছে জুতোর মধ্যে, বোধ হয় পড়েই যাই, এই সময় তো ব্যাপারটা হোল। একটু হতভম্ব হয়ে চেয়ে থেকে জিজ্ঞেস করছে—‘তা, আপনার হাজ্‌ব্যান্ড কে? কোথায় থাকেন তিনি?’......সত্যি কথা বলতে কি, একেবারে ধাঁধায় পড়ে গেছি, অতটা তো ঠিক করা ছিল না। ধাঁধায় পড়েই এদিক-ওদিক চোখ ঘোরাতে—যেন লজ্জায়ই বলতে চাইছি না—হাজ্‌ব্যান্ডের ওপর নজর প’ড়ে গল......উফ্! সে সে......”

এবার হেসে একেবারে উল্টে পড়ল বিপাশা। সামলাতেও দেরি হোল, তার ওপর হাসির মধ্যেই ভেঙে ভেঙে বলে চলল—“জানলার মধ্যে দিয়ে চোখ পড়ে গেল কমলাদি’ নীচে, দুশো গজ দূরে একটা বক্সিং boxing শেখবার আখড়া—দুজনে ঘুষোঘুষি করছে—জন ছয়েক চারিদিকে দাঁড়িয়ে দেখছে। যারা করছে বক্সিং হাতে গাব্দা গাব্দা বক্সিং প্লভ boxing glove পরা—একজন ছেলে-মানুষই। যাকে দেখিয়ে দিলাম হাজ্‌ব্যান্ড বলে, নিশ্চয় বক্সিং মাষ্টার—দুষমন কালো—গাঁট্টা-গোট্টা—এই বুকের ছাতি—এই হাতের মাস্‌ল—ঘামে চক্‌চক্ করছে—শেখাচ্ছেই, তবু অত দূর থেকেও মনে হচ্ছে চোখ দুটো যেন জবলছে—মাঝে মাঝে হুম্ হুম্ শব্দও আসছে ভেসে—ফটাস ফটাস করে এক-একটা ঘুষির আওয়াজও। মিস্টার চুড়িওয়ালা?—সে যা মুখের চেহারা, ফটো তুলে বাঁধিয়ে রাখবার মতন—আমি দেখিয়ে দিতে সেই যে নজর গেছে ওদিকে, আর ঘাড় ফেরাতে পারছে না...উফ্!—উফ্! বাবাগো!”

হাসিটা ছড়িয়ে পড়েছে ঘরময়, সেই সঙ্গে—“বলিস কিরে! তাকে নিজের সোয়ামী ব’লে চালিয়ে দিলি!...... একটু

বাধল না তোমার বিপুদি!...... একি উদ্ভট্ স্বয়ম্বরা বাবা! এত ফিচলেমি তোর পেটে পেটে!...তারপর?......”

“তারপর মুখ ঘুরিয়ে প্রথম কথা—‘আপনি দাঁড়িয়ে কেন? বসুন।...তা, কি করেন আপনার স্বামী?’...

বললাম—‘ওই বক্সিং শেখান্, আর ছোরাছুরি, সেটা ঘরের মধ্যে। জন

“সবটাই তো গোপনীয় স্যার, এমন কি আমি যে ও'র স্ত্রী এ-কথাটাও।”

চল্লিশেক সাকরেদ আছে, তাইতেই চলে যায়, আর...’

—যেন সামলে নিয়েই চুপ করে গেলাম। জিজ্ঞেস করলে—‘হ্যাঁ বলুন, আর কি বলছিলেন।’

—ততক্ষণে বেশ বুদ্ধিও খুলে এসেছে। বললাম—‘সবটাই তো গোপনীয় স্যার, এমন কি আমি যে ও'র স্ত্রী এ-কথাটাও। আপনি চাকরি দিচ্ছেন, না বললেই নয়, তাই—’

বললে—‘আপনি স্বচ্ছন্দে বলুন, এর একটা কথাও বেরুবে না, আপনাকে কথা দিচ্ছি।...আচ্ছা, আপনি না হয় নাই করলেন চাকরি......’

সরিয়ে দিতে চায় আর কি। কিন্তু বললাম না ——তখন বুদ্ধি বেশ খুলে গেছে আমার, জিজ্ঞেস করলাম—‘দিতে চান না কাজটা? তাহলে গিয়ে বলি, উনিই পাঠালেন তো।’

জিজ্ঞেস করলে—‘চটে যাবেন?’

বললাম—‘চটা—তা চটে যদি যান তো নেহাৎ তেমন কারণ না ঘটলে অনিষ্ট করেন না কারুর। এক সেই ক্যালকাটা রায়টের সময় যা......’

আবার যেন বলতে গিয়ে সামলে নিলাম, এইভাবে থেমে যেতে একেবারে ব্যস্ত হয়ে মুখটা এগিয়ে এনে জিজ্ঞেস করল—হ্যাঁ, রায়টের সময়—কি বলতে যাচ্ছিলেন?’

বললাম—‘সে আরও গোপনীয়, স্যার, তবে আপনাকে বলতে বাধা নেই—রায়টের সময় কিছু হাত ময়লা করতে হয়েছিল—উনি একলা শেষ করেছিলেন একুশজন—ছোরা, ঘুষি—তারপর সাকরেদরা আরও—’

‘একুশ!! একলা!...’—সে যা এক চিৎকার স্থান কাল পাত্র ভুলে।...

আবার একচোট ফুকরে হেসে উঠল বিপাশা, বলল ‘নাঃ, পারছি না কমলাদি, পেটে ব্যথা ধরে গেল। মোটামুটি এই ব্যাপার—মোট কথা চাকরি পাকা—দেখলামও তো খাতিরের বহর, কবার ডাকলেও ডিক্‌টেশন দেওয়ার জন্যে। দেখায়, আর ঘুরে ঘুরে জানলার বাইরে চায়। তবে কে ও কুদৃষ্টির নীচে বসে কাজ করবে বলো কমলাদি? মাস পাঁচ ছয় কোন রকম করে চালিয়ে নেওয়া—বাবাকে একবার চেঞ্জ থেকে ঘুরিয়ে আনা পর্যন্ত। তারপর বাবা এসে কাজে জয়েন করলেই শর্মা আবার কলেজে। এই কটা মাস কোন বাধাবিঘ্ন যদি না হয়...’

কমলা অন্যমনস্ক হয়ে কি ভাবছিল, মুখটা ঘুরিয়ে বলল—“হবে না কিছু।”

দিন পাঁচেক পরের কথা। কমলা গিয়ে মিস্টার চুড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা করল, বিপাশাকে তার টেবিল থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে। নমস্কার করে বলল—“আপনার স্টেনোর স্বামীর বোন আমি। দাদা বলে পাঠালেন—তিনি ওকে চাকরি দেওয়ার জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ। শুনেছেন একটা আলাদা চেম্বারও করে দিয়েছেন ওর জন্যে আপনি। আমায় ধন্যবাদ জানাতে পাঠালেন। হ্যাঁ, একটা অনুরোধ করলেন, কথাটা যেন একেবারেই গোপন থাকে। রাগী মানুষ, মেলে হয়তো ”

ঐ পর্যন্তই ছেড়ে দিল। মিস্টার চুড়িওয়ালা যেন অভ্যাসবশেই একবার বক্সিং-রিংটার দিকে চাইল।

খানিকটা অন্তরঙ্গ আলাপ করে চা-টোস্ট খেয়ে উঠে এল কমলা।

শাহ আলমের তাবিজ

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

ট্যুরিস্ট-দের মৌশুমে শুরু হবার আগে-ই ধরনী একবার করে বুড়ো নিকোলাস-এর কিউরিও শপে যায়। ধর্মতলার পেছনের অনেক সরু গলি, অনেক সোজা রাস্তা, অনেক শুঁড়িখানা, শুঁটকি মাছের দোকান, আর্মেনিয়ান, ইহুদী, চীনে, গ্রীক—নানা জাতের মানুষের জংগলের মধ্যে নিকোলাসের কিউরিও-র দোকান। সরু গলিটাতে ঢুকে, ছাই রঙের মস্ত ব্যারাক বাড়ীটার চেহারা দেখলেই বোঝা যায়, এখানে নানা জীবন থেকে ছিটকে পড়া, নানা জাতের মানুষের বিচিত্র পেশা ও নেশার একটা জগৎ আছে। মাসে একবার পুলিশের ভ্যান এসে দাঁড়ায়। জুয়া, বে-আইনী মদ চোলাই, অবৈধ ব্যবসা, দুটো-একটা ছোরা-ছুরি জখমের কেস যখন বা পায় তুলে নিয়ে চলে যায়। দুপুর বেলাটা সব চুপচাপ। ফর্সা রঙ, নোংরা হাত পা, কটা চুল, পানসে চোখের বাচ্চাগুলো পাথর বাঁধানো ফুটপাথে খেলা করে। মেয়েরা ঝগড়া করে। রাস্তার ওপর শুঁটকি মাছ শুকোয়। একটা বুড়ো বসে কাগজের ফুল বানাবার জন্যে কাঁচি দিয়ে রঙীন কাগজ কাটে, তার কাঁচ কাঁচ শব্দ হয়।

একেবারে অন্ধকার কাঠের সিঁড়ি দিয়ে একতলার প্যাসেজ থেকে দুটো সিঁড়ি নেমে নিকোলাসের দোকান। সরু সিঁড়িটা দিয়ে নামবার সময় একটা নিশ্বাস আটকে আসবার ভয় হয়। কিন্তু ঘরে পা দিয়েই ঘরটার উচ্চতা, প্রশস্ততা, ধরনীকে প্রত্যেকবারই বিস্মিত করে। মাথার ওপর ঘি রঙের চীনে ড্রাগনটার মুখ থেকে বালবটা আলো ছড়ায়। শেলফে, আলমারীতে অজস্র মূর্তি, বাসন, রুপা ও তামার গহনা, ফুলদানী। মেঝের কার্পেটটা সবুজ। টেবিলের রেক্সিনটা সবুজ। টেবিল-ল্যাম্পের আলোতে বুড়ো নিকোলাস চোখে চশমা লাগিয়ে শ্যাময় লেদারের টুকরো দিয়ে কোন একটা আশ্চর্য, দুষ্প্রাপ্য জিনিষ পরিষ্কার করে। ধরনী বলে,

—ওটা কি ক্লাইভের দোয়াতদানী?

ছোটখাটো, ছিমছাম মানুষটি নিকোলাস। কানের লোমগুলো কোঁকড়া। আঙুলের গাঁটে গাঁটে লোম। ছাইরঙের কর্ডের প্যান্ট গ্যালিস দিয়ে পরা। সিল্কের সার্টের কলার খোলা। গলায় একটা রুপোর তাবিজ। চশমাটা নামিয়ে নিকোলাস একটু বোদমাতরা দৃষ্টিতে তাকায়। ধরনী তাকে ঠাট্টা করছে, ভাবতে তার কষ্ট হয়। তারপর, হাতের জিনিষটা সযত্নে নামিয়ে রেখে সে বলে,—

—না। হেনরী লরেন্সের ওষুধের গ্লাস। কোন্ সাল যেন? হ্যাঁ আঠার শ' সাতান্ন। লরেন্স-এর সঙ্গে লুকিয়ে যে মুসলমান হাকিম দেখা করতে এসেছিল, আসলে সে ছিল তুর্কীর পাশা-র গুপ্তচর, যাকে বাহাদুর শাহ ফর্মাণ দিয়েছিল......... ...

আর ধরনীর মনে হয়, সে যেন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গল্পের জাদুকরের সঙ্গে কথা বলছে। এমনি করে তার কথায় ভুলবার জন্যে মনকে প্রস্তুত করে-ই সে নিকোলাস-এর দোকানে বিদেশী ট্যুরিস্টদের নিয়ে ঢুকেছে। এর সমস্তটা বানানো, সমস্তটা একটা উচ্চ-স্তরের সেলসম্যানশিপ, তা জেনে-ও এই বুড়ো গ্রীক-এর দোকান থেকে ট্যুরিস্টরা ওয়ারেণ হেস্টিংস-এর ডুয়েল লড়বার পিস্তল, বার্নিয়ার-এর চামড়ার ঝোলা, ট্যাভার্নিয়ার-এর নস্যিদানী, আকবরের আলবোলার নল, শিবাজীকে যে মদ সরবরাহ করতো তার নিজের ব্রান্ডি খাবার জাগ, মিউটিনির খবরে লর্ড ক্যানিঙ-এর মাথা গরম হলে, সেই মাথা ঠাণ্ডা করবার গোলাপজলের শিশি, থ্যাকারের ছোটবেলার ছাতা, অবিশ্বাস্য সস্তা দামে কিনেছে।

ধরনীর কাছে নিকোলাস নিজে-ই একটা অদ্ভুত আকর্ষণের চরিত্র। গল্প বলার কায়দাকে আয়ত্ত করবার জন্যে, সে বসে বসে নানারকম বই পড়ে। এ দেশে দুই পুরুষের বাস। ঝরঝরে বাংলা বলতে পারে। তা ছাড়া, ধরনী দেখেছে নিকোলাসের একটা সততা আছে। সে বুঝেছে, যারা এই সব সীসে, তামা, কাচের টুকিটাকি কিনছে, তারা তার গল্পবলার কায়দাটুকুর-ই দাম দিচ্ছে। সে নিজেই ধরনীকে বলেছে—'Old man Nicholas all over World Many City many Nicholas. All know. No pretention.'

ধরনী যখন গ্রেট ইস্টার্ন, গ্র্যাণ্ড বা ফিরপোর লবি-তে এই সব গল্প করেছে, কোন কোন ট্যুরিস্ট-এর ভাল লেগেছে। ট্যুরিস্ট-রা শীতকালে ভারত দর্শন করতে আসে। রিয়াল ইণ্ডিয়া বলতে যা বোঝায় কলকাতায় তার কিছু নেই। বেনারসের মতো শ্মশান, বা গঙ্গার ঘাট নেই, হরিদ্বারের মতো সাধু-সন্ন্যাসী, আগ্রা দিল্লীর মতো ধ্বংস-স্তূপ, মথুরার মতো ডিভাইন টেম্পল নেই।

ধরনী যখন নিকোলাসের মতো, নিকোলাসের ভঙ্গীতে, কলকাতার ইতিহাস, নবাবী আমলের শেষ আর কোম্পানী রাজত্বের প্রথম দিনের আশ্চর্য, অবিশ্বাস্য রূপকথা বলেছে, তারা আকৃষ্ট হয়েছে।

তাদের ধরনী নিকোলাসের দোকানে এনেছে। আর, নানা বই, নানা গল্প কাহিনীর খাজাঞ্চি নিকোলাস বারবার-ই তাদের মুগ্ধ করতে পেরেছে। একবার, একই ট্যুরিস্ট সীজনে, তিনজনের কাছে হেস্টিংসের প্রতিদ্বন্দ্বীর একমাত্র পিস্তল বিক্রী করে সে মুস্কিলে পড়েছিল। সে রকম ভুল নিকোলাস বারবার করে না। বয়স হবার সঙ্গে সঙ্গে সন তারিখটা একটু গোলমাল হয়ে যায়। অ্যামেরিকানরা 'মুঘল মিনিয়েচার' পছন্দ

করে, ইংরেজরা 'কোম্পানী রেজিম'-এর স্মৃতিচিহ্ন. সে বিষয়ে কিন্তু ভুল হয় না। নিকোলাস ধরনীর একটা আবিষ্কার।

নিকোলাস নিজেই যখন ধরনীকে ডেকে পাঠাল, ধরনী একটু অবাক হয়েছে। নিকোলাস ত তাকে ডাকে না, সে-ই বারবার যায়। খবরের কাগজে মাঝে মাঝে লেখা, আর ট্যুরিস্টদের সঙ্গী হয়ে এদিক-সেদিক ঘোরা, এ ছাড়া কোন বাঁধাধরা কাজ ধরনী জোগাড় করতে পারেনি।

নিকোলাসের ছেলে এসেছিল ধরনীকে ডাকতে। নিকোলাসের দোকানে পৌঁছে ধরনী অবাক হলো। নিকোলাস-কে এত উত্তেজিত সে কোনদিন দেখেনি। মনে হলো, এতদিনে উত্তেজিত হবার মতো সে কোন দামী জিনিষ পেয়েছে, যা রাবিশ নয়, জঞ্জাল নয়। যার নিজের কোন দাম নেই বলে নিকোলাসকে গল্পের জাল বুনে তাতে মূল্য আরোপ করতে হয়। উত্তেজনায় নিকোলাস বাংলা ইংরেজী মিশিয়ে ফেলল। বললো,

—ট্রেজার ফাইন্ড। নো হোকাস--পোকাস।

—কি ট্রেজার?

—সি।

দেখল ধরনী। অতি পুরনো, বিবর্ণ একটা চামড়ার কেস। আর একটা তাবিজ। সোনার চেনে, সোনার তক্তিতে, একটা সবুজ পাথর। পাথরটা ঘিরে ফার্সীতে কতকগুলো ক্ষয়ে যাওয়া অক্ষর।

—কি এটা?

—শাহ আলমের মিসিং জুয়েল। ম্যান্, তুমি চামড়ার কেসে নামটা পড়তে পারছ?

প্রথম নামটা পড়া গেল না। তারপর L...n...all...ম্যাগনিফাইং গ্লাসের নিচে ধরতে বোঝা গেল।

নিকোলাস গড় গড় করে বলে গেল। কাল দু'জন গ্রীক খালাসী এসেছিল। তেহেরাণের কোন্ দোকান থেকে চোরাই-মাল, চোরের ওপর বাটপাড়ি করতে গিয়ে তাদের হাতে চলে আসে। এই তাবিজটা অলক্ষুণে। তারা নিজেই দেখেছে দোকানদার কেমন করে ব্যবসা নষ্ট করেছে, তারপর আত্মহত্যা করেছে। তাদের আর একজন. সঙ্গী মারা গেছে এডেনে। তারা নিজেরা দাঙ্গাবাজি করে দু'দিন জেলে আটক থেকেছে, অস্ট্রেলিয়ার জাহাজ তাদের ফেলে চলে গেছে। একজন বন্ধুর কাছে নিকোলাসের খবর পেয়ে তারা এসেছে। দু'জন গ্রীক খালাসী মোগলবাদশা-র খাস এমারেল্ড বিক্রী করতে সাহস পায়নি।

—কিন্তু ব্যাপারটা কি? আমায় ডেকেছ কেন?

—তুমি জুয়েলারের কাছে এর পাথরটা যাচাই করবে। তুমি তোমাদের কাগজের লোকের কাছে এর ইতিহাসটা জানবে। সি ম্যান, তুমি লেখাপড়া জান। তুমি ওল্ড্ ফ্রেন্ড্।

নিকোলাস যে ভাবে কাগজের লোকেরা সবজান্তা হয়, তাতে ধরনীর হাসি পেল। বললো—আমি তাদের কি বলব?

—ম্যান, তুমি শাহ আলমের জুয়েলের কথা জান না?

না। ধরনী জানে না। সে ঔরঙ্গজেব, শাজাহান, এই সব নাম মনে করতে পারে।

—ম্যান, শাহ আলম দিল্লীর বাদশা ইন্ সেভেন্‌টিন্ এইটিজ্। ব্লাইন্ড এম্‌-পারর। ক্রুয়েল ফেট্।

—বুঝলাম। এখন বল।

নিকোলাস গড় গড় করে শাহ আলমের ইতিহাস বলে গেল। মহাদাজী সিন্ধিয়া যখন শাহ আলমের কাছ থেকে, নিজে পেশোয়ার মুখপাত্র হবার সনদ আদায় করলেন, তখন শাহ আলম বৃদ্ধ। ঔরংজেবের সময় থেকেই দিল্লীর সম্রাট-দের অর্থাভাব। আর ঔরংজেবের নাতির নাতি দ্বিতীয় শাহ আলমের সময়ে বাদশাজাদা বাদশাজাদীদের নিত্যকার খাবার মেলে না। চাকর-বাকর মাইনে পায় না। দিল্লীর জাঁকজমকে যেমন ধুলো তেমনই অযত্নের ছাপ। হঠাৎ কোন মাননীয় অতিথি এসে হুমকি দিলে দরবার সাজাবার জন্যে ফুটোফাটা ছাড়া একটা নতুন কানাও পাওয়া যায় না।

শাহআলমের দুই উজীর পরস্পরকে খুন করেছেন। অন্তত তাঁদের হাতে যে খুন হবেন না, এই ভরসায় বাদশা আপাতত নিশ্চিন্ত। যদি পেটভরে খেতে পাওয়া যায়, আর ঘাতকের হাতে না মরতে হয়, তা'হলে বাদশাহ যে কোন শক্তি, সে ইংরেজ, মারাঠা বা অন্য কেউ, তার হাতে দিল্লীর সিংহাসনের ভার দিয়ে বাণপ্রস্থে যেতে রাজী আছেন। মহাদাজী ভরসা দিলেন তাঁকে মাসে আশী হাজার টাকা সংসার খরচা দেওয়া হবে। দিল্লী আগ্রার শাসনভার সিন্ধিয়া-ই নিলেন।

কিন্তু দিল্লীর সিংহাসনও যেমন খালি থাকে না, তেমনি আর একদল লোকের-ও অভাব হয় না। তারা সিংহাসনের আশেপাশে শয়তানের মতো অপেক্ষা করে। সুবিধে পেলেই একজনকে নামিয়ে আর একজনকে তক্তে বসায়। তাদের ঘুষ দিতে দিতে বাদশা-রা ফতুর। দেওয়ালের পাথরের নিচের গুপ্ত তোষাখানা খালি হতে থাকে, তাদের কোমরের পেটি মোটা হতে থাকে।

এবার, মহাদাজী সিন্ধিয়ার সৈন্যরা যখন আগ্রায় লড়াই করতে ব্যস্ত, স্বার্থ-সন্ধী গোলাম কাদের দিল্লীতে হাজির হলো।

নামে-ই বাদশা। এদিকে যে-ই আসে, তাকে 'বাপু বাছা' বলে সম্মান জানাতে কসুর করেন না বাদশা। গোলাম কাদেরকে-ও বুড়ো বাদশা যথেষ্ট সম্মান জানালেন।

কিন্তু ভবী ভোলবার নয়।

গোলাম কাদেরের ভাবগতিক দেখে বাদশা মহাদাজীকে চিঠি পাঠালেন। এস-ও-এস শীঘ্গির এস।

গোলাম কাদের চিঠি বাজেয়াপ্ত করলো। মহাদাজী ইচ্ছে করলেও আসতে পারতেন না। নতুন সৈন্যদল না এলে তাঁর অবস্থাও বিপন্ন।

গোলাম কাদের ইতিহাসের অন্ধকার জগতের মানুষ। অত্যাচার, অনাচার, লোভ আর প্রবঞ্চনার মধ্যেই তার জন্ম। তার ধারণা হলো, দিল্লীর প্রাসাদের কোথাও না কোথাও অজস্র হীরে-মুক্তো লুকোন আছে। আর তার সন্ধান যদি কেউ রাখেন ত' শাহআলম-ই রাখেন। প্রথমদিন সে শাহআলমের মাথা কেটে ফেলবে বলে শাসাল। বাদশা আশ্বস্ত হলেন। ফরুখশিয়ার মরেছেন, চোখ উপড়ে নেবার পর অসহ্য যন্ত্রণা পেয়ে। জ্যান্ত অবস্থায় চামড়া খুলে নেওয়া বা হাত পা কেটে কবন্ধ করে রাখা, এর চেয়ে মাথা কেটে ফেলা অনেক আরামের। কৃতজ্ঞ বাদশা খোদাতাল্লাকে ধন্যবাদ জানালেন।

না। গোলাম কাদের অত বোকা নয়। তা ছাড়া দিল্লীর মোগলদের সে সব ধনরত্ন সবই কি নাদির শাহ নিতে পেরেছিল? সবই কি একে একে গেছে? গুপ্তধনের নেশায় সে নুরজাহানের সেই পান্নার কণ্ঠি, শাহজাহানের সেই মুক্তো-বসানো পানপাত্রের সেট, গোলকুন্ডার হীরে বসানো ঔরংজেবের কোমরবন্ধ-এর স্বপ্ন দেখতে লাগল। সে সব জহরতের ত' খবর পাওয়া যায়নি? না কি রক্ত আর মৃত্যুর যে ঢেউ বারবার দিল্লীর সিংহাসনকে রাঙিয়ে দিয়ে গেছে তার ঢেউয়ে-ই ভেসে গেছে সব? শাহজাদা বেগম, শাহজাদীদের কয়েদে রেখে গোলাম কাদের শাহআলমকে চাবুক

—ট্রেজার ফাইন্ড্। নো হোকাস—পোকাস"

মারল প্রথমদিন। তারপর হারেমে ঢুকে বেগম ও শাহজাদীদের গা থেকে গয়না কেড়ে নিয়ে তাদের রাস্তায় বের করে দিল। মরিয়া হয়ে শাহআলম বললেন—আমাকে টুকরো টুকরো করে কেটে দেখ, আমার গায়ে কি লুকিয়ে রেখেছি আমি?

পাঠানরা যখন বাদশার গায়ে হাত দিল, শাহআলম চীৎকার করে তাঁর গলায় হাত দিলেন। পাঠানরা গোলাম কাদেরের আদেশে হাসতে হাসতে ছুরি দিয়ে বাদশার এক চোখ তুলে নিল। বাদশা সহসা গলায় হাত দিয়ে তাঁর তাবিজ ধরে বিড়বিড় করে কি বলতে লাগলেন। আর এক চোখের ওপরেও নেমে এল ছুরি।

তাবিজ ছিঁড়ে নিল গোলাম কাদের। দুই চোখ দিয়ে রক্ত পড়ছে, শাহআলম বিড়বিড় করে কি বলে চলেছেন। সহসা গোলাম কাদেরের হৃৎপিন্ডটা কোন্ অজানা অলৌকিকের আশঙ্কায় কুঁকড়ে গেল। সে বিকৃত কণ্ঠে বলল—কি বলছ, কি বলছ তুমি?

শাহআলম দুই রক্তাক্ত কোটর গোলাম কাদের-এর মুখের দিকে তুলে ধরে অদ্ভুতভাবে হাসলেন। বললেন—গোলাম, তুই তৈমুর বংশের রক্ষাকবচ ছিঁড়ে নিয়েছিস। এই কবচকে অভিশাপ অনুসরণ করবে। কুকুরের মতো মরবি তুই। এই কবচ যার হাতে যাবে তাকে-ই শেষ করবে। মরলে পরে তাদের আত্মা শকুনের মতো, কুকুরের মতো, জঙ্গলের পশুর মতো কেঁদে কেঁদে ঘুরবে। এবার আমি নিশ্চিন্তে মরব। আমার বংশের অভিশাপ তোর সঙ্গে যাক।

ঠিক তাই হলো। বাদশা-র ধনরত্ন নিয়ে পালাতে গিয়ে গোলাম কাদের মীরাটে, সিন্ধিয়ার ফরাসী কম্যান্ডার লেস্ডিনো-র হাতে ধরা পড়ে। সিন্ধিয়ার আদেশে লেস্ডিনো-র সৈন্যরা গোলাম কাদেরের চোখ নাক কান ছিঁড়ে ফেলে। সেই রক্তাক্ত প্রেতমূর্তি-কে তারা যখন ফাঁসীতে ঝোলায়, গোলাম কাদের হাসতে হাসতে বলেছিল—বহুৎ আচ্ছা। খুব সাবাস। তৈমুর বংশের অভিশাপ এবার সায়েবের সঙ্গে সঙ্গে যাক। ছেড়ে যাক হিন্দুস্তান।

লেস্ডিনো সেই ধনরত্ন নিয়ে হিন্দুস্তান ছেড়ে পালায়। সিরিয়ায় পৌঁছবার আগেই, মরুভূমিতে শেখরা তার সব কিছু লুঠপাট করে নেয়। গোলাম কাদের মরেছিল ১৭৮৯-তে। ১৮১৩-তে সিরিয়া শহরে চুল দাড়ি গোঁফে ঢাকা মুখ অপ্রকৃতিস্থ জ্বলন্ত চোখ, এক পাগল ফরাসী-কে দেখা যেত। এক বোতল মদ খেতে দিলে সে সিন্ধিয়াকে গালাগালি করতো। দুই বোতল মদ খেলে সে মহাদাজী সিন্ধিয়া, দ্য বয়েন, কাপ্তেন পেরোঁ, এই সব নাম করতো আর তিন বোতল মদ দিলে সে হামা দিয়ে মাটি আঁচড়ে শাহআলমের তাবিজের তল্লাস করতো। লেডি স্ট্যানহোপ মাঝে মাঝে তাকে খেতে দিতেন। অনেকদিন পরে নেপোলিয়নের এক অফিসার আর এক লেস্ডিনো-র সঙ্গে ঐ সিরিয়াতেই লেডি স্ট্যানহোপের খুব প্রেম হয়েছিল। নতুন অফিসারটির বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়েছিল, ঐ লোকটা তার বাবা, যে ইণ্ডিয়াতে লড়তে এবং ধনী হতে এসেছিল। সে এবং লেডি স্ট্যানহোপ যখন বাগানে বেড়াতেন,

তখন বুড়ো লেস্‌ডিনো বিড়বিড় করে তাদের-ই পেছন পেছন তৈমুর বংশের অভিশাপকে তাড়াতে তাড়াতে চলতো।

নিকোলাস বললো—চামড়ার খাপটায় L...n...au পড়তে পারছ? এ নিশ্চয় L-e-s-t-i-n-e-a-u'র নাম। শোন ম্যান, শোন ইয়ং ফ্রেন্ড, তুমি একজন জুয়েলারকে ডাক। আমি এটা যাচাই করাব। ট্রু এমারেল্‌ড্‌। তাহ'লে আমি এটা কিনব। ওরা কাল আসবে।

—কিনে কি করবে?

ধরণী কথা খুঁজে পাচ্ছিল না।

নিকোলাস আস্তে বললো—আই উইল প্রেজেণ্ট ইট টু ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট।

—হোয়াট?

ধরণী তার কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না।

নিকোলাস বললো—মি নো ফুল ইয়ংম্যান। আমি পুওর গ্রীক। অলওয়েজ ড্রিম অফ্‌ গ্রেট থিংস। কিছু করতে পারি না। আমি এটা প্রেজেণ্ট করব। তুমি আমার নাম দিয়ে সব গল্পটা লিখে দেবে। কাগজে ছাপিয়ে দেবে।

—তাতে কি হবে?

—কি হবে?

নিকোলাস মস্ত একটা চুরুট ধরাল। বললো—ম্যান, তুমি ডুয়িং নট্‌ মাচ। এতে তোমার গ্রেট পাবলিসিটি। হয়তো কাগজের লোকরা তোমাকে মস্ত চাকরী দেবে। আমি দেখেছি, তুমি একটা কাজের জন্যে কত চেষ্টা কর। মে বি, ওরা তোমাকে পাত্তা দেয় না। গ্রেট চানস্‌ পাবলিসিটি। আর ফর মি টু। আমার দোকানে সবাই আসবে। সবাই নাম জানবে।

এমনভাবে বললো কথাটা নিকোলাস যে ধরণী রাগ করতে পারল না। নিকোলাস কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বললো—আমার মতো অনেক লোক কলকাতায়। আর্মেনিয়া, গ্রীস, প্যালেস্টাইন, দে উইল নেভার নো। এখানে-ও তাদের কোন জগৎ নেই। তোমাদের শহরে, তোমাদের দেশে, আমরা মাঝে মাঝে লস্ট ফীল করি। মে বি, দিস্‌ গুড্‌ জেশ্চার অন্‌ পুওর গ্রীক্‌স পার্ট।

হঠাৎ প্রায় ক্রুদ্ধ স্বরে সে বললো—'আই উইল ফীল ইণ্ডিয়া মাই ট্রু কাণ্ট্রি। আমি তাদের জিনিষ তাদের হাতে দিয়েছি। এটা কোথায় কোথায় কত জায়গা ট্র্যাভেল করেছে। আবার ফেট একে ইণ্ডিয়ায় ফেরৎ দিয়েছে। এখন দ্যাট গ্রেট ডিনেষ্টি ইজ ডেড। ইণ্ডিয়ার নিজের সব ট্রেজার দেশের বাইরে। ইংল্যাণ্ড ইচ্ছে করলে তার রাজাদের সব জুয়েলারি দেখাতে পারে। ইণ্ডিয়া হ্যাজ্‌ নাথিং'। এটাকে সবাই দেখবে। প্রেজেণ্টেড্‌ বাই নিকোলাস হিপারোদিকাস্‌, কিউরিও মার্চেণ্ট, ক্যালকাটা, ন্যাচারালাইজ্‌ড ইণ্ডিয়ান। ম্যান, আমি যখন ফ্রিস্কো-তে ছিলাম, তারা এ সব গল্প ডলার দিয়ে কিনে নিত। তুমি বুঝতে পারছ না।

নিকোলাসের দোকান থেকে সতেরো শ' আশী আর আঠারো শ' তেরো-র সময় থেকে, ধরণী উনিশ শো ষাটের কলকাতায় বেরিয়ে এল। রোদ্দুরে চোখ মেলতে অসুবিধে হলো তার, শুঁটকী মাছের গন্ধ নিশ্বাসের সঙ্গে নিতে কষ্ট হলো।

প্রথম সে ইতিহাসের খোঁজ নিতে ডক্টর দত্ত-র বাড়ীতে ছুটেছিল। তিনি ইতিহাসটা সমর্থন করলেন, তাবিজটাকে নয়। নিউমার্কেটে তার পরিচিত সিন্ধী জুয়েলারটিকে নিয়ে নিকোলাসের কাছে যেতে তার দু'দিন দেরী হয়েছিল। কাগজের অফিসে উৎসাহের বশে গল্পটা বলে ফেলেছিল ধরণী। নিজেকে তার মনে হচ্ছিল ভাগ্য নির্দিষ্ট কোন অসাধারণ লোক। তার হাত দিয়ে শাহ-আলমের তাবিজের রহস্য প্রকাশ পাবে। তৈমুর বংশের প্রাচীন সম্পদ দিল্লী বা কলকাতার মুাজিয়াম-এ শোভা পাবে। এমন কি, এটা যেহেতু কলকাতায় আবিষ্কার হয়েছে, সে হেতু কলকাতায়-ই থাকবে, এই মর্মে কোন দাবী জানানো যায় কিনা, সে কথা-ও ভেবেছিল ধরণী। নিকোলাসের সম্পর্কে সে একটা অদ্ভুত আত্মীয়তা অনুভব করেছিল। আর সংগে সংগে-ই, সাংবাদিক জগতে নাম করবার মতো সে একটা গবেষণার বিষয়ও খুঁজে পেয়েছিল। সত্যিই ত' যে সব দেশ বিদেশের মানুষ এমনি করে কলকাতা, বম্বে, মাদ্রাজের বন্দরে ছিটকে পড়ে, যারা বছরের পর বছর এ দেশেই থেকে যায়, তাদের পেশা নিয়ে, তাদের জীবন নিয়ে সে লিখবে। এবং কোন একদিন বিলেতের বি, বি, সি-তে সে এই সব শ্যাওলার মতো ভাসমান মানুষদের নিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে, এ রকম স্বপ্নও ধরণী দেখতে পেরেছিল।

সে এবং সিন্ধী জুয়েলারটি যখন নিকোলাসের দোকানে পৌঁছিয়েছিল, তখন রাস্তায় ভীড়। পুলিশের গাড়ী এখানে সেখানে থেমে থাকা, ফিসফিস করে কথা বলা জনতা।

ধরণী দৌড়তে সুরু করেছিল। দৌড়ে ভীড় ঠেলে সে যখন ঢুকতে পেরেছিল, তখন নিকোলাস হিপারোদিকাস, কিউরিও মার্চেণ্ট অফ্‌ ক্যালকাটা, ন্যাচারালাইজ্‌ড ইণ্ডিয়ান এ্যাম্বুলেন্সে চড়ে মর্গে যাবার জন্যে তৈরী। কিউরিও শপ লণ্ডভণ্ড। টেবিলে ল্যাম্পটা তখনো জ্বলছে। কাঁদতে কাঁদতে, হাত মোচড়াতে মোচড়াতে নিকোলাসের ছেলে পুলিশ অফিসারকে কথার জবাব দিচ্ছে।

ধরণী পুলিশ অফিসারকে সব কথা বলেছিল। তিনি তার সাহায্য ভালভাবেই গ্রহণ করেছিলেন। তবে শাহআলম, তাবিজ, লেস্‌ডিনো সব কথা বাদ দিয়ে একমাত্র ঐ গ্রীক খালাসী দুটির প্রসংগকেই গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

হ্যাঁ। তারাই খুন করেছিল। মেটিয়াবুরুজের শুঁড়িখানায় যাকে ধরা গিয়েছিল, সে স্বীকার করে যে হ্যাঁ, তার সঙ্গীর সঙ্গে সে-ও গিয়েছিল বুড়ো শয়—তানের কাছ থেকে তাবিজটা আনতে। বুড়ো রেগে গিয়ে তাদের বলে-

ছিল, এটাতে তাদের কোন অধিকার নেই। পরদিন সে তাদের ডার্টি মানি দিয়ে দেবে।

কিন্তু তার সংগী তখন আর তাবিজটা বিক্রী করতে চায় না। সে মন বদলিয়েছে। তাদের জাহাজ তৈরী। এই নিয়ে বুড়োর সংগে হাতাহাতি। আর বুড়ো যদি নিজে জোর করে পরের জিনিষ আটকে রেখে, হঠাৎ চোর চোর বলে চীৎকার না করতো, তাহ'লে বোধ হয় তার সংগী ছোরা বের করতো না। তার সংগী খুন করেছে, তার সংগী তাবিজটা নিয়ে পালিয়েছে। তার নিজের ডান হাত ত' ভাঙা। প্ল্যাস্টার করা। পুলিশ বলুক, তার পক্ষে কি খুন করা সম্ভব? তার হাতের ছাপ কি কোথাও আছে?

প্রমাণাভাবে এই খালাসীটি মুক্তি পায়। তার সংগীর আর কোন খবর পাওয়া যায়নি। তবে অনেকদিন পরে, অস্ট্রেলিয়াগামী জাহাজে কয়লা ঘরের পাশে একজন গ্রীক নাবিকের মৃতদেহ খুঁজে পাবার কথা কোন ইংরেজী কাগজের এক কোণাতে পড়ে ধরণীর বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়েছিল, সে-ই নিকোলাসের হত্যাকারী।

ধরণী এখনো কোন কাজ পায়নি। এখনো সে ট্যুরিস্টদের সংগে গডেস্ কালীর টেম্পল, গ্রেট সেইন্ট রামকৃষ্ণর দক্ষিণেশ্বর মার্বেল প্যালেস আর ডায়মণ্ডহারবার ঘোরে। তবে কিউরিও কিনতে সে কখনো যায় না। কিউরিও'র কথা বললে সে চুপ করে থাকে। যে ট্র্যাভেল এজেণ্ট তাকে কাজ দেয় সে ধরণীর পেছনে বিড়বিড় করে বলে—'নো মোর ফ্যাসিনেটিং স্টোরিজ! দাঁড়াও সীজন্ গেলেই তোমায় বিদায় করে দেব।

শাহআলমের তাবিজের কথা বললে ধরণী মেজাজ ঠিক রাখতে পারে না। তার মনে হয়, কোথায়, কোন্ জায়গায় এখনো তাবিজটা কার হাতে ঘুরছে ফিরছে, কার ভাগ্যে অভিশাপ টেনে আনছে।

—এ প্রসংগে তুমি অমন খাপ্পা হয়ে যাও কেন?

তার ট্র্যাভেলিং এজেণ্ট কানুভাই বলে। বলে—সব বাজে কথা। পাথরটা সাঁচ্চা হতে পারে না। সে বিষয়ে প্রমাণ কি?

ধরণী বোঝাতে পারে না, সাঁচ্চা না ঝুটো, সেটা যাচাই হবার জন্যে অপেক্ষা করেনি তাবিজটা, তার আগেই নিকোলাসের পিঠে ছোরা নামিয়ে এনেছিল, তাতে-ই অবিসংবাদিতভাবে প্রমাণ হয়ে গেছে ওটা-ই শাহআলমের তাবিজ। কান্দাহার, গজনী ও কাবুলের সাতজন পীরের মন্ত্রপূত, তৈমুর বংশের দুর্ভাগ্য অন্য মানুষদের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার জন্যে প্রতিশ্রুত অভিশপ্ত তাবিজ। আর কত মানুষের জীবন যুগের পর যুগ অভিশপ্ত করেছে তাবিজটা, সেই বৃহৎ ইতিহাসের ট্র্যাজেডি ধরণীকে স্পর্শ করে না। সে সব কথা সে মনে রাখেনি। শুধু, একজন নিকোলাস হিপারোদিকাস, ন্যাচারালাইজড ইণ্ডিয়ান-এর একমাত্র স্বপ্নটা ভেঙে দিয়েছে তাবিজটা, সেই জন্যে ধরণী সেটাকে ক্ষমা করতে পারে না।

কানুভাই বলে, ওটা ধরণীর ভাবপ্রবণতা।

স্ত্রীর চেয়ে বড়

শ্রীসুমথনাথ ঘোষ

সত্যি কথা বলতে কি স্ত্রী কুলত্যাগ করেছে শুনলেও এতটা অভিভূত হয়ে পড়তেন না ভবেশবাবু সেদিন বাড়ীতে পা দিতেই যখন শুনলেন রামুয়া চাকরটা কাজ ছেড়ে চলে গেছে, আর তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে, কমলা নিজে!

শুধু একবার 'এ্যাঁ' এই বিস্ময়সূচক শব্দটা মুখে উচ্চারণ করেই তিনি এমন-ভাবে স্তব্ধ হয়ে গেলেন যেন এর চেয়ে মর্মান্তিক দুঃসংবাদ তাঁর জীবনে আর কিছু নেই বা হতে পারে না। তাঁর কণ্ঠ ভেদ করে যতটুকু শোকোচ্ছ্বাস বেরিয়ে এলো, তাকে আর্তনাদ বললে ভুল হয়, বুঝি তার চেয়েও আরো কিছু বেশী, ভাষা দিয়ে যার গভীরতা পরিমাপ করা যায় না।

কমলার কানে তা যেন দশগুণ বর্ধিত হয়ে বাজে! স্বামীর সামনে এসে, হাতমুখ ঘুরিয়ে, এক ঝলক উত্তপ্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে বললে, তখনি বারণ করেছিলুম কুকুরকে এত 'নাই' দিয়ে মাথায় তুলো না। আস্তাকুড়ের ফুলে কোনদিন ঠাকুরের পুজো হয় না। যেমন আমার কথা শোনোনি, তেমনি ফলভোগ করো এখন।

সিঁড়ি দিয়ে তরতর ক'রে নেমে এসে যেন শত্রুপক্ষের ওপর একটা বোমাবর্ষণ করে, সঙ্গে সঙ্গে আবার ওপরে উঠে গেল কমলা।

ভবেশবাবু কেবল হতবাক নয়, হত-বুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন ঠিক তেমনি, সেই জায়গাটিতে। তাঁর মাথার মধ্যে সব যেন কেমন ঘুলিয়ে ওঠে। রামুয়া শুধু পুরনো চাকর ছিল না—যেমন বিশ্বাসী তেমনি নির্ভরশীল, তেমনি সকল কাজে সুদক্ষ। একাধারে চাকরকে চাকর, রাঁধুনীকে রাঁধুনী, আবার ম্যানেজার বললেও অত্যুক্তি হয় না। মোটকথা সংসারের যাবতীয় কাজ—জুতো সেলাই থেকে চন্ডীপাঠ সব কিছু সে একাই করতো। সবচেয়ে বড় কথা, তার হাতে সর্বস্ব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন যেমন ভবেশবাবু, তার চেয়ে বেশী তাঁর স্ত্রী, কমলা!

তাই তিনি বুঝতে পারেন না, অপিসে যাবার আগে পর্যন্ত যে ছিল কমলার একান্ত অনুগত ও বিশ্বাসের পাত্র, সংসারের সর্বময় কর্তৃত্বের পদে সগৌরবে অধিষ্ঠিত, হঠাৎ এই ক'ঘন্টার ব্যবধানে, এমন কি গুরুতর অপরাধ সে করলে যার জন্যে ভবেশবাবুর অপিস থেকে ফিরতে স্বর সইলো না, তার আগেই দূর করে দিতে হলো রামুয়াকে?

অথচ যদি কেউ আদর দিয়ে তাকে মাথায় তুলে থাকে ত সে কমলা নিজে! বাইরের লোক এসে কতদিন কমলার ছেলে বলে তাকে ভুল করেছে। খাওয়ায় পরায় চাকর বলে কোনদিন সে এতটুকু অযত্ন করেনি। সরু চালের ভাত, প্রথম পাতে ঘি। চায়ের সঙ্গে টোস্ট, ডিম, যেমন নিজেরা খেতে ভালবাসে ওকেও তেমনি দিতো একটা সমান অংশ। দশ বছরের এতটুকু বালক চাকরী করতে এসেছিল তখন থেকে একুশ বছরের যুবকটি হওয়া পর্যন্ত কোনদিন এর ব্যতিক্রম ঘটতে দেয়নি কমলা।

বরং ওর এই ভাল খাওয়া ও ভাল জামাকাপড়ের জন্যে অতিরিক্ত খরচপত্রের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে ভবেশবাবু ধমক খেয়ে চুপ করে গিয়েছেন। কমলা বলেছে, চাকর বলে সে কি মানুষ নয়। তার মনে কি সাধ-আহ্লাদ কিছু থাকতে নেই! ভাল খেতে নেই, ভাল পরতে নেই? তাই কমলা নিজে রামুয়াকে দূর করে দিয়েছে শুনে ভাবান্তর উপস্থিত হয় তাঁর মনে। তবে কি? কি জানি! 'মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম'! কমলা বাড়ীতে একা থাকে! ঝিটা কাজ করে দিয়ে চলে যায়। ভ্রূ-কুঞ্চিত করে সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে ওপরে উঠতে থাকেন ভবেশবাবু। মাঝপথে হঠাৎ কমলার ঝাঁজালো কণ্ঠস্বর কানে আসতে থমকে দাঁড়ান। ছিঃ ছিঃ তোর জন্যে কি না করেছি ছোটজাত, চাকর বলে, কোনদিন অযত্ন অনাদর করিনি আর এই তার পুরস্কার? বেইমান, নেমক্‌হারাম, কোথাকার!

ভবেশবাবু কমলার ঘরে গিয়ে বলেন, আসল ব্যাপারটা কি বলোত, আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না।

কমলা একথার কোন উত্তর না দিয়ে ছুটে গিয়ে বিছানা থেকে তার মাথার বালিশটা এনে ভবেশবাবুর নাকের কাছে

তুলে ধরলে। তিনি মুখটা সরিয়ে নিলেন। উ' বিচ্ছিরী তেলের গন্ধ!

যেন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি হ'লো। দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে কমলা, হাঁ, আর এই দ্যাখো স্পষ্ট খোঁপার ছাপ। বলে আবার বেড্‌কভারের উপর থেকে একটা নুতন ধরণের প্লাস্টিকের কাঁটা তুলে এনে ভবেশবাবুকে দেখিয়ে বললে, এটা সেদিন কালীঘাট থেকে কিনে এনে দিয়েছিলুম, ওই ক্ষেন্তি ঝিটাকে!

কাঁটাটা কেবল দেখালে না কমলা, যেন ভবেশবাবুর চোখের মধ্যে বিঁধিয়ে দিয়ে সব কিছু বুঝিয়ে দিলে!

এত বড় আস্পর্দ্ধা তোমার ওই পেয়ারের চাকরের যে, তাকে শুধু একটা কথা বলেছি, হাঁরে এই জন্যে বুঝি বিশ্বাস করে তোর হাতে ঘরদোরের চাবী ছেড়ে দিয়ে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলুম। আসুক আজ বাবু, তারপর দেখি এর কোন বিহিত করতে পারি কিনা! ব্যস্, আর যায় কোথায়। চাবীটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, টিনের সুটকেসের মধ্যে, ওর জামা কাপড় জুতো, যা কিছু বাইরের ঘরে ছিল সব ভরে নিয়ে, খর খর করে বেরিয়ে গেল বাড়ী থেকে। শুধু ফটকের কাছে একবার থমকে দাঁড়িয়ে বললে, এত কিসের ভয় দেখান, এর চেয়ে ভাল কাজ আমার ঢের মিলবে!

ঠিকই! ভবেশবাবু সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, আজকের দিনে অনেক তপস্যা করলে তবে এ রকম চাকর পাওয়া যায়!

ওগো, না না, তা নয়। আসলে রাগটা হলো, ক্ষেন্তিকে আমি তার আগে বাড়ী থেকে দূর করে দিয়েছিলুম সেইজন্যে! বুঝতে পারছো না, দুই আর দুয়ে চার!

ভবেশবাবু কণ্ঠের ক্রোধ চাপতে চাপতে বলেন, তখনি নিষেধ করেছিলুম, কি দরকার আবার একটা ঝিয়ের—একা সবই ত করছে রামুয়া বরং মাইনে ওর কিছু বাড়িয়ে দাও, তাহলেই ও খুশি থাকবে! তা শুনলে না যেমন আমার কথা। ঘাড়ের বাঁশ ইচ্ছে করে টেনে নিলে নিজের দেহে?

ওই ত আমার রোগ! মানুষের কষ্ট দেখলে আর স্থির থাকতে পারি না। ভাবলুম এই ঠান্ডার দিনে ভোরে উঠে বাসন-কোসন মাজতে জল তুলে ঘরদোর ধোয়ামোছা করতে কষ্ট হয় ওর—ঝিটা থাকলে বাইরের কাজগুলো সে করে দিলে, ও ঘরের কাজগুলো যেমন আরো ভাল করে করতে পারবে তেমনি অনেকটা পরিশ্রমের ওর লাঘব হবে! আমার যেমন মরণদশা, তাই ওর ভালো করতে গিয়েছিলুম।

দেখো কতদিন তোমায় নিষেধ করেছি, বেশী ভাল করার চেষ্টা করো না। যে চাকর তাকে চাকরের মত থাকতে দাও! তাকে মণিবের পর্যায়ে তুললে সে যদি মনিবের খাটে শুতে চায়, তো দোষ কার?

ঘাট হয়েছে! সব দোষ আমার, স্বীকার করছি। বলে খাটের ওপর থেকে বেডকভারটা ছুঁড়ে নীচে ফেলে দিয়ে কমলা বলে চাকর, মানুষের বাড়ীতে কত আসছে, কত যাচ্ছে। কিন্তু তুমি এমনভাব করছো যেন দেশে রামুয়া ছাড়া আর চাকর পাওয়া যায় না।

এর জবাবটা সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁটের ডগায় এসে পড়ে ভবেশবাবুর কিন্তু সামলে নেয় তাড়াতাড়ি শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায়! রামুয়ার মত চাকর যে দুর্লভ, তা ভাল করেই জানতো কমলা। আর জানতো বলেই তাকে তাড়িয়ে দিতে পেরেছে এইভাবে। নইলে লঘু অপরাধে এমন গুরুদন্ড কিছুতেই দিতে পারতো না। ভবেশবাবু অনেকদিন আগে এটা লক্ষ্য করেছেন যে, তাঁর মুখে রামুয়ার সুখ্যাতি শুনলেই কমলার মুখটা যেন কেমন বিবর্ণ হয়ে ওঠে। অথচ সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা এই রামুয়াকেই যখন তখন উপদেশ দিতো কমলা, বাবুর যেন কোন কাজে এতটুকু ত্রুটি না হয়। কোন অসুবিধে না হয়—সব সময় নজর রাখবি সেদিকে। আমার শরীর খারাপ, ও'র অফিস বেরুবার সময় মুখে মুখে হাতে হাতে সবকিছু করতে পারি না, অনেকদিন হয়ত রান্নাই পুরো হয়ে উঠতো না—সেইজন্যেই তোকে এত মাইনে দিয়ে রাখা, ভুলে যাসনি যেন তা কোনদিন।

কথাটা যেমন সত্যি এবং সাধ্বী রমনীজনোচিত তেমনি, এটাও আরো সত্যি, যে দিন থেকে রামুয়া সেবা ও পরিচর্য্যার দ্বারা কেবল ভবেশবাবুর অন্তর জয় করেনি, কমলার উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল, সেইদিন থেকে খুশির সঙ্গে কেমন একটা বেদনা যেন ফুলের মধ্যে কীটের মত তার অন্তরে বাসা বেঁধেছিল। কথাটা হেঁয়ালীর মত শোনালেও চিররহস্যময়ী নারীর অন্তরের গোপনতম প্রদেশে কোথায় যেন একটা কাঁটা খচ্ খচ্ করতো সব সময়। কমলা মুখে তা স্বীকার না করলেও, অন্তর্যামী বুঝি তা জানতেন।

বাথরুমে ঢুকে হুড় হুড় করে বত জল ঢালতে থাকেন ভবেশবাবু, গায়ে, মাথায়, সর্বদেহে তত যেন উত্তাপ বেড়ে যায়। কি জানি কেন, সব আক্রোশটা গিয়ে পড়ে তাঁর কমলার ওপর! এর মধ্যে কমলার একটা সুস্পষ্ট ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত পান। নারীর মন জটিল, ও রহস্যাবৃত। 'দেবাঃ ন জানন্তি কুতঃ মনুষ্যা' :—এই জন্যে বুঝি মুনি-ঋষিরা বলে গেছেন!

রামুয়াকে উপলক্ষ্য করে কমলার মুখ থেকে যে সব উক্তি-জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতসারে হোক তাঁর কর্ণপটাহে আঘাত করেছে, আজ একে একে সব বিশ্লেষণ করতে থাকেন ভবেশবাবু। সত্যি কমলা শিখিয়ে পড়িয়ে রামুয়াকে এমনি তৈরী করেছিল যে, ভবেশবাবু তাঁর প্রয়োজনীয় সব কিছু হাতে হাতে, মুখে মুখে ঠিক ঠিক পেতেন। ঘড়ির কাঁটার তবু নড়চড় হয় কিন্তু তার কাজের এতটুকু এদিক ওদিক হতো না! ভোরে উঠে 'বেড-টি' দেওয়া থেকে শুরু করে স্নানের গরম জল, সেভিংসেট, কাপড় ও চটিজুতো বাথরুমে রেখে আসা, অপিসের ভাত টেবিলে সাজিয়ে দিয়ে, যে জামাকাপড় পরে তিনি বেরুবেন, তা ঠিক আছে কিনা তদারক করা, সিগারেটের টিন, দেশলাই, অপিসের কাগজপত্তরের সঙ্গে রুমাল, চশমা ও ফাউন্‌টেনপেন সব ব্যাগের মধ্যে পুরে দেওয়া, বেরুবার আগে খপ্ করে একবার জুতোটা বুরুশ দিয়ে সাফ করা, খাওয়ার পর বাতে বদহজম না হয় তারজন্যে কবিরাজী গুলীর সঙ্গে এক গ্লাশ জল এনে হাতে দেওয়া প্রভৃতি কাজে যেমন কোনদিন ভুল হতো না তেমনি আবার ফিরে এলে, দরজায় একবার মাত্র কড়া-নাড়ার শব্দ হলে হয়, যে কাজেই থাক, চোখের নিমেষে এসে দরজা খুলে তাঁর হাত থেকে ব্যাগটা আগে নিয়ে ভিতরে চলে যায়।

কতদিন এর জন্যে কমলাকে মন্তব্য করতে শুনেছেন, ওঃ বাবুকে দরজা খুলে দেবার বেলা যেন তোর টনক পড়ে, আর আমি কোনদিন বাইরে বেরুলে, কড়া নেড়ে হাত ব্যথা হয়ে গেলেও তুই শুনতে পাস না! তুমি নিশ্চয়ই কিছু তুকতাক জানো, নইলে আমি ওকে সবসময় ভালমন্দ খেতে দিই, পরতে দিই, তদসত্বেও ও তোমার এত পেয়ারের হয়ে উঠলো কি করে?

ওকেই জিজ্ঞেস করো। বলে মুচকি হেসে স্ত্রীকে বললেও আসল কারণটা কিন্তু তাঁর অজানা ছিল না। রামুয়া ছেলেমানুষ তাই মধ্যে মধ্যে দু'চার আনা বকশিস্ দিয়ে ভবেশবাবু কোনদিন

বলতেন যা আজ সিনেমা দেখিস্, কোনদিন বা বলতেন হোটেলে যা ইচ্ছে খাস্, কখনো বা কিছু না বলেই ওর হাতে আনিটা দোআনিটা গুঁজে দিতেন। তিনি জানতেন, বিড়ি সিগারেট খেতে শুরু করেছে রামুয়া দেশওয়ালী ভাইয়াদের দলে মিশে, তাছাড়া বাঁধা মাইনের চেয়ে 'উপরি' পাওনায় লোভ মানুষ মাত্রেই বেশী!

অবশ্য একেবারে যে ভালোবেসে বিনাস্বার্থে ভবেশবাবু এমন উদার ও মুক্তহস্ত হতেন, তা নয়। রামুয়া তার দৈনন্দিন কর্মসূচীর ওপর যে অতিরিক্ত পরিচর্যা করতো মনিবের, তারি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এই যৎকিঞ্চিৎ বকশিস্। মাথা ধরেছে হয়ত তাঁর, মাথাটা টিপে দিলে, হাঁটু কনকন্ করছে শুনে বেশ করে পা দু'টো ডলাই-মলাই করে দিলে। হয়ত অসময়ে বৃষ্টি এসে পড়লো, ছাতি নিয়ে অফিসে যাননি ভবেশবাবু, বাস্ থেকে নেমেই দেখেন ছাতি হাতে করে প্রশান্তমুখে দাঁড়িয়ে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে সে বড় রাস্তায়। শুধু কি এই, আরো অশেষ গুণ রামুয়ার! মনিবের এই বাড়ীটা যেন তার প্রাণ! একটা ফুল কেউ গাছ থেকে তুললে যেমন তার বুকে বাজে, তেমনি কোন ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষে কেউ কাচের বাসনের সেট্ বা অন্য কিছু 'গালিচা', 'সতরঞ্চি' প্রভৃতি সোখীন জিনিস চেয়ে নিয়ে গেলে, যতক্ষণ না পর্যন্ত আবার সেগুলো বাড়ীতে ফিরিয়ে দিয়ে যায় ওর চোখে যেন ঘুম নেই! নিজেই দু'বার তিনবার তাগাদা দিয়ে নিজেই এক সময় মাথায় করে নিয়ে আসে এমন কি ভিখিরী মাগন বেশী আসতে দেখলেও তার মাথা গরম হয়ে ওঠে! যেন মনিবের পয়সা তারা লুটে নিচ্ছে মনে করে। দরজাটা বন্ধ করে দিতে দিতে বলে, যা না খেটে খেগে যা। রেশনের চাল সস্তা নাকি!

কমলার আবার এই জায়গাটায় সব-চেয়ে দুর্বলতা বেশী। কেউ 'মা' বলে এসে হাত পাতলে, কিছুতেই তাকে শূন্য হাতে ফেরাতে পারে না। পুরনো কাপড়, টাকা-পয়সা, চাল-ডাল ওই রামুয়ার হাতে দিয়েই পাঠিয়ে দেবে। এতে রামুয়ার গায়ে জ্বালা ধরে। কমলাকে স্পষ্টই মুখের ওপর বলে, কি হয় এত সব জিনিস ওই বাজে ঝুটো লোকদের দিয়ে?

আহা ওরা গরীব, বলতে নেই ওকথা! জানিস্, হাত তুলে মানুষকে কিছু দেওয়ার জন্যে ভাগ্য করে আসা চাই।

রামুয়া এ সবের তাৎপর্য ঠিক বুঝতে পারে না। বাবুর কানে মায়ের এই অতিরিক্ত দান-ধ্যানের কথাটা কৌশলে তুলে দেয়, যাতে তিনি নিজে নিষেধ করেন তাকে।

কথাটা স্বামীর মুখে শুনে রাগ সামলাতে পারে না কমলা। ওকে কি তুমি গোয়েন্দা নিযুক্ত করেছো, আমার বিরুদ্ধে, যে আমার দোষ-ত্রুটি ধরে তোমায় লাগায়?

আরে না-না, রাগ করো না! বলে প্রশান্ত হাসি মুখে টেনে ভবেশবাবু স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেন। মনিবের পয়সা খরচ হতে দেখলে ওর কিরকম কষ্ট হয়, এটা তারি দৃষ্টান্ত! ও সত্যি-সত্যি আমাদের একেবারে 'আপন' মনে করে।

মুখটা চট্ করে স্বামীর দিক থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে জবাব দেয় কমলা, আমাকে না। তোমায়?

ওই হলো! আমি, তুমি—আবার আলাদা নাকি!

তাই ত জানতুম। ওর জন্যে এত করে মরি আমি, কিন্তু ও তো দেখি তোমাকেই দেবতার মত শুধু পুজো করে!

ঠোঁটের কোনে হাসি চেপে ভবেশবাবু উত্তর দেন, সে ত তোমার-ই শিক্ষা। পুজোর যা-কিছু মন্ত্র সব-ই ত তুমি তার কানে দিয়েছো!

এখন দেখছি ভুল করেছি! স্ত্রীর কণ্ঠস্বরটা এবার কেঁপে উঠতে ভবেশ-বাবুর কানে যেন তা কেমন বেসুরো লাগে।

সত্যি স্ত্রীর কাছে যে সেবা-যত্ন স্বামীর প্রাপ্য অথচ তিনি পাননি; মায়ের কাছে ছেলের যে স্নেহ পাওয়া উচিত কিন্তু অকালমৃত্যুর দরুণ ভবেশ-বাবুর সে আস্বাদ মেটেনি। রামুয়া যেন একসঙ্গে তাঁর সেই স্নেহ-বুভুক্ষু অন্তরে সব ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করে! ছোট-খাটো কাজ, আপাতদৃষ্টিতে যাকে তুচ্ছ মনে হয়, তার ভেতর দিয়ে যেন ভবেশবাবুর অন্তরকে সে স্পর্শ করে, নাড়া দেয়। যে মাছটি খেতে ভবেশবাবু ভালবাসেন, বিশেষ করে যে তরকারীটা হয়ত তাঁর কাছে খুব প্রিয়, খুঁজে খুঁজে এ বাজার সে বাজার থেকে এনে সে হাজির করে। অসময়ে এঁচোড়ের ডালনা পাতে দেখে

ভবেশবাবু বিস্ময় প্রকাশ করেন, এ্যাঁ এখন কোথায় পেলি এ!

'লেক' বাজার থেকে এনেছি।

কমলার কণ্ঠ রাগে জ্বলে ওঠে। এ্যাঁ, এর জন্যে তুই এই তিন মাইল পথ হেঁটে লেক্ বাজারে গিয়েছিলি? মিথ্যা করে রামুয়া বলে, না আমার এক ভেইয়া'র সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম ওই দিকে, এই একবার বাজারে ঢুকলুম, যদি কিছু ভালমন্দ পাই!

এমনি করে 'তপ্‌সে মাছ', 'গঙ্গার ইলিশ্' সংগ্রহ করে আনে, কোনদিন নতুন বাজার থেকে, কোনদিন বা বাগ্-বাজারের খড়ের ঘাট থেকে। শুধু বাবু খেতে ভালবাসে বলে। তাছাড়া জোর করে, পীড়াপীড়ি করে খাওয়ায় মায়ের মত।

খেতে বসে ভবেশবাবুর চোখে জল এসে পড়ে। তিনি বেশ জানেন, ওই সব সুদুর্লভ বস্তু, এ তল্লাটে কোথাও আজ-কাল পয়সা ফেললেও মেলে না! তার জন্যে কি পরিশ্রম করতে হয়! আবার ধোপ-দোরস্ত কাপড়-জামা ভেঙ্গে হয়ত বেরুতে যাচ্ছেন ভবেশবাবু, রামুয়া হঠাৎ এসে পড়ে বলে, এ জামার কাছে কাপড়টা কেমন ময়লা দেখাচ্ছে, একেবারেই মেলেনি! এটা বদলে যান বাবু। এদিকে দৃষ্টি সবচেয়ে যার সজাগ থাকা উচিত, সেই স্ত্রীকে তখন ডেকে তিনি জিজ্ঞেস করেন, হ্যাঁগো, রামুয়া বলছে, জামা-কাপড়ে নাকি মোটে মিল্ খায়নি। জামাটা বেশী ফর্সা দেখাচ্ছে!

কমলা শুধু নিস্পৃহ কণ্ঠে উত্তর দেয়, যখন ও বলছে, তখন নিশ্চয়ই বদলানো উচিত। বলে তখনি একটা ফর্সা কাপড় আলমারী থেকে বার করে দিয়ে চলে যায়। মনে মনে বলে আদিখ্যেতা!

কোনদিন বা ভবেশবাবু জামা-কাপড় পরে জুতোর ফিতেটা বাঁধছেন, এমন সময় ছুটে একটা ডাব কেটে এনে রামুয়া দাঁড়ায় তাঁর কাছে। স্মরণ করিয়ে দেয়, ডাক্তারবাবু ভাত খাওয়ার পর দু'-তিন দিন যে ডাব খেতে বলেছেন!

সাবানটা মুখে ভাল করে ঘষতে গিয়ে হঠাৎ ভবেশবাবুর চোখের ভেতর ফেনা লেগে চিন্তার সুতটা কেটে যায়। মনে হয় কে যেন লঙ্কাবাটা ঘষে দিয়েছে। চোখে-মুখে বার বার জলের ঝাপটা দিতে দিতে যখন জ্বলুনিটা নিবৃত্তি হয় তখন আবার আগের প্রসঙ্গে ফিরে আসে মনটা। হাঁ, সেদিনের ঘটনা ভোলবার নয়। ভবেশ-বাবুর অন্তরে গাঁথা থাকবে চিরদিন।

কমলা বাপের বাড়ী গিয়ে দিন পনেরো থাকবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় সঙ্গে সঙ্গে যখন ভবেশবাবু উত্তর দিলেন, 'বেশ ত যাও না, থেকে এসো, তখন উৎসাহের পরিবর্তে সহসা নিরুৎসাহের মেঘ যেন ঘনিয়ে এল।

কিন্তু তোমাকে এখানে একা কে দেখবে?

কেন? রামুয়া ত রয়েছে! তবে তোমার এতো চিন্তা কিসের। বরং তোমারও ভুল হয় আমার কাজে, কিন্তু রামুয়াকে কি কোনদিন দেখেছো কিছু ভুলে যেতে, বিশেষ করে আমার কাজ!

জানি! বলার সঙ্গে সঙ্গে সহসা কমলার কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে এলো, মুখটা থম-থম করতে লাগল! তারপর চোখের জল সামলে নিয়ে বললে, এখন ত আমার সব কিছুতে খুঁত দেখবেই! আমার বাবা মা ত' ঝি-চাকরের কাজ করার জন্যে আমাকে তোমার হাতে তুলে দেননি! আর আমি ওসব পারি না বলেই ত রামুয়াকে শিখিয়ে পড়িয়ে এমন করে তৈরী করেছি! তাকে এত আদর-যত্ন করি—শুধু তোমারই জন্যে। তোমারই মুখ চেয়ে, তা তুমি বুঝতে পারো না!

আরে আমিও ত সেই কথাই বলছি!

তা জানি! বলেই সহসা ঘর থেকে বেরিয়ে যায় কমলা। আগে দু'দিনের বেশী তিন দিন বাপের বাড়ী গিয়ে থাকতে চাইলে হাত ধরে কত কাকুতি-মিনতি করতো ভবেশবাবু, অথচ এখন পনেরো দিন থাকবে শুনেও তাড়াতাড়ি চলে আসবার জন্যে যেমন একবারও অনুরোধ করলেন না, তেমনি বললেন না, আমি কিছুতেই তোমায় ছেড়ে এতদিন থাকতে পারবো না। আসল ব্যথাটা যে কোথায়, তা বুঝতে না পেরে হতবুদ্ধি হয়ে যান ভবেশবাবু।

এদিকে পনেরো দিন কেটে যাবার পর আরো তেরোটা দিন যখন রাগ করে বাপের বাড়ী বসে ছিলো কমলা এবং ভবেশবাবু তাকে চলে আসবার জন্যে একটা চিঠিও লিখলেন না, তখন অগ্নি-মূর্তি হয়ে একদিন নিজেই হাজির হলো। স্বামীর ঘরে ঢুকে অভিমান স্ফুরিত ওষ্ঠে বললে, আমি মলুম কি বাঁচলুম একবার খোঁজ নিতেও ত গেলে না?

বালাই, ষাট! তুমি বাপ-মায়ের কাছে বিশ্রাম নিতে গেছো। জানি সুখেই আছো। দু'-দশদিন বেশী রইলে ভালই ত! তাছাড়া আমার যখন কোন অসুবিধে হচ্ছে না এখানে, কেন মিছিমিছি তুমি দুদিন জিরোতে গেছো, আবার তোমাকে টেনে আনি!

তার মানে ঝি-চাকরের কাজটা রামুয়া করে দিচ্ছে বলে আর স্ত্রীকে তোমার সংসারে কোন প্রয়োজন নেই? এই ত বলতে চাও?

ছিঃ ছিঃ—কি যা-তা বলছো। তুমি হলে গিয়ে আমার গৃহলক্ষ্মী!

থাক। আর শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে হবে না! সেইজন্যে লক্ষ্মীকে বিদেয় করে দিব্যি সুখে—স্বচ্ছন্দে ছিলে না? দেখো, আমার কাছে আর চালাকী করো না। তোমরা পুরুষ! তোমরা সব পারো। তোমাদের হাড়ে হাড়ে চিনেছি, জেনেছি! বলতে বলতে হঠাৎ কেঁদে ফেললে কমলা।

ওই রামুয়া যদি চলে যেতো, তা'হলে আবার এই অকর্মণ্য বৌকে মনে পড়তো, তার তোষামোদ করতে জানি। ওই চাকরটা যখন আসেনি, তখন ত এই দাসীকে দিয়েই তোমার সব প্রয়োজন মিটতো, আজ ওকে পেয়েছো বলেই আমাকে এইভাবে ভুলতে পেরেছো!

কি বলছো? তুমি কি ওই চাকর-ঝিয়ের সমান!

তার চেয়েও অধম! রামুয়া যা করতে পারে আমি তা পারি না, না জানি না? কি, একদিনের জন্যেও তুমি আমাকে ডেকে বলোনি, এটা করে দিয়ে যাও! কমলার দু' চোখ বেয়ে নিঃশব্দে জল ঝরে পড়ে।

বিস্ময়াভিভূত দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ নীরবে তাকিয়ে থেকে ভবেশবাবু উত্তর দেন, সে তোমারই ভালর জন্যে!

আমার ভালর জন্যে কেউ ত তোমায় মাথার দিব্যি দিতে আসেনি। উত্তপ্ত হয়ে ওঠে কমলার কণ্ঠ।

ভবেশবাবু নিজকে যতদূর সম্ভব সংযত করে প্রশ্ন করেন, তোমার সংসার, তুমিত ইচ্ছে করলে আসতে পারতে, তোমাকে আবার ডাকতে হবে কেন?

চোখ দুটো এবার হিংস্র হয়ে ওঠে কমলার, তা হয়ত পারতুম। কিন্তু তুমি আরো কত দূরে বাড়ো, আরো কত অব-হেলা, হতশ্রদ্ধা করো আমাকে, তাই দেখছিলুম এতদিন! ছি ছি বাবা-মার কাছে লজ্জায় আমি মুখ দেখাতে পারি না। তাঁরা জোর করে আমায় পাঠিয়ে দিলেন, হাজার হোক চাকর সে কখনো তোর মত দেখা-শুনা করতে পারে! অথচ তোমার একবারও একথা মনে উদয় হলো না যে, আমার সম্মান রক্ষা করার জন্যে,

অন্তত তোমার সেখানে গিয়ে আমায় নিয়ে আসা উচিত!

বলতে বলতে সদর্পে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় কমলা।

শুকনো তোয়ালে দিয়ে গা মুছতে মুছতে ভবেশবাবুর মনে পড়ে যায়, এর ঠিক কয়েকটা দিন পরেই ক্ষেন্তি ঝিকে নিযুক্ত করেছিল কমলা। তিনি প্রথমটা আপত্তি করেছিলেন, তবু যখন রামুয়ার কাছ থেকে আরো বেশী কাজ পাওয়া যাবে এই অজুহাতে কমলা তাকে বহাল করলে, তখন তিনি বলেছিলেন অন্তত-পক্ষে একটা বুড়ো কি প্রৌঢ় গোছের লোক রাখলে ভাল হতো!

তারও জন্যে যুক্তির অভাব হয়নি কমলার। সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল, হাঁ বুড়ো হাবড়া ঝি—দু'দিন অন্তর অসুখের দোহাই পেড়ে কামাই করবে, আর আমাকে তার মাইনে গুণে যেতে হবে। ক্ষেন্তির বয়েস কম, ভালই ত! জোয়ান, খাটিয়ে, অন্ততঃ কামাই করবে না যখন-তখন। ঝি-চাকর রাখতে গেলে, আগে সেটা দেখা কর্তব্য নয় কি?

এর ভিতরে যদি ভবেশবাবু কমলার কোন দুরভিসন্ধি ছিল মনে করেন, তা'হলে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। কমলা হয়ত কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে চেয়েছিল। হয়ত তার সেদিনের সেই সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা আজ জয়যুক্ত হলো! কে জানে! স্ত্রীলোকের পক্ষে সবই সম্ভব। নারীমন দুর্জ্ঞেয় জটিল।

ভবেশবাবু স্নান করে বারান্দায় এসে বসলে চা তৈরী করে নিয়ে এলো কমলা।

স্বামীকে চা দিয়ে নিজের পেয়ালাটা হাতে করে এসে সে বসলো তার সামনে। তারপর পেয়ালাতে নীরবে দু-এক চুমুক দিয়ে নিঃশব্দে একবার ভবেশ-বাবুর মুখের রেখাগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে মোলায়েম সুরে বললে, তুমি রাগ করলে আমার ওপর! আচ্ছা ওই রকম কেলেঙ্কারীর পর কি আর রামুয়াকে বাড়ীতে রাখা চলে? মানুষের চরিত্রটাই সব! সেটা গেলে আর রইলো কি! কোন্ বিশ্বাসে তার ওপর ঘর-সংসারের সবকিছু দায়িত্ব ছেড়ে দিই বলো?

ভবেশবাবু পেয়ালাটা হাতে করে কি যেন ভাবছিলেন। চা-টা জুড়িয়ে যাচ্ছে, সেদিকে বুঝি খেয়াল ছিল না। কমলার কণ্ঠস্বরে তার যেন চমক ভাঙ্গল। পেয়ালাটা মুখের কাছে তুলে, একসঙ্গে দু'বার চুমুক দিয়ে স্ত্রীর চোখের ওপর নিজের দু'টি চোখ রাখতেই কমলা বলে উঠলো, দেখো ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যে! রামুয়াকে যে তাড়াতে হলো না, ও নিজে থেকেই চলে গেল—ভালই হয়েছে। কি বলো?

যেন তার এই কথার সমর্থন স্বামীর কাছ থেকে লাভ না করা পর্যন্ত সুস্থির হতে পারছিল না কমলা কিছুতেই।

ভবেশবাবু আরো মুহূর্ত কয়েক তেমনি নীরব থেকে, আবার চায়ের পেয়ালা থেকে একসঙ্গে দু' চুমুক চা মুখের মধ্যে টেনে নিয়ে একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস গোপন করে বললেন, হাঁ, ভালই হয়েছে।

শুধু তুমি কেন, যে শুনবে, সে-ই ওই কথা বলবে। তা আমি জানি। রামুয়াকে আমি ছেলের মত ভালবাসতুম! বলে অনেকদিন পরে আবার ছেলে-মানুষের মত হেসে উঠলো, অকারণে! বুঝি সেই গম্ভীর আবহাওয়াটাকে সে-হাসি দিয়ে তরল করে দিতে চায়।

ওয়েটার একবার বোধ হয় ডেকেছিল, খেয়াল করি নি, এবার এসে খুব আস্তে বাহুমূলে ছুঁলে। চোখ তুলে চাইতেই সেলাম করে বলল, দোকান বন্ধ হো গিয়া সাব।

উঠে দাঁড়ালাম। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম এগারোটা কুড়ি। কুড়ি মিনিট আগে দোকান বন্ধ হয়েছে। সদরে তালা-চাবি, কিন্তু খিড়কি খোলা। সে পথ আমার অজানা নয়।

বাইরের ফুরফুরে হাওয়ায় নেশাটা একটু গাঢ় হয়ে এসেছিল, হঠাৎ ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দে চমকে উঠলাম।

গাছের নীচে অন্ধকারে একটা ছায়া। কান্নাটা যেন সে দিক থেকেই আসছে।

সামনে একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। রোজকার মতন। চেনা ড্রাইভার। ঠিক জায়গায় নামিয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, বেসামাল হলে হাত ধরে সিঁড়ির কাছ বরাবর তুলে দেয়। এমন কি, বাড়তি পয়সা হাতে তুলে দিলে, ঠিক ফেরৎ দিয়ে দেয়।

ট্যাক্সিতে ওঠবার মুখে আবার বাধা। ছায়াটা এগিয়ে এল। একেবারে পাশে।

উস্কোখুস্কো চুল। চোখের জলে সযত্নে আঁকা প্রসাধন নষ্ট হয়ে গেছে। স্কার্টটা একেবারে আনকোরা নয়।

প্লিশ বাবু, আমায় একটু পৌঁছে দেবেন। শরীরটা বড় খারাপ লাগছে।

এবার চিনতে পারলাম। শরীরের আর দোষ কি। আমি হোটেলে ঢোকার সময় দেখেছি সামনের টেবিলে মেয়েটি বসে আছে, আর উঠে এল বোধ হয় আমার একটু আগে। এর মধ্যে একবারও গ্লাশ খালি ছিল না।

তোমার সঙ্গে কেউ নেই? মেয়েটির দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলাম।

মেয়েটি বব-করা চুলগুলো নাড়ল, না, ফিলিপ অন্য হোটেলে গিয়েছে। সারা রাতের প্রোগ্রাম।

ফিলিপ?

মেয়েটি একেবারে গায়ের ওপর এসে দাঁড়িয়েছে। তার স্কার্টের কোণগুলি উড়ে উড়ে আমার প্যান্টের ওপর এসে পড়ছে। সুরা আর সেন্টের মেশানো গন্ধ।

মেয়েটি কথা বলতে গিয়েই থেমে গেল। ড্রাইভার অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে, চলিয়ে সাব, বহুত দের হো গিয়া।

ট্যাক্সির দরজা খুলে সরে দাঁড়ালাম। মেয়েটি আগে উঠল, আমি পিছনে।

কোথায় যেতে হবে? ড্রাইভার নয়, আমি জিজ্ঞাসা করলাম মেয়েটিকে।

এলিয়ট স্ট্রীট। মেয়েটি সীটে হেলান দিতে দিতে বলল।

ট্যাক্সি চলতে শুরু করতে আমি পুরোনো কথার খেই ধরলাম, ফিলিপ কে বললে না?

মেয়েটি চোখ বুজে ছিল। সেই-ভাবেই উত্তর দিল, আমার স্বামী। ওই যে সামনে বসে বেহালা বাজাচ্ছিল।

ভাবতে আরম্ভ করলাম। একটি মেয়ে পিয়ানো বাজিয়ে গান করছিল। শেষ গানের লাইন কটা এখনও মাথার মধ্যে ঘুরছে। Ramona, we meet beside the waterfall পিছনে বসে একজন বেহালার ছড় টানছিল।

ফিলিপ গেল কোথায়?

বললাম যে, সারা রাতের প্রোগ্রাম। হোটেল ম্যাজেস্টিকে। সেই ভোরে ফিরবে।

মেয়েটি হাই তুলল। দু' হাত প্রসারিত করে আড়ামোড়া ভাঙতে গিয়েই থেমে গেল। একটা হাত আমার গায়ে এসে লেগেছে।

কিছুক্ষণ কোন কথা হ'ল না। মধ্য-রাতের ক'লকাতা। এখনও এখানে ওখানে দু' একটা ছুটকো লোক। নিশাচর। মাঝে মাঝে রাস্তার মোড়ে পুলিশের পরিচিত চেহারাও দেখা গেল।

আপনি, আপনি কোথায় থাকেন? মেয়েটি আদুরে গলায় প্রশ্ন করল। থেমে থেমে।

বালিগঞ্জ। বার তিনেক সিগারেট ধরাবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে উত্তর দিলাম। আঙুলের ডগাগুলো ভীষণ কাঁপছে। কাঠি জ্বলছে কিন্তু জ্বলন্ত কাঠি মুখ পর্যন্ত পৌঁছোচ্ছে না।

বাড়তি সিগারেট আছে আপনার কাছে? মেয়েটি হাত বাড়াল।

শেষ সিগারেটটা তার হাতে ফেলে দিতেই মেয়েটি চেঁচিয়ে উঠল। ড্রাইভারের পিঠে হাত চাপড়াতে চাপড়াতে বলল, রোক্কে ড্রাইভার, Stop, Stop।

আমি রাস্তায় নেমে দাঁড়ালাম। মেয়েটি টলতে টলতে নামল।

প্লিজ, যদি কিছু মনে না করেন, একটু সাহায্য করবেন আমাকে। ওপরে উঠিয়ে দেবেন?

দু' এক মিনিটের দ্বিধা। ক্ষীণ সন্দেহের একটা ঝিলিক, তারপর জোর করে সব ঝেড়ে ফেলে দিলাম। আমি অনেক পুরোনো পাপী। আমার এ সবে ভয় নেই। এর চেয়ে আরো জঘন্য নরক ঘাঁটা আমার অভ্যাস আছে। বাপের রেখে যাওয়া দেড় লাখ টাকা প্রায় তলানীতে এসে ঠেকেছে। পার্ক সার্কাসের বাড়ীটা পাওনাদার গ্রাস করেছে। আমি যেখানে এসে দাঁড়িয়েছি, তার চেয়ে আর বেশী নীচে নামা যায় না।

মেয়েটির হাত ধরে ওপরে উঠলাম। নীচু হয়ে তালা খুলতে গিয়ে মেয়েটি সুবিধা করতে পারল না। বুঝলাম ওর হাতও ভীষণ কাঁপছে।

চাবিটা আমার হাতে দিয়ে বলল, আপনি একবার চেষ্টা করুন তো যদি পারেন। আমি বড্ড টিপ্সি হয়ে পড়েছি।

ভাগ্য সুপ্রসন্ন। একবারের চেষ্টাতেই তালা খুলতে পারলাম।

দরজা খুলে যেতে মেয়েটি আগে ঘরে ঢুকে বাতি জ্বালিয়ে দিল। সেই আলোতেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম।

ছোট্ট ঘর। ফিটফাট সাজানো। আসবাবপত্র সবই স্বল্প মূল্যের কিন্তু গোছানোর কায়দায় চমৎকার দেখাচ্ছে। পুরোনো স্কার্ট ছেঁড়া পর্দা। টেবিল-চেয়ারের ঢাকনি কটাও পরিত্যক্ত পরিধেয় থেকেই তৈরী, তবু মানানসই।

নিজের ছন্নছাড়া জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে এমন পরিপাটি চোখ-জুড়ানো সজ্জা খুব ভাল লাগল। নির্নিমেষ চোখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম।

একটু বসে যাবেন না দয়া করে? এক পেয়ালা কফি করে দিই। এ ছাড়া কি-ই বা আপনাকে দিতে পারি।

হাত নেড়ে বারণ করলাম। নীচে থেকে অসহিষ্ণু হর্ণের শব্দ কানে আসছে। আর অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। ড্রাইভার যদি ভাড়ার মায়া ত্যাগ করে চলে যায় তবে এই নিশীথে এমন একটা জায়গায় বিপদেই পড়ে যাব। হেঁটে বাড়ী ফিরতে হবে।

শুভরাত্রি জানিয়ে দ্রুত পায়ে নেমে এলাম।

ড্রাইভার ছাড়ল না। এ ধরণের রাত্রি-সহচরীদের আস্কারা দিলে ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে তার একটা বিভীষিকাময় চিত্র এঁকে সামনে ধরল। আমি ভক্তিভরে শোনার ভান করলাম।

একটা সুবিধা, বাড়ী ফিরে কোন কৈফিয়ৎ দেবার প্রয়োজন হয় না। কৈফিয়ৎ নেবার লোক এখনও সংসারে আসে নি। আর কোনদিন আসবে এ সম্ভাবনাও কম। সংসারের কর্ণধার অশ্বিনী। একাধারে পাচক, পরিচারক ও শাসক।

সুরা পান করা নিয়ে অশ্বিনী কম বলে নি। রাত্রে ফিরে আসার পর ঝাড়া এক ঘণ্টা তার উপদেশ শুনতে হয়েছে। ইদানীং আর কিছু বলে না। বিশেষ করে জোর করে আমার প্রসাদ গ্রহণ করানোর পর থেকে।

এখনও মাঝে মাঝে প্লাশে একটু রেখে অশ্বিনীকে বলি, অশ্বিনীচরণ এটা বাথরুমে খালি করে এস। অশ্বিনী খালি করে আসে। আলমারীতে রাখা ব্র্যাণ্ডি আর জিনের বোতলে প্রায়ই একটু কম থাকে। এ সব দিকে নজর দিতে গেলে সংসার চলে না। অন্ততঃ ছন্নছাড়ার সংসার।

মেয়েটিকে প্রায় দেখতাম। বারে সামনের টেবিলে বসে থাকে। এক মনে বেহালা শোনে, প্লাশে চুমুক দেয়। নাম শুনলাম ডোরা। ফিলিপের সঙ্গে বিয়ে হয় নি, হবার কথা হচ্ছে।

কিছুদিন ধরে পাওনাদারের ঝামেলা চলল। কোর্ট অবধি গড়াল ব্যাপারটা। উকিল আর কোর্টঘর করতে করতে বিকেলে আর ফুর্তি করতে যাওয়া সম্ভব হয় নি। নেশাটুকু বাড়ীতেই করতে হয়েছিল।

পরে যেদিন বারে গেলাম, ডোরাও নেই, ফিলিপও উধাও। অন্য একজন বসে বেহালা বাজাচ্ছে।

একবার ভাবলাম, ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করি, তারপর মনে হ'ল, কি দরকার ওসব বাড়তি খবরে। কে কোথায় গেল তার খোঁজ রাখা আমার দায় নয়। তারচেয়ে পরম যত্নে রামের প্লাশটা মুখে তুললাম।

কিন্তু দেখা একদিন হয়ে গেল।

সিনেমার সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। এক বন্ধুর অপেক্ষায়। হঠাৎ ডোরার সঙ্গে দেখা।

আমি লক্ষ্য করি নি, সেই এসে আমার সামনে দাঁড়াল, গড্ ইভনিং মিস্টার।

নড্ করে তার দিকে চেয়েই অবাক হলাম। কোটরগত চোখ, বিবর্ণ ওষ্ঠাধর, অস্থিপ্রকট চেহারা। পরণের পরিচ্ছদও যথেষ্ট মলিন।

কি খবর?

ম্লান হেসে বলল, ভাল নয়।

'বারে' দেখি না যে?

আর যাই না ওখানে। কি করতেই বা যাব।

কোন প্রয়োজন ছিল না। নিছক সময় কাটাবার জন্যই জিজ্ঞাসা করলাম, এমনি সময় কাটাতে। যে জন্য আমি যাই।

আমি সময় কাটাতে যেতাম না, আমি যেতাম ফিলিপের বেহালা শুনতে। সে আর নেই।

শেষ দিকের কথাগুলো ডোরা বলল অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে।

নেই মানে? একটা চোখ হাতঘড়ির দিকে রেখে আবার জিজ্ঞাসা করলাম। নেই মানে, আমার কাছে নেই।

সেকি? আর একবার চাইলাম ঘড়ির দিকে। বন্ধুর আসার সময় পার হয়ে গেছে। এলে এতক্ষণে আসত। এখন আমার কিছু করার নেই।

আপনি কি খুব ব্যস্ত আছেন? সিনেমায় যাবেন? খুব করুণ কণ্ঠে ডোরা প্রশ্ন করল।

ঘাড় নেড়ে বললাম, না ব্যস্ত মোটেই নেই। এক বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। সে বোধ হয় আর আসবে না।

তা হ'লে একটু আসবেন আমার বাসায়?

এলিয়ট রোডে? বিস্ময় প্রকাশ করলাম। এখান থেকে এলিয়ট রোড পর্যন্ত গিয়ে কারো জীবন কাহিনী শোনার আমার আগ্রহ কম।

না, সেখানে তো আর আমি থাকি না। সেটা ফিলিপের বাড়ী ছিল।

তবে কোথায় যেতে হবে?

ডোরা বিগলিত গলায় বলল, এই যে পাশের গলি।

চেয়ে দেখলাম। শীর্ণ গলি। দু পাশে প্যাকিং কেস তৈরীর কারখানা। রাস্তার অর্ধেকটা জুড়ে কাঠ, পেরেক আর লোহার পাত ছড়ানো। শব্দও নেহাৎ কম নয়।

ডোরা এগিয়ে চলল। আমি পিছনে। দোকানীরা একবার চোখ তুলে দেখেই চোখ নামাল। বোঝা গেল এ সব ব্যাপারে তাদের উৎসাহ কম। দৃশ্যটাও বিশেষ অপরিচিত নয়।

গলির মাঝামাঝি। ছোট্ট ঘোরানো কাঠের সিঁড়ি। আধো-অন্ধকারে রীতিমত বিপদজনক।

উঠতে হবে নাকি? একটু সংশয় প্রকাশ করলাম।

বুঝতে পারছি আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে। আর একটু কষ্ট করুন। এই যে সামনের দরজা। মাথাটা দেখবেন।

মাথাটা দেখা সত্ত্বেও একটু ঠুকে গেল। উঃ বলতে গিয়েই সামলে নিলাম। ছোট্ট নীচু ঘর। এমন আস্তানায় মানুষ থাকতে পারে, ভাবতে পারি নি।

ভিতরে ঢুকব কিনা ভাবছিলাম, মোমবাতি হাতে ডোরা এগিয়ে এল।

আসুন, আসুন।

বহু কষ্টে ভিতরে ঢুকলাম।

সামনে একটা প্যাকিং বাক্সের ওপর রঙীন কাপড় ঢাকা। বোঝা গেল সেটা সেন্টার টেবিলের কাজ করছে। চারপাশে জরাজীর্ণ মোড়া।

দেহের ভার সইবে কিনা ভেবে মোড়ার ওপর বসতে সাহস হচ্ছিল না। ব্যাপারটা বোধ হয় ডোরা বুঝল। কোণ থেকে একটা টুল টেনে এনে মাঝখানে রেখে বলল, আপনি বরং এইটের ওপর বসুন।

বসলাম। বললাম, বল কি বলতে চাইছিলে?

এক মিনিট অপেক্ষা করুন। ডোরা পর্দা সরিয়ে ভিতরে চলে গেল। মিনিট কয়েক, তারপর ফিরল চায়ের কাপ হাতে করে। বোঝা গেল, বাইরের কোন দোকান থেকে ডোরা কিনে এনেছে।

চায়ের কাপ হাতে নিতে নিতে বললাম, এ সব হাঙ্গামা করার কি দরকার ছিল।

কোন উত্তর না দিয়ে ডোরা সামনের মোড়ায় বসল।

ফিলিপ আইভিকে বিয়ে করেছে।

জ্বলন্ত মোমবাতির শিখার দিকে চেয়ে ডোরা কথাগুলো বলল। নিস্পৃহ, নিরাসক্ত সুরে।

কে আইভি? চায়ের কাপ নামিয়ে রাখতে রাখতে জিজ্ঞাসা করলাম।

আমার খুড়তুতো বোন। স্বামী মারা যেতে আমার কাছেই এনে রেখেছিলাম। সে ফিলিপের কাছে বেহালা শিখত। অনেক রাত অবধি গল্প-গুজব করত দুজনে। আমি ফিলিপকে বিশ্বাস করতাম। অন্য কোন সন্দেহই আমার মনে জাগে নি। তা ছাড়া, বরাবর ফিলিপ আমায় আশ্বাস দিয়ে এসেছে, সে আমাকে বিয়ে করবে। হঠাৎ এক রাতে বাড়ী ফিরে দেখলাম, ফিলিপ আর আইভি পাশাপাশি বসে আছে। দুজনেই খুব হাসি-খুশী।

আমাকে দেখে ওরা উঠে দাঁড়াল। ফিলিপ বলল, তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম ডোরা, একটা কথা আছে।

আমি মনে করলাম একটা বড় হোটেলে ফিলিপের বেহালা বাজানোর কাজ পাবার কথা ছিল, সেইটে বুঝি
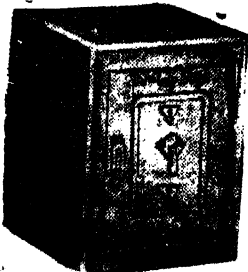
হয়েছে। সেটা হওয়া মানে, দুজনের আরও কাছে আসা। পাদ্রীর সামনে অঙ্গীকার করে একজনের আর এক-জনের ভার নেওয়া।

ফিলিপ কিন্তু অন্য কথা বলল।

কাল সকালে আমরা বিয়ে করছি ডোরা। আইভির খুব ইচ্ছা, তুমি বেস্ট মেড হও।

"আসুন, আসুন"

আমার হাতে একটা ফুলদানী ছিল, সমস্ত শরীর কেঁপে উঠতে সেটা হাত থেকে পড়ে চুরমার হয়ে গেল।

নীচু হ'য়ে কাঁচের টুকরোগুলো কুড়োতে গিয়ে, হাতে একটা টুকরো ফুটে গেল। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ল মেঝের ওপর, স্কার্টে।

ঈস্, রক্ত পড়ছে যে? ফিলিপ উদ্বিগ্ন হবার ভান করল।

আঙুল চেপে ধরে চুপচাপ বসে রইলাম। ভাবলাম বলি, এ আর কতটুকু রক্ত দেখতে পাচ্ছ ফিলিপ। এর চেয়ে অনেক বেশী রক্তক্ষরণ হচ্ছে তোমার চোখের আড়ালে। সমস্ত হৃদয়টা নিঃস্পে-ষিত করে সহস্র ধারায় রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

ভোর রাতে বাড়ী ছাড়লাম। এ সংসার নিজের হাতে একটু একটু করে গুছিয়ে ছিলাম। যে-টুকু অবসর পেতাম, কেবল সংসারের চিন্তা করতাম। রাত জেগে ছেঁড়া কাপড় জুড়ে-জুড়ে পর্দা, পুরোনো স্কার্ট দিয়ে চেয়ারের ঢাকনা, ভাড়া করা ফার্ণিচার, কিন্তু এমন যত্ন লোকে নিজের জিনিসেও করে না।

কিছুক্ষণ কোন কথা নেই। দুজনেই চুপচাপ। ডোরার আর কিছু বলার নেই। যেটুকু বলার ছিল বলেছে। আমারও জিজ্ঞাসা করার কিছু ছিল না।

উঠে দাঁড়ালাম।

চলি ডোরা একটু কাজ আছে।

ডোরাও উঠে দাঁড়াল। বলল, আপনার কাজ মানে তো 'বার-এ' গিয়ে বসা। তাই না?

হাসলাম, হ্যাঁ তাই। ওখানে বসে কি মনে হয় জানো। পৃথিবীতে ওই যায়গা-টুকুই বুঝি সত্যি, ওই সময়টুকুই আনন্দের। নয় তো আর সবই তো অলীক। মানুষের ওপর আর কতটুকু আস্থা রাখা যায় বল?

ডোরা কি বুঝল জানি না। মাথা নিচু করে রইল।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে একবার চেয়ে দেখলাম। মোমবাতিটা ধরে ডোরা পাষান-মূর্তির মতন দাঁড়িয়ে আছে। না, পাষাণ-মূর্তি নয়, পাষাণ-মূর্তির দু চোখ বেয়ে ওভাবে অশ্রুর ধারা নামে না।

এর পরে পথে আর একবার ডোরার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

অত্যধিক মদ্যপানের প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে শরীরে। পেটের মধ্যে অসহ্য একটা ব্যথা অনুভব করছি। সেইজন্যই ডাক্তারের কাছে ছোটাছুটি, ওষুধ আনা এসব চলেছে। রসদও ফুরিয়ে এসেছে। এমন সময় ফুরালো, যখন রসদের সত্যি-কারের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী।

এবার ডোরার সঙ্গে আর একটি যুবক। পোশাক দেখে মনে হ'ল জাহাজের নাবিক।

এবারেও ডোরা আমাকে প্রথমে দেখতে পেল। রাস্তা পার হচ্ছিলাম, পিছন থেকে ডাকল, মিস্টার, মিস্টার।

ফিরে এলাম। ফুটপাতের ওপর।

ডোরা এগিয়ে এসে বলল, আসুন আলাপ করিয়ে দিই। আমার ফিঁয়াসে আর্থার। আর্থার টমসন। আর ইনি, ইনি—

ডোরা মাঝপথেই থেমে গেল। আমার নাম, পদবী কিছুই জানে না। কোনদিন জানবার সুযোগও হয় নি। তাড়াতাড়ি কথাট পাল্টে নিয়ে বলল, আমার খুব পুরোনো বন্ধু আর হিতাকাঙ্ক্ষী।

আর্থারের হাতে হাত রাখলাম। নীল চোখ, দীর্ঘ চেহারা। জলের জীব, স্থলে থাকার কয়েকটা দিন প্রাণভরে যারা আনন্দ করে, সেই জাতের। এদের ভাল-বাসাও জলের রেখার মতনই। সহজেই মুছে যায়।

তবু ডোরাকে অভিনন্দন জানালাম। বললাম, তোমার ভাবী জীবন সুখের হোক। এবারে সংসার পাতছো কোথায়?

ডোরা লাল হ'য়ে উঠল। অন্যদিকে চেয়ে বলল, এখনও ঠিক করি নি। আর্থার [illegible] চাকরি ছেড়ে দেবে। জল-পুলিশে [illegible] চেষ্টা করছে। সেটা হ'য়ে গেলেই আমরা কোথাও বাসা ঠিক করব।

ডোরাকে এত প্রাণচঞ্চল এর আগে দেখি নি। মনের মানুষকে নিয়ে মনের

মতন বাসা বাঁধবে, তাই বুঝি ওর এত উচ্ছ্বাস।

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। বহুদিন শয্যাশায়ী ছিলাম। পরমায়ুর বিনিময়ে জীবনের শেষ কপর্দক প্রায় হাতছাড়া হয়ে গেছে। নতুন করে জীবন আরম্ভ করেছি। একটা মিলে খাতা লেখার কাজ। সকালে যেতে হয়, দুপুরে খাবার ছুটি আবার ডিউটি রাত আটটা পর্যন্ত। বাসাও নিয়েছি খিদিরপুরে। মিলের কাছাকাছি। বাসা মানে এক ডালে বহু বিহঙ্গের বাসা। মেসবাড়ী।

বিকেলের দিকে মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে। বহুদিনের নেশা। একদিন আমার কাছে অমৃত ছিল। আজ ডাক্তারের নির্দেশে অমৃত বিষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছুটির দিন গঙ্গার ধারে গিয়ে বসি। ঢেউয়ের কলরোল, মাঝি-মাল্লাদের হৈ-হল্লার মধ্যে নিজের ফেলে আসা জীবনের উন্মত্ততা ফিরে পাই।

মাঝে মাঝে ভাবি। যে সম্পদ আমার হাতে এসেছিল, তা দিয়ে জীবনটাকে নতুন করে গড়ে তুলতে পারতাম। নতুন ভাবে। কিন্তু অর্থের সে সমুদ্রে আমি উচ্ছৃঙ্খলতার ভেলা ভাসিয়েছিলাম। বহু কষ্টে নিজের সলিল-সমাধিটুকু বাঁচাতে পেরেছি।

শনিবার মিলের কাজ সেরে বিকেলের দিকে বাড়ী ফিরছি। সকাল থেকেই শরীরটা খারাপ। মেজাজটাও তাই। হঠাৎ হৈ-চৈ চীৎকারে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

গোলমালটা এ তল্লাটে একটু বেশী। ছোট-খাটো দাঙ্গা লেগেই আছে। মাতাল নাবিকদের চেঁচামেচি। মিলের মজুরদের রেষারেষি, তা ছাড়া মোটর দুর্ঘটনাও কমতি নেই।

পথ-চলতি একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার মশাই?

ভদ্রলোক বোধ হয় একটু ব্যস্ত ছিলেন। চলতে চলতেই বললেন, কি জানি, বোধ হয় কেউ কাউকে ছুরি-টুরি মেরে থাকবে।

দাঁড়িয়ে পড়লাম। ভদ্রলোক যতটা অবিচলিতচিত্তে ঘটনার বিবৃতি দিলেন, ঘটনাটাকে অত লঘু বলে মেনে নিতে পারলাম না। ছুরি-ছোরার ব্যাপার, একটু

নাগিন হ্রদ : কাশ্মীর ফটো : সুখেন্দু গাঙ্গুলী

সাবধান হওয়াই ভাল। অথচ অন্য পথ নেই। বাড়ী ফেরবার ওই একটি মাত্র রাস্তা।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম। ভীড়ের মধ্যে ছেলে-ছোকরাই বেশী। দু-একজনের হাতে ইঁটের টুকরোও রয়েছে।

কি হয়েছে ভাই? তাদের একজনকেই জিজ্ঞাসা করলাম।

একটা পাগলী স্যার।

পাগলী। পাগলীকে নিয়ে এত হৈ-চৈ কেন? অবশ্য মারাত্মক পাগলীও দু-একজন আছে।। মনে আছে একজন আমাকে একবার প্রায় আধ মাইল পথ দৌড় করিয়েছিল।

ভিড়ের মাথার ওপর দিয়েই একবার নজর দিলাম। কিছু দেখা গেল না। ভীড় কাটিয়ে একটু এগিয়ে গিয়েই থেমে গেলাম।

পরণে শতছিন্ন স্কার্ট, গলায় রঙীন কাগজের মালা, মাথায় শোলার হ্যাট। এক পায়ে ছেঁড়া মোজা। জীর্ণ জুতো। স্ত্রীলোকের নয়, পুরুষের। সারা মুখে দগদগে ঘা। দুটো চোখ স্ফীত, রক্তবর্ণ।

তবু চিনতে পারলাম। ডোরা।

দু-একটি ছোকরা ঢিল ছোঁড়বার চেষ্টা করতেই তাদের বাধা দিলাম।

কেন, ওকে জ্বালাতন করছ? কেন ঢিল ছুঁড়ছ?

ওকে মারছি না স্যার, ওর ঘরে ইঁট মারলেই পাগলী ক্ষেপে উঠছে।

ঘর?

এইবার ভাল করে দেখার চেষ্টা করলাম।

ডোরা আড়াল করে দাঁড়িয়েছে।

একটা টেলিগ্রাফের পোস্টের পাশে আরও কতকগুলো বাঁশের খুঁটি পুঁতেছে। তার ওপর কিছু টেউ-টিন আর পুরোনো নারকেল পাতার ছাউনি। তলায় পরিপাটি করে পেতেছে একটা ছেঁড়া মাদুর। একটা ভাঙা প্যাকিং কেস মাঝখানে। তার ওপর ভাঙা কুঁজোয় কিছু নোংরা কাগজের ফুল।

ডোরার সংসার। এই সংসারটুকু বাঁচাবার জন্যই সে জনতার নিক্ষিপ্ত ঢিল, ইঁটের টুকরো নিজে বুক পেতে নিচ্ছে।

আর একবার ছোকরাদের বারণ করতে গিয়েই থেমে গেলাম। এদের থামালেই ডোরার সংসার বাঁচবে না। আরও বড়ো ইঁটের টুকরো যে ছুঁড়ছে, তাকে আটকাবো কি করে?

অরণ্য ও আরণ্যক

অমল দাশগুপ্ত

পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেকটি দেশের সাহিত্যে মুখ্য স্থান জুড়ে আছে অরণ্য। বিশেষ করে ভারতীয় সাহিত্যে তো বটেই। ঋগ্‌বেদের স্তোত্রে, বৌদ্ধ জাতকের কাহিনীতে রামের বনবাসে, মহাভারতের অজ্ঞাতবাস পর্বে, কৃষ্ণের অরণ্যলীলায়, কথাসরিৎসাগরের গল্প, এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রের একাধিক উপন্যাসের পটভূমিতে। অরণ্য ও আরণ্যক জীবকে বাদ দিলে ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনীগুলি অনেকাংশে বাতিল হয়ে যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এমন সমস্ত কথা বলা হয়েছে যা থেকে বোঝা যায়, অরণ্য ও আরণ্যক জীবকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে সে যুগেও ব্যাপক ব্যবস্থা ছিল। আজকাল যাকে আমরা বলি প্রোটেকটিভ বা সংরক্ষিত অরণ্য, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে তার নাম দেওয়া হয়েছে 'অভয়ারণ্য'। আইন জারি করা হয়েছিল যে অভয়ারণ্যের এলাকায় কেউ যদি হরিণ, গৌর বা বাইসন, পাখি ও মাছ বা অন্যান্য জীবকে ফাঁদে ফেলে, নির্যাতন করে বা হত্যা করে তাহলে তাকে দণ্ড দেওয়া হবে। সকল আরণ্যক জীবজন্তুর এক-ষষ্ঠাংশকে এই অভয়ারণ্যের আশ্রয় দেওয়া হত। কোনো কোনো জন্তু বা পাখির ক্ষেত্রে মৃগয়া বা হত্যা একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল। কালিদাসের কাব্যে অরণ্য ও আরণ্যক জীবের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের যে নিবিড় ও মাধুর্যমণ্ডিত চিত্র উপস্থিত হয়েছে তা আজও আমাদের মুগ্ধ করে। কালিদাস যদি একালের লেখক হতেন তাহলে একালের পরিভাষায় কালিদাসকে আমরা শ্রেষ্ঠ প্রকৃতিবিজ্ঞানী আখ্যা দিতাম।

এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে যদি আমরা আমাদের ধর্মশাস্ত্র, পুরাণকথা, শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠা উল্‌টিয়ে যাই তাহলে এমন কথাও আমাদের মনে হতে পারে, আমাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক গোটা অতীতটাই এক কথায় অরণ্যবন্দনা। ঋষির ধ্যানের আলয়কে আমরা নাম দিয়েছি তপোবন, রাজার উপবেশনের আসনকে সিংহাসন। অরণ্যের প্রত্যেকটি বৃক্ষকে আমরা মর্যাদা দিয়েছি, প্রত্যেকটি জীবকে মহিমান্বিত করেছি। শুধু তাই নয়, স্বর্গের দেবদেবীরা পর্যন্ত আমাদের কল্পনায় এই পৃথিবীর অরণ্যচারী এক একটি জীবকেই বাহন করেছেন।

এই কারণেই অরণ্য ও আরণ্যক জীবকে নিয়ে আমাদের দেশে অতুলনীয় সাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টি হয়েছে। পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের গল্প পড়েন নি বা শোনেন নি, এমন মানুষ আমাদের দেশে খুব সম্ভবত একজনও নেই। এই দুটি গ্রন্থ পশুপাখির আশ্চর্য এক জগতকে আমাদের সামনে মেলে ধরেছে। শেয়াল, সিংহ, ষাঁড়, কচ্ছপ, কাক, ইঁদুর, বানর, কুমির, উট, হাতি, বক, বেড়াল, সাপ, পেঁচা, চড়াই—পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের গল্পে এমনি অজস্র পশুপাখির আনাগোনা। গল্পে এরা মানুষের মতোই কথা বলে, মানুষের মতোই সুখে-দুঃখে অভিভূত ও বিচলিত হয়, মানুষের মতোই কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে ঘর-সংসার পাতে। পড়তে পড়তে এই পশুপাখির জগতকে আমরা আপন জগৎ বলে ভাবতে শুরু করি। এই আধুনিক বিজ্ঞান যুগের দ্রুত ধাবমান জীবনেও এই সমস্ত গল্পের রস আমাদের কাছে এখনো ফিকে হয়ে যায় নি।

আর আমাদের কবিরা পাখির কূজন নিয়ে কত যে কাব্য রচনা করেছেন তা সংখ্যার হিসেবে ধরা সম্ভব নয়। সাম্প্রতিককালের শক্তিমান ঔপন্যাসিক বনফুল শুধু পাখিদের নিয়েই একটি উপন্যাস লিখেছেন। তাছাড়া, কাব্য বা সাহিত্যের কথা বাদ দিলেও, একটা তুলতুলে চড়াই পাখি যখন এক ফালি রোদ সারা গায়ে মেখে আমাদের ঘরের জানলার আলসেতে নাচানাচি করে—সে দৃশ্য আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বদমেজাজী মানুষের মধ্যেও খানিকটা খুশির ছোঁয়া বুলিয়ে দেয়।

খুব সম্ভবত এই কারণেই ভাস্কর ও চিত্রশিল্পীদের এই পশুপাখির জগৎ যতোটা টেনেছে এমন আর কোনো কিছু নয়। সব যুগের সব দেশের শিল্পকর্ম সম্পর্কেই একথা সত্যি। আমাদের দেশে সাঁচী স্তূপে বা অজন্তা গুহায় বা খাজুরাহো মন্দিরগাত্রে এমন নিদর্শন অজস্র রয়েছে যা থেকে বোঝা

যায়, এই পশুপাখির জগৎ মানুষের কল্পনাকে কতখানি উদ্দীপিত করেছে।

অবশ্য চোখ খোলা রাখলে এমনি ধরণের নিদর্শন আমরা জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই দেখতে পাব। আমাদের উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষে আমরা এখনো পশুপাখির মূর্তি গড়ি। যে কোনো মেলায় গেলে আশ্চর্য রংয়ে রেখায় ঐজ্জ্বল পশুপাখির খেলনা-মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। আজকাল তো রুচিবান মানুষের ড্রইং-রুমেও এই পশুপাখির খেলনা মূর্তি স্থান পেয়েছে।

তার চেয়েও বড়ো কথা, আদিম ট্রাইবাল মানুষ বিশেষ বিশেষ পশু কিংবা পাখিকেই তাদের আদিপুরুষ বলে মনে করত। আমাদের দেশের প্রাচীন পুঁথিতে পশুপাখি বা গাছ-গাছড়ার নামে বংশ-পরিচয় দেবার দৃষ্টান্ত অজস্র। ঋগ্বেদে একদল মানুষকে বলা হয়েছে অজ বা ছাগল। আরেক দলের নাম শিগ্রু বা সজনে। মৎস্য তো আছেই। রামায়ণ-মহাভারতের এমনি কয়েকটি নাম—প্যাঁচা, বিছে, কাক, আখ, বেল, শেয়াল, গাধা, গোসাপ, মুরগি, হাতি, ভেড়া, শুয়োর, বাঘ, পঙ্গপাল, হাঁস, মাগুর মাছ, খরগোশ, ঘোড়া, তাল, শাল, বাঁশ, জাফান ইত্যাদি। বৈদিক-সাহিত্যের কয়েকটি ঋষি-নাম : কৌশিক, মাণ্ডুক্যেয়, গোতম, বৎস, শুনক। কৌশিক মানে প্যাঁচা, মাণ্ডুক্যেয় মানে ব্যাংয়ের বাচ্চা, গোতম মানে ষাঁড়, বৎস মানে বাছুর, শুনক মানে কুকুর। নৃতত্ত্বের ছাত্র মাত্রেই জানেন, যে বিশেষ জন্তু বা গাছের নাম থেকে বংশের পরিচয় থাকে তাকে বলা হয় টোটেম। এই আদিম টোটেম-বিশ্বাসকে আমরা বহুদূরে পেছনে ফেলে এসেছি বটে কিন্তু এখনো পর্যন্ত এই টোটেম বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত সমস্ত আচার-কানুন থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারিনি।

যাই হোক, যেদিক থেকেই বিচার করা হোক না কেন, অরণ্য ও আরণ্যক জীব আমাদের জীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। এই প্রবন্ধে ভারতের অরণ্য ও আরণ্যক জীব সম্পর্কে কিছু তথ্য নানান সূত্র থেকে সংগ্রহ করে এক সঙ্গে উপস্থিত করছি।

আয়তন

ভারতের মোট আয়তন ১২,৬৬,৯০০ বর্গমাইল। উত্তর থেকে দক্ষিণে এই দেশটির বিস্তৃতি প্রায় ২০০০ মাইল। পূব থেকে পশ্চিমে প্রায় ১,৭০০ মাইল।

ভারতের প্রাকৃতিক গড়ন সম্পর্কেও কিছুটা ধারণা থাকা দরকার। উত্তরে তুষারমণ্ডিত হিমালয় যা কয়েকটি দীর্ঘতম নদীর উৎস। দক্ষিণে দাক্ষিণাত্যের মালভূমি, যার উত্তরে জঙ্গলঢাকা পাহাড়, পূবে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে আরব সাগর। আর হিমালয় ও দাক্ষিণাত্যের মধ্যে রয়েছে ১২০০ মাইল লম্বা গাঙ্গেয় সমতলভূমি, যার পশ্চিমে রয়েছে ভারতের মরুভূমি অঞ্চল।

এই বিরাট ও বিচিত্র দেশটিতে ২,৮০,০০০ বর্গমাইল পরিমিত স্থান জুড়ে আছে অরণ্য। প্রতি বছরের প্রায় ৫৫ কোটি ঘনফুট কাঠ এই অরণ্য থেকে পাওয়া যায়। প্রায় ৮০ লক্ষ মানুষ এই অরণ্য থেকে জীবিকানির্বাহ করে। ১৯৫৩-৫৪ সালে এই অরণ্য থেকে সরকারী কোষাগারে আয় হয়েছিল ২০২০ লক্ষ টাকা।

এ থেকে শতকরা হিসেবটাও বার করা চলে। ভারতের মোট ভূখণ্ডের শতকরা প্রায় ২২-৩ ভাগ হচ্ছে অরণ্য। তবে যেহেতু ভারতের সব অঞ্চলে অরণ্যের বিস্তৃতি সমান ভাবে হয় নি, কাজেই আঞ্চলিক ক্ষেত্রে এই শতকরা হিসেবটা অনেকখানি ওঠানামা করে। ত্রিপুরার মোট ভূখণ্ডের শতকরা প্রায় ষাট ভাগ অরণ্য, আসামে শতকরা ৪৪ ভাগ।

এইসব অঙ্কের হিসেব দেখে এমনিতে মনে হতে পারে, কোনো একটি দেশে এত বেশি অরণ্য থাকার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু পৃথিবীর অন্য কয়েকটি উন্নত দেশের সঙ্গে তুলনা করলে বোঝা যাবে, এমন কি অরণ্য-সম্পদেও ভারত কতখানি দীন। সোভিয়েত ইউনিয়নে মাথাপিছু অরণ্য রয়েছে ৩-৫ হেক্টর (১ হেক্টর= ২-৪৭১ একর), মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ১-৮ হেক্টর আর ভারতে মাত্র ০-২ হেক্টর। এমন কি অরণ্যজাত উৎপাদনের পরিমাণও ভারতবর্ষে অনেক কম। অঙ্কের হিসেবে আসা যাক। ফ্রান্সে অরণ্যজাত উৎপাদনের পরিমাণ একর প্রতি ৫৬-৮ ঘনফুট। জাপানে ৩৭-০ ঘনফুট, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ১৮-০ ঘনফুট আর ভারতে মাত্র ২-৫ ঘনফুট।

অরণ্যের তাৎপর্য

অরণ্য শুধুই শোভা বর্ধন করে না, শুধুই কতকগুলো প্রয়োজনীয় উপকরণ (বাঁশ, লাক্ষা, আঠা, রজন, ভেষজ ইত্যাদি) সরবরাহ করে না, অন্য এক-দিক থেকেও দেশ ও জাতিকে বাঁচিয়ে রাখে।

অরণ্য একদিকে যেমন উদ্ভিজ্জ আস্তরণ বিছিয়ে দিয়ে জমিকে উর্বরা করে তোলে, অন্যদিকে তেমনি আব-হাওয়াকে করে তোলে অনুকূল। এক-একটি গাছ যেন এক-একটি পাম্প। এই পাম্প মাটির তলা থেকে জল টেনে তুলছে আর বাতাসকে করে তুলছে আর্দ্র। আজকাল আমাদের দেশের অনেক অংশে আবহাওয়া যেন আচমকা পাল্টে গেছে। অনেক ক্ষেত্রেই এ ব্যাপারটা ঘটেছে গাছপালা কেটে ফেলার দরুণ।

অরণ্য ঢালু জমির ক্ষয় রোধ করে। বৃষ্টির জল যখন পাহাড়ে জমি দিয়ে গড়িয়ে নামতে থাকে তখন তা তোড়ের মুখে অনেকখানি জমিকেও ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু পাহাড় যদি জঙ্গলে ঢাকা থাকে তাহলে গাছের শেকড় জমিকে এমনভাবে আঁকড়ে ধরে থাকে যে বৃষ্টির জল সহজে আর সেই জমিকে আলগা করতে পারে না। তাছাড়া গাছের মোটা শেকর অনেকখানি বৃষ্টির জল শুষে নেয় এবং সেই জলের সঞ্চয় শেষ পর্যন্ত হয়তো বা ঝরণা বা ফোয়ারা হয়ে বেরিয়ে আসে। এইভাবে অরণ্যের সাহায্যে সারা বছর ধরে জলের যোগান অব্যাহত থাকে ও বন্যার আশঙ্কা কমে।

এবারে উলটো ছবিটাও কল্পনা করা চলে। ন্যাড়া ন্যাড়া পাহাড় যেখানে জঙ্গলের চিহ্নমাত্র নেই, এই অবস্থায় বৃষ্টির জল জমির উপরিভাগের সারাংশকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, বালি আর কাঁকরে পাহাড়ের নিচের জমিও হয়ে ওঠে অনাবাদী, অল্প বৃষ্টিতেই বন্যা, অল্প অনাবৃষ্টিতেই খরা। অরণ্য না থাকলে দেশের চেহারা যে কী নিষ্করুণ হয়ে ওঠে তার একটি দৃষ্টান্ত মেসোপটেমিয়া। এককালের এই উর্বর ও সমৃদ্ধ দেশটি এখন একেবারেই মরু-ভূমি হয়ে উঠেছে। প্যালেস্টাইন ও সিরিয়ারও একই অবস্থা। ভারতে নিবরণ্য-করণের একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে পাঞ্জাবের শিবালিক। তিনশো বছর আগে সম্রাট জাহাঙ্গীর যখন এখানে নূরজাহানের জন্যে নূরপুর দুর্গটি তৈরি করেছিলেন তখনো এখানে এত ঘন অরণ্য ছিল যে, পাখির পক্ষে পুরো-পুরি ডানা মেলা সম্ভব হত না। মাত্র তিনশো বছরের মধ্যেই সেই ঘন অরণ্যের চিহ্নমাত্র নেই। পাহাড়ের ঢালু গা বৃষ্টির জলে প্রচণ্ডভাবে ক্ষয় হয়ে চলেছে।

অবশ্য ভারত সরকার বর্তমানে অরণ্য-সংরক্ষণ সম্পর্কে অতিমাত্রায়

সজাগ। অরণ্য সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের জন্যে প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় খরচ করা হয়েছে ১৫০-৫ লক্ষ টাকা, দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় ২৪ কোটি টাকা, তৃতীয় পরিকল্পনাতে প্রায় সম-পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ হয়েছে। ১৯৫০ সাল থেকে এই উদ্দেশ্যে বন-মহোৎসবও শুরু হয়েছে।

কিন্তু এত অর্থ বরাদ্দ ও এত আয়োজন সত্ত্বেও গত কয়েক বছরে অরণ্য-সম্পদের দিক থেকে আমাদের দেশ যে খুব বেশী সমৃদ্ধ হয়েছে তা বলা চলে না। কারণ এদিকে অরণ্য সম্পদ রক্ষার জন্য এত বিপুল আয়োজন সত্ত্বেও অন্য দিকে জমিকে আবাদী করার প্রচেষ্টায় ও বাঁধ নির্মাণের কর্ম-কান্ডে বিস্তৃত অঞ্চলের অরণ্য লোপ পাচ্ছে। দৃষ্টান্ত অজস্র। তেরো মাইল লম্বা হিরাকুদ বাঁধের পেছনে যে বিস্তৃত হ্রদ তৈরি হয়েছে তার ফলে উড়িষ্যার একটি প্রাচীনতম অরণ্য অঞ্চলের অবলুপ্তি ঘটেছে। তেমনি অবলুপ্ত হয়েছে উত্তরপ্রদেশের উত্তরাঞ্চলের তরাই জঙ্গল। কার্বানি নদী পরিকল্পনাটি সমাপ্ত হলে মহীশুরের পঞ্চাশ মাইল দূরের সুবিস্তৃত বাঁশের জঙ্গলটিরও আর কোনো চিহ্ন থাকবে না। কুমায়ুনে পাহাড়ের রামগঙ্গা নদীর বাঁধ করবেট সংরক্ষিত অরণ্যের অনেকখানি অংশকেই জলের তলায় ডুবিয়ে দেবে, এমন আশঙ্কা করার যথেষ্ট কারণ আছে। এমন কি আসামের বিখ্যাত কাজীরঙ্গা সংরক্ষিত অরণ্য থেকেও টুকরো টুকরো অংশ হাসিল করার চেষ্টায় কোনো বিরতি নেই। এই দূরদৃষ্টিহীন নিবরণ্য করণের মারাত্মক ফল দেখা দিয়েছে ভারতের আরণ্যক জীবের ক্ষেত্রে। এমন কি কোনো কোনো পশু একেবারে নির্বংশ হবার মুখে। যেমন, ভারতীয় চিতা, এককালের এই বিখ্যাত ভারতীয় পশুটি এখন লুপ্তপ্রায়। এবং এ ব্যাপারটি যদি চলতে থাকে তবে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে আরো বহু ভারতীয় পশুর একই অবস্থা দাঁড়াবে। কিন্তু এ আলোচনা তোলবার আগে ভারতের আরণ্যক জীবের কিছুটা পরিচয় দেবার চেষ্টা করা যাক।

ইতিপূর্বে ভারতের প্রাকৃতিক গড়ন সম্পর্কে যে সব কথা বলা হয়েছে তা থেকে বোঝা যায়, এই বিপুল ও বিচিত্র দেশের আবহাওয়া সর্বত্র একই ধরণের হওয়া সম্ভব নয়। হয়ও নি। একদিকে তিব্বত সীমান্তে হিমালয় অঞ্চল জুড়ে রয়েছে চির-তুষারের রাজত্ব, অন্যদিকে রাজস্থানের মরুভূমি। বিকানিরে গ্রীষ্ম-কালে উত্তাপের মাত্রা ১২০ ডিগ্রি ফারেনহাইট ছাড়িয়ে যায়, অথচ দার্জিলিং-এ শীতকালে তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি ফারেনহাইটের নিচে নেমে আসে। জয়সলমারে সারা বছরে ৫ ইঞ্চিও বৃষ্টি হয় না, অথচ চেরাপুঞ্জিতে প্রায় ৪৩০ ইঞ্চি। কাজেই, স্বাভাবিক কারণেই, ভারতের এই আবহাওয়াগত তারতম্য উদ্ভিদজগৎ ও জীবজগতেও বৈচিত্র্য এনেছে।

ভারতে স্তন্যপায়ী জীব আছে ৫০০ রকমের। জীববিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় স্পিসিস বা প্রজাতি। অর্থাৎ, ৫০০ বিভিন্ন প্রজাতির স্তন্যপায়ী। তেমনি বিভিন্ন প্রজাতির পাখি আছে ৩,০০০ আর পোকামাকড় ৩০,০০০। তাছাড়া আছে নানা প্রজাতির মাছ, সরীসৃপ ও উভচর জীব। সব মিলিয়ে ভারতীয় আরণ্যক জীবের যে ছবিটি পাওয়া যাচ্ছে তা যেমনই বর্ণাঢ্য, তেমনই সুসমৃদ্ধ।

প্রাকৃতিক পরিবেশের দিক থেকে বিচার করলে ভারতকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা চলে : (১) হিমালয় অঞ্চল, (২) গাঙ্গেয় অঞ্চল ও (৩) দাক্ষিণাত্য। এই তিনটি অঞ্চলের প্রধান প্রধান আরণ্যক জীবের কিছুটা পরিচয় নেবার চেষ্টা করা যাক।

হিমালয় অঞ্চল

এই অঞ্চলের বিস্তৃতি সিন্ধুনদীর উৎস থেকে ব্রহ্মপুত্রের উৎস পর্যন্ত। দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৫০০ মাইল। আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরের মৌসুমী বায়ু এখানে এসে প্রতিহত হয়। ফলে এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাতও প্রচুর।

আরণ্যক জীবের রকমভেদ অনুসারে এই অঞ্চলটিকে আবার তিনটি এলাকায় ভাগ করা হয়েছে :

(ক) পশ্চিম হিমালয় (সিন্ধু-শতদ্রু)

এই এলাকায় পশুর মধ্যে রয়েছে কয়েক জাতীয় বন্য ছাগল, বাদামী ও কালো ভালুক, কাকর (এক জাতীয় হরিণ), স্নো লেপার্ড বা শ্বেত চিতাবাঘ, সিরু, গোরাল ইত্যাদি।

(খ) মধ্য হিমালয় (শতদ্রু-গণ্ডক)

এই এলাকার পশুরাজ্যও অনেকটা পশ্চিম হিমালয়ের মতোই।

(গ) পূর্ব হিমালয় (গণ্ডক-ব্রহ্মপুত্র)

এই এলাকায় দেখতে পাওয়া যাবে গোরাল, সম্বর, কাকর, কালো ভালুক। একটু নিচের দিকে বাঘ ও হাতি। একেবারে পূর্বদিকের এলাকায় ভারতের বিখ্যাত পশু একশৃঙ্গ গণ্ডার।

গাঙ্গেয় সমতল

এই অঞ্চলের আবহাওয়া উষ্ণ ও জমি উর্বর। এই কারণেই এই অঞ্চলে জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি। গড়ে প্রতি বর্গমাইলে ৪০০জন। আবার এই অঞ্চলেরই পশ্চিমে রয়েছে রাজস্থানের মরুভূমি। শোনা যায়, এককালে নাকি এই মরুভূমির এলাকায় ঘন অরণ্য ছিল আর আবহাওয়া ছিল আর্দ্র। তখন নাকি এই এলাকায় প্রচুর হাতি ও গণ্ডার ঘুরে বেড়াত।

এই ঘন জনবসতির জন্যেই এই অঞ্চল থেকে অরণ্য ক্রমশ লুপ্ত হয়েছে।

ফলে বন্য পশুরা আশ্রয় নিয়েছে উত্তরের হিমালয়-পাদদেশের তরাই জঙ্গলে, পশ্চিমের আরাবল্লী পর্বতে ও দক্ষিণের মালভূমিতে।

এই অঞ্চলের পশুদের মধ্যে রয়েছে—

(ক) হিমালয়ের পাদদেশে বাঘ, চিতাবাঘ, সম্বর, ভালুক, কাকর, গণ্ডার (আসামে ও বাংলায়) চিতল, হরিণ ও চার শিংওলা বন্য ছাগল;

(খ) মধ্যবর্তী এলাকায় কৃষ্ণসার, নীলগাই, শুয়োর, সজারু, ইত্যাদি;

(গ) আরাবল্লী পাহাড়ে ও দক্ষিণের মালভূমিতে বাঘ, চিতাবাঘ, সম্বর, কাকর, চিতল ও ভালুক।

দাক্ষিণাত্য

এই মালভূমিটি ঘিরে রয়েছে সারি সারি পাহাড়। উত্তরে বিন্ধ্য ও সাতপুরা, পূবে পূর্বঘাট ও পশ্চিমে পশ্চিমঘাট। আবহাওয়া ও বৃষ্টিপাত অনুসারে এই অঞ্চলটিকে তিনটি এলাকায় ভাগ করা চলে—

(ক) পশ্চিমঘাট, নীলগিরি, মালাবার উপকূল ইত্যাদি সমেত পশ্চিম উপকূল, যেখানকার বৃষ্টিপাত বছরে ৮০ ইঞ্চি বা তারও বেশি;

(খ) বোম্বাই, ইন্দোর, নাগপুর ইত্যাদি সমেত গোদাবরীর উত্তরের মালভূমি, যেখানকার বৃষ্টিপাত বছরে ৪৫ থেকে ৮০ ইঞ্চির মধ্যে;

(গ) পূর্ব উপকূল, যেখানকার বৃষ্টিপাত ২০ থেকে ৩০ ইঞ্চির মধ্যে।

এই অঞ্চলের জন্য পশুদের মধ্যে আছে বিভিন্ন জাতীয় ছাগল, বন্য বেড়াল, শেয়াল, নকুল, হায়েনা, নেকড়ে, কাঠ-বেড়াল, খরগোস ইত্যাদি। বাইসন, সম্বর, ভালুক ও বন্য কুকুরও পাওয়া যেতে পারে। আর আর্দ্র এলাকাগুলিতে আছে হরিণ, মহিষ ও হাতি। এ ছাড়াও পশ্চিম উপকূলের দিকে হাতি, বাইসন, নকুল, উদ ও আরো কয়েক ধরনের পশু

বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য

বন্য ভেড়া ও ছাগলের বাস প্রধানত হিমালয় অঞ্চলে। এমন কি হিমালয়ের দশ হাজার ফুট উঁচুতেও কয়েক জাতের ভেড়া দেখতে পাওয়া যাবে। যেমন তিব্বতী ভেড়া। উঁচুতে প্রায় চার ফুট (মাটি থেকে গর্দান পর্যন্ত) আর চল্লিশ ইঞ্চি লম্বা শিঙ। আবার আরেক জাতের ভেড়া আছে যাদের শিঙের বাহার তাকিয়ে দেখবার মতো। শিঙের রঙ হাতির দাঁতের মতো, অনেকটা দড়ির মতো পাক খেয়ে খেয়ে দু-পাশে ছড়িয়েছে, লম্বায় প্রায় ৭৩ ইঞ্চি। উরিয়াল ও নীলগাই চেহারার দিক থেকে মাঝারি, শিঙের দিক থেকেও তাই। বন্য ছাগলও নানা জাতের—যেমন, আইবেক্স, মারখোর (৬৫ ইঞ্চি শিঙ), থর (১৫ ইঞ্চি শিঙ), সিরু (১০ ইঞ্চি শিঙ), গোরাল ইত্যাদি।

তবে শিঙের বাহারের দিক থেকে ভেড়ার ওপরে হরিণরাই টেক্কা দেয়।

আবার, শিঙ নেই এমন হরিণও আছে, যার নাম দেওয়া হয়েছে কস্তুরী। এই হরিণের শরীরে এমন একটি গ্রন্থি আছে যা থেকে কস্তুরী সুবাস নিঃসৃত হয়। অন্যদিকে পাঞ্জাব অঞ্চলে হিমালয়ের দক্ষিণে আছে চারশিঙওলা হরিণ, যার চলতি নাম চৌশিঙ।

ভারতীয় গণ্ডারের কিন্তু একটিমাত্র শিঙ আর শিঙের অদ্বিতীয়তার জন্যেই তার পৃথিবীজোড়া খ্যাতি। গণ্ডার আফ্রিকাতেও আছে কিন্তু সেই গণ্ডারের শিঙ দুটি।

ভারতে এই বিখ্যাত জীবটি কিছু-কাল আগে প্রায় লোপ পেয়ে যাবার মতো অবস্থায় এসেছিল। গত চল্লিশ বছর ধরে সরকারী প্রচেষ্টায় সংরক্ষিত অঞ্চলে এদের রক্ষণাবেক্ষণ চলেছে।

তবে ভারতের অরণ্যে কিন্তু শৃঙ্গ-বানদের চেয়ে শৃঙ্গহীনদেরই প্রতাপ বেশি। যেমন, হাতি, বাঘ ও সিংহ। অবশ্য সিংহ সম্পর্কে একটি বলার কথা আছে। কিছুকাল আগে ভারতের উত্তর ও মধ্য অঞ্চলে সিংহ পশুরাজের মতোই অবাধে চলাফেরা করত। এখন শুধু গুজরাটের গির সংরক্ষিত অরণ্যে কয়েকটি সিংহকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের চন্দ্রপ্রভা সংরক্ষিত অরণ্যেও তিনটি সিংহ আছে। ভারতে মোট সিংহের সংখ্যা বর্তমানে প্রায় তিনশো।

বিলীয়মান ও লুপ্তপ্রায়

বিলীয়মান ও লুপ্তপ্রায় পশুর তালিকায় প্রথমেই নাম করতে হয় চিতার। তারপরে একশৃঙ্গ গণ্ডারের। অবশ্য শেষোক্ত জীবটির অবস্থা এখন ভালোর দিকে। আসামের সংরক্ষিত অরণ্যে বর্তমানে গণ্ডার আছে ২৪০। কুচবিহারে আছে কুড়িটি, বিহারে পাঁচটি। সব মিলিয়ে বর্তমানে ভারতে প্রায় ৩৫০টি গণ্ডার আছে।

নতুন নতুন জমি আবাদ করার দরুন গৌর বা ভারতীয় বাইসন ঠাঁইছাড়া হয়ে গিয়ে লোপ পাবার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। কয়েক জাতের হরিণ এবং বন্য ভেড়া ও ছাগলের সংখ্যাও ক্রমশঃ হ্রাস পাবার দিকে। এমন কি যে-সব পশুকে সংরক্ষিত অরণ্যে রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে তারাও উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে যথেষ্ট সংখ্যায় বৃদ্ধি পাচ্ছে না। গোটা ভারতের ছবি যদি চোখের সামনে ধরা যায় তাহলে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, ভারতের বন্য জীবন একটা বিপর্যয়ের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। এই বিপর্যয়কে রোধ করতে হলে সমস্যাটিকে জাতীয় ভিত্তিতে বিবেচনা করা উচিত। অচিরেই উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত না হলে ভারতের অতুলনীয় বন্য-জীবন এমনভাবে লোপ পাবে যার আর কোনো প্রতিকার থাকবে না। অবশ্য ১৯৫২ সালেই ভারত সরকারের উদ্যোগে বন্য-জীবন সংরক্ষণের জন্যে একটি বোর্ড গঠিত হয়েছে। কিন্তু এই বোর্ড এখনো পর্যন্ত অনেকটা উপদেষ্টা কমিটির মতো। অন্যদিকে বিপর্যয়টি এতই ব্যাপক যে শুধু একটি বোর্ডের সুপারিশে তার প্রতিকার সম্ভব নয়। যুদ্ধকালীন জরুরি অবস্থার মতো একটি সামগ্রিক প্রচেষ্টা গড়ে তুলতে না পারলে এই বিপর্যয় প্রতিহত হবে না।
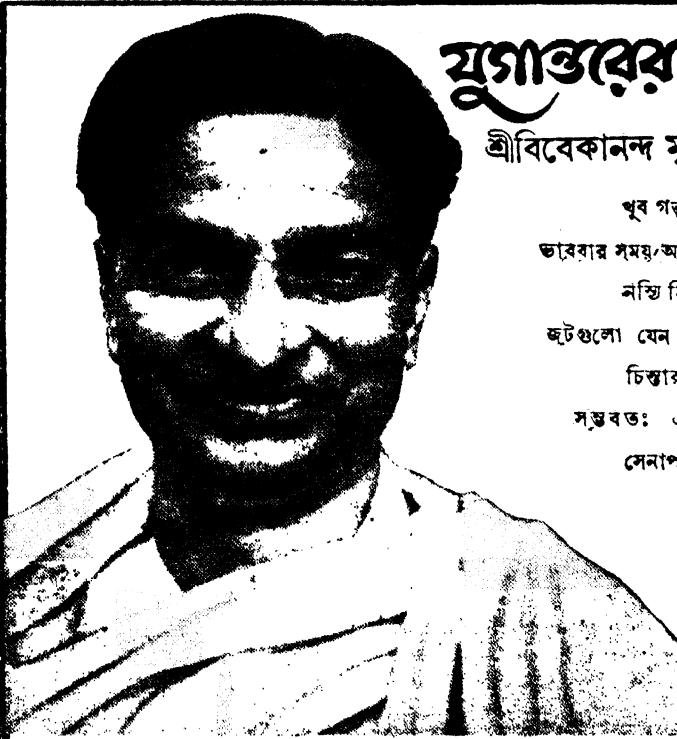
[এক]

একটি সামান্য চুরি উপলক্ষে এতখানি উত্তেজনা কোনো শহরে আজ পর্যন্ত হয়েছে কি না—উত্তেজনার ইতিহাসে তার কোনো নজির পাওয়া যায় না। এটি অবশ্য ছোট শহর—বড় শহর কলকাতার তলী। সংক্ষেপে শহরতলী।

ঘুমন্ত অবস্থায় কাদম্বিনী চৌধুরীর একখানা হাত থেকে দামী পাথর সেট করা একটি ব্রেসলেট ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। নিয়েছে জানালা দিয়ে। এমন জোরে টেনেছে যে তাঁর হাত ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে।

শখ করে বাড়ি করেছিলেন শহরতলীতে। শহরের বাড়িতে সব সময় ভাল লাগে না, নতুনত্ব চাই, একটুখানি বেশি খোলা জায়গা চাই, তাই এই বিলাস।

দোতলা বাড়ি, অনেকখানি জায়গার উপর। উপরতলাটা এখনো ফিনিশ হয়নি, নিচের তলা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। সব শেষ হলে তবে আসবাবপত্র আসবে। ইতিমধ্যে দামী ফিতের খাটিয়া আর দু' চারখানা চেয়ার টেবিল মাত্র সম্বল। কাদম্বিনী চৌধুরীর ভয়ানক ইচ্ছা একতলাতেই গৃহপ্রবেশ করে কয়েকদিন অস্থায়ীভাবে সেখানে থাকেন।

যে জানালার ধারে তিনি শুয়ে ছিলেন, বিছানা থেকে তার দূরত্ব দশ ফুট। জানালা থেকে যতদূর সম্ভব দূরে বিছানা শুধু চোরের ভয়েই, কেননা সেটি নিচের তলার ঘর। এবং যদিও জানালার বাইরে ছ' ফুট দূরে প্রাচীর, কিন্তু বাইরের লোক প্রাচীর ডিঙিয়ে অনায়াসে ভিতরে আসতে পারে। তাই প্রাচীর থাকা সত্ত্বেও অতিরিক্ত সতর্কতা।

তবু হাত থেকে ব্রেসলেট ছিনিয়ে নেওয়া সম্ভব হল কি করে? বাইরের লোক জানালা দিয়ে হাত গলিয়ে কাদম্বিনী চৌধুরীর হাত থেকে ব্রেসলেট খুলে নিতে পারে না এবং দরজা দিয়ে ঘরেও কেউ ঢোকেনি।

তার প্রমাণ আছে। প্রমাণ কাদম্বিনী চৌধুরীর স্বামী কদম্ব চৌধুরী। চিৎকার শুনে তিনি পাশের ঘর থেকে ছুটে এসে দরজায় বার বার কড়া নাড়তে কাদম্বিনী এক হাত দিয়ে দরজা খুলে দিয়েছিলেন। তার মানে দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল।

একদল লোক রটাচ্ছে ভূত এসেছিল। আর একদল বলছে কাদম্বিনী চৌধুরীই ভূত, ইচ্ছে করলেই হাত লম্বা করতে পারেন। প্রাচীন কালে রূপকথার সুন্দরী স্ত্রীরা যেমন আসলে রাক্ষসী, কাদম্বিনীও তেমনি আসলে ভূত।

পুলিস অনেক চিন্তা করে বলেছে, রহস্য। এবং আরও অনেকক্ষণ চিন্তা করে বলেছে, রহস্য কিছুই নেই।

ব্রজবিলাসকেও ডাকা হয়েছে, কিন্তু আপাতত সে পুরনো বাড়িতে গিয়ে অনুসন্ধান চালাচ্ছে। সে বলেছে হাত লম্বা হয় এটাই ঠিক। এবং এখানে ঘণ্টাখানেক বসে চিন্তা করেই চলে গেছে পুরনো বাড়িতে।

অতএব পুলিস তার নিজস্ব পদ্ধতিতে জেরা চালাচ্ছে নতুন বাড়িতে বসে এবং কদম্ব চৌধুরী উত্তর দিচ্ছেন।

"মিসেস চৌধুরী একা শুয়ে ছিলেন এক ঘরে। উনি কি একা থাকতে ভালবাসেন?"

"সব সময়ে নয়, এবাড়িতে শখ হয়েছিল একা থাকবার।"

"ও'র কি কোনো গরীব আত্মীয় আছেন?"

"আমার জানার মধ্যে কেউ নেই।"

"বাপের বাড়ির অবস্থা কেমন?"

"আপনার সীমা ছাড়াচ্ছেন, এরকম প্রশ্নের উত্তর আমি দেব না।"

"মাপ করবেন, কোনো দুশ্চরিত্র ভাই কিংবা নিকট আত্মীয় কেউ আছেন?"

কদম্ব চৌধুরী বিরক্ত এবং নিরুত্তর।

"কিছু মনে করবেন না, কেসটা সাজানো নয় তো? ধরুন কাউকে সাহায্য করার দরকার অথচ হাতে নগদ টাকা বিশেষ নেই, তাই চুরির অভিনয় ক'রে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা। মনে হয় কি এ রকম?"

"আপনার এ সব কোনো প্রশ্নেরই উত্তর আমি দেব না। ভাষাটাও আপনার মার্জিত নয়।"

"অবশ্যই নয়। এনকোয়ারী করতে করতে এই রকম হয়ে যায়, সে জন্য ক্ষমা করবেন। ডিটেকটিভ লাগিয়েছেন কি?"

"ব্রজবিলাস সরকার দেখছেন কেস্‌টা। তিনি এই মুহূর্তে আমাদের পুরনো বাড়িতে সন্ধান চালাচ্ছেন, খবর এসেছে—এখুনি আসছেন।"

"ব্রজবিলাস? ও একটা চালিয়াত, সহজ জিনিসকে জটিল করে তোলে। কিন্তু চোর ধরতে ডিটেকটিভ কেন?"

"আমার স্ত্রীর ইচ্ছা। আমি নিজে পুলিস বা ডিটেকটিভ কিছুই ডাকতাম না। সময় নষ্ট, টাকা নষ্ট, অথচ কোনো লাভ নেই। মিসেস চৌধুরী জোর করে এ সব করিয়েছেন। এ কেস্ পুলিসে কি করবে? যদি করে তবে ডিটেকটিভই করবে, আর কেউ না।"

"বটে?—বেশ তো, টাকা আছে, ওড়ান না? এরপর চুরি দূরের কথা খুন হলেও পুলিস ডাকবেন না। মুণ্ডুটি যদি দেহ থেকে খসে মাটিতে পড়ে যায় তবু ডিটেকটিভকেই ডাকবেন।"

কথা শেষ হতে না হতে ব্রজবিলাস বাড়ির সামনে এসে নামল। তার এক হাতে টাইপরাইটার, অন্য পাশে কাঁধে ঝোলানো একটি থলে, তার মধ্যে টাইপ করা এক গাদা কাগজের ফ্লাট ফাইল, ম্যাগনিফাইং গ্লাস, তামাকের টিন, তিন চারটি পাইপ।

ব্রজবিলাসের বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে ভারত সরকারের অনেক সাহায্য হয়েছে সেজন্য সে যাতে বিলেত থেকে নিয়মিত পাইপের তামাক পায় তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু তবু বিদেশী তামাকে সকল দেশী সমস্যার সমাধান হয় না, এবং ব্রজবিলাস সম্প্রতি একটি আশ্চর্য আবিষ্কার করেছে—বিদেশী একটি বিশেষ তামাকের সঙ্গে মাত্র এক গ্রেন গাঁজা মিশিয়ে নিলে যে-কোনো দেশী রহস্য অতি সহজে ভেদ হয়ে যায়। এ পরীক্ষা সে বিলেত গিয়েও করেছে, এবং শীতের দেশ হওয়া সত্ত্বেও ফলে কোনো তারতম্য দেখা যায়নি।

ব্রজবিলাস কদম্ব চৌধুরীর পৈতৃক বাড়িতে গিয়ে একবেলা কাটিয়ে এলো। সেখানে সে যা দেখতে চেয়েছে তা সে দেখেছে, যা শোনবার শুনেছে, এই রকম একটা তৃপ্তির ভাব তার চোখে।

দেখেছে একটা মেয়েদের সাইকেল, এক জোড়া পাহাড়ে ওঠা জুতো। জানতে পারা গেছে কাদম্বিনী চৌধুরী আগে সাইকেল চালাতেন, এখন মোটর চালান। তিনি তিনবার মোটর দুর্ঘটনায় পড়েছেন। পাহাড়ে ওঠার ভীষণ শখ ছিল এককালে।

পতন কাহিনীও আছে। পাহাড় থেকে নিচে পড়ে গিয়েছিলেন একবার, এবং তাতেও দমেননি, কয়েক দিন পরে আবার পাহাড়ে উঠেছিলেন।

একবার পাহাড়ের জঙ্গলপথে একা গিয়ে পথ হারিয়েছিলেন, শেষে রাত্রিবেলা দুজন পাহাড়ী তাঁকে এনে পোঁছে দেয়।

নতুন বাড়িতে যাবার সময় কি কি সঙ্গে নিয়েছেন তার খবরও যতদূর সম্ভব সংগ্রহ করা হয়েছে।

সব শেষে ব্রজবিলাস একটা ঘরে ঝাড়া দু ঘণ্টা বসে পাইপ খেয়েছে। বলা বাহুল্য তামাকের সঙ্গে সেই বিশেষ দ্রব্যটি মেশানো ছিল। তারপর তিন ঘণ্টা টাইপ করেছে।

ব্রজবিলাস পোঁছে বাহিত-জিনিসগুলি নামিয়ে রেখেই দারোগাকে নমস্কার করে বলল, "হাতে সময় নেই, আমাকে এখুনি কাজ আরম্ভ করতে হবে।"

দারোগা একটুখানি বিদ্রুপের সুরে বললেন, "চুরি হল এ বাড়িতে, আপনি একটি দিন কাটিয়ে এলেন আর এক বাড়িতে, তবে আর এ বাড়িতে কি কাজ থাকতে পারে?"

ব্রজবিলাস কিছু অন্যমনস্কভাবে বলল, হ্যাঁ, তা হয়তো নেই, না থাকলেই মঙ্গল। সেখানেই দেখেছি অনেক কিছু।"

"খুব মজার তো? কি দেখেছেন জানতে পারি?"

"চোখ খুললেই যা দেখা যায় তাই দেখেছি, অবশ্য আমার দেখা মিথ্যাও হতে পারে।"

"জানালা থেকে খাটের দূরত্বটা মেপে দেখুন আগে, তা হলেই বুঝতে পারবেন জল বড়ই গভীর।"

"গভীর জলের কথায় ভয় দেখাচ্ছেন কেন? না হয় ব্যর্থ হব। আমাকে তবু চেষ্টা করতে হবে। আপনি আমার সময় নষ্ট করে দিচ্ছেন অকারণ।"

"আপনার নির্বুদ্ধিতার সীমা দেখতে চাই এখানে বসে।"

"ও! তা হলে আপনাকে আমি খুব খুশি করতে পারব, আমাকে শুধু সামান্য একটু গাঁজা জোগাড় করে দিতে হবে, দেবেন দয়া করে?"

দারোগা এ কথায় খুব এক চোট হেসে বললেন, "বুঝতে পেরেছি, দিচ্ছি

জোগাড় করে। আর আমার এখানে থাকা পোষাবে না সাঁত্যই।"

দারোগা কনসটেবলকে গাঁজা জোগাড়ের হুকুম দিয়ে বিদায় নিলেন। তিনি অদৃশ্য হওয়া মাত্র কনসটেবল ট্যাঁকে জড়ানো থলি থেকে ব্রজবিলাসকে একটুখানি গাঁজা বার করে দিয়ে অনেকগুলো দাঁত বিকসিত করল। দেখা গেল তার ডান হাতখানাও ঐ সঙ্গে বেরিয়ে এসেছে। সেই হাতে ব্রজবিলাস একটি টাকা দিল, কনসটেবল আরও বেশি দাঁত বার করে এবং সভক্তি সেলাম জানিয়ে দারোগাকে অনুসরণ করল।

ব্রজবিলাস সমস্ত রাত একটা ঘরে বসে শুধু পাইপ টেনেছে। পরদিন সামান্য কিছু আহার করে কর্তব্য শুরু করল। রাতে চলেছিল মগজের কাজ, দিনে আরম্ভ হল অন্তর্দৃষ্টিতে দেখা সত্যকে যাচাই করার কাজ। তখনও সামান্য অংশে আলোকপাত বাকি। ঠিক যেমন পূর্ণিমার আগের দিন চাঁদের একটুখানি অংশে আলো পড়তে বাকি থাকে, তেমনি।

এই সময় কাদম্বিনী চৌধুরী নিজে থেকেই ব্রজবিলাসের কাছে এসে একটি নতুন খবর দিলেন, সকাল বেলাতে একটা হনুমান এসে জানালার ধারে বসেছিল।

ব্রজবিলাস জিজ্ঞাসা করল, "একথা বলছেন, মানে হনুমানের উপর আপনার সন্দেহ হচ্ছে কি এখন? কিন্তু ওরা তো রাত্রে বেরোয় না। কারো শিক্ষিত হনুমান হলে হতেও পারে। কিন্তু এখানে সে প্রশ্ন আসছে না, সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। কিন্তু আপনি হনুমান ধরতে গিয়েছিলেন কেন?"

কাদম্বিনী চমকে উঠলেন এ কথা শুনে। ব্রজবিলাসের তো তা দেখবার কথা নয়। তবে কি ভদ্রলোক না দেখেও সব দেখতে পান!

কাদম্বিনী চৌধুরী বুঝলেন, এই সামান্য কথাটা গোপন করে লাভ নেই। হনুমান ধরার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তাঁর আছে। তাই ব্রজবিলাসকে সে-কথা বলতে যেতেই ব্রজবিলাস তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "আমার যা জানবার তা জানা হয়ে গেছে আর কিছুই বলতে হবে না।"

ব্রজবিলাস আবার কিন্তু চিন্তামগ্ন। সবই শেষ, সামান্য একটুখানি কিসের অভাব। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে উঠল একটি কুণ্ডলী পাকানো ফ্লেক্স ঘরের এক কোণে পড়ে আছে। তার একটা দিক প্লাগে লাগানো যায়, আর একদিকে বালব্ লাগানো যায়। এ জিনিষটা এতক্ষণ তার কাল্পনিক ছবির মধ্যে আসে নি, এখন হঠাৎ আসাতে সে আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠল।

অবশ্য এটি না এলেও ব্রজবিলাসের মূল সিদ্ধান্তের কোনো বদল হত না। তার সব কথাই টাইপ করা হয়ে গেছে, পুরনো বাড়িতে বসেই সে চতুর্দশীর চাঁদ হাতে পেয়ে গেছে। টাইপ করা হয়ে গেছে পঞ্চাশ শীট কাগজ।

ব্রজবিলাস ফ্লেক্সটি মেপে ফেলল, তার মুখ খুশিতে উজ্জ্বল। সে আরও কোনো একটি জিনিস খুব উৎসাহের সঙ্গে খুঁজতে আরম্ভ করল। ঘরে নেই, বাইরে ঘাসের মধ্যে থাকা সম্ভব। যে জানালা থেকে ব্রেসলেট ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে তার বাইরেই সেটি থাকবার কথা।

ব্রজবিলাস ঘাসের উপর ছাগলের ঘাস খাওয়ার ভঙ্গিতে খুঁজতে লাগল। নতুন তৈরি বাড়ি, এখনও জঞ্জাল সব সাফ করা হয়নি, তার মধ্যে খুঁজতে হচ্ছে খুব মনোযোগের সঙ্গে।

[দুই]

ব্রজবিলাস যখন কিছু খোঁজে তখন বুঝতে হবে সে জিনিষ সে পাবেই। একবার একটা কেসে তার ধারণা হয়েছিল অপরাধী একটা বিশেষ ঘরেই নিশ্চয় আছে। সে ঘরে কোনো আসবাব ছিল না, পরিষ্কার ঝকঝকে দেয়াল। কিন্তু ব্রজবিলাসের ধারণা কখনও মিথ্যা হয় না। সে সেই দেয়ালের ভিতর থেকে অপরাধীকে টেনে বার করল, দেয়াল যেমন ছিল তেমনি রইল, একটি টুকরোও কোথাও খসল না। কি করে হল, সবাই জিজ্ঞাসা করল। ব্রজবিলাস শুধু মৃদু মৃদু হাসল।

সেই ব্রজবিলাস জানালার বাইরে একটি বিশেষ জিনিষ আছে সন্দেহ করেছে, অতএব ধরে নিতে হবে সে জিনিষ সেখানে আছেই।

পেল ঠিক সেই জিনিষটি। কাপড়ের পাড় ছেঁড়া একটি বারো-তেরো ইঞ্চি টুকরো, কোনো জিনিষ তা দিয়ে জড়িয়ে বাঁধা ছিল, বোঝা যায়। এখনও তার পাক খোলেনি। গিট বাঁধা ছিল তারও চিহ্ন রয়ে গেছে।

ব্রজবিলাস ছুটে ঘরে গিয়ে টাইপ করতে বসল, আজ তার চাঁদ ষোল কলায় পূর্ণ হয়েছে।

টাইপ শেষে ব্রজবিলাস কফি খাচ্ছিল। আজ সে ভীষণ খুশি। সব মিলে গেছে। এখন শুধু দু একটি বিষয় সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হওয়া সত্ত্বেও যাচাই করা দরকার। যথাযথ যাচাই না করলে কোনো সত্য বৈজ্ঞানিক সত্য হয় না।

বাইরে ভালুক-নাচ দেখাচ্ছিল একটা লোক, তার ডুগডুগির বাজনা আর চিৎকার কানে আসছে ব্রজবিলাসের।

ব্রজবিলাসের কানে সেই শব্দ এসে, সিনেমা ক্যামেরায় যেমন শব্দ আলোতে রূপান্তরিত হয়ে তার ছবি ওঠে, তেমনি আলোতে রূপান্তরিত হল। সে কফি খেয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। কেন, তা সেই জানে, কি আলো জ্বলল, তা সেই জানে। বলে গেল একটি বিশেষ সূত্র সন্ধানে সে ব্যস্ত থাকবে, সন্ধ্যার আগে আর সে আসতে পারবে না।

এতে কাদম্বিনী চৌধুরীও যেন একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তাঁরই ইচ্ছায় ডিটেকটিভ এসেছে, অথচ বাড়ির মধ্যে সর্বক্ষণ একজন ডিটেকটিভ থাকলে কেমন যেন চলাফেরায় অস্বস্তি বোধ হয়। নিজেকেই সবসময় অপরাধী বোধ হয়।

ভালুক নাচ থেমে গেছে অনেকক্ষণ। ব্রজবিলাস চলে যাওয়ার পর ভালুক নাচ এলে বাইরে গিয়ে বেশ দেখা যেত, ডিটেকটিভের সামনে একজন মহিলার ছেলেমি করা পোষায় না।

কিন্তু কাদম্বিনী চৌধুরীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল বিকেলের দিকে। ভালুক নাচের ডুগডুগি আবার শোনা গেল। তিনি নিজে ঘরের বাইরে গিয়ে নাচওয়ালাকে ডেকে খেলা দেখতে লাগলেন। লোকটির দুটো ভালুক, তার মধ্যে একটি খুব ভাল নাচে। তাকে একটি বোতল দিয়ে মাতালের ভূমিকা অভিনয় করতে বলা হল—"যারে বেটা মাতাল বনি!"—ভালুক বোতল মুখে দিয়ে মাতাল সাজল। কি সুন্দর সে মাতালের অভিনয়, সবাই হাততালি দিতে লাগল। কাদম্বিনী চৌধুরী তাঁর স্বামীর মত্ত অবস্থা অনেকবার দেখেছেন, কিন্তু এই ভালুকের মতো এমন চমৎকার মাতাল তিনি দেখেননি। স্বামীর মাতলামির উপর তাঁর অশ্রদ্ধা জাগছিল ভালুকের মাতলামি দেখে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল, মনে এলো এখন তো আর উপায় নেই।

এমন সময় এক হৈহৈ কাণ্ড। মাতাল ভালুক তার মনিবের আদেশ অমান্য করে মাতলামির ঝোঁক ছুটে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই উপস্থিত যাবতীয় দর্শক—ছেলে-বুড়ো সবাই ভয়ে দিশেহারা হয়ে যে যেদিকে পারল ছুটতে লাগল। কিন্তু কাদম্বিনী চৌধুরীর কি ভয়ানক সাহস,

তিনি স্ত্রীলোক হয়ে ছুটে গিয়ে ভালুক-টাকে ঝাপটে ধরলেন এবং তাকে কাবু করে ফেলে কোনো রকমে ভালুককে তার মালিকের হাতে ফিরিয়ে দিলেন।

দর্শকেরা তখন পালানো প্রত্যাহার করে দাঁড়িয়ে গেল এবং কাদম্বিনী চৌধুরীর সাহসের জন্য তাঁকে প্রশংসা করতে লাগল যদিও তার একটা কথাও তাঁর কানে গেল না। কারণ সে সময় তিনি অবিরাম হাঁচছিলেন হাাঁচ্চো হাাঁচ্চো করে। ভালুকের লোম তাঁর নাকে ঢুকে এই বিপর্যয় ঘটিয়েছে। এবং গোটা পঞ্চাশেক হাঁচির পর তাঁর খেয়াল হল এ রকম একটি কাজ তাঁর মতো মহিলার প্রকাশ্যে করা হয় তো উচিত হয়নি, বিশেষ করে নতুন জায়গায়। তিনি ছুটে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করলেন।

ব্রজবিলাস এলো ঘণ্টা দুই পরে। বেশ প্রফুল্ল দেখাচ্ছে, শিস দিচ্ছে। এসেই বলল "আমার সব কাজ শেষ হয়েছে।"

কাদম্বিনী ব্যগ্রস্বরে প্রশ্ন করলেন "চোর ধরা পড়েছে?"

ব্রজবিলাস বলল "পড়েছে বৈকি।"

"কোথায়? সে কি এখন থানায়?—কাদম্বিনীর ঠোঁটে বাঁকা হাসির রেখা।

ব্রজবিলাস বলল, "না। আমার কাজ চোর ধরা নয়, চোর ধরতে আমাকে ডাকা হয়নি, ডাকা হয়েছে রহস্য ভেদ করতে।"

"কি রকম?"

"আমি চাই সমস্ত ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে। অবশ্য আমার ব্যাখ্যা, অনুমান, এবং সিদ্ধান্ত সবই আমি অনেক আগেই টাইপ করে রেখেছি। তার পরে অনেক কিছু দেখেছি ও জেনেছি, কিন্তু সে সবই আমার পূর্ব সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করেছে।" কদম্ববাবু, আপনি থানার দারোগাকে ডাকুন, তাঁর সবটা শোনা দরকার।

কদম্ব চৌধুরী একটুখানি বিরক্তভাবে বললেন, "আবার দারোগা কেন এর মধ্যে। সব তো আপনিই করলেন।"

"তবু ডাকুন।"

দারোগা প্রথমে আসতে রাজি হননি, বলেছেন ওসব চালিয়াতির মধ্যে আমি নেই। কিন্তু পরে অনেক অনুনয় বিনয় করে তাঁকে আনা হয়েছে।

[তিন]

ঘরে মাত্র চারজন লোক। কদম্ব চৌধুরী, কাদম্বিনী চৌধুরী, ব্রজবিলাস সরকার ও থানার দারোগা।

সবাই উৎসুক। চৌধুরী দম্পতির বুক দুরু দুরু। দারোগা মহা বিরক্ত। কিন্তু ব্রজবিলাসের মুখে খুব একটা গর্বিত ভঙ্গি।

ব্রজবিলাস তার চেয়ারটিকে একটু দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল যাতে দূর থেকে

তিনজনকে একসঙ্গে সম্বোধন করার সুবিধা হয়।

পাইপে ভাল তামাক পুরে ভাল করে ধরিয়ে ব্রজবিলাস উঠে দাঁড়িয়ে টাইপ করা কাগজের দিকে দৃষ্টি রেখে বলতে লাগল।

"এই কেসটার প্রথমেই যে বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে সে হচ্ছে জানালা ও খাটের দূরত্ব। দারোগাবাবু ঠিকই বলেছিলেন, ঐখানেই ব্যাখ্যা করা শক্ত। কি করে অত দূর থেকে একটি লোক মিসেস চৌধুরীর হাত ছুঁতে পারে এই হল প্রধান প্রশ্ন। এক, চোরের হাত দশ ফুট হলে তা হতে পারে, অথবা মিসেস চৌধুরীর হাত দশ ফুট লম্বা হওয়া দরকার।

"এ দুটোর কোনোটাই সম্ভব নয়।

"তৃতীয়—খাটটা যদি জানালার পাশে সরিয়ে দেওয়া যায় তা হলে চুরির ব্যাখ্যা হতে পারে। পরীক্ষা করে দেখেছি খাট জানালার পাশে সরানো হয়েছিল। কিন্তু পরীক্ষার আগেই এ অনুমান আমি নির্ভুলভাবে করেছি। মিসেস চৌধুরী, আপনি একটু বিচলিত হচ্ছেন, দরকার নেই বিচলিত হবার। শুনুন ধৈর্য ধরে।

"কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, খাট জানালার পাশে সরানো হল কেন? এবং আগেই বলে রাখি, একদিন নয়, পর পর কয়েকদিন রাত্রে সরানো হয়েছে, অথচ ঘরে খুব ভাল এবং নতুন পাখা ফিট করা আছে, প্রচুর হাওয়া পাওয়া যায় তা থেকে। তবু জানালার ধারে যাওয়া কেন? এবং যদি যাওয়া হল তা হলে খুব দামী পাথর

বসানো ব্রেসলেট হাতে পরা অবস্থায় কেন?

"এ প্রশ্নের উত্তর আমি পেয়েছি পুরনো বাড়িতে সন্ধান চালিয়ে।

"মিসেস চৌধুরী অ্যাডভেন্চার প্রিয়, সবসময় বিপজ্জনক কাজে হাত দিতে ওঁর ভাল লাগে। মিসেস চৌধুরী, বিচলিত হবেন না। মিস্টার চৌধুরী, আপনি আমার কথায় খুশি হয়ে উঠছেন দেখতে পাচ্ছি। শুনুন ধৈর্য ধরে সবটা।

"মিসেস চৌধুরী নতুন বাড়িতে একটি রাত কাটিয়েই ছটফট করছিলেন অ্যাডভেন্চারের অভাবে। নতুন পরিবেশে এই ইচ্ছাটা নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। এঁর পূর্ব ইতিহাস আমি যা পেয়েছি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পাহাড়ে ওঠার দুঃসাহসিক চেষ্টা, মোটর চালিয়ে দুর্ঘটনা ঘটানো, এবং পাহাড় পথে এলোমেলো ঘুরে পথ হারিয়ে মজা দেখা।

"এবারে নতুন অ্যাডভেন্চারের পরিকল্পনা। ব্রেস্লেট-হাতে শুয়ে হাতখানা জানালার বাইরে রাখলে চুরির একটা সম্ভাবনা থাকে, এবং বিশুদ্ধ চুরি নয়, হাত থেকে টেনে ছিনিয়ে নিতে এলে সেই সঙ্গে একটা কোনো দুর্ধর্ষ চোরের সঙ্গে ধস্তাধস্তি—কল্পনা করতেও মিসেস চৌধুরী রোমাঞ্চিত হয়েছিলেন।

"কিন্তু অন্ধকারে প্রাচীর ডিঙিয়ে চোর এসে ঠিক তাঁর পরিকল্পনা মিলিয়ে চুরি করতে চাইবে কেন এটি একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁর কাছে। তাই তিনি কম পাওয়ারের একটি বাল্ব আনিয়ে প্লাগ থেকে জানালার বাইরে ঠিক-জায়গায় আলো ফেলার ব্যবস্থা করেছিলেন। হাতখানা শোবার সময় জানালার বাইরে রেখে, আলোটা জানালার গরাদের সঙ্গে, ছেঁড়া পাড়ের অংশ জড়িয়ে বেঁধে রেখেছিলেন। এ এক অদ্ভুত মনস্তত্ত্ব, কিন্তু তার ব্যাখ্যা করতে আমি আসিনি।"

ব্রজবিলাস একটুখানি থেমে পাইপ ধরিয়ে আবার বলতে আরম্ভ করল—"এইবারে আমি আর একটা দিকের ছবি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করি।"

কদম্ব চৌধুরী একটুখানি চঞ্চল হয়ে উঠলেন এ কথায়।

দারোগার চোখ দুটি ক্রমে বড় হচ্ছে।

ব্রজবিলাস বলতে লাগল, "আমার অনুমানে কোথাও ভুল থাকলে আপনারা বলে দেবেন। আমার মনে হয় মিসেস কাদম্বিনী চৌধুরী আমার ব্যাখ্যা এ পর্যন্ত সবই মেনে নিয়েছেন।"

কাদম্বিনী দেবী একটু জোরের সঙ্গে বললেন "বেশ তো নিয়েছি, তারপর কি বলুন।"

"এবারে মিস্টার কদম্ব চৌধুরীর দিকের কয়েকটি কথা বলছি। তিনি তাঁর স্ত্রীর এই জাতীয় দুঃসাহসিক এবং বেপরোয়া কাজ কখনও সমর্থন করতে পারেননি। তিনি স্ত্রীকে অনেকবার এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন।

"এইবার আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। মিঃ কদম্ব চৌধুরী একদিন রাত্রে উঠে হঠাৎ তাঁর স্ত্রীর এই মতলবের কথা বুঝতে পারেন। আলো জেবলে তার নিচে ব্রেসলেটসুদ্ধ হাত রাখা—এ সবই তিনি নিজ চোখে দেখেছেন। কিন্তু প্রথম দিন বুঝতে পারেননি কি করা উচিত। পরদিন রাত্রে তিনি কর্তব্য ঠিক করে ফেলেন।"

কদম্ব চৌধুরী উসখুস করতে লাগলেন। ব্রজবিলাস বলল, "আশা করি আমি ঠিক বলছি মিস্টার চৌধুরী।"

মিঃ কদম্ব চৌধুরী নীরব থেকে সম্মতি জানালেন। ব্রজবিলাস বলতে লাগল, "ফলে মিসেস চৌধুরীর হাতের কি দুর্দশা হয়েছে দারোগাবাবু জানেন। মিস্টার চৌধুরীর কোনো অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি স্ত্রীকে শিক্ষা দেবার জন্যই এটি করা কর্তব্য মনে করেছিলেন।

দারোগা আসন থেকে উঠে পড়লেন। তাঁর দৃষ্টি ব্রজবিলাসের উপর নিবদ্ধ। ব্যবহার দুর্বোধ্য।

ব্রজবিলাস বলতে লাগলেন, "এইবার আমার শেষ কথাটি বলি। মিস্টার চৌধুরী, কম পাওয়ারের আলোটি আপনি আগে খুলে নিয়েছিলেন। মিসেস চৌধুরী ঘুমিয়ে ছিলেন। কাজেই ব্রেসলেট কে ছিনিয়ে নিয়েছে তা তিনি অন্ধকারে বুঝতে পারেননি।

"কিন্তু মিস্টার চৌধুরী, আপনার উদ্দেশ্যের কথা ভেবে আপনাকে আমি আদৌ অপরাধী মনে করতে পারছি না, আইনেও আপনাকে অপরাধী করবে না। কিন্তু আপনি শুনে বিস্মিত হবেন যে মিসেস চৌধুরী টের পেয়েছিলেন যে কাজটি আপনার।"

"অ্যাঁ!" বলে লাফিয়ে উঠলেন মিঃ কদম্ব চৌধুরী।

ব্রজবিলাস বলল, "আমি ঠিকই বলছি। মিসেস চৌধুরী সে জন্য প্রকাশ্যে পাঁচজনের সামনে স্বামীকে জব্দ করার উদ্দেশ্যেই ডিটেকটিভ ডাকার ব্যবস্থা করেছিলেন।"

ইতিমধ্যে দারোগা ব্রজবিলাসের কাছে এগিয়ে এসেছেন এক পা এক পা করে।

ব্রজবিলাস বলতে লাগল, "আমি কোনো অনুমানই বিনা যাচাইয়ে সিদ্ধান্তরূপে খাড়া করি না। আমি মিসেস চৌধুরীর অ্যাডভেন্চারপ্রিয়তা নিজে একবার পরীক্ষা করে দেখেছি।"

কাদম্বিনী চৌধুরী উৎকর্ণ হলেন।

"মিসেস চৌধুরী যে পালিয়ে যাওয়া ভালুকটাকে নিজের জীবন বিপন্ন করে ধরে এনেছিলেন, সে ভালুক আমি স্বয়ং। আমিই ভালুক সেজে এ পরীক্ষা করেছি।"

দারোগার চোখে উন্মাদনা ফুটে উঠছে ক্রমে।

মিসেস চৌধুরী কটমট করে চেয়ে আছেন ব্রজবিলাসের দিকে।

ব্রজবিলাস বলতে লাগল—"আর একটি মাত্র কথা। ফ্লেক্সের সঙ্গে যে কম পাওয়ারের বাল্বটি লাগানো ছিল সেটি মিস্টার চৌধুরীই ব্রেসলেট ছিনিয়ে নেবার আগে খুলে নিয়েছিলেন সে কথা আমি আগে বলেছি। আমার এ অনুমান সত্য কিনা যাচাই করার জন্য এরই মধ্যে এক সময় লুকিয়ে বালবটি আবিষ্কার করেছি—মিস্টার চৌধুরীর পকেটে।

কদম্ব চৌধুরী মুগ্ধ—গদগদ।

দারোগা ততোধিক। তিনি ঠিক এই মুহূর্তে ব্রজবিলাসের বুদ্ধিতে, অনুসন্ধান রীতিতে এবং ঘটনা বিশ্লেষণের কৌশলে আনন্দে ক্ষেপে গিয়ে এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসলেন। তিনি ব্রজবিলাসকে কঠিন আলিঙ্গনপাশে বেঁধে তার মুখচুম্বন করতে লাগলেন। সে কি উন্মাদনা। কিছুতেই ছাড়েন না। ব্রজবিলাসের দুর্দশায় চৌধুরী দম্পতি দারোগাকে শেষে অনুনয় বিনয় করতে লাগলেন, কিন্তু দারোগা নাছোড়।

অবশেষে থানা থেকে চারজন কনস্টেবল ডাকিয়ে এনে ব্রজবিলাসকে উদ্ধার করতে হল দারোগার আলিঙ্গন থেকে।

দারোগা তখন কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হয়ে বললেন, "আমাকে আপনারা মাপ করবেন, অতিরিক্ত বিস্ময়ে আমার কোনো কাণ্ডজ্ঞান ছিল না।"—বলেই অবসন্ন অবস্থায় মাটিতে বসে পড়লেন। তাঁকে অ্যাম্বুলেন্স ডাকিয়ে তাদের গাড়িতে তুলে দেওয়া হল।

ব্রজবিলাস মুখে জীবাণুনাশক লোশন লাগাতে লাগলেন।

আফ্রোদিতে

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

শ্মশান থেকে আমরা চারজন যখন ফিরেছি বেলা তখন প্রায় নটার কাছাকাছি। তখনো বৃষ্টি পড়ছে একটানা। আর সেই বৃষ্টির শব্দের ভেতর দিয়ে সামনের বাড়ীর দোতলা থেকে মায়ের কান্না শোনা যাচ্ছে এখনো : ও খুকু—খুকুরে—

খুকুকেই এই মাত্র পুড়িয়ে ফিরেছি আমরা—যার ভালো নাম ছিল কণিকা। আর আমরা চারজন নিজেদের মধ্যে যার নাম দিয়েছিলুম—নীলিমা।

আমাদের চার জোড়া চোখ এক সঙ্গে দোতলার সেই জানালাটার দিকে গিয়ে পড়ল। বৃষ্টিভেজা পর্দাটা জানালার গরাদের সঙ্গে এমনভাবে এঁটে বসেছে যে মনে হয়—ও আর কোনোদিন সরবে না। সত্যিই সরবে না। আর কোনোদিন ওখানে এসে দাঁড়াবে না নীলিমা—ঘন কালো চুলের রাশি আঁচড়াতে আঁচড়াতে অন্যমনস্ক হয়ে তাকিয়ে থাকবে না আকাশের দিকে। আজকের এই জমাট ধোঁয়াটে মেঘ, এই একটানা কান্নার মতো বৃষ্টি আমাদের ঘরের মধ্যে স্থির হয়ে থাকবে। অনেক—অনেক দিন পর্যন্ত।

আমি তালাটা খুলছিলুম, সেই সময় সমীরের চোখ পড়ল চিঠির বাক্সের দিকে।

—ঈস্—বাক্সটা খোলা ছিল দেখছি! কার একটা চিঠি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে!

জলে ভিজে একাকার একখানা খাম। কালি গলে ঠিকানাটা সম্পূর্ণ অপাঠ্য হয়ে গেছে! অনেক চেষ্টা করেও আমরা পাঠোদ্ধার করতে পারলুম না। ডাকঘরের ছাপটাও এই শহরেরই—তা থেকেও কোনো হদিস মিলল না।

সমীর বললে, পরে খুলে দেখা যাবে। আগে এই ভিজে জামা-কাপড় ছাড়া যাক।

বারান্দায় আমাদের চারখানা ইজি-চেয়ার তেমনি পাশাপাশি সাজানো আছে। কিন্তু কাপড় বদলে, ক্লান্ত শরীরে আজ যেন আমরা এক একটা নির্জন দ্বীপের মতো বিচ্ছিন্ন মন নিয়ে নিজের নিজের চেয়ারে এসে বসলুম। সামনের চারটি ছোট ছোট টিপয়ে আমাদের চাকর হীরালাল চা সাজিয়ে দিয়ে গেল। কিন্তু চায়ে কারো উৎসাহ ছিল না। বাইরের ধোঁয়াটে আকাশ আমাদের চেতনার মধ্যে স্তব্ধ হয়ে ছিল, আমাদের বুকের ভেতর বৃষ্টি পড়ছিল। আমরা ভাবছিলুম—আমি জানি, আমরা সবাই ভাবছিলুম—চিতার পোড়া কাঠ আর কয়লাগুলো এতক্ষণে খাঁড়ির খরস্রোত বেয়ে গঙ্গায় গিয়ে পড়েছে—সেখান থেকে চলেছে সমুদ্রের দিকে।

আজ রবিবার—আমাদের তিনজনের অফিস নেই। ডাক্তার অংশু রয়েছে চার দিনের ছুটিতে—তারও হাসপাতালে ছোটবার দায় নেই কোনো। আজ সমস্তটা দিন এই বিষণ্ণ দ্বীপের বিচ্ছিন্নতা নিয়ে আমরা এইভাবে কাটিয়ে দিতে পারি; মনের ভারে শূন্য অবসন্নতার ভেতরে তলিয়ে থাকতে পারি। আর আশ্চর্য হয়ে ভাবতে পারি, কেন আত্মহত্যা করতে গেল আমাদের নীলিমা—কী ওর দরকার ছিল!

সেই সময় সমীর বললে, ওহো—সেই চিঠিটা। কার নাম ছিল বোঝা যাচ্ছে না। তোমরা যদি অনুমতি করো তো খুলি।

প্রমোদ ইজিচেয়ারে চোখ বুজে পড়েছিল। কথা বললে না, মাথা নেড়ে সম্মতি দিলে। আমি আর অংশু বললুম, নিশ্চয়, নিশ্চয়।

সমীর খাম খুলল। বললে, এটা নষ্ট হয়নি—পড়া যাবে।—তারপরেই অদ্ভুত একটা শব্দ করে, প্রায় বোবাধরা গলায় বললে, একি! এ যে নীলিমা—মানে কণিকার চিঠি!

কণিকা—নীলিমা! মেঘলা আকাশ থেকে এক একটা করে তীরের মতো বিদ্যুৎ এসে যেন আমাদের প্রত্যেককে আঘাত করল। আমি আর অংশু মেরুদণ্ড টান করে সমীরের দিকে তাকালুম, ঝিমন্ত প্রমোদ এমনভাবে উঠে বসল যে, ওর হাঁটুর ধাক্কায় চায়ের পেয়ালাটা নিচের বৃষ্টিঝরা উঠোনের মধ্যে গিয়ে ঠিকরে পড়ল।

সমীরের মুখের রঙ বদলাচ্ছিল বহুরূপীর মতো। শ্বাস পড়ছিল ঘন ঘন।

—কাকে লিখেছে—কাকে?—আমাদের তিনজনের গলা এক হয়ে ছুটে গেল ওর দিকে।

তেমনি অস্বাভাবিক স্বরে সমীর বলল, জানি না। পড়ো।

ওর হাত থকে অংশু চিঠিটা নিলে। তারপর পড়ে গেল।

'কাল যখন এই চিঠি তুমি পড়বে, তখন আমি আর থাকব না। আমি অরুণকে কথা দিয়েছিলুম—আসছে মাসে বাবা বিয়ের দিন ঠিক করেছেন। তোমাকে কত ভালোবেসেছি সেটা বুঝতে পারলুম কাল—অরুণের চিঠি পাওয়ার পর। আমাকে ও এত বিশ্বাস করে যে ওকে দুঃখ দেওয়া অসম্ভব। তাই তোমাকেও চাইতে পারলুম না। আত্মহত্যা করব কোনোদিন ভাবিনি—জীবন সম্বন্ধে আমার কোনো নালিশ ছিল না। কিন্তু কী করা যায় বলো—কাল সারা রাত ভেবেও যখন জট খুলতে পারিনি! তাই চলেই যেতে হল। তোমাকে এই আমার প্রথম আর শেষ চিঠি। খুব অনিচ্ছা নিয়েই মরতে চলেছি, তবু এই-টুকু তৃপ্তি রইল যে এতদিনের সংকোচ কাটিয়ে এইবারে বলতে পারলুম,

তোমাকে ভালোবেসেছি—আমাকে তুমি সুধায় ভরে দিয়েছ।—কণিকা।'

কিছুক্ষণ আমরা আমাদের চেয়ারের মধ্যে এক ভাবে বসে রইলুম। তারপর শুকনো ঠোঁটটা একবার চেটে নিয়ে, পড়ন্ত বৃষ্টির শব্দের ভেতরে—প্রায় শোনা যায় না—এমনিভাবে প্রমোদ জিজ্ঞেস করলে, কোনো নাম নেই কোথাও?

অংশু বললে, না।

—কাকে লেখা কিছু বোঝবার জো নেই?

অংশু আবার বললে, না।

আমরা চারজনে চারটে চেয়ারে তেমনি নিথর হয়ে বসে রইলুম—একসঙ্গে চেয়ে রইলুম আকাশের দিকে। তিন কাপ চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল, প্রমোদের ছিট্‌কে পড়া পেয়ালাটার ভেতর ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগল করোগেটেড্ টিনের চাল থেকে। আর প্রত্যেকের মনের বিষণ্ণ দ্বীপগুলোকে ঘিরে ঘিরে ঘন সামুদ্রিক কুয়াশার মতো একটি মাত্র সংশয় জেগে উঠতে লাগল : কে সে? যার জন্যে আমাদের সকলের আকাশ থেকে আলো নিবে গেল? আমাদের নীলিমার মৃত্যুর জন্যে কে দায়ী? প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকের সন্দেহ সমুদ্রের হিংস্র ঢেউ হয়ে গর্জন করতে লাগল।

কাল শেষ রাতে যখন আমরা শব নিয়ে শ্মশানে গিয়েছিলুম—তখন এই মন আমাদের ছিল না। একটি শোক—একটি আহত বিস্ময় আমাদের চারজনকে একসঙ্গে বেঁধে দিয়েছিল। মানুষ কেন আত্মহত্যা করে—এ নিয়ে অনেক তত্ত্ব আমরা জানি। প্রমোদ কিছুদিন অ্যাব্‌-নর্ম্যাল সাইকোলজী নিয়ে চর্চা করেছে—সে আমাদের চাইতে অনেক বেশি জানে। আমি স্তাঁধাল আর প্রুস্তের ভক্ত—জেম্‌স্ জয়েস নিয়ে অনেক তর্ক করেছি কলেজের কমন-রুমে—মাদাম বোভারির মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে পত্রিকায় একটা লেখা পাঠিয়েছিলুম, যদিও ছাপে নি। ডাক্তার অংশুও মানুষের মনোব্যাধির খবর রাখে। কিন্তু কাল শেষ রাতে আমরা কেউ বুঝতে পারিনি আমাদের নীলিমা কেন এমন ক'রে নিজের মৃত্যুকে ডেকে আনল। সমীর ওয়াই-এম-সি-এ'তে থাকবার সময় বেহালায় বিলিতী সুর বাজাতে শিখেছিল—কিন্তু শপ্যাঁর বিষাদ ঘন মেলোডির ভেতরেও সে নীলিমার মনের সন্ধান পায়নি।

আজ দেখা গেল শপ্যাঁ নয়, অ্যাব্‌-নর্মাল সাইকোলজী নয়, মেন্টাল্ ডিজিজ নয়, হেন্‌রি জেম্‌সের চরিত্র নয়! নিতান্ত সাধারণ—নিতান্তই রোম্যান্টিক্ আত্ম-হত্যা। কিন্তু আমাদের মধ্যে কে সেই অচেতন বিশ্বাসঘাতক—যে এমন একটা তুচ্ছ মৃত্যুর অ্যান্টিক্লাইম্যাক্স রচনা ক'রল? আমরা আজ নিজেদের ঘৃণা করছি—ঘৃণা করতে শুরু করেছি পরস্পরকে। এই বৃষ্টিঝরা কর্মহীন মলিন দিনটা আমাদেরই মনের ভারে আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে।

অথচ কাল শেষ রাতে—অথবা আজ বেলা সাড়ে ন'টার সময় চারখানি ইজি-চেয়ারে এসে বসা পর্যন্ত—একটি শোকের জগতে—একটি বিমূঢ় বিস্ময়ের আঘাতে আমরা এক হয়ে ছিলুম!

আমরা বসেছিলুম তিনদিক খোলা সেই টিনের চালাটার নিচে। মিউনিসি-প্যালিটির সিমেন্টের বেঞ্চিটার ওপর। আমাদের পায়ের কাছে দুটো লণ্ঠন জ্বলছিল—একটার মাথার দিক খানিকটা ভাঙা—তীব্র কেরোসিন গ্যাস উঠে আস-ছিল তার ভেতর দিয়ে। হু হু করে হাওয়া ছুটেছিল গঙ্গার চড়ার ওপর,—কী কতগুলো দুলছিল ঢেউয়ের মতো—রাতে মনে হয়েছিল ভুট্টার ক্ষেত, দিনের বেলা দেখেছিলুম ঘাসের জঙ্গল।

সেই হাওয়ায় চিতার আগুনটাও লাফালাফি করছিল, মিউনিসিপ্যালিটির দুজন ডোম বাঁশ দিয়ে মধ্যে মধ্যে চিতাটা ঝেড়ে দিচ্ছিল, কতগুলো ফুল্‌কি উড়ে গিয়ে পড়ছিল নিচের খাড়িটার কালো জলে। একটা আধভাঙা কল্‌সীকে মড়ার মাথার মতো দেখাচ্ছিল চিতার আলোয় আর কণিকার থার্ড ইয়ারে পড়া ছোট ভাইটা, খাঁড়ির ওপারে—চড়ার ওপারে—দূরের অন্ধকার গঙ্গার দিকে একভাবে তাকিয়ে বসে ছিল।

সমীর ফিস ফিস করে বলেছিল আশ্চর্য!

আমরা তিনজনে শাড়া দিয়ে বলে-ছিলুম, আশ্চর্য!

তা ছাড়া কী আর? কলকাতা থেকে আমাদের হেড্ অফিস সরে গিয়ে যখন পশ্চিমের এই শহরটাতে চলে এল, আর আমরা তিন বন্ধু—আমি, সমীর আর প্রমোদ এখানে বদলি হলুম—তখন অনেক কষ্টে শহরের শেষ প্রান্তে এই নির্জন জায়গায় ছোট বাড়ীটি সংগ্রহ করেছিলুম। এর মধ্যে উপযাচক হয়ে দেখা দিল অংশু ডাক্তার : 'থাক্‌বার জায়গা পাচ্ছি না, আপনাদের মেসে যদি দিন কয়েকের জন্যে—'

ক'দিনের জন্যে এসে পাকাপাকি হয়ে গেল। তিনজনে ব্রীজ জমতনা—দেখা গেল অংশু অদ্ভুত ভালো খেলোয়াড়। বেশ মেজাজের মানুষ—আমাদের মতোই ব্যাচেলার। কাজেই ত্রিভুজটি নির্ভুল চতুষ্কোণে পরিণত হল। ব্রীজ তো ছিলই—তার সঙ্গে মিলল সমীরের বেহালা, প্রমোদের অ্যাব্‌নর্ম্যাল সাইকোলজী, অংশুর ডাক্তারী অভিজ্ঞতার গল্প আর আমার সাহিত্য-তত্ত্ব।

কোনো থ্রীল ছিল না, ক্লান্তিও ছিল না। সন্ধ্যেয় ব্রীজ খেলে, রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা চার বন্ধু চারটি ইজিচেয়ারে এসে বসে পড়তুম। আমি আর অংশু সিগারেট খেতুম একটার পর একটা, সমীর বেহালা বাজাত, প্রমোদ চোখ বুজে শুনত। তারপর হঠাৎ প্রমোদ এক সময় নাক ডাকাতে আরম্ভ করলে ইজি-চেয়ার শুদ্ধ শূন্যে তুলে তাকে চমকে দেওয়া—শোওয়ার আগে এইটুকুই ছিল আমাদের শেষ কৌতুক।

আমাদের বাসার সামনের ছোট মাঠ-টুকু পেরিয়ে রাস্তার ওধারে যে পুরনো দোতলা বাড়ীটা—যার সামনে দুটো নিমের গাছ, প্রথম থেকেই তার দোর-

জানলা বন্ধ দেখেছি। কবে সেখানে লোক এল, জানি না। কিন্তু এক রবিবারে—অংশুরও যেদিন অফ্‌-ডিউটি, আর আমরা সমীরের তক্তপোশে বসে তাস খেলছি, এমন সময় প্রমোদ বললে, লুক্‌!
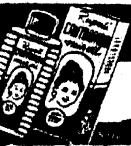
পাঁচটা নো-ট্রাম্প্‌সের ডাক নিয়ে আমার তখন মাথা তোলবার জো ছিল না। কিন্তু যে পরমশত্রু সমীরের হাতে বিপজ্জনক টেক্কাটার অস্তিত্ব অনুমান করে চিন্তিত হচ্ছিলুম, সে-ই যখন ধাক্কা দিয়ে বললে, দ্যাখ্‌না, তখন—

সামনের বাড়ীর দো-তলার জানলায় একটি মেয়ে। কুড়ি-বাইশ বছর বয়েসে হবে মনে হয়। বাঙালী—সে কথা বুঝতেও সময় লাগে না। কিন্তু সেজন্যে নয়। তরুণী মেয়ে দেখলেই হাঁ করে চেয়ে থাকার রুচিও আমাদের কারুর নেই। আসল কথা হল, এমন রূপ যেখানে সেখানে চোখে পড়ে না।

পরনে নীল শাড়ী। (পরে আমরা দেখেছি, নীল শাড়ী ছাড়া অন্য কোনো রঙের শাড়ী সে কখনো ব্যবহার করত না।) এক হাতে জানালার গরাদে ধরে দাঁড়িয়ে। আর এক হাতে চিরুণী দিয়ে ঘন চুলের রাশি আঁচড়ে চলেছে। দু-হাতের দুটি সোনার বালা মিশে আছে গায়ের রঙে। আকাশের দিকে চোখের দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে কী ভাবছিল সে-ই জানে।

অংশু বললে, জানালাটা বন্ধ করে দাও। কী ভাববে আমাদের?

শমীর প্রতিবাদ করলঃ ভাববে কেন? মানুষে খুসি হয়ে দেখবে বলেই তো পৃথিবীতে সুন্দর জিনিষেরা এসেছে।

—কিন্তু—

—কিন্তুর কিছু নেই। আমরা প্রত্যেকে অন্যকে জানি, খাঁটি ভদ্রলোক হিসেবে সবাই-ই নিজেকে দাবি করতে পারি। এর মধ্যে তো কোনো নোংরামো নেই কোথাও। সেদিন যখন চারজনে গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখছিলুম, তখন তো আমরা কেউ-ই লজ্জিত হইনি।

মেয়েটির চোখ আকাশ থেকে নেমে এইবার আমাদের ওপর দিয়ে ঘুরে গেল। আমাদের দেখেও দেখল না, এইভাবে চুল আঁচড়ে চলল।

প্রমোদ বললে, তা হলে এসো, একটা চুক্তি করা যাক।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, কিসের চুক্তি?

—যেমন ভাবে আমরা চারজনে গঙ্গার চড়ার ওপর সূর্যাস্ত দেখেছিলুম, এই মেয়েটিকেও সেই ভাবে আমরা দেখব।

আসল কথা হল, এমন রূপ যেখানে সেখানে চোখে পড়ে না।

অর্থাৎ সম্পূর্ণ ইম্‌পার্সোনাল ভাবে—বিশুদ্ধ সৌন্দর্য হিসেবে। ঘরে কেউ একা থাকলে কখনো জানালা খুলব না—দুজন থাকলে নয়, তিনজন থাকলেও নয়। যখন দেখব, একসঙ্গে চারজনেই দেখব। তাতে লাভ হবে এই—ইন্‌ডিভিজুয়াল হিসেবে আমাদের কারো মনে কোনো রকম ব্যক্তিগত দুর্বলতা আসবে না।

আমি হাসলুমঃ অর্থাৎ যৌথভাবে বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের উপাসনা?

—ঠিক তাই।

—বেশ একটা নতুন রোম্যান্টিক্‌ অ্যাপ্রোচ্‌ মনে হচ্ছে!

সমীর বললে, ক্ষতি কী। কিছুতেই রোম্যান্টিক হবো না—এই কথা নিয়ে চাঁচানোটাও তো একটা সংস্কার। তাকে বলা যায় রোমান্স্‌ অফ্‌ অ্যান্টি-রোম্যান্টিসিজম্‌!

ডাক্তার অংশু বিরক্ত হয়ে বললে, আঃ, কচকচানি বন্ধ করো। দ্যাখো, মেয়েটি আমাদের লক্ষ্য করছে।

সমীর বললে, ক্ষতি কী। কিছুতেই নেহাৎ অদ্রষ্টব্য নই। তুমি আর, প্রমোদ

তো রীতিমতো সুপুরুষ—আমি আর সুকুমারও খুব সম্ভব সুশ্রী বলেই বাজারে চলে যেতে পারি। আমরা চারজনে যেমন ইম্‌পার্সন্যালি ওকে দেখছি, ও-ও তেমনি ইম্‌পার্সন্যাল চোখে আমাদের দেখছে।

—তা হলে আমার কথাটাই তোমরা মেনে নিচ্ছ।—প্রমোদ খুশি হয়ে জিজ্ঞেস করল ঃ তা হলে চুক্তিটা পাকা?

আমি আর সমীর একসঙ্গে জবাব দিলুম ঃ পাকা।

অংশু চিন্তিতের মতো মাথা নাড়ল ঃ তোমাদের ইম্‌পার্সোন্যাল সৌন্দর্যের তত্ত্ব আমার ডাক্তারী মগজে ভালো করে ঢুকল না। তবে এই সর্তটা মানছি আমরা চারজনই একসঙ্গে ওকে দেখব।

তাতে অন্তত এইটে লাভ হবে যে, লাঠি যদি কখনো খেতেই হয়, সেটা ভাগাভাগি করেই খাব। একা আমার পিঠেই এসে পড়বে না।

চিতাটা জ্বলছে—গঙ্গার চড়ার হু হু হাওয়া এসে তার শিখাগুলোকে নিয়ে খেলা করছে। সেই ছোট ভাইটা—পূর্ণেন্দু—ঠিক একইভাবে বসে আছে সেখানে। সমীর ফিস ফিস করে টুকরো টুকরোভাবে প্রথমদিনের কথা বলছে, আমরা তিনজন আলাদা আলাদা ভাবনা নিয়ে—কিছু শুনছি, কিছু শুনছি না। যে মাথাভাঙা লণ্ঠনটা থেকে কেরোসিনের গ্যাস বেরুচ্ছিল, সেটা শেষবারের মতো এক রাশ উগ্র দুর্গন্ধ ছড়িয়ে দপ করে নিভে গেল। অন্ধকার ফিকে হয়ে এসেছে, চড়া পেড়িয়ে পশ্চিমে গঙ্গার দিকটায় কয়েকটা সাদা সাদা রেখা ফুটে উঠছে। একটু পরেই ভোর হবে।

তারপর আরো কতদিন পার হয়ে গেছে। আমরা এই বাড়ীর নতুন ভাড়াটেদের দেখেছি। একজন প্রৌঢ় বাঙালী ভদ্রলোক—ঠিক নটা চল্লিসে একটা পুরোনো সাইকেল নিয়ে অফিসে চলে যান। ঠিক দশটা পনেরো কিংবা কুড়িতে একটি প্রিয়দর্শন ছেলে ট্রাউজার আর বুশ সার্ট পরে, একটা নতুন সাইকেল নিয়ে কলেজের দিকে রওনা হয়। মাঝবয়েসী একটু ভারী চেহারার একটি শান্ত গম্ভীর মহিলা কখনো একা, কখনো বা মেয়েটির পাশে এই জানালায় এসে দাঁড়ান। বোঝা যায়, বাড়ীতে মোটামুটি এই চারজন লোক। আর একটি ব্যতিব্যস্ত চাকরকেও দেখা যায়, কখনো বাজার করে আনে, কখনও বা দৌড়োদৌড়ি করে ফাই-ফরমাস খাটে।

প্রমোদ এসে একদিন বললে, গেটের সামনে একটা নেমপ্লেট পড়েছে ও-বাড়ীতে। প্রদ্যোতকুমার বসু, ফিসারি ডিপার্টমেন্ট। আমি বললুম, মেয়েটি তা হলে প্রদ্যোত-নন্দিনী। ওর নাম দেওয়া যাক বাসবদত্তা।

শমীর চটে উঠল ঃ দ্যাখো সুকুমার এই জন্যেই তোমার গল্প-প্রবন্ধ কোনো পত্রিকায় ছাপানো হয় না, তুমি স্ট্যাম্প না দিলেও প্রাণের দায়ে ওরাই ফেরৎ পাঠায়। অমন সুন্দর—সমীর আরো জোরালো করতে চাইল ঃ অমন আশ্চর্য সুন্দর মেয়ের নাম কখনো বাসবদত্তা হয়? অত কর্কশ পুরুষালি নাম?

আমি বললুম, মোটেই পুরুষালি নয়। তুমি যদি সুবন্ধু পড়ে দ্যাখো—

—চুলোয় যাক সুবন্ধু। এই মেয়েটি যেন প্রথম সূর্যের আলোয় রাঙানো আকাশের মতো। অমন স্থলে নাম তুমি ভাবতেই পারো না। ওকে বলতে পারো ঃ নীলিমা। বললুম, চীপ—রোম্যান্টিক।

সমীর এইবার ঘুষি বাগালো ঃ ফের যদি রোম্যান্টিক বলে অমনভাবে নাক কোঁচকাবে তা হলে মারামারি হয়ে যাবে। রোম্যান্টিক হওয়ার মতো মনের সুস্থতা নেই বলেই বিরোধিতার ভেক ধরেছে। বাংলা দেশে একসময় যেমন অক্ষম লোক থেকে বালীগঞ্জের মেয়েদের নিয়ে ব্যঙ্গ করা হত।

অংশু বললে, কী কচকচি আরম্ভ করেছ বলো তো। বেশ তো, নীলিমা নামটাই দেওয়া যাক না। আমার তো ভালোই লাগছে। প্রমোদ বললে, আমারও।

মেজরিটি ভোটে আমি হেরে গেলুম বটে, কিন্তু সত্যি বলতে কি নামটা আমারও খারাপ লাগল না। নীল আকাশের সঙ্গে ওর মিতালি, ওর পরণের নীল শাড়ী, একটা নীল রাত্রির মতো মায়ায় ঘেরা ওর মন—সব মিলিয়ে ওকে যেন নীলিমা ছাড়া আর কিছুই ভাবা যায় না। এক একটি মেয়ে নিজের নামের সঙ্গে মানিয়ে যায়, কোনো কোনো মেয়েকে মানাবার জন্যে নাম খুঁজে আনতে হয়।

ওকে নাম দিয়েছি নীলিমা। আমাদের নীলিমা।

তারপর এক সময় প্রদ্যোতবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল—যেমন হয়।
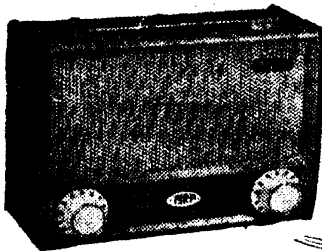
আমরা চার বন্ধু বিকেলে সামনের মাঠটার ভেতরে পায়চারি করছিলুম, উনি একটা লাঠি হাতে বেড়াতে বেড়িয়েছিলেন।

—নমস্কার। আমার নাম প্রদ্যোত বসু।

আমরা প্রতি নমস্কার করলুম।

—পাড়ায় প্রতিবেশী বলতে তো আপনারাই চারজন। প্রায়ই ভাবি আলাপ করব—কিন্তু কিছুতেই আর সুযোগ হয় না। নতুন বদলি হয়ে এসেছি, কারো সঙ্গে বিশেষ জানা চেনাও নেই। বড় একা একা লাগে। কাল বিকেলে যদি আমার ওখানে চা খান—

নিশ্চয়, নিশ্চয়।—আমাদের সৌভাগ্য

সাদাসিদে ধরণের মানুষ—নির্ঝঞ্ঝাট সরকারী কর্মচারী। মোটের ওপর সুখী আর আত্মতৃপ্ত। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমাদের খবর নিলেন। অংশুর মেডিক্যাল কলেজের এক অধ্যাপকের সঙ্গে পড়তেন ছাত্রজীবনে, তাও জানা গেল। তারপর চায়ের নেমন্তন্নের কথাটা বারবার মনে করিয়ে দিয়ে বিদায় নিলেন ভদ্রলোক।

পরদিন চা খেতে যাওয়ার আগে প্রমোদ গম্ভীর হয়ে বলেছিল, বন্ধুগণ আমার একটি বক্তব্য আছে।

সমীর বলেছিল, হিয়ার-হিয়ার!

—না, ঠাট্টা নয়। বন্ধুগণ, তোমরা সবাই জানো, যে নীলিমাকে আমরা প্রায় রোজই দূর থেকে বিশুদ্ধ সৌন্দর্যরূপে দেখে থাকি, আজকে আমরা তার সামনে গিয়ে দাঁড়াব। কিন্তু এই সময় আমাদের সেই পুরোনো চুক্তিটা মনে রাখতে হবে। আমরা তার কালেক্‌টিভ ওয়ারশিপার। অতএব—

—অতএব?—অংশু জানতে চাইল।

—আমরা কেউ এমনভাবে সাজব না যাতে ব্যক্তিগতভাবে কাউকে বিশিষ্ট মনে হতে পারে।

আমি বললুম, আগে বললে না কেন? তা হলে সকলের জন্যে ফুটবলের শর্টস আর জার্সি আনা যেত।

আমাদের তিনজনের হাসিতে প্রমোদ একটু অপ্রতিভ হলো।

—ঠাট্টা নয়। আমরা কেউ ডিসটিং-গুইশড্ হওয়ার চেষ্টা করব না। কেউ আগে বাড়িয়ে বেশি কথা বলে মেয়েটির কাছে নিজেকে তুলে ধরতে চাইব না।

—কিন্তু চেহারায় যারা ডিসটিংটিভ্ তাদের কি হবে?—সমীর প্রশ্ন তুলল: তা হলে আমার আর সুকুমারের মুখ চেয়ে তোমার আর অংশুর এক আধ পোঁচ ভুষো কালি মেখে যাওয়া উচিত।

আমি বললুম, তাতে ওদের ক্রাউনের মতো দেখাবে এবং আরো বেশি ডিসটিংটিভ্ হবে।

কিন্তু ঠাট্টা করে যাই বলি, আমরা চুক্তি ভাঙিনি। বাইরে আমাদের তরলতা যতই থাক—মনের ভেতরে একটা সাধারণ প্রত্যয়ের মতো, একটা আদর্শের মতো, একটা সংকল্পের মতো সেই সর্তটাকে আমরা মেনে নিয়েছিলুম। ওই মেয়েটির ভেতরে আমরা এক সঙ্গে কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়োয় সূর্যোদয় দেখতুম, গঙ্গার ধারে সূর্যাস্ত দেখতুম, তাজমহলের ওপর জ্যোৎস্না দেখতুম, এক সঙ্গে দেখতুম অজন্তা গুহার মহাজনক জাতকের সেই অপূর্ব ছবিগুলো। সেই যৌথ মন নিয়ে—চুক্তির প্রতি সেই আনুগত্য বহন করে আমরা চা খেতে গিয়েছিলুম।

আমার স্ত্রী। আমার ছেলে পূর্ণেন্দু—বি এস্-সি পড়ছে। আমার মেয়ে কণিকা, গত বছর বি-এ পাশ করেছে পাটনা ইউনিভার্সিটি থেকে।

কণিকা হাসল: ওঁদের আমি রোজই দেখি। খুব তাস খেলতে ভালোবাসেন।

সমীর জবাব দিলে, সময় কাটাই। কি আর করা যায় বলুন।

বাড়ী ফিরে আমি বলেছিলুম, দূরে থেকে যা ভেবেছিলুম, কাছ থেকে দেখলুম মেয়েটি তার চাইতেও সুন্দরী।

অংশু হেসে বলেছিল, হ্যাঁ, সাধারণতঃ যা হয় না।

সমীর বলেছিল, কিন্তু ওর নাম কণিকা।

তা হোক, তা হোক।—প্রমোদ জবাব দিয়েছিল: এক বিন্দু জলে সমুদ্র দেখি, একটি নীলিমার কণিকায় নীল আকাশকে দেখতে পাই।

আমরা চারজনেই রোম্যান্টিক হয়ে যাচ্ছিলুম। একা হলে লজ্জা ছিল, কিন্তু চারজনে মিলে যেন একটা নতুন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চলেছি। সামগ্রিকভাবে সৌন্দর্যের উপাসনা করছি আমরা। নিজেদের এই সংঘ শক্তিতে আলাদা একটা গৌরব বোধ হতে থাকে এখন।

......আর একটা লণ্ঠনও নিভল। সূর্যের আভায় গঙ্গার পশ্চিম আকাশ রাঙ্গা হল। চিতাটা প্রায় নিবু নিবু। অংশু আর একটা সিগারেট দিয়েছে আমাকে, আমি ফিরিয়ে দিয়েছি। গলা জ্বালা করছে এখন। গঙ্গার চড়ার ওপর যেগুলোকে রাতের অন্ধকারে ভুট্টার ক্ষেত মনে হয়েছিল, এখন দেখা যাচ্ছে তা ঘাসের জঙ্গল। হাওয়া তেমনি হু হু করে ঘুরছে, আধ ভাঙ্গা কলসীটা রাতের শিশিরে ভিজে চকচক করছে। পূর্ণেন্দু কপালে হাত চেপে বসে আছে, রুক্ষ চুলগুলো উড়ে যাচ্ছে ওর। টিনের চালাটার গায়ে হিন্দী-ইংরেজী আর কখনো কখনো বাংলায় লেখা দুটো একটা নাম একটু আধটু পড়া যায় এখন।

একটু আগে প্রমোদ জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলছিল, এখন আমরা সবাই চুপ করে আছি। এর পরে দিনগুলোর আর কোনো হিসেব করা তালিকা নেই। অনেকবার গেছি, অনেক চা খেয়েছি, প্রদ্যোতবাবুকেও টেনে এনেছি আমাদের তাসের আড্ডায়। কিন্তু এদের বাড়ীতে কখনো একা কেউ যাইনি। সমীর যেদিন বেহালা বাজিয়েছে, সেদিন প্রমোদ বলেছে দানুয়া-ভালুয়ার জঙ্গলে তার বাঘ শিকারের রোমাঞ্চকর কাহিনী; আমি যেদিন ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি করেছি, সেদিন ডাক্তারী অভিজ্ঞতার আশ্চর্য গল্প শুনিয়ে তাক লাগিয়েছে অংশু। আমাদের নীলিমার মুগ্ধ চোখ সকলের ওপর দিয়ে সমানভাবে ঘুরেছে। কারুর ওপর কোনো পক্ষপাতের সুযোগ আমরা কোনো দিন দিইনি। সচেতনভাবে তো নয়, হয়তো অচেতনভাবেও নয়।

শুধু একদিন নীলিমা প্রশ্ন করেছিল: আপনারা চারজন বুঝি সব সময়ে এক সঙ্গে চলেন?

প্রমোদ হেসে বলেছিল: সব সময়ে নয়। কোনো কোনো ব্যাপারে।

সমীরের মুখ ফস্কে বেরিয়ে পড়েছিল: আমরা চুক্তি মেনে চলি।

—কিসের চুক্তি?—নীলিমার কালো চোখের তারায় কৌতূহলের আলো জ্বলে উঠেছিল।

আমি বলেছিলুম: ক্ষমা করবেন—বলতে বাধা আছে!

—চারজনেরই?

অংশু জবাব দিয়েছিল: হাঁ, চারজনেরই।

নীলিমা আর জানতে চায় নি। কোনো দিনই নয়।

রোদ উঠল। চিতা প্রায় নিবে এসেছে। পূর্ণেন্দু উঠে দাঁড়ালো।

আকাশ ও জীবন ফটো: জেঃ আঢ্য

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলুম আমরা। একটু পরেই চিতাটা একেবারে নিবে যাবে, জল দিয়ে ধুয়ে দেওয়া হবে। এক আধটা ছোট হাড়ের টুকরো আর হাতের যে ছোট আংটিটাকে খুলে নেওয়া হয়নি তার একটা গলিত রূপ হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে ওর ভেতরে।

এবার অংশু বললে আশ্চর্য!

আশ্চর্যই তো। রাত বারোটার সময় ঘর থেকে সেই গোঙানির শব্দ। ব্যতিব্যস্ত প্রদ্যোতবাবুর দরজা ভেঙ্গে ফেলা। আশ্চর্যই তো। রাত বারোটার সময় ঘর থেকে এনেছিল নীলিমাই জানে। কিন্তু চারটাকে আর বাড়ীতে পাওয়া যায়নি।

আর এক টুকরো চিঠি।

'আমি যাচ্ছি। আমার মৃত্যুর জন্যে আমি ছাড়া কেউ দায়ী নয়।'

অংশু ছুটে গিয়েছিল। এবার ওকে ডিস্‌টিংটিভ হতে আমরা বাধা দিইনি। কিন্তু দশ মিনিটের বেশি সুযোগ সে পেলো না। মা লুটিয়ে কাঁদলেন। পূর্ণেন্দু বিহ্বলভাবে চেয়ে আছে—যেন কিছু বুঝতে পারছে না এখনো। আর প্রদ্যোতবাবু হাহাকার করছেন: এ আমার কী হল—এ আমার কী হল! আমার সোনার প্রতিমা এমন করে কেন চলে গেল—কেন?

এই সান্ত্বনাহীন অসহ্য শোকের মধ্যে আমরা দাঁড়াতে পারিনি। আমাদের আকাশ নিবে গেছে—একটা স্থবির অন্ধকার লোহার প্রাচীরের মতো চারদিক থেকে উঠে আসছে। সমুদ্রের ধারে গ্রানিট মন্দিরে আফ্রোদিতের সোনার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলুম আমরা—হঠাৎ কোথা থেকে আকাশছোঁয়া ঢেউ উঠে সেই মন্দির—সেই মূর্তিকে চিরকালের মতো অতলে তলিয়ে নিয়ে গেছে।

চিতা নিবেছে। পূর্ণেন্দু জল আনতে নামল গঙ্গার খাঁড়িতে। আমরা স্বপ্নাবিষ্টের মতো উঠে দাঁড়ালুম চার জনে। এবার ওকে সাহায্য করা দরকার।

ভোরের আকাশ কালো করে কোথা থেকে রাশি রাশি মেঘ ঘনিয়ে এল। বৃষ্টি নামবে।

বৃষ্টি পড়ছে।

চারটে ইজি চেয়ারের দ্বীপের ভেতর, চারটে নিঃসঙ্গ, চারটে ঘৃণায় কুটিল মন নিয়ে আমরা বসে আছি। হঠাৎ যেন ঘুমের ঘোর থেকে জেগে উঠে সামুদ্রিক হাওয়ার স্বর পাঠিয়ে দিলে প্রমোদ: এমন তো হতে পারে তুমি বলতে আমাদের চারজনকেই এক সঙ্গে বুঝিয়েছিল সে! আমরা চারজনেই তার কাছে এক হয়ে গিয়েছিলুম?

হয়তো। হয়তো সবাই আমরা দায়ী। এখনো মানতে পারছি না। কিন্তু হয়তো এই কথাটাই আমরা মেনে নেব এর পরে। বিশ্বাস করতে চেষ্টা করব। নইলে, নিজেদের প্রতি ঘৃণায়, পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাসে, আমাদের মধ্যে এই যে কুয়াশা ঘুমিয়ে আসছে, তা আমাদের চারজনকে—চারটি মহাদেশের দূরত্বে ছড়িয়ে দেবে।

বাঙলা চলচ্চিত্র জগতে নব দিগন্ত

পশুপতি চট্টোপাধ্যায়

ইতিহাসের একটুখানি পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন। আমাদের বাঙলা ছবি যদিও কথা কইতে সুরু করেছে ১৯৩০-৩১ সাল থেকে, কিন্তু সত্যিকারের প্রথম সবাক চলচ্চিত্র হচ্ছে নিউ থিয়েটার্সের পতাকাতলে নির্মিত, দেবকীকুমার বসু পরিচালিত "চণ্ডীদাস"। "চণ্ডীদাস"-এর পর প্রায় পঁচিশ বছর ধরে বাঙলা দেশে বহু বাঙলা ছবি তৈরী হয়েছে, যার সংখ্যা অন্ততঃ এক হাজারের কম নয়। এইসব ছবির মধ্যে অন্ততঃ তিন-চতুর্থাংশের গল্প ছিল—গার্হস্থ্য এবং বাকী সব ছিল, ধর্মমূলক, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, হাস্যরসাত্মক, অপরাধমূলক এবং আরো অন্য কিছু। কিন্তু ছবি যে-শ্রেণীভুক্তই হোক না কেন, অল্প কিছু বহির্দৃশ্য বাদে তার বেশীর ভাগ অংশই তোলা হোতো স্টুডিওতে তৈরী সেটের মধ্যে। কক্ষাভ্যন্তরই হোক, আর মন্দিরের ভিতরই হোক, বাড়ীর উঠানই হোক আর মন্দিরের চত্বরই হোক—সবই তৈরী হোতো স্টুডিওর ফ্লোরের মধ্যে। রেল স্টেশন, চৌরঙ্গীর রাস্তা, কয়লাখনির অভ্যন্তর, এমন কি ধানক্ষেত পর্যন্ত গড়া হয়েছে ঐ স্টুডিওর ফ্লোরেরই মধ্যে। আর গার্হস্থ্য চিত্রের তো কথাই নেই: সোফা, সেটি, চেয়ার টেবিল, খাট আলমারি আর কটেজ পিয়ানো দেখে দেখে দর্শক-সাধারণের চোখ রীতিমত পীড়িত হয়ে পড়েছিল এবং মন উঠেছিল হাঁফিয়ে।

অগ্রদূত পরিচালিত তারাশঙ্কর রচিত "বিপাশা" চিত্রে উত্তম ও সুচিত্রা

ঠিক এই সময়ে পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারাদের সমস্যা নিয়ে নিমাই ঘোষ তৈরী করলেন—"ছিন্নমূল।" ছবি হিসাবে যদিও তা সার্থক হয়ে ওঠেনি নানা কারণে, কিন্তু এই ছবিখানিকেই বাঙলার চিত্রজগতে নবযুগের অগ্রদূত বলে অভিনন্দিত করা যায়। কেননা ছবিটির সকল দিকেই একটি নূতনত্বের প্রয়াস দেখা গিয়েছিল। এর বিষয়বস্তুই খালি নূতন ছিল না, এটি তোলাও হয়েছিল সম্পূর্ণ নূতন পদ্ধতিতে। ছবির অভিনেতা-অভিনেত্রীরা বিনা মেক-আপেই ক্যামেরার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং ছবির প্রায় প্রতিটি দৃশ্যই তোলা হয় স্টুডিওর বাইরে, উন্মুক্ত দিবালোকে। যাঁরা এতে অভিনয় করেছিলেন, তাঁরাও প্রায় প্রত্যেকেই চিত্রজগতে নবাগত। কিন্তু নবদিগন্তের আভাষমাত্র দিয়েই নিমাই ঘোষ যেখানে থেমে গেলেন আর্থিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবার ফলে, বছর দুই বাদে সত্যজিৎ রায় এসে সেইখানেই জয়-পতাকা উড্ডীন করলেন তাঁর "পথের পাঁচালী" মারফত। অবশ্য এখানে বলা অন্যায় হবে না যে, সত্যজিৎ রায়ের এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও ভাগ্য ভালো, তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে তাঁর উদ্যমকে জয়যুক্ত করবার জন্যে সাহায্যকারী হিসাবে পেয়েছিলেন। শ্রীরায় দেখালেন যে, তাঁর "পথের পাঁচালী" ছবির গল্প তার গ্রাম্য পটভূমিকাকে আশ্রয় ক'রেই ফুটে উঠেছে, গ্রামীন জীবন থেকে আলাদা ক'রে নিলে তাঁর গল্পের রস যাবে ম'রে, প্রাণ উঠবে শুকিয়ে। তাঁর অপু-দুর্গা হচ্ছে গ্রামের মাটির সন্তান, তার ধূলোকাদা, ঝড়-বৃষ্টি, পুকুর-পাঁদাড় পথঘাট জঙ্গলের সঙ্গে তারা অংগাংগীভাবে জড়িত, যাকে

জওলা প্রোডাকসন্সের "সন্ধ্যারাগ" চিত্রে কল্যাণী ঘোষ।

বলে বাঁশপাতাকে জড়ানো। তাই "পথের পাঁচালী"তে আমরা দেখতে পেলুম একটি পরিপূর্ণ গ্রামের রূপ—তার ভালো মন্দ, সবখানি মিলিয়ে। গ্রামের ছেলেমেয়ে অপু-দুর্গা। তাই শ্রীরায় সাজানো-গোছানো, ঝক্‌ঝকে-তক্‌তকে, নধরকান্তি সুশ্রী ছেলেমেয়েকে প্রচলিত প্রথায় সুন্দর ক'রে মেক্‌আপ্‌ করিয়ে ক্যামেরার সামনে দাঁড় করাননি; চোখ দেখলেই মনে হবে, এরা গ্রামেরই ছেলে-মেয়ে, এমন দু'জোড়া ছেলেমেয়েকে আবিষ্কার করে তাদের বালক-বালিকা এবং কিশোর-কিশোরী সাজালেন। ইন্দির-ঠাকরুণের ভূমিকার জন্যে সত্তরোর্ধ্ব-বয়স বাড়িয়ে বুড়ী করা অভিনেত্রী নিয়োগ করতে তাঁর মন উঠল না; তিনি যথার্থ বৃদ্ধা চুণী-বালাকে খুঁজে বার করলেন। জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্র-পরিচালক পুডভ্‌কিন যাকে বাস্তবধর্মী শিল্পকলা বা realistic art বলেছেন, তাকেই এনে ফেললেন সত্যজিৎ রায় বাঙলার চলচ্চিত্র জগতে। বাঙলার চলচ্চিত্র-শিল্প তার পোশাকী এবং কৃত্রিমতার বন্ধন দশা থেকে মুক্তি পেল।

নিমাই ঘোষ, সত্যজিৎ রায়ের এই বাস্তবধর্মী শিল্পসাধনাকে অনুসরণ ক'রে বা তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে যাঁরা বাঙলার চলচ্চিত্র-জগতে এগিয়ে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন রাজেন তরফদার, মৃণাল সেন এবং ঋত্বিক ঘটক। রাজেন-বাবুর প্রথম ছবি "অন্তরীক্ষ"-তে বাস্তবধর্মিতার বহুতর নিদর্শন পাওয়া গেলেও চিত্রধর্মিতার অভাব ছিল ব'লে "অন্তরীক্ষ" রসিকজনের কাছে উপযুক্ত সমাদর লাভে অসমর্থ হয়েছিল। কিন্তু তাঁর পরবর্তী চিত্র "গঙ্গা" মাত্র চিত্র-সৌন্দর্য দিয়ে দর্শক-নয়নকে এত তৃপ্তি দিয়েছে যে, ছবির প্রথম দিকে মৎস্য-জীবিদের জীবনবেদরূপে রূপায়িত হওয়া সত্ত্বেও আসলে ছবিখানি যে যৌন আবেদনমূলক প্রেম-চিত্ররূপেই সকলের মনহরণে সক্ষম হয়েছে, এই তথ্যটি ব্যক্ত করতে বহু চিত্র-সমালোচকও বিস্মৃত হয়েছেন। মৃণাল সেনের প্রথম ছবি "দুধারা" আমরা দেখিনি। কিন্তু তাঁর "নীল আকাশের নীচে" এবং "বাইশে শ্রাবণ" নিশ্চয়ই বাস্তবধর্মী শিল্প-সাধনার পরিচয় বহন করে। "একাধিক ছবি ও শব্দের প্রয়োগের মধ্য দিয়ে দর্শককে নতুন এক স্তরে পৌঁছে দেওয়ার সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়া"র সাধনায়, "দুই বা ততোধিক বস্তু বা অবস্থার বিরোধের মধ্য দিয়ে তৃতীয় অবস্থায় উন্নীত" করবার প্রক্রিয়াকে সার্থকতার পথে এগিয়ে নিতে যেতে তিনি স্বতঃই সচেষ্ট। ঋত্বিক ঘটকের "মেঘে ঢাকা তারা"-তেও আমরা দেখতে পেয়েছি যে, "নাটক সার্থকতায় পৌঁছোয় বিরোধের মধ্য দিয়ে, চরিত্রের স্পষ্টতাও অন্ত-র্বিরোধের মাধ্যমেই ঘটে থাকে, আর ঘটনার বাস্তবতাও পুরোমাত্রায় নির্ভর-শীল বিরোধী অস্তিত্বের সংঘর্ষের ভেতরেই।" বাস্তুহারা-জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসিকান্না পশ্চিম বাঙলায় যে চরম গ্লানি, লাঞ্ছনা ও অপমানের ভিতর দিয়েই প্রকাশিত ও প্রবাহিত হচ্ছে, তাকেই পরিপূর্ণরূপে চিত্রায়িত করা হয়েছে "মেঘে ঢাকা তারা"-তে।

"ছিন্নমূল" এবং "পথের পাঁচালী"র আগে আমাদের ধারণা ছিল, প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনাকে ছবির পর্দায় তুলে ধরলে তা দর্শকদের বিরক্তিই উৎপাদন করবে। তাই ছবির ঘটনাকে দর্শকদের আনন্দের খোরাক করবার জন্যে আমরা কল্পনার ডানায় ভর ক'রে ওড়বার চেষ্টা করতুম। তাই কাল্পনিক কাহিনীর পাত্র-পাত্রীরাও হয়ে পড়ত অবাস্তব—নিত্য-কারের দেখা রক্তমাংসের মানুষের সঙ্গে থাকত না তাদের তিলমাত্রও সম্পর্ক। "বাস্তব জীবনও যে সম্ভাবনার প্রাচুর্যে ঠাসা, এবং এই আটপৌরে জীবনকে সোজাসুজি দেখার ক্ষমতা আয়ত্ত করাটাই যে যথেষ্ট"—এই মহান সত্যকে নিঃসন্দেহে আমরা ভুলে গিয়েছিলুম। জীবনকে খোলা চোখে দেখা, বোঝা—তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়া হচ্ছে এক কথা, আর তাকে কল্পনার ফানুসে চড়িয়ে 'মনোহারী' ক'রে তোলা হচ্ছে আর এক কথা—দুইয়ের মাঝে আসমান-জমিন ফারাক।

বাঙলা চলচ্চিত্রে এই যে বাস্তব-বাদের প্রবর্তন, ভেবে নেওয়া অন্যায় হবে না যে, এটার আমদানী হয়েছে যুদ্ধোত্তর ইতালীয় ছবি থেকে। "শ্যু শাইন", "বাইসিক্‌ল্‌ থিফ", "মিরাক্‌ল্‌ ইন মিলান", "ইল তেত্তো" প্রভৃতি ছবির পরিচালক ভিত্তোরিও ডে-সিকা জন-সাধারণকে দেখালেন, কত ছোট্ট নগণ্য ঘটনা নিয়ে কি মহান শিল্পসৃষ্টি করা সম্ভব। মনে হয়, গল্প যেন ছড়িয়ে আছে আমাদের চারিদিকে। যে-কোনও জিনিষ ঠিকমত তুলে ধরতে পারলেই হোলো—যে-কোনো মুহূর্ত, যে-কোনো মানুষ, যে-কোনো জায়গা আজ গল্পের উপাদানে ভরপুর। যা-কিছু ঘটছে বা যা-কিছু দেখছি—তাকেই খুঁটিয়ে, চুল চিরে, উল্টেপাল্টে, ছিঁড়েখুঁড়ে দেখতে পারলে দেখা যাবে, তারই মধ্যে রয়েছে একটা পুরো গল্পের মানবীয় উপকরণ, যা আমাদের সিনেমার বিষয়-বস্তু হয়ে উঠতে পারে।

আজকের দিনে আমাদের বাঙলা চলচ্চিত্রকে বাস্তবমুখী ক'রে তুলে নিমাই ঘোষ, সত্যজিৎ রায় প্রমুখ পরিচালকেরা একটি বিরাট সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছেন, এ-কথা অনস্বীকার্য।

সুবালার সাহস

মনীন্দ্রলাল বসু

আশ্বিনের আলোকজ্জ্বল আকাশ মাতৃস্তন্যপানতৃপ্ত শিশুর হাসির মত মধুর ছিল, সহসা অভিমানিনী নারীর ভ্রূকুটিকুটিল আননের মত তিমিরঘন হয়ে এল।

কলিকাতার সংকীর্ণ গলির একতলার ছোট ফ্লাটে সূর্যালোক সোজা আসেনা, কখনও বা পাশের বাড়ীগুলি এড়িয়ে তির্যকভাবে প্রবেশ করে। কিন্তু, আজ প্রভাতে উঠে মনে হয়েছিল, চারদিক আলোয় ঝলমল করছে, শুধু আলো নয় কোথা হতে যেন শেফালীর সুবাস শারদীয় সংগীতের সুর আসছে—কিশোর-স্মৃতির ছায়াছবি। এমনি শরতের আলোয় সুবালার মনে প্রথম যৌবনের সুখস্মৃতি জেগে ওঠে, সেই চিন্তাজ্বরহীন অকারণ পুলকভরা দিনগুলি!

খুসিমনেই সুবালা তাহার ছোট সংসারের কাজ সকালে সুরু করেছিল। ভৃত্যটি অসুস্থ ও অনুপস্থিত, ঠিকে-ঝিকে বাজার পাঠাতে হয়েছে, বেশী দামে বাসী তরকারি ও বরফের মাছ এনেছে বলে বচসা করেনি। গত শরতের রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর তার অন্তরে আজ গুঞ্জরিত হয়ে উঠছে।

কিন্তু চায়ের টেবিলে কলহ না হলেও, স্বামীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি সুরু হল। অফিসের মোটা ফাইল নিয়ে স্বামী চা খেতে এলেন। গম্ভীর প্রকৃতির লোক, স্বল্পভাষী, সহকারী সেক্রেটারীর পদ লাভ করে আরও গম্ভীর হয়ে গেছেন, আগে যেটুকু মন সংসারে দিতেন এখন তা ফাইল দেখতেই যায়।

চার বছরের বিবাহিত জীবনে সুবালা হাঁফিয়ে উঠেছে; গত বৎসরে খোকা আসতে আর সে স্বামীসঙ্গালাপের জন্য তৃষিত হয় না। তবু আজ মোটা ফাইল দেখে তার ইচ্ছা হ'ল, বলে, ছুঁড়ে ফেলে দাও ফাইলটা, আজ শারদশ্রীর সমাদরে অফিসের ফাইল বন্ধ করো, তুমিত উপনন্দের মত ঋণশোধ করতে বসনি। তারপর স্বামী ফাইল হতে মুখ না তুলে বললেন, শোন, আমাকে শীগগীর যেতে হবে, অফিসের গাড়ী এক্ষুনি আসবে, আমাকে আজ দার্জ্জিলিং যেতে হবে।

দার্জ্জিলিং! সুবালা চঞ্চলা হয়ে উঠল। আবদারের সুরে বলে উঠল, বা, দার্জ্জিলিং যাবে, বলনিত, আমি যাব, আমিও যাব দার্জ্জিলিং।

ফাইলের পাতায় লাল পেন্সিলের দাগ কাটতে কাটতে স্বামী বললেন, না, তুমি কোথায় যাবে! আমি অফিসের কাজে যাচ্ছি, তুমি কোথায় যাবে!

আহত অভিমানে সুবালা বললে, বা, আমি যেতে পারিনা বুঝি, প্লেনে যাবেত, প্লেনে বুঝি আর একটা সিট বুক করা যায় না,—আমি যেতে পারিনা!

এবার চশমা খুলে স্বামী চাইলেন, দেখ, এ আমি অফিসের জরুরী কাজে যাচ্ছি, আজই হয়ত ফিরতে হবে, তুমি কোথায় যাবে, অবুঝ হোওনা।

বেশ! সুবালা চলে গেল খোকার কাচা-জামাগুলি উঠানের বারান্দায় শুকোতে দিতে। শরতপ্রভাতের সংগীত ছন্দোভ্রংশ হয়ে গেল।

এক হাতে মোটা পোর্টফোলিও অপর হাতে ছাতা নিয়ে স্বামী চলে গেলেন। সোনার আলো মিলিয়ে গিয়ে বাদল ধারা সুরু হয়েছে।

খোকা সুষুপ্ত, কচি মোটা আঙুলে প্লাষ্টিকের ঝুমঝুমিটা ধরে আছে। খোকার দুধ তৈরি করে বোতলে ভরে সুবালা সোফায় এলিয়ে বসল, আর কোন কাজ করতে তার উৎসাহ রইল না। রান্না-ঘরে ভেটকি মৎস্য খণ্ডগুলি ফ্রাই প্যানে পড়ে রইল, বারান্দায় জামাকাপড়গুলি ভিজতে লাগল, আরও জোরে বৃষ্টি এল। সে ভাবতে লাগল, খুব বৃষ্টি আসে, রাস্তা সব ডুবে যায়, প্লেন ছাড়তে না পারে, বেশ মজা হয়। কিন্তু ভারাক্রান্ত অন্তরে সে কোন কৌতুক অনুভব করতে পারল না।

ত্রস্তা হরিণীর মত সুবালা চমকে জাগল। চারিদিকে নানা শব্দের ঝড় উঠেছে, কোলাহলের তুফান,—ঝমঝম

বিষ্টি পড়ছে, খোকা বোধ হয় উচ্চস্বরে কাঁদছে, জানলাটা কাঁপছে, পথে কোথায় মোটরগাড়ীর হর্ণের ধ্বনি, কে যেন বেল বাজাচ্ছে, এ ঝড়জলে কে বার বার বেল বাজাচ্ছে!

খোকার দিকে একবার চেয়ে সুবালা ড্রয়িংরুম পার হয়ে দরজা খুললে, সম্পূর্ণ খুললে না, একপাল্লা খুলে শাড়ীর আচল কোমরে জড়িয়ে দাঁড়াল। অদূরে এক জীপ-গাড়ী দেখা যাচ্ছে আর দরজা জুড়ে সোনালী-সাজপরা রহস্যময় দীর্ঘকায় যুবকমূর্তি! মাথার টুপি প্রশস্ত কপাল জুড়ে বসেছে, শুধু দুটি চোখ কালো মেঘের পাশে তারার মত জ্বলজ্বল করছে, কোটের কাঁধের ওপর এরোপ্লেনের ডানা আঁকা না আঁটা, বোঝা যাচ্ছে না। বিস্মিতভাবে সুবালা চাইল।

যুবকমূর্তিটি দুলে উচ্চহাস্য করে উঠল। ত্রাসিত হয়ে সুবালা দরজা বন্ধ করবার চেষ্টা করলে, মুখে কোন কথা এল না।

অজানা যুবক দরজা ঠেলে দিলে, অট্টহাস্যে কৌতুক সঙ্গীতের সুরে বলে উঠল—সু-বালা ঠিক বাড়ীতেই এসেছি মনে হচ্ছে—সু-বা-লা চৌধুরি ne' ঘোষ—ঠিক না?

কে! কে আপনি?

আমি চিরপরিচিত, বহু পরিচিত তবু অজানা—

চমকিত হয়ে সুবালা দরজা খুলে দিলে, প্রথম যৌবনের পার হতে কোন চিরপরিচিত বহু আকাঙ্খিত চাউনি ভেসে এল।

দরজা বন্ধ করে তারা ড্রয়িংরুমে এল। কৌতুকের সুরে যুবকটি বললে, হায় ভীতা অ-বালা এখনও চিনতে পারলে না!

কন্ঠের সুরে সুবালার বুকের রক্ত দুলে উঠল! কত শরৎপ্রভাতে কত ফাল্গুনে সন্ধ্যায় ওই সুরে ডাকা তার নাম! ভয় হয় চিনতে।

কে! অসিত! অসি-দা-তুমি! সত্যি তুমি! ওতু-মি!

হাঁ, আমিই, যে পথিক অজানা পথে বাহির হয়েছিল কপর্দকহীন, আজ সে সোনার রথে জয়ী বেশে এল, কিন্তু রাজবালা—

ও! সুবালা শিউরে উঠল। আবেগের সঙ্গে অসিতের হাত ধরলে, সে কোমল তরুণ স্পর্শ নেই, এ দৃঢ় রুক্ষমুষ্ঠি। তবু সুবালা জোরে ধরে রইল। দুই চোখ ফেটে বুঝি অশ্রুপ্লাবন আসছে।

সেই যে তুমি গেলে, তারপর কোন খবর নেই, তিনবছর ধরে একখানা চিঠিও পেলুম না।

আমি তখন ব্রেজিলের ঘন জঙ্গলে হারিয়ে গেছি।

তারপরও ক'বছর কেটে গেল, বলত—

থাক সে কাহিনী, বেবীর চিঠিতে তোমার সব খবর পেতুম, একটা খোকাও-ত হয়েছে।

হাঁ, হয়েছে অবশেষে! আর তুমি?

আমি, দেখতেই পাচ্ছ, এখন এয়ার-পাইলট— ইঞ্জিনীয়ার, ম্যাজিক কার্পেটের অধিকারী —গগণবিহারী— একদিন-রাতে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়ে আনতে পারি—যাবে? যাবে আমার সঙ্গে!

সত্যি! যাব, যাব তোমার সঙ্গে।

হায় বালা, কত সাধ হয় সাধ্য হয় না।

আমি যাবো, কে আমায় আটকাতে পারে! তুমি-ও নিয়ে যাবে না বলো!

আচ্ছা যাবে, সেই রকমই আবদারে আছ দেখছি।

সত্যি নিয়ে যাবে, জাননা, এঘরে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে, চারটে দেওয়াল যেন বুকে চেপে ধরে—

কেন, ড্রয়িংরুমটি বেশ সাজানত দেখছি, আমার ড্রেসডনের চায়ের সেট-

টাও সাজিয়ে রেখেছ, ওতে বুঝি চা খাওয়া হয়না, এমন বাদলাদিনে আমাদের চা ও পাঁপর-ভাজার মজলিস মনে পড়ে—

ও সেই-টাই বুঝি মনে আছে। সুবালা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

চৌধুরি-সাহেব কোথায়?

আজ সকালে দার্জিলিং গেছেন।

তুমি গেলে না, তোমাকে নিয়ে গেলেন না বুঝি।

কে যাবে ওর সঙ্গে, আফিসের ফাইল ঘাড়ে করে, তবে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখবার ইচ্ছা ছিল।

বেশত, কাঞ্চনজঙ্ঘা কেন, এভারেষ্টের শিখরের ওপর তোমায় নিয়ে যাব।

নিয়ে যাবে সত্যি! আমি চলে যাব তোমার সঙ্গে। জাননা—

বেশ, তবে আগে পাঁপর ভাজা—

পাঁপরগুলোয় বোধ হয় ছ্যাতা পড়ে গেছে, ভেটকি-ফ্রাই হতে পারে।

ও! tres bien, tres bien (ত্রেঁ বিয়াঁ)।

মোহমুগ্ধ নয়নে সুবালা অসিতের দিকে চেয়ে রইল।

এই অসিত। সত্যি-ই এই অসিত! না, আর কেউ তার সাজ পরে এসেছে, তার কেমন ভয় করছে। হাঁ, এই অসিত, সেই কিশোর তরুণ এখন বলিষ্ঠ তেজস্বান যুবক, অজানা কত প্রভাতের হঠাৎ-আসা অসিত, কত অপরাহ্নে অলস গল্প-করা অসিত, কত সন্ধ্যায় বিচিত্র রেস্তোরাঁয় খেতে-যাওয়া অসিত! তারপর, কত অজানা দেশে দুঃসাহসিক যাত্রী, জীবনস্বপ্ন-বোনার অসিত! আজ সে এল, চার বছর আগে এলনা কেন, সে কি ভাবে, সারাজীবন প্রতীক্ষা করে বসে থাকা যায়! তার বুক দুরু দুরু করে কাঁপছে।

অসিতও স্থির হয়ে বসে থাকতে পারছে না, কেন! চিরকালই সে চঞ্চল, প্রাণবান, অস্থির হয়ে ঘরের চারিদিকে ঘোরে। সে-ও কি ভাবছে, কেন চার বছর আগে এল না!

অসিত যেন বড় চঞ্চল হয়ে উঠছে, কখনও সে চায়ের পেয়ালা হাতে ঘরের কোনে ঘুরছে, তখনও অর্ধেক ফ্রাই মুখে পুরে জানলা খুলে অন্ধকার আকাশের দিকে চাইছে, কখনও কাঁধে-লাগান রঙীন পেলান খুলে খোকার হাতে গুঁজে দিচ্ছে, গাল টিপে নাচুনি ভঙ্গীতে অপেরেটের সুরে গেয়ে উঠছে, Yes sir, this is my baby!

মায়াক্ষুব্ধনয়নে সুবালা চেয়ে রইল।

চায়ের শূন্য পেয়ালা কাচের টেবিলে ঠক্ করে রেখে অসিত যেন শ্রান্ত হয়ে সোফায় বসলে। সুবালার দিকে কৌতুক-নয়নে চেয়ে হেসে উঠল। ওই চাউনি সুবালার বুকে কাঁপন ধরায়।

তোমাকে প্রথম দেখে কি ভয় পেয়েছিলুম!

এখন-ই বা ভরসা কি?

আমি জানি, তুমি চিরকাল আমাকে ভয় দেখাতে ভালবাস।

হয়ত ভালবাসি বলে ভয় দেখাই, একটা 'হয়ত' আছে, লক্ষ্য করবে।

জানি, সেই একবার মাতাল সেলার সেজে কি ভয় দেখিয়েছিলে।

আর এবার, এ্যাভিয়েটারের সাজে ভয় দেখাতে এসেছি, বলছ।

জানি না। তুমি কোথা হতে আসছ, কোথায় যাবে, সত্যি, সত্যি কি তুমি আমার কাছে এসেছ, তুমি সেই অসিত!

এ সব প্রশ্ন বৃথা। সুদূরপিপাসিনী, দুয়ারে প্রস্তুত রথ, তারপর ব্যোমপথে অজানা যাত্রা, রাজপুত্র সাতসমুদ্র পার হতে এল, রাজবালা কিন্তু জাগছে না—

যাব, যাব, এ চারদেওয়াল চেপে ধরে, কিন্তু কোথায় নিয়ে যাবে—

যে সব জায়গায় তোমার যাবার সাধ

ছিল, এ অন্ধপুরী ছাড়িয়ে নিয়ে যাব, যে-সব অপূর্ব দেশে তুমি যাবে বলে কল্পনা করতে, রুপার্ট ব্রুকের টাহিটির শ্যামল প্রবাল দ্বীপে, অথবা হনলুলুর চিরবসন্তময় সমুদ্রতীরে অথবা দক্ষিণ ফ্রান্সের দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে—এই সজল অন্ধকার হতে মেঘলোক পেরিয়ে যেখানে সূর্যালোকের সাত রঙের বন্যা—শুধু মন নয়, দেহমোর মেঘের সঙ্গী—

সুবলা মুগ্ধচিত্তে শুনছিল, কিন্তু অসিতের ভুল সুরে গাওয়ার ভঙ্গীতে হেসে উঠল।

তারপর!

তারপর জেট-প্লেনে হয় ভূতলে পতন বা মহাকাশে নর্তন। চলো আর দেরী নয়।

তুমি চিরকাল আমার সঙ্গে পরিহাস করতে ভালবাস, তুমি নিষ্ঠুর!

বেশ, সাহসিকা এস, পরিহাস কি সত্য বুঝতে পারবে। আর সময় নেই।

যাব, আমি যাব! কি অদমনীয় দিদৃক্ষায় তার বুক কেঁপে উঠল।

মন্ত্রচালিতের মত সুবালা উঠল। বলাকা-আঁকা ঘন নীল ব্লাউজের ওপর সবুজ শাড়ী পরলে, কানে নীলার দুল টিপে দিলে, কপালে সিন্দুর-তিলক আঁকলে রক্তাম্বুণের মত।

ভুন্ডারস্যোন্! অসিতের কণ্ঠে রঙ্গের সুরে সে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল।

খোকাকে অসিত বুকে ধরে নিয়েছে আনাড়ীর মত, তার হাত ধরে বলে উঠল, মোদের যাত্রা হল সুরু ওগো এ্যাভিয়েটার।

দাও, খোকাকে, কি নিশ্চিন্ত ঘুমোচ্ছে, আর তোমার ওই পরিহাস রাখো।

নিশি পাওয়ার মত সুবালা জীপ গাড়ীতে উঠে বসল। কখন যে গলির মোড়ের লক্ষ্মীভান্ডার কমলাবিপণী পার হয়ে গেল, কখন মেঘস্তম্ভিত আকাশের নীচে কলিকাতার প্রাসাদ-শ্রেণী ছায়াছবিস্রোতের মত মিলিয়ে গেল, কখন সে বৃহৎ ব্যোমযানে উঠল, মেঘলোক পার হয়ে ঊর্ধ্বে আরও ঊর্ধ্বে প্লেন উঠে চলেছে—সুবালার কোন খেয়াল রইল না।

এ কি অপরূপ উজ্জ্বল নীল! একি অলৌকিক সুন্দর শুভ্রতা! একি অপূর্ব বর্ণের বন্যা। একি আলোকের মায়াপুরী! এত রং, এত মাধুরী! বুঝি চোখ ফেটে যাবে!

যেন কোন দুঃস্বপ্ন হতে সুবালা জেগে উঠল। সে কোথায় আছে, এ কোন রূপলোকে এল সে কিছু মনে করতে পারছে না। হয়ত সে স্বপ্ন দেখছে, স্বপ্ন এত সুন্দর হয়! অথবা হয়ত সে তার দম-আটকান ফ্লাটের চারদেওয়াল-চাপা পড়ে মরে গেছে, এখন কোন সুর-লোকে চলেছে। কিন্তু এই ত চার-দেওয়াল-চাপা আরামদায়ক বড় চেয়ারে সে বসে, তার ড্রয়িংরুমের সোফার মত।

তারযন্ত্রের সুরে কে যেন বলে উঠল, কেমোন দেখছেন?

নিম্নে তুষারমৌলি গিরিশৃঙ্গের শোভা দেখতে দেখতে সুবালা বললে—চমৎকার!

ইয়া, টমট্কার!

সুবালা প্লেনের ভেতর চাইলে। তার পাশে এক রহস্যময়ী অজানা তরুণী বসে। নির্বাক বিস্ময়ে সে চেয়ে রইল। সোনার সুতার মত চুলগুলি, স্তবকে স্তবকে ঝুলে পড়েছে, ঘননীল নয়ন, যেন আকাশের সমস্ত নীল রং ছেঁকে নেওয়া, সরু ঠোঁট দুটিতে কে আলতা পরিয়ে দিয়েছে। কি মধুর হেসে সে তাকিয়ে।

মিসেস্ চৌভুরি, ভয় পাবেন না। ভাল লাগে?

খুব ভাল। আপনি?

হাম্ Air hostess, আপনার শিশু আমার নিকট, দেখুন, কেমন ঘুম করছে, milk দিয়েছি। থাক আমার নিকট, আপনি হিমালয়-সীন দেখুন, শীঘ্র চলে যাবে, আমরা এভারেস্টের নিকট যাইতেছি।

এভারেস্ট! সত্যই তাহলে সে প্লেনে বসে, সত্যই কি অসিত তাকে নিয়ে এসেছে। সুবালা যেন কিছু বুঝতে পারছে না। জিজ্ঞাসা করে উঠল, আপনি সত্য বলছেন?

কনকবরণী হেসে উঠল। সুবালার হাত ধরে বললে, সত্য! সত্য! আপনি সত্য, আমি সত্য, এই জেট-প্লেন On Himalayas সত্য! আপনি ভয় পেয়েছেন, অসিট আপনাকে বোধ হয় ভয় দেখায়, কোন ভয় নেই। সত্য!

অসিত কোথায়?

নিজে pilot করছে, এখানে চালান শক্ত। দেখে নিন, ভি ভুন্ডারস্যোন।

ও কথার মানে কি?

সুন্দরম্, সুন্দরম্। ওই এভারেস্ট! ওই তুষার-নদী।

কিন্তু আমি কিছু বুঝতে পারছি না, আপনি আগে বলুন, আমরা কোথায় চলেছি।

আপনার ভয় বুঝি যায় না, আগে দেখে নিন, এ দৃশ্য শীঘ্র চলে যাবে, কয়েক মিনিট, তারপর পার হয়ে যাব। ওই এভারেস্ট শৃঙ্গ!

বাহিরে তাকিয়ে সুবালা দাঁড়িয়ে রইল। ধীরে মাথা নত করে প্রণাম করলে। একি অপূর্ব সুভ্রশ্রী একি শান্তগম্ভীর মহিমা। নিম্নে তুষার-কিরিটি পর্বতমালা মেঘের খেলা, তুষারনদীর বিচিত্র ধারা, এ সকল পৃথকরূপে তাহার চোখে পড়ল না, শুধু এক ঝলক আলোর দিব্যপ্রভা তাহার নয়নে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, সে আলোর পুণ্যস্পর্শ অন্তরে গম্ভীর শান্তি অনুভব করলে। করযোড়ে পূজারিণীর মত স্তব্ধচিত্তে সে চেয়ে রইল। তারপর চোখ বুজে শান্ত হয়ে বসে পড়ল। যখন চোখ চাইলে, সেই অলৌকিক শুভ্রশ্রী কোথায় মিলিয়ে গেছে। গভীর তৃপ্তিতে চক্ষু মুদিত হয়ে এল।

স্বর্ণকেশিনীর স্পর্শে সুবালা চাইলে। টেবিলে চা ও কেক সাজান।

দেখুন নীচে, আমরা শীঘ্র দার্জিলিং পেঁছাব।

দার্জিলিং! এত শীগগীর। কিছু বোঝা যায় না।

মেঘ সরে যাবে, সব দেখা যাবে, আমরা খুব দ্রুত যাই না, ঘন্টায় চারশত মাইল।

কত উঁচুতে?

এখন বোধ হয় বিশ হাজার ফিট, এখন নামছি।

দার্জিলিংত দশ হাজারও নয়, কিন্তু সত্যি আমরা কোথায় চলেছি, কিছু বুঝতে পারছি না।

পেছনে কে উচ্চহাস্য করে উঠল।

রঙীন পেয়ালা হাতে অসিত সেন দাঁড়াল। পোষাকী সাজ আর নেই, হলদে নীল ডোরাকাটা বুস্সার্ট ও ঘন নীল-বর্ণের ট্রাউজার পরে তাহাকে বড় তরুণ দেখাচ্ছে। গম্ভীর সুরে সে বললে, কোথায় চলেছি পাইলট জানে, আমরা কি জানি!

কেন ওঁকে ভয় করাও, ওই দার্জিলিং দেখুন, দেখুন। আমরা সৌভাগ্যবান কোন মেঘ নেই, বৃষ্টি নেই।

ছোট সবুজ ডিপির মত পাহাড়ের গায়ে তাসের ঘরের মত নানারঙের বাড়ী সাজান। ওই দার্জিলিং!

চৌধুরী সাহেবের অফিস কোথায়?

ম্যালের কাছে শুনেছি, ওখানে আমরা নামবো?

ওখানে! আমরা ত টাহিটি দ্বীপে যাচ্ছি।

ওঁকে ভীত কর কেন? আপনি কোথায় যেতে চান?

দার্জিলিং!

দার্জিলিং-এ landing স্থান নেই, প্যারাসুটে নামতে পারবেন?

ভীতভাবে সুবালা উঠে দাঁড়াল। বধকাচের লোহার খাঁচা এখানেও সে কি বন্দিনী?

আপনি বসুন, চা খান। কোথায় যাবেন?

তাহলে কলকাতা, কলকাতা!

বেশ, ওই টেলিফোন আছে, পাইলটকে বলুন কালকুটা।

হায় সাহসিকা! হনলুলু ত হল না।

যাবেন হনোলুলু? কাল আপনাকে কলিকাতায় পেণছে দেব।

না, না, খোকাকে দাও। কলকাতা চলো। কোথায় চলেছে প্লেন, আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

এ জেট্-প্লেন হল্যাণ্ডে নির্মিত হয়েছে, আমরা আরজেনটাইন চলেছি, সেখানে বিক্রয় হবে, পথে আপনাকে দর্শন করতে কলিকাতায় নেমেছি।

বুঝেচি। দর্শন হল। তোমরা সুখী হও।

আমরা সব সময় সুখী। উচ্চ আকাশের নির্মল বাতাসে দেশে দেশে উড়ে বেড়াই। নগরের দূষিত ঘরের দুঃখ নেই—হ্যালো কালকুটা! ইয়া।

অসিত কৌতুককণ্ঠে বলে উঠল, পাইলট কিন্তু সব সময়ে কথা শোনে না, কোন Direction মানে না, নিজের খুসিমত চালায়, আঘাটায় নিয়ে যায়।

আপনি কেক খান, ভয় পাবেন না, ওসব ওর joke দেখুনত পুপে কেমন নিশ্চিন্ত চেয়ে আছে।

জানি, অসিত আমাকে ভয় দেখাতে পরিহাস করতে ভালবাসে।

এক চুমুকে পেয়ালা নিঃশেষিত করে অসিত গম্ভীরভাবে বললে, পরিহাস সহ্য হয়, সত্যকে কি সহ্য করতে পারবে।

ওই মিলিয়ে গেল দার্জিলিং।

অপরাহ্নের ম্লান আলোয় সুবালা যখন তার অন্ধকার ফ্লাটে পেণছাল, সরু-গলি জলে ডুবে গেছে, বর্ষণরিক্ত ছিন্ন-মেঘদল হতে আলোর ফলক মাঝে মাঝে বদ্ধজলে ঝিক্‌মিক্ করছে! কিন্তু চারি-দিকে অপরূপ আলোর আভা, তুষার-কিরিটিণী হিমাচল শ্রেণীর দিব্যদ্যুতির মত। দরজার চাবি খুলে ঢুকতে শাড়ীর লাল পাড় কাদায় কালো হয়ে গেল।

খোকা সুষুপ্ত, শান্ত, যেন কোন স্বপ্নে সমাহিত।

বসবার ঘর, খাবার ঘর, শোবার ঘর, সব ঘর সুবালা চঞ্চলপদে ঘুরলে, সব ঠিক আছে। ঘরে ঘরে বৈদ্যুতিক আলো জেলে দিলে। অসিত যে বলেছিল, সুন্দর সাজান, তা সত্যি মনে হল। ইচ্ছা হল, আরও ভাল করে সাজায়, গোছায়, কিন্তু দেহের শ্রান্তিভারে সে সোফায় বসে পড়ল। অন্তরে গভীর প্রশান্তি অনুভব করলে। বিদ্যুৎশক্তির কৃত্রিম আলো অলৌকিক মনে হল, যেন গৌরী-শঙ্কর শৃঙ্গের দিব্যজ্যোতিঃর এককণা তার ঘরেও জ্বলছে।

স্বামীর পদধ্বনিতে সুবালা চমকে জেগে উঠল। এক হাতে ফাইল-ভরা পোর্টফোলিও অপর হাতে গুটান ছাতা, স্বামী তাকে স্পর্শ করে জাগালেন।

ও তুমি—তুমি! এখন এলে!

বা কি সুন্দর সেজেছ, কোথায় যাবে?

যাবনা, কোথাও যাব না। আবেগের সঙ্গে সুবালা দাঁড়িয়ে উঠল।

শোন, আজ ঝড়েজলে দার্জিলিং যাওয়া হল না, সেখানে নাকি খুব বিষ্টি।

বিষ্টি! সুবালা উচ্চহাস্য করে উঠল। কোন কথা বললে না।

শোন, পুজার ছুটিতে দার্জিলিং যেতে হবে, জরুরী কাজ তুমিও যাবে, সেইরকম হোটেলে বন্দবস্ত করে এলুম।

না, আমি যাব না, আমি দার্জিলিং কেন—আবার সে উচ্চহাস্য উচ্ছ্বসিত হয়ে স্বামীকে আলিঙ্গন করলে। হাতের পোর্টফোলিও ঘরের মেজেতে পড়ে গেল।

স্মিতনয়নে স্বামী তার দিকে চাইলেন। বিবাহের প্রথম বৎসরের সেই রঙ্গিণী চঞ্চলা সুবালা আবার যেন জেগে উঠেছে।

রাত কত হবে কে জানে। বার বার সুবালার ঘুম ভেঙ্গে যায়। এঘর ওঘর ঘুরে বেড়ায়। ব্যোমযানের গতিস্পর্শে দেহের চঞ্চলতা যেন দূর হয় না।

অন্ধকূপের মত উঠানে সে দাঁড়াল, ঊর্ধ্বে চেয়ে রইল। তেতলার ছাদের আলিসার পাশে একটি তারা জ্বলজ্বল করছে, ওই আকাশের কটা ছোট টুকরার দিকে চেয়ে সে ভাবতে লাগল, অগণিত তারাভরা অসীম আকাশের মধ্য দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের তরঙ্গোচ্ছ্বাসের উপর দিয়ে জেট-প্লেন উড়ে চলেছে, কোন নবদেশে অপূর্ব সৌন্দর্যলোকে! সে-ও কি যেতে পারত!

মানুষ খেকো

কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

অনেক হিংস্র বন্য জন্তুই মানুষ ধরে খায়, বাঘ, চিতাবাঘ, সিংহ, এমন কি ভাল্লুক, আবার জলে আছে কুমীর, হাঙ্গর, কামট ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের দেশে "মানুষ খেকো"—কিম্বা নরখাদক—বলতে সাধারণতঃ বুঝায় বাঘ। সব বাঘই কিছু মানুষ ধরে খায় না, বরঞ্চ যাদের বনে জঙ্গলে ঘুরতে হয় তাদের মতে সাধারণ অবস্থায় বাঘ মানুষকে এড়িয়েই চলে। বড় বড় শিকারীদের কাছেও ঐ কথাই শোনা যায়। তবে একথা ঠিক যে কোন কোনও অঞ্চলে মানুষ খেকো বাঘের উৎপাত খুব বেশী, যেমন বাংলায় সুন্দরবন, মধ্যপ্রদেশে মাণ্ডলা, বালাঘাট ও বেতুল্‌ অঞ্চল। সুন্দরবনের শিকারীরা বলে যে ওখানের বাঘ মাত্রেই মানুষখেকো এবং মাণ্ডলা ও বালাঘাট অঞ্চলের লোকের কাছেও ঐ কথাই শুনেছি। তবে রামউক ও সিওনি অঞ্চলের আদিম গোণ্ডজাতির লোকেরা বলে যে বাঘ সহজে মানুষের সঙ্গে শত্রুতা করে না এবং মানুষ সজাগ এবং হাতে হাতিয়ার থাকিলে অর্থাৎ টাঙ্গি, কুড়াল, বর্শা বা তীর ধনুক, যা ওদের অস্ত্র—বাঘ তার কাছে ঘেঁসে না। তবে দৈবাৎ বেকায়দায় পড়লে বাঘ মানুষকে আক্রমণ করবেই, এবং যদি সে বাঘ মানুষ মেরে তার রক্তের স্বাদ পায়, তবে তার মানুষ খেকো হ'তে দেরী লাগে না।

বাঘ মানুষ খেকো হয় কেন? সাধারণ মতে বাঘের "দন্তম্ গলিতং পলিতং কেশম্ অবস্থা দাঁড়ালে, অর্থাৎ সে বুড়ো ও অশক্ত হয়ে পড়লে আর তার বনের পশু তাড়িয়ে ধরা বা মারার ক্ষমতা থাকে না। তখন সে মানুষের পেছনে ফেরে এবং সুবিধা পেলেই মানুষ মেরে খায়। বনে জঙ্গলে কাঠুরে, বনপথ যাত্রী পথিক বা নির্জন অঞ্চলে রাখাল ইত্যাদি তার শিকার দাঁড়ায়। ক্রমে ভয় ভেঙ্গে গেলে সে ভয়ানক হয়ে ওঠে।

বড় শিকারীরা, বিশেষ যাঁদের মানুষ খেকো বাঘ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে, তাঁরা বলেন যে নানা কারণে বাঘ মানুষ খেকো হয়। বাঘ অশক্ত বা বুড়ো হ'লে মানুষ খেকো হয়, তাছাড়াও বাঘিনীর ছানা হলে, নিজের ও তাদের খাবার যোগাড় করতে অনেক সময় সে মানুষ খেকো হয়, কেননা মানুষ সকল জীবের থেকে, আত্মরক্ষার ব্যাপারে বেশী অসহায়। আবার বাঘের বাচ্চা মায়ের সঙ্গে মানুষ শিকার আরম্ভ করলে সহজেই দুর্দান্ত মানুষ খেকো হয়ে দাঁড়ায়। যে সব অঞ্চলে জঙ্গলের আশে পাশে বিশাল গোচারণের মাঠ আছে সেখানের বাঘ প্রায়ই গরু, বলদ, ছাগল, ভেড়া মেরে খায়। এইভাবে পালিত পশু ধরে খেয়ে বাঘ মানুষের ভয়ও হারায় আবার অন্যদিকে বনের পশু শিকারের জন্য যে দ্রুত তাড়া দেওয়ার ক্ষমতা ও অন্য সামর্থ তাও ক্রমে অনভ্যাসের দরুণ হারিয়ে ফেলে। অন্য দিকে যদি গ্রামের পশু ধরায় খুব বেশী বাধা না পায় তবে সেই বাঘ ক্রমে বনের পশু ছেড়ে শুধু গরু-বাছুর মেরেই খায়। সেই বাঘ যদি কোনও কারণে আর গরু-বলদ, ছাগলের নাগাল না পায়, অর্থাৎ এলাকার গোচারণের জমির ঘাস যদি আগুন লেগে পুড়ে যায়—যাহা উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের নানা অঞ্চলে খুব সাধারণ ব্যাপার—অথবা অন্য কোনও কারণে সেখানে গোচারণ বন্ধ হয়, এখন সে গ্রামের পশুর বদলে গ্রামের মানুষ, বনের কাঠুরে ধরে খেতে আরম্ভ করে। যদি গ্রামের লোকজনের কাছে বন্দুক না থাকে বা সে রকম দক্ষ শিকারি যদি তার পিছনে লেগে তাকে শেষ না করে, তাহলে ক্রমে সে অতি ভয়ানক ও মহা-চতুর মানুষ খেকো হয়ে দাঁড়ায়।

আজকের দিনে বন্দুক, রাইফেলের লাইসেন্স পাওয়া সহজ হয়েছে—যদিও বাঘ বা ঐ জাতীয় হিংস্র পশু শিকারের উপযুক্ত শক্তি ও গতিযুক্ত রাইফেলের দাম এখন আগুন—কাজেই এখন বাঘের উৎপাত অনেক কমে গিয়েছে। অনেক বন-জঙ্গল ও কাঠের জন্য উজাড় করা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে সেখানের বন্য পশুও লোপ পেয়েছে। ছোটনাগপুরের অনেক প্রসিদ্ধ জঙ্গলের আজ প্রায় চিহ্নই নাই; গয়ার কাছে "দানোয়া ভালুয়ার" ভীষণ জঙ্গল, দুর্গাপুরের বন-জঙ্গল এসবই মানুষ কাঠের লোভে ও চাষ-আবাদের প্রয়োজনে কেটে প্রায় শেষ করেছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে সেসব জঙ্গলের মানুষ খেকো বাঘও শেষ হয়ে গেছে। মধ্যপ্রদেশেও অনেক অঞ্চল, যেখানে আগে বাঘের রাজত্ব ছিল, এখন খোলা মাঠে পরিণত হয়েছে। ক্বচিৎ কদাচিত সেখানে বাঘের উপদ্রব হয়।

আগেকার দিনে অবস্থা অন্য রকম ছিল। তখন বনজঙ্গল ছিল ঢের ঘন এবং বাঘ শিকারের অস্ত্র এবং সেই অস্ত্র চালাবার জন্য দক্ষ শিকারী, দুইই ছিল কম। সেইজন কিছুদিন পূর্বেও নানা অঞ্চলে বাঘের উৎপাতে সারা তল্লাটের লোক ভীত ত্রস্ত হয়ে থাকতো। সেই সময়ের এক মানুষ খেকোর গল্প বলি। স্থানটি ছিল মধ্যপ্রদেশের বেতুল অঞ্চলের টীকগাছের জঙ্গল এবং সময়টা ছিল এপ্রিল মাসের শেষ অর্ধেক ও মে মাসের আরম্ভে, অর্থাৎ গ্রীষ্মের মাঝামাঝি।

জঙ্গলের প্রবীন কনসারভেটার সাহেবের কাছে খবর গিয়েছিল যে, ঐ খানের কাঠের কারবার বন্ধ হয়ে গিয়েছে এক মানুষ খেকো বাঘের উৎপাতে। সেই দুর্দান্ত শয়তান শতাধিক মানুষ খেয়ে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ মাইল চওড়া এলাকার পথঘাটে লোকচলা বন্ধ করেছে এবং গ্রামাঞ্চলের লোকের প্রাণ অতিষ্ঠ করেছে। অতখানি এলাকা এবং এতো লোক বাঘের পেটে গিয়েছে শুনে সাহেব প্রথমে ভাবেন যে এই অত্যাচার চালিয়েছে একাধিক বাঘে। সেই জন্য দীর্ঘ দিনের শিকারের ব্যবস্থা করে, সঙ্গে হাতি, ঘোড়া এবং লোকলস্কর নিয়ে জঙ্গলে অভিযান করা হয়। জঙ্গলের কাজই সাহেবের পেশা সেইজন ভাল হাতি ও অভিজ্ঞ ও সাহসী শিকার খোঁজার লোক তাঁর সঙ্গেই থাকতো। বাঘের শিকারি বলে তাঁর খ্যাতি থাকায় গ্রামের লোক তাকে সাহায্য করতে সাহস করে এগিয়ে আসতো।

প্রথমে খবর এলো এক অতি ধূর্ত ও বুড়ো বাঘের, যে ঐ অঞ্চলের এক সীমানায় দুই তিন গ্রামের গরু ছাগল মেরে দীর্ঘদিন সেখানের লোকজনকে জ্বালিয়েছে এবং স্থানীয় শিকারিদের এড়িয়ে, আজ এই গ্রামের কাল ভিন্ন গ্রামের, গরু বাছুর মেরেছে। সেটা হয়ত মানুষ খেতে আরম্ভ করেছে এই ভেবে তাকে খুঁজে মারা হোলো। তার পর

সাহেবের পায়ের গোড়ালিতে বিষম চোট লাগায় সাহেব পঙ্গু হয়ে জঙ্গলের ছাউনীর তাঁবুতেই আটকা পড়লেন। এক বড় আমের ঝাড়ের নীচে তাঁবু ফেলে সাহেব পায়ের ব্যবস্থায় ব্যস্ত হলেন কিন্তু কয়েক দিন পরেই খবর এলো যে কাছেই আবার বাঘে মানুষ নিয়েছে, সুতরাং ঠিক হলো অন্য বাঘ মানুষ খেকো, সেই বুড়ো বাঘটা নয়।

বড় গ্রামের কাছে, মোরান নদীর নিকটে, আম্রকুঞ্জে অত বড় শিকারি এসেছেন শুনে নানা গ্রামের লোক এসে বাঘের উৎপাতের কথা জানাতে লাগলো। বাঘের আকার-প্রকার তার মানুষ ধরার কায়দা, এইসব নিয়ে নানা বিশদ বর্ণনা কনসারভেটার সাহেবকে শোনানো হোলো, দিনের পর দিন। বাঘ নাকি প্রকাণ্ড বড়, তার মানুষ খেয়ে পেট মোটা হয়ে মাটিতে ঠেকে গিয়েছে। তার মাথায় সাদা চাঁদের মতো দাগ। একজন বললে যে একবার নাকি একদল যাত্রীকে সে বনের ধারে দাঁড় করিয়ে প্রথমে নিজে বালিতে গড়িয়ে খিদেটা চন্‌চনে করে নিল, তার পর যাত্রীদের সব কয়জনকে দেখে সবচেয়ে মোটা যে ছিলো তাকে ধরে নিয়ে যায়। এই নাকি তার কায়দা। কেউ বললে বাঘ যাদু জানে। মন্ত্রবলে কাঠুরে সেজে সে বনেজঙ্গলে ডাকাডাকি করে, শিস দিয়ে, অন্য কাঠুরেকে ডেকে তারপর বাঘ হয়ে তাকে ধরে। আবার কেউ বললে যে ও শেষ যাকে খেয়েছে তার ভূত ওর মাথায় বসে ওকে বিপদ আপদ থেকে বাঁচায় এবং কোথায়, কোন পথে, এবং কখন, ওর পরের শিকারে যে পথিক, তাকে পাওয়া যাবে এসব বার্তা দিয়ে দেয়।

স্থানীয় ছোটবড় জমীদার, দিশি শিকারি এবং বহু লোকজন, রোজ এসে ভীড় করে সাহেবকে ঐ দুরন্ত বাঘ মেরে তাদের উদ্ধার করার আবেদন জানাতে লাগলো। এক গরীব স্ত্রীলোক এসে কান্নাকাটি করে জানালে যে সে তার কোলের শিশুকে মাটিতে বসিয়ে কুয়োর জল তুলছিল, বাঘটা তখন হঠাৎ এসে তার বাচ্ছাকে নিয়ে যায়। সকলেই জানালে যে তারা সকল রকমে সাহেবকে

বাঘ মারতে সাহায্য করতে প্রস্তুত। কিন্তু তারা সকলেই এমন ভয়ত্রস্ত যে তাদের দ্বারা কোনও সাহায্যই সম্ভব ছিল না।

গাঁয়ের লোক দরজা জানালা বন্ধ করে বড় বড় কাঠের আগড় দিয়ে আটকিয়ে ঘরের ভিতরে থাক্‌তো। পথে বা ক্ষেত-খামারে যেতে হলে, দলবেঁধে লাঠি-কুড়াল নিয়ে, ঢোলকাঁসী বাজিয়ে তবে তারা পথ চলতো। সেই তল্লাটের ছোট গ্রামগুলির লোকজন প্রায় সকলেই বড় গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিল বা দেশ ছেড়ে পালিয়েছিল। সারা দেশের বসতি উজাড় করে এনেছিল এই একটা হিংস্র মানুষ-খেকো। প্রথমে দুটো বাঘে উৎপাত আরম্ভ করেছিল, তার একটা, বোধহয় বাঘিনী—স্থানীয় শিকারিরা গুলি করে মারে বছর খানেক আগে, গ্রীষ্মকালে। কিন্তু এই শয়তানটাকে কিছুতেই শেষ করা যাচ্ছিল না।

খবর এলো যে ঐ বাঘ চারখেরা নামক গ্রামে মানুষ মেরেছে। সাহেব তখন খুঁড়িয়ে চলতে পারেন এবং হাতির হাওদায় ঠিকমত বন্দুক ধরে বসতে পারেন। ছাউনি তোলা হোলো এবং শিকারি হাতি, মালবওয়া হাতি, লোক-লস্কর নিয়ে সাহেব চল্‌লেন সেই গ্রামে। পথ চলার সময় সামনে ও পিছনে হাতির দল, এবং লোকজনের সারির দুপাশে বন্দুকধারি পুলিশ কয়জন, সাহেবের কয়জন বন্দুকধারী পিয়ন মার্চ করে চল্‌লো। লোকজনকে নিষেধ করা হোলো দলের সারি ছেড়ে আশে-পাশে ছুটকে যেতে।

পথের দুপাশে ঝোপ-ঝাড়ে ভরা টীক গাছের ঘন জঙ্গল। আবার একটা আঁকা-বাঁকা নালা, কখনো পথের একে-বারে পাশে, কখনো একই তফাতে চলেছে যার মধ্যে মাঝে মাঝে জলেভরা খাদ রয়েছে। মানুষ খেকো বাঘের পক্ষে এর চেয়ে ভাল এলাকা হতে পারে না। পথের ধারে স্থানে স্থানে টুকরা পাথরের ঢিপিতে বুঝাচ্ছে যে সেখানে একজন বাঘের মুখে প্রাণ দিয়েছে। পথের পাশে দুটো গ্রাম দেখা গেল, জনমানব শূন্য। সাহেব, শিকারি নিয়ে, নালায় নেমে দেখ্‌তে দেখ্‌তে চললেন এবং অনেক জায়গায় একটা বড় মর্দা বাঘের থাবার পুরাণো দাগ দেখলেন। স্থানীয় শিকারিরা জানালে যে সেগুলো ঐ মানুষখেকোরই পদচিহ্ন।

চারখেরায় দেখা গেল গ্রামের লোক বাঘের ভয়ে সবাই পালিয়েছে। গ্রামে ছায়ারও অভাব ছিল, কিন্তু বাঘের এলাকার কেন্দ্রস্থল বলে সাহেব গ্রামের কাছেই ছাউনি বসিয়ে হাতি পাঠালেন রসদপত্রের জন্য, কেননা সঙ্গে অনেক লোকজন, হাতি-ঘোড়া। সেই দিনই সন্ধ্যার মুখে একজন লোক খবর নিয়ে এলো যে, যে পথে সাহেব এসেছেন তার কাছেই, লে নামের গ্রামের পাশে, একদল পথিকের মাঝ থেকে একজনকে ঐ বাঘে নিয়েছে। যাত্রীরা না জেনে, নির্ভয়ে ঐ বনপথে চলেছিল।

পরের দিন খুব ভোরে দুটি হাতি নিয়ে সাহেব রওয়ানা হয়ে সকাল আটটার আগে অকুস্থলে পেঁাছালেন। জায়গাটায় একটা ছোট নালা পথ পার করে মোরান নদীর দিকে গিয়েছে। সেখানে সেই অভাগা যাত্রীর কাঁধের বাঁকে বাঁধা ঝুড়ি এবং তীর্থবারিভরা ছোট ঘড়া সবই পড়ে আছে, তার পাশে শুকানো রক্তের চাপ ধুলায় রয়েছে। তাকে যেদিকে টেনে ঐ নালায় নিয়ে গেছে তার দুপাশের ঝোপে তার কাপড়ের টুকরা লেগে রয়েছে। আরো কিছু দূরে এগিয়ে এক ঘন ঘাসের ঝোপে সেই গরীবের হাড়-গোড়, মাথা আর শরীরের কিছুটা দেখা গেল। বাঘটা ভয়ানক চতুর, তাই মানুষ মেরে একবারে যতটা সম্ভব খেয়ে নিতো। অন্য বাঘের মত দ্বিতীয় বার শিকারের কাছে আসা তার ছিল না। সুতরাং সেখানে তার জন্য অপেক্ষা বৃথা জেনে, সেইদিনই বাঘের খোঁজে তার পায়ের দাগ ধরে সাহেব ও তার শিকারির দল রওয়ানা হল।

"খোঁজ'কার—অর্থাৎ যারা বন্যপশুর পায়ের দাগ বা অন্য চিহ্ন ধরে অব্যর্থভাবে শিকারের খোঁজ দেয়—লোকেরা ভয়ে ভয়ে ও অতি সন্তর্পণে সেইখান থেকে মানুষখেকোর পায়ের দাগ ধরে এগোতে লাগলো। তারা চলছিল সাহেবের শিকারি হাতির প্রায় শুঁড়ের নীচে, উপরে রাইফেল বাগিয়ে ধরে সাহেব পাহারায় আছেন। নদীর পাড়ে ঐ পায়ের দাগ একটা বালির চড়ায় এগিয়ে জলের কাছে গেলো। সেখানে বাঘ জল খেয়ে নদীর পাড়ের নীচে বড় বড় পাথরে ভরা এক গর্তের দিকে যায়। সেই গর্তের মুখে পাথর ছুঁড়ে এবং পরে ছুঁচো বাজি ফেলে দেখা গেল যে একটা ঘেয়ো হুঁড়ার (হায়না) ছাড়া আর কিছু সেখানে নাই। তার আশে-পাশে সারাদিন খোঁজ করে বাঘের কোনও চিহ্ন না পাওয়ায় সন্ধ্যার মুখে সাহেব ছাউনির দিকে ফিরবার হুকুম দিলেন।

ফেরার পথে, যখন সন্ধ্যার অন্ধকার প্রায় ঘনিয়ে এসেছে, এবং ছাউনি মাইল দুই-তিন মাত্র তখন সাহেবের হাতির পিছনে যারা চলেছিল তাদের একজন চমকে দাঁড়ালো এবং সাহেবকে থামতে বললো তার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বাঘের পায়ের দাগ ধরা পড়েছে। কিছুক্ষণ দেখার পরই বুঝা গেল যে এই সেই বাঘ যার খোঁজে সারাদিন গিয়েছে। শুধু তাই নয় অভিজ্ঞ শিকারি এবং তার বন্যপশুর বিষয়ে দক্ষ অনুচরদের চোখে একথাও স্পষ্ট জাহির হোলো যে সময় সাহেবের দল পথ ছেড়ে নালায় নেমে সেই বাঘে ধরা লোকের সন্ধানে ফিরছিলেন, তার কিছু পরেই অন্যদিক দিয়ে এসে বাঘ সেইপথেই তার গন্তব্যস্থলে গিয়েছে। সাহেবের হাতির পায়ের দাগের উপরে তার প্রকাণ্ড চওড়া—প্রায় চৌকো থাবার চিহ্ন সে খবর অব্যর্থভাবে জানাচ্ছে। এদিকে সন্ধ্যা নেমে এলো কাজেই ছাউনিতে সবাই ফিরলো। মানুষ খেকো কাছাকাছিই আছে জানা ছিল, কেননা, ছাউনি থেকে মাইলখানেকের মধ্যে বাঘটা চলাপথ ছেড়ে পাশের নালায় নেমে গিয়েছে, তার পায়ের চিহ্নে একথা বুঝায়। সেইজন্য ছাউনির বাইরের দিকের তিন কোনে তিনটা হাতি বাঁধা হোলো এবং তাদের মাঝে আগুন জেলে রাখা হোলো।

পরের দিন অতি ভোরেই যেখানে বাঘ পথ ছেড়ে নালায় নেমে গিয়েছিল সেখানে থেকে নালায় নেমে, ঝোপঝাড় দাবড়ে হাতি নিয়ে বাঘের খোঁজ করা হোলো। কিন্তু বাঘ নালা ছেড়ে এক জায়গায় ঘন জঙ্গলে ঢুকেছে সেই পর্যন্ত তার চিহ্ন পরে আর কিছুই নাই। কিন্তু ওকে খুঁজে বেড়াতে হবে, কেননা মানুষ খেকো সাধারণ বাঘ নয়—যে রয়ে-সয়ে তার ঠিকানা পাওয়া যাবে, তার খোঁজ আরম্ভ হলে ভোর থেকে সন্ধ্যা এবং প্রয়োজন হলে দিবারাত্রী চালাতেই হবে। এই স্থির করে সাহেব তাঁবুতে ফিরে সকালের খাওয়ায় বসতে যাবেন এমন সময় একদল বাঞ্জারা—এরা যাযাবর জাতীয় একজাতের লোক, বেদে ইরাণী-দের মত, দেশে দেশে গরু, ভেড়া ইত্যাদি বেচে বেড়ায়—ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিলে যে তাদের একজন লোককে ঐ সকালেই গরুর পালের মাঝ থেকে বাঘে ধরে নিয়ে গেছে, যখন ওরা রাত-কাটাবার পর ছাউনি তুলে যাত্রারম্ভ করছে।

খাওয়া রইল। হাতির হাওদা খুলতে বারণ করে সঙ্গে কিছু খাবার ও পানীয় নিয়ে সাহেব সদলে রওয়ানা দিলেন দু-চার মিনিটের মধ্যে। লম্বা ঘাসে ভরা খানিক নীচু জমীর মাঝে একটা নালা, তারই ধারে লোকটি বাঘের কবলে গিয়েছে। সেখানে তাকে টেনে নিয়ে গেছে সেখানের ঘাস তখনও চাপে দলিত হয়ে আছে। কোনও খোঁজের দরকার

ছিল না, সেই ভীষণ ঘটনার সবকিছু স্পষ্টভাবে চোখে দেখা যাচ্ছিল। হিঁচড়ে টানার দাগ নালার খাড়া পাড়ের পাশ দিয়েই চলেছিল। কিছু দূরে খুব উঁচু ঘাসের বন দেখা দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সাহেবের বড় মাকনা হাতি সরযূপ্রসাদ, জোরে পা ঠুকে শুঁড় তুলে জোরে ডেকে উঠল। সেই বৃংহিত নিনাদের সঙ্গে সঙ্গেই ঘাসের ঝোপ নড়ে উঠলো। হাতিকে জোরে চালিয়ে খানিক এগিয়ে যেতেই সেই বাঞ্জারার খানিক খাওয়া বীভৎস লাশ দেখা গেল। সেটা ডিঙ্গিয়ে আরো এগোতেই দেখা গেল একটা লম্বা হলদে রংয়ের জানোয়ার লাফিয়ে নালায় নেমে গেল। এতো ঘন ঘাসের ঝোপ যে গুলি করার মত দেখা গেলো না।

হাতিকে নীচের নালায় নামাতে সময় লাগলো। কিন্তু নালার বালি মাটিতে বাঘের থাবার দাগ সুস্পষ্ট এবং বোঝা গেল যে সে ছুটে পালাচ্ছে। মাইল খানিক নালায় যাবার পর বাঘ আবার ঘাসের বনে উঠে পড়ল। কিন্তু এখানের ঘাস ছোট এবং হাতির হাওদা থেকেই বাঘের চলার নিশানা পাওয়া যায় কাজেই সমানে হাতি চালিয়ে তাড়া দেওয়া চললো। আরো খানিক যাবার পর জমীটা পাথুরে ও খুব অসমান হওয়ায় বাঘের পিছু নেওয়া একটু আস্তে আস্তে করতে হোলো, কেননা তার পায়ের দাগ অত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। বুঝা গেল যে বাঘের যথেষ্ট দম আছে এবং তাকে তাড়িয়ে অনেক দূর যেতে হবে। সেইজন্য আরো খোজকার লোকের জন্য খবর পাঠানো হোলো এবং হুকুম দেওয়া হোলো যে গঞ্জাল নদীর ধারের একটা গ্রামে যেন সাহেবের জন্য একটা ছোট তাঁবু পাঠানো হয় কেননা বাঘটা সেই-দিকেই চলেছে মনে হোলো।

সারাদিন সেই পাথুরে ভাঙ্গা জমীর পথে বাঘের থাবার চিহ্ন ধরে তাড়া দেওয়া চললো কিন্তু বাঘের দেখা পাওয়া গেল না। সঙ্গের দিশি শিকারির দল অব্যর্থ চোখে বাঘের নিশানা দেখে এগিয়ে চললো। সন্ধ্যার মুখে নদীর মাইল খানেকের মধ্যে এক ঘন কাঁটার বনে পৌঁছানো গেল। ঐ সময়ে ঐ রকম ঝোপ ঝাড়ের ভিতর মানুষখেকো বাঘের খোঁজ করা অসম্ভব, কাজেই সেখানেই সেদিন-কার মত ক্ষ্যান্ত দিতে হোলো।

কাছের একটা গ্রামে রাত কাটিয়ে, পরদিন অতি ভোরে সাহেবের দলবল আবার সেই তাড়া আরম্ভ করলে। একটু গিয়েই নদীর বুকে বালির উপর বাঘের পায়ের দাগ দেখা গেল এবং আরও কিছু-দূরে যাবার পর স্থানীয় শিকারিরা ভাদ-গাঁওর কাছে বাঘ থাকার মত জঙ্গল আছে বলায় সাহেব সেখানে তাঁবু পাঠাবার খবর দিয়ে লোক রওয়ানা করে সমানে বাঘের পিছনে চললেন। নদীর বালিতে আরও অন্য বাঘের পায়ের ছাপ দেখা গেল, কিন্তু ঐ মানুষখেকোর চৌকো থাবা সেগুলোর চাইতে অনেক বড় এবং বালির ছাপে স্পষ্ট দেখা গেলো যে তার পিছনের এক পায়ের থাবার একটা আঙ্গুল যেন ঘসে চলেছে। ওখানের লোকেরা একবাক্যে বললে যে, কয়মাস আগে এক স্থানীয় শিকারির পুরাণো "ম্যাচ-লক" (পলতে দেওয়া) গাদা বন্দুকেরগুলি ঐ পায়ের থাবায় লাগার পর থেকে বাঘটা ঐ রকম একটু পা টেনে চলে। সুতরাং কোনও সন্দেহ আর রইলো না যে সাহেবের দল সেই মানুষখেকোকেই তাড়িয়ে চলেছে এবং সেইজন্য ঠিক হোলো যে তাকে আর রেহাই দেওয়া নয়, শিকারির দলের সামর্থ থাকতে।

বাঘের নিশানা ধরে আরো এগিয়ে একটু ঘন জঙ্গলের কাছে শিকারির দল পেঁছাল। ঝোপ-ঝাড় এবং জাম ও ঝাউ গাছের বন, তার খানিকটা নদীর পাড়ের উপরে খানিকটা নদীর বুকে নেমে গিয়েছে। বাঘটাকে আগের দিন অবিশ্রাম তাড়িয়ে আনা হয়েছে, কাজেই শিকারিরা আন্দাজ করলে যে এইদিন, জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুরের প্রচণ্ড রোদের সময়, সে ঐ জঙ্গলেই লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করবে তারা বললে যে এর পর বহু দূর পর্যন্ত আর কোনও স্থান নেই যেখানে বাঘ গাছের ছায়া এবং পিপাসার জল পেতে পারে। এবং সেই জঙ্গলের চারিদিক ঘুরে ভাল করে দেখা গেল যে বাঘের বেরিয়ে যাওয়ার মত পায়ের ছাপ বা অন্য নিশানা কিছুই নাই। বাঘ ঘেরার মধ্যে পড়েছে এটা স্থির জেনে তখন সকলে চললো গাঁয়ে, খেয়েদেয়ে তাজা হয়ে নেবার জন্য। ঠিক হোলো যে দুপুরে, প্রচণ্ড রোদের সময়, বাঘকে দাবড়ে বার করে তারসঙ্গে মোকাবিলা করা হবে।

বেলা এগারটা আন্দাজ, যখন বাতাসে ক্রমে আগুনের হলকা ছুটছে, শিকারির দল অতি সন্তর্পণে জঙ্গলে ঢুকলো। নদীর বুকে, যেখানে জঙ্গল খুবই ঘন এবং অসংখ্য ছোট বড় খানা-খন্দ-নালায় জমীটা ভরা, সেখানেই বাঘ রয়েছে জানা গেল। চারিদিকে বড় গাছে লোক উঠিয়ে বাঘ আটকাবার "স্টপ" বসানো হোলো এবং নদীর পাড়ের উপর দিকে উঠ্‌বার যেটা একমাত্র সহজ পথ সেখানে একটা হাতি ও শিকারি দাঁড়

করানো হোলো। তারপর আরম্ভ হোলো "হাঁকা" এবং তাতে সবার আগে চললো সরযূপ্রসাদ হাতি, তার হাওদায় দোনলা ভারী রাইফেল হাতে সজাগদৃষ্টিতে তাকিয়ে স্বয়ং সাহেব এবং তাঁর সঙ্গে "খোজকার"দের মধ্যে সকলের চাইতে সাহসী ও তীক্ষ্ণদৃষ্টি এক হিন্দুস্থানি কায়েতের সন্তান, যাকে সবাই "লালা" বলে ডাকতো।

সরযূপ্রসাদ ধীরে ধীরে, কিন্তু সমানে, জঙ্গলের কেন্দ্র লক্ষ্য করে, ঝোপ-ঝাড় ভেঙ্গে এগোতে লাগলো। ঝাঁকে ঝাঁকে ময়ূর উড়ে বেরোলো, কিছু খরগোস ও অন্য ছোট জানোয়ারও ছুটে বেরিয়ে গেলো। জঙ্গলের মাঝখানটা খুবই ঘন এবং গাছের শিকড় ও ডালে ছাওয়া গভীর খানাখন্দে ভর্তি। তার কাছে এসে হাতি থেমে গেল এবং পরে জোরে মাটিতে পা ঠুকতে এবং শুঁড়ের ভিতরে আস্তে আস্তে কাঁপানো গুণগুণে শব্দ করতে লাগলো—যার মানে কাছেই বাঘ!

সবাইতো দূরু দূরু বুকে, উদগ্রীব হয়ে চতুর্দিকে দেখতে লাগলো। খানিক পরে হাতির মাহুত, যে সামনে ও কিছু নীচে হাতির ঘাড়ে বসেছিল—একটা জাম গাছের তলা দেখিয়ে বললে যে বাঘটা সেখানে শুয়ে। সাহেবের ইঙ্গিতে লালা সেখানে একটা বড় পাথরের টুকরা ছুঁড়ে ফেলতেই বাঘ গাঁক করে গর্জে, লাফ মেরে ঝোপ ভেদ করে পালাবার চেষ্টা করল। সাহেবের রাইফেলের দুইনলই গর্জে উঠলো, গুলী লাগার শব্দও শোনা গেল, বাঘ কিন্তু থামলো না, পালাবার চেষ্টায় নদীর পাড়ের উপর ওঠার পথ নিল। সে পথ হাতি ও শিকারি দিয়ে আটকানো দেখে বাঘ, ভীষণ গর্জন করে, সাহেবের হাতি লক্ষ্য করে তেড়ে এগিয়ে এলো। গাছ-পালা ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে তাকে ঠিক মত দেখা যাচ্ছিল না, সেজন্য সে যখন মাত্র কুড়ি পঁচিশ গজ দূরে তখন সাহেব রাইফেল চালালেন। এবারের গুলীতে বাঘ, একটা খানায় পড়ে গেল। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে উঠে সে আবার হাতির দিকে তেড়ে এলো, কিন্তু অতটা জোরে নয়। সাহেব তাকে তাক করে শেষ মার দেবার জন্য রাইফেল তুলেছেন এমন সময় হাতিটা বোঁ করে ঘুরে গেল। সাহেবের মুখ ও বন্দুকের মুখ বিপরীত দিকে ফিরে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে পিছনদিকে আঁচড়, কামড়ের শব্দ ও হাতির পাগলের মত গাঝাড়া ও লাফ্-ঝাঁপে বোঝা গেল যে সাহেবের এক অতি ভয়ানক সহযাত্রী জুটেছে হাতির উপরে।

হাতির বিষম গাঝাড়া দেওয়া ও লাফঝাঁপের চোটে সাহেব কোনও ক্রমে হাওদা ধরে নিজেকে পড়ে যাওয়া থেকে বাঁচাচ্ছেন, বাঘকে গুলী করার কথা তখন দূরে। সরযূপ্রসাদ শিকারি হাতি, কিছুক্ষণ পরে গা ঝেড়ে বাঘকে ফেলতে না পারায় সে অন্য ব্যবস্থা করার চিন্তায় একটু সোজা হয়ে দাঁড়ালো। সাহেবও সেই মুহূর্তে ঘুরে রাইফেলের মুখ প্রায় বাঘের মাথায় ঠেকিয়ে গুলী চালিয়ে তার খুলি ছাতু করে দিলেন। বাঘ আলুর বস্তার মত ধপাস্ করে পড়ে গেল। তখন সাহেবের খেয়াল হোলো যে যত নষ্টের গোড়া হোলো সরযূ-প্রসাদের মাহুত—লোকটা ছিল আফিং-খোর—এবং সেইই হাতি নিয়ে পালাবার চেষ্টায় হাতি ঘুরিয়েছে এবং তখনও চেষ্টা করছে তাকে জঙ্গল থেকে বার করার জন্য। সাহেব তাকে ধমকে, শেষে রাইফেলের কুঁদো দিয়ে ঘা'কতক দিতে তার নেশা ছুটে চৈতন্য হোল। তখন হাতি ঘুরে বাঘের দিকে ফিরে আবার তার দেহটা থেঁৎলাবার জন্য নাচানাচি আরম্ভ করল। সরযূপ্রসাদের শিকারি হাতি হিসাবে একটু দোষ ছিল—সেটা সাহসের অভাব নয়, বরঞ্চ আতিশয্য। তাকে সোজা রাখার জন্য সামনে মাহুত ও পিছনে লেজের কাছে লাঠি হাতে এক হাতির সহিস লাগতো। আফিংয়ের ঝোঁকে মাহুত যখন হঠাৎ হাতিকে ঘুরোয় তখন ঐ সহিস টাল সামলাতে না পেরে নীচে পড়ে গিয়েছিল—প্রায় বাঘের মুখে। বাঘ তখন উন্মত্ত হয়ে হাতির উপর উঠে, হাতিকে এবং শিকারিকে ঘায়েল করতে চায়, সুতরাং সহিসের দিকে তাকায়নি। সহিস ছোকরাও ছুটে পালিয়ে অন্য হাতির কাছে আশ্রয় নেয়।

বাঘটার আঁচড় কামড়ে সরযূ-প্রসাদের পিছন দিক ক্ষত-বিক্ষত হয়, কিন্তু তার সাহস অটুট রয়ে যায়। ঐ শিকারের কয়দিন পরে আবার বাঘ শিকারে সে সমানে এগিয়ে গিয়ে স্থির-ভাবে আহত বাঘের সামনে দাঁড়ায়।

মানুষ খেকো বাঘটা পুরো দশ ফুট লম্বা এবং পূর্ণ শক্তিশালী ছিল। তার নখ দাঁত সবই ছিল ঠিক এবং দেহের গঠনও ছিল প্রচন্ড শক্তির পরিচায়ক। গল্পের মানুষ খেকো বাঘের মত 'গলিত দন্তনখর' বা জরাগ্রস্ত তো সে ছিলই না, আবার স্থানীয় লোকের বর্ণনা মত তার মাটি-ছোঁয়া ভুঁড়ি বা মাথায় চাঁদের মত সাদা দাগ এ সবও ছিল না। মানুষ-খেকো বাঘের বর্ণনায় এই সব আজগুবি কথা ঐ অঞ্চলে চলিত আছে, কাজেই এই বাঘের বেলায়ও ঠিক ঐ রকম বর্ণনাই হয়েছিল।

বাঘ মারার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ অঞ্চলে বাঘে মানুষ নেওয়া বন্ধ হয়ে গেল। কিছুদিন পরে যখন নিশ্চিতভাবে জানা গেল যে আসল মানুষ খেকোই শেষ হয়েছে তখন সাহেবের শিকারের সফরও শেষ হোলো।

১। মাকনা হাতি—মদ্দা হাতি কিন্তু দাঁতেল নয়। অর্থাৎ জন্ম থেকেই সে গজদন্তহীন। কারণ যাই হোক, এরকম পুরুষ হাতি অসম্ভব শক্তিশালী ও চালাক হয় বলে খ্যাতি আছে। বোধহয় পুরুষ হাতির প্রধান অস্ত্র যে শাবলের মত দুই দাঁত, তার অভাব মেটাবার জন্যই প্রকৃতি-দেবীর এই ব্যবস্থা। অভিজ্ঞ মাহুতেরা বলে যে, হাতির বাচ্চার ঐ দাঁত বেরোলে খোঁচা লাগে বলে তার মা দুধ খেতে দেয় না। মাকনা বাচ্চার দাঁত না থাকায় সে মায়ের দুধও অনেক দিন পায় এবং মায়ের যত্নও পায় বেশী, সেই জন্য তার গায়ের জোর ও বুদ্ধির জোর দুই-ই বাড়ে।

২। Match lock পুরণো ধরণের গাদা বন্দুক। এর ঘোড়ার মুখে পলতে থাকতো এবং তাতে আগুন ধরিয়ে বন্দুক চালাতে হতো। ঘোড়া টিপলে তার পলতে বন্দুক ধাগতো।

বিদ্যে ছুঁয়ে তিনসত্যি করেছে অপর্ণা। তার জীবনে যদি কোনদিন সে আর আবির ছোঁয় তাহলে......তাহলে যে কি তা সে স্পষ্ট করে বলেনি, একটা ভয়ংকর রকমের কিছু, যা বলা দূরে থাক ভাবতেও পারছিলনা সে। ছি—ছি—ছি একথা বলতে পারলেন জ্যেঠিমা, যে জ্যেঠিমাকে মার

চেয়ে ভালবেসে ভক্তি করে এসেছে অপর্ণা।

অরুণদা ত বরাবর আসেই —পিসীমার দেওরের ছেলে অরুণদা। সেই একরত্তি বেলা থেকে দেখে আসছে। দোলের দিন প্রতি বছরই ত আসে, রং নিয়ে ফাগ নিয়ে প্রতি বছর যা হয় গতবার তাই ত হয়েছিল—অর্থাৎ সেও অরুণদাকে ফাগে রং-এ চুপিয়ে দিয়েছে—অরুণদাও দিয়েছে। এর মধ্যে দোষটা কোথায়, কিন্তু গতবারে এই নিয়ে যাকে বলে একেবারে যাচ্ছেতাই—তাই করলেন। —"মেয়ে যত বড় হচ্ছেন তত ধিঙ্গি হচ্ছেন—লজ্জা করেনা এরকম বেলেল্লাপনা করতে।' কিন্তু গতবারের চেয়ে অন্যবারের তফাৎটা কোথায়, কি অন্যায় করেছিল সে! সেই অরুণদাই ত এসেছিল—সেই-রকমইত রং নিয়ে ফাগ নিয়ে হুল্লোড়—যা সব বছরেই হয়ে থাকে। মানে, দোলের দিন রঙ খেলতে গেলে একটু হাতে হাতে বা গায়ে গায়ে ঠেকবেই......মানে, মুখে জোর করে ফাগ দিতে গেলে তাকে ত কোমরটা ধরে একটু কাছে টানতেই হবে—তা নয়ত ফাগ মাখাতে গেলে দুনিয়ায় কে কবে মুখটা বাড়িয়ে দেয়, তাছাড়া এইত কয়েক বছর আগে সব ভাইবোনেরা মিলে অরুণদাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে বুকের উপর পড়ে রং মাখিয়েছে জ্যেঠিমার সে সব কথা মনে হল না। তার বদলে তিনি মাকে যেসব কথা বলেছেন—এবং না রাত্তিরে তাকে যা সব বলেছেন, সে সব কথা মুখে আনা যায় না, জানিনা আবার এসব কথা অরুণদার বাড়ী পর্যন্ত গিয়েছে কিনা, তাহলে ত অপর্ণাকে বিষ খেতে হবে।

অরুণদা নাকি তার মুখে, বিশেষ করে সিঁথিতে ঘসে ঘসে ফাগ মাখিয়েছিল......যত সব বাজে কথা, আর যদি বাজে নাই হয়, বেশ করেছে তাতে ক্ষতি কি, তার মানে কি...যাকগে ওকথা। তার নিজের দুহাতে ফাগ ছিল, অরুণদা তার হাত থেকে ফাগ ফেলে দেবার জন্য টানতে সে হুড়মুড় করে তার বুকের মধ্যে গিয়ে পড়েছিল...আচ্ছা, হাতটা ওরকম করে টানলে লোকে আপনিই ত গিয়ে পড়বে জ্যেঠিমার হাতটা ধরে কেউ টানুকনা—দেখি তিনি কি করে দাঁড়িয়ে থাকেন। এর মানে বুঝি......ছি—ছি জ্যেঠিমার এরকম মনোবৃত্তি, একটা তুচ্ছ সামান্য ব্যাপার এইরকম ব্যাকা করে দেখলে তার গলায় দড়ী দেওয়া ছাড়া গতি কি! তারপর ও কেন জানিনা অরুণদাকে ঢিপ করে একটা প্রণাম করে ফেলেছিল, আর অরুণদাও......না, জ্যেঠিমা নিশ্চয়ই দেখতে পাননি, আন্দাজ করে বানিয়ে বানিয়ে বলেছেন। কেন—ওর প্রণাম করাটা তার চোখে পড়ল না......কেন—এর আগে উনিই ত বিজয়ায় অরুণদাকে প্রণাম না করার জন্য কত বকেছেন; তাছাড়া অরুণদা যেন কি! দোলের দিন, একবাড়ী লোক থৈ থৈ করছে...বেশত প্রণামই না হয় করেছিলুম কিন্তু তাই বলে...... যাকগে, যা হবার তা ত হয়েই গেছে, এবার বিদ্যে ছুঁয়ে তিনসত্যি করেছে অপর্ণা যদি জীবনে আর কোনদিন সে আবির ছোঁয় তাহলে........সেই ভয়ঙ্কর অনুচ্চারিত অকল্পিত শপথবাক্য!

দোলের দিন ভোরে উঠে ঘটা করে স্নান করতে গেল অপর্ণা। ছোট ভাইবোনেরা এসে বলল—"এই দিদি রং গুলোব না ...খুনখারাপী, বড় কড়া রং রে। কাপড় ছিঁড়ে যাবে তবু রং উঠবে না।" ঠিক ওর কোলের ভাই মন্টু বললে "আমি এসব বাজে ব্যাপারে নেই—আমি বিকেলে রং

খেলব—ড্যানিসিং রং—কাপড় জামা শুখিয়ে যাবে—ব্যস, আর সব উঠে যাবে। বলত তোকে দিতে পারি।"

অপর্ণা কারো সংগে কথা না বলে তোয়ালে সাবান নিয়ে কলঘরে চলে গেল। অনেকক্ষণ ধরে ভাল করে সাবান মেখে চান করলে—যেন রংএর যেটুকু কথা তার কানে এসেছে—তাতেই তার গায়ে রং লেগেছে। চান করে চুল খুলে ধবধবে সাদা জমির একটা শাড়ী পরে দোলের বিরুদ্ধে মূর্তিমতী প্রতিবাদের মত কলঘর থেকে বেরিয়ে এলো অপর্ণা। এমনি দোলের দিন সাদা জমির শাড়ী পরতেন ছোট বেলার মিশনারী স্কুলের হেনাদি—হেনাদি খৃষ্টান ছিলেন; একবার তাঁর বাসায় দল করে গিয়ে কি বিচ্ছিরি ব্যাপার। যাকগে সেকথা,—কই জ্যেঠিমা কোথায় গেলেন—এবার একবার দেখুন—এবার ত সে দোতলায় সোজা নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেবে—তারপর কার সাধ্য তাকে সে খিল খোলায়।

অপর্ণা জানে এই সময়টা জ্যেঠিমা পুজোর ঘরে থাকেন। তাঁকে দেখাতে গেলে তাকে পুজোর ঘরের সামনে দিয়ে যেতে হয়—কিন্তু মুস্কিল! জ্যেঠিমা যদি চোখ বুজিয়ে থাকেন। অপর্ণা পা ঠুকে ঠুকে এগিয়ে গেল—জ্যেঠিমা চোখ চেয়েই ছিলেন, বললেন—"ছি অপি, মেয়েমানুষ চলবে, তার পায়ের শব্দ হবে কি রে! ওঃ তোর চান হয়ে গেছে দেখছি, আয় ভেতরে আয় গোবিন্দর পায়ে দুটি ফাগ দিয়ে যা।"

অপর্ণা যেভাবে জ্যোঠিমার মুখের দিকে চাইলে তাতে সত্যিকারের অপর্ণা হলে তিনি তক্ষুণি ভস্ম হয়ে যেতেন। অপর্ণা তেমনি পায়ের শব্দ করতে করতে ঘরে গিয়ে সশব্দে দরজায় খিল লাগিয়ে দিলে। নাও হল ত—অপি আর বেলেল্লাপনা করবে না—তোমরা সবাই নিশ্চিন্ত ত। জ্যোঠিমার গলা শুনতে পেলে অপর্ণা—তিনি বলছেন,—"দেখলে মেয়ের কান্ড, গোবিন্দর পায়ে দুটি ফাগ দিতে বললুম—মেয়ে তেজ দেখিয়ে মটমট করে চলে গেলেন। ঠাকুরপোকে কত করে বললুম আর লেখাপড়ার কাজ নেই—ওই ইস্কুল ফাইনেলেই ভাল—এবার ওর বিয়ের চেষ্টা কর—না কলেজে পড়ুক—এবার কলেজে পড়ার ঠেলা সামলাও—এখন সব দেখবার আগে যেন চোখ বুজতে পারি।'

অপর্ণা ভাবলে—ও'র চোখ যদি দিনরাত্তির ঘুর ঘুর করে আর পেছনে

ঘোরে তাহলে তা বোজাই ভাল। ভেবেই ওর মনটা খারাপ হয়ে গেল—না—না— এসব বিচ্ছিরি কথা তার মনে এলো কেন। ঠক করে কপালে হাত ঠেকিয়ে গোবিন্দকে মনে মনে প্রণাম করে বললে—ঠাকুর দোষ নিওনা জ্যেঠিমাকে ভাল রেখো।'

ঘরের জানালাগুলো ভাল করে খুলে দিলে অপর্ণা। দক্ষিণের জানলা দিয়ে চৈত্রের খরা বাতাস এসে মুখে লাগল। রং ছোবেনা বলেছে—কিন্তু দেখবেনা এমন প্রতিজ্ঞা ত করেনি। কিছু দূরে পার্কের দুটো কৃষ্ণচূড়া গাছ লালে লাল হয়ে যেন দুজনে দুজনকে রং মাখাচ্ছে আর কেসিয়ার মোমের মত ফুলের গোলাপী ছড়াগুলো যেন মজা দেখে মাথা দোলাচ্ছে। নীচের রাস্তায় তখন ছেলে-মেয়েরা রং নিয়ে মেতে উঠেছে। নন্টে, রীণা এরাও বালতি আর পিচকিরী নিয়ে দৌড়াচ্ছে—এর মধ্যেই সব ভূত হয়ে গেছে। মাত্র কবছর আগে সেও ওদের মত দৌড়েছিল। তারপর শাড়ী পরার পর থেকে মা জ্যেঠিমা সব বন্ধ করে দিয়েছেন। কিন্তু বাইরে না গেলেও বাড়ীর মধ্যেই বা কি কম। প্রথমেই ঠাকুরের, তারপর কোনরকমে বাবা, কাকা, মা ও জ্যেঠিমার পায়ে দুটি দুটি ফাগ ছুঁইয়েই বাস্! তারপরই বেলা একটা দুটো পর্যন্ত হুড়যুদ্ধ! স্কুলের, কলেজের মেয়েরা সব দলবেঁধে আসত। তাছাড়া......নাঃ অরুণদা ত এখনো এলোনা। অন্যবারে ত এর মধ্যে এসে যায়। সেই না হয় এবার দোল খেলবে না —কিন্তু মন্টু নন্টু রীণা এরাত রয়েছে— ওদের যেন সাধ যায় না! জ্যেঠিমার কথা কেন যে রাগ করে অরুণদাকে বলতে গেল, তারপর থেকে অরুণদা এ বাড়ীতে আসাই কমিয়ে দিয়েছে। কেমন যেন চোরের মত আসে আর অল্প কিছুক্ষণ থেকে চলে যায়। পড়াশুনার দু একটা টুকিটাকি কথা ছাড়া তার সঙ্গে কথাই বলে না আজকাল। আজ যদি অরুণদা না আসে— তাহলে জ্যেঠিমা মা এরা সব বুঝতে পারবে। ঠিক বুঝবে, অপি সব বলে দিয়েছে—তার মানে বাইরের ছেলেটা অপির কাছে মা জ্যেঠিমার চেয়ে বেশী আপন হয়েছে—না অরুণদাটা যেন কি!

অপর্ণা আবার জানলার কাছে এসে দাঁড়াল। বাড়ীর মধ্যে যাবার পথটা ঠিক জানলার নীচেই। নিশ্চয়ই অরুণদা আসবে আর উপরের জানালার দিকে একবার চাইবেই। চুলে সাবান দিয়েছে অপর্ণা— চৈত্রের হাওয়ায় [illegible] এলোচুলে শুকিয়ে মুখের উপর উড়ে উড়ে পড়ছে। এমনিই ওর চোখদুটো বড়—তাতে হালকা করে কাজল দিয়েছে— যেন একটি বিষণ্ণ বেদনার প্রতিমূর্তি। অরুণদা দেখুক! দেখুক তার আজকের কৃচ্ছ্রসাধনার মধ্যে তার মনের আর্তি।

নীচে থেকে বাবার গলা পেলে অপর্ণা, তিনি বলছেন—"কইরে অপিকে দেখছি না—অপি কোথায়।" জ্যেঠিমা ঝঙ্কার দিলেন—"কোথায় আবার রাজকন্যে তেজ দেখিয়ে ঘরে ঢুকে খিল দিয়েছেন। এই তোমায় বলে রাখছি ঠাকুরপো ও মেয়ের কপালে যদি অশেষ দুর্গতি না থাকে তাহলে আমার নাম বদলে রেখো।" বাবার গলা শুনে তাঁকে খুব বিচলিত হয়েছেন বলে মনে হল না. বললেন—"অসুখ টসুখ করেনি ত।"

এর মধ্যে ছোট ভাই বোনরা পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কয়েকবার এসে দরজায় ধাক্কা দিয়ে গেছে।—"এই দিদি, কি হচ্ছে বাইরে আয়।" কিন্তু অপর্ণা বাইরে ত আসেই নি—দোরও খোলেনি। তাদেরও আজকের দিনে দিদির অভিমান ভাঙবার মত বাজে কাজে অপব্যয় করবার মত অপর্যাপ্ত সময় হাতে নেই —তাই সকলেই চলে গেছে আর আসেনি। বেলা বাড়তে তার কলেজের বন্ধুরা এসে দরজায় ধাক্কাধাক্কি করল— ফাগে রং এ তাদের প্রায় চেনা যাচ্ছে না— মাথার উপর অভ্রকুচি চিকচিক করছে— "এই অপি বেরিয়ে আয় কি ছেলে-মানুষী হচ্ছে। এখান থেকে অমিয়াদির ওখানে যেতে হবে—তারপর সুমিত্রার ওখানে।" উল্লাসে পাখীর মত কলমুখর। অপর্ণার পক্ষে ত দোর খোলা অসম্ভব— বললে "আমায় মাপ কর ভাই— আমার শরীর খুব খারাপ।"

—"যা যত সব বাজে কথা'—দেখ বেরো বলছি নইলে ভাল হবে না"। অপর্ণার সমস্ত সত্ত্বা যাই যাই করছে— ওই আবির অভ্র আর ছোপ ছোপ নানা রংএর আধভেজা শাড়ীগুলো তাকে ভীষণভাবে টানছে, কিন্তু না-না অপর্ণা

শপথ করেছে বিদ্যে ছুঁয়ে, যাকে বলে তিন সত্যি—সামনেই পরীক্ষা এ শপথ ভাঙবে কি করে। তাছাড়া অরুণদা—অরুণদা যদি এর মধ্যে এসে পড়ে। ওরা আরো দু একবার অনুরোধ করলে—কিন্তু গোষ্ঠির মধ্যে একজন কতটুকু খানিকটা শাসিয়ে চলে গেল।

কিন্তু অরুণদার ত কোন পাত্তাই নেই—একটা বিচ্ছিরি কান্ড না ঘটিয়ে ছাড়বে না।

অপর্ণা 'সঞ্চয়িতা' নিয়ে আবৃত্তি করতে আরম্ভ করল—

"... ... ...
আয়রে ঝঞ্ঝা পরাণ বধূর
আবরণরাশি করিয়া দে দূর
করি লুণ্ঠন অবগুণ্ঠন বসন খোল
দে দোল দোল..........

দূর ভাল লাগছে না। তার চেয়ে অরুণদাকে একটা চিঠি লিখলে কেমন হয়! অরুণদা যখন জানালার নীচে দিয়ে যাবেন তখন টুপ করে ফেলে দেবে। কিন্তু ফেলাও বেশ শক্ত। মনে কর কাগজটা নীচে পড়বার আগেই অরুণদা এগিয়ে গেলো—দেখতে পেল না, তারপর বাবা বা কাকার হাতে পড়লে ত সব খতম! না, লোকে ত বিমান থেকে বন্যা এলাকায় আটার বস্তা ফেলে আর সে দোতলা থেকে একটুকরো কাগজ ঠিক করে ফেলতে পারবে না। আচ্ছা, দেখিই না। ওই ত ভোলা আসছে বাজার নিয়ে রংএ ভূত হয়ে—ওই ভোলার গায়েই ছোটবেলা কত রং দিয়েছে সে। অপর্ণা তাড়াতাড়ি একটা কাগজ দলা পাকিয়ে জানালার কাছে এসে দাঁড়াল—তারপর ভোলা আসতেই টুপ করে ফেলে দিলে। আশ্চর্য্য! পড়বি ত পড় একেবারে ভোলার টাকের উপর। ভোলা উপর দিকে চেয়ে হাসল—ওর সারা মুখখানায় কারা কালো রং মাখিয়ে দিয়েছে—শুধু দাঁত আর চোখের ভেতরটা সাদা হাসতেই ওকে হনুমানের মত মনে হল। অপর্ণাও হেসে ফেললে—কিন্তু তারপরেই মুখের সবটা থমথমে করে গুছিয়ে নিলে। ছিঃ—তার না শোক চলছে, হাসি এলো কি করে। যাকগে ও রিস্ক্ নেবে না। অরুণদাকে জানিয়েই ফেলবে।

বালিশ বুকে নিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে চিঠি লিখতে আরম্ভ করল। কিন্তু কি লিখবে। কতকগুলো কাগজ অযথা নষ্ট করলে। তারপর লিখলে—অরুণদা মনে পড়ে আমার গত বছরের জীবনের প্রথম দোল? কী অক্ষয় সুধায় না ভরিয়ে দিয়েছিল!—আমি তারি স্মৃতি নিয়ে আমার জীবনের বাকী দোলগুলো কাটিয়ে দেবো—তুমি দুঃখ কোরোনা অরুণদা......' বড় ভাল লিখেছে অপর্ণা পড়তে গিয়ে কান্নায় নিজের গলা বুজে আসছে।

হটাং চমকে উঠল অপর্ণা। অরুণদার গলা না! মন্টু, নন্টে রীণা সবাই চেঁচাচ্ছে। মা যেন একবার বললেন—'তুই যে এত বেলা করে এলি অরুণ......" অরুণদার গলাই শুধু পাচ্ছিনা। আহাম্মুখী করে কেন এখন চিঠি লিখতে বসল। জানালায় আর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে চোখাচোখি ত হতই।

কিন্তু অরুণদা কি ওকে খুঁজছে না?—নিশ্চয়ই খুঁজছে। হয়ত রীণাকে টফির ঘুষ দিয়ে এ বাড়ীর আবহাওয়া জেনে নিচ্ছে। একটু কৌতুকের হাসি অপর্ণার ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল। আচ্ছা অরুণদা চুপিচুপি উপরে উঠে আসতেও ত পারে। যে মেয়ে গেরুয়া না পরেও সকাল থেকে সন্ন্যাসিনী সেজেছে—তার উপর কি জ্যেঠিমা এখনো চোখ পেতে বসে আছেন? না—দরকার নেই দরজার খিলটা খুলেই রাখি। রং খেলব না, সাফ কথা—কিন্তু খিল দিয়ে ঘরের মধ্যে বসে থাকব এমন কথা ত ছিল না—এ যেন একটু বেশী বাড়াবাড়ি হচ্ছে। অপর্ণা উঠে গিয়ে নিঃশব্দে খিলটা খুলে দিল। এখন অরুণদা যদি ওর ঘরে ঢুকেই পড়ে তাহলে ওর করবার কি আছে—পড়াটড়া বলে দিতে এমনিত কতবারই এসেছে। তা ছাড়া সে এই প্রতিজ্ঞাই করেছে জীবনে কোনদিন রং না আবির ছোঁবে না—কিন্তু কেউ যদি জোর করে ওকে আবির মাখায়—বিশেষ করে সে যদি পুরুষ মানুষ হয়...আচ্ছা তাহলে তার সংগে জোরে অপর্ণা পেরে উঠতে পারে? আসল কথা সে ত আর আবির ছুঁচ্ছে না—তাকে জোর করে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ছোঁয়ান হচ্ছে। তাইতে কারো দিব্যি পচে যায়। আর এ নিয়েত আইন আদালত হয় না। অপর্ণা অসহিষ্ণু হয়ে উঠে দাঁড়াল—জানালার বাইরে কৃষ্ণচূড়ার ডালে ডালে দোলা লেগেছে—কেসিয়ার ডালগুলোও যেন মেতে উঠেছে। রাস্তার পীচের রং পর্যন্ত বদলে গেছে—দেওয়ালে ফিকে রং গাঢ় রংএর ছোপ। ছেলেমেয়েদের রংটং খেলা প্রায় শেষ হয়েছে। ওদিকের বস্তির ছেলেরা খুব হল্লা করছে—কাদা নিয়ে ছুঁড়ছে এ ওকে তাড়া করছে। দোলের আবশ্যিক পরিণতি সে প্রতি বছর এমনি দেখে এসেছে। এক লরিভর্তি একগাদা তারই বয়সী ছেলে-মেয়ে রং খেলে গান গাইতে গাইতে চলে গেল—কেন, তার বেলা দোষ হয় না? এগুলো ত কই জ্যেঠিমার চোখে পড়ে না—যত সব সেকেলেপনা।

কিন্তু অরুণদা যেন কি? মন্টু নন্টে রীণা হুল্লোড় করছে আর অরুণ দুনিয়া ভুলে গেল। কিম্বা ওই

জ্যোঠিমা—যে জ্যোঠিমা অপমানের কিছু বাকী রাখেননি—যাঁর জন্য অপর্ণা আজ সন্ন্যাস নিয়েছে হয়ত তাঁরই নিরামিষ ঘরের দরজার কাছে বসে তাঁরই হাতে ভাজা বেগুণী খাচ্ছে। নির্লজ্জ কোথাকার! সব ভুলে গেল। গত বছরের রং খেলা—আর ওই সব মাথা-মুণ্ডু......তার চোখের উপর মেঘলা দিনের গাঢ় ছায়া নেমেছে—ঠোঁট দুটো শুখিয়ে শুখিয়ে উঠছে—সারা শরীরে একরকমের দাহ অনুভব করছে।—বেটাছেলে জাতটাই এমনি!

পায়ের শব্দ না?—উৎসুক হয়ে দাঁড়াল অপর্ণা। তাই কখনো হয়। অরুণদা তার অনেক চাওয়া বছরের একটি দিনকে ব্যর্থ করে চলে যাবে! আসল কথা—ম্যানেজ করতে পারছিল না বেচারা। জ্যোঠিমার দরজায় বসে তেলেভাজা যদি খেয়েই থাকে—সে জ্যোঠিমার চোখে ধুলো দেবার জন্য। হালকা পায়ের শব্দ ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে—এক্ষুণি একটা ভীরু কাঁপা গলায় 'অপি' ডাক শুনবে। অপি কিন্তু সে ডাকে সাড়া দেবে না। অরুণদা হয়ত বলবে—ছেলেমানষী কোরোনা অপি তুমি বুঝতে পার না আমার কি অবস্থা। গতবারের ব্যাপারের পর এমনি হুট বলতে চলে আসা যায় নাকি!" অপি তখনো কথা বলবে না যতক্ষণ না অরুণদা এগিয়ে এসে চারিদিক চেয়ে ভয়ে ভয়ে.........

একটা কল্পিত আবেগে অপর্ণার পা দুটো কাঁপছে—ঠোঁট দুটো কান দুটো জ্বালা করছে—গলা শুকিয়ে আসছে। না-না মান অভিমান করে বাজে সময় কাটিয়ে দেবার কোন মানে হয় না। কে জানে, জ্যোঠিমা হয়ত পেছন পেছন এক গ্লাস জল বা এমনি কিছু নিয়ে উঠে আসবেন। বাড়ী ত নয়, জেল—না জেল বোধ হয় এর চেয়ে অনেক ভাল। তার চেয়ে ও চোখবুজে একেবারে অরুণদার বুকের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে। না জেনে পথ পড়ব তোমার বুকের মাধ্যখানে......' পায়ের শব্দ দরজার সামনে এসে গেছে। অপর্ণা চোখবুজে দরজার দিকে এগিয়ে যাবার জন্য এক পা তুলছে এমন সময় দরজাটা সশব্দে খুলে গেল।

—"অরুণদা!"

রীনি বলল—"অরুণদা অনেকক্ষণ চলে গেছে. বেলা দুটো বেজেছে—মা ভাত বেড়েছেন নীচে যেতে বলল।"

রীনি নোটিশ ধরিয়ে যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল। অপর্ণা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ওর ঠোঁটদুটো আগের মত জ্বলছে—কান দুটো আগের মত দপদপ করছে— কিন্তু চোখের কাজলের নীচে মেঘলাদিনের কামনাঘন নিবিড়তা আর নেই—সে দুটো রাগে আর ঘৃণায় দপদপ করে জ্বলছে।

অরুণকে লেখা অসমাপ্ত চিঠিখানা টেনে নিয়ে একেবারে কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেললে। কান্নার গলা বুজে আসছে—অপর্ণা বালিশে মুখ গুঁজে সেটা চাপবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগল। তার দেহটা ফুলে ফুলে উঠছে আর তার অস্পষ্ট গোঙানীর মধ্যে কটা কথা মাত্র শুধু শোনা গেল—"ভীতু—ভীতু কোথাকার!"—এই বিদ্যে ছুঁয়ে তিনসত্যি করছি যদি কোনদিন তোমার........."

নতুন পাওয়া

শেফালী চট্টোপাধ্যায়

স্ত্রী বিয়োগের পর সত্যিই কি সন্ন্যাসী হলেন প্রতাপবাবু। ধুতি ছেড়ে থান পরলেন। মাছ ছেড়ে নিরামিষ ধরলেন। তিনটে ছেলের নামে তিনখানা বাড়ী লিখে দিলেন। নিজে রইলেন এক সতন্ত্র বাড়ীতে। নীরব নিস্তব্ধ বাড়ীতে একা রইলেন মাত্র।

বন্ধু মহলে তুমুল আলোচনা। লোকটা কি পাগল হয়ে যাবে? বন্ধুর স্ত্রীরা প্রতাপবাবুর মতো স্ত্রীর স্বামী সৌভাগ্যের জন্য বারবার ধন্যবাদ জানাতে লাগলেন ভগবানের কাছে। স্বামীদের প্রতি কথায় প্রতাপবাবুর আদর্শ হতে বল্‌লেন।

পঞ্চাশোর্ধ প্রতাপ রায়কে সান্ত্বনা দিতে বন্ধুরা প্রতি সন্ধ্যায় প্রতাপবাবুর গৃহে হাজির হতেন। সান্ত্বনা না পেলেও প্রতাপবাবু স্নেহময়ীকে ভুলে থাকতেন হয়ত বা কিছুক্ষণের জন্য।

বন্ধু গোরাচাঁদবাবু বলতেন—"আবার বিয়ে কর প্রতাপ। বড় মেয়ের ত অভাব নেই। শূন্য মন পূর্ণ না হলেও শূণ্য ঘরত পূর্ণ হবে।"

নাঃ রে আর হয় না গোরা, স্নেহময়ীর শূণ্য ঘর আর কোন নারীই পূর্ণ করতে পারবে না। সে মানুষ ছিলো না ছিলো দেবী। তার শূণ্য সিংহাসনে জ্বলবে ধূপের আগুন, যা নিজেও পুড়বে, পোড়াবে আমাকে। কথা শেষে প্রতাপবাবুর চোখে জল দেখে, বেদনার পশরা নিয়ে চলে গিয়েছিলেন গোরাচাঁদবাবু।

দেখতে দেখতে বছর চার কাটলো। প্রতাপবাবুর কাছে শূণ্য মন আর শূণ্য ঘরের রূপ যেন হঠাৎ একদিন বদলে গেল মনে হতে লাগলো মরুভূমির মধ্যে বাস করছেন। তৃষ্ণায় তাঁর গলাটা কাঠ হয়ে উঠলো। জল কোথায়? তাই সেদিন গোপনে খবরের কাগজের পাতায় এক বিজ্ঞাপন দিয়ে বসলেন।

তিরিশের উর্ধ্বে, যে কোন বর্ণের বিধবা, সধবা, (ডাইভোর্স) বা কুমারী পাত্রী চাই। পাত্রীর সাক্ষাৎ বাঞ্ছনীয়।

এরপর যদিও রইল বক্স নম্বর, তবুও কিভাবে যেন কথাটা প্রচার হয়ে পড়লো বন্ধু মহলে। এবার গোরাচাঁদবাবু এগিয়ে এলেন বাধা দিতে। "আর কেন প্রতাপ সময় ত হয়ে এলো।" প্রতাপবাবু বিজ্ঞের হাসি হাসলেন। "সময় হয়ে আসবার আগে ত চাই সমব্যথি। ও সব তোমরা বুঝবে না। এর পরেও অনেকের অনেক আপত্তি প্রতাপবাবুর দৃঢ়তার বানে ভেসে গেল।

একদিন দেখা গেল প্রতাপবাবুর স্টুডিবেকার থেকে নেমে এলেন তিনি নিজে, আর পিছনে নামলেন এক স্থুল-কায়া বর্ষীয়সী মহিলা। উনি প্রতাপ-বাবুর চেয়ে দৃঢ়মনা, দশ বছর বিধবা থাকবার পর আজ আবার প্রতাপবাবুর হাতের সিঁদুরে সিঁথি রাঙ্গা করেছেন। মুখে সলাজ হাসবার চেষ্টা, দীর্ঘদিন রঙীন শাড়ী পরায় অনভ্যস্ত মহিলার পরনে ফিকে গোলাপী শাড়ী।

প্রতাপবাবু তাঁকে ডাকলেন—"এস প্রভা তোমার ঘর, তুমিই দেখে নাও। জানত ছেলে বৌ কেউই আমাকে স্বাগত জানাতে আসবে না আজ।"

"তোমার কিছুই ভাবতে হবে না, এই বাড়ীই আমাকে স্বাগত জানাচ্ছে।" প্রভাবতী স্থূল দেহ নিয়ে মন্থরগতিতে গেটের ভিতর চলে গেলেন। প্রতাপবাবুও পিছু পিছু। সামনেই স্নেহময়ীর বড় অয়েল পেন্টিং। এর দিকে চেয়ে প্রতাপবাবু বললেন, "এতদিনে আবার কোথায় জন্ম নিয়েছে।"

"আসা যাওয়াই ত সংসারের রীতি। ঐ ভেবে বসে থাকলে চলে? সান্ত্বনার স্বরে বললেন প্রভা। "হ্যাঁ গো। ছবিখানাকে সরিয়ে রেখ, মরা মানুষের ছবি দেখলে আমার মন যেন কোথায় চলে যায়—এগিয়ে এসে প্রভার হাত ধরলেন প্রতাপবাবু। বললেন, চল, তোমার শোবার ঘর, বসবার ঘর দেখিয়ে দিয়ে আসি।

এরপর ঠাকুর, চাকর তাদের নূতন প্রভুপত্নীকে চা মিষ্টিতে আপ্যায়িত করতে এতটুকু ত্রুটি করলেন না। প্রভাদেবীর গোগ্রাসে খাওয়াকে, সানন্দে খাওয়া মনে করে পরম তৃপ্তি নিয়ে চেয়ে রইলেন প্রতাপবাবু। সেইদিন থেকে আরম্ভ হলো তাঁর দ্বিতীয় সংসার।

নূতনের ডোরে বাঁধা পড়লেন প্রতাপবাবু। এমন সংসারী হয়ে পড়লেন যে—ভিতর বাড়ী থেকে সদর ঘরে আসবারও সময় পান না তিনি। বন্ধুরা সান্ধ্য মজলিসে এসে প্রতাপবাবুকে না পেয়ে

চলে যান। ব্যবসায় সংক্রান্ত ব্যাপারে কর্মচারীরা এসে ফিরে যায়। এমন কি বড়বাজারের ব্যবসায় দেখতেও যান না দীর্ঘদিন।

রোজ সন্ধ্যায় গাড়ী দাঁড়ায় দরজায়। প্রতাপবাবু ও প্রভাদেবী গিয়ে ওঠেন সেই গাড়ীতে। ঘুরে বেড়ান শহরের নানা জায়গায়। যেখানে যেতে বা যা কিনতে প্রভার ভাল লাগে, তাই করেন প্রতাপবাবু। প্রভা ছাড়া আজ আর কাওকে চান না। ছেলেরা এমন কি নাতি-নাতনীর কথাও ভুলে গেছেন তিনি। এরপর আসাম থেকে বিশেষ কাজে তার এল তাঁর কাছে। যেতেই হবে। প্রভার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রওনা হলেন পরদিন।

সাতদিন পরে কাজ মিটিয়ে ফিরে এলেন প্রতাপবাবু। প্রভাকে দেখবার জন্য ব্যস্তপায়ে ব্যাকুলমন নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। দেখলেন প্রভার খাটে বসে আছে তিনটি মেয়ে। পাশে দাঁড়িয়ে সহাস্যময়ী প্রভা। অপরিচিতা মেয়ে দেখে বাইরেতে পা বাড়ালেন তিনি। বাধা দিলেন প্রভা, "কি, বাইরে যাচ্ছ কেন?"

লজ্জিত মুখে প্রতাপ বললেন, "না, না। তোমার আত্মীয় রয়েছেন।" আমি পরে আসব এখন।

একমুখ হাসলেন প্রভা, "ওরা আমার মেয়ে"।

তো-মা-র মেয়ে?

হ্যাঁ গো তোমারও ত মেয়ে। যা, তোরা প্রণাম কর। তোদের—

মেয়েগুলো ছুটে এসে প্রতাপবাবুর পায়ে মাথা নোয়ালে। পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলেন প্রতাপবাবু। তার মাঝে মেয়ে কটির অজস্র প্রশ্ন—কি বলে ডাকবো আপনাকে? ছোট মেয়েটি বলে উঠলো, মেশোমশায়, জানিস না। সে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলো প্রতাপবাবুকে। মেশোমণি আমি কোন ঘরে থাকবো বলে দা-ও। আব্দারে ভরা তার সুরেলা স্বর।

বিস্মিত প্রতাপবাবুর চোখ পড়লো, প্রভার দিকে থমথমে মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। চোখে তাঁর আক্রমণের আভাষ। সে দিকে চেয়ে সহজ হতে চেষ্টা করল প্রতাপবাবু। "যে ঘর ইচ্ছে নিও মা, তোমরা যে কদিন থাক এ বাড়ীর সমস্তই তোমাদের। সেই হাতের বন্ধনকে লোহার শিকলের বন্ধন অনুভব করলেন। প্রতাপ রায় রাশ রাশ সাপ তাঁর শিরায় শিরায় দংশন আরম্ভ করলো। সেই দিকে চেয়ে এগিয়ে এলেন প্রভাদেবী, বললেন "ওকি বলছো? ওরা ত চিরদিনই এখানে থাকবে।

আহা বাছারা আমার সারা জীবন কষ্ট পেয়েছে। আজ একটু সুখের মুখ দেখলো তোমার জন্য। এ্যাঁ, প্রতাপবাবুর চোখ দুটো যেন বেরিয়ে আসতে চায়। কিছু বলবার ইচ্ছা আছড়ে পড়তে লাগলো, প্রকাশ করবার ক্ষমতা কই। বড় মেয়ে দুটি একটু ইতস্ততঃ করছিলো তাদের বর্তমান করণীয় কি? এবার সেই এগার বছরের আহ্লাদী প্রতাপ রায়কে ছেড়ে জড়িয়ে ধরলো বড় বোনটিকে, "দিদি চলো আমাদের ফুল বাগান দেখে আসি।"

প্রতাপবাবু এতক্ষণ পরে বললেন—হ্যা মা যাও তোমাদের ফুলবাগান দেখে এসো। তোমাদের ফুল বাগান—

ওরা চলে যেতেই শান্তির নিশ্বাস ফেললেন প্রভাদেবী। "আহা বাছারা আমার দশ বছর পরে ঘর পেলো। তা-ছাড়া আহ্লাদী আমার জন্ম থেকেই বাপ হারা।

প্রতাপ প্রশ্ন করলেন—"কই তোমার যে মেয়ে তিনটি আছে একথা ত বলোনি।

"বলবার প্রয়োজন মনে করিনি কেন জান, তোমার তিনটি ছেলে থেকেও যদি তোমাকে মানতে পেরে থাকি তবে তুমি আমায় মানতে পারবে না কেন?"

তবুও শেষ চেষ্টা প্রতাপের, বেশ তা না হয় মেনে নিলাম, কিন্তু ওরা কি অন্য জায়গায় থাকতে পারত না?

না পরের বাড়ী ওরা আর থাকতে পারবে না, এতদিনে ওরা আশ্রয় পেয়েছে।

ওদের বোর্ডিং-এ রেখে দেবো, যত টাকা খরচ হয় সব দেব, শুধু ওদের এখান থেকে যেতে বলো। নচেৎ আমি হয়ত পাগল হয়ে যাবো। একান্ত অনুরোধ নিয়ে বললেন প্রতাপ রায়।

ওদের নিজের বাপ হলে কি একথা বলতে পারতে? গলার স্বর আর্দ্র হয়ে ওঠে প্রভার। আবার ক্রুদ্ধ হলেন, আমার বাড়ী ছেড়ে আমার মেয়েরা চলে যাবে, আর আমি শান্তিতে থাকবো মনে করেছ?

তোমার বাড়ী?

হ্যাঁ, আগে থেকেই ত এ বাড়ী আমার নামে লিখে দিয়েছ।

ওঃ লিখে দিয়েছি, বেশ করেছি। আমি জ্ঞানীর মত কাজ করেছি। স্বব-সায়ীর মত কাজ করেছি। তার সংগে আমার মাথাটাও তোমাদের কাছে বিকিয়ে দিয়েছি। প্রতাপ রায় বসে পড়লেন দুহাতের উপর মাথা রেখে। প্রভার অজস্র কথার তীর তাঁর সারা দেহে এসে বিঁধতে লাগলো একটার পর একটা।

"এখন আর অনুতাপ করে কি হবে বলো, জানোইত এ বয়সে মরতে এসেছি, শুধু ঐ মেয়ে কটীর জন্য। ওদের মায়ের যা কিছু সব ত ওদেরই। আজ পুরুষ মেয়ের সমান অধিকার, একথা ওরা বুঝে যাক, আহা বাছারা আমার কবে থেকে বাপহারা। তুমি কি এখানে থাকতে পারবে ভেবেছ?" ওরা আমার যদি চলে যায়?—

আমি থাকতে পারবো না। বিপন্ন-বিস্ময়ে প্রতিবাদ করবার জন্য উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করবার মুহূর্তে আবার ছুটে এলো আহ্লাদী, ঝাপটে ধরলে প্রতাপ রায়ের গলাটা।

মেশোমণি, চলো আমাকে একটু গাড়ী করে বেড়াতে নিয়ে যাবে। কই—ওঠোনা?

আমি—

হ্যাঁ—তুমি-তুমি ত আমার বাবামণি। অবাঞ্ছনীয় হাতের বেষ্টনীর মাঝে আড়ষ্ট হয়ে প্রতাপ রায় ভয়ার্ত চোখে বললেন, কে? কে বললে? ঐ ত দিদি বললে, তুমিইত আমার বাবামণি হয়েছ। তোমার সব আমাদের হয়েছে। চলো। দিদি ধরত বাবামণিকে জোর করে নিয়ে যাই।

আহ্লাদীর মুখের কথা শেষ না হতে তিন বোনে মিলে, হিড় হিড় করে সদরের দিকে টেনে নিয়ে গেল প্রতাপ রায়কে—পিছনে মুখে কাপড় দিয়ে ডুকরে হেসে উঠলেন প্রভাদেবী।

এদিকে প্রতাপ রায় যখন তিন কন্যার ব্যূহের মাঝে সমাহিত পথের দুধার জনারণ্য হয়ে উঠেছে তখন প্রতাপ রায়কে কেন্দ্র করে। সেই ব্যূহ ভেদ করে সামনে এসে দাঁড়ালেন গোরাচাঁদবাবু।

"কি হে প্রতাপ নূতন পাওয়ার আনন্দ বুঝি?"

বিপন্ন চোখে গোরাচাঁদবাবুর দিকে চেয়ে বললেন প্রতাপবাবু, আমাকে বাঁচাও গোরা। নূতন পাওয়ার মোহ আমার কেটে গেছে। আমি নিস্ব—আমি রিক্ত, মনে হচ্ছে কেউ কোথাও আমার নেই, আশ্রয় হারা আমি সর্বক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে—কথা শেষ হওয়ার আগেই সেইখানে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন প্রতাপ রায়। কে জানে সে জ্ঞান আর কোনদিন তাঁর ফিরেছিলো কি-না।

৯ই জুন, ১৮৬২—

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ষ্টীম শিপ 'ক্যানাডায়' চড়ে চলেছেন য়ুরোপে। স্বদেশে পড়ে রইলেন প্রিয়তমা স্ত্রী আঁরিয়েৎ আর ছোটো ছেলেমেয়েরা। মাইকেল তাদের জন্য অবশ্য বন্দোবস্ত করেছেন, যেন তারা কষ্ট না পায়। সেদিন সেই য়ুরোপযাত্রীর মন নিশ্চয়ই ঘরের কোণে পড়েছিল। সেই প্রদোষান্ধকারে বাইরণের উক্তির প্রতিধ্বনি করে মাইকেল বলেছিলেন—'My Native land. Good night!' অশান্ত, রণক্লান্ত, বিদ্রোহী মধুসূদনের চোখে সেদিন নেমে এসেছিল প্লাবন। দেশের লোকের প্রতি বিশ্বাস করে মধুসূদন সেদিন বিদেশ যাত্রা করলেও তারা তাঁর স্ত্রী-পুত্রদের প্রতি করুণা করেনি, এবং শেষ পর্যন্ত স্ত্রী আঁরিয়েৎকেও য়ুরোপে পাড়ি দিতে হয়। ইংলণ্ডে খরচ বেশী, সেখান থেকে প্যারী, প্যারী থেকে ভার্সাই। অভাবের তাড়নায় স্ত্রী-পুত্রের আহার জোটে না, প্রতিবেশীরা গোপনে কখনো কিছু খাদ্যবস্তু বা পানীয় রেখে যায়, সেই ভয়ংকর মুহূর্তের সেইটুকু সম্বল। সেদিন বাংলাদেশের একজন মানুষ মাইকেলকে সাহায্য করেছিলেন, তাঁর নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। মধুসূদন বিদ্যাসাগরকে লিখেছিলেন—

"The man to whom I have appealed has the genius and wisdom of an ancient Sage, the energy of an Englishman, and the heart of a Bengali mother. I was right; an hour afterwards, I received your letter and the 1500/- Rs. you have sent me." অবশ্য এমন অর্থ সাহায্য ঈশ্বরচন্দ্রকে বার বার পাঠাতে হয়েছে।

এই দারিদ্র্যের পীড়নে যখন জর্জরিত, জীবন যখন শুখায়ে ধূলি-ধূসর, তখন সেই নিদারুণ সংকটের কালে করুণাধারার মত এসেছে প্রেরণা। মাইকেলের লেখনীনিসৃত সনেট এই কালের রচনা। প্রায় শতাধিক চতুর্দশপদী কবিতাবলী ১২ নম্বর রু দ্য স্যানটিয়ার্সের বাড়িতে বসে কবি লিখেছিলেন। এই কবিতার মধ্যে কবির পাশ্চাত্য প্রীতির ঘোর কেটে গিয়েছে, তার পরিবর্তে এসেছে নিবিড় স্বদেশ প্রেম। ভার্সাই থেকে সেদিন তিনি বন্ধু গৌরদাস বসাককে লিখেছিলেন ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী :

"If there be any one among us anxious to leave a name behind him, and not pass away into oblivion like a brute let him devote himself to his mother tongue—"

১৮৬৩ থেকে ১৮৬৫ এই তিন বছর প্রবাসে কাটিয়েছেন মধুসূদন এবং এই কালের মানসিক ও পারিপার্শ্বিক

অবস্থার এক কাব্যময় প্রকাশ তাঁর 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'। রায় বাহাদুর দীননাথ সান্যাল 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র ভূমিকায় লিখেছেন :

"মাইকেল মধুসূদন ইংলন্ডে দেড় বৎসর থাকিয়া ১৮৬৩ সালে ফ্রান্স রাজ্যে গমন করেন এবং ভরসেল্স নামক তথাকার সুপ্রসিদ্ধ নগরে দুই বৎসর কাল অবস্থিতি করেন। তিনি এই সময় "চতুর্দশপদী কবিতাবলী" নাম দিয়া একশতটি কবিতা ছাপাইবার জন্য আমাদিগের নিকট পাঠাইয়া দেন।"

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে মধুসূদন বেশ পসার জমিয়েছিলেন। কিন্তু আয় অপেক্ষা অধিক ব্যয় করতেই তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। এদিকে স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল, ঋণের বোঝা বেড়ে চলল, রোগশয্যায় শুয়েও কবি লিখছেন অর্থের জন্য, অন্নের জন্য। তারপর ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের মাঝামাঝি পাঠাতে হল আলিপুর জেনারেল হাসপাতালে (এখন যা সুখলাল কর্নানী)। আরিয়েত্তা কবির প্রিয়তমা জীবনসঙ্গিনীর মৃত্যু হয়েছে কবির মৃত্যুর মাত্র দুদিন আগে। সে সংবাদটুকুও একজন মুমূর্ষু মাইকেলকে শুনিয়ে গেল, মাইকেলের হৃদয়-মন ভেঙে পড়ল, অশান্ত বিপ্লবী রণক্লান্তদেহ অচৈতন্য হয়ে পড়ল ২৯শে জুন অপরাহ্নে। স্ত্রীর সমাধির পাশেই কবরস্থ করা হয়েছিল মধুসূদনকে। আর সহস্রাধিক মানুষ শবানুগমন করেছিল সেদিন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর লোয়ার সার্কুলার রোডের সমাধিতে কবির 'grateful and admiring countrymen' সমাধি ফলক স্থাপন করলেন, যার গায়ে লেখা আছে—

"দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধিস্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দত্ত কুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন!"

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন : "তাঁহার জীবন শোকান্ত মহাকাব্য, তাঁর গ্রন্থগুলিও সেইরূপ শোকান্ত মহাকাব্য।"

'কৃষ্ণকুমারী নাটকে'র শোকান্ত পরিণতি লক্ষ্যণীয়। মাইকেল মধুসূদন সর্বাঙ্গ সুন্দর ট্রাজেডি নাটক রচনা করলেন ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে, আজ থেকে একশ' বছর আগে। ট্রাজেডির মধ্যে আছে কিছু পরিমাণ সংঘর্ষ আর বিরোধ, ভাবের সংঘর্ষ, চিন্তার সংঘর্ষ, আশা, বাসনা, উদ্দেশ্যের সংঘর্ষ। একের সঙ্গে অপরের সংঘর্ষ, বিপরীতমুখী দুটি শক্তির বিরোধ। ট্রাজেডির এই উপজীব্য। সংগ্রাম, পরাজয়, অসহায় অবস্থা এবং তার জন্য যে বেদনার্ত-বিড়ম্বনা তা সবই ট্রাজেডি। ব্যাকরণসম্মত ট্রাজেডির সংজ্ঞা এই। কিন্তু তাই বলে শুধু ক্লেশ ভোগ করাটাই আবার বিয়োগান্ত ঘটনা নয়। যে বেদনা বিশেষ ধরণের যন্ত্রণা ভোগের ফলে উদ্ভূত তার নাম ট্রাজেডি। কৃষ্ণকুমারী ভীম সিংহের দুহিতা, সীতা ও দময়ন্তীরা যে বংশের বধূ হয়ে এসেছেন সেই মহৎ বংশে তাঁর জন্ম। কৃষ্ণকুমারী সুন্দরী, জয়পুরের লম্পট রাজা জগৎ সিংহ তার রূপমুগ্ধ, মানসিংহ পাণিপ্রার্থী। দুজনেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, হয় কৃষ্ণকুমারী লাভ নয় উদয়পুর ধ্বংস—এর মধ্যে আর কোনো মধ্যপন্থা নেই। রাজা ভীম সিংহের উভয় সঙ্কট। তিনি কৃষ্ণকুমারীকে অগত্যা হত্যা করে সমস্যার সমাধান করবেন স্থির করলেন, আর কৃষ্ণকুমারী শেষকালে বিষপানে আত্মহত্যা করেন। মধুসূদন ইতিহাসকে কিঞ্চিৎ বিকৃত করে কৃষ্ণকুমারীকে হত্যা করেছেন খড়্গাঘাতে।

নাটক হিসাবে কৃষ্ণকুমারী দুর্বল

রচনা। এক হিসাবে বলা যায় মধুসূদন 'কৃষ্ণকুমারী'র মাধ্যমে বিয়োগান্ত নাটকের পরীক্ষা মাত্র করেছেন। উত্তরসূরীদের কাছে এই নাটক মূল্যবান। মধুসূদন একশো বছর আগে যে ভুল করেছেন, কিংবা যদি বলি ভুল না [illegible] একটা নতুন ধারা প্রব[illegible] করেছেন, আজ একশো বছর পরে আমরা সেখান থেকে কতখানি অগ্রসর হয়েছি? নাটকের আঙ্গিকে [illegible] ট্রাজেডির গ্রামার অক্ষুণ্ণ রেখে বিগত একশো বছরে ক'খানি সার্থক বিয়োগান্ত নাটক রচনা করেছি! এই প্রশ্নের বিচার করার সময় আজ এসেছে। বিয়োগান্ত নাটকের আজ শতবর্ষপূর্তিকাল, তাই মধুসূদন আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

এই ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসেই প্রকাশিত হয়েছিল "মেঘনাদ বধ কাব্য"। রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সে 'মেঘনাদ বধ কাব্য' সম্পর্কে বলেছেন :

"মেঘনাদ বধ কাব্যে, কেবল ছন্দোবন্ধে ও রচনা প্রণালীতে নহে, তাহার [illegible]কার ভাব ও রসের মধ্যে একটা অপূর্ব [illegible]রিবর্তন দেখিতে পাই। এ পরিবর্তন [illegible]বিস্মৃত নহে। ইহার মধ্যে একটা বিদ্রোহ আছে। কবি পয়ারের বেড়ি ভাঙিয়াছেন এবং রাম রাবণের সম্বন্ধে অনেকদিন হইতে আমাদের মনে যে একটা বাঁধাবাঁধি ভাব চলিয়া আসিয়াছে, স্পর্ধাপূর্বক তাহার শাসনও ভাঙিয়াছেন। এই কাব্যে রাম-লক্ষ্মণের চেয়ে রাবণ-ইন্দ্রজিৎ বড়ো হইয়া উঠিয়াছে।... (আষাঢ় ১৩১৪) রমেশচন্দ্র দত্ত বলেছেন—সারা বাংলাদেশ সেদিন বুঝিয়াছিল বঙ্গ সাহিত্যের দিগন্তে এক নবীন জ্যোতিষ্ক উদ্ভাসিত। সেই ১৮৬১-তেই ১২ই ফেব্রুয়ারী বিদ্যোৎসাহিনী সভা কবিকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেছিলেন।

প্রচলিত রীতি থেকে বিভিন্ন পন্থায় রাবণকে বিচার, এবং কেবল ছন্দবন্ধে এবং রচনা প্রণালীর বৈচিত্র্য নয়, চিন্তাধারার বৈপ্লবিক বৈচিত্র্য আজ থেকে একশ' বছর আগের বাঙালীর পক্ষে বিচার করা কঠিন হয়নি, সময় লাগেনি।

বঙ্কিমচন্দ্র যে বলেছিলেন "সুপবন বহিতেছে, জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও, তাহাতে নাম লেখ—শ্রীমধুসূদন।" সেই জাতীয় পতাকা আজ ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে বসে আমরা কি উড়িয়েছি? আজ তাই রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী দিবসে বসে মেঘনাদবধ নাটকের শতবার্ষিকীর কথা বিস্মৃত হলে চলবে না। মাইকেল মধুসূদন দত্ত সাঁইত্রিশ বছর বয়সে লিখিত এই কাব্য সম্পর্কে তাঁর বন্ধু [illegible]জনারায়ণকে বলেছেন—..."ওহে রাজ! [illegible] কাব্য নিশ্চয়ই আমাকে অ[illegible] ক[illegible]।" কবির এই বাক্য আজ একশত বছর[illegible]রের আলোকে বিচার করলেও বলা যা[illegible] সত্য হয়েছে। 'মেঘনাদবধ কাব্য' তাঁকে অ[illegible] করেছে।

মাইকেলের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল য়ুরোপীয়,[illegible] তিনি শুধু বিলাত যাত্রার মোহে ক্রিশ্চান হননি, তাঁর য়ুরোপীয় মনোভঙ্গী[illegible] তাঁকে ক্রিশ্চান করেছিল। য়ুরোপের সাহিত্য যে বঙ্গ সন্তানকে সর্বপ্রথম হাতছানি দিয়েছিল তাঁর নাম শ্রীমধুসূদন। তাই তিনি আঙ্গিক, রূপকল্প, চিত্রকল্প, বিন্যাস ও বক্তব্য সব কিছুকেই য়ুরোপীয় ছাঁচে ঢালতে পেরেছিলেন এবং সেই সঙ্গে বাংলা সাহিত্যকেও একেবারে নতুন ছাঁচে ফেলে একটা বিশিষ্ট আকার দিতে পেরে-ছিলেন। এই বৈপ্লবিক এক্সপেরিমেন্ট সম্ভব হয়েছিল তাঁর য়ুরোপীয় দৃষ্টি ভঙ্গীর জন্য। তিনি রাজনারায়ণকে লিখেছিলেন : "মেঘনাদ বধ কাব্যে দ্বিতীয় সর্গ পড়িতে পড়িতে তোমার ইলিয়াডের চতুর্দশ সর্গের কথা মনে পড়িবে; আইডা পর্বতে জুপিটারের
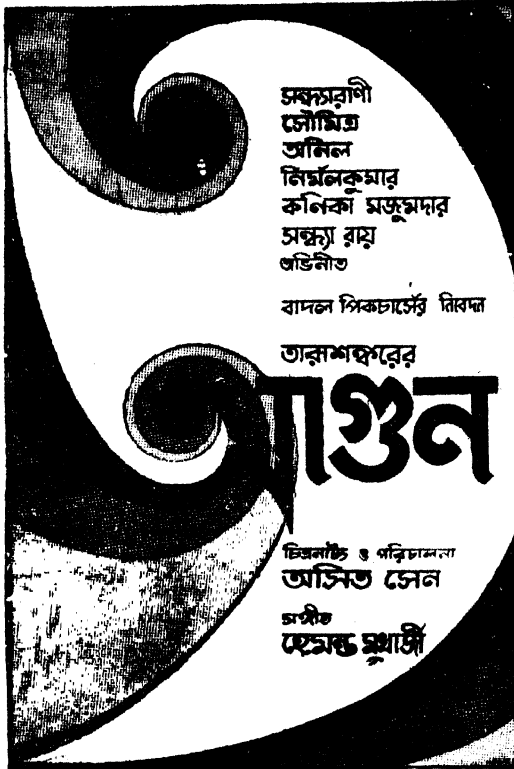
কাছে জন্নোর অভিসার দৃশ্যকে আমি জানিয়া শুনিয়া গ্রহণ করিয়াছি তবে যতদূর সম্ভব তাহাকে হিন্দু-পোশাক পরাইতে চেষ্টা করিয়াছি।"

শ্রীমধুসূদন য়ুরোপীয় টেকনিক গ্রহণ করেছেন তাকে খাপ খাওয়ানোর জন্য স্বদেশী পুরাণের সাহায্য নিয়েছেন। তাঁর কবি-কল্পনায় এক বিশাল পটভূমি সংগ্রহ করে তার ওপর যথেচ্ছ রঙ লাগিয়েছেন, তবে তাঁর তুলির আঁচড় বলিষ্ট ও সাহসিক। তাই মেঘনাদবধ কাব্য সাঁইত্রিশ বছর বয়সের কবির এক বৈপ্লবিক প্রয়াস। প্রচলিত রীতির বাঁধা-ধরা পথে তিনি অগ্রসর হননি, পথ তৈরী করতে হয়েছে। মেঘনাদ বধ কাব্য অতিশয় সতর্ক রচনা। কোথাও গতানুগতিক অনুকরণ নেই, পরিবর্তনশীল রূপ এবং গতিশীল কল্পনার বলিষ্ঠতা এবং দেবতার-স্তুতি ত্যাগ করে মানবের দুঃখ বেদনার প্রতি সম্পূর্ণভাবে অভিমুখী হওয়া একটা বিশেষ ব্যতিক্রম বা departure সেখানেই তার সার্থকতা।

মধুসূদনের মনে অমরত্বের স্পৃহা প্রবল ছিল। ইংলণ্ড যাত্রাও এমনই একটি স্পৃহার ফল।—গৌর দাসকে তিনি অতি অল্প বয়সেই লিখেছিলেন—

—"Oh! how should I like to see you write my 'Life' if I happen to be a great poet, which I am almost sure I shall be, if I can go to England."

মাইকেল হয়েছিলেন শ্রীমধুসূ[illegible] দত্ত মূলতঃ এই অমরত্ব লাভের বাস[illegible]। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে মিশন রো'র [illegible]য় তাই তিনি অকুতোভয়ে ক্রিশ্চান[illegible] গ্রহণ করেছিলেন এবং 'মাইকেল' হ[illegible]ছিলেন।

ক্রিশ্চান হওয়ার পরও পি[illegible]তা রাজনারায়ণ দত্ত কিছুকাল অ[illegible] সাহায্য করেছিলেন, তারপর সেই [illegible] সাহায্য বন্ধ হওয়ার পর ১৮৪৮-এ [illegible]াদ্রাজ যাত্রা করেন। সেখানে থাকার সম[illegible] **Madras Circulation** নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয় **"The Captive Ladie"**! এই কাব্যগ্রন্থও প্রশংসালাভ করেছিল। গৌরদাস বসাকের হাতে একখানি গ্রন্থ উপহার পেয়ে জন ড্রিংকওয়াটার বেথুন কিন্তু একটি বিশেষ ধরনের উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি সেদিন গৌরদাসকে বলেছিলেন—

"he could render far greater service to his country and have a better chance of achieving a lasting reputation for himself, if he will employ the taste and talents which he has cultivated by the study of English in improving the standard and adding to the stock of poems of his own language."

ভার্সাই শহরের বৈদেশিক পরিবেশে

বসে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বেথুন সাহেবের উক্তির যাথার্থ বুঝেছিলেন মধুসূদন তাই 'মাইকেল' আবার 'শ্রীমধুসূদন' -এ ফিরে এসেছিলেন আর বঙ্গজননীর ভান্ডার থেকে বিবিধ রতন আহরণ করে বঙ্গভারতীকে শ্রদ্ধার অঞ্জলি দান করে গিয়েছেন।

মাদ্রাজে প্রায় আট বছর কাটিয়ে মধুসূদন যখন বাংলাদেশে ফিরলেন তখন প্রথমা স্ত্রী ম্যাকটাভিসের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটেছে। ফরাসী মহিলা আঁরিয়েৎ সোফির সঙ্গে বিবাহ হয়েছে, আর পিতা রাজনারায়ণ দত্তের মৃত্যুর পর আত্মীয়স্বজন ধন-সম্পত্তি লুট করে খাচ্ছে।

আর্থিক সংকট মধুসূদনের চিরদিনের সহচর। এই সময় বন্ধুদের উপদেশে তিনি পুলিশ আদালতের হেডক্লার্কের পদ গ্রহণ করেন আর সেই আদালত বাড়ির কাছাকাছি ৬নং লোয়ার চিৎপুর রোডের (বর্তমান লালবাজার থানার পূব দিকের বাড়ি) বাড়িটি ভাড়া নিয়ে বাস করতে লাগলেন।

গৌরদাস বসাক লিখছেন—

—"It was in this memorable house that he wrote his principal works — Sarmistha, Tilottoma and Meghnathbadh. Had Bengal been England this house would have been purchased and maintained for being visited by the admirers of his genius."

বাংলাদেশ ইংলন্ড নয়। গৌরদাস দিয়েছিলেন ইংলন্ডের দৃষ্টান্ত, তার কারণ ইংলন্ড স্বাধীন দেশ বাংলা ছিল পরাধীন ভারতের একটি প্রদেশ মাত্র। আজ ভারতবর্ষ স্বাধীন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত অমরত্ব লাভ করেছেন সে বিষয়ে বিতর্ক বা সংশয় নেই। আজ ট্রাজেডি নাটক, মেঘনাদ বধ কাব্য প্রভৃতি রচনার শতবার্ষিকী পূরণ সমারোহে না হলেও অনাড়ম্বর ভঙ্গীতে প্রতিপালিত হচ্ছে। ৬নং লোয়ার চিৎপুর রোডের বাড়ির মালিক কিন্তু মুর্শিদাবাদের নবাব। বাড়িটির সর্বত্র ছাতিয়া ব্যবসায়ীদের জিনিষপত্র বোঝাই, মেঘনাদ বধ কাব্য রচয়িতার নামগন্ধ কোথাও নেই। ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের যে বাড়িটিতে উইলিয়াম ম্যাকপীস থ্যাকারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তার অঙ্গে একখণ্ড প্রস্তর ফলক লাগানো আছে কিন্তু পুলিশ কোর্টের বড়বাবু মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে গৃহে 'শর্মিষ্ঠা', 'তিলোত্তমা' এবং 'মেঘনাদ বধ কাব্য' রচনা করে বাংলা সাহিত্যের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছেন সেই বাড়িটি সম্বন্ধে যেন কারো কোনও কর্তব্য নেই।

নিঃসন্দেহে আমরা আত্মবিস্মৃত জাতি। রণক্লান্ত বিদ্রোহী মধুসূদন আজ গৌড়জনের কাছে বিস্মৃতবিপ্লবী।

আলদহের বুলবুল-
চণ্ডী গ্রামে মাটির
তলায় প্রাপ্ত প্রায়
৮০০ বৎসর পূর্বেকার
কষ্টিপাথরে তৈরী
[illegible]

দশভুজা শ্রীদুর্গা

ফটো : শিশিরকুমার চৌধুরী

অর্থাৎ গঙ্গার ধারে তাকে মুমূর্ষু অবস্থায় নিয়ে গেলাম এবং ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে তিনি ঠিক গোধূলি-লগ্নে মারা গেলেন। তাই বাধ্য হয়ে আমার পিসতুতো ভাইকে আমাদের বাড়িতেই থাকতে হোলো; হালিসহরের তাঁর বাড়িতে কেউ আর রইল না। আমার পিসতুতো ভাইএর নাম ত্রিপুরারী, ওরফে টিপু, অর্থাৎ টিপু-সুলতান, বাবা তাকে তাই বলেই ডাকতেন। তিনি তাঁর ঠাকুমার কাছেই হালিসহরে মা[illegible] হয়েছিলেন। একমাত্র সন্তান, তাই তাঁর পিসীমা, অর্থাৎ আমাদের মা'র কাছেই কোলকাতায় বসবাস করতে লাগলেন।

তাঁর সম্বন্ধে আরো কিছু বলতে হয়। অন্যান্য গুণাবলীর কথা নাই তুললাম, যথা তাঁর কণ্ঠস্বর, তাঁর দর্শনে পাণ্ডিত্য এবং অদ্ভুত রকমের সত্য-[illegible]াদিতা। এখনকার ঘটনা এই; তাঁ[illegible] নিজের মা জীবিত ছিলেন, এবং তি[illegible] তাঁর মা'র ত্রয়োদশ বৎসরের [illegible]র সন্তান। তাঁর মাকে টিপুদা 'জ[illegible]নী' বোলে ডাকতেন। শুচিবাই [illegible]ছিল 'জননী'র প্রধান গুণ। একটু আধটু নয়, গুরুতর, ভীষণ রকমের; অর্থাৎ দরজা বন্ধ করে, উলঙ্গ অবস্থা[illegible] ঘরদোর পরিষ্কার করতেন, পা[illegible] কিছু 'দোষস্থ' জিনিষ মাটিতে [illegible]য়ে যায়। ছ'মাস হালিসহরে থাকতেন [illegible]র শ্বশুর বাড়িতে, এবং ছ'মাস ত[illegible] পিত্রালয়ে, ত্রিবেণীর কাছে বাঁশবে[illegible]তে। ছ'মাস প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় হা[illegible]সহরে গঙ্গার-ঘাটে স্নান করতে যে[illegible]ন, পাড়ার লোক বড় মানুষের পুত্রব[illegible] বলে সে সময় দরজা বন্ধ করে [illegible]তেন। এই শুচিবাই আমি নিজে জা[illegible] টিপুদার সঙ্গে তাঁর জননীর [illegible]লমাত্র যোগ ছিল না। তাঁর ঠাকুমাকে [illegible]নি মা বলেই ডাকতেন। বলা বাহুল্য, [illegible]পুদা বিবাহ করেনি।

সেদিন সকালবেলায়, সাড়ে ছটার সময় আমি ওপরের বারান্দায় বসে চা খাচ্ছি, নীচে অন্য সকলের জন্য চা তৈরী হচ্ছে, টিপুদা শোবার ঘর থেকে বাইরে এলেন। এসেই বল্লেন, 'পিসে-মশাই, একটা স্বপ্ন দেখলাম, জননী যেন মারা যাচ্ছেন।' 'স্বপ্ন কি আর সত্যি হয়! সত্যি হলে অবশ্য মন্দ হবে না।' 'আরো একটি স্বপ্ন দেখলাম, একত্রেই যেন মনে হোলো। পিসীমা গঙ্গার-ঘাটে একটা বটতলায় যেন শুয়ে আছে।' 'সেটা কি রকম হোলো?' 'বুঝতে পারলাম না।' যাই হোক, চা খাওয়া শেষ

কিন্তু পদ্মা সেখান থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। মাঝখানে চর ও ঝোপঝাড়।"

(৩)

"আপনি কিন্তু আমাকে ফাঁকি দিলেন," বিজয়মাধব বললেন, "ছেঁড়া চিঠির প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেলেন। কবেকার চিঠি তা তো বুঝলুম। কিন্তু কার চিঠি? কী ছিল সে চিঠিতে? অবশ্য গোপনীয় হয়ে থাকলে বলতে হবে না আমাকে।"

"না, না। গোপনীয় নয়।" সুলক্ষণ আশ্বাস দিলেন। "আস্ত থাকলে আপনাকে দেখাতেও পারতুম। এই দুটো টুকরো দেখে আপনি কতটুকু বুঝবেন? মেয়েলি হাতের লেখা। হাঁ। একটি মেয়ের লেখা।"

বিজয়মাধবের চোখে হাসির ছটা। "কেমন? বলেছিলুম কি না! প্রেমপত্র।"

"না। প্রেমপত্র নয়। কিন্তু পটভূমিকাটা আরো একটু বিশদ করা দরকার।" সুলক্ষণ বলতে লাগলেন, "সন্ত্রাসবাদের যুগ তখন শেষ হয়ে আসছে, কিন্তু দুই শিবিরের মনোমালিন্য সমান তীব্র। বোধহয় আরো তীব্র। কারণ সন্ত্রাসবাদীরা হেরে গেছে। আর ইংরেজরা পরাজিতের উপর চাপিয়ে দিয়েছে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ, যাতে তারা আর মাথা তুলতে না পারে। এটা শুধু তাদের আঘাত না করে সারা হিন্দুসমাজকেই আঘাত করেছে। হিন্দুসমাজের প্রতিবাদটা গিয়ে লেগেছে মুসলমান সমাজের মনে। মুসলমানরা ভাবছে হিন্দুরা কেমন হিংসুটে, আমরা কিছু পেলে তাদের গা জ্বালা করে। তারা যে পেয়ে এসেছে দেড়শ' বছর ধরে তার বেলা! বাংলাদেশের দশা দেখে আমি তার নাম দিই 'হার্টব্রেক হাউস'। অহরহ আমাকে ব্যথা দিত তার অপ্রকৃতিস্থতা। আমার চোখের সুমুখেই ভাবের দিক দিয়ে ভাগ হয়ে যাচ্ছিল আমার দেশ। ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছিল তখন থেকেই বারো বছর পরে যা ফলল সেই ফসলের। সোনার বাংলা অবশেষে মুষল প্রসব করল। যখনকার কথা বলছি তখন প্রসববেদনার অনেক দেরি, কিন্তু গর্ভযন্ত্রণা আরম্ভ হয়ে গেছে। শুধু বোঝা যাচ্ছে না সেটা কিসের পূর্বাভাষ।"

বিজয়মাধব বললেন, "আমি তো ধরে নিয়েছিলুম ওটা ইংরেজের চালবাজি।"

"ছেড়ে দিন ওসব ইতিহাসের উপরে।" সুলক্ষণ উদাসীনের মতো বললেন, "শুধু মনে রাখলেই হবে যে, বাংলাদেশ বলে যে সত্তাটি ছিল সেটি দেখতে দেখতে হয়ে দাঁড়াল 'হার্টব্রেক হাউস'। কারো মনে সুখ রইল না। চারদিকে এমন অপরিসীম সৌন্দর্য! যাকে অমর করে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। অথচ মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক আপনার লোকের মতো থাকছে না, পরের মতো হয়ে যাচ্ছে। একে অমর করে দেবে কে? এটা কি অমর করে দেবার মতো জিনিস? এই হার্টব্রেক হাউসে বাস করে কে কী সৃষ্টি করতে পারে যা অমর হবে? এক যদি পদ্মাকে নিয়ে, পল্লীপ্রকৃতিকে নিয়ে, বাউলদের নিয়ে পড়ে থাকি তো অমর সৃষ্টি সম্ভবপর। আর নয়তো নরনারীপ্রেম নিয়ে।"

"আমরা পাঠকরা লেখকদের এসব সমস্যার ধার ধারিনে।" বললেন বিজয়মাধব।

"আপনারা ফেলবেন কড়ি, মাখবেন তেল। কিন্তু তেল যে আসে কোনখান থেকে সে খবরে আপনাদের কাজ নেই।" সুলক্ষণ একটু হাসলেন। "না থাকাই ভালো। আমার তখন সব থেকেও চিত্তপ্রসাদ নেই। একটা প্রচ্ছন্ন ব্যথা আমাকে ভিতরে ভিতরে অপ্রসন্ন করে
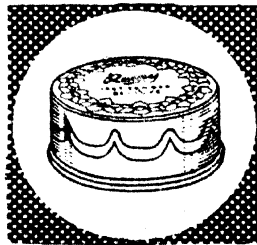
রাখে। বিশেষ কারো উপরে নয়। ল্যান্ডরের মতো আমারও মটো হলো—
"I strove with none, for
none was worth my strife,
Nature I loved and,
next to Nature, Art:"
এই যখন আমার মনের অবস্থা তখন হঠাৎ একদিন আমার নামে একখানি চিঠি এলো। খুলে দেখি উপরে লেখা আছে 'সেনসর' ও 'পাশ' করা হয়েছে।"

বিজয়বাবুর চক্ষু চড়কগাছ। "আপনার চিঠি সেনসর করে! এতবড় ধৃষ্টতা!"

"না করে উপায় কী? ওটাই জেলখানার নিয়ম।" সুলক্ষণ মুচকি হাসলেন।

"বলেন কি! জেল থেকে চিঠি!" বিজয়বাবু স্তম্ভিত।

"যেমন তেমন জেল নয়। স্পেশ্যাল জেল। নামটা স্মরণ নেই। খুব সম্ভব হিজলী। সেনসর করেছিলেন কমান্ডান্ট কি অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডান্ট। ইংরেজীতে। চিঠিখানা কিন্তু বাংলায় লেখা। কোনোখানে কাটাকুটির চিহ্ন ছিল না। বোধহয় আপত্তিকর শব্দ বা বাক্য ছিল না। লেখিকা—" সুলক্ষণ আবার মুচকি হাসলেন।

"লেখিকা!" বিজয়বাবু শুনে থ।

"লেখিকা আমার সম্পূর্ণ অচেনা। কোনো দিন তাঁর নামটা পর্যন্ত শুনিনি বা দেখিনি। আপনাকে আমি তাঁর পদবী বলব না। নাম মণিকা। আর যা আপনি জানতে চাইবেন তা আমারও অজানা। কত বয়স। কুমারী না সধবা না বিধবা। কয়েদী না ডেটিনিউ। কোন্ মামলার সঙ্গে জড়িত। না নিছক সন্দেহের সূত্রে গ্রেপ্তার। তবে এটা ঠিক যে তিনি সন্ত্রাসবাদী বলে গণ্য। জেলটা সন্ত্রাসবাদী রাজবন্দী বা বন্দিনীদের। ওখানে অহিংসাবাদীদের রাখা হতো না।" সুলক্ষণ গম্ভীর হয়ে গেলেন।

"আমি ভাবছি কোন্ মণিকা। দত্ত? ঘোষ? চট্টোপাধ্যায়? আমিও তো এককালে সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে যোগ রেখেছি। তবে জড়িয়ে পড়িনি। আমার মটো হলো ধরি মাছ না ছুঁই পানী।" বিজয়মাধব হো হো করে হাসলেন।

"পদবী আমি আপনাকে বলছিনে, ভাই। আমার কাছে ওই জিনিসটি আশা করবেন না। পাছে টের পান সেই ভয়েই তো মালীকে ডেকে ঘুড়িটা চালান করে দিলুম। এতক্ষণে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কে জানে হয়তো হাতের লেখাও আপনার চেনা। তবে সে ক্ষেত্রে আমার আপত্তি নেই। চান দেখতে যে ক'টা টুকরো বাঁচিয়েছি? নিন। দেখুন।" সুলক্ষণ বাড়িয়ে দিলেন।

"না। চিনতে পারছিনে। চেনা কি সম্ভব পঁচিশ বছর বাদে? তা ছাড়া আমি যাঁদের কথা ভাবছি তাঁদের সঙ্গে চিঠি লেখালেখি ছিল না।" বিজয়বাবু ' দিলেন।

চিঠিখানা রাজনীতিবর্জিত। নিছক সাহিত্যিক প্রসঙ্গে ভরা।" সুলক্ষণ স্মৃতির সলিলে ডুব দিলেন। "এত ভালো মেয়ে, সাহিত্য এত ভালো বোঝেন, তবু বন্দিনী! আমার বই তিনি পড়েছেন। আরো পড়তে চান। কাহিনীটা শেষ না করে তিনি শান্তি পাচ্ছেন না। নায়ক নায়িকার কি মিলন হবে? কেন আমি অমন নিষ্ঠুর? মিলনের তো বাধা তেমন কিছু নেই। কাহিনীটা কি বানানো? না সত্যিকার? সত্যি ওরা আছে নাকি? বাকী খণ্ডগুলো যেন আমি চটপট লিখে ফেলি। তাঁর নিজের শরীর ভালো নয়। যদি না বাঁচেন তা হলে আফসোস থেকে যাবে।"

"এইবার বুঝেছি কোন্ মণিকা।" বিজয়মাধব বিজয়ীর মতো ভঙ্গীতে তাকালেন। ও মণিকা ঘোষ। যার কালাজ্বর হয়েছিল।"

"উঁহু। হলো না। হলো না।" হেসে মাথা নাড়লেন সুলক্ষণ।

"তা হলে মণিকা দত্ত। যার হয়েছিল অ্যানিমিয়া।" আঁধারে ঢিল ছুঁড়লেন বিজয়বাবু। "অ্যানিমিয়া থেকে দাঁড়ায়—"

"নেতি। নেতি। তা হলে বাকী থাকেন মণিকা চট্টোপাধ্যায় তো? আমি আগেভাগেই বলে রাখছি যে তিনিও নন।" সুলক্ষণ বিজয়কে পরাজয় করলেন।

'তা হলে কে? যাক, আপনি বলে যান। বাকীটা শুনি। আর কি কি ছিল চিঠিতে? ইংরেজের অত্যাচারের কোনো সাঙ্কেতিক আভাস? আপনার কাছে কোনো সাঙ্কেতিক প্রশ্ন? ভাষাটা সোজা বাংলা না একটু ঘোরালো?" জেরা করলেন বিজয়।

"অতি সহজ ও সরল বাংলা। কোনো ছলচাতুরী নেই। ভাবতে অবাক লাগে ইংরেজরা কোন্ দোষে বন্দী করতে গেল অমন একটি নিরীহ মেয়েকে। কি ও'র অপরাধ? নিশ্চয়ই কেউ ভুল খবর দিয়েছে। এমনও হতে পারে যে তিনি সরল বিশ্বাসে কাউকে আশ্রয় দিয়েছেন বা নিষিদ্ধ বইপত্র রেখেছেন। আমার কী! তবু মনে হলো আমিও তো গভর্ণমেন্টকে চিঠি লিখে বলতে পারি যে, মেয়েটি ভালো। তাঁর কেসটা যেন সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা হয়। যেন তাঁর স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখা হয়।" সুলক্ষণের স্বর করুণ হয়ে এলো।

"লিখলেন তা হলে অমন একখানা চিঠি?" অধীর হলেন বিজয়মাধব।

"শতং বদ মা লিখ। লিখলে হয়তো আমাকেই কৈফিয়ৎ দিয়ে মরতে হতো কেন আমার সন্ত্রাসবাদীদের উপর এত দরদ। তাঁরা হয়তো বিশ্বাসই করতেন না যে আমার দরদটা বিশুদ্ধ মানবিক। কে জানে হয়তো খুব খারাপ রেকর্ড তাঁর। হয়তো রিভলবার রাখাঢাকার ব্যাপার। পুলিশে তো আমার শত্রু বড় কম ছিল না। কেন ওদের হাতে একটা হাতল দিই?" সুলক্ষণ আপনার হয়ে জবাবদিহি করলেন।

"বুঝেছি।" বিজয়বাবু ব্যঙ্গ করলেন, "আপনার মটো চাচা আপনা বাঁচা। ছেড়ে দিন বড় বড় বুলি। তারপর?"

"তারপর সুযোগের অপেক্ষায় রইলুম। যদি কোনো ইংরেজ বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়, যার কাছে কথাটা পাড়া যায়। ওদের মধ্যে উদারচরিতের অভাব ছিল না। যাঁদের কাছে বসুধৈব কুটুম্বকম্। দু'পক্ষে একটা কমন গ্রাউন্ডও তো ছিল। ফাসিজমের উপর ঘৃণা। হিটলার দিন দিন উদ্ধত হয়ে উঠছিল।" সুলক্ষণের মনে পড়ে যাচ্ছিল সে কথা।

বিজয়মাধব অধৈর্য হয়ে বললেন, "মণিকার চিঠির জবাব দিলেন? না তখ্ বেলাও চাচা আপনা বাঁচা?"

"দিলুম বইকি।" সুলক্ষণ হেসে বললেন, "তার বেলা ধরি মাছ না ছুঁই পানী। যাতে সেনসর না হয় সেইজন্যে অতি সন্তর্পণে লিখলুম। পুরোদস্তুর সাহিত্যিক চিঠি। লিখলুম লেখকের সৃষ্ট চরিত্রের উপর লেখকের জোর খাটে না। তারা পুতুলখেলার পুতুল নয়। তারা স্বাধীন মানুষ। তারাই লিখিয়ে নেয়, লেখককে স্বাধীনতা দেয় না। তারা যদি মিলতে না চায় আমি কি করে মেলাব? জোর করে? ওরা যখন বিদগ্ধ পাঠকের দরবারে নালিশ করবে তখন আমি যে হেরে যাব। তার চেয়ে ওদের খুশিমতো ওদের বাঁচতে দেওয়াই ভালো নয় কি? মিলবে না হয়তো, কিন্তু বাঁচবে। ওরা যদি বাঁচে তো ওদের ভিতর দিয়ে আমিও বাঁচব। বোন, আপনাকেও বাঁচতে হবে। কাহিনী যত দীর্ঘ হবে তার চাইতেও দীর্ঘ হবে আপনার জীবন। আরো, আরো দীর্ঘ।"

"এই? আর কিছু নয়?" বিজয়বাবু নিরাশ হলেন।

"না। আর কিছু নয়। তিনি আমার কাছে একটা মেসেজ পাঠিয়েছিলেন। আমিও তাঁর কাছে একটা মেসেজ পাঠালুম। এর চেয়ে বেশি হলে হয়তো মেসেজটাই পেঁৗছত না। পেঁৗছল যে, তাই বা কেমন করে বলি? পরে আর কোনো চিঠি পাইনি। খুব অস্পষ্ট মনে পড়ে কোথাও যেন পড়েছিলুম ওই নামের একটি মহিলার মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু তিনিই কি না অনুসন্ধান করিনি। রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়। সন্ত্রাস-বাদের অবসান ঘটে। নতুন নতুন সমস্যার উদয় হয়। যুদ্ধ, মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক তাণ্ডব, তারই মাঝখানে এক সময় অগাস্ট মাসের বিদ্রোহ। মণিকাকে আমি ভুলে যাই। অনেক, অনেক বছর পরে সেকালের এক রাজবন্দিনীর সঙ্গে কেমন করে আলাপ হয়ে যায়। জিজ্ঞাসা করি তিনি চিনতেন কি না মণিকা বলে কোন রাজবন্দিনীকে। পদবীটাও বলি। তিনি চিনতেন। তখন আমি জানতে চাই মণিকা এখন কোথায় আছেন, কেমন আছেন। ভদ্রমহিলা তো বিস্ময়ে বিমূঢ়। মণিকা কবে মারা গেছে! টি বি হয়েছে দেখে ওরাই ছেড়ে দেয়। সারে না। দিন দিন বেড়ে যায়।" সুলক্ষণের কণ্ঠ রোধ হলো আবেগে।

"সত্যি! বড় দুঃখের বিষয়।" সমবেদনা জানাতে গেলেন বিজয়।

"ভদ্রমহিলার ধারণা খবরটা যথাকালে আমার কানে পেঁৗছেছে। মণিকা নাকি আমার কথা বলতেন। চিঠিও নাকি লিখেছিলেন আমাকে। উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রতীক্ষা করছিলেন আমার ধারাবাহিক উপন্যাসের পরিণতি। কাহিনীটার শেষ জেনে যেতে পারলেন না। সত্যি, এর মতো দুঃখের বিষয় কী হতে পারে!" সুলক্ষণের কাছে।

বিজয়মাধবকে এবার চিন্তান্বিত মনে হলো। সুলক্ষণ গাঢ়স্বরে বলতে লাগলেন, "একটা ইংরেজী কবিতা পড়েছিলুম। কার লেখা মনে নেই। অন্ধকার রাত্রে অকূলে সমুদ্রবক্ষে জাহাজরা চলেছে। কোথাকার এক জাহাজ কোথাকার এক জাহাজকে দূর থেকে সিগনাল করে। সিগনালের উত্তরে সিগনাল পায়। তার পর দুই জাহাজ দুই দিকে অদৃশ্য হয়।"

এর পর নীরবতা।

হঠাৎ নীরবতা ভঙ্গ করলেন বিজয়-মাধব। "আমি জানি এ কোন্ মণিকা।"

"আপনি তাঁকে জানতেন? সত্যি?" অপ্রতিভ হলেন সুলক্ষণ।

"জানব না? মণিকা দাশগুপ্ত আমার দিদির স্কুলের ছাত্রী। বেঁচে থাকলে আমারি বয়সী হতো। বিয়ে হয়ে থকলে এতদিনে তারও নাতি হয়ে থাকত। আহা, বেচারি।" বিজয়বাবুর চোখে নাতি না হওয়াটাই বেচারিত্ব।

এবার স্বীকার করতে হলো সুলক্ষণকে। "কিন্তু এত যদি জানেন তবে এটাও আশা করি জানেন কেন তাঁর বিয়ে হলো না, কেন ওঁকে আটক করা হলো।"

"জানি বইকি।" বিজয়মাধব এবার শ্রোতা নন, বক্তা। "তবে খুঁটিনাটি বলতে পারব না। ততদিনে সেও আর আমার দিদির স্কুলের ছাত্রী নয়, আমিও বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে অধ্যাপনা উপলক্ষে মধ্যভারতে। শুনেছি যার সঙ্গে ওর বিয়ের সব ঠিক ছিল সে ছেলেটা পুলিশে চাকরি নেয়। তাও স্পেশাল ব্রাঞ্চে। মণিকা বেঁকে বসে। তার আগেই সে সন্ত্রাসবাদীদের বিশ্বাসভাজন হয়েছে। দলভুক্ত না হোক। বিয়ে করলে তার জানা সীক্রেট তার স্বামী যেমন করে হোক বার করে নিতই। তার ফলে স্বামীর হয়তো প্রমোশন, কিন্তু সন্ত্রাস-বাদীদের বিপদ আর মণিকা বেচারির প্রাণসংশয়। ওরাই তাকে খতম করত। অত কথা না বলে সে শুধু বলে সে দেশের জন্যে চিরকুমারী হতে চায়।"

এবার শোনার পালা সুলক্ষণের। তিনি উৎকর্ণ হয়ে রইলেন।

"ওর দাদারাও সন্ত্রাসবাদী। পুলিশের পক্ষে ওকেও সন্দেহ করা স্বাভাবিক। ওর বরই ওকে ধরিয়ে দেয়। মণিকা ওকে যে সব চিঠিপত্র লিখেছিল তার এক জায়গায় কী একটা বেফাঁস উক্তি ছিল। কোথায় কী যেন লুকোনো রাখার সঙ্কেত। প্রত্যাখ্যাত পুরুষ সেটা উপর-ওয়ালাদের দেখিয়ে প্রতিশোধ নেয়। হতাশপ্রেমিকের কীর্তি। তার পরে কীর্তিমান অন্য একজনকে বিয়ে করে।" বলতে বলতে বিজয়ের চোখে আগুন জ্বলে উঠল।

"তার পর?" বিজয়মাধবই শেষ করলেন, "তারপর সন্ত্রাসবাদীরাও প্রতি-শোধ নেয়। বরাবরের মতো ইনভ্যালিড বানিয়ে দেয়। তাতে মণিকার কী! সেও তো শুকিয়ে ঝরে পড়ে।"
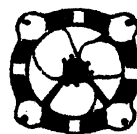
নিঃসঙ্গ এ-দেশের মানুষ। সব মেয়ের স্বামী মেলে না, অনেক পুরুষ অবিবাহিত থাকেন; আর তরুণদের মধ্যে সম্প্রতি যদিও প্রজননপ্রিয়তা দেখা যাচ্ছে, প্রৌঢ় দম্পতিরা অনেকেই নিঃসন্তান। আর সন্তানের সঙ্গেও, আমাদের অর্থে, ঘনিষ্ঠতা এদের অভিপ্রেত নয়; শিশুদের পক্ষে যা প্রয়োজনীয় ও কল্যাণকর তা ষোলো ছেড়ে আঠারো আনা করা হবে, কিন্তু আমরা যাকে আদর বলি, সেটা নিষিদ্ধ। নিচের ঘর থেকে ভেসে আসছে বয়স্কদের হাস্যালাপ, পানভোজন ও নৃত্যগীতের শব্দ, আর বিনিদ্র শিশু একা শুয়ে-শুয়ে ভাবছে কখন তার সুগন্ধি মা তাকে ঘুমের আগে চুমু খেয়ে যাবেন—এই ছবিটি পশ্চিমী সাহিত্যের ততটাই অঙ্গ, যতটা শরৎচন্দ্রে মাতৃস্নেহের ফেনিলতা। বঙ্গরমণীরা এটাকে হয়তো নিষ্ঠুর বলবেন, কিন্তু এইভাবে লালিত প্রতীচ্য মানুষই আধুনিক জগতের স্রষ্টা ও বিজেতা, সে-কথা ভুলে গেলে চলবে না। অবশ্য মার্কিন দেশের অন্যতম প্রবাদ এই যে পিতামাতারা সন্তানের সেবার জনাই বেঁচে থাকেন, শিশুদের যত্ন বলতে যা বোঝায় তা এখানে ত্রুটিহীনভাবে বিধিবদ্ধ, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখে এমনও ধারণা হ'তে পারে যে, অষ্টবর্ষীয় পীট অথবা জুলিয়ার ইচ্ছা অনুসারেই মা-বাবারা বেছে নেন কোনো বিশেষ মার্কার ভটা অথবা মোটরগাড়ি। কিন্তু এই সব-কিছুরই পিছনে আছে সেই নিষ্কম্প শৃঙ্খলা, যা সারা প্রতীচীর জীবনধর্ম: সন্তান যাতে সুস্থ, সক্ষম ও স্বাবলম্বী হ'য়ে ওঠে, সব প্রযত্ন প্রথম থেকে সেই দিকে ধাবিত। মা-বাবার সঙ্গে বেশি মেলামেশার স্থান নেই এই ব্যবস্থায়; ছেলেমেয়েরা বড়ো হয় আবাসিক বিদ্যালয়ে, বা যদি বাড়িতেও থাকে, দিনমান তাদের স্কুলেই কেটে যায়; 'বাড়ি' নামক ব্যাপারটির অনেকখানি দায়িত্ব সর্বসম্মতিক্রমে বিদ্যালয়গুলিতে অর্পিত হয়েছে। ছুটিতে পুনর্মিলনও নিয়ম হিশেবে ধ'রে নেয়া যায় না, কেননা গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্পও অগুনতি। এ-ই হ'লো শৈশবকালীন বিধান; তারপর সন্তান যেই যৌবনে পা দিলে, তখনই মা-বাবার সঙ্গে তার বসবাস ফুরোলো। যদি সে কর্মজীবনে প্রবেশ করে, তা হ'লে, অবিবাহিত হ'লেও, সে আলাদা থাকবে; আর যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ নিতে চায়, তা হ'লেও তাকে অন্য কোনো শহরে পাঠানো সুপিতার কর্তব্য। পুত্রকন্যা সাবালক হ'লেই সব অর্থে স্বতন্ত্র হ'লো, স্বীকৃত হ'লো তাদের স্বাধীন সত্তা; তারপর যা থাকে তা স্বাভাবিক আত্মীয়তাবোধ, কিন্তু আমাদের ধরনে সংসক্তি কল্পনাতীত। পারিবারিক ঘনিষ্ঠতার অভাবে এমনও হ'তে পারে যে ছেলেমেয়েদের স্নেহের আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত থেকে যায়; আর সেইজন্যই, আজকাল অনেকে বলছেন, এ-দেশে কৈশোরক অপরাধপ্রবণতার প্রাদুর্ভাব ঘটছে। তেমনি, বন্ধনহীন ব'লেই, এরা বেরিয়ে পড়তে পারে খেয়ালখুশিমতো পৃথিবীর পথে, কোনো সজল চোখ বা নির্ভরশীল আত্মীয় এদের পিছনে টানে না, কেউ যদি চায় বোর্জিলে বা বালীদ্বীপে অবশিষ্ট জীবন কাটাতে, সেই ইচ্ছে চরিতার্থ করার হার্দ্য কোনো বাধা নেই। শুধু আর্থিক হিশেবে নয়, মনের দিক থেকেও স্বাধীন এরা। 'যে যার পায়ে'—এই হ'লো প্রতীচীর মূলনীতি।

যে-কোনো সমাজে সব ব্যবস্থা পরস্পর-সম্পৃক্ত। প্রতীচীর অন্যান্য লক্ষণ চিন্তা করলে মুহূর্তে বোঝা যায় কেন এখানে স্বনির্ভরতা আশৈশব শিক্ষণীয়। পার্থিব জীবনে কৃতী হ'তে হ'লে ঐ গুণটি চাই, কষ্টের অভ্যাসও প্রয়োজন। এক ইংরেজ কবি আমাদের নিমন্ত্রণ করলেন লণ্ডনে, তাঁর কিশোর পুত্র সেখানে উপস্থিত। আমি লক্ষ করলুম, পিতা একটু বিশেষ যত্ন নিয়ে পুত্রকে খাওয়ালেন—'ওটা আর-একটু নাও, ওয়াইনটা বরং আর না-খেলে, ট্রেনে হয়তো ঘুমিয়ে পড়বে।' আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার ছেলে পাব্লিক স্কুলে পড়ে, এখনই ফিরে যাবে সেখানে—আর ওদের স্কুলে খাওয়া বড্ড খারাপ।' 'তা-ই নাকি?' 'ব্যাপারটা হ'লো—ছেলেবেলায় যারা কষ্ট করে, তারাই বড়ো হ'য়ে স্থাপন করে উপনিবেশ, আমাদের পাব্লিক স্কুলগুলিতে এই ধারণা এখনো চলছে,' ব'লে একটু হাসলেন আমাদের নিমন্ত্রণকর্তা। তাঁর এই কথাটিতে আমি অনুভব করলুম প্রতীচীর চরিত্রের এমন একটি দিক, যা আমাদের পরিচিত হ'লেও স্মরণযোগ্য। তিন ভাই-বোনের মধ্যে একজন অস্ট্রেলিয়ায়, আর-একজন ভারতে, আর বোন বিয়ে ক'রে চলে গেছে মণ্ট্রিয়ালে—এদের পক্ষে সামান্য এ-রকম ঘটনা। পরস্পরে ক-বার দেখা হয় জীবনে? বা বৃদ্ধ পিতামাতা ক-বার দেখতে পান সন্তানদের? কিন্তু প্রত্যেকে যে সম্পন্ন জীবন পেয়েছে সেটাই বড়ো কথা, এবং তার জন্য অন্য দিকে ত্যাগ করতে এদের আপত্তি নেই।

প্রথম যখন পিট্সবার্গে গিয়েছিলুম, কলেজের এক কর্মিণী আমার নির্দেশমতো কিছু বাসনপত্র আমাকে দিতে এলেন। 'ঠিক আছে সব?' 'মনে তো হচ্ছে।' 'আর-কিছু দরকার হ'লে বলবেন—You must speak up.' এ-দেশে শোনা যে-সব উক্তি আমার মনে গ্রথিত হ'য়ে আছে, এটি তার অন্যতম। কেউ কোনো প্রয়োজন অনুমান ক'রে নেবে না—সে-রকম সময় কারো নেই, অভ্যেসও নেই—সব একেবারে খোলাখুলি বলতে হবে। মার্কিনীরা অত্যন্ত অতিথিবৎসল, এদের পক্ষে দেখাশোনা মানেই আহারে নিমন্ত্রণ, ব্যবসায়িক নিয়োগও অনুষ্ঠিত হয় লাঞ্চে, বা অন্তত পানশালায় বা কফিখানায়। পক্ষান্তরে, কোনোরকম বিশৃঙ্খলা যা ঘটাতে পারে, তা কেউ কল্পনায় স্থান দেবে না; দিনের প্রতিটি ঘণ্টা এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত যে স্বল্প আতিথেয়তার জন্যও অগ্রিম ব্যবস্থা প্রয়োজন। বাড়িতে অবেলায় কোনো অতিথি এলে তাকে যে-কোনোরকমে দুটো ভাত ফুটিয়ে দেয়া—এটা হয়তো বঙ্গমহিলাদের পক্ষে এখনো অসাধ্য হয়নি কিন্তু এখানে তা সম্ভবপরতার পরপারে; নির্দিষ্ট সময়

পেরিয়ে গেলে, অতিথি অভুক্ত কিনা তা জিগেস করাও অবান্তর; তাঁকেই মুখ ফুটে বলতে হবে তিনি বুভুক্ষু, তখন কোনো আহারস্থলের নিশানা পাওয়া যাবে। বলা বাহুল্য, এর কারণ উদারতার অভাব নয়, অনমা বিধিবদ্ধতা। মার্কিনীরা যাকে বলে 'টাইট স্কেজুল', মানে, নিবিড় কর্মসূচি, তা এখানে অনেকেরই নিত্যসঙ্গী; হঠাৎ এক ঘণ্টা সময় ফাঁকা পাওয়া গেলে কোনো বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দিয়ে আসার উপায় নেই, বা আগে কিছু না-জানিয়ে কোনো প্রিয়জন কখনো টোকা দেবে না দরজায়; বাড়িতে কাউকে খেতে বলতে চাইলে কুড়ি দিনের আগে কোনো তারিখ পাওয়া নাও সম্ভব হ'তে পারে। সকলেই এতদূরে পর্যন্ত ব্যস্ত ও সচল যে সবকিছুই আয়োজিত ও প্রত্যাশিত হওয়া চাই, কোনো স্থান নেই দৈনন্দিন জীবনে আকস্মিকের।

এবং এদের সমাজে প্রতিযোগিতাও তীব্র। অবশ্য জীবিকার জন্য কাউকেই ভাবতে হয় না, কিন্তু যে-কোনো ক্ষেত্রে উন্নতি করতে হ'লে, বা বন্ধু পেতে হ'লে, বা এমনকি বিবাহের ব্যাপারে মেয়েদের দিক থেকে, সব সময় থাকতে হবে সজাগ, সচেষ্ট ও উদ্যোগী। যে-মানুষ লাজুক, বা বেশি আত্মসচেতন, বা অত্যন্ত খুঁতখুঁতে যার স্বভাব, তাকে 'পেছিয়ে' পড়তে হয়। মেয়েদের কাগজে প্রশ্ন বেরোয়, 'আমার বয়স ষোলো, চেহারা মোটামুটি ভালো, কিন্তু এখনো আমার কোনো ছেলে-বন্ধু জুটলো না। আমার কী করা উচিত?' উপদেশদাত্রীর উত্তর: 'তুমি বোধহয় অমিশুক, ছেলেদের সামনে আড়ষ্ট হ'য়ে থাকো, তাদের কথাবার্তায় যোগ দিতে পারো না। তোমাকে এই সংকোচের ভাবটা কাটিয়ে উঠতে হবে।' ধরনটা য়োরোপেও একই, কিন্তু ইংলণ্ডে এখনো একটি শ্রেণী জন্মসূত্রে কিছু সুবিধে পেয়ে থাকেন, তাঁদের পক্ষে মনোহরভাবে লাজুক হওয়া সম্ভব; কিন্তু আমেরিকার শ্রেণীভেদহীন উন্মুক্ত সমাজে প্রতিযোগিতার আয়তন এমন বিপুল যে তার প্রভাব খুব অল্প লোকই কাটাতে পারে। সব মিলিয়ে মনে হয় যে মার্কিনী সমাজ দক্ষ ও গুণীজনের পক্ষে উত্তম, কেননা তাঁরা অন্যদের দ্বারা আকাঙ্ক্ষিত, তাঁদের জন্য দিকে-দিকে দরজা খোলা রয়েছে; কিন্তু যারা সাধারণ লোক—আর তারাই অসংখ্য,—তারা সমস্ত জৈব তৃপ্তির অধিকারী হ'য়েও এড়াতে পারে না নিঃসঙ্গতা, আর হয়তো ভিতরে-ভিতরে এক ধরনের ব্যর্থতাবোধ।

এর স্পষ্টতম ছবি মেয়েদের জীবনে দেখা যায়। আধুনিক প্রতীচীর একটি বৈশিষ্ট্য হ'লো নিঃসঙ্গ নারী। দামি রেস্তোরাঁয় মহিলা এসেছেন প্রকাণ্ড কুকুর নিয়ে, জন্তুটিকে সোফার উপর পাশে বসিয়ে নিজেও খাচ্ছেন তাকেও খাওয়াচ্ছেন; বা নেহাৎই সময় কাটাবার জন্য তিন প্রৌঢ়া নিঃশব্দে ব'সে আছেন পার্কের বেঞ্চিতে—য়োরোপের রাজধানীগুলিতে এ-রকম দৃশ্য বিরল নয়। কিন্তু এই ব্যাপারটিও আমেরিকায় যেন চরমে পৌঁচেছে। বিয়ে হয়নি, বা বিধবা বা পতিবিচ্ছিন্না, বা সধব হয়েও আর্থিক সাচ্ছল্যভাবশত অনেকখানি অবসর যাঁদের আছে—এমন মেয়েরা এই দেশের নাগরিকসংখ্যার একটি অগৌণ অংশ। এঁরা ছিলেন না সেই কবির কল্পনায়, যাঁর প্যারিসে নানা ধরনের নিঃসঙ্গতা বিরল এক-একটি পুষ্পের মতো বিকশিত; এঁরা বিশেষভাবে এই শতকের সৃষ্টি। যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র এঁরা ছড়িয়ে আছেন, ভালো-ভালো হোটেলে ও অ্যাপার্টমেন্টে; জানলা থেকে দেখা যায় চওড়া নদী বা প্রশান্তসাগর; ঘরে আছে কাশ্মীরি কার্পেট, ড্রেসডেনের চীনেমাটি, রুশীয় খুন্ট; ভাঁড়ারে আছে কালো, সবুজ, জুঁইগন্ধি ও গোলাপগন্ধি চা, এবং বাছা-বাছা হিস্পানি ও ফরাশি মদিরা; আছে বলতে গেলে সবই, কিন্তু হয়তো বা মনের কোনো অবলম্বন নেই। নিঃসন্তান, বা সন্তানেরা বড়ো হ'য়ে দূরে স'রে গেছে, বিত্ত পেয়েছেন স্বামী অথবা পিতার, গৃহকর্ম বা উপার্জনের দাবি নেই; ফ্যাশনের অনুশীলন, বিবিধ বিনোদ, মাঝে-মাঝে য়োরোপে বা জগৎজোড়া ভ্রমণ—এ-সবের পরেও উদ্বৃত্ত থাকে সময়। এই অবস্থায় সার্থকতা খুঁজে পান শুধু তাঁরা, যাঁরা গুণী বা ব্যক্তিত্বশালিনী বা কোনো আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত; এ-রকম কোনো-কোনো মহিলা আমার পক্ষে স্মরণীয় হ'য়ে আছেন। কিন্তু অন্যেরা—যাঁরা নিরুপায় হ'য়ে সংগীত অথবা সাহিত্যের চর্চা শুরু করেন, বা চেষ্টা করেন 'বুদ্ধিজীবী' হ'তে, তাঁদের বেদনা জানি না কোনো মার্কিনী কবি ব্যক্ত করেছেন কিনা। এঁরা স্থাপন করেন প্রতি জনপদে মহিলা-ক্লাব; যথাযোগ্য দক্ষিণা দিয়ে বক্তৃতা শোনেন ট্যাং শিল্প, সামোয়া দ্বীপের সমাজব্যবস্থা, মধ্য-প্রাচীর ইতিহাস ও ভারতীয় বৈষ্ণব তত্ত্ব বিষয়ে; যেমন তৃপ্তিহীন এঁদের জ্ঞানের পিপাসা, তেমনি জ্ঞানের সিকি-দুয়ানিগুলো এঁদের জীবনে অর্থহীন। এঁরা অনেকেই কবিতা লেখেন, নিজের খরচে বই ছাপান, স্থানীয় কোনো মফস্বলি কাগজে হয়তো এঁদের সচিত্র জীবনীও বেরোয়; কিন্তু কবিতা লেখার চেষ্টা থেকে এঁদের বিরত করার মতো কোনো হিতৈষী বন্ধু এঁদের জোটে না। যে-কোনো প্রকার বুদ্ধিজীবী চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে এঁদের; যে-কোনো প্রকার খ্যাতিমানের সঙ্গে দু-দণ্ড কথা বলার চেষ্টায় এঁরা বহু ত্যাগ স্বীকার ক'রে থাকেন। এঁরা স্বাভাবিক শিকার সেই সব সাহিত্যিকদের, যাঁদের বিবেকের বালাই অল্প এবং জীবিকার নিশ্চয়তা নেই। সে-রকম যোগাযোগ ঘটলে, ক্ষতিস্বীকার ক'রেও, এঁরা তবু একজন মানুষের সঙ্গলাভ করেন। কিন্তু তাও সব সময় ঘটে না; তখন থাকে দিনে পাঁচবার আহার, তা হজম করার জন্য পদচারণা ও সমুদ্রস্নান, সচিত্র পত্রিকাগুলোর পাতা ওল্টানো, যেখানে যা-কিছু 'ঘটছে' সাধ্যমতো সেগুলোতে যাওয়া, নতুন বেশবাস, নতুন গৃহসজ্জা—এই সব। কেউ যাতায়াত শুরু করেন হিন্দু সন্ন্যাসীর কাছে, কেউ হন রুডলফ স্টাইনারের ভক্ত; কেউ বা শিক্ষা নিতে যান জেন তত্ত্বে। কিন্তু অবশেষে সেই নিরালম্ব নিজের কাছেই ফিরে আসতে হয়।

নু্য ইয়র্কে, যেদিন এপ্রিল ছড়িয়ে দেয় রোদ্দুর, পার্কের বেঞ্চিগুলো বৃদ্ধায় ভ'রে যায়। বৃদ্ধও থাকেন, কিন্তু আমার চোখে যে-ছবি আছে তাতে মহিলাদেরই আধিক্য। দেখে মনে হয় না এঁদের অবস্থা সচ্ছল, গায়ের কোটটি যেন পুরোনো, খুব সম্ভব শস্তা পাড়ায় একখানা মাত্র ঘরে এঁদের বাসা। ছেলেমেয়ে, নাতি-নাৎনি নিয়ে মন্তব্য বিনিময় করেন এঁরা—তারা দূরে আছে—ক্রিসমাসেও সব সময় দেখা হয় না; হয়তো স্বামীদের কথাও ওঠে এক-আধবার—সম্ভবত তাঁরা আরো দূরে। প্রকৃতির দান এই রোদটুকু এঁরা প্রগাঢ়ভাবে ভোগ করেন, কিন্তু আবার হয়তো ছায়া ক'রে আসে, ধারালো হয় বাতাস—তখন উঠে মন্থর পায়ে এঁরা যে যাঁর বাড়ি ফেরেন—সেখানে আছে রান্না, খাওয়া, খাওয়ার পরে বাসন ধুয়ে রাখা; আর-কিছু নেই।

সেবারে যখন জাহাজে যাচ্ছি নু্য ইয়র্ক থেকে লণ্ডন, ভোজনশালায় আমার স্থান পড়েছিলো একটি পাঁচ-আসনের টেবিলে। অন্য চারজনের মধ্যে সকলেই মার্কিনী সকলেই মহিলা, ষাট থেকে তিরিশের মধ্যে তাঁদের বয়স। জাহাজের প্রথা অনুসারে এঁরা নিজ-নিজ নাম বললেন আমাকে, আমাকে বিনিময় করতে হ'লো। এঁরা উপচে পড়ছেন

খুশিতে, এক ঝাঁক পাখির মতো আওয়াজ ক'রে কথা বলছেন, এত আনন্দ শুধু দেশভ্রমণে বেরিয়েছেন ব'লে নয়, পরস্পরকে বন্ধু পেয়েছেন ব'লে। খুব সম্ভব ক্ষণিকের বন্ধুতা—হয়তো য়োরোপে পৌঁছেই বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়বেন এঁরা, স্বদেশে ফিরে আর দেখা হবে না, কিন্তু—স্পষ্ট বোঝা গেলো—এই পাঁচটি দিন থেকে এঁরা যতটা সম্ভব সঙ্গসুখ নিংড়ে নিতে বদ্ধপরিকর। খেতে-খেতে অনেকগুলি প্রশ্ন করলেন আমার উদ্দেশে : আমার অনতিদীর্ঘ উত্তরে এঁরা নিরাশ হলেন তা আমার চোখ এড়ালো না। এঁদের আগ্রহ সত্ত্বেও আমি পারলাম না এঁদের সঙ্গে মিশে যেতে—কেননা এঁদের আলাপের যেগুলো বিষয় আমি তাতে স্বভাবত অনুৎসুক,—কেমন যেন প্রক্ষিপ্ত-মতো ব'সে রইলুম। পরের দিন আমার মনে হ'লো যে আমার অনুজ্জ্বল উপস্থিতি এঁদের স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে;—কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন ক'রে এক কোণে একলা একটি টেবিল নিলুম।

মানুষের কাছে মানুষের মতো বাঞ্ছনীয় আর-কিছু নেই। আমাদের দেশের যৌথ পরিবার ভেঙে যাচ্ছে—আর তাতে মঙ্গল হয়নি আমি তা কিছুতেই বলবো না—কিন্তু এখনো প্রায় সকলেরই আছে একটি আত্মীয়মহল, তা সব সময় প্রীতিকর না-হ'লেও অন্ততপক্ষে নিঃসঙ্গতার প্রতিষেধক। তাছাড়া, সময়ের তত ধরাকাট নেই ব'লে, কিছু-না-কিছু বন্ধু-বান্ধব, অন্তত শহরগুলিতে, অধিকাংশেরই জুটে যায়; সংস্থা নয়, পার্টি নয়, বিশুদ্ধ আড্ডা এখনো সপ্রাণ আমাদের মধ্যে। প্রবীণ মহিলারা, মাসি-পিসি দিদিমার ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'য়ে প্রচুর মানসিক তৃপ্তি আহরণ করেন তাও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু, আমরা যা সহজে পাই, আর পাই ব'লে যার মূল্যও হয়তো বুঝি না, তা প্রতীচীর জনসাধারণের পক্ষে অনেক সময়ই দুর্লভ। অসংখ্য সংস্থা ও কলাকেন্দ্র, হাজার ধরনের ক্লাব, বিচিত্র ও বিরাট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি—অনেকের পক্ষে এগুলোই উপায়, যার দ্বারা মানুষের সংসর্গলাভ ঘটতে পারে। অর্থব্যয় ক'রে এগুলোতে যোগ দিলে, কোন বন্ধুলাভের আশা আর সুদূরপরাহত থাকে না। ন্যু ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ক্লাশে আসতেন দুই প্রৌঢ় ও প্রৌঢ়া; কয়েক-দিন তাঁদের দেখলুম পাশাপাশি আসনে ঘনিষ্ঠ হ'য়ে বসতে, যতটা না পড়া শুনছেন তার বেশি দৃষ্টিবিনিময় করছেন নিজেদের মধ্যে; তারপর একদিন ক্লাশের পরে তাঁরা উৎফুল্ল মুখে আমাকে জানালেন যে তাঁরা আজ রাত্রেই ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ছেন—আর ক্লাশে আসবেন না। আমি মনে-মনে তাঁদের মিলিত জীবনকে শুভ কামনা জানালুম।

বিবাহ হ'লো : বর-কন্যা উভয়েরই বয়স ষাট, সত্তর বা এমনকি আশি পেরিয়ে গেছে,—এই কথাটা কলকাতায় ব'সে শুনতে হঠাৎ খুব অবাক লাগে, কিন্তু অল্প একটু তলিয়ে দেখলেই এর অর্থ বুঝতে দেরি হয় না। এ-সব বিবাহের উদ্দেশ্য—আর-কিছু নয়, শুধু একজন সঙ্গী পাওয়া, একজন মানুষ, যার সঙ্গে কথা বলা যাবে, ঝগড়া করা যাবে, বিনিময় করা যাবে স্মৃতি ও বিবিধ বিষয়ে মতামত, বেরোনো যাবে সিনেমায়, বা রেস্তোরাঁয়, বা দেশভ্রমণে। একজন সারাক্ষণের সঙ্গী, যার জন্য সকালে উঠে তৈরি করা যাবে ব্রেকফাস্ট, বা দোকানে গিয়ে পছন্দ করা যাবে জামা-কাপড়, বা যার হাতে হাত রেখে চুপচাপ ব'সে থাকা যাবে পার্কে, জুন মাসের সুদীর্ঘ সন্ধ্যায়। প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ দম্পতিরা এ-দেশে পরস্পরনির্ভর বা পরস্পর-সম্পূর্ণ—আর এ থেকে তাঁরাও বাদ যান না যাঁরা যৌবনে বিবাহ করেছিলেন এবং একবারের বেশি করেননি। পারিবারিক জীবনে ব্যাপ্তি নেই ব'লে, এঁরা মনের দিক থেকেও একে অন্যের অনন্য অবলম্বন হ'য়ে পড়েন; পুত্রকন্যা পরিজনের সঙ্গে যে-পরিমাণে সম্বন্ধ হয় শিথিল, ঠিক সেই পরিমাণে নিবিড় থাকে দাম্পত্য। নিতান্ত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে-ধরনের সংলিপ্ত এখানে নিয়ম, আমরা তাতে এখনো অনভ্যস্ত আছি। আমাদের দেশে প্রৌঢ় স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের পটভূমিকায় পর্যবসিত হন, রঙ্গমঞ্চ অধিকার ক'রে নেয় পুত্রকন্যা ও তাদের সম্পৃক্তজনেরা; প্রতীচ্য মানুষের মনে হ'তে পারে আমাদের দাম্পত্য জীবনে ঘনিষ্ঠতা নেই, আর আমরা হয়তো এদের ব্যবহারে দেখতে পাই আতিশয্য। আসল কথা, এদের বিবাহের মূল কথা হ'লো পারস্পরিক সঙ্গদান ও সঙ্গলাভ, আর আমাদের—সংসারযাত্রা। এদের মধ্যে, বিবাহ যতদিন টিকে থাকে, ততদিন তার আদর্শ হ'লো ঐকান্তিকতা; কর্মস্থলে ছাড়া স্বামী-স্ত্রীর সর্বদা একত্র থাকা বিধেয়; কখনো-কখনো, এমনকি, বিচ্ছেদ হ'য়ে যাবার পরেও, প্রাক্তন দম্পতি বন্ধু হিশেবে সম্বন্ধ বজায় রেখে চলেন। আর আমাদের বিবাহ প্রথম থেকেই বহুজনবেষ্টিত ও বহু কর্তব্যে জটিল, তার একটিমাত্র অংশ হ'লো দাম্পত্য জীবন। এই কথাটাকেই ঘুরিয়ে বলা যায় যে, যেমন সমগ্রভাবে জীবনের প্রতি, তেমনি বিবাহের প্রতি, এদের মনোভাব যৌবনোচিত, যৌবনের প্রকাশে কোনো সংকোচ নেই এদের, এবং তাকে দীর্ঘায়িত করার জন্যও এরা অনবরত প্রয়াসী; আর আমাদের জীবন-নাট্যে একটির বেশি অঙ্ক জোড়ে না যৌবন, আর তখনও তার গোপনতাকেই মনোজ্ঞ ব'লে ধরা হয়।

যাকে বলছি যৌবনোচিত মনোভাব তারই সঙ্গে সম্পৃক্ত এদের তৃপ্তিহীন নূতনত্বপ্রীতি। নতুন ছেড়ে নতুনতরর আকর্ষণে এরা বিপুলবেগে অনবরত ধাবমান। সদ্যতনটা বেশি ভালো না-ই বা হ'লো, সেটা যে আনকোরা, তা-ই যথেষ্ট। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য সামগ্রীর বছর-বছর হালচাল বদলাচ্ছে, যাঁরা ফ্যাশনের তরঙ্গশীর্ষে ভাসমান, সেই মেয়েরা দেখা দিচ্ছেন কোনো ঋতুতে পিঙ্গল এবং অন্য কোনো ঋতুতে হয়তো নীলবর্ণ কেশদাম নিয়ে। হেনরি মিলার আক্ষেপ ক'রে বলেন, 'সারা আমেরিকায় এমন কোনো গৃহস্থ নেই, যে বলতে পারে—'ঐ চেয়ারে আমার পিতামহ বসতেন।' যাকে আমরা প্রাকৃত বাংলায় 'মায়া' বলি, সেই ভাবটি এখানে সম্পূর্ণ অপরিচিত; জিনিশ একটু পুরোনো হ'লেই ফেলে দেয় এরা, না-দিয়ে উপায়ও থাকে না, কেননা জীবনযাপনে সমকালীনের দাবি অমোঘ, বাড়িতেও জায়গা অল্প, এবং আজ কেউ ওয়াশিংটনে আছে ব'লে পরের সপ্তাহে যে ফ্লরিডায় চ[illegible] যাবে না, তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। অগত্যা অনেক স্মৃতিচিহ্ন জঞ্জাল-স্তূপে বিলীন হ'য়ে যায়। ন্যু ইয়র্কে যে-রকম বেগে নূতন অট্টালিকা নির্মিত হয় তা ভারতবাসীর পক্ষে চমকপ্রদ; আমাদের চোখের সামনে একটা বারোতলা একশো ফ্ল্যাটের বাড়ি চার মাসে প্রায় শেষ হ'য়ে এলো। কিন্তু এগুলোকে স্থান দেবার জন্য যে-সব পুরোনো বাড়ি নিশ্চিহ্ন হয়, তার মধ্যে অনেক থাকে স্মৃতিজড়িত বা যশস্বীর সুঘ্রাণে ভরা;—গ্রীনিচ গ্রামের যে-সব সেকেলে বাড়িতে উনিশ ও প্রথম-বিশ-শতকী বিখ্যাত লেখকরা বাস ক'রে গেছেন, তার কয়েকটিমাত্র টিকে আছে এখনো, অন্য-গুলোর ভূমিতে উঠেছে উচ্চ, উজ্জ্বল ও আধুনিক অ্যাপার্টমেন্ট-ভবন। এডগার পো-র কুটিরের উল্লেখ দেখছি তথ্য-পুস্তিকায়, কিন্তু ন্যু ইয়র্কে হুইট-ম্যানের কোনো স্মারণিক আছে ব'লে জানতে পারিনি। কোথায় সেই গরিব কফিখানা যেখানে যুবক ওজস্বী আড্ডা

দিতেন? সেই রেস্তোরাঁ, যেখানে ডীন হাওয়েলস-এর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়? সেগুলো নেই ব'লে ধ'রে নিচ্ছি, কেননা থাকলে তার আওয়াজ শোনা যেতো। এই তথ্যগুলো মনে রাখলে আর অবাক লাগে না, যখন দেখা যায় এই যন্ত্রেশ্বর দেশে ছোটোখাটো মেরামতের কোনো ব্যবস্থা নেই—বা কোথায় আছে তা আবিষ্কার করা গবেষণাসাপেক্ষ। প্র· ব· র একপাটি জুতোর বন্ধনী ছিঁড়ে গেলো, তার সংশোধন কর্ম হিশেবে অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু—অথবা সেইজন্যেই—কাছাকাছি সব ক'টা সম্ভবপর দোকানে ঘুরেও নিষ্ফল হ'তে হ'লো। সিগারেটের লাইটার কোথাও সারানো যায় কিনা, সে-বিষয়ে সন্ধান ক'রেও আমি ব্যর্থ হয়েছি: সারাতে চাই শুনে সদালাপী সিগারেট-বিক্রেতাটি বরং একটু অবাক হ'য়ে তাকিয়েছে আমার দিকে। 'সারিয়ে কী হবে? এটার দাম বড়োজোর দেড় ডলার—ফেলে দিয়ে আর-একটা কিনুন না।' আমি তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলুম না যে কথাটা দেড় অথবা পাঁচ ডলার নিয়ে নয়, জিনিশটি আমি টোকিওতে কিনেছিলুম, একটি বৈদেশিক স্মৃতি হিশেবে আরো কিছুদিন ব্যবহার করতে পারলে মন্দ লাগতো না। জড় বস্তুর সঙ্গেও ব্যবহারের দ্বারা এক ধরনের আত্মীয়তা জন্মে—অন্তত আমাদের তা-ই মনে হয়—একটি পুরোনো কলমের মেরামতে আমরা যতটা অর্থব্যয় করি তা দিয়ে হয়তো নতুন দুটো কেনা যেতো—কিন্তু জিনিশটা যে পুরোনো ব'লেই বেশি মূল্যবান, এই কথাটা সাধারণ মার্কিনী মানসের অন্তর্ভুক্ত নয়। জীবন-সঙ্গী বা সঙ্গিনীর পরিবর্তন যে অন্যান্য দেশের তুলনায় এখানে কিছুটা বেশি প্রচলিত, হয়তো তারও একটা কারণ এই নূতনের সম্মোহন ও স্মৃতির প্রতি অনাসক্তি। তারুণ্যই মার্কিন দেশের জীবনধর্ম।

পরম ভালো বা পরম মন্দ ব'লে পৃথিবীতে কিছু নেই; সবই আপেক্ষিক; সব প্রথা, ব্যবস্থা ও মনোভাব সর্বাঙ্গীণ প্রয়োজনেরই অনুগামী, এবং এমন কোনো সমাজও নেই, যাতে কালোচিত পরিবর্তন না ঘ'টে। আমাদের সমাজও যে-ভাবে দ্রুত বদলাচ্ছে, তাতে মনে হয় আমার এই তুচ্ছ লেখাটা কোনো শত-কান্তিক বাঙালি তরুণের চোখে পড়লে তিনি হয়তো কৌতুক বোধ করবেন। তা'তে আমার অনিকেত আত্মা বিক্ষুব্ধ হবে না, সে-কথা এখনই জানিয়ে রাখছি। তারুণ্য আমাকে আকর্ষণ করে, আমাদের দেশে [illegible] বরণীয়, কিন্তু আমেরিকায় অতি বিচিত্র তার প্রকাশ। 'বৃদ্ধ' শব্দটি এদের কথ্যভাষা থেকে নির্বাসিত হয়েছে, বড়ো জোর এরা 'সাবালক' বা 'বয়স্ক' অবস্থা পর্যন্ত পৌঁছয়। পিটার্সবার্গে এক নিমন্ত্রণে গিয়ে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প করছিলাম; তিনি কথাপ্রসঙ্গে বললেন, 'I was young then,' কিন্তু তক্ষুনি, এক সেকেন্ড মাত্র থেমে আবার বললেন, 'I mean—younger,' অথচ বয়স তাঁর নিঃসন্দেহে উত্তরপঞ্চাশ, কেশ রজতস্পৃষ্ট; জীবনের এই পর্যায়ে আমরা বরং কিছুটা জাঁক ক'রে ব'লে থাকি যে আমাদের 'বয়স হয়েছে'। আমাদের মুগ্ধ না-হ'য়ে উপায় থাকে না, যখন দেখা যায় সপ্ততি বা অশীতি-বর্ষীয়ারা অঙ্গরাগে ও বেশভূষায় তাঁদের পৌত্রীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছেন; দাঁড়াচ্ছেন যথাসম্ভব সোজা হ'য়ে, সূক্ষ্ম বলিরেখাযুক্ত নয়নে ফুটিয়ে তুলছেন চটুলতা, মোহন হাস্যে বিকশিত করছেন তাঁদের উজ্জ্বল ও কৃত্রিম দশন-পংক্তি, ভ্রূবিলাস, পরিহাস ও বাহুভঙ্গি, যথাসময়ে যথাযোগ্যভাবে অনুষ্ঠিত ক'রে যাচ্ছেন। 'বার্ধক্যে সুখী হ'তে হ'লে এশিয়াতে জন্মানো উচিত', এ-রকম কথা প্রতীচীবাসীরা মাঝে-মাঝে ব'লে থাকেন, এবং সুখ মানে যদি প্রশান্তি হয়, বা স্নেহের তৃপ্তি, বা মানসিক নির্ভরলাভ, তাহ'লে—দারিদ্র্য সত্ত্বেও, আমাদের দেশে শাশুড়ি-পুত্রবধূর আবহমান বিবাদ সত্ত্বেও, এই কথাটা স্বীকার্য হ'তে পারে। যাঁরা বয়সে বড়ো তাঁরা শুধু ঐ কারণেই শ্রদ্ধেয়, যে-কোনো লোকের চুলের রং বদল হ'লে তার একটি আলাদা সম্মান প্রাপ্য হয়, এই সংস্কার—যা অদূর অতীতে য়োরোপেও ছিলো আর আমরা এখনো কাটাতে পারিনি—

মার্কিনদেশে তার প্রতিষ্ঠা নেই। এখানে বাস করে তিন স্তরের মানুষ : শিশু, সদ্যতরুণ ও স্থায়ী তরুণ, আর শেষোক্ত স্তর দুটি সমাজের চোখে নির্ভেদ। ফলত, যত বাড়ে বয়স, তত কঠিন চেষ্টা করতে হয় যৌবনের প্রচ্ছদ টিকিয়ে রাখতে; সেটা আরামপ্রদ নাও হ'তে পারে, কিন্তু তাতে অন্য দিক থেকে এটুকু লাভ হয় যে লোকেরা, কখনোই নিজেদের 'বৃদ্ধ' ভাবে না ব'লে, হয়তো মনের দিক থেকে অবসন্ন হ'য়ে পড়ে না, প্রাকৃত পতনে এলিয়ে দেয় না নিজেকে। আমরা যেমন, দেহে নয়, মনোধর্মে, কিছুটা অকালেই বার্ধক্যদশায় উপনীত হই, হ'তে ভালো-বাসি—বা অন্তত এক পুরুষ আগেও তা-ই ছিলো আমাদের লোকাচার—এখানে তেমনি প্রতিজ্ঞা উঠছে উদ্ধত হ'য়ে : 'না, মানবো না হার, শেষ পর্যন্ত সতেজভাবে বেঁচে থাকবো।' এই ভাবটিও গুণী-জনের পক্ষে যত অনুকূল, সামান্যের পক্ষে তা নয়। এক বিশিষ্ট মহিলার কথা শুনলুম, যাঁর চার স্বামীর মধ্যে একজন ছিলেন জর্মান কবি, আর-একজন ইটা-লিয়ান গীতস্রষ্টা, অন্য দু-জনও খ্যাতি-মান ফরাশি ও মার্কিন। তিনি বৈধব্য-দশায় সম্প্রতি আশি পেরিয়েছেন, এবং জীবনসম্ভোগের ইচ্ছা ও ক্ষমতা তাঁর এখনো অক্লান্ত। একবার কঠিন পীড়া থেকে আরোগ্য লাভ ক'রে তিনি এক বন্ধুকে বললেন, 'যে-কোনো হাবা ম'রে যেতে পারে, বেঁচে থাকতে হ'লে ঘটে বুদ্ধি চাই!' এই মহিলা—জর্জ সাঁ-র সুযোগ্য উত্তরাধিকারিণী—এঁকে আধু-নিক প্রতীচ্য মানসের পরাকাষ্ঠা বললে ভুল হয় না।

কিন্তু এর পিছনে একটি তিমিরবর্ণ তথ্য লুকিয়ে আছে, তা—মৃত্যুভয়। মৃত্যু-ভয় কার বা নেই, কিন্তু বহু-যত্নে, অনেক আগে থেকে, সেই অনিবার্য পরিণামের বিরুদ্ধে দেয়ালের পর দেয়াল তোলার চেষ্টা—তা এই দেশের ও যুগের একটি নূতন মনোভঙ্গি। এঁরা অনেকে আহার করেন বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক মতে; দুগ্ধপানে বয়স্কদের রুচি ও ক্ষমতা আমাকে অবাক ক'রে দিয়েছে; মেয়েরা কেউ-কেউ, ওজন-বৃদ্ধির প্রথমতম লক্ষণেই, স্বাদু ও স্বাভাবিক আহার ত্যাগ ক'রে চার বেলা গলাধঃকরণ করেন একটি টিনে-পোরা পদার্থ—যাতে স্নেহগুণ একেবারেই নেই, কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় অন্য সব উপাদান নাকি অক্ষুণ্ণ। সেবারে দেখেছিলুম, প্রায় এমন কোনো সাবালক স্ত্রী বা পুরুষ নেই যিনি সিগারেট খান না, কিন্তু সকলেই কর্কটরোগের সঙ্গে এই অভ্যাসের সম্বন্ধ নিয়ে ভাবিত; এবারে, সেই সম্বন্ধ 'প্রমাণ' হ'য়ে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে, অনেকেই দেখি সিগারেট ছেড়ে দিয়েছেন—আর কারো-কারো হয়তো তিরিশ বা চল্লিশ বছরের অভ্যাস ছিলো! প্রায় অতি-মানবিক এই সংযম ও মনোবল—আমি অন্তত, অনুকরণে অক্ষম ব'লে, শতমুখে এর প্রশংসা না-ক'রে পারি না; এবং এমন অনুমানও সংগত যে পরবর্তী গবেষণার ফলে এই মত যদি বাতিল হ'য়ে যায়, বা তাতে দেখা দেয় সংশয়, তাহ'লে তখনই সিগারেটের কাটতি আবার আকাশে ঠেকবে। হোক বিজ্ঞান, হোক বিজ্ঞাপন—কোনো স্বাস্থ্য-সম্মত নির্দেশ অক্ষরে-অক্ষরে মেনে চলায় মার্কিনীদের জুড়ি নেই জগতে। নিশ্চয়ই স্বাস্থ্য ও আয়ু সকলেরই কাম্য, তা অর্জনের প্রয়াসও সাধু, কিন্তু এ-দেশে কারোরই কি এ-কথাটা কখনো মনে হয় না যে 'মারের সাবধান নেই'?

জরা, ব্যাধি, মৃত্যু—বিশেষত মৃত্যু—এই বিষয়গুলো আধুনিক পশ্চিমী সাহিত্যের বড়ো একটি অংশ জুড়ে আছে। কিন্তু সাহিত্যে যা উন্মুখর, জীবনে তা অনুচ্চারিত; কবিরা যে-ভীষণ পাতালে বার-বার অবতরণ করেছেন তাকে তথ্য হিশেবেও স্বীকার করা শিষ্টাচার নয়। সামাজিক জীবনে নিষিদ্ধ এ-সব বিষয়, পারতপক্ষে শব্দ-গুলো কেউ মুখে আনে না। যেন মৃত্যুর অস্তিত্ব নেই, এই ভান সার্বিক-ভাবে স্বীকৃত; কখনো কেই গুণ্ঠন ছিন্ন হ'লে সাধারণ মানুষ কী-ভাবে সাড়া দেয় তার একটি উদাহরণ মনে পড়ছে। একটি খুচরো খাবারের দোকান ছিলো আমাদের হোটেলের পাশেই, একদিন সেখানে গিয়ে শুনি, দোকানি তার এক বাঁধা খদ্দেরকে একটি মৃত্যুসংবাদ জানাচ্ছে।

'Remember that big burly fellah who used to drop in here for bottles of Guiness—that big hulk of a guy? He has *kicked the bucket!* You know, I met his wife round the corner—near the bank —and you know what she told me? "My man has *popped off!*" "You know, my ole man has *popped off!*" She said, "It's Guiness did it." That big hulk of a fellah who used to drop in here—remember? He has *kicked the bucket!*'

পর-পর তিন খদ্দেরকে খবরটা জানালে লোকটি—একই ভাষায় ও ভঙ্গিতে; আমি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে শুনলুম। সে যে বার-বার কথাটা বলছে, তাতেই বোঝা যাচ্ছে তার বেদনা, কিন্তু বেদনাপ্রকাশের এই ভাষা আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অপরিচিত। লোকটি অবশ্য শিক্ষিত নয়, কিন্তু কল-কাতার কোনো ক্ষুদ্র দোকানদার অনেক-দিন ধ'রে দেখা কোনো মানুষের মৃত্যু বিষয়ে তুলনীয় ভাষায় কথা বলছে, তা কল্পনা করা শক্ত। কলকাতায় বরং অনেক-বার দেখেছি, রাস্তায় যখন মৃতদেহ নিয়ে যাচ্ছে, কোনো বস্তিবাসিনী, চলা থামিয়ে জোড়হাতে নমস্কার করেছে সেই দেহকে—এটাকে কেউ-কেউ হয়তো কুসংস্কার বলবেন, কিন্তু এতে অন্তত এই বোধটুকু প্রকাশ পায় যে মৃত্যু এক মহান আবির্ভাব—শ্রদ্ধেয়, রহস্যময়, দেবতার মতো।

অনেকদিন আগে ইভলিন ওয়া-র একখানা উপন্যাস পড়তে শুরু করে-ছিলুম। হলিউডের এক প্রবীণ চিত্রনাট্য-লেখক আপিশে গিয়ে দেখলে তার চাকরি গেছে, তখনই বাড়ি এসে আত্মহত্যা করলে, লোকেরা খবর পেয়ে যথোচিত ব্যবস্থা করতে এলো। এতখানি ঘটনা প্রথম দু-তিন পৃষ্ঠার বেশি জায়গা জোড়েনি, তারপর অনেকটা অংশ জুড়ে ছিলো মার্কিনী 'মরণ-শিল্পে'র সানুপুঙ্খ বর্ণনা। কেমন ক'রে মৃতদেহকে সাজায়, অঙ্গরাগলেপনে ক'রে তোলে মনোহর, ফিরিয়ে আনে বৃদ্ধার তরুণী রূপ, অপসৃত করে জরার চিহ্ন, রোগের চিহ্ন, যাতনার ছায়া, ফুটিয়ে তোলে মুখে এমন প্রফুল্লতা যে মৃত ব'লে আর মনেই হয় না—পাতার পর পাতা এ-সব বিবরণ বিস্তারিত দেখে আমি, স্বীকার করছি, উপন্যাসটি শেষ করার উৎসাহ পাইনি। কিন্তু তার সাহায্যে আমি প্রথম জেনে-ছিলুম যে আমেরিকায় যে-সব নতুন শব্দের উদ্ভব হয়েছে তার একটি হলো 'mortician'. 'Beautician', mortician' —রূপশিল্পী, শবশিল্পী : বলতে গেলে একই পেশা, শুধু দ্বিতীয় দ'ক্ষর 'মক্কেল' হলেন—সপ্রাণ বনিতারা নন, স্ত্রী-পুরুষনির্বিশেষে মৃতেরা। কিন্তু এই শিল্পীদের অভিধানে 'মৃত' শব্দের অস্তিত্ব নেই, এঁরা তাকে বলেন 'প্রিয়জন'—'the loved one'—এমনি আরো অনেক পরিভাষা বা ছদ্মভাষা রচিত হয়েছে, যার উদ্দেশ্য হ'লো মৃত্যুকে একেবারে মৃদু ও মোলায়েম ক'রে তোলা, এই ঘটনায় স্বভাবত যারা শোকার্ত হ'তে পারে, তাদের মনে এমন একটি মোহসঞ্চার, যেন এতে কষ্টের কোনো কারণই নেই। একবার ক্যালি-ফর্নিয়ার মধ্য দিয়ে বাস্-এ ভ্রমণ করে-ছিলুম; পথে যে-ক'টা গ্রাম বা ছোটো শহর পড়লো, সর্বত্র দেখলুম, যেমন অনিবার্যভাবে মুদিখানা ও ড্রাগস্টোর

আছে, তেমনি শোভা পাচ্ছে শবশিল্পীর ফলকচিহ্ন।

লস এঞ্জেলেসের এক প্রান্তে একটি বিখ্যাত, কুখ্যাত ও বিশাল গোরস্থান আছে, তার নাম 'ফরেস্ট লন' বা কানন-প্রান্তর। 'মৃত্যু নেই—' এই মোহ অথবা অভিনয়কে কতদূর পর্যন্ত টেনে নেয়া যেতে পারে, এই স্থানটি তার প্রকৃষ্টতম উদাহরণ। এটি চোখে দেখার চেষ্টা আমি করেছিলুম; কিন্তু স্থানীয় লোকেরাও সকলে তার পথ চেনে না; দু-বার রাস্তা ভুল ক'রে, ম্যাপ দেখে-দেখে, আমার বন্ধু আমাকে নিয়ে যখন পৌঁছলেন, তার একটু আগে প্রবেশ-দ্বার বন্ধ হ'য়ে গেছে। বাইরে থেকে যেটুকু আভাস পেলুম তাতে মনে হ'লো, এর যে-সব জমকালো বর্ণনা পড়েছি তার সঙ্গে বাস্তবের কোনো গরমিল নেই। বাইরে থেকে, বা ভিতরে গিয়েও, হঠাৎ কারো মনে হবে না এটি গোরস্থান: বন, বীথিকা ও জলাশয়, কৃত্রিম পাহাড় ও রমণীয় মর্মর-মূর্তি—যেন এক প্রমোদ-উদ্যান ছড়িয়ে রেখেছে আমন্ত্রণ—কোথাও ফোয়ারার কলস্বর, কোথাও বা অদৃশ্য যন্ত্রে নিঃসৃত হচ্ছে সুকোমল সংগীত, যেন পরলোকের পরপার থেকে। গান হয়তো বলছে: 'এই যে, কেমন আছো তোমরা? আমি ভালো আছি, তোমাদের সঙ্গেই আছি—তোমরা ভালো থেকো।' কোথাও এমন কিছু নেই যা আশা ও সুখভোগের পক্ষে উৎসাহজনক নয়: ভয় থেকে, দুঃখ থেকে, আঘাত থেকে অতি যত্নে বহু দূরে সরিয়ে মৃত্যুকে যেন মিশিয়ে দেয়া হয়েছে জীবনের অন্যান্য সাধারণ, সহনীয়, এবং এমনকি উপভোগ্য অভিজ্ঞতার মধ্যে। যারা মাটির তলায় চ'লে গেছে তারা যে সেখানে বেশি 'ভালো আছে', তা বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে, কিন্তু যারা আসে 'প্রিয়জনে'র সঙ্গে 'দেখা করতে' তারা যাতে সুখী ও তৃপ্ত মনে ফিরে যেতে পারে, বসতে পারে প্রফুল্লভাবে ডিনারে, তারই জন্য এই বিপুল আয়োজন। এই গোরস্থানে ভূমি অগ্নিমূল্য; চিত্রতারকা ও অন্যান্য ধনীরা অগ্রিম তা কিনে রাখেন, তাঁদের অন্তিম বাসস্থানও 'শ্রেষ্ঠ' হওয়া চাই। অবশ্য এই ধরনের দ্বিতীয় কোনো গোর-স্থান আছে ব'লে আমি শুনিনি, বরং আমার মুখে 'ফরেস্ট-লন'-এর উল্লেখ শুনে অনেকেই হেসে বলেছেন—'ও. হলিউডের সেই পাগলামি! ও-সব ছেড়ে দিন!' শবশিল্পীদের প্রাদুর্ভাবও, আমার যতদূর ধারণা, ক্যালিফর্নিয়া ছাড়া অন্য কোথাও নেই অথবা প্রবল নয়: অন্তত নিউ ইয়র্কে ঘোরাঘুরি ক'রে ও-রকম একটিও ফলকচিহ্ন আমার চোখে পড়েনি। সমগ্র মার্কিনীদের বিষয়ে এ থেকে কোনো সিদ্ধান্ত করা অনুচিত হবে, তবে মৃত্যু বিষয়ে বিশেষ একটি মনোভাব—যা এই দেশেই উদ্গত হয়েছে—তার চরম ব্যঞ্জনা হিশেবে 'ফরেস্ট-লন' উল্লেখযোগ্য।

এই প্রসঙ্গে অন্য একটি ঘটনা মনে পড়ছে। এক নিমন্ত্রণে এসেছি আমরা; গৃহস্বামী বুদ্ধিজীবী, বন্ধুবৎসল ও গণ্যমান্য। পার্ক এভিনিউর দশতলায় তাঁর অ্যাপার্টমেন্ট; ঘরে আছে খাঁটি রেনেসাঁস আসবাব, ষোলো শতকের মূল ইটালিয়ান ছবি; অতিথিদের মধ্যে আছেন জর্মান কবি, নামজাদা মার্কিনী সমাজ-তত্ত্ববিদ, কোটিপত্নী প্রৌঢ়া, ব্লন্ড রূপসী, এবং অন্য অনেক বিশিষ্ট জন। কিছুক্ষণ আগে উত্তম ডিনার খাওয়া হয়েছে; এখন কন্যাক বা কির্শ্ বা বেনেডিক্টিন, হাভানা চুরোট, সোনামুখ সিগারেট—আর গল্প-গুজব। কেউ ব'সে, কেউ দাঁড়িয়ে; কেউ আবৃত্তি করছেন কবিতা, কেউ নতুন কোনো শিল্পীর সুখ্যাতি করছেন, কোথাও বা কথা হচ্ছে শাড়ির সৌন্দর্য ও অসুবিধে বিষয়ে। এর মধ্যে গৃহস্বামী হঠাৎ একজন অতিথিকে ডেকে নিয়ে গেলেন পাশের ঘরে। এক মিনিট পরে ফিরে এলেন অতিথিটি, কিন্তু তারপর আর এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন না, স্ত্রীকে নিয়ে চ'লে গেলেন একবার 'গুড-নাইট' পর্যন্ত উচ্চারণ না-ক'রে। আমরা শুনলুম, তাঁর টেলিফোন এসেছিলো শিকাগোর এক হাসপাতাল থেকে; তাঁর কন্যার সেখানে একটু আগে মৃত্যু হয়েছে: তাঁরা এখনই শিকাগোর প্লেন ধরবেন।

কয়েক সেকেন্ড নিঃশব্দ রইলো ঘর; এক টুকরো মেঘ দেখা দিতে-দিতেই মিলিয়ে গেলো। তারপর আবার শুরু হ'লো কথাবার্তা—কবিতা নিয়ে, আল-জেরিয়ার সমস্যা নিয়ে, সাম্প্রতিক ভারতে মেয়েদের অবস্থা নিয়ে। যেন কিছুই হয়নি, যেন কারোরই মন স্পৃষ্ট হয়নি বিষাদে, সব আছে সুস্থ ও অটুট। এটাই সভ্য আচরণ, সব দেশে, যেখানেই আধুনিক সভ্যতা প্রভাবশালী, সেখানেই এই রকম হ'তে হ'তো; আর এটাই যে সত্য আচরণ নয় তা প্রমাণ করা দুঃসাধ্য। অন্তত এর ব্যতিক্রম ঘটানো সন্ন্যাসী না-হ'লে সম্ভব নয়।

পতানু পাগলা

বনফুল

আমার ছেলেবেলায় পতানু পাগলা মণিহারী গ্রামে একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য প্রাণী ছিল। 'প্রাণী' কথাটি ইচ্ছা করিয়াই ব্যবহার করিতেছি। আকৃতিতে মনুষ্য হইলেও আচার ব্যবহারে সে পশুর মতোই ছিল। কালো কুচকুচে গায়ের রং, মাথায় প্রকাণ্ড টাক, ঝাঁকড়া ঘন ভ্রূদুটি যেন ঝুঁকিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতেছে ছোট ছোট ঘোলাটে চোখ দুইটির ভিতর কি আছে। টিকোলো নাক। থুতনি নাই বলিলেই হয়। মুখময় কাঁচা-পাকা গোঁপ দাড়ি, মুখে সর্বদা একটা হাসি যেন লাগিয়াই আছে। সর্বদাই যেন সে একটা মজা দেখিতেছে। মজাটা যে কিসের তাহা অন্য লোকে বুঝিতে পারিত না। হয়তো দূরে একটা ছাগল চরিতেছে, পতানু তাহার দিকে হাসি মুখে চাহিয়া বসিয়া আছে। দেখিতে দেখিতে হয়তো হাসির বেগ বাড়িয়া গেল, তখন মুখে হাত চাপা দিয়া খুক্‌খুক্‌ করিয়া হাসিতে লাগিল। এ রকম দৃশ্য প্রায়ই দেখা যাইত।

পতানুর মা আমাদের বাড়িতে আসিত। তাহার মুখে তাহার পাগলামির আদি ইতিহাস শুনিয়াছিলাম। তাহার বয়স যখন উনিশ কি কুড়ি বছর তখন তাহাকে 'রংরুটে' ভুলাইয়া লইয়া যায়। তখনকার দিনে বিদেশে কাজ করিবার জন্য এদেশ হইতে কুলি চালান দেওয়া হইত। এদেশের নিরক্ষর জনসাধারণকে মিথ্যা আশায় ভুলাইয়া রিক্রুটিং অফিসাররা তাহাদের নিকট হইতে টিপসই লইয়া তাহাদিগকে কখনও সিংহল, কখনও কেনিয়া, কখনও বা আর কোথাও চালান করিয়া দিত। প্রায় এসব কুলি আর বাড়ি ফিরিত না। পতানু কিন্তু বছর দশেক পরে ফিরিয়াছিল। এমন অবস্থায় ফিরিয়াছিল যে তাহার মাও প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারেন নাই। মাথায় চুল নাই, অথচ একমুখ কাঁচাপাকা দাড়ি, আর সম্পূর্ণ উলঙ্গ। আসিয়া প্রথমেই সে ঘরে ঢুকিয়া একেবারে কোণে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মুখে আঙুল দিয়া সভয়ে কেবল বলিয়াছিল, 'চুপ'। আর কোনও কথা বলে নাই, খাইতে দিলে খায় নাই পর্যন্ত। কোণে উবু হইয়া বসিয়াছিল সমস্ত রাত। তাহার পরদিন সকালে তাহাকে পাওয়া গেল না। খোঁজ খোঁজ পড়িয়া গেল চতুর্দিকে। সাতদিন সে গা ঢাকা দিয়া রহিল। কোথায় গেল কেহই কোন পাত্তা করিতে পারিল না।

অষ্টম দিন রাত্রে গ্রামের চৌকিদার রহমন পাহারা দিতে বাহির হইয়া হঠাৎ 'ভূত' 'ভূত' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া নায়েব মশাইয়ের বাড়িতে উঠিয়া পড়ে।

নায়েব মশাই বাহিরে আসিয়া দেখিলেন রহমন থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

"কি ব্যাপার রহমন?"

"ভূত হুজুর। স্বচক্ষে দেখলাম ওই প্রকাণ্ড গামহার গাছ থেকে নামল। এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে। একেবারে নাংগা—"

সেই রাত্রেই পতানু ধরা পড়িল আবার। দিনের বেলা সে বড় গামহার গাছের মগডালে উঠিয়া বসিয়া থাকিত। রাত্রে, গভীর রাত্রে চুপি চুপি নামিয়া আসিত।

সকলের পরামর্শ অনুসারে ইহার পর পতানুকে বাঁধিয়া রাখা হইল। বেশী দিন নয়, মাত্র দুইদিন বাঁধিয়া রাখার পর পতানু গোপ, দার্শনিক

হইয়া গেল। তাহার মুখে একটা অদ্ভুত হাসি ফুটিল। সে হৃদয়ঙ্গম করিল—লোহারি বাঁধনে বেঁধেছে সংসার, দাসখৎ লিখে নিয়েছে হায়। বিদ্রোহ করে লাভ নেই। ইহার পর হইতে তাহার মুখের হাসিটা প্রায় চিরস্থায়ী হইয়া গেল।

আমরা যখন তাহাকে দেখিয়াছিলাম তখনও সে প্রায় উলঙ্গ হইয়া থাকিত। মাঝে মাঝে একটা ন্যাকড়া তাহার কোমরে জড়ানো থাকিত বটে, কিন্তু প্রায়ই থাকিত না। থাকিত কেবল দড়িটা।

সে উঁচু জায়গায় উবু হইয়া বসিয়া থাকিতে ভালবাসিত। আমাদের বাড়ির সামনে যে হাট বসিত, সেই হাটতলার পূর্ব ও পশ্চিম কোণটা বেশ উঁচু। আর একটা উঁচু জায়গা ছিল পোস্টাফিসের সামনে, আর একটা পীরবাবার পাহাড়ের কাছে। ইহারই কোনও একটাতে পতানু ভোর বেলা আসিয়া বসিত। বসিয়া আপন মনেই হাসিয়া যাইত। কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর আকাশের দিকে তাকাইয়া কি যেন দেখিত, তাহার পর উঠিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে আর একটা উঁচু জায়গায় গিয়া বসিত। সেখানেও ওই, কিছু একটা দেখিয়া হাসি। হয়তো একটা ছেঁড়া কাগজ, বা একটা ছেঁড়া জুতা। এইসব দেখিয়াই খুশিতে মশগুল হইয়া থাকিত পতানু।

আর সে পলাইবার চেষ্টা করে নাই।

একদিন কিন্তু একটা কাণ্ড ঘটিল। পতানু গোয়ালা- পোস্টাফিসের সামনে উঁচু জায়গাটায় বসিয়া ধাড়ি সার দোকানের দিকে চাহিয়াছিল। ধাড়ি সা হালুয়াই, মানে ময়রা। সে বসিয়া লুচি ভাজিতেছিল। একটু পরেই স্টীমারের যাত্রীরা এদিক দিয়া যাইবে, তাহার সদাভাজা 'পুরি'র একটিও পড়িয়া থাকিবে না। ধাড়ি সা রোজই ইহা করে, পতানুও রোজই বসিয়া দেখে। কিন্তু সেদিন পতানুর মনস্তত্ত্বে কি যে গোলযোগ ঘটিয়া গেল জানি না, সে সোজা উঠিয়া ধাড়ি সার দোকানের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

বলিল, "আমার লুচি খেতে ইচ্ছে করছে, আমাকে লুচি দাও—"

ধাড়ি সা তো অবাক!

বলিল, "ভাগ পাগলা! লুচি খাবি? পয়সা আছে?"

পতানুর পয়সা ছিল না সত্য, কিন্তু যাহা ছিল তাহা পয়সার চেয়ে প্রবল। প্রচণ্ড শক্তি ছিল তাহার।

সে সোজা দোকানে উঠিয়া গেল ও বারকোশশুদ্ধ লুচিগুলো নামাইয়া হাঁউ হাঁউ করিয়া খাইতে লাগিল। ধাড়ি সা বাধা দিতে গিয়া পড়িয়া গেল প্রচণ্ড এক চড় খাইয়া। তাহার পর সে চীৎকার চেঁচামেচি করিয়া লোক জড় করিয়া ফেলিল। কিন্তু পতানুকে সহজে কাবু করা গেল না। সে সমস্ত লুচিগুলি তাড়াতাড়ি খাইয়া মিষ্টান্নও খাইতে লাগিল। তাহার রুদ্র মূর্তি দেখিয়া সহজে কেহ তাহার নিকট ভিড়িল না।

সে খাইতে খাইতে চোখ পাকাইয়া ক্রমাগত বলিতে লাগিল—"খবরদার"—

তাহাকে পুলিশে যখন হাসপাতালে লইয়া আসিল তখন তাহার হাতে ও কোমরে দড়ি। শোনা গেল, পতানু ধাড়ি সার দোকানের পরাত দিয়াই কয়েকটি লোককে জখম করিয়াছে। আমার বাবাই তখন হাসপাতালের ডাক্তার ছিলেন। সে যুগে উন্মাদ পাগলের যে চিকিৎসা-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তাহাই তিনি করিলেন। ব্যবস্থাটি বড় ভয়ানক। পতানুকে উপুড় করিয়া শোওয়াইয়া চার-পাঁচ জন বলিষ্ঠ লোক তাহাকে ধরিয়া রহিল। বাবা একটা মোটা গুণ ছুঁচ দিয়া তাহার ঘাড়ের মাংসে এফোঁড় ওফোঁড় করিয়া একটা মোটা সুতা পরাইয়া দিলেন। বলিলেন, "বদমায়েসি করলেই সুতোটা ধরে টানবে।" ভয়ানক চিকিৎসা। এই চিকিৎসার গুণেই কিন্তু পতানুর দুর্দান্ত ভাবটা কাটিয়া গেল। কিছুদিন আর সে ঘরের বাহির হইল না। মাস-দুই পরে দেখিলাম আবার একদিন সে হাটতলায় উঁচু জায়গাটায় উবু হইয়া বসিয়া আছে। ঘাড়ের ঘা শুকাইয়া গিয়াছে, সুতাটাও আর নাই। ভাবিলাম তাহার সহিত গিয়া একটু কথা বলি। কিন্তু কিছুদূর গিয়াই আমাকে থামিয়া যাইতে হইল। পতানু কানে হাত দিয়া হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল—

"ডাক্তারবাবু ব্রিনডাইন্।"

ব্রিনডাইন? এ আবার কি ভাষা!

পতানু ক্রমাগত বলিয়া চলিল—"ডাক্তারবাবু ব্রিনডাইন, ডাক্তারবাবু ব্রিনডাইন, ডাক্তারবাবু ব্রিনডাইন।" যতক্ষণ দম রহিল ততক্ষণ বলিল।

আমি আর আগাইতে সাহস করিলাম না। পরে দেখিলাম এই 'ব্রিনডাইন' শব্দটা পতানুকে পাইয়া বসিয়াছে। রোজই সে কোথাও না কোথাও বসিয়া 'ব্রিনডাইন' করিতেছে। তবে নামটা রোজ এক নয়। কোন দিন ডাক্তারবাবু ব্রিনডাইন, কোন দিন দারোগাবাবু ব্রিনডাইন, কোন দিন বা নায়েববাবু ব্রিনডাইন।

কিছুদিন পরে একটা পাগলা মহিষের উপদ্রবে গ্রামের লোক সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। মহিষটা কাহার, কোথা হইতে আসিয়াছে তাহা জানা গেল না। সে মাঝে মাঝে গ্রামের মধ্যে উন্মত্ত ঝড়ের মতো ছুটিয়া আসিয়া সম্মুখে যাহাকে পাইত তাহাকেই আক্রমণ করিত। মহিষ বাহির হইয়াছে রব উঠিলেই সবাই ছুটিয়া গিয়া ঘরে খিল দিত।

পতানু একদিন পোস্টাফিসের সামনে বসিয়া 'ব্রিনডাইন' করিতেছিল। হঠাৎ পাগলা মহিষটা ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া পড়িল। পতানু কিন্তু পলাইল না। লাফাইয়া গিয়া পাগলা মহিষের শিং দুইটা ধরিয়া ফেলিল সে। দুই পাগলে খানিকক্ষণ যুদ্ধ হইল। কিন্তু যমের বাহনের সহিত যুদ্ধে মানুষের পরাজয় অনিবার্য। পতানু ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। মহিষ শিং দিয়া তাহার পেটটাই ফাঁসাইয়া দিয়াছিল। শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিবার আগে সে বলিয়া গেল—"পাগলা ভঁইস ব্রিনডাইন।"

অনেকদিন পরে একটি রিক্রুটিং অফিসারের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। বৃদ্ধ লোক, রিটায়ার করিয়াছেন। আসাম অঞ্চলে কাজ করিতেন। কথায় কথায় যখন জানিতে পারিলেন আমার বাড়ি মণিহারী তখন বলিলেন যে মণিহারী গ্রামের এক পতানু তাঁহাদের চাবাগানের কুলি ছিল। লোকটা চাবাগানের সাহেব মালিককে এক ঘুঁসিতে ভূশায়ী করিয়া সরিয়া পড়িয়াছিল। তাহার পর বলিলেন, "সাহেবটা পাজিও ছিল মশাই। কুলিদের বড়ই নির্যাতন করত। কথায় কথায় বলত—Bring down the whip· তার বাড়িতে দোতলার উপর একটা শঙ্কর মাছের ল্যাজ দিয়ে তৈরি চাবুক ছিল। সেইটে দিয়ে সপাসপ চাবকাত কুলিগুলোকে।" কে জানে পতানুর 'ব্রিনডাইন'—ইংরেজি Bring down কথার অপভ্রংশ কি না।

তুষারকান্তি ঘোষ

আমি যে কাহিনীগুলি লিখছি, সেগুলি সবই আমার জানা। এগুলিকে ডাক্তারী গল্প বলা চলে। ঠিক ওষুধ পড়লে রোগীর যে কত উপকার হয়, তা' যাঁরা না দেখেছেন, তাঁরা বুঝতে পারবেন না। এই রকম কতকগুলি সত্য ঘটনা লিখছি।

প্রথমেই আমার নিজের অসুখের কথা বলি। বছর ৩০।৩৫ আগে sore throat ও Pharyngitisএ খুব ভুগতুম। সে ভোগা চলতেই থাকত,—১০।১৫ দিন পরপরই অসুখে পড়তুম এবং শরীরের স্বাচ্ছন্দ্য বলে কিছু ছিল না।

ব্যাপারটা হত এই রকম : কোন একদিন সকালে উঠে দেখলুম যে গলায় ব্যথা হয়েছে আর জ্বর-জ্বর ভাব। শরীর গ্লানিতে ভর্তি, নাইবার, খাবার কোন ইচ্ছে নেই, আর মেজাজটা বিগড়ে আছে। অল্পেতেই বিরক্তি ও রাগ হয়। তখন চিকিৎসা শুরু করতুম, তা সে হোমিওপ্যাথিই হোক, কবিরাজিই হোক কিংবা অ্যালোপ্যাথিই হোক। আমার তাড়াতাড়ি relief পেলেই হল। কখনও foot bath নিচ্ছি, কখনও অ্যালোপ্যাথি মিকশ্চার খাচ্ছি, কখনও কবিরাজি বড়ি খলে মেড়ে খাচ্ছি, কখনও বা হোমিওপ্যাথি বেলেডোনা এক dose খেয়ে নিলুম। এই সব চিকিৎসার জন্যে, কিংবা কোন চিকিৎসা না করলেও তিন চার দিনের মধ্যেই acute condition-টা চলে যেত। তখন আর কাশলে লাগত না, আর গলাটাও সরল হয়ে আসত। শরীরটা মোটামুটি ভালোই বোধ হত। এইভাবে ৭।৮ দিন যেত এবং যখন মনে ভাবছি এইবারে গলা'টা সম্পূর্ণ সেরে গেছে তখন হঠাৎ একদিন নতুন করে গলায় ব্যথা হত এবং আবার নতুন করে চিকিৎসা সুরু করতে হত। এইভাবে বছরের পর বছর ভুগতুম। Change এ গেলে দু-একমাস ভালো থাকতুম। কিন্তু আবার যে কে সে-ই।

এই সময় একদিন ডাঃ বিধান রায়কে আমার এই অসুখের কথা বলি। ডাঃ রায় তখনই কাগজ কলম নিয়ে একটা ওষুধ লিখে দিলেন এবং বলে দিলেন যে যখন সরলভাবে কফ উঠতে থাকবে তখন খাবার পর দুবেলা ঐ ওষুধ যেন ছোট চামচের এক চামচ করে খাই। এই ওষুধ ব্যবহার করে আমি যে কী উপকার পেয়েছিলুম তা আমি লিখে বোঝাতে পারব না। এই ওষুধ খাবার পর দু-তিন দিনের মধ্যে অসুখটা সেরে গেল এবং শরীরে বল ও স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে এল। তারপরে এর দ্বিতীয় আক্রমণ হল ছ-মাস বাদে। সে-বারও ঠিক সময়ে ডাঃ রায়ের ওষুধ ব্যবহার করে-ছিলুম, পরের আক্রমণ এসেছিল দু'বছর বাদে। তারপর থেকে যে Pharyngitis একবারও হয়নি একথা বলব না। যেমন normal কোন মানুষের কখনও-সখনও গলায় ব্যথা হয়, আমারও তাই হয়ে থাকে। সে chronic অসুখ আর নেই। ডাঃ রায় যে ওষুধ আমায় দিয়েছিলেন তার নাম colossol iodine।

এই গলার ব্যথার ব্যাপার নিয়ে আমার আর একটি ঘটনার কথা মনে পড়ল। আমাদের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা আমরা ডাঃ পি সাহাকে দিয়ে করাই। একবার দেওঘর থেকে গলায় ব্যথা নিয়ে ফিরলুম। শরীর বেশ অস্বাচ্ছন্দ্য এবং কথা বলতে কষ্ট হয়। আমি ডাঃ সাহাকে টেলিফোন করলুম। তিনি একটা ওষুধ বলে দিলেন। তাঁর এই ওষুধ খেয়েও তিন দিনেও আমার গলার acute stage-টা গেল না। তখন একদিন তাঁর বাড়ি গিয়ে পরীক্ষা করালুম। তিনি আমার গলাটা ভালো করে টর্চলাইট দিয়ে দেখে বললেন, "এ যে raw beef এর মত দেখছি। আচ্ছা, আপনার কি শীত করছে?" আমি বললুম, "হ্যাঁ বেশ শীত শীত করছে।" তিনি আমাকে ওষুধ দিলেন, Heper Sulphur (Dilution মনে নেই)। আমি তখনই কিং কোম্পানীতে গিয়ে ঐ ওষুধ এক ডোজ খেলুম। সেখান থেকে আপিসে গেলুম চিঠির জবাব দিতে। যখন চিঠি dictate করছি আমার সেক্রেটারী বললেন, "আপনি অন্যদিন গলার ব্যথার জন্য আস্তে আস্তে কথা বলেন, আজ তো বেশ জোরে বলছেন। গলার ব্যথা কি সেরে গেছে?" আমার হঠাৎ মনে হল, 'তাই তো, গলার ব্যথা তো টের পাচ্ছি না!' এক ঘণ্টা আগে Heper Sulphur খেয়েছিলুম। এর মধ্যে সত্যিই অসুখটা সম্পূর্ণ সেরে গেছল।

ডাঃ পি সাহার চিকিৎসার কথা লিখতে গিয়ে আর একটি অদ্ভুত ঘটনার কথা মনে পড়ছে। এলাহাবাদে আমার এক আত্মীয়ার menopause এর প্রাক্কালে প্রচুর রক্তস্রাব হতে থাকে এবং তিনি অত্যন্ত ফ্যাকাশে ও দুর্বল হয়ে পড়েন। তাঁকে এলাহাবাদের সুবিখ্যাত লেডী ডাক্তার মিসেস মজুমদারকে দিয়ে দেখানো হয়। সেই সময়ে আমার বন্ধু ডাঃ কর্ণেল মণি দাসও এলাহাবাদে উপস্থিত ছিলেন। তাঁকেও ডাকা হল এবং আমাদের পারিবারিক চিকিৎসক ডাঃ পি ঘোষও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। নানারূপ ওষুধ, ডুস ইত্যাদি দেওয়া হতে লাগল। কিন্তু কিছুতেই রক্ত বন্ধ হল না। ডাক্তাররা তখন বললেন যে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে operation করতে হবে। এই কথা শুনে আমাদের বাড়ির সকলেরই অত্যন্ত মন খারাপ হয়ে গেল। আমাদের আত্মীয়া বললেন, কোন অস্ত্র চিকিৎসার আগে একবার যেন ডাঃ সাহাকে তাঁর অসুখের কথাটা বলা হয়। আমি রাজি হলুম এবং কোলকাতায় চলে এলুম। ডাঃ সাহা আমার কাছে অসুখের সমস্ত বর্ণনা শুনে একটা ওষুধ লিখে দিলেন। আমি তখনই সেই ওষুধ কিনে লোক দিয়ে এলাহাবাদে পাঠিয়ে দিলুম। তার পরদিন আমার আত্মীয়া সেই ওষুধ গ্রহণ করলেন। অবশ্য তার দু-দিন আগে থাকতেই অন্য সমস্ত ওষুধ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। চব্বিশ ঘণ্টা বাদে আমি টেলিফোনে খবর পেলুম যে আমার আত্মীয়ার অসুখ একটু বেড়েছে। আমি ব্যস্ত হয়ে ডাঃ সাহাকে

সে-কথা জানালুম। ডাঃ সাহা বললেন, "এটা হয়তো ওষুধের জন্যেই হয়েছে। এখনই চিন্তার কোন হেতু নেই।" আর সত্যিই তাই, ওষুধ খাবার বাহাত্তর ঘণ্টা বাদে এলাহাবাদ থেকে আমাকে ফোনে জানানো হল, আমার আত্মীয়ার অসুখ সম্পূর্ণ সেরে গেছে। এটা যে আমার কাছেই একটা miracle মনে হয়েছিল তা নয়, অন্য ডাক্তারেরাও আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন। ওষুধটার নাম ছিল Faximus Americana।

এইখানে একটা কথা বলে রাখি, কেউ যেন মনে না করেন যে, আমি কোন ডাক্তারের কিংবা কোন চিকিৎসা পদ্ধতির নিন্দা কিংবা সুখ্যাতি করছি। ডাঃ পি সাহার চিকিৎসায় কোন কোন অসুখে ফল পাই নি। যেমন আমার বাঁ চোখে যখন Glaucoma হয়, তখন ডাঃ সাহার চিকিৎসাতে আমি উপকার বোধ করিনি। পরে অস্ট্রিয়ার Dr. Lindner আমার সেই চোখে operation করেন। সব চিকিৎসা পদ্ধতিরই উপকার আছে। তবে, কোন ক্ষেত্রে ভালো ফল হয়, কখনো বা হয় না।

ওপরে যে কর্ণেল দাশের কথা লিখেছি তিনি এখন বেহালায় বাস করেন। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয় আলিপুর জেলে, ১৯৩৫ সালে আমি সেখানে তিন মাস বন্দী ছিলুম ও কর্ণেল দাশ ছিলেন ঐ জেলের superintendent।

এইখানে আয়ুর্বেদ চিকিৎসার একটি ঘটনা মনে পড়ল। আমাদের বাড়ির একটি ছোট ছেলের একবার Bright's Disease হয়েছিল। ছেলেটি ফুলত এবং তার urine-এ ablumen ও cast ছিল। তাকে অনেক দিন ধরে অনেক রকমের চিকিৎসা করা হয়। যদিও অসুখটা অনেকটা ভালো হয়েছিল, তবু সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়নি। এই চিকিৎসার সময়ে ছেলেটিকে যে কত উপোস এবং কম খেয়ে থাকতে হয়েছিল, সে কথা মনে করলে এখনও দুঃখ পাই। তার ফোলা সেরে গেল, urine থেকে cast চলে গেল এবং ablumen খুব কমে গেল। কিন্তু ablumen-এর একটু trace কিছুতেই গেল না। সব শেষে এর চিকিৎসা করেন কবিরাজ রামচন্দ্র মল্লিক। কবিরাজ মশায়ের চিকিৎসায় ছেলেটির urine দোষশূন্য হল। আজকে সেই ছেলে স্বাস্থ্যবান দিগ্গজ পুরুষ হয়েছে। কবিরাজ রামচন্দ্র তাকে কি ওষুধ দিয়েছিলেন মনে নেই। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলে দিতে পারবেন।

সবশেষে বলছি ডাঃ নীলরতন সরকারের একটি অদ্ভুত চিকিৎসার কথা।

সেটা বোধহয় ১৯২৬।২৭ সালের কথা। আমাদের বাড়ীর একটি মহিলার কলেরা হোল; একেবারে খাঁটি এসিয়াটিক কলেরা। ছ ঘণ্টার মধ্যে রোগিণী প্রায় মৃত্যুর দরজায় পৌঁছে গেছে। আমাদের বাগবাজার পাড়ার দুজন অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার প্রায় সমস্তক্ষণ উপস্থিত থেকে তাঁর চিকিৎসা করছিলেন। কিন্তু অনেক ওষুধ, Oil Juniper, Oil Cajiputy দিয়েও কোন উপকার হোল না। রোগিণীর শেষ অবস্থা,—হাতে পায়ে খিল্ ধরছে। ডাক্তারদের উপদেশমত হাতে পায়ে এরারুট ঘষে দেওয়া হতে লাগল। রোগিণীর সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে। ক্রমে তাঁর সামনে সমস্ত অন্ধকার হয়ে আসতে লাগল। তখন তিনি বললেন, "শীগ্গির ও'কে ডেকে দাও"। তিনি তাঁর স্বামীর কাছে বিদায় নিলেন। তাঁর স্বামী তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, "তুমি ভগবানকে ডাকো, তিনি নিশ্চয় তোমাকে ভাল করে দেবেন।" যে কারণেই হোক, ঘণ্টা দু-এর মধ্যে রোগিণীর অবস্থা যেন একটু ফিরল—খুব একটুখানি যেন ভাল বোধ করলেন। এইভাবে সেই রাত্রি কেটে গেল। তারপর-দিনও তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হলেন না, তবে ডাক্তারেরা আশা দিলেন যে, আর প্রাণের ভয় নেই। এইভাবে আরও ৪৮ ঘণ্টা কেটে গেল; তখন কলেরার চিহ্ন আর কিছু নেই, তবে রোগিণী বড় দুর্বল, যেন বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে আছেন।

ডাঃ রায় তখনই কাগজ কলম নিয়ে একটা ওষুধ লিখে দিলেন......

এইবারে তাঁর অদ্ভুত অসুখের কথা ও নীলরতনবাবুর অদ্ভুত চিকিৎসার কথা বলছি। এই ক'দিন মহিলাটির টেমপারেচার সমানে ৯৬° হয়ে আছে। কখনো কখনো ৯৬°এর'ও ২।১ পয়েন্ট নীচে। দিনে ৪ বার করে টেমপারেচার দেখা হোত। মহিলাটির কলেরা সেরে যাওয়ার ৩ দিন বাদে দেখা গেল যে বেলা ১২টার সময় তাঁহার টেমপারেচার ৯৬·৬ হয়েছে। ৩ ঘণ্টা বাদে দেখা গল যে টেমপারেচার আবার ৯৬° হয়ে গেছে। তার পরদিন বেলা ১২টার সময় টেমপারেচার হোল ৯৭° এবং ৩।৪ ঘণ্টা পরে ৯৬·৫। তার পরদিন বেলা ১২টার সময় টেমপারেচার হোল ৯৮° এবং তার ৫।৬ ঘণ্টা বাদে হোল ৯৭°। এইভাবে দিনের পর দিন জ্বর বেড়ে চল্ল। রোজই বেলা ১২টার সময় এক ডিগ্রি করে জ্বর বাড়ে এবং Minimumও এক

ডিগ্রি করে বাড়ে—যেমন ৯৯·—৯৮·; ১০০·—৯৯· ইত্যাদি। এইভাবে জ্বর সমানে চলছে ও বাড়ছে। রোগিণী নিজে এবং আমরা সকলে খুব ভয় পেয়ে গেলুম যে এইভাবে যদি নিয়মিত জ্বর বাড়তে থাকে তাহলে শীঘ্রই ১০৪·।১০৫· জ্বর উঠে যাবে এবং রোগিণী প্রাণ হারাবে। যে দুজন ডাক্তার তাঁর চিকিৎসা করছিলেন তাঁরা আমাদের পাড়ার ডাক্তার ছিলেন,—তাঁদের মধ্যে একজন Retired Civil Surgeon। এই ভদ্রলোক অত্যন্ত সরল প্রকৃতির ও অত্যন্ত স্পষ্টবক্তা ছিলেন ও আমাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তাঁর স্পষ্ট কথার একটা উদাহরণ দিই। যেদিন রোগিণীর প্রথম কলেরা হয় সেদিন বিকেল ৪টার সময় তিনি রোগিণীকে দেখে আমাদের আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"কোন ভয় নেই—রাত্রি ৮টা—৯টার আগে কিছু হবে না। যখন দেখবে হাতে-পায়ে খিল্ ধরছে তখন এরারুটের গুঁড়ো ঘষে দেবে।"

ইনি এবং অপর ডাক্তারবাবু প্রাণপণে রোগিণীর জ্বরের চিকিৎসা করতে লাগলেন এবং বহু ওষুধ খাওয়ালেন। Blood examination ও Urine examination ইত্যাদি সব করালেন। কিন্তু কিছুতেই জ্বরের নিয়মিত অগ্রগতি বন্ধ করতে পারলেন না। আমাদের বাড়ীর লোকেদের মনের অবস্থা সহজেই অনুমান করা যায়। একে কলেরার প্রচণ্ড আক্রমণে রোগিণীর শরীর পাত হয়ে গেছে, তার ওপর জ্বরাসুরের উগ্র আক্রমণে শরীরের আর কিছু রইল না। প্রথমে আমরা ও পরে ডাক্তারেরা একরকম হাল ছেড়ে দিলেন। আমরা রোগিণীকে মিথ্যা আশ্বাস দিতুম যে ভয়ের কোন কারণ নেই, শ্রীভগবান নিশ্চয়ই ভাল করে দেবেন। কিন্তু সে আশ্বাসে রোগিণী মনে কোন বল পেতেন না। তিনি নিজের শরীরের অবস্থায় বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর যাবার দিন এসে গেছে। তাঁর বয়স তখন অল্প এবং তিনি তখন মাত্র একটি সন্তানের মাতা।

এই সময়ে আমরা একদিন ডাক্তারবাবুদের সঙ্গে আলোচনা করছি যে কী করা যায়। Civil Surgeon ডাক্তার আমাকে বললেন, "আমাদের চিকিৎসায় যা করা যায় সব আমরা করেছি, কিন্তু এখন যা রোগিণীর অবস্থা তাতে ২।১ দিনের মধ্যে তাঁর যা হবার তা হয়ে যাবে।" বেলা তখন ৪টে। সেদিন বেলা ১২টার সময় তাঁর জ্বর উঠেছিল ১০৪· এবং সে সময় নেমে হয়েছে ১০৩·। আমরা স্থির জানতুম যে তার পরদিন তাঁর জ্বর হবে ১০৫· এবং তার পরদিন হবে ১০৬·। মনের এই অবস্থায় আমি ভাবলুম যে একবার ডাক্তার নীলরতন সরকারকে নিয়ে আসব। তিনি আমাদের বাপ্ খুড়োকে জানতেন এবং আমাদের বাড়ীতে কঠিন অসুখ হ'লে কখনো কখনো আসতেন। তিনিও ডাক্তার বিধান রায়ের মত আমাদের পরিবারে ভিজিট্ নিতেন না। সেই জন্যে আমরা তাঁকে যখন তখন ডাকতে পারতুম না। কিন্তু এখন আর লজ্জা করার সময় নয়, তাই আমি গাড়ী নিয়ে তখ্খুনি তাঁকে আনতে গেলুম। আমার বেশ মনে আছে যে তিনি সন্ধ্যার আগেই এলেন এবং রোগিণীকে পরীক্ষা করলেন। যাঁরা নীলরতনবাবুকে কোন রোগীকে পরীক্ষা করতে দেখেছেন তাঁরা জানেন যে তিনি কী যত্ন নিয়ে, কত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এবং কত সময় দিয়ে রোগী পরীক্ষা করতেন। অবশ্য রোগীকে পরীক্ষা করবার আগে সেই ডাক্তার দুজনের কাছে রোগের সমস্ত বিবরণ শুনে নিয়েছেন। রোগীকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষার পর নীলরতনবাবু তাঁর সেই অবর্ণনীয় মিষ্ট হাসি হেসে ডাক্তারদের বললেন—"Intestine"। তারপরে তিনি যখন basinএ সাবান দিয়ে হাত ধুচ্ছিলেন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম—"ডাক্তারবাবু, কী হবে?" তিনি তাঁর সেই চিরপরিচিত আশ্বাসদায়ী হাসি হেসে বললেন—"ভয় নেই, সেরে যাবে।" বলাই বাহুল্য তাঁর এই কথা শুনে আমাদের হৃদয়মন আশায়-আনন্দে ভরে গিয়েছিল।

হাত ধুয়ে নীলরতনবাবু ঘরে এসে prescription লিখতে বসলেন। লেখা মানে তাঁর নিজের হাতের লেখা নয়, তিনি বলে যেতে লাগলেন আর একজন ডাক্তার লিখে যেতে লাগলেন। এইবার একটি হাসির কথা বলি। শুধু হাসির কথা নয়, এর দ্বারা প্রমাণ হবে যে নীলরতনবাবু যেমন কাউকে কোন শক্ত কথা বলতে পারতেন না, তেমনি তিনি কিন্তু কারুর উপরোধে-অনুরোধে তাঁর নিজ-চিকিৎসার একটুও ব্যতিক্রম করতেন না। তিনি ওষুধের নাম বলছেন এবং কত গ্রেন্ বলে দিচ্ছেন। এসব বলার সময় ডাক্তারবাবুরা কখনো কখনো বলছেন যে অমুক ওষুধটি ৫ গ্রেন বেশী দেওয়া উচিত কিংবা ২ গ্রেন কম দেওয়া উচিত। নীলরতনবাবু চুপ করে শুনেছেন আর বলছেন—"এটি আপনি ৫ গ্রেন বেশী দিতে বলছেন, তা দিলেও হয়।" তারপর একটু থেমে বললেন—"তবে আমি ভাবছি যে আমি যে ক'গ্রেন দিতে বললুম এখন তাই দিয়েই দেখা যাক।" এরূপ ঘটনা ২।৩ বার হোল। প্রত্যেকবারই নীলরতনবাবু ওদের কথা মেনে নিলেন কিন্তু একবারও তাঁর ওষুধের এক গ্রেনও এদিক-ওদিক করতে দিলেন না। Prescription লেখা হয়ে গেলে ডাক্তারবাবুরা বললেন, "আপনি যে

"ভয় নেই, সেরে যাবে"

Alkaline mixture দিলেন তা আমরা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকবার দিয়েছি কিন্তু কোন ফল পাওয়া যায়নি। কাল রোগীর ১০৫° জ্বর ওঠবার কথা। আপনি আর কেন ওষুধ দেবেন না?" নীলরতনবাবু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বিনয়সূচক হাসি হেসে বললেন—"আজকে এই ওষুধই চলুক।" তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, "এই ওষুধ ৪ ঘণ্টা অন্তর দেবেন। কাল বেলা ১২টায় কত জ্বর ওঠে দেখবেন এবং সন্ধ্যার সময় আমায় Report দেবেন।" নীলরতনবাবু ঘর থেকে বেরোবার আগে রোগিণীকে শুধু বললেন—"ভয় নেই, সেরে যাবেন।"

নীলরতনবাবুকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আমি ঘরে এসে দেখি যে ডাক্তারবাবুরা মুখ গম্ভীর করে বসে আছেন। তাঁরা দুজনেই আমাকে বললেন যে নীলরতনবাবুর মতন ডাক্তারের কাজের সমালোচনা তাঁরা করতে চান না। তবে একথা নিশ্চিত যে এ mixtureএ রোগীর কোন উপকার হবে না। যদিও ডাক্তারদের এ কথা শুনে আমাদের মনটা দমে গিয়েছিল তবুও মনে কেমন একটি অনুভূতি হচ্ছিল যে নিশ্চয়ই নীলরতনবাবুর ওষুধে উপকার হবে। যাই হোক, নীলরতনবাবুর ওষুধের প্রথম dose পড়ল রাত ১০টায়। যাঁরা রোগিণীর সেবা করছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধানা ছিলেন রোগিণীর মাতাঠাকুরাণী। ওষুধ খাওয়াবার পরেই তিনি খবর দিলেন যে ওষুধ খেয়েই রোগিণী সেটি বমি করে ফেলেছেন। আমি তক্ষুনি নীলরতনবাবুকে telephone করলুম। তিনি বললেন যে পরের doseটা ৪ ঘণ্টা বাদে না দিয়ে ২ ঘণ্টা বাদে দেওয়া হোক্। তিনি আরও বললেন যে যদি রোগীর জ্বর ছেড়ে যায় এবং রোগী আনচান্ করেন তাহলে ৫।১০ ফোঁটা Brandy যেন দেওয়া হয়। আমরা রোগিণীর মাতাঠাকুরাণীকে নীলরতনবাবুর কথা জানিয়ে শুতে গেলুম। কথা রইল ১২টার সময় ১ দাগ ও ৪টার সময় ১ দাগ ওষুধ দিতে হবে।

ভোর যখন ৫টা, আমি স্বপ্ন দেখছি যেন রোগিণীর ১০৫° জ্বর হয়েছে, অথচ তিনি যেন ভালই আছেন। এমন সময় রোগিণীর মাতাঠাকুরাণী এসে বললেন—"তুমি শীগ্‌গির এস, ও'র গা বরফের মত ঠাণ্ডা আর ও কেমন করে চাইছে!" আমি ধড়মড় করে উঠে জিজ্ঞেস করলুম, "ওর টেম্পারেচার কত?" তিনি বললেন—৯৫°। আমি তক্ষুণি রোগিণীর ঘরে গিয়ে দেখলুম যে তিনি অতি শান্তভাবে এদিক-ওদিক চাইছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলুম—"কেমন আছ?" তিনি বললেন—"ভাল।" আমি—"কোন কষ্ট হচ্ছে কী? তাহলে ডাক্তারবাবু তোমাকে কয়েক ফোঁটা Brandy দিতে বলেছেন।" তিনি বললেন—"কষ্ট হচ্ছে না।"

সেই দিন সকালে আমাদের বাড়ীর সকলেরই অসীম আনন্দ। ৮টার সময় তৃতীয় ডোজ ওষুধ পড়ে গেল—তখন টেম্পারেচার হয়েছে ৯৬°। সবচেয়ে বেশী জ্বরের সময় হচ্ছে বেলা ১২টা। পূর্বে যে ভাবে দিনের পর দিন জ্বর বাড়ছিল সেই হিসাবমত আজ ১২টায় জ্বর হওয়ার কথা ১০৫°। বেলা ১২টা বাজল, রুগীকে আর ১ ডোজ্ ওষুধ দেওয়া হোল। দেখা গেল যে রুগীর temperature 97·6। ৪ ঘণ্টা বাদে দেখা গেল ৯৬°। সন্ধ্যার সময় যখন নীলরতনবাবুকে আমরা report পাঠালুম তখন রোগিণীর টেম্পারেচার ৯৫°। এই যে টেম্পারেচার ৯৫° হোল, এর পর ৩ দিন ধরে ২।১ পয়েন্ট ছাড়া তা ৯৫এর চেয়ে আর বাড়েনি।

যে দিন রোগিণী পথ্য করলেন সেদিন ডাক্তারবাবু দুজনকেও আমরা খেতে বলেছিলুম। খাবার পরে যখন আমরা গল্প করছি তখন রোগিণী এসে সেখানে কিছুক্ষণের জন্য বসলেন। রোগিণীকে দেখে আমার আগেকার কথা মনে পড়ে গেল। আমি ডাক্তারবাবুদের বললুম—"ব্যাপারটা কী হ'ল বলুন ত।" তাঁরা বললেন—"ব্যাপার আর কী? রুগী সেরে উঠল, এই হ'ল!" আমি বললুম—"তা যেন হ'ল, কিন্তু আপনারা যে বলেছিলেন নীলরতনবাবুর 'Alkaline mixture'এ কিছু হবে না—তার কী?" তখন স্পষ্টবক্তা Retired Civil Surgeon মহাশয় বললেন, "এতে আশ্চর্যটা কোনখানে? এই পাশের ডাক্তারবাবুর practice কেমন আমি জানি না, তবে আমার practice কেমন তাতো জানি। Retire করে অবধি তো practice করছি, কিন্তু রোগীর মুখ দেখছি কই? যদি কারুর মুখ একবার দেখি, দ্বিতীয়বার সে তো আর আসে না। যখন Civil Surgeon ছিলুম তখন visit ১৬৲ টাকা থেকে ৮৲ টাকা, এবং পরে ৪৲ টাকা অবধি করেছিলুম। কিন্তু তবু ত private practice জমল না। আর দেখুন গিয়ে ৭নং Short Streetএ। নীলরতনবাবু visit নিচ্ছেন ৬৪৲ টাকা ক'রে, তবুও তাঁর বাড়ীতে যেন রোগীর গাদী লেগে গেছে। তা তাঁর Alkaline mixtureএ রোগ সারবে না ত কী আমাদের mixtureএ সারবে!"

সেই মহিলাটি এখন সুখেই ঘরকন্না ক'রছেন।
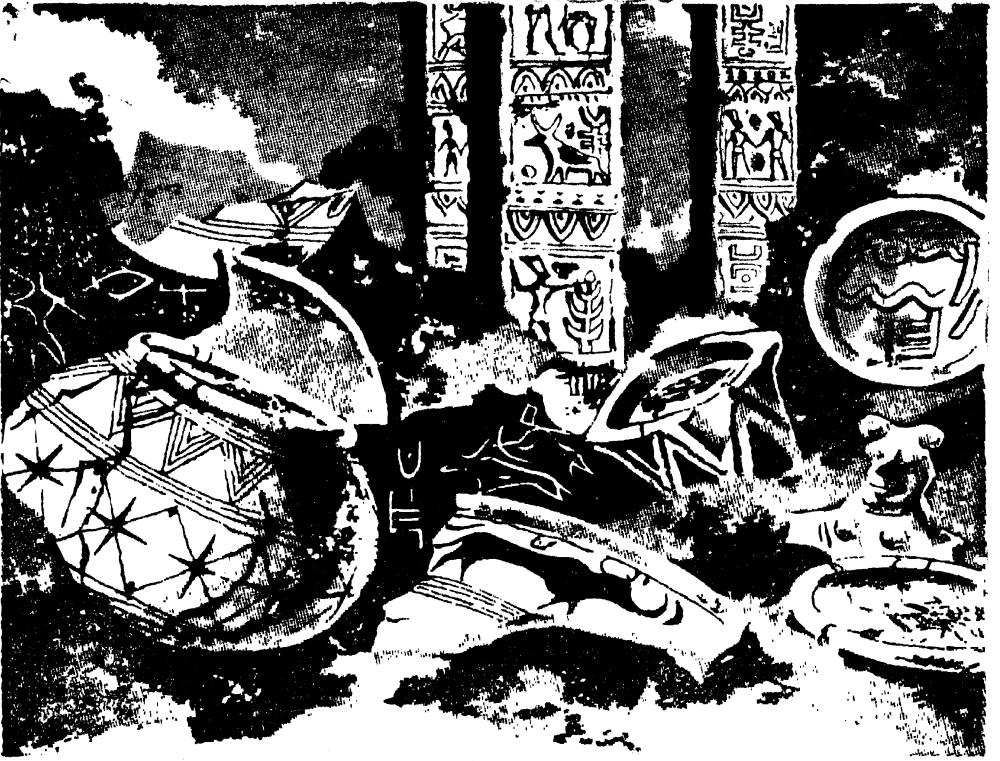
সভ্যতার প্রথম বিকাশ…

মিশরে, মধ্য এশিয়ায় বা ভারতে যেখানেই হয়ে থাক, এবিষয়ে কারো দ্বিমত নেই যে, সভ্যতার ক্রমবিকাশের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো শস্য উৎপাদন। আদিম মানুষ যেদিন প্রথম সোনালী ফসল ফলাতে সফল হলো সেদিনই তার যাযাবর জীবনে যবনিকা নেমে এলো, সে ঘর বাঁধতে শিখলো। এমন কি হাজার হাজার বছর পরেও পিরামিডের তলায়, হরপ্পা ও মোহেঞ্জোদড়োর ধ্বংসস্তূপের নীচে পাওয়া গেছে সেই প্রাক্-আর্যযুগের স্বর্ণশীর্ষ খাদ্যশস্যের সন্ধান।

তখনকার দিনে প্রধান খাদ্যশস্য ছিল যব — বলা হত 'শূকধান্য'। আজকের দিনেও সারা উত্তর ভারতে সমস্ত প্রকার শুভকাজের একটি অপরিহার্য উপকরণ হলো যব। প্রাচ্য চিকিৎসা-শাস্ত্রে যবের ব্যবহার বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল, যেমন যবান্ন, যবশক্তু, যবমণ্ড ও যবাগু। যুগ যুগ আগে প্রচলিত যে যবের কথা বলা হলো সেই যব থেকেই তৈরী হয় আজকের দিনের সুপরিচিত বার্লি। স্নিগ্ধ, সুপাচ্য ও পুষ্টিকর পথ্য হিসেবে বার্লি চমৎকার।

'রবিনসন্স পেটেন্ট বার্লি'র প্রস্তুতকারকদের পেছনে রয়েছে দেড়শত বছরেরও ওপর বার্লি তৈরীর অভিজ্ঞতা। সুপুষ্ট বার্লিশস্য থেকে সর্বাধুনিক কারখানায় বৈজ্ঞানিক উপায়ে, স্বাস্থ্যসম্মতভাবে এই বার্লি তৈরী ও টিনে ভরতি করা হয়। চিকিৎসকেরা রবিনসন্স পেটেন্ট বার্লিরই ব্যবস্থা দেন। রুগ্ন ও দুর্বল ব্যক্তিদের, শিশু ও প্রসূতিদের পক্ষে বার্লি ও দুধবার্লি একাধারে উপকারী ও উপাদেয় পথ্য। তাছাড়া, পাতিলেবু বা কমলালেবুর রসের সঙ্গে বার্লির পানীয় পরম স্নিগ্ধ ও তৃপ্তিকর। **অ্যাটলান্টিস (ঈস্ট) লিমিটেড** (ইংলণ্ডে সংগঠিত)

JWTRPT 6089

বংশী ভুনাওয়ালার দোকান ছিল আমাদের পাড়ায়। ভুনাওয়ালা বলে তাচ্ছিল্য করবার কিছু নেই; বিরাট বড় দোকান—সকাল থেকে রাত্রি দশটা অবধি খদ্দেরের ভিড় লেগেই আছে।

বংশীর বাবা শুকদেও প্রথম জীবনে ফেরি করত। তখন কলকাতা শহরে এত রবরবা ছিল না। আমাদের দিকটায় বিস্তর জমি খালি পড়েছিল। তারই খানিকটা ইজারা নিয়ে সে ছোট একটি দোকান পেতেছিল। সেই দোকানই ক্রমশ বড় হয়ে আজ বংশী ভুনাওয়ালার দোকানে পরিণত হয়েছে।

শুকদেওয়ের তিন ছেলে—বংশী, গণেশ ও রামচরণ। এই ছেলেরাই পরে বাপের ব্যবসাকে ফলাও করে তুললে। খালি ভুনাওয়ালার দোকান নয়—দোকানের সংলগ্ন আরো খানিকটা জমি নিয়ে তারা দোতলা মাঠকোঠা করেছিল। এইখানে তারা ভাড়াও দিত এবং নিজেরাও থাকত।

শুকদেও মারা যাবার পর এরা তিন ভাইয়ে অক্লান্ত চেষ্টা করে ছোট্ট সেই দোকানটিকে বড় কারবারে পরিণত করলে। তিন ভাই বিয়ে করলে; বৌরা এসে স্বামীদের কারবারে লেগে গেল। এখন মস্ত উঁচু মাচায় গামলায় করে থরে থরে পণ্য সাজানো—চালভাজা, কড়াইভাজা, ছোলাভাজা, চ্যাপ্টা ছোলা, যবের ছাতু, ছোলার ছাতু—আরও কত কি! নিচে গনগন করছে উনুন—পাশে বৌরা জাঁতা ঘুরোচ্ছে, কেউ বা বাড়ীর ভেতরে রাঁধছে, কেউ বা মাচার ওপরে দোকানে বসে জিনিসপত্র বিক্রি করছে। ছেলেরা কোট-জুতো পরে ইস্কুলে যাতায়াত করছে। এক কথায় বংশীর যেমন জমজমাট ব্যবসা তেমনি জমজমাট পরিবার।

বংশীর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি কিন্তু তার স্ত্রীর বয়স তার থেকে অনেক বেশি। বংশীর বয়স হলেও তাকে তখনো জোয়ান বলে মনে হতো কিন্তু তার বৌকে আসল বয়সের চেয়েও অনেক বেশি বয়সের বলেই মনে হতো। এরই মধ্যে বংশী দিনকয়েকের জন্য কোথায় গিয়ে এক বিয়ে করে বৌ নিয়ে এল। বংশীর কাণ্ড দেখে তাদের বাড়ীর সবাই তো বটেই পাড়াসুদ্ধ লোক অবাক। দিন-কতক খুব হৈ-চৈ, ঝগড়া-ঝাঁটি—চালে আর কাক-চিল বসতে পারে না এমনই অবস্থা।

দিনকয়েক বাদে অবস্থায় একটু সামাভাব এসে পৌঁছলে সকলে বংশীর নববিবাহিত স্ত্রীকে চক্ষু মেলে দেখলে এবং দেখে দ্বিতীয় দফা অবাক মানলে।

নতুন বৌয়ের বয়স বাইশ তেইশ বছর হবে। রংটা মাজা-মাজা—বংশীদের ঘরে তাকে গৌরবর্ণাই বলা চলে। টানা-টানা চোখ দুটি যেন একটি শাণিত ছুরির দুটো ফলা। মুখখানা একটু লম্বা এবং অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত। দেহলতা নিটোল যেন কুঁদে বার করা হয়েছে। এ রকম সুন্দরী অনেক বড় ঘরেও মেলে না।

নতুন বৌ এসেই নিজেকে বিপরীত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিলে।

দু'দিনের মধ্যেই সে দাঁড়িপাল্লা ধরতে শিখে গেল এবং বাংলা বলতে লাগল বংশীদেরই মতো। নতুন বৌয়ের নাম ফুলবাসিয়া।

ফুলবাসিয়ার আগমনের পর বংশীর দোকানের বিক্রি বেড়ে গেল প্রায় দ্বিগুণ। পাড়ার যাঁরা জন্মেও ভুনা-ওয়ালার দোকান থেকে জিনিস কিনতেন না তাঁরা হঠাৎ ছোলাভাজা ও চালভাজার অনুরাগী হয়ে উঠলেন। কিন্তু ফুল-বাসিয়া তাঁদের অনুগ্রহকে গ্রাহ্যই করলে না। দরকার হলে তাদের সংগে সমানে চেঁচামেচি করতেও ছাড়ত না। আমরা জানি এই ফুলবাসে অনেক দূর-দূরান্তের ভৃঙ্গ আকৃষ্ট হয়ে ছুটে আসত কিন্তু ফুলের চারদিকে গুঞ্জরণ করাই তাদের সার হতো। সকলকে বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে যেতে হতো।

ফুলবাসিয়ার বচন ছিল তীক্ষ্ণ। সমানে বাংলা ও হিন্দী ভাষায় সে গালি-গালাজ করে যেত। কিন্তু তবু খদ্দেরের ভিড় কমত না। বংশী ভুনাওয়ালার দোকান এখন লোকের কাছে ফুল-বাসিয়া ভুনাওয়ালীর দোকানে পরিণত হলো।

ইতিমধ্যে ফুলবাসিয়া আবার পশ্চিমের কোন জায়গা থেকে গোটা পাঁচ-ছয় দুধাল ছাগল আমদানি করলে। গাধার মত সর্বাঙ্গে লম্বা লম্বা লোম-ওয়ালা এবং গরুর পালানের মতন পালানওয়ালা সেই ছাগলের দল দেখবার জন্যে রাস্তায় লোক দাঁড়িয়ে যেত। এগুলি ছিল ফুলবাসিয়ার নিজস্ব সম্পত্তি। সে নিজে তাদের পরিচর্যা করত, নিজে দুধ দোয়াতো এবং বিক্রিও করত। উদ্বৃত্ত দুধ যা থাকত তা তাদের সংসারের জন্য খরচ হতো।

বর্ষা আর শীতকাল ছাড়া বংশীদের পরিবারের পুরুষেরা প্রায় সকলেই রাস্তায় খাটিয়া পেতে রাত্রি কাটাতো। ছাগলগুলোও এই সময়ে বাইরেই থাকত। তাদের বাড়ীর কয়েক পা দূরেই ছিল প্রকাণ্ড মাঠ; সেই মাঠে দুপুরবেলা ফুলবাসিয়াই ছাগল-গুলোকে ছেড়ে দিয়ে আসত। তারা স্বচ্ছন্দে ঘাস-টাস খেত। আবার বিকেল নাগাদ সেগুলোকে সংগ্রহ করে এনে বাগানের দু'পাশে বেঁধে রাখত।

এখন এই মাঠটি ছিল আমাদের লীলাভূমি। পাড়ার এবং বেপাড়ার আমরা কয়েকটি সেরা সেরা ছেলে এই মাঠে ফুটবল খেলতুম এবং আড্ডা দিতুম। ফুলবাসিয়ার দিকে না এগোলেও আমাদের মধ্যে তার সম্বন্ধে আলোচনার অন্ত ছিল না। খেলা যে রোজই হতো তা নয় কিন্তু যেদিনে খেলা হতো না সেদিনে নানান বিষয়ের আলোচনার মধ্যে ফুলবাসিয়া ছিল একজন।

দেবাশীষ থাকত আমাদের পাড়া থেকে একটু দূরে। সে ফুটবল খেলত না, আলোচনার মধ্যে অতি সামান্যই কথাবার্তা বলত; কিন্তু সে ছিল আমাদের সিগারেটের ভাণ্ডারী।

—দেবা, একটা সিগারেট ধরা। —বলা মাত্রই সে পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরিয়ে দু'টান মেরে আমাদের দিকে এগিয়ে দিত। ও ছিল অতি ভালমানুষ ও নিরীহ লোক। আমাদের যেদিন কিছুই করবার থাকত না সেদিন দেবাশীষকে নিয়ে চ্যাংদোলা করে দৌড়ানো হতো। কখনো কখনো শুকনো পাতা যোগাড় করে তাতে আগুন ধরিয়ে তার মধ্যে দিয়ে দেবাশীষকে দোলানো হতো আর সে চাঁ-চাঁ করে চেঁচাত। আমরা তাতে পরমানন্দ উপ-ভোগ করতুম। দেবাশীষ হাসিমুখেই এ-সব সহ্য করত এবং কোনোদিনই আড্ডা কামাই করত না।

দেবাশীষ ছিল পয়সাওয়ালা ঘরের ছেলে কিন্তু তার কোনো চাল ছিল না বললেই হয়। মোটা কাপড়ের পাঞ্জাবি, মোটা ধুতি—এই ছিল তার পোষাক। আর ছিল তার মেজাজ! অমন শরীফ মেজাজের লোক আজও আমার চোখে পড়েনি। কখনো তাকে বিরক্ত হতে বা রাগতে দেখিনি।

আমাদের মাঠ রাস্তার ধারে হলেও তার তিন ভাগ ছিল কতকগুলো বাড়ীর আড়ালে, আর এক ভাগ ছিল রাস্তার দিকে খোলা। একদিন বিকেলে আমরা মাঠে বসে গুলতানি করছি, ফুটবলটা পাম্প হচ্ছে—এখুনি খেলতে নামব এমনি অবস্থা—ঠিক সেই সময় কে যেন

দেবাশীষের কাছে সিগারেট চাইলে। দেবাশীষের পকেটে তখন সিগারেট ছিল না। —এখুনি কিনে নিয়ে আসছি—বলে সে উঠে রাস্তার দিকে অগ্রসর হলো। ঠিক সেই সময় বিপরীত দিক থেকে ফুলবাসিয়ার আবির্ভাব ঘটল।

ফুলবাসিয়া এসেই চীৎকার করে তাদের উদ্দেশে গালাগালি দিতে সুরু করল। আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলুম—কি হলো রে! [illegible] সেই উত্তেজিত অবস্থায় সামনে [illegible] সাধ্য আমাদের ছিল না। শেষকালে বুঝতে পারা গেল তার ছাগলের পালকে তাড়া দিয়ে কে মাঠের বার করে দিয়েছে।

ফুলবাসিয়া চেঁচাচ্ছে। এমন সময় এদিক থেকে দেবাশীষ এগিয়ে গিয়ে ফুলবাসিয়াকে কি যেন বললে। আমরা সবাই হাঁ করে দেখছি যে এবার কি হয়! ফুলবাসিয়া দেবাশীষের কথায় কি একটা জবাব দিলে কিছুই শুনতে পাওয়া গেল না। তারপরে দুজনে কিছুক্ষণ কথাবার্তা হলো—কি কথাবার্তা হলো কিছুই আমরা বুঝতে পারলুম না—আমাদের চোখের সামনে দিয়ে তারা দুজনে রাস্তার দিকে চলে গেল।

কি কথাবার্তা হতে পারে তা অনুমান করবার চেষ্টা করছি এমন সময়ে আমাদের ফুটবল পাম্প হওয়া শেষ হয়ে গেল। আমরা মাঠে নেমে পড়লুম—খেলার উত্তেজনায় দেবাশীষ ও ফুলবাসিয়া উভয়েই ডুবে গেল।

পরের দিন আমাদের অন্য জায়গায় ম্যাচ খেলা। তার পরের দিন গড়ের মাঠে মোহনবাগানের ম্যাচ। এই রকম উপরি উপরি কতকগুলো ব্যাপারে সেদিনের বিকেলের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছি। সেদিনের সেই ব্যাপারের পর দেবাশীষ যে আর মাঠে আসছে না —এটা আমরা কেউই লক্ষ্য করিনি।

প্রায় পনের দিন এইভাবে কেটে যাওয়ার পর একদিন বিকেলে মাঠে আমি একলা বসে আছি এমন সময় দেবাশীষের কথা মনে পড়ে গেল। একটু পরেই নির্মল মাঠে আসতেই আমি তাকে বললুম—এই, দেবাশীষ আসছে না কেন? কি হলো তার?

নির্মল বললে—অনেক দিন আসছে না দেখে আজ সকালে তার বাড়ী গিয়েছিলুম। সে বললে—একটা ছেলে পড়াবার কাজ পেয়েছি ভাই। বিকেলবেলা স্রেফ আড্ডা না দিয়ে তাকে পড়াতে যাই। দশ টাকা করে দেবে বলেছে—মন্দ কি!

নির্মল বলতে লাগল—জিজ্ঞাসা করলুম—তোমার টাকার কি এত ভাবনা? যখনই চাইছ—বাবার কাছ থেকে পাচ্ছ। আমার কথা শুনে দেবাশীষ আমতা আমতা করতে লাগল, স্পষ্ট জবাব কিছুই দিলে না।

নির্মল আরো বললে—ব্যাপারটা রহস্যময় বলে বোধ হচ্ছে। আমি ঠিক করেছি কাল বিকেলে ওর পেছু নিয়ে দেখবো যে ও কোথায় যায়!
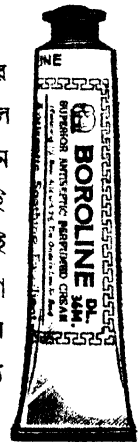
আমি বললুম—আমিও তোর সংগে যাব।

ঠিক হল আজ আমরা দুজনে দেবাশীষের পেছু নেব। সে চারটের সময় বাড়ী থেকে বেরোয়।। আমরা বেলা সাড়ে তিনটের সময় গিয়ে তার বাড়ীর আশেপাশে কোথাও লুকিয়ে থাকব।

পরের দিন আমি আর নির্মল তাদের বাড়ীর থেকে খানিকটা দূরে অবিশ্যি বাড়ীটাকে নজরে রেখে—এক জায়গায় ওৎ পেতে বসে রইলুম। বেলা চারটে নাগাদ দেবাশীষ বাড়ীর থেকে বেরিয়ে এল। দেখলুম তার গায়ে ধোপদোস্ত পাঞ্জাবি, পরণেও তেমনি ফর্সা ধুতি। বাড়ী থেকে বেরিয়ে একবার চারদিকে ভালো করে দেখে আমরা যেদিকটায় বসে ছিলুম তার বিপরীত দিকে হন হন করে চলতে লাগল। খানিকটা চলে আমরা কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে এসে পৌঁছলুম। তখন রাস্তায় লোক চলাচল বেড়েছে। দেবাশীষ তারই মধ্যে দিয়ে উত্তর মুখে এগিয়ে চলল। আমরাও সমান ব্যবধান রেখে তার অনুসরণ করতে লাগলুম। দেখলুম সে খানিকটা করে চলে আর ফুটপাথের ধারে এসে দাঁড়িয়ে চারদিকে চায়—আবার চলতে থাকে। নির্মল বললে—দেখলি! ছেলে পড়াতে যাবে তো এত সন্তর্পণে কেন বাবা!

যাই হোক আবার সে চলতে লাগল। মানিকতলার ভেতরে ঢুকে সে হঠাৎ মারলে টেনে দৌড়। কি ফ্যাসাদ! আমরাও দৌড়তে লাগলুম। পঞ্চাশ ষাট গজ দৌড়ে একটা পানের দোকানের সামনে সে দাঁড়িয়ে গেল। সেখান থেকে সিগারেট কিনে একটা সিগারেট ধরিয়ে হেলে-দুলে চলতে লাগল পশ্চিম দিকে। আমরা যতদূর সম্ভব নিজেদের লুকিয়ে লুকিয়ে তার অনুসরণ করতে লাগলুম। তারপরে বাঁ দিকে একটা পল্লীর মধ্যে ঢুকে পাঁচখানা বাড়ী ছাড়িয়ে একটা বাড়ীতে টুপ করে ঢুকে পড়ল। আমরাও ছুটে গিয়ে সেই বাড়ীর মধ্যে ঢুকলুম। দেবাশীষ ততক্ষণে উঠোন পার হয়ে অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে উঠছে। আমরা তার এত কাছে এসে পড়েছি—তবু সে টের পেল না। ওপরে দোতলায় উঠে সে বারান্দার ধারে একটা ঘরে ঢুকে পড়ল।

ঘরের দরজা খোলাই ছিল। আর বাক্যব্যয় না করে আমরাও ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লুম। দেবাশীষ উঠে আমাদের দেখে বলে উঠল—আরে! তোরা কোত্থেকে? আমার পেছনেই ছিলি বুঝি? আমার গোড়া থেকেই মনে হচ্ছিল কে যেন আমার পেছু নিয়েছে! যাকগে—যখন এসেই পড়েছিস তখন বোস ভাই!

ঘরের মধ্যে একদিকে একটা উঁচু বিছানা—তাতে বালিশ পাশবালিশ সবই রয়েছে। বিছানার সামনে মাদুর পাতা। আমরা জুতো খুলে মাদুরে বসলুম। এমন সময় ঘরে অন্য দিকের একটা দরজা দিয়ে ঢুকল ফুলবাসিয়া।

কিমাশ্চমতঃপরম্! মিশরের পিরামিড কিংবা ইলোরা আর কৈলাস চেষ্টা করলে কল্পনা অন্তত করা যায়। কিন্তু এ যে কল্পনাতীত!

দেবাশীষ বললে— ফুলবাসিয়া, বোসো। এরা আমার বন্ধু। আমার অজ্ঞাতে আমার পেছু নিয়ে একেবারে এখানে এসে ঢুকেছে।

ফুলবাসিয়ার মুখ দেখে মনে হলো সে আমাদের আসাটা মোটেই পছন্দ করেনি। একটু হেসে তবু সে বললে—তাই নাকি!

ফুলবাসিয়াকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল। একেই তো সে ছিল সুন্দরী, তার ওপরে দেহে ক'দিন সাবান পড়েছে—মাথায় তেল—সুন্দর একখানি চওড়া পেড়ে তাঁতের শাড়ী হিন্দুস্থানী ধরণে পরা—মাথায় কবরীতে একটি বেল-ফুলের মালা জড়ানো—সত্যিই চমৎকার দেখাচ্ছিল ফুলবাসিয়াকে!

দেবাশীষ আমাদের বললে—এ বাড়ীতে কয়েক দিনের জন্যে এসে উঠেছি বটে কিন্তু অন্যত্র বাড়ী আমি ঠিক করেছি। শীগগিরই সেখানে উঠে যাব—

একটুক্ষণের মধ্যে ফুলবাসিয়াও মুখর হয়ে উঠল। আমি আর থাকতে না পেরে তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—অচ্ছা ফুলবাসিয়া, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, রাগ করবে না তো?

সে বললে—না, না, আপনারা বন্ধুলোক, আপনাদের কথায় কি রাগ করতে আছে?

জিজ্ঞাসা করলুম—অনেকগুলি ধনী লোক তোমার অনুগ্রহভিখারী হয়ে নিরাশায় ফিরে গিয়েছে। শেষকালে দেবার মধ্যে তুমি কি দেখলে—

ফুলবাসিয়া আমার কথার মাঝখানে বললে—ওর ওপর বড় মায়া পড়ে গেল। তাছাড়া দিনরাত সতীনের সংগে খিচিমিচি আর ঐ বুড়ো বর সহ্য করতে পারলুম না। তার ওপরে দেখলুম মানুষটা ভালো—তাই সব ছেড়ে দিয়ে চলে এলুম।

দেবা বললে—কিন্তু ভাই, তোমাদের একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে। প্রতিজ্ঞা কর আমরা যদ্দিন বেঁচে আছি একথা কারো কাছে প্রকাশ করবে না—

প্রতিজ্ঞা করলুম— ফুলবাসিয়া খপ করে আমার দুহাত ধরে বললে—কারুকে বলবেন না। আমার স্বামী খবর পেলে মিছিমিছি কতকগুলো মারপিট থানা পুলিস হবে।

ফুলবাসিয়ার হাত ধরে বললুম—তুমি নিশ্চিন্তে থাক—কারুকে বলব না।

দেবার কল্যাণে দেবদুর্লভ ফুলবাসিয়ার স্পর্শলাভ করলুম।

বন্ধুবান্ধবদের কাছে ঘুণাক্ষরেও দেবাশীষের কথা প্রকাশ না করলেও তার সম্বন্ধে আলোচনারও অন্ত রইল না। কোথায় গেল সে—কেন আসছে না—কেন রাগ করেছে ইত্যাদি। যাই হোক দিন কাটতে লাগল। এর মধ্যে আমি কিংবা নির্মল কেউই আর ওদিকে যাইনে। একদিন নির্মল দেবার বাড়ীতে গিয়ে খোঁজ নিয়ে এল—তার বাবা মারা গিয়েছেন। সে নিজের বিষয়-আশয় বুঝে নিয়ে বসতবাড়ীর ভাগ ভাইদের কাছে বিক্রি করে দিয়ে কোথায় চলে গিয়েছে!

দিন কাটতে লাগল। বন্ধুবান্ধবদের অনেকেই চাকরি পেয়ে অদৃশ্য হতে লাগল। ক্রমে ফুটবল খেলা ছেড়ে ভবের খেলা সুরু করবার ডাক পড়ল। মাঠ থেকে ঘাট, ঘাট থেকে আঘাটার কোনাকুনি ত্রিকোণীতে ঘা খেয়ে খেয়ে ফিরতে লাগলুম। গুরুজনদের অনুশাসন অমান্য করে নিরবচ্ছিন্ন আড্ডা-সাধনের ফল হাতে হাতে পেয়ে গেলুম। তখনকার যুগে এখনকার মত চাকরি এত সুলভ ছিল না। খোঁটার জোর না থাকলে চাকরি পাওয়াই যেত না। অনেক

উমেদারির পর একটা বড় সওদাগরি আপিসে শেষকালে চাকরি জুটে গেল।

কিছুদিন বাদে তারা বললে—বিদেশে যদি যাও তাহলে উন্নতি হবে। ব্যস্—বিদেশে চলে গেলুম।

দীর্ঘদিন—অতি দীর্ঘদিন অতিবাহিত হবার পরে বদলী হয়ে আবার কলিকাতায় ফিরে এলুম। মাথার চুল খিচুড়ি, চোখে চশমা, দাঁত পড়তে সুরু করেছে—এই অবস্থা। কলকাতায় ফিরে এসে দেখলুম বংশী ভুজাওয়ালার অবস্থা অনেক ফিরে গিয়েছে।

তাদের মাঠকোঠা হয়েছে অনেক বিস্তৃত। শুনলুম তারা টাকা ধারধোর দেবার কারবারও করে। কারা যেন দু' তিনখানা বাড়ীও তাদের কাছে বাঁধা রেখেছে। একখানা নিজস্ব বাড়ীও করে ফেলেছে। তাছাড়া ওরা আবার খুচরোর সঙ্গে পাইকারী কারবারও আরম্ভ করেছে। বস্তা বস্তা চালভাজা ছোলাভাজা কড়াইভাজা ভুট্টার খই পাইকারী কারবারীরা কিনে নিয়ে যাচ্ছে। বংশী ও তার ভাইয়েদের হাতে সোনার তাগা উঠেছে। বংশীর বেশ ভুঁড়িও হয়েছে। মেয়েরা-বৌরা আর তাদের কারবারের কাজ করে না। ছ'টা সাতটা কারিগর দিনরাত কাজ করে চলেছে। এক কথায় অবস্থা তারা ফিরিয়ে ফেলেছে।

ইওরোপে তখন যুদ্ধের সাড়া লেগেছে। সকলেই নিজের ঘাঁটি সামলাচ্ছে—হিটলারের হিট অসহ্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু এতদিন সবাই ঘুমোচ্ছিল তারই মধ্যে সে নিজেকে অসম্ভব শক্তিশালী করে তুলেছিল। তার কিছু কিছু ঢেউ আমাদের ভারতবর্ষে এসেও লাগছিল। হঠাৎ একদিন দুপুরবেলা যুদ্ধ ঘোষিত হলো।

যুদ্ধ ঘোষণা হবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো যেন সকলেই উদগ্রীব হ'য়ে অপেক্ষা করছিল—যে যার ঘাড়ে পারল লাফিয়ে পড়ল। আমাদের শহরের হালচালও গেল বিগড়ে। সন্ধ্যার দীপমালা নিষ্প্রভ হতে হতে একেবারে নিভে গেল। দোকান-পাট সব বন্ধ। সরকার জীবনধারণের জন্য খাদ্যবিতরণের ভার নিজে নিলেন। ফলে একশ' দেড়শ' বছর ধরে এখানে যারা মুদির দোকান করে আসছে তারা ঝাঁপ বন্ধ করে ম্লান মুখে দেশে ফিরে গেল। সন্ধ্যে হলেই সব বন্ধ। বংশী ভুজাওয়ালার দোকানও এর মধ্যে টিমটিম করে চলে একদিন বন্ধ হ'য়ে গেল।

পাড়ার লোক বল্লে—তাই তো বংশী, তোমাদের এতকালের ব্যবসা নষ্ট হয়ে গেল!

বংশী ওপরের দিকে হাত দেখিয়ে বললে—পরমাত্মা যা করবেন তাই হবে।

কিন্তু সেই দিনই পাড়ার লোক সবিস্ময়ে দেখলে বংশীর মাঠকোঠার সামনে খানতিনেক লরী বস্তাবোঝাই হ'য়ে এসে দাঁড়াল। লরীতেই লোকজন ছিল। তারা ঝটপট নেমে মুহূর্তের মধ্যে ভর্তি বস্তাগুলো দোকানের মধ্যে নিয়ে গেল। বস্তাগুলো ছোট বড় লাল শাদা নানান আকারের কাঁকরে ভরা। ধুলো, কেওলিন, মাটিগুঁড়োনোও তার মধ্যে আছে। সারারাত ধরে সেই সব কাঁকর, বালি, ধুলো, চালে ডালে ছোলায় মটরে কলায়ে ধনে-জিরেয় আটায় ময়দায় মিশ্রিত হয়ে শেষ রাত্তিরে তিন লরীর বদলে ছ' লরীর মাল চালান হয়ে গেল। আবার দিনের বেলায় আসতে লাগল চাল ডাল আটা ময়দা। বংশীরা ফুলে ফেঁপে উঠল। শুধু বংশীরা নয়—এ রকম অনেক বংশী অর্থলোভে পাইকিরি দরে নরহত্যা করতে লাগল।

যুদ্ধের ঘূর্ণিতে মানুষের মাথা গেল বিগড়ে। সংসারের হাওয়াই উলটে গেল। ছেলে বাপকে ধরে ঠেঙ্গাতে লাগল—চাকর মনিবকে। চোর হল সাধু, সাধু হল চোর, মেয়েরা হয়ে উঠল বেপরোয়া। এর মধ্যে বিদেশ থেকে দলে দলে সৈনিক এসে পড়ল শহরে; জিপ গাড়ী সাঁজোয়া গাড়ী দিনরাত্রি পথের ওপর দিয়ে ছুটতে লাগল। সুদ্ধ নরহত্যা করবার উল্লাসে তারা লোক-চাপা দিত। আমি নিজের চোখে দেখেছি লোকচাপা দিয়ে তারা হাসতে হাসতে ছুটে গেছে। লোক ছুটছে—কোথায় টাকা, হা টাকা, যো টাকা! এই উন্মাদনা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে
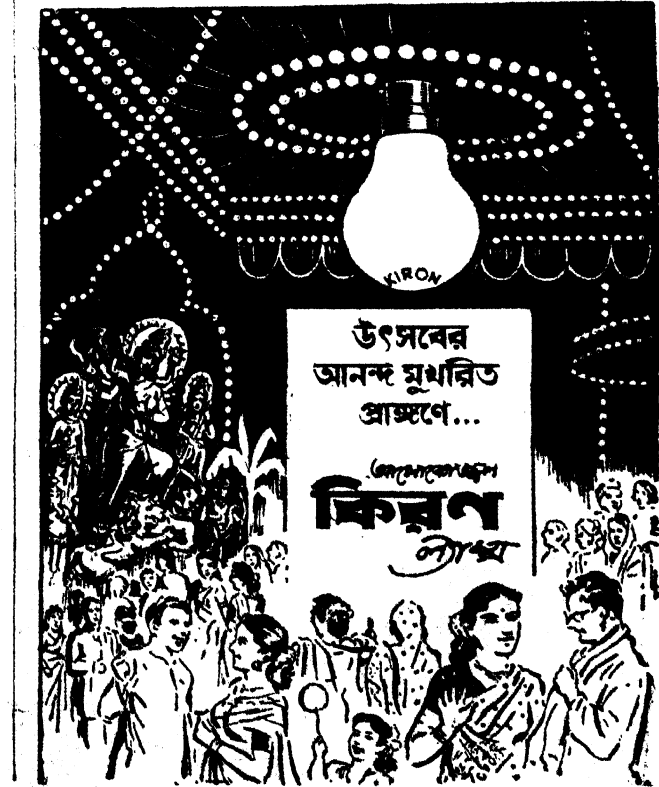
যে দেখেছে নটরাজের তাণ্ডব সেই জেনেছে কি মহান কি বিরাট আর কি অপ্রতিবার্য এই ধ্বংসের লীলা।

এরই মধ্যে একদিন দেখা গেল বংশীদের অতবড় মাঠকোঠা ভেঙে একেবারে মাঠ করে ফেলা হয়েছে। যে সময় একমুঠো সিমেণ্ট কিংবা এক পাত ইস্পাত শতগুণ দাম দিয়ে লোক যোগাড় করতে পারে না সেই সময়ে বংশীর বিরাট প্রাসাদ হ'তে লাগল। দ্যাখ্-দ্যাখ্ করে এক বছরের কাজ দু'-মাসেই শেষ হয়ে গেল। একদিন যেখানে বংশী ভুজাওয়ালার ছোট্ট ঘর ছিল সেখানে উঠে পড়ল এক বিরাট প্রাসাদ। তাদের বাড়ীর কাছেই মস্ত একটা খালি জায়গা পড়েছিল সেটা কিনে নিয়ে বংশী নিজের নামে বাজার বসিয়ে ফেললে। বাজারের চারদিকে তেতলা বাড়ী—বাড়ীর ওপর লেখা হলো "বংশীবাবুর বাজার"। শহরের আর একদিকে আর এক বাজারের নাম হলো "গণেশ মার্কেট", আর একটা বাজারের নাম হলো "রাম-বাবুর বাজার"। বংশীরা এক এক ভাই আট-দশ লাখ টাকার ওয়ার-বণ্ড কিনে ফেললে। বংশীর বাড়ীর গেটে তামার প্লেটে বড় বড় পেতলের হরফে লেখা হলো—'বংশীপ্রসাদ জয়সোয়াল এণ্ড ব্রাদারস্ প্রাইভেট লিমিটেড'। দরজার আর এক দিকে লেখা হলো "জয়সোয়াল প্যালেস"। গেটের দু'দিকে বন্দুকধারী সেপাই বসল। আরো আশ্চর্যের বিষয় বংশীকে সরকার দু'দিন ডেকে নিয়ে গেল। জেনারেল পোস্টআপিসের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বংশীপ্রসাদ ওয়ার-বণ্ড সম্বন্ধে লেকচার দিয়ে এল।

সেদিন ছিল মহরমের ছুটি। ছেলে-বেলায় বাবার হাত ধরে আমরা দুই ভাই মহরম দেখতে যেতুম। মেছোবাজারে একটা বাড়ীর উঁচু রকে আমাদের চড়িয়ে দিয়ে বাবা নিজে পাশে দাঁড়াতেন। সেই দামামাধ্বনি ও রণহুঙ্কার, লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, পাটাখেলা, লুপখেলা—এই সব দেখতে দেখতে আমাদের বুকের মধ্যেও রণবাদ্য বাজতে লাগল। কখনো ভয়ে, কখনো উৎসাহে সময়টা যে কি করে কেটে যেত তা বুঝতে পারতুম না। ফেরবার সময় দুই ভাইয়ে দু'টো ঝিঁঝি-পোকা কিনে বাজাতে বাজাতে ফিরতুম।

তারপর থেকে সখ করে কখনো মহরম দেখতে যাইনি। বন্ধুবান্ধবদের পাল্লায় পড়ে দু'একবার যেতে হয়েছিল বটে কিন্তু ভিড়ের ঠেলায় কিছুই ভালো লাগেনি।

সেদিন ছিল আপিসের ছুটি। কাজ-কর্ম কিছুই নেই। খুড়ো জ্যাঠা আর অবশিষ্ট নেই যে ধরে গঙ্গাযাত্রা করি—নিজেই গঙ্গাযাত্রা করলে হয় এমনই অবস্থা—দুপুরবেলা সার্কুলার রোডে মহরম দেখতে গেলুম। এক জায়গায় ভিড় একটু কম দেখে ফুটপাথের ধারে গিয়ে দাঁড়ালুম। চোখের সামনে লাঠি খেলতে খেলতে দলের পর দল চলেছে। দেখলুম সেই আণ্ডারওয়্যারের ওপরে জরির ফিতে দেওয়া জাঙিয়ার বাহুল্য আর নেই—অধিকাংশই পেণ্টুলান-হাফ-প্যাণ্ট-বুশশার্ট পরে নেমেছে। এই সব দেখছি—এমন সময় দেখি আমার পাশে যে লোকটি দাঁড়িয়েছিল সে ধীরে ধীরে আমাকে লক্ষ্য করে দেখছে।

দেখলুম লোকটির মুখ হাত কান—সব কুষ্ঠরোগে ফুলে উঠেছে। মনের মধ্যে অস্বোয়াস্তি ভোগ করতে লাগলুম—মনে হলো আস্তে আস্তে সেখান থেকে সরে পড়ি। ঠিক সেই সময় লোকটি ঘুরে সিধে আমার মুখের দিকে তাকাল।

আমিও তার মুখের দিকে তাকালুম—মুখটা অসম্ভব ফোলা, চোখ দুটো কোথায় গর্তের মধ্যে ঢুকে গেছে—কিন্তু দেখতে দেখতে সেই দুই চোখে পরিচয় ভেসে উঠতে লাগল। বলে উঠলুম—আরে! দেবাশীষ যে! কি খবর?

ভাঙা ভাঙা গলায় সে বললে—চিনতে পেরেছেন?

আমি বললুম—দেবাশীষ, আমাকে আপনি বলছ কেন?

দেবাশীষ বললে—কি জানি, যদি কিছু মনে করো।

দেবাশীষ চলতে আরম্ভ করল উত্তর মুখে। আমিও তার সঙ্গে সঙ্গে পা বাড়ালুম। জিজ্ঞাসা করলুম—ফুল-বাসিয়ার খবর কি?

সে বললে—ফুলবাসিয়া মারা গেছে বছর দুই হলো। তারই তো প্রথমে এই রোগ হয়। ডাক্তার দেখে বললে—এ বড় খারাপ জাতের কুষ্ঠ। একে একখুনি কোনো আশ্রমে পাঠিয়ে দাও, সেরে যাবে। মধ্যপ্রদেশে বড় আশ্রমে তাকে পাঠাবার ব্যবস্থাও করেছিলুম কিন্তু সে কিছুতেই যেতে চাইল না। বললে—তোমাকে ফেলে কোথাও গেলেই আমি মরে যাব। দেখতে দেখতে সে ফুলে ফেটে পড়তে লাগল। বছর দুয়েকের মধ্যে সে মারা গেল। তারপরেই আমাকে এই রোগে ধরেছে।

বললুম—কি অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে তোমার—তোমার মুখ—তোমার চেহারা!

দেবাশীষ বললে—খালি আমার চেহারার পরিবর্তন দেখছ? সমস্ত দুনিয়াটা কি ফুলে ফেঁপে পচে ফেটে পড়ছে না? কি বদলে যায়নি? আমাদের ছেলেগুলো মেয়েগুলো ন্যায় ধর্ম সমাজ—সবই তো কি অদ্ভুত বদলে গেছে। এর মধ্যে যে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারবে সেই নিজেকে বাঁচাতে পারবে।

বললুম—তুমি কোনো আশ্রমে চলে যাচ্ছ না কেন?

দেবাশীষ বললে—আমি যাব ঠিক করে ফেলেছি। বিষয়-আশয়ের বন্দোবস্ত করতে যা একটু দেরি।

চলতে চলতে দেবাশীষ বললে—আশ্রমে যাবার আগেই আমি একটা পরি-বর্তনের আশা করছি।

জিজ্ঞাসা করলুম—কি পরিবর্তন?

—মৃত্যু।

কথাটা বলেই দেবাশীষ বাঁদিকের একটা গলিতে ঢুকে পড়ল। গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে তাকে দেখতে লাগলুম। তার পা-দুটোও অসম্ভব রকমের ফুলে উঠেছে। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে সে মন্থরগতিতে এগিয়ে চলেছে। অপস্রিয়-মান সেই চেহারা ক্রমেই আমার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে লাগল।

তারপর ডানদিকের একটা গলিতে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হবিবন মিয়া খাদিরন বিবি ও গুলাব টাট্টু

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

ব্যাপারটা মিটমাট হয়ে গেল; এর ফলটা এক হিসাবে মিট্‌ঠু মাদারির বানর-দম্পতিরই প্রাপ্য।

সামান্য একটু কথা কাটাকাটি, তাই থেকে রীতিমতো ঝগড়া হয়ে দুই বেহাইয়ে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে গেল। ওদের জাতের মধ্যে নেশার মুখে এ রকম ব্যাপার নিত্য হচ্ছে, নেশার মুখেই আবার হাত ধরাধরি, ক্ষমা চাওয়া, নাককান মলার ঘটা, চোখের জলে কোথায় ভেসে যাচ্ছে মনের সব ময়লা। নিত্যকার ব্যাপার, তবে বেহাইয়ে-বেহাইয়ে ব'লে এক্ষেত্রে একটু মর্যাদার প্রশ্ন এসে পড়ল, তাই থেকে অধিকারের। লছমন বলল—"ভেবেছ কি তুমি একবার নিজেকে বল দিকিন। লছমন মোড়লের মেয়ে ঘরে তুলে জাতে ক'ধাপ উঠে পড়লে কিনা এক লাফে, দেমাকে ধরাটাকে সরা দেখছ একেবারে। তা যাও, আজ থেকে সব সম্বন্ধ নাকচ ক'রে দিলাম এই।"

দুখনও চোখ পাকিয়ে উঠল, বলল—"উঃ, স্বর্গে টেনে তুলেছ! তা থাকো তোমার স্বর্গে। আগে কিন্তু মেয়েটিকে

বাড়ি ব'য়ে দিয়ে যাবে, তারপর তুমিও নাকচ তো আমিও নাকচ।"

"যাবে না ছোটলোকের বাড়ি আর। জন্ম দিয়েছি, এক মুঠো খেতে দেওয়ার সামথ রাখি।"

"এক আঁজলা ট্যাকা নিয়ে তবে মেয়ে দিয়েছ। খরিদকরা পুত্রবৌ আমার, জোর ক'রে টেনে নিয়ে আসব।"

"ফিরিয়ে নিও তোমার ট্যাকা।"

"নিলাম না ফিরিয়ে। আমায় আমার খরিদ-করা মেয়ে ফিরিয়ে দেবে, হকের জিনিস, আইন আছে দেশে। আদালত আছে।"

"যাও, করোগে আদালত।"

"জোর ক'রে কেড়ে নিয়ে আসব, আদালত তো অনেক পরে।"

জিতুদাসের ছেলের তিলক, অর্থাৎ পাকা-দেখা। বাইরের ওসারায় তাল-পাতার চ্যাটাই বিছিয়ে আসর হয়েছে, মাঝখানে দুটো ঘয়লা, গোটাকতক কাচের গেলাস; এই আসরেই ঝড়টা উঠল হঠাৎ। কেউ ঢুলুনির মধ্যে পিট-পিট ক'রে চাইছে, কেউ থামাবার চেষ্টা করছে অবশ হাত তুলে, এদিকে কিন্তু বেড়েই যাচ্ছে ঝড়ের বেগ। কেড়ে নিয়ে আসবার কথায় লছমন হাতের গেলাসটা নামিয়ে রেখে কটমট করে চেয়ে রইল দুখনের দিকে, একটা চরম জবাব খুঁজছে, এই সময় তার দৃষ্টিটা বাইরের দিকে গিয়ে পড়ল, তিলক দেখতে সেখানে পাড়ার কতকগুলো ছেলে-মেয়ে জড়ো হয়েছে সেইখানে। ঘাড়টা তুলে গেলাসটা উল্টে দিল মুখে। তারপর রাগের মাথায় গেলাসটা ছুঁড়ে ফেলেই যেন ফণা ধ'রে দাঁড়িয়ে উঠে গটগট করে বেরিয়ে গেল, এবং দলের মধ্যে থেকে একটা বছর আট-নয়েকের মেয়েকে ঝাপটে তুলে ধরে ঘুরে দাঁড়িয়ে নেশার ভারি গলায় হুংকার করে উঠল—"তা কেড়ে নেবে তো এসো, দেখি কত বড় বুকের পাটা!"

দাঁড়িয়েই রইল কিছুক্ষণ, মেয়ে-সুদ্ধ ওপরের দিকটা ভারি হয়ে গিয়ে অল্প অল্প টলছে। আরও গোটা-কতক ডাক দিল, তারপর দু হাতে মেয়েটার কাঁধ-দুটো ধ'রে মুখটা সামনে ঠেলে নিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করল—"বল্, যাবি? তাহলে এক্ষুণি আছড়ে পাঠিয়ে দিই শ্বশুর-বাড়ি!"

কি বুঝি হয়ে পড়ে এখনি; সবাই হতভম্ব হয়ে গেছে। মেয়েটা "ও বাবা!" ব'লে ডুকরে কেঁদে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ে দু' হাতে গলাটা জড়িয়ে ধরতে "সুনরিয়ারে!— বিটিয়ারে আমার— তোকে কেড়ে নেবে রে!" বলতে বলতে-- ওর কান্নার সঙ্গে প্রায় গলা মিলিয়ে বাড়ি-মুখো হোল।

উৎপত্তিটা নেশার গেলাসের মধ্যে হ'লেও অনেক ভেতর পর্যন্ত গোড়া নেমে গেছে, বোঝাপড়া আর হতে চাইছে না কোন মতে। লছমনের গুমর জাত নিয়ে, দুখনের জোর সে টাকা দিয়ে জাতের ধার ভোঁতা করে দিয়েছে। কেউ দমবে না। চেষ্টা করছে সমাজের সবাই, কোনও ফল হ'চ্ছে না। একটা কাজিয়া বাধিয়ে কেড়ে নিয়ে আসবার কথাটা—সামনে কলসী, গেলাস থাকলেই বেরোয় মুখ দিয়ে। তবে দুখন বসেও নেই, আদালতের কথা ভাবছে। যদিও ভাবছে থিতিয়ে-জিরিয়েই। তাড়াহুড়ার তো কিছু নেই, ওদিকে মেয়েকে দ্বিরাগমন করাবার, এদিকেও বৌকে দ্বিরাগমন করিয়ে নিয়ে আসবার এখনও ঢের দেরি। ততদিন বেশ চলে আক্রোশ জীইয়ে রাখা।

মাস-তিনেক কেটে গেল। এর মধ্যে একটা "ভার" অর্থাৎ তত্ত্ব পাঠাবার দিন এসে চলেও গেল শুকনো, দু'দিকের ফোঁসফোঁসানিটা দু'দিনের জন্য একটু বাড়িয়ে দিয়ে। এই ক'রে কেটে যেতে লাগল সময়।

ওদিকে বর-কনের কথা। ন' বছরের কনে, বর বয়সের দিক দিয়ে প্রায় ঐ রকমই, বেটাছেলে ব'লে মাথায় এক মুঠো বড়। তাই দেখে বিয়েও দেওয়া হয়েছে---বিয়ের কিন্তু এরা বোঝে কি? বর বনুশী আগেও যেমন সকালবেলা মোষ চরাতে নিয়ে যেত এখনও তেমনি যায়, গ্রামের শেষে পাকুড়-গাছতলায় সঙ্গীদের সঙ্গে কপাটি, গুলি-ডান্ডা খেলায় মাতে, নাইবার সময় পিঠে চড়ে মোষটাকে জলে নামিয়ে হুল্লোড় করে, খাওয়ার সময় মোষ নিয়ে ফিরে আসে। কনে সুনরিয়া তো বরাবর থাকতও না শ্বশুরবাড়িতে; কখনও-সখনও গেল, কিছু দিন রইল, তা সেটুকু বন্ধ হয়ে ওর দৈনন্দিন জীবনে কোন ইতর-বিশেষই হয়নি। বেশই আছে, ওদিকে ভাববারই দরকার হয় না। শুধু একটু-খানি। সুনরিয়াদের বাড়িটা এদিকেই, বামনটুলির বড় পুকুরটার ওধারে। ওরা যখন হুটোপুটি খেলত, মেয়েটা অন্য কতকগুলো মেয়ের সঙ্গে তার ছোট ভাইটাকে নিয়ে পাকুড়গাছের তলায়

একদিকে দাঁড়িয়ে দেখত, সেটা আর নেই। তাও ধরতে গেলে সেটা তো অনেক দিন থেকেই নেই। এ রকম নিয়মিত ছিল বিয়ের আগে, আট মাস হ'তে চলল, বিয়ের পর সুনরিয়া কোন কোন দিন যেন পথ ভুলে এসে পড়ত, দাঁড়াতও অনেক দূরে, পাকুড়তলার বাইরে। সেটুকু গেছে। তা কবে থেকে গেছে খেয়ালও নেই। ভালও হয়েছে, বিয়ের আগে ও এসে দাঁড়ালে বেশ লাগত, খুব জিততো বনশী, বিয়ের পর-- লাগত এক রকম ভালোই--তবে, কি যে হোত, বড্ড হেরে যেত।

এক একবার ভাবে—যাক, বালাই না আসে সেই ভালো। শ্বশুরের ওপরের রাগটা (ওর ততটা না থাকলেও পরিবার-গত তো বটেই) সুনরিয়ার ওপর পড়ে গিয়ে খানিকটা।

যদি মনে পড়ে গেল। খেলার মাতুনিতে পড়েই বা কতটুকু মনে থাকে?

মেয়েদের আলোচনার বারো আনাই কারুর-না-কারুর শ্বশুরবাড়ি নিয়ে সেজন্য সুনরিয়ার মনটা বনশীর মতো অতটা নির্লিপ্ত হওয়া সম্ভব নয়। পাঁচজন একত্র হলেই ঐ কথা, তার মধ্যে তার শ্বশুরবাড়ির কথাও এসে পড়ে, নিত্যই একটু একটু ক'রে নাড়া দিয়ে যেতে থাকে মনটাকে। যা দু' পাঁচবার গিয়েছিল ঐ ক'টা দিনের মধ্যে, তার স্মৃতিটাকে রাখে জাগিয়ে—...শাশুড়ি বড্ড ভালো, এখানে মার যেমন নিত্য বকুনি—এটা ভুল হয়ে গেল—ওটা ওরকম করে করতে গেলি কেন?—বউমাটা কেঁদে সারা হচ্ছে, কানে যাচ্ছে না?—শাশুড়ি সেরকম নয়। আদর করে, সাজিয়ে, পাঁচজনকে দেখিয়ে যেন আশ মিটত না। তারপর, কি খাবে, কোনটে ভালোবাসে। নিজেই জোগাড়-যন্ত্র করে দেওয়া, কিম্বা বাজার থেকে আনিয়ে দেওয়া। একটু শুধু বন্ধ থাকতে হোত, এমন প্রাণ খুলে খেলা নয়, গলা ছেড়ে হাসি-হুল্লোড় নয়। প্রথম প্রথম হয়েও যেত কিছু কিছু, এ-পাড়া-ও-পাড়াই তো, এখানকার অনেক সঙ্গী গিয়ে জুটতও সেখানে,—শাশুড়ি যেমন ডাকতও তাদের, একটু বাড়াবাড়ি হলে তেমনি গরগরও করত। ঐ যা একটু, তবে সে গরগরানির সবটুকুই মাকে নিয়ে—কেমন মা, মেয়েকে একটু সহবৎ শেখায়নি, কনে-বৌ শ্বশুরবাড়ি গিয়ে কিভাবে চলতে হয়, কথা কইতে হয়, হাসতে হয়, শিক্ষা নেই!

তা শিখেও তো আসছিলই সুনরিয়া।

মোট কথা সব মিলিয়ে শ্বশুরবাড়ি জায়গাটা ভালোই। তবে আস্তে আস্তে মিলিয়েও আসছে যেন সব। তার ওপর মার কোলে এই নতুন খুকিটা এসেছে। এও একটা কথা। কাজ বেড়েছে সুন-রিয়ার, খিটিমিটি বেড়েওছে মার, তবু কী চমৎকার খুকিটা! কী মিষ্টি হাসি! সুনরিয়ার এক একবার মনে হয় কাজ নেই বাবা আর শ্বশুরের ঝগড়া মিটে, দিব্যি আছে সে।

কারুর বরের গল্প যদি কোনদিন বেশি হয় বড়রা একত্র হলে, সঙ্গী-সাথীকে নিয়ে ছোট ভাইটার হাত ধরে পাকুরতলায় ছোঁড়াদের হুটোপাটি খেলা দেখবার জন্যে গিয়ে দাঁড়ায় সুনরিয়া। তারপর আবার ভুলে যায় শ্বশুরবাড়ির সবার কথা।

এই করে চলে যাচ্ছিল, এমন সময় এক দিন তড়বড়ে এক বাজনা বাজাতে বাজাতে মিটঠু মাদারি ঢুকল গ্রামের মধ্যে—"চলে এসো বাচ্চারা! চলে এসো বুড়োরা! সবাই সবার কাজ ছেড়ে চলে

এসো! মিট্‌ঠু মাদারির জানোয়ারের খেলা দেখবে এসো—হবিবন মিয়া আর খাদিরণ বিবি আরবী টাট্টুতে চড়ে তাঁদের কেরামতি দেখাতে এসেছেন!—সব কাজ ফেলে চলে এসো!—ছেলে-বুড়ো, মেয়ে-মদ্দো—যে যেমন আছ!

হাতের তড়বড়ে বেজে ওঠে—চড়্-র্-র, চড়্-র্-র্, চড়াৎ!

একটা সাদা রামছাগল, তার পিঠে দুটো বাঁদর। সামনেরটা হুলো, বেশ বড়ো, তাগড়া; পেছনেরটা মাঝামাঝি, বরং ছিমছিমেই। হবিবন মিয়া আর খাদিরণ বিবি। ছেলেমেয়েরা সবাই চেনে, গত বৎসর এই সময় ফাগুয়ার কয়েক দিন আগে গ্রামে এসেছিল মিট্‌ঠু মাদারি, মিয়া-বিবির নাম আওড়াতে আওড়াতে, নাচতে নাচতে, হাততালি দিতে দিতে একটা দল ঘিরে চলেছে, মাদারি বামনটুলির বড় পুকুরের ভিণ্ডায় একটা গাছতলায় এসে থামল। আরবী ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল দুটিতে। আগে হবিবন মিয়া, পরণে চুড়িদার পায়জামা, গায়ে মেরজাই, মাথায় লাল চুড়ো-ওলা টুপি। নেমে হাতদুটো বাড়িয়ে ধরতে খাদিরণ বিবিও ঝুঁকে পড়ে হাত বাড়িয়ে দিল। পরণে ঘাগরা, গায়ে মেয়ে-কুর্তা, চোখে টানা কাজল।

মিট্‌ঠু মাদারির তড়বড়ে বেজে চলেছে। ছুটে আসছে ছেলেমেয়ের দল—বড়রাই বা নয় কেন? নেহাৎ ছুটে না হয় নাই আসুক। মিট্‌ঠু মাদারি নাম ক'রে গিয়েছিল গত বৎসর। খেলা শুরু হয়ে গেল।

নানারকম। দড়ি হাতে মাঝখানে মিট্‌ঠু বসে, আরবী টাট্টু 'গুলাব' প্রথমে 'কেরামতি দেখাল নিজের। দু' পায়ে দাঁড়িয়ে, সামনের পা-দুটো মুড়ে ঘুরে এল দু'পাক, মাঝে মাঝে একটা পা কপালে ঠেকিয়ে সেলাম করাও আছে। একটা ছোট্ট টুলের ওপর চার পা একত্র ক'রে দাঁড়াল। শুয়ে পেটের ব্যথায় ছটফট করতে লাগল, হবিবন হাকিম হয়ে ওষুধ দিতে আবার চাঙ্গা হয়ে উঠল। রুগী দেখতে বাইরে যাবে হকিম সায়েব। টাট্টু ঘোড়াকে বেশ খানিকক্ষণ ধরে ডলে-মলে নিলে হিস-হিস শব্দ করার সঙ্গে, খাদিরণের কাছ থেকে ওষুধের থলিটা নিয়ে গালে একটা বিদায়-চুম্বন দিয়ে উঠে বসল টাট্টুর ওপর।...হেসে, হাততালি দিয়ে লুটোপুটি খাচ্ছে ছেলেমেয়ের দল। আরও সব রকমারি খেলা। মিট্‌ঠু মাদারির ডান হাতে দড়ি, তারই টানের ইসারায় নাকি হচ্ছে সব, তবে বোঝবার জো নেই। বাঁ হাতে তড়বড়েটা, চড়-চড়, চড়াৎ-চড়াৎ করে বেজে উঠছে। মুখে বুলি; সে-সব বুলিই বা কী মজাদার! হাসির হররা তুলছে মাঝে-মাঝে, সবার মধ্যে, ছোট-বড় নেই তায়।

সব শেষে এল সবচেয়ে মজাদার খেলা। খাদিরণ বিবি মান ক'রে শুয়ে আছে। রুগী দেখে এসে ওষুধের থলি হাতে দিতে গেছে, নেবে না। পকেট থেকে ভিজিটের টাকা বের করে দিচ্ছে, নেবে না। মাথায়-পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, উঠবে না। "কি ব্যাপার পেয়ারী আমার, জান আমার, চোখের রোশনি আমার?"—কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে মিট্‌ঠু মাদারির মুখ দিয়ে বলছে হবিবন, খাদিরণ "খ্যাঁক-খ্যাঁক" করে উঠে ছিটকে সরে আসছে। মুখের কাছে খাবার ধরছে, নতুন চুনরী (ঘাঘরা) এনে ধরছে হাতের কাছে, নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এতটুকু নরম হয় না। হবিবন মাথায় করাঘাত ক'রে দুহাতে মাথা চেপে ধ'রে বসে রইল।

মাদারির মজাদার বুলির সঙ্গে তড়বড়ে বেজে চলেছে। এক সময় হঠাৎ মাদারির খেয়াল হতে প্রশ্ন করল—"দেখো তো মিয়া, খাদিরণ বিবি "নৈহর" (বাপের বাড়ি) যেতে চায় কিনা।"

শুনেই চাঙ্গা হয়ে উঠল হবিবন, মাথা দোলাতে দোলাতে এসে মিট্‌ঠু-মিয়ার পিঠে সাবাশির চাপড় দিল ক'টা—"ঠিক বলেছ! ঠিক বলেছ!"

বিবির কানের কাছে মুখ নিয়ে জিজ্ঞেস করতে, এতক্ষণে মাথা দোলাল। তারপর উঠেও বসল। তার তোড়জোড় এবং শেষে গুলাব-টাট্টুর ওপর মিয়ার পেছনে বসে বাপের বাড়ি রওয়ানা।

এর ওপরেও রগড় আছে, একেবারে শেষ দিকে।

গেল তো বিবি নৈহর, ফিরতে একেবারে নারাজ।

আবার সেই সব ব্যাপার—খোসামোদ, লোভ দেখানো—"আরে পেয়ারী মেরী, জান মেরী, তু চলো এবার, তুমি ভিন্ন ঘর আমার অন্ধকার—এই নাও চুনরী, এই নাই লহঠী" (গলার চুড়ি)—কোন মতেই আর বাগ মানানো যায় না বিবিকে, মাথা নাড়া আর থামে না। গুলাব-টাট্টুর ওপর চড়ে ফিরে ফিরে আসে হবিবন।

তারপর আবার ঐ মিট্‌ঠু মিয়ার পরামর্শ!—"আরে মিয়া, কোথায় আছ তুমি? খোসামোদ ক'রে, চুনরী-লহঠী দেখিয়ে কি কেউ কারুর বিবিকে তার বাপের বাড়ি থেকে ফিরিয়ে আনতে পেরেছে?"—মিট্‌ঠু হাসির হররা তুলে চারিদিক থেকে হাতটা ঘুরিয়ে এনে বলল—"এই এত লোক তো রয়েছে, জিজ্ঞেস করো না তাদের নিজের নিজের কথা। বিবিকে আনবে তো তোমার এক নম্বরে ওষুধ বের করো—দবা-ই-ডাণ্ডা—শুড় শুড় করে আসবে চলে।"

লাফিয়ে ওঠে হবিবন মিয়া, পিঠ ঠুকে দেয় মিট্‌ঠু মাদারির—আলবৎ, ঠিক বলেছ! তারপর ওর পাশ থেকেই দবা-ই-ডণ্ডা, মোটা লাঠিটা তুলে নিয়ে গুলাব-টাট্টুকে ছুটিয়ে একেবারে শ্বশুর-বাড়ি গিয়ে নামা।

তারপর মাথার ওপর ডাণ্ডা ঘুরিয়ে দে মার, দে মার! "আরে মিয়া, অত রাগ নয়, বিবি মরে গেলে করবে কি?"—ক্যাঁচ ক্যাঁচ ক'রে ওঠে হবিবন। মিট্‌ঠু মিয়া সবার দিকে চেয়ে বুঝিয়ে দেয়—"হবিবন বলছে মরে গেলে আবার বিবি করব—একটা নয়, দুটো নয়—দশটা বিশটা—বিবির আবার অভাব নাকি?"

মারতে মরতে টেনে নিয়ে আসে। হাত ধরে নয়, গুলাব-টাট্টুর পিঠে করেও নয়—হিড়হিড় ক'রে চুলের মুঠি ধ'রে। খাদিরণ বিবি আওয়াজ তোলে—ক্যাঁচ-ক্যাঁচ-ক্যাঁচ-ক্যাঁচোর-ক্যাঁচ—এই যাচ্ছি, এই যাচ্ছি—এই তো যাচ্ছি মিয়া।

হাসির চোটে বামুনটুলির বড় পুকুরে যেন ঢেউ তুলে দেয় ছেলেগুলো, হাততালি দেয়, ডিগবাজি খায়, ধুলো ওড়ায়, হুল্লোড়-বাজি আর থামতে চায় না। তামাসা বন্ধ করে সামনে বেছানো চাদরটার ওপর থেকে পয়সা জড়ো করতে থাকে মিট্‌ঠু মাদারি।

হুল্লোড় করতে করতে ছেলেরা চলেছে পাকুড়তলার দিকে, তাদের খেলা জমাবে। মেয়ের দলও রয়েছে—একটু আলাদা, তবে মাঝে মাঝে মিশেও যাচ্ছে; এতো মাতামাতি, একটা যেন নেশা ধ'রে গেছে সবার। মুখে হবিবন মিয়া, খাদিরণ বিবি, গুলাব-টাট্টু। একটা ছেলে অন্য একটার কাঁধ ধরে তার ঘাড়ে লাফিয়ে উঠতে গেল, চেঁচিয়ে উঠল—"আমার গুলাব-টাট্টু। গুলাব-টাট্টু আমার!"

একটা স্ফুলিঙ্গ ছিটকে পড়তে আগুন ধরে গেল—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আজ মিট্‌ঠু মাদারির খেলা! হবিবন মিয়া-খাদিরণ-বিবি-গুলাব-টাট্টু। কে কি সাজবে!..."

"বনশী কোথায়?...বনশী! বনশী! ...তুই হবিবন মিয়া...আর খাদিরণ?"

"খাদিরণ তো রয়েছেই—সুখিয়া—এই যে দেখলুম তাকে!...ধ'রে নিয়ে চল ওদের!...উঃ কী মজাই যে হবে!....."

লোভ হয় বৈকি। ছেলেমানুষের মন। আর মাতালই হয়ে উঠেছে তো। এও সত্যি-সত্যি খেলা! তবে শেষ পর্যন্ত অত সত্যিটা আর হতে পায় না।

বন্‌শী অবশ্য রাজি, জিজ্ঞেস করে, "সুনারিয়া রাজি আছে?"

কথাটা কানে যাওয়া মাত্রই সুনারিয়া বাড়ি-মুখো হয়েছে, গিয়ে ধরতে বেঁকে দাঁড়ায়—"আমি গালাগাল দোব—চেঁচিয়ে ডাকব বাবাকে—ইস, বেত মেরে নিয়ে আসবে, সাদ্য ওর!"

একটু সুর কেটে যায়। তবে মাতনের মধ্যে একটু সুর কাটলোই বা কি? মিয়া-বিবি-টাটু পেতে দেরি হয় না। খেলা ওঠে জমে। শুধু বন্‌শী আস্তে আস্তে একটু আলাদা হয়ে পড়ে চুপটি করে থাকে বসে। তেমনি সুনারিয়া এসে জোটে আবার। অবশ্য, কাছে নয়, অনেক দূরে: বামনটুলির বড় পুকুরের এদিকের ভিন্ডায় জোড়া খেজুর গাছের নীচে।

পাড়া জাগিয়ে হুল্লোড়, পারবে কেন থাকতে?

সন্ধ্যা পেরিয়ে যায় খেলা আজ শেষ হয় না।

"সুন্দরী, আমি রে চুপ।"

পুকুর ঘুরে কখন এসে পেছনটিতে দাঁড়িয়েছে বন্‌শী। ঘুরে দেখে একবার আঁৎকে উঠেই যেন কাঠ মেরে গিয়ে মুখের দিকে চেয়ে রইল সুনারিয়া।

"যাবি আমাদের বাড়ি?"

চুপ করে চেয়েই রইল—

"মা কাঁদছিল তোর জন্যে আজ।" মায়ার সঙ্গে লোভও জুড়ে দিল বন্‌শী, বলল — "আজ পুয়া (মালপো) পাকিয়েছে কিনা, তুই ভালোবাসতিস..."

"কি করে যাব? বাবা চটবে যে।"

"বলবি, বাঃ আমি কি করব? আমায় হাবিবন মিয়ার মতন মারতে মারতে নিয়ে এল মিট্‌ঠু মাদারির খেলা দেখে। দুটো গালাগালও জুড়ে দিস না হয়।"

"সত্যি মারবি তুই!"

"তা কখনও পারি? শুনোনি তো?— শাদিরণ বিবি ছিল হাবিবন মিয়ার জান, চোখের রোশনি।"

ডান হাতটা ধরল। সুনারিয়া বলল— "আবার দিয়ে যাবি তো?"

"তা যাব না? কী যে বলিস!"

জিতু দাসের ছেলের বিয়ের ভোজ খেয়ে ফিরছিল দুজনে পাশের গ্রাম থেকে। লছমন আর দুখন। নেশায় টলতে টলতেই। একটু রাত হয়ে গেছে। বামনটুলির পুকুরের ভিন্ডায় ওপর এসে খবরটা শুনল। মিট্‌ঠু মাদারির খেলা দেখে মারের ভয়ে সুনারিয়া বন্‌শীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে।

দাঁড়িয়ে পড়ল লছমন; তার দেখা-দেখি দুখনও, সামলাসামলি হয়েই। লছমন চটে ওঠবারই চেষ্টা করল, না পেরে দুখনকে বুকে জড়িয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল, বলল—"আমাদের আর এরা মানল না সমুধি (বেহাই), মান-ইজ্জৎ সব গেল! বন্‌শীও তোমায় একবার জিজ্ঞেস করবে তো—বাতিল করে দিলে আমাদের। আর বাড়ি নয় সমুধি, এ জীবন আর রেখে ফল কি?"

কেঁদে আর কুলিয়ে উঠতে পারছে না।

একবার শেষ-দেখা দেখে এসে বামনটুলির পুকুরে ডুবে মরার সংকল্প ক'রে দুজনে টলতে টলতে এগুল দুখনের বাড়ির দিকে।
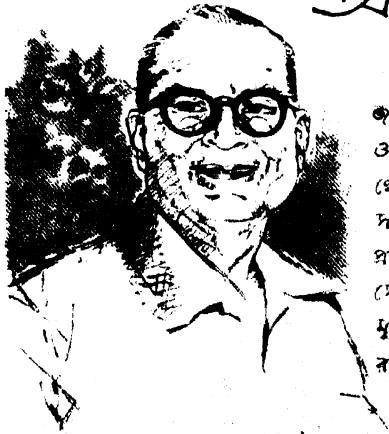
অনিমিত্তা

(উপন্যাস)

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

মন বলছে, হবে না। ফিরে যাই। দরকার নেই।

গেট পর্যন্ত এসে একবার পিছিয়েও গিয়েছিল ক' পা। বোধ হয় নিজেরও অজান্তে। কিন্তু, না, এতদূর যখন এসছে তখন বাকিটুকু দেখে যেতে দোষ কী। হবে না তো হবে না। না হবার আগেই ফিরি কেন? মরব তো একবারই মরব।

আর, দরকার নেই বলছ? ভীষণ দরকার। মর্মান্তিক দরকার।

গেটের ছিটকিনিটা আলগোছে খুলল ভাস্কর। না, কুকুর নেই। থাকলে এতক্ষণে সোরগোল পড়ে যেত। তা ছাড়া, উকিলের বাড়ি, যেখানে বহু লোকের আনাগোনা, সেখানে কুকুর চলে না।

নির্ভয়েই গেটটা ঠেলল ভাস্কর। আর্তনাদের মত একটা আওয়াজ উঠল। আগন্তুক কেউ ঢুকছে গৃহস্বামী সচকিত হলেন।

'কী চাই?' বইয়ের দেয়াল দিয়ে গাঁথা সাজানো ঘরটাতে ঢুকতে যত না ঘাবড়েছিল, কন্ঠস্বরে বেশি ঘাবড়াল ভাস্কর।

'কে আপনি?' জগৎপতি শূন্য চোখে তাকাল : 'আপনাকে তো চিনতে পারছি না।'

'আমি এ পাড়াতেই থাকি। আমার নাম ভাস্কর বসু।'

'কোনদিন দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না।' জগৎপতি দৃষ্টিটাকে তীক্ষ্ন করলেন : 'কী দরকার?'

কাছাকাছি অনেক চেয়ার পড়ে আছে। একটার দিকে করুণ চোখে তাকাল। নম্র আঙুলে একটু স্পর্শও করল একটাকে। ভাস্করের মনে হল, নিতান্ত কাঠ বলেই চেয়ারটা প্রতিবাদ করল না। নইলে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে একশেষ করত।

জামার পকেট থেকে কতগুলি কাগজ বের করল ভাস্কর।

'কোনো কেস? বসুন।'

চেয়ারের মাঝখানে নয়, চেয়ারের ধারে আড়ষ্ট হয়ে বসল ভাস্কর।

'কিন্তু, শনিবার, আজ আমার সম্পূর্ণ বিশ্রাম। আপনি কাল আসবেন।'

'কোন কেস নয়।'

'কেস নয়?' সংসারে তবে আর কী হতে পারে, কী থাকতে পারে, জগৎপতি অবাক হবার ভাব করলেন: 'তবে কাগজপত্র কিসের?'

যেন কত বড় হার, কত বড় লজ্জা, ভাস্করের গলার স্বর ক্ষীণ হয়ে এল। বললে, 'একটা চাকরি—'

'চাকরি?' আকাশ থেকে পড়বার মতন মুখ করলেন জগৎপতি: 'এখানে চাকরি কোথায়?'

'চাকরি নয়, চাকরির দরখাস্ত।' ক্লিপ-আঁটা এক তাড়া কাগজ থেকে একটা আলগা করতে চাইল ভাস্কর।

'দরখাস্ত—তা আমাকে কী করতে হবে? লিখে দিতে হবে? দেখে দিতে হবে?' স্বরে একটু ব্যঙ্গ মেশালেন জগৎপতি: 'ভুল ইংরিজি কারেক্ট করে দিতে হবে?'

'না।'

'তবে? বলুন না, কী করতে হবে। আমার সময় নেই—' উঠি-উঠি ভাব করলেন জগৎপতি।

'আমাকে আপনি করে বলছেন কেন?' নিচু চোখ উঁচু করল ভাস্কর: 'আমি কত ছোট।'

'না, মশাই ছোট-বড় কেউ নেই। মানুষ হয়ে জন্মাবার সম্মানে সকলে সমান।' জগৎপতি ফের চঞ্চল হয়ে উঠলেন। বললেন, 'চুপ করে রইলেন কেন? কী করতে হবে আমাকে তাই বলুন।'

'বিশেষ কিছুই নয়।' লঘু হবার চেষ্টায় একটু বুঝি বা হাসল ভাস্কর।

'বিশেষ-অবিশেষ যাই হোক বলবেন তো কথাটা।' জগৎপতি এবার প্রায় ধমকে উঠলেন : 'ইয়ং ম্যান, যা বলবার তা বলতে পারেন না ঝটপট? এতটুকু ব্যক্তিত্ব নেই? বলুন কী চাই? কী করতে হবে আমাকে?'

'একটা সার্টিফিকেট দিতে হবে।'

'কী দিতে হবে?' উঠতে যাচ্ছিলেন, ফের বসে পড়লেন জগৎপতি।

'সার্টিফিকেট।'

'কেন, আমি কি গেজেটেড অফিসর?'

'গেজেটেড অফিসরের দরকার নেই। যে কোনো বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক হলেই চলবে। এই দেখুন না ফর্মটা—' কাগজের তাড়া নিয়ে আবার একটু ব্যস্ত হল ভাস্কর।

'আর রাজ্যে ভদ্রলোক নেই?'

'তেমন কাউকে চিনি না।' ভাস্কর অপরাধীর মত মুখ করল।

'আর আমাকে চেনেন?'

'আপনাকে কে না চেনে! আপনার কত নাম-ডাক। কত প্রভাব-প্রতিপত্তি!"

একটু কি • গললেন, ঝুঁকলেন জগৎপতি? জিগগেস করলেন, 'কী লিখতে হবে?'

'এমনি শাদা কাগজে নয় স্যার, আপনার লেটার পেপারে লিখবেন—'

'কী লিখব তাই বলুন না।' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন জগৎপতি।

'সামান্য—শুধু এক লাইনের একটা কথা। আপনি যদি লিখে দেন, আপনার মত লোক যদি লিখে দেয়, তাহলেই আমার চাকরিটা হয়ে যায়।'

'হয়ে যায়!' ব্যঙ্গে ঝলসে উঠলেন জগৎপতি : 'কিন্তু কী আশ্চর্য, কথাটা কী!'

'কিছুই নয়—এই লিখে দেবেন, আমাকে আপনি চেনেন আর আমার নৈতিক চরিত্র ভালো।'

'কী চরিত্র?'

'নৈতিক চরিত্র। তাই চেয়েছে। এই দেখুন—' ভাস্কর কাগজ নিয়ে আবার ঘাঁটাঘাঁটি সুরু করল।

'তা আপনার নৈতিক চরিত্র ভালো কি মন্দ তার আমি কী জানি?'

যেন মাটিতে বসে পড়ল ভাস্কর। তবু যেন সমস্ত আশা এক নিমেষে থুইয়ে বসল না। বললে, 'আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখুন, আমাকে কি অসৎ বলে মনে হয়?'

'অসৎ?' হা-হা করে হেসে উঠলেন জগৎপতি। কাঠ-কাঠ কৃত্রিম হাসি।

ভাস্করের মনে হল কথাটা বুঝি ঠিক হয়নি। তাই স্বর সারল্যে ভরে নিয়ে বললে, 'আমি যে ভালো আমার মুখ দেখে এ আপনার বিশ্বাস হয় না?'

'ভালো?' হাসতে চেয়েও হাসলেন না জগৎপতি। বললেন, 'আমার সঙ্গে চলুন কোর্টে। দেখে আসবেন। মুখে সব স্বর্গের ছবি আঁকা, কিন্তু ভেতরে একেকটি চোরাগোপ্তা। মুখ দেখে ভোলবার বয়েস আর নেই।'

হঠাৎ পাশের প্যাসেজ থেকে কে ডেকে উঠল : 'বাবা, আমাদের হয়েছে।'

'ও, হ্যাঁ, এই উঠি।' ব্রস্তব্যস্ত হবার ভঙ্গি করলেন জগৎপতি : 'খবরের কাগজে চোখ বোলাবার জন্যে বৈঠকখানায় ঢুকলাম, সঙ্গে-সঙ্গে লোক—'

'কাগজ-টাগজ সব নিয়ে যাব।' বাইরে থেকে আবার তাড়া এল : 'তুমি চলে এস।'

উঠছেন, ভাস্কর আবার বাধা দিল। বললে, 'সরাসরি যদি না পারেন, ঘুরিয়েও তো পারেন লিখতে। আপনার হাতের যা-হোক একটা লাইন পেলে—যেমনভাবে হোক—'

'ঘুরিয়ে লিখতে হবে?' উঠে দাঁড়ালেন জগৎপতি।

'অন্তত এভাবে লিখুন, এর নৈতিক চরিত্রের বিরুদ্ধে আমি কিছু জানি না।'

'আপনার কাছ থেকে শিখে নিয়ে লিখতে হবে?'

'না, তা বলছি না, তবে—' রিক্ত আঙুলে কাগজগুলো আঁকড়াল ভাস্কর : 'তবে ওতে বিবেকের সঙ্গে সামান্যতম মীমাংসা চলে হয়তো।'

'না, চলে না।' চোয়ালের হাড় দৃঢ় করলেন জগৎপতি। বললেন, 'অমনি ঘুরিয়ে বলাটাকে সৎ বলে না। আপনার সৎ-অসতের ধারণা কী তা বোঝা গেল। ছলনা কখনো সৎ নয়।'

দুর্বল মুখে ভাস্কর একটু হাসল। বললে, 'নৈতিক চরিত্রের সার্টিফিকেট চাওয়াটাই একটা ছলনা। আর, ছলনার সঙ্গে ছলনার মোকাবিলা করাটাই তো সার্থক ওকালতি।'

'ও, আপনি উকিল বুঝি একজন?' তেরছা করে তাকালেন জগৎপতি।

'না, ছি, উকিল হতে যাব কেন?'

'জানেন আমি একজন উকিল?'

'ও, হ্যাঁ, মাপ করুন।' সাত হাত জলের নিচে পড়েছিল, তক্ষুনি আবার সামলাল ভাস্কর। 'আমি সেই ভেবে আপনার কাছে আসিনি। একজন উদার পরোপকারী মহানুভব ব্যক্তি ভেবে আপনার কাছে এসেছি।'

'কিন্তু সবার উপরে সত্য—সত্যটা দেখবেন তো?' জগৎপতি হুমকে উঠলেন : 'ঐ প্রথম কথাটা, আসল কথাটায় হ্যাঁ বলি কী করে? প্রথমেই লিখতে হবে, আপনাকে আমি চিনি। বলুন, আমি চিনি আপনাকে? কোন দিন দেখেছি?'

শিশুর মত হেসে উঠল ভাস্কর। বললে, 'এই তো আমাকে দেখলেন। চিনলেন। মানুষকে দেখতে-চিনতে কতক্ষণ লাগে?'

'আচ্ছা—' ভিতরের দরজার দিকে হঠাৎ তাকালেন জগৎপতি। তক্ষুনি আবার মুখ ফেরালেন এদিকে : 'আচ্ছা, আপনি এ পাড়ার তরুণ-সমিতিকে চেনেন?'

'তরুণ সমিতি—' নামটা বার কতক আওড়ে স্মৃতিটাকে যেন উজ্জ্বল করতে চাইল।

'অন্তত ওদের কেউ আপনাকে চেনে?' হঠাৎ ভিতরের দরজার উদ্দেশে মুখরিত হলেন জগৎপতি : 'রুচি, রুচি!'

সঙ্গে-সঙ্গেই একটি কুড়ি-একুশ বছরের মেয়ে সামনে এসে দাঁড়াল।

জগৎপতি জিগগেস করলেন, 'তুই এই ভদ্রলোককে চিনিস? তোদের তরুণ সমিতির মেম্বর?'

ভদ্রমহিলাকে উত্তর দেবার একটা সুযোগ দিতে হয়। তাই মুখ তুলল ভাস্কর।

[illegible] রাস্তার দিকে তাকাল রুচিরা : 'শুভময় বলতে পারে।'

'কেন তুইও তো সমিতির জয়েন্ট সেক্রেটারি।' সগর্বস্নেহে তাকালেন জগৎপতি।

হ্যাঁ, সে দিক থেকে বলতে পারি', নিজের থেকে রুচিরা এবার তাকাল : 'নন ইনি মেম্বর।'

'তার জন্যে এত পরিশ্রমের দরকার কী! সে তো আমিই বলতে পারতাম।' ভাস্কর অস্ফুট একটু হাসল।

সেটা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করলেন জগৎপতি। মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বলছেন পাড়ায় থাকেন, তবু এঁকে মেম্বর করা হয়নি?'

এটা কী রকম সওয়াল হল! বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকালো রুচিরা। পাড়ায় যত কাগা-বগা-অঘা আছে সবাইকে মেম্বর করতে হবে? যে অসভ্য তাকে কি উচিত সভ্য করা? কিন্তু বাবার

ব্যক্তির মুখোমুখি হওয়া দরকার। তাই রুচিরা ঝিলকিয়ে উঠল : 'তা হলে উনি থাকেন না পাড়ায়।'

'না, না, উনিশ-এফ-এ আমি থাকি, যদি চান তো দেখে আসবেন।' বলেই আবার চোখ নামাল ভাস্কর। বললে, 'তবে মেম্বর করতে চাইলেই হতাম কিনা ঠিক নেই।'

'কেন, পয়সা নেই? দুঃস্থ গরিব?' জগৎপতি প্রায় মুখ বেঁকালেন।

'তা তো বটেই। তা ছাড়া রুচিরও তো একটা কথা আছে।' বলেই অজান্তে চমকে উঠল ভাস্কর, পাপ মুখে কারু নাম নেওয়া হয়ে গেল বুঝি। বলেই সামলাল তৎক্ষণাৎ। 'তার মানে ওটা তো একটা নাচ-গান-ফুর্তির আড্ডা বলে শুনেছি।'

'শুনেছেন? কেন নাচ-গান-ফুর্তি খারাপ?' জগৎপতি এবার স্পষ্ট রুষ্ট হলেন : 'আপনি সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করেন না?'

কাগজপত্র গুটোতে লাগল ভাস্কর। বুঝল আশার শেষ রেখাটুকুও মিলিয়ে গেল। তাই বুঝি, চেষ্টা না করলেও, একটি ব্যঙ্গের রেখা ঠোঁটে ফুটে উঠল। বললে, 'ওটা তো সংকৃত করে বলা। কিন্তু আসলে, খাঁটি বাংলায়, ওটা একটা উচ্ছৃংখলতার ডিপো।'

'জানেন তরুণ সমিতির প্রেসিডেন্ট আমি?' জগৎপতি প্রায় বুক চিতিয়ে দাঁড়ালেন।

লজ্জায় ম্লান হয়ে গেল ভাস্কর। বেআইনি ভাবেই এতক্ষণ বসে ছিল চেয়ারে, আশা ছেড়ে দিয়ে দুরাশাকে আঁকড়ে ধরে। এবার উঠে পড়ল। বললে, 'আমাকে মাপ করবেন। আমি তরুণ সমিতি নিয়ে আলোচনা করতে আসিনি। তরুণ সমিতি দীর্ঘজীবী হোক। আমি এসেছিলাম আপনার একটা দস্তখতের জন্যে—'

'বাবা, চলে এস, আর সময় নেই, এখুনি সবাই এসে পড়বে—' প্রায় ঝাঁপিয়ে-পড়ার মত করে বললে রুচিরা। বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বেরিয়ে মা এণাক্ষীকে কাছে পেয়েই একেবারে তেলে-বেগুনে হয়ে উঠল। 'দেখ না, বাবা কোন একটা বাজে লোকের সঙ্গে বসে তরুণ সমিতি নিয়ে চর্চা করছেন। যার-তার সঙ্গে কী দরকার আলোচনা করা। ওদিকে দেরি হয়ে যাচ্ছে—' ডান হাতে বাঁধা ঘড়ির দিকে তাকাল একবার রুচিরা।

দেরি হয়ে যাচ্ছে অথচ আলোচনায় আটকে আছেন, কে সেই লোক, কৌতূহলী হল এণাক্ষী। একটা অসফল উঁকি মেরে ঝাপসা গলায় জিগগেস করলেন, 'কে লোক?'

'কে জানি কে! বাবার একটা দস্তখতের জন্যে পিড়াপিড়ি করছে।' আশেপাশের সকলকে শুনিয়ে খরস্বরে বললে রুচিরা, 'কিন্তু—দস্তখত নিবি তো ফি কই? ন্যায্য ফি ছাড়া উকিল কখনো কলম ধরে নাকি?'

কথাটা লুফে নিল ভাস্কর। বললে, 'এমনি সার্টিফিকেটের জন্যে ফি নেন আপনি?'

বেফাঁস কথায় রুচি-টা একেক সময় এমন অপ্রস্তুত করে, জগৎপতি ভ্রুকুঞ্চন করলেন। বললেন, 'না। আপনাকে আমি চিনি না। তাই এক্ষেত্রে সার্টিফিকেট দেওয়া অসম্ভব। ফি-এর কথা বলছেন, ফি দিতে চাইলেও অসম্ভব। যখন চিনি না। তখন আমি অসহায়। সুতরাং—'

'চলে যান।' ভাস্কর হাসল : 'চলেই যাচ্ছি। কিন্তু কোথায় যাই বলুন। কোথায় পাই তেমন বড়লোক।'

'না পান তো আমি কী করব।' স্বরে ঝাঁজ আনলেন জগৎপতি।

'এমন সব সৃষ্টিছাড়া নিয়ম করে যার মাথামুণ্ডু হয় না।'

'যারা নিয়ম করেছে তাদের মুণ্ডুপাত করুন গে। এখানে কিছু হবে না।' জগৎপতি মুখ ফেরালেন।

তক্ষুনি একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল।

এণাক্ষী চাঞ্চল্যে ঝলমল করে উঠল : শুভময়রা এল বুঝি?'

'না, না, শুভময় তো স্টেশন ওয়াগন নিয়ে আসবে।' রুচিরা মাকে সংশোধন করল : 'এ মিস্টার চক্রবর্তী এসেছেন।'

অরিন্দম চক্রবর্তী। ইনজিনিয়র। জগৎপতি বেরিয়ে আসতেই অরিন্দম বললে, 'আমার সঙ্গে ইনি কণাদ দত্তগুপ্ত। চার্টার্ড য়্যাকাউন্টেন্ট।'

'উনিও জয়েন করছেন নাকি?' ঢেউ তুলে দু পা এগিয়ে এল রুচিরা।

সেই মতলোবেই তো নিয়ে এসেছি সঙ্গে করে।' জয়ীর মত হাসল অরিন্দম।

'তা হলে প্রথমেই তো ও'র মেম্বর হতে হয়।'

'ওরে বাবা, কী ঝানু সেক্রেটারি! কারু ফসকে যাবার উপায় নেই।' অরিন্দম হেসে উঠল : 'একেবারে লাইফ মেম্বর হয়ে যাবে।'

'সঙ্গে চেক-বই আছে।' কণাদ প্রথমে কোটের পকেটে চড় মারল কিন্তু রুচিরা তবু তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে আছে দেখে সরাসরি খুলেই দেখাল চেক-বই।

জগৎপতি অভ্যর্থনা করে উঠলেন : 'বা, ভালো কথা।'

'কিন্তু এ আপনারা করেছেন কী?' রুচিরা ঝলসে উঠল।

'কী করেছি?' এপাশ ওপাশ তাকাতে লাগল অরিন্দম।

'সুট পরে এসেছেন কেন? বলাই তো আছে, পার্টিতে-অনুষ্ঠানে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে আসতে হবে—'

'তা, এখন কি সময় আছে?' কণাদ ব্যস্ত হয়ে উঠল। পারলে পোশাক কেন গায়ের চামড়াও বুঝি সে ছুলে দেয়। অরিন্দমের হাত ধরে টান মারল হেঁচকা। বললে, 'চলো না, চেঞ্জ করে আসি। নিয়ম যখন আছে—'

কোমল হল রুচিরা। বললে, 'আপনি ফার্স্ট অফেন্ডার, এ যাত্রা এক্সকিউজ করা গেল। আর আপনি স্যাঙাত বলে আপনাকেও। কিন্তু, আগেই বলে রাখি, বসতে চেয়ার পাবেন না।'

'না', ওধার থেকে জগৎপতি উচ্ছ্বসিত হলেন : 'ডেক-এ ঢালা ফরাস। সমান-তন্ত্র।'

'তাই সই। ট্রাউজার্স পরলে কী হয়, আমরা চাপটি খেয়েই বসব।' কণাদ বললে। ভাবখানা বোধ হয় এই আমরা সমস্ত দোকানের খদ্দের।

'তা আপনারা তো তৈরি।' এণাক্ষীকে লক্ষ্য করল অরিন্দম : 'চলুন, আমার গাড়ি আছে, আমার গাড়িতে আমরা বেরিয়ে পড়ি।' রুচিরার গায়েও একবার বুলিয়ে নিল চাউনি।

এণাক্ষী দিব্যি ঠেলে দিল মেয়েকে। বললে, 'তুই যা।'

'চলুন।' কণাদকে আড়াল করে এগিয়ে এল অরিন্দম।

'আমাদেরও গাড়ি আছে।' পালটা বলে রুচিরা, খোঁচাটা প্রচ্ছন্ন থেকেও থাকল না বোধ হয়।

'তাতে আমি আর উনি যাব।' এণাক্ষী ছটফট করে উঠল : 'ও'র তো এখনো স্নানও হয়নি।'

'সে তো আমাদের বাড়ির গাড়ি।' রুচিরা বললে, 'আমি তার কথা বলছি না। আমাদের গাড়ি মানে স্টেশন ওয়াগন, যেটা শুভময় নিয়ে আসছে। যেটায় আমরা র‍্যাঙ্ক য়্যান্ড ফাইলরা যাব।'

'হ্যাঁ', মীমাংসার সুর আনলেন জগৎপতি : 'ও সেক্রেটারি, ওর কি আগে গেলে চলে? ও পরে যাবে।'

'শেষে আয়োজনে কোনো ত্রুটি হলে আপনারাই অসন্তুষ্ট হবেন।' রুচিরা হাসল : 'তারপর আজ যিনি নতুন লাইফ মেম্বর হচ্ছেন তাঁর কাছে যথাসম্ভব নিখুঁত করেই দেখানো দরকার।' তাকাল কণাদের দিকে : 'কী বলেন, ঠিক বলিনি?'

'ঠিক বলেছেন।' অরিন্দমের হাত ধরে টানল কণাদ। বললে, 'চলো আমরা বেরিয়ে পড়ি।'

দুজনে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় খুলে দিয়ে গেল গেটটা।

জগৎপতি বুঝি একটু এগিয়ে দিতে এসেছিলেন, দেখলেন ভাস্কর, সেই প্রার্থী ছেলেটা তখনো ঘুরঘুর করছে।

'এ কি, যাননি এখনো?' প্রায় ফেটে পড়লেন জগৎপতি।

'ভাবছি এখনো যদি দেন সার্টি-ফিকেটটা। সামান্য একটা কথা। তাতে আপনার কিছু ক্ষতি নেই, কিন্তু আমি একটা চাকরি পেয়ে যাই।'

যেন একটা সাম্রাজ্য পেয়ে যাই এমনি করে বললে কথাটা।

'আপনাকে বলেছি না, আপনাকে চিনি না, আপনার সম্পর্কে কিছু জানি না, তাই পারব না লিখতে।' ফিরে দাঁড়ালেন জগৎপতি : 'তখন থেকে কেন মিছামিছি বিরক্ত করছেন? যান, আমার সময় নেই। আমাকে এখুনি বেরুতে হবে।'

'জানি, আজ তরুণ সমিতির স্টিমার-পার্টি। আপনারা সবাই যাচ্ছেন। কিন্তু এক লাইন লিখে দিতে কতক্ষণ আর লাগে বলুন। আপনারা বড়লোক—আপনারা যদি—'

'বড়লোক মানে?' যেন প্রচণ্ড একটা গাল খেয়েছেন এমনি জ্বলে উঠলেন জগৎপতি : 'বড়লোক হওয়া কি দোষের কথা? আমি কি ইনহেরিট করে বড়লোক হয়েছি? যা হয়েছি স্ট্রাগল করে হয়েছি। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে হয়েছি। কত বাধা-বিপদ-ব্যর্থতার সঙ্গে লড়াই করে, কত ধৈর্য কত অধ্যবসায়ের পাহাড় ডিঙিয়ে—তার আপনি কী জানেন! আপনি যে চাকরি করতে যাচ্ছেন তাও ক্রমে এই বড়লোক হবার জন্যে—'

'না, তা নয়, আমি বলছিলাম, বড়-লোক যখন, তখন হৃদয় কেন বড় হবে না?'

'সেই হৃদয়ের বড়ত্ব প্রমাণ করতে হবে মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে, বে-আইনি কাজ করে? মার্জনা করুন। আমার দ্বারা হবে না। আপনি যান।' জগৎপতি গেটের দিকে ডান হাতটা প্রসারিত করে দিলেন : 'পথ দেখুন।'

'আচ্ছা, আসি, নমস্কার।' করুণ মুখে নমস্কার করল ভাস্কর। জগৎপতি লক্ষ্য করলেন, দুটি হাত ঠিক একত্রই করেছে ছেলেটা আর নাকে মুখে নয়, সম্পূর্ণ কপালে এনেই ঠেকিয়েছে; এবং পরাভূত, প্রত্যাখ্যাত হলেও ধীর পায়েই পেরিয়েছে গেটটা; আর, সব চেয়ে আশ্চর্য, পেরিয়ে গিয়ে হাট-করা গেটের দরজা দুটো আস্তে টেনে খাঁজে খাঁজে লাগিয়ে বন্ধ করেছে।

ভাবখানা এমনি, যেন হেরে গেলেও পৃথিবীর উপর তার রাগ নেই।

কোথায় ফিরে আসবেন তক্ষুনি, তা নয়, জগৎপতি খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। এক মুহূর্ত ভাবলেন, ছেলে-টাকে ডাকব নাকি।

কিন্তু তক্ষুনি ওয়াগন নিয়ে হুড়-মুড় করে এসে পড়ল শুভময়। হুড়-মুড় করে গেট-কেট ছত্রখান করে দিয়ে ভিতরে ঢুকল। লাফিয়ে উঠল দাওয়াতে। 'আপনারা রেডি?'

জগৎপতি বললেন, 'ওরা রেডি। আমি চানটা করে নিই।'

'কী দরকার। স্টিমারেই ফার্স্ট ক্লাস বন্দোবস্ত আছে, সেখানেই চান করে নেবেন।' তারপর প্যাসেজটা পেরিয়ে

আসতেই উথলে উঠল : 'বা, আপনারা তৈরি। তাড়ার অগ্রেই তৈরি—এ যে আপনারা ইতিহাস সৃষ্টি করলেন—'

'না, তৈরি নয়।' এণাক্ষী বললেন, মোড়ের দোকান থেকে কিছু জাজা পান কিনে নিতে হবে।'

'দিন, কিনে আনছি।' শুভময় হাত পাতল : 'এ আর কতক্ষণ!'

ব্যাগ খুলে তার হাতে টাকা দিলেন এণাক্ষী। 'জর্দা আনবেন কিন্তু।'

'আর আমাকে ঐ রক্তকরবীর গুচ্ছটা।' বাগানে গাছের দিকে চোখ ফেলল রুচিরা।

শুভময় পানের দোকানে অর্ডার দিয়ে ছুটতে-ছুটতে ফিরে এল। ফুলের গুচ্ছটা রুচিরাকে পেড়ে দিয়ে আবার ছুটল দোকানে।

পান নিয়ে এসে দেখল জগৎপতির শেভ হয়েছে বটে স্নান হয়নি। তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে-মুছতে শুভময়কে বললেন, 'খান-কয়েক চেয়ার জোগাড় হবে তো হে?'

'চেয়ার? চেয়ার কেন? ধাক্কা খেল শুভময়।

'অরিন্দম আর তার বন্ধু আসছে। দুজনেরই সাহেবী পোশাক। যখন এসেই পড়েছে এ পোশাকে তখন আর ওদের যন্ত্রণা দেওয়া কেন? বিশেষত', হাসলেন জগৎপতি : 'বন্ধু যখন লাইফ মেম্বর হচ্ছেন—'

'লাইফ মেম্বর হচ্ছেন? তা, চেয়ার জোগাড় হবে বৈকি।' লাফিয়ে উঠল শুভময়।

'না। সমিতির নিয়ম ভাঙা চলবে না।' দৃঢ়স্বর রুচিরার। 'আমরা আইন করে আবার আমরাই যদি তা ভাঙি, তাহলে মানে হয় না কোনো।'

'যে বন্ধু আজ নতুন মেম্বর হচ্ছে সে তো জানে না সাত-পাঁচ।' বললেন জগৎপতি।

'কিন্তু আইন জানি না এ আইনের চোখে কোনো অজুহাত নয়।' দৃঢ়তর রুচিরা।

'বন্ধু না জানতে পারে, কিন্তু অরিন্দমবাবু তো জানেন।' রুচিরার থেকে প্রেরণা নিয়ে বললে শুভময়, 'তিনি কেন অনুষ্ঠানে স্যুট পরে আসেন? চেয়ার ডিম্যান্ড করেন? তিনি তো আর নতুন নন।'

'আহা, বন্ধুর খাতিরে ঐ রকম পরে ফেলেছে। বিশেষ খেয়াল করেনি।' জগৎপতি ঠান্ডা গলায় বললেন, 'আর তার বন্ধু যদি চেয়ার পায় সে নিচে বসবে এটা দৃষ্টিকটু লাগে।'

'দুজনেই নিচে বসবে।' রুচিরার স্বর তপ্ততর।

'চেয়ার কখানা থাক না।' মিটমাটের সুরে বললেন এণাক্ষী, 'যার যখন খুশি কখনো নিচে বসবে কখনো বা চেয়ারে বসবে।'

'নিজের কথাটাই ভাবলে বুঝি।' স্ত্রীকে লক্ষ্য করে পরিহাস করলেন জগৎপতি।

'তোমার কথাটাও ভাবলাম।' পান-মুখে হাসলেন এণাক্ষী।

শুভময় চেয়েছিল হাসতে কিন্তু রুচিরার মুখ দেখে গম্ভীর হয়ে গেল। মুখে যাই বলুন, অন্তরে বড়লোকের প্রতিই বাবার টান বেশি, তার প্রতিবাদেই যে রুচিরার গাম্ভীর্য সেটা বুঝতে দেরি হল না। তাই জগৎপতিকে লক্ষ্য করে রুক্ষ স্বরে জিগগেস করলে, 'আপনার কি আরো দেরি হবে?'

'হ্যাঁ, হবে একটু। তোমরা বেরিয়ে পড়। আমি বাড়ির গাড়িতেই যাব না-হয়।'

'আপনি?' এণাক্ষীর দিকে তাকাল শুভময়।

'আমিও পরে যাব।'

'আর—' এবার রক্তকরবীর গুচ্ছের উপর চোখ রাখল।

'আমি যাব আমাদের গাড়িতে। সমিতির গাড়িতে।' খসা আঁচলটা শূন্যে উড়িয়ে দিয়ে ওয়াগনে উঠল রুচিরা।

গাড়িভর্তি গুচ্ছের ছেলেমেয়ে কিল-বিল খিলখিল করে উঠল।

২

একমাত্র মেয়ে। তারও চেয়ে বেশি—একমাত্রসন্তান। তারও চেয়ে বেশি—আশা যখন চলে যাচ্ছিল তখন এসেছে। এসেছে শেষ যৌবনে শেষ জোয়ারে।

তাই রুচিরা আদরের পিরামিড। সোহাগের পাহাড়-পর্বত।

প্রথম জীবনে সামান্য অবস্থায় জগৎপতি সুরু করেছিল। যাতে তাড়া-তাড়ি হয় তারই জন্যে বি-এ পাশ করেই ল-তে ঢুকল। টারেটুয়ে ল পাশ করেই, যাতে তাড়াতাড়ি হয়, চলল ফৌজদারিতে।

নেই চুলো নেই মরুব্বিধ-মাতব্বর ই, একমাত্র উচ্চাশাকে মূলধন বসল বটতলায়।

খতে-দেখতে জমে গেল প্র্যাকটিস। প্র্যাকটিস জমাতে কী লাগে? বিদ্যে বুদ্ধি নয় বিত্তবেসাত নয়, একমাত্র ষ্ট। শুধু লাঙল ঠেললে কী হবে বৃষ্টি না ঝরে? আর বৃষ্টি যদি ।, মাটিতে যদি একবার জল দাঁড়ায় হলে এমনি একটা বীজ ছুঁড়ে দিলেই না।

প্রথমেই একটা বলাৎকারের মামলা। হতভাগা মামলা। তাতে উকিলের সে মামলা পেলেই ভাগ্যমন্ত। তার ক্ত মহৎ কাজ। দুঃস্থের সেবা। পীড়িতের উপশম। দোষী জেনেও আসামীকে খালাস করে আনা।

কোর্টে যাবার মুখে, ঠিক জায়গা বুঝেই, নবগ্রহের মন্দির। জগৎপতি ওতায় পয়সা দিয়ে প্রণাম করে কপালে টা সিঁদুরের ফোঁটা চড়াল। আর সামীকে কাঠগড়া থেকে বেকসুরে নিয়ে আনলো।

হল প্রমাণে পাওয়া গেল মেয়েটার আইন ধ বয়স হয়েছে আর অভিযোগে কে ধর্ষণ বলা হচ্ছে তা আসলে প্রেমের পঢৌকন।

জগৎপতির জয়জয়কার পড়ে গেল। সকলে বললে, কপালে ওর ঐ সিঁদুরের ফোঁটাটাই তার সাফল্যের রহস্য।

তা কেন। কালক্রমে জগৎপতি যখন ইকোর্টের খাতায় নাম লেখাল, সম্ভ্রান্ত- ম হল, তখন সে আর সিঁদুরের ফোঁটা ও কই? দিত না। যে রূপার ফোঁটা তার আর সিঁদুরের ফোঁটার দরকার না।

কী কুৎসিত কষ্টেই না কেটেছে এখমটা। মানিকতলার ওদিকে একটা হাঁপধরা গলিতে দেড়খানা ঘর নিয়ে ছিল। বাজার-দর পড়ে যেতে পারে ভেবে ক পড়তে-পড়তেই বিয়েটা সেরে নিয়ে ছিল বুদ্ধি করে। নইলে একা থাকলেই মেসে থাকতে হত, আর মেসে থাকতে হলে বৈঠকখানা পেত কোথায়? মক্কেলের সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলতে গেলেই তো সর্বনাশ। তাহলে প্র্যাকটিসের কথা না ভেবে ভাবতে হত কেরানিগিরির কথা, নয়তো ইস্কুল মাস্টারির। উচ্চাশার মুখে ছাই পড়ত। এ দিব্যি বউ হল বলে একটা ডেরা হল, ঠিকানা দেবার মত বৈঠকখানা হল। যদি কেউ কখনো আসে, এণাক্ষীকে আধখানা ফালি ঘরটাতে দাঁড় করিয়ে রেখে শোবার

ঘরকেই বৈঠকখানা করে নেওয়া যায়। বসুন, বসুন, তাতে কী, বিছানার উপরেই বসুন।—কথাটা সেরে নিতে কতক্ষণ। লোকে যাই বলুক, বৈঠকখানাতে কে কবে শোবার ঘরের স্পর্শ দিয়েছে!

দিনে-দিনে বছরে-বছরে জগৎপতির উন্নতি হতে লাগল। টাকা হওয়া মানেই উন্নতি হওয়া। আর, তখন তার মান শুধু ধনবান বলে নয়, সর্ববিদ্যায় জ্ঞানবান বলে। সর্বসভায় সে তখন বাঁধা শোভাপতি। সে হাসলেই তখন সেটা রসিকতা, মুখ গম্ভীর করলেই সেটা বিসদৃশ। টাকার প্রবেশ করলেই তার তখন শিল্পে প্রবেশ, সাহিত্যে প্রবেশ, শাস্ত্র-পাণ্ডিত্যে পর্যন্ত অধিকার। সমাজের তখন সে একজন কর্তা-ভর্তা লোক, বৈদগ্ধ্যের চূড়ামণি। তখন এমন কি সে সার্টিফিকেট দিতে উপযুক্ত।

'তুমিই আমার লক্ষ্মী।' এণাক্ষীকে গোড়ার দিকে বলেছিল একদিন জগৎপতি।

'লক্ষ্মী না তার বাহন!'

'কী যে বলো! তোমার জন্যেই তো আমার এ সাফল্য। নইলে, আমি কী ছিলাম—'

'কিন্তু আমার সাফল্য কোথায়?' মুখখানা বুঝি ছলছলে করেছিল এণাক্ষী: 'তুমি তো টাকা পাচ্ছ, মান পাচ্ছ, প্রশংসা পাচ্ছ, কিন্তু আমি কী পেলাম! আমি তো রিক্ত।'

হেসে উঠেছিল জগৎপতি। 'তাই তো তোমাকে লক্ষ্মী বলছি। এ লক্ষ্মী বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী নয়, বাংলা দেশের লক্ষ্মী। তার মানে বেশ শান্ত, ঠাণ্ডা, সুবোধ মেয়ে।'

'বটে আর কি।' চোখের কোণে ইসারাকে সূক্ষ্ম করেছিল এণাক্ষী: 'বাংলা দেশের লক্ষ্মীদেরও ধন-রত্ন কিছু কম নয়।'

'সেইজন্যেই তো তোমাকে বাহবা দিচ্ছি। গোড়াতেই তুমি রত্নপ্রসূ হয়ে ওঠনি। তছনছ করনি সংসার। আমাকে একটু গুছিয়ে তোলবার সময় দিয়েছ।'

'সব তো আমারই দোষ।' অভিমানে মুখ মেঘলা করেছিল এণাক্ষী।

'আমি দোষ বললাম নাকি? গুণ, গুণ—তুমি আমার গুণের সাগর।' চিবুক ধরে একটু বা আদর করতে চেয়েছিল জগৎপতি: 'আমার নিশ্বাসের হাওয়া। নইলে তুমি যদি বছর-বছর হাসপাতালে ছেড়ে যেতে, তাহলে আমি এত সব সামলাতাম কী করে? আমার প্র্যাকটিসই হত না।'

'কিন্তু শুধু প্র্যাকটিসে কী হবে? ব্যাংক ভরলেই কি আর ঘর ভরে?' হঠাৎ প্রখর হয়ে উঠেছিল এণাক্ষী: 'সব, সব তোমার দোষ।'

'আমার দোষ?' ছুটতে-ছুটতে বাস্ মিস করার মত মুখ করেছিল জগৎপতি।

'হ্যাঁ, তোমার। তোমার মন এক-ফোঁটাও আমার দিকে নয়, কেবল মোকদ্দমার দিকে। তোমার ফন্দিফিকির, মামলা জেতার, আমাকে জেতার নয়। আমি নিতে চাইলেও তুমিই দিতে চাও না। তোমার মন নেই সংসারে।'

'আমার সংসারে মন নেই?' মন খুলে হেসে উঠেছিল জগৎপতি: 'আমি কি সন্ন্যেসি?'

'তোমার মন শুধু টাকায়। নামে। কী করে আঙুল ফুলে অশ্বত্থ গাছ হবে তার দিকে।'

'তার আগে কলাগাছটা হয়ে নিই।' আবার হেসেছিল জগৎপতি।

'তোমার এত দিয়ে কী হবে? খাবে কে?'

'দাঁড়াও, সবুর করো। সবুরেই মেওয়া ফলবে। কাল পূর্ণ হলেই আসবে অকালকুষ্মাণ্ড।'

বাড়ি বদলাল জগৎপতি। একতলা ছেড়ে দোতলা বাড়ি নিল। নিচে বৈঠকখানা উপরে শোবার ঘর, ঠাকুর-চাকর টেলিফোন—দাঁড়াল পাকাপোক্ত মধ্য-বিত্ততায়। অনেক আরাম-অবকাশ নিয়ে এল এণাক্ষীর জন্যে। সাজ-গোজ-গয়না, সিনেমা-থিয়েটার-জলসা, দরাজ হাত-খরচ—কোনো কিছুই ত্রুটি রাখল না জগৎপতি। কিন্তু আসল ঘরেই মশাল নেই, শুধু ঢেঁকিশালে চাঁদোয়া টাঙিয়ে কী হবে?

'আমি যদি আসামী হতাম তাহলেই বোধ হয় আমাতে তোমার আপ্রাণ আকর্ষণ হত।' তবু অভিযোগ যায় না এণাক্ষীর।

'আসামী হতে মানে?'

'আসামী হলে তুমি যে করে হোক আমাকে মুক্ত করে দিতে।'

'তুমি এখানে মুক্ত হতে চাইছ কোথায়? তুমি তো বন্ধ হতে চাইছ। যেতে চাইছ সলিটারি কনফাইনমেন্টে।' আবার হাসির ঢেউ তুলল জগৎপতি।

বিয়ের প্রায় পনেরো বছর পর আগমনীর আভাস জাগল।

হাসি ফুটল এণাক্ষীর। হাসি শুধু মুখে নয় সর্বাঙ্গে। যন্ত্রণার মধ্যেও যে এত স্বপ্ন তা কে জানত। সবাই বললে, ছেলে হবে।

মেয়ে হল।

আর মেয়ে হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই আরো পসার বাড়ল জগৎপতির। গাড়ি হল। প্রথমে একটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড, ক-মাস পরেই একটা আনকোরা আলিশান।

অনেক টাকা দিয়ে গ্যারেজওয়ালা বড় বাড়ি ভাড়া নিল। উর্দি হল ড্রাইভারের।

সব এখন মেয়ের দৌলতে। মেয়েই রাজার ধন এক মানিক। সাত কাশ-ছেঁচা এক চাঁদ।

খরচের ঢেউয়ে আদরের পানসি ভাসাল বাপ-মা।

মেয়ে যখন জন্মেছে তখন সেটা বড়লোকের ঘর; তাই, সন্দেহ কি, সে আদ্যোপান্ত বড়লোকের মেয়ে আর তার জন্মাবার উনিশ-কুড়ি বছর পরও যখন আর কেউ এল না, তখন, সন্দেহ কি, সে বড়লোকের একমাত্র সন্তান।

রুচিরা যা চায় তাই পায়।

সাজগোজ প্রসাধন এ সব তো মামুলি কথা। বই-লাইব্রেরি-প্রফেসর এ সবও সেকেলে। খেলাধুলো দৌড়ঝাঁপ এতেই বা কী এমন নতুনত্ব। নাচবে গাইবে বা নাটক করবে এ তো গরিব মধ্যবিত্তরাও করে। তারপর সাঁতার শেখা বা মোটর চালানো মোটেই দুরূহ ব্যাপার নয়, মাস অনেকের ওয়াস্তা। এতে আর সবিশেষ কী গুণপনার পরিচয়।

এ সবে রুচিরার মন ভরে না। এক দিকে তার বিষম অভাব। তার একটা জিনিস নেই। আর সেটাই আসল জিনিস।

তার নাম স্বাধীনতা। তার স্বাধীনতা নেই।

নেই? না। অনেক কিছুই সে পায় বটে কিন্তু চেয়ে পায়। বাবা, ওটা আমার চাই, বলতে হয় মুখ ফুটে। বাবা যদি বোঝেন ওটায় সম্ভ্রমের হানি হবে না পাইয়ে দেন। দামের জন্যে ভাবেন না। বা, ওটা আমায় কিনে দাও, ওটা দেখতে বেশ, মিনতির সুরে আনতে হয় দস্তুর-মত। আর্জি নিয়ে মা তখন পেশ করবেন বাবার কাছে। আর বাবার হিসেব মর্যাদার হিসেব। যদি বোঝেন ওতে আভিজাত্যের ক্ষতি হবে না, বৃদ্ধি হোক বা না হোক, বাবা প্রশ্রয়ে উদার হবেন।

কিন্তু যাই বলো, চাইতে হয়, আর চাওয়াটাই ঘেন্না। হোক না বা তা বাপের কাছে চাওয়া। হোক না বা তা ঈশ্বরের কাছে। চাইতে গেলেই নিজেকে কেমন ছোট-ছোট লাগে, কেমন গলার কাছে দলা পাকায়। যতই হাল্কা সুরে খুশির ঢেউ তুলে চাওয়া যাক না কেন, কোত্থেকে একটা সন্দেহ না কুণ্ঠা না দ্বিধা এসে জোটে। কিংবা হয়তো বা নামঞ্জুরের ভয়।

নিজের বলে অনেক যদি টাকা থাকত রুচিরার! আর টাকা, টাকাই বুঝি স্বাধীনতা!

তার বাবার টাকা আছে, মায়ও হয়তো আছে, কিন্তু সেই কপর্দকশূন্য। সে হাত-খরচ পায় না বলতে চাও? না, তা পায়, কিন্তু এক থোক ফুরিয়ে আরেক থোক চাইতে গেলেই বাবার কাছে হিসেব দিতে হয়। একেবারে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে না হোক, অন্তত উপর-উপর। যে টাকায় হিসেব দিতে হয়, সে কি আর টাকা? আর, সুখ তো সত্যি ধনে নয়, মনে। তাই যখন ভাবা যায় এ টাকা আমার নয় পরের, তখন আর আদর থাকে না বলে বুঝি দরও থাকে না।

কিন্তু টাকায় রুচিরার কী দরকার? কোথাও যাবে? বাবাকে বলুক না, নিখুঁত বন্দোবস্ত করে দেবে। কিছু কিনবে? বাবাকে বলুক না, নিটোল কিনিয়ে দেবে। কাউকে দেবে, দান করবে? বলুক না বাবাকে। পাত্র বা প্রতিষ্ঠান যদি জগৎপতির ব্যবসায় না প্রতিকূল হয় সে আপত্তি করবে না।

না, সব সময় বাবাকে বলতে হবে কেন? পারব না বলতে।

নিজের বলে টাকা পেলে কী করত সে? হয়তো কিছুই করত না। শুধু নিজের বলে, নিজস্ব বলে অনুভব করত।

বা, তা হলে বাবার বাড়ি-গাড়ি—দক্ষিণে নতুন বাড়ি উঠছে জগৎপতির—টাকা-পয়সা অস্থাবর মালামাল সবই তার, ওমনি অনুভব করলে হয়! অন্তত জগৎপতির তিরোধানে তো তাই হবে। প্রথমে একটা আট আনা প্রণামী পাবে বটে, কিন্তু এণাঙ্কীয় অবর্তমানে ষোল আনাই রুচিরার।

কিন্তু সে ষোল আনা অনুভব এখন এ মুহূর্তেই হবে কী করে? যা হবে তা এক্ষুনি-এক্ষুনি হয় কই? তাছাড়া কে কার আগে মরে তার ঠিক কী?

বেশ তো, যা একদিন তার ষোল আনা হবে, তার এক চিলতে এখুনি তাকে লিখে-পড়ে দিয়ে দেওয়া যায় না? সে তো আইনের চোখে এখন সাবালক হয়ে উঠেছে। সেই এক চিলতের সে নিরভিভাবক মালিক হতে পারে না? যার সম্পর্কে কোনো জবাবদিহি থাকবে না কারু কাছে? মুখ নিচু করে দিতে হবে না হিসেব-নিকেশ।

সে মেয়ে, বড়লোকের মেয়ে, আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা। অমন একটা চিলতে পেলে সে একটু স্বাধীনতা কিনত।

সে সেকেণ্ড ক্লাশ ট্রামে উঠত, রিকশা চড়ত, ট্রেনে টিকেট কাটত থার্ড ক্লাশের।

ফুচকা খেত, খেত বা ঘুগনিদানা। পান খেত, আলতা পরত খালি পায়ে, কালীঘাট যেত, গঙ্গাস্নান করত। উনুনের সামনে বসে রাঁধত ডাল-ভাত।

তার সব আছে কিন্তু সাধারণ হবার আটপৌরে হবার স্বাধীনতা নেই। এমন কিছুই সে করতে পারে না যাতে তাকে গরিব-গরিব দেখায়। সাদামাঠা বলে মনে হয়।

যেহেতু তার যে-সব পরের ধনে পোদ্দারি। নিজের রোজগেরে টাকা হলে তাকে সাদাসিদে হতে কে বাধা দেয়?

তাই বি-এ পাশ করার পর জগৎপতিকে রুচিরা বললে, 'আমি এবার চাকরি করব।'

'কোনো আশা নেই।' ঘরে ঢুকেই ভাস্কর বললে মাকে উদ্দেশ করে। মা পাশের ঘরে পুজোয় মগ্ন, তারই জন্যে তাকে উঁচু গলায় শোনানো দরকার। 'কী করে হবে? মানী-গুণী ভদ্রলোক সামান্য এক লাইন সার্টিফিকেট দিতে নারাজ। এত অবিশ্বাস! তারপর যেখানেই যাবে সেখানেই মেয়েদের ভিড়।'

পুজোর মধ্যেও মা দু-একটা কথা না কন এমন নয়। জবাবের উদ্বেগ মনে পুষে না রেখে সোজা খোলসা করে দেওয়াই ভালো। কিন্তু এখন, এ মুহূর্তে মার কোনো সাড়া নেই। নেই বা একটু হতাশার দীর্ঘশ্বাস।

'দুঃস্থ মেয়ে নেই এ কথা বলছিনে।' আপনমনেই বলতে লাগল ভাস্কর: 'তারা আসে, আসুক। কিন্তু এমন অনেক মেয়ে আছে যারা বড়লোক, যাদের টাকা রোজগারের কোনো দরকার নেই। তারা চাকরি করতে চায় শুধু চালের জন্যে। আর তাদের মুরুব্বি যাকে বলে তারাই পেয়ে যায় সহজে।'

মহালয়ার তবুও সাড়াশব্দ নেই।

জুতো পায়েই পাশের ঘরে ঢুকে পড়ল ভাস্কর। 'এই চাকরিটাও হল না, মা।'

পাশের ছোট ঘরের এক কোণে অল্প একটু জায়গা নিয়ে পুজোয় বসেছে মহালয়া। সামনে ছোট জলচৌকির উপরে পিতলের সিংহাসনে ছোট এক গোপাল।

'একটা না হয় আরেকটা হবে।' মহালয়া শান্তস্বরে বললে।

'ছাই হবে। তুমি ঐ ক্ষুদ্রকায় দেবতাটাকে ছাড়ো।' ভাস্কর বললে গম্ভীর হয়ে: 'ওটা অপোগণ্ড শিশু, ওর কোনোই শক্তি নেই।'

মহালয়া বুঝি মনে মনে হাসল। বললে, 'ও গিরিগোবর্ধন ধরেছিল।'

'মুণ্ডু ধরেছিল। দেখ কী নির্লজ্জ, আমরাই খেতে পাচ্ছি না, আর ও কেমন হাত বাড়িয়ে আমাদের কাছেই ভিক্ষে চাইছে। ওটাকে ফেলে দাও মা, তার চেয়ে বরং হনুমানকে ধরো।'

মহালয়া কথা কইল না।

'হনুমান পাহাড় শুধু মাথায় ধরেনি বয়ে নিয়ে এসেছিল লঙ্কায়। মরা লক্ষ্মণকে বাঁচিয়েছিল ওষুধ দিয়ে।'

তন্ময়তার মধ্য থেকেই বললেন মহালয়া। 'তুই-ই তো আমার মহাবীর।'

৩

নতুন অঞ্চলে তেতলা বাড়ি তুললেন জগৎপতি।

প্রথমে ভেবেছিলেন একতলাটা ভাড়া দেবেন, নিজেরা থাকবেন উপরে। কিন্তু ঠিক সময়েই, ধনী হবার পর মোটা হয়েছে এণাক্ষী, হৃৎপিণ্ডে চাঞ্চল্য ঘটেছে। ডাক্তার বললে, ওঠা-নামা যত কম করা যায়। তাছাড়া মক্কেলরা হন-হন করে ঢুকে পড়তে ব্যস্ত, সিঁড়ি ভাঙতে গেলেই দেরি করবে তারা, দ্বিধায় পড়বে। ধনাগমের পথ দ্রুত ও সমতল রাখাই বাঞ্ছনীয়। সুতরাং ছাড়া যাবে না একতলা।

কিন্তু তিনটি তো মোটে প্রাণী—এত-এত ঘর তারা ভরবে কী দিয়ে? ঠিক করলে, তেতলাটা ভাড়া দিই।

কিন্তু যাকে-তাকে দেওয়া যায় না। এমন লোককে দিতে হয় যাতে বাড়িটার জাত থাকে। ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট অনেকদিন থেকে লেখালেখি করছে। তাদের এক পাঞ্জাবী অফিসরের সমূহ একটা ফ্ল্যাট দরকার। কোনো ঝামেলা নেই, সজ্জন সিং-এর। সে একলা, অখণ্ডিত; বিয়ে করেনি এখনো। আর ভাড়া যা দেবে সরকার তা ন্যায্যের চেয়েও বেশি। আর আদায়ে কোনো ঝঞ্ঝাট নেই বাড়িওলার। আদায় নিশ্চিত ও অনায়াস।

সজ্জন সিং মুকুটের মণি হয়ে বসল মাথার উপর।

মাঝে মাঝে রাস্তায় একা-একা এসে দাঁড়ান জগৎপতি। বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকেন একদৃষ্টে। এ কি তার বাড়ি? ও অভিবাদী স্বপ্নের উপর দাঁড়িয়েছে

করে? এ কি তারই ইট-পাথরের ? কী করে এ সম্ভব হল? কোত্থেকে গজিয়ে? কে দিল? কেন দিল? না আবার একদিন কেড়ে নিয়ে যাবে? লা করে ফেলবে? যেমন ফাঁকা ছিল তেমনি ফাঁকা করে দেবে সমস্ত?

তা কেন? মনে মনে হাসলেন জগৎ-ত। যখন একবার দিতে শুরু করেছে ঢেলে করেই দেবে। না দিলে চলবে কেন? আমিই বা ছাড়ব কোন বুদ্ধিতে? আমি কি দুর্বল, না অধম?

যখন উঠতে সুরু করেছি, আরো ব। বাড়িতে-গাড়িতে উঠেছি, নামে-ধামে উঠেছি, এবার উঠব শক্তিতে।

আর শক্তি মানেই রাজশক্তি।

হাইকোর্টের জজ করে দেবার কথা উঠছিল। প্রত্যেক নিয়োগেই একটা-না-একটা প্রতিবাদ ওঠে, জগৎপতির বেলায়ও ব্যতিক্রম হল না। বলা হল, জগৎপতি ফৌজদারিতেই রপ্ত, দেওয়ানির ক-খ-গও জানে না। জজ হলে কিছু জানতে লাগে নাকি? পাল্টা বলে এপক্ষ। উকিল জজ হলে তো তার আইনের লাইব্রেরি বেচে দেয়, বেচে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়। কিন্তু তা নয়, জগৎপতি নিজেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। জজের মধ্যে জৌলুস কোথায়? গাড়িতে পাশে আর্দালি নিয়ে না এলে তাকে চেনে কে? আর মাইনেই বা কত, এবং কত দিন? উকিল হিসেবে জগৎ-পতির রোজগার অনেক বেশি আর ইহ-জগতে তার কোনোদিন রিটায়ারমেন্ট নেই। স্ট্রেচারে করে উঠে শুয়ে-বসে শেষ দিন পর্যন্ত সে হেঁদিয়ে যাবে আর রক্ত উঠে মরে গেলে লোকে বলবে, দেখ, লোকটা কেমন জিন-লাগাম-যুক্ত ঘোড়ার মত মরেছে।

না, শুধু টাকায় সুখ নেই। ভোগ নেই। আসল সুখভোগ শক্তিতে। আর শক্তি মানে হিত করার শক্তি নয়, অনিষ্ট করার শক্তি। যার যত অনিষ্ট করার শক্তি তারই তত সম্মান, তত অভিনন্দন। আর শাসন করার অস্ত্র হাতে না থাকলে অনিষ্ট করি কি করে? আর শাসন করার চূড়ান্ত অস্ত্র মন্ত্রীত্বে।

মন্ত্রী হবার স্বপ্ন দেখছেন জগৎপতি। ভাবছেন রাজনীতিতে ঢুকবেন। আর তো জেলে যাওয়া নেই, এখন শুধু টাকার খেলা। টাকা দিয়ে, টাকা দেখিয়েই কিনবেন নমিনেশন। তারপরে ভোট। মনে-মনে হাসলেন জগৎপতি। হ্যাঁ, তার জন্যে কিছু মাটি তৈরি করতে হবে বৈকি। দরিদ্রের বন্ধু সাজতে হবে। তার মানে এখানে-ওখানে কিছু চাঁদা দিতে হবে মুক্তহস্তে। নিতে হবে জনপ্রিয়তার দীক্ষা। আর যে যা বলে সকলের মতে ঘাড় কাত করে নির্বিবাদ সায় দিয়ে যাওয়ার নামই জনপ্রিয়তা। আরো একটা বড় কথা, হতে হবে প্রগতিবাদী। এ আবার হতে হবে কী! বড়লোক হবার সঙ্গে-সঙ্গেই তো আপনা থেকে হয়ে গিয়েছে। প্রগতির প্রত্যক্ষ উদাহরণই তো রুচিরা। তার সাজ-গোজ লেখা-পড়া চলা-ফেরা, ইংরিজি-বাঙলা উচ্চারণের কথা ছেড়ে দিই, মাঠে-ময়দানে তার দাপাদাপি ছুটোছুটিও ধর্তব্য নয়, এত-র উপরে তার আবার নাচ-গান-অভিনয় দেখ। আর কে না জানে, হালের অভিধানে নাচ-গান-অভিনয়ই সংস্কৃতির নামান্তর। আর যা সংস্কৃতি তা-ই প্রগতি।

সেদিন কোথায় বেরুচ্ছে রুচিরা, পোশাক দেখে জগৎপতি থমকে গেলেন। বলে উঠলেন: 'এ কী! হাত গলা কান সব খালি কেন?'

রুচিরা মৃদু হেসে বললে, 'এটাই প্রোগ্রেসিভ।'

'বুঝেছি। যাকে বলে গরিব-গরিব দেখানো।' জগৎপতি হাসলেন। 'কি, গাড়িতে যাচ্ছিস তো?'

'হ্যাঁ, বাবা—'

'তার মানেই তাই। কারুকার্য যাই থাক, আসল ঠিক থাকলেই হল।' এবার জগৎপতি তাঁর হাসিতে একটু কুটিলতা মেশালেন: 'গরিব হওয়া নয়, গরিব-গরিব দেখানো।'

'বেশি দেখাতে গেলে লোকে আবার কৃপণ না ভাবে।'

'হ্যাঁ, সেটা আবার লক্ষ্য রাখতে হবে। কৃপণ-কৃপণ না দেখানো।' কথাটা কী রকম হয়ে গেল দেখে শব্দ করে হাসলেন জগৎপতি: 'কৃপণ কখনো জনপ্রিয় হয় না। জনপ্রিয় হওয়াটাই প্রগ্রেসিভনেস। যাচ্ছ যে, একা যাচ্ছ?'

'না, কলেজের কটা মেয়েকে তুলে নেব।'

'খুব ভালো। সকলের সঙ্গে মিশে পাঁচজনের একজন হয়ে গিয়ে আবার

"এ কী! হাত গলা কান সব খালি কেন?"

'কোনটা?' মেয়ের সঙ্গে সমানে-সমানে কথা বলতে জানেন জগৎপতি।

'এই নিরলঙ্কার থাকা।' কথাটা শক্ত হয়ে গেল বুঝে রুচিরা নিজেই সেটা নিরলঙ্কার করল: 'মানে সরল সাদামাঠা থাকা—'

নিজের কোটে একলাটি হয়ে ফিরে আসা। এটাই বোধহয় বাঁচবার আর্ট।'

খুব একটা ত্বরার ভাব ফুটিয়ে রুচিরা বললে, 'এ বেলা তোমার গাড়ি লাগবে?'

'না। কতক্ষণ দেরি হবে তোমার?'

'এই ঘণ্টা দু-তিন।'

কোথায় যাচ্ছে জিগগেস করাটা অবান্তর, অনাধুনিক, তাই জগৎপতি সংক্ষেপে শুধু বললেন, 'এস।'

তারপরে গেলেন এণাক্ষীর কাছে। 'তুমি একবার পাড়াটা ঘুরে এস।'

'ও আমি পারব না।'

'সে কী, নতুন বাড়ি করে এসেছ এ পাড়ায়, সবার সঙ্গে ভাব করতে হয়।'

'তুমি করো গে।'

'আমি তো গেছি এ-বাড়ি ও-বাড়ি। আপনাদের কাছাকাছি এলাম—নমস্কার করে বলতেই সকলে সৌজন্যে একেবারে বিগলিত হল। কী অমায়িক, কী নিরহংকার, পরস্পর বলাবলিও কানে এল।' সমস্ত মুখে তৃপ্তি মেখে তাকালেন জগৎপতি : 'যাও না, তুমিও বাড়ি-বাড়ি গিয়ে বিনয় দেখিয়ে এস না। দেখবে গিন্নির দল কেমন তোমাকে মাথায় করে রাখবে।'

'আমার বয়ে গেছে।' একবাক্যে নাকচ করে দিল এণাক্ষী। : 'কিছুর মধ্যে কিছু না, আমি বাড়ি-বাড়ি ঘুরে বেড়াই—পাগলের মত!'

'পাগলের মত হবে কেন, ঘোর বুদ্ধিমানের মত।' গম্ভীর হলেন জগৎপতি : 'ওটাই হচ্ছে জনপ্রিয় হবার সহজ উপায়। আর জনপ্রিয় না হলে ইলেকশানে জিতব কী করে?'

বিদ্রূপের হাসি হাসল এণাক্ষী। বললে, 'এ যে গাছে না উঠতেই এক কাঁদি। আগে ইলেকশান আসুক। তখন দেখা যাবে। তখন না হয় ঘরে ঘরে, দ্বারে দ্বারে গিয়ে দাঁড়াব।'

'সেই দাঁড়ানোটা যাতে সড়গড় হয় তারই অভ্যেস আগে থেকে করে রাখা ভালো। মাটি পাট করে না রাখলে ফলন ভালো হয় কী করে?'

'রাখো। ঘোড়ার দেখা নেই আগেই চাবুকের ধুম।' হঠাৎ ভঙ্গিটা মোলায়েম করল এণাক্ষী : 'দেখবে ওরাই আসবে আগে আগে।'

'তা আসুন, কিন্তু ভয় হয়, বাড়ি ফিরে গিয়ে তোমাকে অহংকারী বলবে। কিন্তু আগে-ভাগে তুমি যদি যাও নিজের থেকে, আর দেখতে হবে না, জয় পড়ে যাবে চারদিকে।'

'দরকার নেই। অমন ফাঁকা জয়ধ্বনি আমি চাই না।' ঘুরে দাঁড়াল এণাক্ষী : 'তার চেয়ে, অহংকারী বলুক, তা অনেক ভালো।'

'বলো কী, শুধু-শুধু লো[ক] পীড়ার কারণ হবে?'

'শুধু শুধু লোকে যদি পীড়[িত] হয়, আমি কী করতে পারি?' সরল-শা[ন্ত] মুখ করল এণাক্ষী : 'ভগবান যদি আমাকে ঐশ্বর্য দেন, আমার কী উপায় আছে? জিনিস বেশি হলেই জিনিস উঁচু হবে। আর উঁচু হওয়া মানেই তো উদ্ধত হওয়া নয়। এই যদি লোকে বলে—'

'না, লোককে বলতে দেওয়া নয় কিছুতেই। আচ্ছা, বেশ', মীমাংসার সুরে ভাঁজল জগৎপতি, 'আমি গিয়েছি, তুমি হঠাৎ এখুনি না গেলে। কিন্তু ভদ্রমহিলারা যদি আসেন কেউ বেড়াতে, তোমার সঙ্গে পরিচিত হতে, ভীষণ আপ্যায়িত করবে, অমানীকে মান দেবে অকাতরে—'

'সে আর তোমাকে বলতে হবে না।' এণাক্ষী হাসল : 'তবে দয়া করে জানিয়ে দিও যেন কেউ দুপুরেবেলা না জ্বালায়। কত তপস্যা করে এই দুপুরের ঘুমটুকু আদায় করেছি, তা যেন পণ্ড না হয়।'

কণ্ঠে জগৎপতিও তারল্য আনলেন : 'কুকুর থেকে সাবধান' লোকে যেমন নোটিশ টাঙিয়ে রাখে তুমি তেমনি নোটিশ টাঙিয়ে রাখ—নাসিকাগর্জন থেকে সাবধান।'

কিন্তু প্রথমেই যে এল সে শুভময়। সঙ্গে আরো দুটি যুবক।

সরাসরি ঢুকে পড়ার দরুন একটু বোধহয় চমকালেন জগৎপতি। কিন্তু ভুল করলেন না, দিলেন না ভুল হতে। বললেন, 'বসুন।'

চিড়বিড় করে উঠল ছেলেগুলি। শুভময় বললে, 'আমাদের আপনি বলছেন কী—আমরা কত ছোট—'

'না, না, ছোট-বড় কী! ছোট-বড় বলে কেউ নেই। গণতন্ত্রে আমরা সকলে সমান!'

'সেদিক থেকে বলতে গেলে অবশ্যি ঠিক কথাই, তবে সাধারণ সামাজিক ক্ষেত্রে—' শুভময় কথটা শেষ করতে পারল না।

'দেখুন যতদিন আপনি-তুমি-তুই চলবে ততদিন গণতন্ত্র নিরর্থক। গণতন্ত্রে ভাষারও সংস্কার হওয়া দরকার। এমন বাক্য ও ব্যাকরণ রাখা উচিত নয়, যা থেকে শ্রেণীতে-শ্রেণীতে তারতম্যের সূচনা হয়।'

সঙ্গের আর দুটো ছেলে তো চুপ করেই রইল, শুভময় কান চুলকোতে চুলকোতে বললে, 'তা, আপনি যা বলছেন—কিন্তু, আমাদের বক্তব্যটা খুব ছোট।'

'ছোট হয়, নাই বা বসলেন তবে।'
...ৎপতি বন্ধ করলেন বক্তৃতা। সহৃদয় ...ন্ধ চোখে তাকালেন : 'বলুন কী চাই?'

'সরস্বতী পুজোর চাঁদা।'

পুজো? ঝাঁজ নিয়ে মুখ দিয়ে প্রায় বেরিয়ে আসছিল কথাটা, তাড়াতাড়ি গিলে ফেললেন জগৎপতি। পূজারীর চেহারা ও পোশাক এক পলকেই দেখলেন একটু খুঁটিয়ে। পরনে প্যান্ট, গায়ে হাতা-গুটোনো শার্ট, বুকের সবগুলো বোতাম খোলা। বোতাম একটাও নেই বলতে চাও? না, সবগুলো বোতামই আছে কিন্তু একটাও ঘরে আবদ্ধ নয়। জামার বুক খুলে রাখাই শুভময়ের বৈশিষ্ট্য।

'পুজো করেন বুঝি আপনারা?' একটুও যেন বাঙ্গ না ফোটে সতর্ক থাকলেন জগৎপতি।

'বুঝতেই পারেন—' একটু বা কাঁচুমাচু মুখে করল শুভময় : 'পুজোটা উপলক্ষ মাত্র, আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে উৎসব।'

'ঠিকই তো। তাই তো দরকার। উৎসব না থাকলে পুজো কী?' রসিদ-বইয়ের জন্যে হাত বাড়ালেন জগৎপতি : 'কত দিতে হবে?'

বাইরে থেকে মহড়া দিয়ে এসেছে বোধহয়, শুভময় আর তার বন্ধুরা একসঙ্গে বলে উঠল : 'দশ টাকা।'

রসিদ-বইটা দেখতে লাগলেন জগৎপতি। সপ্রশংস স্বরে বলে উঠলেন : 'বাঃ, চমৎকার নাম তো সমিতির!'

'আপনি ভালো বলছেন? সবাই ঠাট্টা করে, বলে, বুড়ো হয়ে গেলেও, চুল-দাড়ি পাকলেও তরুণ থাকবে।'

'তাই তো চাই। চিত্তে তরুণ, রক্তে তরুণ।' তরুণের দৃষ্টিতে ভাবলেন জগৎপতি : 'তা ছাড়া এ ত কোনো ব্যক্তি নয়, এ সমিতি। তরুণ সমিতি। মেম্বররা আসবে যাবে, বুড়ো হবে, কিন্তু সমিতি যে-তরুণ সেই তরুণ।'

'ঐ যে কী না' জানি বলে কথাটা—মেন মে কাম য়্যাণ্ড মেন মে গো—' সমিতির পিছনের দিকের ছেলেটা বাকি কথাটা মনে করতে না পেরে বাঙলায় সারল : 'কিন্তু আমি ঠিক আছি।'

'বাট, আই গো অন ফর এভার!' জগৎপতি পাদপূরণ করে দিলেন। রসিদ-বইয়ের শূন্য স্থানও পূরণ করলেন স্বহস্তে।

'ভুল লেখেন নি তো স্যার?' শুভময় নম্রমুখে বললে।

'ভুল? ভুল করতে যাব কেন?' টেবিলের ড্রয়ার টানলেন জগৎপতি।

'একটা শূন্য বেশি দেন নি তো?'

'কই? দেখি। না, ঠিক আছে। এক-শোই দিচ্ছি তোমাদের।' টানা খুলে জগৎপতি একটা একশো টাকার নোট কুড়িয়ে নিয়ে দিয়ে দিলেন অনায়াসে।

'একশো!' প্রায় একটা জয় দিয়ে ওঠবার মত উদ্দীপ্ত ভঙ্গি করল শুভময়। লোকে চার আনা—আট আনা দেয়, বড়জোর এক টাকা—ইনি না হয় দু টাকা দেবেন, খুব বেশি হলে পাঁচ টাকা—কিন্তু এ যে পূজাতীত প্রসাদ! অতি-উৎসাহে শুভময় জগৎপতির পায়ের ধুলো নিয়ে বসল। গদ্গদস্বরে বললে, 'যাবেন কিন্তু।'

বিসর্জনের পরের দিন জলসা।

সমিতির সেক্রেটারি, শুভময় ও আরো কটা ছেলে এসেছে জগৎপতির কাছে। 'আপনাকে স্যার সভাপতি হতে হবে।'

তা জগৎপতি জানেন। নইলে এক-মুষ্টিতে অতগুলো টাকা দেবার মানে কী? তবু একেবারে শস্তা না দেখায় তাই বললেন, উদাসীনের মত, 'আমার সময় কোথায়?'

'তা আমাদের জন্যে একটু সেক্রিফাইস করবেন, স্যার।' শুভময় এমনভাবে বললেন যেন সময়কালে ওরাও অনেক করবে জগৎপতির জন্যে, অনেক খাটবে-পিটবে, অনেক সময় ও শ্রম দেবে অকাতরে।

'তা ছাড়া আমি এসব বুঝি কী—'

'কী যে বলেন স্যার। তাছাড়া, কী বলব, আপনি তো সবই জানেন, আজকাল কি কিছু বুঝতে লাগে?'

'তবু যে-বিষয়ে যার নাম-ডাক—আর কাউকে ডাকুন।' অন্যমনস্ক হতে চাইলেন জগৎপতি।

'আপনার নাম-ডাক কি কম? আমাদের পাড়ায় মনীষী থাকতে আমরা অন্যত্র যাব কেন?'

'তোমরা পাড়ার ছেলে—তোমরা যখন বলছ।' অগত্যা রাজি হলেন জগৎপতি।

'বাড়ির সবাইকে নিয়ে যাবেন। আমি কার্ড দিয়ে যাব।'

বাড়ির সবার দিকে তা হলে নজর পড়েছে সমিতির। জগৎপতি হাসলেন মনে-মনে। কিন্তু পরিপূর্ণ পড়েনি। নচেৎ পাড়ায় জলসা হচ্ছে অথচ তাতে রুচিরা নেই এটা আর যাই হোক, সংস্কৃতি নয়।

জলসায় গিয়ে জগৎপতি এক বিষম কাণ্ড করে বসলেন। একটা মঞ্চ তৈরি হয়েছিল, তাতে তিনি বসেছিলেন আর তাঁরই সঙ্গে সংযুক্ত বলে এণাক্ষী আর রুচিরা। আরো কে-কে বসেছিলেন সেটা তাঁর লক্ষ্যের ছিল না। উদ্বোধনী বক্তৃতায় তিনি বললেন, গণতন্ত্রে মঞ্চের প্রয়োজন নেই, কে কার থেকে উঁচু যে উচ্চাসনে বসবে, সব শ্রেণীহীন সমতলতায় মিশে যাবে একত্র হয়ে। তবে যদি বলেন, দর্শকের সুবিধের জন্যে একটা মঞ্চ দরকার, তা হলে তাতে তারাই বসবে যারা অংশ নিয়েছে জলসাতে; যারা অবান্তর, যারা আগন্তুক, তারা শুধু তাদের পদ-মর্যাদা বা অন্য মর্যাদার বলে মঞ্চাধিকার করে থাকবেন এ অসম্ভব। দস্তুরমতো রুচিরার দিকে তাকালেন জগৎপতি। বললেন, আমি সভাপতি বলে মঞ্চস্থ হয়েছি, কিন্তু আমার বাড়ির মেয়েরা কোন অধিকারে বসবেন বেদীতে? তাঁরা তো সভার কেউ নন, তাঁরা সাধারণ দর্শকমাত্র। তাঁদের স্থান জনগণের মাঝখানে। আর, মঞ্চ থেকে নেমে গেলে আমিও তাঁদেরই পাশে—

চারদিক থেকে দারুণ হাততালি পড়ল। থামতে চায় না সহজে। এ একেবারে জননেতার মত কথা। মহানুভবের আহ্বান।

এণাক্ষী আর রুচিরা নেমে গেল স্টেজ থেকে। মাটিতে মেয়েদের এলেকায় গিয়ে বসল। বাড়ি ফিরে এণাক্ষী বিরক্ত মুখে বললে, 'খুব স্টান্ট দিলে যা হোক।'

'কিন্তু কী রকম নিলুম একহাত!' নিশ্বাসে বুক ভরে নিয়ে পরিতৃপ্ত মুখে বললেন জগৎপতি : 'জনপ্রিয়তার মই ধরে উঠে গেলুম কয়েক ধাপ। কী, বলো, উঠলুম কিনা। তোমরা যদি সাহায্য করো—'

'কিন্তু যাই বলো, ছেলেটা ভালো।'

'কোন ছেলেটা?'

'ক্লাবের যে সেক্রেটারি। শুভময়।'

'কেন, কী করেছে?'

'আমাকে একটা চেয়ার দিয়েছে বসতে। বললে, জনগণের মধ্যেও যাঁরা মানী-গুণী তাঁরা বিশেষ আসন পায় বৈ কি। নিন, বসুন। বলে কোণের দিকে, একটা চেয়ার পাতলে আমার জন্যে।'

'তোমার মোটেই চেয়ারে গিয়ে বসা উচিত হয়নি।' রুচিরা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল : 'আমাকেও দিতে চেয়েছিল একটা, আমি রিফিউজ করে দিয়েছি। গোড়াতেই আমার নিচে মাটিতে বসার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু বাবাই ডেকে নিলেন স্টেজের উপরে—'

হো হো করে হেসে উঠলেন জগৎপতি। 'ঐ, ঐ স্টান্টটার জন্যে। কিন্তু', এণাক্ষীকে লক্ষ্য করলেন : 'শুভময় বেশ বিবেচক ছেলে তো! চেয়ার এনে দিয়েছে! তাছাড়া, যাই বলো, গঠনশক্তি আছে ছেলেটার! কী রকম করে-কম্মে তুলেছে ব্যাপারখানা! করে কী ছেলেটা? চাকরি-বাকরি আছে কিছু?'

'কে জানে!' ঠোঁট ওলটালো এণাক্ষী। মানে, করলে কত টাকার বা করে, এমনি উপেক্ষা।

'অবস্থা নাজানি কী রকম?'

'পায়ে যখন স্যান্ডেল তখন নিশ্চয়ই ভালো নয়।' রায় দিল এণাক্ষী।

'লেখাপড়াই বা কদ্দুর?'

'বেশিদূর নয়।' এণাক্ষী মুখচোখ গম্ভীর করল ঃ 'বেশিদূর হলে কি জামার বুকের বোতামগুলো খোলা রাখে?'

হেসে উঠলেন জগৎপতি। বললেন, 'ওটা বোধহয় স্মার্টনেসের চেহারা। মানে, এত দ্রুত, যে জামার বোতাম লাগাবার সময় নেই।'

'হ্যাঁ, ঐ চেহারাটাই চকচকে।'

একটা লোককে বিচার করবার কীসব বুর্জোয়া স্ট্যাণ্ডার্ড! মনে মনে রুষ্ট হল সুচিরা। বললে, 'অলস গবেষণা না করে ভদ্রলোককে সরাসরি ডেকে জিগগেস করলেই হয়!'

৪

ডাকতে হল না, ফাঁকা বুঝে নিজের থেকেই হাজির শুভময়। 'একদিন আমাদের সমিতিতে চলুন, দেখে আসুন স্বচক্ষে।'

'এই যে—' উচ্ছ্বসিত হলেন জগৎপতি ঃ 'আসুন, বসুন।'

'আপনি যদি এখনো আপনি বলেন তাহলে তো মুস্কিল।' দাঁড়িয়ে রইল শুভময়।

'গণতন্ত্রের যুগ—আপনি না বললেই অপমান। কিন্তু যাই বলো,' নিজেকেই নিজে সংশোধন করলেন জগৎপতি ঃ 'বাঙলা ভাষায় আপনি-তুমি-তুই একটা আশ্চর্য চারুকলা। গণতন্ত্রের লোক মনতন্ত্রে এসে গেলেই আপনি তুমি হয়ে ওঠে।'

'তবে?' প্রায় জয়ীর মত তাকাল শুভময়।

'বোসো হে বোসো।' সপ্রশংস দৃষ্টি তুলে তাকালেন জগৎপতি। বললেন, "তোমার কিন্তু চমৎকার গঠনশক্তি। ফাংশানটা কী অপূর্ব, সুপার্বলি সাকসেসফুল করে তুললে। কত বয়েস হবে তোমার? ত্রিশ-বত্রিশ?'

'কাছাকাছি।' ডান হাতটা মুষ্টিবদ্ধ করল শুভময়। দৃঢ় করল কণ্ঠস্বর। বললে, "এই গঠনশক্তির গুণেই তো গত ইলেকশানে জিতিয়ে দিলাম বিনয়দাকে।'

একটু বুঝি বা চিন্তিত হলেন জগৎপতি। ইলেকশানে দাঁড়াতে হলে তাঁকেও দাদা[illegible] হবে। এসব অর্বাচীনের দল তাঁকে জগৎদা বলে ডাকবে। উপায় নেই। দাদার জোরেই কুণ্ঠিত করা।

'কিন্তু দেখুন ইলেকশানে জেতার পর বিনয়দার আর দেখা নেই। তখন কত কী বলেছিলেন আমাদের সমিতির জন্যে হ্যানো করবেন ত্যানো করবেন। এখন সব ফক্কা।' আস্তিন গুটোলো শুভময় ঃ 'আমরাও দেখে নেব। এক মাঘে শীত পালায় না। যাই বলুন ইলেকশানের ক্যান্ডিডেটকে বিশ্বাস করতে নেই।'

'না, না, লোক বুঝে বিশ্বাস করবে বৈকি।' পরামর্শদাতা-উকিলের ভঙ্গি করলেন জগৎপতি ঃ 'তবে আগে কড়ি পিছে বড়ি। দাম আদায় করে নিয়ে পরে কাজ দিতে হয়। যাক গে, গতস্য শোচনা নাস্তি। এখন বলো,' উদার প্রশ্রয়ে হাসলেন জগৎপতি ঃ 'তুমি কী করো?'

'এই ডোবালেন।' শুভময়ও হাসল। বললে, 'করি মানে, সমিতি করি, ভলান-টিয়ারি করি।' যেন এটা একটা প্রকান্ড করা এমনি গর্বের ভাব করল শুভময়। 'বলতে পারেন রাজ্যের উত্থান-পতন ঘটাই।'

'না, আমি বলছি, কোনো আফিসে চাকরি-বাকরি করো কিনা।'

'তা একটা করতে হয়। একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে যৎসামান্য মেকানিকের চাকরি।'

'কিছু মনে কোরো না। মাইনে?'

'অতি দরিদ্র। বাবার বন্ধুর ফার্ম, গোড়াতে খুব আশ্বাস দিয়েছিলেন উন্নতির চূড়ায় এনে তুলবেন, এমনকি বিলেত পাঠাবেন ট্রেনিং দিয়ে—'

'সে সব হলনা বুঝি?'

'কী করে হবে? গোটা দুই স্ট্রাইক অর্গানাইজ করতে হল যে।' ঢোক গিলল শুভময় ঃ 'কিন্তু আফিসে উন্নতি হল না বলে আমি আমার উচ্চাশা ছাড়িনি।'

'উচ্চাশা—কতদূর উচ্চ?'

'মন্ত্রীর গদি পর্যন্ত।' এতটুকু ভড়-কালনা শুভময়।

'মন্ত্রী?' জগৎপতি স্তম্ভের মত হয়ে গেলেন। তার অর্থ, আগামী নির্বাচনে তাঁকে একটা লোফারের সঙ্গে প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করতে হবে।

'হ্যাঁ, আশ্চর্য হচ্ছেন কী!' তরল স্রোতে হাসল শুভময় ঃ 'সবচেয়ে সোজা। সবচেয়ে শস্তা এই মন্ত্রী হওয়া।'

'বলো কী?' একটু বুঝি বা গম্ভীর হলেন জগৎপতি ঃ 'তোমার পড়াশোনা কদ্দুর?'

'কেন, পড়াশোনা লাগে নাকি? বিনয়দা, যাঁকে রিটার্ন করিয়ে দিলাম তিনি তো আই-এ ফেল।'

'আর তুমি?'

'বাবা মারা গেলেন, আমার বিএস-সি পরীক্ষা দেওয়া হল না।'

'তার মানে?'

'তার মানে তাই। হ্যাঁ, চলতি বাঙলা বলতে পারেন বি-এ ফেল। যারা পে[illegible] করে তাদের পরীক্ষা দেওয়া হয়। যারা প্লেস কিংবা ডিভিশন পায় না তা[illegible] সব সময়েই দু নম্বরের জন্যে মি[illegible] করে।' হাসির শব্দ মিলিয়ে যাবা[illegible] আগেই চেঁচিয়ে উঠল শুভময় ঃ কিছু ন[illegible] কিছু না, কিস্সু লাগেনা মন্ত্রী হতে।

'কিছু না?' প্রায় হতাশের মত মু[illegible] করলেন জগৎপতি।

'অন্তত লেখাপড়া না। বরং লেখা-পড়াটা মন্ত্রীত্বের পক্ষে হ্যান্ডিক্যাপ রাজনীতির পক্ষে ডিসট্র্যাকশান। যে হোলটাইমার পলিটিশিয়্যান সে লেখাপড় করবে কী! লেখাপড়া করলেই তে বিবেক জন্মাবে। যার বিবেক আছে সে মন্ত্রী হবে কী করে?'

'তবে কী লাগে? টাকাকড়ি?'

'কিছুমাত্র না। বিনয়দার অবস্থ[illegible] কী! নো অস্টেনসিবল মিনস অ[illegible] লাইভলিহুড।' চোখের ইঙ্গিতটা কৌতুকে উজ্জ্বল করল শুভময় ঃ 'আর পরের বা[illegible] আমি যদি দাঁড়াই, আমার অবস্থা তো বিনয়দার চেয়েও বিনীত।'

সমস্ত বিষয়বৈভব অসার ভস্মমু[illegible] —জগৎপতির মনে এক পলকের জন্যে বৈরাগ্যের উদয় হল। ভয়ে-ভয়ে জিগগে[illegible] করলে, 'তাহলে কী লাগে?'

'শুধু পার্টি, পার্টির এক[illegible] হওয়া লাগে। আই বিলঙ টু দি পার্টি—শুধু [illegible] উন্নতির ছাড়পত্র। বিদ্যা না অর্থ [illegible] চরিত্র না—আর কোনো যোগ্যতা না, শু[illegible] দলের দলী হওয়া। শুধু ভলান্টিয়া[illegible] করা।'

'শুধু ভলান্টিয়ারি?'

'এখন তো তবু একটা কিছু করতে হচ্ছে, কয়েক বছর আগে হলে শুধু গাঁজার দোকানে পিকেটিং করেই মন্ত্রী হতে পারতাম।'

যেন মেনে নিতে পারছেন না এমনি কষ্ট-মাখা মুখ করলেন জগৎপতি।

'কেন নয় বলুন? ডেমোক্র্যাসিতে আর কী লাগে? ডেমোক্র্যাসিতে পার্টি ছাড়া আর কী আছে? পার্টি ছাড়া আ[illegible] কোনো ধর্ম নেই কর্ম নেই তীর্থ নেই স্লোগানের বাইরে কোনো গান নেই এই ধরুন না আমাকে। আমি পার্টি একজন য়্যাকটিভ মেম্বর, আমার উদ্দেশ আরো কী করে য়্যাকটিভ হব, কী কে আসব দলের ফ্রণ্ট লাইনে। আমা[illegible] সামনে দলবাজি ছাড়া আর আদর্শ কী আর আমি যদি একবার দলের মু[illegible]

াণী হতে পারি, মানে, ঠেলাঠেলি করে ার এগিয়ে আসতে, তখন আমাকে নির্বাচনের টিকিট না দিয়ে যাবে কোথায়? আমার পল্লীতে আমি ছাড়া আর আছে কে?'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে জগৎপতি বললেন, 'কিন্তু শুধু টিকিট পেলেই তো চলবে না।'

'বাকিটা পার্টি দেখবে। চেষ্টা করবে তার প্রেস্টিজ রাখতে। নিয়ে আসবে তার ফান্ড, তার কাগজ, তার অর্গানাইজেশন। আমার ব্যক্তিগতভাবে কিছুই করণীয় নেই। আমি কেন লেখাপড়া করতে যাব? আমার টাকাপয়সা না থাকলেই বা কী আসে যায়? আর চরিত্র? ও তো একটা সুবিধের কথা।'

'কিন্তু ভোট যারা দেবে তাদের কাছে তো একটু প্রিয় হতে হবে?'

'তারই জন্যে তো সমিতি করা। দুঃস্থের সেবা করা, নিরানন্দকে আনন্দ দেওয়া—মানে কিনা—' কুটিল রেখায় হাসল শুভময়: 'জনসংস্পর্শ ঘটানো।'

'চলো দেখে আসি তোমাদের সমিতি।' উঠে পড়লেন জগৎপতি।

পায়ে হেঁটে যাবারই ইচ্ছে ছিল জগৎপতির, কতটুকুনই বা পথ—কিন্তু শুভময় বললে, 'না, গাড়ি করে চলুন। সব পথটাই পায়ে হেঁটে গেলে কেউ ইমপ্রেসড হয় না, খানিকটা মোটরে গিয়ে বাকিটা পায়ে হাঁটলেই লোকে মহানুভব বলে।'

দুখানা ছোট-ছোট ঘর নিয়ে সমিতির বসবাস। একখানা ঘরে কটি আলমারিতে কিছু বই ও মাঝখানে টেবলের উপর কটা ছেঁড়া পত্রিকা আর তাকে ঘিরে কটা নড়বড়ে চেয়ার। পাশের ঘরটাতে কিছু খেলার ও থিয়েটারের সরঞ্জাম।

'সমিতির শক্তি জিনিসে নয়, মানুষে।' টিপ্পনী ঝাড়ল শুভময়।

'তা আর বলতে। কিন্তু দুঃস্থের সেবাটা কী হয়?'

'বস্তি-অঞ্চলে শিশুদের দুধ দেওয়া হয়, ওষুধ দেওয়া হয়, কোথায় কোনো বিরোধ ঘটলে তার মীমাংসার ব্যবস্থা করা হয়, রাস্তার আবর্জনা সাফ না হলে তুলে নিয়ে কাউন্সিলারের বাড়ির সামনে জড়ো করা হয়—' প্রকাণ্ড লিস্টি দিলে শুভময়।

'আর আনন্দের ব্যবস্থা?' রিডিং-রুম আর লাইব্রেরির দিকে কটাক্ষ করলেন জগৎপতি। 'এই মাত্র?'

'না। আরো আছে। মাঝে মাঝে প্রসেশান করা আছে। প্রভাতফেরী থেকে আর আছে পুজো পার্বণ ্যা। আর লক্ষ্যে-উপলক্ষ্যে জলসা করা, থিয়েটার করা—আর বুঝতে পাচ্ছেন—এতেই জনগণের বেশি ফুর্তি।'

'এ সব তো ভালোই কিন্তু স্থায়ী কোনো একটা সমাজসেবা হয় এটাই কি ভালো নয়? যেমন ধরো নাইট-স্কুল, বেবি-ক্লিনিক—'

'নিশ্চয়। একশোবার। আপনি যদি আসেন—'

আসবেন বলেই তো এগিয়েছেন জগৎপতি। তরুণ সমিতির আওতায় নিজের বাড়িতে সভা ডাকলেন। সভ্য যারা আছে তারা তো বটেই, বাইরের ভদ্রলোকদেরও নিমন্ত্রণ হল। লোকসেবা দরিদ্রসেবার মত মহৎ ব্রত আর কী আছে, কিন্তু তার জন্যে টাকা দরকার। আন্তরিক কর্মী যদি পাওয়া যায় টাকার অভাব হবে না। আর তরুণ সমিতির কর্মীরা যে আন্তরিক এ কে সন্দেহ করবে?

প্রথমেই সমিতির জন্যে বড় ঘর দরকার। মুকুলবাবুর দোতলার ভাড়াটেরা বদলি হয়ে উঠে যাবে শুনেছি, সেটা সমিতির জন্যে বিনা সেলামিতে নেওয়া যায় হয়তো। তারপর জগৎপতিবাবু নিজে যখন হাল ধরেছেন তখন আর ভাবতে হবে না।

কিন্তু আরেকটা দিক দেখা দরকার। স্বাধীন ভারতে পুরুষ আর মেয়ে দুয়েরই সমান অধিকার, সমান ভোট। তাই তরুণ সমিতিতে মেয়েদেরও আসা উচিত। অন্তত তাদের আসার পথে কোনো বাধা রাখা অসঙ্গত।

বা, জলসা কি থিয়েটারে পাড়ার মেয়েরা তো নামেই। কখনো-কখনো প্রসেশনে।

হ্যাঁ, এবার তাদের 'অফিস' দিতে হবে। মন্দ কি, লেডিস সেকশানই খোলা হোক। তাদেরও ক্লাব-লাইফ, সঙ্ঘশক্তি দরকার। তাছাড়া বস্তি-এলাকায় এমন বহু সমস্যা আছে যা মেয়েদের পক্ষেই চর্চা করা সম্ভব, হয়ত শোভনও।

সমিতির নাম স্যার? তরুণ-তরুণী?

নাম যা আছে তাই থাকবে। তরুণের মধ্যেই তরুণী অন্তর্ভুক্ত। আমরা সবাই তরুণ।

হুল্লোড় পড়ে গেল। ঘ্যাঁচ করে জগৎপতি হাজার টাকার চেক কাটলেন। নকুলবাবুর ভাড়াটে দোতলা ছেড়ে দিল সমিতিকে। নকুলবাবু ছেড়ে দিলেন সেলামি।

লেডিস সেকশানের ইন-চার্জ কে হবে এই নিয়ে এখন প্রশ্ন।

আগে মেয়েরা আসুক। জমুক। তারপর তারাই ঠিক করবে কে হবে তাদের ইন-চার্জ।

'তরুণ সমিতিটা ক্যাপচার করা যাক।' রুচিরাকে বললেন জগৎপতি, 'তুই লেডিস সেকশানের ইনচার্জ হ।'

উৎসাহে মেতে উঠল রুচিরা। বললে, 'খুব ভালো কথা। সোশ্যাল সার্ভিস আমার চিরকালের ফেভারিট সাবজেক্ট—'

রুচিরার স্বরে সত্যের টান পেয়ে একটু বুঝি ভড়কালেন জগৎপতি। বললেন, 'আগে তোর পরীক্ষাটা হয়ে যাক।'

'তা তো বটেই। কিন্তু বিকেল-বিকেল বাড়ি-বাড়ি ঘুরে রিক্রুট করতে বাধা নেই।'

'তারপর তোরা দলে যখন ভারী হবি,' বাড়িতে জগৎপতি লঘুতার সুরেই বজায় রাখতে চাইছেন, 'তখন ওটাকে একটা মহিলা সমিতি করে নেব, আর তোর মা তার অধিনেত্রী হবে।'

'রক্ষে করো।' এণাক্ষী নিশ্বাস ছাড়ল: 'স্বস্তিতে আছি তাই থাকতে দাও। ওসব বস্তি-সংস্কারে আমি নেই।'

এণাক্ষীর সেকেলে কথায় কে কান দেয়। মাস-মাস চার আনা চাঁদা, মেয়ে মন্দ জোগাড় করল না রুচিরা। বড়-লোকের সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ে, দরজা থেকে কী করে ফিরিয়ে দেওয়া যায়। অবশ্য কেউ-কেউ আপত্তি তুলেছিল, পুরুষমেয়ের একত্র সমিতি কেন? সেকশান যদিও নামকা ওয়াস্তে আলাদা রাখা হয়েছে, কেন্দ্র এক। রুচিরা আর তার সহচরীরা হেসেই উড়িয়ে দিল কথাটা। একত্র নয় কোথায়? কলেজে একত্র, ইউনিয়নে একত্র, অফিসে অ্যাসেম্‌ব্লিতে, সেক্রেটারিয়েটে— সর্বত্র। জলসায়, সিনেমায়, থিয়েটারে। একত্র না হয়ে উপায় কী! সংবিধানেরই তাই নির্দেশ। সামান্য একটা পাড়ার সমিতিতে উলটো হতে যাবে কেন?

শুভময়কে গিয়ে বললে, 'লেডিস সেকশানটা তুলে দিন।'

'তুলে দেব?' শুভময় এমনভাবে তাকাল যেন তার বুকের মধ্য থেকে কে হৃৎপিণ্ডটা উপড়ে ফেললে।

'তুলে দেবেন মানে মিলিয়ে দেবেন, অ্যামালগেমেট করে দেবেন।' রুচিরা বললে। 'ক্লাব এক হয়ে যাবে, তার কোনো বিভাগ থাকবে না।'

'তার মানে এক পাখির দুই পাখা নয়, দুই পাখায় এক পাখি।' প্রাঞ্জল করল শুভময়। 'একত্র না হলে কমরেড-শিপ, সহমর্মিতা জন্মায় না।'

'হ্যাঁ,' হাসল রুচিরা: 'যাকে বলে, এক প্রাণ এক মন একতা।'

'তা আপনার বাবাকে বলুন।'

'বাবাকে বলতে যাব কেন? এ আমরা নেক্সট্ মিটিং-এ নিজেরাই পাশ করিয়ে নেব।'

'তা হলে আপনার পজিশনটা কী রকম হবে?'

'আপনার যা আমারও তাই। সমান-সমান।'

'সমান-সমান?'

'হ্যাঁ, আমি আপনারই মত জয়েন্ট সেক্রেটারি। ওটা পাশ করিয়ে নিন।'

'চমৎকার হবে। বাঙলায় বলবে যুগ্ম সম্পাদক।'

পরের মিটিং-এ তাই পাশ করিয়ে নিল। শুনে জগৎপতি খুব উচ্ছ্বসিত হলেন না। বাড়িতে রুচিরাকে বললেন, 'এতটা সক্রিয় হবার কী দরকার? চুল না ভিজিয়ে সাঁতার কাটাই তো ভালো। যাকে বলে ধরি মাছ না ছুঁই পানি।' সূক্ষ্ম করে হাসলেন বিজ্ঞের মত।

'না, না, কোনো কিছুতে লাগতে হলে সর্বশক্তি দিয়েই লাগাতে হয়।'

কিন্তু রুচিরার কী দুর্দান্ত শক্তি তা কি এই বাউণ্ডুলে পাড়া জানে?

কী করে জানবে!

তাই রুচিরার পরীক্ষা হয়ে যেতেই জগৎপতি নিজে একটা জলসাতে উদ্যোগী হলেন। আর তার মধ্যে একটা গীতি-নাট্য ঢুকিয়ে দাও। রুচিরা নাচবে গান গাইবে অভিনয় করবে।

হ্যাঁ, এবার আর খোলামেলা প্যাণ্ডেল নয়, স্টেজওয়ালা হল-এ, আর, কণ্ঠস্বর দৃপ্ত করলেন জগৎপতি, দস্তুর-টিকিট বেচে।

আর এভাবেই আয়-আদায় বাড়াতে হবে সমিতির।

উদ্যমে-উৎসাহে উন্মাদ হয়ে উঠল শুভময়। জামার বুকের শেষ বোতামটাও খুলে ফেলল।

জগৎপতি নিজেও কিছু টিকিট বেচলেন। ব্যারিস্টার মহলে, ইঞ্জিনিয়ার মহলে, ফার্মে-কোম্পানিতে। পাত্রস্থ করবার আগে মেয়েকে মঞ্চস্থ করি। তাকে আগে দেখ, শোনো, তারপরে যদি উপযুক্ত বুঝি আলাপ করিয়ে দেব।

কয়েকজন অতিথি-শিল্পীকেও নেওয়া হল। কয়েকজন বা সীমান্তবর্তিনীকে। হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড। আর রোমহর্ষক টিকিটবিক্রির পরিচয় যত না ভিড়ে তত, বা, তার চেয়েও বেশি, দুর্মদ হাততালিতে।

আর কী গায়, কী বা নাচে! নাচের কাছে গান কী! দেখেছ কেমন আনন্দের বৃষ্টি। প্রতিটি ভঙ্গি কেমন লাবণ্যে লালিত-পালিত। লাস্য আর বিন্যাসের কারিকুরি, রেখার আর চূড়ার আর গহ্বরের। অভিনেত্রীর কাছে নর্তকী কী! দেখেছ কেমন উচ্চারণ কেমন অল্প দিয়ে অসামান্যের ইশারা। আর সমস্ত কিছুর মাঝে যে একটি শালীন নম্রতা আছে, মার্জন-ভূষণ আছে, তার রহস্য হচ্ছে রুচিরা শিক্ষিতা। আর সবচেয়ে যা মজবুত তা হচ্ছে এই শিক্ষার আভি-জাত্য। কিন্তু যাই বলো, সব কথার শেষ কথা হচ্ছে মেয়েটা ধনী। ধনে-জনেই রুচিরা মনোহারিকা।

জলসার সাফল্যে জগৎপতির বুক-কাঁধ আরো চওড়া হয়ে উঠল। কিন্তু এণাক্ষীর সব মামুলি কথা। সে উঠল ঝাপটা মেরে: 'কিন্তু মেয়েটাকে তো শুধু নাচালে চলবে না, বিয়ে দিতে হবে তো!'

'এইবার নূপুরের আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ল, এইবার আসবে সব যোগ্য পাত্রের আবেদন।'

'সে সব দরখাস্ত তুমিই যাচাই করবে নাকি?' এণাক্ষী কটাক্ষ হানল।

'প্রথম স্ক্রুটিনিটা আমি করে দিলেই কি ভালো হয় না? পরে ইন্টারভিউ করে শেষ বাছাই মেয়ে করে নেবে।'

'তার মানে তুমি তোমার ইচ্ছামত পাত্র ধরে আনবে আর তারা মেয়ে দেখে পছন্দ করলে তাদের ভেতর থেকে মেয়ে এক-জনকে চরম বেছে নেবে বলতে চাও?' এণাক্ষীকে প্রায় ক্রুদ্ধ শোনাল।

'আমি বুঝি অমনি করে বললাম?'

জগৎপতি তাঁর বক্তব্যটা বিশদ করলেন। মেয়ে নিজেই যদি তার বর নির্বাচন করে জগৎপতি তাতে বাধা দেবেন না, বাধা দেবার তাঁর অধিকারই বা কী। কিন্তু তার নির্বাচনটা সুষ্ঠু হয় এটুকু তো তিনি দেখতে পারেন। বা, তার নির্বাচনে মতামত দিতে গেলে তো সে সেই তার স্বাধীনতাতেই হাত দেওয়া হল। কিন্তু, প্রশ্ন এই, তার সেই নির্বাচনের ক্ষেত্রটা কতটুকু? ক্ষেত্রটা নিতান্ত সংকীর্ণ বলে মেয়েরা সাধারণত কী করে? যাকে হাতের কাছে পায় তাকেই ধরে বসে। তাই কখনো-কখনো পরিবারের মধ্যেই প্রেম ঘটায়। আমার বক্তব্য হচ্ছে মেয়েদের নির্বাচনের ক্ষেত্রটা বড় করে দেওয়া উচিত, বাজারটা বড় হলেই জিনিসটা ভালো পাবার সম্ভাবনা। তাই ভাবছি কি, বাড়িতে এবার গণ্য-মান্যদের যোগ্য-ভোগ্যদের ডেকে আনি, রুচিরার জন্যে বাজার বড় করি।

এটা মন্দ কী, সায় দিতে এণাক্ষীর বেগ পেতে হল না।

'অসম্ভব'। বিয়ের ইঙ্গিতও রুচিরা কাছে ঘেঁসতে দেয় না। বলে, 'আমার অনেক কাজ।'

শুভময়কে গিয়ে বললে, 'দেখুন আমাদের সমিতির দুটো দিক আছে, একটা কালচারাল আরেকটা সোশ্যাল। এ পর্যন্ত আমরা আগেরটার উপরেই বেশি জোর দিয়েছি, কিন্তু আমার মনে হয়—'

'আপনার ঠিকই মনে হয়, সোশ্যাল-টাই বেশি জরুরি।'

'চলুন না। বস্তিতে-কলোনিতে যাই, ওদের কী গ্রিভ্যান্স তার খোঁজ নিই।'

'ওদের অনন্ত গ্রিভ্যান্স, খোঁজ নিয়ে শেষ করতে পারবেন না,' হাসল শুভময়, 'তার চেয়ে আমরা বরং আমাদের শক্তির খোঁজ নিতে পারি। মানে, আমরা কতদূর কী ক্ষমতা রাখি তার খোঁজ।'

'আমরা স্কুল খুলতে পারি।'

'ঠিক বলেছেন। নাইট স্কুল তো আমাদের প্রেসিডেন্টের পেট প্রোজেক্ট।'

'হাঁ, আমি যা বুঝি, একমাত্র শিক্ষার অভাবই আমাদের সমস্ত ব্যাধির মূল। শিক্ষার অভাবের জন্যেই আমাদের অস্বাস্থ্য, দারিদ্র্য, অধর্ম—'

'সব কিছু।' অসহিষ্ণু হয়ে শুভময় বললে, 'তাহলে শিগগির একদিন কমিটির মিটিং ডাকি।'

'এর আবার মিটিং কী!' রুচিরাও কম অসহিষ্ণু নয়। 'এ সবচেয়ে সোজা কাজ। যে কেউ ইচ্ছে করলে যাকে খুশি এক নিরক্ষরকে আলোকিত করে তুলতে পারে।'

'তবু সমিতির বিধি-পদ্ধতি মেনে চলতে হবে। তা, কমিটিতে ওটা পাশ করে নিতে কতক্ষণ।'

সেই সম্পর্কেই শুভময় জগৎপতির কাছে এসেছে।

"আমি একটা খুব বড় কেস নিয়ে মফস্বলে যাচ্ছি। ফিরতে কদিন দেরি হতে পারে।' জগৎপতি আশ্বাসের সুরে বললেন, 'তা আমি না থাকি, আমাকে বাদ দিয়েই করে নিয়ো। স্কিম তো খুব চমৎকার। কী নাজানি কথাটা? লোক-কল্যাণকর।'

'না, না, আপনি আসুন—'

চলে যাচ্ছিল শুভময়, জগৎপতি ডাকলেন। বললেন, 'আচ্ছা, ধরো, নেক্সট ইলেকশানে পার্টি তোমাকে টিকেট দিল না, অন্য লোককে দিল, তা হলে তুমি কী করবে?'

'যা যতক্ষণ পার্টিতে আছি ততক্ষণ পার্টির ম্যাণ্ডেট মানব, ভাঙব না তার ডিসিপ্লিন।' খোলা বুকে বীরের মত বললে শুভময়।

'যে টিকিট পাবে তার জন্যে খাটবে তুমি ইলেকশানে?'

'আপ্রাণ খাটব। বিনয়দার জন্যে খাটিনি? তবে এবার বুদ্ধিমান হব। আগে সাব-কন্ট্র্যাক্ট দাও, পরে অন্য কথা।'

'এম-এল-এ হবার আগেই কন্ট্র্যাক্ট দেবে কী করে?'

'তা হলে নগদ বের করো। তেল মাখবার আগে কড়ি ফেল।'

'তা বলতে পারো।'

'শুধু সিঙাড়া খেয়ে শ্লোগান দিতে পারব না।'

'তা বিনয়বাবুর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি তোমাদের সমিতিকে খুব সুখ্যাতি করলেন। বললেন সবুর করতে। সময়মত গ্রাণ্ট-ট্রাণ্ট পাইয়ে দেবেন অনেক কিছু।'

'তা হলেই হল।' প্রশস্ত বুকে ভরে নিশ্বাস নিল শুভময়: 'আমি আমার নিজের জন্যে কিছু চাই না। সমিতি যদি পায়, তাহলে আমিই পেলাম। সমিতি বড় হলেই আমার বড় হওয়া।'

৫

সকাল থেকেই তেতলায় ঠুকঠাক শব্দ হচ্ছে। কখনো হঠাৎ দুদ্দার শব্দ।

'কী ব্যাপার?' রুচিরার দিকে তাকাল এণাক্ষী।

'কিছু একটা মেরামত হচ্ছে মনে হচ্ছে—' রুচিরারও স্বস্তি নেই।

ক্রমশই বাড়ছে সে শব্দ। হঠাৎ কড়-গুলি ইট খসে পড়ল নিচে। মনে হল তেতলার ছাদের দেয়াল ভাঙা হচ্ছে।

'একবার দেখে আসবি?'

'সজ্জন সিং বাড়িতে আছে কিনা ঠিক কী।'

এণাক্ষী নিজেই আবার বারণ করল। বললে, 'কী জানি কী, মিলিটারির কাণ্ড, মাথামুণ্ডু কিছু বোঝা যায় না। থাক, গিয়ে কাজ নেই।'

বারণ সহ্য করতে পারে না রুচিরা। আর এ বুঝি তার ভীরুতা তার অপটুতার উপর কটাক্ষ।

সটান উঠে গেল রুচিরা।

সিঁড়ির প্রান্তে দেখতে পেল সজ্জনকে। রুক্ষ মুখে স্পষ্ট ইংরিজিতে জিগগেস করল: 'এসব কী হচ্ছে?'

সজ্জন সিং বুঝতে পেরেছে অভিযোক্তা কে। কথার সে কোনো উত্তর দিল না। চেষ্টারও ধার দিয়ে গেল না। বরং পিছন ফিরে ঘুরে দাঁড়িয়ে সে তার ইঞ্জিনিয়রের সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগল।

এ কী অসৌজন্য! আরো দুধাপ উপরে উঠল রুচিরা। স্বর আরো একটু চড়া করে বললে, 'জানতে পারি কি কেন এত গোলমাল হচ্ছে? কেন এত সব ভাঙাচোরা?'

'এসব জেনে আপনার কাজ নেই।' শুধু ঘাড় ফিরিয়ে প্রশ্নের জবাব দিল সজ্জন।

'নিশ্চয়ই আছে। যেহেতু আমরা এ বাড়ির মালিক। আপনাকে তেতলায় শুধু থাকতে দেওয়া হয়েছে। ছাদ-দেয়াল ভেঙে ফেলতে দেওয়া হয়নি।'

'সে আমি বুঝব, আমার ডিপার্টমেন্ট বুঝবে।' দস্তুরমত সিঁড়ির দিকে চাক্ষুষ ইশারা করল সজ্জন: 'আপনি এখানে নাক ঢোকাতে আসবেন না। নিজের চরকায় তেল দিন গে যান।'

'না, বিনা অধিকারে আমার বাড়ির কী ক্ষতিসাধন করছেন তা আমাকে দেখতে হবে স্বচক্ষে।' রুচিরার ভঙ্গিও কম জঙ্গী নয়।

'আপনারই অধিকার নেই বিনানুমতিতে আমার ফ্ল্যাটে ঢোকবার—' উদ্যত বাধার মত দরজা জুড়ে দাঁড়াল সজ্জন সিং।

'এ কী, ওপাশের জানলাটাই আপনি লোপাট করে দিয়েছেন।' শেষ পর্যন্ত না উঠে এখান থেকেই নজর করতে পেরেছে রুচিরা। 'এ সবের মানে কী? হচ্ছে কী এ সব?'

এবার ইঞ্জিনিয়র সাহেব দয়া করলেন। বললেন, 'তেতলাটা এয়ারকণ্ডিশানড হচ্ছে। তারই জন্যে হচ্ছে খানিক রদবদল।'

'এয়ারকণ্ডিশানড হচ্ছে, তার জন্যে বাড়িওলার অনুমতি নিয়েছেন?'

ইঞ্জিনিয়র বললেন, 'তার আমি কী জানি?'

'আপনাকে জিগগেস করা হয়নি। যে এ বাড়ির টেনেণ্ট তাকে জিগগেস করা হয়েছে।'

'আর সেই টেনেণ্ট জবাবদিহি করবে আপনার কাছে নয়, আপনার বাবার কাছে যিনি এ বাড়ির আসল মালিক, যিনিই আমাকে বসিয়েছেন ভাড়াটে।' কোমরে হাত রেখে রুখে দাঁড়াল সজ্জন।

'বাবা এখন বাড়ি নেই। তাঁর অনুপস্থিতিতে আমিই তাঁর প্রতিনিধি।'

'যান-যান। তিনি মরে গেলে আসবেন।' বিদ্রূপে ঝিলকিয়ে উঠল সজ্জন। 'যতদিন তিনি বেঁচে আছেন আপনি কেউ নন, কিছু নন।'

'আমি যতদিন বেঁচে আছি, আমিই সমস্ত। সহ্য করব না আপনার ঔদ্ধত্য।'

'যা করতে পারেন করুন।' পিছন ফিরে সজ্জন আবার ইঞ্জিনিয়রকে নিয়ে পড়ল।

এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থেকে নিচে নেমে গেল রুচিরা। এণাক্ষীকে একবার জিগগেস করল, তেতলার কোনো ঘর এয়ারকণ্ডিশানড করার অনুমতি বাবা দিয়ে গিয়েছেন কিনা। কখনো না। তা হলেই হল। একেবারে নিচে নেমে গেল রুচিরা। আর খানিকটা পথ পায়ে হেঁটে একেবারে তরুণ সমিতিতে।

সমিতির তদারকিতে সকালেও একবার হাজিরা দেয় শুভময়, সাঙ্গ-পাঙ্গরাও কেউ-কেউ থাকে, সহসা সেখানে এসে দাঁড়াল রুচিরা। রুক্ষ, দীপ্ত, অবিনাস্ত।

'শুনুন। একবারটি বাইরে আসুন।' রুচিরা অন্তরঙ্গের মত ডাকল।

যদিও জানে কাকে ডাকছে তবু শুভময় নিজের বুকের উপর আঙুল রাখল: 'আমাকে বলছেন?'

'আর কাকে?'

হ্যাঁ, আমি ছাড়া আর কে আছে বিশ্বভুবনে, বীরত্বের এমনি ভঙ্গি করে রাস্তায় বেরিয়ে এল শুভময়।

সমস্ত বললে রুচিরা। এর প্রতিবিধান কী?

মালিক-শ্রমিক বিরোধে সমিতি চিরদিন শ্রমিকের পক্ষে লড়েছে। মহাজন খাতকের সংঘর্ষে খাতকের পক্ষে। তেমনি বাড়িওলা-ভাড়াটের ঝগড়ায় ভাড়াটের পক্ষে। কোন দিকে ন্যায় বা সত্য তার মধ্যে যায়নি, শুধু পক্ষ দেখেছে।

এবারও পক্ষ দেখল।

বাড়িওলা এ প্রশ্ন আর উঠল না।

রুচিরা। রুচিরাই সমিতি।

'চলুন। কী স্পর্ধা! ভদ্রমহিলাকে অপমান করে।'

এক বাক্যে এত ক্ষেপে উঠবে ভাবতেও পারেনি রুচিরা। যেন খোলা তলোয়ারের ডগার উপর লাফিয়ে পড়তে ছুটেছে শুভময়। নিরস্ত করবার দুর্বল চেষ্টা করল রুচিরা। বললে, 'থানায় খবর দিলে কেমন হয়?'

'থানার রাস্তা তো জানা নেই।' অস্পষ্ট একটু হাসল শুভময়: 'আইনের বাহুর চেয়ে নিজের বাহুকেই চিরদিন দীর্ঘ ও বলবান মনে করে এসেছি।' বলে সে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল তেতলায়।

দোতলা পর্যন্ত এগিয়ে দিল রুচিরা, বাকিটা শুভময় তাকে উঠতে দিল না। বললে, 'আপনি আপনার জায়গায় থাকুন, একা আমি যাচ্ছি। এখানে যুগ্ম হয়ে লাভ নেই। এখানে একা এক পায়েয় থাকাই ভালো।'

বাকি সিঁড়িটা প্রায় একলাফে উঠে গেল শুভময়। দেখল দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

তবু, ছেড়ে দেবার মতন ব্যাপার নয়। সাধারণ ভাড়াটে-বাড়িওলার ঝগড়া নয়, এখানে এক বাঙালি তরুণীকে অপমান করা হয়েছে। আর সে তরুণী যে-সে নয়। সমিতির অন্যতর সম্পাদিকা। তার মানেই সমিতির অপমান। আর শুভময় যখন সহকারী তখন তারও।

দ্রুত ও দুর্বিনীত কড়া নাড়তে লাগল শুভময়।

সজ্জন সিং গ্রাহ্যও করল না।

'কাওয়ার্ড'। শুভময় গর্জন করে উঠল।

আর যায় কোথা! যেন ঝড়ের ধাক্কায় দরজা খুলে গেল। 'হোয়াট ডু ইউ মিন?' হুমকে উঠল সজ্জন সিং: 'তুমি কে?'

'আমি যেই হই না কেন, তুমি কোন সাহসে বাঙালি ভদ্রমহিলাকে অপমান করো?'

'বেশ করি। তাতে তোমার কী! তুমি বলবার কে? তুমি এ বাড়ির কেউ নও। তুমি একটা রাস্তার লোক।'

'রাস্তার লোক? বেশ, নেমে এস রাস্তায়।'

'তাই, যাও, নামো গে। অন্তত যেখানে দাঁড়িয়ে আছ, দোতলা-তেতলার এই সিঁড়ি—এ আমার টেনান্সির মধ্যে। সুতরাং তুমি একটা ট্রেসপাসার। গুলি করে তোমাকে আমি শেষ করে দিতে

পারি।' বলতে-বলতে প্রবল আক্রোশে দরজা আবার বন্ধ করে দিল সজ্জন।

'বার করছি তোমার গুলি-করা।' রাগে গরগর করতে করতে নেমে গেল শুভময়।

দোতলা থেকে যখন একতলায় নামছে তখন রুচিরা চাইল তার পিছু নিতে।

এণাক্ষী মুখিয়ে উঠল : 'তুই কোথায় যাচ্ছিস?'

'যা, দেখি কী হয়।' ছটফট করে উঠল রুচিরা।

'এখন ঝগড়া তো ওদের দুজনের! ওদের মধ্যে তোর এখন গিয়ে পড়বার কী হয়েছে! শোন, যাসনে—'

'কী আশ্চর্য, আমাকে নিয়েই তো ঝগড়া! আগুনে লাগিয়ে দিয়ে আমি সরে রইলাম এটা কেমন কথা!' কথা শুনল না রুচিরা, নিচে নেমে গেল।

উত্তেজনায় আরো বুঝি ইন্ধন পড়ল। শুভময় বললে, 'বলে কিনা গুলি করবে। তার আগেই ঢিলিয়ে টিট করে দেব বাছাধনকে।'

বলতে-বলতেই দলের কটা ছোকরা তেতলার বারান্দা তাক করে ঢিল ছুঁড়তে লাগল। সে বারান্দাতেই তখন দাঁড়িয়েছিল সজ্জন আর ইঞ্জিনিয়র। একটা ঢিল তো ইঞ্জিনিয়রের টুপির উপর পড়ল, আরেকটা সজ্জনের কান ঘেঁষে দেয়ালের গায়ে। আর কটা এখানে-ওখানে জানলা-দরজায়।

তবে রে—একেবারে একটা বন্দুক নিয়ে নিচে ছুটে এল সজ্জন। ঢিলযুদ্ধের কে সেনাপতি আন্দাজ করতে তার দেরি হল না। 'কই সেই স্কাউণ্ড্রেলটা কোথায়?' মুখে এই সিংহনাদ। 'কই সেই রিংলিডার?'

এদিক-ওদিক খুঁজতে হল না, সামনেই দাঁড়িয়ে আছে শুভময়। যেমন বুকখোলা তেমনি। বললে, 'মারবে তো মারো। আমি তোমার মত কাওয়ার্ড নই। লক্ষ্যহীন ঢিলের উত্তরে প্রত্যক্ষ বন্দুক নিয়ে আসি না—'

চোখের পলকপাতে কী যা জানি কাণ্ড ঘটে যাবে মুহূর্তে, চূড়ান্ত উত্তেজনায় দিশেহারার মত রুচিরা হঠাৎ শুভময়কে আড়াল করে দাঁড়াল। সজ্জনের বুঝি আর গুলি ছোঁড়া হল না। দ্বিধায় এক মুহূর্তে দুলে-যাওয়া অর্থই পাহাড়ের চূড়ার শেষ ও শাণিত বিন্দু থেকে স্খলিত হয়ে পড়ে যাওয়া মাটিতে।

প্রায় একেবারে রাস্তায় নেমে এসেছিল সজ্জন, কিন্তু গুলি যখন ছোঁড়া হল না তখন আর দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ নয়। চারদিক লোক ছুটে আসছে ধর-ধর মার-মার করতে-করতে, এখুনি মত্ত জনতা ঝাঁপিয়ে পড়বে সজ্জনের উপর আর বন্দুকটাকে কেড়ে নিয়ে লগুড় করে তুলবে। সুতরাং সাহসের আসলই হচ্ছে বৈচক্ষণ্য, এ সনাতন মন্ত্র বিবেচনা করে যেমন এসেছিল তেমনি পালিয়ে গেল সজ্জন। ফ্ল্যাটে ঢুকে সিঁড়ির দরজা সবলে বন্ধ করে দিল।

জনতার তখন মহাস্ফূর্তি। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে হৈ-হল্লা করতে তখন অনেক সুবিধে।

মুহূর্তে, চূড়ান্ত উত্তেজনায় দিশেহারার মত রুচিরা হঠাৎ শুভময়কে আড়াল করে দাঁড়াল।
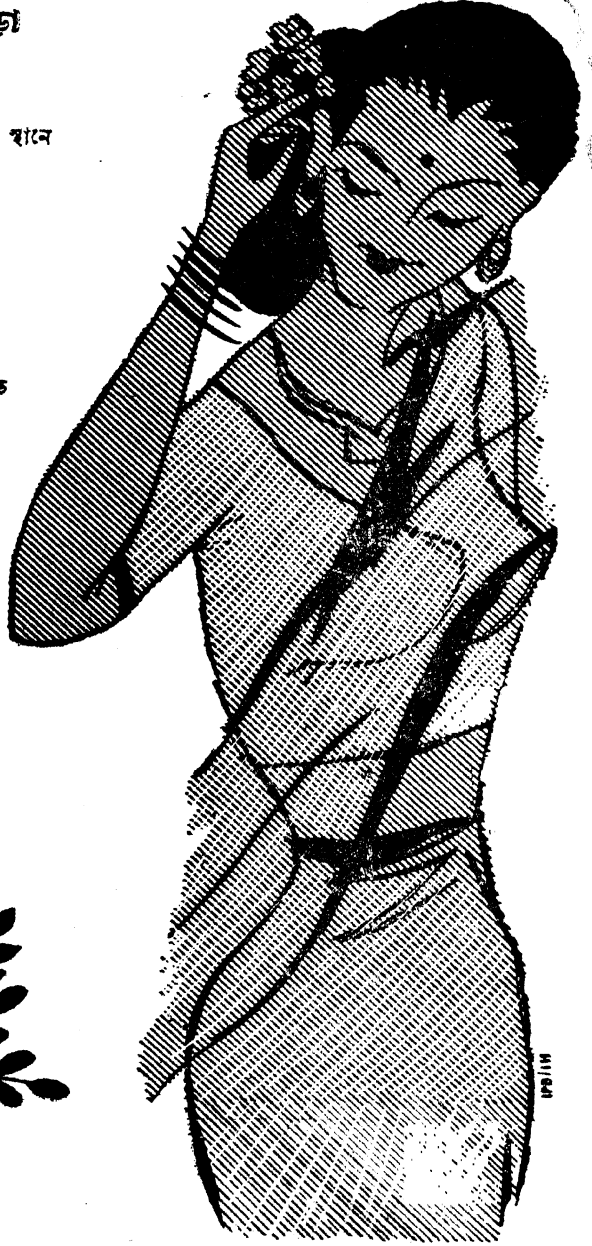
বেরিয়ে এস। খালি হাতে বেরিয়ে এস। দেখি তোমার কেমন মুরোদ, কতটা আস্ফালন।

জিরো-তে ডায়াল করল এণাক্ষী।

পুলিশের গাড়ি এসে গেল। শুভময় আর সজ্জনকে নিয়ে গেল থানায়। রুচিরাকে লক্ষ্য করে বলে গেল, আপনিও প্রস্তুত থাকুন।

পরদিন এসে পড়লেন জগৎপতি। ব্যাপারটা জেনে প্রথমেই তাঁর মনে প্রশ্ন জাগল এটা তাঁর ইলেকশানের কাজে লাগবে কিনা। একবার মনে হল লাগবে, আরেকবার ভাবলেন লাগবে না। আর যাই হোক, এতদূর গড়াতে দেওয়ার দরকার ছিল কী?

'খুব নাটক শিখেছিস, না?' ভয়-উদ্বেগে জর্জর, এণাক্ষী সরাসরি রুখে উঠল: 'অমন করে পোজ দিয়ে দাঁড়াবার কী হয়েছিল?'

'মানে?' দারুণ বিরক্ত হল রুচিরা: 'তুমি কোত্থেকে দেখলে?'

'জানলায় দাঁড়িয়ে দেখলাম। আমার বুক কাঁপছে, হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। জানো, দেখলাম,' এবার স্বামীর দিকে তাকাল এণাক্ষী: 'উনি একেবারে দেয়াল হয়ে আড়াল করে দাঁড়ালেন। ভাবখানা এই, গুলি করতে হলে আমাকে করো। কী নাটক! কী নাটক!'

'যে আমার জন্যে বিপন্ন হয়েছে তাকে আমি রক্ষা করবার চেষ্টা করব না?'

'তারই জন্যে তুই ও লোকটার অমন গা ঘেঁষে দাঁড়াবি?' এণাক্ষীর জিভ প্রায় লকলক করে উঠল।

'গা ঘেঁষে দাঁড়ালে কী হয়?' রুচিরাও কম জ্বলে উঠল না: 'কাছাকাছি হয়ে না দাঁড়ালে ওকে আড়াল করা যায় কী করে?'

'কিন্তু যদি, মা, ছুঁড়ে দিত গুলি?' জগৎপতি মন-মেজাজ ঠাণ্ডা রাখলেন।

'কই দিল না তো! আমাকে দেখেই তো ভড়কে গেল।'

'কী দরকার ছিল ভড়কিয়ে দেবার! ছুঁড়লে ছুঁড়ত গুলি! যে মরবার মরে যেত।' এণাক্ষী উঠল আবার ফোঁস করে।

'মরে যেত!' রুষ্ট রেখায় হাসল রুচিরা।

'কত লোকই তো পথে-ঘাটে মরছে এমন য়্যাকসিডেন্টে। হঠকারীরা অমনি মরেই থাকে। তাছাড়া ও তো গুলি খাবার জন্যে বুকের জামা খুলেই রেখেছে।' সারা শরীরে রি-রি করছে এণাক্ষী।

এতটা স্পষ্টাস্পষ্টি জগৎপতির পছন্দ হল না। তাঁর কৌশল হচ্ছে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার কৌশল। দেখাবেন শাক খাবেন মাছ। খাবেন পটল বলবেন উচ্ছে। তাই বললেন, 'অমন করে বলছ কেন? শুভময়ের দোষ কী! শুভময় তো মহৎ কাজই করেছে। বিপন্ন যদি সাহায্য চায় ও সাধ্যমত দেবে না সাহায্য? কিন্তু আমি বলছিলাম—' মেয়ের দিকে তাকালেন জগৎপতি।

'কী?' রুচিরাও তাকাল স্থির চোখে।

'আমি বলছিলাম, তরুণ সমিতি পর্যন্ত যাওয়ার কী দরকার ছিল? আমি এলেই তো ফয়সালা হতে পারত। বিনানুমতিতে ঘরদোর রদবদল করছে, ওদের ডিপার্টমেন্টে নালিশ করলেই তো শায়েস্তা হত। নয় তো আদালতে যেতাম।' গলার স্বর এতটুকু কাঁপল না জগৎপতির: 'মিছিমিছি বাইরের লোককে এ ঘরের ব্যাপারে টেনে আনতে গেলে কেন?'

'মিছিমিছি বলছ বাবা?' রুচিরার স্বরে একটু বুঝি অভিমানের টান লাগল: 'একটা অত্যাচারী যদি পীড়ন করে অপমান করে তাহলেও প্রতিকারের আশায় যেতে পারি না বাইরে?'

'কী দরকার! এ তো তেমন কিছু গুরুতর নয়! যদি চাও তো থানায় ফোন করো।'

'যেমন আমি করেছিলাম।' গর্বের ঢেউ তুলল এণাক্ষী।

'যদি হাতের কাছে সাহায্য থাকে, তবুও?'

'হ্যাঁ, তবুও।' এণাক্ষীই খেই ধরল: 'সব কিছুরই একটা শ্রী আছে, রীতি-নীতি আছে। নাটুকেপনাটা ভালো নয়। ভাগ্যিস কারু হাতে তখন ক্যামেরা ছিল না। একটা কেউ ফ্ল্যাশ তুলে নিলেই কেলেঙ্কারি।'

'আহা, অমন করে বলছ কেন?' জগৎপতি আবার শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চাইলেন।

'এই যে আপনি এসে পড়েছেন—' 'সিঁড়ি দিয়ে সটান উপরে উঠতে লাগল শুভময়: 'এ দিকে কী মজা হয়েছে শুনুন।'

কার অনুমতি নিয়ে উঠছে? বিস্ময়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকাল এণাক্ষী। যেন কোন যুদ্ধ জয় করেছে এমনি গর্বে সিঁড়ি কাঁপিয়ে উঠে আসছে উপরে। 'উপরে কেন?' এণাক্ষী নিজেকে আর সম্বরণ করতে পারল না। প্রায় দাঁতে-দাঁত লাগিয়ে রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল: 'নিচে নিয়ে যাও। এখানে নয়। এখানে কী?'

কথাটা কানে গেল নাকি শুভময়ের? দরজার সামনে দাঁড়াল এক সেকেন্ড। বললে, 'ভিতরে আসতে পারি?'

'আরে এস এস, তুমি হলে ঘরের লোক, আসবে বৈকি।' জগৎপতি উদার আনন্দে অভ্যর্থনা করলেন: 'তুমি ছিলে বলেই কত বড় বিপদ থেকে এঁরা সবাই বেঁচে গেল সেদিন—'

'এখন সজ্জন সিং বলে কী জানেন?' শুভময় হাসতে লাগল: 'বলে, বন্দুক গুলি ছিল না। শুধু ফাঁকা ভয় দেখাবার জন্যেই বন্দুক তাক করেছিল। কিন্তু বন্দুকে গুলি আছে কি না আছে এ কে হিসেব করবে? যে বন্দুকের সামনে বুক দিয়ে দাঁড়াবে, নিশ্চয়ই সে নয়। তার দাঁড়ানোটাই মহৎ, এক কথায় অপূর্ব।' তন্ময় চোখে রুচিরার দিকে তাকাল শুভময়: 'আমি বাঁচিয়েছি কী বলছেন? বাঁচিয়েছেন উনি। শুধু আমাকে নয় সমস্ত তরুণ সমিতিকে। এ যুগের তারুণ্যকে—'

নিচে নামবার উদ্যোগ দেখালেন জগৎপতি। বললেন, 'পুলিশ কোনো কেস-টেস করবে নাকি?'

'চলুন, বলছি।' হাতের এক ঝাপটায় বাজে কথা সব সরিয়ে দিতে চাইল শুভময়। বললে, 'আমরা ঠিক করেছি সমিতির পক্ষ থেকে রুচিরা-দেবীকে সম্বর্ধনা দেব।'

'আমাকে ছাড়া কী করে ঠিক হয়?' হাসি-হাসি মুখ করল রুচিরা।

'আপনার একটা ভোট না হয় বিপক্ষে যাবে, কিন্তু এদিকে আর সবাই হাত তুলে দিয়েছে, আওয়াজ তুলে দিয়েছে—'

'সামান্য কী একটু সাহস দেখিয়েছে, তার আবার সম্বর্ধনা কী!' সহজ গলায় দিব্যি বলতে পারল এণাক্ষী।

'সে পরের কথা পরে দেখা যাবে। এখন চলো নিচে চলো, সজ্জন সিংকে ডাকাই—' শুভময়কে জগৎপতি নিচে নামিয়ে নিলেন।

সজ্জন সিংকে ডাকতে হল না। আর কোনো দিন না। সজ্জন সিং ভেগেছে, ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়েছে। ডিপার্ট-মেন্ট তার আচরণ সমর্থন করতে পারে নি। সজ্জন সিং-এর বদলি আর কোনো ভাড়াটেও পাঠায় নি। প্রজা-স্বত্বই ইস্তফা দিল ডিপার্টমেন্ট। এই লোকালয়ে কাজ নেই ভাড়াটে হয়ে।

'বুঝলেন ঢিলের কাছে গুলি হেরে গেল।' বাহাদুরের মত বললে এসে শুভময়।

'কিন্তু মাস-মাস পাঁচশো টাকার ক্ষতি।' পারিবারিক নিভৃতিতে শোক।

'মিলিটারির সঙ্গে লড়াই করে তো ভারী হল।' মেয়ের দিকে ক্রুদ্ধ কটাক্ষ করলেন এণাক্ষী : 'সলিড একটা ভাড়াটে উৎখাত হল।'

'ভাড়াটের জন্যে ভাবনা!' ঠোঁট ওলটালো রুচিরা।

'তা হলেও, মাথার উপরে মিলিটারি থাকা, কত বড় প্রেস্টিজ একটা।' এণাক্ষী নড়ে-চড়ে বসল।

প্রকাশ্যে এতটা যেন হজম হচ্ছিল না জগৎপতির। মা-মেয়ের মধ্যে মীমাংসার সুরে বললেন, 'তা নয়, কিন্তু শাঁসালো অথচ ভালো ভাড়াটে পাওয়া দুর্ঘট।'

'আমি বলছি কি বাবা, তেতলাটা আর ভাড়া দিয়ে কাজ নেই।' একটু আবদারের টান আনল রুচিরা।

'সে কী?'

'ওটা তুমি আমাকে ছেড়ে দাও।' দুই চোখে আনন্দ নিয়ে এল রুচিরা : 'ওটাতে আমি একটা ইস্কুল করি।'

'ইস্কুল?' এবার চমকালেন জগৎপতি।

'হ্যাঁ, বয়স্কদের না হয়, শিশুদের ইস্কুল।' আনন্দের সঙ্গে স্বপ্ন এনে মেশাল রুচিরা : 'বস্তির ছেলে-মেয়ে, গরিব ছেলে-মেয়ে জড়ো করে এনে পড়াই! আমাদের বাড়িতেই একটা নাইট-ইস্কুল করি। তুমি তো কত নাইট-ইস্কুলের ভক্ত!'

'ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েদের নাইট-স্কুল কী!'

'বেশ তো ডে-ইস্কুলই না হয় করব। কত বড় কাজ বাবা। আমাকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যাও, এ কত বড় প্রার্থনা!'

'তেতলায় ইস্কুল কী!' এবার এণাক্ষী রব তুলল। 'যত রাজ্যের নোংরা ছেলে-মেয়ে এসে বাড়ি ঘরদোর একটা জঘন্য খাটাল করে তুলবে এ আমার সহ্য হবে না।'

'বা, তা হতে দেব কেন? ওরা আসুক না তেতলায়। ওরা বুঝুক ওরাও এক উঁচুতে উঠতে পারে। উঠেও পেতে পারে মানুষের মমতা—বাবা—' জগৎপতির কাছে দু' পা বুঝি এগিয়ে এল রুচিরা।

'তুমি ইস্কুল করতে চাও একটা নার্সারি খোলো, কে-জি ক্লাশ চালাও।' গম্ভীর হলেন জগৎপতি : 'এটাই তো আজকাল খুব চলছে, খুব ফ্যাসানেবল হয়েছে।'

'বেশ, তাই খুলি।' মরীয়ার মত জ্বলে উঠল রুচিরা, 'কিছু একটা করি।'

'তার জন্যে তোমাকে আলাদা ঘর নিতে হবে, পাঁচশো টাকার আয় তো আর ফেলে দিতে পারি না।'

'তোমার আর টাকা দিয়ে কী হবে বাবা?'

'টাকা দিয়ে আর কী হয়?' হেসে উঠলেন জগৎপতি : 'কিছু হয় না। টাকা দিয়ে শুধু স্কুল হয়।'

ভাড়াটে শুভময়ই জোগাড় করে আনল। উঁচু দাঁড়ের এক মাদ্রাজী অফিসর।

'মাদ্রাজি-পাঞ্জাবি ছাড়া আজকাল আর বড় অফিসর কই?' দুঃখের সঙ্গে অলক্ষ্যে যেন একটু তৃপ্তির আভাস দিলেন জগৎপতি : 'শুধু অফিসরই বড় নয়, টেনান্টও ভালো। তা পাঁচশো দিতেই রাজি তো?'

'সাড়ে পাঁচশো।' বিজয়ীর মত ভঙ্গি করল শুভময়।

'পঞ্চাশ টাকা বেশি?' সে যেন কত বেশি এমনি বেশি-বেশি খুশি হল এণাক্ষী।

'তা ছাড়া—' জগৎপতির কানে-কানে বলার মত ভঙ্গি করে অথচ সবাইকে শুনিয়ে শুভময় বললে, 'সেলামিও দেবে বলেছে।'

'দেবে?' দরকার হলে সপ্রশংস দৃষ্টিতে বন্দনা করতেও পারে এণাক্ষী। 'যা হোক তুমি বেশ কাজের ছেলে।'

সন্ধ্যায় সমিতির ঘর থেকে টেনে শুভময়কে বাইরে নিয়ে এল রুচিরা।

'এটা আপনি কী করলেন?'

'কী করলাম!' প্রায় আকাশ থেকে পড়ল শুভময়।

'আপনি সেক্রেটারি হয়ে সমিতির নিয়মকে অমান্য করলেন?'

তবু যেন সোজা হচ্ছে না বিষয়টা শুভময় এমনি মুখ করল।

'সমিতির নিয়ম হচ্ছে বাঙালি হয়ে বাঙালি ছাড়া অন্য কাউকে বাড়ি ভাড়া না দেওয়া। আপনি এক মাদ্রাজি জোগাড় করে আনলেন?'

'ভাড়া না দেওয়া মানে পারতপক্ষে না দেওয়া।' শুভময় হাসবার চেষ্টা করল : 'নিয়মের মধ্যে একটা 'পারত-পক্ষে' আছে।'

'তা বাঙালির জন্যে চেষ্টা করে-ছিলেন?'

'চেষ্টা করতে গেলেই দেরি হয়ে যেত। আর যত দেরি তত ক্ষতি।'

'কার ক্ষতি?' ঝলসে উঠল রুচিরা।

'কার আবার! আপনাদের।'

'কিন্তু সেলামি পাইয়ে দিলেন কী বলে? সমিতির জন্যে নকুলবাবুর থেকে দোতলাটা ভাড়া নেবার সময় সেলামির বিরুদ্ধে তো কত আন্দোলন করলেন—'

'বা, সে তো সমিতির জন্যে। একটা সৎ সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্যে। আর এ তো উড়ে এসে জুড়ে-বসা বিদেশী ভাড়াটে, একে শুষতে আপত্তি কী!'

'আপনার কোনো নীতিজ্ঞান নেই।'

'নীতি!' তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে হাসল শুভময়। 'সংসারে একটা মাত্র নীতি আছে, সে হচ্ছে আত্মপ্রতিষ্ঠা। আরো একটু বাড়িয়ে বলতে পারেন, আত্মবিস্তার।'

'ও বাড়ির জন্যে সেলামি পাইয়ে দিলে আপনার প্রতিষ্ঠা হয় কোন হিসেবে?' এবার যেন বিদ্রুপের খোঁচা মারল রুচিরা।

'এখানে আত্ম ইনক্লুডস আত্মীয়। আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্থ—একটু বাড়িয়ে বলতে গেলে—আত্মীয় প্রতিষ্ঠা।'

'ও বাড়ি আপনার আত্মীয় হল কী করে?' এবারের খোঁচা যেন উপর-উপর নয়।

'ও বাড়ি মানে, আপনারা। তার মানে আপনাদের স্বার্থে—আপনারা যখন সমিতির লোক—শুধু আপনাদের জন্যে। এও বোধ হয় বাড়িয়ে বললাম।' রুচিরার চোখের মধ্যে চোখ রাখল শুভময় : 'কিছু মনে করবেন না, সত্য করে বলি, শুধু আপনার জন্যে।'

যা ভেবেছিল তা নয়, অন্য রকম মনে করল রুচিরা। বললে, 'না, না, আমি কেউ নই, আমি ও বাড়ির কেউ নই।'

'সে কি?' ও বাড়িঘর সব তো একদিন আপনার হবে।'

'আমার সেই সুদূর স্বার্থের কথা ভাবলেন বুঝি?' রুচিরার চোখে আবার সেই বিদ্রুপের ঝিলিক : 'সেই ধরা-ছোঁয়ার বাইরে অস্পষ্ট ভবিষ্যতের কথা? কিন্তু বর্তমানে—বর্তমানে আমার কী স্বার্থ? বর্তমানে আমার কী আছে? কিছু নেই। কিছু নেই।'

'কিছু নেই?'

'না। আসল যে জিনিস সেই স্বাধীনতাই নেই।'

'আপনার স্বাধীনতা নেই? আপনি বড়লোকের মেয়ে—'

'গালাগাল দিচ্ছেন নাকি?' চলতে-চলতে এক পা থামল রুচিরা। 'বড়-লোকের মেয়ে, কিন্তু নিজে তো বড়লোক নই।'

'তবু—'

'না, না, নেই স্বাধীনতা।' প্রায় কান্নার মত মুখ করল রুচিরা : 'যেখানে খুশি আমি যেতে পারি না, যার সঙ্গে

খ্শি মিশতে পারিনে। ঘরে-বাইরে পারিনে আন্তরিক হতে।'

'না, না, সে কী কথা!' শ্ভময় দাঁড়িয়ে পড়ল : 'স্বাধীনতা চাই বৈকি। যে করে হোক, নিতে হবে স্বাধীনতা। সমস্ত সংগ্রামই তো এই স্বাধীনতার জন্যে।'

অনেক দেরি করে বাড়ি ফিরল র্চিরা।

গোমরা ম্খে এণাক্ষী জিগগেস করল : 'কোথায় গিয়েছিলি?'

এক বাক্যে উত্তর দিল র্চিরা : 'কোথাও না।'

৬

এণাক্ষী বললে, মেয়ের এবার বিয়ে দাও।

বলতে হয়, বললে কথাটা। কিন্তু ওই ছ্ঁড়ি তোর বিয়ে—ব্যাপারটা যে এত সোজা নয় এ কে না জানে। মেয়ের পছন্দই যে শেষ পর্যন্ত কাজ করবে তাতে সন্দেহ কী, কিন্তু পছন্দটা খানিক ছন্দ মেনে চলে এটাই শ্ধ্ দেখবার। আকাঙ্ক্ষার বিমানটা ঘ্র্ণিবায়্ বা বজ্র-বিদ্যুতের উপর দিয়ে মসৃণ-স্নিগ্ধ অভিজাত আকাশে উঠে আসে এইটুকুই শ্ধ্ চালিয়ে আনায় কৌশল।

'কজন পাত্রকে তো সেদিনকার জলসাতে নিমন্ত্রণ করে এনেছিলাম।' বললেন জগৎপতি, 'তারা তো র্চিরাকে দেখে খ্ব ইমপ্রেসড। এবার ভাবছি দ্'য়েক জনকে বাড়িতে ডাকি চা খেতে। র্চিরার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি। তা থেকে—'

'তার থেকে তুমি শ্ভকে বলো ও ঠিক এক শাঁসালো পাত্র এনে দেবে।' লঘ্ শব্দেই হাসল এণাক্ষী : 'দেখতে-না-দেখতে কেমন স্ন্দর ভাড়াটে এনে দিল। করিতকর্মা ছেলে—'

'তা বটে।' সায় দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আবার নাকচ করলেন জগৎপতি : 'কিন্তু পাত্রের ও ব্ঝবে কী!'

'হ্যাঁ', একট্ ব্ঝি বা অন্কম্পার স্র আনল এণাক্ষী : 'ছেলেটা ভারি গরিব। কাকার বাড়িতে পেয়িং-গেস্ট হয়ে থাকে। লেখাপড়াও বেশি করতে পারে নি। চাকরিটাও সামান্য।'

'কিন্তু উচ্চাশা আছে।'

'গরিবের আবার উচ্চাশা! কু'জোর চিৎ হয়ে শোয়ার চেষ্টা।' এণাক্ষী এবার একট্ বা মিনতির স্র আনল : 'তুমি ওকে একটা কিছ্ পাইয়ে দিতে পারো না?'

'দেখি—' কোর্টের পোশাক পরে বেরুচ্ছেন জগৎপতি, ফিরলেন। চিন্তার দ্-একটা স্ক্ষ্ম রেখা টানলেন ম্খে। বললেন, 'আজকাল ও যেন একট্ বেশি আসে!'

'সে তো আমার ফ্টফরমাস খাটতে আসে।'

'তা আস্ক আর যাক, ওকে আমাদের সকলেরই দরকার, কিন্তু যেন বসে না।'

'না, না, আড্ডা ও দেয় কোথায়?'

'কিন্তু এখন যেন র্চিবার ঘরে আছে মনে হচ্ছে।'

'সে ওর ঐ ছেলেদের জন্যে বই-খাতা কিনতে দিয়েছিল, তাই বোধ হয় পেঁ'ছে দিতে এসেছে।'

বলতে-না-বলতেই বারান্দায় বেরিয়ে এল শ্ভময়। সিঁড়ির দিকে দ্রুত পায়ে ছ্টতে ছ্টতে বললে, 'অফিসে লেট হয়ে যাব—'

জগৎপতি তাকে তাঁর গাড়িতে তুলে নিতে পারতেন, অনেকটা পথ পারতেন এগিয়ে দিতে। অনেকটা সময় তাহলে বাঁচত শ্ভময়ের, কিছ্টা বা বাসভাড়া। কিন্তু জগৎপতি তাকিয়েও দেখলেন না। এমন ভাব করলেন যেন তিনি কোন আইনের চিন্তায় বিভোর। যেন তিনি এখন এ সংসারেই নেই।

'দেখি কী আনল?' র্চিরার ঘরে ঢ্কল এণাক্ষী।

এই শ্ধ্ জিনিস এনে দিয়েই এণাক্ষীর স্নজরে এসেছে শ্ভময়। এণাক্ষীর বিপ্ল সখ, এনে দিয়েছে নানা রকমের ফ্লের চারা, পাখি-পাখাল, ঘর সাজাবার ট্কিটাকি। কী নয়? পানের জরদা-মশলা পর্যন্ত। চাকর-বাকর ছাড়া বাড়িতে একটা ছেলে নেই যে আদেশে-অনাদেশে এদিক-ওদিক ছ্টোছ্টি করতে পারে। অসামান্যে তো বটেই, সামান্যেও। জলের পাম্পটা খারাপ হয়েছে তো সমিতির সেক্রেটারিকেই ডাকো। নিওন লাইটের টিউবের বেলায়ও তাই। ভাড়াটের কী অস্বিধে তারও নিরাকরণে সমিতির সেক্রেটারি। সেক্রেটারিটা পরে সংক্ষিপ্ত হয়ে শ্ভময়। ময়-টা লয় হয়ে গিয়ে শেষে শ্ভ।

কিন্তু ঐ,—কাজের বেলায় কাজি কাজ ফ্রোলেই পাজি।

'বই-টই কী আনল?' র্চিরার ঘরে ঢ্কল এণাক্ষী।

'এখনো আনেনি। লিস্ট নিয়ে গেল।'

হঠাৎ ঘরের মেঝের দিকে নজর পড়ল এণাক্ষীর। ও কী, কাঁচা কাদার
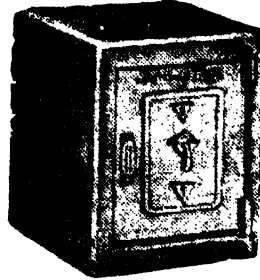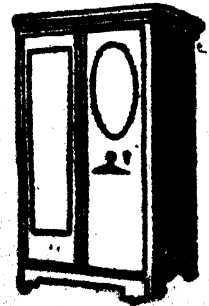
দাগ! সর্বাঙ্গে জ্বলে উঠল এণাক্ষী : 'ওকে ঘরের বাইরে জুতো ছেড়ে আসতে বলতে পারিসনে?'

'তাকি কখনো বলা যায়?'

'খুব বলা যায়। যে ম্যানার্স জানে না তাকে শেখাতে হয় কানে ধরে। আর পায়ে ওর সেই শাণ্ডিল্য মুদির আমলের স্যাণ্ডেলই থেকে গেল চিরদিন। এতটুকু ভদ্রস্থ হল না!'

'আহা, মেঝেতে কাদা লাগলে কী হয়?' হাসতে চেষ্টা করল রুচিরা।

'জলে-ঝাঁটায় ধুয়ে মুছে ফেলতে হয়।'

'কদ্দিন ফেলবে?'

'তার মানে?'

'এ বাড়ি হাতছাড়া হয়ে যাবে।'

'কে নেবে?' চোখে-মুখে আতঙ্কের ছবি ফোটাল এণাক্ষী।

খিলখিল করে হেসে উঠল রুচিরা : 'এ বাড়ি ইস্কুল হয়ে যাবে।'

রসিকতাটা যেন একটু হৃদয়ঙ্গম হল এণাক্ষীর। 'তোর বস্তি-ক্লাশটা তোর এই দোতলার ঘরেই চালাবি নাকি?'

'না, আপাতত নিচের ঘরে বসাব। তবে পরে, কালক্রমে কী হয় কিছু বলা যায় না।' মাকে ভয় পাইয়ে দিতে মজা লাগে বলে রুচিরা আবার ঘোর-ঘোর মুখ করল।

'কী হবে কালক্রমে?'

'ভূমিকম্পও তো হতে পারে। চারদিক থেকে কী সব উঠছেন গগনচুম্বীরা—ঔদ্ধত্যের কালাপাহাড়ের দল। যিনি সর্বংসহা তাঁরও সহ্যের সীমা আছে। একদিন সব পড়বে হুড়মুড় করে—'

'সেদিনও শেষ পর্যন্ত জল আর ঝাঁটারই দরকার হবে।' চাকরের উদ্দেশ্যে হাঁক পাড়ল এণাক্ষী।

কিন্তু নিচের ঘরেও ক্লাশ বসাতে দিতে আপত্তি জগৎপতির।

'এগুলোকে পেলি কোত্থেকে?' কোথায় মমতায় আকৃষ্ট হবেন, তা নয়, যেন শিউরে উঠলেন।

আশেপাশেরই বস্তির ছেলেমেয়ে। এমনিতে ফুল চুরি করে নিয়ে যায়, ধরা যায় না, কিন্তু সেদিন একটা কাটা ঘুড়ির উদ্দেশে এক দঙ্গল ঢুকে পড়েছিল বাগানে। অতি-উৎসাহে দেখতে পারনি গেট কখন বন্ধ করে দিয়েছে রুচিরা। তা ছাড়া ঘুড়িটা প্রথম কে ধরেছে তাও রুচিরাকে বিচার করে দেওয়া দরকার। কই ঘুড়ি কই? শুধু কঙ্কাল দুটো কাঠি পড়ে আছে। এ নিয়ে আবার কান্নাকাটি, মারপিট। পানের দোকান থেকে এক গোছা ঘুড়ি কিনে আনাল রুচিরা। চুরি-করা ফুলের চেয়ে এ অনেক ভালো। কাল আবার এলে খাবার দেবে। কদিন খাবার দিয়ে পরে শার্ট-ফ্রক। এবার আস্তে আস্তে বই-খাতায় এস। অ-আ শেখ। এক-দুই শেখ। এক পয়সা খরচ লাগ ব না।

গোড়ায় গোড়ায় বাঙালি। পরে হিন্দি মাস্টার এনে হিন্দি।

বাপ-মা়রা খুশি। মহাখুশি। বড়লোকের বাড়ির খেয়াল, ভালো ছাড়া মন্দ হবার কী আছে! লেখাপড়া কিছু হোক না হোক, ফ্রি টিফিন তো পাবে।

ছাত্রছাত্রীর চেহারা দেখে জগৎপতির মোটেই আহ্লাদ হল না। বললেন, 'এক রাজ্যের নোংরা এ বাড়িতে কেন?'

'সুরু করতে হলে ঘর তো একটা কোথাও চাই।' রুচিরা বললে ঠাণ্ডা হয়ে : 'সমিতির অফিসে জায়গা কোথায়?'

'তা হ'ল আমার বাড়ির এ নিচের ঘরটা সমিতিরই সামিল হল?'

'মন্দ কী! তুমি সমিতির প্রেসিডেন্ট, জনসেবার খাতিরে দিলেই না হয় একটা ঘর ছেড়ে। আমাদের নাটকের রিহার্সেলেরও একটা ভালো ঘর নেই। ও ঘরটা সে কাজেও লাগতে পারবে।'

'রিহার্সেলের জন্যে হল-ঘরটাই তো ছেড়ে দিতে পারব। কিন্তু বাড়ির মধ্যে এই নোংরা বস্তি-বস্তি ভাবটা ভালো লাগছে না।'

'সেবা তো নোংরা ঘেঁটেই করাত হবে বাবা। যে সুস্থ আছে, পরিচ্ছন্ন আছে তার সেবার কী দরকার!'

'আমার সেবার আইডিয়া এ রকম ছিল না।'

'তোমার আইডিয়া ছিল মুখেই জগৎ মারবো, কাজে কিছু কর বা না।'

'অন্তত তুমি করবে না। তুমি উপরে থাকবে, একটি নাম হয়ে থাকবে, যাকে বলে ফিগার হেড হয়ে থাকবে। আর য়্যাকচুয়াল ফিল্ডে কাজ করবে গরিব গৃহস্থ ঘরের মেয়েরা, যারা র‍্যাঙ্ক য়্যাণ্ড ফাইল—'

'তার মানে কাজের বেলায় ওরা আর ক্রেডিট নেবার বেলায় আমি?'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। এটাই হচ্ছে পলিটিক্স।'

'অন্য মেয়েরা যা পারবে তা আমার করতে বাধা কী!'

'বাধা অনেক। প্রধান বাধা আভিজাত্য। শালীনতা।'

রুচিরা চুপ করে রইল।

'আমি যদি কোনো সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে টাকা দিই, চ্যারিটি করি, তা হলে কি তাতে আমারও সেবা করা হল না?' জগৎপতি একটু পায়চারি করে নিলেন : 'কুষ্ঠ হাসপাতালে আমার শুধু দান করলেই চলবে না, হাসপাতালে গিয়ে নিজের হাতে আমাকে রুগীর সেবা করতে হবে?'

'কিন্তু আমার যখন টাকা নেই তখন আমি কী দেব?' নত চোখ তুলল না রুচিরা : 'আমার পক্ষে শ্রম দেওয়া ছাড়া আর কী আছে?'

'না, তুমি শুধু নাম দেবে, ঔজ্জ্বল্য দেবে।'

'নাইট স্কুল করবার তো তুমি পক্ষপাতী ছিলে—' চোখ তুলল রুচিরা।

'সে তো এখনো আছি। তাই বলে তুমি সে স্কুলে মাস্টারি করবে নাকি?'

'আমি তাহলে কী করব?'

'তুমি শুধু মোড়লি করবে। উপর-উপর ফোঁপর-দালালি করবে।'

আবার চুপ করল রুচিরা।

'একটা স্কুল অর্গানাইজ করতে হলে অনেক রকম লোক লাগে। তাদের সবাই আর মাস্টার নয়, দারোয়ান চাপরাশি নয়। কেউ কেউ বা পরিচালক-গোষ্ঠীর মধ্যে। কারু কারু বা সেক্রেটারিয়েট ডিউটি। তুমি তাদের কেউ হবে। শেকড়ে যাবে কেন, পল্লবে থাকবে। সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলারা কী ভাবে প্রতিষ্ঠান চালায় দেখ না। তুমিও তেমনি কাগজে-কলমে থাকবে, একেবারে কোদাল-শাবল ধরবে কেন? বরং মাস্টার রাখবে মাইনে দিয়ে, নিজে হবে কেন? জাহাজের যে সারেঙ সে কি খালাসীর কাজ করে?'

বাড়ির স্কুল তুলে দিল রুচিরা।

'ও সব কী করব দিদিমণি?' বই-খাতা শ্লেট-পেন্সিল যা যা দেওয়া হয়েছিল তাদের দিকে লক্ষ্য করল ছেলে-মেয়েরা : 'রেখে যাব?'

'না, নিয়ে যা। রেখে দিস যত দিন পারিস।' তারপর নিজের মনে বললে, 'যদি কোথাও কোনোদিন একটা আগুনের ফিনকি জ্বলে ওঠে!'

তারপর একদিন জগৎপতির সামনে গিয়ে দাঁড়াল রুচিরা। বললে, 'আমি একটা চাকরি নিলে কেমন হয়?'

'কোথায় চাকরি?' কাজের মধ্যে আছেন বলে জগৎপতিকে অন্যমনস্ক শোনাল।

'পাইনি এখনো। চেষ্টা করে দেখা যায়।'

'আগে তোমার রেজাল্টটা বেরুক।'

'চুপচাপ বসে আছি।' নিঃস্বের মত বললে রুচিরা।

চুপচাপই থাকো, নিজের স্তব্ধতা দিয়ে তাই বোঝালেন জগৎপতি।

স্বাধীনতা কি চেয়ে-চিন্তে হয়, কাকুতি-মিনতি করে? জোর করে নিতে হয় ছিনিয়ে। নিজের পথ নিজে কাটতে হয়। অস্ত্র শুধু নিজের প্রতিজ্ঞা।

চলে যাচ্ছিল রুচিরা, ডাকলেন জগৎপতি। বললেন, 'তোমার যদি টাকার দরকার হয়, তোমার মায়ের কাছ থেকে চেয়ে নিতে পারো।' নীরবে একটু বুঝি বা বিবেচনা করলেন : 'হ্যাঁ, একশো টাকা।'

'দরকার নেই।'

এর কদিন পরেই এক সন্ধ্যায় জগৎপতি অরিন্দমকে চায়ে নেমন্তন্ন করে আনলেন। আলাপ করিয়ে দিলেন রুচিরার সঙ্গে।

উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল অরিন্দম। বললে, 'বাঃ, আপনার টেস্ট আছে। নাম তো রুচিরা, তাই রুচি থাকবে তাতে আশ্চর্য কী।'

এঞ্জিন থেকে আর কত কবিত্ব বেরুবে, হাসল রুচিরা। বললে, 'কেন, আমি কী করেছি?'

'প্রকাণ্ড কাণ্ড করছেন—তার মানে, আপনি কিচ্ছুই করেন নি। মানে', টাই নিয়ে একটু টানাটানি করল অরিন্দম : 'একদম সাজেন নি। আমি আসব, আমি এসেছি জেনেও একটুও ফিটফাট হবার চেষ্টা করেন নি। যেমনটি ছিলেন তেমনটিই আছেন। এ যে কত বড় রূপ, স্বভাবে সুন্দর হওয়া—' ধীরে ধীরে বসল অরিন্দম।

'আপনার জন্যে রান্না করছিলাম যে।' বাধা দিল রুচিরা।

'সে কি, আপনি রাঁধতেও জানেন নাকি?'

সব রান্না জানলে বোধ হয় আভিজাত্য দেখায় না, সারা দিন আঁশশালেই কাটাতে হয়, তাই জগৎপতি তাড়াতাড়ি সংশোধন করলেন : 'কয়েকটা স্পেশ্যাল রান্না শিখেছে—ঐ যে কোন কোম্পানি থেকে শিখিয়ে যায়!'

'কত আপনার গুণ!' তন্ময়ের মত বলতে লাগল অরিন্দম : 'সেদিন কী গর্জাস নাচলেন! কী সুপার্ব ফিগার আপনার! একবার মনে হল প্যান্থার, একবার মনে হল পাইথন—'

'আপনি এঞ্জিনিয়ার, মোটরগাড়ি কি ট্রেন কি এরোপ্লেন মনে হল না?' লঘু করে দিতে চাইল রুচিরা।

'তারপর গানও তো শুনলে।' মনে করিয়ে দিলেন জগৎপতি।

'এক কথায় সুইট।' সোফায় ডেউয়ে উঠল অরিন্দম : 'ছাড়ব না। গান শোনাতেই হবে।'

'তারপরে আরো আছে।' জগৎপতি প্রগাঢ় হলেন : 'সোশ্যাল সার্ভিসে ইনটারেস্টেড।'

'সে তো আজকাল একটা বিরাট কোয়ালিফিকেশান।'

মুখ চোখ জ্বলে উঠল রুচিরার। বললে, 'যাই আপনার চাটা নিয়ে আসি।'

'না এই যে আমি এনেছি।' দরজার বাইরে এণাক্ষী ঘোষণা করল।

প্রথমে খাবারের পরিমাণ সম্বন্ধে ঘোরতর আপত্তি জানাল অরিন্দম। পরে সোশ্যাল সার্ভিস বা সমাজসেবার কথা তুলল। বিলেতে কী রকম কী দেখে এসেছে তার বিবরণ দিলে। এই যে সে দিন জলসাতে এসেছিলে, যাতে রুচিরা নাচল গাইল প্লে করল সে একটা সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে। তারই জন্যেই তো টিকিট বিক্রি হল। আর, জানো, সে প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি রুচিরা।

জয়েন্ট সেক্রেটারি! রুচিরার ইচ্ছে হল প্রতিবাদ করে। কিন্তু কী হবে প্রতিবাদে। কে বা বলছে কাকে বা বলছে।

'আমরা সে সমিতির মেম্বর হতে পারি না?'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।' উচ্ছ্বসিত হলেন জগৎপতি। 'আমার এলাকায় যখন এ প্রতিষ্ঠান তার উন্নতি-সমৃদ্ধি চাই বইকি একশোবার। আর তোমরা এসে ঢুকলেই ওর 'টোন'টা একটু সুস্থ হয়, সম্ভ্রান্ততা বাড়ে।'

'ঠিক, ঠিক। আজই মেম্বর হয়ে যাব।'

'তার আগে সমিতির নিয়মাবলীটা একটু দেখে নেবেন না?' অরিন্দমের চাঞ্চল্যকে একটু সংযত করতে চাইল রুচিরা।

'আপনিই তো সেক্রেটারি, শুধু আপনাকে দেখে নিলেই তো হবে।' মনি-ব্যাগ বার করল অরিন্দম : 'মোট কত দিতে হবে তাই বলুন।'

'সে পরে হবে খন। আপনি আগে হাত লাগান।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সুরু করে দাও।' জগৎপতি তাড়া দিলেন।

'আপনি—আপনারা?'

'এ শুধু আপনার জন্যে পার্টি'। আপনি সভ্য হবেন সেই সম্মানে। আপনি খাবেন, আমরা খাওয়াব।'

'বা, তা কি হয়?' প্লেটগুলো প্রতিপক্ষদের দিকে ঠেলে-ঠেলে দিল অরিন্দম। 'আমরা সবাই সভ্য।'

'হ্যাঁ, সমস্তটাই ইনফরম্যাল। তাই যে পারো যা পারো তুলে নাও।' একটা ঘরোয়া আত্মীয়-পরিবেশ এনে ফেললেন জগৎপতি। এণাক্ষীকেও ইঙ্গিত করলেন বসে পড়তে।

'কিন্তু আপনি কিছু নিচ্ছেন না?' রুচিরার দিকে চোখ তুলল অরিন্দম।

'বা, একজনকে তো পরিবেশন করতে হয়!'

'আহা, এর আবার পরিবেশন কী!' এণাক্ষী ভ্রূকুটি করল : 'তুইও বোস না ও পাশটাতে।'

'আমি পরে। আমি সকলের শেষে। সবার শেষে যা বাকি রয় তাহাই লব।'

লক্ষ্য করে বলতে গিয়ে অলক্ষ্যে বুঝি সুরের একটু টান দিয়ে ফেলল রুচিরা।

'ভালোই, আপনার মুখে যে কোনো খাবার নেই। আপনার মুখ-দাঁত সব ফ্রি আছে।'

অরিন্দম খাবারভরা মুখে বললে, 'আপনি তাহলে গান পরিবেশন করুন।'

'সেইটেই শ্রেষ্ঠ খাবার।' টিপ্পনী জুড়লেন জগৎপতি : 'সকল মিষ্টির সেরা মিষ্টি।'

'ঠিক, ঠিক।' সায় দিল অরিন্দম। যেন এটা তার নিজেরই বলা উচিত ছিল এমনি আপশোষের ভঙ্গি করলে।

'যে রকম নাকে-মুখে খাচ্ছেন, কান-দুটোও ফ্রি আছে কিনা সন্দেহ হচ্ছে।' রুচিরা এবার শব্দ করেই হাসল।

'আছে, আছে।'

মুখ মেঘলা করে থাকেনি, পরিহাসের সুরে কথা কইছে রুচিরা, এতেই এণাক্ষী আর জগৎপতি খুশি কিন্তু এত সহজেই সে গান ধরে বসবে এ প্রায় কল্পনার অতীত। তা হলে অরিন্দমকে তার অপছন্দ হয়নি। মোটকথা, পাখিকে তার অনুকূল আকাশ দিলেই উড়তে পারে। এবার একটি অনুকূল বৃক্ষ দিলেই বসতে পারে বিশ্রামে। একটু যেন বা হালকা হলেন দুজনে।
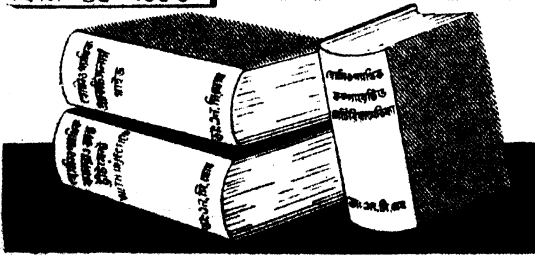
এমন সময়, চারপাশে বোনিয়মের হাওয়া, সেই ঘরে ঢুকে পড়ল শুভময়। গায়ে সেই বুকখোলা পাঞ্জাবি, পায়ে শান্তিনিকেতনের স্যাণ্ডেল।

কাঁচের বাসনের শব্দ, টুকরো-টুকরো কথা, হঠাৎ স্তব্ধতা, তারপরে গান— সহজেই আকৃষ্ট হবার মত। তাছাড়া এ অভিনব পরিবেশে হঠাৎ কোনো কাজের জন্যে শুভময়কে দরকার পড়তে পারে।

কিন্তু হঠাৎ জগৎপতি ধমকে উঠলেন, : 'এখন নয়। পরে।'

তবু এক মুহূর্ত ঝুলে থেকে নিতান্ত অনিচ্ছায় সরে গেল শুভময়।

'দাঁড়াও, কথাটা সেরে আসি।' জগৎপতি অনুসরণ করলেন। পাছে আবার না চলে আসে। রসভঙ্গ ঘটায়।

গান থেমে গেছে রুচিরার।

'কে?' জিগগেস করল অরিন্দম।

যেন দেখতে পায়নি এমনি সরল অনুমানের ভাব করল এণাক্ষী। বললে, 'কোনো মক্কেল-টক্কেল হবে হয়তো।'

তক্ষুনি ফিরে এলেন জগৎপতি। অরিন্দমের কৌতূহলকে নিরস্ত করবার জন্যে বললে, 'সমিতির এই একজন মেম্বর। নেক্সট মিটিং-এর ডেটটা ঠিক করতে এসেছিল—'

'এই ভদ্রলোক সেদিনকার জলসাতে স্ক্যাকটিং করেছিল না?' অরিন্দম বললে, 'চমৎকার করে কিন্তু।'

'হ্যাঁ, স্ক্যাকটিংটা বেশ শিখেছে।' জগৎপতি টিপ্পনী জুড়লেন।

'এ কি, আপনার গান কী হল!' রুচিরাকে মনে করিয়ে দিল অরিন্দম।

রুচিরা তখন একটা প্লেট নিয়ে পড়েছে। বললে, 'দেখছেন না মুখে খাবার পোরা।' সেই অবস্থায়ই হাসল : 'এখন আর সভ্য নই, অন্যরকম হয়ে গিয়েছি।'

তারপর কথায়-কথায়, শেষ ক্ষেপে, প্রস্তাব এল, অরিন্দমের নতুন ওয়ার্ক-সাইটে বেড়াতে গেলে কেমন হয়।

'চলুন, আমার গাড়ি আছে।'

জগৎপতি কী করে যাবেন, তাঁর কত কাজ। আর এণাক্ষীর যদি যেতে হয় বাড়ির গাড়িই তো তৈরি। রুচিরার তবে জায়গা হয় কোথায়?

তাই এণাক্ষী বললে রুচিরাকে, 'তুই যা।'

অরিন্দমের উৎসাহে তাতে মন্দা পড়বার কথা নয়, বললে, 'তাই চলুন।'

'মন্দ কী। চলুন।' রুচিরা পা বাড়াল।

'আমরা পরে না হয় একদিন যাব।' পিছন থেকে বললেন জগৎপতি।

'কিন্তু আপনি এমনি ভাবেই যাবেন?' একটু কি ইতস্তত করল অরিন্দম?

'না, না, একটু ফিটফাট হয়ে যা।' এণাক্ষী তীক্ষ্ম দৃষ্টির প্রহার হানলেন।

'বা, কেন, দিব্যি আছি। তখন যে বললেন, আটপৌরে থাকাই অসাধারণ থাকা, স্বভাবে সুন্দর থাকা—'

'ও, বলেছিলাম নাকি? চলুন তাহলে।'

ড্রাইভার নেই, অরিন্দমই হুইল ধরল। কাজেকাজেই সামনে বসতে হল রুচিরাকে।

জগৎপতি আর এণাক্ষী চোখ-চাওয়াচাওয়ি করলেন। অনুকূল দেশ পেলে নদী আপনা থেকেই ঢল নামায়।

'আপনি বেশ ফ্রি—'

'ফ্রি মানে কী?'

'স্বাধীন। সংস্কারমুক্ত। তাই না? দিব্যি চলে এলেন। সাজগোজ প্রসাধনেরও তোয়াক্কা করলেন না—'

'হ্যাঁ, আপনাকে একটা অনুরোধ করতে এলাম।'

'অনুরোধ? কী?'

'আমাকে একটা চাকরির জোগাড় করে দিতে পারেন?'

'চাকরি?' অবিশ্বাস্য হেসে উঠল অরিন্দম : 'আপনার চাকরির কী দরকার!'

'দরকার—ঐ যে বললেন ফ্রিডম—তার জন্যে।'

'বাজে কথা।' একটু বুঝি বা গম্ভীর হল অরিন্দম : 'অবশ্যি বাপের ঘরে মেয়ের ফ্রিডম নেই। তার ফ্রিডম স্বামীর সংসারে। আর সেই মনোমত সংসার আপনি তো ইচ্ছে করলেই লুফে নিতে পারেন। রূপে গুণে অর্থে—'

'রাখুন, আমার মত দীনহীন খুব কম আছে—'

হাসিতে আবার ফেটে পড়ল অরিন্দম। 'দাঁড়ান, আপনার বাবাকে বলছি।'

'ঐ তো আমার স্বাধীনতার নমুনা।'

'বেশ তো বলব না। আপনার রেজাল্ট বেরুচ্ছে কবে?'

ক-দিন পরেই রেজাল্ট বেরুল।

শুভময়কে ডাকালেন জগৎপতি। বললেন, সমিতি এবার তার জয়েন্ট সেক্রেটারিকে একটা সম্বর্ধনা দিক। খুব ভালো কথা, সব এক তন্ত্রীতে শিহরিত হবে। হ্যাঁ, সেই উপলক্ষ্যে আমি একটা স্টিমার পার্টি অ্যারেঞ্জ করছি। সব খরচ আমার। ভীষণ আনন্দের কথা। তোমার সমিতির তরফ থেকে একটা জলসা বসাও। যিনি পাশ করেছেন, যাঁর জন্য সংবর্ধনা, তিনি নাচবেন-গাইবেন তো? হ্যাঁ, বিশিষ্ট কজন অতিথি-অভ্যাগত নিমন্ত্রণ করব, তাঁদের খাতিরে রুচিরাকেও নামতে হবে আসরে। লেগে যাও জোগাড়যন্ত্রে। ঢোল পিটিয়ে দাও।

স্টিমার পার্টিটা জমল না।

আর সবই হল, রুচিরা নাচল তো না-ই, গানও গাইল না। কত পাহাড়-গলানো অনুরোধ, টলল না রুচিরা। বললে, নিদারুণ মাথা ধরে আছে, মন-মেজাজ তিরিক্ষি।

সর্বক্ষণই দেখছে সম্ভ্রান্তের দল থেকে অসম্ভ্রান্তের দলকে আলাদা করে রাখা হচ্ছে। যদি খাবার কিছু কম পড়ছে সে ঐ অসম্ভ্রান্তদের পাতে। চা-সিগারেট যত যার খুশি সম্ভ্রান্তরাই পাবে, অসম্ভ্রান্তরা সকলেই পেয়ালা-পিরিচ আশা কোরো না, রুমাল দিয়ে ধরে খুরি করে খাও।

আর জগৎপতি শুভময়কে এমনভাবে খাটাচ্ছেন যেন খিদমদগারিই তার পেশা।

অথচ এতটুকু ভ্রূক্ষেপ নেই। খাটছে না তো, প্রাণের স্বাস্থ্যে চারদিকে উথলে পড়ছে।

রুচিরার মনে হয় ভদ্রতার অবশেষ জামাটাই যা শুভময় গায়ে রেখেছে কেন? রীতিমত রিক্তগাত্র মজদুর হয়ে যাক। ওদের শালীনতাকে ত্রস্ত-ব্যস্ত করুক।

'নতুন তাশটাও ওদের দেবেন নাকি?' রুচিরা আপত্তি করল।

'ওরা অতিথি।'

'ওরা সবাই সমিতির মেম্বর হয়ে গিয়েছে। সুতরাং তিথি-অতিথি নেই, সবাই সমান, নো ডিসক্রিমিনেশান—'

'ওদের দিচ্ছি ওদের কিছু অধিকার আছে বলে নয়, ওদের প্রতি কৃপা করে।'

ওদের দিকে

অরিন্দম বাড়িতে এসে গিয়েছে, তার পরে কণাদকে ডাকা হবে। আর ঐ বুঝি নতুন ব্যারিস্টার পল্লব বাগচি। কণাদের পর চায়ে পল্লব আসবে। আর পল্লবের পাশে তিলক বিশ্বাস, কোন এক সদাগরী ফার্মের অফিসর। পল্লবের পরে হবে তিলকের নিমন্ত্রণ।

কোন অরণ্যে গেলে এসব শ্বিপদের থেকে ত্রাণ পাওয়া যায়?

ফিরতি পথে বাস-এ আসতে-আসতে রুচিরা শুভময়কে বললে, 'ওদের প্রতি আপনি যেমন কৃপা দেখাচ্ছেন, শেষকালে ওরা না সমিতি ক্যাপচার করে বসে!'

শুভময় তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল।

'সমিতির 'টেরিটরি' কতটা হবে কিছুই বলা নেই।' রুচিরা মুখচোখ আবার চিন্তিত করল : 'তাই যে কোনো ওয়ার্ডের লোক এসে ভিড় জমাতে পারে। আমাদের পাড়াকে দিতে পারে ডুবিয়ে।'

বিন্দুমাত্র ভাবিত নয় শুভময়। বাস থেকে নেমে যাবার সময় হাসিমুখে বললে, 'যতক্ষণ আমি-আপনি একত্র আছি কারু সাধ্য নেই আমাদের হটাতে পারে।'

৭

শুভময় আর রুচিরা একত্র হয়ে কাজে বেরুল।

কথাটা জগৎপতির কাছে চাপা থাকল না। রুচিরাকে ডেকে জিগগেস করলেন : 'তোরা নাকি বস্তিতে-বস্তিতে ঘুরছিস?'

অস্বীকার করবার কী আছে? নাইট স্কুল খুললে শ্রমিকদের মধ্য থেকে কত নম্বর ছাত্র পাওয়া যাবে তারই একটা হিসেব নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। স্কুল খুলতে এখনো অনেক দেরি।

'তা হোক। তাতে তোর কেন মাথাব্যথা?'

সমিতির খাতায় আছে, জগৎপতির সইয়ের উপরে, বস্তিতে বস্তিতে নাইট স্কুল খোলার কথা। যদি সে সম্বাদে সেক্রেটারিকে যেতে হয় রুচিরাকেও জয়েন্ট হিসেবে সঙ্গী না হয়ে উপায় কী।

'ও বস্তির লোক, ও থাক বস্তিতে। তুই না।' হুঙ্কার ছাড়লেন জগৎপতি।

'বস্তিই তো শক্তির স্তূপ। তোমার ভোটের সারনাথ।'

'আমি সমস্ত ভোট পয়সা দিয়ে কিনে নেব। নাইট স্কুল-টুল সব কায়দার কথা, নইলে আমি বস্তিতে গোপনে আগুন লাগিয়ে দিয়ে পরে প্রত্যক্ষ লরিবোঝাই রিলিফ নিয়ে যাব, লুটে নেব সমস্ত ভোট। তার জন্যে তোকে এ নোংরার রাজ্যে গিয়ে দালালি করতে হবে না।'

শুভময়কে ডাকালেন জগৎপতি।

'শোনো, ওসব বস্তি-টস্তিতে তুমি রুচিরাকে সঙ্গে নিও না।'

যে আজ্ঞে, এই রকমই একটা উত্তরই জগৎপতি আশা করেছিলেন, কিন্তু শুভময় একটা অন্যরকম সুর বার করল। বললে, 'আমি কি আর নিই! উনি নিজের থেকেই আসেন!'

'ও একা-একা যায়, তার তুমি কী করবে!' জগৎপতি অন্যদিকে তাকালেন : 'কিন্তু তোমরা একসঙ্গে গেলে কী রকম যেন দেখায়!' কথাটা কঠিন হয়ে গেল টের পেয়ে একটু বা পরিহাসের আমেজ আনলেন : 'পাড়ার স্ত্রীলোকেরা সূর্পনখা আর পুরুষেরা খরদূষণ।'

এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল শুভময়। তার মানে তার সঙ্গটা বরণীয় নয়। সে নিচুতলার লোক। সে অকুলীন।

কিন্তু কথাটা শুভময় সুন্দর ঘুরিয়ে নিল। বললে, 'হ্যাঁ, তা মিথ্যে নয়। শত হলেও মিস চ্যাটার্জির রেপুটেশানটা দেখতে হয়। তবে, উনি রিলিফে যান আর না যান, মেয়েরা মেয়ের নিন্দে করবেই।'

'তা করুক। অঙ্গার শত ধুলেও তার মালিন্য যাবে না। শত লেখাপড়া সত্ত্বেও মেয়ে মেয়েই থেকে যাবে।'

'তা হলে এক কাজ করুন। ও'কে ক্লাবটাই ছেড়ে দিতে বলুন।' আর পরম হিতৈষীর মত মুখ করে বললে, 'আর একটা ওকে গাড়ি কিনে দিন।''

তা হলে বোধহয় এ'র সুবিধে হয়! কিন্তু তেমন কোনো ভ্রূকুটি না করে জগৎপতি সরল মুখে বললেন, 'কই গাড়ির কথা তো কিছু বলছে না।'

'গাড়ি হলেই আর ওসব গলি-ঘুঁজিতে ঢুকতে পারবেন না। আপনা থেকেই রিলিফের থেকে মুখ সরিয়ে নেবেন।'

'সে চেষ্টা আমি দেখছি। এদিকে তুমি—'

'নইলে ক্লাবের থেকে নাম কাটিয়ে নিন।'

'সে ভারি ড্র্যাস্টিক হবে। শুধু তুমি যদি ওকে একটু পাত্তা কম দাও, সমীহ কম করো, এড়িয়ে চলো—'

'এত বড় একজন গুণী শিল্পী—' প্রশংসার কথাটা কী ভাবে বলবে বুঝতে পারল না শুভময়।

'কিন্তু সেইসঙ্গে ও যে আবার ধনী—বড়লোকের মেয়ে। কারু কারু মতে শুধু বড়লোক হওয়াটাই তো একটা অপরাধ। ওকে যদি সেই বড়লোক হওয়ার দরুন খোঁটা দাও, ঠাট্টা করো, যদি ওর আন্তরিকতায় সন্দেহ দেখাও—'

'বড়লোক!' কী রকম অদ্ভুত চোখে তাকাল শুভময়।

'তাছাড়া আবার কী। বড়লোকের মেয়ে তো বটে।' জগৎপতির উকিলি-গলায় এতটুকু আটকাল না : 'আর বড়-লোক মানেই তো স্বার্থান্বেষী। এসব বলে ওকে টিটকিরি দেবে। ওকেই বা তোমরা রেহাই দেবে কেন? ওর এই রিলিফের ভাবটা যে একটা স্টান্ট মাত্র সেটাই বা দেবে না কেন বুঝতে?'

'সাধ্যমত চেষ্টা করব।' সুন্দর ঘাড় হেলাল শুভময় : 'মানে, ও'কে বোঝাব ও'র সত্যিকার অবস্থা—মানে ও'র সামাজিক অবস্থা—'

'হ্যাঁ, তুমিই পারবে।' জগৎপতি দিব্যি শুভময়ের কাঁধে হাত রাখলেন, দিব্যি হাসলেন : 'আমার-তোমার ভবিষ্যৎ থাক বা না থাক, ওর তো আছে। তুমি তো সেটা বোঝো—'

'কিছু ভাবতে হবে না আপনাকে।' কাঁধ থেকে হাতটা খসিয়ে দিল শুভময়। বললে, 'সব ঠিক হয়ে যাবে।'

টেবিলের ড্রয়ার টানলেন জগৎপতি। 'আর তোমাদের সেই হোমিওপ্যাথি ডিসপেনসারির জন্যে টাকা চাই বলছিলে—'

'সে আরেকদিন হবেখন।' দ্রুত বেরিয়ে গেল শুভময়।

তারপর যথারীতি কণাদ গুহের চায়ে নেমন্তন্ন হল। রুচিরা বললে, 'আমার কজন বন্ধুকে ডাকি।'

'তোর আবার বন্ধু কে?' এণাক্ষী ফোঁস করে উঠল।

'বা, জয়শ্রী, প্রাবনী, নিবেদিতা—'

'সর্বনাশ!' প্রায় পথে-বসার মত মুখ করল এণাক্ষী।

'শুধু মেয়েদের নাম করলাম, তাইতেই সর্বনাশ?'

'শেষকালে ওদের কাউকে পছন্দ করে বসুক।' এণাক্ষী হাঁসফাঁস করে উঠল।

'না, এতে বাইরের লোকের পাট নেই। এটা কোনো জলসা বা স্টিমার-পার্টি নয়।'

ওপাশ থেকে বলে উঠলেন জগৎপতি : 'এটা নিতান্ত ঘরোয়া ব্যাপার, কনফিডেনশিয়্যাল—'

ক্লাবে নয়, একেবারে শুভময়ের বাড়িতে গিয়ে পাকড়াও করল রুচিরা।

'কী আশ্চর্য, আপনি এখানে কেন? সমিতিতেই তো দেখা হতে পারত। কিংবা ওখানে কাউকে খবর দিলেই তো—'

'না, না, ব্যাপারটা ঘরোয়া আর কনফিডেনশিয়্যাল—'

'সেটা মন্দ নয়।' শুভময় হাসল : 'কিন্তু এখানে, এ বাড়িতে আপনাকে আমি বসাই কোথায়?'

বাড়িটার দিকে নিজেরও অলক্ষ্যে তাকাল রুচিরা। বললে, 'না, বাড়ি লাগবে না, বসতে আসিনি। আপাতত পথে নেমে এলেই চলবে।'

'সে তো খুব আইডিয়াল অবস্থা।' রোয়াক থেকে পথেই নেবে এল শুভময়। 'বলুন কী করতে হবে?'

'পর্শু বিকেল চারটের সময় আমাদের বাড়িতে আপনার চা-খাবার নেমন্তন্ন।'

'চা খেতে হবে?' হতাশের মত চেহারা করল শুভময় : 'মোটে এইটুকু? আমি ভেবেছিলাম বুঝি লাফ দিয়ে সমুদ্র পেরোতে বলবেন।'

'সে তো কনস্ট্রাকটিভ কিছু হল।' রুচিরা ধারালো চোখে হাসল : 'আমি ডাকব আপনাকে দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করে দিতে। তার মানে, ঠিক চা খেতে নয়, চায়ের আসরটা ভণ্ডুল করে দিতে।'

উচ্ছ্বসিত হেসে উঠল শুভময়। বললে, 'আমি পণ্ড করতে ভণ্ডুল করতে ওস্তাদ। কিন্তু ব্যাপার কী?'

ব্যাপারটা বললে রুচিরা। বললে, 'ভাব দেখাবেন, আপনাকে কেউ ডাকেনি, আপনি নিজের থেকেই এসেছেন। আর যদি একবার এসেছেন, মাঝপথে আপনি চলে যেতে প্রস্তুত নন। আপনি উঠবেন না, নড়বেন না, ঐ লোকটাকে কিছুতেই দেবেন না নিভৃত হতে।'

'মাত্র এইটুকু? জিনিসপত্র কাপ-প্লাস কিছু ভাঙতে-টাঙতে হবে না?'

'না, দরকার হবে না। শুধু জীবনের কৃত্রিম শালীনতার উপর একটা উপহাসের মত উপস্থিত থাকবেন।'

'খুব পারব। আপনার জন্যে সব পারব।' [illegible] বুকে একবার বুঝি বা হাত রাখল শুভময়।

'জানি পারবেন। তারপরে আরো লোক আসবে—তিলক আসবে, পল্লব আসবে, তাদেরও ঠেকাবেন।'

'কিছু ভাববেন না।' শুভময়ের কপালের কাছেকার কটা কালো চুলের গুছি হাওয়ায় দুলে উঠল। 'মিলি-টারিকেই ঠেকিয়েছি, আর এ তো তৃণ-পল্লব!'

শনিবার, বিকেল চারটেয় কণাদকে নিয়ে আসর প্রায় সরগরম হয়ে উঠছে এমনি সময় পর্দা সরিয়ে হঠাৎ শুভময় ঘরে ঢুকল। আজকের জামা কাপড় সচরাচরের চেয়েও ম্লান, স্যান্ডেলের একটা স্ট্র্যাপ বোধহয় খানিক আগেই ছিঁড়ে গিয়েছে। হুল্লোড়ের মত করে বললে, 'বাঃ, এই যে ঠিক সময়ে এসে পড়েছি। চমৎকার।' মুহূর্তমাত্র দেরি বা দ্বিধা না করে একেবারে টেবলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল : 'শোনপাপড়ি? এ আমার খুব প্রিয়।' বলেই বলা-কওয়া নেই একটা তুলে মুখে পুরল।

সর্বশরীরে জ্বলে উঠল এণাক্ষী। 'এ অসময়ে তুমি কোত্থেকে?'

'দুর্ভিক্ষের দেশ থেকে।' গুঁড়ো গুঁড়ো পাপড়ি ফেলতে-ফেলতে শুভময় বললে।

'ও! তোমার সেই ডিসপেনসারির চাঁদাটা বুঝি?' জগৎপতি উঠলেন চেয়ার ছেড়ে। 'এসো। পাশের ঘরে এসো।'

'চাঁদা পরে হবে। আগে এই উপস্থিতকে সারি।' সন্দেশের স্তূপের দিকে হাত বাড়াল শুভময় : 'আজ আর মক্কেল সেজে কেটে পড়তে রাজি নই।'

অনেক কষ্টে হাসি চাপল রুচিরা। বললে, 'বসুন। এই নিন স্যান্ডুইচ নিন।' আর লোক পেল না, প্লেটটা শুভময়ের দিকেই বাড়িয়ে ধরল।

'মিষ্টিতেই আমার বেশি লোভ।' প্রায় বর্বরের মতই দাঁত দেখাল শুভময়। 'এখনো অসভ্য আছি। দাঁত এখনো ভালো আছে।'

এণাক্ষীও দাঁত দেখাল। স্বামীকে উদ্দেশ করে বললে, 'ওকে পাশের ঘরে নিয়ে যাও না। বাইরের লোকের সামনে মিস্টার গুহ আড়ষ্ট বোধ করছেন।'

'করছেন?' জিগগেস করল শুভময়।

'না, না, সে কী কথা?' লাজুক ভঙ্গি করল কণাদ : 'আড়ষ্ট হতে যাব কেন? তা ছাড়া ও'কে তো চিনি। সেদিন আলাপ হল স্টিমারে—'

'বলুন আমাকে তাহলে বাইরের লোক বলা যায়?' কণাদকেই সালিশ মানল শুভময়।

'কিন্তু এ অকেশনে উনি তো

ইনভাইটেড নন।' এণাক্ষী যন্ত্রণা আর পারল না লুকোতে।

এবার এণাক্ষীর কাছেই শুভময় পেশ করল। 'সংসারে কে ইনভাইটেড? আর এত যেখানে ভোগ্যবস্তু, যে যা পাচ্ছে সে তাই লুফে নিচ্ছে, কেড়ে খাচ্ছে।'

'প্যাটিস নিন।' রুচিরা শুভময়কেই সাধল। তারপর কণাদের দিকে ফিরে : 'আপনি?'

'না, আমি উঠি।'

কাজে কাজেই। জমল না এতটুকু। না গান না বাজনা না বা একটু রঙ্গরস। গাড়ি কণাদও একটা জোগাড় করেছিল কিন্তু বৃথাই সেটাকে নিতে হল ফিরিয়ে।

রুচিরা শুভময়কে লক্ষ্য করে বললে, 'যদি চান তো মিস্টার গুহ লিফট দিতে পারেন আপনাকে।'

কোনো পক্ষ থেকে কোনো চাঞ্চল্য ফোটবার আগেই জগৎপতি গর্জন করে উঠলেন : 'না।' পরে তাকালেন শুভময়ের দিকে : 'তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

শুভময় থামল। কণাদ চলে গেল একা-একা।

ঘরে এক পিণ্ড ঠাণ্ডা লোহার মত স্তব্ধতা।

জগৎপতি দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে। এক পা এগোলেন শুভময়ের দিকে। বললেন, 'শোনো। তুমি আর আমার বাড়িতে এস না।'

'আসব না?'

'না, কখনো না। এলেও বাইরের বৈঠকখানা পর্যন্ত। অন্তঃপুরে নয়। অভিজাত পরিবারের ভেতরের লোকেদের সঙ্গে মিশতে তুমি উপযুক্ত নও।'

রুচিরা ভাবছিল এর পরে, আচ্ছা, আসি, বলে সোজা চলে যাবে শুভময়। তা নয়, সাফাই গাইবার চেষ্টা করল। 'আমার এইভাবে এসে পড়াটা খুব অন্যায় হয়েছে, তাই না?'

'ঘোরতর অন্যায়।' জগৎপতি ক্রুদ্ধ ভঙ্গিটা একটুকু শিথিল করলেন না। 'তোমার ব্যবহারে মিস্টার গুহ রীতিমত অপমানিত বোধ করেছেন। বুঝে নিয়েছেন কোন স্তরের জীবেদের সঙ্গে আমাদের মেলামেশা। রুচিরা কোন সমিতির সেক্রেটারি।'

'সে তো আগেই বুঝেছেন সেই স্টিমারে।'

'না, আজকে একটি বিশেষ বোঝা-পড়ার জন্যে এসেছিলেন। এসেছিলেন রুচিরাকে পছন্দ করতে। কিন্তু তোমার অযোজনা তার অন্তরায় হয়েছে।'

'সে কী কথা! আমি এখুনি ভদ্রলোককে ধরে আনছি।' শুভময় ভঙ্গিতে ছোটবার উদ্যোগ দেখাল : 'দেখি কেমন সে পছন্দ না করে! যদি চান তো আদায় করে নিচ্ছি ডকুমেন্ট।'

খিলখিল করে হেসে উঠল রুচিরা। যেন এক পক্ষের পছন্দেই হবে!

'না। তোমার কিছু করতে হবে না। তুমি তোমার নিজের কাজ দেখ গে যাও।' জগৎপতি একেবারে চূড়ান্ত দাঁড়ি টানলেন।

শুভময় এণাক্ষীর দিকে এগোল। বললে, 'আপনার সেই ফুলগাছের কথা বলেছিলেন—' কী যে ফুলটার নাম নিজেই মনে করতে পারল না।

'না, দরকার নেই।' মুখের দিকে চেয়েও দেখল না এণাক্ষী।

'আর সেই হাতির দাঁতের জিনিস চেয়েছিলেন—'

'দরকার নেই। তুমি আর এস না।'

'আসবই না?'

'না। তোমরা-আমরা দুই সমাজের লোক। তেলে-জলে মিশ খায় না কিছুতেই।'

চলে গেল শুভময়।

তারপর কিছুকাল জগৎপতি অনন্য-স্মরণ হয়ে প্র্যাকটিসেই ডুবে রইলেন। তাঁর চটক ভাঙল যখন একদিন রুচিরা ধীরপায়ে কাছে এসে শান্তস্বরে বললে, 'আমি একটা মেয়ে-ইস্কুলে চাকরি পেয়েছি।'

'পেয়েছ—নাওনি তো এখনো?'

'নিয়েছি। কাল জয়েনিং ডেট।'

'কত মাইনে?'

'মাইনে সামান্য।'

'তোমার ঐ কটা টাকার মর্মান্তিক দরকার?'

'দরকার টাকার নয়, দরকার স্বাধীনতার?'

'স্বাধীনতার?'

'হাঁ, তার চেয়ে বড় জিনিস কিছু হতে নেই সংসারে।'

'একটা গরিব মাস্টারি নেওয়াই যদি তোমার স্বাধীনতার নমুনা হয় তাহলে এ বাড়ি ছেড়ে তোমাকে অন্যত্র চলে যেতে হবে।'

'বা, তা কেন?'

'তা নইলে ছোট কাজ করে আমার আভিজাত্যের সম্মান তুমি ক্ষুণ্ণ করতে পারো না।'

'মাইনে কম বলেই তো কাজটা ছোট?'

'তা ছাড়া আর কী?'

'কিন্তু কাজটা যদি বড় হত, মানে মাইনে যদি বেশি হত!'

'তা হলেও দেখতে হত কাজটা মানের কিনা, কাজটা কোথায়, কী ধরনের—'

'এইখানেই স্বাধীনতা!'

'নয় তো আমার বাড়িতে থাকবে আর আমারই সম্মান নস্যাৎ করবে এ হয়

না, কোনোক্রমেই না। আমার বাড়ি ছাড়ো, ইচ্ছেমত স্বাধীনতা ফলাও, কিছু বলতে আসব না। দেখবও না তাকিয়ে। না, নেই, অমন অন্ধ স্নেহ নেই আমার।' শেষের কথাটায় যেন বেশি জোর দিয়ে ফেললেন জগৎপতি।

রুচিরা মনে-মনে হাসল। অমন বোকা আবেগও তার নেই যে নিশ্চিন্ত আশ্রয় সে নিজের থেকে ছেড়ে দেবে, ছেড়ে দিয়ে অকূলে ভাসবে। বাবা যদি দেনও তাড়িয়ে ক'দিন বাদেই কোন না আবার ডেকে নেবেন বুকে তুলে।

এ সব ইতিহাসের চেয়েও পুরোনো।

চাকরিতে গেল না রুচিরা। এক চাকরি যায় আরেক চাকরি হবে।

'তুই সেদিন বড় চাকরির কথা বলছিলি না?' জগৎপতি সেদিন বললেন, 'একটা জোগাড় করেছি তোর জন্যে।'

'মাইনে কত?' উৎসাহ যেন এণাক্ষীরই বেশি।

'দেড় হাজার।'

'দেড় হাজার! পনেরো শো। একটা মেয়ের মাইনে পনেরো শো'

'মেয়ের নয়, মেয়ের স্বামীর। অরিন্দমের। খোঁজ নিয়ে জেনেছি, অরিন্দম রাজি আছে। কী বল?' রুচিরার চোখে চোখ ফেললেন জগৎপতি : 'ওর বাবা যখন বেঁচে, তখন তাঁর কাছে গিয়ে সম্বন্ধটা উত্থাপন করি।'

জেরায় প্রশ্ন করে মনোমত উত্তর পাবারই আশা করায় অভ্যস্ত জগৎপতি। এ ক্ষেত্রেও আশা করেছিলেন রুচিরা বলবে, তোমার যা ইচ্ছে তাই করো। কিন্তু বেয়াড়া সাক্ষীর মত হঠাৎ বলে বসল, 'আমার সম্বন্ধ ঠিক আছে।'

'ঠিক আছে মানে? কাকে বিয়ে করবি ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ।'

'কে সে?'

'জিগগেস কোরো না। জানতে চেও না।'

'মানে ঐ স্কাউন্ড্রেলটা?'

রুচিরা চুপ করে রইল।

'কে, নাম বল, কণ্ঠস্বর চাপতে চাইলেও পারছেন না : 'শুভময় ঘোষ?'

'হ্যাঁ।' রুচিরা নিটোল গলায় বললে।

'ওটা তো বেজাত, জাতছাড়া।'

'মানে ঘোষ বলে?' নম্র থাকবারই চেষ্টা করল রুচিরা। 'ও সব কায়েত-বামুন তো কোনোদিন মানতে না।'

'এখনো মানি না। ও সব নিয়ে কে মাথা ঘামায়? কিন্তু ও ছাড়া আরো এক জাতিভেদ আছে।'

'সে আবার কী?'

'বড়লোক আর ছোটলোক।'

'ছোটলোক? গরিব বলেই ছোট-লোক?' যেন একটা রুদ্ধ আর্ত রুচিরার বুক থেকে বেরিয়ে গেল।

'হ্যাঁ, গরিব বলে।'

'তুমিও এককালে গরিব ছিলে বাবা।'

'যখন ছিলাম তখন ছিলাম। তখন তুই আদালতের একটা পিওনকে বিয়ে করতিস কিছু বলতে আসতাম না। কিন্তু এখন—' সাজানো ঘরের চারদিকে চোখ বুলোলেন জগৎপতি : 'এখন জাতে উঠে জাত খোয়াতে পারব না আমি কিছুতেই। না, কিছুতেই না। আমার মেয়ের বিয়েতে হাইকোর্টের জজেরা আসবে না এ অসম্ভব।'

অপমানে স্তব্ধ হয়ে রইল রুচিরা।

এণাক্ষী এতক্ষণে মুখ খুলল। এতক্ষণ এমন একখানা ভাব করেছিল যেন একবর্ণও তার হৃদয়ঙ্গম হয়নি। কিন্তু এখন, ঘর হঠাৎ নীরব হয়ে যেতেই সমস্ত প্রাঞ্জল হয়ে উঠল নিমেষে। 'এ সব কী বলছিস তুই?' কণ্ঠস্বরে প্রায় মূর্ছা যাবার মত অবস্থা : 'ঐ গুন্ডাটাকে বিয়ে করবি?'

রুচিরার মুখে কথা নেই।

'ঐ চাকরটাকে? যে সর্বক্ষণ লোকের ফাইফরমাস খাটে? বাজার করে? পানের দোকান থেকে পান কিনে আনে? বিড়ি খায়?' ঘৃণায় কিলবিল করতে লাগল এণাক্ষী।

আর যেন কিছু বলবার নেই, কাটা-কুটি করবার নেই, তেমনি বসে রইল রুচিরা।

'তোর রুচিকে বলিহারি! ওটা তোর চেয়েও কম লেখাপড়া জানে। আর মাইনে পায় কত? আমরা আমাদের ড্রাইভারটাকে যা দিই তার চেয়েও কম। ও তো একটা ভোলানটিয়ার।'

সূর্য পুব দিক ছাড়তে পারে আমি আমার প্রতিজ্ঞা ছাড়ব না তেমনি যেন ভঙ্গি রুচিরার।

'এ বিয়ে যদি হয় তা হলে আমি বিষ খাব, গলায় দড়ি দেব, ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ব মাটিতে।'

জগৎপতি ও সব আতিশয্যে গেলেন না, বাস্তবকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন : 'ও তোর ভরণপোষণ করবে কী করে?'

রুচিরা চুপ।

'ও তো ওর কাকার বাসায় এক চিলতে এক ফালির মধ্যে থাকে, ও তোকে রাখবে কোথায়? আলাদা একটা বাসা ভাড়া নেবারও তো ওর সঙ্গতি নেই। কি, কী হবে ভবিষ্যতে? ভেবেছিস কিছু?'

সূক্ষ্ম রেখায় হাসল একটু রুচিরা। বললে, 'ও সব এখনো কিছু চূড়ান্ত ভাবিনি।'

'ওগো সেই মিলিটারিটা সেদিন এই বুক-খোলা নচ্ছারটাকে গুলি করল না কেন? স্টেটবাস এত লোককে চাপা দেয়, ওকে কেন ছাড়া রেখেছে? পুলিশ এত রকবাজ গোলন্দাজকে ধরে ওকে কেন এখনো ধরেনি? শোন,' এণাক্ষী বিপুল বিক্রমে ঘোষণা করল : 'যে করে পারো ঠেকাও এই বিয়ে। ভেঙে দাও, ভেস্তে দাও।'

সুতরাং ভাবতে দাও। মাথা গরম গরম করে শুধু হৈ-চৈ করলে অপর-পক্ষের জেদ বাড়ে। উৎপীড়ন করতে গেলে মরীয়া হয়ে ওঠে। চুপচাপ বসো পাশটিতে। বুদ্ধি দাও।

কিসের কী বুদ্ধি! সমানে চেঁচাচ্ছে এণাক্ষী : 'অরিন্দমকে ডাকো। ওর হাতে যত শিগগির পারো দিয়ে দাও গছিয়ে।'

আর রুচিরা মনে-মনে স্থির করছে এ বিয়েকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলতেই হবে। গরিব বলে যাতে আর প্রত্যাখ্যান চলবে না। চলবে না। শুভময় যাই হোক, যেমনতরোই হোক, তারই হাতে অনিবার্য হবে সমর্পণ।

৮

শুভময় যে ফার্মে কাজ করে তার কর্তা অনাদি ঘোষালের সঙ্গে ষড় করলেন জগৎপতি। প্রাথমিক টাকাটা জগৎপতিই দাদন করলেন, অনাদি ভাব দেখাল কোম্পানিই খরচ দিচ্ছে। তবে যাও দু বছরের ট্রেনিংএ চলে যাও বিলেত।

উত্তুঙ্গতম শৃঙ্গেরও বাইরে এই কল্পনা। কালো একটা আগুনের শিখার মত লেলিহান হয়ে উঠল শুভময়।

'টাকার জন্যে ভেবো না। আমিই তোমার গ্যারেন্টার থাকব।' জগৎপতি ভরাট গলায় বললেন, 'কোম্পানি না দেয় টাকা আমি দেব। তুমি যাও, মানুষ হয়ে এস।'

উৎসাহে জ্বলতে লাগল শুভময়। পারলে এখুনি সে ছুট দেয়, পাল তোলে, পাখা মেলে আকাশে। বললে, 'আমার কত দিনের স্বপ্ন। একবার পৌঁছুতে পারলে আর কিছু ভাবি না। একবার ঝাঁপ দিতে পারলেই হল—ঝাঁপ দেওয়া নিয়ে কথা—ঝাঁপ দিতে পারলে পায়ের নিচে মাটি পাবই। হয় দাঁড়াবার নয় পড়বার। টাকা কত দিক থেকে আসবে, নয়তো ছিনিয়ে নেব গায়ের জোরে।'

পিঠ চাপড়ালেন জগৎপতি : 'এত বড় একটা উচ্চাশা পরিপূর্ণতার অবকাশ

পাবে না এ অসহ্য। তাই তোমার ফার্মকে ধরে এই সুযোগটা করে দিলাম।'

'আর ট্রেনিং কমপ্লিট করে এই ফার্মেই ফের ফিরে আসবে এই আমরা আশা করব।' বললেন অনাদি ঘোষাল। 'বন্ড সই করে দেবে সেই মর্মে।'

'তা দেবে বইকি।' গম্ভীরমুখে বললেন জগৎপতি, 'তবে যদি নিজের কৃতিত্বে ওর চেয়েও ভালো চান্স কোথাও পাও, কোম্পানি তাতে বাদ সাধবে না।'

'নিশ্চয়ই নয়।' সায় দিল অনাদি : 'শুধু ফার্মের টাকাটা ফেরত দিয়ে দিলেই হবে।'

'তার জন্যে আমি আছি।' টেবিলে কিল মারলেন জগৎপতি : 'আর ইতি-মধ্যে ফার্মের অবস্থা যদি খারাপ হয়, ফার্ম ব্যাঙ্ক-আউট করে, তাহলেও ভাববার কিছু নেই।'

'আমি কিছুমাত্র ভাবি না, কোনো অবস্থাতেই না।' হাসতে লাগল শুভময়।

'তখনও আমিই আছি। সব সময়েই আছি। কোনো মামলা নিলে শেষ পর্যন্ত আমি না জিতে ছাড়ি না।'

কী ইঙ্গিত পেয়ে অনাদি চলে গেল ঘর ছেড়ে, শুভময়ের সঙ্গে জগৎপতি নিভৃত হলেন। অনাদিকে লক্ষ্য করে বললেন, 'ওর সঙ্গে আমার একটু প্রাইভেট কথা আছে, দেখবেন কেউ যেন না ঢোকে, দেয়ালে না কান পাতে।'

'ঠিক আছে।' ওপার থেকে বললে অনাদি। যেন নিজেই সে পাহারা দিচ্ছে এমনি আশ্বাস তার স্বরে।

'বোসো।' কণ্ঠে মধু ঢেলে বললেন জগৎপতি।

মুখোমুখি বসল শুভময়।

'তোমাকে মানুষ হবার এত বড় একটা চান্স দিচ্ছি কেন বুঝতে পারছ?' জগৎপতি শুভময়ের চোখের মধ্যে তাকালেন।

বুঝতে পারছে এমনি বিনয়কমনীয় ভঙ্গি করল শুভময়।

'যাতে তুমি রুচিরার যোগ্য হতে পারো। সমাজের উঁচু মহলে উঠে আসতে পারো সহজে।'

যেন বুকের উপর প্রচন্ড একটা ঘুষি খেল শুভময়। কিন্তু দিব্যি হজম করে নিল হাসি মুখে। বললে, 'তা তো ঠিকই।'

'কারু ওয়ারিশ পেয়ে বড় হওয়া সেটা কোনো কাজের কথা নয়।'

'না, না, সব সময়ে নিজের জোরে বড় হওয়া।' অলক্ষ্যে হাত মুঠ করল শুভময়।

'প্রত্যেক ভালোবাসার মধ্যে শ্রদ্ধা বলে একটা জিনিস থাকে—কী বলো, থাকে কিনা?'

'নিশ্চয়ই থাকে।'

'থাকা উচিত। নইলে ভালোবাসা টেকসই হয় না। তারই জন্যে ধনে-মানে মজবুত হওয়া দরকার। তারই জন্যে তোমাকে বিলেত পাঠানো।'

এ সবও ছোটখাটো প্রহার, কিন্তু হাসিমুখে সব সহ্য করল শুভময়।

'তারপর, শোনো।' আরো একটু এগিয়ে এলেন জগৎপতি, কণ্ঠস্বরকে ঝাপসা করলেন : 'শুধু একটা সর্ত আছে, সর্তটা কঠিন।'

কঠিন বলে সংসারে কিছুই নেই এমনি উড়িয়ে দেবার হাসি হাসল শুভময় : 'বলুন।'

'তুমি যে যাচ্ছ এ কথা ঘুণাক্ষরে কাউকে বলতে পারবে না। যেন অন্তত রুচিরা না জানতে পারে।'

পথনটা শুভময় একটু বুঝি বা

হকচকিয়ে গেল। শুকিয়ে গেল মুখ-চোখ। কথা বেরুল না।

জগৎপতি বললেন, 'রুচিরা যদি জানতে পারে তাহলে বিপদ আছে। বুঝতে পাচ্ছ?'

হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছে শুভময়। নিজেরও অলক্ষ্য ঠোঁট দিয়ে একবার জিভ চাটল। বললে, 'বুঝতে পাচ্ছি। জানতে পারলে ও বাধা দেবে।'

'হ্যাঁ, রব তুলবে, বিয়ে করে তবে যাও, কিংবা নিজেই যাবার জন্যে, সঙ্গী হবার জন্যে হৈ-চৈ করবে। তার মানেই—বুঝতে পাচ্ছ—'

'তার মানেই যাওয়া বন্ধ।' ফাঁকা গলায় হাসির আওয়াজ তুলল শুভময়।

'মানুষ হবার বিরাট একটা সম্ভাবনার মূলোচ্ছেদ।' একটু বা দার্শনিক হলেন জগৎপতি: 'জীবনে বড় হতে হলে নিষ্ঠুরও হতে হয় মাঝে মাঝে।'

'বা, এ নিষ্ঠুরতা কোথায়?' জগৎপতির জীবনদর্শনে ভাষা জোগাল শুভময়: 'সব শুরুই শেষের জন্যে। আর যেখানে শেষ ভালো সেখানে সব ভালো।' একটু বুঝি বা জগৎপতিকেই সান্ত্বনা দিতে চাইল: 'তাছাড়া দু বছর কতটুকুই বা সময়। দেখতে-দেখতে কেটে যাবে।'

'হ্যাঁ, আড়ালে থেকে তোমারও রুচিরাকে পরীক্ষা করে দেখা দরকার, তার ভালোবাসা খাঁটি কিনা, দু বছর তোমার জন্যে ঠিক সে প্রতীক্ষা করে থাকতে পারে কিনা, না, সবটাই তার মোহ, বড়লোকের মেয়ের খামখেয়াল।' জগৎপতি যেন শুভময়ের কত বড় বন্ধু, অভিজ্ঞ হিতৈষী, ডিফেন্সের উকিল—এমনি উদার ভাব করলেন।

'নিশ্চয়, পরীক্ষা দরকার।' সৎ হতে চাইল শুভময়। 'শুধু ওর নয়, আমারও। ওরও দেখা দরকার বড় হয়েও আমি কৃতজ্ঞ আছি কিনা, আবদ্ধ আছি কিনা চুক্তিতে।'

'সুতরাং ওকে কিছুতেই জানতে দেওয়া নয়।' চোখমুখ ঘোরালো করলেন জগৎপতি: 'যদি দেখি ও জানতে পেরেছে, তাহলে—তাহলে সমস্ত তক্ষুনি ভণ্ডুল করে দেব।'

'আমার কাছ থেকে কোনো ভয় নেই। কিন্তু অফিস থেকে যদি কথা ওঠে!'

'সাধ্যমত চেপে রাখবে অনাদি। তবু যদি কেউ ফিস ফিস করে সটান উড়িয়ে দেবে। অস্বীকার করবে। যদি রুচিরাও কিছু সন্দেহ করে জিগগেস করে—'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে শুভময় বললে, 'অস্বীকার করব।'

'শোনো, এ কটা দিন সমিতিতে বিশেষ যাওয়া-আসা করে কাজ নেই।'

'না, কী কাজ!'

'আর রুচিরার সঙ্গে দেখা করাও বন্ধ করে দাও।'

একটা বুঝি ঢোক গিলল শুভময়। বললে, 'একেবারে বন্ধ করে দিলে বরং সন্দেহ হতে পারে। তার চেয়ে যেমন দেখা হচ্ছে হোক, ওর মনটাকে সন্দেহের অতীত করে রাখি।'

'তা তুমি যা ভালো বোঝো।' উঠি-উঠি করলেন জগৎপতি: 'কিন্তু বলে দিচ্ছি, রুচিরার কথায় বা ব্যবহারে যদি বুঝি ও জানতে পেরেছে, তাহলে সমস্ত ক্যানসেলড।'

'আমি বোকা নই। নিজের কপাল আমি নিজে খাব না।' বুক-খোলা জামায় হাসল শুভময়।

'সমস্ত কিছু ভীষণ তাড়াতাড়ি করিয়ে নিচ্ছি। ধরো, আর সাত দিন। তারপর তুমি বম্বে চলে যাও। তোমার জাহাজ বম্বে থেকেই ছাড়বে। সেখানেই না হয় দিনকতক গাঢাকা দিয়ে থাকো।'

'তাই থাকব।' অলক্ষ্যে একটা নিশ্বাস ফেলল শুভময়: 'এদিকে না হয় চালু করে দেব আফিসের কাজে মফস্বলে গিয়েছি।'

কাঁটায়-কাঁটায় ঘুরল ঘড়ির কাঁটা।

হাওড়া স্টেশনে বম্বে মেলে শুভময়কে সি-অফ করতে এলেন জগৎপতি। সঙ্গে অনাদি ঘোষাল। অনাদিকে শুধু নমস্কার করে জগৎপতিকে প্রণাম করল শুভময়।

'থাক থাক এস।'

গাড়ি ছেড়ে দিল।

অনাদি বললে, 'তাড়িয়ে দিলেন, না, ওই পালিয়ে গেল ঠিক বোঝা গেল না।'

কদিন পরই বুঝবে। মনে মনে হাসলেন জগৎপতি, যখন টাকা গিয়ে আর পৌঁছুবে না। যখন পড়বে আথান্তরে। যখন জলে পড়ে হাত তুললেও কাউকে পাবে না আশেপাশে।

খুনের আসামী অনেক খালাস করেছেন জগৎপতি। কিন্তু খুন করা যে এত সহজ, আরামের, তা কোনোদিন জানতেন না।

৯

তারপর চাকায়-চাকায় ঘুরতে-ঘুরতে জগৎপতির মোটর ঊনিশ-এক বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল।

ফুটপাতে দাঁড়িয়ে জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালেন জগৎপতি: 'ভাস্কর আছ?' দেখলেন তেরো-চৌদ্দ বছরের একটা ছেলে মেঝেতে মাদুরে বসে পড়ছে। তার মনোযোগকে চটিয়ে দেবার জন্যে এবার চেঁচিয়ে উঠলেন: 'শোনো এটা কি ভাস্কর বসুর বাড়ি?'

ধড়মড় করে উঠল ছেলেটা। বাইরে গাড়ি দেখে ভীষণ অবাক হয়ে গেল। একটা গাড়িওলা লোক দাদাকে খুঁজছে এ একেবারে অভিনব।

'হ্যাঁ, আমাদের বাড়ি।' সপ্রতিভের মত ছেলেটা বললে, 'দাদা বাজারে গিয়েছেন।'

'তারপরেই তো নাকে মুখে গুঁজে আপিসে বেরুবে। তবে আর সকালে দেখা করার সুবিধে হবে না। শোনো, ভাস্করকে বোলো সন্ধেয় আমার সঙ্গে দেখা করতে।'

'সন্ধেয় যে দাদার আবার টিউশানি আছে।'

'তাহোক। টিউশানির পরেই যেন যায়। আমি কে চেন তো?' গাড়ির দিকে অভ্যাসবশেই চোখ ফেললেন: 'এ গাড়িটা কোন বাড়ির জানো তো?'

'না।' নির্মল সারল্যে ছেলেটা হেসে উঠল। খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল রাস্তায়। বললে, 'গাড়ির নম্বরটা দেখে রাখছি। দাদা এলে বলব।'

'তোমার নাম কী?'

'আমার নাম তো সোমনাথ।' তবু ভদ্রলোক নিজের নামটা বলে কিনা অপেক্ষা করতে লাগল।

জগৎপতি বললেন, 'বোলো মিস্টার চ্যাটার্জি এসেছিলেন। জরুরি কাজ আছে।'

আমাকে দেখামাত্রই চোখের পলকে সবাই চেন এটাই তো যশস্বীদের আশা, কিন্তু এই ছেলেটা অপোগণ্ড বলে তত বিরক্ত হলেন না জগৎপতি। বাঙলায় জগৎপতি বলতেও কেমন যেন খেলো শোনায়, তাই মিস্টার চ্যাটার্জি বললেন। যথেষ্টেরও বেশি পরিচয় দেওয়া হয়েছে এতে। বললেন, 'বোলো, ভুলো না।'

'ঐ যে দাদা এসে পড়েছেন।' বাঁচল সোমনাথ।

এক হাতে রেশনের থলে আরেক হাতে মাছের জায়গা—মাছের জায়গাটা খালি—দেখা দিল ভাস্কর।

'এ কি, আপনি?' নমস্কার করার কথাও ভুলে গেল সহসা।

'হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ দরকার।' ভাস্করের মাথা থেকে পা পর্যন্ত চোখ বুলোলেন জগৎপতি। বললেন, 'সন্ধের পর টিউশানি সেরে যেও একবার আমার বাড়িতে। নয়তো যদি বলো তোমার এখানে—।' জানলা দিয়ে ঘরের ভিতর চোখ ফেললেন আরেকবার।

'আমার এখানে কী!' একটু আড়ষ্ট হল ভাস্কর : 'আমিই যাব আপনার বাড়ি।'

'হ্যাঁ, যেও। সুখবর আছে।'

গাড়িতে যেতে-যেতে মনে মনে হিসেব করলেন জগৎপতি। বাড়িতে চাকর নেই, ভাস্করই বাজার করে। মাছের দাম বেশি বলে মাছ কেনে না প্রত্যহ। ঘরের মধ্যে চেয়ার নেই, লোক এলে বাইরে দাঁড়িয়েই বোধ হয় কথা সারে। আর নেহাৎ ভিতরে নিতে হলে বসতে মাদুর পেতে দেয়। মোট দুখানা ঘর মনে হল। পাশের ঘরে তক্তপোশ আছে কিনা বলা যায় না, তবে একজন মহিলার আভাস পাওয়া গেল, তিনি বোধ হয় মা। মা না থাকলেই বোধ হয় ভালো ছিল। কিন্তু মা না থাকলে দুবেলা দুটো ফুটিয়ে দেবে কে? একটা রাঁধুনে বামুন রাখবার সঙ্গতি কই?

আরো খানিক দেখলেন তলিয়ে। ছেলেটা বোধহয় সৎ, স্থির, মজবুত। জামার বোতামগুলো বন্ধ, মাথার চুলগুলো পাখির বাসা করে রাখেনি। আরো মনে পড়ল সেদিন প্রথম তাঁর বাড়ি থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে যাবার সময়ও সে খোলা গেটটা খোলা রেখেই চলে যায়নি, যথারীতি বন্ধ করে দিয়েছিল। সে এলোমেলো নয়, সে ছন্দের অনুগামী। সে রীতির পূজারি। সে বিশ্বাসযোগ্য।

সুখবর বলতে আর কী, কোথাও একটা চাকরির সুবিধে হয়েছে হয়তো।

এতটা যেন আশার বাইরে, এমনি কষ্টরই দেখলেন মহালয়া। বললেন, 'হয়তো বা কোনো কন্যাদায়গ্রস্ত বাবাকে উদ্ধার করবার ডাক পড়েছে।'

'তাতে আমার কী!' তেতে উঠল ভাস্কর : 'সেটা আমার কী সুখবর!'

'বা, আমার সুখবর। আমার ঘরদোর আলো হয়ে উঠবে।'

'সেই ঘরের আলোতে তুমি বাইরে বসে আঁধার দেখবে। যা না রোজগার তাতে আবার বিয়ে! কী না জানি বলে, আহা, সেই কথাটা—' ভাস্কর হাসল : 'যা মা কনে তার দু পায়ে আলতা!'

টিউশনি সেরে সন্ধ্যার পরে ঠিক হাজির হল ভাস্কর। দেখে মনে হল অনেকক্ষণ ধরেই অপেক্ষা করছেন জগৎপতি।

বৈঠকখানায় না বসিয়ে পাশের ছোট একটা ঘরে নিয়ে এলেন। আস্তে বললেন, 'বোসো।' বসতেই একেবারে খিল চাপালেন দরজায়।

মাঝখানে একটা চেয়ার রেখে দুজনে বসলেন মুখোমুখি। আজেবাজে মামুলি কথা পাড়লেন প্রথমে. আজকের খবরের কাগজের কথা, দেশের দুর্দশার কথা, প্রতিষ্ঠান বা পার্টি দিয়ে কী হবে যদি মানুষ না থাকে, আর মানুষেই যদি বিশ্বাস না রাখা যায় তা হলে পৃথিবীতে কী নিয়ে থাকবে মানুষ, এমনি সব অবান্তর কথা।

একটু বুঝি বা চঞ্চল হল ভাস্কর। হাসি-হাসি মুখ করে বললে, 'কী একটা সুখবর আছে বলছিলেন—'

'বলছি।' এত বড় একটা কোর্ট-কাঁপানো উকিল, কথার ভট্টাচার্য তারই মুখ দিয়ে কিনা এখন কথা বেরুচ্ছে না। 'আচ্ছা তোমার সেই চাকরিটা হয়নি যেটার জন্যে আমার কাছে সেই এসেছিলে?'

'কী করে হবে? আপনি বিমুখ হয়ে রইলেন।'

'হ্যাঁ, সেটা আমার পক্ষে উচিত হয়নি। আমার এত মানুষ নিয়ে কারবার, আমার লোক চেনা উচিত ছিল। তুমি সেই যে বলেছিলে আমার মুখ দেখুন সেইটেই খাঁটি কথা। আমি মনে-মনে ঠিক চিনেছিলাম তোমায় মুখ দেখে। কিন্তু জানো, ওকালতির ঐ এক বিষম দোষ একটা পয়েন্ট পেয়ে গেলে প্রাণপণে তাকেই আঁকড়ে থাকা, আর তাকে ছেড়ে দেওয়া নয় কিছুতেই। কত অমন ক্ষুদ্র তুচ্ছ পয়েন্টের ফাঁক দিয়ে বড়-বড় মামলা ফেঁসে গেছে, সেদিন তোমারটাও গেল। কিন্তু জানো, সেই দিন থেকে অনুতাপে দগ্ধ হয়ে যাচ্ছি। তোমার একটা ক্ষতিপূরণ না করে দেওয়া পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছিনে। আচ্ছা, যেখানে এখন তুমি আছ সেখানে কত পাচ্ছ?'

'সব সুদ্ধ একশো চৌষট্টি টাকা।'

'মোটে? আচ্ছা, তোমার মাইনে যদি সাড়ে তিনশো হয়, চারশো হয়?'

এতে আবার কী হয় জিগগেস করতে হয় নাকি? ভাস্কর নির্লিপ্তের মত শূন্যে তাকিয়ে রইল।

'ভালোই হয়, কী বলো?'

এর আবার ভাস্কর কী বলবে? ভাস্কর কি কোনোদিন অত মাইনে কবু হতে দেখেছে সজ্ঞানে?

'তোমরা তো দুটি ভাই। আর—' থামলেন জগৎপতি।

'আর, মা আছেন।'

হালকা হয়ে যাবার মত নিশ্বাস ফেললেন জগৎপতি। 'আর কোনো ডিপেণ্ডেন্ট?'

'আপাতত নেই।'

'তা হলে ওরকম একটা মোটাসোটা মাইনে হলে বিয়েও করতে পারো স্বচ্ছন্দে।'

কাষ্ঠের মত হাসল ভাস্কর : 'বর্তমান যা মাইনে তাইতেই তো মা অস্থির হয়ে উঠেছেন।'

'না, বর্তমান মাইনেতে হয় না। শোনো।' একটা প্যাকেট থেকে কিছু

কাগজ বের করলেন জগৎপতি : 'এই অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা ফিল-আপ করে কালই পাঠিয়ে দাও। এ কোম্পানির মালিক, বদ্রীবিশাল আমার মক্কেল। আমার খাতিরেই একটা ওপনিং করে দিচ্ছে তোমার জন্যে। ইনস্পেকটরের চাকরি, চাকরিটা ভালো। মাইনে ভালো হলেই সমস্ত ভালো। কত টিনের ঘরের টালির ঘরের কোর্টে গিয়ে কেস করেছি; ফি দিক না, গাছতলায় দাঁড়িয়ে কেস করব। যজ্ঞে ঘি ফেল, যেখানেই হোক জ্বলবে দাউ দাউ করে।'

'চাকরিটা পার্মানেন্ট?'

'নিশ্চয়ই। নইলে তুমি তা নেবে কেন? তুমি একবার গিয়ে সব দেখেশুনে এস না। পছন্দ না হয় চলে আসবে।'

'না, না, নামকরা ফার্ম'। ফর্মটা উলটে-পালটে দেখল ভাস্কর। 'দেখবার শোনবার কিছু নেই।'

'দেখবে অ্যাপ্লাই করার সঙ্গে-সঙ্গেই চাকরি। ইণ্টারভিয়ুও লাগবে না।'

'ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট?' ভাস্কর না বলে পারল না।

'না, তাও না। শুধু ধুতি-পাঞ্জাবি ছেড়ে শার্ট-প্যাণ্ট পরতে হবে। জুতো কাবলি পর্যন্ত চলতে পারে কিন্তু স্যাণ্ডেল চলবে না। তার মানে ঢিলেমি ছেড়ে স্মার্টনেসে আসতে হবে।'

'বা, তাতে আপত্তি কী! যেমন কাজের যেমন পোশাক। যে অফিসের যা রেওয়াজ তা মানতে হবে বৈকি।'

'পোশাক-আশাকের জন্যে তোমার হাতে টাকা না থাকে, আমি দিতে পারি চালিয়ে।'

'না, না, তার জন্যে ভাবতে হবে না আপনাকে। সে আর কটা টাকা।'

তবু সমস্তই যেন কেমন ফাঁকা-ফাঁকা, অবান্তর মনে হচ্ছে ভাস্করের কাছে। যেন আরো কিছু কথা আছে, অন্য কিছু বক্তব্য। এতেই যেন রহস্যের শেষ নয়।

তবু কই, মুখ খুলেছেন না তো জগৎপতি।

তবে এবার উঠতে হয়। দরখাস্তের ফর্মটা ভাঁজ করে পকেটে পুরেছে ভাস্কর, জগৎপতি হঠাৎ গলা নামালেন : 'আর শোনো তোমাকে আমি দশ হাজার টাকা দেব।'

'টাকা? দশ হাজার! আমাকে!' ভাস্কর কি মাটিতে আছে না শূন্যে আছে বুঝতে পাচ্ছে না।

'হ্যাঁ, বিয়ের যৌতুকস্বরূপ দেব। প্রথমে পাঁচ হাজার, পরে আরো পাঁচ। কিংবা যদি বলো—'

ভাস্কর কী বলবে! সে তো জড়, পাথর হয়ে গিয়েছে। বললে, 'কে বিয়ে করবে?'

'তুমি।'

'আমি বিয়ে করব, তার আপনি যৌতুক দেবেন কেন?'

'বা, আমার মেয়েকেই যে বিয়ে করবে। মেয়ের বিয়েতে জামাইকে শ্বশুর যৌতুক দেয় না?' কথার সুরে জগৎপতি যেন একটু স্নেহ মেশালেন।

যেন কোন এক রূপকথার রাজ্যে উড়ে এসেছে, ভাস্কর তেমনি ঘুমেজড়ানো গলায় জিগগেস করল, 'আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করব? তার মানে আমার হাতে আপনার মেয়েকে সঁপে দেবেন, তুলে দেবেন? এও হয় নাকি? এ আপনি কী বলছেন?'

'ঠিকই বলছি।'

'আমি কি আপনার মেয়ের যোগ্য? আমি একটা সামান্য মাইনের কেরানি—'

'চারশো টাকা মাইনের ইনস্পেক্টর—জামাই হিসেবে একেবারে মন্দ কী!' জগৎপতি একটু হাসবার চেষ্টা করলেন : 'তা ছাড়া যোগ্যতা তো শুধু টাকার নয়, যোগ্যতা চরিত্রে, যোগ্যতা সাধুতায়। যোগ্যতা মনুষ্যত্বে।'

'এ সব কী প্রলাপ বকছেন?' ভাস্কর ছটফট করে উঠল : 'আপনার মেয়ে জানেন? তাঁর এ বিয়েতে মত আছে?'

'রুচিরার মত না থাকলে তোমাকে বলতে সাহস পেতাম কী করে?' সে রাজি আছে বলেই তো—'

'কিন্তু কেন? আমি কেন? আমি কে?' ভাস্কর প্রায় আর্তনাদ করে উঠল : 'রূপে-গুণে উজ্জ্বলন্ত মেয়ে, কোথায় রাজার ঘর আলো করবে, তার জন্যে কিনা আমারই ভাঙা বাড়ি ঠিক করলেন? আমি কোথাকার কে এক হরিপদ কেরানি—'

হঠাৎ ঘরের আলো অন্ধ হয়ে গেল, সমস্ত কিছু মুছে গেল, ডুবে গেল অন্ধকারে।

বেশিক্ষণ নয়।

কতক্ষণ পরেই আবার আলো জ্বলল। ঘরে আলো হতেই শোনা গেল জগৎপতিকে : 'কিন্তু তুমি মহৎ। তুমি বিশ্বাসযোগ্য। তবে এই সর্ত, তুমি এক বছর বাদে বিয়ে আবার নাকচ করে দেবে। ডিভোর্স দিয়ে দেবে রুচিরাকে।'

এতক্ষণে যেন পায়ের তলায় মাটি পেল ভাস্কর। 'তাই বলুন। এক বছর পর বিয়ে আবার ভেঙে দিতে হবে!'

'এক বছর না হোক বড় জোর দেড় বছর।' জগৎপতি মনে মনে হিসেব করলেন।

'মানে বিয়ে করে আবার তা ভেঙে দিতে হবে।' মূঢ়ের মত হাসল ভাস্কর : 'তাও আবার হয় নাকি?'

'খুব হয়। কিছুমাত্র হাঙ্গামা নেই। তোমাকে শুধু তিনবার তিনটি দস্তখৎ করতে হবে। ব্যস, তা হলেই নিষ্পত্তি।'

'শুধু তিনবার?' যন্ত্রের গলায় আবৃত্তি করল ভাস্কর।

'প্রথমে বিয়ের নোটিশে একটা সই, দ্বিতীয় সইটা বিয়ের দলিলে, আর তৃতীয়টা ডিভোর্সের আর্জিতে। কিছু-মাত্র হাঙ্গামা পোয়াতে হবে না তোমাকে।' আশ্বাসভরা দৃষ্টিতে তাকালেন জগৎপতি। যেন কোথাও এতটুকু বালি-কাঁকর নেই আগাগোড়া মোলায়েম।

'কিন্তু—' আবার কোথায় যেন একটা দুষ্টু কাঁটা খোঁচা মারছে। ঢোঁক গিলল ভাস্কর।

'বলো, হ্যাঁ, যা কিছু প্রশ্ন আছে খোলসা করে নেওয়াই ভালো।'

'আর কিছু নয়', ভাস্কর হাসল : 'বিয়ে নাকচ করার সঙ্গে সঙ্গে চাকরিও নাকচ হয়ে যাবে?'

'বা, তা কেন?' জগৎপতি উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'চাকরির সঙ্গে বিয়ের সম্পর্ক কী? বিয়ে ছুটে গেলেও তোমার পার্মানেণ্ট চাকরি পার্মানেণ্টই থাকবে। অত কথায় কাজ কী! আগে চাকরিতে ঢুকবে পরে তো বিয়ে। সুতরাং চাকরি নেবার পর যদি বিয়েটা না-ও করো—'

'না, না, চাকরির সর্তই তো বিয়ে।' ভাস্কর গম্ভীরমুখে বললে, 'আর কথা একবার দিলে তা রাখতে হবে বৈকি।'

'এইটেই তো কথার মতো কথা।' জগৎপতি আবার আশ্বাসের আলো আনলেন চোখে : 'আর আমি বলছি এতে তোমার ভয়ের কিছু নেই।'

'না, না, ভয়ের কী!' খোলা গলায় হেসে উঠল ভাস্কর।

'লোকসানও কিছু নেই।'

'লোকসান!' ভাস্করের চোখে আনন্দের বিদ্যুৎ খেলে গেল : 'লোক-সানের কথা কে ভাবে?'

'তবে—'

তবু কী যেন ভাবনা থেকে যায় এখানে-ওখানে। ভাস্কর চেয়ার থেকে উঠি-উঠি করতে-করতে বললে, 'দু-চার দিন একটু ভেবে দেখি।'

'কিন্তু তাই বলে চাকরির দরখাস্তটা দিতে কিন্তু দু চারদিন দেরি কোরো না। কালকেই পাঠিয়ে দিও। নিজের হাতে যদি দিতে পারো তাহলে সব চেয়ে ভালো হয়।'

সত্যিই তো, আসলে আমার স্থির হচ্ছে
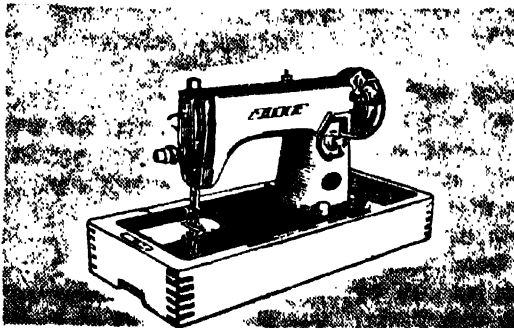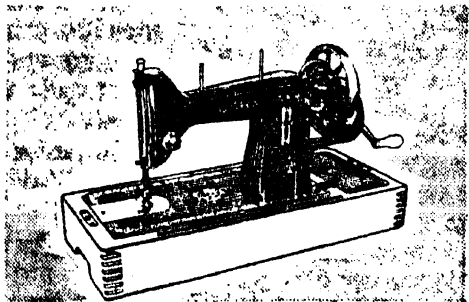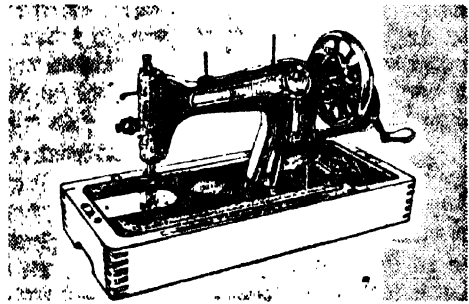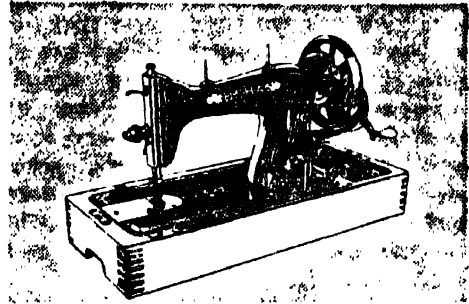
ভাস্কর। কালকেই তো চাকরিটা ধরতে হয়—অন্তত দেখে-শুনে আসতে হয়—যত শিগগির অবহিত হওয়া যায় ততই মঙ্গল। আর চাকরি সম্বন্ধেই যদি সে কৃতসংকল্প হয় তা হলে অন্য বিষয়টা সম্বন্ধে দ্বিধা করার অবকাশ কোথায়?

ভাস্কর ফের শিথিল হয়ে বসেছে লক্ষ্য করলেন জগৎপতি। বললেন, 'এতে ভাববার কী আছে? তোমার কোথাও এতটুকু ক্ষতি নেই, বিপদ নেই। ঝামেলা নেই এক ফোঁটা। একবার নামটা লেখা, আরেকবার নামটা কেটে দেওয়া। বাস, ফুরিয়ে গেল। কেউ কিছু জানতেও পারবে না।'

'জানতেও পারবে না?' চমকে উঠল ভাস্কর।

'না, মানে, বিয়েটা জানতে পারবে, ডিভোর্সটাও জানতে পারবে। সে সব আমিই ব্যবস্থা করব। তা ছাড়া এ তো হয়, হামেশাই হচ্ছে আজকাল। কি, হয় না?'

'হয় বৈকি। সংসারে কী না হয়? এমন সব হয় যা ভাবাও যায় না।' ভাস্কর নিশ্বাস ফেলল।

'এ তো প্রায় ডাল-ভাত। বড় ঘরের মেয়ে একটা হেঁজিপেঁজির সঙ্গে প্রেমে পড়েছে এ শোনোনি তুমি কোনো দিন?'

'কিন্তু এটা কি প্রেম?'

'তাই রাষ্ট্র করতে হবে। আর প্রেমের বিয়ে বছর ঘুরতেই ভেঙে যাচ্ছে এও এমন কিছু আশ্চর্য নয়। লোকে শর্তের কথা কী করে জানবে? সে তো আর লেখা-পড়া হচ্ছে না। সে আমাতে-তোমাতে। লোকে জানবে বিয়ের পর বনিবনা হয়নি, বড়লোক-গরিবের বিয়েতে এ রকম অমিল হয়েই থাকে—তাই ডিভোর্স হচ্ছে। এতে অত ঘাবড়াবার আছে কী! লোকের এ ক্ষেত্রে অন্য অনুমানের অধিকার নেই। আইনই দেবে না সে অধিকার।' জগৎপতি টেবলের ধারটা ধরলেন মুঠ করে।

'আইন?'

'হ্যাঁ, আইন। যখন তোমার বিয়ে, তোমার স্ত্রী, তোমারই সমস্ত।'

'আবার সেই সমস্ত দিয়ে দিতে হবে জলাঞ্জলি।' ম্লান মুখে হাসল ভাস্কর।

'তা দিলেই বা। যা তোমার প্রাপ্য নয়, ন্যায্য নয়, তা তুমি রাখবে কেন?' জগৎপতি বিস্ময়ের ভাব করলেন: 'তা তুমি বিদেয় করে দেবে। তুমি যেটুকু করবে সবই পরিত্রাতার ভূমিকায়। তার জন্যে তোমার টাকা, চাকরি—'

'টাকা?' কথাটা যেন ভুলে গিয়েছিল ভাস্কর, প্রায় উছলে উঠল।

'হ্যাঁ, বলেছি তো, নগদ দশ হাজার—বিয়েতে পাঁচ, বিচ্ছেদে পাঁচ। আর স্থায়ী পাকাপোক্ত চাকরি। এ প্রায় রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া জমিদারি—এ কি কেউ ছাড়ে?'

কিন্তু সেই সঙ্গে তার বদলে, আরো কত বড় জিনিস ছেড়ে দিতে হবে তার কে হিসেব রাখে?

'কেউ ছাড়ে না। এত বড় একটা সুযোগ আসে না হামেসা। আচ্ছা,' চেয়ার ছেড়ে উঠল ভাস্কর: 'মানে পরোপকারের সুযোগ।'

'তবে তোমার ফাইন্যাল কথাটা জানতে পারব কবে? কাল? নতুন চাকরিতে জয়েন করবার পর?'

'আমার মাকে জানাই। তিনি কী বলেন—'

'না, না, মাকে জানানোর দরকার নেই।' শত মুখে 'না' করে উঠলেন জগৎপতি: 'তাঁকে জানিয়ে লাভ কী? তিনি যদি মত না দেন?'

সত্যিই তো, কিছুই হয় না তা হলে। চাকরিটাও হয় না।

'সব ছেলেই মাকে জানিয়ে প্রেম করে নাকি? না কি বিয়ে করে? একেবারে বউ নিয়ে গিয়ে মাকে প্রণাম করে। রাখো,' প্রায় ধমকে উঠলেন জগৎপতি: 'মাতৃ-ভক্তি দেখাতে হবে না। তোমার মাকে যা বলবার আমি বলব।'

'বা, তা হলে তো কথাই নেই।' দরজার দিকে এগুলো ভাস্কর।

'তা হলে নতুন অফিসটা যাচাই করে কালকেই আমাকে ফাইন্যাল কথা দিচ্ছ।'

'দেখি—'

'বেশ, কাল না হলে পরশু।' দৃঢ় হলেন জগৎপতি।

'পরশু।'

ভিতরে-বাইরে আকুল চোখে তাকাল ভাস্কর। যার জন্যে এত, সে কই? তাকে কি একবার দেখা যায় না স্বচক্ষে? বিয়ে হবে কি কনেকে দেখতে না দিয়ে? অন্ধকারে রেখে?

সেই কবে একবার দেখেছিল ঐ বৈঠকখানায়। যেন একটা বিদ্যুৎ আকাশ থেকে মাটিতে পড়ে কি কারণে শূন্যে মিলিয়ে যেতে পারেনি, খাড়া হয়েই দাঁড়িয়ে রয়েছে। আরো দু একবার দেখেছে হয়তো রাস্তায়, মোটরে। রাস্তা দিয়ে কে হাঁটছে ফিরেও তাকায়নি। আজ, এখন, একবার দেখা হয় না? দেখতাম চোখ দুটো কতটা উদাসীন। আর বিদ্যুৎ জুড়ে কটা মেঘের পলস্তারা।

ভাস্করের ঔৎসুক্যকে ধরতে পেরেছেন জগৎপতি। বললেন, 'রুচিরার শরীরটা ভালো নেই।'

'না, না, তাকে বিরক্ত করে লাভ কী। সবই তো কাগজ-কলমের ব্যাপার।' হাসতে-হাসতে বেরিয়ে গেল ভাস্কর। 'দলিলের লীলাখেলা।'

'কাল তবু একবার আমার সঙ্গে দেখা কোরো। হ্যাঁ, আর, যা বললাম তা যেন আর কাউকে প্রকাশ কোরো না।'

'আমি কি পাগল? নিজের পায়ে কুড়ুল মারি? জানাজানি করে ফাঁসিয়ে দিই মামলাটা?' ভাস্কর একটু বা মিনতি ঝরাল কণ্ঠে: 'আপনিই যেন আর কাউকে বলবেন না।'

বাড়িতে ফিরলে মহালয়া জিগগেস করলেন ব্যাপারটা কী।

'একটা চাকরি দিতে চায়।'

'সে কী?' চমকে উঠলেন মহালয়া: 'কত মাইনে?'

'সাড়ে তিন শো চারশো—' যেন গায়ে লাগে না এমনি ভাবে ভাস্কর বললে।

'কী সর্বনাশ! এত?' মহালয়া চোখ প্রায় কপালে তুললেন: 'হঠাৎ তোর প্রতি এত দয়া?'

দিব্যি গোপন করল ভাস্কর। বললে, 'একবার আমার চাকরিতে সার্টিফিকেট দেয়নি চাওয়া সত্ত্বেও, তাই হয়নি সেই চাকরিটা। তারই প্রায়শ্চিত্ত করল বোধ হয়।'

'লোকটা ভালো।' রায় দিলেন মহালয়া।

'ভীষণ ভালো।' সায় দিল ভাস্কর: 'প্রথম-প্রথম ঠিক বোঝা যায় না।'

১০

হোক অসুস্থ, তবু রুচিরার সঙ্গে কথা না বলে কিছুই করা যাবে না।

'চাকরি কেমন দেখলে?' জিগগেস করলেন জগৎপতি।

'সব ঠিক হয়ে ছিল। দরখাস্তটা দিতেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দিয়ে দিয়েছে।'

'তাই দেবে। তেমনি বলা ছিল। স্টার্টিং কত দিল?'

'সাড়ে তিন শো।'

'তাই বা ক'জনে দেয়। তিন মাস পরেই চারশো দেবে দেখো।' জগৎপতি একটু অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করলেন: 'তোমার মাকে বলেছ?'

'বলেছি।'

'কী বললেন?'

'বললেন, এবার আর কোনো কথা শুনব না, বিয়ে করে বউ এনে দিতেই হবে আমাকে।'

'তাই বলো!' সশব্দে হেসে উঠলেন জগৎপতি। 'কবে জয়েন করছ?'

'করছি শিগগিরই। কিন্তু—'

'কিন্তু কী, বলো।'

মিস চ্যাটার্জির সঙ্গে নিভৃতে

একবার দেখা করা দরকার।' ভাস্কর মুখেমুখে সারল্য আনবার চেষ্টা করল : 'আপনিই বলুন, আমার অবস্থায় পড়লে একবার না দেখা করে পারতেন? না তাঁর মুখের কথাটা একবার শুনতেন না স্বকর্ণে? মন খোলসা করতেন না?'

তা আর বিশ্লেষণ করবার কী আর এর মধ্যে মনেরই বা প্রবেশ কেন যে তাকে পরিষ্কার করে নিতে হবে? এ তো শুধু কটা দস্তখতের কারিকুরি। তবু পুরুষের কৌতূহল কী বস্তু তা জগৎপতি বোঝেন। সুতরাং ভাস্করের প্রস্তাবে অসংগত কিছু নেই। তবু উকিলিবিদ্যায় পারংগম, একটু অন্যরকম করে না বলে পারেন না থাকতে। তাই বললেন, 'এ তো নেগোশিয়েটেড ম্যারেজ। এ রকম ক্ষেত্রে বর-কনের প্রথম দেখা তো বিবাহ-সভাতেই হয়ে থাকে। আগে আর হয় কবে?'

'এখানে বিবাহ-সভাটা কোথায়?'

'রেজেস্ট্রি-অফিসে।'

'বিয়ে যখন রেজিস্ট্রারি করে তখন এটাই ধরে নিতে হবে বিয়ের আগে থেকেই পার্টিদের জানাশোনা।' লঘু সুরটাই বজায় রাখল ভাস্কর : 'নইলে আকস্মিকভাবে দুজনে একদিন বিয়ে-আফিসে এসে পড়েই বলা নেই কওয়া নেই দলিলে দস্তখত করে দিয়ে স্বামী-স্ত্রী সাজল এটা বোধহয় নাটকেও চলে না।'

'তা অন্যায় বলোনি।' তর্ক আর বাড়ালেন না জগৎপতি। সন্দেহ কি, তুরুপের তাস ভাস্করের হাতে। এখন এক ধার থেকে সব পিট নেবারই মালিক সে নিঃসন্দেহ। তাই আর কাটা-খোঁচা না রেখে বললেন সহজ সুরে : 'তাহলে তুমি একটু বোসো, আমি ওকে খবর দিই।'

'খবর দেবেন মানে—' ব্যাপারটা প্রাঞ্জল করতে চাইল ভাস্কর।

'মানে, দেখে আসি ও এখনই দেখা করতে প্রস্তুত কিনা, না, কি দেখা করার অন্য সময় ঠিক করে দেবে।'

মুহূর্তে মাথার মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল। ভাস্কর মেঝের দিকে তাকিয়ে বললে, 'সেই সংগে স্থানটাও ঠিক করে নেবেন।'

'স্থান? স্থান আবার কোথায়! স্থান তো এখানেই, এ বাড়িতেই।'

'না। আমার মনে হয়, দেখাটা আমার বাড়িতেই হওয়া দরকার।'

'তোমার বাড়িতে?' যেন জগৎপতির পিঠে কে ছোরা বসাল।

'সেইটেই তো সমীচীন। যেহেতু এক্ষেত্রে প্রার্থী আমি নই, প্রার্থী উনি।

একটু বা রুক্ষ শোনাল ভাস্করকে : 'যে প্রার্থী সেই যায়, সেই সাধে। আর যে দেয়, যে প্রার্থনা পূরণ করে, সে নড়ে না, সে তার নিজের জায়গায় বসে থাকে। সুতরাং এক্ষেত্রে মিস চ্যাটার্জিই যাবেন আমার কাছে, আমার বাড়িতে, তাঁর আবেদন নিয়ে। সেইটেই শোভন, সেইটেই সম্ভ্রান্ত। বলুন, ঠিক বলছি না? আর্জি নিয়ে, দরখাস্ত নিয়ে প্রার্থীই কোর্টে যায়, কোর্ট কি আর প্রার্থীর বাড়িতে আসে?'

'তা কমিশনে জবানবন্দি নিতে কোর্টও বাড়িতে আসে বৈকি।' গভীরে একটু বুঝি বিরক্ত হলেন জগৎপতি। 'তাছাড়া তোমার বাড়িতে জায়গা কোথায়?'

'তা যা জায়গা আছে তাই যথেষ্ট। একটা কথা সারতে আর কত জায়গা লাগে?'

'না, না, আমি বলছি একটু কম্ফর্টেবলি বসে অন্য দু-চার কথার মধ্যে বিষয়টা পাড়লেই ভালো হয়।'

অভিমানের ছোঁয়াচ এখনো বুঝি সম্পূর্ণ কাটল না স্বর থেকে। ভাস্কর বললে, 'সোফা-কোচ না থাকলেও কম্ফর্টেবলি বসা যায় হয়তো। তা ছাড়া, বিস্তৃত আলাপ করবার অবকাশ এখন কোথায়, প্রয়োজনই বা কী। যে ঘটনাটা ঘটতে চলেছে তাতে ও'র সম্মতিটা কত-দূর তাই একটু যাচাই করে নেওয়া। আমি জানি আপনি ও'র ঠিকই প্রতি-নিধিত্ব করছেন তবু ও'র সংগে যে একটা সাক্ষাৎ বোঝাপড়া দরকার তা অস্বীকার করতে পারেন না। সেক্ষেত্রে কথাটা নিশ্চয়ই খুব সংক্ষিপ্ত হবে, দ্রুত হবে—'

চাকরিটা বাগিয়ে নিয়ে সরে পড়তে চায় নাকি? কিন্তু, না, তা কী করে হয়? মুখ-চোখের তেমন চেহারা নয়, আর, তা ছাড়া, স্বরে যুক্তি নেই এমন কথাও বলা যায় না। জগৎপতি সুর বদলালেন। 'এখুনি যদি ও যায়, তোমার মা যে দেখে ফেলবেন। কী ভাববেন তিনি? কী বোঝাবে তাঁকে?'

ভাস্কর এক মুহূর্তও দেরি করল না ভেবে নিতে। বললে, সময় আগে থেকে ঠিক করা থাকলে সে সময় মাকে অন্যত্র পাঠিয়ে দেব।'

'কিন্তু,' গলা নামালেন জগৎপতি :

'প্রতিবেশীরা তো আছে। তোমাদের পাশেই তো আরেক ভাড়াটে। কে কী দেখে নিয়ে কী সন্দেহ করবে, সুরু করবে ফিসফিসানি, বলা সয় না। ব্যাপারটা যত গোপনে রাখা যায়, যত চুপচাপ—'

'তবু, তাই বলে—' ভাস্কর আবার কী আপত্তি তুলতে চাইল। একটা ভিক্ষুক-ভিক্ষুক ভাব করে সে যাবে নিচু হয়ে এই ভঙ্গিটা সে কিছুতেই তার মর্জির সংগে পাচ্ছে না খাপ খাওয়াতে।

জগৎপতি আর দেরি করলেন না। তর্কে না থেকে সরাসরি মিনতিতে নেমে এলেন। বললেন, 'ওর অবস্থাটা তো তুমি সহজেই বুঝতে পারো। দেহে-মনে একে-

যায়ে ভেঙে গিয়েছে। এত বড় বিশ্বাস-ঘাতকতা কেই পারে ক্ষমা করতে? সর্বক্ষণ দু হাতে মুখ ঢেকে রেখেছে।'
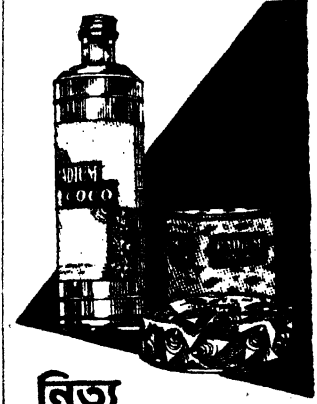
শুধু এইটুকুতেই হল না, তবে না—বুঝে নিলেন জগৎপতি। বললেন: 'খালি কাঁদছে, চুল ছিঁড়ছে, দেয়ালে মাথা কুটছে। স্নান করছে না, খাচ্ছে না, ঘুমুতে পাচ্ছে না। শেষকালে মরে যাবে মেয়েটা? শুধু ক্ষণিক একটা ভুলের জন্যে, এত বড় একটা জীবন ছারখার হয়ে যাবে? বলো আমি তাই হতে দেব? আমার যে আর কেউ নেই—' ভাস্করের কাঁধে হাত রাখলেন জগৎপতি।

'বা, আমি তো প্রায় রাজিই।'

'আমি তা জানি। তুমি দয়ালু, তুমি মহানুভব, তুমিই প্রগতিপন্থী। এই দয়াতেই তোমাকে আরো একটু উদার হতে হবে। মেয়েটা যে সত্যিই অসুস্থ, অক্ষম। অন্তত সেই কারণেই যদি একটু ক্ষমা করো—'

এক মুহূর্ত স্তব্ধ রইল ভাস্কর। বললে, 'বেশ, এইখানেই দেখা করব। তবে সময়টা কখন হবে—'

আর জট পাকালেন না জগৎপতি। বললেন, 'সময় আর কী। এখুনি, এখুনিই তো হতে পারে। সবই যখন ঠিক, তখন দেরি করার মানে হয় না। তুমি এস, চলে এস আমার সঙ্গে উপরে। এখুনি আলাপ করিয়ে দি।'

সিঁড়িতে পা ফেলে-ফেলে উঠতে লাগলেন জগৎপতি।

আশ্চর্য ভাস্করও চলতে লাগল পিছু-পিছু।

এটা কী রকম হচ্ছে কে জানে। ভাগ্যের মুখ হিংস্র না গম্ভীর না পরিহাসতরল তাই বা কে বলবে। নিজের বেশবাস, ক্লান্তি-গ্লানির কথাও একবার চেষ্টা করল ভাবতে, ভাববার কিছু প্রয়োজন আছে কিনা তাও ভেবে পেল না। ও পক্ষেও কোনো উদ্যোগ নেই, আয়োজন নেই। সজ্জা-চেষ্টা তো দূরের কথা। তবু দুজনের দেখা হবে। আর, এই কিনা প্রথম দেখা।

'চলে এস।' উপরে ঘরে যে আছে তাকে অবহিত করবার উদ্দেশ্যে হাঁক পাড়লেন জগৎপতি: 'রুচি ঘরেই আছে। কোথায় আর যাবে এ সময়। হ্যাঁ, ঠিক আছে, চলে এস।'

কোথায় চলেছে ভাস্কর? কাকে দেখতে! কাকে পেতে কাকেই বা আবার ছেড়ে দিতে!

পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকলেন জগৎপতি। 'এই যে তুই আছিস। সেই যে বলছিলাম—সেই ভাস্কর, ভাস্কর বোস এসেছে।' পর্দায় বাইরে অপেক্ষা করছিল ভাস্কর, তাকে লক্ষ্য করে জগৎপতি বলে উঠলেন, 'এস, এ ঘরে এস। তোমাদের কথাটা সেরে নাও। ক্লিয়ার করে নাও। হ্যাঁ, সব কিছু ক্লিয়ার করে নেওয়া ভালো। শেষে কোনো না ছিচ্ হয়—'

খাটের উপর আধশোয়া অবস্থায় বসে রুচিরা জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল। দেখছিল বিকেল কেমন করে সন্ধ্যায় মিলিয়ে যায়, সন্ধ্যা কেমন অন্ধকারে। একটা হলদে রোদের ফালি কেমন এতক্ষণ ও পাশের বাড়িটার গায়ে স্বপ্নের মত লেগে ছিল, কেমন আস্তে-আস্তে সেটা বেগনি হতে-হতে ছাই-ছাই রঙের হয়ে গেল। আর বুঝি তাকে দেখা যাবে না, খুঁজে পাওয়া যাবে না, মরা দেয়াল সেই মরা হয়েই থাকবে। হঠাৎ বাবার ডাকে ধড়মড় করে উঠল রুচিরা। চকিতে একটু টানাটান করে নিল শাড়িটা, ভঙ্গির শৈথিল্যটাকে শাসন করল। আর কে একটা অচেনা বন্য জন্তু ঘরে ঢোকে তা দেখবার জন্যে দুই চোখের সন্দেহকে তীক্ষ্ন করে তুলল।

ভাস্কর ঘরে ঢুকতেই জগৎপতি বললেন, 'বেশ নিরিবিলি আছে, তোমাদের বোঝাপড়াটা করে নাও। নিশ্চিত হয়ে। আমি যাই।' বলে তাকালেন রুচিরার দিকে: 'ইনিই সেই ভাস্কর। যে অর্থে সূর্য অন্ধকার দূর করে, আরোগ্য নিয়ে আসে, ও সেই অর্থেই ভাস্কর।' আর পরে ভাস্করের দিকে তাকিয়ে: 'বুঝতেই পাচ্ছ ইনিই রুচিরা, আমার মেয়ে, আমার একমাত্র সন্তান।' বলে আস্তে-আস্তে খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন জগৎপতি।

ঘরের মধ্যে চুপ করে রইল দুজনে। স্তব্ধতা কোনো কালে এমন চেহারা নিতে পারে ভাবতেও পারত না কেউ। ঘরের মাঝখানে ভাস্কর দাঁড়িয়ে, আর রুচিরা খাটের উপর বসে, পিছন ফিরে, জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে। কেউ কাউকে চেনে না, কে কী বলবে বা কেমন করে বলবে জানা নেই, শুধু এক ঘর শূন্যতা এক পিণ্ড পাথর হয়ে যাচ্ছে ক্রমে-ক্রমে। যেন কোথাও আরম্ভ নেই সমস্তটাই সমাপ্তি দিয়ে ভরা।

দূর ছাই, আমার বয়ে গেছে দাঁড়িয়ে থাকতে। চঞ্চল হয়ে উঠল ভাস্কর। যার কাঁদবার কথা, সাধবার কথা, মুক্তির মূর্তিবতী আকৃতি হয়ে ওঠবার কথা সে বিমুখ হয়ে বসে থাকবে আর আমি ধানাই-পানাই করব এ অসম্ভব।

'দয়া করে পর্দাটা টেনে দিন।' মুখ না ফিরিয়েই বললে রুচিরা।

ভাস্কর চলে যাবার জন্যেই বুঝি এগিয়েছিল দরজার দিকে, এখন কথা শুনে পুনরু করে পর্দাটা টেনে দিয়ে খাটের অনেক কাছে এসে দাঁড়াল।

'বসুন।' ঘাড় ফিরিয়ে হাত বাড়িয়ে চেয়ার দেখাল রুচিরা।

ভাস্কর বসল কাছাকাছি। ব... 'কিন্তু আপনি যদি মুখ ফিরিয়ে ... তবে কার সঙ্গে কথা কইব?'

তবু নিঃসাড়ের মত বসে রইল ... মনে।

'ভাগ্যের প্রহারে আমাদের মুখ যত... বিকৃত হোক,' ভাস্কর বললে, 'আমরা সেই মুখেই পরিপূর্ণ সম্ভাষণ করব পৃথিবীকে। আমরা পরাজিত নই কিছুতেই।'

রুচিরা মুখ ফেরাল।

সন্ধ্যা হব-হব করলেও ঘরে আলো ছিল, যে-আলোতে ধীরেসুস্থে সব কথাটাই বলে নেওয়া যায়। কিন্তু অস্থির হয়ে উঠল ভাস্কর, জিগগেস করল, 'আলোর সুইচটা কোথায়?'

সেটা আবিষ্কার করা কিছু কঠিন নয়, শুধু পরোক্ষে জেনে নেওয়া আলো জ্বালতে রুচিরার আপত্তি আছে কিনা।

না, নেই। সুইচটা দেখিয়ে দিল রুচিরা।

আলোটা জ্বালতেই রুচিরা ঝলমল করে উঠল। সমস্ত ধূসর সোনার রং ধরল। উজ্জ্বল আর মধুর বেজে উঠল একসঙ্গে।

কিন্তু আলোতে তো শুধু দেখা নয়, নিজেকেও দেখানো। ভাস্কর তাকাল অন্যদিকে।

রুচিরা জিগগেস করলে, 'আপনি নতুন চাকরিতে জয়েন করেছেন?'

'করিনি এখনো।'

'দেখবেন।' যেন সাবধান করে দিচ্ছে রুচিরা। 'ভালো করে খোঁজ-খবর নিয়ে নেবেন।'

'খোঁজ-খবর?'

'হ্যাঁ, যেন শেষে না ঠকেন।' দীর্ঘ বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল রুচিরা: 'চারদিকেই স্বার্থপরের ভিড়। আর, সেই টাকাটা পেয়েছেন?'

'টাকা?'

'যে নগদ দশ হাজার টাকা দেবার কথা—পাঁচ হাজার এখন আর পাঁচ হাজার পরে—দিয়েছে প্রথম কিস্তি?'

'দেয়নি এখনো।'

'আগে নিয়ে নেবেন। নগদ নেবেন। আগাম নেবেন। চেক-টেক বিশ্বাস করবেন না।'

'না, না, সে কী অবিশ্বাসের কী আছে?' কুণ্ঠায় কালো হয়ে গেল ভাস্কর।

'তবু সাবধান থাকা ভালো।' কালো চোখের কোলে একটু বুঝি মমতার

আভাস আনল রুচিরা : 'আগের চাকরিটা হুট করে ছেড়ে দেবেন না।'

'না, আমি কয়েক দিনের ছুটি নেব। ছুটি নিয়ে দেখব নতুন চাকরিটা সরল কিনা, মজবুত কিনা।' হাসল : 'ও সব আপনি কিছু ভাববেন

...র সঙ্গে সম্পর্ক হবে, আশ্চর্য, তার প্রথম আলাপে কী সব কথাবার্তা! ...গ্যকে বলিহারি। এমন কথা কোনো শাস্ত্রে, কোনো ইতিহাসেই বুঝি লেখা নেই। কিন্তু কী করা যাবে, আনন্দ তো আর সবার কাছে এক পোশাকেই আসে না। আনকোরা নতুন পোশাক যদি না পায়, বাসি মলিন পোশাকে এলেও কম সুন্দর লাগে না মাঝে-মাঝে।

'তা ছাড়া, চাকরির বিপদ হলেও বা কী এসে যায়!' একটু বুঝি স্ফূর্তির টান আনল ভাস্কর : 'এমন যার শ্বশুর তার যোগ্য ব্যবস্থা হবেই।'

'শ্বশুর?' হঠাৎ যেন চমকে উঠল রুচিরা।

'বাঙলা ভাষায় তো তাই-ই বলে জানি।'

চোখ পড়তেই হঠাৎ আবার মুখ ফিরিয়ে নিল রুচিরা।

'সেই কথাটাই তো আমি জানতে এসেছি আপনার কাছে।' চেয়ারটা আরো একটু কাছে টেনে আনল ভাস্কর : 'আমাকে কেন নির্বাচিত করলেন?'

এতটুকু অপ্রস্তুত হল না রুচিরা। বললে, 'একজনকে নির্বাচিত করতে হতই।'

'কিন্তু আমাকে কেন?'

'তা জানি না। আপনি বাবার নির্বাচন।'

'কিন্তু আপনার যিনি নির্বাচন ছিলেন তিনি কোথায়?' ভাস্করের কথার টানে একটু বুঝি বা ঝাঁজ ফুটে উঠল।

'জানি না। শুনেছি তিনি বিলেতে চলে গিয়েছেন। এত বড় অসৎ, যাবার সময় দেখা পর্যন্ত করল না। দেখা করা দূরের কথা, জানালও না চলে যাচ্ছে। গিয়ে একটা চিঠিও লিখল না। অফিস থেকে নাকি পাঠিয়েছে, বাবা ঠিকানা এনে দিলেন। কত লেখালেখি, কত তার-বেতার, কোনো সাড়া নেই শব্দ নেই কিছু নেই—'

'তার নাম কী?'

রুক্ষ রেখায় করুণ করে হাসল রুচিরা। বললে, 'সে যখন পুরুষ তখন তার নাম অদৃষ্ট। আর সে যদি মেয়ে হত তার নাম হত নিয়তি।'

ভাস্কর ভেবেছিল এইখানে রুচিরা কান্নায় ভেঙে পড়বে, যে অপমানের প্রতি-বিধান নেই তারই বিরুদ্ধে নিষ্ফলের দেশে আর্তনাদ করবে। কিন্তু তা নয়, স্বরে দৃঢ়তা আনল রুচিরা। বললে, 'অদৃষ্ট যখন জীবনকে ধরে বেঁধে মারে তখন জীবন সেই অদৃষ্টকে অস্বীকার করতে চায়, অতিক্রম করতে চায়। শত মার সত্ত্বেও সেই বন্ধন মেনে নিতে চায় না, কিছুতে না। চায় বেরিয়ে আসতে। মুক্ত হওয়া মুক্ত থাকাই জীবনের একমাত্র কাম্য। আমিও তাই মুক্ত হতে চাই; আর সম্প্রতি আমার সেই মুক্তির উপায় আপনি।' অসংকোচ দৃষ্টির পরিপূর্ণ প্রার্থনা এবার রাখল ভাস্করের মুখের উপর।

ভাস্কর বললে, 'এ ছাড়া আর কোনো উপায়, আর কোনো পথ ছিল না?'

'ছিল হয়তো কিন্তু কোনোটাই এ রকম সম্ভ্রান্ত বা নিরাপদ নয়। আপনি কি আমাকে আত্মহত্যা করতে বলছেন?' একটু হাসল রুচিরা।

'না, না, অসম্ভব।'

'বাঁচবার পথ যদি একান্তই না পাই তখন দেখা যাবে। আর শত দুঃখে-দৈন্যে জীবনে-বঞ্চনায়, সব অবস্থায়ই বাঁচবার পথ আছে এ আমার বিশ্বাস।'

'আমারও।'

'আরেক পথ ছিল আইনের বিরুদ্ধতা করা, তাতে বাবার ভীষণ আতঙ্ক।'

'নিশ্চয়। তাতে শুধু মৃত্যুরই ভয় নয়, মৃত্যুর উপরে আবার জেলের ভয়।'

'আরো একটা পথ ছিল। সে হচ্ছে বাড়ি থেকে একেবারে পথে নেমে আসা। নিরাশ্রয় সাজা। তারপর কোনো হোম্-এ গিয়ে ওঠা। তা আমি যাব কেন?' অনেকক্ষণ খাড়া হয়ে বসে ছিল এবার একটু হেলান দিল : 'আমার এত বড় বাড়ি, এত সব বিষয় এ আমি কেন ত্যাগ করতে যাব? জীবনের প্রথমে কোথাও একটা ভুল করেছি, তাই বলে কি বাকি জীবন ভোগের বার হয়ে গিয়েছি? একটা তুচ্ছ হঠকারিতার শাস্তি কি সমস্ত জীবন পঙ্গু করে দেওয়া?'

'না, না, কিছুতে নয়।' সব দিক থেকে সায় দিতে পারছে জেনে শান্তি পেল ভাস্কর।

'তাই দেখছেন এ নতুন অভিনব পথটাই সবচেয়ে নিরীহ, সবচেয়ে মান-নীয়।' ভঙ্গিটাতে আর একটু লালিত্য আনল রুচিরা।

শুষ্ক রেখায় হাসল ভাস্কর। 'কিন্তু আমি আশ্চর্য হচ্ছি, আমি এর মধ্যে এলাম কী করে? আমার কী যোগ্যতা ছিল!'

আহাহা, এ আবার জিজ্ঞাসা করতে হয় নাকি? কথাটা বলেই মনে মনে নিজের গালে চড় মারল ভাস্কর। তোমার কাণাকড়িরও যোগ্যতা নেই। না বিদ্যা না বিত্ত না বৃত্তি না জন্ম। আর ঐ তো তোমার চেহারার ছিরি। তোমার একমাত্র যোগ্যতা তুমি গরিব, তুমি একটা হীন-মন্য কেরানি, তুমি একটা মোটাসোটা চাকরি পেলে বর্তে যাও, এক থোকে হাজার টাকা তুমি এখনো দেখনি, আর, সোনার মত সুন্দর এক লোচনলোভন তরুণী দেখলে তুমি লালায়িত হবে। জগৎপতি ঠিক তোমার পরিমাপ বুঝে নিয়েছেন। আর তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সাড়ম্বরে শুনতে চেয়ো না।

'আপনি আদর্শবাদী, তাই বোধহয় আপনাকে বাবার ভালো লেগেছে।' রুচিরা কথাটাকে অন্য আলোয় রাখল। 'মনে হয়েছে নির্ভরযোগ্য।'

'আদর্শবাদী?'

'হ্যাঁ, সেই গোড়াতেই যে বললেন আমার পরাজিত নই কিছুতেই, সেই-খানেই তো আপনার আদর্শবাদের সুর। আর যারা আদর্শবাদী তাদেরই নিশ্চিন্ত হয়ে বিশ্বাস করা চলে। বিশ্বাস করা চলে যে তারা কথা রাখবে, সর্ত পালন করবে।' হাত দুটো তুলে মাথার পিছনে এনে রাখল রুচিরা।

'ও! বছর খানেক বাদে বিয়েটা ছেড়ে দিতে হবে সেই কথা বলছেন?' ভাস্কর বুকের মধ্যে মোচড় খেল : 'সেইটে কি এসেনসিয়েল?'

'বা, সেইটেই তো সমস্ত কথা। সমস্ত কৌশলটাই তো আমার মুক্তির জন্যে। এতক্ষণ তবে কী বলছিলাম আপনাকে? মুক্তি—মুক্তি ছাড়া আর কী আছে!' আবার ভঙ্গি বদলে, লাবণ্যের নদীতে ঢেউ তুলে নড়ে-চড়ে বসল রুচিরা : 'আপনিই বলুন, মুক্তির মত আর দামী কী!'

'তাতো ঠিকই।' ভাস্করকে আবার সায় দিতে হল।

'নর্ম্যালি আপনার সঙ্গে আমার যুক্ত হবার কথা নয়, যা আমাদের সামাজিক বা সাংসারিক অবস্থা। আপনার সাময়িক সম্পর্কটা ধার নিচ্ছি শুধু আমার মুক্তি কিনে নেবার জন্যে। বলুন,' রুচিরার চোখ দুটো জলের ছোঁয়ায় চকচক করে উঠল : 'মুক্তির জন্যে কী মূল্য না দেওয়া যায়! তা ছাড়া—'

চোখ তুলে তাকাল ভাস্কর।

'তা ছাড়া, যে নষ্ট যে খল যে অসাধু তাকে আপনি নেবেন কেন? তার সঙ্গে জড়িয়ে আপনার সুন্দর পবিত্র জীবন কেন বিড়ম্বিত করবেন? না, কখনো না। আমিই তা দেব না হতে। নিজেকে বাঁচাতে পারিনি,' চোখ নিচু করল রুচিরা : 'কিন্তু আপনাকে বাঁচাব।'

উত্তরে ভাস্কর কী বলবে? বাঁচবার কথায় বাঁচাবার কথায় কী বলার থাকতে পারে? আর জীবনকে সুন্দর রাখা, পবিত্র রাখা, অম্লান রাখা—এ সব তো উচ্চাঙ্গের কথা। এতে কারই বা আপত্তি? কিন্তু কেউ নষ্ট-ভ্রষ্ট হলেই সে একেবারে গ্রহণের অযোগ্য হয়ে যায় তাই বা কে বলে? বরং এখন, যেমন মনে হচ্ছে, কারু কারু বেলায় একটু দোষ একটু ত্রুটি একটু কালিমা থাকলেই বুঝি সে বেশি লোভনীয় হয়। তাকে তখন একটু ক্ষমার চোখে দয়ার চোখে শান্তির চোখে দেখতে হয় বলেই সে দর্শনে রূপ বুঝি আরো বেশি ফোটে।

'আমি না হয় সব কথা গোড়াতেই বললাম, কিন্তু এমন যদি হত', চোখদুটি বেদনায় নম্র করল রুচিরা : 'বিয়ের পর আপনি প্রথম জানতে পারতেন যে আপনার স্ত্রী' মুখ ফেরাল রুচিরা : 'আমারই মত বন্দী, তাহলে আপনি নিশ্চয়ই তাকে ক্ষমা করতেন না, নিশ্চয়ই তাকে তখুনি ত্যাগ করতেন, ছুটি দিয়ে দিতেন—'

'বলা যায় না কী করতাম!' সপ্রতিভ মুখ করল ভাস্কর : 'রেখে দিতেও পারতাম।'

'কি, সর্ত থাকলেও?' প্রায় রুখে উঠল রুচিরা।

'না, সর্তের কথা আলাদা।'

'কিন্তু আমার বেলায় সর্ত আছে।' কালো কটাক্ষে হুঁশিয়ারির সঙ্কেত আঁকল রুচিরা।

'সে আমার মনে থাকবে।' উঠে পড়ল ভাস্কর।

'আপনি খুব ভালো!' কী বলবে, এ ছাড়া কী বললে আরো ভালো শোনাতে পারে রুচিরা ভেবে পেল না।

'কিন্তু—' যাই-যাই করেও তখন যাওয়া যায় না এমনি মনে হল ভাস্করের।

'কিন্তু, কী—' ভয়-ভয় চোখে তাকাল রুচিরা।

'কিন্তু, ধরুন,' হাসল ভাস্কর : 'শেষ পর্যন্ত এমন যদি হয় আপনি সর্তটা এনফোর্স করতে চাইলেন না?'

'তার মানে?'

'তার মানে এই বিয়েটা আর ভেঙে দিতে চাইলেন না?'

'না, না, তা কেন?' খাঁচায় আটকানো পাখির মত রুচিরার বুকের ভেতরটা ছটফট করে উঠল। 'আমার চাওয়া-না-চাওয়ায় কী এসে যাবে? শুনুন আমি চাই কি না চাই, সমস্ত অবস্থাতেই আপনার সর্ত আপনাকে পালন করতে হবে।'

'তা তো ঠিকই। কিন্তু জানেন সর্তটা কার্যকর করা সর্ত যে আ[illegible] করে তারই ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।'

'বুঝতে পাচ্ছি না।' জলে-পড়ার ম[illegible] মুখ করল রুচিরা।

'ধরুন আমার ঘড়িটা আপনার কাছে রাখতে দিলাম। সর্ত করে দিলাম যে, সাত দিন পর আপনাকে সে ঘড়ি ফেরত দিতে হবে। সাত দিন হয়ে গেল—'

অস্থির হয়ে উঠল রুচিরা। বললে, 'বা, তক্ষুনি-তক্ষুনি আমি ফেরত দেব।'

'কিন্তু ধরুন, কোনো কারণে আপনার যদি একটু ভুল হয়ে যায়, একদিন দেরি করে ফেলেন—'

'বা, সর্তের জোরে আপনি তা আদায় করে নেবেন।'

'আমিও তো তাই বলছি। যেহেতু সর্ত আমি আরোপ করেছি আমিই তা আদায় করব।' হাসি-হাসি মুখটা আরো সরল করল ভাস্কর : 'কিন্তু ধরুন, দেখলাম সে-ঘড়িটা আপনার পড়ার টেবলের উপর পড়ে আছে, কিংবা আপনার হাতে বাঁধা, তখন আমার ইচ্ছে হতে পারে, ও ঘড়ি আমি আর ফেরত চাইনে, ও ঘড়ি আমি একেবারে আপনাকে দিয়ে দিলাম।'

'আমি তা নেব কেন?' প্রায় যেন জ্বলে উঠল রুচিরা : 'আমি আমার কথা রাখব। আপনার জিনিস ফিরিয়ে দেব আপনাকে।'

'আমি যদি না নিই আপনি কিছুই করতে পারেন না। ঘড়ি আপনি ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারেন বাইরে, ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে পারেন হাতুড়ি মেরে, যা খুশি তাই করতে পারেন, কিন্তু আমি হাত পেতে ফেরত না চাইলে আর ফেরত দিতে পারেন না আমাকে। তেমনি—'

'তেমনি, তেমনি কী?'

'তেমনি, এক্ষেত্রে সর্ত থাকা সত্ত্বেও আপনার ইচ্ছে হতে পারে সর্তটা এন-ফোর্স না করি, যখন আচ্ছাদিত হয়েই গিয়েছি তখন বিয়েটা আর না ভাঙি। মোটকথা', আনন্দের একটু রঙ ছিটোল কথায় : 'মোটকথা বিয়েটা আপনার ভালো লেগে যেতে পারে।'

'তা কী করে হয়?'

'তা হয় না। হওয়া সম্ভব নয়। উচিতও নয় হয়তো।' হাসল ভাস্কর : 'তবু মানুষের মন আর সময়ের কথা কেউ বলতে পারে না। যার সঙ্গে নর্ম্যালি আপনার যুক্ত হওয়ার কথা নয়, তাকেই

হঠাৎ ভালো লেগে গেল। বিয়ে ভাঙার কথা আর মনে রইল না।'

কী লোভী বোকা-বোকা দেখাচ্ছে ...কটাকে। কথাটা একেবারে ব্যক্তিগত ...র তুলেছে। একটু আশ্বাস দিতে হয়, ...ল প্রেরণা আসবে কী করে? তাই ...রা ভাস্করের দিকে চেয়ে অপরূপ ...রায় হাসল। বললে, 'সেই চান্স তো ...ব সময়েই আছে। ভালো যদি লেগে যায় তা হলে কে আর চলে আসে!'

'বলা যায় না। মাঝে মাঝে অসম্ভবও ঘটে যায় জীবনে।'

'নইলে আর জীবন কী!' হাসির ইশারার মদির একটা টান দিল রুচিরা: 'আমি চলে যেতে না চাইলেও হয়তো আপনি তাড়িয়ে দিতে ব্যস্ত হবেন। আপনারই আমাকে অসহ্য মনে হবে।'

'হ্যাঁ শুনেছি কখনো কখনো দরিদ্রের পেটে অমৃত সহ্য হয় না।'

'তখন দেখবেন সর্তটা ছিল বলেই বাঁচোয়া।' খাট থেকে নামবার উদ্যোগে একটি ভঙ্গুর ভঙ্গি করল রুচিরা।

বড্ড বেশিক্ষণ একসঙ্গে থাকছে না? এণাক্ষী এল তদারক করতে। এসেই এক মুহূর্তে আপাদমস্তক দেখে নিল ভাস্করকে।

'আমার মা' বলে পরিচয় করিয়ে দিল না রুচিরা। আর এণাক্ষীর মূর্তিতে এখন শুধু তিক্ততার ঝাঁজ। এমন ভাব দেখছে ভাস্করকে যেন সেই আসামী অপরাধী।

'এখন আসি।' সিঁড়ির রাস্তা চিনে এসেছে, তাড়াতাড়ি নেমে গেল ভাস্কর।

'এই ছোঁড়াটা?' খোলা দরজার দিকে উগ্র চোখ পাঠাল এণাক্ষী।

জগৎপতি এসে সামিল হলেন।

'তুমি রাজ্যে আর লোক পেলে না? কোত্থেকে একটা বাজে-মার্কাকে ধরে এনেছ?'

'না, না, ছেলেটা ভালো।' জগৎপতি এক কথায় সেরে দিতে চাইলেন।

'কিন্তু কী কুচ্ছিত দেখতে! বেঁটে, মোটা, চোয়াড়ে-চোয়াড়ে চেহারা—'

'না, না, অমন কিছু মন্দ নয়। তুমি বড্ড বাড়িয়ে বলো। বেশ সুস্থ সবল চেহারা। খাঁটি ছেলে। ভিত-বনেদ মজবুত।' এও জগৎপতি বাড়িয়ে বলছেন কিনা কে জানে।

'এ রকম একটা জংলিকে জামাই করবে?' প্রায় কেঁদে ফেললেন এণাক্ষী।

'এ তো আর চিরকালের জন্যে হচ্ছে না। বড় জোর বছর দেড়েকের জন্যে হচ্ছে। তারপর ছেড়ে দিচ্ছে রুচিকে, ভেঙে দিচ্ছে বিয়ে।' জগৎপতি দেখলেন রুচিরা অন্ধকারে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে তাই এণাক্ষীর কিঞ্চিৎ সন্নিহিত হলেন গোপনে কথা বলবার জন্যে। এমন একটা বিষয় কথা বলেও সুখ নেই। অথচ স্তব্ধতাটাও ভয়ংকর। বললেন, 'এটা একটা কাগুজে বিয়ে. সমস্ত ব্যাপারটাকে আইনের চোখে সিদ্ধ করবার জন্যে। বিয়েটা যে ফের ভেঙে দেবে, ডিভোর্স করে দেবে সেটাও বৈধ ব্যাপার। আর তাহলেই রাহুমুক্তি। কেউ কোনো কিছু খুঁত ধরতে পারবে না, সম্ভ্রান্ততা সব দিক থেকেই বজায় থাকবে। জীবনে পূর্ণ হয়ে বাঁচবার. নতুন হয়ে বাঁচবার আবার একটা সুযোগ পাবে রুচিরা। সেই সুযোগ ওর জন্যে আবার তৈরি করে দেব। একবার ভুল করেছে বলে আরো একবার করবে না নিশ্চয়।'

'বুঝলাম। কিন্তু ধরো,' চোখ মুখ

ঘোরালো করল এণাক্ষী : 'যদি ও রুচিকে ছেড়ে না দেয়!'

'ছেড়ে না দেয়?'

'যদি ডিভোর্স না করে! বিয়ে না ভাঙে! আইনে তো তুমি ওকে বাধ্য করতে পারবে না। কি, পারবে?'

'না। তা পারব না। শুধু ওর মুখের কথা। ব্যাপারটা কাগজে-কলমে উঠে কাগজে-কলমেই কাটা পড়বে—এই ওর প্রতিশ্রুতি। আমি জানি,' জগৎপতি ভরাট গলায় বললেন, 'ও ওর কথা রাখবে।'

'সকলেই সব কথা রাখল। কিন্তু ধরো যদি না রাখে! যদি বউ আটকায়!' বিভীষিকা দেখল এণাক্ষী।

'তখন অন্য পথ দেখতে হবে। মোট-কথা, যে করে হোক,' চিবুকে কুটিল রেখা ফেললেন জগৎপতি। 'আনতেই হবে ছাড়িয়ে।'

'কিন্তু যদি কোনো কারণে আনতে না পারো, আর যদি ঐ কদাকার লোকটাই পার্মানেন্ট জামাই হয় আমি পাগল হয়ে যাব।' এণাক্ষী হাঁসফাঁস করে উঠল। 'নিশ্চয়ই টাকা দিয়েছে ওটাকে?'

'একটা ভদ্রস্থ চাকরি দিয়েছি। বেশ কিছু নগদ টাকাও দেব বলেছি। নইলে ওর উৎসাহ হবে কেন?' ও কেন এগিয়ে আসবে? কেন ঝক্কি পোয়াতে রাজি হবে? কখনো-কখনো মানুষের সদগুণকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্যেও টাকা কাজ করে। কখনো-কখনো টাকা পাবে বলেই মানুষ পরোপকারী সাজে। আগুনে পর্যন্ত ঝাঁপ দেয়।'

'তার মানে,' কান্নার সুরে আনল এণাক্ষী : 'লোকটা টাকাও খাবে মেয়ে-টাকেও আটকাবে। আমি তাহলে আত্ম-হত্যা করব।'

'অত সোজা নয় আত্মহত্যা।' জগৎ-পতি অলক্ষ্যে বুঝি একবার অন্ধকার বারান্দার দিকে তাকালেন। বললেন, 'তুমি ঘাবড়িয়ো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। ভাস্কর কথা খেলাপ করবার মত ছেলে নয়।'

'আমি বলি কী, তুমি ওরকম গরিব-গুরবো কেরানি-ক্লাশ না ধরে একটি সঙ্গতিসম্পন্ন ভদ্র শিক্ষিতকে ধরো—যেমন সাধারণ অবস্থায় হলে ধরতে। সেইখানে টাকা ঢালো। সেইখানেই মানিয়ে নেওয়াও।'

'এই না হলে মেয়েলি বুদ্ধি।' অন্ধকার বারান্দাকেই বুঝি আবার লক্ষ্য করলেন জগৎপতি : 'এমনিতে যে উপযুক্ত পাত্র সে জেনেশুনে কিছুতেই রাজি হবে না। শুধু টাকাই তার আকর্ষণের বস্তু হবে না কখনো। আর যদি তুমি লুকিয়ে দিতে চাও পাত্রীর অভাবের চেয়েও বেশি হবে। তাছাড়া বিষয়টাকে ব্যক্ত করে কতজনের কাছে তুমি যাচাই করবে শুনি? জানাজানি হয়ে শেষ পর্যন্ত বার লাইব্রেরিতেও ঢি-ঢি পড়ে যাবে। যে পথটা আমি ঠিক করেছি সেইটেই সব চেয়ে বিচক্ষণ। লো-ক্লাশ গরিব কেরানিই টাকার জন্যে উত্তেজিত হবে। আর এখানে জানাজানির ভয়-ডর কিছু নেই। গোড়া-গুড়ি থেকেই দলিলে-প্রমাণে নিখুঁত।'

'তারপর ডিভোর্স হয়ে যাবার পর?'

'তখন আবার নতুন পরিচ্ছেদ।' বললেন জগৎপতি, 'এমনিতে হ্যান্ডি-ক্যাপড মেয়ের চেয়ে ডিভোর্সড স্ত্রীর বাজার দর অনেক বেশি। বিচ্ছিন্ন হয়ে বেরিয়ে এসে রুচিরা আবার নতুন করে পাত্রস্থ হবে। নতুন করে পৃষ্ঠা ওলটাবে।'

'ভগবান জানেন কী হবে!' এণাক্ষী বারান্দা থেকে মুখ সরিয়ে আনল ঘরের মধ্যে। বললে, 'একটিনি করবার জন্যে যে ছেলেটাকে ঠিক করেছ সেটায় রুচির মত আছে তো?'

'আর মতামত!' নিশ্বাস ফেললেন জগৎপতি : 'এখন তো পাত্র লক্ষ্য নয়, এখন লক্ষ্য শুধু তিনটে দলিল। এক, বিয়ের, দুই বার্থ-রেজিস্ট্রেশানের আর তিন বিচ্ছেদের ডিগ্রির। পাত্র ফুটোই হোক আর আস্তই হোক কী যায় আসে!

'কিন্তু যা করতে হয় তাড়াতাড়ি—'

'তাতে আর সন্দেহ কী!' উঠে পড়লেন জগৎপতি।

১১

অফিস থেকে ফিরে ভাস্কর দেখল মা খুব মনোযোগের সঙ্গে একটা চিঠি পড়ছে। লম্বা চিঠি।

'আপনার ছেলেকেই জিগগেস করবেন।' শেষদিকটায় চলে এসেছে মহালয়া : 'সে যদি মানুষ হয় নিশ্চয়ই সে সমস্ত স্বীকার করবে। অসহায় মেয়েকে বাপের বাড়ি ফেলে সরে পড়বে না। অবিলম্বে বিয়ে করে নিজের সমস্ত দায়িত্ব পালন করবে। আপনি মহীয়সীর মাতার মত আপনার ছেলেকে আশীর্বাদ করবেন।'

'কে লিখেছে চিঠি?'

'নাম নেই।'

'নাম নেই? বেনামী চিঠি কে লিখল?' হাত বাড়াল ভাস্কর।

'পড়ে দ্যাখ—' মহালয়ার মুখ থমথম করতে লাগল।

সমস্ত মিথ্যে। ভাস্কর চিৎকার করে উঠবে এই আশা করছিল মহালয়া, কিন্তু কী আশ্চর্য, ভাস্কর চুপ করে রইল। শুধু নিজের মনে বলে উঠল : 'আমিই তোমাকে সব বলতাম।'

'তাহলে এ সব যা লিখেছে সত্যি?'

হাঁ-না কিছুই বলল না ভাস্কর। চুপ করে রইল।

তার মানে তাই।

মহালয়া নিঃশ্বাস ছাড়ল। খুশি-খুশি ভাব করল : 'তাহলে দেরি করছিস কেন? আমার গোপাল এসেছে। গোপালকে নিয়ে আয় উদ্ধার করে।'

এক স্তূপ পাথরের মত অনড় হয়ে বসে রইল ভাস্কর। গায়ের জামাটা খুলে ফেলার কথাও ভুলে গেল।

'তাই সেদিন এই ভালো চাকরিটা জুটিয়ে দিল।' পাশের ঘরে যেখানে ঠাকুর আছে সেদিকে লক্ষ্য করে মহালয়া বললে, 'সবই গোপালের ইচ্ছে। গোপালের দয়া।' যুক্ত করে প্রণাম করল মানসবিগ্রহকে।

এর মধ্যে যে অনিয়ম আছে সহসা দেখতে চাইল না। তবু চোখ এড়াল না ভাস্করকে কেমন যেন একটু শীর্ণ একটু নিস্তেজ দেখাচ্ছে। তাই একবার মহালয়াকে বলতে হল : 'এ যে কেমন করে হল কেমন করে হয় কে বলবে।'

এবারও চুপ করে থাকাই উচিত ছিল হয়তো কিন্তু অন্য অর্থে সত্যের সুর আনল ভাস্কর। 'কখন কী করে যে কী ঘটে যায় কেউ জানে না।'

'তা যা হবার তাই হয়েছে। এখন তা নিয়ে কথা বলা বৃথা।' ভাস্করের কাছ ঘেঁসে দাঁড়াল মহালয়া : 'নতুন চাকরিতে তোর মোট কত মাইনে বাড়ল?'

'প্রায় দু শো।'

'আমি বলি কী, এবার একটু ভালো দেখে বাড়ি ভাড়া কর।' নিজেই তার কারণ দেখাল মহালয়া : 'নতুন বউ আসবে বাড়িতে।'

মাকে আরো একটু উৎসাহিত করতে লোভ হল ভাস্করের। বললে, 'তা ছাড়া যৌতুক বাবদ পাঁচ হাজার টাকা নগদ দিচ্ছেন।'

'বলিস কী! পাঁচ হাজার?' প্রায় ভোর রাতের স্বপ্নের মত মনে হল মহালয়ার : 'ফার্ণিচার দেবে না?'

'তাও বা কোন না-দেবে!'

'তবে সে সব ঢোকাবি কোথায়? তাই বলছিলাম বাড়িটা বদলা। একটু ছিমছাম বড়সড় দেখে ঠিক কর। শ্বশুরকে বললে সেই ঠিক করে দেবে। বড়লোকের একমাত্র মেয়ে, বাপ তার জন্যে কিছু অভাব রাখবে না।' জাহাজ সত্যি কোন বন্দরে এসে থামছে, পায়ের কাছে এসে থামিক বুঝি আজান দেজ

মহালয়া, আলোয়-আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল, বললে, 'নিজের ইচ্ছেয় বর বেছেছে ...য়ে, তার সে-ইচ্ছেকে মেনে নিচ্ছে, ...চ্ছে। আর সে মেয়েই তো একমাত্র ...। তার মানে তুই—তুই-ই সমস্ত মালিক হবি?'

...পালই সমস্ত কিছুর মালিক ...হাসল ভাস্কর।

...গাপাল—সে তো আমারই গোপাল।' ...ার যুক্তকর হল মহালয়া।

যেন একটা সাম্রাজ্য জয় করা হয়েছে এমনি এখন মনোভাব মহালয়ার। শেষ যদি ভালো হয় তাহলে পথের ভালো নিয়ে আর কে মাথা ঘামায়? পথ যতক্ষণ পথ ততক্ষণই মতামত, পথ যখন প্রাপ্তিতে এসে পৌঁছায় তখন একমাত্র আওয়াজ—জয়ধ্বনি। সাফল্যই পথের একমাত্র বিচার।

সান্ধ্য-খেলাধুলো সেরে সোমনাথ বাড়ি পৌঁছুতেই মহামায়া উথলে উঠল: 'জানিস তোর দাদার বিয়ে হচ্ছে?'

মার মুখে-চোখে আনন্দ উপচে পড়ছে বটে কিন্তু সত্যি ব্যাপারটা আনন্দের না আতঙ্কের বুঝতে পারল না সোমনাথ। শুধু বললে, 'সত্যি?'

'কার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে জানিস?'

'কার সঙ্গে? সোমনাথের কী জানবার থাকতে পারে কে জানে।

'সেই যে মিলিটারির সঙ্গে লড়েছিল তার সঙ্গে।'

'সত্যি?' উচ্ছ্বাসে এবার সোমনাথই ছাপিয়ে পড়ল: 'সেই মেয়েটা?'

'মেয়েটা—মেয়েটা কী? শাসন করতে চাইল মহালয়া।

আর কী বলা যায়, কী ভাবে বলা যায় জানে না সোমনাথ। চোখ দুটো কপালে রেখেই বললে, 'সে যে মা সাংঘাতিক সুন্দর দেখতে।'

'হ্যাঁ, খুব সুন্দর।' সায় দিল মহালয়া।

'তুমি দেখেছ?' ভাস্কর জিগগেস করল।

'সেই এক দিন দেখেছি। যেদিন ওদের সেই তিনতলার ভাড়াটে নিয়ে গোলমাল হয়—সেই দিন দেখেছিলাম রাস্তায়।' কী যে অপূর্ব সেদিন দেখছিল তা প্রকাশ করবার মত ভাষা কোথায় মহালয়ার, চোখে মুখে কপালে ভ্রূতে তারই ছবি আঁকল।

'আমি কত বার দেখেছি।' সুতরাং তারই বলবার অধিকার বেশি এমনি ভাব করল সোমনাথ। 'আর, মা, সাংঘাতিক বড়লোক।'

'সেই বড়লোক এখন আমাদের আপনার লোক হবে।' এ নাটকে সোমনাথের কোনো অংশ নেই, তবু তার মাথার চুলে হাত বুলিয়ে তাকে একটু আদর করল মহালয়া।

'কিন্তু জানো মা, আমাদের দলের ছেলেরা বলে, ও খুব অহঙ্কারী।'

'ও কে?' মহালয়া আবার শাসনের ভুরু তুলল।

'যে আমার বৌদি হবে।' লজ্জার ভাব করল সোমনাথ।

'সে বুঝি ও হয়?'

'আর কী সর্বনাম আছে?' লজ্জার ভাব কাটিয়ে উঠল সোমনাথ: 'আগে বৌদি হোক পরে উনি বলা যাবে।'

'কিন্তু তুই অহংকারের কী বুঝিস?' পাড়ার চোখ থেকে দেখা কোনো নতুন আলো ফেলতে পারে কিনা সোমনাথ জানতে কৌতূহল হল ভাস্করের।

সোমনাথ কথার কথা একটা বলেছিল মাত্র, চুপ করে গেল। মহালয়া বললে, 'যে এত সুন্দর দেখতে, যার এত টাকা-পয়সা, তার একটু অহংকার থাকবে এ আশ্চর্য কী। তার একটু অহংকার না থাকলে যেন মানায়ও না। তা ছাড়া ধনী-গুণী বাপের মেয়ে লেখাপড়াও শিখেছে নিশ্চয়—'

'বা, বি-এ পাশ করেছে।' এবার ভাস্করই বুঝি একটু গর্বের টান দিয়ে বসল।

'তারপর আবার বি-এ পাশ!' মহালয়ার প্রায় লটারিতে টিকিট পাবার মতন হল: 'ভগবানের এক সঙ্গে এত দয়া খুব কমই হয়। এত দয়া, এত দান!'

'তা ছাড়া এখানকার তরুণ সমিতির জয়েন্ট সেক্রেটারি।' ভাস্কর বললে, 'ভীষণ পপুলার। কত পরোপকার করেছে, করতে চেষ্টা করেছে। সবাই এক-বাক্যে প্রশংসা করে।' কেন যে অপবাদ খণ্ডন করতে চাইছে, কার জন্যে, নিজেই যেন ভেবে পেল না ভাস্কর। তবু বললে, 'সেবা করতে বস্তিতে-বস্তিতে পর্যন্ত গিয়েছে, মজুরদের জন্যে নাইট-ইস্কুল খুলেছে—'

যদি অহংকারই থাকবে তাহলে জেনে-শুনে সব ঝক্কি-ঝঞ্ঝাট মাথায় নিয়ে গরিবের ঘরের বউ হতে রাজি হয় না।' শেষ রায় দিয়ে দিল মহালয়া।

কোন জানলার কোন কোণে দাঁড়ালে ঐ বড়লোক বাড়িটার এক চিলতে আভাস পাওয়া যায় সোমনাথের জানা আছে। এখন অন্ধকারে কিছু ধরা যাচ্ছে না বটে কিন্তু আকাশের কোন জায়গায় সেই প্রাসাদ, অনুমান করে নিতে দেরি হল না। মনে মনে সেই রঙের প্রাসাদটাকে হাত বাড়িয়ে ধরল সোমনাথ। একেবারে টেনে নিয়ে এল তার ছোট্ট ঘরের মধ্যে।

পরামর্শে সন্নিহিত হল মহালয়া। 'কী ভাবে বিয়েটা হচ্ছে?'

'বুঝতেই পাচ্ছ—সনাতন পথে নয়, চোরাগলিতে। মানে রেজেস্ট্রি করে। আলো নেই বাজনা নেই মিছিল নেই বরযাত্রী নেই। আর জানো তো', মায়ের হঠাৎ নিবে-যাওয়া মুখের দিকে তাকাল ভাস্কর: 'এটাই আজকালকার হিসেবে সব চেয়ে সভ্য রীতি।'

'তা মেয়ের বাড়িতে উৎসব হবে না? প্রীতিভোজ?'

'না হওয়ারই সম্ভাবনা। শত হলেও ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেয়েছে তো।'

'তার মানে?'

'মানে মেয়ে তো আর বাপের মত নিয়ে পাত্র-নির্বাচন করেনি।' বললে ভাস্কর, 'আর সে-নির্বাচন বাপের মাপ-কাঠিতে নিশ্চয়ই কিছু আহা-মরি নয়, তাই—'

'তা বাপ কী করবে? মেয়ে যখন ভালোবেসে একজনকে সম্পূর্ণ বরণ করে নিয়েছে—'

'তাই তো বাপ পারল না অস্বীকার করতে। কিন্তু তার অভিমান হওয়া তো স্বাভাবিক। তাই কোনো উৎসব হবে এমন মনে হয় না।'

'কিন্তু আমার এখানে?'

'বলো কী করতে হবে?' ঢোক গিলল ভাস্কর: 'যেখানে দস্তখৎ করে বিয়ে সেখানে আবার সামাজিকতা কী। লোকজন খাওয়ানোর কথা তুলো না।'

'তা তুলছি না। কিন্তু বিয়ের পর যেদিন বউ এনে ঘরে তুলবি সেদিন সে সময়টায় আত্মীয়স্বজন থাকবে না কেউ? না বললে তারা আসবে কেন?' মহালয়ার স্বরে কান্নার ছোঁয়াচ লাগল।

'কাকে-কাকে বলতে চাও?'

'কেন, তোর মাসীমারা আছে, জেঠতুতো দিদি বৌদি আছে—'

'তারা কী করবে?'

'কেন, বউ ঘরে আসার সময় বউ-বরণ করবে, কিছু মাঙ্গলিক করবে, আশীর্বাদ করবে, বউয়ের সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেবে, বউয়ের মত করে একটু সাজাবে-গোজাবে—আগের থেকে তো তৈরি হয়েই আপিসে যাবে না, আর আপিসে, যেখানে বিয়ে হবে, সেখানে কি সিঁদুর আছে, না প্রসাধনের জিনিস আছে?'

'তা ঠিক, তা ঠিক।' হাসতে লাগল ভাস্কর।

'কি, আপিসেই তো বিয়ে। আর

সেখান থেকেই তো সটান বউকে বরের বাড়ি নিয়ে আসা।'

'তাছাড়া আবার কী। তবে বেশি লোক ডেকো না। ঐ যা বললে, মাসিমা, দিদি আর বউদি—'

'আর পাড়ার মধ্যে যারা আছে?'

'তারা তো পর্দার ফাঁকে উঁকি মারতে আসবে।'

'কিন্তু ফুলশয্যে?'

ফুলশয্যে, না, ভুলশয্যে! কথাটা জিভের ডগায় এসেছিল, রুখে দিল ভাস্কর। বললে, 'ও সব হাঙ্গামা বাধিয়ো না। একে ছোট বাড়ি, জায়গা নেই, তায় দিন-কাল ভালো নয়।'

'দিন-কাল ভালো নয় মানে?'

'ভালো নয় মানে যারা সভ্যভব্য, প্রোগ্রেসিভ, তারা ও রকম শয্যে-টয্যে করে না। করলেও লোক ডেকে করে না।'

'বা, সকলকে ডেকে এনে আমি দেখাব না আমার ভাস্করের কেমন বউ হল? বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী এসে কেমন বসেছে মাটির ঘরে।'

'যার অদৃষ্টে যখন আছে তখন দেখবে।'

'বা, ফুলশয্যের রাত ছাড়া আবার কখন দেখবে? লোকে জিগগেস করলে আমি বলব কী—'

'কিছু বলতে হবে না। যদি বলতে হয় বলে দিও, ও সব লাগে না, ও সব আগেই হয়ে গিয়েছে।' বলেই উচ্চরোলে হেসে উঠল ভাস্কর। হাসিটা যেন ব্যঙ্গের হাসির মত শোনাতে চাইল, কিন্তু নিজেই নিজেকে ব্যঙ্গ করছে এটা কেমন তরো? তাই হাসিটা তাড়াতাড়ি পিষে ফেলে বললে, 'সামান্য কটা যা টাকা পাওয়া যাবে তা যদি ধরে রাখতে না পারি তাহলে কী লাভ!'

মহালয়া নিরস্ত হল। জিগগেস করল, 'বিয়েটা কবে?'

'নোটিশ দেওয়া হয়ে গিয়েছে। আর দিন দশ-বারো পরেই মেয়াদ যাবে নোটিশের। তার পরেই তারিখ ঠিক হবে।'

'তারিখটা আমি জানতে পারব তো?' যেন অনেক কিছু জানায়নি, অনেক কিছুই গোপন করা হয়েছে সেই অভিমানই যেন।

'বা, বউ নিয়ে ঘরে ঢুকব সেদিন, তোমাকে প্রণাম করব দুজনে, আর তুমিই তারিখ জানতে পারবে না?'

মহালয়ার অভিমান জল হয়ে গেল। তরল মুখে বললে, 'দু-দিন আগে যেন জানান্। ওদের খবর দেব তো বউ দেখতে আসতে!'

হ্যাঁ, দিন ঠিক হয়েছে। আগামী বুধবার। বুধবার দুপুরে। বউ নিয়ে বাড়ি আসতে ধরো, বিকেল তিনটে—চারটে।

'আমি ওদের সকালে এসেই না হয় থাকতে বলব।' সময়ের গণ্ডি আরো একটু বাড়িয়ে দিল : 'রেখে দেব সন্ধে পর্যন্ত।'

সোমনাথ অবশ্যি সেই দিন থেকেই রাষ্ট্র করছে—জগৎপতিরও সেই মত, কিছু দিন আগে থেকেই রাষ্ট্র হওয়া ভালো—বেশ তো, যদি কারু কিছু বলবার থাকে, আপত্তি করবার থাকে, নোটিশে প্রতিবাদী হও, দেখা যাবে হয়-নয়। আপিসেও বিয়ের কথা শুনতে পেল ভাস্কর। সবাই তার ভাগ্যে ঈর্ষান্বিত। লোকে রাজকন্যা আর অর্ধেক রাজত্ব পায়, কিন্তু এ যে দেখি রাজকন্যা আর পূর্ণ রাজত্ব। আর জগৎপতি কত উদার। প্রেমকে সম্মানিত করবার জন্যে কত সে মুক্তপ্রাণ, কত সে মহানুভব!

কিন্তু সে বুধবার কতদূর?

কে একজন এক দিনের জন্যে রাজা হয়েছিল, ভাস্কর এক বছরের জন্যে স্বামী হবে! এক বছর কি কম সময়? এক বছরের পরেও চাকরিতে কিছুটা এক্সটেনসন হতে পারে। সেটা উপরি পাওনা। সমস্তটাই উপরি পাওনা। চাকরি, টাকা, এই লোভনীয় উপস্থিতি। এই অনাবৃত অধিকার। ছোঁয়া যায় না এমন একটা আগুনের শিখাকে কয়েক রাত্রির জন্যে শয়নশিয়রের প্রদীপ করা যাবে এ কে জানত। ভাষায় এমন কত শব্দ আছে যার সঙ্গে সাক্ষাৎ নেই, সে সব শব্দ এবার উচ্চারিত হবে; কত সুর আছে সঙ্কেত আছে যা রক্তে আনবে অজানা যন্ত্রণা; কত রহস্য আছে যা শত সূক্ষ্ম ব্যবচ্ছেদেও পৌঁছুতে দেবে না তার সমাপ্তিতে। এ কী এক অসহ্য জাগরণ! সমস্তটা ক্ষণস্থায়ী বলেই যেন এত তীব্র স্বাদ। ট্রেনটা ছাড়তে ছাড়তেই পৌঁছে যাবে তারই জন্যে এত ত্বরা এত দাহ, এত ইচ্ছা।

দুপুরের দিকেই চলে এসেছে রাঙা-মাসি, কিছু পরেই গিনি দিদি আর মলয়া বৌদি এক সঙ্গে।

মলয়া বৌদি বললে, 'কতই যে তোমরা আরো দেখাবে।'

সায় দিল ভাস্কর : 'হ্যাঁ, এ তো শুধু ভূমিকা।'

মলয়া বৌদি আলপনা আঁকতে চাইছে, ভাস্কর মত দিচ্ছে না। বলছে, 'কাগজে-কলমের ব্যাপার, তার মধ্যে আবার শিল্পকলা কিসের?'

মানতে চাইছে না মলয়া, বলছে, 'সবটাই কি খবরের কাগজ, একটু কবিতা-টবিতাও তো থাকবে।' পিটুলি-গোলা নিয়ে বসে গেল মলয়া।

দুপুর দুটো নাগাদ [illegible] পাঠালেন জগৎপতি।

'সেই গাড়িই যখন পাঠাল [illegible] ফুলটুল দিয়ে একটু সাজিয়ে দি[illegible] কেন?' মলয়া ঢলে পড়ল হাসিতে।

'আহা, আমি কনের বাড়িতে আ[illegible] করে বিয়ে করতে যাচ্ছি কিনা।' ভাস্কর বললে।

'তবু বিয়ে করতেই তো যাচ্ছ। আর গাড়ি দেখে বুঝছি পাত্রীপক্ষেরই নিমন্ত্রণে। কিন্তু যাই হোক, গাড়ির সাজ না থাক, তোমার সাজ থাকবে না কেন?' মলয়া ব্যস্ততার ভাব দেখাল : 'জংলি শার্ট আর প্যান্ট পরে তোমার যাওয়া চলবে না, ধুতি-পাঞ্জাবি পরে যাও।'

'আপিসের বিয়ে আপিসি পোশাকেই হওয়া উচিত। এ তো তবু আমি বিয়েতে ফুলপ্যান্ট আর বুশ-শার্ট পরে যাচ্ছি, ক'দিন পরে দেখবে পুজোরি পুরোতেরা হাফ-প্যান্ট আর তোয়ালে-গেঞ্জি পরে পুজোয় বসেছে।' আগের কথাটা আবার নাটকীয়ভাবে আওড়াল ভাস্কর : 'এ তো শুধু ভূমিকা।'

গাড়িতে গিয়ে উঠেছে, গিনি-দিদি পিছু ডাকল। 'সে কি, মা-মাসিকে প্রণাম করে যা।'

গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে ভাস্কর বললে, 'বা, আপিস যাবার সময় আমি প্রণাম করে যাই নাকি? এও তো আপিসেই যাওয়া।'

ড্রাইভারকে জিগগেস করল, 'কোথায় যাবে?'

ড্রাইভারটাও উদ্ধত। কথার উত্তর দিলে না। ভাবখানা এই, দেখতেই পাবে কোথায় নিয়ে যাচ্ছি।

গাড়ি এসে জগৎপতির বাড়ির সামনে দাঁড়াল।

ভাস্কর নামল না। হর্ণ বাজিয়ে মালিকদের সজাগ করা অসভ্যতা তাই ড্রাইভার নিজেই খবর দিতে চলল। দরকার নেই। রুচিরা আগে থেকেই তৈরি। ড্রাইভার পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই বেরিয়ে এল গেট খুলে।

যে দিকে ভাস্কর তার অন্য দিকের দরজা খুলে গাড়িতে উঠল রুচিরা।

ভাস্কর জিগগেস করলে, 'কেমন আছেন?'

'ভালো। আপনি?'

'এই কেটে যাচ্ছে এক রকম।'

গাড়িতে স্টার্ট দিল ড্রাইভার।

একটু বা চঞ্চল হল ভাস্কর, বললে, 'আর কেউ যাবে না?'

'হ্যাঁ, বাবার দুজন জুনিয়র উকিল, রয় আর বাসু, তাঁরা আসছেন ঐ র গাড়িটাতে। তাঁরা সাক্ষী হবেন।'

'ঠিক আছে।' নাটকে তার কত বড় বিশিষ্ট পার্ট এমনি প্রধানত্বের ভাস্কর নড়ে-চড়ে বসল।

জ্ঞানে তাকালও রুচিরার দিকে। টুকুও সাজগোজ করেনি। একটা ফুল নয়, একটু রঙ নয়, একটু হাসি নয়। বা, কী করে তুমি আশা করতে পারো? কোথাও কিছু আশা করবার নেই জেনেও অবাধ্য মন আশা করে। তাকে না হয় শাসন করলাম, কিন্তু দুটো কৃতজ্ঞতার কথাও তো বলতে পারে। আপনি কত ভালো, কত মহৎ, আপনার জন্যেই ফাঁসির দড়িটা খুলতে পারলাম গলা থেকে এ জাতীয় দু-একটা কথা। সেদিন কত কথাই তো হল, আজ একেবারে চুপচাপ নিশ্চুপ। বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে যেন ভাস্কর কোথাকার কে এক বিদেশী। কোনো দিন তার নামও শোনেনি রুচিরা।

ভাস্করও কথা বলল না।

দশ মিনিটের মধ্যেই সই-সম্পাদন হয়ে গেল। একই মোটরের দুই প্রান্তে-বসা দুই নিঃশব্দ আরোহী স্বামী-স্ত্রী হয়ে গেল।

রয় আর বাসু বললে, 'আমরা তা হলে চলি।' তারা অতশত কী জানে, গাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে স্বচ্ছন্দ কণ্ঠে বললে, 'আপনারা সুখে-শান্তিতে থাকুন। উইশ্ ইউ গুড লাক।'

'ও'দের একটু খাইয়ে দিতে হয়।' ভাস্কর তাকাল রুচিরার দিকে : 'কী বলো, ডাকব?'

রুচিরা ভুরু কুঁচকালো। বললে, 'যা না-বিয়ে তার আবার ভোজ। রাখুন, ডাকবেন না কাউকে।'

'এ তো ভোজ নয় এ সামান্য ভদ্রতা।'

'ভদ্রতার কারু দরকার নেই। কাজ হয়ে গিয়েছে, উঠুন, এখন বাড়ি চলুন।'

আগে রুচিরা, পরে ভাস্কর উঠল। বিয়ের আগে যেমন ব্যবধান রেখে বসেছিল বিয়ের পরেও সেই ব্যবধান। বিয়ের আগে যেমন চুপচাপ করে এসেছে বিয়ের পরেও সেই চুপচাপ।

'শোনো তোমাকে একটা কথা বলি।' ভাস্কর মাস্টার-মাস্টার মুখ করল।

'বলুন।'

'মনে হচ্ছে তুমি আমাকে আপনি বলে বলতে চাও।'

'আমারও ইচ্ছে আপনিও আমাকে আপনিই বলুন।'

'অসম্ভব। কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে আপনি বলে বলেছে ভূভারতে এমন কথা কেউ শোনেনি।'

'বেশ, আমি আপনার চেয়ে বয়সে ছোট, আপনি আমাকে ডাকতে পারেন 'তুমি' বলে। কিন্তু, মাপ করবেন, আমি পারব না।'

'শোনো, আমাদের বাড়িতে যখন যাচ্ছ তখন সবার সামনে আমার সঙ্গে যদি কথা বলো, তেমন কথা বলার অবকাশ অবশ্যি কম, দয়া করে 'তুমি' বোলো—খবরদার, 'আপনি বোলো না।'

'কেন?'

'আমাদের বাড়ির সকলে জেনেছে, মানে অনুমান করেছে, তুমি আমার প্রেমে পড়ে আমাকে বিয়ে করছ। একমাত্র প্রেমই অযোগ্যকে রাজমুকুট পরাতে পারে, নইলে আমার মত অক্ষম-অধম লোক কী করে তোমার মালা পায়? সেক্ষেত্রে তারা যদি দেখে তুমি আমাকে 'আপনি' বলছ, তারা ভড়কে যাবে। তারা অনেক কিছু অঘটন সরল মনে মেনে নিতে পারে, কিন্তু যুবক-যুবতী পরস্পরকে 'আপনি' বলে প্রেম করছে ও বিয়ের পরেও 'আপনি' চালাচ্ছে—এতটা এদের সহ্য হবে না। এরা তাহলে সন্দেহ করবে, সুন্দর করে একটা বাগান সাজিয়েছি এতদিন—তছনছ করে ফেলবে।'

'কিন্তু', কুটিল ভুরু কুটিলতর করল রুচিরা। বললে, 'কিন্তু আমাকে আপনাদের বাড়িতে যেতে হবে কেন?'

'বা, বিয়ের পর বউকে নিয়ে বর বাড়ি যায় না? তেমনি এখন নিয়ে যাব তোমাকে।'

'বউ, কে বউ?'

'তুমি।' ছেলেমানুষের মত গোবেচারা মুখ করল ভাস্কর : 'আমার বউ।'

'আমাদের এটা কি বিয়ে নাকি? এটা একটা ছল।'

'সমস্তই ছল। সে না হয় আমি-তুমি জানলাম, কিন্তু অন্য লোকে জানে কেন?' অবাধ্যকে বোঝাবার মতন করে শান্ত সুরে ভাস্কর বললে, 'লেপাফা যখন হয়েছে তখন তাকে দোরস্ত রাখাই দরকার।'

'তার মানে আমরা যে স্বামী-স্ত্রী এটা প্রকাশ্যে দেখিয়ে বেড়াতে হবে?'

'অন্তত আজকের দিনে তো একটু দেখানো দরকার—আমার মাকে, আমার দিদি-বৌদিকে।' আপোসের ভাবই বজায়

রাখছে ভাস্কর : 'তাঁরা আশা করে পথ চেয়ে বসে আছেন।'

'মাপ করবেন। যা মিথ্যে তা সত্যি করে জানাবার কোনো দরকার নেই।'

'মিথ্যেকে মিথ্যে বলেই জানাতে বলছেন? তাহলে তো আদ্যোপান্ত, গোড়া থেকে শেষ পর্যন্তই জানাতে হয়। সেটা কি তোমার পক্ষে, তোমার বাবার পক্ষে সুবিধের হবে?'

'কিন্তু, বলতে চান, সমস্তটাই কি ভিত্তিহীন নয়?' রুচিরাকে বুঝি একটু ক্রুদ্ধ শোনাল।

'হয়তো তাই। কিন্তু আমার বাড়ির লোককে তা বুঝতে দেওয়া হয়নি। বুঝতে দেওয়া হয়েছে, তুমি আমার। সর্বসমেত আমার।'

'সর্বসমেত?' ভাস্করের চোখে এবার চোখ ফেলতে হল রুচিরাকে।

'হ্যাঁ, মাথার চুলের ডগা থেকে পায়ের নোখের কোণটুকু পর্যন্ত।' কণ্ঠস্বরে দৃঢ় হল ভাস্কর : 'শুধু আমাদের সংসারকে নয় জগৎ সংসারকে তাই বুঝতে দেওয়া হয়েছে। এখন, এই মুহূর্তে আমার সংস্পর্শে এসে তুমি সমস্ত গ্লানি থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছ। তাই সবটাই মিথ্যে বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।'

'বাজে কথা।' পাশের দিকে আরো সংকুচিত হল রুচিরা।

'কিন্তু যে দলিলটা দুইজনে যুক্ত হয়ে সই করে দিয়ে এলাম, যার একটা নকল পকেটে করে নিয়ে এসেছি সেটা বাজে নয়।' ভাস্কর দৃঢ়তর হল : 'আবার যতক্ষণ পর্যন্ত না নাকচ হচ্ছে ততক্ষণ ও ওর কাজ করে যাবে।'

একটু বুঝি ভয় পেল রুচিরা। দীর্ঘ চোখে তাকাল ভাস্করের দিকে। বললে, 'আপনার বাড়িতে গিয়ে আমাকে কী করতে হবে?'

'শুধু একটু দাঁড়াতে হবে বউ হয়ে।' ভাস্করের গলায় কোত্থেকে আপনা-আপনিই মমতা এসে গেল : 'আঁচলটা একটু তুলে দিতে হবে মাথার উপর। এখন একেবারে কাঠ-কাঠ হয়ে আছ একটু লতা-লতা হয়ে দাঁড়াবে।'

আশ্চর্য, হাসল না রুচিরা। কাঠ-কাঠ থেকেই বললে, 'শুধু দোরগোড়ায় গিয়ে দাঁড়ালেই হবে?'

'তাই বলে নমস্কার, আসি, বলে দুটো হাত নাক বরাবর তুলেই পালাবে না, একটু বসবে।'

এখনো হাসল না রুচিরা। বললে, 'শুধু দাঁড়াব না, আবার বসব?'

'মানে বউ-বরণ করতে কী সব স্ত্রী-আচার করে মেয়েরা তাই হয়তো করবে।'

সর্বাঙ্গে জ্বলে উঠল রুচিরা। 'তার মানে মুখে দই-মধু না গোবর পুরে দেবে আর কুলো দিয়ে ঠুকবে কপালটা? অসম্ভব।'

'আচ্ছা, আমি ও সব না হয় বারণ করে দেব। কিন্তু—'

'কিন্তু আবার কী?'

'কিন্তু তোমার সিঁথিতে যদি কেউ সিঁদুর মাখিয়ে দেয় আপত্তি কিসের?'

'সিঁদুর?' এবার বুঝি নিজের ভাষাটা যথেষ্ট মনে হল না। অন্য ভাষার শরণ নিল রুচিরা, বললে, 'ইমপসিবল।'

'সাপের ছোবলের মত মনে হচ্ছে যেন সিঁদুরটাকে?'

'তার চেয়েও বেশি। দেখুন কথা বাড়িয়ে কাজ নেই। যা আমি বিশ্বাস করি না তা করতে পারব না কিছুতেই।'

'অনেক কিছু তো আমরা বিশ্বাস না করেও করি।'

'আপনি করুন গে। আমি করি না।'

'তুমিও করো। বিয়েতে বিশ্বাস না করেও বিয়ে করো।'

'থামুন। কিছুতেই পারব না পরতে।' রুচির কথা ছেড়ে দিয়ে যুক্তির কথা খুঁজে নিল রুচিরা : 'সিঁদুর পরলে একজিমা হয়।'

'তেমনি মিষ্টি খেলে দাঁত যায়। শুপুরি খেলে ক্যানসার হয়। কিন্তু পান খেয়ে ঠোঁট দুটি টুকটুকে লাল করলে কেমন সুন্দর দেখায় বলো তো। তেমনি গায়ে গয়না, ভরাট মাথায় সিঁদুর, একেবারে রাণীর মত দেখাবে।'

'তারপরে আবার গয়নাও পরতে হবে নাকি?' রুচিরার সারা শরীর রি-রি করে উঠল।

'হাতের কবজিতে সরু সুতোর মত ঘড়ি এও তো এক রকমের গয়না।' আবার অলক্ষ্যে কণ্ঠস্বরে স্নেহ এল ভাস্করের : 'মা হয়তো তোমার জন্যে গলার হার আর হাতের চুড় গড়িয়েছেন, তাই দিয়ে সাজাবেন তোমাকে। আজকের দিনে এমন রিক্ত হাত আর শূন্যে গলা কি ভালো দেখায়?'

এই প্রথম সুযোগ এসেছে ভাস্করের, হাত বাড়িয়ে রুচিরার একটা করুণ, নিরীহ মণিবন্ধ টেনে নিল।

সবেগে তক্ষুণি হাত ছাড়িয়ে নিল রুচিরা। বললে, 'অমন সঙ সেজে পারব না দাঁড়াতে।'

'জীবনের সার্কাসে, কে জানে, আমরা সবাই সঙ। আর যাদের আমরা সঙ ভাবি, কে জানে, হয় তো তারাই খাঁটি, তারাই সমস্ত খেলার বাহাদুর।'

'তারপর অমনি দাঁড়ালে ফ্ল্যাশ লাইটে ফোটো তুলে নেবেন আমার?'

'ও হো, সোমনাথকে বলে আসা তো! ভালো কথা মনে করিয়ে দি নিশ্চয়ই, একটি ছবি তুলে রাখে একটা এভিডেন্স। চলে যাবার পর স্মৃতিচিহ্ন। ড্রাইভারকে বলো, গ্রাফারের দোকান থেকে একজনকে নিয়ে যাই বাড়ি। জীবনের এক. মুহূর্তকে অবিনশ্বর করে রাখি।'

'ড্রাইভার।' থরথরে হুকুমি আওয়াজ বের করল রুচিরা : 'সোজা বাড়ি চলো।'

'ফোটো না হয় ছেড়ে দিই, কিন্তু আমাদের বাড়ি হয়ে চলো। ও'রা সব পথ চেয়ে আছেন। গয়না বিশ্বাস না করেও সোনা নেওয়া যায়। সিঁদুর বিশ্বাস না করেও শুধু সাজা যায় সিঁদুরে। কয়েক মিনিটের তো ব্যাপার। চলো। তোমাক তো আর কেউ ধরে বেঁধে রাখবে না বাড়িতে। আমিই আবার তোমাকে পেঁৗছে দিয়ে আসব।'

রুচিরা কথা কইল না।

ড্রাইভার সোজা চলল নিঃশব্দে, তার অর্থই নিজের বাড়ির দিকে।

ও দিক দিয়ে না ঘুরে এদিক দিয়ে গেলে আগেই ভাস্করদের বাড়ি পড়ে, ভাস্করদের বাড়ি হয়েই যাওয়া যায় সিধে। চূড়ান্ত মুহূর্তে ভাস্করের মনে হল ড্রাইভারকে হুকুম দেয়, গাড়িটা ওদিক দিয়ে নয়, এদিক দিয়ে ঢুকে পড়ো। কিন্তু গলায় সে জোর কই যে রুচিরার স্তব্ধতাকে অতিক্রম করতে পারে পকেটের দলিলে কি এত জোর আছে যে গাড়ি থামায়?

কিন্তু ছোট্ট একটা শব্দ সে বার করতে পারে মুখ দিয়ে।

'রোকো।'

গাড়িটা থামল। ভাস্কর বললে, 'আমি এইখানে নেমে যাই।' বলতে-বলতেই নেমে গেল। রুচিরার সঙ্গে তাদের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হবে এ যেন রুচিরা না ভাবে।

রুচিরা চোখ তুলে তাকাল ভাস্করের দিকে। চোখের কালো দেখল না চোখের কোলে কালির পোঁচ দেখল ঠিক করতে পারল না।

দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবার আগেই রুচিরা কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করল। সংক্ষেপে বললে, 'আসবেন।'

তক্ষুনি-তক্ষুনি বাড়ি ফিরল না ভাস্কর। কী মুখে ফিরবে! বিয়ে বলে আপিস থেকে ছুটি নিয়েছে, যাওয়া যায় না আপিসে। হাঁটতে-হাঁটতে বড় রাস্তায় এসে একটা ট্রামে উঠে বসল।

সন্ধে হয়ে গেল, তখনো ভাস্করের

দেখা নেই। ভাবনায় পড়ল মহালয়া। ...ক্ষণ অপেক্ষা করবে, নিমন্ত্রিতারা ...র গেল। বলে গেল, রেজেস্ট্রি করা ...য় তো, একদিন না হয়তো আরেক দিন ...ে এর তো আর লগ্নালগ্ন নেই, এতে ...আর পাঁজিপুঁথি লাগে না।

মহালয়া সোমনাথকে পাঠালেন খোঁজ ...রতে। ব্যানার্জিদের বাড়িতে দেখে আয় তো ব্যাপার কী।

সোমনাথ গেল ভয়ে-ভয়ে। কোনো হৈ-চৈ নেই, লোকজন নেই, আলোও একটা বাড়তি জ্বলছে না কোথাও। বিয়ে বাড়ি কি এমনি নিঝুম হয়? এমনি কি তার ঝাপসা-ঝাপসা চেহারা থাকে? ওই তো বারান্দায় রুচিরাকে দেখা যাচ্ছে। দাদা কই? দাদা তো নেই ধারে-কাছে। মেয়েটাকে তো মোটেই বৌদি-বৌদি মনে হচ্ছে না। যদি তার বৌদিই হয় তবে তাকে অমনি দূরে, রাস্তায় ফেলে রাখতে পারে?

সাহস করে গেট খুলে বৈঠকখানায় ঢুকে পড়ল সোমনাথ। হ্যাঁ, কর্তাই তো একা বসে আছেন ঘরের মধ্যে।

'আমার দাদা এখানে আছে?'

'কে দাদা?' মুখ তুললেন জগৎপতি।

'ভাস্করনাথ—'

সে কে? সে এখানে আসবে কেন?' নির্লিপ্তের মত নথিতে আবার চোখ রাখলেন জগৎপতি।

'তার কি আজ এ বাড়িতে বিয়ে হয়েছে?'

'কী হয়েছে?' বিরক্তিতে এবড়ো-খেবড়ো হয়েছে মুখ, জগৎপতি আবার তাকালেন।

'বিয়ে হয়েছে? এ বাড়ির মেয়ের সঙ্গে?'

'ফাট্! ভাগ! এইটুকু ছেলে, এখুনি গাঁজা ধরেছে! মিথ্যে বলার ওস্তাদ হয়ে উঠেছে!'

লোকটা পাগল নাকি? কে জানে কী। আশ্চর্য নয়, মোটা একটা বই তুলে ছুঁড়ে মারতে পারে। পালিয়ে গেল সোমনাথ।

বাড়ি ফেরার মুখেই দেখল দাদা আসছে। কী রকম মাঠ থেকে ফেরা হেরে-যাওয়া চেহারা।

বাড়িতে পা দিতেই মহালয়া সোমনাথকে দূরে রেখে ভাস্করকে নিয়ে পড়ল। 'কী, হয়ে গিয়েছে বিয়ে?'

পকেটে দলিলের নকলটা অনুভব করল ভাস্কর। বললে, 'হ্যাঁ, হয়ে গিয়েছে।'

সোমনাথ ত অবাক!

'তবে বউ এল না যে বড়?'

'শরীর খারাপ।'

সোমনাথ তো আরো অবাক।

দিদি-বৌদি মাসিমারা যে চলে গিয়েছে তা আর জিগগেস করতে হয় না। ভাস্কর আপোসের সুরে বললে, 'তাতে কী। অন্য একদিন আসবে। সেদিন মাসিমাদের আবার খবর দেব। দিন তো আর ফুরিয়ে যাচ্ছে না।'

'আহা এ আবার কোন ঢং!' এতক্ষণ প্রতীক্ষা করে থাকার পর এই হতাশা মহালয়াকে অস্থির করে তুলল। 'আপিসে যেতে পারল, তখন শরীর বেশ সুস্থ, আর এখানে এসে একটু দেখা দিতেই ভেঙে পড়ল শরীর! এ সব ন্যাকামির কথা।'

'একটু লজ্জাও তো হতে পারে!' কেন কে জানে তবু রুচিরারই পক্ষ নিতে অলক্ষ্যে কে ঠেলছে ভাস্করকে।

'আহা, লজ্জা আবার কী! বাপের বাড়িতে হেঁটে-চলে বেড়াচ্ছে না, বেরুচ্ছে না আত্মীয়স্বজনদের সামনে। এ তো স্বাভাবিক স্ত্রী—লজ্জা কিসের?

'তবু—'

'রাখ, বুঝতে পেরেছি, এ অন্য রকমের লজ্জা। এখন বোধহয় পষ্টাপষ্টি বুঝতে পেরেছে আমরা খুব গরিব, আমাদের ঘর-দোর ভীষণ ছোট, আমাদের জিনিসপত্র একেবারেই নেই, তাই, তাই ওর এই হেনস্তা। তাই ও এল না—'

'বা, গরিব হলে কী হয়?' জগৎপতি বোঝাচ্ছেন তাঁর মেজ শালা সরোজেন্দ্রকে: 'গরিব হলে ছেলে কি আর ভালো হতে পারে না?' জগৎপতি বেদিতে বসা আচার্যের ভঙ্গিতে বললেন, 'গুচ্ছের টাকা থাকলেই কি গুচ্ছের সুখ হয়? হোক গরিব, তবু স্বামী যদি সৎ হয় চরিত্রবান হয়, কী বলে, যদি পত্নীপ্রেমিক হয় তাহলে মেয়ের সুখশান্তি বিশেষ কম হয় না।'

'তা না হোক,' সরোজেন্দ্র বললে, 'কিন্তু তাই বলে জগৎপতির মেয়ের, এক-মাত্র মেয়ের একটা চালচুলোহীন কেরানির সঙ্গে বিয়ে হবে এ ভাবা যায় না।'

'তা তুমি কী করতে পারো?' সরলতা-মাখা শিশুর মত মুখ করল জগৎপতি: 'যদি ভালোবাসা হয় তা হলে তোমার কী করবার আছে? তুমি আধুনিক ভাবাপন্ন শিক্ষিত বাপ হয়ে তাকে বাধা দিতে পারো না। আমিও তাই দিইনি বাধা।'

'আর বাধা দিতে গেলেই বিপরীত কাণ্ড।' সমাজের কত বড় দুর্দিন তারই দুশ্চিন্তায় পীড়িত সরোজেন্দ্র: 'হয় আত্মহত্যা নয় কেলেঙ্কারি।'

বড়লোক হবার পর ভায়েদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেড়েছে, কবেই ছেড়েছে, কে কোথায় আছে খবর রাখে না, কার কে যা কটা ছেলে-পিলে [illegible] সব ভাসা-ভাসা—কিন্তু শালাদের ছাড়তে পারেনি, শালাদের কেউ ছাড়তে পারে না। যাদের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক নেই তারাই আজকাল আপন জন।

'বাধা দিতে যাবই বা কেন?' আলো-চনার খেই ধরল জগৎপতি: 'একের স্বাধীনতা তো অন্যের মাপ অনুসারে চলবে না। আমার পছন্দই তো আর তোমার পছন্দ নয়। তাই আমি বললুম তুমি যাকে ভালো বুঝেছ প্রিয় বুঝেছ তাকেই তুমি বিয়ে করো। স্বাধীনতা তোমার, দায়িত্বও তোমার। কী বলো, ঠিক বলিনি? ঠিক করিনি?'

দরাজ গলায় সায় দিল সরোজেন্দ্র: 'একশোবার ঠিক।'

'তা ছাড়া এখনো আমরা জাতিভেদ মানব, স্বাধীন হবার পরেও, এ অসহ্য।'

এখন তো আর বামুন-কায়েতের জাতিভেদ নেই, সে তো প্রায় উঠে গেছে, এখন বড়লোক আর গরিবের জাতিভেদ।'

'সে জাতিভেদও আমরা উঠিয়ে দেব। বলো দিইনি উঠিয়ে? গরিব বলে ভাস্করকে জামাই বরতে আপত্তি করেছি? এই তো বিয়েটা আজ হয়ে গেল। প্রেমের সম্মান তো আমি রাখলুম। তারপরে ওদের বনিবনা না হয়, কোনো বিরোধ-সংঘর্ষ বাধে, বিয়ে ওরা উচ্ছেদ করে দেয়, তা আমার কী করবার আছে? তাতে আমার কী দায়িত্ব!' জগৎপতি ক্লান্তের মত পিঠ রাখলেন চেয়ারে।

'সে পরের কথা পরে। সে ওদের নিজেদের আর্টিস্ট্রি, নিজেদের কারিগরি।' বললে সরোজেন্দ্র।

'সে ওদের নিজেদের অদৃষ্ট।'

একটু চুপচাপ থাকলেন জগৎপতি। পরে দীর্ঘ নিশ্বাসটা চাপা দিয়ে বললেন ব্যস্ত সুরে: 'তোমার বোনই একটু আপসেট। শত হলেও প্রেম-ট্রেম কিছু বোঝেন না, করেনও নি কোনোদিন। তাঁকে একটু বোঝাও।'

সরোজেন্দ্র উঠে দাঁড়াল। হাসিমুখে বললে, 'আর রুচি?'

'তার তো কেল্লা ফতে। সে নিজের সৌভাগ্যে ডগমগ।'

ঘরে এতক্ষণ টেবল-ল্যাম্পটা জ্বল-ছিল, সরোজেন্দ্র চলে গেলে বোতাম টিপে আলোটা নিবিয়ে দিলেন জগৎপতি। অন্ধকারে হঠাৎ মনে হল যেন শুভময় এসে দাঁড়িয়েছে। হাসতে-হাসতে বলছে, কী হত বিয়েটা হতে দিলে? কী হত যদি সত্যি মেয়েটাকে সুখী হতে দিতেন, হালকা হতে দিতেন? সৌভাগ্যেই ডগমগ বৈকি। কী লাভ হল ওর সৌভাগ্যের সঙ্গে নিজের ভুয়ো সম্মানকে তোল করতে

গিয়ে? পারলেন আমাকে সম্পূর্ণ তাড়াতে? না, কি ভাস্করকেই পারবেন?

যেন কয়েক পা এগিয়ে এল শুভময়। কী রকম শীর্ণ ও শুকনো দেখাচ্ছে। ছন্নছাড়া, ভবঘুরে।

না, কিছু হয়নি আমার। টাকা যখন বন্ধ করে দিলেন, বুঝতে পেরেছি, আমার আপিস আর কেউ নয়, আপনারই ষড়-যন্ত্রের সহায়, তখন দিশেহারা হয়ে পড়ে-ছিলাম। প্রথমটা ঘোরতর কষ্টে কেটেছে। কিন্তু হাতে-পায়ে ঘাড়ে-পিঠে খাটতে তো আমরা পেছ-পা নই। তাই যা হোক দাঁড়িয়ে পড়েছি। কিন্তু ভাবছি, আপনি কী করবেন? আপনার ভাগ্য যখন আপনাকে কায়িক শ্রমে ডাক দেবে?

না, আমার ঠিকানা নেই। আমি কি এক জায়গায় আছি? জীবিকার ঠেলায় ঘুরছি এখানে-ওখানে। যাকে শেষ করে দিতে চেয়েছিলেন, উড়িয়ে দিতে চেয়ে-ছিলেন, তাকে আর খুঁজবেন কোথায়? ডাকলেই কি সে আর আসে?

তার যে ডাক মনের মধ্যে আছে তা আছে। সে ঠিক সময়ে এসে হাজির হবে। তাকে বেঁচে থাকতে দিন। উজ্জ্বল হতে দিন। বেঁচে থাকাই উজ্জ্বল হওয়া।

তত দিনে ভাস্করকে তাড়ান। পথ পরিষ্কার রাখুন।

আরো এক পা এগিয়ে এল বুঝি সেই ছায়ামূর্তি। জগৎপতি বোতাম টিপে আবার আলো জ্বালালেন। রগ দুটো টিপে ধরলেন দু হাতে। মাথাটা ছিঁড়ে পড়ছে। অসহ্য যন্ত্রণা।

অসহ্য যন্ত্রণা ভাস্করেরও। পাচ্ছে না ঘুমোতে। বিছানা এত কাঁটায় আকীর্ণ ছিল এর আগে কোনোদিন আবিষ্কার করেনি।

মনকে প্রবোধ দিতে চাইল। তোমার অধিকে কেন লোভ? যা পেয়েছ তাই তোমার যথেষ্ট। আজকালকার দিনে কে হুট করে দুশো টাকা প্রমোশন পায়? একটা দলিলে সামান্য সই করার দাম পাঁচ হাজার আদায় করে? আরো পাঁচ হাজার নাচছে তোমার কপালে। তাই নিয়ে তৃপ্ত থাকো। পাশ ফের। ঘুমোও। তোমার কিছুই হয়নি না ঘুমোবার। তাঁতি আছ, ঠিক থাক তাঁত বুনে। কেত্তন ধরে কী লাভ?

আর সোমনাথ ভাবছে, বউ নেই এ কেমনতরো বিয়ে? বারান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, এ কেমনতরো অসুখ? আর মেয়ের বিয়ে দিয়ে লোকটা বিয়ের নামে বলে কিনা, ফাট? আর আমাকে বলে কিনা, আমি গাঁজা খেয়েছি!

আর দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসে মহালয়া জপ করছে। আর ভাবছে গোপালকে। বলছে, গোপাল, তুমি কি সত্যিই এসেছ? সত্যিই আসবে?

১২

'বউমা কেমন আছেন একবারটি খোঁজ নিবি না?'

মহালয়াই খালি ট্যাক ট্যাক করে। আপিসে বেরুবার সময় মন্ত্র ধরিয়ে দেয়। হাতে ঘড়ি বাঁধতে-বাঁধতে ভাস্কর বলে, 'কে কার খোঁজ করে তার ঠিক নেই।'

আপিস থেকে ফিরল মহালয়া আবার মনে করিয়ে দেয়: 'কি রে, গিয়েছিলি?'

'সময় পাইনি।' পাশ কাটিয়ে যায় ভাস্কর।

এ কী রকম হল? বিয়ে হতে না হতেই বেসুরো! কারু প্রতি কারু টান নেই। এই তো কাছাকাছি বাড়ি। তুই বউ, তুইও তো আসতে পারিস নিজের থেকে। মিলিটারি-ঠেঙানো মেয়ে, তোরই বা কী এত সঙ্কোচে নুয়ে থাকা। একদিন শুধু একটু নিজের সংসারে দেখা দিয়ে যেতে পারিস না? আর তুই স্বামী, তোকেও আমি প্রশংসা করতে পারি না। তোর কোনোই জোর নেই?

কী জানি কী! অনিয়মে সবই ব্যতিক্রম। মহালয়া ঠাকুর-ঘরে গিয়ে বসে। ভাবে, আর সব থাক-যাক, তার গোপাল ঠিক আছে।

'আজ একবার সময় পেলে খোঁজ করিস।' আবার মন্ত্র দেয় মহালয়া।

'ও সব ভুলে যাও।' হাতে ঘড়ি বাঁধতে-বাঁধতে ভাস্কর বলে, 'ভদ্রগোছের একটা চাকরি হয়েছে, ব্যাঙ্কে য়্যাকাউন্ট হয়েছে এই নিয়েই খুশি আছি। আর সব স্বপ্নকথা!'

'বা, তা কী করে হয়?'

হয়। তাই তো ছিল। আপিস যেত-আসত, তার বাইরে ফাঁকা মাঠ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এখনই বা বেশি আর কী হয়েছে! একটু ছুঁতে গিয়েছিল, হাতটা সরিয়ে নিয়েছে। আর সেই যে বলেছিল, 'আসবেন', ওটা হচ্ছে, টোপ, যাতে ভাস্কর একেবারে না বিগড়ে যায়। সেই ডাক মানে অর্থীর মত এস, আরো কিছু তোমার সাংসারিক সুরাহা হয় কিনা। দাবিদার হয়ে এস না।

'তুই স্বামী, তুই তোর দাবি ছাড়বি কেন?' মহালয়াই আবার খোঁচ মারে।

সত্যিই তো, হঠাৎ মাথা ঘুরে যায় ভাস্করের, বাপের বাড়িতে থাকবে বললেই সে থাকবে বাপের বাড়ি? ধর্মে নীতিতে আইনে কোথাও এর সমর্থন নেই। দলিল যতদিন জীবিত আছে ততদিন তার স্বামিত্বও জীবিত। আর যতদিন স্বামিত্ব জীবিত ততদিন স্ত্রী বাধ্য স্বামীর সঙ্গে একত্রবাসে। হ্যাঁ, বাধ্য। বেশি তড়পাবে না; আদালতে স্ত্রী দখলের মামলা ক[illegible] দেব।

তা ছাড়া, পরে যে রুচিরাকে ডিভো[illegible] করে দিতে হবে, তারই জন্যে এ[illegible] বিরোধের ভূমিকা দরকার। মাকে ত[illegible] বলা যাবে এমন দুর্বিনীত ঝগড়াটে অসা[illegible] স্ত্রীকে নিয়ে কে ঘর করবে? দিই এটার দড়ি খুলে। যেখানে খুশি বেড়াক। যেখানে খুশি বাঁধা পড়ুক।

অবস্থা তখন এমন চরমে এনে দেবে, মা-ই বলবেন দে ওটকে তাড়িয়ে। তা হলেই নিখুঁত হবে।

একটা বছর কি কম? একটা দিন কি কম? একটা মিনিট পেলে তাতেই রাজ্য জয় করা যায়। ঘুরে আসা যায় পৃথিবী।

জুনিয়র রয় এসেছে, খোলা কাছারির প্রথম দিনই সেই ডাক্তারের আপিল, মুহুরি ব্রিফ এগিয়ে দিল।

'এ কনভিকশান টিকতে পারে না।' ব্রিফ ওলটাতে-ওলটাতে বললেন জগৎ-পতি: 'মেয়েটার জীবন বিপন্ন হয়েছিল বলেই সে ছুরি চালিয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে মেয়েটা তো বেঁচে গিয়েছে, বাঁচিয়ে দিয়েছে ডাক্তার। একটা সুস্থ-সমর্থ আস্ত মানুষের থেকে একটা আগন্তুক প্রাণের দাম বেশি?'

জুনিয়র বললে, 'প্রশ্ন হচ্ছে সত্যিই মেয়েটার জীবন বিপন্ন হয়েছিল কিনা।'

'মেডিক্যাল এভিডেন্স থেকে সেটা দেখানো যাবে। য়্যাপার্ট ফ্রম ইট, অন্যতর অর্থেও এ ব্যাপারটা দেখা হবে না কেন?' হাতের লাল-নীল পেন্সিলটা শূন্যে স্থির রেখে বললেন জগৎপতি, 'মেয়েটার জীবন বিপন্ন—ধরো সামাজিক কলঙ্ক থেকে, আত্মগ্লানি থেকে—সেইটেই বা কি কিছু কম শত্রু? সেই শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করে ডাক্তার যদি মেয়েটাকে জীবনের সুস্থ লাবণ্যে দাঁড় করিয়ে দেয়, তাহলে কি সে সমাজের হিত করে, না অহিত করে?'

'এই লাইটে কোনো কেস আর্গুড হয়নি কোর্টে।'

'না, না, কোর্টের কথা ছেড়ে দাও। আমি সমাজের দিক থেকে বলছি। শত্রুকে ঠেকাবার জন্যে তুমি নানা রকম কনট্রোলের বেড়া দিয়েছ, বসিয়েছ সশস্ত্র প্রহরী, খুব ভালো কথা, আকস্মিক কিন্তু দুর্ঘটনায় একটা শত্রু যদি সমস্ত বেড়া-পাহারা টপকে ঢুকে পড়ে, তাকে তখন আর মারা যাবে না, তাকে তখন স্বাগত জানাতে হবে এ অভিনব।'

জুনিয়র বললে, 'এরা বলবে দুর্ঘটনা ঘটবে কেন?'

'দুর্ঘটনা তো ঘটবার জন্যই। আর দুর্ঘটনা ঘটবে না কেন?' চারদিকে

দারিদ্র্য বেকারি হতাশা অনিয়ম, তার [illegible] উত্তেজিত জীবন, ক্ষিপ্র আর [illegible]পেতের জনতা, দুর্ঘটনা ঘটাই তো [illegible]ভাবিক। তারপর তুমি সমাজ, তুমি [illegible]জই প্রলুব্ধ করছ, বিজ্ঞাপন দিয়ে [illegible]ছ। যে সমস্ত উপায়-পদ্ধতি আগে [illegible]আইনি ছিল, তাই এখন তুমি তাদের [illegible] তর কাছে, এমন কি মুখের কাছে এনে দিচ্ছ। বড়-বড় অক্ষরে জয়গান গাইছ। সেই ক্ষেত্রে এদিক-ওদিক দু-একটা ফসকে যাবেই। বন্দুকের গুলি পর্যন্ত ফসকায়, আর ও তো সামান্য কথা।' প্রায় আর্গুমেণ্টের পর্যায়ে নিয়ে এলেন জগৎপতি : 'তারপর তা মেরামত করতে গেলেই ধরছ ডক্তারকে। তোমাদেরই ব্যবস্থার বলি সেই অসহায় মেয়েটাকে। কী হচ্ছে অন্যত্র? এই দেশে অচল তো ওই দেশে সচল। মেয়েটার সংগতি নেই, তাই এ দেশ থেকে ফুই করে ও দেশে চলে যেতে পারল না, বিজ্ঞয়িনীর মত পারল না জীবনকে স বর্ধনা করতে। পুলিশের আসামী হয়ে দাঁড়াল কাঠগড়ায়।'

বিনীত মুখে রয় বললে, 'অন্যদিকেও বলবার আছে।'

যা জগৎপতির ধারা, টেবিল ঘুসি মারলেন : 'কিছু বলবার নেই। চোরকে চুরি করতে পাঠিয়ে গৃহস্থকে সজাগ থাকতে বলা ভণ্ডামি—স্রেফ ভণ্ডামি। তুমি যদি চুরিকে লিগ্যাল করো, চোরকে মারাও লিগ্যাল করতে হবে।'

মুহুরি হাসল কিন্তু জুনিয়র হেসেও হাসল না। বললে, 'তাহলে পাপ বেড়ে যাবে সমাজে।'

'আর এই যে মানুষ বাড়ছে, এ সব মূর্তিমান পাপ নয়?'

কে একটা লোক বৈঠকখানার পাশের প্যাসেজ দিয়ে দ্রুত পায়ে অন্দরমহলে ঢুকে গেল।

ঠিক লক্ষ্য করেছেন জগৎপতি : 'কে?'

লোকটা প্রায় সিঁড়ির কাছে এসে পৌঁচেছে। বললে, 'আমি।'

'কে আমি?'

সিঁড়ি দিয়ে উঠছে সেই স্বরটা : 'আমি ভাস্কর।'

একটু দাঁড়িয়ে যাচ্ছে না। একবিন্দু দ্বিধা নেই। যেন আলো-হাওয়ার মত সরল। আলো-হাওয়ার মতই অধিকারে অবাধ।

চুপ করে গেলেন জগৎপতি। নথিতে মন দিলেন।

সরাসরি একেবারে ঢুকতে পারল না এবার, কেননা পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখল ঘরে রুচিরা নেই। কিন্তু ঘরে যখন রেডিও চলছে তখন সন্দেহ নেই, সাময়িক অনুপস্থিতির পর এখুনি ফিরে আসবে। ভাস্কর নিঃশব্দ ঘরে ঢুকল, বসল চেয়ারে।

ঠিক। খানিক পরেই পাশের ঘর থেকে এল রুচিরা। এক মুহূর্তে বুঝি বোঝেনি ঘরে কেউ আছে, এসে বসে আছে, তাই একটু অন্যমনস্ক হয়েছিল; কিন্তু ক্ষণকালই ঘরের হাওয়াটা আর কারু নিশ্বাসে অন্যরকম হয়েছে টের পেতেই পিছন ফিরল, বিরক্ত বিমর্ষ মুখে বললে, 'এ কী! আপনি কখন?'

'এই তো।'

'একেবারে না বলে কয়ে?'

'কেন, আসা যায় না নাকি?'

'এসেছেন তো দেখতেই পাচ্ছি। তবু একটু জানান দিয়ে এলেই হয়তো শোভন হয়।'

'শোভনের কথা আর না-ই বললেন।' কিছুতেই আর এখন 'তুমি' বলতে পারল না ভাস্কর : 'কিন্তু জানান যে দেব ঘরে লোক ছিল?'

'লোক না ছিল তো পর্দা ছিল।'

'পর্দা থাকলে কী হয়?' এত দুঃখেও হাসি পেল ভাস্করের।

'পর্দা থাকলে বাইরে দাঁড়াতে হয়। ভিতরের লোক যতক্ষণ না সংকেত করে ততক্ষণ।'

'ভিতরে লোকই নেই তো সংকেত করবে কী! আর ভিতরের লোকের জন্যে হাঁ করে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবার দিন আর আমার নেই।'

'কেন, আপনার কিসের দিন?'

'এই যেমন এসেছি, সরাসরি চলে আসার দিন। ঘোষণা না করেই ঘরে ঢোকার দিন।'

'ঐ একটা কাগজের জোরে?'

'তা ছাড়া আবার কী! সমস্তই কাগজ। আবার আপনি যখন ছাড়া পাবেন, আমাকে কলা দেখাবেন, তখনও সেই কাগজেরই জোরে।' তরল হবার চেষ্টায় ভাস্কর হাসল : 'আপনার টাকা ও কাগজ, মানসম্ভ্রম ডিপ্লোমা-সার্টিফিকেটও কাগজ, বাড়ি-ঘরের স্বত্ব-স্বামিত্বও কাগজ। দয়া করে রেডিওটা বন্ধ করে দিন। কাজের কথাটা সেরে নি।'

'কাজের কথা কিছুই নেই।' গর্বের ভঙ্গি ফোটাল রুচিরা।

'কাজ বাগিয়ে নিয়ে এখন এ কথা বলা সোজা।' ভাস্কর নিজে উঠেই রেডিওটা বন্ধ করে দিল। বললে, 'কিন্তু নাটক এখনো শেষ হয়নি। সুতরাং কাজের কথা এখনো কিছু থেকে গেছে।'

'না, নেই। এক দফায় টাকা নিয়েছেন কাজ দিয়েছেন, আরেক দফায় নেবেন, বাকি কাজটুকু সেরে দেবেন।'

'অত সোজা নয়। যা বলছি শুনুন। মিছিমিছি ঝগড়া করে লাভ নেই।' ভাস্কর আবার তার চেয়ারে গিয়ে বসল। বললে, 'ঐ সোফাটাতে বসুন।'

সমস্ত অসহ্য লাগছে রুচিরার। ঝিলিক দিয়ে উঠল : 'আপনার কথামত বসব?'

'আমার কথামত বসবেন কেন? এমনিতেই বসবেন। একটা লোক কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে? তার উপর আপনি অসুস্থ। বসলে পরেই আপনি আরাম পাবেন।'

'কত আপনি আমার আরাম দেখছেন!'

কথায় কী রকম একটু টান লাগল না? উৎসুক হয়ে তাকাল ভাস্কর। না, এদিকে চোখ নেই রুচিরার। জানলার শিক ধরে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে।

'আপনার আরাম দেখছি না? সমস্তই তো আপনার আরামের জন্যে। বলুন, এদিকে তাকান, বলুন, আপনি এখন প্রচণ্ড আরাম পাচ্ছেন না? আপনার সমস্ত ভার লঘু হয়ে যায়নি? এত বড় একটা উপকার করলাম তবু আপনার সামান্য কৃতজ্ঞতা নেই?'

'বলুন কী আপনার কথা।' রুচিরা ঘরে দাঁড়াল। সোফায় বসল মুখোমুখি।

'এখন আপনাকে অনেক সুন্দর লাগছে।'

মুখ-চোখ আবার গম্ভীর করল রুচিরা। বললে, 'কী কাজের কথা আছে তাই বলুন।'

'কথাটা খুব ছোট।'

'তবে এত ধানাই-পানাই করছেন কেন? আপনার আপিস নেই?'

'না। অসম্বদ্ধ কথা কিছু বলব বলেই ছুটির দিন বেছে এসেছি। আপনার বাবাকেও দেখলাম বাড়িতে আছেন, নিচে বসে কাজ করছেন।'

'বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

'না। দেখলুম তিনি কাজ করছেন তাই আর তাঁকে বিরক্ত করলাম না।'

'তিনি দেখেছেন আপনাকে?'

'বোধহয় দেখেছেন। না দেখলেও বুঝেছেন আমি এসেছি।'

'বুঝেছেন, তবু তিনি আপনাকে আটকালেন না?' ভুরুতে বিস্ময় আঁকল রুচিরা।

'আটকাবেন কেন? তিনি আইনজ্ঞ, বিচক্ষণ, তিনি জানেন আমার ন্যায্য অধিকার হয়েছে, বাড়িতে ঢোকবার, আপনার কাছাকাছি হবার। এমন কি ঘরে ঢুকে দরজায় খিল দেবার। তাই

জায়গা ছেড়ে ওঠেননি, ছোট কড়ে আঙুলটাও নাড়েননি। আপনার বাবার ব্যবহার থেকেই অবস্থাটা বুঝে নিন। আচ্ছা, আপনার মা কোথায়?'

'কেন, আবার মাকে কেন?' ধমকে উঠল রুচিরা।

'আপনার মা আমার আসার খবর পেলে নিশ্চয়ই, আর কিছু না হোক, একথালা জলখাবার পাঠাতেন।'

'জলখাবার?'

'বা, জামাই এলে শাশুড়ি জলখাবার খাওয়ায় না?'

মুখ চোখ করুণ করল রুচিরা। ম্লান কণ্ঠে বললে, 'মার খুব অসুখ।'

'কেন কী হয়েছে?'

'হাই ব্লাডপ্রেসার। খুব বাড়াবাড়ি হয়েছিল।'

'সব আপনার কাণ্ডে?'

'না, আপনার ভয়ে।'

'আমার ভয়ে? সে কি, আমাকে ভয় কিসের? আমি কী করেছি?'

'মার ভয় হয়েছিল আপনি কথা রাখবেন না।'

'কথা রাখব না মানে বিয়ে করব না।'

'হ্যাঁ, ভেবেছিলেন, টাকা নিয়ে সরে পড়বেন।'

'এ রকম ধারণা হবার কারণ?'

'যারা গরিব, যারা অভাবী, যারা ছোট-ছোট লুব্ধতায় দিন-রাত ঘুরে বেড়ায় তারা কথা রাখে না, তারা তাদের স্বার্থ সিদ্ধ করে সরে পড়ে।'

'বটে? আর আপনার নিজের ধারণা?'

'আমিও মার সঙ্গে একমত।'

'গরিবেরা কথা রাখে না?'

'না, কথার চাইতে তাদের কাছে তাদের নিজের সুবিধের দাম বেশি! স্বার্থের জন্যে তারা অনায়াসে সত্যকে ছেড়ে দেয়। এমন ছেড়ে দেয় যে, তাদের আর পাত্তাই পাওয়া যায় না যে প্রতিশ্রুতিটি তাদের কেউ মনে করিয়ে দেবে।'

'বুঝলাম। কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের দায়ে শুধু গরিব কেন, বড়লোকেরাও কিছু কম পড়ে না। যাক গে,' ঝগড়ার সুরটা জোর করেই তাড়িয়ে দিল ভাস্কর। বললে, 'এখন কেমন আছেন?'

'কিছুটা ভালো। তবে এখনো নিচে নামেন না।'

'কবে থেকে ভালো? যেদিন বিয়েটা হয়েছে সেদিন থেকে?'

'হ্যাঁ, বলতে পারেন, যেদিন সেই ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের আপিসে একটা ছাপানো ফর্ম সই করা হয়েছে।'

'অতখানি কথার আশ্রয় না নিয়ে সভ্য ভাষায় সংক্ষেপে সেটাকে বিয়ে বলে। যাক গে। আপনার মার যখন অসুখ তখন আপনাকেই অতিথি-সৎকার করতে হয়।'

রুচিরা দৃঢ় হল। বললে, 'আপনার কথাটা কী এই বেলা সারুন। সভ্য ভাষায় সংক্ষেপে সারতে তো আপনি বিশেষ দক্ষ।'

'তাই বলে আমাকে আপনি এক কাপ চা-ও খেতে দেবেন না?'

'ও সবের ভার আমার উপরে নেই।'

'না থাক। তাই বলে আপনি বলবে আপনার অন্তরঙ্গ পুরুষ এ বাড়িতে এক পেয়ালা চা পাবে না এ অসম্ভব।'

'কী বললেন?'

'আপনার আগন্তুক অতিথি।'

'আমি বললে এ বাড়ির যে-কাউকে চা খাওয়াতে পারি কিন্তু তার একটা টাইম আছে।'

'জামাইয়ের জন্যেও টাইম?'

'আপনার কথাটা সারুন।'

'কথাটা ছোট্ট। সেটা আর কিছুই নয়, আমার একটা অনুরোধ রাখুন। উঠুন, চলুন আমার সঙ্গে। আচ্ছা, এই বেলা না হয় বিকেলে চলুন।'

'কোথায়?'

'কথাটা ছোট্ট। সেটা আর কোথাও নয়, আমাদের বাড়ি।'

'আমাদের—আমাদের বাড়ি মানে?'

'মানে আমার বাড়ি। আর যেটা আমার বাড়ি সেটা আপনারও বাড়ি। মানে আমাদের বাড়ি। চলুন।'

'ইমপসিবল।' রুচিরা সেই বিশ্রী ইংরিজি কথাটা উচ্চারণ করল।

'আমার মা, আপনাকে, তাঁর ছেলের বউকে, দেখতে উৎসুক।'

'আমি যাব না। পারব না যেতে। যদি আপনার মার ইচ্ছে হয় তিনি এখানে এসে আমাকে দেখে যেতে পারেন।'

ভাস্করের সমস্ত স্নায়ু-শিরা কুণ্ডলী পাকিয়ে গেল, দংশনের তীক্ষ্ণ উদ্যতিতে। তবু প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সংযত করল, রূঢ় হতে দিল না। বললে, 'ছেলের বিয়ের পর মা প্রথম বউ দেখতে আসে ছেলের শ্বশুরবাড়িতে এমন অদ্ভুত কথা কেউ শোনেনি।'

'বউ যদি অসুস্থ হয় আসতে দোষ কী।'

'আপনি তো তেমন কিছু অসুস্থ নন।' চোখে আবার হঠাৎ স্নিগ্ধতা এল ভাস্করের: 'আপনি অনায়াসে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারেন। তাঁর তখন কত আনন্দ হবে।'

'কিন্তু সেই আনন্দ কত দিন!'

'পরের কথা পরে। বহু আনন্দই লুচনায় অকপট থেকে পরে মিথ্যে হয়ে যায়। তার জন্যে আজকের আনন্দকে কে প্রত্যাখ্যান করে? হাতের পাখিকে উড়িয়ে দেয়? শুনুন আমার এ অনুরোধটুকু রাখুন। সমস্ত পর্বত এড়িয়ে কাকে আমি নি[illegible] করেছি, কাকে আমি ভালোবেসেছি একবার দেখাতে দিন।'

'ভালোবেসেছেন?'

'ঐ অমনি করে বলা। অন্তত মা তে জানেন ঐ রকম। তাছাড়া ভালোবাসলেই ভালোবাসা। শুনুন,' চেয়ারের পিঠ ছেড়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল ভাস্কর। বললে, 'আমার মার কাছে, আগেই আপনাকে বলেছি, আপনার লেশমাত্র সংকোচ নেই। আপনি তাঁর কাছে শুধু স্বাগত নন, আপনি সম্মানিত।'

'সম্মানিত?'

'হ্যাঁ, তাঁর কাছে আপনি শুধু তার পুত্রবধূ নন, তাঁর গোপালের মা।'

'গোপালের মা?' হাসবে না কাঁদবে ভেবে পেল না রুচিরা। প্রায় আর্তনাদের মত শব্দ করে উঠল: 'ইমপসিবল! তারপর যখন সত্য টের পাবেন?'

'সত্য? সত্য আর কোথায়? এখন আইন যা বলবে তাই সত্য। এক বিশাল অশ্বত্থ গাছের মত আমি পক্ষী আর তার শাবক দুইকেই আচ্ছাদন করেছি। সুতরাং আমিই সত্য, 'তাহার উপরে নাই'। আর আপনি যাকে সত্য বলছেন, ক্ষুদ্র বৈজ্ঞানিক সত্য, তাও যদি একদিন মার কাছে প্রতিষ্ঠিত হয়, মার কাছে স একবার গোপাল সে সব সময়েই গোপাল। সব শিশুই গোপাল।'

'সব শিশুই গোপাল?'

'হ্যাঁ, শিশুর আবার জাতিভেদ কোথায়?' উৎফুল্ল চোখে বলতে লাগল ভাস্কর: 'একটা প্রকাণ্ড টেবলের উপর আট-দশটা উলঙ্গ শিশুকে পাশাপাশি শুইয়ে দিন না—দেখবেন সব কটা সমান হাসছে ফ্যাক ফ্যাক করে। বলে দিতে পারবেন, কোন ছেলেটা ফুটপাতে হয়েছে, কোনটা বস্তিতে, কোনটা রাজপ্রাসাদে? তফাত করতে পারবেন না। সব শিশুই সমান। সব শিশুই গোপাল।'

তির্যক তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল রুচিরা। বললে, 'আমি আপনাদের সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র বুঝেছি। এমনি করে আমাকে আপনারা আপনাদের সংসারের খাঁচায় বন্ধ করে রাখতে চান। রাখতে চান গরিব করে, সংকীর্ণ করে। গরিবের প্রতি আর আমার মোহ নেই। যেখানে আমার আনন্দ নেই আকর্ষণ নেই সে-ঘরে আমাকে ডাকবেন না। আমাকে ছুটি দিন।' দুহাতে মুখ ঢেকে উচ্ছ্বসিত কেঁদে

উঠল রুচিরা : 'আপনাকে শুধু মুক্তি-লে ডাকা হয়েছে, আমাকে শুধু দিয়ে আপনি মুক্ত হোন। কেন ক্তির বেশি আপনি দিতে চাচ্ছেন, ত্র চাচ্ছেন? না, না, পারব না, তাই যেতে পারব না।'

আপনি সম্পূর্ণ ভুল বুঝছেন, ভুল হন।' শান্তস্বরে ভাস্কর বললে, ক্তির ফটকে পেঁাছুতে হলে খানিকটা পথ তো হাঁটতে হবে। আমরা তো সেই পথে সেই ফটকের দিকেই চলেছি। পথ দিয়ে যেতে-যেতে শুধু এদিক-ওদিক একটু তাকিয়ে যাওয়া—'

'যাতে শেষ পর্যন্ত ফটকে গিয়ে না পেঁাছুই।' করতলের ঢাকা থেকে মুখ মুক্ত করল রুচিরা। 'মাপ করবেন, যা মিথ্যে তাকে ছলনা দিয়ে আর চাইনে জীবন্ত করতে।'

চাইনে, চাইনে—সমস্ত ঘরদেয়াল ভিতর-বার-আলো-হাওয়া বলে উঠল সমস্বরে।

চোখের কোলে এখনো জল টলটল করছে, উপর পাতার পালকে এখনো কণা-কণা শিশির—এক পলক দেখল ভাস্কর। যে এমনিতে গর্বে-গরিমায় সুন্দর সে বুঝি কাঁদলেও সুন্দর। কিন্তু কতক্ষণ তুমি দেখবে? যার প্রতি টান নেই আকর্ষণ নেই, আনন্দের সম্বোধন নেই, তাকে দেখাবেই বা কতক্ষণ। নির্মম আঁচলে চোখ মুছে ফেলল রুচিরা।

'বেশ, তবে তাই, যাবেন না।' উঠে পড়ল ভাস্কর।

বারান্দায় কার আসার শব্দে দুজনেই উচ্চকিত হল।

'এ কী, মা, তুমি উঠে এসেছ কেন?' রুচিরা এগিয়ে গিয়ে ধরল এণাক্ষীকে। আস্তে-আস্তে ডিভানে বসিয়ে দিল। পিঠের দিকে কটা বালিশ দিল এগিয়ে।

'কী হয়েছে? কী চায় ও?' সামনেই দাঁড়ানো ভাস্কর, তাকে উপেক্ষা করে এণাক্ষী রুচিরাকেই জিগগেস করলে।

রুচিরা তাকাল ভাস্করের দিকে। ভাস্কর বললে, 'ওকে বাড়িতে নিয়ে যেতে এসেছিলাম।'

'এমন কোনো কথা ছিল?' এবারও রুচিরার দিকে তাকিয়েই প্রশ্ন করল এণাক্ষী।

'না।' স্পষ্টস্বরে রুচিরাই উত্তর দিল।

'তবে?' এণাক্ষী এবার ভাস্করকে লক্ষ্য করল।

'সর্তগুলি তো আর লেখা হয়নি যে নির্দিষ্ট করা যাবে।' ভাস্কর বললে, 'তবে সব কথাই তো উচ্চারিত হয় না, কিছু কথা আবার উহ্য থাকে। খেতে আসবেন, এ বলে কেউ নিমন্ত্রণ করলে আঁচিয়েও যাবেন এটা নিমন্ত্রণের মধ্যেই ধরা থাকে। তেমনি বিয়ে করুন বললে বউকে ঘরে নিয়ে যান এটা নিশ্চয়ই অনুক্ত আছে। এ নিয়ে বিচ্ছিন্ন কোনো সর্ত হয় না কোনোদিন।'

'বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার কী দরকার?'

'আর কিছুর জন্যে নয়, আমার মা একবার দেখতে চেয়েছেন তাই।'

'আপনার মা জানলেন কী করে?'

'যাই হোক, জেনেছেন, আমিই জানিয়েছি যেটুকু জানাবার।'

'আর কাউকে জানানো যাবে এমন কোনো কথা ছিল?'

'জানানো যাবে না এমনও কোনো কথা ছিল না।'

তর্ক করা বৃথা। তাই এণাক্ষী মেয়ের মন জানতে তাকালেন রুচিরার দিকে। জিগগেস করলেন, 'কি, তুই যাবি নাকি?'

'না, না, আমি যেতে যাব কেন?' শত রসনায় না করে উঠল রুচিরা।

খুশি হয়ে বালিশের ঢেউয়ে নড়ে-চড়ে বসল এণাক্ষী। জোর পেয়ে বললে, 'মোট কথাটা ছিল, বিয়েটা হবে, তারপর বিয়েটা যাবে। এর মধ্যে আর কোথাও কারু যাওয়াযাওয়ির নেই, খাওয়াখাওয়ির নেই। এক দস্তখতে হ্যাঁ, আরেক দস্তখতে, না, হয়ে গেল। যার জন্যে টাকা নিয়েছেন সেইটুকুই করুন, কমও নয়, বেশিও নয়, সেইটুকু, বুঝলেন? তবে আপনার মা যদি চান, তাঁকে এখানে পাঠিয়ে দিতে পারেন।'

'বুঝেছি।' ভাস্কর দরজার দিকে এগোলো।

'নিচে ও'র সঙ্গে দেখা করে যাবেন।'

'উনি যদি চান ও'কে আমার ওখানে পাঠিয়ে দেবেন একদিন।'

নিচে নেমে গেল ভাস্কর। চলে যাবার সময় দেখল তরুণ সমিতির কটা চাঁই ছেলের সঙ্গে আলোচনা করছেন জগৎপতি।

'না, না তরুণ সমিতিকে কে মারবে?' পরবর্তী সম্পাদক রণেন দত্ত বললে, 'কর্ণধার একজন যায় আরেকজন আসে। নৌকা সামলে দেয়।'

'এই তো তরুণের মত কথা। যতই

নদী ঝড়ে উত্তাল হোক, নৌকো কিছুতে ডুবতে দেওয়া নয়।' ড্রয়ার টেনে চেক-বই বার করলেন জগৎপতি। স্বর নিচু করে জিগগেস করলেন, 'তোমাদের প্রাক্তন মাঝির খবর কি?'

'কোনো খবর নেই। এ রকম ইরেসপনসিবল লোক দেখা যায় না।' রণেন দত্ত ঝাঁজিয়ে উঠল। 'দিব্যি পালিয়ে গেল দেশ ছেড়ে।'

'ইরেসপনসিবল বোলো না, বলো অপরচুনিস্ট।' দলের আরেকজন টিপ্পনী কাটল।

'অপরচুনিস্ট কথাটা ভালো শোনাচ্ছে না।' আরেকজন ফোড়ন দিল : 'চির-তরুণ।'

দিব্যি সমান-সমান হবার চেষ্টা করলেন জগৎপতি : 'এক সেক্রেটারি না-বলে-কয়ে চম্পট দিল আরেক সেক্রেটারি বিয়ে করে বসল।'

সভ্যের দল হেসে উঠল মন খুলে : 'একেই বলে এস্কেপিস্ট।'

আবার কেন কে জানে হেসে উঠল সকলে।

দিব্যি প্রশ্রয় পেয়ে একজন বললে, 'আমরা তো ভেবেছিলাম দুজন একসঙ্গে পালিয়েছে। তেমনি একটা কানাঘুষো চলছিল সমিতিতে।'

'যা রটে তাই সব সময়ে ঘটে না।'

'কিংবা, রটে একরকম ঘটে অন্য-রকম।' একটু বুঝি সংশোধন করলেন জগৎপতি : 'আসল গোপন রেখে নকল নিয়ে খেলা করে। আসলে বিয়ে করবে ভাস্করকে, মেলামেশা শুভময়ের সঙ্গে। কী না জানি কথাটা, ভাজে ঝিঙে বলে পটোল।'

উচ্চহাসির রোল উঠল ঘর ভরে।

'এটাও একটা তারুণ্যের লক্ষণ।' কে মন্তব্য করল।

'তবেই বলো, আমার কি ভাস্করের সঙ্গে বিয়েতে আপত্তি করা উচিত ছিল?'

'বা, তা কেন, আপনি যুগধর্ম পালন করেছেন।'

তাই রুচিরা সমিতি থেকে বেরিয়ে গেলেও জগৎপতি থেকে গেলেন। থেকে গেলেন ছোকরাদের সহানুভূতিতে, সেই পুরোনো মুরুব্বি হয়ে।

'হলই বা না আমার একমাত্র মেয়ে, হলই বা না অবস্থাপন্ন, তাই বলে কি ওর নির্বাচনে আমি হস্তক্ষেপ করতে পারি?'

'বা, আপনি প্রগতিবাদী, আপনি তা কেন করবেন?'

'তারপরে ভালোবাসার বিয়ে প্রায়ই টেঁকে না।' যেন ভবিষ্যৎ বাণী করছেন এমনি অভ্রান্ত জগৎপতির কণ্ঠ : 'এ বিয়েও টিঁকবে না, ভেঙে যাবে। সেটা সুদিন না দুর্দিন হয়ে আসবে জানি না, কিন্তু সেদিনও আমি তার প্রতিবন্ধক হব না। সবার জীবনে স্বাধীনতাই বড় কথা সেইটেই স্বীকার করে যাব।'

বাড়ির মধ্যে না হয়ে রাস্তায় হলে সবাই জয় দিয়ে উঠত। এই তো দেশ-নেতা হবার মত মনোভঙ্গি। এই তো দলের সঙ্গে থাকা, দলকে সঙ্গে নিয়ে চলা।

'তোমরা টাকা চাচ্ছ, নিশ্চয়ই আমি দেব।' দুশো টাকার একটা চেক কেটে রণেনের হাতে দিলেন জগৎপতি : 'ফিস্টি করো সকলে তাতেও আমি রাজি। কিন্তু এ রকম একটা বাজে বিয়ের জন্যে ফিস্টি এতে মন উঠছে না।'

'বাজে বিয়ে, স্যার?'

'বাজে মানে আর কিছু নয়, অসরল বিয়ে। দেখালে একজনের সঙ্গে, করলে আরেকজনকে। এবং তারই আভাস পেয়ে শুভময় বিবাগী হল কিনা তার ঠিক কী!' ঠিক অবাধ গলায় বলতে পারছেন জগৎপতি : 'তাই সাধে কি আর বিয়েতে নেমন্তন্ন করিনি কাউকে? মনের দুঃখ মনেই চেপে গিয়েছি। হত দুই সেক্রেটারির বিয়ে, শুধু ক্লাব-হাউস কেন, পাড়া-কে-পাড়া আমরা ইলিউমিনেট করতাম।'

'তাই বিয়ের নামে ফিস্টি করা নয়। স্যার ঠিকই বলেছেন। এ ফিস্টি' রণেন ঘুসি তুলে ঘোষণা করল, 'আমাদের প্রেসিডেন্টের জন্মদিন উপলক্ষে।'

'আমার জন্মদিন? সে তো—' জগৎপতি আমতা-আমতা করতে লাগলেন।

'যেদিনই জন্মদিন হোক কিছু এসে যায় না।'

'আমরা যে কোনোদিন যে কোনো মুহূর্তে জন্মাতে পারি। প্রতিদিনই আমাদের জন্মদিন।'

'আর সেইটেই তারুণ্যের চিহ্ন।' চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন জগৎপতি।

ঘুসি তুলে আওয়াজ দিতে-দিতে বেরিয়ে পড়ল ছেলেরা। জগৎপতি জন-প্রিয়তার তুঙ্গতর শৃঙ্গে এসে উঠলেন।

ভিতরে গিয়ে দেখলেন স্ত্রী আর মেয়ের মধ্যে একটা তপ্ত স্তব্ধতা থমথম করছে। 'কি, ভাস্কর এসেছিল না? চলে গিয়েছে? আমার সঙ্গে দেখা করল না তো? কী বলে গেল?'

'বলে গেল তোমাকে ওদের ওখানে পাঠিয়ে দিতে।' এণাক্ষী ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে।

উপর-উপর শুনেই আর সিদ্ধান্ত করতে রাজি নয় জগৎপতি। জিগগেস করলেন, 'ব্যাপার কি?'

'ব্যাপার রুচিকে বাড়িতে নিতে চায়।'

'কেন?'

'ওর মাকে বউ-দেখাবে বলে।'

রুচিরা সামনেই, তবু এ জিগগেস করলেন জগৎপতি, 'কি বললে?'

'যা বলবার তাই বললে। বলা এমন কোনো সর্ত ছিল না। ওদের বাড়িতে গিয়ে উঠতে হবে বউ হয়ে।'

'তার মানে "না" করে দিলে?'

'হ্যাঁ, বাবা, 'না' করে দিলাম।' রুচিরাই বলল অকপটে।

'একেবারে কাঠখোট্টা 'না' করে দেওয়াটা ঠিক হয়নি।' জগৎপতি মুখে চিন্তার রেখা টানলেন : 'যাব-যাচ্ছি যাব-যাচ্ছি করে ছলনায় ভুলিয়ে রাখা উচিত ছিল। চটিয়ে দিলে কাজ ভালো হবে না।'

'না, না, আর ছলনা নয়। চটলে চটুক। যা হবার তা হোক। আমি কিছুতেই ও বাড়ি যাব না।' রুচিরা আবার কান্নায় ফুঁপিয়ে উঠল।

'তা তো যাবি না, কিন্তু ওর হাতে এখনো রঙের টেক্কা।'

'বলতে চাও, প্রতিশোধ নেবে? ডিভোর্সটা দেবে না? না দিক।' থরথর জ্বলে উঠল রুচিরা : 'তবু, তবু ও পাবে না আমাকে। যাব না ওর বাড়ি। যাকে আমি ভালোবাসিনি, যার প্রতি আমার ভালোবাসা জাগেনি, তাকে আমি স্বামী বলে পারব না মেনে নিতে। না, কখনো না। ডিভোর্স না দিল তো বয়েই গেল।'

'কিন্তু এর চেয়ে আরো বড় অস্ত্র তার হাতে আছে।'

'সে কী?' এণাক্ষী বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল।

'সে কোর্টে গিয়ে রেস্টিটিউশন অফ কনযুগেল রাইট চাইতে পারে। বলতে পারে, কোনো সঙ্গত কারণ নেই, স্ত্রী স্বামীর থেকে আলাদা থাকছে। মামলার ডিক্রি পেয়ে জারি করে জোর করে নিয়ে যাবে স্ত্রী।'

'সে ডিক্রি আমি মানব না।'

'কোর্টের ডিক্রি মানবি না কী!'

'না মানব না, আমি আত্মহত্যা করব, খুন করব।' কাঁদতে-কাঁদতে উঠে পড়ল রুচিরা, দেয়াল ধরে দাঁড়াল টাল রাখতে : 'যে করেই হোক আমি ফিরিয়ে নেবই আমার স্বাধীনতা। একটা ভুল করেছি বলে আর আমার মুক্ত হবার নির্মল হবার অধিকার নেই, এ হতেই পারে না।

এত বড় জীবন! এত বড় পৃথিবী! শুধু আমারই স্থান নেই?'

এদিকে কী এক অশরীরী আতঙ্ক দেখে এণাক্ষী টলে পড়ছিল, জগৎপতি ধরে ফেললেন। আস্তে-আস্তে ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলেন বিছানায়। খবর পাঠালেন ডাক্তারকে।

রুচিরাকে বললেন, 'এখুনি এত ঘাবড়াচ্ছিস কেন? মামলার কথা বললুম বলে কী! মামলার ডিক্রি পাওয়া কি সোজা কথা? তবে আমি আছি কী করতে?'

এ সবে সান্ত্বনা নেই রুচিরার। তার আশ্বাস এখনো বিশ্বাসে। শত নষ্ট-ভ্রষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হলেও মানুষ সৎ হতে পারে সত্যাশ্রয়ী হতে পারে এই প্রত্যয়ে।

কিন্তু তাই বলে জগৎপতি হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারেন না। ক' দিন পরে গাড়ি নিয়ে ভাস্করদের বাড়ির সামনে দাঁড়ালেন এক ছুটির দিন।

মহালয়া উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল: 'বৌমা এল বুঝি।'

উৎসুক হয়ে তাকাল ভাস্কর। সোমনাথ তো বাইরেই ছুটে এল। না, জগৎপতি একাই এসেছেন। সঙ্গে রাজ্যের জিনিসপত্র, কাগজের বাক্স-প্যাকেট খাবার-দাবার। নিজের হাতে করে, কিছুটা বা সোমনাথের সাহায্যে, নামালেন একে-একে। স্তূপীকৃত করে তুললেন।

'বৌমা এল না বুঝি?' মহালয়াই এগিয়ে এসে কথাটা পাড়ল।

'আসবে, আজই আসবে। ভাস্কর, তুমি আজ দুপুরে আমাদের ওখানে খাবে, আর বিশ্রাম করে বিকেলে ফেরবার সময় নিয়ে আসবে রুচিকে।'

প্রথমে নিষ্প্রাণ জিনিসগুলি দেখে ভাস্করের ইচ্ছে হয়েছিল, প্রত্যাখ্যান করে দেয়; কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হয়েছিল কোন্ সততায় সে প্রত্যাখ্যান করবে, সে তো এমনি ঘুষ নিতেই অভ্যস্ত। এখন রুচিরা আসবে জেনে মন খুশিতে টলমল করে উঠল, দেখতে চাইল কী কী জিনিস, কার জন্য কী। মার জন্যে গরদ, দু ভাইয়ের জন্যে ধুতি, অর্ডার না দিয়ে কেনা যায় বলে রঙ-বেরঙের বুশ-শার্ট, রুমাল। আর নীল দড়ি দিয়ে বাঁধা বাক্সে সন্দেশ আর শোনপাপড়ি।

'আসবে তো, কিন্তু এইটুকু তো আমাদের বাসা।' মহালয়া দিব্যি দরদ আনন্দ কণ্ঠে: 'থাকবে কী করে?'

'এখন তো একবার আপনাকে দেখা দিতে আসা। তাতে তো আর এইটুকু বাসাতে আটকাবে না।' জগৎপতি অনায়াসে মায়ায় মমতায় কণ্ঠস্বর আর্দ্র করলেন: 'কদিন পরে যখন স্থায়ীভাবে থাকতে আসবে তখন অবশ্য কুলোবে না এখানে।'

'তখন কী হবে?'

'তখন একটু বড় দেখে ফ্ল্যাট নিতে হবে। কিন্তু,' সারল্যে ভরপুর হয়েই বললেন জগৎপতি: 'সময়কালেই তো আর মনোমত ফ্ল্যাট পাওয়া যায় না, তাই সেটা এখন থেকেই ভাড়া নিতে হবে।'

'আমিও তো কবে থেকেই তাই বলছি ভাস্করকে। এখন বিয়ে করলি, বউ আসবে, আমার গোপাল আসবে, একটা বড় দেখে বাসা নে।' মহালয়া অনুযোগ করে উঠল: 'কিন্তু ছেলের আমার গা হয় না। গোপালের কৃপায় মাইনেও তো বেশ বাড়ল।'

'না, না, ও মাইনেতে কী করে পারবে? আমি একটা দেখেও এসেছি। এই কাছেই। দোতলায় তিনখানা ঘরের ফ্ল্যাট—'

'তিনখানায় প্রচুর হয়ে যাবে আমাদের।' যেন আর কিছু দেখতে হবে না এমনি ত্বরিত স্ফূর্তিতে বলে ফেলল মহালয়া।

'কিন্তু ভাড়া কত?' ছন্দভঙ্গের মত প্রশ্ন করল ভাস্কর।

'একশো ষাট টাকা।'

শীর্ণ হয়ে গেল মহালয়া। এক ফুঁয়ে নিবে গেল ভাস্করের মুখ।

'আমাদের পক্ষে বেশি হয়ে যাচ্ছে না?' মহালয়া তাকাল কাতর চোখে।

'বেশি মানে? সামর্থ্যের বাইরে হয়ে যাচ্ছে। অতগুলো টাকা শুধু বাড়ি-ভাড়াতেই বেরিয়ে গেলে ভাস্কর খাবে কি? শ্বেতহস্তী পুষবে কী দিয়ে?'

জগৎপতি বুঝতে পারলেন শ্বেত-হস্তীর ইঙ্গিতটা এদের পক্ষে একটু কঠিন হচ্ছে।

তাই নিজেই পরিষ্কার করলেন: 'শ্বেতহস্তী মানে বড়লোকের মেয়ে। আপনার ছেলের বউ।' তাকালেন মহালয়ার দিকে: 'শ্বেতহস্তী পোষা কি চারটিখানি কথা? আজকাল কি আর সেই সীতা-সাবিত্রীর আদর্শ আছে যে স্বামীর সঙ্গে বনে হয় তো বনেই যাব, কাঠ কাটতে হয় তো কাঠই কাটব কোমর বেঁধে? স্বামী গরিব বলে আমি, বড়লোকের মেয়ে, আমি তার সংসার করব না, বা তার ঘর আমার মাপে ছোট মনে হবে এ নিদারুণ অন্যায়—'

'কিন্তু ও নিয়ে আপশোস করা বৃথা।' মহালয়াই যোগ করল।

'হাঁ, উপায় নেই। বাস্তব বাস্তব।' বললেন জগৎপতি: 'তাই ঠিক করেছি ও ফ্ল্যাটটার ভাড়া আমি দেব।'

'আপনি দেবেন?' মহালয়ার চক্ষু স্থির।

'হ্যাঁ, জামাইকে লোকে যৌতুক দেয় না? মাসিক একশো ষাট টাকা ভাড়া এমন কি আর বেশি কথা? তাই ভাড়া দেবই শুধু ঠিক করিনি, ভাড়া নিয়েও নিয়েছি ফ্ল্যাটটা।'

'নেওয়া হয়ে গিয়েছে?' মহালয়ার দুই চোখে বিস্ময় আর ধরছে না।

আরো বিস্ময় সোমনাথের মুখে-চোখে। 'ফ্ল্যাটটা দোতলায়?' কোনোদিন দোতলায় থাকেনি সেই অপূর্বের অনুভবে রঙিন এখন সোমনাথ: 'সিঁড়িটা কোনদিক দিয়ে? কতটা লম্বা? কতগুলো ধাপ আছে?'

'নিচে দোকান আছে দু-তিনটে। পাশ দিয়ে গলি, আর সেখান থেকেই উঠে গিয়েছে সিঁড়ি।' জগৎপতি তরতর করে বলে চললেন, 'মাস খানেকের মধ্যেই ফ্ল্যাটটা খালি হবে আর তক্ষুনি ঢুকে পড়বেন আপনারা। আমি সব ব্যবস্থা পাকা করে এসেছি, বাড়িওলাকে দিয়েছি সেলামি আর দু মাসের য়্যাডভান্স।'

কিন্তু কত দিন আপনি ভাড়া টানবেন? এমন একটা প্রশ্ন স্বভাবতই উঁকি মারল ভাস্করের চোখে। জানি, কত দিন। বড় জোর এক বছর। অর্থাৎ যত দিন না ছাড়পত্রে সই করে দিচ্ছে। তারপর? তারপর কি পুনর্মূষিক নয়?

ভাস্করের এই অস্বস্তিটা টের পেলেন জগৎপতি। বললেন, 'কথা হচ্ছে বাড়িওলা গোটা বাড়িটা বিক্রি করে দেবে। তা যদি হয়, যত দাম হোক, কতই বা আর হবে, আমি কিনে নেব। আর যদি ওটা শ্বশুরের বাড়ি হয়, তাহলে কি আর জামাইকে ভাড়া গুনতে হবে? গুনতে হলেও সে নিশ্চয়ই নমিন্যাল, নামমাত্র হবে কিছু। গায়ে লাগতে দেবে না। কী, তাই নয়?'

দুর্বল রেখায় ভাস্কর হাসল। পরের কথা পরে। এই মুহূর্তে যা সহজ তা আসুক সহজ হয়ে। সহজ সুখই বুঝি সবচেয়ে দুষ্প্রাপ্য।

চলে যাবার ভঙ্গি করলেন জগৎপতি। ভাস্কর এগিয়ে দিতে এল।

'যেও বারোটা নাগাদ।' জগৎপতি মনে করিয়ে দিলেন।

'খাওয়াটা থাক।'

'থাকবে, কেন?'

'ঠিক একটা হৃদ্য পরিবেশ হবে না।'

'হবে না মনে করছ? তা হলে থাক।' জগৎপতি দিব্যি ফিরিয়ে নিলেন কথা। সদাশয় মুখে বললেন, 'তাহলে বিকেল চারটে নাগাদ যেও। একটু চা খেও না

হয়। তারপর নিয়ে এস রুচিকে। রুচি তৈরি হয়ে থাকবে।'

চারটে নাগাদই গেল ভাস্কর।

আর চারটে নাগাদই এল ডাক্তার।

'এই যে তুমি এসেছ। ভালোই করেছ।' জগৎপতি ভাস্করকে ছেড়ে দিয়ে ডাক্তারকে নিয়ে পড়লেন : 'খানিকক্ষণ আগে থেকে কী রকম একটা 'পেন' উঠেছে—'

'চলুন, দেখি—' বললে ডাক্তার।

দুজনে উঠছে সিঁড়ি দিয়ে, ভাস্কর ভাবতে চেষ্টা করল অসুখটা কার। রুচিরার, না, তার মার।

আর, সন্দেহ রইল না কার, যখন উপর থেকে জগৎপতি ডেকে উঠলেন ভাস্করকে। এস, তুমিও চলে এস।

ভাস্কর নিচে থেকেই বললে, 'আমি 'পেন'-এর কী বুঝি?'

'এটিই বুঝি জামাই?' জিগগেস করলে ডাক্তার।

সানন্দ মুখে স্পষ্ট সায় দিলেন জগৎপতি। বললেন, 'নিয়ে যেতে এসেছে।'

নিচেই অপেক্ষা করতে লাগল ভাস্কর। খেলাটা শুধু দেখে যেতে হবে না, খেলাটা খেলে যেতে হবে।

কতক্ষণ পরেই স-ডাক্তার নামলেন জগৎপতি।

রুগীর কী অবস্থা, ব্যাধির কী গতি-প্রকৃতি সে-সব উপরেই আলোচনা হয়ে গিয়েছে, এখন যেটা সবচেয়ে জরুরি সেটা ভাস্করের সামনে বলা দরকার। তাই জগৎপতি প্রশ্ন করলেন ডাক্তারকে : 'এ অবস্থায় হাঁটা-চলা কি ঠিক হবে?'

'কখনো না। এখন সম্পূর্ণ বিশ্রাম।'

দোরগোড়ায় ডাক্তারকে ফি দিলেন জগৎপতি, আর যেহেতু রুচিরার যাওয়াটা বন্ধ হয়ে গেল সেই হেতু বুঝলেন ভাস্করকেও কিছু ফি দেওয়া দরকার। বললেন, 'একবার উপরে যাও। রুচি তোমাকে খুঁজছিল, কী যেন বলবে।'

'না, বলবে আবার কী! তার তো এখন বিশ্রাম প্রয়োজন।' বলে সটান বেরিয়ে গেল ভাস্কর।

এণাক্ষীর ঘরেই বসেছিল রুচিরা, যাতে ভাস্কর হঠাৎ ঘরে ঢুকে রুচিরাকে না একা পায়। যদি একা ঘরে ঢোকে তাকে তো অনধিকার প্রবেশ বলা চলবে না, আর যদি নিয়ে যাবে বলে হাত ধরে টানাটানি করে তা হলেও বলা চলবে না বলাৎকার। শত হ'লেও আইনের চোখে স্বামী, ডাকাত পড়েছে বলে চেঁচামেচি করলে তো সিদ্ধ হবার নয়। তাই জোরে না পারি বুদ্ধিতে পারব।

জগৎপতি এসে বললেন, 'খুব চটে গিয়েছে।'

'তা চটুক। চলে গিয়েছে তো?' এণাক্ষীর বুক থেকে পাথর নামল : 'ও চলে গিয়েছে শুনলেই আমার নিশ্বাস-প্রশ্বাস সহজ হয়।'

'এখনো সম্পূর্ণ চলে গেল কই?' নিশ্বাস-প্রশ্বাস দীর্ঘ করলেন জগৎপতি।

'তুমি এত পারো, এটা পারো না?' রাতে ভালো ঘুমুতে পারে না এণাক্ষী, তাই এই দুরভিসন্ধিটা চোখে জ্বলবার সঙ্গে-সঙ্গে তাকে কেমন পাগলের মত দেখাল।

'বিবেকের ভয় তো নয়, ভাগ্যের পরিহাসে ধরা পড়ে যাবার ভয়।' স্থির-মাথার লোক, বললেন জগৎপতি : 'যার জন্যে গোড়াতেই রুচির জন্যে ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে পারলাম না।'

মোটেই তার জন্যে নয়। ভঙ্গিতে এই ভাবটা ফুটিয়ে রুচিরা চলল তার নিজের ঘরের দিকে। পাপ বলতে চাও বলো, কিন্তু আসলে এ প্রতিবাদ। সে এই প্রতি-বাদ, এই জীবন্ত প্রতিবাদ নিয়েই চেয়েছিল বেঁচে থাকতে। পরে ঘটনাটা যে ভাবে ঘুরল, তাতে তার কোনো হাত নেই। যে কোনো ভাবে, যে কোনো দিক থেকেই হোক, দুঃখ আসবেই। দুঃখ না এলে পাপকে পোড়াবে কে, কী করে হবে জীবনের শুদ্ধিস্নান!

রুচিরা তার নিজের ঘরে গিয়ে দরজায় খিল দিল।

কোনো টান নেই কোনো আকর্ষণ নেই, গরিবানার মোহ তার ভেঙে গিয়েছে, তবু মানুষ হিসেবে ভাস্করের প্রতি একটু মায়া কোন না আছে রুচিরার। শত হলেও পরোপকার তো করেছে, প্রত্যাখ্যাতার কলঙ্কমোচন করেছে, একটা অপ্রার্থিত জন্মকে তো জীবনের অধিকারী করেছে, সেই দিক থেকে কিছু মূল্য তাকে দেবই, কিন্তু তাই বলে সামান্য বেগুনওয়ালা হয়ে সে যেন হীরের দাম না চায়, হাতের চেয়ে গ্রাস না বড় করে।

ডিক্রি করে বউ দখল নেবে? যেখানে প্রাণ নেই সেখানে তো মাংসপিন্ডও নেই।

১৩

আপিসে টেলিফোন করলেন জগৎ-পতি : 'কে ভাস্কর? হ্যাঁ, তোমার মাকে বোলো তাঁর একটি নাতি হয়েছে। নব-জীবন নার্সিং হোমে আছে। ভালোই আছে দুজনে। তোমার মাকে নিয়ে এক-দিন এস। আর, হ্যাঁ, বার্থ রেজিস্ট্রেশনটা করে ফেলো।'

'ঠিক আছে।'

মহালয়া তো শোনামাত্রই যাবার জন্যে পাগল। ছেড়ে দে, আমি আমার গোপালকে দেখে আসি।

'বউ দেখল না, ছুটল নাতি দেখতে!' বিদ্রূপ করল ভাস্কর।

'বউয়ের উপর আমার অভিমান হতে পারে কিন্তু গোপালের উপর আমার অভিমান কী!'

'কিন্তু গোপালকে তুমি চিনবে কী করে?' ভাস্কর তরল পরিহাসের সুরে বললে, 'দেখলে এক ভদ্রমহিলা একটা ছেলে কোলে করে বসে আছে, তুমি কী করে বুঝবে ঐ ভদ্রমহিলা তোমার পুত্রবধূ?'

'তুইও চল, তুই সনাক্ত করে দিবি।' মহালয়া আবেশভরা মুখে বললেন, 'তুইও দেখে আসবি তোর গোপাল।'

'আমার বয়ে গেছে! আমি নতুন বাড়িতে, দোতলার ফ্ল্যাটে উঠে এসেছি। ঘর-দোর সাজিয়েছি-গুছিয়েছি, কোনো অসুবিধেই রাখিনি, এবার সে আসবে সংসার করতে। আমি ততদিন অপেক্ষা করব।'

'কিন্তু আমার যে তর সইছে না।'

'যে গোপাল তোমার মান রাখল না, নিজের থেকে এল না তোমার কাছে, তোমার কোলে, তাকে দেখবার জন্যে কেন তোমার মাথাব্যথা?'

'আমার কত দিনের সাধ পাব আমার গোপালকে।'

'তার মানে আমাকে পাবার আগেই তোমার গোপাল পাবার ইচ্ছে। ধৈর্য ধরো। যদি সত্যিই গোপাল হয় সে নিজের থেকেই তোমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বে।'

ফার্নিচারও জগৎপতিই কিনে দিয়েছেন, পর্দা-কার্পেটও তাঁর পয়সায়। এ সব ঠাট-ঠমক না হলে সে আসবে না। পরোক্ষে এটাই বলা যে, যেহেতু তোমার সাধ্য নেই এই সাজ-সজ্জার উচ্চ-স্বরটা বজায় রাখো, পুষতে পারবে না এই ঐরাবতকে। আড়ম্বর ছাড়া কি ঠাকুরাণীর পুজো হয়? সুতরাং, ছেড়ে দাও, তপ্ত কয়লার টুকরো ফেলে দাও হাত থেকে, যে বয়ে যেতে এসেছে তাকে বয়ে যেতে দাও।

নতুন ফ্ল্যাটে বদলি হতে ইচ্ছে ছিল না ভাস্করের। এ যেন তারই অসামর্থ্যকে রঙিন পেন্সিলে দাগ দিয়ে দেখানো। কিন্তু ন্যায্য বিবাহেও তো স্ত্রীকে নিয়ে সংসারে বিস্তৃত হবার তাগিদে বড় বাড়ির খোঁজ পড়ে। তা ছাড়া তার তো নগদ-বিদায়ের পালা, যা হাতে আসে তাই সে লুফে নেবে না কেন, কেনই বা
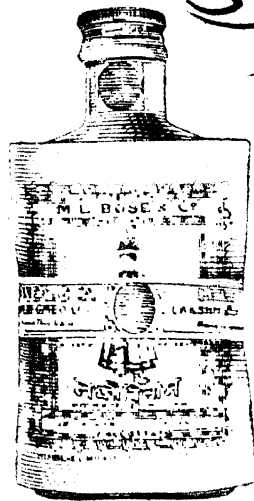
লুটে নেবে না? দুদিনের বৈরাগীই তো ভাতকে প্রসাদ বলে নেবে।

ভাস্কর জানে, দুদিন পরে সমস্ত কিছু তাসের ঘরের মত উড়ে যাবে, আবার সে নেমে আসবে তার বিবর্ণতায়। তাই সে পুরোনো বাড়িটা ছাড়েনি, পুরোনো বন্ধু, সদাব্রতকে এনে বসিয়েছে, ভাড়া চলছে আগের নামে। ভয় আছে, সে দুর্দিনে বন্ধু আবার না বিশ্বাসঘাতকতা করে। স্বত্ব না থাক, মাত্র দখলের জোরে না পথ আটকায়।

আসতে হলে এখানেই আসত। কোনা অল্পতাই বেশি হত না। কিন্তু কেন আসবে? কিসের টান কিসের আকর্ষণ কিসের প্রাবল্য? কী তার আছে যাতে সে মহালোবান বসে প্রতিভাত হতে পারে? কুড়িয়ে নিতে পারে সমস্ত মন, সমস্ত শরীর, সমস্ত সার-সত্তা? কিছুই নেই। শুধু ফাঁকা আওয়াজে কার বুক সে বিদ্ধ করবে?

না, ফাঁকা আওয়াজ কে বললে? আইনের শিলমোহর করা দস্তখৎ। সে দস্তখতের পিছনে সমস্ত রাজশক্তি, সমস্ত উদ্যত বেয়নেট। সে অধিকারই বা সে প্রতিষ্ঠিত করবে না কেন? কেন এক ক্ষণগর্বিতার ঔদ্ধত্যকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেবে না? কেন ক্ষুদ্র একটা খেয়ালের সামনে সে সমস্ত পুরুষ-শক্তিকে, সমাজশক্তিকে নিষ্প্রভ করে রাখবে? সে ছাড়বে কেন, সে ঠকবে কেন, কেন সে তার প্রাপ্তব্যকে কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করে নেবে না? হোক তা এক পিণ্ড ইচ্ছাহীন মাংস, তাতেই সে অপূর্ব নৈপুণ্যে পারবে প্রাণ এনে দিতে, সমস্ত বৈমুখ্যকে নিয়ে যেতে আনুকূল্যে। পারবে না? পারা যায় না কোনদিন? একটা ভালো-লাগাকে ফলিয়ে তোলা যায় না ভালোবাসায়?

কত আর ধৈর্য ধরবে, বাধা-বিপদ ডিঙিয়ে সোমনাথকে নিয়ে মহালয়াই একদিন গিয়ে হাজির হল। সুবিধেই হল হয়তো, জগৎপতি ভাবলেন। বিরোধটা তাহলে একটা একক গাছে আবদ্ধ না হয়ে সমগ্র অরণ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

এণাক্ষীর কাছে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলেন। এণাক্ষী নিয়ে গেল রুচিরার ঘরে। সর্বভোলা কোনো-কিছুর ধার-না-ধারা নির্বোধ শিশু খাটের আধখানার অনেক বেশি জায়গা জুড়ে রাজ্য বিস্তার করে ঘুমুচ্ছে, পাশে আধশোয়া রুচিরা।

পলকে বুঝে নিল মহালয়া। 'এই যে আমার গোপাল!' পরিপ্লাবী স্নেহে ঝুঁকে পড়ল মহালয়া: 'আমার কত সাধনার ধন!'

একটা ফিটফাট পোশাকের ছিমছাম ধাই—সম্ভ্রান্ত নাম আয়া নার্স—পাশেই ছিল, শাসন করে উঠল: 'অত ঝুঁকবেন না।'

'না, ঝুঁকছি না।' একটু বুঝি সরে গেল মহালয়া: 'দেখছি আমার গোপালকে। মাথাভরা কী সুন্দর চুল! কী নাক-চোখ-কপাল! একেবারে আমার ছেলেবেলার ভাস্কর।'

এণাক্ষী রুচিরাকে বললে, 'ইনি ভাস্করের মা।'

'আমি তোমার শাশুড়ি। আর তুমিই আমার ঘরের লক্ষ্মী, যশোমতী।' রুচিরার চিবুকে ধরে একটু আদর করল মহালয়া: 'আমার বউমাও বা কী সুন্দর!'

রুচিরা হাত তুলে নমস্কার করল। পাশে চেয়ার দেখিয়ে বললে, 'বসুন।'

সে মনোযোগ স্নেহ-কৌতূহলে আক্রান্ত হবার আগেই নার্সের ইঙ্গিতে দূরে সরে গিয়ে এক কোণে একটা সোফায় গিয়ে বসেছে।

মহালয়া সরল না, খাটেই জায়গা করে নিয়ে বসল। নার্সকে বললে, 'গোপালকে একটু আমার কোলে দেবে?'

'দেখছেন না ঘুমুচ্ছে।' নার্স আবার শাসন করল।

'আহা, গোপাল খানিক জাগে খানিক ঘুমোয়, তাতেই তো রাত-দিন, সুখ-দুঃখ, মিলন-বিরহ। যদি একটু জাগেও, আবার আমার কোলে এসে গোপাল ঘুমিয়ে পড়বে।'

এণাক্ষীর অসহ্য লাগছিল, বললে, 'কী অমন একটা বিশ্রী নামে ডাকছেন?'

'গোপাল বিশ্রী নাম?'

'নিশ্চয়ই। গরু, গরুর পাল এ-সব আবার কী নাম? ও সব নাম আজকাল চলে নাকি?' এণাক্ষী গর্ব ফুটিয়ে বললে, 'আমরা অন্য নাম রেখেছি।' এমন একখানা ভাব করল, শিশু যেন ওদেরই একলার শিশু, আর কারু নাম রাখবার এক্তিয়ার নেই।

'কী নাম?' তবু জিগগেস না করে পারল না মহালয়া।

'অসীম।'

'বা, অসীম তো খুব ভালো নাম। আমার গোপালই তো অসীম—অনন্ত—অশেষ।'

তবু গোপালকে কেউ মহালয়ার কোলে তুলে দিল না। নার্সের চোখ পাহারা দিচ্ছে।

তখন মহালয়া রুচিরার দিকে মনোযোগ দিল। জিগগেস করল: 'নার্সিং হোম থেকে ফিরেছ কত দিন?'

এণাক্ষীর মুখের দিকে তাকাল রুচিরা। বললে, 'দিন সাতেক।'

'নার্সিং হোমে ছিলে কদিন?'

'দু সপ্তাহ।'

মহালয়া হিসেব করে দেখল, অনায়াসেই প্রণাম করতে পারত রুচিরা। প্রণাম কি আর পুরো করতে হত নত হয়ে? সেই নম্রতার ঠাণ্ডা ভঙ্গিটুকু করতে না করতে মহালয়াই তাকে নিরস্ত করত।

'নিজের ঘরে কবে যাবে?'

যা হোক রুচিরাই তো উত্তর দেবে, তা নয় এণাক্ষী বললে, 'সে ডাক্তার জানে। শরীর এখনো—'

'তা হলে আজ আসি।' আবার গোপালের কাছে এগিয়ে গেল। ছোট দুটি সোনার বালা তার হাতে ঠেকিয়ে রাখল বালিশের কাছে। শক্ত জিনিস এত কাছে রাখা উচিত নয় সেই ওজুহাতে তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে সরিয়ে রাখল নার্স।

মহালয়া চলে যেতে-যেতে আবার ফিরল। বললে, 'আমি আবার আসব। সেদিন নিশ্চয়ই গোপালকে জাগা দেখব। শুনব তার মিষ্টি কান্নার বাঁশির সুর।'

'যদি আসেন তো একটু জানিয়ে আসবেন।' মনে করিয়ে দিল এণাক্ষী।

নেমে যাচ্ছে, মহালয়া শুনতে পেল শিশুকণ্ঠের আর্তনাদ। ওই, ওই আমাকে ডেকেছে। এবার সোমনাথ ধমকাল।

তাই আর ফিরতে পেল না মহালয়া।

বাড়ি এসে ভাস্করকে বললে, 'ওরা এমন একটা ভাব দেখাল যেন গোপাল ওদেরই সব, আমাদের কেউ নয়।'

'কবে আসবে তার কিছু আভাস দিলে?'

'কিছুমাত্র না। ডাক্তারের উপর বরাত দিলে।' মহালয়ার মুখ থমথমে হয়ে উঠল: 'মনে হচ্ছে আমাদের ওর সব কিছু অপছন্দ। স্বামী অপছন্দ, শাশুড়ি অপছন্দ, বাড়িঘর লোকজন আচার-বিচার নামধাম—সমস্ত।'

'শুধু ওর ছেলে পছন্দ।'

'কিন্তু ছেলে তো ওর নয়, ছেলে আমাদের। ও না আসে তো না আসুক,' মহালয়াও দৃঢ় হতে পারল: 'আমাদের ছেলে আমাদের দিয়ে দিক।'

কতদিন পরে, কাউকে কিছু না জানিয়ে, দুপুর বেলা, রিকশা করে বেরিয়ে পড়ল মহালয়া। কে তাকে আটকায়, সোজা উঠে এল সিঁড়ি দিয়ে, এদিক ওদিক না তাকিয়ে একেবারে তার গোপালের কাছটিতে।

'কেমন আছ বৌমা?'

ছেলেটা জেগে আছে, খাটের কাছে দাঁড়িয়ে তাই দেখছিল রুচিরা, প্রশ্ন

শুনে চমকে তাকাল পিছন ফিরে। বললে, 'এ কি আপনি?'

'কেমন আছ?'

'ভালো নয়।' রুচিরা এক রাজ্যের অসন্তোষের মুখোস আঁটল মুখে।

'আর আমার গোপাল?' মহালয়া তাকিয়ে দেখল গোপাল অজ জেগে আছে, তাকিয়ে আছে, সমস্ত আকাশ চন্দ্রে-সূর্যে আলো করে আছে। তাকিয়ে দেখল নার্সটা আজ নেই, বিদায় হয়েছে কুচক্রীটা। অবাধে তাই গোপালকে বুকে তুলে নিল মহালয়া, আদরে আনন্দে আঘ্রাণে অনুভবে নতুন এক আস্বাদের অধ্যায়ে চলে এল।

'কেমন ঠান্ডা ছেলে, কেমন বড়সড় হয়ে উঠেছে।' তার গোপালের কত রূপ কত গুণ বলে শেষ করতে পারছে না মহালয়া।

রুচিরা ভাবছিল, সমস্তই কেমন মায়া আর মায়াই কেমন মধুময়। নইলে অজন্তে তারও চোখে ঘোর লাগে কেন? একটা বৈধতার আচরণ পড়েছে বলে নির্ভর হয়ে সেও তাকাতে পারছে শিশুর দিকে, চোখে বুকে আনতে পারছে মমতা। যা লজ্জার ছিল তা এখন আনন্দের হয়ে উঠেছে। আশ্চর্য, সমস্তই তা হলে ভ্রম-প্রমাদ-অসারল্য?

হঠাৎ তন্ময়তায় ধাক্কা খেল যখন শিশুকে সরিয়ে রেখে মহালয়া জিগগেস করলে, 'এখন তো বেশ সুস্থ হয়েছে, এবার তবে কবে বাড়ি যাবে?'

'না এখনো সুস্থ হইনি।' মুখ নিচু করে বললে রুচিরা।

'তোমার সত্যি কি হয়েছে তাই বলো তো। কেন তুমি যেতে চাচ্ছ না নিজের জায়গায়।?'

'তা হলে আপনাকে বলি।'

'বলো।' ঘেঁসে কাছে এল মহালয়া।

'আপনার ছেলে আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করেছে।'

'প্রবঞ্চনা? সে কী?'

'বলেছিল সে হ্যানো ত্যানো পাশ, কোন সদাগরী আফিসে বিরাট কী চাকরি করে, নিজেদের বাড়ি আছে, আরো কত কী। এখন বিয়ের পর দেখছি সমস্ত ভুয়ো, আগাগোড়া মিথ্যে। সে দেখছি গরিবের গরিব, অকর্মণ্য, অশিক্ষিত। যার জীবন এতবড় একটা মিথ্যার কারবার তার সংসার করতে আমার মন ওঠে না।'

'তুমি বলো কী? ভাস্কর আমার কখনো এত হীন হতে পারে?' মহালয়া রাগবে না কাঁদবে ভেবে পেল না : 'তাই যদি হবে তবে তোমার বাবা তাকে এত যৌতুক দিলেন কেন?'

'তারই জন্যে দিলেন। আশা করলেন আমি যদি যাই, কত কমে আমার চলতে পারে। আমি বলি কি, আমি যখন এই প্রবঞ্চনার প্রশ্রয় দিতে রাজি নই, তখন আমাকে আপনারা ত্যাগ করুন।' স্থির তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল রুচিরা : 'বিবাহ-বিচ্ছেদ করিয়ে নিন।'

'আর আমার গোপাল?'

মহালয়া চেঁচিয়ে উঠল।

'আপনাদের ছেলে আপনারা নিয়ে নিন। আমার কিছু আপত্তি নেই।' রুচিরা কান্নায় করুণ মুখে বললে, 'আমি আবার আমার কুমারী জীবন পেতে চাই। আমার সেই পবিত্র জীবন, স্বাধীন জীবন।'

এ যেন কী রকম অন্য রকম হয়ে গেল। ভাবনায় পড়ল মহালয়া। তবু চলে যাবার আগে একবার চেষ্টা করল প্রলেপের হাত বুলোতে, বললে, 'তেমন যদি কিছু ভুল বোঝাবুঝি হয়ে থাকে, তা এখন ভুলে যাও। তোমার গোপাল এসেছে, তোমার আর কী দুঃখ! যাই হোক ভদ্রস্থ চাকরি-বাকরি হয়েছে এখন ভাস্করের, তাকে মার্জনা করে নিতে দোষ কী। তা ছাড়া তুমি এত বড় বাপের মেয়ে, একমাত্র ওয়ারিশ—তোমার কিসের ভাবনা?'

'না, না, আমি প্রবঞ্চকের ঘর করি না।' দু হাতে মুখ ঢেকে অঢেল কেঁদে ফেলল রুচিরা : 'যে কথা দিয়ে কথা রাখে না সে আমার শত্রু।'

তবু গোপালের দিকে ফিরে তাকাল মহালয়া। বলল, 'তুমি যখন এসেছ তখন সব গোলমাল মিটিয়ে দাও।'

বাড়িতে ফিরে এসে ভাস্করকে সব বললে মহালয়া।

ভাস্কর বিন্দুমাত্র উত্তেজিত হল না। শান্ত মুখে বললে, 'আদ্যোপান্ত মিথ্যে। নিজের অহঙ্কারকে ঢাকা দেবার ছলনা। তুমি ওদের ওখানে যাও কেন? যেও না।'

'যে স্ত্রী স্বামীর নামে এত মিথ্যে রটায় তাকে নিয়ে আবার ঘর করা কী। জানি না কী করে বিয়ে ছাড়িয়ে দেওয়া যায় আজকাল। যদি দেওয়া যায়,' মহালয়া অকুণ্ঠ মনে বললে, 'তা হলে ছাড়িয়েই দেওয়া উচিত।'

ভাস্কর বুঝছে কেন এ মিথ্যের অবতারণা। শুধু বিয়ে ভাঙার প্রেরণাকে সচেতন করবার জন্যে। মাকেও সেই প্রেরণার আবেগ জোগাবার কাজে নিযুক্ত করবার জন্যে।

মুখে বললে, 'একশোবার উচিত।'

একটু বুঝি বা অসহিষ্ণু হয়েছে মহালয়া। 'তা হলে এখন তুই কী করবি?'

'আপাতত চুপ করে বসে থাকব।'

'চুপ করে বসে থাকবি? সে আমি সহ্য করতে পারব না। আমাকে তা হলে কাশীতে দিদির বাড়ি পাঠিয়ে দে।'

ভাস্কর চুপ করে রইল।

কিন্তু চুপ করে থাকতে তাকে দিচ্ছে কে? কদিন পরে জগৎপতি এসে হাজির।

'বার্থ রেজিস্ট্রেশনের নকল নিয়েছ?'

'নিয়েছি। এই যে।'

দেখলেন, ঠিকই আছে। পিতা হিসেবে ভাস্করেরই নাম আছে। তারিখও ঠিকঠাক। কিন্তু ছেলের নাম গোপাল রেখেছ বুঝি? হ্যাঁ, মায়ের প্রিয়তম নাম গোপাল। আমাদের অসীম নামটাই পছন্দ। তা বেশ তো, অসীম পোশাকি থাকবে, গোপাল ডাক-নাম।

'তোমার ব্যাঙ্কে তোমার নামে বাকি পাঁচ হাজার টাকার চেক পাঠিয়ে দিয়েছি।' বললেন জগৎপতি : 'এবার তবে ডিভোর্সের মামলাটা ফাইল করে দিই।'

'আমাকে কী করতে হবে?'

'আমি একটা অর্জি তৈরি করে দেব সেটা সই করে দেবে।'

'শুধু এইটুকু?' পরম আশ্বাসে বললে ভাস্কর।

'হ্যাঁ। আর বিয়ের পরেই তাড়াতাড়ি হচ্ছে বলে একটা স্পেশাল কেস করতে হবে। সে সব আমি দেখে নেব।'

'আর কিছুই আমাকে করতে হবে না?'

'সময়কালে একটা এক্সপার্টি এভিডেন্স দিতে হবে। ব্যস, শান্তি।'

'আর্জিটা এনেছেন?' যেন এখুনিই সই করে দেবে হাত বাড়াল ভাস্কর।

'না, দিন-কতক পরে তুমি আমাদের বাড়ি যেও, সই করিয়ে নেব। ব্যাঙ্কে খোঁজ কোরো, টাকাটা ঠিক ক্রেডিট হল কিনা।' আশীর্বাদে ভরপুর হয়ে জগৎপতি বাড়ি ফিরলেন।

কদিন পরে সকালবেলা ট্যাক্সি নিয়ে জগৎপতির বাড়ির দরজায় এসে থামল ভাস্কর। ট্যাক্সিকে দাঁড় করিয়ে রেখে ঢুকল ভিতরে। ডাকাত-পড়ার মত ঢুকল রুচিরার ঘরে। রুচিরা ছেলে কোলে নিয়ে বসে আছে।

অসম্ভব সুন্দর দেখাচ্ছে রুচিরাকে। ভাঙা-ভাঙা শরীরটা আঁকাবাঁকা সুরের মতই মনোহর। কিন্তু, না, বিভ্রান্ত হবে না, বাস্তবভূমিতে দাঁড়িয়ে নিজ।

'চলুন, আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি।' ভাস্কর যেন ঘোড়ায় চড়ে এসেছে : 'উঠুন, চট করে তৈরি হয়ে নিন। ট্যাক্সি অপেক্ষা করছে।'

'কোথায় যেতে হবে?' চোখ তুলল রুচিরা।

'আমার বাড়ি।'

'সেখানে কী?'

'সেখানে কী জানি না। তবু আপনাকে যেতে হবে। যেতেই হবে।'

'তার আগে বিচ্ছেদের মামলার আর্জিটা সই করেছেন?'

'না, করিনি। কিন্তু, কাকে আমি বিচ্ছেদ করব?'

'কাকে, জানেন না? আমাকে।'

'মামলা স্ত্রী-বিচ্ছেদের। কিন্তু আপনি কি আমার স্ত্রী?'

'আমি কে তবে?' হাঁপধরা লোকের মত মুখ করল রুচিরা।

'আপনি একজন ভদ্রমহিলা। ভদ্রমহিলার সঙ্গে বিচ্ছেদের কথা ওঠে কী করে?'

'ভদ্রমহিলা?'

'ভদ্রমহিলা বলেই তো 'আপনি' করে বলছি। স্ত্রী হলে তো তুমি বলতাম।' নিজের থেকেই ভাস্কর বসল সামনের চেয়ারে। বললে, 'তাই যদি সত্যিই বিচ্ছেদ চান তা হলে আপনাকে পুরোপুরি স্ত্রী হতে হবে। আমার সংসার করতে হবে।'

গোপালকে শুইয়ে রাখল বিছানায়। বেশেবাসে নির্ভেজাল পারিপাট্য আনল। যত পারল বিষ ঢালল কণ্ঠে। রুচিরা বললে, 'বাকি টাকাটা পেয়ে গিয়েছেন বুঝি?'

'টাকা পাবার কথা—পাব না কেন?'

'তবে আর কী চান? চাকরিও তো একটা বাগিয়েছেন জুৎসই। আসবাব-ওয়ালা ফ্ল্যাটও। যে শুধু টাকার কাঙাল তার আর কী দরকার?'

'টাকার কাঙাল?'

'টাকার দামে পরোপকার করতে এসেছেন!' আগুনের মত হয়ে উঠে পড়ল রুচিরা : 'আমি তো ভদ্রমহিলা, আপনি তবে কেন ভদ্রলোক হতে পারছেন না? আর সকলের দাম আছে, নিজের কথার কেন দাম নেই? ব্লেকমেল করতে এসেছেন! অভদ্র কোথাকার!'

'এখন তেজ দেখানো খুবই সহজ।' ভাস্করও জিভকে ঘৃণার পাষাণে শান দিয়ে নিল : 'এখন যে বৈধতায় আচ্ছাদিত হয়েছেন। নিশ্চিন্ত হয়েছেন। এখন আমিই তো অভদ্র। আর আপনি—!'

কী একটা কঠিন কুৎসিত কথা বলবে অনুমান করে দু কান দু হাতে চাপা দিল রুচিরা।

কিন্তু, শুনুক বা না শুনুক, থামল না ভাস্কর। বললে, 'আর আপনি সতীশক্তির প্রতিমূর্তি। শুনুন, বাপের বাড়িতে মজাসে বসে থেকে আপনি মুক্তি পাবেন না। আপনাকে মুক্তি নিতে হবে আমার ঘর থেকে, আমার বন্ধন থেকে।'

'কিন্তু আপনার ঘরে যে আমি যাব সেখানে আমার কিসের আকর্ষণ?' রুচিরা প্রায় হাহাকার করে উঠল : 'আমি কি আপনাকে কোনো দিন চেয়েছি? কোনো দিন ভালোবেসেছি একফোঁটা?'

'ভালোবাসার কথা বলবেন না। আর চাওয়া? যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই।' ক্রোধ ছেড়ে দৃঢ়তায় নেমে এল ভাস্কর : 'ভালোবাসা ছাড়া স্বচ্ছন্দেই বহু স্বামী-স্ত্রী সংসার করে যাচ্ছে। একটুকু বাধছে না। ইচ্ছে করলে আপনিও পারবেন।'

'ইচ্ছে? আমার ইচ্ছে নেই, ইচ্ছে হয় না একফোঁটা। আপনার কী আছে যে হবে?'

'কী আছে?' ভাস্কর উঠে দাঁড়াল : 'দুখানি কাগজ আছে। স্বামিত্বের ইস্তাহার আর পিতৃত্বের সার্টিফিকেট।'

'যে দু টুকরো কাগজে সেই ঘোষণা করা আছে তার দাম ঐ দু টুকরো কাগজেরও সমান নয়। সমস্তই অলীক, অসার। সে আপনিও জানেন, আমিও জানি।'

'আমার-আপনার জানায় না-জানায় কিছু এসে যাবে না। আইন কী জানে তাই দেখতে হবে।'

'খুব আইনজ্ঞান হয়েছে আপনার!'

'আমাদের কী করে হবে? সমস্ত আইনজ্ঞান আপনার আর আপনার বাবার!'

'ছোটলোক কোথাকার! ভেবেছিলাম কিছু মর্যাদা আছে আপনার, কিছু মহত্ত্ব। কিছু নেই। আপনার আছে শুধু টাকার খাঁকতি, কী করে আরো দুটো টাকা হবে। আরো যদি কিছু দরকার হয়, যান না বাবার কাছে, গিয়ে হাত পাতুন।'

'কে কার কাছে হাত পাতে দেখা যাবে।'

'আমরা হাত পাতি না, আমরা হাত বাড়াই। সে হাত স্বত্বের হাত, সত্যের হাত, আপনার মত গরিব ক্ষুদ্রাত্মা ভিক্ষুকের হাত নয়।'

'তবে তাই। আপনি তা হলে যাবেন না আমার সঙ্গে?' খাটের দিকে দু পা এগুলো ভাস্কর।

'ককখনো না।' রুচিরা খাটের বাজু ধরল।

'বেশ, যাবেন না। কিন্তু আমি ছেলেকে নিয়ে যাই।' বলে মুহূর্তের মধ্যে ভাস্কর ছেলেকে খাট থেকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে কাঁথায়-ন্যাকড়ায় বুকের মধ্যে পুঁটলি করে চেপে ধরে চলল সিঁড়ির দিকে।

একেবারেই প্রস্তুত ছিল না রুচিরা। প্রথমটা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল, পরে হৃৎপিণ্ডে হেঁচকা টান পড়তেই যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠল : 'একে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?'

'আমার বাড়িতে।'

সিঁড়ির কাছাকাছি রুচিরাও এসে পড়েছে। বললে, 'সে কী, ও কি আপনার ছেলে?'

সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত পায়ে নামতে-নামতে হেসে উঠল ভাস্কর। বললে, 'কার ছেলে তা কোর্টকে, আইনকে গিয়ে জিগগেস করুন।'

খুব একটা চেঁচামেচি করতে গলায় বুঝি আটকাল রুচিরার। প্রথমত, নাটকীয়তার প্রতি অরুচি, দ্বিতীয়ত এণাক্ষীর বাড়াবাড়ি অসুখ চলেছে কদিন। তেমন চেঁচামেচি করলে এণাক্ষী নিশ্চয়ই উত্তেজিত হবে, হয়তো বা ছুটে আসবে, হার্টের অবস্থা যা শোচনীয়, একটা কিছু ঘটে যাওয়া অসম্ভব নয়। আর তৃতীয়ত, মনের গভীর স্তরে আছে বোধহয় শীতলতা—যাক নিয়ে, নিয়ে গেলে বাঁচি—এই নিলর্জ্জ উপশম।

তবু জান্তব আসক্তিতে নেমে এল নিচে। আর বুঝি নাগাল পেল না। সিঁড়ির প্রথম ধাপের উপর বিধ্বস্তের মত বসে পড়ল রুচিরা। একবার কেঁদে উঠল, 'বাবা' বলে—জগৎপতির উদ্দেশে।

জগৎপতি বৈঠকখানায় কাজ করছিলেন, ত্রস্ত পায়ে ছুটে এলেন। এণাক্ষীর কিছু হল নাকি? দেখলেন প্যাসেজ দিয়ে কে বেরিয়ে গেল ভাস্করের মত। বাইরে এসে নিশ্চিত হলেন, ভাস্করই তো, রাস্তায় দাঁড়ানো ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠছে।

'শোনো।' জগৎপতি ট্যাক্সিকে উদ্দেশ করলেন।

হতচকিতের মত ড্রাইভার দাঁড়িয়ে গেল।

রাস্তায় চলে এসে জগৎপতি দাঁড়ালেন ট্যাক্সি ঘেঁসে। বললেন, 'তুমি কখন এলে টের পাইনি। এখুনি চলে যাচ্ছ কী। নেমে এস। আর্জিটা তৈরি হয়েছে। সই করে দিয়ে যাও।'

'সই করব না।'

'সে কী, সই করবে না মানে?'

'সই করব না মানে সই করব না।' ভাস্কর ট্যাক্সিকে হুকুম দিল : 'চলো।' ট্যাক্সির স্টার্টের আওয়াজ ছাপিয়ে

ভাস্করের পুঁটলির মধ্যে থেকে একটা কচি কান্নার শব্দ উঠল।

'ও কে? ও কে তোমার ওখানে?' জগৎপতি স্তম্ভিতের মত হয়ে গেলেন।

'ও আমার ছেলে।'

'তোমার ছেলে?'

'হ্যাঁ, আমার ছেলে। ওকে এই পাপপুরী থেকে নিয়ে যাচ্ছি আমি।'

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?'

'আমার ওখানে। আমারই ওকে মানুষ করবার কথা।'

ট্যাক্সি ছেড়ে দিল।

১৪

মহালয়ার কোলে শিশুকে ঢেলে দিয়ে ভাস্কর বললে, 'এই নাও তোমার গোপাল।'

'নিয়ে এসেছিল? পেরেছিস আনতে?' আতঙ্কে-আনন্দে মেশানো চেহারায় মহালয়া জাপটে ধরলেন, আঁকড়ে রইলেন গোপালকে।

'কেন পারব না?' ভাস্কর প্রায় বীরের মত বললে, 'মা নষ্ট বলে ছেলেকে নষ্ট হতে দিতে পারি না। দেখ এখন পারো কিনা বাঁচিয়ে রাখতে।'

কী যে বলিস। মহালয়া একেবারে বুক দিয়ে পড়লেন। আঁতুড়ে মা মরে গেলে ছেলে কি আর বাঁচে না? খুব বাঁচে। দেখে এসেছেন মা বুকের দুধ খরচ করতে অনিচ্ছুক, তাই বোতলে টিনের দুধ খাচ্ছে ছেলে। তাই যদি হয়, মাকে আর তবে কিসের প্রয়োজন? বোতল আর টিনের দুধ মহালয়াও জোগাড় করতে পারে। এনে দিতে পারে দোলনা, ফানুস, ঝুমঝুমি, বিছানা-বালিশ, এনে দিতে পারে রঙিন মশারি। ডাক্তার ডাকতেও অপারগ নয় মহালয়া। যে সমস্ত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর তার কিছুরই অভাব হবে না।

কতক্ষণ কাঁদবে গোপাল! এই আবার হাসতে সুরু করেছে। হাত-পা ছুঁড়ে খেলতে সুরু করেছে। ঘুম থেকে উঠে চোখ মেলেই খুঁজতে শিখেছে ঠাকুমাকে। ভাস্করকেও চিনতে শিখেছে। সোমনাথও যদি হাত বাড়িয়ে দেয় কোলে উঠতে আপত্তি করে না।

তবু ভয়ে-ভয়ে আছে মহালয়া। ডাকাতি করে এমনি ছেলে নিয়ে আসা কিছুতেই বরদাস্ত করবেন না জগৎপতি। এত বড় একজন জবরদস্ত ধনী-মানী সহ্য করবেন না এ অপমান। মেয়ের মনোভাবে যুক্তি থাক বা না থাক, পিতৃস্নেহ স্বভাবতই মেয়ের পক্ষ নেবে। কিছুতেই মেয়েকে পরাভূত দেখতে চাইবে না। শূন্যকোলে রিক্তবুকে মেয়েকে শোকার্ত মুখে সংসারে ঘুরতে-ফিরতে দেখবে, সব থেকেও যার কিছু নেই, এ বাপের পক্ষে অমানুষিক যন্ত্রণা। প্রতিকার আসবেই আসবে।

কিন্তু কী প্রতিকার? পুলিশ নিয়ে আসবে? ভাস্কর বললে, বাপ তার ছেলে নিয়ে এসেছে এর মধ্যে দুরভিসন্ধি কোথায়? না, ফৌজদারির নামগন্ধও নেই। এক করতে পারে কোর্টে গিয়ে শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের দাবি জানাতে পারে। বলতে পারে, দুধের শিশু, মার হেপাজতেই তার থাকা উচিত। শিশুর মঙ্গল দেখতে হলে, এক্ষেত্রে, মা-ই উপযুক্ত অভিভাবক, বাপ নয়। সুতরাং মার কাছেই ফিরিয়ে দেওয়া হোক শিশুকে।

বেশ তো, যাক না কোর্টে, করুক না দরখাস্ত। সমগ্র কথাটা উঠে পড়ুক। কাপটের যবনিকা ছিঁড়েখুঁড়ে খানখান হয়ে যাক।

কিন্তু কই দশ-বারো দিন হয়ে গেল, ও পক্ষের কোনোই উচ্চবাচ্য নেই। কোথায় কোর্ট-পুলিশ! সামান্য একটা কেউ খোঁজ করতে পর্যন্ত এল না।

না, আসবে, নিশ্চয়ই আসবে। এবার বুঝবে রুচিরা, এ বাড়িতে সত্যিই তার কোনো আকর্ষণ আছে কিনা। আর এ টান, যেমন-তেমন নয়, একেবারে নাড়ীর টান, গভীরের কান্না। একেবারে মূলে ধরে উপড়ে আনা।

এ শিশুই টেনে আনবে রুচিরাকে। যেখান থেকেই আসুক সন্তান সন্তান। তার কাছে কিসের লজ্জা কিসের অহংকার। ধৈর্য ধরো, আসবেই আসবে। প্রত্যাখ্যানের এক স্তূপ পাথর স্নিগ্ধ-গাত্রী হয়ে যাবে। যদি কারু ক্ষমতা থেকে থাকে তবে এই এক শিশুরই আছে।

কদিন পরে একটা শুধু ফোন এল আপিসে। হ্যাঁ, জগৎপতির গলা।

'কি, কী হল? কী ঠিক করলে?'

'কোন বিষয়ে?'

'ডিভোর্স বিষয়ে। সে কী, মনে করতে পারছ না?'

'না, তা কেন?'

'তবে? কী বলতে চাচ্ছ?'

'বলতে চাচ্ছি যার ডিভোর্স তিনি নিজে এসে নিয়ে যাবেন।' রিসিভার রেখে দিল ভাস্কর।

তারপর সটান ভাস্করের আপিসে চলে এলেন জগৎপতি। বাড়িতে যেতে পা উঠল না। যদি তাড়িয়ে দেয় তা হলে কী করে কোন মুখে ফিরে আসবেন?

আপিসে ধরাই সোজা। আপিসের পরিবেশই যথাযোগ্য গাম্ভীর্য আনবে।

ম্যানেজার নিভৃত দর্শনের ব্যবস্থা করে দিল। ভাস্করের মুখোমুখি বসলেন জগৎপতি।

'আমি সেই আর্জিটা নিয়ে এসেছি, কোর্ট-ফি চড়িয়ে। একবার কি পড়ে দেখবে?' জগৎপতি ব্যাগ খুলে হাত ঢোকালেন।

'না। পড়বার দরকার নেই।' ভাস্কর বললে।

'তা হলে দস্তখৎ করে দাও।'

'বলেছি তো দস্তখৎ আমি করব না।'

'করবে না?'

'মানে এখন করব না।'

'কখন করবে?'

'চুক্তির সমস্ত সর্ত যখন পরিপূর্ণ হবে।' ভাস্কর পরিচ্ছন্ন প্রশান্ত মুখে বললে।

'চুক্তির আর কী সর্ত? উঁচু চাকরি আর নগদ টাকা। ফ্ল্যাট যে ভাড়া করে দিয়েছি সেটা বাড়তি, অতিরিক্ত। এর বেশি আর কিছু ছিল না।'

'ছিল। সে সর্ত রুচিরার সঙ্গে।'

'মিথ্যে কথা।' জগৎপতি হুংকার দিয়ে উঠলেন: 'চুক্তির মধ্যে পক্ষ শুধু আমি আর তুমি। রুচিরা আসতেই পারে না। রুচিরার সঙ্গে তোমার দেখা হল কখন? চুক্তি হয়ে যাবার পর।'

'চুক্তিটা কন্টিনু করছিল, কনক্লুডেড হয়নি। কাগজে-কলমে লেখা হয়নি তো, তাই ধরা যাচ্ছে না। আপনি রুচিরাকে জিগগেস করে দেখবেন।'

তর্ক করা অসম্ভব। কণ্ঠে মিনতি মাখালেন জগৎপতি। বললেন, 'কেন আর ঝামেলা বাড়াচ্ছ? বলো আর কত টাকা চাই। চেক-বই আমার সঙ্গেই আছে। আমি একদিকে চেক কাটি তুমি অন্যদিকে আর্জি সই করো। দুটো এক-সঙ্গেই হয়ে যাক।'

'টাকা?' মুখে তেতো-তেতো ভাব করল ভাস্কর: 'টাকার কথা রুচিরাও বলেছিল। আমাকে বলেছিল গরিব, ভিক্ষুক, বলেছিল ব্ল্যাকমেলার। আমি রাজি হইনি। কেননা টাকার চেয়ে মান বড়।'

'মান বড়? কিসের মান?'

'স্বামিত্বের মান।'

'এর পরে আর কোন কথা বলা চলে? জগৎপতি তখন অন্য মূর্তি ধরতে চাইলেন। বললেন, 'তুমি যদি কথা না রাখো, পরিণাম কী হবে ভাবতে পারো?'

'পারি। কিন্তু কথা আমি রাখব না আপনাকে কে বললে?'

'কোথায় রাখছ?' অস্থির হয়ে মাঝখানের টেবিলে কিল বসালেন জগৎপতি: 'আর্জিতে সই দিচ্ছ কই?'

'কোনো টাইম-লিমিট নেই।'

'নেই মানে? বলা ছিল বিয়ের দু-এক বছর পরে।'

'তার মানেই একটা ভদ্র, যাকে বলে ফেয়ার টাইম, ছেড়ে দিয়ে। ততদিন একটু অপেক্ষা করতে দোষ কী।'

'তোমার কী মতলব তা আমি বুঝেছি। স্কাউন্ড্রেল—'

'কে কাকে বলছে!' অনুকম্পার হাসি হাসল ভাস্কর।

ঝট করে উঠে পড়লেন জগৎপতি। বললেন, 'দেখি আর কী উপায় আছে।'

তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরল ভাস্কর। মহালয়াকে বললে সব কথা। বললে, 'সঙ্গে লোক দিচ্ছি, তুমি গোপালকে নিয়ে আজ রাত্রেই বড় মাসিমার কাছে কাশী চলে যাও।'

'আর তোরা?'

'আমরা থাকব। আমার আপিস, সোমনাথের ইস্কুল। আমাদের জন্যে ভাবনা কোরো না। মর্তের এক অসহায় গোপালকে রক্ষা করেছি বলে ব্রহ্মাণ্ডের গোপাল আমাদের রক্ষা করবেন।'

মহালয়া তৈরি হতে লাগল।

'মর্তের এই গোপালের জন্যেই আমার বেশি ভয়। হামলা করে ওকে না একদিন ছিনিয়ে নেয় তোমার বুক থেকে।' বলতে লাগল ভাস্কর: 'তুমি ভাবতে পারো মা, বুড়ো ঠাকুরদা এক-বারও নাতির কথা জিগগেস করলে না? ঠাকুরদাকে ছেড়ে দি, ওর মায় জুড়ি নেই। যে বাড়িতে ওর ছেলে আছে, পেটের ছেলে, সে বাড়িও ওর আকর্ষণীয় নয়। আজকালকার মা-রাও বদলে গিয়েছে, মডার্ণ হয়েছে। আজকাল কুপুত্র যদাপি হয় কুমাতাও কম নয়। মায়ে-পোয়ে মোকদ্দমা হলে, আজকালকার মা-রা মামলা ছেড়ে দেয় না, বুকে বসে দাড়ি ওপড়ায়, তারপর ছেলেকে হারিয়ে ছাড়ে। নইলে ভাবতে পারো, ছেলেটাকে একদিন একটু দেখতেও আসে না? মনে হয় ছেলেটাকে যে নিয়ে এসেছি এতে ওর আরাম হয়েছে, ফুর্তি হয়েছে—'

'আমি বলি কী, তুই তোর ছেলে পেয়েছিস, বউকে তুই ছেড়ে দে।' মহালয়া বললে, 'যার এখানে মন নেই, যে অন্য রকম, তাকে জোর করে ধরে বেঁধে রেখে শান্তি নেই। ধরে বেঁধে রাখতে পারবিওনে।'

'আমার মনে হয় লুকিয়ে-লুকিয়ে ও ছেলের খোঁজ নেয়।' আত্মতৃপ্তের মত বললে ভাস্কর: 'আর যখন বোঝে ছেলে ভালো আছে তখন আলস্যে হাই তোলে। এখন ছেলেকে দূরে সরিয়ে দিলে এ বাড়ির শূন্যতা যদি আকর্ষণীয় হয়।' এবার বুঝি আপন মনেই কথা বলে উঠল: 'ও যে অন্যরকম তাতে সন্দেহ কী। কিন্তু ওর অহংকার চূর্ণ হবার আগে ও ছাড়া পাবে এ হতে পারে না। এ কোন দিন হয়নি পৃথিবীতে।'

রাত্রের ট্রেনে মহালয়া গোপালকে নিয়ে কাশী রওনা হয়ে গেল। সঙ্গে যে চলনদার বোনপোটি আছে সে কাশীর সব অন্ধি-সন্ধি জানে, কোনো ভয়-ভাবনার কিছু নেই।

গাড়ি ছাড়ো-ছাড়ো, মহালয়া বললে ভাস্করকে, 'বউ যদি রাজি হয় আমাকে খবর দিস।'

'রাজি হল না, কিছুতেই না।' একটা স্তব্ধীভূত হাহাকারের চেহারায় জগৎপতি তাঁর শোবার ঘরের সোফায় ভেঙে পড়লেন।

এণাক্ষী বিছানায় শোয়া, ওঠবার চেষ্টা করেও পারল না উঠতে। বললে, 'আরো কিছু টাকা পেলেও না?'

'না।' তারপর গালাগাল দিতে লাগলেন। একেই বলে মোকদ্দমায় হার। হেরে গেলে গালাগাল দেওয়া। এমন হার জগৎপতি হারেননি জীবনে।

রুচিরা সামনেই দাঁড়িয়েছিল, তাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'আমি পারলাম না। তুমি এখন নিজে দেখ। নিজের পথ নিজে খুঁজে নাও।'

'তাই হবে।' রুচিরা সহজ স্বচ্ছ হবার চেষ্টা করল: 'তাতে ভাববার কী আছে।'

'কিন্তু তুমিও যে পারবে এমন মনে হয় না।' পরাভূতের মত শূন্যচোখে তাকিয়ে জগৎপতি বললেন, 'শেষ পর্যন্ত যদি তোমাকে ঐ নামটার সঙ্গেই জড়িয়ে থাকতে হয় মরেও শান্তি পাব না।'

পারলেন না বসে থাকতে, উঠে পড়লেন। জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন, আবার ফিরে এলেন। বললেন, 'আসলে আমার লোকনির্বাচনেই ভুল হয়েছিল।'

ক্রূর চোখে তাকাল এণাক্ষী।

সে দৃষ্টির সাক্ষাৎ হবার সাহস নেই জগৎপতির। তবু বর্বরতার কথাটা বলতে

আর বাধা কী। তাই বললেন, 'লোকটা আসলে গরিব। লোভী।'

তত রাগে নয় যত ঘৃণায় জ্বলতে লাগলেন জগৎপতি। কুটিল মনের গহনে চিন্তার জট পাকাতে লাগলেন। প্রতিকার নেই প্রতিশোধ নেই।

কিন্তু নিমেষে সমস্ত বানচাল হয়ে গেল।

সেই রাতেই আবার নতুন স্ট্রোক হল এণাক্ষীর। আর দু দিন দু রাতের বিপুল সংগ্রামকে ব্যর্থ করে দিয়ে সে চোখ বুজল।

আবার হার খেলেন জগৎপতি।

মনে হল আদিগন্ত সমস্ত সংসার শাদা হয়ে গিয়েছে। কোথাও আর স্বপ্নের রঙ নেই, আশার রেখা নেই—সমস্তই ভোজবাজি, সমস্তটাই প্রবঞ্চনা। বাড়ি-ঘর মিথ্যে, টাকা-পয়সা মিথ্যে, নাম-যশ পদবী-প্রতিপত্তি সমস্ত। তরুণ সমিতি, মন্ত্রীত্ব, শক্তির মদিরা সমস্ত অবস্তু। গন্ধর্বনগরে এসে আকাশকুসুম চয়ন করা।

একমাত্র সত্য বুঝি এই কান্না। ভাগ্যের রুদ্ধ-স্তব্ধ লোহার দরজায় কপাল কোটা।

জগৎপতির কাঁধে মাথা রেখে কাঁদছে রুচিরা। মেয়ের মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন জগৎপতি। বলছেন, 'তুই ভেঙে পড়ছিস কেন? কত পথ তোর সামনে এখনো পড়ে আছে। তুই এগিয়ে যাবি। যে পড়ে ওঠে সেই-ই তো বাহাদুর। সমস্ত ভুলের বাইরেও ভালো আছে। তুই সেইখানে গিয়ে দাঁড়াবি। তুই থামবি কেন? আমিই আর পারব না উঠতে। আমারই আর ভবিষ্যৎ নেই।'

রুচিরাই তখন বাবাকে সান্ত্বনা দিতে বসল। কিন্তু কী সান্ত্বনা দেবে ভাষা খুঁজে পেল না।

তবু সান্ত্বনা আছে। পথ চলার সান্ত্বনা। পথের যে শেষ নেই এই-ই তো অনন্ত সান্ত্বনা। অনন্ত সামর্থ্য।

তাই লঘু পায়ে পথ চলতে-চলতে রুচিরা সিঁড়ি বেয়ে হঠাৎ একদিন এক সন্ধ্যায় দোতলায় উঠে এল। বাড়িটা কেমন ঘুমো-ঘুমো নিঝুম মনে হচ্ছে। না, কোণের ঘরটাতে পড়ছে সোমনাথ। ও দিকে বুঝি রান্নার ব্যবস্থা। কানে আসছে রান্নার ছ্যাঁকছোঁক। আর সব কোথায়?

সোমনাথের ঘরের দরজার ওপারে এসে দাঁড়াল রুচিরা।

'কে?' চমকে উঠল সোমনাথ।

'আমি। চিনতে পাচ্ছ না?'

কী করে চিনবে। কত দিন হয়ে গেল সেই একদিন দেখেছিল। এতদিনে চেহারাও বদলে গিয়েছে অনেক।

'না। বলুন না কে?'

'আমি—আমি গোপালের মা।'

তড়াক করে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠল সোমনাথ। বললে, 'আপনি—তুমি, বৌদি?'

'হ্যাঁ। বাড়িঘর খালি দেখছি যে, গোপাল কোথায়?'

'মার সঙ্গে কাশী গিয়েছে।'

'একেবারে ছেলেবেলা থেকেই তীর্থ-যাত্রা।' হাসতে চেষ্টা করল রুচিরা: 'তোমার দাদা কোথায়?'

'অফিস থেকে এসে কোথায় একটু বেরিয়েছেন, এক্ষুনি এসে পড়বেন। আপনি আসুন, দাদার ঘরে এসে বসবেন।'

খাটে চেয়ারে টেবিলে আলমারিতে দাদার ঘর। পর্দা কার্পেটও ছিল বা'স শুনেছিল তা এখন বেপাত্তা। চারদিকে তাকাল রুচিরা, কিছু আকর্ষণীয় আছে কিনা। একটা বই নেই, ম্যাগাজিন নেই, টেবিলে নেই কোন লেখার সরঞ্জাম। ধুলোমাখা একটা ফুলদানি আছে, ফুলের চিহ্নলেশ নেই। দেয়ালে একটা ক্যালেণ্ডার পর্যন্ত নেই। আগাগোড়া চিত্তদারিদ্র্যের রুক্ষতা।

কতক্ষণ পরেই সিঁড়িতে জুতোর শব্দ হল। সোমনাথ গিয়ে বসল তার টেবিলে।

শান্ত স্থির মুখে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে রুচিরা। অবিশ্বাসী চোখকে শাসন করবার আগেই চিনে ফেলল ভাস্কর। বলে উঠল, 'এ কী, আপনি? কী ব্যাপার?'

'মা মারা গিয়েছেন।'

'হ্যাঁ, সে তো অনেক দিন হল। শ্রাদ্ধে নেমন্তন্ন না করলেও কানে এসেছে।'

'এবার আবার বাবা পড়েছেন। ডাক্তার যত বলছেন কিছু নয়, বাবা তত ঘাবড়াচ্ছেন তত কাহিল হচ্ছেন। শুনলে বিশ্বাস করবেন? কোর্টে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। উকিল কোর্টে যাওয়া বন্ধ করেছেন মানেই বুঝতে পেরেছেন তাঁর ইতির রেখা ঘনিয়ে এসেছে।'

'আপনি কী করছেন?'

'আমি? আমি পথে-পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি।'

'তাই বুঝি এসেছেন পথ ভুলে?'

রুচিরা শীর্ণ মুখে হাসল। বললে, 'পথ ভোলার পরেও যে পথ আছে তাই খুঁজতে।'

অনন্য মনে ভাস্কর সমগ্র করে দেখল রুচিরাকে। কেমন টুলটুল করছে মুখখানি। ঝুরো ঝুরো কয়েক গুচ্ছ রুখু চুল কপালের এখানে-ওখানে নেমে আরো করুণ করে রেখেছে। গলায় হার নেই বলে কণ্ঠা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেই স্পষ্টতা ঢাকবার জন্যে গলার কাছে আঁচল টানছে বারে-বারে। হাত দুখানি তেমনি খালি, কিন্তু আজ বুঝি তাতে দৃঢ়তার নয় রিক্ততার উল্লেখ। তার পরনের সিল্কের শাড়িটা আজ যেন ঔদ্ধত্যকে নয় দারিদ্র্যকে ব্যক্ত করছে।

'আজ এ বাড়িতে আসবার আপনার আকর্ষণ কী হল?' কথার সুরে বাঙ্গ আনতে গিয়ে আনতে পারল না ভাস্কর, কেমন যেন করুণায় মিশে গেল: 'আপনার অসীমও তো এখানে নেই।'

'ছেলের জন্যে হলে তো কত আগেই আসতাম। ও আপনাদের কাছে আছে। তাইতে আমি নিশ্চিন্ত।'

'তবে আর এ বাড়িতে আপনার আকর্ষণ কী?'

রুচিরা ভাস্করের চোখের উপর চোখ ফেলল। বললে, 'আমার একমাত্র আকর্ষণ তুমি।'

'আমি?' আশিরপদনখ শিউরে উঠল ভাস্কর।

'হ্যাঁ, তুমি, তোমার মহত্ত্ব। তোমার মহত্ত্বই আমার একমাত্র আকর্ষণ, একমাত্র আশ্রয়।' রুচিরার কথায় বুঝি কান্নার আমেজ লাগল কিন্তু শোনাল আনন্দের মত: 'একদিন তুমিই এগিয়ে এসেছিলে, বন্দিনীকে উদ্ধার করতে। সেদিন তুমি ছাড়া আমার আর কেউ বন্ধু ছিল না।'

'আর আজ?'

'আজও তুমিই আমার একমাত্র বন্ধু। তোমার দৃপ্ত যৌবন, দীপ্ত চরিত্রই একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য।'

'অত কথার কী দরকার?' ক্লান্ত মুখে হাসল ভাস্কর: 'বলো কী করতে হবে? সেই তৈরি আর্জিটাতে সই করতে হবে?'

'হ্যাঁ, তাই। আরো প্রমাণ করতে হবে তুমি দরিদ্র নও, ক্ষুদ্রাত্মা নও, লালসাই তোমাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে না—'

'লালসা!' চোখের দৃষ্টি স্নেহে ভিজিয়ে রুচিরার গায়ের উপর রাখল ভাস্কর।

'একশোবার নয়। তুমি আধুনিক যৌবনকে গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করবে। মহৎ বলে প্রতিপন্ন করবে।' কথার ছটায় ঝলমল করে উঠল রুচিরা: 'অর্থের অনটন দারিদ্র্য নয়, চিত্তের কার্পণ্যই দারিদ্র্য।'

'সংক্ষেপে বলো না তোমাকে ছেড়ে দিতে হবে।'

'কী এসে যায় একটা দুঃখিনী বন্দিনী মেয়েকে ছেড়ে দিলে?' মিনতি-ভরা চোখ তুলল রুচিরা।'

'তা তো দিলাম। কিন্তু আমার কী হবে?'

'তোমার কী হবে মানে?' রুচিরা যেন কাঠ হয়ে গেল।

'আমি তবে কী নিয়ে থাকব? তুমি একদিন আসবে এই আশাটা ছাড়তে পাচ্ছি কই? শোনো মজার কথা। তার আগে তোমাকে একটু চা করে দিতে বলি।' বলে উঠে পড়ল।

'না, না, চায়ের দরকার নেই।'

'চা আমারও জন্যে। নর্ম্যালি চা-টা তোমারই করে দেবার কথা। তা যখন হবার নয় তখন ঠাকুরকে বলা ভালো।' তাই বললে ভাস্কর। পরে আবার চেয়ারে এসে বসল। বললে, 'মজার কথাটা হচ্ছে, আপিস থেকে নোটিশ দিয়েছে, চাকরিটা ছাঁট হয়ে যাবে।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ, তিন মাসের নোটিশ। সুতরাং, আমি বলতে পারি যেহেতু চাকরিটা থাকছে না, ছাড়িয়ে নেওয়া হচ্ছে, সেই-হেতু আমি রাখব না প্রতিজ্ঞা।'

'না না, তুমি তা বলবে না।'

'বলব না। কেননা চাকরি চলে যায়, আবার চাকরি পায়। কিন্তু তুমি চলে গেলে তোমাকে পাব কোথায়?'

'ছি ছি, আমি একটা কী!' নিজেই নিজেকে ধিক্কার দিতে চাইল রুচিরা: 'আমি বাজে, পচা, কুচ্ছিত।'

সরল শিশুর মত শব্দ করে হেসে উঠল ভাস্কর। বললে, 'মেয়ে যখন পুরুষকে ভালোবাসে তখন মনে-মনে কিছু-না-কিছু সে হিসেব করে, রূপবান কিনা, ধনবান কিনা, বিদ্বান কিনা, সুবিধেজনক কিনা—কিন্তু পুরুষ যখন ভালোবাসে তখন সে চিন্তা করে না। মেয়ে পচা কিনা, বাজে কিনা, কুচ্ছিত কিনা। সধবা না বিধবা, স্বৈরিণী না কলঙ্কিনী এ সব বিচারও তার হিসেবের বাইরে।'

'এ সমস্তই কথার কথা।' রুচিরা এখনো বুঝি কঠিন হল: 'কিন্তু এক্ষেত্রে ভালোবাসার কথা ওঠে কী করে?'

ভাস্কর হাসল: 'উঠে পড়লে কী করা যাবে? আর ভালোবাসা যদি একবার জাগে তা হলে কি তুমি আর তাকে লালসা বলতে পারো?'

রুচিরার গা কেমন ছমছম করে উঠল। বললে, 'কিন্তু যখন আপনি বাবার সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন তখন তো আলাপ হওয়া দূরে থাক, আমাকে দেখেনইনি মুখোমুখি।'

'তোমার কী বুদ্ধি! যেন না দেখে না জেনে ভালোবাসা যায় না। যদি না-ও যায়, পরে জাগতে দোষ কী! যখন তোমাকে পরে দেখলাম, পরে আলাপ হল—তখন?'

'কিন্তু ভালোবাসা তো আমারও মধ্যে জাগা দরকার!' রুচিরার গলায় ঝাঁজ ফুটল।

'নিশ্চয়। তারই জন্যে তো ঐ সর্তটা যোগ করেছিলাম। আর তুমি তা হাসি-মুখে মেনে নিয়েছিলে।'

'বা, আমি আবার কোন সর্ত মেনে নিয়েছিলাম?' প্রায় লাফিয়ে উঠল রুচিরা।

ঠাকুর দুই হাতে করে দুই পেয়ালা চা এনে রাখল টেবিলে।

ভাস্কর বললে, 'সার্ভিসটা ভালো হল না। চা-টা খাও, বলছি।'

'না, তুমি আগে বলো।'

ভয় নেই। চায়ে কোনো তুক করিনি যে চুমুক দিলেই তোমার ভালোবাসা জাগবে। যদিও সর্তটা সেইরকম ছিল। মনে নেই?'

নিচু হয়ে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিল রুচিরা।

'কথা ছিল ইতিমধ্যে তুমি আমাকে একটা চান্স দেবে তোমার মধ্যে ভালো-বাসা জাগাতে পারি কিনা। শুকনো কাঠে ফুল ফোটাতে পারি কিনা। কথা ছিল আমার সাধনার ফলে তোমার শেষে এও মনে হতে পারে যে এ বিয়ে আর ভেঙে দিয়ে কাজ নেই, যাকে ঘৃণা করব ভেবেছিলাম সেই আমার বরণীয়।'

'তার মানে ভালোবাসা জাগে কিনা তা দেখবার জন্যে তোমার সঙ্গে আমি ঘর করি। তার মানেই আবার বেড়ি পরি। কী চমৎকার!' রাগ-রাগ মুখ করল রুচিরা: 'যে সর্তের পূরণ হয় না তা একজন স্বীকার করলেও কিছু এসে যায় না। অপূরণীয় অপূরণীয়ই থাকে।'

'বা, স্বহৃলে ঘর না করেও তো সে চান্স দেয়া যায়।'

'আমি তো তার উপায় দেখি না। শেষকালে আমি যখন ডিভোর্স নিয়ে যাই দেখি আমি আবার বন্দী।' রুচিরা ঝট করে উঠে পড়ল চেয়ার ছেড়ে: 'তা হলে আমি কী বুঝছি?'

'কী বিষয়? মহৎ হয়ে যাব কিনা?' ভাস্করও দাঁড়াল মুখোমুখি। বললে, 'কিন্তু, মহৎ হওয়া মানেই তো শাস্তি পাওয়া, চিরকালের জন্যে তোমাকে হারিয়ে ফেলা।'

'তা আর কী করা যাবে?' এক পা এগুলো রুচিরা। বললে, 'যা পাবার নয় তা কোনোদিনই পাবার নয়। এ কি, দরজা বন্ধ করবে নাকি?'

'না, বন্ধ করব কেন? পাশের ঘরে সোমনাথ পড়ছে। তাছাড়া তুমি স্ত্রী, আজও স্ত্রী, তোমার সম্পর্কে আড়ম্বরের দরকার নেই। তোমার দরজা সব সময়েই খোলা। বলছিলাম কী, আরো একটু বসে যাও।'

'না।' চঞ্চল হয়ে উঠল রুচিরা: 'আমার গাড়ি এসেছে। হর্ণ শুনছ না?'

'তা গাড়ি এলেও একটু বসে যাওয়া যায়।'

'অকারণে বসে লাভ কী।'

'বেশ তো আজ তাড়া থাকে, আরেক দিন এস।'

'তা হলে ঐ কথা রইল। আরেকদিন আসব।'

ভাস্কর রুচিরাকে এগিয়ে দিতে এল। দেখলে নিচে কে একজন সুটপরা ভদ্রলোক গাড়িতে বসে সিগারেট টানছে।

রুচিরাই আলাপ করিয়ে দিল: 'ইনি ভাস্কর আর ইনি এঞ্জিনিয়র অরিন্দম।'

গাড়িতে উঠে অরিন্দমের কাছ থেকে সিগারেট চেয়ে নিল রুচিরা। ঠিক ধরালো কিনা দেখা গেল না—গাড়ি আগেই স্টার্ট নিয়েছে। তা সিগারেট খেলে কী হয়! রুচিরা যদি সিগারেট খায় তা হলে তো ওকে ভালোই দেখাবে।

কিন্তু মদ খেলে?

জানি না।

সেদিন সন্ধ্যায় আবার চলে এল রুচিরা। কিন্তু আজ তার এ কী মূর্তি! পা টলছে চোখ মুখ লালচে। কথাও জড়ানো।

ঘরে ঢুকেই ভাস্করের গলা জড়িয়ে ধরল। কাঁদতে-কাঁদতে বললে, 'তুমি আমার স্বামী, তুমিই আমাকে বাঁচাবে।' তুমিই মুক্ত করে দেবে আমাকে। তুমি—তুমি। তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই।'

'এ কী, তুমি ড্রিংক করেছ।' ভাস্কর ধীরে সরিয়ে দিল রুচিরাকে।

'বাবার কথায় করেছি। বলেছেন এতেই তোমার কাছে কেস মেড আউট হবে। বলো না, হবে? মাতাল দেখলে ছেড়ে দেবে তুমি?'

'ছি! তুমি শেষকালে এইরকম সুরু করলে?'

'কেন করব না? বাবার যা অসুখ হয়েছে উনি আর বেশিদিন নেই। উনি টে'সে গেলেই সমস্ত বাড়ি-ঘর-টাকা-পয়সা আমার হবে। ষোল আনা আমার। এত সম্পত্তি একটু-আধটু ওড়াব না? না ওড়ালে চলবে কেন? আর পাঁচজনে

খাবে কী।' হাসছে, হাসতে গিয়ে কাঁদছে রুচিরা।

'চলো তোমাকে তোমার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

ট্যাক্সি ডাকল। রুচিরাকে পৌঁছে দিল উপরে। ঝি-এর জিম্মায়।

এণাক্ষীর মারা যাবার পর থেকে জগৎপতি নিচেই শুচ্ছিলেন। এখন অসুখ বাড়াবাড়ি হবার পর উপরে ওঠার আর প্রশ্নই ওঠে না।

জগৎপতি কেমন আছেন খোঁজ নেবার জন্যে ভাস্কর তাঁর ঘরে ঢুকল। জগৎপতি চিনতে পারলেন। এত কষ্টের মধ্যেও আনন্দের আভাস আনলেন মুখে।

'আর্জিটা দিন, সই করে দি।' ভাস্কর কাছে এসে দাঁড়াল।

অ্যাটেন্ডেন্ট ছিল, জগৎপতির নির্দেশে নিয়ে এল ফাইল। আর্জিটা পড়ল। বিচ্ছেদের কারণ স্ত্রীর ব্যভিচার। কো-রেসপণ্ডেণ্ট কে? কো-রেসপণ্ডেণ্ট অরিন্দম।

ভাস্কর পাতায়-পাতায় সই করে দিল। ভাবল অরিন্দমের সমর্থনের জন্যে কত খেসারত না দিতে হয়েছে।

জগৎপতি বললেন, 'অরিন্দম তো সমন পেয়ে চুপ করে থাকবে। তোমাকেই জবানবন্দি দিতে হবে দাঁড়িয়ে। আরেক-বার একটু কষ্ট করতে হবে তোমাকে।'

'করব।'

'আমার জুনিয়র রয় তোমাকে সব বুঝিয়ে সুঝিয়ে দেবে।'

'তার জন্যে আপনি ভাববেন না।'

'তবেই আমি রুচিকে মুক্তি কিনে দিতে পারব।' কষ্টে নিশ্বাস নিচ্ছেন জগৎপতি। অ্যাটেণ্ডেন্টের অনুরোধ অগ্রাহ্য করে বললেন, 'জীবনে এই আমার এক যন্ত্রণার দায় ছিল তা আমি নির্বাহ করে গেলাম। মুক্তি এনে দিতে পারলাম রুচিকে। তারপর যা খুশি সে করুক, যেখানে খুশি সে যাক, তার মঙ্গল সে নিজে বুঝুক। আমি বাধা দেব না। আমার মোহ ঘুচেছে। আমি আর থাকবও না বাধা দিতে। নির্মল চোখে চোখ বুজতে পারব।'

'আমি তবে এখন চলি।'

'এস। উনি যদি আজ থাকতেন দেখে যেতে পারতেন আমার নির্বাচন ভুল হয়নি।' চলে যাচ্ছিল ভাস্কর, অ্যাটেণ্ডেন্ট ফের ডেকে আনল। জগৎপতি বললেন, 'তোমার আপিস তোমাকে ছাঁটাইয়ের নোটিশ দিয়েছে, তাই না? আচ্ছা আমি দেখি।'

'এখুনি দেখবেন না।' হাসল ভাস্কর: 'জবাবদিহিটুকু এখনো বাকি আছে।'

'তা থাক।'

'তা ছাড়া ও চাকরি আমি করব না। ও বাড়িতে থাকব না। আমি আমার সত্য পরিচয়ে, স্বাধীন পরিচয়ে নেমে যাব।'

চলে গেল ভাস্কর। খোলা গেট বন্ধ করে দিয়ে গেল।

১৫

ঠিক কাঁটায়-কাঁটায় হয়ে গেল সমস্ত।

জবানবন্দি হল। ডিক্রি হয়ে গেল একতরফা।

আর রুচিরাকে পায় কে। দেখে কে। জানলায় গিয়ে দাঁড়াল রুচিরা। দেখল একটা বিরাট মিছিল বেরিয়েছে। কিসের মিছিল, কোথায় চলেছে এসব জিজ্ঞাসা তার মনে এল না। সে শুধু দেখল জনস্রোত। উদ্বেল জনস্রোত। এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্ত পর্যন্ত চলেছে। অনুভব করল সেও তাদেরই একজন। সে এখুনি নেমে যেতে পারে মিশে যেতে পারে এগিয়ে যেতে পারে।

এক সন্ন্যাসী মিশনকে বাড়ি-ঘর সম্পত্তি—সমস্ত দান করে দিচ্ছেন জগৎপতি। জগৎপতি চোখ বুজলেই সেই দান কার্যকর হবে, অর্থাৎ দখল নিতে পারবে মিশন। আর রুচিরা? সম্পত্তির আয় থেকে তাকে কিঞ্চিৎ মাসোয়ারা দেওয়া হবে। আর তার আচরণ যদি মিশনের অনুমোদিত হয় তা হলে যতদিন না অন্য কোথাও প্রতিষ্ঠিত হয় ততদিন তাকে এ বাড়িতে এককোণে একটু থাকতে দেবেন দয়া করে।

আর, এ বাড়ি পরে হাসপাতালই হোক বা ইস্কুলই হোক বা অন্য কোনো লোককল্যাণের প্রতিষ্ঠান, কোথাও না কোথাও, ক্ষুদ্রাক্ষরে হলেও চলবে, এণাক্ষীর নাম যেন কোথাও লেখা থাকে।

'মেয়েটাকে যে একেবারে বঞ্চিত করছেন।' জুনিয়র রয় আপত্তি করেছিল একবার।

'কে জানে করছি কিনা। না, ওকে সত্যি মানুষ হতে সাহায্য করছি।' জগৎপতি অলক্ষ্য বেদনায় ক্লান্তবোধ করতে লাগলেন: 'ওর হাতে সমস্ত সম্পত্তিটা ছেড়ে দিয়ে গেলে, বুঝতে পারছ, উচ্ছৃঙ্খল হবার সুযোগ দেওয়া হবে, সব তছনছ হয়ে যাবে। মোটা আয় দিলে ও আরামে ডুববে, সংগ্রামে ঝোঁক থাকবে না, আর স্বাধীনতা যে সংগ্রামের দ্বারাই শুদ্ধ হয়, সিদ্ধ হয়, ভুলে যাবে সে কথা।' বুকের ব্যথাটাকে একটু স্তিমিত হতে দেবার জন্যে কিছুক্ষণ চুপ করলেন জগৎপতি। পরে আবার বললেন, 'গারবের প্রতি যে ওর সহানুভূতির ভাব ছিল সেটা কৃত্রিম, এবারই যদি সে-ভাব

সত্য হয়। গরিব হতে ওর এতটুকুও বাধবে না, লাগবে না, আমিও এককালে ঘোরতর গরিব ছিলাম। আর, তারপরেও যদি ও তরুণ সমিতিতে থাকে, তখন দেখবে সে সমিতির উদ্দেশ্য মন্ত্রী বানাবার দিকে থাকবে না, থাকবে মানুষ বানাবার দিকে।'

কিন্তু আজ সকালে, এত সকালে, কে এল বাড়িতে? বারান্দা দিয়ে ঘুরে উপরে উঠে যাচ্ছে? কে, অরিন্দম?

অ্যাটেন্ডেন্ট বললে, 'না, অরিন্দম নয়।'

তবে, কে? আমি এখনো বেঁচে নেই? শুয়ে আছি বলে কি আমার কর্তৃত্ব শেষ হয়ে গিয়েছে? দলিল তো এখনো এক্সিকিউট করিনি।

কে?

'আমি শুভময়।'

সত্যি? বিছানায় উঠে বসবার চেষ্টা করলেন জগৎপতি। শুভময় আলোয় এসে দাঁড়াতে স্পষ্ট করে দেখলেন, চিনলেন। বললেন, 'ফিরে এসেছ?'

'হ্যাঁ, শত বিপদ বাধা লাঞ্ছনার পরেও পেরেছি ফিরতে।' খুব হাসি-খুশি শুভময়ঃ 'দমদম থেকে বাড়ি হয়েই—'

'হ্যাঁ, সেইটেই বড় কথা—ফিরে আসা, ফিরে-ফিরে আসা।' ধীরে ধীরে বিছানায় কাত হলেন জগৎপতি।

'কেউ রুখতে পারল না।' দৃঢ় দীপ্ত কণ্ঠে শুভময় বললে, 'আরেকটা ফার্মে চাকরি নিয়ে এসেছি। আগের সেই শয়তান ফার্ম নয়, আরেকটা ফার্মে। বিদেশী ফার্মে।'

'চাকরি পাওয়া অবান্তর। তোমাকে যে আগের চেয়ে অনেক বেশি ব্রাইট দেখাচ্ছে তাও অবান্তর।' আবার চিৎ হবার চেষ্টা করলেন জগৎপতিঃ 'তুমি যে বেঁচে আছ তুমি যে ফিরে এসেছ তাই যথেষ্ট। যাও উপরে যাও, রুচি আছে, ভালো আছে—'

তিন লাফে সিঁড়ি ডিঙিয়ে উপরে উঠে গেল শুভময়।

জগৎপতি বললেন, দলিলটা এবার তাহলে ছিঁড়ে ফেলে দিতে হয়। পেয়েও পেল না বলে আর যারই দুঃখ হোক সন্ন্যাসীদের হবে না। তারা সমস্ত বিষয়-বাসনার ঊর্ধ্বে।

উপরে এসে দেখল, স্নান হয়ে গিয়েছে রুচিরার। আর খোলা চুল অনেক লেখাপড়া নিয়ে ঝুঁকে পড়েছে তার টেবিলে।

শব্দ শুনে পিছন ফিরে তাকিয়ে উথলে উঠল রুচিরাঃ 'আরে তুমি! তুমি কখন এলে?'

'এইমাত্র।'

'আরে বোসো, বোসো। কত কথা যে বলার আছে তোমাকে।'

'আমারই বেশি বলার আছে।' চেয়ারে বসল শুভময়ঃ 'তোমার কাছে ক্ষমা চাইবার আছে। কিন্তু একটা কথা যদি শোনো, যদি বোঝো, সব তোমার বাবার কারসাজি, বাবার ষড়যন্ত্র—'

'না, না, আজ শুধু ক্ষমা, চারদিকে ক্ষমা।' টেবিলের দিকে পিঠ রেখে উঠে দাঁড়াল রুচিরাঃ 'আসল ষড়যন্ত্রী ভাগ্য, তাকেও ক্ষমা। জীবনেরই এত ঔদার্য আছে যে মৃত্যুকে ক্ষমা করতে পারে; এমন কি সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি অপমানকেও পারে।'

'তবু আমার কথা সব শোনো।' বকতে সুরু করল শুভময়। বললে, 'আমার মধ্যে অন্ধ ত্বরা ছিল, দ্রুততা ছিল, কিন্তু পালানো ছিল না। ইচ্ছে ছিল দ্রুত বড়লোক হবার উপায় খুঁজে নিয়ে আসব। তোমার বাবার কাছে সামাজিক যোগ্যতা সাব্যস্ত করব। কিন্তু তোমার বাবাই পথে বসালেন। ফেলে দিলেন অকূল নিঃস্বতার মধ্যে। সকলের উপর অভিমান হল। কেন জানি না তোমারও উপর। নিজেরই ঠিকানা নেই, তোমার ঠিকানাও ভুলে গেলাম। আমার অবস্থাটা তুমি বোঝো তুমিই বুঝবে—'

'আর এদিকে আমার অবস্থাটা?' খিল খিল করে হেসে উঠল রুচিরা। কায়দা করে, কাটা কাটা করে, দিতে লাগল খবরগুলো। পরে দুদিকে দুহাত ছড়িয়ে খোলা চুলে উত্তাল আনন্দে বলে উঠলঃ 'সব চেয়ে বড় যে খবর সে হচ্ছে মুক্তি। মুক্তি।'

'অসীম কোথায়?'

'কে জানে কোথায়? কাশীতে না বৃন্দাবনে। না কি মরে গেছে। না কি মিশে গিয়েছে জনস্রোতে।'

'তা হলে আর ভাবনা কী।' শুভময়ও উঠে দাঁড়াল।

'না, আর ভাবনা কী।' আবার আরেক ঢেউ হাসি তুলল রুচিরাঃ 'অভিনয়ের চূড়ায় উঠে সিগারেট-মদও ছুঁতে হয়েছিল আমাকে। বাবা ভাবলেন পংক কুণ্ডে তলিয়ে গেলাম বোধহয়। পিছনে সন্ন্যাসী লাগালেন। উপদেশের ধোঁয়ায় দম আটকে আসে আর কী। কিন্তু সমস্ত উপদেশের থেকে দুটো জিনিস খুব মনে ধরল। এসব প্রেম সিগারেটের ধোঁয়া। কিছু ছাই ফেলে রেখে শূন্যে মিলিয়ে যাবার জিনিস। আর শরীরের মধ্যে সে রক্ত, যে বেঁচে থাকবার ঝাঁজ—সেই আসল মদ।'

'তা হলে এবার এস তোমার বাবাকে গিয়ে প্রণাম করি।' বললে শুভময়।

'মানে বিয়ে করি?' আবার আরেক পশলা হাসি ছড়াল রুচিরাঃ 'তুমি একা যাও।'

'একা?'

'হ্যাঁ, আমি আবিষ্কার করেছি আমি তোমাকেও ভালোবাসিনি। শুধু একটা জেদের বশে, অপমানের প্রতিশোধ নেবার পাগলামিতে, প্রতিহিংসায়, তোমাকে আঁকড়েছিলাম।' শান্ত, গম্ভীর, নিরুত্তাপ কণ্ঠে রুচিরা বললে, 'ওটা প্রেম নয়। তুমিও জানো, ওটা প্রেম নয়। ওটা সিগারেটের ধোঁয়া।'

'তা হলে?' দ্বিধায় দুর্বল হল শুভময়ঃ 'ফিরে যাব?'

'ফিরে যাবে কেন, এগিয়ে যাবে। ফিরে গিয়েছে অরিন্দম। সে বিয়েতে রাজি নয়, অথচ কদাচারে রাজি। তাকেই দিয়েছি ফিরিয়ে।'

দৃঢ়, দ্রুত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল শুভময়। জগৎপতির সঙ্গে দেখা না করেই বারান্দা দিয়ে চলে গেল গেটের দিকে।

'কি, কী হল?' যতদূর সাধ্য চেঁচিয়ে উঠলেন জগৎপতি।

কোনো উত্তর হল না। জগৎপতি বুঝলেন, কিছুই হবার নয়।

এই বিরাট স্তব্ধতা এই বুঝি এক মুক্তির ডাক।

দলিল সম্পাদন করে দিলেন। আর সম্পাদন করে দিয়েই জগৎপতি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। কখন প্রাণ যায় তারই অপেক্ষায় সন্ন্যাসীর দল তাঁকে পাহারা দিতে লাগল।

সেবা নয় পাহারা।

ভাগ্যের এমন রসিকতা, সাতদিনেও অজ্ঞানের শেষ হয় না। ছ ঘণ্টা করে চারজন সন্ন্যাসী সিফট ডিউটিতে কাজ করছে। মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র বাড়িটার দখল নিয়ে নিতে হবে। তাড়িয়ে দিতে হবে ঐ অলক্ষণা মেয়েটাকে।

স্যান্ডেল পায়ে রুচিরা পথে বেরিয়ে পড়েছে, কোথাও কোনো সংস্থান হয় কিনা।

আর ওদিকে ভাস্করেরও চাকরি নেই, বাড়িওলাও ছেড়ে দেবার চিঠি ছেড়েছে। আগের বাড়িটা যে বন্ধুর কাছে ছিল সে খবর পাঠিয়েছে ঠিক এখুনি ছাড়তে পারছি না।

ভাস্করও পথে বেরিয়েছে। কোথাও কিছু সুরাহা হয় কিনা।

কে জানে মুক্ত পথ কোথায় কোন দূর বিন্দুতে আবার এদের মিলিয়ে দেবে। কিংবা দেবে না।

(শেষ)

বিষ্ণুপুরের দশাবতার তাস

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতবর্ষে তাসখেলার প্রচলন কত দিনের? প্রত্যক্ষ ঐতিহাসিক প্রমাণ সম্মত এ-প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন।

১৫২৭ খৃষ্টাব্দে বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে এ-কথা লিখেছিলেন—"শাহ্ হাসান তাস খেলার অতিশয় ভক্ত ছিলেন। যে রাত্রে আমরা আগ্রা পরিত্যাগ করি, সেই রাত্রিতে আমি মীর আলি কর্চির মারফৎ কিছু তাস শাহ্ হাসানের কাছে পাঠাই।" ভারতবর্ষে তাস খেলার বিষয়ে এইটিই সম্ভবত সর্বপ্রাচীন দলিল। এর প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে, আবুল ফজল আইন-ই-আকবরীতে তৎকালীন এক প্রকার তাস খেলার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আকবরের সময়ের পূর্বে বারোটি রঙ ও প্রত্যেক রঙের বারোটি তাস, অর্থাৎ ১৪৪টি তাসের একরকম "গঞ্জিফা" উত্তরভারতে প্রচলিত ছিল। "গঞ্জিফা" কথাটি পারসীক; অর্থ তাস খেলা। আবুল ফজল আরও উল্লেখ করেন যে এই "গঞ্জিফা"কে সরল ও সহজসাধ্য করে আকবর বারোটি তাসে একটি রঙ ও এরকম আটটি রঙের অর্থাৎ মোট ৯৬টি তাসের এক খেলার প্রবর্তন করেন। দরবারের আমীর ওমরাহদের সঙ্গে আকবর বাদশা এই খেলাটিই খেলতেন।

বাবর ও আবুল ফজল "গঞ্জিফা" এই পারসীক শব্দটি ব্যবহার করেছেন বলেই এ-সিদ্ধান্ত করা যায় না যে ভারতীয় তাস খেলা পারস্য থেকে আমদানি। বরং, মুঘল যুগের অনেক আগে থেকেই যে ভারতবর্ষে তাস খেলার প্রচলন ছিল এমন অনুমান করবার অতিশয় সঙ্গত কারণ আছে। এই অনুমান প্রত্যক্ষ ঐতিহাসিক দলিল দিয়ে হয়ত প্রমাণ করা যাবে না। কিন্তু বহু ঐতিহাসিক সত্যই তো যুক্তিসহ অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত কেননা কোন লিপি বা দলিলের সেখানে অস্তিত্বই নেই। তাসখেলার ভারতীয় উৎপত্তির বেলাতেও এই একই যুক্তি আশ্রয় করা অসমীচীন নয়।

কী সেই যুক্তিসহ অনুমান?

প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে এই অনুমানের সূত্র ধরে আমরা একেবারে পুরাকালের ভারতবর্ষে পৌঁছতে পারব না। কেননা, অনেক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে দাবা বা পাশা খেলার উল্লেখ থাকলেও, তাস খেলা বা তার অনুরূপ কোন খেলার কুত্রাপি উল্লেখ নেই। তৎকালীন কোন চিত্রে তাস খেলার ছবিও অঙ্কিত হয়েছে বলে জানা যায়নি। এ-থেকে বিশ্বাসযোগ্যভাবেই প্রমাণ হয় যে প্রাচীন ভারতে তাস খেলার মত কোন খেলার প্রচলন ছিল না; এর আমদানি পরবর্তী কালের।

পরবর্তী কাল বলতে, বহু শতাব্দী পরে পারস্য অঞ্চল থেকে মুঘল-বাহিত হয়ে তাসের ভারতবর্ষে প্রথম অনুপ্রবেশ যে বিশ্বাসযোগ্য নয় সে-কথা আগেই বলেছি। বাংলাদেশের বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর এলাকায় "দশাবতার তাস" নামে এক প্রকার তাস খেলার এখনও প্রচলন আছে যেটির উৎপত্তিকাল বেশ প্রাচীন হওয়াই সম্ভব। অন্তত, মুঘল যুগের যে পূর্বে তাতে সন্দেহের অবকাশ কম। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের মুখপত্রে প্রকাশিত তাঁর এক নিবন্ধে এই স্থির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন যে বিষ্ণুপুরের দশাবতার তাসের উৎপত্তিকাল খৃষ্টীয় অষ্টম অথবা নবম শতাব্দী। তাঁর যুক্তির আলোচনা করবার আগে দশাবতার তাসের সংক্ষিপ্ত একটু বর্ণনা দেওয়া প্রয়োজন।

বিভিন্ন সময়ে, পৃথক অবতারের রূপে বিষ্ণু যে দশবার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এ পুরাকাহিনী সর্বজনবিদিত। মীন, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম (রঘুনাথ), পরশুরাম, বলরাম, জগন্নাথ (বুদ্ধ) ও কল্কি—এই দশ অবতারের রূপ অবলম্বন করে

দশাবতার তাসের শ্রেণী বা রঙের বিভাগ।

অবতার পিছু একটি করে রঙ ধরা হয় বলে এ-খেলায় দশটি রঙ; প্রত্যেক রঙে বারোটি তাস; মোট তাসের সংখ্যা একশো কুড়ি। এর রঙের বারোটি তাসের মধ্যে সম্মানিত বা "অনার্স" কার্ড মাত্র দুটি—সর্বোচ্চটিতে স্বয়ং অবতারের একটি বহুবর্ণ চিত্র উৎকীর্ণ থাকে আর দ্বিতীয়টিতে তার উজির বা মন্ত্রীর। পরবর্তী অল্পমূল্যের তাসগুলি, ইয়োরোপীয় তাসের মতই, দশ, নয়, আট ইত্যাদিক্রমে তিরি, দুরি, টেক্কা পর্যন্ত। এগুলিকে চিহ্নিত করবার জন্য প্রত্যেক অবতারের ভিন্ন ভিন্ন প্রতীকচিহ্নের কল্পনা করা হয়েছে। যেমন, মীন-অবতারের প্রতীক—মাছ, কূর্ম-অবতারের কচ্ছপ, বরাহ-অবতারের শঙ্খ, নৃসিংহ-অবতারের চক্র, বামন-অবতারের কমণ্ডলু, রাম-অবতারের তীর, পরশুরামের কুঠার, বলরামের মুষল, জগন্নাথ বা বুদ্ধের পদ্ম আর কল্কির খড়্গ। অতএব, মীন-অবতারের (বা রঙের) টেক্কায় আঁকা থাকবে একটি মাছের ছবি, তিরিতে তিনটি মাছের, নহলায় নটি মাছের এবং এই একই নিয়মে অন্য অল্পমূল্যের তাসগুলি চিহ্নিত হবে। বুদ্ধ বা জগন্নাথের প্রতীক পদ্ম। অতএব বুদ্ধ-অবতারের (বা রঙের) পঞ্জায় থাকবে পাঁচটি পদ্ম, আটায় আটটি—এই রকম প্রতীকভেদে সব অবতারেরই বেলায়।

এক রঙের (বা অবতারের) বারোটি তাসের রূপ বর্ণনার পরেই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে বিভিন্ন অবতারদের আপেক্ষিক গুরুত্ব কি? রাম বা রঘুনাথই হলেন অবতারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁর এত প্রতাপ যে রাম-অবতারের তাস দিয়ে যিনি খেলা আরম্ভ করবেন তিনি প্রথম পিটটি তো, সর্বোচ্চ কার্ড খেলেছেন বলে, পাবেনই, এমন কি পরবর্তী পিটটিও তার বাঁধা তা তিনি দ্বিতীয় পিটের খেলা যে-কোন তাস দিয়েই আরম্ভ করুন না কেন। বেশ অদ্ভুত নিয়ম সন্দেহ নেই।

আরও একটি অদ্ভুত নিয়ম আছে। অবতারদের মধ্যে পাঁচজন হলেন "অভিজাত" আর বাকি পাঁচজন "অন্ত্যজ", "অভিজাত" অবতারেরা, যথাক্রমে, রাম (রঘুনাথ), পরশুরাম (ভৃগুরাম), বলরাম, জগন্নাথ (বুদ্ধ) ও কল্কি। আর "অন্ত্যজেরা" হলেন—মীন, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ ও বামন। একটা

রূপক কল্পনা করেছেন। এটা কষ্ট-কল্পনা বলেই মনে হয়।

দশাবতার তাসের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণের পর আমরা পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সেই যুক্তিতে ফিরে যেতে পারি যার সাহায্যে তিনি প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে বিষ্ণুপুরের এই তাস খেলা এগার থেকে বার শ' বছরের পুরাতন।

তাঁর প্রথম যুক্তি এই যে দশ অবতারের যে পর্যায় বিষ্ণুপুরের তাসে স্বীকৃত তাতে বুদ্ধের স্থান পঞ্চম। বুদ্ধের যে-প্রতিকৃতি চিরাচরিতভাবে তাসে আঁকা হয়ে আসছে তাতে পিন্ডাকৃতি একটি অঙ্গের শীর্ষে একটি মানুষের মাথা ও দুটি মানুষের হাত আঁকা থাকে।

[বুদ্ধ বিকল্পে জগন্নাথ-অবতার হিসাবেও স্বীকৃত এবং তাঁরও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খুব সুনির্দিষ্ট নয়।] এই না-মানুষ, না-অন্যকিছু গঠন নিয়ে, শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে, বুদ্ধের স্থান অর্ধ-পশু, নৃসিংহ ও বিকৃত-মানব বামনের ঠিক মধ্যখানেই হওয়া উচিত। অর্থাৎ, দশাবতার তাসে, প্রাণীজগতের সর্বপ্রাচীন জীব মীন থেকে শুরু করে কল্কি অবধি যে-ক্রম অনুসরণ করা হয়েছে তাতে আকৃতিগত বিবর্তনের বেশ স্পষ্ট একটা ছাপ আছে। এই সুপরিকল্পিত বিবর্তনের ক্রমপর্যায়ে বুদ্ধ বা জগন্নাথের

মুষলধারী বলরাম

বিবর এখানে লক্ষ্য করা উচিত যে যে-সব অবতারদের হীন শ্রেণীতে ফেলা হয়েছে তাদের আকৃতি কিন্তু মনুষ্যেতর প্রাণীর মত বা তার কাছাকাছি। মীন, কূর্ম ও বরাহের বেলায় এ-নিয়ম প্রাঞ্জল। নৃসিংহ তো না-মানুষ না-সিংহ আর বামন, তার খর্বাকৃতির জন্যই বোধ হয়, পুরোদস্তুর মানুষের মর্যাদা পাননি। "অভিজাত" অবতারেরা সকলেই পশু-প্রভাবের ঊর্ধ্বে। এইজন্যই হয়ত তাঁরা অভিজাত।

সে যাই হোক, যে-অদ্ভুত নিয়মটির কথা বলব বলে এ-প্রসঙ্গে এসেছিলাম সেটি হচ্ছে,—অভিজাত অবতারদের বেলায়, "অনার্স কার্ডের" পরেই টেক্কা হল সর্বোচ্চ তাস, তার পরে দুরি, তিরি ইত্যাদিক্রমে মূল্যহ্রাস হতে হতে দশ হল সবচেয়ে ছোট তাস। আর "অন্ত্যজ" অবতারদের বেলায়, অবতার আর উজির-দের পরেই, দশ হল সর্বোচ্চ তাস আর টেক্কা সব থেকে ছোট। এ-নিয়মটির উৎপত্তি-রহস্য চেষ্টা করেও জানতে পারিনি। এতে যে-জটিলতার সৃষ্টি হবার কথা, খেলাটিকে মনোগ্রাহী করবার জন্য তার সত্যিই প্রয়োজন ছিল কিনা কে জানে।

আরও একটা নিয়ম আমার কাছে আশ্চর্য মনে হয়েছে। দিনের বেলা খেলা হলে, রাম-অবতারের তাস পেতে খেলা শুরু হয় আর রাত্রে "স্টার্টার" হল মীন অবতার। কোনও কোনও গবেষক এ-থেকে রাতের অন্ধকার ভেদ করে জীবজগতের বিকাশের সূচনা ও দিনের আলোয় ধনুর্বাণধারী মানুষের আবির্ভাবের এক

ধনু ও কুঠারধারী পরশুরাম

খেলা চলতে পারে। খেলা যদি দিনের-বেলায় হয়, তবে, যে-হাতে রাম-অবতারের তাসটি এসেছে সেই হাতই খেলা শুরু করবেন। রাত্রে এই সম্মান মীন-অবতারের। আগেই বলেছি যে রাম-অবতারের তাসটি বাবদ সেই ভাগ্যবান খেলোয়াড়ের পর পর দুটি পিট বাঁধা। এর পর, তিনি হাতের অন্যান্য "অনার্স কার্ড" খেলবেন এবং যাবতীয় সম্মানিত তাস শেষ হবার পর তিনি অল্পমূল্যের তাস পেতেও খেলা চালাতে পারেন বা অন্যকে পাস দিতে পারেন। দ্বিতীয় বা তাঁর পরবর্তী খেলোয়াড়দের খেলার নিয়ম একই। তাঁরাও প্রথমে হাতের যাবতীয় "অনার্স কার্ড" খেলে, ইচ্ছে হলে অন্যকে পাস দিতে পারেন। একজন খেলোয়াড় পাস দেবার পর যদি পরবর্তী পিটটি তাঁর ঠিক বাঁ-দিকের খেলোয়াড় পান তবে তিনি ভাগ্যবান। কেননা এ-রকম পিটকে "টিপসহি" বলে অভিহিত করা হয় এবং তার মূল্য ধরা হয় দুটি পিটের (অথবা দশটি তাসের) সমান। ১২০টি তাসে পাঁচজন খেলোয়াড় বসে খেলায় মোট ২৪টি পিট। খেলার শেষে, কে ক'টি পিট পেলেন তা গুণে ফলাফল স্থির করা হয়। প্রথম পাঁচটি পিটে ধরা হয় এক পয়েন্ট। তারপরের প্রত্যেক বাড়তি পিটের মূল্য "প্লাস" পাঁচ পয়েন্ট আর কমতির "মাইনাস" পাঁচ। অর্থাৎ কেউ যদি ছ'পিট পান তাহলে তাঁর পয়েন্টের সংখ্যা হবে ছয়, ন'পিট পেলে একুশ আবার, পক্ষান্তরে চারপিট পেলে "মাইনাস" চার, দু'পিট পেলে "মাইনাস" চোদ্দ ইত্যাদি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই পয়েন্টের উপর বাজি রেখে খেলা হয়।

এযাবৎকাল বিষ্ণুপুরের যে-সব শিল্পী দশাবতার তাস তৈরী করে এসেছেন তাঁদের বংশগত উপাধি "সূত্রধর"। সূত্রধর বলতে আমরা এখন কেবলমাত্র কাঠ-মিস্ত্রিদেরই বুঝি। কিন্তু মল্লরাজাদের আমলে বিষ্ণুপুরের যাবতীয় শিল্পীরাই সূত্রধর পদবীতে পরিচিত ছিলেন। রাজানুগ্রহে এঁদের মধ্যে কুশলীরা ফৌজদার পদবীতেও ভূষিত হতেন। গদাধর ফৌজদার, সতীশ ফৌজদার, কেদার সূত্রধর প্রমুখ অনেক শিল্পী একদা দশাবতার তাস-চিত্রণে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। উৎকৃষ্ট পটচিত্র অঙ্কনের সমস্ত দক্ষতাই তখন এ-কাজে দরকার হত। আশুতোষ মিউজিয়মে রক্ষিত এক প্রস্থ পুরাতন দশাবতার তাসের সঙ্গে বর্তমানকালে প্রস্তুত এই তাসের তুলনা করলেই বোঝা যায় যে অঙ্কনপটুত্ব অধুনা অনেক হ্রাস পেয়েছে। শিল্পীর সংখ্যাও নগণ্য। বর্তমান লেখক ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে বিষ্ণুপুরে মাত্র কয়েক ঘর দশাবতার তাসের কারিগর দেখেছিলেন। তাঁদের আর্থিক অবস্থা এত শোচনীয় যে এই কুল-ব্যবসায়ে তাঁরা যে বেশীদিন টিকে থাকতে পারবেন এমন মনে হয় না।

দশাবতার তাস অঙ্কনরত শিল্পী

আমাদের আর পাঁচটা মনোরম কুটিরশিল্পের মতই দশাবতার তাস তৈরীর বেলায় যন্ত্রপাতির ব্যবহার নেই বললেই চলে। এখানে প্রধান মূলধন বংশগত নৈপুণ্য। পুরনো ধোয়া কাপড় পর পর কয়েক ভাঁজ সাজিয়ে, প্রথমে আঠা দিয়ে জুড়ে নেওয়া হয়। এই আঠা বাড়ির মেয়েরাই তেঁতুল বীচির গুঁড়ো সেদ্ধ করে তৈরি করে দেন। আঠা কিছুটা শুকিয়ে কাপড়ের জমিন অনেকটা পিচবোর্ডের মত শক্ত হয়ে উঠলে, দুপিঠে খড়িমাটির প্রলেপ লাগিয়ে শুকিয়ে নেওয়া হয়। এই খড়িমাটির জমিনের উপর পরে নানা রঙের ছবি আঁকতে হবে বলে এটিকে বহুব্যবহারে-মসৃণ একটি পাথরের নুড়ি দিয়ে অনেকক্ষণ ঘসে যতদূর সম্ভব তেলা করে নেওয়া হয়। অতঃপর নির্ধারিত আকারের একটি চাকতি এই কাপড়ের উপর চেপে ধরে কাঁচি চালিয়ে অনুরূপ আকারের চাকলা কেটে নেওয়া হয় অনেকগুলি। এইগুলির উপরেই অসীম ধৈর্যের সঙ্গে দশ অবতার, তাঁদের দশ উজির ও প্রতীক-চিহ্নিত অন্যান্য তাসগুলি আঁকা হয় রঙ-তুলি দিয়ে। বলা বাহুল্য, রঙগুলি সম্পূর্ণ দেশীয় পদ্ধতিতে প্রস্তুত। বিষ্ণুপুরে এক সময় "পাটরাঙা" নামে একটি বিশেষ সম্প্রদায় ছিলেন যাঁদের জাত-ব্যবসা ছিল স্থানীয় উপাদানে নানা রকম রঙ তৈরি করা। তাসের সামনের দিকের নক্‌শা আঁকা শেষ হলে, পিঠের দিকে গালা ও মেটে সিঁদুরের এক মসৃণ প্রলেপ টেনে এগুলির অঙ্গসজ্জা শেষ করা হয়।

আমাদের নক্‌শী-কাঁথা, আমাদের বালুচর শাড়ির মত একেবারে স্মৃতি-কথার কোঠায় এখনও গিয়ে না পৌঁছলেও, দশাবতার তাস-শিল্পের অমোঘ গতি সেইদিকেই। অবসর-ভিত্তিক জীবনধারা থেকে আমরাও অমোঘভাবে যে কর্মব্যস্ততার যুগে উত্তীর্ণ হয়েছি তাতে, দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়লেও, চোখের উপরে এ-রকম একাধিক চিত্তাকর্ষক কারুকলার অপমৃত্যু আমাদের বোধ করি সহ্য করতেই হবে। *

---

* প্রবন্ধের সহিত ব্যবহৃত আলোক-চিত্রগুলি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর বিষ্ণুপুর শাখার সৌজন্যে লেখক কর্তৃক গৃহীত।

রেবা রোধসি

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

শেষ পর্যন্ত রাজপুত্র তূণীরবর্মাকে রাজ্য হইতে নির্বাসন দিতে হইল। রাজা শিববর্মা তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ ইন্দ্রবর্মাকে ডাকিয়া বলিলেন,—'তূণীর যে অপরাধ করেছে তাতে মৃত্যুই তার একমাত্র দণ্ড। কিন্তু সে আমার পুত্র, তাকে চরম দণ্ড দিতে আমার হৃদয় ব্যথিত হচ্ছে। তুমি তাকে সঙ্গে নিয়ে রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এসো। তাকে বলে দিও, আমি তার মুখদর্শন করতে চাই না, সে যেন আর কখনো এ রাজ্যে পদার্পণ না করে।'

যুবরাজ ইন্দ্রবর্মা বিষণ্ণ মুখে বলিলেন,—'যথা আজ্ঞা আর্য।'

ন্যূনাধিক সাত শত বছর পূর্বে নর্মদার উত্তর তীরে মহেশগড় নামে এক রাজ্য ছিল। রাজ্য আকারে বৃহৎ নয়, কিন্তু সমৃদ্ধশালী। কয়েক বছর আগে আলাউদ্দিন খিলজি যখন দেবগিরি রাজ্য লুণ্ঠনের জন্য দাক্ষিণাত্যে গমন করেন তখন তিনি মহেশগড় রাজ্যের পাশ দিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, রাজ্যে প্রবেশ করেন নাই; কিন্তু তদবধি নর্মদা অববাহিকার রাজ্যগুলিতে শঙ্কা ও সন্ত্রাসের সৃষ্টি হইয়াছিল। যবন জাতি অতি কপট ও নিষ্ঠুর; তাহারা বিশ্বাসঘাতক বন্ধুত্বের ভান করিয়া সদ্ভাব-প্রতিপন্নকে হত্যা করে। যবন সম্বন্ধে সর্বদা সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

মহেশগড় রাজ্যেও এই সন্ত্রাসের ছোঁয়াচ লাগিয়াছিল। রাজশক্তি সৈন্যদল গঠন করিয়া আততায়ীর আগমন প্রতীক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু বছরের পর বছর কাটিয়া গেল, যবনেরা ফিরিয়া আসিল না। ধীরে ধীরে অলক্ষিতে সতর্কতাও শিথিল হইতে লাগিল। সৈন্যদল হ্রাস পাইল, রাজপুরুষেরা বাহিরের দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া আভ্যন্তরীণ ক্ষুদ্র কূটনৈতিক খেলায় মনোনিবেশ করিলেন।

ভারতের ইতিহাসে এইরূপ ঘটনা বারংবার ঘটিয়াছে। শত্রু চোখের আড়াল হইলেই মনের আড়াল হইয়া যায়। আবার যখন শত্রু আচম্বিতে ফিরিয়া আসে তখন তাহা অপ্রত্যাশিত উৎপাত বলিয়া মনে হয়। আমরা অতীতকে বড় সহজে ভুলিয়া যাই, তাই বোধহয় আমাদের ইতিহাসের প্রতি আসক্তি নাই।

মহেশগড়ের রাজা শিববর্মার বয়স হইয়াছে। সেকালে রাজাদের বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল, যিনি যতগুলি রাজকন্যা ঘরে আনিলেন তাঁহার মর্যাদা তত বেশি। শিববর্মার সাতটি মহিষী, পুত্র-সংখ্যা ত্রিশের ঊর্ধ্বে। তন্মধ্যে কেবল জ্যেষ্ঠপুত্র সিংহাসনের উত্তরাধিকারী,

অন্য রাজকুমারদের কোনও কর্ম নাই। তাঁহারা আহার বিহার মৃগয়া এবং প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ করিয়া জীবন-যাপন করেন। পুরুষানুক্রমে এই উদ্বৃত্ত রাজপুত্রেরা এবং তাঁহাদের পুত্র-পৌত্রেরা রাজপুত জাতিতে পরিণত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সহজাত ক্ষাত্রতেজ ছিল; তাই অদ্যাপি রাজপুত পুরুষের শৌর্যবীর্য বাহুবল ভুবনবিখ্যাত এবং রাজপুত রমণীর গতিছন্দে রাজরাণীর গর্ব সুপরিস্ফুট।

তূণীরবর্মা রাজা শিববর্মার তৃতীয় মহিষীর গর্ভজাত চতুর্থ পুত্র। তিনি কোনোকালে রাজা হইবেন সে সম্ভাবনা নাই। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার স্বভাব দুরন্ত ও দুঃশীল, কেহ তাঁহাকে শাসন করিতে পারিত না। তারপর তিনি যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন তখন তাঁহার স্বভাব আরও প্রচণ্ড ও দুর্দমনীয় হইয়া উঠিল। তাঁহার আকৃতি যেমন সুন্দর, দেহ তেমনিই বলশালী, তাঁহার প্রতিকূলতা করিতে কেহ সাহস করে না; উৎসর্গীকৃত বৃষের ন্যায় তিনি স্বচ্ছন্দচারী হইয়া উঠিলেন। ভোগবাসনে তাঁহার রুচি রাজকবি ভর্তৃহরির পন্থা অবলম্বন করিল; জীবনে ভোগ্যবস্তু যদি কিছু থাকে তবে তাহা মৃগয়া এবং নারীর যৌবন। যৌবনং বা বনং বা।

রাজপুত্রেরা কেহই শান্তশিষ্ট মিতাচারী হন না; কিন্তু তাঁহাদের উচ্ছৃঙ্খলতা মাত্রা অতিক্রম করিলে প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা যায়। তূণীরবর্মার আচার-আচরণ লইয়া রাজার নিকট নিত্য অনুযোগ অভিযোগ আসিতে লাগিল। রাজা পুত্রকে সংযত করিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু কোনও ফল হইল না। অবশেষে তূণীরবর্মা এক অমার্জনীয় অপরাধ করিয়া বসিলেন, এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের তরুণী ভার্যাকে অপহরণ করিলেন।

এ মহাপাতকের মার্জনা নাই। রাজা পুত্রকে কারারুদ্ধ করিলেন, তারপর তাঁহার নির্বাসনের আদেশ দিলেন।

কারাগার হইতে তূণীরবর্মাকে মুক্ত করিয়া যুবরাজ তাঁহাকে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিতে আদেশ করিলেন, স্বয়ং অন্য অশ্বে আরোহণ করিয়া নগরদ্বারের অভিমুখে চলিলেন। আগে-পিছে দুই দল ধনুর্ধর রক্ষী চলিল।

রাজপথের দুই পাশে নাগরিকের ভিড় জমিয়াছে। অধিকাংশই নীরব, কদাচিৎ কেহ ধিক্ ধিক্ বলিয়া তিরস্কার জানাইতেছে। তূণীরবর্মার মুখে কখনও হিংস্র ভ্রূকুটি, তখনও খরশান ব্যঙ্গ-হাস্য। তিনি পাশে মুখ ফিরাইয়া যুবরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ—বধ্যভূমিতে?'

ইন্দ্রবর্মা ধীর স্বরে বলিলেন,—'না। মহারাজ তোমাকে নির্বাসন দণ্ড দিয়াছেন।'

তূণীরবর্মার অধর বিদ্রূপে পঙ্কিল হইয়া উঠিল, তিনি বিকৃত হাস্য করিয়া বলিলেন,—'অসীম করুণা মহারাজের। তোমার যদি অধিকার থাকত তুমি বোধহয় আমার প্রাণদণ্ড দিতে।'

ইন্দ্রবর্মা ক্লান্ত নিঃশ্বাস ফেলিলেন, উত্তর দিলেন না।

নগর হইতে রাজ্যের সীমান্ত বহু দূরে। নগর ছাড়াইয়া তাঁহারা নর্মদার তীর ধরিয়া পূর্বমুখে চলিলেন। বেলা তৃতীয় প্রহরে রাজ্যের সীমান্তস্তম্ভ দেখা গেল। সীমান্তস্তম্ভের নিকট আসিয়া ইন্দ্রবর্মা অশ্ব স্থগিত করিলেন, একটি কোষবদ্ধ তরবারি তূণীরবর্মার হাতে দিলেন, স্নেহার্দ্র স্বরে বলিলেন,—'ভাই, এই অশ্ব এবং এই তরবারি মাত্র এখন তোমার সম্পত্তি। রাজার আদেশে তুমি নির্বাসিত হয়েছ; কিন্তু তুমি ক্ষত্রিয়, তোমার ভুজবলই তোমার ভাগ্য। যাও, আর কখনো এ রাজ্যে ফিরে এস না। কিন্তু মাঝে মাঝে মাতৃভূমিকে স্মরণ কোরো।'

তূণীরবর্মা তীব্রতিক্ত ব্যঙ্গহাস্য করিয়া বলিলেন,—'মাতৃভূমি! মহেশগড় আমার মাতৃভূমি নয়, বিমাতৃভূমি। এখানে সবাই আমার শত্রু। যদি কোনো দিন ফিরে আসি, একা ফিরব না, এই তরবারি হাতে নিয়ে ফিরে আসব।'

ইন্দ্রবর্মা জানিতেন ইহা ক্রোধের আস্ফালন মাত্র, তিনি দুর্মদ সাহসী ও হঠকারী, কিন্তু সৈন্যদল গঠন করিয়া তাহার নেতৃত্ব করা তূণীরবর্মার সাধ্যাতীত। ইন্দ্রবর্মা শান্ত ভর্ৎসনার কণ্ঠে বলিলেন,—'ছিঃ তূণীর ভাই, তুমি রাজপুত্র, নিজের বংশে কলঙ্কারোপ কোরো না।'

তূণীরবর্মা চিৎকার করিয়া উঠিলেন,—'আমার বংশ নাই, মাতৃভূমি নাই। পৃথিবীতে আমি একা।' বলিয়া তিনি ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া পূর্বদিকে ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন।

সে-রাত্রি তূণীরবর্মা নর্মদাতীরের এক বৃক্ষতলে কাটাইলেন, পরদিন আবার পূর্বমুখে চলিলেন। নর্মদার তীর কখনও সমতল, কখনও শৈলবন্ধুর। কদাচিৎ দুই-একটি আরণ্যক জাতির গ্রাম। গ্রাম হইতে খাদ্য মিলিল।

দ্বিতীয় দিন সূর্যাস্তের প্রাক্কালে তূণীরবর্মা একটি গ্রামের নিকটবর্তী হইলেন; দেখিলেন নদীসৈকতে [illegible] আটবিক জাতীয়া যুবতী গান গাহিয়া গাহিয়া নৃত্য করিতেছে। তাহাদের নিরাবরণ বক্ষে বনজ ফুলের মালা, কেশকুণ্ডলিতে শিখিচূড়া।

তূণীরবর্মা অশ্ব দাঁড় করাইয়া দেখিতে লাগিলেন, তারপর অশ্ব হইতে নামিয়া যুবতীদের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইলেন। যুবতীরা ভয় পাইল না, খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

একটি যুবতী হাসিল না, কাছে আসিয়া তূণীরবর্মাকে প্রদক্ষিণ করিয়া দেখিতে লাগিল। তারপর নিজের গলার মালা খুলিয়া তাঁহার গলায় পরাইয়া দিল।

অন্য যুবতীরা কলহাস্য করিতে করিতে ছুটিয়া গ্রামের দিকে চলিয়া গেল।

তূণীরবর্মা যুবতীকে হাত ধরিয়া কাছে টানিয়া লইলেন, স্মিতহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তোমার নাম কি?'

যুবতী স্নিগ্ধ চক্ষুদুটি তাঁহার মুখের উপর স্থাপন করিয়া বলিল,—'রেবা।'

কিছুক্ষণ পরে এক দল আটবিক পুরুষ ভল্ল লইয়া উপস্থিত হইল, তূণীরবর্মাকে নিরীক্ষণ করিয়া যুবতীকে জিজ্ঞাসা করিল,—'এ কে?'

যুবতী বলিল,—'ওর গলায় আমি মালা দিয়েছি, ও আমার পুরুষ।'

পুরুষেরা তখন তূণীরবর্মাকে প্রশ্ন করিল,—'তুমি কে?'

তূণীরবর্মা তরবারির মুষ্টিতে হাত রাখিয়া বলিলেন,—'আমি রাজপুত্র।'

পুরুষদের মধ্যে যে সর্বাধিক বয়স্ক সে বলিল,—'রাজপুত! এখানে এসেছ কেন?'

তূণীরবর্মা বলিলেন,—'আমাকে কেউ ভালবাসে না, তাই রাজ্য ছেড়ে চলে এসেছি।'

পুরুষ জিজ্ঞাসা করিল,—'তুমি আমাদের গ্রামে থাকবে?'

তূণীরবর্মা বলিলেন,—'থাকব।'

গ্রামের একান্তে নর্মদার তীরে কুটির বাঁধিয়া তূণীরবর্মা রহিলেন। রেবা এই নূতন ঘরের ঘরনী।

রেবার শ্যামল দেহটি যেমন পরম কমনীয়, তাহার মনও তেমনি শান্ত-স্নিগ্ধ প্রসন্ন। তূণীরবর্মা এমন রমণী পূর্বে দেখেন নাই; নাগরিকা রমণীদের অন্তরে ক্ষুধা অধিক, তৃপ্তি কম।

...শা রেবাকে লইয়া সুখের ... নিমজ্জিত হইলেন।

আটবিকদের জীবনে অধিক বৈচিত্র্য ... তাহারা অল্প চাষবাস করে, নদীতে মাছ ধরে, ধনুর্বাণ লইয়া বনে শিকার করে। মহুয়া এবং বনমধু হইতে আসব প্রস্তুত করিয়া তাহারা পান করে, নেশায় মত্ত হইয়া নৃত্যগীতে মাতামাতি করিতে করিতে কে কাহার স্ত্রী কে কাহার পুরুষ ভুলিয়া যায়। আদিম অনিরুদ্ধ তাহাদের জীবন, সংস্কারের বন্ধনে তাহাদের মন পঙ্গু হইয়া যায় নাই।

তূণীরবর্মার মনে চিন্তা নাই; তিনি যখন ইচ্ছা নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সাঁতার কাটেন, তাঁহার বলিষ্ঠ বাহুক্ষেপে নর্মদার জল তোলপাড় হয়। কখনও তিনি তীরে বসিয়া অলসভাবে মাছ ধরেন। কখনও বা গ্রামের যুবকদের সঙ্গে বনে গিয়া ময়ূর হরিণ বরাহ শিকার করিয়া আনেন। আটবিকদের সঙ্গে তিনি ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া গিয়াছেন, তাহারাও রাজপুত্রকে আপন করিয়া লইয়াছে। তূণীরবর্মা উপলব্ধি করিয়াছেন যে, অন্তরে তিনি বন্য আটবিক মানুষ, এই জীবনই তাঁহার প্রকৃত জীবন; এতদিনে তিনি স্বক্ষেত্রে উপনীত হইয়াছেন। নাগরিক জীবনযাত্রার জন্য তাঁহার অন্তরে বিন্দুমাত্র পিপাসা নাই।

কদাচিৎ সূর্যাস্তকালে নর্মদাসৈকতে একাকী বসিয়া নানা জল্পনা তাঁহার মনে উদয় হয়। নদীর স্রোত পশ্চিম দিকে বহিয়া চলিয়াছে; এখন যে-জল এখানে বহিতেছে সেই জল হয়তো কাল প্রাতঃকালে মহেশগড় নগরের পাশ দিয়া বহিয়া যাইবে। মহেশগড়ের কথা স্মরণ হইলেই তাঁহার মন বিমুখ হয়। তিনি ভাবেন, মহেশগড় আমার জন্মভূমি নয়, মহেশগড়ের মানুষ আমার আপনজন নয়। এই নদীতীরস্থ ক্ষুদ্র গ্রাম তাঁহার আপন স্থান, এই বন্য অর্ধনগ্ন মানুষগুলি তাঁহার পরমাত্মীয়, রেবা নাম্নী ওই শ্যামলী মেয়েটি তাঁহার অন্তরতমা। জীবনে তিনি আর কিছু চাহেন না।

এইভাবে দিন কাটিতে থাকে। বৎসরাধিক কাল অতীত হইয়া যায়।

একদিন হেমন্তের দ্বিপ্রহরে তূণীরবর্মা রেবাকে বলিলেন,—'চল্ রেবা, বনে শিকার করতে যাই।'

রেবা উল্লসিত হইয়া বলিল,—'আমাকে নিয়ে যাবে?'

তূণীরবর্মা বলিলেন,—'হ্যাঁ, আজ আর কেউ নয়, শুধু তুই আর আমি।'

'বেশ চল।' বলিয়া রেবার মুখে একটু শঙ্কার ছায়া পড়িল—'ফিরতে যদি রাত হয়ে যায়? বনে নেকড়ে বাঘ বুনো কুকুর আছে।'

তূণীরবর্মা বলিলেন,—'যদি রাত হয়ে যায়, দুজনে গাছের ডালে উঠে রাত কাটিয়ে দেব। আয়।'

নদীর ধারে অশ্বটি চরিতেছিল, তূণীরবর্মা তাহার মুখে রজ্জুর বল্গা পরাইলেন, লাফাইয়া তাহার পিঠে উঠিয়া বসিলেন, রেবাকে টানিয়া নিজের সম্মুখে বসাইয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন।

গ্রাম হইতে ক্রোশেক দূরে পশ্চিমে শাল পিয়াল মধুক তিন্তিড়ির বন। বনের কিনারে ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া তূণীরবর্মা রেবার সহিত বনে প্রবেশ করিলেন। তূণীরবর্মার হাতে ধনুর্বাণ আছে বটে কিন্তু মৃগয়ার দিকে মন নাই।
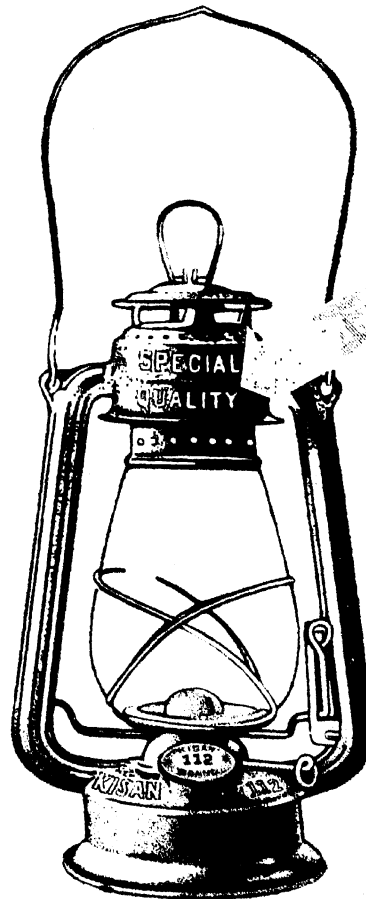
ছুটোছুটি লুকোচুরি খেলা; বালক-বালিকার কৌতুক কুতূহলের সহিত যুবক-যুবতীর রতিরঙ্গ মিশিয়া বন-বিহার পরম রমণীয় হইয়া উঠিল। তুণীরবর্মা যখন সময় সম্বন্ধে সচেতন হইলেন তখন প্রণয়িযুগল বনের পশ্চিম প্রান্তে পৌঁছিয়াছেন এবং সূর্যাস্ত হইতেও বিলম্ব নাই।

তুণীরবর্মা বলিলেন,—'চল্ চল্, এখনো বেলা আছে, অন্ধকার হবার আগে বন পেরিয়ে যেতে পারব।' তিনি রেবার হাত ধরিয়া আবার বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন।

কিন্তু কয়েক পদ যাইবার পর তাঁহাদের গতিরোধ হইল, উত্তর দিক হইতে গম্ভীর শব্দ শুনিয়া তুণীরবর্মা থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। দূরে যেন দুন্দুভি বাজিতেছে, তাহার সহিত শৃঙ্গনিনাদ। এ শব্দ তুণীরবর্মার অপরিচিত নয়—রণবাদ্য। তাঁহার নাসা-পুট স্ফুরিত হইল, তিনি শ্যেনচক্ষু ফিরাইয়া সেই দিকে চাহিলেন।

দূরে এক সারি ভল্লের ফলক দেখা গেল; তারপর দেখা গেল অসংখ্য অশ্বারোহীর দল। তাহারা এই বনের দিকেই অগ্রসর হইতেছে।

রেবা ভীতভাবে তুণীরবর্মার হাত টানিয়া বলিল,—'ওরা কারা? আমার ভয় করছে, চল পালিয়ে যাই।'

তুণীরবর্মা বলিলেন, 'সৈন্যদল আসছে, বোধহয় এই বনে রাত্রি যাপন করবে।—কিন্তু পালাব না। দেখতে হবে ওরা কারা।' তিনি একবার চারিদিকে চক্ষু ফিরাইয়া একটি বৃহৎ পত্রবহুল শালবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন, বলিলেন,—'চল, ওই গাছে উঠে লুকিয়ে থাকি।'

দুইজনে শালবৃক্ষের উচ্চ শাখায় উঠিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন। ঘন পত্রের অন্তরাল হইতে তুণীরবর্মা দেখিতে লাগিলেন, সৈন্যদল বনের মধ্যে প্রবেশ করিল। বিচিত্র তাহাদের লৌহ শিরস্ত্রাণ মুখমণ্ডল শ্বশ্রুমণ্ডিত। তিনি অস্ফুট স্বরে রেবাকে বলিলেন,—'ম্লেচ্ছ সৈন্য!'

সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে বনভূমি তমসাচ্ছন্ন হইল। ম্লেচ্ছ সৈন্যদল বনের মধ্যে রাত্রি যাপনের আয়োজন করিতেছে। কয়েক স্থানে আগুনের চুল্লী জ্বলিয়া উঠিল। যে বৃক্ষে তুণীরবর্মা রেবাকে লইয়া লুকাইয়া ছিলেন সেই বৃক্ষতলে একদল নিম্নতন সেনানী আগুন জ্বালিয়া আহার্যদ্রব্য সিদ্ধপক্ব করিতে লাগিল। তাহাদের শূলপক্ব মাংসের পোড়া গন্ধ তুণীরবর্মার নাকে আসিতেছে। তাহারা বাক্যালাপ করিতেছে; অজ্ঞাত ভাষা অধিকাংশ দুর্বোধ্য, তুণীরবর্মা কান পাতিয়া শুনিতে শুনিতে যাহা বুঝিলেন তাহার মর্মার্থ এই: মালিক কাফুর নামক এক সেনাপতি এই ম্লেচ্ছ বাহিনীর অধিনায়ক; তাহারা দাক্ষিণাত্যে অভিযান করিয়াছে, কিন্তু নর্মদা নদী পার হইবার পূর্বে নর্মদার উত্তর তীরে যত হিন্দু রাজ্য আছে, সমস্ত বিধ্বস্ত করিয়া যাইবে, যাহাতে পশ্চাৎ হইতে শত্রু আক্রমণ করিতে না পারে।—

রাত্রি গভীর হইল। সৈন্যদল আহা-রাদি সম্পন্ন করিয়া ভূমিশয্যায় ঘুমাইয়া পড়িল, আগুন নিভিয়া গেল, বন আবার নিস্তব্ধ হইল। বৃক্ষশাখায় তুণীরবর্মা বৃক্ষের কাণ্ডে পৃষ্ঠার্পণ করিয়া নিঃশব্দে রেবাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। রেবা যদি ঘুমের ঘোরে বৃক্ষ হইতে পড়িয়া যায় কিংবা চীৎকার করিয়া ওঠে তবেই সর্বনাশ।

রাত্রি শেষ হইল। দুন্দুভি ও শিঙা বাজিয়া উঠিল। ম্লেচ্ছ সৈন্যদল ঘোড়ায় চড়িয়া পশ্চিমদিকে চলিয়া গেল।

তুণীরবর্মা বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিলেন। তাঁহার মুখে নিদ্রাহীন রাত্রির ক্লান্তিরেখা, কিন্তু আরক্ত নেত্রে চিন্তার আলোড়ন চলিতেছে। রেবা তাঁহার হাত ধরিয়া বনের ভিতর দিয়া পূর্বদিকে লইয়া চলিল। রেবার চক্ষু সতর্কভাবে চারিদিকে ফিরিতেছে, তুণীরবর্মা চিন্তায় আচ্ছন্ন। বন হইতে নির্গত হইয়া রেবা বলিয়া উঠিল,—"কৈ, আমাদের ঘোড়া কোথায়?"

তুণীরবর্মা চকিত হইয়া চারিদিকে চাহিলেন,—'ঘোড়া নেই! বনের মধ্যেও নেই?'

রেবা বলিল, 'না। থাকলে দেখতে পেতাম।'

তুণীরবর্মার মুখ কঠিন হইল, তিনি বলিলেন, 'ম্লেচ্ছ তস্করগুলো চুরি করে নিয়ে গেছে।'

কুটিরে ফিরিয়া তুণীরবর্মা উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিলেন। তারপর নর্মদার তীরে গিয়া বসিলেন। রেবা তাঁহার সঙ্গে আসিয়া পাশে বসিল।

নর্মদার স্রোত কলকল শব্দ করিয়া চলিয়াছে; যেদিকে তুণীরবর্মার মাতৃভূমি সেইদিকে চলিয়াছে। দেখিতে দেখিতে তুণীরবর্মার চক্ষু বাষ্পাকুল হইল, হৃদয়ে অসহ আবেগ উন্মথিত হইয়া উঠিল। তিনি আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, উঠিয়া দাঁড়াইলেন, গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—'রেবা!'

রেবা তাঁহার মুখের ভাব লক্ষ্য করিতেছিল, শঙ্কিতকণ্ঠে বলিল,—'কি?'

তুণীরবর্মা বলিলেন,—'আমি চললাম। মহেশগড়ে সংবাদ দিতে হবে, শত্রু আসছে।'

রেবা কাঁদিয়া উঠিল,—'তুমি চলে যাবে!'

তুণীরবর্মা বলিলেন,—'আমাকে যেতেই হবে। আমার শরীরের সমস্ত নাড়ী আমাকে টানছে, না গিয়ে উপায় নেই।'

রেবা গলদশ্রুনেত্রে চাহিয়া বলিল,—'কিন্তু তুমি যাবে কি করে? তোমার ঘোড়া নেই, শত্রু অনেক দূরে এগিয়ে গিয়েছে। তুমি কি ওদের আগে পৌঁছুতে পারবে?"

'পারব।' তুণীরবর্মা নদীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন—ওই নদী আমাকে পৌঁছে দেবে।—রেবা কেঁদো না, যদি আমি বেঁচে থাকি, আবার আমি তোমার কাছে ফিরে আসব।'

তিনি রেবাকে একবার দৃঢ়ভাবে বুকে চাপিয়া লইলেন, তারপর তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া হাসিমুখে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

সেদিন সূর্যাস্ত কালে ম্লেচ্ছবাহিনী নর্মদার তীরে একটি অটবিতে আশ্রয় লইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কয়েকজন নদীতে জল আনিতে গিয়া দেখিল, স্রোতের মাঝখান দিয়া একটা মানুষ ভাসিয়া যাইতেছে। তাহারা নিরুৎসুক চক্ষে দেখিল, গ্রাহ্য করিল না। একটা কাফের যদি ডুবিয়া মরে, মন্দ কি?—

রাত্রি তৃতীয় প্রহরে মহেশগড় রাজ-পুরীর পশ্চাতে বাঁধানো ঘাটে একটি মানুষ জল হইতে বাহির হইয়া আসিল। চাঁদের আলোয় তাহার সিক্ত দেহ ঝিক্-ঝিক্ করিয়া উঠিল। ঘাটে প্রহরী নাই, রাজপ্রাসাদ দ্বার বন্ধ করিয়া ঘুমাইতেছে।

কিন্তু তুণীরবর্মা জানিতেন কী করিয়া রুদ্ধ প্রাসাদে প্রবেশ করা যায়; তিনি গুপ্ত পথে পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তারপর যুবরাজ ইন্দ্রবর্মার মহলে গিয়া দ্বারে করাঘাত করিলেন—'দ্বার খোলো—দ্বার খোলো—'

ইন্দ্রবর্মা নিদ্রাকষায় নেত্রে দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিলেন, তুণীরবর্মাকে দেখিয়া বলিলেন—'একি! তুণীর—তুমি!'

তুণীরবর্মার দেহ এতক্ষণে অবশ হইয়া আসিতেছিল, তিনি বলিলেন,—'শত্রু আসছে—ম্লেচ্ছ শত্রু মহেশগড় আক্রমণ করতে আসছে—তোমরা প্রস্তুত হও—' এই পর্যন্ত বলিয়া তিনি জ্ঞান হারাইয়া সহসা ভূমিতে লুটাইয়া পড়িলেন।

*

সেবার মালিক কাফুরের সৈন্যদল মহেশগড় রাজ্য জয় করিতে পারে নাই।

অনেকদিন পরে কাল রাত্রে দেশে গিয়েছি। ভোরবেলা ধড়মড়িয়ে ঘুম থেকে উঠি। সামন্ত-বাড়ি কান্নার রোল। সন্ত্রস্ত হয়ে ছুটে গেলাম। সমীরণ সামন্তর মা বুড়ো মানুষ, কাকীমা বলে ডাকি। আমায় দেখে লুটোপুটি খেতে লাগলেন।

হয়েছে কি কাকীমা?

সমীরণ মারা গেছে।

আমি স্তম্ভিত। রাত্রে এসেছি, এত বড় কথাটা কেউ বলল না! সামন্ত-কাকা মারা গেলেন, সমীরণ তখন পাঁচ বছরের। তারপরে তারও টাইফয়েড। একুশ দিন

বড় সৎ ছেলে সমীরণ। কান্নার ফাঁকে ফাঁক কাকীমা তার গুণের কথা বলছেন। মাকে সে চোখে হারাত। এক-বার কাকীমাকে বিছেয় না কিসে কামড়ে-ছিল। একফোঁটা ছেলে কাঁদতে কাঁদতে বিল ভেঙে ওঝার বাড়ি ছুটল। ইনিয়ে-

যমে-মানুষে টানাটানি। যুবা বয়স তখন আমার, রাতের পর রাত জেগেছি এই কাকীমার সঙ্গে। যম পরাস্ত হয়ে পালাল। বছর দুই আগে বিয়ে হয়ে গেছে সমীরণের। আমি সেই সময়টা বিষম এক জরুরী কাজে আটকা। আসব না, আসার কোন উপায় নেই। কাকীমাও নাছোড়বান্দা। চিঠির পর চিঠি পাঠাচ্ছেন—একফোঁটা বয়সে বাঁচিয়ে তুলেছিসে, সংসারধর্মে মতিও তোমার কথায় হল। তুমি সামনে না থাকলে, কখন পাকছাট মারে বলা যায় না। সম্বন্ধটা তাহলে ভেঙে দিতে হয়। হোক তাই তোমার যদি সেই রকম ইচ্ছা।

সমস্ত ফেলে চলে এলাম কাকীমার জেদাজেদিতে। বরকর্তা হয়ে বিয়ে দিয়ে আনলাম। সেই ফুটফুটে কচি বউটা—আহা রে, তারই বা কী দশা এখন!

বিনিয়ে এমনি সব বলে যাচ্ছেন। পুরনো দিনের কত ঘটনা। তুচ্ছ জিনিসটাও বড় হয়ে আজ চোখের উপর ভাসে।

আচ্ছন্ন হয়ে বসে বসে শুনি। এ কী, সমীরণের বউ এক পেয়ালা চা আমার সামনে রেখে প্রণাম করে ধীর-পায়ে চলে গেল। এই বয়সের বউরা যেমনধারা সাজগোজ করে অবিকল তাই, বিধবার লক্ষণ দেখা যায় না। কাকীমা-ই সাজ বদলাতে দেন নি, বুঝতে পারি। একমাত্র ছেলের বউ নিরাভরণ হয়ে সামনের উপর ঘুরবে, সে বড় মর্মান্তিক— ছেলে নেই, পলকে পলকে সেই শোক মনে তুলে দেয়।

ক্ষণপরে, কী আশ্চর্য, খোদ সমীরণই ঘর থেকে বেরিয়ে বেড়ার গায়ের একটা ভেরেন্ডার ডাল ভেঙে নিল। চোখ কচলে ভাল করে দেখে নিই—সমীরণই। আমি যেন কে না কে—একটি

কথাও না বলে মুখ ফিরিয়ে দাঁতন করছে।

কী সমীরণ, আমায় চিনিস নে বুঝি?

সমীরণ জবাব দেয় : মরে গেছি তো শুনলে। মরা মানুষ কোন আক্কেলে জ্যান্তদের কাছে যাবে বলো!

ঝগড়াঝাটির ব্যাপার অতএব। কাকীমাকে ধমক দিই : যা যাবড়ে দিয়ে-ছিলে! অমন কথা বলে কখনো—বিশেষ এই নিজের ছেলের সম্বন্ধে! একমাত্র ছেলে তোমার।

কাকীমা ডুকরে কেঁদে ওঠেন : মিছে বলিনি বাবা। নিজের ছেলে আর নেই। মরে গেছে, মরা ছাড়া কী আর বলি! এতদিন সে ছিল বটে আমার—

চা দিয়ে বউ রান্নাঘরে ঢুকেছে। সেই দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলেন, এত সাধ-আহ্লাদের ছেলে ঐ হারামজাদী

গুণ করে নিয়েছে। কাল সমস্ত দিন একাদশী করে আছি—তা একবার যদি তাকিয়ে দেখে, মা-বুড়ি থাকল কি মরল।

সমীরণ সকাতরে আমার দিকে চেয়ে বলে, শুনলে তো? জানতাম সাত-কাণ্ড রামায়ণ শুরু হল বলে। সেই লজ্জার মুখ লুকিয়ে বসে ছিলাম। গতিক যা দাঁড়িয়েছে, একমুখো ছুটে বেরুব। উঃ, কী সর্বনাশ যে করেছ দাদা—এবারে বলতে এলে কথা রাখব না।

কাকীমা করকর করে ওঠেন : কাল ছিল না আমার একাদশী? বল্ ভেড়া-কান্ত, তোর মুখেই শুনি।

রাত্রে সেজন্য ছানা আর মিষ্টি-মিঠাই এনে দিয়েছি—এনেছি কিনা সেটাও বল দাদার কাছে।

সে বুঝি আমার জন্যে? সমীরণের কথার জবাব কাকীমা আমায় উদ্দেশ করে দিচ্ছেন : কোঁচার তলে মালসা ঢাকা দিয়ে সন্ধ্যার পর বাবু টিপিটিপি ঘরে গিয়ে উঠল। বুড়ো হয়েছি বলে ভেবেছে চোখও গেছে। এক মালসা রসগোল্লা বউকে ধরে ধরে গিলিয়েছে।
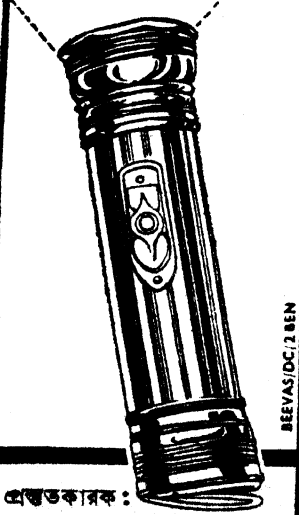
একেবারে না দিলে মন্দ দেখায়, পাথরের বাটিতে করে এই টুকু-টুকু চারটে গুলি ঠকাস করে আমার সামনে ফেলে গেল। মিঠাই বলে তাই আবার খোঁটা দিতে এসেছে তোমার কাছে!

ধৈর্য হারিয়ে সমীরণ গর্জন করে উঠল : এনেছি মোটমাট ছটা, তাই এখন পুরো মালসা হয়ে গেল। তুমি একবার বসন্ত ময়রার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে দেখ দাদা। সে তো অচেনা মানুষ নয়, তোমার কাছে মিথ্যাও বলবে না।

আমিও রাগ করে বলি, মিষ্টিমিঠাই বাড়ি এলে বউ খাবে না, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে যাবে—এই বুঝি বিচার কাকীমা! খেয়েছে, বেশ করেছে। ছিঃ!

কাকীমা বলেন, আমি খেতে দিই না? কত পর অপর বলে আমার বাড়ি চিরকাল আমার কাছ থেকে নিচ্ছে-খাচ্ছে—

দেখেছি বলেই তো বলি। কাঁচ মেয়ে বাপ-মা ভাই-বোন ছেড়ে তোমার বাড়ি এসেছে—

কাকীমা আবার জ্বলে উঠলেন : কাঁচ ঐ চোখেই দেখতে। মিটমিটে শয়তান, বিষপুটুলি। বাইরে থেকে একদিন এসে কি বুঝবি? দুটো বছরের মধ্যে ছেলে আমার পর করে দিয়েছে। সাত নয় পাঁচ নয়, পেট-মোছা কোল-মোছা এক ছেলে আমার।

হাউহাউ করে কাঁদতে লাগলেন। সত্যি তো চোখে দেখেছি, কত কষ্টে মানুষ করেছেন সমীরণকে। একটা দিনের ছবি ভুলতে পারিনে। ক্রোশ দুই দূরে বড় ইস্কুল। বৈশাখ মাসে মর্নিং ইস্কুল—খুব ভোরবেলা আকাশে পোহাতি তারা থাকতে গাঁয়ের ছেলেরা রওনা হয়ে পড়ে। বড় হয়ে গেছে, শেষরাত্রে উঠে আম কুড়াতে গেছি। দেখলাম, কাকীমাও ছেলেদের পিছু পিছু যাচ্ছেন। মাঠের প্রান্তে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন—বড় মাঠ ধীরে ধীরে পার হয়ে তারা বড় রাস্তায় উঠল। একা নয় সমীরণ, চার-পাঁচ জনে বেশ একটা দল হয়ে যাচ্ছে। কাকীমা নিশ্চল মূর্তি হয়ে সেই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে। দেখতে পাচ্ছেন না এত দূর থেকে—কিন্তু নিশ্চিত জানি, দুটি চোখের পলকহীন দৃষ্টি সমীরণের উপর সঞ্চরণ করে বেড়াচ্ছে। কখনো যদি ইস্কুল থেকে ফিরতে দেরি হয়েছে, খর-দুপুরে একবার বাড়ি একবার ঐ মাঠ করে বেড়াতেন, তা-ও দেখেছি।

কাকীমা, বলছেন, এই দেখ বাবা, আমার পরনের কাপড়ের দিকে একটিবার—

সমীরণ কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল, মহাপাপের ফল ভুগছি, দেখ দাদা। অন্যে তাকে ঐ ছেঁড়া কাপড় দেখাবে, ও জিনিষ সেই জন্যেই পরে থাকে। নতু কাপড় এনে দিলাম, ছুঁড়ে আস্তাকুড়ে ফেলল।

ফেলব না? কী কাপড় এনেছিলি, সেটাও বুকে হাত দিয়ে বল্। হাতে নেই বহরে নেই, জালের মতন একটু জিল-জিলে ছেপটি। তেমন কাপড় মানুষ রাস্তার কানা-খোঁড়াকেও ভিক্ষে দেয় না। বউয়ের বেলা তো জোড়ায় জোড়ায় বানারসি-বোম্বাই। খেলার জিনিস ন হয়ে কি জন্যে তবে নিতে যাব?

সমীরণ বলে, যে কাপড় পরে, ঐ তোমায় চা দিয়ে গেল। জোলাদের ভুরেশাড়ি—তাই নাকি বেনারাস-বোম্বাই! যা অবস্থা করে তুলেছে, কোন দিন আত্মঘাতী হব, মনের সাধে বউকে তখন বিধবার থানকাপড় পরাবে। সেই ক'টা দিন একটু ক্ষমা দিতে বলো দাদা।

একটুখানি দম নিয়ে আবার বলে, এই ভবিষ্যৎ বুঝতে পেরেই সেবারে বেরিয়ে পড়েছিলাম। তোমরা সেটা হতে দিলে না। মায়ের সঙ্গে সঙ্গে তুমিও জুটে গেলে। বিয়ে আমি করতে চাই নি। দেখেশুনে মা-ই মেয়ে পছন্দ করল, কলকাতার কাজকর্ম ফেলে তুমি এর উপর এসে পড়লে—

কাকীমা সঙ্গে সঙ্গে বলেন, কনে চিনতে ভুল করেছি, ভাল ঘরের মেয়ে বলে আনলাম, ঘরে তুলে দেখি ডাকিনী। ডাকিনীর হাতে পুত্র সমর্পণ করলাম, এর চেয়ে যমের হাতে দিলে ভাল ছিল। সেই যখন টাইফয়েড হয়ে একুশ দিন একুশ রাত্রি লড়ালড়ি চলল—

আমার উপর হঠাৎ ধমক দিয়ে উঠলেন : তুমিই তো ডাক্তার-কবরেজ অষুধপত্তর টাকাপয়সা নিয়ে এসে পড়লে। আমার এই বুড়ো বয়সের খোয়ারটা দেখবে বলে বুঝি? ডাকছি সেই যমকে—একবার ভুল হয়েছে, আর হবে না। যম এসে নিয়ে যাক, মনকে তাতে প্রবোধ দিতে পারব।

আর একদিনের কথা আমার মনে পড়ে। সমীরণের বিয়ের মাস পাঁচ-ছয় আগেকার কথা। সামন্তবাড়ি এমনি কুরুক্ষেত্র-ব্যাপার। কাকীমা বুক ছেড়ে কাঁদছেন : মেয়েটা যম এক ছেলে—সে না থাকলে কাকে নিয়ে আমার সংসার গো!

র মধ্যে অনেক সুরে অনেক কথা ছেন—প্রধান কথাটা এই।

আমার মুশকিল, বড় এক জটিল মামলার দলিলদস্তাবেজ নিয়ে বসেছি, দলিলের স্থূল-কথাগুলো সতর্কভাবে টুকে নিতে হচ্ছে। উঠব বললেই ওঠা যায় না। জীর্ণ কাগজ যথোচিত যত্নে তুলে পেড়ে রাখা অনেকক্ষণের ব্যাপার।

গ্রামের একজনকে মুহুরি হিসাবে রেখেছি। তাকে জিজ্ঞাসা করি, কাঁদেন কেন কাকীমা, কী হল? কী সমস্ত ঐ বলছেন—

সামন্তবাড়ির অদূরে বিশাল দীঘি। ধুক করে আমার জলের কথাটাই মনে হয়।

দীঘিতে ডুবেটুবে গেল নাকি?

দীঘির দু-শ হাতের মধ্যে সমীরণ যায় না। জলের নামে ভয়। সদরে জজের সেরেস্তায় একটা চাকরি হয়েছিল—নৌকোয় স্টিমারে জলের উপর দিয়ে যেতে হয়, সেই ভয়ে গেলই না সেখানে?

গাছ থেকে পড়ল না তো? উঠোনের পরেই তো গোলাপখাস গাছ।

মুহুরি বলে, বাপ-পিতামহ দোতলায় ঘর তুলে গেছেন, জ্ঞান হবার পর সে ঘরেই গেল না কখনো। চামচিকে আর ইঁদুরের বাসা হয়ে আছে। উপরে উঠলে মাথা ঘোরে। গাছে চড়বে সেই মানুষ তবেই হয়েছে! উঠোনের ঐ নিচু গোলাপ-খাসের আম পাড়তে মা-বুড়ি পাড়ার্নি ডেকে ডেকে হয়রান।

তবে কান্না কিসের—এই আকাশ-ফাটানো কান্না? পুলিশের হাঙ্গামায় পড়ল না তো? বেচারামের বউটা সেবারে এমনি মাথা-ভাঙাভাঙি করছিল। অনেক-দিন আগে আমার ছেলেবয়সে অহিভূষণের পিশিমাকেও ঠিক এমনি ডাক ছেড়ে কাঁদতে দেখেছিলাম।

বহুদর্শী মুহুরি মৃদু হেসে ঘাড় নাড়ল : উঁহু, তা কেন হবে? বেচারাম সিঁদেল চোর, সিঁদের মুখে ধরা পড়ল। হাতকড়ি পরিয়ে টানতে টানতে বাড়িতে বউয়ের কাছে নিয়ে গেল। অহিভূষণ স্বদেশি—পুলিশ রিভলভার পেল, আর বন্দেমাতরম-লেখা নিশান। সমীরণ সৎ ছেলে, ঐসব কোন ঝামেলায় নেই। চুরি করে না, স্বদেশিও করে না। তাকে পুলিশে কেন ধরতে যাবে?

কাকীমার কান্না আরও তীব্র হয়ে কানে বাজে : তুই গেলে কী নিয়ে থাকব রে বাবা—

চলে যাচ্ছে নিশ্চয় কোনখানে। চাকরিবাকরি করতে বিদেশ যাচ্ছে, তা-ও হতে পারে। কি বল মুহুরিমশায়?

মুহুরি বলে, তা হলে কাঁদতে যাবে কেন? বুড়ি তো চাচ্ছে তাই। বলে, বসে খেলে রাজার ভাণ্ডার ফুরিয়ে যায়। বেরিয়ে পড়ে রোজগারপত্তর কর, বিয়ে দিয়ে বউ ঘরে নিয়ে আসি—

আর্তনাদ ক্রমেই বাড়ছে। যাওয়া উচিত, তাড়াতাড়ি কাগজপত্র গোছাই। এমনি সময় দেখি, অমূল্য ডাক্তার যাচ্ছেন সেইদিকে।

শুনুন, ও ডাক্তারবাবু, অসুখবিসুখ নাকি সমীরণের?

মুহুরি জুড়ে দিল : জীবনের ভয়?

অমূল্য ডাক্তার হনহন করে আমার দিকেই চলে আসেন। ভ্রুভঙ্গি করে বললেন, হয়ই যদি অসুখ—টি, বি, ক্যান্সার, থ্রম্বসিস, যার চেয়ে বড় অসুখ নিদানে নেই। তা বলে, জীবনের ভয়—এই অমূল্য সিংহি হোমিওপ্যাথি বাক্সসহ গ্রামের উপর বর্তমান থাকতে? শহর থেকে ডাকাডাকি—সিবিল-সার্জন অবধি হাত ধরে বললেন, বসে যান এখানে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে, হাঁপ ছেড়ে বাঁচি আমরা। তবু গ্রাম ছেড়ে নড়িনে। কেন? আমার জ্ঞাতগুষ্ঠি গ্রামবাসী—আমি চলে যাবার পর একটি প্রাণী কেউ বেঁচে থাকবে? যমদূতের পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছি। মহামারী জলস্তম্ভ খাণ্ডবদাহনে দুনিয়া উৎসন্ন হয়ে যাক, এ গাঁয়ের গাছের পাতাটি খসবার উপায় নেই। আপনি তো গাঁয়ে থাকেন না, যারা সব আছে জিজ্ঞাসা করে দেখুন।

ডাক্তার চলে গেলেন। কাগজ-পত্র গুছিয়ে আমিও উঠলাম। কাকীমার আর্তনাদে দস্তুরমতো ভিড় জমে গেছে। ঠিক আজকের মতোই গিয়ে জিজ্ঞাসা করি, হয়েছে কি কাকীমা?

ভগবানে পেয়েছে সমীরণকে। সন্ন্যাসী হয়ে যাবে।

ভিড়ের মধ্যে ভস্ম-মাখা সাধু বিশালানন্দ। সেইদিকে কাকীমা কটমট করে তাকালেন।

ভাল ছেলে তোমার কাকীমা। ভগবান পাদপদ্মে টেনেছেন। তাই নিয়ে কান্না-কাটি করে তুমি লোক জমাচ্ছ। ছিঃ!

কাকীমা লজ্জা মানেন না। সাধুর দিকে চেয়ে বলেন, ছেলে আমার এমন ছিল না কস্মিনকালে। ঐ বাবাজী ফুস-মন্তর দিয়ে করেছে।

ভালই তো। চতুর্দিকে যা সমস্ত হরদম দেখি—সন্তান বাঁদর-বদমায়েশ হয়ে বাপ-মায়ের হাড় ভাজা-ভাজা করে দিচ্ছে। ভগবানে মতি গেছে, এমন ভাগ্য ক-জনের হয়?

কাকীমা বলেন, ভগবান কি চাকরি দেবেন, খেতে পরতে দেবেন? এক ছেলে আমার, বিয়েথাওয়া দিয়ে খালি সংসার ভরভরন্ত করব—কতদিনের সাধ। ভগবান গোড়াতেই তো বাগড়া দিয়ে বসবেন।

পুনশ্চ বিশালানন্দকে দেখিয়ে বলেন, সে বটে বাবাজিদের পোষায়। রজত-কান্তি রায়ের বাড়ি আস্তানা, ভগবান বানের জলের মতো দিচ্ছেন রায় মশায়দের। আমাদের এই এঁদো ঘরবাড়ি, কোন দুঃখে ভগবান মরতে আসবেন? ঢুকতেই তো মাথা ঠুকে যাবে।

হাতে জপের থলি। বললেন, নাম-জপ করছিলাম একটু পুকুর-ঘাটে বসে। নেত্যর মা গিয়ে বলল, দেখ গিয়ে ও ঠাকরুন, ছেলে তোমার সন্ন্যাসীঠাকুর ভাগিয়ে নিয়ে চলল। জপ ছেড়ে ছুটে এসেছি। ইহকাল তো দুঃখকষ্টে দাসী-বৃত্তি চেড়ীবৃত্তি করে গেল—পরকালের একটু সুরাহা করে নেব, সে কি আর হতে দেবে হতচ্ছাড়া বাবাজী? তোমরা সব এসে পড়েছ বাবা—এই জন্যেই চেঁচা-মেচি করছিলাম। জপটা তাড়াতাড়ি সেরে আসিগে এইবার। বাবাজীর সঙ্গে তোমরা বুঝসমঝ করতে লাগো। ফিরে এসে তখনো যদি ছাইমুখোটাকে দেখি, খ্যাংরা পেটা করে ছাড়ব। ওর ভগবানের নিকুচি করেছে।

কাকীমা অন্তর্হিত হলে বিশালা-নন্দকে চুপিচুপি বলি, সরে পড়ুন বাবাজী। কাজ নেই সমীরণের পারত্রিক মঙ্গলে। এক্ষুণি যদি বিদায় হন—এই পাঁচ টাকা। জপ সেরে কাকীমা ফিরলে কি হবে জানিনে। ভগবান স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে ঠেকাতে পারবেন, তা-ও কিন্তু ভরসায় আসে না।

বিশালানন্দ বুদ্ধিমান, প্রস্তাবটা বুঝে দেখলেন তিনি। আশীর্বাদ করে পাঁচ টাকা দক্ষিণা নিয়ে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হলেন।

কাকীমা এসে বললেন, বিশ্বাস নেই বাবা। চলে গেছে, কিন্তু রজতকান্তির বাড়ি তো রয়ে গেল। আড়ালে আবডালে ফুসফুস-গুজগুজ করবে। কনের জোগাড় দেখ তুমি, সাদামাটা যা-হোক একটা হলেই হল। বিয়ে সামনের বোশেখে। যমের হাত থেকে বাঁচালে তো ভগবানের হাত থেকে বাঁচাও একবারে।

কনে আমার দেখতে হয়নি, কাকীমাই সব করলেন। আজকে সেই কনের হাত থেকে যমের হাতে পুনশ্চ চালান করবার কথা বলছেন। তাতে নাকি প্রবোধ পাবেন।

জাতির শ্রীবৃদ্ধিতেই
উৎসবের
আনন্দ
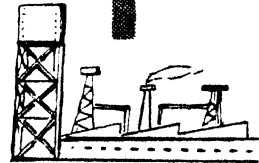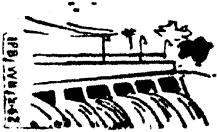
বাজপাখি

অজিত দত্ত

হঠাৎ কোন্ মহাশূন্যে থেকে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে
কঠিন অব্যর্থ নৃশংস ঠোঁটে
অসহায় দুর্বল পাখির ছানাটাকে
মুহূর্তে ছিনিয়ে নিয়ে গেল বাজপাখিটা।
তারপর ঊর্ধ্বে, আরো ঊর্ধ্বে উঠে
মেঘরাজ্যে দৃষ্টির সীমানায় ভেসে গেল,
যেন একটা কালো চাঁদের ফালি।

ছোট পাখিটার উষ্ণরক্ত ওর রক্তে মিশে গেল,
তার প্রাণ ওর ডানাদুটিতে দিল বলিষ্ঠ গতি,
ওর নখর আরো একটু তীক্ষ্ণ হল।
আবার ও পৃথিবীতে নেমে আসবে
তাজা রক্তের পিপাসায়।

•

কী সুন্দর বাজপাখিটা ভেসে যাচ্ছে দ্যাখো!
ওর দেহে পৃথিবীর উষ্ণ রক্ত
ওর মাথায় স্বর্গের আশীর্বাদ,
ওর ডানায় বায়ুলোকের অনাহত বীণা বাজছে॥

শবরী

বিষ্ণু দে

অপ্রাকৃত শিল্প যবে মূর্তি পায় জীবন্তে, বাস্তবে,
তখনই নন্দিত মন বাঁধে তাকে স্মৃতির শাশ্বতে।
চৈত্রের সন্ধ্যায় কবে তাঁবু ছেড়ে রূপালি গৌরবে
বেরিয়ে দেখেছি তাকে—শবরীকে, হিরণসৈকতে,

কোয়েলের পাড়ে পাড়ে সে চলেছে, তাম্রঘট দেহে
আলোর কথক কিংবা লোকনৃত্যে অন্য কোনো দোলা।
প্রকৃতির প্রিয় যে সে, খুলে পড়ে সামান্য মেখলা—
জলে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে, জল ওঠে অঙ্গ বেয়ে স্নেহে।

সম্ভবত শবরীও প্রকৃতির আত্মীয় প্রজ্ঞায়
জেনেছিল আছে তার নির্বিশেষ বিমুগ্ধ দর্শক—
সেও নৈর্ব্যক্তিক, নগ্ন, বিমূর্ত সে সৌন্দর্য-সংজ্ঞায়
তাকাল, ছিটাল জল, যেন সেও নিজে সমর্থক।

জানি সেই সমর্থনে প্রকৃতিতে আত্মসমর্পণ,
সেই উৎসেই শুদ্ধ সব সৌন্দর্যের মৌলিক বসতি,
কাব্যচিত্র ভাস্কর্যের যা কিছু পরম শুভক্ষণ
সবই সেই লীলায়িত চেতনার চূড়ান্ত প্রগতি।

শবরীর স্নান কিংবা খেলা দেখে চলেছি তাঁবুতে—
রূপালি পূর্ণিমা আর বালির সোনায় ক্ষিপ্র জল
ধাতুর সংহতি পায়। আজও দেখি সে অষ্টধাতুতে
বন্য প্রকৃতির তাম্র কন্যা জ্বলে বিমূর্ত, উজ্জ্বল॥

মহুয়ার রাত

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

আশাভঙ্গের রঙ ভাদ্রশেষ পশ্চিম আকাশে
সব শূন্য একাকার। বুদ্বুদের মতো শুধু ভাসে
নানান চোখের স্মৃতি। জলভরা টলটলে
বৈশাখের বুক-খাঁখাঁ। শ্রাবণের জলে জলে
অতল গভীর স্বাদ।
আশাভঙ্গের ক্ষণ
অঙ্গীকারে আবদ্ধ কোরো না।
ফিরে নাও কৃপণের মতো
মিলনের ক্ষণকাল। বিচ্ছেদের মোহনা-বিস্মিত
তনুর তনিমা। ফিরে নাও মুখ চোখ হাত
আর স্বেদবিন্দু। আর মহুয়ার রাত॥

জিজ্ঞাসা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

এ জিজ্ঞাসা থেকে গেল মনে :
কেন প্রেম, তার অন্বেষণে
শ্রান্ত এ হৃদয়!
সব যদি দু' দণ্ডের হয়,
এতো ফুল কেন ফোটে চারপাশে তবে?
মনে গন্ধ র'বে!
রয় না ত, সবি মুছে যায়;
প্রগল্‌ভ ভাষায়
যতো কথা বলা সব দু'দণ্ডে শেষ,
শরীরের অবশ আবেশ
মুহূর্তে উধাও।
কী পাও, কী পাও
প্রেম-যন্ত্রণায়?
শুধু জিজ্ঞাসাই থেকে যায়॥

নেপথ্য সভায়

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

১

তাহলে একাকী যাবো নেপথ্যের গোপন সভায়।
তোমরা এখন কেউ সেখানে যেয়ো না।
আমি আগে গিয়ে দেখি
টবে ফুল আছে কিনা, পুকুরের জলে
আয়নার মতো মুখ দেখা যায় কিনা।
গাছগুলো উত্তোলিত বাহুর শোভায়
ছায়া-লীন স্নেহে মমতায়
উচ্ছ্বসিত কিনা।

২

গত অজন্মার স্মৃতি অত্যন্ত করুণ।
সমস্ত আকাশ থাক, যতো নদীনালা
শুকনো মরুর মতো, আর্দ্র গাছপালা
জ্বলে পুড়ে একাকার, নারীর শরীর
ধূসর পাংশুল। এবং পুরুষ যুবা, শিশু
রক্তের ক্ষতের চিহ্ন মুখে পলাতক।
কেউই ছিল না কাছে। মেঘের ফোঁটাও
কোনোখানে নেই। এক ফোঁটা বৃষ্টি না পেয়েই
ধীরে ধীরে শীর্ণ হতে শীর্ণতর হয়ে
ঝরলো বাগানে যতো অশোক, পলাশ, কৃষ্ণচূড়া।

৩

আজ কি আবার সেই ঝরাপাতা স্তূপে
নতুন প্রাণের সাড়া। শাখায়, প্রাঙ্গণে
নিবিড় সবুজ। টবে ফুল হাসছে কি ফের
প্রাণের দীপ্তিতে।
দেখে আসি একবার নেপথ্যের গোপন সভায়॥

গ্রীষ্মকেই তারা

অরুণ মিত্র

গ্রীষ্মকেই তারা উৎস ব'লে জানে।

তাদের প্রণয় বা বন্ধুত্ব কোনো ধারাজলে পুষ্ট হয়নি। রক্তের মুখে উষ্ণ হাতের চাপ তাদের অনুভবে রয়েছে। কাঁকরে আর আগাছায় তাদের শরীর ছিঁড়েছিল এবং সেই প্রথম তারা দিনের ভগ্নাংশগুলোকে একত্র হ'য়ে তপ্তকাঞ্চন বর্ণে ফুটতে দেখেছিল। তখন থেকেই মমতার জাদু তাদের সামনে দুপুরের আচ্ছন্ন বীথি মেলে রেখেছে। তারা রোজ সেখানে দু' দণ্ড গা এলিয়ে দেয় এবং স্মরণে আনবার চেষ্টা করে কোন্ কোন্ উত্তাপের লগ্নে তারা আবিষ্কৃত হয়েছিল।

আরও বড় ক্ষত যখন গোপনে বুকের ভিতর হয় তখন আঁধি আছে। ধুলোর ঘূর্ণিতে উত্তাল বাঁচার আস্বাদ তারা নিশ্বাসের সঙ্গে নেয়। সেখানে অবশ্য একটুও স্থিতি নেই। কিন্তু তারপরই তো চুম্বনের লালে শেষ বেলাকে ঢলতে দেখার শান্তি।

কোথায় এক রাজ্যে নাকি বিশল্যকরণী জন্মায়, তার অলৌকিক কাহিনী তারা প্রায়ই শোনে। কিন্তু রোদের বাস্তব থেকে মেরুসমান দূরে সে কি কোনো মৃত দেশ নয়? হঠাৎ উন্মনা হ'য়ে যাওয়ার পর তারা আবার স্পষ্টতায় ফিরে আসে। গ্রীষ্মের কাছে বিদায় নিলে ভীষণ একলার পথ শুরু হয়, তারা ভাবে।

শারদ

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

শরৎ হল যে কোকিল সময়—কি অপরূপ
ধুয়ে নীল হল ঘনপুঞ্জিত মেঘধূপ।
ঘুম মেখে নিয়ে পদ্মগন্ধে
প্রজাপতি-পাখা নিঝুম সন্ধ্যে
স্তব্ধ নিতল; এই সুশীতল
পরম চেতনা ধরে না
কোনো ইতিহাসে। কোনো মন্দিরে
গভীরে মগ্ন রূপবন্দীরে
এতটা করুণা করে না।

এমন কি ওই ভরা কল্লোলে
ফোলা পচা পাতা পীত পল্বলে
যেন হৃতসাজ ভ্রষ্টাচারী—
তারও ঠাঁই আছে; রূপের ঝারি
ঝরে নিঃশেষ হয় না বুঝি।
হেলায় ছড়ানো পুরানো বিষম
তারি পাশে ফের নূতন সুষম
কেবলি খুঁজি।
আর, কি আশ্চর্য,
এ ঐশ্বর্য
তোমার-আমার সবারি পুঁজি!

মুখার্জি সাহেব

দিনেশ দাস

রাত্রির প্রশান্তি নামে :
উত্তপ্ত চৌরঙ্গীপাড়া ক্রমে শান্ত হয়।
এখন অফিস শূন্য,
এবার মুখার্জি ওঠে :
পিছনে ভ্রূকুটি করে বুড়ো দরোয়ান।

আকাশের বুকে
কুয়াশা চাদরে ঢাকা শ্বেত শিশু-চাঁদ :
রাজপথে কিছু আলো, কিছু অন্ধকার।
শূন্য বেলুনের মত ফুটপাথ ধরে হাঁটে মুখার্জিসাহেব!
গ্র্যাণ্ড হোটেলের নীচে বইয়ের দোকানে
দাঁড়ায় কিছুক্ষণ সোনালী বাতাসে,
কখনো বা বই কেনে।
ভীরু বালকের মত কখনো চকিত হয়
একজোড়া রাতের পাখির ডাকে :
আঙুর-শীতল রাতে ভাবে শুধু
নিজের অথবা স্ত্রীর বন্ধ্যাত্বের কথা।

একথা গৃহিণী জানে
অকারণ রাত্রি করে কেন বাড়ি-ফেরা,
কেন এই ম্লান নিঃসঙ্গতা!
সে শুধু নিঃশব্দে রাখে টেবিলের 'পর
রাতের আহার্য আর এক গ্লাস চকোলেট-দুধ।
বিষণ্ণ তৃপ্তির সঙ্গে মুখার্জিসাহেব পান করে
পাশে সেই মহিলাও পান করে
হারানো দিনের যত সুরভি পানীয়।

অনেক দূরত্ব নিয়ে পাশাপাশি দুজনেই শোয় :
মুখুজ্যের হাতে থাকে বই,
সে-নারী খাটের উপরে চেয়ে থাকে ছায়ার দিকেতে
নীরব, শীতল।
অদ্ভুত নৈকট্য আর দূরত্বও নিয়ে
কাছাকাছি শুয়ে থাকে তারা
দু'মুঠো ছাইয়ের মত।
যেখানে একদা
জ্বলেছিল দুটি লাল আগুনের শিখা॥

সময় পালক হ'য়ে উভয়কে ছুঁয়ে যায়,
ঘুমোয় শয্যায় দুটি উত্তর-যৌবন—
ঘুমোয় তাদের সাথে সকালের তারা॥

আশ্বিনের কবিতা

হরপ্রসাদ মিত্র

মনে আছে সেই ফাঁকা চাঁদিপুর,
দূর থেকে দেখা
বালিতে-জলে—
ডাইনে ফিরতে হঠাৎ বিকল
গাড়িটা,
বোধের অন্য তলে
এক লহমায় পৌঁছেছিলাম।
দেখতে-দেখতে শরীর-ঘটে
শাদা জামাটায় রক্তের লাল
ঢেউ ছুঁয়ে গেল।
অন্য পটে—
সাড়ে-দশটার সময়চিহ্নবিলোপ থেকে সে
সময়ে ফেরা,
মনে আছে সেই ফাঁকা চাঁদিপুর
স্নায়ুঝংকার-স্মৃতিতে ঘেরা!

সেদিন যেমন,—আজকেও তাই
প্রথাবিলোপের প্রবল ঘাতে
এলো আশ্বিনে নতুন শিউলি
চির-আবর্তে নতুন হাতে—
লাগে সোনারঙ্ অবাক রোদের
বর্ণাভা,—তাই
নিজেকে বলি—
থেমে আছি। তবু হয়তো আমরা
থামি না কখনো,
গভীরে চলি।

বাঁকা পথের যাত্রী

গোপাল ভৌমিক

কি আমার চাই হয়নি তা জানা বলে
পৃথিবীর পথে চলি শুধু টলে টলে।
এ পথ সে পথ বহু ঘোরাঘুরি করে
নিয়তিকে নতি জানিয়ে যাই নি মরে।

শ্যামলকে দেখি, সেতো মহা ধনবান,
শুনি অরুণের পড়ানোর জয়গান;
রাজনীতিবিদ্ অমিতাভ কম কিসে?
শুনে খুশী হই, ভরে না এ মন বিষে।

তুলনায় আমি কিছুই হইনি জানি,
তবু এ হৃদয়ে নেই এতটুকু গ্লানি।
বহু পরাজয়ে একথা শিখেছি ঠেকে,
আমার চলার পথটি গিয়েছে বেঁকে।

ঘুর পথে তাই চলতে করে না ভয়,
হই না আহত দেখেও সহজ জয়!

রাত্রির আকাশ

উমা দেবী

নগরীর রাত্রির আকাশ—
ও যেন স্পর্শের অতীত এক নীল কোমলতা,
স্বপ্নের অতীত এক বাস্তব পূর্ণতা—
হে রাত্রি আমাকে আজ জানাও কি কথা!

বোবা মন, বাক্য তার হারিয়ে গিয়েছে
হৃদয়-অরণ্যে নীল ফুলেরা যেখানে
বিষ-বিষ রাঙা রেণু ঝরিয়ে দিয়েছে—
যেখানে পড়ন্তবেলা শেষ রোদটুকু নিয়ে
প্রান্তরের প্রান্তে পালিয়েছে।
কাজের বোঝাই-হানা ক্লান্ত গো-শকট
তবুও রাত্রির দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়েছে।

সন্ধ্যা কেন আসে বল এ শহরে?—সন্ধ্যা কেন আসে?
যেখানে শ্রান্তির ধুলো
ঘুরে ঘুরে এসে সর্পিল বাতাসে হৃদয় কাঁদায়—
না জানি কত কি ফুল ফুটে ফুটে
সৌরভ ছড়ায় কোনোখানে ঠিক সেই মুহূর্তেই।
ঠিক সেই মুহূর্তেই সান্দ্রতম প্রেমের বাসনা
নিজের বিবর থেকে ভীরু ভীরু শশকের মত
দু'চোখে সারল্য জেলে কী যেন বা খুঁজে ইতস্তত
আবার গহনে ডুবে যায়!
আলো জ্বলে পথে পথে—
সারি সারি—রক্তচক্ষু মাতালের মত
—শহরের এই সন্ধ্যা আমাকে কাঁদায়!

হে রাত্রি তুমি তো আজও রেখেছ বিশ্বে
আমাকে ডুবাও তাই হৃদয়ের নীল শূন্যতায়
আজও নীহারিকা যার স্বপ্ন দেখে নূতন গ্রহের
হয়তো বা পেতে চায় নূতন আকাশ—
দিয়ে এক অফুরন্ত সতেজ আশ্বাস
কাঁপাও সৃষ্টির চেতনায়—
কাঁদাও কি তিক্ত-মধু সে গভীরতায়?

অমৃত-স্বপনে

ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

তোমারে বাসিতে ভাল যদি মন চায়,
প্রাণের সাগরে যদি ওঠে কোন ঢেউ,
ফিরায়ে দিও না তারে দেহের সীমায়,—
সন্ধ্যাকাশে শুকতারা দেখিবে না কেউ
এ দেহ রচিল কোন্ অলঙ্ঘ্য প্রাচীর—
এ বেদনা কেন জাগে দুস্তর বাধায়;
আকাশ বাতাস আজি হয়েছে অধীর,
ধরণীরে বন্দী করি' প্রকৃতি-লীলায়!
বসুধারে সাক্ষী মানি তাই নিশিদিন
এ দেহ-ইন্ধনে নিতি প্রজ্জ্বলিত হয়
সৃষ্টির অগ্নিতে সেই অপার বিস্ময়—
অচঞ্চল প্রেম মোর বাধাবন্ধহীন।
অকম্পিত রূপ তার জাগে শুধু মনে,
মুক্তির আনন্দ লাগি' অমৃত-স্বপনে।

মানুষ

বীরেন্দ্র মল্লিক

মৃত্যুঞ্জয় জানি তুমি, তবুও পেতেছি কত ছল,
গ্রন্থাগারে গ্রন্থ নেড়ে রচিয়াছি গ্রন্থিভাঙা কত না কৌশল,
করিয়াছি কূট তর্ক, সভাগৃহে সমাবেশে কত না বিচার,
তোমাকে হত্যার অস্ত্র তীব্র হতে তীব্রতর করি আবিষ্কার
পরেছি জয়ের টিকা; তারপর হুড়োহুড়ি মানপত্র
বিদগ্ধজনের,
প্রথমেই মোর নাম বড় বড় হরফেতে সংবাদপত্রের।

তবু তুমি মরিবে না এ কথাটা সার সত্য জানি;
মরে যদি কেউ সে তো, প্রথমেই আমি যাব, মনে মনে মানি;
সব মেকি, সব ফাঁকি—ফাঁকির প্রাসাদ এ তো
তিলে তিলে গড়ি,
একদিন মাটি কাঁপে, ইঁট কাঠ চাপা পড়ে শ্বাসরুদ্ধ মরি।
মৃত্যুহীন তুমি দেখ, ঊর্ধ্বাকাশে ঊর্ধ্ব হতে
নিম্ন পানে চাহি;
হেসে বল, 'অমর অব্যয় আমি, মোর মৃত্যু নাহি।'

শতবর্ষ পরে

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

উজ্জ্বল উজ্জ্বল আলো অন্তহীন আশা
গভীর গভীর মানবতা
মুছে গেলে আমাদের রক্ত লাগে ভালো
হিংসা দ্বেষ অপ্রেমের কথা।

অমল শতাব্দী থেকে নির্বাসিত হ'য়ে
অন্ধকার সব অন্ধকার
কাঁধে নিয়ে ক্লান্তি ক্লান্তি ক্লান্তির বলয়ে
আমরা সাজাই শবাধার।

শিকারী চিলের মত চারদিকে অসুখ
পুঁজ মাছি বসন্ত কলেরা
ঈর্ষার অমোঘ মার, রক্তে ভাসা মুখ
কাগজের মত ক'রে ছেঁড়া।

উজ্জ্বল উজ্জ্বল আলো অন্তহীন আলো
ভালোবাসা, ভোরের সবিতা
মুছে গেলে আমাদের হৃৎপিণ্ডের কালো
কথাগুলি জ্বালে শুধু চিতা॥

বঞ্চিতা

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

'একটি কথা উড়লো কোথা?'—শুধায় মেঘদূতে।
বাতাস বলে, 'হাসনুহানা হোক না যতো ক্ষীণ
একটু শ্বাস সুরভি হয়ে রয়েছে তাতে লীন।
আমি তো তারই খবর রাখি; কথা সে কোন ভূত?'
সেকথা শুনে ঝিলিক দিয়ে উঠলো বিদ্যুৎ—
'জানো কে আসে?—প্রতীক্ষায় কাঁপছে লোক তিন;
একটি কথা গানের মতো বাজছে, নয় বীন।
একটি তারা প্রদীপ জেবলে আকাশ প্রস্তুত।'
সে-সংলাপ আড়াল থেকে শুনলো এ-আঁধার
ঝিঁঝিঁরা শুনে বাগানময় লাগালো হৈ চৈ—
পথের দীপ নিষ্পলক বলে—'প্রহর গণি।'
কে এলো ভেবে অবাক্ মানি; কে এলো কোথা, কই?
আমার সুরে অনেক দূরে কী এক আগমনী
শুনতে পেয়ে তাই তো আমি রেখেছি খুলে দ্বার।

গল্প পড়ি তেলেনাপোতাটার—
শেষটা দেখি, কেউ না, আসে মশকসুন্দরী।
সে বলে—'অভিসারের পথে তোমাকে নিতি স্মরি
এসো হে প্রিয়, আলিঙ্গন করি।'
মুক্তদ্বারে ঢোকেন ঘরে, ফ্লিটের ভয় নেই—
এত যে প্রেম লেপ্টে গেলো একটি চড়েতেই।

আলোক সরকার

স্তূপীকৃত ইঁট-পাথরের অবহেলা। পরিশ্রান্ত কাণ্ডের উপর
শেওলা জমেছে। আর রক্তমাটি বিদীর্ণ ঘোষণা।
বলিষ্ঠ শিকড় যেন প্রতিজ্ঞার দীপ্ত। ম্লান সমস্ত প্রহর
একাগ্র ভাবনা, কোন হীরা-জ্বলা অন্ধকারে কীর্ণ সমারোহে
শিকড় নেমেছে? গ্রামে-গ্রামে এখন শরৎকাল
রৌদ্রের সম্পূর্ণ, নদী মূর্ত অঙ্গীকারে যায় ব'হে।

কোনোদিকে আলোড়ন নেই শান্ত হাওয়া এলো,
সবুজ পাতার অন্তরালে
পরিপূর্ণ ফলের প্রশান্ত স্বাভাবিক।
অন্ধকারে রক্তিম উৎসবে মূর্ত বিদ্যুতি বৈশাখ,
প্রতিষ্ঠ প্রবালে
একটি তন্ময় ধ্যান নির্নিমেষ। খড়ের চালের নম্রতার
স্বর্ণিল ধূসরে কোন অবসাদ, যেন অবসাদ যেন
সপ্রাণ অলীক
যেন প্রতিবিম্ব সব উচ্ছ্বলতা হেমন্ত আঁধার।

সপ্রতিভ একটি অস্তিত্ব গাঢ় জাগরণ,
দ্যুতিময় সবুজ স্ফুরিত
ডালপালা স্পর্ধিত একক।
প্রতিটি শাখার হীরা আকাশের প্রান্তে উপনীত।
কেবল দুইটি পাতা বিবর্ণ হলুদ, মাটির ভীষণ অস্বীকারে
কাকে খোঁজে? উৎসব মুখর গ্রাম শূন্যতায় রিক্ত অপলক
কাকে খোঁজে? ভাবনা নিমগ্ন,
মাটি তাপিত ঈপ্সিত জ্বলে লুপ্ত অধিকারে।

নয়নে নয়নে তুমি

হরেন্দ্রনাথ সিংহ

স্নিগ্ধ কালো নয়নের আকুল আহ্বান
শেষ বিদায়ের ক্ষণে—অজানা জীবনে,
বিচিত্র করিয়া তোলে রঙীন স্বপনে;
অলক্ষে জীবনী-শক্তি করিছে প্রদান।
নূতন করিয়া একী ফিরে এলো জ্ঞান—
হেরি দীপ্ত-দিব্যজ্যোতি নিশীথ শয়নে,
অতল পরশে কাছে নিরালা গোপনে,
দিতেছে আঁখির আলো সুধার সন্ধান।

নীরব নয়নে হয় কত পরিচয়,
বলে যায় কত কথা দৃষ্টি আঁখিতারা।
নিখিল প্রিয়ার সাথে আঁখি বিনিময়,
অবিরল বহে তাই প্রেম অশ্রুধারা।

একী খেলা দৃষ্টি হানো নম্র আঁখি ঠারে,
প্রলয় খেলায় হেরি লীলায় তোমারে।

শব্দ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

তখন দরজার বাইরে স্পষ্ট শোনা যায়, উদ্ভিদের পদশব্দ,
শারীরিক মিলিত হবার আগে বাসনার
ভিতরে শিশুর হাসি—সরল, অথবা দুই প্রতীক্ষিত ঘড়ি
দু দিকে দেয়াল জোড়া বিপরীত আয়না থেকে বহুলক্ষ
ঘরের ভিতরে
পরস্পর কথা বলে, এ ছাড়া সমস্ত দৃশ্য চুপ।

আমার মুখের মধ্যে জিভ নেই, দাঁত নেই, অধরোষ্ঠহীন,
বারান্দায়
শার্ট প্যাণ্ট শুকোচ্ছে রোদে, গেঞ্জি উড়ে গেছে ডাস্টবিনে,
ডাকবাক্সে চিঠি দিল ভোরবেলা, খালি খামে ডাকটিকিট
ভিতরে শরীর নেই, হাসাকর শুয়ে আছি টেবিলে ধুলোয়,
এমনকি মেয়েরাও শব্দহীন, বুকের ভিতরে
হাসি, কান্না, ক্রোধ, পোকার মতন
খেলা করছে, টেলিপ্রিণ্টারের শব্দে ট্রেন অ্যাকসিডেন্ট
মন্ত্রী, বন্যা থেমে গেছে
ভগ্ন প্রেমিকের ছুরি ঝলসে উঠলে প্রতিনায়িকার কণ্ঠে
আর্তনাদ নেই
শুধু আছে উদ্ভিদের পদশব্দ, অজাত শিশুর হাসি
এবং ঘড়ির
গূঢ় আলোচনা, দূরে ফুল ফোটার কলরব,
জলাশয়ে মাছের চিৎকার।

জ্যোৎস্না নিভে গেলে তবু অন্ধকার নেই,
আঃ, শব্দ থেমে গেলে তবু অমোঘ গোলমাল
জেগে থাকে; হৃৎপিণ্ড ছিন্নকরা ভালোবাসা
ঘুমোতে পারে না কবিতায়,
স্বপ্নে, শোকে—কুমারী মেয়ের গন্ধে দূষিত বাতাস
চতুর্দিকে ঘোরে, প্রতি মানুষের মুখ ভাটফুলের মতন
অশ্লীল মনে হয়
আমার আত্মায় কোনো ঘড়ি নেই, আয়না নেই,
মাতৃজঠরের স্মৃতি নেই।

সে দিব্য আঙুল

রাম বসু

সে দিব্য আঙুলে করে করোটিকে উদ্ভিন্ন কুসুমে,
সূর্য আর কুয়াশায় পরিপূর্ণ ভরাট গলায়
শব্দ পায় অবয়ব। হৃদয়ের জ্বলন্ত নির্ধূমে
চন্দন অরণ্যে শুভ্র আলোকিত কপোত ওড়ায়।

ভূমি যত ক্ষয় হোক, আবিষ্কৃত গেরুয়া চূড়ায়
টের পাই ষড়ঋতু। অভিষিক্ত অঙ্গে ধীরে নামে
পুরুষ প্রগাঢ় দীপ্তি। অনুভবে, স্থাপত্য কায়ায়
ললিত কঠিন রাগ: সুসঙ্গতি দক্ষিণে ও বামে।

কাঁকর বৈদূর্যমণি। নষ্ট বীজ কবিকণ্ঠে শ্লোক
শ্মশান চাঁপায় কাল, দ্বীপগুলি আহত বিচ্ছিন্ন
চিত্রা তোলে সাদা পানা। বৈঠা, হাওয়া নাচায় আলোক।

ভালবাসা ক্রুশবিদ্ধ ভালবাসা রক্তাক্ত দাক্ষিণ্য।

উৎসব পালন করি অশ্রু পুঁতি মাটির তিমিরে,
বৃক্ষ ফলবতী হলে নদী হলে অপরূপ পরী
মানুষের পতনের উৎস মুখে নীরন্ধ্র গভীরে।
ইচ্ছা হও শুশ্রূষার মত শান্ত বিষণ্ণ সুন্দরী।

সে দিব্য আঙুল কটি মন্ত্রপূত আমাকে বাজায়
হিরণ্য আকাশ: নিচে অনুমান—কেন্দ্রস্থ বিশ্বের
মাঝখানে প্রবাহিত প্রাণ, শক্তি। সমবেদনায়
আমরা আকাশ হলে ঢেউগুলি হবে আমাদের।

আড়চোখে দেখি

অরবিন্দ গুহ

আড়চোখে দেখি মেঘের তলায়
            পাকা রাস্তার দু-পাশে আলো;
ভালো লেগে গেল, ভীষণ ভালো।
কেউ কি দেখল আমার এ-দেখা মেঘের তলায়?
        কারো কিছু দেখা না-দেখায়,
        বলা না-বলায়,
        কিছু এসে যায়?
        যায় না, তবুও আড়চোখে ভালো।

কেউ কি শুনল আধফোটা স্বর আমার গলায়?
        কারো কিছু শোনা-না-শোনায়,
        বলা না-বলায়,
        কিছু এসে যায়?
        যায় না, তবুও চুপচাপ দেখি—আমার ইচ্ছে।
        এখন অনেক পাচ্ছি—আমাকে অনেক দিচ্ছে
        মেঘের উপরে করুণ তারা;
        যদিও অনেক সঙ্গী, এখন সঙ্গীহারা—
        একলা এখন উজ্জ্বল নীল মেঘে আসক্ত।
        আড়চোখে দেখি তারার মাংস মেঘের রক্ত॥

অবশ্য তোমাকে

মৃগাঙ্ক রায়

কেননা পৃথিবীতে প্রতিদিন সন্ধ্যা হয়
তাই তোমার প্রেমে আমার প্রয়োজন।
বাড়ন্ত ছায়ার মাথায় মাথায় কাক
ডেকে ডেকে ওড়ে, কুকুরের নখর বাজে
ধূমল গলিতে; পাতাল, স্রোতস্বনিত
প্রভূত পাতালে পিছলে প'ড়ে যায় সূর্য।

কেননা সে স্বাদু অন্ধকারে সৃষ্টির ত্রিকোণ
গ'লে যায়; সব রূপ, বাড়ি জাহাজ জ্যোতি
জানালার কাঁচে চৌকো আলো, গাছ গন্ধ,
মানুষের অস্থি এবং মেদের সংস্থান—
সব গ'লে গ'লে গ'লে প্রকাণ্ড শূন্যতা
পিঠ ঠেকিয়ে থাকে আকাশে।

তাই তোমাকে আমার প্রয়োজন
কেননা তুমি এক ব্যবহার্য অন্ধকার;
তোমাকে দলিত ক'রে প্রেম এবং ভোরের ত্রিকোণ॥

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

শঙ্খমালা নদী আমার শিথান হোক, জল
শীতল-পাটি শয্যা রচে আমায় যদি ছুঁলো—
ঘিরলো আমায় কী অপরূপে নিবিড় কল্লোল,
যাক ধুয়ে এই স্রোতের মুখে সাত-রাজ্যের ধুলো।

দিক নেই: সাত-সাগর শোনায় বজ্র-বিষাণ ডাক
আমায় জড়ায় হাসনসখী তেরো নদীর বাহু,
ঘাটে ঘাটে পেরিয়ে যাবো, অচিন দেশের বাঁক—
ভাসানো মান্দাসে আমার লখীন্দরের আয়ু।

নানান জলে গুজব রটায়, গায়ে ছিটায় কালি,
তপ্ত দেহ জুড়িয়ে যাক, স্নিগ্ধ হোক মন,
স্রোতের ঘোড়ার কেশর ধরে বাজাই করতালি;
ও বেহুলা, তোমাকে দিই প্রথম যৌবন।

উজল হীরার ফুল ভেসে যায়, চাঁদের ঝালর দোলে
বাসর সাজে মীনকন্যার কোমল করপুটে,
সাঁতালি পর্বতের বারণ-মন্ত্র নেই এ জলে—
কুটিল-কালো কাল-নাগিনী মরুক মাথা কুটে।

এখন চতুর্দিকেই ঢেউয়ের ডম্বরু শোন্, ওরে!
জীবন জুড়ে নাচে আমার তরঙ্গ চঞ্চল,
জন্ম-মৃত্যু নাচে যুগল বুকের চূড়ার পরে
ও বেহুলা, তুমিই আমার কবচ-কুণ্ডল।

চৈত্র সন্ধ্যায়

বাণী রায়

সুদীর্ঘ চুম্বন এক করি অনুভব
আমার বঞ্চিত ওষ্ঠ-অধর সে ভরে;
শরীর পাগল করে,
মন সিক্ত প্রেমে,
সে চুম্বনে দিনে দিনে জাগে বসন্ত-উৎসব।

অদেহী চুম্বন এক চৈত্রালী সন্ধ্যায়
আকাশী জোয়ারে ভাসে নীলের সাগরে,
বৈশাখী রাত্রির রূপে আচম্বিতে ঝরে,
ফাল্গুনে বাতাসে দোলে ঝাউএর শয্যায়।

প্রবাস হিমেল সিন্ধু পার হয়ে এল,
তাই কি পালঙ্কে তার শীতার্ত বেদনা?
উষ্ণ সূর্যের ঋতু জাগাক সান্ত্বনা,
সূর্যের প্রসাদ সে তো এতদিনে পেল!

বিরহবিধুর দিনে প্রণয়ভাবনা,
স্বপ্নের চুম্বনে আজ মিশে গলে' গেল।

এলসিনোরে ঝড়

কৃষ্ণ ধর

এলসিনোরের চূড়োয় সেদিন ভীষণ ঝড়
বিশ্বাস দোলায়িত, আকাশে জিজ্ঞাসা
অস্তিত্বে অনস্তিত্বে অসম্ভব দড়ি টানাটানি
বিপর্যস্ত চেতনা সেই ঝড়ে
মানুষের প্রকৃতি পায়চারি করে এলসিনোরে।

প্রশ্নের কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে ফেরে
আহত নেকড়ের মতো, প্রতিহিংসা তারে
দিনরাত্রি দংশেছিল, প্রশ্নের অন্ধকারে
চমকিত মেঘের প্রাসাদে,
অলৌকিক কণ্ঠস্বর বাজে
কণ্ঠস্বর ডাকে জিঘাংসারে।

সময় শিথিল গ্রন্থি, নড়বড়ে অস্তির সংকট
তাকে উন্মোচন করে
ধর্ষিত কুমারী রাত্রি ভোক্তা সূর্য আরক্তিম ভোরে
পায়ে হাঁটে ঝড়ে জলে এলসিনোরে আজ
এলসিনোরে।

বৈদেহী

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

প্রথম পাপ করার মতো বিবেক এল মনে,
চক্ষু বুজে সেই নারীকে নিলাম আলিঙ্গনে;
সে কি হর্ষ, প্রাত্যহিক অপস্মারগুলি
পালিয়ে গেল পিলসুজের অঙ্গুলিহেলনে।

'আমায় তুমি অভিজ্ঞতায় ভুক্তভোগী করো'
ব'লে আমি প্রথমে তার উরোগুঞ্জাহার
ছিনিয়ে নিয়ে ফেলে দিলাম জানালার বাহিরে :
কিন্তু তবু তার আনন্দ আকাশগঙ্গার।

'নিমজ্জন করো আমায় তোমার কালো চুলে'
বল্‌তে গিয়ে অকস্মাৎ আমার স্বরলিপি
নিখাদ গুহায় অবরুদ্ধ; অনর্পিত তবু
বিস্ফারিত ইন্দুলেখা ব্যক্ত বাহুমূলে।

'আমার কাছে সূর্য আছে' কৃত্রিম শপথে
কাছে এনে দিলাম তাকে অন্তর্বেদনা,
তবু অবাক, আঁখিপদ্মে ছিল না ভর্ৎসনা,
অনুক্ত আকৃতি ছিল রক্তকোকনদে।

'তুমি আমায় এখনো কি নম্র কিশোর ভাবো?'
এই ব'লে যেই অম্লান মুখ বিকীর্ণ আঙুলে
স্নান করালাম, সে কি তৃপ্তি, অন্ধকারে হলো
সুবিনীত গৃহদাহ সিতকঞ্জনাভ।

'কে তুমি? কমলে কামিনী? কার ঘরে বিদ্রোহ
সংঘটিত ক'রে এলে' এই ব'লে ফুকারি;
আচম্বিতে চুম্বনের বৈশ্বানরে দেখি
আমায় রেখে গিয়েছে সেই স্বাবলম্বী নারী।

বুঝি আমার কবিতা

কবিতা সিংহ

ঈশ্বর! আমাকে তুমি যৌবন যাবার আগে দিও না মরণ
যদিও সামান্য এসে থেমে গেছে ক্ষীণ আয়ুরেখা
কে তবে, কে তবে আর এই সব রজনীর কালোমুক্তা
গুণে গুণে যাবে?
কে খুলবে, এ নির্জনে উপাধানে, চুলের-ঝরোকা—!

আর চুল কালোফুল অন্ধকারে আরো অন্ধকার
স্মৃতির আশ্চর্য দীপ জেল্‌লে রাতে মণিমুক্তা গুনি
যুগল ভুরুর নীচে ঢাকা দুটি নীলকান্ত মণি!

নিরুপম বেদনায় বিনিদ্র রজনী যেন সিঁড়ি
শামুকের ভিতরের অপরূপ কারুকার্য হয়
ক্রমাগত নেমে যাই উঠে আসি সেই কালো গোলক-ধাঁধায়।

ঈশ্বর আয়ুর পাত্রে ঢেলে দাও নির্জলা-নির্জন
পান করি রাত' ভরে পান করি গায়ে বড় জ্বর
জ্বর বড় ভালো লাগে অনুপম স্বপ্নের মতন

ঈশ্বর আমাকে তুমি যৌবন যাবার আগে
দিও না মরণ!

সত্তা

তরুণ সান্যাল

ব্লেকের মতন বস্তুরহস্যের মধ্যে যেতে হবে,
প্রশান্তিকে ভৃত্য বলে অতএব মনে করা ভালো—
মুখ তার স্নিগ্ধ...শুচি, রীতি নিয়মানুগ উৎসবে
—যথাসময়ে অন্ধকার, ছায়া, শেজ...জ্যোৎস্নাধারা,
অনেক গভীরে আরো বাস্তবের মধ্যে যেতে হবে,
যেখানে কেবল সত্তা ইঁট লোহা মেদ মাংস নয়
এমন কি পরমাণু, ইলেকট্রন নয়, কিন্তু রবে
যাকে ঘিরে অস্তিত্বের রূপময় ধ্বনিত তন্ময়।

যেমন সমুদ্র জাগে বালুবেলাভূমে অন্ধকারে,
যেমন লবণগন্ধে সাপের মাথার মণি, জল,
যেমন অরণ্য বয় সজীব সবুজে অন্ধ তারে
প্রবল বাহুর টানে ছন্দোময় জটিল...সরল......
অথবা তুহিন শুভ্রে মরুভূমি শীতলে......বা বালু
দর্শায় সত্তার কেন্দ্রগামী অবতরণের ঢালু॥

আমলকী তলা

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

এমন বিরহ-ঘৃণা ঘৃণাবিরহের অর্থ হয়—
পৃথিবীতে কোনোদিন ভুলে যাওয়া হয়নি সৌরভ
অথবা বৃষ্টির দিন, আমলকীর বিস্তারিত বনে।
অথবা ভুলিনি মৃত্যু ঝাঁট দেয় আমলকীর তলা!

সেই আমলকীগুলি, রাখা আছে গোপনে আমার;
মনে নেই কুড়ায়েছি অথবা আমারে কুড়ায়েছে
ঐসব আমলকী; মনেরও তো গোপনতা আছে?
মন বড় পক্ষপাতদুষ্ট, কিন্তু আত্মসাবধানী!

ভালোবেসে সুখ ছিলো, ভালোবেসে দুঃখ কি ছিলো না?
মহিলা বাসিবে ভালো, আমিও তো বাসিব তাহারে
ভালোমন্দ কোনো এক? নতুবা, হে বিষমানুপাতী
বিরহ, তোমারে এসে তুচ্ছতাই শ্মশানে সাজাবে।
মহিলা বাসিল বলে ভেসে গেলে? ফিরে চাহিলে না?
পরস্পর ক'রে আছো অধিকার এই অনুভবে।

অদ্ভুত মুখোশ যুদ্ধে

মণীন্দ্র রায়

অদ্ভুত মুখোশযুদ্ধে কেঁপে ওঠে মন।
শাণিত বল্লম হাতে ও কে
আততায়ী আক্রমণে নিঃশব্দে ধাবিত!
আমি তার প্রকৃতি কি মুখের গড়ন
জানি না, হিংসায় তনু মৃত।

এবং বিচিত্র আরো, যে মুহূর্তে আমি
বুঝেছি প্রাণের মূল্যে—নিহিত জিজ্ঞাসা
ক্ষরিত রক্তের চেয়ে দামী,
তখনি মুখোশ খুলে সেই হন্তারক
দেখাল, কী প্রগাঢ় তামাশা।

জীবনের পর্বে পর্বে সশস্ত্রে লিখিত।
যখনি জ্বালার দিন নিভে আসে, আমি
নিজে বধ্য এবং জহ্লাদ।
মৃত্যুর নরকে নেমে শুদ্ধ, স্বয়ংবৃত,
মুছে ফেলি প্রাচীনা বিষাদ॥
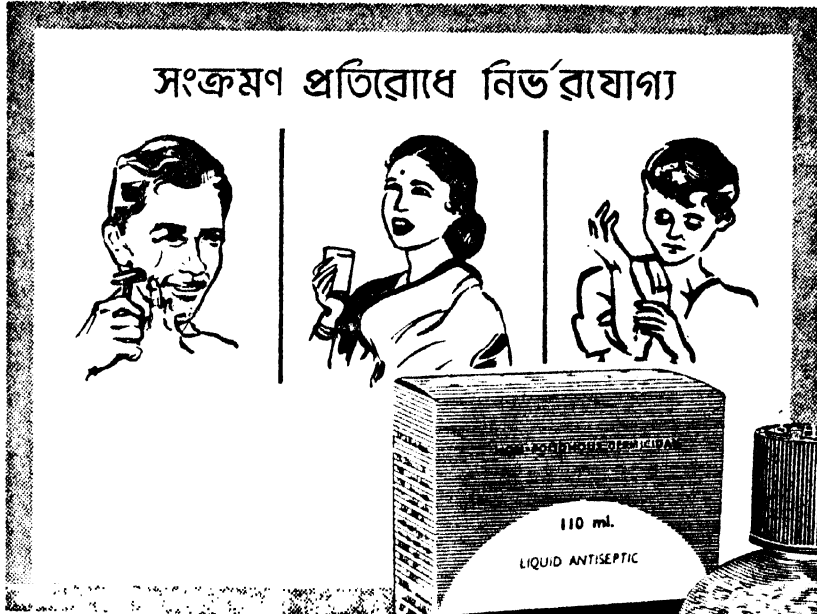
আসা-যাওয়া

কাজের ফাঁকে

শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়

(উপন্যাস)

গ্রামের গল্প আপনারা শুনতে চান না। কিন্তু গ্রামের গল্পই আমি আপনাদের শোনাবো। কারণ গ্রাম ছাড়া আমি কিছু জানি না।

বর্ধমান জেলার কুলটিকুরি গ্রাম। গ্রামের দক্ষিণ দিকে ওই যে দেখছেন রূপাই নদী—শান্ত শিষ্ট ছোট্ট নদীটি—শুধু বর্ষার সময় ওর চেহারা যায় বদলে। শুনেছি নাকি ছোটনাগপুরের পাহাড়-ধোয়া জল যখন ঝাঁপিয়ে পড়ে ওই রূপাই-এর বুকে। গেরুয়া রং-এর ঘোলাটে জল হুড় হুড় করে বয়ে যায় ওর দুকূল ছাপিয়ে।

এই নদী যেখানে বাঁক নিয়েছে, সেই বাঁকের মুখে ছিল বিঘে-দশেক জমি। জমিতে ফসল ফলতো প্রচুর।

তাই বোধ হয় ওই জমিটার নাম ছিল—বসুন্ধরা।

মাটির এমন চমৎকার নাম কে যে কখন রেখেছিল তার হদিস মেলা ভার।

কিন্তু এই নামের সংগে আমাদের গল্পের একটু সম্বন্ধ আছে, তাই আমার এত কথা বলা।

এই জমির মালিক ছিল কুলটিকুরির গ্রামের আনন্দ হালদার।

আর সেই আনন্দ হালদারের স্ত্রী কাজল-বৌ এই জমির নামে নাম রেখে বসলো তার ছোট মেয়েটার।

নাম রাখলো বসুন্ধরা।

আনন্দ হালদার বলেছিল, করলে কি কাজল-বৌ, মেয়েটার বসুন্ধরা নাম রাখা উচিত হলো না।

কেন ?

বসুন্ধরার মত ফলবতী হয়

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

যদি ওই মেয়ে, তো ছেলেতে-মেয়েতে ঘর যে ওর ভরে যাবে!

কাজল-বৌ বলেছিল, থামো। নামের মহিমা আমার জানা আছে। আমি নিজে টাকি টাকি করে কথা বলি তাই তুমিই বলেছিলে বড় মেয়েটার নাম সুবচনী রাখতে। কিন্তু নামের গুণে কিছু হলো? সুবচনীর বচন শুনলে তো গা জ্বলে করে।

আজ কোথায় গেল সেই কাজল-বৌ আর কোথায় গেল সেই আনন্দ হালদার?

বুজটিকুরি নাম আছে, কিন্তু সে গ্রাম নেই।

রূপাই নদী আছে, কিন্তু নদীর বাঁকে সেই বসুন্ধরা জমি নেই।

গ্রামের চিহ্ন বিলুপ্ত করে দিয়ে সেখানে হয়েছে প্রকান্ড এক ইস্পাতের কারখানা আর বসুন্ধরার সেই উর্বর মাটির বুকের ওপর পাতা হয়েছে লোহার লাইন, তার ওপর দিয়ে বড় বড় স্টিম ইঞ্জিন টেনে নিয়ে চলেছে হাজার হাজার মালের গাড়ী।

এখনও বেঁচে রয়েছে সেই গ্রামের মেয়ে সুবচনী—

আর তার সহোদর বোন বসুন্ধরা।

এই বসুন্ধরাকে নিয়ে আমাদের এই কাহিনী।

সে কাহিনী শুনতে হলে আপনাদের একটু পিছু হাঁটতে হবে।

আনন্দ হালদারের জীবনে অভাব ছিল মাত্র একটি।

তার ঘর ছিল কিন্তু ঘরণী ছিল না। দেশোয়ালী যাত্রার দলে গান গেয়ে আর বক্তৃতা করে ঘুরে বেড়াতো আনন্দ হালদার। বাড়ীতে তার মন বসতো না।

কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে বলতো, বনের চিড়িয়া রে ভাই, খাঁচায় ভাল লাগে না।

তাহলে একটি বিয়ে কর।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতো আনন্দ হালদার।—না রে ভাই, বেশ আছি।

কিন্তু বেশ থাকতে বুঝি দিলে না বিধাতা।

আনন্দ হালদার দূরের একটা গ্রামে গিয়েছিল যাত্রার দলের সঙ্গে। গ্রামের লোক এক জায়গায় অতগুলি লোককে ঠাঁই দিতে পারেনি। বাড়ীবাড়ী থাকবার খাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।

আনন্দ ছিল যে-ভদ্রলোকের বাড়ীতে, সেই বাড়ীতে ছিল একটি মেয়ে। মেয়েটির বয়েস হয়েছিল পনেরো-ষোলো। পরিপূর্ণ যৌবন তখন তার—ছেঁড়া কাপড়ে ঢাকা পড়ে না।

বাইরের লোক আনন্দ। থাকতেও তাকে দেওয়া হয়েছিল বাইরের ঘরে।

কিন্তু ঘরের মেয়ে ওই আইবুড়ো বাসন্তীর ওপরেই বাড়ীর গিন্নি দিয়েছিল তার সেবাযত্নের ভার।

মনুষটা দুদিন রয়েছে তাদের বাড়ীতে, তেলের বাটি, জলের গ্লাস, ভাত-মুড়ির থালা, সবই তার কাছে ধরে দিয়ে আসতে হয়েছিল বাসন্তীকে।

"...তা তোমার মত সুভদ্র পাত্র কোথায় বল।"

কথাও দ্ব' চারটে কইতে হয়েছিল বই-কি!

—কি গো, কেমন যাত্রা শ্বনলে?

বাসন্তী এসেছিল আসন পেতে আনন্দের খাবার ঠাঁই করে দিতে। কথাটার জবাব দেয়নি বাসন্তী। চোখ তুলে একবার তাকিয়েই আবার চোখ নামিয়ে গায়ের কাপড়টা টানতে টানতে চলে গিয়েছিল সে।

দ্ব'রাত্রি যাত্রা হয়ে গেছে তাদের বাড়ীর কাছেই। কাল রাত্রে বাসন্তী গিয়েছিল যাত্রা শ্বনতে। অর্জ্বন সেজেছিল আনন্দ। আর স্বভদ্রা সেজেছিল মেয়ে-মেয়ে চেহারার একটি ছেলে। স্বভদ্রাকে তার ভাল লাগেনি।

ভাতের থালা নিয়ে আবার ঘরে ঢ্বকলো বাসন্তী।

আনন্দ আবার জিজ্ঞাসা করলে, যাত্রা কেমন শ্বনলে কই বললে না তো?

বলতে হলে তার ম্বখের দিকে তাকাতে হয়। প'চিশ-ছাব্বিশ বছরের য্বক সে। তাকাতে লজ্জা লজ্জা করে। বাসন্তী তব্ব বললে—

—এ-মা, ওই কি তোমাদের স্বভদ্রা নাকি?

আনন্দ হেসেছিল বাসন্তীর কথা শ্বনে। বলেছিল, তা তোমার মত স্বভদ্রা পাব কোথায় বল!

রীতিমত ভেংচি কেটে বাসন্তী বলেছিল, আ-মর, ম্বখপোড়া!

বলেই সে ছ্বটে পালিয়েছিল সেখান থেকে। গিয়েই বলেছিল বাড়ীর গিন্নিকে। বলেছিল, মামী, আমি আর যাব না ওখানে। এবার যেতে হয় তুমি যাও।

কি বললি? আমি যাব? শোনো গো শোনো—মেয়ের কথা শোনো!

গিন্নি জানিয়ে দিলে বাড়ীর কর্তাকে। উঠোনের পেয়ারাতলায় খাটিয়া বিছিয়ে বাড়ীর কর্তা তামাক টানছিলেন। উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, কি বলছে?

বলছে, তুমি যাও ওই যাত্রার দলের লোকটার কাছে।

কেন?

কেন তা ওকেই জিজ্ঞাসা কর না।

মামা কিন্তু বাসন্তীকে কিছ্বই জিজ্ঞাসা করলেন না। 'ব্বঝেছি' বলে গিয়ে দাঁড়ালেন আনন্দ হালদারের কাছে।

আনন্দ তখন খেতে বসেছে। ম্বখ তুলে বললে, আস্বন।

যেরকম ভেবে গিয়েছিলেন তিনি, মনে হয়েছিল এই নিয়ে একটা গন্ড-গোল বাধাবেন। কিন্তু কিছ্বই তিনি করলেন না। খাটের ওপর ভাল করে চেপে বসে জিজ্ঞাসা করলেন, খাচ্ছো কেমন?

ভাল।

রান্না কেমন?

খ্বব ভাল।

মামা বললেন, সব রান্না করেছে ওই মেয়েটা।

কোন্ মেয়েটা?

আনন্দ ম্বখ তুলে তাকালে একবার।

মামা হাসলেন। হাসিটা কেমন যেন বাঁকা হাসি। বললেন, ছলনা করছো কেন? জানো তো সবই। আচ্ছা, খেয়ে নাও, তারপর বলছি।

ভাল করে খাওয়া আর হলো না আনন্দ হালদারের। প্বকুরের ঘাটে আঁচিয়ে এসে বসলো মামার পাশে। বসেই বললে, নিন, কি বলছেন বল্বন।

মামা বললেন, তোমার বাড়ী কোথায়?

কুলটিক্বরি।

আমাদের এই কুলটিক্বরি?

আনন্দে মামার কালো ম্বখখানা যেন আরও কালো হয়ে গেল। এখান থেকে হাঁটাপথে ছ' সাত ক্রোশ দ্বরে কুলটিক্বরি গ্রাম। এত কাছে যে অর্জ্বন সাজবার মত এত বড় একজন অভিনেতা থাকতে পারে তা তাঁর জানা ছিল না।

ভাল, ভাল। পৈতে রয়েছে যখন বাম্বন তো নিশ্চয়ই। তা বিয়ে-থা হয়েছে তো? ছেলেপ্বলে ক'টি?

আনন্দ বললে, বিয়েই করিনি আমি।

কেন?

আনন্দ হেসে বললে, সে-সব কথা আর নাই-বা শ্বনলেন!

তব্ব শ্বনিই না!

এই যেমন ধর্বন আপনি, দরদ দিয়ে জিজ্ঞেস করছেন, এরকম কেউ নেই যে আমার। মা নেই, বাপ নেই, ভাই নেই, বোন নেই, আমি একা। বিয়ে আমার দেবে কে?

মামা কি যেন ভাবলেন। ভেবে বললেন, থাবার ব্যবস্থা আছে বাড়ীতে?

তা আছে। বাড়ী আছে, কিছ্ব জমিজমা আছে। বেশ আছি মনের আনন্দে, খাইদাই ঘ্বরে বেড়াই—

মামা বললেন, না, তা চলবে না।

কী চলবে না?

এই রকম বাউন্ডুলের মত যাত্রার দলে দলে ঘ্বরে বেড়ানো চলবে না।

কি করতে হবে?

বিয়ে করতে হবে।

ব্যাস, হয়ে গেল আনন্দ হালদারের বিয়ে।

যাত্রার দলে বক্তৃতা করতে গিয়ে গ্রামে ফিরলো বৌ নিয়ে। বেশ ডাগর-ডোগর স্বন্দরী বৌ। যেমন স্বন্দর গড়ন তার তেমনি স্বাস্থ্য, তেমনি যৌবন। কানে দ্বটি দ্বল ছাড়া সোনার নামগন্ধ নেই সারা গায়ে। মাথায় এক-মাথা ভোমরা-কালো চুল, আর টানা-টানা কাজল-পরা দ্বটি চোখ।

বিয়ের কনের সেই কাজল-পরা চোখ দেখেই তার নাম হয়ে গেল কাজল-বৌ। কেউ আর তাকে বাসন্তী বলে ডাকলে না।

বৌ ছিল না তো ছিল না, নিজেই রাঁধতো-বাড়তো খেতো, মনের আনন্দে ঘ্বরে বেড়াতো, বেশ ছিল আনন্দ হালদার। কিন্তু এখন আর সে বাড়ী থেকে বেরোতে চায় না। যাত্রা-পার্টি ভাবলে ব্বঝি সে টাকা পায় না বলে যেতে চাচ্ছে না। রীতিমত টাকা কব্বল করলে তারা। গা-হাত-পা টিপে দেবার জন্যে একজন চাকর দেবে বললে, আর দেবে ফার্স্ট-ক্লাস 'অনার'। সপ্তাহে একদিন মাংস আর রাত্রে দেবে ল্বচি। তব্ব যেতে চাইলে না আনন্দ হালদার।

সবাই বললে, ব্যাটা বৌ-পাগ্লা হয়ে গেছে।

কিন্তু না, বৌ-পাগ্লা সে হয়নি। দ্ব'জনেরই শরীরে মনে তখন যৌবনের মাদকতা। কাজল-বৌকে তখনও সে ঠিক চিনতে পারছিল না।

অসম্ভব ম্বখরা এই কাজল-বৌ। ম্বখরা, কিন্তু ভুলেও কোনোদিন একটা মিথ্যা কথা বলে না।

আনন্দ একদিন বলেছিল, তুমি এমন ট্যাক্ ট্যাক্ করে কথা বল, অথচ তোমার মামার কথা তো বেশ মিষ্টি মিষ্টি।

কাজল-বৌ বলেছিল, ও আমার নিজের মামা নাকি?

কই, সে-কথা তো উনি আমাকে বলেননি!

বলতে হলে যে অনেক কথা বলতে হয়!

এই বলে সেই অনেক কথার সব কথা-গ্বলোই কাজল-বৌ বলেছিল আনন্দ হালদারকে।

প্রথমে বলেছিল, নাই-বা শ্বনলে সে-সব কথা।

না, আমি শ্বনবো।

কথাগ্বলো কিন্তু ভাল নয়।

আনন্দের জেদ গেল চড়ে।—তাহ'লে তো শ্বনতেই হবে।

কাজল-বৌ বললে, আচ্ছা বিপদে

পড়লাম তো দেখছি। কথা বলাও জ্বালা, না বলাও জ্বালা! স্বামীকে সবাই নাকি দেবতা বলে। না বললেও পাপ হবে। শোনো তবে। শুনে যদি মন খারাপ করেছ তো তোমারই এক-দিন কি আমারই একদিন!

হেসে হেসে আনন্দ বললে, না না, মন খারাপ করব না। তুমি বল।

কাজল-বৌ বললে, আমার বাবা আর মা—বিয়ের আগেই প্রেমে পড়েছিল। দু'জনে লুকিয়ে লুকিয়ে পালিয়ে এসেছিল পূব-বাংলার কোথাকার কোন্ এক গাঁ থেকে।

তোমরা তাহ'লে বাঙ্গাল?—আনন্দ বলেছিল, তাতে কি হয়েছে? এর জন্যে মন খারাপ করব কেন?

আরে বাবা দাঁড়াও, কথাটা আমাকে শেষ করতে দাও আগে। আমার বাবা বামুন, মা কায়েত! আর শুনবে?

কথাটা শুনে মাথাটা চম্ করে ঘুরে গিয়েছিল পাড়াগাঁয়ের ছেলে—গোঁড়া সংস্কারান্ধ আনন্দ হালদারের। দাঁত দিয়ে জিব কেটে বলেছিল, ছি ছি, তুমি আমার জাত মেরে দিলে!

তুমিই জানলে শুধু, আর কেউ জানে না সে-কথা।

আনন্দকে তবু চুপ করে থাকতে দেখে কাজল-বৌ বলেছিল, কি ভাবছো? ছেড়ে দেবে আমাকে?

আনন্দ মুখ তুলে তাকিয়েছিল কাজল-বৌএর দিকে। এই রূপ, এই যৌবন! না না, ছেড়ে দেবার কথা ভাবতেই পারে না।

আরও শুনতে চাও?

আরও আছে নাকি?

আছে বই-কি! নইলে তোমার হাতে পড়'বা কেন?

দপ্ করে জ্বলে উঠলো আনন্দ!—আমার হাতে—মানে খুব খারাপ হাতে পড়েছ নাকি?

না, হাত খারাপ নয়, তবে মনটা খারাপ। ঘর-বসা মন নয়। উড়ু-উড়ু ভাব। উড়তে পারছো না শুধু আমার জন্যে।

আনন্দ ঠান্ডা হলো। বললে, ঠিক বলেছ। এইবার বল তোমার আরও কি ব্যাপার আছে।

আমার ব্যাপার নয়।—কাজল-বৌ বললে, আমি আমার মা-বাপের কথা বলছি। আমার মা'র হাতে ছিল টাকা, আবার বাবার মাথায় ছিল বিদ্যে। বাবা ইস্কুলে ইস্কুলে হেড-মাস্টারী করে করে বেড়াতো। এক জায়গায় বেশিদিন থাকতো না কিছুতেই। কেন থাকে না তখন কি আর জানতাম কিছু! জানলাম—বাবা যখন ধরা পড়ে গেল।

ধরা পড়ে গেল?

হ্যাঁ, ওই যে-গাঁয়ে তোমার বিয়ে হলো ওখানকার ইস্কুলে বাবার তখন পাঁচ বছরের চাকরি। এক নাগাড়ে পাঁচ বছর আমরা কোথাও থাকিনি। বাবার তখন বয়েস হয়ে গিয়েছিল, আর চারদিকে খুব নাম-ডাক। এই সুখ্যাতিটাই দিলে বাবার সর্ব্বনাশ করে। বাবা ধরা পড়লো—তার এক বি-এ বি-টি বন্ধুর নাম-ধাম ভাঁড়িয়ে বাবা নাকি কুড়ি বচ্ছর মাস্টারী করে আসছে, অথচ আমার বাবা আসলে নাকি ম্যাট্রিক পাশ।

আনন্দ বলে উঠলো, সে তো তোমার বাবার বাহাদুরী বলতে হবে।

হ্যাঁ, সেই বাহাদুরীর পুরস্কার বাবা পেলে। একটি বচ্ছর মামলা চলবার পর বাবার হলো আট বছর জেল।

তোমার বাবা কি এখনও জেল খাটছে?

না। ছ' মাস পরে বাবা জেলখানাতেই মারা গেছে। মার তখন খুব অসুখ। ওই যে আমার মামা, উনিই দেখাশোনা করতেন, নিজের বাড়ীতে এনে রেখেছিলেন আমাদের, মামলা-মোকর্দ্দমা তদ্বির করেছিলেন উনিই। মাকে দিদি বলে ডাকতেন।

আনন্দ বললে, ও'কে দেখেই আমি বুঝেছিলাম—মানুষটা ভাল।

হ্যাঁ ভাল বই-কি! এ-যুগের উপযুক্ত মানুষ। উনি ঠিক বুঝতে পেরেছিলেন—মার হাতে টাকা আছে। মামলার তদ্বির করতে গিয়ে দশ-পনেরো হাজার টাকাকে একেবারে তিন হাজার টাকায় এনে ফেললেন। সেই তিন হাজার টাকা আর এই আমার মতন ধাড়ী আইবুড়ো মেয়েকে তাঁর হাতে তুলে দিয়ে মা আমার মারা গেলেন ও'রই বাড়ীতে।

সে কি কথা?—আনন্দ একটু অবাক হয়ে গেল। তোমার মার গয়না-গাঁটিও কিছু ছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু বিয়ের সময় কিচ্ছু তো দিলে না!

কাজল-বৌ বললে, দেবার জন্যে তো নেয়নি।

আনন্দ বললে, তুমিও তো কিছু বললে না তখন?

ম্লান একটু হাসলে কাজলবৌ। বললে, বললাম না আনন্দকে পাবার আনন্দে। ওখান থেকে পালিয়ে আসবার সুখে।

সেই সুখে বছর ঘুরতে না ঘুরতেই কাজল-বৌ-এর একটি মেয়ে হলো।

মেয়ের বচন যাতে মিষ্টি হয় তাই তার নাম রাখলো—সুবচনী।

তার পরের বছর আবার একটা মেয়ে।

তার পর আবার।

এবার কাজল-বৌ বিদ্রোহ করলে। বললে, তোমার বসুন্ধরার জমির ফসলে আর চলবে না। এবার বেরোও তুমি বাড়ী থেকে। চাকরি-বাকরি একটা দ্যাখো কোথাও।

আনন্দ বললে, আমার চোদ্দপুরুষে কেউ কখনও চাকরি করেনি। গোলামী আমি করতে পারব না।

বেশ তবে যাত্রার দলেই যাও।

সে দলটা উঠে গেছে। যেতে হলে কলকাতায় যেতে হয়।

তাই যাও। আমি আর তোমাকে বাড়ীতে থাকতে দেবো না।

সত্যিই দিলে না থাকতে। কাজল-বৌ-এর কথার জ্বালায় আনন্দ হালদারকে বেরোতে হলো।

কলকাতার দলে পাত্তা পাওয়া সহজ নয়।

আনন্দ যায় আর ফিরে আসে, আবার যায় আবার ফিরে আসে।

ঘরের সুখ পেয়েছে আনন্দ। বাইরে আর তার মন বসছে না।

কাজল-বৌ বলে, এ কী হলো বল তো তোমার? আগে ভেবেছিলাম বাড়ী থেকে বেরোলে আর তুমি বাড়ী ঢুকবে না, এখন দেখছি,—ঠিক তার উল্টো।

আনন্দ বলে, এমন তো ছিলাম না আমি। তুমিই তো করেছ।

আমার দোষ দিও না বলছি। আমি কিছু করিনি।

করতে বাকি কি রেখেছো? আমার জাত পর্যন্ত মেরে দিয়েছ।

কাজল-বৌ বলে, তাতে তোমার তো কিছু আটকাচ্ছে না। আমারই ভয়ে বুক দুরু-দুরু করছে।

ছেলেমেয়ের ভয়ে মেয়েদের বুক দুরু দুরু করে এই তো আমি প্রথম শুনছি।

থাক আর শুনে কাজ নেই। কাজল-বৌ বলে, এখন তুমি বাড়ী থেকে বেরুলে বাঁচি।

দিবারাত্রি শুধু সেই এক কথা! বেরোও, আর দূর হও! এমন করলে মানুষ আর কাঁহাতক বাড়ীতে থাকে!

এবার সত্যি-সত্যিই রাগ করে বাড়ী থেকে চলে গেল আনন্দ। দুটি বছর আর বাড়ীমুখো হলো না। প্রথম প্রথম দু'তিনখানা চিঠি লিখেছিল, তিরিশটে টাকা পাঠিয়েছিল, তারপর আর চিঠিপত্র খবরাখবর না দিয়ে কাজল-বৌকে অনেক ভাবনা ভাবিয়ে অনেক কান্না কাঁদিয়ে আনন্দ হালদার বাড়ী যখন এলো, দেখলে ছোট মেয়েদুটো মরে গেছে। বড় মেয়ে সুবচনী শুধু ফন্ ফন্ করে দিব্যি বড় হয়ে উঠেছে।

কাজল-বৌ এবার আর তাকে কিছু বললে না। মেয়েদুটোর শোকে কাঁদলে খানিকটা। তারপর বললে, ধনি মানুষ যা হোক্।

আস্কারা পেয়ে গেল আনন্দ হালদার।

এবার কিছু টাকা সঙ্গে এনেছিল সে।

মনে হলো যেন তার সেই আগের দিনগুলো আবার ফিরে এসেছে।

আবার আর একটি মেয়ে হলো কাজল-বৌএর।

এই মেয়েটির নাম রাখলো সে—'বসুন্ধরা'।

কাজল-বৌ এবার আর তাকে যেতে বলেনি। কিন্তু কি জানি কেন, আনন্দ নিজেই একদিন বলে বসলো, আমি চললাম।

তারপর বছরের পর বছর পেরিয়েছে, আনন্দ হালদার মরেছে কি বেঁচে আছে তার কোনও সন্ধান নেই।

কাজল-বৌএর দু'পাশে দুটো মেয়ে। সুবচনী আর বসুন্ধরা। দুটোই দেখতে ভাল। দুটোই সুন্দরী।

ছোটটাও আজকাল ফ্রক ছেড়ে কাপড় পরছে। বড়টার বিয়ে তো আজ দিলেও হয়, কাল দিলেও হয়।

বসুন্ধরা জমিটুকুর ফসলে আর কতদিন চলে?

তবু ভগবান রক্ষা করেছেন—তিন-জনেরই অটুট স্বাস্থ্য। মাও যেমন, মেয়ে দুটোও তেমনি।

মা বাঁদি-বা লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে এর-ওর বাড়ী কাজকর্ম করে বেড়ায়, মেয়েদুটোকে বাড়ীর বার করতে ভরসা হয় না। সংসারের দুঃখ-ধান্দায় বড়টা একটুখানি দড়কচা মেরে গেছে সত্যিই, কিন্তু বসুন্ধরা একে-বারে আগুনের মত। যেমন গায়ের রং তার তেমনি সুন্দর চেহারা।

কাজল-বৌ বলে, এর ওর বাড়ী টং টং করে ঘুরে বেড়াস না মা, কে কোন্‌দিন কি কথা বলে বসবে, সহ্য করতে পারব না।

সুবচনী বলে, বলুক না, কই দেখি কেমন বাহাদুর! লাথি মেরে মুখ তার ভেঙে দেবো না!

বসুন্ধরা খিল্ খিল্ করে হাসে আর বলে, আমি কিন্তু চললুম মা বাবুদের বাড়ী, আমাকে কেউ কিছু বলবে না।

সুবচনী বলে, ওই দ্যাখো মা, তোমার আদরিণী কন্যা চললো বাবুদের বাড়ী। ওদের তিন বৌএর তিনটে ছেলেকে কোলে পিঠে নিয়ে নেচে নেচে ঘুরে বেড়াবে সারাদিন।

যাবুগে মরুকগে আর পারি না আমি।

সুবচনীকে একটা ভেংচি কেটে দিয়ে বসুন্ধরা পালিয়ে যায়।

দেখলে মা?

সুবচনী তার মায়ের কাছে গিয়ে বলে, আমার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না মা, তুমি ভাবো তোমার এই বসুন্ধরার জন্যে।

আমি ভাববো?

কাজল-বৌ তার বড় বড় চোখ-দুটি তুলে বলে, আমি যদি আজ মরে যাই, তুই ওর বড় দিদি—তোকেই তো ওর কথা ভাবতে হবে।

বেশ তাহলে আমাকে কিছু বোলো না। কাল থেকে মারের চোটে আমি ওর বাবুদের বাড়ী যাওয়া বন্ধ করে দেবো।

এইবার কাজল-বৌএর চোখদুটি জলে ভরে আসে।

পারবি মারতে? ওর গায়ে হাত তুলতে তোর কষ্ট হবে না?

তাই বলে বাবুদের বাড়ী ও ঝিয়ের কাজ করবে? ওদের ছেলে বয়ে বয়ে বেড়াবে?

ছেলে বয়ে বেড়াতে ও ভালবাসে।

পুরনো দিনের কথা মনে পড়লো কাজল-বৌএর।

ওর নাম যখন রাখলাম বসুন্ধরা, তোর বাবা তখন বলেছিল—বসুন্ধরা নাম রেখে খুব ভুল করলে কাজল-বৌ, দেখবে ও বসুন্ধরার মত ফলবতী হবে। ছেলেতে-মেয়েতে ঘর ওর ভরে যাবে।

তা বিশ্বাস নেই মা, পাড়ার বাচ্চা-গুলো বসুন্ধরাকে একবার দেখলে হয়, ছুটে ওর কোলে গিয়ে উঠতে চায়।

কাজল-বৌ বলে, দাঁড়া আগে বিয়ে দিই, তারপর ছেলে! ওর বিয়ে না হয়

দুদিন পরে দিলেও চলবে, এখন তোর বিয়ে কেমন করে দেবো তাই ভাবছি।

ভাবতে কিন্তু শেষ পর্যন্ত হলো না কাজল-বৌকে।

বর্ষাকাল। অথচ বর্ষা বলে মনেই হয় না। চারিদিকে কাঠ-ফাটা রোদে মাঠের মাটি একেবারে শুকিয়ে গেছে। দিনের মধ্যে বার দুইতিন শুধু আকাশ অন্ধকার করে মেঘ উঠছে, ঝিপ্ ঝিপ্ করে একটুখানি বৃষ্টি হচ্ছে, তারপর আবার যে-কে সেই!

এমন দিনে আমাদের আনন্দ হালদার এলো একজন ছোকরাকে সঙ্গে নিয়ে। বললে, সুবচনীর বর নিয়ে এসেছি দ্যাখো।

কাজল-বৌ বললে, দাঁড়াও আগে তোমাকে দেখি।

তা দেখবার মত চেহারা নিয়ে এসেছে বটে আনন্দ হালদার। চট করে দেখে আর তাকে চেনবার উপায় নেই। মুখে একমুখে কাঁচাপাকা দাড়িগোঁফ, মাথার চুল নেমেছে কাঁধ পর্যন্ত। পরনে গেরুয়া রঙের ধুতি পাঞ্জাবি।

তা সন্ন্যেসী হলে কবে থেকে?

আনন্দ বললে, ঘরছাড়া করে তুমিই তো আমাকে সন্ন্যেসী করে দিয়েছ।

তা বেশ করেছি। চিঠিপত্রও তো এক-আধখানা লিখতে হয়!

সন্ন্যেসীদের চিঠিপত্র লিখতে নেই।

ঢং দ্যাখো! তাহলে এলে কেন?

আনন্দ বললে, সুবচনী বড় হয়েছে। বিয়ে দিতে হবে না?

এত ভাবো তুমি আমার জন্যে?

ভাবি বলেই তো পাত্রটিকে সঙ্গে করে নিয়ে এলাম।

কাজল-বৌ পাত্রটিকে তখন দেখে নিয়েছে। তা মন্দ নয়। দেখতে শুনতে ভালই।

কিন্তু হ্যাঁগা, ছেলেটির যে একটি চোখ কানা!

আনন্দ বললে, দুচোখওলা ছেলের দাম অনেক।

কাজল-বৌএর কেমন যেন সন্দেহ হলো। খাওয়াদাওয়ার পর একটু নিরিবিলি হয়ে কাজল-বৌ একটু হেসে বললে, আমি তো জানি তুমি কত বড় সন্ন্যেসী! এখন সত্যি করে বল তো স্বামীজি, ব্যাপারটা কি! তুমি কিছু খেয়েছ নাকি ছোঁড়াটার কাছ থেকে?

আনন্দ বললে, সত্যি বলছি টাকা-কড়ি কিছু খাইনি, তবে দুবেলা ভাত খেয়েছি ওর বাড়ীতে।

ভাত খেতে দোষ নেই। এখন বল কি হয়েছে।

আনন্দ তখন বললে সব কথা খুলে। বললে—

সন্ন্যাসী-মানুষ, বিনা টিকিটে ট্রেণে চড়ে সারা ভারতবর্ষের তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সেদিন হরিদ্বার থেকে আসছিল কলকাতার দিকে। ইচ্ছে ছিল, দক্ষিণেশ্বরে যাবে। কিন্তু দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত যাওয়া তার সম্ভব হলো না। শ্রীরামপুরের কাছাকাছি ছোট্ট একটি ষ্টেশনে টিকিট-চেকার তাকে নামিয়ে দিলে গাড়ী থেকে। সন্ধ্যে হয়ে গেছে। কোথায়-বা যাবে। ষ্টেশন-ঘরের একপাশে কম্বল বিছিয়ে চুপ করে বসেছিল আনন্দ। এমন সময় এই ছোকরাটি এসে দাঁড়ালো। জিজ্ঞাসা করলে, আপনি কোথায় যাবেন স্বামীজি?

আনন্দ বললে, যাচ্ছিলাম একবার দক্ষিণেশ্বরে। মাকে দর্শন করতে।

রাত্রিটা কি এইখানেই কাটাবেন ভেবেছেন?

তাছাড়া আর উপায় কি বল!

রাত্রে কি খাবেন আপনি?

কিছু না। এমনিই কাটিয়ে দেবো। এর পরে কখন ট্রেণ পাব বাবা?

ছেলেটি বললে, সব চেয়ে ভাল হয় আপনি যদি কাল সকালে যান।

তাই যাব।

আনন্দ শুয়ে পড়ছিল, ছেলেটি জিজ্ঞাসা করলে, আপনি বাঙ্গালী?

হ্যাঁ বাবা, বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ। বর্ধমান জেলায় আমার বাড়ী। আমার নাম আনন্দ হালদার।

তাহ'লে আপনি আসুন আমার সঙ্গে। আমার বাড়ীতে চলুন। কাছেই আমার বাড়ী। কাল সকালে আপনাকে আমি ট্রেণে তুলে দেবো।

আনন্দ গিয়েছিল তার বাড়ীতে। ইঁটের তৈরি ছোট্ট একখানি মাত্র ঘর। পাশেই একটুখানি রান্নার জায়গা। সুমুখে অনেকখানি জায়গা জুড়ে উঠোন। উঠোনে নানা রকমের গাছ। চারিদিকে রাংচিতে গাছের বেড়া। ছোকরাটির সঙ্গে পরিচয় হলো। নাম ঝন্টুলেন চক্রবর্তী। সেও ব্রাহ্মণ। ইষ্টিশানের পাশে উমাশশী রাইস মিলের ম্যানেজার সে।

আনন্দকে ঘরের ভেতর নিয়ে গিয়ে মহা সমাদরে বসিয়েছিল ঝন্টুলেন চক্রবর্তী।

আনন্দ জিজ্ঞাসা করেছিল, বাড়ীতে তোমার আর-কাউকে দেখছিনে কেন বাবা?

হাতজোড় করে ঝন্টুলেন বসেছিল আনন্দ হালদারের সামনে। গড় হয়ে একটি প্রণাম করে বলেছিল, আপনারা সাধু-সন্ন্যাসী মানুষ, আপনারা তো সবই বুঝতে পারেন বাবা। আমার হাতটা দেখে কই বলুন দেখি—আমার বংশরক্ষা হবে?

এই বলে সে তার হাতটি বাড়িয়ে দিয়েছিল আনন্দ হালদারের সুমুখে।

একটুখানি অবাক হয়ে ঝন্টুলেন

চক্রোত্তির মুখের দিকে তাকিয়েছিল আনন্দ।

তবে কি এইজনাই তাকে সে ডেকে আনলে বাড়ীতে? চুলদাড়ি আর সাধু-সন্ন্যাসীর মত গেরুয়া রঙের কাপড়জামা দেখেই বোধকরি তার ধারণা হয়েছিল—আনন্দ বুঝি একজন ত্রিকালজ্ঞ ঋষি।

আনন্দ বলেছিল, হাত দেখতে তো আমি জানি না ঝুলন, কিন্তু তোমার এত বংশরক্ষার তাগিদ কেন?

কথাটার ঠিক জবাব দিতে পারেনি ঝুলন। কিম্বা হয়ত এত বড় চুল-দাড়িওলা একজন স্বামীজির সামনে কথাটা বলতে তার লজ্জা হয়েছিল।

আনন্দ জিজ্ঞাসা করেছিল, বিষয়-সম্পত্তি কি তোমার খুব বেশি আছে—যার জন্যে তুমি একজন উত্তরাধিকারী রেখে যেতে চাও?

অত-সব ভাবেনি ঝুলন চক্রোত্তি। ধানের জমি কিছু আছে আর আছে এই এতখানা জায়গা জুড়ে তার ভদ্রাসন। গ্রামটা ধীরে-ধীরে শহর হয়ে উঠছে। জায়গা-জমির দাম বাড়ছে। তার ওপর আছে ওই উমাশশী রাইস্ মিলের চাকরি। ঘরে বসে পঞ্চাশ টাকা মাইনে পায়।

আর এই যে একটি চোখ তার নেই দেখছেন, ওতে তার আটকায় না কিছু। উমাশশী রাইস্ মিলের ধান-চালের হিসেব, কুলি-কামিনের হাজরি—সবই সে তার এই একটি চোখ দিয়েই দিব্যি চালিয়ে দেয়।

আনন্দ বললে, বিয়ে তাহ'লে তুমি একটি করতে চাও?

হ্যাঁ স্বামীজি, দু' দুটো বিয়ে করে-ছিলাম। পট্ পট্ করে বছর ঘুরতে-না ঘুরতে দুটোই মরে গেল। তারপর এই দেখুন না—

নিজে উনোন ধরিয়ে, জল তুলে, বাট্না বেটে নিজেই রান্না করে খাওয়া!

সুতরাং আনন্দ বুঝলে—ঝুলনের একটি বৌ দরকার।

দুজনের জন্যে উনোনে ভাত চাপিয়ে দিয়ে ঝুলন আবার এসে বসলো আনন্দর কাছে।

পয়সা চাই না কড়ি চাই না, শুধু চাই একটি মেয়ে। আর পয়সা আমাকে দেবেই-বা কে? দিতে চায় না শুধু এই চোখটার জন্যে।

তা এটা আমার রোগ-ব্যাধি কিছু নয়। জন্ম থেকেই এমনি।

তারপর ধরুন না কেন, আমার বাড়ীতে কলহ-কচ্‌কচির কিছু নেই। ননদ নেই ভাজ নেই, ভাই-ভায়াদের বখ্‌রা-ভাগাভাগি কিছু নেই, একেবারে নির্ঝঞ্ঝাট, একা ঘরের একা বৌ।—যে আসবে সে থাকবে একেবারে মহারাণীর মত। তাছাড়া আমার ওই আমগাছে আম, জামগাছে জাম, পেয়ারা গাছে পেয়ারা, লেবুগাছে লেবু। পেড়ে পেড়ে এনে দেবো, বসে বসে খাবে। বাড়ীর পাশেই ধীরুর ঘাট-বাঁধানো পুকুর। চানেরও যত সুখ, মাছেরও তত সুখ। ছিপ্ ফেলে মাছ ধরে এনে দেবো, উনোন ধরিয়ে দেবো, বাট্না বেটে দেবো, ঘরকন্নার আর্ধেক কাজ আমি নিজে করে দেবো।

এমনি সব সুখের কথা গড় গড় করে বলে যেতে লাগলো ঝুলন, আর আনন্দ তার আঙুলে গুণে গুণে হিসেব করতে লাগলো—তার সুবচনীর বয়স কত হলো।

বিয়ের বয়স তার নিশ্চয়ই হয়েছে। কাজল-বৌ কোনও ব্যবস্থাই করতে পারেনি। শুধু তাকে গালাগালি দিচ্ছে বসে বসে।

কাজল-বৌ বললে, দিচ্ছিই তো! সুখ করবার বেলা নিজে, আর ঝক্কি-ঝঞ্ঝাট পোয়াবার বেলা আমি।

জানি। কিন্তু আমি খুব সুখে থাকি না কাজল-বৌ।

কাজল-বৌ বললে, সুখের জন্যে তো ঘর ছাড়োনি তুমি। আমাকে বাঁচাবার জন্যে আমার কাছ থেকে তুমি পালিয়েছ।

কিন্তু এই কি বাঁচা কাজল-বৌ। নিজের ভেতরের জানোয়ারটাকে মারবার জন্যে নিজের ভয়ে নিজেই পালালাম। না পারলাম তোমাকে বাঁচাতে, না পারলাম নিজে বাঁচতে।

ও-সব কথা বোলো না বলছি। এখুনি কি বলতে কি বলে ফেলবো।—এই দ্যাখো, বুড়ো বয়েসে চোখটাও কি খারাপ হলো নাকি? ঝপ্ ঝপ্ করে জল পড়ছে!

এই বলে দু'চোখে আঁচল চাপা দিয়ে চোখ খারাপের ছুতো করে কাজল-বৌ খানিকটা কেঁদে নিলে।

আনন্দ বুঝতে সবই পারলে। বুঝতে পেরেও আবার সেই বিয়ের কথাই পাড়তে হলো। মেয়ের বিয়ে।

তাহলে কি করবে? সুবচনীর বিয়ে এই ছেলেটির সঙ্গে দেবে?

তুমি বাপ্, তুমি যা বলবে তাই হবে।

আনন্দ বললে, এর চেয়ে ভাল আর কোথায় পাবে বল—দিয়ে দাও।

শেষ পর্যন্ত তাই হলো।

আনন্দ তার দুদিনের অন্নের ঋণ পরিশোধ করলে ঝুলনকে তার কন্যাদান করে।

ঝুলন চক্রবর্তী বিয়ে করলে তার বংশ রক্ষার জন্যে। বংশ না থাকলেও যাদের চলে তাদের চলে, কিন্তু উমাশশী রাইস্ মিলের ম্যানেজার শ্যামানন্দপুর গ্রামের একচক্ষু ঝুলন চক্রবর্তীর বংশ থাকবে না—সেরকম অগৌরবের কাহিনী বাংলাদেশের ইতিহাসে অন্তত লেখা নেই।

সুতরাং বিয়ে তাঁদের নির্বিঘ্নে চুকে গেল।

কাজল-বৌ বললে, ছেলেটি দেখতে শুনতে মন্দ নয়, কিন্তু আর-একটি চোখ যদি থাকতো—

ওই একটি চোখই ভালো, তুমি জানো না কাজল-বৌ!—আনন্দ বললে, দু'চোখ থাকলে মেয়ের পিতৃকুলে মাতৃ-কুল—একুল ওকুল—দু'কুলের খবর নিতে চাইতো। তোমার বাপ-মায়ের খবর নিতে গেলেই—ব্যাস্, বিয়েটি যেতো বন্ধ হয়ে।

কাজল-বৌ আর কোনও কথা বললে না। শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, এবার আর একটা রইলো।

আনন্দ বললে, ভাবছো বুঝি ওর জন্যেও এমনি একটা কানা-খোঁড়া ধরে আনবো?

এত দুঃখেও ম্লান একটুখানি হাসি দেখা গেল কাজল-বৌ-এর মুখে। বললে, যেরকম সুন্দরী হয়ে উঠছে মেয়েটা, কি যে হবে কে জানে।

বাবুদের বাড়ীতেই তো থাকে দেখছি, ওইখান থেকেই একটা ধরেটরে নেবে বোধহয়।

কাজল-বৌ বললে, ধরেটরে নেবে কি বলছো গো! খারাপ যদি কিছু করে বসে, তো করবে তোমার রক্ত ওর গায়ে আছে বলে।

আনন্দ বললে, আমি খারাপ কিছু বলছি না কাজল-বৌ, আমি বলছি ভাল চেহারা আছে, ভালটালো বেসে যদি কাউকে বিয়ে-থা করে তো আমরা বেঁচে যাই।

সেরকম ভাগ্য নিয়ে কি এসেছে বসুন্ধরা?

বিয়ের পর কাজল-বৌকে যেমন এনেছিল আনন্দ হালদার, তেমনি আবার কাজল-বৌএর মেয়ে সুবচনীকে নিয়ে গেল ঝুলন চক্রবর্তী। নিয়ে গেল তাদের সেই শ্যামানন্দপুর গ্রামে।

বাপ আনন্দ হালদার গেল তাদের সঙ্গে।

গেল, কিন্তু আর ফিরে এলো না।

সুবচনী চিঠি লিখলে তার মাকে: আমার জন্যে তুমি ভেবো না মা। আমি বেশ ভালই আছি। বাবা এখানে সারাদিন

ছিল, তারপর এখান থেকে যাবার সময় আমাকে বলে গেল—তোর মাকে একটা খবর দিয়ে দিস, আমি এখন বাড়ী ফিরবো না।

চিঠি পেয়ে মনের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেল কাজল-বৌএর। এখন তাদের বয়স হয়েছে, মেয়েরা বড় হয়েছে, কাজল-বৌ ভেবেছিল আনন্দ ফিরে আসবে। এবং বাড়ীতেই থাকবে।

আশায় আশায় রইলো কিছুদিন।

মাসের পর মাস গেল, বছরের পর বছর।

আনন্দ আর ফিরলো না।

ফিরলো না, কোনও খবরও দিলে না।

কাজল-বৌএর শুধু এই অনুশোচনাই হতে লাগলো যে সে-ই ঘরছাড়া করলে মানুষটাকে।

একএকবার মনে হতে লাগলো—হয়ত বা হুট্ করে এসে একদিন হাজির হবে। এসেই বলবে—বসুন্ধরার বিয়ে দেবার সময় হয়েছে তাই এলাম।

চুলদাড়িওলা সাধু-সন্ন্যাসী দেখলেই কাজল-বৌ থমকে দাঁড়ায়। দোরে ভিখিরী এসে দাঁড়ালেই ছুটে গিয়ে দেখে আসে।

ছি ছি এ কেমনধারা স্বেচ্ছানির্বাসন!

একদিন যাকে সে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিল, আজ মনে হয় সে ফিরে আসুক্!

অপরের দয়ার ওপর নির্ভর করে পথে পথে মানুষটা ঘুরে বেড়াচ্ছে, মাথার ওপর কোনও আশ্রয় নেই, রোগে সেবা করবার কেউ নেই, সময়ে চারটি খেতেও পায় না হয়ত।

বর্ষাকাল। ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি পড়ছে। কাজল-বৌ সেই বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে কাজ করছে।

বসুন্ধরা বললে, তুমি বৃষ্টিতে ভিজছো কেন মা? অসুখ করবে যে!

না না—কিছু হবে না আমার। এই বলে মেয়েকে থামিয়ে দিয়ে সে ভিজতে লাগলো। চোখের জলে আর বৃষ্টির জলে এক হলে গেল। মেয়ে বুঝতে পারলে না মা কাঁদছে।

আর-একজন এমনি ভিজছে না? কাজল-বৌ মনে-মনেই বললে, কথাটা। মেয়ের কাছে মুখ ফুটে কিছু বলাও যায় না।

এমনি করে বৃষ্টিতে ভিজে, রোদে পুড়ে, মাটিতে শুয়ে আর রাত্রি জেগে কাজ করে কাজল-বৌ।

কাজ করে আর বসুন্ধরার দিকে ফিরে ফিরে তাকায়।

বসুন্ধরা বলে, কি দেখছো মা অমন করে?

কি দেখছি?

মেয়েকে আদর করে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে, দেখছি এরই মধ্যে কত বড়টি হয়ে গেলি তুই!

অযত্নে অনাদরে মানুষ, তবু হয়ে উঠেছে যেন অগ্নিশিখা! যেমন গায়ের রং তার তেমনি স্বাস্থ্যসুন্দর দেহ। পিঠ ছাপিয়ে কোমর পেরিয়ে গেছে মাথার চুল। যেমন সুন্দর মুখ তার তেমনি সুন্দর দুটি চোখ! একবার তাকালে আর সেদিক থেকে চোখ ফেরানো যায় না—এত রূপ!

এই তো বিয়ে দেবার সময়। কিন্তু কার হাতে দেবো রে তোকে?

কাজল-বৌএর শুধু সেই এক চিন্তা।

সুবচনীর বর নিয়ে এসেছিল তার বাপ। এবারেও হয়ত সে আসবে। স্বামী তার এত নিষ্ঠুর হবে না কখনও।

ভেবে ভেবে আর শরীরের ওপর অত্যাচার করে করে অমন সুন্দর স্বাস্থ্য কাজল-বৌএর—তাও যেন গেল ভেঙে।

পাড়াপড়শী সবারই নজরে পড়লো সেটা।

কে যেন সেদিন বললে, শরীরের দিকে নজর দাও কাজল-বৌ, তুমি মরে গেলে মেয়েটার কি হবে?

কাজল-বৌ বললে, আমি মরবো না মা, আমি ঠিক বেঁচে থাকবো। আমি মরে গেলে শাস্তিভোগ করবে কে?

মুখে বলে বটে, কিন্তু বুঝতে পারে—মরলে তার চলবে না। বসুন্ধরার ব্যবস্থা একটা কিছু না হওয়া পর্যন্ত বেঁচে তাকে থাকতেই হবে।

কিন্তু মরা বাঁচা মানুষের হাতে নেই। ভাগ্যের অধিদেবতাকে চোখেও দেখা যায় না। চোখে দেখা যায় শুধু তার বাড়ীর কাছে মুখুজ্জেদের রাধাশ্যাম-মন্দিরের যুগল মূর্তিটিকে।

কাজল-বৌ কোনোদিন যায় না সেখানে। হঠাৎ সেদিন বসুন্ধরাকে বললে, চল্ যাই মুখুজ্জেদের মন্দিরে আরতি দেখে আসি।

কাজল-বৌ গিয়েছিল তার মনের কথা ঠাকুরকে জানাতে. কিন্তু সেখানে

গিয়ে যা ঘটলো সেরকম ঘটনা যে ঘটবে তা সে ভাবতেও পারেনি।

মুখুজ্যেদের অবস্থা এককালে ভালই ছিল। মন্দিরের সুমুখে নাটশালাটি পুরনো হলেও দেখতে সুন্দর। আর রাধাশ্যাম বিগ্রহের কথা তো সবাই জানে। ওরকম বিগ্রহ এ-তল্লাটে কোথাও নেই। কষ্টিপাথরের শ্যাম, আর অষ্টধাতুর রাধা। গ্রামের মেয়েছেলে অনেকেই সন্ধেবেলা এখানে বেড়াতে আসে। গাছপালায় ঢাকা জায়গাটি বড় মনোরম।

কাজল-বৌ সোজা মন্দিরের কাছে গিয়ে প্রণাম করছিল। সন্ধ্যে তখনও হয়নি। আরতি হতে দেরি আছে।

প্রণাম করে যেই মাথা তুলেছে, দেখলে, বাবুদের মেজ-বৌ তার পাশে দাঁড়িয়ে।

বলি হ্যাঁ গা, কাজল-দিদি, মেয়েটাকে পাঠাওনি কেন? আমার ছেলেমেয়েরা যে ওর জন্যে হেদিয়ে মলো! ওই দ্যাখো না! বসুন্ধরাকে দেখবামাত্র ওর কোলে গিয়ে ঝাঁপিয়ে উঠেছে।

কাজল-বৌ দেখলে, নাটশালার এক-পাশে বছর-চারেকের একটা ছেলে আর বছর-খানেকের একটা মেয়েকে নিয়ে বসুন্ধরা বসে পড়েছে খেলা করতে।

ও তো যেতে বললেই যায়। আমিই ওকে যেতে দিইনি।

কথাটা ভাল করেই বলেছিল কাজল-বৌ। কিন্তু মেজ-বৌ তার জবাব দিলে অন্য রকম করে। বললে, তা দেবে কেন? মেয়ে এখন তোমার বড় হয়েছে, খুঁটে খেতে শিখেছে, এখন আর তোমার ভাবনা কি?

মন-মেজাজ ভাল ছিল না কাজল-বৌএর। কথাটা শুনে ফিরে দাঁড়ালো। বললে, খুঁটে খেতে শিখেছে মানে? কী বলতে চাও তুমি?

মেজ-বৌও কম যায় না। বললে মানেটা আর বুঝতে পারলে না? যখন দরকার ছিল তখন পাঠিয়েছ। তোমার বসুন্ধরা যখন এই এতটুকু মেয়ে—তখন থেকে এই সেদিন পর্যন্ত ও তো আমার ঘরেই খেয়ে-পরে মানুষ! ভাল ভাল জামা দিয়েছি, কাপড় দিয়েছি, খেতে দিয়েছি—তবে হ্যাঁ, তার জন্যে ও আমার উপগার কিছু করেছে বই-কি! আমার যেমন পোড়া কপাল, বছর-বছর ছেলেমেয়ে হয়েছে, ও-ই তাদের মানুষ করেছে। আমিও যেমন করেছি, ও-ও তেমনি করেছে। কিন্তু আজ যদি তুমি বল—বসুন্ধরা, বাবুদের বাড়ী যাসনে। নিমকহারামী হবে না?

কাজল-বৌ বললে, কিন্তু কেন যেতে বারণ করেছি সেটি তো বুঝলে না মেজ-বৌ।

কেন বারণ করেছ শুনি?

কাজল-বৌ বললে, বসুন্ধরার ওই বয়েস আর ওই চেহারা, আর তোমাদের বাড়ীতে হুদো হুদো ব্যাটাছেলে!—কার মনে যে কি আছে কিছু তো বলা যায় না।

মেজ-বৌ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। বললে, বুঝেছি। বসুন্ধরা আমার ছোট ঠাকুরপোর কথা বলেছে বুঝি তোমাকে?

কাজল-বৌ বললে, কই না, কারও কথা তো বলেনি।

নিশ্চয়ই বলেছে, নইলে তুমি জানলে কেমন করে?

আমি কিছু জানি না মেজ-বৌ, এই ঠাকুর-ঘরে দাঁড়িয়ে বলছি—

মেজ-বৌ বললে, বয়েস-কালে অমন কত হয়। সে কি আর গায়ে লেখা থাকে কারও! তোমার মেয়েটিও তো কম নয়। ছোট ঠাকুরপোর গায়ে জল ছুঁড়ে দেয়, ভেংচি কাটে, আরও কত কী করে।

মন দিয়ে শুনছিল কাজল-বৌ। শুনতে শুনতে বললে, তারপর?

তারপর আর-কি! তোমার অমন সুন্দরী বিয়ের যুগ্যি মেয়ে, চোখের সামনে দেখছে সব সময়, পুরুষ-ব্যাটা-ছেলে ছোট ঠাকুরপো মাথার ঠিক রাখতে পারেনি, কি যেন সব ফষ্টিনষ্টি করেছিল ওর সঙ্গে।

ব্যাস, কাজল-বৌএর মুখখানা হঠাৎ কেমন যেন শক্ত হয়ে গেল। বজ্র-টজ্র পড়লো নাকি কোথাও? আর কোনও কথা সে শুনতে চাইলে না। হন্ হন্ করে এগিয়ে গেল নাটশালার দিকে।

বাবুদের মেজবৌ—মানে দেশে তখন জমিদারী ছিল, কুলটিকরি গ্রামের জমি-দারের মেজ-বৌ পেছনে দাঁড়িয়ে রইলো 'থ' হয়ে। কথাটা তার তখনও শেষ হয়নি। তার সেই অসমাপ্ত কথার মাঝ-খানে নিতান্ত দরিদ্র এক বাউণ্ডুলের বৌ সিংহিনীর মত গিয়ে দাঁড়ালো বসুন্ধরার কাছে।

হাতে ধরে টেনে তুললে বোধকরি অশোভন হয়, তাই সে শুধু গম্ভীরমুখে বললে, বসুন্ধরা, আয়!

মাকে সে দেখতেও পায়নি এতক্ষণ। বুকের আঁচলটা ঘোমটার মত করে মাথায়-মুখে ঢাকা দিয়ে বসুন্ধরা ছেলে-মেয়ে দুটোকে বোধকরি ভয় দেখিয়ে হাসাহাসি করছিল, মার ডাক শুনে মাথায় কাপড়টা তুলে মা'র মুখের দিকে তাকাতেই তার মুখের হাসি বন্ধ হয়ে গেল।

মা বললে, ওঠ্। চল্ বাড়ী চল্।

কিন্তু এই বাচ্চা মেয়েটা? ছেলেটা?

বসুন্ধরা সুমুখে তাকিয়ে দেখলে, মেজ-বৌ এক পা এক পা করে এগিয়ে আসছে সেইদিকে।

উঠে দাঁড়িয়েছিল বসুন্ধরা।

কাজল-বৌ তার একখানা হাত চেপে ধরে একরকম টেনেই নিয়ে গেল সেখান থেকে।

সারা রাস্তা বসুন্ধরার সঙ্গে একটি কথাও বললে না কাজল-বৌ।

মায়ের হাবভাব দেখে খানিকটা আঁচ করেছিল বসুন্ধরা।

ঠিক, যা ভেবেছিল তাই হলো।

বাড়ীতে আর তৃতীয় ব্যক্তি কেউ নেই। মা আর মেয়ে। তবু বাড়ী ঢুকেই দরজার খিলটা বন্ধ করে দিলে কাজল-বৌ। তারপর আলো জেলে সন্ধ্যে দেবার পর্যন্ত তর সইলো না তার। উঠোনের ওপরেই বসুন্ধরাকে কাছে ডেকে বললে, বাবুদের সেই ছোঁড়াটার সঙ্গে কী তুই করেছিস বল্!

কিচ্ছু করিনি মা।—আমার—আমি—

কেমন যেন একটু থতমত খেয়ে গেল বসুন্ধরা।

কাজল-বৌ তখন থর থর করে কাঁপছে। ফট্ করে বসুন্ধরার গালে এক চড় বসিয়ে দিয়ে বললে, আমি যা ভয় করেছিলাম, তাই।

আদরের মেয়ে বসুন্ধরা।

চোখ দুটি তার জলে ছল্ ছল্ করে এলো।

কাজল-বৌ বললে, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? বল্। বলেই তার মনে হলো, পাশের বাড়ী থেকে কেউ যদি শোনে!—এইদিকে সাবে আর হতভাগী।

হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল তাকে ঘরের দাওয়ায়।—বল্ কি সর্বনাশ করেছিস! আগে আমি শুনবো, তারপর আলো জ্বালবো।

বসুন্ধরার গোলাপী দুই গালের ওপর সুন্দর দুটি জলের ধারা নেমেছে তখন। অভিমানে মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না। তবু লজ্জার কথা বলতে হলো তাকে।

সেদিন থেকে আমি আর গেছি ওদের বাড়ী?

আজে-বাজে কথা বলছিস কেন, কি হয়েছে তাই বল্।

কিচ্ছু হয়নি মা। এই আমি তোমার পায়ে হাত দিয়ে—

না তোকে পায়ে হাত দিতে হবে না। তুই কি করেছিস তাই বল্।

কিচ্ছু করিনি।

আবার বলে কিচ্ছু করিনি। আমি সব শুনেছি মেজ-বৌএর কাছ থেকে।

কিচ্ছু শোনোনি। আমি তো সব বলেছি মেজ মাসীমাকে।

কী বলেছিস?

রোজই তো বলতাম—শম্ভুদা ভারি অসভ্য। আমাকে দেখলেই কিরকম করে।

মেজবৌ কি বলতো?

খালি-খালি হাসতো আর বলতো, কল্‌কেগে। ভারি তো একটু জল ছুঁড়ে দিয়েছে গায়ে, তাতে কি ফোস্‌কা হয়ে গেল নাকি তোর?

তারপর?

তারপর সেদিন বাড়ী আসছিলাম, সিঁড়ির কাছটায় দাঁড়িয়েছিল শম্ভুদা, আমি দেখতে পাইনি! আমাকে ধরে ফেললে।

তুই চেঁচালি না কেন?

চেঁচালাম তো। মেজ মাসীমা এসে দাঁড়াতেই আমাকে ছেড়ে দিলে। আমি ছুটে বাড়ী চলে এলাম। সেদিন থেকে আর গিয়েছি?

আর কিছু করেনি?

না। শোনো!

বলেই সে তার মায়ের মাথাটা নিজের মুখের কাছে টেনে এনে কানে-কানে চুপিচুপি কি যেন বলে চুপ করে রইলো।

ঠিক বলছিস তো? গালে কামড়ে দিয়েছিল, আর কিছু করেনি?

বসুন্ধরা মাথা নেড়ে বললে, না মা না, তুমি ভেবো না।

ভাববো না কি না! মেয়ে হয়ে জন্মেছিস যে!

এই বলে কাজল-বৌ উঠলো। উঠে বললে, নে আর বসে থাকিসনে, লণ্ঠন জ্বাল্, জ্বালিয়ে উনোনে আগুন দে। আমি ততক্ষণ তুলসীতলায় প্রদীপটা দিয়ে আসি।

তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়ে প্রণাম করতে গিয়ে কাজল-বৌএর শুধুই মনে হতে লাগলো—বসুন্ধরা বড় হয়েছে। তার বিয়ে দিতে হবে। কিন্তু কার হাতে তুলে দেবে তার ওই সোনার প্রতিমাকে? কানা একটি ছেলের হাতে তো দিয়েছে এক-জনকে তুলে।

চার বছর বিয়ে হয়েছে তার।

চার বছরে হয়েছে তিনটে ছেলে। এখন সে তিন ছেলের মা।

দেখতে ইচ্ছে করে তবু সে একটি-বারের জন্যও আসে না এখানে।

আসে না শুধু মায়ের কষ্ট হবে বলে।

চিঠি লেখে—আমি বেশ ভালই আছি মা, আমার জন্যে ভেবো না।

না, ভাববে না। সুবচনীর জন্যে ভাববে না, বসুন্ধরার জন্যে ভাববে না, নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর জন্যে ভাববে না, তার আবার ভাবনা কিসের?

গেল বছর দেশে আম হয়েছিল খুব। একটা লোক দিয়ে নিজের গাছের এক ঝুড়ি আম পাঠিয়ে দিয়েছিল সুবচনী। সঙ্গে চিঠি লিখেছিল,—আমার বাড়ীর গাছে এত এত ফল হয় না, পাঁচ ভূতে খেয়ে যায়, আমি কিন্তু একটাও মুখে

দিতে পারি না। খালি খালি মনে হয় আমার মা খাচ্ছে না, বোন খাচ্ছে না।

বাস্‌ আর সে পড়তে পারেনি চিঠিখানা। টপ্‌ টপ্‌ করে চোখের জল পড়েছিল চিঠির ওপর। চিঠিখানা বসুন্ধরার হাতে তুলে দিয়ে বলেছিল—নে তুই পড়!

বসুন্ধরা বাকি চিঠিখানা পড়ে শুনিয়েছিল মাকে।

—"বসুন্ধরা এতদিনে নিশ্চয়ই খুব বড় হয়ে উঠেছে। এবার তার বিয়ে দিতে হবে। তোমার জামাইকে বলেছি—ভাল একটি ছেলের খোঁজ করছে সে। বলেছি টাকাকড়ি কিছু দিতে পারবো না, শুধু মেয়েটিকে দেখে নিতে হবে। তা বসুন্ধরাকে যে দেখবে তারই পছন্দ হবে।

আমিও কম চেষ্টা করছি না। আমাদের বাড়ীর একেবারে গায়ে-লাগা যে-বাড়ী, সেই বাড়ীতে একটি ছেলে আছে মা, রাজপুত্তুরের মতন চেহারা। ছেলেটি বি-এ পাশ করে কলকাতায় চাকরি করছে। কলকাতা তো আমাদের শ্যামানন্দপুর থেকে বেশি দূরে নয়। লোকজন সব রোজ যায় রোজ আসে। সেই ধীরু-ঠাকুরপোর সঙ্গে আমাদের বসুন্ধরার যদি বিয়ে হতো মা, কি ভাল যে হতো তা আর বলবার নয়। বাড়ীতে শুধু বিধবা মা। দিব্যি দোতলা বাড়ী, ঘাট-বাঁধানো পুকুর, তার ওপর ধীরু-ঠাকুরপো চাকরি করছে কলকাতায়। আমার মতন যদি বছরে বছরে ছেলে হয় বসুন্ধরার, ছেলেমেয়েতে ঘর যদি ভরেও যায় তবু ভাববার কিছু নেই।

আমি সেদিন কপাল ঠুকে বলেছিলাম ধীরু-ঠাকুরপোকে। বলেছিলাম তুমি শুধু একটিবার দ্যাখো আমার বোনটিকে। তা সে কি বললে জানো মা, বললে, তোমার বোন কতদূর পড়েছে। হায় রে কপাল, সবাই আজকাল লেখা-পড়া-জানা মেয়ে বিয়ে করতে চায়। বসুন্ধরা যদি লেখাপড়া জানতো! ভাগ্যিস তুমি আমাদের মেরে মেরে নিজে পড়িয়েছিলে। তাই আজ বাংলা বই পড়তে পারি, চিঠি লিখতে পারি।

আমি এখনও ধীরু-ঠাকুরপোর পেছুতে লেগে আছি মা। তুমি কিছু ভেবো না। জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে, তিন বিধাতা নিয়ে। ইতি।

তোমার সুবচনী।"

জন্ম মৃত্যু বিয়ে, তিন বিধাতা নিয়ে!

কাজল-বৌ জানে সবই, তবু তার ভাবনার অন্ত নেই। মেয়ে করে তাকে পাঠিয়েছে ভগবান, মা হবার জন্যেই তার জন্ম, তবু সেই মা হবার ভয়েই স্বামীকে সে তাড়িয়েছে বাড়ী থেকে। তাহলে আর তার সন্তানের জন্মটা বিধাতার হাতে রইলো কোথায়? দুটো মেয়ে তার মরে গেছে। মৃত্যুও যে বিধাতার হাতে—দুদিনের জন্য পৃথিবীতে এসে কীট-পতঙ্গের মত মরে গিয়েই কি সেকথা তারা প্রমাণ করে দিয়ে গেল? আর বিয়ে? তার মায়ের মত সে নিজেও কি কাউকে ভালবেসে দেহ দান করে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারতো না? যাত্রার দলে অর্জুন-সাজা আনন্দ হালদারের বাড়ীতে তাকে কি আসতেই হতো? সুবচনীকে একচোখ কানা ঝন্টন চক্রবর্তীর হাতে তুলে দেওয়া ছাড়া তার কি কোনও পথ ছিল না?

সুবচনী লিখেছে—ভেবো না মা।

তবু সে তার পেটের মেয়ে, লিখেছে এই যথেষ্ট।

কাজল-বৌ বললে, রান্না আমি করছি বসুন্ধরা। তুই বই নিয়ে বোস্‌, একটু লেখাপড়া কর্‌।

বসুন্ধরা বললে, সুনীতি পাঠ তো আমার শেষ হয়ে গেছে মা, আর তো বই নেই, কি পড়বো?

কাজল-বৌ বললে, খাতা-পেন্সিল নিয়ে হাতের লেখা অভ্যেস্‌ কর্‌।

মা তার হঠাৎ এ-কথা কেন বললে, বসুন্ধরার বুঝতে দেরি হলো না। খাতা-পেন্সিল নিয়ে বসলো বসুন্ধরা। বললে, দিদিকে একখানা চিঠি লিখি মা।

তাই লেখ্‌। অনেকদিন তার খবর পাইনি।

খুব মন দিয়ে চিঠিখানা লিখছিস বসুন্ধরা। কাজল-বৌ জিজ্ঞাসা করলে, কি লিখলি, পড়, শুনি।

বা-রে আমি তো হাতের লেখা অভ্যেস করছি।

তবে যে বললি—দিদিকে চিঠি লিখি।

তার মানেই তাই।

কাজল-বৌ আর কোনও কথাই বললে না। রান্না করতে করতে একসময় দেখলে মেয়েটা লিখতে লিখতে পেন্সিল হাতে নিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমন্ত মেয়ের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো কাজল-বৌ। ফুটন্ত ফুলের মত সুন্দর মুখ। নিখুঁত সুন্দরী বসুন্ধরা। সারা দেহে তার যৌবনের সাড়া জেগেছে। এ-মেয়ের আর বিয়ে না দিলে চলে না। কিন্তু হে ভগবান! যতই যা ভাবি না কেন, জন্ম মৃত্যু আর বিয়ে—এই তিনটের অধিকার তুমি মানুষের হাতে ছেড়ে দাওনি। তাই যদি সত্য হয় তো এই হতভাগীর বিয়ের ভাবনা থেকে আমাকে নিশ্চিন্ত কর!

ঘুমন্ত বসুন্ধরার হাতখানা সরিয়ে খাতাটা তুলে নিলে কাজল-বৌ। দেখলে বসুন্ধরা লিখেছে—

দিদি,

মাকে নিয়ে কি মুস্কিলে যে পড়েছি দিদি তা আর তোকে চিঠি লিখে কি জানাবো। আমি যত বড় হয়ে উঠছি মা ততই আমার জন্যে ভেবে ভেবে সারা হচ্ছে। যে-কোনও একটা পুরুষ-

ব্যাটাছেলে এখন যদি এসে বলে আমি তোমার মেয়েকে বিয়ে করবো, পয়সাকড়ি কিছু চাই না, মা বোধহয় তারই হাতে আমাকে তুলে দেবে। আমি কিন্তু দিদি ঠিক করেছি—বিয়ে আমি করব না। মার কাছে সেকথা বলবার জো নেই। মেয়ে হয়ে জন্মানোর জ্বালা কি কম? তবু তুই বেঁচেছিস—তোর তিনটে মেয়ে না হয়ে ছেলে হয়েছে। মেয়ে হলে মরতিস। ভগবান তোকে যেন একটাও মেয়ে না দেয়!

গত বছর তোর বাগানের আমের সঙ্গে তুই যে চিঠি লিখেছিলি, সেই চিঠির কথা আজকে মায়ের হঠাৎ মনে পড়েছে। লেখাপড়া জানা মেয়ে বিয়ে করতে চেয়েছে তোর সেই ধীরু-ঠাকুরপো না কে, এতদিন হয়ত সে কোনও ইস্কুল-মাস্টারণীকে বিয়ে করে সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করছে। তবু আমার মায়ের ধারণা সে বুঝি তার এই সুনীতিপাঠ-পড়া মেয়েটিকে বিয়ে করবার জন্যে বসে আছে। তাই মা আজ আমাকে বলে বললো—একটু বই নিয়ে বোস, লেখা-পড়া কর্।

আমার ওই একখানি বই দিদি—'সুনীতিপাঠ।' সে পাঠ আমার শেষ হয়ে গেছে। তাই তোকে এই চিঠি লিখে, লেখার অভ্যেস করছি।

তোর সেই রূপকথার রাজপুত্তুর ধীরু-ঠাকুরপোকে বলিস, খুব ভুল করলে যে লেখাপড়া জানা মেয়েকে বিয়ে করে। রাজকন্যে না হোক্ রূপবতী বসুন্ধরা বরণমালা হাতে নিয়ে বসে ছিল তার জন্যে।

তোর অরুণ, বরুণ, তরুণকে খুব দেখতে ইচ্ছে করে দিদি। পারিস তো একবারটি আসিস। ইতি।

বসুন্ধরা

বসুন্ধরার চেহারার মত তার হাতের লেখাটি হয়েছে সুন্দর। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কাজল-বৌ'এর দেখা যেন আর শেষই হয় না! লজ্জায় যদি সুবচনীকে চিঠিখানা সে পাঠাতে না চায় তাই খাতা থেকে পাতাটা সে ছিঁড়ে নিয়ে লুকিয়ে রেখে এলো ঘরের ভেতর। তারপর বসুন্ধরাকে বললে, ওঠ্। খেয়ে নে। এ-সব এখন রাখ্।

বলেই খাতাটা নিজেই বন্ধ করে দিয়ে লণ্ঠনটা তুলে নিলে সেখান থেকে।

বসুন্ধরা বুঝতেই পারলে না তার দিদিকে লেখা চিঠিখানা তার খাতার ভেতর নেই।

বুঝতে যেদিন পারলে, কাজল-বৌ তার আগেই খামের ঠিকানাটা নিজের হাতে লিখে চিঠিখানা সুবচনীকে পাঠিয়ে দিয়েছে।

বসুন্ধরা বললে, আমার খাতা থেকে পাতা কে ছিঁড়লে মা?

কাজল-বৌ বললে, বাইরের লোক তো কেউ আসেনি ছিঁড়তে, আমিই ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি। ছি! অমনি করে লেখে নাকি?

বসুন্ধরা বললে, তুমিও যেমন! আমি কি দিদিকে সত্যি-সত্যিই লিখছিলাম নাকি? হাতের লেখা মক্স করছিলাম।

তা হাতের লেখাটি তোর ভালই হয়েছে।

এই বলে কথাটা কাজল-বৌ পাল্টে দিলে।

বসুন্ধরা হাসতে হাসতে বললে, কেমন মাস্টারণীর কাছে শিখেছি দেখতে হবে তো! তুমি যে ভাল মাস্টারণী মা। তোমার বাবা মাস্টার ছিল যে! —আচ্ছা মা, তুমি তো অনেক লেখাপড়া শিখতে পারতে, শেখোনি কেন?

আমার বাবা চেয়েছিল শেখাতে। মা দেয়নি। মেয়েদের লেখাপড়া শেখবার এমন রেওয়াজও ছিল না তখন। মা বলতো, কি হবে বাসন্তীর লেখাপড়া শিখে, সারাজীবন হয়ত ভাতই রাঁধবে-আর ছেলে মানুষ করবে! তা মা বেঁচে থাকলে এই দুর্গতি আমার হতো না হয়ত। মার হাতে অনেক টাকা ছিল, অনেক সোনার গয়না ছিল।

মনের দুঃখেই এই সব কথা বলছিল কাজল-বৌ।

তা বসুন্ধরার চেহারাও যেমন সুন্দর তার বুদ্ধিও তেমনি ধারালো। চট্ করে অমনি ধরে বসলো তার মাকে—আচ্ছা মা, তুমি যে কথায় কথায় দুঃখু-দুঃখু দুর্গতি-দুর্গতি করো, এই তো বললে তোমার মায়ের হাতে টাকা ছিল সোনা ছিল, কিন্তু তাতে তোমার দুর্গতি ঠেকাতে পেরেছে?

মা যে আমার মরে গেল!

বসুন্ধরা বললে, তবেই দ্যাখো, ও সব মানুষের হাতে নয়।

কাজল-বৌ বসুন্ধরার মুখের দিকে তাকালো। এমন করে মেয়েকে সে কোনোদিন যেন দেখেনি। ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো বসুন্ধরার কাছে। বললে, এ-সব কথা এই বয়েসে কোথায় তুই শিখলি রে?

বসুন্ধরা দুহাত দিয়ে মাকে তার জড়িয়ে ধরে বললে, তোমার কাছে।

মাও তখন মেয়ের মুখখানি নিজের বুকের ওপর চেপে ধরে বললে, এমনি কথাগুলো যদি বলিস তাহলেও অনেকটা নিশ্চিন্ত হই।

বলতে বলতে কাজল-বৌ'এর বুক থেকে কেমন যেন একটা স্বস্তির দীর্ঘ-নিশ্বাস বের হয়ে এলো। মনের কথা তার খুলেই বলে ফেললে মেয়ের কাছে।—আমি ছাড়া তোকে দেখবার যে আর

কেউ নেই বসুন্ধরা. তাই আমি এত ভাবি। তাহলে বল্—আমি মরে গেলে তুই তোর পথ ঠিক বেছে নিতে পারবি!

খুব দুঃখের কথা। তবু বসুন্ধরা তার মাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই বোধহয় জোর করে বললে, খুব পারবো। তুমি ভেবো না।

কাজল-বৌ আবার বললে, শম্ভুর মত ওই সব জানোয়ারগুলো তোকে টেনে ছিঁড়ে খেতে পারবে না বল্।

বসুন্ধরা বললে, আমি যদি ছিঁড়ে খেতে দিই, তাহলেই খাবে। আর যদি না দিই তো ওর চোদ্দপুরুষের সাধ্যি নেই আমার কিছু করে।

এই তো কথার মত কথা! কাজল-বৌ এইটিই যেন শুনতে চেয়েছিল বসুন্ধরার মুখ থেকে। মেয়েকে বুকের ওপর আরও ভাল করে চেপে ধরে একটু আদর করে তার সেই আপেলের মত মসৃণ সুন্দর গালের ওপর হাত বুলিয়ে বললে, সেদিন খুব জোরে একটা চড় মেরেছিলাম। যা দেখি, গাছ থেকে মোচাটা কেটে আন্। আজ একটা নতুন রান্না তোকে শিখিয়ে দিই।

বসুন্ধরা বঁটি হাতে নিয়ে কলাতলায় গেল মোচা কাটতে, কাজল-বৌ ঢুকলো রান্নাঘরে। —খুব সত্যি কথা বলেছে মেয়েটা। আমার ইচ্ছে না থাকলে কে আমাকে খারাপ কাজ করাতে পারে? কিন্তু 'ইচ্ছে'—'ইচ্ছে', এই যে এক সর্বনাশা কথা—ইচ্ছে। এই ইচ্ছেটা তো আর জন্তু-জানোয়ারের নেই। তাদের আছে শুধু দেহ। মানুষের আছে দেহ আর মন। দেহের ইচ্ছে আর মনের ইচ্ছে। এই দুটো মানুষকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে দিনরাত।

এমনি ভাবনার সূত্র ধরে কাজল-বৌ অনেক দূরে চলে গেল। ভাবনা-চিন্তার আর থেই খুঁজে পেলে না কোথাও। এই পুষ্পিত-যৌবনা বসুন্ধরা, তার ওই অনবদ্য সুন্দর দেহ! দেহের একটা স্বাভাবিক ক্ষুধা আছে, মনের একটা স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা আছে। মেয়ে হয়ে জন্মেছে। মা হবার দুর্বার বাসনাকে সে দমন করবে কিসের জোরে? তবে শুধু তাকে একটা কথা শিখিয়ে রাখা দরকার—

ও মা, তুমি এখনও আগুন দাওনি উনোনে? কি ভাবছো বসে বসে?

মোচাটা মায়ের সামনে নামিয়ে দিয়ে বসুন্ধরা বললে, কেমন করে কুটবো বল।

মা বললে, শোন্, তার আগে তোকে একটা কথা বলে রাখি। দ্যাখ্, মানুষের ভেতর জন্তু-জানোয়ার অনেক আছে। জন্তু-জানোয়ারের ছেলে জন্তু-জানোয়ারই হয়। তুই যেন জন্তু-জানোয়ারের মা হতে চাস্ না কোনোদিন।

ধেৎ! কী যে সব ভাবো আর কী যে সব বলো! সরো। তুমি মোচা কোটো, আমি আগুন দিই।

এই বলে বসুন্ধরা তার কোমরের কাপড়টা গাছকোমর করে বেঁধে কাজল-বৌকে জোর করে সরিয়ে দিলে সেখান থেকে।

সুবচনীর চিঠির জবাব এলো শ্যাম-নন্দপুর থেকে। কাজল-বৌ'এর শরীরটা আজ ক'দিন থেকেই ভাল যাচ্ছে না। রোজ সকালে মাথা ধরে, বিকেলে গাটা জ্বর-জ্বর করে। বসুন্ধরা গিয়েছিল সরকারদের বাড়ী মা'র জন্যে পেয়ারা আনতে। উঠোনের গাছটা তাদের পেয়ারায় পেয়ারায় ভরে গেছে। বসুন্ধরা গাছে উঠতে জানে। নিজেই গাছে উঠে এক আঁচল কাঁচা-পাকা পেয়ারা পেড়ে নিয়ে একটা পেয়ারা খেতে খেতে বাড়ী ফিরছিল, পিয়ন তার হাতে চিঠিটা দিলে। হাতের লেখা দেখেই বুঝেছিল দিদির চিঠি। পেয়ারাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চিঠিটা খুললে সে রাস্তার মাঝখানেই। পড়লে চিঠিখানা। দিদি লিখেছে—

"তোর চিঠি পেলাম বসুন্ধরা।"

ও-মা, সে আবার কখন্ চিঠি লিখলে দিদিকে?

আরও কয়েকটা লাইন পড়তেই গোপন রহস্য বুঝতে তার আর বাকি রইলো না। তার সেই খাতায় লেখা চিঠিখানা ছিঁড়ে নিয়ে মা ঠিক পাঠিয়ে দিয়েছে দিদিকে।

—"তোর বড় কপাল মন্দ বসুন্ধরা। নইলে আমি ঠিক পটিয়ে এনেছিলুম ধীরু-ঠাকুরপোকে। ধীরু-ঠাকুরপো চাই-ছিল একটি লেখাপড়া জানা মেয়ে, আর তার মা চাইছিল একটি বড়লোকের মেয়ে। কপালগুণে জুটেও গেল। কলকাতা থেকে এক বড়লোক এসেছিল তাদের ঘাট-বাঁধানো পুকুরে ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে। ধীরুকে দেখে মনে ধরে গেল তাঁর। ভদ্রলোকের একটি মাত্র মেয়ে। আই-এ পাশ করে বি-এ পড়ছে। কলকাতায় মস্ত বড় বাড়ী, বিষয়-সম্পত্তি টাকাকড়ি যা-কিছু আছে সবই ওই মেয়ে-জামাই পাবে। এমন সুযোগ ছাড়ে? ধীরু-ঠাকুরপোর মা—আমি তাঁকে মাসীমা বলে ডাকি, তিনি তো দু'পায়ে লাফাচ্ছেন। বোধহয় আসছে-মাসেই বিয়ে হয়ে যাবে।

যাকগে। রূপবতী বসুন্ধরার বর আমি জুটিয়ে দিচ্ছি। ভাবিসনে তুই।
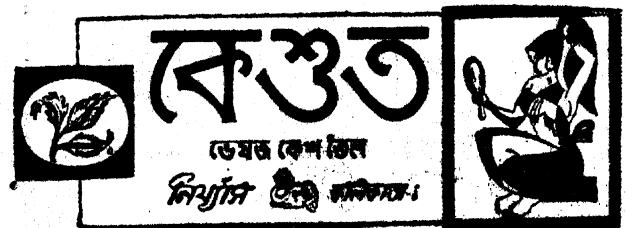
মাকেও ভাবতে বারণ করিস্। অরুণের বাবা চেষ্টা করছে খুব। দুটি পাত্রের খবর এনেছিল। আমার ভাল লাগেনি।

অরুণ, বরুণ, তরুণ ভালই আছে। ভারি দুরন্ত হয়েছে তারা। মাকে আর আলাদা চিঠি লিখলাম না। এই চিঠিখানাই দেখাস মাকে। ইতি। তোর দিদি।"

এ চিঠি আর মাকে দেখিয়ে কি হবে? মার খুশী হবার মত কোনও খবর নেই। ধীরু-ঠাকুরপোর বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেছে। দুটি পাত্র দেখেছিল জামাইবাবু। দুটিই অচল।

বাড়ী ঢুকে দেখে, জ্বরে একেবারে বেহুঁস হয়ে পড়ে আছে কাজল-বৌ। গা যেন আগুনের মত পুড়ে যাচ্ছে। বসুন্ধরার আঁচলের পেয়ারা আঁচলেই রইলো, জামার নীচে লুকনো চিঠিখানা আর বের করতে হলো না, মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বসুন্ধরা ডাকলে, মা!

এক ডাকে সাড়া পেলো না তার। তিন চার বার ডাকবার পর চোখ চেয়ে তাকালো কাজল-বৌ। চোখদুটো লাল। শুধু একবার বললে, উঁ। বলেই আবার চোখ বুজে এলিয়ে পড়লো।

মার এরকম অসুখ বসুন্ধরা কখনও দেখেনি। নিজেকে নিতান্ত অসহায় বলে মনে হতে লাগলো।

তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে মা? জল খাবে?

উঁ।

জল খাবে?

না।

থাক্ আর বকিয়ে কাজ নেই। মা ঘুমোচ্ছে, ঘুমোক্। বসুন্ধরা তার আঁচলের পেয়ারাগুলো রাখলে। চিঠিখানা রাখতে গিয়ে আর-একবার খুলে পড়লে। গ্রামে দুজন ডাক্তার আছে। হোমিও-প্যাথী ডাক্তারকে ডাকলে নেবে এক টাকা, আর এ্যালোপ্যাথী ডাক্তার নেবে দু'টাকা।

কিন্তু টাকা কোথায়?

আজকের রাতটা পার হোক্, কাল দেখা যাবে।

ঠাণ্ডা ভাত বসুন্ধরা খেতে পারে না বলে রোজ রাত্রে কাজল-বৌ গরম ভাত রান্না করে। বসুন্ধরার সেদিন ইচ্ছে করলো না রান্না করতে। হেঁসেলে দেখলে, দিনের ভাত ভিজনো রয়েছে অনেকগুলো। মা আজ খায়নি। ডাল ছিল খানিকটে, আর ছিল একটা পাথরের বাটিতে এক বাটি টক। বসুন্ধরা টিন থেকে ঢেলে আনলে কতকগুলো মুড়ি, আনলে খানিকটা সরষের তেল, আনলে কাঁচা পেঁয়াজ আর কাঁচা লঙ্কা। তারপর সব একসঙ্গে মাখিয়ে পরমানন্দে খেলে সেইগুলো।

সকাল-সকাল খেয়ে নিয়ে, এঁটো পরিষ্কার করে, থালাবাটি মেজে ধুয়ে পরিপাটি করে রেখে রান্নাঘরের শেকল তুলে দিয়ে বসুন্ধরা এলো তার মায়ের কাছে।

আজ সে-ই হয়েছে মা, মা হয়েছে মেয়ে।

রোজ রাত্রে কাজল-বৌ যেমন করে বসুন্ধরাকে জড়িয়ে ধরে শোয়, সেদিন বসুন্ধরা তেমনি করে তার মাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়লো।

মাকে ভাল করে দাও ঠাকুর, মা ছাড়া আর যে কেউ নেই!

চোখ দিয়ে দর দর করে জল গড়িয়ে এলো বসুন্ধরার।

রাত্রে জ্বর যদি না ছাড়ে, কাল সকালেই সে যাবে ডাক্তারের কাছে।

নিজেকে খুব একা মনে হতে লাগলো তার।

এ সময় তার বাবা যদি থাকতো!

পৃথিবীতে এমন ঘটনা ঘটে যা একেবারে অপ্রত্যাশিত।

ঘটে হয়ত এমনিই, কিন্তু মানুষের মন নানা রকম তার ব্যাখ্যা করতে থাকে। কেউ-বা করে তার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা, কেউ-বা করে অন্য-কিছু।

রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি বসুন্ধরার।

এক চট্‌কা ঘুমের পর যেই তার ঘুম ভেঙে গেছে, মায়ের কপালে হাত দিয়ে দেখেছে—তখনও তেমনি গরম। রীতিমত ভয় হয়েছে বসুন্ধরার। ভয়ে ভয়ে শুধু ভগবানকে ডেকেছে আর ভেবেছে—মা যদি মরে যায়, তাহলে তার কি হবে? কোথায় সে যাবে?

এ পৃথিবীতে একা থাকবার উপায় নেই তার। সব সময়েই তাকে আগলাবার জন্য একজন শক্ত মানুষ চাই। কিন্তু কেন? কেন? সেই বর্বর যুগ থেকে মানুষ কি এক চুলও এগোয়নি এখনও! রাবণেরা কি চিরজীবী?

আবার কখন্ ঘুমিয়ে পড়েছিল বসুন্ধরা।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপন দেখলে, তার

বাবা এসেছে। ঘুমের ঘোরেই সে চেঁচিয়ে উঠেছিল 'বাবা' বলে। তারপর কখন্ সকাল হয়েছে বুঝতে পারেনি।

মায়ের কপালটা একটু ঠাণ্ডা মনে হলো। মা ঘুমোচ্ছে।

পাশেই খিড়কির পুকুর। বসুন্ধরা গিয়েছিল কাপড় কাচতে।

ফিরে এসে কাপড় ছেড়ে ভিজে কাপড়টা উঠোনে মেলছিল বসুন্ধরা, সদর দোরের বাইরে কে যেন তার নাম ধরে ডাকছে মনে হলো।

তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা খুলে দিতেই দেখলে সৌম্যদর্শন এক সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে! বসুন্ধরার বাবা—আনন্দ হালদার।

তার স্বপ্নের সঙ্গে এমন হুবহু মিলে যাবে তা সে ভাবতে পারেনি। আনন্দর মুখের দিকে কেমন যেন অবাক হয়ে তাকিয়েছিল বসুন্ধরা। আনন্দ, বললে, অমন করে তাকিয়ে রয়েছিস কেন মা, চিনতে পারিসনি?

বসুন্ধরা বললে, না বাবা, আজ আমি তোমাকে স্বপ্নে দেখেছি। আর ঠিক আজই তুমি এলে। কাল থেকে মা'র জ্বর হয়েছে।

এই বলে সে ঘরে ঢুকলো মাকে এই খবরটা দেবার জন্যে।

ঘাম দিয়ে কাজল-বৌ'এর জ্বরটা ছাড়ছে তখন। বসুন্ধরা ভেবেছিল মা ঘুমোচ্ছে। কপালে হাত রাখতেই কাজল-বৌ বলে উঠলো, কার সঙ্গে কথা বলছিলি?

কেমন যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললে, বাবা এসেছে মা।

"হ্যাঁ, আমি এসেছি।"

আনন্দ ঘরে ঢুকলো। দাড়ি চুল আরও বড় হয়েছে। চেহারাটা আরও সুন্দর হয়েছে আনন্দ হালদারের।

"জানি তুমি আসবে।"

কাজল-বৌ'এর ক্লান্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

আনন্দ এগিয়ে গেল। মুখে কোনও কথা বললে না। শুধু তার হাতটি বাড়িয়ে কাজল-বৌ'এর কপালে রাখলে। কাজল-বৌও তার একটি হাত তুলে আনন্দর হাতটিকে চেপে ধরলে। চোখ খুলে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো কিছু-ক্ষণ। তারপর তার চোখের কোণ বেয়ে দুটি অশ্রুর ধারা গড়িয়ে আসতেই হাতটা ছেড়ে দিয়ে ডাকলে, বসুন্ধরা!

যাই মা!

আসতে হবে না। তোর বাবাকে চা করে দে।

কাজল বৌ'এর কপাল থেকে হাতটা তুলে নিয়ে আনন্দ বললে, তুমি একটু চুপ করে শুয়ে থাকো। আমি চান করে আসি।

অনেকদিন পরে তার নিজেরই খিড়কির পুকুরে স্নান করে এলো আনন্দ হালদার। নিজেরই বাড়ীতে আজ সে আগন্তুক। কেমন যেন অদ্ভুত অদ্ভুত মনে হচ্ছে সব-কিছু।

সারা ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থক্ষেত্র পরিক্রমা করেছে সে তিনবার। তার এই বড় বড় চুলদাড়ি, দীর্ঘায়িত দেহ, গৌর-বর্ণ আর গৈরিক বস্ত্র দেখে অনেক ভেবেছে—সে একজন সিদ্ধ সাধক। যাত্রার দলে অভিনয় করতো সে। ভাল অভি-নেতা বলে তার নাম হয়েছিল। সিদ্ধ-সাধকের অভিনয় করে সে তার জীবনটাকে কাটিয়ে দিতে পারতো। কিন্তু তা সে কোনোদিন করেনি। হাতে পয়সা ছিল না বলে চুলদাড়ি রাখতে বাধ্য হয়েছিল. সাদা জামাকাপড় তাড়া-তাড়ি ময়লা হয়ে যায় বলে কাপড়জামা গেরুয়া রঙে ছুপিয়েছিল প্রথমে। কোনও গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করেনি, কারও কাছ থেকে মন্ত্রদীক্ষা নেবার লোভ তার কোনোদিন হয়নি। পাঠ নিয়েছিল সে তার নিজেরই জীবনের কাছে। সংগ্রাম করেছিল নিজেরই জীবনের সঙ্গে। শরণাপন্ন হয়েছিল জীবন-দেবতার। জানতে চেয়েছিল জীবনের রহস্য। জানতে চেয়েছিল আনন্দ হালদার নামে যে-মানুষটি জগতে বিচরণ করছে, কী তার সত্য পরিচয়!

মনে হয় এতদিন পরে সে তা জেনেছে।

স্নান করে ফিরে এসে আনন্দ দেখলে, কাজল-বৌ উঠে বসেছে।

বসুন্ধরা চা তৈরি করেছিল। মাকে বাবাকে চা দিয়ে নিজেও সে খেতে বসলো। চা খেতে খেতে বললে, যা ভয় আমার হয়েছিল কাল! মা ভাল করে কথা বলছে না, বাড়ীতে একটা মানুষ নেই—

আনন্দ হাসছিল।

কাজল-বৌ বললে, তুমি হাসছো? আচ্ছা ভাবো তো, আমি যদি মরে যেতাম, একা ও মেয়েটা কি করতো?

আনন্দ বললে, কেন ভাববো কেন? কল্পনায় দুঃখ তৈরি করে কষ্ট পেতে যাব কেন?

কাজল-বৌ বললে, বেশ আনন্দময় পুরুষ যা-হোক! বাপ্-মা নামটিও রেখেছিল বেছে-বেছে—আনন্দ।

ফিক্ করে হেসে ফেললে বসুন্ধরা।

—ও মা, এ তুমি করলে কি? বাবার নাম মুখে আনলে?

কাজল-বৌ বললে, থাম্ মুখপুড়ী! বিয়ে হোক্, তারপর বুঝবি—নাম মুখে আনলে দোষ হয় না।

বলেই সে তার স্বামীকে নিয়ে পড়লো। বললে, দ্যাখো, আমার কিন্তু সত্যি মনে হচ্ছে—আমি আর বাঁচবো না। ভালই হলো—তুমি এসেছ, তোমার হাতে মেয়েকে তুলে দিয়ে এবার চলে যেতে পারলেই আমার ছুটি।

আনন্দ বললে, বেঁচে থেকে কেন মরছো বল তো?

তুমি মেরে রেখেছ তাই মরছি।

কেউ কাউকে মেরে রাখে না কাজল-বৌ। মানুষ নিজের দুঃখ নিজেই তৈরি করে।

কাজল-বৌ বললে, তাহলে বলতে চাও বসুন্ধরার বিয়ের ভাবনা আমি ভাববো না?

না ভাববে না। ভেবেছ তো এত-দিন ধরে, কিছু করতে পেরেছ? নিজের মন খারাপ করেছ আর শরীর নষ্ট করেছ। এর বেশি আর কিছু করতে পারনি।

কী বলছো পাগলের মত? আগুনের মত ওই মেয়েকে নিয়ে চুপ করে বসে থাকা চলে?

আনন্দ বললে, চলে কাজল-বৌ চলে। বসুন্ধরা আমাদের মেয়ে, কিন্তু ভাগ্যটা ওর নিজের। এই অদৃষ্ট দিয়েই আমরা জন্মান্তর বুঝতে পারি।

কাজল-বৌ বললে, কাল থেকে কিছু খাইনি, তোমার সঙ্গে বকতেও পারব না, তোমার ও-সব কথা আমি বুঝতেও পারব না। তোমার এই মেয়ের সঙ্গে তুমি কথা বল। ও-ও ঠিক তোমারই মতো কথা বলে। সেই যে সেই কথাটা বল্ না তোর বাপকে। সেই যে সুবচনী লিখেছিল!

বসুন্ধরা বললে, বাবা জানে। বলেই সে চায়ের কাপগুলি হাতে নিয়ে সেগুলো ধোবার ছুতো করে পালিয়ে গেল সেখান থেকে।

কাজল-বৌ বললে, বিয়ের কথায় লজ্জায় পালিয়ে গেল। কিন্তু আমার শুধু কি ভয় হয় জানো? ওরও তো শরীর-মনের একটা স্বাভাবিক ক্ষিদে আছে। ও যদি বোঝে—বাপ্-মা তার বিয়ের কোনও চেষ্টাই করছে না, ওর ভাগ্যের ওপর ওকে ছেড়ে দিয়ে বসে আছে অথচ ভাগ্যেরও সাড়াশব্দ কিছু পাচ্ছে না, তখন যদি ফট্ করে কিছু করে বসে তাহ'লে মেয়েদের সব চেয়ে যেটা বড় জোর—সেই জোরটা ওর থাকবে না।

আনন্দ একটু হাসলো। হেসে বললে, জয় রামকৃষ্ণ!

কাজল-বৌ বললে, তুমি এখন অনেকখানি ওপরে উঠে গেছ। আমি কিন্তু এখনও মাটিতে দাঁড়িয়ে রয়েছি। কাজেই আমি ভাবছি একরকম, তুমি ভাবছো আর একরকম।

এই বলে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কাজল-বৌ আবার বললে, কতরকম করে যে কথাগুলো ভাবি তার আদি-অন্ত নেই। ভাবনা ছাড়া আমার আর কাজ কি বল। এক এক সময় ভাবি—এ কী হলো আমাদের? এই কি জীবন? এই কি সংসার? এরকমটি হলো কার দোষ? তুমি ঠিক সংসারী মানুষ নও। আমিই তোমাকে জোর করে সংসারী করতে চেয়েছিলাম। আমার কোনও দোষ ছিল না। আমার ধর্ম আমি ঠিক পালন করেছি। তোমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছি, সুন্দর দুটি মেয়ে দিয়েছি, হয়ত আরও দিতে পারতাম, কিন্তু দেখলাম তুমি উদ্যোগী পুরুষ নও। সন্তান দেবে, কিন্তু তার মুখে অন্ন দেবে না। উপার্জন করবে না। তাই আমি তোমাকে জোর করে তাড়িয়ে দিলাম বাড়ী থেকে।

আনন্দ বললে, চুপ কর। তোমার জ্বর হয়েছে। কাল থেকে কিছু খাওনি। দুর্বল হয়ে পড়বে।

তাহ'লে এবার তুমি বল, আমি শুনি।

আনন্দ বললে, তাহ'লে চল তুমি ঘরে গিয়ে চুপটি করে শোবে চল। এখানে বসুন্ধরা আসা-যাওয়া করছে। ওর সামনে সব কথা বলা চলে না।

সেই ভাল।

কাজল-বৌ ডাকলে, বসুন্ধরা!

বেশি দূরে ছিল না সে। উনোনে আগুন দিচ্ছিল। রান্না করবে। সেইখান থেকেই সাড়া দিলে।

কাজল-বৌ বললে, এইখানে আয়। শুনে যা। আমি চেঁচাতে পারি না।

মেয়ে এসে দাঁড়ালো। সর্বাঙ্গসুন্দরী বসুন্ধরা। গাছকোমর দিয়ে শাড়ীটা ভাল করে কোমরে জড়িয়েছে। দু'হাতে দুটি সোনার চুড়ি, কানে দুটি দুল, আর কোথাও এতটুকু সোনার চিহ্ন নেই শরীরে, তবু যেন মনে হচ্ছে কত-ই না সেজেছে। আনন্দ প্রাণ ভরে চেয়ে দেখছিল তাকে। কাজল-বৌ বললে, দেখছো কি? এই বয়েসের মেয়েরা কত গয়না পরে, শাড়ী পরে, কিন্তু কোনও সাধই আমি ওর মেটাতে পারিনি। তোমার বসুন্ধরার ফসলে আমরা দুমুঠো খেতে পাই—এই পর্যন্ত।

আনন্দ বললে, বসুন্ধরা সর্বংসহা। সব-কিছু সে সহ্য করে।

কাজল-বৌ বললে, সন্ন্যাসী বাপের ওইটুকুই সান্ত্বনা। বসুন্ধরা, বাপ যখন এসেছে বাড়ীতে, ভাল করে খাওয়া-মাছটাছ খাও তো?

জোটে যদি তো না বলি না।

কাজল-বৌ বললে, তাহ'লে পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে রাখালকে একবার ডাক্। আমার ওই ছোট্ট টিনের বাক্সটায় খুচরো পয়সা কিছু আছে—

আনন্দ বললে, টাকা-পয়সা আমিও কিছু সঙ্গে এনেছি।

কাজল-বৌ হাসলে একবার তার মুখের দিকে তাকিয়ে। ম্লান একটুখানি হাসি। বললে, সাধু-সন্ন্যেসীর পয়সা না নেওয়াই ভাল।

হাসতে হাসতে বসুন্ধরা গেল রাখালকে ডাকতে।

আনন্দ বললে, মেয়েটা আমাদের ভালবাসার সন্তান কাজল-বৌ। ও কখনও

কাজল-বৌ বললে, আমি বুঝি অসন্তুষ্ট?

না, তুমি অসন্তুষ্ট নও। —আনন্দ বললে, তুমি লক্ষ্মী।

আমি লক্ষ্মী?

আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো যেন কাজল-বৌ'এর মুখখানি। পরিণত বয় সর এই স্বীকৃতি তার চিন্তাক্লিষ্ট মনে দিল আনন্দের সান্ত্বনা। কাজল-বৌ'এর চোখ দুটি ছল-ছল করে এলো। বললে, সত্যি বলছো তোমার মনের কথা? আমি লক্ষ্মী তো তুমি কী?

আনন্দ বললে, তুমিই বল, আমি কি!

তুমি? কাজল-বৌ খানিক ভেবে বললে, তুমি একটি উড়ো পাখী। খাঁচার ঘর তোমার জন্যে নয়।

আনন্দ হাসতে লাগলো। বললে, তার চেয়ে বল—লক্ষ্মীছাড়া বাউণ্ডুলে।

দেখছো কি?.....কোনও সাধই আমি ওর মেটাতে পারিনি

ভূত-প্রেতের ভাগ্য নিয়ে আসেনি এ-পৃথিবীতে। ওর মন্দ কিছু হবে না। ভালই হবে।

কাজল-বৌ বললে, সুবচনী বুঝি আমাদের ভালবাসার সন্তান নয়? ওর সুখ তো খুব হলো!

তোমার সুখের কল্পনা অন্য রকম কাজল-বৌ। তুমি ভাবো বুঝি খুব বড়লোকের বৌ হলেই সুখে থাকে। আমি সারা ভারতবর্ষ বহুবার ঘুরেছি, অনেক বড়লোকের মেয়ে-বৌকে দেখেছি, আবার অনেক গরীবের ঘরেও আতিথ্য গ্রহণ করেছি। দেখেছি—যে অসন্তুষ্ট, সে-ই অসুখী। তোমার সুবচনী বড়লোক না হতে পারে, কিন্তু অসন্তুষ্ট নয়।

কাজল-বৌ বললে, না না ওটা গালাগালি হয়ে গেল। গালাগালি তোমাকে অবশ্য আমি কম দিইনি। কিন্তু সে বয়স আর নেই। লক্ষ্মীমন্ত হতে পারোনি বলে লক্ষ্মীছাড়া হতে যাবে কোন্ দুঃখে? উড়ো পাখী তুমি, তোমাকে তো আমি উড়িয়ে দিয়েছিলাম আকাশে। সেখানে থাকতে তো পারোনি, ঘুরে ফিরে আবার সেই ছোট্ট বাসাটিতে ফিরে এসেছ।

এসেছি তোমার ভালবাসার টানে। তোমার ভালবাসা না পেলে আমি যে কোথায় ভেসে যেতাম কে জানে। আমি উদাসীন হতে পারি, কিন্তু অকৃতজ্ঞ নই।

কাজল-বৌ বললে, তুমি যে শিল্পী। শিল্পীরা উদাসীন হয়েই থাকে।

সেই উদাসীন শিল্পীকে ভালবেসেছিলে তুমি। তাই তোমার এই দুঃখ।

হায় রে নিরাসক্ত শিল্পী! আনন্দ মনে-মনেই বললে, লক্ষ্মীর কৃপা তুমি পাবে না কোনোদিন।

আনন্দ হালদার আসবার পর কাজল-বৌ যেন অন্য মানুষ হয়ে গেল। বসুন্ধরার বিয়ের কথা আর একটি বারও মুখে আনলে না। যার মেয়ে তারই হাতে ফেলে দিলাম। সে যা ভাল বুঝবে, তাই করবে।

আনন্দকে বললে, কোন-কিছু ভাবতে বারণ করেছ যখন, তখন আর ভাববো না।

এই বলে নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় স্বামীর সেবাযত্ন করতে লাগলো প্রাণপণে। বসুন্ধরাকে বললে, অনেকদিন পরে তোর বাবা এসেছে বাড়ীতে। দেখিস যেন তার কোনও কষ্ট না হয়!

আনন্দ যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো।

এ কি করছো কাজল-বৌ, তোমরা দুই মা-মেয়ে আমার পেছনে এমন করে কেন লাগলে বল তো?

কাজল-বৌ বললে, কেন, কি মনে হচ্ছে তোমার?

মনে হচ্ছে আমি যেন গুরুদেব এসেছি তোমাদের।

কাজল-বৌ বললে, সত্যি বলছি— তোমাকে ঠিক তেমনই মনে হচ্ছে আমার।

অনেকদিন পরে এলাম কিনা, তাই—

না, তা নয়। মনে হচ্ছে তুমি যেন নিজেকে ভেঙেচুরে আবার নতুন করে গড়ে ফেলেছো। এই মানুষটিকেই আমি খুঁজেছিলাম।

হেসে বলেছিল আনন্দ হালদার, আমি সেই আনন্দ হালদারই আছি কাজল-বৌ।

কাজল-বৌ জোর করে বলেছিল, না নেই। সে হালদারকে আমি ভালবেসেছিলাম, কিন্তু শ্রদ্ধা করিনি। এখন আমার খুব আনন্দ হচ্ছে।

সংসারের অবস্থা খুব স্বচ্ছল নয়, তবু কেমন যেন একটি অনাবিল আনন্দে এই তিনটি প্রাণীর কেটে গেল প্রায় মাসাধিক কাল।

সুবচনীকে চিঠি লিখেছিল বসুন্ধরা লিখেছিল, বাবা এসেছে।

সুবচনী জবাব দিয়েছে। লিখেছে, বাবাকে একবার এখানে পাঠিয়ে দিস। অনেকদিন দেখিনি বাবাকে। দেখতে ইচ্ছে করে।

আনন্দ বলেছিল, যাব।

কিন্তু কে জানতো তাকে এমন করে যেতে হবে।

কোথাও কিছু নেই হঠাৎ একদিন কাজল-বৌ বললে, আমার বিছানাটা পেতে দে তো বসুন্ধরা, শরীরটে কেমন যেন খারাপ মনে হচ্ছে।

বসুন্ধরা তার কপালে গায়ে হাত দিয়ে দেখলে, তেমন গরম বলে মনে হলো না। বললে, কই জ্বর তো আসেনি!

এখনও আসেনি। কিন্তু আসবে।

রাত্রে কিছু খেলে না কাজল-বৌ।

সকালে উঠে বসুন্ধরা দেখলে তার মার সারা গা যেন আগুন। ডাকলে সাড়া দিচ্ছে না। বাবা কখন বিছানা ছেড়ে উঠে গেছে সে বুঝতেও পারেনি।

খানিক পরেই আনন্দ হালদার বাড়ী ঢুকলো ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে।

—মার কখন জ্বর এসেছে বাবা?

—রাত বারোটার পর।

বসুন্ধরা বললে, আমি তখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

আনন্দ বললে, সারারাত বকেছে। ভোরের দিকে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ডাক্তার ওষুধ দিলেন।

রাত্রে জ্বরের ঘোরে ভুল বকতে লাগলো কাজল-বৌ।

—বসুন্ধরাকে ধর ধর—পড়ে যাবে যে!

—তা আমি কি করবো বল। মেয়েটা এমনিই।

খিল্ খিল্ করে হাসতে লাগলো কাজল-বৌ। কি বলে কিছুই বোঝা যায় না। অস্পষ্ট প্রলাপ। মাথায় জল দিয়ে হাওয়া করতে লাগলো বসুন্ধরা। আনন্দ বললে, এবার তুই শুয়ে পড় মা। আমি বসি। অক্লান্ত ভাবে সেবা করলে বাপ আর মেয়ে।

তিনদিনের দিন ডাক্তার বুঝতে পারেনি, কিন্তু আনন্দ বুঝতে পারলে, কাজল-বৌ আর বাঁচবে না। বসুন্ধরাকে বোঝাতে আরম্ভ করলে, মানুষকে এমনি করে একদিন চলে যেতে হয় মা, মানুষ চিরদিন থাকে না।

তাহ'লে তুমি কি বলছো বাবা, মা আর বাঁচবে না?

না।

বাবা, তোমার কষ্ট হচ্ছে না?

দাঁতে দাঁত চেপে আনন্দ জোর করে বললে, না। তোমার মা অনেক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে।

বসুন্ধরা আর থাকতে পারলো না সেখানে। ছুটে পালিয়ে গেল রান্নাঘরে। সেখানে গিয়ে খানিকটা কেঁদে প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিলে।

কাজল-বৌ মারা গেল চারদিনের দিন সকালে।

মেয়েটা পাছে কাতর হয় তাই আনন্দকে চুপ করে থাকতে হলো।

বসুন্ধরা যতখানি কাতর হবে ভেবেছিল, ততখানি কাতর অবশ্য হলো না। অনেক কান্নাই কাঁদলে সে, কিন্তু একেবারে ভেঙে পড়লো না।

বাড়ীখানা খাঁ-খাঁ করছে।

কাজল-বৌ নেই।

বাড়ীতে বাপ আর মেয়ে।

যেমন পারলে চারটি রান্না করলে বসুন্ধরা। বাপকে খাওয়ালে। নিজেও খেলে। তারপর দিদিকে চিঠি লিখলে, দিদি, আমাদের মা আর নেই।

সুবচনীকে চিঠি লিখে বসুন্ধরা তার বাবাকে নিয়ে পড়লো।

ঘর-সংসারের কাজ করে আর বলে, আচ্ছা বাবা, মা এখন কোথায়?

আনন্দ বললে, কোথাও নেই। যে দেহটা তোমাদের মা ছিল, সে দেহ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এখন তোমাদের মা আছে তোমাদের স্মৃতিতে। এখন তোমরা সেই স্মৃতির পুজো করবে। তোমরা যে অকৃতজ্ঞ নও, তোমরা যে মানুষ—তাই প্রমাণ করবে তার শ্রাদ্ধ শান্তি করে।

যদি না করি?

না করলেও তার কিছুই এসে যাবে না।

তাহ'লে মা আর কিছু দেখতেও পাচ্ছে না, শুনতেও পাচ্ছে না, আমাদের সঙ্গে তার আর কোনও সম্বন্ধই নেই?

না। যতদিন দেহ ছিল ততদিন সবই ছিল, চোখ ছিল, কান ছিল, ইন্দ্রিয় ছিল। সেই দেহটাই ছিল তোমাদের মা। এখন সে বিদেহী আত্মার সঙ্গে কারও কোনও সম্বন্ধ নেই। সে আর তোমাদের মা নয়।

সে আবার এই পৃথিবীতে জন্ম নেবে তো বাবা?

আনন্দ বললে, ও-রকম কাজ করতে করতে শুনলে জন্মান্তর রহস্য বুঝতে পারবি না বসুন্ধরা। এইখানে এসে বোস, মন দিয়ে শোন্, ভাল করে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

বসুন্ধরার বুঝবার আগ্রহ অত্যন্ত প্রবল। চা তৈরি করছিল সে। চায়ের কাপ দুটি হাতে নিয়ে আনন্দর কাছে

এসে বসলো সে। বললে, নাও বল বাবা। চা খেতে খেতে বল। আমিও চা খেতে খেতে শুনি।

আনন্দ বললে, খুব শক্ত কথা নয়, সোজা কথা। ধর, আনন্দ হালদার নামে একটি লোক বাসন্তী নামের একটি মেয়েকে বিয়ে করেছিল। তাদের দুটি মেয়ে হলো। অর্থাৎ তোমরা জন্মালে। একজন সুবচনী আর একজন বসুন্ধরা। তোমাদের চেহারায়, আকৃতিতে, প্রকৃতিতে, স্বভাবে চরিত্রে, কথায় বার্তায়—খুব ভাল করে দেখলে দেখতে পাবে তোমাদের বাবাকে আর মাকে। তার মানেই তোমরা আমাদের সন্তান। আর কেউ নয়। অথচ আমাদের শাস্ত্র বলছে পূর্বজন্মে তোমরা অন্য কেউ ছিলে।

বসুন্ধরা বললে, তা কেমন করে হয় বাবা? এতক্ষণ যা বললে তাতে তো বুঝতে পারছি না—তারা আমাদের মধ্যে ঢুকলো কখন? আর কেমন করেই-বা ঢুকলো?

আনন্দ বললে, ঢুকলো প্রাকৃতিক নিয়মে। ঢুকলো তোমাদের অদৃষ্ট ভাগ্য হয়ে। যেটা কেউ কোনোদিন দেখতে পায় না। দেখতে পায় না বলেই তাকে বলা হয় অদৃষ্ট। তোমরা দুটি বোন—আপাতদৃষ্টিতে এক। কেন না এক বাপ-মায়ের সন্তান। কিন্তু তোমাদের দুজনের ভাগ্য দুটি আলাদা।

বসুন্ধরা অবাক হয়ে গিয়ে আনন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে এই জন্মান্তর-রহস্যের কথা শুনছিল। আনন্দ বললে, এমনি করে এ পৃথিবী ত জীব-জগতের আবর্তন চলছে। জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করছে ভাগ্য। জন্ম থেকে জন্মান্তরে নিয়ে যাচ্ছে, কৃতকর্মের ফল ভোগ করাচ্ছে আর ক্রমশ টেনে নিয়ে চলেছে মহত্তর জীবনের দিকে।

উনোন ধরে গেছে। বসুন্ধরাকে উঠতে হবে। রান্না করতে হবে।

আমি চাকি বাবা। যাহোক কিছু রান্না করিগে।

আনন্দ বললে, যাও। মার জন্যে দুঃখ কোরো না, শোক কোরো না। মানুষ আসে আবার চলে যায়। এই জগতের নিয়ম।

সুবচনী এলো তার তিন ছেলেকে নিয়ে। সঙ্গে এলো ঝুলেন।

মার জন্যে অনেক কান্নাই কাঁদলে, অনেক কথা বললে, অনেক দুঃখ করলে। সব চেয়ে বড় দুঃখ তার এমন সোনার চাঁদ ছেলেদের দেখাতে পারলে না তার মাকে।

অসুখের খবরও তো একটা দিতে পারতিস বসুন্ধরা।

বসুন্ধরা বললে, অসুখ হয়ে ভুগে ভুগে যদি মরতো তো খবর তোকে দিতাম বই-কি দিদি। মা যে চারদিনের দিন মরে গেল। খবর দেবার সময় পেলাম কোথায়!

খবর দিলেও কি আমি আসতে পারতাম নাকি এই মানুষটির জ্বালায়!

এই বলে সে ঝুলেন চক্রবর্তীকে আক্রমণ করলে।

ঝুলেন চক্রবর্তীর অপরাধ উমাশশী রাইস মিল থেকে সে একটি দিনেরও ছুটি পায় না। রবিবার দিনেও বেরোতে হয় তাকে। মাইনে অবশ্য পঞ্চাশ টাকা থেকে পঁচাত্তোর টাকা হয়েছে।

সুবচনী বললে, উপরি-পাওনার লোভে এক-একদিন বাড়ী ফেরে রাত এগারোটার ট্রেনটা চলে যাবার পর। এই যে এসেছ চারটি দিনের ছুটি নিয়ে—তাও কি আসা হতো নাকি? আমি নিজে গিয়ে কেঁদে পড়লাম সেই বুড়ো মালিকটার কাছে। বুড়ো বলে কিনা—সবই তো বুঝছি মা, কিন্তু ও চলে গেলে আমার সেই ভাইপোটাকে বসাতে হবে।

সে হারামজাদা চুরি করে ভুটিনাশ করে দেবে। তা করুক না চুরি। তাতে তোমার কি। বুড়োর মেলা টাকা।

ঝুলন বসেছিল আনন্দর কাছে। বললে, শুনুন, আপনার মেয়ের কথা শুনুন। বুড়ো আমাকে নিজের ছেলের মত দেখে, তার ভাল আমাকে দেখতে হবে না?

সুবচনী বললে, ওর কথা শুনো না বাবা, বুড়ো দুটো মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে আর ও একেবারে গলে জল হয়ে যায়। ওখানে আর-একটা ধান-কল হয়েছে, ওকে হাতে পায়ে ধরে সাধাসাধি করছে; বলছে—একশ' পঁচিশ টাকা মাইনে দেবো, তা' ও যাচ্ছে?

ঝুলন বললে, থামো থামো, ও-রকম নিমকহারামী করতে বোলো না আমাকে।

সুবচনী চেঁচিয়ে উঠলো: এইটে নিমকহারামী হলো?

আরও কি যেন সে বলতে যাচ্ছিল, বসুন্ধরা তাকে তুলে নিয়ে গেল রান্না-ঘরে। —ছেলেরা ঘুমিয়েছে, এই সময় তুই চারটি খেয়ে নে দিদি।

কি রেঁধেছিস, কই দেখি!

সুবচনী রান্না দেখছিল, বসুন্ধরা বললে, তুই খুব সংসারী হয়েছিস দিদি।

না হলে চলবে কেন লা! তিন-তিনটে ছেলে হয়েছে, আরও ক'টা হবে তার ঠিক নেই। তাও ভাগ্যিস জমি-জমা পুকুর বাগান বেশ ভালই আছে তাই এখন কিছু ভাবতে হচ্ছে না। কিন্তু এর পর? আরও দুটো পাঁচটা হলে তখন কি হবে?

বসুন্ধরা দিদিকে খেতে বসিয়ে বললে, আর দুটো পাঁচটা চাস্ না দিদি, তার চেয়ে তুই এক কাজ কর্। আমি তো একা থাকতে পারব না, তুই এইখানে এসে থাক্। জামাইবাবু মাসে-মাসে কিছু কিছু করে টাকা পাঠাবে। অরুণ বরুণ তরুণকে আমরা দু'বোনে ঠিক মানুষ করে তুলতে পারব।

এই মরেছে! মায়ের রোগ দেখছি তোকেও ধরেছে বসুন্ধরা। তুই ছোট ছিলি তুই জানিস না, মা আমাদের বাবাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল বাড়ী থেকে ছেলেপুলে হবার ভয়ে। তুই আমাকে মায়ের পাটে বসাতে চাস্?

বসুন্ধরা সেকথার জবাব দিল না। চুপ করে রইলো।

সুবচনী বললে, তোকে অতসব ভাবতে হবে না। সে সব আমরা পরা-মর্শ করেই এসেছি। তোর বিয়ে দিতে হবে না?

বসুন্ধরা এবারও চুপ করে রইলো। কি রে কথা বলছিস না যে?

বসুন্ধরা বললে, বিয়ে আমি করব না।

বিয়ে করবি না তো কি করবি? ছি! ও-কথা বলতে নেই। আমি বড় বোন—বেঁচে যখন রয়েছি তখন আমাকেই সব করতে হবে। আমাদের বাপ তো ওই!

এই বলে খানিক থেমে আবার বললে, মরবার সময় মায়ের সংগে যদি আমার দেখা হতো তো দেখতিস মা আমার হাতে ধরে বলতো—ছোট বোন্‌টা রইলো—ওকে দেখিস্।

বলতে বলতে ঝর্ ঝর্ করে কেঁদে ফেললে সুবচনী।

দিদির কান্না দেখে বসুন্ধরার চোখ দিয়েও টস্ টস্ করে দুফোঁটা জল পড়লো।

তিন ছেলের মা সুবচনীকে দেখে বুঝবার জো নেই যে তার ছেলেপুলে হয়েছে—এমনি বাঁধন মেয়েটার। কিন্তু মুখে একেবারে হয়ে উঠেছে পাকা গিন্নি। বাপ্‌কে বললে, শোনো বাবা, মাকে তো চিরটা কাল জ্বালিয়েছ। তাও ভাগ্যি ভাল যে মরবার সময় দয়া করে একটিবার দেখা দিলে। এখন বল তুমি কি করবে! আবার পালাবে না থাকবে?

আনন্দ চোখ বুজে বললে, বড় কঠিন প্রশ্ন মা।

আবার তক্ষুনি চোখ চেয়ে সুবচনীর কাঁধে হাত রেখে বললে, আমি এক্ষুনি কি করব তা আমি জানি না।

এই দ্যাখো, সাধু-সন্ন্যেসীর মত কথাও বলতে শিখেছ। তুমি জানবে না তো কে জানবে?

আনন্দ বললে, আমার ভাগ্য-বিধাতা। তাঁর হাতে আমি নিজেকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছি। তিনি যখন যা বলেন আমি তাই করি।

সুবচনীর বড় বড় চোখ আরও বড় বড় হয়ে গেল। অবাক্ হয়ে তার বাবার মুখের দিকে একবার তাকালে। তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে একবার দেখে নিলে ঝুলন কাছাকাছি কোথাও রয়েছে কিনা। দেখলে নেই। তখন বললে, অতিথ-ফকিরদের মতন গাঁজা-টাঁজা খাও নাকি?—আচ্ছা বেশ, তোমার সেই তিনিকে জিজ্ঞাসা কর। আমি ততক্ষণ না হয় এইখানে বসি।

আনন্দ হাসলে। —তুই সেই সুবচনীই আছিস দেখছি!

হ্যাঁ, সেই সুবচনী থাকবার জো আছে? দিয়েছ তো একটা কানা-খোঁড়ার হাতে তুলে! তারপর মেয়েটা মলো কি বাঁচলো কেউ একবার ফিরেও তাকালে না।

আনন্দ বললে, সুখে-শান্তিতে আছ তো মা, তাহলেই হলো।

সুবচনী বললে, সে আছি কার জোরে বাবা, নিজের জোরে। আমি শক্ত না হ'লে তোমার জামাইটি কি কিছু করতো নাকি? ও শুধু ভূতের মত খেটেই মরতো। তা হ্যাঁ, ভুলুর ছেলে, নিন্দে করবো কেন? খাটতে পারে তোমার জামাই। খেটে খেটে মুখে রক্ত তুলে দিলে। এত যে বলি, দিনরাত খাটছো, একটু দুধ খাও। তা শোনে আমার কথা? একটা কথা শোনে না। কোনদিন এক ছটাক দুধ আমি খাওয়াতে পারলাম না ওকে। খালি খালি বলে—ছেলেদের খাওয়াও। আচ্ছা তুমিই বল তো বাবা, ছেলেরা কত খাবে? দুদুটো গাইএ দুধ দিচ্ছে, আট সের করে দুধ। পাশের বাড়ীর মাসীমাকে আমি বিক্রি করি দু'সের।

বসুন্ধরা বোধকরি শুনছিল দিদির কথাগুলো। পাশের ঘরের দোরের কাছে দাঁড়িয়ে বলে উঠলো, দুধ তুই বিক্রি করিস দিদি?

হ্যাঁ করি। বড়লোকের বাড়ী দেখে বাবা তো দেয়নি আমার বিয়ে! তাই দুধ বিক্রি করি, আম বিক্রি করি, কাঁঠাল বিক্রি করি, কলা বিক্রি করি পুকুরের মাছ বিক্রি করি। আরও কি করেছি শুনবি? বিয়ের সময় জমি ছিল মোটে পাঁচ বিঘে। এখন জমি কিনেছি পঁচিশ বিঘে, দুটো পুকুর কিনেছি, বাগান কিনেছি। এই সব মাকে আমার দেখাবার ইচ্ছে ছিল রে, কিন্তু হলো না আমার কপাল মন্দ, আর হলো না আমাদের এই সন্ন্যেসী বাপটির জন্যে।

বলতে বলতে গলাটা তার ধরে এলো।

আনন্দ হাসতে হাসতে বললে, আমার জন্যে কেন হলো না মা?

তুমি এসে বাড়ীতে থাকবে, তবে তো মা-বোনকে নিয়ে থাব, নইলে এই ফাঁকা বাড়ী ফেলে মা আমার যেতো কেমন করে? কপালগুণে যদি-বা এখন এলে তো মা আমার চলে গেল।

আবার খানিকটা কাঁদলে সুবচনী।

তারপর আঁচল দিয়ে চোখদুটো মুছে তার বাবার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কই, কি ঠিক করলে তুমি বল বাবা!

আনন্দ বললে, না মা, কিছুই এখনও ঠিক করিনি।

থাক্ আর তোমাকে কিছুই ঠিক করতে হবে না। আমি কি ঠিক করেছি

শোনো। বসুন্ধরাকে আমি নিয়ে যাচ্ছি আমার বাড়ীতে। তোমাকেও আমি নিয়ে যেতাম বাবা, সারাজীবনটা তো হাটে-মাঠে কাটালে, বুড়ো বয়েসে তোমারও একটু সেবার দরকার, কিন্তু এ-বাড়ী ছেড়ে যদি সবাই চলে যাই তো এ-বাড়ীতে ভূত নাচবে।

আনন্দ বললে, খুব ভাল। আমি এই বাড়ীতেই থাকবো।

বসুন্ধরা বলে উঠলো, বলে তো দিলি খুব! বাবাকে রান্না করে দেবে কে?

সুবচনী বললে, তুই দিবি? শ্যামানন্দপুর থেকে রান্না করে দিয়ে যাবি রোজ! কচি খুকি! সাধু-সন্ন্যেসী মানুষ দেখে লোকে হয়ত' বাড়ীতে ডেকে পৌষ মাসে মাঠের ধান যখন খামারে উঠবে তখন আমি একবার আসব, এসে তোমাকে আমার বাড়ীতে নিয়ে যাব। দেখো যেন ফুড়ুৎ করে পালিয়ে যেয়ো না। চাষের ফসল তাহলে আর কিছু পাওয়া যাবে না।

আনন্দ হাসতে লাগলো। বললে, না না আমি কোথাও যাব না। তোরা যা।

বসুন্ধরাকে নিয়ে সুবচনী চলে গেল।

কুলটিকুরী গ্রামে রইলো আনন্দ হালদার তার কাজল-বৌ-এর স্মৃতি নিয়ে।

ট্রেণ থেকে যখন নামলো তারা, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

বসুন্ধরা আলো দেখবে, শহর দেখবে না ছেলে সামলাবে?

স্টেশনটি ছোট হলে কি হবে। ইলেকট্রিকের আলো জ্বলছে।

বসুন্ধরা চুপিচুপি তার দিদিকে বললে, একেই বিজ্‌লী বাতি বলে, না দিদি?

সুবচনী বললে, হ্যাঁ।

বলেই সে দাঁড়ালো। মেজ ছেলেটা ছিল সুবচনীর কোলে।

ওগো শুনছো?

ঝন্টন যাচ্ছিল কুলির পিছু-পিছু। ডাক শুনে তাকেও দাঁড়াতে হলো। সুবচনী তার কোল থেকে বরুণকে নামিয়ে দিয়ে বললে, নাও একে। কেমন স্বার্থপর মানুষ দ্যাখো! ছেলেগুলোকে আমাদের কাছে ঠেলে দিয়ে নিজে কেমন মজাসে বিড়ি টানতে টানতে চললো। আবার বিড়ি টানছো?

বিড়িটা তাড়াতাড়ি ফেলে দিয়ে বরুণকে কোলে তুলে নিয়ে ঝন্টন বললে, তোমাদের গাঁয়ে যে সিগ্রেট পাওয়া গেল না।

স্টেশনের বাইরে গিয়ে মতিলালের দোকান থেকে নাও। নিজের জন্যে একটা পয়সা খরচ করতে চাইবে না কিছুতেই। বিড়ি টানলে মাইনে বাড়ে কখনও?

বলেই সে বসুন্ধরার কোল থেকে তরুণকে নিজের কোলে টেনে নিয়ে বললে, নে এবার তুই দেখতে দেখতে চল্। ছেলেটা বিরক্ত করছে তোকে। ওগো শুনছো?

আবার দাঁড়াতে হলো ঝন্টনকে।

দুটো সাইকেল-রিক্‌শা করবে। ছেলেদের নিয়ে একটাতে তুমি চড়বে, আর একটায় আমরা দুবোনে চড়বো। বসুন্ধরাকে দেখাতে দেখাতে নিয়ে যেতে হবে।

বসুন্ধরা বললে, তবে যে মা বলতো তোর পাড়াগাঁয়ে শ্বশুরবাড়ী!

সুবচনী বললে, পাড়াগাঁ আর রইলো কোথায়? প্রথম যখন আসি এখানে, তখন ছিল। তবে আমাদের দিকটা এখনও পাড়াগাঁ আছে। এখনও আমরা পুকুরে চান করি, টিপ্-কলে জল ধরি, বাড়ীতে লণ্ঠন জ্বলাই।

বসুন্ধরার মুখে হাসি ফুটলো।

—পুকুরে চান করিস? সাঁতার কাটলে বকে না তো কেউ?

সুবচনী বললে, বকবে আবার কে? ও তো মাসীমার পুকুর। সেই যে খাঁদু-

"দিয়েছ তো একটা কানা খোঁড়ার হাতে তুলে!"

দুদিন দুমুঠো খাইয়েছে বাবাকে, তাই বলে বারোমাস তিরিশ দিন খাওয়াবে নাকি? হ্যাঁ বাবা, নিজে রান্না করে তোমাকে খেতে হয়নি?

আনন্দ বললে, হয়েছে। কতদিন রান্না করে খেয়েছি।

ওই শোন্ বসুন্ধরা!

তাহলে এই কথা রইলো বাবা, তুমি রইলে এইখানে। বসুন্ধরাকে আমি নিয়ে গেলাম। তারপর সেই অঘ্রাণ-

বসুন্ধরা কখনও ট্রেণে চড়েনি। শহর দেখেনি।

সুবচনীর বড় ছেলে অরুণ তার মাসীকে সব দেখাতে দেখাতে নিয়ে যাচ্ছিল। বসুন্ধরার কোলে ছিল সবচেয়ে ছোট তরুণ। সেও কম দুরন্ত নয়। সবে সে হাঁটতে শিখেছে। মাসীর কোল থেকে নামবার জন্য সে ছটফট করছিল। প্ল্যাটফর্মে নেমে সেও হাঁটবে।

ঠাকুরপোর কথা লিখেছিলাম তোকে—এই মাসীমার ছেলে ধীরু-ঠাকুরপো।

ধীরু-ঠাকুরপো?

নামটা বেশ ভালই মনে আছে বসুন্ধরার। বিয়ে তার এতদিন নিশ্চয়ই হয়ে গেছে। কথাটা তার জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা করছিল, সুবচনী নিজেই বললে, ফিরে বোধহয় আসছে মাসেই হবে। পাকাদেখা হবে শুনে এসেছিলাম।

ষ্টেশনের বাইরে সারি সারি দোকান। সাইকেল-রিক্শায় চড়তে চড়তে বসুন্ধরা বললে, এইটে বুঝি তোদের বাজার?

সুবচনী বললে, না এটা আমাদের বাজার নয়। গাঁয়ে আমাদের দোকান আছে, হাট আছে। আর ওই যে দেখছিস—খুব জোর আলো জ্বলছে, ওইটে তোর জামাইবাবুর উমাশশী রাইস মিল। ওইখানে ও কাজ করে। আবার এইদিকে তাকা। —আঙুল বাড়িয়ে সুবচনী দেখিয়ে দিলে, ওইখানে আবার আর-এক মুখপোড়া আর একটা ধানকল করেছে। ওরাই ওকে ডাকছে। বলছে, দেড় শ' টাকা পর্যন্ত মাইনে দেবে। টাকা থাকলে আমরাই একটা ধানের কল বসাতাম। খুব ভাল। ঢেঁকি-টেঁকি সব উঠে গেল তো! বাঁচা গেল। রাঙা-রাঙা ভাত আর খেতে হবে না কাউকে! আমার বাড়ীর ভাত দেখবি সাদা ধপ্-ধপ্ করছে একেবারে পদ্মফুলের মত।

এমনি করে কথা বলতে বলতে ষ্টেশান-বাজার পেরিয়ে সাইকেল-রিক্শা গ্রামের পথ ধরলো।

ও মা এ কি হলো? আলোগুলো নিবিয়ে দিলে যে!

দূর মুখপুড়ী! এ যে আমাদের গাঁয়ের রাস্তা। এখানে আলো কোথায় পাবি?

বসুন্ধরা বললে, গাঁগুলো বুঝি অন্ধকার?

অন্ধকার আর বেশিদিন থাকবে না। এখানে অমনি বিজ্লীবাতি দেবে বলছে।

তারপর খানিকটা ভাল, খানিকটা খারাপ রাস্তার ওপর দিয়ে, ডানদিকে বেঁকে বাঁদিকে ঘুরে আবার খানিকটা সোজা গিয়ে দু'খানা রিক্সা-গাড়ীই এসে দাঁড়ালো মুকুন্দ চক্কোত্তির দরজায়।

বাস্, এবার নামতে হবে। এই আমার বাড়ী।

দোরে তালা বন্ধ। মুকুন্দের পকেটে চাবির গোছা। রিক্সার ভাড়া মেটাবে, তারপর তালা খুলবে। কোলে ছেলে নিয়ে মুকুন্দের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল।

সুবচনী বললে, ছেলেদের দাও আমাদের কাছে। তুমি ভাড়া মিটিয়ে, দোরের তালা খুলে তাড়াতাড়ি গিয়ে সেই হ্যাজাক্ বাতিটা জ্বালাও।

ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে দোরের তালা খুলতে খুলতে মুকুন্দ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলো, লখিন্দর! লখু! লখু!

বসুন্ধরা জিজ্ঞাসা করলে, লখু কে দিদি?

লখু আমাদের মুনিষের ছেলে। গরুগুলো দেখে, ঘরের কাজকর্ম করে দেয়। ওকেই রেখে গিয়েছিলাম বাড়ীতে।

মুকুন্দ বললে, লখু ওর বাড়ীতে খেতে গেছে বোধ হয়।

ঘর খুলে মুকুন্দ লণ্ঠন জ্বালছিল।

সুবচনী বললে, ওই দ্যাখ্ লণ্ঠন জ্বালছে। হ্যাজাক্ জ্বালতে বললাম না?

মুকুন্দ বললে, হ্যাজাক্ কি হবে?

শোনো কথা! বসুন্ধরা এলো, ওকে সব দেখাবো না? তাছাড়া পুকুরে যাব, নতুন জায়গা, ও যদি আছাড় খেয়ে পড়ে? কেন জ্বালবো, কি হবে, হেনো-তেনো সাত-সতেরো জিজ্ঞাসা না করে আমি যা বলছি তাই কর। হ্যাজাকটা আমাদের কাছে রেখে লণ্ঠন নিয়ে তুমি পুকুরে গিয়ে হাত-পা ধুয়ে ঠাণ্ডা হয়ে বোসো, আমি চা করে দিচ্ছি। —আর হ্যাঁ, কান দিয়ে শোনো, পুকুরে যাবার আগে উনোনে আগুনটা দিয়ে দাও। লখু দুধ রেখেছে কিনা দ্যাখো। গরম করে ছেলেদের খাইয়ে দিই। নইলে এক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়বে ওরা। বড় বড় সাগরে মাছ জিয়োনো আছে চারটে। লখু যদি জল না পাল্টেছে তো দ্যাখো হয়ত মরেই গেছে। আমরা এ ক'দিন বাড়ীতে ছিলাম না—চারদিক ঘুরে ফিরে একবার দ্যাখো—সব জায়গায় সব জিনিসটি ঠিক আছে কিনা!

বসুন্ধরা হ্যাজাক্ বাতি কখনও দেখেনি। একদৃষ্টে সেইদিকে তাকিয়ে ছিল। বাতিটা জ্বলে উঠতেই দিনের মত আলো হয়ে গেল।

এ তো লণ্ঠনের মত দিদি। হাতে করে নিয়েও যাওয়া যায়।

সুবচনী বললে, ওইটিই সুখ আমাদের। কলকাতার কাছেই থাকি তো।

কলকাতা তুই দেখেছিস দিদি?

দেখেছি। একদিন কালীঘাট গিয়েছিলাম আর একদিন মাসীর সঙ্গে গিয়েছিলাম দক্ষিণেশ্বর—তাও ভাগ্যিস্ ধীরু ঠাকুরপো নিয়ে গিয়েছিল। তোর জামাইবাবুর কি ছুটি আছে যে আমাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াবে!

বসুন্ধরা বললে, আমাকে একদিন কলকাতা দেখিয়ে দিস দিদি।

সুবচনী বললে, দেখাবো দেখাবো—সব দেখাবো।

বলতে বলতে তার নজরে পড়লো—জামা খুলে গামছা আর লণ্ঠন নিয়ে মুকুন্দ বেরিয়ে যাচ্ছে।

চলে যাচ্ছ? ষ্টোভটা জ্বালিয়ে দিয়ে গেলে না? চায়ের জলটা চড়িয়ে দিয়েই আমরা পুকুরে যেতাম তাহ'লে।

লণ্ঠন নামিয়ে মুকুন্দ ষ্টোভ জ্বালাতে বসলো।

ছেলে তিনটি আশ্চর্য রকম ঠাণ্ডা। অরুণ বরুণ দু'জনে মিলে ষ্টোভটি আনতে যাচ্ছিল। অরুণ বললো, তুই বোস, আমি আনবো।

দাদার কথা শুনে বরুণ বসে পড়লো।

বসুন্ধরা বললে, অরুণ যে ঘুমিয়ে পড়লো দিদি।

ঘুমোক। দুধ খেতে বললেই উঠবে।

বসুন্ধরা বললে, ভারি সুন্দর তোর ঘরখানি দিদি।

দাঁড়া এখনও তো কিছু দেখিসনি তুই। সকাল হোক, সব দেখাবো।

সুবচনী বললে, খুব কষ্ট করে সব করতে হয়েছে। একটি একটি করে সব করেছি আমি।

জামাইবাবুর কথা তুই একটিবার বলছিস না দিদি। জামাইবাবু কিছু করেনি?

ষ্টোভ জ্বালাতে জ্বালাতে মুকুন্দ তার একটি চোখ দিয়ে বসুন্ধরার দিকে তাকিয়ে একবার হাসলে।

তা না বললে পাপ হবে। খেটেখুটে ও টাকা এনে দিয়েছে তবে তো করেছি।

সুবচনী তার স্বামীর দিকে তাকিয়ে প্রসন্ন হাসিতে মুখখানা তার উজ্জ্বল করে বললে, তা অমন করে শালীর দিকে মিট্ মিট্ করে তাকাচ্ছো কি, তোমার নিন্দে আমি করি না কারও কাছে। —তবে হ্যাঁ, একটি অভাব আমার এখনও ঘোচেনি। আর একখানি ঘরের অভাব। ও অবশ্য চেয়েছে ঘর করতে, আমিই করতে দিইনি। সে টাকাটা অন্যদিকে খরচ করেছি।

ঘরের কথায় বসুন্ধরা অন্যমনস্ক হয়ে কি যেন ভাবতে লাগলো। দিদি তাকে নিয়ে তো এলো এখানে, কিন্তু ঘরেসত্তা তার এমনিই যে একঘরে সবাই মিলে শোবারও উপায় নেই। শুধু তারই

সৌন্দর্য্য রসিকা
যুগে যুগে .....
... এবং
Trojan
ট্রোজন
প্রসাধনী
সৌন্দর্য্য বিকাশে
এঞ্জেল কসমেটিক্স কর্পোরেশন
কলিকাতা-২
BEEVAS/EX/13

জন্যে জামাইবাবুকে হয়ত দিনের পর দিন বাইরে শুতে হবে।

ট্রেণের আওয়াজে ঘুম ভাঙলো বসুন্ধরার।

চোখ চেয়ে দেখলে, ঘরের দরজা জানলা খুলে দেওয়া হয়েছে। সকাল তখনও হয়নি। বাইরে গাছে গাছে নানারকমের পাখী ডাকছে।

দিদি বললে, ওঠ্। পাঁচটার ট্রেণটা পেরুলো।

বসুন্ধরা গায়ের কাপড়চোপড় সামলে উঠলো। বললে, তোদের বুঝি ঘড়ি দেখতে হয় না।

সুবচনী বললে, না। আমরা ট্রেণ দেখেই সব কাজ করি।

ঘরে স্টোভ জ্বলছে। ছেলেরা উঠেছে। বিছানার ওপরেই তিন ভাই খেলা করছে।

ঝুলনের স্নান হয়ে গেছে এরই মধ্যে। কাঁধে গামছা নিয়ে মুড়ি খেতে বসলো ঝুলন।

বসুন্ধরা বললে, খুব খিদে পেয়ে গেছে বুঝি?

সুবচনী বললে, ও তো এক্ষুনি চা-মুড়ি খেয়ে কাজে চলে যাবে। খেতে আসবে সেই বারোটার সময়।

বসুন্ধরা বাইরে উঠোনে গিয়ে দাঁড়ালো। কাল রাত্তির অন্ধকারে কিছুই সে দেখতে পায়নি। চারিদিক ঘুরে ফিরে দেখতে লাগলো। কত রকমের কত গাছ, কত রকমের পাখী. ঝুলন চক্কোত্তির রান্নাঘর, গোয়াল, খামার, বাঁদিকে একটা আম কাঁঠাল আর নারকেলের বাগান। কুলটিকুরিতে একটা নারকেলের গাছ দেখা যায় না, আর এখানে কত নারকেলের গাছ। ঘাট-বাঁধানো এই পুকুরটা বুঝি দিদির ধীরু ঠাকুরপোর—আর এই ছোট্ট দোতলা বাড়ীখানি। ও মা, ওদেরও উঠোনে যে একটা মস্ত জামের গাছ! কালো কালো জাম ধরে রয়েছে বিস্তর। বসুন্ধরার ইচ্ছে করতে লাগলো—এক্ষুনি গাছে উঠে গিয়ে এক-আঁচল জাম পেড়ে নিয়ে আসে।

বসুন্ধরা, পুকুরের ঘাটে হাত মুখ ধুয়ে দাঁত মেজে কাপড় কেচে আয়। চা খাবি।

বসুন্ধরা তখন সদর দরজা খুলে সুমুখে ট্রেণের লাইন দেখছে। রাস্তার ধারে আর-একটা পুকুর। মনে হচ্ছে যেন পুকুরের পাড়ের ওপর দিয়েই লাইনটা চলে গেছে।

খুব ভাল লাগছে বসুন্ধরার।

ঝুলন কাজে বেরিয়ে গেল। লখিন্দর দুধ দুইলে।

ধীরুদের পুকুরে গিয়ে নামলো বসুন্ধরা। যেমন সুন্দর জল তার তেমনি নির্জন ঘাট। বাঁধানো সিঁড়ির ধাপে ধাপে নামতে নামতে সে অনেকখানি জলে নেমে গেল। গায়ের জামা কাপড় খুলে ফেলতেও কোনও লজ্জা নেই এখানে। কেউ দেখবে না।

সাঁতার কাটার লোভ সম্বরণ করে তাড়াতাড়ি উঠে এলো বসুন্ধরা।

দিদি ডাকছে।

নে কাপড় জামা ছেড়ে তাড়াতাড়ি চা খেয়ে নে। দুধ দিতে যাব মাসীমাকে।

যা না, আমি চা খাচ্ছি।

সুবচনী বললে, তোকেও নিয়ে যাব যে সঙ্গে করে! মাসীকে দেখিয়ে আনি। চুলটা ভাল করে আঁচড়ে নে।

সব চেয়ে ভাল যে-শাড়ীখানা ছিল বসুন্ধরার, মিলের সেই চওড়া ফুল-ফুল-পাড় শাড়ীখানি, সেইটি পরলে বসুন্ধরা। নিজের হাতের সেলাই-করা লাল পপলিনের জামাটি পরলে। তারপর কপালে একটি ছোট্ট সিঁদুরের টিপ পরে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বললে, না দিদি আমি যাব না। আমার লজ্জা করছে।

চায়ের কাপটা এগিয়ে দিয়ে সুবচনী বললে, চা যে জুড়িয়ে গেল। —তা লজ্জাটা কিসের শুনি?

তুই আমার সেই চিঠিখানা দেখিয়ে দিয়েছিলি তোর ধীরু-ঠাকুরপোকে।

তা ধীরু-ঠাকুরপোকে দেখিয়েছিলাম দেখিয়েছিলাম; তার মাকে তো দেখাইনি।

চা খেতে খেতে বসুন্ধরা বললে, সেও তো আছে বাড়ীতে! দেখবে তো আমাকে!

কে? ধীরু-ঠাকুরপো?

হুঁ।

সুবচনী বললে, তোকে বলিনি বুঝি সেকথা। ধীরু-ঠাকুরপো তো থাকে না বাড়ীতে। কলকাতায় থাকে, শনিবার আসে আবার সোমবার চলে যায়। আজ তো বুধবার।

বসুন্ধরা জিজ্ঞাসা করলে, ছেলেরা কি করবে?

ওরা ঠিক থাকবে বাড়ীতে। এইটেকে নিয়ে যাব শুধু।

সুবচনী তার ছোট বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিলে। দুধের জায়গাটা বসুন্ধরা নিতে যাচ্ছিল, সুবচনী বললে, দে ওটা আমার হাতে দে। তুই খালি হাতে চল্।

ধীরুর বাড়ী যেতে হলে রাস্তা দিয়ে ঘুরে যেতে হয় না। দুটো বাড়ীর মাঝখানে খাটো প্রাচীরটা ঝুলন চক্রবর্তীর।

তারই মাঝখানে ছোট্ট একটা দরজার শেকল খুললেই ধীরুদের কুয়োতলা। আর সেই কুয়োর পাশেই প্রকাণ্ড একটা জামের গাছ। তার বাঁদিকে সান-বাঁধানো পুকুরের খিড়কি, ডানদিকে ছোট্ট একটু উঠোনের পাশেই বাড়ী।

সুবচনী বললে, শেকলটা খোল।

শিকল খুলে বন্ধ কপাট দুটো ঠেলতেই হাতে ধুলো লেগে গেল বসুন্ধরার। হাতের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বসুন্ধরা বললে, ভাল কাপড়টা আজ মিছেই ভাঙলাম।

কেন যে সেকথা বললে সুবচনীর বুঝতে দেরি হলো না।

মুচকি একটু হেসে সুবচনী বললে, তা হোক্। শনিবার আমার একখানা ভাল শাড়ী দেবো তোকে।

বসুন্ধরা ফট্ করে একটা চড় মেরে বসলো দিদির পিঠে। বললে, আমি যেন সেইজন্যে বলছি!

মাসী কোথায় গো—মাসীমা!

ঝুলনের বৌ সুবচনীর গলার আওয়াজ মাসীমা ভাল করেই চেনে। ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো দুধের জায়গা হাতে নিয়ে।

তুমি যে কাল এসেছ বৌমা, তা আমি কাল রাত্তিরেই—

হঠাৎ বসুন্ধরার ওপর নজর পড়তেই মুখের কথা তার মুখেই আটকে রইলো।

ও, এই বুঝি তোমার সেই বোন?

সেই বোন, মানে যে-বোনের এত প্রশংসা তুমি কর। যার কথা উঠলে কথা আর শেষ হতে চায় না!

হ্যাঁ মাসীমা, এই আমার সেই বোন। মা মরে গেল, কোথায় আর ফেলে রেখে আসবো এই সোমত্ত মেয়েকে, তাই সঙ্গে করেই নিয়ে এলাম।

মাসীমা দুধটা ঢেলে নিলে নিজের পাত্রে।—হ্যাঁরে, তোর লখু নিজে খেয়ে নিয়ে জল-টল ঢেলে দেয় না তো দুধে? তুমি যে-কদিন ছিলে না বৌমা, সে কদিন কি কষ্ট যে গেছে আমার তা আমিই জানি।

কেন মাসীমা? কি হয়েছিল?

হয়নি কিছু। সময়ে আসতো না, ডাকলে সাড়া দিত না—এই আর-কি! ধীরু এলো তো বললুম—আধ সের দুধ বেশি দে। তা কিছুতেই দিলে না হতভাগা। বললে, আমার হিসেব-করা দুধ। মা এসে আমাকে বকবে। তা—বোনটির বিয়ের কথাবার্তা কোথাও কিছু হলো?

সুবচনীর মনে হলো যেন মাসী তাকে বিদ্রূপ করলে।

না মা, কোথায় আর হবে? ধীরু-ঠাকুরপোর সঙ্গে দিতে চাইলাম, তা তুমি তো দিলে না আমরা গরীব বলে। কেন, বৌ কি তোমার খারাপ হতো?

খারাপ ভাল কিছু জানি না বাছা, প্রজাপতির নির্বন্ধ, যেখানে কপালে ছিল সেইখানেই হলো। ধরো—অত বড়-লোকের একটিমাত্র মেয়ে, বিষয়সম্পত্তি টাকাকড়ি বাপের যা কিছু সব ওই মেয়েই পাবে, তার ওপর ধীরু চেয়েছিল লেখাপড়াজনা মেয়ে, তাও হলো। এখন ভালয়-ভালয় বিয়েটি চুকে গেলেই নিশ্চিন্ত হই। তা হাঁ রে—

কি যেন বলতে গিয়েও মাসীমা বললে না। দুধের জায়গাটা ঘরের ভেতর রাখতে গেল। বসুন্ধরা তখন দোরের কাছ থেকে সরে পড়েছে। বিয়ের কথা হচ্ছে, সরে তো যাবেই।

সুবচনী বললে, হাঁ রে বলো কি যেন বলতে যাচ্ছিলে মাসী?

মাসীমা বেরিয়ে এসে বললে, হ্যাঁ, বলছিলাম কি, নিয়ে তো এলে বোনটিকে, ঘর তো একটি, কাল রাত্রে তোমরা সব একসঙ্গেই শুয়েছিলে তো!

একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো সুবচনীর। সামান্য যা কিছু আছে তার, এতদিন তাইতেই সন্তুষ্ট ছিল সুবচনী। মনে হতো তার অভাব যেন কিছুই নেই। আজ যেন প্রথম তার মনে হলো সে দরিদ্র।

অরুণের বাপকে তো জানো মাসী, গাছতলায় শুতেও তার আটকায় না। কাল ওকেই দিয়েছিলাম বাইরে ঠেলে। একটা মাদুর বিছিয়ে বাইরের চালায় শুয়েই রাতটা দিলে কাটিয়ে। আমরা দু'বোনে শুয়েছিলাম ঘরের ভেতরে।

মাসীমা কি যেন ভাবলে। ভাবলে, তার এই বাড়ীটার ঘরগুলো সব খাঁ খাঁ করছে। অন্ধকার রাত্রে লাইনের ধারে শেয়াল ডাকে। রাত-বিরেতে জামগাছের তলায় কুয়োতলায় যেতে গা ছম্ ছম্ করে। ঝুলনের বৌ বাপের বাড়ী চলে গিয়েছিল, ধীরু ছিল না বাড়ীতে, মনে হচ্ছিল যেন জনমনুষ্যহীন এই নির্বান্ধব পুরীতে চোর-ডাকাত এসে সন্ধ্যেবেলায় যদি তাকে খুন করে দিয়ে যায় তো কেউ জানতেও পারবে না। তার চেয়ে—

শোনো বৌমা, ঝুলন বাইরে শুয়ে থাকবে আর তোমরা দু'বোন ঘরের ভেতর শোবে—সে ব্যবস্থা একদিন চলতে পারে। তাই বলে তো বারো মাস চলে না।

সুবচনী বললে, তা তো চলে না মাসী, কিন্তু কি করবো বল। আর-একখানা ঘর করতেও তো টাকার দরকার।

মাসী বললে, তার চেয়ে এক কাজ কর। আমি তো একাই থাকি। তোমার ঘর যতদিন না হয়, সন্ধ্যেবেলা খাইয়ে-দাইয়ে ওকে আমার বাড়ীতে দিয়ে যেয়ো। আমার কাছেই শোবে।

সুবচনী কার মুখ দেখে উঠেছে আজ কে জানে। যে-মাসীর কাছ থেকে এতটুকু সুবিধে কেউ আদায় করতে পেরেছে—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন কেউ নেই যে হলপ করে বলতে পারে। সেই মাসীর আজ এই অনুগ্রহে সুবচনী যেন কৃতার্থ হয়ে গেল।

কই রে, কোথায় গেলি বসুন্ধরা! বোন আমার খুব ভাল, বুঝলে মাসী। আমাকে দেখে ওকে বিচার কোরো না। আমি একটু ঝটফটে ট্যাকট্যাকে চির-কাল। আর বসুন্ধরা আমাদের যেমন সুবুদ্ধি তেমনি ঠান্ডা।

বসুন্ধরা যে কত ঠান্ডা সে-কথা বুঝতে অবশ্য খুব বেশি দেরি হলো না। সুবচনীর রান্নাবান্না আছে, ঘরকন্নার কাজকর্ম আছে, বসে বসে গল্প করবার জো নেই। সে তাই বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে বাড়ীর দিকেই চলে যাচ্ছিল, জাম-গাছের তলাটা তখনও পেরোয়নি, হঠাৎ বসুন্ধরার গলার আওয়াজ! জাম খাবি দিদি? ভারি মিষ্টি জাম।

ওমা তুই গাছে উঠেছিস? নাম্ নাম্ শীগ্গির নাম্। মাসী দেখতে পেলে—

পেছনে ফিরে দেখে, মাসী দাঁড়িয়ে।

ওই দ্যাখ্, পেড়ে দেবার লোক অভাবে গাছের জাম আমার গাছেই রইলো। ধীরু এসেছিল যেদিন, তোর ওই লখিন্দর ছোঁড়াটাকে বললুম দে বাবা চারটি পেড়ে, তো শুনলে আমার কথা? বললে, বর্ষায় পেছোল হয়েছে গাছটা, পা হড়কে পড়ে যাব। বলেই ছুটে পালালো।

বসুন্ধরা বললে, ভাল কাপড়টায় জামের দাগ লাগলে আর উঠবে না দিদি, একটা গামছা-টামছা দে। মাসীমার জন্য ভাল ভাল জাম কিছু পেড়ে দিই।

সুবচনীকে কিছু বলতে হলো না।

মাসীই বললে, দিচ্ছি। দাঁড়া। নামিস্‌নে।

বলেই মাসী বোধকরি গামছা আনতে গেলে।

সুবচনী বললে, জাম পেড়ে দিয়ে তুই আয় বসুন্ধরা। আমি বাড়ী যাচ্ছি।

মাসী গামছা আনলে। গামছাভর্তি জাম পেড়ে নিয়ে বসুন্ধরা নেমে এলো গাছ থেকে।

এত জাম পাড়লি কেন?

বসুন্ধরা বললে, সব জাম তো পেকে গেছে। পাখীতে আর বাদুড়ে খেয়ে সব নষ্ট করে দেবে। পরিষ্কার কুলো আছে বাড়ীতে?

কুলো কি করবি?

দেখুন না কি করি!

অতি যত্ন করে কুলো ধুয়ে জামগুলি ধুয়ে নুন মাখিয়ে রৌদ্রে শুকোতে দিলে বসুন্ধরা।

মাসী সব দেখলে চেয়ে-চেয়ে। বললে, ভালই হলো। আজ বুধবার। আর দুদিন বাদে শনিবারে ধীরু আসবে পাঁচটার গাড়ীতে, তখন বেশ মজে থাকবে জামগুলো। তা বাছা তোর দিদির জন্যে দুটো নিয়ে গেলিনে কেন এই থেকে? গাছে উঠে তোকে জাম পাড়তে দেখে গেল, বলবে মাসী দিলে না। ওর ভারি ট্যাঁকটেকে কথা!

বসুন্ধরা বললে, না, এতে কেউ হাত দেবে না বলছি। ওদের দিতে হয় আমি আবার পেড়ে দেবো।

কথাটা ভালই লাগলো মাসীর। কিন্তু গাছে উঠে জাম পেড়ে দিলে মেয়েটা, তার বদলে ওকে এক পেয়ালা চা অন্তত খাইয়ে দেওয়া উচিত।

চা খাবি তো বল্। আমি চা করতে যাচ্ছি। জল একটু বেশি নিই তাহ'লে।

বসুন্ধরা মুখ তুলে তাকালে মাসীর দিকে। বললে, উনোন ধরিয়ে চা করবেন?

হ্যাঁ বাছা, ওই উনোনেই দুধটা গরম করে রাখবো। তারপর নিজের জন্যে চারটি ভাতে ভাত বসিয়ে দেবো।

টালির-ছাউনী রান্নাঘরটা আলাদা। কুলো আনতে গিয়ে বসুন্ধরা সব দেখে নিয়েছে। চা খাবে কি খাবে না কিছু না বলেই বসুন্ধরা উঠে গেল সেখান থেকে।

যাক্‌গে। মাসী চা চিনির কৌটা আর দুধের ডেক্‌চিটা নিয়ে রান্নাঘরে এসে দেখে বসুন্ধরা উনোন ধরাতে বসে গেছে।

কয়লার উনোনটা ধরাতে গেলি কেন? কাঠের উনোনে চা করে নিলেই হতো।

বসুন্ধরা বললে, আপনি দুধটা এ সময় নিয়ে এলেন কেন মাসীমা? দুধে ধোঁয়া বসে গেলে আর খেতে পারবেন না। দুধটা রেখে আসুন, যান।

আরে! মেয়েটা হুকুম করে যে! বিরজাসুন্দরী হুকুম সবাইকে করেই এসেছে চিরকাল। কারও হুকুম তাকে কোনোদিন তামিল করতে হয়নি। কাজেই সামান্য একটুখানি অনুরোধও তার কাছে কেমন যেন হুকুম-হুকুম মনে হয়।

দুধটা মাসী শেষ পর্যন্ত রেখেই এলো। কিন্তু এসে দেখে মেয়েটা চলে গেছে। এরই মধ্যে উনোনের ওপরে আঁচ উঠছে। মেয়েটা তাহ'লে উনোন ধরাতে জানে!

কোথায় গেলি রে তুই? নামটাও তো মনে পড়ছে না। কি যেন বলেছিল— বৌ! বৌ! বলি ও অরুণের মা! কেট্‌লিটা কোথায় রাখলে জিজ্ঞাসা কর তো তোমার বোনকে!

যাচ্ছি।

বসুন্ধরার গলার আওয়াজ!

ঠিক। দিদির কাছে গিয়ে উঠেছে। আমি ভাবলুম বুঝি উনোন ধরিয়ে চা করবে। মিছেই ওকে বাড়ীতে শুতে বললুম। পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিতা মেয়ে। গাছে উঠে জাম পাড়তেই জানে শুধু।

জামগাছটার দিকে তাকিয়ে এমনি-সব কথাই ভাবছিল মাসী উঠোনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। এমন সময় দেখা গেল, বসুন্ধরা আসছে তার দিদির বাড়ী থেকে। পরনের কাপড় দিয়ে ধরেছে কেট্‌লিটা। বোধকরি জলটা গরম করে নিয়ে এলো সুবচনীর উনোনে।

দিদির বাড়ী ছুটলি কেন? এ-উনোনটাও তো ধরে এসেছে।

দিদির স্টোভ জ্বলছে যে! আপনার তো স্টোভ নেই।

স্টোভ নেই কে বললে? আমার সব আছে।

আছে তো আছে। আসুন তাড়াতাড়ি চা দেবেন আসুন।

চায়ের কৌটাটা বের করে দিয়ে মাসী বললে, দিদি তোর স্টোভে রান্না করছে নাকি?

গরম জলে চা ছেড়ে দিয়ে বসুন্ধরা বললে, হ্যাঁ। দিদির কয়লা ফুরিয়ে গেছে।

এখান থেকে চারটি নিয়ে গেলেই পারতো।

বসুন্ধরা বললে, কাজ কি বাবা, সময়ে না দিতে পারলে আপনি আবার সাত-কাণ্ড করবেন। না নিয়েছে ভালই করেছে।

সাতকাণ্ড করবো? এই কথা বলছিল বুঝি তোর দিদি?

বসুন্ধরা তাকালে একবার মাসীর মুখের দিকে।—না না খারাপ কিছু বলেনি। বলছিল মাসী খুব হিসেবী। ওই রকম হিসেবী হতে পারলে আমি অনেক কিছু করতে পারতাম।

চায়ের সরঞ্জাম একে একে বসুন্ধরার হাতের কাছে নামিয়ে দিতে দিতে মাসী বললে, তোর দিদি বুঝি খুব বেহিসেবী? কই দুধের হিসেব একচুল এদিক ওদিক হোক্ দেখি। টাকাটি কই একদিন দেরি হোক্ দেখি দিতে! অমনি রু রু করে ছুটে আসবে—মাসী, আজ কত তারিখ মনে আছে?

সুন্দর মুখে বড় সুন্দর হাসি হেসে উঠলো বসুন্ধরা। বললে, গরীবের অনেক জ্বালা।

উনোন ধরে গেছে। দুধটা একটুখানি গরম করে এনে বসুন্ধরা চা খেতে দিলে মাসীকে। নিজেও নিলে এক কাপ। জিজ্ঞেস করলে, চা খারাপ হয়েছে?

চা খেতে খেতে মাসী বললে, এ তো শ্যামানন্দপুরের চা নয় যে খারাপ হবে? এ চা ধীরু এনেছে কলকাতা থেকে।

বসুন্ধরা বললে, আপনার ধীরু কলকাতা থেকে চা এনেছে— সেইটেই বড় কথা হলো, আর যে করলে, তার কিছু নয়?

মাসী বললে, খুব দামী চা যে!

যতই দামী হোক্ মাসীমা, চা করতে না জানলে খারাপ হবেই।

না না চা তুই ভালই করেছিস।

চা খেয়ে কাপদুটো ধুয়ে [illegible] বসুন্ধরা। বললে, নিন এবারে [illegible]ক রান্না করতে হবে বলুন। উনোন ধরে গেছে।

তুই কি আমার রান্না[illegible] করে দিবি নাকি?

তা নয় তো কি করবো আমি বসে বসে। একটা কাজ তো করতে হবে।

মাসী বললে, আমি তো ভাতে ভাত খাই বাছা। আমার আবার রান্না কি? আমার রান্না তোকে করতে হবে না। যা তুই তোর দিদির ছেলে ধরুগে।

ধরবার মত ছেলে দিদির কোনোটাই নয় মাসী। বাচ্চাটা তো কাঁদতেও জানে না। এক জায়গায় বসিয়ে দিলে চুপ করে খেলা করে।

এই বলে বসুন্ধরা মাসীর মুখের দিকে তাকিয়ে ফিক্ করে হেসে বললে, আপনি আমাকে তাড়াতে যাচ্ছেন কেন বলুন তো?

এ তো বড় সাংঘাতিক মেয়ে! তাড়াতে চাইবো কি রে? তোকে আমি রাত্তিরে শুতে বলেছি আমার কাছে। তা জানিস?

কথাটা শোনেনি বসুন্ধরা। শুনে খুব খুশী হলো।

সত্যি বলছি কাল রাত্তিরে আমার ভাল ঘুম হয়নি মাসীমা। শুয়ে শুয়ে খালি ভেবেছি—কেন মরতে এলাম দিদিকে কষ্ট দিতে।

তাই তো বললুম তোর দিদিকে। রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার পর এখানে দিয়ে যাস তোর বোনটাকে। কি নাম বললে তোর? নামটি ভুলে গেলাম।

বসুন্ধরা।

নীচে তিনখানা, ওপরে তিনখানা ঘর। খালিই তো পড়ে থাকে। তাই

যেই কিনুক, আজ আমি আপনাকে ঘি-ভাত খাওয়াবোই।

না রে না, ঘি-ভাত খেতে হয় না।

খুব খেতে হয় মাসীমা, আপনি খাবেন নাতো খাবে কে? আপনার ছেলে রোজগার করছে, বড়লোকের মেয়ে বৌ হয়ে আসছে বাড়ীতে, ভাল-মন্দ খেয়ে খেয়ে শরীরটাকে ঠিক করে ফেলুন। বড়লোক কুটুমজনের কাছে বেরুতে হবে তো!

কথাটা সত্যি। কিন্তু খরচটাও তো

বসুন্ধরা আসছে তার দিদির বাড়ি থেকে। পরনের কাপড় দিয়ে ধরেছে কেট্‌লিটা।

বললুম—বসুন্ধরা শোবে আমার ঘরে। একাই তো থাকি এত বড় বাড়ীটায়।

বসুন্ধরা ছাড়লে না কিছুতেই। রান্না সে করবেই।

ঘি আছে আপনার ঘরে?

ঘি কি হবে?

আছে কিনা বলুন না!

আছে। তোর দিদির কাছেই কিনেছি। ঘি তো আজকাল পাবার জো নেই। তা তোর দিদির যা গলাকাটা দাম। আমি বলেছিলাম ঘি খাব না। ধীরু ছাড়লে না। কিনে দিলে তোর দিদির কাছ থেকে।

তা সে আপনার ধীরুই কিনুক আর

দেখতে হবে! মনে-মনে কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছিল বিরজাসুন্দরীর। মেয়েটার কোনও মতলব নেই তো? তা মতলব যা-ই থাক্, সে-পথে কাঁটা পড়ে গেছে। ধীরুর বিয়ের যদি পাকাপাকি ব্যবস্থা না হয়ে যেতো, মেয়ে দেখে ধীরুর পছন্দ যদি না হতো, তাহ'লেও-বা কথা ছিল। যাক্‌গে, আর ভাবতে পারে না। ঘিয়ের জায়গাটা বসুন্ধরাকে দেখিয়ে দিলে মাসীমা।

তা'হলে তুইই-বা আজ দিদির কাছে খাবি কেন, এইখানেই খা।

বসুন্ধরা বললে, আমার চাল নেওয়া হয়ে গেছে ওখানে।

তা হোক্, সে-ভাত ওবেলায় খাবি।

বসুন্ধরা জাম-তলা থেকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে দিলে, দিদি, আমি আজ এইখানে খাব।

মাসী বললে, তোমার বোন আজ আমাকে পোলাও রান্না করে খাওয়াবে।

এই মরেছে! মাসীকে অত খরচ করিয়ে দিস্‌নে হতভাগী, ধীরু-ঠাকুরপো এলেই বলে দেবে—মেয়েটা উড়ন্‌চণ্ডী।

তা বলুক দিদি, তুই চুপ কর্।

সুবচনী আর কিছু বললে না বটে, কিন্তু খেতে বসে মাসীমার প্রশংসা যেন আর ধরে না!

এ-রকম রান্না কোথায় তুই শিখলি রে বসুন্ধরা?

আমার মায়ের কাছে।

মাকে আজ হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল। সেই কাজল-বৌএর কথা। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বসুন্ধরা চুপ করে কি যেন ভাবছিল। মাসী বললে, শনিবার রাত্তিরে আর নাহয় তো রবিবার ধীরুকে এমনি করে খাইয়ে দিস তো মা!

বসুন্ধরা বললে, মাছ আনিয়ে দেবেন তাহ'লে।

মাছ তো আমার এই পুকুরে। এই তো হাতের কাছে।

কিন্তু মাসীমা, একটা কথা বলে রাখছি আপনাকে। আমি কিন্তু রান্না করে দিয়ে পালিয়ে যাব। আপনি ধরে দেবেন খাবারটা।

মাসীমা বললে, লজ্জা করবে বুঝি? আমার ছেলে কিন্তু আজকালকার ছেলেদের মত নয়। যেমন চেহারা তার তেমনি স্বভাব চরিত্র—

বসুন্ধরা বললে, জানি।

তুই জানলি কেমন করে? তুই তো দেখিস্‌নি তাকে।

দিদি আমাকে চিঠি লিখেছিল যে!

কি লিখেছিল?

লিখেছিল, খুব ভাল একটি পাত্র ছিল হাতে, হাত-ছাড়া হয়ে গেল। তার-পর লিখেছিল—ওই আপনি যা বললেন, মানুষের মতন চেহারা, দেবতার মতন চরিত্র—এমনি-সব আরও কত-কি!

বলেই ফিক্ করে হাসতে লাগলো বসুন্ধরা। এখন আর হাসতে দোষ কি? তার সঙ্গে বিয়ে হবার যদি আশা থাকতো তা'লে লজ্জায় হয়ত কোনও কথাই সে বলতে পারতো না।

কিন্তু মুস্কিল হলো এই যে—তার ভাবী পুত্রবধূটি যে আকাশের চাঁদ এবং সে চাঁদ যে কেমন করে তার হাতে এসে ধরা দিয়েছে তারই সবিস্তার বর্ণনা একটি একটি করে বসুন্ধরাকে সবই শুনতে হলো।

আকাশের চাঁদই হোক আর যাই

হোক্, এখন আর বসুন্ধরার তাতে কিছু এসে-যায় না। এখন আর বিয়ের ভাবনা সে ভাবেই না। গরীব বাপের মেয়ে হয়ে জন্মেছে সে বাংলাদেশে—তার অভিশাপ তাকে বহন করতেই হবে।

মুখখানা তার শুকনো দেখলে পাছে দিদির মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে, তাই সে হেসে খেলে ছুটে ছুটে বেড়ায়। মাসীমার যাবতীয় কাজ সে করে দেয়, দিদির ছেলেদের নিয়ে খেলা করে, পুকুরে সাঁতার কাটে, গাছে উঠে পেয়ারা পাড়ে, আম পাড়ে, জাম পাড়ে, কাঁচা আম নুন দিয়ে দিয়ে খায়।

দুদিন পরেই শনিবার এলো।

সকালে পিয়ন একখানা চিঠি দিয়ে গেল। বিরজাসুন্দরীর নামে খামের চিঠি।

অন্যদিন হলে চিঠিখানা নিয়ে মাসীমা হয়ত সুবচনীর কাছে যেতো, সেদিন সে ডাকলে, বসুন্ধরা।

রান্নাঘরে বসুন্ধরা কি যেন কাজ করছিল। 'যাই মাসীমা' বলে বেরিয়ে এলো।

পড়তে জানিস?

জানি বই-কি! কই দেখি কার চিঠি!

চিঠিখানা একরকম কেড়েই নিলে বসুন্ধরা। খুলে দেখে একখানা চিঠির সঙ্গে একটি মেয়ের ফটো।

বসুন্ধরা চিঠিখানা মনে মনে পড়লে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলে ছবিখানা। তারপর চেঁচিয়ে ডাকলে, দিদি! দিদি!

মাসী বললে, দিদিকে ডাকছিস কি না? আগে বল্ কার চিঠি!

সেকথার জবাব না দিয়ে বসুন্ধরা আবার বললে, ছুটে আয় দিদি, চট্ করে দেখে যা।

মাসী আবার জিজ্ঞাসা করলে, কি দেখবে?

বসুন্ধরা বললে, দিদির ধীরু-ঠাকুরপোর বৌ।

তুই তো ভারি ফাজিল মেয়ে বসুন্ধরা! রাগে যেন ফেটে পড়লো বিরজাসুন্দরী। চিঠিখানা বসুন্ধরার হাত থেকে একরকম জোর করে কেড়ে নিয়ে বললে, আমার বৌএর ছবি আমাকে আগে না দেখিয়ে তুই তোর দিদিকে ডাকছিস?

বসুন্ধরা বললে, আপনার বৌকে তো আপনি সারা জীবন দেখবেন মাসীমা, দিদি একবার দেখুক।

ছবিখানা তন্ময় হয়ে দেখতে লাগলো বিরজাসুন্দরী। কিন্তু কোত্থেকে এসেছে, কে পাঠিয়েছে তাও তো জানা দরকার!

সুবচনী এসে দাঁড়িয়েছে।

কই দেখি কেমন বৌ হলো ধীরু-ঠাকুরপোর।

মাসীর হাত থেকে ছবিখানা নেবার জন্যে সুবচনী হাত বাড়ালে।

ছবি না দিয়ে চিঠিখানা সুবচনীর হাতে তুলে দিয়ে মাসী বললে, তুমি আগে আমাকে চিঠিখানা পড়ে শুনিয়ে দাও তো বৌমা! এ-ছুঁড়ি শুধু ফিক্ ফিক্ করে হাসছে।

সুবচনী চিঠিটা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়লে।

পূজনীয়া বেয়ান-ঠাকরুণ, আমার প্রণাম জানিবেন।

এই পর্যন্ত পড়েই সুবচনী বললে, বিয়ের আগেই তুমি বেয়ান হয়ে গেলে মাসী।

মাসী বললে, বিয়ে তো একরকম হয়েই গেছে বাছা। নাও পড় তারপর কি লিখেছে।

সুবচনী পড়লে—নিরুপমার একখানি ফটো পাঠাইলাম। শ্রাবণে নিরুর জন্ম-মাস, কাজেই সেদিক দিয়া বিবাহের একটু অসুবিধা আছে। সুতরাং আগামী অগ্রহায়ণেই বিবাহ দিব স্থির করিয়াছি।

কথাবার্তা সবই হইয়া আছে। আর নতুন করিয়া বলিবার কিছু নাই। নিরুপমার মা শ্রীমান ধীরেন্দ্রনাথকে একবার দেখিবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে। আপনি যদি তাহাকে একবার আমার বাড়ীতে আসিতে বলেন তাহা হইলে বড় ভাল হয়। লজ্জায় সে বোধ-হয় একা আসিতে চাহিবে না। আপনার অনুমতি পাইলে আমি নিজে গিয়া তাহার আপিস হইতে তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিতে পারি।

আশা করি আপনি কুশলে আছেন। আপনি আমাদের প্রণাম জানিবেন। নিবেদন ইতি।

শ্রীপরাশর বন্দ্যোপাধ্যায়

চিঠিখানি মাসীর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে সুবচনী বললে, দাও এবার ফটোটা দেখি।

ফটো দেখে মুখখানা গম্ভীর হয়ে গেল সুবচনীর। মনের কথা নিঃসঙ্কোচে বলে ফেলাই তার চিরকালের অভ্যাস, কিন্তু আজ সে হঠাৎ বুঝতে পারলে সব জায়গায় সব কথা অকপটে প্রকাশ করা চলে না।

কাজ ফেলে এসেছি মাসী। বলে সুবচনী চলে যাচ্ছিল, মাসী বললে, মেয়েটি কেমন তা তো বলে গেলে না বৌ?

ভালই তো। বলে চলে যাচ্ছিল সুবচনী। আবার ফিরে দাঁড়ালো। মনের কাঁটা সঙ্গে-সঙ্গে উপড়ে ফেলাই তার স্বভাবধর্ম। বললে, সব সুখ কি সব সময় হয় মাসী? তুমি টাকা পয়সা মেলে, বিষয়-সম্পত্তি নেবে, আবার মেয়েটিও পরমাসুন্দরী হবে—তা কেমন করে হয়?

এই বলে আর দাঁড়ালো না সুবচনী।

কথাটা ভাল লাগলো না মাসীর। সুবচনীকে দুকথা শুনিয়ে দিতে ইচ্ছে করছিল। বসুন্ধরা সেটা বোধ করি টের পেলে। বললে, দিদির কথা আপনি শুনবেন না মাসী। খুব ভাল বৌ হয়েছে আপনার।

এইটিই যেন শুনতে চাইছিল বিরজাসুন্দরী।

সত্যি বলছিস?

সত্যি মিথ্যে জানি না মাসী, আমার যা মনে হয়েছে তাই বলছি।

মাসী বললে, ধীরুকে বলিস।

বসুন্ধরার রাঙা মুখখানি যেন আরও রাঙা হয়ে উঠলো কথাটা শুনে। —ধীরুদার সঙ্গে আমি কথাই বলতে পারবো না।

কেন পারবি না? ধীরু তো তোর দাদার মত। দাঁড়া আসুক ধীরু, আজই তো বিকেলে আসবে, দেখবি সে তোকে কত ভালবাসবে। ধীরু যখন খুব ছোট ছিল তখন কি বলতো জানিস? বলতো আমার একটা বোন নেই কেন মা? আমি বলতুম—বোন একটা তোর কিনে এনে দেবো।

এই বলে হাসতে হাসতে মাসী হঠাৎ হাসি বন্ধ করে বললে, আসবামাত্র ছবিটা আমি দেখাবো না ধীরুকে। তুই সেই তেমনি করে চা করে দিবি, ধীরু বসে বসে চা খাবে, তখন দেখাবো ছবিটা। কেমন দেখলি? জিজ্ঞাসা করলে আমাকে তো লজ্জায় কিছু বলবে না। তুই তখন বলবি যা বলতে হয়। কেমন?

বসুন্ধরা বললে, না মাসী না। আমি আসবোই না বিকেলবেলা। চা আপনি করে দেবেন। রাত্রে ধীরুদা কি খাবে বলুন।

খায় তো ভাত। সেদিনের মত ঘি-ভাত করে দিতে পারিস।

বসুন্ধরা বললে, আপনি দেখছি সব ভুলে যাচ্ছেন। জেলেকে বললেন, কাল সকালে এসে সে পুকুরে মাছ ধরে দেবে, সেই মাছ দিয়ে—

কথাটা তাকে শেষ করতে দিলে না মাসীমা। মনে পড়েছে। মাথাটা তার

পালিয়ে দিয়ে গেছে সুবচনী। সব সুখ নাকি একসঙ্গে হয় না। বিষয়-সম্পত্তি, টাকাকড়ি আর পরমাসুন্দরী বৌ নাকি একসঙ্গে পাওয়া যায় না। মেয়েটি যে পরমাসুন্দরী নয় তা তার চাল্‌সে-ধরা চোখেও ছবি দেখে বুঝতে পেরেছে বিরজাসুন্দরী। কিন্তু বিষয়-সম্পত্তি টাকাকড়ি যদি না থাকে তো পরমাসুন্দরী বৌ নিয়ে ছাই হবে। ধীরু অবশ্য তা জানে। জানে যে তাকে মানুষ করতে গিয়ে, লেখাপড়া শেখাতে গিয়ে, জমিজমা যা কিছু ছিল সবই গেছে। এখন তার বৌ-এর চেয়ে বিষয়-সম্পত্তির বেশি প্রয়োজন।

মাসী বললে, ঘি আছে বাড়ীতে। রাতে লুচিও করে দিতে পারিস।

সেই ভালো। বসুন্ধরা বললে, আমি চুপিচুপি এসে লুচি-তরকারি করে দেবো। খেতে দেবেন আপনি। খেয়েদেয়ে মাথা ঠাণ্ডা হবে যখন, তখন ছবিটা হাতে দিয়ে বলবেন, আমি দেখাতে ভুলে গিয়েছিলাম।

পরামর্শটা মন্দ নয়। মাসী বললে, নাহলে তাহলে তোকে আর দিদির কাছে খেতে হবে না। এইখানেই খাবি।

না মাসীমা, আপনি বড্ডো বাড়াবাড়ি করছেন। এসে অবধি তো একবেলা এইখানেই খাচ্ছি—

তা হোক্। দিদিকে বলে আসবি।

যেমন করে হোক্, ধীরুকে রাজী করাতেই হবে।

বিরজাসুন্দরী তাই সঙ্গে নিলে বসুন্ধরাকে।

আপনি ভাবছেন কেন মাসীমা। কেমন মিল হয়েছে বলুন তো? নিরু আর ধীরু।

মাসী বললে, দেখেছিস? এরকম করে তো আমি বলতে পারব না বাছা!

পাঁচটার ট্রেণটা বাড়ীর পাশ দিয়ে পেরিয়ে গেল।

এই ট্রেণের প্যাসেঞ্জার নিয়ে কতক্ষণ পরে সাইকেল-রিক্‌সা শ্যামানন্দপুরে এসে পৌঁছোয় এখানকার সবাই তো জানে।

জানতো না শুধু এখানকার নতুন মেয়ে বসুন্ধরা।

মাসীকে সে বলেই রেখেছে সে আসবে না। আপনি চা করে দেবেন।

ধীরু এলো। হাতের ব্যাগটা দোতলায় তার নিজের ঘরে রেখে এসে চটি পায়ে দিয়ে গামছা নিয়ে ধীরু পুকুরের দিকে গেল হাত-মুখ ধুতে।

মা তখন চা করতে বসেছে।

ওদিকে কে জানতো বসুন্ধরা ঠিক সেই সময়েই ঘাট-বাঁধানো পুকুরে সাবান মেখে গা ধুতে যাবে। সবে তখন সে কাপড়টা নিঙড়ে ভিজে কাপড়টা গায়ে জড়াচ্ছে।

ধীরুকে সে দেখতে পেয়েছিল না কপাট খোলার আওয়াজ পেয়েছিল কে জানে, তাড়াতাড়ি সাবানটা তুলে নিয়ে সে ছুটলো। ছুটলো পুকুরের পাড়ে পাড়ে জোড়া নারকেল গাছের মাঝখান দিয়ে পায়ে চলার পথ ধরে।

কপাটের ফাঁক দিয়ে ধীরু দেখলে সবই।

প্রথমে ভেবেছিল সুবচনী। তারপর দেখলে না, সুবচনী নয়।

হাত মুখ ধুয়ে এসে চা খেয়ে ধীরু তার মাকে জিজ্ঞাসা করলে, বৌদিরা এসেছে?

মা বললে, এসেছে।

অন্যদিন ধীরু তার ওপরের ঘরে উঠে যায়, সেদিন কিন্তু সোজা সে জাম-গাছের তলা দিয়ে কুয়োতলার দোরটা ঠেলে—উঠলো গিয়ে সুবচনীর বাড়ীতে।

এই মরেছে! ছবির কথা সুবচনী দেবে হয়ত ফাঁস করে!

ধীরু বললে, বৌদি, এসেছ?

হ্যাঁ ভাই এসেছি, বোসো।

না আর বসবো না। জানতে এলাম তোমরা এসেছ কিনা।

বিয়ের নেমন্তন্ন করবে নাকি?

বিয়ে যখন হবে তখন করব।

সুবচনী ধীরুর কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, বৌটি দেখেছ?

না।

কলকাতায় রয়েছে, যাও একদিন গিয়ে দেখে এসো। বাপের বিষয়-সম্পত্তি কি কি আছে ভাল করে একবার খবর নিয়ে এসো।

ফটোর কথাটা বলবার জন্যে যেন ছট্‌ফট্ করছে সুবচনী। ওদিকে ঘরের ভেতরে কাপড় ছেড়ে চুলটা আঁচড়াতে আঁচড়াতে বসুন্ধরা রেগে রেগে মরছে।—হে ভগবান, দিদি যেন চিঠির কথা—ফটোর কথা ওকে কিছু না বলে।

ধীরু নিজেই কথাটার মোড় ফিরিয়ে দিলে। জিজ্ঞাসা করলে, তোমার সেই বোনটির খবর কি বৌদি? বিয়ে হয়ে গেছে?

প্রশ্নটার ভেতর না-ছিল বিদ্রূপ, না ছিল কোনও ঝাঁঝ, তবু সুবচনীর কানে কেমন যেন বিদ্রূপের মতই শোনালো কথাটা।

সুবচনী সহ্য করে থাকবার মেয়ে নয়। তক্ষুনি জবাব দিয়ে বসলো—হ্যাঁ ভাই বিয়ে হয়ে গেছে। এদিককার ছেলেরা কিরকম হয়েছে জানি না, তবে আমাদের ওদিকের ছেলেরা কষ্ট করে আজ-কাল লেখাপড়া শিখে বেশ মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠেছে। তাদেরই ভেতর একটি ছেলে পয়সাকড়ি কিছু চাইলে না, বাপের বিষয়-সম্পত্তি কি আছে দেখলে না, লেখাপড়া বেশি শেখেনি বলে নাক সিঁট্‌কোলে না, চুপচাপ বিয়ে করে নিয়ে চলে গেল।

এমন গম্ভীর হয়ে কথাটা বললে

সুবচনী যে ধীরুর মাথাটা কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল। তাহ'লে পুকুরের ঘাটে কাকে দেখলে সে?

তাদের পুকুরের ঘাট থেকে আর কোনোদিকে যাবার কোনও পথ নেই। যে-পথ দিয়ে তাকে সে যেতে দেখেছে সে-পথ একমাত্র বলেন চক্রবর্তীর বাড়ীতে আসবার পথ। মেয়েটি নিশ্চয়ই এই ঘরের ভেতর আছে, কিন্তু যে-অবস্থায় তাকে সে দেখেছে সে-কথা বলাও চলে না। মেয়েটি শুনলে লজ্জা পাবে, কাজেই মনের কৌতূহল মনেই চেপে রাখতে হলো ধীরুকে।

সুবচনী জিজ্ঞাসা করলে, পরশু সকালেই তো চলে যাবে?

ধীরু বললে, না। দু'দিন ছুটি আছে।

একটু চা করি। খাও।

না বৌদি, এইমাত্র চা খেয়ে এলুম।

ঠিক এমনি সময় মা'র ডাক শোনা গেল।

ধীরু! শোন্।

মা ডাকছে। আসি বৌদি, আবার দেখা হবে।

ধীরু চলে যেতেই সুবচনী ঘরের দিকে মুখ ফিরিয়ে আস্তে আস্তে বললে, বসুন্ধরা দেখলি?

বসুন্ধরার কোনও জবাব পাওয়া গেল না। সে তখন হাত-আর্শীটা নিয়ে কপালে টিপ পরছিল। সুবচনী ঘরে ঢুকলো। বললে, দেখলি ধীরু-ঠাকুরপোকে?

দিদির দিকে না তাকিয়েই বসুন্ধরা বললে, দেখলাম।

সুবচনী বললে, ওই ছেলের ওই বৌ! আমার ইচ্ছে করছিল আরও কিছু শুনিয়ে দিতে, কিন্তু সময় পেলাম না।

না দিদি শোনাসনে।

শোনাবো না কি রে? টাকাই ওদের বেশি হলো? ধীরু-ঠাকুরপোর মত ওই ছেলে—ভালবাসতে পারবে ওই হাবলা-মুখো কেবলি-কেবলি মেয়েটাকে?

ভালবাসা তো পথে-ঘাটে গড়াগড়ি যাচ্ছে! টাকা-পয়সাতেই সব ঠিক হয়ে যাবে দেখে নিস্।

বলেই বসুন্ধরা কেমন যেন বিষণ্ণ হাসি হাসতে হাসতে বললে, ভালবাসা! ভাল—বাসা!

ওদিকে ধীরু গিয়ে তার মাকে জিজ্ঞাসা করলে, কি জন্যে ডাকলে মা?

বৌ কিছু বলছিল?

কই না, কিছু তো বলেনি।

মা আশ্বস্ত হলো। বললে, দুধের হিসেবটা করে দিস তো বাবা। মাসের পয়লা তারিখেই টাকার জন্যে ছিঁড়ে খাবে। মেয়েটা টাকা টাকা করেই মলো।

প্রোগ্রাম ঠিক করাই ছিল। বসুন্ধরা আসতে দেরি করেনি। রান্নাঘরেই সব কিছু এনে রাখা হয়েছে। টুঁ শব্দটি না করে বসুন্ধরা রান্না করছে।

বর্ষা প্রায় ধরে এসেছে। কোনোদিন বৃষ্টি হয়, কোনোদিন-বা হয় না। আজও ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি একবার হয়ে গেল। তারপরেই সব ফরসা।

আকাশে চাঁদ ছিল। চাঁদের আলো এসে পড়েছে উঠোনে, জামগাছের মাথায়, আর বাড়ীটার আনাচে-কানাচে। দোতলার ঘরে আলো জ্বলছে। উনোনের কাছে বসে বসেই বসুন্ধরা সব দেখলে।

ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, বাইরের ওই আবছা জ্যোৎস্নায় কেমন যেন একটা রঙিন স্বপ্নের আবেশ। বসুন্ধরারও স্বপ্ন দেখবার বয়স। কিন্তু তার মায়ের মৃত্যুর পর কী যে হয়েছে বসুন্ধরার—মনে হয় কে যেন তার চুলের মুঠি ধরে প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি দিয়ে তার সব সাধ সব স্বপ্ন ভেঙে দিয়ে গেছে। পৃথিবীটা তার কাছে যেন শুধু পদার্থময় হয়ে উঠেছে। শুধু যেন জল, মাটি গাছপালা আর কাঁকর পাথর ছাড়া এখানে আর কিছু নেই। মানুষ আছে তার মন নেই, কথা আছে তার ছন্দ নেই, শব্দ আছে তার সুর নেই, ঘুম আছে তার স্বপ্ন নেই।

মাসীমা আসতেই বসুন্ধরা বললে, আপনি খেয়ে নিন মাসীমা। আমিষ নিরামিষ সব আমি আলাদা করে রেখেছি।

বেশ করেছিস। ধীরুর জায়গা করে দেবো?

কোথায় করবেন?

এইখানে করি। এখান থেকে সব জিনিস ওই দোতলায় তুলতে কষ্ট হবে।

একেবারে এই চোখের সামনে? বাইরে করলে হতো না?

মাসীমা বললে, অত লজ্জা কেন রে? বাইরে জায়গা করবো, বর্ষাকাল, যদি বৃষ্টি আসে?

বসুন্ধরা আর আপত্তি করতে পারলে না।

মাত্র হাত-চারেক দূরে বসে বসে খাবে দিদির সেই ধীরু-ঠাকুরপো, আর বসুন্ধরা এই উনোনের কাছে বসে বসে লুচি ভাজবে। কেমন যেন লজ্জা-লজ্জা করতে লাগলো বসুন্ধরার। খানিক পরে নিজেকে সামলে নিলে। কিসের লজ্জা?

মাসীমা নিজে গিয়ে ডেকে আনলে ধীরুকে।

কুমারী মেয়ে, মাথায় কাপড় টেনে ঘোমটা দেওয়া চলে না। শাড়ীর আঁচলটা যেমন প্যাঁচ দিয়ে কোমরে জড়ানো ছিল তেমনিই রইলো। পিঁড়িটা টেনে নিয়ে উনোনের আড়ালে বসতে গিয়ে একেবারে মুখোমুখি হয়ে গেল। আবার পিঁড়িটাকে টানাটানি করে পাশ ফিরে বসা তখন আর সম্ভব নয়।

ধীরু তো ঘরে ঢুকে আসনে বসতে গিয়ে অবাক্!

হ্যাঁ, এই মেয়েটিই তো! একেই দেখেছে সে পুকুরের ঘাটে।

ধীরু তার মায়ের দিকে তাকিয়ে বললে, বৌদির বোন না?

মাসীমা বললে, হ্যাঁ, এই তো বসুন্ধরা। কেন তুই দেখিসনি তখন?

কখন?

সেই যে বিকেলে—তুই যখন গেলি বৌমার বাড়ী—

কই না তো! ও তখন বোধহয় লুকিয়ে বসেছিল ঘরের ভেতর। বেরোয়নি।

মাসীমা বললে, বড় ভাল মেয়ে। এসে অবধি আমারই কাজকর্ম করে। বলেনের তো একখানি মাত্র ঘর তাই আমার কাছেই শোয় এসে রাত্রে।

ধীরু ও ও করছে, খাচ্ছে আর একবার করে তাকাচ্ছে বসুন্ধরার দিকে। আগুনের আভায় মুখখানি কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। নিটোল সুন্দর হাতে মাত্র একগাছি করে সোনার চুড়ি। কানে দুটি পাথরের দুল। লাল সস্তা পাথর। মাঝে মাঝে আগুনের মত চিক্ চিক্ করছে। সস্তা একটা ডুরে শাড়ী, তাও মনে হচ্ছে যেন কত দামী।

বসুন্ধরাকেও এক-আধবার তাকাতে হচ্ছে বই-কি!

দেখতে হচ্ছে লুচি আর দরকার হবে কিনা। মাসীমা তুলে তুলে দিচ্ছে আর সে শুধু ভেজেই চলেছে।

না না আর দরকার হবে না।

ধীরুর খাওয়া শেষ হয়ে গেছে।

মাসীমা হঠাৎ বলে উঠলো, ও মা, আসল কথাটাই তোকে আমি বলতে ভুলে গেছি। দাঁড়া আমি নিয়ে আসি।

এদের দু'জনকে একলা ফেলে রেখে মাসীমা চলে গেল তার সেই ভুলে-যাওয়া জিনিসটা আনতে। কি সে জিনিস বসুন্ধরা জানে।

পালাতে ইচ্ছে করলো বসুন্ধরার। কিন্তু পালাবার আর পথ নেই। দুধের বাটিটা ধরে দিতে ভুলে গেছে মাসীমা।

দাঁড়ান। উঠবেন না।

দুধের বাটিটা দু'হাত দিয়ে ধরে

বসুন্ধরা হেঁট হয়ে নামিয়ে দিল ধীরুর হাতের কাছে।

ধীরু কি যেন দেখলে। কি দেখলে বসুন্ধরার নজর এড়ায়নি। পেছন ফিরে মুখ টিপে একটুখানি হেসে বসুন্ধরা আবার তার নিজের জায়গায় এসে বসলো।

তোমার সিঁথিতে সিঁদুর নেই কেন?

হাসতে গিয়েও হাসতে পারলে না বসুন্ধরা। কি জবাব দেবে তাও সে বুঝতে পারলে না। মোক্ষম একটা জবাব তার ঠোঁটের কাছে এসেও আটকে রইলো। কড়াইটা সে উনোন থেকে নামিয়ে দিয়েছে। কাজ করবারও কিছু নেই। মাথা হেঁট করে বসে রইলো বসুন্ধরা।

তোমার দিদি তখন বললে—কে একটি ছেলে যেন—

দিদি আর তার বিধাতা দুজনেই তার সঙ্গে রসিকতা করেছে সেকথাও সে মুখ ফুটে বলতে পারলে না।

সব কিছু রহস্যাবৃতই রয়ে গেল। খামখানা হাতে নিয়ে মাসীমা ঘরে ঢুকলো।

খাওয়া হয়ে গেছে? যা আঁচিয়ে আয়। তোকে একটা জিনিস দেখাচ্ছি।

আঁচিয়ে এলো ধীরু।

মা তার হাতে খামখানা দিয়ে বললে, চিঠিখানা আগে পড়্। নিরুপমার ছবিটি সে বের করে রেখেছিল।

ধীরু আবার তার আসনের ওপর বসে লণ্ঠনের আলোয় চিঠিখানা পড়লে। তারপর জিজ্ঞাসা করলে, চিঠির সঙ্গে আর-কিছু ছিল না?

আর-কিছুটি আঁচলের তলায় লুকিয়ে রেখেছিল মাসীমা। বের করে দিলে ধীরুর হাতে। ধীরু একবার দেখলে ছবিখানি। তারপর ছবি আর চিঠি একসঙ্গে নিয়ে চট্ করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

মাসীমা বসুন্ধরার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, কিছুই বললে না যে রে?

আপনিও তো কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না।

আমার বাপু লজ্জা-লজ্জা করতে লাগলো। তুই জিজ্ঞাসা করবি চল্।

বসুন্ধরা বললে, আপনি খেয়ে নিন আগে।

নে তবে তুইও বোস। ধীরু এখন ঘুমোবে না। অনেক রাত্রি পর্যন্ত শুয়ে শুয়ে বই পড়বে।

খেতে বসে বসুন্ধরা বললে, কী আর জিজ্ঞাসা করবেন মাসীমা, বিয়ের তো পাকাপাকি কথাবার্তা সব ঠিক হয়েই আছে।

হ্যাঁ হ্যাঁ সব ঠিক। এই মাসেই হতো। হলো না এই যে মেয়ের জন্মমাস না কি-যেন লিখেছে—

বসুন্ধরা বললে, তবে আর কেন মিছে ঘাঁটাচ্ছেন ছেলেকে? পছন্দ না হলেও সে কি আর আপনার মুখের ওপর বলবে কোনদিন যে এ-মেয়ে চলবে না?

মাসীকে একটু ভাবতে হলো। বললে, নাঃ, তা কোনোদিন বলবে না। তাছাড়া ধর্ কলকাতায় একখানা দোতলা বাড়ী, বেহালায় না কোথায় যেন দশ কাঠা জমি, মায়ের তা নেই নেই করেও হাজার-পাঁচেক টাকার গয়না, তার ওপর ধর এত-এত সম্পত্তি যার, তার নগদ টাকা পনেরো-বিশ হাজার নিশ্চয়ই আছে। এই সবই পাবে ওই মেয়ে-জামাই।

বসুন্ধরা বললে, এ সুযোগ কখনও ছাড়তে আছে? বিয়ে আপনি এইখানেই দিন।
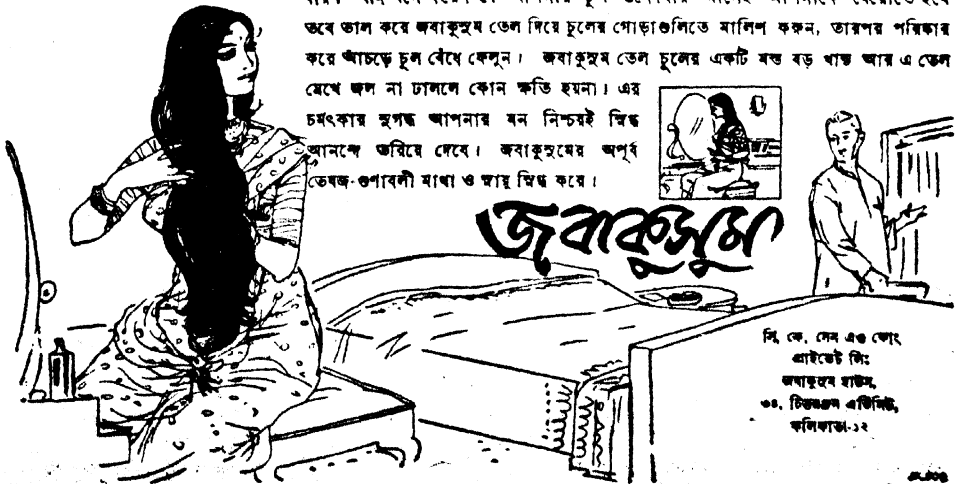
দেবো তো নিশ্চয়ই! তবু তুই এক-

বার ধীরুকে জিজ্ঞাসা করবি চল্। আমি একটু নিশ্চিন্তি হই।

খেয়েদেয়ে হেঁসেলের পাট চুকিয়ে দু'জনেই ওপরে উঠে গেল।

মাসী দাঁড়ালো একটু দূরে। বসুন্ধরাকে বললে, যা তুই আগে ঢোক্, জিজ্ঞাসা কর. তোর পেছনে পেছনে আমি যাচ্ছি।

বসুন্ধরা গিয়ে দেখলে ধীরু তার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। ডাকতে ভরসা হলো না। ফিরে গেল মাসীর কাছে। বললে, মাসীমা দোর বন্ধ।

খুব ভোরে ঘুম ভেঙেছিল বসুন্ধরার।

পুকুরের ঘাটে গিয়ে দেখে দিদি কাপড় কাচছে।

বসুন্ধরা হাসতে হাসতে বললে, কাল ভারি মজা হলো দিদি।

দিদির গায়ে হাসতে হাসতে ঢলে ঢলে পড়ে আর বলে, কাল তুই বললি তো ধীরুদাকে—আমার বিয়ে হয়ে গেছে। কথাটা উনি ঠিক বিশ্বাস করে বসেছেন। খালি খালি আমার সিঁথির দিকে তাকান আর বলেন, সিঁথিতে তোমার সিঁদুর কই?

তুই কি বললি?

কথাটা আমি ভেঙে-ফুটে কিচ্ছু বলিনি। চুপ করে ছিলাম।

সুবচনী বললে, বুড়ী ঠিক বলে দেবে। নইলে একটা ভারি মজা করতাম ঠাকুরপোর সঙ্গে।

হাঁরে, ফটোটা ও দেখেছে? সুবচনী জিজ্ঞাসা করলে।

বসুন্ধরা বললে, দেখেছে।

কি বললে?

কিচ্ছু না বলে ঘরে গিয়ে খিল দিয়ে শুলো।

ওর মা কিছু জিজ্ঞাসা করেনি?

বসুন্ধরা বললে, আমাকে বলছিল—তুই জিজ্ঞেস কর্। দিদি, আমার কি জিজ্ঞাসা করা উচিত? আমার লজ্জা করে না? তোর ধীরু-ঠাকুরপো হয়ত ভাবতে পারে—আমি বলতে চাচ্ছি তোমার বৌএর চেয়ে দ্যাখো আমি কত সুন্দরী।

সুবচনী বললে, তোকে কিছু বলতে হবে না, আমি জিজ্ঞাসা করব।

না দিদি তোরও কিচ্ছু বলা উচিত নয়।

সুবচনী অবাক হয়ে তাকালো বসুন্ধরার মুখের দিকে। মেয়েটা বলে কি?

তোর বিয়ে দিতে হবে না? তুই কি এমনি আইবুড়ী হয়ে থাকবি নাকি চিরকাল?

বসুন্ধরা বললে, তাই বলে এমনি করে? রূপ দেখিয়ে? লোভ দেখিয়ে?

সুবচনী তাকে এক ধমক দিলে। খুব কথা শিখেছিস, তুই থাম্।

বসুন্ধরা আর কথা বলেনি। সুবচনী বললে, জলে দাঁড়িয়ে থাকিস না. অসুখ করবে। আয়, আমার ঘরে চা খাবি আয়।

এই বলে বোনকে তার নিজের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে বললে, কাপড়চোপড় ছেড়ে বোস্, চা খা। দুধ দিতে গিয়ে আমি ওই মাতৃভক্ত শিশুটিকে একবার ডেকে আনবো আমার বাড়ীতে।

বসুন্ধরা কাপড় জামা পরতে পরতে ফিক্ ফিক্ করে হেসে উঠলো। —মাতৃভক্ত শিশু কাকে বলছিস দিদি? তোর ধীরু-ঠাকুরপোকে?

তা না তো কি?

সুবচনী স্টোভ জেলে চা করতে বসলো। বসুন্ধরাকে বললে, অরুণের বাপের জন্যে একথালা মুড়ি ঠিক করে রাখ্।

থালায় মুড়ি ঢালতে ঢালতে বসুন্ধরা বললে, জামাইবাবু এখনও চান করেনি?

আমাদের আগে করেছে। সে গেছে দুধ আনতে।

স্টোভের আওয়াজে অস্তে কথা শোনা যাচ্ছিল না, তাই সুবচনী জোরে-জোরে বললে, এই সময় অরুণের বাপ এখানে নেই, ছেলেরা এ-সব কথার মানে বুঝতে পারবে না, তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করে নিই, সত্যি জবাব দে। কাল প্রথম যখন তার চোখে তোর চোখ পড়লো, কী সেখানে দেখেছিলি?

বসুন্ধরা বললে, কী আবার দেখবো?

এই দ্যাখ্ তুই পাশ কাটাবার চেষ্টা করছিস। আমার কাছে লুকোসনি বসুন্ধরা। আমিও মেয়ে। পুরুষের চোখের ভাষা পড়তে আমাদের দেরি হয় না। এমন চোখের চাউনি আছে যা দেখলে ঘেন্নায় চোখ ফিরিয়ে নিতে হয়। আবার এমন চাউনি আছে যা দেখলে আবার দেখতে ইচ্ছে করে।

বসুন্ধরা বললে, কেমন চাউনি জানিস? মনে হলো যেন মানুষটি অবাক হয়ে গেছে আমাকে দেখে। মনে হলো যেন বলতে চায়—তোমাকে পেলে আমি মাথায় করে রাখতে পারি, তোমাকে আমি পুজো করতে পারি।

এইবার তোর কথা বল্। লুকোসনি বসুন্ধরা। সব্বনাশ হয়ে যাবে। তুই ওকে পেলে ভালবেসে ঘর-সংসার করতে পারবি?

বসুন্ধরা বললে, যাঃ!

বলেই সে মুড়ির টিনটা রাখতে গেল।

যা নয় বসুন্ধরা, সত্যি কথা বল্।

বসুন্ধরা এগিয়ে এলো তার দিদির কাছে। বললে, জেনে তুই কি করবি বল্।

সুবচনী বললে, দু'জন দু'জনকে ভালবেসে যদি বিয়ে করে তো সংসার খুব সুখের হয়।

তুইও এই কথা বলছিস দিদি? তোর দেখেই আমি বুঝেছি—ওপরের চেহারাটা কিছুই নয়। এ রূপ দুদিনেই নষ্ট হয়ে যাবে। নষ্ট যা হবে না তা হচ্ছে—ভেতরের মানুষটা। সেই ভেতরের মানুষটিকেই মানুষে ভালবাসে। ওপরের চেহারাটা ভাল হলে ভাল লাগে এই পর্যন্ত।

সুবচনী বললে, ওরে বাবা, এ যে বড় বড় কথা বলছিস তুই। এই বয়েসে ও-সব তুই শিখলি কোত্থেকে?

তোর কাছ থেকে। মা বলতো সুবচনী আমার সুখী হলো না। বলতো তোর বাবা দিলে একটা কানা মানুষের সঙ্গে জুটিয়ে, ওকে সুবচনী ভালবাসতে পারবে না। কিন্তু কি হলো দিদি? তোদের যা ভালবাসা দেখছি—খুব কম স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এরকমটি হয়।

ছোট বোনের কাছ থেকে এই স্বীকৃতি—সুবচনীকে কেমন যেন বিহ্বল করে দিলে। হাত বাড়িয়ে বসুন্ধরাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বুকের ওপর চেপে ধরে কি যেন বলতে গিয়েও বলতে পারল না, ঠোঁট দুটো থর্ থর্ করে কেঁপে উঠলো, চোখ দিয়ে দর দর করে জল গড়িয়ে এলো।

খানিক পরে শাড়ীর আঁচলে চোখ মুছে নিজেকে সামলে নিয়ে সুবচনী বললে, তাহ'লে তুই কি বলিস্ ধীরু-ঠাকুরপোকে বলেকয়ে একবার দেখবো না?

বসুন্ধরা তখনও তার কোলে মুখ গুঁজে পড়েছিল, বললে, না দিদি না।

এই বলে সে মুখ তুলে উঠে বসলো। বললে, আমি যদি একটুখানি চেষ্টা করি দিদি তাহ'লে আমি জানি ও ঠিক পাগলের মত আমার পিছু পিছু ছুটে বেড়াবে। কিন্তু তা আমি কখনও করবো না। তুইও কিছু বলিস না।

সুবচনী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। বললে, ধীরু-ঠাকুরপো মানুষটা ভাল। বেচারার জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে।

দুধ নিয়ে এলো ঝলেন।

অনেকখানা দুধ দিয়েছে আজ। নিজে না দাঁড়িয়ে থাকলে হয় না। চা

যাত্রী

মুকুলকান্তি ঘোষ

গঙ্গোত্রী

মানিক চট্টোপাধ্যায়

হলো? দাও, একটু দেরি হয়ে গেল আজ।

চা নিয়ে ধীরে-সুস্থিরে খাবার অবসর আজ আর তার হলো না। দু'এক চুমুক খেয়েই সব চাটুকু ঢেলে দিলে মুড়ির ওপর।

তাই না দেখে বসুন্ধরা তো হেসেই খুন!

এ আবার কি রকম খাওয়া হচ্ছে দাদা?

সুবচনী বললে, ওর খাওয়া হলেই হলো!

তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে জামা গায়ে দিয়ে ঝুলন বেরিয়ে গেল।

বসুন্ধরা বললে, আমি যাই দিদি, মাসীমা বলেছে ওর ছেলেকে আজ পোলাও খাইয়ে দিতে হবে। জেলে আসবে মাছ ধরতে। ভাল চাল আছে কিনা দেখি!

যাওয়ায় বাধা পড়লো।

সুবচনীর বাচ্চা ছেলেটা ঘুম থেকে উঠে বসেছে বিছানায়। বসুন্ধরা হাত বাড়াতেই ঝাঁপিয়ে সে তার কোলে উঠে পড়লো।

এ'টো চায়ের কাপ-ডিস আর থালা নিয়ে সুবচনী বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। মাসীমার কোলে চড়ে তরুণ আবোল-তাবোল কী যে বলছিল কিছুই বুঝা যাচ্ছিল না। বসুন্ধরা হাসতে হাসতে বললে, তোমার ভাষা আমি কিছু বুঝতে পারছি না বাবা, যা বলবে স্পষ্ট করে বল।

এই বলে সে তার পেটে নিজের নাকটা ঘসে দিতেই খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো ছেলেটা। বসুন্ধরা তার সেই হাসিমুখে একটি চুমু খেয়ে নিজেও হাসতে হাসতে কার যেন পায়ের শব্দে দোরের দিকে তাকিয়েই দেখে, ধীরু এসে দাঁড়িয়েছে।

রাত্রের দেখা আর দিনের দেখায় তফাৎ আছে। ভোরের আলোয় দু'জন দু'জনকেই দেখলে। বসুন্ধরার শাড়ীর আঁচলটা মেঝেয় লুটিয়ে পড়েছিল, চট্ করে একহাত দিয়ে তুলে নিলে।

ধীরু জিজ্ঞাসা করলে, বৌদি কোথায়?

চোখ দুটি তুলে বাইরের দিকে তাকিয়ে বললে, ওই তো।

রান্নার জায়গায় তোলা জলে মাথা হেঁট করে সুবচনী বাসন ধুচ্ছিল, ধীরুকে দেখতে পায়নি। এতক্ষণে মুখ তুলে দেখেই হাতের কাজ ফেলে ছুটে এলো। —সক্কাল বেলা, ধীরু-ঠাকুরপো —বোসো।

—না বসবো না। মা বললে তোমার বোন কি-একটা কথা বলবে আমাকে। সেই কথাটা শুনতে এলুম।

কথাটা শুনে কেমন যেন চমকে উঠলো সুবচনী। চমকাবার মত কথাই।

সুবচনী বললে, এমন কি কথা রে? যা শোনবার জন্যে ধীরু-ঠাকুরপো ছুটে এসেছে সকালবেলা—

মুচকি একটু হেসে মুখ নামালে বসুন্ধরা। বললে, আমার কথা নয়, মাসীমার কথা। বলবো এরপর।

মাসীমার কথা শুনে আশ্বস্ত হলো সুবচনী। আশ্বস্ত হলো ধীরুও।

ধীরু বললে, আচ্ছা বৌদি, কাল তুমি আমাকে কি রকম অপ্রস্তুত করলে বল তো! বললে তোমার বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। তোমার বোনকে জিজ্ঞাসা করলাম—চুপ করে রইল। আজ এক্ষুনি মাকে জিজ্ঞাসা করতেই মা বললে, বৌ তোর সংগে রসিকতা করেছে।

সুবচনী বললে, ভাগ্য আমাদের সংগে রসিকতা করেছে ভাই, তাই আমিও মানুষের সংগে রসিকতা করবার লোভ সামলাতে পারি না।

ধীরু বললে, না না ও রকম রসিকতা ভাল নয় বৌদি। তোমার বোনের বিয়ে হবে। নিশ্চয়ই হবে। মা বলছিল—ওর জন্যে একটি ছেলে দেখতে। আমি দেখবো—

এই বলে বসুন্ধরার দিকে তাকিয়ে ধীরু আবার বললে, তাহলে বোলো এক সময় তোমার কথাটা—তোমার যখন অবসর হবে। আমি চলি বৌদি।

ধীরু চলে গেল।

বসুন্ধরা বললে, দিদি, হলো তো! শুনলি?

সুবচনী বললে, শুনলাম।

আশা ভরসা সব একেবারে শেষ করে দিয়ে চলে গেল ধীরু।

মাছ ধরানো হলো পুকুরে। পোলাও রান্না হবে।

পোলাওএর মসলাপাতি, চাল, ঘি, মাসীমা সবই ঠিক করে রেখেছিল আগে থেকে।

বসুন্ধরার রান্না শেষ হতে প্রায় বারোটা বেজে গেল। একটি মানুষের জন্যে আয়োজন, কিন্তু মনে হলো যেন যজ্ঞিবাড়ী।

মাসীমা কিন্তু ছট্‌ফট্‌ করে বেড়াচ্ছে সেই সকাল থেকে।

বলি এতবার যে এ-ঘর ও-ঘর করছিস তবু তোর আর অবসর হলো না বসুন্ধরা?

কিসের অবসর মাসীমা?

কথা না হয় আমরাই ভুলে যাই বয়েস হয়েছে বলে, কিন্তু তোরও কি মতিভ্রম হলো নাকি এই বয়েসে?

মাসীমা কি বলতে চায় বুঝতে সে পেরেছে ঠিকই। শুধু এটা-সেটা বলে ঠেকিয়ে রাখছিল যতক্ষণ পারে।

বসুন্ধরা বলেছিল, এত সব রান্না-বান্না করতে করতে এই হলুদ-তেল-মোছা নোংরা কাপড়টা পরে ধীরুদার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারবো না আমি।

সত্যিই তো, মেয়েটা সেই সকাল থেকে চরকির মত ঘুরছে, রান্না করছে, আগুনতাতে থেকে থেকে মুখখানা হয়ে উঠেছে লাল টক্‌টকে, ঘেমে একেবারে নেয়ে যাচ্ছে মাঝে-মাঝে।

না বাছা তোকে আর বিরক্ত করবো না। যখন তোর ফুরসুৎ হবে তখন বলবি।

রান্নাবান্না শেষ করে ধীরুর সামনে খাবার ধরে দিয়ে বসুন্ধরা বললে, কি চাই না চাই আপনি এবার দিন মাসীমা, আমি চট্‌ করে একবার চান করে আসি।

সাবান মেখে পুকুরে স্নানই করলে সে।

তারপর ফর্সা কাপড় জামা পরে পিঠে একপিঠ চুল এলিয়ে দিয়ে বসুন্ধরা যখন এসে দাঁড়ালো রান্নাঘরে, দেখলে ধীরুর খাওয়া তখন সব শেষ হয়েছে।

মাসীমা বললে, ধীরু কি বলছে শোন্‌ বসুন্ধরা।

হাসতে হাসতে বসুন্ধরা বললে, কি বলছে?

ধীরু বললে, সত্যি বলছি আমি এমন রান্না খাইনি কোনোদিন।

বলেই সে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আর চোখ ফেরাতে পারে না। সদ্য স্নান করে এসেছে বসুন্ধরা। মাথার চুল তখনও শুকোয়নি। মুখখানা যেন আরও উজ্জ্বল মনে হচ্ছে। শাড়ীটা পরেছে সে এক অদ্ভুত ধরণে। বাঙালী মেয়েরা সাধারণত ওরকম করে পরে না।

সুবচনীর বাড়ীতে কিছু পাঠিয়ে দিয়ে, মাসীকে খাইয়ে নিজে খেয়ে বসুন্ধরা বললে, ছাতে বসে চুলটা শুকিয়ে আসি মাসীমা।

মাসীমা এঁটোকাটা মুক্ত করছিল। বসুন্ধরা চেয়েছিল মুক্ত করতে, কিন্তু মাসীমা দেয়নি। বলেছে, না, কাপড়-চোপড় কেচে এসেছিস তোকে আর আমি এ-সব ঘাঁটাঘাঁটি করতে দেবো না।

বসুন্ধরা জিজ্ঞাসা করলে, তোমার বাড়ীতে বাংলা বইটই কিছু আছে মাসীমা?

কি বই? রামায়ণ? কি করবি?

চুল শুকোতে শুকোতে পড়ব।

তা যা না ধীরুর কাছে চেয়ে নিগে একখানা বই। আর অমনি সেই কথাটা—

মাসীমাই তাকে পাঠিয়েছিল ধীরুর ঘরে।

বসুন্ধরা গিয়েছিল একটা বই চাইতে। পায় তো ভালো, না পায় তাতেও ক্ষতি নেই। বই একখানা পেলে সেইটে পড়তে পড়তে চুলগুলো মেলে দিতো পিঠের ওপর। শেষ-বর্ষার আকাশ। তখনই মেঘ, তখনই বৃষ্টি আবার তখনই রোদ্দুর।

কেমন করে মাসীমার কথাটা ধীরুকে জিজ্ঞাসা করবে সেই কথা ভাবতে ভাবতে সিঁড়ি দিয়ে উঠে বসুন্ধরা ধীরুর ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

ধীরু সিগারেট খায় তা সে জানতো না। বিছানার ওপর শুয়ে বুকের নীচে একটা বালিস রেখে ধীরু সিগারেট টানছিল। বসুন্ধরাকে ঢুকতে দেখেই সিগারেটটা সে নিবিয়ে দিলে।

বসুন্ধরা হেসে ফেললে। —ও-মা, একি করলেন? আমি একা এসেছি। মাসীমা আসেননি। ওটা নিবিয়ে ফেললেন কেন?

কোনও জবাব না দিয়ে বিছানার ওপর উঠে বসলো ধীরু।

সেই কথাটা বলতে এসেছ বুঝি?

হ্যাঁ। আরও একটা কাজ ছিল।

কি কাজ বল। দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোসো এইখানে। বলেই ধীরু তার ধপ্‌ধপে সাদা চাদর-বিছানো বিছানাটা দেখিয়ে দিলে। বললে, আমি নেমে যাচ্ছি।

সত্যিই ধীরু নেমে যাচ্ছিল খাট থেকে। বসুন্ধরাই দিলে না নামতে। বললে, না। আপনি উঠবেন না। তাহলে আমিই চলে যাব।

বসুন্ধরা বসলো খাটের পায়ের দিকে। নির্ভীক নিঃসংকোচ মুখের চেহারা। খোলা চুল পিঠের ওপর

ছড়ানো। কতক-বা মুখের পাশ দিয়ে বুকের ওপর এসে পড়েছে। অপূর্ব সুন্দরী বসুন্ধরা।

এ-ঘরে একদিনও ঢোকেনি সে। মাসীমা শুধু দেখিয়ে দিয়েছিল এইটে ধীরুর ঘর। ঘরের এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখতে দেখতে বললে, ছাতে চুল শুকোতে যাব, তাই একখানা বাংলা বই নিতে এসেছিলাম।

ওই তো বইএর গাদা। নাও তোমার যেটা খুশী।

নিতে হলে খাটের ওপর উঠে গিয়ে নিতে হয়। বসুন্ধরা কাৎ হয়ে শুয়ে হাত বাড়িয়ে কয়েকখানা বই তুলে আনলে। নানারকমের বাংলা নভেল। আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো বসুন্ধরার মুখখানি।

সময়টা কাটবে ভাল। এই বইগুলো যদি আমি একটি একটি করে পড়ি, পড়তে দেবেন?

ধীরু বললে, কেন দেবো না? সব তুমি নিয়ে যাও।

বসুন্ধরা আবার উঠে বসলো।—যাক, একটা কাজ হয়ে গেল। এইবার সেই কথাটা বলি। কিন্তু—

বলেই সে লজ্জায় মুখ নামিয়ে ক্রমাগত একটা বইএর পাতা ওলটাতে লাগলো।

বল। বলতে লজ্জা হচ্ছে কেন?

এ-কাজের ভারটা মাসীমা আমার ওপর না দিলেই পারতেন।

আচ্ছা, শুনুন তাহলে। বলে নিজেকে একটু শক্ত করে নিয়ে বসুন্ধরা বললে, কলকাতা থেকে যে-ছবিটি এসেছে সে-মেয়েটিকে আপনার পছন্দ হয়েছে কিনা মাসীমা এই কথাটি জানতে চান।

হুঁ, বুঝেছি।

হাত বাড়িয়ে বালিসের তলা থেকে খামখানা এনে ছবিখানি ধীরু বের করলে খামের ভেতর থেকে। বললে, তুমি কি বলতে চাও বল।

আমি কি বলবো?

তোমাকে বলতে হবে।

বসুন্ধরা বললে, বেশ তো। মন্দ কি? একেই বিয়ে করুন।

একে তুমি বেশ বলছো?

বসুন্ধরা তার মুখে আঙুল দিয়ে বললে, চুপ! মাসীমা শুনলে কষ্ট পাবেন।

তাহলে কি বলতে চাও, মাকে খুশী করবার জন্যে এই মেয়েটিকে বিয়ে করব আমি?

বসুন্ধরা বললে, আস্তে কথা বলুন। মা এক্ষুনি আসবেন হয়ত।

অসীমের সন্ধানে ফটোঃ কুমারেশ বিশ্বাস

দাঁড়াও দেখছি।
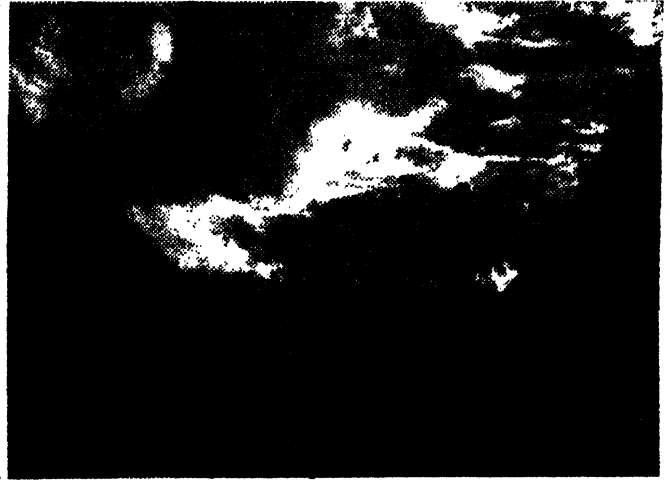
ধীরু নামলো খাট থেকে। ঘরের বাইরের বারান্দায় গিয়ে রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে দেখলে। তারপর আকাশের দিকে তাকালে। কালো মেঘ উঠেছে আকাশে। সূর্যকে ঢেকে ফেলেছে।

ধীরু ফিরে এসে বললে, এঁটো বাসনের গাদা নিয়ে মা চলে গেল পুকুরের ঘাটে। মা এখন আসবে না।

বসুন্ধরা সেকথায় কান দিলে না। যেন আপনমনেই বললে, চুলগুলো আজ আর শুকোবে না দেখছি। রোদ্দুরটা চলে গেল।

ধীরু বললে, কালো মেঘে আকাশটা ছেয়ে ফেলেছে। ভীষণ বৃষ্টি নামবে। তা নামুক। শোনো বসুন্ধরা, এই মেয়েটিকে বিয়ে করলে মা খুশী হবেন জানি। কিন্তু আমি?

বসুন্ধরা বললে, মাকে খুশী করা আপনার উচিত।

কিন্তু আমি তো মানুষ। আমার তো একজোড়া চোখ আছে। আমি যে তাকাতে পারছি না এই মেয়েটির মুখের দিকে।

বসুন্ধরা হাসলো। মুক্তোর মত দাঁতের সারি। পান খায় না তবু রাঙা রাঙা দুটি ঠোঁট। হাসলে বড় সুন্দর দেখায় তাকে।

বসুন্ধরা বললে, পারবেন। খুব তাকাতে পারবেন। তাছাড়া আপনি যা চেয়েছিলেন তাই পেয়েছেন। মেয়েটি লেখাপড়া জানে, অনেক বিষয়-সম্পত্তির মালিক হবেন।

তুমি আমাকে ঠাট্টা করছো বসুন্ধরা।

না না সত্যি বলছি ঠাট্টা করিনি। আপনি নিজে শিক্ষিত। যে-মেয়ে লেখা-পড়া জানে না তার সঙ্গে কথা বলে আপনি সুখ পাবেন না।

তুমি ভুল বলছো বসুন্ধরা। আমি কাল সারারাত ঘুমোইনি—এই সব কথাই ভেবেছি শুধু।

ভেবে কি ঠিক করলেন?

ভেবে কোনও কূলকিনারা পাইনি। এখানে আসবার আগের দিন একটা বইএ পড়লুম একটা ভারি মজার গল্প। গল্পটা শোনো, তোমাকে বলি। স্বামী প্রফেসার, রীতিমত শিক্ষিত, স্ত্রী পরমা-সুন্দরী, বি-এ বি-টি। কোন্ এক ইস্কুলের টিচার ছিলেন। সন্তানসম্ভবা বলে চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছেন। ঝগড়া-ঝাঁটি মনোমালিন্য অনেকদিন থেকেই চলছিল। শেষ পর্যন্ত স্ত্রী নালিশ করে-ছেন আদালতে। তিনি আর স্বামীর ঘর করবেন না। তাঁর ভরণপোষণের দায়িত্বও স্বামীকে নিতে হবে না। একটা চাকরি তিনি অনায়াসে যোগাড় করে নিতে পারবেন।

বসুন্ধরা জিজ্ঞাসা করলে, স্বামীর অপরাধ?

তিনি নাকি তাঁকে অপমান করেছেন। হাতের ছড়ি দিয়ে স্ত্রীকে মেরেছেন। খেতে না দিয়ে ভাতের থালা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন।

এখন স্বামী কি বলছেন?

বলছেন, সব মিথ্যে কথা। স্বামীর কপালটা ছিল অবশ্য তুলো আর লিউকো-প্লাস্টের পটি দিয়ে ব্যাণ্ডেজ-করা। মুখে মাখবার কি-একটা স্নো না ক্রিমের ভারি শিশি এমনভাবে ছুঁড়ে মেরেছেন তাঁর

স্ত্রী যে, কপাল কেটে রক্ত বেরিয়ে গেছে। তিনি বলছেন, ও আমার বিবাহিতা স্ত্রী। আমি ওকে আলাদা থাকতে দেবো না। আমার অপমান হবে।

কথায় বাধা পড়লো। চারিদিক অন্ধকার করে ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি নামলো। বসুন্ধরা বললে, এই রে! এখন আমি যাব কেমন করে?

এই বলে সে উঠতে যাচ্ছিল।

ধীরু বললে, যাবে আবার কোথায়?

বাড়ীতেই তো রয়েছ। শোনো শোনো তারপর কি হলো শোনো। স্বামী ছাড়তে চান না স্ত্রীকে। বলছেন, ও আমার ছেলের মা।

স্ত্রী বলছেন, ভুল করে আমি এক পশুর ছেলে গর্ভে ধারণ করেছি।

জানোয়ারের ছেলে জানোয়ার হবে। আমি চিনতে পারিনি আমার এই শিক্ষিত স্বামীটিকে। সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত আমাকে করতে দেওয়া হোক্।

ঘন বর্ষার সেই আধো অন্ধকার ঘরের মধ্যে বসুন্ধরা মাথা হেঁট করে বসে বসে শুনছিল এই কাহিনী। তেমনি মাথা হেঁট করেই বললে, স্বামী-স্ত্রী দুজনের মনের মিল হয়নি। মানুষের মিল হয় মনের সঙ্গে। চোখের নেশা দুদিনেই কেটে যায়। মনের নেশা কাটে না।

ধীরু বললে, মনের দেখা তো চট্ করে মেলে না বসুন্ধরা। চোখেরও তো একটা দাবী আছে।

এইবার চোখ তুলে চাইলে বসুন্ধরা। বললে, তাহলে পৃথিবীতে যারা সুন্দর হয়ে জন্মায়নি, তারা কি করবে? আপনি আমার দিদির কথাটা একবার ভাবুন। স্বামী তো দেখতে ভাল নয়। একচোখ কানা। দেখলে একটা কুলি-মজুর বলে মনে হয়। কিন্তু ভাব-ভালবাসা দেখেছেন ওদের?

বাইরে বর্ষণমুখর পৃথিবী আর সেই স্বল্পালোকিত ঘরের মধ্যে প্রিয়দর্শন এক যুবক আর পরমাসুন্দরী এক যুবতী। দুজনেই চেয়েছিল জীবনের একাকীত্ব থেকে মুক্তি। দুজনেই চেয়েছিল দুটি আনন্দসুন্দর জীবন। অনাদি-কালের চিরন্তন আকর্ষণ ছিল এই দুই বিকসিতযৌবন কুমার-কুমারীর মধ্যে, তবু তারা কোন্ স্পর্ধায় এত কাছাকাছি বসেছিল একই শয্যার দুই প্রান্তে? অলক্ষ্যে থেকে পুষ্পধনু অনঙ্গদেব বোধকরি হেসেছিলেন একটুখানি। হেসেওছিলেন আবার সাহায্যও করেছিলেন। হাসিটা বিদ্রূপের হাসি নয়, আনন্দের হাসি। নইলে সাথী নির্বাচনে দিশাহারাই না হয় হয়েছিল ধীরু, তাই বলে তার শিক্ষিত মনের মর্যাদাবোধকে বিসর্জন দিয়ে বাঁকাচোরা বাধানিষেধের আড়ালটুকু ভেঙে ফেলবার মত দুর্দমনীয় আবেগই-বা সে পেলো কোথায়? আর উদ্দামযৌবনা বসুন্ধরা? সেই-বা তার সহাস্য ছলনার যবনিকাজাল অপসারিত করে দিয়ে ধীরুর সে অযাচিত আমন্ত্রণকে অভ্যর্থনা করলো কেমন করে?

প্রকৃতিও বোধকরি ষড়যন্ত্র করেছিল। অবিরত বর্ষণের ধারামুখরিত সেই শ্যামানন্দপুরের অপরাহ্ণবেলাটি মনে হচ্ছিল যেন একটি আশ্চর্য মধুর স্বপ্ন।

মনের সঙ্গে মনের, ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার, আর দুটি দেহ মন চৈতন্যের নিবিড়তর মিলনের পুলকস্পর্শ—এই দুই পুষ্পিতযৌবন নরনারীকে যেন এক অনাস্বাদিতপূর্ব স্বর্গসুখের অনুভূতির, এক অত্যাশ্চর্য নতুন সত্যের উপলব্ধির দ্বারপ্রান্তে পেঁছে দিয়ে গেল।

বসুন্ধরা! বসুন্ধরা!

চমক্ ভাঙ্‌লো বসুন্ধরার। মাসীমা ডাকছেন রান্নাঘর থেকে। ছুটে বেরিয়ে গেল সে। ওদিকের বারান্দায় গিয়ে বললে, এই যে, আমি এখানে।

তুইও আট্‌কে গেলি চুল শুকোতে গিয়ে, আমিও আটকে গেলাম। পোড়া বিষ্টি আর বন্ধ হবে না আজ। ধীরুর ঘরে একটা ছাতি আছে বোধহয়। সেইটে নিয়ে একবার আয় না বাছা। আমি এখনও একটা পান পর্যন্ত মুখে দিইনি।

ছাতি আনতে যেতে হবে ধীরুর ঘরে!

যেই পেছন ফিরেছে, দেখলে ছাতি হাতে নিয়ে ধীরু এসে দাঁড়িয়েছে।

হাত বাড়িয়ে ছাতিটা নিয়ে বসুন্ধরা সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে রান্নাঘরে চলে গেল।

মাসী বললে, চুল আজ আর তোর শুকালো না! এমন চুলও তো কোথায় দেখিনি মা। চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে এলো-খোঁপা করে বেঁধে ফ্যাল্। মা-কালীর মত একপিঠ চুল এলিয়ে ঘুরে বেড়াসনি। চল্। ছাতিটা খোল্।

ছাতি নিয়ে দুজনেই আবার এলো ওই ঘরে।

জিজ্ঞাসা করেছিলি ধীরুকে?

করেছিলাম।

কি বললে?

কিছুই বললে না।

হাঁ না—কিছু না?

না।

ধীরুর ভারি লজ্জা যে! মুখ ফুটে কিছু বলবে না আমি জানি। তিনটের গাড়ীটা পেরিয়েছে? আওয়াজ শুনেছিস?

পৃথিবীর কোনও আওয়াজই এতক্ষণ শোনেনি বসুন্ধরা।

মাসী বললে, আমি একটু গড়িয়ে নিই বাছা। তুইও একটু শুয়ে নে। খুব খেটেছিস আজ।

বসুন্ধরা বললে, আমি একবার দিদির কাছ থেকে ঘুরে আসি।

পান সাজতে সাজতে মাসী বললে, বিষ্টিবাদ্লায় নাই-বা গেলি!

বৃষ্টি ধরে এসেছে।

বলেই সে মাথায় কাপড়টা তুলে দিয়ে জামতলা হয়ে কুয়োতলা পেরিয়ে সুবচনীর ঘরে গিয়ে চুপ করে দাঁড়ালো।

অরুণ বরুণ জানলার পাশে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখছিল। মাসীকে দেখে অরুণ বললে, এই এত বড় বড় মাছ—

কোথায় রে?

ওইখানে। বলে আঙুল বাড়িয়ে ছেলেটা উঠোন দেখিয়ে দিলে। বললে—চল দেখবে চল।

সুবচনী তক্তাপোষের ওপর শুয়েছিল ছোট বাচ্চাটাকে কোলের কাছে নিয়ে। বললে, দুষ্টিতে ওর ভেজবার মতলব। খবরদার যাসনে।

বসুন্ধরা কোনও কথা না বলে দিদির কাছে গিয়ে শুয়ে পড়লো।

সুবচনী তার মাথায় হাত দিয়ে বললে, ভিজলি বুঝি?

না।

পোলাও খুব ভাল রান্না হয়েছিল।

বসুন্ধরা শুধু বললে, হুঁ।

ধীরু-ঠাকুরপো খেয়ে কিছু বলেনি?

চুপ করে রইলো বসুন্ধরা।

বিয়ের কোনও কথাবার্তা হয়নি? হাঁরে?

এবারও বসুন্ধরা কিছু বললে না। সুবচনী দেখলে সে চোখ বুজে শুয়ে আছে।

তা ঘুম পেয়েছে তো ঘুমো না!

বসুন্ধরা শুয়েই রইলো। জেগে রইলো না ঘুমোলো কিছুই বুঝা গেল না।

রবিবারের রাতটা কোনোরকমে কাটলো।

রাত্রে ভাত খেয়েছে ধীরু। রান্না করে ভাতের থালাটা মুখের কাছে ধরে দিয়েই সেখান থেকে সরে গেছে বসুন্ধরা। কি নেবে না নেবে জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করেনি।

সোম মঙ্গল দুদিন ছুটি। ধীরু বাড়ীতেই থাকবে।

বসুন্ধরা কেমন যেন লুকোচুরি খেলছে। মাসীমার কাজকর্ম করে দিয়ে ঘন-ঘন চলে আসছে সুবচনীর কাছে। মাসীমা ডাকলে যাচ্ছে, নয়ত' যাচ্ছে না।

বসুন্ধরার মুখের দিকে সকাল থেকে বার বার তাকাচ্ছিল সুবচনী।

দুপুরে বললে, তোর মুখখানা কেমন যেন ভার-ভার মনে হচ্ছে বসুন্ধরা। কি ভাবছিস? অসুখবিসুখ করেনি তো? কই দেখি!

কপালে গায়ে হাত দিয়ে দেখলো সুবচনী। না, কিছু হয়নি।

মুখে তোর হাসি নেই, কথা নেই। কি হয়েছে? বল্ না!

কী আবার হবে?

বাচ্চা ছেলেটাকে কোলে তুলে নিয়ে বসুন্ধরা বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো।

উঁহু, কিছু হয়েছে ঠিক। তোর এত কথা, এত হাসি, কাল থেকে একেবারে চুপ। বল্ বসুন্ধরা, আমার ভাল লাগছে না কিন্তু, আমি তোর পায়ে মাথা খুঁড়ে দেবো।

তারও যে মাথা ঠুকতে ইচ্ছে করছে! তবু বললে, না দিদি কিছু হয়নি। এই তো কথা বলছি।

সেখান থেকে সরে যাবার জন্যে বসুন্ধরা উসখুস করতে লাগলো। তার কোলে ছিল তরুণ। বললে, চল তোকে শালুক ফুল দেখাই গে।

এই বলে তরুণকে শালুক ফুল দেখাবার ছল করে বসুন্ধরা গেল ধীরু-দের বাঁধানো ঘাটের দিকে।

ঘাটের একটা সিঁড়ির ধাপে বসলো গিয়ে।

ঘাটে আসতে আসতে শালুক ফুলের কথা ভুলে গিয়েছিল বসুন্ধরা। কিন্তু ছেলেটা ভোলেনি। পুকুরে শালুক ফুল ফুটেছিল অনেকগুলো। সেইদিকে হাত বাড়িয়ে তরুণ বলতে লাগালো, শালুক দাও।

তাকে চুপ করাবার জন্যে বসুন্ধরা বললে, বা-বা শালুক নিতে নেই। জলে বেড়াল আছে। ম্যাও!

বেড়ালকে ভয় করে ছেলেটা। সেও বললে, বেলাল্ আছে। ম্যাও। কামুড়ে দেবে।

এই বলে ছেলেটা ঘাটের পৈঠায় ম্যাও! ম্যাও! বলে ছুটে ছুটে খেলা করতে লাগলো। বসুন্ধরা ভাবতে লাগলো। ভাবতে লাগলো তার মায়ের কথা। একদিন সন্ধেবেলা কুলটিকুরির বাড়ীর উঠোনে দাঁড়িয়ে মা তার গালে ঠাস্ করে একটি চড় মেরেছিল। কেঁদে সে তার মায়ের পায়ে ধরে বলেছিল, এই তোমার পা ছুঁয়ে বলছি মা, আর আমি কোনোদিন কিছু করব না।

সে প্রতিজ্ঞা সে রাখতে পারলে না।

বসুন্ধরার দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে এলো। দু'হাত দিয়ে নিজের মুখটাকে চেপে বসুন্ধরা লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদলে খানিকটা।

ছেলেটা জলের দিকে নেমে যাচ্ছে। বসুন্ধরা উঠে গিয়ে তাকে ধরে আনলে। আকাশে আবার মেঘ করেছে। বৃষ্টি নামতে পারে। আঁচল দিয়ে ভাল করে চোখ দুটো মুছে নিয়ে তরুণের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বসুন্ধরা ঘরে এসে দেখে তার জামাইদাদা খেতে বসেছে।

বসুন্ধরাকে দেখে ঝুলন জিজ্ঞাসা করলে, খাওয়া হয়েছে?

অনেকক্ষণ।

সুবচনীর দিকে তাকিয়ে ঝুলন বললে, খবরটা তাহ'লে ওকে বলি।

বল।

ঝুলন বললে, খুব ভাল একটি পাত্রের সন্ধান পেয়েছি। কোৎরাং-এ মিলের 'পাগ্ মিল্' আছে।

পাগ্ মিল্ কাকে বলে জানতো না বসুন্ধরা। জিজ্ঞাসা করলে, পাগ্ মিল্ কাকে বলে দিদি?

সুবচনী বললে, ইঁট তৈরি হয় যেখানে।

ঝুলন বললে, বেশি বয়স নয়। বছর ত্রিরিশ-বত্রিশ হবে। হ্যাঁ তাও বলে রাখি। বিয়ে একবার করেছিল, বৌ মরে গেছে। ওপক্ষের একটি মেয়ে আছে। তবে মেয়েটি এখানে থাকে না। বললে, মামার বাড়ীতে থাকে। পছন্দ হয় তো বল—কাল তাহ'লে একবেলা ছুটি নিয়ে যাই কোৎরাং। বেশি দূরে নয়, এই কাছেই।

লজ্জা নেই, সঙ্কোচ নেই, স্পষ্ট পরিষ্কার জিজ্ঞাসা করলে বসুন্ধরা, টাকা চাইবে না?

ঝুলন বললে, খুব কম। তিন চারশ' টাকাতেই হয়ে যাবে। তোমাকে দেখলে হয়ত কিছুই চাইবে না।

বসুন্ধরা বললে, বিয়ে না করলে হয়ত চাইতো না। হাত পাতলে বরং দু' দশ টাকা পাওয়া যেতো।

সুবচনী ধমক দিলে, ও আবার কি কথা! ছি!

বসুন্ধরা বললে, ছি কেন বলছিস দিদি, সত্যি কথা। খুব সত্যি কথা।

শেষের কথাটা বলতে গিয়ে তার গলাটা ধরে এলো।

নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, তিন চারশো টাকাই-বা তুই পাবি কোথায় দিদি?

সে আমি যেখানেই পাই তোকে তা ভাবতে হবে না। কিন্তু আমি বল-ছিলাম কি—আগেকার পক্ষের একটা মেয়ে আছে; এখানে না যাওয়াই ভাল।

বসুন্ধরা বললে, নিশ্চয়ই যাবে। মেয়ে থাকলো তো কি হলো, দাদা তুমি যাও, তুমি যাও—

বলতে বলতে বসুন্ধরা ছুটলো মাসীমার বাড়ীর দিকে।

সেখানে গিয়ে আবার আর-এক বিপদ।

মাঝের দোরটা পেরিয়েই দেখে, মা-ব্যাটায় কথা হচ্ছে। মা দাঁড়িয়ে আছে জামগাছের তলায় আর ধীরু বসে আছে কুয়োর বাঁধানো পাড়ের ওপর।

ওদের দেখেই বসুন্ধরা পালিয়ে আসছিল, মাসীমা দিলে না পালাতে। বললে, যাসনে বসুন্ধরা শোন্।

মাথা হেঁট করে বসুন্ধরাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হলো।

মাসীমা বললে, এই মাসে তো ধীরুর বিয়ে হবার কথা ছিল, বিয়ের সময় আমি তিন হাজার টাকা পেতুম। ধীরুকে কলেজে পড়াবার সময় দু' হাজার টাকায় অতি উৎকৃষ্ট সতীঘাটার ধানের জমি আর রামকানালির বাগানটি আমি বিক্রি করেছি। সেই ধানের জমি আর বাগান হেবো হালদার আমাকে ফিরিয়ে দেবে বলেছে। ধীরুকে তাই বলছি—পরাশরবাবুকে তুই একটা চিঠি লেখ্।—লিখে দে, বিয়ে নাহয় দু'মাস পরেই হবে, কিন্তু টাকাটা তুমি এখন আমাকে দিয়ে যাও। হেবোকে আমি বলে রেখেছি। দু'শ টাকা বেশি পেলেই এখন সে আমাকে জমি বাগান ফিরিয়ে দেবে। কি? আমি অন্যায় বলছি কিছু? তুই কি বলিস বসুন্ধরা?

বসুন্ধরা চুপ করে রইলো। সে আবার কি বলবে?

চিঠিফিটি লিখতে পারব না আমি।

বলেই ধীরু সেখান থেকে উঠে পালিয়ে গেল।

মাসীমা বলে, বেশ তাহ'লে আমিই লিখি।

এই বলে বসুন্ধরার কাছে এগিয়ে এসে তার হাত ধরে মাসী বললে, আয় আমার সঙ্গে। বেশ করে গুছিয়ে এই কথাগুলি তুইই লিখে দিবি আয়।

মাসী ছাড়লে না কিছুতেই। বসুন্ধরাকে যেতে হলো তার সঙ্গে।

যেতেও হলো। লিখতেও হলো।

ছুটির দুটো দিন বাড়ীতেই কাটাতে হলো ধীরুকে।

এই দুটি দিনের মধ্যে অনেকবার আকাশ অন্ধকার করে মেঘ উঠলো, ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি নামলো, কিন্তু একটি বারের জন্যও বসুন্ধরা এলো না তার ঘরে।

বসুন্ধরার কেমন যেন শুকনো-শুকনো চেহারা, চুল আঁচড়ায় না, ভাল কাপড় পরে না, মুখ নীচু করে ঘরের কাজকর্ম সবই করে, ধীরু কাছে এলেই সরে যায়।

সেদিন শেষ রাত্রি। কাল সকালেই ধীরু চলে যাবে কলকাতায়। ভাতের থালাটা ধরে দিয়েই বসুন্ধরা বেরিয়ে যাচ্ছিল ঘর থেকে, ধীরু তার মায়ের কাছেই ডেকে বসলো, বসুন্ধরা!

বসুন্ধরা ফিরে দাঁড়ালো। মুখখানি বিষন্ন ম্লান। একগাছি চুল কপালের ওপর এসে পড়েছে। ডুরে শাড়ীর আঁচলটা শুধু ফেরতা দিয়ে কোমরে গোঁজা। তাও যেন কত সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে।

বড় বড় চোখদুটি তুলে একবার ধীরুর দিকে তাকালো সে। চোখে চোখ পড়ে গেল। কালো তারা দুটি যেন থর থর করে কাঁপছে।

ধীরু বললে, বইগুলো নিলে না যে!

বসুন্ধরা শুধু বললে, নেবো।

নেবো বলেই চলে গেল বেরিয়ে।

দোরের কাছে দাঁড়িয়েছিল ধীরুর মা।

ধীরুর মনে হলো সে যেন অপরাধী। বসুন্ধরার কাছে সে যেন মারাত্মক কোনও

অপরাধ করে ফেলেছে। মার দিকে চোখ পড়তেই মনে হলো মাও যেন তার কৈফিয়ৎ চাচ্ছে তার কাছ থেকে। ভাতে তখনও হাত দেয়নি সে। ভাতগুলো খেতে ইচ্ছে করছিল না তার। হঠাৎ বলে বসলো, কি হয়েছে ওর? ভাল করে কথা বলছে না—

মাসীমাও সেটা লক্ষ্য করেছে। বসুন্ধরার কাছে গিয়ে কানে কানে কি যেন তাকে জিজ্ঞাসা করলে। বসুন্ধরাও যেন মাথাটি কাৎ করে দায়-সারা গোছের জবাব দিলে, হ্যাঁ।

মাসীমা বললে, ও।

ধীরুর কাছে এসে বললে, না কিছু হয়নি। এমনি।

ব্যস, আর কোনও কথা নেই। ওই পর্যন্তই।

পরের দিন খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠেছিল ধীরু। মার ঘরে উঁকি মেরে দেখেছিল, বসুন্ধরার শোবার জায়গাটা খালি। তারও আগে কখন্ সে উঠে চলে গেছে। পুকুরের ঘাটে গিয়েছিল হাত-মুখ ধুতে। যদি বসুন্ধরার সঙ্গে একটিবার দেখা হয়! কিন্তু না, সেখানেও নেই। সুবচনীর বাড়ীতে যেতে কেমন তার সাহসে কুলোয়নি।

সাতটায় ট্রেণ। কলকাতায় যাবার জন্যে তৈরি হয়ে নীচে নেমে এসেছিল ধীরু। হাতের ব্যাগটা নামিয়ে মোড়ার ওপর বসেছিল চা খাবার জন্যে।

মা বলেছিল, শুধু চা খাবি? চারটি মুড়ি খা।

না।

বৌমা দুধ দিয়ে গেছে। এক বাটি দুধ গরম করে দিক্।

না।

সুমুখে রান্নাঘরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল ধীরু।

ভোরের আকাশে শুকতারার মত চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে তারই দিকে এগিয়ে আসছে বসুন্ধরা। শাড়ী পাল্টেছে। চুলও আঁচড়েছে মনে হচ্ছে। কিন্তু সেই ম্লানমুখী বসুন্ধরা।

ওপরের ঘরের চাবিটা ছিল ধীরুর হাতে। চাবিটা অন্য দিন সে মার হাতে দিয়ে যায়। সেদিন কিন্তু বসুন্ধরার পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে বলেছিল, ঘরের চাবি রইলো। বই যা দরকার হবে নিও।

চাবিটাও তুলে নেয়নি, কোনও কথাও বলেনি বসুন্ধরা। চায়ের পেয়ালাটি সে তার পায়ের কাছে নামিয়ে দিতে গিয়েছিল, ধীরু হাত বাড়িয়ে ধরে নিয়েছিল পেয়ালাটি।

হাতে ঠেকেছিল হাত, আর চোখে পড়েছিল চোখ।

রোমাঞ্চিত শিহরণ জেগেছিল ধীরুর সর্ব অঙ্গে। আর প্রচণ্ড আঘাত লেগেছিল তার বুকে। বসুন্ধরার দুটি চোখ জলে ভরা। লুকোতে চেয়েছিল বসুন্ধরা। কিন্তু লুকোতে পারেনি। পেছন ফিরে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল সে।

দোর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছিল তার মা। যাবার সময়েও বলেছিল, চিঠিখানা ডাকে দিয়েছি। আজকালের মধ্যেই পাবে।

ধীরুর মুখ দিয়ে কথা বেরোয়নি।

চিঠি পেয়ে টাকাটা যদি বেইমশাই তোর আপিসে গিয়ে তোর হাতেই দিয়ে আসে তো নিবি। বাড়ীতে একবার যদি তোকে নিয়েই যেতে চায় তো যাবি। লজ্জা-টজ্জা করিস নে।

কোনও কথা না বলে ধীরু সাইকেল-রিক্সায় গিয়ে উঠেছিল।

কোৎরাং থেকে 'পাগ্ মিলে'র মালিককে ধরে নিয়ে এসেছে ঝুলন চক্রবর্তী।

লোকটি ভাল। হাতে রুপো-বাঁধানো লাঠি। গায়ে গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবি। পরণে লাল পাড় কোঁচানো ধুতি। চেহারা দেখে বয়স অনুমান করা শক্ত। মুখের চামড়া একটু কুঁচকে গেছে।

ঝুলন একেবারে ঘরের দোরে এনে হাজির করলে ভদ্রলোককে।

সুবচনী একটু অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে মাথার কাপড়টা তুলে দিয়ে বললে, একটা খবর দিয়ে আসতে পারলে না? জানো তোমার একখানা ঘর—

ঝুলন বললে, সে অবসর আর দিলেন কোথায় বটব্যাল-মশাই! বললেন, মেয়েটিকে একবার দেখেই—

পাগ্ মিলের মালিক বটব্যালমশাই তখন নিজেই কথা বললেন। জুতো খুলে তিনি তখন একেবারে ঘরের ভেতর প্রবেশ করেছেন।

সে জন্যে কোনও চিন্তা করবেন না আপনি। মেয়েটি যেমন অবস্থায় আছে সেই অবস্থাতেই একবার দেখিয়ে দিন আমাকে।

বলতে বলতে তক্তাপোষের ওপর চেপে বসলেন বটব্যালমশাই।

সুবচনী বললে, না না তা কি হয় নাকি? এসেছেন যখন, একটু মিষ্টিমুখ করে যান। ওগো, শুনছো? ওখানে আবার কি খুঁজছো তুমি?

ঝুলন তখন তক্তাপোষের নীচে বসে কি যেন হাতড়াচ্ছিল। সুবচনীর কথা শুনে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে।

সুবচনী বললে, যাও চট্ করে কিছু সন্দেশ নিয়ে এসো।

সন্দেশ যে আমি এনেছি পকেটে করে। ডিস খুঁজছিলুম।

ওই দ্যাখো, গ্লাস ডিস সব আছে রান্নাঘরে। নিয়ে যাও, নিয়ে গিয়ে দাও খেতে। আমি ততক্ষণ বসুন্ধরাকে বারণ করে দিই—এদিকে আসতে।

ঝুলন চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করলে, কেন, বারণ করবে কেন?

সুবচনী কিন্তু সে চুপিচুপি কথার জবাবে বেশ জোরে জোরেই বললে, তুমি দাওগে খেতে। তারপর বলছি। একটা খবর দিয়ে আসবার কথা তবে আর
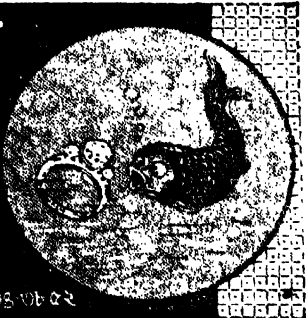
বলছিলুম কেন? আজ বিষ্যুৎবার। মেয়ে আজ আমাদের দেখাতে নেই।

কথাটা শুনতে পেলেন বটব্যাল-মশাই। ভেতর থেকেই জবাব দিলেন, কেন? বৃহস্পতিবার তো ভাল বার।

আজ্ঞে না। আমাদের একটা ইয়ে আছে।

বলেই সুবচনী মাসীর বাড়ীর দিকে চলে গেল। ছেলে তিনটেকে সঙ্গে নিয়ে বসুন্ধরা বোধ হয় সেইখানেই গেছে। তাড়াতাড়ি বারণ না করলে হয়ত ফট্ করে এসে পড়বে।

সুবচনী যা ভয় করেছিল শেষ পর্যন্ত কিন্তু তাই হলো।

বটব্যালমশাই সন্দেশটি মুখে দিয়েছেন আর ঠিক সেই সময়েই গোয়ালের দিক থেকে ছেলে তিনটেকে সঙ্গে নিয়ে বসুন্ধরা এসে হাজির।

'দিদি' বলে ডেকে ঘরে ঢুকেই নতুন মানুষ দেখে আবার বেরিয়ে আসছিল, ঝুলন বললে, এই তো বসুন্ধরা। দাঁড়া দাঁড়া যাসনি, শোন্!

ঝুলন তার কোল থেকে ছেলেটাকে তুলে নিয়ে বললে, দেখুন বটব্যাল-মশাই! এত কষ্ট করে এলেন যখন—হোকগে বৃহস্পতিবার। আমি ও-সব মানিটানি নে।

মাসীর বাড়ী থেকে ছুটতে ছুটতে এসে দাঁড়ালো সুবচনী। দূর থেকেই সে দেখতে পেয়েছিল বসুন্ধরাকে। দোরের কাছে এসে যেন সে রাগে একেবারে ফেটে পড়লো।

তোমার কি এতটুকু আক্কেল-বুদ্ধি নেই? আমি বারণ করে গেলাম—

বটব্যালমশাই জল খেয়ে গ্লাসটা নামিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, থামুন মা থামুন। আপনার বারণ উনি শোনেননি, ভালই করেছেন। দেখুন, ইঁটের দালালী করতে করতে পাগ্ মিলের মালিক হয়েছি আমি। আক্কেল-বুদ্ধি আপনার স্বামীর না থাকলেও আমার একটু আছে। বৃহস্পতিবারে মেয়ে দেখাবেন না, আপনার একটু 'ইয়ে' আছে শুনেই আমি একটুখানি আঁচ করেছিলুম, এখন সব পরিষ্কার হয়ে গেল। আপনার এই বোনটি হলো গিয়ে এক নম্বরের ফার্স্ট ক্লাস ইঁট, বড় বড় ইমারত-অট্টালিকার দরকার হয়। এ দিয়ে কাদার গাঁথনি হয় না। হলেও বড় বেমানান হয়। এই সোনার প্রতিমাকে আমি কি কখনও বিয়ে করতে পারি মা, না আপনিই আমার হাতে তুলে দিতে পারেন এই লক্ষ্মীমন্ত মেয়েটিকে?

এই বলে বসুন্ধরার মাথায় হাত দিয়ে বটব্যাল-মশাই বললেন, তুমি রাজরাণী হও মা, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন!

বটব্যাল-মশাই জুতো পরলেন, লাঠিটি হাতে নিলেন, তারপর আবার দাঁড়িয়ে বলে গেলেন, আপনার ঠিকানা আমার জানা রইলো চক্কোত্তিমশাই। ভাল ছেলের সন্ধান যদি পাই তো আপনাকে আমি জানাব। আসি। নমস্কার!

ভাল ছেলের সন্ধান কিন্তু বটব্যাল-মশাইকে দিতে হলো না। তার আগেই একটা অঘটন ঘটে গেল।

একটা দিন পরই শনিবার।

শনিবারের পাঁচটার ট্রেণ।

ধীরু এলো। সাইকেল-রিক্সা এসে দাঁড়ালো বাড়ীর দরজায়। মস্ত বড় একটা সুটকেস হাতে নিয়ে ধীরু নামলো রিক্সা থেকে।

আমার ওপরের ঘরের চাবি কোথায় মা?

মা বললে, চাবি যেখানে থাকে সেইখানেই আছে। দ্যাখ্‌গে আমার ঘরের দেয়ালের গায়ে পেরেকে ঝোলানো। কেন, চাবির কথা আজ জিজ্ঞাসা করলি যে?

ধীরু বললে, সেদিন যাবার সময় চাবিটা ফেলে দিয়ে গিয়েছিলাম বসুন্ধরার পায়ের কাছে। বই নেবে বলেছিল না?

কই, বই-টই কিছু নেয়নি। এই নতুন বাক্সটা কিনলি বুঝি? বেইমশাই টাকা দিয়েছে?

না।

ধীরু ওপরে উঠে গেল, সুটকেসটা রাখতে।

সুটকেস রেখে চটি পরে গামছা কাঁধে নিয়ে যেমন নেমে আসে তেমনি নেমে এলো ধীরু। বসুন্ধরা চা করছে। মা দাঁড়িয়ে আছে উঠোনে।

হাঁরে ধীরু, বেইমশাই তোর আপিসে কোনও খোঁজখবর নেয়নি? আমার চিঠিটার জবাব দিলে না কেন বল্ দেখি? হেবো এসেছিল পরশু সকালে। আমি বললুম—আর কয়েকটা দিন সবুর কর বাবা, জমি ফেরত নেবার সব ব্যবস্থাই আমি পাকাপাকি করে ফেলেছি। এখন নিলে ধানসুদ্ধ পাওয়া যেতো জমিটা—এই আর-কি!

শেষ পর্যন্ত কথাগুলো শুনলে না ধীরু। চলে গেল পুকুরের ঘাটে।

হাঁরে বসুন্ধরা, চিঠির ঠিকানাটা তুই ভাল করে লিখেছিলি তো?

লিখেছিলাম।

কথাগুলি যা যা বলেছিলুম—ঠিক ঠিক লেখা হয়েছিল?

হুঁ।

তাহলে চিঠির জবাব এলো না কেন বল্ দেখি?

তাও বলতে হবে বসুন্ধরাকে? বসুন্ধরা চুপ করে রইলো।

কাপে দুধ চিনি দিয়ে ঘন-ঘন তাকাতে লাগলো খিড়কির দিকে।

ধীরু এলো। এসেই বসে পড়লো রান্নাঘরের সিঁড়ির ধাপে। কাপটা হাতে হাতে বাড়িয়ে দিলে না বসুন্ধরা। চা তৈরি করে একটুখানি ঠেলে দিলে মাত্র ধীরুর দিকে।

মা সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভাল করে তাকাতে পর্যন্ত পারলে না বসুন্ধরার দিকে। কাপটা তুলে নিয়ে যেই সে মুখে দিয়েছে, অমনি মাতৃকণ্ঠ থেকে সুধাবর্ষণ সুরু হলো।

তখন আমার কথাগুলো তুই ভাল করে শুনলি না ধীরু। বেইমশাই-এর টাকার জন্যে আমি ছটফট্ করছি কেন জানিস? এখন যদি জমিটা কিনে নিতে পারতুম তাহলে ধানসুদ্ধ পাওয়া যেতো। তোর পড়ার খরচ চালাতে গিয়ে ওইটি আমার গেছে।

হ্যাঁ না কিছু বললে না ধীরু। খুব তাড়াতাড়ি খানিকটা চা খেয়ে নিয়েই কাপটা হাত থেকে নামিয়ে দিয়ে ধীরু সোজা চলে গেল সুবচনীর কাছে।

কি করছো, বৌদি?

লেখাপড়া শেখাচ্ছি ছেলেদের।

সব-চেয়ে ছোট ছেলে তরুণ বসে আছে সুবচনীর কোলে, আর অরুণ বরুণকে দু' খানা শ্লেট দিয়ে বসিয়ে দিয়েছে অ আ লিখবার জন্যে।

ধীরু দাওয়ার ওপর চেপে বসলো। বললে, ছেলেদের লেখাপড়া শেখাতে গিয়ে কত খরচ হলো হিসেব রাখো।

সুবচনী জিজ্ঞাসা করলে, কেন?

ওদের বিয়ের সময় সেটা আদায় করতে হবে বৌ-এর বাপের কাছ থেকে।

সুবচনী চট্ করে কথাটা ধরতে পারলে না। একবার তাকালে ধীরুর মুখের দিকে। তারপর বললে, তোমার মুখে হঠাৎ এ-কথা কেন ঠাকুরপো?

কিছু না। এমনিই বললাম।

না না এমনিই কেন বলবে? তুমিও তো ওই দলে! তোমার শ্বশুরকেও তো সেদিন মাসীমা একখানা চিঠি লিখিয়েছেন বসুন্ধরাকে দিয়ে!

কী লিখিয়েছেন?

সুবচনী হেসে বললে, কিছু জানো না যেন! ন্যাকামি কোরো না ঠাকুরপো, ন্যাকামি ভালবাসি না।

সুবচনীর চাঁছাছোলা কথা। সত্যি কথাটা মুখের ওপর না বলতে পারলে তার সুখ হয় না। বললে, আমার যে

কিছু বলবার উপায় নেই। মুখের কথাটা মুখের ডগায় এসে আটকে থাকে।

কেন?

ভাববে বুঝি আমার বোনকে তুমি বিয়ে করলে না তাই বলছি। কলকাতায় তো রয়েছ, দাও না দেখে একটি ছেলে!

ধীরু বললে, সেই রকম একটি ছেলের সন্ধান আমি পেয়েছি। সেই কথাই বলতে এলাম তোমাকে।

সত্যি?

সত্যি।

সুবচনী বললে, তাহ'লে পাঠশালার ছুটি দিয়ে দিই?

তার মানে?

অরুণ বরুণের শ্লেটদুটো সরিয়ে নিয়ে সুবচনী বললে, যা, তোদের আজ ছুটি। খেলা করগে যা।

অরুণ বরুণ ছুটে চলে গেল। কোলের ছেলেটো কোলের ওপর ঘুমিয়ে পড়েছিল। সুবচনী বললে, এটা এখনও ইস্কুলে ভর্তি হয়নি। ঘুমিয়ে পড়েছে। একে শুইয়ে দিয়ে এসে ভাল করে শুনি।

ছেলেটাকে ঘরের ভেতর শুইয়ে দিয়ে এসে সুবচনী ভাল করে চেপে বসলো। বললে, বল এবার। কি সুখবর নিয়ে এসেছ, শুনি।

ধীরু বললে, তুমি একদিন আমাকে বলেছিলে তোমার বাপের বাড়ীর দেশের ছেলেরা লেখাপড়া শিখে আজকাল নাকি খুব ভাল হয়ে উঠছে। একটি পয়সা না নিয়ে তোমার বোনকে বিয়ে করে নিয়ে চলে গেছে। বলেছিলে কি না?

হ্যাঁ বলেছিলাম।

অথচ কথাটা ডাহা মিথ্যে কথা।

সুবচনী বললে, হ্যাঁ, মিথ্যে কথা। তোমার ওপর রাগ করে বলেছিলাম। আর যতই লেখাপড়া শিখুক সে রকম দিন কখনও আসবে বলে মনে হয় না।

ধীরু বললে, কেন আসবে না?

সুবচনী বললে, মা বাপের ওপর ছেড়ে দিলে চলবে না। ছেলে-মেয়েদের নিজেদের শক্ত হতে হবে। তা কি আর কোনোদিন হবে এই হতভাগা দেশে?

হবে বৌদি হবে। হবে কেন, হয়েছে। সেই খবরটাই দিতে এসেছি তোমাকে। আগামী পরশু মানে সোমবার সন্ধ্যেবেলা তোমার বোন বসুন্ধরার বিয়ে আমি ঠিক করে ফেলেছি। পাঁজি দেখে দিন স্থির করেছি। তোমার এই ঘরের ভেতর বিয়ে হবে। একটি পয়সা খরচ করতে হবে না। মুকুন্দদা শিবু ভট্চাজকে খবর দেবে। পাড়ার দু-চারজন লোককে

রাতের পড়া ফটো: সুব্রত ত্রিপাঠী

যদি খাওয়াতে হয় তো খাইয়ে দিও। খরচ সব আমার।

সুবচনী বিশ্বাস করতে পারলে না কথাটা। বললে, কী পাগলের মত কথা বলছ ঠাকুরপো? ছেলে দেখলাম না কিছু না—

ছেলে দেখতে চাও দ্যাখো।

সুবচনী জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় ছেলে?

এই তো তোমার সামনে বসে।

বলে ধীরু তার নিজের বুকে হাত রেখে বললে, আমি—আমি বিয়ে করব বসুন্ধরাকে।

যে রকম জোরের সঙ্গে বললে কথাটা, সুবচনী অবিশ্বাসও করতে পারলে না, আবার পুরোপুরি বিশ্বাসও হলো না। বললে, তুমি আমার সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করছ না তো ঠাকুরপো?

ধীরু বললে, না বৌদি সত্যি বলছি।

কিন্তু তোমার মা?

মা এখনও জানে না।

কখন জানাবে তাকে?

আজ রাত্তিরে।

সুবচনী বললে, আগে দ্যাখো জানিয়ে—কি হয়।

যা হবার তাই হলো।

খাওয়া-দাওয়ার পর জানানো হয়েছিল তাঁকে। জানিয়েছিল অবশ্য তাঁর একমাত্র সন্তান ধীরু।

প্রথমটা গুম্ হয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো বিরজাসুন্দরী, তার পর আরম্ভ হলো তার কটূক্তির তাণ্ডব।

সব দোষ গিয়ে পড়লো সুবচনীর ওপর।

মাসী বললে, ওই হারামজাদীই আমার এই সুব্বনাশটি করেছে। আমি বুঝতে পারছি। সতীঘাটার ধানের জমি আর রামকানালির বাগান আমি ফিরে পাব—ও-মাগীর তা' সহ্য হবে কেন? আর তোকেই বা কি বলবো ধীরু, লেখাপড়া শিখে শেষ পর্যন্ত এই বুদ্ধি হলো তোর? তিনটি হাজার টাকা নগদ, কলকাতায় একখানা বাড়ী, টাকাকড়ি গয়নাগাটির তো কথাই নেই, সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে একটি পয়সা না নিয়ে তুই বিয়ে করবি ওই মেয়েটাকে? কেন? কি দুঃখে? তুই লেখাপড়া জানিস না, না রোজগার করতে পারিস না? আমার যে মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করছে হতভাগা!

রাত্রে খেয়েদেয়ে সেই যে বসুন্ধরা পালিয়েছিল সুবচনীর কাছে, সে আর এ-পথ মাড়ায়নি।

সকালে দুধ দিতে এলো না সুবচনী। পাঠিয়ে দিলে বসুন্ধরাকে।

বিরজাসুন্দরী বললে, খবরদার বলছি দুধ দিবিনে। টান মেরে ফেলে দেবো আমি।

দুধ নিয়ে ফিরে গেল বসুন্ধরা।

সুবচনী বললে, রেখে দে। বুড়ীকে আর দুধ খেতে হবে না।

জামগাছের তলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুবচনীকে শুনিয়ে শুনিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গালাগালি দিতে লাগলো বিরজাসুন্দরী।

পুকুরের ঘাটে ধীরুর সঙ্গে দেখা হলো সুবচনীর। সুবচনী বললে, মা যখন তোমার এমনি করছে ঠাকুরপো, তখন তুমি এক কাজ করতে পার। বসুন্ধরাকে আমি পাঠিয়ে দিই কুলটিক্রিতে। সেখানে আমার বাবা আছে, আমাদের বাড়ী আছে। মার চোখের বাইরে বিয়েটা সেরে দিয়ে এসো, তারপর মা একটু ঠান্ডা হলে বৌ নিয়ে আসবে।

রাজী হলো না ধীরু। বললে, না। লুকিয়ে আমি কিছু করব না। যা করব সামনাসামনি করব। তোমার বাড়ীতেই কাল আমাদের বিয়ে হবে।

হলোও তাই।

ঠিক সময়েই বিয়ে তাদের হয়ে গেল।

বিয়ের পর মাকে প্রণাম করতে গেল ধীরু আর বসুন্ধরা।

বসুন্ধরাকে মানিয়েছে চমৎকার। কলকাতা থেকে ধীরু তার জন্যে মনের মত কাপড় জামা কিনেই এনেছিল।

কিন্তু প্রণাম করতে গিয়েই বাধলো বিপদ।

ধীরু প্রণাম করলে, মা তখন গম্ভীর মুখে চুপ করে রইল।

কিন্তু বসুন্ধরা যেই প্রণাম করবার জন্য মাথা হেঁট করেছে, বিরজাসুন্দরী মারলে তাকে সজোরে এক লাথি। বললে, বেরিয়ে যা তুই আমার চোখের সমুখ থেকে। তোকে আমি সহ্য করতে পারছি না।

'মা' বলে চীৎকার করে বসুন্ধরা উলটে পড়েছে তখন সিঁড়ির ওপর। দুহাত দিয়ে মাথাটা চেপে ধরেছে সে। কিছুতেই উঠতে পারছে না।

ধীরু ছুটে গেল তার কাছে। দেখলে মাথা দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে।

হাত ধরে তুলে ধীরুই তাকে তার ওপরের ঘরে নিয়ে গেল। টিনচার আইডিন লাগিয়ে দিলে। জিজ্ঞাসা করলে, খুব কি লেগেছে?

বসুন্ধরা হেসে বললে, না।

পরের দিন সকালে ধীরু আর বসুন্ধরা মার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

ধীরু বললে, আমরা কলকাতায় চললাম মা।

মা ভেবেছিল ছেলে বুঝি একাই চললো।

বসুন্ধরাকে পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলে, ও-ও চললো বুঝি?

ধীরু বললে, হ্যাঁ। ওকেও নিয়ে যাচ্ছি।

মা বললে, তাই যা। আমার চোখের সুমুখ থেকে দূর হয়ে যা তোরা।

সাইকেল রিক্সা ডেকে এনেছিল ঝন্টুন চক্রবর্তী।

সুবচনীর এদিক দিয়ে আসবার উপায় নেই। তাই সে তার ছেলে তিনটিকে নিয়ে ওই দিক দিয়ে ঘুরে ধীরুদের দোরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল রিক্সার কাছে।

বসুন্ধরা সুবচনীকে প্রণাম করলে।

সুবচনীর চোখে জল। বললে, তোরা দুজনে সুখেই থাকবি তা জানি। তবু আশীর্বাদ করছি—

আর সে কিছু বলতে পারলে না। কান্নায় গলাটা ধরে এলো।

খানিক পরে বললে, বাবাকে আমি চিঠি লিখে জানিয়ে দেবো। তুই কলকাতায় গিয়ে আমাকে একটা খবর দিস।

বসুন্ধরা বললে, দেবো।

পরের দিন বিকেলে কলকাতা থেকে এলেন পরাশরবাবু।

দেখা করলেন বিরজাসুন্দরীর সঙ্গে।

আপনার চিঠি আমি পেয়েছিলাম বেয়ানঠাকরুণ!

ছেলেবৌকে বিদায় করে দিয়ে মনের অবস্থা তার ভাল ছিল না। কোনও জবাব দিতে পারলে না ধীরুর মা। চুপ করেই রইল।

পরাশরবাবু আবার বললেন, টাকাটা আমি এখন জোগাড় করতে পারলাম না বেয়ানঠাকরুণ। তবে পুজোর আগেই এক হাজার টাকা আমি দিয়ে যাব। বাকি দু'হাজার টাকা দেবো বিয়ের সময়।

এতক্ষণ পরে কথা বললে বিরজাসুন্দরী। বললে, টাকা আর দিতে হবে না আপনাকে। আমার ছেলের বিয়ে হয়ে গেছে।

কথাটা বোধহয় রাগের কথা।

পরাশরবাবু বললেন, আপনি রাগ করলেন আমার ওপর?

না রাগ করিনি। সত্যি বলছি।

পরাশরবাবু কি যেন ভাবছিলেন।

ধীরুর মা বললে, তবে যে বলেছিলেন আপনি বড়লোক?

পরাশরবাবু বললেন, বিয়ে যখন হয়েই গেছে আপনার ছেলের, তখন আর বলতে দোষ নেই—শুনুন!

মা বললে, কি শুনবো?

পরাশরবাবু বললেন, মেয়েটা আমার দেখতে তেমন ভাল নয়। ভেবেছিলাম, আপনারা গরীব। টাকার লোভ দেখালে আমার মেয়েটার বিয়ে হয়ে যাবে। তাই ও-সব কথা বলেছিলাম।

মা বললে, খুব অন্যায় করেছিলেন আপনি।

পরাশরবাবু বললেন, বাড়ন্ত আই-বুড়ো মেয়ে যাদের বাড়ীতে, তারা এর চেয়েও বড় অন্যায় করে থাকে।

এই বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, তাহলে আমি চলি। প্রণাম।

আচ্ছা আসুন।

বিরজাসুন্দরী তাঁকে বিদায় করে দিয়ে কেমন যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। জামগাছের তলায় গিয়ে ডাকলেন, বৌ! ও বৌ!

বৌ মানে সুবচনী।

সে ভাবতেই পারেনি যে ধীরুর মা তাকে এমন করে ডাকবে। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সাড়া দিলে। বললে, কি বলছো?

ধীরুর মা বললে, ওরা বোধহয় আমাকে খবর-টবর দেবে না। তোর কাছে ওদের চিঠি এলে আমাকে জানাস।

সুবচনী বললে, জানাবো।

বলেই সে মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগলো।

—শেষ—

॥ ১ ॥

আমি তখন ছাতের ঘরে বসিয়া আধুনিক কবিতায় মনোনিবেশ করিয়াছি। আমি যখন পড়িতে বসি প্রায় রোজই তখন একতলার ছোট মেয়েটি আসিয়া তাহার সব কালীঘাটের হাঁড়ি-কুঁড়ি ছাতে বিছাইয়া রান্নাবান্না খেলিতে বসে। পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকেই আমাকে তাহার সুপক্ক অভিনব ঘন্ট-ব্যঞ্জনাদি মাঝে মাঝে খাইয়া লইতে হয় এবং কিছু কিছু রোচক মন্তব্য প্রকাশ করিয়া তাহাকে খুশী রাখিতে হয়।

আজ আধুনিক কবিতায় হাত দিয়াছি একটা বিশেষ সংকল্প লইয়া; সে সংকল্প হইল এই যে, আজ আর হেলায়-ফেলায় আধুনিক কবিতা পড়িবার তরল প্রবণতা প্রকাশ করিব না। এ-কথাটা এতদিনে বুঝিয়া লইয়াছি যে আধুনিক কবিতা পড়িতে হইলে মনকে আগে তাহার উচিত-মূল্য দিবার জন্য প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। উচিত-মূল্য দানের মধ্যে এখানে শ্রমদানের কথাটা বড় হইয়া আছে; শ্রমদানের অর্থ এখানে উপযুক্ত মনন-দান। পূর্বাভ্যাসে বহুবার বিড়ম্বিত হইয়াছি; সেই বিড়ম্বনার অভিজ্ঞতায় এখন স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, আধুনিক কবিতায় মননের একটি সমবায় নীতি অনুস্যূত আছে,—সেই সমবায়ের অংশীদার একদিকে কবি নিজে, অন্যদিকে সহৃদয় পাঠক। সহৃদয় বলিতে সম-মননশক্তি-সম্পন্নতার উপরে এবং সম-রুচিপ্রবণতার দিকটার উপরেই জোর দিতে হইবে। সমবায়-নীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত এই কাব্য-ব্যাপারে অংশভাগ ঠিক সমান সমান না হইলেও অন্ততঃ দশ-আনা ছ'-আনার কাছাকাছি হইতে হইবে; নতুবা লাভের অংক উভয়দিকেই ঘাটতি পড়িবার সম্ভাবনা। কথাগুলি এখন জানিতে এবং বুঝিতে পারিয়াছি বলিয়া বিধিপূর্বক পাঠের জন্য নিজেকে সচেতনভাবে প্রস্তুত করিয়া লইবার তাগিদ বোধ করি; আজ নিজেকে যতটা পারি সেইভাবেই প্রস্তুত করিয়া লইয়া কবিতা পাঠে বসিয়াছিলাম; কিন্তু তাহাতেও সুফল তেমন কিছু হয় নাই।

আশঙ্কা করিতেছি, এই উপক্রমণিকা দৃষ্টে ইঙ্গিতবহুজ্ঞ সামাজিকগণ আশা করিতেছেন এই যে, আমি শেষ পর্যন্ত বহু-উক্ত বহুশ্রুত এবং বহুচর্চিত একটি রক্ষণশীল-স্লোগানেরই পুনরাবৃত্তি করিতে চাই, স্লোগানটি হইল, আধুনিক কবিতা' অতিশয় দুর্বোধ্য। এই স্লোগানটি আবার আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ নয়, ইহা সম্পূর্ণ আর একটি অনুসিদ্ধান্ত লইয়া, তাহা হইল এই যে, যাহা দুর্বোধ্য তাহা মূলতঃ কোন সাহিত্যকর্মই নয়।

এই আশঙ্কিত পথে পদচারণা আমার আকাঙ্ক্ষিত নয়। এতদিনে আমরাও জানিয়া ফেলিয়াছি যে, কবিতা লইয়া সাধারণতঃ যে বোঝা-না-বোঝার কথাগুলি বলা হইয়া থাকে তাহা কতকগুলি অচল কথাকেই প্রথানুগতঃ ঠেলিয়া চালাইবার চেষ্টা মাত্র। কবিতা বোঝা শব্দের অর্থ সরাসরি একটা সারমর্ম বা ভাবার্থ বুঝিয়া লওয়া নয়; একটি কবিতা একজন কবির অত্যন্ত ব্যাপক এবং অত্যন্ত জটিল সমগ্র পরিবেশের সম্ভারই একটি অনুভূতির পরিচয়; কবির সঙ্গে ততটা সম্ভব এক হইয়া গিয়া সেই অনুভূতিরই যে গ্রহণ তাহারই তাৎপর্য হইল কবিতা বোঝা। যখন বলিলাম সুফল ফলিল না, তখন বলিলাম গ্রহণটা সম্পূর্ণভাবে হইল না। কেন সেই কথাটিই বিচার্য। নিজেকে বাঙলা কবিতার একটি গড়পড়তা সাধারণ পাঠকরূপে ধরিয়া লইয়া সেই 'কেন' কথাটার উত্তরেই ঘুরিয়া ফিরিয়া নানাভাবে নিজের মধ্যে পাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

আমি যখন সেই আত্মবিশ্লেষণ এবং তাহাকে সাধারণীকরণের দ্বারা কবিতা সম্বন্ধে কতকগুলি মৌলিক সত্য আবিষ্কারের চেষ্টা করিতেছি তখন ছাতের এক কোণ হইতে ছোট মেয়েটি তাহার ছোট ছোট হাতা-খুন্তির টুং-টাং শব্দের দ্বারা আমার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া আশ্বাসের সুরে আমাকে বলিয়া উঠিল, 'তোমাকে অত ভাবতে হবে না, একটু দেরী কর, এই আমার হয়ে এল।'

আমি ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোমার কি হয়ে এসেছে? তুমি আজ কি রান্না করছ?'

মেয়েটি বলিল, 'পায়েস রান্না করছি।'

আমি বলিলাম, 'বাঃ, পায়েস? একটুখানি নিয়ে এস না।'

মেয়েটি বলিল, 'বারে, এখন পর্যন্ত নুনই দিলুম না, নিয়ে আসব কি?'

আমি হাসিয়া বলিলাম, 'পায়েসে নাকি নুন দেয়? ছ্যা-ছ্যা-ছ্যা—তুমি রান্নাই শেখনি।'

মেয়েটি সহসা একটু অপ্রতিভ হইয়া পরক্ষণেই মুখখানি ছুঁচলো করিয়া বলিয়া উঠিল, 'হ্যাঁ-গো হ্যাঁ, পায়েসেও একটু নুন দিতে হয় গো! এবে আমি অন্য রকমের পায়েস রাঁধছি, বিলিতি পায়েস গো!'

আমি সামনের বইখানি বন্ধ করিয়া রাখিয়া ভাবিতে লাগিলাম, কথাটা ত মেয়েটি মন্দ বলে নাই, নূতন করিয়া একটু ভাবিয়া দেখিবার মত।

একরকমের পায়েস সম্বন্ধে আমরা বহুদিন যাবৎ অভ্যস্ত, সে সম্বন্ধে আমাদের প্রায় অনড় একটা সংস্কার গড়িয়া উঠিয়াছে। এই অভ্যাস এবং সংস্কার দুই-ই ত একদিন বদলাইয়া যাইতে পারে। অন্য সব খাবারের শেষে আমরা এতদিন বেশ স্বাদু এবং উপকারী বলিয়া পায়েস খাই; এই স্বাদুত্ব এবং প্রয়োজনীয়ত্বের সঙ্গে আমাদের সাধারণ আহারের অভ্যাসের সঙ্গে সামগ্রিকভাবে একটা যোগ আছে। আমাদের আহারের অভ্যাস হয়ত আস্তে আস্তে এমনভাবে বদলাইয়া যাইতে পারে যখন দুগ্ধ ও শর্করাযোগে প্রস্তুত একজাতীয় একটি বিশেষ লেহ্য পদার্থকেই আমাদের পরম-হৃদ্য এবং বলকারী বলিয়া মনে হইবে না, তখন হয়ত নুন-ঝাল-টক-মিষ্টির মিশ্রণজাত কোনও খাদ্য বা পানীয়কেই অধিক হৃদ্য এবং উপকারী মনে হইবে।

আবার আশংকা হইতেছে, আমার সম্বন্ধে সন্দেহ উৎপন্ন হইতেছে যে আমি আধুনিক কবিতাকে নুন মিশ্রিত নববিধানের পায়সান্ন বলিয়া সস্তা রসিকতা করিতে উদ্যত হইতেছি। আধুনিক কবিতা লইয়া সস্তা রসিকতা অনেক হইয়াছে, সেই চর্বিত-চর্বণের কোন অভিপ্রায় আমার নাই। তাহা ছাড়া আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে আমি বিরুদ্ধ রসিকতাপন্থী নই; আমার অভ্যাস-সংস্কার অনুশীলন-প্রবণতার সহিত যে-জিনিসটি হুবহু মিলিয়া না যায় তাহার আর ভাল হইবার কোন অধিকার বা সম্ভাবনাই নাই এমনতর কথা আমার নিকটে যুক্তিবিগর্হিত বলিয়া মনে হয়।

॥ ২ ॥

ভাবিয়া চিন্তিয়া আমার এই কথা মনে হইয়াছে, আমরা যাহারা একদল লোক আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে একটা নঙর্থক অবজ্ঞা বা প্রদর্থক বিদ্বেষ পোষণ

করি কবিতা সম্বন্ধে তাহাদের অভ্যাস সংস্কার আদর্শ আধুনিক কবিগণের অভ্যাস সংস্কার আদর্শ হইতে পৃথক। এইখানেই আমরা টেবেল চাপড়াইয়া বলিয়া উঠিব, কবিতা ত কবিতা, হাজার বৎসর আগেও কবিতা, পাঁচ শত বৎসর আগেও কবিতা, এখনও কবিতা—আবার পাঁচ শত বৎসর হাজার বৎসর পরেও কবিতা, রূপেগুণে একটু তরতম হইতে পারে মাত্র—একেবারে বদলা-বদলির কথা আসে কি করিয়া? কিন্তু চোখের সামনে দেখিতেছি মানুষের জীবনযাত্রা বদলাইয়া যাইতেছে, মানুষের সমাজ-সংগঠন ভাঙিয়া-চুরিয়া নূতন হইয়া গড়িয়া উঠিতেছে, মানুষের বিশ্বাস—মানুষের জীবন সম্বন্ধে মূল্যবোধ পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে, শুধু কবিতা সে এক কবিতাই হইয়া থাকিবে—সে আর দুই হইয়া উঠিতে পারিবে না, এ-কথা বলার তাৎপর্য কি হইবে?

মনন ব্যাপারে আমি হয়ত একেবারে নিরেট গোবেট নই; সঙ্কল্পকেও হয়ত দৃঢ় করিয়া লইলাম যে প্রচুর পরিমাণে মানসিক শ্রমদানের দ্বারা সমবায়-প্রথায় কবির সহিত সহানুভূতিশীল অংশীদার হইয়া তাঁহার কবিতা আস্বাদ করিব; ফলে হয়ত দেখা গেল অনেকখানি শ্রম-দানের পরিণামে গলদ্‌ঘর্ম হইয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি, যাহাকে গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলাম তাহার গ্রহণ হয়ত একরূপ হইয়াছে, কিন্তু তাহা আমার সত্তার কোন অংশের নিকটেই হৃদ্য হইয়া ওঠে নাই। এরূপ কেন হয়? এ-ক্ষেত্রে মনে হয়, অভ্যাস-সংস্কারবশতঃ আমি একটি কবিতার নিকট হইতে যে প্রয়োজন-সিদ্ধির আশা করি ঠিক সেই জাতীয় প্রয়োজনসিদ্ধির তাগিদ তাঁহার কবিতা-রচনার পিছনে একজন আধুনিক কবি কোনওদিনই অনুভব করেন নাই। পিকাসোর ছবির কলা-কৌশলটি হয়ত বুঝিয়া লইলাম; বুঝিলাম, একটি নারী-দেহের সব অবয়বই ইহার মধ্যে আছে, সেগুলিকে খুঁজিয়া একত্র করিয়া লইবার সঙ্কেতও কবি এক জায়গাতে রাখিয়া দিয়াছেন; এইবারে আমার মনটিকে একটু নড়াচড়া করাইয়া সব খুঁজিয়া লইলেই নারীটির বিশেষ মূর্তিখানি দেখিয়া ফেলিতে পারিব। আমি সচকিত হইয়া মনকে প্রচুর পরিমাণে নড়াচড়া করাইলাম, হয়ত সব অবয়বগুলি ছবি-খানির মধ্যে আবিষ্কারও করিয়া ফেলিলাম,—তাহার পরে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলাম, এমন নারীরূপে আমার কাজ নাই। পিকাসো বলিলেন, তুমি যে নারী-রূপ চাও তাহা অঙ্কিত করিবারও আমার কোন দায় নাই, তুমি অন্যত্র পথ দেখ। ঠিক তেমনইতর একজন আধুনিক কবির একখানি কবিতার বই সাগ্রহে পাঠ করিয়া কেহ হয়ত বলিবেন, 'তোমার কবিতা ত পড়িলাম, সব না বুঝিলেও কিছু কিছু না হয় বুঝিলাম, কিন্তু হায়, কোন একটা কিছুকেই ত বড় করিয়া পাইলাম না, আমার মন যে কোথাও এতটুকু একটু গলিল না!' কবি বলিবেন, 'গোড়াতেই যে ভুল করিয়া ফেলিয়াছেন মশাই; আমার কবিতা ত কোন একটা কিছুকে বড় করিয়া পাইবার জন্য নয়, কাহারও মন গলাইবার জন্য নয়; আমার কবিতা মনকে উত্তেজিত করিয়া তুলিবার জন্য, এদিক হইতে ওদিক হইতে সেদিক হইতে আচমকা নাড়া দিয়া দিয়া দিশাহারা ভ্রান্ত করিয়া তুলিবার জন্য, সংশয়ে তর্কে অবিশ্বাসে আপনার মনকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া তুলিবার জন্য, সব কবিতা জুড়িয়া কিছু একটা বড় করিয়া পাইতে হইলে, 'আঁখি ছলোছলো' করিয়া লইতে হইলে, মনকে গলাইতে হইলে রবিঠাকুরের কাছে যান।' এ-সব ক্ষেত্রে আমাদিগকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে, যাঁহারা যাহা করিতে চাহেন নাই তাঁহারা তাহা করেন নাই বা করিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহাদের শিরসি যথেষ্ট পরিমাণে নিন্দা-বিদ্রূপ স্তূপীকৃত করিবার যৌক্তিকতা আছে কিনা; অপরপক্ষে তাঁহারা যাহা করিতে চাহিয়াছেন তাহা যদি সুষ্ঠু উপায়ে করিতে পারিয়া থাকেন সেখানে তাঁহাদের সাফল্য স্বীকার্য কি না।

এইখানে জলদগম্ভীর স্বরে যেই কথাটি বলা হইবে তাহা এই, 'যাহা করিতে চাহে নাই তাহাই যে করা উচিত ছিল, যাহা করিতে চাহিয়াছে তাহাই যে করিতে না চাওয়া উচিত ছিল।' এই-খানেই চরম বিতর্ক ও মতদ্বৈধ। এই বিতর্কের এবং মতবিরোধের মীমাংসা কে করিবে? কল্যাণের আদর্শকেই এখানে ধ্রুব বলিয়া দাঁড় করান হইবে। কিন্তু সেই কল্যাণের আদর্শে মানুষের ঐকমত্য কোথায়? যেখানে ফাটল সেখানেই প্রলেপ লাগাইয়া সহস্রতালির সনাতন হইবার চেষ্টাতেই মানুষের কল্যাণ, না যেখানে চিড় ধরিয়াছে সেখানে বজ্র-আঘাতে ভাঙনকে ত্বরান্বিত করিয়া নূতন গঠনের সম্ভাবনাকে সহজ করিয়া দেওয়াতেই মানুষের কল্যাণ? আবার হয়ত সাবধানী পাঠকের পক্ষ হইতে বলা হইবে, কল্যাণের চিন্তা ও চেষ্টার মধ্যে এই যে দুইটি কোটি রহিয়াছে তাহার দুইটিকেই স্বীকার করিয়া লইলাম, এবং দুইটিকেই শ্রদ্ধা করিতে রাজি আছি; কিন্তু অশ্রদ্ধা করি তাঁহাদের যাঁহারা বিশ শতকের বাঙলা কবিতার উত্তর-তিরিশের যুগে ঘুরিয়া ফিরিয়া নির্বীর্যের মতন কেবলই বলিয়াছেন, আমরা এদিকেও নাই—ওদিকেও নাই—আমরা দিগ্‌ভ্রান্ত —আমরা 'ত্রিশঙ্কু',—আমরা মানুষকে আমাদের সেই দিগ্‌ভ্রান্তি এবং ত্রিশঙ্কু-ত্বের কথাই নানাভাবে শুনাইতে চাই। উত্তরে তাঁহারা বলিবেন, কালই আমাদের জাতীয় জীবনটাকে একটা ক্ষণপরিধিতে ত্রিশঙ্কু করিয়া তুলিতে চাহিতেছিল; আমরা যদি সেই শঙ্কটের সঙ্কেত অমন করিয়া না দিতাম তবে জীবন-সত্য হইতেই আমরা বিচ্যুত হইয়া পড়িতাম; আমাদের সৎসাহস আমাদের জীবন-পরিচয়ের সততায়, সেই সততাই আমাদের কবিকর্মকে শর্তহীন সমর্থন দান করিয়াছে।

॥ ৩ ॥

পায়সে লবণ দিয়া একটা নব-পায়সান্ন-রচনাবিধির কথা গল্পচ্ছলে উল্লেখ করিয়াছি। গল্পচ্ছলে উল্লেখ করিলেও জানি এমন অনেকে আছেন যাঁহারা আধুনিক কবিতার রচনাবিধি সম্বন্ধে এই দৃষ্টান্তটিকে অনেক দূরে টানিয়া লইতে উৎসাহিত হইবেন। তাঁহারা বলিবেন, কবিতা রচনা করিতে বসিয়া ছন্দোব্যবহারের এবং পঙ্‌ক্তিবিন্যাসের যেরূপ খামখেয়াল চলিতেছে, অলঙ্কার-প্রয়োগে যে-সকল উদ্ভটত্বের আশ্রয় গ্রহণ করা হইতেছে, শব্দ-প্রয়োগের যে উৎকট মহিমা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে—ইহার যে-কোনও একটি পায়সান্ন-রচনায় লবণ সংযোগের সহিত অতি সুষ্ঠুভাবে তুলিত হইতে পারে। সব জিনিসকে একসঙ্গে জড়াইয়া লইয়া কথা বলিয়া লাভ নাই, আধুনিকদের ছন্দোব্যবহারকে পৃথক্ করিয়া লইয়া কথা বলিতেছি। আমি কোন পক্ষে-বিপক্ষে কথা বলিব না, যাহা ঘটিয়াছে এবং ঘটিতেছে তাহার পিছনকার কতকগুলি ঐতিহাসিক তথ্যের প্রতিই দৃষ্টি আকর্ষণ করিব।

আধুনিককবিতা-বিরোধী কাব্য-রসিকগণের আধুনিক কবিতার প্রতি বিরূপতার যা বিস্ময়ের মত একটা কারণ, গদ্যছন্দের অতিমাত্রায় ব্যবহার (যেটাকে তাঁহারা বলিবেন ছন্দোহীনতা), পর্ব-ব্যবহারের একান্ত অনিয়মিততা, পঙ্‌ক্তি-ও স্তবকব্যবহারে অনর্থক স্বেচ্ছাচারিতা এবং বহুক্ষেত্রেই মিলবর্জন বিষয়ে একটা অহেতুক উৎসাহ-আধিক্য। আধুনিক কবিগণের পক্ষ হইতে এ-বিষয়ে কারণ যুক্তি ব্যাখ্যা নানাভাবে দেওয়া হইয়াছে, সেগুলির পুনরাবৃত্তির পথে আমি অগ্রসর হইতে চাহি না। সেইসব যুক্তি-প্রতিযুক্তির কথা ছাড়িয়া দিয়া মোটা-

মূটিভাবে আমরা লক্ষ্য করিতে পারি, যাঁহারা ছন্দোবিষয়ে আধুনিক কবিতার বিরূপ সমালোচক তাঁহাদের মনের মধ্যে ছন্দ সম্বন্ধে এবং কবিতার ক্ষেত্রে ছন্দের প্রয়োজন সম্বন্ধে বহুকাল-লালিত এবং অনেকখানি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত একটা বিশেষ ধারণা আছে। ছন্দ সেখানে সঙ্গীতেরই প্রকারভেদ এবং ছন্দোব্যবহারের মূল প্রয়োজনও হইল কবিতাকে যেখানে যতখানি সম্ভব সঙ্গীতাশ্রয়ী করিয়া তোলা। এই জাতীয় ছন্দোব্যবহারের মূলতত্ত্বটি রবীন্দ্রনাথের 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতাটির ভেতরেই চমৎকার প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে এই জাতীয় একটি মতকেই গ্রহণ করা হয় যে, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের ব্যবহৃত যে কাজের ভাষা তাহার শক্তি অর্থের দ্বারা সীমিত; শব্দকে অর্থের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া আভাসে-ইঙ্গিতে অনন্তশক্তিমান করিয়া তুলিবার জন্যই শব্দের সহিত সঙ্গীতের সংযোগ।

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে দেখিতে পাই, ঈশ্বর গুপ্তের পূর্বপর্যন্ত বাঙলা সর্ববিধ কবিতাই সংগীত, ইহার মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম মধ্যযুগের চরিতগ্রন্থগুলি; যদিও মধ্যযুগে সেগুলি কিভাবে পঠিত হইত ঠিক জানি না, কিন্তু আধুনিককালে বৈষ্ণবগণ কর্তৃক চৈতন্যচরিতামৃতও আগাগোড়া গীত হইতে শুনিয়াছি। আমাদের চর্যাপদগুলি মূলতঃ গীত, তাহার নামই ছিল চর্যাগীতি। জয়দেবের গীতগোবিন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তন এবং সহস্র-সহস্র বৈষ্ণব-কবিতা মূলতঃ গীত হইবার জন্যই লিখিত। আমাদের মঙ্গলকাব্যগুলি আমাদের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য হইবার পূর্বপর্যন্ত বা গবেষক পণ্ডিতগণ কর্তৃক চর্চিত হইবার পূর্বপর্যন্ত কখনও গীত না হইয়া শুধুমাত্র পঠিত হইত বলিয়া আমাদের জানা নাই। আসরে গীত না হইয়া যেখানে ঘরে ঘরে পঠিত হইত সেখানে সে পঠন-রীতিও আসলে গীত-রীতিই ছিল। ব্যক্তিগতভাবে দেশ-গাঁয়ে মঙ্গলকাব্য পঠিত হইতে দেখিবার অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। বরিশালের বহু অঞ্চলে গোটা শ্রাবণ মাস ধরিয়া বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল পঠিত হয়, এই পঠনের অভিজ্ঞতা আমার প্রত্যক্ষ। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরে একটি সংক্ষিপ্ত নিদ্রার অন্তে বয়স্কা মহিলাগণ মনসামঙ্গলের পুঁথি লইয়া বসিতেন; তাঁহারা পয়ার এবং ত্রিপদী ছন্দকে বহুরকমের সুর দিয়া দিয়া পড়িতেন (কখনও কখনও পুরুষেরাও যোগ দিতেন), আমরা একটি আনাড়ি বাল-খিল্যের দল তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া বসিতাম বিভিন্ন রকমের ধুয়া টানিবার জন্য। সত্যনারায়ণের পাঁচালী পড়িতে দেখিয়াছি পুরুষগণকে, প্রথম হইতে শেষ অবধি রীতিমতন সুর করিয়া গান। রামায়ণ-মহাভারত আসরে গীত হইবারই রীতি ছিল। আমাদের ছেলেবেলাতেও আমরা যেখানে রামায়ণ-মহাভারত পঠিত হইতে দেখিয়াছি, সেখানে রীতিমত সুর করিয়া পড়িতে দেখিয়াছি। পয়ার ও ত্রিপদীকে আমরা তানপ্রধান ছন্দ বলিয়া থাকি। আজ আমরা পয়ার-ত্রিপদীকে যেভাবে করিয়া পড়িতে শিখিয়াছি তাহার মধ্যে তান-মান কিছুই নাই, যত দিন যাইতেছে ততই তাহা কাটাছাটা একটা টেরে-টক্কার ছন্দে পর্যবসিত হইতেছে। কিন্তু কয়েকদিন পূর্বেও মনে আছে, আমার ভগ্নী আমার মাকে রামায়ণ পড়িয়া শুনাইতেছিল। সে-খুব স্পষ্ট উচ্চারণেই পড়িতেছিল, কিন্তু আমার মা বারবারই প্রতিবাদ জানাইয়া বলিতেছিলেন, 'কবিতা পড়তে হয় তো কবিতার মতন ক'রে পড়, অমন ছাই-ভস্ম ক'রে পড়ছিস্ কেন?' কবিতার মতন পড়ার অর্থ তাঁহাদের মতে বেশ সুর করিয়া পড়া।

ঊনিশ শতকের পূর্বপর্যন্ত আমাদের কবিতা ও সংগীত পরস্পর-বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র দুইটি জাতিরূপে দেখা দেয় নাই। পূর্বেই বলিয়াছি, এই বিচ্ছেদ প্রথম স্পষ্ট হইয়া উঠিল ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায়; পয়ার-লাচাড়ীর অতিমাত্রায় সঙ্গীতাশ্রয়িত্বের বিরুদ্ধে প্রথম প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন মধুসূদন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথে আসিয়া আবার দেখা গেল, তিনি পৃথকভাবে সহস্র সহস্র গান রচনা করিলেও কবিতার মধ্যে যে বিচিত্র নিখুঁত ছন্দ ব্যবহার করিলেন তাহা কবিতাকে বিচিত্র সূক্ষ্মতায় সঙ্গীতাশ্রয়ী করিয়া তুলিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ মুক্তক ছন্দও রচনা করিয়াছেন, অমিত্রাক্ষর ছন্দ বেশী ব্যবহার না করিলেও অমিত্রাক্ষর ছন্দ বহু ব্যবহার করিয়াছেন, ছড়ার ছন্দকেও প্রবহমাণ করিয়া চলতি ভাষার রীতিতে কবিতা রচনা করিয়াছেন, সর্বোপরি তিনি করিয়াছেন সর্বপ্রথম এবং সর্বাধিক গদ্যছন্দের ব্যবহার; তথাপি রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্য-কবিতা পড়িয়া ফলশ্রুতিতে মনে এই কথাই জাগিয়া ওঠে যে, রবীন্দ্রনাথ সুরের রাজা, তাঁহার হাজার হাজার গানের ভিতর দিয়াও—তথা তাঁহার কবিতার ভিতর দিয়াও।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় এই যে ছন্দের সুরধর্মিতা রবীন্দ্রানুসারী সত্যেন্দ্রনাথ কবিতার এই দিকটাকেই অত্যন্ত করিয়া তুলিলেন। রবিমণ্ডলস্থিত অন্যান্য কবিগণের ভিতরে ছন্দের এই সুরধর্মিতার অনুবর্তন দেখা দিল। কবি কালিদাস রায়ের 'নন্দপুর চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার' কবিতা কিছু দিন পূর্বপর্যন্ত অনেক লোকেরই মুখে মুখে শোনা যাইত।

বিশ শতকের উত্তর-তিরিশের কোঠায় নূতন যে কবিদলকে দেখা গেল তাঁহারা কবিতার এই জাতীয় একটা সমমাত্রিক সমপার্বিক এবং অত্যন্তভাবে সহজগ্রাহ্য সুরধর্মিতার বিরুদ্ধে তীব্র মানসিক প্রতিক্রিয়া লইয়াই কলম ধরিয়াছিলেন। একদিকে এই কবিগণ যে জীবনের মধ্যে নিজদিগকে প্রক্ষিপ্ত দেখিতে পাইলেন তাহার বিপর্যস্ত অসৌষম্য ও সুরহীনতা, অন্যদিকে যুদ্ধোত্তর পাশ্চাত্য কবিতার (বিশেষ করিয়া ইংরেজী ও ফরাসী) সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও তৎপ্রতি আনুগত্যবশতঃ গভীর প্রভাব, তাহার সহিত তৎকালপ্রচলিত কবিতার স্বপ্নালু সুরধর্মিতার বিরুদ্ধে চিত্তের একটা তীব্র প্রতিক্রিয়া—এই সব মিলিয়া নবাগতগণের ছন্দোব্যবহার রীতিকে দিন দিন অন্য পথে চালিত করিতে লাগিল। তাহা ছাড়া আর একটা কথা উত্তর-তিরিশের আধুনিক কবিগণ সকলেই অকপটে স্বীকার করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের সর্বাতিশায়ী প্রভাবকে অতিক্রম করিয়া উঠিবার একটা আগ্রহ সকলের মধ্যেই দুর্বার হইয়া উঠিয়াছিল; রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কাটাইয়া উঠিতে হইলে তিনি একটি বিশেষ জাতীয় ভাষা ছন্দ ও মিলের যে মোহজাল বিস্তার করিয়া বসিয়াছিলেন তাহা হইতে নিজেদের ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা নবাগতগণের সকলকেই করিতে হইয়াছে।

একটা তথ্য স্মরণ রাখিতে হইবে। প্রথম দিকে বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাস, সুধীন দত্ত, বিষ্ণু দে প্রভৃতি কিন্তু একেবারে ছন্দোহীন নন; প্রতিক্রিয়াটা প্রথম প্রথম বেশী দেখা দিয়াছে মিলের প্রতি অবজ্ঞায় এবং 'কাব্যিক ভাষা' পরিবর্জনে। গদ্যছন্দের প্রতি ঝোঁকটা ক্রমান্বয় বাড়িয়াছে, হয়ত সেখানে সাহস পাওয়া গিয়াছে রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতেই। অমিত পর্বের ব্যবহার, পঙক্তি-বিন্যাসের এবং স্তবক-বিন্যাসের ক্ষেত্রে অমিত স্বাধীনতা—এগুলি অল্পদিনের মধ্যেই লক্ষণীয়রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এইগুলিকে অবলম্বন করিয়া এই কবিগণের মধ্যে একটা দৃঢ় মনোবৃত্তি গড়িয়া উঠিল যে, প্রথাবদ্ধ অতিপেলব এবং ঝিমধরানো কাব্যিক ভাষার সঙ্গে সুরলা ছন্দের যে মিশ্রণ—ওটা নেহাৎ একটা মধ্যযুগীয়তা, বিংশ-শতকীয় জীবনলোড়নে জাত কবিতার সহিত তাহার কোন সংগতি নাই—যোগ নাই। অন্যদিকে যে প্রাত্যহিক কথ্য ভাষা যথেষ্ট সঙ্গীতময় এবং সঙ্কেতময় নয় বলিয়া কাব্য-কবিতার ক্ষেত্রে অপাঙক্তেয় রূপে পরিহার্য ছিল নূতন কবিগণ তাহারে মধ্যেই ভাষার যথার্থ শক্তির সন্ধান পাইলেন; তাঁহারা বলিলেন, আধুনিক জীবনের মধ্যে যে অস্থিরতা তীব্রতা এবং ক্ষিপ্রতা রহিয়াছে তাহাকে ঠিক ঠিক ভাবে প্রকাশ করিবার ক্ষমতা একমাত্র কথ্য ভাষার মধ্যে এবং কথ্য বচন-রীতির মধ্যেই রহিয়াছে; ইঁহারা তাই কথ্য ভাষাকে এবং বচনরীতিকেই কবিতার মধ্যে যথা-সম্ভব প্রয়োগের পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন।

॥ ৪ ॥

কথ্য ভাষা এবং কথ্য বচন-রীতিকেও কবিতায় প্রধান করিয়া স্থান দিবার ফলে সুরের সহিত কবিতার বিচ্ছেদ আরও পূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আপনাদের কিছু কিছু তথ্যের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আধুনিক বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে কবিতার সঙ্গে সুরের বিচ্ছেদ যেরূপ তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে এবং সে বিচ্ছেদকে আধুনিকগণ যেভাবে, শুধু ঐতিহাসিক সত্য রূপে নয়, একান্ত বাঞ্ছনীয় সত্য রূপেই গ্রহণ করিতে সমুৎসুক, ভারতবর্ষের অন্যত্র কোথাও কিন্তু তেমন নয়। হিন্দী কবিতার মধ্যে এখন আধুনিক ইউরোপীয় কবিতার এবং আধুনিক বাংলা কবিতার রূপবিবর্তনের অনুরূপ রূপবিবর্তন দেখা দিতেছে, তথাপি বৃহত্তর জনসমাজে—এমন কি শিক্ষিত জনসমাজে স্বীকৃত এবং আদৃত কবিতা রীতিমত সুরাশ্রিত। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে—প্রগতিশীল ছাত্র-সমাজের মধ্যে আজকার দিনে কোনো কবি-সম্মেলন হইলে কবিতাগুলি সুরসংযোগে প্রায় গানের মতন পরিবেশন করিবারই রীতি। ডঃ বচ্চন আধুনিক হিন্দী কবিগণের মধ্যে একজন জনপ্রিয় কবি; তিনি নেহাৎ গতানুগতিক রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের প্রতিভূমাত্র নহেন; তিনি ইংরেজি-সাহিত্যের গবেষণা করিয়াই উচ্চ উপাধি লাভ করিয়াছেন; সুধীসমাজে তাঁহাকে তাঁহার নিজের কবিতা যখন পাঠ করিতে দেখিয়াছি তখন সুরসংযোগে রীতিমতন গান করিয়াই পরিবেশন করিতে দেখিয়াছি। উর্দুর ক্ষেত্রে এই জিনিসটি আরও অনেক বেশি। উর্দুর কিছু কিছু কবি-সম্মেলনে যোগ দিয়া দেখিয়াছি, সেখানে সুর ব্যতীত কবিতাপাঠের কোন রীতিই নাই। পাঞ্জাবী কবিতাও সুরসংযোগেই পরিবেশিত হয়। কিছু দিন পূর্বে একটি সর্বভারতীয় সাহিত্য-সম্মেলনে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, দক্ষিণ-ভারতের কবিগণের মধ্যেও প্রচলিত এই রীতি। একজন কন্নড়-কবি—যিনি সাহিত্য একাডেমির পুরস্কার লাভ করিয়াছেন—তাঁহাকে আমরা তাঁহার স্বরচিত একটি কবিতা আমাদিগকে পাঠ করিয়া শুনাইতে বলাতেই দেখিলাম তিনি দিব্য সুর দিয়া সঙ্গীতের ন্যায় তাঁহার কবিতাটি আমাদিগকে শুনাইতে লাগিলেন।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, আমাদের মধ্যে যাঁহারা কবিতার ক্ষেত্রে নববিধান-পন্থী তাঁহারা যেখানে আজকালের দিনেও অমনতর সুর করিয়া কবিতা-আবৃত্তি দ্বারা কবি-সম্মেলনের অনুষ্ঠান [illegible] তাঁহাদের সম্বন্ধে মুখ বাঁকা করিয়া সদয়ভাব প্রকাশপূর্বক বলিবেন, উঁহারা এখনও মধ্যযুগে বাস করে, [illegible] কবিতার রুচি উঁহাদের মধ্যে গড়িয়া উঠিতে এখনও আরও পাক্কা দুই শত বৎসর দেরী। কিন্তু প্রতিবাদে বলা যাইতে পারে, আধুনিক বাংলা কবিতা অতি উচ্চ মান লইয়া একটি অতি উচ্চ এবং পরিশীলিতচিত্ত অতিক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিয়াছে, দেশের জনসাধারণ ত দূরের কথা, উচ্চকোটির শিক্ষিত সংস্কৃতিসম্পন্ন সমাজের সহিতও ইহার কোন নিবিড় যোগ নাই। বিবিধ উপলক্ষে কবি-সম্মেলনের একটা রেওয়াজ এখন আমাদের মধ্যেও চালু হইয়া উঠিয়াছে, তাহার কোনও অনুষ্ঠানেই কোনও উৎসাহ উদ্দীপনা নাই এমন কথা বলিব না; কিন্তু সে উৎসাহ অধিকাংশ স্থলেই ছাত্র-সম্প্রদায় বা শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে কবিতা সম্বন্ধে এবং দেশের কবিগণকে একত্রে সম্মিলিত করা বিষয়ে সাধারণ উৎসাহ-উদ্দীপনা, কিন্তু দীর্ঘকালের কবিতা-পাঠ শ্রোতৃমণ্ডলীর ভিতরে সত্যকারের একটা সাড়া জাগাইয়া তুলিতে পারিয়াছে আমি তেমনটা বেশি লক্ষ্য করিতে পারি নাই। অতি-মুষ্টিমেয় শ্রোতা ব্যতীত বাকি বৃহত্তর অংশের এক অংশকে দেখিয়াছি একটা বিদ্রূপাত্মক-মনোভাবসম্পন্ন, অপর অংশটিকে দেখিয়াছি উদাসীন—একটা নিষ্ক্রিয় উপস্থিতি দ্বারা তাঁহারা শ্রোতার সংখ্যাটিকে বাড়াইয়া তোলা ছাড়া আর কিছুই করেন না। কবিগণের মধ্যেও কাহাকে কাহাকে দেখিয়াছি, নিজের কবিতাপাঠের অন্তে

কেমন একটা বিরূপতা বা অসহিষ্ণুতা লইয়া সরিয়া পড়িতে। আমার অভিজ্ঞতায় যাহা দেখিয়াছি তাহাতে বরঞ্চ মনে হইয়াছে, আধুনিক কবিতার এই জাতীয় কবি-সম্মেলন না হইয়া আধুনিক কবিতায় যথার্থ প্রবেশ আছে এবং এ-বিষয়ে যথার্থ শ্রদ্ধাশীল কোনও ব্যক্তি যদি আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টান্ত-স্বরূপ আধুনিক কবিগণের কবিতা হইতে মাঝে মাঝে আবৃত্তি করিয়া শোনান তবে তাহা শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে অধিক সাড়া জাগাইয়া তোলে।

হিন্দী-উর্দু কবি-সম্মেলনের ক্ষেত্রে কিন্তু তাহা নয়; সেখানে বিপুল শ্রোতৃ-সমাবেশ দেখিয়াছি, এবং শ্রোতৃমণ্ডলীর স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কবিতাপাঠ হইতে দেখিয়াছি। উর্দু 'মুশয়রা'র (কবি-সম্মেলন) মত প্রাণবন্ত অনুষ্ঠান খুব কম দেখিয়াছি। সমাজজীবনের বিভিন্ন স্তরের লোক সেখানে সাগ্রহে সমাগত হন, এবং তাঁহারা বিপুল উৎসাহ-উত্তেজনার ভিতর দিয়া কবিগণের ভাব ভাবনা ভঙ্গি সুর—সমস্ত জিনিসের অংশীদার হইয়া উঠিতে থাকেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁহারা পরমোল্লাসে কবির পর কবিকে স্বাগত জানান। হৃদয়ের সংবাদ সেখানে আধুনিকগণের ভাষায়ই 'অত্যন্ত-ভাবে সোচ্চার'। ইহা হইতে স্বাভাবিক-ভাবেই কেহ কেহ একটা অভিমত গড়িয়া লইতে পারেন যে, যাঁহারা আজকারের দিনেও কবিতাকে সহজগ্রাহ্য ভাবে ছন্দে সুরে এমনভাবে প্রাণবন্ত করিয়া রাখিতে পারিতেছেন কবিকুলে তাঁহারাই ধন্য, অপরেরা আপন আপন অতিসংকীর্ণ কোটরের মধ্যে ধিক্কৃত।

কিন্তু আমার মনে হইতেছে, আমাদের আধুনিক কবিগণ ঐ সব 'মুশয়রা'-ওয়ালাগণকে ডাকিয়া বলিবেন, তোমাদের ঐ অনির্বাচিত বিমিশ্র জনসংঘট্ট কবিতার নামে উন্মাদনা-উত্তেজনা আমাদের একটা মানসিক বিবমিষার উদ্রেক করিতেছে; আমাদের কবিতা ঠিক এত স্তরের এত লোকের জন্য নয়, রসাস্বাদনের নামে ঐ-জাতীয় একটা উত্তেজনাময় চিত্ত-স্পন্দনের জন্যও নয়,—আমাদের কবিতা সুনির্বাচিত সুগঠিতচিত্ত সুসংহত সূক্ষ্মজটিল-আকার-ইঙ্গিতজ্ঞ বিশেষ শ্রেণীর সামাজিকের জন্য। এ-সব কথা তাঁহারা যদি একান্ত উৎকলিকাজাত উন্নাসিকতা-সহকারে বলিতেন আমরাও তাহা হইলে ক্ষেপিয়া উঠিবার একটা সহজ সুযোগ পাইতাম। কিন্তু আমার বিশ্বাস তাঁহারা এ-কথা বলিবেন একটা নবগঠিত মানসধর্ম হইতে, সে মানস-ধর্মের সততায় আমার কোনও অবিশ্বাস নাই। আমার বিশ্বাস এখানে মানসধর্মের বিভিন্নতা কবিতা সম্বন্ধে মৌলিক বাসনাই পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছে। যেখানে আধুনিক কবিতাকে ভাল লাগিতেছে না—গ্রহণ করিতে পারিতেছি না—কেবলমাত্র ও-বিষয়ে একটা আক্ষেপ-হীন সার্বিক বিরূপতার জন্য নহে—সততার সঙ্গে চেষ্টা করিয়াও বিফল হইতেছি—সেখানে বুঝিয়া লইতে হইবে, কবিতা-বিষয়ে মৌলিক বাসনাতেই হয় আমি কবিগণ হইতে অনেকখানি পৃথক হইয়া পড়িয়াছি, না-হয় আমা হইতে কবিগণ অনেকখানি পৃথক হইয়া পড়িয়াছেন।

॥ ৫ ॥

কবিতার ক্ষেত্রে সুর বর্জন করিয়া কবিতাকে যথাসম্ভব কথা-রীতির কাছা-কাছি টানিয়া লইবার চেষ্টা আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রে অন্যদিক হইতেও হানিকর হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। আধুনিক কবিতা এখন আর কেহ মুখস্থ করে না। ভাল কবিতা হইলে তাহাকে মুখস্থ করিয়া রাখিবার একটা রেওয়াজ ছিল; আধুনিক ভাল কবিতাও তেমন কাহারও মুখস্থ আছে বলিয়া জানা নাই, যাঁহারা আধুনিক কবিতার অত্যন্তভাবে অনুরাগী তাঁহাদেরও নয়। আবৃত্তি করিতে হইলে বই ছাড়া কোথাও চলে না, চলিলেও জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন', সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'উটপাখী', বুদ্ধদেব বসুর 'বন্দীর বন্দনা', বিষ্ণু দে'র 'ঘোড়সওয়ার' প্রভৃতি খুব অল্প কয়েকটা কবিতা চলে, যেগুলি ঠিক ছন্দ-মিল-বর্জিত নয়।

কিন্তু এ অভিযোগও আধুনিক কবিগণের মনে খুব একটা কিছু আঘাত হইয়া দেখা দিবে বলিয়া মনে হয় না। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'ঝর্ণা ঝর্ণা সুন্দরী ঝর্ণা' কবিতাটিকে যে আগ্রহ লইয়া বহু লোকে কণ্ঠস্থ করে এবং আবৃত্তি করে সেই জাতীয় কোনও আগ্রহ লইয়া লোক তাঁহাদের কবিতা মুখস্থ করুক আবৃত্তি করুক ইহা আধুনিক কবিগণ কর্তৃক খুব একটা অভীপ্সিত এবং প্রত্যাশিত বলিয়া মনে হয় না। তাহা অপেক্ষা বহু-মাননীয় বলিয়া তাঁহারা মনে করিবেন কোনও সাগ্রহ ক্ষমাশীল মননের তীব্রতা ও সতর্কতাকে। এ-ক্ষেত্রেও পাঠকের নিকটে কবির প্রত্যাশায় প্রাচীনপন্থীগণের সহিত অনেকখানি ভেদ ঘটিয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

অবশ্য একটা জিনিস বহুদিন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। আধুনিক কবিগণ পরিপন্থী হইয়াছেন সুরেলা আমেজের সঙ্গে তন্দ্রালুতা এবং স্বপ্না-লুতারও, নিজেদের কাছে এবং পাঠকের কাছে তাঁহারা চাহেন সদা-সচকিত মন। কাব্যালুতা জিনিসটাকে তাঁহারা ঐ তন্দ্রালুতা এবং স্বপ্নালুতারই রকমফের মনে করিয়া তাহাকে সর্বথা পরিবর্জনীয় বলিয়া অভিমত এবং সংকল্প গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা স্বরা যুগের কাব্যালুতা উবিয়া যায় নাই, আমার সন্দেহ, একটি বিশেষ গোষ্ঠীর ভিতরে তাড়া খাইয়া খাইয়া সেই কাব্যালুতা স্থান করিয়া লইয়াছে একটি বৃহৎ ব্যাপক গোষ্ঠীর মধ্যে 'আধুনিক সংগীতে'র পক্ষপুটের আড়ালে। চৈতী সাঁঝে বা রাতে বা নিশীথে 'ঝিরি ঝিরি' হাওয়ার মধ্যে 'ফিরি ফিরি' আসিয়া 'হিয়া'র সঙ্গে 'পিয়া'র কোন প্রকারের মিলন একটা এলেকায় একেবারে নিষিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে; তাহার সঙ্গে এই জাতীয় মিলনের ফলে জাত কোনও প্রকার 'দুরু দুরু গুরু গুরু উড়ু উড়ু ধুরু ধুরু' প্রভৃতি জাতীয় ভাববিকারের উপরে রীতিমত কণ্ট্রোলের ব্যবস্থা বিধেয় বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে; কোথাও আল-গোছে 'গেনু' আর সঙ্গে সঙ্গে আচমকা কিছু 'পেনু'—এ-জাতীয় সকল সম্ভাবনা অশ্রদ্ধেয় বলিয়া শতধা কীর্তিত। সেই 'আধুনিক কবিতা'র এলাকার পাশাপাশি ভাবিয়া দেখুন 'আধুনিক গানে'র বিস্তৃত এলাকার কথা। কি মনে হইবে? 'আধুনিক গান' কি বৃহত্তর সমাজ-জীবনের মধ্যে 'আধুনিক কবিতা'র একটা পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া? সেখানে যে চাঁদে জ্যোৎস্নায় পিয়ালকুঞ্জে ঝর্ণাধারে চৈত-রাতের দখিন হাওয়ার ঝিরি ঝিরিতে বা শাওন রাতের গুরু গুরুতে এনু গেনু পেনু বেণু এবং হিয়া পিয়া দিয়া নিয়া—সে-কি এক কাণ্ড ঘটিতে আরম্ভ হইয়াছে! অত্যাশ্চর্যের কথা এই, ইহার মধ্যে আবার যে যত বেশি আধুনিক তাহার ভিতরে ঘটিতেছে তত এই সব ঘটনার মাত্রাধিক্য! জানি আধুনিক গানের উৎসস্থল সিনেমা; সেখান হইতে জাত, সেখানে জীবিত,—কিন্তু সেখান হইতে বিজয়গর্বে প্রধাত হইতেছে বৃহৎ সমাজ-জীবনের মধ্যে—এবং সেখানে গিয়া যে রীতিমত অভিসংবেশ লাভ করিতেছে। মুখ্যতঃ সিনেমার পরিবেশে এবং প্রয়োজনে জাত এবং বিবর্ধিত বলিয়া এগুলি ত অপাঙ্‌ক্তেয় নয়, বহু-প্রচলিত এবং সংবর্ধিত। মনে থাকিয়া থাকিয়া কেবল একটা কথা উঁকিঝুঁকি মারে—ইহা বৃহত্তর সমাজ-জীবনের মধ্যে কোনও রূপ একটা প্রকৃতির প্রতিশোধ নয় ত?

কিন্তু আধুনিক কবিগণ বলিবেন, প্রকৃতির প্রতিশোধ যদি হয়ই বা তবে করণীয় কি? যেখানে কঠোর সংযম সেইখানেই প্রকৃতি প্রতিশোধ লইতে চায়; কবিতার ক্ষেত্রে কঠোর কলা-সংযম সমাজ-প্রকৃতিতে হয়ত অন্যদিক দিয়া প্রতিশোধে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছে; সেই প্রতিশোধের ভয়ে সংযমের কঠোরতাকে শিথিল করিয়া দেওয়া শ্রদ্ধেয় কাজ হইবে কি? পাঠক-সমাজ যদি আমাদের স্তরে উঠিয়া আসিতে না পারে, তাহাদের জন্য আমরা অতখানি নীচে নামিয়া যাইতে প্রস্তুত নই। এই দৃঢ় মনোবৃত্তির মধ্যে একদিকে একটা শ্রদ্ধেয় আদর্শনিষ্ঠা সূচিত হয় এ-কথা যেমন অস্বীকার করা যায় না তেমনি প্রতিপক্ষ হয়ত আবার দুইটি সত্যের দিকে কবিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেন; প্রথমতঃ তাঁহারা বলিবেন, সংযমের কঠোরতার বিরুদ্ধে প্রকৃতি তখনই প্রতিশোধ লইতে চায় যখন সংযম জীবনের অন্যান্য সকল দিকের সঙ্গে একটা স্বাস্থ্যপূর্ণ সঙ্গতি রক্ষা করিতে না পারে, আধুনিক কবিতা সম্ভবতঃ এই স্বাস্থ্যপূর্ণ সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারে নাই। দ্বিতীয় কথা, সমাজ-জীবনকে একান্ত অযোগ্য বলিয়া ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া বা পাশ কাটাইয়া গিয়া সমাজ-জীবন হইতে একান্তভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবার কোনও অধিকারও কোনও কবির নাই, কারণ, কবিতা মূলতঃ একটা সামাজিক কর্ম।

আধুনিক কবিগণের রবীন্দ্রধর্ম অতিক্রমের সার্বজনীন চেষ্টার কথা সকলেই জানি। রবীন্দ্রনাথের সর্ববিধ লেখার মধ্যেই বহুস্থলে একটি বিশেষ প্রবণতা লাভ করিয়াছে—তাহা হইল বিশুদ্ধ প্রাণরসকে আস্বাদ করিবার চেষ্টা। এই বিশুদ্ধ প্রাণরসই যেন বিশুদ্ধ ভাবরস। বিশুদ্ধ প্রাণরস শব্দের অর্থ হইল মনন হইতে বিমুক্ত করিয়া প্রাণস্পন্দনের নিবিড় অনুভূতি—এ অনুভূতি কোনও চৈতসিক বস্তু নয়—ইহা সত্তার ভিতরে অনুভূতি। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার একটি লেখায় বনের গাছগুলিকে অবলম্বন করিয়া বলিয়াছেন, "কোনো কৌতুকপ্রিয় শিশু-দেবতা যদি দুষ্টামি করিয়া ঐ অতো গাছটির মাঝখানে কেবল একটি ফোঁটা মন ফেলিয়া দেয়! তবে ঐ সরস শ্যামল দারু-জীবনের মধ্যে কী এক বিষম উপদ্রব বাধিয়া যায়!" রবীন্দ্রনাথের ভয় ছিল প্রাণ-লীলা যদি শেষপর্যন্ত মনের দ্বারা আক্রান্ত হয়। রবীন্দ্রনাথও অবশ্য প্রাণ-লীলার উপরে চৈতন্যের অনন্ত মহিমার কথা বলিয়াছেন; এখানে যে মনের কথা বলা হইল তাহা সেই অনুভূতিঘন চৈতন্য নয়, এ মন তর্ক-সংশয়চ্ছন্ন বুদ্ধি-প্রক্রিয়ার কর্তা। মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর মানব-জীবনে সেই জিনিসটিই ঘটিয়া গিয়াছে, কোন দেব-শিশু নয়, ইতিহাসের আবর্তে জাত এক শয়তান-শিশু আসিয়া মানুষের প্রাণ-রসের সবল অস্থিতে সন্ধিতে চিন্তাবিষ মিশাইয়া দিয়াছে; ফলে শুধু অমৃত-আস্বাদনের উপায় নাই, সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে বিষ-জারণ মন্ত্রের, সে কাজের দায়িত্ব অগ্রসর হইয়া নিজেদের স্কন্ধে গ্রহণ করিতে হইয়াছে আধুনিক কবিগণকে। যাহারা আঁৎকাইয়া উঠিয়া চিৎকার করিতেছি, এ কি অঘটন—কবিতার নামে এ কি ভূতের মন্ত্র!—তাঁহাদিগকে ডাকিয়া আধুনিক কবিগণ বলিবেন, তুমি জীবনকে দেখিয়াছ প্রথা-বদ্ধ সংস্কারের চোখে—আধুনিক জীবনের প্রাণরসের মধ্যে সঞ্চারিত বিষক্রিয়াকে বুঝিবার মত হয় তোমার বোধশক্তি নাই—না হয় তুমি বুঝিয়া শুনিয়াও তোমার যত শক্তি আছে সকল প্রয়োগ করিয়া তোমার চোখ দুইটিকে বুজাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছ, কিন্তু—

অন্ধ হ'লে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?

॥ ৬ ॥

যে কথা দিয়া আরম্ভ করিয়াছিলাম সেই কথা দিয়াই শেষ করিতেছি। আমরা মনন-ক্রিয়ার মধ্যে তিনটি জিনিস আছে বলিয়া জানি, অনুভূতি চিন্তা ও চেষ্টা; আধুনিক যুগে মনটা এমনভাবে জোরে জোরে নাড়া খাইয়াছে যে, তাহার ফলে বিশুদ্ধ অনুভূতি বা ইমোশন বলিয়া কোন জিনিস এখন নাই, এ যুগে ইমোশন চিন্তা-চেষ্টার সঙ্গে একেবারে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া গিয়াছে। আমরা হয়ত কবিতায় এখনও কেবল ইমোশন খুঁজিয়া ফিরিতেছি—ইমোশন যে চিন্তা ও তজ্জাত হলাহলের দ্বারা জর্জরিত হইয়া একটা জটিল বিমিশ্র রূপ ধারণ করিতেছে আমরা হয় তাহার সন্ধান জানি না—না হয় জিনিসটা এখনও আমাদের ধাতস্থ নয় বলিয়া তাহাকে আমরা সাদরে গ্রহণ করিতে চাই না। ব্যক্তিজীবনে এমন অনেক সময় দেখিয়াছি যখন মনটা নানা ঘাতপ্রতিঘাতে এমন তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে যে তখন আর কিছুই ভাল লাগে না; এই কিছুই ভাল লাগে না অবস্থায় কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতা লইয়া বসি—বাছিয়া বাছিয়া তাঁহার শৈশব-স্মৃতির কবিতাগুলি পড়ি, তাঁহার লুসি কবিতাগুলি পড়ি—তপ্ত তিক্ত মন আবার স্নিগ্ধ শীতল হইয়া ওঠে। এই প্রসঙ্গে অনেক দিন মনে হইয়াছে, কই, আধুনিক কবিতার মধ্যে এমন কোনও কবিতা ত স্মরণ করিতে পারিতেছি না যাহাকে ঐ সব ক্ষণে আমার মন বাছিয়া লইতে পারে। পরে ভাবিয়া মনে হইয়াছে, ইহা আধুনিক কবিতারই ত্রুটি বা অপূর্ণতাজ্ঞাপক না হইতে পারে। যে বাসনা লইয়া আমি কবিতা পড়িতে চাই এবং কবিতা দ্বারা আমি যে প্রয়োজন সিদ্ধ করাইয়া লইতে চাই সেই বাসনা এবং প্রয়োজন-বোধই অনেকখানি পিছাইয়া-পড়া বাসনা এবং প্রয়োজনবোধ; সেগুলি মেটানো তো ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ এবং রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে দিয়াই চলে। আধুনিক যুগে কবিতাকে লইয়া আরও অনেক নূতন বাসনা অনেক নূতন প্রয়োজনবোধ জাগিয়া উঠিয়াছে, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-রবীন্দ্রনাথকে দিয়া সে-গুলি মেটানো চলে না—তাই প্রয়োজন হইয়াছিল নূতন আদর্শ ও নূতন শিল্প-রীতি লইয়া নূতন কবিকুলের।

একটা যন্ত্রণা, একটা অস্থিরতা, একটা কেমন অস্পষ্ট আতঙ্ক।

সব কিছু একসঙ্গে মিলিয়ে বিমূঢ় আচ্ছন্নতার মধ্যে কোথা থেকে তীব্র একটা উৎকণ্ঠার ঢেউ-এর পরে ঢেউ।

কয়েক মুহূর্ত এইভাবে যাবার পর তন্দ্রাটা চট্ করে ভেঙে গেল। ভেঙে চুরমার হয়ে গেল বলা-ই উচিত।

অন্ধকার ঘরটাই যেন তীব্র ঝণৎকারে আর্তনাদ করছে।

ব্যাপারটা ভয়াবহ কিছু নয় যদিও। ঘোরটা কেটে যেতেই বুঝলাম, ফোন বাজছে।

এত রাত্রে ফোন বাজা মানেই অবশ্য একটা দুঃসহ উপদ্রব। টেবিলের ওপর রাখা হাত-ঘড়িটায় দেখলাম রাত প্রায় সাড়ে বারোটা।

অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে আচমকা ঘুম ভাঙার জড়তা নিয়ে ফোনটা তুলে একটু রুক্ষ স্বরেই বললাম,—হ্যালো......

আর যা বলতে চেয়েছিলাম বলা হ'ল না। আমার কথার মাঝখানেই ওধারের আওয়াজ শোনা গেল,—গলাটা ভার-ভার দেখছি। ঘুমোচ্ছিলে বুঝি?

এমন কথায় হাড়-পিত্তি জ্বলে যায় কি না! রাত্তির একটা বাজতে চলেছে। এমন সময় লোকে ঘুমোয় না ত কি করে! মেজাজটা কোনরমে সামলে জিজ্ঞাসা করলাম,—কিন্তু আপনি কে জানতে পারি? কাকে চাইছেন?

কাকে চাইছি!—ওধার থেকে একটু হাসির শব্দ শোনা গেল,—চাইছি তোমাকে। শ্রীযুক্ত রত্নেশ্বর রায়কে। আর আমি হলাম ইশ্বর ভবতোষ হাজরা, ওরফে ভবা। কেমন হ'ল?

না, হল না। কড়া গলাতেই বলতে গেলাম,—প্রথমতঃ আমি......

নামটা পাল্টেছ! আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ওধারে ভবা বা ভবতোষ যেই হ'ন পূরণ করে বললেন,—তেমন অবস্থায় সকলকেই পাল্টাতে হয়। কিন্তু খোল-নলচে যাই বদলাও আমাকে ত ফাঁকি দিতে পারবে না। আমি যে ইশ্বর ভবতোষ। ইশ্বর বলেই অবশ্য চিনতে পারছ না। শ্রীযুক্ত যখন ছিলাম তখন ভালোই চিনতে। দুবেলা এই অধীনের বাড়িতে ঘণ্টা কয়েক ক'রে না কাটালে ভাত হজম হত' না। তার পর সেই মামলাটার পড়ার পর থেকে অবশ্য ডুব মেরেছ। ডুবে ডুবে রত্নেশ্বর নামটাও ধুয়ে মুছে এসেছ। কিন্তু নাম পাল্টেও সেই আগের কারবারই চালাচ্ছ নিশ্চয়?

ঘুমের দফাও রফা হয়েছে। এই বাতুলকে শক্ত দুটো কথা শুনিয়ে দিতে গিয়ে হঠাৎ মুখের রাশ টানলাম।

হেসে বললাম,—না ভাই। একবার নাম পাল্টালে কারবারও পাল্টাতে হয়। আমদানি রপ্তানি ছেড়ে এখন কারখানা খুলেছি। বন্ধুত্বের খাতিরে, এ কারবার আর তোমায় ডোবাতে দেব না।

একটু থেমে আবার বললাম—

কিন্তু তুমি কি করছ এখন? চৌধুরীদের যে বাড়িটায় ছিলে সেটাত' দেনার দায়ে নিলেম করিয়ে ছেড়েছ সেই কবে! নিজের বুদ্ধির দোষে কি সুবিধেটাই খোয়ালে বলো ত! পরের ধনে পোদ্দারী করছিলে, তার ওপর কলকাতা শহরে খাওয়া-পরা থাকার ভাবনাটাও ঘুচেছিল। কিন্তু সে সুখ তোমার সইল না। তা এখন আবার কার স্কন্ধে ভর করেছ? চৌধুরীর হাবাগোবা সেই ভাইপোটার? সেই যে, ভালমানুষ পেয়ে বকিয়ে যার মাথায় হাত বোলাতে' কি নাম যেন গণেশ হ্যাঁ হ্যাঁ গণেশই ত!

ওপারে কয়েক সেকেন্ড কোন সাড়া-শব্দ নেই।

টেলিফোনটা নামাতে যাচ্ছি এমন সময় কানের পর্দা কাঁপানো একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাসই যেন শোনা গেল।

দীর্ঘনিঃশ্বাসের পর তারই সঙ্গে সুর মেলানো হতাশ কণ্ঠ,—গণেশ আর নেই।

গণেশ নেই,—সবিস্ময়ে আমাকেই জিজ্ঞাসা করতে হল,—গেল কোথায়?

মারা গেছে!—আবার একটা দীর্ঘশ্বাস —যদিও মারাই গেছে বলা উচিত নয়।

সামলাতে আমার একটু সময় গেল। তারপর বললাম,—শেষ পর্যন্ত মারাই গেল! তা যাওয়া আর আশ্চর্য কি! কাঁচা বাঁশে যখন ঘুণ ধরিয়েছিলে তখনই জানি সর্বনাশের বেশী দেরী নেই। কিন্তু তাহলে তোমার বেশ মুস্কিল হয়েছে দেখছি। আস্তানা গাড়বার মত একটা জায়গা পাওয়াত আজকাল সোজা নয়।

ওদিক থেকে এবার হাসির শব্দ এল। শুখনো বিরস হাসিই বলা উচিত। তারপর তাচ্ছিল্যভরে জবাব,—আমার আস্তানার জন্যে তোমার কোন ভাবনা নেই। ভুলে যাচ্ছ কেন আমি এখন ঈশ্বর ভবতোষ ওরফে ভবা।

তা ঈশ্বর ভবতোষ, ভবলীলা সাঙ্গ করলে তাহলে!

হ্যাঁ, তাই করতে হ'ল।—ভবতোষের উদাস কন্ঠ,—খবরের কাগজে দেখেছ নিশ্চয়।

না, আমি আবার আইন-আদালতের পৃষ্ঠাটা পড়ি না।

ও! পড়লেই ভয় হয় আবার বুঝি নিজের নামটা দেখতে পাও! সেই মামলার পর থেকেই অরুচি ধরে গেছে, কেমন? তবে আইন-আদালতের পৃষ্ঠায় নয় আমার খবরটা......

থামিয়ে দিয়ে বললাম, তোমার খবরটা কাগজে না পড়েও জানি।

জানো?—ঈশ্বর ভবতোষ যেন একটু বিচলিত।

হ্যাঁ, তোমায় একবার যখন চিনেছি তখন তোমার ভূত-ভবিষ্যৎ জানতে কি আর কিছু বাকি আছে। তা ফন্দিটা ভালোই এঁটেছ।

তুমি এটাকে ফন্দি বলছ!—ভবতোষ ক্ষুণ্ণ কি না ঠিক বোঝা গেল না,—ফন্দিটা কোথায় পাচ্ছ?

ওই ঈশ্বর হওয়াটাই একটা ফন্দি। এক ঢিলে এক-দুই নয়, একেবারে সব পাখি মারা হয়ে গেল। পাওনাদারদেরও ফাঁকি দিলে আবার আণ্ডা-বাচ্চাদেরও একটা গতি হয়ে গেল।

আণ্ডা-বাচ্চা আবার কোথায় হে!—ভবতোষ ক্ষুব্ধ।

ও, তাহলে বানিয়ে বানিয়ে আমাকে ও-সব গল্প শোনাতে! সেই অজ কোন পাড়াগাঁয়ে যাঁকে ফেলে এসে কলকাতায় স্ফূর্তি করতে সেই তোমার স্ত্রী লীলা-দেবী বলেও কেউ নেই বলবে বোধহয় এবার?

তাইত বলতে হচ্ছে। ঈশ্বর হয়ে আর মিথ্যা কথাটা বলি কি করে!

হুঁ, কিন্তু সারা জীবনের অভ্যেসটা কি অত সহজে ছাড়া যায়। সেই কি যেন নাম, ওই যে তোমার গণেশ চৌধুরীরই মাসতুতো বোন হে, পড়াবার নাম করে যার সঙ্গে প্রেম করতে,—হ্যাঁ, হ্যাঁ রেবা, সেই রেবার কাছেও ওই মিথ্যেটা কেন চালাতে এখন অবশ্য বুঝছি।

বুঝছ? ঈশ্বর ভবতোষ যেন খুশি —রেবার কথা তাহলে তোমার মনে পড়ছে!

পড়বে না? নিজের দাম বাড়াতে, কত ভালো ভালো লোকের সঙ্গে তোমার আলাপ দেখাবার জন্যে আমাকে ধরে বেঁধে ও বাড়িতে কি কমবার নিয়ে গেছ! তা ছাড়া ও রকম একটি......

ইচ্ছে করেই ওইটুকু বলে থামলাম। ঈশ্বর ভবতোষ কেমন যেন অস্থির হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—ও রকম একটি কি?

ও রকম একটি—সত্যের খাতিরে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি—কুতকুচ্ছিত চেহারা আমি অন্ততঃ এখনো দেখিনি। ধরি মাছ না ছুঁই পানি কায়দায় নিজের কাজ হাসিল করতে তুমি হতাশ প্রেমিক সাজতে তা কি আর বুঝি না! স্ত্রী থাকতে বিয়ের প্রস্তাবের ভয় নেই অথচ ভালবাসার ভাণ করে যা পাওয়া যায় হাতিয়ে নেওয়ার সুবিধে। তোফা আরামে দিব্যিই ত ছিলে। ল্যোডটা একটু সামলে চললে ও বাড়ি কি নিলামে ওঠে! যাই হোক ঈশ্বর হয়ে একটা সুবিধে ত হয়েছে। ফুটো বৌকে ফেলে যাবার সুযোগ মিলেছে। ওই ট্রেনের 'মাস্থলি'-টাতেই কাজ হল কেমন?

ট্রে-ট্রেনের মান্থলি-তে কা-কাজ হল তুমি বলছ!—ঈশ্বর ভবতোষকে একটু তোৎলা মনে হল।

হ্যাঁ বলছি। আর আমায় বলতে হবে কেন, তুমি জানো না! হৃৎপিণ্ড কাটিয়ে কাটিয়ে গণেশকে ত' তখন সেরে এনেছ! তার চুলের টিকিটি পর্যন্ত বাঁধা পড়েছে। তা তাকে পালাবার পরামর্শ দিয়ে ভালোই করেছিলে। নিরুদ্দেশ হওয়া

ছাড়া তার গতি কি! নিরুদ্দেশ হওয়ার পক্ষে বড় শহরের মত এমন সুবিধের জায়গা আর নেই, আর বড় শহরের মধ্যে বোম্বাই-এর তুলনা হয় না। সেখানে কোট প্যাণ্ট কি পাজামা পাঞ্জাবী পরলে কে কোন মুলুকের চেহারা দেখে চেনে কার সাধ্য।

দম নেবার জন্যে একটু থামতে ঈশ্বর ভবতোষ তাড়া দিলে,—বলো, থামলে কেন?

তার তাড়া দেবার দরকার ছিল না। নিজের উৎসাহেই আমি বলে চললাম,—সেখানেই নাম ভাঁড়িয়ে গণেশ তখন কোন অখন্দে পাড়ায় ঘাপটি মেরে আছে। বুদ্ধি শুদ্ধি গণেশের চিরকালই ভোঁতা। নাম ভাঁড়াতেও তোমার নামটা ছাড়া আর কিছু মাথায় আসে নি। কিংবা তুমিই সে পরামর্শ দিয়েছিলে, কেমন?

তাতে আমার লাভ!—ভবতোষ একটু থতমত খেল কি?

না লাভ না থাক লোকসান ত নেই। তার শেষ পর্যন্ত এই ঈশ্বর হওয়াটে মন্দ কি? গণেশ মাস কয়েক অজ্ঞাতবাস করবার পর তুমি লুকিয়ে তার কাছে গিয়ে হাজির। দরদী বন্ধু সেজেই গেছলে। তবে তার আস্তানায় যাও নি। এখানে সেখানে কখনো চৌপাটিতে কখনো চার্চগেটে দেখা করেছিলে। তুমি যাবার কদিন বাদেই কিন্তু বোরিভাল্লির কাছে সেই দুর্ঘটনা। সকাল বেলা দেখা গেছল লাইনের ধারে একজন যাত্রীর মৃতদেহ পড়ে আছে। অনেক রাত্রে বোরিভিলি থেকে বোম্বাই আসবার শেষ ট্রেনের কোনো কামরা থেকে সে যাত্রী পড়ে গিয়েছিল বলে মনে হয়। কিংবা কেউ ঠেলেও ফেলে দিয়ে থাকতে পারে। বেশী রাত্রে বোম্বাই ফিরতি প্রথম শ্রেণীর কামরাগুলো অনেক সময়ে একেবারে খালি থাকে। যাত্রীর পকেটে মাসিক টিকিটে তার নাম পাওয়া যায়। সে নাম তোমার—ভবতোষ হাজরার। তুমিই ঠেলে দিয়েছিলে না কি কামরা থেকে? কিন্তু ভাবছি তাতে ঈশ্বর হওয়া ছাড়া তোমার অন্য লাভ কি।

লাভ আছে, যথেষ্ট আছে। হ্যাঁ, ঠিক বলেছ কামরা থেকে ঠেলেও দিতে পারি।—ভবতোষ উত্তেজিত।

দিতে পারো মানে?—এবার আমার হতভম্ব হবার পালা,—আবার ঠেলে দেবে কি?

তাই, এইবারই ত দেব। আমি ওই খুন করবার প্ল্যানটাই যে ভাবছিলাম। অনেক ধন্যবাদ। আচ্ছা তোমার মানে আপনার ঠিকানা আর ফোন নম্বরটা বলে দিন ত চট্ করে।

আমার ঠিকানা আর ফোন নম্বর? কেন আমাকেও খুন করবার প্ল্যান আছে নাকি?—আমি স্তম্ভিত।

আরে না না, দরকার আছে। ছাপা হলে আপনাকেই পাঠাবো।

আমাকেই ছাপা হলে পাঠাবেন? কি পাঠাবেন?

কি দেখতেই পাবেন। এখন বলুন চটপট করে ঠিকানাটা। না হয় শুধু ফোন নম্বরটা বলুন।

কিন্তু ফোন নম্বর আবার দেব কি! নম্বর না জানলে ফোন করলেন কি করে?

আপনিও যেমন!—ও দিক থেকে অবজ্ঞার হাসি শোনা গেল,—নম্বর জেনে ফোন করেছি নাকি! আন্দাজে যা পড়েছে তাই ঘুরিয়েছি। ফোনের লটারী বলতে পারেন। রোজ রাত্রেই প্রায় করি আমি।

রোজ করেন! দুপুর রাত্রে ফোনের লটারী! আর তাতে আমারই মাথা বেগার খাটিয়ে নেওয়া! নাঃ, খুনের প্ল্যানটা আমারই দরকার মনে হচ্ছে। আপনার ফোন নম্বরটা.....

ওদিকে খট্ করে ফোনটা নামিয়ে রাখার শব্দ শোনা গেল।

লিপটন
LAOJEE
লাওজী
চা
LIPTON'S
LAOJEE
THE DUST TEA
FOR THE HOTEL
LIPTON'S
LAOJEE
THE DUST TEA
FOR THE HOTEL
লাওজী
চা
LAOJEE
কম দামে
সেরা চা
LLC-6 BEN

ব্যর্থ তপস্যা

সতীনাথ ভাদুড়ী
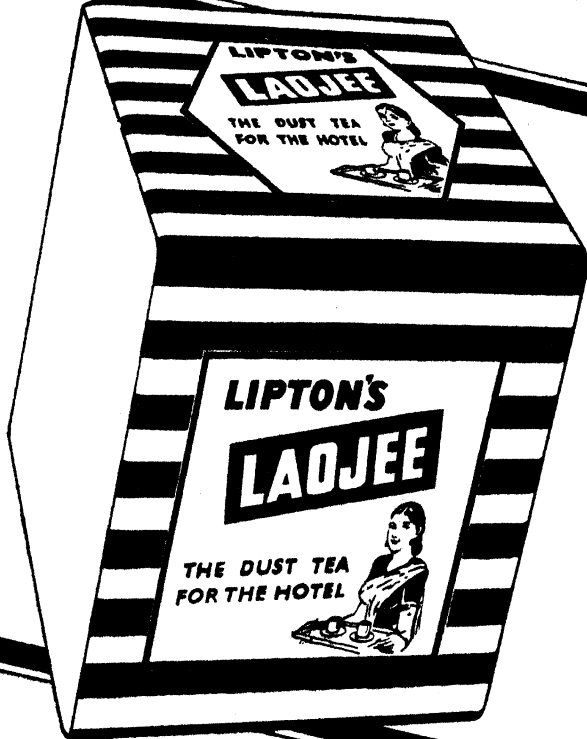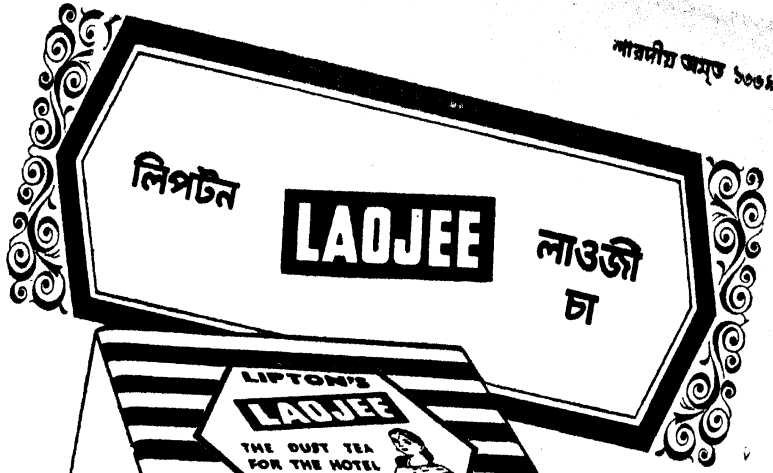
সন্ধ্যাবেলায় পৌঁছলাম ধর্মশালায়। অযোধ্যায় তখন যাত্রীদের বেশ ভিড় চলেছে। ঘর পাওয়া শক্ত। আট আনা বকশিশ পেয়ে ধূর্ত দরোয়ান হুজুরকে যে ঘর দেখিয়ে দিল তাতে একটা মাত্র ছোট গবাক্ষ। মোমবাতি জ্বালিয়ে ভাল করে দেখলাম ঘরটাকে। এ ঘর আর পাশের ঘরের মধ্যে একটা তালাবন্ধ

দরজা। বাতির আলোয় পড়া গেল কপাটের উপর খড়ি দিয়ে লেখা—"এই তালা দেখে যাত্রীরা যেন এ ঘরকে নিরাপদ না মনে করেন। আমি ভুক্ত-ভোগী, আমার সর্বস্ব চুরি গিয়েছে।"

ঠিক বন্ধ আছে কিনা দেখবার জন্য কপাটে খট্‌খট্‌ করে ধাক্কা দিতেই তালাটা খুলে এল।

"একটু আস্তে ভাইয়া! এখানে একজন লোক অসুস্থ।"

মোলায়েম গলা। আমি অপ্রস্তুতের একশেষ। ও ঘরের মধ্যে কোন আলো ছিল না; আমার ঘরের মোমবাতির আলো খানিকটা জায়গায় গিয়ে পড়েছিল মাত্র। এই আবছা আলোয় এক নজরে মনে হল—একজন সন্ন্যাসী উপদ্রুত হয়ে

শুয়ে রয়েছেন; আর একজন গেরুয়াপরা স্ত্রীলোক তাঁর কোমরে সেঁক দিয়ে দিচ্ছেন।

"মাপ করবেন সাধুবাবা।"

"হ্যাঁ সাধু তো ঠিকই; কলিকালের সাধু! শাস্ত্রে বলেছে কলিতে তপস্বীরা হয় গ্রামবাসী; আর সন্ন্যাসীরা হয় অর্থ-লোলুপ। সন্ন্যাসিনঃ অতি অর্থ-লোলুপাঃ।"

ঠিক এক্কাটা আলা কাঁদিনি। শুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ! নিজেকে জোর করে

তুললেন, সে কী আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে? আমি যে চোর আসতে পারে ভেবে দরজার তালা পরীক্ষা করছিলাম। উনি যে কথা বললেন আমার দিকে না তাকিয়ে! আধ্যাত্মিক মার্গে অন্তত খানিকটা অগ্রসর না হলে, এ ক্ষমতা লোকের আসে না। আমি সাধুসঙ্গ করবার জন্য তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াই। হঠাৎ যখন এঁর সাক্ষাৎ পেয়েছি, তখন এ সুযোগ ছাড়া হবে না কিছুতেই।

বলা কথাগুলো! কণ্ঠস্বরের তিক্ততা অনভিজ্ঞ কানেও ধরা পড়ে। এর। চোর-ছ্যাঁচড় হতে পারে না। নিজের তালা দিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম; নিরাপত্তার জন্য নয়, ভদ্রতার খাতিরে।

দরজা বন্ধ করবার পর হঠাৎ খেয়াল হল—উনি যে অর্থলোলুপতার কথা

পরের দিন সকালে গেরুয়াপরা মহিলাটির সঙ্গে দেখা হ'ল ধর্মশালার গেটের বাইরের মুদীর দোকানে। কপালে তিলক, পায়ে খড়ম, নাতিপ্রৌঢ়া, স্বাস্থ্যবতী, খাটো গড়ন।

দুইজনেই চাল ডাল কিনতে গিয়েছি। গায়ে পড়ে তাঁর সঙ্গে কথা আরম্ভ করলাম।

"সাধুবাবা আছেন কেমন?"

"ভোরের দিকে একটু ঘুমিয়েছেন।"

"ও'র অসুখটা কি?"

"কোমর থেকে মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে ঘাড় মাথা পর্যন্ত অসহ্য ব্যথা। হয় ও'র মাঝে মাঝে। হয় আবার সেরে যায় দুই একদিনের মধ্যে।"

দোকানীকে যখন উনি পয়সা দিলেন তখন দেখলাম মহিলাটির হাতে একটা প্রকাণ্ড উল্কি। অশ্বারূঢ় কোন ব্যক্তির ছবি। ব্যক্তি না, কোন দেবতা; কেননা তাঁর মাথার চারিদিকে জ্যোতির্মণ্ডল দেওয়া রয়েছে। দেবতার হাতে খোলা তলোয়ার। তলোয়ারের গায়ে লাল রঙের অগ্নিশিখা আঁকা। ঘোড়া ছুটে চলেছে বায়ুগতিতে।

বহু ভেবেও কিছুতেই মনে করতে পারলাম না ইনি কোন দেবতা।

মহিলাটির সঙ্গে আবার দেখা ধর্ম-শালার রান্নার জায়গায়। আমি ইট সাজাচ্ছি উনুনের জন্য; কাঠ, হাঁড়িকুড়ি নিয়ে তিনি ঢুকলেন। আমার পৈতাটা বোধহয় তাঁর নজরে পড়ল।

"ব্রাহ্মণ?"

"হ্যাঁ"

"চাল না আটা?"

"চাল"

আমি জল আনবার জন্য কলতলার দিকে যাচ্ছি; হঠাৎ চীৎকার করে উঠলেন তিনি। ছুটে গিয়ে দেখি উনি ষাঁড় তাড়াচ্ছেন আমার উনুনের কাছ থেকে।

"শ্রীরামচন্দ্রজীর রাজ্যে কখনও খাবার জিনিস এমন ভাবে ফেলে রেখে যেতে আছে! আমি আজ রুগীর জন্য খিচুড়ি রাঁধব। খিচুড়ি চলে তো দিন না আপনার চাল ডাল আমার কাছে; এক-সঙ্গেই রেঁধে দিই।"

এর থেকেই সাধুবাবার সান্নিধ্যে আসবার সুযোগ পেলাম। কী জ্বলজ্বলে চোখ দুটো! বয়স আশী বছর হবে। গৌরবর্ণ; দীর্ঘকায়; সুন্দর চোখ মুখ। গৈরিক বসন; কিন্তু গলায় যজ্ঞোপবীত। এর থেকে মনে হ'ল যে উনি বোধহয় আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করেননি। পৌরুষ ও দৃঢ়তাব্যঞ্জক চেহারা।

গিয়ে প্রণাম করতেই জিজ্ঞাসা করলেন "ব্রাহ্মণ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"বাড়ী কোথায়?"

"গয়া"

"গয়া!"

বাড়ী গয়ায় শুনে এত আশ্চর্য হলেন কেন বুঝতে পারলাম না।

"বাঙালী?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"

"বাঙালীরা বড় রোগা আর বেঁটে হয়। তুমি তো দেখছি তবু একটু লম্বা আছ।"

"হ্যাঁ"

"মাছ মাংস নিশ্চয়ই খাও।"

"না আমি খাই না।"

"ব'স!"

আমি বসলাম।

"তীর্থযাত্রী?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, বেশীটা তাই; তবে তার সঙ্গে খানিকটা ঘুরে বেড়াবার শখও আছে।"

"বহু জায়গা দেখেছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"

"নেপালে গিয়েছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"

"সেখানে শুনেছি এখনও গোবধ হয়?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"

"নেপালের গরু দেখেছ?"

"ঠিক মনে নাই। দেখে থাকব নিশ্চয়।"

"খুব ছোট হয় শুনেছি? ছাগ প্রায়াসু ধেনুষু?"
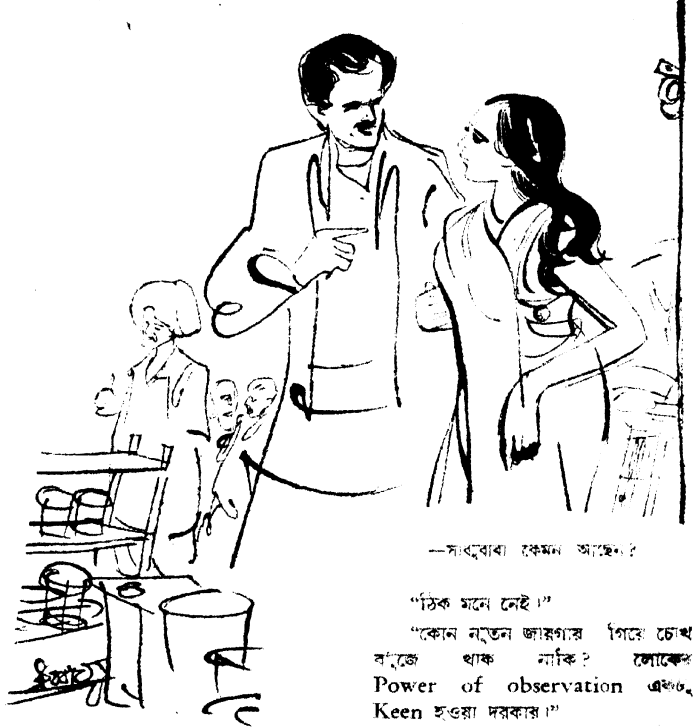
—সাধুবাবা কেমন আছেন?

"ঠিক মনে নেই।"

"কোন নূতন জায়গায় গিয়ে চোখ বুজে থাক নাকি? লোকের Power of observation একটু Keen হওয়া দরকার।"

চটে উঠেছেন বৃদ্ধ। আমার ভক্তি আরও বাড়ল তাঁকে ইংরাজী বলতে শুনে। এই সময় আমার দৃষ্টি গেল তাঁর হাতের দিকে। এ'র হাতেও সেই উল্কি।

দ্রুত ধাবমান অশ্বে আরূঢ় উন্মুক্ত অসিধারী সেই দেবতার ছবি!

সে তো একশবার।"

"পাঞ্জাবের গরুগুলো কিন্তু বেশ বড় বড় হয়।"

"পাঞ্জাবের কোথায় আপনার বাড়ী?"

"বাড়ী ছিল; এখন আর নেই। ১৯৪৭-এর আগে ছিল। গ্রামের নাম ছিল সম্ভল। মণ্টগোমারি জেলা। ওদিকে গিয়েছ নাকি?"

গেরুয়াপরা মহিলাটি এতক্ষণে কথা বললেন—

"বাবুজী, দেখছেন না মাথার যন্ত্রণায় উনি কি রকম কষ্ট পাচ্ছেন এখন।"

অর্থাৎ আপনি এখন উঠুন। কাজেই উঠতে হ'ল।

"কিছু ওষুধ-বিষুধ দরকার হলে......"

"না না, উনি ডাক্তারি ওষুধ খান না।

বৃদ্ধ বললেন "লজ্জাবতী লতার শিকড় কপালে ঘষতে পারলে হ'ত।"

"আচ্ছা,-আমি দেখছি চেষ্টা করে।"

"কাছাকাছি তো আমি খুঁজেছিলাম, পাইনি।"—মহিলাটি বললেন।

অযোধ্যায় তীর্থ করতে এসে দেবদর্শনের আগে লজ্জাবতী লতার শিকড় খুঁজে বেড়ান যে কতদূর হাস্যাস্পদ আচরণ সেকথা তখন খেয়াল ছিল না। একজন উচ্চস্তরের সাধকভক্তের কাছে ঘেঁষবার নেশা অন্য সব কিছুকে ভুলিয়ে দেয়।

লজ্জাবতী লতা সরযূর ধার থেকে আরম্ভ করে সীতাদেবীর মন্দির পর্যন্ত সমস্ত জায়গা চষে ফেলেও কোথাও পাওয়া গেল না। শেষকালে ফয়জাবাদের এক আয়ুর্বেদী গাছগাছড়া-বিক্রেতার কাছ থেকে একটা শুকনো শিকড় পাওয়া গেল। যে কোন গাছের শিকড় চাইলেই বোধ হয় এইটাকেই দিত সে দোকানদার। তবু আমি বর্তে গেলাম, একজন যৌগিক বিভূতিসম্পন্ন মহাত্মার সামান্য একটু কাজে আসতে পেরে।

শিকড়টাকে মহিলাটির হাতে দিতেই তিনি বললেন—"শ্রীমদ্ভাগবতে বলেছে কলির ভেষজে দ্রব্যগুণ কমে যায়। এখন দেখা যাক, শেষাবতারের কৃপায় যদি কিছু হয়।" ভগবানের নাম স্মরণ করে তিনি সেটাকে মাথায় ঠেকিয়ে নিলেন।

কপালে শিকড় ঘষবার জন্য বৃদ্ধ মাথার বাঁধন খুলছেন। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল—"ওঁকে এর দাম দাওনি কেন রুক্মিণী? রামাবতারের জন্মস্থানে এসে বিনা দক্ষিণায় ভেষজ নিয়েছ! কলির স্ত্রীলোক কিনা, তাই আক্কেল নেই, লোভ আছে!" রাগে মুখচোখের চেহারা বদলে গিয়েছে বৃদ্ধের।

রুক্মিণী দেখলাম এসব রাগের ব্যাপারে অভ্যস্ত। ধমকানি খেয়ে একটুও বিচলিত হলেন না তিনি। আমি তখনকার মত সেখান থেকে পালিয়ে বাঁচি। বুঝি যে বৃদ্ধ একটু ছিটগ্রস্ত ও কোপন স্বভাবের লোক। বুড়ো বয়সে অমন একটু হয়েই থাকে সকলের। বহু বড় বড় সন্ন্যাসীরও এ দুর্বলতা আমি দেখেছি। ও'রা কী ভেবে কী করেন, কী বলেন, আমরা সাধারণ মানুষরা সেটা ধরতে না পেরে, ও'দের সম্বন্ধে নানা রকম ভুল ধারণা করে নিই। কেউ না বললেও বৃদ্ধ জানতে পেরেছেন যে রুক্মিণী লজ্জাবতী লতার শিকড়ের দাম দেয়নি। এই কথাটাই আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে হ'ল।

রাত্রিতেও রুক্মিণী আমার ডাল রুটি তয়ের করে দিলেন নিজের রান্নার সংগে। জানতে পারলাম যে বৃদ্ধের মাথার যন্ত্রণা কমে গিয়েছে।

"কলিযুগের ভেষজেও তাহলে দেখছি রোগ সারে।" ভেবেছিলাম এই কথাটা বলে তাঁকে হাসাতে পারব।

রুক্মিণী গম্ভীর হয়ে জবাব দিলেন—"হয় কখন কখন।"

"আপনার কথা শুনে তো আপনাকে পাঞ্জাবের লোক বলে মনে হয় না।"

"আমার বাড়ী মথুরায়। গিয়েছেন নিশ্চয় মথুরায়? দ্বাপরের শ্রীকৃষ্ণাবতারের জন্মস্থান যে। কোন তীর্থকামী কি সেখানে না গিয়ে পারে?"

আমার কৌতূহল হচ্ছিল জানবার জন্য যে বৃদ্ধ তাঁর কে হ'ন। মথুরায় যখন বাড়ী, তখন বৃদ্ধের মেয়ে হতে পারেন না রুক্মিণী। বিবাহের কোন লক্ষণ তাঁর বেশে নেই। তবে?

জিজ্ঞাসা করতে বাধল।

পরের দিন সকালে দেখলাম বৃদ্ধর মেজাজ ভাল রয়েছে। আগের দিনের গল্পের জের টেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"নেপালের কোথায় কোথায় গিয়েছ?"

"কাটমণ্ডু আর পশুপতিনাথ।"

"বল কি! আর কোথাও যাওনি!"

"ওই দুটোই তো নেপালে আসল দেখবার জায়গা।"

"তুমি তো সব জেনে বসে আছ দেখছি!"

চটে উঠেছেন বৃদ্ধ।

"কিছু জানি না বলেই তো আপনার কাছে আসা।"

"আবার বাচালতা! নেপালে গিয়ে একবার কলির প্রথম অবতারের কথা মনে পড়ল না?"

মাথা গুলিয়ে গেল। ঠিক মনে করতে পারলাম না কলির প্রথম অবতার কে; আর কেনই বা নেপালে গিয়ে তাঁর কথা মনে পড়তে বাধা।

"ও। তাই বলো! কলির প্রথম অবতার কে জান না বুঝি? পুরাণে আছে, কলিযুগে বাচালতাই পাণ্ডিত্যের প্রমাণ হবে। তুমি হচ্ছ সেই কলির পণ্ডিত! গায়ে জোর না থাকুক, বুদ্ধিমান বলেই তো জানতাম বাঙ্গালীদের।"

"আজ্ঞে আমি সায়েন্সের গ্রাজুয়েট কিনা, তাই এ সব বিষয়ের জ্ঞান খুব কম।"

"সায়েন্সের গ্রাজুয়েট তো আমিও। তাই বলে নিজেদের শাস্ত্র পড়ব না? অবতারদের সকলকার নাম জান? শ্রীকৃষ্ণাবতারের দেহাবসানে পর থেকেই কলিযুগের আরম্ভ। বুদ্ধদেবই কলিযুগের প্রথম অবতার।"

"জানি; মনে পড়ছিল না।"

চোখ বুজে প্রণাম করে বৃদ্ধ বললেন—"কলির শেষ অবতারের নাম মনে আছে—না সেটাও মনে নেই? তাঁর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবার সময় হয়ে গিয়েছে। কলিযুগ শেষ হ'বার শাস্ত্রোক্ত সব লক্ষণ চারিদিকে তুমিও দেখছ আমিও দেখছি।"

তাঁর মুখচোখের ভাব হয়ে গেল অন্যরকমের। গদগদকণ্ঠে শাস্ত্রের সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করে তার মানে বলে বলে যেতে লাগলেন।

"কলিযুগের শেষে মনুষ্যরা হয় লোভী, কামুক ও দরিদ্র। স্ত্রীলোকরা হয় কটুভাষী, খর্বকায়, নির্লজ্জ, অধিক ভোজী, বহুপুত্রবতী। তপস্বীরা হয় গ্রামবাসী ও সন্ন্যাসীরা হয় অর্থলোলুপ। পুরুষরা হয় স্ত্রৈণ; আর তারা চালিত হয় শ্যালক-শ্যালিকার মন্ত্রণা দিয়ে। বহুভাষী ব্যক্তিকেই লোকে পণ্ডিত বলে। বাচালতাকেই লোকে সত্যতার প্রমাণ বলে মনে করে। দেহীদের দেহ হয় ক্ষীণ; ধেনুসকল ছাগতুল্য; ওষধিসকল অল্পগুণ; গৃহসকল হয় লোকশূন্য। বণিকরা হয় অসৎ ও প্রতারক। রাজগণ প্রজাপীড়নকারী।...... কলির শেষের আর বাকি কি।......সব লেখা আছে শাস্ত্রে।......"

রুক্মিণী কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন খেয়াল করিনি। বৃদ্ধের খাওয়ার সময় হয়েছে; আমাকে তাই সেখান থেকে উঠতে বললেন। গলার স্বর বেশ দৃঢ়। বৃদ্ধ চোখ নামিয়ে নিলেন মাটির দিকে। একটু যেন অপ্রস্তুত হয়েছেন।

পরদিন রুক্মিণী মন্দিরে যাবার পর বৃদ্ধ নিজে থেকেই আমাকে ডাকলেন, বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে। বাইরে বার হবার মত সুস্থ বোধহয় তখনও হননি। একা একা থাকেন; কথা বলবার জন্য লোকের দরকার তাঁর। আমার ভয় যে আবার সেই কলিযুগ আর অবতারদের কথা না পাড়েন।

"তুমি চাকরিবাকরি কর নাকি?"

"করতাম, এখন আর করি না। স্কুলমাস্টার ছিলাম।"

"ছেলেরা মানুষ হয়েছে?"

"আপনাদের আশীর্বাদে কাজকর্ম করছে; আর সেইজন্যই আমি এই তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াবার ফুরসত পেয়েছি।"

"তোমার আবার তীর্থকরা! নেপালে গিয়ে বুদ্ধদেবের জন্মস্থান কপিলাবস্তু না দেখেই ফিরলে? আর তাঁর মহাপরিনির্বাণের স্থান কুশীনগর? আমি তো ভাবতেই পারি না। অবতারদের জন্মস্থান ও লীলাক্ষেত্রগুলো দেখলে মনে উৎসাহ পাওয়া যায়; নিজেদের কর্তব্যের প্রেরণা পাওয়া যায়; আমাদের ভবিষ্যতের কর্মপ্রণালীর খসড়া তয়ের করা যায়। কলির প্রথম অবতারের লীলাক্ষেত্র থেকেই আমরা সবচেয়ে কার্যের নির্দেশ বেশী পেতে পারি; তিনি সবচেয়ে কম পুরনো কিনা।"......

মনের আবেশে তিনি আরও কত কথা বলে যাচ্ছেন একটুও না থেমে। কথাগুলো যেন বিনা চেষ্টায় আপনা থেকে বেরিয়ে আসছে তাঁর মুখ থেকে, প্রলাপের মত। এমনভাবে প্রাণ ঢেলে দিয়ে বলা, যে এক একবার মনে হচ্ছে যে এগুলোর মধ্যে হয়ত কোন গভীর তত্ত্ব আছে। হয়ত নিছক পাগলের প্রলাপ নয়। চিন্তা তাঁর বিক্ষিপ্ত নয়। অবতার আর কলিযুগ এই দুটো বিষয়কে কেন্দ্র করে তিনি যেন সবাক চিন্তা করে চলেছেন। শ্রোতা উপলক্ষ মাত্র। উঠে গেলে হয়ত দুঃখিত হবেন; তাঁর এই একঘেয়ে কথা চুপ করে বসে শোনা ছাড়া উপায় নেই।

......"জন্মস্থানগুলোর গুরুত্ব সব চেয়ে বেশী। সে যুগের লোকজন না থাকুক, সে সমাজ না থাকুক, সেখানকার হাওয়াবাতাস, জলমাটি, পশুপক্ষী সব তো প্রায় সেই রকমই আছে। চিন্তা করে বার করতে হয় যে, ভগবান পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবার জন্য ঠিক ওই রকম জায়গা বেছেছিলেন কেন? সেইটা বুঝতে পারলে আমাদের কাজ হয়ত খানিকটা সহজ হয়ে আসে। কপিলাবস্তু আজ জঙ্গল। শ্রীকৃষ্ণাবতার ও শ্রীরামাবতারের জন্মস্থানের উপর আজ বিধর্মীদের প্রার্থনামন্দির খাড়া রয়েছে। এর একমাত্র অর্থ হ'ল যে ওই সব অবতারদের যুগ শেষ হয়ে গিয়েছে; নূতন অবতারের আবির্ভাবের সময় হয়েছে। তাঁর আসা দরকার। তাঁকে যেমন করে হোক আনতে হবে! মানুষের মধ্য দিয়েই ভগবান কাজ করেন; আমাদের হাত তুলে বসে থাকলে চলবে না। তোমার ছেলেদের বিয়ে হয়েছে তো? নাতিপুতি কয়টি? যারা ভাত খায় তাদের সন্তান বেশী হয়।"

হঠাৎ তিনি কথার প্রসঙ্গ একেবারে বদলে দিয়েছেন, রুক্মিণীকে আসতে দেখে। আমি তাড়াতাড়ি উঠে পড়ি। এঁদের ব্যাপারটা ঠিক বুঝছি না। তবে বৃদ্ধের অলৌকিক বিভূতি সম্বন্ধে সন্দেহ হতে আরম্ভ হয়েছে। তিনি যদি সব জানতে পারেন, তবে আমার নাতি কয়টি, এ খবরটা তাঁর অজানা কেন?

পরের দিন সকালে দরোয়ান এসে জানিয়ে গেল যে এখানে যাত্রীদের এক নাগাড়ে তিনদিনের বেশী থাকবার হুকুম নেই। অর্থাৎ তাকে আবার বকশিশ দিতে হবে। পাশের ঘর থেকে শুনতে পেয়ে বৃদ্ধ বেরিয়ে এসেছেন। ভীষণ খাপ্পা দরোয়ানের উপর। বললেন—"চল তোমার মালিকের কাছে। মেরে তোমার হাড় ভাঙ্গব। আমাকে বাঙ্গালীবাবু পাওনি। যাত্রীদের অনর্থক জ্বালাতন করা বার করছি আমি তোমার!"

দরোয়ান গজগজ করতে করতে চলে গেল। বুঝলাম যে আজ বৃদ্ধ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছেন। ধর্মশালার উঠনে পায়চারি করতে করতে আমার সঙ্গে গল্প আরম্ভ করলেন। রুক্মিণী তখন সরযুতে স্নান করতে গিয়েছেন।

বুড়োবয়সে এক এক সময় এক এক প্রসঙ্গের উপর ঝোঁক পড়ে। বৃদ্ধ আজও আবার আমার নাতিদের সম্বন্ধে সব খবর খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করা আরম্ভ করলেন। গায়ের রঙ, স্বাস্থ্য, মাছমাংসের উপর ঝোঁক আছে কিনা, ভীতু না সাহসী, জিদ আছে নাকি—আরও কত প্রশ্ন। আমার মনে হ'ল আমাকে খুশী করবার জন্য নাতিদের কথা তুলছেন তিনি।

তাঁকে খুশী করবার জন্য আমিও ইচ্ছা করে কলিযুগের প্রসঙ্গ ওঠালাম।

"দরোয়ানটাকে দেখলেন না। আপনি ঠিকই বলেছেন—কলিযুগের শেষ এটা।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমিই বলো, সব লক্ষণ একেবারে হুবহু মিলে যায় কিনা। তোমাদের মত নিরপেক্ষ লোকের কাছ থেকে শুনলেও খানিকটা ভরসা পাই।"

"সব মিলে যাচ্ছে। একজন অবতার এসে দুষ্কৃতদের নাশ না করলে আর এখন কোন উপায় নেই।"

আনন্দে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন বৃদ্ধ।

"বুদ্ধদেবের লীলাক্ষেত্র গয়ার লোক তুমি। তুমি একথা না বুঝলে বুঝবে কে? সব কথা আগে থেকে খুঁটিয়ে লেখা আছে পুরাণে। তবু কেন এমন হ'ল?"

"কী? কী এমন হ'ল? কিসের কথা বলছেন?"

"না, সে অন্য কথা।"

গম্ভীর হয়ে গেলেন বৃদ্ধ।

নূতন একদল যাত্রী বাক্স-পেটরা নিয়ে ধর্মশালার গেটের মধ্য দিয়ে ঢুকল। প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্য আমি বলি —"যাত্রী আসবার কামাই নেই।"

"হ্যাঁ।"

"আচ্ছা আপনি বলছিলেন না, শাস্ত্রে আছে—কলির শেষে গৃহসকল লোকশূন্য হয়?"

"হ্যাঁ আছেই তো। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে লেখা আছে—শূন্যপ্রায়েষু সদ্মসু। সদ্ম মানে জান তো? সদ্ম হচ্ছে গ্রাম।"

"তবে?"

বৃদ্ধের জ্বলজ্বলে চোখ দুটোর দীপ্তি দ্বিগুণে বেড়ে গেল।

"তবেটা কিসের? কি বলছ স্পষ্ট করে বল না!"

গলার স্বর বেশ রুক্ষ। মুখ এগিয়ে এনেছেন আমার মুখের কাছে। উত্তেজনা ও অধীরতার ছাপ তাঁর চেহারায় সুস্পষ্ট। মনে হচ্ছে আমার উত্তর তাড়াতাড়ি বার করে নেবার জন্য এখনই বুঝি গলাটা দু'হাত দিয়ে ধরে ঝাঁকি দিয়ে দেবেন।

"আমি তো দেখছি ঘরে ঘরে লোক বাড়ছে। সর্বত্রই এই। একটা বাড়ী খালি হলে, পঞ্চাশটা লোক ভাড়া নেবার জন্য তখনই এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। এ বিষয়ে, কলির শেষদশার শাস্ত্রীয় বিবরণের ঠিক উলটো ব্যাপার দেখছি আমরা সারা দেশে।"

ভয় করছিলাম যে রেগে ফেটে পড়বেন বৃদ্ধ অর্বাচীনের এই বাচলতায়; কিন্তু প্রতিক্রিয়া হ'ল একেবারে অন্য রকমের। কপালের বলিরেখাগুলো আরও গভীর হয়ে উঠল। কুঞ্চনরেখাগুলোর ক্ষণদীপিকায় ধরা পড়ল একটা অপরাধীর কুণ্ঠিত ভাব।

মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে তিনি বললেন—"কথাটা আমারও মনে হয়; কিন্তু আমি ওটার উপর গুরুত্ব দিতে চাই না। একশটা কথার মধ্যে যদি নিরানব্বই মেলে, আর একটা না মেলে, তাহলে সেই গরমিলটাকে কি উপেক্ষা করা যায় না?"

"হয়ত যায়।"

"সেই কথাই আমিও আমার মনকে বোঝাই।"

"আরও একটা কথা আমার মনে হয়েছে। যদি কিছু মনে না করেন তো বলি।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো, বলো! সংশয় দূর করবার জন্যই এই আলোচনা। এতে আবার দ্বিধা কিসের?"

"আপনি বলেছিলেন, শাস্ত্রে আছে, কলিতে স্ত্রীলোকরা বহু সন্তানবতী হয়। তাই যদি হয়, তবে আবার গৃহ লোক-

শূন্য হবে কি করে? এ নিশ্চয়ই শাস্ত্রের একটা অসংগতি।'"

"না না। ও ইচ্ছে তোমার যুক্তির দৌর্বল্য। লোক বেশী জন্মালে কি হবে; তার চেয়েও বেশী মরতে তো পারে। মহামারী ইত্যাদির কথা ভুলে যাচ্ছ কেন। আমি যখন লাহোর থেকে পাস্ করে সম্ভলের আশ্রমে যাই তখন আমারও এটাকে শাস্ত্রের অসংগতি বলে মনে হত। ও রকম মনে হয় প্রথম প্রথম। ওটা কোন দোষের নয়।"

আমার মানসিক অবস্থার একটা ভুল আন্দাজ করে নিয়ে উনি আমাকে আশ্বাস দিচ্ছেন। সে ভুল ভাঙ্গলে অনর্থক ও'কে দুঃখ দেওয়া হয়। তাই তাঁর কথায় সায় দিলাম।

"ঠিক বলেছেন আপনি।"

"সংসারে ভবিষ্যতে কবে কোথায় কি হবে, শাস্ত্রে সব আগে থেকে ছক কেটে লিখে দেওয়া আছে। মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেবার জো নেই। নইলে ভগবান দশম-অবতারের নাম যে কল্কি হবে, ব্রাহ্মণ বিষ্ণুযশার ঔরসে, সুমতির গর্ভে সম্ভল গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করবেন, এসব কথা আগে থেকে পুরাণে লেখা হয়ে গেল কেমন করে?"

"সে তো ঠিকই।"

"তুমি ভাবছ বিজ্ঞান পড়েছ বলে সংশয় বেড়েছে তোমার। ভুল ধারণা। যতই শাস্ত্র পড়, খানিকটা বিজ্ঞান না জানা থাকলে কি চলে? দশম অবতারের হাতের অসিতে থাকবে অগ্নিশিখার দ্যুতি। সবাই বললে পেট্রল মাখাও। সে আগুন থাকবে কেন। তাহলে ন্যাকড়া জড়াতে হয় তলোয়ারে। আমি তখন ফস্‌ফরাস্ মাখিয়ে ওতে আগুনের দীপ্তি আনি। কিন্তু আমাদের মধ্যে যাদের মন বেশী সংশয়ী তারা তখনও বাধা তুলেছিল। তারা বলে, শাস্ত্রের লেখার সব সময় যুগোপযোগী অর্থ করে নিতে হবে। খড়্গ সে যুগে দুষ্কৃতদের সংহারের জন্য ভাল অস্ত্র বলে গণ্য হত; কিন্তু এ যুগে অচল। তরবারির উপরের অগ্নিশিখার ইঙ্গিত হল আজ-কালকার আগ্নেয়াস্ত্রের দিকে। তারা বলল দশমাবতারের হাতে বন্দুক দাও। বন্দুক ছিলও আমাদের কাছে। আমি হতে দিইনি শাস্ত্র-বহির্ভূত জিনিস। ভুল করেছিলাম বোধহয়। কে জানে কী হ'ত! হয়ত কলির শেষ তখনও হয়নি, আমাদেরই বুঝতে ভুল হয়েছিল!

বৃদ্ধ কী বলছেন ঠিক ধরতে পারছি না। প্রতি কথায় গভীর রহস্যের আভাস পাচ্ছি। তিনি ধরে নিয়েছেন যে আমি সব বুঝছি। জানবার জন্য কৌতূহল আমার কম নয়; কিন্তু কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারছি না, পাছে আবার তিনি সতর্ক হয়ে যান সেই ভয়ে। বুঝতে পারছি যে, গৃহ লোকশূন্য না হওয়ার কথাটা বলবার পর থেকেই আমার প্রতি তাঁর মনোভাব বদলেছে। বিশ্বাস করে আমার কাছে তাঁদের গোপন কথা বলা যেতে পারে, এরকম একটা ধারণা তাঁর জন্মেছে। সেটা নষ্ট হতে দিতে চাই না। তাই বলতে হ'ল—"ভুল মানুষের হ'তেই পারে।"

স্নান করে মন্দির হয়ে রুক্মিণী ফিরলেন। আজ আর কথা পাল্টাবার প্রয়াস নেই বৃদ্ধের। তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন বলতে—কলিযুগের শেষ সম্বন্ধে বাঙ্গালীবাবুর সংশয়ের কথাটা। চাপা গলায় আরও কিসব যেন কথা হ'ল দুজনের মধ্যে। তারপর হেসে এগিয়ে এলেন রুক্মিণী আমার দিকে।

"আমি আগেই চিনেছি বাঙ্গালী-বাবুকে। শিক্ষাদীক্ষা সংস্কার লোকের হাবভাবে ফুটে বার হয়। বাবুজি প্রথম থেকে গম্ভীর হয়ে আমাদের কথা শুনেছেন; অন্য লেখাপড়াজানা লোকদের মত আমাদের পাগল ভাবেননি।"

এরপর থেকে বৃদ্ধ আর রুক্মিণী একেবারে অন্য মানুষ। রুক্মিণী আর বৃদ্ধের কথা সামলে নেবার চেষ্টা করেন নি। আমি কোন প্রশ্ন করলে বৃদ্ধও আর বিরক্ত হননি।

সেই রাত্রিতে সব কথা জানতে পারি। খাওয়াদাওয়ার পর সারারাত আমাদের গল্প চলে। এ'দের কাহিনী যেমন চমক-প্রদ, তেমনি কৌতুকজনক। কিন্তু শোন-বার সময় এর কৌতুকের দিকটা খেয়াল করবার মত মানসিক অবস্থা আমার ছিল না।

এ'রা মথুরার চতুর্বেদী বংশোদ্ভব। এবং কল্কি-সম্প্রদায়-ভুক্ত। এ রকম কোন উপাসক-সম্প্রদায়ের নাম আগে শুনিনি। এর উত্তরে, বৃদ্ধ বললেন যে, তাঁরা সংখ্যায় অতি মুষ্টিমেয়, তা'ও দিন দিন কমে যাচ্ছে। নূতন লোক এপথে আর আসতে চায় না। আগেকার যারা ছিল, সেসব পরিবারের ছেলেপিলেরাও আজ-কাল এপথ মানতে চায় না। সারা ভারতে ছড়ান এই ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের দুইচারজনের পরস্পর দেখাশোনা হয় কুম্ভমেলায়, আর বিষ্ণুর অবতারদের লীলাক্ষেত্রগুলিতে। অনেক দিন থেকে এই সম্প্রদায় মুমূর্ষু অবস্থায় কোন রকমে শুধু টিকে ছিল। প্রায় একশ বছর আগে এতে নূতন জীবনের সঞ্চার করেন বৃদ্ধের পিতা শ্রীকল্কিপদ—এ সম্প্রদায়ের সবচেয়ে সম্মানিত নাম। তিনি এই দলকে সাধন-ভজন ছাড়াও এক ক্রিয়াশীল কর্মপন্থা দেন। তিনি বলেন, কল্কি অবতার আসবেন বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। ইনি আগের নয়জন অবতারের মত নন। তাঁদের লোকে জেনেছে, ভগবান পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবার পর। কিন্তু কল্কি অবতারের বেলায় ভগবান তাঁর নাম-ধাম সবকিছু বহু আগেই প্রকাশ করে দিয়েছেন শাস্ত্র পুরাণে। এর উদ্দেশ্য, দশম অবতারের বেলায় মর্ত্যের লোকদের আগে থেকে এক কর্মপন্থার ইঙ্গিত দেওয়া। কর্মযোগী কল্কিপদ সম্প্রদায়ের লোকদের প্রথম কাজ দিলেন সারা ভারত ঘুরে ঘুরে সম্ভল গ্রাম খুঁজে বার করবার। পুরাণে আছে :—

"সম্ভল গ্রামমুখ্যস্য ব্রাহ্মণস্য মহাত্মনঃ।
ভবনে বিষ্ণুযশসঃ কল্কি প্রাদুর্ভবিষ্যতি॥"

সম্ভল গ্রামের প্রধান ব্রাহ্মণ মহাত্মা বিষ্ণুযশার ভবনে কল্কি অবতীর্ণ হবেন। কাজেই সম্ভল গ্রাম খুঁজে বার করাই হল প্রথম কাজ। বছর কয়েক খোঁজবার পর সম্ভল নামের এক গ্রাম পাওয়া গেল পাঞ্জাবে। সে গ্রামের বেশীর ভাগ লোক ভিন্নধর্মাবলম্বী; ব্রাহ্মণ এক-ঘরও ছিল না। কল্কিপদজী কয়েকঘর ব্রাহ্মণ সংগে করে নিয়ে গিয়ে, সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করা আরম্ভ করলেন। কিছুকাল পরে ঝিলাম নদীর খাল কাটা হলে, তাঁদের সকলেরই আর্থিক অবস্থা ফিরে যায়। চাষবাস করেই সকলের জীবিকা চলত। কল্কি-পদজী সেখানে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে যান, ও দেহত্যাগ করবার আগে দলের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশ দিয়ে যান। তারপর থেকে এই বৃদ্ধের উপরই দলের মুখ্য দায়িত্ব বর্তায়।

পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হয়ে আসছিল পঞ্চাশ বছর ধরে। বৃদ্ধের প্রথম ছেলের নাম রাখা হল বিষ্ণুযশা। শাস্ত্রে আছে বিষ্ণুযশার স্ত্রীর নাম সুমতি। তাই দলের আর এক ব্রাহ্মণের মেয়ে হলে তার নাম রাখা হ'ল সুমতি। বড় হলে সুমতির সংগে বিয়ে দেওয়া হল বিষ্ণুযশার। সকলেই জানত এদের প্রথম সন্তান হবে ছেলে। হলও তাই। ছেলের নাম রাখা হ'ল কল্কিদেব।

কল্কিদেবের কথা বলতে গিয়ে বৃদ্ধের চোখে জল এল। "কী রূপ! কী কান্তি সে দেহের! নিজের নাতি বলে বলছি না। তাঁকে নাতি বলে কোনদিন ভাবিনি। দেবতা জানে আমরা সকলে তাঁকে সমাদর করে এসেছি তাঁর জন্ম থেকে। এতো শুধু আমাদের সম্প্রদায়ের প্রশ্ন নয়; সারা পৃথিবীর মানুষদের

ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে ওই ভগবান কল্কির উপর! বেদব্যাস যেমন বর্ণনা দিয়ে গিয়েছেন কল্কি-ভগবানের, ঠিক সেইরকম করেই আমরা তাঁকে গড়ে তোলবার চেষ্টা করেছিলাম। শস্ত্র শাস্ত্র উভয় বিষয়েই সমান পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন কল্কিদেব। অন্যায় দেখলে চোখে তাঁর আগুন জ্বলে উঠত সেই বাল্যকাল থেকেই। সেকথা আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে আনন্দ পেতাম। পঞ্চাশ বছর ধরে সম্ভলের স্ত্রীপুরুষ সকলে প্রত্যহ একত্র হ'তাম কল্কি-আশ্রমে। সেখানে শাস্ত্রালোচনা হ'ত। স্ত্রীপুরুষ সকলের অবতার সম্বন্ধীয় সব শাস্ত্র পড়া ছিল। তাই সকলেই আলোচনায় যোগ দিতে পারত। পঞ্চাশ বছর ধরে সে সব শাস্ত্রের প্রতিটি শব্দের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে এসেছি আমরা; তবু বিষয়বস্তু কখন পুরনো বা একঘেয়ে মনে হয়নি আমাদের কাছে। ব্যাখ্যায় যখনই কোন নূতন পয়েন্ট উঠেছে, তখনই সেটাকে লিখে রাখা হত। পঞ্চাশ বছর ধরে লেখা এইসব টীকা-টিপ্পনীগুলো একখান বিরাট গ্রন্থ হয়ে উঠেছিল। সে বই সকলের অবশ্য-পাঠ্য ছিল। কলিযুগ শেষ দশায় পৌঁছেছে কিনা সেই কথার আলোচনাই হ'ত সবচেয়ে বেশী; কেননা পৃথিবীর আশাভরসা সবকিছু নির্ভর করছে, ওই কথাটার সঠিক বিচার আর নির্ণয়ের উপর। শাস্ত্রে বলা আছে ঠিকই; কিন্তু ভগবান আর মুনিঋষিরা কী ভেবে কী বলেছেন সেকথা বোঝা অত সহজ নয়। গ্রন্থের সব চেয়ে বেশী পাতা জুড়ে ছিল আপনার তোলা পয়েন্টটা—স্ত্রীলোকরা বহু সন্তানবতী হলে, গৃহ সকল লোকশূন্য হয় কেমন করে? এই দুটি পরস্পরবিরোধী উক্তির সামঞ্জস্যসাধনের চেষ্টা করে গিয়েছিলেন স্বয়ং কল্কিপদজী—। তবু তার পঞ্চাশ বছর পরও ওই সংশয়ের সম্পূর্ণ নিরসন হয়নি হাজার দিনের আলোচনা সত্ত্বেও।"

এতক্ষণে আমি বুঝি কেন আমার প্রশ্ন, বৃদ্ধ আর রুক্মিণীর মন গলাতে পেরেছিল। তাঁদের শাস্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাসকূটের সন্ধান একজন সম্পূর্ণ বাইরের লোককে অনায়াসে পেতে দেখে তাঁরা চমৎকৃত হয়েছিলেন।

বৃদ্ধ বলে চলেছেন—"সমস্যা কি শুধু একটা? পুরাণে লেখা আছে—কল্কি বেগবান দেবদত্ত অশ্বে আরোহণ করিয়া রাজচিহ্নধারী কোটি কোটি দস্যুকে খড়্গ দ্বারা সংহার করিবেন। এখানে দেবদত্ত কথাটার মানে পরিষ্কার। কল্কির বাহন সাদা ঘোড়াটিকে ভগবান নিজেই জুটিয়ে দেবেন। একথা জানা সত্ত্বেও একটা করে সাদা ঘোড়া আমরা সব সময় আশ্রমের আস্তাবলে রেখে দিতাম। সে ঘোড়ার নাম রাখা হত দেবদত্ত। নিরর্থক ও অনাবশ্যক জেনেও আমরা দেবদত্ত নামের ঘোড়া পুষতাম, শুধু দলের কয়েকজন সংশয়ীর মনের তৃপ্তির জন্য। কেউ বলত পোষা ঘোড়ায় চলবে না; কারও বা মত ছিল যে সব প্রাণীই যখন দেবতার দেওয়া, তখন আশ্রমের পোষা ঘোড়াতেই বা কল্কিদেবের চলবে না কেন? মোটকথা, শাস্ত্রের কথা যাতে কোনরকমে নিষ্ফলা না যায়, সেজন্য আমরা আটঘাট বেঁধে কর্মের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলাম। এসব সত্ত্বেও আমরা মোটামুটি একমত ছিলাম যে কলির শেষ-দশা উপস্থিত হয়েছে। শুধু কবে কখন কল্কিদেব তাঁর কাজ আরম্ভ করবেন, সেই খবরটা ছিল আমাদের অজানা। উৎকণ্ঠ প্রতীক্ষা আমাদের এক মুহূর্তের জন্যও সুস্থির হতে দেয় না। আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা, কর্মজীবনের প্রতি পদক্ষেপ নিয়োজিত ছিল এক স্থিরলক্ষ্যের দিকে। অভ্যাসে চিন্তাধারা হয়েছে এক-

মুখী। দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি ও তপস্যা সত্ত্বেও কল্কিদেব তাঁর কাজ আরম্ভ করতে দেরী করছেন দেখে আমরা অধীর হয়ে পড়েছিলাম।

"তারপর হঠাৎ যখন সেইদিন এল, তখন আর ভাববার সময় পাওয়া গেল না। যখন ভারত-পাকিস্তান ভাগাভাগি হল তখনকার কথা বলছি। সম্ভল পড়ল পাকিস্তানে। সবাই যে যার মত পালাচ্ছে; আমরা ভয় পাইনি। বরঞ্চ আমরা সাগ্রহে লক্ষ্য করছি, শাস্ত্রের বচন অনুযায়ী গৃহ-সকল লোকশূন্য হচ্ছে। তবে কি সেই প্রতীক্ষিত দিন এসে গেল! সকলে মিলে দিনরাত আলোচনা আর প্রার্থনা করি। কল্কিদেবের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি যে কোন প্রকার নিকট-ভবিষ্যতের ইঙ্গিত সেখান থেকে পাওয়া যায় কিনা। চতুর্দিক থেকে নানারকম খবর এসে পৌঁছচ্ছে গ্রামে। আমরা নির্বিকার। সম্ভল থেকে দেড় মাইল দূরে ঝিলাম খালের একটা সরকারী অফিস ছিল। সেখানকার ওভারসিয়র আত্মারামের খুব আলাপ ছিল আমাদের সঙ্গে। একরাত্রিতে দেখি খাল অফিসের দিককার আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। আগুন লেগেছে সেখানে। লোকজনের হৈচৈ শোনা যাচ্ছে এতদূর থেকেও। এসব জিনিস তখন চতুর্দিকে অষ্টপ্রহর ঘটছে। আমরা

কল্কিদেবকে ঘিরে বসে আছি তাঁর ইঙ্গিতের প্রতীক্ষায়। এতগুলি লোকের মনে সেই এক চিন্তা। হঠাৎ ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পাওয়া গেল। সকলে উৎকর্ণ হয়ে শুনছি। শব্দটা এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। সওয়ারহীন সাদা ঘোড়াটা এসে ডাকল। ওভারসিয়র আত্মারামের ঘোড়া ভয় পেয়ে পরিত্রাহি চীৎকার করতে করতে পালিয়ে এসেছে আমাদের আস্তাবলের তার চেনা বন্ধুর কাছে।

নিজের বুকের স্পন্দনের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। কারও মনে আর কোন সংশয় নেই। দেবদত্ত অশ্ব! সময় এসে গিয়েছে। পঞ্চাশ বছরের জল্পনা-কল্পনার নিরসন হয়েছে। আর কি এখন বসে থাকলে চলে! শাস্ত্রের বিবরণ অনুযায়ী কল্কিদেবকে স্নান হল।

দুর্বৃত্তদের দল আসছে! মশালের আলো দেখা যাচ্ছে। জিগিরের ধ্বনি কানে আসছে। আমরাও প্রস্তুত। ওরা সংখ্যায় আমাদের দশগুণ; তাতে কি হয়েছে!! জয় ভগবান কল্কি অবতারের জয়! ওদের আসা পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করে থাকব কেন? তিন মাসের শিশু কোলে নিয়ে এক মা চলেছেন এগিয়ে। কিশোরীর দল নিঃশঙ্ক। আট বছরের ছেলেটা পর্যন্ত হাতে একটা লাঠি নিয়েছে। ভয় কিসের; কল্কিদেব রয়েছেন সঙ্গে! কল্কিদেব চলেছেন আগে আগে; দলের সকলে রয়েছে তাঁর পিছনে। সকলের শঙ্কাহীন মুখমণ্ডলে স্থির-বিশ্বাসের দ্যুতি। বহুঈপ্সিত চরম মুহূর্ত এসে গিয়েছে। জয় কল্কিদেবের জয়!

হাতে জ্বলন্ত উন্মুক্ত অসি; দেবদত্ত ঘোড়া ছুটিয়ে বায়ুগতিতে এগিয়ে গেলেন কল্কিদেব। অনেকগুলো বন্দুকের শব্দ হ'ল একসঙ্গে। বিকট উল্লাসের গগনভেদী চীৎকার শোনা গেল। বলবার আর কিছু নেই। কল্কিদেবকে ঘোড়া থেকে পড়ে যেতে দেখেছি। সব কিছু ভুলে সকলে মিলে ছুটেছি তাঁর দিকে। কিন্তু পৌঁছতে পারলুম কই তাঁর কাছে। তারপর আর কিছু মনে নেই।"

বৃদ্ধ কাঁদছেন। রুক্মিণীও কাঁদছেন। কাঁদছেন এক বিরাট কর্মপ্রচেষ্টার অপ্রত্যাশিত ব্যর্থতায়।

বৃদ্ধের ঊরুতে গুলি লেগেছিল। জ্ঞান হবার পর নিজেকে দেখেছিলাম এক সরকারী ক্যাম্পে। তারপর কেমন করে এদেশে ফিরলেন সেসব কথা এখানে অবান্তর। তবে সম্ভলের মেয়েপুরুষ কেউ বেঁচেছিল কিনা সে খবর তিনি আজ পর্যন্ত পাননি।

শুনতে শুনতে, নিজের অজ্ঞাতে এই ধর্মান্ধ বৃদ্ধের একমুখী চিন্তার আবর্তের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি আমিও। লোকটি নিজের সন্তানসন্ততি, আত্মীয়-কুটুম্ব কারও মৃত্যুর জন্য একফোঁটা চোখের জল ফেলেননি। তাঁর দুঃখ তাঁদের নিরলস তপস্যার গ্লানিকর নিষ্ফলতায়। শাস্ত্রের বচন মিথ্যা হতে পারে না। তবে কেন এমন হল? তিনি জানেন এ ব্যর্থতা সাময়িক। মহাজনদের আরব্ধ কাজ মাঝ-পথে বন্ধ হয়ে যেতে পারে না। যে মহান কর্মের গুরুদায়িত্ব একদিন তাঁর উপর পড়েছিল সে কাজ যতদিন বাঁচবেন তাঁকে চালিয়ে যেতে হবে। নূতন করে গড়ে তোলবার শক্তি এখনও তাঁর আছে। তবু তাঁর মনে সংশয় জেগেছে। কেন এমন হ'ল?

পাগলামি সংক্রামক ব্যাধি কিনা জানি না। একরাত্রির অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে এসে আমারও মনে হতে আরম্ভ হয়েছে, কলির শেষ এসেছে কিনা নির্ণয়ে হয়ত এঁদের ভুল হয়েছিল। তাই হয়ত তাঁদের চেষ্টা এখনকার মত ব্যর্থ হয়েছে। বৃদ্ধকে বলি—"ওদিককার ধেনুরা ছাগতুল্য নয় কিনা—হয়ত সেইজন্য......"

উনি আমার হাত চেপে ধরছেন কৃতজ্ঞতায়। মিথ্যা স্তোকবাক্যের চেয়ে বেশী কিছুর সন্ধান পেয়েছেন আমার গলার স্বরে। কথাটা নিশ্চয়ই তাঁরও মনে হয়েছে বহুবার।

পরের দিন সকালের ট্রেনেই অযোধ্যা ছেড়েছি। পালিয়ে বেঁচেছি। ভেবে রেখেছি কয়েক বছর পর একবার কপিলাবস্তু দেখতে যাব। আমার ধারণা, বৃদ্ধ সেখানে সম্ভল নামের এক নূতন গ্রাম প্রতিষ্ঠা করে, অসমাপ্ত কাজ আবার আরম্ভ করবেন। কল্কিদেবকে যে এ পৃথিবীতে আনতেই হবে। এঁদের মাথায় এই গুরুদায়িত্ব তাঁরা কি কখনও নিশ্চেষ্ট হয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারে!

মহারাণী

বিমল মিত্র
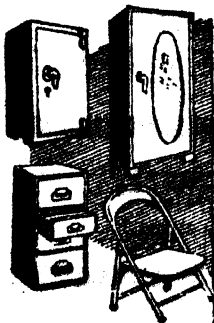
মহারাণী কলকাতায় আসছেন। মহারাণী মানে নাহারগড় স্টেটের খাস মহারাণী। নাহারগড়ের যুবরাজ বিন্ধ্য প্রসাদের সঙ্গে বিয়ে হবার পর তিনি সেখানেই চলে গিয়েছিলেন। আর তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি। সে আজ প্রায় দশ বছর আগেকার কথা। আসলে মহারাণী সাধারণ ঘরেরই মেয়ে। নেহাৎ পাঁচ-পাঁচী। ডাক নাম ছিল গৌরী। গৌরী দেবী নামটাই ছাপানো হতো কাগজে।

মহারাণী এত দিন পরে কলকাতায় আসছেন শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

কলকাতায় মহারাণীর এস্টেট ছিল জানতাম। মার্লিন প্লেস না কোথায় একটা প্যালেস ছিল। সারা বছর ফাঁকাই পড়ে থাকতো। বিরাট বাড়ি শুনেছি সেটা। বাড়ি, বাগান, চাকর, মালী সবই ছিল, শুধু মালিক ছিল না। মালিক থাকতো ছোটনাগপুরে, নিজের রাজ্যে।
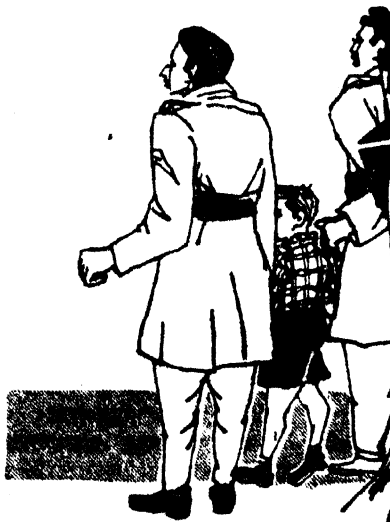
টেলিফোন পেয়ে তাই একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

—আপনি কি মিস্টার মিত্র?

বললাম—হ্যাঁ, কথা বলছি—

বোধ হয় ভদ্রলোক মহারাণীরই ম্যানেজার-এ্যাসিস্ট্যান্ট-সেক্রেটারি কেউ হবেন। সম্পত্তিদেখা শোনা করেন।

বললেন—মহারাণী বুধবার সন্ধ্যে-বেলা কলকাতায় আসছেন, চার ঘণ্টার জন্যে, রাত্রেই আবার চলে যাবেন সুইজারল্যাণ্ডে—আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চান—

প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারিনি। এত বছর পরে গৌরী দেবীর সঙ্গে যোগ-সূত্রটা ঠিক তাড়াতাড়িতে ধরতে পারিনি।

—আপনি বিকেল পাঁচটার সময় এলেই চলবে, পাঁচটা থেকে সাড়ে পাঁচটা আপনাকে টাইম দিয়েছেন—

আমি রাজি হলাম। রাজি না হবারও কারণ ছিল না। রাজি না-হয়ে উপায়ও ছিল না। কারণ গৌরী দেবীকে আমি ভাল করেই চিনে নিয়েছিলাম।

তখনকার দিনে গৌরী দেবীর বেশ নাম ছিল। এখনকার লোকে সে-নাম ভুলে গেছে। সে যুগেই দু'একটা ছবিতে ভাল অভিনয় করে নাম করেছিলেন গৌরী দেবী। 'ঋষির প্রেম' কি 'কৃষ্ণকান্তের উইল' কিম্বা 'পুরাণ-ভকত'এ ভাল পার্ট করেছিলেন। সবে তখন টকী সুরু হয়েছে। এক-একটা ছবি আসে আর আমরা হুমড়ি খেয়ে পড়ি। টিকিট-ঘরের জানালা-দরজা ভাঙা-ভাঙি হয়। রাণী-বালা, জ্যোৎস্না গুপ্তা, প্রতিমা দাশ-গুপ্তার যুগ তখন। সেই যুগেই আরো কয়েকটা ছবি করলেই গৌরী দেবী একেবারে ফিলম-স্টার হয়ে উঠতে পারতেন। কিন্তু হঠাৎ গৌরী দেবী একদিন ফিলম্ লাইন থেকেই একেবারে চলে গেলেন।

কিন্তু সে অন্য প্রসঙ্গ। এ-গল্পের সঙ্গে তার কোনও যোগাযোগ নেই।

বলতে গেলে গৌরী দেবীর সঙ্গে আমার সামান্যই আলাপ। আমি তখন সেই বাচ্চা বয়েসে একটা নাটক লিখে ফেলেছিলাম। একেবারে আস্ত তিন অঙ্কে সমাপ্ত সম্পূর্ণ একখানা নাটক। কাঁচা বয়সের লেখা হোক আর যাই হোক, নাটকখানা পাড়ার ক্লাবের ছেলেদের ভাল লেগেছিল। সামাজিক বিষয়-বস্তু। নাম দিয়েছিলাম 'ত্রিভুজ'। ক্লাবে আমি ছিলাম সব চেয়ে কম বয়সের ছেলে। বড়োয়াই পাণ্ডা। নিজের মাস্টারমশাই আসতেন সন্ধ্যেবেলা, তাই রিহার্শালে কোনও দিন যেতে পারতাম না। ইচ্ছে থাকলেও যাবার উপায় ছিল না। শুধু অতুলদা'র কাছে শুনেছিলাম বিখ্যাত অভিনেত্রী গৌরী দেবী হিরোইনের পার্ট করতে রাজি হয়েছেন। অতুলদা'ই ছিল ক্লাবের ড্রামাটিক সেক্রেটারি। অতুলদা অনন্য-কর্মা লোক। অতুলদা'ই চেষ্টা করে বড় বড় লোককে ক্লাবে আনতো। তখনকার দিনে মেয়র-শেরিফ-লাটসাহেব কাউকেই ক্লাবের ফাংশানে আনতে বাকি রাখেনি অতুলদা। সেই অতুলদা যে আমার নাটকে গৌরী দেবীকে হিরোইনের পার্ট করতে রাজি করাতে পেরেছে, তা শুনে আমি খুব বেশি অবাক হয়নি। শুনে আনন্দ হয়েছিল খুবই নিশ্চয়। ভেবেছিলাম ডি-এল-রায়ের মত কি গিরীশ ঘোষের মত না-হোক, একটা ছোটখাটো নাট্যকার আমি বড় হয়ে হবোই।

কিন্তু হঠাৎ একদিন অতুলদা এল বাড়িতে।

বললে—ওরে, একটা মুশকিল হয়েছে—।

আমি সত্যিই ভয় পেয়ে গিয়ে-ছিলাম। তাহলে কি আমার নাটক হবে না?

—না তা নয়, গৌরী দেবী বলছেন ওই লাভ-সীনটা ঠিক লেখা হয়নি। ডায়ালগগুলো পছন্দ হচ্ছে না ওঁর—

—তাহলে কী হবে? প্লে করবেন না উনি?

অতুলদা বললে—কিছু বুঝতে পারছি না।

জিজ্ঞেস করলাম—উনি কী বললেন?

—জিজ্ঞেস করলেন ড্রামাটিস্ট্ কে? আমি তোর নাম করলুম। তখন উনি আবার জিজ্ঞেস করলেন—ড্রামাটিস্টের বয়েস কতো? আমি তোর বয়েসটাও বললাম। বললাম—সেকেণ্ড ইয়ার স্টুডেন্ট্—

—শুনে কী বললেন?

—শুনে গৌরী দেবী বললেন—লাভ্ সম্বন্ধে এর কোনও আইডিয়াই নেই—

—কেন?

অতুলদা বললে—তা কিছু বললেন না। আমি তো অতো বড় আর্টিস্ট্কে মুখের ওপর কিছু বলতে পারি না। তখন আমি বললাম—এখন কী করা যায় বলুন? শুনে গৌরী দেবী বললেন—ড্রামাটিস্ট্কে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দিন, আমি তার সঙ্গে একটু ডিস্কাস্ করবো—

খানিক থেমে অতুলদা বললে—তুই এক কাজ কর, তুই একবার গিয়ে দেখা কর গৌরী দেবীর সঙ্গে— গিয়ে ডিস্কাস্ করে দ্যাখ্ না কী বলেন!

বললাম—আমি একলা যাবো?

—হ্যাঁ, তুই একলাই যা—আমার যাওয়া ঠিক হবে না। যা-যা বলেন তাই-তাই-ই করা যাবে, অতো বড় আর্টিস্ট্ যখন পাওয়া গেছে তখন ওর টেস্ট্ মত নাটক বদলালে ক্ষতি কী?

—বাড়ির ঠিকানা কী?

অতুলদাই ঠিকানা বলে দিয়ে-ছিল। অতুলদাই বলতে গেলে সব বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল। দিন-ক্ষণ ঠিক করে আমি একদিন গিয়ে হাজির হলাম গৌরী দেবীর বাড়ি। টালিগঞ্জের আনোয়ার শা রোডের ওপর বাড়ি। তখন আনোয়ার শা রোড আরো জঙ্গল-ভর্তি ছিল। সামনে নিউ থিয়েটার্সের দু নম্বর স্টুডিও। আমি সেই স্টুডিও বাঁয়ে রেখে আরো কিছু দূর গিয়ে ডানহাতি একটা বাড়ির গেট খুলে ভেতরের বাগানে ঢুকে পড়লুম।

গৌরী দেবীকে সশরীরে কখনও দেখিনি। সিনেমায় দেখা ছিল। চাকর দরজা খুলে দিতেই আমি আমার নাম বললাম। চাকরটা আমায় ভেতরে নিয়ে গিয়ে একটা ড্রয়িংরুমে বসালো। বেশ সাজানো ঘর। চারদিকে পরিপাটি আসবাব। দেয়ালে গৌরী দেবীরই কয়েকটা ফ্রেমে বাঁধানো ছবি টাঙানো।

একটা সোফার ওপর আড়ষ্ট হয়ে বসে ছিলাম। চাকরটা পাখা ঘুরিয়ে দিয়ে গিয়েছিল।

ভাবছিলাম জীবনে কখনো কোনও এ্যাকট্রেসের বাড়ি ঢুকিনি। এরা কী-রকমভাবে কথা বলবে আমাদের মত সাধারণ লোকের সঙ্গে তারও অভিজ্ঞতা ছিল না। তা ছাড়া, বহুদিন বহুরাত পরিশ্রম করে নাটকটা লিখেছি। এর অভিনয় না হলে সব পরিশ্রমটাই পণ্ডশ্রম হয়ে দাঁড়াবে। আর গৌরী দেবী অভিনয় না করলে শেষ পর্যন্ত এ-নাটকের অভিনয় হবে না। পাড়ার ক্লাবের লোকেদের নাটকটা আকর্ষণ নয়, আকর্ষণ হলো গৌরী দেবী। নাটকের তো অভাব নেই বাঙলা ভাষায়। শেষ পর্যন্ত আমার নাটক না নিয়ে হয়ত অন্য কোনও নাটক পছন্দ করে বসবে। গৌরী দেবীরই কোনও পছন্দসই ড্রামাটিস্টের নাটক। সেই গৌরী দেবীই অভিনয় করবেন, ক্লাবও থিয়েটার করবে, মাঝখান থেকে আমিই শুধু বাদ পড়ে যাবো।

হঠাৎ যেন নাকে এসে সেণ্টের গন্ধ লাগলো।

আর সঙ্গে সঙ্গে আঁচলটা ওড়াতে ওড়াতে ঘরের ভেতরে এসে হাজির হলেন গৌরী দেবী।

আমি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে দুই হাত জোড় করে নমস্কার করলাম।

গৌরী সামনের সোফাটায় বসলেন—

বললেন—বোস তুমি—

চেয়ে দেখলাম সেজেগুজেই এসেছেন। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত নিখুঁত।

বললাম—আমাকে অতুলদা পাঠিয়ে-ছেন আপনার কাছে, আমার একটা

ড্রামা ও'দের ক্লাব প্লে করছে, আপনি বলেছিলেন একটা সীন্ নিয়ে একটু ডিস্কাস্ করবেন আমার সঙ্গে—

গৌরী দেবী বললেন—একটা সীন্ নয়, পুরো ড্রামাতেই আমার আপত্তি—

আমি ভয় পেয়ে গেলাম। কিছু কথা আমার মুখ দিয়ে বেরোল না।

গৌরী দেবী আবার বললেন—হ্যাঁ, ওদের আমি বলিনি, কিন্তু ড্রামাটাই আমার ভালো লাগেনি—ওটা ড্রামাই হয়নি—

বললাম—কেন? ও-কথা বলছেন কেন? ও'রা তো সবাই ভাল বলছেন—

—ও'রা বলুন গে, ও'রা তোমার মুখ-রাখা কথা বলতে পারেন, কিন্তু আমি তো আর্টিস্ট, আমি তো বুঝি কীসে ড্রামা হয় আর কীসে ড্রামা হয় না—

আমি হতবাক হয়ে চেয়ে রইলাম গৌরী দেবীর মুখের দিকে। আমি এখানে আসবার সময় আশাই করিনি এমন হতাশ করবেন আমাকে গৌরী দেবী।

বললাম—কোন্ জায়গাটায় ডিফেক্ট আছে আপনি যদি বলে দেন তো আমি সেটা সংশোধন করতে পারি,—

গৌরী দেবী বললেন—সংশোধন করলেও হবে না—আগাগোড়াই ডিফেক্ট্—

এর পর আর আমার কোনও কথা বলবার রইল না।

গৌরী দেবী বললেন—আসলে তোমার লাভ্ সম্বন্ধে কোনও অভিজ্ঞতাই নেই, ওভাবে প্রেম হয় না— বিশেষ করে নাটকে—

জিজ্ঞেস করলাম—কিন্তু......

গৌরী দেবী বাধা দিয়ে বললেন—যে জিনিস সম্বন্ধে তোমাদের এক্সপিরিয়্যান্স নেই তা নিয়ে লেখো কেন তোমরা? শুধু তুমি একলা নও, আজকাল অনেকের লেখাতেই এটা দেখেছি—কেউ লিখতে জানে না—

বললাম—কোন্টা সম্বন্ধে বলছেন?

—ওই লাভ্ সম্বন্ধে! প্রেম সম্বন্ধে! তোমার বয়েস কতো?

বললাম—উনিশ!

—উনিশ বছর বয়েসে কতটুকু জানা সম্ভব! ক'টা মেয়ের সঙ্গে মিশেছো? এক মা-বোন ছাড়া সংসারে কার সঙ্গে মেশবার সুযোগ হয় তোমাদের?

আমি স্বীকার করলাম যে, সে-সৌভাগ্য আমার হয়নি। আর মা ছাড়া আমি অন্য কোনও স্ত্রীলোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিই নি। তা ছাড়া আমার নিজের বোনও নেই। সত্যি কথা বলতে কী, আমাদের সে-যুগে মেয়েদের সঙ্গে মেশবার সুযোগই ছিল না এখনকার মত।

—তাহলে? তোমার 'ত্রিভুজ' নাটকে হিরোইন্‌কে করেছো অপরূপ রূপসী, আর হিরোকে করেছো আগ্‌লী। হিরো খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাঁটে। সে হিরোকে হিরোইন্ কী করে ভালবাসবে? যদি নায়ক খোঁড়া হয় তাহলে নায়িকা তাকে ভালবাসতে পারে?

—কিন্তু খোঁড়াদের কি বিয়ে হয় না? স্ত্রীরা কি খোঁড়া স্বামীদের ভালবাসে না? স্যার ওয়াল্টার স্কট তো বইতে পড়েছি খোঁড়া ছিলেন, তাঁরও তো বিয়ে হয়েছিল, তাঁর স্ত্রী তো তাঁকে ভালোইবাসতো!

গৌরী দেবী যেন চটে গেলেন।

বললেন—দেখ, যা জানো না তা নিয়ে তর্ক কোর না, লাইফের ট্রুথ্ আর লিটারেচারের ট্রুথ্ কি এক? নাটক কি লাইফের কার্বন্-কপি?

আমি শুনেছিলাম গৌরী দেবী গ্র্যাজুয়েট। কিন্তু তাঁর যে এত জ্ঞান তা জানতাম না। কথাগুলোর কোনও জবাব

আমার মুখ দিয়ে বেরুল না। আর তখন আমি এত ভেবে-চিন্তে লিখিনি। নাটক লিখবো বলেই নাটক লিখেছি। বেশ জমাটি হলেই হলো, শেষ পর্যন্ত সাসপেন্স থাকলেই হলো, তার বেশি আর কিছু জানতাম না।

বললাম—তাহলে কী করবো?

নাটকটা ছিঁড়ে ফেলে দাও, ও তোমার পণ্ডশ্রম হয়েছে মনে করো!

বললাম—আর কি আমার উৎসাহ হবে? খুব ইনস্পিরেশন নিয়ে লিখেছিলাম, আর ও'রাও বললেন প্লে করবেন, তাই দু'মাস রাত জেগে লিখে ফেলেছিলাম—

গৌরী দেবী বললেন—কিন্তু আমি তার কী করবো! আমি তো বলছি প্লে করতে পারি আমি যদি হিরোকে খুব বিউটিফুল দেখতে করে দাও! ও হয় না, কোনও ইয়াং মেয়ে ও-রকম খোঁড়া ছেলেকে ভালবাসতে পারে না! ও রকম চেহারা দেখলে আমার মুখ দিয়ে প্রেমের কথা বেরোবে না!

বললাম—কিন্তু প্লে করলে আপনি দেখতেন খুব হাততালি পেতেন, দর্শকদের সিমপ্যাথি পেতেন—

—না না না, আমি তো বলেছি, জীবনে বা আর্টে অসুন্দর জিনিসের ঠাঁই নেই! খোঁড়া লোক দেখলে আমার গুলী করে মেরে ফেলতে ইচ্ছে করে—খোঁড়া লোককে কি কুঁজো লোককে আমি দেখতে পারি না—

—সত্যি বলছেন?

—সত্যি বলছি না তো মিথ্যে বলে আমার লাভ কী?

—রাস্তায় খোঁড়া ভিখিরি দেখলেও আপনার মায়া হয় না?

গৌরী দেবী বললেন—রাস্তার ভিখিরিকে কি আমি ভালবাসি? তার সঙ্গে কি আমার ভালবাসার সম্পর্ক? তার দিকে তো একটা পয়সা ছুঁড়ে দিলেই হলো। কিন্তু স্বামী? খোঁড়া স্বামীকে আমি কী করে ভালবাসবো? তার দিকে চেয়ে দেখতেই যে আমার ঘেন্না হবে! তুমি তো শেষ দৃশ্যে তাদের বিয়ে হলো দেখিয়েছ—অ্যাবসার্ড! একেবারে অ্যাবসার্ড! আর্টের এলিমেণ্টারি নলেজও তোমার নেই—! তুমি অন্য নাটক লেখো কিংবা হিরোকে সুস্থ-স্বাভাবিক-সুন্দর করে দাও, আমি গ্ল্যাডলি প্লে করবো!

তারপর একটু থেমে আবার বললেন—আর অত কথা থাক, এই যে তুমি, তুমি তো সুন্দরী মেয়েটার সঙ্গে খোঁড়া ছেলেটার চূড়ান্ত প্রেম দেখিয়েছো, তুমি নিজে কোনও খোঁড়া মেয়েকে বিয়ে করার কথা কল্পনা করতে পারবে? খোঁড়া মেয়েকে দেখলে তোমার প্রেম জাগবে? বলো, উত্তর দাও—

তারপর যেন নিজের মনেই বলতে লাগলেন—আরে নাটক লেখা যদি অত সোজা হতো তো বাঙলা দেশে কেউ আর বাদ থাকতো না, সবাই ড্রামাটিস্ট হয়ে যেতো—

আমার আর কোনও কথা বলবার রইল না। আমি চুপ করে রইলাম। গৌরী দেবীর শাড়ির আঁচলটা কাঁধ থেকে সরে পড়ে যাচ্ছিল, আর বার বার তিনি সেটাকে তুলে দিচ্ছিলেন। চারিদিকে নিস্তব্ধ নিঝুম আবহাওয়া, আর ঘরের মধ্যে শুধু আমরা দু'জন, সেই কম বয়েসের চোখ দিয়ে গৌরী দেবীকে যে-রকম সুন্দরী দেখেছিলাম, পরে আর কখনও কোনও মেয়েকে আমার চোখে অত সুন্দর মনে হয়নি। পায়ের আঙুলের নখগুলো রং করা, হাতের নখগুলোও রঙিন। গাল ঠোঁট শাড়ি ব্লাউজ সবই রঙিন। সেদিন গৌরী দেবী আমার জন্যে অনেকখানি সময় নষ্ট করেছিলেন। সে-জন্য আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু গৌরী দেবীর মতের সঙ্গে আমি মতে মিলতে পারিনি! সৌন্দর্য কি শুধু বাইরের জিনিস? ভালবাসা কি সত্যিই দেহ-নির্ভর? তাহলে মন নিয়ে কেন এত মারামারি? আমার সেই অল্প অপরিণত বয়েসেই দৃঢ় ধারণা হয়েছিল যে, গৌরী দেবীর কথা সত্য নয়। গৌরী দেবী বড় আর্টিস্ট হতে পারেন, কিন্তু নাটক সম্বন্ধে তাঁর মতটাই শেষ মত নয়!

গৌরী দেবী দাঁড়িয়ে উঠলেন।

বললেন—আমার আবার এখুনি একটা অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে—

আমিও দাঁড়িয়ে উঠেছিলাম। বললাম—তাহলে অতুলদাকে গিয়ে কী বলবো?

—বোল, ও নাটকে আমি প্লে করবো না।

—কিছু কারণ বলবো?

গৌরী দেবী বললেন—হ্যাঁ তাও বলতে পারো, বোল খোঁড়ার সঙ্গে প্রেম হয় না, খোঁড়াকে ভালবাসা যায় না,—

এর পরে আমি আর দাঁড়াইনি। আমি তাঁকে নমস্কার করেই চলে এসেছিলাম সেদিন গৌরী দেবীর বাড়ি থেকে। আমার জীবনে নাটক লেখার সেই প্রয়াসের সেখানেই ইতি হয়েছিল।

বাড়ি ফিরে আসতেই অতুলদা বললেন—কী রে, কী হলো?

সব বললাম। নাটক হয়নি। নাটক লেখাতেই গোলমাল আছে। যা-যা গৌরী দেবী বলেছিলেন সব খুলে পরিষ্কার করে বললাম।

সব শুনে অতুলদা বললেন—বড় ভাবিয়ে তুললে, এতদূর প্রগ্রেস করে এখন পৌঁছিয়ে যাওয়া, বড় মুশকিলে ফেললে দেখছি।

বললাম—আপনারা অন্য প্লে ধরুন না—

শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাই-ই হয়েছিল। তাড়াতাড়ি একটা চলতি নাটক ধরে প্লে করা হয়েছিল। গৌরী দেবী তাতে প্লে-ও করেছিলেন। হাততালি পেয়েছিলেন খুব, তারিফ পেয়েছিলেন খুব। অত বড় আর্টিস্ট, তিনি যে দয়া করে একটা অ্যামেচার ক্লাবের প্লে'তে নেমেছিলেন তাতেই সমস্ত লোক ধন্য হয়ে গিয়েছিলেন। প্রচুর টিকিট বিক্রি হয়েছিল। শুধু আমি সে-প্লে দেখতে যাইনি। দেখতে যাইনি অভিমানে নয়, ক্ষোভে। আমার সমস্ত পরিশ্রম পণ্ডশ্রম হলো বলে নয়, আমার শিল্প-প্রচেষ্টার কদর্থ হলো বলে। সবাই জানলো এবং বিশ্বাস করলো আমার নাটক নাটকই হয়নি। সবাই বুঝলো আমি নাটক লিখতে পারি না। নাটকের এ-বি-সি-ডিও আমি জানি না। ক্লাবের রিহার্শালে এসেই গৌরী দেবী সকলকে সে-কথা বলে গিয়েছেন শুনলাম। আমি ক্লাবের সকলের চোখে সেদিন থেকে ছোট হয়ে গেলাম। বলতে গেলে সেদিন থেকে আমি ক্লাবের সঙ্গে চিরদিনের মত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম।

এরপর জীবনে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। সে-ক্লাবও উঠে গেছে। গৌরী দেবীও সিনেমা-থিয়েটার লাইন থেকে বিদায় নিয়েছেন। রাণীবালা, জ্যোৎস্না গুপ্তা, প্রতিমা দাশগুপ্তার মত গৌরী দেবীও অভিনেত্রী-জীবন থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। কিন্তু বড় হঠাৎ। ঠিক উঠতির সময়ে। পরে শুনলাম নাহারগড় স্টেটের যুবরাজ বিন্ধ্যপ্রসাদ সিং-কে বিয়ে করে ফেলে তিনি নাহারগড় স্টেটের রাণী হয়ে গেছেন। ছোটনাগপুরের বিরাট স্টেট্ নাহারগড়। কোটি টাকার রেভিনিউ স্টেটের। নানা রকম কথা ছড়ালো। একজন বললে গৌরী দেবী দল-বল নিয়ে থিয়েটার করতে যান নাহারগড়ে, সেই সময়েই ঘটনাটা ঘটে। যুবরাজ বিন্ধ্যপ্রসাদের নজরে পড়ে যান গৌরী দেবী। মহারাজার আপত্তি সত্ত্বেও গৌরী দেবীকে তিনি বিয়ে করে বিলেতে গিয়ে বাস করতে আরম্ভ করেন।

এ-সব অনেক বছর আগেকার কথা। এর পর স্টেট্ মহারাজার হাতছাড়া

হয়ে গেছে। মহারাজাও মারা গেছেন। কিন্তু স্টেটের যা প্রপার্টি তার সবটুকু ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট নিতে পারেনি। বহু সোনা, বহু জুয়েলারী সুইজারল্যাণ্ডের ব্যাঙ্কে সরিয়ে রেখেছিলেন তিনি। বাপ মারা যাবার পর বিন্ধ্যপ্রসাদ মহারাজ হয়েছেন। গৌরী দেবীও মহারাণী হয়েছেন। নাহারগড়েই বিরাট প্যালেস তৈরি করেছেন। এয়ার-কণ্ডিশন্‌ড প্যালেস। তারপর এইবার,—এই গেলবারে জেনারেল ইলেকশানের সময়—মহারাজা নাহারগড় থেকে পার্লামেণ্টের ক্যাণ্ডিডেট হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কংগ্রেসের নমিনেশন পেয়ে এম-পি হয়েছেন। এ-সব খবর সে-সময় খুব শুনেছিলাম। শুনেছিলাম গৌরী দেবী নাকি প্রজাদের প্রত্যেকের বাড়িতে পায়ে হেঁটে গিয়ে গিয়ে ভোট চেয়ে চেয়ে বেড়িয়েছেন। যে-মহারাণীকে প্রজারা জীবনে চোখে দেখেনি, সেই তাঁকেই কষ্ট করে ভোট চাইতে দেখে প্রজারা কেঁদে ভাসিয়েছিল। প্রজারা কৃতার্থ হয়ে গিয়েছিল ধন্য হয়ে গিয়েছিল মহারাণীমার কষ্ট দেখে। সেই সব ছবি কিছু কিছু বোম্বাই-এর ইংরিজী সাপ্তাহিক পত্রিকায় ছাপাও হয়েছিল।

তা এতদিন পরে সেই মহারাণী কলকাতায় আসছেন। সুইজারল্যাণ্ডে যাবার পথে। আর আমাকে দেখা করতে অনুমতি দিয়েছেন, এতে আমার কৃতার্থ হবারই কথা। কিন্তু তবু আমি মনে মনে কৃতার্থ হতে পারিনি। আমার নাটক লেখা হয়নি বলে নয়। জীবন সম্বন্ধে আমার বোধই বদলে গিয়েছিল এই ক'বছরে। বাঙলা দেশে এখন লোকে আমাকে গল্প-উপন্যাস লেখক বলে জানে। কিন্তু সেদিন সেই গৌরী দেবীর দেওয়া আঘাত আমি জীবনে ভুলতে পারিনি। নাট্যকার হতে পারিনি বলে তবে কি আমার মনে ক্ষোভ আছে? এখনও কি আমি নিজের অহঙ্কার ত্যাগ করতে পারিনি?

দেখা হলে মহারাণী আর কী-ই বা বলবেন আমাকে? কীই বা বলতে পারেন?

বড়জোর সবাই যেমন মাতব্বরি করে সেই রকম দু'চারটে মাতব্বরির কথা বলবেন। আমার লেখার কী দোষ-ত্রুটি তাই-ই খুঁটে খুঁটে বলবেন। কোন্ লেখককে এ-দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়নি তা তো জানি না। একমাত্র হোমার আর বাল্মিকী ছাড়া পৃথিবীর সব লেখককেই সমালোচকের কুৎসা-কটূক্তি শুনতে হয়েছে। যে লেখক সমালোচককে ভয় করে তার লেখাই উচিত নয় এই সিদ্ধান্তই জীবনে পাকা করে নিয়েছি।

তাই গৌরী দেবীর নিমন্ত্রণ পেয়ে তৈরি হয়েই গেলাম।

বুধবার। বিকেল সাড়ে চারটে থেকে পাঁচটা। ঠিকানা মিলিয়ে মার্লিন প্লেসে গিয়ে পৌঁছোলাম। গেটে দারোয়ানের কাছে নাম ধাম কুলুজী দিলাম।

যথাসময়ে সে আমাকে ভেতরের পার্লারে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলে। তারপর বোধহয় ভেতরে গিয়ে খবর দিলে। আমি চুপ করে বসে বসে বাইরের বাগানের দিকে চেয়ে দেখছিলাম। বাগানের তেমন যত্ন নেই। মহারাজ বা মহারাণী কেউই কলকাতায় কখনও আসেন না। বছরের অর্ধেকটাই কাটে বাইরে। এখনই মহারাজা এম-পি হওয়াতে দিল্লীতে আছেন। চাকর-বাকর-মালী কেউউ তাই মন দিয়ে কিছু কাজ করে না।

হঠাৎ একজন বৃদ্ধ মতন লোক শশব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন।

বললেন—আপনি এসেছেন? এই আধঘণ্টা হলো মহারাণী এসেছেন, এসেই আপনার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন—

হঠাৎ বাইরের বাগানের দিকে একটা শব্দ হতেই চেয়ে দেখি দু'জন উর্দি-পরা চাকর একটা ছোট ছেলেকে হাতে ধরে নিয়ে বেড়াচ্ছে। বছর চারেক বয়েস হবে। ফুটফুটে ফর্সা চেহারা। চমৎকার দামী সাজ-পোষাক।

জিজ্ঞেস করলাম—ও কে? কার ছেলে?

ভদ্রলোক বললেন—আমাদের মহারাজকুমার, মহারাণীর এই প্রথম ছেলে, একটিই হয়েছে—

কী রকম যেন ভূত দেখতে লাগলাম চোখের সামনে।

ভদ্রলোক বললেন—ম হা রা জ-কুমারকে নিয়েই মহারাণী সুইজারল্যাণ্ড যাচ্ছেন, অপারেশন করতে—

অপারেশন করতে! দেখি ছেলেটা খোঁড়াচ্ছে। একটা পা সোজা কিন্তু আর একটা পা ত্রিভঙ্গ হয়ে বেঁকে গেছে। সেই খোঁড়া পায়ে বেড়াতে গিয়ে বড় অদ্ভুত ভঙ্গি করতে হচ্ছে ছেলেটিকে। বড় করুণ, বড় কষ্টকর সে দৃশ্য।

ভদ্রলোক বললেন—আমি খবর দিচ্ছি মহারাণীকে—

বলে ভদ্রলোক আবার ভেতরে চলে গেলেন।

আমি একদৃষ্টে ছেলেটির দিকে চেয়ে দেখতে লাগলাম। আমার মনে হলো আমার নাট্যকার হওয়া হয়নি, তা না হোক। কিন্তু আমার সেদিনের সেই আঘাতের প্রতিশোধ ঈশ্বর এমন করে নিলেন কেন? আমি তো এ চাইনি! আমি তো এ কল্পনাও করতে পারতাম না। গৌরী দেবী কি এই খোঁড়া ছেলেকে ভালবাসতে পারবেন? নিজের পেটের সন্তানকে তিনি গুলী করে মারতে পারবেন? তবে কেন সুইজারল্যাণ্ডে নিয়ে যাচ্ছেন অপারেশান করবার জন্যে? তাকে সুস্থ-সুন্দর করে তোলবার জন্যে? লাইফের ট্রুথ আর লিটারেচারের ট্রুথ কি সত্যই আলাদা? লিটারেচার কি সত্যিই লাইফের কার্বন্-কপি নয় তাহলে?

আমার মাথার মধ্যে সব গোলমাল হয়ে গেল। আমি উঠে দাঁড়ালাম। তারপর কাউকে কিছু না বলে হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে বাগানে নামলাম। তারপর গেট্ পেরিয়ে একেবারে সোজা রাস্তায়। রাস্তায় নেমে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ুতে লাগলাম। মহারাণীর পরাজয় যেন আমারও পরাজয়! গৌরী দেবীর এ-লজ্জা আমি চোখের সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে পারতুম না। আমি রাস্তার মানুষের ভিড়ের মধ্যে নিরুদ্দেশ হয়ে যেন খানিকটা স্বস্তি পেলাম।

অনাদি আর বিশু প্ল্যানশেটে বসবে এই রকম মতলব করছিল।

অনাদি বলছিল, প্ল্যানশেটে আত্মা আনা কি সোজা কথা? রীতিমতো সাধনা দরকার। এ সব কাজ চঞ্চলমতি বালকের জন্য নয়। মনস্থির ক'রে বসতে হবে, মনটাকে চারদিক থেকে টেনে ছিঁড়ে এনে, চেপে, একটি ছোট্ট বিন্দু বানাতে হবে, তবে তো তার আত্মিক আকর্ষণ বাড়বে? আজ দু বছর ধ'রে চেষ্টা ক'রে পারিনি। অন্তত দুজনের একাগ্রতা দরকার।

বিশু বলছিল, ঐ খানেই তো ভাই মুশকিল, মনটাকে কোনো মতে কোনো একটা আত্মার চিন্তার মধ্যে আটক রাখতে পারছি না।

সে তো দেখতেই পাচ্ছি। সব সময় একটা উড়ুউড়ু ভাব। কোনো একটা দেহের মধ্যে মনটাকে আটকাবার ফন্দিতে আছ।

কি যে বল অনাদি!

ঠিকই বলি। প্রেমে পড়েছ। দেহের আকর্ষণে বাঁধা পড়েছ, আত্মার কি দাম এখন? সেও আবার কোনো এক মৃত আত্মীয় বা বন্ধুর আত্মা। কি বল? জ্যান্ত'র স্মৃতির মধ্যে জ্যান্তর সাঁতার কাটা, তার দাম কত বেশি! কি বল হে ভবনাথ?

পরিমল গোস্বামী

ভবনাথ, অর্থাৎ আমি, একটু দূরে ব'সে একখানা বিদেশী সাপ্তাহিক পত্র পড়ছিলাম। পড়া হ'ল না। উঠে এলাম আসন থেকে। বললাম, প্রেমের কথা কি বলছিলে? দু'গজ দূরে প্রেমের প্রসঙ্গ উঠলে কি পড়ায় মন যায়?

অনাদি বলল, প্ল্যানশেটে বসতে চাই, কিন্তু এই হতভাগা বিশুটার সঙ্গে বসলে কোনো ফল হবে ব'লে মনে হচ্ছে না। বর্তমানে ওর মতিস্থির নেই। প্রেমে প'ড়ে গোল্লায় গেছে।

এই কথা? কিন্তু তাতে অসুবিধাটা কোথায়? মহাশূন্যবাসী আত্মারা

প্রেমিককে খাতির করে, প্রেমকে তুচ্ছ মনে করে না। ওকে নিয়ে বসে দেখ, আত্মা ঠিক নেমে আসবে।

না, তুমি ঠাট্টা করছ, ভবনাথ। ওকে নিয়ে বসলে কিছুই হবে না। তুমি বসতে রাজি আছ কি না বল।

আমি? না ভাই, আমি ওতে রাজি নই। ভূতের রাজত্বে বাস করছি, ভূত তাড়াতে পারলে বাঁচি, এর উপর আবার প্ল্যানশেটে ব'সে পায়ে ধ'রে কাকুতি-মিনতি করে ভূত নামাতে হবে, আমি ওর মধ্যে নেই। ভূতের কি কোনো মর্যাদা আছে যে তাকে খোশামোদ করতে হবে?

না, ঠিক সে রকম নয়। ধর তোমার কোনো বন্ধুর আত্মাকে যদি আনা যায়, এবং তার বাণী শুনতে পাও, তা হ'লে কি তোমার ভাল লাগবে না? না বলতে পারবে না। সন্ধ্যার পর এসো, তিনজনেই বসা যাবে।

পৃথিবীতে সন্ধ্যা নেমেছে। মহাশূন্যে দিন নেই, রাত নেই, আলো নেই, অন্ধকার নেই। মহাশূন্যের এমনি আলো-অন্ধকারহীন কোনো জায়গায় কয়েকটি বালক ব'সে আলাপ করছিল। তাদের আলাপের বিষয় পৃথিবী থেকে উড়ে-আসা রকেট। তাদের কাছে খুব মজার মনে হচ্ছিল এই সব শূন্যচারীদের আবির্ভাব। এমন সময় একটি বালকের দেহ একদিকে হঠাৎ খানিকটা প্রলম্বিত হয়ে আবার যথাপূর্ব হয়ে গেল। অ্যামিবা নামক এক-কোষ জেলিজাতীয় প্রাণীদেহের এক একটা অংশ যেমন হঠাৎ একদিকে হাত বাড়ানোর আকারে লম্বা হ'য়ে আবার ফিরে আসে, এবং জেলিদেহের সঙ্গে মিশে যায়, এও তেমনি। বালকটির দেহে বার বার এই রকম হ'তে লাগল।

সবাই ওরা বুঝতে পারল পৃথিবী থেকে কেউ তাকে ডাকছে। বার বার দেহে টান পড়ছিল এবং শেষ বারে জোয়ারের জলের মতো উঁচু হয়ে উঠল এবং সমস্ত দেহটাই ছুটে চলল পৃথিবীর দিকে। শূন্য থেকে শুধু শোনা গেল, তা হ'লে আসি ভাই?

ঠিক এর কয়েক মিনিট আগে পৃথিবী পৃষ্ঠের কোনো এক স্থানে নিম্নলিখিতরূপ ঘটনা ঘটছিল।

অর্থাৎ আমরা তিনজন সন্ধ্যার পর প্ল্যানশেটে বসেছিলাম।

সবাই আনাড়ি, বই পড়ে পণ্ডিত হবার চেষ্টা আর কি। কিন্তু ফল যা হয়েছিল ভাবলে আজও কাঁপতে থাকি। জীবনে কখনও আর এ কাজ করব না। খুব শিক্ষা হয়েছে। সত্যিই শিক্ষা হয়েছে। সুখে আছি এখন।

একটা হরতনের আকারের বোর্ডে তিনজন বসেছিলাম। একটিমাত্র পেনসিল, আমার এক হাত তাতে লাগানো।

তিনজনেই একাগ্র মনে কোনো এক মৃত বন্ধুর কথা ভাবব। ঠিক হ'ল বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডাকা যাক। তিনি আমাদের সবারই বন্ধু ছিলেন, এবং ডাকলেই আসবেন কথা দিয়েছিলেন। এমন কি না ডাকলেও আসবেন এমন ভরসাও দিয়েছিলেন। কিন্তু আজ প্রায় বারো বছর তাঁর কোনো খবর নেই।

আমার হাতে পেনসিল দেওয়ার কারণ সবার মতে আমিই নাকি মীডিয়াম হবার সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত, কারণ আমার মন খুব দুর্বল, এবং আমি একজন ইনট্রোভার্ট, স্মৃতিমন্থন ক'রে সময় কাটাই, ইত্যাদি। ওদের এই বিচার শুধু ভোটের জোরে মেনে নিলাম।

কাজ আরম্ভ হ'ল যথাসময়ে। ঘরের আলো নেবানো, বাইরের আলো যাতে প্রবেশ করতে না পারে জানালা বন্ধ ক'রে সে ব্যবস্থাও করা হল। মোট কথা মনকে বিক্ষিপ্ত করতে পারে এমন কিছু সে ঘরে রাখা হ'ল না, এবং বাইরে থেকে কেউ ডাকাডাকি করতে না পারে সেজন্য পাহারা বসানো হ'ল।

বিভূতিবাবুর চেহারা চিন্তা করছিলাম একাগ্র মনে। কিন্তু মনের বিচিত্র ব্যবহার। পাঁচ সেকেণ্ডের বেশি তাঁর চেহারা মনের সামনে কিছুতেই ধ'রে রাখতে পারছিলাম না। ভাবতে ভাবতে চিন্তা কোন্ পথে যে চলতে লাগল, তাকে ঠেকানো গেল না। অন্ধকারে চোখ বুজে ভাবছিলাম। কিন্তু যখনই একটা ভাবতে যাই, তখনই দেখি আর একটা ভাবছি। বিভূতিবাবুর কথায় মনে এলো পথের পাঁচালির কথা। তারপর অপুর কথা। তারপর আমার নিজের বালককালের কথা। চারদিক নিস্তব্ধ। কাছে বা দূরের কোনো শব্দ কানে আসছে না। বসেছি অশরীরী আত্মা নামাতে। পরিবেশ, উদ্দেশ্য, সব মিলে কেমন যেন একটা ভয়ংকর ভাব, গা ছমছম করছে। কল্পনাতেই ভূত দেখতে পাচ্ছিলাম। ভয়ে প্রায় অসাড় হ'য়ে আসছে দেহমন। শেষে প্রাণপণে মনটাকে আত্মা-চিন্তা থেকে আত্ম-চিন্তাতেই আবদ্ধ রাখতে লাগলাম।

মনের সঙ্গে একটা দ্বন্দ্ব চলছিল ভিতরে ভিতরে। আমার চেতনা বলছিল শুধু উদ্দিষ্টকে ভাবতে থাক, কোনো ভয় নেই, তিনি তোমার বন্ধু, কিন্তু অবচেতন মন আমার নিজের বাল্যকালের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করল, এবং আমিও শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিলাম।

সমস্ত ঘটনাটা ঘটতে দশ মিনিটও লাগেনি। এমন সময় যা ভয় করেছিলাম তাই যেন হ'তে আরম্ভ করল। আমার মাথাটা ঝিম ঝিম করতে লাগল, গায়ের লোম সব খাড়া হ'য়ে উঠল, সমস্ত গায়ে কাঁটা গজিয়ে গেল, শেষে মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল। তারপর সমস্ত গা কাঁপতে লাগল। হাতের পেনসিল কাঁপতে লাগল।

আমার অবস্থা অনুমান ক'রে সহযোগী বন্ধু দুজনও কাঁপতে লাগল। যেন বিদ্যুৎপ্রবাহ চলছে আমার দেহে, আমাকে যারা ছুঁয়ে আছে, তাদের দেহেও তা সঞ্চারিত হচ্ছে। তবু আমাদের মধ্যে অনাদি একটু বেশি ঠাণ্ডামাথা, সে জিজ্ঞাসা করল কে এসেছেন বলুন।

এমন একটি প্রশ্নে আমার সমস্ত গা হিম হ'য়ে গেল। আমারই মধ্যে বাইরে থেকে একটা আত্মা এসে ঢুকে পড়েছে, এ কল্পনাটা খুব সুখপ্রদ নয়।

কিন্তু তবু আমার হাতের পেন্সিল লাফাতে লাগল। যন্ত্রের নিচে কাগজ পাতা ছিল, লিখন চলল তার উপর।

লেখা থেমে গেল হঠাৎ। অনাদি টর্চ জেবলে নাম প'ড়ে বলল, অসম্ভব! মিথ্যা কথা!

আমি নাম প'ড়ে স্তম্ভিত। দেখি আমারই নাম। এ কেমন কথা? আমি কি আধা-চেতন অবস্থায় এই নাম লিখেছি? বন্ধুরা বিদ্রূপ করতে লাগল আমাকে। বলল চালাকি ক'রেছ। এও তোমার এক রসিকতা। তা-ছাড়া তোমার ভূত আসবে কোত্থেকে, তুমি তো বেঁচে আছ। তোমার হাতের লেখার সঙ্গেও এ লেখার মিল দেখছি না।

আমি বললাম, কি জানি। মিল নেই ব'লেই তো আরও সন্দেহ হচ্ছে। কিন্তু তবু মনে হচ্ছে যেন এ আমারই লেখা। বহুকাল আগে এই ভাবেই তো লিখতাম, কিন্তু এখন আর চেষ্টা করলেও এ রকম লিখতে পারি না।

তারপর এক বিপর্যয় কাণ্ড ঘটে গেল।

পেন্সিল ফেলে আমি হাসতে লাগলাম ছোটদের মতো। তারপর লাফিয়ে উঠতে গিয়ে ঘাড়ের উপর একটা ভারী বোঝার চাপে কটীদেশে বড় চোট লাগল। কি একটা পিণ্ড যেন ঘাড়ের উপর চেপে বসেছে, দেখা যায় না, হাতে ছোঁয়া যায় না, অথচ তার চাপ স্পষ্ট

অনুভব করলাম। এ এক নতুন বিভীষিকা। আমার চোখমুখের চেহারা দেখে বন্ধুরা ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। তাদের সন্দেহ রইল না আমাকে ভূতে ধরেছে।

কিন্তু হঠাৎ ঘাড়ের বোঝা অগ্রাহ্য ক'রে আমি লাফাতে লাগলাম।

অনাদি বলল, এ কি ব্যাপার?

বিশু বলল, তোমার পায়ে বাত।

আমি বললাম, জানি, কিন্তু ভাই লাফাতে বাধ্য হচ্ছি। স্ফূর্তিতে

......শেষে মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল।

লাফাচ্ছি। ঠেকানো যাচ্ছে না। আনন্দ ধরছে না।

কেন আনন্দ ধরছে না?—প্রশ্ন করল বিশু।

বোধ হয় ভূতে ধরেছে।—বলল অনাদি। বেশ চেঁচিয়ে বলল।

সবাই ছুটে এলো মজা দেখতে। অনাদিদের বাড়িতে প্ল্যানশেট বসানো হয়েছিল, দু বছর ধ'রে হচ্ছে, কিন্তু ভূত এলো এত দিন পরে এই প্রথম। খবর শুনে বাড়ির মেয়েরা এসে পড়ল। আমি কেমন যেন বিভ্রান্তভাবে হাসতে হাসতে বাইরে পালিয়ে গেলাম।

বন্ধুরা ছুটল আমার পিছনে। তারপর আমাকে ধ'রে নিয়ে এলো আমাদের বাড়িতে। তারপর ডাক্তার এলো, ওঝা এলো, কিন্তু আমার ঘাড় থেকে ভূতের বোঝা নামাতে পারল না তারা কেউ। ভোরবেলা পালিয়ে গেলাম ঘর থেকে।

তারপর দিশাহারা হয়ে ঘুরছি। পা আর চলে না, তবু না চ'লে পারি না। ছোট ছেলেরা আমার গায়ে ঢিল ছোঁড়ে, আমিও তাদের গায়ে ঢিল ছুঁড়ে হাসতে হাসতে ছুটে পালাই। তারপর আমার খোঁজে আমার বাড়ির লোকেরা এলো আমাকে ধরতে।

এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। বুঝতে পারছি সব, অথচ আমাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না। কত বড় মুক্তির স্বাদ পাই, অথচ সর্বাঙ্গে ব্যথা। মনে হয় যেন নদীর ধারে ধারে চিরদিন উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াই। বড়দের সংস্রব ভাল লাগে না। মনে হয় স্বাধীনভাবে লাফাই, গাছে উঠি, নদীতে সাঁতার কাটি, মাছ ধরি, অথচ দেহটা বয়স্ক লোকের, সেটাও বুঝতে পারি।

আমি দুটি ব্যক্তিত্বে ভাগ হয়ে গেলাম। আসলে এদের মধ্যে নতুন ব্যক্তিত্বটিই হ'ল প্রধান। অথচ অনুতাপ নেই সেজন্য। মাঝে মাঝে সব মনে পড়ে, কিন্তু তখনই চিৎকার ক'রে গান গেয়ে উঠি, আবার সব ভুলে যাই। আবার সব মনে পড়ে।—শেষকালে কি আমারই ভূত আমাকে ধরল? কিন্তু আমি তো বেঁচে আছি। এই তো আমি বেঁচে আছি। তার প্রমাণ, আমি যে অনুভব করছি আমি বেঁচে আছি। তবে?

তবে এ কার ভূত? যদি অন্যের ভূত হয় তবে আমার ছদ্মনামে আমার ঘাড়ে চাপবে কেন? নিজের নামেই তো আসতে পারত। তা-ছাড়া আমার ভূত আমার ঘাড়ে চাপবে একথা পরস্পরবিরোধী।

হঠাৎ আমার কানের কাছে চাপা সুরে ভূত বলে উঠল, সন্দেহের কারণ নেই, আমি তোমারই ভূত।

এর পর থেকে সে চুপ। আর একটি কথা বলেনি। আমিও চুপ।

আমার বাড়িতে বহু লোক আসতে লাগল আমাকে দেখতে। খবরটা ছড়িয়ে পড়েছিল আগুনের মতো। খবরের কাগজের রিপোর্টাররা এসে পড়ল। বলল, অদ্ভুত কাণ্ড। তারা যতদূর সম্ভব উত্তেজনাপূর্ণ ক'রে এ খবর কাগজে ছেপে দিল।

ভূত ইতিমধ্যে আমাকে কেমন যেন নিরুৎসাহ ক'রে ফেলেছে। আমি নেশা-খোরের মতো ঝিমিয়ে পড়েছি। অতএব আপাতত ছুটে বেড়াবার উৎসাহ আর নেই। পায়ে বাতের ব্যথা খুব বেড়ে গেছে।

লোকের ভিড় ক্রমে বেশি হচ্ছে। সেই ভিড় ঠেলে ইম্প্রেজারিও খগেন রায় এসে হাজির। সব শুনে সে বলল, এর একটা বিরাট সম্ভাবনা। আমি একটা উৎসবের ব্যবস্থা করছি। আমি তিনটি লোককে বিখ্যাত করব। অনাদিবাবুকে, বিশু-বাবুকে আর ভবনাথবাবুকে। টাকাও পাবেন তাঁরা বিস্তর। সোজা ব্যবসায়িক প্রস্তাব, আমাকে শুধু ফ্রী হ্যান্ড দিতে হবে। একটি শুধু প্রশ্ন—আমি ভবনাথ-বাবুকেই জিজ্ঞাসা করছি।—ভূত কি

এখনও আপনাকে ধ'রে আছে? আই মীন, ঘাড়ে চেপে আছে?

আমি বললাম কি জানি, আচ্ছা দেখি, ব'লে অতি কষ্টে দাঁড়াতে গিয়ে বুঝলাম, এখনও চেপে আছে।

খগেন রায় বলল, ঠিক আছে। এ এক আশ্চর্য ঘটনা। জীবিত লোকের ভূত স্বাধীন ভারতে এই প্রথম।

একজন রিপোর্টার নোট নিতে নিতে জিজ্ঞাসা করল স্বাধীনতার আগে এমন হ'য়েছে কি কোথাও?

ভগবান জানেন। কিন্তু 'স্বাধীন ভারতে প্রথম' বললে এর মর্যাদা অনেক বেড়ে যায়। 'স্বাধীন ভারতে নিজের ভূত নিজের ঘাড়ে'— দেখুন তো কেমন রোমাঞ্চকর শোনায়! ভূতের এই নতুন মনোভাব স্পিরিচুয়ালিস্টদের কাছেও নতুন বোধ হবে। ভূতের এ একটা নতুন অ্যাপ্রোচ—একেবারে অভিনব।

দেশময় প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হ'ল। দলে দলে লোক হানা দিতে লাগল আমাদের বাড়িতে। খগেন রায় আমাকে গোপনে সরিয়ে ফেলল খুব মজবুত নিরাপদ আশ্রয়ে। বলল আর মাত্র সাত দিন। টাকা যা হবে আপনারা তিনজনেই পাবেন, আমার শুধু টেন পারসেণ্ট—শতকরা দশ। অবশ্য সব খরচের পর যা লাভ থাকবে তার।

খগেন রায় আরও একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করল, ভূত যে আপনারই ভূত এটা নিশ্চিত বুঝতে পেরেছেন কি?

বুঝতে পেরেছি।

ভূত কথা বলে?

মাত্র একবার বলেছিল।

আরও বলবে এমন সম্ভাবনা আছে কি?

তোয়াজ করলে বলতে পারে। কিন্তু তার কথা আমি ভিন্ন আর কেউ শুনতে পায় না যে। নীরবে কানের ভিতর চালান করে, কি কৌশলে সেই জানে।

তা হোক, কি বলে শুনে রাখুন। একটা পুরো রাত দিচ্ছি আপনাকে।

অনেক সাধাসাধনার পর ভূত রাত্রে গোপনে আমাকে বলল, আমারই ভালর জন্য সে আমার ঘাড়ে চেপেছে এবং সে কার ভূত তাও আমার অনুরোধে রাত্রে বলেছে।

সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। এমন যে হ'তে পারে আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। পরদিন খগেন রায়কে সব বললাম।

খগেন রায় সব শুনে স্তম্ভিত হ'ল, কিন্তু কি ক'রে এ সব কথা পঞ্চাশ টাকা, পঁচিশ টাকা, আর দশ টাকার টিকিটে বিক্রি করা যায় সে হ'ল সমস্যা। অবশেষে একটা উপায় সে বা'র করল।

বিরাট ভিড়। টিকিট বিক্রি বন্ধ ক'রে দিতে হয়েছে স্থানাভাবে। লাখখানেক টাকার টিকিট বিক্রি হয়েছে। টিকিট ব্ল্যাকমার্কেট হয়েছে কত! যারা ভিতরে ঢুকতে পারেনি তাদের জন্য বাইরে লাউড স্পীকারের ব্যবস্থা হয়েছে।

বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে—ভবনাথবাবুর ঘাড়ে তাঁর নিজেরই যে ভূত চেপে বসেছেন, সেই ভূত আজ বিদায়ের আগে অভূতপূর্ব সব স্বীকারোক্তি করবেন। ভূতের নিজ কণ্ঠেই সব শোনা যাবে। ভূতকে দেখা যাবে না, শুধু কথা শোনা যাবে। তাঁর কথা শেষ হলেই তিনি বিদায় হয়ে যাবেন। তিনি ভবনাথবাবুকে একটি বিশেষ শিক্ষা দেবার জন্য তাঁর ঘাড়ে এসে চেপেছিলেন, সে কথা তিনি নিজের ভাষায় নিজকণ্ঠে বলবেন, এমন আশ্চর্য অলৌকিক কাণ্ড যেমন স্বাধীন ভারতে এই প্রথম, নিজের ভূত নিজের ঘাড়ে চাপাও স্বাধীন ভারতে এই প্রথম। এখন এদেশে স্বপ্নবিলাসী আফিং-খোরদের স্থান নেই, সেই শিক্ষা আপনারা পাবেন ভূতের বাণীতে। অনুষ্ঠানে এ ভিন্ন নাচ-গানের ব্যবস্থাও আছে।

কিছু শিক্ষা পাওয়া যাবে শুনে বাইরের ভিড় থেকে অনেক লোক ফিরে চ'লে গিয়েছিল, কিন্তু সে দশ লাখের মধ্যে কয়েক হাজার মাত্র। কয়েকজন ছোকরাকেও বলতে শোনা গিয়েছিল—সিখ্যার ভয়ে শালা ইস্কুল ছেড়েছি, এখানেও মাইরি সেই সিখ্যা?

অনুষ্ঠান আরম্ভ হ'ল। প্রথমে নাচ গান। তাণ্ডব, রায়বেঁশে, প্রভৃতি নাচ। তারপর খগেন রায়ের উদ্বোধনী বক্তৃতা।

আমাকে রাখা হয়েছিল পর্দার আড়ালে। পর্দা তুলে ফেলা হ'ল। আমার দুদিকে দুই প্ল্যানশেট বন্ধু অনাদি আর বিশু। তৃতীয় আরও এক পরিচিত যুবক। সে জাদুকর অতুলচন্দ্র সরকার।

আমাকে আগেই এ সব পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছিল, ভূতও সব জানত।

পর্দার আবরণ তোলা হ'লে মামুলি হর্ষধ্বনি হ'ল, সে সব কথা বলব না। যে নাচ-গান আর উদ্বোধনী বক্তৃতা হ'ল সেও মামুলি।

এইবার ভূতের বক্তৃতা।

ভূত কিছু বলার আগেই কয়েক সেকেন্ড শূন্যে গীটার বেজে উঠল। এটি প্রোগ্রামে ছিল না। খগেন রায় মনে মনে ব্যাপারটা বুঝতে পারল।

ভূতের একেবারে ছেলেমানুষের গলা। মনে হ'ল একটি বালক কথা বলছে। কথাটা আসছে আমার মাথার কিছু উপর থেকে—শূন্য হ'তে।

চারদিকে ভৌতিক নিস্তব্ধতা।

ভূত বলতে লাগল—"ভবনাথ ও আমি যে একই ব্যক্তি সে কথা বিশ্বাস করুন। তবু আপাতত আমাকে পৃথক রেখেই কথা বলছি, নইলে বুঝতে পারবেন না।

"আপনারা জানেন ভবনাথ প্ল্যানশেটে বসেছিল। কথা ছিল সে একাগ্র মনে তার এক বন্ধুর মূর্তি চিন্তা করবে। কিন্তু সে একাগ্রচিত্ত নয়। সে তার বন্ধুর সৃষ্ট এক বালকের কথা ভাবতে লাগল, তারপর তার নিজের বালক-কালের কথা। সে কালকে সে পিছনে ফেলে এসেছে অনেক দিন। অথচ সে সব সময় সেই ফেলে-আসা দিনের স্মৃতির মধ্যে ডুবে থাকতে ভালবাসে। সে জানে না যে তার বাল্যকাল অনেক দিন ম'রে গেছে। আজ আমি ভবনাথকে ছেড়ে যাবার আগে সেই কথাটা তাকে এবং আপনাদের সবাইকে জানিয়ে যাই যে আমিই তার সেই মৃত বাল্যকালের ভূত।"

এ কথায় সমস্ত দর্শক চমকে উঠল। এবং আমিও আরও একবার চমকালাম, যদিও ভূত এ কথা আমাকে রাত্রে বলেছে।

তারপর ভূত বলতে লাগল, "এই ভবনাথ এখন বোধ হয় বুঝতে পারছে তারই ভূত তারই ঘাড়ে কি ক'রে চাপে। নিজের কালকে ভাল না বেসে শুধু অতীতকে নিয়ে মেতে থাকা সুস্থ মনের পরিচয় নয়। ভবনাথের এটি একটি মানসিক ব্যাধি। ভবনাথ, বল দেখি এ ব্যাধির নাম কি?"

আমি বললাম, নস্‌টালজিয়া।

"ঠিক। আমি তার এই ব্যাধি সারাবার জন্যই তার পায়ে বাত থাকা সত্ত্বেও তাকে দৌড়ঝাঁপ করিয়েছি ছেলেবেলার মতো। ছেলেবেলার ভূতের শাস্তি এটি। এখন আমাকে সে ছাড়তে পারলে বাঁচে। আশা করি আমি ছেড়ে গেলে ও সুস্থ মানুষ হবে, কাজের মানুষ হবে। তা হ'লে এবারে আসি? নমস্কার।"

আমরা দাঁড়িয়ে উঠলাম।

অদ্ভুত অভিজ্ঞতা নিয়ে দর্শকেরা বিদায় হ'ল। আয়োজন কত সংক্ষিপ্ত, কিন্তু কত অলৌকিক। দর্শকদের বিদায় হতেই ঘণ্টাখানেক লাগল। মেয়েরা যারা এসেছিল তাদের মধ্যে অনেকেই ভূতের কণ্ঠ শুনে মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল। তাদের জন্য অ্যাম্বুল্যান্সের জোগাড় করতে হল অনেকগুলি। দর্শকদের মুখে শুধু—অদ্ভুত, অভূতপূর্ব, কল্পনার অতীত। দুচারজন অবিশ্বাসী যারা ছিল তাদের গুঁতিয়ে বা'র ক'রে দেওয়া হ'ল।

ভূত রাত্রে ঐ সব কথাই আমাকে বলেছিল। খগেন রায় সব আমার কাছ থেকে টুকে নিয়েছিল। তার ব্যবস্থা অতি পাকা। সে জানত ভূতের কণ্ঠ আর কেউ শুনতে পাবে না, তাই সে জাদুকরকে এনে বসিয়েছিল আমার পাশে। সে ভেন্‌ট্রিলোকুইজম-বিদ্যার সাহায্যে ভূতের কথাগুলো মুখস্থ ক'রে ব'লে গেল। সবাই ভাবল কথাগুলো আমার মাথার উপর থেকে ভূত বলছে। তার আগে সে নিজের কিছু কৃতিত্ব প্রোগ্রামে যোগ ক'রে ঐ বিদ্যার সাহায্যেই কয়েক সেকেন্ড গীটার বাজিয়েছিল।

হাজার হাজার লোকের টিকিট কেনা সার্থক হল, তারা অদ্ভুত অলৌকিক জিনিস দেখে গেল নিজের চোখে। ভীষণ উত্তেজনার ব্যাপার।

বলা বাহুল্য অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য এমন সর্বাঙ্গসুন্দর ও সার্থক করার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য জাদুকরকেও একটা মোটা টাকার অংশ দেওয়া হয়েছিল।

আর আমার যা ছিল না তা হয়েছে। টাকা হয়েছে এবং বিয়ে হয়েছে। ভূতটা আর ডাকলেও আসে না।

বানিয়ে বানিয়ে অনেক গল্প লিখলাম জীবনে। শূন্যে হাতড়ে হাতড়ে, মানুষ জোগাড় করলাম, তাদের গায়ে ইচ্ছেমত রং চড়ালাম, ইচ্ছেমত তাদের মারলাম কাটলাম বাঁচালাম। আবার জলজ্যান্ত সত্যি মানুষ নিয়েও কম গল্প লিখিনি।

তাদের ওপর যথেচ্ছাচার চলেনি, তারা যে যেমন রঙের সেই রঙটি সমেত পাঠকের সামনে ধরে দিয়েছি, যেমন পেরেছি না পেরেছি। গল্পের নায়ক-নায়িকার উপাদান থাকে অনেকের মধ্যে, তারা যেন সাধারণ হয়েও অসাধারণ, তারা আমাদেরই মত হাসে কাঁদে খায় ঘুমোয়, কিন্তু সেই হাসিকান্নার মধ্যে থেকেই গল্প উঁকি মারে। মনে হয়, 'একে নিয়ে তো গল্প লেখা যায়।'

যেমন আমাদের তরুদি, যেমন উষা-বৌদি, যেমন দুলুকাকা, কি যেমন অমূল্যমামা। এ'দের নিয়ে ভেবেছি, এ'দের নিয়ে লিখেছি।

এমন কি বটুডাক্তার আর বিধু-কবরেজকে নিয়েও গল্প লিখেছি। কিন্তু কৃতান্ত ভট্টাচার্যকে নিয়ে গল্প লিখবো, একথা কোনদিন ভাবিনি। সেদিনও যদি কেউ এসে আমায় বলতো, 'কৃতান্তকে নিয়ে লেখনা—', আমি তাকে পাগলা-গারদে যাবার পরামর্শ দিতাম, কিন্তু আজ আমিই বসেছি কাগজ-কলম নিয়ে।

বসতেই হ'ল।

না না তা নয়। ভট্‌চায আমাকে কাকুতি-মিনতি করেনি। যেমন করেছিল তরুদি আর দুলুকাকা। ওদের ওই কাকুতি-মিনতিটাই গল্প হয়ে উঠেছিল আমার। কৃতান্ত ভটচায ওদের মত নয়, বরং ঠিক উল্টো। আমি ওকে নিয়ে গল্প লিখবো জানতে পারলে রক্ষে রাখতো না। যারা বানিয়ে বানিয়ে কতকগুলো মিথ্যে কাহিনী লেখে তাদের দু'চক্ষে দেখতে পারে না কৃতান্ত।

আমাকেও পারে না।

দেখলেই বলে, 'রাতদিন কাগজের ওপর কলম ঘসে ঘসে কী স্বর্গলাভ হয়? যা যা, তার চেয়ে বরং গরুর খড় কুচোগে যা। তবু বুঝবো বিশ্ব-সংসারের কিছু কাজ করছিস।'

যেন কৃতান্ত ভটচাযের বোঝা না বোঝা নিয়েই বিশ্ব-সংসার চলছে, চলবে। তা' সে কথা তো আর মুখের ওপর বলা যায় না, বরং এমন অপরাধী ভাবই দেখাতে হয় যাতে মনে হয়

আমিও জানি গরুর খড় কুচোনোর চাইতে উল্লেখের কিছু করছি না আমি।

আমার এই অপরাধীভাবে অবশ্য কৃতান্ত প্রীত হয়। বলে 'একটা মাত্তর মিথ্যের ফলে রাজা যুধিষ্ঠিরের নরক-দর্শন ঘটেছিল। আর তোরা—এই গল্প-লিখিয়েরা, রাতদিন মিথ্যের চাষ করছিস! ছিঃ। যে জগৎ নেই, সেই জগতের ওপর ফুল কাটছিস। বলি সত্যি জগতের ওপর একটা কলমের আঁচড় কাটবার ক্ষমতা আছে? তা তো নেই? তবে আর কেন মিথ্যে...।'

কৃতান্ত ভটচাযের মুখে 'সত্যি-মিথ্যে' 'স্বর্গ-নরক' শুনলে কৌতুক অনুভব না করে পারি না। কারণ ব্রাহ্মণের ঘরের 'চন্ডাল' এই কৃতান্তর আর যাই হোক 'সত্যের স্বর্গে' ঠাঁই পাবার কোন আশা আছে, এমন মনে হয় না।

পুরুত বামুনের ছেলে কৃতান্ত 'ঘোষার প্লাটে' বসে চা খায়, বাগদী-বাড়ী ভাত খায়। আর গাঁজাটা খায় শ্মশানে বসে পাগা ডোমের সঙ্গে। কৃতান্তর বন্ধুকুল ওই সব 'উচ্চকুলের' স্বয় এক একখানি।

তবু কৃতান্ত পাড়ার পুরুত।

সকালবেলা ধোবাপুকুরে একটা ডুব দিয়ে তোহারতা একটা পেতলের সাজি হাতে করে ফুল তুলে বেড়ায় কৃতান্ত, তারপর সেই না বলে চেয়ে নেওয়া ফুলগুলি দিয়ে বংশগত সম্পত্তি 'দামোদরে'র পুজোপাঠ সেরে যজমানিতে বেরোয়—।

বারোমেসে পুজো আছে কিছু কিছু। কার বাপঠাকুর্দা কোথায় শিব-প্রতিষ্ঠা, বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠা, কি কোন দেবী-প্রতিষ্ঠা করে রেখে গেছে, নাতিপুতি কৃতান্ত ভটচাযকে মাস মাস কিছু দিয়ে নিত্যপুজোর ঠাট বজায় রেখে পিতৃ-পিতামহের সেই অবিমৃষ্যকারিতার দায় পোহাচ্ছে।

তা'ছাড়া—'নৈমিত্তিক' পুজোও আছে, থাকে প্রায়ই। নমো নমো করে লক্ষ্মী-পুজো আছে, সত্যনারায়ণ আছে, শ্রাদ্ধ-পিন্ডি, 'বার্ষিক' একোদ্দিষ্ট এগুলোও আছে। প্রথা না থাক, প্রথার কঙ্কালটা তো টিকে রয়েছে এখনো সেরস্থঘরে? মেয়ে-বৌগুলো হাসপাতাল থেকে আঁতুড়ের ঝামেলা মিটিয়ে এলেও, আর 'যেঠেরা', 'আটকৌড়ে' উঠে গেলেও তাদের মুখ করিয়ে নিতে একুশো বাঁট্টা করছে এখনো অনেকে। অন্ততঃ কৃতান্ত ভটচাযের গ্রামে এখনো আছে এসব। শুনতে কলকাতা থেকে মাত্র তেরো মাইল, কিন্তু আসলে অনেক দূরে আছে এরা।

অতএব রোগা পাকসিটে কালো যক্কি, কটুভাষী অনাচারি কৃতান্ত ভটচায, যজমানিতেই চালিয়ে যাচ্ছে। তা' ছাড়া বাপপিতামোর আছেও কিছু। অবিশ্যি সংসারই বা কি? 'অপনি বৈ উনি তিনি' তো কেউ নেই?

কৃতান্ত অকৃতদার।

লোকে বলে, 'দেখতে অত খারাপ ছিল না কৃতান্ত। একহারা শ্যামবর্ণ, মুখশ্রী মন্দ নয়, মোটামুটি এই ছিল ওর আকৃতি। কিন্তু কথায় বলে, রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট, প্রকৃতির দোষে আকৃতি নষ্ট। গাঁজা খেয়ে খেয়ে পরে নাকি ওই কদর্য চেহারা হয়েছে ওর। চেহারার দোষে বিয়ে জোটেনি ওর, এটা ভুল। কানা-খোঁড়ারও বিয়ে হয়, তা' কালো কুৎসিত!

আসলে বিয়ে হয়নি ওর নামের দোষে। যার যত ফেলনা মেয়েই হোক, 'কৃতান্ত'র হাতে কে মেয়ে তুলে দিতে চায়?

চায়নি।

তাই বিয়েও জোটেনি কৃতান্তর।

ওর মৃৎবৎসা মা নামের ফাঁদে স্বয়ং কৃতান্তকে ধোঁকা দিয়ে এই একটা ছেলেকে কোনরকমে পৃথিবীর আলো-বাতাসের দাবীদার করে রেখে যেতে পেরেছে বটে, কিন্তু কৃতান্তর সে গুড়ে বালি। কৃতান্ত জগতে কাউকে রেখে যেতে পারবে না।

অবিশ্যি তার জন্যে কৃতান্ত মনঃক্ষুন্ন নয় মোটেই। ও বেলা বারোটা অবধি ওই বাড়ী বাড়ী ফুল ফেলে বেড়ায়, তারপর বাড়ী এসে দুটো ভাত সেদ্ধ করে খায়, এবং খাওয়া-রূপ পাপ-কর্মটা চুকিয়ে নিয়েই হৃষ্টচিত্তে হয় ছাতা বগলে কলকাতায় ছোটে কোর্টে হাজরে দিতে, আর নয়তো মামলার কাগজপত্র বগলে করে ছোটে পণ্ডা ফিচেলের বাড়ী।

না, 'ফিচেল' অবিশ্যি কোনও আইন-সম্মত পদবী নয়, কিন্তু পাড়াসুদ্ধ সবাই পণ্ডাকে পণ্ডা 'ফিচেল'ই বলে। বলতে বলতে, ওটা যেন পণ্ডার পদবীতেই দাঁড়িয়ে গেছে।

এই পণ্ডা কৃতান্তর প্রাণের গুরু।

যত কূটকচালে বুদ্ধি সাপ্লাইয়ের রাজা। আর সে বুদ্ধি সাপ্লাই না করলে চলবে কেন? পণ্ডা আছে বলেই না কৃতান্ত একটা উত্তেজনাময় কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে রাখতে পেরেছে এত-দিন?

তেরো বছর ধরে একটা মামলা লড়ছে কৃতান্ত। তা'ও মিথ্যে মামলা। যে জিনিস ওর নয়, দশেধর্মে জানে বোঝে, সেই জিনিস নিয়ে এই লড়া-লড়ি।

আর প্রতিবাদিনী কে?

না একটা অসহায় বিধবা।

যে বিধবাটা নাবালক ছেলে নিয়ে একলা যুঝছে পৃথিবীর সঙ্গে। কৃতান্ত তাকে তপ্ত শাল দিচ্ছে। সবাই জানে সুশীলা যে বাড়ীতে বাস করে, সেটা আর তার আনুষঙ্গিক যে বাগান-পুকুর, ধানজমি আছে, সবই সুশীলার মামার। যে মামার ছেলেপুলে ছিল না, আর যেখানে সুশীলা আজন্ম মানুষ হয়েছে।

আজন্ম, আজ অবধি।

নড়েনি কোনদিন কোথাও।

বিয়ে হয়ে শ্বশুরবাড়ী যাবে, তাও নয়। মামাদের অবস্থা ভাল, তারা সংসারে কেউ নেই বলে ভাগ্নীর বিয়ে দিয়ে ঘরজামাই রেখেছিল।

তা' জামাইয়ের বোধহয় আয়েস সইল না, মরেই গেল। ছেলেটা তখন সুশীলার মাত্র মাস আষ্টেকের।

সুশীলার জীবনটা দুঃখের সাগর।

যা পায় তা ভোগ হয় না। মামামামী আদর করে বিয়ে দিয়ে ঘর-জামাই পুষল, নাতি হবার আশায় গয়না গড়িয়ে দোলনা কিনে আকাশ-পানে চেয়ে চেয়ে দিন গুনতে লাগল, পোড়া ভাগ্যে সেই মামামামী থাকতে আর তাদের নাতি দেখাতে পারল না সুশীলা।

বিয়ের পর পাঁচ-সাত বছর কাটল। ঠাকুর দেবতার দোর ধরতে ধরতে মামী হতাশ হয়ে উঠল, শেষ অবধি মারাও গেল। দু'দিনের আড়াআড়িতে দু'জনে। কলেরায় সেবার অনেক লোক মরেছিল গ্রামের।

দুঃখে-শোকে প্রথমটা হাতের মাদুলী গলার কবচ সব খুলে ফেলে-ছিল সুশীলা, আবার হাহাকরা শূন্য প্রাণের দায়ে নিজেই নতুন করে জোগাড় করতে সুরু করল।

আর অবশেষে একদিন মিলল দেবতার বর। তিন মাইল দূরে পায়ে হেঁটে একলা গিয়ে কোন ফুলন্ত ডালিম গাছে 'মানসিক' বেঁধে এসে জ্বরে পড়ল সুশীলা, কিন্তু সে জ্বর থেকেই অঙ্গ জরজর।

ছেলে হল রূপের কান্তি।

শ্যামবর্ণ রঙ্ হলে কি হবে, নাদুস-নুদুস যেন যশোদার গোপালটি! স্বামী-স্ত্রী দু'জনে গিয়ে মানসিক ছাড়িয়ে এল,

সুশীলায় বায়নায় অন্নপ্রাশনে ঘটাও হল বেশ, কিন্তু নিভল রোশনাই বাতি।

স্বামী মারা গেল সুশীলার।

ছেলে নিয়ে একা সুশীলা।

তবে পয়সার অভাব নেই এই যা। কিন্তু মানুষের অভাবও তো কম অভাব নয়? যা আছে তা রাখে কে? কে দেখে, কে শোনে? সেই দুঃখেই এবাড়ী ওবাড়ী হাতড়ে বেড়াচ্ছে সুশীলা, এমন দুর্দিনে কৃতান্ত ভটচায দিল এক নালিশ ঠুকে।

কী?

না, সুশীলা যা কিছু ভোগ করছে, সবই না কি কৃতান্তর। কি বার্তা? কি করে? কেন পড়েই আছে শাদা কথা। যে ব্যক্তি সুশীলার মামা, সেই ব্যক্তিই কি কৃতান্তের পিসেমশাই নয়? সুশীলার মামী কৃতান্তের আপন পিসি ছিল না?

কথাটা অবিশ্যি মিথ্যে নয়।

সুশীলার মামীর নিজের ভাইপো ওই গেঁজেল লক্ষ্মীছাড়া কৃতান্ত। কিন্তু তাতে কি? ঘনশ্যাম চক্রবর্তী কি তাঁর বিষয়সম্পত্তি নিজের মানুষ-করা সোনার প্রতিমা ভাগ্নীকে না দিয়ে, পরিবারের অকালকুষ্মাণ্ড ভাইপোটাকে দিয়ে যাবেন?

কৃতান্ত বলে, তাই গেছেন তিনি।

কৃতান্তকেই দিয়ে গেছেন যথা-সর্বস্ব। আর সেই দানপত্রের দলিল কোর্টে দাখিলও করেছে কৃতান্ত ভটচায।

লোকে বলে জাল দলিল।

পণ্ডা ফিচেল কোর্টে কাজ করে। এ গ্রামের যার যা লেখবার ওই লেখে। দলিল লেখার কায়দাও জানে। তার সেই জাল করার কায়দাও নাকি তার কাছে জলের মত।

এদিকে সুশীলা বেচারীর হাতে প্রমাণপত্র বলে তেমন কিছু নেই। এমন কি মামা তার কাগজপত্তর কোথায় কি রাখত, বা রেখে গেছে, তাই জানে না ভালকরে। এবাড়ীতে থাকতে হলে যে আবার তাকে দাবীদারের প্রমাণ দেখাতে হবে, তা' বোধকরি কোনদিন স্বপ্নেও ভাবেনি। যেদিন শুনল কৃতান্ত দলিল দেখিয়েছে, সে দিন মামা-মামীর বিশ্বাস-ঘাতকতায় 'কাঠ' হয়ে গেল।

কিন্তু ঝিউড়ি মেয়ে সুশীলা, তা বলে 'কুসুম সুকুমারী' নয়। মোটামুটি দজ্জালই বরং। তাই সেই কাঠ ভাব কাটতেই ছুটলো কৃতান্তর বাড়ী, আর পাড়ার লোক জড় করে যাচ্ছেতাই গালা-গাল দিয়ে এল তাকে। গালাগালের বহর আর জয় শুনলে কে বলবে পরিচ্ছন্ন স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেকার মেয়ে।

যেন সংসারের ঝানু পঞ্চাশ বছরের প্রৌঢ়! আমীর্‌পিসী 'সেতু'র সুবাদে একদা যে কৃতান্তের সঙ্গে কত খেলেছে, কত হাসি গল্প করেছে, কৃতান্তের ওই ইস্কুল কলেজ ছেড়ে বজ্‌জেনে বামুন হয়ে যাওয়া দেখে ঠাট্টা করেছে, সে সব ভুলে গেল সুশীলা।

কিন্তু ভুলবে নাই বা কেন?

কৃতান্ত ভোলেনি?

কৃতান্ত যদি ওই চেনা-জানা, 'আত্মীয়' বললেও হয়, মেয়েটাকে অসহায় উপরে ঠকাতে আসে, সুশীলা আবার মৃদু-ভাষিণী হতে যাবে কিসের দায়ে?

সেই লেগে গেল খটাখটি।

আর লেগেই আছে এযাবৎ।

তেরো বছর ধরে চলছে।

দু' বছরের ছেলেটা সুশীলার পনেরো বছরের হলো, সুশীলার সেই যৌবন অপা কালিমার্ত হলো চুলের রাশ কেটে 'ওয়ার' করলো নিজে হাতে করে, কিন্তু মামলা চলছেই।

যেমন দিনের পর রাত, আর রাতের পর দিন, এবং শীতের পর বসন্ত, আর

বসন্তের পর গ্রীষ্ম আসাটা একটা অনিবার্য নিয়ম, তেমনি অনিবার্য নিয়মে আদালতে 'দিনের' পর আবার 'দিন' আসে।

অবিশ্যি অসহায় মেয়ে বলে মামলা চলার কোন ব্যাঘাত ঘটছে না সুশীলার। এ ব্যাপারে হিতৈষী জুটেই যায়। মামলা মকদ্দমায় জগতের সেরা রস পায়, এমন ব্যক্তির অভাব নেই জগতে।

সুশীলা একদিকে চালায় মামলা, আর একদিকে চালায় গলা। গালাগালি, শাপ-শাপান্ত, শাপমন্যি, এ সবের স্টক ফুরোয় না সুশীলার। দিনভোর ঘুরে বেড়ানো কৃতান্তকে যে কোন জায়গায় একবার ধরতে পারা কিছু শক্ত নয়, দু'বার চারবারও হয়ে যায় কতদিন।

'সুশীলা সুরু করে গালাগালের ছড়া।

'মড়িপোড়া মুখপোড়া, বামুনের ঘরের চাঁড়াল...মুচি...মুদ্দফরাস' কোন কিছু বাদ রাখে না সুশীলা।

তবে মস্ত একটা অসুবিধে এই, স্ত্রী-পুত্র নেই কৃতান্তর।

কাজেই অভিশাপের সেরা অভিশাপ 'নির্বংশ হ'-টা বলা চলে না। যেটা বুকে বাজে, প্রাণে লাগে।

সুশীলার আক্রোশবাণীটা তাই যেন বাতাসে মাথা কোটে। আর কৃতান্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখে।

হ্যাঁ দাঁড়িয়েই থাকে, চলে যায় না।

কাঠি কাঠি হাত দুখানা বুকের ওপর আড় করে রেখে দিব্যি হাসি হাসি মুখে দাঁড়িয়ে থাকে। অবশ্য ওর ওই পেশী-সর্বস্ব মাংসহীন মুখটা যতটা হাসি হাসি হওয়া সম্ভব। ব্যঙ্গ হাসির ধারালো ছুরি আর কি।

অনেকক্ষণ বলে সুশীলা যদি একটু হাঁফ জিরোয়, প্যাঁচা মুখ ব্যঙ্গে বিকৃত করে কৃতান্ত বলে, 'এক্ষুনি ভাঁড়ার ফুরিয়ে গেল? সে কি। তাহলে আজ আর ক্ষিদে হবে না তোর।'

বলা বাহুল্য নিত্যঘটনা হলেও, সুশীলার কণ্ঠঝঙ্কার দু পাঁচজনকে নিকটে টেনে আনেই। তাদের মুখে চোখে ওই বাক্যোক্তির প্রতিক্রিয়া দেখে দ্বিগুণ জ্বলে ওঠে সুশীলা, সাপের মত সরু চকচকে হাত দুখানা প্রায় ওর মুখের কাছে নেড়ে চিৎকার করে ওঠে, 'এখন ক্ষিদে বাড়িয়ে কি করবো? ক্ষিদে বাড়াবো তোমার ছেরাদ্দর দিন। পেট ধুয়ে বসে থাকবো। কবে ওলাউঠো ধরবে তোমায়, কবে তোমার তেরাত্তির পোয়াবে না, তারই দিন গুনছি আমি।'

নির্বিকল্প নির্বিকার কৃতান্ত বলে, 'শুধু ওলাওঠো? বসন্ত, যক্ষ্মা, টাইফয়েড ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, কালাজ্বর সবাইকে ডাক। যে পারে। যে তোর প্রতি সদয় হয়। কিন্তু ছেরাদ্দর লুচিটা খাবি কার কাছে? সেটা আদায় করবে কে? এক তুই যদি নিজেই বেওয়ারিশ বামনা বলে—'

সুশীলা আঙুলগুলো মটকে মটকে বলে, 'মর মর, এক্ষুনি মর তুমি! যে চুলোয় বসে গাঁজা গেলো, সেই চুলোয় গিয়ে পড়গে। 'পাকুড়তলা'র ডোম তোমার মুখে আগুন দিক।'

কৃতান্ত বলে, 'বালাই ষাট্, ডোম কি বল? তোরাই পাঁচজনে দিয়ে দিবি? কি বল হে? তোমাদের পুরুত আমি, ডোমে পোড়াবে আমায় এটা কি নেয্য কথা হলো? যাইহোক, তুই তবু একটা আপনার লোক।'

সুশীলা অতঃপর ধেই ধেই করে ওঠে। তিনশো তেত্রিশবার মরণ 'টাঁকে' কৃতান্তর, তবে নিজের কাজে যায়।

কৃতান্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসে। বলে, 'মদ গাঁজার মত, এও একটা নেশা জন্মে গেছে ওর।' বলে, 'ওই ঝড় বৃষ্টি—বজ্জরটা পেটের মধ্যে ভরে রাখলে ক্ষিধে হবেই বা কি করে?'

যেন সুশীলার ক্ষিধে হওয়াটা ভারী একটা দরকারি কথা। তার জন্যে গ্রামসুদ্ধু লোকের পুরুতকে 'যমের দক্ষিণ দোরে যাও, তিনদিনের বাসি মড়া হয়ে থাকো'—বলা চলে।

মরার বাড়া গাল নেই, তাই ঘুরে-ফিরে ওই কথাটাই বলে সুশীলা, নানা ছন্দে, নানা সুরে।

কৃতান্ত ভটচায সমবেত জনতার দিকে তাকিয়ে বলে, 'দেখেছিস তোরা? বুদ্ধি দেখেছিস আমাদের সুশীলাবালার? বলি আমি আবার কার দোরে যাবো? নিজেই যম।'

তা এ তো ছিল নিত্যকার ঘটনা।

চন্দ্র-সূর্যের নিয়মের মত একটা নিয়ম হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ক্রমশঃই ব্যাপারটা জয়াবহ দাঁড়াচ্ছে। কারণ কলিকালের রীতি অনুসারে অধর্মের জয় আর ধর্মের পরাজয় সূচিত হচ্ছে।

কৃতান্ত জিতছে।

'তিন কোর্টের' মামলা।

দু কোর্টে নাকি সুশীলা জিতেছিল, কিন্তু এই শেষ কোর্টে সুশীলা পথে বসলো।

আদালতে নাকি প্রমাণিত হয়েছে, দলিল জাল নয় খাঁটি। এবং সেটাই স্বাভাবিক। নিঃসন্তান ঘনশ্যাম নিজের বোনের মেয়ের চাইতে, স্ত্রীর ভাইয়ের ছেলেকে প্রাধান্য দেবে, এটাই ন্যায়সংগত। কারণ বিষয় কৃতান্ত পেলে সেটা ঘনশ্যামের শ্বশুরের বংশে রয়ে গেল, কিন্তু ভাগ্নী সুশীলা পেলে?

কিছু না।

সুশীলার বর অথবা ছেলে, তারা কি আরো নিকট হলো? পেতে তো তারাই পাবে?

পাকাপাকি রায় বেরোবার আগেই খবরটা জানাজানি হয়ে গেল। আর সুশীলা মরমে মরে গিয়ে বিছানা নিল। সত্যি যে এমনটা হতে পারে, তা তার ধারণা ছিল না।

পাড়ার লোক, যারা ওই নিত্য গালা-গালির শ্রোতা ছিল, একটা 'চরম' কিছুর আশা করেছিল, তারা একটু হতাশ হলো, বাড়ী বয়ে দেখতেও গেল সুশীলার অসুখটা কতদূর।

তা' মনের অসুখও অসুখ বৈকি।

তা'তেও মানুষকে দুর্বল করে, শীর্ণ করে, কালিবর্ণ করে।

সুশীলার ছেলে সূর্য জ্ঞানাবধি এই মামলা দেখছে। মামলার কথা দিয়েই তার নাড়ি কাটা। কৃতান্ত যে তাদের পরম শত্রু এ তার হাড়ে শিরে মাংশে মজ্জায় গাঁথা। ছেলেবয়েস থেকেই ভাবতো ওর যদি একটা অনিষ্ট হয় তো সে দুহাত তুলে নাচে।

কিন্তু কৃতান্তর আর অনিষ্ট কি? আজ মরলে কাল টেনে ফেলে দেবে লোকে, ফুরিয়ে যাবে সব।

ও যে এই তেরো বছর মামলা লড়েছে, এই এক রহস্য।

লোকে তো বলতো, 'গাঁজার-নেশার মত, এ ওর একটা নেশা। সর্বস্বান্ত হয়ে হেরে মরবে।'

তা' সেই হেরে মরার দিনটার আশায় আশায় ছিল সূর্য। কিন্তু এ কী!

পনেরো বছরের প্রায় জোয়ান হয়ে ওঠা রক্ত আগুন হয়ে উঠল।

অবিশ্যি একথা আমার শোনা কথা। ওদের বাড়ীর ঝি রাষ্ট্র করে বেড়িয়েছিল, সূর্য না কি ওর মার অনুমতি চেয়েছিল, ওই পাজী ভটচাযটার দফা গয়া করে

দেখায়। সুশীলা বিরক্ত ভাবে বলেছিল, 'থাম্ থাম্ ঢের মুরোদ দেখিয়েছিস!'

কিন্তু রায় বেরোনোর ঠিক পরের-দিনই ঘটে গেল ব্যাপারটা। ভোরবেলা যখন কৃতান্ত ধোবার পুকুরে ডুবটা দিয়ে, তার সেই লিকলিকে দেহটা গামছা দিয়ে রগড়াচ্ছিল কোথা থেকে একখানা ইঁট এসে তার মাথায় লাগল। আস্ত থান ইঁট।

ব্রহ্মরক্তে পুকুরের জল লাল হলো। আশপাশের ধোবাকুলের যাই ভাগ্যিস চোখে পড়েছিল, তাই লোকটা হাস-পাতালে যেতে পেল, একটু ওষুধ ব্যান্ডেজও পড়ল।

সন্দেহ রইল না কারুর, এ কাজ কৃতান্তর শত্রুপক্ষের, কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখেনি কেউ।

সূর্য তো আজ তিনদিন গ্রামছাড়া। কলকাতায় পিসির বাড়ী গিয়ে বসে আছে। আর সুশীলা খবর পেয়ে এমন পাথর হয়ে গেল যে, সেটা 'অভিনয়' ভাবা কঠিন।

কিন্তু করলই বা কে?

আকাশ থেকে বাজ পড়তে পারে, থান ইঁট পড়ে না।

তা, ওর আর হদিস হলো না।

ঘরে ঘরে আলোচনাই চলল। তাও যদি সঙ্গে সঙ্গে মরতো, তাহলে খুনের চাঞ্চল্য নিয়ে হয়তো একটা তোলপাড় খোল কান্ড হতো। কিন্তু তক্ষুণি মরল না কৃতান্ত ভটচায। দেড় মাস ধরে কাৎরে কাৎরে, হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ী এসে মারা গেল।

শ্মশানঘাটে মৃত্যুর কারণ লেখা হল 'ক্ষত বিষাক্ত হইয়া মৃত্যু'।

ওর গাঁজার সঙ্গী 'পদা' ডোমই না কি শেষ ছাড়পত্র দিল ওকে। পদা না কি দেখে মুখ বিকৃত করে বলেছিল, 'দূরে শালা, মর্লি মর্লি, পিশিন্ডি'র হাতে মর্লি!'

যারা সঙ্গে গিয়েছিল তারা কথাটার মানে বুঝতে পারল না, গেঁজেল ডোমটার কথায় কানও দিল না।

কিন্তু পরবর্তী ঘটনাটা ঘটলো একটা অভাবনীয় নাটকের মূর্তিতে। পণ্ডা ফিচেলই ফাঁস করলো খবরটা। মরবার আগে কৃতান্ত ওই তেরো বছরের মামলায় পাওয়া যাবতীয় বিষয়, আর নিজের পৈত্রিক যা যেটুকু ছিল সব, লেখাপড়া করে দিয়ে গেছে সূর্যর নামে।

কৃতান্তর মামলা-জেতা, এবং কৃতান্তর ইঁট খাওয়ার চাইতে আরো অনেক বেশী চমকপ্রদ হল খবরটা।

গ্রামসুদ্ধু লোক ঝেঁটিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল সুশীলার বাড়ী।

কী ব্যাপার, কী ব্যাপার।

সুশীলা পাথর মুখে বলল, 'ব্যাপার আর বুঝতে পারছ না? মরণকালে জ্বরচ্ছেদ। অনুতাপে জ্বলে পুড়ে মরেছে। বুঝেছে এই মহাপাতক নিয়ে মরলে অপদেবতা হয়ে ঘুরতে হবে, গতি হবে না। তা' দিয়ে তো আবার ছুঁচ বিঁধিয়ে রেখেছে, নাও এখন ব্যবস্থা করে দাও তোমরা। শর্ত না পাললে যখন বিষয় পাচ্ছে না সুবু—'

হ্যাঁ শর্ত একটা রেখেছে কৃতান্ত।

বেশ কড়া একখানি শর্ত।

কৃতান্তর শ্রাদ্ধ করতে হবে সূর্যকে! পুরোদস্তুর ষোড়শ দান করে, ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে! আর 'দামোদর'টার ভার নিতে হবে।

শ্রাদ্ধ হয়ে গেল আজ।

ব্রাহ্মণরা আকণ্ঠ খেয়ে মন্থরগতিতে ফিরছে কৃতান্তর বাড়ী থেকে। সূর্য সবাইকে দক্ষিণা দিয়েছে গলবস্ত্র হয়ে।

এই বাড়ীতেই হল।

নিজের বাড়ীতে করতে দেয়নি সুশীলা। তা' কৃতান্ত ভটচাযের ভিটেটাও তো এখন সূর্যর। সেই প্রাপ্তির আহ্লাদে সূর্যর মুখ চোখ জ্বলজ্বল করছে।

কৃতান্ত ভটচাযকে নিয়ে গল্প লিখবো একথা কোনদিন ভাবিনি, কিন্তু আজ লিখছি। কৃতান্তর ক্ষীণ হয়ে আসা কন্ঠের কথাগুলো কানে বাজছে......'কেন জানি না কাউকে বলে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। পাপের স্বীকার না করলে শুনেছি গতি হয় না।' দম নিয়েছিল কৃতান্ত, তারপর বলেছিল, 'অনেক খোসামোদ করেছিলাম পিসিকে, পিসি বলল, 'ঘরে ঘরে বিয়ে! ছিঃ!'

'কোথা থেকে একটা লক্ষ্মীছাড়া ফাঁপাবাপকে ধরে এনে লক্ষ্মী-প্রতিমাটাকে তুলে দিল তার হাতে। রূপ ছিল পাজীটার, কিন্তু মাকাল ফল। মেয়েটা বোকা ছিল, অতশত বুঝত না, 'ছেলে ছেলে করে উন্মাদ। নিজেকেই নিষ্ফলা ভেবে দশ বিশ সের মাদুলি কবচ চাপাচ্ছে।......একদিন জনমানবশূন্য এক জঙ্গলের পথে আসছি পাখী মেরে, দেখি একা গলদঘর্ম হয়ে কোথায় চলেছে। কি না তিন মাইল পথ ভেঙে কোন চুলোয় যাচ্ছে মানসিক করতে।' মুখটা বিকৃত করল কৃতান্ত, 'দেখে রাগে আপাদমস্তক জ্বলে গেল। মেজাজ ঠিক রাখতে পারলাম না। বলে দিলাম, ওসব ছাইপাঁশ করে হবেটা কি? মাদুলি কবচের বাবারও সাধ্য নেই। তোর ওই ফাঁপাবাপটা দিয়ে মনস্কামনা পূর্ণ হবার আশা ছাড়।

'বোকা মেয়েটা চমকে গেল, হাঁ হয়ে গেল. তারপর বুনো জানোয়ারের মত ক্ষেপে উঠল। ক্ষেপে গিয়ে বলল, 'বেশ যাব না মানসিকে।—প্রমাণ দেখাতে পারো তোমার কথার—'

বাধা দিয়েছিলাম কৃতান্তকে।

বলেছিলাম, 'থাক, তোমার মাথায় চাড় পড়বে।'

কৃতান্ত হেসে বলেছিল, 'চাড় আর কোথাও পড়ে না রে। গাঁজার দমে সব আলগা করে দিয়েছি।'

শুনতে পাচ্ছিলাম অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে। তারপর যেদিন দেখতে গিয়েছিলাম— সেদিন বলেছিল, 'বলছিস —এত 'ইয়ে' ছিল তো মামলা বাধিয়ে উৎখাত করলাম কেন? ভেবেছিলাম 'শত্রুর ঘর' করে রেখে লোকচক্ষে ধুলো দেব। এতবড় শত্রুকে নিয়ে সন্দেহটা উঠবে না কখনো।......আর কি জানিস? তবু তো একটু যোগসূত্র। কাগজেপত্তরে আইনে-আদালতে ওর আর আমার নামটা তো একসঙ্গে ঘুরছে। গালমন্দর খাতিরেও তো দুবেলা দেখা হচ্ছে। এই একটা আমোদ আর কি। কে জানতো এতখানি মিথ্যে নিয়ে মামলায় আমিই জিতে যাবো। ভাগ্নিরের চোটে পণ্ডাই এটি করল। ডোবাল আমায়।'

এর দু'দিন পরেই মারা গিয়েছিল কৃতান্ত।

আজ শ্রাদ্ধ চুকে গেল।

বিষয়ের লোভে সুশীলা ছেলেকে দিয়ে ওই চিরশত্রুটার শ্রাদ্ধ করালো বলে সুশীলাকে ধিক্কার দিচ্ছে অনেকে। আবার সুশীলার মহত্ত্বকে সাধুবাদও দিচ্ছে কেউ কেউ। সুশীলা নাকি বলেছে, 'উইলে শর্ত না থাকলেও জলপিন্ড একটু দেওয়াতামই সূর্যুকে দিয়ে। যতই হোক মামীর বাপের বংশ। মামী আমার মায়ের মত ছিলেন।'

না, আমি সুশীলার কথা ভাবছি না।

আমি ভাবছি সূর্য কোন মন্ত্রে পিন্ডদান করলো?

চতুর্থ কোণ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

আমার কথা :

আজ রবিবার, সকাল আটটা বাজল। বাইরের ঘরে বসেছি খবরের কাগজটা নিয়ে। এবং মনটা আশঙ্কায় কাতর হয়ে ভাবছে, একটু পরেই মল্লিক আসবে। তাকে কোনোমতেই ঠেকানো যাবে না, কারণ কাব্যের ভাষায় সে মৃত্যুর চাইতেও দুর্বার।

আর মল্লিক যেদিন আসবে, সেদিন আকাশ ভাঙা বৃষ্টি নেমে আমাদের এই গলিটাকে আগে থেকেই ডুবিয়ে দেবে না। বরং সে-রকম যদি একটা প্রচণ্ড গোছের বৃষ্টি-বাদল হয়ই, তা হলে সেটা শুরু হবে ও আমার বাড়ীতে পৌঁছোবার পর। অর্থাৎ যাতে আরো ঘণ্টা দুই নিশ্চিন্তে বসে যেতে পারে। এই যে আধমাইলটাক ও হেঁটে আসে, তাতে কোনোদিন ওকে ষাঁড়ে গুঁতিয়ে দেয় না, কিংবা কলার খোসায় পা পিছলে আছড়েও পড়ে না (অবশ্য এই চাইতে কোনো বড়ো অপঘাত ওর আমি কামনা করি না)। দাড়ি কামানোর পর যেমন তার অলক্ষিত পুনরুত্থান অনিবার্য, তেমনি সপ্তাহের দুটি দিন মল্লিকের আবির্ভাব একেবারে প্রাকৃতিক নিয়মের অন্তর্গত। মল্লিক জানে, বুধবার কলেজ আমার ক্লাশ থাকে না আর রবিবার আমার স্বাভাবিক ছুটি।

বিকেলে দেশবন্ধু পার্কে একদিন বেড়াতে গিয়ে মল্লিককে আবিষ্কার না করা পর্যন্ত খুব সুখে ছিলুম আমরা, আমি আর আমার জার্ণালিস্ট বন্ধু জীবেশ। জীবেশ কবি, আধুনিক সাহিত্য তার নখদর্পণে। যদিও দুজনে একসঙ্গে আমরা বি-এস্‌সি পাশ করেছিলুম, কিন্তু জীবেশের মন পড়ে ছিল সাহিত্যের দিকে। কাজেই ও তখুনি খবরের কাগজে সাব-এডিটার হয়ে ঢুকে পড়ল আর কবি হিসেবে নামও করে ফেলল দারুণ। আমি

এম-এস্‌সি পেরিয়ে কলেজের মাস্টারীতে ঢুকলুম, আপাতত সেই গোয়ালেই আমার জাবর-কর্তন চলছে।

তবু, জীবেশ আমাকে ভোলেনি, সময় পেলে আড্ডা দিতে আসে, বলতে কি, কবিতা পড়ার নেশাও একটু ধরিয়েছে। লিখি না, কারণ, 'ইথাইল-মিথাইলে'র চাহিদা মিটিয়ে ওটা আর সম্ভব হয় না। তবু বেশ কেটে যাচ্ছিল। হঠাৎ মাঝখানে মল্লিকের আবির্ভাব।

সেদিন দেশবন্ধু পার্কে দক্ষিণের বাতাস দিচ্ছিল, বিশাল পার্কে প্রচুর লোকজন থাকলেও কারো গায়ে গায়ে ঠেকছিল না, আকাশে ভালো একটা চাঁদ ছিল আর সামনের পুকুরটায় জলে আলো ছায়া দুলছিল। তখন অবশ্য জীবেশ কবিতা আওড়াচ্ছিল না, ঘাসের ওপর বসে—পা ছড়িয়ে সিগারেট খেতে খেতে, আমরা দুজনে ক্রিকেট সম্পর্কে আলোচনা করছিলুম এবং রোহন কানহাই আর ওরেলের খেলা নিয়ে রোমাঞ্চিত হচ্ছিলুম।

মল্লিক বোধ হয় পাশ দিয়ে যেতে যেতে, আমাদের আলোচনা শুনে দাঁড়িয়ে পড়েছিল—আমরা লক্ষ্য করিনি। হঠাৎ শুনলুম, 'দাদা, আপনাদের ডিস্‌কাশনে জয়েন করতে পারি কি?'

আমরা তাকিয়ে দেখলুম, লোকটি দু-এক বছরের বড়োই হবে আমাদের চাইতে। একটা ইলেকট্রিক পোস্ট্ কাছাকাছিই ছিল, তাতে দেখলুম, তার রঙ টকটকে ফর্সা, গোলগাল চেহারা, আহ্লাদে-আহ্লাদে মুখ। গায়ে গিলেকরা আদ্দি কিংবা মলমলের পাঞ্জাবি, তার বোতামগুলো কাঁধের ওপর; পরণে বনেদী ধাঁচের কালো ফিতেপাড় ধুতি, পায়ে সাদা নাগরা। হাতে বোধ হয় গোটা আষ্টেক আংটি—নবগ্রহের প্রায় সব ক'টিকেই তাদের সাহায্যে বশীভূত করা হয়েছে।

'দাদা, কিছু যদি মাইণ্ড না করেন—'

মাইণ্ড্ করলেও ভদ্রতা রাখতে হয়। আমরা বললুম, 'না-না, আসুন, বসুন এখানে।'

দেখলুম, লোকটি জীবনে কখনো ক্রিকেট্ খেলেনি, কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত ক্রিকেটের স্কোর-বোর্ড তার কণ্ঠস্থ। প্রত্যেক খেলোয়াড়ের নাড়ী-নক্ষত্র এমন করে জানা যে, মনে হল ডবলু-জি গ্রেসের সঙ্গে ও বসে বোধ হয় ডিনার খেয়ে এসেছে। যাই হোক, ভালোই লাগল।

পরে আলাপ জমল। কাছাকাছিই থাকে। প্রকাণ্ড সাবেকী ধাঁচের বাড়ী, সে-আমলের মার্বেল বাঁধানো মেজে, বড়জোড়া আয়না, এদিকে ওদিকে দু-চারটে ইটালীয়ান মূর্তি—দেওয়ালে মাস্টার আর্টিস্টদের ইমিটেশন ছবি। এখন চার সরিকে ভাগ হয়ে গেছে—তবু বিরাট ব্যবসা। মল্লিক গ্র্যাজুয়েট, কিন্তু চাকরি করে না—ব্যবসাতেই প্রচুর টাকা আসে। বনেদী ধরণের সাজপোশাক ছাড়া আর কোনো রকম বড়োমানুষী চাল নেই—ট্রামে বাসে আসে যায়, আমাদের মতো মধ্যবিত্তের সঙ্গে সহজে মিশে যেতে পারে। আমরা ওর বাড়ীতে গোকুল পিঠে, চন্দ্রপুলী আর জরদা পোলাও খেয়েছি অনেক দিন। ওর টাকায় ভালো সীটে বসে থিয়েটারও দেখেছি অনেকবার। কিন্তু—

কিন্তু শেষ পর্যন্ত মল্লিক পাগল করে তুলেছে।

ক্রিকেট ওর একটা 'হবি' বটে, কিন্তু নেশা নয়। নেশাটি হচ্ছে ওর স্ত্রী।

নিজের স্ত্রীকে সকলেরই ভালো লাগে—অন্তত লাগা উচিত। আর সময় সুযোগ ঘটলে স্ত্রীর গুণপনা আমরা সকলেই সাধ্যমতো জাহির করবার জন্যে সচেষ্ট থাকি। কিন্তু মল্লিক—ওঃ!

এমন দুরন্ত আধুনিক কালেও ওদের পরিবারে মেয়েদের উচ্চশিক্ষা খুব কৃতিত্বের ব্যাপার নয়। রূপ এবং টাকাই তাদের যোগ্যতার মানদণ্ড। মেয়ের ফর্সা রঙ পাকা কিনা যাচাই করবার জন্যে এখনো রুমাল দিয়ে ঘষে দেখার ব্যবস্থা আছে; এই বিয়ে করে ছেলে ক'খানা বাড়ী পাবে এইটিই হল প্রথম জিজ্ঞাসা।

এর মাঝখানে এক বিপর্যয় কাণ্ড ঘটিয়েছে মল্লিক। তার বাড়ীর উজ্জ্বল গৌরবর্ণের সমারোহের মধ্যে সে কালো রঙের একটি মেয়ে বিয়ে করেছে। এবং আরো ভয়ঙ্কর কথা, মেয়েটি রূপ আর রূপোর পুঁটলি নিয়ে হ্যারিসন রোডের বিলিতী ব্যাণ্ড পার্টির আওয়াজে চার-দিক মুখরিত করে এসে বাড়ীতে ঢোকেনি। অত্যন্ত সাধারণ ঘরের—বাংলা দেশের কোন এক মফস্বল শহরে তার বাড়ী। কলকাতার মার্চেন্ট অফিসে চাকরি করত, ব্যবসার সূত্রে সেখানে প্রায়ই যেতে হত মল্লিককে। কী করে আলাপ হল, সে আলাপ গাঢ় হল, শেষ পর্যন্ত দুজনে চলে গেল রেজিস্ট্রারের কাছে।

বরবধূ যখন বাড়ীতে এল, সে দৃশ্য অনুমান করা যায়। মল্লিকের বড়দা—যিনি সেই মুহূর্তেই কোন এক রায়-চৌধুরীদের সঙ্গে পঞ্চাশ ভরি সোনা আর মোটরগাড়ী নিয়ে আলোচনা করছিলেন, তিনি দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লেন আর পরদিনই আলাদা হওয়ার প্রস্তাব আনলেন। অন্য আত্মীয়েরা প্রায় বছরখানেক মল্লিকের মুখদর্শন করলেন না। সে যা হওয়ার হোক, আপাততঃ আমাদের প্রাণ নিয়ে টানাটানি। আমার আর জীবেশের। সেই সাধারণ কালো মেয়েটির গুণ-ব্যাখ্যান শুনতে শুনতে আমরা প্রায় পাগল হয়ে গেলুম।

আমার রবিবার আর বুধবারের সকাল দুটো ওর স্ত্রীর মহিমা-কীর্তনে অসহ্য করে তোলে। অন্য কাউকে কথা বলতে পর্যন্ত দেবে না—একটানা বকর-বকর:

'আমার স্ত্রী—তিনি দেবী, তিনি মহীয়সী—'

মল্লিক যা বলে:

ভাই, মেয়েটিকে ভালো লেগেছিল কি সাধে? একটু গোড়া থেকেই শোনো তাহলে।

অর্ডারটা বের করতে পারলে চটপট একটা জরুরি কাজ হয়ে যায়, শুধু ঘোরাচ্ছে আর ঘোরাচ্ছেই। মানে কিছু খাবার মতলব আর কী! সেটা মুখ ফুটে বললেই মিটে যায়—তা নয় হাজারো ধানাই-পানাই!

শেষে একদিন ওঁকে বললুম, 'দেখুন, আপনি যদি একটু কষ্ট করে চন্দ্রনাথ-বাবুকে বলে অর্ডারটা বের করে দেন—আমি তো জেরবার হয়ে গেলুম। বরং আপনার পরিশ্রমের জন্যে আমি কিছু—'

শুনেই দেখলুম, ভুরু কুঁচকে উঠল, থমথমে হল মুখ। বললেন, 'ঘুষের কথা বলছেন? আচ্ছা, এটা আমি ওপরে রিপোর্ট করব।'

সর্বনাশ, সাপের গায়ে পা দিয়েছি—অর্ডারটা ক্যান্‌সেল্ হয়ে না যায়। হাত জোড় করে বললুম, 'আমাকে মাপ করবেন, আমি এ-রকম কথা আর জীবনে উচ্চারণ করব না। তবে অনেক জায়গায় কিছু কিছু দিতে হয় বলে—'

উনি বাধা দিয়ে বললেন, 'তা হতে পারে। কিন্তু ব্যতিক্রম থাকে।'

'থাকে বইকি। চোখের সামনেই তো দেখতে পাচ্ছি। এমন ভুল আর করব না। এখন যদি দয়া করে—'

'আচ্ছা, দেখছি'—উনি হেসে চলে গেলেন আর পরের দিনই অর্ডারটা বেরিয়ে এল।

আরে ভাই, চারদিকে ঘুষের রাজত্ব—যেদিকে চাও, হাত পাতাই রয়েছে। কখনো কখনো এত বিরক্ত লাগে যে হাত-গুলোতে কাঁকড়া বিছে ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু মেয়েটিকে দেখে চমক লাগল।

গরীবের মেয়ে—মার্চেন্ট্ অফিসে কী-ই বা মাইনে পায়? তবু লোভ নেই দেখে ভীষণ ভালো লাগল। আলাপ হল একটু একটু করে। একদিন বিকেলে

ডালহাউসি স্কোয়ার থেকে বেরিয়ে অনেক কষ্টে একটা ট্যাক্সি ধরেছি, দেখি উনি ট্রামের জন্যে অপেক্ষা করছেন। জানতুম, শ্যামবাজারের দিকে থাকেন, ডেকে বললুম, 'আমি তো ওদিকেই যাচ্ছি, আসুন—লিফ্‌ট দিই আপনাকে।'

বললেন, 'ধন্যবাদ, দরকার নেই।'

বললুম, 'আমি সামনে বসব, আপনি বরং পেছনের সীটে—'

উনি বললেন, 'না, ধন্যবাদ।'

আমি কিন্তু ভাই, মনে মনে খুশিই হলুম। এই তো চাই। আজকাল যা হচ্ছে—রেস্তোরাঁয় পার্কে যেখানে-সেখানে ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে মিলে যে হুল্লোড় দেখতে পাই, তাতে মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। ভাবি দেশটা চলেছে কোনদিকে—সমাজ-টমাজ বলে কিছু তো আর রইল না! তার মাঝখানে এ তো এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম—যাকে বলে রয়্যাল এক্‌সেপ্‌শন!

কত আর বলব—সে তো দস্তুর মতো মহাভারত হয়ে যায়। কি হে জীবেশ, উঠলে যে? কী বলছ কাজ আছে? আচ্ছা ভাই তুমি যাও, আমি সুকুমারের সঙ্গেই গল্প করি।

জানলে সুকুমার ওঁকে বিয়ে করে বাড়ীতে এনে খুব ঝক্কি-ঝামেলা যে পোয়াতে হয়েছিল তা মানি। এমন কি, ছেলেটার অন্নপ্রাশনে যে এত আয়োজন করলুম এমন বাড়ী বাড়ী বলে এলুম—তবু আত্মীয় স্বজন কেউ এলই না বলতে গেলে। ভাগ্যিস জ্ঞাত-গোত্তর, আর বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে দু-চারজন বেশ বাইরে লোক ছিল, নইলে বিস্তর জিনিস নষ্ট হত। সে যাই হোক—এখন সবাই বলছে, ছোট বৌমা খুব লক্ষ্মী মেয়ে। শুধু রংটা একটু ফর্সা হলে—

ওইটে ভাই আমাদের ফ্যামিলির সব চাইতে উইকনেস। আমাদের বাড়ীতে তাই কালো কেউ নেই আছেন সোনার গৌরাঙ্গ। বাবা বলতেন কালো লোক দেখলে নাকি তাঁর মেজাজটাই খারাপ হয়ে যায়।

কিন্তু কালোয় যে কত ভালো সে তো আমি রোজই দেখতে পাচ্ছি। আমার বোনদের কিংবা বৌদিদের তোমরা দ্যাখোনি—সায়েবদের টেক্কা দেয় তাদের দুধে-আলতায় রঙ। ছোটোবেলা থেকেই ওই রঙের ভেতর বড়ো হয়েছি আমি—রূপ দেখলেই আর মন খুশি হয় না। আমি তো জানি ভাই, বড়ো বৌদি কী খাণ্ডারটে, মেজো বৌদি কী স্বার্থপর আর বোন দুটো কী নাকতোলা! গয়না আর সিনেমা, বসে বসে পান চিবিয়ে মোটা হয়ে যাওয়া—গুণের তো সব ঢেঁকি!

কী বলছ, আমাদের ঘরের কথা শুনতে চাও না? আচ্ছা, থাক তা হলে। আমার বৌয়ের কথাই বলি। কলেজে পড়েছে, বাইরে চাকরি-বাকরিও তো করেছে, কিন্তু নিজেরাও তো দেখেছ—কখনো ঘরের বাইরে বেরিয়েছে বলে মনে হয়? সংসারের মধ্যে ডুবেই গেছে একদম। আমিই কখনো-সখনো জোরজার করে টেনে নিয়ে যাই সিনেমায় কি গঙ্গার ধারে কিংবা বোটানিক্‌সে—নইলে তো বেরুতেই চায় না। এ রকম সতী-সাধ্বী মেয়ে যে একালে থাকতে পারে—নিজের জীবনে না দেখলে আমি তো বিশ্বাসই করতে পারতুম না। আমার বোন কিংবা বৌদিরাও এদিক থেকে ভালোই—কিন্তু ওরা তো কখনো বাইরের জগৎ দেখল না, ওদের পরীক্ষাই হল না কোনো রকম। কিন্তু জ্যোৎস্নাকে দ্যাখো। একা চলা-ফেরা করেছে, কলেজে পড়েছে, চাকরি করেছে পুরুষদের সঙ্গে। রংটা ময়লা হলেও দেখতে খারাপ, কোনো শত্রুতেও বলবে না এ-কথা। অমন সুশ্রী চেহারাটি নিয়ে এই দিনকালে—এতগুলো পুরুষের সঙ্গে মিশে—রীতিমতো অগ্নিপরীক্ষা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। বললে হয়তো বিশ্বাস করবে না, রোজ সকালে উঠে প্রথমেই প্রণাম করে আমাকে।

হাসছ? কী বললে, তোমার পিসিমার গল্পটা? সেই যে শীতের ভোরে উঠে স্বামীর পাদোদক খাবার জন্যে ভদ্র-লোকের পা লেপের তলা থেকে বের করে এক ঘটি বাসি ঠাণ্ডা জলে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন আর 'বাপরে বাপরে' বলে লাফিয়ে উঠেছিলেন তিনি? জানি, জানি—সে আমি শুনেছি। কিন্তু সুকুমার, এ ঠাট্টার কথা নয়। আই অ্যাম সীরিয়াস, ভেরি সীরিয়াস।

একটা এগ্‌জাম্পল দিই—তবেই ওঁর ক্যারাক্‌টারের দিকটা বুঝতে পারবে।

অল্পবয়েসী একটি ঝি ছিল ভাই আমাদের বাড়ীতে। খুব চটপটে, খুব কাজের, মুখে হাসি লেগেই আছে, আমার ছেলেটাকে কোলেপিঠে করে মানুষ করত। জ্যোৎস্নাও খুব পছন্দ করত ওকে।

গত বছর জগদ্ধাত্রী পুজোর সময় ভাঁড়ার থেকে কী আনতে গিয়ে জ্যোৎস্নাই দেখতে পেলে। ভাঁড়ারের পাশে, একটু নিরিবিলি জায়গাতে বাড়ীর ঠাকুর ঝির হাতে জোর করে কী লুচিমিষ্টি গুঁজে দিচ্ছে আর খিলখিল করে হাসছে ঝিটা। ওকে দেখেই দুজনে পালিয়ে গেল।

পরদিনই জ্যোৎস্না বললে, বিদেয় করো ও দুটোকে।

ঝি-টা নয় গেল, কিন্তু ঠাকুর পুরোনো, প্রায় বিশ বছর কাজ করছে। আমার মায়াই পড়ে গিয়েছিল। পা ধরে যখন কাঁদতে লাগল, তখন আমি বলেছিলুম, 'এত করে যখন মাপ চাইছে, তখন নয়—'

জ্যোৎস্না বললে, 'না, তা হয় না। জগদ্ধাত্রী পুজো, গেরস্থর একটা শুভ-দিন, বাড়ীতে দেবতার কাজ—সে-দিনেও এমন বেলেল্লাপনা! ওদের রাখলে বাড়ীতে পাপ ঢুকবে। বিদেয় করো।'

করলুম বিদেয়। কিন্তু জ্যোৎস্নার মনটা একবার দ্যাখো। যাওয়ার সময় ঠাকুরের পুরো মাইনে মিটিয়ে তো দিলেই, সেই সঙ্গে আরো একশো টাকা দিয়ে বললে, 'তোমার ছেলেপুলেদের জন্যে দিলুম। কিন্তু ঠাকুর, যেখানেই থাকো, ভালো করে থেকো এরপর থেকে। মনে রেখো, তোমার বয়েস হয়েছে—তোমার ঘর-সংসার আছে।'

এমনিতে এত নরম-সরম, অথচ একটু বেচাল দেখলেই লোহার মত শক্ত, কিছুতে নোয়ানো যায় না—আরো বিশেষ করে মর্যাল-ক্যারাক্‌টারের কোশ্চেন যেখানে। আর তার পরিচয় তো প্রথম দিনেই পেয়েছিলুম আমি—যখন অর্ডারটা বের করবার জন্যে ঘুষের কথা বলতে গিয়ে গালে চড় খেয়ে ফিরেছিলুম দস্তুরমতো।

এই পরশুই হয়েছে কি—

কি হে, অত বড়ো একটা হাই তুললে যে? কী বলছ বাড়িতে ভালো ঘুম হয়নি একটু বিশ্রাম করতে চাও? আচ্ছা বেশ-বেশ। তা হলে আজ আমি উঠি।

আরে আসল কথাই যে ভুলে গেছি। জীবেশটা চট করে উঠে গেল তোমাকে বলে যাই তুমি ভাই একটু দয়া করে জানিয়ে দিয়ো ওকে। কাল রাত্তে তোমরা দুজন খাবে আমার ওখানে। উপলক্ষ? না-না, সে এমন কিছু নয়। মিসেস মল্লিক কী দু একটা নতুন রান্না করবেন—বড় খুশি হবেন তোমরা খেলে। যাই বলো ভাই, রান্নাটা কিন্তু ওর খাসা। ঠাকুরের রান্নায় কি আর গিন্নীর মনের ছোঁয়াটি লাগে?

আসছ তো নিশ্চয়? ভুল হয় না যেন। আমিই বরং জীবেশের অফিসে টেলিফোন করে বলে দেব ওকে। চলি ভাই তা হলে—

আমার কথা :

চুলোয় যাক নতুন রান্না, আর তো পারা যায় না।

মল্লিকের স্ত্রী ভালো, বেশ ভালো, খুব ভালো—এমন কি সারা বাংলাদেশের লেডী নাম্বার ওয়ান—এগুলো সব মানতে রাজী আছি আমরা। কিন্তু দিনের পর দিন এক কথা শুনতে ভালো লাগে কারো? মল্লিক এমনিতে চমৎকার লোক—সৎ, ভদ্র, বন্ধুবৎসল—লোককে খাওয়াতে ভালোবাসে, তাদের জন্যে খরচ করে সুখী হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেন যে সবাই ওকে এড়িয়ে চলে, কেন যে ও শেষ পর্যন্ত আমাদের ঘাড়ে এসেই চড়াও হয়েছে, সে কথা বুঝতে আমার আর বাকী নেই।

আমার স্ত্রীর গুণপনাও কি আমি কিছু কিছু বলতে পারি না? তিনিও যে অসাধারণ সুগৃহিণী, তিনি যে একদা রেডিওতে ক্লাসিকাল্ গান গাইতেন—স্বয়ং ওঙ্কারনাথ যে একবার তাঁর পিঠ চাপড়ে দিয়েছিলেন তা-ও কি লোককে শোনাবার মতো নয়? আর জীবেশ? তার স্ত্রীতো পরমা সুন্দরী, ইংরেজির এম-এ, একটা মেয়েদের কলেজে ভাইস-প্রিন্সিপাল, দুবার ইন্টার-কলেজিয়েট ডিবেটে মেডেল পেয়েছেন—তাও তো বুক ঠুকে বলবার মতো। কিন্তু আমরা বলি না, বলতে প্রবৃত্তিই হয় না। আবার বলবার সুযোগই বা দিচ্ছে কোথায় মল্লিক? একটু যদি মুখ খুলেছি, আর দেখতে হল না। সঙ্গে সঙ্গেই :

'যাই বলো ভাই, আমার মতো স্ত্রী-ভাগ্য'—

জীবেশ না হয় 'কাজ আছে' বলে পালিয়ে বাঁচতে পারে, কিন্তু নিজের ঘরদোর ফেলে আমি যাই কোথায়? মরীয়া হয়ে যখন ভাবছি, এবার মল্লিক এসে বসতে না বসতে তারস্বরে আমার স্ত্রীর স্তুতি আরম্ভ করব আর নেপথ্য থেকে গৃহিণীর কানে যদি তার কিছু কিছু পৌঁছোয় তা হলে আখেরে আবার কিছু ভরসা আছে—এমন সময় জীবেশের একটা চিঠি এল।

ওর বড়ো ভগ্নীপতি পার্টিশনের পর পশ্চিমবাংলার এক মফঃস্বল শহরে এসে বছর দশেক আগে ওকালতি আরম্ভ করেন। এতদিনে বেশ পশার হয়েছে, নতুন বাড়ী করেছেন—দেশের পুজোটাও আরম্ভ করবেন আবার। জীবেশকে অনেকবার যেতে লিখেছিলেন, ওর আর সময়ই হয়নি। এবার ভগ্নীপতি বাড়ীতে দুর্গাপুজো করবেন জেনে সস্ত্রীক তিন সপ্তাহের জন্যে বেড়াতে গেছে সেখানে।

আমারও কলেজ ছুটি। মহালয়া পেরিয়ে গেছে, নীল আকাশে টুকরো টুকরো শাদা মেঘ, প্যান্ডাল তৈরী প্রায় শেষ, চারদিকে লাল শালুর জয়ধ্বজা, মেয়েদের ভিড়ে জামা-কাপড়ের দোকানে আর পা ফেলবার জায়গা নেই। কলকাতা থেকে পালাতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু নানা ঝামেলায় আমার আর বেরুবার পথ বন্ধ। শুধু নিরুপায়ভাবে একা বসে বসে মল্লিকের পত্নী-বন্দনা শুনতে হচ্ছে। জীবেশও নেই, যে এই দুঃখের একটুখানি ভাগ নিতে পারে।

বাইরের ঘরে বসে দূরের একটা লাল শালুর ওপর দেখছি : 'শারদিয়া দুর্গোৎসব।' বানানটা একটু শুধরে নিলে কী ক্ষতি হয় এই তত্ত্বচিন্তা করছি, এমন সময় পিয়ন একটা এন্‌ভেলপ দিয়ে গেল। দেখি, জীবেশের চিঠি। ইংরেজিতে, এয়ার-লেটারের পাতলা কাগজে চারপাতা ধরে লেখা।

জীবেশের সেই মারাত্মক চিঠি :

'মাই ডিয়ার সুকুমার,

দিস্ ইজ নো লেটার ফর ইউ—বাট এ বম্, র‍্যাদার অ্যান আটমিক বম্! ডোল্ট বী অ্যাফ্রেড্ ওল্ড্ বয়—ইট্ ইজ নট্ ফর ইউ।

(যাক, বাঁচা গেল। তবে কার জন্যে? মনে মনে অনুবাদ করে আমি পড়ে গেলুম।)

বেচারী মল্লিক—আমাদের সেই পত্নী-বাতিকগ্রস্ত বন্ধুটি—জানে না, কী নির্বোধের স্বর্গে বাস করছে সে! জানে না সেই প্রাচীন প্রবচনটি : যা কিছু ঝকমক করে, তা-ই সোনা নয়।

হাঁ-হাঁ, আমি তার স্ত্রী জ্যোৎস্না মল্লিকের কথা বলছি, যিনি কুমারী জীবনে ছিলেন জ্যোৎস্না রায়। তাঁর সম্পর্কে এই চিঠিতে তোমাকে কিছু আলোকদান করতে চাইছি। সেই লেডী গডিভা, কিংবা প্রীসেস্‌ডা, কিংবা পেনিলোপী, অথবা সীতা-সাবিত্রী—কী বলব তাঁকে? এখানে সেই মাননীয়া 'সীজার পত্নী' (না-না, মল্লিকপত্নী) সম্পর্কে তোমাকে কয়েকটি তথ্য পাঠাচ্ছি, তাঁর কুমারী জীবনের কাহিনী। তিনি এই শহরেরই মেয়ে।

পৃথিবীর সমস্ত বড়ো বড়ো আবিষ্কারের মতো এটাও একটা আকস্মিক ঘটনা। একটা শেল্‌ফে কতগুলো পুরোনো পত্রপত্রিকা ঘাটতে ঘাটতে আট বছর আগেকার একখানা কলেজ ম্যাগাজিন বেরিয়ে এল। চোখে পড়ল লেডীজ ডিপার্টমেন্টের ইউনিয়নের একটা গ্রুপ ফোটো। তাতে আমার ভাগ্নীর ছবি আছে, সে ইউ-নিয়নের সেক্রেটারী ছিল। আর মেম্বার-দের মধ্যে রয়েছে একটি মেয়ে : জ্যোৎস্না রায়। সেকেন্ড ইয়ার।

মুখটা একটু কচি, মাথায় বিনুনী, কিন্তু তা হলেও চিনতে কষ্ট হয় না। নীচে জ্যোৎস্না রায় নাম লেখা

দেখে সন্দেহের আর লেশমাত্রও রইল না। আমার ভাগনী মীরা পুজো উপলক্ষে শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেছে, তাকে বললুম, 'এই মেয়েটিকে চিনিস?'

সে চমকে বললে, 'ছোট মামা, বেছে বেছে ঠিক লোককেই বের করেছ তো! কী সাংঘাতিক মেয়ে, আর ওকে নিয়ে কত কাণ্ড তখন। চেনো নাকি ওকে?'

আমি চমকালুম ওর চাইতেও বেশি। বললুম, 'না, চেহারা দেখে বেশ স্মার্ট মনে হচ্ছে কিনা, তাই জিজ্ঞেস করছিলুম। সাংঘাতিক বলছিস কেন?'

তখন মীরা যে কাহিনীটি শোনালো —সেটি সংক্ষেপে এই।

চেহারা দেখে যেমনই মনে হোক, মেয়েটি আসলে ভয়ঙ্কর। এই শহরে তখন এক ছোকরা থাকত, তার নাম জয়ানন্দ ঘোষ—সংক্ষেপে জনু ঘোষ। স্কুলের গণ্ডী পেরুতে পারেনি, বখাটে হয়ে বেড়াত, জনু ঘোষের উৎপাতে স্কুল-কলেজের পথে তটস্থ থাকত মেয়েরা। শুধু একটি গুণ ছিল তার। নামকরা ফুটবল-খেলোয়াড়, ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টসে অনেকগুলো কাপ-মেডেল পেত। বাপের একটা সামান্য দোকান ছিল—তাতেই কোনমতে সংসার চলত তাদের।

জনু ঘোষের মতো স্কাউণ্ড্রেলকে কোনো মেয়ে পছন্দ করতে পারে—এ ধারণারও বাইরে। তবু একদিন কলেজে চিঠি এল একখানা—জ্যোৎস্নার নামে। তাতে জনু ঘোষের সই। সে-চিঠি প্রেমপত্র।

প্রিন্সিপ্যাল জ্যোৎস্নাকে ডাকলেন: 'এর মানে কী?'

জ্যোৎস্না মাথা নীচু করে রইল।

প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'এর সঙ্গে তোমার কোনো যোগ আছে?'

জ্যোৎস্না স্বীকারও করল না, অস্বীকারও নয়। তেমনি দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে।

প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'সাবধান করে দিচ্ছি। তোমরা এখন বড়ো হচ্ছ, ভালো-মন্দ বোঝবার বয়েস তোমাদের হয়েছে। এই জনু ঘোষ অত্যন্ত জঘন্য চরিত্রের ছেলে। এর সঙ্গে ভবিষ্যতে তোমার কোনো মেলামেশার সংবাদ যদি পাই, তা হলে এই কলেজে তোমার আর জায়গা হবে না।'

কিন্তু মহিলারা কি সত্যিই বর্বরকে ভালোবাসে?

তাই দেখা গেল শেষ পর্যন্ত। প্রিন্সিপ্যালকে কিছুই করতে হল না, জ্যোৎস্নাই নিজের পথ বেছে নিলে। একদিন সুপ্রভাতে জ্যোৎস্নাকে আর বাড়ীতে পাওয়া গেল না—জনু ঘোষকেও না।

ধরা পড়ল পরের দিন। মোগলসরাই না কোথায়। দিল্লীর টিকেট ছিল সঙ্গে।

জ্যোৎস্নার বাবা-মা লজ্জার ভয়ে পুলিশ কেস ধামাচাপা দিলেন, জনু ঘোষ শহর ছেড়ে কোথায় উধাও হল, কলেজ থেকে জ্যোৎস্নাকে ট্রান্সফার করিয়ে পাঠানো হল কলকাতায় মামার বাড়ীতে। তারপর জ্যোৎস্না আর কখনো এখানে ফেরেনি। ফিরবেই বা কোন মুখে? বাপ-মা পর্যন্ত ওর নাম উচ্চারণ করেন না।

আমার প্রিয় বন্ধু—সুকুমার, এই হল মল্লিক-গৃহিণীর আদি জীবনের কাহিনী। মল্লিকের কাছে যে সীরাজ-পত্নী কালপুর্ণিয়ার মতো সতী, পেনিলোপীর চাইতেও মহীয়সী!

আমাকে ভুল বুঝো না। একটি মেয়ে তার প্রথম জীবনে কাউকে ভালোবেসে যদি কোনো ভুল (আপেক্ষিক) করেই থাকে, তা হলে তার জন্যে আমার বিবেক তাকে এক কথায় বাতিল করে দেবে না। কিন্তু মল্লিক সম্পর্কে কী বলো তুমি? অজ্ঞতার আশীর্বাদে সে সুখে আছে, স্ত্রীর গুণ-গান গেয়ে চলেছে চারণদের মতো, এক-দিন যদি সব সে জানতে পারে, যদি সত্যের বোমাটি ফাটে, তা হলে সে দাঁড়াবে কোথায়?

প্রসঙ্গত মনে পড়ল, ইবসেনের 'বুনো হাঁস' নাটকটি তোমার পড়া আছে কি?

আমার কথা:

এরপরে কিছু কিছু নিজের খবর দিয়েছে জীবেশ, একদিন পাখি শিকার করতে নদীর চরে গিয়েছিল তার বিবরণ দিয়েছে, ক'টি স্নাইপ 'ধলেজাত' হয়েছিল তা-ও লিখেছে। কিন্তু সেগুলো গৌণ। চিঠির প্রথম অংশটা পড়বার পর থেকেই আমি স্তব্ধ হয়ে গেছি। মল্লিকের পত্নী-বন্দনা থামিয়ে দিতে পারি এই চিঠিতেই এই ব্রহ্মাস্ত্রে তার জিহ্বা চিরকালের মতো বন্ধ করে দিতে পারি। কিন্তু ব্যাপার তো সেইখানেই শেষ হবে না। এই চিঠি দেখে যে আগুন জ্বলবে তাতে ওর সংসার ধ্বসে পড়তে পারে, হাওয়ায় উড়ে যেতে পারে ওর তাসের ঘর। বিশ্বাস যেখানে এমন অন্ধ, সেখানে বিশ্বাসভঙ্গের ট্র্যাজেডী যে কী নিদারুণ রূপ নিতে পারে, তা অনুমান করা একেবারে অসম্ভব নয়।

কিন্তু এরও পরে মল্লিকের স্ত্রীর সতীত্বের মহিমা দিনের পর দিন কান পেতে শুনতে হবে, সত্যটা গলার কাছে উঠে এলেও তাকে প্রাণপণে ঠেকিয়ে রাখতে হবে, আসল প্রহসনটা সেখানেই। আগে যদিবা কখনো কখনো ওকে ঠাট্টা করা যেত, এখন তা-ও চলবে না। সব সময় সতর্ক হয়ে থাকতে হবে, কখন সত্যটা দুর্বল মুহূর্তে মুখ ফসকে বেরিয়ে আসে!

মল্লিককে থামিয়ে দেবার অস্ত্র হাতে পেয়েছি। কিন্তু সে অস্ত্র তো সঙ্গে সঙ্গে তাকেও হত্যা করবে। রোগ সারাতে গিয়ে রোগীকে শেষ করা—সে অন্তত আমার কাজ নয়—জীবেশকে যতদূর জানি, তারও নয়।

এখন আর মল্লিকের হাত থেকে পরিত্রাণ নেই।

জীবেশের চিঠিটা ড্রয়ারে রেখে উঠে দাঁড়াতেই মনে পড়ল, আজ সন্ধ্যে-বেলাতেই মল্লিকের ওখানে আমার চায়ের নেমন্তন্ন। গোকুল পিঠে আর জর্দা-পোলাও খেতে হবে ওখানে।

কিন্তু এর পরেও আমি যেতে পারব? শুনতে পারব মল্লিকের বক্তৃতা? ওর স্ত্রীর হাতের মিষ্টির স্বাদ কেমন লাগবে আমার? একটা বঞ্চনার তিক্ততায় সমস্ত জিনিসটা অসহ্য কি হয়ে উঠবে না? আমি বসে থাকতে পারব সেখানে? আর প্রতি মুহূর্তেই কি মনে হবে, আমার সঙ্গে একটা গোখরো সাপের ঝাঁপি আমি বয়ে চলেছি—এক বিন্দু অসতর্কতায়, এক পলকের ভুলে তার ঢাকনাটা খুলে যেতে পারে?

এতগুলো জিজ্ঞাসার জবাব মনের ভেতরে কোথাও খুঁজে পেলুম না আমি।

একটা অন্ধ ক্রোধে মনে হতে লাগল, এ চিঠি জীবেশ আমাকে না লিখলেও পারত। মল্লিকের বক্তৃতার চাইতে সত্যের যন্ত্রণা অনেক বেশি দুঃসহ—কেন জীবেশ সেই যন্ত্রণার মধ্যে ঠেলে দিলে আমাকে?

তবু যেতে হল। না-যাওয়ার মতো কোনো কৈফিয়ৎ আবিষ্কার করা সম্ভব হল না আমার পক্ষে।

মল্লিক সাদরে অভ্যর্থনা করল: 'এসো প্রোফেসার, এসো—'

সহজভাবে ওর দিকে চাইতে পারছি না বলে আমিই অমর্গলভাবে কথা আরম্ভ করলুম। অকারণে একটা হাসির গল্প বললুম, পুজোর সময় কলকাতায় মাইকের উপদ্রবে ভদ্রলোক টিঁকতে পারে না সে কথা বললুম, গতবার পুজোয় নাইনিতালে বেড়াতে গিয়ে কী কী প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে-

ছিলুম বিস্তারিত বিবরণ শোনালুম তার।

নিজের বকুনিতে নিজেরই যখন মাথা ধরে গেল, তখন বাধ্য হয়ে থামতে হল আমাকে। আর মল্লিক ফুরসৎ পেয়েই মুখ খুলল: 'আজ তোমাকে চা খেতে ডেকেছি কেন জানো? আমার স্ত্রীর আজকে জন্মদিন।'

সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের ওপর একটা চাবুক পড়ল। মুখের রঙ বদলালো কিনা জানি না, সামলে নিয়ে বললুম, 'ছি—ছি, আগে বললে না কেন? তা হলে একটা কিছু—'

'প্রেজেন্টেশন আনতে, না? কিন্তু আমার স্ত্রীই বারণ করলেন। বললেন, ওসব ভালো নয়, এক পেয়ালা চা খেতে ডেকে মিছিমিছি লোকের খরচান্ত করা। শুভেচ্ছাটাই হল আসল। সত্যি বলতে কি, এমন কন্‌সিডারেট মেয়ে—'

আমার কান দুটো জ্বালা করতে লাগল। আর সেই সময় ঘরে ঢুকল একটি লোক। বেঁটে খাটো জোয়ান চেহারা, পরণে আধময়লা জামা-কাপড়। ডাকল: 'বাবু!'

'কিহে জয়ানন্দ?'

'টেলিফোন এসেছে।'

'যাচ্ছি'—মল্লিক উঠে গেল। বলে গেল: 'এক মিনিট। আসছি এক্ষুনি।'

জয়ানন্দ! আমার মাথার ভেতরে যেন বজ্র পড়ল। লোকটা বেরিয়ে যাচ্ছিল, আমিই ডাকলুম ওকে।

'শুনুন?'

লোকটা হাত জোড় করে বললে, 'আজ্ঞে আমাকে তুমিই বলবেন। আমি বাবুর সামান্য কর্মচারী।'

'তোমাকে তো আগে কখনো দেখিনি।'

'আমি ওঁদের বর্ধমানের অফিসে কাজ করি। কাল কলকাতায় এসেছি। বাবু আমায় খুবই অনুগ্রহ করেন, বলতে গেলে ডেকেই চাকরি দিয়েছেন—নইলে খেতে পেতুম না।'

আমি বললুম, 'তোমারই ডাক নাম জুনু ঘোষ?'

লোকটা বললে, 'বাবু বলেছেন বুঝি আমার কথা?' হঠাৎ ওর মুখের ওপর একটা আতঙ্কের ছায়া নামল। বললে, 'আজ্ঞে আমি একটু ওদিক পানে যাই—কাজ আছে।'

আমার মাথা ঘুরতে লাগল। এই জুনু—জয়ানন্দ ঘোষ! না জেনে ওকে চাকরি দিয়েছে নাকি মল্লিক? জ্যোৎস্নার অনুরোধেই কি সাপ এনে পুষেছে ঘরে? আমি যা ভাবতে পেরেছিলুম, তার চাইতেও অনেক বড়ো সর্বনাশের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে মল্লিক, আরো ভয়ঙ্কর বিশ্বাসঘাতকতার ছুরি তিলে তিলে শান দেওয়া হচ্ছে ওর জন্যে?

মল্লিক ফিরে এল। বলব, বলব ওকে সব কথা? আমার শরীরে আগুন জ্বলতে লাগল।

শরতের আকাশ থেকে খেয়ালী বৃষ্টি এল একপশলা। আমার জুতো জোড়া দরজার বাইরে ছিল, মল্লিক ডাকল:

'জুনু—'

'আজ্ঞে'—পোষা কুকুরের মতো ছুটে এল সে।

'বাবুর জুতোটা তুলে আনো ঘরে।'

'আনছি'—আমি ওঠবার আগেই সে নক্ষত্রবেগে আদেশ পালন করল। তারপর বললে, 'আজ্ঞে এবার ওপরে চলুন—মা খাবার দিয়েছেন।'

মা!

মল্লিক হাসছিল। বললে, 'চলো হে প্রোফেসার—'

কিন্তু ওর হাসির দিকে তাকিয়ে মন স্তব্ধ হয়ে গেল।

কিছুই জানে না—না আমাদের চাইতে স্ত্রীর কথা, জুনু ঘোষের কথা অনেক বেশি করে জানে মল্লিক? জুনু যে আজ জ্যোৎস্নাকে 'মা' বলে ডাকে, মুখের কথা পড়তে না পড়তে জুতো তুলে আনে—একি ওর নিষ্ঠুর কুটিল প্রতিহিংসারই দিক? এবং দিনের পর দিন স্ত্রীর পবিত্রতা সম্বন্ধে এই দীর্ঘ বক্তৃতা—এই প্রশংসার বন্যা—একি তিলে তিলে বিষের সূচীমুখে স্ত্রীকে দগ্ধ করে ফেলা—হাত-পা বেঁধে সর্বাঙ্গে বিন্দু বিন্দু অ্যাসিড ঢেলে তাকে পুড়িয়ে মারা? ওর উজ্জ্বল প্রসন্ন হাসি কি সেই বীভৎসতম ঘাতকতার ছদ্মবেশ? মল্লিক কি দেবতা? মল্লিক কি শয়তান?

একমাত্র যে বলতে পারে, সে জ্যোৎস্না মল্লিক।

আর জ্যোৎস্না মল্লিক তা কোনোদিন বলবে না।

ছায়া

লীলা মজুমদার

তাসজোড়া বাক্সে পুরতে পুরতে ডাক্তারবাবু বললেন, তা বললে তো আর হবে না, গোপেনবাবু, সব জিনিষ যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যানা করা যায় না। এত লোকে দেখেছে, সবাই কি আর মিথ্যে কথা বলে?

গোপেনবাবু নরম গলায় বললেন,

না, ঠিক তা বলছি নে, তবে কি জানেন, আত্মার যদি অসীম স্বভাব হয় তবে তার একটি সীমাবদ্ধ রূপ কি করে দেখা যাবে?

চৌধুরীমশাই বললেন,

সীমাবদ্ধ রূপ আবার কি? আত্মার বিস্তার যেমন অসীম, তার ক্ষমতাও তেমনি অসীম; একটা সীমাবদ্ধ রূপ নেওয়া তার পক্ষে কিছু শক্ত কাজ নয়।

দানু বললে,

আর রূপও নিচ্ছে না এক্ষেত্রে, শুধু একটু ছায়া নিচ্ছে, ধরাও যায় না ছোঁয়াও যায় না, ভেতর দিয়ে গঙ্গার ওপারের গাছ দেখা যায়, চাই কি ওর মধ্যে দিয়ে হেঁটেও চলে যাওয়া যায়।

চৌধুরীমশাই শিউরে উঠে, গায়ের চাদরটা একটু ভালো করে জড়িয়ে নিলেন।

আসলে কি জানেন গোপেনবাবু, বিয়ে থা তো আর করলেন না, তাই সব জিনিষ যুক্তি দিয়ে বুঝতে চান। পৃথিবীতে যে এমন বহু জিনিষ আছে যার সামনে যুক্তি তর্ক খাটে না, এ অভিজ্ঞতা আপনার হবে কোত্থেকে?

ডাক্তারবাবু উঠে দাঁড়ালেন।

চলি, গোপেনবাবু, আমার বাড়িতেও কেউ রাত করার যুক্তি মানতে চায় না। কিন্তু আপনার ঐ অসীমের কথাটার মধ্যে যে কিছু নেই, তাই বা বলি কি করে। তবে কি জানেন, ছ ফুট লম্বা মানুষটার ফটোও তো একটা চার ইঞ্চি বাই চার ইঞ্চি কাগজে ধরে যায়। অবিশ্যি সে ছবিটা কিছু আর আসল মানুষটা নয়, তার হুবহু ছায়াটুকু ছাড়া আর কিছু নয়। তেমনি কালের পটেও হয়তো বিশেষ অবস্থায় ঘটনার আর পাত্র-পাত্রীর ছাপ পড়ে যায়, আবার সেই বিশেষ অবস্থা ঘটলে ফটোর মতো সেগুলো দেখা যায়। বলা যায় না কিছুই। চল, দানু।

দানু গলায় কম্ফর্টার জড়াচ্ছিল, পাড়ায় ভালো গাইয়ে বলে তার সুনাম, পুজোর সময় সখের থিয়েটারে তাকে গাইতে হবে, কাজেই সাবধানের মার নেই। তাছাড়া এদের যা কথাবার্তা এমনিতেই কেমন গাটা শির-শির করতে আরম্ভ করেছে। জোর করে হেসে দানু বললে,—

ভূত নিয়ে আর মাথা ঘামিয়ে কি হবে বলুন গোপেনবাবু? তার চেয়ে স্মাগলারদের সম্বন্ধে সাবধান হোন, দেখেছেন তো কাগজে কি লিখেছে, মেরে লাগিয়েছে নাকি আর এই সব জায়গাতেই কোথাও স্মাগলারদের আড়ত। মাঝ-গঙ্গায় জাহাজ নোঙর করে সোনাদানা-গুলোকে জলে ডুবিয়ে দিলেই হোল! গভীর রাতে সাঙ্গাতরা নৌকা করে গিয়ে জল থেকে সেগুলো উঠিয়ে এনে পাচার করে দেয়। ব্যাস্ আর কি চাই!

চৌধুরীমশাইও খুব হাসতে লাগলেন।

আরে, জালেও ফেলে না; এই তো শীতের হাওয়া দিতে শুরু হোল বলে, ওরা এখন জলে ডুব দিল আর কি, তুমিও যেমন! আমি বিশ্বস্ত সূত্রে শুনেছি, বয়ার তলায় শেকলের সঙ্গে বেঁধে রেখে দেয়। গিট খুলে নিয়ে গেলেই হোল। তবে পুলিসও এতদিনে শুঁকে শুঁকে সব বের করেছে; তারাও এখানে ওখানে ঘাপটি মেরে যাচ্ছে, হাতে-নাতে এক ব্যাটাকে ধরতে পারলেই হোল, জেরা করে তার কাছ থেকে সব কথা বের করে নিতে পারবে।

ডাক্তারবাবু বললেন,

এদের যেমন কথা! কিন্তু বাস্তবিকই একটু সাবধানে থাকবেন গোপেনবাবু, দুষ্টু লোকের কিছুই বলা যায় না। বে-আইনি কাজ করে করে শেষটা ওদের মনটা এমন হোয়ে যায় যে দুটো-একটা খুন-খারাবিতে কিছুই বাধে না। তার ওপর একেবারে একা থাকেন তো। আপনার কি মশাই, এক-আধটা পুরোনো চাকরও থাকতে নেই? এখানকার লোক যে মরে গেলেও এ বাড়িতে রাত কাটাবে না সেটা মানি।

গোপেনবাবু আস্তে আস্তে বললেন,

পুরনো চাকর তো সঙ্গেই এনেছিলাম, তা সে কিছুতেই গঙ্গার একটা কাছে থাকতে রাজি হোল না। গঙ্গার

গন্ধে নাকি তার হাঁপানি বাড়ে। একটা রাত মোটে ছিল।

চৌধুরীমশাই বললেন,

গঙ্গার গন্ধ-ফন্ধ কোনো কাজের কথা নয়. আসলে আপনার ঐ মালী মজুররা স্রেফ তাকে ভূতের ভয় দেখিয়ে ভাগিয়েছে। বুদ্ধির কাজই করেছে। আপনি তো আর ভালো কথা শুনবেন না। পই-পই করে বলছি, আমার ছোট বাড়িটাতে উঠে আসুন, ঐ রাঁধুনেই রাঁধবে, গঙ্গার ঐ স্যাঁৎসেঁতে হাওয়া থেকেও রেহাই পাবেন. চাই কি পুরোনো চাকরটাও ফিরে আসতে পারে। মোটে ত্রিশ টাকা ভাড়া। তা ভালো কথা কে শোনে?

ওরা বিদায় নিয়ে চলে গেলে পর, ছোট ফটকে তালা দিয়ে, মোটা আমেরিকান তারের জালে ঘেরা বারান্দায় তালা দিয়ে, গোপেনবাবু গঙ্গার ধারের বারান্দাতে এসে দাঁড়ালেন। আসলে ঐ একই বারান্দা, গোটা বাড়িটাকে ঘিরে রয়েছে, আগাগোড়া তারের জালে মোড়া। আগে নাকি জোয়ারের সময় দু-একবার মকর-টকরো কুমিরকে একেবারে বাড়ির সীমানা পর্যন্ত উঠে আসতে দেখা যেত তাই এই ব্যবস্থা। গোপেনবাবু কেনবার আগে ত্রিশ-চল্লিশ বছর নাকি বাড়িতে সত্ একটা কেউ বাস করে নি। বড় জোর একটা রাত কি দুটো রাত।

বারান্দার বাইরেই রং-বেরঙের ভাঙা চীনেমাটির বাসনের টুকরো বসানো সিমেণ্ট দিয়ে বাঁধানো চাতাল। এক কালে এখানে ফোয়ারা থেকে জল বেরুত ফোয়ারার চারধার বাঁধানো, গোটা দুই পাথরের বেঞ্চিও রয়েছে।

বারান্দা থেকে গোপেনবাবুর মনে হতে লাগল ফিকে তারার আলোয় একটা বেঞ্চির কোণায় কে বসে রয়েছে। সারা গায়ে সবুজ কাপড় জড়িয়ে, পাৎলা ছিপ-ছিপে একটি মেয়ে যেন গঙ্গার দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে।

গোপেনবাবুর ছাপ্পান্ন বছরের জীবনে এই প্রথম তাঁর সারা গায়ে কাঁটা দিল মনে হচ্ছে যেন এক ঢাল ভিজে চুল মাথার ওপর জড়ো করে রেখেছে. কানে গলায় গয়না চিকচিক করছে, গায়ের রং যেন কাঁচা হলুদ। তারার আলোতে সত্যি কতখানি দেখছেন আর কতখানি কল্পনা করে নিচ্ছেন নিজেই বুঝতে পারছেন না। মেয়েটির পাশে বেঞ্চির ওপরে বাধা আধ হাত লম্বা একটা কালো বাক্সও চোখে পড়ল।

এতক্ষণে গোপেনবাবুর চৈতন্য হল। তাইতো চোরাকারবারিরা তো এই রকম সব সুন্দর মেয়েদেরই কাজে লাগায়। কথাটা তো তাঁর অজানা নয়; সত্যিই তো এ মেয়েকে কখনো কেউ সন্দেহ করতে পারে না, একটা কোমল শ্যামল লতার মতো বেঞ্চির ওপর হাল্কা শরীরটা কেমন এলিয়ে রয়েছে। এতখানি দূর থেকে তার মাধুরী টের পাচ্ছেন গোপেন-বাবু, কিসের একটা মৃদু সুগন্ধও যেন নাকে আসছে।

হাতে একটা বন্দুক নেই, লাঠি নেই, অমনি বারান্দার জালে বসানো ছোট দরজাটির ছিটকিনি খুলে গোপেনবাবু বাইরে এলেন। মোটাসোটা ফর্সা মানুষটি, মাথার চুল পাৎলা হয়ে এসেছে. নাকের ওপর মোটা কালো ফ্রেমের চশমা বসানো, চোখটা দিন-দিন যেন আরো খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কে জানে কাছে গিয়ে হয়তো দেখবেন সব ভুল, কি দেখছেন আর পাঁচ রকম গল্প শুনে কি মনে করে বসে আছেন। ওখানে সত্যি কারো থাকার সম্ভাবনা কম পথ তো শুধু গঙ্গা, নয়তো দু ফুট উঁচু পাঁচিল টপ-কানো। তাছাড়া এ এলাকায় কেউ রাত এগারোটার সময় যে এ বাড়িতে আসবে না সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই। তবে এ এলাকাতে যারা থাকে তারা হল সব আটপৌরে মানুষ। অমন মেয়ে এখানকার হবে কেন?

বারান্দা থেকে চার ধাপ সিঁড়ি নেমে, চাতালে বসানো এক মানুষ উঁচু লাল গোলাপের গাছের সারি পার হয়ে, শুকনো ফোয়ারার ধারে এসে দেখেন, যা মনে করেছিলেন ঠিক তাই, বেঞ্চিতে কেউ বসে নেই।

কেমন একটা দীর্ঘনিশ্বাস বুক ঠেলে বেরিয়ে এল। তবে কি গোপেনবাবু মনে মনে চেয়েছিলেন যে, ঐখানে ঐ রকম একটি মেয়ে সত্যি থাকুক? ওরকম মেয়ে হয় কখনো? ও তো চল্লিশ বছর ধরে দেশী বিদেশী কাব্যে পড়া যত সুন্দরী তাদের রূপরস দিয়ে মনগড়া একটা ছবি একটা ছায়া, কি যেন বলছিল দানু, ওর মধ্য দিয়ে চাই কি হেঁটেও চলে যাওয়া যায়।

কিন্তু কি একটা অনভ্যস্ত সুগন্ধে বাতাসটা তবে কেন ভারি হয়ে আছে? গোপেনবাবু চারদিক চেয়ে দেখলেন গন্ধরাজের ঝোপের গাঢ় সবুজ ছায় থেকে খানিকটা ফিকে সবুজ যেন আলগা হয়ে বেরিয়ে এল। হঠাৎ তাকে একটা কাছে দেখে গোপেনবাবু কেমন যেন হকচকিয়ে গেলেন।

মেয়েটি ম্লান একটু হেসে বললে,

বড় বিপদে পড়েছি, আমাকে সাহায্য করুন। এটা লুকিয়ে রাখুন। বলে বুকে আঁকড়ে ধরা কালো বাক্সটি পরম নিশ্চিন্ত-ভাবে গোপেনবাবুর দিকে এগিয়ে দিলে। গোপেনবাবুর কণ্ঠ দিয়ে স্বর বেরোয় না, অস্বাভাবিক হেঁড়ে গলায় বললেন,

কি—কি আছে ওতে?

সে খিল-খিল করে হেসে উঠল, সে হাসি গাছে গাছে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনি হয়ে গঙ্গার বুকের ওপর ছড়িয়ে পড়ল। মেয়েটার কি এতটুকু বুদ্ধি নেই, কে জানে পুলিশরা কোথায় ওর সন্ধানে ঘাপটি মেরে বসে রয়েছে। চোরাকারবারি গোপেনবাবু আগে কখনো চোখে দেখেন নি, তাই ভালো করে তাকে দেখলেন। ইস্, এরা এত রূপসীও হয়! চোখে ধাঁধা লেগে যায়। কপাল ঘিরে বেঁটে বেঁটে ভিজে কোঁকড়া চুলের গুছি, দুকানে দুটি সবুজ পাথর, তারার আলোয় ঝিকমিক করছে, পাৎলা পাখির ডানার মতো ভুরু, কি যে সূক্ষ্ম কি যে মসৃণ, জোরে কথা বলতে ভয় করে। অথচ ওরই ঐ আধভেজা কাপড়ের ভাঁজের মধ্যে কোথাও একটা মুখ-কাটা ভোঁতা বন্দুক লুকিয়ে আছে। অব্যর্থ টিপও নাকি চোরাকারবারি মেয়ে-দের, দানু কোন কাগজে পড়েছে। এর হাতের আঙুলগুলো সত্যি সত্যি চাঁপার কলির মতো, একটা আঙুলে এই বড় একটা সবুজ পাথর বসানো আংটি পরা।

খুশি হয়ে কেন লোকে পাপ করে, কিসের জন্যে নরকে যাওয়া সার্থক মনে হয়, সে রহস্য হঠাৎ গোপেনবাবু বুঝে ফেললেন। হাত বাড়িয়ে বাক্সটি ধরলেন। এত ভারি যে আরেকটু হলে পড়েই যাচ্ছিল। মেয়েটি খুব কাছে এসে হেসে বললে,

খুব ভারি, না? খুলেই দেখুন না এত ভারি কেন।

বলে বাক্সের ডালা নিজেই তুলে দিল। বাক্সভরা সোনার মোহর। সে বললে,

একটা ভালো জায়গায় লুকিয়ে রাখুন, কেমন?

বলে এক মুহূর্তের জন্য গোপেন-বাবুর হাতের কব্জির ওপর নরম কাঁচ পাঁচটি আঙুল রাখলে।

গোপেনবাবুর কান ঝিমঝিম করতে লাগল, ভাবলেন একেই বোধহয় সুখমৃত্যু

বলে। পর মুহূর্তেই মেয়েটি অনেকখানি দূরে সরে গেল। বলল,

ওগুলো আমার নয়। পরে গোলমাল চুকে গেলে, বনানী দেবী, বনহুগলি এই নামে পাঠিয়ে দেবেন কেমন? কিছু বলতে পারলেন না গোপেনবাবু। একদৃষ্টি তার দিকে চেয়ে রইলেন। সে একটু একটু করে সরে যেতে লাগল, দেখতে দেখতে এতটা তফাতে চলে গেল যে, এই তার সবুজ সাড়ি গাছের সারির সংগে মিশে যায়, আবার এই যেন ঝিকমিকিয়ে ওঠে। তারপর গঙ্গার ধারের সবুজ ঘাসে ঢাকা পাড়ির সঙ্গে একেবারে মিলিয়ে গেল, আর তাকে আলাদা করে দেখা গেল না।

গোপেনবাবু বাক্স নিয়ে ঘরে এলেন। মাথার ভিতরটা একেবারে পরিষ্কার, কোথায় লুকোতে হবে আর বলে দিতে হল না। চাতালের সিঁড়ির পাশেই পাতা-বাহারের চীনেমাটির টব সরিয়ে, ছোট্ট খুরপি দিয়ে গভীর একটা গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে বাক্স পুঁতে, যত্ন করে মাটি চাপা দিয়ে, টবটি আবার যথাস্থানে রেখে, নিশ্চিত মনে শুয়ে শুয়ে পুলিসের লোকের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

এল তারা ঠিকই, ঘণ্টা দুই পরেই, সঙ্গে তাদের চৌধুরীমশাই, গ্রাম-পঞ্চায়েতের পাণ্ডা তিনি, এসব ব্যাপারে বাদ পড়েন না। বড় ফটকের ঘণ্টা দিয়ে একটু লজ্জিতভাবে এসে দুটো একটা মামুলী প্রশ্ন করল শুধু।

জিগগেস কত্তে হয় বলে কচ্ছি, স্যার, নইলে এদিকে যে কারো নদীর দিক থেকে আসা সম্ভব নয়, সেটা আমরা খুব জানি। নদীতেও আমাদের লোক আছে যে। তবে মেয়েছেলেরা কত্তে পারে না এমন কাজ নেই, তাই একবার খোঁজ কত্তে আসা। আপনি নিশ্চিন্ত হোয়ে ঘুমুন গে। জালের দরজায় তালা দেন আশা করি? এ গাঁয়েরই কারো কারো সংগে ওদের সড় আছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। এমনভাবে সোনাদানা চালান হয় যে, বে-আইনি বলে ধরে কার সাধ্যি! চলি স্যার।

তারা গেলে পর দরজায় তালা দিয়ে গোপেনবাবু শয্যা নেবামাত্র ঘুমিয়ে পড়লেন। ঠোঁটের কোণে একটুখানি হাসি লেগে থাকল।

পরদিন সকালে রাধেশ্যাম এসে চা টোস্ট নিয়ে গোপেনবাবুকে ডেকে তুলল। তার কাছে খিড়কি দোরের চাবি থাকে। চোখের কোলে তার কালি।

কি হোল রাধেশ্যাম?

সে বললে,

কাল রাতে গাঁয়ে কেউ ঘুমোয় নি, বাবু, সারারাত খানাতল্লাসি চলেছে। আমিনদের বাড়িতে মেয়েছেলেটি ধরা পড়ে গেছে। তক্তাপোষের নিচে সোনা। তাই দেখতে গেলাম, কি সোঁদর, মাইরি। কাঁদতে ইচ্ছে কচ্ছিল।

গোপেনবাবুর হাতখানি কাঁপছিল, অনেক যত্নে পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে বললেন, সোনা হয়তো আর কেউ এনেছে? ও মেয়ে আনবে কেন?

সে তো তাই বলছে। নাকি কিচ্ছুটি জানে না। এমনি বেড়াতে এসেছিল. আমিনের ঠাকুমা ওর ধাইমা ছিল, হেনা-তেনা কত কি। খুব কাঁদছিল মেয়েটা। ঐ দেখুন লরি এল, ওকে থানায় নিয়ে যাবে। কি হোল গো, বাবু?

গোপেনবাবু পেয়ালা ফেলে আথালি পাথালি ছুটে চললেন। কাঁদছে মেয়েটা? হয়তো ভাবছে গোপেনবাবুই খোঁজ দিয়েছেন। কেমন অসহ্য লাগল ভাবনাটা। লরির কাছে পেঁছে দেখেন লাল নীল কাপড় পরা, এক গা সোনার গয়না পরে, ঠোঁটে গালে রং মেখে লম্বা চওড়া এ কোন মেয়েকে তোলা হচ্ছে? আঃ, বাঁচা গেল।

রুমাল দিয়ে হাসি চেপে গোপেনবাবু ঘরে ফিরে রাধেশ্যামকে নতুন করে চা আনতে বললেন। সংগে সঙ্গে দানুকে নিয়ে চৌধুরীমশাইও এসে উপস্থিত, চুল সব উস্কোখুস্কো, উত্তেজনায় ফেটে পড়ছেন। দানু বসে পড়েই বললে,

শেষটা গেলি তো বাছা ফটকে? মেয়েছেলে হয়ে এসবে ঢোকা কেন! চা খাওয়ান গোপেনদা। চৌধুরীমশাই পা-দুখানি মেলে দিয়ে বসলেন। দানু বললে,

যাক, আপনার একটা বিপদ ঘুচল। চোরাকারবারি মেয়ে ধরা পড়ল। এবার ভূত হইতে সাবধান।

চৌধুরী মশাই বললেন,

না, ঠাট্টা নয়, রাত্রে এমনিতেই গা ছমছম করে, তাই কাল আর কিছু বলিনি, কিন্তু এ বাড়ির দুর্নাম কি একেবারে মিছিমিছি হোয়েছে ভেবেছেন? এটা জগু বোসের বাগানবাড়ি ছিল তা জানেন? দেউলে হোয়ে জগু বোসও মল, তার সুন্দরী বাইজি বাক্সভর্তা মোহর নিয়ে নিখোঁজ হোল, সেও প্রায় ত্রিশ চল্লিশ বছর হোতে চলল। জগু বোসের বৌ বনানী দেবী এখনো বেঁচে। নাকি বন-হুগলিতে বুড়ো বয়সে একরকম না খেয়ে দিন গুনছে।

শিরার মধ্যে রক্ত চলাচল বন্ধ থেকে যায়। নাকি ছবি, নাকি ছায়া, ওদের মধ্যে দিয়ে নাকি হেঁটে চলে যাওয়া যায়।

নিঝুম দুপুরে নির্জন চাতালের ধার থেকে টব সরিয়ে বাক্স তুলে, তুলো দিয়ে এঁটে প্যাক করে, চটে সেলাই করে, গোপেনবাবু কলকাতায় এসে বড় পোস্টাপিস থেকে নিজের নাম ভাঁড়িয়ে বনহুগলিতে 'রেজিস্টার্ড' পার্সেল পাঠালেন। ফিরবার সময় তিনটে বেকার উড়নচড়ে ভাইপোকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। কাজকর্ম না শিখলে চলে কখনো?

তাছাড়া সে যে আর কখনো আসবে না তা কি তিনি জানেন না?

একশ টাকার। কড়া কলপ-দেওয়া ইস্তিরিকরা নতুন জামাকাপড়ের মত খড়খড়ে নতুন।

বউদিরই বাক্‌স্ফুরণ হল প্রথম, ও-মা, সত্যিই তো রে! কত টাকা?

আড়াই হাজার। পরে আরো আড়াই হাজার পাব।

আর খবর শোনার ধৈর্য থাকল না। এক-গাল হেসে খবরটা দাদাকে জানাতে

খবরটা ভালো করে শোনার আগেই আমার ঘরের রমণীটির মুখখানা যা হল তা দেখলে কোনো ভদ্রলোকের আর খবর দেবার উৎসাহ বোধ করা উচিত নয়। বিশেষ করে ভালো খবর শোনাতে গেলেও যদি এই মুখ হয়। কিন্তু ঘরে তখন তার বড় জা'টিও ছিলেন। তিনি অপেক্ষাকৃত সহৃদয়া। ছোট জায়ের নিস্পৃহ অবহেলা তুচ্ছ করেই আগ্রহ প্রকাশ করলেন, "থমলে কেন, কি হল বলো না শুনি?

আমি প্রথম শ্রেণীর ভদ্রলোক নই। অর্থাৎ, ঘরনীর মুখের প্রায়-অপমানকর অভিব্যক্তি-সহ 'হুঃ!' বচনের ঘায়ে পুনরুবকার আহত হবার মত ভদ্রলোক নই। তা ছাড়া খবরটাও ফেলনা নয় যখন, ভ্রাতৃজায়ার আগ্রহটুকু অবলম্বন করেই উৎসাহের আঁচটা আর একবার উঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করা যেত। কিন্তু তার আগে তাঁর উদ্দেশে স্ত্রীটি ছোট-খাট ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, শুনবে আবার কি, ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে এবারে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখতে বলো গে। শুনতে হয় নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসে শোনোগে, রাত জেগে আমাকে এখন এক গাদা খাতা শেষ করতে হবে—

বিরাগের যথার্থ হেতু আছে। তার ইস্কুলের ষান্মাসিক পরীক্ষার শ-চারেক খাতায় নম্বর বসাতে হবে। আর পাঁচ সাত দিনের মধ্যেই ছুটি শেষ। ইস্কুল খুললেই মেয়েরা নম্বর নম্বর করে মাথা খাবে। সংসারের ঝামেলায় গোটা ছুটিতে পঞ্চাশটা খাতাও দেখা হয়নি। কোনদিন হয়ও না। এ-ব্যাপারটায় বরাবরই সে আমার সাহায্যপ্রত্যাশী। এবারেও যথা-রীতি কথা দিয়েছিলাম দেখে দেব। কিন্তু দেব দেব করে এ পর্যন্ত একটা খাতা ওলটানোরও ফুরসত হয়নি। ফলে ভালো খবর শোনারও ধৈর্য বা সহিষ্ণুতা গেছে। বিছানায় খাতার গাদা ছড়িয়ে বসেছে।

কথা না বাড়িয়ে আমি পকেট থেকে লম্বা খামটা বার করলাম। তার ভিতরের বস্তুটি বার করতে গিয়ে খামের একটা ধার ছিঁড়ে গেল। একটান আমি বাকি-টুকুও ছিঁড়ে ফেললাম। খামের ভিতর থেকে যা বেরুল, আচমকা দুজনেই তারা মন্ত্রমুগ্ধ। করকরে নোটের একতাড়া, সব শোনাবার জন্যে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

অতঃপর স্ত্রীর সঙ্গে শুভদৃষ্টি। কিন্তু তার বিস্ময়ের ঘোর একেবারে কাটেনি। নোটের তাড়া হাতে তুলে নিল। দেখল। নিজের অগোচরে নাকেও ঠেকালো একবার।

টাকার গন্ধই তো?

অপ্রস্তুত হয়ে হেসে ফেলল।—বেশ যাও! ছড়ানো খাতাগুলো এক-হাতে ঝেঁটিয়ে সরিয়ে দিল। অর্থাৎ ইচ্ছে করলে বসতেও পারি। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, কোন্ বইটা নিলে?

বই না, ছোটগল্প। বাড়িয়ে দিতে হবে—

কোন্ গল্পটা?

হেসে বললাম, তোমার সেইটাই।

খুশি হবে জানতাম। শীলা ভারী খুশি। নাম শীলা বটে, কিন্তু আজকাল নামটা খুব মানায় না ওকে। সে-কথা মুখ ফুটে বলতে পারি না। আমার ওপর হামেশা তার রাগ-বিরাগের ব্যাপারটা খুব নিভৃতের ব্যাপার নয় এখন। তবু এই নামে এখন আর যে ওকে মানায় না

এ-কথা এক আমার ছাড়া আর বোধহয় কারো মনে হয়নি। 'সেই গল্পটা' বলার পিছনে আর তার খুশির পিছনে একটা মানসিক যোগ আছে।

গোড়ায় গোড়ায় আমার সব লেখার প্রতি তার স্বাভাবিক আগ্রহ ছিল। কি লিখছি, কি লিখব, কি লেখা উচিত, সে-সম্বন্ধে আলোচনা হত। কোন্ গল্পের পরিণতি কি হওয়া উচিত তাই নিয়ে আগে থাকতে মতামত ব্যক্ত করে বসে অনেক সময় বিভ্রান্তও করত। উল্টো রাস্তায় গিয়ে অনেকবার মন কষাকষিও হয়েছে। কিন্তু সাংসারিক স্রোতের ধারায় পড়ে লেখার ওজন টাকার ওজনে মাপতে মাপতে স্বাভাবিক আগ্রহটুকু এখন স্বাভাবিক নিস্পৃহতায় এসে ঠেকেছে। কিছু লিখতে বসলে বড় জোর জিজ্ঞাসা করে, কার জন্য লিখছ বা কত টাকা দেবে? উপন্যাস লিখতে বসেছি দেখলে তবু একটু খুশি হয়। এর পিছনে কিছুটা স্ফীত অঙ্কের আশ্বাস আছে। সংসার নির্বাহের প্রয়োজনে এই আশ্বাসও না থাকলে সবই অন্ধকার, তা আমিও জানি। তবু কোনো আশ্বাসের কথা না ভেবেই আগে এক-একটা উপন্যাসের জট ছাড়িয়ে লক্ষ্যের মোহনায় পৌঁছানোর চেষ্টায় দুজনের অনেক বিনিদ্র রাত কেটেছে। সেই সব স্মৃতি কেন জানি আমার ভিতর থেকে মুছে যায়নি একেবারে।

কিন্তু আমি ওর দোষ দিই না একবারও। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত হাড়ভাঙা খাটুনির পরে সাহিত্যপ্রীতির ছিটেফোঁটাও আর অবশিষ্ট থাকার কথা নয়। যত রাত বাড়ে ততো মেজাজ চড়ে। মেয়েটা তেমন দোষ না করেও ঝাঁঝালো কথা শোনে, সময়ে না ঘুমুলে অবুঝ ছেলেটার পিঠেও দু'চার ঘা পড়ে। তারপর নিজে গজগজ করতে করতে শোয়। কিন্তু রাতের গজগজানি বেশিক্ষণ শুনতে হয় না, অভিযোগের তালিকার মাঝামাঝি পৌঁছনোর আগেই ঘুমিয়ে পড়ে।

তার সব থেকে বেশি রাগ ইস্কুলটার ওপর। আমার লেখার অনিয়মিত রোজগারের সঙ্গে ওর স্কুলের নিয়মিত দেড়শ টাকা যুক্ত না করলে দু'হাতে কচুরি-পানা ঠেলেও সংসারতরীটি মাসের শেষের মাথায় টেনে নিয়ে যাওয়া শক্ত। আজ তিন বছর ধরে চাকরি ছাড়ার জন্যে এক পায়ে প্রস্তুত সে। ওর দেড়শ টাকার জায়গায় আমার রোজগার আর একশটা টাকা বাড়লেই চাকরির মুখে ঝাঁটা মেরে আসবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার রোজগার বাড়বে সে প্রত্যাশা আর বোধ-হয় করে না। অথচ আমার রোজগার আসলে সত্যিই কিছু বেড়েছে। সংসারের খরচ সেই তুলনায় অনেক বেশি বেড়েছে বলে বাড়তিটুকু তার চোখেই পড়ে না। সে-কথা বলতে গেলে চোখে খোঁচা পড়বে। তাই এ-ব্যাপারে আমি প্রায় মৌনী।

তার অভিযোগ, ইস্কুলের হেড মিসট্রেস, অ্যাসিসট্যান্ট হেড মিসট্রেস, সিনিয়র টীচার, সেক্রেটারী সকলেই তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। চাকরি করছে বলে মাথা কিনেছে ভাবে। একধার থেকে ওর ঘাড়ে ক্লাস চাপায় আর খাতা চাপায় আর উপদেশের ছলে কড়া কথা বলে। অভিযোগগুলো সত্যি কিনা আমি কখনো যাচাই করে দেখিনি। হতেও পারে সত্যি। কিন্তু আমার বিশ্বাস, চাকরিটা চক্ষুশূল বলেই অভিযোগগুলো চার-গুণ সত্যি হয়ে সর্বদা ওর মাথায় ঘোরে। তাছাড়া ওপরওয়ালা বরদাস্ত করা ধাত নয় যার, ওপরওয়ালার সহজ কথাও সে বাঁকা শুনে থাকে। কিন্তু এইসব বিশ্লেষণ আমার একান্ত নিভৃতের।

এবারে 'সেই গল্পটা'র ইতিবৃত্ত বলি। লম্বা ছুটি-ছাটা এলে ঘরনীর মেজাজ সর্বদাই অতটা সপ্তমে চড়ে থাকে না। তখন ইচ্ছেমত সংসার আর ছেলেমেয়ের দেখাশুনা করেও আমার সদ্য কোনো লেখা নিয়ে একটু-আধটু মাথা ঘামানোর অব-কাশ পায়। সমাপিকা গল্পটা ওর গত ছুটিতে লেখা। গল্পটা লেখার সময়ে একটা ত্র্যহস্পর্শের যোগ হয়েছিল। অর্থাৎ শীলার অবকাশ ছিল, আমার শরীর অসুস্থ হয়েছিল, আর সম্পাদকের গল্পটা অবিলম্বে হাতে পাওয়ার তাড়া ছিল। আমি লিখে উঠতে পারছিলাম না, শীলা আমার হয়ে কলম ধরেছে। আমি বলেছি, ও লিখেছে। ফলে প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর মতান্তর ঘটেছে। শেষ পর্যন্ত ওর মনমতই গল্পটা খাড়া করে তুলেছিলাম। শেষ হতে উচ্ছ্বাসের আতি-শয্যে বলেছিল, সত্যিই গল্পটা ভালো হয়েছে।

আমি যেমনই লিখে থাকি, গল্পটা ওর ভালো লেগেছিল। আমার নির্বাচিত সঙ্কলনে ও-গল্পটার স্থান দিইনি দেখে মুখ বাঁকিয়ে বলেছে, ওকে জব্দ করার জন্যেই সঙ্কলনে এটা বাতিল করা হল।

কিন্তু গল্পটা সত্যিই এমন কিছু অভিনব নয়। লেখকের বা লেখক-সঙ্গিনীর দরদটুকু ছেঁকে তফাত করে দিলে এমন কিছুই নয়। তবে দরদের ওজনটাও একেবারে ফেল্না নয় বটে। গল্পের বিষয়বস্তু দু'কথায় বলে নেওয়া দরকার। একটি সাধারণ ঘরের ছেলে একটি সাধারণ ঘরের রূপসী মেয়েকে ভালবাসত। দু'জনারই সংগ্রামী জীবন। ছেলেটি মরীচিকার আশায় ক্রমশ বাঁকা পথে তলিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু এ যুগেও একটি শিক্ষিতা রূপসী মেয়ের অনেক শক্তি। সে সোজা রাস্তা ধরেই দৃপ্ত চরণে সাফল্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। দু'জনের মানসিক ব্যবধান বাড়ছে, বস্তুতন্ত্রীয় ফারাক বাড়ছে। উপ-সংহারে চূড়ান্ত স্খলনের এক বেদনা-করুণ মুহূর্তে মেয়েটি অনেক প্রলোভন তুচ্ছ করে ছেলেটিকে আবার সুস্থ জীবনের পথে টেনে তুলছে।

গল্পটা কেন শীলার এত পছন্দ হয়েছিল সেটা এবারে সহজ অনুমান-সাপেক্ষ। তবে স্বীকার করতে বাধা নেই, তার অতটা আগ্রহে বোনা বলেই হয়ত আমারও নিতান্ত মন্দ লাগেনি। আরো দু'চারজন যখন প্রশংসা করেছিল গল্প-টার, তখন এমনও মনে হয়েছিল নির্বাচিত সঙ্কলনে ওটা দিলেই হত। পরের সংস্করণে ওটা জুড়ে দেওয়ার ইচ্ছেও আছে।

এই সমাপিকা গল্পটাই এক নামকরা চিত্র-প্রযোজকের মনে ধরেছে। তারই ফলে আমার নগদ আড়াই হাজার টাকা প্রাপ্তি, আর, ওটা ঠিকঠাক করে দিলে আরো আড়াই হাজারের প্রতিশ্রুতি।

একটা দিনের মধ্যে বাড়ির হাওয়া বদলে গেল। গল্পটা ভালো করে বাড়িয়ে দেবার জন্যে শীলা উঠতে-বসতে তাড়া দিতে লাগল। সংসার আর ইস্কুলের খাটুনির পরেও রাত জেগে শোনে কতটা কি করলাম। তর্ক করে, পরামর্শ দেয়, কোথায় অদল-বদল করা দরকার নির্ভয়ে আর নির্দ্বিধায় তা ব্যক্ত করে। নিজের

দিক থেকে এবারে আমি যথাসাধ্য পরিশ্রম করেছি, আর পরিশ্রম সার্থক হল বলেও ভাবছি।

শীলার খেদ, অনেক আগেই চিত্র-জগতের দিকে চোখ রেখে লেখা উচিত ছিল। তার আশা, এ ছবিটা ভালো হলে বছরে একটা করে অন্তত ছবির কন্ট্রাক্ট হবেই। আর তা হলেই সে অনায়াসে ইস্কুলের চাকরি ছাড়তে পারবে। এই লেখাটা শেষ হলে আর একটা ছবির প্লট ভাবার তাগিদ দিয়ে রেখেছে সে।

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমাপিকা লেখার কাজ শেষ হল। প্রযোজক শুনলেন। শুনে গভীরভাবে চিন্তামগ্ন হলেন। তারপর ছবির সুনিশ্চিত আর্থিক লাভের দিকে চোখ রেখে ছোট-খাট একটা বক্তৃতা করে ফেললেন। ছবির গল্প কোন্ ধরনের আবেগের প্রাধান্য থাকা দরকার, প্রথম প্রণয়-পর্বটি কতটা উষ্ণ-ঘন হওয়া অনিবার্য, নায়ক-নায়িকার আবেগ-মধুর সান্নিধ্যের উপ-যোগী কিছু সিচুয়েশনের অবতারণা, ইত্যাদি। তাঁর নির্দেশ, গল্পের এই ত্রুটিগুলো বেশ ভেবেচিন্তে সেরে দিতে হবে।

স্টুডিওতে প্রযোজকের ঘরে বসেই আবার দিনকতক ধরে মেরামত আর নতুন সংযোজনের কাজটি সম্পন্ন করতে হল। শুনে প্রযোজক বললেন, মোটামুটি হয়েছে, এখন এঁরা কি বলেন দেখি।

এঁরা অর্থাৎ, পরিচালক, আলোক-শিল্পী, এডিটার প্রভৃতি। সকলকে নিয়ে প্রযোজকের ঘরে আবার একদিন শোনার আসর বসল। শোনার পরে সকলেই ঠিক প্রযোজকের মতই নির্বাক খানিকক্ষণ। আমি দুরু দুরু বক্ষে তাঁদের মতামতের অপেক্ষায় বসে আছি।

পরিচালক নীরবতা ভঙ্গ করলেন। বললেন, গল্প ভালোই তবে অনেক জোড়াতাপ্পি লাগবে এখনো। তাঁর মতে গল্পে বিস্ময়সৃষ্টির দিকে আমি আদৌ চোখ দিইনি। যা ঘটতে পারে তাই শুধু ঘটছে, অপ্রস্তুত দর্শককে হকচকিয়ে দেবার মত ঘটনা-সংযোজন দরকার। এছাড়া মাঝে মাঝে কমিক রিলিফ না থাকলে গল্প দর্শকের বুকে চেপে বসবে। সেদিকে চোখ রেখে দুই একটা চরিত্র আমদানি করতে হবে। এছাড়া আভাসে-ইঙ্গিতে যা-কিছু বলা হয়েছে, সেগুলো স্পষ্ট করে সাধারণ দর্শকের বোধগম্য করে দিতে হবে—পয়সা তো তারাই দেয়।

প্রযোজক এবং আর সকলে একবাক্যে সমর্থন করলেন তাঁকে। এরপর আলোক-শিল্পী তাঁর ক্যামেরা স্কোপ প্রসঙ্গে কিছু পরামর্শ দিলেন, আর এডিটার ছবির স্পীড প্রসঙ্গে। মাথাটা কি এক দুর্বোধ্য বাষ্পে ভরাট হয়ে উঠছিল। বাকি পাওনা আড়াই হাজার টাকার অঙ্কটাও কেমন ঘষা-মোছা লাগছে। যাই হোক, প্রযোজকের অফিস-ঘরে বসে আবার পনের বিশ দিনের একাগ্র পরি-শ্রমের পর অদল-বদল সংযোজন-বিযোজনের ব্যাপারটা সম্পন্ন হল। কিন্তু কি যে দাঁড়াল আমি সঠিক বলতে পারব না। গভীর মনোনিবেশ সহকারে কর্মকর্তারা শুনে মন্তব্য করলেন, চলতে পারে—।

আমার বুক থেকে যেন পাহাড় নামল। কিন্তু না নামাই উচিত ছিল। এর দিন কয়েক পরে বাকি টাকাটা পাওয়ার আশাতে প্রযোজকের কাছে এসেছিলাম। আমাকে দেখেই তিনি বলে উঠলেন, এসেছেন খুব ভালো হয়েছে, আপনাকে খবর দেবার জন্যে এক্ষুনি লোক পাঠাব ভাবছিলাম। চলুন একবার ঘুরে আসি—

কোথায়?

আসুন না—

প্রযোজকের গাড়িতে চেপে যে বাড়ির গেটের সামনে এসে থামলাম, সেই বাড়িটা আমি চিনি না। কিন্তু গাড়িতে বসে শুনেছি কার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্যে চলেছি। শোনার পর থেকে মনে মনে আমি বিলক্ষণ বিচলিত। বহু নাম শোনা আর বহু ছবিতে দেখা যশস্বিনী চিত্র-তারকার আবাসে এসেছি আমরা। সদ্য বর্তমানের ছবিটির ইনিই নায়িকা। উনি নিজেই নাকি আমার সঙ্গে একবার সাক্ষাতের অভিলাষ জ্ঞাপন করেছেন। প্রযোজককে বলেছেন, আমার সঙ্গে তাঁর ঝগড়া আছে।

খবর পেয়ে মহিলা এলেন। আমি যুক্তকরে বি-নত হলাম। প্রযোজক হেসে বললেন, আসামী হাজির, আপনি বোঝা-পড়া করে নিন।

আসামীর মুখ দেখে মহিলাটির হয়ত করুণা হল। বললেন, আগে একটু চা হোক, কেমন?

আমি কৃতার্থ হয়ে বোকার মত মাথা নেড়ে বসলাম, অর্থাৎ, চায়ের তৃষ্ণা আপাতত নেই জানালাম। মহিলা সরাসরি কাজের কথায় এলেন। বললেন, আপনার গল্প ভালো, কিন্তু আপনার নায়িকার প্রতি আপনি সুবিচার করেননি। আগুনের ফুলকির মত মেয়ে—তার কাজ আর সংলাপও তেমনি হওয়া দরকার। নায়কের প্রতিটি চাল-চলন তার চোখের ওপর থাকবে, নায়ককে সে লাগামের মুখে রাখবে, সংঘাত আরো জোরালো হবে—অথচ ভিতরে ভিতরে সে কাঁদবে। এ-ধরনের কিছু সিচুয়েশান ভাবুন, নইলে মেয়েটির আদর্শ তেমন উঁচু হয়ে উঠছে না।

প্রযোজকের সপ্রশংস অভিব্যক্তি। ফেরার পথে গাড়িতে বসে বললেন, আপনার গল্প পছন্দ হয়েছে বলেই এতটা ইনটারেস্ট নিচ্ছে—ভালই তো হল, ওঁকে যত বেশি ছবিতে দেখানো যায়। যা বললেন ভেবেচিন্তে করে দিন।

করে দিলাম।

এরপর টাকার জন্য আবার দিন কয়েক প্রযোজকের স্টুডিও-অফিসে হানা দিয়েছি। কিন্তু ছবির প্রাথমিক কাজে তিনি এত ব্যস্ত যে আগমনের উদ্দেশ্যটা আমি বলে উঠতে পারছিলাম না। সর্বদাই পাত্র-মিত্র পরিবৃত হয়ে আছেন তিনি।

কিন্তু অদৃষ্টে তখনো কিছু বাকি ছিল জানতুম না।

সে-দিন এসে দেখি ঘরে গুরু-গম্ভীর মুখে ছবির নায়ক বসে। আমি ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে প্রযোজক তাঁর দিকে চেয়ে ইঙ্গিত করলেন একটু। তারপর আমাকেই বললেন, ইনি তো আপনার এই গল্পে কাজ করতে চাইছেন না।

আমি হতভম্ব। এই নায়কটিও যশস্বী শিল্পী, হেলাফেলার লোক নন্।

কম্পিতবক্ষে আমি তাঁর পাশের খালি চেয়ারটাতে বসলাম। কিন্তু নায়কটি আর একদিকে ঘাড় ফিরিয়ে রইলেন।

আমি অপরাধীর মত প্রযোজককেই জিজ্ঞাসা করলাম, কি হল......

নায়ক আমার দিকে ফিরলেন এবার। সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে নির্লিপ্ত মুখে বললেন, লেখকদের গল্প বেশিরভাগই নায়িকাপ্রধান হয়, কিন্তু এতটাই যদি হবে, নায়ক চরিত্রের দরকার কি? শুধু নায়িকা নিয়েই গল্প হয় না?

আমি নির্বিরোধী মানুষ, তবু একটা রুক্ষ জবাবই মুখে এসে যাচ্ছিল। কিন্তু এক-ঘর উৎসুক লোকের চোখের ঘায়ে জবাব মুখেই থেকে গেল।

নায়ক ধীরেসুস্থে বললেন, আপনার নায়িকার পাশে নায়কটি ডলপুতুলের মত হয়ে গেছে—তার স্কোপ বলতে কিছু নেই। সে অধঃপাতে যাক বা যেখানেই যাক, তার মধ্যে জ্বালা থাকবে, যাতনা থাকবে, পুরুষকার থাকবে। প্রতিষ্ঠা পেল না বলে একটা মেয়ের হাতের খেলনা হয়েও যে থাকতে রাজি নয় সে—এটা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিতে হবে। নইলে আমার এতে এসে লাভ কি!

প্রযোজক তাড়াতাড়ি বললেন, সব হবে সব হবে, আপনি ভাবছেন কেন! আপনার রোল ছোট হলে তো আমার ছবি মার খাবে। আমার দিকে তাকালেন, এঁর দিকটা সত্যিই ভালো করে ভাবা হয়নি, সব শুনলেন তো, চরিত্রটা এবারে বেশ করে ফুটিয়ে তুলুন।

তাও তুলেছি। সব মিলিয়ে কি করেছি আমার ভাবার শক্তি নেই। বাকি আড়াই হাজার টাকাও পেয়েছি। টাকাটা শীলার হাতে তুলে দিতে সে খুশিতে আটখানা। শিগগীরই ইস্কুলের চাকরিটা ছাড়া অসম্ভব হবে না ভাবছে সে। এরপর অন্য লেখা নিয়ে বসতে দেখলেও ভুরু কুঁচকেছে, বলেছে, ছবির আর একটা গল্পটল্প ভেবে রাখলে হত না!

ছবির কাজ যত শেষ হয়ে আসছে আমার ততো মুখ শুকোচ্ছে। এদিকে আমার আপনজনেরা ছবির মালিকের প্রচারের ছটায় মন্ত্রমুগ্ধ। তাই আমার শুকনো মুখ কারো চোখে পড়েছে মনে হয় না। সারাক্ষণই কি এক অস্বস্তিকর যাতনা। অবশ্য সে-যাতনা যথাসাধ্য গোপন করতে চেষ্টা করেছি।

বাজার সরগরম করে একদিন ছবির মুক্তি ঘোষণা করা হল। বাড়িতে একটা আনন্দমিশ্রিত উত্তেজনার ঢেউ খেলে গেল। হলের সামনে কত লম্বা লাইন হয়েছে আর কত মাথা গিসগিস করছে তার প্রত্যক্ষ বিবরণ শোনা যেতে লাগল। ছবির প্রশংসাও কানে আসতে লাগল। আমি যে চুপি চুপি ছবিটা একদিন দেখে এসেছি সে-কথা আর কাউকে বলা গেল না। শীলা আমার নিস্পৃহতা দেখে রীতিমত বিস্মিত। সেদিন দশ বছরের মেয়ে ইস্কুল থেকে ফিরে বলল, বাবা, আমাদের ক্লাসের মেয়েরা তোমার ছবি দেখতে চাইছে।

হঠাৎ একটা ধমক খেয়ে হকচকিয়ে গেল সে। তার মা ঘরে থাকলে বিলক্ষণ অবাক হত। আদরের মেয়েকে কখনো বকি না বলেই তার রাগ। বিকেলে ইস্কুল থেকে ফিরে সে-ও হাসিমুখে বলল, কয়েকজন টীচার ধরেছে ছবি দেখাতে হবে—দুই একজন দেখেও এসেছে, খুব ভালো বলছিল। এরা পাশ-টাশ দেবে তো না কি?

আমি একটা দরকারী চিঠি লিখছিলাম, জবাব দেবার ফুরসত হয়নি।

আটদিনের দিন খবরের কাগজের সমালোচনা বেরুল। বাড়িতে আর এক-প্রস্থ খুশির তরঙ্গ বয়ে গেল। কাগজ-ওয়ালারা মোটামুটি প্রশংসাই করেছে ছবিটার, বর্তমান সমাজের বাস্তব চিত্র, সবল নারী সত্তার শক্তি-মাধুর্য, পুরুষের আচ্ছন্ন পুরুষকার, ইত্যাদি অনেক গাল-ভরা শব্দও চোখে পড়েছে। সমস্যাসংকুল ছবিটিতে অনেক সুন্দর সুন্দর হাসির খোরাক আছে পড়ে শীলা অবাক।—এ গল্পে আবার হাসি কোথা থেকে এলো?

তার দিকে চেয়ে সেই প্রথম আমার হাসি পেয়েছিল।

সেই সকালেই স্বয়ং প্রযোজক বাড়িতে এসে হাজির। তাঁর ধারণা ছবি 'হীট্' করবে। অবিলম্বে আর একটা গল্প লেখার জন্য উৎসাহিত করে গেলেন তিনি। শুনে শীলা মুখ বাঁকালো।—গরীবের কথা বাসি হলে ফলে, আমি যে ক'মাস ধরে তাগিদ দিচ্ছি কানেই যায় না!

ওর ধারণা, ও বলেছে বলেই কানে যাচ্ছে না, নইলে কানে যেত।

শীলা আর বউদি দলবলসহ ছবিটা দেখে এলো আরো এক সপ্তাহ বাদে। বাড়ির কর্ত্রী সকলকে খাইয়ে-দাইয়ে তারপর যেমন নিজে আহারে বসে, এই ছবিটা দেখার ব্যাপারেও তার তেমনি মনোভাব। সকলে দেখেশুনে তৃপ্ত হোক, তারপর নিজে দেখবে।

তারা ছবি দেখে ফেরার একটু আগে শীলার বোন আর ভগ্নিপতি এসে উপস্থিত। তারা দিনকতক আগেই ছবি দেখেছে। এরা ফিরতে সোৎসাহে ছবির আলোচনা শুরু হয়ে গেল। বউদি বললেন, বেশ ছবি হয়েছে, আমার বাপু ভালোই লেগেছে। ভালো কোথায় কার লেগেছে সেই বিশ্লেষণ চলতে লাগল। শীলা হাসিমুখে শুনছে, আর এক-এক বার আমার দিকে তাকাচ্ছে।

রাত্রি। ঘরের আলো নিবিয়ে আমি আগেই শুয়ে পড়েছিলাম। শীলা ওপাশে শয্যা নিল টের পেলাম। মাঝে ছেলে ঘুমিয়ে। অনেকক্ষণের একটানা নীরবতার পরে অন্ধকারে ছেলের গা ডিঙিয়ে এক-খানা হাত আমার বাহুতে ঠেকল।

ঘুমুলে?

না।

কি ভাবছ?

একটু থেমে বললাম, ছবির প্লট।

শীলার হাতটা আমার বাহুর ওপর থেকে আস্তে আস্তে সরে গেল। একটু বাদে গালের নিচে হাত রেখে আধ-শোয়া হয়ে ছেলের গায়ের ওপর দিয়েই এদিকে ঝুঁকল। আমার মুখ দেখতে চেষ্টা করছে হয়ত। দ্বিধা কাটিয়ে [illegible], আমাদের যে-ভাবে চলছে চলে যাবে, টাকার জন্যে আর তোমাকে ও-সব লিখতে হবে না, বুঝলে?

আবছা অন্ধকারে এবারে আমি তার মুখখানা ভালো করে দেখতে চেষ্টা করলাম। একবার ইচ্ছে হল আলোটা জেলে দেখি। তা করিনি। অন্ধকারেই কতক্ষণ চেয়েছিলাম বলতে পারব না। হালকা নিঃশ্বাস ফেলে কতক্ষণ বাদে দুচোখ নিমীলিত করেছি, তাও না।

না। শীলাকে আমি সত্যি কথা বলিনি। আমি ছবির প্লট ভাবছিলাম না। কিছুই ভাবছিলাম না। শুধু মনে হচ্ছিল, আমার নিজস্ব বিত্তশূন্য পথে আমি এক নিঃসঙ্গ যাত্রী।

এখন মনে হল, তা নয়। সঙ্গিনী আছে।

চলচ্চিত্রের শিল্প-অনুভূতি

নির্মল কুমার ঘোষ (এন, কে, জি)

গত অর্ধ শতকের চলচ্চিত্র-নির্মাণ এবং চলচ্চিত্র-দর্শন বাংলার চিত্রামোদীদের যদি কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা দিয়ে থাকে তবে তার মূল্য হলো এই যে, বাংলার দর্শক আজ বাহ্য চাকচিক্য উপেক্ষা করে সারবস্তুর মর্যাদা দিতে শিখেছে। কিছুদিন আগেও ছবির বিজ্ঞাপন জনপ্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নামাবলী মুড়ে তা দিয়ে, দর্শক আকৃষ্ট করাই মনে হতো ঘোষকদের একমাত্র কাম্য; অন্ততঃ সেই নামকীর্তিই ছিল ঘোষণার মুখ্য চিন্তা। নেহাৎই ভদ্রতার দায়ে উল্লেখ করা হ'ত কলাকুশলী, সংলাপকার, কাহিনীকার অথবা রূপ-সজ্জাকরের নাম। আজ কিন্তু দর্শকের দৃষ্টি ও চৈতন্য বহু খুঁটিনাটি বিষয়ে সজাগ হয়ে উঠছে, আপনাপন ক্ষেত্রে প্রতিটি কর্মীবৃন্দকে তার যোগ্য মর্যাদা দিতে শিখেছে। তাই আজ ছবির প্রচার-বিদ্ সাড়ম্বরে ঘোষণা করেন যে, উল্লিখিত ছবিতে শুধু জনপ্রিয় অভিনেতা বা অভিনেত্রীই নেই, বহুসমাদৃত কোনো কাহিনী গ্রহণ করা হয়েছে, সে কাহিনীর চিত্ররূপ দিচ্ছেন প্রথিতযশা কোন ব্যক্তি, ক্যামেরার ভার নিয়েছেন সুদক্ষ অপর কেউ এবং রূপসজ্জার ও আঙ্গিকসজ্জার গুরুদায়িত্ব প্রায়শঃই কোনো বিখ্যাত শিল্পীর উপর ন্যস্ত করা হয়। পূর্ণ মর্যাদায় চলচ্চিত্রের অভিষেক আজ আর সুদূরের স্বপ্ন নয়।

অজয় কর পরিচালিত আর, ডি, বনশালের 'সাত পাকে বাঁধা' চিত্রে সুচিত্রা সেন ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

তথাপি, কোথা থেকে এক অদৃশ্য হস্তের প্রবল বাধা বাংলা চলচ্চিত্রের পথরোধ করছে। জাতীয় সরকার চলচ্চিত্রকে সাহায্যের ঐকান্তিক চেষ্টায় নিরত, দেশের জনসাধারণ অধুনা চলচ্চিত্রকে মার্জিত আনন্দরসের প্রাপ্য সম্মান দিতে অভ্যস্ত, চলচ্চিত্র কলা-কুশলীদের প্রয়োগনৈপুণ্য উন্নতির পথে, বিজ্ঞানের সংস্পর্শে চিত্রকলা সমৃদ্ধ—তবুও সে কোন দুস্তর বাধা যা বঙ্গীয় চলচ্চিত্রের শিল্পমান আরো অনেক উন্নত করতে দিচ্ছে না? হলিউড পরিদর্শন-কালে বুদ্ধদেব বসু-বর্ণিত সেই গাইডটির কথা মনে পড়ে, গভীর হতাশা ও বিভ্রান্তিতে যে বলেছিল—"সব দেশ থেকে দর্শক আসে এখানে, দেখে বলে 'এ রকম তো কিছুই নেই আমাদের'—কিন্তু তারা যে কেমন করে আমাদের চেয়ে ভাল ছবি তৈরী করে তা' ভেবে পাই না।" অন্যান্য দেশের যে অর্থবল বা জ্ঞানবল রয়েছে আমাদের তা নেই। তাই গাইডটির এ কথা আমাদের মুখে শোভা পায় না। তবু আমাদের চলচ্চিত্র নিয়েও তো চেষ্টার ত্রুটি হচ্ছে না, আশানুরূপ ফল পাচ্ছি না কেন?

কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করি দর্শককে। দর্শকের মাঝে দুটি ভাগ—কৃষ্টিগতভাবে একটি ভাগ সচেতন, একটি অচেতন। সচেতন শ্রেণীর দর্শক চলচ্চিত্রের উন্নতি নিয়ে মাথা ঘামায় না; নাচে-গানে-হাসিতে-স্ফূর্তিতে উন্মত্ত দুটি-তিনটি ঘণ্টা

বিমল বর্মন পরিচালিত আর, ডি, বনশালের এক টুকরো আগুন চিত্রে বিশ্বজিৎ ও তন্দ্রা বর্মন।

কাটাতে পারলেই তাদের ব্যয়িত অর্থের সার্থকতা সম্বন্ধে তারা নিশ্চিন্ত। যে আনন্দ তারা সংগ্রহ করলো তা যে স্থূল এবং অপরিশীলিত তা নিয়ে মাথাব্যথা তাদের নেই। সচেতন শ্রেণীর দর্শক অবসর-মুহূর্তে চায়ের কাপ মুখে ধরে বাংলা চিত্রশিল্প সম্পর্কে যেটুকু বলে বা ভাবে তার অধিকাংশই সহানুভূতিশূন্য উন্নাসিক সমালোচনা। রসোত্তীর্ণ চিত্রের মর্যাদা দিতে তারা কুণ্ঠিত নয়, কিন্তু অনুত্তীর্ণ চিত্রগুলো সম্পর্কে সহানুভূতি-পূর্ণ আলোচনায় অযথা কালক্ষেপ করতে তারা নারাজ। অতএব বাংলা চিত্রকে উন্নত করার গরজ যাদের সেই চিত্রনির্মাতা ও প্রযোজকদের কাছেই সেই একই নালিশ শুনে ফিরতে হয়—ভালো গল্পের বড় অভাব। কিন্তু সেটাই কি ঠিক? বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতা, প্রাণচাঞ্চল্য, বহুমুখী সমৃদ্ধি যখন বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে তখন কি বলবো বাংলা চিত্রজগৎ উপযুক্ত গল্পের অভাবে বিপর্যস্ত? তা যদি হবে তবে রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্রের অমর কাহিনীসকল এখন সশঙ্ক এবং সময়-বিশেষে হাস্যকর চিত্ররূপ নিয়ে আমাদের সামনে যে উপস্থিত হয় তাও কি ভালো গল্পের অভাবে? আর তর্কের খাতিরে যদি এ প্রশ্ন তুলতেই হয়—তবে বলি সাধারণ দৃষ্টিতে কতটুকু চিত্র-গ্রহণোপযোগী গল্প আছে ক্ষুধিত পাষাণে, কাবুলিওয়ালাতে, পোস্ট-মাস্টারে?

আমার মতে গলদ গল্পের অভাবে নয়, উপযুক্ত চিত্রনাট্য-রচয়িতার দুর্লভতায়। ভালো বক্তা যেমন শূন্যের ওপরে কোনো সারগর্ভ মনোরম বাণী রচনা করতে সক্ষম ভালো নাট্যরচয়িতাও তেমনি সামান্যতম বিষয়বস্তু নিয়েই মনোগ্রাহী একটি নাটক রচনা করতে পারেন। তা যদি না হয় তবে 'শাপমোচন', 'কানামাছি' বা 'সবার উপরে' প্রভৃতির মতন অন্তঃসারশূন্য, অবাস্তব কাহিনীর মনোজ্ঞ চিত্রপরিবেশন কিভাবে সম্ভব। অন্যদিকে, অনেক প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যের চিত্ররূপ এমন করুণভাবে অতি-সাধারণ রূপ নেয় যে, মনে হয় তারও একটি প্রধান কারণ সাহিত্যিকের সক্ষম হাতে বলিষ্ঠ নাট্য-রচনার অভাব। এ কাজে আবার পুরো-পুরি গদ্য-সাহিত্যিকের চেয়ে নাট্য-রচয়িতার অভ্যস্ত হস্ত দক্ষতর হবে। তবে যিনিই হ'ন তাঁর চিত্রজগতের চেয়ে সাহিত্যজগতের সঙ্গে সংস্পর্শ থাকাই অধিক কাম্য।

আমাদের দেশের সাহিত্যিকদের সম্পর্কে (অবশ্য সম্মানিত ব্যতিক্রম স্বীকার করে) মোটামুটিভাবে বলা যায় যে তাঁরা এ মহৎ দায়িত্ব অস্বীকার করেছেন। আমাদের চিত্রনাট্যের ভার যাঁদের ওপরে অর্পিত তাঁরা সাহিত্য-রচনার চেয়ে চিত্রনাট্য-রচনাকেই পেশা-গতভাবে গ্রহণ করেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা কেউ বাংলার যৌবনচিহ্নিত 'New age'-এর প্রতিনিধি ন'ন।

অঞ্জন ফিল্মসের শ্রীজয়দ্রথ পরিচালিত 'অভিনন্দনা' চিত্রে বিশ্বজিৎ ও সন্ধ্যা রায়।

তাঁদের নাট্যরচনার চিন্তা, ভাবধারা বা ভঙ্গিমা দু' যুগ আগেকার বাংলাদেশের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অপরপক্ষে আজকের বাংলাদেশ যে সাহিত্যিকদের লেখায় সার্থকভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে তাঁদের সাহিত্যিক কৌলীন্য তাঁদের চিত্রনাট্য-রচনায় নামতে দেয় না। বাধ্য হয়ে নবচেতনাসম্পন্ন পরিচালকগণ আজ নিজেরাই চিত্রনাট্য-রচনায় হাত দিয়েছেন এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে চিত্রের কাহিনীও তাঁদের স্বরচিত। এতে তাঁদের পরিচালকের কর্তব্য কিছু পরিমাণে ব্যাহত হচ্ছে বলাই বাহুল্য। আর এও ঠিক যে এ ব্যবস্থা সাময়িকভাবে কার্যকরী হলেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হিসাবে কোনো-মতেই কাম্য নয়। সাহিত্য যদি জীবনের দর্পণ হয় আর চলচ্চিত্র যদি জীবন-দর্শনের মাধ্যম হয় তবে সাহিত্যের অত্যাধুনিক গতি থেকে গা বাঁচিয়ে চলার পরিবর্তে সাহিত্য ও চলচ্চিত্র উভয়ে হাত মেলালে উভয়েরই লাভ।

একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের উৎপত্তি বিভিন্ন, অতএব গতিও বিভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। বস্তুতঃ বাংলা সাহিত্য যতই মনস্তত্ত্ব-বিষয়ক হবার দিকে ঝুঁকছে বাংলা চলচ্চিত্র ততই 'নিও-রিয়ালিজম্' ত্যাগ করে 'নিও-রোম্যাণ্টিসিসমের' দিকে মোড় নিচ্ছে। অতএব বাস্তব মনচর্চায় নিরত সাহিত্য থেকে বস্তুসংগ্রহ 'নিও-রোম্যাণ্টিক' চলচ্চিত্রের পক্ষে সুসাধ্য নাও হতে পারে। কিন্তু নবযুগের সাহিত্যিক তাঁর নবধারায় পুরাতন সাহিত্যের যে নব-রূপায়ন সাধন করবেন চলচ্চিত্রজগতে তা এক নতুন যুগের সূচনা করবে বলে আশা করা অন্যায় হবে না। চিত্ররসিকের মনশ্চক্ষে সেই স্বর্ণোজ্জ্বল দিনটি ভাসছে যেদিন চিত্র-পরিচালক নবযুগের সাহিত্যিকের সহযোগিতায় বঙ্গচলচ্চিত্রজগতে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবেন।

শিল্প কখনও থেমে থাকে না, কারণ শিল্পীর কখনও পূর্ণ প্রশান্তি আসে না। শিল্পীর শিল্প-প্রেরণাই তার মধ্যে সৃষ্টি করে এক অপরূপ অতৃপ্তি যা শিল্পকে দেয় নতুন সৃষ্টির দ্যোতনা। সাহিত্যে যে শিল্প আছে তার সংস্পর্শ-চ্যুতিই বঙ্গচলচ্চিত্রের এ স্থিতিশীলতার জন্য অনেকাংশে দায়ী। বিশ্বভারতীর শিল্পনিকেতনসমূহে কুটীর শিল্পের নিদর্শনস্বরূপ যে হাতী-ঘোড়া-মানুষ-পুতুল চোখে পড়ে তা নয়নমুগ্ধকর সে কথা সন্দেহাতীত, তবু হস্তশিল্পের

মূল্যবান অভিজ্ঞান হিসাবে কখনও তা আমাদের ঘরে শোভা পায় না—তখন খোঁজ পড়ে Curio-shop-এ প্রাপনীয় শিল্পবস্তুর। চলচ্চিত্র যদি শিল্পকৃতি হয় তাতে শিল্পীর ব্যক্তিগত স্বাক্ষর থাকা দরকার। কিন্তু অধুনা চলচ্চিত্রও গণ-উৎপাদনের আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। যন্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে গণ-উৎপাদন উৎকর্ষ-লাভের পরিচারক হতে পারে, কিন্তু কলাশিল্পে বহু-সৃষ্টি বিনাশেরই কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং আজকের চলচ্চিত্রশিল্প ঠিক সেই পথেই এগোচ্ছে। সব ছবিতেই একই ধরণের শিল্পস্বাক্ষর। কোনো বিশেষ ছবি না দেখলেও দুঃখের কিছু নেই, ঠিক সেই ধরণের ছবি আপনি আরও নিশ্চয় দেখেছেন অথবা দেখবেন।

এ কথার গৌরবময় ব্যতিক্রমস্বরূপ যাদের নাম করা যেতে পারে তাঁরা সংখ্যায় মুষ্টিমেয় এবং চলচ্চিত্রজগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনে তাঁরা আজও অক্ষম। বঙ্গচলচ্চিত্রের শৈশবাবস্থায় দেখা যেতো বহু ব্যবহৃত গৃহকোণসম্বলিত কাহিনীর অবিরাম চিত্ররূপ। সাধারণ সংসারের আরও সাধারণ প্রবৃত্তি এবং দৈনন্দিন ঘটনাসমূহ অবলম্বন করে মামুলী কাহিনী রচনা করা হত—সেই কুচক্রীর মন্ত্রণায় সোনার সংসার ছারখার হয়ে যাওয়া, শেষ মুহূর্তে ভুল-বোঝাবুঝির পালা শেষ করে মিলনান্তক পারিবারিক দৃশ্য—গণ-উৎপাদনের সেই শুরু। এর পরে একই বিশেষ ধরণের শিল্পব্যঞ্জনায় শিল্পী-মনের পৌনঃপুনিকতা প্রতিটি ছবিতে ছবিতে দেখতে দেখতে বোঝা গেলো শিল্পও আজকাল জনগণের জন্য মাত্র বৃহত্তর শ্রমশিল্পের পরিমাপে নির্মিত হচ্ছে—স্টুডিও নামধারী কারখানাসমূহ হ'তে জনগণের একঘেয়ে আনন্দে যোগানদার Standardized চিত্রসমষ্টি। চিত্রপরিচালক আজ শিল্পী ততটা নয় যতটা ব্যবসায়ী। তাঁর ব্যবসায়-নীতিটুকুই শুধু সময়ের সঙ্গে রূপবদল করে: যেমন পুরোনো সমাজের ভগ্নদশায় বাস্তবতাবোধ ছিল তাঁদের নীতি। এবং বাস্তবতাকে অনুকরণ করতে গিয়ে অতিবাস্তবতার ভঙ্গিমা অবলম্বন করেছেন তাঁরা বর্তমানে। ব্যবসায়ীর মতন তাঁরা অনুকরণ করেন, শিল্পীর মতন অনুধাবন করতে চান না। বিহঙ্গ ডানায় ভর করে অনন্ত আকাশের পানে উড়ে চলে কিন্তু তখন ডানাদুটো মুখ্য থাকে না, উদার আকাশের অসীম নীলের নৈস্তব্ধ্য উপলব্ধিই তখন তার সবটুকু সত্তা জুড়ে থাকে। উপকরণ যেন তার বাহুল্যে উদ্দেশ্যকে গৌণ না করে দেয় সেদিকে সচেষ্ট থাকতে হবে। যন্ত্র আমাদের শিল্প-উপলব্ধির উপায়মাত্র, তার ডানায় ভর করে অযান্ত্রিক শিল্প-সৃষ্টি কেন সম্ভব হবে না?

অতএব চিত্র-সমালোচকের দৃষ্টিকোণ থেকে মনে হয় চিত্র-পরিচালক ও প্রযোজকের সম্মুখে এখন দুটি কর্তব্য—চলচ্চিত্রে প্রকৃত শিল্পের অনুসরণ করা এবং আমাদের বিশেষ পারিপার্শ্বিকের কথা স্মরণ রেখে তদুদ্দেশ্যে আত্মনিয়োজিত সাহিত্যিকের সাহায্য গ্রহণ। চমকপ্রদ সফলতায় সঙ্গেই যন্ত্র আজ বর্তমান মানবের দৈনন্দিন জীবন আক্রমণ করেছে। কিন্তু তার আনন্দের উৎসটুকুতে অন্ততঃ যেন প্রকৃতি ও শিল্পের একাধিপত্য বিরাজ করে—ব্যবসায় বুদ্ধির কাছে শিল্পীমানসের এইটুকুই প্রার্থনা।

আলোচনা চক্র

অমৃতের পক্ষ থেকে
আলোচনায় অংশ গ্রহণ
করেছেন
আশীষতরু মুখোপাধ্যায়

*

চলচ্চিত্র-শিল্পীর জীবন সম্পর্কে জনসাধারণের কৌতূহল চিরদিনের। শিল্পসৃষ্টির আনন্দে শিল্পী যখন তন্ময়, তখন দর্শক সেই জীবন সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি উৎসাহী। এই দূরকে আপন করে জানার উদ্দেশ্য মহৎ হলেও শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আলোচনা না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কারণ শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবন তার একান্তই নিজস্ব। একমাত্র অভিনীত চরিত্রসৃষ্টির মধ্য-দিয়েই হবে তাঁর অভিনয়-জীবনের সব-চেয়ে বড় স্বীকৃতি। সেখানে ব্যক্তিগত পরিচয় বড় নয়। তাই শুধু শিল্পী-জীবনের অভিজ্ঞতা ও আজকের চলচ্চিত্রে কি ভাবে প্রস্তুতির প্রয়োজন সেই প্রসঙ্গে আমরা কিছু প্রশ্নের আলোচনা করবো।

চলচ্চিত্র-গ্রহণের সামান্য অবসরে শিল্পীদের স্বকণ্ঠের উত্তর এখানে জানানো হল। স্থানাভাবে কিছু প্রশ্নের উত্তর বাদ পড়েছে। এজন্য আমরা দুঃখিত। শিল্পীদের এই উত্তর-মালা সম্পূর্ণই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে কথিত এবং মতামতও তাঁদের একান্ত ব্যক্তিগত। আলোচিত শিল্পীরা হলেন উত্তমকুমার, অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও সুপ্রিয়া চৌধুরী।

প্রশ্ন : চলচ্চিত্রে কেন এলেন ?

(১) অভিনয়ে কোন বিশেষ ঝোঁক।

(২) আকস্মিক যোগাযোগ।

উত্তমকুমার :
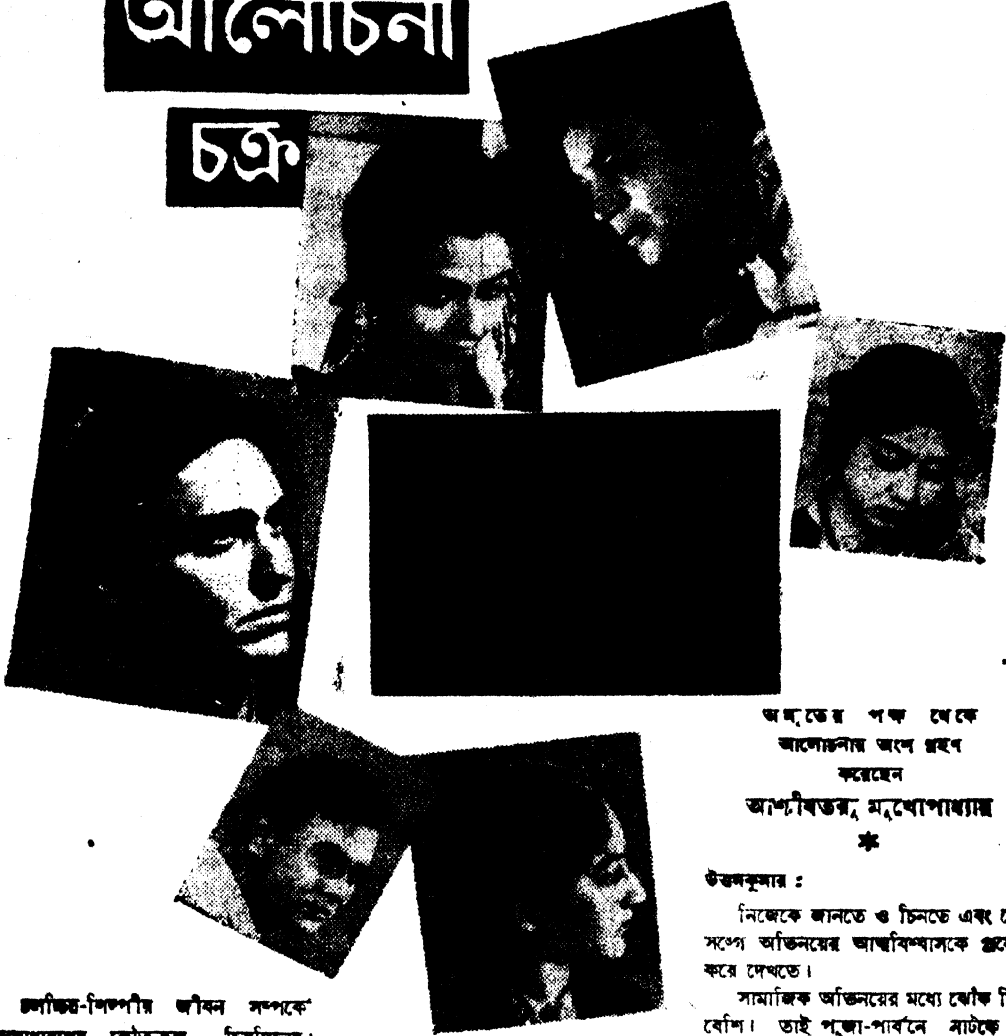
নিজেকে জানতে ও চিনতে এবং সেই সঙ্গে অভিনয়ের আত্মবিশ্বাসকে প্রয়োগ করে দেখতে।

সামাজিক অভিনয়ের মধ্যে ঝোঁক ছিল বেশি। তাই পুজো-পার্বনে নাটকে মন টানতো।

চলচ্চিত্রে যোগাযোগটা আকস্মিক হলেও প্রথমে গণেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহায্যে চলচ্চিত্র-অভিনয়-জীবন শুরু করি আজ থেকে ষোল বছর আগে।

অনিল চট্টোপাধ্যায়

ঝোঁক ছিল বলার থেকে ছিল না বলাটাই বোধহয় ঠিক বলা হবে। তবে ছাত্রাবস্থায় কলেজে নাটক করেছি অনেক-বার, কিন্তু তখন একবারও মনে হয়নি যে, অভিনয় জীবনে পেশা হলে মন্দ হয় না।

চলচ্চিত্রে আসাটা একটা আকস্মিক যোগাযোগ বলাটাই বোধহয় ঠিক কথা। সহকারী পরিচালক হিসেবে আমি প্রোডাকসন্সের 'যোগবিয়োগ' ছবিতে

প্রথম কলাকুশলী হয়ে আসি। তারপর এই কোম্পানীর অস্তিত্ব লোপ পাবার পরই আমার অভিনয়-জীবনের শুরু।

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় :

অভিনয়ে বিশেষ ঝোঁক যে বয়সে চলচ্চিত্র বা মঞ্চে আকর্ষণ করে, আমি ঠিক সেই বয়েসে চলচ্চিত্রে যোগ দিইনি। ছোটবেলাতেই চলচ্চিত্রে যোগ দেওয়ার কারণ আমাদের অভাবগ্রস্ত সংসারে সাহায্য করা। ছোটবেলা থেকেই অভিনয়, নাচ-গান আমার ভাল লাগতো, কিন্তু এই ললিতকলা যে আমার জীবনযাত্রার পাথেয় হবে তা কোনদিন ভাবিনি।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় :

চলচ্চিত্রে আসাটা আমার পুরোপুরি আকস্মিক নয়। কারণ ছেলেবেলা থেকেই অভিনয় করার নেশা ছিল। কলেজ-জীবনের শেষে প্রায় মনস্থির করে ফেলেছিলাম অভিনয়কেই পেশা হিসেবে নেব। তবে তখন প্রধানত লক্ষ্য ছিল মঞ্চ। পরে চলচ্চিত্রে আসাটা যোগাযোগ হলেও আকস্মিক নয়।

সুপ্রিয়া চৌধুরী :

ছোটবেলা থেকে অভিনয় করার দারুণ ইচ্ছে ছিল মনে। ভবিষ্যতে যেদিন প্রথম অভিনয়ের সুযোগ আসে সেদিন এত বেশি আনন্দ পেয়েছিলাম যা আজও ভুলতে পারি না।

আজ থেকে বারো বছর আগে শ্রীমতী চন্দ্রাবতী আমাকে প্রথম চলচ্চিত্রে যোগাযোগ করিয়ে দেন।

প্রশ্ন : অভিনয়-জীবন কেমন ?

(১) আত্মবিশ্বাসের সুযোগ কতদূর।

(২) পরিবেশ কেমন ?

(৩) কিছু পরিবর্তনের প্রয়োজন কিনা।

উত্তমকুমার :

অভিনয়ের জীবন ভালই বলব। প্রত্যেক চরিত্র-সৃষ্টির মধ্যে এ জীবন সার্থক মনে হয়।

আত্মবিশ্বাসের সুযোগ আছে নিশ্চয়ই, তবে ছবির ভাল-মন্দ সবকিছুর সমন্বয় দর্শকের দ্বারা সমাদৃত না হলে শিল্পীর পক্ষে সে সুযোগ সব সময় সুফল হয় না। দর্শকদের অভিজ্ঞতের ওপর এ প্রত্যয় নির্ভর করে।

পরিবেশ বলতে কোন প্রতিবাদের কথা মনে পড়ছে না। সমাজের আর সব পরিবেশের মতই সুস্থ—এর জন্য ভিন্ন কোন পরিবেশের প্রয়োজন হয় না।

চলচ্চিত্রে প্রথম পরিবর্তনের প্রয়োজন ভাল গল্পের। তারপর চিত্রনাট্য। তা না হলে শুধু অভিনয়ে এমন কিছু পরিবর্তন হওয়া উচিত বলে মনে করি না।

অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় :

'কাজই একমাত্র মুক্তির পথ'—এ মতবাদে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁদের সব কাজই ভাল লাগে, এই আমার বিশ্বাস। যে পথে মনের সহজ বিকাশ, যেখানে বিকশিত মনের পরিব্যাপ্তি সেখানে পরিতৃপ্তি আছে। যে কোন শিল্প-সৃষ্টি বা শিল্পানুভূতির মধ্যে এ সুযোগ রয়েছে। অভিনয়-জীবন তার ব্যতিক্রম নয়।

আত্মবিশ্বাস, ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মূল ভিত্তি। অভিনয়ে এই

আত্মবিশ্বাসের প্রতিফলন চরিত্র-সৃষ্টিতে ও অভিব্যক্তিতে।

পরিবেশ বলতেই সাধারণতঃ মনে আসে স্টুডিওর কথা। কিন্তু স্টুডিও ছাড়াও শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবনের পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনেকাংশে এ জীবনকে প্রভাবান্বিত করে। তাছাড়া স্টুডিওগুলো সম্বন্ধে বাইরের লোকের ধারণা ও মতামত বেশির ভাগ ভুল জনশ্রুতি ও কল্পনার ওপর নির্ভর করে আছে। ইঁটের পর ইঁট গাঁথা ম্যানসনের ছোট্ট খুপরী, কল-কারখানার ধোঁয়ায় ঠাসা মানুষের জীবন থেকে খোলা আকাশের নীচে এ কাজের সময়টুকু জীবনে কম আনন্দ ও স্বাস্থ্য এনে দেয় না। অখ্যাত কুশলী থেকে বিখ্যাত পরিচালকের স্নেহ, সাহচর্য ও সহযোগিতার মাঝে আমাদের কাজের পরিবেশ সহজ ও সুন্দর মনে হয়।

পরিবর্তন ও উন্নতির অবকাশ নিশ্চয়ই আছে। পুরোনোর বদলে নতুন যন্ত্রপাতি ও স্টুডিওগুলো আরও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হলে ভাল হয়।

অনিল চট্টোপাধ্যায় ঃ

অভিনয়-জীবনে ভাল লাগে তবে দুঃখ সেখানেই যে মনের মত চরিত্র পাওয়া যায় না। চলচ্চিত্রের বেশির ভাগ চরিত্র স্বাভাবিক বলে মনে হয় না, তবে ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়, কিন্তু তা সংখ্যায় খুব নগণ্য। অনেক সময় কোন শিল্পীকে প্রযোজক ও পরিচালকেরা একটা 'টাইপ' করে দেবার চেষ্টা করেন যেটা শিল্পীর পক্ষে ক্ষতিকর। নতুন ধরনের চরিত্র করায় বিশ্বাসী তাই আজ মনের মত হলে খুব ছোট 'রোল' বা 'একস্ট্রা'র কাজ করতে দ্বিধাবোধ করি না।

আত্মবিশ্বাস না থাকলে কোন শিল্পী বাঁচতে পারেন না। গোড়ার দিকে সকলের মুখেই শুনেছি যে আমার দ্বারা কিছু হবে না তাই প্রচুর ছোট ভূমিকায় নামতে হয়েছে। আজকের আমি-র আত্ম-বিশ্বাসটাই কিন্তু সেদিনের আমার এক-মাত্র সম্বল ছিল।

পরিবেশ-রচনার জন্য দায়ী আমরা নিজেরাই। পরিবেশ ভালো এবং উপ-যোগী। আরও ভাল হবার সুযোগ রয়েছে এবং উন্নতি তো হচ্ছেই।

ভালোর জন্যে পরিবর্তনের প্রয়োজন তো সব সময়ই আছে। অনেক সময় আমাদের দীর্ঘ সময় কাজ করতে হয় (আট ঘণ্টার বেশি) যেটা ক্ষতিকর। তাছাড়া ছবি মুক্তি পাবার পরও প্রাপ্য টাকা অনেক সময় পাওয়া যায় না—এ পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে।

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ঃ

মানুষের জীবনটাই একটা বড় রঙ্গ-মঞ্চ। অভিনেত্রীর জীবন কোন দিনই খারাপ লাগেনি। এর মধ্যে সত্যিকারের থ্রিল আছে—বিশেষ করে নিজের অভিনীত ছবি যখন মুক্তি পায়।

আত্মবিশ্বাস না থাকলে জীবনের কোন পথেই তো চলাফেরা চলে না।

পরিবেশ মোটেই অস্বাস্থ্যকর নয়। তাছাড়া পরিবেশকে সুন্দর করে নেওয়া তো নিজের ওপর নির্ভর করে। কল্যাণময় পরিবর্তন তো সব সময়ই বাঞ্ছনীয়।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ঃ

অভিনয়ের জীবনই বলুন আর অন্য যে কোন জীবনেই বলুন, আত্মবিশ্বাসের

মূলে আছে কাজ করার সফলতা আর সার্থকতা। অভিনয়-জীবনের উৎকর্ষের এবং 'জনপ্রিয়তা'-র সঙ্গে সঙ্গে আত্ম-বিশ্বাস বাড়তে থাকে সাধারণত। তবে এমন লোকও সংসারে থাকে যাদের ভেতরে আত্মবিশ্বাসটা গোড়া থেকেই কাজ করে। তাদের উন্নতি হলে আত্মবিশ্বাস হয় না। আত্মবিশ্বাস থাকে বলেই তাদের উন্নতি হয়। সে বিশ্বাসটা তাদের ভেতরকার ক্ষমতার ওপর বিশ্বাস।

ভালো-মন্দ মিশিয়ে। যেমন অন্য সমস্ত জায়গাতেই। এই প্রসঙ্গে আমার নিজের একটা অভিজ্ঞতাকে স্পষ্ট করে জানাতে ইচ্ছে করে। আমার চোখে চলচ্চিত্রের এই 'জগত'টা জগতের বাইরের কিছু বলে কোনদিনই মনে হয় না। আমাদের সমাজে যে ধরনের পরিবেশ যে ধরনের ভালোমন্দ সর্বত্রই চোখে পড়ে এখানেও সেই একই কথা। পরিবর্তনের অনেক কিছু আছে। কিন্তু যতদিন না সেই পরিবর্তনগুলো সামাজিক পরি-বর্তনের সঙ্গে মিলবে ততদিন তার খুব একটা মূল্য হবে বলে মনে হয় না।

সুপ্রিয়া চৌধুরী :

অভিনয়-জীবন ভাল। শিল্পী-জীবনের মাঝে সবকিছু ভুলে অভিনয় করতে ভাল লাগে। অভিনয়-জীবন যত-দিন থাকে ততদিনই ভাল লাগে।

কর্ম-জীবনের সব জায়গার মত এখানেও সে আত্মবিশ্বাসের সুযোগ আছে।

পরিবেশ বলতে অভিনয়ের সময় টুকুতে সামান্য কলাকুশলী থেকে আরম্ভ করে সকলের মধ্যে কিছু না কিছু ভালোর সন্ধান মেলে। এখানে অনে আশা বলেই এ পরিবেশ ভাল লাগে।

পরিবর্তনশীল যখন সবকিছুই তখ এখানেও পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে বিশেষ করে এখানকার কলাকুশলীদে অভাব সবচেয়ে বেশি। অনেক কষ্টে জীবনের নিরাপত্তার প্রয়োজন। অভিন সম্পর্কে এ কথাই বলবো যে পুরনে থেকে নতুনের জন্ম। পরিবেশ-অনুযায় অভিনয়েরও পরিবর্তন চলেছে।

প্রশ্ন : বাংলা ছবির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কতটুকু প্রস্তুতির প্রয়োজন?

(১) অভিনয় যাঁরা করেন তাঁদের বি করণীয়।

উত্তমকুমার :

ছবির জন্য ছবি করার দিন গেছে দর্শকদের কাছে যে ছবি ভাল লাগে সে ছবি নির্মাণের কথা আগে ভাবতে হবে। ছবিতে পয়সা না পেলে এ চলচ্চিত্র-শিল্প বিশেষ করে বাংলা দেশে লুপ্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। তা বলে পরীক্ষামূলক ছবি হবে না এ কথা বলা না। ছবির বাজার বাড়াতে হবে।
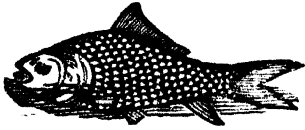
ভবিষ্যৎ তোলা আছে পরিচালক চিত্রনাট্যকারের ওপর। ভাল ছবি করা হলে ভাল গল্পের প্রয়োজন। অভি ছাড়া শিল্পীদের আর কোন ক্ষমতা নেই

অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় :

চিত্র-প্রস্তুতির ভাবে ও ব্যঞ্জনা বাংলা ছবি অনেকখানি এগিয়ে এসেছে অল্প কয়েকজন এর অগ্রণী হলেও, এঁদে প্রভাব প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে সমস্ত চিত্র শিল্পে ছড়িয়ে রয়েছে। বহু পুরনে স্টুডিওর সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে কেবল মাত্র চিন্তাধারা ও বুদ্ধি সম্বল করে যা এতটা অগ্রগতি—তবে বাংলা ছবি ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে তর্ক কে তুলবে

অন্য সব কথা ছেড়ে দিয়ে অভিনয়ে শিক্ষা ও প্রস্তুতির একান্ত প্রয়োজ একথা নিশ্চিত। কোন শিক্ষাকেন্দ্রে ব সরকারী সাহায্যে এ সুযোগ পাওয়া যেত পারে, হয়তো যায়ও। তবে মনে হয় ব্যক্তি গত প্রতিভার ওপরই এ শিল্প নির্ভর করে। হয়তো কোন কোন ক্ষেত্র শিক্ষায়তনের সুযোগ ও মঞ্চাভিনয়ে প্রয়োজন আছে। আমাদের পারিবারি পরিবেশ, স্কুল-কলেজ ও অন্যান্য কর্ম

ওই আসছে— মঞ্জুসা দে

চোটে পানে না! —ঝর্ণা দেব

বলিস্ কি লা! পি, রায়চৌধুরী

টুমি কে? —রেখা ঘোষ

লাডুলী —আরতি দে

উপরে : বামে—পেজাপাতি —শিবাণী দত্ত, দক্ষিণে—যামোই না —শম্ভু বোস, মধ্যে : হেয়ের্ হি হি —পি. ঘোষ
নিচে : বামে—ঠিক বলছো? —উদয়কুমার বিশ্বাস, দক্ষিণে—দুলালী —ডি, সিংহ

জীবনের মধ্য দিয়ে অভিনয়-জীবনকে নানাভাবে প্রভাবান্বিত করে।

অনিল চট্টোপাধ্যায় :

আমার মনে হয় ভাল ছবি অর্থাৎ রুচিবান ছবি করাই হচ্ছে ভবিষ্যতের প্রস্তুতির ইঙ্গিত। দর্শকদের রুচি পাল্টানোর সময় এ সছে।

অভিনয় যাঁরা করেন তাঁদের মানও উচ্চ হওয়া দরকার এবং যুগোপযোগী হওয়া প্রয়োজনীয়। পরিবেশের ওপর চরিত্র-সৃষ্টি নির্ভর করে। অভিনয়-শিল্পীদের অবশ্য বহু অংশে নির্ভর করতে হয় পরিচালক এবং দর্শকদের ওপর। উভয়ের রুচি ভালো হলেই অভিনয়-শিল্পীরাও সার্থক কাজ করতে পারবেন।

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় :

বাংলা ছবির বাজার অত্যন্ত ছোট—কিন্তু ছবি যাঁরা তৈরী করেন তাঁদের সৃজনশক্তি অপ্রতুল নয়। বাংলা ছবির বাজারকে যদি বাঁচিয়ে রাখতে পারা যায় তাহলে ছবি-নির্মাতারা যে আরও ভাল ছবি তৈরী করতে পারবেন— আমি তা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি।

অভিনয় যাঁরা করেন তাঁদের করণীয় বহু কিছুই আছে। সে সম্বন্ধে অল্প কথায় কিছু বলা চলে না। সময়ান্তরে বিশেষ আলোচনার সুযোগ পেলে জানাবো।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় :

বাংলা ছবির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কথা এলেও সেই সামাজিক পরিবর্তন ইত্যাদি পুরোনো কথাগুলিই আবার উঁকি দিতে থাকে। সেখানে শুধু অভিনেতা কেন চলচ্চিত্র-কর্মীরাই এমনকি বাংলা দেশের সমস্ত দর্শকসমাজেরই যৌথ দায়িত্ব আছে। এত বড় দায়িত্বের প্রস্তুতি কি কি ভাবে হতে পারে তা এত ছোট্ট জায়গার মধ্যে ভেবে দেখা কঠিন।

সুপ্রিয়া চৌধুরী :

মামুলি গল্পের দিন শেষ হয়েছে। বাংলা ছবির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উপযুক্ত চলচ্চিত্র-কাহিনীর প্রস্তুতির সঙ্গে ভাল ছবি তৈরীর উৎসাহ বাড়াতে হবে। অভিনয় তার পরের কথা। বাংলা দেশে অভিনয়ের প্রস্তুতি কোন দিন হয়নি। স্টুডিওতেই চিত্রগ্রহণের সময় অভিনয়ের প্রথম হাতেখড়ি হয়।
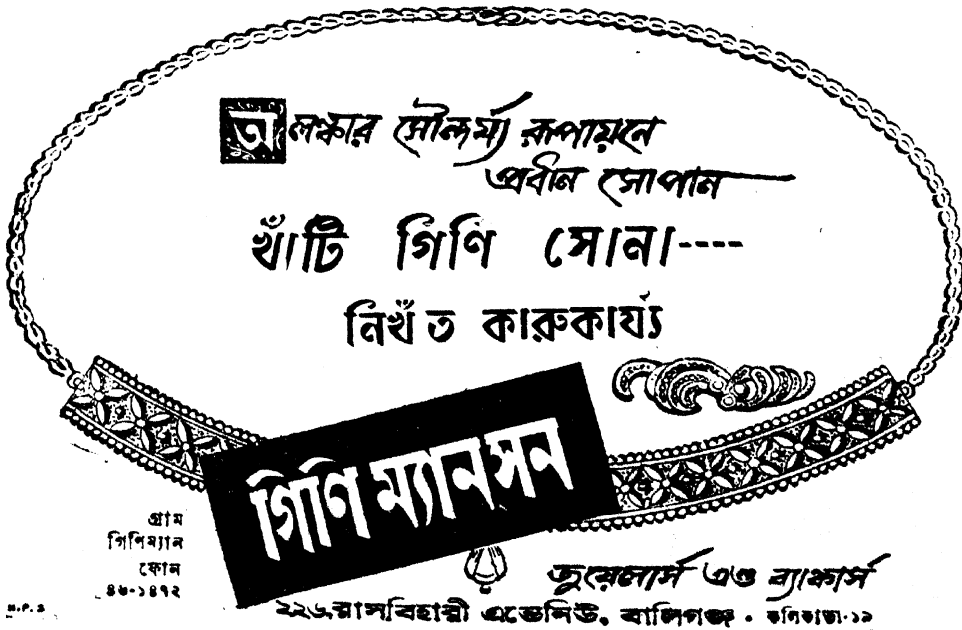
চলচ্চিত্র-মানের উন্নতিসাধন করতে হলে সকলের উৎসাহ ও দলগত প্রচেষ্টার প্রয়াস থাকা দরকার। অভিনয়ের প্রস্তুতির জন্য শিক্ষায়তনের প্রয়োজন আছে।

প্রশ্ন : বাংলার শিল্পীদের ভবিষ্যৎ কি?

(১) খ্যাতিচ্যুত একদা খ্যাতিমান শিল্পীর নিরাপত্তা।

উত্তমকুমার :

নিরাপত্তা বলতে কোন কিছুই নেই। সমস্তটাই একটা ভাগ্য বলে মনে হয়। অভিনয়ে যতদিন সুনাম ততদিন অর্থ। তারপর খ্যাতিচ্যুত একদা খ্যাতিমান শিল্পীকে সাহায্য করতে কেউ এগিয়ে

আসবে না। নিজের কাছে শিল্পীর যা নিরাপত্তা। সচল অবস্থায় সঞ্চয়ী হওয়া ছাড়া ভবিষ্যতের আর ভিন্ন কোন অবলম্বন নেই এই চলচ্চিত্র-অভিনয়ের জগতে।

অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় :

শিল্পীর ভবিষ্যৎ—ভাল মন্দ তার সবকিছুই শিল্পের জন্য। খ্যাতি, অখ্যাতি সবই শিল্পের মাধ্যমে। তর্ক, বিতর্ক, সংগঠন আর পরিকল্পনা শিল্পীকে বোধহয় বেশিদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। কালের যে অমোঘ চিরন্তন নিয়ম শিল্প ও শিল্পীর ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে এসেছে, বাংলা ছবির শিল্পীদের ক্ষেত্রেও সে নিয়ম অলঙ্ঘনীয়।

অনিল চট্টোপাধ্যায় :

শিল্পীদের ভবিষ্যৎ বলতে আমি তো কোন নির্দিষ্ট আকার খুঁজে পাই না। অভিনেতা হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত যতদিন থাকা যায় ততদিনই অর্থ, নাম, যশ—সবকিছুই। তবে আমার মনে হয় খ্যাতিচ্যুত শিল্পীদের আবার অভিনয়ের সুযোগ দিলে আবার খ্যাতিমান হবার সম্ভাবনা থাকে। তা নাহলে নিরাপত্তার কোন খোলা রাস্তা নেই।

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় :

বাংলার শিল্পীদের ভবিষ্যৎ যে আশাপ্রদ নয় একথা খুবই সত্যি। খ্যাতিচ্যুত একদা খ্যাতিমান শিল্পীদের কেউ কেউ আজ খুবই কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। মাঝে মাঝে এই দুঃস্থ শিল্পীদের জন্য বেনিফিট নাইট অভিনয় হয় বটে কিন্তু বিপুলসংখ্যক শিল্পীদের সে সাহায্য অতি নগণ্য।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় :

অভিনেতার আর্থিক নিরাপত্তার কোন সুরাহা অভিনেতাদের সংগঠন থেকে পুরোপুরি করা যায় কিনা জানি না। হয়ত কিছু অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা তাতে হতে পারে, কিন্তু সমস্যার মূলটা রয়েই যায়। যে সমস্ত পেশায় স্থির কোন নির্দিষ্ট কোন রোজগার নেই—'স্বাধীন ব্যবসা' যারাই করে তাদেরই জীবন আমাদের মত ওঠা-পড়ার সংকটের মধ্যে দিয়ে যায়। সেই 'স্বাধীন রোজকারে'-র থেকেও আমাদের পরাধীনতা একটু কম। কেননা আমাদের ওঠা-পড়াটা আরও অনিশ্চিত। যদি আমাদের চলচ্চিত্র-শিল্পের লাভ, লোকসান, মালিকানা, মূলধন ইত্যাদি কোন মূলগত এবং সামগ্রিক পরিবর্তন না হয় তাহলে নিরাপত্তার অন্য কোন ব্যবস্থাই হতে পারে না বলে আমার মনে হয়। এখন সে পরিবর্তন কি হবে না হবে তা খুঁটিয়ে বলতে পারেন বিশেষজ্ঞরা।

সুপ্রিয়া চৌধুরী :

আজকের দিনে বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্প যেভাবে চলছে—তার বহুমুখী পরিবর্তন না হলে বাংলা শিল্পীদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় একথা বলা চলে।

শিল্পীদের যদি নিরাপত্তাই থাকতো তাহলে একদা খ্যাতিমান বহু শিল্পী এই চলচ্চিত্র-অভিনয় থেকে দূরে চলে যাবেন কেন?

শ্রীনিমাই সন্ন্যাস প্রসঙ্গে

আনন্দকুমার সেন

'প্রেম পৃথিবীতে একবার মাত্র রূপ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা বঙ্গদেশে।' সেই প্রেমাবতার আবির্ভূত হয়েছিলেন নবদ্বীপের বিখ্যাত পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্রের ঘর আলো করে শচীমাতার কোলে। নিম গাছের নীচে লাভ করেছিলেন এই মানবদেহধারী দিব্যবিভাকে, তাই শচীমাতা নাম দিলেন নিমাই। পিতা দিলেন নাম বিশ্বম্ভর।

১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী ফাল্গুনী পূর্ণিমার সন্ধ্যায় অশান্ত শিশু নিমাই এলেন মানব জীবনের আনন্দঘন মহাবিভূতি নিয়ে। নবদ্বীপবাসী ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে তাঁর অত্যাচারে আর দুর্বিনীত ব্যবহারে। এই অশান্ত মানবশিশু কালে কালে নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হয়ে উঠলেন। ব্যাকরণ, দর্শন, কাব্য সাহিত্যের বিদ্যা নির্বিশেষে স্বীকরণ করার সঙ্গে সঙ্গে বহুভাষাজ্ঞান লাভ করেন। কিন্তু চিরকালের চাপল্য আর রহস্যপ্রিয়তা হারিয়ে গেল না পাণ্ডিত্যের দাম্ভিকতার অন্তরালে। সেকালের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত তাঁর পাণ্ডিত্য এবং পরিহাসের তীব্র বিদ্যুতচমকে দিশাহারা হয়ে পড়লেন। নিমাই পণ্ডিত পূর্ব বাংলা থেকে ফিরে এসে দেখেন পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়া আর ইহজগতে নেই। প্রিয়তমা পত্নীর বিয়োগবেদনা তাঁকে সংসার-বিমুখ করে তুলল। কিন্তু মাতৃ আজ্ঞাকে তুষ্টমানসে বিবাহ করলেন বিষ্ণুপ্রিয়াকে। গয়াধামে নিমাইয়ের চরিত্রে এল এক অপূর্ব ভাবোন্মাদনা। বিষ্ণুপাদমূলে অঞ্জলি দানকালে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন প্রেমাবেশে। ঈশ্বরের পাদমূলে বিসর্জিত হল উদ্ধত দাম্ভিক মানবকের। উৎসৃত হলেন মহামানবপ্রেমী চিরকালের আদরের দুলাল। রহস্যময় মোহন মুহূর্তে জন্মগ্রহণ করেন মহামানব। জাতির রুদ্ধশক্তিনিময় জীবনান্তরালে লুকিয়ে ছিল যে কল্যাণের আলোক-

মাধুরী মুখোপাধ্যায়

ধারা এক অনন্ত দুর্লভ মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ল মুক্তিকামী পার্থিব জীবনপ্রেমী লোভাতুর মানুষের মাঝে। মথুরার পথে

গৌরগোপাল
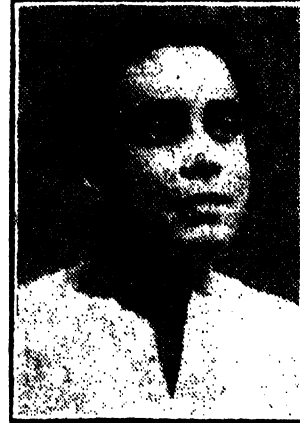
ছুটেছে নিমাই বিরহের শেষে প্রেমিকের পাশে মিলনের জন্য। কিন্তু ফিরে আসতে হল বহুজনের বাধাদানের ফলে। কিন্তু নিমাইকে ঘরে বেঁধে রাখা গেল না। চব্বিশ বৎসর বয়সে এক অমৃত ক্ষণে কাটোয়ার কেশব ভারতীর কাছে দীক্ষা নিলেন।

•

সমগ্র বঙ্গদেশ এই মহামানবের আবির্ভাবলগ্নের জন্য অসীম সাধনায় কাটিয়েছে দীর্ঘকাল। বাঙলায় ঘরে ঘরে অনাচার আর কদাচারের যে লেলিহান শিখা প্রতিনিয়ত আপন লালসাময় জিহ্বায় জীবনের সার্বিক সুস্থতাকে গ্রাস করছিল, যে নীরব জীবনবোধে জীবনের স্বাভাবিক ছন্দের তাল বিলীন হয়ে এক সর্বনাশের পথে এগিয়ে যাচ্ছিল, অবশেষে এক দিব্য জ্যোতিপ্রভায় সর্ববিধ অন্ধকার বিদূরিত হয়ে বাঙালী মহাতেজে দৃপ্ত হয়ে উঠল। প্রেমধর্মের আদর্শে বিপর্যস্ত সমাজ-ব্যবস্থায় জড়ত্বের
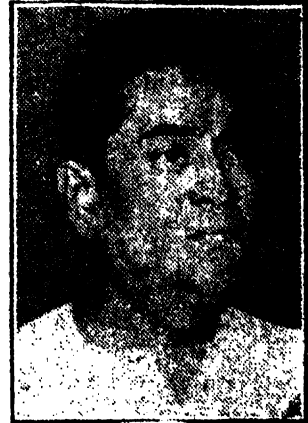
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

মনোজ বিশ্বাস

সন্ধ্যা রায়

পাষাণভার বিলীন হল। গৌর-কান্তি গৌড়কিশোর ভাবোন্মেলচিত্তে বাঙলার মানুষের মন জয় করে নিলেন। হিন্দু-মুসলমান ধর্ম নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষ তাঁর প্রেমাশ্রুতে স্নাত হয়ে নব-জীবন লাভ করল; মহামানবের কর-স্পর্শে সুপ্ত নির্জীব বীর্যহীন জাতি শক্তির উন্মাদনায় প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। নামসংকীর্তন-বিভোর আত্মহারা হরি-নামোন্মাদ দেবশিশু প্রেমবিতরণে, দেবতার আলিঙ্গনমানসে দাক্ষিণাত্য, বৃন্দাবন, গৌড়ে পরিভ্রমণ করলেন। নীলাচলে কাশীমিশ্রের আলয়ে আঠারো বৎসর অতিবাহিত করবার পর ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে আষাঢ়ের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে রবিবারে আট চল্লিশ বৎসর বয়সে মহাপ্রভু ঐ স্থানে দিব্যোন্মাদ অবস্থায় অনন্ত নীলিমায় লীন হয়ে যান।

সাধুশ্রেষ্ঠ মহাত্মা শিশিরকুমার মহাপ্রভু নিমাইয়ের এই জীবন অবলম্বন করে রচনা করেছেন অমর-নাটক 'শ্রীনিমাই সন্ন্যাস'। নাটকের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন ঃ 'এই চারিশত বৎসর হইল কাঞ্চননগরে (কাটোয়া) শ্রীনিমাই পণ্ডিত সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সেই সন্ন্যাসের দিন সেই স্থানে শ্রীমহাপ্রভুর আকর্ষণে অসংখ্য লোক সমবেত হয়। সেই সময় কারুণ্য রসের এরূপ তরঙ্গ উঠে যে, বহুতর লোক তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সংসার ত্যাগ করে। তখন যে ক্রন্দনের রোল উঠে তাহার প্রতি-ধ্বনি এখনও শুনা যায়।'—সত্যি এখনও শোনা যায়। ভক্তহৃদয়ের আকুল কামনায় মহাপ্রভু জীবন্ত হয়ে উঠেছেন নাটকের প্রতিটি সন্ধিক্ষণে। চারশ বছরের প্রাচীন-তার অন্তরাল হতে সে প্রেমের, সে বিনয়ের, সে ভক্তির বাণী ভক্তের কণ্ঠ হতে কণ্ঠান্তরে দিব্য বিভূতির ন্যায় প্রতিনিয়ত সমুদ্ভাসিত। দুঃখবেদনা গ্লানির পঙ্কিলতার মাঝখানে মহামানবের যে জয়ডঙ্কা বেজে ওঠে, ষোড়শ শতকে যার জয়ধ্বনি বাঙলায় মরাগাঙে জোয়ার এনে-ছিল ভক্তশ্রেষ্ঠ শিশিরকুমারের অমর লেখনীতে তা শাশ্বত বিভায় বিভূষিত।

বাঙলা জীবনী-নাটক পর্যায়ে 'শ্রীনিমাই সন্ন্যাস'এর আবেদন অসামান্য। দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের ওপর মহাপ্রভুর জীবনভাষ্য যে বাঙ্ময় রূপ লাভ করে তা একমাত্র সম্ভব হয়ে উঠেছে ভক্ত-হৃদয়ের অসীম আকুতি ও প্রগাঢ় শিল্পানুভূতির জন্য। মহৎ জীবনই শুধু নয় শিল্পীর সূক্ষ্মরস-বিশ্লেষণের দুর্লভ ক্ষমতারও অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। তা না হলে কোনক্রমেই সর্বজনরসগ্রাহ্য-রূপে শিল্পাভিব্যক্তি দান সম্ভব নয়।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর সমগ্র জীবনব্যাপী যে লীলাখেলা মানবজীবনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল মহাত্মা শিশিরকুমার তাকেই শিল্পরূপে দান করেছেন। অদ্বিতীয় পণ্ডিত নিমাই তার বালকসুলভ চাপল্যে এবং সহপাঠীদের প্রতি একান্ত দরদমাখা অমায়িক ব্যবহারে সকলেরই প্রিয়জন। বাইরের জীবনে তাঁর রঙ্গপ্রিয়তা সকলের কাছে আদরণীয়। তাঁর অধ্যাপক জীবন, গৃহত্যাগ, সন্ন্যাসগ্রহণ, জন্মভূমি পরি-দর্শন প্রতিটি দৃশ্যই সমান আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী। যুগে যুগে দুর্জনের দুষ্কৃতি থেকে পবিত্র মানবাত্মা রক্ষা-মানসে দেবতার যে মানবরূপে আবি-র্ভাব ঘটে থাকে নবদ্বীপের পণ্ডিতের ঘরে সে দেবতারই আবির্ভাব ঘটেছিল। তাঁর অলোকসামান্য দিব্যবিভায় সাধু-সজ্জনের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতির বিনাশ সাধিত হয়—তার সংকীর্তন ধ্বনিতে বাঙলার আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে—তাঁর পদসঞ্চারে তাঁর লীলাখেলায় বাঙলার অপবিত্র ধূলিকণা পবিত্র হয়ে ওঠে। ঘরে রয়েছেন সন্তানস্নেহবৎসলা স্নেহান্ধ মাতৃদেবী, অপরূপ রূপলাবণ্যবতী পতিপ্রাণা তরুণী ভার্যা, অসংখ্য অকৃত্রিম সুহৃদ সহপাঠী, সকলের মাঝখান থেকে দূরে সরে যান। সংকীর্তনোন্মাদ এই মানবটি লক্ষ লক্ষ মানবের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পাগলের মত ঘুরে বেড়ান পাপী মানুষের উদ্ধারকল্পে। মানব-মনের গভীরতর আন্তরাত্মার অভিব্যক্তিতে নাটকটি আপ্লুত।

অনিন্দ্যসুন্দর অপরূপ তরুণ পণ্ডিতের ধ্যানমূর্তির স্নিগ্ধ জ্যোতি-র্মালায় নির্ঝরিত অমৃতধারা। 'আমি সন্ন্যাসী হয়ে সকলকে হরি নাম দিতে বলব।' অসহায় নিখিলমানবের বেদনায় তাঁর চিত্তে হাহাকার ফুটে ওঠে। ভক্তের কাতর আহ্বানে সোনার মূর্তি ধরে আবির্ভূত হন ভগবান। তিনি বেদনার্ত অসহায় মানুষকে সত্যের সন্ধান দেন।

নাটকে নিমাই চরিত্রের এই মহানুভবতার সংগে সংগে, ফুটে ওঠে সকল মানবকে পরিত্রাণের জন্য অন্ধকারের মধ্যে আলোর ঝর্ণাধারা বিকিরণের কথা। 'ভজ গৌরাংগ, কহ গৌরাংগ, লহ গৌরাংগের নাম রে'—বাঙালীর প্রাণের কথা, বাঙালীর জীবন-সংগীত। এখানেই নাটকের দ্বিতীয় অংক প্রথম দৃশ্য। নিতাই ভক্তবৃন্দকে সংগে নিয়ে সুললিত সুমধুর কণ্ঠে যখন গানটি গেয়ে ওঠেন—তখন নিমাই উত্তর দেন 'জীবমাত্রেই আপনাকে আপনি ভজন করে থাকে।'

নীল আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। নিশীথের নির্জনতার অন্তরাল হতে বেজে ওঠে বিদায় লগ্নের বাঁশি। নেপথ্যে মোহন সুরে ভেসে আসে "ন বৈ যাচে রাজ্যং ন চ কনককর্ণিক্যাভবম্।" মায়াভিভূত পরাণপ্রিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া নিদ্রামগ্ন। মাতৃদেবী শচীমাতার অসীম সতর্কতা আর স্নেহ, ভক্তবৃন্দের আকুল নিবেদন ভেসে যায় কৃষ্ণানুরাগে। বিষ্ণুপ্রিয়ার আত্মমগ্ন মুহূর্তে নিমাই-এর কণ্ঠ হতে উচ্চারিত হল 'হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে'—হায় বিষ্ণুপ্রিয়া! মুহূর্তের আত্মমতায় হারিয়ে গেল অসীম আলোকে নবীন সন্ন্যাসী। অনন্ত নিঃসীমবেদনার জগৎ গ্রাস করে নেয় বিষ্ণুপ্রিয়াকে। তাঁর কাতর আবেদনে উৎকণ্ঠিতা জননী শচীমাতা দেখেন তাঁর পরাণমণি নিমাই নেই। উন্মাদের মত নবদ্বীপের পথে পথে উচ্চারিত হয় নিমাই! নিমাই! নিমাই! কিন্তু যে বুঝেছে অনন্তের মায়া, যে পেয়েছে অসীমের সন্ধান শত স্নেহ ভালবাসা মান অভিমান তাকে আবদ্ধ করতে পারে না। 'ওরে আমি আর তোকে সংকীর্তনে বাধা দেব না, নিমাই ফিরে আয়! কোথায় নিমাই! মাতৃ-হৃদয়ের সুগভীর বেদনার্ত আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে। ফিরে আসে আর্তনাদ! ঘুরে ফেরে কর্ণ হতে কর্ণে!

তৃতীয় অংকের তৃতীয় দৃশ্য। কাটোয়ার কেশবভারতীর আশ্রমে নিমাই পণ্ডিত এলেন দীক্ষা গ্রহণমানসে। যজ্ঞাগ্নিতে ভস্মিভূত হল পূর্ব পরিচয়। জীবনের অতীতকে ভুলে গিয়ে জন্ম জন্মান্তরের পবিত্র আলোকধারায় ধৌত হলেন নিমাই। কৃষ্ণ-উন্মাদ নিমাই হলেন শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য। ধ্যানমগ্ন কেশব-ভারতীর কাছে দীক্ষিত হয়ে অন্ধকার রাত্রে বেরিয়ে পড়েন বৃন্দাবনের পথে। নিত্যানন্দ ভক্তবৃন্দসহ যখন মহাপ্রভুকে ফিরিয়ে নিতে এলেন, তখন হারিয়ে গেছে নিমাই—চিরপরিচিত রহস্যপ্রিয় বিশ্বম্ভর। নররূপী ভগবানকে পেলেন সকলে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপে।

নিমাই পণ্ডিতের সংকীর্তনধারায় লক্ষ লক্ষ মানুষ আলোর সন্ধান পেয়েছে। দেখেছে একই অংগে অন্তর-কৃষ্ণ ও বাহির-গৌর। সংকীর্তন প্রচারে বার বার বাধা এসেছে। নবদ্বীপের গোঁড়া ব্রাহ্মণ

ন্যায়রত্ন হরিনাম-প্রিয় ছিলেন না। কিন্তু পরিশেষে হরিনাম-মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হয়ে হরিনামে দীক্ষিত হন। নাটকের একটি অপূর্ব দৃশ্য 'বিদ্যাবাগীশ ও ন্যায়রত্ন উদ্ধার' (চতুর্থ অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য)।

নাটকের শেষ দৃশ্য চরমোৎকর্ষ লাভ করেছে। শূন্যঘরে প্রস্তরিত বিষ্ণুপ্রিয়া বার বার কামনা করেছিলেন মহাপ্রভুর পদযুগলকে। যখন আবার মিলন হল মহাপ্রভু বললেন, 'শ্রীকৃষ্ণ ভজনা কর।' তখন বিরহবেদনায় ভূপ্রিত লক্ষ্মীস্বরূপিণী অবগুণ্ঠনবতী বিষ্ণুপ্রিয়া স্থির কণ্ঠে বলেন, "আমি তোমাকেই জানি, শ্রীকৃষ্ণকে জানি না। তুমি আমাকে এমন কিছু দিয়ে যাও, যাঁর স্মরণে আমি চিরদিন কাটাতে পারি।' সে প্রার্থনায় মহাপ্রভু দান করেন তাঁর পাদুকাযুগল। সমস্ত শোক সমস্ত ব্যথা-বেদনা ভুলে যান বিষ্ণুপ্রিয়া। পাদুকাযুগল পেয়ে তিনি বলে ওঠেন,—'তোমাকে পূজো করেই আমি বিরহ-যন্ত্রণা দূর করব।' তারপর থেকে তিনি মহাপ্রভুর পূজোয় আত্মনিয়োগ করেন ঐ পদযুগল সেবার মাধ্যমে।

'শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমের ঠাকুর, প্রেম বিলাতে এলো নদীয়ায়'—এই প্রস্তাবনা থেকেই নাটকটির শুরু এবং সমাপ্তি হল 'হরি হরয়ে নমঃ' সংগীতময়তার মধ্য দিয়ে। সমগ্র নাটকটি ২৫ খানি অনবদ্য কীর্তনগানে সমৃদ্ধ। লক্ষ লক্ষ মানুষের অন্তরের বাণী নাটকটির মধ্যে উচ্চারিত। বাঙালীর অন্তরের বাণী যে প্রেম তা প্রতিটি ছত্রের মধ্য দিয়ে উৎসারিত।

গত কয়েক বৎসর কলকাতায় 'শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আবির্ভাব উৎসব' পালিত হচ্ছে। সেখানে নাটকটির অভিনয়ই এর জনপ্রিয়তা বিশেষভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে। নাট্যকারের স্বপ্নকে সার্থক রূপদানের চেষ্টায় শিশিরকুমার ইনস্টিটিউটের নাম উল্লেখযোগ্য। সৌখীন শিল্পীসঙ্ঘের মধ্যে তাঁরা একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা লাভ করেছেন। ইনস্টিটিউট ১৯৫৫ সালের ১৯শে অক্টোবর মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে 'শ্রীনিমাই সন্ন্যাস' নাটকটি সাফল্যজনকভাবে মঞ্চস্থ করেন। প্রযোজনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ। সংগীত-পরিচালনা করেন খ্যাতনামা সুরশিল্পী শ্রীকমল দাশগুপ্ত ও নাট্য-পরিচালনা করেন শ্রীমিহির গঙ্গোপাধ্যায়।

বাঙলাদেশের বিভিন্ন সহরে ও গ্রামে নাটকটির অভিনয় দর্শকবৃন্দকে মুগ্ধ করেছে। আড়বেলিয়া ও বাগজোলায় 'শ্রীনিমাই সন্ন্যাসে'র অভিনয় যথেষ্ট কৃতিত্বের দাবী রাখে।

মহৎ শিল্পের মূল্য অপরিসীম। সার্থক শিল্প চিরকালই রসগ্রাহী মানুষকে আকৃষ্ট করেছে। শিশিরকুমারের শিল্পপ্রতিভা ছিল প্রথম শ্রেণীর। তা না হলে এ রকম উৎকৃষ্ট নাট্যরচনা সম্ভব হত না। রচনার মহানুভবতা, প্রযোজনার স্বাভাবিকতা এবং অপূর্ব সংগীতময় আবহাওয়া সৃষ্টির পরিবেশ অভিনেতাদের শিল্পপ্রতিভা বিকাশে সহায়তা করেছে বারবার। এবং এই সমস্ত কারণেই তাঁদের অভিনয়ে আন্তরিকতা অধিক মাত্রায় ফুটে উঠেছে—প্রেরণা দিয়েছে। নিমাই চরিত্রের অভিনয় সহজসাধ্য নয়। কিন্তু শিল্পী শ্রীমনোজ বিশ্বাসের অভিনয়ে গুরুদায়িত্ব যথেষ্ট সংযম ও কৃতিত্বের সঙ্গে পালিত হয়েছে। শ্রীগৌরগোপাল অভিনীত নিতাইয়ের চরিত্রসৃষ্টি অনবদ্য। নৃত্যে ও গীতে তাঁর অভিনয় যেমন সর্বাঙ্গসুন্দর, তেমনি নির্মল আনন্দেরই প্রতিচ্ছবি। শ্রীগৌরগোপালের অকৃত্রিম হৃদয়সঞ্জাত ভাবোন্মাদনায় এই রসাস্বাদন সৃষ্টি সম্ভব হয়ে উঠেছে। সৌখীন সম্প্রদায়ের লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পী হিসাবে শ্রীসত্য রায় খ্যাতিলাভ করেছেন। ন্যায়রত্নের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তুলেছে। কেশবভারতীর ভূমিকায় শ্রীঅমর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের ভূমিকায় ভূপতি ভট্টাচার্য, মুকুন্দের ভূমিকায় ও সঙ্গীতে শ্রীনীরেন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবাসের ভূমিকায় শ্রীসুধীর মুস্তাফির অভিনয় উল্লেখযোগ্য। শ্রীঅসিতকান্তি ঘোষ প্রাণবন্ত অভিনয় করেন হরি প্রামাণিকের ভূমিকায়। শচীমাতার চরিত্রে শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাণস্পর্শী অভিনয় প্রকৃত মাতৃসুলভ মনোভাবই প্রস্ফুট করে তোলে। নিমাইয়ের গৃহত্যাগে বিলাপদৃশ্য, পাগলিনী শচীমাতার উন্মত্ত অবস্থা ও নিমাইয়ের সঙ্গে মিলনের দৃশ্যে তিনি সমস্ত পরিবেশকেই জীবন্ত করে তোলেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার ভূমিকায় শ্রীমতী মাধবী মুখোপাধ্যায় চরিত্রসুলভ স্বাভাবিকতা বজায় রেখেছেন। কখনও কখনও তাঁর অভিনয় হৃদয়স্পর্শী হয়ে ওঠে। অন্যান্য পুরুষ-চরিত্রের অভিনয়ে প্রত্যেকেই সংযতভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেছেন।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর জীবনভাষ্য 'শ্রীনিমাই সন্ন্যাস' নাটকটি হরিনামসংকীর্তন মাহাত্ম্যে জীবন্ত। বৈষ্ণবকুলচূড়ামণি মহাত্মা শিশিরকুমারের অসামান্য অবদান নাটকটি। অভূতপূর্ব রচনাশৈলীর মাধ্যমে ধর্মপ্রাণ দেশবাসীর হরিনাম-প্রেমিকতার মাহাত্ম্যই ফুটে উঠেছে নাটকটিতে।

গ্রন্থনা ও রচনা • কণাদ চৌধুরী

সুখের সঙ্গে শাড়ির যোগাযোগ নিরবচ্ছিন্ন। বিশেষতঃ শাড়িটি যদি নয়নসুখকর হয়, তবে ত কথাই নেই। রমণী শরীরকে প্রস্ফুটিত উদ্যানের সঙ্গে তুলনা করলে শাড়িকে উক্ত উদ্যানের শ্রেষ্ঠ বেড়া বলা যেতে পারে। আজ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশে যতরকম নারী-প্রচ্ছদ আবিষ্কৃত হয়েছে, শাড়ি তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। প্যারিস-নিউইয়র্কের ফ্যাশানবিদরাও আজকাল শাড়ি-গানে উচ্চকণ্ঠ। শাড়ির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে, শাড়িরিণী হলে সবাইকেই ভাল দেখায়। পায়ের গড়ন ভালো না হলে চাইনিজ ফ্রক পরবার উপায় নেই; আসামের মেখলা পরতে গেলে তন্বী হওয়া আবশ্যিক; শালোয়ার-কামিজের জন্যে অন্ততঃ পাঁচ ফুটে মাথা রাখতে হবে—আবার পাঁচ-দশের ওদিকে শিরো-সঞ্চালনকারিণীর পক্ষে এই পোষাক গর্হিত, কারণ, একজন মহিলা রণ-পা পরে হেঁটে যাচ্ছেন এই কুচিন্তার হাত থেকে পথজনকে রক্ষা করা অন্যতম নাগরিক কর্তব্য। কিন্তু এবম্বিধ কূটনীতি শাড়ি প্রসঙ্গে আসে না। কারণ, শাড়ির চরিত্র খাঁটি ভারতীয়। শাড়ির আবরণে সব শরীরই এক দেহে লীন হয়ে যেতে পারে। আসলে প্রতীচ্য-প্রচ্ছদের মত শাড়িকে শরীরের ক্রীতদাসী সাজতে হয় না সেলাই করে, সুতোর শেকলে। দর্জির কাঁচির তোয়াক্কা না রেখে, সকল অঙ্গ ভরে হাসতে প্রচ্ছদের মধ্যে একমাত্র শাড়িই পারে। শরীরের সঙ্গে শাড়ির মিত্রতাও একনিষ্ঠ। অঙ্গের অসমঞ্জস বেদনার স্থানগুলিকে সে কখনো লোকচোখে হেয় করে না। শাড়ি জননীজনোচিত স্নেহে শরীরের সাত-খুন স্বচ্ছন্দেই মাপ করে দেয়।

কিন্তু শাড়ির এত সব গুণাবলী আমরা কবে থেকে জানলাম? কিশোরী ভারতবর্ষ প্রথম শাড়ি ধরল কবে? এর উত্তরে পেছন ফিরতে হবে মধ্যযুগে। মধ্যযুগের ভাস্কর্যে রাজশেখরের "কাব্য মীমাংসায়" তৎকালীন ভারতের প্রচ্ছদ-রীতির উজ্জ্বল উদাহরণগুলি রয়েছে। লুম্বিনীতে বুদ্ধ-জন্মের গান্ধার ভাস্কর্যের (দ্বিতীয় শতক) মূর্তিগুলি শাড়ি-সজ্জিত। কুষাণ যুগের প্রাপ্ত নারীমূর্তিটি কাছা দিয়ে শাড়ি পড়েছে। মধ্যযুগের পূর্বে কিন্তু শাড়ি-পরিহিতা স্ত্রী-চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়নি। প্রাচীন যুগ থেকে ভারতীয় প্রচ্ছদ-রীতির ক্রমবিবর্তন ধারায় প্রায় শেষ অঙ্কে শাড়ির জন্ম এবং শাড়ি-কার সার কথা এই বিবর্তনেই নিহিত।

প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত ভারতীয় পরিচ্ছদ-ধারা চারটি পরিচ্ছেদে ভাগ করা যেতে পারে। প্রাচীন যুগ থেকে খৃঃ পূঃ ৩২০ শতক, খৃঃ পূঃ ৩২০ শতক থেকে ৩২০ খৃষ্টাব্দ, ৩২০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১১০০ খৃষ্টাব্দ এবং ১১০০ খৃষ্টাব্দ থেকে আধুনিক কাল—এই চার পর্যায়ে ভারতীয় পোষাকের বিবর্তন-ধারা বর্তমান যুগে এসে পৌঁছেছে।

প্রাচীন যুগ থেকে খৃষ্টপূর্ব ৩২০ শতক:

এই যুগে তিনটি বিভিন্ন ধরণের আবরণ-রীতি প্রচলিত ছিল ভারতবর্ষে।

(১) নীবিবন্ধ খাটো কাপড়ের অধোবাস, কাঁচুলি আর ওর্ধনি।

(২) দ্বিতীয় ধরণের পরিচ্ছদটি প্রায় শাড়ির মত। অধোবাসের একটা অংশ ('পল্লব') আঁচলের মত ঊর্ধ্বাঙ্গ ঢেকে দিত।

(৩) তৃতীয় প্রচ্ছদ-রীতিটি আদিবাসীদের মধ্যেই সীমিত ছিল। শুধু একখণ্ড বস্ত্র কাঁধের ওপর দিয়ে অথবা বাহুর তল দিয়ে বাঁধা থাকত।

এই যুগে স্ত্রী এবং পুরুষের পোষাকের তফাৎ বিশেষ ছিল না। এবং উর্ধ্বাবাসে বিশেষ কোনো পক্ষেরই আসক্তি ছিল না। শীত-গ্রীষ্মের শাসনেই শুধু উর্ধ্বাবাসের অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব নির্ভর করত।

খৃঃ পূঃ ৩২০ থেকে ৩২০ খৃষ্টাব্দ

এই যুগে ইতিহাস এবং বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন জলবায়ুর প্রভাব ভারতীয় আবরণসজ্জা নানা ধরণে পরিবর্তিত হয়েছে। অন্ততঃ আট থেকে দশটি বিভিন্ন প্রচ্ছদ-রীতির পরিচয় এই যুগে পাওয়া যাবে। শাড়ি জাতীয় আবরণের প্রভাব এই যুগে আরো বেড়েছে। সূচীবদ্ধ পোষাক-আশ.কও আবির্ভূত হয়েছিল। ভারতের উত্তর-পশ্চিমে সেলাই-করা পোষাকের জনপ্রিয়তা জলবায়ুর প্রভাবেই বেড়ে গিয়েছিল। এই যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য পরিচ্ছদের আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য। 'সকাছা' পদ্ধতিতে বস্ত্র পরিধানের জন্মও এই যুগে হয়েছে বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। বারহুত ভাস্কর্যের মোহিনী মূর্তির সকাছা পরিধেয় পণ্ডিত-বক্তব্যের অন্যতম প্রমাণ। কুষাণ যুগের রমণীটিও কছা দিয় কাপড় পরেছে। মধ্যভারত এবং মহারাষ্ট্রীয় মহিলাদের কাছা দেয়া শাড়ি পরার পদ্ধতির শুরু সম্ভবতঃ এই যুগেই।

৩২০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১১০০ খৃষ্টাব্দ :

নারী-পরিচ্ছদের স্বাতন্ত্র্য এই যুগের কাছে অপরিসীম ঋণী। কারণ, এই যুগেই স্ত্রী এবং পুরুষের পরিধেয়ের পার্থক্য প্রথম সূচিত হয়; সকাছা পদ্ধতির অধোবাস পুরুষদের ধুতি হল এবং শাড়ি কেবল মহিলা-শোভনরূপেই গণ্য হল।

১১০০ খৃষ্টাব্দ থেকে আধুনিক কাল :

এই যুগের ভারতীয় পোষাকের সংগে ভারতের রাজনীতিও অঙ্গাঙ্গী জড়িত। এই যুগের মধ্যেই তুর্কীরা ভারতে এসেছে, মুঘলরা দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজদণ্ড চালিয়েছে, ইংরেজরা এসেছে। রাজদরবারের আস্থাভাজন হবার জন্যে পুরুষদের পোষাকে রাজ-রুচিও আমদানী হবার ফলে পুরুষের পোষাকে খলিফা, মাস্টার টেইলার প্রভৃতির কাঁচি অমোঘ হয়ে উঠেছে ক্রমে ক্রমে। কিন্তু ভারত-ললনারা মোল পরিধেয় শাড়িকে কিছুতেই ছাড়তে পারেন নি। পুরুষরাও যাঁরা বিদেশী পোষাক পরেন না, তাঁদেরো বিদেশে গমনকালে আর কিছু না হোক, অন্ততঃ প্রিন্স কোট মারফৎ মাঝামাঝি একটা রফা করতেই হয়। কিন্তু শ্রদ্ধার সংগে বলতে হয়—পোষাক যুদ্ধে ভারতীয় মহিলারাই একমাত্র আপোষ-হীন সাফল্য-সংগ্রাম চালিয়ে এসেছেন চিরকাল। উৎকট জাত্যাভিমানী জাপানী মেয়েরাও আজকাল ক্রমশঃ কিমোনোকে সিন্দুকে তুলে ফ্রকে গা গলিয়েছে, বিদেশে বার্মিজ মেয়েরা আজকাল ইয়োরোপীয় পোষাক পরতে আপত্তি করে না।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইতিহাস কথিত প্রবাদটি "Unity in the deversity" শাড়ির প্রতিও প্রযুক্ত হতে পারে অনায়াসে। ভারতীয় মহিলারা সকলেই প্রায় শাড়ি পরেন বটে, কিন্তু একভাবে পরেন না। দাক্ষিণাত্যে সকাছা শাড়ি পরার ধরণের সংগে বাঙ্গালী শাড়ি পরায় অমিল যথেষ্টই। গুরুজনের সামনে উত্তর ভারতের বধূ মাথায় ঘোমটা তোলেন, কিন্তু কুর্গের গিন্নী কোনো

অবস্থাতেই মাথায় ঘোমটা দিয়ে খোঁপার ফুলগুলোকে গোপন করবেন না। রাজস্থান, মালওয়া এবং সৌরাষ্ট্রে শাড়িকে কুঁচি দিয়ে দিয়ে প্রায় ঘাঘরা করেই পরা হয়, তবে আজকাল বাঙ্গালী ধরণের শাড়ি পরাই সমস্ত দেশে অনুসৃত হচ্ছে ক্রমশঃ।

শুধু কি পরিধান পদ্ধতি, বস্ত্র-কৌলিন্যেও শাড়ি এদেশের বিভিন্ন স্থান-মাহাত্ম্যকে অতিক্রম করতে পারেনি। টাঙ্গাইল থেকে নিশ্চয়ই শাড়ি চালান আসে না ভারতবর্ষে, কিন্তু 'টাঙ্গাইল' নামটা কি মুছে ফেলবার শাড়িবিলাসিনী হৃদয় থেকে? আওরাঙ্গাবাদী শাড়ি আজকে বম্বের প্রিন্স অফ ওয়েলস যাদুঘরে শোভা পাচ্ছে এবং আওরাঙ্গাবাদে আজকাল চোলির 'হিমরু' ছাড়া আর কিছু আসে না। তবুও ত বেনারসের জরি-কাজ কাতান শাড়িকে অনেক সময় আওরাঙ্গাবাদী বলে পরে মেয়েরা। আবার প্রায় একই ধরণের শাড়ি, তাদের

বয়ন-প্রণালীও প্রায় এক, তবু তাদের পার্থক্যও চিরকালের। যেমন, ইন্দোরী শাড়ির আঁচলা এবং পাড় প্রায় গোয়ালিয়রের চান্দেরী শাড়ির মতই। শুধু লতাপাতা নক্সা ইন্দোরীতে নেই, জমিতে ডুরে, তাতেই কত, কত তফাৎ। 'আমেদাবাদী পটোলা', উড়িষ্যার 'ইক্কত', এবং দাক্ষিণাত্যের 'পচেনপল্লি' কাপড়ের বয়ন-প্রণালী একই, শুধু আমেদাবাদীর তাঁতিরা জ্যামিতিক নক্সায় বেশী আসক্ত—এইটুকু তফাৎই নির্বাচকমণ্ডলীর মনে জাতিস্মর হয়ে থাকে।

যাদুঘরের কিছু কিছু শাড়ির জন্যে আজও পুরবাসিনীরা শোক-দিবস যাপন করেন। বাংলাদেশের বালুচর শাড়ি স্মৃতির অতলে তলিয়ে যাওয়ার মত। বালুচর শাড়ির আঁচলাটিকে আজো

সম্পূর্ণ পুনরুদ্ধার করা গেল না। পৈথান বস্ত্রের উল্লেখ গ্রীক সাহিত্যে পাওয়া গিয়েছে শুধু। 'কলমকারী' শাড়ি কি আর উদ্ধার করতে পারবেন নিখিল ভারত তাঁত শিল্প সমিতি? পুরোনো ঐতিহ্যের শাড়ি পুনর্প্রচলনের জন্যে কলাক্ষেত্রের শ্রীমতী রুক্মিণী অরুনডেল-এর নাম এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

পরিশেষে নিবেদন, শাড়ির ইতিকথায় ইতি টানা অসম্ভব। কারণ শাড়ি যদি দর্জির দোকান থেকে আসত, তবে ছাঁট-কাটের মোটামুটি একটা পরিসংখ্যান দেওয়া যেত। প্রতি বছরই নতুন শাড়ির জন্ম হচ্ছে। এ বছরের 'মানে-না-মানা' শাড়ির দাম আগামী বছরে হয়ত শুধু মফস্বলেই দেয়া হবে, শহরের দোকানের কাছে তখন 'সপ্তপদী'। তাছাড়া শাড়ির খোল, পাড়, আঁচল এবং পরার ধরণের অযুত বৈচিত্র্যতায় শাড়ি নিরবধি নতুন।

অর্থাৎ সোজা কথা বলতে গেলে, শাড়ি মাত্রেই দ্রৌপদীর শাড়ি—এর শুরু হয়ত আছে—কিন্তু শেষ নৈব নৈব চ।

পাতায় পাতায় রে

বছরের বিশেষ বিশেষ সময় কাগজ খুললেই বন-মহোৎসবের খবর চোখে পড়ে। কিন্তু যাঁরা কিনু গোয়ালার গলিতে থাকেন তাঁদের কাছে খবরটা পরদিনই বাসী হয়ে যায়। হয়ত হরিপদবাবু গলি থেকে রাজপথে এসে ফুটপাতের বকুল গাছটার দিকে একাধিকবার তাকান কিন্তু তাতে সবুজের সঞ্চয় কতটুকুই বা হয়। ছোট দুটো ঘর, দাওয়া নেই, বারান্দা নেই যে, দুটো টব এনে বসাবেন। ঘরের সাদা দেয়াল দেখতে দেখতে মনে হয় কলকাতায় নয়, হিমমরুর চিরতুষারের প্রান্তে কে তাঁকে ফেলে দিয়ে গেছে। করপোরেশনকে মাঝে মাঝে গালাগাল দেন, 'দু-চারটে বকুল গাছও ত গলিতে লাগাতে পারতিস বাপু।' পাড়ার লোকে শুনে হাসে। সেই ল্যাম্পপোস্ট—যেটা অকেজো হয়ে পড়ে আছে আজ চারবছর সেটাই সারানো হচ্ছে না, একটু বৃষ্টি হলেই যে গলিতে ভেলা ভাসে সেই গলিতে বকুলোদ্যান! কিন্তু মরুদ্যান ত মরুভূমিতেই হয়।

—কিছু না হোক নিদেন দু-চারটে ক্যাকটাস!

অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে হরিপদবাবু একমাথা পাকা চুল নিয়েও ময়দানের দিকের সীটে বসবার জন্যে ঠেলাঠেলি করেন, শুধু আকাশ দেখবেন বলে, জল দেখবেন বলে, সবুজ দেখবেন বলে। উত্তর মরুর বন্ধুরাও নিরুত্তর চোখে ফেরেন না। কোন বারান্দার কোন টবে কটি পাতাবাহার, তাই মুখস্থ করতে করতে বাসে-ট্রামে ঘরে ফেরার কাল কাটে। আবার দোতলা বাস দৈবাৎ বাঁ-ফুটপাতের দিকটা যদি একটু বেশী ঘেঁষে যায় করুণাঘন দু-একটি সবুজ পাতার ডাল স্টেটবাসের জানালা দিয়ে ঢুকে পড়ে ভেতরে। চকিতে দু-একটা পাতা ছিঁড়ে নেন কেউ কেউ, নাকে তুলে ধরেন, নিজের ছেলেমানুষী নিজের কাছেই অলৌকিক মনে হয়।

কিন্তু ঘরে ঢুকলেই সিন্ধু মনও বন্দু হয়ে আসে। দেয়ালের ক্যালেন্ডারে আঁকা বাগানের দিকে তাকিয়েই প্রাণ-পাখী পাখা ঝাপটায়। বিশাল তক্তোপোশ, কেরোসিন কাঠের তাকে বোরিফুডের কৌটো, স্থানাভাবে ঘরের মাঝখানেই দড়িতে কাঁথা, ঝুলে-পড়া আলো, দেয়ালে দশ বছর আগের চুনকাম! পারলে হরিপদবাবু যথাসম্ভব দেরী করেই বাড়ি ফেরেন। একদা শৈশব প্রীতি শিশুকেই শেখায় পৃথিবীর অন্যতম বর্ণ সবুজ। বড় হয়েও সেই স্মৃতি ইচ্ছা হয়ে হাওয়া দেয় সময় সময়—ঘাস-মাতার সবুজ শরীরের সুগন্ধি অন্ধকার থেকে নেমে—ঘাসের মধ্যে যেন ঘাস হয়ে জন্মাই।

সবুজের এক অর্থ বাঁচা। পুরোনো বাড়ির গলিত পাঁচিল থেকে, সেই সবুজ বাঁচাটা অশত্থ-চারা হয়ে আশ্বাসই যদি দিতে পারে, তবে কেন সে হরিপদবাবুর সকাল নটার রোদ আসা জানালায় এসে দাঁড়াবে না? এবং হরিপদবাবু একদিন সকালে বাজারের হিসেব করতে করতে হঠাৎ সেদিকে তাকিয়ে বলেও ফেলতে পারেন, 'ওগো, দেখে যাও, তোমার গাছে একটা নতুন পাতা বেরিয়েছে!' ডালে ফোড়ন দেয়া খানিকক্ষণের জন্যে স্থগিত রেখে ছুটে আসবেন গিন্নী এবং তখন

ভাঙা বাড়িতে থেকেও অশত্থ গাছটা ক্রমশঃ বাড়িটাকে আরো ভেঙে ফেলছে জেনেও মনে হবে আকবর বাদশার সঙ্গে তাঁর কোন ভেদ নেই।

তাহলে কি হরিপদ-গিন্নী শিশু-লালন, রন্ধন, তৈজসপত্র-মর্দন ইত্যাদি বাদ দিয়ে শুধু পত্রপুষ্পচর্যাই করে যাবেন! কিন্তু পুষ্প কোথায় কলকাতায়! নতুন নতুন বাড়ি উঠছে, উঠোনে ঘর তুলে ভাড়া বসছে, পোণে এক কাঠা জমির দাম লাখের কাছাকাছি যাচ্ছে, কলকাতার সাজান বাগান আমাদের পিতা পিতামহরাই ধীরে ধীরে শুকিয়ে যেতে দেখেছেন। সেদিন কি শখ হয়েছিল মাথায় বেলফুলের একটা গোড় দেবেন বলে হরিপদ-গিন্নী 'বেলফুল'ওয়ালাকে ডেকেছিলেন। মরচের মত লাল ধরে গেছে ফুলে, সেই মালাটিরই দাম নাকি চার আনা। 'নেবে ত নাও মা নইলে চলি, ভিক্টোরিয়াতে এই মালাই পড়তে পাবে না' বলে মালাওয়ালা আর ভাববারও অবকাশ দেয়নি। সোজা হাঁকতে হাঁকতে চলে গেছে। সেই থেকে ফুলের জলসায় হরিপদ-গিন্নী নীরব হয়ে আছেন। আর পুষ্পের পর পত্র? কলকাতার বুকচাপা

নিঃশ্বাসে মানুষের বুকেই ঘুণ ধরে—গাছ ত ছার। এখানে পাতার জন্মহারের চেয়ে মানুষের জন্মহার বেশী, বোধহয় সহজাত। কাজেই কিনু গোয়ালার গলির মত গলিতে বাস করলে, পত্র-চর্যার জন্যে নটানি অথবা হর্টিকালচারের মূল্যবান গ্রন্থ পড়ে সময় নষ্ট না করলেও চলবে।

বাস্তবিক কজনের বাড়িই বা উদ্যান-মণ্ডন। একঘর দু-ঘরের 'ফ্ল্যাট' যে আমাদের অনেকের বাসা! তবে একথাও ঠিক, আপনার বাসাটিকে যদি আপনি ভালবাসেন তাহলে আপনার সবুজ ভালবাসা দিয়ে আপনি স্বচ্ছন্দেই আপনার বাসাটিকে ভালো বাসা বানাতে পারেন। কিন্তু তার আগে নীচের কটি 'মনে রাখুন' মনে মনে রাখুন।

।। মনে রাখুন ।।

ঘরে করার গাছ আলাদা। নানারকম ক্যাকটাস (ফণীমনসা), মানিপ্ল্যাণ্ট, পাতাবাহার আপনার সহায়। সবরকমের পাতাই কলকাতায় পাওয়া যায় সহজে, রথের মেলাতে ত গাছের দোকানে জঙ্গলই হয়ে যায়। এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ মানিপ্ল্যাণ্ট ত কলকাতার যত্রতত্রই হয়।

১। যে পাত্রে গাছ রাখবেন তার তলায় জল-নিকাশের ফুটো রাখবেন। নারকোলের ছোবড়ার একটা আসবার রাখুন। তার পর ঝুরো মাটির সংগে পরিমাণ মত সার মিশিয়ে পাত্রটি ভর্তি করুন। গাছ পুঁতবার আগে জল দিয়ে মাটি ভিজিয়ে নিয়ে ভিতরে গর্ত করে গাছটি বসিয়ে দিন।

২। মানিপ্ল্যাণ্ট শুধু জলেই বাঁচে। ঘরের যেখানে একটু আলোহাওয়া বেশি সেখানেই কাচের পাত্রে, শিশিতে ওকে রেখে দিলে সে আপনাকে সহজেই প্রচুর পত্রসম্ভার উপহার দেবে। ক্যাকটাসে মাটির সঙ্গে নুড়ি মিশিয়ে নিতে পারেন। গাছেরই জন্য বেশি সময় ব্যয় না করতে পারলে আপনি বরং ঘরে ক্যাকটাসই সাজান।

৩। পোর্টুলোকা বা নাইন ও' ক্লকে পাতার সৌন্দর্যর সংগে পাড়াও পাবেন আবির রঙের ফুল। তবে ফুল ও পাতা একত্রে চাইলে আপনাকে পোর্টুলোকার পাত্রটিকে ঘর-বার করতে হবে। অর্থাৎ রোদে দিতে হবে প্রতিদিন।

৪। যে পাত্রে গাছ রাখবেন সে পাত্র কিনতে বাজারে যাবার দরকার নেই। টিন-কাটার দিয়ে ট্যালকাম পাউডারের পেট কেটে তাকে তার দিয়ে সমান্তরাল-ভাবে ঝুলিয়ে দিলে শান্তিনিকেতনি বাঁশের পুষ্পপাত্রের চেয়ে কিছু মাত্র খারাপ লাগবে না। এই সংগে সবিনয়ে জানাই—এক টাকার মধ্যেই দুটি পাত্রে রং করার মত তেলরং পাওয়া যাবে। ছোট ঘর হলে দেয়ালের যা রং পাত্রের রং তাই হলেই মানাবে। এ ছাড়া কাচের যে কোনো পাত্র, খুরো-দেওয়া জাপানী বাটি, মাটির পাত্র, বিশেষ করে কালো পোড়ানো মাটির ক্ষুদ্র কুঁজো সবুজকে সর্বাঙ্গ-সুন্দর পশ্চাদ্‌পট দেবে।

৫। যদি জীবন্ত গাছের পরও মনে হয় আরো কিছু সাজালে হত, তাহলে বন্ধ্য উৎসবে ফুল, নিত্য দিনের জন্য পাতা অভাবে সুন্দর গড়নের শুকনো ডাল সাজান। কোথাও বেড়াতে গেলে ডাল সংগ্রহ করে আনবেন। সে ডাল অনেক দূরে রাখবেন—অর্থাৎ উঁচুতে দেয়ালে।

উচ্চ-মধ্যবিত্ত এবং বিত্তবান সমাজে সোনার চেয়ে দামী যদি কিছু থাকে, তা হল জড়োয়ার গয়না। মধ্যবিত্ত সমাজেও এক-আধটা দামী হীরের আংটি, কানের ফুল ইত্যাদি ব্যবহৃত হয় না, তা নয়। কিন্তু অলংকার হিসেবে জহরতের ব্যবহার শুধু শৌখিনতা বা বিলাসিতার জন্যেই করা হয় না। দুর্ভাগ্যকে ফিরিয়ে আনা, রোগমুক্তি, এমনকি রূপবর্ধনের জন্যেও জহরতের আংটি প্রভৃতি ধারণ করেন অনেকে। রত্ন মেয়েদের রূপ-লাবণ্য বৃদ্ধির সহায়ক হতে পারে। অবশ্য যে চেহারায় যাকে যে রত্ন মানায় তার ওপরেই সব নির্ভর করে। উদ্দেশ্য প্রণোদিত এই জহরৎ ধারণকে স্বচ্ছন্দেই 'জহরৎ-ব্রত' বলা যেতে পারে। কারণ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় কোনো আচার-অনুষ্ঠান পালনকেই ত আমরা 'ব্রত গ্রহণ' বলি। আর এই ধরণের জহরৎ ধারণ কালে কিছু আচার-অনুষ্ঠান ত করেই লোকে। কিন্তু রত্ন ধারণের আগে এদের সম্বন্ধে একটা মোটা-মুটি জ্ঞান থাকা দরকার। নীচে রূপবর্ধক রত্নাবলী সম্বন্ধে কয়েকটি জ্যোতিষ-শাস্ত্রীয় বিশ্বাস প্রদত্ত হল।

নবরত্ন : নবরত্নের নটি রত্ন হল, মুক্তো, মাণিক্য, বৈদূর্য, গোমেধ, হীরা, বিদ্রুম, পুষ্পরাগ, মরকত এবং নীল-কান্ত।

মুক্তো : মুক্তোর মধ্যে এমন একটা শক্তি আছে যা মানসিক প্রফুল্লতা বাড়ায়। স্নায়ুতন্ত্রের মুক্তোর প্রভাব অত্যন্ত বেশী। গায়ের রং কালো হলেও তাতে লাবণ্য বা শ্রী আনতে মুক্তোর বিশেষ ক্ষমতা আছে। যে-সব মহিলা অতিরিক্ত মোটা হয়ে যাচ্ছেন মুক্তো ধারণ করলে মেদবৃদ্ধি ব্যাহত হয়। হৃদ-সংক্রান্ত রোগেও মুক্তো ফলদায়ক।

চুনী : চুনীর প্রভাব অনেকটা মুক্তোর মতই।

প্রবাল : প্রবালকে সাধারণ কথায় 'পলা' বলে। রক্তবর্ণ, পলাশ বর্ণ, শঙ্খবর্ণ এবং শ্বেতবর্ণের পলা পাওয়া যায়। পলা শরীরে তেজ বৃদ্ধি করে, রক্ত চলাচলে সমতা আনে। দেহের শীর্ণতা পলার সংগে মুক্তো ব্যবহারে দূর হতে দেখা গিয়েছে। যে-সব মেয়ে বেশী রোগা, সর্দি-কাশিতে ভোগে তাদের পক্ষে পলার সংগে মুক্তো উপকারী।

পান্না : কচি ঘাসের রঙ এবং সবুজ রঙে পান্না পাওয়া যায়। পান্না ফ্যাকাশে সাদা রঙে লালিত্য আনে।

গোমেদ : মেদবৃদ্ধি রহিত করে।

যোগাযোগ

গজেন্দ্রকুমার মিত্র
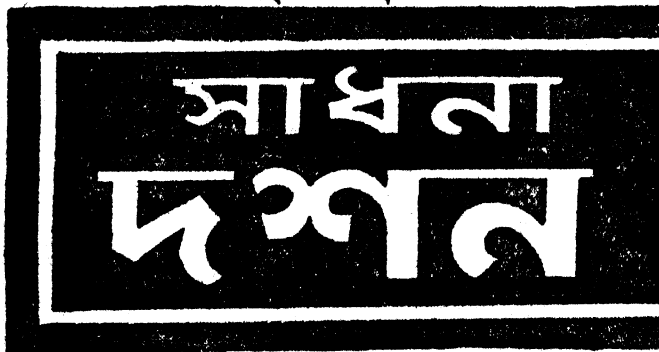
১৯৬২ সনের ৫ই মে হাওড়া থেকে যে পুরী এক্সপ্রেস রওনা হয় তার একটি আনরিজার্ভড্ থার্ড ক্লাস কামরাতে গাড়ি ছাড়ার আগে, একেবারে শেষ মুহূর্তে, একটি লোক এসে উঠেছিল। গাড়িতে পেষাপেষি ভিড় তার ওপর কয়েকটি কলেজের ছেলে যাচ্ছিল দল বেঁধে, তারা যথারীতি দরজা আগলে দাঁড়িয়ে—সুতরাং উঠতে পাবার কথা নয়। যারা জোর জবরদস্তি তর্ক বিতর্ক করেছিল তারা কেউ উঠতে পারেওনি। কিন্তু এ লোকটি সে সব কিছু না ক'রে নীরবে বিনা প্রতিবাদে গাড়ির পাদানীতে দাঁড়িয়ে হাতল ধরে ঝুলে যেতে শুরু করল। বেশ কিছুক্ষণ ঐ ভাবে যাবার পর ছেলেগুলিই তাকে ভেতরে ঢুকিয়ে নিয়েছিল।

নিতান্তই সাধারণ লোক, হতদরিদ্র-গোছের আকৃতি। সঙ্গে টিকিট ছিল কিনা সন্দেহ। খুব সম্ভব ছিল না, কারণ যারা পয়সা খরচ ক'রে টিকিট কাটে তারা এমন করে সহযাত্রীদের জুলুম আর তাম্বি সহ্য করে না। গাড়িতে উঠে বসবার জায়গা আশা করে—না পেলে বচসা করে, ঝগড়া করে, হাতাহাতিতেও কুণ্ঠিত হয় না। একেবারে কোথাও কোন স্থান না থাকলে অন্তত বিলাপ করে, অসন্তোষ প্রকাশ করে। এ লোকটি কিন্তু কিছুই করেনি, গাড়িতে উঠে অন্যদিকে তাকায়ওনি বোধ হয়—একেবারে লোকের কাছে, জানলার ধারে ধারে আধুনিক কামরায় যে একটি করে বসবার সীট্ থাকে—তারই পিছনে সামান্য খাঁজমতো জায়গাতে একটি ভাঁজকরা বিবর্ণ তুলোর কম্বল পেতে বসে পড়েছিল। তার সঙ্গে মালও ছিল সামান্য, ঐ ছেঁড়া কম্বলটা বাদ দিলে একটা গামছায় জড়ানো বোধহয় একখানা ধুতি এবং পানের বটুয়া ছাড়া আর কিছু ছিল না। লোকটির গায়ে জামাও ছিল না।

লোকটি বসেই কোণে ঠেস দিয়ে চোখ বুজেছিল। হয়ত অসুস্থ ছিল তখনই—কিম্বা ক্লান্ত। ঠাসা এক কামরা লোক, তারা অনেকেই বসবার জায়গা পায়নি—ফলে বকাবকি চেঁচামেচির অন্ত ছিল না। কলেজের ছেলেগুলো অবিরাম হৈ-হল্লা ক'রে যাচ্ছে কিন্তু এত চিৎকারেও লোকটি চোখ খোলেনি। যেমন উঠেই অবসন্নভাবে বসে পড়েছিল, তেমনিই বসে রইল, চোখও খুলল না, কথাও বলল না।

ও কাউকে লক্ষ্য না করলেও ওকে অনেকে লক্ষ্য করছিল। ছেলেরা তো বিশেষ ক'রে। কেউ কেউ বিনা টিকিটে ভ্রমণ করা নিয়ে কটু মন্তব্য করছিল, কেউ কেউ বা এই ধরণের ভালমানুষ চেহারার দীনহীন লোকই যে গাড়িতে চুরি-ডাকাতি করে সে সম্বন্ধে সচেতন ক'রে দিচ্ছিল বাকী যাত্রীদের।

লক্ষ্য করছিল বলেই ওর প্রথম নড়ে-চড়ে ওঠা থেকে সব ঘটনাটাই চোখে পড়েছিল অনেকের। তখন বোধহয় রাত চারটে হবে, হঠাৎ যেন চমকে ঘুম ভেঙে যাবার মতো ক'রে নড়ে উঠল লোকটি, যেন হঠাৎ দম-আটকে আসার মতো হাঁ ক'রে নিঃশ্বাস নিল বার কয়েক—তারপরই আবার সব স্থির হয়ে গেল। মাথাটা তেমনিই পিছনে হেলে সেই গাড়ি আর সীটের খাঁজে গিয়ে আটকাল। তফাতের মধ্যে এবার আর চোখ দুটো পুরো বুজল না, মুখটাও একটু ফাঁক হয়ে রইল। শেষনিঃশ্বাসটা নেবার জন্য মুখটা যা ফাঁক হয়ে ছিল সেটা আর বন্ধ হ'ল না।

ছেলেরা তখনও বুঝতে পারেনি। বাথরুমের পাশে বাঙ্কের ওপর যে মধ্য-বয়সী ভদ্রলোকটি বসেছিলেন তিনিই প্রথম বলে উঠলেন, 'মাই গড্! লোকটা মরে গেল নাকি?...হার্ট ফেল করল?'

তখন অনেকেই সচকিত হলেন। ওদিকের লোকেরা ভিড় ক'রে এলেন দেখতে। ছেলেরাও ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল। সত্যি সত্যিই একেবারে বিনা প্রস্তুতিতে, বিনা নোটিসে একটা লোক এমন ক'রে দুবার খাবি খেয়েই মরে যাবে এ চোখে দেখেও বিশ্বাস করা শক্ত।

বিশ্বাস হ'লও না প্রথমটা। 'এই—!' 'আরে, শুনতা হ্যায়?' 'কী হয়েছে হে তোমার? শরীর খারাপ লাগছে?' ইত্যাদি প্রশ্নে ও উচ্চগ্রামের কণ্ঠস্বরে তার মনো-যোগ আকর্ষণের চেষ্টা চলল খানিকটা। একজন তাঁর জলের বোতল থেকে খানিকটা জল নিয়ে ছিটিয়ে দিলেন মুখে। আর একজনকে বললেন বাতাস করতে। হয়ত আরও জল দিতেন কিন্তু অনেকেই প্রতি-বাদ ক'রে ওঠাতে নিবৃত্ত হলেন। বহু-মাল ও বহু মানুষ আশপাশেই মেঝেয় পড়ে—একটু বেশী জল হ'লেই গাড়িয়ে

আসবে, যদি মড়াই হয় তো মড়ার জল, সেটা আদৌ অভিপ্রেত নয় কারও।

গাড়ির এক কোণে কার একটা ছাতা ছিল, ছেলেদের একজন ছাতাটা টেনে নিয়ে বরদুই খোঁচা দিয়েও দেখল। কিন্তু বেশীক্ষণ সে পরীক্ষা চালাবার সুযোগ মিলল না, যাঁর ছাতা তিনি হৈ-হৈ ক'রে উঠলেন। ছেলেটি তাড়াতাড়ি ছাতা রেখে দিতেও তার জের মিটল না। ছাতার মালিক যথেষ্ট ঝাঁঝ প্রকাশ করতে লাগলেন বহুক্ষণ পর্যন্ত, ছেলেটিও দু-একটা গরম গরম জবাব দিল শেষের দিকে। ফলে হয়ত বেশ একটা বড় রকমের তামাসা জমে উঠত—যদিনা গাড়ির অপর দু-চার জন মধ্যস্থ হয়ে মিটিয়ে দিতেন।

এদিকের গণ্ডগোলটা মিটতে ছেলেদের মনোযোগটা আবার ঐ লোকটার উপরই এসে পড়ল। তাদের তখনও বিশ্বাস হচ্ছে না কথাটা। সত্যিই এভাবে অকস্মাৎ বিনা কারণে বা বিনা আয়োজনে একটা লোক নিঃশব্দে মরে যেতে পারে—এটা বিশ্বাস করার বয়স নয় তাদের। তারা নিজেদের মধ্যে ও নিয়ে তর্ক বাধিয়ে তুলল।

একজন বলল, 'আরে এই হ'ল রিয়াল থ্রম্বসিস। বুঝতে পাচ্ছিস না?'

আর একজন বলল, 'দূর, এসব লোকদের কখনও থ্রম্বসিস হয়! বারা ঘরে বসে কাজ করে, শুধু মাথা ঘামায় আর ভাল ভাল রিচ ফুড খায়—সেই সব সিডেন্টারী হ্যাবিটের লোকরাই থ্রম্বসিসে মরে। এ যদি মরেও থাকে—হুইচ আই ডাউট ভেরি মাচ—হার্ট ফেল করে মরেছে হঠাৎ!'

'ওরে বাবা ও-ই হ'ল। যার নাম ভাজা চাল তার নামই মুড়ি। আগে থ্রম্বসিস নামটা জানত না, বলত হার্টফেল। এখন সবই ঐ থ্রম্বসিস।'

'কিন্তু ও বাবা মরেনি—আমি বাজী রেখে বলতে পারি। হয় ভোচ্‌কানী গেছে, হয়ত অনেকদিন খাওয়া টাওয়া হয়নি—নয়তো মস্ত ঘুঘু। ঐ রকম পোজ করেছে, আমরা মরে গেছে মনে ক'রে নিশ্চিন্ত হলেই কিছু একটা ঝেড়ে নিয়ে পালাবে।'

'হ্যাঁ—এই এত বেলায় চারিদিক ফরসা হয়ে গেছে—এখন চুরি করবে! তুইও যেমন! ও গেছে, গন্।'

'একটু দেখলেই তো হয়—দাঁড়া আমি একটা এক্‌স্‌পেরিমেন্ট করছি!' একটি ছেলে উঠে কাছে এসে দাঁড়াল, 'ক্ষিদেয় যদি অজ্ঞান হয়ে গিয়ে থাকে খাবারের গন্ধে উঠে বসবে ঠিক। একটু খাবার দিয়ে দ্যাখ বরং—'

'হ্যাঁ—ঠিক বলেছিস মাইরি। লুচি, লুচি ইজ দা থিং—লুচির গন্ধে মরা-মানুষ জেগে ওঠে। লুচি আছে কার কাছে? বার করো!'

সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাগ থেকে খাবারের কৌটো বার করল একজন। অল্প বয়সের কৌতূহল ও নিষ্ঠুরতায় সবাই ঝুঁকে পড়ল আবার, অনেকেই হাসতে লাগল একটা বড় রকমের তামাসার আভাসে, সকলেরই চোখে মুখে কৌতুকজড়ানো উত্তেজনা; তারই মধ্যে একজন একখানা লুচি ছুঁড়ে দিলে তার মুখের দিক তাগ ক'রে। লুচিখানা তার মুখে লেগে কোলের ওপর এসে পড়ল—এবং পড়েই রইল। কিন্তু ততক্ষণ আর এক মুঠো বোঁদে এসে পড়েছে। কে একজন আস্ত চীনেবাদাম গোটা দুই ছুঁড়ল ওপাশ থেকে।

এবার ওদেরই মধ্যে থেকে একটি ছেলে ধিক্কার দিয়ে উঠল, 'এই—কী হচ্ছে কি, অসভ্যতা করছিস কেন? একটা ডেড্‌ ম্যানকে নিয়ে এসব বিশ্রী রসিকতা আমার ভাল লাগে না!'

'সত্যিই বাবারা' ভরসা পেয়ে ওধার থেকে একজন প্রবীণ ব্যক্তি বলে উঠলেন, 'মৃত্যুর একটা স্যাংটিটি আছে, মৃত-ব্যক্তিকে অমন খোঁচাখুঁচি করা ঠিক নয়।'

অপ্রস্তুত হয়ে সরে এল সবাই। অবশ্য কতটাই বা সরা সম্ভব। তবু, কিছুক্ষণের মতো ওদের সেই অবিশ্রান্ত হৈ-চৈতেও ছেদ পড়ল। মিনিট দুই তিন স্তব্ধ থেকে যেন মৃতের আত্মাকে সম্মান দেখাল ওরা।

তার একটু পরেই অবশ্য আবার শুরু হয়ে গেল তাদের আলোচনা। প্রথম দিকে সেটা ঐ মৃত ব্যক্তিটির মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল কিছুক্ষণ। কী হয়েছিল লোকটার, কেন মারা গেল, কী করে বা কী করত, কোথায় বাড়ি—এই সম্পর্কে নানা বিচিত্র অনুমান তর্ক ও বাজী রাখারাখি। প্রসঙ্গটা ফুরিয়ে যেতে আবার যথারীতি আলোচনাটা রাজনীতি, কলেজ ও চলচ্চিত্রে এসে পড়ল।

সে লোকটি তেমনিই পড়ে রইল। সেই কোণে ঠেস দিয়ে—লুচি, বোঁদে ও চীনেবাদাম কোলে নিয়ে।

ইতিমধ্যে বেশ বেলা হয়ে গেছে। গাড়ি খুরদা রোডে এসে পড়ল।

কে একজন বললেন, 'গার্ডকে তো তাহলে ইনফর্ম করা দরকার, এমন কাণ্ডটা হ'ল—'

সঙ্গে সঙ্গে তিন চার জন হাঁ-হাঁ ক'রে উঠলেন, 'অমন কাজও করবেন না। অমন কাজও করবেন না। আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে? খবর পেলেই পুলিশ আসবে—কী হয়েছিল কী বৃত্তান্ত, কে চেনে ওকে—হাজারো রকমের জেরা আর জবানবন্দী শুরু হয়ে যাবে। দু' ঘণ্টা তিন ঘণ্টা হয়ত ডিটেন্‌ড্‌ হয়ে যাবে গাড়ি তার ফলে। তারপর হয়ত বলে বসবে আপনারা নেমে যান গাড়ি কাটব। এই ভিড়ে আবার কোথায় গিয়ে উঠব মশাই মোট-ঘাট নিয়ে? আপনি তো এক কথা বলে খালাস।......তার চাইতে চলুন—যেমন এতক্ষণ এলেন, তেমনি চুপচাপ বসে কাটিয়ে দিন, কতটুকুই বা বাকী? পুরীতে পৌঁছে সবাই নেমে যাব যখন—যাদের চোখে পড়বার ঠিক পড়বে। তখন থানাপুলিশ যা হয় হোক, আমাদের তো হয়রান করতে পারবে না!'

বুদ্ধিমানের মতো কথা তাতে সন্দেহ নেই।

যিনি গার্ডকে খবর দেবার প্রস্তাব করেছিলেন তিনি অপ্রতিভ ভাবে চুপ ক'রে গেলেন।

কিন্তু ট্রেন সেদিন অনেক দেরিতেই পৌঁছল পুরী। ছাঁক একটি ঘণ্টা লেট্ হয়ে গেল। নটায় পৌঁছবার কথা—ঠিক দশটায় পৌঁছল।

ওদিকে ঠিকমতো এসে সাক্ষীগোপালে দেরি ক'রে ফেলল এক ঘণ্টা।

সাক্ষীগোপাল স্টেশনে ঢোকবার মুখেই ঘটল ঘটনাটা।

যারা বাইরের দিকে ছিল—এ কামরার ছেলেরা দুদিকের দরজা খুলে নিজের নিজের বেডিং পেতে সামনেই বসে ছিল—তারা সবাই দেখেছে।

ওদিকের পাকা রাস্তাটা দিয়ে তীর-বেগে আসছিল ছেলেটা, কুড়ি বাইশ কি পঁচিশ হবে তার বয়স—মালকোঁচামারা ধুতি পরনে, গায়ে ধোপদস্ত ছিটের শার্ট, সুশ্রী ভদ্র চেহারা। যে সাইকেলটা করে আসছিল সেটাও ঝকঝকে নতুন। একেবারে লাইনের ধারে পড়ে রাস্তাটা যেখানে ঘুরে গেছে, সেইখানে নেমেই সাইকেলটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছুটে এসে দুটো বাঁশের মাঝখানে গলা দিয়ে শুয়ে পড়ল। কেউ কোনদিক থেকে ওঠার কি কোন বাধা দেবার সময় তো পেলই না,

ঘটনাটা কি ঘটছে তা বোঝবার আগেই ঘটে গেল ব্যাপারটা। চোখের পলক না ফেলতে ফেলতে ছেলেটির গলা থেকে মুণ্ডটা কেটে বেরিয়ে গেল।

তারপর যথারীতি হৈ-চৈ, চেনটানা, ভিড়। রিপোর্ট, চেঁচামেচি। এবং অনাবশ্যক দেরি।

তারপর এক সময়ে গাড়ি আবার ছাড়ল। পুরীতে পেঁছিলও। যাত্রীরা নেমে গেলেন পাণ্ডাদের কচকচি ও রিক্সওয়ালাদের কোলাহলের মধ্য দিয়ে। এক গাড়ি অশিক্ষিত ও অর্ধ-শিক্ষিত ব্যক্তির এক-রাত্রি-বাসের চিহ্ন বহন করে পড়ে রইল শুধু রাশীকৃত জঞ্জাল—খাবারের টুকরো, শালপাতা, দগ্ধাবশিষ্ট বিড়ি, দেশলাইয়ের কাটি, চীনাবাদাম ও কলার খোসা—এবং আরও বহু বিচিত্র আবর্জনা।

আর পড়ে রইল ঐ মৃতদেহটা, সেই একক আসনের খাঁজে মাথা হেলিয়ে অর্ধ-নিমীলিত স্থির শূন্য দৃষ্টি মেলে, মানুষের নিষ্ঠুর-কৌতুকের চিহ্নস্বরূপ লুচি বোঁদে ও চীনেবাদাম কোলে ক'রে।

পড়ে রইল সাক্ষীগোপালের প্ল্যাটফর্মে ঢোকবার মুখে দ্বিখণ্ডিত মৃতদেহটাও। কোথা থেকে যেন রেল পুলিশের দারোগা আসবেন, সরেজমিন তদন্ত হবে, তবে ডোম এসে লাশটা সরাবে। আপাতত পড়ে রইল ঐ ভাবেই—ধড়টা থেকে মাথাটা হাত-চারেক দূরে, তারও স্থির বিস্ফারিত দৃষ্টি অনন্ত শূন্যে মেলে দিয়ে।

এ দুটো ঘটনার কথা অনেকেই জানেন। সে গাড়িতে যাঁরা ছিলেন, ঐ দুই স্টেশনের স্টেশন-স্টাফ এবং আরও অনেকে। কিন্তু জানেন দুটো ঘটনা বিচ্ছিন্ন ভাবে। এর মধ্যে কোন যোগাযোগ আছে কিনা তা জানেন না। হয়ত কোন দিন কথাটা ভেবেও দেখেননি। হয়ত ঐ হার্টফেল ক'রে মরা লোকটির কোন পরিচয়ও পাওয়া যায়নি কোন দিক থেকে।

তাঁরা জানেন না তার কারণ তাঁদের জ্ঞান পরিমিত, দৃষ্টি সংকীর্ণ। শুধু তথ্যের ওপরই নির্ভর করতে হয় তাঁদের। লেখকের দৃষ্টি মুক্ত এবং সত্য। তিনি বহুদূর দেখতে পান। তাঁর কল্পনা অনেক সময় এমন সত্যে পৌঁছয় যেখানে পৃথিবীর কোন তথ্য কোনদিন নাগাল পাবে না।

আমি দেখতে পাচ্ছি দুটি মৃত্যুর মধ্যে এক রহস্য-নিবিড় যোগাযোগ।

আমি পরিচয় পেয়েছি ঐ লোকটির। ওর নাম শত্রুঘ্ন দাস। এই সাক্ষীগোপালের কাছেই ওর বাড়ি।

ছেলেটিকেও চিনি। ওর নাম বিশ্বনাথ। ছেলেবেলায় নাম ছিল মাগন দাস। শত্রুঘ্নর ছেলে ও। একমাত্র ছেলে।

আরও ভাল ক'রে এর রহস্যটা জানতে হ'লে আমার সঙ্গে যেতে হবে আপনাকে বহু বছর আগের একটা সময়ে।

এই বিশ্বনাথের ছেলেবেলায়।

শত্রুঘ্ন লেখাপড়া জানত না। যেমন আর পাঁচজন ওদের দেশ থেকে যায় শুধুমাত্র দুটো হাতের ওপর ভরসা ক'রে কলকাতায়—সেইভাবে সেও এসেছিল একদিন। এখান-ওখান ঘুরে চ্যাটার্জী বাবু 'পিল্যাম্বরে'র কাছে এসে ঠেকেছিল। ভাল মিস্ত্রী, কাজ ভাল শিখেছিল বলে ঐখানেই হেড মিস্ত্রীর কাজ পেয়ে গিয়েছিল। পয়সা ভালই কামাত, বাবুর বিশ্বাসভাজন—আর এখান ওখান করার কোন প্রশ্ন ছিল না।

যথাসময়ে অর্থাৎ যথাসময়ের অনেক আগেই শত্রুঘ্নর বিয়ে হয়েছিল। তখনও সে কাজ খুঁজতে বেরোয়নি কলকাতাতে। বাপের সামান্য জমি ভরসা, পোষ্য অনেক। খুবই দুর্দশায় দিন কাটত ওদের। কিন্তু তাতে ওরা অভ্যস্তও ছিল, খুব দুর্দশা বলে কোনদিন কেউ ভাবতে শেখেনি সে অবস্থাটাকে।

প্রথম ভাবল শত্রুঘ্নই। কলকাতায় এসে নাগরিক জীবন দেখে প্রথম তার মনে হ'ল যে এ-ই তো জীবন। এরাই তো বেঁচে আছে। তাদের জীবনের মূল্য কি? প্রয়োজনই বা কি?

সেই দিনই প্রতিজ্ঞা করল সে যে যদি কোনদিন তার ছেলে হয় তো তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষের মতো মানুষ করবে—এমন ক'রে ওদের মতো গরু-ভেড়া-ছাগলের জীবন যাপন করতে দেবে না।

ছেলে হ'লও ওর প্রথমেই। আগে মনে হয়েছিল কিছুই হবে না—ওর বৌ একটু রুগ্ন গোছের ছিল, সময় পেরিয়ে বেশী বয়সেই হ'ল। তারপর ওর বৌ আর বাঁচেনিও বেশীদিন, বছর খানেক সূতিকায় ভুগে মারা গিয়েছিল। তখন শত্রুঘ্নর বয়স সামান্যই—পঁচিশ ছাব্বিশের বেশী নয়—সকলেই আশা করেছিল যে ও আবার বিয়ে করবে। না করবার কোন আপাত-কারণও ছিল না, কলকাতায় 'কাম্‌অ' করে, টাকা কামায়—সে তো একটা ছেড়ে তিনটে বিয়ে করতে পারে। আত্মীয়-স্বজনরা চেপে ধরেও ছিল খুব। কিন্তু শত্রুঘ্ন আর রাজী হয় নি।

সুখের চেয়ে তার কাছে উচ্চাশাটাই বড় হয়ে উঠেছে তখন, সে বুঝেছে যে এখন বিয়ে করলে আরও বহু ছেলেমেয়ে হবে তার, আর তাদের সবকটাকে ভালভাবে মানুষ করা তার দ্বারা সম্ভব হবে না, যত পয়সাই সে কামাক না কেন! একটি মাত্র ছেলে প্রসব করেই যে ওর স্ত্রী মারা গেল, এটাকেও সে বিধাতার স্পষ্ট নির্দেশ বলে ধরে নিল। এই ছেলেই মানুষ হোক ওর—আর সে কিছু চায় না।

শত্রুঘ্ন করলেও অসাধ্য-সাধন। পাঁচ বছর বয়স থেকেই ছেলেকে বোর্ডিং-এ রেখে পড়াতে লাগল। অনেক খরচা, সে সময়টা যুদ্ধের বাজারে কাজ-কারবার কম। মালই পাওয়া যায় না, যা মেরামতী কাজ। মিলিটারীতে নাম লেখালে অনেক টাকা পাওয়া যেত হয়ত কিন্তু শত্রুঘ্নর ভরসা হ'ল না। তাতে স্বাধীনতা থাকবে না। হয়ত কোন দূর দেশে ঠেলবে, মগের মুলুকেই ঠেলবে হয়ত, সেখানে বোমা কি গুলিগোলায় মরে যাওয়াও বিচিত্র নয়। এখানে তার ছেলেটা বারোমাস বোর্ডিং-এ থাকে—তাকে কে দেখে? মরে গেলেই বা তার কি হবে। অনেক ভেবে সে বেশী মাইনের লোভ সম্বরণ করল।

কিন্তু পুরনো কাজেও টিঁকে থাকতে পারল না। পুরনো মনিব পুরনো কর্মচারীর মাইনে হিসেব করেন আগের দিনের পরিপ্রেক্ষিতে, সেই হিসেব-মাফিক বাড়ান একটু একটু ক'রে। এধারে যুদ্ধের বাজারে নতুন নতুন কারখানা হচ্ছে তখন, তাতে মোটা মাইনের ব্যবস্থা। তারই একটাতে ঢুকে পড়ল সে।

কিন্তু তাতেও কুলোয় না। নিজের খরচ যেমন-তেমনই হোক—একটা ঘরে তারা দশ-বারোজন থাকে, শুধু ভাত-ডাল ফুটিয়ে খায়—কিন্তু তার দায়-ধাক্কা অনেক। দেশে তখনও বুড়ো মা-বাবা আছে, ভাইটা লড়াইয়ে চলে গেছে—কিছুই পাঠায় না প্রায়, তার সংসারও দেখতে হয় ওকে। এদিকে ছেলে হোস্টেলে থেকে পড়ে—তার এক গাদা খরচ। মাগন দাস নাম দিয়েছিল ওর ঠাকুর্দা, বহু ঠাকুরের দোরে মেগে ছেলে হয়েছিল বলে, ইস্কুলে ভর্তি করার সময় শত্রুঘ্ন পালটে বিশ্বনাথ ক'রে দিলে। মাগন অর্থাৎ ভিক্ষা শব্দটা দারিদ্র্যের প্রতীক, তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক না থাকে ছেলের কোন দিন। ভদ্রলোকের ছেলের

মতোই যেন সে মানুষ হয়—এই চেষ্টাই করেছে শত্রুঘ্ন বরাবর। বই-খাতা অনেকেই চেয়ে-চিন্তে জোগাড় করে, ওরও হয়ত তা হ'ত কিন্তু সে দিক দিয়েই যায়নি কোনদিন।

এর মধ্যে বহু দুঃখ করতে হয়েছে তাকে। কারখানার চাকরি ছাড়াও অনেক খুচরো কাজ করত সে। যে অঞ্চলে ওদের বাসা—সেখানে তখনও সব বাড়িতে জলের ব্যবস্থা হয়নি—ভারীর চাহিদা আছে। শত্রুঘ্ন ভোরে উঠে দু-তিন বাড়ি জল যোগাত। রাত্রে ফিরেও যোগাতে হ'ত। যেদিন ওভার-টাইম থাকত—সেদিন অন্য ভারীর সঙ্গে বন্দোবস্ত ক'রে যোগানটা ঠিক রাখত। এ ছাড়া একজনের বাড়িতে মালীর কাজ করত, রবিবার বা ছুটি-ছাটায়। প্লাম্বারের যন্ত্রপাতি কিছু কিছু ছিল ওর কাছে—আশপাশের বাড়িতে কারও কোন দরকার পড়লে টুকটাক কাজ সেরে দিয়ে আসত। তাতেও দু-চার টাকা পাওয়া যেত। এক কথায় বারোমাস এবং প্রতি মাসে ত্রিশ দিন ভূতের মতো খেটেছে সে। ভোর হওয়ার বহু আগে থেকে আরম্ভ করত—গভীর রাত্রি পর্যন্ত চলত সে খাটুনি। সূর্য কখন ওঠে বা কখন অস্ত যায় তা কোন দিন চেয়ে দেখেনি সে।

তার ফলে, যে-ছেলের জন্যে এত, সেই ছেলের সঙ্গেই দেখা হ'ত দৈবাৎ, কালে-ভদ্রে। ছুটি পাওনা হ'ত কিন্তু ছুটি মানেই তো লোকসান। কখনও-সখনও দু-তিন দিনের ছুটি নিয়ে দেশে আসত ছেলেকে দেখতে—ছেলের ছুটির সময়, তাও যেতে-আসতেই দুটো রাত চলে যেত, একদিনের বেশী ছেলের কাছে থাকা হ'ত না। ওর ইস্কুলে কখনও যেত না শত্রুঘ্ন, পাছে তার বেশভূষা কি কথা-বার্তায় তার স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে—ছেলে লজ্জা পায়।

ইস্কুলের পড়া শেষ হ'তে বিশ্বনাথ বলল, 'এবার আমি একটা কাজটাজ খুঁজি—তুমি দিনকতক বিশ্রাম নাও। যা হোক একটা চাকরি কি আর জুটিয়ে নিতে পারব না?'

কথাটা শুনে শত্রুঘ্ন শিউরে উঠল।

বাবে! এই জন্যে কি সে এত কষ্ট করল। ছেলেকে কলেজে না পড়িয়ে, তিনটে পাস না করিয়ে সে ছেড়ে দেবে? কী হয়েছে তার শরীরে যে এখন থেকে ছেলেকে দিয়ে রোজগার করিয়ে বসে বসে খাবে সে?

'যা যা, তোর কাজে যা। কী করবি না করবি সে আমি বুঝব।'

এক ধমকে চুপ করিয়ে দিল সে ছেলেকে।

না, বালেশ্বর কলেজে নয়, পুরীর ছোট কলেজেও নয়—ওদের গ্রামের পোস্ট-মাস্টারবাবুকে খরচ দিয়ে পাঠিয়ে সে কটকের র‍্যাভেনশ' কলেজেই ভর্তি করিয়ে দিলে। ছেলে তবু একবার আপত্তি করতে গিয়েছিল, পুরীতে হ'লে ফ্রী হ'তে পারত, বালেশ্বরেও চেনা লোক আছে, অন্তত হাফ্-ফ্রী হ'ত—আর কিছু না হোক, হোস্টেলের খরচ অনেক কম ওসব জায়গায়, এ শত্রুঘ্ন কী করলে! মিছিমিছি এ নবাবীতে দরকার কি?

এর মধ্যে একদিন ঠাকুরদার মৃত্যু-সংবাদ দিতে সে কলকাতায় এসেছিল, তার বাবা কী অবস্থায় থেকে তার খরচা জোগায় তা নিজের চোখেই দেখে গেছে।

কিন্তু শত্রুঘ্ন এবারও কোন কথা শুনল না। তার এখন দায়-ধাক্কা অনেক কম। মা বাবা গেছে—ভাই ফিরে এসেছে, তার সংসার সে বুঝবে—এখন তার দায় বলতে ঐ ছেলে। পাঁচটা নয় দশটা নয়—একটাই ছেলে। তার জন্যে খরচ করবে না তো কার জন্যে করবে? যদি পাঁচ-সাতটা ছেলেমেয়ে থাকত ওর, কি বিশুর মা বেঁচে থাকত—তা হ'লে কি আর পারত? তার ভাবনা না বিশ্বনাথ ভাবে—মন দিয়ে লেখাপড়া করুক সে, তা হ'লেই শত্রুঘ্নর এ কষ্ট সার্থক।

তাছাড়া এখন আয়ও অনেক বেড়েছে আগের চেয়ে, স্বদেশী সরকারের আমলে বেশ ভালই রোজগার করছে সে, শরীরও অপটু হয়ে পড়েনি কিছুমাত্র। এখনই বা কাজ ছাড়বে কেন সে? আর তার বয়সই বা এমন কি একটা হয়েছে? এখনও তো পঞ্চাশ হয়নি। আরও ঢের কম। ঠিক হিসেব নেই—কিন্তু তার যখন বাইশ-তেইশ বছর বয়স তখনই বিশু এসেছে তার ঘরে—আর বিশুরেই বা কী এমন বয়স। হিসেব করে নিক না বিশু। এত তো লেখাপড়া শিখছে। তার কি বসে খাবার বয়স এটা?

এরপর আর কথা চলেনি। শত্রুঘ্নর বহুকষ্টার্জিত অর্থে বেশ অবস্থাপন্ন ছেলের মতোই কটকের সরকারী কলেজের হোস্টেলে থেকে পড়েছে বিশু।

কিন্তু শত্রুঘ্নর উচ্চাশা এইখানেই থেমে থাকেনি। ছেলেকে যেমন মানুষ করছে, তার উপযুক্ত ঘরবাড়িও যে করে দিতে হবে সে কথাটাও সে ভোলেনি। ওদের গ্রামে পাকাবাড়ি কারও নেই, বাড়ি করার সাজ-সরঞ্জাম বহুদূর থেকে আনাতে হয়—সুতরাং খরচ অনেক বেশী তবু তিল তিল ক'রে পয়সা জমিয়ে ওর হিস্যায় একখানা পাকাঘরও তুলে ফেললে সে ইতিমধ্যে। ছাদটা হ'ল না এ যাত্রায় —আপাতত অ্যাসবেস্টাসের চাল দিয়েই রাখতে হ'ল কিন্তু অন্যসব মাল-মসলায় কোন কার্পণ্য করেনি। দরজা জানলাও সদর বাজার থেকে ভাল দেখে আনিয়েছে। এরকম কখনও এ গ্রামের লোকে দেখেনি —গ্রামে রটে গেল—লড়াইয়ের বাজারে বিস্তর টাকা কামিয়েছে শত্রুঘ্ন দাস, টাকার কুমির হয়ে গেছে।

আরও একটি আশা তার ইদানীং একটু একটু ক'রে মনের মধ্যে বেশ ভালমতো একটা আকার ধারণ করেছে।

একটি মনের মতো বৌ আনবে সে ছেলের জন্য।

আবার লক্ষ্মীছাড়ার সংসারে শ্রী ফিরবে, সুখের সংসার হয়ে উঠবে। মা-হারা ছেলেটা চিরকাল হোস্টেলে হোস্টেলে কাটাল—এবার যখন কাজকর্ম করবে তখন যেন অন্তত একটু গৃহসুখ পায়।

সে বৌ-ও মনে মনে ঠিক করে রেখেছে সে।

ওদের পাশের গ্রামের দামো—ওর সঙ্গে এক কারখানাতেই কাজ ক'রে এক বাসাতেই থাকে দীর্ঘকাল। দামোই বলে-কয়ে ওকে এ কারখানাতে ঢুকিয়েছিল, তার জন্য একটা কৃতজ্ঞতাও আছে। এতাবৎ এই দীর্ঘকাল উপকার ছাড়া অপকার কখনও করেনি।

দামো ওদের সজাতিও বটে।

এই দামোরই একটি বিবাহযোগ্যা মেয়ে আছে। বয়স—তাদের তুলনায় একটু বেশীই হয়ে গেছে, খুব কম ক'রেও, শত্রুঘ্নর যা আন্দাজ—চোদ্দ-পনেরো হবে। দেখতে যে খুব একটা ভালো তা নয়—অবশ্য কুৎসিতও নয়। তা তাদের ঘরে তাদের গ্রামে সুন্দরী মেয়ে আর কটা আছে। কৈ, নজরে তো পড়ে না। তবু এ মেয়েটির একটা আলগা শ্রী আছে বেশ। লক্ষ্মী নাম—আচারে-আচরণে, চলায়-বলায়ও চমৎকার একটা লক্ষ্মী-লক্ষ্মীভাব। সবচেয়ে যেটা শত্রুঘ্নকে আকৃষ্ট করেছে—স্বভাবটি ভারী মিষ্টি। একবার দামোর খুব অসুখ করে—খবর পেয়ে বাড়ি থেকে স্ত্রী আর মেয়ে এসেছিল সেবা করবার জন্যে, সেই সময়ই লক্ষ্মীকে প্রথম দেখে ও। শুধু শত্রুঘ্ন কেন বাসার সকলেই লক্ষ্মীর ব্যবহারে ও মিষ্টি কথায় মুগ্ধ হয়ে

গিয়েছিল। বাপের সেবাও করেছিল তেমনি, ঐটুকু মেয়ে দিনরাত খুটখাট কাজ ক'রে যেত—মার সাহায্য করত।

তারপর—ঐ মেয়েটিকে আরও ভাল ক'রে দেখতেই—একবার দামোর বাড়িতে গিয়েছিল শত্রুঘ্ন, দামোর সঙ্গে। আরও ভাল লেগেছে তার। এই মেয়েই তো সে চাইছিল, যাকে দেখেই মা-জননী বলে ডাকতে ইচ্ছে করে।

সেই বারেই মনস্থির ক'রে ফেলে সে। কলকাতায় ফিরে, দামো পাছে অপর কোন জায়গায় কথা দিয়ে ফেলে (খোঁজ-খবর তো করছেই বহুদিন ধরে) এই ভয়ে, দামোকেও অভিলাষটা জানিয়েছে সে। তবে একটা কথা, যতদিন না ছেলে তিনটে পাস দিয়ে কোন ভাল চাকরী নিচ্ছে, ততদিন সে বিয়ে দেবে না ছেলের —ছেলেও রাজী হবে না। ভাল ক'রে নিজের পায়ে ভর দেবার আগেই একটা বোঝা ঘাড়ে করতে চায় না আজকালকার কোন ছেলেই। শত্রুঘ্নরও সেটা পছন্দ নয়।

বলা বাহুল্য দামো হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পেয়েছিল একেবারে। তাদের ঘ'র তিনটে পাস করা চাকুরে বাবু পাত্র এখনও দুর্লভ। এমন অদৃষ্ট কি তার লক্ষ্মীর হবে?

তার মনের এই গোপন কথাটি অবশ্য ছেলেকে জানায়নি শত্রুঘ্ন। জানাবার কোন প্রয়োজনও বোধ করেনি। তার ছেলে বাধ্য—ভাল ছেলে। বাপকে সে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে। বাবা তার সুখের জন্য যে ব্যবস্থা করছে সে ব্যবস্থা সে মাথা পেতে সসম্মানেই নেবে নিশ্চয়। আর সুখীও সে হবে, নিশ্চয়ই হবে। শত্রুঘ্ন ভুল করেনি। ছেলের মুখের দিকে চেয়ে বহু দুঃখ করেছে সে। সব-চেয়ে, বলতে গেলে ভরা-যৌবনেই সন্ন্যাসী হয়েছে। ওর যে বয়সে বিশুর মা মরেছে সে বয়সে এখন প্রথম বিয়েই হয় না। ছেলের কথা ভেবেই তো সে আর বিয়ে করেনি। নিজে একদিনও ভাল একখানা কাপড় পরেনি, একদিনও—এই কলকাতার বাজারে কত ভাল ভাল খাবার —জীবনধারণের মতো ভাত-ডাল ছাড়া কোন খাবার কিনে খায়নি। সবই ছেলের মুখ চেয়ে। ছেলের সুখের ব্যাপারে হিসেবে ভুল হ'লে চলবে না।

বিশ্বনাথ বি-এ পাস করলে ভাল ভাবেই। তারপর পরীক্ষা দিয়ে প্রভিন্সিয়াল অ্যাডমিনস্ট্রেটিভ সার্ভিসে ঢুকে পড়ল। কোন ধরপাকড় করতে হ'ল না, সে রকম মুরুব্বী ছিলও না কেউ। নিজের জোরেই বেরিয়ে গেল। তার কৃতিত্বের আরও একটি স্বীকৃতি পেল সে। প্রথমে সাবডেপুটি হবার কথা, কিন্তু সরকার থেকে ট্রেনিং দিয়ে একেবারে ব্লকডেভেলপমেন্ট-এ বড় একটা পদে তাকে বসিয়ে দেওয়া হ'ল।

এ ছেলে শহর বাজারেও সুপাত্র। পাড়াগাঁয়ে তো কথাই নেই, এ রকম পাত্র সেখানে সুদূর কল্পনারও অতীত। সুতরাং চারিদিক থেকে বহু পাত্রীর বাবা ঠিকানা যোগাড় ক'রে খুঁজে খুঁজে এসে হাজির হ'তে লাগলেন শত্রুঘ্নর বাসায়। শেষে ওদের পাশের গ্রামের জমিদার—রাজা উপাধি তাঁর—লোক পাঠালেন ওর কাছে।

এ শত্রুঘ্নরও কল্পনাতীত সৌভাগ্য। কিন্তু শত্রুঘ্নর সৌভাগ্যের ধারণা একটু অন্য রকম। বৃদ্ধ বয়সে দুটি কোমল স্নেহপরায়ণ হাতের সেবা একটি কল্যাণী মেয়ের সস্নেহ সম্ভাষণ, সংসারের শ্রী—এই তার কাম্য। তার ছেলেকে রাজার জামাই ক'রে চিরদিনের মতো আয়ত্তের বাইরে পাঠাবার জন্য সে এমনভাবে মানুষ করেনি।

সে রাজার লোককে 'না' বলে দিল। কিন্তু সেই সঙ্গেই বুঝল যে আর দেরি করাও উচিত নয়। লোভ বলবান। চারিদিক থেকে বড় বেশী টাকার প্রলোভন আসছে। তার মতো দরিদ্র লোক কতদিন এ লোভ সামলাতে পারবে তার ঠিক কি? সামান্য ক'টা টাকার জন্য হয়ত ছেলের সুখসৌভাগ্য বিক্রি ক'রে বসে থাকবে শেষ পর্যন্ত।

রাজার লোককে বিদায় ক'রেই শত্রুঘ্ন দু'দিনের ছুটির দরখাস্ত করল। ছেলের নতুন চাকরী সে আসতে পারবে না। তবে জায়গাটা ভাল সাক্ষীগোপালের কাছেই—ঐখানে কোথাও থেকে হেঁটে গিয়ে দেখা ক'রে আসা যায়। একেবারে ছেলের কাছে গিয়ে ওঠা ঠিক হবে না, ছেলে হয়ত লজ্জা পাবে।......

বিশু ওকে দেখে অবাক হয়ে গেলেও লজ্জা পেল না। অতি সহজেই অধস্তন কর্মচারীদের সামনে প্রণাম ক'রে পায়ের ধুলো নিলে, অফিসে নিয়ে গিয়ে বসালে

তারপর দুপুরে খাওয়ার ছুটি হ'তে বাসায় নিয়ে গিয়ে শত্রুঘ্নরও স্নানাহারের ব্যবস্থা ক'রে দিলে। আলাদা কোয়ার্টার এখনও পায়নি, বিয়ে না হ'লে পাবে না। তবে—অন্য অফিসারদের সঙ্গে থাকলেও—আলাদা ঘর পেয়েছে একখানা। কথা-বার্তার কোন অসুবিধা নেই।

খেতে খেতেই কথাটা পাড়ল শত্রুঘ্ন। ছেলে কৌতূহলী হয়ে উঠেছে—প্রথমটায় তো ওকে অমনভাবে আসতে দেখে উদ্বিগ্নই বোধ করেছিল। আর অন্ধকারে রাখা ঠিক নয়। বিশুর বিয়ের বয়স হয়েছে, অবস্থাও হয়েছে—গোড়ায় সেই কথাই বলল। বহু সম্বন্ধ আসছে চারিদিক থেকে, শত্রুঘ্ন আর সামলাতে পারছে না। রাজামশাই সুদ্ধ লোক পাঠিয়েছেন তার কাছে—কথাটা জানিয়ে আনন্দিত গর্বে ছেলের সর্বাঙ্গে চোখ বুলিয়ে নিল একবার। তারপর নিজের মনের গোপন ইচ্ছাটির কথাও জানাল। দামোকে কথা-দেওয়া হয়ে গেছে—তাও। দামো বেশী কিছু দিতে পারবে না—কিন্তু তার দরকারও নেই। বিশু যদি বেঁচে থাকে তো ঢের টাকা রোজগার করবে। আসলে মানুষের যেটা দরকার—সুখ-শান্তি, সেটা দিতে পারবে দামোর মেয়ে। বিশু সুখী হবে তাকে বিয়ে ক'রে।

নিজের বলার ঝোঁকে আপন মনে বলে যাচ্ছিল শত্রুঘ্ন, বলতে বলতে নিজেরই মানসচোখে ভেসে উঠছিল ভবিষ্যতের একটি স্বপ্নচিত্র—সেখানে শান্তি ও শ্রী'র একটি ক্ষুদ্র নীড়ে সুখী একটি পরিবার, আর তার মধ্যে সেও—তৃপ্ত, চরিতার্থ। এই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ক্ষণকালের জন্য চোখ ধেঁধে দিয়েছিল বলেই শত্রুঘ্ন লক্ষ্য করল না যে বিশুর মুখ ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেছে, চোখে ফুটে উঠেছে অসহায় বিহ্বলতা।—

দুটো বাজার ঘণ্টা পড়তে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে উঠে পড়ল বিশু। এখনই আবার অফিস শুরু হবে, পাঁচটা পর্যন্ত চলবে অফিস। বাবা এখন বিশ্রাম করুক, সে ফিরে আসছে ছুটি হলেই।

শত্রুঘ্ন বললে, 'কিন্তু আমি তো এখনই ফি'রে যাব ভাবছিলুম রে, এতটা পথ যাওয়া—সময় তো লাগবে।'

'না না, আজ কোথায় যাবেন—কাল গেলেই চলবে। তাছাড়া হাঁটতেই বা হবে কেন, জীপ আছে, পৌঁছে দেবে এখন—'

ব্যস্ত হয়েই চলে গেল বিশ্বনাথ। কিন্তু শত্রুঘ্নর হঠাৎ কেমন মনে হ'ল যে কোথায় কী একটা গোলমাল বেধেছে। ছেলের আচরণ ঠিক সহজ বা স্বাভাবিক নয়। ছেলের যে সহজ সম্মতি আশা করেছিল বা সম্মতিসূচক নীরবতা—তা যেন ওর এই প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যাওয়ার মধ্যে নেই।

ছেলেরই বিছানায় শুয়ে পড়ল বটে কিন্তু ঘুম এল না। বিশু মুখে কিছু বলেনি এটা ঠিক, তবু শত্রুঘ্ন স্বস্তি পাচ্ছে না কিছুতেই। গোলমাল কেন, কিসের গোলমাল—না বোঝা পর্যন্ত স্বস্তি পাবেও না। তাই বিকেলে ছেলে এসে চা নিয়ে বসতেই একেবারে সরাসরি আক্রমণ করল সে, 'তাহলে কবে নাগাদ ছুটি নিতে পারবি বল, সেই বুঝে দিন ঠিক করব। ওদেরও তো একটু সময় দিতে হবে!'

গত তিন ঘণ্টাতেই বিশ্বনাথের মুখে বহু পরিবর্তন হয়েছে। মসৃণ ললাটে জেগেছে কুঞ্চন, অমন যৌবনদীপ্ত মুখে কে কালি লেপে দিয়েছে। সেটাও চোখ এড়ায়নি শত্রুঘ্নর। খেটেখুটে এল ঠিকই—কিন্তু এই বয়সে, চেয়ার টেবিলে বসা কাজে, মুখে এমন কালি পড়ে না। এত দ্রুত আক্রমণের বোধহয় সেও একটা কারণ।

বিশুর কপালে আবারও বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। সে অসহায়ভাবে একবার বাবার মুখের দিকে চাইবার চেষ্টা ক'রে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, 'এখন থাক না বাবা, এই তো সবে চাকরীতে ঢুকেছি। এত তাড়া কি?'

'তোর তাড়া নেই আমার তাড়া আছে। আমি ঢের দিন কষ্ট করেছি—আর না। বৌয়ের সেবা চাই।' শত্রুঘ্নর গলায় অস্বাভাবিক জোর।

তবুও বিশ্বনাথ ওর মুখের দিকে চাইতে পারে না। তেমনি ওদিকে চেয়েই জবাব দেয়, 'কিন্তু তুমি তো এখনই চাকরী ছেড়ে বৌয়ের সেবা খেতে আসছ না। যখন সে সময় হবে তখনই না হয় তাড়া করো।'

শত্রুঘ্ন আর কথার মারপ্যাঁচে গেল না। ছেলের মুখের দিকে চেয়ে সোজা-সুজি প্রশ্ন করল, 'কী ব্যাপার বল দেখি বিশু—ঠিক ঠিক বল। আমাকে লুকোবার চেষ্টা করিসনি কিছু। আমি বুঝেছি কী একটা গোলমাল আছে তোর কথার মধ্যে।'

তবু খানিকটা সময় নিল বিশু। ঘেমে নেয়ে উঠল সে। গলাটা ধরে আসতে লাগল কথা কইতে গি'য়, বহু-ক্ষণ পর্যন্ত স্বরই ফুটল না যেন। শত্রুঘ্ন অবশ্য তাড়া দিল না, স্থির হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল ছেলের সামলে ওঠবার। স্থির হয়ে গেছে যেন তার বুকের মধ্যটাও—সমস্তটা যেন হিম আড়ষ্ট হয়ে গেছে কী এক অজ্ঞাত অশুভ আশঙ্কায়।

অবশেষে প্রায় মরীয়া হয়েই বলে ফেলল বিশু।

তার কলেজের সহপাঠিনী মালতী। সে-ই তার স্বপ্নকল্পনা। সেই তার আত্মার আনন্দ, প্রাণের আরাম। তাকে ঘিরেই যত কিছু সুখস্বপ্ন তার। যদি সুখী হয় তো তাকে পে'লই হবে। সেও রাজী আছে। সেও চাকরী পেয়েছে। এই চাকরীই। চেষ্টা করছে এই ব্লকে আসবার। এলে বিয়ে করা সহজ হবে। সে সম্ভাবনা হ'লে বিশু বাবাকে বলবে বলে স্থির করে রেখেছিল। বাবা যে এত শিগ্‌গির তার বিয়ের জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়বে তা ভাবেনি। তাহ'লে আগেই বলত। বাবা যেভাবে তাকে মানুষ করেছে, তাতে কোন শিক্ষিত ভদ্র মেয়ে ছাড়া যে তার বিয়ে করা সম্ভব নয়—শত্রুঘ্নর সেটুকু জানা উচিত। তা ছাড়া ছেলের সুখের প্রশ্নই যদি বড় হয়—বিশুর এই নির্বাচনে ওর অমত করা উচিত নয়।

স্থির হয়ে শুনল শত্রুঘ্ন, পাথরের মতোই স্থির হয়ে বসে শুনল। বাধা দিল না, চেঁচামেচি করল না—মাঝে কোন প্রশ্নও করল না। বিশুর বলতে অনেক সময় লাগল কিন্তু ধৈর্য ধরেই শুনল সে। সব বলা শেষ হ'তে শুধু বলল, 'তুমি তাকে কথা দিয়েছ?'

'হ্যাঁ—একরকম দেওয়াই। মানে আমিই তার কাছে কথা পেড়েছি।'

'অ। তাহলে আর এর নড়চড় হওয়া সম্ভব নয়?'

'কিন্তু তার কোন দরকার হবে না বাবা, তুমি একে দ্যাখো, তোমার নিশ্চয়ই পছন্দ হবে। খুব ভাল মেয়ে।'

হাসল শত্রুঘ্ন। বলল, 'বিয়ে করবি তুই, আমি দেখে কী করব বল। আমার পছন্দরই বা কী দাম। তোর ভাল হ'লেই ভাল।...তা তাহলে আর দেরি করার দরকার কী? বিয়েটা সেরেই ফ্যাল—'

এই সরল হাসি ও সহজ কথা সত্ত্বেও বিশ্বনাথ ব্যস্ত হয়ে উঠল।

'না বাবা, তবু তুমি একটু দ্যাখো। বলছি, তোমার ভাল লাগবে।'

'বেশ তো। ভালই তো। তাহলে তুই-ই বা অত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন। তাই যদি জানিস তো দেখাতে চাইছিস কেন মিছিমিছি।'

'তবু, তুমি দ্যাখোই না একবার।' জেদ করার মতোই বলে বিশ্বনাথ।

শত্রুঘ্ন আবারও হেসে বলে, 'আমরা মুখ্যু লোক কোতা পিটে খাই। আমা-দের পছন্দ এক রকমের। এর ওপর অত

ভরসা করিসনি। তাছাড়া—যদিই ধর আমার অপছন্দ হয়—তুই কি বিয়ে বন্ধ করতে পারবি? অন্য মেয়ে বিয়ে করবি আমার পছন্দমতো?'

'তোমার যদি অমত হয় তো—নিশ্চয় ও বিয়ে বন্ধ করব, এ তুমি কি বলছ! তবে অন্য মেয়ে হয়ত বিয়ে করতে পারব না। হয়ত আর বিয়েই করব না। তবে তোমার অমতে তোমার পুত্রবধূ এনে তোমার ঘরে বসাব না—তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।'

'আর তা জেনেও আমি তোর মনের মতো বৌ অপছন্দ করব ভাবছিস! ও বাজে কথা থাক, তুই শুধু একটু তাড়াতাড়ি ঠিক ক'রে ফ্যাল!'

'কিন্তু—কিন্তু সে আমার সজাতি নয় বাবা। ওরা ব্রাহ্মণ। বিয়ে এমনি হয়তো হবে না। রেজেস্ট্রী করতে হবে।'

'তা বেশ তো। কিন্তু লোকজন খাওয়াতে তো বাধা নেই? যেদিন থেকে রোজগার করছি সেইদিন থেকেই শখ, গ্রামের লোক আনা সবাইকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াব। বাবা-মা'র শ্রাদ্ধের সময় হয়ে ওঠেনি, কারণ তখন পয়সা ছিল না হাতে প্রায় কিছুই, যা করেছি দেনা ক'রে করেছি। তোর বিয়েতেও যদি না খাওয়াতে পারি—'

'হ্যাঁ, তা পারবে বাবা, নিশ্চয় পারবে। আর কটা মাস অপেক্ষা করলে আমিও কিছু দিতে পারব।'

'না, তার আর দরকার হবে না, তুই বরং তাড়াতাড়ি যাতে হয়—সেই চেষ্টা কর্।'

মাস দুই পরেই বিয়ে হয়ে গেল ওদের। এর জন্যে অনেক কাণ্ড করতে হ'ল বিশ্বনাথকে, অনেক তদ্বির। প্রথম তদ্বির মালতীর বদলির, দ্বিতীয় তদ্বির কোয়ার্টারের। ওর সৌভাগ্যক্রমে দুটোই হয়ে গেল নির্বিঘ্নে। সুতরাং পাত্র-পাত্রী কোন পক্ষেই আপত্তির কোন কারণ রইল না।

শত্রুঘ্নও খুশী শেষ পর্যন্ত। গ্রাম-সুদ্ধ লোককে নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়াতে পেরেছে সে ভালভাবেই। বৌটিও ভাল হয়েছে। দেখতে যেমন-তেমন কিন্তু স্বভাব বড় মিষ্টি। যথার্থ শিক্ষার পালিশ আছে ব্যবহারে। উদ্ধত বা উন্নাসিক নয়। শ্বশুর কেমন কী করে সবই সে জানে, তবু শ্বশুরের প্রাপ্য সম্মানে এতটুকু ত্রুটি ঘটতে দেয়নি। এই ক'দিনেই সেবা যত্ন যথেষ্ট করেছে। শিক্ষিত ও ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়ে বলে যত না ছোক—সরকারী চাকরীকরা মেয়ে ওর বৌ হয়েছে বলেই গ্রামের লোকেরা যথেষ্ট ঈর্ষিত শত্রুঘ্ন সম্বন্ধে। আরও ঈর্ষা—সেই চাকরে বৌও তার অশিক্ষিত অল্প-বিত্ত শ্বশুরকে শ্বশুরের মতোই ভক্তি-শ্রদ্ধা করছে বলে।

বিবাহের উৎসব-অনুষ্ঠান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ওদের ছুটির মেয়াদও ফুরিয়ে এল। এবার কর্মস্থলে ফিরতে হবে। মালতী বলল, 'আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন।'

'নিশ্চয়ই যাব। তোমাদের ঘর-সংসার গুছিয়ে না দিলে চলবে?'

তবু সংশয় থেকে যায় মালতীর মনে। বলে, 'আর কলকাতাতে ফিরবেন না তো?'

'ও হরি, তা না ফিরলে চলে! আমারও তো ছুটির মেয়াদ ফুরিয়ে এল।'

'কিন্তু আর দরকার কী বাবা আপনার সেই খাটুনির মধ্যে গিয়ে?'

'দূর পাগলী, এখনও পঞ্চাশ বছর বয়স হয়নি আমার, এরই মধ্যে বসে বসে খাব! আর কিছুদিন চাকরী করি তারপর বসবার কথা ভাবা যাবে।'

'কিন্তু—' কী যেন বলতে গিয়েও থেমে যায় মালতী।

'কিন্তু কি মা? বল না, ভয় কি?'

'বলছি যে—আপনার ছেলে এখন বড় অফিসার হয়েছে, আমিও—, এখন আপনার আর ও চাকরী করা ভাল দেখায় না। লোকে এ নিয়ে হয়ত মুখের সামনেই ঠাট্টা তামাসা করবে—। জানেন তো, আমাদের এ দেশের লোকের স্বভাব খোঁচা দিতে পারলে আমরা ছেড়ে দিই না। আগে করতেন সে আলাদা কথা ছিল—এখন আরও একটা কথা উঠবে লোকে বলবে ব্যাটা-বৌ খেতে দেয় না।'

শত্রুঘ্ন কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'হ্যাঁ, এটা আমার ভাবা উচিত ছিল মা। কিন্তু বিশু তো বলেনি কখনও—, তাই মনে পড়েনি। তা তার যদি অসুবিধা হয়, ও চাকরি ছেড়ে দেব বৈকি। কিন্তু এক-কথায় এখান থেকে ছাড়ি কি করে, এতদিনের চাকরি, পাওনাও আছে অনেক, তাছাড়া তাঁদের বলে কয়ে আসাও তো উচিত, নইলে বেইমানী করা হয় তাদের সঙ্গে—'

কেমন অসহায় ও অনুনয়ের ভাবে চায় সে পুত্রবধূর মুখের দিকে।

লজ্জিত হয়ে পড়ে মালতী। তাড়াতাড়ি বলে, 'না না এখনই ওখান থেকে ছাড়তে বলছি না আপনাকে। একথা বলেছি জানলেও আপনার ছেলে রাগ করবেন।...আপনি যান—। তবে তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন। আমরা থাকব কার ভরসায়—আপনি কলকাতায় বসে থাকলে?'

শত্রুঘ্ন হাসল একটু। এরা লেখা-পড়া জানা মেয়ে—কিন্তু বলে-ফেলা কথা এখনও সুকৌশলে ঢাকতে পারে না। গুছিয়ে কোন কথা পাড়তেও পারে না। বিশুর মা হ'লে এর চেয়ে অনেক গুছিয়ে বলতে পারত।

শত্রুঘ্ন ওদের সঙ্গে ওদের কোয়ার্টার পর্যন্ত এল।

দুটো তিনটে দিন থাকলও। কিছু কিছু গোছগাছ ক'রে দিল। তবে সে শুধু সংসারের হাঁড়ি-হেঁসেলের দিকটাই, শৌখীন সাজসজ্জার কিছুই বোঝে না সে, সেদিকে গেলও না। নতুন কোয়ার্টার, বহু সুখ সুবিধার ব্যবস্থা—লোভ হয় বৈকি। মনে হয় অনেক খেটেছে—দিন কতক আরাম করতে দোষ কি? কিন্তু সে লোভ সে সামলে নেয়। এর মধ্যে সে বড়ই বেমানান। চাকরবাকররাও জেনে গেছে যে সে এদের গুরুজন হ'লেও সে মূর্খ, সে এদের চেয়ে অনেক ছোট।

বিদায়ের দিনও জীপে তুলে দিয়ে পুত্রবধূ প্রশ্ন করল, 'তাড়াতাড়ি চলে আসছেন তো?'

'দেখি—।' বলে হাসল শুধু।

মালতী বলল, 'এখানে যদি খুব অসুবিধা মনে করেন, দেশেও তো এসে

থাকতে পারেন। নতুন বাড়িঘর করেছেন, পরের ভরসায় ফেলে রেখেই বা লাভ কি? দেশে থাকলে জীপ পাঠিয়ে আনিয়ে নিতে পারি মধ্যে মধ্যে, আমরাও যেতে পারি। কিছুদিন এখানে রইলেন—কিছুদিন ওখানে রইলেন—। কিন্তু চাকরি আর না।'

অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল শত্রুঘ্ন, হঠাৎ যেন প্রবল উৎসাহভরে মাথা নাড়ল, 'সে তো বটেই। আচ্ছা আসি তাহ'লে। সাবধানে থেকো তোমরা।'

জীপ ছেড়ে দিল। মালতী কী একটা বলতে গেল সেটা আর শোনা হ'ল না।

যত তাড়াতাড়িই সে চলে আসুক, মাসখানেকের আগে যে আসতে পারবে না তা এরা জানত। তাই চিঠিপত্র না পেলেও কোন উদ্বেগ বোধ করেনি, খবর নেবারও প্রয়োজন বোঝেনি। কখন যে মাসখানেক কেটে গেছে তাও বুঝতে পারেনি।

মাসখানেক পরেই খবর পাওয়া গেল অবশ্য। কিন্তু সেটা শত্রুঘ্ন মারফৎ নয়। দামোর মারফৎ। দামো এসে খবর দিলে।

একবস্ত্রে চলে এসেছে। স্টেশনে নেমে এক মিনিটও কোথাও দাঁড়ায়নি, মুখে জল দেয়নি। এতটা পথ প্রায় রুদ্ধ-শ্বাসে ছুটে এসেছে। এভাবে এসেছে তার কারণ তার মনে হয়েছে এ ব্যাপারে —পরোক্ষ হ'লেও—তার একটা বড় রকমের দায়িত্ব আছে।

খবর সংক্ষেপে একটিই—শত্রুঘ্নর বোধহয় মাথায় কিছু গোলমাল ঘটেছে। দামোর মেয়েটির জন্যে সে-ই উদ্যোগী হয়ে একটি ভাল সম্বন্ধ ঠিক করেছিল, গত সপ্তাহে অনেক খরচপত্র ক'রে বিয়ে দিয়েছে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে। তখন দামো বোঝেনি যে কোথা থেকে অত টাকা পেল শত্রুঘ্ন। কালই জেনেছে। চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল সে কদিন আগেই। আফিসের প্রাপ্য টাকা চুকিয়ে নিয়ে সেই টাকাই খরচ করেছে। সামান্য কিছু বাকী ছিল, ক'দিনের মাইনে না কি ওভারটাইম, সেইটে নিয়েছে কাল, তা থেকে পুরীর একখানা থার্ড ক্লাস টিকিট কেটে যা ছিল সব পাঠিয়ে দিয়েছে দামোর মেয়েকে—মনিঅর্ডার ক'রে। কাপড় জামা স্যুটকেস ওখানে যা ছিল—সামান্যই অবশ্য, একখানি কাপড় আর একটি গামছা রেখে সব বিলিয়ে দিয়েছে গরীব দুঃখী ভিখিরী ডেকে।

আফিসের খবরটা জানতে পেরেছে দামো দিন দুই আগে। তারপরই এই ঘটনা। সে চেপে ধরেছে শত্রুঘ্নকে। কী মতলব তার, কী করতে চায় সে। এতদিন ভেবেছে যে দেশে যাবে কিম্বা ছেলের কাছে—কিন্তু জামাটা পর্যন্ত বিলিয়ে দিল—তার মানে কি? সে কি আত্মহত্যা করতে চায়?

'না রে,—আত্মহত্যা করব কেন? ছিঃ। এবার দিনকতক বিশ্রাম করব।' হেসে জবাব দেয় শত্রুঘ্ন।

'তার জন্যে কি এমন ক'রে কেউ সব বিলিয়ে দেয়। এ তুমি আমাকে ঠকাচ্ছ।'

দামো দুহাত চেপে ধ'রে ওর, 'ঠিক ক'রে বলো দিকি কী মতলব তোমার!'

'না রে, সত্যিই ছুটি নিলুম এবার। কাজ থেকেও—সংসার থেকেও। একদম স্বাধীন জীবন এখন থেকে। আর কোন পরোয়া রইল না কারও। ভগবানকে তো ডাকিনি এতদিন, ডাকার সময় পাইনি।—এবার তাঁকে ডাকব। পুরীতে যাব, বাসা রাখব না কোথাও, যেখানে সেখানে পড়ে থাকব। যদি কোন মঠে কাজ পাই, বাসন মাজার কি ঝাড়ু দেবার তো তাই নেব। নইলে আনন্দবাজারে প্রসাদ মেগে খাব। প্রভুকে দর্শন করব তাঁর নাম করব—তোফা আনন্দে দিন কেটে যাবে। খুব আনন্দে থাকব রে, বিশ্বাস কর, খুব আনন্দ।'

আর কিছু বলেনি দামো। ছুটে চলে এসেছে এখানে। আজকেরই টিকিট কাটা আছে। আজকের এক্সপ্রেস ট্রেনে রওনা হবে শত্রুঘ্ন। এখন তো আর সেখানে আটকানোর সময় নেই। বিশু যদি পারে তো কাল এই ভোরে সাক্ষী-গোপালেই নামিয়ে নিক, নইলে যদি খুঁজে না পায় তো—যেন পুরী পর্যন্ত চলে যায় ঐ ট্রেনে, সেখান থেকে ধরে নিয়ে আসে।

চুপ করে বসে শুনেছিল বিশ্বনাথ। স্বপ্নাবিষ্টের মতো। মুখে কোন ভাবই ফোটেনি এর মধ্যে একবারও। দামোর কথা শেষ হ'তে শুধু বললে, 'তাই যাব। ভোরেই স্টেশনে চলে যাব।'

তারপর মালতীকে বলেছিল দামোর খাওয়াদাওয়া ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে, আর ওরই একখানা ধুতি বার ক'রে দিতে।

তারপর থেকে আর একটি কথাও বলেনি কারও সঙ্গে। আফিসেও যায়নি সেদিন। স্লিপ লিখে ছুটি নিয়েছিল।

শান্ত, স্তব্ধ হয়ে বসেছিল সে। প্রশান্ত ভাবলেশহীন মুখ। সে মুখ দেখে কিছুই বোঝবার উপায় ছিল না, মনে যদি কোন ঝড় উঠে থাকে, তার কোন লক্ষণ প্রকাশ পায়নি সেখানে।

এতখানি স্তব্ধতা ওর স্বভাব-বিরুদ্ধ, তাই মালতী প্রথমে একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু খাওয়ার সময়ে যথানিয়মে এসে খেতে বসাতে ততটা ভয় আর থাকেনি। সেও চুপ ক'রে ছিল, এ প্রসঙ্গে কোন কথা বলতে সাহস হয়নি তার। হয়তো মনের মধ্যে গোপন একটা বিবেকের দংশনও অনুভব করছিল —কে জানে!

চুপ ক'রেই রইল বিশু—বাকী সমস্ত দিন। রাত্রেও বহুক্ষণ পর্যন্ত। একভাবে একটা চেয়ারে বসে রইল সে। শেষে মালতী উদ্বিগ্ন হয়ে এসে অনুযোগ করতে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল।

কিন্তু ঘুম আসেনি বহুকাল। সেটা মালতীরও না জানবার কথা নয়। কারণ সেও জেগে ছিল। তার ঘুম হচ্ছে না নানা রকম এলোমেলো চিন্তার জন্য। সে জন্যে কোন ভাবনা নেই। বিশুর ঘুম আসা দরকার। নীরবে নিঃশব্দে কী প্রচণ্ড ঝড় বহন করছে সে বুকের মধ্যে, তা'—পূর্বইতিহাস সবটা জানা না থাকলেও—কিছু কিছু বুঝতে পারে বৈকি মালতী।

শেষে একসময় ভরসা ক'রে প্রশ্নটা করেই ফেলল, 'ঘুমের ওষুধ খাবে কিছু? দেব?'

খুব সহজভাবে উত্তর দিলে বিশু, 'না, কাল ভোরে উঠতে হবে।'

'ভোরে যে যাবে—জীপ বলে রেখেছ? মহান্তীবাবুকে না বললে কি গাড়ি আনবেন?'

'দরকার হবে না। সাইকেলে যাব।'

সংক্ষিপ্ত, কিন্তু সহজ উত্তর। স্বাভাবিকও।

'এতটা পথ সাইকেলে যাবে—কষ্ট হবে খুব।'

মৃদু অনুযোগ একটু করল মালতী, বেশী কিছু বলতে পারল না। আজ যেন সে বিশুর নাগাল পাচ্ছে না কিছুতেই, বড় দূর বড় পর মনে হচ্ছে নিজেকে।

আর একটি মাত্র প্রশ্ন করেছিল সে খানিক পরে, অনেকক্ষণের অনেক সংকোচ কাটিয়ে, 'ও'কে এখানেই আনবে তো?'

বিশুও একটি মাত্রই কথা কয়েছিল তার উত্তরে, 'না।'

আর কোন কথা হয়নি।

আর কোন কথা হ'লও না কোনদিন। কারণ বহুরাত্রি পর্যন্ত জেগে এপাশ ওপাশ করতে করতে শেষ রাত্রের দিকে মালতী ঘুমিয়ে পড়েছিল, বিশু যে কখন উঠে রওনা হয়ে গেছে, তা সে টের পায়নি।

সেকালের সাহিত্য ক্ষেত্রে

✲ ✲ হেমেন্দ্রকুমার রায় ✲ ✲

কয়েকটি ঘটনা, অন্ততঃ পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর আগেকার। সেকালের সাহিত্যিক ও সাহিত্য-সমাজের সঙ্গে একালের অনেক কিছুই মেলে না। বিশেষ ক'রে বেমিল দেখা যায় সেকালের ও একালের সাহিত্যিকদের মন নিয়ে তুলনা করলে—অবশ্য আজ আর আমি তা করব না। তবে এইটুকু কেবল বলতে পারি, নিম্নগতি অবলম্বন করেছে একালের সাহিত্যিক-মনোবৃত্তি। পরে এ বিষয় নিয়ে ভালো ক'রে আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল।

সেকালকার অধিকাংশ পত্রিকার কার্যালয়ে থাকতেন জোট বেঁধে কয়েকজন সাহিত্যিক। পত্রিকার প্রবীণ লেখক ছিলেন তাঁরাই। তাঁরা কেবল কলম চালাবার জন্যে জোট বাঁধতেন না, নিয়মিত বৈঠক বসিয়ে বিবিধ বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনাও করতেন। এই শ্রেণীর বৈঠকে যোগ দেবার আমি প্রথম সুযোগ পাই "অর্চনা" কার্যালয়েই। যতদূর মনে হয় তখন "অর্চনা"র দ্বিতীয় বর্ষ চলছে। সেটা স্বদেশীর যুগ বটে, কিন্তু বাংলাদেশে তখনও বোমার নাম ও শব্দ শোনা যায় নি।

"অর্চনা"র সম্পাদক ও সহযোগী-সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত ও স্বর্গত কৃষ্ণদাস চন্দ্র। প্রধান লেখক ছিলেন কেশবচন্দ্র, কবি ফণীন্দ্রনাথ রায়, অমরেন্দ্রনাথ রায়, ভূপেন্দ্রনাথ রায় ও দার্শনিক রামদয়াল মজুমদার প্রভৃতি। ওঁদের মধ্যে মরজগতে বিদ্যমান থেকে লেখনী-চালনা করছি কেবল কেশবচন্দ্রের সঙ্গে আমি। নিতান্ত তরুণ বয়সে মারা না গেলে ভূপেন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই আজ একজন প্রখ্যাত সমালোচক ও প্রবন্ধাকার ব'লে গণ্য হ'তে পারতেন।

অর্চনার বৈঠকে এসে উঠতেন-বসতেন কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল। তাঁর আলোচনায় প্রায়ই প্রকাশ পেত রবীন্দ্রনাথের কবিতার দোষের দিকটা। রবীন্দ্রনাথের লেখনী রাশি রাশি কবিতা প্রসব করছে বটে, কিন্তু তার অধিকাংশই মূল্যহীন—এইটেই তিনি আমাদের বোঝাতে চাইতেন নানাপ্রকারে। সঙ্গে সঙ্গে অক্ষয়কুমার এটুকুও জানিয়ে দিতে ভুলতেন না যে, তিনি মূল্যহীন কবিতা লেখেন না, কারণ, অনেক দিন ধ'রে ভেবে-চিন্তে তবে এক-একটি কবিতা রচনা করেন। কেউ যদি তাঁকে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে উচ্চতর স্তরের কবি বলত, তাহ'লে তাঁর মুখ বেশ প্রফুল্ল হয়ে উঠত। একজন শ্রেষ্ঠ কবির এই দুর্বলতা ও আত্মশ্লাঘা আমার ভালো লাগত না।

আমরা একটি সাহিত্য-সমিতি গঠন ক'রে তার নাম রেখেছিলুম "সাধনা সমিতি"। দীনেশচন্দ্র সেন ও সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ কয়েকজন প্রখ্যাত সাহিত্যিক ছিলেন তার পৃষ্ঠপোষক। সেখানকার প্রধান সভ্য ছিলুম আমরা এই কয়েকজন—সত্যানন্দ রায় (যাঁর নামে বালীগঞ্জ অঞ্চলে একটি রাস্তা আছে), অমরেন্দ্রনাথ রায়, ভূপেন্দ্রনাথ রায় এবং আরো কয়েকজন সাহিত্যরসিক। অর্চনা কার্যালয়েই সমিতির আসর বসত এবং সেখানে বক্তৃতা ক'রে গিয়েছেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও দীনেশচন্দ্র সেনের মত স্বনামধন্য ব্যক্তিরাও। ভূপেন্দ্রনাথ রায়, অমরেন্দ্রনাথ রায় ও আমি প্রবন্ধ পাঠ করতুম। পাঠের শেষে বয়োজ্যেষ্ঠ কেশবচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি মতামত প্রকাশ করতেন।

তারপরই "সাধনা-সমিতি"র অস্তিত্ব লোপ। বোমা ফাটল, ক্ষুদিরাম গ্রেপ্তার হ'লেন, প্রফুল্ল চাকী স্বহস্তে মৃত্যুবরণ ক'রে ব্রিটিশরাজকে ফাঁকি দিলেন এবং পুলিসও নানা সমিতির উপরে হানা দিতে লাগল।

দীনেশচন্দ্র সেন ও সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি ভীত ও ব্যস্তভাবে তাড়াতাড়ি এসে জানিয়ে দিয়ে গেলেন যে, সাধনা-সমিতির পৃষ্ঠপোষকদের দল থেকে তাঁদের নাম কেটে দিতে হবে।

কিসের সাধনা? দৈহিক শক্তির সাধনা? সে যুগে 'সাধনা' নামটাই অতিশয় সন্দেহজনক হ'য়ে উঠেছিল—সাহিত্য-সমিতিও আর চলল না।

তারপর স্বর্ণকুমারী দেবী সম্পাদিত "ভারতী" পত্রিকায় কয়েকটি রচনা প্রকাশ ক'রে আমার নাম যখন কিঞ্চিৎ পরিচিত হয়েছে, সেই সময়ে কবিবর যতীন্দ্রমোহন বাগচী আমাকে পাকড়াও ক'রে নিয়ে গিয়ে "মানসী" পত্রিকার দলে ভর্তি ক'রে দিলেন, মাসিক চাঁদা দিতে হবে তিন টাকা ক'রে। সেটা "মানসী"র দ্বিতীয় বৎসর। সেখানকার বৈঠকে কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তও প্রায় প্রতিদিন হাজিরা দিতেন। সেই প্রথম তাঁর সঙ্গে আলাপ।

কিছুকাল পরে দ্বিজেন্দ্রলাল যখন কাব্যে দুর্নীতির ধুয়ো তুলে রবীন্দ্রনাথের উপরে বারবার হামলা দিতে লাগলেন, সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথের পক্ষ নিয়ে একমাত্র "মানসী"ই ক'রেছিল দ্বিজেন্দ্রলালকে প্রতি-আক্রমণ। সত্যেন্দ্রনাথের সাহায্য গ্রহণ ক'রে যতীন্দ্রমোহন বাগচী বৃহৎ প্রবন্ধ লিখে যে তীব্র ভাষায় দ্বিজেন্দ্রলালকে আক্রমণ করেছিলেন, তিনি জীবনে আর কখনো তেমনভাবে আক্রান্ত ও ধিক্কৃত হন নি। এই আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ তখনকার সাহিত্য-জগৎকে রীতিমত স্তম্ভিত ক'রে দিয়েছিল।

সাহিত্য-জগৎ থেকে ব্যাপারটা চরমে উঠল নাট্য-জগতে গিয়ে।

রবীন্দ্রনাথকে কুৎসিত ও ভীষণভাবে ব্যঙ্গ ক'রে দ্বিজেন্দ্রলাল "আনন্দ-বিদায়" নামে এক প্রহসন রচনা করলেন কোন অশুভ দিবসে। তার অভিনয় বিজ্ঞাপিত হ'ল ষ্টার থিয়েটারে। প্রথম অভিনয়-রাত্রেই ব্যাপার যা হ'ল তা আর কহতব্য নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের জনপ্রিয়তাও কোন কাজে লাগল না, রবীন্দ্রনাথের অপমানে সমস্ত দর্শক ক্ষেপে গিয়ে এমন মারমুখো হয়ে উঠল যে, রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষ আত্মরক্ষা করবার জন্যে তাড়াতাড়ি যবনিকা ফেলে দিলেন এবং দ্বিজেন্দ্রলালও চুপিচুপি 'বক্স' থেকে নেমে রঙ্গালয়ের খিড়কীর দরজা দিয়ে প্রস্থান করলেন।

সেইখানেই থেমে গেল সব ঝড়। তারপর দ্বিজেন্দ্রলাল আর কখনো রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বাচনিক বোমা ফাটাবার চেষ্টা করেন নি।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোনদিনই জড়িয়ে পড়েন নি এই যুদ্ধমান দুই দলের অশোভন যুদ্ধরঙ্গের সঙ্গে। ব্যারিষ্টার এ চৌধুরীর ভবনে দ্বিজেন্দ্রলাল একদিন সকলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় নিযুক্ত এমন সময়ে দৈবগতিকে রবীন্দ্রনাথ ঠিক সেই সময়েই সেখানে সামাজিকতা রক্ষা করতে এলেন। বাড়ীর লোকেরা সকলেই উৎকণ্ঠ—কারণ দ্বিজেন্দ্রলালের 'যুদ্ধং দেহি' রব তখন সাহিত্য-সমাজের সর্বত্র গিয়ে পৌঁচেছিল—সবাই ভাবলে এখনি বুঝি কোন অপ্রিয় দৃশ্যের অবতারণা হ'বে।

কিন্তু কিছুই হ'ল না। রবীন্দ্রনাথ সহজভাবেই সহাস্যে দ্বিজেন্দ্রলালের

সম্বোধন ক'রে মিষ্ট ভাষায় বাক্যালাপ করতে লাগলেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের কেন এই রবীন্দ্র-বিরোধী মনোভাব? হিংসা এবং ক্রোধ। হিংসার কারণ বোঝা কঠিন নয়। এবং ক্রোধের কারণ হচ্ছে, দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতা প'ড়ে রবীন্দ্রনাথ বারবার পত্রিকার উচ্ছ্বসিত প্রশংসাপূর্ণ সুদীর্ঘ সমালোচনা ক'রেছিলেন, কিন্তু তাঁর থিয়েটারি নাটকগুলি পাঠ ক'রে অবলম্বন করেছিলেন মৌনব্রত। প্রবাদ বলে, বোবার শত্রু নেই। কিন্তু এক্ষেত্রে সে প্রবাদ ব্যর্থ হয়েছে।

"মানসী"র বৈঠকের পরেই আমি ঠিক নিজের মনের মত একটি আসর খুঁজে পেলুম। সেখানে যে কয়েকজন তরুণ টাকা-আনা-পয়সার হিসাব ভুলে নিত্য আনাগোনা করতেন তাঁদের চক্ষে ছিল কবিত্বের স্বপ্নকাজল এবং মনে ছিল অরূপের রূপকল্পনা। সাহিত্যের মৌতাতে একেবারে মশগুল হয়ে দুনিয়ার আর কিছুই নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামাতেন না।

ছোট্ট আসর। সেখানে এসে নিত্য যাঁরা দেখা দিতেন তাঁদের নামের ফর্দ দীর্ঘ নয়; যথা—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীঅমল হোম, শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার, শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী, শ্রীচারুচন্দ্র রায় ও শ্রীনরেশচন্দ্র দত্ত। তাঁদের অধিকাংশই তখন ছাত্রজীবন যাপন করছেন।

নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত "জাহ্নবী" নামে একখানি ছোট পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন, প্রথম দিকে আমিও তার সঙ্গে যুক্ত ছিলুম ঘনিষ্ঠভাবেই। তারপর কিছুকাল চ'লে পত্রিকাখানির অস্তিত্ব লুপ্ত হয়।

কয়েক বৎসর পরে আবার নবপর্যায়ে "জাহ্নবী" প্রকাশিত হ'ল এবং যাঁর নাম সম্পাদক ব'লে ছাপানো হ'ল, আসলে তিনি ছিলেন কার্যাধ্যক্ষ, কারণ বিষয়বস্তু নির্বাচন ও সম্পাদনার ভার গ্রহণ ক'রেছিলেন পূর্বোক্ত তরুণের দলই। আমিও মনে-প্রাণে তাঁদের সঙ্গে মিলে-মিশে গিয়ে নিয়মিত লেখক হয়ে পড়লুম। সাহিত্য-সেবা করতে করতে আমি যে সেই বন্ধুত্ববন্ধনে আবদ্ধ হলুম, প্রায় চার যুগ পরে আজও তা আলগা হয়নি।

সময়টা আমার ঠিক স্মরণে আসছে না, তবে এইটুকু বলতে পারি লোকসাধারণ তখনো শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচিত হয় নি।

সেই দলের মাত্র একজন (নরেশচন্দ্র) সাংবাদিকরূপে আশাপ্রদ জীবন আরম্ভ ক'রেও এ পথ থেকে স'রে দাঁড়িয়েছেন, কিন্তু বাকি সকলেই রীতিমত খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন—যেমন প্রভাতচন্দ্র অধুনালুপ্ত দৈনিক "ভারতে"র সম্পাদকরূপে, অমলচন্দ্র "মিউনিসিপাল গেজেট" ও সরকারের প্রচার-সচিব ও অন্যান্য বিভাগের কর্মকর্তারূপে, সুধীরচন্দ্র "মৌচাক" সম্পাদক ও বাংলা দেশের একজন প্রবীণ পুস্তক-প্রকাশকরূপে, প্রেমাঙ্কুর গ্রন্থকার ও চিত্রপরিচালকরূপে এবং চারুচন্দ্র চিত্রশিল্পী ও চিত্রপরিচালকরূপে সকলের কাছেই সুপরিচিত। নশ্বর মানবজীবন নাকি পদ্মপত্রে জলের মত চঞ্চল, কিন্তু আমরা যে এখনো পদ্মপত্রের উপর থেকে টুপ্ টুপ্ ক'রে ঝ'রে পড়িনি, এই সত্যটা আমার কাছে আজ বিস্ময়কর ব'লে মনে হয়।

তারপর আমাদের এই ছোট দলটি কেমন ক'রে ক্রমেই বৃহত্তর হয়ে "যমুনা" ও "মর্মবাণী"র দলের সঙ্গে মিলে অবশেষে সা হি ত্য-ক্ষে ত্রে প্রসিদ্ধ "ভারতী"র সুবৃহৎ ও সুবিখ্যাত দলে পরিণত হ'ল, সে কাহিনী অন্যত্র বর্ণনা করেছি। তারা পরিণত হয় দ্রুমে।

"ভারতী"র বৈঠকের অনেক কাহিনী আছে, এখানে তারই ভিতর থেকে একটি কৌতুকবহ কাহিনী বেছে নিয়ে আপনাদের শোনাব। কাহিনীটি এক সুপরিচিত কবির কাহিনী। বহু পত্রিকায় তাঁর বহু কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি এখন স্বর্গত হ'লেও তাঁর নাম আমরা করব না, কবি বলেই ডাকব। আর একটি কথাও ব'লে রাখা ভালো। কবি ছিলেন অত্যন্ত প্রেমী—প্রতিদিন নব নব প্রেম-সরোবরের জলে অবগাহন করতেও তাঁর আপত্তি ছিল না এবং সারা জীবনে তিনি কেবল প্রেমের কবিতাই রচনা ক'রে কাটিয়ে গিয়েছেন। এই কথা নিয়ে তিনি প্রায়ই গর্ব প্রকাশ করতেন। আর সব দিক দিয়ে মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন ভালো লোক, তাই আমরা সকলেই তাঁকে ভালোবাসতুম এবং তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য।

কবিবর সত্যেন্দ্রনাথকে বাইরের লোক মনে করত সুগম্ভীর ব্যক্তি, কিন্তু "ভারতী"র মজলিসে যাঁরা তাঁকে পেয়েছেন তাঁরা জানতেন তিনি একজন কৌতুকপ্রিয় মানুষ। এই কাহিনীতেই তাঁর কৌতুকমূর্তির একটা দিক প্রস্ফুট হবে।

সেবার বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের আসর বসেছে নৈহাটিতে এবং সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন স্বর্গত সাহিত্যাচার্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়। সম্মেলনে পঠিত একটি সুদীর্ঘ কবিতার কথা আজও ভুলতে পারিনি—অপূর্ব কবিতা, মহান কবিতা। রচক অক্ষয়কুমার বড়াল—কবিতাটি পরে "সাহিত্য" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। নাম বোধ হয় "মানব"।

আমরা সদলবলে সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলুম—বলা বাহুল্য, সঙ্গে ছিলেন প্রেমিক কবিও। অল্পক্ষণ সভায় উপস্থিত থেকে আমরা বাইরে এসে দাঁড়ালুম। এ-সব সভার ভিতরকার প্রতিবেশ কোনকালেই বেশীক্ষণ আমরা সহ্য করতে পারতুম না—মনে হত সবই যেন কৃত্রিম, কেবল লোক দেখাবার জন্যে সাজিয়ে-গুছিয়ে খাড়া করা হয়েছে, প্রায় রঙ্গমঞ্চের মত বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। বর্ধমান সাহিত্য সম্মেলন, মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মেলন—সে সব স্থানেও ঐ একই ব্যাপার। কোথাও একদিনের বেশী টিকতে পারি নি।

নৈহাটিতে তো পুরো একদিনও ছিলুম না। বেরিয়ে এসে দেখি, আমাদের সঙ্গে কবি নেই। তাঁর খোঁজে মণ্ডপের ভিতরে উঁকি মেরে দেখা গেল, কবি দিব্য খুশী মুখে মহিলাদের জন্যে নির্দিষ্ট আসন ঘেঁসে আসরে আসীন। সভা তাঁর খুব ভালো লেগেছে ব'লেই মনে হ'ল। কাজেই ডাকাডাকি ক'রে তাঁকে আর উত্ত্যক্ত করা হ'ল না।

সভার বাইরে এসে প্রথম কোথায় যাওয়া হ'ল, স্মরণে আসছে না—বোধ করি সাহিত্যাচার্য বঙ্কিমচন্দ্রের ভবনে। গঙ্গার ধারে বেশ খানিকক্ষণ পায়চারি ক'রে শহরের কোন কোন অলি-গলিও ঘুরে আসা গেল।

একটা খুব ছোট কানাগলির ভিতরে দাঁড়িয়ে সত্যেন্দ্রনাথ বললেন, "মণিলাল, তোমার কাছে সাদা কাগজ আছে?"

মণিলাল ("ভারতী" সম্পাদক) বললেন, "আছে। কি হবে?"

সত্যেন্দ্রনাথ মৃদুহাস্যরঞ্জিত মুখে বললেন, "দাও তো, প্রেমপত্র লিখতে হবে।"

আমরা সকলেই কৌতূহলী হয়ে দেখলুম, একটা বাড়ীর সামনের রোয়াকের উপরে ব'সে সত্যেন্দ্রনাথ বাম হস্তে কলম ধ'রে এই মর্মে লিখলেন :

"আমার প্রিয়তম কবি,

তোমার কবিতা পাঠ ক'রে তোমাকে স্বচক্ষে দেখবার ও তোমার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে হৃদয় আমার ব্যাকুল হয়ে উঠেছে—তোমাকে না দেখে আমি আর থাকতে পারছি না। উপরে ঠিকানা দিলুম, দয়া ক'রে সন্ধ্যাকালে একটিবার দেখা দিও। আমার মাথার দিব্য রইল। ইতি

তোমা-গত-প্রাণ
একজন অভাগিনী নারী"

তারপর, যে বাড়ীর রোয়াকের উপরে তিনি বসেছিলেন সেই বাড়ীর নম্বর ও গলির নাম লিখে কাগজখানা ভাঁজ করে তার উপরে কবির নাম লিখে সত্যেন্দ্রনাথ বললেন, "চল, আবার সম্মেলনের মণ্ডপের কাছে যাওয়া যাক। পত্রখানা দিয়ে আসবার জন্যে একটি দূত খুঁজতে হবে তো?"

দূত অবিলম্বে পাওয়া গেল। এক চৌদ্দ-পনেরো বছরের নগ্নপদ ছোকরা। সত্যেন্দ্রনাথ মণ্ডপের ভিতরে কবির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে তাকে শুধোলেন, "এই কাগজখানা যদি ঐ বাবুর হাতে দিয়ে আসতে পারো, তাহলে চার আনা পয়সা বখশিশ পাবে।"

সে রাজী।

—"কিন্তু বাবুর হাতে কাগজখানা দিয়েই চ'লে আসবে। খবরদার, আমাদের কথা বলবে না।"

দেখলুম, যথাসময়ে দূতের হাত থেকে কাগজখানা নিয়ে কবি পাঠ করলেন, তারপর এদিকে ওদিকে তাকিয়ে চঞ্চলভাবে গাত্রোত্থান ক'রে বাইরে আমাদের কাছে এসে দাঁড়ালেন।

জিজ্ঞাসা করা হ'ল, 'আসছে ট্রেনেই আমরা কলকাতায় ফিরব, তুমিও তো আমাদের সঙ্গেই যাবে?"

কবি ঘাড় নেড়ে বললেন, "না ভাই, নৈহাটিতে সন্ধ্যার সময়ে আমার একটু জরুরি কাজ আছে। আমি পরে যাব।"

আমরা আর সবাই কলকাতায় ফিরে এলুম।

সেই দিনেরই কথা। কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে অক্সফোর্ড মিশনের পাশে আমাদের একটি মজলিশে বহু সাহিত্যিক এসে জুটতেন, গালগল্প করতেন। সেইখানে প্রেমাঙ্কুর ও আমি এবং আরো কেউ কেউ ব'সে রাত্রিবেলায় আলাপ করছিলুম—হঠাৎ কবি এসে উপস্থিত। তখন বোধ করি রাত এগারোটা বাজতে মিনিটকয় দেরি।

কবির মুখ জলভরা মেঘের মত গুরুগম্ভীর।

তিনি কি নৈহাটির অপরিচিত গলির ভিতরে কোন বাড়ীর সামনে সন্ধ্যার পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রেও তাঁর দর্শন-পিয়াসী কোন সুন্দরীর দেখা * না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছেন? না তাঁকে সন্দেহজনক কোন লোক ভেবে সে-পাড়ার বাসিন্দারা কিছু অশিষ্ট আর অমিষ্ট ব্যবহার ক'রে তাঁর প্রেম-দরদী প্রাণে দারুণ ব্যথা দিয়েছে?

সে সব কিছুই কবি ভাঙলেন না। শ্রান্তভাবে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "ট্রেন ফেল্ করেছিলুম।"

ছোট বোন রঞ্জনার মেয়ের অন্নপ্রাশন। বিমলার নিমন্ত্রণ। নামকরা ব্যারিস্টারের বৌ রঞ্জনা, নিজে এসে নিমন্ত্রণ করে গেছে তার দিদিকে। এ বুঝি বিমলার আশাতীত। বলে গেছে, "দিদি, তোমার যাওয়া চাই-ই কিন্তু।"

"যাব"—কথা দিতে হলো বিমলাকে। হাসতে হাসতে গাড়ীতে উঠে গেল রঞ্জনা। ওর হাতের দামী ভ্যানিটি ব্যাগের জৌলসের দিকে তখনও চেয়েছিল পর্ণা। বিমলার বড় মেয়ে।

কিন্তু অন্তহীন ভাবনায় পড়ল বিমলা। সেই ছোট্ট রঞ্জনা আজ কত বড় হয়েছে, যাকে নিজে হাতে মানুষ করেছে বিমলা। সেই দু' মাসের রঞ্জনাকে রেখে মা যখন মারা গেলেন, তখন রাতের পর রাত জেগে ওকে নিয়ে বসে থেকেছে, দিনের পর দিন বোনকে নিয়ে কেটেছে, খাওয়ার সময় হয়নি। নিজের লেখাপড়া পর্যন্ত ছাড়তে হয়েছিল ঐ ছোট বোনটির জন্য। তারপর একদিন বিয়ে হয়ে শ্বশুরবাড়ী এলো বিমলা, দিদিকে ছেড়ে কত কেঁদেছিল রঞ্জনা। সে কান্নার রেশ আজও কানে বাজে তার। আর মনে হয় শ্বশুরবাড়ী এসে ঐ ছোট বোনটির জন্য লুকিয়ে কত কেঁদেছে বিমলা, স্বামী

সান্ত্বনার বাণী শোনাতেন, মাঝে মাঝে নিয়েও আসতেন রঞ্জনাকে।

তার পর বড় হলো রঞ্জনা, বাবা ওকে লেখাপড়া শেখালেন। ও বি-এ পাশ করেই জানালো সদ্য ব্যারিস্টার হয়ে আসা নির্মল বোসকে বিয়ে করবে।

কিছুতেই রাজী হোলেন না বাবা। মনোমত পাত্র আগেই স্থির করে রেখেছেন তিনি। তাঁর মত ছিল বিয়ে করার চেয়ে বিয়ে দেওয়াটাই সুখের হয় বেশী। বাবা আর রঞ্জনার মতদ্বৈতের মধ্যে এগিয়ে গেল বিমলা, বাবাকে বুঝিয়ে বললে, "মনে প্রাণে যা চাওয়া যায় সেটা পেলেই মানুষ সুখী হয় সবচেয়ে বেশী।"

"বেশ," রাজী হোলেন বাবা, সেই চার বছর আগে হাসতে হাসতে রঞ্জনা চলে গেল স্বামীর ঘরে। সত্যিই তো কত সুখী হয়েছে রঞ্জনা। প্রথম মেয়েটির মুখে ভাত দেবে সমারোহ করে। বাবা আর নেই। তার এ সৌভাগ্য দেখে সুখী হবে তার দিদি ছাড়া আর কে?

বিকেল পাঁচটায় অফিস থেকে ফিরলেন বিমলার স্বামী। সামান্য মাইনের কেরানী। ছেলেমেয়ে চারটি নিয়ে কোন রকমে দিন কাটে। চিন্তা আর অভাবে হাসতে ভুলে গেছে বিমলা।

তবুও আজ খুশীর জোয়ার এসেছে ওর মনে। হাসি জড়ানো মুখে এসে জানালো, রঞ্জনা আসবার বিশদ বিবরণ। ভাষাশূন্য চোখে চেয়ে রইলেন বিমলার স্বামী। সে চাহনির অর্থ ভাল করেই জানে বিমলা। বললে, "ভাবছ কেন? সে ব্যবস্থা আমি করেছি," বলেই একটা ক্ষয়ে যাওয়া বড় আংটি স্বামীর হাতে দিয়ে বললো, "ভাল দেখে একটা আংটি গড়িয়ে দিতে বলো স্যাকরাকে। একটা সাদা পাথর যেন বসিয়ে দেয়। রঞ্জনা যেন মনে না করে তার মেয়েকে দিদি খারাপ জিনিস দিয়েছে।"

"শেষ সম্বল"—কথাটা বলেই বুঝি হাসলেন একটু বিমলার স্বামী। বিমলার স্নেহঝরান হাসির স্রোতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল সেটুকু। দুদিন পরে নির্দিষ্ট দিনে ছেলেমেয়েদের সংগে নিয়ে রঞ্জনার বাড়ী যাওয়ার জন্য তৈরী হলো বিমলা। বহুদিনের তুলে রাখা পাট-ভাংগা শাড়ীখানা পরে জীবনের প্রথম পাশের ভাড়াটের গলার হারটা চেয়ে নিয়ে গলায় পরলে। অবশ্য তার স্বামীর তরফ থেকে বাধা এলো, তিনি বললেন,

"পরের গলার হার কিন্তু অহরহ তোমায় সাপ হয়ে দংশন করতে চাইবে।"

স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে ও চোখ নামিয়ে নিয়ে বিমলা বলেছিল,

"রঞ্জনার মাথাটা নিচু হয় আমার জন্য এ আমি চাই না, তাই তোমার অবাধ্য হতে হলো।" বাবার চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল ষোল বছরের মেয়ে পর্ণা।

সামনের পথে অগুনতি গাড়ীর সারির মধ্যের সামান্য পথটুকুতে গিয়ে দাঁড়াল বিমলা আর তার ছেলেমেয়েরা।

একটু দূরে দেখতে পেলে অতিথি-দের স্বাগত জানাচ্ছে নির্মল। "তোদের মেশোমশাই।" প্রশান্ত-মুখে প্রসন্ন-মনে এগিয়ে গেল বিমলা। কিন্তু ও কি: ওদের দিকে একবার চেয়ে কিছু না বলেই সদ্য গাড়ী থেকে নেমে আসা এক মহিলাকে স্বাগত জানাতে এগিয়ে গেল নির্মল। হঠাৎ মনে হলো কে বুঝি এক দোয়াত কালি ঢেলে দিলো বিমলার মুখে। কোন রকমে নিজেকে আয়ত্তে নিয়ে অসহায় ছেলেমেয়েদের বললে,

"ওরে তোরা এগিয়ে আয়, কাজের বাড়ীতে সবাই ব্যস্ত।" আর একটু এগিয়ে সামনে দেখা রঞ্জনার সংগে—ভিতর বাড়ীতে অভ্যর্থনা করছে সে, ওদের দেখে উচ্ছ্বসিত হওয়ার বদলে কেমন যেন ম্রিয়মাণ হয়ে বললে, "দোতলায় যাও।"

বিমলার কিছু বলতে যাওয়ার মুহূর্তে অন্যের সঙ্গে কথা বলায় ব্যস্ত হলো রঞ্জনা। "চল্" ছেলেমেয়েদের দিকে চাইতেই বুঝি লজ্জা হলো বিমলার। কেমন আনমনে চাইতে চাইতে দোতলায় উঠে গেল বিমলা। পিছনে ছেলেমেয়েরা। কার্পেট বিছানো বড় ঘরখানায় ঐশ্বর্যের প্রমাণ নিয়ে বসে' আছেন অসংখ্য অভ্যাগতা, তাঁদের মাঝখানে রুপোর এক ট্রে পান—ইচ্ছেমত মুখে ভরছেন, দামী জর্দার গন্ধে ঘর মুখর, তার সঙ্গে আছে উচ্ছ্বসিত হাসি। এত হাসি আজও জগতে আছে একথা নূতন করে স্মরণে আনল বিমলা। এদের মাঝে সামান্য সময় যেন সমাহিত হয়ে ছিল সে।

হঠাৎ সতেজ সহজ হয়ে উঠলো বিমলা। এবার এগিয়ে গেল সেখানে। সেখানে আয়ার কোলে বসে আছে পম্পা। বুকের ভিতর রাখা রুমালে বাঁধা আংটিটা খুলে পরম তৃপ্তি নিয়ে পম্পার আঙ্গুলে পরিয়ে দেওয়ার মুহূর্তে হাঁ হাঁ করে এসে দাঁড়াল রঞ্জনার ননদ, "না-না ওর হাতে ও আংটি পরাবেন না—বৌদি বলছে হীরের আংটিটাই ওর হাতে থাকবে।"

হাতখানা সেইখানে স্থির হয়ে গেল। বিমলা পম্পার আঙ্গুল তখনও ছাড়তে পারেনি। পিছন ফিরে চোখ পড়লো পর্দার দিকে। দেখলো শুধু সেই নয়, ঘরসমেত প্রতিটি নারীর কৌতূহলী চোখ তার উপর। কৌটো সমেত আংটিটা আবার সে রুমালে বেঁধে কোন রকমে রেখে দিল বুকের মধ্যে।

ঠিক সেই মুহূর্তে খাওয়ার টেবিলে ডাক এলো। রঞ্জনা নিজে অভ্যাগতদের ডাকতে এলো। দুই অপরিচিতার মাঝে নিজে দাঁড়িয়ে পরিচয় করালো একে একে। "এই আমার সেজ ননদ আর এই আমার স্বামীর সিনিয়র ডি, গুপ্তর স্ত্রী মিসেস্ গুপ্তা, ইনি আমাদের ক্লাবের সদস্যা। ইনি রিটায়ার জাস্টিস্ বি. এন, চ্যাটার্জির মেয়ে ললিতা, আমার বন্ধু। এই যে সুধাদি অর্থাৎ ডাঃ এম, এন, মল্লিক ওর স্বামী, ইনি নিভাদি, এবারে এম-এল-এ হয়েছেন, আমার বন্ধুর দিদি, আমারও।" রঞ্জনার সঙ্গে হেসে উঠলেন ঘরের সবাই, এমনি করে কত বড় বড় পরিবারের সঙ্গে রঞ্জনার পরিচয় তারই খানিকটা প্রকাশ করে নিলে সে। বোনের গর্বে গর্বিতা হওয়ার আগে কেমন যেন বোকা বনে গেছে বিমলা, বার বার তার মনে হোল কোথায় এসেছে, কেন এসেছে সে। অভ্যাগতাদের নিয়ে চলে যাওয়ার অবকাশে মাত্র একঝলক বিমলার দিকে

চেয়ে গেল রঞ্জনা। রঞ্জনা কি জানে না যে দূরে যাওয়ার ব্যস্ততা তারই সবচেয়ে বেশী। সংগে পুরুষমানুষ নেই। এসেছে সে টালা থেকে বালিগঞ্জে। ছোট ছেলেটি খিদেয় অস্থির। সবকিছু মিলিয়ে কেমন যেন দিশেহারা হয়ে পড়লো বিমলা। বোবা একটা অপমান তাকে জড়িয়ে ধরলো। অথর্ব অসাড় করে দিল তার দেহটা। এক পা উঠে দাঁড়াবার শক্তি হারিয়ে ফেললো সে। তখনি ভেবে নিল পরের বারে ডাকবে নিশ্চয়ই। প্রায় জনশূন্য ঘরে সন্তান কটিকে নিয়ে বসে রইলো বিমলা। পম্পাকে নিয়ে তখন বাইরে গেছে আয়া। নিচের ক'জন সম্ভ্রান্ত মানুষ দোতলায় উঠতে পারছেন না, তাঁদের হার্ট দুর্বল। তাঁদের দামী উপহারগুলো বয়ে নিয়ে আসতে যেতে তো হবেই। কিন্তু হঠাৎ কি হলো ওদিকে।

সারা বাড়ীখানা যেন হৈ হৈ শব্দে মুখর। পম্পার হাতের হীরের আংটি হারিয়ে গেছে। কে নিল, কি হলো চারিদিকে চাপা গুঞ্জন! নিয়ে এখনও পালাতে পারেনি। বিস্মিত চোখে চাইছে বিমলা; তার মেয়েটির চোখে ভরার্ত অনুতাপ—ওদের দিকে চেয়ে যেন কথা বলছে সবাই; না-না এ ওদের মনের ভুল, কেউ স্বপ্নেও কি ও কথা ভাবতে পারে, হাজার হোক নিজের বোন ত, মনের অলক্ষ্যে নিজের জামা-কাপড়ের দিকে চেয়ে নিলে বিমলা। হঠাৎ ঝড়ের মত ঘরে এলো রঞ্জনা, ইসারায় দিদিকে পাশের ঘরে ডেকে আবার তেমনি ভাবে চলে গেল। ততক্ষণে আবার একঘর মানুষ পূর্ণ হয়ে গেছে বিমলার আসে-পাশে। তার মধ্যে দিয়ে সে একবার পর্ণার অপমানের গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে থাকা মুখের দিকে চেয়ে নিল। উঠতে তাকে হলোই।

পায়ে পায়ে বিমলা এসে দাঁড়াল পাশের ঘরের দরজায়। বাইরে থেকে শুনলো নির্মলের রূক্ষ স্বর "তখনই বলেছিলাম ও-সব আত্মীয়কে নিমন্ত্রণ করতে যেও না, যাদের পরিচয় দিতে লজ্জা হয় তাদের ডাকা কেন?" রঞ্জনার চাপা স্বর কাঁটার মত বিঁধল বিমলার বুকে, "জানতুম কি অভাবে দিদির স্বভাবটাও হারিয়ে গেছে। তাছাড়া ভেবেছিলুম নিমন্ত্রণ করলেও অত দূর থেকে কেউ আসবে না। এখন দেখছি গুষ্টিসুদ্ধ এসে হাজির হয়েছে।" পা-দুটো বিমলার দরজায় আটকে গেল। গলাটাও শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে গেল। প্রতিবাদ করবার ভাষা হারালো জিভ। তবুও পর্দা সরিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো রঞ্জনার ঘরে। পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা ছোট মেয়ের পাংশু মুখ এখন ওর চিন্তার বাইরে। বিমলার উপস্থিতি লক্ষ্য করেই বেরিয়ে গেল নির্মল। বিনা ভূমিকাতেই বিমলার দিকে চেয়ে রঞ্জনা বললে—"তুমি এত ছোট হয়ে গেছ দিদি, যে স্বচ্ছন্দ পম্পার হাতের হীরের আংটিটা খুলে নিলে?"

"রঞ্জনা"—আর্তনাদ করে উঠলো বিমলা,—"এ কথা বলতে তোর মুখে আটকালো না এতটুকু? বাড়ীর এই অসংখ্য মানুষের মধ্যে চোর হিসাবে শুধু আমিই পড়লাম, কে আমাকে চুরি করতে দেখেছে বলতে পারিস?"

"হ্যাঁ—অনেকে, অনেকে দেখেছে"—তবুও জুলুম করে রঞ্জনা,—"তুমি বুকের ভিতর থেকে একটা রুমাল নিয়ে তাতে বেঁধে রেখেছ পম্পার আংটি। জীবনের প্রথম দিন যা দিয়ে আমি তাকে আশীর্বাদ করেছিলাম, এখনও বলছি তাকে তুমি ফিরিয়ে দাও দিদি।"

উঃ অস্ফুট এক চাপা আর্তনাদ বেরিয়ে এলো বিমলার বুক ভেঙে। সে কোন কথা না বলেই বার করলে বুকের ভিতরের সেই রুমালটা। চারিদিকে যে অসংখ্য কৌতূহলী চোখ তখন বিমলা-রঞ্জনার দিকে চেয়ে আছে সে খেয়ালও ওদের কারও নেই। এবার বিমলা রুমালের কোণ থেকে হাতে রাখলে একটা ছোট আংটি, যা পম্পার হাতে একবার পরাতে যেয়ে হতাশ হয়েছিলো।

"ভেবেছিলাম যাওয়ার বেলা ওর কচি আঙুলে পরিয়ে দিয়ে যাব নিজ হাতে।" হাতে রাখা সেই আংটিটার উপর বিমলার অপমান, দুঃখ, বেদনা মেশানো কয়েক ফোঁটা জল কোন বাধা না মেনে নেমে এলো। ভাষা নেই রঞ্জনার মুখে। হঠাৎ সেইখানে ছুটে এলো পম্পার আয়া।

"এই যে বৌদি, এই তো খুকুমণির সেই আংটি। ফুলদানির পাশে কার্পেটের উপর পড়ে ছিলো।" বিমলার পাশে রঞ্জনার হাতে ঝিকমিকিয়ে উঠলো সেই আংটি। ঠক-ঠক করে কাঁপতে থাকা বিমলার হাত-থেকে সেই আংটিটা টপ করে পড়ে গড়িয়ে গেল। মিলিয়ে গেল ঘরের উৎসুক মানুষের মাঝে। রক্তশূন্য মুখে দাঁড়িয়ে রইল রঞ্জনা, পাশ থেকে কয়েকজনের কানাকানি—"মিসেস্ রায়ের দিদি বুঝি, নিজের বোন নয় নিশ্চয়ই। ভদ্রমহিলা কি অপমানিতই না হলেন শেষ পর্যন্ত!"

বিমলা-রঞ্জনার চারিটি চোখের দৃষ্টি ততক্ষণে স্থির হয়ে গেছে এক জায়গায়। হয়তো অতীতকে স্মরণ করবার সুযোগ পেয়েছে দুজনে। বিমলার অবশ দেহটা এক্ষুণি বুঝি পড়ে যাবে। এমনি মুহূর্তে পর্ণা ডাকলো "চলে এসো মা।" "কোথায়?" "বাড়ী।" "হ্যাঁ চল।" ছেলেমেয়েদের সংগে বাইরে এলো বিমলা।

রঞ্জনার হাতের উপর তখন হীরের আংটিটা একটা জ্বলন্ত আগুনের গোলা হয়ে উঠছে। এখনি বুঝি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে ওর সারা দেহটা।

দ্বিচারিণী

সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়

"—গুণের মধ্যে ত শুধু ছবি তোলা আর বড় বড় বোলচাল ছাড়া! তবু বুঝতুম যদি ছবি আঁকতে পারতেন—ফটোগ্রাফার আবার শিল্পী—আরশুলো আবার....."

স্বামীর প্রকাণ্ড অয়েলপেন্টিং-এর সামনে দাঁড়িয়ে ধুপদানীতে ধূপগুলো জ্বালিয়ে দিতে দিতে এই কথাগুলো অস্ফুটে বললে সুপর্ণা—ওরফে মিসেস চৌধুরী।

সকাল থেকে শোকোৎসব সুরু হয়েছে। সকালবেলা ঘরের মেঝেতে আলপনা দিয়ে গেছে মেয়েরা—নানা প্রতিষ্ঠান থেকে পাঠান রজনীগন্ধা আর পদ্মের প্রায় স্তূপ হয়ে উঠেছে। অফিসরদের মেস থেকে পাঠিয়ে দিয়েছে সাদা ফুলের জড়োয়ায় জড়ানো সবুজ পাতার রিং। ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট সমর চৌধুরীর দেওয়াল ভর্তি বিভিন্ন ছবির গলায় সেগুলো পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে অনেক রথীমহারথীদের বাণী এসেছে—এসেছে তার, অনেক গণ্যমান্য লোক সকাল থেকে দেখা করে গেছেন।

সুপর্ণার প্রস্তুতিই কি কম! গতকাল চুলে শ্যাম্পু করেছে। ভোরে সকলের অলক্ষ্যে খুব পাতলা করে চোখের কোলে সুরমা দিয়ে তার দৃষ্টিতে ক্লান্তি আর বেদনা ফুটিয়ে তুলেছে, লেস দেওয়া বকের পালকের মত সাদা সিফনের স্বচ্ছ শাড়ী পরেছে—তার নিচে লক্ষ্ণৌ চিকনের ব্লাউস নিটোল বক্ষবাসের আভাস দিচ্ছে। তারপর সকাল থেকেই চলেছে ম্লান হাসি, নমস্কার আর প্রতিনমস্কারের পালা।

এই ত কিছুক্ষণ হল ফিরেছে ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট থেকে। বাৎসরিক স্মৃতিসভার আয়োজন। জনৈক দেশনেতা পৌরোহিত্য করেছেন—যাঁরা ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট সমর চৌধুরীর অসীম বীরত্ব, দুঃসাহসিকতা আর আত্মদানের কথা আবেগময়ী ভাষায় বক্তৃতা করেছেন তাঁরাও কেউ কম কেউকেটা নন। আর মঞ্চের একপাশে ম্লানমুখী ঐহিকের সর্বসুখবঞ্চিতা সমরবধূ সুপর্ণা।

আজ পাঁচ বছর ধরে একই উৎসবের পুনরাবৃত্তি। শুধু মঞ্চের উপরের লোকদের মুখ কিছু কিছু বদলে গেছে, শুধু সমর চৌধুরীর বীরত্বের আর অসীম সাহসিকতার কাহিনীর সঙ্গে কিছু উপকথা জড়িয়ে গেছে, শুধু আগের মত তেমন ভিড় জমে না, অবশ্য নামকরা আর্টিস্ট থাকলে সে অন্য কথা। গোলদীঘির চারপাশে যারা ঘোরে অথচ ক্লান্ত হলে বসবার জায়গা পায় না—তাদেরও কেউ কেউ আসে। তবু খানিকটা সময় কাটে—মন্দ কি!

এবার সন্ধ্যার প্রস্তুতি পর্ব। কিছু রবীন্দ্র-সঙ্গীত, কয়েকটি ভক্তিমূলক গান গাইবার জন্য কয়েকজন শিল্পীকে আমন্ত্রণ জানান হয়েছে—তাঁদের এবং বিশিষ্ট অতিথিদের জন্য একটু হাল্কা ধরণের জলখাবারের ব্যবস্থাও রাখতে হয়েছে। এই সবের প্রাথমিক পর্বে ধূপদানীর ধূপকাটিতে ধূপ লাগাতে গিয়ে হঠাৎ একথা তার মুখ দিয়ে বেরোলো কেন? কাকে বললে এ-কথা?—সমর চৌধুরী ত নয়ই—তবে? ধূপ আর ধুনোর অস্পষ্ট ধোঁয়ায় বীর সমর চৌধুরী, মৃত্যুর পর যাঁকে ভারত সরকার বিশিষ্ট বীরের সম্মানে ভূষিত করেছেন—সেই সময় চৌধুরীকে আবরণ করে ধোঁয়ার মতই অস্পষ্ট অন্য কিছু—

হ্যাঁ অংকুর, অঙ্কুর গুপ্ত—চিফ ফটোগ্রাফার, মুরুব্বীর জোরে কোন কাগজের যেন প্রেস ফটোগ্রাফার হয়েছে—আর তাদেরই আনুকূল্যে আজ দিন-সাতেক হল ইউরোপ রওনা হয়ে গেছে ......আর্টিস্ট। আর্টিস্ট কাকে বলে সুপর্ণা জানে।

স্বামীর ছবি থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে পাশের দেওয়ালে তার নিজের ফটোগ্রাফের দিকে চাইলে সুপর্ণা। ফুল-সাইজ এনলার্জ করা রঙীন ফটোগ্রাফ। ছবি তুলেছিল, রং করেছিল অঙ্কুর—সে একটা বিশ্রী ব্যাপার।

বছর দশেক আগেকার কথা। তখন সুপর্ণার বিয়ে হয়নি। কলেজ থেকে দল করে ওরা বোটানিক্স গিয়েছিল পিক্‌নিক্ করতে। সারাদিন রান্নাবান্না খাওয়া-দাওয়া হৈ হুল্লোড়। বিকেলের দিকে ওরা ছোট ছোট উপদলে বেরিয়ে পড়েছিল—ওর সঙ্গে ছিল রেবা। রেবার মাথার একটা পিন খুঁজে পাচ্ছিল না—তাই সেও আসছি বলে ফিরে গেছে।

সামনে একটা গাছে থোকো থোকো লাল ফুল। লোভ সামলাতে পারেনি সুপর্ণা। এক থোলো তুলে নিয়ে নিজের চুলের গোড়ায় পরে নিয়েছিল। একটু উঁচু ডালে আর এক থোকো—রেবার জন্য ত চাই।

পায়ের আঙ্গুলের উপর ভর করে হাত তুলেছে সুপর্ণা ফুলের থোকটা নেবার জন্য—পশ্চিমের একফালি রোদ পড়েছে তার মুখে, দেহতটে, যৌবন-বৃন্তে—ঠিক এমনি সময়—

'বাঃ চমৎকার! —পাশের দিকে ফিরে চাইতেই ক্লিক। ক্যামেরা গলায় হাসছে অঙ্কুর গুপ্ত। নাম অবশ্য তখন জানত না। জেনেছে অনেক পরে। সুপর্ণা রেগে গেল, চ্যালেঞ্জের সুরে বললে, "আপনি আমার ছবি নিয়েছেন?"

বেহায়া লোকটা ঘাড় কাৎ করে বললে—"নিশ্চয়ই—"

—"নিশ্চয়ই", ব্যঙ্গ করে পুনরুক্তি করলে সুপর্ণা—"লজ্জা করলা না বলতে।"

"লজ্জা"—যেন আকাশ থেকে পড়ল অঙ্কুর—"মিছে কথা বললেই ত লজ্জা হত।"

—"খুব হয়েছে, ভব্যতাবোধ নেই—অসভ্য কোথাকার। আমি যদি পুলিশকে বলে দিই কেমন হয়।"

—"খুব ভাল অবশ্য হয় না। মিথ্যে খানিকটা ঝামেলা বাড়বে। কারণ আমাকেও সে ক্ষেত্রে বলতে হবে ভদ্র-মহিলা বেআইনী করে ফুল তুল-ছিলেন, আমি একটা প্রমাণ রাখবার জন্য ছবি নিয়েছি"। সুপর্ণার দিকে না চেয়েই স্পুল ঘোরাতে লাগল।

"বেআইনী করে।" একটু থতমত খেয়েছিল সুপর্ণা।

"—তা না ত কি। কোম্পানীবাগানে যে ফুল তোলা নিষেধ একথা বাংলা ইংরেজী হিন্দি সব ভাষায় লেখা আছে—আর সেটা না বোঝবার মত খুকী আপনি নন।"

"মুখ সামলে কথা বলবেন—" রুখে এসেছিল সুপর্ণা।

হেসে ফেলেছিল অঙ্কুর। ছোট ছেলেমেয়ে যখন রেগে গিয়ে বড়দের মারতে যায়, বড়রা যেমন হাসে তেমনি।

"—যাক গে ছেড়ে দিন—অন্যায় আপনিও করেছেন, আমিও হয়ত করেছি। আপনি করেছেন প্রকৃতির বিরুদ্ধে সরকারের আইনের বিরুদ্ধে—আমি হয়ত করেছি একটা প্রচলিত অর্থহীন এটিকেটের বিরুদ্ধে—আসুন আমরা বন্ধুভাবে বিদায় নিই।"

"—কি হয়েছে রে সুপর্ণা।" রেবা এসে পড়ায় সুপর্ণার সাহস বেড়ে গেল।

"—দেখনা রেবা—এই লোকটা আমাকে না বলে আমার ফটো তুলেছে—অভদ্র কোথাকার—আবার বন্ধুভাবে বিদায় নিই...যতসব...আপনি আমাদের সামনে ছবির স্পুল খুলে ফেলুন।"

"—মাপ করবেন", হেসে ফেললে অঙ্কুর—"সকাল থেকে ঘুরে ঘুরে একটা মাত্র ছবির সাবজেক্ট পেয়েছি--কত ভয়ে ভয়ে আছি—না আবার খারাপ হয়ে যায়..."

"—আমরা আপনার লেকচার শুনতে আসিনি, চলুন আমাদের প্রাইস-প্রিন্সিপ্যালের কাছে।"

অঙ্কুর হেসে নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিলে তার হাত ধরে নিয়ে যাবার জন্য।

তার এই বেপরোয়া ইয়ার্কিতে সুপর্ণা ফেটে পড়ছিল, রেবা তাকে সামলে নিলে। ভারিক্কী চালে রায় দিলে—

—"যাক, যা হবার হয়ে গেছে—আপনাকে এবার ছেড়ে দিলুম—কিন্তু ওর যখন ছবি নিয়েছেন তখন আমাকে এক কপি দেবেন।"

সুপর্ণার প্রবল বাধা সত্ত্বেও রেবা মধ্যস্থ হয়ে ব্যাপারটা পাকা করে ফেলেছিল।

সুপর্ণা দলের মধ্যে যখন রেবাকে নিয়ে ফিরে এলো তখন আর সে সুপর্ণা নয়। ওর হাসিখুশী সব চুপসে গেছে—সারা দেহে-মনে পরাজয়ের লজ্জা।

ঠিক দিনে ঠিক সময় ওকে একরকম জোর করে সঙ্গে নিয়ে রেবা কলেজের দরজায় দাঁড়িয়েছিল। রেবার ভয় তাকে একলা দেখলে অঙ্কুর ছবি নাও দিতে পারে।

মাটির পরে চোখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সুপর্ণা। ওই লোকটা ত ছবি দিতে আসছে না, আসছে ওর কান মলে দিতে। মুখের দিকে চেয়ে হয়ত একটু হাসবে? কি কেমন!

রেবা অধৈর্য হয়ে ঘড়ি দেখছিল। ব্রাউন কাগজে মোড়া প্রকাণ্ড একটা পিজবোর্ড নিয়ে একটা ছেলে সুপর্ণার সামনে এসে দাঁড়াল।

"—এই নিন, এটা আপনাকে দিতে বললে।"

"—কে?" রেবা প্রশ্ন করলে। সুপর্ণা চকিতে চোখ তুললে।

"—ওই যে ওই বাবুটা, ওপারে দাঁড়িয়ে রয়েছে।"

যেদিকে আঙুল দিয়ে দেখাল সেদিকে অঙ্কুরের ছায়াও নেই। সুপর্ণা বেঁচে গেল!—না, সুপর্ণা অস্বীকার করবে না—সুপর্ণা মরমে মরে গেল। বুকের মধ্যে একটা গুরুভার—একটা অব্যক্ত বিশ্রী অনুভূতি, তার কারণ খোঁজবার সাহসই হয়নি সেদিন।

তার ছবি! ফুলসাইজ মাউন্ট করা রঙীন ছবি! জীবনে অনেক ছবি তোলা হয়েছে তার—এই অনবদ্য ভঙ্গীমায় অমেয় সুষমায় ভরা এমন ছবি তার হয়নি। অথচ যে লোকটা এই অনুপম ঐশ্বর্য তাকে একরকম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে দিয়ে গেল, তার নাম-ঠিকানা জানল না, কৃতজ্ঞতা জানাবার, প্রশংসা করবার, ক্ষমা চাইবার সুযোগ পেল না। শুধু রইল একটা বিকেলের তিক্ত অভিজ্ঞতা—খানিকটা অশোভন গালাগালি আর একটা লোকের সম্পূর্ণ উপেক্ষা-করা হাসি।

অঙ্কুর গুপ্তকে নিয়ে বেশী দিন ভাবেনি সুপর্ণা। কুমারী মন—অনেক আলোছায়া লীলারহস্যের মাঝে ধরে রাখবার মত কিছু পায়নি। বরং কিছুদিন পরে বোটানিকস-এর কাহিনীটা অনেকটা মজার ঘটনা বলে মনে হয়েছিল। ছবিটা দেখে কেউ সপ্রশংস বিস্ময়ে প্রশ্ন করলেই শুরু করত—'সে ভাই এক মজার ব্যাপার.........'

বছর দুই পরে সুপর্ণার বিয়ে হয়। সমরকে বলেছিল গল্পটা বেশ জমিয়ে। সমর ত হেসেই খুন। "—খুব দিয়েছেন ত ভদ্রলোক।"

"—যাও যাও, আমিও দিতে পারতুম, নেহাৎ রেবাটা একটা বিশ্রী কাণ্ড করে বসল—না হলে লোকটাকে আমি রাস্তার উপর নাকে খৎ দেওয়াতুম।"

"সে যাই হোক এমন ছবি হয় না, আর হবে না। লোকটার পরিচয় জানা থাকলে বিয়ের পর তাকে দিয়ে আমাদের ছবি তোলাতুম।"

মেয়েরা যা চায় সমরের মাঝে সবই পেয়েছিল সুপর্ণা। শ্বশুরবাড়ীর বনেদী আভিজাত্য—অথচ বর্তমান যুগকে গ্রহণ করবার অপূর্ব ক্ষমতা। সমর ওকে নিয়ে গিয়েছিল নিজের কর্মস্থলে, ক্লাব, খেলা, বেড়ান—জীবনকে নানা দিক থেকে বিচিত্র করে পাওয়া। মাঝে মাঝে কোলকাতায় আসত—টলমল করছে সুপর্ণা কানায় কানায়, যাকে বলে টইটুম্বুর!

কিন্তু জীবনটা যে তুবড়ীর মত—সহস্রধারায় ফুল কেটে হঠাৎ চারিদিক অন্ধকার করে নিভে যেতে পারে একথা ভাবেনি সুপর্ণা।

হঠাৎ বেসক্যাম্পে কি একটা খবরকে কেন্দ্র করে চাপা গুঞ্জন—ফ্যামিলি পাঠিয়ে দিতে হবে—সীমান্তে এমন একটা কিছু ঘটেছে যার ফলে সমর ও আরো কয়েকজনকে এক্ষুনি রওনা হতে হবে।

তারপর একদিন সন্ধ্যায় রেডিওতে সেই ভয়ঙ্কর সংবাদ। এক দুঃসাহসিক ঝুঁকি নিয়ে ফ্লাইট-লেফটন্যাণ্ট সমর চৌধুরী প্লেন ক্র্যাশ করে মারা গেছেন। তাঁর এই অভূতপূর্ব আত্মত্যাগে একটা ফুল স্কোয়াড্রন শুধু রক্ষা পায়নি, সীমান্তের অবস্থা সম্পূর্ণ ভারতের অনুকূলে এসে গেছে। তাঁর মরদেহ আগামী-কাল বিশেষ বিমানে দমদমে আনা হচ্ছে—সেখান থেকে শোভাযাত্রা করে তাঁকে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে পূর্ণ সামরিক মর্যাদার সঙ্গে দাহ করা হবে।

সুপর্ণা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ছিল। কিন্তু পরের দিনটি কী অপার বিস্ময় নিয়ে তার সামনে অপেক্ষা করছিল তা জানত না সুপর্ণা। দমদম বিমানঘাঁটি থেকে শবদেহের জয়যাত্রা! হাজার হাজার লোক পথের দুপাশে কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে

মৃতের প্রতি শেষসম্মান দেখাতে এসেছে। অজস্র ফুল পড়ছে—অসংখ্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে শবাধারে মাল্যদান চলছে। সুপর্ণার প্রতিই বা সকলের কী শ্রদ্ধাবনত বেদনাময় দৃষ্টি। কেলকাতায় প্রত্যেকটা খবরের কাগজে প্রথম পাতা জুড়ে সংবাদ—তরুণ বীরের কীর্তি-কাহিনীর নিখুঁত পঞ্জী—আর তার সঙ্গে সুপর্ণার নাম জড়িয়ে আছে। সময়, সমরের বিরহী আত্মা কি দেখতে পাচ্ছে এই সমারোহ, যে সমর প্রায়ই এক অখ্যাত কবির ইংরেজী কবিতা থেকে দুটি লাইন বারবার আবৃত্তি করত—যার অর্থ—"আমি মরব না, আমরা মরব না—আমরা অস্ত যাব ভাস্বর পশ্চিম দিগন্তে সূর্য সমারোহে"—এই ত সে খ্যাতির ভাস্বর আকাশপটে তার মহাপ্রয়াণ!

তার কিছুদিন পরে ভারত সরকার সেনাবাহিনীর শ্রেষ্ঠ সম্মানে সমরকে ভূষিত করলে। ২৬শে জানুয়ারী ডাক পড়ল সুপর্ণার দিল্লীর দরবারে। সিফনের শাড়ীপরা মূর্তিমতী শোক সুপর্ণা নতনেত্রে দাঁড়াল রাষ্ট্রপতির সামনে—তিনি হাতে তুলে দিলেন সনদ। ক্যামেরা ফ্লাস্ করে উঠল।

কোলকাতায় ফিরে এলো সুপর্ণা। ফিরে এলো পঁচিশ বছরের মহারাণী স্বামীর পূর্ণ গৌরবের উত্তরাধিকারীণী হয়ে। দেশের রাষ্ট্রনেতারা আর বিদগ্ধ-সমাজ তার সঙ্গে দেখা করে এলো, শ্রদ্ধাভরে, চাইল দেওয়ালে-বিলম্বী ইউনিফর্ম পরা সমর চৌধুরীর ছবির দিকে।

দিনসাতেক পরে এসেছিল অংকুর। রাষ্ট্রপতি-ভবনে তোলা ছবিগুলি দিতে। কার্ড পাঠিয়ে বাইরে অপেক্ষা করছিল। ডাক পড়ল। ভেতরে গিয়ে ছবির খামটা ওর হাতে দিতে গিয়ে দেওয়ালে ঝোলান সুপর্ণার ছবির দিকে অংকুরের চোখ পড়ল।

—"আপনি?"— বলেই চোখের বিস্ময়কে একটু হাসিতে রূপান্তরিত করল। সুপর্ণা ওর মুখের দিকে চেয়ে সবিস্ময়ে বললে—"আপনি আমায় চেনেন নাকি?"

"—আপনাকে? —না।"

—"না মানে, আপনার কথা শুনে ত তা মনে হল না।"

—"সত্যিই আপনাকে চিনি না—শুধু আপনার ছবিটা চেনা মনে হয়েছিল।"

—"এর অর্থ!"

"—বিশেষ কিছু নেই—এমনি অর্থ-হীন অনেক কিছুই ত অনেকের মনে হয়। এও তেমনি।"

ঠিক তেমনি কথার ধরন। পাঁচ বছর আগে বটানিক্‌স-এর এক অপরাহ্ন মনে পড়ে গেল সুপর্ণার। কার্ডের নামটার দিকে চেয়ে সুপর্ণা বললে—

—"আপনি অংকুর গুপ্ত?"

—"কেন, পরের কার্ড দিয়ে কেউ কেউ আপনার সঙ্গে দেখা করেছে নাকি?"

ওর কথার ধরনে সুপর্ণা হেসে ফেলেছিল—না লোকটা একটুও বদলায়নি।

—"যদি কিছু মনে না করেন মিঃ গুপ্ত, আমার ঐ ছবিটা কি আপনার তোলা?"

—"সেই রকমই মনে হচ্ছিল, কিন্তু যেভাবে কাঁচের উপর ধোঁয়া লেগেছে......

সুপর্ণা হাসলে। একটু থেমে গম্ভীর হয়ে বললে—"আপনাকে মনে রেখেছি একথা বললে মিছে কথা বলা হবে। কিন্তু একদিন যে আপনার সঙ্গে অত্যন্ত অশোভন ও রূঢ় ব্যবহার করেছি —এ কথাটা কোনদিন ভুলতে পারিনি"—একটু থেমে বললে, "মাঝে মাঝে আসুন না অংকুরবাবু।"

"কেন, তাহলে আবার বেশ কিছু-দিন ধরে ভাল ব্যবহার করে পূর্ব অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করবেন।"

সুপর্ণা চেয়ে দেখেছিল—আর কথা বাড়ায়নি। তবুও অংকুর নিজে থেকে কোনদিন আসেনি। সুপর্ণাকে আজকাল অনেক সভাসমিতিতে প্রায়ই যেতে হয়—সেখানে প্রেস ফটোগ্রাফারদের আনাগোনা, অংকুরের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়ে যেত—জোর করে কোন কোন দিন ধরে আনত। ইতিমধ্যে বাড়ীর সকলের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিয়েছে আর পরিচয়ের সেই একই ভাষা—"আমার ছবিখানা ও'রই তোলা।"

সুপর্ণা অনেক চেষ্টা করেছিল অংকুরকে একটু নিকট করবার। কিন্তু তার মুখের প্রচ্ছন্ন কৌতুক আর শ্লেষ দিয়ে যেন সবসময় তার নিজের সামনে একটা পরিখা খুঁড়ে রেখেছিল—একই সোফায় পাশাপাশি বসেও সে পরিখা পার হতে পারা যায় না।

একদিন সুপর্ণা বললে: "দেখুন অংকুরবাবু, আপনি বিশ্বাস করেন, মানুষের সঙ্গে মানুষের পরিচয়ের ক্ষেত্র কতকগুলি সময়কেন্দ্রিক বৃত্তের মত—কোন একটা পরিধির মধ্যে এসে 'আপনি' আজ বোধহয় অশোভন শোনায়।"

—"তাই নাকি? আমি কি এই বাড়ীতে সেইরকম কোন পরিধির মধ্যে গিয়ে পড়েছি নাকি?" কপট ভয়ের সঙ্গে যেন কথাটা বললে অংকুর।

সুপর্ণা হাসলে। বললে—"না তেমন কথা আপনার পরম শত্রুও বলবে না—কিন্তু এমন ত হতে পারে আমি সেইরকম কোন পরিধির মধ্যে যেতে চাইছি। আচ্ছা, আমি যদি আপনাকে ঠাকুরপো বলি..."

—"আমি আপত্তি করব!"

বিস্মিত হয়েছিল সুপর্ণা। স্বর্গত সমর চৌধুরীর স্ত্রী একজন প্রেস ফটো-গ্রাফারকে ঠাকুরপো বলে সম্বোধন করতে চাইছে—ফটোগ্রাফার আপত্তি করছে।

—"আপত্তি করব এই জন্য যে আপনার স্বনামধন্য স্বামীর সঙ্গে আমার চাক্ষুস পরিচয়টুকু পর্যন্ত ছিল না, সত্যি বলতে কি মৃত্যু দিয়েই তাঁকে চিনেছি—এমন হঠাৎ কোমরা তাঁর ভাই সাজা......"

তার কথার ধরণে সুপর্ণা হেসে ফেলল।—"আচ্ছা তা না হয় বুঝলুম—আপনি যখন আমার চেয়ে বয়সে বড় তখন যদি আপনাকে দাদা বলি।"

"—কিছু মনে না করেন ত বলি, এমনি নিঃসম্পর্কীয় মানুষের মাঝে পাতান আত্মীয়তা আমার কেমন থিয়েটার থিয়েটার মনে হয়—কেউ কারো আপন নয় অথচ স্টেজের উপর কত রং কত ঢং।......"

সুপর্ণা আহত হয়েছে। তা লক্ষ্য করেই হয়ত অংকুর বলল—"আচ্ছা বলতে পারেন এর অন্তর্নিহিত অর্থই বা কি? দুজন নিঃসম্পর্কীয় নরনারীর মধ্যে একটু নিরাপত্তার কবচ সৃষ্টি করা—তাই না?"

সুপর্ণা দৃঢ়কন্ঠে প্রতিবাদ করেছিল। —"না তা নয়, অন্য দেশের কথা জানি না, কিন্তু এদেশে আমরা যারা পুতুল খেলি ছোটবেলায়, সই গঙ্গাজল পাতাই—যারা ক্লাবে যাই না, যাদের মেলামেশার শতকরা নিরেনব্বুই ভাগ পারিবারিক গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ—সেখানে জীবনে খাপছাড়া কিছু ঘটলে, তাকে পারিবারিক সীমানার মধ্যে আপন করে না পেলে আমাদের পাওয়া যে অসম্পূর্ণ থেকে যায় অংকুরবাবু।"

"—সে ত গেল আপনার কথা, আমারও ত কিছু বলার থাকতে পারে। আমারই বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কয়েকজন আছে যারা নিজেরা ঘর বাঁধলে না, কিন্তু যেখানেই স্নেহ ভালবাসায় একটু নরম মাটি পেয়েছে—সেখানেই শিকড় গাড়তে চেয়েছে। দাদা বৌদি কাকা কাকী পিসীমা মাসীমা—এমনি যা হয় কিছু না কিছু একটা পাতিয়ে বসেছে—এমন কি বাইরের লোকের কাছে পরিচয় করাতে হলেও সত্যি কথা বলতে দুখে যাবে। এই

"সব ঠাঁই মোর ঘর আছে ভাই" এর কবি-বন্দিত লোকদের আপনারা যত ভাল আর যত মহৎই বলুন না কেন—সোজা কথায় আমি অনুকম্পা করি।"

এই অঙ্কুর! সমরের সঙ্গে চরিত্রগত মিল তার কোথাও বোধহয় নেই। তবু একজনের কথা মনে হলে আর একজনের কথা অমনি মনে আসে সুপর্ণার। যেন দুটো লোক একই চাকরির জন্য তার কাছে ইনটারভিউ দিচ্ছে। সমরের রক্তে আভিজাত্যের ধারা—আদর্শ আর সঙ্কল্পে অবিচল—স্নেহে প্রেমে কর্তব্যবোধে তার তুলনাই হয় না। বেশী কথা একসঙ্গে বলতে পারত না—কেমন যেন থতিয়ে যেতো। তিন বছরের বিবাহিত জীবনের কথা শুধু নয়—সুপর্ণার ভাবী জীবনটাকে যে আত্মদানের মহত্ত্ব দিয়ে সৌভাগ্যে রাঙিয়ে দিয়ে গেছে। তবু-ও কোথাও যেন কি একটা পাওয়া যাচ্ছে না—একটা লক্ষ্মীছাড়ার জন্য.. আশ্চর্য! একটা জ্যোতিষ্ক ছেড়ে উল্কার প্রতি নিষ্ফল আকর্ষণ।

অথচ লোকটা সে আকর্ষণকে উপেক্ষা করে, ব্যঙ্গ করে বারবার। উপযাচিকার মত নানাভাবে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তোলবার চেষ্টা করেছে। ক্লান্ত বিধবার বেদনাহত মূর্তি......দিগন্তে হারিয়ে যাওয়া উদাসীন ধ্যানমূর্তি......চঞ্চল মেয়ের হ্লাদিনী মূর্তি—পারেনি। যেন ওই লোকটার কাছে হারবার জন্যই তার জন্ম। মনে পড়ে—এমনি একদিন মনের চঞ্চলতা বোধ হয় নেমে এসেছিল চোখের দৃষ্টিতে, অঙ্কুরের হাত ধরেছিল হঠাৎ। কেমন ঠাণ্ডাভাবে হাত ছাড়িয়ে নিয়েছিল অঙ্কুর। বলেছিল—"বৈধব্য ব্যাপারটাই প্রকৃতির বিরুদ্ধে অপরাধ। মানুষ প্রাচীন-কাল থেকে তার আপন স্বার্থের জন্য কতকগুলো বিধিনিষেধ তৈরী করেছে—সমস্ত অগ্রসর দেশের লোক সেগুলো মাঝে মাঝে যাচাই করে নিয়ে পরিবর্তন করেছে—হিন্দুরা এতদিন পারেনি। অথচ সমস্ত সৃষ্টিরহস্যের দিকে চেয়ে দেখলে এর কারণ পাওয়া খুবই শক্ত মনে হয়। সংযম! রাসেল বলেন—সংযমকে আমরা একটু বাড়াবাড়ি করেছি—প্রতিদিন আমাদের চারপাশে যত লোভ যত আকর্ষণ—সেগুলো থেকে আত্মরক্ষার জন্য এবং মানুষ সাধারণভাবে যা করে তাই যথেষ্ট।"

সুপর্ণার বলতে ইচ্ছে হয়েছিল—আপনি রাসেলের উপদেশ নিজে মেনে চলেন। কিন্তু সে কথা না বলে বললে—"কোন বিধবা যদি বিয়ে করতে রাজী হয়—আপনি নিজে সে বিয়েতে সম্মত আছেন।"

অত্যন্ত নগ্ন এবং ব্যক্তিগত প্রশ্ন। লজ্জায় লাল হয়ে উঠল সুপর্ণা। কি ভাবলে অঙ্কুর। অঙ্কুরও বোধ হয় প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু কথাটা ঘুরিয়ে দিয়ে কৌতুক করে বললে—"নীতিগত নয়, স্বার্থগত বাধা আছে—কারণ আমার বিধবা মা সেক্ষেত্রে বিয়ে করতে চাইলে আমি ভয়ানক অসুবিধেয় পড়ব।"

সুপর্ণা হেসে বলেছিল—"আচ্ছা লোক যা হোক আপনি, আপনার মুখে কি কিছু আটকায় না।"

সুপর্ণা নিজেকে অনেক বুঝিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে হয়ত অঙ্কুরের খোঁজ করেনি, অথচ এই যে খোঁজ করেনি এইটাই সবচেয়ে বেশী মনে রেখেছে। সভা-সমিতিতে দেখা হলে না চেনবার ভান করেছে। ব্রত উপবাস করে মনকে সংযত করবার চেষ্টা করেছে—রোজ পুজোর ঘরে বসে অনেকক্ষণ ধরে আত্মশুদ্ধি করবার চেষ্টা করেছে—ধ্যান করতে চেয়েছে সমরের—তিন বছরের সাহচর্যের বহু খুঁটিনাটি স্নেহ-সোহাগ স্মরণ করবার চেষ্টা করেছে—কত ভাল কত মহৎ সমর। আশ্চর্য! একটু অসতর্ক মুহূর্তে ঘসা কাঁচের মধ্যে দেখা মূর্তির মত সমর ঝাপসা হয়ে গেছে—স্পষ্ট হয়ে উঠেছে অঙ্কুর।

তা না হলে, আজকের এই গৌরবোজ্জ্বল স্মরণ-উৎসবে যখন দেশের মানুষ এসে নত হয়ে রেখে গেল তাদের শ্রদ্ধাঅর্ঘভার—সমস্ত অনুষ্ঠানের মধ্যে কোন মহোত্তর প্রেরণা কেন পাচ্ছে না সুপর্ণা—কেন স্বামীর ছবির সামনে দাঁড়িয়ে তাঁরই পবিত্র স্মৃতিতে ধূপ জেলে দিতে গিয়ে গাল দিয়ে বসল অঙ্কুরকে।

রঙ বেরঙ

ছবি বসু

গলির মুখোমুখি দুই বাড়ী, চোখে চোখি হতেই পরিচয় হল, পরিচয় শেষে আন্তরিকতা।

মৃন্ময়ীর বিয়ে হয়েছে বছর দুয়েক। এখনও তার দেহেমনে কনে-চন্দন আর রঙের বাহার, সবিতার বিয়ে হয়েছে বছর দশেক তবে নামেই বিয়ে। বাপের বাড়ীর মস্ত সংসারের ঝক্কি মাথায় নিয়ে বয়েস পেরিয়ে যাওয়া আইবুড়ো মেয়ের মত তার এক বর্ণহীন জীবনযাত্রা।

সন্ধ্যার সময় সবিতা যখন গা ধুয়ে বারান্দার রেলিঙে কাপড় মেলতে আসে, মৃন্ময়ী হয়ত তখন তার শোবার ঘরটি পরিপাটি করে গোছাচ্ছে, খুব আস্তে আস্তে রেডিওতে গীটারে বাজছে একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত। আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই মৃন্ময়ীর স্বামী রমেশ আপিস থেকে ফিরবে।

সবিতা জানে মৃন্ময়ী এখন চোখা-চোখি হলেও দাঁড়াবে না, প্রাণপণ তাড়া করে কাজ সেরে গা ধুয়ে কাপড় ছেড়ে আসবে। হয়ত নীল শাড়ী নয়ত টিয়াপাখী রঙের নাহয় লাল, বেগনে, আসমান যত রঙ আছে তার কোন একটি পরে ঘরটায় ফিকে নীল বাতি জ্বালিয়ে দেবে। সেই রহস্যঘন ঘরটার কেমন একটা আকর্ষণে সবিতা হয়ত একটু বাদেই ঘুরেফিরে আবার এসে দাঁড়াবে। দেখবে রমেশ একটা ক্যাম্প চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়েছে আর তার মুখোমুখি চেয়ারে চায়ের পেয়ালা নিয়ে মৃন্ময়ী।

অশেষ মন্থরতায় গড়িয়ে গড়িয়ে একটা উপন্যাস মৃন্ময়ী শেষ করেছে কোনকালে। সবিতার বাপু বড় বাড়াবাড়ি, একবারও কি আসতে নেই ইদিকে? শেষে সবিতার দেখা যদি-বা মিলল, ও তখন ভারী ব্যস্ত, বার্লি নিয়ে দোতলায় যাচ্ছে মেজখুড়ীকে খাওয়াতে। মৃন্ময়ীর সঙ্গে চোখাচোখি হতে একবার শুধু থমকে দাঁড়াল।

—কি বলবে বল, দেখছ না হাতে এখন কত কাজ, মরবারও ফুরসত নেই আমার।

ঠোঁট উলটে মৃন্ময়ী তার দেয়ালের দিকে ফিরে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে—আর আমরা সবাই বুঝি নিষ্কর্মার দল?

—তাই বলেছি?

কথাটাকে আমল না দিয়ে হাসতে হাসতে সে ওপরে যায়। তারপর চেঁচিয়ে বলে—বলি ও মেজখুড়ী, চটপট বার্লিটা খেয়ে নাও দিকি। জানালায় আর একজন হাঁড়িমুখ করে বসে আছেন যে।

—কে লা হাঁড়িমুখো, ও মিনুর কথা বলছিস? তা যা বাপু তার সামনে।

মেয়েটা কোথায় এই বয়সে নিজের ছেলেপিলে ঘর-সংসার নিয়ে থাকবে তা নয়, বুড়ীদের সেবা করেই আজন্ম কাল কাটল! আশ্চর্য বুড়ীর ঘটা ও বাড়ীতে।

আর সবিতাই বা কী? না হয় নিজের ঘর-সংসারই হ'ল না তাই বলে কি অমনি সাদা-মাটা শুকনো হয়ে থাকতে হবে? এতটুকু রঙ নেই মেয়েটার কোথাও, না সাজ-সজ্জায় না মনে, এর চেয়ে গেরুয়া পরে বৈরিগী হয়ে যাওয়াও যে ছিল ভাল। ফাঁকা পেয়ে সেদিন বলেই বসে মৃন্ময়ী।

—শরীরে কোথাও ত রঙ নেই দেখি, তবে অত ঘটা করে সিঁথেয় রঙ পরা কেন বাপু?

সিঁদুর পরা নিয়ে এর আগেও মৃন্ময়ী খোঁটা দিয়েছে তাই প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্য সবিতা বলে—

—আচ্ছা গো আচ্ছা, তোমার জানালার বাহারি পর্দার মত কাপড়ে সারা অঙ্গ জড়িয়ে রাখব।

কথাটা যে মৃন্ময়ীর মনঃপূত হল না তা সে বোঝে।

সিঁদুরটা ও আজও পরে কেমন একটা অভ্যাসের দোষে—নিজের বিবর্ণ বেরঙা ছবিতে জোর করে রঙের আঁচড় কাটবার মত।

মৃন্ময়ীর মনের রঙ সকাল, সন্ধ্যায় এক-এক রকম। সকাল বেলা ক্ষণে ক্ষণে মুখোমুখি বাড়ীর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে একটি বর্ণহীন মনে যদি একটু রঙের তৃষ্ণা জাগে, গতানুগতিক এই

জরাগ্রস্ত জীবনের মোহ যদি ওর একটুও কাটে।

সন্ধ্যার ছায়া ঘনাতেই সেই চিন্তা লেশমাত্র ওর মনে থাকে না, নিজের সেই ফিকে নীল বাতি-জ্বালানো ঘরে আর একটি মানুষকে ঘিরে আশা-আকাঙ্ক্ষার কোন বেদনার রেশই খুঁজে পায় না।

ঠিক সময়ে সবিতাও এসে ছাতের কোণ ঘেঁষে দাঁড়াবে—সিঁথির সিঁদুরের মত সেও ওর এক অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে।

চোখে পড়বে মুখোমুখি বসা রমেশ আর মৃন্ময়ীকে। হাওয়ায় জানালার ফুল-কাটা নেটের পর্দা উড়ছে—আগুন-রাঙা শাড়ী পরেছে মৃন্ময়ী। টুকরো টুকরো কথা তারপর উঁচু পর্দায় বাঁধা মৃন্ময়ীর হাসির আওয়াজ যেন ছিটকে এসে পড়ছে এ বাড়ীর ছাতে। ধূপের ধোঁওয়া পাক খাচ্ছে টেবিলের এক ঝাড় রজনীগন্ধার গায়ে।

সেই সময়ে বিরক্তিকর ঠেকে এ বাড়ীর বাতে-পঙ্গু বড়খুড়ীর একঘেয়ে কাত-রানির আওয়াজ, মনে হয় একটু পরে রমেশ আর মৃন্ময়ী বেড়াতে বেরুবে। পাশাপাশি চলতে চলতে আড়চোখে চেয়ে যেন ইচ্ছে করেই মৃন্ময়ী রমেশের এ'ক-বারে গা ঘেঁষে চলবে, মনে হবে বড় বাড়াবাড়ি করছে মৃন্ময়ী। শনি আর রবি এ দুটো দিন যেন একবারও ফুরসত হয় না মৃন্ময়ীর, একবারও সে আসে না জানালার পাশে। যদি বা আসে, সবিতাকে খুঁজে বেড়ায় না সেই এক'জোড়া চোখ এ সে হলপ করে বলতে পারে।

একটানা বর্ষা চলছে ক'দিন ধরে এক নাগাড়ে।

উত্তরের জানালার গায়ে খাট-বিছানা। বৃষ্টির ছাটে সব ভিজে একসা হয় তাই ক'দিন ধরে জানালা বন্ধ রেখেছিল মৃন্ময়ী।

আজ বেলার দিকে বৃষ্টি ছেড়েছে—এক ফালি রোদ্দুর এসে পড়েছে সামনের দেবদারু গাছটার পাতায়। দুটো বাড়ীর সামনের গলি-পথটা ধুয়ে পুঁছে কেমন ঝকঝকে লাগছে। ফুটপাথের এদিকটার ডাষ্টবিনে আবর্জনা সব ডাঁই হয়ে রইত অনদিন। আজ এরই মধ্যে সব আবর্জনা সাফ হয়ে গেছে।

সবিতার দেখা পায়নি ত সে বেশ ক'দিন।

কৌতূহল চাপতে না পেরে এ বাড়ীতে এসেই পড়ল মৃন্ময়ী। ছোট-খুড়ী তখন পান সাজতে বসেছেন। ওকে দেখে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন।

—মিনু এলে নাকি মা? পানগুলো চটপট জড়িয়ে ফেলত বাছা। আমারও হয়েছে এমন অভ্যাসের দোষ কেউ সঙ্গে না রইলে মোটে কাজ এগোয় না।

সাহস করে সবিতার কথা জিজ্ঞেস করতেও বাধে। তবে কি সে রাগ ক'র চলে গেছে! আশঙ্কায় পান মুড়তে যেয়ে দু-চারটি ছিঁড়েও যায়।

সবিতার তবু দেখা নেই। কেন একা একা কি এত সামলাতে পারে ছোট-খুড়ী? বুড়ো হয়েছে, হয়ত দু-চার কথা বলেও থাকবে বা, তাতেই এত রাগ?

তখন বিরক্ত হয়ে বলে—কেন সবিতা গেল কোথায়?

হাঁ করে কিছুক্ষণ মুখের দিকে চেয়ে থাকেন ছোটখুড়ী।

—ওমা, সত্যিই তুমি জান না, বন্ধুকে কিছুই বলেনি সে? বলছি, তার আগে যাও দিকি মা চট করে দেখ ত ওপরে যেয়ে মেজখুড়ী বার্লিটা ঠিক খেল কিনা, না পড়ে আছে অমনি?

ডিঙি মেরে মেরে ওপরে আসে মৃন্ময়ী।

ছোটখুড়ীর কথা যেন কেমন রহস্যময়। তবে কি অন্যায় কিছু করে বসল নাকি সবিতা? নিশ্চয়ই কোন গোলমাল আছে নইলে অমন রসিয়ে রসিয়ে বলারই বা কি মানে!

মেজখুড়ী একগাল হেসে বলেন—মিনু এসেছ বুঝি মা? পায়ের আওয়াজ পেয়ে ভেবেছি সবিতা, তাই ভয়ে ভয়ে খাচ্ছি। না গো না আমারই ভীমরতি ধরেছে। সে এখন আসবে কি করে বাছা?

—কেন তার আবার সময় অসময় কি, আপিসের বড়সাহেব নাকি? সময়মত মুগীমানুষটাকে একটু পথ্যিও দিতে পারে না? বিরক্তি আরও বাড়তে থাকে। এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন হয়ে উঠেছে সবিতা এরই মধ্যে!

তিনতলা থেকে মানদাঝি ঘন ঘন ডাকতে থাকে। বাধ্য হয়ে কথাটা না শুনেই তিনতলায় উঠে আসে মৃন্ময়ী।

সেখানে বাতে পঙ্গু বড়খুড়ী শুয়ে আছেন—পাহাড়ের মত একতাল মাংস-পিণ্ড। এপাশ থেকে ওপাশ ফিরিয়ে শোয়াবার জন্য হাঁকাহাঁকি করছে মানদা।

—দেখ দিকি দিদিমণি, এই তিনমণি দেহটাকে সে একাই ঘোরাত-ফেরাত যেন পেটের ছেলেকে কোলে কাঁখে নিচ্ছে। সেই তিনমণি দেহটাই নড়েচড়ে মৃন্ময়ীকে বসতে ইসারা করে তারপর তার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নেয়।

ফুলো ফুলো হাতের মধ্যে মৃন্ময়ীর হাতটা কাঁপতে থাকে। মরা জন্তুর মত চোখ বড়খুড়ীর, ঘোলাটে, দৃষ্টিহীনের মত চাহনি। সবিতার কথাই বলেন বড়খুড়ী—

বড়খুড়ীর ভাইপোর হাতেই ছিল চাকরিটা; ভারী মানী লোক তিনি। মেয়েদের কি একটা শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে। তাদের দোকানে মাল বেচবার কাজটা সবিতা পেয়েছে, বাতে পঙ্গু বড়খুড়ীই ভাইপোকে ডেকে মাথার দিব্যে দিয়ে কাজটা ওর জুটিয়েছেন। চোখ বুঁজেই বলেন বড়খুড়ী—এখন বয়স আছে, গতর আছে। এ সংসারে ওর গতরটা শুধু শুধু শেষ করি কোন ধর্মে? বলতে বলতে বড়খুড়ী হাঁপাতে শুরু করেন। এইবার ব্যথাটা বাড়ল, আবার যন্ত্রণায় কাতরাতে শুরু করবেন বড়খুড়ী।

শনিবারের সন্ধ্যা—সেই ফিকে নীল বাতি-জ্বালা ঘর, রেডিওতে সেতারের ঝঙ্কার, ফুলের গন্ধ, ধূপের ধোঁওয়া তার ওপর স্বামীর সান্নিধ্য ছেড়ে অসময়েই উলটো দিকের বড় বাড়ীটায় এসে ঢোকে মৃন্ময়ী।

নিঃশব্দে বেরিয়ে আসতে মুখো-মুখি পড়ে সবিতার সঙ্গে। তখন তাকে যেন আজ প্রথম চোখে পড়ল মৃন্ময়ীর। এ ত সেই সামনের বাড়ীর মুখগোঁজা আটপৌরে ভীরু মেয়েটি আর নয়। এর যেন কোথায় রঙ ধরেছে। এ-রঙের পরিচয় মৃন্ময়ী জানে না। তার অনেক অনেক রঙীন শাড়ীতে, ঘরের নীল বাতিতে কিংবা হৃদয়ভরা উত্তাপে কোথাও এই রঙের রেশ নেই।

সবিতার সিঁথি আজ শুভ্র, শরীরের কোথাও রঙের লেশমাত্র নেই তবু কোথায় যেন ঘোর লেগেছে। সেই ঘোর কেমন উজ্জ্বল হ'য়ে রক্তাভ দেখাচ্ছে তিনতলার ঐ পঙ্গু অথর্ব বড়খুড়ীকেও।

এই বর্ণহীন জরাগ্রস্ত বাড়ীটার রঙের ঘটায় চোখে যেন ধাঁধা লেগে যায় মৃন্ময়ীর।

বিকার

দীপক চৌধুরী

রণদাপ্রসাদ গুহ নতুন গাড়ি কিনেছে। ছোটখাট চ্যাপ্টা ধরনের গাড়িটা। এক এক সময় মনে হয় দুই হাতের চেটোর মধ্যে তুলে এনে বার-কয়েক উল্টেপাল্টে দিলে বডিটা সেঁকা রুটির মতো লেপ্টে যাবে বুঝি। বেঁটে মানুষেরও পা ছড়িয়ে ব'সে গাড়ি চালাতে কষ্ট হয়। বন্ধুটি লম্বা নয়। সাধারণ বাঙালীদের যা দৈর্ঘ্য তার চেয়েও ইঞ্চি দুই ছোট। বিলেতী বণিক অফিসে বড় চাকরি করে।

আমি উদ্ভিদবিদ্যার ছাত্র। লাঞ্চ খাওয়াবার জন্য অফিস থেকে ধরে নিয়ে এসেছে আমায়। অফিসের ড্রয়ারে প্ল্যাস্টিকের তৈরী তিন রঙা টিফিনের বাক্সটা প'ড়ে রয়েছে। নিশ্চিন্ত-মনে হাতরুটি আর আলুরদম খেতে পারতাম। আমার আশেপাশে ব'সে যারা কলম পেষে তারাই আমার বন্ধু। তাদের সুখদুঃখের গল্প শুনতে শুনতে রুটি আর আলুরদম খেতে ভাল লাগে আমার। বড় হোটেলে এনে রণদাপ্রসাদ এ-সব আমায় শোনাচ্ছে কি? আর কেনই বা শোনাচ্ছে? সমাজের উচ্চস্তরে উঠে গিয়েছে। সেখানে কি বন্ধুবান্ধবের অভাব না কি? ওর নিজের যদি বন্ধু না থাকে মিসেস গুহর তো আছে? স্বাধীনতার পরে এবং রণদার একগুচ্ছের টাকা মাইনে বাড়ার পরে তাঁকে সবাই মিসেস গোহো ব'লে ডাকতে লাগল। কারণ ওর অফিসের বড়সাহেব হঠাৎ কবে একদিন ডিনার টেবিলে তাঁকে মিসেস গোহো ব'লে ডেকে ফেলে-ছিলেন।

কিন্তু আমাকে কেন লাঞ্চ খাওয়াতে নিয়ে এসে এ-সব উচ্চস্তরের গল্প শোনাতে চায় সে? রণদার সংসারে কি অশান্তি ঢুকেছে? অমন একটি নিশ্ছিদ্র ফ্ল্যাটের মধ্যে অশান্তি ঢুকল কোন্ পথ দিয়ে? সংসারে তো শুধু স্বামী-স্ত্রী। একটি মাত্র ছেলে। এই সেদিন ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ ক'রে দুর্গা-পুরে গিয়েছে ইস্পাত তৈরীর কাজ শিখতে। তারপর বিলেত যাবে। অতএব ভেটকী আর পোনামাছের দর জেনে আমার কি লাভ? সুপ খাওয়ার পর পেট ব্যথার অজুহাত দিয়ে উঠে পড়ব ভাবছিলাম। তিনরঙা প্ল্যাস্টিকের বাক্সটার মধ্যে মন প'ড়ে রয়েছে আমার। তিনটি ছেলেমেয়েকে খাইয়েদাইয়ে কলেজ-ইস্কুলে পাঠাবার আগে কতো যত্ন ক'রে আমার জন্য জলখাবার তৈরী ক'রে দেয় তরুণা।

রণদাকে বললাম, 'আমার একটু তাড়াতাড়ি যেতে হবে।'

'তা হয় না। পুরো কোর্স খেয়ে যেতে হবে। একঘণ্টা পরে গেলে বণিক অফিস ফেল পড়বে না।'

রণদাপ্রসাদ শুধু বেঁটে নয়, দেখতেও অসুন্দর। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরুবার পরেই বিয়ে করেছিল। তখন স্ত্রীর নাম ছিল ইলা। মিসেস গুহ কিংবা মিসেস গোহো বলে কেউ তাঁকে ডাকত ব'লে মনে পড়ে না। যাওয়াআসা খুবই ছিল। আমাদের বন্ধুদের মধ্যে কারো কারো সংগে অন্তরংগতাও হয়েছিল। যারা দেখতে সুন্দর নয় তাদের সংগেই ঘনিষ্ঠতা করতেন তিনি। নিজে কিন্তু সুন্দরী। অসামান্যা বললেও চলে। আমি তো সারা জীবনেও ঐ ধরনের একটি সুন্দরী স্ত্রীলোক পথেঘাটে, সিনেমার পর্দায় কিংবা সামাজিক মিলনক্ষেত্রে কোথাও দেখতে পাইনি। রণদাপ্রসাদের কাছেই শুনেছিলাম যে, হাজার দুই ফটো আর পাত্র দেখে শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেই ওকে নির্বাচন করেছিলেন।

গোঁফ রাখবার পর রণদাকে আরো বেশি অসুন্দর দেখায়। গোঁফের ওপর হাত রেখে চিন্তামগ্ন হয়ে ছিল সে।

একটু পরে সে বলল, গাড়িটা নতুন কিনেছি, একটু আগেই ডেলিভারি
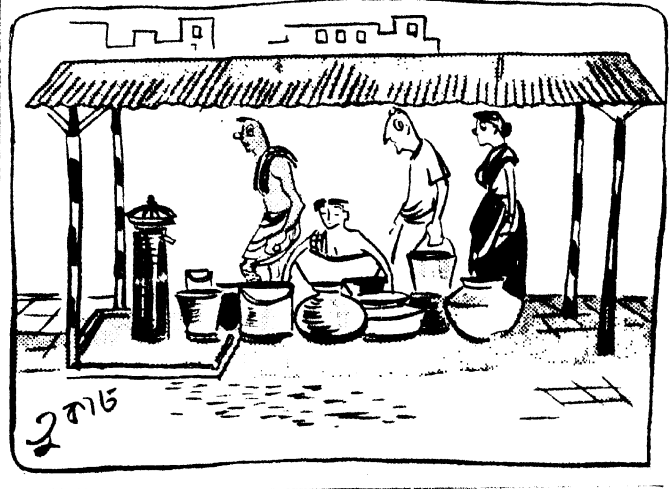
নিলাম। চল্ একটা লম্বা ড্রাইভে যাই—'

'তা হয় না ভাই।'

'কেন? অফিসে গিয়ে আর কি করবি, চল্ সোজা চ'লে যাই ডায়মন্ড-হারবার। এখান থেকে টেলিফোন ক'রে তোর বড়সাহেবের কাছ থেকে ছুটি চেয়ে নে।'

'কি ব'লে ছুটি নেব?'

'বলবি পথে ব্রেক-ডাউন হ'য়ে গেল।'

'নতুন গাড়ি!!'

'ব্রেক-ডাউন যখন হয় তখন নতুন আর পুরনো দুই-ই সমান। আগে থেকে বলা যায় না কিছু।'

ছেলেবেলা থেকে আমরা এক সংগে লেখাপড়া করেছি। গভীর বন্ধুত্ব ছিল আমাদের মধ্যে। রণদা চাকরি পেল বি-এ পাস করবার পরে। আমি গেলাম বিজ্ঞান কলেজে উদ্ভিদ-বিদ্যা পড়তে। এই বিদ্যা আমার কোনো কাজে লাগল না। রণদার চেষ্টায় আমিও বণিক অফিসে চাকরি পেয়ে গেলাম। অফিস দুটো আমাদের আলাদা আলাদা, কিন্তু এক রাস্তায়, একেবারে পাশাপাশি। বোধহয় এতো কাছে ব'লেই ক্রমে ক্রমে আমরা দূরে সরে যেতে লাগলাম। যখন দেখা হতো তখন কোনো সামাজিক উপলক্ষ থাকত। কোনো বন্ধুর বিয়ে। নয়তো কোনো বন্ধুর বোনের জন্ম-দিন। দু'চারবার ফুটবল খেলার মাঠেও দেখা হয়েছে। রণদার বিয়ের পর থেকেই ভাঙ্গন ধরতে আরম্ভ করে-ছিল। অতো সুন্দরী স্ত্রী কপালে জুটে গেল ব'লে কেউ কেউ ঈর্ষায় জ্বলেপুড়ে মরতে লাগল। যাওয়াআসা বন্ধ ক'রে দিল।

আজ সে হঠাৎ আমার অফিসে এসেছিল লাঞ্চ টাইমের অনেক আগে। অতো বড় একটা বিলেতী কোম্পানীর মেজোসাহেব সে. কিন্তু আমার মতো একটি সাড়ে চারশো টাকার কেরানীর টেবিলের ওপর ভর দিয়ে মিনিট-পাঁচেক অপেক্ষা করতে হয়েছিল ওকে।

যাহোক রাস্তায় বেরোলাম আমরা। যেতে যেতে লক্ষ্য করলাম, সাদা সাটিন কাপড়ের হাফপ্যান্ট পরেছে রণদা। জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুই হাফপ্যান্ট পরিস কেন? তুই তো আর রাস্তাঘাট কিংবা কারখানা পরিদর্শন করিস না।'

'পরলে ক্ষতি কি?' উদাসভাবে প্রশ্ন করল রণদা।

'ক্ষতি আছে। তোকে আরও বেশি বেঁটে দেখায়।'

'সেই জন্যই তো মিসেস গোহো দু' ডজন হাফপ্যান্ট অর্ডার দিয়ে তৈরী

করিয়ে এনেছেন। মজবুত কাপড়। বছর পাঁচেক ধরে ব্যবহার করছি—নিয়মিত ধোপাবাড়ি পাঠাই, তবু—' থেমে গেল রণদা।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'তবু কি?'

'ছেঁড়ে না। আমার ধোপাটাতো একটি ঐতিহাসিক চরিত্র। চেংগীস খাঁ-র মতো দুর্ধর্ষ। যা পায় সবই প্রায় কেটেকুটে শেষ করে দেয়। কিন্তু আমার হাফপ্যান্টগুলোর সঙ্গে পেরে ওঠে না। মনে মনে খুশী হন মিসেস গোহো।'

'যাই বলো ভাই, তোমায় কিন্তু বামনবীরের মতো দেখায়।'

'মিসেস গোহো তো তাই চান। নাকের তলায় এই যে জিনিসটি দেখছিস—' গোঁফের গায়ে আঙুল দিয়ে খোঁচা মারতে মারতে রণদা বলল, 'এটার মূলেও তিনি। রাখতে বাধ্য করালেন।'

'আয়নায় মুখ দেখিস না?'

'তেইশ বছর আগে দেখতাম। তখন বিয়ে হয় নি। পরে আর দেখবার দরকার হয় নি। মিসেস গোহো বলতেন, আমার মতো সুন্দর পুরুষ জীবনে আর দ্বিতীয়টি দেখেন নি। দু'হাজার ফোটো আর পাত্র দেখে আমায় নির্বাচন করেছিলেন। তাঁর ভালবাসার সমুদ্রে তেইশটা বছর গা ভাসিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ছিলাম। এখন দেখছি আসলে ওটা সমুদ্র নয়, পংককুন্ড।'

'কিসের কুন্ড বললি?'

'বিকারের। মনোবিকার। গল্পটা তোকে শোনাব। সেই জন্যই তোকে লাঞ্চ খেতে ডেকে নিয়ে এলাম। নইলে কাটলেটের মতো চ্যাপ্টা একটা গাড়ি দেখাবার জন্য ডাকতাম না নিশ্চয়ই। চল্, এখান থেকে বেরিয়ে পড়ি।

'বড়বাবুকে তা হ'লে টেলিফোন করি একবার?'

'হ্যাঁ। তিনি আমায় খুব ভালভাবেই চেনেন। তাঁকে বল, আমার গাড়িতে বেড়াতে বেরিয়েছিলি—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সত্যি কথাই বলবি। বলবি যে, নতুন গাড়ি। এক মাইলও চলেনি। ব্র্যান্ড নিউ কার। তবু ধাপার কাছে এসে ব্রেক-ডাউন হ'ল।'

'ধাপা, না ডায়মন্ডহারবার?'

'দুই-ই সমান।'

দক্ষিণ কলকাতার সেই লেকটা। বহুদিন এদিকে আসি নি। বছর পাঁচেক আগেকার ছবিটার মধ্যে অনেক অদলবদল হয়েছে। চারদিকটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাতে লাগল রণদা। দক্ষিণ দিকের সেই নিবিড়তার ঘন ঝোপগুলোকে কেটে সাফ করে ফেলা হয়েছে। তবে দক্ষিণে না থাকলেও হয়তো পশ্চিমে কোথাও নতুন ঝোপের জন্ম হয়েছে। মানুষ যতোদিন মানুষ থাকবে ঝোপগুলোকে ততদিন পুরোপুরি উচ্ছেদ করা যাবে না।

চাঁছাছোলা একটা শহরের পাশে ঝোপজঙ্গলগুলো সাদা-কালো ছবির মতো লাগত। আজ দেখছি চারদিকেই কংক্রিটের পরিমাণ বেড়েছে। ভূদৃশ্যটা ফ্ল্যাট।

সাঁতার ক্লাবের মুখোমুখি গাড়িটা দাঁড় করিয়ে দিল রণদা। জিজ্ঞাসা করল, 'গাড়িতে বসবি, না বেঞ্চিতে?'

'আড়াল-আবডাল তো কোথাও নেই। এখানেই ভাল।'

রণদা সিগারেটের টিনটা আমার দিকে এগিয়ে ধরে বলল, 'ইলার আর ভাইবোন নেই। ছেলেবেলা থেকে আদর আর নাই পেয়ে পেয়ে ক্লাস সেভেনে প'ড়ে রইল বছর দুই। তারপর লেখা-পড়া খতম করল। অবস্থা ভাল, কাজ-কর্ম কিছু করতে হয় না। যেখানে যায় আর যার সঙ্গেই দেখা হয় সর্বত্র ও সবার কাছ থেকেই শুধু রূপের প্রশংসা শোনে। ক্রমে ক্রমে ওর গোটা মানসিক জগতটা একটা অসার আত্ম-শ্লাঘার জগত হ'য়ে উঠল। কি ক'রে যেন ইলা বুঝতে পারল, সাদা-কালো ছবির মতো একটা তুলনামূলক বৈসাদৃশ্য না ঘটলে রূপের জ্যোতি নিষ্প্রভ হ'য়ে যায়। প্রতি ব্যাপারেই এই বৈসাদৃশ্য ঘটাবার চেষ্টা করেছে সে। পাশের লোকটি কুৎসিত না হলে দর্শকরা ওর রূপের যথার্থ মর্যাদা দেবে না, এই রকমের একটা ভয় ঢুকে গেল তার মনে। এই ভয়টা শেষ পর্যন্ত হ'য়ে দাঁড়াল বিকার। ভালবাসার যে স্বাভাবিক বীজ থাকে মানুষের মনে সেটি অংকুরেই বিনষ্ট হ'ল।

'এমন চরিত্রের একমাত্র গুণ হচ্ছে দাম্ভিকতা। আমার মাইনে বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর সামাজিক মর্যাদাও বাড়ল। নিউ মার্কেট থেকে শাড়ি কিনে উপহার দিতে যায় আমার সহকারী ফণী বাগচির স্ত্রী রমলাকে। তার জন্ম-দিন। একশো ত্রিশ টাকা দিয়ে যে সে কাতান সিল্কের শাড়িটা কিনল তা যদি রমলা বুঝতে না পারে সেই ভয়ে ক্যাশমেমোটা সবার অলক্ষ্যে ফেলে রেখে এল সেন্টার টেবিলের ওপর। আর রমলা যদি ওর চেয়ে বেশি সুন্দর হ'তো তা হ'লে জন্মদিনের তারিখটিতে

সামনে ছবি পেছনে ছবি—
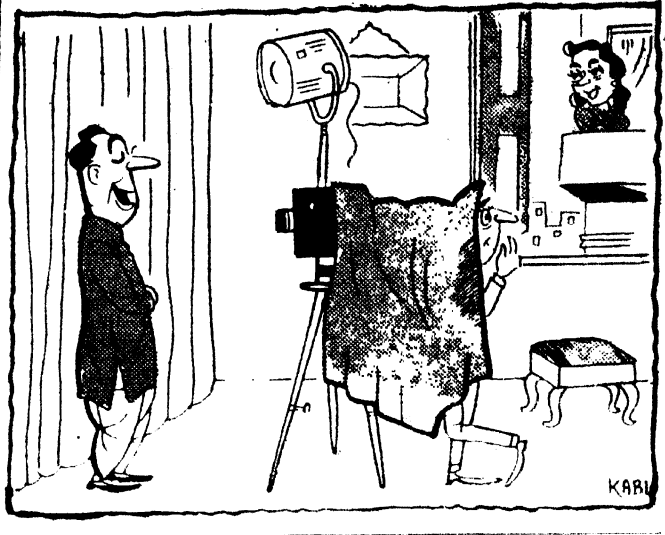
পেট ব্যথা শুরু হ'য়ে যেত ইলার। সেই মনোবিকারটিকে পুষ্ট ক'রে তোলার চেষ্টা করছে দিনরাত। গানবাজনার ধার ধারে না সে। কিন্তু নিউ এম্পায়ারে বিখ্যাত লোকের যখন কনসার্ট হয় তখন সবচেয়ে বেশি দামের টিকিট কাটে ইলা। টিকিট কেটে বাড়ি ফেরবার মুখে ডায়ার কোম্পানীর দত্তসাহেবের বাড়ি গিয়ে মিসেস দত্তর সঙ্গে মিনিট-পাঁচেক গল্প করে। কনসার্ট দেখতে যাওয়ার খবরটা দেয়। কিন্তু কতো টাকার টিকিট কেটেছে সেই খবরটা শোনাতে লজ্জা পায় ব'লে মিসেস দত্তের অলক্ষ্যে টিকিটখানা মেঝের ওপর ফেলে রেখে আসে। বাড়ি ফিরে ঘন্টাখানিক অপেক্ষা করে, ছটফট করে। মিসেস দত্তের চোখে যদি টিকিটটা না প'ড়ে থাকে? টেলিফোন তুলে নিয়ে তাঁকে ডেকে বলে, "ভুল ক'রে টিকিট-খানা কি তোমার বাড়িতে ফেলে এসেছি ভাই?" জবাব দেন মিসেস দত্ত, "হ্যাঁ। বেয়ারাকে দিয়ে আপনার ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছি।"

'গত তেইশটা বছর সবার প্রশংসা কুড়োতেই ব্যস্ত ছিল সে। এর বাইরে কোনো ব্যাপারের প্রতি আগ্রহ ছিল না ওর। এমনকি সবচেয়ে বেশি দামের টিকিট কেটে কনসার্ট শুনতেও যেত না। যদি ওর পাশের কিংবা পেছনের কোনো স্ত্রীলোক ইলার চেয়ে বেশি সুন্দর হয়? ক্লাবে কিংবা হোটেলে ডিনার খেতে গিয়ে যে দু'-একবার তেমনটা হয় নি তা নয়। হয়েছে। টেবিলের লোকেরা ওর দিকে না চেয়ে হয় তো সেই অন্য মহিলাটির দিকে বার কয়েক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে। বিশ্বাস করো, বাড়ি ফিরে এসে অসুস্থ হ'য়ে পড়েছে সে। পরের দিন সকালে ডাক্তারকে ডেকে পাঠাতে হ'ল। রীতিমতো অসুখে ভুগে উঠল ইলা। বাড়িয়ে বলছি না মোহিত, এ রকম বার-কয়েকই হয়েছে।

'আমার ছেলে অমলেশ বিলেত যাবে আসছে বছর। তার বিয়ের জন্য পাত্রী খুঁজছে ইলা। এ পর্যন্ত হাজার-দুই পাত্রী আর পাত্রীর ফোটো দেখেছে সে। কোনোটাই পছন্দ হচ্ছে না। অমলেশ নিদারুণ মাতৃভক্ত। মায়ের পছন্দ-মতো মেয়েকেই সে বিয়ে করতে

চায়। কাল আমায় একটি অতি অসুন্দরী মেয়ের ফোটো দেখিয়ে বলছিল, "খোকার বউ ক'রে আনব একে। আমার কাছে কাছেই তো থাকবে।" জিজ্ঞাসা করলাম, "কতদূর অবধি লেখাপড়া করেছে? উঁচু সমাজে মেলামেশা করতে হবে তো তাকে।" জবাব দিল, "ক্লাস সেভেন পর্যন্ত প'ড়ে সেলাই-ফোঁড়াই-এর কাজ শিখছে। বাপটি বড় ভাল লোক। পোস্ট অফিসের ইনস্পেক্টার।" কাল থেকে আমার মনে আর একবিন্দু শান্তি নেই। অমলেশের জীবনটাও নষ্ট করতে বসেছে। অথচ চিকিৎসারও কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছি না। অমলেশকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করা কি আমার কর্তব্য নয়, মোহিত?'

'সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই নেই।'

'উপায়টা বাৎলে দে না?'

'সত্যি বলছিস?'

'তেইশ বছরের ইতিহাস তো খুলেই বললাম তোকে।'

সাঁতার ক্লাবে আলো জ্বলে উঠেছে। ফ্লুরেসেন্ট আলোয় আশপাশের অস্পষ্টতা কেটে গিয়েছে। মালবিকাদের গল্পটা অদ্ভুতই বটে। মিসেস গোহোর মনের অন্ধকার দূর করতে হ'লে সাঁতার ক্লাবের ঐ ফ্লুরেসেন্ট আলোর মতো একটা আলোর দরকার। সুইচ টিপে আলো জ্বালাবার সাহস থাকা চাই রণদার।

একটু ভেবেচিন্তে বললাম, 'একটি সুন্দরী এবং গুণবতী মেয়ের সঙ্গেই বিয়ে দিতে হবে অমলেশের। ঐ হচ্ছে তার চিকিৎসা।'

ফেরার মুখে গড়িহাটার পথ ধ'রে চলল সে। আমায় যেতে হবে উত্তর দিকে।

রণদা বলল, 'আমিও ভাবছিলাম, একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গেই বিয়ে দেব অমলেশের। তুই কি খোকাকে দেখেছিস?'

'দেখেছি।'

'কতোদিন আগে?'

হিসেব করবার কি স্মরণ করবার চেষ্টা করতে হ'ল না। বললাম, 'গত শনিবার।'

'আশ্চর্য! কি ক'রে দেখলি?' জবাবের জন্য অপেক্ষা না ক'রে রণদাই নতুন প্রশ্ন করল, 'তোর বড় মেয়ে রুবার বয়স কতো হল?'

'সতেরো।'

'দেখতে কিন্তু ভা-রি সুন্দর হয়েছে।'

'কবে দেখলি ওকে?'

'বোধ হয় গত রবিবার, সকালের দিকে। আমার বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল।'

'যাচ্ছিল, না কারো জন্য অপেক্ষা করছিল?'

আমার কথা শুনে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ঘাড় বেঁকিয়ে তাকালো রণদা।

আমি বললাম, 'এইখানেই আমায় নামিয়ে দে। দু' নম্বর বাস ধরব।' গাড়ি থেকে নেমে গেলাম আমি। সঙ্গে সঙ্গে রণদাও নামল। আমার ঘাড়ে হাত রেখে জিজ্ঞাসা করল, 'রুবার সঙ্গে কি খোকার পরিচয় আছে?'

'আগামী শনিবার আমার বাড়ি আসিস।' বাসে উঠে পড়লাম আমি। পাশ থেকে আবার সে জিজ্ঞাসা করল, 'খোকা কি তোর ওখানে যায়?'

জবাব দিতে পারলাম না। বাসটা স্টপেজ থেকে বেরিয়ে এল।

এধারে-ওধারে পাইনবার্চের জটলা। ছোট ছোট কত ফুলের গাছে ফুল ফুটে রয়েছে। আর দূরে, আকাশের গায়ে যেন কাঞ্চনজঙ্ঘার চিরতুষার ধবল চিত্র আঁকা। এমন জায়গায় বসে ধূমায়িত চায়ের পেয়ালায় চুমুক দেওয়া সৌভাগ্য বৈকি। অন্তত ভবতোষের মনের তাই বিশ্বাস।

ঠিক ছাতাটার নীচে তখনো তিনটে সিট ছিল। ছাতার আবরণটুকু যারা সহ্য করতে নারাজ, তারা ছিটকে ছড়িয়ে বসেছিল ছোট ছোট টেবিলে, জোড়ে জোড়ে মুখোমুখি—পুরুষ ও নারী। যেন কাছে থেকেও আরো কাছে পেতে চায় নিজেদের। তাই কারো সামনে চায়ের পেয়ালায় চা জুড়োয় নিঃশব্দে, কারো বা সিগারেট দু' আঙ্গুলের মধ্যে পুড়ে পুড়ে ছাই হয় খেয়াল থাকে না। একে অপরের মুখের দিকে তাকিয়ে, মৃদু অস্ফুট গুঞ্জন করে—কাছাকাছি টেবিলে বসেও কেউ বুঝি তা শুনতে পায় না। বেশ একটা অন্তরঙ্গ মধুর আমেজ।

কেবল ভবতোষ একা যেন মূর্তিমান ছন্দপতন। একটা শূন্য চেয়ার দখল করে কাটলেটের শক্ত মাংস দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে চা খাচ্ছিল। ঠিক ওর সামনে আর দুটো শূন্য আসন পড়েছিল। একটু পরে সেখানে এসে বসলো দুজন। একটি সুদর্শন পাঞ্জাবী যুবক আর এক তরুণী যুবতী, ওর স্ত্রী হলেও কিন্তু জাতে পাঞ্জাবী নয়—অবাঙ্গালী। যদিও বাঙ্গালীসুলভ কোমলতা তার চলনেবলনে, ভাবেভঙ্গীতে সর্বত্র কিন্তু যেমন ঢ্যাঙ্গা, তেমনি সুসম ছন্দোময় দেহটি যেন লতানে অপরাজিতার মত ঘন পল্লবে ও পুষ্পে সুশোভিত। বব্‌করা চুল, ঠোঁটে রং, চোখে কাজল হলেও কোথায় যেন একটা রুচির শাসন ছিল, কোন উগ্রতা দৃষ্টিকে পীড়া দেয় না।

ভবতোষের একেবারে সামনে ওরা বসেছিল। বোধহয় আর কোন 'সিট' খালি ছিল না বলেই একেবারে ওর মুখোমুখি বসতে বাধ্য হয়েছিল।

কাটলেটের টুকরোটা চিবতে চিবতে চায়ের পেয়ালা মুখের কাছে তুলে, আড়চোখে একবার চট করে মেয়েটিকে দেখে নিলে ভবতোষ। কিন্তু দৃষ্টিটা দ্রুত সরিয়ে নিতে গিয়ে হঠাৎ মনে পড়ে যায়, এই ধরণের চোখের চাউনী এর আগে যেন কোথায় দেখেছে। ঠিক এমনি না হলেও যেন এর সঙ্গে কিছু সাদৃশ্য আছে। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দেয় আর ভাবে। না। অসম্ভব! যার মুখটা মনে আসে, ছ্যাঃ ছ্যাঃ কিসে আর কিসে। পদ্মের সঙ্গে ঘেঁটুফুলের তুলনা?

কুমকুম? সেই রোগা কাঠের মত দেহ। যেন শুকনো একটা খেজুর গাছ? আঠারো বছর যে ওর বয়েস কে বলবে। তার সঙ্গে চোখের সামান্য আদল আসে, এই পর্যন্ত! মন থেকে তৎক্ষণাৎ কুমকুমের স্মৃতি মুছে ফেলে ভবতোষ। ওর নামটা এর সঙ্গে মনে পড়তে গা যেন ঘিনু-ঘিনু করে ওঠে!

অপাঙ্গে একবার তাকালো ভবতোষ সামনের সুন্দরী তরুণীটির দিকে, চোখটা যেন জুড়িয়ে গেল। রংকরা মুখ! কি স্নিগ্ধ! কি মধুর!

যার জন্যে ভবতোষের মনে এত তোলাপাড়া তার কিন্তু কোন কিছুই খেয়াল ছিল না। খাওয়াটা যেন গৌণ! হাসিতে চোখমুখ উদ্ভাসিত করে কখনো যুবকটির কানের কাছে মুখটা নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে কি বলছিল, আবার কখনো তিরস্কারের ভঙ্গীতে তাকে শাসন করে, নো ডার্লিং, ডোণ্ট বি সিলি!

মেয়েটির মুখের ওই ইংরিজী কথাগুলো যেন ভবতোষের কানে অমৃত-বর্ষণ করে। সত্যি ভারতীয় কোন মেয়ের মুখে এত মিষ্টি ইংরিজী উচ্চারণ ইতিপূর্বে শোনেনি ভবতোষ! সেই তরুণী যুবতীর কণ্ঠের মাধুর্য যেন ইংরিজী শব্দগুলোকে অবলম্বন করে সরস হয়ে ওঠে ভিজন্নাগে তারপর ওই রক্তাক্ত ওষ্ঠের ফাঁক দিয়ে একটি একটি করে পাকা আঙ্গুরের দানার মত ঝরে পড়ে। ইংরেজের মুখের যে ইংরিজী কথাগুলো মনে হয় যেন কর্ণ-পটাহে আঘাত করে সজোরে কান মলে দিয়ে যায়, ওই তরুণীর কণ্ঠে তা যেন সঙ্গীত হয়ে বাজে।

দু'কানে মধু ভরে নিয়ে উঠে যায় একসময় ভবতোষ। আর সহ্য করতে পারে না। চোখের সামনে আর একজনের সৌভাগ্য দেখে ঈর্ষার আগুনে জ্বলতে থাকে। সে অবিবাহিত। বিবাহের বয়েস অনেককাল উত্তীর্ণ,

হয়ে গেছে। অবশ্য এতদিন পাত্রী জোটেনি বলে যে বিয়ে করেনি তা নয়, যেমনটি সে চায়, তেমনটি পায়নি। অথচ ঠিক যে কেমন চায়, তাও বুঝিয়ে বলতে পারে না। আজ এই মেয়েটিকে দেখে তার সমস্ত মন যেন একসঙ্গে চীৎকার করে বলে ওঠে, ঠিক এমনি একজনকেই সে চেয়েছিল জীবনসঙ্গিনী করতে।

ওরা চলে গেলে অনেকক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইল ভবতোষ সেইখানে, ঠিক তেমনিভাবে। ওর দুই কানের ভেতরে তখনো জ্বলছিল তপ্ত বালুকণার মত সেই ইংরিজী কথাটা—'ননসেন্স'। তরুণীর কন্ঠের সেই জ্বালা নিমেষে ভবতোষের জীবনের এক ঘৃণিত ও বিস্মৃত অধ্যায়ের মধ্যে যেন তার মনকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

হাঁ, ঠিক এমনি ভাবেই গর্জে উঠেছিল কুমকুম একদিন। তার কণ্ঠ-স্বরের সঙ্গে হঠাৎ মিল দেখে কেবল যে বিস্মিত হয় ভবতোষ তাই নয়, মনে মনে ভাবে, সকল নারীর কণ্ঠ বুঝি এক হয়ে মিলে যায়, ওই একটি ক্ষেত্রে, যখন বিষ উদ্‌গীরণ করে।

ভবতোষ আর কুমকুমরা একই বাড়ীর দুটি ফ্ল্যাটে পাশাপাশি ভাড়া থাকতো। সে দশ-বারো বছর আগের কথা। ভবতোষের তখন সবে গল্পলেখক বলে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। কুমকুম ছিল ওর গল্পের নিয়মিত পাঠিকা। যে পত্র-পত্রিকায় ওর গল্প প্রকাশিত হতো আগেই কুমকুম তা পড়ে দেখতো তাকে নায়িকা করে ভবতোষ এবারের গল্পটা লিখেছে কিনা। কেমন করে তার মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে ভবতোষ গোপনে তাকে ভালবাসে। তাই যখন তখন ওর লেখার ঘরে এসে সোহাগ-উথলানো স্বরে বলতো, কি, আমায় নিয়ে একটা গল্প লিখলেন না। কবে লিখবেন? কেবলই ত বলেন, যথাসময়ে লিখবেন। এমনি করে ত তিন বছর কেটে গেল! তারপর একটু থেমে অভিমানস্ফুরিত ওষ্ঠে বললে, আমি মরে গেলে বোধহয় লিখবেন!

চটে ওঠে ভবতোষ। দেখো কুমকুম, তোমার সঙ্গে এ নিয়ে তর্ক করার প্রবৃত্তি আমার নেই! বব্‌ করে চুল ছাটলে, আর মুখে রঙ মেখে চোখে কাজল দিয়ে নিত্য-নতুন 'বয়ফ্রেণ্ডের' সঙ্গে সিনেমাতে, রেষ্টুরেন্টএ কিংবা লেকে হাওয়া খেতে গেলেই আধুনিকা হওয়া যায় না! এর চেয়ে ওই যারা মুখে রঙ মেখে সান্ধ্য-বেলায় গলির মুখে দাঁড়িয়ে থাকে তারাও ঢের ভালো। তাদের তবু বুঝতে পারি। তারা উপার্জন করে পেটের দায়ে।

অগ্নিশিখার ওপর যেন ঘৃতাহুতি হলো। অপমানে কুমকুমের সর্বদেহ কাঁপতে থাকে। বলে, ছিঃ আমার সম্বন্ধে তাহলে আপনার মনের ধারণা এই!

হাঁ। উত্তেজিত হয়ে ওঠে ভবতোষ। যদি সাহস থাকে ত জবাব দাও আমার কথার। বলো, সত্যি। এই তিন বছরে অন্ততঃ তোমাকে মিশতে দেখেছি তিন ডজন যুবকের সঙ্গে! বলো তাদের সঙ্গে সাজ-গোজ করে তুমি কোথায় যাও। তাদের সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক! তারা কি তোমায় নিয়ে গিয়ে গীতাপাঠ করে? কতক্ষণ তোমার সঙ্গ মানুষের ভাল লাগতে পারে? কি তুমি জানো! আজ তিন বছর ধরে দেখছি আই-এ সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ছো। বই নিয়ে শুধু কলেজে যাও আর আসো। না পড়েছো কোন বাংলা সাহিত্যের ভাল বই, না জানো ভালো করে কথা কইতে। না বোঝো গান-বাজনা—না জান ললিত-কলা। একমাত্র সস্তার হিন্দী আর বাংলা সিনেমা দেখো, তাও শুধু তার গানগুলোর জন্যে? সেখানে গল্পের মধ্যে যেটুকু সাহিত্যরস তা গ্রহণ করারও ক্ষমতা নেই তোমার! সেইজন্যে একমাত্র দেহ ছাড়া আর তোমার কোন সম্বল নেই। কিন্তু দান করতে করতে সে-দেহ আজ দেউলে হয়ে গিয়েছে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারার দিকে কোনদিন তাকিয়ে দেখেছো?

মানুষের সহ্যেরও একটা সীমা আছে। কুমকুম আর পারলে না চুপ করে থাকতে। হঠাৎ মাথায়-লাঠিমারা কুকুরের মত চীৎকার করে উঠলো, ননসেন্স! আমার চেহারায় কিছু থাক বা না থাক, আপনাকে কেউ তার সমালোচনা করতে ডাকেনি! বলে একটু থেমে ভবতোষের মুখের ওপর যেন একমুঠো উত্তপ্ত বালি ছুঁড়ে মারলে। আপনার নিজের চেহারাটা কি, একবার দেখেছেন কি? কোন মেয়ে আপনাকে ভালবাসতে পারে না, কোনদিন। নিশ্চিত জানবেন।

বলতে বলতে ছুটে তার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সেই কুমকুমের সঙ্গে শেষ দেখা ভবতোষের। কারণ ভবতোষরা সেই মাসেই সে বাড়ী ছেড়ে দেয় এবং দক্ষিণ কলকাতা থেকে একেবারে চলে যায় পাইকপাড়ায়। এগারো বছর হয়ে গেল এখনো সেখানেই রয়েছে।

সেদিন রাত্রে 'গ্রিলনারী' হোটেলে খেতে গিয়ে আর এক নতুন অভিজ্ঞতা হলো ভবতোষের। বাজনার তালে তালে জোড়ে জোড়ে যে-সব পুরুষ ও রমণী দ্বৈত-নৃত্য করছিল, তাদের মধ্যে রয়েছে সেই পাঞ্জাবী যুবক ও সেই তরুণী যুবতী। দু'জনে দু'জনের কখনো হাত ধরে কখনো কোমর ধরে, পায়ে পায়ে, তালে তালে, বাজনার ছন্দে যেন ভেসে চলেছে। ভবতোষের চোখ দুটো বঁড়শির মত আটকে গেল সেই নৃত্যময়ী মেয়েটির দেহে। বঁড়শির টানে ওর চোখ দুটো তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। যতক্ষণ সে নাচলো ততক্ষণ খাওয়া ভুলে গিয়ে তাকিয়ে রইলো ভবতোষ তার

দিকে! আশ্চর্য, অদ্ভুত এই রমণী! মনের মধ্যে ঘুরে-ফিরে, কেবল এই কথাটাই পাক খেতে থাকে।

এর কয়েকদিন পরে, জলাপাহাড় থেকে নামছে ভবতোষ, এমন সময় নিকটেই ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দ পেয়ে থতমত খেয়ে এক পাশে সরে দাঁড়াল, দেখলে সেই তরুণীটি ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারছে আর ঘোড়াটা লাফাতে লাফাতে তীরবেগে ছুটছে। ঘোড়ার সহিসটা অনেক পিছনে পড়ে আছে। প্রাণপণে ছুটেও সে তার নাগাল পাচ্ছে না। মেয়েটি ছুটে ভবতোষের সামনে দিয়ে চলে যাবার সময় শুধু একবার আড়-চোখে তাকালে তার মুখের দিকে। সে-দৃষ্টির অর্থ ধিক্কার! ভবতোষের পৌরুষকে যেন ধিক্কার দিয়ে চলে গেল সে!

'মাউণ্ট প্লেজারী' হোটেলে উঠেছিল ভবতোষ। হোটেলটা কেবল নিরিবিলি নয়, যেমন পরিচ্ছন্ন তেমনি ভদ্র ও শান্ত পরিবেশ!

সেদিন বেশ রাত হয়েছে। ঘরে ঘরে আলো গেছে নিভে। মনে হচ্ছে সমস্ত বাড়ীটা যেন সুষুপ্ত, হঠাৎ মৃদু সঙ্গীত-ধ্বনি ভবতোষের কানে ভেসে এলো, একেবারে তার পাশের ঘর থেকে। লেপটা মুখ থেকে সরিয়ে, মাথাটা উঁচু করে উৎকর্ণ হয়ে রইলো। হাঁ। ঠিক তার পাশের কক্ষ থেকেই আসছে। ইংরিজী গানের একটা কলি গুনগুন করে কে গাইছে 'ওঃ ডার্লিং ইউ আর নট্ ফার ফ্রম মি!' কাঁপা-কাঁপা গলায়, স্পষ্ট মধুর কথা ও সুর। ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলো ভবতোষ! একি, এ যে সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর। তবে কি? না না। এই হোটেলে ত আজ পনেরো দিন আছে ভবতোষ, কখনো কি তাহলে দেখা হতো না?

পাশের ঘরে একেবারে একই দেওয়ালের ওপাশে সেই অসামান্যা তরুণীটি রয়েছে, ভাবতে ভাবতে সারা রাতে আর তার চোখে ঘুম এলো না। পরের দিন ভোর হলে, বেড্-টি দিতে এলো যে বেয়ারাটা তাকে জিজ্ঞেস করে ভবতোষ জানলে, তার অনুমানই ঠিক। মিসেস কাউর। কাল এসেছেন এই হোটেলে। তার স্বামী তিন দিনের জন্যে বিশেষ কাজে কলকাতায় চলে গিয়েছেন স্ত্রীকে এই হোটেলে রেখে।

ব্রেক্-ফাস্টের পর কালকের স্টেটস-ম্যান্' কাগজটা নেবার ছল করে ভবতোষ 'গুড্ ডে' বলে তার সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করে। একটা সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে সিগারেট খাচ্ছিল তরুণীটি। তার রংকরা নখ ও দুটো আঙ্গুলের ফাঁকে যে সিগারেটটা ছিল, তাতে একটা টান দিয়ে, ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ভবতোষকে বসতে বলল।

সেদিন রাত্রি যখন সাড়ে বারোটা, হঠাৎ তরুণীটি ভবতোষের দরজার কড়া নাড়লে।

'ইয়েস্ ম্যাডাম' হোয়াট কেন আই ডু ফর্ ইউ!' বলতে বলতে শশব্যস্তে ভবতোষ ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

তরুণীটি তখন মুখটা বিকৃত করে ইংরিজীতে বললে, তোমার কাছে কি 'এ্যাসপেরিন্' জাতীয় কোন 'ট্যাবলেট' আছে। আমার মাথার অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে।

সরি। আমার কাছে 'এ্যাসপেরিন্' নেই তবে 'এনাসিন্' আছে। যদি মনে করেন ওতে কাজ হবে, তাহলে—

—হাঁ —ওতে হবে। আমার স্বামীর ব্যাগে ওষুধ ছিল—সে ব্যাগটা নিয়ে চলে গেছে নইলে আপনাকে কষ্ট দিতুম না এত রাত্রে। ধন্যবাদ, বলে 'এনাসিন্'-এর প্যাকেটটা নিয়ে চলে এলো।

ভবতোষ বললে, যদি রাত্রে যন্ত্রণা বাড়ে, তাহলে আমাকে নিশ্চিত ডাকবেন আমি আপনার ওষুধ এনে দেবো।

থ্যাংক ইউ। বলে ঘরে গিয়ে শুলো তরুণীটি!

ঘণ্টা খানেক সব চুপচাপ। তারপর হঠাৎ 'ওঃ' বলে যন্ত্রণায় একটা অস্ফুট আওয়াজ করলে তরুণীটি। সঙ্গে সঙ্গে ভবতোষ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললে, মিসেস কাউর—কি কষ্ট হচ্ছে!

তরুণীটি দরজা খুলে বললে, একটা রুমাল দিয়ে আমার মাথাটা বেশ করে বেঁধে দিন ত। কিছুতেই ঘুম আসছে না। অসহ্য যন্ত্রণা। মাথা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। ভবতোষ ওর বিছানার ওপর বসে রুমাল দিয়ে বেশ করে মাথাটা বেঁধে দিতে সঙ্গে সঙ্গে যেন নিঝুম হয়ে ঘুমিয়ে পড়লো তরুণীটি। পাছে খাট থেকে নামতে গেলে বিছানাটা নড়ে উঠে ঘুম ভেঙ্গে যায়, সেইজন্যে আরো একটু অপেক্ষা করলো ভবতোষ বিছানায়।

একটু পরে যখন নেমে আসবে মনে করছে, এমন সময় আবার উঃ বলে একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলো মেয়েটি। ভবতোষ রুমালটা আরো শক্ত করে বাঁধতে গেলে, ওর হাতটা কপালের ওপর টিপে ধরলে তরুণীটি। ভবতোষ তখন ওর রগের দুটো পাশ টিপে নিঃশব্দে বসে রইলো।

রাত তখন বোধহয় সাড়ে তিনটে হবে। তরুণীটির ঘুম ভেঙ্গে গেল। চমকে উঠে বসলো সে। দেখে ভবতোষ ঘুমিয়ে পড়েছে ওরি বিছানায়। আর যে হাত দিয়ে ওর কপালটা টিপে ধরেছিল, সেটা ওর বুকের ওপর।

নন্সেন্স! বলে ওর হাতটা ঘৃণায় ঠেলে দিতেই অপ্রস্তুত হয়ে উঠে পড়লো ভবতোষ। বললে, এক্সকিউজ মি প্লিজ।' হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছি। সারাদিন ঘুরে ঘুরে শরীরটা খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল বলে সামলাতে পারিনি নিজেকে।

'দিস্ ইজ এ ড্যাম্ লাই!' তুমি ইচ্ছে করে আমার ঘুমের সুযোগ নিয়েছো। আমি এখনি লোকজন ডেকে আনছি। তুমি আমাকে 'এসাল্ট' করতে চেয়েছিলে।

ভবতোষের সর্বশরীর তখন ঘামে ভিজে উঠেছে। 'নো নো - প্লিজ্ ম্যাডাম্ —এক্সকিউজ মি। আই আসক্ ইয়োর পার্ডন।' বলে যেমন দুটো হাত তার সামনে জোড় করলে, অমনি মেয়েটির মুখের কঠিন রেখা ধীরে ধীরে কোমল হয়ে উঠলো। তবু কণ্ঠে কৃত্রিম রোষভরে সরল বাংলায় বললে, বলুন ক্ষমা করুন। বলুন? নইলে আমি কিছুতেই ছাড়বো না আপনাকে।

ক্ষমা করুন। কাঁপা-কাঁপা গলায় কোন রকমে বললে ভবতোষ।

শুধু এই কথা মুখে বললেই চলবে না। কাজে দেখাতে হবে।

বলুন, কি করতে হবে।

আমাকে নিয়ে একটা গল্প লিখতে হবে। আজকের রাতের এই কাহিনী। যার নায়ক আপনি, আর নায়িকা আমি। বলুন লিখবেন? প্রতিজ্ঞা করুন আমায় ছুঁয়ে। শেষের কথাটা জোরে বলবার সময় আর হাসি চেপে রাখতে পারলে না। খিল খিল করে যেন হাসির বন্যা বইয়ে দিলে। কি এখনো কি আমায় নিয়ে গল্প লেখা চলে না?

আপনি — তুমি ......হাঁ...... তাহলে বাঙ্গালীর মেয়ে......সেই...... কুমকুম?

না। কুমকুম নই। সে মরে গেছে। আমি মিসেস কুমকুম কাউর!

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

beulux
ANKAR
বিউলাক্সের
তুলনা নেই
পূজোর বাজার করার সময়
প্রথমেই মনে রাখবেন
বিউলাক্স
বিউটি ক্রীমের কোন বিকল্প ক্রীম টিউবে পাওয়া যায় না।
বিউলাক্স
একমাত্র বিউটি ক্রীম যা'র নিয়মিত ব্যবহারে মুখ ও দেহত্বকের সৌন্দর্য্যেরই শুধু বৃদ্ধি হয় না সমস্ত অবাঞ্ছিত দাগ নির্মূল হয়ে মুখ ও দেহত্বক উজ্জল, কমনীয় ও স্নিগ্ধ হয়।
বিউলাক্স
একমাত্র বিউটি ক্রীম যা' প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিকের (ডি, ফিল ও ডি, এস,সি) আবিষ্কার এবং শ্রেষ্ঠতম ভেষজগুণ সম্পন্ন ও ল্যানোলিন, ক্যালামিন এবং স্কীন ফুডের সমস্ত উপকরণ সহ তৈরী।
বিউলাক্স
বিউটি ক্রীম ফাউণ্ডেশন ক্রীম হিসাবে পাউডার ধরে রাখবার অপূর্ব প্রসাধন।
বিউলাক্স
বিউটি ক্রীমের ভেষজগুণ যা'তে নষ্ট না হয় সেজন্য মৃদু গন্ধযুক্ত করা হয়েছে।
আবার মনে রাখবেন বিউলাক্স
বিউটি ক্রীমের কোন বিকল্প নেই।
সুতরাং কেনার সময় বিউলাক্স
বিউটি ক্রীম-ই চাইবেন।
beulux
beulux
beulux
beulux
beulux

১৩৭০
শারদীয় অমৃত
সূচীপত্র

এবার পূজার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ

॥ অমলেন্দু ভট্টাচার্য ॥

রক্তরাগ

॥ হরেন ঘোষ ॥

শিখর স্বপ্ন ২·৫০

॥ দেবাচার্য ॥

ধর্মদন্ত্রা (মহাকাব্য) ৮·০০

॥ ঊষাদেবী সরস্বতী ॥

ধূলির ধরায় ২·৫০

॥ মদন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

পরপূর্বা ২·৫০

মধ্যাহ্নের গান (যন্ত্রস্থ)

॥ শক্তিপদ রাজগুরু ॥

মন মানে না ৩·০০

পথ বয়ে যায় ৩·৭৫

অবাক পৃথিবী ৩·৫০

॥ চিত্রগুপ্ত ॥

আমি চললাম হে ৩·০০

॥ মনোজিৎ বসু ॥

বেলাভূমি ২·৫০

॥ শিবদাস চক্রবর্তী ॥

মেঘ মেদুর ২·৫০

॥ শান্তি দাসগুপ্তা ॥

অগ্নিসম্ভবা ৩·৭৫

॥ শ্রীশ্রীমাধব রায় ॥

কিংবদন্তী (যন্ত্রস্থ)

॥ প্রভাত দেবসরকার ॥

আকাশপ্রদীপ ৩·০০

॥ মনোজ সান্যাল ॥

শ্বেত চন্দন ৩·৭৫

অনুবাদ সাহিত্য

আলবার্টো মোরাভিয়ার
WOMAN OF ROME
এর বাংলা অনুবাদ

রোমের রূপসী
১ম খণ্ড ৪·০০

রোমের রূপসী
২য় খণ্ড ৫·০০

THE WAYWARD WIFE
-এর বাংলা অনুবাদ

স্বৈরিনী ৪·৫০

এমিল জোলার
HUMAN BEAST -এর বাংলা অনুবাদ

পাশবিক ৫·৫০

অনুবাদক :—প্রবীর ঘোষ

চলন্তিকা প্রকাশক

২১২।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

● কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই।

কার্ল মার্কস, ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধ ১·৫০

উপনিবেশিকতা প্রসঙ্গে ১·৫০

ভি আই লেনিন

প্রাচ্য জনগণের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন ১·১২

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র প্রসঙ্গে ০·৮১

*

মিখাইল শলোখফ

ধীর প্রবাহিনী ডন ৯·০০

সাগরে মিলায় ডন (১ম খণ্ড) ৬·০০

সাগরে মিলায় ডন (২য় খণ্ড) ৭·০০

ইলিয়া এ রেনবুর্গ

পারীর পতন ৮·০০

নবম তরঙ্গ
১ম খণ্ড ৪·৫০। ২য় খণ্ড ৬·০০। ৩য় খণ্ড ৭·৫০

॥ লোক-বিজ্ঞানের বই ॥

আন্দ্রেই বাখারেভ

ইভান মিচুরিন : প্রকৃতির রূপান্তরের মহান সাধক ০·৮৭

আলেক্সান্দ্র ভলকভ

পৃথিবী ও আকাশ ৩·৫৬

এল লান্দাও : ওয়াই রুমার

আপেক্ষিকতার তত্ত্ব ১·৫০

এম ভি বিয়েলিয়াকফ

বায়ুমণ্ডল ১·৭৫

এম ইলিন

শত সহস্র জিজ্ঞাসা ২·২৫

তিয়ের-ওগালিয়েজফ

সূর্যগ্রহণ ১·২৫

রুশ বিজ্ঞানকাহিনীকারদের

চাঁদে অভিযান ৩·০০

এফ আই চেস্তনভ

আয়নোস্ফিয়ারের কথা ১·৫০

* শারদীয় বিক্রয় অভিযান উপলক্ষে নিম্নলিখিত বইগুলির দাম কমানো হল। পিয়তর পাভলেঙ্কো : **জীবনের জয়গান**—(সুলভ সংস্করণ ১·০০) আলেক্সি তলস্তয় : **অগ্নিপরীক্ষা** : তিন খণ্ডে (৩ খণ্ড একত্রে ১৫্, পরিবর্তে ৫্) আলেকজান্ডার কুপরিন : **রক্তবলয়** (৫·৫০ পরিবর্তে ২·৭৫) লিওনিদ সলোভিয়েভ : **বুখারার বীর কাহিনী** (৬·৫০ পরিবর্তে ২·০০)

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ

১২, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিঃ ১২ ॥ ১৭২, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিঃ ১৩
নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর ৪

সূচীপত্র

বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
কবিতা		শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র, শ্রীবিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশান্তিকুমার ঘোষ, শ্রীকিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, শ্রীকৃষ্ণ ধর, শ্রীরাম বসু, শ্রীহরেন্দ্রনাথ সিংহ, শ্রীমৃগাঙ্ক রায়, শ্রীসুনীলকুমার নন্দী, শ্রীআলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শ্রীতরুণ সান্যাল, শ্রীপ্রমোদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমোহিত চট্টোপাধ্যায়, অনিল ভট্টাচার্য, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত, শ্রীশান্তি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমণীন্দ্র রায়।	
স্বর্ণসজ্জা	(উপন্যাস)	শ্রীমনোজ বসু	১০০-১২৭
ভালুক শিকার	(কাহিনী)	শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়	১২৮
আমি বৈজ্ঞানিক হলাম না	(গল্প)	শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	১৩০
ইউরোপের জিপ্সি সমাজ	(প্রবন্ধ)	শ্রীদিলীপ মালাকার	১৩৬
দেওয়া নেওয়া	(গল্প)	শ্রীপরিমল গোস্বামী	১৩৯
সুখ	(গল্প)	শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	১৪২
শহীদস্তম্ভ	(গল্প)	শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত	১৪৫
শাস্তি	(গল্প)	শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	১৪
পলাতকার প্রত্যাবর্তন	(গল্প)	শ্রীদীপক চৌধুরী	১৫
দোঁহে ডাকে দোঁহারে	(গল্প)	শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক	১৫
দুই বউ	(গল্প)	শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু	১৬
প্রবেশ ও প্রস্থান	(গল্প)	শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র	১৬
চলতি বাজার	(রম্যরচনা)	শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	১৭
দেহ ও মন	(গল্প)	শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ	১৭
মাদুলি	(গল্প)	শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল	১৮
দুই লেখকের স্ত্রী	(আলোচনা)	শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়	১৮
বাবা	(গল্প)	শ্রীবনফুল	১৯

পূজার আনন্দ উৎসব

প্রতিশ্রুতি

এখানে এসে জিনিষ কিনতে আপনার গায়ে লাগবে না।

সহজ এবং সামান্য টাকায় প্রতি মাসে কিস্তিতে নিয়ে আপনি আপনার সখের জিনিষ কিনতে পাবেন, আর সেই সঙ্গে বিনামূল্যে আপনি হয়ত কোন না কোন দামী উপহার পেতে পারেন।

১৯৬৩ সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর মাসে যাঁরা এখান থেকে জিনিষ কিনবেন তাঁদের 'লাকি' ক্যাশমেমো এবং 'লাকি' সর্তাবলীর সই করা কাগজে নিম্নলিখিত যে কোন একটি উপহার লাভ কোরতে পারেন। এগুলি সবই প্রয়োজনীয়। ফলাফল ঘোষণা হবে, ১লা নভেম্বর।
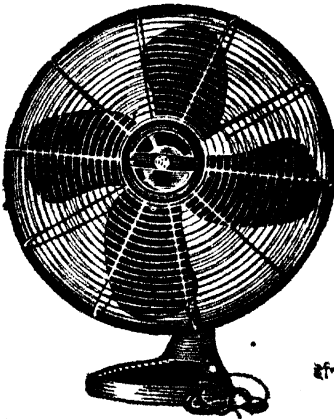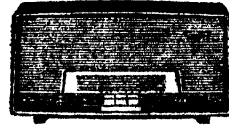
আরফি ট্রানজিস্টার রেডিও

হিমালায়

১) হিমালায় রেফ্রিজারেটর
২) আরফি ট্রানজিস্টার রেডিও
৩। ইণ্ডিয়া ইলেকট্রীক ফ্যান
৪) অলউইন স্টীল আলমারী
৫) হাই-ডোন প্রেস্টিজ কুকার

ইণ্ডিয়া ইলেকট্রীক ফ্যান

ইষ্টার্ণ ট্রেডিং কোং

২, ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।
২২-৩০৯৬ - ২২-৩৯৩৮

মাত্র ২৫৲ টাকা অগ্রিম আদায় দিয়ে একটি জনপ্রিয় অলওয়েভ রেডিও সেট ভোগ করুন।

সূচীপত্র

অঙ্গসজ্জা : শ্রীশৈল চক্রবর্তী, শ্রীসময় দে, শ্রীরেবতীভূষণ ঘোষ, শ্রীসূর্য রায়, শ্রীসুধীর মৈত্র, শ্রীঅজিত গুপ্ত, শ্রীধ্রুব রায়, শ্রীশ্যামল সেন, শ্রীসুব্রত ত্রিপাঠী, শ্রীস্বপন রায় ও শ্রীধ্রুবজ্যোতি সেন।

[দাম : তিন টাকা]

উৎসবের
দিনগুলি
আনন্দমুখর
করে
লিলি বিস্কুট
দুইটি জনপ্রিয় বিস্কুট
কার্নিভ্যাল
ও
থিন এরারুট
লিলি বিস্কুট কোং, প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা-৪

প্রচণ্ডদৈত্যদর্পঘ্নে চণ্ডিকে
প্রণতায় মে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি
যশো দেহি দ্বিষো জহি॥

শারদীয় অমৃত ১৩৭০

বর্ষা এলো, গেল। দেখা দিল নীল আকাশে শরতের আলোকে উদ্ভাসিত "শাদা মেঘের ভেলা"। তারপর আরম্ভ হ'ল আলোছায়ার ইন্দ্রজাল। দেখা দিল বর্ষার ঘন মেঘ তার পিছনে শরতের নীলিমা। প্রবল বর্ষণ, ক্ষণিকের নিবৃত্তি পরে উজ্জ্বল সূর্যকিরণ, এইভাবে চলল বর্ষা ও শরতের লুকোচুরি খেলা। ক্রমে শরৎ গেল হারিয়ে, আকাশ আচ্ছন্ন হল বর্ষার ঘনঘটায়। এবং এরই মধ্যে শোনা গেল আনন্দময়ীর আগমনীর শঙ্খধ্বনি। এখানে ওখানে, ঝড়বৃষ্টির ঝাপটার মধ্যে, বাতাসে ভেসে এলো আনন্দের উচ্ছ্বাসভরা সুরলহরী।

দেশের চতুর্দিকে রয়েছে অভাব-অনটনের চীৎকার। সাধারণজনের দেহমন দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা মিটাতেই শ্রান্ত, বিভ্রান্ত ও অবসন্ন। এদিকে মৎস্যহীন শাকান্ন ভোজন—তাও যদিবা এবেলায় অন্নভোজন তো ওবেলা গোধূম চর্বণ—স্নেহপদার্থশূন্য টোনঠাসা-টানাদুগ্ধযোগে শর্করা-বর্জিত চা-পানে তৃষ্ণা দূরীকরণের বৃথা চেষ্টা। অন্যদিকে কর্মস্থলে যাওয়ার যানবাহনের দুরবস্থা, এবং সেইসঙ্গে বর্ষার ঝড়ঝাপ্টা! এইভাবে দিনগত পাপক্ষয়ের অসম প্রয়াসে লোকের মন তিক্ত-বিরক্ত। সর্বোপরি পঞ্জিকা-বিভ্রাটের ফলে ছুটি-ছাটারও অভাব এবং সেইসঙ্গে টাকার প্রশ্ন, বোনাস, আগাম-প্রাপ্তির প্রশ্ন তো আছেই।

এই সবের মধ্যে পূজা—সে যেন উৎসবের পূর্ণ আয়োজন হতে না হতেই করুণ অশ্রুভরা বিদায়ের পালা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই শোনা যায় অচিরে পুনরাগমনের বার্তা। এবারের শারদীয়ার এটাই হ'ল বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সে বৈশিষ্ট্য কি শুধু জ্যোতির্বেত্তাগণের মতভেদের ফলে?

মাগো, দুর্গতিনাশিনী! তুমি কি তোমার সন্তানগণের দুঃখ-দুর্দশা চরমে উঠেছে দেখেই, তাদের আশাহত মনপ্রাণে নতুন ভরসা দেবার জন্যই, এইভাবে এলে, গেলে, এবং আবার ফিরে এলে? দাও মা, দেশের আবাল-বৃদ্ধবনিতার দেহমনে জীবনপথে অগ্রসর হওয়ার ধৈর্য ও শক্তি। তরুণদের হৃদয়ে দাও আত্মবিশ্বাস ও সামর্থ্য, দীপ্ত কর তাদের ললাটে যৌবনের জয়তিলক।

ঘোড়া হাটের পালা

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

।। চিত্রকর চিত্র দর্শান ।।

ও দেখেন দেখেন চিত্রে দেখেন
রথের ঘোড়া কাঠের ঘোড়া,
জলকলের জল পী পী ঘোড়া,
বাজি ঘোড়া তাজি ঘোড়া,
বর্মী পনি আরবী ঘোড়া,
ছকড়া গাড়ির নেংড়া ঘোড়া
জোড়া জোড়া জুড়ে আছেন,
খেংরাপটির অলি গলি—
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি।

।। হরিশ, হাটুরে ও বাটুরের প্রবেশ ।।

হাটুরে। ঘোড়া-হাট জমলো কেমন?
বাটুরে। ওহে হরিশ ঐ!
হরিশ। ঘোড়া কিনতে এলো ময়রা বুড়ো
রথ টানাবে তের চুড়ো।
রথ-তলায় ভারি কান্ড রৈ রৈ,
ঢাক বাজে, ঢোল বাজে, লোক হাঁকে
পথ চলায় কাদা থৈ থৈ।

হাটুরে। এই মরেছে, নায়েব এয়েচে।
বাটুরে। নাস্তের কাঁড়ির মাথা খেয়েছে।
হাটুরে। নে কলকিটা ফুকে নে
হরিশ। বানরে শুনছি ধরবে ধ্বজা
চল দেখি গা রথের মজা।

।। নায়েব মশায়ের প্রবেশ ।।

নায়েব। উঃ উপরে সূর্যের তাপ নীচে মরু বালি
সর্বে ফুল দেখিতেছে চক্ষের পুতলী।
কেন্দোতেলোটা গরম হয়ে উঠল, বলি ও হরিশ, হাট জমলো কেমন? কও তো কে কে আসলো?
হরিশ। গোমসামুখো গোরে ওঝা
মোলা বিকোয় পয়সা জোড়া।
ঘোমটা তোলা বামন বৌ
নিলে কোমা-ক্ষীর দেড় পোয়া,
আটগাছা গালায় চুড়ি রাং মোড়া,
সিঁদুর কৌটো দুটো জোপালিস নক্সাতোলা,
শাড়ি রংচঙে মাহি দুটি,

ভোমরা পাড় চৌডারা,
আট পোরে মোটা গড়া
চার বৌউর চার জোড়া।
ওঝা নেয় চৌদ্দ পোয়া এক বিঘত
এক লাঠি বেউড় বাঁশের
আর যাস-তেল এক তোলা।
কৌশল দাঁ তৌশিলদার
তোলা ওঠায় মোট বাঁধে
লোক ডাকে ও ঔ থাকে থাকে।
মহুয়াতলার কাবলীঅলা
ভোলা ময়রাকে বয়েৎ শোনায়
—ওয়াশিল ওয়াকিব মৌকা
ঔভার বেহাল।
ব্যাপারি কাহার টাঁপারি বেচে
র‍্যাপার কেনে বেছে বেছে।
মোড়াতে বসে ওমেশ মন্ডল
পড়ে কথামালা—
কখন চেঁচিয়ে কখন আস্তে,
গড় গড় চলেছে যেন রেল গাড়ি
কর্মনাশার পুলের পর দে।
ঘুটে ভাজে বেগুন পোড়া
গোবরা মানে হাঁসা ঘোড়া।

।। ভোলানাথের প্রবেশ, সঙ্গে পিলে ।।

ভোলা। নমস্কার লাইব মশায়।

নায়েব। বলি, ও ভোলানাথ, তেরো চুড়ো রথ বার করেছ শুনলাম। টানাবা কি দিয়া?

ভোলা। এই ছোট-কুটুমের সখ। বলে কিনা ঘোড়া দিয়ে রথ টানা চাই। ঘোড়াই বা পাই কোথায়, চাবুকই বা পাই কমনে বলেন?

নায়েব। ঘোড়া-ঘাটের হাটে ঘোড়ার অভাব? রোসো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি ঘোড়া! ও গোবরা—একটু চড়া দর যদি হাঁকো তো ঘোড়া তোমার। কৈলেস গোঁসাই লেগেছে, তার পেতোল গোপালের রথ টানাবে।

ভোলা। তাহলে কর্তা ঘোড়া তো আমি পাইনে। কপালেতে ঢেঁকি চড়া, আমার কেন হবে ঘোড়া?

নায়েব। তুমি হলে আমাদের জানিত লোক। তোমার দাবি আগে। বাদশাবাবুর টাটু যাকে-তাকে দেবো নাকি?

পিলে। কৈলেস গোঁসাইটাই লেবে ঘোড়া। অগাধ বিষই তার, আমরা কি তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারি কর্তা?

নায়েব। একটা বোঝা-পড়া করে ঘোড়াটা নিয়ে নাও গা। মনিব খুশী হয়ে যাবেন। পাড়াশুদ্ধ দেখে অবাক হয়ে চেয়ে থাকবে—হাঁ ভোলানাথ রথ দিয়েছে বটে।

ভোলা। আমার জমীটুকু খালাস করে দেন—ঘোড়া নিয়ে আমি চলে যাই—রথ টানাই, ঘানি টানাই, যা পারি।

নায়েব। সে তো ঠিকই হয়ে আছে গো। ঐ ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে একদিন কাছারিতে এসো রথযাত্রার পর, বুঝলে? চলি একবার গো-হাটার দিকে। এস হে হরিশ—ভোলানাথকে ঘোড়াটা দেখিয়ে দাও গা, ভিড়ে কোথায় ঘুরবেন উনি।

ভোলা। আজ্ঞে কিছু প্রয়োজন নাই, আমি একাই যাচ্ছি। ঘোড়া চিনে নেবো। আস, আস, পিলে।

[সকলের প্রস্থান

।। ছেকড়া ও নেংড়া ঘোড়ার প্রবেশ ।।

ছেকড়া। ওখরঃ ওখরঃ ওখরঃ খড়ঃ খড়ঃ খড়ঃ!

নেংড়া। ঘাড় নড় বড়ঃ, দাঁত পড় পড়ঃ, হাড় জিজ্জির জর্জরঃ!

।। কাঠের ঘোড়ার প্রবেশ ।।

।। পদ্য ।।

জল পী পী কাঠের ঘোঁড়া
সোয়ারি বিনে রয়েছি খোঁড়া
রোদে পুড়ি জলে ভিজি
দানা না পেয়ে করছি চিঁ চিঁ।
সোয়ারি পাই খোস-মেজাজি
সফরে যাই এখনি আজই।
আজ শহর ফিরতে যাই
তাজব মহলে সেঁধোই ভাই।
সেখানে রাজার অশ্বশালে
থাকি পক্ষীরাজের হালে।
চিবোই সোনামুগ চিরনি দাঁতে
বেড়াই ছাতে চাঁদ্নি রাতে।
ডানা কাটা পরী যার সহচরী
সে চেনে আমারে ছানা বিদ্যাধরী।
ছাদের পরে থাকি, চাঁদের আলো খাই
নিঃসাড়াতে আমি সারারাত কাটাই।
কাগ ডাকতে আস্তে আস্তে
চলি এ হাটে সে হাটে বিচালি মোড়া।

।। ছকড়া নেংড়ার গীত ।।

তাড়-পতড়াই সিপাই কি ঘোড়া
কুছ নাহি হো তব্‌ভী থোড়া।
ছক্কর হরিহর ছত্তর।
দপ্তরখানার নেংরা ঘোরা
কাক্ক দিলাম বিস্তর।
খেয়ে কুটি আর খড়,
এ ষাটি বচ্ছর
করে চলাচলি বহুৎ থোড়া,
গিয়াছি চীন তাতারে,
ঝিন্দ নেপালে বিন্দাবনে
এবারে পড়লেই হয় শকটে জোড়া।

।। সকল ঘোড়ার নৃত্য গীত ।।

হাটের ঘোড়া বাটের ঘোড়া,
কাঠের ঘোড়া জোড়া তাড়া।
বাজি ঘোড়া তাজি ঘোড়া
ল্যাজ দুলে দুলে লাল নীল ঘোড়া।
ল্যাজ আপসাই,
সোয়ারি সহিস কারো দেখা নাই,
আপন মনেই চরে চরে খাই।
খাই দাই কাঁসি বাজাই
লাত চালাই জোড়া জোড়া
থোড়া যদি ঘাস দানা পাই
গুঁড়াই শিল নোড়া।

[ঘোড়াদের পলায়ন

।। ঘোড়ার দালাল, ভোলানাথ ও পিলে ।।

দালাল। ঘোড়াটা একবার দেখলে হতো না?

পিলে। আমি জানি সেটা খোঁড়া। খেঁদুবাবুকে নিয়ে শিকারে যেতে পাগলা কুকুরে কামড়ে একটা পা জখম করেছে।

ভোলা। বাকি তিনখানা পা তো আছে, কাজ চলবে না?

পিলে। তা চলতে পারে একরকম।

দালাল। ঔষধপত্র করলে আর একখানাও ভাল হতে কতক্ষণ! কিছু তুঁতের খরচ—বস্।

॥ ওমেশ মণ্ডলের প্রবেশ ॥

ওমেশ। বলি ভোলানাথ, ভাল আছ? রথের সাট কিনলে বুঝি! দিব্যি কাঠের ঘোড়া এসেছে, এক জোড়া নিয়ে ফেলগা রথ টানাবে।

পিলে। একটা জ্যান্ত ঘোড়ার চেষ্টায় আছি। মস্ত রথ কিনা ঘোড়া না হলে—

ওমেশ। দেখ না, জ্যান্ত ঘোড়া একটা যদি পাও তো ঐ কৈলেসের থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়।

ভোলা। একটা ঘোড়া পেয়েছি, কিন্তু একটা পা কুকুরে কাটা।

ওমেশ। সে কিছু নয়। খুব ভালো ওষুধ পেয়েছি—এই দেখ। কথামালা উনপঞ্চাশ পৃষ্ঠায় বিদ্যাসাগর লিখেছেন—কুকুর-দষ্ট মনুষ্য—এক ব্যক্তিকে কুকুরে কামড়াইয়া দিল—তারপর, যাক গে, হাঁ—যদি ভাল হইতে চাহ, আমি যাহা বলি তাহা কর।

ভোলা। পিলে শুনে থাক।

ওমেশ। যদি ভাল চাহ—ক্ষতের রক্তে রুটির টুকরা ভিজাইয়া যে কুকুর কামড়াইয়াছে তাহাকে খাইতে দাও।

ভোলা। চাপাটি না পাউরুটি?

ওমেশ। নিশ্চয় পাউরুটি। হিন্দু হয়ে বিদ্যাসাগর কি আর ওটা খুলে লিখবেন?

ভোলা। এই তো ভাবনাতে ফেল্লেন—কোন কুত্তোতে কাটলে জানি কি প্রেকারে?

দালাল। কাচারির চেনা কুকুর একপাল, তারি মধ্যে ওটাও আছে।

ভোলা। দেড় কুড়ি কুকুর—রুটি যোগাতে নিজের আহার মাটি।

পিলে। তারপর রুটির লোভে সব কটা এসে ঘিরে ধরুক তখন ঘোড়াশুদ্ধু সবংশে নিপাত।

ওমেশ। আহা লিখেছেন, তুমি নিঃসন্দেহে ভাল হইবে। বিদ্যাসাগর যা তা লেখেন নি। রুটির ভাবনা নেই, রুটিওলা আমার হাতে আছে, আমাদের সমসুর চাচা সে।

ভোলা। মানুষকে কাটার কথা লিখেছে, ঘোড়াকে সে ওষুধ খাটবে কেন?

ওমেশ। ঘোড়াতে মানুষে কি তফাৎ আছে গো—ঘোড়া ধরে পিঠে জিন, মানুষ ধরে পেটে জিন। মন-এ অশ্ব জোড়ো হবে মনুষ্য। মনুষ্য থেকে মন বাদ দাও বাকি রইলো অশ্ব। হিসেব বোঝো না? এই দেখ সাতচল্লিশ পৃষ্ঠা কথামালায় অশ্ব বলছে অশ্বারোহীকে—ভাই! হরিণ আমার বড় অপকার করিতেছে। জাত-ভাই না হলে এ কথা কেউ বলে থাকে? মানুষে যে নানা রকমের আছে গো—যত প্রকার জানোয়ার তত প্রকার মনুষ্য। 'প্রতাপসিংহ' 'রামসিং' 'হংসরাজ'। অত কথায় কাজ কি—'পশুপতি'—আর চাই কি! চলি এখন কাজে।

দালাল। চলেন—আমিও চলি নায়েব মশার বাসায়।

ভোলা। পিলে, একগাছ কথামালা নিয়ে চল ঘোড়াটা ডাকাডাকি করা যাক্‌গা।

[সকলের প্রস্থান

॥ কৌশল দা ও নায়েব মশা'র প্রবেশ ॥

নায়েব। এস একটু চালাটার তলে বসা যাক। আষাঢ় মাসের ধূপ বড়ই তেজস্কার। পেয়াসের জোরে প্রাণ করে হাহাকার। ঘোড়াটার কি হল হে কৌশল?

কৌশল। এই এখনি ডাকাডাকি শুরু হবে। এই যে মোড়লমশাই আসছেন।

॥ ওমেশ মণ্ডলের প্রবেশ ॥

নায়েব। এদিককের কত দূর?

মোড়ল। মাছ ঠিকরেছে। কুকুর-কাটা শুনে ভড়কেছিল, এক কথামালা, রসমঞ্জরী আর নামাবলীতে কাজ হাসিল পনের আনা। এখন আমার ছাওয়ালটার কাজটা যাতে—

নায়েব। সে হয়েই আছে জানো। ঘোড়াটা গছাতে পারলেই হয়, হুকুম নেওয়াই আছে।

মোড়ল। পিলে গোবিন্দটা বাগড়া দিচ্ছে, না-হলে এতক্ষণ গেঁথে তুলতেম। বেন্দাবনকে কৌলেস গোঁসায়ের কাছে পাঠাতে তবে আসছি।

॥ বিন্দাবনের প্রবেশ ॥

কৌশল। কি হল বিন্দাবন?

বিন্দাবন। আসছেন, টোপ গিলেছে।

নায়েব। দেখ, টোপ গিলে না ছেড়ে যায়!

বিন্দাবন। তার যো কি? এক গান আছে।

নায়েব। গাও শুনি।

॥ গীত ॥

তবে কি বঁড়শি খেতো, টোপ গিলিত
মাছের যদি মন থাকিত।
ও সে একবার টোপ গিলিয়ে ছুটে গিয়ে
আবার এসে না গিলিত।
গলাতে বঁড়শি হানে ছিপের টানে
ছটফটানি অবিরত
কাঙ্গাল কয় মানুষ হয়ে মন হারায়ে
হলেম আমি মাছের মতো
হয়ে লোভের অনুগত।

মোড়ল। ওউ ভিস্তি, বড় ধূপ চলারে। সামনেটায় জল ছিটায়ে দেও।

॥ ভিস্তির প্রবেশ ॥

ভিস্তি। মুশয়, আস্তাবোলমে পানি দিয়া, বাগিচামে পানি দিয়া, বৈঠকখানামে পানি দিয়া। মুশয় মুশয় পানি বিনা ঘোড়া মর যাতা। বেগর পানি ফুলবাগিচা শুকাই যাতা।

নায়েব। এখানটায় একটু জল। তোমার ফুল-কপির বাগিচায় পরে জল দিও শীতকালে। ঠান্ডা হয়ে আমরা বাঁচি, দাও জল ছিটান।

॥ ভিস্তির গীত ॥

শীতল শীতল পানি ছিটল
মিঠল মিঠল লহর পানি।
গঙ্গা পানি ভরল নিল
বম্বা পানি ছিটল দিল,
মোশক মোশক মুছয় মুছয়।

নেপথ্যে। ঘোড়া পালালো—ধর ধর ও ধর ধর ধর!

॥ যদু মাষ্টারের দ্রুত প্রবেশ ॥

যদু। আই কম্ বাই-কম্ তাড়াতাড়ি
যদু ডাক্তার তাড়াতাড়ি
হর্স রাণ প্যাকড়ান
কম্ কম্ কম্ কম্ জল্‌দি কম্
পা পিছলে পচাৎ দম্।

॥ মোণ্টা সহিসের প্রবেশ ॥

মোণ্টা। এঃ জল ছিটায়ে কাদা করচে।

মোড়ল। ও রে ও মোণ্টা, ঘোড়া পালালো কি দৌড়ে ধর।

কৌশল। হ্যাঁ দেখ, কথা কয় না—হল কি তোর?

মোণ্টা। নায়েব মশয়, বিচার করেন ঐ যদু মাষ্টর—

যদু। ডাক্তার বল! বল আমার দোষটা কি হল? ঘোড়া নিয়েছি ভাড়া, তার পিঠে বসবো, ছাওয়াতে বসবো এর আবার বিচার কিসের?

মোণ্টা। গোরাই নেলেন ভাড়া। এক পিঠ চড়লেন ভাড়া দেলেন, কিন্তাম ছাওয়া তো ভাড়া দেই নাই। গোরার প্যাটের তলায় বৈসেন কি হেছাবে? দ্যান এহন, ডবল ভাড়া।

যদু। তোমার ঘোড়া? ভাড়া দিতে হয় কাছারিকে দেবো—কাছারির ঘোড়া, সবাই জানে!

নায়েব। তকরার রাখ, ঘোড়া ধর গিয়া, নয়তো দুই জনকেই দায়িক করছি।

॥ পিলে ও ভোলার প্রবেশ ॥

পিলে। ঘোড়া ছেড়ে ভাড়া নিয়ে দুজনে ধুন্ধুমার বাধালে হাটের মধ্যে, ঘোড়া জল পেয়ে মারলে দৌড়।

ভোলা। এখন হাটের মাঝে হাঁড়ি ভাঙলো তো। ঘোড়া আমি খরিদ করতে এলাম, আর দেখি ঘোড়া দিলে চম্পট।

পিলে। চক্ষের নিমেষ ফেলাতে অদৃশ্য।

ওমেশ। ঘোড়াতো নয় পক্ষীরাজ। দৌড়োয় যেন হরিণ ছানা।

মোণ্টা। আমি জানিনে কর্তা? —হাঁসা ঘোড়া যাকে বলে—রাজ-হাঁসের মতো বাঁকা ঘাড়। হস্ত কলামীর দ্যাশ থিকে ছোট ম্যানেজার সাহেব ওকে জিমখানায় খেলা শিখাতি আনে—বিলাত যাবার দিনে হাজার টাকায় মনিবকে দিয়া যায়।

কৌশল। ঘোড়া তো ঘোড়া—পিঠে গদি দাগ, চলতে রাস্তা কাঁপিয়ে যায়।

বিন্দাবন। সাঁপ ভেঙ্গো উচ্চোশ্রবা ইন্দির রাজার।

।। গীত ।।

ইন্দির রাজার উচ্চশ্রবা,
চোখ দুটো তার রক্তজবা।
বাঘের থাবা চারখান খুরে,
হেক্কায় টপকায় সাত সমুন্দুরে।
দুনিয়া টইলে দরিয়াই ঘোড়া
দুলকি চলে চমকি ঘোড়া।
দুম হিলাতে আসমান টলে
কপালে দাগা চন্দ্র-সভা।

ভোলা। এমন ঘোড়ার দাম না-জানি কত হবে।

ওমেশ। সৌখিন খদ্দের তো নেই যে হাজার দিয়ে নেবে। এখন এক একটা ক্ষুর যদি একশো করে হয় তো ঢের।

ভোলা। চারশো!

পিলে। মোটে তিনখানা পা, একটা তো না থাকারই মধ্যে—তাতে যা দৌড় দিয়েছে, খানায় পড়ে বাকি কটাও না যায়!

কৌশল। ওগো শালের জোড়া আর সেফায়ের ঘোড়া—কিছু না থাকলেও থাকবে ঘোড়া।

যদু। সেফায়ের ঘোড়া! আমি মাসে পাঁচ সিক্কেতে ভাড়া করে ঠেকেছি—যাকে বলে ছক্কড়, তাই।

নায়েব। বলি মাস্টার—ছক্‌কড় কথায় কটা ছ কটা ক কটা ড-রে শূন্য ড় আছে বলতে পারো? না না বলে ফেল লজ্জা কি—এখনি হাই ইস্কুলে কাজ পেয়ে যাবে।

ওমেশ। বুঝে শুঝে কথা কইতে হয় হে মাস্টার।

কৌশল। ঠিক আছে তোমার ঘোড়াটাতে, পষ্টাপষ্টি ডাক দাও, খদ্দের ভাগাতে চাও কেন? তোমার ডাক পাঁচ সিকে এই তো কথা?

ওমেশ। আমার বিড় রইলো—হাত আনেন, বুঝলেন—এই!

ভোলা। তার উপর আর পাঁচ আমার ধরেন।

কৌশল। কি প্যালারাম চুপ যে, ডাক দাও।

পিলে। ধরেন আরো এক

ওমেশ। আমার আর পাঁচ। গোঁসাই কোথায়?

মোণ্টা। দেখেন দাঁ মশয়, আমি গরীব, আমার হাতের ঘোড়া কিছু ছেড়ে ছুড়ে আমাকেই দেন।

ভোলা। ঘোড়া কেনে না, ঢেঁকি কেন গা। রইলো আমার আর পাঁচ।

পিলে। বস্ হাতের পাঁচ। হয় তো দেন, নয় তো চলি।

।। কৈলেস গোঁসায়ের প্রবেশ ।।

কৈলেস। ডাক হয়ে গেল নাকি? আমার যে দরকার রথের জন্যে!

ভোলা। ও গোঁসাই দাস, ছুতার-বাড়ি কাঠের ঘোড়া ফরমাস দাও গা। চলেন দাঁ মশয়, টাকা বুঝে লবেন।

পিলে। ঘোড়া যে পলাতকা!

ভোলা। পলাতকা? যাবে কোথায় তিন পায়ে? ছুটে ধর গিয়া! চলেন দাঁ মশয়।

গোঁসাই। বলি ঘোড়াটা কত্তে গেল?

ভোলা। সে খবরে তোমার প্রিয়োজন?

গোঁসাই। ওরই জোড়াটা বিক্রি হয়েছিল কিনা গত বছর—তাই শুধোচ্ছি। আমিই তো সেটা নিয়েছিলাম।

কৌশল। জোড়া কি কও? যা ঘোড়া নিলেন ভোলানাথ—জুড়িই মেলে না, তার আবার জোড়া!

মোণ্টা। দাম জেনে কি করবেন? জলের দরে গেল—লেজের দামও উঠল না।

নায়েব। যাও, এখন পলাতকা ঘোড়াটাকে ধর গিয়া।

।মোণ্টার ও পিলের প্রস্থান

বলি যদু, ঘোড়া হল জমীদারের কাচারীর, তুমি সেটার পিঠে চড় কি হিসেবে?

যদু। মোণ্টা ভাড়া খাটায় কোন হিসাবে, কার হুকুমে তাই কন।

কৌশল। এখানে হুকুম দেবার মধ্যে আছেন এক যদু মাস্টার, আমরা আছি ও'র হুকুম হাকাম তামিল করতে।

নায়েব। ঠিক বলেছ ঠিক!

।। ঘোড়া নিয়ে মোণ্টা ও পিলের প্রবেশ ।।

পিলে। ধরেছি—ঘুরে ফিরে ঠিক আস্তানায় যেখানকার সেখানে দাঁড়িয়ে বিচালি খাচ্ছে আর খোঁড়া পায়ে তাল দিচ্ছে দেখি। দৌড়ে একটু থকে গেছে।

মোণ্টা। ও হো বেটা ঠান্ডা হো, ও হো!

ওমেশ। ওকে একটু ঘাস আর দুখান জিলাবি দাওগা ভোলানাথ, আর সেই অষুধ, বুঝলে? কর্মনাশার পুল পেরিয়ে তবে জল খেতে দিও।

যদু। জল দেখলে ফস্ করে হায়দার ফোবিয়া চাগাতে পারে।

ভোলা। নায়েব মশায় যা দাম চাইলেন তাই দেলাম, এখন আমার অদেষ্ট আর আপনার কীরপা। খুশী থাকবেন আমার পরে।

পিলে। এবারে পুজোয় সন্দেশ সরবরা করবো আমরা। বাবুর জন্যে একটা সন্দেশের ঘোড়া বানিয়ে আনবো।

নায়েব। এ তো খুশীর বিষয়। ও হে কৌশল, পুজোর পূর্বে মনে করে দিও।

।। বিন্দাবনের গীত ।।

ভাল-ব্যাপার হল এবার
হটু গোলে হাট ভাঙিল
কেউ করিল দুনো ব্যাপার।
কেউবা মূলে সব হারালো
পূরলো কারো মন-আশা
কারো দুঃখ মনেই রইলো।

।সকলের প্রস্থান

।। ঘোড়া লইয়া ভোলা ও পিলে ।।

ভোলা। ওরে পিলে, লেজ মোড়া দে না কসে।

পিলে। এ কি গরু যে লেজ মলবো আর চলবে?

ভোলা। তুই সামনে আয়—কান দুটো মুচড়ে ধর দেখি কেমন না চলে।

পিলে। কেমড়ে দেবে। বাপরে ল্যাং মারচে।

ভোলা। ধর না চেপে—বাগডোর পালাতে চায় যে।

।। ভোলার গীত ।।

হো প্যালারাম দড়াটে ধর।
আমি ল্যাজ মলি তুই কানটা মল।
এ যে দুষ্টু ঘোড়া কামড়াতে চায়
কান দুটো ওর মুচড়ে ধর।
ঘোড়া নিয়ে হল বড় দায়
ডানে চালাইতে ঘোড়া বামে যেতে চায়।
ভাবলেম নেবো ঘর—
মনোহর অশ্ববর!
কাজ দিবে বিস্তর তিন পায়—
রথ টানায়, ঘানি টানায়।

এখন সে চলতে এলে মাথা চালে
অনিচ্ছাতে ঘাড় বাঁকায়।

।। হাটুরের প্রবেশ ।।

হাটুরে। টানা হেঁচড়া কর কেন? চড়িয়ে দাও সওয়ারি। পেটে কিছু নাই, পিঠে চাপ পড়লেই সোজা চলবে, হেলবে না দুলবে না।

ভোলা। পিলে, আমি চাপি, তুই লেজ মোড় দিতে দিতে চল তালতলী ঘুরে।

।। গীত ।।

সেই তালতলী বাঁধ অল্প জল
ছাপা ছৈ নাল ফুলে,
খেজুর গাছে লেজঝুড় পাখী
ডাক দিয়ে দিয়ে দোলে।
বলেরে সই ঘাটে কে ঐ—

।। শৈল ও হৈমর প্রবেশ ।।

শৈল। বলি ও হৈম!

হৈম। কি লা শৈল!

শৈল। দেখ দেখ বুড়োটা চলেছে ঘোড়ায়, আর ছেলেটাকে হাঁটাচ্ছে। দয়া মায়া নেই গা?

হৈম। বুড়ো বয়েসে পটের থোক
হেসে মলো পাড়ার লোক।

শৈল। আহা কি বা মুখের ছাই
তবু হলুদ মাখে নাই।

হৈম। আবার বুড়োর দাঁত বার করে হাসি দেখ!
দাদার বয়েসে খান না পান
দাঁত বার করে গেল পরাণ

শৈল। ওলো ও যে ভোলানাথ আর প্যালারাম। কুটুম্ব মানুষ চুপ চুপ!

হৈম। চুপ করবো কেন? বলি
ভেয়ের নাইকো মনে
বুদ্ধ কাঁদে বেত সাগরের বনে।

[প্রস্থান

ভোলা। ওরে পিলে বড় লজ্জা দিয়ে গেল। আয় বাপু তুই সোয়ার হ আমি হেঁটেই চলি।

।। পিলে সোয়ারির গীত ।।

দড়বড়ি ঘোড়া চড়ি হামি চলি যাও রে
সমরে চলিনু আজি হামে না ফেরাও রে।
হরি হরি হরি হরি বলি রণ রঙ্গে
ঝাঁপ দিবে প্রাণ আজি সমর তরঙ্গে।
ওই শুন বাজে ঘন রণ জয় বাজনা
নাচিছে তুরঙ্গ মোর রণ করে কামনা।
উড়িল আমার ঘোড়া, এরে না থামাও রে
দাও দুই কানে মোড়া কসে চাবকাও রে।

[প্রস্থান

।। পাঠশালার ছেলেদের প্রবেশ ও গীত ।।

অল্গাদ পাঁড়ে লঙ্গাট সিং
দাঁও প্যাঁচ ঝাড়ে।
ধরে মেড়ার শিং,
চলে তিং ভূং
তাল পাতার সেফাই নড়ে,
লাফালাফ গঙ্গা ফড়িং।

প্রথম। ও দেখ সত্যিই তালপাতার সেফাই আসছে রে।

দ্বিতীয়। ওরে পিলেটা ঘোড়ায় চড়েছে।

তৃতীয়। ও তারকদাস, পিলে তো বড় বেইমান—দাদাকে দিয়েছে ঘোড়ার রসি, নিজে হয়েছে সওয়ার।

চতুর্থ। তাই নয় নিজেও হাঁটো! চলেছে যেন কল্কি অবতার!

।। এক হাতে কাঠের ঘোড়া অন্য হাতে
দড়ি লইয়া ভোলার প্রবেশ, পিছনে তারক ।।

ভোলা। বলি ও ছেলেরা—দড়াগাছ একবার ধর। দেখো পিছলি হটতে দিও না। আমি থকে গেছি, একটু সামলে নিই! এঃ কাঠের ঘোড়াটা ভারি তো কম নয়। তারক—এটাকে ধরো একবার দাদা!

তারক। এ সব বুদ্ধি রথের সরঞ্জাম খরিদ হল! ঘোড়াটা একটু ছোট হল না?

ভোলা। দমে ভারি আছে। জ্যান্ত ঘোড়া থাকবে একদিকে, এটা থাকবে একদিকে জোতা! রথ আর হেলতে পাবে না।

।। পিলের প্রবেশ ।।

ভোলা। ঘোড়া থেকে নাবলি কেন?

পিলে। লোক হাসাহাসি করছে, নানান কথা উঠেছে।

ভোলা। কেন, কেন? আবার কি কথা উঠল? অ্যা?

পিলে। লোকে বলছে একালে বুদ্ধের সম্মান নেই—ছোট চলে ঘোড়ায়, বড় চলে হেঁটে।

তারক। এ তো ঠিক কথাই বলেছে। এমনিই তো হয়েছে কলিকালে!

।। গীত ।।

কাল হয়েছে কলি দুঃখের কথা বলি কায়?
আসল যা তা নকল হল, আজরে নকল বিকায়।
পুরাতন চাল কেউ পোঁছে না,
মুখে রোচে না নতুন বিনা।
মানামান পথে হাঁটে
কান-কাটা চাপে শিবিকায়!

ভোলা। যখন খালি ঘোড়াটা দুজনায় তাড়িয়ে চল্লেম, তখন লোকে বল্লে, নির্বোধ ঘোড়া থাকতে হেঁটে চলে, ঘর থাকতে বাবুই ভেজে। চড়লাম নিজে ঘোড়াতে—শৈল আর হৈম বল্লে—বুড়োর আক্কেল দেখ, ছোট ছেলেটিকে হাঁটাচ্ছে, নিজে যাচ্ছে মজায়। চড়ালাম পিলেকে, নামলাম নিজে—এখন বলে ওতেও দোষ। কার মন রাখি বল?

পিলে। অ্যা করতে ও চটে, স্যা করতে হঃ চটে!

ভোলা। দোকর সমিস্যে—আন ঘোড়া, দুজনেই চড়ি যা থাকে কপালে!

তারক। বুড়ো খোঁড়া ঘোড়াটাকে কি হত্যে করতে চাও অত ভার চাপিয়ে?

ভোলা। কি করি তাই বল—শ্যাম রাখি না কুল রাখি?

।। গীত ।।

শুনরে ভাই আমারে সবাই—
যা নয় তাই কইলে কি হবে
মিছে দাও লাজ, করেছি যে কাজ
তার কি উপায়, বল আজ সবে।
গোঁসা করোনা আমার কি দোষ
এরে তুষিলে ওর হয় রোষ
রাখি কার মন, ভাবি তা এখন
মানিব কখন যেমনি করে।

বলি ও তারক, তুমি লেখাপড়া শিখেচো—কথামালা পড়ে বল তো দাদা দোটানায় কিসে পরিত্রাণ পাই।

পিলে। টানা-হেঁচড়াতে ঘোড়ার সঙ্গে আমরাও মরি বুঝি।

তারক। বলি, ঘোড়াটি কার শুনি।

ভোলা। কেন—আমার।
পিলে। আমরা কিনেছি।
তারক। তোমাদের আচরণ দেখে তা তো বোধ হয় না। নিজের ঘোড়া হলে দরদ থাকতো। ওটার উপরে দুজনের ভার চাপিয়ে দম নিকলে দেবার পরামর্শ করতে না!
ভোলা। কি করি তাই বল এখন—

॥ গীত ॥

কি করি তাই বল এখন
যা হবার তা তো হয়েছে।
মিছে কেন দুঃখ দাও,
শত্রু আর কেন হাসাও,
গোল করে ঘোল ঢেল না মস্তকে।
ধরি তোমার দুটি করে
যা বলতে হয় বোলো স্বরে,
পরে জানতে পারলে পরে
লাজের কথা মস্ত যে!

তারক। কথামালায় বলাছে—ঘোড়াকে এতক্ষণ যেমন কষ্ট দিয়াছ, অতঃপর উচিত হয় উহাকে তোমাদের দুইজনে কাঁধে করিয়া লইয়া যাওয়া।
ভোলা। চল পিলে একখান বাঁশ যোগাড় করে কাঁধে তুলি বোঝা!
পিলে। লাত ছুঁড়বে যখন?
ভোলা। পা ক'খানা বেঁধে ফেলিলা তায়।

॥ সকলের গীত ॥

ঘোড়া চাল ও ভোলানাথ
আমরা সঙ্গে যাবো।
বাঁধবো ঘোড়ার চরণ কটি
নূপুর তাতে পরিয়ে দেব।
ঘুরিয়ে রাস্তার দেখিয়ে যাবো
কর্মনাশার খালের পারে।

[প্রস্থান

॥ তামাক-খেগো বুড়োর প্রবেশ ॥

॥ গীত ॥

মনের মাঝে দেখ বুঝে তামাক বড় মিষ্টি
দোক্তা গুড়ুক তামাকেতে রেখে দেছে ছিষ্টি।
তার চেয়ে দেখ ভাইরে হুঁকো বড় দোস্ত
আমির ওমরা সবাই আছে হুঁকোর উপর মস্ত
হুক্কা আর কলকি আর অম্বুরী তামাক
একসাতে হলে তবে খুস হয় দেমাক।
তামাক ও হুকোর পরে লোকে যত ব্যস্ত
দুনিয়াতে কোন কামে নাহি তত ব্যস্ত।

॥ ঘোড়া কাঁধে ভোলা পিলের প্রবেশ সঙ্গে বালক দল ॥

॥ গীত ॥

আগডুম বাগডুম ঘোড়াদুম চলে
ঝাজ মৃদং কাঁসর বলে।
নাচতে নাচতে দিয়ে তুড়ি,
আস্তে আস্তে চলছে ঘুড়ি,
কর্মনাশার পুলটার পার—
লোকের ঠেলায় যাওয়া ভার।
ঘোড়া চমকায় ঝাঁঝর বাজে,
লাগধুম লাগধুম ডঙ্কা সাজে।

বালক দল। চল চল তামাসা দেখিগে

[সকলের প্রস্থান

॥ অন্য এক দলের প্রবেশ, গীত ॥

বড় বান ডেকেছে কর্মনাশার
মানুষের কাঁধে ঘোড়া পারায়,
তোরা সব দেখবি যদি ছুটে আয়।
জলের ডাকে রোল তুলেছে,
বাঁধা ঘোড়া দড়া ছিঁড়েছে।
লাফ দিয়েছে সাঁকোর পরে
বিষম জলের তোড়।
ভোলারাম বুদ্ধিধর
পেলারাম থতমত।
অশ্ববরের মাথা টলে,
হুসা রবে ঝাঁপিয়ে জলে
পাঁকে পড়ে তলিয়ে যায়।

জনতা। ঐ যে, ঐ যে, ঐ গেল ভেসে, যা ভুস্,' লেজ উল্টিয়ে ফুস্।
—কই রে, কই রে, কই রে, ঘোড়া কই, একটা ঘোরঘোর দুস্।
—তোর যেমন চোখ নাই, দেখনা ঘোড়া দরিয়াই!
—দরিয়ার ঘোড়া গেল দরিয়ায়, আমরা চল ঘরে যাই ভাই!

[প্রস্থান

॥ পিলে, ভোলার প্রবেশ ও খেদ ॥

ওরে সব গেল রে দরিয়ায়,
যথা সর্ব ভাইসে যায়।
উচ্চশ্রবা উল্টে পড়ে
উজান জলে ঢেউ আছড়ায়
মোর আশার নৌকা ফাঁইসে যায়।
পাড়ায় পাড়া লোকে হাসে
মোরাই কাঁদি দুজনায়।
লাভ না পেলাম পুঁজি খেলাম
মিছে এলাম এবার হাটে।
কিছু ফললো না ফল আসাই বিফল
কেবল মলেম বেগার খেটে।
তুরকী তাজি বাকি পিছে
মন কেবলি মরলো ছুটে।
হাটে বাটে ঘাটে আঘাটে
সেই মুটে বইলো বোঝা
খেয়ে গালাগাল হাতে হাতে।

॥ পিলের গর্জন ॥

ও আমার দুর্দশা
সোয়ারে করলে কোন ঠাসা
ঘোড়া বেটা অজ্ঞতার অনুবর্তী।
লাগ পেলে ঘাড়ে চড়ে
দাঁত ভাঙ্গি চড়ে চড়ে
ব্যক্ত আছে চরাচরে প্যালারামের কীর্তি।
কাণ্ডটা বুঝেছি পাকা
উঠল ওটার মরণ পাখা—
পক্ষীরাজ হয়ে গেল উড়তে পেয়ে শক্তি।
বেঁচে থাক কাঠের ঘোড়া
রথের ধুরোয় বইবে জোড়া
দেবে টান না খেয়ে দানা একরত্তি।

অভিনয়

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ষোড়শী সংঘ ইংরিজীতেও তাই লেখে তবে ফুলমুন ক্লাব নামটাও আছে। ওইটেই প্রথম ছিল—পরে ওটা বাতিল হয়েছে, নামের তাৎপর্যটাকে বড় করবার জন্যে। ষোলজন নিয়ে ক্লাব—ষোল কলায় পূর্ণও বলা যায় কিন্তু পূর্ণিমা বা ফুলমুন এটা চলে না। এখন শুধু ষোড়শী। সভ্যদের বয়স বত্রিশের বেড়ায় গণ্ডিতে ঘেরা। তবুও সময় বিশেষে নাটকের খাতিরে হয়তো বা বৃদ্ধ-বৃদ্ধার কঠিন পার্ট করতে কখনও কখনও বাইরে থেকে নামজাদা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিতে হয়। ওখানে বলতে গেলে বলতে হয় বত্রিশের বেড়ার মধ্যে বেমালুম জোড় দেওয়া একটা আগড় আছে সেটা খুলে দেওয়া হয়। প্রথম প্রথম রঙ্গমঞ্চের নামকরা নাটকে ওদের যাত্রা শুরু হয়েছিল—তারপর কর্ণধারের ইচ্ছায় এখন রঙ্গমঞ্চের পাড়ি দেওয়া স্রোত বাদ দিয়ে নতুন নাটকের অনাবিষ্কৃত স্রোত ধরে চলতে শুরু করেছে।

এরই টানে ওই আগড়ের প্রবেশপথে ষোড়শীর মধ্যে পঁয়ত্রিশের জন্মদিন পার হয়েও প্রবেশ করলে নাট্যকার-নট-সাহিত্যিক অংশু রায়। নাট্যকার এবং নট হিসেবে সে অংশু রায় কিন্তু সাহিত্যিক হিসেবে সে তার পুরো নাম অংশুমান দেবরায় নামে পরিচিত। নাটক সে কমই লিখেছে—অভিনয়ও কমই করছে—সাহিত্যিক হিসেবে সে উদীয়মান থেকে উর্ধ্বে উঠেছে। এবং

একটু বিশিষ্টও বটে। বৈশিষ্ট্য তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে। ডানপন্থী বামপন্থীর কোন দলের কোন ধার ধ'রে চলে না, মাঝখান ধ'রে চলে। তারপর কাগজের দলের মধ্যেও থাকে না। একটু একাকিত্বই তার বিশেষত্ব। নামও তার আছে। হয়েছে। ওকে রাবিশ বলে ফেলে দেবার জন্যে আলোচনার মুখরতা সত্ত্বেও ফেলে দেওয়া যায় না। কোন পুরস্কার সে পায়নি কিন্তু পুরস্কার যারা পেয়েছে প্রবীণ তারা তাকে সমাদর করে। কাগজওয়ালাদের দলের যে মতই হোক না কেন তার লেখার অনাদর করে না। সমাদর করেই ছাপে। বইয়ের বাজারে চাহিদা আছে সুনামও আছে, বই বিক্রী হয় বলেই নয়—অগ্রিমের দাবী নেই বলেও বটে। মিটিংয়েও ডাক পড়ে কিন্তু অংশুমান বড় যায় না। গেলে নিজের উপস্থিতির দাগ রেখে আসে। নিরিবিলি একাকী থাকতে থাকতে তার খেয়াল হল নাটক লিখতে। সেটা রেডিয়োর জন্যে প্রথম। প্রথম নাটকই খুব সাফল্যমণ্ডিত হল। তারপর পর পর কয়েকখানাই একাঙ্কিকা সে লিখে ফেললে। কয়েকটা রেডিয়োতে হল। কয়েকটা হল না কারণ রেডিয়োর সরকারী বাধানিষেধ সেখানে অনেক। যেমন অবৈধ প্রেম পর্যন্ত সেখানে চলে কিন্তু সেই প্রেমের পরিণামে যদি কোন নবজাতক ভূমিষ্ট হয় তা হলে তার কান্না উঠলে বায়ুতরঙ্গে কালবৈশাখীর ঝড় উঠে ট্রানস্‌মিশন বন্ধ হয়। তারপর সরকারবিরোধী কিছু থাকলেই মুস্কিল। সে যাক। আবার তাদের মতে যোগ্যতা বিচারের রায়টা অংশুমানের বিচারের সঙ্গে না মিলতেও পারে। এমনি একটা একাঙ্কিকা নিয়েই অংশুমান হটকারিতাবশে একটা দলের সঙ্গে নায়কের ভূমিকায় নিজেই নেমে পড়ে নট হিসেবে খ্যাতিলাভ করলে। প্রথম, যারা অভিনয় করছিল বইখানা —তারা তাকে নায়কের ভূমিকা দিতে খুঁতখুঁত করেছিল, কারণ হলেনই বা নামকরা সাহিত্যিক তা' বলে অভিনয় ভাল করবেন তার কি মানে আছে। কিন্তু মানে আছে—সেটা অংশুমান জানত বলেই সে এগিয়েছিল। অভিনয়ের প্রথম ভয় হ'ল দর্শক। একসঙ্গে একগুলো চোখ আর কালো কালো মাথা যেন একটা বিভীষিকার সৃষ্টি ক'রে সব গুলিয়ে দেয়। বক্তৃতা করা সোজা কিন্তু অভিনয় করবার সময় নিজের জ্ঞানের কথা কিংবা পরকে পেঁচিয়ে গাল দেওয়ার ব্যঞ্জন চাটনী পরিবেশন করা চলে না, আমি অমুকচন্দ্র অমুক এ কথাও মনে রাখলে চলে না—বলতে হয় মুখস্থ করা কথা এবং গোঁফদাড়ি পরে নিজের অমুকত্ব ঢাকা দিতে হয়। নিজেকে ভুলাতে গিয়ে সব ভুলে যায় মানুষ এমন কি কানেও কি হয় প্রম্‌টিং শোনা যায় না। এ বিষয়ে অংশুমান অবহিত ছিল। তার উপর নিজের লেখা নাটক সুতরাং রিহারশ্যালে অন্যদের সন্দেহ অপনোদন করেই ক্ষান্ত হল না—একেবারে ঘোড়দৌড়ের শেষ জায়গায় ওদের থেকে গোটা দেহটাকে বেশ হাত কয়েক এগিয়ে দৌড় শেষ করলে। ওদের সঙ্গে আরও কয়েকটা একাঙ্কিকা সে অভিনয় করলে ঝোঁকের বশে এবং অংশু রায় নাট্যকার ও নট বলে খ্যাতিলাভ করলে। এ সব অবশ্য বছর পাঁচেক আগেকার কথা। তারপর সে নিজেকে সম্বরণ করেছিল। এই সময়ের মধ্যে খানদুয়েক ভাল বই লিখে সাহিত্যিক খ্যাতিতে ভারী হয়ে উঠল। কেউ সচরাচর অভিনয়ের অনুরোধ নিয়ে আসত না। হঠাৎ এল ষোড়শী সংঘ।

তারা প্রবীণ প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিক শিবনাথবাবুর একটি একাঙ্কিকা 'কালরাত্রি' অভিনয় করবে। অনুমতির জন্য তারা শিবনাথবাবুর কাছে গিয়েছিল কিন্তু শিবনাথবাবু অনুমতি দেন নি। কারণ নাটকটি রেডিয়োর জন্য লেখা, শোনার নাটক—তাকে দৃশ্যনাট্য করতে গেলে জমানো মুস্কিল হয়। একবার একটি প্রতিষ্ঠান এই একাঙ্কিকাখানি করতে গিয়ে এমন ব্যর্থ হয়েছিল যে তিনি দেখতে গিয়ে দুঃখ পেয়েছিলেন। ষোড়শী সংঘের এবারের পরিচালক রঞ্জন অংশুমানের ভক্ত এবং প্রায় বন্ধু বটে। প্রায় অংশুমানের কাছে আসে—তার প্রশংসা করে, তার কথা শোনে—অংশুমানের জন্মদিনে যে অল্প কয়েকজন বন্ধুবান্ধব আসে, তাদের মধ্যে সে-ই নিয়ে আসে সব থেকে ভাল ফুল, ভাল মিষ্টি এবং ভাল উপহার। শুধু তাই নয়, সে নিজে রান্না করে ভাল—মধ্যে মধ্যে অংশুমানের গৃহিণীহীন গৃহে মাংস কিনে এনে রান্না ক'রে অংশুকে খাওয়ায় নিজে খায়। ১৯৬০ সালে অংশুমান পঁয়ত্রিশ বছরের যুবক সুতরাং তার গৃহ গৃহিণীহীন কেন এ নিয়ে প্রশ্ন কেউ করে না—কিন্তু গবেষণা স্বাভাবিক ভাবে অনেকেই হয়। ভবিষ্যতে পত্র-সাহিত্যে অংশুমানের পত্রসঞ্চয় থেকে হয়তো ভাল কিছু পাওয়াও যেতে পারে—কোন অজ্ঞাতনাম্নী নারী সাহিত্যিক হিসেবে খ্যাতিলাভ করবেন এ অনুমানও করে; কিন্তু রঞ্জন বলে—সে নিশ্চিন্ত জানে অংশুবাবু পত্রগুলি কিছুদিন অন্তর বহ্নিমুখে সমর্পণ করেন। তবে এটুকু বলতে পারি লোকটি মদ খেলেও মাতাল নয়, প্রেমপত্রের উত্তর দিলেও প্রেমিক নয়. গৃহিণী না-থাকলেও গৃহস্থালি পরিপাটী ও গৃহস্বামী হিসেবে শক্ত পোক্ত! মানুষ হিসেবে মডার্ন—ভগবান মানেন না; সমাজ তাঁর কাছে মৃত—ডেড, রাষ্ট্রের আইনকে মানেন কিন্তু কংগ্রেস সম্পর্কে ধারণায় নিজে সুখী নন, বলেন ফেলকরা ছাত্র; তবে জীবন নিয়ে ভাবেন। সে ঠিক বুঝি না! লোকের পাওনা সম্পর্কে সচেতন—শোধ দেবেনই। ভিখিরীদের ভক্তিমতী গৃহিণী পরিচালিত গৃহের মত ভিক্ষে দেবার ব্যবস্থা রেখেছেন। বড়লোক বন্ধু আছে কিন্তু সদ্ভাব নেই, কিন্তু কম্যুনিষ্ট নন।

এই রঞ্জন অংশুমানের কাছে এল শিবনাথবাবুর কাছে একখানা পত্রের জন্য। অংশুমানকে শিবনাথ স্নেহ করেন, অংশুমান যদি লেখে যে এরা অভিনয় ভাল করে এবং করবে তাহ'লে শিবনাথ অনুমতি দেবেন। অংশুমান লিখে দিয়ে বিপদে পড়ল। শিবনাথ অনুমতি দিলেন এবং লিখলেন—"তুমি যদি নায়কের ভূমিকায় অভিনয় কর তবে খুব খুশী হব। আমি যাব দেখতে এবং কালরাত্রির সার্থক অভিনয় দেখে খুশী হব। তোমার অভিনয় আমি দেখেছি। এবং তুমিও আলোচনা-প্রসঙ্গে কালরাত্রির প্রশংসা করেছ আমার কাছে!"

রঞ্জনও পেয়ে বসল—ষোড়শী সংঘের সভ্যরাও—আজকের দিনে যা বলি আমরা তাই হল—ভী-ষণ ভয়ংকর খুশী ও উৎসাহিত হল। অংশুমান না বলতে আর পারলে না। কালরাত্রি নাটকখানি তাঁর ভাল লাগে। ভারী রোমাণ্টিক। বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে আদৌ টেকে না, অবাস্তব। কিন্তু রূপকথার মত মনোহারী মিষ্ট। শেষটিতে যে বেদনা আছে তার রেশ ধরে রাখতে ইচ্ছে করে।

নাটকটির আরম্ভ একটি নার্সকে নিয়ে। সুন্দরী চটুল এবং প্রগল্‌ভা মেয়ে। তরুণ ডাক্তারেরা তার প্রতি মুগ্ধ। কিন্তু সে আমল বড় দেয় না। একজন তরুণ দুঃসাহসী কুটিল-চরিত্র সুদর্শন ডাক্তার কিন্তু অগ্রসর হল। তাতে ফল হ'ল এই যে—মেয়েটি ডাক্তারের একখানা ডায়রী এবং চিঠি হস্তগত করলে—যাতে ডাক্তারটির মারাত্মক কুকর্মের স্বীকৃতি আছে। ধরাও সে দিয়েছিল। ডাক্তারটি জানতেন না চুরির কথা। এরপর তিনি তাকে ফেলে যে মুহূর্তে স'রে যেতে চাইলেন—সেই মুহূর্তে সে হস্তগতকরা ডায়রী এবং চিঠি প্রকাশ ক'রে দিতে উদ্যত হল। ডাক্তার বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করলেন। কিন্তু অন্য সব ডাক্তারেরা তার উপর বিরূপ এবং প্রায় খড়্গহস্ত হয়ে উঠল। মেয়েটি চাকরী করত একটি ক্লিনিকে। সেখানকার যিনি প্রধান—তিনি প্রৌঢ় খ্যাতনামা চিকিৎসক; তিনি কিন্তু মেয়েটিকে স্নেহ করতেন কন্যার মত। অন্য ডাক্তারেরা ইঙ্গিত করত যে, মেয়েটির পিতৃত্বের দায়িত্ব তাঁর। অথবা যৌবনে যে নার্সটিকে তিনি ভালবেসেছিলেন—যে নার্সটি এই মেয়েটির

চেয়েও স্বৈরিণী ছিল—এ তারই মেয়ে। স্নেহটা সেই হেতু। তবুও তিনি নার্সটিকে ডেকে বললেন—তাকে বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। অবশ্য বিচার করবেন কয়েকজন ডাক্তার। যদি মেয়েটির অন্যায় প্রমাণিত হয় তবে তার নার্সবৃত্তির ডিপ্লোমা ক্যান্সেল করে দেওয়া হবে। এইখানেই নাটকের আরম্ভ। পিছনের ঘটনাগুলি যাদানুবাদের মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে। এই মুহূর্তেই একটি লোক এল প্রবীণ ডাক্তারের কাছে। —তাঁরই চিকিৎসাধীন এক রোগীর বাড়ী থেকে। কেসটি বাইরে থেকে সাধারণ কেস। কিন্তু ভিতরে অনেক জটিলতা। একটি অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। সুদর্শন তরুণ। এক বছর আগেও তার হাসি-উল্লাসের সীমা ছিল না। বাঁশী বাজাত, আর ছদ্মনামে গান রচনা করত সুরও দিত। যা রেকর্ডও হয়েছিল এবং অল্পদিনের মধ্যে তরুণ-সমাজে অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠেছিল। সে কিন্তু তার ছদ্মনামটি এমন সযত্নে গোপন রেখেছিল যে, বন্ধু-বান্ধবেও জানত না। এক বৎসর আগে—ঠিক আজকের তারিখে ছিল তার বিয়ের কালরাত্রি। অর্থাৎ বিবাহের ঠিক পরের দিনের রাত্রি। এই রাত্রিতে হিন্দু সমাজের বিধিমতে বর ও বধূর সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ। এর পরদিন হয় ফুলশয্যা। কলকাতার দক্ষিণে নদীর ধারে গ্রাম; অবস্থাপন্ন ঘর। ঘরে ওই এক ভাই আর তার বড় বিধবা বোন নিয়ে সংসার। বড় দিদিই তাকে মানুষ করেছেন। আর দুচার জন পোষ্য আত্মীয় আছে। রূপসী মেয়ে দেখে বিয়ে দিয়েছিলেন দিদি। সে নিজেও তাকে দেখে এসেছিল। মুগ্ধ হয়েছিল বিশেষ করে এই কারণে যে, মেয়েটি ভাল গান গায় এবং কনে দেখার আসরে—মধুকরের (তার ছদ্মনাম) গানই সে গেয়েছিল। সকৌতুকে সানুরাগে সে তার পরিচয় গোপন রেখে মধুকরের নিন্দা করেছিল, তাতে মেয়েটি ক্ষুব্ধ হয়েছিল। ছেলেটি ঠিক করেছিল, প্রথম মিলনরাত্রির আগে পর্যন্ত সে এ পরিচয় গোপনই রাখবে। অর্থাৎ ফুলশয্যার রাত্রি পর্যন্ত।

আরও ঠিক করেছিল যে, ওই দিন লোকসমাজেও সে প্রকাশ করবে যে, সেই মধুকর। বিবাহের পরদিন বর-কন্যা এসে নৌকায় করে যখন ঘাটে পৌঁছুল—তখন ঝড় বৃষ্টি—দুর্যোগ। অবশ্য খুব বিপদের মত নয়। তবে তার মধ্যে দিদির অনেক সাধ করে ব্যবস্থা-করা শোভাযাত্রা পণ্ড হল। আলো-বাজনাসহযোগে দুই পাল্কীতে বর ও কন্যাকে সারা গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়ে আতসবাজী পুড়িয়ে ঘরে তোলা গেল না। দিদি ব্যবস্থা করলেন, বর-কন্যা সেদিন ওই ঘাটেই দুখানা স্বতন্ত্র নৌকায় রাত্রিবাস করবে। পরের দিন সকালে শোভাযাত্রা সাজিয়ে বর-কনেকে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়ে ঘরে তুলবেন—বধূবরণ করবেন; সারা গ্রামের লোক দেখবে।

সেই ব্যবস্থায় বর-কনে দুই পাশাপাশি নৌকোয় গ্রামের ঘাটে রাত্রিযাপন করছিল; নৌকোর মাঝিরা ঘুমিয়েছে, বরের চাকর, কনের ঝি সকলে ঘুমিয়েছে, প্রায় মধ্যরাত্রি; আকাশের মেঘ কেটে গিয়ে আকাশে চাঁদ উঠেছে; বরের ঘুম হয় নি—সে বাঁশী হাতে এসে নৌকোর ছইয়ের বাইরে বসে সুর তুলেছিল। মধুকরের গানের সুর। হঠাৎ তার মনে হয়েছিল, বাঁশীর সুরের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে কে গান গাইছে। তারপর বধূ এসেছিল বাইরে। সে বাজিয়েছিল বাঁশী—সে গেয়েছিল গান। মাঝিরা জেগে উঠেও আবার চোখ বন্ধ করেছিল, ক্লান্ত দেহ—নদীর বাতাস ঘুমিয়েও গিয়েছিল। হঠাৎ বর বলেছিল—রাত্রিটা কি এমনিই যাবে।

মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল—আমি যাই—আমাকে ধর—।

সে বারণ করতেও সময় পায় নি—বলতে পায় নি—আমি যাই—; বধূও নৌকো থেকে পাশের নৌকোয় আসবার জন্য পা বাড়িয়েছিল। খুব কাছাকাছি নৌকো, তবু নৌকো দুলে উঠে গিয়েছিল সরে, বধূ পড়ে গিয়েছিল জলে। সঙ্গে সঙ্গে বরও দিয়েছিল ঝাঁপ। মাঝি-মাল্লারাও জেগেছিল। তারাও এর পর ঝাঁপ দিয়েছিল। গঙ্গায় তখন জোয়ার। পায়নি তাদের সহজে। বরকে পেয়েছিল অচেতন অবস্থায়। বুকে আঘাত লেগেছে। কনেকে পরদিন পেয়েছিল—চড়ার উপর বধূবেশিনী কন্যাটি—ফুলশয্যার বদলে বালির শয্যায় শুয়ে শেষঘুমে ঘুমিয়ে পড়েছিল। বরের অসুখ তখন থেকে। তখন কলকাতার হাসপাতালে এনে রাখা হয়েছিল। বুকের আঘাতও সেরেছিল; কোমরে আঘাত লেগেছিল—তাও সেরে এসেছিল, ডাক্তারদের মতে কিন্তু ছেলেটি নিজে সারে নি। শুধু ক্লান্ত আচ্ছন্নের মত পড়ে আছে। ভাল সে হয় নি। ভাল হতে সে চায় না। ভাল সে হবে না। তার শেষদিন আসবে আগামী বৎসরে ওই কালরাত্রির তারিখে, সেদিন তার দৃঢ় ধারণা মৃতা বধূ আসবে, তার পাশে দাঁড়িয়ে হাত বাড়াবে, সেও হাত বাড়াবে, বধূর মতই সে পড়বে মরণ-সমুদ্রে, বধূও ডুব দিয়ে তার হাত ধরবে গিয়ে—এবং চলে যাবে তারা নিরুদ্দেশের দেশে।

এই চিকিৎসার ভার নিয়েছিলেন এই বিখ্যাত প্রবীণ চিকিৎসকটি। হাসপাতাল থেকে এনে মাস দুয়েক ক্লিনিকে রেখে তিনি তাকে বাড়ীতেই রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। রোগীদের মধ্যে না রেখে তার নিজের ঘরে স্বাভাবিক অবস্থার মত রেখেছিলেন। তার বই—গ্রামোফোন—রেডিয়োর ব্যবস্থার মধ্যে রেখে চেয়েছিলেন ধীরে ধীরে ছেলেটি জীবনের আকর্ষণ ফিরে পাবে। নার্স ছিল। নার্স ছেলেটি পছন্দ করে না। রাখতে চায় নি। কিন্তু এই প্রবীণ ডাক্তারটি তাকে মিষ্টি কথায় রাজী করিয়েছিলেন। বলেছিলেন—তোমার কথা অন্যে যে অবিশ্বাস করে করুক, আমি করি না। আমি বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করি ওই দিন নিশ্চয় সে আসবে। কিন্তু সে দিনটা পর্যন্ত তোমার রোগশয্যায় সেবার জন্য তো লোক চাই। তার জন্য নার্সরাই সব থেকে পারঙ্গম—তারাই এ কাজের জন্য বিশেষ শিক্ষা নিয়েছে। সুতরাং নার্সে আপত্তি করবে কেন? সে রাজী হয়েছিল কিন্তু তরুণী নার্স পাঠাতে নিষেধ করেছিল। প্রৌঢ়া নার্স রাখা হয়েছিল একজন।

তাতেও কিন্তু সমস্যা মেটে নি। কোন নার্সকেই সে এক সপ্তাহ দু-সপ্তাহের বেশী সহ্য করে নি। উত্তেজিত হয়েছে সামান্য ত্রুটিতে। কটু কথা বলেছে। তাকে সরিয়ে আবার অন্য নার্স এসেছে।

আজ সেই দিন। সকাল থেকেই রোগী উত্তেজনায় অধীর। সে আসবে। তার জন্য বিছানায় শুয়ে শুয়েই নির্দেশ দিচ্ছে। ঘর সাজাচ্ছে চাকরে। কাপড় কোঁচাতে বলেছে—সে পরবে। মালা গাঁথাচ্ছে। বাঁশী নিয়ে বসে আছে। আজ সে বাজাবেই। এসব দেখে নার্স একটু বিরক্তি প্রকাশ করেছিল—সে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। রোগীর দিদি কাঁদছেন। তিনি বৃদ্ধ কর্মচারীকে পাঠিয়েছেন ডাক্তারের কাছে—আজ তাঁকে যেতেই হবে। রোগীকে যদি কোন মতে শান্ত করতে পারেন!

ডাক্তার শুনে অনেকক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর সহকারীকে ডেকে পরামর্শ করলেন। স্থির করলেন বিচিত্র পন্থা। তারপর দুজনে গেলেন রোগীকে দেখতে। দেখলেন—বৃদ্ধের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। রোগী বরের সাজে সেজে হাতে বাঁশী নিয়ে বসে আছে। বাঁশীর সুর না উঠলে অশরীরিণী বধূ কায়াময়ী হয়ে তো আসতে পারবে না। তার বাঁশীর সুরই হবে অসীম শূন্যলোকে তার পথের সূত্র। বাঁশী তাকে বাজাতেই হবে। ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে দেখলেন। কথা কইলেন। বুঝলেন—উন্মাদ, সে তার বিশ্বাস থেকে নড়বে না। এই বিশ্বাসে এমনি দৃঢ় সে যে, প্রতিনিবৃত্ত করতে গেলে হিতে বিপরীত হবে। তিনি ভেবে নিয়ে বললেন—বেশ তাই হবে।

নির্দেশ দিলেন—কেউ যেন তার কথার প্রতিবাদ না করে। অমান্য না করে। তবে রোগীর কাছে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, অশরীরিণী বধূ কায়াময়ী হয়ে না আসা পর্যন্ত সে রোগী।

রোগী বললে—সেই নির্দিষ্ট সময়ে বারোটার সময় বাঁশী বাজাবে সে।

—নিশ্চয় কিন্তু বারোটার আগে নয়।

তাই স্থির করে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রোগীর দিদিকে বললেন—কোন প্রতিবাদে লাভ নেই। যা বলছে তাই করে যান। দেখুন না—কি হয়! হয়তো বউয়ের আত্মা আসবে।

বলে তাকে চুপি চুপি বললেন—একটি ব্যবস্থা আমি করব। একমাত্র পথ। দেখুন তাতে কি হয়। একটি কথা, আপনাদের বউটির ছবি দেখে মনে হয় একটু দীর্ঘাঙ্গী ছিল এবং হাল্কা শরীর ছিল।

—হ্যাঁ।

—তা হ'লে সে আসবে। একটি সর্ত। বউটির গায়ে যে গহনাগুলি ছিল সেগুলি সব বের করে রাখবেন, কি রংয়ের কাপড় ছিল? বিয়েতে সাধারণতঃ লাল রঙই তো থাকে।

—ফিকে গোলাপী বেনারসী।

—তেমনি কাপড় কিনে আনতে হবে! কেমন? বুঝেছেন তো, তার আত্মা যখন কায়া ধরবে, তখন এগুলি সে পাবে কোথা। সে সবই তো চিতায় উঠবার সময় ফেলে গেছে সে? আর বউ যদি এসে ওকে না নিয়ে গিয়ে নতুন ক'রে বাঁচিয়ে দিয়ে যায়—তবে সে গহনা কাপড় নিয়ে যাবে। যদি নিয়ে যায়—তবে নিশ্চয় সে ফেলে দিয়ে যাবে। বুঝলেন।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দিদি বলেছিলেন—তাই হবে!

ডাক্তার বলেছিলেন—বউ আসবে আপনাদের! কিন্তু কোন পথে কি ভাবে আপনি জানতে পারবেন, কিন্তু অন্যে যেন কেউ না জানে!

তাই হ'ল। মধ্যরাত্রে বাঁশীর সুর তুললে সে, অর্ধোন্মাদ তরুণ।

ঘরে নীলাভ আলো জ্বলছিল!

ঠিক জানালার ধারে এসে দাঁড়াল ফিকে গোলাপী রঙের বেনারসী-পরা দীর্ঘাঙ্গী তরুণী! সেই গহনা। সে বললে—আমি এসেছি।

রোগী উঠে বসল। বধূ বললে—তুমি তো জান মর্ত্যের আগুনের আলো আমার এ মায়াময় কায়াতে সহ্য হয় না। ওই আলোটা নিভিয়ে দাও। ওগো, নইলে যে আমি তোমার কাছে যেতে পারছি না!

রোগী বললে—তোমার মুখ কেমন ক'রে দেখব?

—চাঁদের আলোয়। আজ যে আকাশে পূর্ণিমা। তিথি ভুলে গেছ। সেই আলো জানালা দিয়ে এসে পড়বে মেঝেতে, আমি বসব সেই আলো সারা অঙ্গে মেখে—আমাকে তুমি দেখবে!

অপরূপ কথায় আত্মহারা বর বেড সুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দিল; কনে এসে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে-পড়া মেঝের উপর বসল টেবিলের উপর থালায় মালা ছিল—সেই মালা নিয়ে বরের গলায় পরিয়ে দিয়ে বললে—এবার তুমি পরিয়ে দাও।

মেয়েটি আর কেউ নয়, বধূর আত্মা নয়, সেই নার্সটি, যে তরুণ ডাক্তারদের নিয়ে খেলা করে। কিন্তু ধরা দেয় না। ধরা দিলে কালনাগিনীর মত দংশন করে। প্রবীণ ডাক্তারটি শেষে এই উপায় স্থির করেছেন। রোগীর বিশ্বাসমত ওর বিশ্বাস পূরণ করিয়েই মেয়েটি আসবে বধূ সেজে; সেই সজ্জা, সেই আভরণ; সেই দীর্ঘাঙ্গী তরুণী, আলোহীন ঘরে জ্যোৎস্নার মায়ালোকে অন্ধবিশ্বাসের ঠুলি-পরা বর তাকে বধূ বলেই বিশ্বাস করবে। এবং প্রথম কিছুক্ষণ উত্তীর্ণ হলে আর ধরবার কোন শক্তি তার থাকবে না; মেয়েটি তাকে তার করস্পর্শে, ছলনাভরা কথায় ভুল থেকে গভীর ভুলে নিয়ে যাবে; শান্ত করবে কাছে বসে, কপালে হাত বুলোবে। তারপর ধীরে ধীরে তার বাঁচবার ইচ্ছা ফিরিয়ে আনবে। বলবে—তুমি বাঁচ—তোমাকে যে বাঁচতে হবে। তুমি মধুকর নামে বিখ্যাত হও। আমি শূন্যলোকে ঘুরব আর শুনব মধুকরের গান আকাশে উঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাতেই হবে আমার অনন্ত তৃপ্তি। তুমি বাঁচ, তুমি বাঁচ। ওগো তুমি বাঁচ। তারপর তাকে বিশ্বাস করিয়ে বলবে—তুমি বিবাহ কর। তুমি বিশ্বাস কর, আমি তার আত্মার সঙ্গে এক হয়ে যাব। না বিবাহ করলে আমাকে শুধু শূন্যলোকে ফিরতে হবে। দেখ তুমি ভাল হয়ে গেছ। ওঠ তুমি, দাঁড়াও, এস, তুমি আমার কাছে এস। সে নিশ্চয় হাঁটবে। শুধু সাবধান যেন মানবী দেহের উত্তপ্ত অঙ্গস্পর্শে তার মোহ না ভাঙে! এইভাবে ধীরে ধীরে তার বিশ্বাস ফিরিয়ে এনে তাকে ঘুম পাড়িয়ে চলে আসবে সে। ঘুমের ওষুধ সঙ্গে থাকবে তার। তাই সে সময়মত তাকে খাইয়ে তার মাথায় হাত দিয়ে বসবে!

এর জন্য সে ওই বধূর অলঙ্কারগুলি সব পাবে; যার দাম অন্তত সাত-আট হাজার টাকা। যদি সে না পারে—যদি সব ব্যর্থ হয়, তবুও তাকে এই এক রাত্রির অভিনয়ের জন্য এক হাজার টাকা দেওয়া হবে।

মেয়েটি এল—সকৌতুকে এল। এক বিচিত্র অভিনয়! এবং আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে অভিনয় ক'রে গেল। রোগীকে শেষ রাত্রে ঘুম পাড়িয়ে বেরিয়ে এসে সে ক্লান্ত হয়ে অন্যঘরে প্রতীক্ষমান ডাক্তারের সামনে চেয়ার বসে টেবিলে মাথা রাখল!

ডাক্তার হেসে বললেন—ওয়েল ডান। খুব ভাল করেছ। অদ্ভুত! কিন্তু তুমি একটু বিশ্রাম কর। একটু পরেই রওনা করে দেব তোমাকে আমার গাড়ীতে। এখানে কাউকে দেখতে দেব না। কোনক্রমে এ কথা ওর কানে উঠলে হয়তো ও পাগল হয়ে যাবে।

পাশের ঘরে মেয়েটি শুলে।

কিছুক্ষণ পর ডাক্তার ঘরে এসে ওকে ডাকলেন। কিন্তু সাড়া পেলেন না। নাড়া দিয়ে দেখলেন, মেয়েটি বেঁচে নেই! তার হাতের মুঠোয় চিঠি! লিখেছে—জীবনে শেষ অভিনয় করে গেলাম। এরপর আর বাঁচতে পারব না। মনে হচ্ছে সব পেয়েছি। সকাল হলে সব হারাব। তাই সকাল হবার আগেই বিষ খাচ্ছি, পটাসিয়াম সায়নায়েড। ওটা আমার ভ্যানিটি ব্যাগে থাকত। অনেক দিন থেকে। আজ কাজে লাগল। জীবন এত মধুর জানতাম না। সে স্বাদ মিলিয়ে যাবার আগেই চলে যাচ্ছি।

এই নাটক! নাটকে ওই ঘরের পার্ট করতে হবে অংশুমানকে। রিহারশ্যালে এসে অংশুমান খুশী হল। বেশ পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। বেশ মাঝারি গোছের ঘরে মেঝে জোড়া শতরঞ্জের উপর ধবধবে চাদর পাতা—কয়েকটা তাকিয়া। দেওয়ালে কখানি ভাল ছবি। এবং ষোড়শী সংঘের সভ্যাগুলি সকলেই বেশ রুচিসম্পন্ন আধুনিক। প্রায় সকলেই শিক্ষিত। প্রবীণ ডাক্তারের পার্ট করবে বিমল গুপ্ত—ভাল চাকরী করে। তার স্ত্রীও এর সভ্যা। সে করবে দিদির পার্ট। এ ঘর তাদেরই ফ্ল্যাটের ঘর। নরেন বোস—সে করবে ডাক্তারের এ্যাসিস্ট্যাণ্টের পার্ট, বোসও লেখাপড়া-জানা ছেলে—একটু-আধটু লেখে—সে দালালী করে। এমনি ভাবে সকলেরই অন্তত একটি আধুনিকতা ও সংস্কৃতির ছোঁয়াচ এবং ছাপ আছে। অর্থাৎ ছবির বাজারে তারা হাটবাজারের ছবি নয়, কোন না একজিবিশনের মডার্ন ছবি-আঁকিয়ের ছবি। দশ জন পুরুষ ছ জন মেয়ে। ছ জনের মধ্যে চার জনই চার জন সভ্যের স্ত্রী। পঞ্চম ও ষষ্ঠ জন সংস্কৃতিবতী মহিলা—যৌবন অতিক্রম করেছেন—কিন্তু প্রৌঢ়া নন। পার্ট-টার্ট করেন না, ব্যবস্থা বন্দোবস্ত করেন, উৎসাহ খুব; একজনের গাড়ী আছে। একজন বড়দি, অন্যজন মিনু-মাসীমা।

রঞ্জন সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে। অংশুমান জিজ্ঞাসা করলে—হিরোইন কে? ইরার পার্ট করবে কে? বললে না তো?

রঞ্জন বললে—একটি নতুন মেয়ে। অনেক কষ্টে রাজী করিয়েছি। কিন্তু আপনি নামবেন শুনে ভড়কেছে। এখনও আসে নি।

—নতুন মেয়ে?

—খুব স্মার্ট—আর ভারী সুন্দর চেহারা। নরেনবাবু বলছিলেন—বলুন না নরেনবাবু।

—আপনিই বলুন!

—বলছিলেন এইরকম স্ত্রী পেলে ডিপ্লোম্যাটিক কোরের চাকরীর দরখাস্ত করতাম। ওয়াণ্ডারফুল মেয়ে।

থেমে গেল রঞ্জন। বিমল গুপ্ত বললে—নরেনবাবু নিজে ব্যাচেলার অবশ্য। রঞ্জন খোলা দরজার দিকে মুখ করে বসেছিল। রঞ্জন বললে—ওই—ওই এসে গেছেন সীতা সেন।

চঞ্চল একটি মেয়ে। সত্যি চমৎকার দেখতে। রঙে গৌরী নয়, মাজা রঙ, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের চেয়েও একটু উজ্জ্বল, ত্বকে একটি কোমল লাবণ্যের মসৃণতা আছে। পার্টে যেমন দরকার তেমনিই একটু দীর্ঘাঙ্গী; ছোট কপাল—চোখ দুটি বেশ টানা-ডাগর, ঠোঁট আর চিবুক ভারী সুন্দর, সবচেয়ে সুন্দর দাঁতগুলি, হাসলে মেয়েটি মনোহারিণী হয়ে ওঠে; চুলগুলি কাঁধ ছাড়িয়ে পিঠের সিকিখানা পর্যন্ত এসে ছড়িয়ে পড়ে আছে। বাকীটা কেটে ছোট করে নিয়েছে। সামনের দিকে সোজা সিঁথির দুপাশে একটু ফুলিয়ে সাজানো। লাগে খুবই সুন্দর কিন্তু প্রসাধন করেছে বলে অপবাদ কেউ দিতে পারবে না। কানে দুটি গোল রিং। মেয়েটি হেসে নমস্কার করলে। বাঁ হাতে ঘড়ি, ডান হাত খালি। আঙুলগুলি লম্বা-ধরনের। গলায় পলা বা লাল বিড আর সোনার মটরদানার একগাছি হার বা মালা কিম্বা মালাহার যাই হোক না নাম মেয়েদের কাছে।

বিস্মিত হ'য়ে গেল অংশুমান। চেনা মুখ—অত্যন্ত চেনা! হ্যাঁ, এই কিছুদিন আগে—। তার আগেই সীতা সেন তাকে নমস্কার করলে—আপনি ভালো আছেন? চিনতে পারছেন আমাকে?

এই কিছুদিন আগেই একদিন সকালে অংশুমানের বাসার সামনের পথে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে এসে ফটক ধরে দাঁড়িয়ে বলেছিল—নমস্কার, ভেতরে আসব?

অংশুমান একলা বসে চিন্তায় মগ্ন ছিল। সে তার দিকে তাকিয়ে প্রথমদৃষ্টিতেই প্রসন্ন হয়েছিল। সুন্দর একখানি মুখ এবং বেশ সপ্রতিভ সুমার্জিত ভঙ্গি। একটু হাসি মুখে লেগে আছে। সে বলেছিল—আসুন।

মেয়েটি ভিতরে এসে বলেছিল—একটু ভেতরে যাব—মেয়েদের সঙ্গে দেখা করব।

অংশুমান কৌতুক এবং বিস্ময় দুইই বোধ করেছিল একসঙ্গে। বিস্ময় এই যে, সাধারণত মেয়েই হোক আর পুরুষই হোক যারা আসে তারা তার কাছেই আসে। মেয়েটি তার কাছে আসে নি। আর কৌতুক এইজন্য যে, বাড়ীতে তো কোন মেয়ে নেই! সে বলেছিল—আমাকে বলতে পারেন না?

মেয়েটি অত্যন্ত সপ্রতিভ, বলেছিল—লেখাটেখার কথা হলে আপনাকে বলতাম। কিন্তু তা নয়। এবং ব্যাপারটা আপনার জুরিসডিকসনের একবারে বাইরে।

—আমাকে চেনেন।

—তা চিনি।

—কিন্তু—

মেয়েটি তার মুখের দিকে তাকিয়েছিল—তারপর বলেছিল—আপত্তির কারণ আছে?

—না—তা নেই। তবে মেয়ে বলতে তো কেউ নেই!

—ও। কখন আসবেন?

—আমি একা মানুষ। সংসারে মেয়ে-ছেলে তো নেই।

—ও। বলে মেয়েটি অপ্রতিভ হয়ে ছোট একটি হাঁ করেছিল। তারপর বলেছিল—আমি এসেছিলাম ইলেকট্রিক কুকার নিয়ে। দেখাতাম তাঁদের। তারপর হেসে বলেছিল—কয়লার ধোঁয়ার অপকারিতা, তার অপরিচ্ছন্নতা এই সবগুলো বুঝিয়ে কুকার জেলে ডেমনেস্ট্রশন দিয়ে দেখাতাম। ইলেকট্রিক কুকার কোম্পানীর ওখানে কাজ করি! আপনাকে চিনি কিন্তু আপনি এখানে একলা থাকেন তা জানতাম না!

এতক্ষণ ধরে একটা হিন্দুস্থানী রাস্তার উপর একটা ঝুড়িতে কয়েকটা কাগজের বাক্স নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। অংশুমান ঠিক অর্থটা ধরতে পারে নি। ভেবেছিল—সে লোকটা বোধ হয় কোন একটা বাড়ী খুঁজছে; মেয়েটি তার সামনেই বাড়ীতে ঢুকেছে—কথাবার্তা কইছে, সম্ভবতঃ এ বাড়ী ঢুকলেই বা কথা বলে চলে গেলেই এগিয়ে এসে বলবে—সেলাম বাবু, পতাটা টো দেখিয়ে তো। এবার বুঝতে পারলে এ লোকটা ওই কুকার-বাহক।

অংশুমান একটু বেশী করুণা করলে নিশ্চয়। অথবা এই বেশীটুকু তার অবশ্য দেয়। নইলে কোম্পানী বেছে বেছে এমন মিষ্টি চেহারার এজেন্ট-ক্যানভাসার রাখবে কেন? তারা ব্যবসায়ী—তারা সাহিত্যিক শাস্ত্রকার থেকে অনেক বেশী বাস্তবসত্য বোঝে এতে কোন সন্দেহ নেই। বাস্তবের উপরে উঠতে পারে না—এইটেই তাদের ক্ষুদ্রতা বল ক্ষুদ্রতা অন্ধতা বল তাই।

এই নাটকটায় বাস্তব মূল্য নেই—এইটেই নাটকটির বড় দাম। যাক, সেদিন সে করুণা না—করুণা নয়—এমনি একটি মিষ্টি চেহারার শ্রীময়ী মেয়ে যে জিনিসই এনে থাক—তা ফিরিয়ে না দিয়ে নিয়েছিল। বলেছিল—মেয়ে কেউ নেই বলে আমার রান্নাঘর নেই এমন তো নয়। রান্নাঘর আছে রান্নাও হয়—উনোনে কয়লাও জ্বলে ধোঁয়াও হয়। বেশ তো আমাকেই দেখিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে যান। আমি নেব না কে বললে?

সে হিন্দুস্থানীটাকে ডেকেছিল—এই ইধর লাও।

লোকটি জিনিসগুলি এনে নামিয়েছিল। মেয়েটি বলেছে—এখানেই দেখবেন? এই বারান্দায়। আর রান্নার লোক কই আপনার। একজন আছে নিশ্চয়। আপনি নিজে রাঁধেন এ নিশ্চয় ঠিক নয়।

—ঠিক কথা। চলুন ঘরের মধ্যে চলুন। বলে অংশুমান তার চাকর-রাঁধুনী-বাজার-সরকার-ম্যানেজার-সেক্রেটারী সব — একমাত্র দুলালকে ডেকেছিল।

বিচিত্র মেয়েটি এরপর আশ্চর্যভাবে পাল্টে গিয়ে যেন ওই বস্তুগুলি সম্পর্কে একজন টেকনিক্যাল এক্সপার্ট হয়ে কথা বলতে শুরু করেছিল। সুন্দর করে সব গুছিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে বলেছিল—এর এ-সি-ডি-সি নেই। শকও লাগবে না। খুব ভাল ব্যবস্থা আছে। আর্থ করে দেওয়ার ব্যবস্থা এর মধ্যে ক'রে দেওয়া আছে। সব থেকে বড় সুবিধে রান্না হবে ঘড়ির কাঁটা ধরে, এবং সুন্দর সিদ্ধ হবে। ধোঁয়া নেই, উনোনের পাশে পাহারা নেই। প্লাগ লাগিয়ে সুইচ দিয়ে যা খুশি করুন, ঘড়ির কাঁটায় সময়টি হলেই একটা সিগন্যাল হবে—তখন নামিয়ে নিন।

তারপর বললে—আপনার তো খুব

সুবিধে। আপনারা দুজন। আপনি বরং একটা কুকার নিন—আর একটা কেটলী নিন।

তাই নিয়েছিল অংশুমান কিন্তু অর্থ-মূল্য দিয়ে জিনিস নিয়েই শান্ত হয়নি, মেয়েটিকে আরও একটুক্ষণ ধরে রেখেছিল, বলেছিল—কেটলীতে চা করে খাইয়ে এবং খেয়ে যাবেন না?

—নিশ্চয়!

চা করবার সময় সে এক্সপার্টের মতই কথা বলেছিল দুলালের সঙ্গে, একেবারে ঘড়ি ধরে দেখিয়ে কেটলীর জল টিপটে ঢেলে চা দিয়ে বলেছিল—বাস।

চা তৈরী ক'রে অংশুমানের সামনে নামিয়ে দিয়েছিল—খান!

—আপনার কই?

—আমাকেও খেতে হবে?

—নিশ্চয়! দেখুন ভাল হল কি মন্দ হল—নিজে দেখুন!

—ভাল হবেই।

—তা হ'লে আর একদফা করবেন!

মেয়েটি হেসে ফেলেছিল। তারপর কথা শুরু হয়েছিল। পরিচয়ে যে-কথা হয় সেই কথা। নাম বাড়ী বাড়ীতে কে আছে এ থেকে আরম্ভ। সে বলেছিল নাম সীতা সেন। বাড়ীতে মা আছেন। বাপ নেই বড় ভাই ভাই-বউ আছে তার কটি বাচ্চা আছে। বছরখানেক ঢুকেছে এদের এখানে। ডাঃ রায়ের ক্লীন ক্যালকাটা-স্মোক নুইসেন্স বন্ধ পরিকল্পনার পর আরম্ভ হয়েছে এদের এই কর্মব্যস্ততা। গ্যাস আসবে, এখন থেকে কোম্পানী গ্যাসের নানা ধরনের উনোন-টুনোন নিয়ে নানান কাজ করছে। সে আই-এ পড়তে পড়তে ঢুকেছে এখানে। বেশ সপ্রতিভভাবে বললে—দুবার ফেল করলাম—বাবা মারা গেলেন। পেনসন বন্ধ হল। দাদা চাকরী ক'রে, ছোট চাকরী। কি করব? ঢুকে পড়লাম চাকরীতে।

অংশুমান এর পর আর প্রশ্ন করতে পারে নি। মাইনে কত? বা বিয়ের কথা! তবে হঠাৎ খুঁজে পেয়েছিল একটা প্রশ্ন? কেমন লাগে এ চাকরী আপনার?

—প্রথম বাধোবাধো লাগত; আমরা জন ছয়েক মেয়ে আছি—আর সবই তো পুরুষ। এখন সে সব কেটে গেছে। বেশ লাগে।

নিজেই বলেছিল—মাইনে খারাপ দেয় না—একশো পঁচিশে শুরু। তারপর বাড়ে বছরে পাঁচ টাকা। তা ছাড়া বিক্রির উপর একটা কমিশন আছে। এর উপর এই কাপড়চোপড়। বছরে এক সেট।

কাপড়-ব্লাউসের সেট সত্যিই বেশ ঝলমলে এবং ভাল ছিল। বিশেষত্ব ছিল—লাল নাইলনের শাড়ী লাল সাটিনের ব্লাউস। পায়ের চটির স্ট্র্যাপসুদ্ধ লাল। সেটা অংশুর চোখে ধরাও পড়েছিল এবং মানেও বুঝেছিল। বলেছিল—লাল রংটা কি হীটারের বিজ্ঞাপন।

কৌতুকে তার চোখ ভুরু নেচে উঠেছিল। হেসে সে বলেছিল—ঠিক ধরেছেন। এ নইলে সাহিত্যিক বলবে কেন? এই বুদ্ধির ঝল-মলানি পাই বলেই আপনার বই ভালবাসি। আচ্ছা! অনেক ধন্যবাদ। এবার উঠি—অনুমতি করুন!

ইঙ্গিত বুঝে অংশু বলেছিল—চেক দেব তো?

—কেন দেবেন না?

অংশু চেক লিখে তার হাতে দিয়ে বলেছিল—কোন গোলমাল হলে ফ্রি সার্ভিস তো?

সে হেসে বলেছিল—নিশ্চয়। কিন্তু সে মিস্ত্রী এসে দিয়ে যাবে। আমি নয়!

তারপরও একদিন মেয়েটি পথ দিয়ে যেতে যেতে তার বাসায় উঠেছিল। দুলালকে জিজ্ঞাসা করেছিল—বাবু কই?

—ভিতরে লিখছেন।

—একবার খবর দাও না। মেয়েটা সে দিনের অভিজ্ঞতায় ভেবেছিল—অংশুমান সহাস্যে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু দুলাল এসে তাকে নিয়ে গিয়েছিল অংশুমানের লেখার ঘরে। অনেক বইয়ের মধ্যে চেয়ারে ব'সে টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে লিখেই যাচ্ছিল অংশুমান—সে ঘরে ঢুকে বলেছিল—নমস্কার।

মাথা না তুলেই অংশুমান বলেছিল—নমস্কার! বসুন। দেওয়াল ঘেঁষে একখানা সোফা এবং সেটের চেয়ার দুখানা রাখা ছিল; তার উপর বসে সে অপেক্ষা করেছিল; অংশুমান কলম রেখে মাথা তুলবে, এবং উঠে এসে হয়তো একখানা চেয়ারে বসবে। সীতার এটা দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু অংশুমান তখন অন্য মানুষ। সব লেখকই হয়, তার নিজের জগতের বিধাতা হয়ে যখন বসে তখন তার সে ধ্যান বা তার সে আসন থেকে সহজে সে চ্যুত হয় না। তার উপর অংশুমান একটু শক্তও বটে। জীবনে খেলা মানুষ করে, কিন্তু খেলার আনন্দও আছে, তবু মানুষ বিচিত্র—সে খেলা নিয়ে থাকতে পারে না। কাজে কর্মে অনেক ক্লেশ অনেক

যন্ত্রণা তার কাছে আনন্দের খেলাকে ছোট করে ফেলে। অংশুমান তার লেখার মধ্যে কল্পনা করছে—এ লেখা তার আলোড়ন সৃষ্টি করবে; এ লেখার মধ্যে সে খেলা-কাজ সব কিছুর মর্মচ্ছেদ করে তার স্বরূপটি আবিষ্কারের চেষ্টায় আছে। সে মুখ তুলে-ছিল কলমও রেখেছিল কিন্তু চেয়ার ছেড়ে উঠে আসে নি। একটা সিগারেট ধরিয়ে বলে-ছিল—বলার মধ্যে একটু বিস্ময়ও ফুটে উঠেছিল—ওগুলো তো ঠিকই আছে। ঠিক চলছে তো! দুলাল ফোনটোন করেছিল না কি?

মেয়েটি—অংশু তখন তার নামও ভুলে গেছে;—মেয়েটি প্রগল্‌ভা—সে বলেছিল—

—নিশ্চয়। কিন্তু সে মিস্ত্রী এসে দিয়ে যাবে। আমি নব…

না—না—খারাপ হবে কেন? খারাপ জিনিস তো দিই নি।

অংশু বলেছিল—তবে? অর্থাৎ তাহলে আপত্তি হঠাৎ?

মেয়েটি এবার একটু অপ্রতিভ হয়েছিল, বলেছিল—এ পাড়াতে অর্ডার ছিল দিয়ে এলাম। ভাবলাম আপনার সঙ্গে দেখা করে যাই!

—ও। বসুন। বসুন। দুলাল! চা আন।

—না—চা আমি খাব না!

—সে কি?

—হ্যাঁ। আমি উঠলাম। নমস্কার।

—নমস্কার। প্রতিনমস্কার করেই অংশু কলম তুলে নিয়েছিল। লেখাটা তখন মনের ভিতর থেকে কলম বেয়ে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে বেশ বেগের সঙ্গে। ওদিকে আছে কাগজের তাগিদ। এবং টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়তে পড়তে দেখলে লাল মলমলের শাড়ীর ফেরগুলো বায়েকের জন্য ঝলকালো;

সে মাথা তুললে না—চলে গেল চোখের সামনে থেকে—লালচে আভা একটা সরে গিয়ে রৌদ্রালোকের শুভ্রতা ফুটে উঠল।

আজ এখন মেয়েটির পরনে সব সাদা। আর একটু প্রভেদ আছে। সেদিন বাঁ হাতে রিস্টওয়াচ ছিল—ডান হাতে সোনার রুলি ছিল, আজ রিস্টওয়াচ আছে—রুলি নেই। আর একটা প্রভেদ আজ খাটো চুলগুলি শ্যাম্পু করা এলানো। সে দুদিনই চুলে ঈষৎ তেলের স্পর্শের চিক্কণতা ছিল আর দুই বেণী ক'রে ঘাড়ের উপর সুন্দর একটি খোঁপা ছিল।

আজ মেয়েটিকে অন্যরকম লাগছে। আশ্চর্য মনোহারিণী এবং এলানো শ্যাম্পু-করা চুলের মধ্যে একটা এলো মেলো নেশা রয়েছে! মেয়েটি বসেছে সামনেই। তার বিপরীত দিকে। বেশ মৃদু একটি গন্ধ আসছে।

সীতা সেন। সীতা সেন তাকে প্রশ্ন করলে—চিনতে পারছেন আমাকে?

সে ঠিক ধরতে পারলে না—খোঁচা আছে কিনা। কিন্তু সঙ্কুচিত বিনয়ের অভাব ছিল না এটা নিশ্চিত। সে প্রতিনমস্কার ক'রে হেসে বলেছিল—এ'রা বলেছিলেন—হিরোইন সীতা সেন একটি আশ্চর্য নতুন মেয়ে। আমি সীতা সেনে ধরতে পারি নি—কিন্তু আপনাকে দেখেই চিনেছি—সে রক্তরাগ থেকে শুভ্র পদ্মরাগের রূপান্তর সত্ত্বেও! ভারী চমৎকার দেখাচ্ছে আপনাকে আজ!

সীতা সেন ঠকে না। সে বললে—আজও থিয়েটারের বিজ্ঞাপনবাহিনী নই আজ তো মধুকরমোহিনী হিরোইন!

প্রগল্‌ভতায় একটু সংযত হল অংশু। তার মর্যাদা আছে খ্যাতি আছে। তবু বললে—তা বটে! তারপরই বললে—তা হলে রঞ্জন—আর দেরী না করে আরম্ভ করে দাও! ওদিকে দেরী করে লাভ কি?

রঞ্জন বললে—আজ আপনি একটা রিডিং দিন আমরা শুনি। আমি নামে পরি-চালক হলে কি হবে—আপনিই সব করবেন। আমি খাটব।

তাই হল। অংশুমান নাটকখানি আগা-গোড়া নিজের মত ক'রে রিডিং দিয়ে গেল। সে নিজে লেখক এবং এ্যাকটিংও ভাল করে—তবে তার এ্যাক্টিংয়ে একটু ইমোশন আছে। একালের মত বাস্তবতার জন্যে শুকনো নয়। কিন্তু ইমোশনের আমেজের ফলও আছে। সে যখন পড়া শেষ করল—তখন সকলে অভিভূতই হয় নি—চোখও সকলের সজল হয়ে গেছে। বই রেখে সে চুপ করলে। গোটা ঘরটা স্তব্ধ হয়ে রইল। মেয়েরা চোখ মুছছিল। সীতা সেন শুধু দুই হাঁটুর উপর চিবুকটা রেখে স্তব্ধ হয়েই বসেছিল—চোখের জল সে মোছেনি।

অংশুমান একটা সিগারেট ধরিয়ে বললে—বই ভাল—তবে শক্ত!

রঞ্জন বললে—শক্ত না হলে ভাল হয় কি করে?

বিমল গুপ্ত বললে—দ্যাটস্ ইট!

মাসীমা বললেন—আমার খু—ব ভাল লেগেছে। খু—ব ভাল।

বড়দি চোখ তখনও মুছছিলেন। বল-লেন—বড় লেখকের লেখা! তাছাড়া জানো লেখাটা ট্রান্সলেশন হয়েছে ইউরোপে! ওই যে গুরুসদয় দত্ত রোডে মিসেস সিনহা থাকেন নরওয়ের মেয়ে—উনি ওদের ভাষায় ট্রান্সলেশন করছেন। উনিই তো আমাকে বললেন। রেডিয়োতে শোনা শেষ করেছেন—আমি গেলাম—আমাকে বললেন—কি সুন্দর একটা ওয়ানএ্যাক্ট প্লে হল রেডিয়োতে বড়দি কি বলব! আমি ট্রান্সলেশন করব আমাদের ভাষায়। আমি তখন এসে বিমলকে বললাম। বিমল পড়ে রঞ্জনকে ধরলে!

অংশুমান বললে—আমি উঠব রঞ্জন।

—দাঁড়ান, ট্যাক্সি আনাই।

সীতা সেন বললে—আমি যাব রঞ্জন-বাবু?

—নিশ্চয়! ও'কে অংশুদা—। উনি আপনার ওদিকে যাবার মাঝপথেই থাকেন।

—বেশ তো।

গাড়ীতেও মেয়েটি চুপ ক'রে বসে রইল। এবং চুপ করে নেমে গেল মাঝপথে ওর বাড়ীর কাছে।

রঞ্জন অংশুর বাসাতেই নামল। বললে—একটু তেষ্টা আছে দাদা। খেয়ে যাব।

—বেশ তো!

অংশু মদ্যপান করে। তবে বাড়ীতে। বারে যায় না। দলেও না। রাত্রে বাড়ীতে বসে খায়। পার্টিতেও সে যায় না। গেলেও সেখানে খায় না। দু চারজন বন্ধু আছে তারা

রাত্রে থাকলে তাদের সঙ্গে খায়। রঞ্জন তাদের মধ্যে একজন। বাড়ীতে বসে মদের গ্লাস হাতে নিয়ে বললে অংশু—ওকে কোথায় পেলে রঞ্জন ? ও—পারবে ?

রঞ্জন বললে—আপনি তো জানেন ওকে।

—জানি। প্রগল্‌ভা বটে। ইলেকট্রিক কুকার কোম্পানীর বেশ সাকসেসফুল ক্যানভাসার বটে। মেয়েটির মোহ আছে। এই জানি। ও পারবে ?

—পারবে বলেই মনে হয়। ওকে প্রথম দেখি—কফি হাউসে। তারপর দেখি মেট্রোর বারে; তারপর দেখি চিড়িয়াখানায় একদল ওরা হৈ হৈ ক'রে ঘুরছে। সিগারেট খাচ্ছে। জন ছয়-সাত ছোকরা তিন-চারটি মেয়ে। একটা এ্যাংলো মেয়েও ছিল। ওদের মধ্যে একজনের সঙ্গে পরিচয় ছিল। সবার সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল। সব মডার্ন ক্লেস। চাকরী করে অধিকাংশই ওই কুকার কোম্পানীতে। সবাই অবিবাহিত। নামহীন ক্লাব। ওরা eat drink and be merry বলতে পারেন। এই সেদিন মেয়েটির চেহারায় বেশ কি ভাব ভাল লাগল। এ পার্টটা বিমল গুপ্তের বউয়ের একবার কথা। অশিক্ষিতা অসভ্যা। বিমলের স্ত্রী নিজে একটু মোটা তা জানে। পার্টটাও কঠিন। যে সব মেয়েরা পয়সা নিয়ে অভিনয় করে—তাদের সবাইকে চিনি, কাউকে ঠিক মনে লাগছিল না। তা ছাড়া ওরা সব এমন পালিশ-শোখা মরাল হয়ে গেছে—না যে যতই শেখান—সে শেখানো বুলির সুর ছাড়বে না। হঠাৎ মনে খেলল, একে নিলে কি হয় ? বললাম। প্রথমে বললে—ও হবে না। তারপর পাঁচদিন লেগে রইলাম। বললাম—ভাল পার্ট করবে—সিনেমায় নেমে যাবে। বললে—দেখুন, প্রেজুডিস কিছু নেই আমার। হবে এই বেশ আছি। এর বেশী কি করব ? কি হবে ? তখন বললাম—আমাদের ক্লাবে ভাল লোক—সম্ভ্রান্ত লোক সব। তাতে ও হাসলে। তখন কথায় কথায় আপনার কথা বললাম—রাজী হল। বললে—সত্যি ? বললাম—চল দেখতে পাবে। তখন বললে—তা হ'লে রাজী। কিন্তু আগে থেকে আপনারা চেনেন তা কি জানি ?

অংশু গ্লাসের পানীয়ের দিকে তাকিয়ে বললে—হুঁ।

একটু পর আবার বললে—কিন্তু ও পারবে কিনা আমার সন্দেহ হচ্ছে।

—কেন ?

—প্রগল্‌ভতা আর এ্যাক্টিং এক নয়। গলা খুকোর। তুমি তো আমার থেকে ভাল জান!

কথাটা অংশুমানের মিথ্যে হল না—সাঁত্যা হল! পরেরদিনই রিহারশ্যালে এসে সাঁতা রিহারশ্যাল দিতে দিতে থমকে গেল। প্রথম দিকটা যেখানে সে ডাক্তারের কাছে তার বিরুদ্ধে অভিযোগের উত্তর দিচ্ছে সেখানটা বেশ দিলে। খাসা বললে। সেখানটা অংশুমানের পার্ট ছিল না—সে বসে শুনছিল—তার আঙুলে ধরা সিগারেট পুড়ে যাচ্ছিল—ভুলে গেছে সে টানতে। কি চমৎকার বলছে মেয়েটি। রঞ্জনের দৃষ্টি আছে—অনুমান আছে। প্রবীণ ডাক্তার বললে—এ তুমি কি করছ ? কোন পথে চলেছ ?
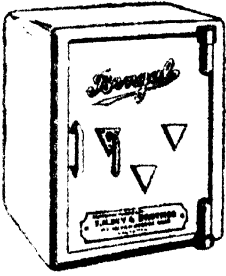
—যা আমার মন করায় তাই করছি ডাক্তারবাবু! আমার কাছে তো তা অন্যায় মনে হয় না। হলে করব কেন ? এবং অন্যে বললেই বা মানবে কেন ?

—অন্যায় মান না ?

—না। আর পথ ? কোন পথে মানুষ কোথায় কবে কোন স্বর্গে পৌঁচেছে বলুন ? সেই তো মাটির ধুলোতেই সে চোখের জল ফেলে শেষ নিঃশ্বাস ফেলে। তারপর মাটির ধুলোতেই মিশিয়ে যায়। তারপর কে তার ছবি টাঙিয়ে রাখলে, নিত্য একটি ক'রে মালা দিলে, তাতে কি কিছু আসে যায় যে মরে তার ? যায় না। আমার কাছে তো যাবে না। বরং তার চেয়ে এই চিঠিপত্র দেখুন। বিচার করুন আমি তাকে ঠকাতে চেয়েছি—অন্যায় ক'রে ব্ল্যাকমেলিং করেছি—না তিনিই প্রতিশ্রুতি ভেঙে আমাকে জব্দ করতে চেয়েছেন। যার উত্তরে এগুলি জাল নয়—সত্য আমি প্রকাশ করে দিয়েছি। বিচার করুন। পাপ-পুণ্যের বিচার লোকে বলে ভগবানের হাতে। তিনি নেই বলেই আমার ধারণা। থাকলে তো এমনিই আমার সাজা হবে তাঁকে না-মানার জন্যে। এটা না হয় বোঝার উপর শাকের আঁটির মত তার উপর চাপবে। ফাঁসির হুকুমের পর পাঁচ বছর কারাবাসের ব্যবস্থা হবে!

সুন্দর বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে বললে সাঁতা। সকলে তারিফ করে উঠল। অংশুমানও বলে উঠল—চমৎকার। সুন্দর হচ্ছে। এই স্পিরিট বজায় রেখে চললেই বাস আর কিছু লাগবে না।

দিনের শেষে —[illegible] সিংহ

সীতা সিনটা সেরে অংশুর সামনেই বসল, বললে—এক প্লাস জল খাব! বাবাঃ। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে! গেছেতে এমন একটি বিস্ময়ের টান ছিল—যে সকলেই হেসে উঠল। তাতে সে অপ্রতিভ হল না। বললে—তবে এমন কিছু নয়—ফাঁসির আসামীর পাটাতনের উপর দাঁড়ানো নয়।

অল্পক্ষণ পরেই এল সেই সিন। অংশুমানের সঙ্গে তার অভিনয়। স্থির হয়ে একদৃষ্টে চেয়ে সে ওই বিচিত্র কল্পনার বিভোর রোগীর চরিত্রে অংশুমানের অভিনয়ের মহড়া দেখতে লাগল। ভরাট গলায় বলে যাচ্ছে অংশুমান। চোখ তার স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। সে বলছে—রাত্রে যখন সবাই ঘুমোয় তখন সে জেগে থাকে—সে যেন দূর দূর অতিদূরে কোন লোক থেকে ডাক শুনতে পায়—ওগো—ওগো—আমায় ধর—আমায় টেনে নাও! পাতায় খসখসানি ভেসে আসে, সে বুঝতে পারে—অসহায় ভাবে বায়ুস্তরে তার অশরীরী কান্নাখানি ভেসে বেড়াচ্ছে। সে দু'হাত বাড়িয়ে সেদিন সেই জলের তলায় যেমন তার জন্যে হাত বাড়িয়েছিল—তেমনি ভাবেই এই শূন্যতার সমুদ্রের মধ্যে তার জন্যে হাত বাড়িয়ে আছে। ঝিল্লী ডেকে যায়—তার মধ্যে সে শোনে তার জীবন-জোড়া কান্না! কিন্তু আজ সে আসবে। সে আসবে। নিঃশব্দ পদপাতে এসে দাঁড়াবে সেই ক্ষণে—আমি বাঁশী বাজাব—তার সুরের সূত্র ধরে সে এসে দাঁড়াবে—ওই জানালার ধারে—

—উঠুন। সীতা দেবী—উঠুন।

—আমি?

—হ্যাঁ। জানালার ধারে এসে দাঁড়িয়েছেন আপনি। ডাকছেন—মধুকর! ক্যাচ ধরে ডাকতে হবে। মানে ওর অসমাপ্ত কথা আপনার কথায় সমাপ্ত হবে!

সীতা সেন উঠে দাঁড়াল। রঞ্জন পরিচালক—সে বললে, অংশুদা আর একবার শেষটা বলুন। অংশু চোখ দুটি উপরের দিকে তুলে বিষন্ন-উদাস অথচ প্রত্যাশাভরা কণ্ঠে বললে—রাত্রে ঝিল্লী ডেকে যায় আমি শুনতে পাই তার জীবনজোড়া কান্না বেজে চলেছে। একটু থেমে সে আবার শুরু করলে, কণ্ঠস্বর পাল্টালো—একটু দীপ্ত হয়ে উঠল। অংশুমান বললে—কিন্তু আজ সে আসবে। নিঃশব্দ পদক্ষেপে আসবে। আমি বাঁশী বাজাব—বাঁশীর সুরের সূত্রোটি ধরে সে এসে দাঁড়াবে হয়তো ওই জানালার ধারে আমাকে ডাকবে—

ইসারা করলে রঞ্জন। বলুন-বলুন।

একটু চেষ্টা করলে সীতা সেন—কিন্তু বলতে পারলে না। কেমন যেন নার্ভাস হয়ে গেছে মুখ দেখেই বোঝা যায়। পারলে না বলতে—সময় পার হয়ে গেল।

অংশু বললে—আচ্ছা আবার আমি বলছি। সে শুরু করলে। কিন্তু তবুও বলতে পারলে না সীতা সেন— মুহূর্তে মুহূর্তে তার মুখখানা ফ্যাকাসে ক্লিষ্ট হয়ে যাচ্ছে। চোখের দৃষ্টি কেমন অসহায় ভয়ার্ত হয়ে উঠছে! চুপ ক'রে সে দাঁড়িয়ে আছে!

অবশেষে সে বললে—এ আমি পারব না। বলে অত্যন্ত ধীর পদক্ষেপে এসে বসে পড়ল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মাথা নিচু করে বসে রইল। গোটা ঘরখানাই নিস্তব্ধ। সকলে চুপ হয়ে গেছে। চোখে তারা দেখতে পাচ্ছে মেয়েটির অবস্থা। এ অবস্থায় কি বলবে—কি বলতে পারে?

নীরবতা ভঙ্গ করে অংশু বললে—কি হ'ল? আসছে না?

মুখ মাথা ঝেড়ে সে বললে—না!

—এক কাজ করুন। বইখানার ওই সিনটা রিডিং পড়ুন! বেশ উঁচু গলায়। অবশ্য এ্যাকটিংয়ের মত করে। পড়ুন।

সীতাকে বইখানা এগিয়ে দিল রঞ্জন। সীতা কিন্তু স্পর্শ করল না। অংশু বললে—পড়ুন। সীতা এবার ঘাড় তুলে মাথা নেড়ে বললে—আমি পারব না!

—কেন পারবেন না?

—না। আমি কেমন হয়ে যাচ্ছি। তাছাড়া আপনি এত ভাল পার্ট করছেন—আপনার পরে আমার কথা আসছে না। আমার গলা শুকিয়ে গেছে। হাত পা কাঁপছে। আপনারা অন্য কাউকে দিন।

—বেশ তো একবার পড়ুন না।

—কি হবে পড়ে? পারব না যা—।

—লজ্জা লাগছে?

—লজ্জা? একটু জোরে সীতা বললে—লজ্জা কেন হবে? প্রথম সিনে যে কথাগুলো বললাম—লজ্জা পেলে ওই কথাগুলোই আটকাতো!

—বেশ, আপনি পড়ুন। কথাটাই রাখুন না।

বইখানা টেনে নিয়ে পড়ে গেল সীতা। সবটাই পড়লে। অর্থাৎ রিডিং পড়ে সে নববধূ যুগলের কথাই বলে গেল। পড়ার মধ্যে অভিনয়ভঙ্গির রেশ ছিল না কিন্তু পড়ে গেল। অংশু বললে—ঠিক আছে। আমি এখানে রিহারশ্যালের মত করে বলে যাই আমার পার্ট, আপনি পড়ে যান বই দেখে।

সেটা সে পারলে। অংশু বললে—আজ থাক। খুব ভাল হবে আপনার। দেখবেন।

অংশু সেদিন ট্যাক্সিতে শুধু সীতাকে নিয়ে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে নিজে বাসায় ফিরল। ট্যাক্সিতে চড়বার সময় সীতাকে ডাকলে—আসুন। পৌঁছে দিয়ে যাব! রঞ্জন তুমি চলে যেয়ো।

ট্যাক্সিতে চড়ে সীতাকে বললে—শাই কেন আপনি?

—শাই? শাই কেন হব? আপনিই বলুন না আমি শাই? আমি ক্যানভাসারের কাজ করি, আমি শাই? হাসলে সীতা।

অংশু বিস্মিত হয়ে গেল। সীতা পাল্টে গেছে। এ সেই মেয়ে। ক্যানভাসার। রঞ্জন বলেছিল—তাকে সে কফি হাউসে দেখেছে, মেট্রোর বারে দেখেছে, চিড়িয়াখানায় দলের মধ্যে হৈ হৈ করতে দেখেছে—অংশু তাকে নিজের চোখে না দেখলেও তার আভাস পাচ্ছে।

অংশুমান বললে—তা হলে? অভিনয়ে লাভ সিন। এতে নার্ভাস হচ্ছেন কেন?

একটু ভাবল সীতা। বললে—দেখুন,—কারণ ঠিক একটা নয়। আমি বসে বসে ভাবছিলাম।

—কারণগুলো কি বলুন দেখি?

সীতা তার কপালের চুল সরিয়ে বললে—প্রথম কারণ আপনার সামনে। আপনি খুব ভাল অভিনয় করেন শুনেছিলাম—রিহার্স্যালে দেখছি। আমি বলব কথাগুলো, কিন্তু লোকে বোধহয় হাসবে।

—না, হাসবে না। একটু প্রাণ দিয়ে অভিনয় করতে হবে। নিজেকে একটু ভুলতে হবে। দেখবেন আমার চেয়ে—

সীতা সেন বললে—সেই হয়েছে বিপদ। কিছুতেই ভুলতে পারছি না নিজেকে। আমি—। কিছু মনে করবেন না তো?

—কেন, মনে করব কেন?

এগুলো রোমান্টিক ননসেন্স মনে হচ্ছে আমার। আমি মডার্ন-টডার্ন বুঝিনে। হাল-ফ্যাসান জানি। সাজতে-গুজতে পারি। কথাও বলতে পারতাম, এখন ক্যানভাসারি করে প্রায় টেপ রেকর্ডারের মত বেজে চলি। বাবা ছিলেন রিটায়ার্ড গভর্নমেন্ট সারভেন্ট—বাড়ীতে এককালে সাহেবিয়ানা ছিল, রিটায়ারমেন্টের পর অনেক খাটিয়েছিলেন, কিন্তু উঠিয়ে দেননি। ছেলেবেলা মিশনারী ইস্কুলে পড়েছি। বড় হয়ে কিছুদিন লরেটো তারপর অর্থাভাবে দেশী ইস্কুলে।

হেসে বললে—অবিশ্যি আজকাল আর লরেটো আর দেশীতে তফাৎ নেই। সবখানে এক হাওয়া এক জল। পড়াশুনোয় ভাল ছিলাম না। ইস্কুলে হৈ হৈ করেছি; কিছুই গ্রাহ্য করিনি ভাবিনি। বাবা বলতেন—বিয়ে marriage is sort of liscensed prostitution; তবু বিয়ের কথা বলতেন। বলতেন বিয়ে দিতে হলে খুব ভালো ঘরে ভালো পাত্রে দাও। নয় তো দিয়ো না। মেয়েকে লেখা-পড়া শেখাচ্ছ খেটে খাবে। বিয়ের রোমান্স দশদিন। বামুনদের অশৌচের মত। মাথা কামিয়ে শ্রাদ্ধ সেরেই উইল প্রবেট, সাকসেশন সার্টিফিকেট, ব্যাঙ্ক ব্যালান্স বিষয়ের হিসেবে বসতে হবে। না বসে উপায় নেই। বাইরের জগৎ বাধ্য করবে এবং তোমার অন্তর একেবারে ঝাঁপ দিয়ে পড়বে like a hungry dog বাপের পরিত্যক্ত মাংসখণ্ড—বা—আধখানা খাওয়া গরু-শুয়োর যাই বল তার উপর। আমার বিয়ের কথায় বাবা মাকে বলতেন এসব। এমনিও বলতেন।

একটু থেমে সীতা বললে—অবাক হচ্ছেন না?

অংশু বললে—একটুও না। অত্যন্ত নগ্ন সত্য!

—ওই। নাটকের সত্যটা ওই নার্সের বধূবেশের মত ছদ্মবেশ একেবারে মিথ্যে!

—তা না-হতে পারে। তবুও একটি মেয়ে পুরুষের মধ্যে প্রেম হতে পারে। তার উপর ছেলেটির মনে অনুশোচনা রয়েছে!

—তাই কি? সীতা প্রশ্ন করলে।

—কেন? এটাকে অসত্য বলবেন কি করে?

সীতা বললে—যদি বলি আমার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে। আমার উপলব্ধি

থেকে। শুধু একলা আমার নয়। সব মানুষেরই তাই!

—না।

—আমিও না বলছি। আপনি লেখক। এই সেন্টিমেন্টগুলো নিয়ে ভাঙিয়ে কিম্বা এই কাঁচা মাটি নিয়েই নানান পুতুল গড়েন। বাস্তবকে স্বীকার করেন না। আমার নিজের জীবনের বাস্তব একেবারে পাথুরে মাটির বাস্তব। পলিমাটির সমতল নয়। তবুও স্বীকার করবেন যে পৃথিবী বলতে শুধু মাটি বোঝায় না মাটি পাথর দুই বোঝায়! আমার জীবনে আই-এ দুবার ফেল করলাম —বাবা মারা গেলেন। শেষের দিকে তিনি আমার বিয়ের জন্যে চেষ্টা করছিলেন। চেহারা খারাপ নয় আমার, দুচার ঘরে সম্বন্ধ হচ্ছিল। কিন্তু টাকা প্রবলেম, আমার শুধু ম্যাট্রিক কোয়ালিকেশন প্রবলেম। বাবা ক্লার্কেল অফিসার ছিলেন—বড় বাড়ীতে ভাল চাকরে ছেলের কাছে সেটা প্রবলেম। বাবার প্রবলেম—গেরস্তঘর। সাধারণ ছেলে, শুধু কেরানী!

হেসে উঠল সীতা। তারপর বললে—সুতরাং বিয়ে হল না। বাবা মারা গেলেন। দাদা শুধু কেরানী—তিনটে ছেলে—বউদি বড় চাকুরের মেয়ে। নতুন প্রবলেম। বাবার পেনসেন বন্ধ। বাবার দেনা। প্রবলেমের উপর প্রবলেম। বাবার বন্ধু একজন এই চাকরী করে দিলেন। পলিটিক্যাল পার্টীতে বিয়েব সুযোগ আছে। অবশ্য ডাইভোর্সের পথ খোলা রেখে বিয়ে। এই চাকরীর মধ্যেও সেটা আছে। অনেক অল্পবয়সী ছেলে আমাদের সঙ্গে কাজ করে। তাদের সঙ্গে মিশছি-হাসছি-খেলছি এবং এটা একেবারে দিনের আলোর মত স্পষ্ট যে—দেহের তাড়নায় ছেলেতে মেয়েতে কিছুকাল হয়তো দু' মাস এক বছর—বড়জোর একটা বাচ্চা হওয়া অবধি বেশ একটা গাঢ় উত্তপ্ত আবেগ থাকে সেটাকে আমরা প্রেম বলি। তারপর ওই অশৌচের মত কালটা কাটে। তখন হিসেব আসে। এবং দেখা যায় সাপের বিষ দেহে ঢোকার জন্য জিভে যা মিষ্টি ঠেকছিল সেটা বিষের ক্রিয়াটা কাটতেই তেতো নিম হয়ে গেছে। যাদের বিষ কাটে না তারা মরে সাপে কাটা রোগীর মত। সুতরাং ওই যে নাটকের অ্যাক্টিং ওটাকে সত্য বলে মানি কি ক'রে?

হেসে অংশুমান বললে—এইখানেই হেরে গেলেন। নিজেকে নিজেই কন্ট্রাডিক্ট করলেন।

—কেন? আপনার সাহিত্যিক প্যাঁচটা শুনি?

—প্যাঁচ একটুও দিচ্ছি না। প্যাঁচে আপনিই পড়েছেন। সমস্ত ব্যাপারটাই গোলমাল ক'রে ফেলেছেন।

সীতা তার দিকে সবিস্ময়ে তাকালে।

অংশু বললে—ওটা সত্যিকারের ক্লাড সিন? না নাটকেই বলে দেওয়া আছে, ওটা অভিনয়?

চমকে উঠল সীতা।

অংশু বললে—নয়?

সীতা এবার ধীরে ধীরে বললে—যেন ভেবে বুঝতে বুঝতে বলছে— কিন্তু মেয়েটা অভিনয় করতে গিয়ে তো প্রেমে পড়েছে। বিষ খেয়ে মরেছে।

—তা মরেছে। সেখানটায় তো আপনি শুধু শুয়ে থাকবেন চোখ বুজে। আপনার নিশ্বাস পড়বে—সেটা নাট্যশাস্ত্র অনুসারে আপত্তিজনক হবে না!

হেসে উঠল সীতা।

অংশু বললে—আপনার নামবার জায়গা কিন্তু পেরিয়ে চলে এসেছি।

—ও মা। তাই তো। ওঃ বউদি যা ঝাঁ-ঝাঁ করবে! সব তেতো হয়ে যায়।

অংশু বললে—সাপের বিষের ক্রিয়াটা কাটিয়ে দেন। সীতা খিলখিল করে হেসে উঠল!

অংশু ট্যাক্সিওলাকে গাড়ী ঘোরাতে বললে।

* * *

পরেরদিন সীতা এল এবং ওই সিনটার রিহারশ্যাল দিতে দাঁড়াল। প্রথমেই বললে—আজ আর একবার দেখি! না পারি তো মাপ চাইব কিন্তু।

রিহারশ্যাল কিন্তু ভালো হল না। প্রাণহীন হয়ে গেল। কথাগুলো বলে যাওয়াই হ'ল। সে কিছু বলবার আগেই অংশু বললে—গুড!

সীতা বললে—এই গুড?

—তার সূচনা!

—আমার কিন্তু মনে হচ্ছে হবে না।

—হবে! আমি বলছি!

অংশুর অনুমান পুরো সত্যিও হল না—মিথ্যেও হ'ল না। সীতা সেন অনেকটা উন্নতি করলে কিন্তু সেটা অংশুর বিপরীতের উপযুক্ত নয়। এবং কেমন একটা খামতি যেন রয়ে গেল।—প্রতিদিনই অভিনয় শেষে বেশ একটু হেসে নিয়ে বলত—বাবা, একেই বলে নাটক। রীতিমত নাটক!

ষোড়শী সংঘের সভ্যেরা প্রত্যেকেই মর্যাদাবান লোক। অন্তত সমাজে সেটা স্বীকৃত এবং তাঁরা নিজেরাও সে সম্পর্কে সচেতন। তাঁরা বেশ খুশী হচ্ছিলেন না। অস্বস্তি বোধ করছিলেন এই রূপসচেতন মেয়েটির অতি-আধুনিকতা ও উগ্র প্রগল্ভতার জন্য। এই কয়েকদিনেই সে স্বরূপে প্রকাশিত করেছে নিজেকে। দু-একদিন তার প্রসাধনের মিষ্টি গন্ধের সঙ্গে একটি ক্ষীণ কটুগন্ধ পাওয়া গেছে! সে হাসছে উচ্চগ্রামে। আসে যায় তার পদক্ষেপ অতি চঞ্চল এবং একটু বেশী শব্দ করছে তাঁদের চেয়ে!

রঞ্জন নিজেও একটু অস্বস্তি বোধ করছে এবং মনের মধ্যে একটু অপ্রীতি জমে উঠেছে। অংশুমান যেন ওকে নিয়ে খেলা করছেন। কেউ কিছু বলতে পারছে না।

বিপদ বাধল স্টেজ রিহারশ্যালের দিন। এতদিনের পর ওই সিনে অংশুমানের কথা ধরে কথা বলতে গিয়ে কথা বলতে পারলে না। প্রথম দিনের মত।

—কি হল?

বলতে সে কিছু পারলে না কিন্তু থরথর করে কাঁপতে লাগল!

সকলে বলে—কি হল?

সে অসহায় ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, ঘামছে; দরদর ধারে ঘামছে। একটু একটু হাঁপাচ্ছে। রঞ্জন এসে বললে—মিস সেন, কি হল?

অস্ফুট কণ্ঠে সে বললে—পারছি না। এ আমি পারব না রঞ্জনবাবু!

—সে কি?

—না! আমি পারব না! আমার সর্বাঙ্গ কাঁপছে! দেখুন!

ষোড়শী সংঘের সকলে রাগে অধীর হয়ে উঠল। বিমল গুপ্ত বললে—রাবিশ! প্লে বন্ধ করে দিন! রঞ্জনবাবু আর অংশুবাবু এর জন্যে দায়ী।

মাসীমা বললে—এ যে দারুণ ন্যাকামি। আমরা পারিনে!

অংশু উঠে এল, সে স্টেজে তার জায়গায় বসে ছিল। বললে—সরুন তো সব।—সকলে স'রে দাঁড়াল। অংশু এসে সামনে দাঁড়াল সীতার। বললে—কি হয়েছে তোমার? এক মুহূর্তে সে তুমি বললে। কণ্ঠস্বর তার রূঢ়।

সে কণ্ঠস্বর শুনে সীতা সকরুণভাবে তার মুখের দিকে তাকালে।

অংশু বললে—কি হয়েছে বল?

সীতা বললে—আমি পারছি না। আমি কাঁপছি! ঘামছি!

—না কাঁপছ না। ঘামছ ঘাম। পার্ট করতেই হবে!

সীতা এবার বললে—না, আমি পারব না!

খপ ক'রে তার হাত ধরে অংশু তাকে টেনে গ্রীনরুমের একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দিলে! সীতা তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

—কি? পারবে না কেন?

সীতা এবার একলা অংশুমানকে পেয়ে দীপ্ত হয়ে উঠল এবং বললে—না। পারব না। আমি পারছি না! করব না আমি অভিনয়!

—কি ভেবেছিলে কি?

—কি?

—সাহিত্যিক অংশুমান তোমার প্রেমে পড়েছে? এবং ভয় হচ্ছে অভিনয় করতে গিয়ে তার প্রেমে তুমি পড়ে যাবে? নির্বাক স্তব্ধ হয়ে গেল সীতা। তার সুন্দর মুখ পেন্টের রঙে আরও সুন্দর হয়ে উঠেছিল—সে মুখ যেন কালো হয়ে গেল। দুটি অশ্রুর ধারা তার চোখের কোল বেয়ে নেমে এল।

অংশু বললে—কাঁদছ কেন? কেঁদে কি ফল? এদের কথা ভাবছ না তুমি?

চোখ মুছে সীতা উঠে দাঁড়াল। বললে—চলুন।

কোন উৎসাহবাক্য বললে না অংশু—কোন সান্ত্বনা না—দরজা খুলে বললে—এস!

ষ্টেজে এসে বললে—আরম্ভ কর। গোড়া থেকে। এই সিনের গোড়া থেকে। বিকেল থেকে সিন আরম্ভ। বিকেলের আলো—! বিকেলের আলো দাও! প্রমটার—!

আরম্ভ হয়ে গেল। একপাশে উইংসের ধারে মাটির মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল সীতা। মাটির দিকে চেয়ে আছে। হঠাৎ তার কানে এল—কিন্তু আজ সে আসবে। নিঃশব্দ পদক্ষেপে আসবে! আমি আমার বাঁশীর সুরে ছাড়িয়ে দিয়েছি। তারই সুতো ধরে এসে—সে হয়তো ওই জানালার ধারে এসে দাঁড়িয়ে ডাকবে—

—মধুকর—! সীতা এসে ঠিক দাঁড়িয়ে ডাকলে।

কে একজন বললে—লাউডার।

অংশু বিরক্তিভরে বললে—না! ঠিক ডাক হয়েছে। লাউডার হবে না। প্রেমের অভিনয় চীৎকার করে ঢাক বাজিয়ে হয় না। ডিস্টার্ব করবেন না। প্লিজ! তবে একটু ড্রাই হয়েছে।

আবার এই জায়গাটা থেকে আরম্ভ করতে হল।—সীতা আবার ঠিক এসে ডাকলে মধুকর! তারপর চলল অভিনয়ের মহলা। আগামীকালের জন্য প্রস্তুতি! ঠিক চলছে, শুধু সীতা প্রাণহীন! শুধু বলেই যাচ্ছে। বলেই যাচ্ছে যেমন প্রমটার বলাচ্ছে। কিন্তু সে এখনও কাঁপছে—এখনও ঘামছে। মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেছে। তবু সে পার্টটা চালিয়ে যাচ্ছে।—সিন শেষ করে বাইরে এসে সে বসে পড়ল। হাঁপাচ্ছে সে।

রঞ্জন এসে পাখাটা খুলে দিলে। দুই হাতে মুখ ঢেকে বসে আছে সীতা। সম্ভবত কাঁদছে! অংশুমান দৃশ্য বদল হতে এসে দাঁড়াল সেখানে। বললে—মরে শুয়ে থাকার সিনে আজকে ওকে শুতে হবে না। এমনি করতে বল।

রঞ্জন চলে গেল। অংশুমান বললে—এখন ভাল বোধ করছেন?

মুখ তুলে তাকিয়ে সে একটু হেসে বললে—অভালো বোধ করেছি কে বললে আপনাকে? এখন দয়া করে একখানা গাড়ী আনিয়ে দিন। ভাববেন না—কাল ঠিক সময় আসব।

—ধন্যবাদ। গাড়ী ঠিক আছে। দেখি দাঁড়ান।

নিঃশব্দে সে চলে গেল। ষোড়শী সংঘের সভ্যদের মধ্যে অসন্তোষ অতৃপ্তির গুঞ্জন উঠল। প্রাণহীন শুষ্ক অভিনয়ের জন্য কোন ক্রিয়া হয় নি দর্শকদের মনে। অংশুমান বললে—কি করব? আর তো উপায় নেই। তবে—। কাল এর চেয়ে ভাল করবে তা বলতে পারি। আজ আমি ওকে খুব মানে বাক্যে যতখানি কশাঘাত হয় করেছি।

পরদিন পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে প্রবীণ লেখক শিবনাথের সামনে অংশুমানের কথাটা পরিমাণে অতি সত্য হয়ে উঠল। আশ্চর্য! সীতা এল যথাসময়ে। নীরব স্তব্ধ। এবং

চোখ দুটি অত্যন্ত ধারালো মনে হল। কিছু পান করেছে কিনা সে নিয়ে মহিলারা একটু কানাকানি করলেন। কিন্তু কোন ব্যতিক্রম বৈলক্ষণ্য কেউ দেখতে পেলে না গন্ধ পেলে না। ওদিকে সীতা প্রথম দৃশ্যে ধারালো ছুরির দীপ্তি নিয়ে প্রবেশ করলে। সে যখন বক্র তিক্ত হেসে বললে—যা আমার মন করায় আমি তাই করি ডাক্তারবাবু। আমার কাছে তো তা অন্যায় মনে হয় না। মনে হলে করব কেন? আর অন্যে তাকে অন্যায় বললে মানব কেন?

—মানবে না?

—না। আর পথ? কোন পথে মানুষ কোথায় কবে কোন্ স্বর্গে পৌঁচেছে বলতে পারেন? সেই তো মাটির ধুলোতেই সে চোখের জল ফেলে শেষনিঃশ্বাস ফেলে। তারপর ছাই হয়ে কিম্বা পচে মাটির ধুলোতেই মিশে যায়!..............। পাপ-পুণ্যের বিচার লোকে বলে ভগবানের হাতে। তিনি নেই বলেই আমার ধারণা। আমি মানি না। থাকলে তো এমনিতেই আমার সাজা হবে তাঁকে না-মানার জন্যে। তার উপর এই সব যদি পাপই হয়—তবে তার সাজাটা বোঝার উপর শাকের আঁটিই হবে। ফাঁসির হুকুমের পর পাঁচ বছর কারাবাসের ব্যবস্থা হবে।

সে কথা শুনে লোকে শিউরে উঠল। চমকিত হল। কি প্রখরা, কি উদ্ধত—উগ্র মেয়ে! তারপর কিন্তু শেষ দৃশ্যে সে যখন বধূবেশে এল, তখন তার কণ্ঠ যেন বিরহ-বিধুরা চক্রবাকীর মত করুণ। এবং অভিনয়ের মধ্যে মনে হল—অংশুমানের কাছে বসে থাকলেও একটি অদৃশ্য নদী তাদের মধ্যে বয়ে যাচ্ছে। যার অপর পারে সে বসে রয়েছে। কিন্তু সে আজও কাঁপছিল। থর-থর করে কাঁপছিল। মুখের পেন্টের উপর বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। পার্ট শেষ করে সে টলতে টলতেই বেরিয়ে গেল। প্রেক্ষাগৃহে দর্শকেরা কাঁদছে। মাসীমা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। বড়দিদি চুপ করে বসে আছেন। দুটি জলের ধারা তাঁর চোখের উপর চিক্‌চিক্‌ করছে—তিনি মোছেন নি। মুছতে ভুলে গেছেন। লেখক শিবনাথবাবুর চোখেও জল।

শেষ দৃশ্যে প্রবীণ ডাক্তার চিঠিখানা পড়লে। নাটক শেষ হল।

ছুটে গেলেন মাসীমা স্টেজের ভিতর। বড়দিদি এবং অন্য সভ্য ও কিছু নিমন্ত্রিতেরা গেলেন স্টেজের মধ্যে। শিবনাথ-বাবুও গেলেন। বিমল গুপ্ত স্টেজের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল। সে বললে—মেয়েটি এসেই অজ্ঞান হয়ে গেছে। এখন—একটু—।

অর্থাৎ ভিতরে যাবেন না।

শিবনাথবাবু বললেন— একদিন আমার ওখানে সব নিমন্ত্রণ তোমাদের বলো অংশুকে।

স্টেজ থেকে বেরিয়ে গ্রীণ-রুমে সীতা টলতে টলতেই এসেছিল এবং এসেই মরা নার্সের ভূমিকার জন্য অন্য সেটে যেতে যেতে পথেই লুটিয়ে পড়েছে—জ্ঞান হারিয়ে। রঞ্জন তাকে তুলে পাখার তলায় শুইয়ে মুখে-চোখে জল দিয়েও জ্ঞান ফেরাতে পারে নি। ডাক্তার ডাকতে হয়েছে। এর মধ্যে অংশুমানও এসেছে। সে দেখেই দুবার ডেকে ওর পাশে ঝুঁকে ব'সে আছে। ডাক্তার বলেছেন অত্যন্ত স্ট্রেন হয়েছে। খুব ইমোশনের সঙ্গে পার্ট করার জন্যে হয়েছে! এখন বিশ্রাম—ফুল রেস্ট। অন্ততঃ ঘণ্টাখানেক শুইয়ে রাখুন। জ্ঞান অবশ্য একটু পরই হবে। একটু গরম দুধ—না হলে জল দিন। ওই চোখের পাতা কাঁপছে। চোখ মেলবেন। —কিন্তু ভিড় করবেন না! না।

আধঘণ্টা পর রঞ্জন সীতাকে বললে—গাড়ী আনতে বলি?

সীতা বললে—হ্যাঁ!

রঞ্জন বেরিয়ে গেল—অংশুমান সামনে চেয়ারে বসে সিগারেট টানছেন। সে বললে—সীতা!

সীতা তার মুখের দিকে তাকালে।

অংশুমান বললে—তোমাকে আমি ভালবাসি সীতা।
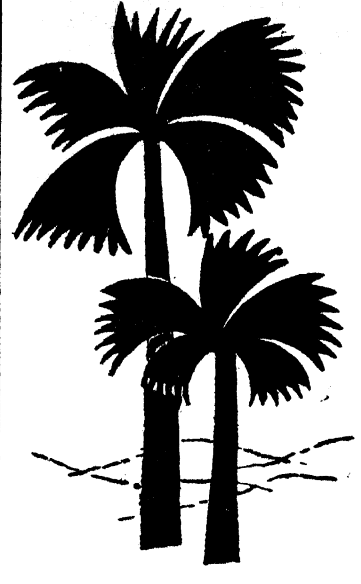
সীতা একটু হাসলে। কিন্তু কিছু বললে না।

রঞ্জন ফিরে এসে দাঁড়াল।—গাড়ী এসেছে!

সীতা উঠে দাঁড়িয়ে বললে—আমার মনকে আমি বুঝে দেখব অংশুবাবু। পরে—

—পরে?

—আজকেই এখুনি উত্তর চান?

—হ্যাঁ।

একটু চুপ ক'রে থেকে সীতা বললে—না। তারপর বললে—অভিনয়—অভিনয় অংশুবাবু। ভুলে যান। অভিনয় শেষ হয়ে গেছে।

অংশুমান দৃঢ় কণ্ঠে বললে—না। অভিনয়ও সত্য হয়। জ্ঞান বুদ্ধি যুক্তি হারিয়ে মানুষ লুটিয়ে পড়ে ধুলোয়।

সীতা মাটির দিকে তাকিয়ে রইল। অকারণে বা সাধারণের অগোচর কোন কারণে টপটপ করে চোখ থেকে জল ঝরে পড়ল!

অংশু বললে—চল!

সীতার সঙ্গে অংশুর কিন্তু বিবাহ হয় নি। দেখাও বিশেষ হয় না। কখনও কখনও রবিবার দিন সীতা আসে—কুকারে রান্না করে—খায় দায়—সারাদিন বালুচরে দুটি ছেলেমেয়ের মত খেলা করে চলে যায়।

তবে চিঠি লেখে। অজস্র চিঠি দুজন দুজনকে লেখে। রঞ্জনের কথা মিথ্যে হয়েছে। অংশুমান চিঠি পোড়ায় না সযত্নে সঞ্চয় করে। সীতা এখন ক্যানভাসারি করে না সে এখন শিবনাথবাবুর সুপারিশে একটি আধা-সরকারী নারী প্রতিষ্ঠানে ভাল চাকরী করে। কফি হাউসে—মেট্রোর, চিড়িয়াখানাতেও আর দেখা যায় না। অভিনয়ও করে না, সে অংশুমানও না, সীতাও না। জীবনে অভিনয় শেষ হয়ে গেছে।

অন্নদাশঙ্কর রায়

"পাবন সেন-হাজরা! পাবন! তুমি লণ্ডনে!" বেণুদির জন্মদিনের উৎসবে ওই ছন্নছাড়া যুবককে আবিষ্কার করে রাঙাদি বিস্মিত ও সস্মিত হন।

করমর্দনের পর ওর হাতখানি ধরে ওকে বসিয়ে দেন আপনার একপাশে। "তোমার কথা আমি এত শুনেছি যে তুমি আমার নিম চেনা হয়ে রয়েছ। বাকী ছিল শুধু মুখ চেনা। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। বলব। পার্টির পরে।"

পাবন কিন্তু ভদ্রমহিলার নামটিপর্যন্ত জানত না। বেণুদির দিকে তাকাতেই তাঁর খেয়াল হয়। "ওমা। তাও জান না? মিসেস বরাট আমাদের দেশের বিখ্যাত—"

বিখ্যাত ব্যারিস্টার মিস্টার পি এল বরাটের সহধর্মিণী। রাঙাদি কথা কেড়ে নিয়ে নিজের গায়ে পেতে নিলেন। "দূর! বিখ্যাত কিসের! বিখ্যাত যদি বল তো আমার বন্ধু সরোজিনী নায়ডু। এ মণিহার আমায় নাহি সাজে।"

তা শুনে চারদিকে হাসাহাসি পড়ে গেল। অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা নিয়ে ছুটো-ছুটি করছিলেন বেণুদির স্বামী। এইচ গোস্বামী। ইনিও একদিন বিখ্যাত ব্যারিস্টার হবেন। আপাতত উকীল পরিচয়টা খণ্ডাতে বিলেত এসে মিডল টেম্পলে ভর্তি হয়েছেন। বেণুদিও নিয়েছেন বাংলা আর সংস্কৃত পড়ানোর কাজ। গোস্বামী—তার চেয়ে ভালো শোনায় বেণুস্বামী—এক সেকেন্ড থমকে দাঁড়িয়ে একটু ফিক করে হেসে বললেন, "রাঙাদি, শুধু কি দেশে, বিদেশের ইংরেজমহলেও আপনার নাম অনেকদূর ছড়িয়েছে। অবাক কাণ্ড! ওরাও বলে, রাঙ্গাডি!"

তা শুনে আবার একচোট হাসি। উৎসাহিত হয়ে বেণুস্বামী আরেক কদম এগিয়ে গেলেন। আক্ষরিক অর্থে নয়। "কে না জানে আপনারা কর্তাগিন্নী কী একটা গোপনীয় মিশন নিয়ে এদেশে এসেছেন। একটি ছোট পাখী আমার কানে ফিসফিসিয়ে বলছিল মোতিলাল নেহরু—"

রাঙাদি তর্জনী মুখে তুললেন। "চুপ চুপ! ও কী যা তা বকতে শুরু করলে, হেমেন্দর! তুমি কি জান না, সে রামও নেই সে অযোধ্যাও নেই। মন্টেগু যখন সেক্রেটারি অফ স্টেট আর সিন্‌হা আণ্ডার সেক্রেটারি তখন ওঁকেও একটা পদ অফার করা হয়েছিল। উনি ধন্যবাদ দিয়ে বলেন, আমি নাম চাইনে, দাম চাইনে, পদ চাইনে, পদবী চাইনে. আমি চাই শুধু এইটুকু. আমার দেশের শাসনসংস্কার আইনের খসড়ায় যেন আমারও কিছু হাত থাকে।"

সকলে উৎকর্ণ হয়ে শুনেছে লক্ষ করে তিনিও আরেক কদম এগিয়ে গেলেন। অবশ্য স্বস্থানে আসীন থেকে। "তা বলে নেহরু কনস্টিটিউশনে ওঁর কোনো হাত নেই। কেন যে ও রকম রটে! উনি এবার

এসেছেন প্রিভি কাউন্সিলে হিয়ারিং উপলক্ষে। বছর খানেক থাকতে হবে। বাড়ী নেওয়া হয়েছে। উনি ন্যাশনাল লিবারল ক্লাবের পুরোনো মেম্বর। সন্ধ্যাবেলা হয় ক্লাবে যান, নয় হাউস অফ কমন্সে গিয়ে ডিবেট শোনেন। যার যা নেশা। তাই আজকের মতো প্রীতিকর অনুষ্ঠানেও যোগ দিতে অক্ষম বলে ক্ষমা চেয়ে পাঠিয়েছেন।”

“ছি ছি! ও কী বলছেন, রাঙাদি! ওঁর মতো মান্য ব্যক্তির স্নেহ আশীর্বাদই পরম সৌভাগ্য।” বেণুদি দুই হাত একত্র করলেন।

“আমার কথা যদি বল”, রাঙাদির কথা তখনো শেষ হয়নি, “আমি একজন সেকেলে ফেমিনিস্ট। মিসেস প্যাঙ্কহার্স্টের অনুচর হয়ে লড়েছি। এই যে মেয়েরা আজ ভোটের অধিকার পেয়েছে এর জন্যে সমস্তটা ধন্যবাদ কি বুড়ুইনের পাওনা?”

পাবন ততক্ষণ পাশে বসে উসখুস করছিল। অমন একজন জাঁদরেল মহিলার পাশে কি ও বেচারাকে মানায়? কোথাকার কে এক পাবন সেন-হাজরা! লন্ডনে নবাগত বললেও চলে। পরনে সস্তা কন্টিনেন্টাল পোশাক। একঘর অতিথির ঈর্ষাকাতর চাহনি তাকে সূঁচের মতো বিঁধছিল। সে উঠি উঠি করে না পারে উঠতে, না পারে বসে থাকতে।

“গুড ইভনিং, রাঙাদি” বলে উদয় হলেন এক ইংরেজ মহিলা, তাঁর পিছনে শশব্যস্ত গৃহস্বামী বেণুস্বামী। পাবন বুঝতে পারল যে এইবার স্বর্গ হইতে বিদায়। মানে মানে সরে পড়াই শ্রেয়। ইংরেজ মহিলাকে সে তার আসন অফার করতেই তিনি একবার আলগোছে বললেন, “থ্যাঙ্ক ইউ।” তার পর রাঙাদির সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলেন। সেকালের গল্প।

এর পরে প্লেটে করে মিষ্টান্ন পরিবেশন। স্বদেশী বিদেশী দুই রকমই ছিল। সাহায্য করছিল পাবনের বন্ধু শ্যামল ও কান্তিমান এবং আরো কয়েকজন। তারা বাঙালীর মেয়ে। পরিবেশনের মাঝখানে কখন একসময় আরম্ভ হয়ে গেল রবীন্দ্র-সংগীত। সকলে জমজমাট হয়ে বসলেন। ওটা যেন উপাসনাগৃহ। আহার যাঁদের সারা হয়নি তাঁরাও প্লেট সরিয়ে রাখলেন।

স্মৃতি রায়চৌধুরীর কণ্ঠ। শুনতে শুনতে পাবনের মন চলে যায় কোন্ রূপের জগতে। যেখানে গুণী বসে তাঁর সুরের জাল বুনছেন। হঠাৎ কী এক আবেগ এসে তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে দেয়। সে যেখানে বসেছিল সেটা দরজার একধারে। দরজাটা একটু ফাঁক করে সে চকিতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়। বেশীর ভাগেরই তখন ভাবে ঢুলু ঢুলু আঁখি। যাঁদের তা নয় তাঁরা গায়িকার দিকে তাকিয়ে। কেউ টের পায় না।

নিচের তলায় দোতলায়—শ্যামল আর কান্তিমান দুই বন্ধুর ফ্ল্যাট। তারই ছোট একখানা পাশের ঘরে পাবনের লন্ডনের ডেরা। লন্ডনে সে মনের মতো বাসা খোঁজার আয়াস স্বীকার করতে চায় না বলে এইখানেই আপাতত থাকে ও খরচের অংশ বহন করে। খাওয়াদাওয়া বেণুদিদের সঙ্গে।

পাবনের ঘরখানা ছোট হলেও তার কাচের জানালাটা বেশ বড়। সেটা রাস্তার দিকে। বাতায়নের ধারে আসন পেতে বসে চোখ কান দুই খোলা রাখে পাবন। কান পেতে শোনে গানের পর গান। একবার মনে হলো রাঙাদিও কণ্ঠক্ষেপ করলেন। আশ্চর্য গলা, কিন্তু দম রাখতে পারেন না। “ভাবনা আমার পথ ভোলে।” পথ ভুলতে ভুলতে কোথাকার ভাবনা কোথায় গড়ায়।

সৌন্দর্যের সরোবরে নিয়ত নিমগ্ন থাকতে চায় সে। এ সরোবর সতত পূর্ণ। “পূর্ণ চাঁদের মায়ায়।” অদৃশ্য উৎস হতে নিত্য ঘটে এর পুনঃপরিপূর্ণতা। মনে মনে প্রার্থনা করে, “তুমি চিরসুন্দর। তুমি সৌন্দর্যঘন। তোমার সৌন্দর্য সেই অদৃশ্য উৎস যা এই রূপের সরোবরকে রস দিয়ে নিত্য ভরে রাখে। আমি ডুব দিই, তলিয়ে যাই, তল পাইনে, উঠে আসি। যতক্ষণ ডুবে থাকি ততক্ষণ অনুভব করিনে আমার ব্যথা। হয়তো ব্যথাও ব্যথার মতো লাগে না। সৌন্দর্যের রসায়ন তাকেও রূপান্তরিত করে।”

পাবন চুপচাপ একা থাকতে ভালোবাসে। আহত পাখী যেমন নিভৃতে থেকে আপনাকে সারিয়ে তুলতে চায়। কাউকে জানতে দেয় না কোন্‌খানে তার জখম। লাইট হাউসের মতো তার মুখশ্রী বার বার আঁধার হয়ে যায়, বার বার জ্বলে ওঠে। অন্ধকারটা আলোর অভাব নয়। অবগুণ্ঠন। তার এই বিষাদ কতকাল দীর্ঘ হবে কে জানে!

বাইরে টোকা পড়তেই পাবনের হুঁশ হয়। “আসুন” বলে সে তৎক্ষণাৎ শুধরে নেয়। “কাম ইন” বলার আগেই হেমেনদা প্রবেশ করেছিলেন। বললেন, “শীগগির। রাঙাদি বাইরে দাঁড়িয়ে।”

“বেশ ছেলে যা হোক।” ঝঙ্কার শোনা গেল। “গান ভালো লাগে না এমন মানুষ এই প্রথম দেখছি জীবনে। চল এখন, লক্ষ্মীটি। দিদিকে পৌঁছে দিয়ে আসবে।”

গায়ে ওভারকোট চড়িয়ে পাবন চলল তাঁর সঙ্গে পায়ে হেঁটে। দূরত্ব এমন কিছু নয়। কীটস যে বাড়ীতে থাকতেন তারই কাছাকাছি বরাটরা বাড়ী নিয়েছেন। হ্যাম্পস্টেড হীথের ধারে।

“শুনেছি ইউরোপের মিউজিয়ামগুলো তুমি গুলে খেয়েছ। আর ক্যাথিড্রালগুলো নাকি তোমার নখদর্পণে।” পথে যেতে যেতে রাঙাদি বললেন।

“কার কাছে ওসব শুনেছেন, রাঙাদি?” পাবন বলল সানন্দে অথচ সসংকোচে। “কিন্তু অভয় দেন তো আপনাকে দিদি না বলে মাসিমা বলে ডাকি।”

“কেমন করে জানলে যে তোমার মা আমাকে দিদি বলে বোন সম্পর্ক পাতিয়েছেন? হাঁ। সেই কথাই তোমাকে বলতে চেয়েছিলুম। আমি তাঁকে চিনতুম না। তিনি অবশ্য আমার নাম জানতেন। কাগজে বেরিয়ে যায় যে আমরা প্রিভি কাউন্সিলে অ্যাপিয়ার করার জন্যে আবার বিলেত আসছি। তখন তোমার মা এসে আমার সঙ্গে দেখা করেন। বলেন, ছেলে চিঠিপত্র লেখে না। কোথায় থাকে, কী করে, কেউ জানে না। শোনা যায় মস্কো আর্ট থিয়েটারে যোগ দিয়েছে। বোধহয় দেশে ফেরার ইচ্ছে নেই। আমরা যদি লন্ডনের হাই-কমিশনারকে ধরে এর একটা বিহিত করতে পারি।”

পাবন কী বলবে ভেবে পায় না। নীরবে শুনে যায়। পূর্ণিমা রাত্রি। কিন্তু লন্ডনের আকাশ মেঘে আর ধোঁয়ায় অন্ধকার। বৃষ্টি টিপ টিপ পড়ছে। প্রখর শীত। অথচ বেশ তাজা লাগে হ্যাম্পস্টেড অঞ্চলে বেড়াতে। রাস্তা ক্রমে ক্রমে উঁচু হয়ে গেছে। হাওয়া আসছে বনস্থলী দিয়ে।

“এদেশে এসে অবধি তোমার খোঁজ বড় কম করিনি।” রাঙাদি বলতে থাকলেন। “কিন্তু কণ্টিনেণ্টে তো যাইনি। খাঁটি খবর পাব কার কাছে? সবই দোসরা তেসরা হাতের উড়ো খবর। কেউ বলে তুমি নাকি এক অভিনেত্রীর প্রেমে পড়েছ, কেউ বলে তাকে বিয়ে করেছ, কেউ বলে সে তোমাকে ছেড়ে চলে গেছে, কেউ বলে তোমারি দোষ। আবার এমনও বলে যে তোমার বরাত ভালো তুমি ওর মতো একটি দুষ্প্রাপ্য রত্ন জয় করে নিতে পেরেছিলে। কিন্তু পারবে কেন রাখতে?”

এর উত্তরে পাবন শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। রাঙাদি আঁধারে দেখতে পেলেন না তার মুখখানা আকাশের মতোই অন্ধকার। যদিও সে আকাশ পূর্ণিমার আকাশ।

পাবন ভাবছিল, ওই যে পূর্ণিমা ওকে যেন আমি অবিশ্বাস না করি। চাঁদ যদিও দেখতে পাচ্ছিনে তবু তার জ্যোৎস্নার অস্পষ্ট আভাস তো দেখতে পাচ্ছি। যদিও একটুখানি জায়গা জুড়ে ফুটে বেরোচ্ছে তবু তো জ্যোৎস্না। আর-কোনো তিথির জ্যোৎস্না নয়, পূর্ণিমার জ্যোৎস্না। পূর্ণতার অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ যদিও, তবু তো পূর্ণতা। আমি যেন বিশ্বাস না হারাই। বিশ্বাস না হারাই।

“পাবন”, রাঙাদি বললেন, “তোমার খবর তোমার মুখেই শুনব এখন। আজ নাই বা শোনা গেল। কিন্তু আমাকে না বলে আবার কণ্টিনেণ্টে পালিয়ে যেয়ো না।”

এতক্ষণে ও ছেলের সাড়া পাওয়া গেল। “তেমন কোনো অভিপ্রায় নেই, রাঙা মাসিমা। বি-এতে আশাতীত ভালো করেছিলুম, বন্ধুরা বলল, চল অক্সফোর্ড। এসে দেখি ঠাঁই নেই। এক বছর সবুর করতে বলে। সময় আর অর্থ নষ্ট করতে হলে বিলেতে কেন? ওই টাকায় স্ট্রাসবুর্গে ফরাসী ও জার্মান শেখা যায় ও ফাঁকে ফাঁকে দেশ দেখা যায়। সেটাও তো শিক্ষার অঙ্গ। পরের বছর অক্সফোর্ড আমাকে স্মরণ করে। কিন্তু আমার জীবনে তখন এক ক্রাইসিস চলছে। সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ নয়। হ্যামলেটের মতো দোদুল্যমান অবস্থা। ফলে অক্সফোর্ড হাতছাড়া হয়। এর জন্যে সবাই আমাকে দোষ দিয়েছে, আমিও

দিয়েছি। কিন্তু যেটা হাতছাড়া হয় সেইটেই কি সবচেয়ে কাম্য।"

রাঙাদি চিন্তান্বিত হলেন। শুধু বললেন, "ক্রাইসিসটা কী তা তো জানলুম না।"

"সেটা আরেক দিন শুনবেন। যদি শুনতে চান।" পাবন প্রতিশ্রুতি দেয়। "আমার জীবনের গতি বদলে গেল। কিন্তু না গেলেই ভালো হতো এটা আর আমার মনে হয় না। এই তিন বছরে আমি আমার আপনাকে জেনেছি। এখন যদি কোনো আক্ষেপ থাকে সেটা কেরিয়ার ঘটিত নয়। কিন্তু সেটাও আরেক দিনের জন্যে তোলা রইল, মাসিমা।"

মিস্টার বরাট বাড়ী ফিরে মামলার কাগজপত্র নিয়ে বসেছিলেন। পাবনের পরিচয় পেয়ে বললেন, "ওঃ তুমিই সেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ পুরুষ। এস. এস। তোমাকে একটা মজার কথা শোনাবার জন্যে কবে থেকে ছটফট করছি।"

ওদিকে মিসেসের চোখে নিষেধ। তিনি কফি তৈরি করে আনার ছলে প্রস্থান করলেন। পাবন তো মহাকৌতূহলী হয়ে কাঠের মতো বসে রইল।

"হাইকমিশনারের পার্টিতে," বরাট সাহেব বলতে লাগলেন, "তাঁর এডুকেশনাল অ্যাডভাইজারের সঙ্গে আলাপ। কথায় কথায় বলি, অক্সফোর্ড কেমব্রিজে আজকাল আমাদের ছেলেরা কেমন করছে? তার পরে জানতে চাই, আচ্ছা, সেন-হাজরা বলে একটি ছেলে অক্সফোর্ডের ম্যাগডালেন কলেজে জায়গা না পেয়ে কন্টিনেন্টে চলে যায়। তার পরে তার কী হলো বলতে পারেন? ভদ্রলোক এক মিনিট ভেবে হঠাৎ হো হো করে হেসে ওঠেন।"

বরাট নিজেও হাসি চাপতে পারলেন না। তার পর ভদ্রলোকের উক্তির পুনরুক্তি করলেন।

"He is the only fellow who ever rejected the advances of Magdalen".

অপরের কাছে যা পরিহাস ভুক্তভোগীর কাছে তা হুল ফোটা। পাবন আগেও সয়েছে। এবারেও সইল।

বরাট এর পরে গম্ভীর হয়ে বললেন, "ও রকম সুযোগ জীবনে দ্বিতীয়বার আসে না। অধিকাংশের জীবনে প্রথমবারও আসে না। পেলে কি কেউ ছাড়ে? তুমি সেই দুর্লভ একজন। তোমার বাবা তো আহত হবেনই। লোকের কাছে কী কৈফিয়ৎ দেবেন? তুমিও তো তাঁর কাছে কৈফিয়ৎ দাওনি। দেশে ফিরে গিয়ে তুমি যদি সত্যি সত্যি কিছু করতে চাও তো এখনো সময় আছে। আইন পড়। এই আমার পরামর্শ। তোমার পিতারও।"

সেদিন কফির পেয়ালায় চামচ দিয়ে নাড়তে নাড়তে পাবন বলল মেসোমশায়কে, "দেশ যেদিন স্বাধীন হবে সেদিন দেখবেন অক্সফোর্ডের চেয়ে প্লাসবুর্গের আদর কিছু কম নয়। আর ব্যারিস্টারদের চেয়ে আর্ট ক্রিটিকদের মর্যাদা বরং বেশী। তা নিয়ে কিন্তু আমার ভাবনা নেই। আমার ভাবনা অন্য কারণে। আর তার কোনো প্রতিকারও নেই।"

"দেশ স্বাধীন হলেও" মেসোমশায় হাসলেন, "তোমাকে না খেয়ে স্বর্গে যেতে হবে পাবন। সেইজন্যেই বলছি মর্ত্যে থাকার একটা অবলম্বন চাই। আর্ট বলতে ওরা বোঝে প্রাচীন ভারতেরই রকমফের। আর ক্রিটিসিজম বলতে তারই সমর্থন।"

"তা হলে," পাবন বলল, "দেশে ফিরে যাওয়া আমার হবে না। গেলে এমনি বেড়াতে যাব।"

"সেই আশঙ্কাই তোমার মা বাবা করছেন।" এবার বললেন রাঙাদি।

তাঁরা কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন না, সেও খুলে বলল না, কী নিয়ে তার ভাবনা। অন্য কী কারণে। কেন তার কোনো প্রতিকার নেই।

সে অনেক কথা। কাকেই বা বলবে! কেই বা বুঝবে?

দুই

দেবযানীর কী হলো তা তো সকলেই জানে। কচের কী হলো তা মহাভারতে নেই।

কচকে পাঠানো হয়েছিল অসুরদের দেশ থেকে মৃতসঞ্জীবনী শিখে আসতে। যাতে দেবপক্ষের মৃতরা বেঁচে ওঠে। কচ তো সহস্রবর্ষ পরে মৃতসঞ্জীবনী নিয়ে ফিরে এলেন। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল মৃতদের একজনকেও প্রাণ ফিরিয়ে দিতে পারলেন না।

বললেন, বিদ্যাটা আমি জানি, শিখিয়ে দিতেও পারি, কিন্তু প্রয়োগ করতে অক্ষম। আমাকে গুটি কয়েক শিষ্য দেওয়া হোক। আর দেওয়া হোক একশ বছর সময়। তার পরে দেখবেন একজনও বিনষ্ট হবে না।

কিন্তু এই একশ বছর কী হবে? সৈন্য অসহায়, বৈদ্য অসহায়, কিছুই করবার নেই। অসুরগুলো এন্তার মারছে আর জিতছে। কোনদিন স্বর্গে ঢুকে পড়ে। একশ বছর সবুর করছে কে?

দেবতারা অতীব অসন্তুষ্ট হলেন। বৃহস্পতিপুত্র, তুমি তা হলে এতদিন করলে কী?

দেবযানীর অভিশাপের কথা বলতে হলো সবাইকে। কিন্তু কেউ বিশ্বাস করলেন না। আর করলেই বা কী? একটি নারীর অভিশাপে একটি পুরুষ এমন শক্তিহীন যে তার সামনে হাজার হাজার সৈনিক মরছে, সে জানে কেমন করে বাঁচাতে হয়, অথচ সাক্ষীগোপাল। এর চেয়ে ঢের ভালো হতো সে যদি আদৌ না জানত বাঁচাতে।

নারীর অভিশাপে এটাও একপ্রকার পুরুষত্বহীনতা।

দেবযানী এমন এক প্রতিশোধ নিল যা আর কোনো নারী কোনো দিন নেয়নি। এমন কি উর্বশী যে অভিশাপ দিয়েছিল অর্জুনকে সেও তেমন মারাত্মক নয়। মাত্র একটা বছর বৃহন্নলা হয়ে থাকতে হলো তাঁকে। সারা জীবন নয়। কিন্তু দেবযানীর অভিশাপে বেচারা কচ চিরটা কাল অসমর্থ হয়ে রইলেন। তাঁর শিষ্যরাও তাঁকে ছাড়িয়ে গেল। বেচারা কচ! কোচারা পুরুষ!

পাবনের বেলাও কি তাই হবে? নারীর অভিশাপ কি অব্যর্থ?

প্লাসবুর্গ যখন সে যায় তখন জানত না সেখানে তাকে আটকা পড়তে হবে। মাস দশেক বাদে সেখানে তার কাজ সারা হলে সে প্যারিস ইত্যাদি ঘুরে অক্সফোর্ডে ফিরবে। তার বিশ্বাস অক্সফোর্ড তাকে ডাকবে। সত্যি একদিন ডাকল। কিন্তু ততদিনে তার জীবন আর একজনের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। সিদ্ধান্ত নিতে হলে আর একজনের মত নিতে হয়। আর একজন বলে বসল, যেতে নাহি দিব।

সেই অবুঝ নারীর জেদই জয়ী হলো। পাবন থেকে গেল। যাকে ভালোবাসত সে মেয়েটি আর্টিস্ট। তাকে দিল আর্টের দীক্ষা। তার রূপদৃষ্টি খুলে গেল। সে যেদিকে তাকায় সেদিকেই রূপ। সেদিকেই সৌন্দর্য। দুজনে মিলে বেরিয়ে পড়ে। ক্যাথিড্রাল। মিউজিয়াম। স্টুডিও। শুধু একটি শহরের নয়। ফ্রান্সের, জার্মানীর, ইটালীর, বেলজিয়মের, হল্যাণ্ডের, অস্ট্রিয়ার। মেয়েটি আঁকে। পাবন দেখে, ধ্যান করে, স্কেচ করে। ধীরে ধীরে আপনাকে জানে। হাতের পাঁচ হিসাবে একটা

ডিগ্রী বা ডক্‌টরেট তার চাই। সেটা অক্সফোর্ডের হলে আরো কাজে দিত। তা বলে স্ট্রাসবুর্গেরটাও ফেলনা নয়। কিন্তু তার সত্যিকার লক্ষ্য হলো সৌন্দর্যে স্থিতি। চিরকালের মতো।

এরিকা মেয়েটির নাম। দেখতে সুশ্রী। তার শ্রী তার অন্তরের প্রতিফলন। নিজের সাধনা তাকে বিভোর রাখে। বাইরের জগৎ সম্বন্ধে সে উদাসীন। তার মা নেই। বাবা আবার বিয়ে করেছেন। হোম বলতে পিসীর বাড়ী। পিসেমশায় পাবনের অধ্যাপক। পাবনকেও তাঁরা স্নেহ করেন। তাই বোনের মতো মিশতে দেন। ওরাও তাঁদের বিশ্বাসের মর্যাদা রাখে। কেউ কাউকে মুখ ফুটে বলে না যে ভালোবাসে। ব্যবহারেও পরিচয় দেয় না। শুধু চোখের আলোয় দেখতে পায় প্রেমের অশরীরী অস্তিত্ব। কোনো দিক থেকে কোনো অঙ্গীকার নেই। স্বীকৃতি-টুকুও নেই। কেউ জিজ্ঞাসা করলে এরিকা বলে পিসেমশায়ের ছাত্র। পাবন বলে, অধ্যাপকের নীস।

প্রথম বছরটা অর্থাভাব হয়নি। বাড়ী থেকে সাহায্য নিয়মিত পৌঁছত। দেশ থেকে টাকা আসা দ্বিতীয় বছর থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। বাবার আলটিমেটাম হলো, হয় অক্সফোর্ড, নয় লন্ডনের ইন্‌ বা টেম্পল। অক্সফোর্ডের সঙ্গে আই সি এস সংযুক্ত থাকলে সোনায় সোহাগা। না থাকলেও চলবে। কিন্তু কণ্টিনেন্টের ডক্‌টরেট? নৈব নৈব চ। ইনভেস্টমেন্ট হিসাবে অচল। পাবন তাঁর আলটিমেটাম উপেক্ষা করায় তিনিও তার মাসোহারা আটক করেন। কী করে যে পড়ার খরচ জোটাতে হলো সে অনেক কথা। মাঝে মাঝে এরিকার কাছে ধার নিতে হয়েছে, পরে সে ধার শোধ করতে হয়েছে। ফরাসী ও জার্মান পত্রিকায় পর্যটনকাহিনী লিখে মন্দ পাওয়া যায়নি। তার পরে আর্টের উপর লিখে যশও কিছু হয়। এ সবেরই পিছনে এরিকার হাত। ফরাসী ও জার্মান রচনামাত্রেই তার দ্বারা সংশোধিত। থীসিস লিখতেও পদে পদে তার সাহায্য নিতে হয়েছে। তিনটি বছর কেটে যায় স্ট্রাসবুর্গে।

ডক্‌টরেট পাবার পর আর ওখানে থাকার কোনো মানে হয় না। পাবন চলে আসে প্যারিসে ভাগ্যপরীক্ষা করতে। তাই নিয়ে এরিকার সঙ্গে মনোমালিন্য। সে বলে, "আমি ভাবতেই পারছিনে তোমাকে ছেড়ে কেমন করে আমার দিন কাটবে!" পাবন বলে, "আমিও কি ভাবতে পারছি? কিন্তু প্যারিসে গেলে আমি আরো কিছু শিখব। শিল্পই এখন থেকে আমার জীবন। আমার জীবনে আর কী আছে, বল?"

"আর কী আছে, পাবন?" এরিকা তার চোখে চোখ রেখে বলে, "আর কী আছে, তা কি মুখ ফুটে বলে দিতে হবে? কেন তুমি প্রপোজ করছ না?" পাবন এর উত্তরে বলে, "কোন্‌ সাহসে করব? দেশে আমাদের অবস্থা ভালো, কিন্তু বাবা চটে রয়েছেন। আরো রাগ করবেন। ইউরোপে যে থাকব তারই বা উপায় কী? লিখে যা পাই তাতে বড়জোর একজনের চলে। তা

ছাড়া," পাবন আরো ভেবে বলে, "আমার একটা সংকল্প আছে। একদিন না একদিন আমি দেশে ফিরে যাব ও মরা গাঙে জোয়ার আনব। আমি তো ইউরোপে তেমন কিছু ঘটাতে পারব না।"

তখন এরিকা বলে, "বুঝেছি। তুমি মা-বাপের অমতে বিয়ে করবে না। করবে কেবল একটার পর একটা অ্যাফেয়ার। প্যারিসে তার অশেষ সুযোগ। ওইসবই হবে, হবে না শুধু মরা গাঙে জোয়ার আনা। তার জন্যে চাই আমার মতো একজনকে। তোমার কোন্‌ শুভকর্মে না আমি সহায় হয়েছি, পাবন? কেন তুমি এই পার্টনারশিপ ভঙ্গ করতে চাইছ?"

পাবন আঘাত পায়। এতদিন সে যা করেছে তা অ্যাফেয়ার নয়। একটার পর একটা তো অভাবনীয়। প্যারিসে না গিয়ে মিউনিকে বা রোমে গেলেও এরিকা ওই কথাই বলত। তা বলে কি সে আর কোনো-খানে যাবেই না? সৌন্দর্যের সঙ্গে তার পরিচয় প্রগাঢ় হবে কী করে? একাধিক বার ওরা দুজনায় প্যারিস ঘুরে এসেছে। কিন্তু প্যারিসকে অমন করে চেনা যায় না। আপনার করতে হয়।

প্যারিসের আকর্ষণ আর এরিকার আকর্ষণ। কোন্‌টা বেশী দুর্বার, কোন্‌টা কম? সেবার অক্সফোর্ডের সঙ্গে আকর্ষণ-পরীক্ষায় এরিকার জয় হয়েছিল। এবার তার হার হলো। সে ক্ষমা করল না। আর পাবনও তো অক্সফোর্ড যেতে না পেয়ে ভিতরে ভিতরে অভিমান পুষছিল। বিদায়ক্ষণে ঘটে গেল একটা বিস্ফোরণ।

"তুমি! তুমি আনবে মরা গাঙে জোয়ার!" এরিকা বলল তির্যক হেসে। "তুমি জান তুমি তা পার না। একদিন একটা রেখাও কি এঁকেছ বা শব্দ হয়েছে, সার্বজনীন হয়েছে? সৃষ্টি তোমাকে দিয়ে হবে না। সৃষ্টিশীলতাই তোমার মধ্যে নেই।"

পাবন চমকে উঠে কাতরভাবে বলল, "ও কী বলছ, এরিকা! ও যে অভিশাপ!" তাকে জড়িয়ে ধরে তার মুখে চুম্বন এঁকে দিয়ে বলল, "ওতে কি আমার ভালো হবে? তুমি যদি আমাকে সত্যি ভালোবাস তো ও অভিশাপ ফিরে নাও।"

"না, না, অভিশাপ কেন দেব? তা কি আমি পারি?" এরিকা নরম হয়ে বলল, "সৃষ্টি তোমার হাত দিয়ে হবে না কিন্তু সৃষ্টিরহস্য তুমি ভেদ করবে। তোমার সংস্পর্শে যারা আসবে তারা সৃষ্টির প্রেরণা পাবে।"

প্যারিসে গিয়ে পাবন ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যায়। সেখানে যেমন অষ্টপ্রহর মেলা বসেছে। মেলামেশার অন্ত নেই। কিন্তু কেউ কাউকে চেনে না। আলাপী মিলে যায় বিস্তর, কাজকর্মেরও সুবিধা হয়, রোজ থিয়েটার কিংবা কাবারে, যখন খুশি কাফে। স্টুডিওগুলো চষে বেড়ায়, মিউজিয়ামগুলো মুখস্থ হয়ে যায়। শিল্পী ও শিল্পরসিক মহলে তার নামের কার্ডই তার পরিচয়পত্র। দুনিয়ার তামাম বিষয়ে কথায় কথায় ইশতেহার বার করা চাই। কবি ও কলা-বিদ্‌রা তাতে স্বাক্ষর দেন। পাবন ধন্য হয়ে যায় যখন ইশতেহারগুলোতে তাকেও স্বাক্ষর দিতে বলা হয়। দেখ দেখি, প্যারিসে না এলে এমন ভাগ্য হতো কখনো?

একটু থিতিয়ে যাবার সময় যখন এলো তখন পাবন হৃদয়ঙ্গম করল যে সে আর্টিস্ট নয়। তার আঁকা ছবি কেউ কোনোদিন আর্ট গ্যালারিতে বা মিউজিয়ামে দেখবে না।

প্রদর্শনীতে দেখলেও সঙ্গে সঙ্গে ভুলে যাবে। প্রদর্শনী তো একটা দুটো নয়। শত শত। একের পর এক পরিদর্শন করতে করতে স্মরণশক্তির শেষ সীমায় পৌঁছয়। কপাল ঠুকে একবার সে একটা প্রদর্শনী করেছিল। জনসমাগমও মন্দ হয়নি। বিক্রীও যা হলো তা খরচ ওঠার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু পাবন স্বয়ং বুঝতে পারল ওসব এরিকার সঙ্গে ও এরিকার পরামর্শে আঁকা বলেই কোনো মতে জলচল। দ্বিতীয় বার প্রদর্শনী করতে তার হাত উঠল না। প্রদর্শন করার মতো কিছু থাকলে তো!

ল্যাটিন কোয়ার্টারে তার প্রিয় ভোজনাগার ছিল একটি রাশিয়ান রেস্তোরাঁ। শ্বেত রাশিয়ানদের। সেইখানেই আলাপ হয়ে যায় মস্কো আর্ট থিয়েটারের ভাঙা দলের শিল্পীদের সঙ্গে। তাঁদের সৌজন্যে সে থিয়েটার ক্রিটিকের পাশ পায়। থিয়েটারে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ সে যেখানেই আসন নিক না কেন তার মনে বিভ্রম জন্মায় যে, সেও মঞ্চের জীবনের অংশীদার। সে শুধু দর্শক নয়। অভিনেতা অভিনেত্রীদের সঙ্গে সে একপ্রকার আত্মীয়তা অনুভব করে।

সদর অন্দর দুই মহলেই তার প্রবেশ। গ্রীনরুমে গিয়ে সে সাজসজ্জা নিরীক্ষণ করে। দুটো একটা ইঙ্গিত দেয়। মেক-আপে ভীরুভাবে হাত লাগায়। বিরতির সময় মঞ্চে উঠে সেখানকার সেট নাড়াচাড়া করে। সেখানেও দুটো একটা ইঙ্গিত দেয়। এর পরে সে গিয়ে রিহার্সালে হাজির হয়। সেখানেও গায়ে পড়ে হস্তক্ষেপ করে।

সে যে আর্টিস্ট, কেবলমাত্র আর্ট ক্রিটিক নয়, এইভাবে সেটা জাহির করেই তার পৌরুষ। মনে মনে বলে, এরিকা, তুমি যদি এখানে এখন থাকতে তা হলে দেখতে আমি এখনো যথেষ্ট শক্তি রাখি। মস্কো আর্ট থিয়েটারেও আমার খোদকারী খাটে। স্টানিস্লাভস্কি যদি জানতেন আমাকে ধন্যবাদ দিতেন।

এমনি করে সে একদিন মাদাম কর্সাকোভার সুনজরে পড়ে। সম্পর্কটা বিশুদ্ধ ভদ্রতার। তার থেকে একটু এগিয়ে বন্ধুতার। তার চেয়ে গভীর কিছু নয়। কিন্তু ঈর্ষাকাতর ভারতীয়দের মতে ওটা প্রেম। তাই যদি না হবে তবে পাবন কেন মাদামের গায়ে ফারকোট পরিয়ে দেয়? কেনই বা ট্যাক্সিতে উঠিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে? এক একদিন ভিতর থেকেও? পাশাপাশি বসে আহার করেই বা কোন্ সুবাদে? কী এত বলবার আছে মাদামের কানে কানে? প্রায়ই তো বোকে উপহার দিচ্ছে।

তার জীবন ধন্য হয়ে যায় মাদাম যেদিন তাকে বলেন, "আপনি আর্ট ক্রিটিক বলে পরিচয় দিলে হবে কী? আপনি আর্টিস্ট। রূপকথার বীস্ট যেমন ছিল ছদ্মবেশী রাজপুত্র আপনিও তেমনি ছদ্মবেশী শিল্পী।"

"তা হলে রূপকথার বিউটি কে?" কথাটা বলি বলি করে বলা হয় না। যদি আর কারো কানে যায়। তা ছাড়া সে এই সম্পর্কটিকে প্রেমে পরিণত হতে দিতে চায় না। দিলে শিকলির টানে ভালুকের মতো ঘুরবে ইউরোপের এক রাজধানী থেকে আরেক রাজধানীতে। মস্কো আর্ট থিয়েটার কোনো এক স্থানে স্থিতিবান নয়।

সেই দলটির সঙ্গে পাবনও এলো লণ্ডনে, কিন্তু তাদের সঙ্গে লণ্ডন ছাড়ল না। সে তো ইংরেজীতেও লেখে। এদেশেও তার চেনা মহল ছিল। বন্ধুরা বলল, থেকে যাও। কর্সাকোভা তার হাতে চাপ দিয়ে নীরবে বিদায় নিলেন।

তিন

এসব কথা কি মা মাসীকে বলা যায়? না বোঝানো যায়? পাবন তাই এতদিন তার মাকেও লেখেনি। দিদিকেও না। রাঙাদিকে একদিন বলল রেখেঢেকে।

তিনি বিমর্ষ হলেন। "এই তো! প্রেমে না পড়ে থাকতে পারলে না তো! কেন যে আমাদের ছেলেদের এ দুর্মতি হয়! কী আছে এদের মেয়েদের যা আমাদের মেয়েদের নেই? রূপযৌবন কি এদেশেই আছে? ওদেশে নেই? না, বাপু। ভাবালে।"

এর পরে একদিন তিনি বললেন, "আইন পড়তে নারাজ শুনে তোমার মেসোমশায় চুপ করে বসে থাকেননি। মহারাজা গাএকবাড়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। মহারাজার মিউজিয়ামের জন্যে তোমার মতো একজন জহুরীর দরকার। ইউরোপে মাঝে মাঝে আসবে, দেখে শুনে ছবি কিনবে, শিল্পদ্রব্য কিনবে। ভারতেও ঘুরে ঘুরে তাই [illegible] সুখের চাকরি! মহারাজা তোমাকে ইণ্টারভিউতে ডেকেছেন। নামমাত্র ইণ্টারভিউ। সব ঠিকই আছে।"

আর কেউ হলে লাফিয়ে উঠত। বলত, "আঁচাব কোথায়?" কিন্তু পাবন শুধু বলল, "ভেবে দেখব।"

তার পর তার সেই ভেবে-দেখা আর ফুরোয় না। কয়েক সপ্তাহ গা-ঢাকা দেবার পর আবার তার উদয়। "কি হে, ভেবে দেখলে?"

"রাজা মহারাজাদের মনমেজাজকে আমি বড় ভয় করি, রাঙামাসী। ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ। আমার পছন্দ হয়তো ও'র পছন্দ হবে না। অমনি চাকরিটি যাবে। মুণ্ডুটি যে যাবে না সেইটুকু প্রোগ্রেস হয়েছে।" পাবন অনেক মাথা খাটিয়ে এই জবাবটি বানিয়েছিল।

প্রস্তাবটা লোভনীয়। আর সয়াজী রাও তো অতি সজ্জন। সে রকম কোনো আশঙ্কাই ছিল না। বরং ছিল মানবসৃষ্ট সৌন্দর্যের নিত্য সাহচর্য। সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রার পাথেয়। স্বদেশের জন্যে কিছু করার সুযোগও। কিন্তু তা হলে তো দেবযানীর অভিশাপ প্রকারান্তরে মেনে নেওয়া হলো। ও যে আত্মিক পুরুষত্বহানি। রাজরোষের চেয়েও ভয়াবহ।

যেমন অক্সফোর্ডের আহ্বানের বেলা তেমনি বড়োদার প্রস্তাবের বেলা পাবনের কাজ হলো হ্যামলেটের ভূমিকার অভিনয়। "টু বি অর নট টু বি"। দিনের পর দিন, হপ্তার পর হপ্তা কেটে যায়। সিদ্ধান্ত নেওয়া আর হয় না।

রাঙাদি হাল ছেড়ে দেন। "তোমার দেখছি কিসে নিজের ভালো হবে সে জ্ঞানটাই নেই। তোমার জন্যে কিছু করতে যাওয়া মিছে।"

তা বলে তিনি তাকে একেবারে বর্জন করলেন না। যখনি পার্টি দিতেন আর পাঁচজনের মতো তাকেও ডাকতেন। ইতিমধ্যে সে পাড়াবদল করে চেলসীতে উঠে গেছল। আর্টিস্টদের সংসর্গ যাতে আরো ঘনিষ্ঠভাবে পায়। আর্ট বই সম্পাদনার ভার তার উপর পড়েছিল। ভূমিকা ও টীকা লিখতে হয় তিনটে ভাষায়। এই নিয়ে চলে যাচ্ছিল একরকম।

রাঙাদির ওখানেই একবার এক পার্টিতে দেখা। মল্লিকার সঙ্গে। "পাবন, এদিকে এসো। এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। পতিতপাবন সেন-হাজরা। মল্লিকা সিন্‌হা।"

"উঁহু। হলো না, হলো না।" বেণুদি বলে উঠলেন। "বিশিষ্ট শিল্পরসিক তথা বিদ্যানাগরিক ডক্টর সেন-হাজরা। বিখ্যাত অধ্যাপক পি কে সিন্‌হার রূপসী ও গুণবতী কন্যা মিস সিন্‌হা।"

পাবন যে মল্লিকার সঙ্গে দুটো কথা কইবে তার বন্ধু শ্যামলের ওটা সহ্য হলো না। সে ছোঁ মেরে পাবনকে নিয়ে গেল ও কানে কানে বলল, "তুমি অনেক দুঃখ পেয়েছ। আর বাড়াতে যেয়ো না। মল্লীকে আমি চিনি। ও ধরা দেবার পাত্রী নয়।"

"তুমি ভুল করেছ, শ্যামল।" পাবন হেসে বলল, "আমিই ধরা দেবার পাত্র নই।"

এমনিতেই ব্যাপারটা একটুখানি সামাজিকতার ঊর্ধ্বে উঠত না। মল্লিকাও ভুলে যেত পাবনকে। পাবনও মল্লিকাকে। কিন্তু শ্যামল যে অভিনয়টি করল তার ফল হলো বিপরীত। ওটা নাকি সে বেণুদির শিক্ষায় করেছিল। রাঙাদিও ছিলেন ওই চক্রান্তের মধ্যে। কেউ যদি পাবনকে ভুলিয়ে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে সে মল্লিকা। দেশে একবার যদি ফেরে তা হলে বাকীটা লজিক অনুসারে অনুসরণ করবে।

পার্টি থেকে বিদায় নেবার সময় পাবন বলল মল্লিকাকে, "আবার কবে আমাদের দেখা হচ্ছে?"

"ইচ্ছা করলে কালকেই।" মল্লিকা আশা দিল।

"ব্রিটিশ মিউজিয়ামে কাল আমি দশটার সময় দাঁড়িয়ে থাকব। গেটে।"

"আচ্ছা। আমার ভয়ানক কৌতূহল ভিতরে গিয়ে দেখতে।"

"বেশ তো। আমি দেখাব।"

শুনেও না শোনার ভান করলেন বরাটরা। গোস্বামীরা। শ্যামল ও কান্তিমান। আর পাবন প্রস্থান করল কোনো দিকে না তাকিয়ে। মল্লিকা তো বরাটদের অতিথি।

এরিকার অভিশাপের পর থেকে একটু একটু করে পাবনের মনে লালিত হচ্ছিল নবজাত একটি আইডিয়া। দেবযানীর শাপ মোচন করতে পারে দেবযানী স্বয়ং। তা যখন এ জীবনে সম্ভব নয় তখন তার একটিমাত্র বিকল্প আছে। আর একজন
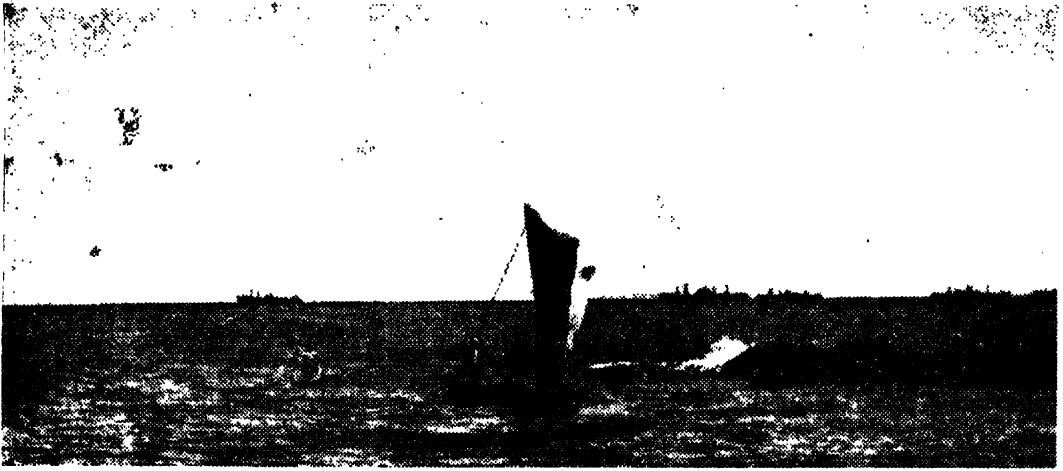
অভিযান ফটো : নেপাল মুখোপাধ্যায়

নারী আসবে, সে দেবে বর। তার বরও হবে অব্যর্থ। সে বলবে, তুমি সৃষ্টি কর। অমনি পাবন সৃষ্টি করবে।

ব্রিটিশ মিউজিয়াম কি এক আধঘণ্টায় দেখা হয়? একটা দিন লেগে গেল শুধু গ্রীক রোমান ভাস্কর্য ও বাস্তুকলা পরিদর্শন করতে। মাঝখানে একঘণ্টা মধ্যাহ্নভোজন। কাছেই পেলেন ট্রী রেস্টোরাণ্ট। তার দেয়ালে একটা প্লেন গাছ আঁকা। সেখানে বেশী লোক যায় না। নিরিবিলি পাওয়া যায়।

ব্রিটিশ মিউজিয়াম কি একদিনে দেখা হয়? পরের দিনও দেখতে এলো। মল্লিকা। আবার সেই রেস্টোরাণ্ট। তার পরের দিন। তারও পরের দিন। তার পরে শনিবার। মধ্যাহ্নভোজনের পর ওরা চলল কিউ গার্ডনস দেখতে। পরের দিন রবিবার। সেদিনও তাই। মল্লিকা এসেছে দেশ দেখতে। এই তার কাজ। দেশ দেখা হচ্ছে। রথ দেখার সঙ্গে সঙ্গে কলা বেচার কথাও ছিল। মন্টেসরি ট্রেনিং নেওয়া। সেটার জন্যে মাথাব্যথা নেই।

ব্রিটিশ মিউজিয়াম শেষ করতে তিন সপ্তাহ লাগা বিচিত্র নয়। এটাও তো শিক্ষা। তার পর ভিক্টোরিয়া ও আলবার্ট মিউজিয়াম। আরো তিন সপ্তাহ। শিক্ষা বইকি। এর পরে ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি। আরো দু সপ্তাহ। তারপর টেট গ্যালারি। আধুনিক চিত্রকলা। এমনি করে মাস তিনেক কোনখান দিয়ে কেটে গেল।

"আচ্ছা, ডক্টর সেন-হাজরা," মল্লিকা একদিন জিজ্ঞাসা করল, "আপনি যে আমার জন্যে এত সময় নষ্ট করছেন এর প্রতিদান আমি দেব কী করে? কী আছে আমার যা আপনার গ্রহণযোগ্য হবে?"

"তা যদি জানতে চান তবে আপনাকে সমস্তটা শুনতে হবে।" পাবন উত্তর দিল।

যে কথা সে মা মাসীকে বা দিদিকে খুলতে সাহস পায়নি, চায়নিও, সেই কথাই আগাগোড়া শুনিয়ে গেল এই মেয়েটিকে। কিছুই গোপন করল না, হাতে রাখল না। সে জানত যে মল্লিকা ধরা দেবার পাত্রী নয়। সেও নয় ধরা দেবার পাত্র। সম্পর্কটা বিশুদ্ধ বন্ধুতার।

"ওঃ এইটুকু আপনি চান! দুটি অক্ষরের একটি শব্দ! বর!" মল্লিকা বলল মৃদু হেসে।

"হাঁ, দেবী।" পাবন বলল শ্রদ্ধাভরে।

"আর আমি কী চাই সেটা জানতে চাইলেন না যে?" আরক্ত হয়ে সুধালো মল্লিকা।

"আপনি? আপনার কোনো অভাব আছে নাকি? শুনি?" বিস্মিত হলো পাবন।

"সেটিও দুটি অক্ষরের একটি শব্দ।" পাবন বোকার মতো ভাবছে দেখে মল্লিকা বলল, "পারলেন না তো অনুমান করতে? সেটি আপনার ওই শব্দটিরই প্রতিধ্বনি।"

"বর!" অবাক হলো পাবন। "আপনাকে কে আবার অভিশাপ দিল?"

"দূর! বর শব্দের কি একটাই অর্থ?" মল্লিকা রেগে উঠল।

"ওঃ বুঝেছি!" ডক্টর যারা হয় তাদের বুদ্ধিশুদ্ধি একটু দেরিতে হয়।

"কী বুঝলেন?" মল্লিকা হাসতে হাসতে ঢলে পড়ল।

"আমি কিন্তু শুনেছিলুম," পাবন বলল সবিস্ময়ে, "আপনি নাকি বিয়েই করবেন না।"

"কথাটা মিথ্যা নয়। যা পোহাতে হয়েছে আমাকে, তারপরে আমার দশা হয়েছে যেন ঘরপোড়া গোরুর। আর একটু হলেই আমি মরেছিলুম।" মল্লিকা শিউরে উঠল।

পাবনের আগ্রহ দেখে মল্লিকা শোনায় তার গল্প।

ছেলেবেলা থেকেই সে একটু উদাসীন প্রকৃতির। শাড়ী কিংবা জামা, গয়না কিংবা সেন্ট, পাউডার কিংবা রং কোনো দিন তাকে আকর্ষণ করেনি। কিন্তু সিঁথির সিঁদুর সম্বন্ধে তার একটা মোহ ছিল। শিবের কাছে সে মনে মনে বর প্রার্থনা করত। শিবের মতো বর। যাকে অন্তর থেকে ভক্তি করতে পারবে। কলের মতো নয়। দেখতে সুন্দর নাই বা হলো। নাই বা হলো ধনবান। কেই বা জানত শিবের বংশ-পরিচয়?

বাবার সঙ্গে দেখা করতে তাঁর ছাত্ররা আসত। তিনি তাদের বুঝিয়ে দিতেন। বলে দিতেন কী কী পড়তে হবে। কারো কারো সঙ্গে তর্কও করতেন। তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ছিল একটি ছেলে। যখন-তখন আসত। বাবার কাছে এমন সব বই ছিল যা আর কোথাও পাওয়া যায় না। সেসব বই বাইরে নিয়ে যেতে দেওয়া হয় না। সেসব বই সে চেয়ে নিয়ে পড়ত। বাবা তাকে ঢালা অনুমতি দিয়ে রেখেছিলেন যে, সে লাইব্রেরীতে বসে যতক্ষণ ইচ্ছা, যে বই ইচ্ছা পড়তে পারবে। পরে তিনি তাকে বাজিয়ে দেখতেন যে, সে সত্যি পড়েছে ও মনে রেখেছে। বাবাকেও সে বাজিয়ে দেখত। তিনি পড়েছেন, না শুধু সাজিয়ে রেখেছেন।

বাবা একদিন বললেন, ওই যে জগৎ ওই আমার ইস্পাতের উপযুক্ত। ওর সঙ্গে লড়ে সুখ আছে। বাবা ওকে ডাকতে আরম্ভ করলেন জগৎসিংহ বলে। ঠাকুমা বললেন, মল্লীর জন্যে আর পাত্র খুঁজতে হবে না। জগতের সঙ্গেই সম্বন্ধ কর। মা একটু 'কিন্তু' 'কিন্তু' করেন। কে ও? কাদের ছেলে? কোথায় ওদের দেশ? ভালো করে খোঁজখবর নিয়েছ? জগতের উপর অগাধ বিশ্বাস ছিল বাবার। ও যা পরিচয় দিয়েছিল তাই বেদবাক্য। এমনিতেই বাবা আত্মভোলা মানুষ। ইতিহাস নিয়ে মত্ত। জগৎ যেদিন এম-এ'তে ফার্স্ট হয়, সেদিন উল্লাসে উদ্বাহু হন। হাঁ, জগৎসিংহ একদিন তাঁর চেয়ারে বসবে।

মাসকয়েক পরে বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়ে যায়। মল্লিকার বি-এ পরীক্ষাটার

জন্যেই যা দেরি। বথাকালে নিমন্ত্রণের চিঠি ছাপা হয়ে বিলি হয়। ডাকে দেওয়া হয়। আজ বাদে কাল রাম রাজা হবে, এমন সময় বাদ সাধল কৈকেয়ী। পুরুলিয়া বারের নামজাদা উকীল রসময়বাবু বাবার সহপাঠী ছিলেন। তিনি ছুটে এলেন কলকাতায়। বাবার সঙ্গে দরজা বন্ধ করে কথা বললেন। বাবা যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, তখন তাঁর চোখে আগুন জ্বলছে। জগৎটাকে পেলে তিনি খুন করবেন।

মল্লিকা তখন গায়ে হলুদের জন্যে তৈরি হচ্ছে। তার মা এসে গাছের মতো ভেঙে পড়লেন। জগৎ যে এমন করে দাগা দেবে, কে জানত। এত ভালো ছেলে, তলে তলে এত কপট। কোনো দিন কি বলেছে যে, চার বছর আগে তার বাবা তার বিয়ে দেন, কিন্তু বৌকে ঘরে নেন না। ছেলেকেও যেতে দেন না শ্বশুরবাড়ী। রসময়বাবুকে আরো টাকা দিতে হবে, আরো গয়না দিতে হবে, আরো হেঁট হতে হবে। কারণ ছেলে যে আরো যোগ্য হয়েছে ও দিন দিন হচ্ছে। অমন জামাই কি অত সস্তায় বিকোবে? রসময়বাবু তাঁর ক্ষমতার শেষ সীমায় যান। বলে দেন যে, আর পারবেন না। তখন তাঁর চোখে ধুলো দিয়ে এই দ্বিতীয় বিবাহের আয়োজন করা হয়। একেবারে কলকাতায়।

মল্লিকাও বজ্রাহত। কিন্তু আপনাকে সে সামলে নেয়। রসময়বাবুকে বলে, কাকা, আপনি বিজলীকে আসতে টেলিগ্রাম করে দিন। তার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে। তার আসা চাই-ই। রসময়বাবু তো অবাক। কিন্তু তাঁকে কিংবা কাউকে ভেঙে বলে না মল্লিকা কী আছে তার মনে।

কন্যাকে সভাস্থ করার সময় বর-বাবাজী আবিষ্কার করে যে, এ মল্লিকা নয়, এ বিজলী। সে ভয়ানক চমকে ওঠে। কিন্তু গোলমাল করে না। কন্যাকর্তা অসুস্থ বলে "কাকা" রসময়বাবু সম্প্রদান করেন। তারপর দানসামগ্রীর বেলা জগৎ নিজেই দাগা পায়। ওসব তো তার জন্যে নয়। ওসব মল্লিকার অনাগত বরের জন্যে তোলা থাকবে। শেষে রসময়বাবু কথা দেন যে, তিনি তাঁর জামাতার মনে কোনোরকম আফসোস রাখবেন না। বরকর্তাকে ঢোঁক গিলতে হলো। ও ছেলেকে তৃতীয়বার বর সাজাবার সাহস তাঁর ছিল না।

এর পরে মল্লিকা একদল তীর্থযাত্রীর সঙ্গে হরিদ্বার যাত্রা করে। তার মা-বাবা অনুমতি দেন। বেচারি কী নিয়ে থাকবে? পড়াশুনায় তো মন নেই। পাগল হয়ে যায়নি এই রক্ষা। বিয়ের কথা তোলে কার সাধ্যি। কুম্ভমেলার ভিড়ে একদিন হরিদ্বার থেকে সে হারিয়ে যায়। খবর পেয়ে তার বাবা রওনা হন তাকে খুঁজতে। অনেকদিন বাদে তার সন্ধান মেলে। তখন সে সন্ন্যাসিনী। মা শয্যা নিয়েছেন শুনে অবশেষে বাড়ী ফেরে। ইতিমধ্যে সে হয়েছিল সন্ন্যাসিনীদের সম্বন্ধে মোহমুক্ত। আর পুরুষজাতির যে পরিচয় সে ঘরের বাইরে গিয়ে পেয়েছিল, তার ফলে বীতশ্রদ্ধ। কেউ শিব নয়। কোথাও সে টিকতে পারে না। না ঘরে, না বাইরে। সে এখন না ঘরকা না ঘাটকা।

তাই তাকে জাহাজে তুলে দিয়ে রপ্তানী করা হয়েছে সরাসরি কলকাতা থেকে লন্ডনে। রাঙাদি তার ভার নিয়েছেন। বিলেতে যদি তার মন ফেরে। ভালো লাগে তো মন্টেসরি ট্রেনিং নেবে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সে খুব ভালোবাসে।

পাবনের চোখ কখন এক সময় ঝাপসা হয়ে এসেছিল। সে চশমা খুলে নিয়ে চোখ মুছল। ধরা গলায় বলল, "উদাসিনী রাজ-কন্যা, তোমার গুপ্ত কথা তো শুনলুম। তোমার জন্যে কী করতে পারি, তাই ভাবছি।"

"আর যাই কর," মল্লিকা হেসে বলল, "উপকার করতে চেয়ো না। দুঃখ-তাপে আমার মূল্য আমি বুঝেছি। আমার জন্যে যে আমাকে চাইবে, আমার রূপগুণ কুলশীলের জন্যে নয়, আমার পিতার ধনমান প্রভাব-প্রতিপত্তির জন্যেও নয়, তেমন কেউ যদি থাকে, তবে আমিও ভেবে দেখব।"

"তুমি কি জগৎকে—" পাবন বলতে বলতে থেমে গেল।

"ভুলে গেছি কিনা জানতে ইচ্ছা কর? না, ভুলে যাইনি। তবে সে ভালোবাসা আর নেই। হৃদয় এখন আমার হাতে ফিরে এসেছে। আমি ফ্রি।" মল্লিকা গম্ভীর।

"তুমি কি আশা কর তোমার জন্যে কেউ একজন তপস্যা করবে?" পাবন শুধায়।

"নিশ্চয়। এবার গৌরীর জন্যে তপস্যা।" মল্লিকা উত্তর দেয়।

তখন বসন্তকাল। শীতের মেঘবৃষ্টি কুয়াশার যবনিকা সরে গেছে। আকাশ অন্তহীন নীল। আলো ঝরে পড়ছে শতমুখে। বাতাসে হাজার ফুলের গন্ধ আর হাজার পাখীর কণ্ঠ। নতুন পাতায় পুরোনো গাছের ডাল ছেয়ে গেছে। চেনা যায় না যে, এই সেই রিক্তপত্র ছায়াশূন্য তরু। কত বড় একটা রূপান্তর ঘটে গেল ক'টা দিনে।

কেনউডে বেড়াতে বেড়াতে ক্লান্ত হয়ে ঘাসের উপর আসন নিয়েছিল মল্লিকা ও পাবন। "ওই যে রূপান্তর," পাবন নীরবতা ভঙ্গ করল, "ওর সঙ্গে ম্যাচ করবে তোমার-আমার দুজনারই রূপান্তর। বসন্ত আসবে আমাদেরও জীবনে।"

মল্লিকা একবার পাবনের চোখে চোখ রেখে নামিয়ে নিল। তার অন্তরে দোলা লেগেছে। সে অনুভব করছে একটি পরম লগ্ন আসন্ন।

পাবন ভয়ে বলবে কি নির্ভয়ে বলবে? ইতস্তত করতে করতে হঠাৎ জোর করে বলে বসল, "উদাসিনী রাজকন্যা, তুমি কি স্বর্গের দেবকন্যার মতো অভিশপ্ত কচকে বর দিয়ে ত্রাণ করতে পার না?"

"সানন্দে।" মল্লিকা বলল আবেগভরে, "নাও, নাও, যে বর চাও সে বর নাও।"

মন্ত্রপাঠের মতো পাবন তার প্রতি-ধ্বনি করল। "নাও, নাও, যে বর চাও সে বর নাও।"
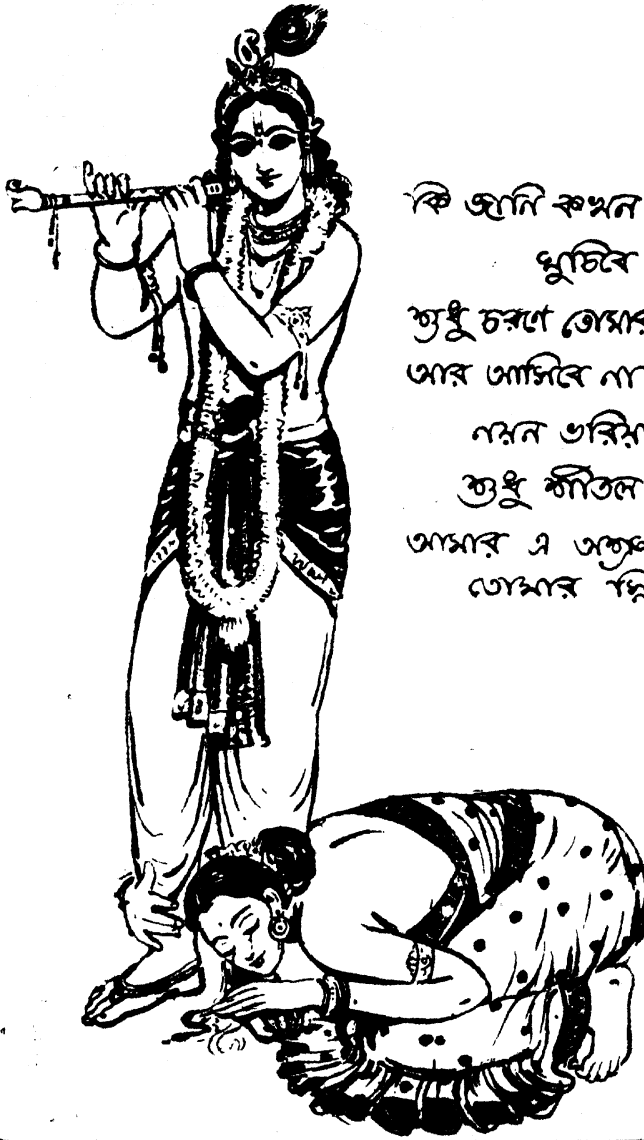
কি জানি কখন নিদ্রা টুটিবে
ঘুচিবে সুপ্ত রজনী।
শুধু চরণে তোমার পড়িয়া রহিব
আর আসিবে না দিন যামিনী।
নয়ন ভরিয়া অশ্রু ঝরিবে
শুধু শীতল করিবে তপ্ত ধরণী
আমার এ অশ্রু স্পর্শিবে না কভু
তোমার স্নিগ্ধ চরণ তরণী।
সুধীর চ্যাটার্জ্জি
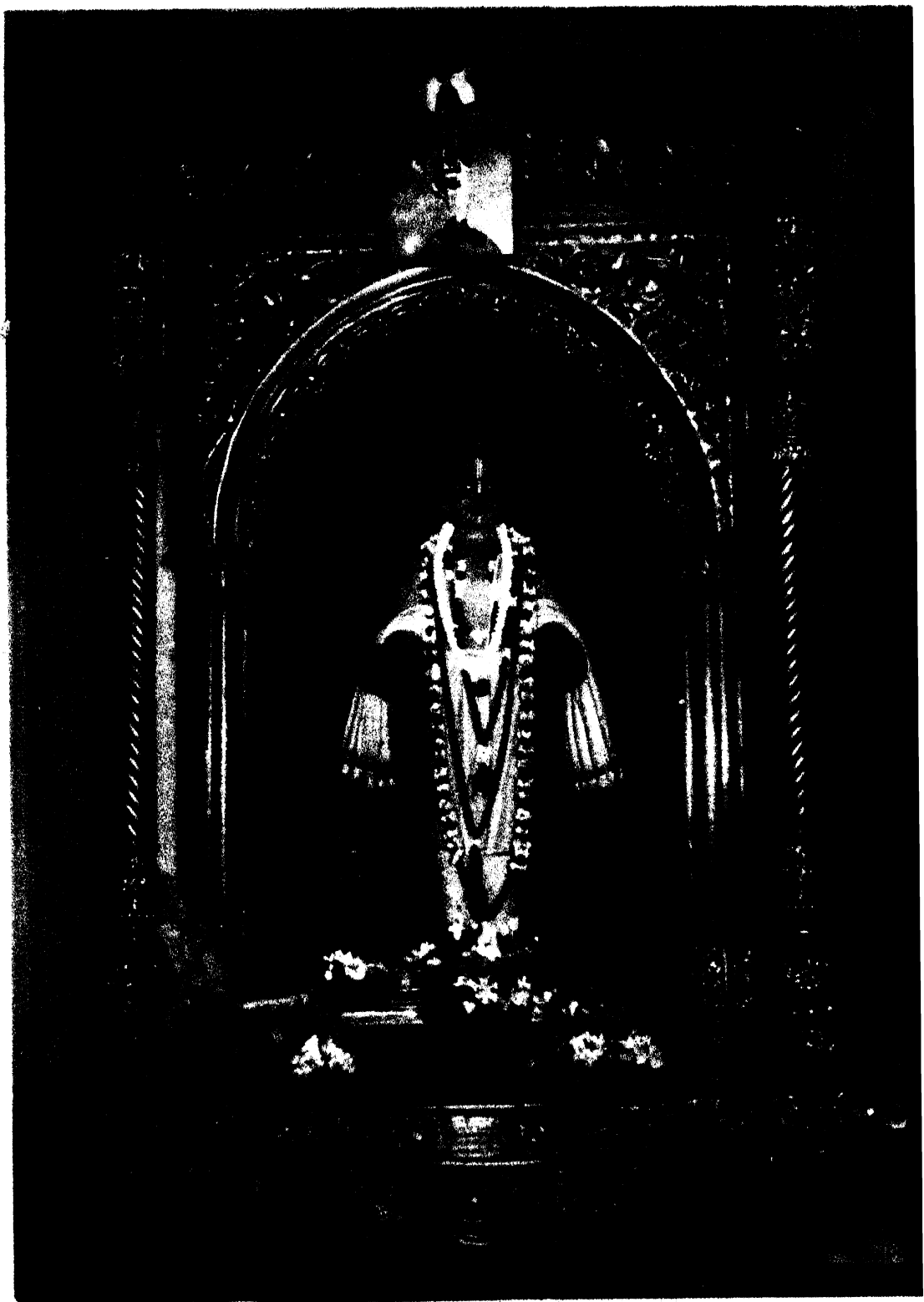
শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পূজিত মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ। নবদ্বীপ।

আধুনিক ভারতবর্ষে ও চীনে বিজ্ঞানের স্থান

হুমায়ুন কবির

১৯৫৮ সালের ৪ঠা মার্চ তারিখে ভারত সরকার বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় নীতি ঘোষণা করে এক প্রস্তাব পার্লামেণ্টের সামনে উপস্থিত করেন। এ দেশে বিজ্ঞানের বিকাশে সে এক স্মরণীয় দিন। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োগে জনসাধারণের জীবিকার মান বাড়াবার চেষ্টা গত দেড়শো দুশো বছরে বহু দেশেই হয়েছে, কিন্তু বোধহয় পৃথিবীতে কোন দেশই ইতি-পূর্বে বিজ্ঞান সম্বন্ধে সরকারী নীতি এ-ভাবে ঘোষণা করে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রসারের দায়িত্ব গ্রহণ করেনি।

এ নীতি সাড়ে পাঁচ বছর পূর্বে গৃহীত হয়েছিল। প্রস্তাব গ্রহণের কয়েক মাসের মধ্যেই দেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের এক সম্মেলন আহ্বান করে কার্যপন্থা নির্ধারণের চেষ্টা হয়। গত পাঁচ বৎসরে সে সম্মেলনের বহু প্রস্তাবকে কার্যকরী রূপ দেওয়া হয়েছে। নানা বিষয়ে নানাদিকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও গবেষণা প্রসারের চেষ্টাও সুস্পষ্ট, কিন্তু বৈজ্ঞানিক নীতি প্রস্তাবে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু দেশের সামনে যে আদর্শ উপস্থিত করেছিলেন, সে আদর্শ দেশ আজো পরিপূর্ণভাবে পূরণ করতে পারেনি।

জমার খাতায় অনেক জিনিস নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারি। ১৯৫৮ সালে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য ভারত সরকার পনের কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল, তার মধ্যে সি এস আই আর অর্থাৎ কাউন্সিল অব সায়েণ্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ পেয়েছিল সাড়ে চার কোটি টাকারও কম। এবছর ভারত সরকার বিজ্ঞানের জন্য চল্লিশ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে, তার মধ্যে সি-এস আই আর দশ কোটি টাকা পাবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণার সংখ্যা ও মানও বেড়েছে, এবিষয়ে সন্দেহ নাই।

এ পাঁচ বছরে ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক ও টেকনিকাল শিক্ষার সম্প্রসারণ উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৮ সালে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে আন্দাজ ৬০০০ ও পলিটেকনিকে দশ হাজার শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছিল। এবছর ইঞ্জি-নীয়ারিং কলেজে ১৯০০০ এবং পলিটেক-নিকে প্রায় ৩৩০০০ শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে। বি এস সি এবং এম এস সি ক্লাসেও ছাত্রভর্তির সংখ্যা পাঁচ বছরে দ্বিগুণের চেয়ে বেশী বেড়ে গিয়েছে।

মেধাবী অথচ গরীব ছাত্রছাত্রীর জন্য নানা ধরণের স্কলারশিপ স্টাইপেণ্ডও অনেক বেড়েছে। প্রত্যেক রাজ্যসরকার ছাত্রবৃত্তির সংখ্যা ও পরিমাণ বাড়িয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়েই নতুন নতুন ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা হয়েছে। কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক গবেষণা মন্ত্রণালয় ও সি এস আই আর ১৯৫৮ সালে যেখানে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য হাজারের কম ফেলোশিপ দিত, এবছর তারা ২৩০০ ফেলোশিপ দিচ্ছে। টেকনিকাল শিক্ষার জন্য মন্ত্রণালয় ১৯৫৮ সালের হাজারটি স্কলারশিপের জায়গায় ১৯৬২ সালে ৩৫০০ স্কলারশিপ দিয়েছিল। এ বছর সে সংখ্যা আরো বাড়বে। ইউনি-ভার্সিটি গ্রাণ্টস কমিশনের তরফ থেকেও অনেক ফেলোশিপ এবং স্কলারশিপের ব্যবস্থা হয়েছে এবং সম্প্রতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রি-সভা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, যোগ্য প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর উচ্চশিক্ষার জন্য কর্জে হাসিনা রূপে ক্রমবর্ধমানভাবে বৃত্তির এমন ব্যবস্থা করতে হবে যে মেধাবী একটি ছাত্রও যেন উচ্চশিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়।

একদিকে যেমন বৈজ্ঞানিক ও টেকনি-কাল শিক্ষার প্রসার বেড়েছে, স্কলারশিপ ফেলোশিপের সংখ্যা বেড়েছে, অন্যদিকে সেই সব শিক্ষিত ব্যক্তির কাজের জন্যও নতুন ব্যবস্থা করা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক নীতি প্রস্তাব গ্রহণের পরে যে বৈজ্ঞানিক সম্মেলন আহ্বান করা হয়েছিল, তার অন্যতম প্রধান সুপারিশ অনুসারে মেধাবী বৈজ্ঞানিকদের জন্য সায়েন্টিস্টস পুল, অথবা বৈজ্ঞানিক নিয়োগকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। মেধাবী ও উচ্চশিক্ষিত বৈজ্ঞানিকের যদি স্থায়ীভাবে কাজ পেতে দেরী হয়, তাঁদের সায়েণ্টিস্ট পুলে নেওয়া হয়। শিক্ষা ও গুণ অনুসারে তাঁরা সম্মানী পান এবং যতদিন স্থায়ী কাজের ব্যবস্থা না হয়, যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা লেবরেটরীতে নিজের ইচ্ছা অনুসারে তাঁরা কাজ করতে পারেন। প্রথমে এই নিয়োগ কেন্দ্রে একশ'জন বৈজ্ঞানিকের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছিল, কিন্তু পাঁচ বছরের মধ্যে সেই সংখ্যাকে বাড়িয়ে পাঁচ'শ করা হয়। সম্প্রতি সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে তাঁদের সংখ্যা আর নির্দিষ্ট থাকবে না, উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত সমস্ত বৈজ্ঞানিককেই এ নিয়োগ কেন্দ্রে যোগদানের সুযোগ দেওয়া হবে। সতের'শয়েরও বেশী বৈজ্ঞানিক এ নিয়োগ কেন্দ্রের সুবিধা পাঁচ বছরে পেয়েছেন।

এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকেই গত পাঁচ বছরে বিজ্ঞানের প্রসার ও বৈজ্ঞানিকের জন্য

উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র তৈরীর জন্য যে চেষ্টা হয়েছে, পাঠক-পাঠিকা তার খানিকটা পরিচয় পাবেন। প্রগতি হয়েছে এ কথা নিঃসন্দেহ, কিন্তু তা সত্ত্বেও যে এখনো অনেক কিছু করতে হবে সে কথাও সমান নিঃসন্দেহ। বিশেষ করে চীনের আক্রমণের পরে আমাদের বৈজ্ঞানিক পরিস্থিতির খতিয়ান নেওয়া আরো প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশরক্ষার জন্য আজ বিজ্ঞানের প্রয়োজন সবাই মানেন। কৃষিই হোক অথবা শিল্প উদ্যোগ হোক, সমস্ত ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের প্রয়োগ উন্নতির একমাত্র পথ। দেশরক্ষার জন্য যে হাতিয়ার দরকার, তাও বিজ্ঞাননির্ভর। দেশের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য একদিকে যেমন অস্ত্রশস্ত্র চাই, অন্যদিকে চাই অধিক খাদ্যশস্য এবং উন্নততর শিল্পব্যবস্থা। এক কথায়, বিজ্ঞানই বর্তমান যুগে দেশরক্ষা এবং দেশের উন্নতির সবচেয়ে বড় অস্ত্র।

স্বভাবতই চীনদেশের সঙ্গে এ সমস্ত ক্ষেত্রেই ভারতবর্ষের তুলনা হবে, তুলনা প্রয়োজন। অন্যান্য ক্ষেত্রের আলোচনা আজ করব না। সমস্ত ক্ষেত্রেই বিজ্ঞান আমাদের ভবিষ্যত নির্ণয় করবে, তাই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তুলনা করলেই ভবিষ্যত সম্বন্ধেও স্পষ্ট ধারণা করা যাবে।

ভারতবর্ষ এবং চীনদেশের মধ্যে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় তফাৎ দুই দেশের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে মিলবে। চীনদেশে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের উপরেই ঝোঁক, বিজ্ঞানের সত্যানুসন্ধান বা বিশুদ্ধ গবেষণার দিকে বর্তমানে দৃষ্টি নাই বল্লেই চলে। দেশে উৎপন্ন নানা ধরণের কাঁচামাল আবিষ্কার এবং তাদের যথাযথ ব্যবহার আজ চীনদেশের বৈজ্ঞানিকের একমাত্র লক্ষ্য। সে তুলনায় ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিকদের সাধনার ক্ষেত্র অনেক বেশী ব্যাপক। ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ব্যবহারিক প্রয়োজনকে অস্বীকার করেন নাই, কিন্তু তার মধ্যে নিজের প্রচেষ্টাকে সীমাবদ্ধও রাখেন নাই।

চীনদেশে মৌলিক গবেষণার প্রতি অবহেলা অন্যভাবেও দেখা যায়। বহুক্ষেত্রে বিদেশী উৎপাদন পদ্ধতির অনুকরণ করেই চীনা বৈজ্ঞানিক তুষ্ট, এবং তাতে অবশ্য আশু ফল লাভও হয়েছে। ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক কেবলমাত্র ব্যবহারিক গবেষণায় তুষ্ট নন, বরং কোন কোনো ক্ষেত্রে মৌলিক সন্ধানের জন্য ব্যবহারিক গবেষণাকে অবহেলাই করেছেন। শিল্পউদ্যোগের অনেক ক্ষেত্রে তাই বর্তমানে ফল মেলে নাই। অল্পদিনের বিচারে তাই চীনদেশ বেশী লাভ করেছে, কিন্তু যদি এতদিনের মৌলিক গবেষণার ভিত্তিতে আজ ভারতবর্ষের বৈজ্ঞানিক ব্যবহারিক প্রয়োগের দিকে মনোযোগ দেন, তবে চীনের সে লাভ দীর্ঘদিন স্থায়ী হবে না।

বর্তমান ফললাভের আগ্রহ চীনদেশের শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যেও স্পষ্ট। মৌলিক বিজ্ঞান শিক্ষার চেয়ে টেকনিকাল শিক্ষার উপরই চীন বেশী জোর দিয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষার চেয়ে উচ্চস্তরের কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিতের সংখ্যা চীনদেশে ১৯৫০ সালে আন্দাজ সোওয়া লাখ ছিল। তাদের মধ্যে একুশ হাজার ইঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রী বা ডিপ্লোমাধারী অর্থাৎ ১৯৫০ সালে উচ্চশিক্ষিতের এক-পঞ্চমাংশেরও কম ইঞ্জিনীয়ার। ১৯৬০ সালে এ ধরণের উচ্চশিক্ষিতের সংখ্যা প্রায় সাত লক্ষ হয়ে দাঁড়ায় কিন্তু তাদের মধ্যে ইঞ্জিনীয়ার হয় ২১০,০০০। উচ্চশিক্ষিতের সংখ্যা বেড়েছে ছয়গুণ কিন্তু ইঞ্জিনীয়ারের সংখ্যা বেড়েছে দশগুণ, ফলে ১৯৬০ সালে সমস্ত উচ্চশিক্ষিতের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ছিল ইঞ্জিনীয়ার।

১৯৫০ সালে ভারতবর্ষে উচ্চশিক্ষিতের সংখ্যা ছিল প্রায় চার লাখ এবং তাদের মধ্যে ইঞ্জিনীয়ার প্রায় ৬০০০০ অর্থাৎ সাত ভাগের এক ভাগ। দশ বছর পরে ১৯৬০ সালে উচ্চশিক্ষিতের সংখ্যা বারো লাখেরও বেশী এবং তাদের মধ্যে ইঞ্জিনীয়ার ছিল প্রায় আড়াই লক্ষ। অর্থাৎ উচ্চশিক্ষিতের সংখ্যা বেড়েছে তিনগুণ, কিন্তু ইঞ্জিনীয়ারের সংখ্যা বেড়েছে চারগুণ। আজো ভারতবর্ষে উচ্চশিক্ষিতের সংখ্যা চীনের প্রায় দ্বিগুণ। কিন্তু ইঞ্জিনীয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে চীন ভারতবর্ষের প্রায় সমান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ব্যবহারিক প্রয়োগের প্রতি চীনদেশের যে ঝোঁক, বিজ্ঞান শিক্ষাব্যবস্থার আলোচনা করলেই তা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। ১৯৫০ সালে চীনদেশে বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষিত লোকের সংখ্যা ছিল ১১০০০ এবং দশ বছরে তা চার গুণ বেড়ে ৪৪০০০ হয়েছে। ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিকের সংখ্যা ছিল ১৯৫০ সালে ৮০০০০ এবং ১৯৬০ সালে তা বেড়ে দুই লক্ষে দাঁড়ায়। চীনদেশে দশ বছরে ইঞ্জিনীয়ারের সংখ্যা বেড়েছে দশ গুণ, কিন্তু বৈজ্ঞানিকের সংখ্যা বেড়েছে চার গুণ। ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিকের সংখ্যা বেড়েছে আড়াই গুণ এবং ইঞ্জিনীয়ারের সংখ্যা চার গুণ। আরো লক্ষ্য করা উচিত যে ১৯৫০ সালে চীনদেশে বৈজ্ঞানিকের সংখ্যা ছিল ইঞ্জিনীয়ারের অর্ধেক কিন্তু ১৯৬০ সালে মাত্র এক পঞ্চমাংশ। ভারতবর্ষে কিন্তু দশ বৎসরে অনুপাত সে পরিমাণে বদলায় নি। এ দেশে বৈজ্ঞানিকের সংখ্যা পূর্বে ছিল ইঞ্জিনীয়ারের দেড় গুণ এবং বর্তমানে প্রায় সমান সমান।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে চীনের তুলনায় ভারতবর্ষের বর্তমান অগ্রগতি আরো স্পষ্ট। ১৯৫৭ সালে চীনদেশের একাডেমী অফ সায়েন্সের অধীনে ১৭০০০ লোক কাজ করত, তাদের মধ্যে মাত্র ৭৪৬ জন ছিলেন উঁচুদরের বৈজ্ঞানিক। সি এস আই আর-এ কর্মচারীর সংখ্যা বর্তমানে এগারো হাজার, কিন্তু তাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিকের সংখ্যা দু'হাজারের বেশী। সমস্ত স্তরের বৈজ্ঞানিক কর্মীর সংখ্যা

বিচার করলে চীনদেশের বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানে তাদের সংখ্যা সমস্ত কর্মচারীর এক তৃতীয়াংশেরও কম, ভারতবর্ষে সি এস আই আর-এ তাদের সংখ্যা অর্ধেকের চেয়ে একটু বেশী। আণবিক শক্তি, কৃষিবিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক দফতরের সংখ্যা যোগ করলে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে চীনের তুলনায় ভারতের অধিকতর বিকাশ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হয় ১৯৪৭ সালে। চীনদেশে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র ১৯৪৯ সালেই একনায়কত্ব স্থাপন করে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ প্রথম থেকেই এগিয়ে ছিল, আজো আছে কিন্তু গত পাঁচ-ছয় বৎসরে চীনদেশ ভারতবর্ষকে পিছনে ফেলবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই সেকথা পরিষ্কার বোঝা যাবে। বর্তমানে ভারতবর্ষে বিভিন্ন টেকনিকাল ও ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ছাত্রসংখ্যা আন্দাজ দুই লক্ষ, কিন্তু চীনদেশে তাদের সংখ্যা প্রায় আট লক্ষ। চীনের এ চ্যালেঞ্জ পরাজিত করতে হলে জনবল এবং অর্থবল উভয় ভাবেই আমাদের প্রয়াস অনেক বাড়াতে হবে। কেবলমাত্র অর্থ দিয়ে কোনক্ষেত্রেই প্রগতির বিচার করা চলে না একথা সত্য, কিন্তু অর্থ ভিন্ন যে প্রগতি হয় না সেকথাও সমান সত্য। তাছাড়া কোন্ দেশ বা রাষ্ট্র কোন ব্যাপারে জাতীয় সম্পদের কি পরিমাণ অংশ ব্যবহার করে, তার দ্বারা বিভিন্ন ক্ষেত্রের রাষ্ট্রীয় মূল্যায়ণ বোঝা যায়।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য মোট ১৩০ কোটি টাকার বরাদ্দ হয়েছে। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনায় যে দশ হাজার কোটির বেশী অর্থব্যয় হবে, তার শতকরা দেড় টাকাও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় খরচ হবে না। পরিকল্পনার বাইরে এ পাঁচ বছরে আরো প্রায় ৭০ কোটি টাকা নানান বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে ব্যয়ের ব্যবস্থা আছে। সমস্ত মিলিয়ে তাই পাঁচ বছরে আন্দাজ ২০০ কোটি টাকা অর্থাৎ বছরে গড়পড়তায় ৪০ কোটি টাকা ভারতবর্ষের বৈজ্ঞানিক বাজেট। সে তুলনায় চীনদেশ বৎসরে প্রায় ২০০ কোটি টাকা বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য বরাদ্দ করেছে। কাজেই আমরাও যদি বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য অধিক অর্থের ব্যবস্থা না করি, তবে আজ না হোক কাল এ বৈজ্ঞানিক প্রতিস্বন্দ্বিতায় আমাদের পরাজয়ের আশঙ্কা রয়েছে। ভারতবর্ষের বর্তমান জাতীয় আয় বৎসরে প্রায় ১৫০০০ কোটি টাকা, তার শতকরা একভাগ, অর্থাৎ বছরে অন্তত দেড়শো কোটি টাকা যদি আমরা বিজ্ঞানের জন্য খরচ করি, তবে চীনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আতঙ্কিত হবার কারণ থাকবে না।

গত পাঁচ বছরে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে যে কাজ হয়েছে, তার বিচারের জন্য সম্প্রতি দিল্লীতে যে সম্মেলন হয়েছিল, তার অন্যতম প্রধান সিদ্ধান্ত যে আগামী পাঁচ বছরে বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রতি বিশেষ ঝোঁক দিতে হবে। ভারতবর্ষে বর্তমানে প্রায় ১৫০০০ বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে নিযুক্ত, পাঁচ বছরের মধ্যে তাঁদের সংখ্যা বাড়িয়ে ৩০০০০ করা প্রয়োজন। সেজন্য অর্থের বরাদ্দও বাড়াতে হবে এবং জাতীয় আয়ের অন্তত এক শতাংশ বিজ্ঞানের জন্য নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। পাঁচ বছরে জাতীয় আয় বেড়ে বৎসরে ২০,০০০ কোটিরও বেশী হবে, কাজেই তখন বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য বছরে অন্তত ২০০ কোটির ব্যবস্থা করতে হবে।

কেবলমাত্র গবেষণার জন্য অর্থবরাদ্দ এবং বৈজ্ঞানিকের সংখ্যা বাড়ালে চলবে না, সঙ্গে সঙ্গে গবেষণার মান ও বেগও বাড়াতে হবে। তার জন্য প্রথম প্রয়োজন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিজ্ঞান শিক্ষার ও গবেষণার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নতি। অধ্যাপক ও ছাত্রদের মধ্যে যোগাযোগ বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে একপক্ষে ন্যাশনাল লেবরেটরী ও বেসরকারী গবেষণাগারগুলি ও অন্যপক্ষে দেশের শিল্প ও উদ্যোগের ঘনিষ্টতর সম্বন্ধ স্থাপন করতে হবে। পারস্পরিক আলোচনা ও বিচার না হলে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উন্নতি হতে পারে না, তার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে, লেবরেটরীগুলিতে এবং সমস্ত বৈজ্ঞানিক সংস্থায় আলোচনা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার আবহাওয়া সৃষ্টি করা একান্ত প্রয়োজন। প্রবীণ ও তরুণ বৈজ্ঞানিকের পারস্পরিক সম্বন্ধ যদি সক্রিয় সহযোগিতার ভিত্তিতে স্থাপিত হয়, তবে ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কাজ অবশ্য প্রয়োজনীয়। ভারতবর্ষে বহু খ্যাতনামা লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক রয়েছেন। কিন্তু তবু দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়—যে আজো দেশে বৈজ্ঞানিক আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়নি। সেই আবহাওয়া নাই বলেই বহুক্ষেত্রে প্রতিভাশালী বৈজ্ঞানিকও গবেষণায় আশানুরূপ ফল পান না। সেই আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে হলে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের সাধারণ জ্ঞান ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে। মাতৃভাষার মাধ্যম ভিন্ন তা সম্ভব নয়। কিন্তু মাতৃভাষায় দুচারখানি পাঠ্যপুস্তক লিখে সে উদ্দেশ্য সাধন করা যাবে না। তার জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় বিজ্ঞান সম্বন্ধে বহু সাধারণ পাঠ্য বই, পত্রিকা, গল্প, উপন্যাস। আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিকেরা আজো জনসাধারণের জন্য সহজপাঠ্য বিজ্ঞানের বই লেখার দিকে বিশেষ মনোযোগ দেন নাই। বাঙলায় জগদানন্দ রায় বা রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর আগে যে সব বই লিখেছিলেন, আজো তার চেয়ে খুব বেশী অগ্রসর আমরা হইনি। সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্রিকায়ও বিজ্ঞানের স্থান আজো নগণ্য। সে তুলনায় চীনদেশে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের সাধারণ জ্ঞান ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা অনেক বেশী প্রবল। ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ও লেখক এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে অধিক সংখ্যায় নানা ধরণের বিজ্ঞানের বই লিখবেন। সাপ্তাহিক ও মাসিকের মাধ্যমে তরুণ ও প্রবীণ নাগরিকদের মধ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞান ছড়িয়ে দেবেন। আজ দেশের এই অন্যতম দাবী।

দুই উকিল

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

'আরে, আপনি?' চেয়ার থেকে উঠে এগিয়ে এল প্রশান্ত : 'আপনি কবে এলেন?' নিচু হয়ে প্রণাম করল আগন্তুককে। একটু বা উচ্ছ্বসিত হয়েই করল।

মুগ্ধের মত তাকিয়ে দেখল ভদ্রলোকের হাতে একটা কাগজের বাণ্ডিল। গোলাপী ফিতে দিয়ে বাঁধা।

এ রকম রমণীয় দৃশ্য বুঝি আর হতে নেই। ঐ গোলাপী ফিতেটাই বুঝি আশার হাতছানি।

বেরালের যেমন শিকে উকিলের তেমনি ব্রিফ।

যা ভেবেছি তা না-ও হতে পারে। কখনো-কখনো গোলাপী ফিতে একটা বিশুদ্ধ ছলনা।

চারদিকে তাকিয়ে আগন্তুক বললেন, 'বাড়িটা তো ভালোই পেয়েছ।'

'ছোটর মধ্যে মন্দ নয়।'

'বাড়ির পজিশনটাও ভালো। ট্রাম রাস্তার কাছে। বেশি ঘুরতে হবে না মক্কেলদের।'

প্রশান্ত সামান্য হাসল।

'তা বই-টইও বেশ জোগাড় করে নিয়েছ দেখছি।'

'বই কোথায়? শুধু নজিরের স্তূপ।'

'আজকাল আইন তো বইয়ে নয়, নজিরে।' মাঝখানে টেবিল, মুখোমুখি বসলেন আগন্তুক। অনন্তর সুরে জিগগেস করলেন : 'হাইকোর্টে কেমন হচ্ছে?'

'ঠিক হচ্ছে না এখনো', এবার প্রশান্ত সশব্দে হাসল : 'হব-হব হচ্ছে।'

'বা, নিশ্চয়ই হবে।' ভদ্রলোক উৎসাহ-ভরা উদার সুরে বললেন, 'তুমি এত বড় একটা ব্রিলিয়ান্ট স্কলার, তোমার বিদ্যে-বুদ্ধি পাণ্ডিত্য বৃথা যাবে না।'

'এর আগে দু বছর যে মফস্বলে ছিলাম কিচ্ছু হয়নি।'

'তুমি মফস্বলের পক্ষে বেমানান', ভদ্র-লোক আরো উত্তপ্ত হলেন : 'তোমার ফিল্ড হচ্ছে হাইকোর্ট।'

'ঐ যে কানুনগো হিসেবে ফেইলিউর হবার পর তাকে সাবডিপটি করে দিল আর সাবডিপটি হিসেবে ফেইলিউর হবার পরই ডিপটি—'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আগন্তুক বললেন, 'আজকাল হলে কানুনগো হিসেবে ফেইলিউর হবার পরই মিনিস্টার—'

'তেমনি মফস্বলে ফেইলিউর হবার পরে হাইকোর্ট।' আবার হাসল প্রশান্ত।

'যারা মফস্বল থেকে আসে তারা নাকি খুব চেঁচায়?'

'মামলা পেলে তো চেঁচাবে।'

'না, তুমি চেঁচিও না। আস্তে-সুস্থে ধীরে-ধীরে আর্গুমেন্ট করবে। যে যত সম্ভ্রান্ত, শুনেছি, সে তত নিস্তেজ।'

'যদি এমন হয় আপনার কথা জজেরা শুনতে পাচ্ছে না, তাহলে বুঝতে হবে আপনি না-জানি কী অমূল্য বস্তু পেশ করলেন—'

'হ্যাঁ, আনহার্ড মেলডিই বেশি মধুর।'

ভদ্রলোক ব্যাণ্ডিলের ফিতে খুলতে লাগলেন।

বেরালের ভাগ্যে শিকে কি তবে ছিঁড়বে?

বড় আস্তে-সুস্থে ধীরে-ধীরে ফিতেটা খুলছেন ভদ্রলোক। ভঙ্গিটা বড় বেশি সম্ভ্রান্ত।

'কী ওটা?' জিগগেস না করে পারল না প্রশান্ত।

'একটা সেকেন্ড আপিল—'

'কী মামলা?' হাত বাড়িয়ে প্রশান্ত ব্রিফটা টেনে নিল।

'খাস দখলের। আমাদের গ্রামের শরৎ সমাদ্দারকে মনে আছে? তারই জমি।'

ব্রিফ ওলটাতে-ওলটাতে প্রশান্ত বললে, 'দু কোর্টেই হেরেছে?'

'মুন্সেফের জাজমেন্ট তো আগাগোড়া ভুল। আর সাবজজ অকালে বুড়ো হয়েছে, খাটতে চায় না। আপিল ওলটাতে হলেই বেশি লিখতে হয়, যেতে হয় এভিডেন্সের মধ্যে, রুলিং-এর মধ্যে, তাহলেই তো বেশি খাটনি। তাই নমো-নমো করে সবের তাকে থেকে নিচের রায়টা বহাল রেখেছে। 'আই হ্যাভ নো রিজন টু ডিস্টার্ব দি ফাইন্ডিং—'

কতক্ষণ চুপ করে থেকে নথিটা পড়ল প্রশান্ত। জিগগেস করলে, 'আপনি নিচে ছিলেন?'

'দু কোর্টেই ছিলাম।'

উপর-উপর দেখেই একটা শার্প-পয়েন্ট আবিষ্কার করল প্রশান্ত। বললে, 'এ পয়েন্টটা আর্গু করেছিলেন?'

'করেছি বৈকি। কিন্তু তোমাকে বলব কী, মুন্সেফটা গোঁয়ার আর সাবজজটা তালকানা।'

আরো কতক্ষণ নীরবে নথি পড়ল প্রশান্ত।

ভদ্রলোক বোধ হয় প্রশান্তের কপালে রাজটীকা দেখলেন। বললেন, 'আমি তখনই বলেছি এত কুইক গ্র্যাস্প সচরাচর দেখা যায় না। শরৎ সমাদ্দারের ইচ্ছে ছিল একজন সিনিয়র দেয়, আমি বললাম, না, প্রশান্তই যথেষ্ট।'

'শরৎবাবু কোথায়?' নথির থেকে ক্ষণিক চোখ তুলল প্রশান্ত।

'কালীঘাটে পুজো দিতে গিয়েছে।' অনুকম্পা মিশিয়ে হাসলেন ভদ্রলোক।

'আপিল ফাইল করবার আগেই কালীঘাট?'

'হ্যাঁ, আদ্যেই আদ্যাশক্তি। কালীই হাই-কোর্টেশ্বরী।' ভদ্রলোক দার্শনিকের মত ঔদাস্য আনলেন : 'কিছুই বলা যায় না। কখনো পারে এসে তরী ডোবে, কখনো বা ডাঙাতেই নৌকো চলে।'

'তা তো ঠিকই।' বিনয় মিশিয়ে বললে প্রশান্ত।

'নানা মুনির নানা মত। ক্ষণে-ক্ষণে নানা মত। সমস্ত অনিশ্চয়। তাই শুধু প্রার্থনা, মা, তোমার আইন তোমাতে থাক, তুমি শুধু রায়টুকু আমার করে দাও—'

'তা হলে—' প্রশান্ত নির্ভুল সুরে সেই বজ্রগর্ভ ইঙ্গিত করল : 'তা হলে—'

অলক্ষ্যে জামার পকেটে হাত রাখলেন ভদ্রলোক। বললেন, 'তা হলে তুমি একাই পারবে মনে করছ?'

'না-পারার তো কারণ দেখি না। বেশ তো, আপিলটা আগে অ্যাডমিটেড হোক, পরে ফাইন্যাল হিয়ারিং-এর সময় যদি দরকার হয়, একজন সিনিয়র নেওয়া যাবে না-হয়—'

'আমিও তাই বলি। সমাদ্দারই শুধু দোনা-মোনা করে। আমি বলি, প্রশান্ত আমাদের গ্রামের ছেলে, সাত রাজার রাজ্যে এমন মানিক মেলে না, ও একাই এক হাজার। জানো', ভদ্রলোক আরো সন্নিহিত হলেন, 'কাল তো এসেছি, স্টেশনে নামতেই এক টাউটের সঙ্গে দেখা। সমাদ্দারকে বললাম অমন উদোমাদা চেহারা করে নেমো না, পেছনে লোক লাগবে, বাঙাল ভাববে। ঠিক যা বলেছিলাম—'

'লোক লাগল?'

'আর বলো কেন, প্রথম ভেবেছিলাম প্রাইভেট গাড়িকে ট্যাক্সি করতে এসেছে বুঝি। পরে মনে হল হোটেলের দালাল। শেষকালে, স্বরূপে প্রকাশিত হল, উকিলের টাউট। ঠিক ধরেছে সমাদ্দারকে। যে গরু হারিয়েছে তার হাতে যেমন খুঁটো আর দড়ি দেখে চেনা যায়, তেমনি সমাদ্দারের হাতের কাগজপত্র দেখে লোকটা চিনল এ মামলায় হেরেছে। বললে, উকিল চাই? চলুন ফার্স্ট ক্লাশ উকিল দিচ্ছি।'

'ফার্স্ট ক্লাশ!' প্রশান্ত হাসল : 'যেন ফার্স্ট ক্লাশ হোটেল।'

'আমি ধমকে উঠলাম।' বললেন ভদ্রলোক, 'বললাম আমাদের উকিল ঠিক আছে। আপনাকে দালালি করতে হবে না। লোকটা নাছোড়। বললে, কে উকিল? শরৎটা যা ন্যালাখ্যাপা, বললে, আমাদের উকিল প্রশান্ত সরকার, এম-এতে ফার্স্ট ক্লাশ। রাখুন, লোকটা টিটকিরি দিল, ক-অক্ষর জ্ঞান নেই, তার ব্রহ্মবিচার। বলি এম-এ দিয়ে কী হবে, আইনে কদ্দুর? আমি থাকাতে লোকটা আর বেশি দূর সুবিধে করতে পারল না, কেটে পড়ল। নইলে শরতের মুণ্ডু প্রায় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। আমিই আজ ভোর হতে তাকে ঠেলেঠুলে কালীঘাটে পাঠালাম। বললাম, মাকে পুজো দিয়ে এস, মনটা ভালো হবে, মনে জোর পাবে, প্রশান্তকেও পারবে আস্থা রাখতে—'

'ঠিক আছে। তবে এখন—' আরেকটা বজ্রগর্ভ ইঙ্গিত ছুঁড়ল প্রশান্ত।

'হ্যাঁ, খরচের একটা এস্টিমেট করো—'

'এর আবার এস্টিমেট কী—' তন্দু প্রশান্ত কাগজে আঁক পাড়ল।

খসড়ার দিকে এক নজর তাকিয়েই ভদ্র-

লোক উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'তোমার ফি-টা আরো দশ টাকা বাড়িয়ে নাও।'

'বাড়িয়ে নেব?' যেন কোন অভাবনীয়কে দেখছে এমনি চোখ বড় করল প্রশান্ত।

'হ্যাঁ, বাড়িয়ে নাও।' ভদ্রলোক আরো উত্তপ্ত হলেন। 'শরৎ অবশ্য বলছিল, গ্রামের লোক, ফি-টা একটু কম করতে বলবেন। আমি বললাম, ঠিক উলটো, গ্রামের লোক বলেই ফি-টা বাড়িয়ে দিতে হবে। গ্রামের লোককে যদি পেট্রোনাইজ না করো তো কাকে করবে? এ তো আর চিরকেলে বটকৃষ্ণ ঘোষ পাওনি যে এক পয়সায় অক্রূরসংবাদ শোনাতে বলবে। তাই তোমাকে বলছি এই তক্কে বাড়িয়ে নাও ফি-টা—'

'বেশ, যা হয় দেবেন। কিন্তু টাকা কি—'

'সব শরতের কাছে। ও কি কালীঘাট থেকে এ বাড়ি চিনে নিতে পারবে?' একটু বুঝি উন্মনা হলেন বটকৃষ্ণ : 'তাই ওকে কোর্টে যেতে বলেছি। কোর্টেই পেমেন্টটা করে দেব।'

'বেশ, আমি গ্রাউন্ডস তৈরি করছি।' কাগজ-কলম টেনে নিল প্রশান্ত : 'একটা স্টে-র দরখাস্তও করতে হবে। শরৎবাবুকে দিয়ে একটা এফিডেভিট করিয়ে নিতে হবে। আমার মুহুরি এসে পড়বে এখুনি। হ্যাঁ, কোর্টেই সব হবে। আমার মুহুরিই ঠিক-ঠাক করে দেবে সমস্ত। আজ বুধবার—শুক্রবারই আর্জেন্ট অ্যাপ্লিকেশন শোনার দিন।' ত্রস্তব্যস্ত হয়ে উঠল প্রশান্ত, যেন ফাঁকা মাঠে বল পেয়ে ছুটেছে গোলের দিকে। 'আজই আপিল ফাইল করে মুভ করে নিতে হবে যেন পরশু শুক্রবারটা না মিস হয়।'

'ঠিক আছে। অতি সুন্দর।' উঠে পড়লেন বটকৃষ্ণ।

'আপনি শরৎবাবুকে নিয়ে যত শিগগির পারেন চলে যান কোর্টে। এই যে—এই যে মুহুরিবাবু এসে গিয়েছেন। তবে আর কী, চিনে রাখুন মুহুরিবাবুকে—' মুহুরির দিকে তাকিয়ে প্রশান্ত বললে, 'এদের একটা সেকেন্ড আপিল—স্টে-র দরখাস্ত—এফিডেভিট—'

বটকৃষ্ণ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন, সাড়ে আটটা। মুহুরিকে লক্ষ্য করে মুরুব্বিয়ানা করে বললেন, 'আপনার বোধ হয় আরো কিছু আগে আসা উচিত। হাই-কোর্টের উকিলের সকাল বলতে আর কতক্ষণ। যেন পদ্মপাতায় শিশিরের জলটুকু—সুতরাং—' আবার ঘড়ি দেখলেন বটকৃষ্ণ।

'হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ুন, দেরি করবেন না।'

'এখন ট্যাক্সি পাব আশা করি। সব কাঁটায়-কাঁটায় চলছে। চলা উচিত। শুধু মোকদ্দমার ফলটাই—' শূন্যের দিকে এক-বার চোখ তুলে বেরিয়ে পড়লেন বটকৃষ্ণ।

চারদিকে ত্বরার বিদ্যুৎ খেলতে লাগল।

শার্টে বোতাম নেই কেন, এ ময়লা কলারটা আবার দিয়েছ কেন, অন্তঃপুরেও ঝলস লাগল।

মধুশ্রী জিগগেস করলে, 'নতুন মোকদ্দমা পেয়েছ বুঝি?'

'হ্যাঁ, আমাদের গাঁয়ের বটকৃষ্ণবাবু নিয়ে এসেছেন। সিনিয়র উকিল, সদরে-মফস্বলে খুব নাম-ডাক। আর আমার উপরে তাঁর খুব বিশ্বাস। তুমিই শুধু আমাকে মানতে চাও না—'

'টাকা দিয়েছেন?'

'জানো আমার যা ফি তার উপরে আরো দশ টাকা বেশি দেবেন। জেনে রাখো সে দশ টাকা তোমার।'

'দশ টাকা বেশি কেন?' স্বামীর পরা-শার্টে বোতাম লাগাতে-লাগাতে জিগগেস করলে মধুশ্রী।

'ওদের দেশের আমি রত্ন সেই পুরস্কার।'

'রতনেই রতন চিনেছে।' সুতোর শেষ গিঁটটা দাঁত দিয়ে কাটল মধুশ্রী।

কোর্টে গিয়ে প্রশান্ত দেখল সব কাঁটায়-কাঁটায়। এভিডেভিট হয়ে গিয়েছে। ফাইলড হয়েছে আপিল। মুভ করা হয়েছে বেঞ্চকে। আগামী শুক্রবারই দিন হয়েছে শুনানির। আপিল অ্যাডমিটেড হবে কিনা। আর অ্যাডমিটেড হলেই স্টে। প্রতিপক্ষ শরৎ সমাদ্দারের বিরুদ্ধে নিম্ন আদালতে যে ডিক্রিজারি করেছে তা আপাতত বন্ধ।

'কিন্তু মক্কেল কই?' প্রশান্ত আর শান্ত থাকতে পারল না।

'এদিকেই তো ছিল।' খুঁজতে বেরুল মুহুরি।

আনাচে-কানাচে সিঁড়িতে-বারান্দায় কোথাও পাওয়া গেল না।

'একবার বুড়ো বলেছিল বটে রাত্রে আপনার বাড়িতে যাবে।'

'দুটোই তো বুড়ো। কোনটা বলেছিল?'

মুহুরি মাথা চুলকে বললে, 'উকিল-বুড়ো। বটকৃষ্ণবাবু।'

'তোমাকে খরচের টাকা দিল কে?'

'মক্কেল। শরৎ সমাদ্দার।'

'তখনই আমার টাকাটা নিয়ে নিলে না কেন?'

'আমি কি জানি যে ফি বাকি আছে? আমাকে তো তখন বলেন নি।'

'যাক, রাত্রে আসবে বলেছে? তাই আসুক।' চিরদিন আশায় বাসা বাঁধা উকিলের, প্রশান্ত তাই সুতো ছাড়ল।

'না-এসে যাবে কোথায়?' মুহুরি বললে, 'মামলা তাহলে টেঁসে যাবে না? দু-দু কোর্টে হেরেছে। যদি প্রতিকার চায় আসতে হবেই।'

রাত্রেও কেউ এল না। না শরৎ না বটকৃষ্ণ।

একটা শব্দ নেই রেখা নেই, বৃহস্পতি-বারের রাত্রি ভোর হল।

শুক্রবার সকালে প্রশান্ত বললে, 'নট-প্রেস্‌ড বলে রিজেক্টেড হয়ে যাক।'

"এ কী অসম্ভব কথা, ফি দেবে না মামলা চালাবে? কিন্তু', মুহুরি মুখ-চোখ চিন্তিত করল : 'হঠাৎ কোনো বিপদ হয় নি তো?'

'তা হলে একটা খবর দেবে তো?'

'হয়তো সকালে কোর্টে টাকা নিয়ে উপস্থিত হবে।' মুহুরি আশ্বাস দিল।

শুক্রবার সকালেও নিষ্কলঙ্ক। বটমূলে কৃষ্ণও নেই আর শরৎশশীরও উদয় হল না।

কিন্তু তাই বলে পিটিশনটা মুভ না করার কোনো প্রজেক্ট নেই। আইনের এমনু
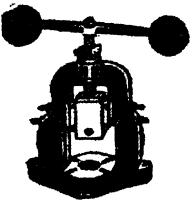
একটা ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট সে আবিষ্কার করেছে যেটা প্রত্যক্ষে জজেদের সামনে বলবার জন্যে মুখটা ভীষণ কুটকুট করছে।

বলবার জন্যেই তো উকিল হওয়া। মনের কথা মনে চেপে রেখে গোঁজ হয়ে বসে থাকবার জন্যে নয়।

টাকা না দিয়ে যাবে কোথায়? অন্য ব্যবসায় পারিশ্রমিক না দিক মামলা করে আদায় করা যাবে না কিন্তু ওকালতির পারিশ্রমিক মামলা করে উশুল করা চলবে। যেহেতু ওকালতি সবচেয়ে সাধু ও সম্মানিত ব্যবসা।

কে পক্ষ কে উকিল কোনো দিকে তাকাল না প্রশান্ত। মুভ করল দরখাস্ত। আইনের পয়েন্টটা একটু বিবৃত করতেই আপিল য়্যাডমিটেড হয়ে গেল। মঞ্জুর হল স্টে। নথি-তলব।

বিশুদ্ধ প্রবক্তার মুখে উচ্চারিত মন্ত্র অলৌকিক কাজ করল—সমস্ত দিন এমনি একটা ঝঙ্কার অনুভব করল প্রশান্ত। টাকার কথাটা মনের কোণেও উঁকি মারল না। না বা দশ টাকার আশায় উজ্জ্বল মধুশ্রীর মুখটা।

শনিবার সকালে চিঠি এল বটকৃষ্ণের :

বুধবার সন্ধেয় তোমার বাড়ি যাবার কথা ছিল কিন্তু হোটেলে ফিরে এসেই টেলিগ্রাম পাই, স্ত্রীর কলেরা। রাত্রের ট্রেনেই রওনা হয়ে চলে এসেছি। অবস্থা এখন ভালোর দিকে, চিন্তার কারণ নেই। শরৎ সমাদ্দারকে বলে এসেছি বৃহস্পতিবারের মধ্যেই যেন তোমার টাকাটা পৌঁছে দেয়। আশা করি আপিল য়্যাডমিটেড করিয়ে নিতে পারবে। তোমার অল্পদিনের প্র্যাকটিস হোক কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস তোমার হাতেই জয়-লক্ষ্মী বাঁধা পড়ে আছে।

প্রশান্ত লিখল :

শরৎ সমাদ্দারের আপিল য়্যাডমিটেড হয়েছে। ডিক্রিজারি বন্ধ আনটিল ফারদার অর্ডারস। লোয়ার কোর্টে চলে গিয়েছে নির্দেশ। আমার ফি এখনো পাইনি। টাকা নিয়ে কেউ আসেনি আমার কাছে। মক্কেলকে বলবেন আমার প্রাপ্য টাকা যেন অবিলম্বে পাঠিয়ে দেয় মনি-অর্ডার করে।

অনেক দিন কোনো উত্তর নেই।

ফার্স্ট—সেকেন্ড রিমাইন্ডার পাঠাল প্রশান্ত।

বটকৃষ্ণ লিখলেন :

'শরৎ সমাদ্দারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সে বললে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে। তোমার পরের চিঠি পেয়ে আবার তাকে ধরলাম, সে আমাকে টাকা পাঠাবার পোস্ট্যাল রিসিট দেখাল—তোমার ওদিকে টাকাটার কোনো গোলমাল হয়নি তো? তোমার অনুপস্থিতিতে তোমার বাড়ির কোনো লোক টাকাটা রাখেনি তো? পরে তোমাকে বলতে হয়তো ভুলে গেল—'

পাল্টা জবাব পাঠাল প্রশান্ত :

'আমার টাকা অন্য লোককে দেবার কোনো অথরিটি নেই পোস্টআপিসে। পোস্ট্যাল রিসিট না দেখিয়ে শরৎবাবুকে য়্যাকনলেজ-মেন্ট রসিদ দেখাতে বলুন। টাকা না পাঠিয়ে মিথ্যার অবতারণার কী হেতু বুঝতে পাচ্ছি না।'

এর উত্তরে বটকৃষ্ণ শরতের উদ্দেশে গালাগালের ফোয়ারা ছোটালেন।

'লোকটা মহা হারামজাদা। য়্যাকনলেজ-মেন্ট দেখানো দূরের কথা, দেখাও দিচ্ছে না। লোক পাঠালে ভাগিয়ে দিচ্ছে। এখন শুনতে পাচ্ছি তীর্থে গিয়েছে। যে লোক এমন শঠ, প্রতারক, পরস্বাপহারী তার তীর্থে কী হবে? তার বিষয়সম্পত্তির ভরাডুবি তো হবেই, সে নিজেও নিপাত যাবে।'

এর পরে আর করবার কী আছে, প্রশান্ত হাল ছেড়ে দিল।

কিন্তু নৌকো তক্ষুনি ডোবে কই?

"দশ টাকা বেশি কেন?"

তা হবে, তোমার কী মাথাব্যথা! যে বিনা পয়সায় এত উপকার করল, এক কথায় আপিল য়্যাডমিট করিয়ে নিল তাকে শেষ সময়ে বর্জন করার অকৃতজ্ঞতা ঈশ্বর কখনোই ক্ষমা করবেন না। হতভাগাকে বিষয়বিষে ধরেছে, ওর ক্যান্সার না হয় তো কী বলেছি!'

খোঁজ নিয়ে জানল আপিলেন্টের পক্ষে আর কারু য়্যাপিয়ারেন্স নেই। যে-কে-সে, প্রশান্তই একমাত্র উকিল।

রেসপণ্ডেন্ট য়্যাপিয়ার করেছে। আর তাদের পক্ষে জাঁদরেল সিনিয়র উকিল অবিনাশ বিশ্বাস।

শরৎ সমাদ্দারের আপিল মান্থলি থেকে ডেইলি লিস্টে উঠেছে।

বটকৃষ্ণকে লিখল প্রশান্ত :

'এবার আপিলের ফাইন্যাল হিয়ারিং হবে। মক্কেলকে বলুন আমার দুবারের ফি পাঠিয়ে দিতে। নইলে আমি য়্যাপিয়ার করব না। আপিল যদি ডিসমিসড ফর ডিফল্ট হয়ে যায়, আমাকে দোষ দিতে পারবেন না।'

"না, তোমার দোষ কী!' লিখলেন বটকৃষ্ণ : 'ঐ হারামজাদা আমাকে ছেড়েছে। শুনছি তোমাকেও। শুনছি ফাইন্যাল হিয়ারিং-এ অন্য উকিল দেবে। তোমাকে যদি না রাখে, তোমার ন্যায্য ফি তোমাকে না দেয়, তুমি দাঁড়াবে কেন? মামলা যা হবার

'আমার ফি নেই, আমি দাঁড়াব কোন সুবাদে? বলে দেব, নো ইনস্ট্রাকশানস।' বললে প্রশান্ত।

'তার আর কী করা?' সায় দিল মুহুরি।

কিন্তু, যাই বলো, ল-পয়েন্টটা ভারি ইনটারেস্টিং। আর্গুমেন্টে আনন্দ আছে। রাত্রে ভালো করে ঘুমুতে পারল না প্রশান্ত। এ-পাশ ও-পাশ করতে লাগল। এ পয়েন্টটা ওকে ছেড়ে দিতে হবে? আপিল এডমি-শানের সময় তো প্রতিপক্ষ আসেনি, এক তরফা ভাসা-ভাসা একটু বলেই প্রাথমিক কাজ হাসিল করেছে। কিন্তু এখন প্রতি-পক্ষ যুদ্ধসাজে সেজে এসেছে, সশস্ত্র হয়ে

ঝিলম নদীর তীর (কাশ্মীর) ফটো : কুমারেশ বিশ্বাস

এসেছে, এখন লড়তেই তো মজা, জিততে পারলে পরম রোমাঞ্চ। সামান্য কটা টাকার জন্যে এ রোমাঞ্চ ও ছেড়ে দেবে?

কিন্তু হতচ্ছাড়া মক্কেল ফি দেবে না, আর আমি বোকার মত আর্গুমেন্ট করব ওকে জেতাবার জন্যে—আমার কি মান-সম্মান বলতে কিছু নেই? আমাকে তো জীবিকার্জন করতে হবে, আর এই তো আমার একমাত্র পথ। আমাকে ঠকাবে, আমাকে শোষণ করবে?

কিন্তু, রোমাঞ্চটা ঠিক একটা কবিতার মত, গানের মত, নিটোল শিল্পসৃষ্টির মত মনে হতে লাগল প্রশান্তর। সে পয়েন্টটার ব্যাখ্যায় বর্ণনায় বিস্তারে বিশ্লেষণে যেন গানেরই সেই আস্থায়ী অন্তরা সঞ্চারী ও আভোগের আস্বাদ। এ কি কখনো ছাড়া যায়? তার উপরে ও পক্ষের ব্যাখ্যা-বর্ণনাকে নিরস্ত করে দেবার স্বপ্নের যে সুখ, বর্ণের যে ঝলক, তা সে আর পাবে কোথায়?

কি না-পাই তো না-পাই, মামলায় দাঁড়িয়ে গেল প্রশান্ত।

প্রাণ ঢেলে আর্গুমেন্ট করল। কে শরৎ সমাদ্দার, কে বা বটকৃষ্ণ ঘোষ, পকেট তার ফাঁকা না বোঝাই, মধুশ্রীর পাতা হাতে দশ টাকা আছে কি নেই, কিছুই তার ভাবনার মধ্যে রইল না, সে গ্রন্থির পর গ্রন্থি উন্মোচন করে মন্ত্রপাঠ করতে লাগল—প্রতিপক্ষ দাঁড়াতে পারল না।

দু-দু কোর্টের হারা মামলা ডিক্রি হয়ে গেল।

একটা আগুন-লাগা গানের মত হয়ে বাড়ি ফিরল প্রশান্ত।

মুহুরি বললে, মামলা জিতেছে, এবার পাঠাতে পারে টাকাটা। আবার একবার লিখুন বটবাবুকে।

না, আর লেখার মানে হয় না। অন্তত এর পরে আর নয়। লিখল না প্রশান্ত।

কত দিন পরে শরৎ সমাদ্দারের চিঠি এল।

বক্তব্য বিশেষ কিছুই নয়, মামলার যে ব্রিফটা প্রশান্তর কাছে ছিল তা যেন সত্বর পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

পত্রপাঠ ব্রিফ পাঠিয়ে দিল প্রশান্ত।

ব্রিফ দেখে শত টুকরো হয়ে ফেটে পড়ল শরৎ। 'আমি টাকা দিই নি? দু-দুবারের টাকা বাড়তি-বাবদ বাড়তি-টাকা, সিনিয়রের টাকা—সমস্ত আমি বটকেষ্টর হাতে দিয়েছি। প্রশান্তবাবুকে না দিয়ে সিনিয়র না রেখে সমস্ত টাকা ও নিজে মেরেছে, আত্মসাৎ করেছে। কী ভয়ংকর কথা! তারপর আবার আমাকেই গালাগাল দিয়েছে। আমি যদি হারামজাদা হই ও কিসের জাদা? আমার তো ক্যান্সার হবে, ওর কী হবে?'

বটকৃষ্ণের কাছে খবর পৌঁছুল।

শুকনো মুখে বললেন, 'জানতাম প্রশান্ত খুব সতর্ক ছেলে, ওকে লেখা আমার চিঠিগুলো মামলার ব্রিফের মধ্যে রেখেছে কেন? আমার চিঠি তো মামলার বিষয়ের সম্পর্কে ইররেলিভ্যান্ট। এত বড় একটা আইনজ্ঞ লোক, আমার চিঠি কেন নথিভুক্ত করে? ও সব তো ওর ব্যক্তিগত ব্যাপার, ও সব তো ওর ছিঁড়েখুঁড়ে নষ্ট করে দেওয়া উচিত ছিল। ওরা ব্রিফের পার্ট হয় কী করে?'

'ব্রিফেরই তো পার্ট'।' বললে আরেক উকিল, 'মামলার থেকেই তো এ চিঠির জন্ম। আর বুদ্ধি করে ব্রিফের সামিল করেছিল বলেই তো চোর ধরা পড়ল।'

শরৎ সমাদ্দার সমস্ত কথা খুলে জানাল প্রশান্তকে। লিখলে, আমি বটার বিরুদ্ধে ফৌজদারি করব, আপনি সাক্ষী হবেন। আমার থেকে নিয়েছে এ আমি বলব আর আপনাকে যে দেয়নি এ আপনি বলবেন।

তাগিদের পর তাগিদ আসতে লাগল, প্রশান্ত রাজি হয় না।

'এ পাপকে শাসন না করলে ঘোরতর অন্যায় হবে সমাজের। মিথ্যাবাদের পিরামিড এ লোকটাকে কিছুতেই ছেড়ে দেওয়া নয়। ক্যান্সার ছেড়ে গ্যাংগ্রিন হলেও নয়। চুরিও করবে আবার গালাগালও দেবে এ অসহ্য। আপনি যদি রাজি না হন—'

প্রশান্ত লিখল : 'আমার এখানে নিত্য কাজ, আমি ভীষণ ব্যস্ত। সাক্ষ্য দেবার সময় নেই, সুবিধেও হবে না।' তারপরে যোগ করল : 'আপনি তো মামলা জিতেছেন। তাই সব কিছুকে জয়ের চোখে আনন্দের চোখে দেখুন—'

শুনে বটকৃষ্ণ হাসতে লাগলেন। বললেন, 'কাকের মাংস যে কাকে খায় না, তা শরৎ সমাদ্দার জানবে কী করে? তা ছাড়া প্রশান্ত এখন উঠতি উকিল, তার অত টাকার খাঁই নেই। আর আমি জানি, আমাকে সে লিখেওছে, সে যে ল-পয়েন্টে আর্গুমেন্ট করে মামলা জিতেছে সে রোমাঞ্চ একটা গানের মত, কবিতার মত। তার কাছে টাকা কী। এ আমি জানতাম বলেই এ মামলা আমি প্রশান্তকে দিয়েছি, সিনিয়র পর্যন্ত রাখি নি। আজ তার কত নাম, কত প্রসার! শরৎ সমাদ্দার, একটা মক্কেল, এ সিক্রেট বোঝে এমন সাধ্য কী! এ একেবারে টপ-সিক্রেট।'

আবার হাসতে লাগলেন বটকৃষ্ণ।

এই যে নতুন
টিনোপাল প্যাক
এটি আপনিই কেবল
খুলতে
পারবেন !
Tinopal
টিনোপাল এখন
রঙিন চমৎকার নতুন প্যাকে
সর্ব্বত্র পাওয়া যাচ্ছে !
পিলফারপ্রুফ সীল
এর নতুন অ্যালুমিনিয়ামের
প্যাক এমনভাবে সীল করা
যে কেবল আপনিই
খুলতে পারবেন···
সামান্য একটু টিনোপাল
ব্যবহার করলে সাদা
জামাকাপড় সবচেয়ে
বেশী সাদা হ'য়ে ওঠে।
টিনোপাল এদের রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক
জে. আর. গায়গী. এস. এ. বাল, সুইজারল্যাণ্ড
ভারতে প্রস্তুতকারক: সুহৃদ গায়গী লিমিটেড, ওয়াডী ওয়াডী, বরোদা
বিক্রয় কার্য্যালয়: এক্সপ্রেস্ বিল্ডিং, চার্চগেট, বোম্বে-১—বি.আর.

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

আমার কাহিনীর শুরু হবে অর্ধ-শতাব্দীর কয়েক বছর আগে—উনবিংশ শতকের শেষভাগে। একটি ঘটনা তখন ঘটেছিল আমাদের অজ্ঞাতসারে যা বাঙলা সাহিত্যের প্রচারের ইতিহাসের একটা স্মরণীয় ঘটনা।

বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন তখনকার বাংলা সাহিত্যের অবিসম্বাদী সম্রাট। তিনি তার কিছুকাল আগেই গত হ'য়েছে। তারপরও বাংলা সাহিত্যে কাব্য ও উপন্যাস বেশ কতকগুলি বই লেখা ও প্রকাশিত হয়েছিল বটে, কিন্তু তাদের প্রচার ছিল সামান্য। তখনকার অনেক জনপ্রিয় লেখকের নামও হয়তো আজকাল কেউ জানেন কিনা সন্দেহ। যথা দামোদর মুখোপাধ্যায় যিনি লিখেছিলেন দুর্গেশনন্দিনী ও কপালকুণ্ডলার দু'খানি পরিশিষ্ট, যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় যিনি অনেকগুলি ছোট ছোট উপন্যাস লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের দিদি স্বর্ণকুমারী লিখেছিলেন কতকগুলি উপন্যাস যেমন দীপনির্বাণ, হুগলীর ইমাম বাড়ী, স্নেহলতা প্রভৃতি। তাছাড়া তিনি ভারতীর সম্পাদিকাও ছিলেন। তাঁর রচিত উপন্যাসগুলির সৌষ্ঠব ছিল, তবে সেগুলির প্রচার খুব বেশী ছিল না।

রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি এবং সমাজ ও সংসার দু'টি পারিবারিক উপন্যাস লিখেছিলেন, তবে এগুলি দলছাড়া হ'লেও প্রচারের দিক থেকে খুব বেশী ভিন্ন ছিল না। তাছাড়া সংখ্যার দিক থেকেও এই বইগুলি খুব বেশী ছিল না। সেকালে যে কয়েকটি পাবলিক লাইব্রেরী ছিল তার মধ্যে এসব বই ছিল বড়জোর দুইটি ছোট আলমারী ভরত কিনা সন্দেহ। রবীন্দ্রনাথ তখন আসরে নেমেছেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে তিনি এক সভায় মাল্যদানেও সম্বর্ধিত হ'য়েছেন। কিন্তু তাঁর প্রতিষ্ঠা তখনও গানে। তাঁর কতকগুলি গান ব্রাহ্মসমাজ গ্রহণ করেছিল। আর তাঁর প্রেমের গান বেশীর ভাগই যুবকদের কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হতো। কবিতার বই কয়েকখানি ছাপা হ'য়েছিল। কিন্তু তার প্রচার খুব বেশী ছিল না। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে তাঁর কয়েকটি ছোটগল্প প্রকাশিত হ'য়েছিল এবং তার আদরও হ'চ্ছিল, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের বিরাট বটবৃক্ষের ছায়ায় সেসব বেশী প্রসার পায় নি।

আমি যখন এম-এ ক্লাশে পড়ি (১৯০১—২ সালে) তখন আমার সহপাঠীর মধ্যে ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের দৌহিত্র পুরেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে আমাদের খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। ক্লাশে অল্পসংখ্যক সহপাঠীর মধ্যে এবং ক্লাশের বাহিরেও প্রধানতঃ পুরেন্দুর বাড়ীতে, যেখানে শেষজীবনে বঙ্কিমবাবুর বাসস্থান ছিল, আমাদের অনেক বৈঠক বসত।

এই সময়ে একদিন পুরেন্দুর মুখে একটা খবর শুনলাম। পুরেন্দুরা তখন বঙ্কিমচন্দ্রের বইয়ের কপিরাইটের মালিক ছিলেন। বসুমতী কাগজের প্রতিষ্ঠাতা ও মালিক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁদের কাছে বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত বইয়ের কপিরাইট কিনে নেবার প্রস্তাব ক'রেছেন, সব বই একসঙ্গে গ্রন্থাবলী আকারে ছেপে সস্তায় বিক্রি করবার জন্য। শুনলাম যে, সব বইয়ের কপিরাইটের দাম দেবেন তাঁরা পাঁচ হাজার টাকা। পুরেন্দুরা সেই প্রস্তাব বিবেচনা ক'রছেন। শুনে আমি চমকে উঠলাম—মাত্র পাঁচ হাজার টাকায় বঙ্কিমচন্দ্রের সব বই নিয়ে নেবে! আমি অত্যন্ত আপত্তি করে পুরেন্দুকে এ প্রস্তাব গ্রহণ করতে বারণ করলাম। উত্তরে পুরেন্দু যা বললে তা শুনে আরেক দফা মাথা ঘুরে গেল। সে বলল যে, এখন আর বইয়ের কোনো বিক্রী নেই। বঙ্কিমবাবুর সমস্ত বই বিক্রী করে বছরে যে আয় হয় সে সম্বন্ধে, ঠিক সংখ্যাটা আমার মনে নেই, তবে যে সংখ্যা দিলে পুরেন্দু সে অতিশয় তুচ্ছ। আমি মাথায় হাত দিয়ে বসলাম। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরেই এই অবস্থা যদি হয়ে থাকে তবে বাংলা সাহিত্যে নতুন বই লেখায় বিশেষ উৎসাহ হবার কথা নয়। তখন মনে পড়ল ইংল্যাণ্ডের গোল্ডস্মিথ প্রভৃতি লেখকের বইগুলির যৎসামান্য মূল্য দিয়েছিল তৎকালীন প্রকাশকেরা।

যাই হোক, এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত হল এবং কিছুদিন পরেই বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হল। আমার কথা, প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে বিক্রীও হল বসুমতী অফিস থেকে।

গ্রন্থাবলী প্রকাশের এই চেষ্টা উপেন্দ্রনাথের পক্ষে এই প্রথম নয়। যখন প্রথম বসুমতী সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন উপেন্দ্রবাবু, সে সময়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন যে, প্রথম বৎসরে মাত্র ডাকমাশুলের পয়সা দিলেই গ্রাহকগণ সমস্ত বছরের বসুমতী

পাবেন। তার ওপর পাবেন কতকগুলি উপহার। যে সব বই উপহার দেয়া হয়েছিল তার মধ্যে কতকগুলো বাজে নাটক, যথা অতুল গ্রন্থাবলী প্রভৃতি ছিল। কিন্তু একখানি বই আমার কাছে খুব মূল্যবান বোধ হয়েছিল। সেটি প্রাচীন কবির গ্রন্থাবলী। তাতে বিদ্যাপতি থেকে আরম্ভ করে ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদ প্রভৃতি পর্যন্ত সব কবির লেখা ছিল।

আমি তখন এণ্ট্রান্স স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে (অর্থাৎ ম্যাট্রিকের ক্লাস টেনে) পড়ি। মাত্র ছয় আনার ডাকটিকিট পাঠিয়ে দিয়ে আমি এক বৎসরের জন্য বসুমতীর গ্রাহক হয়ে পড়লাম এবং এই সব উপহার পেলাম। প্রাচীন কবির কাব্যের সঙ্গে তাঁদের এই গ্রন্থাবলী দিয়েই আমার প্রথম পরিচয় হল। তাতে আমি অত্যন্ত উপকৃত হলাম। উপেন্দ্রবাবু তার পূর্বে কোনো সংবাদপত্র প্রকাশের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন না। আমার যতদূর মনে হয় তখন তাঁর কারবার ছিল কাগজ বিক্রী এবং কতক বই বিক্রী। তাঁর বসুমতী প্রকাশের উদ্যোগ সেই কারবারেরই আঙ্গিকস্বরূপ ছিল।

তখন বাংলা ভাষায় কোনো দৈনিক কাগজ ছিল না। এর আগে 'দৈনিক' নামে একখানা কাগজ বেরিয়েছিল। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে সেই কাগজ ছিল না। বসুমতীর প্রকাশের সময়ে যে বাংলা কাগজ চলতি ছিল তার মধ্যে প্রধান ছিল 'বঙ্গবাসী', 'সঞ্জীবনী' ও 'হিতবাদী'। আরো কয়েকখানি কাগজ কিছুকাল আগে কিংবা সেই সময়ে চলছিল যথা 'বঙ্গ নিবাসী', 'সময়', ইত্যাদি। এর মধ্যে বঙ্গবাসী ছিল বোধ হয় সবচেয়ে পুরোনো এবং সেকালের হিসেবে বহুল প্রচারিত। বলাবাহুল্য 'বঙ্গবাসী'ও সাপ্তাহিক ছিল। বসুমতী বের হওয়ার আগে আমি স্কুলের খুব নীচু ক্লাসে পড়ি তখন বঙ্গবাসীতে আগ্রহ সহকারে পড়েছিলাম, মণিপুর রাজ্যের বিরুদ্ধে ভারত গভর্ণমেণ্টের অভিযানের বিবরণ। আমার যতদূর মনে হয় সে অভিযানের যে বিবরণ বঙ্গবাসীতে বেরোত, তাতে মণিপুরের রাজা টিকেন্দ্রজিৎ-এর পক্ষ বিশেষ সমর্থিত হত। এর কয়েক বৎসর পরে বঙ্গবাসীতে একটি প্রবন্ধ বের হয়েছিল, আমার মনে হয়, তার নাম ছিল 'ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা'। সে প্রবন্ধ ঠাট্টা-তামাশা করে লেখা হয়েছিল। কিন্তু তাতেই তখনকার গভর্ণমেন্ট বিচলিত হয়ে বঙ্গবাসীর বিরুদ্ধে সিডিশনের অভিযোগ আনেন। পিনাল কোডের যে ধারায় সেই অভিযোগ আনা হয়, ১২৪ (ক) ধারা, সেটা এর কিছুদিন পূর্বে প্রবর্তিত হয়েছিল এবং বঙ্গবাসীর মোকর্দমা বোধ হয় সেই ধারায় সর্বপ্রথম অভিযোগ ও বিচার। সে মোকর্দমায় বঙ্গবাসীর পক্ষে নিযুক্ত হয়েছিলেন প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার জ্যাকসন-সাহেব। সেই মোকর্দমাটি বোধহয় সম্পাদকের পক্ষে ক্ষমাপ্রার্থনা করায় শেষ পর্যন্ত উঠে যায়। তার পরে এই ধারায় মোকর্দমা হয় বোম্বাইয়ের বালগঙ্গাধর তিলকের নামে এবং সেই মোকর্দমায় তিলকের সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হওয়ার পর তার প্রচার ক্রমে যথেষ্টই বেড়ে যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত বই আলাদা কিনতে লাগত আঠারো-উনিশ টাকা। সেই সমস্ত বই বসুমতীর সংস্করণে বিক্রী হতে লাগল ছয় টাকায়। বঙ্কিমচন্দ্রের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি যতই থাকুক, আঠারো-উনিশ টাকা দিয়ে সমস্ত বই কিনে পড়বার মত আগ্রহশীল পাঠক সে সময়ে বেশী ছিল না। পক্ষান্তরে এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ হওয়ার পর অল্পখরচে সেই সমস্ত বই পড়বার আগ্রহে দলে দলে খরিদ্দার এসে পড়ল। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী পথ-প্রদর্শন করল এবং এর পর অন্যান্য গ্রন্থকারের গ্রন্থাবলী প্রকাশ করে স্থাপিত হল বসুমতী সাহিত্য মন্দির।

এই সময়ের কাছাকাছি, কিছু আগে পরে, হিতবাদীর প্রকাশিত হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী এবং তারপর রবীন্দ্রনাথের গদ্য গ্রন্থাবলীরও প্রচার ভালই হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-রচনা ও তার প্রকাশ হচ্ছিল ক্রমে ক্রমে। আমি যখন ১৮৯৭ সালে কলেজে পড়তে আসি, তখন তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'কড়ি ও কোমল', 'মানসী' ও 'সোনার তরী' পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল। তাছাড়া কয়েকখানি নাটক, যেমন 'রাজা ও রাণী', 'বিসর্জন', 'মায়ার খেলা' ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছিল সেই সময়। অনেকগুলি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত ছোটগল্পের সংখ্যাও কম ছিল না। তখন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের রচনা যা প্রকাশিত হয়েছিল তাতে বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। যুবকেরা এবং সম্ভবতঃ যুবতীরাও এসব রচনা আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করতেন। একবার এক সভায় বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে বালক রবীন্দ্রনাথ যে সম্মান পেয়েছিলেন তার কথা রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে লিখে গেছেন।

পূর্বেই বলেছি যে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সমাদর হয় তাঁর গানে। তাঁর গান যুবকদের কণ্ঠে কণ্ঠে বহুদূর প্রচার হয়ে গিয়েছিল। সে সময় পর্যন্ত রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী যে কবিতা ও কাব্যগ্রন্থ সবচেয়ে বেশী সমাদৃত ছিল সে হল হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের কাব্য। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গান হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রে প্রচলিত ধারা থেকে এত বিভিন্ন ভাবে পৃথক যে তাতে পাঠকের মনে একটা সাড়া না দিয়ে পারে না। সে সাড়াটা যে সম্পূর্ণ অনুকূল ছিল তা নয়। তাঁর অনেক সমালোচনা হত, গালাগালিও কম হয় নি। আর তাঁর একখানি বই কড়ি ও কোমল নিয়ে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ব্যঙ্গ করে একখানি ছোট বইও লিখে ফেলেছিলেন, তার নাম 'মিঠে কড়া'। 'রাহু' ছদ্মনামে লিখিত হয়েছিল বইটি। গান বাজনা কিংবা কবিতাপাঠের জন্যে লোকেরা বিশেষতঃ যুবকেরা সমবেত হলে,

প্রায় কথা উঠত, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ-এর মধ্যে কে বড় কবি। এ নিয়ে তর্কও হত বিস্তর। তার মধ্যে আমার এক সমপাঠী বন্ধু অভিনব পন্থা আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর বাড়ি ছিল কলেজ স্ট্রীটের ওপরে। তিনি তাঁর বন্ধুদের সংগে তর্ক করে ঠিক করলেন যে, তাঁর বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে পথচারীদের এক এক করে ডেকে জিজ্ঞেস করবেন, কে বড়—হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র না রবীন্দ্রনাথ। এই উপায়ে পথচারীদের মত গ্রহণ করে তবে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। এটা হাসির কথা হলেও এক হিসেবে একে আধুনিক সাংবাদিকদের গ্যালপ পোলের অগ্রবর্তী বলে বিবেচনা করা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের গান কিন্তু সকল বিরুদ্ধমত অগ্রাহ্য করে বিশেষ করে যুবক-যুবতীদের কণ্ঠে খুব চলতি হয়েছিল। এক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ তখনি অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলেন। এখনকার চলতি গান ধ্রুপদ এবং ধামার ইত্যাদি থেকে তখন সবচেয়ে নতুন নিধুবাবুর টপ্পা পর্যন্ত যা সব বৈঠকে গীত হত সেগুলির সুর ও তাল শাস্ত্রীয় মতে বিশুদ্ধ করবার চেষ্টা হত। রবীন্দ্রনাথের গান তখন যা বেরিয়েছিল তার মধ্যে ধ্রুপদাঙ্গ গান বিশেষ করে ব্রাহ্মসমাজে গীত হত। তা ছাড়া বেশীর ভাগ গান সুরে তালে অর্থভক্তি মানত না। কিন্তু তার মাধুর্য ছিল অসাধারণ। তাই প্রবীণ সুরজ্ঞদের অসন্তুষ্টি অগ্রাহ্য করে, ভাবের ঝোঁকে নিত্যনতুন সুরে ও তালে প্রচারিত হচ্ছিল সে সব গান। এতে যাঁরা সুরজ্ঞ বলে স্পর্ধা করতেন তাঁরা যে সে সময়ে নাসিকাকুঞ্চন করবেন, এ কিছু বিচিত্র নয়। আমার যে বালক-বন্ধুটি অভিনব পন্থায় গ্যালপ পোল করে কবিদের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ করতে চেয়েছিলেন, তিনি তখনই তবলা-বাদনে ওস্তাদ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর কাছে গানের তালটাই ছিল প্রধান জিনিস। তিনি রবীন্দ্রনাথের গানের বিচার করতেন ওস্তাদি মাপকাঠিতে, সুর-তালের বিশুদ্ধতা দিয়ে। যাঁরা সেকালে সংগীতের চর্চা করতেন তাঁরাও ছিলেন এই দলে। কাজেই তাদের কাছে রবীন্দ্রনাথের নাম প্রতিষ্ঠা পায় নি। প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল যুবক-যুবতীদের কণ্ঠে। তাদের কোনো অনুষ্ঠানে গানের আয়োজন হলেই বেশীর ভাগ স্থলে রবীন্দ্র-সংগীত গাওয়া হত। তাঁর কবিতার সমাদরও সেই মাপে হয়েছিল। তাঁর কাব্যের ছন্দ, তখন পর্যন্ত প্রচলিত গাঁট বাঁধা ছন্দ ও মাত্রার নিয়ম পদে পদে লঙ্ঘন করে স্বচ্ছন্দ-বিচরণ করত। সেটা প্রাজ্ঞেরা পছন্দ করতেন না। কিন্তু সেই ছন্দের সাবলীলতা মুগ্ধ করেছিল বহুতর পাঠককে। রবীন্দ্রনাথ কি ছন্দে, কি গানে সুর, তাল ও ছন্দ সৃষ্টি করতে এসেছেন। কোনো শাস্ত্র বা বাঁধা নিয়মের দাস তিনি ছিলেন না। তাই তাঁর 'বরজলালে'র দল চলতি সুর-তাল ও ছন্দের মাপকাঠিতে তাঁর কাব্যের বিচার করতে গিয়ে তাঁর কাব্য-প্রতিভার রসগ্রহণ করতে অক্ষম ছিল। আর সেইজন্যেই নিন্দা ও বিরুদ্ধ সমালোচনার জংগলের ভিতর দিয়ে তাঁকে পথ তৈরি করে অগ্রসর হতে হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতার লৌকিক সমাদর মুখে মুখে যতই হোক, তাঁর বইয়ের বিক্রী কিন্তু সে অনুপাতে প্রায় কিছুই হত না।

রবীন্দ্রনাথের তখনকার লেখা কবিতার বই বোধহয় সবগুলি তাঁদের পরিবারের নিজস্ব ব্রাহ্ম-মিশন প্রেসে ছাপা হোত এবং তখনকার মুষ্টিমেয় বইয়ের দোকানে দু-চারখানা বিক্রী হ'ত। তবে তা বেশী নয়, কেননা তখনকার দিনের লোকের বই কিনে পড়বার মানসিকতা বলতে গেলে ছিলই না। তাই রবীন্দ্রনাথের প্রচার-সৌভাগ্য তখন কমই ছিল। তাঁর কোনো কবিতার বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ তখন হয়েছে বলে আমার স্মরণ হয় না। গল্পের বই তাঁর তখনই কয়েকখানি বেরিয়েছিল, কিন্তু তাও বেশী বিক্রী হয়নি। তাঁর গদ্যগ্রন্থ সমস্ত একসংগে করে ছেপেছিল হিতবাদী অফিস থেকে। সে বইয়ের প্রচার অপেক্ষাকৃত বেশী হয়েছিল, ঠিক যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের বইয়ের বেশী প্রচার হয়েছিল বসুমতী গ্রন্থাবলী প্রকাশের পর।

এইরকমই সস্তা সংগ্রহ-পুস্তক লভ্য হওয়ার ফলে বাংলা সাহিত্যের বই অত্যন্ত মন্থর-গমনে বেশী প্রচার হতে লাগল।

এরপরে ক্রমে বাঙালী পাঠকের বই পড়বার আগ্রহ বেড়ে যেতে লাগল ধীরে ধীরে।

বাংলা সাহিত্যের এই অগ্রগতিতে সাময়িক সাহিত্যের কিছু হাত ছিল, বসুমতী ও হিতবাদীর বই-প্রচারে হাত দেওয়ার অনেক আগে থেকেই বঙ্গবাসী এবং তার সংশ্লিষ্ট 'জন্মভূমি' পত্রিকার দ্বারা অনেকগুলি বাংলা বই প্রচারিত হয়েছিল। বঙ্গবাসীর উদ্যোগে পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের সম্পাদনায় বহু শাস্ত্র-গ্রন্থের অনুবাদ ও মূল প্রকাশিত হয়েছিল। এক সময় কেবলমাত্র এই বঙ্গবাসী সংস্করণেই বাংলাদেশে সে-সব বই পাওয়া যেত। এরপরে আরো নতুন নতুন মাসিক সাহিত্য প্রকাশিত হতে লাগল। সুরেশ সমাজপতি-সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকা পূর্ব-প্রচারিত পত্রিকাগুলির চেয়ে অনেক বিষয়েই শ্রেষ্ঠ ছিল। তাতে লিখতেন যাঁরা তার মধ্যে ছিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত, উমেশচন্দ্র বটব্যাল, জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতি। উমেশচন্দ্র বটব্যাল বাংলায় বৈদিক গবেষণার পথিকৃৎ ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' বোধহয় মাসিক সাহিত্যের সর্বপ্রথম উচ্চাংগ পত্রিকা। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন ছেড়ে দেওয়ার পর বের হয়েছিল তাঁর জামাই রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রচার' পত্রিকা। যে-কদিন রাখালচন্দ্র চালক ছিলেন তখন 'প্রচারে' বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক লেখা বের হ'ত। কিন্তু সে-কাগজ উঠে যাওয়ার পর সাহিত্য
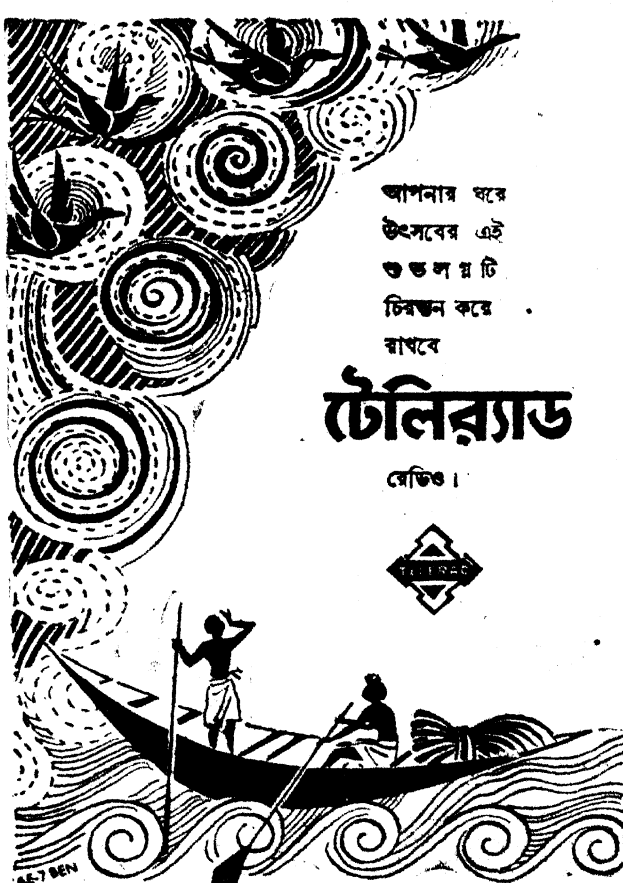
পত্রিকার মত আর কোন কাগজ ছিল না। এরপরে সুরেশ সমাজপতির 'সাহিত্য' ও ঢাকা থেকে প্রকাশিত কালীপ্রসন্ন ঘোষ-সম্পাদিত 'বান্ধব', বঙ্গবাসী অফিস থেকে প্রচারিত 'জন্মভূমি' কতকটা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। কিন্তু বাংলা মাসিক সাহিত্যে নতুন পথ দেখালেন এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রথমে সম্পাদনা করতেন দাসাশ্রমের মুখপত্র 'দাসী'। আমার সঙ্গে 'দাসী'র সংযোগ হয়েছিল যখন আমি স্কুলে পড়ি। সেই সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনের 'আবাসিক' ব্রাহ্মপ্রচারক ছিলেন অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়। তখন সাহিত্য পত্রিকায় উমেশচন্দ্র বটব্যাল একটি প্রবন্ধ লেখেন, 'রামমোহন রায় ও রামজয় বটব্যাল'। তাতে রামজয় বটব্যালের সঙ্গে রামমোহন রায়ের এক মামলার ফয়সালা বের হয়। সেই প্রবন্ধে বেশ স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল যে রামমোহন রায় রামজয় বটব্যালের নামে এক মামলা করে বটব্যালকে বিব্রত করেন। এই প্রবন্ধে রামমোহন রায়ের উপর দোষ চাপিয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছিল যে, রামমোহন রায় ধর্ম-প্রবর্তক হিসেবে ধার্মিক ছিলেন না, ছিলেন সাধারণ মামলাবাজ একটি জমিদার। 'দাসী' পত্রিকায় 'সাহিত্যে'র এই প্রবন্ধের একটি উত্তর প্রকাশ করেন অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়। আগেই বলেছি, আমি তখন স্কুলের ছাত্র। এই দুটি প্রবন্ধ পড়ে আমি একটা প্রত্যুত্তর লিখি, এর আগেও আমি শৈশব কাল থেকেই অনেক লেখা লিখে ছাপাবার জন্য সম্পাদকদের কাছে পাঠিয়ে দিতাম। বলাবাহুল্য সে সব লেখা কোনো সম্পাদকই প্রকাশযোগ্য মনে করেন নি। আমি যখন মুঙ্গেরে ফার্স্টক্লাসে পড়ি তখন ঐ প্রবন্ধটি 'দাসী'তে ছাপা হয়। আমার এই প্রবন্ধ হঠাৎ 'দাসী'তে প্রকাশিত হল দেখে সেই শহরে বেশ একটু আলোড়ন হয়েছিল। সেই প্রবন্ধে আমি এ-কথাই প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছিলাম যে উমেশচন্দ্র বটব্যাল যে ফয়সালা লক্ষ্য করে রামমোহন রায়ের চরিত্রের উপর একটু কালিমা লেপন করবার চেষ্টা করেছেন তা ঠিক হয়নি, পক্ষান্তরে অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ফয়সালার সত্যতা সম্পর্কে যে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন তাও ঠিক নয়। সম্পাদক মহাশয়, আমি যে একজন আইনজ্ঞ বা পণ্ডিত লোক নই, মাত্র তেরো বছরের ছেলে এ সন্দেহ করেন নি। অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে উত্তর লিখেছিলেন তাতে তিনি ধরেছিলেন হয় আমি উকিল নয়তো পণ্ডিত। আমার উপর শ্লেষ বর্ষণ করতে ত্রুটি করেন নি। সেই আমার প্রথম প্রকাশিত রচনা। এ-রকম ভাবে প্রকাশিত হওয়ায় আমি বেশ একটু গর্ব অনুভব করেছিলাম।

'দাসী' উঠে যাওয়ার কিছুদিন পরে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আবার আবির্ভূত হলেন 'প্রদীপ' নামে একটি পত্রিকার সম্পাদকরূপে, রামানন্দবাবু তখন কিংবা তার কিছুকাল পরে এলাহাবাদে অধ্যাপক হয়ে যান। 'প্রদীপ' তারপর কিছুকাল চলে বৈকুণ্ঠনাথ দাসের সম্পাদনায় কলকাতা থেকে। এই সময় এলাহাবাদ থেকেই রামানন্দবাবু 'প্রবাসী' নামে এক মাসিকপত্র বের করেন। মাসিক সাহিত্যে 'প্রদীপ' ও 'প্রবাসী' সম্পূর্ণ নতুন। রামানন্দবাবু এই উন্নততর ধারার প্রবর্তন করেন ও বিশেষ প্রতিষ্ঠাও অর্জন করেন। পরে এই প্রবাসী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' ক্রমশ প্রকাশিত হওয়ায় তার প্রতিষ্ঠা ও প্রচার অনেক বেড়ে গিয়েছিল।

প্রবাসী প্রকাশের আগে আর একখানি কাগজ বের হয়েছিল, বঙ্গদর্শন নব-পর্যায়। প্রকাশক ছিলেন শৈলেশচন্দ্র মজুমদার-পরিচালিত মজুমদার লাইব্রেরী। শৈলেশবাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বন্ধু এবং তাঁকে লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথের কবিতা 'মানসী'তে আছে। তিনি ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং তাঁর সাহিত্য রচনার দিকেও ঝোঁক ছিল। রবীন্দ্রনাথের সহযোগে তিনি বৈষ্ণব কবিতা নিয়ে একখানা কাব্যগ্রন্থ লিখেছিলেন। শৈলেশচন্দ্র দু-একখানা গল্পের বই লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এঁদের পরিবারের খুবই হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিল। তাঁদের এই উদ্যমে রবীন্দ্রনাথ শুধু উৎসাহই দেন নি, তাঁর সহযোগিতাও দিয়েছিলেন। নব-পর্যায়

জমিকে চল্ — ফটো : রামকিঙ্কর সিংহ

বঙ্গদর্শনে প্রধান আকর্ষণ হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের এই সহযোগ। তিনি হলেন এই মাসিকের সম্পাদক এবং এতে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর নতুন লেখা উপন্যাস 'চোখের বালি' আর 'নৌকাডুবি'। এ-দুখানি বই রবীন্দ্র-রচনায় একটি নতুন ধারার প্রবর্তক। চোখের বালি এবং নৌকাডুবি বাঙালী পাঠককে বেশ চমক দিয়েছিল এবং ঔপন্যাসিক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের এই নতুন আবির্ভাব তখনকার পাঠকদের বেশ উদ্বুদ্ধ করেছিল। বিশেষ করে যুবকদের। বলাবাহুল্য রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য বইয়ের মতন এ-বইয়েরও বিরুদ্ধ সমালোচনা ছিল। নারীচরিত্রের যে নতুন পরিচয় এই বই দুটিতে পাওয়া গেল, তা নিয়ে বেশ কিছু বিরূপ সমালোচনা হল। নীতি-বিরুদ্ধতা নিয়ে একাধিক কঠোর মন্তব্য প্রকাশিত হল। তখনও আমি ছাত্র-পর্যায়েই ছিলাম। আমাদের সহপাঠী ও বন্ধুদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের এই নতুন সৃষ্টি নিয়ে প্রায়ই আলোচনা হ'ত। বিরুদ্ধ আলোচনা কিছু ছিল বটে, কিন্তু এ-বই দুটি তখনকার যুবকদের খুব প্রশংসাভাজন হয়েছিল।

নব বঙ্গদর্শনের সংগে আমার একটু সংযোগ ছিল। শৈলেশবাবুর অনুরোধে আমি সে কাগজের জন্য একটি গল্প লিখেছিলাম। 'মুগ্ধা' নাম দিয়ে গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল। সেইটেই ছিল আমার প্রথম প্রকাশিত গল্প। নব বঙ্গদর্শন বন্ধ হয়ে গেলে রবীন্দ্রনাথের লেখায়ও কিছু ছেদ পড়ল। তাঁর এর পরের বই হ'ল 'গোরা'। সে-কথা আগেই বলেছি।

প্রবাসী ইতিমধ্যে কলকাতায় নিয়ে এসেছিলেন রামানন্দবাবু। এক বৎসর ধারাবাহিকভাবে চলে, বৎসরের শেষেও গোরা সম্পূর্ণ না হওয়ায় এর অবশিষ্ট অংশ পরবর্তী বৎসরে ধারাবাহিকভাবে চলতে লাগল। প্রবাসী পত্রিকার পর বৎসরের সংখ্যার সংগে গোরার পূর্বমুদ্রিত অংশ একটা পুস্তকাকারে ছাপিয়ে গ্রাহকদের কাছে বিক্রী করা হল। তখন প্রবাসীর আফিস ছিল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পাশে ছোট একটি ঘরে। পুনর্মুদ্রিত গোরার সংগে পরবৎসরের প্রবাসী পাওয়ার জন্য গ্রাহকেরা যে ভিড় করে সেই ঘরে যেতেন সে কথা আমার খুব স্পষ্ট করে মনে আছে। আমিও ছিলাম সেই ভিড়ের মধ্যে একজন। এর পূর্বে কোনো বই সংগ্রহ করবার জন্য এত লোকের ভিড় বোধহয় কখনো হয়নি।

এই সময় থেকে রবীন্দ্রনাথ বেশ নিয়মিতভাবে তাঁর অন্য রচনাও লিখে যেতে লাগলেন এবং তাঁর রচনায় প্রবাসীর পরবর্তী লোকপ্রিয়তার মাত্রা অনেক পরিমাণে বেড়ে গেল।

প্রবাসী আরো অন্য একটা বৈচিত্র্য এনেছিল—তা উচ্চস্তরের প্রবন্ধাদি এবং চিত্রাবলী। তার আগে কোন কাগজ এতগুলি ভালো ছবি নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে নি। সেরকম ছবি প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল না। আগে বাংলা বইয়ে যে-সমস্ত ছবি ছাপা হোত, তার সৌন্দর্য কিছুই ছিল না। আগে ছবি ছাপবার একমাত্র উপায় ছিল Wood Block, কাঠ-খোদাই করে। আর সে কাঠ-খোদাইও বিশেষ সুন্দর হ'ত না। সেকালের মুদ্রিত 'রামায়ণ-মহাভারত' কিংবা পাঠ্য-পুস্তকে যে-সব ছবি ছাপা হত তার বেশীর ভাগই ছিল অত্যন্ত কদর্য। রঙীন ছবি কেবলমাত্র 'লিথোগ্রাফ' করে ছাপা হত। সেই প্রণালীতে ঠাকুর-দেবতা বা পৌরাণিক কাহিনীর ছবি Arts Studio তৈরী করতেন। বাংলাদেশে তা' ছাড়া অন্য কোনো ভালো রঙীন ছবি হ'ত না। প্রবাসীর জন্মের কয়েক বৎসর আগেও উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রথম বাংলাদেশে 'হাফটোন' ছবি বের করেন। ক্রমে তিন বা তার চেয়ে বেশী রঙয়ে হাফটোন ছবি তৈরী হতে লাগল। প্রবাসী কাগজে প্রথম উপেন্দ্রকিশোর রায়ের রঙীন হাফটোন ছবি প্রকাশিত হতে আরম্ভ করল এবং এই চেষ্টায় 'প্রবাসী' প্রচুর সফলতা অর্জন করল। অজন্তা ইত্যাদি স্থানের প্রাচীন রঙীন ছবি, যা এখনো পৃথিবীর বিস্ময়, তার সংগে বাঙালী পাঠক পরিচিত হলেন প্রথম প্রবাসীর মাধ্যমে। ক্রমেই অন্যান্য উৎকৃষ্ট চিত্রের প্রতিলিপি প্রকাশিত হওয়ার ফলে ভারতের এবং অন্যান্য দেশের শ্রেষ্ঠ চিত্র-সম্পদের সংগেও বাঙালী পাঠকের পরিচয় হল।

এর আগেও বাংলায় এবং ভারতে রঙীন ছাপানো ছবি বিক্রী হ'ত। সেগুলি প্রায় সবই বিলেতী, ফরাসী দেশের ওলিওগ্রাফই প্রধানতঃ। বাঙালী ও ভারতীয় সকলেই সেইগুলি দিয়ে নিজেদের চিত্র-তৃষ্ণা পরিতৃপ্ত করত। ভারতীয় প্রাচীন চিত্রে যে বিশেষ সৌন্দর্য আছে সে-সম্বন্ধে তখনো এ-দেশে বিশেষ জ্ঞান হয়নি। তাই এর কিছুদিন পরেও লর্ড কার্জন যিনি ভারতীয় আর্ট সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন—তিনি আক্ষেপ করে বলেন যে, তিনি অনেক রাজা-রাজড়ার বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়ে দেখেছেন যে তাঁদের বাড়ীতে গৃহসজ্জার মধ্যে ভারতীয় আর্টের কোন নিদর্শন নেই। তিনি দেখেছিলেন Flaming brussels, French-made oliograph এবং Tanghtenhum court road furniture। দেশীয় লোকের ভারতীয় আর্ট-এর প্রতি এই ঔদাসীন্য ও বিদেশী নিকৃষ্ট আর্টের প্রতি আদর তিনি তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছিলেন। বাংলাদেশে কিংবা কলকাতাতেও ভালো আর্টের পরিচায়ক চিত্রাবলীর যে একান্ত অভাব ছিল তা' নয়, কলকাতায় ছিল Indian Arts School-এর সংপৃক্ত একটা Art গ্যালারী। তাতে ছিল ইটালী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পগুরুদের আঁকা ছবি। তা'ছাড়া কলকাতার বড় বড় লোকদের বাড়ীতেও ছিল কতকটা এমনি ইউরোপীয় আর্টিস্টদের আঁকা ছবি। কিন্তু কোথাও ভারতীয় কিংবা পূর্বদেশীয় আর্টিস্টদের শ্রেষ্ঠ আর্টের কোনো নমুনা ছিল না।

এই সময় হ্যাভেল ছিলেন আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ। আমরা একদিন খবরের

কাগজে দেখলাম যে আর্ট গ্যালারীতে ইউরোপীয় শ্রেষ্ঠ আর্টিস্টদের যেসব ছবির নমুনা ছিল সেগুলি অধ্যক্ষের আদেশে সেখান থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এই নিয়ে খবরের কাগজে গালাগাল দেওয়া হয়েছিল। আমরা বাইরে থেকে আমাদের প্রচুর অজ্ঞতা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে এই কার্যের নিন্দা করলাম। আমাদের প্রথম চোখ খুলল রবীন্দ্রনাথের এক প্রবন্ধে। তাতে ভারতীয় চিত্রকলার উৎকর্ষ এবং তার সঙ্গে আমাদের দারুণ অপরিচয় নিয়ে তিনি আক্ষেপ করেছিলেন। আর সেই সঙ্গে তিনি ভারতীয় চিত্রকলার নিদর্শন আর্ট গ্যালারীতে টাঙাবার জন্য বিদেশী চিত্রগুলি সরিয়ে ফেলার প্রশংসাও করেছিলেন।

এই সময় থেকে ভারতীয় চিত্রকলার প্রসার ও প্রশংসা ক্রমশ বেড়ে গেল। একদিকে হ্যাভেল-সাহেবের ভারতীয় চিত্রকলার প্রতি তীব্র অনুরাগ, অন্যদিকে লর্ড কার্জনের ভারতীয় চিত্রকলার প্রতি বিশেষ পক্ষপাতের ফলেই এই অবস্থা ঘটেছিল তা স্বীকার করতে হবে।

এই সময়ে ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনে অবনীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে তাঁর অনুরাগী শিষ্যদলের মধ্যে ভারতীয় চিত্রকলার চর্চা আরম্ভ হয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথ নিজে এবং নন্দলাল প্রভৃতি শিল্পানুরাগীর দল সেইখানে বসেই অনেকগুলি ছবি এঁকেছিলেন, যা আর্টিস্টদের কাছে বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল। (আমার যতদূর মনে পড়ে, অবনীন্দ্রনাথ তখনো আর্ট কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল হননি।) প্রবাসীতে এইসব ছবি এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানের তৎকালীন ও প্রাচীন চিত্র রঙে ছাপা হয়ে ক্রমাগত প্রকাশিত হতে লাগল। অজন্তার গুহা-চিত্রের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়, এবং অনেকেরই প্রথম পরিচয়, হয়েছিল প্রবাসীর মাধ্যমে। তা' ছাড়া মুঘল-চিত্র, রাজপুত-চিত্র বহুল পরিমাণে প্রবাসীতে বের হয়েছিল। হ্যাভেল এবং অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় চিত্রকলা প্রসারের জন্য যে চেষ্টা করেছিলেন তার পাশে প্রবাসী পত্রের এই প্রচেষ্টা বিশেষভাবে ফলবতী হয়েছিল। প্রবাসীর সঙ্গে সঙ্গে রামানন্দবাবুর সম্পাদিত মডার্ণ রিভিয়ুতেও এ-সব চিত্র ছাপা হ'ত। এর ফলে তখন লোকসমাজে ভারতীয় ও পূর্বাঞ্চলের চিত্রকলার প্রতি অনুরাগ বিপুল পরিমাণে বেড়ে গিয়েছিল।

প্রবাসীর পরে বাংলাদেশে ক্রমান্বয়ে অনেক মাসিক পত্রিকা বের হয়েছিল। সেগুলি সব ব্যাঙের ছাতার মত অসার্থক সৃষ্টি ছিল না, কিন্তু যা কিছু সার্থক পত্রিকা দেখা দিচ্ছিল তার প্রবর্তন হচ্ছিল প্রবাসীর আদর্শেই। তার মধ্যে একটু বেশী সাড়া জাগিয়েছিল 'ভারতবর্ষ'। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স এই পত্রিকা প্রকাশ করবেন এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সম্পাদক হবেন একথা আগের থেকেই প্রচার করা হয়েছিল। কিন্তু 'ভারতবর্ষ' প্রকাশিত হবার আগেই দ্বিজেন্দ্রলাল মারা যান। তাঁর জায়গায় জলধর সেন সম্পাদক হন। জলধর-বাবু যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন এই কাজ তিনি বিশেষ দক্ষতার সঙ্গেই পরিচালনা করেছেন।

ভারতবর্ষ কাগজ বের হবার সময় থেকেই আমার সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল। খুব গোড়ার দিকেই আমি প্রবন্ধ লিখি, এবং তার মধ্যে একটি প্রবন্ধে আমার বেশ একটু খ্যাতি হয়েছিল। সেই প্রবন্ধ পড়ে প্রমথ চৌধুরী মহাশয় আমাকে বিশেষ প্রশংসা করেন ও উৎসাহ দেন। বলাবাহুল্য এর পরে তাঁর সংকল্পিত সবুজ পত্রে আমাকে লিখতে বলেন। আমি তখন ঢাকায়। সেখান থেকে মাঝে মাঝে প্রবন্ধ লিখে পাঠাতাম সবুজপত্রে।

সবুজ পত্র যে সেকালে কতদূর প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল সেকথা এখনো সকলেই স্মরণ করতে পারবেন। তাতে প্রমথ চৌধুরী মহাশয় তাঁর নিজের ভাষায় যেসব প্রবন্ধ লিখেছিলেন তার ফলে বাংলা ভাষায় এক নতুন ধারা প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল। এর ফলে নিশ্চয়ই সবুজ পত্রের প্রসার অনেক বেড়ে গিয়েছিল, কিন্তু তার প্রতিপত্তির প্রধান কারণ ছিল রবীন্দ্রনাথের রচনা। রবীন্দ্রনাথ অনেকদিন পর সবুজ পত্রে লিখতে আরম্ভ করলেন। প্রথম উদ্বোধন করলেন "ওরে সবুজ ওরে আমার কাঁচা" কবিতায়। তখন তিনি অল্পদিন আগে নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পরে ইউরোপ-ভ্রমণ থেকে ফিরে এসেছেন। তখনকার লেখায় একটা সম্পূর্ণ নতুন ধারা ফুটে উঠল। 'চোখের বালি' থেকে 'গোরা' পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের গতি দেখে অনেকে ভেবেছিল যে তিনি বোধহয় সাধারণ হিন্দু-সমাজের চিন্তাধারার অনুবর্তী হয়ে পড়ছেন। কিন্তু সবুজ পত্রে যে লেখা বেরুল তাতে সে সন্দেহ একেবারে দূর হয়ে গেল। সবুজ পত্রে যেসব গল্প প্রকাশিত হয় তার অনেকগুলি ইউরোপীয় সাহিত্যের নবতম চিন্তার অনুকূল ছিল। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পটিতে ইবসেনের ডল্স্ হাউস-এর প্রচুর ছায়াপাত আছে। পরে 'চতুরঙ্গে'র চারটি গল্প সে সময়ের ইউরোপের সামাজিক স্বাধীনতা-মন্ত্রে দীক্ষিত। তারপর এল 'ঘরে-বাইরে'। এটা সম্পূর্ণ নতুন ধরণের উপন্যাস, যা পাঠকসমাজকে চমক লাগিয়ে দিয়েছিল। এই সময়কার অন্যান্য অনেকের লেখার মধ্যে একটা তীব্র প্রগতির চেষ্টা আমরা দেখতে পাই, তার মধ্যে অবশ্য সর্বাগ্রগণ্য শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্কিমবাবু মারা যাবার পর কথা-সাহিত্যের ইতিহাসে একটা জড়তা এসে গিয়েছিল। উপন্যাস ও গল্প প্রকাশিত হ'য়েছিল অনেকগুলি, মাঝে রবীন্দ্রনাথও ভালো বই লিখলেন। কিন্তু জনসাধারণের মতে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর মতো সাহিত্য-সম্রাট পদবীর যোগ্য কেউ হননি, রবিবাবুর লেখা যারা পছন্দ করতো, তারা তাঁকে ভালোই মনে করতো। কিন্তু বঙ্কিম-চন্দ্রের মত উজ্জ্বল গৌরব কেউ পাননি। নব-পর্যায়ে বঙ্গদর্শনের আগে রবীন্দ্রনাথও কোন পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস লেখেন নি। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সগৌরবে প্রতিষ্ঠা হবার আগে পর্যন্ত অনেকটা জায়গা জুড়ে ছিল পাশ্চাত্য সাহিত্যের ছায়াপুষ্ট গল্প। তার মধ্যে দু'চারজনের বেশ একটু বৈশিষ্ট্যও ছিল। আমার নিজের অন্তত তখনকার বিবেচনায় শ্রেষ্ঠ গল্প-লেখক ছিলেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

রবীন্দ্রনাথ লিখতেন খুব কম এবং ধীরে ধীরে। কিন্তু যখন তিনি লিখতেন, তখন কারো সন্দেহ থাকত না তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে। গত পঞ্চাশ বৎসরের সাহিত্যের ইতিহাসে ইনি ছিলেন এক বিরাট মূর্তি। তাঁর হাতেই বাংলাভাষা, কাব্য ও প্রবন্ধাদি অসাধারণ পরিপুষ্টি লাভ করেছে। এই পরিপুষ্টি ও প্রতিষ্ঠা শুধু একদিকে নয়, সকল দিক দিয়েই সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে যে সাহিত্য চলিত ছিল তা যতই ভালো হোক, সে ছিল আংশিক। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুকারীগণ তাকে একটা সর্বাঙ্গীণ পরিণতিতে পৌঁছে দিয়েছেন। এই পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বাংলা সাহিত্যে একটা তীব্র প্রগতির স্রোত বয়ে গিয়েছে। এর ফলে আমরা পেয়েছি অপূর্ব পরিণত ভাষা ও সাহিত্য যা প্রতিদিনই উন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে।

বিজ্ঞান ভিত্তিক রহস্যোপন্যাস

পিতামহ ব্রহ্মার অহোরাত্রে এক কল্প
এক কল্পে চতুর্দশ মনু
দ্বাদশ মনু
রুদ্রসাবর্ণি

প্রথম উল্লাসে
অন্ধচটক

গহন অরণ্যই বলা যায়।

লতায় পাতায় গুঁড়িতে শিকড়ে ঝুরিতে জড়াজড়ি মৃত্যুর ফাঁদ।

অরণ্য আর জলা। সন্ধ্যার লোহিতাভ আকাশ ঘন অরণ্যের পত্রজাল ভেদ করে তার ওপর প্রতিফলিত। মনে হয় যেন অরণ্যের গা বেয়ে ফিকে রক্ত গড়িয়ে গড়িয়ে ওখানে জমা হয়ে আছে।

অরণ্যের আবছা অন্ধকার থেকে একটা প্রাণীকে ছুটে এমনি একটা জলার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখা গেল।

যেখানে জলা সেখানে আলোর তেমন অভাব এখনো নেই।

প্রাণীটার আকার দেখে প্রথমে বোঝা যায় দ্বিপদ জীব কোনো। তারপর চেনা যায় মানুষ বলে। মানুষের প্রায় আদিম নগ্ন চেহারা, শুধু পশুচর্মের জায়গায় হাতে-বোনা একপ্রকার বস্ত্রে যৎসামান্য কটিদেশ আবৃত। হাতে তার একটা হাতিয়ার গোছেরই আছে মনে হয়।

অগভীর জলা। মানুষটা তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে কখনো সাঁতরে কখনো জল ঠেলে নিচের কাদার ওপর দিয়ে যথাসাধ্য দ্রুতবেগে সভয়ে এগিয়ে যায়।

সে কিছুদূর গিয়ে একবার ফিরে তাকায়।

ঠিক সেই মুহূর্তে ফাঁস দেওয়া একটি রজ্জু তার ওপর অব্যর্থ লক্ষ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। চক্ষের নিমেষে সে ফাঁস তার মাথা দিয়ে গলে তার দুটি বাহু সমেত দেহটাকে সুদৃঢ় বন্ধনে বন্ধন করে।

তারপর চলে টানাটানি।

মানুষটা প্রাণপণে কাদার মধ্যে পা দিয়ে চেষ্টা করছে সে প্রচণ্ড আকর্ষণের বিরুদ্ধে যোঝবার। কিন্তু কাদায় পা বসাবার মত দৃঢ় আশ্রয় নেই, ক্রমাগতই পিছলে যায়। হাত দুটি তার উপরন্তু দড়ির ফাঁসে বাঁধা পড়ে অকর্মণ্য। ধীরে ধীরে বঁড়শিতে গাঁথা মাছের মত দেখা যায় সে অসহায়ভাবে তীরের দিকেই আকৃষ্ট হচ্ছে। সন্ধ্যার রঙে রাঙা জলার জল ঘোলাটে কর্দমাক্ত হয়ে উঠছে তার নিষ্ফল সংগ্রামে।

এমন নির্মম দড়ির ফাঁসে কে তাকে টানছে?

কে নয় কারা?

জঙ্গল যেখানে জলার ধার পর্যন্ত নেমে এসেছে সেখানে দুটি মূর্তিকে দেখা যায়। বলিষ্ঠ হাতে তারা অমোঘভাবে শিকারকে একটু একটু করে তাদের কাছে টেনে আনছে।

চারটি বলিষ্ঠ হাত কিন্তু পেশীবহুল কর্কশ নয়। কেমন যেন একটু পেলব। সৌষ্ঠবের আভাস সে বাহুতে আছে। থাকা অস্বাভাবিক নয়, কারণ বলিষ্ঠ হাতে ফাঁস দেওয়া রজ্জুতে শিকারকে যারা টানছে তারা স্পষ্টই পুরুষ নয় স্ত্রীলোক।

নারীমূর্তি দুটিও যেন আদিম। লজ্জা নিবারণের মত সামান্য দেহবাস আছে মাত্র। তাতে সুগঠিত নারীদেহের রূপ আরো ভালো করে ফুটে উঠেছে।

এ রূপ বিস্ময়কর, কোমলে কঠিনে মিলে অপরূপ।

দুই নারীমূর্তি একদিক দিয়ে যেন পরস্পরের বিপরীত। একজনের চুল স্বর্ণাভ, দেহবর্ণও সুগৌর আর একজনের মাথার কালো কেশ মেঘলোমের মত কুঞ্চিত, গায়ের রঙও নিকষকৃষ্ণ। কোন কবি উপস্থিত থাকলে হয়ত ভাবতে পারত একজন যেন উষা ও অন্যজন রাত্রি।

এই দুই নারীকে একত্র দেখবার মত একটি মাত্র যে পুরুষ সেখানে উপস্থিত তার মধ্যে কবি-কল্পনা যদি থাকত, তবু উপমা ভাবার মত তখন তার অবস্থা নয়। দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে সে তখন তার বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার জন্যে ব্যস্ত।

শেষ পর্যন্ত মুক্তি সে পেল। পেল তার হাতের হাতিয়ার-টুকুর কল্যাণে। হাতিয়ারটা ছোরাও নয় তলোয়ারও তাকে বলা যায় না। মাঝামাঝি একটা হ্রস্ব-কৃপাণ জাতীয় অস্ত্র। নারী শিকারীরা যখন তাকে সবলে টানছে তখন কোনরকমে হাতের হাতিয়ারটা শুধু কব্জির জোরে খাড়া করে রেখে ফাঁসের দড়িতে সে ঘর্ষণ করবার চেষ্টা করে গেছে। দড়িটার দু-একটা বুনন কেটে যেতেই দেহের সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করে বাঁধনটা সে ছিঁড়ে ফেললো। তারপর উন্মত্তের মত হাত-পা ছুড়ে সাঁতরে জলার অপরপারের দিকে এগিয়ে গেল।

কাটা ছেঁড়া ফাঁস নতুন করে তৈরী করে আর তখন ছোড়বার বোধ হয় সময় নেই। শিকারী মেয়েদুটিকে কিন্তু শিকার ফসকে যাওয়ায় তেমন রুষ্ট বা হতাশ বলে মনে হল না। ছেঁড়া ফাঁসের

দড়ি গুটিয়ে নিতে নিতে দুজনেই তখন হাসছে খিল খিল করে।

ফাঁসের দড়িটা গোটানো অবস্থায় কৃষ্ণা মেয়েটিই কাঁধের ওপর ঝুলিয়ে নিয়ে বললে, এটাও ফসকালো তাহলে!

ফসকাবে না! শুভ্রা মেয়েটি হেসে বললে, বেরুবার সময় ওই অপয়া নিকিটাকে দেখলাম না!

এ তোর অন্যায় নাশা! মেয়েটি ভর্ৎসনার স্বরে বললে, নিকি যদি অপয়া হয়ত আমরা কি? পেরেছি এ পর্যন্ত একটা কাউকে ধরতে?

আমরা ধরতেই পারিনি। আর নিকি যে ধরেও ফক্কা! গৌরাঙ্গী নাশা হাসতে হসতে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললে, আমি তোকে বলে রাখছি লুনা, এই নিকি যে কি সাংঘাতিক মেয়ে নেতামাও একদিন বুঝবেন। ওকে কিরকম আস্কারা দেন নেতামা দেখেছ ত। অথচ ওকে আখড়াইতে জায়গা দেওয়াই উচিত নয়। ওর গায়ে গামা-ঘা বেরোয়নি কখনো জানিস ত।

কৃষ্ণকায়া লুনা কৌতুকভরে নাশার দিকে তাকিয়ে হাসল শুধু।

সেটা ওর কলঙ্কর বদলে সৌভাগ্যও ত হতে পারে। হাতের ধারালো কিরিচের মত অস্ত্র দিয়ে জঙ্গলের জড়ানো একটা লতায় কোপ দিয়ে লুনা পথ পরিষ্কার করে নিলে। তারপর হেসে বললে, নেতামার কাছে ওই জন্যেই হয়ত ওর আদর।

আবোল-তাবোল বকস্নি লুনা। মাঝে মাঝে তোকেও আমার কেমন বেজাত লাগে। গামা-ঘা যার নেই তার ত সমাজেই জায়গা হওয়া উচিত নয়। সে অচ্ছুত। কাফ্রামদের কার গামা-ঘা নেই বা হয়নি বলতে পারিস! শুনেছি ইউরুশ প্রভারদেরও গামা-ঘা না থাকলে মান থাকে না।

লুনা হেসে বললে, আর নেতামার কাছে এও কি শুনিস নি যে এককালে গামা-ঘা কাকে বলে মানুষ জানত না।

ও সবও গাঁজাখুরী উপকথা! নাশা বিরক্তই হয়ে উঠল, তাহলে ত মানুষ একদিন সব জায়গায় গিজগিজ করত, পাহাড়ের মত কুঁড়ে বেঁধে থাকত, পাখিদের মত আকাশে উড়ত, এসব ছেলেভুলোন গল্পও সত্যি বলে মানতে হয়, বিশ্বাস করতে হয় যে আমাদের মত আখড়া করে নয়, মেয়ে-পুরুষ একদিন জোড়ায় জোড়ায় থাকত।

তোর এসব বিশ্বাস হয় না নাশা!

তোর হয়?

না, ঠিক হয় না। তবে ভাবতে ভাল লাগে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ইতিমধ্যে গাঢ় হয়ে এসেছে। আকাশে মেঘের রক্তিমা গেছে মিলিয়ে। অন্ধকার জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পথ চিনে যাবার চেষ্টাতেই কালা-ধলা দুই সখীর আনন্দে ছেদ পড়ল।

দ্বিতীয় উল্লাস
অশোক বনিকা

ফাঁস-দেওয়া দড়ির বাঁধন ছাড়িয়ে যে মানুষটা জলা পার হয়ে গেছল। তাকেও সন্ধ্যার অন্ধকারে জলার ওপারে ছুটতে দেখা গেল।

জলার এপারে অরণ্য আর ততো ঘন নয়। কিন্তু ক্রমশঃ ঘনায়মান রাত্রি আকাশ ও মাটি একাকার করে দিচ্ছে প্রতি মুহূর্তেই।

এরকম অন্ধকারে বনপথে চলাফেরায় লোকটা যে অনভ্যস্ত নয় তা তার প্রায় স্বচ্ছন্দ দ্রুতগতিতেই বোঝা গেল। কিন্তু এ অঞ্চলটা তার বোধহয় অপরিচিত।

অন্ধকারের মধ্যে অদূরে একটা ক্ষীণ আলো জ্বলে উঠতেই চমকে থেমে যাওয়ায় তা প্রমাণিত হ'ল।

আলোটা দেখে দ্বিধাগ্রস্তভাবে কিছুক্ষণ সে দাঁড়িয়ে রইল। একবার আলো যেদিকে দেখা গেছে তার বিপরীত দিকে কয়েক পা ছুটেও গেল সে। কিন্তু সেখানে আবার থেমে পড়ে কৌতূহল-বশেই বোধ হয় সন্তর্পণে আলোর দিকেই আবার অগ্রসর হ'ল।

আলো যেখান থেকে দেখা গেছল কাছে যেতে সেটা ছোট-খাট একটা বসতি বলেই মনে হ'ল। অন্ধকারে কয়েকটি কুটীরের আয়তন শুধু বোঝা যায়। কুটীর কটির চারিধারে নিচু জংলী গাছের বেড়া।

আলোটা একটি কুটীরের ফাঁক দিয়েই আসছে। লোকটা কিছুক্ষণ বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে জায়গাটা ঠাহর করবার চেষ্টা করলে। তারপর ফিরে যাবার জন্যে দু'পা বাড়িয়েই ভয়ে একেবারে যেন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কে একজন বাইরে থেকে এদিকেই অসছে। জঙ্গলের লতাগুল্মে তারই পায়ের শব্দ।

নিঃশব্দে রুদ্ধ নিশ্বাসে দাঁড়িয়ে পড়া সত্ত্বেও আগন্তুক তার উপস্থিতি টের পেয়েছে বোঝা গেল।

জিজ্ঞাসা করলে, কে ওখানে?

গলার স্বরে পুরুষ বলেই বোঝা গেল। শুধু তাইতে নয় পরিচয় জিজ্ঞাসার অনুগ্রধরণেও লোকটা আশ্বস্ত হ'ল কিনা কে জানে!

তার জবাবে অন্ততঃ রুদ্ধশ্বাস আতঙ্কের আভাস আর পাওয়া গেল না।

প্রাভার বুবন। সে অকম্পিত কণ্ঠে জানালে।

বুবন! আগন্তুকের কণ্ঠে বিস্মিত আনন্দই প্রকাশ পেল এবার।

দ্রুতপদে সে কাছে এগিয়ে এসে দাঁড়াল।

বুবন নিজের অনিচ্ছাতেও স্বাভাবিক সাবধানতায় একটু পিছিয়ে গেছল কিন্তু আগন্তুকের পরের কথায় তারও আশ্চর্য পরিবর্তন দেখা গেল।

ভয় পাবার কিছু নেই বুবন। আমি দূরু!

দূরু! তুমি এখানে? বুবন এগিয়ে গিয়ে সবিস্ময়ে দূরুকে জড়িয়ে ধরলে।

আলিঙ্গনবদ্ধ দূরু বললে,—সে কথা আমিই ত তোমায় জিজ্ঞাসা করতে চাই। কিন্তু এখানে নয়, ভেতরে চল। আমার নিবাসে।

তোমার নিবাস এখানে! দূরুর সঙ্গে বাইরের বেড়ার একটি আগড় সরিয়ে ভেতরে যেতে যেতে বুবন বিস্ময় প্রকাশ করলে।

উত্তর না দিয়ে দূরু তাকে যে কুটীরটি থেকে আলো দেখা গেছল তারই ভেতরে নিয়ে গিয়ে একটি কাষ্ঠাসনে বসতে ইঙ্গিত করলে।

বুবন কিন্তু বসল না। চারিদিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে মাটি ও জংলীগাছের তৈরী সুনির্মিত ঘরটিকে পর্যবেক্ষণ করে বললে, বসব কি! এ তোমার নিবাস কি বলছ! প্রাভার শিবির থেকে তুমি নিরুদ্দেশ হয়ে গেছ আজ প্রায় পঞ্চদশ পূর্ণিমা। তুমি জঙ্গলে কোন দুর্ঘটনায় মারা গেছ বা কাফ্রামরা তোমায় ধরে নিয়ে মেরে ফেলেছে বা বন্দী করেছে—এই ত আমরা সবাই ভেবেছি! তোমার পর অবশ্য আজিব আর নন্দকও জঙ্গলে হারিয়ে যায়। শিবির থেকে দূরে কোথায় যেতেই আজকাল কেউ সাহস করে না।

দূরু বাধা দিয়ে হেসে বললে,—তাহলে তুমি এতদূর আজ এসেছ কোন সাহসে!

সে কথা সবই বলছি পরে। কিন্তু শিবির থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে আর সেখানে ফিরে যাওনি কেন? এখানেই বা নিবাস নির্মাণের মানে কি?

মানে শিবিরে আর ফিরে না যেতে চাওয়া। দূরু একটি কাষ্ঠাসনে বুবনকে একরকম জোর করেই বসিয়ে তার পাশে জায়গা নিয়ে বললে, যারা নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে ভেবেছ সেই আজিব ও নন্দকও আমার সঙ্গেই এখানে আছে।

তারাও এখানেই আছে! আমি তোমার কথা কিছু বুঝতে পারছি না দুরু। শিবিরে তোমাদের ওপর কোন অত্যাচার কি উৎপীড়ন ত হয় নি। তবু কোন দুঃখে বা আক্রোশে এখানে এসে তোমরা লুকিয়ে আছ!

লুকিয়ে আছি বলতে পারো অবশ্য! দুরু হাসল, কিন্তু দুঃখে বা আক্রোশে নয়। শুধু নিজেদের কাজ নির্বিঘ্নে করবার অবসর পাবার জন্যে। শিবিরে আমাদের ওপর কোন অন্যায় শাসন অবশ্য ছিল না। এখানে যা করছি তা সেখানেও করা যেত না এমন নয়। কিন্তু এমন নির্বিঘ্ন নিরুদ্বেগ শান্তি সেখানে পেতাম না। শিবিরে থাকবার একটা গোষ্ঠীগত দায়িত্ব আছে। আমাদের পরমায়ু কতটুকু আর। সে দায়িত্ব পালনের সময়টুকুও আর নষ্ট করতে চাই না।

তা চাও না বুঝলাম! বুবন অস্থিরভাবে এবার উঠে দাঁড়াল,—কিন্তু নির্বিঘ্নে যে কাজ করবার কথা বলছ সেটা কি?

সেটা কি তা তোমার অনুমান করা উচিত ছিল। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে তাই আমার নেশা।

ওঃ তোমার সেই ইতিহাস-উদ্ধার! বুবনের গলায় বিস্ময়ের সঙ্গে অবজ্ঞার আভাসটুকুও পাওয়া গেল।

হ্যাঁ তাই। আমাদের প্রাভার শিবিরে এ নেশা হাস্যকর। একমাত্র ইওসোভেদের কারুর কারুর এই নিরর্থক খেয়াল আছে বলে জানি। তাদের একজনের সঙ্গে ছাড়া আমার কোনদিন এ বিষয়ে আলাপ করার সৌভাগ্য হয় নি। শিবিরে থাকলে এ নেশায় একাগ্র হয়ে থাকতে পারতাম না। আমার নিজেরই কর্তব্যবুদ্ধিতে বাধত। তাই এমন করে চলে এসেছি।

তুমি না হয় ইতিহাস খোঁজবার নেশায় এসেছ কিন্তু আজিব ও নন্দক! তাদের শিবির ছাড়বার কারণ?

কারণ এক না হলেও একই জাতের। তবে আমার চোখ পেছনে আর আজিব ও নন্দকের দৃষ্টি সামনে। আজিব চায় কায়্রাম প্রাভার আর ইওসোভ এই তিন শিবিরের মধ্যে ঘৃণা সন্দেহ শত্রুতা ঘুচিয়ে এক মিলিত সমাজ তৈরী করতে আর নন্দক সে সমাজকে চায় বিলুপ্তি থেকে বাঁচাতে।

একই হোক আর আলাদাই থাক বিলুপ্তি ঠেকাতে পারবে না কেউ। প্রাভার শিবিরে গত পোনেরো বৎসরে একটা শিশু দেখেনি তা জানো। কায়্রাম আর ইওসোভদের অবস্থা আরো শোচনীয়। শিশু একটা দুটো সেখানে জন্মেছে কিন্তু তাদের বাঁচান যায় নি। সুতরাং আর পোনেরো কি বড় জোর কুড়ি বছর বাদেই মানুষ নামে কোন প্রাণী আর থাকবে না।

দুরুর মুখে বুঝি একটু হাসি ফুটে উঠেছিল। তা দেখে একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই বুবন আবার বললে, হাসছ যে! আমাদের পরমায়ু আর কত, বড় জোর ত্রিশ কি পঁয়ত্রিশ বছর। এখন সবচেয়ে যারা ছোট তাদের বয়স পেনেরো ষোল। যদি আর নতুন জন্ম না হয় তাহলে খুব বেশী হ'লে কুড়ি বছর এদের জীবনের মেয়াদ!

তা হবে কেন? ষাট সত্তর এমন কি আশি বছরই বা বাঁচতে আপত্তি কি!

আপত্তি কিছু নেই। দিনগুলো আরো বড় হয়ে রাতগুলো ছোট হলেও আপত্তি নেই। কিন্তু তা হয় না।

হবে না কেন? তাও হয়। দুরু আবার হাসল। আমরা কিছুই জানি না। এই কুয়োর ব্যাঙের মত যেখানে পড়ে আছি শুধু সেই জায়গাটুকু দেখেই সব বিচার করি। এখান থেকে অনেক অনেক দূরে এমন জায়গা

থাকতে পারে,—পারে কেন আছে বলেই আমার ধারণা, সেখানে সারা বছরে কখনো দিন কখনো রাত ফুরোতে চায় না।

এবার বুবেন হো হো করে হেসে উঠল। বললে,—এও তোমার ইতিহাস হাতড়াতে পাওয়া ধারণা নাকি! স্বপ্ন দেখতে চাও ত দেখো। কিন্তু কে না জানে এই জঙ্গলের চারিদিকে প্রাকার-গিরি আর তারপরে শুধু অনন্তসলিল। সে এমন সলিল যে, কোন নৌকো সেখানে ভাসে না। নুড়ির মত ডুবে যায়। তাছাড়া দিনরাত্তির সেখানে প্রলয়ের ঝড় বইছে।

হয়ত তাই, দুরু এবার গম্ভীর হয়ে বললে, কিন্তু আমাদের জানা কোন মানুষ ত তা দেখে আসে নি। সুতরাং এ কল্পনায় যদি বিশ্বাস করতে পারি, ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে যা পাই তাই বা একেবারে উড়িয়ে দেব কেন।

কি পাও তোমরা ইতিহাসে?—বুবেনের গলা বেশ চড়া।

যা পাই তা শুনলে আমাদের শিবির আমি বিদায় হয়ে গেছি বলে খুশীই হবে। ইতিহাসে যা পাচ্ছি তাতে বুঝতে হয় আমরা যেখানে আছি সেটা গোলাকার একটা বিরাট বর্তুলের অতিসামান্য একটু ছিটে-ফোঁটা মাত্র। এ বিরাট গোলককে মানুষ বলত পৃথিবী। এ পৃথিবী যে কত বড় তা আমাদের কল্পনারও বাইরে। তার এক জায়গা থেকে আর এক জায়গার তফাৎও আকাশ-পাতাল। তবু এ পৃথিবীর যে দিকেই যাও গোলাকার বলে আবার উল্টো দিক দিয়ে ফিরে আসা যায়। কোন এক যুগে মানুষ নাকি তাও গেছে!

তাও গেছে! বুবেনের হাসি এবার যেন থামতেই চায় না, কিন্তু মানুষ ত পিপীলিকা কি কৃকলাস নয়। পৃথিবী যদি গোল বর্তুল হয়, তাহলে অন্য পিঠে গেলে নিচে মাথা ওপরে পা করে হাঁটবে নাকি? পড়ে যাবে না?

যা জেনেছি তাই তোমায় বললাম। ইতি-হাস খুঁজতে গিয়ে এ কথাও জেনেছি যে, মানুষের পরমায়ু সত্তর আশি এমন কি শতাধিক হ'ত।

কোন দিন ধলবে মানুষের দুধারে পাখিদের মত দুটো করে পাখাও থাকত। দেখো দুরু, তুমি ত' জানো, আমি যাকে বলে যুক্তিবাদী। যা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে তার কোন দাম আমার কাছে নেই। অবাস্তব গল্প নিয়ে মাথাঘামানো আমি পছন্দ করি না। এখন বলো, তোমাদের এ নিবাসের খবর পণ্ডারেংকে জানাবো কিনা!

ইচ্ছে করলে জানাতে পারো। তাহলে আবার কোথাও চলে গিয়ে ডেরা বাঁধতে হবে। কারণ শিবিরে আমরা ফিরব না। এখন অন্ততঃ নয়।

বেশ ফিরো না। আর ফিরেই বা হবে কি! এখানেও যা হবে সেখানেও তাই. পিছনে তাকিয়ে যাই কল্পনা করোনা সামনে সব অন্ধকার।

দুরু খানিক চুপ করে রইল। তারপর একটু তেজের বললে, তবু হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে ত পারছ না। তুমি ত পারছ না। এখন হঠাৎ নিজেদের এলাকা ছেড়ে এ অঞ্চলে চড়ু মেরেছিলে কেন বল ত? বাচ্চা চুরিটুরির আশায়?

বাচ্চা চুরি? বুবেন আতঙ্কের ভাব দেখাল, বাচ্চা যদি কোথাও থাকেও তবু কাক্রামদের আখড়া থেকে চুরি করতে আসবে এতবড় বুকের পাটা প্রাভারদের কারুর অন্ততঃ নেই। তুমি ত জানো আমাদের শিবিরে যেমন পুরুষ বেশী ওদের আখড়ায় তেমনি সবই প্রায় মেয়ে। কিন্তু চেহারাতেই মেয়ে, আসলে কালনাগিনী। না, বাচ্চার লোভে নয়, এসেছিলাম পরজের কোন খোঁজ পাই কিনা দেখতে। প্রায় দ্বাদশ পূর্ণিমা আগে পরজকে কাক্রামরাই অরণ্য থেকে ধরে নিয়ে যায় বলে আমাদের বিশ্বাস। নদীতে যেখানে সে জাল ফেলতে গেছল সেখানে তার পাদুকা ও কৃপাণ পাওয়া গেছে। কাক্রামদের আখড়ার আশপাশে ঘুরে তার কোন সন্ধান পাওয়া যায় কিনা তাই দেখতে গেছলাম। কিন্তু আরেকটু হলে নিজেই বন্দী হচ্ছিলাম তাদের হাতে। নেহাৎ বরাত জোরে তাদের ফাঁদদড়ি ছাড়িয়ে এসেছি।

ছাড়িয়ে এলে কেন? দুরু হাসল, বন্দী হয়ে ওদের আখড়ায় গেলে ত পরজের খবর আরো ভালো করে পেতে! ওদের সম্বন্ধেও অনেককিছু জানতে পারতে!

কাক্রামদের বন্দী হতাম সাধ করে? বুবেনের চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠল। ওরা কি অকথ্য যন্ত্রণা দেয় তা জানো। ওদের মধ্যে পুরুষ নেই বললেই হয়। বাইরের পুরুষ ধরে নিয়ে গিয়ে তার সমস্ত রক্ত শুষে নিয়ে নিজেদের পুরুষদের গায়ে চালান করে। তারপর শুখনো ছোবড়ার মত মানুষটাকে দগ্ধে দগ্ধে মেরে আরকে জারিয়ে রাখে।

যুক্তিবাদীর মতই কথা বলছ নিশ্চয়ই?

দুরু হেসে আরো কি বলতে যাচ্ছিল হঠাৎ বাইরে থেকে ব্যস্তভাবে আর দুটি মানুষ ঘরে ঢুকল।

বুবেন সবিস্ময়ে বললে, আরে এই ত আজিব আর নন্দক! যাক্ তোমাদের সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল।

আজিব ও নন্দককে কিন্তু অত্যন্ত উত্তেজিত মনে হ'ল, বুবনকে দেখে চিনতে পেরেও সামান্য একটু মাথা নেড়ে সম্ভাষণ জানাবার পর প্রথমে আজিব বললে, শুনতে পাচ্ছ দুরু!

বহু দূরের একটা পটহধ্বনি তখন কুটীরের ভেতরও অস্পষ্ট ভাবে শোনা যাচ্ছিল।

কান পেতে একটু শুনে বুবেনই প্রথম উৎসাহভরে বলে উঠল—এ ত কাক্রামদের ডঙ্কা! নিশ্চয় কোন বন্দী ওদের পালিয়েছে। হয়ত পরজই হবে!

দুরু মাথা নাড়লে। সঙ্গে সঙ্গে নন্দক বললে—না, এ সে ডঙ্কানিনাদ নয়। এ ডঙ্কার আওয়াজ শুনে বোঝা যাচ্ছে কাক্রামদের আখড়ায় যা অবিশ্বাস্য তাই ঘটেছে।

সে অবিশ্বাস্যটা কি?. কাক্রামদের খপ্পর থেকে বন্দী পালানই কি কল্পনাতীত ব্যাপার নয়? বুবেন জিজ্ঞাসা করলে অস্থির ভাবে।

হ্যাঁ, ওরা যাদের ধরে নিয়ে যায় তাদের পালাবার খবর পাওয়া যায় না বললেই হয়। আজিব [illegible] বললে, কখনো-সখনো আখড়ার বাইরের জঙ্গলে আমরা প্রাভাররা বা ইওসোভেরা নিজেদের শিবিরের লোককে ওদের কাছ থেকে ছলেবলে ছাড়িয়ে নিয়ে গেছে মাত্র। কিন্তু তার জন্যে যে ডঙ্কা ওদের আখড়ায় বাজে এ ধ্বনি তা থেকে আলাদা।

কি বোঝাচ্ছে তাহলে এ ডঙ্কানিনাদে? বুবেন সশঙ্ক ঔৎসুক্যের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে।

বোঝাচ্ছে যে ওদেরই কেউ স্বেচ্ছায় আখড়া ছেড়ে পালিয়েছে না অপহৃত সে বিষয় ওরা নিঃসন্দেহ নয়।

তাহলে ত' আবার সেই হানাহানি কাটাকাটি শুরু!—নন্দক হতাশায় নিশ্বাস ফেললে।

হ্যাঁ। দুরু গম্ভীর স্বরে বললে, ওদের সমাজের এই একটি অলঙ্ঘ্য নির্দেশ। ওদের দল ছেড়ে কেউ কোথাও যেতে পারবে না। যদি যায় ত তার নিস্তার নেই। সমস্ত আখড়া এক প্রাণ এক দেহ হয়ে যেমন করে হোক তাকে খুঁজে আনবেই চরম শাস্তি দিতে। মরে গেলেও পার পাবে না কেউ। জীবিত কি মৃত হোক তার দেহের শেষ বিশ্রাম ওদের নিজস্ব সমাধিক্ষেত্রে। ওদের কেউ এই নির্বুদ্ধিতা করেছে কিনা জানি না, কিন্তু নিজেকে শুধু নয়—আমাদের সকলকে সে বিপন্ন করেছে। প্রাভার আর ইওসোভেদের ওপরই ওদের সন্দেহ ও আক্রোশ প্রথম গিয়ে পড়বে। চলবে ক্ষমাহীন ক্লান্তিহীন সংগ্রাম যতদিন না পলাতকের সন্ধান মেলে।

পলাতক নয় বলো পলাতকা! নন্দকের স্বর বেশ তিক্ত। ওদের মধ্যে পুরুষ আর কজন। আর তাদের পালাবার মত পৌরুষ নেই। যে পালিয়েছে সে নারী নিশ্চয়। সেজন্যেই ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। শিবিরবাসের স্মৃতিতে এ ব্যাপার কখনো হয়নি। কি কারণে ওদের আখড়ার কেউ পালাতে পারে তাই বুঝতে পারছি না।

তার চেয়ে নিজেদের বিপদের পরিমাণটা বোঝবার চেষ্টা করো। আজিব চিন্তিত মুখে বললে—এতদিন নির্বিবাদে আমরা এখানে থাকতে পেরেছি। কিন্তু এখন ওদের আক্রোশের আগুনে আমাদের মূল শিবিরকেই রেহাই দেবে না। আমরা ত শুখনো উড়ো পাতা মাত্র।

তার মানে কি বুঝতে পারছ ত! প্রাণী হিসাবে মানুষ এমনিতেই লুপ্ত হতে বসেছে। হঠাৎ দৈবের কৃপা না হ'লে কি আমাদের গবেষণায় কোন উপায় খুঁজে না বার করতে পারলে আর কুড়ি কি বড় জোর ত্রিশ বছরের মধ্যেই মানুষ বলে কেউ থাকবে না। এই অতর্কিত হিংসার বন্যা সেই সমাপ্তিই আরো দ্রুত এগিয়ে দেবে। দুঃখ এই যে, মানুষের বিলুপ্তি রোধ করবার জন্যে যারা ইতিহাসের লুপ্তবিদ্যা উদ্ধার করে নতুন উপায় আবিষ্কারের তপস্যা করছে তারা তাদের সাধনা শেষ করবার সময়টুকুও পাবে না।

সময় পেলে সত্যিই কোন উপায় আবিষ্কৃত হতে পারে বলে তোমরা আশা করো? বুবেন ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করলে।

নিশ্চয় করি! দৃঢ়স্বরে জানালো নন্দক, অন্ততঃ শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ওই আশা নিয়েই কাজ করে যেতে চেয়েছিলাম।

শুধু আমরা তিনজনা নয়, আজিব গাঢ় বিষণ্ণ স্বরে বললে, আমি জানি ইওসোভেদেরও কয়েকজন সাধক এই একই সাধনায় তন্ময় হয়ে আছে। সে সাধনা আর শেষ করবার সুযোগ হবে না।

কেন হবে না! উত্তেজিত হয়ে উঠল বুবন, তোমাদের সব কথা আমি ভালো করে বুঝি না। তোমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন নিয়ে পরিহাসই করেছি এতদিন। কিন্তু এতটুকু দাম যদি তোমাদের সাধনার থাকে তাহলে তা কিছুতেই ব্যাহত হতে দেওয়া হবে না। যে আত্মঘাতী সংগ্রামে মানুষের ভবিষ্যৎই বিপন্ন তার মূল কারণই দূর করতে হবে আগে। যে পলাতকাকে ফিরে পাওয়ার জন্যে কাক্রামদের এই ক্ষিপ্ততা তাকে আমরাও খুঁজব। খুঁজে পেলে নিজেরাই বন্দী করে ফিরিয়ে দেব ওদের কাছে। এ সংগ্রাম তাহলে ত থামবে।

তা থামবে! হতাশ স্বরে বললে নন্দক, কিন্তু অনেকগুলো যদি তার আগে কাটাতে হবে। তাছাড়া আমাদের কি ইওসোভ শিবিরের মনোভাব ত তোমার অজানা নেই। কাক্রামদের ঢিলের বদলে পাটকেল ছোড়বার জন্যে সবাই ক্ষেপে উঠবে। তাদের আখড়া-পালানো মেয়ে খুঁজে ফিরিয়ে দেবার জন্যে একটা আঙুলও নাড়বে না কেউ।

তাহলে আমি একাই খুঁজব। বুবনের গলা ধীর অথচ কঠিন। আমার চেয়ে সেরা শিকারী কোন শিবিরে আছে বলে আমি মানি না। আমি সমস্ত পাহাড় জঙ্গল তন্ন তন্ন করে খুঁজব। দরকার হলে তিমির-কন্দরের ভেতরে গিয়েও সন্ধান করব। যেমন করে হোক সে সর্বনাশিনীকে আমি জীবন্ত বা মৃত ওদের হাতে তুলে দেবই। এই আমার মৃত্যুপণ প্রতিজ্ঞা আজ এই মুহূর্ত থেকেই।

বুবন নিজের প্রতিজ্ঞার অটলতা প্রমাণ করতেই তৎক্ষণাৎ কুটীর থেকে অন্ধকারে বেরিয়ে গেল।

তার চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুদূরে ডঙ্কাধ্বনি দ্রুত ও স্পষ্ট হয়ে উঠল যেন আরো। মনে হ'ল ডঙ্কাধ্বনি নয় ও যেন শঙ্কিত বিহ্বল রাত্রিরই উদ্দাম হৃদস্পন্দন।

একাগ্রভাবে তিনজনে কিছুক্ষণ সে ধ্বনি-তরঙ্গ শোনবার পর আজিব বললে, তুমি ত ওদের ডঙ্কাধ্বনির ভাষা আমাদের চেয়ে ভালো করেই জানো। এখন কি বলছে ঠিক স্পষ্ট বুঝতে পারছি না। তুমি পারছ?

পারছি। নন্দকের মুখ গম্ভীর। যে নিরুদ্দিষ্টা তার উদ্দেশে প্রথমে বলছে, যেখানেই তুমি থাকো অনন্যা নেতাদের আহ্বান তুমি শুনতে পাচ্ছ। স্বেচ্ছায় তুমি যাওনি আমরা জানি। তবু যদি সত্যিই তা গিয়ে থাকো তাহলে চরম শাস্তি এড়াতে হ'লে সূর্যোদয়ের আগে তোমার আখড়ায় ফেরা চাই। সূর্যোদয়ের পর আর তোমার এখানে জায়গা হবে না। স্বেচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক যেখানেই তুমি গিয়ে থাকো তোমায় আমরা জীবিত কি মৃত খুঁজে আনবই। তারপর আমাদের দুই শিবিরকে শুনিয়ে বলছে, কাক্রামদের এ অপমান যারা করেছে তাদেরও সূর্যোদয় পর্যন্ত সময় দেওয়া হচ্ছে। সূর্যোদয়ের মধ্যে যদি অপহৃতাকে ফিরিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি না দেওয়া হয় তাহলে কাক্রামদের সঙ্গে আমৃত্যু সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হও।

তিনজনেই নীরবে খানিক দাঁড়িয়ে রইল একথা শোনবার পর।

কয়েক মুহূর্ত বাদে নন্দকই প্রথম কথা বললে। সমস্ত উত্তেজনা পার হয়ে এসে তার কন্ঠ এখন শান্ত ও দৃঢ়।

নিরীহ অসহায় দুর্বল বলে কাক্রামরা আমাদের পরীক্ষা করে নিয়ে এতদিন তাচ্ছিল্য ভরে এখানে থাকতে দিয়েছে। তাদের অবহেলা অবজ্ঞায় আমাদের নিজে-দের কাজ আমরা করে যেতে পেরেছি নির্বিঘ্নে। কিন্তু আর তা সম্ভব নয়। শিবিরে ফিরে গিয়েও আর আমরা নিরাপদ হ'ব না। যে উন্মত্ত সংগ্রাম এবার শুরু হবে তাতে দয়া মায়া ক্ষমা কোন পক্ষেরই তাতে থাকবে না। আমাদের সামনে এখন দুটি মাত্র পথ খোলা। এক এতদিনের সমস্ত সাধনা জলাঞ্জলি দিয়ে নিজেদের শিবিরের সঙ্গে এই সর্বনাশা সংগ্রামে যোগ দেওয়া, আর এক, কোথাও নিজেদের সম্পূর্ণ গোপন করে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অসাধ্য সাধনের ব্রতে একনিষ্ঠ থাকা।

বুঝলাম তোমার কথা। আজিব বাধা দিয়ে বললে—কিন্তু কাক্রামদের দৃষ্টি এড়িয়ে লুকিয়ে থাকবার মত কোন জায়গা কোথাও আছে কি?

আছে বলে মনে করি। নন্দক দৃঢ়-স্বরে জানালে, বুবনই তার ইঙ্গিত দিয়ে গেছে।

তার মানে তিমির-কন্দর!

দুরু ও আজিব দুজনের কন্ঠেই শঙ্কিত বিস্ময় ফুটে উঠল।

হ্যাঁ, তিমির-কন্দরই আমাদের একমাত্র আশ্রয়। এ কন্দরে মানুষের পা কখনো পড়েছে বলে কেউ জানে না। কাক্রামদের উন্মত্ত আক্রোশও কন্দরের নিষেধ-সংস্কার অতিক্রম করতে সাহস করবে না। আমা-দের যেটুকু উপকরণ সম্ভব সঙ্গে নিয়ে আজ রাতেই সেখানে রওনা হতে হবে।

কিন্তু—আজিব তার শেষ কুন্ঠিত প্রতিবাদ বুঝি জানাতে গেছল।

যেন তার প্রত্যুত্তরই জ্বলন্ত বহ্নি তীর হয়ে দূরের একটি কুটীরের ওপর এসে পড়ল।

দেখতে পাচ্ছ! নন্দক তীব্রস্বরে বললে, এ সংগ্রামে প্রতিশ্রুতি কি নীতির কোন মূল্য নেই। আশ্বাস দিয়েও কাল সূর্যোদয় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে কাক্রামরা প্রস্তুত নয়।

দূরের কুটীর-চূড়ায় আরেকটা জ্বলন্ত তীর নন্দকের কথা সমর্থন করতেই এসে পড়ল।

তৃতীয় উল্লাস
সন্দেহশঙ্কিত

উত্তেজিত হলেও মনে মনে একটা অটল সঙ্কল্প নিয়ে বুবন অন্ধকারে বেরিয়ে এসেছিল।

এ অঞ্চলটা তার তেমন চেনা নয়। কাক্রামদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও সংঘর্ষ এড়াবার জন্যে প্রাভার বা ইওসোভেরা পারতপক্ষে এদিকে আসে না। বহুকাল আগে—কৈশোর তখনও সে পার হয় নি আহত একটা ঝাঁকাল হরিণের অনুসরণ করে একবার এদিকে এসে পড়েছিল। এদিকের অরণ্যভূমির সঙ্গে সেইটুকুই ছিল তার পরিচয়। তারপর এই দ্বিতীয়বার এসে-ছিল পরন্ত-এর সন্ধান করতে। এ সন্ধান শিবির-সভার নির্দেশে নয়। শিবির-সারাথিরা বরং এই সন্ধান নিরর্থক বলেই সাব্যস্ত করেছিল। বুবন এসেছিল তার নিজের গরজে।

শিবির-জীবনে সকলেই বন্ধু। তবু পরন্তের প্রতি তার যেন বন্ধুত্বের চেয়ে বেশী কিছু ছিল। পৌরাণিক কাহিনীতে পিতৃস্নেহ বলে যে দুর্বলতার কথা শুনেছে অনেকটা তারই মত। অথচ পরন্তের সে পিতা নয় এমনকি সহোদর ভ্রাতাও নয়। দুজনে প্রায় একই বয়সী। পিতৃ-পরিচয় তাদের শিবিরে বহুকাল অচল। মাতৃ-পরিচয় নিয়েও কেউ মাথা ঘামায় না। শিশুর জন্ম বহুকাল তাদের শিবিরে হয় নি। যখন হ'ত তখন বছর তিনেক মাত্র মাতৃ-নিলয়ে শিশু ও মাতা একত্র স্থান পেত। তারপর থেকেই কৈশোর না পার হওয়া পর্যন্ত বালক-বালিকাকে থাকতে হ'ত মন্ডলাবাসে বয়স্কদের থেকে পৃথক-ভাবে। শিবির-জীবনের শিক্ষা-দীক্ষা জীবন-রহস্যের পাঠগ্রহণ সব সেইখানে। প্রাভার শিবিরে বহুকাল থেকে নারী ক্রমশঃ বিরল হয়ে আসছে। তাদের সময়ে মন্ডলা-বাসে বারোটি কিশোরের মধ্যে তিনটি মাত্র কিশোরী ছিল। মন্ডলাবাসের নীতি অনু-যায়ী তাদের বারোজনেরই এই তিনটি কিশোরীর সঙ্গে যৌবন-লীলার অভিনয় করার কথা। পরন্ত কিন্তু সেই কিশোর বয়সেই বিরূপ ছিল এ সবের প্রতি। মন্ডল-মুখ্যের ভৎর্সনা ও শাসনের ভয় সে অগ্রাহ্য করত। বুবন তখন থেকেই নিজের চেয়ে পরন্তের জন্যেই চিন্তিত হ'ত বেশী। পরন্তকে পক্ষপুটে রক্ষা করবার মত একটা অদম্য ব্যাকুলতা সে তখনই অনুভব করেছে। মন্ডলাবাসে থাকতেই তার এবং পরন্তের মাতা যে ভিন্ন তা সে জেনেছিল। পিতার সঙ্গে ত নয়ই মন্ডলাবাসে মাতার সঙ্গেও দেখাশোনার কোন রীতি নেই। তবু কোন কোন জননী আদিম বাৎসল্যের প্রেরণায় সন্তানকে দেখবার আশায় মন্ডলা-বাসের আশেপাশে ঘোরাঘুরি না করে পারত না। পরন্তের জননীকেও সে আসতে দেখেছে এইভাবে এবং সে উপস্থিত থাকলেও শুধু পরন্তকেই আদর

কয়াতে বুঝেছে পরজের মাতার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।

পরজ অবশ্য নিজের জননীর এই স্নেহের উচ্ছলতাতেও কেমন যেন অস্বস্তি-বোধ করত। যথাসম্ভব এড়িয়েও চলতে চাইত তাই।

মাতৃস্নেহের এ ধরণের উচ্ছ্বাস শিবির-জীবনে একান্ত বিরল। পরজের তাতে অস্বস্তি অনুভব করা তাই হয়ত ঠিক অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু আরো বহু ব্যাপারে পরজ একটু দলছাড়া অদ্ভুত প্রকৃতির ছিল সেই বয়স থেকেই।

যুবনের তার প্রতি মমতা ও আকর্ষণের কারণ তাই কিনা কে জানে।

সেই মণ্ডলাবাসে শৈশব কৈশোর কাটিয়ে যৌবনে শিবির-সেবক হওয়া পর্যন্ত পরজ ও তার সৌহার্দ্য বেশীর ভাগ একতরফা হলেও অটুট থেকেছে। বুবন শিবির-সমাজের শ্রেষ্ঠ শিকারী হয়ে উঠেছে দিনে দিনে, সকল দিকেই সহজাত ক্ষমতার পরিচয় দিলেও পরজ কোন বিষয়ের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারেনি শুধু যেন আগ্রহেরই অভাবে।

দুরু নন্দক কি আজিবের মত উদ্ভট কোন নেশাও তার মধ্যে কখনো দেখা যায়নি। দুরুর ইতিহাস-উদ্ধারের তন্ময়তা, আজিব ও নন্দকের দুর্বোধ সব খেয়াল শিবিরে তখন পরিহাসের খোরাক জুগিয়েছে। এক ধরণের নির্দোষ অপ্রকৃতিস্থতা বলেই ধরে নিয়ে সবাই এদের প্রতি করুণাই অনুভব করেছে মনে মনে। পরজ তা করেনি। বহু সময় পরজকে এদের সঙ্গে গভীর আলোচনায় ব্যয় করতে দেখে বুবন বিস্মিত হয়েছে তখনই। কিন্তু এই কৌতূহলটুকুর পরিচয় দেওয়া ছাড়া পরজ তাদের পথের পথিক হওয়ার কোন লক্ষণ দেখায়নি।

দুরু নন্দক ও আজিব যখন নিরুদ্দেশ হয় তখন অবশ্য ব্যাপারটাকে স্বেচ্ছা-অপসারণ বলে শিবিরে কেউ সন্দেহ করেনি। দুর্ঘটনা বলেই ধরে নিয়েছিল। এমন দুর্ঘটনা যার মধ্যে ভিন্ন গোষ্ঠীর হাত থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু প্রাভারেরা কাপুরুষ নয়। শিবির-সেবক কেউ নিরুদ্দেশ হলে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে প্রতিশোধ খোঁজে না। ইওসোভদের সঙ্গে এ বিষয়ে তাদের মিল আছে। পুরুষ বা নারী হরণ তারা স্বাভাবিক বলেই মেনে নেয়। তিন তিন জন শিবির-সেবক পর পর নিখোঁজ হবার পর তাদের শঙ্কিত সতর্কতা শুধু কিছুদিন বেড়েছিল।

পরজের নিরুদ্দেশ হওয়া কিন্তু সেটুকু ক্ষীণ চাঞ্চল্যও যেন জাগায়নি। শিবির-জীবনে ক্লান্তি ও হতাশা ক্রমশঃই গাঢ় হয়ে আসছে। শিবির-সমাজই অমোঘ বিলুপ্তির পথে। দু'চারজনকে অকালে হারালে অস্থির হবার বুঝি কিছু নেই।

অস্থির হয়েছিল শুধু একা বুবন। প্রথম প্রথম পরজ যে নদীতীর থেকে নিরুদ্দেশ হয় তারই ধারা অনুসরণ করে যতদূর সম্ভব তন্নতন্ন করে খুঁজেছে। নদীটি কিন্তু এমন কিছু বড় নয়। তাছাড়া তার অগভীর জলের স্রোত এমন প্রবল নয় যে পরজের মত দক্ষ সাঁতারুর সেখানে বিপদের সম্ভাবনা। তবু আকস্মিক দুর্ঘটনার কথা ভেবে কয়েকদিন দুই তীরের কোথাও সে সন্ধান করতে বাকি রাখেনি।

এ সন্ধানে বিফল হয়ে ইওসোভদের শিবির-এলাকাতেও সে ঘুরে বেড়িয়েছে কয়েকদিন পরজের খোঁজ পাবার আশায়। ইওসোভ ও প্রাভারদের মধ্যে নারীপুরুষ-হরণের প্রতিযোগিতা এককালে খুবই প্রবল ছিল। ইদানীং তা প্রায় থেমে গেলেও পরজের সেখানে বন্দী হওয়া একেবারে অসম্ভব নয়। ভাগ্যক্রমে ইওসোভদের শর্ভের সঙ্গে দেখা না হয়ে গেলে আরো কতদিন সেখানে নিষ্ফল সন্ধানে কাটাতে হত কে জানে!

শর্ভ ইওসোভদের এক ব্যতিক্রম, দুরু আর তার সাথীরা এমন কি পরজও যেমন ব্যতিক্রম প্রাভারদের। শিবির-জীবনে তারা নিজেদের সম্পূর্ণভাবে মিশিয়ে দিতে কিছুতেই পারে না। ইওসোভ আর প্রাভার-দের শিবির-সারথিদের মতে তাদের মধ্যে নাকি সুদূর পৌরাণিক যুগের বিকৃতি কিছুটা প্রতিফলিত। শিবির-সমাজে তাই তারা অনেকখানি অচল।

শর্ভকে বুবন ভালো করে জানবার সুযোগ পেয়েছিল বহুদিন আগে। প্রাভারদের হাতে বন্দী হয়ে শর্ভকে কিছুকাল তাদের শিবিরে কাটাতে হয়। প্রাভারেরা শেষ পর্যন্ত প্রচলিত রীতি লঙ্ঘন করে তাকে যে মুক্ত করে দেয় তার আসল কারণ শর্ভের অদ্ভুত অপ্রকৃতি-স্থতা। দুরু বা পরজের সঙ্গে সে বিকৃত মনোভঙ্গির কোন মিল নেই। প্রজননের দিক দিয়ে তার অক্ষমতা প্রমাণিত হবার পরও শিবির-বিধিঅনুসারে তার প্রাভারদের মধ্যে থাকবার কথা। কিন্তু প্রাভারদের শিবির-সারথিরাই শর্ভের আচরণে ও কথায় উদ্ভ্রান্ত উত্যক্ত হয়ে স্বেচ্ছায় তাকে বিদায় দিয়েছে।

সত্যিই শর্ভকে নিয়ে যেন হাস্য-পরিহাসও ঠিক জমত না। অদ্ভুত অকল্পিত তার সব জিজ্ঞাসা ও জল্পনা। কেন এ সৃষ্টি, কি অর্থ জীবনের, জন্মমৃত্যুর এ দুর্বোধ প্রবাহ কোথায় ধাবমান। মৃত্যুই কি সমাপ্তি, সত্য কি শ্রেয়ই বা কি, এসব প্রশ্ন শুনতে ও তার বিচার করতে কোন শিবিরেরই কেউ অভ্যস্ত নয়। এসব অবান্তর নিরর্থক বিচার নিয়ে হাসাহাসি করতে গিয়েও অনেকেই কেমন যেন যন্ত্রণা-তীব্র অস্বস্তি অনুভব করেছে। শিবির-সারথিরা শর্ভের সঙ্গে এসব আলোচনা অনুচিত বলে ঘোষণা করেছে। তবু বয়স্করা শর্ভকে এড়িয়ে চললেও মণ্ডল-মুখ্যদের শাসন অগ্রাহ্য করে বয়ঃসন্ধিগত কিশোর-কিশোরীরা শুধু অদ্ভুত কিছুর উত্তেজনাতেই তাকে অনুসরণ করেছে সময় অসময়ে। বয়স্কদের মধ্যে দুরু আজিব ও নন্দককে শর্ভের সঙ্গে আলোচনা করতে দেখে কেউ অবশ্য তেমন কিছু মনে করেনি। বিস্মিত হয়েছে বুঝি পরজকেও মাঝে মাঝে শর্ভের সঙ্গী হতে দেখে। পরজ ও শর্ভ মিলিত হলে অবশ্য তর্কের ঝটিকাই উঠেছে সর্বক্ষণ। বুবন উপস্থিত থাকলে সে তর্কের বিশেষ কিছু বোঝেনি। কিন্তু এই নিরর্থক বাক্যব্যয় তার কাছে ক্লান্তিকর হলেও কি যেন একটা দুর্বোধ যন্ত্রণা জাগিয়েছে তার মনে।

শেষ পর্যন্ত শর্ভকে শিবির থেকে বিতাড়িত করার পর অনেকেই যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। দুরু ও তার সঙ্গীদের অদ্ভুত সব নেশা সম্বন্ধে অন্ততঃ উদাসীন হয়ে থাকা যায়, তাদের নিজের খেয়ালে থাকতে দিলে কারুর কোন লাভ-লোকসান নেই। কিন্তু শর্ভের বেলা নির্লিপ্ত নির্বিকার থাকা যেন কঠিন। শর্ভের সঙ্গে আলাপ করবার চেষ্টা না করলেও তার উপস্থিতিই যেন মনের মধ্যে অস্বস্তিকর জিজ্ঞাসার ঢেউ তোলে।

ইওসোভ শিবিরের আশেপাশে ঘোরা-ঘুরির সময় এই শর্ভের সঙ্গেই হঠাৎ দেখা হয়ে গেছল।

ইওসোভরা সমতল প্রান্তরের সীমায় পার্বত্যভূমির একটি নাতিউচ্চ টিলায় ওপর প্রস্তর-শিবির নির্মাণ করে থাকে। তাদের টিলার পাদদেশের দুর্গম অরণ্যভূমির এক প্রান্তে সেদিন সন্ধ্যায় শর্ভকে নিশ্চিন্তমনে একটি বৃক্ষের কর্তিত কাণ্ডের ওপর বসে থাকতে দেখে বুবন বিস্মিত হয়েছিল। প্রথমে শর্ভবলে দূর থেকে চিনতে পারেনি। মনে করেছিল ইওসোভদের কোন অরণ্য-প্রহরী ওখানে বুঝি বসে আছে। পরে অরণ্য-প্রহরীর হাতে বা কাছাকাছি ধনুর্বাণ না দেখে সংশয়ান্বিত হয়ে আরো একটু কাছে অগ্র-সর হয়ে শর্ভ বলে চিনতে পেরেছিল।

শর্ভের এইভাবে ঘনায়মান সন্ধ্যায় বসে থাকাও অবশ্য একটু অদ্ভুত। বিশেষ কোন প্রয়োজন না হলে কিংবা পাহারায় না থাকলে সূর্যাস্তের আগেই শিবিরে প্রত্যাবর্তনের নিয়ম সকলের পক্ষেই অবশ্যপালনীয়।

শর্ভকে চিনতে পেরে সাহস করে সে কাছে এগিয়ে গিয়ে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেছিল,—শর্ভ তুমি এখানে! শিবিরে যাওনি?

কোন উত্তর না দিয়ে শর্ভ কিছুক্ষণ তার দিকে যেন কৌতুকদৃষ্টিতে চেয়ে দেখেছিল। তারপর হেসে বলেছিল, আমায় আবার বন্দী করতে এসেছ নাকি! চলো আমি প্রস্তুত।

বুবন অপ্রস্তুত বোধ করে বলেছিল, না না, তোমায় বন্দী করতে আসব কেন? সন্ধ্যা হয়ে গেছে তবু শিবিরে না ফিরে গিয়ে বসে আছ দেখে বিস্ময় লাগছে।

তাহলে তোমায় দেখেও আমার বিস্মিত হওয়া উচিত। আগেকার মতই কৌতুক-কুঞ্চিত মুখে বলেছে শর্ভ, তোমার শিবির আমার চেয়েও দূর মনে হচ্ছে।

মনে হবার কি আছে? কতদূর তা তো তুমি জানো। তুমি কি আমায় চিনতে পারনি? বুবন সংশয়ভরে জিজ্ঞাসা করেছে।

না। আমি কাউকে চিনি না। তোমাকেও চিনতে পারিনি। তাই বিস্মিতও হইনি তোমার এখানে আসায়। বিস্মিত হওয়া আমি ভুলে গেছি।

এই আবার সেই অপ্রকৃতিস্থতা শুরু হল ভেবে উদ্বিগ্ন হয়েছিল বুবন। শর্ভের সঙ্গে দৈবাৎ সাক্ষাৎ হওয়া সৌভাগ্য সন্দেহ নেই। তার কাছে পরজের সংবাদ পাওয়া এমন কিছু অসম্ভব নয়। কিন্তু একবার এই ধরণের বাতুলতা শুরু করলে আর তার মুখ থেকে সঠিক সংবাদ কিছু বার করা যাবে কি?

তবু শর্ভকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আসল প্রসঙ্গে নিয়ে যাবার আশায় বুবন বলেছিল, তুমি এখন শিবিরে ফিরে যাবে নিশ্চয়?

শর্ভ মাথা নেড়ে বলেছিল, না ফিরে যাব

না, এগিয়েও যাবো না কোথাও। যাওয়া-আসার এই করুণ প্রহসনেরই আমি শেষ দেখতে চাই।

বলতে বলতে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল শর্ভ,—গতি! গতি! গতি! যেদিকে চাও যা কিছু ছোঁও সবই চলছে, শুধু চলছে। কেন? ভাবতে পারো না একবার, যে সব কিছু থেমে গেছে? সূর্য অস্ত যেতে গিয়ে অনড় হয়ে আছে দূরে পাহাড়ের ওপর লম্বমান। পাহাড়ের নির্ঝর গুহামুখে আছে থমকে থেমে, পাখির পাখা বাতাসে অচল। বাতাস বইতে ভুলে গেছে তুমি আমি সবাই স্থির অপরিবর্তনীয়, সৃষ্টিময় অনন্ত নিশ্চলতা! সব কিছুর ওপর শেষ চিরন্তন দাঁড়ি!

হঠাৎ আবার উচ্চস্বরে হেসে উঠেছিল শর্ভ। তার দিকে যেন অনুকম্পাভাবে তাকিয়ে বলেছিল তারপর, না এ চরম নিশ্চলতা ভাবতেও পারো না! কারণ তুমি আমি চলা দিয়েই তৈরী। কিন্তু কেন? কোথায় চলা? কেন চলা?

তখনই বুবনের মনে হয়েছিল শর্ভের অপ্রকৃতিস্থতা আগের চেয়ে অনেক বেশী বেড়েছে।

তার কাছে কোন সংবাদ সংগ্রহের আশা যখন প্রায় ছেড়ে দিয়ে সরে যাবে কিনা ভাবছে তখন শর্ভ নিজে থেকেই হঠাৎ যেন সম্পূর্ণ সুস্থভাবে বলেছিল, আমার কথা গ্রাহ্য কোরো না বুবন। এ সব আমার নিজেকেই নিজের জিজ্ঞাসা। শুধু সরবে কখনো বলে ফেলি বলে কেউ তা শুনে ভয় পায় কেউ বিরক্ত হয়। আমি শুধু উত্তরই খুঁজছি না বুবন প্রশ্নও খুঁজছি। আমার ধারণা প্রশ্নটা ঠিকমত ধরতে পারলে উত্তর হয়ত আপনিই মিলে যাবে।

একটু থেমে শর্ভ আবার বলেছিল, এখন এ শত্রুরাজ্যে কি উদ্দেশ্য নিয়ে হানা দিয়েছ বল দেখি! আমার অদর্শনে কাতর হয়ে ছুটে আমাকেই দেখতে এসেছ বলে ত মনে হচ্ছে না।

উৎসাহ পেয়েও সরাসরি তখনই প্রশ্নটা করতে বুবন ভরসা পায়নি।

বুবনের দ্বিধা দেখে শর্ভ আবার বলেছে, ভয় নেই। ইওসোভ শিবিরে আমি তোমায় ধরিয়ে দেব না। ও শিবিরের আমি কেউ নই—ভাবতে পারো। ওখানে অন্ততঃ থাকি না।

শিবিরে থাকো না। তবে থাকো কোথায়? বুবন প্রশ্ন করেছিল সবিস্ময়ে।

যেখানে দেখছ সেইখানেই। হেসে বলেছিল শর্ভ, এখান থেকে কোথাও যাবারও দরকার হয় না। ফিরে আসবারও। এ সেই অচলতার অভিমুখে প্রথম একটা ধাপ।

আবার পাগলামি শুরু হবার উপক্রম দেখে বুবন উদ্বিগ্নভাবে নিজের কথাটা এবার না তুলে পারে নি। বলেছিল, তোমাদের শিবিরের একটা খবর জানাবার জন্যেই এদিকে এসেছি। কিন্তু তুমি যে বলছ শিবিরেই থাকো না...

বাধা দিয়ে শর্ভ বলেছিল, শিবিরে থাকি না বলে তার খবরও রাখি না ভাবছ কেন! হয়ত বেশী করেই রাখি। শিবিরের কোন্ প্রাচীর দুর্বল সে খবর অবশ্য তোমায় জানলেও দেব না।

না, সে খবর নয়। বুবন আসল প্রশ্নটা এবার করেছিল, পরজকে তোমাদের ইওসোভরা কি ধরে নিয়ে এসেছে জানো?

পরজ তাহলে তোমাদের শিবিরে নেই! শর্ভ যেন উল্লাসের সঙ্গে বলে উঠেছিল, আমি জানতাম!

কি বলছ কি? বিমূঢ়ভাবে প্রশ্ন করেছিল, কি তুমি জানতে? তাকে ধরবার ফন্দির কথা? ইওসোভরাই তাহলে তাকে ধরে নিয়ে এসেছে?

না, না ইওসোভরা তাকে ধরে আনেনি। আমার কথা তুমি বিশ্বাস করতে পারো। কেউ তাকে ধরেনি। সে নিজেই তোমাদের শিবির ছেড়ে গেছে। যে ঝরনার মুখ আমি তার মধ্যে খুলে দিয়ে এসেছিলাম তাই একদিন তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে আমি জানতাম।

এসব কথা পাগলের প্রলাপ বলেই মনে হয়েছিল বুবনের। শুনতে তার আর ভালো লাগেনি। ইওসোভদের শিবিরে পরজ যে বন্দী নয় সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হবার জন্যে শুধু সে আর একবার জানতে চেয়েছিল, পরজ তাহলে তোমাদের এখানে নেই ঠিক জানো?

জানি জানি। ইওসোভেরা তার কেশাগ্রও স্পর্শ করেনি যেমন জানি, তেমনি জানি একদিন যে আমার বিরুদ্ধে সবচেয়ে প্রবল প্রতিবাদ জানিয়েছে সেই আজ কোন্ দুর্গম নিভৃতে আমারই ধ্যানের অচলতায় নিথর হবার জন্যে ব্যাকুল। আমাকে পরাস্ত করতে যে-তর্কের তুফান সে তুলেছে তাতে তার নিজের মনের মোহাবরণই গেছে সরে।

শর্ভকে তার উচ্ছ্বসিত প্রলাপের মধ্যেই ফেলে এসেছিল বুবন। পরজ ইওসোভ শিবিরে নেই শর্ভের এই খবরটুকুকে বিশ্বাস করা যেতে পারে সে তখন বুঝেছে।

কিন্তু পরজ তাহলে কোথায়? কোন অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনায় নিশ্চিহ্নভাবে সে নিহত একথা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। শর্ভের অর্থহীন প্রলাপে যে ইঙ্গিত আছে তাই কি তাহলে সত্য হওয়া সম্ভব? পরজের এই নিরুদ্দেশ হওয়া আত্মনির্বাসন ছাড়া কিছু নয় এ কথা ভাবতে মন চায় না। পরজকে সম্পূর্ণ সে কখনও ঠিক বোঝেনি, কিন্তু এত বড় পরিবর্তনের কোন আভাস পরজ তাকে দেবার চেষ্টাও করেনি মনে হলে একটা অভিমানও জাগে।

তবু পরজের এ পরিণতিও বুঝি ভালো। ভালো কাফ্রামদের হাতে বন্দী হওয়ার চেয়ে।

শর্ভের কথা ঠিক না হলে একমাত্র সেই সম্ভাবনা ত বাকি থাকে।

সেই নিদারুণ সম্ভাবনার সত্য-মিথ্যা যাচাই করতেই চরম দুঃসাহসে নিজের বিপদ অগ্রাহ্য করে কাফ্রামদের এলাকায় নিঃশব্দে কয়েকদিন কাটিয়েছিল। গতিবিধির গোপনতার জন্যে ধনুর্বাণ পর্যন্ত সঙ্গে রাখেনি।

এ সন্ধান নিষ্ফলই হয়েছে।

অন্য সমস্ত শিবিরে আসন্ন অবলুপ্তির ক্লান্তি ও শৈথিল্য ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে। কাফ্রামরা কিন্তু সারাক্ষণ হিংস্রভাবে সজাগ। তাদের বিনিদ্র পাহারার বেষ্টনী গোপনে ভেদ করে যাওয়া অসম্ভব বলেই বুঝেছে বুবন।

কাফ্রামদের সঙ্গে আর সকলের এ প্রভেদের কারণ কি?

প্রাভার ও ইওসোভদের মধ্যে অবশ্য পুরুষেরই আধিক্য। কাফ্রামরা যেন এ অসামঞ্জস্যের পাল্লা ঠিক রাখতে অতিমাত্রায় নারীপ্রধান। ইওসোভদের মধ্যে পুরুষে নারীর তবু কিছুটা ধরবার মত অনুপাত আছে। প্রাভার আর কাফ্রামরা সম্পূর্ণ বিপরীত এ দিক দিয়ে। প্রাভারদের মধ্যে নারী যেমন অতি বিরল হয়ে এসেছে কাফ্রামদের মধ্যে তেমনি পুরুষ প্রায় অনুপস্থিত।

প্রধানতঃ নারীসমাজ বলেই কি কাফ্রামদের বলিষ্ঠ প্রাণশক্তি এখনো এমন অক্ষুণ্ণ?

কি বলেছিল দুরু? কাফ্রামদের হাতে স্বেচ্ছায় বন্দী হয়ে দেখলেও পারত! কি দেখত সেখানে? দেখবার কোন সুযোগই কি আর পেত! পরজের সন্ধান বাইরে থেকে পাওয়ার যদি বা ক্ষীণতম আশা থাকে একবার কাফ্রামদের হাতে বন্দী হলে একেবারে নিরন্ধ্র কারাজীবন। বিলুপ্তি-রোধের দুঃসাধ্য দুর্বোধ কোনো সাধনা যে দুরুরা সত্যই করছে এ বিষয়ে এখন আর তার মনে সন্দেহ নেই। কিন্তু সে সাধনার যত মূল্যই থাক বাস্তববোধ এই প্রকৃতির মানুষের কত অল্প তা সে ভালো করেই জানে। কাফ্রামদের হাতে বন্দী হওয়া মানে যদি শুধু সমাজভর্তা হওয়া হত তাহলেও তেমন আতঙ্কের বুঝি কিছু ছিল না। পুরুষপ্রধান বলে তাদের প্রাভারদের মধ্যেও শিবিরবন্ধু আছে। তাদের জীবন

শুধু মুক্ত স্বাধীন নয়, মর্যাদাতেও তারা অদ্বিতীয়া। শিবিরকন্যা বা অপহৃতা যাই হোক তাদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই। কিন্তু কে না জানে কাফ্রামদের হাতে বন্দী যারা হয় তাদের জীবন পিঞ্জরাবদ্ধ পশুরও অধম। কাফ্রামদের নিজেদের পুরুষ ছাড়া আর কাউকে সেখানে সমাজভর্তা করা হয় না। বন্দী হয়ে যারা আসে তারা সেই সমাজভর্তাদের কল্যাণে বলির প্রাণীর মত ব্যবহৃত হয় মাত্র।

কে জানে পরজ ইতিমধ্যে তেমনি হয়ে জীবন্মৃতরূপে দিন কাটাচ্ছে কিনা!

এখন সমস্যা কিন্তু পরজের উদ্ধারের চেয়ে আরো অনেক বড় কিছুর। সমস্ত মানব-জাতির ভবিষ্যৎ সংকট-শিখরে দুলছে।

মানব জাতির ভবিষ্যৎ কথাটা মনে আসতেই একটা বিহ্বল বেদনা জাগে। সত্য মিথ্যা জানে না কিন্তু একদিন শিবিরে থাকতে এই দুরুর কাছেই যেন পুরাণ-কল্পনা শুনেছিল। মানব জাতি বলতে শুধু বিবদমান তিনটি নগণ্য শিবিরের কথা কেউ নাকি ভাবতে পারত না। বল্মীক-স্তূপে যত কীট ধরণীময় মানুষের বসতি নাকি তার চেয়ে জনবহুল হ'ত। রাত্রির আকাশে যত তারা তত যোদ্ধা এক এক পক্ষে লাজত সংগ্রামের জন্যে।

তখন শুনে হেসেছিল। উপহাস করেছিল দুরুকে। এখন কেন যেন সে ইচ্ছে করে না। তিন শিবিরে সবসুদ্ধ মানব-প্রতিনিধি কতজন এখন বর্তমান? বড় জোর বিংশ বিংশতি। এই সংখ্যাও প্রতিদিন হ্রাস পাচ্ছে। যারা যাচ্ছে তাদের স্থান পূরণ হচ্ছে না নবজন্মে। এই অন্তর্বিরোধ যত তীব্র হয়ে উঠবে মানব জাতির শেষ প্রতিনিধিদের সংখ্যা হ্রাস পাবে তত দ্রুত। বহুকাল কোন নবজাতক কোথাও দেখা যায়নি। নবজন্ম যদি আর না হয় তাহলে বিশ ত্রিশ বৎসরও আর কাটবে না। তার আগেই ধরণী মনুষ্যহীন হয়ে যাবে। দুরুদের সাধনা সার্থক কিনা তা জানবার অবসরও মিলবে না।

না, আশার সেই ক্ষীণ দীপটুকুকে কিছুতেই অকালে নিভতে দেওয়া চলবে না। যেমন করে হোক এ সংগ্রাম বন্ধ করতেই হ'বে। সম্ভব হ'লে নিজেদের ও অন্যদের শিবিরে গিয়ে জনে জনে প্রতিটি শিবিরসেবককে বোঝবার চেষ্টা করত। কিন্তু এখন সে চেষ্টা বৃথা। আঘাতের বদলে প্রতিঘাতের সংস্কার এমন মজ্জাগত, পরস্পরের হিংসা ঘৃণার ইতিহাস এত দীর্ঘ, যে বিলুপ্তি নিশ্চিৎ জানলেও কেউ সংগ্রামে ক্ষান্ত হবে না। আর প্রাভার বা ইওসোভদের যদি বোঝানো সম্ভবও হয়, কাফ্রামদের নিরস্ত করা অসম্ভব। তাদের সমাজজীবনের ভিত্তিই হল এই প্রতিহিংসার শপথ।

একমাত্র অপহৃতা বা পলাতকা কাফ্রাম নারীকে প্রত্যর্পণ করতে পারলে এ হিংসার তাণ্ডব বন্ধ করা যেতে পারে।

তাই সে করবে।

প্রাভারদের শিবিরে কাফ্রাম নারী বন্দিনী হয়েছে এ কথা তার বিশ্বাস হয় না। ইওসোভদের সম্বন্ধে একেবারে সন্দেহ-মুক্ত সে নয়। এই দুই শিবিরের কোথাও যদি সে বন্দিনী সত্যিই থাকে তাহলে কোন অনুনয় বিনয়ে শিবির-সারথিরা তাকে ফিরিয়ে দেবে বলে বিশ্বাস হয় না। এ প্রত্যর্পণ শিবির-ধর্মের বিরোধী। সুতরাং বুবনকে অসাধ্যসাধনের জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। যদি অপহৃতা হওয়ার অনুমান সত্য হয় তাহলে নিজেদের বা ইওসোভদের শিবির থেকে বন্দিনীকে সে নিজেই হরণ করবে। তার শিকার-নৈপুণ্যের এই হবে চরম পরীক্ষা।

মনে মনে এই সব কথাই পর্যালোচনা করতে করতে বুবন অন্ধকারে অপরিচিত বন-পথের বাধা অতিক্রম করে এগিয়ে যাচ্ছিল।

আপাততঃ তার গন্তব্য ইওসোভদের শিবির-প্রান্ত বলেই সে স্থির করেছে।

প্রাভারদের চেয়ে সেই শিবিরে অপহৃতাকে পাবার সম্ভাবনা কিছু বেশী।

তা ছাড়া এই সঙ্কটে শর্ভের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে কিছু লাভ হয়ত হ'তে পারে! তার প্রলাপ-ভাবনা যত বিক্ষিপ্তই হোক তার কাছে ইওসোভ শিবিরের মনোভাব কিছুটা জানতে পারা সম্ভব। কোন কোন বিরল সুস্থ মুহূর্তে আশ্চর্য পথনির্দেশও তার কাছে পাওয়া যায়।

অরণ্যপথে বেশীদূর কিন্তু তার অগ্রসর হওয়া হল না।

রাত্রির আকাশ যেন রক্তাক্ত ছুরিকায় বিদীর্ণ করে একটির পর একটি বহ্নিতীর তার মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল।

এ তীর কারা ছুড়ছে তা বুঝতে দেরী হল না। কিন্তু কোথায় কাদের লক্ষ্য করে সংগ্রামের এই সূচনা?

দুরুদের বসতি ছাড়া আর কোন লক্ষ্য ত এ তীর-বর্ষণের হতে পারে না। কিন্তু এই নিরীহ নিরুপদ্রব তিনজন অসহায় সাধকের ওপরই এ প্রথম আক্রোশের আঘাত কেন? প্রতিশ্রুতি দিয়েও সূর্যোদয় পর্যন্ত অপেক্ষা করবার ধৈর্য যাদের নেই, এতকাল দুর্বল নির্বিরোধী বলে অবজ্ঞার পাত্র হিসাবে যারা বিবেচিত হয়েছে তাদের ওপরেই প্রথম অতর্কিত নির্মম আঘাত হানতে যারা দ্বিধা করে না, কোন পাশবিক জিঘাংসায় তারা উন্মত্ত?

সমস্ত অরণ্যভূমিই যেন সশব্দে তার প্রশ্নের উত্তর দেয়।

আকাশ-ধরণীতে আতঙ্কের শিহরণ তোলে কাফ্রামদের তীব্র তীক্ষ্ণ যুদ্ধোল্লাস-ধ্বনি।

কাফ্রামরা তাদের অভিযানে বেরিয়ে পড়েছে। শিকার অনুসরণের নিঃশব্দ সঞ্চরণ নয়, কল্লোলিত হিংসার প্রবাহ।

দুরুরা এই দুর্বার স্রোত এড়িয়ে কোথায় পালাবে, কোন আশা তাদের নেই জেনেও বুবন তাদের বসতির দিকে ছুটতে শুরু করে। পদে পদে অরণ্যের বাধা। কিন্তু কোন দিকেই যেন তার ভ্রূক্ষেপ নেই। যেমন করে হোক এই কাফ্রামবাহিনীর আগে তাকে দুরুদের বসতিতে পৌঁছোতে হবে। দুরু, আজিব বা নন্দক কেউই সবল শস্ত্রধর নয়। হলেও কোন সুবিধা অবশ্য হত না। তাদের একমাত্র রক্ষা পাবার উপায় কোথাও আত্ম-গোপন করে থেকে এই দুর্বার প্রবাহকে সামনে এগিয়ে যেতে দেওয়া। বুবন যদি সেইটুকু সাহায্য তাদের করতে পারে শুধু।

কিন্তু সময়মত তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারলেও আত্মগোপন করবার মত কোন আশ্রয় তাদের জন্যে খুঁজে পাবে কি?

খুব বেশী দূরে বুবনকে যেতে হয় না। জ্বলন্ত কুটীরের অগ্নিশিখায় রক্তিম আকাশই তাকে দুরুদের বসতির পরিণাম জানিয়ে দেয়।

এদিকের বনভূমির অনেকখানি সেই আগুনে আলোকিত হয়ে উঠেছে।

স্তম্ভিত হতাশায় সেই দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে বুবন চমকে ওঠে।

দূরের জ্বলন্ত বসতির রক্তাক্ত আলোকে দুটি দ্রুত ধাবমান মূর্তি ক্ষণিকের জন্যে দেখা দিয়েই আবার অরণ্যের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ওরা কারা? একটি ত স্পষ্টতই নারী-মূর্তি। এত দূরে থেকেও তাকে পিঙ্গলকেশা বলে বোঝা যায়। কিন্তু তার সঙ্গী ওই পুরুষটি কে?

ক্ষণিকের দেখাতেও তার গতিভঙ্গি যে পরিচিত বলে মনে হ'ল সে কি চোখের বিভ্রম?

চতুর্থ উল্লাসে
শৃঙ্গগ্রাহিতা

আরো এক পূর্ণিমা গত হয়েছে তারপর।

মুষ্টিমেয় মানবগোষ্ঠীর সংগ্রাম তবু থামেনি। কাফ্রামদের প্রথম আক্রমণের বন্যায় হতাহতের সংখ্যা খুব বেশীই হয়েছিল। তারপর তিন ভিন্ন গোষ্ঠীই স্বতন্ত্র সতর্ক সশস্ত্র দুর্গ-শিবিরে পরিণত হয়েছে। কাফ্রামদের বিরুদ্ধে প্রাভার ও ইওসোভরা হয়ত মিলিত প্রতিরোধে সংযুক্ত হতে পারত। কিন্তু পরস্পরের প্রতি সন্দেহে অবিশ্বাসে তা সম্ভব হয়নি। ইওসোভ শিবিরপতিদের ধারণা প্রাভাররাই এ সংগ্রামের সূচনার জন্যে দায়ী। তারা কাফ্রামদের কোন সেবিকাকে অপহরণ করে এখন তা স্বীকার করতে সাহস করছে না এই ইওসোভদের অভিযোগ। প্রাভারদের অভিযোগও অনুরূপ।

প্রাভাররা গোপনে তীর-বার্তায় কাফ্রামদের কাছে নিজেদের নির্দোষ বলে জানিয়ে তাদের সঙ্গে যোগ দেবার প্রস্তাব করেছে। ইওসোভরাও অনুরূপ উপায়ে স্পষ্টই জানিয়েছে যে প্রাভারদের অপরাধ সম্বন্ধে তারা নিঃসংশয়। কিন্তু কাফ্রামরা এ সব কথার উত্তর দেওয়াও প্রয়োজন মনে করেনি। তাদের প্রতিজ্ঞা অচল অটল। অপহৃতাকে ফিরিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত এ সংগ্রাম তারা চালিয়ে যাবে ফলাফল যাই হোক।

এই অবিরাম দ্বন্দ্বমত্ততায় তিন গোষ্ঠীরই শিবির-জীবন বিপর্যস্ত।

প্রকাশ্য সংঘর্ষ কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। তার পরিবর্তে নিরন্তর গুপ্ত আক্রমণের আশঙ্কায় সমস্ত শিবির ত্রস্ত।

শিবির-পরিধি ছাড়িয়ে কোথাও যাবার উপায় নেই। সে পরিধির মধ্যে থেকেও কেউ নিরাপদ নয়। আহার-অন্বেষণের জন্যে প্রাণ হাতে নিয়ে যারা শিবির-প্রাকার থেকে বার হয়, অনেকেই তাদের ফেরে না। আহার্য ও

femila
পূজোর শ্রেষ্ঠ নিবেদন...
ফেমিলা স্নো
জি. টির অবদান
PUJA

পানীয় দুর্লভ হয়ে আসছে ক্রমে। শত্রুর আক্রমণে শিবিরসেবকের সংখ্যা ক্রমশঃ ক্ষীয়মাণ না হলে খাদ্যসংকট আরো নিদারুণ হয়ে উঠত নিশ্চয়। এ সংগ্রাম সমাপ্ত হবার কোন আশাই আর কেউ করে না। হিংসায় বিষে জর্জর হয়েই মানব-সমাজের অনিবার্য বিলুপ্তি ঘনিয়ে আসছে—এই নিয়তিই সকলে মেনে নিয়েছে।

বুবন কি করেছে এতদিন? সেও কি এই নিয়তির বিরুদ্ধে সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল বুঝে হাল ছেড়ে দিয়েছে?

না, তা সে দেয়নি। এ পর্যন্ত সমস্ত চেষ্টায় বিফল হলেও তার সংকল্প এখনো অটুট।

সেই ভয়ঙ্কর সংগ্রাম-সূচনার রাত্রে প্রথমে সে ক্ষণিকের দেখা যুগলমূর্তিকে অনুসরণ করবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বনপথে বহুদূর অন্বেষণ করেও তাদের সাক্ষাৎ আর পায়নি। কাফ্রামবাহিনী তখন সমস্ত অরণ্য-প্রান্তর প্লাবিত করে চলেছে। কোন-ক্রমে এক বৃক্ষচূড়ায় আশ্রয় নিয়ে সে তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে আত্মরক্ষা করেছিল।

তারপর প্রভাতে ফিরে গেল দুরুদের বসতিতে।

বসতির ভস্মাবশেষই সেখানে পড়ে আছে। দুরু ও তার দুই সঙ্গীর কোন চিহ্ন সেখানে নেই। সে চিহ্ন না থাকা সে শুভলক্ষণ বলে মনে করতে পারেনি। মৃত্যুর চেয়ে বা শোচনীয় কাফ্রামদের হাতে তাদের সেই বন্দীত্বই ঘটেছে বলে ধারণা করতে বাধ্য হয়েছে।

দুরুদের বন্দী হওয়ার অর্থ বিলুপ্তি-রোধের শেষ ক্ষীণ আশাও নির্বাপিত হওয়া। কিন্তু তবু নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকতে পারেনি বুবন।

গোপনে প্রথমে নিজেদের শিবিরে গিয়ে সন্ধান নিয়ে জেনেছে কাফ্রামদের অপহৃতা সেবিকা সেখানে নেই।

নির্মম বিরোধের আবহাওয়ায় সমস্ত অরণ্য-প্রান্তরই বিপদসংকুল। তবু সমস্ত বিপদ অগ্রাহ্য করে বুবন ইওসোভদের শিবির-সীমান্তে গিয়ে সন্ধান করেছে।

সেখানে গিয়ে প্রথমে শর্ভের সঙ্গেই সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিল। কিন্তু তার দেখা পায়নি। অন্ধকার এক রাত্রে জীবন তুচ্ছ করে ইওসোভদের প্রস্তর-প্রাকার ডিঙ্গিয়ে তাদের শিবিরও খুঁজে দেখে এসেছে তারপর। সেখানেও কাফ্রামদের কেউ বন্দিনী হয়ে আছে বলে প্রমাণ পায়নি।

প্রবেশ যতটা সহজ হয়েছিল নিষ্ক্রমণ হয়নি ততটা। রাত্রির অন্ধকারে গোপনে প্রাকার অতিক্রম করলেও বুবন ইওসোভদের বেশ-বৈশিষ্ট্যটুকু অনুকরণ করে গেছে। সে ছদ্মবেশ সত্ত্বেও ফিরে আসবার সময় সন্দিগ্ধ একজন প্রহরীর দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। তাকে শেষ পর্যন্ত নিহত করেই পালিয়ে আসতে হয়েছিল। শিবির-জীবনে এরকম করে হত্যা আগে তাকে কখনো করতে হয়নি এমন নয়। কিন্তু এবারে সমস্ত মন গ্লানিতে অনুশোচনায় ভরে গিয়েছিল। জাতির বিলুপ্তিরোধের ব্রত নিয়েছে বলেই এ হত্যার অধিকার তার আছে কিনা এই প্রশ্নের দ্বিধাদ্বন্দ্বে উঠেছিল জর্জর হয়ে।

মনের এই অবস্থাতেই ইওসোভদের শিবির-সীমা ছাড়িয়ে ফিরে যাবার পথে শর্ভের সঙ্গে দেখা।

আত্মগ্লানিতে অস্থির হয়ে শর্ভের কাছে অকপটে সমস্ত বৃত্তান্ত সে না বলে পারে নি।

শর্ভ হয়ত কৌতুক-প্রলাপে সবকিছু হেসে উড়িয়ে দেবে—এ আশঙ্কা থাকলেও অপরাধ-স্বীকারের এ সুযোগ সে নিয়েছিল অন্তরের অসহ্য যন্ত্রণায়।

শর্ভ কিন্তু কৌতুক করে নি। সমস্ত কথা নীরব মনোযোগের সঙ্গে শুনে গাঢ় গম্ভীর স্বরে বলেছিল, আমি শুধু ইওসোভ হলে রক্তের বদলে রক্ত নিতাম, প্রাণের বদলে প্রাণ। কিন্তু আর আমি ইওসোভ নই, শুধু মানব-জাতির এক প্রতিনিধিও নয়। আমার কথা তুমি বুঝতে পারবে কিনা জানি না। তবু বলি আজ তোমাকে এ অন্তরের যাতনায় অস্থির হ'তে দেখে আমি উল্লসিত। তুমি শুধু প্রাভার ছিলে একদিন, তারপর মানুষ হয়েছিলে। আজ তার চেয়ে আলাদা কিছু হয়েছে, হয়েছে খোঁজার আর না বোঝার যন্ত্রণা। জ্বলে মরো বুবন, জ্বলে মরো। চরম অস্থিরতার পর অচলতার উদ্দেশ আপনি পাবে।

বুবন বোঝে নি কিছুই। বোঝবার কিছু ছিলও না বোধ হয় এই অসম্বন্ধ প্রলাপে। তবু এই এলোমেলো অর্থহীন ধাঁধার মত কথায় কেমন যেন একটু সান্ত্বনার প্রলেপ লেগেছিল তার জ্বালায়।

বিশেষ কোন লাভ হবে না জেনেও সংগ্রাম থামাবার যে উপায় সে ভেবেছে তাও এবার শর্ভকে জানিয়েছিল তার পরামর্শের আশায়।

সমস্যাটা বুঝিয়ে দিয়ে বলেছিল, প্রাভার বা ইওসোভদের কেউ কাফ্রামদের কন্যা যে চুরি করেনি সে প্রমাণ আমি পেয়েছি শর্ভ! এখন কাফ্রামদের সে কথা বিশ্বাস করাবার উপায় কি?

বিশ্বাস করাতে অত ব্যস্তই বা কেন? এবার কৌতুককুঞ্চিত মুখে বলেছিল শর্ভ।

তা না করাতে পারলে এ যুদ্ধ থামবে না যে!

যুদ্ধ থামলে মানুষ বদলাবে কি? শর্ভ হেসে উঠেছিল। মানুষ না বদলালে আজ যুদ্ধ থামিয়ে কাল আবার তার ছুতো খুঁজে বার করতে কতক্ষণ। না বুবন, যুদ্ধ থামিয়ে কোন লাভ নেই।

কিন্তু যুদ্ধ না থামলে মানুষ বলতে আর কেউ থাকবে না! বুবন গভীর উদ্বেগের সঙ্গে বলেছিল।

নাই বা রইল! মানুষকে যেমন করে হোক টিকিয়ে রাখতেই হবে এমন কি কথা আছে। থাকার যোগ্যতা যার নেই তাকে চলে যেতে হবে এই ত নিয়ম। সত্যমিথ্যা কল্পনায় মেশানো কত পুরাণ, কত কাহিনী কত ইতিহাসই ত শুনেছাম। অনেক কীর্তি ছিল তার অনেক ঐশ্বর্য অনেক ক্ষমতা, কিন্তু সে ত শুধু নিজেকে ধ্বংস করতেই চেয়েছে চিরদিন। সেই ধ্বংসই সে হোক না। এ পরিণামে এই অরণ্যের একটা বেশী পাতাও তার দুঃখে খসে পড়বে না জেনো।

শেষ কথাগুলো বলবার সময় উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল শর্ভ।

আবার তার সেই বাতুলতা শুরু হয়েছে বুঝে বুবন বিদায় নেবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু শর্ভ তাকে ছাড়ে নি।

ধরে রেখে বলেছিল, আমাকে তুমি উন্মাদ ভাবছ জানি বুবন। আমার কথায় তোমার সংকল্প তুমি ত্যাগও করবে না নিশ্চয়। এ যুদ্ধ যদি সত্যিই থামাতে চাও তাহলে যা বলি শোন। আমরা বা তোমরা যে নির্দোষ এ কথা কাফ্রামদের বোঝাবার আশা ছেড়ে দাও। তারা একমাত্র যা বুঝবে সেই হারানো কন্যা ফিরিয়ে দাও তাদের।

না পেলে ফিরিয়ে দেব কি করে? হতাশভাবে বলেছিল বুবন। আমাদের কোন শিবিরে সে নেই। কোথায় সে আছে জানলে তিমির-কন্দর হলেও গিয়ে ধরে বেঁধে আনতাম।

সেই তিমির-কন্দরেই তাহলে গিয়ে দেখলে ত' পারো। প্রাচীন প্রবাদ কি বলে জানো ত? প্রাণ হারালেও তিমির-কন্দরে খুঁজলে মেলে।

কিন্তু সে ত কথার কথা! অবিশ্বাসের সঙ্গে বলেছিল বুবন,—সত্যি তিমির-কন্দর কোথাও আছে কি?

আছে! আছে! আবার প্রলাপ শুরু হয়েছিল শর্ভের। নইলে সূর্য উঠতে না উঠতে কোথায় গিয়ে লুকোয় সব অন্ধকার! কোথা থেকে মৃত্যু আসে নিঃশব্দে হিম-শীতল অহিরাজের মত সকলের অগোচরে।

বলতে বলতে উচ্চৈস্বরে হেসে উঠে শর্ভ তাকে ছেড়ে চলে গেছল।

প্রথম উল্লাস
হুনারিনিমানি

তাদের কুটীর ভস্মীভূত হলেও দুরু, আজিব ও নন্দক তাতে মারা পড়ে নি। তাদের বসতির কাছে একটি লতাগুল্মাচ্ছাদিত অর্ধ-শুষ্ক নালায় আত্মগোপন করে কাফ্রামদের প্রথম আক্রমণ থেকেও তারা রক্ষা পায়।

তারপর দুর্গম পার্বত্য অরণ্যের ভেতর দিয়ে সাধারণ চলাচলের সমস্ত পথ সযত্নে পরিহার করে দিনের পর দিন তারা সুদূর পর্বতবেষ্টনীর দিকে অগ্রসর হয়েছে। এ পর্বতমালায় কেউ কখনো যায় নি। এ গিরিবেষ্টনী ঘন নীল মেঘপুঞ্জের মত সুদূর দিগন্তে চাক্ষুষ দেখা গেলেও পুরাণ ও কিংবদন্তীর জগতের বস্তুর মতই তাদের কাছে অবাস্তব।

দিনের পর দিন অজানা অরণ্যভূমিতে পথ হারিয়ে ক্ষুৎপিপাসায় ক্লান্ত-কাতর হয়ে তাদের মনে এই অভিযানের সার্থকতা সম্বন্ধেই সংশয় জেগেছে।

সে সংশয় প্রথম প্রকাশ করেছে, আজিব।

ক্লান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছে, যে নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় চলেছি সে তিমির-কন্দর সত্যিই কি কোথাও আছে? উপকথা রচনা যাদের বিলাস এ তাদেরই অলীক কল্পনা নয় ত?

তিমির-কন্দরে আশ্রয় নেবার পরামর্শ প্রথম নন্দকই দিয়েছিল। কিন্তু তারও আত্ম-বিশ্বাস বুঝি শিথিল হয়ে এসেছে। সে কোন উত্তর না দিয়ে নীরব থেকেছে।

উত্তর দিয়েছে দুরু। দৃঢ়স্বরে বলেছে, না, তিমির-কন্দর অলীক কল্পনা হতে পারে না। ওই দূরে গিরিমেখলা যদি দৃষ্টিবিভ্রম না হয় তাহলে তিমির-কন্দর ওখানে আছে-ই।

কিন্তু সে কন্দর খুঁজে পাবে কেমন করে? তা যে নিরাপদ হবে তারই বা স্থিরতা কি?

নিরাপদ যে হবেই কোন প্রমাণ দিতে পারবো না এখন, কিন্তু যে অঞ্চল আমরা ছেড়ে যাচ্ছি তার চেয়ে বেশী বিপদ সেখানে আছে বলে ভাবতে পারছি না। আর খুঁজে পাওয়ার কথা যদি বলো তাহলে তার নিশানা যা জানি তা খুঁজে যদি না পাই তবে বৃথাই এতদিন ইতিহাস-উদ্ধারে জীবনপাত করেছি।

কি বলে তোমার ইতিহাস? ইতিহাস থেকে যে সঠিক নির্দেশ পাবে তারই বা নিশ্চয়তা কি! নন্দকই এবার জিজ্ঞাসা করেছে।

কয়েকটি শমীবৃক্ষবেষ্টিত একটি বৃহৎ বেদীসদৃশ প্রস্তরখণ্ডের ওপর তখন তারা পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম করবার জন্যে বসেছে।

কটা শুখনো বিবর্ণ শমীগাছের পাতা এদিকে-ওদিকে পড়েছিল। তারই কয়েকটা কুড়িয়ে নিয়ে দুরু বলেছে, অরণ্যের লতা-গুল্মতরু নিয়ে যে সারাজীবন কাটিয়েছে, সে এই কটি জীর্ণপত্র থেকেই শমীবৃক্ষের ধারণা মনের মধ্যে গড়ে তুলতে পারে নাকি? এমনি যে সব স্মৃতির টুকরো আর নিদর্শন কালপুরুষ এধারে-ওধারে তার যাত্রাপথে ছড়িয়ে রেখে যায় তাই কুড়িয়েই ইতিহাসের উপাদান গড়ে ওঠে। যে চেনে বোঝে তার কাছে এই শুষ্ক পত্রে যেমন শমীবৃক্ষের রূপ, সেই উপাদানে তেমনি ইতিহাসের সত্য প্রচ্ছন্ন।

আজিব এবার একটু অধৈর্যের সঙ্গে বলেছে, এসব কথা অস্বীকার করছি না দুরু। কিন্তু তিমির-কন্দর সম্বন্ধে বিশেষ এমন কি পেয়েছে যাতে তার অস্তিত্ব ও অবস্থান সম্বন্ধে তুমি নিঃসন্দেহ, তাই জানতে চাইছি।

যা পেয়েছি তা ইঙ্গিত ও উল্লেখ মাত্র। কিন্তু তাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। দুরু দীর্ঘ আলাপের জন্যে প্রস্তুত হয়ে অর্ধ-শায়িত অবস্থায় বলতে শুরু করেছে, মানবসমাজ বলতে আমরা আমাদের তিনটি ভিন্ন গোষ্ঠীর কথাই এখন জানি। কিন্তু মুষ্টিমেয় এই কটি প্রাণী নয়—এই অরণ্যের পত্রপুঞ্জের মত একদিন অগণন মানুষ সমস্ত ধরণীকে ছেয়েছিল এ বিষয়ে তোমাদেরও নিশ্চয় কোন সন্দেহ নেই। আমাদের এ ধরণী অনন্তসলিলঘেরা অলঙ্ঘ্য পর্বত-প্রাকারবেষ্টিত সমতল এক খণ্ড আরণ্য-প্রদেশ মাত্র যে নয় তাও তোমাদের বলতে হবে না। এ ধরণী এক শূন্যে ভাসমান গোলক সূর্য-চন্দ্র-তারকারা যাকে নিত্য প্রদক্ষিণ করে। প্রাচীন জ্যোতির্বশাস্ত্রের দু'চারটি যে বাণী পুরাণ কিংবদন্তীর মধ্যে বিক্ষিপ্ত ভাবে পাই তাতে এমন কথাও আছে যে, এ মহাগোলক মহাকাশের কেন্দ্রবিন্দু নয়, এই ধরণীই সূর্যের চারিদিকে বিশাল বৃত্তপথে নিত্য ভ্রাম্যমাণ। সে যাই হোক যে ধরণী-গোলকে একদিন মানব স্থানের জন্য কাড়াকাড়ি করেছে, তাতে শেষ কটি মানব-প্রতিনিধি কেন যে আজ লুপ্ত হতে চলেছে সে সম্বন্ধে অনুমান কল্পনা ও প্রমাণ মিশিয়ে কিছু ধারণা আমরা করতে পেরেছি। বহু কল্প আগে আজকের দিনের মরীচির পরিবর্তে পুলহ কি পুলস্ত্য যখন উত্তরা-কাশের ধ্রুবজ্যোতি তখন মানবসমাজ শক্তি ও সমৃদ্ধির চরম শিখরে পেঁৗছোয়। মানুষের পরমায়ু তখন দ্বিশতোর্ধ্ব বিংশতিই ছিল না, যৌবনকালই স্থায়ী হ'ত দুই বিংশতি বৎসর। সেই মহাযুগের ঋষি-তাপসেরা কিন্তু ভ্রষ্ট হ'য়েছিলেন তাঁদের স্বধর্ম থেকে। তাঁরা জেমের

চেয়ে ক্ষমতাকেই আরাধ্য করে অসাধ্য সাধন করেছিলেন সত্য, কিন্তু সেই সিদ্ধি থেকেই মানবসমাজের সর্বনাশ। সেই তাপসেরা সূর্যকেও হীন করতে চেয়েছিলেন এবং তাঁদের আশ্চর্য সাধনায় এই ধরণীতেই অগণন সূর্যশাবক সৃষ্টি করেছিলেন। মানবের হাতে নির্মিত হয়েও এই সূর্যশাবকেরা কিন্তু মানুষের শাসন মানে নি, সমস্ত ধরণী দগ্ধ ও বিধ্বস্ত করে তারা পিতৃলোকেই প্রস্থান করেছে। এই মহা-প্রলয় একবার নয় বহুবার ঘটেছে। প্রতি মন্বন্তরে ধরণীর মানবগোষ্ঠী ক্রমবিলুপ্ত হতে হতে শেষ এই তিনটি শিবিরে সীমাবদ্ধ হয়েছে। এই তিন শিবির-গোষ্ঠীর সুদীর্ঘ পর্যটনের কিছু কিছু ইতিহাস পাওয়া যায়। মানবসমাজের ক্রমবিলুপ্তির কারণ সূর্যতাচ্ছিল্যের এক অভিশাপ। সে অভিশাপ সমস্ত ধরণীর সলিল মৃত্তিকা ও বাতাসে মেশানো, কোথাও অল্প কোথাও বেশী। যে গামা-ঘা আমরা কুসংস্কারবশে অঙ্গের ভূষণ বলে গণ্য করতে অভ্যস্ত, তা সেই অভিশাপেরই স্মারকচিহ্ন। এ অভিশাপ পুরুষের পৌরুষ হরণ করে, নারীর নারীত্ব। যুগে যুগে শিশুজন্ম তাই ক্রমশঃ এত বিরল হয়ে এসেছে। আজ আমরা যে তিন স্বতন্ত্র গোষ্ঠী এই যৎকিঞ্চিৎ ভূখণ্ড-টুকুতে পরস্পরের শত্রুতা করছি কোন এক সুদূর মনু-কল্পাংশে ধরণীর অন্য কোথাও তাদের ভিন্ন ভিন্ন জনবহুল বসতি ছিল। গোষ্ঠী-নামের মধ্যে সেই অতীতের মিলন-বিচ্ছেদের ইতিহাস প্রচ্ছন্ন থাকলেও থাকতে পারে। এই ভিন্ন সব গোষ্ঠী অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ও অভিশাপ মুক্ত স্থানের সন্ধানে বহু যুগব্যাপী বিচরণে শেষ পর্যন্ত এই-খানে এসে যে সমবেত হয়েছে, তাতেই প্রমাণ হয় ধরণীর আর সমস্ত অংশই বর্তমানে জনশূন্য। এ ভূখণ্ডে এসে শেষ আশ্রয় নিয়েও কোন গোষ্ঠীই কিন্তু সম্পূর্ণ অভিশাপমুক্ত হ'তে পারে নি। ক্রমে ক্রমে নবজাতকের সংখ্যা হ্রাস পেতে পেতে আজ শূন্যতায় পৌঁছেছে। গোষ্ঠী-বিলোপের উদ্‌ভ্রান্ত আতঙ্কেই নিশ্চয় আমাদের নীতি-ধর্ম-সমাজবিধি সব কিছু পরিবর্তিত হয়েছে। প্রাচীন কালের চিরাচরিত সব প্রথার সঙ্গে আমাদের বর্তমান শিবির-রীতির কোন মিলই নেই। কোন সুদূর অতীতে এ সব পরিবর্তন কি ভাবে হয়েছে তা কেউ জানে না। শুধু এইটুকু পুরাণ-কথা থেকে পাই যে, আজ আমাদের গোষ্ঠীজীবনে যে শিবিরবধূ ও সমাজভর্তার সবচেয়ে বেশী সমাদর, আদিম কালে তা নাকি অবিশ্বাস্য ছিল। কিন্তু রীতি-নীতির এ আমূল রূপান্তরও নিষ্ফল। দু-একটি নতুন রীতি-নীতিও শিবিরজীবনের স্মরণকালের মধ্যে প্রবর্তিত হয়েছে, যেমন প্রজনন সার্থক করার প্রত্যাশায় ভিন্ন গোষ্ঠীর নারী ও পুরুষ হরণ। এ প্রথা খুব দীর্ঘকালের নয়। শিবিরগাথাতেই পাই যে, আমাদের তিন জীবনকাল আগে কাফ্রামরাই প্রথম নারী সংখ্যাবৃদ্ধির প্রতিকারে আমাদের ও ইওসোভদের পুরুষ হরণ করে নিয়ে যায়। তার প্রতিশোধ নিতে কাফ্রামদের কয়েকটি নারী অপহৃতা হবার পরই এই ভূখণ্ডের সবচেয়ে সাংঘাতিক সংগ্রামের আগুন জ্বলে উঠেছিল। সে আগুন তারপর স্তিমিত হয়ে এলেও একেবারে নির্বাপিত হয়নি। আজ আবার তার উন্মত্ত আস্ফালন শুরু হয়েছে।

তিমির-কন্দরের অস্তিত্ব ও অবস্থান সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর দিতে এ দীর্ঘ ভূমিকা করার কারণ এইবার বলছি শোন। আজ আমরা যার মধ্যে নিমগ্ন তার চেয়ে আরো ভয়ঙ্কর এক প্রলয়তাণ্ডবের দিনে এই তিমির-কন্দরই তখনকার এক বিশাল মানবগোষ্ঠীর শেষ আশ্রয় হয়েছিল বলে আমি সারা জীবনের সন্ধানে আবিষ্কার করেছি। মরীচিরও পূর্বে বশিষ্ট যখন উত্তর গগনের ধ্রুবজ্যোতি তখন শেষ মন্বন্তরের ধ্বংস-লীলায় সমস্ত ধরণী শ্মশান হবার উপক্রম হয়। এই ভূখণ্ডের একটি মানব-সম্প্রদায় তখন কৃত্রিম সূর্যের অভিশাপ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে পর্বত-প্রাচীর লঙ্ঘন করবার চেষ্টা করে। তাতে বিফল হয়ে তারা নগদেবের শরণ নিয়ে তাঁর করুণাভিক্ষাথী হয়। নগদেব তাদের আকুল প্রার্থনায় বিগলিত হয়ে নিজের বক্ষ বিদীর্ণ করে তাদের সেখানে আশ্রয় দেন।

নগদেবের সেই বিদীর্ণ বক্ষই তিমির-কন্দর।

সে তিমির-কন্দরে কত যুগ সেই মানব-সম্প্রদায়ের কাটে জানা নেই। কোন এক সময়ে তাদেরই একটি ক্ষুদ্র শাখাদল এই ভূখণ্ডে কোনো অজ্ঞাত কারণে আবার ফিরে এসেছিল বলে মনে হয়। তারা সেই কন্দরেই আবার ফিরে গেছে না এইখানেই আমাদের শিবির-উপনিবেশগুলি স্থাপিত হবার আগে বিলুপ্ত হয়ে গেছে তা বলা যায় না। তাদের দু-একজন শেষ প্রতিনিধি আমাদের আদি শিবির-সমাজের সঙ্গে মিশে গেছল এমনও হতে পারে। তিমির-কন্দরের কিংবদন্তীর উৎস সম্ভবতঃ তারাই।

শুধু কিংবদন্তীতে নয়, তিমির-কন্দরের অস্তিত্বের আরো বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ এই ভূখণ্ডের নানাস্থানে ছড়ানো আছে। অজ্ঞতায় ও ঔদাসীন্যে তার মূল্য আমাদের কোন শিবির-সমাজই এতদিন বোঝেনি।

ইতিহাস-উদ্ধারের সাধনায় বহু তুচ্ছ প্রস্তরখণ্ড আমায় তোমরা সংগ্রহ করতে দেখেছ। সে সব প্রস্তরখণ্ড কিন্তু সত্যই তুচ্ছ নয়। তিমির-কন্দর থেকে যে শাখাদল এই ভূখণ্ডে ফিরে আসে নিজেদের স্মারক হিসাবে কন্দরের অবস্থান ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ তারা বহু শিলাফলকে খোদিত করে নানাস্থানে রেখে যায়। কালক্রমে সে সব শিলাফলকের অধিকাংশই হারিয়ে গেছে। আমি যা সংগ্রহ করতে পেরেছি তা তার বিক্ষিপ্ত ভগ্নাংশ মাত্র। এ সব ভগ্নফলকের সত্যকার মূল্য আমিও কিছুদিন পূর্বে পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে বুঝিনি কারণ আমি যা পেয়েছি তা শুধু মূল শিলাফলকের ভগ্নাংশ নয়, তাতে যে লিপি খোদিত তাও আমাদের অজ্ঞাত।

মাত্র কিছুদিন আগে দৈবাৎ একটি ফলকাংশে আমি অজ্ঞাত-লিপির পাশে আমাদের শিবির-সমাজের আদি লিপিতে খোদিত কিছু লিখন দেখতে পাই।

কন্দর-প্রত্যাগতদের কেউ কেউ যে আমাদের সুদূর অতীতের পূর্বপুরুষদের সান্নিধ্যে এসেছিল—এ দ্বৈতলিপি তারই আভাস দেয়।

এই দ্বৈতলিপির সাহায্যে বহু চেষ্টায় আমি মূলখণ্ডগুলির অনেকখানি পাঠোদ্ধার করতে পেরেছি। তাই তিমির-কন্দর যে আছে এ বিষয়ে আমার কোন সংশয় নেই।

মাঝে মাঝে দু-একটি প্রশ্ন করার ইচ্ছা হলেও নন্দক ও আজিব এতক্ষণ নীরবে দুরুর কথা শুনেছে।

আজিব এবার উৎসুকভাবেই প্রশ্ন করলে, গুপ্ত কন্দর খুঁজে বার করার কি নির্দেশ পেয়েছ ওই শিলাফলকের লিপিতে?

যা পেয়েছি তার ভাষাও অবশ্য সাঙ্কেতিক। পর্বতদুহিতা নিষ্ক্রান্ত হয়েও সভয়ে যেখানে পিতৃক্রোড়ে ফিরে গেছেন সেইখানেই নগদেবের হৃদয় বিদীর্ণ হয়েছে জানবে, শিলাফলকে খোদিত লিপির এই নির্দেশ।

এ সাঙ্কেতিক ভাষার অর্থ তুমি বুঝেছ? জিজ্ঞাসা করলে নন্দক।

বুঝেছি বলেই আমার বিশ্বাস। দুরু স্মিতমুখে জানালে, পর্বতদুহিতা বলতে প্রস্রবণ বা নদীর উৎস বোঝাচ্ছে নিশ্চয়। কোন গুহামুখ থেকে নির্গত হয়েই এক পার্বত্য জলধারা যেখানে আবার নিকটস্থ কোন গহ্বরে প্রবেশ করেছে সেই বিচিত্র ঘটনাস্থলেই কন্দরের সন্ধান আমাদের করতে হবে।

তাহলে সমস্ত পর্বতমালাই আমাদের পর্যটন করে খুঁজে দেখতে হবে নাকি?

আজিবের কণ্ঠে শঙ্কিত বিস্ময়।

না, আরো কিছু সঠিক নির্দেশও আছে। দুরু কৌতুকস্মিত মুখে জানালে, যেমন যুগ্মশির নগদেবকে প্রণাম না জানালে তিমির-কন্দর গোচর হবে না। তার অর্থ, পর্বতমালার দুটি সমান্তরাল ও সন্নিহিত চূড়া লক্ষ্য করেই আমাদের অগ্রসর হতে হবে। সে যুগল-শৃঙ্গ আশা করি তোমরাও লক্ষ্য করেছ।

তা করেছি! আজিবকে এবার চিন্তিত মনে হ'ল। কিন্তু তিমির-কন্দর খুঁজে পেলেও সেখানে আশ্রয় পাওয়া ত সম্ভব না হতে পারে! সেই প্রাচীন সম্প্রদায় সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন যদি না হয়ে থাকে?

তারচেয়ে বড় সৌভাগ্য ত কিছু আর হতে পারে না। দুরু যেন উত্তেজিত হয়ে উঠল। নন্দকের বিলুপ্তি-রোধের সাধনার তাহলে ত আর প্রয়োজনই হয়ত থাকবে না। কন্দরবাসীদের কাছ থেকেই সে সমস্যার সমাধান আমরা পেয়ে......

কথার মাঝখানে হঠাৎ সচকিত হয়ে থেমে দুরু ব্যস্তভাবে উঠে বসল। তারপর উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করলে, শুনতে পেয়েছ কিছু!

নন্দক এবং আজিবও তখন উঠে দাঁড়িয়েছে। শমীবৃক্ষের বেষ্টনীর ওপর

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চোখ বুলিয়ে তারা জানালে যে শুধু শব্দ নয় চকিতে কি যেন একটা চলে যেতেও তারা দেখেছে। সেটা কোন বন্য মৃগ বা বরাহ নয়।

এ অরণ্যে আর কোন বৃহৎ প্রাণী আছে বলে ত জানা নেই! দুরুর ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল দুর্ভাবনায়।

বন্য কোন পশু কিনা তাই আমার সন্দেহ হচ্ছে। সংশয়জড়িত স্বরে বললে নন্দক।

বন্য পশু না হলে আর কি হতে পারে?—দুরু রীতিমত উদ্বেগের সঙ্গে যেন নিজেকেই প্রশ্ন করলে,—মানুষ? কাফ্রামদের কেউ আমাদের অনুসরণ করে এসেছে এতদূর পর্যন্ত?

না, তা সম্ভব বলে মনে হয় না। কাফ্রামদের কেউ হলে আমরা এতক্ষণ অক্ষত থাকতাম কি? শত্রুর সন্ধান পেয়েও তীর নিক্ষেপ না করে পলায়ন করা তাদের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ বলেই ত জানি।

তবু অত্যন্ত সাবধানে গোপনে এবার আমাদের অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। তিমির-কন্দরের সন্ধান আমাদের অনুসরণ করে কাফ্রামরা যেন কিছুতে না পায়। তা পেলে সর্বনাশের আর কিছু বাকি থাকবে না।

সেই সর্বনাশই যেন মনশ্চক্ষে দেখবার চেষ্টা করে দুরু কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে আবার নিম্নস্বরে বললে, যুগল-শৃঙ্গ যে আমাদের লক্ষ্য তা আমাদের গোপন রাখতে হবে এদিকে-ওদিকে গতিপথ পরিবর্তন করে। কখনো কখনো রাত্রির অন্ধকারেরও সুযোগ নিতে হবে ওদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার জন্যে।

ষষ্ঠ উল্লাস
খলেকপোতিকা

শমীকাননে দুরু ও তার সঙ্গীরা চকিতে যাকে দূর থেকে দেখেছিল, সে আর যেই হোক কাফ্রামদের কেউ নয়।

কারণ কাফ্রামদের সেই দ্বিপ্রহরেই মহা-চক্রের অধিবেশন বসেছে।

এ মহাচক্রে নিতান্ত অক্ষম পঙ্গু ও মুমূর্ষু ছাড়া কারুর অনুপস্থিত থাকবার উপায় নেই।

কাফ্রামদের মহাচক্র নিয়মিতভাবে আহূত হয় না। অতিবিরল এ সমাবেশ আয়োজিত হয় গোষ্ঠীসমাজের নিদারুণ কোন সঙ্কটে কিংবা মৌলিক কোন বিধির যুগান্তকারী প্রবর্তন বা প্রত্যাহারের জন্যে।

বর্তমান গোষ্ঠীর নেতামা ছাড়া আর কেউ কখনও মহাচক্রের অধিবেশন দেখেনি। নেতা-মাই একমাত্র এ সমাবেশ দেখেছেন তাঁর কৈশোর-জীবনে।

কাফ্রামদের বিস্তৃত বসতির চারিধারে ঋজু আরণ্য পাদপের সুউচ্চ প্রাকার। প্রত্যেকটি পাদপের শীর্ষদেশ ভল্লচূড়ার মত সূচল ও তীক্ষ্ণ। মৃত্তিকা ও কাষ্ঠ-নির্মিত তাদের গোলাকার কুটীরগুলির চূড়াও এমনি ভল্লশীর্ষ। বসতির মধ্যদেশে যে বিশাল প্রান্তর ঘিরে কুটীরগুলি সাজানো সেদিন তাইতেই সমস্ত কাফ্রামগোষ্ঠী নেতামাকে ঘিরে সমবেত হয়েছে। নেতামা নাতিউচ্চ একটি বেদীর ওপরে কাষ্ঠাসনে আসীন। তাঁর দুপাশে সশস্ত্র ভল্লশীর্ষ শিরোভূষণে সজ্জিতা দুই মণ্ডলনেত্রী।

কাফ্রামদের মধ্যে জনকয়েক সমাজভৃত্য ছাড়া প্রায় সকলেই রমণী এবং সকলেই সশস্ত্র। শরীরের গঠনসৌষ্ঠবে প্রত্যেককেই যুবতী বলে মনে হয়। প্রায় নিরাবরণ সবল সুঠাম নারীদেহে কোমলতার চেয়ে কাঠিন্যের প্রাধান্যই যেন নূতন এক আকর্ষণের উৎস সৃষ্টি করেছে। ঘন কৃষ্ণ থেকে স্বর্ণাভ-গৌর পর্যন্ত তাদের বর্ণবৈচিত্র্যও বিস্ময়কর।

এই যুবতী-সমাজে নেতামাকেই একমাত্র জরাজীর্ণ বলে বোঝা যায়। কাফ্রামদের কেশ-চর্চার রীতি অনুযায়ী তাঁর শুভ্র বিবর্ণ কেশও ভল্লশীর্ষ শিরোভূষণে সজ্জিত। মুখের চর্ম তাঁর লোল। দীর্ঘকালব্যাপী নেতৃত্বের বিচিত্র অভিজ্ঞতা সেখানে অসংখ্য বলিরেখা অঙ্কিত করে দিয়ে গেছে। বয়সের ভারে দেহ তাঁর ন্যুব্জ। শুধু দুই চোখে যেন অনির্বাণ বহ্নির দীপ্তি।

এই মহাচক্র তিনি নিজেই আহ্বান

করেছেন। কেন করেছেন তা তাঁর নিত্য-সহচরী মণ্ডল-নেত্রীরাও জানে না।

সমাজের অধিকাংশের অনুমান বিপক্ষ-শিবিরের সংগে যে সংগ্রাম চলছে তাতে বিস্ময়কর কোন নূতন রণকৌশল প্রয়োগের কথা জানাতেই এ মহাচক্রের অধিবেশন।

অভিজ্ঞতা যাদের বেশী তাদের অনুমান কিন্তু ভিন্ন। অনুমান নয় আশঙ্কা। নেতামা তাঁর পরিচালন-দণ্ড ত্যাগ করে স্বেচ্ছানির্বাসন বরণ করতে চান—এই সম্ভাবনাই তাদের উদ্বিগ্ন করেছে।

শুধু নেতামার বেলা নয় জরাগ্রাসে পতিত হলে সমাজ-বসতি থেকে স্বেচ্ছা-নির্বাসনে যাওয়ার প্রথা অবশ্য কাক্রামদের সকলের পক্ষেই পালনীয়। শক্তি সামর্থ্য ও যৌবন থাকতে সমাজ ছেড়ে চলে যাওয়া যেমন ক্ষমাহীন অপরাধ, বার্ধক্যে অশক্ত অক্ষম হবার পর বসতি ছেড়ে না-যাওয়া তেমনি লজ্জাকর। এ নির্মম প্রথা অতীতের কোন দীর্ঘ দুর্দিনের স্মৃতি সম্ভবতঃ বহন করছে। আহার্যের অভাব ও তা সংগ্রহের দুঃসাধ্যতার দরুণ সুস্থ ও সবলকে বাঁচিয়ে জাতির জীবনধারা রক্ষার জন্যে দুর্বল অসমর্থ বৃদ্ধদের আত্মত্যাগের এ প্রথা বোধ হয় প্রবর্তিত হয়েছিল।

বর্তমান ভূখণ্ডে কাক্রামদের উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছে বহু যুগ পূর্বে। এখানে আর যত সমস্যাই থাক খাদ্যের অপ্রতুলতা নেই। প্রয়োজন বহু পূর্বে লোপ পেলেও, প্রথা কিন্তু এখনও সমানভাবে প্রচলিত।

নেতামা সেই প্রথানুযায়ী নির্বাসন চাইবার জন্যেই এই মহাচক্র আহ্বান করেছেন এ ধারণা অবশ্য ভুল। নেতামার ভাষণেই তা ভালো করে বোঝা যায়।

নেতামা সে প্রসঙ্গ তোলেন না।

ঈষৎ ক্ষীণ হলেও সুস্পষ্ট দৃঢ় ও গাঢ়স্বরে তিনি বলতে শুরু করেন, আজ এই মহাচক্র কেন ডেকেছি তা জানতে সকলেই নিশ্চয় উৎসুক। মহাচক্র হেলা-ফেলার ব্যাপার নয়। মহাচক্র আহ্বান করবার দায়িত্ব নেবার আগে দীর্ঘকাল কঠিন আত্ম-জিজ্ঞাসায় আমায় অস্থির থাকতে হয়েছে। আমাদের কাক্রাম-সমাজের ইতিহাস কোন সুদূর কাল থেকে শুরু আমিও জানি না। সময়ের দুর্ভেদ্য কুজ্ঝটিকায় আমাদের আদি কাহিনী হারিয়ে গেছে। এই সুদীর্ঘ ইতিহাসেও মাত্র পাঁচবার মহাচক্রের অধি-বেশনের কথা আমি জানি। প্রথম মহাচক্র আহূত হয় কাক্রামদের প্রায় জন্মকালে। উপকথার আকারে সে বিবরণ আমরা পেয়েছি। সেদিন নাকি আমাদের জাতির প্রথম নিদারুণ মহাসংকট দেখা দিয়েছিল। আমাদের পুরাণে বলে দিন ও রাত্রির সন্তানদের মিলনে আমাদের কাক্রাম জাতির সৃষ্টি। দিন ও রাত্রির সন্ততিরা তখন এক মহাভূখণ্ডে একত্র হয়েছে কিন্তু মিলিত হ'তে পারেনি। কে তাদের শ্রেষ্ঠ এই নিয়ে তাদের দ্বন্দ্বের তখন আর বিরাম নেই। রাত্রির সন্ততিদের অন্তরের গভীরতা ও ঐশ্বর্য তারকাখচিত মহাকাশের মতই অসীম, দিনের সন্তানদের বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার

দীপ্তি সূর্যালোকের মতই প্রখর। এ দুই-এর মিলনে আশ্চর্য জাতিসত্তার জন্ম হতে পারে। কিন্তু অবিশ্বাসে ঈর্ষায় ঘৃণায় সঙ্কীর্ণতায় পরস্পরকে আঘাত করবার জন্যেই তারা এমন উন্মত্ত যে সে ভূখণ্ডের আকাশ-বাতাস পর্যন্ত হিংসায় তখন বিষাক্ত। সেই মহাসঙ্কটের দিনে রাত্রির যিনি দেখা দেন এবং প্রতি রজনীতে যাঁর আকাশে এখনো সবচেয়ে উজ্জ্বল দীপ্তিতে অবস্থান পরিবর্তিত হয় সেই নক্ষত্রশ্রেষ্ঠা সূর্যকন্যা ভিনসা এক প্রদোষে ধরণীতে নেমে আসেন এই দুই দলের বিরোধ মেটাতে। সেই সুদূর অতীতে সূর্যকন্যা প্রভাতে ও সন্ধ্যাতেই নাকি মহাকাশে দেখা দিতেন। প্রথম মহাচক্র আহ্বান করে দিন ও রাত্রির মিলনে—কাক্রাম জাতির তিনিই সৃষ্টি করেন এবং তিনিই আমাদের প্রথম নেতামা ভিনসা।

নেতামা কয়েক মুহূর্ত নীরব হ'ন। প্রায় সপ্তগুণক বিংশতি কাক্রাম যেন রুদ্ধ নিঃশ্বাসে তাঁর কথা শোনবার জন্যে একাগ্র হয়ে আছে মনে হয়।

নেতামা এবার দ্বিতীয় মহাচক্রের কথা বলেন। সেই সূত্রে প্রথম মন্বন্তরের তিনি যা বিবরণ দেন তা দূরের ইতিহাসের অনুরূপ হলেও এক নয়। সুদূর অতীতে কাক্রামরা তখন তাদের গৌরবের চরম শিখরে পৌঁছেছে। ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ এই চতুর্ভূত জয় করে তারা অসীম শক্তির অধিকারী হয়ে তখন ব্যোম-বিজয়ে অগ্রসর। ধূলিকণাকেও সূর্যপ্রমাণ করবার দুর্লভ বিদ্যা তাদের আয়ত্ত। কিন্তু সেই বিদ্যাই সমস্ত ধরণীর চরম সর্বনাশ ডেকে আনে। সূর্যস্ফুরণবিদ্যা কাক্রামদের মত আরো বহু মানবসম্প্রদায় তখন অর্জন করেছে। ব্যোম-বিজয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতাতেও তারা অগ্রসর। পরস্পরের মধ্যে মৈত্রী স্থাপনের চেষ্টা সত্ত্বেও একদিন কোনো এক সম্প্র-দায়ের অনবধানতায় সূর্যস্ফুরণবিদ্যার নির্দোষ পরীক্ষা নিষিদ্ধ সীমা ছাড়িয়ে যায়। সমস্ত ধরণীর ধ্বংসলীলার তাইতেই সূত্রপাত। মন্বন্তরের সেই মহাপ্রলয়ের দিনে দ্বিতীয় মহাচক্র আহূত হয়, সূর্য-বিকৃতিতে বিষাক্ত ভূখণ্ড ত্যাগ করে ধ্বংসাবশিষ্ট কাক্রামদের অন্যত্র প্রয়াণের সংকল্প গ্রহণের জন্যে। কাক্রামদের যুগ-যুগ-ব্যাপী পরিব্রাজন তখন থেকেই শুরু। দেশ থেকে দেশান্তরে নিরাপদ নির্বিষ আশ্রয়ের আশায় তারা নব নব উপনিবেশ স্থাপন করে, কিন্তু তাদের সংখ্যা ক্রমশঃই ক্ষয় পেতে থাকে। যত ক্ষীণই হোক জাতির ধারা প্রবাহিত রাখবার আশায় যুগান্তকারী সমাজরীতি সংস্কারের প্রয়োজন অনুভব করে আহ্বান করা হয় তৃতীয় মহাচক্র। সেই মহাচক্রেই সমাজভর্তা প্রথার প্রবর্তন। নারীর তুলনায় পুরুষের সংখ্যা তখনই যৎসামান্য হয়ে এসেছে। নবজন্ম ক্রমশঃই বিরল। আর তারই সঙ্গে সূর্যবিকৃতির প্রতিক্রিয়ায় সমস্ত ধরণী হিমশীতল হয়ে গভীর তুষারে আবৃত। সে তুষারাবরণ কত যুগ যে ধরণী থেকে অপসারিত হয়নি তার কোন হিসাব নেই। সংখ্যায় স্বল্পগণ কাক্রাম জাতি তখনই হ্রাস পেতে পেতে ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠীতে দাঁড়িয়েছে। তুষার যুগের কঠোর জীবন-সংগ্রাম থেকেই উদ্ভব হয়েছে দুটি নির্মম নীতির। অক্ষম অযোগ্য রুগ্ন, জরা-গ্রস্ত বা বার্ধক্যপীড়িতের গোষ্ঠীতে যেমন স্থান নেই, তেমনি সুস্থ সক্ষম সবলের স্বেচ্ছায় গোষ্ঠীত্যাগ অমার্জনীয় অপরাধ। সমগ্র সমাজের মৃত্যুপণ প্রতিহিংসা এই অপরাধীকে যেমন অনুসরণ করে তেমনি গোষ্ঠী থেকে কাউকে বাইরের যে শত্রু অপহরণ করে তাকেও।

চতুর্থ মহাচক্রের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে নেতামার। তখন তিনি কৈশোরে পদার্পণ করেছেন মাত্র। কাক্রামগোষ্ঠী তুষার যুগের পর বহুকালের সুদীর্ঘ পর্যটনে এই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ভূখণ্ডের সন্ধান পেয়েছিল। এ রাজ্যে আসার পরই আরও দুটি মানবগোষ্ঠীর অস্তিত্বের কথা প্রথম তারা জানতে পারে। কিছু আগে বা পরে তারাও দীর্ঘ পর্যটনের পর এখানে এসে উপনিবেশ স্থাপন করে। তাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে বিরোধ ও সংঘর্ষ হলেও কাক্রামরা এ ভূখণ্ডে অন্যান্য বহুদিক দিয়ে অনেক নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করে বহু যুগ ধরে। শিকারের ক্ষেত্র এখানে সুবিস্তৃত, খাদ্য আহরণের মত আরণ্য সম্পদও পর্যাপ্ত।

কিন্তু এ সব সুবিধা সত্ত্বেও বিলুপ্তির করাল ছায়া গোষ্ঠীজীবনে ক্রমশঃই গাঢ় হয়ে উঠেছে যুগের পর যুগে।

অবশেষে চতুর্থ মহাচক্রে ভিন্ন শিবিরের পুরুষ হরণ প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হয়েছে। ফল তার শুভ কিছু হয়নি। আঘাত প্রতিঘাতের তীব্রতায় তিন শিবিরই আরো জনশূন্য হয়ে এসেছে। বিলুপ্তিরোধের সমস্যার সমাধান হয়নি।

নেতামা সংক্ষেপে এ ইতিহাস বিবৃত করে গাঢ় আবেগকম্পিত স্বরে এবার বল্লেন, —তারপর এই পঞ্চম মহাচক্র আমি আজ আহ্বান করেছি কাফ্রামগোষ্ঠীর রীতি-নীতি ও প্রথার চরম এক সংস্কারের প্রস্তাব জানাতে। প্রায় বিংশতি বর্ষ ধরে সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও কোন নবজাতককে আমরা জীবিত রাখতে পারি নি। বিলুপ্তি আমাদের অদূর ভবিষ্যতে অনিবার্য। যে কয় বৎসর এ গোষ্ঠীর পরমায়ু আর আছে হিংসার হানাহানিতে তা কলঙ্কিত রক্তাক্ত করে লাভ কি? প্রথম নেতামা সূর্যকন্যা ভিনসা আমাদের জাতির জন্মলগ্নে পরম প্রীতির যে দীক্ষা দিয়েছিলেন, আজ তার অবশিষ্ট অন্তিম কালটুকু সেই দীক্ষাই অনুসরণ করে কাটাবার সংকল্প জাতিকে আমি গ্রহণ করতে আহ্বান জানাচ্ছি। বিরোধ সংঘর্ষ আর নয়। তার বদলে সকলের প্রতি মৈত্রী। প্রতিহিংসা নয় ক্ষমা ও প্রেম। কাফ্রামগোষ্ঠীর অলঙ্ঘ্য অনুশাসন উপেক্ষা করে আমাদের জাতীয় অভিমানে সবচেয়ে বড় আঘাত যে দিয়েছে তাকেও যেন আমরা ক্ষমা করি। জানি আমাদের সমাজের ইতিহাসে স্বেচ্ছায় গোষ্ঠীত্যাগের এ নিদারুণ কলঙ্ক একান্ত বিরল। এ বিচ্যুতি যখন ঘটেছে তখন তার চরম শাস্তি না দেওয়া পর্যন্ত কাফ্রাম-সমাজ ক্ষান্ত হয়নি। আজ কিন্তু এ অপরাধও ভিন্নদৃষ্টিতে দেখবার সময় এসেছে। শুধু সংঘের স্বার্থই নয় ব্যক্তির স্বাধীনতার মূল্যও আজ আমরা যেন বুঝি। তা ছাড়া যে প্রয়োজনে এ বিধি রচিত হয়েছিল তা আজ আর নেই। গোষ্ঠীকে রক্ষা করার প্রশ্নই আজ অর্থহীন সুতরাং তার নির্মম শাসন স্নেহ ও সহানুভূতিতে শিথিল করবার সময় কি আসেনি? একথা আমি অস্বীকার করি না যে তানিকা বা নিকির ওপরই কাফ্রামদের শেষ আশা নিবন্ধ ছিল। জাতির জীবনধারা যদি প্রবাহিত থাকে তাহলে তার মধ্য দিয়েই থাকবে। সে আশা সফল হয়নি। নিকি আমাদের ছেড়ে না গেলেও হত বলে আর বিশ্বাস হয় না। নিকি কেন স্বেচ্ছায় আমাদের ছেড়ে গেছে জানি না। হয়ত সকলের এত নির্ভরতা সত্ত্বেও জাতির জননী হবার অক্ষমতার লজ্জায়। হয়ত আমাদের সমাজবিধির বিরুদ্ধে বিদ্রোহে। নিকির মধ্যে কিছুটা অস্বাভাবিকতা যে ছিল, আর তা তোমাদেরও আলোচনার বস্তু যে হয়েছে তা আমি জানি। যে ক্ষত আমরা গৌরবচিহ্ন বলে গণ্য করতে অভ্যস্ত নিকি তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। তোমাদের কাছে আজ স্বীকার করছি এই অস্বাভাবিকতাই তাকে আমার কাছে মূল্যবান করে তুলেছিল। আজ এ ক্ষতের যত বড় মর্যাদাই থাক একদিন মানবসমাজ এ ব্যাধি থেকে মুক্ত ছিল—এ কিংবদন্তীতে আমি বিশ্বাস করি। নিকির মধ্যে একটা উগ্র স্বাতন্ত্র্যকে তাই আমি খুব বেশী শাসন করবার চেষ্টা করিনি। তার মুখে আমাদের সমাজবিধির সমালোচনা মাঝে মাঝে তোমরাও নিশ্চয় শুনেছ। তারই কৃতিত্বে বন্দী বিপক্ষ শিবিরের যে পুরুষকে সমাজভর্তা করা হয় অকস্মাৎ একদিন তাকে মুক্তি দেবার অনুমতি নিকি আমার কাছে চেয়েছিল। কাফ্রামদের অলঙ্ঘ্য নীতি অনুসারে সে অনুমতি আমি দিতে পারিনি। তারপর বন্দী সমাজভর্তার পলায়নের মধ্যে নিকির হাত আছে সন্দেহ করে আমি তাকে তিরস্কার করে, শিরোভূষণ কেড়ে নেওয়ার শাস্তিও দিয়েছিলাম। আমার সন্দেহ ভুল কিনা জানি না। হয়ত সেই অন্যায় শাস্তি ও তিরস্কারের প্রতিবাদেই নিকি স্বেচ্ছায় আমাদের সমাজ ছেড়ে গেছে। হয়ত কারণ তার পূর্বে যা বলেছি তাই। কারণ যাই হোক প্রতিশোধ নেবার চেষ্টার ত্রুটি আমরা করিনি। কিন্তু এইবার তাতে ক্ষান্ত হতে চাই। নিকি হয়ত জীবিতই আর নেই। তার দেহাবশেষ কোনো দূর দুর্গম নির্জনতায় একদিন কেউ খুঁজে পাবে। যদি সে জীবিত থাকে তাহলে কাফ্রাম সমাজের অন্তিম নিঃশ্বাসের ক্ষমা আর করুণাই তাকে জানাতে চাই, সেই সঙ্গে সংগ্রামের অবসানের কথা সমস্ত বিপক্ষ শিবিরে। বলো কাফ্রাম মহাচক্র, আজ ডঙ্কাধ্বনিতে এই বার্তাই কি ঘোষিত হবে?

কয়েক মুহূর্ত সমস্ত জনতা স্তব্ধ নিস্পন্দ।

যেন শিলামূর্তি সব সারি সারি সজ্জিত হয়ে আছে।

তারপরই সমস্ত জনতা যেন এক দেহে ভগ্ন আস্ফালন করে এক কণ্ঠে আকাশ-বিদীর্ণকরা উত্তর দিলে—না!

না? নেতামার কণ্ঠ এবার ক্ষীণ। জীর্ণ জরা যেন এই মুহূর্তটার জন্যেই অপেক্ষা করে ছিল। দেহের ওপর তার অধিকার আগেই বিস্তৃত হয়েছে, এবার কণ্ঠের সঙ্গে সেই অনির্বাণ দীপ্তিও মুছে নিল এক নিমেষে।

ক্লান্ত ভগ্ন দুর্বল কণ্ঠে নেতামা বললেন, তবে এই মহাচক্রের কাছে আমার স্বেচ্ছানির্বাসনের সুযোগ আমি ভিক্ষা করছি!

কিন্তু জনতার উন্মত্ত কল্লোলে সে ক্ষীণ কণ্ঠ কোথায় ভেসে গেল।

চারিদিকে ক্ষিপ্ত অস্ত্র আস্ফালনের সঙ্গে তখন হিংসাতীব্র রণোল্লাসের ধ্বনি উঠছে।

অপরাধীর চরম দণ্ড চাই!

কাফ্রামরা শত্রুর শেষ রাখে না!

সপ্তম উল্লাসে

মন্দুকদূত

দুরু ও তার সঙ্গীরা তিমির-কন্দরেই এখন আশ্রয় পেয়েছে।

প্রাচীন শিলাফলকের নির্দেশ মিথ্যা নয়। শুধু পর্বতদুহিতা বলতে যে নির্ঝরিণী-স্রোত তারা অনুমান করেছিল তার পরিবর্তে শুষ্ক সংকীর্ণ পরিখা জাতীয় একটি খাতই দেখা গেছে। হয়ত সেই শুষ্ক খাতই দূর অতীতের নির্ঝরিণী স্মৃতিচিহ্ন।

তিমির-কন্দরে শত্রুর দৃষ্টি এড়িয়ে তারা আসতে পেরেছে বলে তাদের বিশ্বাস।

অন্ততঃ অত্যন্ত সতর্ক পাহারায় থেকেও আর কখনো কোন গুপ্তচরের আভাস তারা পায়নি।

তিমির-কন্দরে প্রবেশের পর অবশ্য এসব তুচ্ছ চিন্তার আর স্থানই নেই তাদের মনে। এক তীব্র বিস্ময়মাদকতার মধ্যে তারা যেন নিমজ্জিত হয়ে গেছে।

তিমির-কন্দর সম্বন্ধে কিছু অনুমান ও কল্পনা তাদের মনে ছিল কিন্তু আসল সত্য তাদের সে কল্পনা ও অনুমানকে বহুদূরে ছাড়িয়ে গেছে।

এমন অবিশ্বাস্য ঐশ্বর্যের কথা তারা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি।

ঐশ্বর্য অবশ্য মূল্যবান ধাতু কি বিচিত্র দুর্লভ প্রস্তরখণ্ডের নয়। সে ঐশ্বর্যের কোন মূল্যই দুরুদের কাছে অন্ততঃ নেই।

এখানে যে ঐশ্বর্য আছে তা বহু যুগ আগেকার এক লুপ্ত মানবসমাজের সঞ্চিত স্মৃতির। সে স্মৃতি খোদিত হয়ে আছে শিলাফলকে গুহাগাত্রে, অঙ্কিত আছে পশুচর্মে।

নিজেদের বিলুপ্তি অনিবার্য জেনে এই বিস্মৃত মানবসমাজ যেন তাদের জাতিজীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা সমস্ত বিদ্যা সমস্ত উপলব্ধি রেখাজালে বন্দী করে সুদূর ভবিষ্যতে প্রেরণ করতে চেয়েছে।

দূর বাইরের ভূখণ্ডে সামান্য যে কয়েকটি ভগ্ন অসম্পূর্ণ শিলাফলকের খোদিত লিপির পাঠোদ্ধার করে উল্লসিত হয়েছে তা এই গুহারাজ্যের সঞ্চয়ের তুলনা অরণ্যের পত্রপুঞ্জের কাছে কটি শুষ্ক জীর্ণপত্র মাত্র।

এই অগণন শাখায় বিভক্তপ্রায় অশেষ সুড়ঙ্গলোকের গুহারাজ্য ছাড়া আর কোন নাম বুঝি দেওয়া যায় না। এ রাজ্যের অতি সামান্য অংশ মাত্র প্রথম কয়েকদিনে তারা সন্ধান করতে পেরেছে।

গুহার প্রথম প্রবেশপথ সংকীর্ণ। সে পথ প্রস্তরখণ্ড ও লতা-গুল্মে কিছুটা আচ্ছন্নই ছিল। সে সব বাধা অপসারিত করবার পর অভ্যন্তরে যত তারা অগ্রসর হয়েছে বিস্ময় তাদের তত বেড়েছে উত্তরোত্তর। গুহাবাস নয় এ যেন সত্যই এক গোপন পাতালপুরী, বিশাল এক পর্বত যার ওপর আবরণ হিসাবে স্থাপিত। এ গুহায় বংশপরম্পরায় যুগযুগান্ত যারা অতিবাহিত করেছে তাদের জীবনযাত্রার নিদর্শন নানাভাবে সর্বত্র ছড়ানো। সে সব নিদর্শনের অর্থ বোঝবার ক্ষমতাও দুরুদের নেই। কয়েকটি এমন বস্তু সেখানে ইতিমধ্যেই তারা পেয়েছে যার প্রয়োজন ও ব্যবহার সম্বন্ধে কোন ধারণাই তাদের নেই। প্রাচীন কিংবদন্তী ও পুরাণের সত্য ও কল্পনায় মেশানো দু-একটি উল্লেখে যেন একটু-আধটু ইঙ্গিত সে বিষয়ে পাওয়া যায়।

মনে রাখবেন, 'ম্যাজদা ল্যাম্পস্ অনেক বেশী উজ্জ্বল ও টেকসই'
MAZDA
MAZDA
MAZDA
MAZDA
MAZDA
MAZDA
একটি
AEI
উৎপাদন
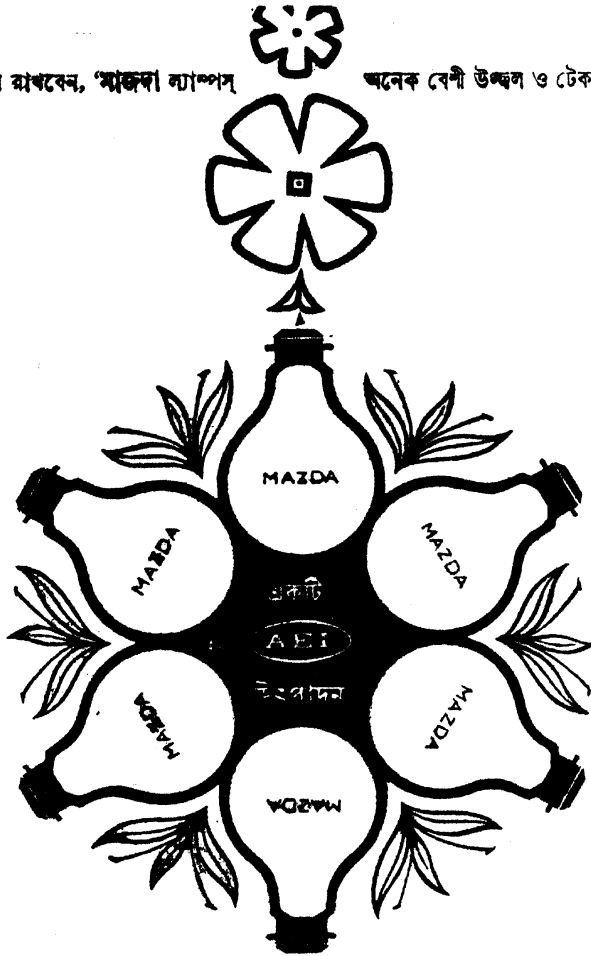
উত্তর ফাল্গুনী
রামকিংকর সিংহ

প্রভাতী

ীরেন চৌধুরী

বিলুপ্ত জাতির লেখসম্ভার থেকে হয়ত অনেককিছুর রহস্য একদিন উদ্ঘাটিত হতে পারে দুরুদেম এই আশা। দুরু নিজের আবিষ্কৃত পাঠোদ্ধার-প্রণালী আরো উন্নত করার চেষ্টাতেই শুধু মত্ত হয়ে ওঠেনি আজিব ও নন্দককেও সে প্রণালী শিক্ষা দিয়েছে।

কয়েকটি দিন এই মাদকতার মধ্যে প্রায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে কেটে যাবার পর হঠাৎ একদিন অপ্রত্যাশিত এক ব্যাপার তাদের সচকিত সন্ত্রস্ত করে তোলে।

এই গুহাপুরীতে নূতন সুড়ঙ্গপথ সন্ধান করতে আজিব ও নন্দক গভীর অভ্যন্তরপ্রদেশে কিছুদূর গিয়েছিল।

তারা পাংশু মুখে ফিরে এসে যে প্রশ্ন দুরুর কাছে তোলে তা চাঞ্চল্যকর।

আজিবই শুষ্ক কণ্ঠে প্রথম জিজ্ঞাসা করে, এ গুহাপুরী যাদের রাজ্য ছিল তারা কি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে মনে করো দুরু?

একটি পশুচর্মের অস্পষ্ট লিখনের পাঠোদ্ধারে দুরু তখন মগ্ন। আজিব ও নন্দকের মুখের পাণ্ডুরতা কি কণ্ঠের কম্পন সে লক্ষ্য করে না।

পশুচর্মের ওপরই দৃষ্টি রেখে সে কৌতুকের স্বরে বলে, বিলুপ্ত হবে কেন? তারা আত্মগোপন করে আমাদের ওপর দৃষ্টি রাখছে। অপেক্ষা করে আছে আক্রমণের সুযোগের।

সত্যই তাই। বলে নন্দক।

এবার নন্দকের গম্ভীর শঙ্কিত স্বর দুরুকে চমকিত করে।

সবিস্ময়ে মুখ তুলে তাকিয়ে বলে, তার অর্থ?

তার অর্থ অভ্যন্তরের এক সুড়ঙ্গপথে কটি পদচিহ্ন আমরা দেখেছি। সে পদচিহ্ন সদ্য সেখানে উপস্থিত ছিল এমন কয়েকটি মানুষের ছাড়া হতে পারে না। গুহার ধূলিতে কয়েকবার বার যাতায়াত চিহ্নগুলি অস্পষ্ট হয়ে গেছে বলে তাদের সংখ্যা নির্ণয় ঠিক সম্ভব নয়, কিন্তু তারা যে আমাদের অংশে এসে আবার ফিরে গেছে এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

আজিবের ব্যাখ্যা শেষ হতেই নন্দক বলে, আরো একটি বড় প্রমাণ আছে বলে আমার এখন মনে হচ্ছে।

কি প্রমাণ? দুরুর উদ্বেগ আর গোপন থাকে না।

আমি যে বিশেষ শিলাফলক কটি নিয়ে কাজ করছি আশা করি তোমরা কেউ তার একটিও অপসারিত করনি? নন্দক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায় সংগী দুজনের দিকে।

সবিস্ময়ে মাথা নেড়ে দুরু ও আজিব জানায়, তারা তা করেনি।

কিন্তু একটি শিলাফলক তার মধ্য থেকে অবিশ্বাস্যভাবে অন্তর্হিত হয়েছে। তোমরা কেউ কোন কারণে সেটি নিয়ে থাকবে ভেবে আমি এ ব্যাপারটিতে কোন গুরুত্ব দিই নি, কিন্তু পদচিহ্নগুলি আবিষ্কারের পর আমার সন্দেহ সহসা জাগ্রত হয় এবং এখন বুঝছি তা অমূলক নয়।

কিন্তু এ যে অসম্ভব! দুরু বিমূঢ় ভাবে বলে, তাদের খোদিত লিপিতে যে বিবরণ পাচ্ছি তাতে বিলুপ্তি আসন্ন বলেই বার বার আক্ষেপ রয়েছে। এ ভূখণ্ডে আমাদের উপনিবেশ স্থাপিত হওয়ারও তা বহু যুগ পূর্বের কথা। তারপর এক ধ্রুবজ্যোতি-বিচলন-কাল এই গোপন গুহাপুরীতে সে জাতির ক্ষীণতম ধারাও প্রবহমান বলে বিশ্বাস করা যায়? আর যদি সেই অসম্ভবই সম্ভব হয় তাহলে তারা তাদেরই নিজেদের শিলা-ফলক চুরি করবে কেন!

কোন বিশেষ বিবরণ কি বিদ্যা আমাদের জানতে না দেবার জন্যেও হতে পারে! নন্দক উত্তর দেয়।

শিলাফলকে সে রকম মূল্যবান কোন কিছুর আভাস কি পাচ্ছিলে? জিজ্ঞাসা করে আজিব।

সঠিক বলতে পারব না। দ্বিধাভরে জানায় নন্দক। এ শিলালেখার পাঠোদ্ধার বেশ কঠিন। তবু মনে হচ্ছিল কুপিতার্কিরণের প্রতিবিধান বিষয়ে কিছু যেন সেখানে বলার চেষ্টা আছে। আমরা যে তাদের প্রাচীন লিপির মর্মভেদ করতে পেরেছি এ কথা বুঝেই তারা ওই শিলাফলক সরাবার জন্যে তৎপর হয়েছে নিশ্চয়।

কুপিতার্কিরণ অর্থে সূর্যাভিশাপ বোঝাচ্ছে বলেই ত মনে হয়! দুরু চিন্তিতভাবে বলে, সে অভিশাপ-খণ্ডনের উপায় আমাদের জানতে দিতে না-চাওয়ার কারণ কি? বৈরিতাই যদি হয় তাহলে আমাদের এখানে প্রবেশেই ত তারা বাধা দিতে পারত! এখন আমাদের বিতাড়িত করবার চেষ্টাও ত অনায়াসে করতে পারে।

হয়ত তাই করবার সুযোগের অপেক্ষায় আছে—বলে আজিব।

না, রহস্যটা আরো জটিল মনে হচ্ছে। দুরু ভ্রূকুঞ্চিত করে কি ভেবে নিয়ে বলে, যদি সত্যিই সেই প্রাচীন জাতির কোন প্রতিনিধি এখনো এই পাতালপুরী অধিকার করে থাকে তাহলে তাদের সঙ্গে দখল নিয়ে সংঘর্ষ আমরা বাধাব না। তাদের যেমন করে হোক বোঝাতে হবে, আমরা শত্রু নই, তাদের সৌহার্দাকামী। অতীতের সেই বিলুপ্ত ধারার সঙ্গে যদি সংযোগস্থাপন সম্ভব হয় তাহলে তার চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কিছু হতে পারে না। তাদের সন্দেহ ও ভয় দূর করে কি ভাবে পরিচয়ের ব্যবস্থা করা যায় তাই আমাদের এখন চিন্তনীয়।

অষ্টম উল্লাসে

দন্ডপেুন্

বুবন অত্যন্ত সাবধানে সবল ও স্থূল বৃক্ষশাখাটির ওপর দাঁড়িয়ে উঠে ঘন পত্র-জাল সামান্য একটু সরিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিচের পার্বত্য উপত্যকার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল।

না, যা আশা করেছিল তা নয়।

একটা সুপুষ্ট শরভ নিকটের প্রস্তর-স্তূপের আড়াল থেকে বার হয়ে এসে নিশ্চিন্ত মনে নধর তৃণসন্ধানে বিচরণ করছে।

অন্য সময় হলে এ সুযোগ সে অবহেলা করত না। অব্যর্থ তীরসন্ধানে অচিরে শরভটিকে ভূলুণ্ঠিত করবার ব্যবস্থা করত।

কিন্তু ক্ষুধায় যতই কাতর হোক এখন তার এ সব তুচ্ছ শিকারে মন দেবার সময় নেই।

সে শুধু একটি, বিশেষ শিকারের অপেক্ষাতেই একাগ্র হয়ে আছে।

গত তিন দিন ধরে দিবারাত্রির অধিকাংশই তার কেটেছে এই বৃহৎ ন্যগ্রোধ জাতীয় বৃক্ষের পত্রাচ্ছাদিত শাখার ওপরে প্রায় নিথর নিস্পন্দ অবস্থায়।

এ ধরণের কঠিন ধৈর্যপরীক্ষা সে অবশ্য পূর্বেও দিয়েছে। কিন্তু পরীক্ষা দিতে হয়েছে এ ভূখণ্ডের একমাত্র হিংস্র বিভীষিকা দানবীয় শরট-শিকারের জন্যে। দানবীয় শরট যেমন হিংস্র-বীভৎস তেমনি চতুর ক্ষিপ্র নিঃশব্দ গতি ও নিমিষে রূপান্তর গ্রহণের দক্ষতায় মায়াবী। অসামান্য সতর্কতায় সুদীর্ঘ কাল বিনিদ্র ভাবে অপেক্ষায় না থাকলে শিকারীকেই তাদের শিকার হতে হয়। এ ভূখণ্ডের সৌভাগ্য এই যে, দানবীয় শরট ছাড়া আর কোন হিংস্র শ্বাপদ এখানে নেই এবং সে বিভীষিকাও একান্ত বিরল। বিরল হওয়ার জন্যে বুবনের অব্যর্থ লক্ষ্য অনেকখানি অবশ্য দায়ী। বিপক্ষ শিবির-পরিধির নিষেধগণ্ডী অগ্রাহ্য করে সে সর্বত্র ঘুণাক্ষরে সংবাদ পাওয়া মাত্র শরট-শিকারের গুপ্ত আশ্রয়মঞ্চের ব্যবস্থা করেছে। তাকে কোন শিবির থেকেই যে এসময়ে বাধা দেবার চেষ্টা হয়নি তাতে শিকারী হিসেবে এ ভূখণ্ডে তার শ্রেষ্ঠত্ব-স্বীকারের প্রমাণ পাওয়া যায়! শিকারে তার নৈপুণ্য যেমন সহজাত উল্লাসও তেমনি স্বতস্ফূর্ত। তার পরিচিত ভূভাগে অবশিষ্ট একটি কি দুটি শরট নিহত হবার পর আর যে শঙ্কাতীর উত্তেজনা উপভোগ করবার মত কোন বিপজ্জনক শিকার কিছু থাকবে না, এ পরিণাম তাকে অনেকবার বিমনা করে তুলেছে। পুরাণ উপকথায় ভয়াল যে সব পদে পদে মৃত্যু-ঝলসিত অরণ্যের কথা শুনেছে তার জন্যে ঈর্ষাই হয়েছে তার আদিকালের মানব-সমাজের প্রতি।

এ কদিন কিন্তু কোন উত্তেজনা-উল্লাসের লোভে সে এই বিনিদ্র শিকার-সন্ধানে আত্মগোপন করে নেই।

শিকারে একাগ্রতা তার অনেক বেশী গভীর হলেও সত্যকার কোন উৎসাহই সে বোধ করেনি।

এই সব ভাবনাতেই কয়েক মুহূর্ত বুঝি মগ্ন ছিল সে। অন্যমনস্কতা তার চকিতে কেটে গেল। শরভটার সহসা দ্রুতবেগে পলায়নের শব্দে নিশ্চয়।

শরভটা অকারণে এমন ত্রস্ত হয়ে ওঠেনি বলে মনে হয়। তার প্রত্যাশা কি তাহলে সত্যিই পূর্ণ হতে চলেছে?

বুবন নিঃশব্দে তার নিক্ষেপ-রজ্জু হাতে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে রইল।

এখানে সে সশস্ত্র হয়ে আসে নি। অস্ত্র বা ধনুর্বাণ কিছুই তার সঙ্গে নেই। হ্রস্ব কৃপাণ অবশ্য তার চিরসহচর। সেই সঙ্গে

এই নিক্ষেপ-রজ্জুটিই যা অতিরিক্ত।

প্রস্তরস্তূপের অন্তরাল থেকে একটা মূর্তি দেখা দিতে না দিতেই বুবন নিক্ষেপ-রজ্জু ক্ষেপণের উপক্রম করলে।

কিন্তু শিরোদেশে ঘূর্ণিত হয়েও সে রজ্জু তার হাত থেকে নিক্ষিপ্ত হল না।

তার পরিবর্তে তার কণ্ঠে বিস্মিত আনন্দধ্বনি শোনা গেল, পরঞ্জ!

প্রস্তরস্তূপের অপর পার্শ্ব থেকে যে বার হয়ে এসেছিল সে এই আহ্বান শুনে শঙ্কিত তৎপরতায় সরে যেতে গিয়েও বোধহয় কণ্ঠধ্বনি চিনতে পেরে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সবিস্ময়ে।

বুবন তখন তার বৃক্ষচূড়ার আশ্রয় থেকে যত দ্রুত সম্ভব নেমে এসেছে।

পরঞ্জ তুমি! এ যে বিশ্বাস করতেই পারছি না!

বুবন পরঞ্জকে উচ্ছ্বসিত আনন্দে আলিঙ্গন করে আবার এক নিশ্বাসে বলে গেল, তোমাকে আর দেখবার আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম। কাফ্রামদের হাত থেকে তুমি যে মুক্তি পাবে কল্পনা করি নি। কেমন করে, কবে তুমি পালিয়েছ?

পরঞ্জের মুখেও গভীর আনন্দের দীপ্তি।

বুবনের আলিঙ্গন থেকে স্মিত মুখে মুক্ত হবার চেষ্টা করে সে বললে, তোমার বলিষ্ঠ বাহুর বজ্রবন্ধন শিথিল না করলে শ্বাসই সে রুদ্ধ হয়ে যাবে। উত্তর দেব কি?

যেন লজ্জিত হয়ে হেসে বুবন পরঞ্জকে মুক্ত করে বললে, বুঝতেই পারছ, অবিশ্বাস্য ও সৌভাগ্যে একটু আত্মহারা হয়ে পড়েছি। এখন শুনি তোমার ইতিহাস।

সবই বলছি। কিন্তু তার আগে এই সুদূরে বৃক্ষচূড়ায় কি শিকারের জন্যে ওৎ পেতে ছিলে বল দেখি? এখানে কোন দানব-শরট দেখা গেছে বলে ত জানি না।

শরভ নয় তার চেয়ে আরো বড় শিকার সন্ধান করছি পরঞ্জ। যে শিকার ধরতে পারলে হয়ত মানবগোষ্ঠী রক্ষা পেতে পারে!

বুবনের কণ্ঠস্বরের গাম্ভীর্যে বিস্মিত হয়ে পরঞ্জ জিজ্ঞাসা করলে—কোন শিকারের কথা বলছ বুবন? তোমার মত শিকারী না হতে পারি কিন্তু এ ভূভাগে শিকারযোগ্য সব প্রাণীই জানি। তা ছাড়া এ শিকারের সঙ্গে মানবগোষ্ঠীর রক্ষা পাওয়ার সম্বন্ধ কি!

সম্বন্ধ এই যে এ শিকার জীবিত বা মৃত যে অবস্থায় হোক কাফ্রামদের প্রত্যর্পণ করতে পারলে এ সর্বনাশা সংগ্রাম থামবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি কাফ্রানদের সেই পলাতকাকে ধরবার জন্যেই অপেক্ষা করছি।

পরঞ্জের দুই চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠল শুধু বিস্ময়ে যেন নয়। বললে—কাফ্রামদের পলাতকা অর্থাৎ নিকিকে তুমি শিকার করতে চাও? তার সন্ধান তুমি পেয়েছ?

হ্যাঁ পেয়েছি। কোন শিবির-পরিধির মধ্যে তার সন্ধান যখন মেলে নি তখন তিমির-কন্দরে আত্মগোপনের উদ্দেশ্যে হয়ত সে এদিকে এসেছে বলে আমার অনুমান হয়। তিমির-কন্দর খুঁজে পাইনি, কিন্তু এই অঞ্চলে বিচরণ করতে করতে সেদিন দূর থেকে এক নারীমূর্তিকে এই পথে যেতে দেখেছি। তার দেহবর্ণ ও পিঙ্গল কেশদামই তাকে কাফ্রামদের পলাতকা বলে চিনিয়ে দিয়েছে। তাকে অনুসরণ করবার আগেই সে পার্বত্য অরণ্যের মাঝে কোথায় অদৃশ্য

হয়ে গেছে। তার গোপন আশ্রয় খ'ুজে বার করতে না পারলেও এই স্থানটির লতা-গুল্ম ও কঙ্করময় মৃত্তিকা পরীক্ষা করে বুঝেছি মানব গতায়াতের সাম্প্রতিক পদচিহ্ন এখানে বর্তমান। তাই এখানে অপেক্ষা করছি প্রস্তুত হয়ে।

পরজ কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থেকে বলে, কিন্তু সে পদচিহ্ন আমারও হতে পারে! এ পথে আমারও যাতায়াত আছে দেখতেই পাচ্ছ।

তোমার যাতায়াতের চিহ্ন? বুবন একটু হাসল। না পরজ, আমার দৃষ্টি অত সহজে প্রতারিত হয় না। তাছাড়া এ স্থান সযত্নে পর্যবেক্ষণ করে অঙ্গবাস-বন্ধনীর এমন ছিন্নসূত্র পেয়েছি যা কাফ্রাম-রমণী ছাড়া আর কারও হতে পারে না। আমি জানি সে পলাতকা এখানেই কোথাও আছে। সুতরাং আমার হাত থেকে তার নিষ্কৃতি নেই।

একটু থেমে উৎসাহভরে বুবন আবার বললে—তুমি। তুমিও ত আমায় সাহায্য করতে পারো?

পরজ বুবনের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে—হ্যাঁ, তা পারি।

সাহায্য করতেই হবে পরজ। কিন্তু তুমি তার নামটাও জানো দেখছি। কি করে? এবার জিজ্ঞাসা করলে বুবন।

পরজ একটু হাসল। তারপর ঈষৎ বিদ্রুপের স্বরে বললে, নামটা আর জানব না! কাফ্রামদের কাছে এতদিন বন্দী ছিলাম কেন তাহলে?

এ উত্তরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন কোন ইঙ্গিত যদি থাকে, বুবন তা বুঝল না। কৌতূহলভরে সে বললে, তাও-ত বটে! সত্যি তাদের হাতে বন্দী হয়েও মুক্তি পেলে কি উপায়ে? মৃত্যু ছাড়া কাফ্রামদের শৃঙ্খল থেকে কেউ মুক্তি দিতে পারে না বলেই ত প্রবাদ।

প্রবাদ মিথ্যা নয়। গম্ভীর স্বরে বললে পরজ।

তা হলে? তুমি......

বুবনের প্রশ্ন সমাপ্ত হবার আগেই বাধা দিয়ে পরজ বললে,—কেমন করে মুক্তি পেলাম সে কাহিনী সত্যিই শুনতে চাও?

নিশ্চয় চাই।

তাহলে শোন, ওই নিকিই আমায় মুক্তি দিয়েছে।

নিকি! মানে যে পলাতকা! —বুবনের গলার স্বরে বিস্ময়ের চেয়ে অবিশ্বাসই বেশী।

হ্যাঁ, স্বেচ্ছায় যে সমাজত্যাগিনী, যাকে বন্দিনী করে প্রত্যর্পণ করলে তিন শিবিরের বিরোধ মিটে যাবে তুমি মনে করো, সেই নিকিই আমাকে মুক্তি দেয়। এই সঙ্গে এ কথাও জেনে রাখো যে আমি কাফ্রামদের কাছে ধরা দিয়েছিলাম স্বইচ্ছায়।

এবার বিস্ময়-বিমূঢ়তায় বুবনের কণ্ঠ দিয়ে আর কোন স্বরই বার হ'ল না।

পরজ নিজে থেকে বলে চলল, কাফ্রামরা আমায় বন্দী করে নিয়ে গেছে এ রকম অনুমান সম্ভবতঃ তোমরা করেছিলে, কিন্তু বন্দী হবার সমস্ত আয়োজন আমিই করে-ছিলাম—এটা নিশ্চয় কেউ ভাবতে পার নি। হ্যাঁ বুবন, আমি কাফ্রামদের বন্দী হতেই চেয়েছিলাম, কেন চেয়েছিলাম তা বোঝানো কঠিন। তবু যতটুকু পারি চেষ্টা করছি। প্রাভার শিবিরের মণ্ডলাবাসেই বোধ হয় লক্ষ্য করেছ আমি একটু দলছাড়া ছিলাম। তোমরা কি ভেবেছ জানি না কিন্তু নিজের মনে এই বিভিন্নতার জন্যে আমার ক্ষোভের অন্ত ছিল না। যা সকলের কাছে সহজ স্বাভাবিক আমার কাছে তা বিস্বাদ লেগেছে। মণ্ডল-কুমারীদের সঙ্গে যৌবনলীলায় কোন আগ্রহ আমার কোন-দিন জাগে নি। বিতৃষ্ণা জেগেছে মণ্ডল-জীবনের আরো অনেক শিক্ষা-দীক্ষায়। তারপর কৈশোর পার হয়ে আমার মন এক ভয়ংকর সন্দেহে জর্জর হয়ে উঠেছে। আমি হয়ত সেই প্রাচীন পুরাণ-বর্ণিত কালের কোন নিষ্ফল প্রক্ষেপ। অসামাজিক যে সব রুচি ও প্রবৃত্তি বহুকাল শিবির-সেবকদের ভেতর লুপ্ত হয়ে গেছে তাই আমার মধ্যে দুষ্ট গোপন ব্যাধির মত আবার দেখা দিয়েছে। আমি তখনই অনুভব করতাম শিবির-বধূরা আমার মনে কোন সাড়া জাগায় না। আমি একেকে একান্ত করে চাই। যাকে চাই তাকে শিবির-বধূদের মধ্যে খ'ুজে পাই না। শিবিরের কারুর প্রতি প্রীতির অভাব আমার ছিল না কিন্তু নিজেকে কোথাও যেন নিঃসঙ্গ করেও রাখতে চাইতাম। সেই নিঃসঙ্গতা যেন কাউকে দেওয়া যায় না। সবচেয়ে গ্লানি হ'ত মনের মধ্যে অদ্ভুত এক স্বপ্নলোক, অথচ তীব্র ব্যাকুলতা অনুভব করে। সে আবেশ-বিহ্বলতা কোন এক বিশেষকে ঘিরেই যেন সার্থক হ'তে চায়। অবাস্তব পুরাবৃত্তে শুনেছি বিশেষ এক নারী ও বিশেষ এক পুরুষের পরস্পরের প্রতি এমনি তীব্র আবেগস্পন্দিত আকর্ষণের কথা। আমাদের শিবির-সমাজ সে জাতীয় আকর্ষণ দূর অতীতেই অতিক্রম করে এসেছে। নিজের মধ্যে তারই স্ফুরণ দেখে ঘৃণায় লজ্জায় তাই পীড়িত হয়েছি কিন্তু কাউকে এমন কি তোমাকে পর্যন্ত তা জানাতে পারি নি। হয়ত আমার এ সমাজ-চেতনার বিকৃতি ভিন্ন সংশ্রবে নিরাময় হতে পারে বলে একদিন হঠাৎ মনে হয়েছে। মনে হয়েছে প্রাভার শিবিরের ব্যাধির চিকিৎসা কাফ্রাম সমাজের নির্যাতনেই হয়ত হতে পারে। নারীপ্রধান কাফ্রাম সমাজে সমাজ-ভর্তা হয়ে কাটাতে হলে প্রকৃতিস্থতা আবার ফিরে আসবে, এই আশায় স্বেচ্ছাতেই কাফ্রাম-শিকারীদের দৃষ্টিতে পড়বার চেষ্টা করেছি। শেষ পর্যন্ত আমার কৌশল ব্যর্থ হয় নি। কিন্তু তাতে ফল যা হয়েছে তা ঠিক বিপরীত। ওই তনিকা বা নিকির হাতেই আমি বন্দী হই। কাফ্রামদের বিধান অনুযায়ী ভিন্ন শিবিরের বন্দী পুরুষকে সমাজ-ভর্তার মর্যাদালাভের পূর্বে পঞ্চ পূর্ণিমা-কাল মূল শিকারীর নিজস্ব সেবক হয়ে থাকতে হয়। নিকিকে দর্শন করবার ও তার সঙ্গ পাওয়ার পর আমার মধ্যকার অসুস্থ প্রবণতা তীব্রভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। আমাদের তিন শিবির-জগতে নিকি ছাড়া আর কোন রমণী নেই বলে আমার মনে হয়েছে। মনে হয়েছে এই নিকিকেই যেন সারা জীবন আমি খ'ুজে ফিরছিলাম। তাকে পাই নি বলেই কোন নারীসঙ্গ আমাকে আকৃষ্ট করে নি। নিজের কঠিন ব্যাধির সমস্ত লক্ষণই আমি তখন চিনতে পেরেছি। বিশেষ করে নিকিকে একান্ত আপন করে নেওয়ার গর্হিততম বাসনা তখন দুর্বার হয়ে উঠে আমায় শঙ্কিত করে তুলেছে। তবু নিজেকে সম্বরণ করতে পারি নি। তখন সমাজভর্তার মর্যাদা পেতে আর এক পূর্ণিমা মাত্র বাকি। সেই পরিণাম আমাকে আতঙ্কে অভিভূত করে দিয়েছে। একদিন নিকির কাছে সমস্ত অসুস্থ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে নিজের মনের বিকৃতি স্বীকার না করে পারি নি।

নিকি প্রথমে এ বাতুলতায় কৌতুকবোধ করে উচ্চহাস্য করেছে, তারপর সমাজভর্তা হওয়ার ব্যাপারে আমার আতঙ্কের কথা শুনে প্রথমে স্তম্ভিত পরে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে। তার কাছে সহানুভূতির বদলে তীব্র তিরস্কারই পেয়েছি তারপর।

সমাজভর্তা পদে অধিষ্ঠিত হতে হয়েছে যথাসময়ে। জীবন আমার বিষময় হয়ে উঠেছে সকল দিক দিয়ে। আমার অস্বাভাবিকতা সকলের গোচর হ'তে বিলম্ব হয় নি

সমস্ত কাম্রাম সমাজের আমি ঘৃণার ও অবজ্ঞার পাত্র হয়ে উঠেছি। আমার সে যন্ত্রণা নিকির দৃষ্টি বোধ হয় এড়ায় নি। সমাজভর্তা হওয়ার পর আমার সঙ্গ সে কিছুকাল পরিহার করেই চলেছিল সম্ভবতঃ ঘৃণাভরেই। কিন্তু সে মনোভাবের পরিবর্তন দেখা দিয়েছে অকস্মাৎ। আমার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ দিনে দিনে বিরল থেকে বহুল, সংক্ষিপ্ত থেকে সুদীর্ঘ হয়ে উঠেছে। তারপর যা ঘটেছে তা অবিশ্বাস্য। ব্যাধিমুক্ত হতে এসে আমি পীড়ায় আরো জর্জরিত হয়েছি। আমার রোগ শুধু উগ্রতর হয়ে ওঠে নি, নিকির মধ্যেও কখন তা সংক্রামিত হয়ে গেছে সে নিজেও জানতে পারে নি। একদিন নিজের মনের এ বিকৃতির কথা সে আমার কাছে স্বীকার করেছে, আমার সমাজভর্তা-জীবন যে তার কাছেও দুঃসহ তাও গোপন করে নি। কাম্রাম নেতাদের কাছে সংঘের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আমাকে মুক্তি দেবার প্রস্তাব করেছে দুঃসাহস ভরে। সেখানে বিফল হয়ে একদিন সত্যিই আমাকে মুক্তি দিয়েছে শিবির-প্রহরীদের দৃষ্টি এড়াবার কৌশল শিখিয়ে দিয়ে। নিজেও একদিন গোপনে স্বেচ্ছায় সে সমাজ ত্যাগ করেছে তারপর।

পরজ নীরব হবার পর বুবনও কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল।

তারপর বিষণ্ণ স্বরে বললে, তোমার এ কাহিনী শুনে পূর্বে হলে হয়ত শুধু বিস্ময় ও ঘৃণাই অনুভব করতাম পরজ, আজ কেবল বেদনাই পেলাম। কিন্তু আমার কর্তব্য থেকে তবু ভ্রষ্ট হতে পারব না।

কি তোমার কর্তব্য? নিকিকে বন্দী করে কাম্রামদের প্রত্যর্পণ করা?

হ্যাঁ, তা না হলে এ সংগ্রামে ধরণী থেকে মানবগোষ্ঠী নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। পলাতকা নিকিকে খুঁজে পাওয়ার ওপর মানবগোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

তা সত্যই করছে বটে! পরজের কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক শোনালো বুঝি আবেগের তীব্রতায়।

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে সে নিজেই আবার বললে দৃঢ়স্বরে, চলো, নিকির সন্ধান আমিই তোমায় দিচ্ছি।

তুমি! তুমি দেবে! সবিস্ময়ে বলল বুবন, এ কাহিনী শোনার পর তোমার কাছেই সব-চেয়ে বড় বাধা পাবার জন্যে যে প্রস্তুত হয়েছিলাম।

তাতে বিস্মিত হচ্ছি না। ম্লান হেসে বললে পরজ, কিন্তু মানবগোষ্ঠীর ভবিষ্যতের খাতিরেই নিকির সন্ধান তোমায় না দিলেই নয়।

নবম উল্লাস

সিংহাবলোকন

তিমির-কন্দর এমন বিভ্রান্তিচক্র তা দুরুরাও অনুমান করতে পারে নি।

বিশাল বল্মীকস্তূপের মত তাতে অসংখ্য প্রশস্ত সুড়ঙ্গপথ পরস্পরকে জড়িত করে এমন জটিলতা সৃষ্টি করেছে যার মধ্যে দিগ্বিদিক স্থির রাখা প্রায় অসাধ্য।

দুরু, আজিব ও নন্দক দীর্ঘ কয়েক দিবসের চেষ্টায় বারবার ব্যর্থ হয়েও কিন্তু পরাভব মানে নি।

তিমির-কন্দরের মধ্যে রহস্যময় পদচিহ্ন পাবার পর থেকে সুদূর অতীতের কন্দর-বাসীদের শেষ প্রতিনিধিদের সন্ধানে তারা অগ্রসর হয়েছে, পথ হারিয়ে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে দীর্ঘকাল তবু আশা ত্যাগ করে নি।

আশা ত্যাগ না করার কারণ অবশ্য আছে। সুড়ঙ্গ-পথে যেতে যেতে এমন কয়েকটি রহস্যময় ধ্বনি তারা শুনেছে যা কন্দরে অন্য কারো অস্তিত্বেরই সাক্ষ্য দেয়।

একবার বিশেষ একটি দ্বিধা বিভক্ত সুড়ঙ্গ-পথের সংগমে উপস্থিত হ'তে না হ'তে দ্রুত এক পদশব্দ বিলীন হয়ে যেতে শুনেছে পার্শ্ববর্তী পথে। তা ছাড়া আরো এমন এক বিচিত্র ধ্বনি মাঝে মাঝে তাদের শ্রুতিগোচর হয়েছে যার স্বরূপ নির্ণয়ই তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। সে ধ্বনি হয়ত রুদ্ধ কন্দর-পুরীর পাষাণগাত্রে ঘাত-প্রতিঘাতের দরুণ বিকৃত ও বিস্ফারিত। মনুষ্য-কণ্ঠনিঃসৃত কোন শব্দের সঙ্গে তার সাদৃশ্য তারা খুঁজে পায় নি। তবু তা যেন তাদের কোন লুপ্ত স্মৃতি আলোড়িত করে ঔৎসুক্য বর্ধিত করেছে।

সে ধ্বনি অনুসরণ করবার চেষ্টা তারা করেনি এমন নয়। কিন্তু সুড়ঙ্গ-পথের গোলকধাঁধায় তা যেন তাদের সঙ্গে লুকো-চুরি খেলেছে।

এ ধ্বনি কিসের হতে পারে তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে বাদানুবাদ তাদের অল্প হয়নি।

নন্দকের ধারণা এ সেই কন্দরবাসীদেরই বিস্মৃত কোন ভাষা যা আজ তাদের কাছে অর্থহীন। আজিবের কিন্তু এ ধ্বনি মনুষ্য-কণ্ঠের কিনা সে বিষয়েই সন্দেহ হয়েছে।

শুধু দুরুই স্পষ্ট কোন অভিমত প্রকাশ করেনি। স্মৃতির ক্ষীণ এক কম্পন তার মনে যে অস্ফুট ইঙ্গিত জাগিয়ে তুলেছে তা যেন কিছুতেই স্পষ্ট হতে চাইছে না।

এই ধ্বনির উৎস সন্ধান করার পথেই অকস্মাৎ সম্প্রতি যা ঘটেছে তাইতেই তারা এখন সবচেয়ে বিচলিত।

দূরে কোন সুড়ঙ্গ-পথ থেকে ক্ষণিকের জন্যে এক আর্ত ক্রন্দন সহসা কন্দরগাত্রে ধ্বনি-প্রতিধ্বনির তরঙ্গ তুলে বয়ে গেছে।

সে তরঙ্গের পর সব আবার স্তব্ধ হয়ে গেলেও তারা আর স্থির থাকতে পারেনি। ব্যাকুল উত্তেজনায় এ ক্রন্দনধ্বনি যে দিক থেকে এসেছে সেই দিকে যত দ্রুত সম্ভব অগ্রসর হবার চেষ্টা করছে কিছুক্ষণ ধরে।

ক্রন্দনধ্বনির রহস্য উন্মোচনের পূর্বেই সুড়ঙ্গ-পথের একটি সংগমে এসে সচকিত হয়ে তাদের দাঁড়িয়ে পড়তে হয়।

অপর দিকের একটি পথে শুধু পদ-ধ্বনি নয় কাদের যেন আলাপ-গুঞ্জনও শোনা যাচ্ছে।

দুরু ও তার সঙ্গীরা সেই আলাপ-গুঞ্জন শুনেই সবচেয়ে বিস্মিত হয়।

এরা কি সেই কন্দরবাসীদের শেষ প্রতিনিধিদের কেউ! কিন্তু গুঞ্জনের ভাষা অস্পষ্ট হলেও আদৌ অপরিচিত বলে মনে হয় না। কালপারাবারের দূর দিগন্তে এই কন্দর যারা অধিকার করে ছিল তাদের ভাষা কি তাহলে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল না?

কয়েক মুহূর্ত পরেই সব প্রশ্নের যে মীমাংসা হয়ে যায় তা একেবারে অপ্রত্যাশিত।

প্রথমে আত্মগোপন করবার বাসনা হলেও

দুরু ও তার সঙ্গীরা সুড়ঙ্গ-সংগমে সাহস-ভরে দাঁড়িয়ে থাকে।

অপর দিকের আগন্তুকরাও সুড়ঙ্গ-সংগমে পৌঁছে দুরুদের দেখতে পেয়ে স্তম্ভিতভাবে দাঁড়িয়ে পড়ে।

কিছুক্ষণ বিমূঢ় বিস্ময়ে দুই দলই নীরব। তারপর হর্ষধ্বনির সঙ্গে পরস্পরের দিকে তারা এগিয়ে যায়।

আগন্তুকরা বিলুপ্ত কন্দরবাসীদের কেউ নয়, তারা বুবন ও পরজ। তারা দুরুদের দেখে যতখানি চমকিত দুরুরা তাদের দেখে ততোধিক।

প্রথম আনন্দোচ্ছ্বাসের পর দুরু সবিস্ময়ে বুবন ও পরজ এ তিমির-কন্দরের সন্ধান কেমন করে পেল জিজ্ঞাসা করে।

পরজ সহাস্যে জানায়, পেলাম তোমা-দেরই অনুগ্রহে।

আমাদের অনুগ্রহে! দুরু বিমূঢ়ভাবে তাকায় পরজের দিকে।

হ্যাঁ, শমীকাননের কথা স্মরণ করলেই বুঝতে পারবে, তোমরাই আমাদের পথ-প্রদর্শক।

শমীকাননে তোমরাই তাহলে গোপনে আমাদের আলাপ শুনেছিলে?

আমরা নয়, আমি। তোমাদের দূর থেকে দেখেই আমার অনুমান হয় যে তিমির-কন্দরই তোমাদের লক্ষ্য। আত্মপ্রকাশ করা তখন নিরাপদ মনে করিনি। গোপনে তোমাদের আলাপ শুনে ও পরে অনুসরণ করে শেষ পর্যন্ত এই তিমির-কন্দরে পৌঁছোই। পৌঁছেও তোমাদের কাছে নিজেদের গোপন করে রাখতে হয়েছিল। গোপন রাখবার সে প্রয়োজন আজ আর নেই। তাই তোমাদের কাছে ধরা পড়ে দুঃখিত হইনি। তোমরা আমাদেরই সন্ধান করবে তা অবশ্য জানতাম।

তা জানতে! নন্দক বিস্ময় প্রকাশ করে। কিন্তু আমরা ত তোমাদের অস্তিত্বও এখানে কল্পনা করিনি। আমরা আদি কন্দরবাসীদের সন্ধানে বেরিয়েছি।

আদি কন্দরবাসীদের সন্ধানে! পরজের দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়। [illegible] ইতিহাসের কিছু নিদর্শন ছাড়া তাদের অস্থি-কঙ্কালও এ কন্দরে আছে কিনা সন্দেহ। তোমরা কি বাতুল?

না, বাতুল নয়। দুরু এবার উত্তর দেয়। তাদের ধারা যে একেবারে বিলুপ্ত হয়নি, সে জাতির দু-একটি প্রতিনিধি যে এখনো বর্তমান তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি।

কি প্রমাণ! বুবন কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করে।

পেয়েছি পদচিহ্ন, তাছাড়া একটি শিলা-ফলক অপসারণের প্রমাণ। নন্দক সেটির পাঠোদ্ধারে রত ছিল। অত্যন্ত মূল্যবান কোনো লিখন তাতে ছিল বলে আমাদের ধারণা। সেটি রহস্যজনকভাবে অপহৃত হয়েছে।

এই প্রমাণ! সহসা উচ্চৈস্বরে পরজ হাসতে শুরু করে। তারপর নিজেকে সংবরণ করে বিমূঢ় দুরুদের জানায়, পদচিহ্ন যা দেখেছ তা আমাদেরই। আর শিলাফলক অপহরণ করেছি আমি!

তুমি! দুরুর কণ্ঠে অবিশ্বাস ফুটে ওঠে। শিলাফলক নিয়ে তুমি কি করবে?

তোমরা যা করো তাই। শোনো দুরু, তোমায় শিলাফলক সংগ্রহ করতে আমি সেই প্রাভার শিবিরেই দেখেছিলাম। তোমার অনু-করণে আমিও গোপনে ফলক সংগ্রহ করে তার পাঠোদ্ধারের প্রণালীও আবিষ্কার করি। সেদিন গোপনে তোমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে এসে ওই বিশেষ শিলাফলকটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তখন নন্দক সেখানে অনুপস্থিত। শিলালেখে কূপিতকিরণের প্রতিকারের কথা লক্ষ্য করে আমি কৌতূহলী হই। সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধারের সুযোগ নেবার জন্যে সেটি আমি অপহরণ করে নিয়ে যাই। তারপর। আমরা যাকে সূর্যাভিশাপ বলি কন্দরবাসীরা তাকেই কূপিতকিরণ আখ্যা দিয়ে প্রতিকারের সত্যিই দু-একটি প্রণালী তাতে খোদিত করে গেছে।

কিন্তু তাহলে,—দুরু বিমূঢ়ভাবে বলে, আমরা যে অদ্ভুত এক ধ্বনি মাঝে মাঝে শুনেছি তার অর্থ কি!

কি জাতীয় ধ্বনি? জিজ্ঞাসা করে পরজ।

তা বলা কঠিন। সে ধ্বনি মনুষ্যকণ্ঠের কিনা তাও স্থির করতে পারিনি।

বুঝেছি। আবার কৌতুক হাস্যের সঙ্গে বলে পরজ, কিঞ্চিদধিক পঞ্চদশ বর্ষ যে ধ্বনি প্রাভারদের কেউ শোনেনি তার স্মৃতির রেশও তোমাদের মনে হারিয়ে গেছে!

অর্থাৎ—দুরু উত্তেজিত স্বরে বলে,—আমার মনে ক্ষীণ যে সংশয় জেগেছে তাই কি তাহলে সত্য! এ ধ্বনি শিশুর ক্রন্দনের?

ঠিকই বুঝেছ, পরজের স্বর গাঢ় গভীর হয়ে ওঠে। শিশুর ক্রন্দনই তোমরা শুনেছ। এ ধ্বনি পঞ্চদশ বর্ষ প্রাভার শিবিরে শোনা যায়নি। তার পূর্বেও মাতৃনিলয়ে কোন কাবুলা উপস্থিত না থাকলে এ ধ্বনির সঙ্গে পরিচিত হওয়া সম্ভব ছিল না। তাই এ ধ্বনি তোমাদের বিমূঢ় করেছে। শোনো দুরু, নন্দক আজিব, শোনো বুবন, এ শিশু আমার, আমার আর নিকির। নিজের নিজের সমাজের কাছে আমরা অপরাধী। আদি যুগের কোন এক দুর্জ্ঞেয় প্রতিফলনে আমরা

বর্তমানের বিকৃত ব্যতিক্রম। কিন্তু সেই বিকারই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। প্রাভার ও ইউসোভ শিবিরে শিশুর মুখ দীর্ঘকাল কেউ দেখেনি। কাফ্রাম সমাজে জননীরা মৃতবৎসা। শিশু-জন্ম কদাচিৎ হলেও তাদের বাঁচানো যায় না। আমাদের সন্তান কোন অলৌকিক কারণে জানি না সুস্থ সবল ও সূর্যাভিশাপ মুক্ত। কন্দরবাসীদের লুপ্ত লিপির কোন মূল্য যদি থাকে তাহলে তার বিধান নিয়ে আর নিজেদের আকুলতা দিয়ে এ সন্তানকে হয়ত বাঁচাতে পারব।

পারব, পারব, পারতেই হবে। নন্দক উত্তেজিত হয়ে ওঠে। আমার আজীবনের সাধনার এই হবে চরম পরীক্ষা। বিলুপ্ত-বেদের যা কিছু ওষধি উপায় আমি জেনেছি শিখেছি সব প্রয়োগ করে এ শিশুকে রক্ষা করবই।

তা যদি পারি, পরজ শান্তস্বরে বলে, তাহলে মানবগোষ্ঠীর নিরাময় ধারা তার ও তার মত আরও দু-একটি নবজাতকের মধ্য দিয়ে ভাবীকালে প্রবাহিত হতেও পারে।

এক মুহূর্ত নীরব হয়ে পরজ আবার বলে, মানবগোষ্ঠীর ভবিষ্যতের দোহাই দিয়ে বুবন নিকিকে বন্দিনী করে কাফ্রামদের কাছে প্রত্যর্পণ করতে চায়। সেই ভবিষ্যতের পানে চেয়েই বুবনকে সন্তানবতী নিকির কাছে নিয়ে যাচ্ছি। তোমরাও চল। তোমাদের কর্তব্য তোমরাই স্থির কোরো তারপর।

কর্তব্য আমার স্থির হয়ে গেছে পরজ। দৃঢ়স্বরে বলে বুবন, শুধু কাফ্রামেরা কেন, এ ভূখণ্ডের তিন শিবির একত্র হয়েও এ কন্দর যদি আক্রমণ করে তবু আমার মৃতদেহ দলিত না করে তারা এ কন্দরে প্রবেশ করতে পারবে না।

কিন্তু আমি শুধু একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না। দুরু তার দুর্ভাবনার কথা প্রকাশ না করে পারে না—সে আর্ত চিৎকার তাহলে কিসের?

কোন আর্ত চিৎকার?

পরজের বিস্মিত প্রশ্ন উচ্চারিত হতে না হতে তারই উত্তরে যেন তিমির-কন্দরের গভীর হৃদয় থেকে এক তীব্র করুণ বিলাপ ধ্বনি তাদের দিকে তরঙ্গিত হয়ে আসছে মনে হয়।

সমবেত সকলে তখন স্থাণুর মত নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে।

কয়েক মুহূর্ত পরেই বিস্রস্ত বেশবাসে উন্মাদিনীর মত পিঙ্গলকেশা কাঞ্চনবর্ণা যে নারী ছুটে এসে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে সকলের দিকে একবার তাকিয়ে পরজের বক্ষের ওপর কান্নায় ভেঙে পড়ে ইতি-পূর্বে কখনো না দেখলেও তাকে চিনতে কারুর বাকি থাকে না।

আকুল ক্রন্দনের ফাঁকে ফাঁকে নিকির উদ্‌ভ্রান্ত অসংলগ্ন বিলাপের যেটুকু অর্থ বোঝা যায় তাতে সবাই স্তম্ভিত।

নিদ্রিত অবস্থায় তার ক্রোড় থেকে কে তার সন্তানকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। জেগে উঠে সন্তানকে না পেয়ে সে তিমির-কন্দরের পথে পথে উন্মাদিনীর মত তাকে খুঁজে বেড়িয়েছে দুর্ভিক্ষেল। কখনো আর্তনাদ করেছে কখনো শোকের তীব্রতায় মূর্ছাহত হয়ে পড়েছে। শিশুর কোন সন্ধান কোথাও পায়নি।

দুরু ও তার সঙ্গীরা এবার বুঝতে পারে প্রথমে তস্করের কবলে অপহৃত শিশুর ক্রন্দনধ্বনিই তারা শুনেছিল। সে তস্কর তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ এড়াবার চেষ্টা করাতেই সে ধ্বনি অমন দিগ্বিদিকে বিক্ষিপ্ত বলে মনে হয়েছে। এরপর তারা যা শুনেছে তা নিকিরই আর্তনাদ।

কিন্তু এই অজ্ঞাত তিমির-কন্দরে প্রবেশ করে এ শিশুকে হরণ করা কার পক্ষে সম্ভব? কাফ্রামদের পক্ষে এ গুহাপুরীর পথ আবিষ্কার করাই ত কল্পনাতীত। তাছাড়া এ পথের সন্ধান পেলেও তারা এ কাজে গুপ্ততস্কর রূপে কাউকে পাঠাত না। সম্মিলিতভাবেই আক্রমণের চেষ্টা করত। শুধু সন্তানকে হরণ করে নিকিকে তারা নিষ্কৃতি দিত না কিছুতেই।

অসহায় নিদ্রিত নারীর কোল থেকে এমনভাবে সন্তানহরণের নৃশংসতা কে তাহলে কিসের স্বার্থে করতে পারে?

এ বিহ্বল প্রশ্নের কোন উত্তরই যেন নেই।

দশম উল্লাস
কৈমুতিক

শিশু-অপহর্তার সন্ধান কিন্তু শেষ পর্যন্ত আশ্চর্যভাবে মেলে। মেলে অবশ্য স্বেচ্ছায় তস্কর স্বয়ং এ অপহরণের দায়িত্ব স্বীকার করে বলে।

তস্কর আর কেউ নয় স্বয়ং শর্ভ—এ কথা কে পেরেছিল কল্পনা করতে!

শিশু-হরণের সংবাদ জানবার পর ব্যাকুলভাবে জনে জনে তখন তিমির-[illegible]

এই অন্বেষণের মধ্যে একটি সুড়ঙ্গ-পথে বুবন ও পরজ শর্ভের দেখা পায়।

তিমির-কন্দরে তার উপস্থিতিই বিস্ময়কর।

কিন্তু সে বিস্ময় প্রকাশের তখন সময় নয়। বুবন ও পরজ ব্যাকুলভাবে অপহৃত শিশুর সংবাদ দিয়ে শর্ভ সে বিষয়ে কিছু জানে কিনা জিজ্ঞাসা করে।

শর্ভ যা উত্তর দেয় তা তাদের কল্পনারও অতীত।

নিজে যাকে হরণ করেছি তার খবর আমি ছাড়া জানবে কে! —নির্বিকারভাবে জানায় শর্ভ।

স্তম্ভিত বিস্ময়েই কিছুক্ষণ বুঝি তারা নির্বাক হয়ে থাকে। তারপর বিমূঢ় ব্যথিত স্বরে পরজ শুধু বলে, এ পরিহাসের সময় নয় শর্ভ। সত্যই আমার সন্তান অপহৃত। যদি যথার্থ কিছু জানো ত বলো। মিথ্যা যন্ত্রণা দিও না।

মিথ্যা যন্ত্রণা থেকে মুক্তিই ত তোমাদের দিতে চাইছি পরজ। তোমার সন্তান সত্যই তাই হরণ করেছি।

তুমি হরণ করেছ সত্যই! পরজের স্বরে তখনো অবিশ্বাস। কেন? কেন?

একটা অতিদীর্ঘ অসহ্য করুণ প্রহসনে শেষ যবনিকাপাত করতে। শর্ভের কণ্ঠ যেন করুণাতেই স্নিগ্ধ।

তোমার বাতুলতা রাখো শর্ভ! পরজ ধৈর্য হারিয়ে বলে, সত্যিই যদি এ কাজ করে থাকো ত কোথায় তাকে রেখেছ বলো! নিয়ে চলো অবিলম্বে আমাদের সেখানে!

না পরজ। শান্ত দৃঢ়স্বরে বলে শর্ভ, ফিরিয়ে দেব বলে তাকে হরণ করিনি। হরণ করেছি ইতিহাসের একটা ক্ষীণতম ধারাও যাতে ভাবীকালে না পৌঁছোতে পারে তারই জন্যে। ওই অবোধ অচেতন জড়পিণ্ড প্রায়-শিশুর মধ্যে তোমরা মানব-গোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ আশার দীপ দেখতে পাচ্ছ। কি সে আশা তা কখনো ভেবে দেখেছ? ওই শিশু বেঁচে থাকলে বড় হবে মানুষ হবে। সে মানুষ হওয়া মানে ত শুধু দেহ ও মনের ক্ষুধায় ও জিজ্ঞাসায় জর্জর হওয়া, নিরাপদ নিশ্চিন্ততার জন্যে গোষ্ঠী গড়ে তারই শাসনবন্ধনে হয় জীবন্মৃত নয় ক্ষত-বিক্ষত হওয়া, অস্তিত্বের অর্থ খুঁজতে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে আকাশ-ধরণী এক বা একাধিক দেবতায় ভরিয়ে তুলে তাদের দীন স্তাবকতা করা! ওই শিশু এক থেকে অগণন ও যদি হয় তাহলেও তার রীতিনীতি ধর্ম সব হবে তার লোভ, হিংসা দম্ভ, দীনতার নগ্ন বীভৎসতাকে রঙীন আচ্ছাদন দেবার ছলনা। মিলনের চেয়ে বিভেদেরই সাধনা সে করবে অনেক বেশী, তারপর একদিন ঈর্ষা ও হিংসার তাড়নায় সূর্য-বীর্য অর্জনের লোভে সূর্যাভিশাপের ব্যাধি-কলঙ্ক নিয়ে আবার ধ্বংসের পথে নামবে। এ দুষ্টচক্র থেকে মুক্তি আছে শুধু সমস্ত আবর্তনের [illegible] সেই অচলতাই তোমার শিশু লাভ করুক। মানবগোষ্ঠীর ধারা চিরকালের মত যাক লুপ্ত হয়ে সেই অচলতায়।

উন্মাদের বাতুল প্রলাপ। তবু তাই শুনতে শুনতে বুবন ও পরজ কি মোহাবিষ্ট হয়ে পড়েছিল!

সহসা চমক ভেঙে উদ্যত-কৃপাণ বুবনই প্রথম চীৎকার করে ওঠে, তোমাকে একটি প্রশ্ন শুধু করব শর্ভ। তোমার আরাধ্য অচলতাই চাও, না শিশুকে দেবে ফিরিয়ে?

উন্মাদ শর্ভ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে। তার অবিচলিত মুখে দুর্বোধ এক হাসি।

বুবনের কৃপাণ সাক্ষাৎ মৃত্যুর মত নেমে আসবার পরও সে হাসি যেন মিলায় না।

শর্ভের ভূলুণ্ঠিত দেহ অস্থিরভাবে অতিক্রম করে বুবন ও পরজ এগিয়ে যায়!

শিশুর অস্পষ্ট রোদনধ্বনি কোন গোপন গুহাগর্ভ থেকে ভেসে আসছে কি!

গহন তিমির-কন্দরের বুকে অনন্ত ভাবীকালই যেন শিশুর কণ্ঠে রোরুদ্যমান। তার সন্ধান সত্যই কি কেউ পাবে না?

—শেষ—

ছোটবেলায় আর কৈশোরে খবরের কাগজের পাতায় পাতায় স্বদেশী আন্দোলনের কথা পড়তাম। পড়তাম জওহরলাল, রাজাজী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, কৃপালনী, পন্থজী, জয়প্রকাশ, অশোক মেটা, রামমনোহর লোহিয়া ও আরো কতজনের কথা। নানাজনের মুখে মুখে শুনতাম বিলেতে বসে কৃষ্ণমেননের কীর্তি-কলাপ। হেডমাষ্টার-মশাইয়ের কাছে কতদিন মাসানীর 'আওয়ার ইন্ডিয়া'র পড়া না পারার জন্য বকুনি খেয়েছি, তার হিসাব-নিকাশ নেই। জওহরলাল-জামাতা ফিরোজকে নিয়েই কি কম খোসগল্প করেছি এর আগে! এমনি নানাভাবে দেশের নেতাদের সম্পর্কে একটা অদ্ভুত কৌতূহল দানা বেঁধে উঠেছিল মনের মধ্যে। মাঝে মাঝে এঁদের কথা ভেবে উত্তেজনাও বোধ করতাম।

দেশ স্বাধীন হলো। হোয়াইটওয়ে লেডল'র ধ্বজায় ফাটল ধরল। বাই য়্যাপয়েন্টমেণ্ট অফ দি হিজ রয়্যাল ম্যাজেষ্টির কদর চৈত্রদিনের ঝরা পাতার মত ঝরে গেল। র‍্যানকিন উঠে খাদি প্রতিষ্ঠানের কর্মচঞ্চলতা সাময়িকভাবে বৃদ্ধি পেল। ভাইসরয় কাউন্সিলের 'অনারেবল মেম্বর'দের গলফ খেলার ছবির পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি ভবন আর লাটপ্রাসাদের সূত্রযজ্ঞের ছবি ছাপা শুরু হলো সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়। লর্ড ক্লাইভের একদা বংশধরদের তীর্থস্থান ইউনাইটেড সার্ভিসেস্ ক্লাব উঠে গেল; পাড়ায় পাড়ায়, মহল্লায় মহল্লায় গান্ধীচক্র, সুভাষদল, ঝান্সী ব্রিগেড গড়ে উঠল। বিদেশী দ্রব্যের ব্যবহার কমল; নেতাজী বিড়ি, তেরাংগা শাড়ী-সন্দেশ, গান্ধীজির বিকৃত ছবিওয়ালা রেশনব্যাগ সারা দেশ ছেয়ে ফেলল। গ্রাজুয়েটও কণ্ডাক্টর হলো; আর ভূতপূর্ব রাজনৈতিক বন্দীর বিড়ির দোকান গজিয়ে উঠল অলিগলির আশেপাশে যত্রতত্র।

দিল্লীর ক্লাইভস্ওয়ের নাম 'জনপথ' হলো। সাহেব গিয়ে কংগ্রেস এলো। উত্তপ্ত লোহার উপর হাতুড়ি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যেমন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে চারদিক, সাউথ ব্লকে জওহরলালের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেও তেমনি দিল্লীর সমাজজীবনের সীমিত গণ্ডী ভেঙে একাকার হয়ে গেল। গলফ-চেমসফোর্ড-জিমখানা ক্লাবত্রয়, সিসিল-ইম্পিরিয়্যাল প্রভৃতির 'বার' ও গুটিকতক কুঠীর মধ্যে অতীত দিল্লীর যে সামাজিক গণ্ডী বাঁধা ছিল, পার্লামেণ্টশীর্ষে তেরংগা দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে কিংসওয়ে ক্যাম্প—হরিজন কলোনী থেকে দক্ষিণে তিনমূর্তি পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল নিঃশব্দে। আর ভাইসরয় কাউন্সিলের সদস্যদের কুঠীর অতি বিস্তৃত অংগনে ঘাসের জাজিম আলুমিনিয়াম পেণ্টেড বেতের কুর্শীতে বসে আই-সি-এস তিলকাঙ্কিত ভাগ্যবানদের অপরাহ্নকালীন মোসাহেবীর আসর বিদায় নিয়ে নতুন করে আরম্ভ হলো পার্লামেন্টের সেন্ট্রাল হলের কফির মজলিশ।

পার্লামেন্টের প্রেস গ্যালারী থেকে জওহরলাল-কৃপালনী-মাসানী-ডাংগে-অশোক মেটা প্রভৃতির বাদানুবাদের সংগে সঙ্গে সেণ্ট্রাল হলের আড্ডাখানার প্রতি আমার অসীম আকর্ষণ। বোধকরি সারা দেশের মধ্যে এটি একমাত্র স্থান যেখানে মন্ত্রীদের অহমিকার উগ্র প্রকাশ নেই, নেই দলাদলির ক্ষুদ্রতা। রাজনৈতিক দুনিয়ার কৈলাস-মানস সরোবর আর কি।

কেরালায় সেণ্ট্রাল ইণ্টারভেনশন নিয়ে লোকসভার ভিতরে কমিউনিস্টদের তীব্র মন্তব্যে জর্জরিত করলেন 'দাদা' কৃপালনী। কৃপালনীর ঘাড়ে বন্দুক রেখে ফায়ার করে সাদা টুপিওয়ালাদের দল আনন্দে আটখান হয়ে লুটিয়ে পড়লেন। কেরালার টমাস ট্রেজারী বেঞ্চে বসে খুনীর মামলার দারোগার মত কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে অফুরন্ত অভিযোগ পেশ করলেন 'মিঃ স্পীকার, স্যারের' বিবেচনার জন্য। ডাঙ্গের সুতীব্র কটাক্ষ ভীমরুলের হুলের মত বিদ্ধ হলো বিপরীত দিকের সবার অন্তরে। ডাঙ্গের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে সংগে বিধান-ভ্রাতুষ্পুত্রী রেণু চক্রবর্তী ও মন্ত্রী-কন্যা পার্বতী কৃষ্ণাণের সম্মিলিত কলধ্বনি কৃপালনী-মাসানী-ফ্র্যাঙ্ক এ্যান্থনীকে একটু চঞ্চল ও লোকসভার পরিবেশকে কিঞ্চিৎ নাটকীয় করে তুলল। এমনিভাবে সংটল-ককের মত অভিযোগ-অনুযোগ দেওয়া নেওয়া হলো।

'হাউস' থেকে সেন্ট্রাল হলে ঢুকলেন প্রায় সবাই। প্রেস গ্যালারী থেকে বেরিয়ে ঘুরে সেন্ট্রাল হলে ঢুকতেই দেখি একটা সিগারেট হাতে নিয়ে গোবেচারার মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন দাদা কৃপালনী। আমাকে দেখতেই বল্লেন, এই, ম্যাচিস দিজিয়ে।

'ম্যাচিস দিজিয়ে!'

'সরি'।

সরি! বেটা বদমাস প্রেসওয়ালা, সিগারেট নেই পিতা এহি বিলিভ করনা হোগা?

একটু এগিয়ে যেতেই আদিভূমি তেলেঙ্গানার নাগি রেড্ডীকে পাকড়াও করে বল্লেন,

দাও আগুন দাও। বিস্মিত ভাবে নাগি রেড্ডীকে চেয়ে থাকতে দেখে আশ্চর্য হয়ে বলে উঠলেন, সারা কেরালায় আগুন জ্বালালে, আর আমার এই সিগারেটে একটু আগুন দিতে পারছ না ?

মুহূর্তের মধ্যে পাশে এলেন ফিরোজ গান্ধী। আচার্যকে লক্ষ্য করে বল্লেন, কিউ দাদা, কি ব্যাপার ? 'ইন্টারভেন' করব নাকি ? বুঝলেন আগুন নিয়ে খেলা চলছে। পরোপকারের মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পকেট থেকে দেশলাই বের করে বল্লেন, নিন, আমিই আগুন জ্বালাচ্ছি। ফোকলা দাঁতের এক গাল হাসি আর ধোঁয়া ছেড়ে আচার্য বল্লেন, তা বাবা তুমি আগুন জ্বালাতে পার; কিন্তু বি কুইক ফিরোজ। সবাইকে হাসিয়ে আচার্য অন্যত্র গমন করলেন।

এক পাশ দিয়ে ঘুরে সেণ্ট্রাল হলের নিউজ কর্ণারে টেলিপ্রিণ্টারের শেষ খবরগুলো দেখতে চলেছি, এমন সময় একটু খোঁচা খেতেই পাশ ফিরে দেখি শ্রীমতী উমা নেহরু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছেন। হাত ধরে টেনে নিয়ে এক কোনায় পাশে নিয়ে বসলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, বলতে পারো বাঙালীদের মধ্যে চৌধুরীরা ব্রাহ্মণ না কায়স্থ ? *হিন্দুর ধর্মশাস্ত্র ও লক্ষণ সেন প্রচলিত শ্রেণী-বিভাগ সম্পর্কে আমার জ্ঞান অপরিসীম; তবুও সমস্ত স্মৃতি রোমন্থন করে বিজ্ঞের মত জানালাম 'দুইই' হয়। শ্রীমতী নেহরুকে একটু চিন্তান্বিত দেখলাম। জানলাম, তাঁরই স্নেহচ্ছায়ায় যেসব বাঙালী উদ্বাস্তু মেয়েরা* উত্তরপ্রদেশের নানা হোমে রয়েছেন, তাঁদেরই একজনের বিবাহ সংক্রান্ত ব্যাপারে এই খোঁজ। ইনি উত্তরপ্রদেশ মন্ত্রিসভার সঙ্গে এক 'জেণ্টলম্যানস এগ্রিমেন্ট' করেছেন যে এই সব বাঙালী উদ্বাস্তু মেয়েদের বিয়ের জন্য বেকার অথচ ভাল ছেলে তাঁর পছন্দ হলে সরকারকে তাদের চাকুরি দিতে হবে। শুধু তাই নয়, উত্তরপ্রদেশ সরকারের নানা দপ্তরে ফাইলের স্তূপের আড়ালে যেসব চিরকুমার লুকিয়ে রয়েছেন, তাঁদের বহুজনের খোঁজ করে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার পাবার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা করেন।

কানে কানে ফিস ফিস করে বল্লেন, মেয়েদের 'হোম' চালান কি সহজ ব্যাপার ! ঝঞ্ঝাটের যেন শেষ নেই।...এক মহারাজপুত্র জানান সে একটি রিফিউজি মেয়েকে ভালবাসে এবং বিয়ে করতে চায়। মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলে মাথা নীচু করে নখ খুঁটতে লাগল; বুঝলাম ইচ্ছা আছে। এবার একটু দৃঢ় হয়ে বল্লেন, জান ভট্টাচারিয়া, আমি কিন্তু ঐ বিয়েতে মত দিলাম না। রাজকুমারকে জানিয়ে দিলাম, বাপের টাকা ও চোখের নেশা কেটে গেলে তো আমার রিফিউজি মেয়েকে দূর করে দেবে; তোমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হবে না।

• • •

শ্রীমতী নেহেরু অন্য একদিন এখানে বসেই কথায় কথায় টাকা-কড়ির আলোচনা শুরু করলেন—'লোকে ভাবে এম পি হলে কত টাকাই না জমাই। বিলিভ মি, একটা পয়সাও জমে না। পার্লামেণ্টারী পার্টিকে হেভী সাবস্ক্রিপসন ছাড়াও আজ এটা, কাল ওটা তো লেগেই আছে।...এই ত জওহরলাল বলেছে, আসাম আর কাশ্মীর ফাণ্ডের জন্য একান্ন টাকা করে দিতে হবে। নিজের কনস্টিটুয়েন্সীতে খরচ আছে, মণ্ডল-জেলা-পি-সি-সি ও এ-আই-সি-সির চাঁদা তো আছেই। এ ছাড়া আছে সোস্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানিজেশন ও আমাদের চিলড্রেন্স আর রিফিউজি হোম-এর চাঁদা। পার্লামেন্ট থেকে যা পাই, তার একটা পয়সাও বাঁচে না, উপরন্তু কুলিয়ে ওঠাই দায়।' একটু থেমে আবার বলেন, 'জওহরলালকেও সব দিয়ে দিতে হয়; বই'এর আয় থেকে কোন মতে নিজের খরচা চালায়।

রিফিউজি মেয়েদের কাহিনী শুনে দিল্লীর পার্লামেণ্ট ভবন থেকে মন তখন চলে গিয়েছে কর্ণফুলি-বুড়ীগঙ্গা-মেঘনার পাড়ে; স্মৃতিপটে ভেসে উঠছে ধুবুলিয়া-বার্ণপুর-বনগ্রামের সেই পরিচিত বেদনাময় ছবি। একটু আনমনা হয়েই চলেছিলাম। হঠাৎ তাঁর হাসির শব্দে মনের চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে গেল। দেখি পাতিল খুব জোর জমিয়ে বসেছেন। কেরালার কমিউনিষ্ট

পাতিল খুব জোর জমিয়ে বসেছেন —

ডেমোক্র্যাসী নিয়ে খোসগল্প চলছে। কেরালা শুনতেই খবর পাবার মহোৎসাহে বেশ একটু ঠেলাঠেলি করেই জায়গা করে নিলাম। শুনি পাতিল বলছেন, কেরালার এক মহতী জনসভায় গীতার কয়েকটি শ্লোককে অ্যামেণ্ড করে ডেমোক্রাটিক করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। প্রস্তাবে বলা হয়েছে, এযুগে গীতার 'এথিক্স অফ লাইফ' অচল এবং তাকে অ্যামেণ্ড করতে হবে। পাতিলের বক্তব্য শেষ হলো; হাসিতে সবাই লুটিয়ে পড়লেন।

পার্লামেণ্টের 'কমিউনিষ্ট পার্টির চীফ এম-পি রিলেসন্স অফিসার' রেণু চক্রবর্তী এতক্ষণ ধৈর্য ধরে গল্প শুনে এবার পাতিলের পিঠে এক মৃদু চাপড় মেরে বল্লেন, হোয়াট ইজ দিস ?

পাতিলের কোট প্যান্ট জামায় অনেকগুলো পকেট

কাকুতি-মিনতি করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার জাঁদরেল মন্ত্রী পাতিল দু'হাত জোড় করে বল্লেন, রেণু, ফর গডস্ সেক, প্লিজ এক্সকিউজ মি। আই অ্যাম দি লাস্ট ম্যান টু ট্রাই টু অ্যামেণ্ড ইউ অ্যাণ্ড ইওর ফ্রেণ্ডস। যা বলেছি, সব অফ্ দি রেকর্ড; রাগ করো না।

হাজার হলেও বিধানবাবুর ভাইঝি, সাংবাদিকের পত্নী এবং তার উপর কমিউ-নিস্ট। সুতরাং বিক্রমটা নেহাৎই কম নয়। ফোঁস ফোঁস করতে থাকেন চক্রবর্তী-গৃহিণী।

একটু চুপ করে থেকে এবার নিতান্ত গোবেচারার মত পাতিল বলেন, রেণু, কাম হিয়ার; বসো কফি খাও।...বেয়ারা! কফি লে আও; এক, দো, দো, তিন......দশ কাপ লে আও।

—শুধু কফি কে খাবে? ফোঁস করে উঠলেন শ্রীমতী চক্রবর্তী।

—আচ্ছা বাবা, অর ভি কুচ লে আও; স্যাণ্ডউইচ, কাজু......।

সবাই এদিকেই মশগুল। এক পাশে ফিরোজ আর কৃষ্ণমেনন যে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, বিশেষ কেউ লক্ষ্যই করেননি। মাথা থেকে গান্ধীটুপি খুলে সাদা চকচকে টাক চুলকাতে চুলকাতে পাতিলকে লক্ষ্য করে ফিরোজ বল্লেন, মিনিণ্টার সাব! হু আর দি টেন ফরচুনেটস যারা কফি আর ঐ সব কি কি পাবে?

অভিমান-হত কণ্ঠে ভ্রূকুঞ্চিত করে কৃষ্ণ-মেনন বলেন, ফিরোজ, ডোণ্ট বেগ ফ্রম সেলফিস পাতিল। শুধু নিজেই কফি খেতে জানে।

উদাসীনভাবে পাতিল বল্লেন, ফিরোজ মে ট্রাই হিজ লাক, বাট আই ডোণ্ট সী এনি হোপ ফর অ্যানাদার।

তবে রে! নো হোপ অ্যানাদার! ছড়ি দিয়ে পাতিলকে ঠেলে সরিয়ে জায়গা করে নিলেন কৃষ্ণমেনন। বেয়ারা কফির ট্রে নিয়ে হাজির হতেই চিলের মত ছোঁ মেরে তুল্লেন। সবার বিস্ময় কাটবার আগেই এক কাপ শেষ করে আর এক কাপ ঢেলে নিলেন মেনন। মিনিটের কাঁটা ঘুরতে না ঘুরতেই সেকেণ্ড কাপ শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন।

—গুড বাই রেণু। ছড়ি দিয়ে পাতিলকে এক খোঁচা মেরে বল্লেন, গুড বাই পাতিল। এক দু' কদম সরে গিয়ে বল্লেন, আমার লুঙ্গি পাঞ্জাবির পকেট নেই, পয়সাও নেই; আগে আগে কেটে পড়ি, নয়ত বেয়ারাটা হয়ত পিছু ধরবে।... অফকোর্স পাতিলের কোট-প্যান্ট-জামার অনেকগুলো পকেট; ফিরোজ, ডু ইউ থিঙ্ক দে আর এমটি?

পিছন ফিরে হাসতে হাসতে কৃষ্ণমেনন চলে গেলেন।

—একমাঘে শীত যাবে না। এই বলে আত্মসন্তুষ্টি লাভ করেন পাতিল।

একটু দূরে দেখি সোস্যালিস্ট থিওরিটি-সিয়ান অশোক মেটা কয়েকজনের সঙ্গে কি না কি গুরুতর বিষয় আলোচনা করছেন। পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। আরও দু' একজন বাঙালী ছিলেন। আমাদের দিকে লক্ষ্য করে বল্লেন, আই কাণ্ট ইমাজিন বেঙ্গল ক্যান গো কমিউনিস্ট। সব বাঙালীর মধ্যেই দেশপ্রেম আছে, ভাল-মন্দ বিচারের ক্ষমতা আছে...

মাঝখান থেকে কে একজন বলে উঠলেন, বাংলার কংগ্রেস যে—

তীব্র আক্ষেপ করে সোস্যালিস্ট তত্ত্ব-বিশারদ বলেন, তাই বলে সবাই কমিউনিস্ট হবে? একি কথা?

তাই বলে সবাই কমিউনিস্ট হবে?

আলাপ-আলোচনার যেন শেষ নেই সেণ্ট্রাল হলে। কি মন্ত্রী, কি এম-পি, কি প্রেস করসপনডেণ্ট—সবার মুখে যেন তুবড়ী ফোটে এখানে।

গোটা দুই বেঞ্চি জুড়ে জমিয়ে বসেছিলেন দাদা কৃপালনী। দাদাকে ঘিরে ছিলেন মহাবীর ত্যাগী, মালব্য, বিমল ঘোষ, শরণ সিং, অশোক সেন প্রভৃতি এবং আমরা একদল। আলোচনা হচ্ছিল মৌলানার বম্ব শেল ফ্রম গ্রেভ ইয়ার্ড—ইণ্ডিয়া এ্যাটেনস্ ফ্রীডম।

আচার্য বল্লেন, আগে তো ওয়ার্কিং কমিটির সব মিটিং-এই আমি উপস্থিত থাকতাম। কিন্তু কই, মৌলানা সাহেব বইতে যা লিখেছেন, তাতো কোনদিন বলতে শুনিনি।

বিমল ঘোষ বলে উঠলেন, দাদা, আপনি একটা অটোবায়োগ্রাফী বা মেমার্স অফ ফ্রীডম মুভমেণ্ট লিখুন...

মালব্য-ত্যাগী-অশোক সেন একযোগে বলে উঠলেন, হ্যাঁ দাদা, আপনি একটা লিখুন।

—কি হবে লিখে? পোষ্টমর্টম একজামিনেশন করে কি কোন লাভ আছে? তাছাড়া এতে হয়ত আবহাওয়া আরো অন্ধকার হয়ে উঠবে।

সবাই বলে উঠলেন, তা হোক, তবু এর প্রয়োজনীয়তা আছে। ভবিষ্যতের ছেলে-মেয়েদের এসব জানান দরকার।

হঠাৎ মাঝখান থেকে বাঁকা চোখে আধো আধো স্বরে সুচেতাদি বলে উঠলেন, আমি কতদিন বলেছি ওকে।

'আমি কতদিন বলেছি ওকে'

—তুমি তো কত কথাই বলো!

মহাবীর ত্যাগী বলে উঠলেন দেশেরও কিছু হবে না, কংগ্রেসেরও কিছু হবে না। হবে কোথা থেকে? এদিকে কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টের স্বামী ফিরোজ এক 'রিবেল', আর জেনারেল সেক্রেটারীর স্বামী দাদা কৃপালনী আর এক ফেমাস রিবেল। কংগ্রেস হ্যাজ বিন হাসব্যাণ্ডেড্ বাই রিবেলস।

লাভলি, লাভলি।

একটু মৃদু হেসে আচার্য বল্লেন, ওসব কথা আমাকে বলো না ভায়া; জওহরলালের পিসফুল কো-এক্‌জিস্‌টেন্স বলতে যদি কোথাও কিছু থাকে, তবে তা আমার বাড়ীতেই আছে। সারা দুনিয়ার অন্যত্র তা বানচাল হয়ে গেছে।

* * *

আর একদিন নানাপ্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনার পর হিউমার নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। ডাঃ কেশকার বল্লেন, আমি যতদূর জানি সরোজিনী নাইডুকে কেউ বিট করতে পারত না। মিসেস নাইডুর হিউমার জ্ঞানের এক চমৎকার কাহিনী শোনালেন ডাঃ কেশকার।

মিসেস নাইডু তখন কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট। বোম্বের থেকে দিল্লী আসছিলেন; সঙ্গিনী ছিলেন এক প্রোথিতযশা কংগ্রেসনেত্রী। নেত্রী মহোদয়ার কণ্ঠস্বরের সঙ্গে পুরুষ-কণ্ঠের বিশেষ পার্থক্য ছিল না। তাছাড়া ববড্ হেয়ার ও দেহের গঠনে নারীর বৈশিষ্ট্য ও কমনীয়তার অভাব ছিল। যাহোক, এক লেডিস ফার্স্টক্লাশে এঁরা দুজনে ভ্রমণ করছিলেন। বেশ একটু রাতে হঠাৎ কি কারণে টিকেট-চেকার দরজায় নক্ করল। দরজা খুলে স্লিপিং স্যুট পরিহিতা মিসেস নাইডু-সঙ্গিনী চেকারের সামনে হাজির হলেন।

—হোয়াটস্ দি ম্যাটার? এত রাত্রে বিরক্ত করতে এলেন কেন?

কণ্ঠস্বরের সেই কর্কশতা।

চেকার তো রেগে লাল। বিরক্ত করতে এলাম কেন, সে পরে দেখা যাবে। কিন্তু হাউ কুড ইউ বি ইন দিস লেডিস কম্পার্টমেণ্ট.. কোন লেডিস প্যাসেঞ্জার আছেন এই কম্পার্টমেণ্টে?

—হ্যাঁ, আমি বাদে একজন লেডি প্যাসেঞ্জার আছেন।

দুজনের কি তর্ক! শ্রীমতী নাইডু চাদর মুড়ি দিয়ে চুপচাপ মুখ টিপে টিপে হাসছিলেন। তাঁর সঙ্গিনী নানাভাবে চেকারকে বোঝাতে চাইছিলেন যে তিনিও এই কামরায় ভ্রমণ করতে পারেন; কিন্তু চেকার কিছুতেই বুঝতে চাইছিলেন না।

দিল্লী ফিরে বন্ধু-বান্ধবদের কাছে সব বৃত্তান্ত পেশ করলেন শ্রীমতী নাইডু। শেষে মন্তব্য করলেন, আই ডোণ্ট নো হাউ সী কনভিন্সড দি চেকার দ্যাট সী ওয়াজ কোয়ালিফায়েড টু ট্রাভেল ইন লেডিস কম্পার্টমেণ্ট।

'ভেবে দেখিনি'

এই সেণ্ট্রাল হলের এমন রাজনৈতিক ও অন্যান্য আলোচনার আড়ালে কাঁচা বয়সের একদল এম-পি আর করসপনডেণ্ট সরস আলোচনার আসর জমিয়ে বসেন।

ভারতনাট্যম দেখিয়ে লণ্ডন-প্যারী-মস্কোতে ঝড় বইয়ে, লণ্ডন টাইমস'এর এডিটোরিয়ালে কমেণ্টেড হয়ে বৈজয়ন্তী-মালা এলেন দিল্লী। অশোকা হোটেলে এক ক্রাউডেড প্রেস কনফারেন্সে নৃত্যপটিয়সী অভিনেত্রী জানালেন, ভারত থেকে ভারত-নাট্যম, কথক প্রভৃতি নৃত্যশিল্পকে কন্টিনেন্টে এক্সপোর্ট করার মহত্তম সুযোগ দেখে এসেছেন তিনি।

যোগীপুরুষের মত এক সাংবাদিক তাঁকে সিরিয়াসলি প্রশ্ন করলেন, বিয়ে করছেন কবে? পছন্দ করেছেন কাউকে? প্রশ্নকর্তার চাইতেও নির্বিকার চিত্তে নিতান্ত দার্শনিকের মত উত্তর দিলেন নর্তকী-অভিনেত্রী, ভেবে দেখিনি।

পরের দিন সেণ্ট্রাল হলে একদল ছোকরা এম-পি ও একদল করসপনডেণ্টদের কি সরস আলোচনা। আড় চোখে চেয়ে দেখেছি, ক'জন বেশ বয়স্ক মিনিস্টার—এম-পি একটু দূরে বসে এই আলোচনার রসালাপ উপভোগ করছিলেন।

এমনিভাবেই চলে সেণ্ট্রাল হলের দিন। মাঝে মাঝে মনে হয় বোধকরি সেণ্ট্রাল হলই ভারতবর্ষের পার্লামেণ্টারী ডেমোক্রাসীর মানস সরোবর। *

* দ্বিতীয় লোকসভার পরিপ্রেক্ষিতে লেখা।

কার্বন কপি

আশাপূর্ণা দেবী

লাল কাঁকরের সরু রাস্তাটা এসে শেষ হয়েছে, রংচটা ওই কাঠের গেটটার সামনে। শেষ হওয়া ছাড়া রাস্তাটার আর গতি ছিল না। কারণ শহরটাও শেষ হয়ে গেছে এখানে।

বাড়ীর পিছনেই রেললাইনের উঁচু বাঁধ। আর ওপাশে অনেকখানি বালির চড়ার ওধারে একটা বালুনদী। নাম নেই, দেহাতিরা ওর প্রকৃতি বিচার করে একটা নাম দিয়ে রেখেছে। ওরা বলে 'হঠাতি'। তার মানে ওই ওর প্রকৃতি। মাসের পর মাস কোথায় কোন-খানে লুকিয়ে আছে, অনড় রোগীর মত পড়ে আছে, হঠাৎ কোনও একদিনের আমাপা বর্ষণে লাসাময়ী নবযৌবনার মত উথলে ওঠে।

এখন নদীটার অনড় রোগীর মূর্তি।

কিন্তু তখন ছিল ভরা যৌবন। অনেক দিন আগে যখন আর একবার এসেছিল উত্তরা 'ফুলমাটিতে'।

তাই এবারে এসে প্রথমটা চিনতে ভুল হচ্ছিল, 'চৌধুরী বাংলো' নামটা পড়ে নিঃসংশয় হলো।

ভাবল সেদিন নদীতে জল ছিল, আর সেই ছোট মেয়েটার চোখেও জল ছিল। অবিরাম কান্নায় বালিশ ভিজিয়েছিল সে, আর এক নদী বইয়ে ছিল।

অন্ততঃ উত্তরার পিসিমা সেই কথাই বলেছিলেন, 'ও-দাদা, মেয়ে যে তোমার কেঁদে নদী বইয়ে দিল গো।'

কিন্তু পিসিমার দাদা ওই নদী বহানোর মধ্যে আতিশয্যতা দেখেননি, তিনি জানতেন এমন ক্ষেত্রে অনেক ছেলেমেয়ে এমন অনেক কিছু করে বসে যা চোখের জলে নদী বহানোর চাইতে অনেক ঘোরালো।

উকিল মানুষ, কেস তো অনেক আসে? দেখেছেন নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে, দেখেছেন আত্মহত্যা করতে। তাই সকরুণ হাসি হেসে বলেছিলেন, 'অমন হয় রে মনীষা। সময় লাগবে সামলাতে।'

সামলাবার জন্যেই না মেয়েকে নিয়ে বিভাসবাবু কলকাতার জনসমাজের বাইরে, এখানে এসে উঠেছেন। নইলে স্বাস্থ্যকর জায়গায় বোনের একটা বাড়ী আছে বলে, স্বাস্থ্য উদ্ধার করে নিতে আর কবে এসেছেন বিভাস?

উত্তরার মা আসেননি।

উত্তরার মা এটাতে আতিশয্য দেখেছিলেন। যার জন্যে মেয়ের এই মর্মান্তিক কষ্ট, সেটা তো মেয়ের নিজেরই বোকামির ফল। তবে?

যা নিজের দোষে ঘটেছে তার জন্যে আবার এত সহানুভূতি কি? এই অভিমত ছিল উত্তরার মায়ের। অভিমত ছিল, উত্তরা যত ধিক্কৃত হবে, যত তার লোকসমাজে মুখ দেখাতে মাথা হেঁট হবে, ততই আগামী বছরের জন্যে চেষ্টা আসবে, শপথ গ্রহণের সংকল্প আসবে।

বিভাস তা' বলেননি।

বিভাস নিজের কাজকর্মের ক্ষতি করে মেয়ে নিয়ে এক মাসের জন্যে এখানে এই 'চৌধুরী বাংলোয়' এসে উঠেছিলেন মেয়ের মনের সদ্যক্ষতের উপর একটা পলেস্তারা পড়বার সুযোগ দিতে।

এখানে লোকসমাজ কম।

উত্তরার পিসেমশাই অনেক দেখেশুনে এই জমিটুকু পছন্দ করেছিলেন বাড়ী করবার জন্যে। শহর ছাড়িয়ে রেললাইনের বাঁধের নীচে।

তা' পিসেমশাইকে আর বেশীদিন সে বাড়ী ভোগ করতে হয়নি, উত্তরার বিধবা পিসিই সময় সুযোগ মিললে এসে হাজির হতেন। কাঠের গেটের গায়ের মরচে-পড়া তালাচাবিটা খুলে ফেলে ঢুকে পড়তেন। থেকে যেতেন কিছুদিন।

সেই 'কিছুদিনে'র মধ্যে সেবার বিভাস আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। আসার কারণটা পিসি হয়তো ছেলেমানুষী বলে ভেবেছিলেন। ভেবেছিলেন দাদার একটা মোটে মেয়ে, তাই দাদা এত নাচাতে পারছেন। কিন্তু পিসির বড় ভাল লেগেছিল। 'বৌদির' আবরণমুক্ত দাদাকে পেয়ে ছেলেবেলার স্বাদ ফিরে পেয়েছিলেন যেন।

আর বিভাসও হয়তো সে আবরণের প্রভাব মুক্ত হয়ে বদলে গিয়েছিলেন, হালকা হয়ে গিয়েছিলেন। এই সহজ আবহাওয়ার মধ্যে থেকে উত্তরার চোখের জল শুকোতে বেশী দেরী লাগেনি, ম্যাট্রিকে ফেল করার মত মর্মান্তিক শোকও সামলে নিতে পেরেছিল।

হ্যাঁ, উত্তরা তার মায়ের মুখে কালি দিয়ে ম্যাট্রিকে ফেল করেছিল। একেবারে অপ্রত্যাশিত! প্রথম দিন প্রশ্নপত্রগুলো হাতে পেয়েই নাকি তার মাথার মধ্যটা একেবারে ধাপসা ধূসর হয়ে গিয়েছিল, সেই ধূসরতার মধ্যে থেকে একটা কথাও উদ্ধার করতে পারেনি উত্তরা। শুধু কলম কামড়েছিল, শুধু আকুল হয়ে মগজের সমস্তটা ওলট-পালট করে হাতড়ে বেড়াবার চেষ্টা করেছিল। চেষ্টা কাজে লাগেনি।

নার্ভাসনেস।

সম্পূর্ণ নার্ভাসনেস!

নইলে পড়াশোনা যথেষ্ট তৈরি করেছিল, বাড়ী এসে সেই প্রশ্নপত্রগুলোকেই টকাটক মেরে নিয়েছিল।

পরদিন থেকে বাকী দিনগুলো দিল পরীক্ষা, কিন্তু প্রথম দিনের ওই ব্যর্থতা সমস্ত উৎসাহ আর চেষ্টাকে শিথিল করে দিল।

ফলপ্রুতি ফেল।"

উত্তরার মা এতটা আশা করেননি। ভেবেছিলেন হয়তো থার্ড ডিভিশন পেয়ে মুখ ডোবাবে। একী! এ যে মুখে কালির বুরুশ!

উত্তরা ঘর থেকে বেরোয় না, কাজেই কালিপড়ামুখ মায়ের সমস্ত আক্ষেপ আর অভিযোগের ভারটা তার উপর গিয়ে পড়ে। বিভাসবাবু দেখলেন মেয়েটাকে ওর মায়ের কবল থেকে কিছুদিনের জন্যে সরানো দরকার।

তাই মেয়ে নিয়ে ফুলমাটিতে চলে এলেন বোনের কাছে।

তা' বিভাসের বিবেচনাটা ভুল হয়নি।

শুধু শোকই সামলে উঠল না উত্তরা, যেন নতুন রক্তে লাবণ্যময়ী হয়ে উঠল, নতুন আবেগে চঞ্চল।

সে আবেগ কি শুধুই 'ফুলমাটির' আকাশ বাতাস আর পাখীরা ফুলেরা নিয়ে এসেছিল? সে লাবণ্যের উৎস কি শুধুই 'ওয়েদার'?

বিভাস শতমুখে 'ওয়েদারের' উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতেন।

মনীষা বলতেন, 'হ্যাঁ নতুন বর্ষায় এখানের সৌন্দর্যের তুলনা হয় না।'

কিন্তু মনীষা ভাইঝির দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাতেন।

আজ আর চৌধুরী বাংলোয় কোনও দৃষ্টি নেই। না স্নেহের, না সন্দেহের। মনীষা মারা গেছেন। অনেকদিন হয়ে গেছেন।

বিভাস খুব ঘটা করে মেয়ের বিয়ে দিয়ে হঠাৎ ওকালতি ছেড়ে ফিল্ম ডিরেক্টর বনে গিয়ে বম্বে চলে গেছেন। আর হয়তো উত্তরার মা এতদিনে মনের মত সমাজ পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছেন।

কিন্তু উত্তরা?

উত্তরা হঠাৎ যেন সমাজের পঙ্কপুট থেকে পিছলে পড়েছে। উত্তরা তার সেই ঘটার বিয়ের স্বামীর হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে ধর্মাধিকরণের কাছে যে আর্জি পেশ করেছিল, তা' মঞ্জুর হয়েছে। উত্তরা আবার তার বাবার পদবীতে ফিরে গেছে, যে বাবা বলেছেন, জীবনে আর ওর মুখ দেখবেন না।

মা ওকে সমর্থন করতে চেষ্টা করেছিলেন, মা ওর এই কাজটাকে ম্যাট্রিক ফেল করার চাইতে বেশী গর্হিত ভাবেননি। কিন্তু বিভাস বলেছেন 'চুপ! যে মেয়ে আমার মুখে কালি মাখিয়েছে—'

উত্তরা একবার মার মুখে কালি লেপেছিল, একবার বাবার মুখে লেপেছে।

আর অবাক হয়ে ভেবেছে উত্তরা, আশ্চর্য তবু বাবার পদবীটাই গ্রহণ করতে হচ্ছে তাকে। তাছাড়া আর কিছু নেই।

এই অস্বস্তিকর মানসিকতায় হঠাৎ 'ফুলমাটির' কথা মনে পড়ল উত্তরার। মনে পড়ল 'চৌধুরী বাংলো'টাকে।

পিসি নেই, পিসির ছেলেরা তো আছে? ওদের কাছে গিয়ে বাড়ীর চাবিটা চাইল উত্তরা। বলল, 'দু' চারদিন থেকে আসব—'

ওরা বলল, 'চাবি খোলা আছে। মালি রেখে দিয়েছি একটা, আর তো যায় না বড় কেউ। শেষে জানলা-দরজাগুলো চুরি হয়ে যাবে। তা' গেলে ওই মালিটাই রেঁধে বেড়ে দেবে। কিন্তু কথা হচ্ছে—'

উত্তরা হাসল। বলল, 'বল শুনেই যাই তোমাদের 'কথা হচ্ছেটা'। বোধহয় এই পাপীয়সীকে বাড়ীতে ঢুকতে দেওয়া নিয়ে দ্বিধায় পড়েছ?'

পিসতুতো দাদা বলল, 'আঃ, কী-যে বলিস! কথা এই, ঠিক এই সময়ই অরণি গেছে ওখানে হপ্তাখানেকের জন্যে। ও এলে—'

উত্তরা স্থির চোখে তাকাল।

অরণি!

দাদা বলল, 'হ্যাঁ অরণি, আমাদের পিসতুতো ভাই? কেন তাকে তো দেখেছিস? সেবারে মামার সঙ্গে যখন গিয়েছিলি, অরণি গিয়েছিল যে?'

উত্তরা ভুরু কুঁচকে বলল, 'মনে পড়ছে। কিন্তু ওরা থাকতে আর কারো যাওয়ায় বাধা আছে?'

পিসতুতো দাদা মাথা চুলকে বলল, 'বাধা মানে আর কি, ও তো একা রয়েছে—'

'কেন ওর স্ত্রী?'

'স্ত্রী? হায় কপাল, মাথা নেই তার মাথাব্যথা! ওই এক ছেলে! অমন কাজকর্ম করছে, অথচ না বিয়ে না সংসার! ওই ছুটি হলেই বেরিয়ে পড়ে। কদাচ কখনো ফুলমাটিতেও যায়। এবারে—তা' ও তো বলেছে সামনের শনিবার পর্যন্ত থাকবে, তুই বরং রবিবারে—'

উত্তরা বলেছিল 'দেখি!'

কিন্তু সেই দেখাটা দেখবার জন্যে যে সেই রাত্রেই ট্রেনে চেপে বসবে উত্তরা, একথা কি ভেবেছিল উত্তরার পিসির ছেলে?

ভাবেনি।

ভাববে কেন? ভাববার মত তো কথা নয়? কিন্তু উত্তরা ভেবেছিল, 'হয়েছে কি! বরং তো সুবিধেই। সাতকালের ধুলো জমানো নেই বাড়ীতে, রান্নাঘরটা চালু রয়েছে।'

ঘরও তো চৌধুরী বাংলোয় গুনতিতে অন্ততঃ গোটা পাঁচেক।

লাল সুরকির রাস্তাটা শেষ করে সাইকেলরিকশটা থামল। নেমে পড়ে গেট ঠেলে ঢুকে সেই পাঁচটা ঘরের দিকে তাকাল উত্তরা। কোন ঘরটায় যেন ছিল সে সেবারে? ওই পিছনের কোণেরটায় না? রেললাইন দেখা যায় বলে বেছে নিয়েছিল।

না, প্রথমটা বেছেছিল বোধহয় কেবলমাত্র পিছন বলেই। যাতে মুখ দেখাতে কম হয়। তারপর ঘরটা ভাল লেগে গেল। ঘরের পিছনে বাগান ছিল। তাই বলেছিল বাবাকে পিসিকে।

বাগান আছে এখনো?

আস্তে এগিয়ে এল উত্তরা। রিকশওলাটার মাথায় নিজের ব্যাগ বিছানা চাপিয়ে।

কিন্তু কই?

কোথায় কে? পিসতুতো দাদার পরিবেশিত খবরটা ভুল তাহলে।

ওকে পয়সা চুকিয়ে দিয়ে বারান্দায় জিনিস দুটো ফেলে রেখে মালিকে খুঁজতে রান্নাঘরের দিকে এগোল উত্তরা।

এমনি একটু জনমনুষ্যহীন জায়গার জন্যেই তো তৃষিত হয়ে উঠেছিল উত্তরা, হাতড়ে মরেছিল সেই জায়গা। ভাবতে, যেখানে কারো 'দৃষ্টি' নেই। না স্নেহের, না সহানুভূতির, না সন্দেহের।

অথচ—

শূন্য খাঁ খাঁ বাড়ীটা দেখে মনটা বিশ্রী হয়ে গেল কেন? খাঁ খাঁ করে উঠল কেন?

মালিকে খুঁজতে বেশী দূর যেতে হল না।

রিকশর শব্দ শুনে নিজেই সে বেরিয়ে আসছিল কোন এক কোটর থেকে। বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল।

উত্তরা অপ্রতিভ হল।

বলল, 'এটা আমার পিসির বাড়ী, বুঝলে? থাকবো দু'চারদিন—'

মালি মাথা চুলকে বলল 'চিঠি এনেছেন?'

'চিঠি!'

'আজ্ঞে মানে দাদাবাবুদের কারো চিঠি না হলে—'

'রয়েছে। তোমাদের আবার এইসব নিয়ম আছে নাকি? আমি নিশ্চিন্ত হয়ে—'

মালি সবিনয়ে একটা বেতের চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বলে, 'বসুন, একটু বসুন। যে দাদাবাবু রয়েছে এখানে, তিনি এলেই—'

উত্তরা এক মিনিট শিথিল হয়ে যায়। কথা বলতে পারে না।

তারপর নিজেকে চোস্ত করে নিয়ে বলে। 'দাদাবাবু? কোন দাদাবাবু আবার? আমি তো তোমার সব দাদাবাবুদেরই কলকাতায় দেখে এলাম। রমেন, সোমেন, শুভেন—'

মালির মুখে এবার হাসি ফোটে। বলে, 'তবে তো সবই জানেন। ইনি হচ্ছেন 'অরণী'বাবু! এই বাড়ীটা অরণীবাবুর মামার বাড়ী!'

'ওহো হো তাই বল—' উত্তরা প্রায় হাততালি দিয়ে ওঠে, 'খুব চিনি। বলতে হয় এতক্ষণ? তা' কোথায় গেছেন তিনি?'

'আজ্ঞে পাখী মারতে—'

'পাখী মারতে? আজকাল আবার শিকারী হয়ে উঠেছেন বুঝি বাবু?'

মালি হাসি গোপন করে বলে, 'আজ্ঞে শিকার বলেন শিকার, খেলা বলেন খেলা। যান রোজ ভোরে বন্দুক ঘাড়ে করে। পাখী?'

বড়ো আঙুলটা তুলে নাচিয়ে দেয় লোকটা। আর এই উত্তর-প্রত্যুত্তরের মাঝখানেই আগন্তুকের আবির্ভাব। বন্দুক হাতে বীরের বেশ।

চমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

অবাক হয়ে বলে 'কে?'

উত্তরা একটু বাঁকা হাসি হেসে, 'চিনতে পারছ না?'

'পারছি বৈকি! পারছি বলেই তো বিশ্বাস করতে দেরী লাগছে।'

'খুব অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে?'

'খুব!'

'কেন, তোমার মামার বাড়ীতে আসতে আছে, আর আমার পিসির বাড়ীতে আসতে নেই?'

'নেই কে বলেছে? আছে বলেই তো সেই দৈবাৎ ঘটনা একাধিকবার ঘটল।'

'কি মনে হচ্ছে?'

'মনে হচ্ছে 'অকস্মাৎ' 'দৈবক্রমে' এগুলো কেবলমাত্র উপন্যাসেরই বস্তু নয়।'

'আর যদি বলি, অকস্মাৎও নয়, দৈবক্রমেও নয়, জেনেশুনে ইচ্ছে করে এসেছি?'

'তাহলে সেই মধ্যে মিথ্যেকে পরম সত্য বলে গণ্য করে স্বস্তিতে পাবো।'
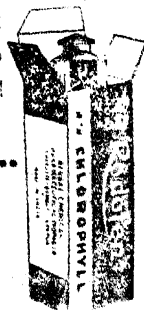
'এখনো সেই রকম সাজিয়ে-গুছিয়ে কথা বলতে পারো দেখছি।'

'সাজিয়ে-গুছিয়ে হয়তো, কিন্তু বানিয়ে বানিয়ে নয়।'

'তোমার কাঁধের বন্দুক দেখে ভয় করছে। গুলিটুলি করে বসবে না তো?'

'ইচ্ছে করছে।'

মালি বোঝে রহস্য আছে।

কারণ বুদ্ধিমানেরা যাদের বোকা ভাবে তারা যে সব সময়ই বোকা হয় না, তার প্রমাণ হামেসাই মেলে। মালিটা বোকা নয়। আর বোকা নয় বলেই আর বেশীক্ষণ হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকার ভূমিকা অভিনয় না করে বলে, 'দিদিমণি খাবেন তো?'

'খাবো বৈকি! বাঃ খাবো না তো কি উপোস করতে এলাম? খুব ভাল-ভাল খাবো। কী কী রাঁধছ বল?'

মালি বিনীত ভঙ্গীতে জানায়, রান্না এখনো শুরু হয়নি, বাবু পাখী মেরে আনবেন এই আশায়—'

এই আশায়!

বাবু ধমকে ওঠে, 'পাখী আবার আমি কবে আনি হে? শিকার করতে যাই বলেই শিকার করে আনতে হবে এমন কোনো কথা নেই।'

উত্তরা মৃদু হেসে আস্তে বলে, 'না তা' নেই বটে। অন্ততঃ তোমার কাছে নেই।'

[illegible] সেই [illegible] নিশ্চিন্ত করে দেয় উত্তর নিজের জন্যে।

অরণি বলে, 'দক্ষিণের ঘর থাকতে, উত্তরের ঘর—'

উত্তরা মৃদু হেসে বলে, 'উত্তরা যে। আর ভাগ্যের দাক্ষিণ্যে যার কপালে ঘরই সইল না, তার আর একদিনের ঘরে দক্ষিণের বাতাস লেগে লাভ?'

'একদিন! একদিন থাকবে বলে এসেছ?'

'কিছুই 'বলে' আসিনি। একদিনের বেশী থাকা সম্ভব কিনা তাও জানি না।'

পিছনের সেই বাগানে এসে বসেছে ওরা। বিকেলের চা খাচ্ছে, বেতের চেয়ার পেতে।

মালিটা সব গুছিয়ে দিয়ে গেছে।

দুপুরবেলা খাইয়েছে চর্ব্যচোষ্য করে, আবার রাত্রের ব্যবস্থাকল্পে বাজারের দিকে গেছে। মনে মনে হেসে গেছে, সুবিধে দিয়ে গেলাম তোদের। যার জন্য যোগসাজস করে দুজনে এসেছিস এখানে। ভাবটা যেন হঠাৎ যোগাযোগ।

সব বুঝি বাবা। এরা ধরতে পারেনি ওর মনের কথা। এরা নিশ্চিন্তে চা খাচ্ছে।

অরণি টেবিলে একটা সিগারেট ঠুকতে ঠুকতে বলে, 'থাকা অসম্ভবই বা মনে হচ্ছে কেন? ভয় করছে?'

'করলে হাসির কিছু নেই।'

অরণি সোজা ওর চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে, রহস্যভরা গলায় বলেন, 'অথচ সেদিন ভয় করোনি। যখন বয়েস ছিল—বোধহয় মাত্র ষোল।'

'ষোল বলেই তো ভয় করেনি! ছাব্বিশ হলে করতো।'

অরণিরও কি ভয় করছে?

নইলে অরণির দেশলাই জ্বালাতে অত দেরী কেন? কথা শুরু করতে জল খেতে ইচ্ছে করছে কেন?

'স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হ'ল কেন?'

'ভাব না থাকলেই বিচ্ছেদ হয়।'

'ভাবের অভাব কিসের, অত ঘটার বিয়ে—'

'বিয়েতে তো আসোনি, জানলে কি করে ঘটার বিয়ে?'

'না এলেও জানা যায়।'

'আমার খবর রাখার তোমার দরকার কি?'

'কিছু না! দেশের বহুবিধ খবরই তো রাখা হয়ে যায়।'

'শুধু এই?'

'তা' ছাড়া কী হবে?'

'ওঃ!'

'মনে হচ্ছে ক্ষুণ্ণ হলে!'

'হয়তো হ'লাম।'

'কেন?'

'আশা করেছিলাম, বলবে আমার খবরই তোমার ধ্যান-জ্ঞান।'

'মেয়েরা মধুর মিথ্যা বলে, কিন্তু বিশ্বাস করে কি?'

উত্তরা এক মুহূর্ত চুপ করে থাকে। তারপর খুব কেটে কেটে বলে, 'সেদিন কিন্তু করেছিলাম।'

'সেদিন!' অরণি বিমূঢ় গলায় বলে, কোনদিন? কোন মিথ্যে?'

'মনে নেই? সেই ভয়ানক মিথ্যা কথাটা বিশ্বাস করে একটা অবোধ মুখ্যু স্কুলের মেয়ে নিজেকে হারিয়ে বসেছিল, আর—'

'সে কথাটা মিথ্যা, এই সত্যটাই বুঝি আবিষ্কার করেছ এতদিনে?'

'সত্যি তারই বা প্রমাণ পেলাম কই?'

অরণি আর একটা সিগারেট ধরায়। ধরিয়ে হাতে রেখে দেয়। বলে, 'হিসেবে একটু ভুল আছে তোমার। মেয়েটা অবোধ মুখ্যু বালিকা এটা ঠিক বসিয়েছ, কিন্তু ছেলেটাও যে নিতান্ত মূঢ় অজ্ঞান কুড়ি বছরের একটা ছেলে মাত্র, সেটা বসাওনি হিসেবের খাতায়। তা' যদি বসাতে, প্রমাণ পেতে। সহজেই বুঝতে পারতে তার কাছে সেটাই সত্য ছিল। সেই প্রথম ভাললাগা-টাকেই সে ভালবাসা বলে বিশ্বাস করেছিল।'

'কিন্তু মাত্র কুড়ি বছরের মূঢ় ছেলেটার দুঃসাহসের তো অভাব ছিল না কিছু?'

'মূঢ় বলেই অভাব ছিল না। দুঃসাহস তো মূঢ়দেরই।'

'পিসি তাই বলেছিলেন বটে—'

'পিসি! ওঃ মামী! হ্যাঁ মামী বলেছিলেন 'তোর যদি বয়েসটা সাবালকের কোঠায় পৌঁছত, তাহলে তোর বাপকে বলে দিয়ে বুঝিয়ে ছাড়তাম শাস্তি কাকে বলে—'

'আমাকেও তাই বলেছিল। বলেছিল, 'পরিণাম জানলে আগুনে হাত দিতে যেতিস না। ভগবানের অশেষ দয়া তাই আমি এসে পড়েছিলাম।'

ঠোঁটটা কামড়ে তিক্ত একটা হাসি হেসে উত্তরা কথা শেষ করে, 'বলেছিল নেহাৎ দয়া করেই, একথা দাদার কানে তুললাম না।' অথচ মজা এই আমি ভেবেছিলাম, অনেক দিন পরে পর্যন্ত ভেবেছিলাম, 'অতটা দয়া প্রকাশ না করলেও হতো। হয়তো বাবার কানে তুললে—'

হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়ায় অরণি। ওর মুখের রঙটা অস্বাভাবিক লাল দেখায়। ওর নিশ্বাসের উষ্ণতা যেন টেবিলের এধারে এসে উত্তরার গালে লাগে।

টেবিলের এধারে ঘুরে আসে ও।

উত্তরার কাঁধের দিকে এসে দাঁড়ায়, চেয়ারের পিঠটা চেপে ধরে, ভয়ানক একটা চাপা অথচ উদ্ধত গলায় বলে, 'তোমার পিসি, আমার মামী, সেই মহিয়সী মহিলাটি যা করেছিলেন, প্রকৃতির আইনে তা' জঘন্যতম অপরাধ তা' জানো? অথচ তিনি এটা করতে সাহস পেয়েছিলেন সামাজিক নিয়মে আমাদের বয়েস তখনো নাবালকত্বের গণ্ডিটা অতিক্রম করেনি বলে।'

'থাক তাঁর কথা......উত্তরার বুকের মধ্যে একটা উত্তাল সুর বাজছিল, উত্তরার শিরায় শিরায় একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ ছুটোছুটি করছিল, উত্তরা প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করছিল, বুঝি সাবালক অরণি তীব্র আক্রোশে সেই নাবালক ছেলেটার ওপর অবিচারের প্রতিশোধ নেবে, তবু কষ্টে কথাকে সহজ সুরে শেষ করেছিল সে, 'তিনি বেঁচে নেই।'

উত্তরা যা আশঙ্কা করছিল—নাকি, শুধু আশঙ্কাই নয়, আশাও? তা যদি অকস্মাৎ ঘটে যেত, হয়তো উত্তরা বাধা দিতে ভুলে যেত, হয়তো ওই বালুনদী 'হঠাতির' মত বালুস্তর ভাসিয়ে দিয়ে উত্তাল হয়ে উঠত, কূল ছাপিয়ে ঢেউয়ের ধাক্কায় পাড় ভাঙত।...কিন্তু...উত্তরার আশা আর আশঙ্কা দুই-ই থমকে থাকল।

অরণি সরে গিয়ে শুকনো ঘাসের ওপর পায়চারি করতে লাগল।......

উত্তরার ঘামে ঠান্ডা হাতটা আবার স্বাভাবিক উষ্ণতায় ফিরে এল।

কখন যেন পড়ন্ত বেলার সূর্য বিদায় নিয়েছে...চেতনায় এল যখন সমস্ত বাগানটা ছায়াচ্ছন্ন হয়ে এসেছে, দুজনায় কেউ কারুর মুখ দেখতে পাচ্ছে না।

অরণি পায়চারি করতে করতে আবার সরে এসেছে, টেবিলের দুটো কোণ চেপে ধরেছে। আর তার মৃদু ভাঙ্গা ভারী গলাটা থেমে থেমে উচ্চারণ করছে। 'তিনি মারা গেছেন, কিন্তু আমরা তো বেঁচে আছি?

সেদিনের সেই অবিচারের শোধ নেওয়া যায় না উত্তরা? এই সন্ধ্যাটাকে ঊনিশশো তেষট্টির মনে না করে ঊনিশশো একান্নর মনে করা যায় না? আমরা তো দু'জনে দুজনকে দেখতে পাচ্ছি না, কী এসে যায় যদি আমরা ভেবে নিই, আমাদের ওপর দিয়ে পুরো একটা যুগ চলে যায়নি। যদি ভেবে নিই সেই আবেগ, সেই রোমাঞ্চ, সেই মরে যাওয়ার মত অসহ্য সুখের মুহূর্তে কেউ এসে রক্তচক্ষু তুলে দাঁড়ায়নি আমাদের সামনে, আমরা শুধু সেই মুহূর্তটাকে গড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছি...এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি...'

'অরণি! তুমি কী আমায় পরীক্ষা করছ?'

'পরীক্ষা! কী বলছ তুমি উত্তরা?'

'হয়তো তুমি ভাবছ, তুমি আছ জেনে, একা আছ জেনে, আমি ইচ্ছে করেই'—

'নিজেকে অত সৌভাগ্যবান ভাবতে পারি, এত সঞ্চয় আমার কোথায় উত্তরা? আমি শুধু মুষ্টিভিক্ষার কাঙালি।'......

'ঘরে চল অরণি! আলো জ্বালাইগে—'

'না!' অরণি সবলে ওর দুটো কাঁধ চেপে ধরে। বলে, 'ঘরে গেলে আলো জ্বালালে আমরা হারিয়ে যাব, ফুরিয়ে যাব, সমাজের শেকলে বাঁধা পড়ে যাব। এখানে প্রকৃতি বন্য, নিরাবরণ! জীবনের একটি সন্ধ্যা কি এই প্রকৃতিকে উৎসর্গ করা যায় না—উত্তরা?'

উত্তরা মৃদু নিশ্বাস ফেলে।

উত্তরার সেই প্রতীক্ষায় উত্তাল রক্ত-প্রবাহ 'সমে' এসেছে, সুস্থির গতি পেয়েছে, তাই গলার স্বর আর কাঁপে না ওর। খুব নরম গলায় বলতে পারে, 'মুষ্টিভিক্ষায় লাভ কি অরণি?'

'মনে কর, আমার দুর্লভ সঞ্চয়ের ঘরে জমা রাখবো সেই ভিক্ষাটুকু। পরে, অনেক পরে জীবনকে যদি কোনদিন নিতান্ত মূল্যহীন মনে হয়, স্মরণ করবো এই সন্ধ্যাটিকে। তোমার আর কতটুকু ক্ষতি উত্তরা, অথচ আমার অগাধ সমুদ্রের লাভ, অনন্ত আকাশব্যাপী লাভ।'

'অরণি আমায় দুর্বল করে দিও না।'

'ভুল করছ উত্তরা। দুর্বলতার অথই জলেই তো ডুবে রয়েছ তুমি! আমি তোমাকে সেই দুর্বলতার পাথর থেকে উঠে আসতে ডাক দিচ্ছি। সবলে নিজেকে প্রকাশ কর তুমি। তুমি যে তোমার নিজের, একান্ত নিজের, সেই সত্যকে মহিমার সঙ্গে স্বীকার কর। এতবড় জীবনের একটি মাত্র সন্ধ্যা আমি তোমার কাছে চাইছি উত্তরা। যেটুকু দিতে কিসের এত দ্বিধা তোমার? তুমি এখন কারো বিবাহিতা স্ত্রী নও, কারো কুমারী মেয়ে নয়, আর তুমি তোমার পিসির নাবালিকা ভাইঝিও নও। তুমি তো কেবল-মাত্র তোমার।'

'সে জোর খুঁজে পাচ্ছি না অরণি..'

উত্তরা মনে মনে বলে, বরং তুমি সবল হও, তুমি আমায় লুঠ করে নাও...তোমার সেই জোরের কাছে, আমি হারিয়ে যাব, মিলিয়ে যাব। মনে মনে এমনি কত কথা বলে উত্তরা। কিন্তু মুখে বলে, 'আমার বুকের মধ্যে কীরকম যেন করছে ; অন্ধকারে আমার ভয় করছে। ঘরে চল অরণি, আলো-জ্বালা ঘরে।'

'সমস্ত যৌবনকালটা ধরে শুধু—' গভীর একটা নিশ্বাস ফেলে বলে অরণি, 'কৃপণতাকে বাড়িয়েছ উত্তরা! অথচ সেদিন যখন এত সম্পদ এত ঐশ্বর্য এত লাবণ্যের কিছুই ছিল না—'

'সেদিনের কথা বারবার তুলো না অরণি। বরং সেদিনের মত নিজের জোরে কেড়ে নাও আমায়—'

অরণি এগিয়ে আসে, আরো কাছে, উত্তরার পিঠটা নয়, চেয়ারের পিটটা চেপে ধরে, হতাশ গলায় বলে, 'তা হয় না উত্তরা! ভিক্ষুক হতে পারি, বিশ্বাসঘাতক হতে পারব না।...তুমি এসে একা বাড়ীতে আমায়

"একটি মাত্র সন্ধ্যা আমি তোমার কাছে চাইছি উত্তরা।"

দেখে তক্ষুনি ফিরে গেলে না, নিশ্চিন্ত মনে রয়ে গেলে, এই বিশ্বস্ততার মূল্য শোধ করবো কি নীচ হয়ে? ছোট হয়ে? যদি স্বেচ্ছায় দিতে মাথায় করে নিতাম।... জানো উত্তরা, সেই কুড়ি বছরের ছেলেটা কত বছর ধরে কী অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখেছে?'

উত্তরার গলা থেকে যে অস্ফুট আওয়াজটা বেরোয়, সেটা বোধহয় 'কি?'

অরণি আবেগরুদ্ধ গলায় বলে, 'সে স্বপ্ন, উঁচু বাঁধের ওপর রেললাইন, চোখের সীমানায় এক দুরন্ত নদী, আর একটা বাড়ীতে শুধু তুমি আর আমি—'

'তোমার সে স্বপ্নের কথা তো কোন-দিন আমার বাবার কাছে এসে বলনি অরণি?'

'বলেছিলাম উত্তরা। তুমি জানতে পারনি। তোমার বাবা বলেছিলেন, আমার মত ইতর ছেলের হাতে মেয়ে দেওয়ার চাইতে মেয়েকে বরং কেটে জলে ভাসিয়ে দেবেন।'

'আশ্চর্য!'

'তাই সে স্বপ্ন শুধু স্বপ্নের কুয়াশায় হারিয়ে গেছে। কিন্তু আজ...আজ আবার তুমি কেন এলে উত্তরা? একা একজন পুরুষের উপস্থিতি অগ্রাহ্য করে কেন রইলে?'

'আমায় মাপ কর অরণি!'

'মোহময়, জ্যোৎস্নাময় রাত্তিরটা তোমার হাতে আছে উত্তরা, ভাববার, সিদ্ধান্ত করবার—'

'রাতটা নেই অরণি, নটার গাড়ীতে আমি ফিরে যাব।'

ট্রেনের টাইমে তাড়াতাড়ি লুচি ভাজতে ভাজতে মালটি ভাবে, 'দূর, যা ভাবছিলাম তা নয় দেখছি। যতই হোক—নির্জন নিরম্বু একটা বাড়ী, বলতে গেলে নিষ্পর একটা লোক। এখনকার মেয়েদের বেপরোয়া সাহস দেখে দেখে মনে করছিলাম বুঝি। ছিঃ ভারী লজ্জা করছে!'

উত্তরাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে ফিরে আসতে আসতে অরণি ভাবে, ঘৃণা হচ্ছে নিজের ওপর। চাবুক মারতে ইচ্ছে হচ্ছে। কী লজ্জা! কী দৈন্য! দৈন্যের কী হাস্যকর প্রকাশ! কেন আমি ভিক্ষুকের মত এত খেলো করলাম নিজেকে? সত্যিই কি দরকার ছিল এতটার?

ট্রেনটা একটানা শব্দ করে চলেছে ঝিক্‌ঝিক্‌, ঝিক্‌ঝিক্‌!

সেই শব্দের মধ্যে উত্তরার ভাবনাগুলো স্পষ্ট হচ্ছে ...মিলিয়ে যাচ্ছে। উত্তরাও ভাবছে, সত্যিই কি দরকার ছিল এতটার? এতটা শুচিবাইয়ের? আমার এই মহান শুচিতার জবাবদিহি করতে যাব আমি কার কাছে? যদি নিজের কাছে হয় সবটাই তো হাস্যকর রকমের মূল্যহীন। প্রতি মুহূর্তেই তো আকাঙ্ক্ষা করেছি আমি ওকে, আশা করেছি।

তবে?

জবাবদিহিটা তাহলে সেই সংস্কারের কাছে। বুঝতে পারছি, আমি জীবন-বিশ্বাসী নই, আমি সত্যধর্মী নই, এমন কি আমি আধুনিকও নই। আমি আমার সেই সেকেলে পিসির কার্বন কপি মাত্র। এছাড়া আর কিছু হবার ক্ষমতা নেই আমার। কিন্তু—আমি এসেছিলাম কেন?

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

নবদ্বীপ নিবাসী রাজপণ্ডিত উপাধি-ধারী সনাতন মিশ্রের কন্যা। নিমাই পণ্ডিত যখন পূর্ববঙ্গে গমন করিয়াছিলেন, সেই সময় পণ্ডিতের প্রথমা পত্নী শ্রীলক্ষ্মী দেবী সর্প দংশনে স্বধামে প্রস্থান করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ-জননী শচীদেবী গঙ্গাস্নানে গিয়া প্রতিদিনই এই বালিকাকে দেখিতেন। বিষ্ণুপ্রিয়া শচীমাতাকে প্রণাম করিলে যোগ্য পতি লাভ কর বলিয়া আশীর্বাদ করিতেন। শচীদেবী একদিন ঘটক কাশীনাথ পণ্ডিতকে সনাতন মিশ্রের বাড়ী পাঠাইয়া পুত্রের জন্য কন্যাটিকে প্রার্থনা করিলেন। সনাতন মিশ্র সানন্দে সম্মতি দিলে শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর বিবাহ হইয়া গেল। বুদ্ধিমন্ত খান এবং মুকুন্দ সঞ্জয় উভয়ে মিলিয়া খুব আড়ম্বরের সঙ্গেই এই বিবাহ-কার্য সম্পাদন করাইয়াছিলেন।

কয় বৎসরই বা তিনি স্বামীর সংসার-সুখ ভোগ করিয়াছিলেন। এই বিবাহের কিছু দিন পরেই পিতার পারলৌকিক কৃত্য সম্পাদনের জন্য নিমাই পণ্ডিত গয়া গমন করেন। গয়াধামেই শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকট তিনি দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। গৃহে ফিরিয়াই শ্রীবাস অঙ্গনে মহাপ্রকাশ, হরিনাম সঙ্কীর্তন—, মাত্র বৎসর দুই গৃহে ছিলেন। কিন্তু গৃহীরূপে নহে, রূপ ছিল হরিপ্রেমে প্রমত্তরূপ। নাম কীর্তন করিতে করিতে আছাড় খাইয়া পড়িতেন, সর্বাঙ্গ ধূলি ধূসরিত, ক্ষতবিক্ষত। প্রায় গৃহে ফিরিতেন রজনী প্রভাতে। বিষ্ণুপ্রিয়া কত না যত্নে প্রিয় দয়িতের শুশ্রূষা করিতেন। শ্রীবাস অঙ্গনেও তাঁহার প্রবেশাধিকার ছিল না। জননী শচীদেবী কিন্তু পুত্রের নৃত্য-কীর্তন দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিয়াছিলেন।

অবশেষে মাঘ মাসের সেই রাত্রি। নিমাই গৃহত্যাগ করিলেন। গৃহে রহিলেন স্থবিরা জননী, যাঁহার পতি পরলোকে, জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বরূপ গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী। আর রহিলেন দ্বিতীয় পক্ষের যুবতী-ভার্যা বিষ্ণুপ্রিয়া। সন্ন্যাসের পর শ্রীপাদ নিত্যা-নন্দের কৌশলে মহাপ্রভু আসিলেন আচার্য অদ্বৈত মন্দিরে শান্তিপুরে। শচীদেবীর ভগিনীপতি আচার্য চন্দ্রশেখর আসিয়া নবদ্বীপের ভক্তবৃন্দকে লইয়া গেলেন শান্তি-পুরে। জননী শচীদেবী গিয়া পুত্রকে দর্শন করিলেন। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া—? পতিবিরহ-বিধুরা পড়িয়া রহিলেন নবদ্বীপের শূন্য মন্দিরে। জিজ্ঞাসা করি—দেবী, কেন তুমি শান্তিপুরে যাও নাই? শান্তিপুরের মত বৃহৎ জনপদে এমন কি কোন ব্রাহ্মণগৃহ ছিল না, যেখানে গিয়া কয়েকদিন থাকিতে, লুকাইয়া আপনার জীবনাধিক প্রিয় দয়িতকে দেখিতে? মা যাও নাই, পতির আদেশ ছিল না বলিয়া না? মহাপ্রভু যেদিন পুরী হইতে জন্মভূমি দর্শনে আসিয়াছিলেন, সেদিন তো লক্ষ লক্ষ লোকে তাঁহার দর্শনলাভ করিয়াছিল। জিজ্ঞাসা করি সেদিনও কি দর্শনের ইচ্ছা হয় নাই?

শুনিয়াছি সারা বৎসরের পর একদিন শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দত্ত মহাপ্রসাদাদি লইয়া পুরীধাম হইতে একজন ভক্ত নবদ্বীপে শুভাগমন করিতেন। সেই একটি দিনের জন্য তোমার গৃহের বহির্দুয়ার সমস্ত বৎসর ধরিয়া অবারিত থাকিত। পাছে প্রেরিত সন্দেশবহকে আসিয়া তিলার্ধের জন্যও বাহিরে অপেক্ষা করিতে হয়। পাছে তাঁহাকে বলিতে হয় ওগো আমি আসিতেছি পুরীধাম হইতে দুয়ার খোল?

তারপর যেদিন শুনিয়াছিলে মহাপ্রভু প্রকট লীলা সম্বরণ করিয়াছেন, সেই দিন হইতেই ঐ দুয়ার চিরদিনের জন্য অবরুদ্ধ হইয়াছিল। দাসীগণ মই লাগাইয়া প্রাচীর পার হইয়া গঙ্গাজলাদি আনিয়া দিতেন। নরহরি চক্রবর্তী বলিয়াছেন—

প্রভুর বিচ্ছেদে নিদ্রা তেজিলা নেত্রেতে।
কদাচিৎ নিদ্রা হৈলে শয়ন ভূমিতে॥
কনক জিনিয়া অঙ্গ সে অতি মলিন।
কৃষ্ণা চতুর্দশীর শশির প্রায় ক্ষীণ॥
হরিনাম সংখ্যা পূর্ণ তণ্ডুলে করয়।
সে তণ্ডুল পাক করি প্রভুরে অর্পয়॥
তাহার কিঞ্চিৎ মাত্র করয়ে ভক্ষণ।
কেহ না জানয়ে কেনে রাখয়ে জীবন ॥

শ্রীরাধার বিরহে ব্রজের পশুপাখী তরু তৃণ লতাগুল্মও কাঁদিয়াছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তো মথুরায় রাজভোগে ছিলেন। দ্বারকায় তাঁহার ঐশ্বর্যের অন্ত ছিল না। আর এ যে সন্ন্যাসজীবন। তুমি গৃহাশ্রয়ে, আর তোমার জীবনদয়িত রৌদ্র বৃষ্টি মাথায় সহিয়া দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা মাগিয়া বেড়াইতেছেন। কুরুক্ষেত্রে একদা সূর্যগ্রহণ উপলক্ষ্যে শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। দন্তবক্র বধের পর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনে শুভাগমন করিয়াছিলেন। আর তুমি?

শ্রীপাদ নিত্যানন্দের তিরোধানের পর শ্রীজাহ্নবী দেবী খেতরীর মহোৎসবে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীধাম বৃন্দাবনাদি তীর্থ পর্যটনে গিয়াছিলেন। তোমার কি গয়া কাশী কুরুক্ষেত্র, শ্রীবৃন্দাবন সকল তীর্থই ছিল মহাপ্রভুর পদরেণু পবিত্র গৃহাঙ্গনে? একটি দিনের জন্যও তুমি সে গৃহের বাহিরে গমন কর নাই। এ হেন দুশ্চর তপশ্চরণ পৃথিবীর ইতিহাসে দুর্লভ। আর্য রমণীর পক্ষে পতি পরম দেবতা। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেহ তো পতির মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করেন নাই। প্রবাদ আছে শ্রীধাম নবদ্বীপের মহাপ্রভুর প্রতি-মূর্তি তোমারই পূজিত। তোমার পক্ষে এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব কি না বলিতে পারি না। হয়তো এই কার্যে তোমার সম্মতি ছিল।

কোন বৈষ্ণব কবিই তোমার কথা লিখিতে সাহসী হন নাই। যে দুই একজন তোমার কথা বলিয়াছেন তাঁহারাও খুব সাবধানতার সঙ্গেই বলিয়াছেন। লোচন দাস ও ভুবন-মোহন দাস তোমার বারমাসের দুঃখের কাহিনী বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের লেখনী তোমার মহনীয় দুঃখের অতি সামান্য অংশও প্রকাশ করিতে পারে নাই। লোচন দাসের একটি কথা আমার বড় ভাল লাগে—

"সংকীর্তন অধিক সন্ন্যাস ধর্ম নহে"

তুমি তো জান মা, মহাপ্রভু তোমার অন্তর্বেদনাকেই প্রকাশ করিয়াছেন। রাধা-ভাবে তাঁহার যে বিলাপ সে তো তাঁহার কণ্ঠে তোমারই আর্তস্বর। তাঁহার চোখে এত জল কোথায় ছিল? সে-তো তোমারই অন্তর নিংড়ানো অশ্রুপ্রবাহ। পতির প্রিয় সাধনে তোমার সহায়তাই তাঁহাকে এমন শক্তি দান করিয়াছিল। প্রেমভক্তির জীবন্ত প্রতিমা তুমি, মহাপ্রভু তোমার কথাই মানবের দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া কাঁদিয়া অযাচিতভাবে বিলাইয়া বেড়াইয়াছেন। তোমারই অসামান্য ত্যাগ, তোমারই অনন্যসাধারণ সাধনা, তোমারই অপার্থিব পতিপ্রেম, তোমারই জগদ্ধিতায় সর্বস্ব বিসর্জন মহাপ্রভুর সন্ন্যাসাশ্রম এবং তদানুষঙ্গিক সর্ববিধ প্রচেষ্টাকে সার্থক করিয়াছিল। আত্মসুখ বাঞ্ছাহীন কৃষ্ণসুখ বাঞ্ছার ইহাই স্বরূপ। ইহাতেই সর্বভূতের কল্যাণ হয়।

দেবীকল্পনার উৎস

পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত

দেবীকল্পনার প্রারম্ভ মানব-সভ্যতার উষাকালে প্রস্তর-যুগের এক অজ্ঞাত অধ্যায়ে যখন পৃথিবীর আদিম অরণ্য, নদী-প্রান্তর ও নিভৃত গিরিগুহা সৃষ্টি করেছিল এক অপার রহস্য। প্রগতিশীল প্রত্ন-গবেষণায় যদিও অতীত যুগের নানা তথ্য সংগৃহীত হ'য়েছে তবুও এ বিষয়ে সন্দেহ নেই আজও নানা বিচিত্র উপাদান মরু-প্রান্তর ও ভূগর্ভে অন্তর্লীন হ'য়ে আছে। এইসব সুপ্রাচীন উপাদান, বিশেষতঃ শিল্প-কর্ম আবিষ্কৃত হ'লে হয়ত মানব-সভ্যতার প্রারম্ভকালের নানা কথা জানা যাবে।

অস্পষ্টতার কুহেলী-আচ্ছন্ন প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তরযুগ থেকেই একদিকে নারীর দেহ-সৌন্দর্য ও হৃদয়-প্রকৃতি যেমন সভ্যতা ও সমাজধর্মকে প্রভাবিত করেছে তেমনি অপরদিকে মাতৃত্বকে সকৃতজ্ঞ অন্তরে অভিষিক্ত করা হ'য়েছে জীবন-দায়িনীর সিংহাসনে। দুইটি কল্পনা ভিন্নতর হ'লেও তারা যেন প্রায়শঃ পরস্পরের মধ্যে লীন হ'য়ে গেছে। করুণাময়ী বিশ্ব-প্রকৃতির প্রলয় লীলায়ও অনুভূত হ'য়েছে সেই চিরন্তন দেবীর অদম্য ক্রোধ। সুদূর স্পেন দেশের অন্তর্গত লেরিডার নিকটবর্তী কোগুলে গুহায় বিস্মৃত প্রস্তরযুগে রূপায়িত চিত্রে হয়ত বা হাজার হাজার বছর পূর্বেকার "অরিগ্নেসীয়" যুগ অথবা তার পরবর্তীকালের দেবীকল্পনার আভাস দেখা যায়। এখানে ঘাগরা পরিহিতা ও অনাবৃত-বক্ষা কয়েকজন নারীকে একটি পুরুষ-মূর্তির চারধারে নৃত্যরতা অবস্থায় দেখা যায়। পুরুষটি নিঃসংশয়ে অতিমানবীয়তা অথবা দেবত্বের অধিকারী। স্বাভাবিক কারণবশতঃ মনে হয় এই অলঙ্কারিত-কুন্তলা ক্ষীণ-কটি নর্তকীরা সম্ভবতঃ পূজারিণী অথবা দেব-সহচরী। তবে প্রশ্ন, এই পূজা কেন? এমনও হ'তে পারে, এই পূজা অথবা তাৎপর্যমূলক নৃত্যো প্রতিভাত হ'য়েছে কোন বিশেষ দিনে উপজাতি-গোষ্ঠীর সফল মৃগয়ার আকাঙ্ক্ষা। দেবীত্বের মহিমা ক্রমশঃই প্রস্তরযুগের সভ্যতাকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে যার পরিচয় পাওয়া যায় বিভিন্ন মাতৃ-মূর্তির রূপায়ণে। ইয়োরোপের অন্তর্গত ভিলেনডর্ফ, লাউসাল ইত্যাদি স্থান, মাল্টাদ্বীপ, এবং তুর্কির অন্তর্গত আমক্ প্রান্তরের প্রস্তরক্ষোদিত প্রাগৈতিহাসিক মাতৃ-প্রতিমাগুলি সর্বদাই নারীত্বের কামনা-বিধৃত আন্তরিক প্রতিমূর্তি ও নিখিল-প্রকৃতির অন্তর্লীন ঐশ্বর্যের প্রতীক।

সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রম-বিবর্তনের সঙ্গে এই দেবীকল্পনার যেন এক রূপান্তর ঘটে। প্রস্তরযুগের নারীমূর্তিগুলি যেখানে প্রায়শই বিপুল দৈহিক শক্তি এবং অসীম কামনা ও মাতৃত্বের প্রতীক পরবর্তী তাম্র ও ব্রোঞ্জযুগে তেমন নানা ক্ষেত্রে এদের দেহ-সৌন্দর্যে কলা-কুশলী নায়িকার লালিত্য প্রতিফলিত হয়। অবশ্য নানা প্রতীকবাদও ধীরে ধীরে বিস্তৃতি লাভ করে। সর্প ও সিংহ ত' প্রাগৈতিহাসিক পশ্চিম-এশিয়া ও পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় জগতে মাতৃপূজার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট হ'য়ে ওঠে। ইজিয়ান উপসাগরে অবস্থিত ক্রীট দ্বীপের প্রাগৈতিহাসিক ধ্বংসাবশেষে আবিষ্কৃত সিংহবাহিনী ও সর্পদেবীর মূর্তি প্রকৃতই এক উচ্চাঙ্গের চিন্তাধারার পরিচয় দেয়। স্যার আর্থার ইভানস্ কর্তৃক আবিষ্কৃত রাজা মাইনসের স্মৃতি-বিজড়িত নোসস্ (Knossos)-এর ধ্বংসাবশেষে যে সর্পদেবীর মূর্তি দেখা যায় তার দেহ-সৌন্দর্যের কিছুটা ভয়ঙ্করী-ভাব সত্ত্বেও সুর-কন্যাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। এই নাগিনীগণ প্রকৃতই সুন্দরী। তাদের ভ্রমরের ন্যায় ক্ষীণ কটিদেশে আঁট-ভাবে পরা থাক্ থাক্ করা নিম্নভাগে ছড়ান ঘাগরা ও দেহের ঊর্ধ্বাংশ প্রায় অনাবৃত। দেবীর কোমরে সর্প-মেখলা, দুই হাতে ভুজঙ্গ ও মাথায় মুকুট। কখনও এই মাতৃদেবীর সঙ্গে বিহঙ্গও দেখা যায়। কে জানে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টান্তে রূপায়িত সর্প, সিংহ পক্ষী নিখিল বিশ্বের প্রতীক কিনা? তবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে প্রাগৈতিহাসিক পশ্চিম-এশিয়ার মাতৃদেবীর সঙ্গে সিংহ, সর্প ও পাখীর সম্বন্ধ আছে। ভারতীয় পৌরাণিক দেবীদের সঙ্গেও এই স্বর্গীয় প্রতীকবাদ দেখা যায়। অথর্ববেদে সর্পকে বিদ্যুতের সঙ্গে তুলনা করা হ'য়েছে। প্রাচীন মিশরের সর্পদেবী নেহেব নায়ু ও বুতো বিশ্ব-নারীত্ব ও সম্ভবতঃ উর্বরতার প্রতীক ছিলেন। প্রথমোক্ত দেবী একদা হেরাক্লিওপলিস্এ পূজিতা হ'তেন এবং তিনি ছিলেন অর্ধ-মনুষ্যাকৃতি। কখনও তাঁকে কল্পনা করা হ'ত উড্ডীয়মান নাগিনীর মত। বৃষ্টিগর্ভ মেঘের মধ্যে স্ফুরিত বিদ্যুৎ ও উড়ন্ত নাগিনীর কল্পনা দুই-ই ভূমির উর্বরতার প্রতি ইঙ্গিত করে। এছাড়া সর্পের বাস ত ভূমিগর্ভেই। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, প্রাচীন ইয়োরোপীয় ধর্ম-কল্পনায় কখনও দ্রুত ঝঞ্ঝা-বায়ুকে তরুণী ভালকীর দেবী-দলের সঙ্গে উপমেয় করা হ'য়েছে। ভারতের পৌরাণিক উপাখ্যানে লক্ষ্মীদেবীকে হস্তী (নাগ নামেও পরিচিত) দ্বারা বারি-অভিষিক্ত হ'তে দেখা যায়। এই হস্তীও অবশ্য বৃষ্টিগর্ভ মেঘের প্রতীক। প্রাচীন পশ্চিম-এশিয়ায় পূজিত পিতৃদেবতাকে এক ক্ষেত্রে মেঘবাহনরূপে এবং উর্বরতার অধিষ্ঠাতা হিসাবে কল্পনা করা হ'য়েছে। সুমেরীয় এবং আক্কাদীয় দেবতা আদাদও ছিলেন একদা বৃষ্টি এবং ঝড়ের অধিশ্বর। যেমন বৈদিক ইন্দ্র ছিলেন বজ্রধর এবং তাঁর

ক্রীট দ্বীপের ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাপ্ত সর্পদেবীর মূর্তি

ঐরাবত বৃষ্টিগর্ভ মেঘেরই স্বর্গীয় প্রতিরূপ।

সুপ্রাচীন কাল থেকেই তরুলতা, নদ-নদী ইত্যাদির মধ্যে দেবীত্বের সন্ধান করা হ'য়েছে। গ্রীক পুরাণে বর্ণিত হ'য়েছে কেমন করে সুন্দরী ডাফনে সূর্যদেবতা এ্যাপোলোর প্রেম থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য বৃক্ষে রূপান্তরিতা হন। অপর একটি কাহিনীতে বর্ণিত আছে বিরহিণী ফিলিস্ কর্তৃক বৃক্ষদেহ ধারণ। প্রাচীন হেলেনীয় সভ্যতায় তরু-দেবীগণ "ড্রায়াড" নামে পরিচিতা ছিলেন। এই "ড্রায়াড"গণ ভারতীয় উপাখ্যানে বর্ণিতা "বৃক্ষকা" অথবা "যক্ষিণী"দের সঙ্গে তুলনীয়া। গ্রীক উপকথায় বর্ণিত আছে হতভাগিনী ড্রাইওপি তাঁর শিশুসন্তানের জন্য একটি পুষ্প আহরণের ফলে একজন ড্রায়াডের ক্রোধ উৎপাদন করেন এবং সেই বৃক্ষ-দেবীর ক্রোধের ফলে তাঁকে সেইখানেই তরু-দেহ লাভ করতে হয়। ড্রাইওপির শেষ প্রার্থনা ছিল তাঁর শিশু-সন্তানকে যেন প্রায়শঃই তাঁর দীর্ঘশ্বাস-ধ্বনিত ছায়াতলে আনা হয়। প্রাচীন গ্রীক উপকথায় ড্রায়াডগণ এক বিস্মৃত অতীতের নির্দেশক এবং ভারতের নানা হিন্দু-বৌদ্ধ উপাখ্যানে বর্ণিতা মায়া-কন-বিহারিণী বৃক্ষকা, অপ্সরা, শালভঞ্জিকা ও যক্ষিণীর সঙ্গে তুলনীয়া। এই দেবী-প্রতিম বনানীসুন্দরীরা যেন প্রাক্আর্য লোকমানসের অনুপম সৃষ্টি। ভারতের ভারহুত ও সাঁচীর তোরণ ও স্তূপ-বেষ্টনীতে যেমন এ'দের অপার দেহ-লাবণ্য ও সুঠাম ভঙ্গি ব্যক্ত হ'য়েছে তেমন শুঙ্গ-কুষাণকালে নির্মিত এ দেশের প্রস্তর ও মৃণ্ময় ভাস্কর্যে যক্ষিণী ও অপ্সরাদের রূপ-রেখা প্রতিফলিত হ'য়েছে। ভারতীয় শিল্পে রূপায়িত এই বৃক্ষকা ও বনদেবীদের সুস্পষ্ট কামনা-বিধৃত নারীত্ব এবং শিল্প-শ্রীমণ্ডিত লাবণ্য স্বভাবতঃই উর্বরতা ও চির-নবীনতার আনন্দময় অভিজ্ঞান।

সমুদ্র ও নদীকে অবলম্বন করেও দেবী-কল্পনার প্রসার ঘটেছে। সাগরের অতল বারিরাশির রহস্য ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীর চাঞ্চল্য মানব-মনের কবিত্ব ও দর্শনকে চির-কালই উদ্বুদ্ধ করেছে। প্রাচীন গ্রীকদের দেবতা বৃদ্ধ নেরেউস ছিলেন যেন সমুদ্র-তলের শান্ত গাম্ভীর্যের প্রতিরূপ এবং তাঁর সুন্দরী ললনারা উপরের ফেনিল ও অশান্ত লহরের প্রতীক সুরঙ্গমা নেরেইডগণ একদা নাবিকমনে হয়ত রোমাঞ্চকর কৌতূহল সৃষ্টি করেছিল। ছোট ছোট নদী অথবা স্রোতস্বিনী নিয়ে যে সব প্রাচীন উপকথা আছে তাদের মধ্যে গ্রীক দেবী এ্যারেথুসার কাহিনীটি খুবই আকর্ষণীয়। কথিত আছে এ্যারে-থুসার সৌন্দর্য-দর্শনে মুগ্ধ হ'য়ে নদী-দেবতা এ্যালফেউস তাঁকে অনুসরণ করেন এবং তন্বী দেবী তাঁর ভয়ে সমুদ্রতল দিয়ে পলায়ন করেন ও পরে একটি নির্ঝরিণীর রূপ পরিগ্রহ করেন। এ্যারেথুসার কাহিনী নিয়ে শেলীর একটি সুন্দর কবিতা আছে। প্রাচীন মিশরে পূজিত নীল-নদের দেবতা হ্যাপি পুরুষ হ'লেও তাঁর দেহে নারীত্বের লক্ষণ ছিল। হ্যাপি-দেবতার নারীত্ব প্রসঙ্গে বলা যায় যে প্রাচীন মিশরে শস্য-দেবী আইসিসকেও মাঝে মাঝে পুরুষরূপে কল্পনা করা হ'য়েছে। এই ধরণের কল্পনায় 'অর্ধনারীশ্বরের' মূলে ভাবটি ব্যক্ত হ'য়েছে কিনা কে জানে?

সমুদ্র এবং নদীর মধ্যে দেবী ও জল-কন্যাদের নানা কাহিনী দেখা যায় ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনী ও কিংবদন্তীতে। গঙ্গা ও যমুনার কল্পনা যেমন একদিকে ভারতের মহান সংস্কৃতির পরিচায়ক অপর-দিকে তেমন লক্ষ্মী, মণিমেখলা এবং বারুণীর কল্পনা সমুদ্রের ঐশ্বর্য ও অপার সৌন্দর্যকে ব্যক্ত করে। বাঙলার প্রাচীন 'মঙ্গল-কাব্য' এবং ব্রতকথায় বর্ণিতা মনসা ও ভাদুলীদেবীও যেন সমুদ্র ও সমুদ্র-যাত্রার অধিশ্বরী। আনুমানিক খৃষ্টীয় ৩য়—৪র্থ শতাব্দীতে ক্ষোদিত অবিভক্ত ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের গান্ধার ভাস্কর্যের একটি নিদর্শনে এক পূর্ণযৌবনা ও শিথিলবসনা নারীকে এক জলচারী ড্রাগনের উপর উপবিষ্টা দেখা যায়। তক্ষশীলা চিত্রশালায় রক্ষিত এই শিলাপটে

নোসস্-এর ধ্বংসাবশেষে প্রাপ্ত সর্পদেবীর মূর্তি

রূপায়িত আলেখ্যটিতে মনসাদেবীর চিত্র পরিকল্পিত হ'য়েছে কিনা কে জানে? এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য, যে, এই স্খলিত আবরণ এক দিকে প্রেম ও উর্বতার প্রতীক যেমন হেলেনীয় শিল্পের এ্যাফ্রোডিটি অথবা ভেনাস মূর্তি সম্বন্ধে একই কথা প্রযোজ্য। প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বেকার লিবীয় (Libyan) মাতৃদেবতা নীথ-এর ধ্যানেও স্খলিত বসনের সুস্পষ্ট ও অর্থপূর্ণ উল্লেখ আছে। সম্রাট নারমের কর্তৃক মিশরের ঐক্যসাধনের পর এই দেবী নেপথিস-ভগিনী আইসিসের সংগে একাঙ্গীভূতা হন। পন্ডিত বাজ (Dr. Budge) কর্তৃক অনূদিত নীথ দেবীর আরাধনা-কাব্যের এক স্থানে আছে,

"হে স্বর্গের দেবী,

হয়নি অস্খলিত কভু তোমার বসন।"

(Donald A. Mackenzie Egyptian Myth and Legend, Intro. XXXV)

সমুদ্র-প্রসঙ্গে দেখা যায় লক্ষ্মী এবং হেলেনীয় প্রেমদেবী এ্যাফ্রোডিটির আবির্ভাবে কিছুটা সাদৃশ্য আছে, অন্ততঃ কয়েক শত বৎসর পূর্বে ইটালীয় চিত্রকর বাত্তিচেল্লি-চিত্রিত ভেনাসের জন্ম বিষয়ক আলেখ্য-দর্শনে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। নীল-নদের বন্যা-প্রসঙ্গে প্রাচীন মিশরীয় ধারণাটি দেবীকল্পনার এক মহান দৃষ্টান্ত। ফারাও শাসিত মিশরে যখনই নীল-নদে জলোচ্ছ্বাস হ'ত তখনই কৃষককুল ভাবত দেবী আইসিসের অশ্রুপাত ঘটেছে। জাহ্নবী ও যমুনার মত তাহলে আবিসিনিয়ার তুষার-মৌলি শৈল-শিখর থেকে প্রবাহিত নীল-নদও বিগলিত করুণার প্রতীক।

তাম্রযুগে পশ্চিম-এশিয়া এবং পূর্ব-ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে মাতৃদেবীর বাহনরূপে সিংহ, চিতা অথবা মার্জার যেমন দেখা যায় তেমন দেবীর বিভিন্ন অর্ধ-জীবাকৃতি রূপও দেখা যায়। এই সব প্রতিমা স্বভাবতঃই ভারতীয় পৌরাণিক দৃষ্টান্তসমূহকে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং এই সব সাদৃশ্য আরও চিত্তাকর্ষক হ'য়ে ওঠে যখন আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগেকার এশিয়া-মাইনর ও প্যালেস্টাইনের ধ্বংসাবশেষে আবিষ্কৃত লিপিতে বৈদিক ও প্রাচীন সংস্কৃত ধরণের নাম দেখা যায়।

(W. F. Albright: The Archaeology of Palestine, A. Pelican Book, pp. 102, 182-83). । এশিয়া-মাইনরের অন্তর্গত ইয়াসিলিকায়ার শৈল-গাত্রে যেমন দেখা যাবে বৃষভেশ্বর পিতৃ-দেবতার সম্মুখে দণ্ডায়মানা সিংহ-বাহিনী মাতৃমূর্তি তেমন সুমেরীয়, ব্যাবিলনীয়, আসিরীয় ইত্যাদি সভ্যতার দ্বারা

লিলিথদেবীর মূর্তি

আলোকিত পশ্চিম-এশিয়ার বিভিন্ন ধ্বংসাবশেষে আবিষ্কৃত বিভিন্ন দেবীমূর্তি ও তাদের বাহন ভারতীয় পৌরাণিক দেবী-গণের সঙ্গে তুলনীয়। প্যালেস্টাইনের অন্তর্গত তেল্‌বেইত্‌-মিরসিমে আবিষ্কৃত এক শ্রেণীর মৃন্ময় ফলকে দেখা যায় প্রেম ও উর্বরতার দেবী ইশ্‌তারের নিরাবরণ মূর্তি দুই হাতে পদ্মের মৃণাল নিয়ে দণ্ডায়মানা যা' সহজেই স্মরণ করিয়ে দেয় প্রাচীন ভারতীয় শ্রী অথবা লক্ষ্মীর ধারণাকে। অপরপক্ষে নৃসিংহী, নাগিনী এবং পেচকসহ লিলিথ দেবীর কামনাদ্যোতক মূর্তিও কম উল্লেখযোগ্য নয়। এ ছাড়া পশ্চিম-এশিয়ার মিনেতএল-বেইদায় প্রাপ্ত গজদন্ত-পেটিকায় ক্ষোদিত প্রফুল্লাননা শস্য-দেবী অথবা করুণাময়ী বন-দেবীর অপরূপ ভংগিমাময় মূর্তিও বিশেষ আকর্ষণীয় এবং ভারতের শকুন্তলা-মানসের অন্তর্লীন ভাবটিকে যেন ব্যক্ত করে। দেবীরূপ ও দেবীধ্যানের পশ্চাতে সহস্র সহস্র বৎসরব্যাপী মানব-মনের তপস্যার পরিচয় পাওয়া যায় যার বিকাশ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে চীন, জাপান, পলিনেশিয়া, মেক্সিকো, পেরু ও আফ্রিকার গহন অরণ্যেও সংঘটিত হ'য়েছিল। কে জানে মানব-সভ্যতার প্রথম প্রভাতে এই দেবীকল্পনা লোক-মানসে কেমন করে স্থান পেয়েছিল? ভারতীয় তাম্র ও ব্রোঞ্জ-সভ্যতার পূর্বে হয়ত আছে নানা অজ্ঞাত অধ্যায়। দেবীর রূপধ্যানের মধ্যেও একটি কথা বার বার ধ্বনিত হ'য়েছে, দেবী ত্রিকালেশ্বরী। তাঁর সংগ্রাম সৃষ্টির পক্ষে ও অনন্তকাল আশ্রিত জীবকুলের রক্ষার্থে।

গোঁজ

সতীনাথ ভাদুড়ী

পঁচিশ বছর আগে বিয়ে হয়েছে; কিন্তু স্ত্রীর উপর আকর্ষণ ভূপতিবাবুর একটুও কমেনি আজও। আকর্ষণ বললে কমিয়ে বলা হয়। তাঁকে স্ত্রৈণ বললেও কমিয়ে বলা হয়। বউ-পাগলা কথাটাও তাঁর মত গম্ভীর ও অদ্ভুত প্রকৃতির লোকের পক্ষে খাটে না। দ্বিধায় পড়ে, পাড়ার লোকে নূতন নামকরণের সময় তাঁর স্বভাবের ওই দিকটা বাদ দিয়ে অন্য একটা দিক চেপে ধরেছিল। তাঁর নূতন নাম দিয়েছিল 'গোঁজ'। নাম বাছবার অসাধারণ প্রতিভা জনসাধারণের। কেননা এর পর থেকেই দেখা গেল, গোঁজ কথাটা শুনলে তিনি রাগে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারান।

কম কথার মানুষ তিনি। যেটুকু বলেন কাজের কথা। কাজটা হচ্ছে, নিজের দুঃখের কথা অপরকে জানানো। উদ্দেশ্য একটু সহানুভূতি পাওয়া। এর অতিরিক্ত আর কিছু চান না তিনি। গম্ভীর প্রকৃতির হলেও লোকজনের সঙ্গ তিনি ভালবাসেন। কারণ লোকজনের মধ্যে গিয়ে না বসলে, কাউকে ধরে নিজের দুঃখের কাহিনী শোনাবার সুযোগ পাবেন কি করে। লোকে বোঝে না। কেউ তাঁর গল্প শুনতে রাজী নয়; কারণ তাঁর দুঃখ নিয়ে মাথা ঘামাবার স্পৃহা কারও নেই।

তিন রকমের দুঃখে তিনি ভোগেন। প্রথম হচ্ছে যে, সর্বগুণসম্পন্না স্ত্রী কৃষ্ণমালার জীবনটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তাঁর মত এক অপদার্থ স্বামীর হাতে পড়ে; দ্বিতীয় দুঃখ যে, সহানুভূতিহীন উপরওয়ালা ও সহকর্মীর তাঁর চাকরি-জীবন দুঃসহ করে তুলেছে। তাঁর তৃতীয় দুঃখ সাংসারিক অভাব-অনটন জনিত।

এই তিনটির অতিরিক্ত কোন চতুর্থ বিষয়ে ভূপতিবাবু কথা বলতে পারেন না। চেনা লোকজনরা যেখানে বসে গল্পগুজব করেন, সেখানে গিয়ে বসতে তিনি ভালবাসেন; আড়ষ্টভাবে চুপটি করে বসে থাকেন। কোন কথা বলতে আরম্ভ করবার আগে তাঁর একটু সময় লাগে। তাই আড্ডার গাল-গল্পের সঙ্গে তাল রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকবার পর তিনি চেষ্টা করেন পাশের লোকটিকে দল থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে নিজের কথার শ্রোতা করে নেবার। এই নিয়েই লাগত গণ্ডগোল।

গণ্ডগোল হ'ত, আবার মিটে যেত। ইদানীং বয়স হয়ে তিনি ক্রমেই বদমেজাজী হয়ে উঠছেন। সবাই বলে গোঁজদার ছিট বাড়ছে। ফলে আজকাল ব্যাপারগুলো গড়াচ্ছে অনেক বেশী দূর।

মহিম ডাক্তারের ডিসপেনসারিতে ওষুধ আনতে গিয়েছিলেন স্ত্রীর জন্য। সেখানে খুব ভিড়। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছিল। এ সময়টুকু ভূপতিবাবু বাজে নষ্ট হতে দেননি। দন্তশূলে কাতর তিনকড়ি-পানওয়ালার কাছে নিজের স্ত্রীর সম্বন্ধে গল্প করছিলেন। রাজারাজড়ার ঘরে যার যাওয়া সাজত, সে এমন স্বামীর হাতে পড়েছে, যে তাকে এক ফোঁটা ওষুধ কিনে দিতে পারে না অসুখ করলে—এই ছিল তাঁর গল্পের সারমর্ম। অনেকক্ষণ শোনবার পর তিনকড়ি বিরক্ত হয়ে বলেছিল—"তা রাজা-রাজড়ার ঘরে পাঠিয়ে দিলেই তো পারেন তাঁকে।"

শুনে খুন চড়ে গিয়েছিল ভূপতিবাবুর। সেখানেই ধস্তাধস্তি আরম্ভ হয়ে যায়। মহিম ডাক্তার ভূপতিবাবুকে চলে যেতে বলেছিলেন ডিসপেনসারি থেকে।

ডিসপেনসারির আড্ডায় যাওয়া সেইদিন থেকে বন্ধ।

এর পরের ঘটনা ঘটে বীণাপাণি ক্লাবে। রিহার্সাল চলছে 'দুঃখীর সংসার' পালার। সবরকম বয়সের লোক আছে সেখানে। হঠাৎ চাপা গুঞ্জনধ্বনি শোনা গেল—"এই রে! গোঁজদা আসছে!"

চোখে-চোখে ইশারা খেলে গেল। ভূপতিবাবু এসে কোথায় বসবেন সে-ই হচ্ছে কথা। যেখানে এসে বসলেন তার কাছ থেকে লোকজন একটু সরে বসল হাসতে হাসতে। ভূপতিবাবু বসেছেন আড়ষ্ট হয়ে। দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বোধ হয় রিহার্সাল শুনছেন। এর পর আর কারও খেয়াল নেই তাঁর কথা। যে যার নিজের মত তাস, দাবা, রিহার্সাল নিয়ে মেতেছে।

হঠাৎ শোনা গেল ভূপতিবাবুর চাপা গলা। একজনের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললেন—"নায়ক বলছে ঠিকই। আমার বাড়ীতেও এই একই অবস্থা। ছেলেমেয়েদের পড়া হয় না পয়সার অভাবে। নুন আনতে পান্তা ফুরায়। সব হুবহু মিলে যাচ্ছে। একমাত্র তফাৎ হচ্ছে যে আমার স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে এ নিয়ে এমনভাবে ঝগড়া করেন না;

আর এমন করে পাড়ার লোকের কাছে বসেও বেড়ান না। বুদ্ধি, বিবেচনা, ত্যাগ যে বিষয়ে বলুন, লাখে অমন একটা মেলে কিনা সন্দেহ। বুঝলেন।......"

"কী কানের কাছে বিড়বিড় করে বকছেন তখন থেকে! বউয়ের কেচ্ছা এখানে কেন? রিহার্সাল, তাস, দাবা এসবের একটাও যদি মনে না ধরে আপনার, তবে বউয়ের আঁচল ধরে বসে থাকুন গিয়ে বাড়ীতে গোঁজ হয়ে! জ্বালাতন!"

"কী! আমাকে গোঁজ বলা! আমার স্ত্রীকে নিয়ে কথা বলতে এসেছেন আপনি?"

হুলস্থুল পড়ে গেল ক্লাবে।

"আমরা বলছি, না আপনি বলছেন?'

মাথায় আগুন জ্বলে উঠেছে ভূপতিবাবুর।

"জুতিয়ে মুখ ভেঙ্গে দেবো!"

তিনি সেই ভদ্রলোকের হাত চেপে ধরেছেন। কয়েকজন মিলে ধরে, ঠেলতে ঠেলতে ভূপতিবাবুকে ক্লাব-ঘর থেকে বার করে দিল। তাঁর আস্ফালন তখনও থামেনি।

এর পরের কাণ্ডটা ঘটে দেবেন মুখুজ্যের বারান্দার আড্ডায়। ভূপতিবাবু এক কোনায় বসেছিলেন অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে। আসর তখন বেশ জমজমাট অবস্থায়। আমেরিকার শক্তি বেশী, না রুশের, তাই নিয়ে দারুণ তর্ক চলেছে। হরেনবাবু হঠাৎ শুনতে পেলেন ভূপতিবাবু কানের কাছে কি যেন বলছেন।

"বড়বাবু ভীষণ জ্বালাতন আরম্ভ করেছে!"

হরেনবাবু আমল দিলেন না। তাঁর মন তখন রয়েছে রুশ-আমেরিকার আণবিক বোমা-প্রতিযোগিতার দিকে পড়ে।

"আঃ! আপনি জ্বালাতন করবেন না এখন!"

কিছুক্ষণের জন্য রেহাই পেলেন হরেনবাবু। তারপর আবার আরম্ভ হ'ল ভূপতিবাবুর চেষ্টা আসরের মূল গল্পস্রোত থেকে তাঁকে আলাদা করে নেবার।

"চাকরি বুঝি আর করা যাবে না। এমন আদাজল খেয়ে লেগেছে বড়বাবুটা আমার পিছনে!"

কোন সাড়া পাওয়া গেল না হরেনবাবুর কাছ থেকে।

"সাহেব লোক খারাপ না; কিন্তু একেবারে বড়বাবুর হাতের মুঠোর মধ্যে।"

"কনুই দিয়ে খোঁচা মেরে এ অফিসের গল্প শোনান কেন বাবা? বেশ তো গোঁজ মেরে বসেছিলে!"

রাজনীতির গল্পে বাধা পড়ল। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির চেয়ে আড্ডার বর্তমান পরিস্থিতি মুহূর্তের মধ্যে বেশী চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠল।

খেপে উঠেছেন ভূপতিবাবু।

"আমাকে গোঁজ বলা! আমি গোঁজ?"

"গোঁজ না তো আবার কি। ওসব গল্প বাড়ীতে গিয়ে, কপোত-কপোতীর মত মুখোমুখি হয়ে বসে, বউয়ের কাছে শোনাওগে যাও! এখানে কেন সকলকে জ্বালাতন করে মারো!"

"আমি কি আপনার চাকর, যে অমনভাবে হুকুম করছেন! আমার স্ত্রী তুলে কথা বলতে এসেছেন! দেবো থাবড়ে মুখ ভেঙ্গে!"

আর যাবে কোথায়। দুইজন প্রৌঢ় ভদ্রলোকের মধ্যে হাতাহাতি হবার উপক্রম। মজা দেখবার জন্য লোক জড় হয়ে গেল। এখানে যাঁরা আড্ডা দিতে আসেন, তাঁরা সকলেই স্থানীয় সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। তাই ব্যাপারটা পাড়ায় আলোচিত হল আরও বেশী করে। ফলে, এই আড্ডার পৃষ্ঠপোষক জনকয়েকের বাড়ী যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল ভূপতিবাবুর।

এর পরের দৃশ্য দোলগোবিন্দবাবুর বাড়ীর অন্নপ্রাশনের ভোজে। ভোজবাড়ীতে ঢুকে কারও সঙ্গে কথা বলেননি। খাওয়ার ডাক এলে আসনে গিয়ে বসলেন। তাঁর দুই পাশের আসন খালি। ভূপতিবাবু বুঝতে পারছেন যে চতুর্দিকের চাপাহাসির লক্ষ্য তিনিই। গৃহস্বামী একটু অপ্রস্তুত হয়ে সম্মুখে এসে বসলেন। আরম্ভ হল গল্প। দোলগোবিন্দবাবু বিনয় দেখিয়ে তাঁর আয়োজনের অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে কথা তুলেছেন। এর পর আর চুপ করে থাকতে পারেন না ভূপতিবাবু।

"এর নাম অসম্পূর্ণ আয়োজন! আমার মত অবস্থার লোকেরা বাড়ীতে কী খায়? শাকভাত জোটে না, তার আবার পোলাও-মাংস! দুধ খেতে পায় আমার ছেলে-মেয়েরা?"

কাছেই একজন গলা খাঁকারি দিল। গৃহস্বামী গতিক বুঝে গল্পের বিষয় পাল্টাবার চেষ্টা করলেন।

"বৃষ্টি হবে বোধ হয় আজ। যা গরম পড়েছে!"

কিন্তু ভূপতিবাবুকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করবার চেষ্টা করা বৃথা।

"বুঝলেন দোলগোবিন্দবাবু, মাসের প্রথমে মাইনে পেলেই আড়াই মণ চাল, ডাল কিনে রাখি, যাতে মাসের শেষে ওই পদার্থটির অভাব না হয়। তবু মুদীর দোকানে বাকি পড়েছে প্রায় শ' দেড়েক টাকা। নিতান্ত বুদ্ধিমতী স্ত্রী পেয়েছিলাম বলেই কোনরকমে দাঁড়িয়ে আছে আমার সংসার।"......উচ্চ হাসির রোলে এর পরের কথাগুলো আর শোনা গেল না।

"এই রে! গোঁজদা আরম্ভ করেছে!"

"ঠিক সুযোগ খুঁজে নিয়ে গোঁজদা গোঁজ ঠুকেছে।"

আর ভূপতিবাবু নিজেকে সংযত রাখতে পারলেন না।

"আমি তোমাদের ইয়ার? আমাকে গোঁজ বলতে এসেছ! অভদ্র চ্যাংড়ার দল!"

"এই তো বেশ কথার তুবড়ি ফুটছে। তোমরা মিছামিছি ওঁকে গোঁজ বলো।"

"ফিরিয়ে নিচ্ছি; ফিরিয়ে নিচ্ছি। গোঁজদা গোঁজ নয়; গোঁজদা গোঁজ নয়।"

একজন মাটির খুরির উপর গ্লাস দিয়ে বাজাতে আরম্ভ করল—গোঁজদা-গজেন্দ্র গোঁজদা গজেন্দ্র। শিষ্টাচার ও চক্ষুলজ্জার বাঁধ ঘুচেছে। কর্মকর্তারা সকলে ছুটে এসেছেন সেখানে। করজোড়ে সকলকে অনুরোধ জানাচ্ছেন, শান্ত হবার জন্য।

আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন ভূপতিবাবু।

"গোঁজ! তোমাদের বাপেরা গোঁজ!"

গলার স্বর ক্রমেই চড়ছে। দোলগোবিন্দবাবু হাত-পায়ে ধরে ওঁকে আবার আসনে বসতে বলছেন। খেপে উঠেছেন ভূপতিবাবু।

"আমি কি ভিখিরী? বাড়ীতে নেমন্তন্ন করে ডেকে এনেছেন এমনিভাবে লোক দিয়ে আমাকে অপমান করাবার জন্য? বাড়ীতে খেতে না পেলেও আপনাদের কাছে হাত পাততে যাই না কোনদিন।......"

দোলগোবিন্দবাবুর হাত ঠেলে দিয়ে গোঁজদা অর্ধভুক্ত অবস্থায় নিমন্ত্রণবাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন। সবাই অপ্রস্তুত। মাথার ছিট যেরকম বাড়ছে, তাতে ভবিষ্যতে ওঁকে ঘাঁটানো আর ঠিক হবে না, এই হল সকলের রায়। এর পর থেকেই হল মুশকিল ভূপতিবাবুর। উপরোক্ত বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলোর সম্মিলিত ফল দাঁড়াল যে, পাড়ার লোকে তাঁকে এড়িয়ে চলে। সবকটি পরিচিত আড্ডায় যাওয়া তাঁর বন্ধ। তিনি রাগ পুষে রাখেন না। রাগ পড়বার পর আবার লোকজনের সঙ্গে মিশতে ইচ্ছা করে। কিন্তু কেউ মিশতে রাজী নয়। কোন আড্ডায় গেলেই সেখানকার লোকেরা কোন-না-কোন কাজের ছুতো দেখিয়ে এক-এক করে উঠে যায়। [illegible] দুঃখও হয়। দুই-একজনকে [illegible] জিজ্ঞাসাও করেছেন—"আমি কি [illegible] [illegible] যে, এমন করে পালাচ্ছ আমাকে দেখে?" তারা কেউ কোন উত্তর দেয়নি।

এত কাণ্ডের পরও ভূপতিবাবু ঠিক ধরতে পারেন না কোথায় তাঁর গলদ, কেনই বা তাঁর অন্তরের কথা তাঁর [illegible] বললেও সকলে বিরক্ত হয়। কারও কাছ থেকে টাকা পয়সা চান না, তবু কেন কেউ তাঁর গল্প শুনতে রাজী নয়?

অফিসে সময় কাটে ছয় ঘণ্টা, যাতায়াত করতে লাগে আধ ঘণ্টা। বাকি সময় কাটে কি করে, সেই হল সমস্যা। স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করতে তাঁর ভাল লাগে। স্ত্রীর কাছাকাছি চুপ করে বসে থাকতেও তাঁর খারাপ লাগে না। কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে যে, চব্বিশ ঘণ্টা তাঁকে পাওয়া শক্ত। পূজো-অর্চার উপর রত্নমালার ঝোঁক চিরদিনের। গুরুদেবের কাছ থেকে দীক্ষা নেবার পর থেকে আরও বেড়েছে। জপ-আহ্নিকে সময় লাগে সকালে দেড় ঘণ্টা, সন্ধ্যায় দেড় ঘণ্টা। এর পর ঢোকেন রান্নাঘরে। তখনই যা কিছু সুযোগ ভূপতিবাবুর, তাঁর কাছে বসবার। অগত্যা রান্নাঘরে।

কাজেই আসল বিপদ রত্নমালার। ওই মানুষটিকে নিয়ে লোকের কাছে উপহাস-গঞ্জনা সহ্য করতে হয়নি তাঁকে, এমন দিন নেই। বিয়ের রাত্রি থেকে আরম্ভ, আজও শেষ হয়নি। মনে আছে, বাসরঘরে হাসি-

ঠাট্টা, অনুরোধ, অনুনয়-বিনয় করেও কেউ নূতন জামাইকে কথা বলাতে পারেনি। "গান গাইবে না; কথা বলবে না; একবারটি হাস অন্তত নতুন জামাই!"

এতক্ষণে জামাই কথা বলল—"আমার মত লোকের হাসিখুশী আসবে কোথা থেকে বলুন?" কঠিন প্রশ্ন। ভ্যাবাচাকা লেগে গেল বাসরঘরের মেয়েদের। তারপর জামাই নিজেই বুঝিয়ে দিলেন। "নিঃশ্বাস ফেলবার ফুরসত নেই, এমন চাকরি। সাহেব আজ একরকম ফরমাশ করে, কাল করে অন্যরকম। খেটে মর; কিন্তু তার বদলে পাবে শুধু গালমন্দ। বলুন, আপনারাই বলুন, এরকম মানুষের হাসি আসে? দেখুন আপনারা আর আমায় জ্বালাতন করবেন না!"

মহিলারা এর থেকে নূতন জামাই সম্বন্ধে যা ধারণা করবার করে নিয়েছিলেন। রত্নমালাও। নূতন জীবন সম্বন্ধে এক অজ্ঞাত ভয়ে কেঁপে উঠেছিল তাঁর বুক। বুঝে গিয়েছিলেন, অন্য দশজনের মত তাঁর কপাল নয়। তারপর পঁচিশ বছর ধরে একথা হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন।

ছেলেমেয়েরা বাপের সম্মুখে নেহাত কাজ না পড়লে আসে না। বাবাও কোনদিন তাদের সঙ্গে বসে গল্প করেননি, তারাও কোনদিন করেনি। বাবার হাস্যাস্পদ চরিত্রের জন্য বন্ধু-বান্ধবদের কাছে তাদের চোরের মত থাকতে হয়। সহপাঠীদের মধ্যে তাদের পরিচয় গোঁজের ছেলে বলে। এইসব নানা কারণে বাবার উপর ছেলেমেয়েদের কোন দরদ নেই। সুতরাং সব দিক দিয়ে মুশকিল রত্নমালারই। এতকাল তবু স্বামী বাড়ীর বাইরে দিনের অনেকক্ষণ সময় কাটাতেন। সেই ছিল বাঁচোয়া। সে শান্তিটুকুও আর রইল না। গুরুদেবের মনে কী আছে তিনিই জানেন। তবে একপক্ষে ভাল হল। স্বামীর নিত্য নূতন কেলেঙ্কারির খবর আর তাঁকে শুনতে হবে না।

ভূপতিবাবু অপেক্ষা করেন, কতক্ষণে স্ত্রী পূজাহ্নিক সেরে রান্নাঘরে আসবেন। রান্নাঘরে বসে বসে দেখেন কী নিপুণ হাতে রত্নমালা সব কাজ করে যাচ্ছেন। বেচারী। তাঁর মত অপদার্থের হাতে পড়ে বেচারীর সারা জীবন খেটে খেটেই গেল! এ-ই একমাত্র ব্যক্তি যে তাঁকে নিয়ে উপহাস বিদ্রূপ করে না; তিনি চুপ করে বসে থাকলে বিরক্ত হয় না; তিনি মনের কথা বলতে আরম্ভ করলে উঠে চলে যায় না।

ছোট রান্নাঘর। দুইজন লোক পিঁড়ি পেতে বসলে তৃতীয় লোকের জায়গা হয় না। সেই ঘরে তিনি যতক্ষণ রাঁধেন ততক্ষণ অতবড় একজন পুরুষমানুষ কাছে পিঁড়ি পেতে বসে তাঁর কাজ দেখবেন, এ জিনিস ভাল লাগে না রত্নমালার। কিন্তু উপায় কি। ও মানুষ যায় কোথায়। কিন্তু এর যে আবার আর একটা দিক আছে। সেকথা বুঝতে আরম্ভ করলেন কয়েক-দিনের মধ্যে। বড় মেয়েটা চিরকাল তাঁর রান্নাঘরের কাজে সাহায্য করত। বাবা বসে থাকলে সে আসে না; সব কাজ রত্নমালাকে একাই করতে হয়।

দ্বিতীয় অসুবিধা স্বামীর গল্প। যতই গম্ভীর প্রকৃতির লোক হন, তাঁর কাছে বসলেই স্বামীর মুখে কথার খই ফোটে। স্ত্রীই একমাত্র মানুষ যার সঙ্গে কথা বলতে ভূপতিবাবুর একটুও বাধো-বাধো ঠেকে না। এ-ই একমাত্র স্থান যেখানে তাঁকে আড়ষ্ট হয়ে বসে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয় না। হাজার বার শুনে শুনে যেসব কথা রত্নমালার আগাগোড়া মুখস্থ হয়ে গিয়েছে, সেই সব কথাই স্বামী প্রত্যহ বলে যান, একই ভাবায়, একই ভঙ্গীতে। মেয়েদের বিয়ে দিতে পাচ্ছেন না, এবং রত্নমালা যে একটি স্ত্রী-রত্ন, এই দুটো কথাই সময় নেয় সবচেয়ে বেশী। মেয়েরা বড় হয়েছে; তারা কাছাকাছি থাকলে এসব কথা যে বলতে নেই, সেকথা খেয়াল থাকে না ভূপতিবাবুর। স্ত্রী ইঙ্গিত-ইশারায় বুঝিয়ে দিলেও একথা তিনি বুঝতে চান না। ছেলেমেয়েদের সামনে লজ্জায় মাথা কাটা যায় রত্নমালার।

মহা মুশকিলে পড়লেন তিনি এ মানুষকে নিয়ে। অসহ্য লাগে তাঁর এই একঘেয়ে গল্প। সংসারে বাঁচতে হলে দুঃখ তো আছেই; সে দুঃখ যত ভুলে থাকতে পারা যায় ততই ভাল। তা নয় কেবল সেই কথা!

বড় মেয়েকে ডেকেছিলেন রত্নমালা রুটি বেলে দেবার জন্য। স্বামীকে বললেন চৌকাঠের বাইরে গিয়ে বসতে, নইলে রান্না-ঘরে রুটি বেলতে বসবার জায়গা হয় না। মেয়েকে দেখেই বুঝি ভূপতিবাবুর মনে পড়ল যে গরীব হয়ে জন্মাবার অনেক দুঃখ; মেয়ের বিয়ে দিতে যত টাকা লাগে অত টাকা তাঁর হাতে কোনদিনই আসবে না।

এতটুকু আক্কেল যদি থাকে মানুষটার! থাকতে না পেরে রত্নমালা স্বামীকে থামতে বললেন। মেয়ে রুটি বেলার কাজ তাড়াতাড়ি কোনরকমে সেরে, উঠে চলে গেল। ভূপতি-বাবু সেইখানে চুপ করে বসে রয়েছেন দেয়ালের দিকে তাকিয়ে। রাত হয়ে যাচ্ছে, ছেলেপিলেদের খাওয়ার সময় হল। তারা খেতে বসবে কোথায়; স্বামী জায়গা জুড়ে বসে রয়েছেন। আর থাকতে না পেরে রত্নমালা বললেন—"ওখানে গোঁজ হয়ে বসে আছ কেন? যাও না, ও ঘরে গিয়ে বস না।"

কথাটা হৃদয়ঙ্গম করতে বুঝি একটু সময় লাগল। তারপর লাফিয়ে উঠলেন পিঁড়ি থেকে ভূপতিবাবু।

"গোঁজ? আমি গোঁজের মত বসি?"

হঠাৎ এই গলা-ফাটান চীৎকারে অবাক হয়ে গেলেন রত্নমালা। স্বামীর চোখমুখের চেহারা অন্যরকম হয়ে গিয়েছে। এ মূর্তি তিনি কোনদিন এর আগে দেখেননি।

"আমাকে গোঁজ বলা! ভেবেছ কি তুমি? চাকর? আমি কি তোমার জমিদারিতে বাস করি? না আমি তোমার টাকা ধারি? আমার বাড়ীতে, আমার পয়সায় খেয়ে, আমাকে গোঁজ বলতে এসেছ! মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেবো! বাড়ী থেকে বার করে দেবো! যাও!" ধাক্কা দিয়ে ভূপতিবাবু স্ত্রীকে রান্নাঘর থেকে উঠনে বার করে দিলেন।

ছোট বাড়ী। এতটুকু উঠন। ছেলে-মেয়েরা সকলে ছুটে এসে থ হয়ে দাঁড়িয়েছে সেখানে। রত্নমালা একটাও কথা না বলে মাথা নীচু করে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন উঠানের মাঝখানে। ছেলেমেয়েদের সামনে এ কী জঘন্য কাণ্ড। তাদের মুখের দিকে তাকাতে পারছেন না তিনি। পাড়াসুদ্ধ জানাজানি হতে আর বাকি নেই বোধ হয়, স্বামীর ওই চীৎকারের পর। পাশের বাড়ীর দুটি ছেলে দোরগোড়ায় উঁকিঝুঁকি মারছে। অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছে না আরও পাড়ার লোক বাইরে জড় হয়েছে কিনা। কেলেঙ্কারির একশেষ!

নিজের কৃতকর্মের গুরুত্ব বোধ হয় বুঝতে পারলেন এতক্ষণে ভূপতিবাবু। গটগট করে তিনি বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন। পাশের বাড়ীর ছেলে দুটো অন্ধকারে দূরে সরে গেল ভয়ে। বর্তমান মানসিক অবস্থাতেও এ জিনিস ভূপতিবাবুর নজর এড়াল না। তাঁর নাগালের বাইরে সকলে পালাতে চায়; এতেই তিনি সবচেয়ে বেশী ব্যথা পান।

এতক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে রত্নমালা। "ও মা!" বলে তিনি ছুটে রান্না-ঘরে ঢুকলেন চড়চড়ির কড়া উনন থেকে নামাতে। একটা পোড়া গন্ধে সারা বাড়ী ভরে গিয়েছে। তারপর সেখান থেকে চেঁচিয়ে ছেলেকে বললেন—"রমেন, তুই একটু দেখ না এই অন্ধকারে কোথায় গেলেন উনি খালি পায়ে, লাঠি টর্চ কিছু না নিয়ে!"

তবু কি আবহাওয়া হালকা হয়।

যাক, ভূপতিবাবু আত্মহত্যাও করেন নি, কিছুই করেননি। অনুশোচনাগ্রস্ত মন নিয়ে ফিরে এসেছিলেন রাত এগারটার সময়। মনে পড়েছিল তিনি না ফিরলে, অভুক্ত অবস্থায় স্ত্রী ভাত আগলে বসে থাকবেন। রাত্রিতে কাঁদতে কাঁদতে স্ত্রীর কাছে বলেছিলেন—"তুমিও যদি আমার দুঃখের কথা শুনতে রাজী না থাক, তবে আমি কার কাছে বলি?"

"ভগবানের কাছে বলো! মানুষে কতটুকু কী করতে পারে।"

তখন কিছু ভেবে বলেন নি রত্নমালা। কথার পিঠে আপনা থেকে বেরিয়ে এসেছিল কথাগুলো।

পরের দিন স্বামীকে বললেন, একটু করে জপতপ করতে। আর কিছুর জন্য নয়,

সময় কাটাবার সুবিধা হবে ওতে; মনের দুঃখও একটু কাটতে পারে।

কথাটা বুঝি ভূপতিবাবুর মনে লাগল। হ্যাঁ না কিছু বললেন না তিনি। আপত্তিও করলেন না।

"তবে আমি গুরুদেবের কাছে লিখি?"

স্বামী দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

রত্নমালা কি লিখেছিলেন গুরুদেবের কাছে তিনিই জানেন। তবে দেখা গেল গুরুদেব অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি ভূপতিবাবুর বর্তমান কর্তব্য সম্বন্ধে লিখিত নির্দেশ পাঠালেন।

"ভূপতি, তোমার এখনও দীক্ষা লইবার সময় হয় নাই। উহার পূর্বে মনকে শোধন করিতে হইবে। স্ত্রীমাত্রকে সাক্ষাৎ ভগবতী জ্ঞান করিবে। রত্নমালার সহিত পাশাপাশি আসনে প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যায় জপে বসিবে। এতদ্ব্যতীত যে সকল প্রতিবেশীর সহিত ইতঃপূর্বে মনোমালিন্যের কারণ ঘটিয়াছে প্রত্যহ তাঁহাদের দ্বারে দ্বারে গিয়া দাঁড়াইতে হইবে, তাঁহাদের পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিবার জন্য। পূর্ণ এক বৎসর এইরূপ করিবার পর তোমার দীক্ষা গ্রহণের যোগ্যতা অর্জিত হইতে পারে; তাহার পূর্বে নয়। এতদ্বিষয়ে আরও কিছু বুঝিতে হইলে শ্রীমতী রত্নমালার নিকট হইতে বুঝিয়া লইও।"......

ভূপতিবাবু দ্বিধায় পড়লেন। গুরুদেবের নির্দেশের প্রথমার্ধ মনের মতন। যিনি এত দূরে থেকে ভাবী শিষ্যের মন বুঝতে পারেন তাঁকে গুরু করতে তাঁর আপত্তি নেই। তবে গুরুদেবের দ্বিতীয় আদেশে তাঁর জোর আপত্তি। যারা তাঁকে দেখলে পালাতে চায়, তাদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে পায়ের ধুলো মাথায় নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। মরে গেলেও না। আত্মসম্মানে বাধে। লোকে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চায় না, এইটাকেই তিনি তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় অভিশাপ বলে মনে করেন।

স্ত্রী তাঁকে বোঝান যে, গুরুদেবের মত সর্বজ্ঞ মহাপুরুষ যখন ওই রকম আদেশ দিয়েছেন, তখন নিশ্চয়ই তার কোন গূঢ় তাৎপর্য আছে।

দেয়ালের দিকে তাকিয়ে ভূপতিবাবু বললেন—"থাকগে যাক!"

"একবার করেই দেখ!"

"না। ওদের পায়ে হাত দিতে পারব না আমি।"

"আমি কি তোমার জমিদারিতে বাস করি?"

"আচ্ছা পায়ে হাত না হয় নাই দিলে। শুধু দুয়ারের ধুলো মাথায় নিলেই চলবে। অষ্টপ্রহর বাড়ীর লোকে যেখান দিয়ে যাতায়াত করে সেখানকার ধুলোই, তাদের পায়ের ধুলো। একবার করে দেখ গুরুদেব যা বলছেন। লজ্জা কিসের। যিনি পথ দেখিয়ে নিয়ে যান তিনিই পথের বাধা দূর করে দেবেন।"

স্ত্রী যে সন্ন্যাসীঠাকুরদের মত এত সুন্দরভাবে কথা বলতে পারেন, এ কথা ভূপতিবাবুর জানা ছিল না।

একটু সহজ হয়ে এল ব্যাপারটা। নরম সুরে বললেন—"লোকে হাসবে যে। দিনের বেলা কিছুতেই নয়। সন্ধ্যার পর যেতে পারি।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, তাতেই হবে। সন্ধ্যার জপ-আহ্নিক সেরে তারপর যেও। ঘণ্টা-দুয়েকের বেশী লাগবে না।"

এই কথাই থাকল শেষ পর্যন্ত।

যে আড্ডায়, যে বাড়ীতে যান সেখানকার লোকজন তাঁকে দেখে সরে পড়ে। কেউ হয়ত দুই একটা কথা বলে, কেউ আবার তাও বলে না। এর জন্য আগে তিনি মনে ব্যথা পেতেন; এখন মনে হয় শাপে বর। অসীম কৃপায় গুরুদেব, তাঁর পদধূলি-সংগ্রহের সব বাধা দূর করে দিচ্ছেন। রাত্রির অন্ধকারে নির্জনে, গৃহস্থের সদর দরজার চৌকাঠের কাছের পদধূলি তুলে নিয়ে মাথায় দেন আর জিভে ঠেকান। লোকে ভাবে পাগলামি; তিনি মনে মনে হাসেন। গুরুদেব নির্দেশ দিয়েছিলেন, ঠাকুরঘরে পাশাপাশি আসনে দুইজনকে বসতে। তিনি পরের দিন গুরুদেবের চিঠিখানা আর একবার পড়লেন। তারপর ঠাকুরঘরে আসন পেতে নিলেন স্ত্রীর সামনা-সামনি। জপের সময় মুখোমুখি হয়ে বসতে চান। এতে রত্নমালার আপত্তি নেই।

স্ত্রী ধ্যানে বসেছেন চোখ বুজে। ভূপতিবাবু ধ্যান করছেন চোখ খুলে। ধ্যানস্থা স্ত্রীকে দেখবার সুযোগ তাঁর হয়নি এর আগে। একেবারে অন্যরকম দেখতে লাগছে। শত রূপে, শত মূর্তিতে তিনি স্ত্রীকে দেখেছেন এর আগে; কিন্তু এত সুন্দর কোন দিন লাগেনি। নিষ্পলক তাঁর চাউনি। মনে মনে হিসাব কষছেন তিনি। সকালে দেড় ঘণ্টা, সন্ধ্যা দেড় ঘণ্টা—প্রত্যহ তিন ঘণ্টা। তিনশ পঁয়ষট্টিকে তিন দিয়ে গুণ করলে কত হয়? দুই একবার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিলেন। কাগজ-পেন্সিল না হলে অসম্ভব। জপ শেষ হবার পর ও ঘরে গিয়ে অঙ্কটা কষে দেখবেন। এই সংখ্যাটা তিনি চান আরও বাড়ুক। বছরের পর বছর দীক্ষা নেবার যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা তাঁর চলতে থাকুক। তাঁর চিত্তশুদ্ধিতে অনেক সময় লাগুক। অত তাড়াতাড়ি কিসের? যে গুরুদেবের ব্যবস্থাপত্র এত চমৎকার তাঁর উপর ভক্তিতে মন গদ্‌গদ হয়ে ওঠে।

দেড়ঘণ্টা কতটুকুই বা সময়!

রত্নমালা চোখ খুলেন।

"একি! তুমি—?"

অপ্রস্তুত হবার বদলে, হেসে ফেটে পড়লেন ভূপতিবাবু।

"তবে কি দেয়ালের দিকে তাকিয়ে গোঁজ হয়ে বসে থাকব?"

হাসতে হাসতে তিনি পুজোর ঘর থেকে বেরিয়ে শোবার ঘরে ঢুকলেন। কাগজ-পেন্সিল খুঁজছেন; তিনশ পঁয়ষট্টিকে তিন দিয়ে গুণ করে দেখবেন কত হয়। ছেলে-মেয়েরা সরে পড়ল, হঠাৎ তাঁকে ঘরে আসতে দেখে। কুলুঙ্গির ভিতরে ধোপার খাতা আর ছোট্ট পেন্সিলটা নজরে পড়ল। ধোপার-খাতার হাতের-লেখাটা দেখে চমকে উঠেছেন তিনি। ধোপার খাতা কে লেখে সে কথা তিনি জানেন না। বড় মেয়েই হবে বোধ হয়।

টাঁকের থেকে দোমড়ানো মোচড়ানো গুরুদেবের চিঠিখানা তিনি বার করলেন। হাতের লেখা হুবহু মিলে যায় ধোপার খাতার লেখার সঙ্গে।

গাঁয়ের নামে নাম বউটির।

পাহাড় ঘেঁষা রুক্ষ্ম গ্রামটার নাম ভবানী। আর, মহেশ করের ঘরের বউয়ের নাম ভবানীবাঈ।

তা বিয়ের আগে নামের মুখরক্ষা করেছিল বটে মেয়েটা। মারাঠী রাজপুত দলবী ঘরের মেয়ে। পোষ মানাতে গেলে ফোঁস করে ওঠা স্বভাব। তার ওপর ছেলেবেলা থেকে মাথার ওপর কড়া অভিভাবক না থাকার ফলে অপরিণত বয়সের স্বাধীন ইচ্ছায় বাধা বিঘ্ন তেমন পড়েনি।। ভাই ফৌজে চাকরি করে। বছরে দু'বছরে কখনো-সখনো এসে দু'দশ দিনের জন্য ঘুরে যায়। বাপ অন্ধ। বসন্ত হয়ে প্রথমে একটা চোখ গিয়েছিল, পরে দ্বিতীয়টারও দৃষ্টি গেছে। দারিদ্র্যের সংসার সামাল দিতেই মায়ের হিমসিম অবস্থা, মেয়ে আগলাবে কখন?

ফলে সময়ে বিয়েও হয়নি মেয়েটার। ওদের ঘরে ছোট বয়সে বিয়ে হয়। তার ওপর চোখে পড়ার মত চোখা রূপ নেই, যে কেউ সেধে এসে ঘরে নিয়ে যাবে। মোটামুটি সুশ্রী হলেও দুরন্তপনা আর বেয়াড়াপনার ফলে চেহারার মধ্যে একটা পুরুষালি কাঠিন্য দিনকে দিন বেশি প্রাধান্য লাভ করছিল। তার জ্বালায় অস্থির পড়শিনীদের অনেক সময় মন্তব্য করতে শোনা গেছে, ওটা মেয়ে না হয়ে ছেলে হলে অন্ধ বাপের কাজে লাগত, ও-মেয়ে নির্ঘাত হাত-পা ভেঙে বাপের বোঝা হবে একদিন।

পারলে এমন মেয়ের হাত-পা হয়ত ভেঙেই দিত কেউ। হাত-পা অল্প-স্বল্প ভেঙে একটু শিক্ষা হোক এমন আশাও যে কেউ করে না এ-কথাও হলপ করে বলা যায় না। ভোর হতে না হতে ছেলে-মেয়ের দঙ্গল নিয়ে ভবানী হুড়মুড় করে একেবারে ওই পাহাড়ের ডগায় গিয়ে উঠবে। পাহাড়টার আড়াল থেকে সূর্যোদয় হয় বলেই ওটার নাম সুরয পাহাড়। সূর্যোদয় দেখে তারা আবার দৌড়-ঝাঁপ করে নেমে আসে। এই ওঠা-নামার রেষারেষিতে ছেলেরাও বড় পেরে ওঠে না তার সঙ্গে। আর ওই মেয়ে জখম হওয়ার বদলে একটু আধটু জখম অন্যের ছেলে-মেয়েরাই হয়।

পাহাড়ের অনতিদূরে ছাতলি নদী। নামেই নদী, বারোমাস শুকনো নুড়ি পাথরের হাড়-পাঁজর বার করেই আছে। ওই শুকনো নদীতেই হুটোপুটি করে সকলে, আর দৈবাৎ কখনো বেশি বর্ষা হলে বা বান ডাকলে আশ-পাশের বাসিন্দারা প্রমাদ গণে। ওই দাঁসা মেয়েকে তখন রুখবে কে, সকাল-সন্ধ্যায় চারবার করে সেই খর জলে ঝাঁপাঝাঁপি করবেই। করুক, তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে ঘরের ছেলে-মেয়েদেরও যে ঠেকানো যায় না। একবার তো একজনের মেয়ে ডুবতে ডুবতে বেঁচেছে, আর একবার একটা ছেলে পাথরে চোট খেয়ে পুরো এক-দিন অজ্ঞান হয়ে ছিল।

এটা মৌজা গ্রাম, অর্থাৎ দোকান পাট হাট বাজার নেই। ভবানী রোজ কসবায় যায় হাট-বাজার সওদাপত্র করতে। যেখানে ওসব আছে তার নাম কসবা। তা সেখানেও নিত্য ঝগড়া করে আসে। যে দামে যে জিনিস পাওয়ার অভিলাষ, তা আদায় না করে নড়বে না। দোকানীকে কটু কথা বলবে, সুবিধে বুঝবে ভয়ও দেখাবে।

সকলেই তিক্ত বিরক্ত তার ওপর।

এরপর আরো কিছু বয়েস হতে মেয়েটার দুরন্তপনা অতটা প্রত্যক্ষগোচর না হোক, তার বেয়াড়াপনার আঁচ সকলেরই গায়ে লাগে। মেয়ের বিয়ে নিয়ে ওর বাপ-মাকে দু'কথা শোনাতে গেলে, এমন কি দুটো সৎ পরামর্শ দিতে গেলেও ওই মেয়ের রসনার ঘায়ে পালাবার পথ মেলে না? অথচ, এব্যাপারেও তাদের তৎপর না হয়ে উপায় কি? উঠতি বয়সের ঘরের ছেলেগুলো যে ওর আশ-পাশেই ছোঁক ছোঁক করে বেড়ায়।

শেষে ওদের এক-ঘরে করারই মতলব ফেঁদেছিল পাড়া-পড়শীরা। এত বয়েস পর্যন্ত অমন মেয়ে ঘরে পুষে রাখাটা অপরাধেরই সামিল। কত বুড়ো হাবড়া অন্ধ খঞ্জ আছে একজনের হাতে গছিয়ে দিলেই তো হয় মেয়ে।

বয়স্ক মাতব্বরেরা কথাটা তুলল গাঁয়ের পাটিল ও মোড়ল কেশরকরের কাছে। কেশরকর প্রায় বৃদ্ধ, কিন্তু বেশ সবল পুরুষ। মস্ত যোদ্ধাবংশের সন্তান, তাকেও বীরপুরুষ জ্ঞানে মান্য-গণ্য করে সকলে। তাদের বীর-বংশের অনেক কথা আজও উপকথা হয়ে আছে। এই গুণেই গাঁয়ের পাটিল সে। গ্রামের বিপরীত প্রান্তে থাকে। দূরে থাকলেও সুরয পাহাড়ের ধারের এক দুর্বিনীত দুরন্ত মেয়ের খবর তার কানে আগেও এসেছিল।

এর বিহিত করতে গিয়েই এক তাজ্জব ব্যাপার ঘটল। শুনে গ্রামবাসীরা অন্তত তাজ্জব বনে গেল। পাটিল কেশরকর নিজে এলো ভবানীর অন্ধ বাপের সঙ্গে দেখা করতে, সেই সঙ্গে তার দুরন্ত মেয়েটাকেও দেখল। ডাকতে হয়নি, বাপের বিচার হবে কথাটা কানে আসতে কোমরে হাত দিয়ে নিজেই সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। তারপর বৃদ্ধ মোড়লকে আরো দুই একদিন এসে মেয়ের বাপের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করতে দেখা গেল। অন্ধ বাপ তার দু' হাত ধরে আনন্দে গদগদ।

পাটিল একটা বিহিতের মতই বিহিত করল বটে। শুনে প্রথমে হাঁ হয়ে গেল সবাই। কেশরকর নিজের ছেলে মহেশকরের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করেছে ভবানীর।

প্রথম বিস্ময় কাটতে সকলের হাড়ে বাতাস লাগল। মেয়েটা মোক্ষম জব্দ হবে এইবার।

ঈর্ষার বদলে তাদের এই আনন্দেরও বিশেষ একটা কারণ আছে। মহেশকর বিপত্নীক। বছর দেড়েক হল ওর বউ রাণীবাঈ আত্মহত্যা করেছে। রাণীবাঈয়ের রূপ ছিল। সেই রূপের জোরেই বোধহয় দুর্দান্ত একরোখা মহেশকরকে সে বশ করতে পেরেছিল। দু'জনে দু'জনকে ভালবাসত খুব। সেই রাণীবাঈ আত্মঘাতিনী হল। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেউ তার নিন্দা করেনি, বরং মহীয়সী বলেছে। আত্মঘাতিনী হবার কারণ, ছেলে-মানুষি কৌতূহল নিয়ে সে কার্তিক পুজো দেখে ফেলেছিল। সংস্কার, সধবা স্ত্রীলোক কার্তিক পুজো দেখলে তার অবশ্যম্ভাবী বৈধব্য। রাণীবাঈ অতশত জানত না, পরে জানল। জেনে নিজের হাতে বৈধব্যযোগ খণ্ডন করে দিয়ে গেল।

মহেশকরও ফৌজে চাকরি করে তখন, বিদেশে থাকে। বীর-বংশের ছেলে বীর-পুরুষই হয়—অল্প সময়ের মধ্যে সে হাবিলদার হয়েছিল। সুযোগ সুবিধে পেলেই এবার বউকে নিয়ে আসবে ভাবছিল। তার মধ্যে এই দুর্ঘটনা। শুনেই দেশে ছুটল সে। তারপর চেষ্টাচরিত্র করে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বসল।

সকলেই প্রায় বউয়ের নামে ধন্য ধন্য করল তার কাছে। এমন কি মহেশকরের বাপ মা-ও। কিন্তু দুই একজন অতি নির্ভরযোগ্য পড়শী-বন্ধু তার কান বিষিয়েও ছিল। তারা আড়ালে জানালো রাণীবাঈ বৈধব্যযোগ খণ্ডন করার জন্য আত্মত্যাগ করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু তার আগে কার্তিক পুজো দেখে ফেলার অপরাধে শ্বশুর শাশুড়ীর গঞ্জনাও বড় কম ভোগ করেনি। একমাত্র ছেলের শংকায় তারা বউয়ের ওপর বিলক্ষণ ক্রুদ্ধ হয়েছিল।

দুনিয়ায় শুধু এই বাপের মুখের দিকে চোখ তুলে কখনো কথা বলেনি মহেশকর। এরপরেও বলল না। কিন্তু বাপের সঙ্গে একটা নীরব বিচ্ছেদ সৃষ্টি হয়ে গেল।

আবার বিয়ের কথা শুনে ভিতরে ভিতরে ফুঁসে উঠল মহেশকর। বাধার আভাস পেয়ে কেশরকর জানিয়ে দিল, বিয়ে না করলে বাপের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক থাকবে না। অতএব মহেশকর বাধা দিল না, —চাকরি করে না, বার্ধক্য বাপের সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচে গেলে তার চলবে না। এই সঙ্গে বন্ধুবান্ধবের পরামর্শে শেষ পর্যন্ত সে আর আপত্তি করল না। কিন্তু বাপের সুনজরে পড়ে রাণীবাঈয়ের জায়গা দখল করতে যে মেয়েটা আসছে—সব রাগ আর বিদ্বেষ গিয়ে পড়ল তার ওপর।

এদিকে সকলের হাড় জুড়লো, কারণ, তারা ভাবল যোগ্যে যোগ্য মিলন হয়েছে। যেমন বেয়াড়া মেয়ে, তেমনি মুগুর জুটেছে। আক্কেল হয়েছে।

মহেশকরকে এখনো ভয়ই করে সকলে। ওই ছেলে ফৌজে চাকরি না করলে বা এভাবে প্রথম বউ না মরলে তার দাপটে গাঁয়ে টেকা দায় হত বোধ করি। যেমন রূপচটা তেমনি একরোখা। তবে ফৌজী দলে ছিল বলে, আর নিজেকে বীর-পুরুষ ভাবে বলে আগের সেই ছেলেমানুষি অত্যাচারের ঝোঁক গেছে। সমবয়সীরা এখন তাকে তোয়াজ করে চলে—গাঁয়ের খণ্ডোবার সঙ্গে তার তেজস্বিতার তুলনা দেয়। ঘোড়ায় আসীন অসি-হস্ত খণ্ডোবা হলেন দেশ-রক্ষক দেবতা—মহাদেবের অবতার।

মদের গেলাসের ইয়ার-বন্ধুরা ঠাট্টা করল, স্বয়ং ভবানী আসছেন—এবারে কার দাপট বেশি দেখা যাক। এরও তাৎপর্য আছে, ভবানী হলেন গ্রাম-রক্ষয়িত্রী দেবী—প্রতি গ্রামেই ভবানী-মূর্তি আছে।

আশা সফল হল। বিয়ের মাস মা ঘুরতে দেব-দেবীর খণ্ডযুদ্ধ বেধে গেল। একে তো কার জায়গায় এসে বসেছে, নতুন-বউ সেই হিসেব করে চলে না, তার ওপর চোখ রাঙাতে গেলে ফিরে যে-ভাবে তাকায়, তা বরদাস্ত করার মানুষ নয় মহেশকর। তাছাড়া বাপ এনেছে বলে সেই রাগ তো আছেই। ভ্রূকুটি গ্রাহ্য করে না বলে হাত নিশপিশ অনেকদিনই করেছে, কিন্তু সেদিন মৃতা রাণীবাঈ সম্পর্কে কি একটা উক্তি করে বসতে আর সহ্য হল না। হাতের লোহার মত পাঁচটা আঙুল ভবানীবাঈয়ের গালের ওপর ফুটে উঠল।

হতভম্ব ভবানী অতি কষ্টে চোখের জল সামলালো। দাঁতে করে ঠোঁট কামড়ে খর চোখে মুখের দিকে চেয়ে রইল।

মহেশকর শাসালো, এই মুখে ফের ওই নাম আনবি তো মুখ একেবারে ভেঙে দেব।

সেই থেকে শুরু। ভবানী ওই নাম মুখে এনেও মার খেয়েছে, আর স্বামীর দাপটের ওপর দাপট করেও মার খেয়েছে। বউ শাসন করা একটা মনের মত কাজ হয়েছে মহেশকরের। আর ওই জেদী দুর্বিনীত মেয়েকে শাসন করার ব্যাপারে একটা সুবিধেও আছে। অত মার খেয়েও জোরে কাঁদে না,—কাঁদেই না বলতে গেলে। আর, শ্বশুরের কাছে নালিশও করে না। শ্বশুর বাড়ি না থাকলে সমান তালে রুখে ওঠে, ফলে আরো বেশি মার খায়। রাগে বিদ্বেষে ভবানীবাঈ এক-একসময় স্বামীর লোকান্তরিত প্রিয়া অর্থাৎ রাণীবাঈয়ের উদ্দেশেও কটূক্তি করে বসে। ফল কি হবে জেনেও করে। অন্ধ আক্রোশে কিল-চড় পড়তে থাকে তখন। ভবানীরও শক্ত সবল হাত আছে দুটো, যতক্ষণ সম্ভব যোঝে সে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হাল ছাড়তে হয়। অমন অসুর শক্তির সঙ্গে সে পারবে কেন।

কিন্তু হাল ছাড়লেও হার মানে না। ফলে মহেশকরের বউকে শায়েস্তা করার গোঁ আরো বাড়ে।

এই পুরুষের রাতের নিভৃত বাসনার মুহূর্তগুলিও কেমন নির্মম হিংস্র মনে হয় ভবানীর। জঠরে মদ ঢেলে বাসনার তাপ জুড়তে চেষ্টা করে প্রথম। এক-একসময় বিফল হয় যখন, তখনই শুধু কাছে আসে।

আর, আসে যখন ভবানীর ওপর দিয়ে একটা বড় রকমের ধকল যায়। নিষ্ঠুর জড় পেষণের মত লাগে। মায়ামমতাশূন্য পর-পুরুষ কবলিত মনে হয় নিজেকে।

বছর না ঘুরতে কেশরকর হঠাৎ চোখ বুজল। মহেশকরের বউ-শাসনের স্বাধীনতা আর একটু বাড়ল। এই করে আরো দুটো বছর কেটে গেল। স্বভাবের ধাত বদলায়নি কারো। কিন্তু ভিতরে ভিতরে দুজনেই কিছুটা শ্রান্ত।

দোলের দিন সেটা। এখানকার যোদ্ধা-বংশীয়রা এই দিনে ঘটা করে বীর-উৎসব করে। মহেশকরের বাড়িতেও এই বীর-উৎসব বহুকাল ধরে চলে আসছে। এ-সবে মহেশকরের উৎসাহ খুব। শিব পুজোতেও সে বীরের মতই শোণিত-ধারার অর্ঘ্য দেয়। মদের পাত্রে নিজের বাহু কেটে অনেকটাই রক্ত দিয়ে ফেলে। প্রথমবার তার রক্ত দেওয়া দেখে ভবানী ভিতরে ভিতরে একটু শঙ্কিত হয়েছিল।

হোলির সন্ধ্যায় অতিথি অভ্যাগতরা এসেছে মহেশকরের বাড়িতে বীর-পুজায় যোগ দিতে। একটু আগে মদ খেয়ে আগুনের চারদিকে নাচ-গান করেছে সকলে। মেয়ে পুরুষেরা আগুনের চারদিক ঘিরে বসেছে। এইবার মৃত বীর ব্যক্তিদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানানো হবে, তাদের যশের কথা খ্যাতির কথা বীরত্বের কথা বলে বলে এই উৎসবে আবাহন করা হবে তাদের। বিশ্বাস, তাদের আত্মা আসে, এক-একসময় কোনো একটি আত্মা এসে ভরও করে পরিবারের বা অন্য কারো ওপর। ভর হলে মহা আনন্দের ব্যাপার। যার ওপর ভর হয়, সে অজ্ঞান হয়ে যায়। তার মুখ দিয়ে মৃত আত্মা তখন কথা বলে।

সকাল থেকেই ভবানীর শরীরটা অসুস্থ ছিল। সে-ও ঘরের এক কোণে চুপচাপ বসে আছে, থেকে থেকে ঝিমুনি আসছে।

'মৃত আত্মার স্তুতি এবং আবাহনের মাঝামাঝি সময়ে দেখা গেল, সে হঠাৎ ঢলে পড়েছে। হাত পা ছুঁড়ে কার সংগে যেন যুঝতে চেষ্টা করল একটু, তার পরেই জ্ঞান হারালো।

হকচকিয়ে গেল সকলেই। মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। মৃত আত্মা রমণীর ওপর ভর করে এ-রকমটা শোনা নেই বড়।

সহসা চমকে উঠল সকলে। ভবানীবাঈ আস্তে আস্তে উঠে বসেছে। তার চোখমুখ স্বাভাবিক নয় খুব। উজ্জ্বল দুই চক্ষু মেলে সে চেয়ে আছে মহেশকরের দিকে।

আমি রাণীবাঈ এসেছি!

সকলে নির্বাক। মহেশকর বিমূঢ়, বিভ্রান্ত। এ-রকম কণ্ঠস্বরও যেন কেউ শোনেনি আর।

তেমনি স্থির স্পষ্ট স্বরে ভবানীবাঈয়ের মুখ দিয়ে রাণীবাঈ বলে যেতে লাগল, তার স্বামী বীর, বীর স্বামীর ভালবাসার টানে সে কোথাও যেতে পারছে না, সর্বদা পাশে পাশে ঘুরছে। আজ সপত্নীর আশ্রয়ে সে স্বামীর কাছে এসেছে—এসেছে কারণ স্বামী সর্বদাই তাকে স্মরণ করছে। এই আশ্রয় সে সহজে ছাড়বে না, স্বামীর মন বুঝে, দুঃখ-বেদনা বুঝে সে মাঝে মাঝে আসবে।

ভবানীবাঈয়ের দু'চোখ আবার ঘোলাটে হয়ে আসতে লাগল। মাথা আবার ঢলে পড়ল।

ঘরের মেয়ে পুরুষেরা স্তব্ধ। মহেশ-করের মুখে রক্ত নেই।

সকলে যখন চলে গেছে, সেই রাতে প্রথম স্ত্রীর শুশ্রূষায় বসেছে মহেশকর। পাখার বাতাস করছে, গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

ভবানীবাঈ চোখ মেলে তাকালো তার দিকে। মহেশকর মুখের কাছে ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করল, কেমন আছিস?

ভবানীবাঈ জবাব দিল না। ক্লান্ত দুই চোখ বুজে এলো আবার।

পরের ছ' সাত মাসে সত্যিই বার পাঁচেক রাণীবাঈয়ের ভর হল ভবানীবাঈয়ের ওপর। এবারে ভর যখন হয় তখন আর বাইরের লোক কেউ থাকে না, শুধু বাড়ির লোক থাকে। রাণীবাঈ কথা বলে মহেশ-করের সংগে। মহেশকর চেয়ে থাকে। শোনে। কথা বলে না।

দেখতে দেখতে মহেশকরের মধ্যে একটা বড় রকমের পরিবর্তন দেখা গেল। স্ত্রীকে অর্থাৎ, ভবানীবাঈকে মার-ধর করা দূরে থাক, তার ওপর রাগ পর্যন্ত করে না। ভবানীবাঈ ইচ্ছে করে দোষ করলেও না। হাসে, স্ত্রীকে আদর করতে আসে। ঘর ছেড়ে বাইরে থাকতে চায় না বেশিক্ষণ। তার মুখের রুক্ষ, কঠিন ছাপটা যেন মুছে যাচ্ছে!

কিন্তু পরিবর্তন কিছু ভবানীবাঈয়েরও হয়েছে। বিপরীত পরিবর্তন। কারণে অকারণে তার মেজাজ চড়ে। মহেশকরের হাসি দেখলে তার গা জ্বলে, আদর করতে এলে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। সে তো জানে এত আদর সোহাগ ভালবাসা কার উদ্দেশ্যে। সে তো উপলক্ষ মাত্র। শুধু সে কেন, মহেশকরের এমন পরি-বর্তনের কারণ বাইরের লোকেরাও জানে। রাণীবাঈয়ের ভর হবার পরে সকল বৃত্তান্ত অন্যেরাই ভবানীবাঈকে সাগ্রহে শুনিয়ে যায়।

ভবানীবাঈয়ের ভিতরে ভিতরে শুকনো টান ধরছে একটা। চোখ জ্বলে, মন জ্বলে, বুক জ্বলে। অসহ্য লাগে এক-একসময়।

আশ্বিনের দশরার দিন এলো।

ওই দিনের দিবাভাগে পুরুষেরা ঘোড়া পুজো, অস্ত্র পুজো, শাস্ত্রগ্রন্থ পুজো করে। মহেশকরের এ-সব অনুষ্ঠানেও ত্রুটি নেই। সন্ধ্যায় স্ত্রীরা কপালে নতুন সিঁদুর দিয়ে, মাথায় আতপ চালের ডালা রেখে স্বামীকে আরতি করে। তারপর তাকে আদর করে বসিয়ে নারকেল বাতাসা খেতে দেয়। স্বামী রুপোর টাকা দেয় স্ত্রীকে।

সন্ধ্যায় মহেশকর ঘরে বসে আছে। কিছুর যেন প্রতীক্ষা করছে সে। অদূরে মেঝেতে ভবানীবাঈ বসে। রুক্ষ, কঠিন মূর্তি। লোকটা বসে আছে বলেই তার রাগ।

স্ত্রীর ভাবগতিক সুবিধের না ঠেকলেও মহেশকর আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল, আমাকে বরণ করবি না...আরতি করবি না?

জবাবে ভবানীবাঈ শুধু দুই চোখে আগুন ছড়ালো এক পশলা।

মহেশকর আবার বলল, এত ভালবাসিস তুই আমাকে—আরতি করবি না? কর্ না... আমি রুপোর টাকা রেখেছি তোর জন্যে।

ভবানীবাঈ ঘোরালো চোখে তাকালো তার দিকে, বুকের আগুন মাথায় উঠছে। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল, আমি তোমাকে একটুও ভালবাসি না, তোমাকে ভালবাসে রাণীবাঈ! বলতে বলতে হঠাৎ আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল সে, একেবারে কাণ্ডজ্ঞান খুইয়ে বসল। দিশেহারা ক্রোধে এত-দিনের সব জ্বালা যেন উদ্গিরণ করতে লাগল সে। মহেশকরের হাসি-মুখ ঝলসে দিয়ে দিয়ে বলতে লাগল, আমি তোমাকে একটুও ভালবাসি না, তুমি একটা বোকা তাই ভাবো রাণীবাঈ আসে তোমার কাছে—তোমার কাছে কেউ আসে না, আমার ওপর কেউ কোনদিন ভর করেনি—কেউ ভর করে না—সব আমি ইচ্ছে করে করি, তোমার মত বোকাকে ভোলাবার জন্য আমিই সব করি—বুঝলে? আমি তোমাকে একটুও ভালবাসি না, আমি তোমাকে ঘৃণা করি, ঘৃণা করি—

আত্মঘাতী স্পর্ধাভরে ভবানীবাঈ চেয়ে রইল তার দিকে।

এইবার কি স্ত্রী-হত্যা ঘটে যাবে একটা!

কিন্তু পরমুহূর্তে ভবানীবাঈ হতভম্ব। ওই মুখে বিস্ময় বিরাগ ক্রোধের চিহ্নমাত্র নেই। মুখের দিকে চেয়ে মহেশকর হাসছে। অনুরাগের ভরপুর হাসি।

বলল, আমি জানি আমার কাছে কেউ কখনো আসেনি—আসে না। এই করে শুধু তুই-ই আসিস। আমাকে যদি ভালই না বাসবি তাহলে নিজেকে খুইয়ে রাণীবাঈ হয়েও আমাকে পেতে চাস কেন তুই?

রাগ গেছে, ঘৃণা গেছে, ওই হাসিমুখের দিকে ভবানীবাঈ ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে শুধু। দেখছে। চোখের কোণ দুটো ঝাপসা হয়ে আসছে, সর্বাঙ্গে কি এক অজ্ঞাত শিহরণ অনুভব করছে। হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে ঘর ছেড়ে ভাঁড়ারের দিকে ছুটল সে—বরণ-ডালা সাজাতে হবে।

আজ ভবানীবাঈ স্বামীর আরতি করবে।

দুটি কবিতা

বুদ্ধদেব বসু

অচেনা, আমাকে যারা চিঠি লেখো

অচেনা, আমাকে যারা চিঠি লেখো—অসুখী, তরুণী,
কবিতার কামড়ে অস্থির যুবা—না-পেয়ে উত্তর
লোকটা দাম্ভিক, ভাবো, কিংবা মানো নিজেদেরই ত্রুটি—

শোনো :
যাকে বলে 'বাস্তবতা' তা নয় বাধা, অনিচ্ছাও নয়।
ফিরে-ফিরে পড়ি সব—উল্লিখিত এবং না-বলা।
চিঠির প্রতিটি শব্দ
রুপোর টাকার মতো সুপ্রিয় নিক্বণে
গড়িয়ে-গড়িয়ে ধীরে জমা হয় আঁধার সিন্দুকে।

শোধ ক'রে দিতে চাই।
তোমাদেরই ঋণী আমি, মাঝে-মাঝে মনে পড়ে।
মাঝে-মাঝে,
যখন প্রকাণ্ড হ'য়ে রাত্রি নামে,
আমি দেখি অন্ধকারে দূরে-দূরে তোমাদের জানালায় আলো
বাঁকুড়ায়, গৌহাটিতে, বরিশালে।
তোমরা যে আছো,
এবং আমিও আছি সেই সঙ্গে,
এই তথ্য হঠাৎ ঝিঁঝিঁর মতো বেজে উঠে
সব শব্দ স্তব্ধ ক'রে দেয়।

কিন্তু—কী বলার আছে?
সে-রুপো গালিয়ে কোন মূর্তি হবে গড়া?
যে-আমি দাঁড়াতে গেলে প'ড়ে যাই,
প'ড়ে গেলে, অনেক উঁচুতে উঠি,
অনেক চেষ্টায় বহু পথ ছুটে
যা ধরি, তা তখনই ধুলোয় ফেলি—
যে-আমি দু-একবার পাতালে সেঁধিয়ে
শুনেছি সবুজ রক্ত গাছের শিরায়—
তার হাতে পরিচ্ছন্ন পুতুল কি হবে গড়া?
তার মনে 'অথবা' 'কিন্তু'র চাপে কথার সুযোগ কতটুকু?

সেইজন্যে, কিছুই বলার নেই।
বড়ো শক্ত কাজ, এই বেঁচে থাকা।

প্রেমে-পড়া পুরুষের গান

এখন, আমার মধ্যে, ঢুকে পড়ে সমস্ত পৃথিবী :
উঁচু বাড়ি, লোকজন মহিলার গন্ধে ভরা বস্ত্রালয়,
খাটুনি, ঝগড়াঝাঁটি, বুকের খিস্তিতে ক্ষিপ্র বখা ছেলে,
আর যারা মন্দিরের আঁধারে অজ্ঞান।

রাত্তির বারোটা বেজে গেলে
আমাকে নিষ্ফল ফুঁড়ে হঠাৎ চীৎকার উঠে ডুবে যায়।
আমাকে মাড়িয়ে চলে হাজার সিঁড়িতে নামা-ওঠা।

সেই খোঁড়া ভিখিরি মেয়েটা
আমার স্নায়ুর ফিতে ছিঁড়ে নিয়ে চুল বাঁধে সরল আহ্লাদে।
বেশ্যাদের ভাঙা গলা
আমার অক্ষম কানে তোলে শঙ্খনাদ।

পশুরাও চ'লে আসে, হামা দিয়ে, কুঁকড়ে বসে ঘেঁষাঘেঁষি,
যেন খুঁজে পেয়ে গেছে বেওয়ারিশ মৌলিক পোর্টিকো।
গাড়ি-টানা প্রকাণ্ড মহিষ তার
ক্লান্তির গালিচা পেতে তৃপ্ত হয়,
নেড়ি কুত্তা চারু চোখে কথা বলে।

আসে দূরে, উপত্যকা, অরণ্য, প্রান্তর,
পথ, যান, সেতু,
শৃঙ্গে-শৃঙ্গে টেলিগ্রাফ-তারে
ছন্দ তুলে ব'য়ে যায় পর্বতের বিরাট বাতাস।

সব স্বস্থ,
সব স্থির, নিশ্চিত, অটুট,
রচিত নাটকে গাঁথা ঘটনার মতো :
শুধু আমি
হ'য়ে গেছি, স্রোত, গতি, নিঃসরণ—
অফুরান, হাঁ-খোলা, রক্তিম,
অচিকিৎস্য সংক্রমণে অবিরল স্রাবময় এক
ক্ষত।

কালো পাহাড়

অজিত দত্ত

এই অন্ধকারে এসো না।
এ-অন্ধকার পাথরের মতো কঠিন।
অনেক আলোতে অবগাহন করে,
অনেক বর্ণের স্রোতে সাঁতার কেটে
তবেই আমি এই অন্ধকারে পৌঁছুতে পেরেছি।

এ-অন্ধকারে এসো না:
কারণ, এ-অন্ধকারের বাষ্প তোমার নাসিকার ঘ্রাণ কেড়ে নেবে,
তুমি ফুলের সৌরভ পাবে না।
এ-অন্ধকারের ঘর্ষণ তোমার মুখের স্বাদ ধুয়ে দেবে,
শুধু তৃষ্ণা ছাড়া তোমার জিহ্বায় আর কিছুই থাকবে না।
তুমি দেখবে মহাশূন্যে নিশ্ছিদ্র মেঘের মতো স্তম্ভিত কৃষ্ণতা।
তুমি যা ছুঁতে চাইবে দেখবে তা তুমি নাগাল পাও না।

এ-অন্ধকারে এসো না।
অনেক সোনালি রোদ সাঁতরে আমি
এই নিষ্ঠুর কালো পাহাড়ে এসে পৌঁছেছি।

তবু, তবু যদি তুমি কোনোদিন এখানে আসো,
যদি এসে পৌঁছও,
তবে হয়তো তুমি দেখবে যে,
এই নিষ্ঠুর অন্ধকার, এই প্রবঞ্চক অন্ধকার,
তোমার জন্য সঞ্চয় করে রেখেছে
একটুখানি সম্পদ, একটু অন্ধকার কণা।

যদি তুমি কান পেতে থাকো,
যদি তুমি অনেক নিবিড় রাত্রি স্তব্ধ হয়ে থাকো,
তবে হয়তো শুনতে পাবে একটা ক্ষীণ সুর,
একটি সূর্যোদয় গানের অস্পষ্ট শেষ কলি।

আর তখন, শুধু তখনই তুমি
এই নিষ্ঠুর অন্ধকারকে ভালোবাসবে।
কেবল তখনই তোমার মনে হবে,
অজস্র রোদের সোনালি রোদ ঠেলে
এতদূরে ভেসে আসা তোমার সার্থক হল॥

চতুর্মুখ

বিষ্ণু দে

তোমার অশ্রুর প্রান্তে হাসে
মহাসমুদ্রের নীলে শান্ত তটরেখা,
ঘরপোড়া মানুষের ঝড়েভাঙা জাহাজের অন্তরীণ নিশ্চিত আশ্রয়।
তোমার চোখের ক্লান্ত রাত্রির আকাশে
দূর স্বর্গ থেকে দেখা পল্লবিত বনরাজিনীলা
জীবনের হেমন্তে উদয়।

তোমার চোখের উচ্চে প্রখর কৈলাসে, -
বহুদিন ছিল এক সাধ
বিশ্বজন্মলা বিরাট হিমের যজ্ঞে
মেলে রাখি সমস্ত হৃদয়
অগ্নিময় শতদলে,
তোমার বিস্মিত পক্ষ্মে, চোখের দীপ্তিতে
যেখানে দাহই শান্তি, অনন্ত আকাশে
নিত্যের যেখানে মুহূর্তের মরণেই জয়।

তুমি দিলে হাতে তুলে দানের আপন লাস্যে
সেই পারিজাত,
তোমার সন্ত্রস্ত ধ্যানে একদা যে ফুলে
তোমাকে অভয় হেনে তুষারবিদারী হাস্যে
দেবদারু বনে চ'লে গেল ক্ষিপ্র পার্বত্য কিরাত।
আবার তোমাকে সেই ফুল দিই,
এক ঝাঁক অরণ্যের অন্ধকার বাঁধো,
কবরীচূড়ায় বাঁধো পারিজাত, স্মিতহাস্যে বক্ষে বক্ষে দুলে।

বহুদিন মনে ছিল সাধ,
রাত্রিগুলি খুলে দিই অপার অগাধ
তরঙ্গিত নীলে নীলে, বিস্ময়ে সমস্ত জাহাজ
স্বাধীন স্বপ্নের মতো অন্ধকারে স্বচ্ছন্দ, অবাধ।
আর, দিনগুলি সূর্যোদয়ে মেলাই বন্দরে,
শান্ত স্থির স্তব্ধ তটদেশে উদ্যানছায়ায়
মাল্লাদের প্রতীক্ষিত ঘরে।
তোমার দু'বাহু ঘিরে মনে হয় আজ
পূর্ণ হবে সাধ॥

মৃত্যুত্তীর্ণ

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

কী যে ভয়ানক
কালো চোখ, কালো চুল, ত্বক
সম্বিতের অন্ধকারে — প্রেমে!
মনের শিখর হতে উজ্জ্বলতা অন্ধকারে নেমে
নিকট অরণ্যে পায় লোলুপ শ্বাপদ।
দিনরাত্রি মূর্ছাহত, নয় নিরাপদ
সেই মৃত্যুগ্রাসে।

যে গহ্বর চুল-চোখ-ত্বকের আভাসে
তা থেকে উত্তীর্ণ আমি, আরোহণ করছি শিখরে।

অগ্নিশুদ্ধ ভোরে
নচিকেতা, পাব আমি শরীরের অন্য এক মানে—
প্রেম নয়, অশরীরী প্রমা, আছি সেই অভিজ্ঞানে॥

মহা তান্ত্রিক

দিনেশ দাস

মহাশ্মশানে একা মহাকাল জাগে,
কালের ঘড়ি এখানে স্তব্ধ!
চতুর্দিকে সাদা কয়েদবেলের মত নরকপাল
মাঝখানে শ্মশানচারী মহাতান্ত্রিক :
সম্মুখে তাঁর করোটির পানপাত্র
হাতে তাঁর এক অদ্ভুত বীণাযন্ত্র
শবের অস্থিতে নির্মিত,
বীণার তন্ত্রীগুলি প্রস্তুত মানুষের শুষ্ক নাড়ীতে।

মহাতান্ত্রিকের আশ্চর্য বীণা এবার ধ্বনিত হ'য়ে উঠল
মনে হয়, সেই সুরে
মৃতের নাড়ীতে নাড়ীতে সঞ্চিত সমস্ত সুর প্রতিধ্বনিত।

ওই তান্ত্রিকের মতই যদি
আমার হাতে ভাষার মৃত শব্দগুলো,
জীবিত হ'য়ে উঠত সুরে
প্রাণিত হ'য়ে উঠত লয়ে!

দীর্ঘায়ু

উমা দেবী

এদিকে ঝাউ-এর বীথি ওদিকে আকাশ অনিবার
মধ্যস্থলে মহানদ-সমুদ্র সঙ্গম।
এতক্ষণ এই ছিল চোখে যতক্ষণ
এক খণ্ড কালো মেঘ ছোঁয়নি গগন।
এতক্ষণ স্বপ্ন ছিল মুগ্ধ দৃষ্টিপাতে।

ভিজে বালি নরম শীতল,
ঝাউবনে পবনে পবনে এক প্রমত্ত মর্মর,
সুনীল আকাশে ভেসে ভেসে
ক্রমশ মিলিয়ে গেল রৌদ্রের পাখীরা
পশ্চিমের দিগন্তসীমায়।
সুদৃশ্য সুন্দর পরিবেশ,
ওর মধ্যে মৃত্যু কি সুন্দর!
মৃত্যু কি সুন্দর—এই চিন্তা নিরন্তর
উঠেছিল মনে মনে।

ঠিক সেই ক্ষণে, যেন মন্ত্রমোহে
সমুদ্রের তল কেটে দেখা দিল তাম্রবর্ণ জ্বলন্ত বিদ্যুৎ,
দিগন্তের সীমা ছুঁয়ে মধ্যাকাশ পর্যন্ত ছড়াল
মৃত্যুনীল-অগ্নিময় শিরাজাল তার।
আক্রোশে চীৎকারে
ভেঙে গেল মেঘদল দরদর বৃষ্টির ধারায়,
সমুদ্র অশান্ত হল।
ক্রমে ক্রমে জল বেড়ে বেড়ে
ভরে গেল বালুতীরে ছোটখাট জলাশয় যত।

তারপর—
ঘন ঘন বিদ্যুতের অগ্নিময় বৃশ্চিকদংশনে,
বজ্রের প্রমত্ত নাদে, সমুদ্রের তরঙ্গবিক্ষোভে,
যখন চেতনা হলো—
তখন—তখন—আর ফেরার উপায় কোনো নাই।
তবু দ্রুত ধাবমান পায়ের তলায়
ক্রমে অপস্রিয়মান বেলাবালুকায়
স্খলমান জীবনের নিশ্চিত শঙ্কায়
মনে হলো—"মৃত্যু ভয়ঙ্কর।"
অশ্রুপূর্ণ জীবনের লবণাক্ত স্বাদ—
সেও স্বাদু—সমুদ্রের তলস্পর্শী মৃত্যুর অগাধ—
মনোহর—তবু ভয়ঙ্কর।

আহ্বান

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

আবার আহ্বান আসে, জ্বলে শুধু নক্ষত্রের বাতি
আমার কামনাগুলি আকাশগঙ্গার নিয়তি
নিয়ে
অন্ধকার-অন্ধকার দিয়ে
হয়তো দেখবার শখ বারবার মিটিয়ে-মিটিয়ে
নতুন তারা'র হাত ধরে।
সে-তারা'র কক্ষপথে মনে হয় যেন ধরা পড়ে
কার মুখ। স্বেদবিন্দু কপালে-কপোলে
ঠোঁটে ক্লান্ত রিক্ত ম্লান হাসি ঢেউ তোলে
অতীত ও বর্তমান। ধাবমান কালে
কেন বারবার রেখা আঁকা হয়?
এ-কার নিয়তি দেখি? এ-কোন্ বিস্ময়?

নতুন তারার হাত ধরে
অন্ধকার অবাক প্রহরে
আকণ্ঠ আহ্বান শুনি।
একি শব্দ, একি গান, কার পদধ্বনি?

অ্যালবামে ভুবনেশ্বর

হরপ্রসাদ মিত্র

বিকেলের শেষ আলো নিভে গিয়ে নক্ষত্র জ্বলবার
অনন্য সন্ধিতে এসে,—
চবুতরে দাঁড়িয়ে সেদিন
দেখলুম মন্দির,—তার উত্তুঙ্গ খাড়াই,
পাথরের ঘট ছুঁয়ে লতিয়েছে সপ্তর্ষিলতিকা।
অদ্ভুত জ্যোতিতে দীপ্ত স্তব্ধ রূপ,
অন্ধকার পট।
যা পায় দর্শক—
সে কি কোনোকালে ভাষায় ধরবার?

অন্ধকার অন্তহীন
মনে হোলো আদিম জননী।
সময়ের বাঁধে বাঁধা হ্রদ, কিংবা অন্য কী যে,—কী যে—
চত্বরে দাঁড়িয়ে সেই মন্দিরের বিশাল খাড়াই
মনে হোলো মিশে গেছে জীবনের আদিম মাটিতে!

সেই স্তূপ
স্তম্ভের গম্ভীর রূপ!

তারপরে, এই লোকালয়ে—
চঞ্চল দু'চোখে তাকে দেখি বৃথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।
নিখুঁৎ রেখায়, খাঁজে, কলসে কোথাও সে যে নেই।
অন্ধকার সে-আকাশ চিরকাল ক্যামেরা-লাজুক।

জীবন কথা

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

নদীর থেকে চুপ-কথা সব হঠাৎ জেগে উঠে
ছড়িয়ে গেলো সারা আকাশময়।
মন বলে—'না, আরো আছে; ও সব কথা নয়।'
একটি মেয়ে পাশেই ছিলো শুধাই ডেকে তাকে,
বললো হেসে—'অনেক কথা আমার বুকের গুপ্তপাড়ায় থাকে।
নাও না বেছে দু'একটাকে ইচ্ছে যদি হয়।'
বাছতে গিয়ে চমকে উঠি
কথা তো নয় দু'এক মুঠি
রক্তে-রাঙা হৃদয়-ভাঙা অবাক্ বিস্ময়
ছড়ালো প্রাণময়।

ফুলের প্রাণে ঘুমিয়ে-থাকা রঙিন কথা আরো
প্রথম রোদের এক ঝলকে জাগিয়ে দিতে পারো।
দেখবে তাতে মন যা বলে, মিথ্যে কিছু নয়;
কথার শেষে অনেক কথাই চুপটি ক'রে রয়।
সে সব কথাই ঝিমোয় মাঠে ঝুরি-বটের ছায়ে
পাল তুলে বা পেরোয় নদী মন-পবনের নায়ে।

পাহাড় থেকে মস্ত কথা পাথর যেন ভারী
গড়িয়ে এসে ধাক্কাখানা দিলো যে এক তারি
আঘাত খেয়ে বুক ভেঙেছে
তাকেই তবু মন মেনেছে
সামলে গেছি তাকে ক'রেই ভর।
সমস্তদিন আঘাত নিয়ে বুক কাঁপে থরথর।
সমস্তদিন বুক থেকে যে রক্ত ঝরে দারুণ আঘাত লেগে
সমস্তদিন জল ঝরে যে কান্না-ভরা আগুন-রাঙা মেঘে
সমস্তদিন ব্যাকুল বাতাস বইছে খর বেগে।
সমস্তদিন প্লাবন-আনা বাদল ঝর ঝর।
আধেক কথা পাথর হয়ে বাজ হেনেছে বুকে
বাকি আধেক পথ হারালো কোথা?

হাসির মতো রোদ এলো যে সলাজ লঘু পায়ে,
বললো—'আরে, কিমাশ্চর্য, জানতে পারোনি তা?
বর্ণ-চোরা কাছেই থাকে, লুকিয়ে থাকে বটে,
হয়তো বা তা অনেক সময় ভিন্ন নামে রটে।
হাসির সাজে আরেক কথা সাজিয়ে রাখি আমি
দুই আধাতেই জীবন আছে পূর্ণ দিনযামী।'

অপেক্ষা

শান্তিকুমার ঘোষ

ফুলেল বাতাসে কিছু আছে সম্মোহন :
গোলাপী শহর সাজে সান্ধ্য অভিসারে;
প্রণালীর জলে নৌকা, নৌকায় গায়ক।

আসবে দিয়েছে কথা পুলের উপর
উড়ন্ত আঁচলে রাত্রি নক্ষত্র ছড়িয়ে।
আরণ্য আমার বাহু আদিম সম্মানে
মদির লোভন তাকে
নেবে ঢেউ-আন্দোলিত নৌকার জগতে॥

চতুর্দিকে তাকালাম

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

নিরানন্দ দৃশ্যপটে কে আবার আমাকে জাগায়
যখন মুমূর্ষু চিত্ত গুহাশ্রিত ভীষণ আঁধারে
পড়ে যাচ্ছে তীক্ষ্ণ যাতনায়। শোচনীয় ব্যর্থতায়
যখন নাগর মূক, নায়িকাও নিজ গর্ভাধারে
গোপন প্রেমের ক্ষুধা বাড়ছে নানা রক্ত উপাদানে
টের পেয়ে বিষাদ-প্রতিমা। এবং হৃদয়তাপে
শহরের মূর্তিগুলো মূক-বধিরের মতো কানে
কিছুই শোনে না কিংবা ফাল্গুনে পাতারা যদি কাঁপে
ছায়ালীন মগ্ন হতে কখনো পারে না। রক্ত ঠোঁটে

দাঁতে দাঁত চেপে যতো ঋতুর কম্পন অনায়াসে
হেঁটে যায় পাতালের দিকে। অন্তত পার্থিব টানে
নিশ্চিহ্ন নূপুরধ্বনি, রৌদ্র জ্যোৎস্না নক্ষত্রের দেশে
মাতাল তরণী নিয়ে কেউ আর আবক্ষ উজানে
যাচ্ছে না ইদানীং। তাই আমি অস্থির বিস্ময়ে

চতুর্দিকে তাকালাম বিকেলের রৌদ্রের স্বচ্ছতা
যখন নারীর মতো প্রতিভাত সমস্ত শহরে
এবং প্রস্তরমূর্তি. টবে শাদা লাল ফুলগুলি
সূর্যের চুম্বনে ভোলে মানবিক হিংসার রুদ্রতা॥

সমুদ্রে নগরে অথবা

কৃষ্ণ ধর

সমুদ্রে নগরে অথবা চিহ্নিত কোনো পথে তাকে
বিভোর শিল্পীর মতো অনেকে দেখেছে বহুদিন।
অন্যমনস্ক হয়ে ঘুরে ফিরে কখনো আপনাকে
প্রসিদ্ধ কোলাহলে হারায়ে ফেলেনি, অন্তরীণ
করেনি নিজের হৃদয়, ব্যবসায়ী তীক্ষ্ণতা ছিল না
তথাপি একটি কার্যে ছিল তার নিজস্ব প্রতিভা।

বিনিময় করেনি সে ভালবাসা, আশ্চর্য তুলনা
দেয়নি কাহারো সংগে বহুতর সৌন্দর্য অথবা
চোখের চাতুর্য কিছুই আকৃষ্ট করেনি, নির্বাক
থেকেছে সে কলরবে, জনশ্রুতি না শোনার ভান
করে গেছে, প্রথামত সুবিনয় দেখিয়ে অবাক
করেনি মজলিস, শোনেনি মুগ্ধ চিত্তে কারো গান।

এই অপরাধে মানুষেরা তাকে ভেবেছে অভদ্র বটে
যেহেতু তাহার হৃদয় পাতা ছিল সমুদ্রের তটে।

ধ্যানে স্থির হও

রাম বসু

অতঃপর, কোথায় এবার
এবার কোথায় যাবো?

নিরীশ্বর, যারা
মানুষীর অহংকারে
প্রেমের কস্তুরী বিশ্বে চিরকাল হতে চেয়েছিল
কোন্‌দিকে যাবে তারা?

ধ্রুপদী নায়িকা সব উপকথা আজ
কেউ অগ্নি, কেউ পাতালের নীচে
লোকশ্রুত নদী
তাদের নির্জন মুখ আমাদের স্মরণ হানে না।

বৃষ্টির একটু পরে ফুটপাতে, জলে
পুষ্পিত নগ্নতা দেখে স্থির আকাশের
পথের কুকুর, আহা, অপরূপ কেঁদে উঠেছিল।

আমরা ব্যর্থতা কান্না যত্ন করে বিদ্রূপে সাজাই
জন্তুর মতন শুধু আর্তনাদ, আর
পতঙ্গের সহজাত সঙ্গীত রচনা সাধ্যাতীত
তাই, অতঃপর কোথায়, কোথায়?

পার্ক স্ট্রীটে অজস্র বকুল ঝরে আছে, ঝরে আছে
পায়ের তলায় তারা পিষে, দলে, পচে, একদিন
পৃথিবীর অন্ধকার উর্বরতা হবে।

ততদিন শূন্যে জাল বুনে' বুনে' ধ্যানে স্থির হও।

চিরসাথী প্রেমের লীলায়

হরেন্দ্রনাথ সিংহ

মনে আশা ভালবাসা দিলে যদি প্রাণে—
প্রণয় ঐশ্বর্য রত্ন জীবনের দান,
কেমনে মর্যাদা রাখি এ মহা সম্মান;
মোহ মায়া মরীচিকা মুগ্ধ দৃষ্টি হানে
রঙীন খেলানা দিয়ে বাসনা প্রদানে—
ছলনায় করে কত ভালবাসা ভান,
দাও শক্তি প্রেম ভক্তি কর ভাগ্যবান,
রব তব নয়নের রহস্য সন্ধানে।

সাধনা পূজায় মগ্ন দীপ্ত তনুখানি,
নিভৃতে রাখিও কাছে জীবনে মরণে।
জ্যোতির্ময়ী মহাবিদ্যা তুমি যে কল্যাণী,
মুক্তির বন্ধনে হিয়া স্মরণে চরণে।

সান্নিধ্য সুধার স্নিগ্ধ ছায়ার কায়ায়,
পূজার মুরতি চির প্রেমের লীলায়।

ভয়াবহ মোচড়ে

মৃগাঙ্ক রায়

এখনো সেই প্রবল হাওয়া আসে নি;
শুধু উত্তর পশ্চিমের কোণে
বাঘের ভরাট গর্জনের মত মেঘ জমেছে,
শেয়াল ডাকছে, ভাঁটার টান ধরেছে গঙ্গায়,
বায়সী অন্ধকারের নিচে
ভেজা বালি থেকে চাপা আলো উঠছে।

এখনো সেই আকাশজোড়া হাওয়া আসে নি?
এপারে চিতা জ্বলছে, সদ্য লাফিয়ে উঠেছে
আগুনের শিখাগুলো, ধোঁয়া পাক খাচ্ছে,
ঢোল বাজছে, খোল করতাল ঢাক বাজছে।

হাওয়া আসবে, প্রবল হাওয়া আসবে;
গাছ ভেঙে পড়বে, হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাবে
শেয়ালের ডাক। তুমি চিতা থেকে উঠে
ঘোমটা টানবে। তোমার গল্পের
এক ভয়াবহ মোচড়ে দাঁড়িয়ে
বিস্মিত হবে রাজীব, ভেজা বালির মত
চাপা আলো উঠবে চোখে॥

আড়াল

সুনীলকুমার নন্দী

নিশীথ হাওয়ায় ডাক দিয়ে যাও, বুঝতে আসো না
এগিয়ে যেতে লতাপাতা জড়ায় এসে পা—

খুলতে খুলতে ফুরায় বুঝি তোমার অবসর...
এখন আমি কী নিয়ে রই, দুয়ার খোলা ঘর
হা হা করে... টিলায় টিলায় নিশীথ ডাকা স্বর।

ডাক দিয়ে যাও, বাইরে আসা সাঙ্গ হলো না—
দু'দিক দু'জন... খুঁজতে গেলে প্রান্তসীমানা
আড়াল ফেলে লতাপাতায় বিপুল আঙিনা...

আয় নেমে আয় লতাপাতা ঘরের মুখে আয়।

তীর্থযাত্রী

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

মা আমাকে নিয়ে একদিন, হাত ধ'রে,
গিরিবর্ত্মের মতো এই বাঁক পার ক'রে দিয়েছিল;
ক্ষুধার্ত পথ, পথের দুরূহ প্রান্ত;
কাঁকন-খোয়ানো কালো এই গলি, দস্যু-অধ্যুষিত
ফাটল-স্ফারিত প্রকাণ্ড ময়দান
হাত ধ'রে পার করেছিল একদিন।

মাকে আমি আজ হাত ধ'রে ধ'রে এ পথ করাবো পার,
মা আজ আমার শিশু,
সতর্ক হাতে ঢাকি দু'য়েকটি রুপালি চুলের গুছি,
আপাতত এই ক্ষুধিত পথের ক্ষুরধার চক্রান্ত
কামক্রোধমোহমোহান্তব্যবসায়ী
পার হয়ে যাই, মা কিছু জানে না, মা আজ আমার শিশু॥

চন্দ্রালোক গীতিকা

তরুণ সান্যাল

খানিক যেন ভালোলাগার স্পর্শ ছিল
কি ছিল ঐ হাতের পিঠে, কিংবা নিচে
বিশাল নীলে হাতের তালু উলটে রাখা :
দশ আঙুলের ফাঁকে গড়ায় আপন বীজে
নিজেই যেন আপনাকে সেচ, তারায় আঁকা
নীলিম আঁচল আলোর ফোঁটায় ফোঁটায় ভিজে

এখন আছি কোন পাহাড়ের গুহার তলে
কালো পাথর, পরুষ পাথর আমায় দেখে
নিজেই নিজের ঘাতক এবং খড়্গ হতে,
চুঁইয়ে নামে শব্দ, চূর্ণ ঘূর্ণি বেঁকে
প্লাবনে যায়, ধাবনে যায় আপন জলে
শিউরে ফাটায় বরফ বুকের সে পর্বতে

কত যে পাখি, কত যে মাছ আকাশে জলে
দেবদূতেরা স্বচ্ছ ডানায় নাইতে আসে
কে অপ্সরী নগ্নস্বকে মেঝের খাটে
হাজার হাসির জ্যোৎস্নাছলাৎ চূড়ায় ভাসে
...শায়িত আছি পত্রছায়ায় বৃক্ষতলে
করোটি তলে জ্যোৎস্নাপায়ী রাত্রি হাঁটে

কালো ঘোড়াটি অন্ধকার, কোথায় যায়
কেবল ছোটে, হাজার বর্শাফলক মেঘে...
কেবল ছোটে, পিঠে পিছল চাঁদের ছোরা,
কপালে গোল শাদাটি যেন স্পর্শ লেগে
সারা আকাশে শাদাকালোয় হারাতে চায়........
কবিতা ফাটে ক্ষুরের ঘসায়, আঁধার ঘোড়া
পুচ্ছে জ্যোৎস্না প্লাবন ধাবন জড়াতে যায়॥

কেউ একজন

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

আসুক আকাশ অন্ধ আবেগে আকুল ক'রে
আমার মনের কাণায় কাণায় পুলক-জ্যোৎস্না
ভাসছে এখন; ভাঙা-ভাঙা মেঘ আড়ালে সরে
এক্ষুনি যাবে। অল্পেই মন অধীর হোস্ না।

এই ছায়া আর এই আলোকের মান-অভিমান,
মালা-বদলের পালা,—শরতের খুশীর ঝলক
ক্ষণ-পূর্ণিমা, এই থৈ থৈ ভাসানের গান—
যত দেখি-শুনি, অবাক দু'চোখে পড়ে না পলক।

অলক্ষ্যে এরা করে যে হৃদয় হরণ আমার,
অঙ্গে অঙ্গে কে যেন আমার বাজায় বাঁশি,
একা একা চাঁদ মেঘের আড়ালে খেয়া হয় পার
রজত-গিরির চূড়ায় ছড়িয়ে জ্যোৎস্না-রাশি।

ভেবে দেখ্ সেই শোকাকুল রাত, দুশ্যান্তের—
দিশেহারা মন যখন অকূল আকাশে উড়তো,
ভেবেছিলি পাবি স্পর্শ দুখানি উষ্ণ হাতের?
রুদ্ধ আবেগে বুকে জড়াবার এই মুহূর্তে!

তাই বলি মন আসলে কিছুই কিছু না, এ-সব
জীবন-নাট্য গড়ার খাতিরে, যেমন ইচ্ছে
হাসিয়ে-কাঁদিয়ে, খাইয়ে অমৃত, তিক্ত-আসব,
কেউ একজন আমাদের যেন নাচিয়ে নিচ্ছে।

অশোক মঞ্জরী

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

আর্তনাদ এনে দিলে শান্তির ভিতর।
এই সব ঘটে গেল চরিত্রের দোষে...
পৃথিবীতে কতবার মেঘ করে, অশোকমঞ্জরী
কতবার কেঁপে ওঠে দুয়ারের কাছে
মানুষেরা ভুলে যায়। কয়েকটি নির্বোধ
অসহ্য স্মরণশক্তি নিয়ে বাস করে।

স্বভাবের মধ্যে সব প্রচণ্ড মশাল
অবিরাম নৃত্য করে, শিকারের তাজা
মাংসগুলি আগুনের লোভনীয় তাপে
সিদ্ধ হয়; চন্দ্রালোক উষ্ণ ডালিমের
রসের মতোন ঝরে, বিপুল চিৎকার
হ'তে থাকে হৃদয়ের বনভোজনের।

পৃথিবীতে বাস ক'রে নিতান্ত বধির
থাকে না কেহই; লাল অশোকমঞ্জরী
দুয়ারে হঠাৎ মৃদু কথা বলে যায়,
এত মৃদু কথা, তারে ছায়া মনে হয়।
মানুষেরা ভুলে যায়; এসব ক্ষণিক
দৃশ্যে ডোবে না কেউ। কয়েকটি নির্বোধ
অসহ্য স্মরণশক্তি নিয়ে বাস করে।

মানসী

অনিল ভট্টাচার্য

আমার মনের সকল মাধুরী দিয়ে
গড়েছি এ তনুখানি
সারা বিশ্বের সুষমা আনিয়া
সাজায়েছি রূপ-রাণী॥

আমার মোহন রূপ-তুলিকায়
শত চাঁদ আনি দিছি তব পায়
অন্তর ভরি প্রেম দিয়েছি গো
প্রিয় সখী হে পাষাণী॥

মর্মরে গড়া হে মোর মানসী
স্বর্গ-সভার তুমি উর্বশী—
তোমারি নীরব নূপুর ছন্দে
বাজে মনোবীণা প্রেম আনন্দে
অয়ি লাবণ্যে তোমারি লীলায়
রাঙিল পরাণখানি॥

প্রেমিকা আমার

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

আয়নায় অনেক বড়ো মুখ রেখে স'রে যাও; দেখি
আমার যা কিছু প্রিয়, মৃত্যুর গভীর দেহভার।
আমি জানি, লাল-রঙা যৌতুক এখন
কোথাও বিকিয়ে যাবে স্থির সত্যে, গোধূলি বেলায়।
কোথাও এখন কারো মৃত্যু হবে, হ'লে
ঝড়ে উল্টে যাওয়া মুখ, গোঙানি-নির্ভর, নত কেহ
প্রতীক্ষায় নিভে যেতে যেতে......কোনো দিন
সমুদ্রে যাবে কি।

এখন সাবেকি ব'লে মনে হয়, ঐ খোলা চুলে
যা বলে বাতাস, আমি সেই সব যথার্থ ভাষণ
ভুলিনি কখনো; তবু চিহ্নহীন, প্রেমিকা আমার,
ফেরাইনি কোনো রৌদ্রশোভিত কানন এই করে!
উদ্ধারে শ্যামল, দৃপ্ত, গম্ভীর তরঙ্গরব কেন
এই বক্ষ চিরে আজ পারে না শোণিতে মিশে যেতে।

বহুদূরে থেকে দেখা যায়, অববাহিকা নিকটে,
দিয়েছি পিপাসা মেলে, সমগ্র প্রহরগুলি একা;
বালিকার মতো জেগে আছে জ্যোৎস্নাতীর।
জ্যোৎস্নায় এখন মৃত্যু হ'লে, হায়
জন্ম হ'লে ফের—দিকচিহ্নহীন প্রেমিকা আমার,
তোমাকে পাবো কি।

জ্যোৎস্নায় সমুদ্রকূলে

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

জ্যোৎস্নায় সমুদ্রকূলে হয় নিরাসক্ত রাহাজানি
নৌকাখানি
বহে আনে যারা
তারা দেয় রত্নের পাহারা
সমুদ্রে, প্লাবনে অনিমেষ
শুধুমাত্র ভেসে যায়, ছেড়ে যায় সমুদ্রের দেশ।
এখন দ্বীপের মাঝে অনিমেষ খুলিয়াছে চোখ
এখানে পালক
পাখির মতন করে ওড়াউড়ি।
কতদিন ওড়ায়নি ঘুড়ি

কতদিন ধরেনি লাটাই
অনিমেষ চেয়ে দ্যাখে পুরাতন অনিমের নাই!
সে তো জ্যোৎস্নাসমুদ্রের কূলে
হয়তো উঠেছে ভারি ফুলে
হয়তো ঢেকেছে তারে বালি
কিংবা করতালি
নিরাসক্ত শিশু — করে খেলা
উপকূলে শুয়ে আছে অনিমেষ একান্ত একেলা।

অস্থিরতা জমে

মণীন্দ্র রায়

অস্থিরতা জমছে ক্রমে ক্রমে,
আবার যেন স্থিতির ভিত
টলছে অনিয়মে।
অন্ধকারে স্রোতের বেগ
যদিও আজ অনুল্লেখ,
পাড়ের মাটি ভোলে কি সেই
ক্ষণিক বিভ্রমে!

শান্তি নেই পুরনো ব্যবহারে,
যদিও সেই প্রাচীনা প্রেম
চাইছে আড়ে আড়ে।
ভালোবাসাও শূন্য, যদি
না ঘটে তার পরমাগতি—
বিদ্ধ ক'রে মর্মমূলে
দেখে সারাৎসারে।

অস্থিরতা, কোথায় নিয়ে যাবি?
কোথায় তোর হৃদয়স্বসা,
একক অনুভাবী?
আদিম পিতা বুকের হাড়ে
ইচ্ছাকে তার গড়তে পারে।
আমরা যে আজ অন্ধ, বধির,
এবং অ-মেধাবী!

তবু এখন রক্তে এ কার শ্বাস?
আশংকা ও আকাঙ্ক্ষার
বিবাহে একি ত্রাস!
তীক্ষ্ণতার সে সংরাগে
ধাতুপিণ্ডে মূর্তি জাগে।
অস্থিরতা, কোথায় নিবি?
সে কোন পরবাস!

PUJA

স্বর্ণসজ্জা

উপন্যাস

ঝড়-বৃষ্টির দুর্যোগ চলছে ক'দিন ধরে। তারই মধ্যে ছোটরায়— চন্দ্রভান্‌ রায়ের বোট ছাড়ল। নীলরঙের বোট, দেখেই লোকে চেনে। আঙুল দেখায় : ছোটরায় চলেছেন ঐ।

দুর্গাপুজো এসে পড়ল। পুজোর কেনা-কাটা সদরে গিয়ে। সেখান থেকে বাড়ি। বাড়ির লোকে পথ তাকাচ্ছে। গিয়ে পৌঁছলে কোমর বেঁধে উদ্যোগ-আয়োজনে লেগে যাবে। সে বড় সামান্য ব্যাপার নয়! পুরুষ-পুরুষান্তর ধরে রায়েদের দুর্গোৎসবের নামডাক। অঞ্চল জুড়ে নেমন্তন্ন। হাজার দুই-তিন মানুষ এসে প্রসাদ পেয়ে যায়। দুর্যোগে তাই বেরিয়ে পড়েছেন, দেরি করবার উপায় নেই।

মাঝ-গাঙ অবধি গিয়ে চন্দ্রভান্‌ সহসা চেঁচিয়ে ওঠেন : বোট ঘোরাও—

কামরা থেকে বেরিয়ে গলুয়ের উপর দাঁড়ালেন। জোয়ার-বেলা। সমুদ্রের যত জল হু-হু করে ধেয়ে আসছে ডাঙার রাজ্যে। আছড়ে পড়ছে বাঁধের গায়ে। ঘাটের উপর দেখে এলেন, বৃষ্টি-ভেজা গেঁয়োগাছগুলো গর্বভরে পাতা দোলাচ্ছে, গাছের আধাআধি এরই মধ্যে জলতলে। একটু পরে চিহ্নমাত্র দেখা যাবে না, ঢেউ ভাঙবে গাছের মাথার উপর দিয়ে।

বোট ঘুরিয়ে বাক্সর মুখে নিয়ে চলো মাঝি। দেখে যাই একবার।

গলুয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তৃপ্তি হল না বুঝি, ছাতের উপর উঠে পড়লেন। কূল ঘেঁসে বোট চলল। তীক্ষ্ন নজরে চন্দ্রভান্‌ দেখছেন, চোখে পলক নেই। মাঝিমাল্লারা কিছু বিরক্ত। মাস ছয়েক একটানা পড়েছিলেন তো চকে, যখন-তখন বাঁধের উপর ঘুরতেন। জল-নিকাশের বাক্সর ধারে গিয়ে কতবার কত রকমে দেখেছেন। ইতিমধ্যে কী এমন ঘটল—বেরিয়ে পড়েও আবার পানসি ঘোরানোর হুকুম।

একটু হেসে কৈফিয়তের ভাবে চন্দ্রভান্‌ বললেন, বড্ড তুফান রে আজ। চোখের দেখা একটিবার দেখে যাই। ঐ পথে অমনি বেরিয়ে পড়ব, দেরি হবে না।

সাগরচক নাম। সমুদ্রের তলে ছিল, চড়া পড়ে ডাঙা জেগেছে। কঠিন বাঁধে চারিদিক ঘেরা—চরের খোলে নোনা জল

না উঠতে পারে। লক্ষ্মীঠাকরুন সমুদ্র থেকে চুপিচুপি উঠে এসে ঝাঁপি উজাড় করে ঢেলে দিয়ে গেছেন। এত ফলন নইলে হয় না। ধান নয়, সোনা ঢেলে দিয়ে যান। প্রতি বছরই এমনি। এক সাগরচকই বিশাল সংসারের সমস্ত খরচ যোগান দেয়। সমস্ত কুলিয়ে তবু ধান বাড়তি থাকে। বড় আদরের চক—বছরের মধ্যে এগারো মাস চন্দ্রভানু এখানে পড়ে থাকেন। সদাসতর্ক, ভয় কিছুতে ঘোচে না। সন্তানের মধ্যে একটি ছেলে। সাগরচকও যেন আর-এক সন্তান। অবোলা সন্তানকে দুর্যোগের মধ্যে নদী-কূলে অসহায় ফেলে যাচ্ছেন—মনের কি অবস্থা মাঝিমাল্লারা বুঝবে কেমন করে?

বাঁধের ধারে চক্কোর দিয়ে ঘুরছেন। এক সময় সম্বিত হল, দেরি হয়ে গিয়েছে বড়। বিস্তর গোন নষ্ট হল। তখন মাঝির উপরে তাড়া : ধেয়ে চলো। এই জোয়ারে আফরার খালে তুলে দিতে হবে। বুঝব ক্ষমতা। সেখান থেকে ভাটা ধরব। নইলে সারা রাত্তির ভোগান্তি।

কিন্তু মুখের তাড়ায় বোট ছোটে না। আফরার আগে থেকেই বেগোন। গুণ টেনে অনেক কষ্টে খালের মুখ অবধি পৌঁছানো গেল। খালে ঢোকা অসম্ভব। আর কি হবে, চাপান দাও তবে এখানে। রাঁধাবাড়া হোক।

চন্দ্রভানু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন চতুর্দিক। মোহনার উপর গোলপাতার ছাউনির প্রকাণ্ড ঘর উঠেছে। অজাঙ্গা জায়গায় ঘর তুলল কে এখানে?

মিস্ত্রিবাবুর খটি।

খটি এদ্দুর অবধি এসে গেছে। কোন জায়গা আর বাকি রাখবে না লালমোহন মিস্ত্রি—ছাঁকনি দিয়ে পয়সা জল থেকে তুলছে।

ব্যাপার তাই বটে। কুচোচিংড়িকে এই অঞ্চলে বলে জলের পোকা। পোকার মতোই অজস্র। স্নানে নামলে ঠোক দিয়ে দিয়ে অস্থির করবে গায়ের তেল খাবার লোভে। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে তবে বাঁচোয়া। গামছা ছাঁকনা দিলে চিংড়ির ভারে সে গামছা টেনে তোলা দায়। চিংড়ি-ধরা একরকম ঘন জাল আছে, কিন্তু জেলে-মালোরা সে জাল বানাতে চায় না। কী হবে জলের পোকা মেরে, খদ্দের কোথা, পয়সা দিয়ে ও জিনিস কে কিনতে যাবে?

মনোজ বসু

লালমোহন মিস্ত্রির উত্তর অঞ্চলের মানুষ। তিনি এসে হাটে হাটে ঢোলশহরৎ দিলেন, যে যত কুচোচিংড়ি নিয়ে আসুক, উচিত দামে কিনে নেবেন তিনি। দরও একটা বেঁধে দিলেন। নতুন এক ব্যবসা ফেঁদেছেন—চিংড়ি শুকিয়ে বাইরে চালান দেওয়া। রোদে শুকানো হবে। এবং বাদার জঙ্গলে কাঠকুটোর অপ্রতুল নেই—রোদের অভাবে আগুনে শেঁকাও চলবে।

গাঙ-খালের বাঁকে বাঁকে কারখানা—চিংড়ি শুকিয়ে বস্তাবন্দি হয় সেখানে, নৌকো বোঝাই হয়ে চালান যায়। এই কারখানাকে বলে খটি। শ' খানেক খটি বসে গেছে দেখতে দেখতে। অহোরাত্রি চিংড়ির নৌকোর চলাচল। জেলেরা অন্য মাছ ধরা ছেড়ে কুচোচিংড়ি ধরছে কেবল। খদ্দের খুঁজতে হয় না, যে কোন খটিতে মেপে দিলেই হাতে হাতে পয়সা। এত শুকনো চিংড়ি কারা খায় রে বাবা! নাম লালমোহন তো কটা বছরের মধ্যে সত্যি সত্যি তিনি লাল হয়ে গেলেন। অঞ্চলের মধ্যে ডাকসাইটে বড়লোক।

বড়লোক ডাক পড়ে গিয়ে কিন্তু বিপদ দেখা দিল। খটিতে খটিতে লুঠতরাজ। জেলেদের দাম মেটানোর জন্য নগদ টাকা-পয়সা মজুত রাখতে হয়, তার উপর মাল বিক্রির টাকা এসে

জমে। এতগুলো খটির সর্বত্র সব সময় কড়া পাহারার ব্যবস্থা সম্ভব নয়। অঞ্চলের মানুষ তারা, তক্কে তক্কে থাকে। দেশি কামারের গড়া বন্দুকে বল্লম শড়কি নিয়ে নদী-খালের গর্ভ থেকে অকস্মাৎ রে-রে করে এসে পড়ে, টাকার থলি ছিনিয়ে নিয়ে চক্ষের পলকে নৌকো ছুটিয়ে দেয়। ধরিত্রীর শিরা-উপশিরার মতো নদী-খাল ছড়ানো।—নৌকো নিয়ে কোন খাল-দোখালার পথে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল, কোন রকম তার নিশানা মেলে না।

পুলিশকে যথারীতি জানিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বোট ও লঞ্চ নিয়ে সমারোহ করে জল-পুলিশ টহল দিয়ে বেড়ায়। ডাকাতরাও তেমনি ঘড়েল। পুলিশ এই দিকটায় তো ভিন্ন একদিকে পড়ে তারা কাজ সেরে পালাল। বড় বেশি গণ্ডগোল তো চুপচাপ রয়ে গেল কিছুদিন। লালমোহন চোখে অন্ধকার দেখছেন।

কারখানার ম্যানেজার ভক্তদাস। ধবধবে পোশাক এ'টে অফিসে বসে ফাইলে সই মেরে যাচ্ছেন, ভাঁটিঅঞ্চলের মানেজার সে মানুষ নয়। নাম সই করতেই কলম ভাঙে, এমনি ম্যানেজার বহু। ভক্তদাস অতদূর নয় অবশ্য। সোনাছড়ি বন্দরে হেড অফিস—সবগুলো খটির যাবতীয় হিসাবপত্র মাস অন্তে সেখানে চলে যায়, জাবেদা খাতায় ভক্তদাস টুকে রাখে। লেখাপড়ার কাজ করে তক্ষুনি আবার চিংড়ির বস্তা ঘাড়ে নিয়ে নৌকোয় ফেলতে লাগল। এই ম্যানেজার। স্থানীয় লোক বলে ঘাঁতঘোঁত সমস্ত জানে। লালমোহনের দেখতে দেখতে এত উন্নতি, তার একটা কারণ ভক্তদাস হেন কর্মিতকর্মা ম্যানেজারটি পেয়ে গেছেন।

ভক্তদাস বিরস মুখে ঘাড় নাড়ে : পুলিশে হবে না বাবু, পুলিশ কি করবে? ওরা হল গর্তের ইঁদুর। যমরাজই খুঁজে হদিস পান না—কোন একটা জোলো-ডাকাত মরতে শুনেছেন কখনো?

লালমোহন বললেন, তবে কি হবে ভক্তদাস? কাজ-কারবার তুলে দিতে বলো?

ভক্তদাস একটু ভেবে বলে, বেলডাঙার রায়বাড়ি গিয়ে ধরুন। ভাঁটি অঞ্চলে থেকে ও'দের শরণ না নিলে উপায় নেই। সকলের কাছে যেতে বলিনে, ছোটরায়কে বলুন। ঐ একজনেই হয়ে যাবে।

লালমোহন কিছু অবাক হয়ে বলেন, আমার জন্য ও'রা কি ডাকাত তাড়াতে যাবেন?

কিছু না। কোন মানুষ কি করছে ও'রা সব জানেন। মাতব্বর একটা-দুটোকে চোখ টিপে দেবেন—সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক ঠাণ্ডা।

গলা খাটো করে ভক্তদাস বলে, রায়েদের এককালে পেশা ছিল এই গাঙে-খালে নৌকা মেরে বেড়ানো। ছোটরায়ের বাপ রুদ্রভানু অবধি চলেছিল। সরকারের কড়াকড়ি বুঝে তিনিই শেষটা চকের বন্দোবস্ত নিয়ে চকদার হলেন। ছোটরায়কে টোলে পাঠালেন পণ্ডিত বানাতে। ছোটরায়ের ছেলেটা শুনি আরও ধুরন্ধর। বিদ্যের জাহাজ হয়েছে, বিদ্যের ধান্দায় দেশভুঁই ছেড়ে কলকাতা শহরে পড়ে থাকে। হাত-পা ধুয়ে রায়েরা এখন পুরোপুরি ভদ্দোরমানুষ—তা হলেও পুরানো খাতির যাবে কোথা? ডাকাতেরা সর্দারমান্য দেয় ও'দের। ছোটরায় আপনাকে পেয়ার করেন জানতে পারলে খটির পাঁচ-শ হাতের মধ্যে কোন মন্দ-নৌকা ভিড়বে না।

পুলিশের দৌড় বোঝা গেছে। ভক্তদাস যা বলছে, এই হল শেষ-উপায়। রায়বাড়ি দুর্গোৎসবে নিমন্ত্রণ আসে। অন্যান্য বার ভক্তদাস গিয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করে, এবারে লালমোহন নিজে যাবেন, নিজে গিয়ে চন্দ্রভানুর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে আসবেন।

এই পুজোর মুখে রায়বাড়ির ছোট তরফে বিষম দুর্ঘটনা। ইন্দুমতী দোতলার সিঁড়ি দিয়ে পড়ে চোট খেলেন। শয্যাশায়ী অবস্থা। বিশাল সংসার, মানুষ কতগুলো হঠাৎ হিসাবে আসে না। সংসারের যাবতীয় দায়দায়িত্ব ঐ এক ইন্দুমতীর উপর। আঁচলে চাবির থোলো ঝুলিয়ে ছোটখাট মানুষটি সকাল থেকে রাতদুপুর অট্টালিকার একতলা-দোতলা ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছেন—কোন কিছু নজরে এড়ায় না। তবু তো চোখ একটি মাত্র, ডান-চোখ কানা। লোকজন তটস্থ—বাতাসের মতন নিঃশব্দপায়ে কখন এসে পড়েন। এমনিই সকলে বরাবর দেখে আসছে। সেই মানুষ দিনের পর দিন বিছানায় নিশ্চল হয়ে পড়ে আছেন। ইন্দুমতীকে বাদ দিয়ে এবারে দুর্গোৎসবের কাজকর্ম কেমন করে হবে, ভেবে পাওয়া যায় না।

গোবিন্দসুন্দরী সম্পর্কের হিসাবে নাকি পিশ-শাশুড়ি। কণ্ঠে কান্নার সুর এনে বলেন, অষ্টপ্রহর পাক দিয়ে বেড়াও বউ, তাতেই সব শাসনে থাকে। দেখাশুনো যতই করি, আমি তো তোমার সিকির সিকিও পেরে উঠব না।

ইন্দুমতী বলেন, ডাল বাছা হয়ে গেছে পিশিমা?

থতমত খেয়ে গোবিন্দসুন্দরী বলেন, হ্যুঁ, তা একরকম—

হয়ে থাকে তো ধামা ধরে আনুন এখানে। আমার সামনে—চোখের উপর। ছোলার সঙ্গে মুসুরি কেমন করে মিশে যায় জানিনে। বিধবারা খাবেন। মুসুরি আমিষ, একটি দানা থাকলে চলবে না।

সত্যিই তো, সত্যিই তো—। বলে গোবিন্দসুন্দরী সরে পড়লেন। দরদ জানাতে এসে কী দুর্ভোগ!

অন্তরালে গিয়ে গর্জন করে ওঠেন : বয়ে গেছে, মাইনে-করা দাসীবাঁদী নাকি! কিচ্ছু করতে পারব না—যাও।

ডালের ধামা নিয়ে বসেছেন আবার। ক্ষীরোদা-ঝি'কে দেখে হাত নেড়ে ডাকলেন : ক্ষীরি, শুনে যা। বড্ড সর্বনাশ যে এদিকে—

কাছে নিয়ে এসে বলছেন, মুখ দিয়ে বের না করিস তো বলি। বউমার ব্যথাখানা সহজ নয়। হাড় চুরমার হয়ে মাংস অবধি থেঁতলে গেছে। আর উঠতে হবে না, বিছানায় পড়ে চিঁ-চিঁ করা এবার থেকে। তেষ্টার এক ঢোক জল—দয়া হল তো কেউ এগিয়ে দেবে, নয় তো ছাতি ফেটে মরবে।

আক্রোশ মিটিয়ে বলছেন। একটা গুণ ক্ষীরোদার—এর কথা ওকে গিয়ে লাগায় না। নির্ভাবনায় তাই বলা যাচ্ছে। বলেন, ধর্ম সব দেখে রাখে। দেখেছে বলেই এত খোয়ার। গুরুজন আমি—একবাড়ি লোকের মধ্যে আমার বাক্স হাণ্ডুল-পাণ্ডুল করে রুপোর বাটি বের করল। রাত্তিরবেলা চোখে ঠাহর হয় না— রুপোর বাটি পিতলের বাটির তফাৎ ধরতে পারিনি। বল্‌রে ক্ষীরো, আমি বুঝি ইচ্ছে করে নিয়েছিলাম! তেমনি ঘরের বেটি আমি, তেমনি ঘরে বিয়ে হয়েছিল!

ক্ষীরো-ঝি জিজ্ঞাসা করছিল—রুপোর বাটি পিতলের বাটির কথা নয়, সে বৃত্তান্ত সকলে জানে, বাড়িসুদ্ধ হাসাহাসি হয়েছে তাই নিয়ে। বলতে যাচ্ছিল, অসুখের কথা গোবিন্দসুন্দরী আন্দাজি বলেছেন, না ধনঞ্জয় কবিরাজ বলেছে কিছু বিশেষ-ভাবে। কিন্তু বলবার আগে দুড়দাড় করে ছুটল দোতলায় ইন্দুমতীর ঘরে। বড় উঠানের অপর দিকে বিনোদের মা আর নকড়ি গোমস্তার কথাবার্তা—তা-ও কানে পৌঁছে গেছে। ইন্দুমতী হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন : কি নিয়ে ঝগড়া তোমাদের? আমার কাছে এসো বিনোদের মা। শুনি।

বিনোদের মা ভয়ে লজ্জায় এতটুকু। ঘরে ঢুকে মিনমিন করে বলে, ঝগড়া নয় মা। মশারি ছিঁড়ে গেছে, মশা আটকায় না। বিনোদকে নিয়ে সমস্ত রাত আলো জেলে বসে ছিলাম। মশারি কবে আসবে, জিজ্ঞাসা করছিলাম গোমস্তামশায়কে?

মশারির কথা বলেছ তুমি কবে?

পরশুদিন।

ইন্দুমতী ভ্রুকুটি করলেন : দু-দুটো দিনের মধ্যে একখানা মশারি জোটে না? আমার সংসারের মানুষ আলো জেবলে বসে রাত কাটায়?

প্রশ্নটা ক্ষীরোদার দিকে তাকিয়ে। খাস-চাকরানিকে সকল কৈফিয়ত দিতে হবে। ক্ষীরো তাড়াতাড়ি বলে, হাটে লোক পাঠানো হয়েছিল। জালের মতন জিনিস দেখে আনে নি। গঞ্জ থেকে কাল ভাল মশারি এনে দেবে।

ইন্দুমতী অধীর কণ্ঠে বলেন, গোড়াতেই কেন গঞ্জে পাঠানো হল না? গোমস্তা-মশায়কে জিজ্ঞাসা করবি। শুনতে চাই আমি জবাব।

বচসার মুখে বিনোদের মা-ও ঠিক এই কথাগুলো নকড়ি গোমস্তাকে বলছিল। অবস্থা বিবেচনায় সে এখন নকড়ির পক্ষ নিয়ে বলছে, হাটে মিলে যাবে, উনি ভেবেছিলেন। গঞ্জ অবধি যেতে হবে না। ভালো জিনিস আসেও তো কখনো-কখনো।

ইন্দুমতী ঝাঁঝ নিয়ে বললেন, আমি উনি, জানি। দক্ষিণপণ মানুষ—বারো গণ্ডা পয়সার মশারিতে যদি কাজ চলে যায়, গঞ্জে পাঠিয়ে খামোকা কেন দু-টাকা-আড়াই টাকা খরচ করতে যাবেন? যাও তুমি বিনোদের মা। দেখছি।

বিনোদের মাকে সরিয়ে দিয়ে ইন্দুমতী ক্ষীরোদাকে বললেন, আমার মশারি খুলে ওর বিছানায় টাঙিয়ে দিয়ে আয়।

স্তম্ভিত ক্ষীরোদা বলে, সে কি! আপনার শরীরের এই দশা মা—

মশারি থেকেও আমার ঘুম হয় না। দুদশ রাত্রে বিনোদের মা যা করেছে—আমার আজ তাই। আলো জ্বলা থাকবে, বসে বসে আমি রাত কাটাব। হাত-পা কোলে করে দাঁড়িয়ে রইলি যে—হুকুম মানবি নে? শুয়ে পড়ে আছি, কিন্তু বেঁচে রয়েছি আমি এখনো।

তাকিয়ে পড়লেন কর্ত্রীঠাকরুন। চোখের দৃষ্টি একনলা বন্দুকের বুলেট যেন। মশারি খুলতে ক্ষীরোদা দিশা পায় না।

অনতিপরে কবিরাজ এলেন। ধনঞ্জয় কবিরত্ন—লোকে বলে ধন্বন্তরি কবিরাজ। অষুধ লাগে না, হাতে ছুঁয়ে দিলেই রোগ নাকি ছুটে পালায়। সেই কবিরাজ গোড়া থেকে দেখছেন—বাত মালিশ, অনুপান বদলে বদলে কত রকমের বটিকা। নিরাময়ের কোন লক্ষণ নেই। কবিরাজকে পেয়ে নিত্যি দিনের সেই প্রশ্ন : আর কত দিন কবিরাজমশায়? আমার সংসার যে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল।

কবিরাজ আজকের মানুষ নন। চন্দ্রভানুর বাপ রুদ্রভানুর যখন শেষ অবস্থা, এই ধনঞ্জয় তখন সূচিকাভরণ প্রয়োগ করলেন। বয়সে ছেলেমানুষ—সেই তখন থেকে রায়বাড়ি যাতায়াত। আপন জনের অধিক হয়ে গেছেন।

ইন্দুমতী বলছেন, চোখের উপর ভূতের নৃত্য চলেছে, সামান্য মশারির অভাবে লোকে জেগে নিয়ে রাত জেগে কাটায়—শুয়ে শুয়ে আমায় এই সমস্ত দেখতে হয়। তাড়াতাড়ি সেরে দিন, নয়তো বিষ বড়ি-টড়ি খাইয়ে শেষ করে দিন একেবারে।

হাসামুখ ধনঞ্জয়ের। ছেলেমানুষের মুখে আগড়ুম-বাগড়ুম শুনছেন যেন।

অধীর কণ্ঠে ইন্দুমতী বলেন, আপনি বলেছিলেন পুজোর আগে সেরে উঠব।

সারবেনই তো।

পুজো যে এসে পড়ল। এক মাসও বোধ হয় নেই।

নির্বিকার কবিরাজ বলেন, আসুক না। আমার কিন্তু মনে হয়, খারাপই হচ্ছে দিনকে দিন। পায়ের দিক থেকে ক্রমেই যেন অসাড় হয়ে আসছে।

ধনঞ্জয় উড়িয়ে দেন : ও কিছু নয়। অনেক দিন ধরে শয্যাশায়ী, অঙ্গের চালনা হয় না। সেইজন্যে অমন ঠেকে।

ইন্দুমতী কিছু ভরসা পেয়ে বলেন, এত বড় মচ্ছব সামনে। কিছুই গোছগাছ হয়নি। আমি পড়ে থেকে সমস্ত মাটি। আগেকার বলশক্তি পাবো তো আবার?

ধনঞ্জয় বলেন, ঠিক পাবেন। হয়েছে কী, বলুন তো? সেরে উঠে ডবল খাটনি খেটে এত দিনের লোকসান সুদসুদ্ধ আদায় করে নেবেন।

চন্দ্রভানু আজ এসে পৌঁছেছেন। কখন এসে কবিরাজের পিছনে দাঁড়িয়েছেন। দু-জনে বাইরে এলেন। ধনঞ্জয়ের এতক্ষণের হাসি-মুখ ঘরের বাইরে এসে অন্ধকার। প্রদীপ নিভে গেলে হঠাৎ যেমন অন্ধকার হয়। বললেন, রোগির সামনে যা-ই বলি, নিজের উপর আমি আর ভরসা রাখতে পারি নে ছোটরায়। ভাল চিকিৎসক কাউকে দেখান।

চন্দ্রভানু বলেন, অবস্থাটা কি, খুলে বলুন।

লক্ষণ খারাপ। প্রাণের শঙ্কা করি নে, বেঁচে থাকবেন ঠিকই। তবে শুয়ে পড়ে থাকতে হবে এমনি।

কত দিন?

ঢোক গিলে কবিরাজ বলেন, হতে পারে সারা জীবন। আমার চিকিচ্ছেয় কাজ হল না। আমি পরাজিত। দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছেন। পায়ের দিক থেকে অসাড় হয়ে আসছে, মিথ্যে বলেন নি সেটা।

চন্দ্রভানু আঁতকে উঠলেন : কী সর্বনাশ!

ধনঞ্জয় বলেন, আমি বলি, দীন নন্দন ডাক্তারবাবুকে দেখান না কেন একবার। তাঁর মতো কেউ নয়। চকে খবর দিয়ে পাঠান। কোন রকম উপায় যদি থাকে, তিনি বাতলে দেবেন।

চন্দ্রভানু বলেন, চক ছেড়ে তাঁর পক্ষে আসা মুস্কিল। ডাক্তারখানা সবে জমতে লেগেছে। আসতেই চাইবেন না। আমি ফিরে যাই—বলে-কয়ে দু-চার দিনের জন্যে পাঠাব। পুজোর গোলমালটা কাটলে সদরের ডাক্তার এনে দেখানো যাবে একবার। বড় সর্বনাশের কথা বললেন কবিরাজমশায়। আমি চকে পড়ে থাকি, ছোটবউ সংসার নিয়ে আছে। দু-জনে দু-দিকে—দিব্যি চলে আসছিল। এই রাবণের সংসার ছোটবউ ছাড়া কে সামলাতে পারে?

কবিরাজ বলেন, রোগিকে স্তোক দিই, তা বলে আপনাকে তো পারি নে। আমার জ্ঞানবুদ্ধিতে যা আসে, খোলাখুলি বললাম। সংসার-সংসার বলে বউমাও ছটফট করছেন। কিন্তু আসল সংসার কতটুকু আপনাদের! স্বামী-স্ত্রী আর ছেলে। তার মধ্যেও দু-জন আপনারা বাইরে বাইরে। আজেবাজে একগাদা পুষ্যি—ওদের কতক সরিয়ে দিন, তা ছাড়া উপায় কি?

বিশ-পঁচিশজন আছেন, আজেবাজে তার মধ্যে একজনও নন। চন্দ্রভানুর স্বর উত্তপ্ত হয়ে উঠল : যাঁদের পুষ্যি বলছেন, তাঁদের একজনকেও আমরা নিয়ে আসিনি। সরাবার ক্ষমতাও আমাদের নেই। বেলডাঙার এই বাড়ি যেদিন শেষ হল, রায়েরা গৃহপ্রবেশ করলেন, আসবাবপত্তর এলো, সেই সঙ্গে ও'দেরও বাপ-দাদারা এসে ঢুকলেন। রায়-বাড়ি যদি কখনো লয় পায়, সকলে আমরা একসঙ্গে সরব। আগে একজনও নয়।

একটু থেমে আবার বলেন, উপায় নেই। রায়েদের প্রতিশ্রুতি আর রায়বাড়ির ইজ্জত এর সঙ্গে বাঁধা। বাইরের লোকের কাছে আজব ঠেকতে পারে, কিন্তু আপনার তো কিছু অজানা নেই। আপনি কেন অমন কথা বলবেন কবিরাজমশায়?

পুজোর দিন এগিয়ে আসে, ইন্দুমতী ততই পাগল হয়ে উঠছেন। অঞ্চলের মানুষ উন্মুখ হয়ে আছে, এবারে বুঝি সমস্ত পুণ্ড। কেলেঙ্কারির পার থাকবে না। বেঁচে থেকে চোখের উপর এ জিনিস তিনি কেমন করে দেখবেন?

দিনের মধ্যে অমন বিশবার স্বামীর উপর অনুযোগ করেন; তুমি কিছু দেখছ না।

চন্দ্রভানু বলেন, এ সবের আমি কি বুঝি আর কি দেখব। দেখতে গিয়ে তোমারই চিরকেলে বন্দোবস্ত হয়তো ভণ্ডুল ঘটিয়ে বসব।

আবার বলেন, বাড়ি এলেই তো শালগ্রাম-শিলা বানিয়ে ফেল। শুয়ে বসে থাকা আর ঘন ঘন তোমার প্রণাম নেওয়া।

ইন্দুমতী কেঁদে বলেন, আমি পড়ে আছি আর সকলে মিলে ধর্ম দেখছ তোমরা এই সময়।

ধনঞ্জয় কবিরাজের সঙ্গে দেখা হলেই মারমুখী : ধোঁকা দিলেন আপনি, কিছুই করলেন না। পুজোর মধ্যে সেরেসুরে উঠব—কোথায়?

কবিরাজ আর সামনে আসেন না, রোগি দেখা আপাতত বন্ধ।

ধ্রুবভানুর কলেজের ছুটি। সে বাড়ি এসেছে। মাকে প্রবোধ দেয় : যত উতলা হবে, সেরে উঠতে ততই দেরি পড়ে যাবে। ছটফট কোরো না, নিশ্চিন্ত সব হয়ে যাবে দেখো।

হবে কেমন করে? তোরা যে বাপবেটা হাতে করে কুটোগাছটিও ভাঙিসনে—

কুটো কি তুমিও কোনদিন ভাঙতে মা।?

কি, কি বললি তুই? ক্রুদ্ধ ইন্দুমতী এক চোখ পাকিয়ে পড়লেন।

ধ্রুব বলে, মিথ্যে বলিনি। ঠাণ্ডা মাথায় বুঝে দেখ তুমি। ছুটোছুটি চেঁচামেচি করে বেড়াও, কিন্তু নিজ হাতে কতটুকু কি করো? যারা বরাবর করে থাকে, এবারও তারাই করবে।

করবে, তার জন্য ডাক-হাঁক লাগে। ছেলে-মানুষ তুই—তোকে কিছু বলছিনে। কিন্তু বাড়ির যিনি কর্তা তিনিও একেবারে চুপ। শালগ্রাম-শিলা কথা বলে না, তিনি কেন তবে বলতে যাবেন? আমি পারি নে, শুয়ে শুয়ে এইখান থেকে চেঁচাই—

হাউহাউ করে ইন্দুমতী কেঁদে পড়েন;

আমার চেঁচামেচি কেউ আজকাল কানে নেয় না। হুকুম নিজের কাছেই কান্নার মতো লাগে।

কিরণবালা কমবয়সি মেয়ে। বরে নেয় না, তা বলে আমোদের কমতি নেই। ছুটোছুটি করে বেড়ায় সর্বক্ষণ। কোন সুবাদে জানা নেই, ইন্দুমতীকে মাসিমা বলে ডাকে। সে এসে খবর দেয় : প্রতিমার উপরে চালচিত্র বসে গেছে, ডাকের সাজ পড়েছে। গর্জনতেল মাখিয়ে দিয়েছে, জ্বলজ্বল করছেন ঠাকুর-ঠাকরুনেরা।

ঠোঁট উলটে ইন্দুমতী বলেন, ঐ সাজ-গোজ অবধি। দুর্গাঠাকরুনের কপালে উপোস এবারে—ছেলেমেয়ে সুদ্ধ।

ক্ষীরো-ঝি সান্ত্বনা দিয়ে বলে, মিছে উতলা হচ্ছ মা। কাজকর্ম ঠিকঠিক চলেছে। গোমস্তামশায় গঞ্জ থেকে এই মাত্তোর কাঁচা-বাজার সেরে এলেন, ভাঁড়ারি তুলেপেড়ে রাখছে।

বাজার হবে না কেন, গোমস্তামশায়ের দু-পয়সা লভ্য আছে যে! ঐ বাজার অবধি, রাঁধাবাড়া হয়ে মানুষের পাত অবধি পৌঁছবে না। এত চোখে চোখে রেখেও ঠেকাতে পারিনে, এবারে দু-হাতে লুটবে।

তবু যথানিয়ম কাজ এগিয়ে যাচ্ছে। ইন্দুমতী যাকে যখন পান জিজ্ঞাসাবাদ করেন। না, গোলমাল কিছু নেই।

ইন্দুমতী কিন্তু অবিশ্বাসে ঘাড় নাড়েন: মিথ্যে বলছ তোমরা সকলে। আমার ভয়ে। যজ্ঞিবাড়ি টু-শব্দটি নেই, বাড়িশুদ্ধ ঘুমিয়ে রয়েছে। কাজ হলে এখানে শুয়ে শুয়েই আমি টের পেতাম।

চন্দ্রভানুকে ডাকিয়ে এনে বলেন, তোমার পায়ে পড়ি—

চন্দ্রভানু বলেন, শালগ্রাম-ঠাকুরের সে তো নিত্যি সকালের বরাদ্দ। অবেলায় গ্রেপ্তার করে পায়ে পড়ার কি ঘটল?

পায়ে পড়ি তোমার—বসে বসে খালি পাশা খেললে হবে না। যত চোরছ্যাচোড় ফাঁকিবাজ—ওদের শাসনে রাখা চাট্টিখানি কথা নয়। কাজে না পেরে ওঠ, মুখে অন্তত কিছু হাঁকডাক করো।

করি তো তাই। হাড়ের পাশাও তেমনি ত্যাঁদোড়। বিনা হাঁকডাকে কথা শোনানো যায়!

এমনি সময় ধ্রুব এসে বলল, নেমন্তন্নর ফর্দ মিলিয়ে এলাম বাবা। অন্য বারে যা যায়, এরই মধ্যে তার দেড়া ছাড়া হয়ে গেছে।

আরে সর্বনাশ, কী করি এখন আমি? ইন্দুমতী আর্তনাদ করে ওঠেন : আমি যে ভাবছিলাম, চিঠির নেমন্তন্ন একেবারে বন্ধ করতে বলব। দক্ষযজ্ঞের ব্যাপার হবে—চোখে না-ই দেখি, কানে তো শুনব! তার আগে মরণ হয় যেন আমার।

পুজোয় লোকারণ্য। ধুমধাম অন্য বারের চেয়ে বেশি বই কম নয়। ভক্তদাসকে নিয়ে লালমোহন এসেছেন। রায়বাড়ির অট্টালিকার সদর-অন্দর উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখলেন খানিক। পুজোর সমারোহ দেখলেন। তাজ্জব হয়ে গেছেন। বলেন, খোলামকুচির মতো টাকা ছড়াচ্ছে, খরচ করতে জানে বটে। আলাদা মনোযোগ এদের।

ভক্তদাস বলে, ডাকাতের গুষ্ঠি যে। টাকা-পয়সা এঁদের কাছে গাঙের জোয়ার-ভাটার খেলা—আসতে যেমন যেতেও তেমনি। খরচা করে আনন্দ এঁদের, জমানোয় নয়। এখন পেশা বদলেছে, কিন্তু পুরানো রেওয়াজ যাবে কোথা?

লালমোহন বলেন, আনি-দুয়ানি-সিকি করে করে আমাদের টাকা—এ জিনিস আমরা ভাবতেও পারিনে। ব্যাপারবাণিজ্যের লোকে পারে না।

চাণ্ডারি মাথায় মাঝি এতক্ষণে দেখা দিল। চণ্ডীমণ্ডপের সামনে চন্দ্রভানুর সঙ্গে মুখো-মুখি। সকৌতুকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন : ওতে কি?

মায়ের নামে যৎসামান্য ভোগ-নৈবেদ্য নিয়ে এসেছি।

ধ্রুবকে ডেকে চন্দ্রভানু লালমোহনের পরিচয় দিয়ে দিলেন : মিত্তিরমশায়—বাইরে থেকে এসে দেখতে দেখতে কারবার জাঁকিয়ে তুলেছেন। সোনাছড়ি বন্দরের উপর একখানা বাড়িও করেছেন ছবির মতো।

ছোটরায়ের মতো মানুষ এতসমস্ত খবর রাখেন—লালমোহন অবাক। চন্দ্রভানু বলছেন, পুজোর ভোগ এনেছেন, পুরুত-ঠাকুর মশায়ের হেপাজত করে নাম-গোত্র লিখিয়ে দিয়ে এসো। যে যে নামে সংকল্প হবে। পুজোঅন্তে প্রসাদ নৌকোয় তুলে দিতে ভুল না হয়—বাড়ি নিয়ে যাবেন।

লালমোহন বলেন, বাড়িতে কে আছে, লোকজন কেউ এখনো দেশ থেকে আসেনি। ভিতরের কাজ এখনো বাড়ির বাকি। মাঘ মাসে গৃহপ্রবেশ, বাড়ির লোক তখন আসবে।

আলাপ জমানোর জন্য লালমোহন উসখুস করছিলেন। সুযোগ পেয়ে অনেক কথা বলে নিলেন। কিন্তু বলছেন কাকে? পাশা পড়েছে বৈঠকখানার ফরাসে। চন্দ্রভানু সেইদিকে ছুটলেন।

ধ্রুবর হাত এড়ানো যায় না। প্রসাদ শুধু-মাত্র নৌকোয় নিয়ে রেহাই হল না। আসনে বসে রীতিমতো রাজসিক প্রসাদ পেতে হল রায়বাড়ি বসে। গুরুতর রকমের হয়েছে। বাড়ির নিচে গড়খাইয়ে নৌকো—সেই পথটুকুও হাঁটা মুশকিল। ধ্রুবও ছাড়বে না : এখন কেন নৌকোয় গিয়ে বসে থাকবেন? জো আসুক। বিশ্রাম করুন ততক্ষণ।

নিরিবিলি একটা কামরায় বিছানা করে লালমোহন ও ভক্তদাসকে নিয়ে চলল। লাল-মোহন মুগ্ধ কণ্ঠে বলে ওঠেন, এমন কাজের ছেলে হয়েছ, বাবাজী, ছোটরায় মশায় তাই নিশ্চিন্ত। আমার মেয়েটাও ঠিক এইরকম। কালেভদ্রে যখন বাড়ি যাই, ছুটোছুটি করে সে-ই আমার সব করে দেয়। কিছু করতে গেলে তাড়া দেয়, শুয়ে-বসে সময় কাটাতে হয়। উঃ, কতদিন যে বাড়ি যাইনি! রক্ষে পাই সোনাছড়ি ওরা সব এসে পড়লে।

ধ্রুব হেসে বলে, এবাড়ি কিন্তু আলাদা। আমি সত্যিই কিছু করছিনে। করছেন বাবা।

লালমোহন আরও মুগ্ধ হলেন। কী বিনয়ী ছেলে, কেমন মিষ্টভাষী। কথা যেন হাসি না মাখিয়ে বলতে পারে না।

ধ্রুব বলছে, বাবা ঐ যে নিচের বৈঠক-খানায় রয়েছেন, ক্ষণে ক্ষণে গলা পাওয়া যাচ্ছে—

ভক্তদাস বলে, পাশা খেলার চিৎকার—

ঐ যথেষ্ট। বাবা রয়েছেন, লোকজনের সেটা মনে পড়ে যাচ্ছে। এর উপরে মুখে আবার কী বলতে যাবেন!

ধ্রুব চলে যাবার পরেও তার কথা। ভক্ত-দাস বলে, পেটে অঢেল বিদ্যে, তাই অমন ভালো। আমাদের তল্লাটে বিদ্যে জিনিসটা বড় কম। রায়বাড়িতেও ছিল না, ছোটরায়কে দিয়ে শুরু। বুড়ো কর্তা পুরানো কাজকর্মে তোবা করে সাগরচক বন্দোবস্ত নিলেন, ছেলেকে টোলে পাঠালেন ধর্মপথে মতি যাবে বলে। তাঁর ছেলেয় এসে একেবারে হুলুস্থুলে কাণ্ড—দু-দুটো পাশ দিয়েছে, জলপানি পেয়েছে একটায়। পড়েই যাচ্ছে। এই বয়স অবধি পড়া ছাড়া কাজ নেই।

লালমোহন বললেন, ছেলেটা বড় আমার মনে ধরেছে। সেই যা বলছিলে তুমি ম্যানেজার — ব্যাপারবাণিজ্য এদের সাহায্য ছাড়া বজায় রাখা যাবে না। এসেছিও সেইজন্যে।

আজ্ঞে হ্যাঁ—

কিন্তু গরজটা কি এঁদের বলো। আমার স্বার্থে কেন এঁরা ডাকাত শাসন করতে যাবেন?

ভক্তদাস ঘাড় নেড়ে বলে, তা করবেন। সেকালে ছিলেন দলপতি, একালের চকদার লোকের উপর মাতব্বরি এঁদের চিরকাল। সেই মাতব্বরি মেনে নিয়ে শরণ নিলেই হল। বলেই দেখুন না। রক্ত এঁদের আলাদা—এই মচ্ছবের ব্যাপারেই দেখতে পাচ্ছেন। অপর দশজনের সঙ্গে মেলে না।

লালমোহন তর্ক করেন : বেশ, একবার না হয় শাসন করে দিলেন—বছর কয়েক নির্ঝঞ্ঝাটে চলল। তার পরে আবার যদি অত্যাচার আসে! বার বার কোন লজ্জায় বলতে যাব? তাই মতলব আসছে একটা মাথায়—

দুটো হাতপাখা নিয়ে ধ্রুবভানু এসে পড়ল এই সময়। মাছি লাগতে পারে, গন্ধ হতে পারে। ছেলেটার সকল দিকে নজর, অতিথির আপ্যায়নে তিলমাত্র ত্রুটি হতে দেবে না।

পাখা দিয়ে চলে গেলে লালমোহন হঠাৎ বললেন, ধ্রুব ছেলেটিকে জামাই করব। তুমি কি বলো ম্যানেজার? অনুরোধে একবার হয়তো এঁরা গাঙ-খাল সামাল করে দিলেন। কিন্তু আমার হল চিরদিনের কাজকারবার। রায়েদের সঙ্গে বাঁধা কুটুম্বিতে হলে একেবারে নিশ্চিন্ত।

ভক্তদাস পরমোৎসাহে ঘাড় নাড়ে : খাসা মতলব করেছেন। ছোটরায়ের বেহাই হতে পারলে তো পাথরে পাঁচ কিল। খটি দুনো তেদুনো করে ফেলব। কোন গাঙ-খালের মোড় বন্ধ থাকবে না। টাকাপয়সা খটির উঠোনে মাদুরে পেতে শুকোতে দিলেও কোন বেটা চোখ তুলে দেখতে যাবে না তখন। কারবারের ছেঁড়া কথা না তুলে তবে আপনি সরাসরি বিয়ের প্রস্তাবই উত্থাপন করুন।

সুযোগও পাওয়া গেল। বিদায় নিয়ে লালমোহন নৌকোয় উঠবেন, গৃহকর্তা চন্দ্রভানুকে খুঁজছেন। তিনি দরদালানে এখন। প্রসন্ন মেজাজ। এত বড় ব্যাপার

ঢুকেবুকে গেল, টু-শব্দটি হয় নি। ইন্দুমতী অভাবে কি-হয় কি-হয়—কিন্তু অন্যান্য বারের চেয়েও বেশি শৃঙ্খলা। চন্দ্রভানু নিজে অবশ্য পাশা খেলেছেন, গল্পগুজব করেছেন, চন্ডীমন্ডপে একটা জলচৌকি নিয়ে অনেকক্ষণ বসে বসে পুজো দেখেছেন। তবে ভোরবেলা উপর থেকে সেই যে নেমেছিলেন, সিঁড়ি বেয়ে আর ওঠেন নি। নিচের তলায় সারা দিন।

লালমোহন গিয়ে নমস্কার করতে চন্দ্রভানু বললেন, আছেন আপনারা? কে যেন বলল, সন্ধ্যের আগে রওনা হয়ে পড়েছেন।

লালমোহন বলেন, কথা ছিল তাই। কিন্তু বাবাজীর জন্য হল না। সামনে বসে এমন খাওয়ালো, গড়িয়ে না-পড়ে উপায় ছিল না। কী ছেলে! পুত্রভাগ্যেও আপনি বড় ভাগ্যবান।

সুযোগ এসে গেল তো প্রস্তাবে আর দেরি কেন? লালমোহন বললেন, একটা দিনেই মনে হচ্ছে ছেলেটি কত আপন আমার! সত্যি সত্যি তাই হতে দিন, সেই দরবার আপনার কাছে।

চন্দ্রভানু সবিস্ময়ে চোখ তুলে চাইলেন : খুলে বলুন মিত্তিরমশায়।

সে দৃষ্টির সামনে লালমোহন থতমত খেয়ে যান। কণ্ঠের আওয়াজ পেয়েই মানুষজন ছুটোছুটি করে কাজকর্মে লেগে যায়, নিশ্চয় এই দৃষ্টির সামনাসামনি পড়বার ভয়ে। বিনা ভূমিকায় বলে ফেললেন, ধ্রুবকে বড্ড ভালো লেগেছে। মীনাক্ষীকে নিয়ে নিন আপনি—ঐ আমার এক মেয়ে।

ভালো তো অনেকেরই লাগে ধ্রুবকে, সত্যি ভালো ছেলে। তবে তো অনেক জনের মেয়ে নিতে হয়। কাকে বঞ্চিত করব বলুন। কিন্তু হবার উপায় নেই। রায়বাড়ির নিয়ম, একের বেশি দুই বিয়ে হবে না। সেকালে হত শুনেছি, এখন বন্ধ।

হো-হো করে চন্দ্রভানু হেসে উঠলেন : বাইরে কেউ যদি কিছু করে উপায় নেই, কিন্তু শুদ্ধান্তঃপুরে স্ত্রী একজনই।

হাসি থামিয়ে গম্ভীর হলেন এবার : এ তল্লাটে আপনি নতুন। কিন্তু ভক্তদাস পুরোনো লোক, তার কিছু অজানা থাকবার কথা নয়। রায়বাড়ির বউ আনতে বিস্তর বিচার-বিবেচনা লাগে। নতুন বড়লোক আপনি—মেয়ের সঙ্গে ভরা সাজিয়ে যৌতুক পাঠাবেন মানুষজনের চমক দেবার জন্য—

লালমোহন আরও ফলাও করে দিলেন কথাটা : আজ্ঞে না, চমক দেবার উদ্দেশ্য নয়। একমাত্র মেয়ে আমার। আইন মতে ছেলেরা ওয়ারিশান। কিন্তু ন্যায়ত ধর্মত মেয়েরও অংশ থাকা উচিত। তাই সেই প্রাপ্য অংশ গয়না ও নগদ টাকায় আমি বিয়ের সময় একেবারে দিয়ে দেবো।

চন্দ্রভানু অবিচল কণ্ঠে বলতে লাগলেন, গয়না-টাকাই সব নয়। রায়বংশের কর্তারা শুধু অট্টালিকাই গড়েন নি, সেই সঙ্গে মস্ত বড় ইজ্জত গড়ে বিস্তর দায়দায়িত্ব দিয়ে গেছেন। যাকে-তাকে এ বাড়ি বউ করে আনা চলে না, কনের বিচারটাই সকলের আগে।

ঘাড় নেড়ে সগর্বে সায় দিয়ে লালমোহন বললেন, খাঁটি কথা। সেদিক দিয়েও জোর আমার খুব। রায়বাড়ির অযোগ্য হবে না আমার মীনা। সোনাছড়ি বন্দরে সামান্য একটু বাড়ি তৈরি হচ্ছে আমার—

হেসে চন্দ্রভানু বলেন, এদেশ-সেদেশের মাঝিমাল্লা নৌকো ঘুরিয়ে নিয়ে আপনার সেই সামান্য বাড়ি দেখতে যায়।

লালমোহন বলেন, মাঘমাসে গৃহপ্রবেশ করে আপনাদের অঞ্চলের পাকা বাসিন্দা হয়ে যাচ্ছি। পায়ের ধুলো দিতে হবে তখন একবার, নিজে এসে বলে যাব। মীনাক্ষীকে দেখবেন—নিজের মেয়ে নিয়ে মিথ্যে দেমাক করছি কিনা, তখন বিবেচনা করবেন।

চন্দ্রভানু সকৌতুকে বললেন, সুরূপা বুঝি? ভালোই। সেটা কিন্তু কিছুই নয়। আমার স্ত্রীর চোখই একটা নেই, শুনেছেন বোধহয়। কুমারী অবস্থায় বাঘে থাবা দিয়েছিল। তার জন্যে রায়বাড়ি বিয়ের বাধা ঘটেনি। আমার নিজের মায়ের সম্বন্ধে বলা ঠিক হবে না কিন্তু এ বাড়ির বউ পদ্মিনী-নুরজাহান কেউ নয়। আমরা রূপ দেখি না, ঘর দেখি।

লালমোহনেরও জেদ চেপেছে। বললেন, কুলীন-ঘর আমরা, মুখ্য কুলীন না হলেও মধ্যাংশ। ঠিকানা দিচ্ছি, দেশেঘরে লোক পাঠিয়ে সন্ধান নিন। সে দিক দিয়েও হারব না।

হেরেই তো রয়েছেন মশায়, লোক পাঠানোর দরকার হবে না। কিন্তু থাক এখন। আজকে আপনি নিমন্ত্রিত অতিথি। অন্য কোন সময় হবে।

লালমোহন বলেন, আবার কবে দেখা হয় না হয়—কথা যখন উঠেছে, খোলাখুলি হয়ে যাওয়া ভালো। আপনি বলুন।

নাছোড়বান্দা লালমোহন, শেষ না শুনে নড়বেন না। চন্দ্রভানু বললেন, বহুজন নিয়ে আমাদের বিরাট সংসার। ছেলের বউ এসে একদিন সংসারের দায়িত্ব নেবে, কর্ত্রী হবে। ধ্রুবর মায়ের যা অবস্থা, সে দিনের খুব যে দেরি, মনে হয় না। যারা সব আছে, আশ্রিত প্রতিপাল্য কেউ নয়, সংসারেরই অংশ। আপনার মেয়ের মনমেজাজ এমন সংসারে খাপ খাবে বলে মনে করতে পারছিনে।

লালমোহন আহত কণ্ঠে বলেন, মেয়েকে তো জানেন না আপনি। দেশেঘরে দূরের জায়গায় রয়েছে, চোখের দেখাটাও দেখেন নি এখন অবধি।

আপনাকেই দেখতে পাচ্ছি। খুব ভাল করেই দেখছি এই ক'বছর, খবর সমস্ত জানি। টাকা অনেক আপনার—কুচোচিংড়ি বিক্রির টাকা। দরদাম ঠিক করে তাই থেকেও আবার ঝুড়ি পিছু এক পয়সা দু-পয়সা করে কাটা হয় খাতার বৃত্তি বলে। এমনি পয়সা জমিয়ে জমিয়ে টাকা।

হেসে উঠে চন্দ্রভানু বলেন, ওরাও ত্যাঁদোড় তেমনি—জেলে হয়ে বেচে দিয়ে এলো, ডাকাত হয়ে লোকসান যন্দুর পারে উশুল করল। ঝালিঝুলি মেখে খাটিতে হুঙ্কার দিয়ে এসে পড়ে,—তাদের বাইরের লোক ভাববেন না, দরদাম নিয়ে খানিক আগেই হয়তো বা কাঁদাকাটা করে গেছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করছি, কুচোচিংড়ি নিয়ে বেশ তো চলছিল, আবার হাঙর ধরার ঝোঁক কি জন্যে?

অপমানে মুখ রাঙা লালমোহনের। সুস্পষ্ট প্রত্যাখ্যান। তা হলেও ঝানু ব্যবসাদার—রাগের মধ্যেও হিসাবজ্ঞান হারান না। কর্মসিদ্ধি না-ও যদি হয়, চটিয়ে উল্টো উৎপত্তি ঘটাতে আসেননি। সামলে নিতে কিছু সময় গেল। হাসিমুখে তারপর বলেন, তা সত্যি, এক পয়সার দু-পয়সার মানুষই আমি। কিন্তু আমার তো কিছু নয়, আরজি আমার মেয়ের বিয়ে নিয়ে—

তাই তো বললাম, ঘর দেখে আমরা মেয়ে আনি। মেয়ের গাইগোত্র দেখতে যাইনে। খেয়ানৌকোর ইজারা নিয়ে প্রথম আপনি পয়সা করেন—দেশেঘরে ছিলেন যখন। আধপয়সা একপয়সা করে খেয়ার মাশুল আদায় হয়, সেই পয়সা। সেটা গর্ব আপনার, গলা ফাটিয়ে জাহির করেন। আমাদের সৃষ্টিছাড়া সংসারের এলোপাথাড়ি খরচা, খরচ করতেও ক্ষমতা লাগে—আপনার হিসাবি ঘরের মেয়ে দেখেশুনে তো পাগল হয়ে যাবে।

ঘরদালানে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল। সারা দিনের অবসন্ন চন্দ্রভানু উপরের সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালেন। অর্থাৎ কথাবার্তা আর চালাতে চান না, বিশ্রাম এইবারে।

নৌকোয় এসে লালমোহন বোমার মতো ফেটে পড়লেন : কথা শুনলে ভক্তদাস! খাতার বৃত্তি আদায় হয়, সেটুকু অবধি জেনেছে। কিন্তু আমি যদি হই একপয়সা আধপয়সার চোর, ওরা যে শ-হাজারের নৌকো-মারা ডাকাত। আজকে চকদার হয়েছেন। দু-দিনের ভন্দোর হয়ে ভাতকে বলেন অন্ন।

ভক্তদাস বলে, এত শোনার পরেও হেসে হেসে কথা বলে এলেন বড়বাবু, ঐটে বড় বুদ্ধির কাজ হয়েছে। জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে ঝগড়া চলে না। বেলডাঙার রায়েরা সত্যি সত্যি একদিন জলের উপরের কুমির ছিল। কুমির কি—কুমির দেখে তো ডাঙায় উঠে পালানো যায়। কুমির-বাঘ দুটো একাধারে—জলে ডাঙায় কোথাও রক্ষে নেই। জমাজমি নিয়ে থেকে এখন নরম হয়েছে—কিন্তু রাগলে বিশ্বাস নেই, পুরোনো রক্ত টগবগিয়ে উঠতে পারে।

গুম হয়ে শুনছিলেন লালমোহন। নিশ্বাস ফেলে বললেন, দেমাক ছিল ভক্তদাস, কোন কাজে আমি হারিনে।

হেরে গেছেন, তাই বা এর মধ্যে ধরলেন কিসে? লক্ষ কথার কমে বিয়ে হয় না, সেই লাখ আগে পুরিয়ে ফেলুন। তার আগে হার-জিতের ব্যাপার নেই। মন খারাপ করে চুপচাপ থাকলে লাখ কেমন করে পুরবে? সারা বিকাল বকবক করে আমি খানিক এগিয়ে দিয়ে এসেছি। খাস-চাকরানি ক্ষীরোদা আমাদের গাঁয়ের। তাকে শুনিয়ে এলাম, কাজেকর্মে মেয়ে খুব দড়, খাটনির দিক দিয়ে শাশুড়ির কান কাটবে নতুন-বউ। কথাটা চলে যাক গিন্নির কানে। আর কন্যাপণের একটা ভারীরকম আন্দাজ দিয়ে এলাম নকড়ি-গোমস্তার কাছে—ছোটরায় অবধি পৌঁছে যাক। কারবারের গরজ, তার উপর আপনার পছন্দ—ঐ বর নিলাম ডেকে কিনব

বড়বাবু। কথাবার্তা যেখানে এগোক, সকড়ি আমায় খবর পাঠাবে বলেছে।

দশমীতে মণ্ডপের প্রতিমা নিয়ে বিসর্জনের জন্য বেরিয়ে গেল। একলা ঘরে শুয়ে পড়ে থেকে ইন্দুমতীর কান আরও তীক্ষ্ণ হয়েছে। কানে এলো গোবিন্দ-সুন্দরীর গলা। মৃদু কণ্ঠে কার সঙ্গে যেন বলছেন, ছোটবউ উঠতে পারে না, কাজ কিছু আটকে থাকল তাতে? কলের মতো সব হয়ে গেল, টু-শব্দটি নেই। কেবল তো চেঁচামেচি আর ঝগড়াঝাটি—লোকে তাতে দিশা করতে পারে না। কাজের গণ্ডগোল হয়। দেখ, অন্য বারের চেয়ে ভালো ভাবে হল কিনা!

আগেকার দিন হলে গোবিন্দসুন্দরীর ডাক পড়ত সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু কথাগুলো এমন নিদারুণ সত্য, ধমক দিতে আজ লজ্জা করছে।

উৎসবের পর স্তব্ধতা। সন্ধ্যার পর থেকেই সদরবাড়ি, অন্দরবাড়ি শ্মশানের মতো থমথম করছে। জানলা দিয়ে চাঁদ দেখা যায়। জ্যোৎস্না এসে পড়েছে ইন্দুমতীর বিছানায়।

পায়ের শব্দ পাওয়া গেল, অতি মৃদু। মানুষ দেখতে হয় না, শব্দেই বোঝা যায়। ইন্দুমতী তবু প্রশ্ন করেন, কে?

কাতর হয়ে বলছেন, ঘরের মধ্যে এসো একবার তুমি। আমার কাছে। উঠতে পারছি নে বলে কি প্রণামটাও নেবে না?

ঘরে ঢুকে চন্দ্রভানু স্ত্রীর পাশে দাঁড়ালেন। বলেন, প্রণাম নিলাম না কেমন করে? সকালেও তো এক দফা হয়ে গেছে। যখন ঢুকে পড়ে থাকি, পায়ের ছাপ আমার হয়ে প্রণাম নিয়ে নেয়।

সে আমার নিত্যদিনের বরাদ্দ। বিজয়ার দিনে এখনকার এ জিনিস আলাদা। ওঠো তুমি, খাটের উপর উঠে দাঁড়াও। আমার মাথার কাছে।

হাত বাড়িয়ে ইন্দুমতী জায়গাটা দেখাতে গেলেন। কী যেন হয়ে গেল হঠাৎ। হাত উঠল না। মাথা ঘোরাবার চেষ্টা করলেন, তা-ও হল না।

"কুচো চিংড়ি নিয়ে খেলতো চলছিল, আবার হাঙর ধরার ঝোঁক কি জন্যে?"

হাউ-হাউ করে কেঁদে পড়লেন: আমি যে পাথর হয়ে জমে গেলাম অহল্যার মতো। অহল্যার পাপ ছিল, আমার তো কোন পাপ নেই। তবে কেন এতবড় শাস্তি? আরও এগিয়ে এসো তুমি। ঠিক আমার শিয়রে। দেখ, আজকে তবু কেঁদে বলতে পারছি—ক'দিন পরে কথাই হয়তো বন্ধ হবে। তখন কিছু বলতে যাবো না। শিয়রে দাঁড়িয়ে পা তুলে দাও আমার কপালের উপর। হাত বাড়াতে পারছিনে বলে পদধূলি পাবো না আজকের দিনে?

সত্যি সত্যি তাই করতে হল চন্দ্রভানুকে। স্ত্রীর কপালের উপর এক পা তুলে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। সেই পা ইন্দুমতী সরিয়ে নিতে দেবেন না: থাকুক, আর একটুখানি রাখো।

কী যেন মধুর তৃপ্তি উপভোগ করছেন। যতক্ষণ সেটা বাড়িয়ে নেওয়া যায়। তারপর এক সময় চন্দ্রভানু পাশে বসে পড়লেন।

ইন্দুমতী গাঢ়স্বরে বলেন, সত্যি, কী মন্তোর জানো তুমি বলো।

কেন?

কাজের মধ্যে একটিবার তোমার গলা পেলাম না। অথচ একটুকু গণ্ডগোল নেই, আপনাআপনি সমস্ত মিটে গেল।

চন্দ্রভানু বলেন, যারা বরাবর করে থাকে তারাই সব করেছে। তুমি উঠতে না পারলেও তোমার নিয়মে কাজ হয়েছে। বাহাদুরি যদি কিছু থাকে, সে তোমার।

ইন্দুমতী বলেন, নিশ্চয় তুমি মন্তোর জানো। নইলে হতে পারে না। আগে জানলে মন্তোরটা শিখে নিতাম। তা হলে চেঁচামেচি ঝগড়াঝাটি করে বাড়িসুদ্ধ বিষনজরে পড়তাম না। এখন আর উপায় নেই। কোন দিন আর উঠতে পারব না, মন্তোর শিখে নিয়ে খাটাব কোথায়?

চন্দ্রভানু সান্ত্বনা দেন: কেন উঠবে না, কী হয়েছে তোমার? কবিরাজমশায় তো বলছেন—

এক মাস। মাসের উপর একটা দিনও বেশি নয়। মাস পাঁচ-ছয় ধরে এই এক মাসের কথা বলেন, তার আগে বলতেন হপ্তা। আর মনে মনে যা বলেন—আগে বুঝতাম না, এখন সেটা ধরে ফেলেছি। কিন্তু যা বলছি—আর আমি তোমায় কাছ-ছাড়া হতে দেবো না। তোমার ঐ মন্তোর নিয়ে আমার পাশে থাকবে। সাজানো সংসার নইলে ছারখার হয়ে যাবে।

আর সেদিকটা—আমাদের সাগরচকের কি হবে তাহলে?

উৎসবের হট্টগোলে চন্দ্রভানু এই ক'দিন সাগরচরের কথা একেবারে ভুলে ছিলেন। হঠাৎ যেন সমুদ্রের কলরোল কানে বেজে ওঠে। ঢেউয়ের পর ঢেউ আছড়ে পড়ছে—চতুর্দিক থেকে। জয়াল নিয়ে বড় বড় মাটির চাঁই জলে খসে পড়ছে। সৈকতবর্তী নিঃসঙ্গ নিঃসহায় চর এই রাত্রিবেলা আর্তনাদ করছে বুঝি চন্দ্রভানুর উদ্দেশে। ভয়ে কাঁপছে।

আর ইন্দুমতী পঙ্গু হয়ে ঠিক পাশটিতে শুয়ে। স্বামীকে ছেড়ে দেবেন না, তাঁরও বড় ভয়। একদিন ইন্দুমতীর নাম রটেছিল সিংহিনী-বউ। বিয়ের সময় তেরো বছরের মেয়ে তিনি। একটা চোখ নেই বলে পাত্র জোটাতে কিছু দেরি হয়েছিল। সিংহিনীর তুলনাটা প্রথম সেই সময়কার। নতুন বউয়ের মেজাজ অসম্ভব রকমের চড়া, ছুঁয়ে কথা বলবার জো নেই—মাথা ঝাঁকিয়ে ফুঁসে উঠবে। কথায় কথায় মাথা ঝাঁকানো ইন্দুমতীর অভ্যাস ছিল সেই বয়সে। মুখখানা ঘিরে থোপা থোপা চুল—ঝাঁকুনিতে চুল দুলে উঠত, সিংহের কেশরের কথা মনে এসে যেত তখন। সতের বছরের কিশোর চন্দ্রভানু নতুন বউয়ের চালচলন দেখে এয়ার বন্ধু কারো কাছে বলেছিলেন, বউ কে বলবে? ঘোমটা দিয়ে সিংহ এসেছে রায়বাড়ি। কথাটা সেই চাউর হয়ে গেল। সেবারে যখন গোবিন্দ-সুন্দরীর তোরঙ্গের মধ্যে রূপোর বাটি আবিষ্কার করে ইন্দুমতী যৎপরোনাস্তি নিগ্রহ করলেন—চন্দ্রভানু তখন বাড়িতে, তাঁরই চোখের উপর। কতই দুরের

হোক, সম্পর্কে পিশিমা। তবু চন্দ্রভানু মুখ দিয়ে রা কাড়লেন না। এই নিয়ে গোবিন্দসুন্দরী কি বলেছিলেন কোথায়, ঠিক কানে পৌঁছে গেছে। চন্দ্রভানু ডাকলেন : শোন পিশিমা, বলে বেড়াচ্ছ আমি নাকি স্ত্রৈণ?

ওমা, এত বড় মিথ্যে কে লাগিয়েছে? গোবিন্দসুন্দরী আকাশ থেকে পড়লেন: সে লোকের যেন কুড়িকুষ্ঠ হয়। মুখে যেন পোকা পড়ে।

সহাস্যে চন্দ্রভানু বলেন, কি বলেছ তবে? তোমার নিজের মুখেই শুনি।

ভাগ্যবতী ছোটবউ, সেই কথা বলে বেড়াই। সেকালের বউরা কেঁদেই জনম কাটাত। গলায় দড়ি দিয়েছে, বিষ খেয়েছে। শতেক পরমায়ু হোক আমাদের ছোট-বউর, সুখে-স্বচ্ছন্দে সংসার করুক।

সরে পড়ছিলেন এমনি সব বলে। চন্দ্রভানু বললেন, সেকালের বউরা ছিল পল্লবিনী লতা। নাড়া দিলে নীহারবিন্দু ঝরে ঝরে পড়ত। সিংহনী এসেছে এই ছোট-বউয়ের রূপ ধরে। এখানে মাথা গলাতে যাবো, এত তাগত নেই আমার। সে তোমরা যাই বলো।

ঠিক তাই। সিংহিনীর দাপট নিয়ে এত কাল সংসার করে এসেছেন। আজকে এই দশা। ক্ষণে ক্ষণে চোখের জল। স্বামীকে ডাকিয়ে এনে পাশে বসান : যেতে পারবে না কোনখানে। কোনদিনও না। আমার শাশুড়ির এই সংসার। মরবার আগে চাবির গোছা আমার আঁচলে বেঁধে দিয়ে গেলেন। স্বর্গ থেকে দেখছেন, আমি অবহেলা করি নি। জীবনে সংসার বই জানিনে। আর তুমি ছটফট করছ সংসার উচ্ছন্নে দিয়ে পালানোর জন্য।

বড় বড় চোখ দুটো বিঘূর্ণিত করে গর্জন করে ওঠেন সহসা : জিজ্ঞাসা করি, সংসারের কোন দায়িত্ব কি তোমার নেই? এ জিনিস শুধু কি একলা আমার?

জবাবের কথা পেয়ে গেছেন চন্দ্রভানু : সংসারের গরজেই তো চকে পড়ে থাকি। আমার বাবাও মরণ পর্যন্ত সেখানে থেকে গেছেন। সংসারের হাল ধরে মা যেমন ছিলেন, তাঁর অন্তে তুমিও তেমনি রয়েছ। আমরা পড়ে থাকি তেপান্তরে। ঘরে বাইরে দু-দিক সামলানো যাচ্ছে, সংসার তাই কলের মতো চলে। চকে যদি না যাই, ভরা সাজিয়ে কে তোমার ভাণ্ডার ভরে দেবে ছোটবউ?

বলছেন, রাত থাকতে উঠে ভাঁড়ারের চাবি খুলে তোমার কাজকর্ম শুরু হয়ে যায়, চলে রাতদুপুর অবধি। সেখানেও তাই, কাজের অন্ত নেই। বাঁধের পর বাঁধ দিয়ে নোনা জল ঠেকানো, খরার সময় জমির উপর হিসাব করে সার সাজিয়ে যাওয়া, কাঁকর বেছে ফেলে চাষ দিয়ে মাটি তৈরি করে রাখা—নতুন বর্ষায় মাখনের মতো যাতে গলে যায়। কত আর বলি ছোটবউ। বিস্তর তোয়াজ করতে হয়, তবে খুশি হয়ে সাগরচক তোমার সংসারের রসদ জোগায়। তোয়াজ শুধু মাটির নয়—মানুষ যারা সেই মাটি নিয়ে পড়ে আছে, তাদেরও। এই চলল। অষ্টপ্রহর কথা-কাটাকাটি। কলহ রীতিমতো। অবশেষে হাউহাউ করে কান্না। ইন্দুমতী যেতে দেবেন না চন্দ্রভানুকে। সর্বক্ষণ আঁকড়ে রয়েছেন।

চিঠি এলো বৃন্দাবনের কাছ থেকে। চন্দ্রভানু যখন চকে না থাকেন, বৃন্দাবনই সর্বময়। হাতের লেখাটা নীহারনলিনীর—নীহারকে দিয়ে লিখিয়েছে। পোস্টাপিস যেতে একটা পুরো ভাঁটির পরেও অর্ধেক ভাঁটি লাগে, পুরোপুরি দিন লেগে যায়। এত হাঙ্গামা করে চিঠি পাঠিয়েছে, না জানি কোন খবর।

পাঁচ পাঁচটা জায়গায় বাঁধ ভেঙেছে। ক্ষেতের পাকাধান নোনা জলে বিস্তর পচে গেছে। অঘ্রাণমাসে এখনই এই—চৈত্র-বৈশাখে সাঁড়াসাড়ির বান আসবে, তখনকার অবস্থা কি দাঁড়াবে? গাঙ যেন খেলাচ্ছে—বেলদার যে দিকটা, সেখানে কিছু নয়—ভিন্ন এক খানে পথ করে নিয়ে উদ্দাম বেগে জল ঢুকে পড়ে। খবর পেয়ে হৈ-হৈ করে সব পড়ল—বাঁধ তার আগেই নিশ্চিহ্ন। জলরাশি খলখল করে বিদ্রুপের হাসি হাসছে। গাঙ বুঝি টের পেয়ে গেছে, আসল মানুষ ছোটরায় নেই এখন, যা খুশি তাই করা যেতে পারে।

এমনি সব কথা চিঠিতে, নীহারনলিনীর বাঁধুনি। সত্যি তাই। সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে, জলের চলাচল সম্পর্কে তেমনি বলা যায় চন্দ্রভানু সম্পর্কে। বাইরের উজ্জ্বল প্রশান্ত নিস্তরঙ্গ নদী দেখে কে বুঝবে শয়তানি মতলব তলে তলে—রূপ দেখিয়ে ভুলিয়ে রেখে নিঃসাড়ে জলতলে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে যাচ্ছে। বৃন্দাবন সর্বদা চন্দ্রভানুর সঙ্গে ঘোরে, তবু সে বোঝে না। এক তৃতীয় নেত্র আছে বুঝি চন্দ্রভানুর, জলের কারসাজি ধরে ফেলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি ব্যবস্থা করেন।

নকড়ি-গোমস্তাকে ডেকে চন্দ্রভানু বললেন, বোটের হালটা ঠিক নেই, তাড়াতাড়ি মেরামত করিয়ে দাও। দু-একদিনের মধ্যে।

যাবেন?

চিঠি তো দেখলে। কথাটা চাউর কোরো না তুমি। তোমার বউঠাকরুন টের না পান।

নকড়ি বলে, আপনিও চললেন—সদর-বাড়ি অন্দরবাড়ি ওরা তো সব লাঠালাঠি হাঙ্গামা বাধাবে নিজেদের মধ্যে। বুড়ো মানুষ আমি সে ঝঞ্ঝাট পোহাতে পারব না। যে মানুষ পারতেন, তাঁর আজ উত্থানশক্তি নেই।

চন্দ্রভানু হাসলেন একটুখানি। নকড়ি আজকের মানুষ নয়, বুড়োকর্তা রুদ্রভানুর আমলের। নিজের কেউ নেই, রায়েরাই সব। হাসির অর্থ বুঝতে বাকি থাকে না—প্রস্তাবটা কানে শোনারই যোগ্য নয়। নকড়ি বলে, অবস্থাবিশেষে ব্যবস্থা, এদ্দিন তো এসব কথা ওঠেনি। রায়বাড়ি থেকে সরিয়ে বৃত্তির ব্যবস্থা বরঞ্চ করে দিন।

জিভ কেটে চন্দ্রভানু বলেন, অমন কথা মুখেও এনো না নকড়ি। মনে করে যাও, ওঁরা উত্তমর্ণ। এক সময় ধেরে খেয়েছিলাম, এখন তার শোধ হচ্ছে। দয়ার দান নয়, উচিত প্রাপ্য নিয়ে নিচ্ছেন। এই ভাবটা মনে এনো, ঝঞ্ঝাট পোহাতে বিরক্তি লাগবে না। আমার মা
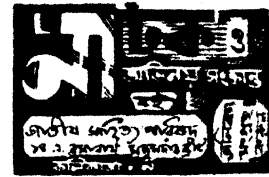
তাই ভাবতেন, ছোটবউও বরাবর তেমনি ভেবে এসেছে।

একটুখানি থেমে জোর দিয়ে আবার বলেন, সত্যি সত্যি তাই। চিরকালের বৃত্তি বদল করে রুদ্রভানু চক বন্দোবস্ত নিলেন। চকদার হলেন, বাবুলোক হলেন, ছেলেদের পড়াশুনোয় দিলেন। কিন্তু তার আগে দরিয়ার জলে চরে বেড়ানোর দিনে যাঁরা সব ছিলেন, তাঁদের দরিয়ায় ডুবানো যায় না। এতবড় বাড়ি এত ঠাট-বাট তাঁদেরই জন্যে। নিজের দুই ছেলে আর ও'রা ওঁদের বউ-ছেলে নিয়ে মা আমার সংসার সাজালেন। তুমি যে জানো না কিছু, তা নয়—জেনেশুনে কেন অবুঝ হও নকড়ি?

নকড়ি বেকুব হয়ে গেছে। আমতা-আমতা করে বলে, রয়েছেন ও'রা সেজন্যে বলছিনে। মানুষে দু-মুঠো খাবে মাথা গুঁজে থাকবে, কে তাতে বাদি হতে যাবে? ক্ষণে-ক্ষণে ধুন্দুমার বেধে যায়, সেইজন্যে ভয় করি। খেয়ে তো কাজ চাই একটা, নইলে পেটের ভাত হজম হয় কি করে?

ঠিক ধরেছ। চন্দ্রভানু লুফে নিলেন কথাটা : বিনি কাজে রাখাটাই ভুল হচ্ছে, গোলমালের মূল সেখানে। কাজ দিতে হবে। জমা-খরচ লিখতে বলব না, কিম্বা নৌকোয় দাঁড় বাইতেও বলব না। তা হলে অপমান বোধ করবেন—খাওয়ার দাম নেওয়া হচ্ছে, এই রকমটা গিয়ে দাঁড়াবে। ভিন্ন রকমের কাজ—

নকড়ি-গোমস্তা তটস্থ হয়ে কাজের নির্দেশ শোনবার অপেক্ষায় আছে।

গান-বাজনার ব্যবস্থা করে দাও। শখের যাত্রার দল গড়ে বৈঠকখানায় মহলা দিন। তাস-দাবা-পাশার দরাজ ব্যবস্থা হোক। বড়-দীঘিতে আর গাঙে-খালে সব ছিপ নিয়ে বসুন। উপস্থিত এই সব মনে আসছে। তুমিও ভাবো না গোমস্তামশায়, ভেবে ভেবে এমনি অনেক বেরুবে। মেয়েদের কি হবে, ছোটবউয়ের সঙ্গে পরামর্শ কোরো। মেয়েদের কথা পুরুষ আমাদের বলা ঠিক হবে না।

জানতে কি ইন্দুমতীর বাকি থাকে? কত চর কত দিকে, ঠিক ঠিক খবর পৌঁছে দিয়ে যায়। চন্দ্রভানুকে এর পর তিনি একেবারে চোখের আড়াল হতে দেবেন না। একটু বাইরে গেলেই ডাক-পাড়াপাড়ি। সন্দেহ করেছেন। পালঙ্কের প্রান্ত দেখিয়ে বলেন, বোসো—বসে থাক এখানে—

কাতর হয়ে ইন্দুমতী বলে ওঠেন, বোটের ছাত মেরামতের ধুম পড়ল—পালাবে আমায় ফেলে? সংসার নয়, নিজের কথাই বলি আজ। সাগরচকে বারো মাস পড়ে থাক তুমি—যখন এসো, কুটুম্বের মতো ক'টা দিন থেকে চলে যাও। কোন দিন বলতে গিয়েছি কিছু? রায়বাড়ির বউয়ের আছে স্বামীসুখ নয়, সংসারের খাটনির সুখ। সেই সুখটাই চলে গেল, কী নিয়ে থাকি আমি বলো।

জল ভরে আসে চোখে। এক বিছানায় পড়ে থেকে থেকে সিংহিনী-বউর কী হয়েছে—কথায় কথায় চোখে জল। বলেন, সাধের সংসার পিছলে বেরিয়ে গেছে আমার হাত থেকে। তুমি আছ কী নিয়ে, গেলে একটা মানুষও আর ঢুকবে না আমার ঘরে। একটা কথা বলি আজ তোমায়। নিজের জন্য কোনদিন কিছু তো চাই নি—সারা জীবনের মধ্যে আজকে একটা প্রার্থনা—

চন্দ্রভানু অভিভূত হয়ে শুনছিলেন। বললেন, বলো—

চলে যাবার আগে তোমার বন্দুকের গুলিতে আমায় শেষ করে যাবে। বেঁচে থেকে চোখ মেলে নিজের হেনস্থা দেখতে পারব না।

রায়বাড়ির চিরকেলে দুর্ধর্ষ সিংহিনী ভেঙে পড়লেন একেবারে।

আর এদিকে চিঠির পর চিঠির বন্যা বয়ে চলেছে। বৃন্দাবনের সেই চিঠি এসেছিল। চকে থেকেও ডাকের চিঠির আনাগোনা চলে তেমন সম্ভাবনা মনে ওঠেনি কারো কখনো। কারণও ঘটেনি। ভুল করেছেন চন্দ্রভানু বৃন্দাবনের চিঠির জবাব পাঠিয়ে। চিঠি দিয়েও কথাবার্তা চালানো যায়, তারা বুঝতে পেরেছে। খেয়ার ইজারাদার লিখেছে : সাগরচকের বাসিন্দাদের দেখাদেখি সবাই এখন মাংনা পারাপার হতে চায়; চন্দ্রভানু চৈত্রমাসে হিসাব করে বছরখোরাকি ধান দিয়ে দেন, তারা কি দেবে? বললে মারতে আসে।

আমিনের চিঠি : চকের মাঝ বরাবর নতুন রাস্তা হবে—চেন নিয়ে সেই জমির মাপজোপ করতে গিয়েছিল, চেন ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে; রাস্তার বাবদে জমি কেউ দেবে না।

মাইনর ইস্কুলের হেডমাস্টার লিখেছেন : ইস্কুল চলছে বটে, কিন্তু ছাত্র নেই। চন্দ্রভানু যতদিন না ফিরছেন, ছাত্র-লাভের কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

সমস্ত চিঠির এক হস্তাক্ষর। ছোটরায়ের কাছে চিঠি কি ভাবে যাওয়া উচিত—বোধকরি কেউ নিজের উপর ভরসা করতে পারে না, নীহারকে দিয়ে লেখায়।

সর্বশেষ ডাক্তার দীন নন্দনের চিঠি। বুড়োমানুষ দীন ডাক্তারের হাত কাঁপে, তাঁর চিঠি নীহারনলিনীকে তো লিখতেই হবে। লিখেছেন : আলমারির কবজায় মরচে ধরে গেল, অষুধ নিতে কেউ আসে না, আলমারি খোলার আবশ্যক হয় না। চন্দ্রভানু না ফিরলে হবেও না আর। মরচে ধরেছে বোধহয় ডাক্তারের হাঁটুতেও—চার মাসের মধ্যে বাসাবাড়ির উঠোন পার হয়ে বেরুনোর আবশ্যক ঘটেনি—।

কেবল নীহারনলিনীর নিজের নামে কোন চিঠি নেই।

বাপ রুদ্রভানু গত হবার পর বছরের মধ্যে এগারো মাস চন্দ্রভানুর সাগরচকে কেটে যায়। বিষয়কর্মের দায়ে পড়ে থাকা—গোড়ায় শুধু মাত্র তাই ছিল। তারপরে ভালবেসে ফেলেছেন। ভালবাসেন সাগরচক জায়গাটাকে, এবং জায়গার বাসিন্দা মানুষগুলোকে। দুর্ধর্ষ ছিল তারা এক কালে—এই বেলডাঙার বাড়ি যারা উঠেছিল তাদেরই দোসর। গাঙে-খালে নৌকো মেরে বেড়াত। পেশাই তাই। এমন হয়ে উঠল, মহাজনের নৌকা ভুলেও ঐ তল্লাটের ছায়া মাড়াত না। মালপত্র যেখানে এক হপ্তায় যাবার কথা, এ-গাঙ সে-গাঙ ঘুরে ঘুরে এক মাসে দু-মাসে পৌঁছত। সরকারও তখন উঠেপড়ে লাগল জেলে-ডাকাত ধরবার জন্য। জল-জঙ্গলের মধ্যে দু-পক্ষে কতকটা যেন গেরিলা-লড়াই। তাদের হাতে দেশি-কামারের গড়া গাদা-বন্দুক—কামারশালে বানানো ছোরা। সরকারের টোটার বন্দুক হলে হবে কি—জঙ্গলের মধ্যে নদী-খাল জাল বুনে আছে, সকল অন্ধি-সন্ধি নখদর্পণে তাদের। আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ে নৌকো ঘায়েল করে কোন একখানে লুকিয়ে পড়ে। জল-পুলিশ তার পরে এসে চতুর্দিক তোলপাড় করেও খোঁজখবর পায় না।

অঞ্চলের ব্যাপার-বাণিজ্য বন্ধ হবার উপক্রম—তারও বড়, সরকারের মান-ইজ্জতে ঘা পড়েছে। মরীয়া হয়ে লাগল পুলিশ। বাঁকে বাঁকে পুলিশের ঘাঁটি, স্টীমলঞ্চ আর সাদাবোট অহোরাত্র চক্কোর দিয়ে ফিরছে। উৎপাত বন্ধ এক রকম। তা হলেও একটা অঞ্চল নিয়ে পুলিশ চিরকাল কিন্তু এভাবে পড়ে থাকতে পারে না—নৌকো-মারারা ওত পেতে আছে, সরে গেলে নির্ঘাৎ সেই আগের অবস্থা হবে। সরকারি তরফের লোকে সেটা জানে।

এমনি সময় জেলার সাহেব-ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে চন্দ্রভানুর বাপ রুদ্রভানু গিয়ে দেখা করলেন। রুদ্রভানু লেখাপড়া তেমন না জানলেও কদর বুঝতেন, চেষ্টা-চরিত্র করে পঞ্চাশ-ষাটটা ইংরেজি কথা মুখস্থ করে নিয়েছিলেন—কথার পৃষ্ঠে কথা জুড়ে সাহেব-সুবোর কাছে যা-হোক করে মনোভাব বোঝাতে পারতেন। রায়েদের নাম সাহেবের কানে গিয়েছিল, খাতির করে রুদ্রভানুকে বসালেন তিনি।

রুদ্রভানু বললেন, ডাকাত-দমনে আমি তোমাদের সাহায্য করব সাহেব। সেইজন্যে এসেছি। উপযাচক হয়ে এলাম তোমার কাছে।

সাহেবের বিস্ময়ের অবধি নেই। নৌকো-মারাদের নেতা এরাই। রুদ্রভানুর বাপ ইন্দ্রভানু নৌকোয় নিজে উপস্থিত থেকে দল চালনা করতেন। এখন অবশ্য নিজেরা যান না, তা হলেও শোনা যায় ওস্তাদ-ভাগ একটা থাকে তাঁদের নামে। বেলডাঙার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসে। তাদেরই ছোটকর্তা প্রস্তাব নিয়ে নিজে হাজির হয়েছেন—

বলছেন, নৌকো-মারা চিরদিনের মতো বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু ভিন্ন পথে। টোটার বন্দুকে ধরুন দশ-বিশজন ঘায়েল করলেন—তার দুনো-তেদুনো এসে পড়বে। এভাবে কোনদিন শেষ হবে না। একেবারে গোড়া ধরে টান দিন।

সেই গোড়ার কথা ফলাও করে বলছেন রুদ্রভানু : মানুষ আসলে কেউ খারাপ নয় সাহেব। অসৎবৃত্তি কেউ শখ করে নেয় না। ভরণপোষণের দায়ে নিতে হয়, তার জন্য মরমে মরে থাকে। সকলে ভোগ-সুখে বহাল-তবিয়তে আছে—তার মধ্যে কয়েকটা মানুষ কেবল নিরন্ন, শক্তি-সামর্থ্য আছে খাটবার জায়গা পায় না। ধর্মকথা শুনিয়ে কি শাসনের ভয় দেখিয়ে তাদের ঠাণ্ডা রাখা যাবে না। বন্দুক না তুলে জমি-জিরেত দাও তাদের, গৃহস্থ বানাও। বোম্বেটে মানুষ মাটির মায়ায় পড়ে যাবে। তখন দেখবে ঘর-বাড়ি পরিবার-পরিজন ছেড়ে নড়তে চাইবে না সেই মানুষ।

এই সমস্ত বোঝালেন তিনি সাহেবকে। প্রস্তাবও আছে। লাট বন্দোবস্ত দিতে হবে

নামমাত্র মূল্যে, সুবিধাজনক শর্তে। এখন বাদার জঙ্গল, অসংখ্য খাল-দোখালা, গাছের নিচে ছায়াচ্ছন্ন ভূমিতে নোনাজলের তফরা খেলে বেড়ায় দিবারাত্রি। জঙ্গল কেটে বাঁধ-বন্দি করে সোনা ফলাবেন সেখানে—তিনি এবং দুর্জন-নৌকো-মারারা মিলে। দলের মধ্যে যারা বুড়োহাবড়া দুর্বল-অশক্ত তারা চলে যাবে বেলডাঙার রায়বাড়ি, তাদের অংশ সেইখানে থেকে নির্ঝঞ্ঝাটে ভোগ করবে।

প্রস্তাব পেয়ে সাহেব লাফিয়ে উঠলেন। এক কথায় রাজি। দলবল নিয়ে রুদ্রভানু উঠে-পড়ে লাগলেন। বেলডাঙার সঙ্গে সম্পর্ক বড় আর নেই। চকেই পড়ে আছেন বারো মাস তিরিশ দিন। সাগরের অনতিদূরে বড় দুই নদীর মোহনার উপর—লোকের মুখে মুখে সাগরচক নাম দাঁড়িয়ে গেল। রুদ্রভানু যা বলেছিলেন ঠিক তাই—চারিদিক প্রায় শান্ত কয়েকটা বছরের মধ্যে। মহাজনি নৌকোর চলাচল শুরু হল আবার। তবে বহর সাজিয়ে যায়—পুরোনো বদনামটা রয়েছে, একা-দোকা নৌকো ভাসাতে আজও গা-ছম-ছম করে। নৌকো মারার ব্যাপার একেবারে যে না ঘটে, এমন নয়। নিতান্তই কালে ভদ্রে।

চর নয়, এক রাজ্যপাট। টিলায় টিলায় গ্রাম। নৌকো-মারা যাদের একদা একমাত্র পেশা ছিল, পুরোপুরি গৃহস্থমানুষ তারা। জমির চাষ করে, ফসল তোলে। গরু-বাছুরের কল্যাণে উঠানে মানিকপীরের গান দেয়। সাঁজের বেলা শাঁখ বাজিয়ে মেয়ে-বউরা ঘরে ঘরে লক্ষ্মীপুজো করে। ক'টা বছরের মধ্যে এত সমস্ত। লোভে বেড়ে গিয়েছে, রুদ্রভানু এক গুরুমশায় জোগাড় করে পাঠশালা বসিয়ে দিলেন। ছোঁড়াগুলো নেহাৎপক্ষে সাদামাটা যোগ-বিয়োগ আর কাঠাকালি বিঘেকালি শিখে নিক।

অন্য সমস্ত বেশ ভালো, এই পাঠশালা করেই বিপদ ঘটল। তারপরে যে ক'টা বছর রুদ্রভানু বেঁচে ছিলেন ছেলে জোটাতে হিম-সিম হতেন। গরু রাখা এবং ক্ষেতে পান্তা-ভাত বওয়ার মতো জরুরি কাজ ছেড়ে পাঠ-শালা ঘরে অলস হয়ে ক-খ-ঠ করবে, কোন মুরুব্বি পছন্দ করে না এটা। নিঃসীম মাঠ আর কূলহীন নদী চতুর্দিকে—পড়ুয়া-দেরও মন-উড়ু-উড়ু। কখনো চোখ রাঙিয়ে কখনো বা মুক্তহাতে টাকা-পয়সা ছড়িয়ে ছাত্র জোটাতে হত।

চন্দ্রভানুর আমলে এসে পাঠশালার এই গতিক দেখে আরও তাঁর জেদ বেড়ে গেল। পাঠশালা কি—তিন-চারখানা ঘর তুলে মাইনর ইস্কুল বসালেন এই জায়গায়। পণ্ডিত একজন ছিলেন, সে জায়গায় পাঁচ-পাঁচজন মাস্টার।

কপালক্রমে এই সময়ে আবার দীননাথ নন্দন ডাক্তারকে জোটানো গেল। সদরে প্রাক-টিশ করে দীন-ডাক্তার দস্তুরমতো নাম করেছেন। চন্দ্রভানুর সঙ্গে দহরম-মহরম খুব। বুড়ো বয়সে ডাক্তারকে হাঁপানি ডিস-পেপসিয়া ইত্যাদি গন্ডা দুই-তিন রোগে ধরল। রোগির চিকিৎসা বন্ধ করে নিজের চিকিৎসাই করেন শুধু। চন্দ্রভানু বলেন, চলে আসুন দিকি আমাদের সাগরচকে। এসে টাট্টু-ঘোড়ার পিঠে চড়ে গাঙের ধারে বাঁধের উপর ছুটোছুটি করুন। মাছ-ভাজা, মাছ-চচ্চড়ি, মাছের ঝাল-ঝোল, মাছের অম্বল—এক পাতে বসে মাছের আট-দশটা তরকারি খেতে লাগুন। ভয় পেয়ে রোগ পালিয়ে যাবার দিশা পাবে না। নিজে আরোগ্য হবেন, অন্য দু-চারকে আরোগ্য করে পুণ্যকর্ম করবেন। সে পুণ্য আমি মাংনা করতে বলি নে, কাছারি থেকে যথাবিধি বৃত্তির ব্যবস্থা হবে।

এ হেন বিচক্ষণ ডাক্তারটি পেয়ে ডাক্তার-খানা খোলা হল সাগরচকে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য—উভয় দিকের ব্যবস্থা। রোগি না আসতে পারে তো ডাক্তার নিজে ঘোড়ায় অথবা নৌকো যোগে গিয়ে ব্যবস্থা দিয়ে আসবেন। অষুধও রোগির বাড়ি গিয়ে পৌঁছবে, এবং অবস্থা বিশেষে পথ্য। একটি পয়সা লাগবে না কোন বাবদে।

ডাক্তারখানারও সেই পাঠশালার দশা। আলমারি ঠাসা অষুধ, ডাক্তারবাবু ধবধবে জামা গায়ে চাপিয়ে বসে আছেন, কিন্তু রোগির টিকি দেখা যায় না। এই খোলা-মেলা জায়গায় লোকের স্বাস্থ্য ভাল, সেটা মানি। তা বলে কি তুচ্ছ জ্বরজারিটাও হতে নেই? হলে গোপন করবে, প্রকাশ হতে দেবে না কিছুতে। ডাক্তারের ভয়ে। ডাক্তারি অষুধ উৎকট তেতো, এবং ডাক্তার ভাত বন্ধ করেন কথায় কথায়। অসুখে এদের মারতে পারে না, কিন্তু পেটে একটা বেলা ভাত না পড়লে মরার দাখিল হয়।

তবে নীহারনলিনী এসেছে দীন-ডাক্তারের সঙ্গে। চালাকিটা বুঝতে কিছুদিন গেল। মেয়েলোক হওয়ায় সুবিধা—পটাপট লোকের ঘরে ঢুকে পড়া যায়। অসুখ করেছে, অথচ ডাক্তার না দেখিয়ে লেপকাঁথা জড়িয়ে নিঃসাড়ে পড়ে আছে—সেটা এখন আর হবার জো নেই। নীহার দেখে এসে দীন-ডাক্তারকে সঙ্গে করে আবার সে বাড়ি যাবে। ডাক্তার ব্যবস্থা দিয়ে ফিরবেন, নীহার তার পরেও থাকবে। নিজ হাতে অষুধ খাইয়ে এবং পথ্যের যথোচিত ব্যবস্থা করে তবে ছুটি। ফাঁকি দিয়ে বিনা চিকিৎসায় রোগ সেরে না ফেলে।

দেখেশুনে মাইনর ইস্কুলের হেডমাস্টার নীহারকে ধরলেন : রোগির জন্যে তোমার ঘোরাঘুরি তো আছেই, ঐ সঙ্গে আমার ছোঁড়াগুলোর একটু খোঁজখবর নিও তো মা। নানান ছুতোয় ইস্কুল কামাই করে।

রোগিদের ছিল, এবার ছেলেদেরও বড় বিপাক। ইস্কুলে যাওয়ার বাবদ নীহারের তাড়া খেতে হচ্ছে। যেখানেই পালাক, ঠিক তার নজরে পড়বে, ধরে নিয়ে ইস্কুলে বসিয়ে দেবে। গতিক এমন, মাঠ পার হয়ে বাঘের ভয় তুচ্ছ করে একদিন বাদায় গিয়ে পড়ল ইস্কুল-পালানো গোটাকতক ছেলে। বাঘ কোথায় লাগে নীহারনলিনীর কাছে!

দীন-ডাক্তার নীহারের পরিচয় দিয়ে থাকেন : মেয়ে আমার। কখনো বলেন, পূর্বজন্মের মা। ছেলে জরায় ব্যাধিতে অথর্ব হয়ে পড়ছে,—মা-জননী আড়ালে থাকতে পারল না, ঝাঁপিয়ে এসে পড়েছে। এর অধিক তাঁর মুখ থেকে পাওয়া যায় না। একা মানুষ ডাক্তার—প্রথম বয়সে বউ আর মেয়ে মারা গেল, তারপরে আর সংসারের ঝঞ্ঝাটে যান নি। জীবন-সায়াহ্নে এই নীহার মেয়েটা এসে জুটল। ঘরের মধ্যে ডাক্তারের দেখাশুনা করে, বাইরে রোগিদের অষুধপথ্য দেয়। নার্সের কাজও করতে হয় দায়ে-দরকারে। কী যে না করে, বলা যাবে না। ডাক্তারের পুরো গার্জেন সে-ই।

অভাগিনী মেয়েটা, বড় দুঃখের জীবন। কিছু লেখাপড়া জানে, এক বয়সে রূপসী বলে খ্যাতি ছিল। কিন্তু বিয়েথাওয়ার দিকে গেল না—মা আর ছোট ভাইদের কোথায় ভাসিয়ে দিয়ে যাবে? মাস্টারি করে সংসার চালিয়েছে, লেখাপড়া শিখিয়েছে ভাইদের। বড় হয়ে তারা চাকরিবাকরি করছে এখন, সংসারধর্ম হয়েছে। এবারে বিয়ে করায় ক্ষতি নেই। প্রয়োজনও বটে—বউরা খিটখিট করে, অনাবশ্যক ভারবোঝা মনে করে নীহারকে। কিন্তু বয়সের সঙ্গে লালিত্য ঝরে গেছে, বিয়ে আর হবে কেমন করে? সে এক দীর্ঘ কাহিনী। এমন শান্ত বুদ্ধিমতী—তবু শেষ পর্যন্ত মাথা খারাপ হল নীহারনলিনীর। উন্মন্ড পাগল। দীন-ডাক্তার দেখছিলেন, চেষ্টাচরিত্র করে তিনিই হাসপাতালে পাঠিয়ে চিকিৎসা করালেন। সুস্থ হল নীহার, কিন্তু তখন সমস্যা, ভাইরা বাড়িতে রাখতে চায় না আর। বউদের ঘোরতর আপত্তি। ভয় করে তাদের, পাগলের চাউনি দেখে আঁতকে ওঠে। ছেলেপুলে কোলে নিতে গেলে বউরা ছিনিয়ে নেয়, পাগলের খেয়াল—দিলই বা মোক্ষম চাপ আদর করতে গিয়ে। এই-সব নিয়ে কুরুক্ষেত্র বাধে, যখন-তখন। শেষটা নীহারনলিনী নিজেই রাগ করে বেরুল। বাঁচল ভাইরা। দীন-ডাক্তার আদর করে ডেকে নিলেন : সংসার-সংসার করে তুই পাগল। আমি ডাক্তার—আসল রোগ তোর কি সেটা জানি। আমি নিজে আর আমার রোগিপত্তর মিলে এখানেও সংসার একটা। এতবড় সংসার কোনখানে পাবিনে— এই সংসারের মালিক হয়ে থাক তুই।

দীন-ডাক্তার ধরেছেন ঠিকই। নিজ কর্তৃত্বে খাটতে পারলে নীহারনলিনী আর কিছু চায় না। ডাক্তারের কাছে বড় আনন্দে আছে। যত কাজ, স্ফূর্তি ততই বেড়ে যায়। এ হেন কর্মিষ্ঠা মেয়ে পেয়ে চন্দ্র-ভানুর মাথায় আবার এক নতুন মতলব উদয় হল। বাচ্চা বাচ্চা মেয়েগুলোই বা বাড়িতে কেন পড়ে থাকবে? তাদের জন্য মেয়ে-পাঠশালা হোক। নীহারনলিনী একেবারে সর্বময়ী এ ব্যাপারে—মেয়ে-পাঠশালার ছাত্রী জুটিয়ে আনা থেকে পড়ানো। নতুন খাটনি পেয়ে আহার-নিদ্রা ভুলে লেগে গেছে। কিন্তু এতদিন যা হোক এক রকম হয়েছে, এইবারের বাধা ঘোরতর। মেয়ে কেউ পাঠ-শালায় দেবে না। বাসন-মাজা, রাঁধাবাড়া, গোয়াল-বাড়ানো, ধান-ভানা, ছেলে-ধরা—কাজের তো অন্ত নেই। শৌখিন লেখাপড়া নিয়ে বসবে কখন এর মধ্যে?

খোদ চন্দ্রভানুকেই শেষে আসরে নামতে হল : কী সমস্ত বলাবলি হচ্ছে—নাকি মাতব্বর?

ঘাড় তুলে চন্দ্রভানুর সঙ্গে কে মুখোমুখি করবে? বেমালুম অস্বীকার : হুটকো মানুষে কোথায় কি বলল—সে কিছু নয়। সাগরচক আপনার—জমাজমি ঘরবাড়ি

ছেলেমেয়ে বাচ্চাবুড়ো সকলের মালিক আপনি। যাকে যেখানে নিয়ে বসালে ভাল হয় সেইখানে বসাবেন আপনি।

অবস্থা এই। নীহারনলিনী সকলের জবানি চিঠি লিখে দিয়েছে, নিজের নামে কিছু লেখে নি। চন্দ্রভানুই লিখলেন তাকে : ডাক্তারবাবুকে নিয়ে চলে এসো। বন্দী আমি এখানে। তোমরা এসে উদ্ধার না করলে বেরোবার কোন উপায় নেই।

দীন-ডাক্তার ও নীহারনলিনী এসে পড়ল। ডাক্তার বলেন, চিঠি না পেলেও এসে পড়তাম। বলেন কি ভায়া, অব্যবহারে স্টেথিসকোপের নল-দুটো অবধি আরশুলায় ফুটো করে দিয়েছে।

নীহার বলে, ডাক্তারখানার এই দশা শুনলেন। ইস্কুলের অমন সুন্দর ঘরবাড়িতে দিনদুপুরে ইঁদুর-ছুঁচো কিচকিচ করে বেড়ায়। মাইনর ইস্কুলের মাস্টারমশায়রা ঠিক সাড়ে দশটায় ঘন্টা বাজিয়ে তাস নিয়ে বসেন, চারটের সময় ছুটির ঘন্টা দিয়ে বাড়ি ফিরে যান।

দীন-ডাক্তার নিশ্বাস ফেলে বলেন, কিছুই গড়ে তোলা গেল না। তাসের ঘর। আপনি ক'টা মাস গরহাজির, চারিদিক দিয়ে সব ধসে পড়ছে। এদ্দিন চকে পড়ে থেকে নিজের শরীরটাই কেবল তাগড়াই করে এলাম। অন্যের কোন-কিছুই হল না।

মানুষের ভাল করা বড় সহজ নয়। চন্দ্রভানু অনেক রকমে ঠেকে বুঝেছেন। সর্বক্ষণ চোখ পাকিয়ে সামলে রাখতে হয়, শৈথিল্য পেলে আর কিছু হতে দেবে না। কিন্তু মনোবেদনা বাইরে থেকে টের পাওয়া যাবে না, হাসিমুখে তিনি সব শুনে যাচ্ছেন। একমুখ হেসে বললেন, ভালই হল। কাজ এবার এখানে—এই রায়বাড়ি। ডাক্তারখানা নেই, ইস্কুল নেই—এত সহজে তাই আপনাদের পেয়ে গেলাম।

ইন্দুমতীর অবস্থা বললেন, ডাক্তারের জিজ্ঞাসার উত্তরে যাবতীয় লক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বর্ণনা করলেন : ধনঞ্জয় কবিরাজ গোড়া থেকে দেখছেন। নিজের উপর তিনি ভরসা রাখতে পারছেন না। আপনি নিরাময় করে দিন ডাক্তারবাবু। ছোটবউয়ের বোঝা তার কাঁধে তুলে দিয়ে খালাস হই। আমি যেতে পারলে চকে যেমন ছিল, তেমনি আবার সব চলবে।

ডাক্তার আর নীহারনলিনীকে নিয়ে চন্দ্রভানু রোগিণীর ঘরে গেলেন। দীন-ডাক্তার ইন্দুমতীর জানা, চিকিৎসার ব্যাপারে অনেকবার এ-বাড়ি এসে গেছেন। অবাক হলেন ইন্দুমতী নীহারকে দেখে। ধবধব করছে গায়ের রং। বয়স হয়েছে—কিন্তু দেহ ছেড়ে যৌবনের বিদায় নেবার লক্ষণ নেই।

মুগ্ধ চোখে মুহূর্তকাল তাকিয়ে ইন্দুমতী বললেন, নোনারাজ্যে এই পদ্মফুল পড়ে ছিল?

দীন-ডাক্তার হেসে বলেন, নোনারাজ্য থেকে তোমার সরোবরে এসে উঠলাম বউমা। বাপ আর মেয়ে আমরা অসুখের সঙ্গে লড়াইয়ে নামছি—আমার ওষুধ আর নীহারের সেবাযত্ন। দেখি, অসুখ কদ্দিন আর তোমায় শুইয়ে রাখতে পারে!

দীন নন্দন হেন ডাক্তারের কথায় ইন্দুমতীর হাসি ফুটল অনেক দিনের পরে। সকাল-সন্ধ্যা দু-বার করে ডাক্তার দেখেন, নীহারনলিনী সর্বক্ষণ ছায়ার মতন ইন্দুমতীর কাছে আছে। কিছুদিন পরে পাকা রায় পাওয়া গেল। নতুন কিছু নয়, ধনঞ্জয় কবিরাজেরই কথা। ইন্দুমতীর বাকি জীবন বিছানার উপরে কাটবে, আর উঠতে হবে না। ধনঞ্জয়ের বিদ্যেসাধ্যি না থাক, ঈশ্বর-দত্ত ক্ষমতা আছে। নাড়ি ধরেই সব বুঝতে পারে।

চন্দ্রভানু হাহাকার করে ওঠেন : উপায়? চক যে আমার রসাতলে যাবার দাখিল। ছুটে গিয়ে পড়বার জন্য ছটফট করছি।

চিন্তাকুল ডাক্তার মৃদু মৃদু ঘাড় নাড়েন : কোন উপায় দেখিনে। অবস্থা আরও বরঞ্চ খারাপ হবার সম্ভাবনা। দেহের নিচের দিকটা এখন অসাড়—এমন হতে পারে, কোন অঙ্গেরই সাড় থাকবে না। মুখের কথা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যাবে।

ভবিষ্যতের এক ছবি খেলে যায় চন্দ্রভানুর মনের উপর দিয়ে। নির্মম নৃশংস ছবি—মানুষের মন বাইরের লোকে দেখতে পায় না, এই বড় রক্ষা। চন্দ্রভানু যেন বিপন্ন সাগরচককে চলে যাচ্ছেন ইন্দুমতীর চোখের সামনে দিয়ে। চকের চেয়ে বড় কিছু নেই তাঁর কাছে। ইন্দুমতীর বাকশক্তি নেই, কিন্তু টনটনে চেতনা। নিষেধ করবার শক্তি নেই, প্যাটপ্যাট করে চেয়ে দেখছেন শুধু। জল পড়ছে হয়তো বা চোখের কোণ দিয়ে। হবেই যখন সেই অবস্থা, তাড়াতাড়ি এসে যাক। দেরি কেন? ইন্দুমতী দিনে দিনে যত অশক্ত হচ্ছেন, তত জোরে আঁকড়ে ধরছেন চন্দ্রভানুকে। পঙ্গু স্ত্রীর আর্তনাদের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে পড়া অসম্ভব।

ক্ষমতা বটে নীহারনলিনীর। ক'টা দিনের মধ্যে ইন্দুমতী তাকে যেন চোখে হারাচ্ছেন। গোবিন্দসুন্দরী একটু-আধটু রোগির কাজ করছিলেন, সামনে হাজির থাকলেও এখন আর ইন্দুমতী তাঁকে কিছু বলেন না। নীহার আসার পরে এই হয়েছে। শতমুখে নীহারের প্রশংসা : আপনাদের ডেকে ডেকে সারা হতাম পিসিমা, এখন মুখের কথা মুখে থাকতেই কাজ হয়ে যায়। ভারি গুণের মেয়ে নীহার, একটি দোষ খুঁজে পাইনে।

গোবিন্দসুন্দরী একদিন বলে বসলেন, আছে বইকি দোষ—

অসহ্য লাগে। নতুন একটি আবার উড়ে এসে জুড়ে বসল। তাঁরা যেমন তেমনি রয়ে গেলেন। বললেন, দোষ আছে বউমা—সর্বনেশে দোষ। সেই এক দোষে সমস্ত মাটি।

কৌতূহলী ইন্দুমতী প্রশ্ন করেন, কি দোষ পিসিমা?

রূপ। বয়স হয়েছে, কিন্তু রূপের আগুন নিভল কই? আগুনে কতজনের কপাল পুড়িয়ে এলো, ঠিক কি! সামলে রেখো বউমা, খাণ্ডব-দাহন না হয়।

ইঙ্গিতের মধ্যে ঘোরপ্যাঁচ নেই। ইন্দুমতীর ক্লান্ত মুখের উপর ক্ষীণ হাসি খেলে যায়। বললেন, এমনিই চেয়েছিলাম পিসিমা। দোষ যে আমারও আছে। কুশ্রী মানুষের হাতে খেতে পারি নে, ঘেন্না করে। দেখতে পান না, খাওয়ার সময়টা ক্ষীরো-ক্ষীরো করে ডাক পাড়ি?

চন্দ্রভানু এই সময়টা দীন-ডাক্তারকে নিয়ে আসছিলেন। গোবিন্দসুন্দরী উচিত মতো জবাব পেয়েছেন—খুশি হলেন কথাবার্তা শুনে। ক্ষীরোদা গৌরাঙ্গী—গোবিন্দসুন্দরী এখন বুড়ো হয়েছেন বলে নয়, বয়সকালেও তাঁর রূপের খ্যাতি ছিল না। ঠিক হয়েছে যেমন লাগতে আসেন। ধক করে একটা জিনিস চন্দ্রভানুর মনে এসে যায়—চকে পালানোর উপায় একটা বোধহয় আছে। এখনই হতে পারে।

ইন্দুমতী ডাক দিলেন : নীহার—

নীহারনলিনী সঙ্গে সঙ্গে বেলের পানা নিয়ে আসে। বেল গুলে ঘরে-পাতা দইয়ের সঙ্গে মেশানো। মশলার কালো গুঁড়ো উপরে ভাসছে। অনেক কষ্টে ঘাড় একটু তুলে ইন্দুমতী একচুমুকে খেয়ে তৃপ্তি ভরে বললেন, আঃ—

গোবিন্দসুন্দরীর দিকে চেয়ে সগর্বে বললেন, দেখলেন! মুখেও কিছু বলতে হয় না আমায়। ডাক শুনে বুঝতে পারে কখন কি লাগবে। সাধে ভালবেসে ফেলেছি! ওর গুণ যে আমার চুলের মুঠি ধরে ভাল-বাসিয়ে ছাড়ে।

দীন-ডাক্তারকে বলেন, এখন আমার ইচ্ছে হয় কি জানেন? আপনার ওষুধ আর নীহারের যত্নে সেরেসুরে যদিই বা ভাল অবস্থা হয়, ইচ্ছে করেই আমি ভাল হব না। ভাল হলে তো নীহারকে নিয়ে চলে যাবেন। ওকে আমি ছাড়তে পারব না।

আশায় আশায় চন্দ্রভানু বলে ওঠেন, তবে আর কি, নীহারকে নিয়ে সংসারধর্ম কর। ডাক্তারবাবু রইলেন, চিকিচ্ছের ত্রুটি হবে না। সাগরচকের গতিক দেখেবুঝে আসি একবার—

না—। কথা নয়, যেন গর্জন করে উঠলেন ইন্দুমতী।

চন্দ্রভানু তবু বলে যাচ্ছেন, গিয়ে তোয়াজ করি গে। চক বিগড়ালে রসদ কে যোগাবে? রসদ বিনে সংসার যে অচল।

প্রাণপণ চেষ্টায় ঘাড় একটু নেড়ে ইন্দুমতী জোর দিয়ে বললেন, না-না-না—। এক চোখের তারাটি দপ করে একবার যেন জ্বলে উঠল। চন্দ্রভানু দেখতে পেলেন সেই সিংহিনী—কেশর ফোলানো। নিরাশ হলেন।

সকলে চলে গিয়ে ঘর নিভৃত হল। ইন্দুমতী আর চন্দ্রভানু। ইন্দুমতী বললেন, কী বললে তুমি—নীহারকে নিয়ে সংসারধর্ম করব! নীহার দ্বিতীয় পক্ষ নাকি তোমার? তা হলেও হবে না। ভাঁড়ারের চাবি শাশুড়ি আমার আঁচলে বেঁধে দিয়েছিলেন। তাঁর শাশুড়ি আবার তাঁর আঁচলে বেঁধেছিলেন। আমি উঠতে পারি না বলে সে জিনিস তোমার কাছে রয়েছে। আর দিতে পারি ধ্রুবর বউয়ের আঁচলে। আমায় খাড়া করে দাও, আর নয়তো ধ্রুবর বিয়ে দিয়ে বউ নিয়ে এসো—চলে যাবার কথা তার আগে বলতে এসো না।

দুয়ের কোনটাই দু-দশ দিনের মধ্যে হবার নয়। ঝড়-বাদলের দুর্যোগের মধ্যে

নদীকূলে নিঃসহায় ফেলে-আসা সাগরচক সর্বক্ষণ ছোটরায়ের মন জুড়ে রয়েছে। চক একদিন জলতলে ছিল। নিঃসীম জলের মাঝখানে বাঁধ ঘিরে তাঁর বাপ রুদ্রভানু রায় ডাঙা আদায় করে নিলেন। সে ডাঙায় ফসল ফলে, সে ডাঙায় মানুষ ঘরের পর ঘর তুলে যাচ্ছে। সে ডাঙায় রাস্তাঘাট সাঁকো-পুল ইস্কুল-পাঠশালা—এবং ডাক্তারখানা। হিংসায় জল বুঝি ফেটে মরছে। বাঁধের উপর ঘুরতে ঘুরতে চন্দ্রভানুর কত দিন মনে হয়েছে, ষড়যন্ত্র ঐ জলের নিচে। খলখল ছলছল করে কুটিল পরামর্শ—কোনখানে এতটুকু ফাঁক পেলে মাথা গলিয়ে ব্যূহের ভিতর ঢুকে মাটির বাঁধ ভেঙে ভাসিয়ে চক আবার পাতালরাজ্যে নিয়ে যাবে। কোটালের মুখে পাহাড় প্রমাণ ঢেউ অধীর হয়ে আছড়ে পড়ে চতুর্দিক থেকে। ঘন বর্ষায় অনতিদূরের সমুদ্র ঘোর গর্জনে ডাক দেয়—দুড়ুম-দাড়াম আওয়াজ ক্ষণে ক্ষণে। সমুদ্রের তলে কামানের লড়াইয়ের মহড়া চলেছে যেন।

ইন্দুমতী বলেন, অত ছটফটানি কেন তোমার বলো দিকি। কাছে একটু বসে থাকতে চাও না। যেন জল-বিছুটি মারে এখানে।

কাতর চন্দ্রভানু বলেন, এই তো আছি বসে।

বসে ফালুক-ফুলুক করছ। সরে পড়তে পারলে বাঁচো। এমনধারা কই আগে তো ছিল না। ডাক্তারবাবুরা এসে পড়বার আগে।

তোমার মনের ভুল ছোটবউ।

ইন্দুমতী রেগে বলেন, চোখদুটো কানা হয়নি এখনো। কানা হয়ে যাই, তখন ভূতের নৃত্য কোরো। কিছু দেখতে পাব না, বলতেও যাব না।

হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলেন। বিস্তর দিন শয্যাশায়ী থেকে মনমেজাজ তিরিক্ষি। বাঁকা কথা ছাড়া মুখে নেই, কথায় কথায় কেঁদে ভাসান। যখন দৌড়-ঝাঁপ পারতেন, এত মানুষের মস্তবড় সংসার ছাড়া অন্য কিছু তাকিয়ে দেখবার ফুরসত ছিল না। দেহ যত অসাড় হয়ে আসছে, স্বামীকে ততই ধরে থাকতে চান। আতঙ্ক লাগে চন্দ্রভানুর—পঙ্গুর পাশে থেকে থেকে নিজেও বোধ করি পঙ্গু হয়ে যাচ্ছেন। মুক্ত জায়গায় থাকার মানুষ—শয্যার পাশ থেকে পালাবার জন্য আঁকুপাকু করেন তিনি।

কোথায় গিয়েছিলে? দুপুর থেকে একেবারে দেখলাম না।

অভিযোগ মিথ্যা নয়। দুপুরবেলা ইন্দুমতী চোখ বুজে ঝিম হয়ে ছিলেন। ফাঁক বুঝে চন্দ্রভানু পালিয়েছিলেন সেই সময়।

ছিলে কোথায় তুমি?

আমতা-আমতা করে চন্দ্রভানু বললেন, কোথায় আবার! কাছারিঘরে গিয়ে জমা-খরচটা দেখছিলাম একটু।

ক্রুদ্ধ ইন্দুমতী বললেন, মিছে কথা। বাড়িতেই ছিলে না তুমি, খিড়কির বাগানে গিয়েছিলে।

এটাও ঠিক। চন্দ্রভানু খিড়কির পুকুর-ঘাটে হুইল-ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে বসে-ছিলেন। সঙ্কটাপন্ন স্ত্রীকে একলা ফেলে মাছ ধরা—এ হেন হৃদয়হীনতার ব্যাপার খুলে বলা চলে না, এটা-ওটা বলতে হয়। অথচ গোপন নেই সেই আসল মানুষের কাছে। সংসার ইন্দুমতীর—লোকজন তাঁরই অনুগত। ভাল হয়ে উঠে আবার হাল ধরবেন, সকলে জেনেবুঝে রয়েছে। একজন কেউ চুপিচুপি খবর পৌঁছে দিয়ে ভাল হয়ে গেছে তাঁর কাছে।

একবার যা বলা হয়ে গেছে সেই জিনিসই ধরে থাকতে হয়। চন্দ্রভানু তম্বি করে বলেন, হুঁ, বাগানে গিয়েছিলাম! শুয়ে শুয়ে দেখেছ তুমি!

দেখতে হয় না, তোমার মুখে তাকিয়ে পড়তে পারি। কেন গিয়েছিলে তা-ও জানি। নীহারনলিনীর সঙ্গে জলকেলি করতে।

ইন্দুমতীর কথাবার্তা এমনি হয়েছে ইদানীং। এক বিছানায় পড়ে থেকে হয়েছে। জ্বলে উঠলেন চন্দ্রভানু। তা সত্ত্বেও সামলে নিতে হল। দীন-ডাক্তারের উপদেশ : শুনে যাবেন, জবাব দিতে যাবেন না। কথা কাটা-কাটিতে উত্তেজনা বাড়বে। পাগলে বকছে, তাই ভাববেন। একদিন সত্যি সত্যি পাগল হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়।

হয়েছে, ঠিকই তো হয়েছে! রাগ নিভে গিয়ে হাসি জাগল চন্দ্রভানুর মুখে। এক মতলব এসে গেছে।

নীহারনলিনীকে নিভৃতে নিয়ে বললেন, যা বলছি শোন মন দিয়ে। হেসো না।

ইতস্তত ভাব আসছিল বোধ হয়। একবার কেশে গলা সাফ করে নিলেন। অতিশয় গূঢ় বৃত্তান্ত, সেটা বোঝা যাচ্ছে। নীহারনলিনী উন্মুখ হয়ে আছে।

চন্দ্রভানু বললেন, প্রেম করতে হবে আমার সঙ্গে।

ভ্রূভঙ্গি করে নীহারনলিনী বলে, হাসতে মানা করলেন, সে জন্যে হাসছি নে। কিন্তু প্রেম আমি করলেও আপনি তো করবেন না। করবেন কোনখানে গিয়ে? বেলডাঙা রায়বাড়ির শতেক কান শতেক চোখ। বিনি কাজের মানুষে বাড়ি বোঝাই—ঠারেঠোরে এমনিই কত রকমের কথা চলছে। আর সাগরচকে যখন ফিরে যাব—হায়রে কপাল! দিন-রাতগুলো চব্বিশ ঘণ্টার না হয়ে আটচল্লিশ ঘণ্টার হলেও তো সিকি মিনিট আপনার অপব্যয়ের ফুরসত হবে না। বুড়ি হতে চললাম— একতরফা প্রেম করে মুনাফাটা কী আমার?

মুনাফা মস্তবড়। তোমার না হোক, আমার। আমারই বা কেন—সাগরচকের। ঠিকই বলেছ তুমি নীহার, সাগরচকে সিকি মিনিটের সময় নেই—কাজ কাজ আর কাজ। প্রেম-প্রণয় যত কিছু বেলডাঙার এই রায়-বাড়ির ভিতরে।

কথাবার্তার ধরন রহস্যময়। নীহার বুঝেও ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। চন্দ্র-ভানুর মুখের দিকে চকিতে একবার চেয়ে নিয়ে বলে, এই বাড়ি? রক্ষে করুন। আমার অত সাহস নেই। বাড়িময় বউঠানের চর। ঐ যে দেখুন, গোবিন্দঠাকরুন—আপনার পিশিমা। গন্ধ শুঁকে শুঁকে বেড়াচ্ছেন। বেচাল কিছু দেখলেই পুটপুট করে লাগাবেন। না দেখলেও বানিয়ে বলবেন বন্দুর পারেন।

চন্দ্রভানু এক কাণ্ড করে বসলেন। নীহারের একেবারে কানের কাছে মুখ এনে অকারণে এদিক-ওদিক বার কয়েক তাকিয়ে ফিস ফিস করে কুশল প্রশ্নের বন্যা বইয়ে দিচ্ছেন : আছ কেমন নীহার? ঘুম-টুম ভাল হয় রাত্রে? দিনমানটা কেমন লাগে? চক ভাল না এই বেলডাঙা? সাঁতারের অভ্যাস তোমার—তা দেখ, দীঘিটা বড্ড সদরের উপর, দীঘিতে সুবিধা হবে না। তুমি বরঞ্চ—

অকস্মাৎ থামলেন, কথাটুকুও শেষ করলেন না। গোবিন্দসুন্দরীকে দেখানোর জন্যে—সরে গেছেন তিনি, উপরে উঠে গেছেন। আর এখন ফিসফিসানির প্রয়োজন নেই।

ফল অনতিপরেই দেখা দিল। ইন্দুমতী গদগদ নীহারের উপর। বললেন, তোমার মতন কাজের মেয়ে দেখিনি আমি। বিপদ-ভঞ্জনকে খুব ডাকাডাকি করি, তিনিই এনে দিয়েছেন। আজ থেকে পাশের এই ছোট ঘরে শোবে তুমি—এক ডাকে যাতে পাওয়া যায়। রাত্রে আমার জলতেষ্টা পায় এক একদিন।

সেই পাশের ঘরে যেতে হয় ইন্দুমতীর ঘরের ভিতর দিয়ে। বাইরের দিককার দরজা তালা এঁটে বহুকাল থেকে বন্ধ। ব্যবস্থা শুনে চন্দ্রভানু মুখ টিপে হাসলেন। অষুধ ধরেছে।

তার উপরেও আছে। ছোটরায়কে ইন্দুমতী বললেন, তুমি নিচের তলায় চলে যাও। নীহার রয়েছে, আর কোন ভাবনা নেই। রোগির কাছে উদ্বেগে তোমার ঘুম হয় না, দেহ আধখানা হয়ে যাচ্ছে। আমি এই পড়ে আছি—এর উপরে তুমি পড়লে তো একেবারে সর্বনাশ। সে আমি হতে দেবো না।

সেই নতুন ব্যবস্থা। চন্দ্রভানুকে আঁকড়ে ধরে ছিলেন ইন্দুমতী, মন্ত্রবলে যেন সেই মুঠো আলগা হয়ে গেল। নীহার-নলিনীকে চোখে হারাচ্ছেন এখন। পাশের ছোট্ট ঘরখানায় নীহারের জন্য তক্তাপোশ একটা। রাত্রে ইন্দুমতী একটু-আধটু যা ঘুমাতেন, তা-ও বন্ধ একেবারে। ক্ষণে ক্ষণে সাড়া নেন : ও নীহার—

নীহার বলে, জল দেবো?

না, এমনি ডাকলাম। তোমার কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা, তাই জিজ্ঞাসা করছি। পরের ঘরের মেয়ে, কতদূর থেকে এসেছ—যা যখন দরকার বলবে, লজ্জা করবে না—কেমন?

দিনমানে কোন এক নিভৃতে নীহার-নলিনী হেসে হেসে চন্দ্রভানুকে বলে, বড্ড ভালবাসা ছোটরায়, ভালবাসার চোটে লহমার তরে ঘুমোতে দেন না। নতুন বিয়ের বরকে হার মানিয়ে দেন, এত ভালবাসা বউঠানের।

চন্দ্রভানু প্রসন্ন। মুক্তি খানিকটা এগিয়েছে। বাড়ি ছাড়া না-ই হোন, ঘর ছাড়া অবধি হয়েছে আপাতত। মনের কথাটা নীহারনলিনীকে বললেন। অন্যে শুনলে বলবে, স্ত্রীর এই অবস্থা, তুমি এখন ফাঁক কাটাবার তালে আছ। বড় স্বার্থপর তো তুমি। কিন্তু নয় কে শুনি—নিজের মতন কোন মানুষ কবে অন্যকে ভালবেসেছে?

ফাল্গুনের শেষে, খুব দেরি তো চৈত্রের গোড়ায় সাগরচক থেকে ধানচালের ভরা এসে পৌঁছায়। এবারে কি হল—চৈত্র গিয়ে বৈশাখ পড়ে গেল, ভরার তবু উদ্দেশ নেই। চন্দ্রভানু নেই, অতএব বৃন্দাবনের উপর ভার। 'আসছি' 'আসছি' করছে বৃন্দাবন, দু-দুবার লোক পাঠিয়ে খবর দিয়েছে—কিন্তু আসে না। রায়বাড়ির সারা বছরের রসদ—বাড়ির ঘাটে এসে না পৌঁছানো পর্যন্ত সোয়াস্তি নেই।

এলো অবশেষে। অন্য বারে যা আসে, পরিমাণে তার অর্ধেক। এই জোটাতেই হিমসিম—গোলার তলা অবধি কুড়িয়ে তুলে এনেছে। তাতে কুলোয়নি—সম্পন্ন চাষীদের গোলা থেকে আনতে হয়েছে। ধারই বলতে হবে—পাওনা নেই তবু চেয়েচিন্তে আনা, ধার বই কি বলা চলে? আগামী সনের খাজনা বাবদে কাটান যাবে।

বৃন্দাবনের কাছে চন্দ্রভানু চকের কথা শুনছেন। কতদিনের অদর্শন, উদ্বেগের তাই অন্ত নেই। দুই প্রান্তের গাঙ, দুটো যেন দুই দুর্বৃত্ত আততায়ী। যেন মানুষ—মানুষের মতো চোখকান আছে তাদের। টের পেয়েছে, আসল মানুষটা হাজির নেই এবারে। একেবারে আদাজল খেয়ে লেগে গেল। পুরানো বেলদার চারজন—বিপদ বুঝে তার উপরে আরও পাঁচ-সাত জন নিযুক্ত হল। অত্যন্ত পাকালোক তারা, জলের চলাচল বোঝে। কাঁধে কোদালি দিন নেই রাত নেই সর্বক্ষণ বাঁধের উপর সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে ঘুরছে। যোগ হলেও হতে পারে, কোন একখানে হয়তো সন্দেহ হল—লাফ দিয়ে পড়ে সেখানে। হাঁক দিল অন্যদের উদ্দেশে, হুড়মুড় করে তারা এলো। দরকার হলে গৃহস্থ মানুষেরাও এসে পড়বে—ঘরবাড়ি ভাতকাপড় এবং দুনিয়ার উপর যা-কিছু বাঁধ-ঘেরা ঐ চরটুকুর ভিতরে। শয়তান জল সেই বস্তু পাতালে টেনে নেবার জন্য হামলা দিয়ে বেড়ায়। মানুষও সর্বক্ষণ তৈরি প্রতিরোধের সৈনিক হয়ে।

হলে হবে কি—সৈন্য আছে, অস্ত্রশস্ত্রও প্রচুর, কিন্তু সেনাপতি কোথা? সে বটে ছোটরায় চন্দ্রভানু। তাঁর বাপ রুদ্রভানুও ছিলেন খানিকটা। জলের শয়তানি বোঝেন এঁরা। ক্ষীণ বীচিভঙ্গে নদী যেন ঢলে ঢলে পড়ছে, আর জলতলে ঠিক সেই সময়টা তস্করের মতো সিঁধ খুঁড়ে যাচ্ছে বাঁধের গায়ে। ছিদ্র একটু পেয়ে গেল তো শতেক তরঙ্গ মাথা-ভাঙাভাঙি করছে ঢুকে পড়বার জন্য। মাটির বাঁধ ভেঙে ভাসিয়ে বিশাল পথ বানিয়ে নিল, রূপসী নদী লহমার মধ্যে রাক্ষসী। এমনি কান্ড ঘটে গেছে বার পাঁচ-সাত। শীতকালের সামান্য জলে এই, দুরন্ত সময় সামনে তো পড়ে আছে—বর্ষায় যখন ঢল নেমে আসবে। চকের বাসিন্দারা ব্যাকুল হয়ে পথ তাকাচ্ছে—কবে আসবেন ছোটরায়, কুহকিনী নদীর ছলাকলায় ভোলেন না যে মানুষ, দৃষ্টি ঠিক গিয়ে সেই পাতালতলে পৌঁছায়।

চন্দ্রভানু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সমস্ত শুনলেন। একটা জিনিস স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, বাঁকে বাঁকে ঘোরা নদীর আর পছন্দ হচ্ছে না। দু-পাশে দুই নদী একটি পথ ধরে এক হয়ে অদূরের সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে যায়। সেই পথ সাগরচকের মাঝ বরাবর। তাড়াতাড়ি রুখে দিতে হবে, নইলে সর্বনাশ। ইতিমধ্যেই হয়তো বা দেরি হয়ে গেছে।

সারারাত্রি চন্দ্রভানুর ঘুম হল না। সাগরচকের মানুষজন ছোটরায়—ছোটরায় করে ডাকছে,—নদী-মাঠ-গ্রাম পার হয়ে রাত্রের নৈঃশব্দে যেন কানে আসে। সকলের সর্বস্ব ভেসে যায়। তবু ইন্দুমতী ছাড়বেন না কিছুতে : চকদার কতই তো আছে—ঘর-বাড়ি ছেড়ে তোমার মতন কে বারোমাস পড়ে থাকে?

আছে চক অনেকেরই বটে, কিন্তু সাগরচক কারো নয়। দুর্দান্ত ছেলের মায়ের মতন হিমসিম হতে হয়, বারো মাস পড়ে থেকেও তো সামলে ওঠা যায় না।

কালবৈশাখীর ঝড়ঝাপটা গেছে আজ সন্ধ্যাবেলা—সন্ধ্যার পরেও অনেকক্ষণ অবধি। বৃষ্টি-ধোওয়া জ্যোৎস্নায় চারিদিক ভরে আছে। ঘর থেকে উঠানে নেমে গিয়ে চন্দ্রভানু খানিক পায়চারি করলেন। একটি মনে এত দুশ্চিন্তা ধরে না। ইন্দুমতীর তো ঘুম নেই, রাত্রি বলে কিছু নেই তাঁর। তাঁকে গিয়ে বলবেন অবস্থা, পরামর্শ করবেন, ছুটি চাইবেন। দীন নন্দনের মতো অমন ডাক্তার সর্বক্ষণ বাড়ির উপর, তার উপর নীহারনলিনী—ভাবনার কিছু নেই। সেইসব বুঝিয়ে বলবেন—

বুঝে দেখ ছোটবউ, সংসারের অন্ন-বস্ত্র, ঠাটঠমক সমস্ত সেই জায়গা থেকে। ভান্ডার ধরে টান পড়েছে—অবুঝ হোয়ো না, কয়েকটা দিন ছুটি দাও আমায়। দেখে আসি একবার, চোখে না-দেখা অবধি সোয়াস্তি নেই।

দরজা ভেজানো। চোখ বোজা ইন্দুমতীর। চন্দ্রভানু সন্তর্পণে একবার উঁকি দিয়েছেন কি না দিয়েছেন, ইন্দুমতী চিৎকার করে উঠলেন : কে, কে তুমি?

সারা রাত্রি তিন-সলতের প্রদীপ জ্বালা থাকে রোগির ঘরে। ইন্দুমতী বলছেন, যাচ্ছ কোথায় তুমি? কোন মতলবে?

চন্দ্রভানু বলেন, মতলব কী আবার! তোমার কাছেই এলাম ছোটবউ—

রাতদুপুরে ছাড়া আসা যায় না বুঝি আমার কাছে? পা টিপে টিপে চোর হয়ে আসতে হয়? ব্যঙ্গের সুরে ইন্দুমতী কেটে কেটে বলছেন, ন্যাকা আমি—বুঝিনে? ঘুমিয়ে আছি ভেবেছিলে? যাচ্ছিলে পাশের ঘরে—বুঝেসুঝেই ওকে এনে আটক করেছি—

রাত ঝিমঝিম করছে। চেঁচামেচিতে জেগে পড়েছে সকলে। ক্ষীরোদার অলিন্দে শোওয়ার ব্যবস্থা সে ঢুকে পড়ল। গোবিন্দ-সুন্দরী নিচের তলার সেই শেষপ্রান্ত থেকে ছুটতে ছুটতে এলেন। দরজা-জানলার বাইরে আরও সব এসেছে, শব্দ-সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। বাড়ির মধ্যে আচমকা এমন মজাদার কান্ড—কে ঘরে শুয়ে থাকতে যাবে? থাকলে ক্ষতি নেই অবশ্য—গোবিন্দসুন্দরী যখন হাজির আছেন, রায়বাড়ি সামান্য স্থান—গোটা বেলডাঙা গ্রামের ভিতরে জানতে কারো বাকি থাকবে না। রাত্রি ভোর হবার যেটুকু অপেক্ষা।

গোবিন্দসুন্দরীকে সাক্ষি মানেন ইন্দুমতী : টিপিটিপি যাচ্ছিলেন পিশিমা। ভেবেছেন ঘুমিয়ে আছি। চক্ষু বুজে আমি ঝিম হয়ে পড়ে থাকি, একদিন না একদিন হাতে-নাতে ধরব। ঠিক তাই হল।

চোপরও—গর্জন করে উঠলেন চন্দ্রভানু। সে গর্জন এ-বাড়ির কেউ কখনো শোনে নি। জোলো-ডাকাত নৌকোয় উঠে প্রথম যে তাড়ায় আরোহীকে ভয়-চকিত করে, সে বোধহয় এই কণ্ঠ। ইন্দুমতী কিন্তু ভয় মানেন না। সাহসী চিরদিনই, পঙ্গু হয়ে পড়ে থেকে আরও যেন ক্ষেপে আছেন। বলেন, কি করবে তুমি, গলা টিপে ধরবে? এসেও ছিলে সেই মতলবে—গলা টিপে শেষ করে নিশ্চিন্ত হয়ে নীহারের ঘরে যেতে। করো তাই। সাগরচকে চোখের আড়ালে যা করে এসেছ, জোড়া-মন্দিরের বাস্তু-ভিটেয় আমার সংসারের উপর সে অনাচার জীবন থাকতে ঘটতে দেবো না আমি।

একবাড়ি লোকের মধ্যে কেলেঙ্কারি। আজ বলে নয়, চিরজীবন পঙ্গু মানুষটা জ্বালিয়ে মারবে। চন্দ্রভানুর এত রাগ হয়েছিল, দেবেন বুঝি সত্যি সত্যি গলার উপর হাতদুটো চাপিয়ে। হঠাৎ কী হল—রাগ একেবারে জল। মুখের উপর চকিতে একটু হাসিও বুঝি খেলে যায়। বলেন, সেই ভালো, চলে যাবো চকে। রাতটুকু পোহাক, সকালবেলাই যাচ্ছি।

ভ্রূভঙ্গি করে ইন্দুমতী বলেন, সে আর গিয়েছ তুমি! খুঁটো পোঁতা যে এখানে—বাঁধা-গরু খুঁটোর চারিধারে ঘুরে মরবে। সে দিকটা লয় হয়ে যাচ্ছে, খবরের পর খবর—খবর নিয়ে বৃন্দাবন নিজে এসে পড়ল। বাড়ির মধু ছেড়ে কিছুতে নড়বার জো নেই। ঘরের মধ্যে এনে পুরেছ, সেই অবধি ধাওয়া করেছ। কতখানি বেপরোয়া হলে তবে মানুষে পারে! ছেলেটা দুদিন বাড়ি এসেছে, তা বলেও লাজলজ্জা নেই একটু।

অপবাদ ঘাড় পেতে নিয়ে একটি কথাও না বলে চন্দ্রভানু সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন। ধ্রুবভানু এসেছে ছুটিতে, দোতলায় শেষ-দিকে তার ঘর। ভিড়ের মধ্যে সে নেই—থাকতে পারে না। কিন্তু জানতে কিছু বাকি থাকছে না তার। লজ্জা ও বেদনা পাচ্ছে, না-থাকলেই ভাল হত আজকের দিনে।

নিচের ঘরে এসে দাঁড়িয়েছেন চন্দ্রভানু। পদশব্দে ঘাড় ফিরিয়ে দেখেন নীহার-নলিনী। কী আশ্চর্য, যাকে জড়িয়ে এত কুৎসা, পিছন ধরে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে নেমে চলে এলো। নীহারনলিনী জাঁক করে বলে, লুকিয়ে-চুরিয়ে নয়, ওদেরই চোখের উপর দিয়ে এলাম। তাকিয়েও দেখল না। কে ভাবতে পারে, এত কান্ডের পর ছোটরায়ের কাছেই যাচ্ছি আবার।

চন্দ্রভানু অবাক হয়ে বলেন, হাসিমুখ যে তোমার?

বাঃ রে, হাসিরই তো দিন। যার জন্যে চেষ্টাচরিত্র তাই তো হয়ে গেল। বউঠান নিজেই এবার চাইছেন, আপনি সাগরচকে চলে যান। আমার সঙ্গে যাতে দেখাসাক্ষাৎ না হয়। কোন ভাবনা নেই। আমি আছি, ডাক্তারবাবু আছেন,—রোগির সেবাযত্নের ত্রুটি হবে না।

সে আমি জানি নীহার। সংসার ঠিকই চলবে, রোগিরও এতটুকু অবহেলা হবে না। তুমি হতে দেবে না। এতবড় মিথ্যে রটনাও তোমার মুখের হাসি মুছতে পারে নি। যে মানুষ রটাল, তার সম্বন্ধে এতটুকু রাগ-দুঃখ তোমার নেই।

নীহারনলিনী খিলখিল করে হেসে ওঠে : রটিয়ে আমার কি ক্ষতিটা করবেন? আমার কি সমাজ-সামাজিকতা আছে? ছেলেমেয়ে আছে যে বিয়েথাওয়া দিতে হবে? আপনজন আছে যে কলঙ্ক শুনে মুখ পুড়বে? কোন দুর্ভাবনা আমার নেই, আমার মতন ভাগ্যধরী কে?

শান্ত গম্ভীরভাবে চন্দ্রভানু শুনে গেলেন। বললেন, ভাবনা আমার হচ্ছে। আমি চলে যাচ্ছি, ছোটবউয়ের আক্রোশের মুখে তুমি একলা পড়ে রইলে—

নীহারনলিনী একেবারে উড়িয়ে দেয় : কিছু না, কিছু না। প্রতাপ বউঠানের ছিল বটে একদিন, রায়বাড়ির সিংহিনী আজ পাঁকে পড়ে আছেন। বাড়ির কেউ পারতপক্ষে সামনে আসে না। আঁচলে চাবি বাঁধা থাকলে সংসারও সেই সঙ্গে বাঁধা থাকে না—এ কথাটা বোঝেন না উনি। রাগ কেন হবে, মায়া হয় আমার বউঠানের উপর।

বলে, আমি ভাবছি আপনার কথা। আপনার নামে যত কুচ্ছোকথা রটে গেল। আপনার যে অনেক আছে। অঞ্চলজোড়া নাম-ডাক, হাজার মানুষে আপনার মুখ তাকিয়ে থাকে—

চন্দ্রভানু নীহারের সেই আগের কথার সুরে বলে ওঠেন, কিছু না কিছু না। পুরুষ-মানুষ আমি যে—তায় রায়বংশের পুরুষ। দুর্নাম এ বাড়ির পুরুষের ভূষণ। কুলাঙ্গার কেবল আমিই ছিলাম। আর হয়ে উঠছে— আমার ছেলে ধ্রুবভানু। মিথ্যে বলছি নে, গোবিন্দ-পিশির সঙ্গে আলাপ করে দেখো তুমি।

হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতে বলেন, জাতে উঠলাম এদ্দিনে। খাতির-ইজ্জত গাঁয়ের উপর যা ছিল, শতগুণ হল এবার থেকে।

ঠিক সকালবেলা নয়, গোছগাছ সারা হতে প্রায় দুপুর। নীলবোট ঘাটে এনে লাগিয়েছে। যাকে যা বলবার বলে-কয়ে—যেমন বরাবর হয়ে আসছে—নৌকোয় গিয়ে উঠলেন।

ইন্দুমতীর ঘরেও গেলেন একবার। ইন্দুমতী বলেন, পালঙ্কের উপর উঠে দাঁড়াও— আমার শিয়রে। বিজয়া দশমীর দিন যেমন করেছিলে।

দাঁড়াতে হল সেই রকম। বিস্তর চেষ্টায় ইন্দুমতী হাত বাড়ালেন একটু। পায়ের ধুলো কোনক্রমে মাথায় ঠেকিয়ে কেঁদে পড়লেন : এই ভাগ্যটুকু কতদিন আর আছে, কে জানে। হাত দুটোও অসাড় হয়ে এসেছে।

যে ক'জন সেখানে, সকলে চোখ মুছছে। কাল এই ঘরের ভিতর এমন বচসা এতবড় কেলেঙ্কারি, সে যেন নিশিরাত্রির দুঃস্বপন একটা। যাত্রামুখে নীহারনলিনী নেই। ইন্দুমতীই তাকে ডাকছেন : ও নীহার, তোমাদের ছোটরায় রওনা হয়ে যাচ্ছেন। কোথায় গেলে তুমি?

সোনাছাড়ি বন্দরে লালমোহন মিত্তিরের বাড়ি শেষ হয়ে গেছে। জাঁকিয়ে গৃহপ্রবেশ। আসল মচ্ছব শেষ হল, শানায়ের বাজনা তবু থামে না। সকালবেলাটা এবং সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত বেজে চলে। চিরকালই বুঝি বাজবে, কোনদিন থামবে না। নৌকোর দাঁড় থামিয়ে গাঙের উপরে মাঝিমাল্লারা শোনে। এক আজব বাড়ি—আয়তনে খুব যে বড় তা নয়। ধরুন আলাদা—কোন ঘর গোল, কোনটা পাঁচকোণা, কোনটা সাত-কোণা। দোতলার একটা বারান্ডা গাঙের জলের উপর অনেক দূর অবধি বেরিয়ে এসেছে। কলকাতা শহর থেকে দক্ষ মিস্ত্রি এনে দস্তুরমতো খরচ-খরচা করে বানানো।

দেশ থেকে সব এসে পড়েছে। নতুন তারা এই ভাঁটিঅঞ্চলে—যা দেখে তাই অপরূপ। বড় বড় গাঙ, দিগ্ব্যাপ্ত মাঠ, মাঠের দূরতম প্রান্তে বাদার জঙ্গলের ঘন সবুজ রেখা। প্রথম কয়েকটা দিন তো মীনাক্ষী বারান্ডার রেলিং ধরে সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকত। সাদা মার্বেলের মেজের সঙ্গে পা দুটো তার যেন গেঁথে দিয়েছে, নড়তে ফিরতে পারে না।

নামডাক হয়েছে বাড়ির তা বলে নিন্দে-মন্দও যে হচ্ছে না এমন নয়। জিনিস চোখে ধরবার মতো বটে, কিন্তু অতিশয় ফঙ্গবেনে। দু-দশ বছরের মধ্যে দেখে নিও

ইঁটে নোনা ধরে পাতলা দেয়াল ফুটো ফুটো হয়ে যাবে। ফুরফুরে. শৌখিনতা এ-তল্লাটে চলে না। তুলনার কথাও ওঠে : দালানকোঠা কেমন হওয়া উচিত বেলডাঙার রায়বাড়ি দেখে বুঝবে। অট্টালিকা নয়, পাহাড়। পাকা-পোড়ের ইট, দেয়াল এক-মানুষের সমান চওড়া। গাঙের বান এসে এসে কতবার আছাড় খেয়ে পড়েছে, ইঁটের একটা টুকরো খসাতে পারে নি কোথাও।

সেই রায়বাড়ি দেখা হয়ে গেল মীনাক্ষীর। নিতান্তই দৈবক্রমে। ঘাড় হেঁট করে মানতে হয়, বড় জিনিস গড়তে জানত বটে তখনকার মানুষ। দেখাটা তবু তো শুধুমাত্র বাইরে থেকে। কৌতূহল ছিল ভিতরে যাবার, কিন্তু হতে পারে না! কুচোচিংড়ি-ধরা মানুষেরা হাঙর ধরার তালে আছে, সেই কথা উঠে পড়বে। নিজের অধ্যাবসায়ের জোরে লালমোহন সামান্য থেকে এত বড়লোক হয়েছেন, তাঁর মেয়েরও ইজ্জত কম নয়।

ব্যাপারটা এই। নদীকূলে বিশাল বটের তলায় শিবমন্দির—কুসির বটতলা সেই জায়গার নাম। কুসি অর্থাৎ কুসুম নামে কোন এক নিষ্ঠাবতী বিধবা শিব-দর্শন পেয়েছিলেন এখানে। বটের ঝুরির মধ্যে বুড়োশিব লুকিয়ে বসে আছেন, নোনা নদীর জোয়ারে ভেসে এসে মকরবাহিনী মা-গঙ্গা তাঁর পাদ-বন্দনা করলেন—স্বপ্নে দেখতে পেলেন কুসুম। পুণ্যমাসের পুণ্য-তিথি সে রাত্রি—অক্ষয়তৃতীয়া। ধড়মড় করে জেগে উঠে আশ্চর্য বৃত্তান্ত কুসুম বললেন সকলকে। তারও অনেক দিন পরে নৌকা-পথে যেতে যেতে হঠাৎ নজরে পড়ল স্বপ্নে-দেখা সেই বটগাছ। নেমে ঘুরে ঘুরে দেখেন। খুঁজতে খুঁজতে বৃহৎ শিলালিঙ্গও পাওয়া গেল—আষ্টেপৃষ্ঠে বটের ঝুরি জড়িয়ে ঠাকুর পালিয়ে রয়েছেন। চাউর হয়ে গেল চতুর্দিকে। অক্ষয়তৃতীয়ার দিন মা-গঙ্গা পতি-সন্দর্শনে আসেন, নোনা গাঙ গঙ্গার মাহাত্ম্য পেয়ে যায়। গঙ্গাস্নানের এমন সুবিধা পুণ্যার্থীরা ছাড়বেন কেন. বিস্তর লোক জমে, মেলা বসে যায় কুসির বটতলায়। নৌকোয় নৌকোয় ছয়লাপ। নৌকো-বাইচ হয়। কুসির বটতলায় মহা-পার্বণ অক্ষয়তৃতীয়ার দিনে।

বৃত্তান্তটা লালমোহনের নতুন বাড়ি এসে পৌঁছাল। অতিরঞ্জিত হয়েই এসেছে। সত্তর বছরের বৃদ্ধা লালমোহনের মা। তিনি রোখ ধরলেন, পাতকী তরাতে মা-গঙ্গা নিজে এদ্দুরে আসতে পারছেন, আর আমরা এই পথটুকু যাব না?

মীনাক্ষী আরও তাঁকে তাতাচ্ছে : বুঝে দেখ ঠাকুরমা। হাঙ্গামা-হুজ্জুত নেই, রেল-স্টিমার চড়তে হবে না, অথচ পুরো-পুরি গঙ্গাস্নানের ফল। মীনাক্ষীও যাবে ঠাকুরমা'র সঙ্গে, কত নদী কত গাঁ-গ্রাম দেখবে!

কিন্তু মুশকিল হল, নিয়ে যায় কে সঙ্গে করে? খটির কাজে বিস্তর কাঠ লাগে, বাদায় বন্দোবস্ত করতে হয়। সেই ব্যাপারে লালমোহনের সদরে যাবার প্রয়োজন ঠিক ঐ সময়টা। এবং তাঁদেরের ব্যাপার ভক্তদাস ছাড়াও হবে না। সঙ্গে কে যাবে তা হলে?

ভক্তদাস বলে, রাইচরণকে আমরা নেবো না। সে ওঁদের নিয়ে যাক। রাইচরণ গেলে নির্ভাবনা।

হল তাই। পুরানো দক্ষ মাঝি রাইচরণ নৌকো নিয়ে চলল। মীনাক্ষীর মা মনোরমা গিন্নিবান্নি মানুষ যাত্রামুখে তিনিও উঠে পড়লেন। ছটফটে মেয়ে আর স্থবির শাশুড়ি সামলানো কি মাঝিমাল্লার কর্ম? মুখে এই বলছেন, পুণ্যলাভের বাসনা তাঁরও কি মনে মনে নেই?

চন্দ্রভানু চলে গেছেন, তারই দিন দশেক পরে। ছুটিতে এসে ধ্রুবভানু মনের সাধে হুল্লোড় করে বেড়াচ্ছে। সমবয়সি আট-দশটা ছোকরা সর্বক্ষণের সঙ্গী।

বাইরে-বাড়ির অদূরে নদী। দিগ্‌ব্যাপ্ত নদী—এপারে দাঁড়িয়ে অনেক ঠাহর করে ওপারের গাছপালা দেখা যায়। এমন নদী রয়েছে, স্নান তবু দীঘিতে। নদীর জল নোনা, তার উপর কুমিরের ভয়। নদী আর দীঘির মধ্যে প্রশস্ত বাঁধ—বাঁধ বেঁধে নদী থেকে একটুকরো জল আলাদা কেটে নেওয়া হয়েছে যেন। বর্ষার সময়টা নদীর লবণাক্ত ভাব অনেকটা চলে যায়, বাঁধের উপর নালা কেটে দেয় তখন। নদীর জল দীঘিতে এসে ঢোকে, সেই সঙ্গে গুঁড়ো-মাছ আসে প্রচুর। ভাঙান, ভেটকি, পায়রা-চাঁদা, চিংড়ি—হরেক রকমের মাছ।

দীঘিতেই অতএব ঝাঁপাঝাঁপি করছে। নেমেছে কোন সকালবেলা। ঘাটে অনেক লোক—তারা বলাবলি করছে, শহরে থেকে এত লেখাপড়া করে ঠাণ্ডা হতে পারল কই? সেই ছেলেবয়সের মতো।

একজন বলে, রায়বংশের রক্তে যে আগুন। কত পুরুষ ধরে জ্বলছে। দুটো পাশ দিয়েই অমনি নিভে যাবে বুঝি? বিদ্যের নিচে চাপা থাকে, বেসামাল হলেই দাউ দাউ করে উঠবে। যেমন ছোটরায়, তেমনি এই ছেলে। রায়-বাড়ির মানুষ নিয়ে আমাদের মতন বাঁধা হিসাব চলে না।

বাঁধের উপরে আমগাছ জামগাছ কয়েকটা। একটা ডালে আম টুকটুক করছে। আঙুল তুলে ধ্রুব অন্যদের দেখাল।

সঙ্গীরা হেসে খুন : সিঁদুরে-গাছের আম যে! কাঁচা থেকেই অমনি সিঁদুরের ছোপ। কী আশ্চর্য, কলেজে গিয়ে নতুন মানুষ হয়ে পড়েছ—এই চিনতে পারো না?

হাসাহাসি ধ্রুবের বরদাস্ত হয় না। বলে, কোনটা কাঁচা কোনটা পাকা দূরে থেকেই আমি ফারাক বুঝি। পরখ হোক তা হলে।

বার দুই ইতিমধ্যে দীঘি পাড়ি দেওয়া হয়ে গেছে। আবার এই নতুন অজুহাত। সাঁ-সাঁ করে সকলের আগে ধ্রুব জল কেটে ছুটল। কখনো ভেসে যাচ্ছে, কখনো ডুব-সাঁতার। একটি দুটি আরও যাচ্ছিল, খানিকটা গিয়ে ফিরে আসে। এই বড় দীঘি এপার-ওপার করা চাট্টি কথা নয়। এবং আম যে কাঁচা, তাতেও সন্দেহ নেই। কী হবে পাগলামির পাল্লা দিয়ে? ধ্রুবই দেখে এসে বলবে।

পৌঁছে গেছে ধ্রুব ওদিককার বাঁধে। গাছের মাথায় তাকিয়ে দেখে। কী বুঝল, সে-ই জানে। হাঁক দিয়ে বলে, বাজি ধরো তবে, আম ছিঁড়ে এনে দেখাই।

মুহূর্ত দেরি না করে গাছের উপর চড়ে গেল। কাঠবিড়ালির মতো এ-ডাল ও-ডাল করছে। কী হল হঠাৎ—থমকে দাঁড়িয়ে যায়। নদীর দিকে নজর পড়েছে। অবাক কাণ্ড। মাঝনদীতে মানুষ দাঁড়িয়ে। নৌকোও একটা কাত হয়ে পড়েছে, দেখতে পাওয়া যায়।

বিপদে পড়েছে কারা। ডালে ডালে পা ফেলে নামবার ধৈর্য থাকে না। দোতলা থেকে ধ্রুব দিল লাফ মাটিতে। ভিজা কাপড়ে বাঁধ ধরে ছুটেছে। রায়বাড়ির তিনদিক ঘিরে কাটা খাল—পুরানো আমলের গড়-খাই। ডিঙি মিলল একটা সেখানে। ডিঙি খুলে লহমার মধ্যে বড়-নদীতে বেরিয়ে পড়ে।

জল জল আর জল. কূলকিনারা নেই—তার মধ্যে মানুষ। যোগীঋষিরা শোনা যায় জলের উপর দিয়ে হেঁটে বেড়াতে পারেন, এরাও বুঝি তাই। হাঁটছে না, জলের উপর দাঁড়িয়ে আছে স্থির হয়ে। একটির পরনে রঙিন কাপড়চোপড়—রঙিন হওয়ায় সকলের আগে নজর পড়ে। জল কেটে ধ্রুব ছুটল সেদিকে।

গঙ্গাস্নানে পাপক্ষয় করে মীনাক্ষীরা কুসির বটতলা থেকে ফিরছিল। পথের মাঝে বিপত্তি। মাঝগাঙে চর—চরে ঠেকে পানসি কাত হয়ে জল উঠে গেছে। তলির তক্তাও কিছু হয়তো জখম হয়েছে—জল ছেঁচে নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত সঠিক বোঝা যাচ্ছে না। মাঝিমাল্লা সেই কাজে লেগে গেছে। শেষ-ভাটায় এখন ডাঙা জেগেছে, নৌকো থেকে বেরিয়ে মেয়েলোক তিনজন আশ্রয় নিয়ে আছে সেখানে। কিন্তু জোয়ার আসন্ন—কতক্ষণই বা আছে পৃথিবী-টুকু! এখনই ভাসিয়ে দেবে। দেখতে দেখতে হাঁটুভর জল—হাঁটু থেকে কোমর কোমর থেকে গলা। তা-ই বা কেন—মাঝগাঙে ভূরিভোজের আয়োজন কুমির-কামট কি এত অবসর দিতে যাবে?

চরের উপর বোঠের খোঁচ মেরে শক্ত করে ডিঙি ধরে ধ্রুব হাঁক দেয় : উঠে আসুন।

বলার অপেক্ষা মাত্র। এসো ঠাকুরমা—বৃদ্ধার হাত ধরে মীনাক্ষী উঠি কি পড়ি চলল। বড় ভয় পেয়েছে। মায়ের উদ্দেশে ডাক দেয় : চলে এসো।

দায়িত্বভার রাইচরণের উপর। জল সেঁচার কাজ ছেড়ে তাড়াতাড়ি সে এগিয়ে আসে : কোথা চললে ঠাকরুনেরা, উতলা হবার কী? আমাদের নৌকোই তো চালু হচ্ছে এবার।

তাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ধ্রুব মনোরমার দিকে চেয়ে বলে, এদিককার গাঙ-খাল বড্ড খারাপ। কুমির এসে কখন লেজের বাড়ি মারবে ঠিক-ঠিকানা নেই।

জানি গো জানি। মেয়েলোক বলে ভয় দেখিও না! ক্রুদ্ধ হয়ে রাইচরণ বলে, বিলেত থেকে আসছি বাপু, সোনাছড়ির লোক আমরা।

কুমিরের নামে মেয়েরা আরও ব্যাকুল। চক্ষের পলকে ডিঙির উপরে।

অন্যদের যথোচিত কাজের উপদেশ দিয়ে রাইচরণও ডিঙির দিকে আসছে। ধ্রুব হাত নেড়ে বলে, তুমি কেন, তোমায় উঠতে দেবো না। নৌকো তোমার তো চালু হয়ে যাচ্ছে। যদি না হয়, জোয়ারের জলে সাঁতার কেটে বেড়িও।

বোঠের ধাক্কায় ডিঙি সত্যি সত্যি জলের দিকে ঠেলে দিল।

রাইচরণ চেঁচামেচি করে : নিয়ে চলল যে, কী সর্বনাশ! কার নৌকো কি বৃত্তান্ত—মা-ঠাকুরমা-দিদি, আপনারা তো এক কথায় উঠে পড়লেন।

কুমির জলের নিচে চলাচল করে, জলের উপরে আরও বেশি ভয়ের জীব—গাঙে-খালে রাহাজানি করে যারা বেড়ায়। ইদানীং খুবই কম, তাহলেও মানুষের একেবারে ভয় ঘোচে নি। মনোরমা শঙ্কিত কণ্ঠে ডাকলেন : চলে এসো না তুমি। জল তা কি হয়েছে! এইটুকু জলে কাদায় ভয় পেয়ে গেলে?

হাসতে হাসতে ধ্রুবভানু ডিঙি ঘোরাল। রাইচরণ উঠে পড়ে নদীজলে পা ধুতে ধুতে বলে, তুমি কে বলো দিকি? তোমার এত দায়টা কিসের?

হাসি থামিয়ে মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে ধ্রুব বলে, ধরেছ ঠিক। বুদ্ধি আছে তোমার। জোলা-ডাকাত। হায় হায়, কুমিরের মুখ থেকে বাঁচাতে গিয়ে ডাকাতের হাতে পড়ে গিয়েছ।

স্নানের মধ্যে উঠে এসেছে—খালি গা। পাথর কুঁদে যেন শক্ত সুপুষ্ট দেহখানি গড়ে তোলা। জোয়ার এসে গেছে, টান কাটাতে শিরা-উপশিরাগুলো ফুলে ফুলে উঠছে। শিরা যেন ইস্পাতের তার—আওয়াজ বোঠের নয়, তারগুলোই বুঝি কড়-কড় করে উঠছে। জোলো-ডাকাত—চেহারায় সেটা কিছুমাত্র অবিশ্বাস্য ঠেকে না। এ হেন বিপদের মধ্যেও হাসি চিক্‌চিক করে মীনাক্ষীর ঠোঁটে। ঐ এক ধরন মেয়েটার। খাসা লাগছে—নিঃসীম জলের উপর দিয়ে ডাকাতে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। রাবণ রথে তুলে নিয়ে গিয়েছিল, এ মানুষ ডিঙিতে তুলে।

ধ্রুব হঠাৎ রাইচরণের উপর খিঁচিয়ে ওঠে : হাঁ করে কি দেখ? হাতের কাছে বোঠে রয়েছে—দাও না দু-টান টেনে। তাড়াতাড়ি ডাঙায় উঠে যাই।

রাইচরণ একদৃষ্টে মাঝগাঙে নিজ নৌকার দিকে তাকিয়ে। জোয়ারে এখনই জলের উপর ভাসবে—তার আগে ভিতরের জল নিঃশেষে সেঁচে ফেলা দরকার। নিজের চলে আসতে হল এদের এই হাঙ্গামায় পড়ে—তিনটে মেয়েলোক এমনি ছেড়ে দেয় কেমন করে? ধ্রুবর ধমকানিতে সক্রোধে চোখ তুলে তাকাল একবার, ভাল-মন্দ জবাব দিল না। মাইনে-করা মাল্লা নাকি তোমার! বাহাদুরি করে যেমন ডিঙি নিয়ে পড়েছিলে, মরো একলা বোঠে মেরে। রাইচরণকে ডাকো কেন এখন? বয়ে গেছে রাইচরণের!

তা ধ্রুবও পরোয়া করে না। পাকা মাঝি রীতিমতো। সাঁ সাঁ করে ডিঙি ছুটিয়ে নিয়ে চলল। মীনাক্ষীর লজ্জা-লজ্জা করে। হাতের কাছে বোঠে—তুলে ধরল একটু উঁচু করে। বোঠের মাথা হঠাৎ জলে ফেলে ঝপ্‌ঝাস করে দিল টান। টানের পর টান—ঠিক একেবারে মাল্লা মানুষের মতো।

ধ্রুব হাঁ-হাঁ করে ওঠে : রেখে দিন আপনি—

হচ্ছে না বুঝি?

ধ্রুব হেসে বলে, হয়নি এখনো। হতে পারে যে কোন মুহূর্তে। ডাঙাঅঞ্চলের মানুষ বোঠে ধরা শিখবেন কোথা? টাল সামলাতে পারবেন না, জলে পড়ে যাবেন।

রাইচরণের একটু আগের কথাগুলোই মীনাক্ষীর ঠোঁটের আগায় এসে পড়ে : তুমি কে বলো দিকি, তোমার এত দায়টা কিসের?

আরও বলতে ইচ্ছে করে, তোমার ভরসা করে বেরিয়েছিলাম নাকি? যা হবার হত—চরের উপর থেকে কুমিরে মুখে করে নিয়ে যেত। তুমি কি জন্য ডিঙি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লে?

মনে মনে এই সমস্ত কথা, অপরিচিত মানুষকে মুখ ফুটে বলা যায় না। বোঠে ডিঙির উপর তুলে রেখে মীনাক্ষী নিঃশব্দে বসে রইল।

লজ্জিত মুখের দিকে চেয়ে ধ্রুব বলে, তাহলেও ধন্যবাদ। চেষ্টা করেছেন, হাত-পা কোলে করে থাকতে পারেন নি।

ডিঙি বাঁধের ধারে আমতলায় এসে পড়েছে। সকলে নেমে পড়ল। রাইচরণ বলে, দিব্যি ছায়া জায়গা। এইখানটা দাঁড়ান আপনারা মা। ওদেরও ঠাহর হবে, পানসি নিয়ে আসবে এখানে।

ধ্রুব বিরক্ত কণ্ঠে বলে, করো তাই তুমি, গাঙের ধারে দাঁড়িয়ে থাক। ঘরবাড়ি রয়েছে—মেয়েরা কেন থাকতে যাবেন? আপনারা চলে আসুন, বাড়ির মধ্যে গিয়ে বসবেন।

মীনাক্ষী পা বাড়িয়েই আছে। বলে, চলুন। আঁচলটা কাদায় গিয়ে পড়েছিল, ধুয়ে নিতে হবে।

দীঘির পাড় ধরে যাচ্ছে। রাইচরণকেও অগত্যা পিছন নিতে হয়। ঠিক যে কারণে নিজের নৌকো ছেড়ে ধ্রুবর ডিঙিতে ডাঙায় আসতে হয়েছে। জোরে হাঁটা ধ্রুবভানুর অভ্যাস—হারবে কেন মীনাক্ষী, সে-ও চলেছে সমানে তার সঙ্গে।

গাছপালার অন্তরাল থেকে রায়বাড়ি অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল, সামনে এসে মীনাক্ষী থমকে দাঁড়ায়। বিশাল অট্টালিকা। দু-পাশে দুই মন্দির—কালীমন্দির আর কৃষ্ণ-মন্দির, প্রকাণ্ড ফটক মাঝখানে। বাড়ি ঢোকা যেন দেবমন্দিরে ঢোকা, এমনি একটা ভাব মনে আসে। যিনি কৃষ্ণ তিনি কালী—আয়ান ঘোষের ছলনার জন্য বংশীধর কৃষ্ণ নৃমুণ্ডমালিনী কালী হয়েছিলেন। রায়-বংশের পুরুষেরা সেকালে কালী-ভজনা করতেন। মেয়েদের কৃষ্ণ-মন্দিরে যাতায়াত, অন্তঃপুর থেকে কৃষ্ণমন্দির অবধি কড়া পর্দার ব্যবস্থা।

অনোরাও এতক্ষণে এগিয়ে এসেছেন। ধ্রুব ডাকল, আসুন—

রাইচরণ চেনে, নৌকোর মানুষ কে না চেনে বেলডাঙার রায়দের বাড়ি? সবিস্ময়ে বলে, কোথায় নিয়ে চললে? রায়বাড়ি নিয়ে ঢোকাচ্ছ যে?

ধ্রুবভানু ঘাড় নেড়ে বলে, হ্যাঁ—

কাজকর্ম করো বুঝি এঁদের?

মনোরমা তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করেন : রায়মশায়দের কেউ হও নাকি বাবা?

ধ্রুব বলে, ছোটরায় চন্দ্রভানু রায় আমার বাবা।

চকিতে আর একবার দেখে নিয়ে মীনাক্ষী মাথা নিচু করে। মনোরমাও তাকিয়ে পড়লেন : ক' ভাই তোমরা? ছোট রায়-মশায়ের একটি ছেলে তো কলকাতায় পড়া-শুনো করে শুনেছি।

ধ্রুব মৃদু হেসে বলে, ভাই-বোন আমার কেউ নেই। আমি একা।

চোখ বড় বড় করে অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে রাইচরণ বলে ওঠে, রায়মশায় ডাকসাইটে মানুষ। এদেশ সেদেশ একডাকে চেনে তাঁকে। তাঁর মতন লোকের ছেলে হয়ে খালি পায়ে মালকোঁচা মেরে গাঙে গাঙে বোঠে বেয়ে বেড়াচ্ছ, আবার বলো কলকাতায় থাক তুমি।

ধ্রুব বলে, সাঁতার কাটতে কাটতে ছুটলাম, গায়ে জামা পায়ে জুতো ফুল-কোঁচা দেওয়া কাপড় কখন পরি বলো।

মনোরমাকে বলে, দাঁড়ালেন কেন? আমাদেরই বাড়ি, ভিতরে গিয়ে বসবেন।

মনোরমা ঘাড় নাড়লেন : না বাবা, রাই-চরণ ঠিক বলেছিল, আমতলায় গিয়ে দাঁড়ানো ভাল। নৌকোর লোক দেখতে পাবে। নয়তো সারা দেশ খুঁজে খুঁজে বেড়াবে।

ধ্রুব বলে, আমি তার ব্যবস্থা করছি। ডিঙি নিয়ে লোক যাচ্ছে, নৌকোয় খবর বলে আসবে।

না বাবা—

ঘুরে দাঁড়ালেন তাঁরা। মীনাক্ষী আসবার বেলা যেমন, ফিরছেও তেমনি দ্রুত পায়ে। সকলের আগে আগে। মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে দেখে ধ্রুব তিক্ত কণ্ঠে বলে, তা ছুটো-ছুটি কেন? বুড়োমানুষটি যে পেরে উঠছেন না। মুখে আহ্বান করা হয়েছে, জোর করে তো নেওয়া হচ্ছে না?

পাষাণমূর্তির মতো সে দাঁড়িয়ে রইল। ফটক অবধি এসে ছুটে পালানো—পরিচয় বুঝতে পেরে বাড়ি ঢুকতে ঘৃণা? নীহার-নলিনীর ব্যাপারটা নিশ্চয়—সোনাছড়ি বন্দর অবধি চলে গেছে, কোথাও লোকের জানতে বাকি নেই। অপমানে জ্বলছে ধ্রুব। সে আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ল হি-হি করে হাসতে হাসতে রাইচরণও যখন ফিরে চলল। তার কথাই বহাল রইল শেষ পর্যন্ত। নতুন টাকা হয়েছে—লালমোহন মিত্তিরের মাঝি-মাল্লা অবধি দেমাক করে দাঁত দেখিয়ে হেসে যায়।

দুই নদীর মোহানার উপর পর পর দুটো প্রশস্ত বাঁধ। ভিতর-বাঁধের গায়ে কাছারি-বাড়ি। ছাদের উপরে চন্দ্রভানু শখ করে কয়েকটা নতুন ঘর তুলেছেন। একদিকে বাদার জঙ্গল, আর একদিকে ফাঁকা—অনেক অনেক দূরে প্রায় সমুদ্র অবধি নজর চলে। মোটা গুঁড়ি ফেলে কাছারির ঘাট বাঁধানো।

চন্দ্রভানুর নীলবোট ঘাটে এসে লাগল। নামতে গিয়ে তিনি থমকে দাঁড়ান। দৃষ্টি ঘুরিয়ে এদিক-সেদিক দেখেন। আর্তনাদের

মতো সুর বেরুল : নামব না, চারিদিক ঘুরে দেখে তারপরে আমি কাছারি ঢুকব।

রওনা হবার দিনও ঠিক এমনি ঘটেছিল।

মাঝি অবাক। দুপুর গড়িয়ে বিকাল—পেটে দানা পড়েনি কারো। গোন পেয়ে শেষরাত থেকে অবিরত বেয়েছে। তিলেকের তরে চন্দ্রভানু থামতে দেননি। রান্নাবান্না করতে চেয়েছিল মাল্লারা—বললেন, পথে-ঘাটে হ্যাঙ্গামায় কাজ নেই। কাছারিবাড়ি উঠেই রাঁধা-ভাত খাওয়াবো খান পাঁচেক তরকারি দিয়ে।

বিনা বিশ্রামে প্রাণপণে দাঁড় বেয়ে এত তাড়াতাড়ি পৌঁছে দিল। শরীর ঝিমঝিম করছে ক্ষিধেয়। চন্দ্রভানু নিজেও জলস্পর্শ করেননি। নামতে গিয়ে কোন বাধা ঘটে গেল—মাঝিমাল্লাদের সর্বক্ষণ জলে বাস, তারা কিছু জানল না বুঝল না—চন্দ্রভানু কী যেন দেখতে পেলেন জলের উপর, ভয়ংকর কথাবার্তা শুনলেন জলের কলধ্বনিতে—ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলে এই অবেলায় ঘুরে ঘুরে বেড়ানোর হুকুম।

বোটের উপরে থেকেই হল না, চন্দ্রভানু নেমে পড়লেন এক সময়ে বাঁধের উপরে। নিচু হয়ে, কখনো প্রায় মাটিতে শুয়ে পরখ করেন ফাটলের ক্ষীণতম রেখা পড়েছে কিনা কোনখানে। দেখতে দেখতে অনেক দূর চলে গেলেন। ঝুপসি ঝুপসি জঙ্গল, মহিষমারি বলে জায়গাটাকে—পুরানো বাদাবনের কিছু অবশেষ। মহিষখালি কিছুতে ঠেকানো যাচ্ছে না, বৃন্দাবন বলেছিল। শুধুমাত্র বাঁধ ভেঙেই জল নিরস্ত নয়, সরু এক খালের রেখা হয়ে দাঁড়িয়েছে অনেকখানি দূরে অবধি। সবুজ বনের উপর দিয়ে ক্ষীণ উপবীত-সূত্রের মতো। এখন নগণ্য চেহারা, বিস্তার এক হাত দেড় হাতের বেশি নয়—কিন্তু এই তল্লাটের উচ্ছৃঙ্খল সুচতুর জলকে বিশ্বাস নেই। তুচ্ছ জলরেখা কোন এক কোটালের কয়েকটা দিনের মধ্যে দুস্তর হয়ে ওঠে। দু-বছর চার বছরে ভয়াল এক নদী—এপারে-ওপারে নজর চলা কঠিন। সেই কাণ্ড বুঝি এখানেও হতে চলেছে। সাগরচক ভূমির অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে দ্বীপ বানাবে, পুরোপুরি নিজের কুক্ষিতে নিয়ে ফেলবে। আক্রমণ তারপরে চতুর্দিক থেকে—নিঃসীম জলের মধ্যে সামান্য এতটুকু ডাঙা কতদিন যুঝতে পারে, দেখে নেবে তখন। সেই অবস্থা খুব যে বেশি দূরে, মনে হয় না।

এর পরে চন্দ্রভানু যেন পাগল হয়ে উঠলেন। আজ এখানে, কাল সেখানে—পাগলের মতন ছুটোছুটি। নদী শান্ত করা যায় কেমন করে। ভাল ভাল লোক এনে দেখাচ্ছেন। চিরকাল যারা এই সব নদীর চালচলতি দেখে আর হাঁকডাক শুনে ভিতরের মতলব ধরে ফেলে, এক মুঠো মাটি হাতে তুলে তল্লাটের মাটির গুণাগুণ বলে দেয়। তেমনি সব অভিজ্ঞ লোক। একজনে এক এক রকম বলে, ভরসা করা যায় না। সদরে গিয়ে সেচ-বিভাগের সঙ্গে কথাবার্তা বললেন। সেখান থেকে কলকাতা। বিস্তর ধরাপাকড় করে বহুদর্শী ইঞ্জিনিয়ার নিয়ে ফিরলেন। ধরেছেন চন্দ্রভানু ঠিকই—জলের গর্ভে চকের তলিয়ে যাওয়া নিতান্ত অসম্ভব নয়। ঠেকানো দুষ্কর বটে। স্রোতের টান ঘুরিয়ে দিতে হবে কায়দাকৌশল করে। অবস্থা এমনি দাঁড় করাতে হবে—চড়া পড়বে এদিকটা, নদীর যত কিছু ভাঙন ভিন্ন পারে। আপাতত একটা কাজ করে দেখুন—ডাঙা থেকে নদীর সিকিভাগ অবধি বাঁধ দিয়ে যান। সে বাঁধ একটি দুটি নয়—একশ দেড়শ হাত অন্তর চলবে। সাগরচকের এলাকা শেষ হবে, তারও পরে খানিকটা দূর অবধি। দুটো বাঁধের মাঝে বালি জমে জমে চর পড়ে আসবে। বাঁধ অবশ্য ভাসিয়েও নিয়ে যেতে পারে। সঠিক কিছু বলা যাবে না, তবে রক্ষার উপায় একটা বটে। করে দেখুন তো রায়মশায়, কী রকমটা হয়।

সেই আয়োজন চলল। মাটি ফেলা শুরু হয়ে গেছে। ঘাট-সত্তরে কী হবে, অনেক বেশি লোক লাগানোর দরকার। শ-পাঁচেক অন্তত। জলের বেগ আটকাতে স্রোতের জলের মতোই পয়সা খরচ। হচ্ছে সেই সব ব্যবস্থা। এমনি সময় এক রাত্রিবেলা হঠাৎ তুমুল কাণ্ড। মহিষমারির কঠিন পুরানো বাঁধ জলের তোড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। শোরগোল তুলে শত-সহস্র মুখে নদীজল ঢুকছে। মানুষও যে যেখানে ছিল আর্তনাদ করে এসে পড়ল। জল ঠেকানোর হরেক চেষ্টা। এমনি মাটি ফেলে লাভ হচ্ছে না, চক্ষের পলকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। গায়ে গায়ে বাঁশের খোঁটা পুঁতে দেদার খড় এনে জড়াচ্ছে খোঁটার গায়ে। এইবারে মাটি। এমনি ভাবে জলের বেগ কিছু কমল।

সারারাত্রি ও সারাদিনের পরিশ্রমে কোন রকমে জল আটকানো গেল। কিন্তু ক্ষীণ বাঁধের পরমায়ু কতক্ষণ—যখন খুশি ভাসিয়ে নিতে পারে। এত লোকের আকুতি দেখে করুণার্দ্র হয়েই যেন বাঁধটুকু থাকতে দিয়েছে। জলরাশি রোদে চিকচিক করছে—চন্দ্রভানু মুখ ফিরিয়ে নেন। মনে হল, তাঁরই দিকে চেয়ে ব্যঙ্গ করছে অকূল হাসি বিস্তার করে।

সাগরচকের কেউ কিছু জানে না, চন্দ্রভানু রাতদুপুরে নীলবোটে গিয়ে উঠলেন। চোরের মতন পালিয়ে যাওয়া—টিলায় টিলায় সেই আর্তনাদ উঠেছিল, তাই বুঝি তাড়িয়ে তুলল তাঁকে। সন্ধ্যাবেলা মাঝিকে একটুমাত্র ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছিলেন, চলে যাবার প্রয়োজন হতে পারে। তৈরি হয়ে বোটের মধ্যে তারা বসে আছে। প্রবল টান—কুটো-গাছটি ফেললে বুঝি দুখানা হয়ে যাবে। টানের পড়ে গিয়ে বোট হু-হু করে ছুটতে লাগল।

ভরা পূর্ণিমা সেদিন, জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটেছে। চন্দ্রভানু বোটের ছাদের উপর উঠে বসলেন, ছাদ থেকে বাষ্পাচ্ছন্ন চোখ চারের দিকে তাকিয়ে রইলেন। যেন সম্বিত নেই। অনেকক্ষণ পরে অস্পষ্ট আদেশ বেরুল : সোনাছড়ি বন্দর—

সোনাছড়ি দেখতে দেখতে জেগে উঠেছে। অঞ্চল জুড়ে লালমোহন মিত্তিরের খাটি, তার যাবতীয় বন্দোবস্ত এই ফুলছড়ির গদি থেকে। গদিরই লাগোয়া লালমোহনের নতুন বাড়ি। খবর গেল। কানে শুনে লালমোহনের বিশ্বাস হয় না। জ্যোৎস্নায় চন্দ্রভানু ঘাটে এসে বোট বেঁধেছেন, নিজে চলে এসেছেন দেখা করার জন্য। দেখ তো আজ সকালে আকাশের সূর্য কোনদিকে উঠেছে—পুবে অথবা পশ্চিমে?

হন্তদন্ত হয়ে লালমোহন ঘাটে ছুটে গেলেন। কৃতাঞ্জলিপুটে বলেন, কি আদেশ?

আপনার প্রস্তাবে আমি রাজি। আপনার সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক হবে আমার—

কিসে কি হল, লালমোহন বুঝতে পারেন না। মত হঠাৎ ঘুরে গেল কিসে?

চন্দ্রভানু নিজেই ক্রমশ প্রকাশ করে বলছেন, আপনার কন্যা আমার কুললক্ষ্মী হবে। কিন্তু বরপণ লাগবে, আমাদের রায়-বাড়ির যা রেওয়াজ—

লালমোহন কৃতার্থ হয়ে বলেন, নিশ্চয় দেবো। তখনই তো বলেছিলাম। আমার ঐ এক মেয়ে। সাধ মিটিয়ে সাজিয়ে দেবো।

চন্দ্রভানু বললেন, আজামোজা কথায় কাজ এগোবে না মিত্তিরমশায়। কথাবার্তা শেষ করে যাবো বলে নিজেই চলে এসেছি। দাবিটা আমি না হয় খোলাখুলি টাকার অঙ্কে বলি—

নতুন নতুন বাঁধ বাঁধা এবং নতুন খাল কেটে স্রোতের গতি ঘোরানো—সমস্ত ব্যাপারের মোটামুটি একটা হিসাব তৈরি হয়েছে। চন্দ্রভানু নিজের সঙ্গতিতে খানিকটা পারবেন। বাকি অঙ্কটা বলে দিলেন। শিহরণ লাগে লালমোহনের, উৎসাহ চুপসে আসে।

মুখের দিকে বক্রদৃষ্টিতে চেয়ে চন্দ্রভানু বললেন, ব্যবসাদার মানুষ—লাভ-লোকসান মনে মনে খতিয়ে দেখছেন। দামটা বুঝি বেশি বলে ঠেকছে?

লালমোহন তাড়াতাড়ি বলেন, তা নয়। দেশ থেকে সবাই তো এসে গেছেন। আমার মা রয়েছেন। সকলের সঙ্গে কথা বলতে হবে একবার—

শেষ করতে না দিয়ে চন্দ্রভানু আগের কথা ধরেই বলে যাচ্ছেন, বাইরে থেকে এসে অঢেল টাকা করেছেন, এবারে প্রতিষ্ঠা চাচ্ছেন অঞ্চলের মধ্যে। রায়বাড়ির সঙ্গে কুটুম্বিতা করবেন, খরচ সেজন্য বেশিই হবে। চিংড়ি-খাটির হিসাব ধরে তুলনা করতে যাবেন না।

কথায় গা পচে যায় না, অপমানের কথা লালমোহন গায়ে মাখেন না। মিনমিন করে বললেন, হিসাবের কি তুলনা করব রায়-মশায়। যদি কিছু করতে হয় সে আমার সঙ্গতির হিসাব।

হাঁকি দিয়ে তৎক্ষণাৎ মাঝিকে ডেকে চন্দ্রভানু বললেন, তোমার দাঁড়িরা সব নেমে গেল কেন? ছুটে গিয়ে ডেকে আনো, রওনা হতে হবে।

রওনা হবেন কেন? জবাব আমি দিইনি তো এখনো—

হতভম্ব হয়ে গেছেন লালমোহন, হেসে ব্যাপারটা লঘু করতে চান। বললেন, কন্যা-দায় মাথার উপর—এ সময় নিজের বুদ্ধি গুলিয়ে যায়, বুদ্ধিশুদ্ধি অন্যের কাছে নিতে হয়। আমি সেই কথাটাই বলছিলাম।

আমারও মাথায় মস্ত দায়। বেশ কথা, গোনের ঘণ্টা দুই-তিন বাকি এখনো।

উজান ঠেলে যাওয়ার কথা ভাবছিলাম। কাজ নেই, রইলাম এখানে জোয়ার অবধি। শলাপরামর্শ যা-কিছু এই সময়ের মধ্যে সেরে আসুন গে।

লালমোহন করজোড়ে বলেন, এখানে জলের উপর কেন থাকতে যাবেন? ঘাটের উপরেই কুঁড়ে-ঘর আমার, ঘরে এসে বসুন। মেয়ে দেখাটাও হয়ে যাবে।

চন্দ্রভানু ঘাড় নেড়ে অবলীলাক্রমে বলেন, দরকার কি? আপনার মেয়ে রূপবতী—সে তো বলেছিলেন আমার বাড়িতে। হয় যদি, আমার সেটা উপরি লাভ। কিন্তু আপনার কোন লাভ নেই। বরপণ তার জন্য কমবে না। রূপ নিয়ে রায়বাড়ির মাথাব্যথা নেই। রায়বাড়ির কনে দেখা হয় কথাবার্তা পাকা করে একেবারে সেই আশীর্বাদের দিনে। পাত্র বউ দেখতে পায় শুভদৃষ্টির সময়। কুশ্রী হলেই বরঞ্চ আমাদের বেশি পছন্দ—রূপের দাপ থাকে না। সংসার নিয়ে পড়ে থাকে সেই বউ, অসুরের মতো খাটে যায়।

কিছু কড়া হয়ে বললেন, আপ্যায়নে আপনি কিন্তু অনেক সময় নষ্ট করছেন মিত্তিরমশায়। জোয়ারের প্রথম মুখে বোট আমি ছাড়বই—তার মধ্যে জবাব না পেলে ধরে নেবো আপত্তি রয়েছে। সম্বন্ধ আরও কয়েকটা আছে, কোন একটা পাকাপাকি করে তবে ফিরে যাব।

চন্দ্রভানু বোটেই রয়ে গেলেন। লালমোহনকে দিশা করতে দেন না, তাড়িয়ে তুললেন একেবারে। চন্দ্রবাবুর আসার খবরটা ইতিমধ্যে চাউর হয়ে গেছে। কি প্রস্তাব নিয়ে উপযাচক হয়ে চলে এসেছেন, শোনবার জন্য বাড়ি উন্মুখ। ডাকতে হল কাউকে। এমন কি ভক্তদাসও এসে দাঁড়িয়েছে।

লালমোহন রাগে গরগর করছেন: দেবো না বিয়ে। টাকার জন্যে সম্বন্ধ করতে এসেছে। টাকায় পুষিয়ে দিয়ে মেয়ের বদলে একটা কলসি কি একটা বালিশ কনে-পিঁড়িতে বসিয়ে সাতপাক ঘোরালেও বোধ হয় আপত্তি করবে না।

লালমোহনের মা গিন্নিঠাকরুন বলেন, মেয়ে তোমার এই একটি বই তো নয়। দিলেই না হয় টাকা। টাকা হয়েছে, সেই জন্যেই বলি। দাদাভাইরা সমস্ত কিছু পাবে কেন, দিদি কি আমার ফেলনা? দিদি আমার গাঙের জলে ভেসে এসেছে?

সেকথা আমিই ছোটরায়কে আগে বলেছি। তাই বলে বেহিসাবি একটা চাইবে?

হিসাবের কথা হলে ভক্তদাসের এক্তিয়ারে পড়ে। সে বলে ওঠে: দিন না দেবেন না দেবেন আলাদা কথা। বিবেচনা করে দেখুন, হিসাব কিন্তু বেঠিক নয়। মহলগুলো খাটি, সব জায়গায় চারটে পাঁচটা করে পাহারাদার। শুধু মাইনে আর বারবরদারি বাবদ কত পড়ে, খতিয়ে দেখুন। এক বছর দু-বছরের ব্যাপার, তা-ও নয়—চিরকাল ধরে চলবে। এর উপরে পুলিশের তদ্বির রয়েছে। বিয়ে যদি হয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে পাহারা বাতিল। ছোটরায়ের বেহাইয়ের জিনিস—ভূতেও তাকিয়ে দেখবে না।

এতটুকু মিথ্যে [illegible] আরও আছে। ছোটরায় নিজে এসেছেন—এই অবস্থায় ভেস্তে দিলে আমাদের আর রক্ষে রাখবেন না। পাততাড়ি গুটিয়ে ঘরে ফিরতে হবে। পুলিশ সর্বক্ষণ মোতায়েন রেখেও সামলানো যাবে না।

সবিস্তারে শুনে মনোরমাও বিরূপ। তিক্তকণ্ঠে বলেন, কেবল ব্যাপারবাণিজ্যই ভাবছেন ম্যানেজারমশায়, মেয়ের দিকটা দেখবেন না? আমি আরও অনেক খোঁজ নিয়েছি। রায়বাড়ির বউয়ের সুখ হয় না, পুরুষেরা বেয়াড়া। আধবুড়ো ঐ ছোটরায়েরই ব্যাপার দেখুন না—স্ত্রী বর্তমান থাকতে কেলেঙ্কারি ঘর অবধি টেনে এনেছেন।

ভক্তদাসের সুর সঙ্গে সঙ্গে পালটে যায়: বটেই তো! সাতপাকের বিয়ে চোদ্দবার উল্টো-পাক দিয়েও খসানো যায় না। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সকল দিক দেখতে হবে বইকি! বলেছেন খাঁটি কথা। রায়বাড়ি আর দশটা গৃহস্থালির মতন নয়। ধরন-ধারণ আলাদা। সুন্দরবনের বাঘ মরে গিয়ে রায়েদের ঘরে জন্ম নেয়। বিশ্বাসও হয় সেকথা।

বিষম সমস্যা। তবে একথাও ঠিক, একালের রায়বাড়ি বদলে যাচ্ছে। অনেক বদলেছে, আরও বদলাবে। জেলো-ডাকাত জলে জঙ্গলে বেড়াত—ভূমিলগ্ন হয়ে চকদার হয়েছে। পাত্র শহরে থেকে পাশের পর পাশ দিচ্ছে—সে কি আর বাপ-পিতামহের মতো হবে!

জোয়ারের আরও কিছু দেরি, অতএব পরামর্শ লম্বা হতে বাধা নেই। বুড়োমানুষ গিন্নিঠাকরুন বেশিক্ষণ বসতে পারেন না, নিজের ঘরে এসে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছেন। শাড়ি খস খস করে অন্ধকারে মীনাক্ষী এসে পায়ের কাছে বসল।

গিন্নিঠাকরুন বলেন, কি দিদি?

মীনাক্ষী বলে, পূর্ণিমায় বাতের অসুখ বেড়েছে তোমার। হাত-পা কামড়াচ্ছে। তাই একটুখানি টিপে দিতে এলাম ঠাকুরমা।

কে বলল তোকে? কিছু হয়নি আমার। যা তুই, কষ্ট করতে হবে না। আমি ঘুমোই।

মীনাক্ষী জেদ করে বলে, প্রতি অমাবস্যা-পূর্ণিমায় তো বাত বাড়ে, হাত-পা কামড়ায়। না বললেই শুনব? তোমার ঘুম ধরেছে ঠাকুরমা, তাই গোপন করছ। না-ই কামড়াল হাত-পা, তা বলে একটুখানি টিপে দিলে বুঝি দোষ!

ঠাকুরমা বলেন, এতক্ষণ ছিলি কোথায় দিদি? কথাবার্তা সব শুনেছিস?

বয়ে গেছে আমার! ঝংকার দিয়ে উঠে মীনাক্ষী পা টিপতে লেগে যায়। ক্ষণপরে বলে, অনেক টাকা চাইছে বুঝি? তা ঠাকুরমা, নাতনিটি তোমার কেমন তা-ও তো দেখতে হবে! টাকার লোভে নিতে যাচ্ছে—বিনি টাকায় কে ঘরে নেবে বলো!

ঠাকুরমা চটে গিয়ে বলেন, টাকা দেবার কথা আমিও বলেছি তোর বাপকে। তার জন্যে মিছামিছি তুই নাতনির নিন্দে করবি নে। মানা করে দিচ্ছি। টাকার জন্যে যে আটকাচ্ছে তা-ও ঠিক নয়। ও-বাড়ির পুরুষগুলো বদ—বনের বাঘ মরে মরে ঐসব পুরুষ হয়েছে, ম্যানেজার বলছিল। বড় ভয়ানক।

মীনাক্ষী এবারে স্পষ্টাস্পষ্টি বলে, সেই জন্যেই আরও যেতে চাই।

কেন রে?

বিড়াল পুষে বশ করে তো সবাই। বাঘ বশ করায় বাহাদুরি। ডাঙাঅঞ্চলের মানুষ বলে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে ওরা। ক্ষমতাটা দেখিয়ে দিতে চাই আমি।

এমনি সময় চটিজুতোর শব্দ বাইরে। পরামর্শ শেষ করে লালমোহন চলেছেন। গিন্নিঠাকরুন ছেলেকে ডাকছেন: ও লালু, শোন। কি ঠিক করলে তোমরা? আমাদের কথাটাও তো শুনে নেবে।

মীনাক্ষী আর নেই। ফুড়ুত করে যেন পাখি হয়ে উড়ে চলে গেছে।

সোনাছড়িতে কথাবার্তা পাকা হল তো সেখান থেকে সদরে। বিয়ের কেনা-কাটা কিছু আছে। কিন্তু আসল ব্যাপার হল—নদীর সঙ্গে পুরোপুরি এবার লড়াইয়ে নামা, সেই আয়োজন। বিশেষজ্ঞ চলে যাবেন সাগরচকে, নক্সা বানাবেন। যন্ত্রপাতি কিছু যাবে বাইরে থেকে। এইসব ব্যবস্থায় দিন দশেক কেটে গেল। সদর ছেড়ে তারপর চন্দ্রভানু বাড়ি চলে এলেন।

ইন্দুমতীর আরও খারাপ অবস্থা। হাতখানাও উঁচু করে তুলতে পারেন না এখন। কিন্তু চোখে আগুন। একবার নীহারনলিনী আর একবার স্বামীর দিকে চেয়ে তিনি ভ্রূকুটি করলেন: অসময়ে হঠাৎ? চকে মন টিঁকল না বুঝি?

মুখে বিষের থলি। সর্ব অঙ্গ গিয়ে মুখটাই বজায় রয়ে গেছে বিষ ছড়ানোর জন্যে। কথা কাটাকাটি করতে প্রবৃত্তি হয় না, অবসন্ন কণ্ঠে চন্দ্রভানু বললেন, আসতে হল ছোটবউ তোমারই সংসারের জন্য। ধ্রুবর বউ ছাড়া কারো আঁচলে তুমি যে চাবি দেবে না। নতুন বউকে শিখিয়ে পড়িয়ে দায়ভার দিতেও সময় লাগবে। বিয়ে ঠিক করে এলাম। ধ্রুবকে জরুরি খবর দিয়ে পাঠিয়েছি। এখনো আসেনি—কাল-পরশুর মধ্যে ঠিক এসে পড়বে। শুভকর্ম মিটিয়ে দিয়ে একনাগাড় এবার থেকে চকে গিয়ে থাকব।

এরপর চন্দ্রভানু আর স্ত্রীর ছায়া মাড়ান না, দোতলার সিঁড়িতেই পা ছোঁয়ান না একেবারে। ইন্দুমতী যা বললেন, তেমনি সন্দেহ আরও কতজনের মনে ঘুরছে! এই নিয়ে কথা উঠবার সুযোগ দেবেন না। বৈঠকখানায় দিনরাত্তের আস্তানা। প্রকাণ্ড হল, অতিকায় থাম সারি সারি। সেইখানে ফরাসের উপর বসে নিজের ডানহাত চিতিয়ে চোখের সামনে ধরে চুপচাপ বসে দেখেন। মানুষের সঙ্গ ভাল লাগে না। কেউ এসে পড়লে দু-কথায় বিদায় করে বাঁচেন। হাতের হিজিবিজি রেখাজালের মধ্যে যেন সাগরচকের গোটা অঞ্চল নিয়ে মানচিত্র। কোথাও নদী কোথাও খাল কোথাও টিলা কোথাও বা ক্ষেত। কত ছুটোছুটি করছেন এদের উপর দিয়ে—সমস্ত যৌবন কেটে গেছে। জীবনের অপরাহ্ণে এসে নদী-খাল বিদ্রোহী—দু-পুরুষ ধরে সাজানো সাগরচক টেনে জলতলে নামিয়ে নিয়ে নিশ্চিহ্ন করবে।

গড়গড়া নিয়ে গেল। কলকাতা থেকে ধ্রুব এসে গেছে, বুঝি মায়ের ঘরেই আছে সে এখন। মেলানো হাত মুঠি হল—মুঠিতে নল ধরে চন্দ্রভানু গড়গড়া টানছেন। চোখ বুঁজে আসে—বোধহয় চিন্তায়। কিম্বা হয়তো আরামে। অনেকক্ষণ কাটল।

পায়ের শব্দে চোখ মেলেন : ধ্রুব?

আমি নকড়ি। চক থেকে একদল প্রজা এসেছে, দরকার আছে আপনার কাছে।

চন্দ্রভানু ভ্রুকুটি করলেন : রায়বাড়ি কোনদিন আসে না কোন প্রজা। আসবার কথাও নয়। কত জায়গায় আমার ছুটোছুটি—বাড়ি এসেছি, তা-ই বা ওরা জানল কি করে?

খোঁজে খোঁজে এসে পড়েছে। সদরেও গিয়েছিল। নাকি উপায় নেই।

আসামি খুঁজতে বেরিয়েছে! জ্বলছেন চন্দ্রভানু মনে মনে। বিশাল পরিবারের যাবতীয় প্রয়োজন তারই, চিরকাল জুগিয়ে এসেছে। বিপদের মুখে রাত্রিবেলা পালিয়ে আসা—পলাতক আসামি ছাড়া অন্য কি ভাবতে পারে?

নকড়ি মৃদুকণ্ঠে বলে, ঘন্টাঘরের নিচে সব দাঁড়িয়ে আছে।

কী করতে হবে আমায় বলো। পাদ্য-অর্ঘ্য নিয়ে ছুটতে হবে? ধাপে ধাপে গলা চড়ছে চন্দ্রভানুর : প্রজা এসেছে—তাই নিয়েও যদি আমায় বিরক্ত করবে, তোমরা আছ কি জন্যে?

নকড়ি হাত কচলে বলে, খাজনা নেবার ক্ষমতাই আমাদের। যদি খাজনা দিতে আসত, নিয়ে নিতাম। আপনা অবধি খবর দেবার কারণ হত না।

রায়বাড়ি তাদেরও অন্য কাজ নেই ঐ খাজনা দেওয়া ছাড়া। বাকি সব রায়েরাই নিজে থেকেই করে আসছে। বাতলে দিতে হয় না।

নকড়ি বলে, বরাবর হয়ে আসছে তো তাই। এবারেই উল্টো-পাল্টা দেখি। হাতে করে লিখিত দরখাস্ত নিয়ে এসেছে।

জবাব দিলেন না চন্দ্রভানু। গড়গড়া টেনে যাচ্ছেন। কাচুমাচু মুখ করে নকড়ি দাঁড়িয়ে। লম্বা একফর্দ বালির কাগজ ঈষৎ নাড়া-চাড়া করে।

মুখ থেকে নল সরিয়ে চন্দ্রভানু বললেন, পড়ো একটু—কি লিখেছে, শোনা যাক।

পড়ছে নকড়ি : মহিমার্ণব হুজুরে বিশাল বটবৃক্ষ-স্বরূপ। আমরা যাবতীয় সন্তান-সন্ততিগণ সুশীতল ছায়ায় পরম শান্তিতে বসবাস করিতেছিলাম—

চন্দ্রভানু হো-হো করে হেসে উঠলেন : খাসা লিখেছে হে! বটবৃক্ষের উপমা—ঝড়-ঝাপটা যতই আসুক বটবৃক্ষ কাবু হয় না। ইস্কুল বসিয়ে কাজ হয়েছে তবে? মুশো-বিদা হেডমাস্টারের ঠিক—অন্য কাজ নেই, বসে বসে দরখাস্ত লিখেছে। মোদ্দা কথাটা কি নকড়ি—নিরবধি বাঁধ ভাঙছে, এই তো?

নকড়ি বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ। চকের দক্ষিণ অংশে লবণাক্ত জলের ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে—

গড়গড়ার নলে মুখ দিয়ে চন্দ্রভানু ঘন ঘন টানতে লাগলেন। অর্থাৎ যা শোনবার হয়ে গেছে, আর শুনে চান না। একটা কিছু জবাব না পেয়ে নকড়িও যেতে পারছে না। চুপচাপ আছে।

ধ্রুব কখন এসে দাঁড়িয়েছে পিছন দিকে। বলে উঠল, তারা দেখা করতে চায় বাবা। মুখে সমস্ত বুঝিয়ে বলবে।

মুখ ফিরিয়ে ছেলের দিকে তাকিয়ে চন্দ্রভানু বলেন, তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে নিশ্চয়। বলেছেও যা বলবার?

হ্যাঁ—। ঘাড় নাড়ে ধ্রুব : কিন্তু আমার বলে কি হবে? প্রতিকার তো আমার হাতে নেই।

আছে। তোমার হাতেই সব। বোসো তুমি। আমার জরুরি ডাক সেইজন্য।

নকড়ির দিকে চেয়ে বললেন, রাত্রে দেখা হবে না। মণ্ডপবাড়ি চলে যাক। বেরিয়ে গেলে দারোয়ানকে দেউড়ি বন্ধ করতে বলো। রাত্রে কি জন্যে ফটক খোলা থাকে, কাল তার কৈফিয়ৎ তলব হবে।

নকড়ি চলে গেলে চন্দ্রভানু আরও কিছুক্ষণ ধূম উদ্গীরণ করলেন। টিক-টিক করে দেয়াল-ঘড়িতে সময় যাচ্ছে। মুখ তুলে হঠাৎ বললেন, তোমার বিয়ে সাব্যস্ত করে এসেছি ধ্রুব। লালমোহন মিত্তিরের মেয়ে। কাল ওরা আশীর্বাদ করতে আসবে। দশ দিন পরে আঠাশে তারিখ বিয়ে।

আবার বলেন, উপায় কি বলো। এর পরেই অকাল পড়ে যাচ্ছে। এক মেয়ে ওদের, অদিনে অক্ষণে দেবে না। তিন মাস তাহলে বসে থাকতে হয়। তারা পারলেও আমি পারব না।

ধ্রুবভানু যেন পাথর হয়ে গেল। বলে, জরুরি ডাক পেয়ে মায়ের কথাই মনে হল আমার। পরীক্ষার মুখ হলেও ছুটে এসে পড়েছি।

চন্দ্রভানু বলেন, আজকেও না এসে পৌঁছলে আমি নিজে চলে যেতাম। দিনক্ষণ পাকাপাকি করে দশের মুকাবিলা লগ্নপত্র করে এসেছি।

ধ্রুব বলে, আমার পরীক্ষা সে ঠিক ঐ সময়টা। দিন নেই রাত নেই জীবন-পণ করে খাটছি।

পরীক্ষা বাতিল।

বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে ধ্রুব নিঃশব্দে উঠে পড়ল। চন্দ্রভানু বললেন, কিছু বলে গেলে না?

আমার মতামত জানতে চাও বাবা?

অমত নয়। সুশীল সুবোধ ছেলের মতন ঘাড় নেড়ে হাঁ বলে যাবে, এইটে চাচ্ছি। এ-বাড়িতে বরাবর যা হয়ে এসেছে। আমিও যেমন একদিন আমার বাবার কাছে হাঁ দিয়েছিলাম।

কিন্তু চন্দ্রভানুর কৈশোরের সে দিন-কাল বদলে গেছে। আলাদা রায়বাড়ি এখন। বাপের কথার জবাবে ধ্রুবভানু বলে, যদি না পারি?

পারলে ভাল ছিল। তুমি মনের খুশিতে থাকতে পারতে, আমিও হাসিমুখে কাজে নামতাম।

একটু থেমে কঠিন কণ্ঠে বললেন, তোমার অমতে কাজের অবশ্য কোনই ক্ষতি হবে না। লালমোহন মিত্তির আশীর্বাদ করে যাবে, আঠাশে তারিখ ঢোল-শানাই বাজিয়ে সোনাছাড়ি বন্দরে গিয়ে তুমিও ঠিক বরাসনে বসবে।

নকড়িকে দ্বারপ্রান্তে দেখা গেল এমনি সময়।

আবার কি নকড়ি?

মণ্ডপবাড়ি তালাবন্ধ। মহাদেব দারোয়ান বলল, চাবি আপনার কাছে।

তাই বোধহয় হবে। চন্দ্রভানুর হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেল। হাসতে হাসতে বলেন, পুজোর পর মহাদেব দেশে যাচ্ছিল, মণ্ডপ-বাড়ির চাবি দিয়ে গিয়েছিল বটে আমায়। সে চাবি আমি ছোটবউকে দিয়ে দিলাম।

ধ্রুব শশব্যস্ত হয়ে বলে, মা'র কাছ থেকে নিয়ে আসি আমি।

চন্দ্রভানু সজোরে ঘাড় নেড়ে উঠলেন : না—

তা হলে ওরা থাকবে কোথায় বাবা? খাবেই বা কি?

মস্তবড় দীঘি রয়েছে—খাবে দীঘির জল। থাকবে আমতলায়।

ছেলেকে ঠেশ দিয়ে বলছেন, কলকাতার তেতলা ঘরে থাকা অভ্যাস নেই—ওরা বেশ পারবে। নোনাঅঞ্চলের মানুষের মুখে অমৃতের মতো লাগবে আমাদের দীঘির জল। উতলা হোয়ো না তুমি—রোগামানুষ ছোটবউকে চাবির জন্য রাত্রিবেলা বিব্রত করব না।

নকড়ির দিকে ফিরে তিক্তস্বরে বলেন, তুমি আজকের মানুষ নও নকড়ি। ব্যাপার কোথায় গিয়ে ঠেকেছে বুঝে দেখ। চকের মানুষদের ভাসিয়ে দিয়ে আমি যেন আরাম করে অট্টালিকায় এসে বসেছি। এতদূর অবিশ্বাস করছে আজ, এত আলাদা করে দেখছে। দল বেঁধে দরখাস্ত নিয়ে চকের কথা মনে করিয়ে দিতে এলো। রায়বাড়ির দেউড়ি পার হয়ে উঠানের উপর জমায়েত হয়ে দাঁড়াল।

মুহূর্তকাল স্তব্ধ থেকে আবার বলেন, বাইরে যেমন, ঘরের ব্যাপারেও ঠিক তাই ছেলের বিয়ে ঠিক করে এসেছি, তা নিয়েও কথা কাটাকাটি। বিয়ে করবে, তার জন্যে নাকি মতামতের দরকার। কী হয়ে গেছে সব, কী ভেবেছে—বলো দিকি! সাগরচক যেন আমার নয়! ছেলে যেন আমার নয়! নদীগুলো যা করছে, এ-ও তাই—বাঁধ ভাঙারই ব্যাপার। কোনদিকে আর বাঁধ রাখা যাচ্ছে না নকড়ি।

কলকে বদলে দিয়ে গেছে, গুম হয়ে চন্দ্রভানু তামাক টানতে লাগলেন। নকড়ি চলে যাচ্ছিল—চন্দ্রভানু বললেন, কাল সকালবেলা ফটক খোলার পরেও সাগরচকের একটি প্রাণী উঠোনের ত্রি-সীমানায় যেন ঢুকতে না পারে। দারোয়ানকে বলে দিও নকড়ি। আর বাড়ির ভিতরের কেউ যদি বেরুতে চায়, তাকেও বেরুতে দেবে না আমার হুকুম ছাড়া।

নকড়ির মুখে কথা সরে না। চন্দ্রভানু আরও স্পষ্ট করে বললেন, ধ্রুবর কথাই বলছি। কাল পাত্র-আশীর্বাদ—আশীর্বাদ শেষ হবার আগে ধ্রুব রায়বাড়ি থেকে বেরুবে না।

ধ্রুবভানুর হাসিমুখ। হেসে বলে, আটক করলে বাবা?

চন্দ্রভানু ঘাড় নাড়েন : অন্যায়ের সাজা পাবে বইকি! চকের মানুষদের গাছতলায়, তোমায় আবদ্ধ ঘরে। তালাও আটকাবে, যদি প্রয়োজন হয়।

কিন্তু ঘরে আটক করেই কি ঠেকাতে পারবেন? ঠেকানো যায় না।

চন্দ্রভানু বলেন : কী জানি, আমি তো বরাবর এই করে এসেছি। বাঁধ আটকে জল ঠেকিয়েছি, দরজা আটকে মানুষ। বাঁধে এখন আর বাগ মানছে না, মানুষই বা কী করে দেখা যাক।

অনেক—অনেক রাত্রি। রায়বাড়ি একেবারে নিশুতি। চন্দ্রভানু ছেলের ঘরের দরজায় নাড়া দিলেন। খিল আঁটা নেই, দরজা হাঁ হয়ে পড়ল। ঘুমোয়নি ধ্রুব। বই একটা সামনে রয়েছে, কিন্তু পড়ছেও না। বাপকে দেখে চকিতে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

চন্দ্রভানু হেসে ওঠেন। ছেলেমানুষের মতো উচ্ছলিত সরল হাসি। এই নিশি-রাত্রে বাইরের কেউ নেই, ইজ্জতের প্রশ্ন নেই। বাপ আর ছেলে—একেবারে ভিন্ন মানুষ বাপ এখন।

বড্ড রাগ হয়েছে—না-রে? আমার স্বভাবটা হুবহু পেয়ে গেছ তুমি। বিয়ের সময়টা আমিও ঠিক এই করেছিলাম।

পাশে বসে পড়লেন। হাসিমুখে ছেলের গায়ে হাত রাখলেন। ধ্রুবর সর্বদেহ কঠিন—বুঝি রক্ত-মাংসের নয়। বুঝি নিশ্বাসও পড়ে না। ইস্পাতে গড়া অচঞ্চল কঠিন মূর্তি একটা।

চন্দ্রভানু আবার হাসলেন। ছেলের মুখের দিকে একটুখানি চেয়ে থেকে বললেন, তোমায় কি বলি, আমারও হুবহু এই ব্যাপার। কে এসে তোমার মায়ের খবর বলল, কনের কিন্তু একটা চোখ নেই। রাগারাগি করছি : কানা মেয়ে বিয়ে করব? আরও খবর পেলাম, চোখের বদলে এক হাজার টাকা বেশি ধরে দিচ্ছেন কনের বাপ। সে টাকা এই সাগরচকেরই জন্য। বন হাসিলে জলের মতন খরচা হচ্ছে—এক হাজারের অনেক দাম তখন। বাবার কানে কি করে কথাটা চলে গেল। এক-ঘর আত্মীয়-কুটুম্বর মাঝখানে ডাকিয়ে নিয়ে বললেন, মতলব কি তোর? আপোসে যাবি, না কান ধরে পানসিতে তুলতে হবে? ভরসা করতে পারেন না। ঘরে ঢুকিয়ে তালা বন্ধ করলেন, যাত্রামঙ্গল পড়বার সময় বের হয়ে এলাম।

এবার ধ্রুব না বলে পারে না : তুমিও তো তালা আটকানোর কথা বললে বাবা।

তিনি সত্যি সত্যি আটকে রেখেছিলেন, আমি শুধু মুখে বললাম-একবার। নকড়ি পুরানো লোক, কর্তার আমলও দেখেছে। রুদ্রভানুর ছেলে হয়ে ইজ্জতের দায়ে একবার অন্তত বলতেই হবে আমায়। বলেছিলাম, এখন আবার রাতদুপুরে খোশামুদি করতে এসেছি। এমন অবস্থা ভাবতে পারতেন সেকালের রুদ্রভানু? তবু তো বউমা আমার কানা নয় খোঁড়া নয়—শুনেছি পরম রূপ-বতী। আর তুমি মুখের উপরেই ফরফর করে অমতের কথা শুনিয়ে দিলে। দিনকাল বদলেছে, সন্দেহ কি!

সাগরচকের কথা এসে গেল। সমুদ্রজল রাক্ষসের মতো হাঁ করে আছে, সিকিভাগ গ্রাস করে ফেলেছে ইতিমধ্যে। বাসিন্দারা আর ভরসা করতে পারে না—পালিয়ে চলে এসেছি, এই ধরে নিয়েছে। বাবা আর আমি—দু-পুরুষ আমরা জীবনপাত করে এলাম, চরের বিপদ আজ দরখাস্ত করে আমার কাছে জানান দিতে এসেছে। রাগ হয় কি না বলো!

বলতে বলতে কণ্ঠ ভারী হল। চোখও অশ্রুসিক্ত নাকি— ম্লান দীপালোকে ঠাহর করবার জো নেই। ক্ষণকাল নিঃশব্দ থেকে চন্দ্রভানু আবার বলেন, দলিলপত্রে মালিক যে-ই হোক, সাগরচক সকলের। সকলে আমরা প্রতিপালিত হচ্ছি—যত মানুষ চকে ঘরবাড়ি বানিয়ে আছে, যত মানুষ এই রায়-বাড়ির ভিতরে আছে। ওদের আর আমাদের বাপ-দাদারা একসঙ্গে জলেজঙ্গলে ছুটো-ছুটি করে বেড়িয়েছে। চিলেকোঠার ঘরজোড়া জয়ঢাক ছিঁড়েখুঁড়ে পড়ে আছে এখনো—একদিন ছিল, ঐ ঢাকে একবার কাঠি দিলে অঞ্চল জুড়ে শতেক ঢাকে ঘা পড়ত সঙ্গে সঙ্গে। দীঘির মাঠ জুড়ে কাতারে কাতারে মানুষ জমত। জীবন দিতে কবুল—দিয়েছেও কতজনা। এখন চকদার মানুষ কিনা, ফরসা কাপড়জামা আমাদের অঙ্গে, বাড়ির ছেলে বিদ্বান হচ্ছে—সেইজন্যে সন্দেহ ওদের। সন্দেহ একেবারে অন্যায়, তাই বা বলি আজ কেমন করে?

দ্বিতীয়পর্ব

বাঘ মরে রায়বাড়ির পুরুষ হয়ে জন্ম নেয়—বাপের বাড়ি ভক্তদাসের কাছে শুনেছিল মীনাক্ষী। এখানে শ্বশুরবাড়িতেও সেই কথা। কিরণবালা মেয়েটা বয়সে মীনাক্ষীর চেয়ে কিছু বড়। বরে নেয় না, কোথাকার অন্য এক রমণী নিয়ে আছে। অসহায় অবস্থা—আছে কিরণ রায়বাড়িতে, খায়দায় থাকে। নতুন-বউয়ের বড় ভাব জমল কিরণের সঙ্গে।

কিরণবালা সাবধান করে দেয় : এরা ভাই সুন্দরবনের বাঘ। বাঘ পোষ মানে না, এরাও তাই। পোষ মানাতে পারবি নে, সর্বদা নজরে নজরে রাখবি—বেচাল কিছু করতে না পারে। অন্তত এই রায়বাড়ির ভিতরে। দুয়োরে ঢুকতে জোড়া-মন্দির, দু-দুজন ঠাকুর-ঠাকরুন চোখ মেলে আছেন, অনাচারে বাড়ি ধ্বসে পড়বে।

ইন্দুমতীর দৃষ্টান্ত দেয়। আরও শোচনীয় অবস্থা তাঁর এখন। কথাও একরকম বন্ধ। মুখ দিয়ে ফ্যাসফ্যাস করে আওয়াজ বেরোয়, সে বোঝে একমাত্র নীহার-নলিনী। বুঝে নিয়ে ব্যবস্থা করে। তবু প্রতাপটা দেখ সেই পঙ্গু মানুষের। নীহার-নলিনীকে আটকে ফেলেছেন নিজের কাছে, স্বামীকে তেপান্তরের চকে সরিয়ে দিয়েছেন। চন্দ্রভানু আসুন দেখি বাড়ি নিয়মের বাইরে—বছরে দুবারের বেশি তিনবার। হপ্তার বেশি থাকুন দেখি বাড়ি এসে। বাড়ি যে কদিন থাকবেন, চোখাচোখি তাকান তো একবার নীহারনলিনীর দিকে। সে আর হতে হয় না! ছোটরায়ের নামে বাঘে-গরুতে এক-ঘাটে জল খায়, কিন্তু বাড়ির মধ্যে সেই মানুষ কেঁচো। শাশুড়ির আঁচলের চাবি নিয়েছ নতুন-বউ, সেই সঙ্গে ওঁর পতি-শাসনের কায়দাও শিখে নাও।

মীনাক্ষী মনে মনে জিভ কাটে। হাসে মুখ টিপে। সখী হয়েছিস—রাত্রিবেলা ভোঁস-ভোঁস করে না ঘুমিয়ে জানলায় আড়ি-পেতে একদিন শুনে এলে তো পারিস কেমন এই তরুণ-বাঘের গর্জন।

নিশিরাত্রি। ভরা পূর্ণিমা সেদিন। রায়-বাড়ির দোতলার অলিন্দে জ্যোৎস্না গড়িয়ে এসে পড়ছে বড় বড় থামের ফাঁক দিয়ে। লোকজন-ভরা বাড়ি নিশুতি হয়ে থমথম করছে। এ রাত্রে দেয়ালের অন্তরালে কে বন্দী হয়ে থাকবে—পায়ে পায়ে দুজনে অলিন্দে এসে বসল।

মীনাক্ষী বলে, বাঘ নাকি তোমরা—কিরণ-ঠাকুরঝি বলে। বাঘ থেকে রায়বাড়ির পুরুষ হয়ে এসেছে।

ঠিক তাই। জোরে জোরে ঘাড় নেড়ে ধ্রুব-ভানু মেনে নিল : অত শক্তি আর অমন সাহস মানুষের কখনো হতে পারে না। আমাদের বলত, বনের বাঘ নয়—জলের বাঘ। গুণীনের মন্ত্র পড়ে নীতিনিয়ম মেনে বনের বাঘ ঠেকানো যায়, কিন্তু জলের বাঘের নামে লোকে একদিন থরথর করে কাঁপত।

দীঘি ছাড়িয়ে তার ওদিকে দিগন্তব্যাপ্ত নদী জ্যোৎস্নায় ঝিকমিক করছে। চেয়ে চেয়ে ধ্রুবভানু উন্মনা হয়ে পড়ে। বলে, খুব যে বেশি দূরের দিন তা নয়। আমার ঠাকুরদা রুদ্রভানু চক বন্দোবস্ত নিয়ে কাছারিতে স্থিতি করলেন। জমি বড় পাজি জিনিস—এক জায়গায় কামড়ে পড়ে থাকতে হয়। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব রুদ্রভানুকে নেশায় জমিয়ে দিল। এলাকা ঠান্ডা করে ফেলল। বলশক্তি দৌড়ঝাঁপ সমস্ত গিয়ে চকের জমিই সর্বস্ব এখন আমাদের।

ধক করে চন্দ্রভানুর কথা মনে এসে যায়। কোথায় এখন—এই জ্যোৎস্না রাত্রে? বউ-ভাতের পর একটা দিনেরও সবুর মানলেন না। এক একটা ঘন্টারও যে অনেক দাম। শয়তান নদী নতুন নতুন প্রবেশপথ বানিয়ে ঘাঁটি শক্ত করে নিচ্ছে। বিয়ের ব্যাপারটা কোন রকমে চুকিয়ে টাকার কাঁড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। চিঠি আসে কালেভদ্রে কদাচিৎ—কেমন আছ, ভাল আছি, এই জাতীয় পাঁচটা সাতটা কথা। সদরে ছুটোছুটি চলছে— অঞ্চলের এর তার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, তারা এসে খবর বলে। আজ এই রাত্রে, অনুমান করা যায়, তাঁরও চোখে ঘুম নেই। পূর্ণিমার জ্যোৎস্না দেখছেন না অলসদৃষ্টি মেলে—মানুষজন জুটিয়ে পূর্ণিমার কোটালের দুর্বার জল-স্রোতের সঙ্গে লড়াই করে বেড়াচ্ছেন।

ধ্রুব গম্ভীর হয়ে পড়েছিল। ভাল লাগে না মীনাক্ষীর—ঝুপ করে কোলের মধ্যে গড়িয়ে পড়ে। দু-বাহু গলায় জড়ায়। বলে, গুণীনের মন্তোর কোথায় লাগে আমার কাছে—সকলের বড় গুণীন আমি। জলের বাঘ বেঁধে ফেলেছি। পোষা বাঘ এই যে

আমার—সে বাঘে হামলা দেবে না কখনো, কামড়াবে না—

ধ্রুব বলে, কি করবে?

গান গাইবে আমার কানে কানে, আদর করবে, ভালবাসার কথা শোনাবে, আমার মনপ্রাণ জুড়ে থাকবে—

চাঁদের আলোয় ধ্রুব মুগ্ধচোখে তাকিয়ে আছে মুখের দিকে। মীনাক্ষী বলেই যাচ্ছে, আজকে বলে নয়—চিরকাল। যতদিন আমি বেঁচে থাকব, তার চেয়ে একটা দিন একটা ঘণ্টা একটা মিনিটও কম নয়। আনন্দের ঘোরে তারপরে একদিন মরে পড়ব তোমার পায়ের নিচে। শেষ তখন।

খবরদার!

বেশ চলছিল, তাড়া খেয়ে মীনাক্ষী সভয়ে ধ্রুবর দিকে তাকায়।

ধ্রুব বলে মরার কথাবার্তা কোনদিন আর যেন মুখে না শুনি। খুনোখুনি হয়ে যাবে, এই বলে দিচ্ছি।

ভয়ে ভয়ে মীনাক্ষী বলে, মরব না তা বলে? কোন একদিন—

না, কোনদিনও না।

এ তোমার অন্যায়, জুলুম।

বেলডাঙার রায়েদের জুলুমবাজ বলে বদনাম কি আজ এই প্রথম হল।

রাত্রি শেষ হয়ে আসে। চাঁদ পশ্চিমে চলেছে। কথার যেন শেষ নেই, কথা বলে বলে সাধ মেটে না। প্রাচীন এক নারিকেল-গাছ অন্দরের উঠানে। গাছের ছায়া পড়ে এসে দুজনের মুখে। গাছের পাতা ঝিলমিল করে, মুখের উপরে জ্যোৎস্না ডোরা কেটে যায়। অসহ্য আনন্দে দিশা করতে পারে না, দুচোখে জল এসে পড়ে মীনাক্ষীর।

ধ্রুব ব্যাকুল হয়ে বলে, কি হল?

কেন তুমি এত ভালো? এবাড়ি নিয়ে কতরকম শুনি—বউদের কত কায়দা-কানুন করতে হয় নাকি বর বাঁধবার জন্য। অলিন্দে অলিন্দে পুরস্ত্রীদের কত চোখের জল পড়েছে। সংসারধর্ম নিয়ে দিনমানটা তবু একরকম কেটে যায়, চার প্রহর রাত আর কাটতে চায় না। রেলিং ধরে কত কত প্রতীক্ষা। কিন্তু এ আমার কী হল—দেবতা হয়ে বরাভয় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছ। একটিবার চাইতে হয় না, আপনাআপনি বর পেয়ে যাই।

দুই সতীনের গল্প বলেছেন গোবিন্দ-সুন্দরী—এ-বাড়ির সেকালের দুই বউ। যে রাত্রে কর্তা বাড়ি এলেন, চুলোচুলি ঝগড়া দু-জনে। কে দখল নেবে স্বামীর? কর্তা বাড়ি না এলে বড় ভাব—দুই বোন তখন, অভিন্নহৃদয় দুই সখী। দাবাখেলা শিখে নিয়েছিল, দাবায় সমস্ত রাত কেটে যেত। মীনাক্ষীর কী দুর্ভাগ্য—একটা সতীন নেই যে খানিক ঝগড়া করে বাঁচে। অতই বা কেন—ধ্রুব বাড়ি ছেড়ে দশ-পা দূরে যায় না যে বিরহের একটা জোর নিশ্বাস ফেলবে। পরীক্ষা দিল না এবার—দেদার ছুটি। ঘুরঘুর করে বেড়ায় নতুন-বউকে কেন্দ্র করে। এ বাড়ির চিরকালের নিয়ম মীনাক্ষীতে এসে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। দুঃখ কম! বাঘ বশ করবার অহঙ্কার নিয়ে এসেছিল, সে বাঘ কোথায় পাবে যে খুঁজে?

বৈশাখ শেষ হয়ে জ্যৈষ্ঠমাস পড়ে গেল। চন্দ্রভানু আসেন না। লোকমুখে খবর এসেছে, আছেন ভালই—কাজের ঝঞ্ঝাটে দেরি হচ্ছে। না আসুন তিনি, কিন্তু সাগরচকের ভরাও যে এসে পৌঁছল না। এমন কাণ্ড আর কখনো ঘটে নি—চন্দ্রভানু কিম্বা রুদ্রভানু কারও আমলেই নয়। মাসাবধি যদি দেরি হয়—কেলেঙ্কারি ঘটবে। রায়বাড়ি উনুনে হাঁড়ি না চড়বার গতিক।

ততদূর নয় অবশ্য। জ্যৈষ্ঠের মধ্যেই এসে পড়লেন। দীঘির পাড়ে নৌকা বেঁধেছে। নকড়ি-গোমস্তা উদ্বেগে ছুটতে ছুটতে ঘাটে গিয়ে পড়ল। সকলের আগে যেটা মনে এসেছেঃ—বাঁধের কি খবর?

অনেক মাটি ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। টাকা অনেক ডুবিয়েছে। আমি ছাড়ব না। মাটি নয়—বুঝলে, ইস্পাতের পাতে ঘিরে আমি এবার বাঁধ ঠেকাব। লখিন্দরের লোহার বাসরের মতো।

কথাবার্তা কেমন যেন খাপছাড়া, দৃষ্টি উদভ্রান্ত। ভয় পেয়ে নকড়ি আর কিছু জিজ্ঞাসা করে না।

চন্দ্রভানু অন্দরে গেলেন। ইন্দুমতী চক্ষুটা মেলে তাকিয়ে পড়লেন, গোঁ-গোঁ করে বললেন কি-একটা। নীহারনলিনী বুঝিয়ে দেয়। : খবর জিজ্ঞাসা করছেন।

হয়তো বা কানও গিয়েছে। চন্দ্রভানু চিৎকার করে শুনিয়ে দেন : বরাবর যেমন এসে থাকে—একটি দানার কমতি নেই। ভরা খালাস হচ্ছে, মিলিয়ে দেখে নিক। রায়বাড়ির পান থেকে চুন খসবে না—যতদিন আমি আছি।

মীনাক্ষী এসে প্রণাম করল। গাঢ়স্বরে চন্দ্রভানু আশীর্বাদ করলেন। বলেন, ফর্দের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে ভাঁড়ারে পাঠাও মা। তোমার শাশুড়ি যা এতদিন করে এসেছে। এককালে আমার মা-ও করতেন।

কণ্ঠস্বর শুনে মীনাক্ষীর ভয় করে। চকিতে একবার শ্বশুরের মুখে তাকায়। ধ্রুবভানুর কাছে বলে, নৌকো-ভরা মালপত্র সকলে কেবল সেইটেই দেখছে।

ধ্রুব বলে, তা ছাড়া আর কি করবে?

মানুষটির দিকে তাকিয়ে দেখে না একবার।

কার ঘাড়ে ক'টা মাথা, ও-মানুষের দিকে চোখ তুলে তাকাবে?

কিন্তু তুমি তো ছেলে—

ছেলে হই যা-ই হই, হুকুম তামিল করবার যন্ত্র। রায়বাড়ির এই বিধি।

তবু ধ্রুব আজ বাপের কাছে গেল। মীনাক্ষী মিথ্যা দেখে নি। বিয়ের কাজ-কর্ম সেরে উৎসব-বাড়ি থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লেন, ব্যস্তসমস্ত মানুষ তিনি তখন। বোঝাই নৌকো নিয়ে সেই মানুষটার প্রেতাত্মা আজ ফিরে এসেছেন।

ধ্রুবভানু আকুল হয়ে বলে, কি হয়েছে বাবা?

কিছু না, কিছু না। খুবই খাটনি যাচ্ছে তো! দরিয়ার সঙ্গে লড়াই। সে লড়াই অবশ্য চিরকালের—

গলা হঠাৎ নিচু করলেন। ফিসফিস করে অতি-গোপন খবর দিচ্ছেন যেন : আমি বুড়ো হয়ে গেছি রে ধ্রুব। গাঙের নবযৌবন দিনকে-দিন। আর বুঝি পেরে উঠলাম না!

ছোটরায় হেন মানুষের মুখে এমনি কথা—বুড়ো হয়েছেন তাতে সন্দেহ কি! এমনি অন্তরঙ্গ কথাবার্তা ছেলের সঙ্গে আর একটিবার হয়েছিল—সেই নিশিরাত্রে ধ্রুব যখন বিয়ের নামে গুম হয়ে বসে ছিল।

চন্দ্রভানু সত্যি সত্যি বুড়োমানুষ। তবু কিন্তু এবারে সাতদিনও নয়। মাল খালাস হলে সঙ্গে সঙ্গে অমনি রওনা।

এর পরে পুরোপুরি মাসও নয়। যাত্রাগান বারোয়ারিতলায়। ভাল পালা—সুভদ্রাহরণ। বেলডাঙার মেয়ে-পুরুষ কেউ বড় বাড়ি ছিল না। কিন্তু হলে হবে কি—ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি এলো হঠাৎ। দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড। বাড়ি এসে তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে সব ঘুমিয়ে পড়েছে। ভাতঘুম এসে গেছে। এমনি সময় হরিধ্বনি : বল হরি, হরিবোল—

ঠাকুরদেবতার নামে মানুষ তো গদগদ হয়ে উঠবে—এ নামে আপাদ-মস্তক কাঁপে। চ্যাটুজ্জেবাড়ির কর্তামশাই বটকৃষ্ণ স্ত্রীকে বলেন, কানে শুনছ ভবীর মা? কে যেন চললেন। তাই না?

ভবীর মা উঠে পড়েছিলেন। হঠাৎ কাঁপুনি ধরে যায়। কাঁপা গলায় পুত্রবধূকে ডাকছেন : অ বউমা, লেপ-কাঁথা যা হোক একটা দাও দিকি নি। শীতে যে জমে গেলাম! শিগগির দাও।

বউয়ের শব্দসাড়া নেই। রাত-দুপুরে কে আবার এখন ঝঞ্ঝাট করে! শুনি নি শুনি নি— এই বেশ ভালো। অগত্যা ভবীর মা যে তোষকে শুয়েছিলেন—সেইটাই উঁচু করে তুলে তার ভিতরে ঢুকে পড়ে কুণ্ডলী হয়ে রইলেন।

বটকৃষ্ণও ওদিকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যাচ্ছেন : কে চললেন বলো দিকি? যাচ্ছেন মহাযাত্রায়—বেরুলেন কোন বাড়ি থেকে? এখন-তখন অবস্থা—গাঁয়ের কারো সম্বন্ধে তো শুনি নি। তুমি শুনেছ নাকি ভবীর মা? ভিন্ন জায়গা থেকে আমাদের শ্মশানঘাটায় আসার শখ কার হল? এত ভাল লাগল কিসে?

ভবীর মা কোন-কিছুই শোনেন না। কান দুটো সমেত গোটা মাথা তোষকের নিচে ঢুকে গেছে। বয়সে বুড়ো হয়ে গেছেন, তাঁদেরও এমনি দিন আসছে—হরিবোলে সেই কথা মনে পড়ে যায়। দেহের কাঁপুনি ঠিক শীতের কারণে না হরিবোলে, বলা কঠিন। আর বটকৃষ্ণের হয়েছে—কোন মানুষটার ডাক পড়ল, গাঁয়ের না বাইরের, সঠিক না জানা অবধি সোয়াস্তি নেই। বলছেন, যে-ই হোক, বেয়াক্কেলে মানুষ বলব আমি তাকে। বৃষ্টি-বাদলার এমন অভদ্রা রাত্রে নিজের একলা যাওয়া নয়—যাদের কাঁধে চেপে চললেন, নিমোনিয়া হয়ে তাদেরও যে যেতে হবে দু-দশ দিনের ভিতর।

বাইরের দাওয়ায় আওয়াজ পেয়ে বলেন, কে গা? অ্যাঁ—অনাদি উঠে পড়েছিস?

বড়ছেলে অনাদিই বটে। বলল, কান্না একটা মনে হচ্ছে বাবা রায়বাড়ির দিক থেকে। রায়বাড়ি কে যাবার মতন? পুরানো রোগি

ছোটগিন্নি যদি হন। কষ্ট বিস্তর ভোগ করেছেন, কিন্তু এখন তো কষ্ট-দুঃখের অতীত তিনি। অঙ্গগুলো পড়ে গেছে, বোধজ্ঞান নেই। সব হারিয়ে শুয়ে পড়ে আছেন, এখন তিনি কেন আর যেতে যাবেন।

ছেলের উপর বটকৃষ্ণ ধমক দিয়ে ওঠেন : তাগড়া জোয়ান বসে বসে আন্দাজে ঢিল ছুঁড়বে কেন? লন্ঠন নিয়ে বেরিয়ে পড়ো, খবরটা নিয়ে এসো। সুখ-অসুখে দেখবে না তো পড়শি হয়েছ কেন?

অনাদি বলে, বৃষ্টিই ছাড়ে না। ঘরের বার হওয়া এখন চাট্টিখানি কথা!

বুড়ো ক্ষেপে যান : আমায় যদি এখন অন্তর্জলীতে নামাতে হত। কি করতে, কাঠুরে ডাকতে যেতে না পড়শির বাড়ি?

এমনি সময় ছাতা মাথায় তিনজন রাস্তা দিয়ে কথাবার্তা বলতে বলতে আসে। আসছে রায়বাড়ির দিক থেকেই। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নন্দকুণ্ড হাঁক দিলেন : কারা তোমরা, এদিকে এসো একবার।

বাঁড়ুজ্জে-পাড়ার গোঁসাইচরণ সতীশ আর মহেন্দ্র।

কোথায় গিয়েছিলে গোঁসাই? কান্নাকাটি কিসের, কি দেখে এলে বলো।

ছোটরায়ের নীলবোট চক থেকে ফিরল। আসল মানুষটা সন্ন্যাস রোগে গেছেন। লাস নিয়ে এসেছে।

সতীশ বলে, নদীর পাড়ে বোট একটুখানি রেখে ছোটরায়ের ছেলেকে তুলে নিল। আর একটি মানুষ নয়, নকাড়ি গোমস্তাও নয়। কত লোক যেতে চায়, তা চক থেকেই প্রজা-পাটক ঠাসাঠাসি হয়ে এসেছে। বলে, জায়গা নেই, চেয়ে দেখ।

গোঁসাইচরণ বলে, লাস নামাল না। বলে, গিন্নি-মায়ের ঐ অবস্থা—কার জন্যে তবে নামানো? বৃষ্টি-বাদলার মধ্যে নামানো-উঠানোয় হাঙ্গামা বিস্তর—নামবেন একেবারে শ্মশানঘাটায়, চিতায় উঠবার সময়টা। বোটের ছাতে বিছানা পেতে সাজিয়ে রেখেছে—ফুলে, ফুলে আর ফুলে। ফুলের পাহাড় ঠেলে মড়ার একখানা আঙুল পর্যন্ত দেখবার জো নেই!

বটকৃষ্ণ গুম হয়ে শুনছিলেন। ফোঁস করে হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন : ছোটরায়ের পাথরের দেহ সন্ন্যাসে আচমকা শেষ করে দিল, আমরা তবে তো নেই।

গোঁসাইচরণ বলে, না চাটুজ্জেমশায়, দেশসুদ্ধ চলে যাবে, আপনার ঐ চিটের মতো দেহ নিয়ে ঠিক টিকে থাকবেন। রসকষ নেই—দুধ মরে ক্ষীর, ক্ষীর মরে চাঁচি, সেই চাঁচি হয়ে আছেন আপনি। ও জিনিসের আর মার নেই।

নিতান্ত এক চ্যাংড়া ছোঁড়ার কথা, তা হলেও সোয়াস্তি একটু পেলেন বোধহয় বটকৃষ্ণ। ঘরের মধ্য সঙ্গে সঙ্গে ভবীর মা'র চিঁচিঁ গলা : ও বউমা, ওরে ও আবাগির বেটি, কথা বুঝি কানে-কপালে যায় না। বললাম না, কম্প লেগেছে। কাঁথা-লেপ যা হয় কিছু ফেলে দে।

গোঁসাইরা তিনজন শতকণ্ঠে তারিপ করছে : এই পুরু তোষক-বালিশ-পাশ-বালিশ। তার উপরে ফুল। অত ফুল জোটালো কেমন করে সেই আবাদ জায়গায়? রাজার বিয়ের ফুলশয্যা যেন শখ করে বোটের উপরে হচ্ছে। তা ছোটরায় প্রজাপাটকদের কাছে রাজাই তো বটে! বোট ভরতি সেই প্রজারা। অত দূরে থেকে বেয়ে বেয়ে নিয়ে এসেছে ঘিরে বসে আছে। তারাই সব—নকাড়ি হেন মানুষটাকেও পাত্তা দিল না।

শুনে শুনে অনাদি চাটুজ্জে চঞ্চল হয়ে ওঠে : দেখতে হয় তবে তো! শ্মশানেই যাওয়া যাক।

অপর তিনজনের খুব বেশি আপত্তি নেই। দেখতেই তো গিয়েছিল রায়বাড়ি অবধি। বলে, ভিজে জবজবে আমরা। তা বেশ, তামাকের জোগাড় দেখুন, এক ছিলিম টেনে গা গরম করে বেরিয়ে পড়ি।

ঘরে ঢুকে অনাদি বৃষ্টিবাতাস আড়াল করে কলকের উপর নারকেল-খোসার নুড়ি ধরাচ্ছে। বউ এসে বলল, সর্দিতে ডবডব করছ, নাড়ি ধরেও বোধহয় জ্বর পাওয়া যাবে। যাবে এই অবস্থায়?

অনাদির সংক্ষিপ্ত জবাব : ছোটরায় কি নিত্যিদিন মরবেন? শ্মশানের মচ্ছব কি রোজ হবে?

দুর্যোগ সত্ত্বেও শ্মশানে বেশ একটি জনতা। হরিবোলের ফলেই এসে জমেছে। যাত্রাগান ভেঙে গেল তো ছোটরায়ের সৎকারে খানিকটা তার ক্ষতিপূরণ। কিন্তু হলে হবে কি—মাঝি নদী দিয়ে নীলবোট বেয়েই চলল। পাড়ের দিকে আসে না। সকলে তখন হাঁক পাড়ছে : শ্মশান এই যে, চিনতে পারছ না? বোট লাগাও—

বোট কানেই নেয় না। জনতা ক্রমশ মারমুখি হয়ে ওঠে : কী আশ্চর্য, মড়া নিয়ে চললে কোথা তোমরা? বলি, ছোটরায় আমাদের বেলডাঙার মানুষ নন? পুরো-পুরি তোমাদের হলেন কেমন করে? আমরা সব দেখবার জন্য দাঁড়িয়ে আছি।

বড় বেশি হৈ-হল্লা তো বৃন্দাবন হালের কাছে খাড়া হয়ে দাঁড়াল। ছোটরায়ের জীবনকালে যেমন ছিল, মরণের পরেও সে সকলের বড় মাতব্বর। চেঁচিয়ে বলে : ছোটরায় মা-গঙ্গায় দাহ হবেন, আজেবাজে শ্মশানে নামবেন না।

গঙ্গায় পৌঁছতে পচে গিয়ে গন্ধ-গন্ধ হবেন যে! হাত-পা খসে খসে আসবে। ভাঁটি-অঞ্চলে গঙ্গা পাচ্ছ কোথা।

বৃন্দাবনের জবাব : কুসির বটতলায়।

সেখানে গঙ্গা তো মরশুমের সময়টা। তার এখনো এক মাস দেড় মাস দেরি।

বৃন্দাবন বলে, এক মাস দেড় মাস দেখতে দেখতে কেটে যাবে। মুক্তি তদ্দিন মুলতুবি থাকুক।

লোকের আহ্বান গ্রাহ্য না করে নীলবোট ছ-খানা দাঁড় বেয়ে তীব্র স্রোতে দেখতে দেখতে বাঁকের আড়াল হয়ে গেল। উৎসাহী কেউ কেউ যেত চলে হয়তো সেই কুসির বটতলা অবধি। কিন্তু রাত্রিবেলা এই জল-বাতাস—সকলের বড় মুশকিল, জায়গাটা নদীর ভিন্ন পারে। খেয়া পাড়ি দিয়ে যেতে হয়। খেয়া বন্ধ হয়ে গেছে—যতই হাঁকডাক করো, মাঝি এই রাত্রে সাড়া দেবে না।

কুসির বটতলার শ্মশানে বোট গিয়ে ধরল। ঝুরি নেমে একটা জায়গা বড় দুর্গম, দিনমানেই অন্ধকার হয়ে থাকে—বেছে বেছে সেইখানটা পছন্দ করে প্রকাণ্ড চিতা সাজিয়েছে। মেলার সময়টা ছাড়াও বারো-মেসে দোকানপাট কিছু কিছু আছে। সাড়া পেয়ে তাদের দু-চারজন এদিকে এসেছে। হরিধ্বনি দিতে আরও কতক এসে পড়ল।

মড়া চিতায় তোলা হবে, তার আগে নদীজলে স্নান করানো বিধি। বৃন্দাবন ধ্রুবভানুকে বলে, কলসি নিয়ে নাও খোকা-বাবু। বাপের শেষ-চানের জল তোমাকেই তুলে আনতে হবে। পথ পিছল হয়ে আছে, পা হড়কে না যায়। পা টিপে টিপে সামাল হয়ে চলো। আলো ধরে আমি আগে আগে যাচ্ছি।

ঘাটে চলল দুজনে। ঘাট আর কি—খান কয়েক বাবলার গুঁড়ি ফেলা আছে এক জায়গায়। হঠাৎ বৃন্দাবন বলে, শোন একটা কথা। কাছে এসো, একেবারে কাছে। কানে কানে বলব।

ফিসফিস করে বলে, মড়ার উপরের কাপড় সরিও না। কাপড়ের উপরেই জল ঢেলে চান করাবে। কাপড়-চোপড় বিছানা-পত্তর ফুলটুল সুদ্ধ চিতায় তুলব। যাকে তাকে ধরতে দেওয়া হবে না—তুমি, আমি, আর বাছাই লোক আছে আমার পাঁচজন।

ধ্রুব বলে, বলো কি বৃন্দাবন-কাকা! শেষ-দেখা একটিবার দেখব না?

বৃন্দাবন বলে, দেখবার মানুষ আরও তো ছিল কতজন—তুমি একলা নও খোকা-বাবু। গিন্নিঠাকরুনের ঐ রকম অবস্থা, তবু তাঁর ঘরে নিয়ে শেষ দেখা দেখিয়ে আনা যেত।

কথা যা বলছে সব সত্যি। এ কাজের মানে খুঁজে পাওয়া যায় না। তা বলে ধ্রুব শুনবে না। জেদ ধরে বলে, অন্যের বেলা যেমন হয় হল—আমি ছেলে, একমাত্র ছেলে, দেখতেই হবে আমায়। মুখ না দেখে মুখাগ্নি হতে পারে না।

বৃন্দাবন গম্ভীর অকম্পিত কণ্ঠে বলে ওঠে, ছোটরায়ই নেই—কার মুখ দেখবে?

ধ্রুব স্তম্ভিত হয়ে বলে, বাবা নন? কাকে তবে বোটের উপর ফুলে ঢেকে নিয়ে এলে?

মানুষই নয়। গরানের ছিটের খড় জড়িয়ে ছোটরায় সাজিয়ে এনেছি। জানি কেবল আমি আর ওরা ঐ পাঁচজন। আমাদের বাইরে অন্য কেউ যেন টের না পায়, একফোঁটা সন্দেহ কারো মনে না আসে!

বাবা কোথায় তবে?

নেই তিনি, মারা গেছেন।

ঢোক গিলে বৃন্দাবন বলে, মেরে ফেলেছে। মেরে গাঙের জলে ভাসিয়ে দিয়েছে। লাস নিখোঁজ।

শুনে ধ্রুব সেই জলের ধারে কাদার উপর ধপ করে বসে পড়ল। সম্বিত আছে কি নেই।

ওদিক থেকে ডাকাডাকি করছে : কই গো, চানের জল আনতে এত দেরি কেন? হল কি?

বৃন্দাবন বলে, খোকাবাবু ভেঙে পড়েছেন। বুঝিয়ে-সুজিয়ে ঠান্ডা করছি। হোক না দেরি, তাড়া কিসের?

ধ্রুবকে বোঝাচ্ছে : এত বড় মানুষটার এই পরিণাম। কুঁদে কেঁদে আমাদেরও কাঁদতে ইচ্ছে করে। চেপে তবু যাত্রার পালার মতো এই ভড়ং করতে হচ্ছে। লোকে বুঝবে

না পারে। বেশি ভয় থানাপুলিশ নিয়ে—তারা ঘুণাক্ষরে না টের পায়।

ধ্রুব মাথা তুলে বলে, খুন করে ফেলেছে—পুলিশে তো আমাদেরই জানানোর কথা।

আরে সর্বনাশ, কিছুতেই নয়! বিড়বিড় করে বৃন্দাবন আদ্যোপান্ত বলে যায়: নোনা জল সাগরচকে শতমুখে ঢুকছে। যত কিছু ছিল, জলে ভাসিয়ে নিয়ে একেবারে নিঃসম্বল করেছে। মাটি না ফেলতে না ফেলতে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। যত যাচ্ছে, রোখ বাড়ে চন্দ্রভানুর। হারব না, হারব না। যে বাঁধ গেছে, ডবল করে মাটি চাপান দাও সেখানে তা-ও গেল তো চৌগুণ। মাটির বাঁধ বলা যায় না শেষটা—চাঁদির বাঁধ। টাকা টাকা করে পাগল হয়ে উঠলেন। বেপরোয়া। সেকালের সেই পুরানো পথ ধরতে হল আবার, রুদ্রভানু যা তোবা করেছিলেন। গাঙে-গাঙে নৌকোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়া। নইলে রায়বাড়ির ইজ্জত থাকে না। ধান চাল জিনিষপত্র ভরা বোঝাই হয়ে যা সেদিন ভান্ডারে উঠল, সাগরচক তার কিছুই দেয়নি। গাঙ-খালের উপর রোজগার।

বৃন্দাবন বলছে, ছোটরায় বড় জাঁকজমকে বেঁচেছিলেন, মরণে সেই জাঁক দেখিয়ে যাচ্ছে। শ্রাদ্ধশান্তিতেও তাই হবে। তার পরেও যেমন যেমন আছে, তেমনি সব চলবে। একচুল এদিক-ওদিক হবে না। তোমার কাঁধে দায় পড়ল খোকাবাবু, রুদ্রভানু অন্তে ছোটরায়ের উপর যেমন একদিন পড়েছিল। কেমন করে কি হবে, আজ থেকে তোমারই ভাবনা সেটা। কিন্তু রায়বাড়ির চিরকালের জৌলুষ নেভানো চলবে না। ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে দেশান্তরী হবে, তার আগে কিছুতে নয়।

চন্দ্রভানু গেলেন। সাগরচক আগেই নাকি গেছে—বৃন্দাবনের কাছে শোনা। রায়বাড়িরও টলমল অবস্থা—তাসের ঘরের মতো কোন দিন বা ভেঙে পড়ে। কি করবে কারো ধ্রুবভানু, তোমার কাঁধের দায় এবারে। এক-দিন রুদ্রভানুর কাঁধ থেকে চন্দ্রভানুর উপর যেমন দায় পড়েছিল।

পুরো বছর যেতে না যেতে অট্টালিকা হঠাৎ যেন শ্রীছাঁদ হারিয়ে বুড়ো হয়ে পড়ল। সদর-উঠানে হাঁটুভর ভাঁটইবন, আশশ্যাওড়ার জঙ্গল। কাছারিঘরে নকড়ি-গোমস্তা কাজ করছে, ছাতের এক চাংড়া চুনবালি খসে হুড়মুড় করে খাতাপত্তরের উপর পড়ল। এক জায়গায় এই একটা ঘরেই নয়, সারা ঘরবাড়ি জুড়ে এমনি কান্ড। নকড়ি বিষম কঞ্জুষ হয়ে পড়েছে, তাকিয়ে দেখবে না এসব দিকে।

নকড়ি বলে, জনমজুর দিয়ে জংগল সাফ করা যায়, রাজমিস্ত্রি লাগিয়ে চুনকামও হতে পারে। আগে বরাবর হয়ে এসেছে, এখন কেন হচ্ছে না—বোঝ সেটা খোকাবাবু। চকের ঐ অবস্থা—এক একটা পয়সা বাপের হাড় এখন। কর্তামশায়েরা তার উপরে ভূতপেত্নীর আড্ডা বসিয়ে গেছেন। পাছে থেকে চুন খসলে ওরা রক্ষে রাখবে না। ওদের ঝঞ্ঝাট কুলিয়ে ওঠা তো অনাসব!

আঙুল দিয়ে পাশের বৈঠকখানা নির্দেশ করল। আড্ডা জমজমাট সেখানে। পাশা পড়ছে। বিষম হুল্লোড়। কচ্চে-বারো ছ-তিন-নয় আ-ঠা-রো—এই কান্ড চলেছে বেলা দুপুর থেকে। নকড়ি একটা জরুরি হিসাব নিয়ে পড়েছে, সাধ্য কি মন বসায়। সেজন্য আরও বিরক্ত। বেলা গড়িয়ে কখন যে লুচি-হালুয়া এসে যাবে! মুখ বন্ধ হবে খেলুড়ে-মশায়দের। আড্ডারও ইস্তফা।

হুঙ্কার উঠল সহসা: তামাক দেবার একটা লোক থাকে না গোমস্তামশায়, আপনাদের হয়েছে কি বলুন তো?

একটা কিছু বলতে হয়—নকড়ি বলে, তাই নাকি? দেখছি।

দেখবেন আর কাকে? সুখময়টাকে বিদায় দিয়েছেন। আছে এক ক্ষীরি-ঝি। সারা দিনে সে মাগীর তো টিকি দেখবার জো নেই।

নকড়ি বলে, ক্ষীরোদার কী দোষ! ভিতরের কত ফাইফরমাস—তাঁরা যে সাক্ষাৎ মা-চামুন্ডা। এক লহমা মেয়েটার পায়ের জিরান নেই।

পুরুষ এদের আত্মাভিমানে লাগে: ভিতরের তোয়াজ হলেই বুঝি হয়ে গেল? আমরা কেউ নই? হুকো দুপুর থেকে তিনবার কি চারবার মাত্তোর ঘুরেছে।

নকড়ি বলে, অনেক বেশি। কোটো ভর্তি তামাক সিকিতে এসে ঠেকেছে।

কি বললেন? মুখ তবে পচে উঠল কেমন করে? ও সব জানিনে, এত হেনস্থা চলবে না। মাহিন্দার না দিতে পারেন, নিজে আপনি তামাক সাজবেন। গুণে গুণে দেবেন, ছিলিমের পাকা হিসাব থাকবে।

এক কথা দু-কথায় লেগে যায় বুঝি ধুন্দুমার! ধ্রুব কোন দিকে যাচ্ছিল, ছুটে এসে পড়ে: গোমস্তামশায়কে কেন। আমি রয়েছি, আমার উপর হুকুম করবেন। দিন কলকে—

কলকে তুলে নিয়ে ধ্রুব তামাক সাজতে যায়। তড়াক করে উঠে নকড়ি ছুটে এসে ছোঁ মেরে নিয়ে ছুড়ে দিল মাটিতে। কলকে খানখান হয়ে যায়।

হাসিতে ভুলিয়ে ধ্রুব নকড়ির ক্রোধ শান্তির চেষ্টা করে: করলাম না হয় একটু সেবাযত্ন। হাত কি আমার ক্ষয়ে যাচ্ছিল?

নকড়ি অবরুদ্ধ স্বরে বলে, চাকরবাকর নেই—তাই বলে ছোটরায়ের ছেলে তামাক সেজে সেজে ভূতপ্রেতের মুখে এগিয়ে ধরবেন, সেই জিনিষ বসে বসে আমি দেখব!

ধ্রুবভানু মরমে মরে গিয়ে বলে, ছিঃ ছিঃ, এসব কী বলছেন। কর্তারা আদরযত্নে এনে রেখে গেছেন। চকের মানুষেরা দরখাস্তে সেই যে অশ্বত্থগাছের উপমা দিয়েছিল, ঠিক তাই।

রাগে গরগর করতে করতে নকড়ি বলে, অশ্বত্থের ডালে ভূত-পেত্নীর আস্তানা। গাছ শুকিয়ে আজ কাঠ হতে চলেছে। অপদেবতা-গুলোর নড়ন-চড়ন নেই। কবে একদিন মেজাজ হারিয়ে ঝাঁটা ধরব—ঝেঁটিয়ে সাফ-সাফাই করব। সে ঝাঁটা আমাকেও তোমরা মারবে, সেটা জানি। কিন্তু নানান অশান্তির মধ্যে এদের নিয়ে মাথার ঠিক থাকে না।

ধ্রুবভানু টেনে নিয়ে এসেছে নকড়িকে কাছারিঘরে, ফরাসের উপর তার নিজ জায়গায় এনে বসিয়েছে। শান্ত করছে: লড়াইয়ে সৈন্যসামন্তের প্রাণ যায় কিম্বা অঙ্গহানি হয়, তাদের ছেলেপুলের জন্য সরকার বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। এ-ও তাই। আপনি আমার চেয়ে বেশি জানেন গোমস্তা-মশায়। রায়েরা সং আর সম্ভ্রান্ত হয়েছে, তারই খেসারত। প্রতিকারের উপায় আপনার আমার হাতে নেই—রায়বাড়ির ইজ্জত এর সঙ্গে জড়ানো, আর পুরানো কর্তাদের প্রতিশ্রুতি। যতদিন রায়বাড়ি আছে, এরাও থাকবে। না পোষায় আমরাই সরব।

সেই রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়ে মীনাক্ষী দেখে ধ্রুব নেই তার পাশে। আনমনা দেখা যায় ইদানীং—মীনাক্ষীর সাতটা কথার পরে হয়তো একটা জবাব দিল। অভিমানে বধূর চোখ ফেটে জল আসে কিন্তু তা-ও ধ্রুবের নজরে পড়ে না। গেল কোথা নিশিরাত্রে? ছাঁৎ করে ওঠে মন, কিরণবালার ভয় দেখানো কথাগুলো মনে ভাসে। রাত্রে ঘরে থাকা একটা এ বংশের পুরুষের রীতি ছিল না। পুরানো রক্ত টগবগিয়ে ওঠে নাকি ধমনীতে?

এমনিই ভাবছিল। হঠাৎ দেখে ছায়ামূর্তি ঘরে ঢুকছে।

আঁতকে ওঠে: কে? প্রায় আর্তনাদ। কে তুমি?

ধ্রুব বলল, ডাকাত। ডাকাতি করতে এসেছি।

খিলখিল করে হেসে ভয় ভাঙিয়ে দেয়। এ হাসি অনেক দিনের পরে। বলে, কী যে ভীতু! কেলেঙ্কারি ঘটাচ্ছিলে এক্ষুনি চেঁচামেচি করে।

লজ্জারক্ত মীনাক্ষী তাড়াতাড়ি বলে, তাই বুঝি! আমি ভেবেছিলাম—

কী ভেবেছিল, তা বলার ফুরসত হল না। বলতে দিল না বরে, মুখে কুলুপ পড়ে গেছে তখন। রাগ-দুঃখ যত-কিছু জমেছিল, সুদে-আসলে শোধ।

ক্ষণপরে ধ্রুব বলে, যা বললাম সত্যি সত্যি তাই হত যদি। আমি না হয়ে ডাকাতই যদি হত—

এখন মীনাক্ষী নির্ভয় নিশ্চিন্ত। বীরাঙ্গনার ভঙ্গীতে বলে, হল তো বয়ে গেল। তুমি কাছে থাকলে ডাকাতে আমার কী ভয়? তোমার বুকে মুখ ঢেকে পড়তাম। তুমি বাঁচাতে আমায়। বাঁচা না-ই হল তো মরে গেলাম। তোমার বুকে মরা হল।

লালমোহন মিত্তির এলেন মেয়েজামাই দেখতে। খবরবাদ না দিয়ে হঠাৎ চলে এসেছেন। চন্দ্রভানুর শ্রাদ্ধের সময় নিতান্ত বাইরের মানুষের মতো কটা দিন থেকে গিয়েছিলেন—তার পরে এই।

নকড়ি ছুটতে ছুটতে ঘাট অবধি গিয়ে আহ্বান করে: আসতে আজ্ঞা হোক, উঠে আসুন। এদ্দিনে তবু সময় হল। মাথার উপরে আপনিই এখন একমাত্র আর কে আছে বলুন। গিন্নিঠাকরুন জ্যান্ত থেকেও তো মরা।

আসিনে কেন জানেন গোমস্তামশায়? ভয়ে। চকদার মানুষের চাল-চলতি আলাদা।

বাড়িতে দীয়তাং ভুজ্যতাং। চিংড়ির কারবারি আমি—তা-ও আবার কুচোচিংড়ি। বুক ঢিবঢিব করে জোড়া-মন্দিরের ভিতর দিয়ে ঢুকতে।

চন্দ্রভানুর কথাগুলোর শোধ নিচ্ছেন এত দিন পরে। মনের মধ্যে পুষে রেখেছিলেন।

বলেন, চক থেকে ধানচাল টাকাকড়ি আসে জোয়ারজলের মতো, খরচা হয়ে যায় ভাটার টানে। ভক্তদাস বলল, চলুন, দেখেই আসা যাক কী বস্তু সেই সাগরচক। সেইখান থেকে ফিরছি। চোখে দেখে এসে তবেই সাহস হল, রায়বাড়ি ঢুকতে। সামান্য মানুষ আমি, কুচোচিংড়ি বেচে খাই—কিন্তু লুকোছাপা নেই, যে কেউ গিয়ে আমার খটি দেখতে পায়। আমার কাজে ইজ্জত না-ই থাক, ভাঁওতাবাজিও নেই। রায়বাড়ির সাগরচক কিন্তু চোখের নজরে আসে না। বুড়োলোক দু-এক জনে বলে, ছিল এককালে সত্যি। কিন্তু ভরা সাজিয়ে এই সেদিন পর্যন্ত এসেছে—সাগরচকের তো নয়, কোন চকের আমদানি—বেহাইমশায় বেঁচে থাকলে আজ জিজ্ঞাসা করে দেখতাম।

কথা বলতে বলতে লালমোহন দীঘির পাড় দিয়ে আসছেন। ম্যানেজার ভক্তদাস যথারীতি সঙ্গে। চন্দ্রভানুর মৃত্যু ও সাগর-চক নিয়ে নানা উল্টোপাল্টা কথা কানে আসতে লেগেছে। লালমোহনের মনে হল, অনভিজ্ঞ জামাইকে অপদস্থ করা ও সম্পত্তি ফাঁকি দেওয়ার জন্য শরিকী চক্রান্ত। সরেজমিনে খোঁজ নিতে দুজনে বেরিয়ে পড়েছেন।

ধান কাটার মরশুম। ক্ষেতখামারের কাজে মানুষ দলে দলে নৌকো নিয়ে নাবালে নামছে। ক্ষেতভরা ফসল, মনভরা স্ফূর্তি। হাসিহল্লায় নদী তোলপাড়।

ভক্তদাস চেঁচিয়ে পথ জিজ্ঞাসা করে : সাগরচক [illegible] দিকে, নিশানা দাও ভাই। সেইখানে যাবো।

সকলে মুখ তাকাতাকি করে। এ বলে, জানো কোথায়? ও বলে, গিয়েছ সেখানে? এত জায়গায় ঘোরাঘুরি—সাগরচক কই মনে তো পড়ে না।

পুরো দুটো দিন এদিকে সেদিকে ঘোরাঘুরি। শেষটা খোঁজ পাওয়া যায়। এক বুড়ো মাঝি গদগদ হয়ে উঠল : আহা, বড় ভাল জায়গা গো! মিঠাজলের পুকুর—টিউকলের তখন চলন হয়নি, খাবার জলের অভাব পড়লে কতদিন এসে চকের পুকুর থেকে নৌকো ভরে জল নিয়ে গিয়েছি। দোতলা কাছারি, ইস্কুল, ডাক্তারখানা—

রাত হয়ে গেছে তখন, অন্ধকার। ভক্তদাস নাছোড়বান্দা হয়ে পড়ল : কোন্ দিকে সেই চক, ভাল করে হদিস দিয়ে যাও মুরুব্বি। ঘুরে ঘুরে নাজেহাল হয়ে যাচ্ছি।

এই তো—

লালমোহন ছইয়ের তলে ছিলেন, লহমার মধ্যে বাইরে চলে এলেন। মাঝি বলছে, রান্নাঘরে ঢুকে বলেন বাড়ি আর কন্দর—আপনাদের হল সেই বৃত্তান্ত। পানসি তো চকের বাঁধে কত্তা।

সীমাহীন জল—জল ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। তবু নাকি সাগরচকে এসে পড়েছেন। সীমানার বাঁধের উপর। ঠাহর করে দেখে দেখে ভক্তদাসও ক্ষণপরে বলে, তাই বটে আজ্ঞে। মুরুব্বি মিথ্যে বলে যায়নি। বাঁধের মতোই লাগে।

ভরা জোয়ারে চারিদিক ডুবে আছে, স্রোত অন্ধকারে ডাক ছেড়ে ছুটেছে। লালমোহনও দেখতে পাচ্ছেন কালো রঙের বিসর্পিল রেখা একটা—মাইল মাইল পরিব্যাপ্ত অতিকায় অজগরসাপ ভাসছে যেন জলের উপর। সাগরচকের বাঁধ। বাঁধের অন্তরালে পাকা ধানে ভরা দিগ্‌ব্যাপ্ত প্রান্তর। দোতলা পাকাকাছারি বড়নদীর উপর। টিলায় টিলায় গ্রাম। রাত পোহায়ে দিনমান হলে ধান কাটতে মানুষ দলে দলে ক্ষেতে নামছে। ক্ষণে ক্ষণে সখীসোনার গান—যেমন ঐ কিষাণদের ডিঙিতে পথের মধ্যে শুনে এলাম। ধান কেটে খোলাটে তুলছে। ডালে-মলে ভরা বোঝাই হয়ে গাঙ-খাল বেয়ে বেয়ে চলে যাবে বেলডাঙার রায়বাড়ি। —একমাত্র মেয়ে মীনাক্ষীর সংসারে। যে সংসারে ধুমধাম লেগেই আছে—চিংড়ির খটিওয়ালা নতুন বড়লোক লালমোহন সে বস্তু ধারণায় আনতে পারেন না। মীনাক্ষীদের সাগরচকে এসে পড়লেন অবশেষে!

নোঙর ফেলতে গিয়ে মাটিও পাওয়া গেল সহজে—অগভীর জায়গা। রাতটুকু সেখানে কাটল। শেষরাত্রে ভাটা, একফালি চাঁদও দেখা দিয়েছে আকাশে। তখন কিছু আন্দাজ পাওয়া যায়। ভোরের আলোয় সুস্পষ্ট দেখা গেল—

ধানক্ষেত কোথা—জলের সমুদ্র। টিলার উপরে দু-চারটে ভাঙাচোরা ঘরবাড়ি, এককালে বসতি ছিল বোঝা যায় বটে। চন্দ্রভানুর বড় বাহারের কাছারিবাড়িও বেশি দূরে নয়।

পানসি ঘুরিয়ে কাছারির ঘাটে গিয়ে ধরল। উঠানে একহাঁটু জঙ্গল—সাপখোপ কত লুকিয়ে আছে ঠিক কি। সীমানার পাঁচিল ভেঙেচুরে স্তূপাকার। নোনা-ধরা পলস্তারা খসে কামরার দেয়ালগুলো দাঁত বের-করা কঙ্কালের মতো ভয় দেখাচ্ছে।

লালমোহন হাহাকার করে ওঠেন : সাগর-চকের জাঁক কানে শুনেই মজলাম। মেয়ে দেবার আগে একবার স্বচক্ষে দেখে গেলাম না!

এখন আবার রায়বাড়ির বৈঠকখানায় ঢুকতে গিয়ে সাগরচকের কাছারির সেই চেহারাটা মনে আসে। এই উঠানও ঠিক তাই। মনঃক্ষোভ চেপে রাখতে পারেন না। স্থান-কাল ভুলে ভক্তদাসকে বলে ওঠেন, কী করেছি আমরা ম্যানেজার! হায় রে হায়, অট্টালিকাই দেখলাম, ভিতরে চামচিকের বাসা দেখলাম না কেউ তাকিয়ে!

ধ্রুবভানু কোন দিকে ছিল, হন্তদন্ত হয়ে এসে প্রণাম করল।

লালমোহন জামাই সম্ভাষণ করলেন : তোমাদের চক দেখতে গিয়েছিলাম, কিন্তু দেখতে পেলাম না বাবাজি। তোমাদের সাগরচক দেখতে হলে ডুবুরি হতে হয়। বেহাইমশায় নেই যে, কাকেই বা বলি আজ এইসব।

একটু থেমে আবার বলেন, মুখে বলেই তো শোধ যাবে না, উপায় কি হতে পারে তাই ভাবছি। কলকাতার পড়াশুনো শেষ করে তুমি কোন কাজকর্মে ঢুকে পড়ো। আমি পিছনে আছি, তোমাদের যা হোক এক রকম সংকুলান হবে। কিন্তু রায়বাড়ির নিত্যিদিনের এই ধুমধাড়াক্কা আর ঐ যে নিষ্কর্মার দল পোষা হচ্ছে—

প্রসঙ্গ উঠতেই ধ্রুবভানু ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। বলে, ভিতরে চলুন যাই—

অর্থাৎ এ সমস্ত আলোচনা কারো সামনে হতে দেবে না। উচিত বটে। রাগের বশে লালমোহনই বরঞ্চ হুঁশ হারিয়েছিলেন। সামলে নিলেন।

অন্দরে যেতে যেতে জামাইকে একেবারে একলা পেয়ে ফলাও করে আরম্ভ করলেন : এক এক মানুষের এক ব্যাপারে মজা। তোমার বাপ-দাদারা পিঁজরাপোল বানিয়ে গেছেন। অকেজো অক্ষম গরু-মহিষ নিয়ে পিঁজরাপোল করে, তোমাদের এটা হল মানুষের পিঁজরাপোল। ভূমিলক্ষ্মী অফুরন্ত দিতেন, তখন এসব পোষাত। পথ দেখিয়ে দাও ওদের সোজাসুজি—দালানে ছুঁচো-চামচিকে বরঞ্চ বসবাস করুক। সে ভালো, এক পয়সাও তাতে খরচা নেই।

কথার মাঝখানে আচমকা ধ্রুবভানু অন্দরের একটা ঘরে আঙুল দেখিয়ে দেয় : আপনার মেয়ে ঐখানে, চলে যান। বলে মুহূর্তের জন্য আর দাঁড়ায় না। হনহন করে উল্টো দিকে চলল। লালমোহন স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ালেন। অশিষ্টতা, অপমান। বাপও একদিন এই বাড়িতে অপমান করেছিলেন। তখন অনেক ছিল, লালমোহনও প্রার্থী হয়ে এসেছিলেন। কিন্তু হাঘরের বেটা হাঘরে আজকে এত স্পর্ধা পায় কোথায়?

মেয়ের কাছে গিয়ে বোমার মতো ফেটে পড়েন : না-হক অপমান করল আমায়। বাপ যেমন ছিল, ছেলেটাও অবিকল তাই। রক্তের দোষ।

মীনাক্ষী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব শুনল। বলে, ওরা কি করবে না করবে, কুটুম্বমানুষ তুমি তার মধ্যে কথা বলতে যাও কেন?

কথার মধ্যে থাকব না—বলিস কি তুই? বুকের জ্বালা—তাই বলতে হয়। বিষয়-সম্পত্তির দফা নিকেশ। পানসি ভরে বরসজ্জা পাঠিয়েছি, মাথা থেকে পা অবধি তোকে গয়নায় সাজিয়ে দিয়েছি—কিছু কি আর থাকবে? বেচে খাবে একটা দুটো করে। সমস্ত হয়ে গেলে ফুটো ইজ্জত তারপরে ঠেকাবে কি করে? ভিক্ষের ঝুলি তখন যে কাঁধে!

সন্ত্রস্ত হয়ে মীনাক্ষী বলে, চুপ করো বাবা। পায়ে পড়ি তোমার। যা বললে কক্ষনো আর উচ্চারণ কোরো না। দেয়ালেরও কান আছে।

থাকলে তো বয়ে গেল। কানে পড়ে কি করবে? সাগরচক সাগর হয়ে রয়েছে। ভিখারি তো এখনই, এত ডাঁট [illegible]সের শুনি[illegible]। তুই চলে আয় আমার সঙ্গে। সোনাছড়ি ভাইদের সঙ্গে [illegible] থাকিস, তোর জন্যে আমি আলাদা পাকা [illegible]বস্থা করব।

শান্ত দৃঢ়ক[illegible]ঠ মীনাক্ষী বলে, এদের

সর্বনাশ দেখে এসে তোমার মন ভাল নেই বাবা। তুমি চলে যাও। মন খারাপ সকলেরই। ভয় করছে, আমারও মুখ দিয়ে বেয়াড়া কথা বেরিয়ে না পড়ে।

ঘুম ভেঙে ধড়মড়িয়ে উঠে মীনাক্ষী দেখে, ধ্রুব নেই—সেই আর এক রাত্রের মতো বেরিয়ে পড়েছে। কুলুঙ্গিতে সারা রাত রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বলে—আবছা অন্ধকার, কেমন একটা রহস্যময় থমথমে ভাব চারিদিকে। ছোটখাট এক মাঠের মতন বিস্তৃত কক্ষ, অত্যুচ্চ ছাত, তারই সঙ্গে নিতান্ত বেমানান ছোট ছোট ঘুলঘুলি আর আঁটো মাপের দরজা—এই রাত্রে মনে হয় রাক্ষসের বিশাল জঠর। তার ভিতরে এসে পড়ে মীনাক্ষী তিলে তিলে জীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। কী করবে সে, কেমন করে বাঁচবে? ডাক ছেড়ে কেঁদে ফেলে বুঝি নিশুতি রায়বাড়ি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করে।

কিরণবালা যখন তখন বলে, পুরুষমানুষ বিশ্বাস করতে নেই ভাই নতুন-বউ—এ রায়-বাড়ির পুরুষ কিছুতে নয়। মুখ দেখে মুখের হাসি আর কথাবার্তা শুনে সেকালের কোন বউ ধরতে পারেনি সেই পুরুষই ডাঙায় জলে সারারাত্তির উৎপাত করে বেড়িয়েছে। বংশের রীতিনিয়ম একালে এসে বাতিল কি একেবারে—কে জানে! ধ্রুবর বুকে মাথা রেখে মীনাক্ষী পরম নিশ্চিন্তে ঘুমোয় একঘুমে রাত কাবার। সকালবেলা মীনাক্ষী উঠে পড়বার পরেও অনেকক্ষণ ধরে ধ্রুব ঘুমোচ্ছে—চেয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে দেবতার মতো প্রসন্ন হাসি ঘুমন্ত মানুষের মুখে। কিন্তু কে জানে, বিশ্বাস নেই এদের—রাত্রে কোন এক মুহূর্তে হয়তো পিতৃ-পুরুষের উচ্ছৃঙ্খল রক্ত দেহের মধ্যে টগ-বগিয়ে উঠেছিল, বেরিয়েছিল টিপিটিপি। শেষ রাত্রে ফিরে এসে আবার দেবতা হয়ে ঘুমোয়। মীনাক্ষী টের পায় না। পুরুষের কত রকমের মহিমা—কে তার হদিস দিতে পারে?

খুটখুট খুটখুট একটা ক্ষীণ আওয়াজ যেন বাইরে। অতি ক্ষীণ—কান পেতে থাকলে তবেই একটু একটু শোনা যায়। সুসম্বদ্ধ তাল রয়েছে—নিশ্বাসেপ্রশ্বাসে যেন ঘুমন্ত অট্টালিকার বুকের উঠানামা। আওয়াজ, বুঝতে পারছে, কক্ষের বাইরে অলিন্দের উপর। খুটখুট খুটখুট। একেবারে দরজা অবধি আসছে এখন, এসে আবার ফিরে যায়।

দরজা ভেজানো, কী সর্বনাশ! খিল দেওয়া নেই। এই দরজা খুলে ধ্রুব বেরিয়ে গেছে। খাট থেকে মীনাক্ষী নেমে পড়েছে: খিল এঁটে দেওয়া যাক। আওয়াজটা খুট খুট করে এই সময় একেবারে চৌকাঠের কাছাকাছি এসে পড়েছে। খিল না দিয়ে মীনাক্ষী দড়াম করে খুলে ফেলল দুদিকের দুই কবাট।

ধ্রুব। সুদীর্ঘ অলিন্দের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পায়চারি করছে। থামের পাশ দিয়ে চন্দ্রালোক তেরছা হয়ে পড়েছে—সেই আলো এক একবার মুখের উপর ঝিক-মিকিয়ে ওঠে। চলছে যেন ঘড়ির পেন্ডুলাম, দেহের মধ্যে প্রাণ বলে বস্তু নেই। দরজা খুলে মীনাক্ষী বাইরে চলে এসেছে, তবু ধ্রুবর নজরে আসে না, চোখ মেলে থেকেও যেন সে কিছু দেখছে না। শয্যার উপরের পাশা-পাশি সেই মানুষটি নয়—প্রেতলোক থেকে সদ্য নেমে এসেছে আলাদা এক ধ্রুব। গা কাঁপে, বুক শুকিয়ে আসে। ব্যাকুল হয়ে ছুটে গিয়ে মীনাক্ষী তার হাত জড়িয়ে ধরল।

আচ্ছন্ন দৃষ্টি তুলে যেন ভিন্ন এক জগৎ থেকে ধ্রুব প্রশ্ন করে, কি মীনা?

মীনাক্ষী কেঁদে বলে, ওগো, আমার ভয় করছে। যা ছিলে তুমি তেমনি হও।

নিঃশব্দে বধূর সঙ্গে সে ঘরে ঢুকল। খাটের উপর পা ঝুলিয়ে বসে বেদনাচ্ছন্ন গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মীনাক্ষীর দিকে। গা শিরশির করে মীনাক্ষীর। বলে, কি হয়েছে, খুলে বলো আমায়। বলো।

ধ্রুব সহসা বলে উঠল, তোমার গয়না-গুলো আমায় দাও।

হায়রে হায়, রূপসী যুবতী বউ চোখে দেখতে পেল না, দেখাচ্ছিল এতক্ষণ গা ভরে

"কি হয়েছে খুলে বলো আমায়।"

যে সব ছাইভস্ম গয়না পরে আছে। গয়না হঠাৎ এক এক চাংড়া আগুন হয়ে ওঠে, গা যেন পুড়েজ্বলে যাচ্ছে, ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারলে বেঁচে যায়।

ধ্রুব আবার বলে, দিয়ে দাও ওগুলো। আমার বড় দরকার।

কাতর অনুনয়ের কণ্ঠ। সম্ভবত জলে-ডোবা সাগরচক নিয়েই ব্যাপার। নতুন বাঁধ বাঁধতে লোক লাগাবে। কিংবা পুরানো কোন ঋণ মাথার উপর চেপে আছে, গয়না দিয়ে দায়মুক্ত হবে। সেই উদ্বেগে ঘুম নেই চোখে। নিশি-পাওয়ার মতন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কেন, কি বৃত্তান্ত—এতসব জিজ্ঞাসার সাহস নেই, ইচ্ছাও করছে না। চোখ ছল-ছলিয়ে এলো মীনাক্ষীর। ছাই গয়না! গয়না চলে গিয়ে রাতভোর তোমায় যেন পাশটিতে পাই। একটি কথাও না বলে মীনাক্ষী একে একে গায়ের গয়না খুলে দিল। মকরমুখ দু'হাতের দুটি কঙ্কণ—মকরের দুজোড়া চোখে লাল-টুকটুকে পাথর বসানো। কঙ্কণ-পরা হাত-দুটি নেড়ে মীনাক্ষী বলে, আমার ঠাকুরমা'র দেওয়া সৌভাগ্যকঙ্কণ। সৌভাগ্য শুধু রেখে দিচ্ছি এ কাউকে দেওয়া যায় না।

ধ্রুবজ্ঞান, বলে, আমায় দাও মীনা, আমি চাইছি। আরও দাও—যেখানে যা-কিছু আছে। তোমার বাক্সপেটরায় যত কিছু আছে, সমস্ত গয়না আমার চাই।

বাক্স খুলে আরও যত ছিল মীনাক্ষী বের করে খাটের উপর রাখে। মধুর হেসে বলে, আর আমার নেই—

কমসম নয়, স্তূপাকার। শীতের উড়ুনি শালখানা খুলে ধ্রুব সমস্ত একত্র করে বাঁধল। পুঁটলিটা উঁচু করে তোলে একবার।

মীনাক্ষী বলে, আমি দেখি—

দেখাদেখি সে-ও তুলতে গেল। সহজ নয়। সোনার বড় বিষম ওজন। তুলতে প্রাণ বেরিয়ে যায়।

ধ্রুব বলে, উঃ, কত দিয়েছেন! বাবা টাকাই চেয়েছিলেন, কিন্তু বাড়তি সোনা কেন যে দিতে গেলেন আমার মতন পাত্রকে!

চুপ! মীনাক্ষীর আদরের তাড়নায় ধ্রুবের কথা শেষ হয় না। হেসে বলে, মোক মেয়েটা গছালেন যে! শ্বশুরঠাকুর না-ই চাইলেন, নিজেদের আক্কেল বিবেচনা থাকবে না : গয়নায় একটু ঝিকমিকে হয়ে তবেই তোমার পাশে দাঁড়াতে পারলাম।

ধ্রুবও হাসছে। বলে, তা নয়। কেন দিয়েছেন জানো—নিগুণে জামাই দুঃসময়ে বেচে খেতে পারবে সেইজন্য। শ্বশুর মশায়ের দূরদৃষ্টি আছে।

মীনাক্ষী শিউরে উঠল। বাপের কাছে যা বলেছিল সত্যি সত্যি তাই। রায়বাড়ির দেয়াল শুনতে পায়। শুনে রেখেছিল তাদের বাপে-মেয়েয় কথা, নতুন-মনিবের কাছে যথাকালে পৌঁছে দিয়েছে।

ভাল করে তখনো সকাল হয়নি। হঠাৎ বৃন্দাবনকে দেখা গেল।

কি খবর?

ভাল খবর খোকাবাবু। গাঙ যা চেয়েছিল, তাই হয়েছে—দুই গাঙে মিলে-মিশে চকের ভিতর দিয়ে সোজা পথ করে নিয়েছে। পাশে পাশে মাটি ফেললে আর এখন গোলমাল করবে না। মুরুব্বিরা বলছেন, চক ছোট হয়ে গেল, কিন্তু বেঁধে ফেলতে পারলে ফলন আগেকার চেয়ে বেশি বই কম হবে না।

যে জন্য বৃন্দাবন এতদূর চলে এসেছে—মবলগ টাকার দরকার। তাড়াতাড়ি চাই। বৃন্দাবনদের অনিশ্চিত পন্থার উপরে নির্ভর করা যাচ্ছে না। কাছে না থাকলে ধারকর্জ করে ব্যবস্থা করে দাও খোকাবাবু, পরিশোধ একটা দুটো বছরের মধ্যে সুনিশ্চিত।

ধ্রুবের কণ্ঠস্বর হাহাকারের মতো। বলে, কিছুই নেই তোমাদের খোকাবাবুর। একেবারে কিছু নেই। ঐরাবত পড়ে পড়ে তাই ব্যাঙের লাথি খায়। যেতেও চাইনে মরীচিকার পিছনে। যার জন্যে বাবার ঐ শেষ পরিণাম।

ছেলেমানুষ বড় বেশি রকম ভেঙে পড়েছে। বৃন্দাবন ধমক দেয় : ছোটরায়ের ছেলে না তুমি?

রায়বাড়ির কুলাঙ্গার। সুখ আর শান্তির সামান্য জীবন চাই আমি। কলকাতার জানা-শোনা সকলের কাছে চিঠিপত্র লিখছি। কোন একটা ব্যবস্থা হলে দেশান্তরী হবো। সাগরচক রায়বাড়ি এ সমস্ত তোমাদের। আমি এখানে বেমানান।

বিরস মুখে বৃন্দাবন চলে যাচ্ছে। ধ্রুব বলে একটু দাঁড়াও। আমি যাবো তোমার ডিঙিতে। পথে নামিয়ে দিও।

মীনাক্ষীর গয়না কাপড়েচোপড়ে জড়িয়ে কাপড়ের পোঁটলা হয়েছে একটা। কাপড় ছাড়া যেন অন্য কিছু নয়। পোঁটলা হাতে ধ্রুব বৃন্দাবনের ডিঙিতে উঠল।

সেই দিন সেই রাত্রি দেখা নেই, পরের দিন সন্ধ্যার কাছাকাছি ধ্রুব বাড়ি ফিরল। ক্লান্তিতে আধখানা, কিন্তু তৃপ্তি আর আনন্দে যেন নেচে নেচে ফিরল। কোন এক বড় দায় কাটিয়ে এসেছে, সেটা আর জিজ্ঞাসা করে নিতে হয় না।

মীনাক্ষীরও বড় আনন্দ। গয়না গেছে, সেই রাত্রির পর থেকেই কেমন এক আতঙ্ক—শতেক বার ঘুম ভেঙে যায়। দেখে, বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছে ধ্রুবভানু, দুটি হাতে বেষ্টন করে আছে তাকে। ধ্রুবের ঘুম আর একটুকু বিচলিত নয়। গয়না বিদায় হয়ে এই যে বউয়ের নতুন গয়না হল। ভারি জাঁকের গয়না। বরের দুখানা বাহু কণ্ঠহার হয়ে গলায় রয়েছে, ভালবাসার মিষ্টি আবেশ সর্ব অঙ্গ আর মনপ্রাণ জুড়ে গয়নার রিনিঝিনির মতো বাজছে। সোনার বোঝা ফেলে ভারমুক্ত হয়েছে মীনাক্ষী। সে ছিল অহংকারের বোঝা, অস্বস্তির বোঝা। ঐ এক ব্যবধান ছিল তার আর ধ্রুবের মধ্যে—ফুটন্ত কাঁটার মতন। বাধা মুছে গিয়ে দুজনে মিলে একলা—একজন।

বাড়ির মধ্যে সকলের নজরে আসতে লাগল। গোবিন্দসুন্দরী অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন : তোমার গা এমন খালি কেন বউমা? গয়না কি হল?

খুলে রেখেছি। বড্ড ভারী পিসিমা। বয়ে বেড়াতে কষ্ট হয়।

গোবিন্দসুন্দরী গালে হাত দিয়ে বললেন, ওমা আমার কী হবে! মেয়েমানুষের গায়ে গয়না ভারী, কেউ বিশ্বাস করবে না। আছে অনেক রকম দেমাক দেখাচ্ছ, তাই বলাবলি হবে।

কিরণবালা বলে, কী হয়েছে বল তো নতুনবউ? ঝগড়াঝাটি হল বুঝি?

হাসিতে ভেঙে পড়ে মীনাক্ষী : দূর!

তা-ও বটে! ঝগড়াঝাটির পর এত হাসিস্ফূর্তি আসে না। ব্যাপার অন্য কিছু।

মীনাক্ষী জবাব ভেবে নিয়েছে ইতিমধ্যে। বলে, রেখে দিয়েছি সামাল করে। মাগো মা, যা সব চুরি-ডাকাতির কথা শোনা যায়!

নয়নতারা ভ্রূভঙ্গি করে বলে, অন্য যেখানে যা-ই হোক, এ বাড়ি কখনো নয়। সর্দার-মানা পেয়ে থাকে এরা এখন অবধি।

রায়বাড়ি স্ত্রীলোক অনেক। কানাকানি সকলের মধ্যে, কথা ক্রমে বাহিরমহলে চলে যায়। সেখান থেকে পাড়ার মধ্যে। সরকার-দের মেয়ে সৌদামিনী এসে বলে—হয়তো বা পরখ করবার অছিলায়—তোমার কঙ্কণ জোড়া একটুখানি দাও নতুন-বউ। স্যাকরা এসে বসে আছে, তাকে দেখিয়ে এক্ষুনি আবার দিয়ে যাবো। ঐ রকম মকরমুখ দিয়ে অনন্ত গড়াব।

মীনাক্ষীকে অগত্যা স্বীকার করতে হয় : গয়না ও'র কাছে দিয়েছি ভাই। উনি কোথায় সামাল করে রেখেছেন।

কিরণবালা এসে দাঁড়িয়েছে। অবাক হয়ে সে বলে, এই মরেছে। নেকী মেয়ে-মানুষ তুই। পুরুষের হাতে গয়না কেউ দেয়—তার উপর এই বাড়ির পুরুষের কাছে?

সৌদামিনী বলে, আছে তো কাছে, না চলে গেছে অন্য কোথায়? তুমি ভিন্ন জায়গার মেয়ে, এখানকার রকমসকম জানো না। গয়না চেয়ে নিয়ে নিজের কাছে রেখে দিও, কাছ-ছাড়া কোরো না। ঘরের পুরুষ ভাল হয়তো বড্ড সুখের কথা। তাই বলে একেবারে গা ঢেলে বিশ্বাস করতে যাবে কেন?

বলছে সৌদামিনী আর বাঁকা হাসি হাসে কিরণবালার দিকে চেয়ে। হাসি দেখে মীনাক্ষীর বুদ্ধিশুদ্ধি কেমন যেন তাল গোল পাকিয়ে যায়, অজানা শঙ্কায় বুকের মধ্যে ঢিবঢিব করে, কঠিন হয়ে বসে থাকে মাথা ঘুরে না পড়ে যেন এদের সামনে।

কিরণবালা পিঠ পিঠ আবার এক গল্প শোনাল—রায়েদেরই বড়তরফের ব্যাপার। ফুল-উয়ের হাতের বালা চুরি গেল নিরেট সোনার জিনিস, বিস্তর দাম। হৈ-চৈ পড়ল বাড়ির মধ্যে। বড়বাবু রগচটা মানুষ, চাকরবাকর ধরে এই পিটুনি : চোর কে, বাইরে থেকে এসেছে? বাড়ির মানুষ তোরাই কেউ সরিয়েছিস, প্রাণে বাঁচতে চাস তো সরলভাবে স্বীকার কর। স্বীকার করল এক ছোকরা চাকর, না করে রেহাই ছিল না। ফাটকে যেতে হল ছোকরাকে। সেই বালা তারপরে পাওয়া গেল জেলেপাড়ায় এক জেলের মেয়ের হাতে। ঠমক করে মেয়েটা মেলায় গিয়েছিল, বেলডাঙার একজনে তার হাতের বালা দেখে এসে [illegible] খাঁটি ব্যাপার তখন বেরিয়ে পড়ে : অপর কেউ নয়, খোদ ফুলবাবুই প্রণয়োপহার দিয়েছেন ঘুমন্ত স্ত্রীর হাত থেকে গয়না চুরি করে নিয়ে। চাকরটা জেল খাটছে তখনো। চুপ, চুপ—ঘরের কেলেঙ্কারি বাইরে চাউর না হয় যেন। তেমন মানুষ বড় তরফের ঐ ফুলবাবু শুধু নয়, নিয়মই এই রায়বংশের।

মীনাক্ষী মরীয়া হয়ে ধ্রুবভানুকে জিজ্ঞাসা করল, গয়না নিয়ে কি করলে? কাছে আছে তোমার?

না, বেচে খেয়েছি।

লালমোহন মিত্তিরের কথাগুলোই ছুঁড়ে মারে তাঁর মেয়ের গায়ে। ভ্রূকুটি করল ধ্রুব বধূর দিকে। বলে, হঠাৎ গয়নার কথা কেন? যেদিন সমস্ত দিয়ে দিলে তখন তো একটি কথাও বলোনি।

মীনাক্ষী থতমত খেয়ে বলে, এমনি—

ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। সামনে থেকে পালিয়ে যেন বাঁচল। ধ্রুবভানুর মনে অহোরাত্র কাঁটার মতো খচখচ করে : গয়নার শোক হঠাৎ উথলে উঠল, আসল কথাটা কি বড়লোকের মেয়ের মনে মনে? সাগরচক গিয়েছে, সেই দায়ে নিজের স্ত্রীও বাঙ্গ করল?

নিভৃতে পেয়ে রুক্ষভাবে সে মীনাক্ষীর হাত চেপে ধরল : গয়নার কথা কি ভেবেছ, সত্যি কথা বলো। স্পষ্টাস্পষ্টি জবাব দাও।

ইদানীং এমন হয়েছে, মীনাক্ষী যার মুখের দিকে তাকায় সৌদামিনীর সেই বাঁকা চোখ দেখতে পায় সেখানে। দেখে দেখে

ক্ষেপে গিয়েছে। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে শান্ত কঠিন কণ্ঠে বলল, আমার সৌভাগ্যকঙ্কণ সেই গয়নার মধ্যে। একেবারে না বেচে যদি বন্ধক দিয়ে থাকো—

কি হবে তাহলে? বড়লোক বাপের হাতে-পায়ে ধরে বন্ধক ছাড়িয়ে আনবে?

হাতে-পায়ে ধরতে হবে কেন? টের পেলে নিজে থেকেই বাবা ছাড়িয়ে দিতেন।

যেন মীনাক্ষী নয়—এত কথা কে বুঝি বলিয়ে নিল তার মুখ দিয়ে। বলতে বলতে থেমে পড়ে। কেমন করে তাকিয়ে পড়েছে ধ্রুব। বাঘের কথা শুনেছিল, বাঘ মরে এরা সব হয়েছে—বাঘে বুঝি এমনি করে তাকায় ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে। নির্বান্ধব এই অট্টালিকা যেন মহারণ্য—বাঘের মুখোমুখি সে দাঁড়িয়ে। হায়, হায়, কে বাঁচাবে?

মীনাক্ষী কেঁদে বলে, ছাই গয়না! গয়না চাইনে আমি। কথার কথা—একটা ঠাট্টাও কি করতে নেই! আমার ঘরের খবর বাবাকে জানাতে যাবো কেন? রাগ কোরো না, পায়ে পড়ি তোমার।

কোন কিছুই ধ্রুবের কান অবধি পৌঁছয় না। সে বলে যাচ্ছে, ঠিক ঠিক সেই জিনিস তোমায় দিতে পারব না। সৌভাগ্য-কঙ্কণও গেছে। কিন্তু গয়নায় তোমাকে ঢেকে ফেলব, গয়নার বোঝায় গুঁড়িয়ে দেবো। এই আমার কথা দেওয়া রইল।

বচসার পর থেকেই নতুন উপসর্গ। ধ্রুবভানুকে সন্ধ্যার পরে ঘরে পাওয়া যায় না, ফেরে অনেক রাত্রে। অর্থাৎ চক্ষুলজ্জার বালাই কেটে আসছে ক্রমে। ঘর ছেড়ে মীনাক্ষী তাদের সেই অলিন্দে এসে দাঁড়ায়। দিগব্যাপ্ত নদী অন্ধকার রাত্রেও চিকচিক করে। অট্টালিকা নিশ্চুপ, নিঃশব্দ। কল্লোলধ্বনি অস্পষ্ট কানে আসে চাপা কান্নার মতো। মীনাক্ষীর মনপ্রাণ ঐ সঙ্গে সুর মিলিয়ে কাঁদে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে একসময়ে সে গিয়ে পড়ে বিছানায়। ধ্রুব আসে অনেক—অনেক পরে, রাত্রি প্রায় শেষ করে। মীনাক্ষী স্পষ্ট টের পাচ্ছে। ঘুমের ভান করে পড়ে আছে, সন্ধ্যা থেকেই ঘুমোচ্ছে যেন। কথা-বার্তা দুজনের মধ্যে সংক্ষিপ্ত, নিতান্ত যেটুকু নইলে নয়। ধ্রুব কদিন বড় উসখুস করেছে, নিভৃতে হয়তো কিছু বলার জন্য। মীনাক্ষী সুযোগ দেবে না। পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়, কাজের অছিলায় সর্বক্ষণ অন্যদের কাছে থাকে। কী হবে আজেবাজে মিথ্যেকথা শুনে?

এক রাত্রে অমনি দাঁড়িয়ে আছে। পায়ের কাছে কী কিলবিল করে—মীনাক্ষী লাফিয়ে দু-পা সরে যায়। না, নতুন কিছু নয়—নর্দমার ফোকর থেকে ইঁদুর বেরিয়ে এসেছিল, মানুষ দেখে পালিয়ে গেল। মানুষগুলো ঘুমোয়, পুরানো বাড়ির অন্ধিসন্ধি থেকে ইঁদুর বেরিয়ে কিচকিচ করে। ছাদের আকুল্সের অন্ধকারে পাখার ঝাপটা দিয়ে বাদুড় উড়ে বেড়ায় এদিক-সেদিক। এদেরই রাজত্ব এখন, এদেরই এই রাত্রিকাল।

গড়খাইয়ের মুখে হঠাৎ নজর গিয়ে পড়ে। বড়নদী থেকে ডিঙি একটা এসে ঢুকছে। একজন মাত্র মানুষ—বোঠেও বাইছে না, আলগোছে ধরে আছে। জোয়ারের ধাক্কায় ধীরে ধীরে ডিঙি খালের মধ্যে ঢুকে গেল। তেঁতুলতলার অন্ধকারে এসে ডিঙি ও মানুষ অদৃশ্য। অত দূরের হলেও সে মানুষ চিনতে মীনাক্ষীর ভুল হয় না।

আজকে আর ঘুমের ভান করে বিছানায় পড়ে না। কথা স্পষ্টাস্পষ্টি হয়ে যাওয়া উচিত। এগিয়ে সিঁড়ির পাশে চলে গেল। উঠে আসছে ধ্রুব অতি নিঃশব্দে—বিড়ালের চলনে। অলিন্দে উপর পা দিয়েছে, শান্তকণ্ঠে মীনাক্ষী আহ্বান করল, এসো।

ধ্রুব হকচকিয়ে গেছে। কৈফিয়তের ভাবে বলে, পড়াশুনোয় বসি। পরীক্ষাটা দেবোই এবার। এত রাত্রি হয়েছে, বুঝতে পারিনি।

যেন অন্যদিন তাড়াতাড়ি এসে পড়ে। মীনাক্ষী সকাল সকাল শুয়ে পড়ে, তাই জানতে পারে না।

ধ্রুব বলে, বাইরে-বাড়ি নয়—এবার থেকে বইটই এই ঘরে নিয়ে আসব।

সে কি গো! হাসিতে ভেঙে পড়ল মীনাক্ষী। ঘাড় দুলিয়ে বলে, না, কক্ষনো না। রায়বংশের পুরুষরা বাইরে বাইরে কত কি করে বেড়ায়। তোমার তো ভাল কাজ—বাইরে-বাড়ি বসে পড়াশুনো করা। সন্ধ্যাবেলা অন্দরে আসতে যাবে কেন? আমার নাম খারাপ হবে—লোকে বলবে, কুহকিনী বউটা বাঘকে ঘরে পুরে ভেড়া বানিয়েছে।

পড়াশুনো সেরে কোন পথ দিয়ে চুপিসারে বাড়ি এসে ঢুকলে সে কি আর দেখিনি আমি? লালমোহন মিস্তিরের মেয়ে মীনাক্ষী, কর্মবীর সজ্জন বাপের মেয়ে পাপজর্জর পড়তি সংসারে এসে পড়েছে—মনে যা হচ্ছে মুখে তার এতটুকু ছায়া ফুটতে দেবে না। কত বড় হাস্যকর কথা বলেছে যেন ধ্রুব, হাসিতে একেবারে গলে গলে পড়ছে। বলে, না, ওসব হবে না, সন্ধ্যাবেলা ঘরে কেন বসে থাকতে যাবে?

ঘরের মধ্যে দুজনে। কুলুঙ্গির প্রদীপটা মীনাক্ষী চাপা-দেওয়া খাবারের কাছে নিয়ে এলো। ঢাকা আলগা করে গ্লাসে জল গড়িয়ে দিয়ে জাপটে বসে পড়ল সামনে মেঝের উপর।

ধ্রুব বলে, তোমার খাওয়া হয়েছে তো?

ভ্রুভঙ্গি করে মীনাক্ষী বলে, কখন, কখন! রোজই তো খেয়ে নিই আমি। কি করব—ক্ষিধে আমি মোটে সহ্য করতে পারি নে, তা লোকে যা-ই বলুক।

ধ্রুবভানু সত্যি সত্যি খুশি হয়ে বলে, কে কী বলবে! পুরুষমানুষ কখন কোন কাজে আটকে পড়ে, আর একজনে না খেয়ে কেন বসে থাকবে?

এ কিন্তু মিথ্যা বলল মীনাক্ষী। খায়নি সে, কোন দিন খায় না। খেতে প্রবৃত্তি থাকে না। রাত্রের খাওয়া ছেড়েই দিয়েছে এক রকম।

আচমকা বোমার মতো এবারে সেই প্রশ্ন, যার জন্য আজ মীনাক্ষী সামনে এসে বসেছে: আমার গয়না কোথা?

হাতের গরাস মুখে না তুলে ধ্রুব তাকিয়ে পড়ল। মীনাক্ষী কেটে কেটে বলে, গয়নায় ঢেকে দেবে বলেছিলে যে হাঁকডাক করে! গয়নার ভারে নাকি গুঁড়িয়ে দেবে? কত দেরি সেদিনের? হাত খালি কান খালি গলা খালি—লোকের কাছে মিথ্যে অজুহাত দিতে দিতে প্রাণ যায়। সর্বাঙ্গ ঢেকে কাজ নেই, আমার কল্যাণকঙ্কণ দিয়ে দাও শুধু। তা-ও না পারো তো সাদামাটা কঙ্কণ এক জোড়া।

পাবে তুমি, নিশ্চয় পাবে। খাওয়া ছেড়ে ধ্রুব উঠে পড়েছে। বলে বাপ-ঠাকুরদার বাস্তুর উপর দাঁড়িয়ে আমি মিথ্যে বলিনি নতুন-বউ। বাপের বাড়ি থেকে যেমনটি এসেছিলে, সোনার সজ্জায় আবার আমি তোমায় তেমনি করে সাজাব। আমার প্রতিজ্ঞা।

সকালে ঘুম ভেঙে মীনাক্ষী দেখে, ধ্রুব কখন উঠে বেরিয়ে গেছে। বাড়িতেই নেই। সমস্তটা দিন কেটে গেল। কোথায় গেছে কেউ জানে না, নকড়ি-গোমস্তা অবধি নয়। কান্না পাচ্ছে বড় মীনাক্ষীর—মানুষটাকে চিনে রাখবে, তা নয় অপমান করে দূরে সরাল। সামনে খাবার নিয়ে বসে খেতে পারল না। এখানে দেখা হলে মাথা খুঁড়বে পায়ে: চাইনে সোনা, কিছু চাইনে আমি। তুমি কাছে কাছে থাকো। সেই আগেকার মতো আদরে আদরে ভরে দাও।

দুটো দিন ও দুটো রাত্রি গেছে। ধ্রুব এলো না। বাড়ির লোকের কিছুমাত্র উদ্বেগ নেই। এই তো নিয়ম পুরুষ-মানুষের। এই তরফে না হোক, অন্য তরফে হামেশাই এ রকম ঘটে রায়বাড়ি। কিন্তু মীনাক্ষী যে অঞ্চলের মেয়ে, সেখানে এ জিনিষের মার্জনা নেই। বাঘ পোষ মানানোর দেমাক করে এসেছিল এবাড়ি, আজ কোথায় মুখ লুকোবে ভেবে পায় না।

আরও অতিষ্ঠ করে তুলছে বাড়ির মানুষ যখন তখন দরদ জানিয়ে। গোবিন্দসুন্দরী বলেন, সোনার অঙ্গ কালি করে ফেললি যে দিদি, আয়না ধরে দেখেছিস? হয়েছে কি শুনি! কাঁচা বয়সে পাকসাট অমন সবাই মেরে থাকে, রক্তের জোর কমলে সেরে যাবে। স্ফূর্তি করে খাবি-দাবি, দেখা হলে মুখ ঘুরিয়ে নিবি। তোদের বয়সের খেলাই তো এই—রাধাকৃষ্ণের মান-অভিমান।

আর কিরণবালা সন্ধ্যা হলেই কাঁটা-চিরুনি ফিতে-দড়ি আলতা-সিঁদুর নিয়ে জোর করে ধরে বসায়। চুল বাঁধবে, পাতা কেটে টিপ পরাবে, সিঁদুর পরাবে, আলতা দেবে পায়ে। ছাঁচিপান মুখে পুরে দেবে ঠোঁটদুটি যাতে লাল-টুকটুকে হয়। মুখ-খানা একবার এদিক একবার ওদিক ঘুরিয়ে দেখে তৃপ্তি ভরে বলে, ফাঁদ একখানা সাজিয়ে রাখলাম ভাই। যে জায়গায় যায়, তার চেয়ে শতেক গুণ রূপ দেখিয়ে মন কাড়তে হবে। তাই আমি করলাম। একবার যদি এসে পড়ে, ফুড়ুত করে পালাতে হবে না বাছাধনের। আটক হয়ে থাকবে।

সাজগোজে সর্বাঙ্গ রি-রি করে জ্বালা করে, মুখে মীনাক্ষী কিছু বলতে পারে না। কদিন পরে ভক্তদাস পানসি নিয়ে এসে পড়ল। লালমোহনের মা'র বড় অসুখ—বুড়োমানুষ কখন আছেন কখন নেই, নাতনীকে একটিবার দেখতে চান। এ সমস্ত

মীনাক্ষীর কারসাজি। চিঠি লিখেছিল মায়ের কাছে, মানে মানে পাপপুরী থেকে যাতে বেরিয়ে পড়তে পারে। বেরিয়ে খোলা হাওয়ায় নিশ্বাস নিয়ে বাঁচবে। ইন্দুমতী থেকেও নেই, ধ্রুব নিরুদ্দেশ—তার মতন ভাগ্য কার? নিজের কর্তা নিজেই এখন। ঘাটে গিয়ে মীনাক্ষী পানসিতে উঠে বসল। ঘাট অবধি যারা এসেছে, মুখ তুলে তাদের দিকে তাকাতে সাহস করে না। হয়তো দেখা যাবে, বাঁকা হাসি হাসছে এ-ওর দিকে চেয়ে। একদিন যেমন সৌদামিনীর মুখে দেখতে পেয়েছিল। হাসিতে আজ বড় ভয়।

গয়না চেয়েছিলে মীনাক্ষী—ঝিলমিলে ঝমঝমে গা-ভরা আজ গয়না। স্বর্ণসজ্জার কোন অঙ্গে বাকি নেই। আর মন-ভরা উল্লাস। এ পৃথিবী সোনা-সোনা হয়ে গেছে, একটুকু কালি-ময়লা নেই। কত কথা জমানো রয়েছে! রাত্রি পোহায়ে দিনমান হবে সকাল গিয়ে দুপুর হবে, দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা হবে—কথা আমাদের ফুরোবার নয়। এত দিনে ধ্রুবভানু নিশ্চয় বাড়ি ফিরেছে, মীনাক্ষীকে খুঁজছে। খোঁজ পেয়েও সে তো শ্বশুরবাড়ি যাবে না। কেন যেতে যাবে অমন শ্বশুরবাড়ি? থমথমে অভিমানে ধ্রুব হয়তো অলিন্দে একাকী ঘুরে বেড়ায়। বাড়ি ফিরে মীনাক্ষী সকলের আগে পড়বে স্বামীর দুটি পায়ে। দু-পায়ে মাথা গুঁজে পড়ে থাকবে। মরে যাওয়ার মতন। যতক্ষণ না আদর করে তুলে ধরে বুকের উপর—বুকে নিয়ে সে মীনাক্ষীর নতুন প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে। এই তুমি? আমায় একেবারে কিছু জানতে দাও নি—মনে-দেহে তুমি কি আমায় বাদ দিয়ে? আমারও সেই জন্যে বড় অভিমান। কত নোংরা ভেবেছি—ছি-ছি, তোমার সম্বন্ধে! যে যাই বলুক, কিরণবালাকে আমি দূর করে দেবোই। বড্ড ইতর মন—নিজের যা ঘটেছে, সকল পুরুষ সেই রকম ভাবে।

সোনাছড়ি আসবার জন্য খবর পাঠিয়ে মেয়ে এমনিভাবে এসে পড়ায় লালমোহন খুব বিস্মিত হয়েছিলেন। বললেন, জামাই তোর সমস্ত গয়না ফেরত দিয়ে গেছে। আমার গয়না সে বাড়িতে রাখবে না। তুই আবার কোন অপমান করবি বলে তেড়ে এসেছিস, বল্ আমায়।

মীনাক্ষী হতবাক হয়ে থাকে মুহূর্তকাল। সামলে নিয়ে তারপর গর্বিত ভঙ্গিতে বলে, গয়না আমিই খুলে দিয়েছিলাম বাবা।

লালমোহন বলেন, সেটা আর বলে দিতে হবে না। নিজের মেয়েই তো বড় শত্তুর! তুই না দিলে জামাই কি গা থেকে কেড়ে আনতে গিয়েছে?

মীনাক্ষী বলে, নতুন গয়না গড়াতে দিয়েছে তোমার জামাই। তোমার গয়নায় আমাদের দরকার নেই।

সেই তো আমার জিজ্ঞাসা। জামাইকে বলতে যাচ্ছিলাম, তীরের বেগে সে ছুটে বেরুল। বলি, গয়না আমার হল কিসে? বিয়ের যৌতুক দিয়েছি, তোদেরই তো সব।

মেয়ের কণ্ঠ কাঁপে অভিমানে ঃ গয়না বেচে খাবে, কি জন্যে তবে বলতে যাও? বেচুক আর জলে ফেলে দিক, আমাদেরই যদি জিনিষ হয়, ফিরে তাকাবে কেন সেদিকে?

জামাইকে বলতে গিয়েছিলাম? চকের দশা দেখে এসে মনের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে নিজের মেয়ের কাছে চুপিসারে বলেছি। পরঘরি হয়ে তুই এখন শত্তুর। পুটপুট করে জামাইয়ের কানে তুলে দিয়ে এই ঝড় তুলেছিস। তুই ছাড়া অন্য কেউ নয়।

দম নিয়ে লালমোহন আবার বলেন, বড্ড দয়া বাবাজীর, রাগটা আমার একলার কাছে দেখিয়ে গেল। বাড়ির অন্য কেউ জানে না। সেই থেকে ভাবছি বেলডাঙা চলে গিয়ে মানীর বেটার হাত জড়িয়ে ধরে গয়না গছিয়ে আসব। হাতেও না কুলায় তো পা ধরব। চিঠি এলো, তুই চলে আসছিস। বলি জামাই এসে গেছে, মেয়ে আবার কি নিয়ে আসে দেখা যাক। বয়েস হয়েছে আমার—বুড়োবয়সে লোকে কত রকম আবোল-তাবোল বকে, তা-ও তো ধরে নিতে পারতিস। এক মেয়ে এক জামাই তোরা আমার—এবারটা ক্ষমা দে।

গলগল করে এমনি বলে যাচ্ছেন, কিছুতে থামানো যায় না। বড় দুঃখ পেয়েছেন লালমোহন। মীনাক্ষীর লজ্জার অবধি নেই। সেই সঙ্গে আনন্দ—কী করবে দিশা করতে পারছে না। একটা বেলা কোনক্রমে কাটিয়ে সেই পানসিতে রওনা হয়ে পড়ল। বিজয়িনী ফিরে চলেছে। একটি একটি করে গয়না সমস্ত গায়ে পরেছে। গলায় পরবার হারই বোধহয় পাঁচ-ছ রকম। হোক গে—

বেমানান হোক যা-ই হোক—স্বর্ণসজ্জায় ঝলমল করে সেই বিয়ের কনের মতো শ্বশুরবাড়ির অঙ্গনে গিয়ে উঠব। এ গয়না জয়ের নিশান—কানাকানি যারা করেছিল, লজ্জায় মুখ লুকোবে। রায়েদের তরফে তরফে যত অকীর্তিই শোনা যাক, তুমি অম্লান। আকাশের ঐ সন্ধ্যাতারার মতো। কত নিচুতে আমি, তোমার নাগাল ধরতে পারিনে।

ভক্তদাস সঙ্গে যাচ্ছে। তল্লাটের সকল খবর রাখে সে, অনেক নতুন কথা বলল। তখন সোনাছড়ি যাবার সময় এক দফা বলেছে, আবার এই ফিরতি পথে। সাগরচকে জোয়ানেরা হৈ-হৈ করে আবার মাটি ফেলছে। নদী সোজা পথ পেয়ে গেছে, তেমন আর আক্রোশ নেই। যত চাষী উৎখাত হয়েছে, তারাই এবারের উদ্যোগী। টাকার সরবরাহ তাদের।

চোখ টিপে ভক্তদাস বলে, এরা চাষবাস করত বটে, কিন্তু বাপ-দাদারা কখনো লাঙলের মুঠো ধরে নি। জমাজমি গিয়ে এরাও আবার পুরনো পথ নিয়েছে শোনা যায়। নাকি চক উদ্ধারের জন্য। বাঁধ হয়ে গেলে চাষী হয়ে ফের লাঙল চষবে।

আবছা অন্ধকারে মন্থর অলস বাতাসে পানসি দুলে দুলে চলেছে—পাশের ছিটে-জঙ্গল থেকে কালো কুমিরের মতো ছোট্ট ডিঙি ছুটে বেরিয়ে যেন পানসির গায়ে লেপটে গেল।

কি চাও? কারা তোমরা?

আলচোরা কর্তামশায় গো, তরাস লেগেছে—

বলতে বলতে পানসির উপর লাফিয়ে পড়ল মরদজোয়ানেরা। হা-হা-হা—উদ্দাম হাসি। বুঝেছে মাঝি-মাল্লারা—ঝপাঝপ জলে লাফিয়ে সাঁতার কেটে পালায়। ভক্তদাসকে জাপটে ধরেছে। কামরার ভিতরে থরথর কাঁপছে মীনাক্ষী।

বজ্রগর্জনে বৃন্দাবন বলে, গয়না খোল—

মীনাক্ষী চকিতে সর্বাঙ্গ শাড়িতে ঢেকে ফেলে গুটিসুটি হয়ে একেবারে গবাক্ষ-লগ্ন হল। এই গয়না এবং তার সকল সত্তা আজ একেবারে এক বস্তু—স্বর্ণসজ্জা বাদ দিয়ে মীনাক্ষীর আর কিছু বাকি থাকে না।

দাও—

বাঘে যেমন শিকার ধরে, তেমনি লাফ দিয়েছে আষ্টেপৃষ্ঠে কাপড়-জড়ানো বউটাকে ধরে ফেলবার জন্য। সোনার রাশি টেনে ছিঁড়ে গা থেকে ছিনিয়ে নেবে। তার আগেই মীনাক্ষী জানলার পথে গাঙে ঝাঁপ দিয়েছে।

ধরো, ধরো—

স্রোতের উপর একবার ঈষৎ ঘূর্ণি উঠল। তারপর আর কিছু নেই। এক ঝাপটা বাতাস বয়ে গেল। কিচির-মিচির করে অদূরের চরের উপর গাঙশালিক ডেকে ওঠে। খলখল ক্রূর হাস্যে রাতের নদী ভাটার স্রোতে বয়ে চলেছে।

বৃন্দাবন গর্জন করে ওঠে ঃ ঝাঁপ দিয়ে পড়ো সব। খুঁজে বের করতেই হবে।

সেই অবগুণ্ঠনবতীর ভাগ্যে যাই-ই হোক, সোনা কিছুতে নিশ্চিহ্ন হতে দেওয়া হবে না জলতলে। খোকাবাবু মুখ ফুটে চেয়েছে বৃন্দাবনের কাছে ঃ গয়না, গয়নার বড় দরকার। বয়সে ছেলেমানুষ, তায় ফুটফুটে যুবতী বউ—সাধ-আহ্লাদের দিনই তো ওদের! নতুন-বউকে গয়না পরাবে।

কলকাতা গিয়েছিল ধ্রুব। ফিরে এসে শোনে, মান করে বউ বাপের বাড়ি গেছে। মান ভাঙাতে যেতে হবে নাকি সেই অবধি। যেতে হয় যাবে, ভাল খবরটা নিজ মুখে শুনিয়ে আসবে। কারখানা গড়ছে তার এক সহপাঠীর বাবা-কাকারা মিলে, দুই বন্ধু, তারা সেই কাজে লেগে পড়বে। জন চারেকের ছোট্ট বাসাবাড়ি—একফোঁটা মানুষ মীনাক্ষী, সেইখানে তাকে মানাবে ভাল। পঙ্গু ইন্দুমতীকে নিয়ে যাবে, বিলাত-ফেরত বড় ডাক্তার দেখাবে। যায় তো নীহারনলিনীও যাবে তার সঙ্গে।

বৃন্দাবন এসেছে খবর পেয়ে বাইরে-বাড়ি ছুটল। বৃন্দাবন বলে, এনেছি। যা চেয়েছিলে খোকাবাবু, খাসা-খাসা গয়না।

মন্ডপবাড়ির একটা কামরায় গিয়ে দুজনে দরজা আঁটল।

এত?

সমস্ত একজনের জিনিস। নিশ্বাস ফেলে বৃন্দাবন বলে, বউটা নেই। মারধোর হয়নি, কিছুই না? নিজেই ঝাঁপ দিয়ে পড়ল, আমরা কি করব? কিন্তু সোনা তো ছাড়া যায় না। খুঁজে-পেতে জল থেকে তুলে গায়ের সোনা খুলে এনেছি।

সকলের আগে যে বস্তুটা বের করে ধরে—সৌভাগ্যকঙ্কণ, অপরূপ কারুকর্ম—মকর-মুখের দুটো জোড়া চোখে লাল-টুকটুকে পান্না জ্বলজ্বল করছে।

— শেষ —

ভালুক শিকারে

ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

বাঘ শিকারে চূড়ান্ত হয়রানির গল্পটা শেষ করেই অর্জুন সেন ভালুকের কথায় এসে পড়ল। আমারই জনৈক বন্ধু সেখানে বসে। তিনি বিজ্ঞের মত মাথা দুলিয়ে প্রশ্ন করলেন :

—ভালুকের গল্প কী তেমন চমকপ্রদ হবে?

—নিশ্চয়, যেমন বাঘ শিকারে, তেমনি ভালুক শিকারেও যথেষ্ট উন্মাদনা আছে এবং বিপদ যে কিছু কম, তাও বলা চলে না—

ভালুকের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমারও আছে, তাই অর্জুনের কথায় সায় দিয়ে বলি—

—সেটা আমিও জানি, নিজেও ভুক্তভোগী কিন্তু—তবে অন্যান্য জানোয়ারের তুলনায় ভালুককে নিরীহ বলা চলে।

—না, না, নিরীহ নয় বরং বলতে পারো বোকা। তাহলে শোনো ওদের কথা। আমি বেশ খুঁটিয়ে দেখেছি। জন্তু-জানোয়ারের জগতে ভালুককে ভাঁড় বললেই ধরে নেওয়া যায়। আবার এমন খামখেয়ালী আর হুঁসিয়ার জন্তুও তুমি খুঁজে পাবে না। নানান জাতের বাঘের তুলনায় ভালুককে তেমন বিপজ্জনক মনে হয় না বটে, কিন্তু হঠাৎ যদি এই জীবটির সঙ্গে মোলাকাৎ হয়ে যায়, তবে তিনি কখন যে কী মূর্তি ধারণ করবেন, তার ঠিক নেই। সাধারণতঃ ভালুক মানুষকে ভয় করে। কিন্তু বেশীর ভাগ তার ব্যতিক্রম দেখা যায়। নিজের রাজ্যে অনধিকার প্রবেশকে সে কিছুতেই বরদাস্ত করে না।

ভালুকের স্বভাব খুঁতখুঁতে হলে কী হয়, মেজাজটা খুব চড়া। যেখানে কোন গন্ডগোল নেই, সেখানেও সে নাক গলায় আর যেখানে বিপদ আসতেই পারে না, তারা নিজেরাই বরং বিপদকে ডেকে আনে। তবে ভালুককে গুলী করলে যদি সে খতম না হয়, তবে ফিরে সে আততায়ীকে আক্রমণ করবেই।

একবার উত্তর কাছাড়ের পাহাড় অঞ্চলে ক্যাম্প করেছিলাম। একঘেয়ে কাজ যখন ভাল লাগতো না—এদিক-ওদিক ঘুরে দেশটাকে ভাল করে দেখে নেবার ইচ্ছে হত। পাহাড়ী জংলা জায়গা—কাজেই বন্দুকটা সঙ্গেই থাকে।

ক্যাম্পে প্রায়ই রিপোর্ট আসে—পাশের গাঁয়ে ধানের জমিতে ভালুকের উপদ্রব বেড়েই চলেছে। আর কিছুদিন এভাবে চললে একটি দানাও চাষীরা ঘরে তুলতে পারবে না। আমি গা করিনি—ভালুক শিকারে তেমন উৎসাহ নেই। ভল্টু মাঝে মাঝে আমাকে উস্কে দেবার চেষ্টায় থাকে। একদিন বেলা দুটোর সময় গ্রামবাসীরা জানায়, দু'-দুটো ভালুক বেরিয়েছে। ধানের ক্ষেতে তাড়া খেলেই তারা আপন ডেরায় ফিরে যাবে।

মাতব্বর গোছের একজনকে জিজ্ঞেস করি—ডেরাটা কোথায়?

—ঐ—হুই—হুই যে পাহাড়, ওর মধ্যে গর্ত করে ওরা থাকে।

আবারও প্রশ্ন করি—তুমি চেন? আমাদের নিয়ে যেতে পারবে?

বিজ্ঞ পথপ্রদর্শকের মত মাথা নেড়ে লোকটি জানায় হাঁ, এসব অঞ্চল তার নখদর্পণে। তখুনি রওনা হলে বেলাবেলি ফিরে আসা যাবে।

জিজ্ঞাসায় জানলাম, ওর নাম টঙ্কনাথ, কিছু জোতজমি আছে, চাষবাস করে—ভগবানের কৃপায় দিন চলে যায়। ভালুকের

অত্যাচারে ফসল নষ্ট হলে তারা সবংশে না খেয়ে মরবে—তাই ভালুক বংশের যথাসম্ভব অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্নের জন্যেই আমার কাছে আগমন।

ভল্টুর প্রতি আমার তির্যক দৃষ্টি—সেও গ্রীবাভঙ্গীতে সম্মতি জানায়, আর তখুনি তৈরী হয়ে নেয়, আমিও টঙ্কনাথের সঙ্গে এদিককার হালচাল নিয়ে কথা বলি আর এগিয়ে চলি।

ক্যাম্প থেকে প্রায় মাইলটাক পথ যাবার পরই পাহাড়ের নীচে পৌঁছানো গেল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখি, কোথাও কিছু নেই। আমরা একটা পাহাড়ে উঠতে থাকি। এবড়ো-খেবড়ো পায়ে-চলা পথ—এঁকে-বেঁকে উপরে চলে গিয়েছে। কিছুদূর উঠতেই একটা গুহার মত দেখা গেল।

‘জগৎ পারাবারের তীরে’—

গুলী খেয়েই ভালুকটা পিছন ফিরে দাঁড়ায়

টঙ্কনাথ জঙ্গলে দেখিয়ে বললে—ওই যে ভালুকের আস্তানা। আমি ধরে নিয়েছিলাম, দানা ফেলে ছেড়ে খেয়ে ভালুক দুটো নিশ্চয় ফিরে আসবে। কিন্তু কোথায়? কোনও পাত্তা নেই। টঙ্কনাথকে সে কথা বলতেই সে আশ্বাস দিল—

—নিশ্চয় আসবে, আর যাবে কোথায়?

এমন সময় দেখা গেল পাহাড়ের নীচে যেখানে উঁচু ঘাসের জঙ্গল, তার মধ্যে দিয়ে কিছু দূরে দূরে দুটো প্রাণী চলে আসছে—ঘাসের ডগাগুলি শুধু নড়ে—আর কিছু দেখা যায় না। আরো একটু কাছে আসতেই জানোয়ার দুটির পিঠের ওপর ভাগটা দেখতে পেলাম কালো লোমে ঢাকা।

টঙ্কনাথ টাক চুলকে বলে :

—ওই যে ভালুক!

ঘন ঘাসের জঙ্গল ভেদ করে জানোয়ার দুটো হালকা ঘাসের মধ্যে এসে পড়তেই দেখা গেল, একটা ধাড়ী ভালুক, পেছনে বাচ্চা। পাহাড় বেয়ে ভালুক দুটো উঠতে থাকে। অনেকটা উঠে এসেছে—আমাদের কাছ থেকে প্রায় সওয়া'শ গজ দূরে, যেভাবে হেলতে-দুলতে আসে, গুলী করার কোনও অসুবিধা নেই। আমার বুলেট কিন্তু ধাড়ী ভালুকটার কাঁধে মেরুদন্ডের ওপর না লেগে তার পেছনে আঘাত করল। গুলী খেয়েই ভালুকটা পিছন ফিরে দাঁড়ায়। বোধ হয় ভাবলে, বাচ্চা ভালুকটাই তাকে আঘাত ক'রছে। তাই প্রচন্ড বিক্রমে সে তার ওপর ঝাঁপিয়ে ক্রমাগত আঁচড়াতে আর কামড়াতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তাকে মেরেই ফেললে— এমনি নির্বোধ জানোয়ার। ধাড়ী ভালুকের ওপর আর এক রাউণ্ড গুলী— সেটাও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। বন্দুকের আওয়াজ পেয়েই ভালুকটা পায়ের ওপর ভর দিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে ওঠে, যেন দেখতে যায়—এ আবার কোন্ আততায়ী। তার বুকখানাকে খোলা পেয়ে আমার বন্দুক আবারও গর্জে ওঠে—আর সেই ধাড়ী কালো ভালুকটা সন্তান বাচ্চার পাশেই ধরাশায়ী।

আর একবার ভল্টু আর টঙ্কনাথকে সঙ্গে নিয়ে কাছাকাছি নদীর পাড়ে বসে আছি। সেদিন খাটুনিও হয়েছে খুব। নদীর পাড় অনেকটা উঁচু—প্রায় পঁচিশ ফুট নীচে দিয়ে পাহাড়ী নদী বয়ে চলেছে। দিনের শেষ—ঠান্ডা ঝিরঝিরে হাওয়ায় শরীর-মন জুড়িয়ে গেল।

ক'দিন কোনও শিকার হয়নি। মাঝে একদিন শুধু একটা হরিণ আর দুটো দাঁতাল শুয়োর পেয়েছিলাম। এদিনও ছুটোছুটিই সার—সারাদিন জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে একবারও গুলী ছোঁড়ার সুযোগ আসেনি। নদীর পাড়ে বসে খানিকটা জিরিয়ে নিচ্ছিলাম বটে, কিন্তু চোখ-কান সজাগ।

হঠাৎ অনেক দূরে থেকে একটা শাঁখের আওয়াজের মত কানে এল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আবার সেই শব্দ। কান খাড়া করে বেশ বোঝা গেল, ডাইনে থেকেই আওয়াজটা আসছে আর খুব বেশী দূরেও নয়।

টঙ্কনাথ এদিককার সবকিছুই ভাল জানে-শোনে, সেই পথ দেখায়। প্রায় একশ' গজ যাবার পরই সামনে একটা বিরাট খাদ—তার তল ঘেঁষে পাহাড়ী ঝর্ণা নদীর দিকে চলে গিয়েছে। টঙ্কনাথ আমার কথায় সায় দিয়ে বললে—

—আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন—ভালুকটা নিশ্চয় ঝর্ণায় জল খেতে এসেছে।

ছোট ছোট ঝোপের ভেতর দিয়ে আমরা সেই খাদের কিনারায় এসে পড়ি। উঁকি দিয়ে দেখি, এধার-ওধার অনেকটা জায়গা ফাঁকা—খাদের পাড় থেকে ঝর্ণার জল পর্যন্ত কোনও ঝোড়জঙ্গল নেই।

কোনো ভালুক দেখা গেল না—কিন্তু ভালুকের ক্ষুব্ধ আক্রোশ আর আস্ফালনের সুস্পষ্ট আওয়াজ পাওয়া যায়। কয়েকবার কয়েক রকম শব্দ শোনা গেল। বুঝতে কষ্ট হল না যে ভালুকের রাজ্যে অরাজকতা শুরু হয়েছে।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি। শীঘ্রই মূর্তিমান দৈত্য মহারাজ সশরীরে দর্শন দিলেন—আর তাঁর পেছনেই স্বয়ং পাটরাণী। গজদশেক পেছনে একটি বাচ্চা ভালুক—যার সাবালক হতে আর দেরী নেই। তিনটি জানোয়ারই সমানে গাঁ-গাঁ করতে থাকে আর এদিক-ওদিক ছিটিয়ে পড়েথাকা খাবারের টুকরো খুঁটে খায়। তিন-চার মিনিটের মধ্যেই তারা আমাদের রেঞ্জের মধ্যে এসে পড়ল—ধাড়ী ভালুকটা বেশ হৃষ্টপুষ্ট আর কুচকুচে কালো। গুলী করতেই লাগলো তার বুকে, কোনো প্রতিবাদ না করেই সে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। এক সেকেন্ডও দেরী না করে আমি মাদী ভালুকটাকে তাক করলাম কিন্তু ততক্ষণে সে একটা লাফ দিতেই গুলীটা তার গায়ে ধাক্কা দিয়ে বেরিয়ে গেল। সেও মাটির ওপর গড়িয়ে পড়ল বটে কিন্তু তখনি উঠে বীর বিক্রমে রুখে দাঁড়ায়। বাচ্চাটা বন্দুকের আওয়াজ পেয়েই ছুটে কোথাও পালাতে চায়। কিন্তু আগের মত এই ধাড়ী ভালুকটাও ভাবল বুঝি বাচ্চাটাই তাকে আঘাত করেছে—তাই সে বীর বিক্রমে আপন বাচ্চার উপরেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু সেও তখন ছুটেছে, কাজেই তাকে সম্পূর্ণ নাগালের মধ্যে না পেলেও ক্রমাগত তার পেছনে থাবা মারতে থাকে। এতেই আমিও কিছুটা সময় পেয়ে গেলাম আর পর পর দুটো গুলীতে দুটোই অক্কা। চক্ষু চড়কগাছ করে ব[সে] থাকা বন্ধুটিকে আমিও বলি—

হাঁদা ভালুকের কথা উদ্ভুত সন্তান অর্জুন সেন ভট... শুনে পুণ্যবান...

ছোট ছোট ঝোপের ভেতর দিয়ে আমরা সেই খাদের কিনারায় এসে পড়ি

স্কুল ছেড়ে কলেজে প্রবেশ করেই আমি প্রফেসার সেনের প্রভাবে পড়ে গেলাম। তিনি ছিলেন বিজ্ঞান বিভাগের কেমিস্ট্রির অধ্যাপক। আমি নির্জলা আর্টসের ছাত্র, সাবজেক্ট নিয়েছি ইতিহাস, লজিক এবং সংস্কৃত। দুটি বিভাগের মধ্যে যোগসূত্র ছিল ইংরাজীর ক্লাস। এই সময়টা আর্টস এবং সায়েন্স একত্র হতাম এবং এই সময় আমি অনেকটা আকস্মিকভাবেই প্রফেসার সেনের প্রভাবে এসে পড়লাম।

প্রফেসার সেন ছিলেন ডক্টর; লন্ডনের ডি-এস্‌সি। এদিকে ইংরাজীতে ছিল অসাধারণ পাণ্ডিত্য; ইংরাজীর প্রফেসার-দের কেউ কোন কারণে অনুপস্থিত থাকলে উনি কখনও কখনও শখ করে ক্লাস নিতেন। [illegible] ডক্টরেট চোখে পড়ত কম, তার ওপর বিলাতফেরৎ, বিজ্ঞানের প্রফেসার হয়ে ইংরাজী পড়ান, এই ছিল যথেষ্ট; প্রফেসার সেনের বেলায় এর ওপর ছিল তাঁর চেহারা এবং বেশভূষা। নিতান্তই শাদামাটা ধুতি, পাঞ্জাবি, কাঁধে একটা মটকার চাদর, শীতকালে তার স্থানে একটা আলোয়ান। এদিকে চুলের সঙ্গে চিরুনি-বুরুশের সাক্ষাৎ নেই, এবং দাড়ি-গোঁফ অল্পসল্প যা হয়েছে তা যেমনকার তেমনি [illegible]। বয়স তাঁর তখন সাতাশ-আটাশ এই রকম; ত্রিশের মধ্যেই। মনে পড়ে প্রথম যেদিন আমাদের ক্লাস নিলেন। সুদূর মফস্বল স্কুল থেকে আসার জন্য আমি কতকটা সঙ্গী এবং সাহসের অভাবে অন্যান্য বিষয়ের ক্লাসে পেছনের দিকেই বসতাম। সেদিন আগেভাগে গিয়ে একেবারে সামনের বেঞ্চে একটি সীট দখল করে বসলাম এবং মুগ্ধ বিস্ময়ে শুধু শুনেই গেলাম না ওঁর পড়ানো, পরন্তু নিজের অকৌলীন্যের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে কিছু কিছু প্রশ্নও করে বসলাম। সর্ব-সাকুল্যে প্রায় পাঁচ-ছয়টি। একটির সম্বন্ধে ভাসা-ভাসা খানিকটা বলে গিয়ে প্রফেসার সেন বললেন যদি বেশি ঔৎসুক্য থাকে তো তাঁর বাড়িতে আসতে পারি।

যোগাযোগের ভূমিকাটুকু সংক্ষেপে এই। একটি স্মরণীয় দিন আমার জীবনে। কিছু যে [illegible] ফসল ফলাতে পারিনি সেটা আমার দুরদৃষ্ট, তবে চেষ্টার যে ত্রুটি করিনি সেটা নীচের কাহিনী থেকে খানিকটা বোঝা যাবে।

যাওয়া-আসা চলে। শুধু আমিই নয়, ছাত্রদের রীতিমতো একটি দল তাঁর বাড়িতে তাঁকে সর্বদাই থাকত ঘিরে, আলোচনার মধ্যে যেমন বিষয় ছিল না নির্দিষ্ট তেমনি সদর-মফস্বল, বা ছাত্রদের শ্রেণী-বিচার নিয়ে কোন প্রভেদ থাকত না।

একদিন বর্ষার জন্য জমায়েৎটা ছিল হাল্কা, আর, শুরু কি করে মনে নেই, তবে আলোচনা একটু ব্যক্তি-ঘেঁষা হয়ে পড়ে-ছিল। অর্থাৎ কে কি হতে চায়, বা কার কি হওয়ার মাল-মসলা রয়েছে ভেতরে। প্রফেসার সেন হঠাৎ আমায় বললেন—'শৈলেন, তুমি বিজ্ঞানের দিকে চলে এসো।'

অভিমতে সবারই পূর্ণ মুক্তি ছিল, তবে থার্ড-ইয়ারের সতোন ছিল একটু বেশি ঠোঁট-কাটা, বলল—'আপনি ওকে আর্টস থেকে ভাঙ্গিয়ে নিচ্ছেন স্যার?'

'পারলে ভালো হোত।' উত্তর করলেন প্রফেসার সেন; বললেন—'ঠিক দলপুষ্ট করবার জন্যে নয়। ও যে শেষ পর্যন্ত একজন দার্শনিক হয়ে আকাশের দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে, কিম্বা তৈমুরলঙ্গের মামার কোথায় মাসির বাড়ি ছিল তা নিয়ে হয়তো তুমি যে একটা ওজন-দুরস্ত ভল্যুম লিখলে, ও আরও গুরুতর ওজনে সেটাকে দাবিয়ে দেওয়ার জন্যে প্রাণান্ত হচ্ছে—এটা যেন ভাবা যায় না।......শৈলেন কি বল এতে?'

কিছু উত্তর দিইনি সেদিন, যতদূর মনে পড়ছে। হাল্কা খণ্ডখণ্ড আলোচনা সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যাচ্ছিল, ওটাও গেল।

উত্তর না দেওয়ার একটা কারণ ছিল। ঐ কারণে না হলেও, আমি এই কথাটা অনেকদিন থেকেই ভাবছিলাম, অর্থাৎ পাঠ্য একেবারে পরিবর্তন করে বিজ্ঞানের দিকে চলে আসা। অনেক দিনের কথা, যতদূর মনে পড়ছে সেকালে মাস তিনেক পর্যন্ত এই পরিবর্তনের পথটা খোলা থাকত।

কিন্তু কোন উপায় ছিল না আমার দিক থেকে, সে আমার জীবনের এক ট্রাজেডী। ওঁর কথায় মনটা শুধু আরও বিষণ্ণই হয়ে রইল কটা দিন।

সেদিন বর্ষাটা ছিল আরও জোর, তার ওপর দিন চারেকের কি একটা ছুটিও ছিল। আমি এই রকমই একটি দিনের অপেক্ষায়ই ছিলাম, মজলিস একেবারে খালি পাওয়ার আশায়। ঠুকঠুক করে গিয়ে উপস্থিত হলাম।

একথা-সেকথার পর একটু সুযোগ পেয়ে কাঁচুমাচু হয়ে বললাম—'আপনি সেদিন কথাটা বললেন স্যার, আমিও কিছু-দিন থেকে ভাবছি কিন্তু কোনও উপায় নেই। অঙ্কে সাংঘাতিক রকম কাঁচা,—নিতান্ত যোগ-বিয়োগ নিয়ে নতুন ম্যাট্রিকুলেশনের অঙ্ক, তাইতে যেমন টায়েটুয়ে পাশ করেছি—বিজ্ঞানের তো আগাগোড়াই অঙ্ক—উঁচু দিকের অঙ্ক—থিটা-পিটা—কি সব শুনি—নামেই মাথা এত গুলিয়ে যায় যে আর......'

করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে এক নিঃশ্বাসে বলে যাচ্ছিলাম, একটু অবাক হয়েই শুনছিলেন প্রফেসার সেন, একেবারে হো হো করে হেসে উঠলেন। আর ঠিক এই সময় সতোন ছাতা মাথায় দিয়ে এসে উপস্থিত হল। বারান্দায় উঠে ছাতাটা মুড়তে মুড়তে প্রশ্ন করল—'কি হলো স্যার?'

'তুমিও এসে গেছ? ভালো হোল।'—হাসতে হাসতেই বলে চললেন প্রফেসার সেন—'শৈলেন যে জন্মস্বত্বেই বৈজ্ঞানিক তার এক মস্ত বড় প্রমাণ পাওয়া গেছে। আমরা নাকি কাটখোট্টা, ঠাট্টা বুঝি না—ঐ নাও, শৈলেনও আমার সেদিনকার ঠাট্টা ধরতে না পেরে মুখ চুন করে ভিজতে ভিজতে উপস্থিত।......'

ও পর্বটা ঐখানেই শেষ হয়ে গেল। ক্রমে বিষয় পরিবর্তনের যে সময়টা দেওয়া থাকত সেটাও গেল পেরিয়ে, অঙ্কের আতঙ্ক কাটিয়ে না উঠতে পেরে আমি যথাস্থানেই রইলাম আটকে।

কিন্তু অশান্তি আমার কাটল না এবং একদিন অলসভাবে ওঁরই জীবনের কথা চিন্তা করতে করতে যেন একটু আলো দেখতে পেলাম। আমি জন্মস্বত্বে বৈজ্ঞানিক এটা যেন ওঁর ঠাট্টা হোল, কিন্তু উনি যে নিতান্তই তাই একথার তো মার নেই; অথচ সাহিত্যে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। ভেতরকার কথাটা আগ্রহ। কলেজের রাস্তাটা বাঁধানো

রাস্তা সুতরাং সুগম: কিন্তু আরও রাস্তা তো আছে—নেপথ্যে আত্ম-চেষ্টা।... অংক? নেপোলিয়ান আলপস্ লঙ্ঘন করলেন কি করে? বোপদেব লিখলেন মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ।

যেখানে যাঁরা অসম্ভবকে সম্ভব করে গেছেন সবাইকে জড়ো করে যখন এইভাবে নিজেকে উৎসাহিত করছি সেই সময় একদিন দৈবক্রমে একখানি বটানী বা উদ্ভিদ-বিদ্যার প্রাথমিক বই আমার হাতে পড়ে গেল। সেদিনটাও একটা স্মরণীয় দিনই আমার জীবনে, যদিও আবার বলতে হয়, ফল কিছু হোল না। কিন্তু সে আলাদা কথা।

দেখলাম এও তো বিজ্ঞান, অথচ অঙ্কের বেড়াজাল দিয়ে ঘেরা নয়। অন্তত গোড়ার দিকে ভীতিপ্রদ তেমন কিছু নজরে পড়ে না, পরে থাকে, সে পরের কথা।

আর একটা মস্ত বড় সুবিধা, লন্দবরেটারির বালাই নেই। যদি থাকেও তো সে পরের দিকে, ইতিমধ্যে আমি অনেকখানি এগিয়ে যাব, একটা ঔৎসুক্য সৃষ্টি হয়ে যাবে এবং তাইতেই নিয়ে যাবে সামনে টেনে। শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্ণ-পরিচয়টাই সবচেয়ে বিভীষিকার যুগ।

আরম্ভ করে দিলাম।

এক আশ্চর্য জগতে প্রবেশ করছি ধীরে ধীরে, অথচ, আরও যা আশ্চর্য—এই জগৎটি তার নীরব আবেদন নিয়ে আমায় বেষ্টন করেই ছিল এতদিন। এও যেন আলিবাবার 'ওপ্ন্ সিসেম'এর ব্যাপার। প্রভেদ এই যে, এ গুহা-দ্বার খোলবার কোন যাদুমন্ত্র নেই, আছে যন্ত্রই, চাবি। আপাতত একখানি তীক্ষ্ণধার ছুরি, একটি কাঁচি, একটা মাইক্রোসকোপ বা অনুবীক্ষণ যন্ত্র এবং একটি ভালো নিড়ানি। অর্থাৎ মিরাক্যল বা ভোজবাজি নয়, সাধনা। মিরাক্যলের বিস্ময়ই আছে স্থায়িত্ব নেই। আরম্ভ করে দিলাম আমার সাধনা।

মিরাক্যল নয়ই বা কি সে? মূল থেকে নিয়ে শীর্ষ পর্যন্ত একটি অতি সামান্য উদ্ভিদের পদে পদে বিস্ময়। আর, কী অফুরন্ত বৈচিত্র্য!

বাড়িতেই আরম্ভ করলাম আমার গবেষণা। আমার পড়ার আড্ডা ছিল ওপরের ছাতে একটি অপেক্ষাকৃত নিভৃত ঘরে। প্রয়োজন মতো গাছ-গাছড়া জোগাড় করে এগিয়ে চলাম।

বেশ নিরুপদ্রবেই কাটল তিনটে মাস। বাড়িতে এ নিয়ে বেশি কৌতূহল নেই। ফুলের শখ ছিল, ছাতে—টবে কিছু জমা হয়েছিল আগে থাকতেই, নূতন শখটা তার মধ্যেই বেশ আত্মগোপন করল। তারপর একদিন টের পেলাম বাড়িতে হয়তো অজানা থাকলেও সংবাদটি সমস্ত পাড়ায় বেশ ভালোভাবেই কখন ছড়িয়ে পড়েছে।

কিসের ছুটি ছিল সেদিন, অনেকরকম গাছ-গাছড়া সংগ্রহ করে খাওয়া-দাওয়া সেরেই আমি কাজে লেগে গেছি। সেদিন উদ্ভিদের শিকড় নিয়ে আমার বিশেষ পরীক্ষা চলছে, এবং সেই উদ্দেশ্যে শিকড়ের বৈশিষ্ট্য আছে এই ধরণের কতক-গুলি উদ্ভিদ সংগ্রহ করে রেখেছি। মধু-মালতী শ্রেণীর লতা-বৃক্ষের বীজ থেকে গাছ হয় না, হয় সুদূর-প্রসারী শিকড় থেকেই। অরকিড বা অন্যান্য পরগাছার শিকড়ের প্রকৃতি ভিন্ন ধরণের। জলজ উদ্ভিদের মধ্যে—কলমি, হিংচা গাঁটে-গাঁটে শিকড় বের করতে করতে অগ্রসর হয়। মৌড়ক-জাতীয় উদ্ভিদের আবার অন্যরকম ব্যবস্থা। এই সব উদ্ভিদের আবার বীজ নেই—প্রকৃতির Economy বা মিতাচারে এও এক আশ্চর্য ব্যাপার!

একেবারে হো-হো করে হেসে উঠলেন

সেদিন আমার টেবিল আর ছোট ঘরখানি এই রকম নানাজাতীয় উদ্ভিদে বোঝাই হয়ে গেছে বলতে পারা যায়। তারই মাঝে দরজার দিকে পিঠ করে আমি তীক্ষ্ণধার ছুরি আর অনুবীক্ষণ যন্ত্রটির সাহায্যে একগোছা হিংচার গোড়া নিয়ে তন্ময় হয়ে পড়েছি, এমন সময় দরজার হঠাৎ আস্তে আস্তে কিছু লোকসমাগম হল বলে অনুভব করলাম। ক্ষণিক অন্যমনস্কতা। তারপর, গভীর তন্ময়তায় যেমন হয়, সেটাও কেটে গেছে, এমন সময় একটু যেন ফিসফিসানির মতো কানে যেতে ঘুরে চাইলাম।

আমার মামার বাড়ি। মামা-মামিমাদের নিয়ে বাড়ির ভেতরটা জনবিরল হলেও, পাড়ায় আশেপাশে দিদিমা-মাসিমাদের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য নয়। এবং তাঁদের অনেকেই, মার সঙ্গে ছেলেবেলা থেকে অন্তরঙ্গতা থাকায়, মামা-মাসিমাদের চেয়েও আমার সম্বন্ধে বেশি আগ্রহশীলা।

দেখলাম বর্ষীয়সী-বৃদ্ধা মিলে পাঁচজনের একটি নাতিক্ষুদ্র দল: পুরোভাগে রয়েছেন লাহিড়ী-দিদিমা। স্থূল শরীরের সমস্ত ভারটা ডান হাতে ডান হাঁটুর ওপর রেখে হেঁট হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, আমি ঘুরে চাইতে বললেন—'তাই দেখছিলুম, কতক্ষণে সাড় হয় শৈলভায়ার আমার।' সঙ্গে সঙ্গে পাশে—রতন-মাসির দিকে চেয়ে বললেন—'তোকে বলছিলাম না রতু? একেবারে ঐরকম জ্ঞান-রহিত না হয়ে গেলে বিদ্যে হয়? মুয়ে আগুন! অত চেষ্টা করলে দাদা, তা হোল কিছু? এখন তিনকাল গিয়ে চারকালে এসে একটু ভাগবত পড়ব—অক্ষর গুণে গুণে দুটো পাতাও শেষ হয় না একটা দিনে।'

"বিদ্যে যে একটা সাধনা পিসিমা।" রতন-মাসি মন্তব্য করলেন।

লাহিড়ী-দিদিমা বলে চললেন—"পরশু সকালে গঙ্গাস্নানে যাওয়ার সময় বাণী-ঠাকুরঝির সঙ্গে দেখা—জিজ্ঞেস করলুম—হ্যাঁগা আমাদের গিরির ছেলে শৈল মামার বাড়িতে যে পড়তে এল, তা লেখাপড়া কেমন করছে, আছে কেমন খোঁজ রাখিস একটু? ......ঠাকুরঝি বললে—'ওমা, সে আবার জানান দিয়ে খোঁজ নিতে হয় নাকি? গিরিদির ছেলে শৈল একজন যে মস্ত বড় কবরেজ হতে চলেছে একথা চৌধুরী পাড়ার কোন্ মানুষটা না জানে? যখনই দেখো, এক-গাদা গাছ-গাছড়া, পাতা-ফল-শেকড় নিয়ে চলেছে।'

......বললুম—'সত্যি নাকি? তা ও ছেলে একটা কিছু যে না হয়েই যায় না এ আমার জানা।......কাল পূর্ণিমা ছিল, বেতো রুগী তায় অনেকটা পথ তো, আর হয়ে উঠল না। ভাবলুম আজ তাহলে একবার দেখে আসি। পথে অমর্ত-দিদি, রতন, সাতকড়ি-ঠাকুরঝি আর বিলাস-ঠাকুরঝির সঙ্গে দেখা, বললে চলো আমরাও যাই......"

সাতকড়ি-মাসি পেছন থেকে একটু এগিয়ে এলেন—"কবরেজ যে এতবড় শহরটা থেকে লোপাট হয়ে গেল বাবা। তোর ঘরটা দেখে যেন বুকে বল আসছে। তা সত্যি কথা বলব বৈকি, যত বড়ই ডাক্তার হোক তোমার বৈকুণ্ঠ চৌধুরী, কি হরিধন অ... কি ... যার নামডাক সেই পান্নালাল ডাক্তারই।"

"তা এসে যখন পড়েছিই মরতে ... দে দিকিন ভা... একটা ভেবেচিন্তে......ঐ গো, উঃ!" —হাঁটুর ওপর ভর দিয়েই দাঁড়িয়ে

ছিলেন লাহিড়ী-দিদিমা, কথা বলতে বলতেই একটা চাড়া দিয়ে মুখটা বিকৃত করে উঠলেন।

হঠাৎ আকস্মিভাবে আর কথাবার্তার গতি-প্রকৃতিতে বিমূঢ়ই হয়ে পড়েছিলাম, "কি হোল দিদিমা?" —বলে একটু ব্যস্ত হয়ে উঠতে নাক-মুখ আরও সিঁটকে একপা এগিয়ে এলেন ভেতরে। বললেন—"সেই কথাই তো বলতে যাচ্ছিলুম দাদু আমার, তা নিজেই তো দেখিয়ে দিলে। বাত আর কি ভাই; আমার যম। কাল আমার কোটালের পূর্ণিমে গেছে, এখন কদিন ভোগায় দেখ; তা দে ভাই দেখেশুনে একটা কিছু।... ওমা, এই তো রয়েছে—কিসের শেকড় বল দিকিন, যেন চেনা-চেনা!"

"মধু-মালতীর"—বললাম অর্থাৎ।

"ঠিক ধরেছি। তার শেকড় তো বাতের মস্ত বড় ওষুধ। না গো অমর্ত-দিদিমা?"

"ধন্বন্তরী একেবারে। কে কথা কে না জানে?" —বলতে বলতে অমর্ত-দিদিমা ঘরের মধ্যে ঠেলে এলেন। "দেখি তো" বলে গোড়ার গোছাটা তুলে নিয়ে বললেন—"মধু-মালতীই তো। শৈলই বলুক না, পড়া বিদ্যে তো, আমরা না হয় আনাড়ি, শুনেছি, বলছি। কি গো, বাতের ওষুধ বলেই এনেছিস তো?"

পরিস্থিতি সূত্রে যে রকম জটিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে, বিমূঢ় ভাবটা কাটা দূরের কথা, আরও উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছিল। আমি

ও'দের আনাড়ি সাব্যস্ত না করে, নিজেও কবিরাজিটা পুরোপুরি মেনে না নিয়ে, মাঝামাঝি একটা দাঁড়ি করিয়ে বললাম—"বাতে অবশ্য লাগে, ভালো ওষুধই, তবে আমি এনেছি এক অন্য উদ্দেশ্যে, সেটা......"

"তাই দেখছিলুম কতক্ষণ সাড়া হয়, শৈলভায়ার আমার।"

আরও তিনজন চৌকাঠ পেরিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন, বিলাস-মাসিমা একটু ঠেলে এসে বললেন—"ওমা, সেকথা কি বলছিস বাবা, একটা ওষুধ নাকি একটা রোগেরই জন্যে? এই কালমেঘের কথাই ধরো না, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, তাতেও ধন্বন্তরী, আবার......"

"আমি ভাই নিলুম গোড়াগুলো, যে জন্যেই না আনিস, তোর দিদিমা তো আগে বাঁচুক.....উঃ মাগো! ঐ আবার একটা টিস মারলে!"—এগুবার ঝোঁকেই আর একবার সিঁটকে উঠে শিকড়ের গুচ্ছটা মুঠিয়ে ধরলেন লাহিড়ী-দিদিমা—"আর একেবারে টাটকা রে! এতেও যদি পোড়া-বাত না সারে তো ফেরেও কাজ নেই, একেবারে শ্মশানে গিয়ে উঠবে তোর দিদিমার সঙ্গে!......আর সাতকড়ি যেন কি বলছিলি?"

"বলছিলুমই তো"—সামনে একটু ঠেলে এলেন সাতকড়ি-মাসিমা। বললেন, "আর ঐ তো জোগাড়ও করে রেখেছে শৈল। মাসি কি আলাদা? উপযুক্ত সন্তান, সে টের পায় যে! কী অনাছিষ্টি পিণ্ডির বাত বাবা! জিজ্ঞেস কর বরং তোর অমর্ত-দিদিমাকে, পাশেই তো বাড়ি। পোড়া শিবপুরের বাজার, সব পাবে,

একমুঠো হিংচে পাওয়া যাবে না। আমি সব কটি নিলুম বাবা। আশীর্বাদ করি দিদির মুখোজ্জ্বল কর। তুই বাবা জোগাড় করে দিবি সব। আর, এবার দুটি বেশি করে আনিস বাবা, যা লোভ দেখালি মাসিকে... ও শাদাগুলো কি বল দিকিন, ব্যাঙের ছাতা নাকি? ...ওরে বিলেস! তোর কোঁড়ক যেরে!"

"তাই নাকি! ওমা, সত্যি তো! এ জিনিস কোথা থেকে জোগাড় করলি বাবা? আমি যে কত লোককে বলে বলে হেরে গেছি! কী যে পেঞ্চায়ে অরুচি, না দেখলে পেত্যয় যাবিনি বাবা! কদ্দিন থেকে সে খুঁজেছি, ঐ একটি জিনিস রোচে মুখে, দু'মুঠো ভাত তুলতে পারি। ......না, দিব্যি দেওয়া রইল কাউকে সন্ধান দেবে না। আমি নিজেই আসব বাবা, নিয়ে যাব। কী অমর্ত যে দিলি শৈল, কী বলে যে আশীর্বাদ করব তোকে। ..."

অম্লশূলে আছে, আধকপালে আছে, পালা-জ্বরে আছে, দাদ-কনকনানি আছে—সেদিনকার সঞ্চিত শিকড়গুলি তো গেলই, পূর্বসঞ্চিত যা কিছু, গাছগাছড়া লতা-গুল্ম ছিল ঘরটায় সবগুলি একটা না একটা রোগ নিবারণ বা আরোগ্যের উদ্দেশ্যে পাঁচজনে হাতিয়ে নিয়ে, পুনরাগমনের ভরসা দিয়ে ঘর টেবিল পরিষ্কার করে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। প্রথম দিনের নমুনা। তারপর এই চলল। বাড়লই বলা উচিত। কারণ, কি থেকে কি হোল জানি না, তবে কবিরাজী যশটা আমার বেড়েই চলল। আমি যে বিজ্ঞান নিয়ে এই এই চর্চাটুকু করছি এটা মামাদের বলার উপায় ছিল না, কলেজ-পাঠের পরিপন্থী বলে সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ করে দিতেন, তবে প্রকাশ না করার শপথ দিয়ে মামিমাদের বলা ছিল, এবং উদ্ভিদজগতের অদ্ভুত রহস্য তাঁরা অবসর সময়ে বেশ আগ্রহের সঙ্গেই শুনতেনও আমার কাছে। দিন কতক তাঁদের কাছেও গোপন রাখলাম—এমনি আসেন, ও'দের মতোই কৌতূহলের সঙ্গে শোনেন গল্প—এই বলেই সারলাম। তারপর, উদ্ভিদ-বিদ্যা তো একরকম শিকেয় উঠল, আমি এমন ভয়াবহভাবে পাড়ার হিংচে-সুশনি-কৌড়ক-নারিকেলের শিকড়—অশোকের ছাল সরবরাহ করার যন্ত্র হয়ে উঠলাম যে একদিন তাঁদেরও বলতে হোল—তাঁরা যদি এ'দের হাত থেকে মুক্তির কোন ব্যবস্থা করতে পারেন।

শিউরে উঠলেন তিনজনেই। বললেন—"রক্ষে করো বাবা, এ শহরে কার এতবড় সাহস যে লাহিড়ী-গিন্নির ঐ দলের ওপর কথা কইবে? ......তার চেয়ে ছেড়েই দে বরং এ বাই, পড়ার ক্ষতি হচ্ছে বলে কর্তাদের কানে তুলতেও তো পারছিস না!......"

ছোট-মামিমার আক্রোশটা একটু বেশি, বললেন—"তার চেয়ে বয়ে যারা হচ্ছিস, কিছু তেমনি গোড়া এনে মিশিয়ে দে না ওর সঙ্গে, দু-একটা মরুক, দল পাতলা হোক, পাড়াটা ঠাণ্ডা হোক।"

খুব মন বসে আসছিল। কিন্তু বৈজ্ঞানিক হওয়ার এমন সুগম পথ ক্রমেই এত দুর্গম হয়ে উঠল যে, যন্ত্রপাতি তুলে রেখে এ

অভিযান সাঙ্গাই করে দেখো ঠিক করেছি. এই সময় জায়গাটার ওপর নজর পড়ে গেল।

শহর থেকে বেশ খানিকটা বেরিয়ে এসে বড় একটা জঙ্গলই বলা চলে. তবে নিতান্ত বাঘ-ভাল্লুকের আড্ডা নয়। দক্ষিণে, ভেতরের দিকে একটা খুব বড় পরিত্যক্ত বাড়ি, জায়গাটা তারই সংলগ্ন মনে হয়। পশ্চিমে খানিকটা দূর দিয়ে রেলের লাইনটা ঘুরে বেরিয়ে গেছে। পূব শহরটা এগিয়ে আসছে. তবে শেষ নূতন বাড়ি যে-কটা নজরে পড়ে তা অনেক দূরে এখনও। চমৎকার নিরিবিলি জায়গা।

প্রথম দিন সঙ্গে আরও দু'জন ছিল বলে দেখে নিয়ে চলেই এলাম, তবে তার পরদিন গিয়ে জঙ্গলের বাইরে বাইরেই ঘুরে ঘুরে যা দেখলাম তাতে মন ভরে উঠল আমার। কত রকমের আগাছা. কত রকমের লতা, গুল্মের ইয়ত্তা নেই। বড় বড় গাছের সংখ্যাও কম নয়। আম, জাম, কাঁটাল, নারিকেল আরও আমার অজানা কি সব বৃক্ষ। আপাততঃ আমার সঙ্গে সেগুলির নিজের কোন সম্পর্ক না থাকলেও তাদের শাখায়-শাখায় অর্কিড ও অন্যান্য নানা জাতীয় পরগাছায় শিক্ষা-গবেষণার একটি বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র সৃষ্টি করে রেখেছে। এক সময়ের সুপরিকল্পিত বাগানই তো. একটি পুরনো ঝাউগাছের প্রায় অর্ধেক পর্যন্ত একটি মনি-প্ল্যান্টের (money Plant) লতা উঠে গিয়ে তার বিরাট হলদে রঙের পাতার ভিড়ে বাগানের খানিকটা যেন আলো করে রেখেছে। একদিকে একটি নবীন অশ্বত্থ একটা খেজুর গাছকে প্রায় সম্পূর্ণ ভাবে আত্মসাৎ করে উঠেছে বেড়ে। প্রকৃতি এখানে ভেঙে-গড়ে যা-খুশি করবার খেলাঘর পেতেছে। অদ্ভুত বেহিসাব, অদ্ভুত খেয়াল, অদ্ভুত বৈচিত্র্য। এই খেয়ালী মেয়ে কি নিয়মে চলে বুঝতে হলে তো এই অনিয়মের রাজ্যেই এসে আসন পাততে হবে।

তাই পেতেছিলাম আমি। মাত্র তিনটি সপ্তাহের সাধনায় যতখানি এগিয়ে যেতে পেরেছিলাম, ওদিকে তিন মাসের চেষ্টায় তার অর্ধেকও পারিনি। তাও সে-সাধনা ছিল তো একরকম অবিচ্ছিন্নই। আর, এর মধ্যে কত ফাঁক!

কলেজের দিনে সময় কমই থাকত হাতে। যে-দিনের যেমন রুটিন, তারপর গঙ্গা পেরিয়ে এতদূরে এসে বাড়ি, তারপর জঙ্গল যোগ করে আবার প্রায় মাইল দুয়েক হেঁটে বাকসাড়ার এই পড়ন্তি বাগান, সময় খুব কম থাকত। তবে ছুটির দিন তাড়াতাড়ি আহার সেরেই বেরিয়ে পড়তাম আমি। একখানি থলের মধ্যে ছুরি, কাঁচি, অনুবীক্ষণ. একটি নিড়ানি। আর থাকত একটি ভাঁজকরা ছোট্ট আসন। ঘুরে ঘুরে প্রয়োজন-মত গাছটি বেছে নিয়ে আসনটি পেতে আমি বসে যেতাম। কখনও কখনও একটি গাছ নিয়েই দিনের পর দিন কেটে যেত আমার।

অনুভব করছি. পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক হয়ে উঠছি আমি। ঘরে-বাইরে অনুযোগ—নিজের শরীর, নিজের বেশভূষার দিকে নজর নেই। এ কী হয়ে উঠছি দিনদিন!

ঠিক ইচ্ছাকৃত নয়, তবু এই যে আপনা হতেই একটা অবিন্যস্ত আলুথালুভাব, চিরুনির সঙ্গে মাথার সম্পর্ক অল্পে অল্পে একেবারেই ঘুচে গেছে, হয়তো কোনদিন তেল দিতেও ভুলে গেলাম, জামার বোতাম নেই, থাকলেও এলিয়ে পড়ে আছে গায়ে—এতে এক অদ্ভুত তৃপ্তি পাই।

—শুধু এই একটা আত্মপ্রসাদ, একটা আত্মপ্রত্যয় যে, আমি হয়ে উঠছি। হয়ে উঠছি ডক্টর সেনের আদর্শে, শুধু তাই নয়, তাঁরও যিনি গুরু, সমস্ত ভারতের যিনি বিজ্ঞান-গুরু সেই আচার্য রায়ের আদর্শে আত্ম-বিস্মৃত সাধক। কৃত্রিম, বা লোক-দেখানো কিছু নয়, মনটা স্বতঃই কেমন যেন নিজে থেকে সরে সরে যাচ্ছে। আমি হয়ে উঠছি।

কিন্তু হায়রে মানুষের দুরাশা!

সেদিন কি একটা স্নান উপলক্ষে কলেজের ছুটি। আগের দিন আমি আবার এক আশ্চর্য উদ্ভিদের সন্ধান পেয়েছি, বনের একটু বাইরের দিকেই এক জায়গায় কতকগুলি লজ্জাবতী লতা। সে সময় আচার্য বোস প্রধানত এইটিকেই অবলম্বন করে তাঁর "প্ল্যান্ট-অটোগ্রাফ" নিয়ে সাড়া জাগিয়েছেন। আগের দিন প্রায় সন্ধ্যার মুখে আমি আবিষ্কার করলাম। তখন আর সময় নেই, পরের দিন প্রায় সমস্ত দিনটা হাতে নিয়ে গিয়ে পড়লাম আমি।

একেবারে তল্লীন হয়ে গেছি, আমার আর বাহ্যজ্ঞান নেই বলা যায়। পাশে বেশ যত্ন করে মাটির চাইসুদ্ধ ওপড়ানো একটি লতা, বাড়ি নিয়ে গিয়ে টবে পুতব। তার পাশে আমার নিড়ানিটা। আমি স্পর্শের তারতম্যে ঝিরঝিরে পাতাগুলিকে শুইয়ে দিচ্ছি। কখনও ধীরে, কখনও ত্বরিতে, অন্যগুলি আবার আস্তে আস্তে জেগে উঠছে নিদ্রা থেকে। সচেতন প্রকৃতির সামনে আমি প্রায় লুপ্ত-চেতন হয়ে এসেছি, এমন সময় বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মতো একেবারে চমকে উঠলাম। এবার আর ফিসফিসানি নয়, একেবারেই স্পষ্ট—

"ও বাবা, তুমি কী করছ এখানে এমন করে!"

ঘুরে দেখি গঙ্গা-স্নানার্থিনীদের বেশ একটি মাঝারি গোছের দল, বৃদ্ধা-প্রৌঢ়া-যুবতী-কিশোরী নিয়ে জনসাতেক; আমায় প্রশ্ন করেছেন সবচেয়ে যিনি বৃদ্ধা। মাথায় কদম-ছাট চুল, পরণে মটকার থান, হাতে একটি কমণ্ডলু। বাকি সবাই দৃষ্টিতে বিস্ময় জাগিয়ে রয়েছে দাঁড়িয়ে; ছোটদের দিকে তার সঙ্গে খানিকটা ভীতিও।

বনটার প্রায় দেড়শ' গজ তফাতে একটা রাস্তা রেলের ওদিক থেকে এসে শহরের দিকে চলে গেছে. আর বনের ওদিক থেকে একটা সরু পায়ে-হাঁটা পথ ঘুরে তাইতে

গিয়ে মিশেছে। একেবারেই চালু নয়, ঘাস জমে গেছে; আজ স্নান উপলক্ষে এই প্রথম মানুষ চোখে পড়ল।

অমন একটা ঘোর থেকে হঠাৎ জেগে উঠে প্রথমটা হতবুদ্ধিই হয়ে পড়েছিলাম, তারপর একটা বিরক্তিই ঠেলে উঠল মনে, কোনও উত্তর না দিয়ে সবার ওপর থেকে বক্রদৃষ্টি ঘুরিয়ে এনে আমি আবার ফিরে বসলাম।

কোন প্রশ্ন নেই আর, শুধু নিজেদের মধ্যে চাপা ফিসফিসানি—

"না ঃ ঘাঁটিয়ে কাজ নেই.....আবার থুরপো সঙ্গে রয়েছে! ...না গো না, অত সাহস দেখাতে হবে না তোমায়...করব জিজ্ঞেস পিসিমা?...চলে আয়, ঘাঁটিয়ে কাজ নেই...কামড়ায়ও...মাথার কি ঠিক আছে...?"

সেদিন এইটুকুর ওপর দিয়েই গেল। চলে গেল সবাই। তারপর আরও দুটো দিন বেশ নিরুপদ্রবেই গেল কেটে। কিন্তু সেটা নিশ্চয় এইজন্যই যে কলেজ থাকায় এবং দেরি পর্যন্ত ক্লাস থাকায় আমি মাত্র একেবারে বিকালের দিকে ঘন্টাখানেক সময় পেলাম এসে কাজ করবার। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। তারপর দিন ছিল রবিবার। আমার লজ্জাবতী-অধ্যায় আপাতত শেষ হয়েছে। বনের ভেতরের দিকে একটা নূতন ধরণের লতা পেয়েছি, ক্যাকটাস-জাতীয়, একেবারে পত্রশূন্যে, গায়ে খুব মিহি রোঁয়ার মতো কাঁটা। সেটি তুলে নিয়ে এসে, কাঁটার জন্যই মাটিতে রেখে আমি প্রায় উপুড় হয়ে শুয়ে প'ড়েই অনুবীক্ষণ নিয়ে পরীক্ষা করছিলাম, একবার উঠে দেখি, প্রায় সেই দলটি কখন এসে একটু তফাতে দাঁড়িয়েছে। এবার যেমন কম বয়সীদের দু'একজন নেই মনে হোল, তেমনি বৃদ্ধা-প্রৌঢ়ার সংখ্যা আরও পুষ্ট। তাঁদের তরফ থেকেই প্রশ্ন-মন্তব্য শুরু হোল—

"ও বাবা, তুমি অমন করে মুখ থুবড়ে এখানে কি করছ চাঁদ আমার? সেদিনও দেখলেম।"

আজ একটু লোভই হোল, উত্তর দিলে যদি নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

আজ বসেও ছিলাম বনের দিকে পেছন করেই, এড়ানোও গেল না। বললাম—"আমি পড়ি মা এখানে এসে।"

পেছনের দিকে একটু চাপা মন্তব্য হোল—"ঐ শোন্ বললি? সহজ লোকের এই পড়া?" হ্যাঁ, বাবা, পড়ো, তা বই তো কোথায়, তোমার?"—অত্যন্ত দরদে ভরা স্বর। আমি উত্তর দেওয়ার আগেই, এ-পড়ার অর্থ যেন ধ'রে নিয়ে অন্যকণ্ঠে প্রশ্ন হোল—"বেশ করো পড়ো বাবা। তা বাড়ি যাও দিকি।...আহা কোন্ মার কপাল ভেঙেছে গো? বাঁশের কোঁড়ার মতন ছেলে এমন! এই বয়সেই সাধ-আহ্লাদ সব গেল!"

প্রশ্নের একটু ভিড়ই পড়ে গেল—

"বিয়ে করেছ তুমি বাবা?"

"বাড়ি কোন্‌খানে?"

"বাপ-মা বেঁচে আছে? (নিজের মনেই) আর বেঁচে থেকে তো ভারি লাভ তাদের! আহা গো!"

"নাওনা-ধোওনা কেন বাবা? নাইবে ভালো করে! মাথায় ভালো ক'রে ঠান্ডা তেল দেবে। বলে দেয় না কেউ? যাও তো মানিক আমার, বাড়ি যাও।"

সেইদিন ঐ পর্যন্তই। উত্তর দেওয়ার যেমন ফাঁকও পাচ্ছি না, তেমনি সব প্রশ্নের একই উদ্দেশ্য দেখে বাক্য খুঁজেও পাচ্ছি না কিছু বলবার। দৃষ্টিও স্বভাবতই শূন্য এবং উদ্‌ভ্রান্ত এবং তাইতেই আশু বিপদের কোন সম্ভাবনা দেখে দলটি শেষে পাৎলা হোল।

কিন্তু শেষ হোল না এইখানে। ক্রমে সকাল ছেড়ে বিকেলেও কৌতূহলীদের সমাগম আরম্ভ হতে লাগল। বিশেষত্ব এই যে অল্প-বয়সীদের সংখ্যা একেবারেই লুপ্ত হয়ে প্রৌঢ়া, বিশেষ করে বৃদ্ধাদের সংখ্যা যেতে লাগল বেড়ে। প্রশ্ন-মন্তব্য—উপদেশও স্পষ্ট হতে হতে শেষে পাগলা-কালীর তামার বালাও এসে পৌছে গেল একদিন।

শেষে পাগলা-কালীর তামার বালাও এসে পৌঁছে গেল একদিন।

তবুও ওদিকে মুক্ত প্রকৃতি একটি একটি করে রহস্যের দ্বার খুলে যে মোহে আকৃষ্ট করছে, ছাড়তে পারছি না।

তারপর একদিন অবস্থাটা এর চেয়েও চূড়ান্তে গিয়ে পৌঁছাল।

কেমন যেন গা-সওয়াও হয়ে এসেছে। ছুরি-কাঁচি-অনুবীক্ষণ নিয়ে কাজ করে যাই, ওরা এসে দাঁড়ায়, প্রশ্ন-মন্তব্য করে, চলে যায়, আবার কাজে লেগে যাই আমি। তারপর শেষ চোটটা নিতান্ত অপ্রত্যাশিত-ভাবেই পড়ল এসে।

সেদিন কাজের মধ্যে হঠাৎ চোখ তুলে দূরে থেকেই দলটিকে দেখে মনে হোল তার মধ্যে থেকে একজন যেন একটু চেনা-চেনা। একটু এগুতেই বুঝলাম লাহিড়ী-দিদিমার দল। আরও কাছে আসতে দেখলাম, একটু রদবদল হয়েছে, অমর্ত-দিদিমা আর বিলাস-মাসিমা নেই, তেমনি এখানকার দলের মাতব্বর জনাত্রিশেক রয়েছেন; বয়সে সবাই কাছাকাছি। এগিয়ে আসতে আসতে লাহিড়ী-দিদিমাদের তিনজনের গতি বিস্ময়ে মন্থর হ'য়ে আসছিল, বেশ বোঝা যায়, হুজুগটা কানে গেছে, তবে ওপাড়ার উদীয়মান কবিরাজ আমিই যে এ-পাড়ায় এসে নূতন-রূপে আসর জমিয়ে বসেছি এটা আন্দাজ করতে পারেননি। থমকে দাঁড়ালেন সামনে এসে। লীডার হিসাবে লাহিড়ী-দিদিমারই প্রশ্ন করার কথা, কিন্তু তিনি যেন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছেন। প্রশ্ন করলেন সাতকড়ি-মাসিমা—

"আমাদের শৈল না? তোর এ-দশা কেন বাবা? আমরা সেখানে তোর ..দিদের জিজ্ঞেস করে উত্তর পাই না......"

"দেবে উত্তর?"

—ফোঁস করে উঠলেন লাহিড়ী-দিদিমা। মুখে ভাষা ফিরে এসেছে।

বেশ সিধে চালেই আসছিলেন—ভারী, শরীরে যতটা সম্ভব—সেইজন্যে চিনতেও ভুল হয়েছিল আমার; হঠাৎ ঝুঁকে প'ড়ে ডান হাতে হাঁটুটা আগের মতো চেপে ধ'রে নাক-মুখ সিঁটকে বললেন—"কম শয়তানের দল! —ওরা ভাঙবে ভেতরের কথা? ভালো কবরেজ ব'লে চালিয়ে শেষে কিনা এক বদ্ধ পাগলের ওষুধ ব্যাভার করিয়ে......উঃ, ঐ আবার টিস্ মারছে গো!—ঐ!—ঐ! তোরা যাবি, না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরণ দেখবি এই আঘাটায় আমার?...ঐ গো! উঃ!..."

ঘুরে দল নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগুলেন শহরের পানে।

আর চালাতে পারিনি দিনকতক তো এই দারুণ অপরাধের স্খলন কি করে হবে সেই দুশ্চিন্তাতেই কাটল ভয়ে ভয়ে। তারপর বৈজ্ঞানিক হওয়ার দুরাশা আর উদয় হয়নি মনে কখনও।
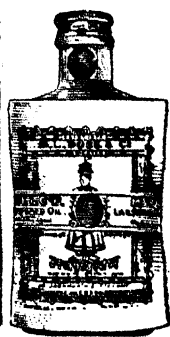
ইউরোপের জিপ্‌সি সমাজ

দিলীপ মালাকার

মধ্যযুগ হতে ইউরোপে পরিচিত জিপ্‌সি-সমাজ। তার আগে এদের কোনো ইতিহাস পাওয়া যায় না। মধ্যযুগ হতে একালের বিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় সমাজে হয়েছে কত ওলট-পালট। কত তার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন। কিন্তু ইউরোপে জিপ্‌সি-সমাজের তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। এখানেই বোধহয় জিপ্‌সি-সমাজের বিশেষত্ব। গত পাঁচশ বছরে জিপ্‌সিদের আচার-ব্যবহার, চাল-চলনেও বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায়নি।

জিপ্‌সিরা ইউরোপে বহুনামে পরিচিত। পূর্ব ও মধ্য ইউরোপে তাদের পরিচয় শিগান বলে। কখনো তাদের বলা হয় বোহেমিয়ান বলে। চেকোশ্লোভাকিয়ার একটি প্রদেশের নামই বোহেমিয়া। বোহেমিয়ান মানে ভবঘুরে। পশ্চিম ইউরোপে এরা পরিচিত 'জিতান' নামে। ইংরেজদের দেশে এরা জিপ্‌সি বলে পরিচিত। কিন্তু জিপ্‌সিদের ভাষায় তারা 'রোম' ও 'মানুষ'। 'রোম' শব্দটি নাকি হিন্দি থেকে এসেছে। এদের ভাষায় 'রোম' হচ্ছে পুরুষ আর 'রোমানি' (সং রমণী) স্ত্রী। মানুষ মানে আমাদের ভাষায় যা তাই। এদের ভাষায় প্রচুর হিন্দি, রাজস্থানি শব্দ ব্যবহৃত হয়। ফলে এখানকার জিপ্‌সি ভাষা একটা জগাখিচুড়ি। গ্রীক, হিন্দি, রাজস্থানি, শ্লাভ ভাষা, স্প্যানিশ শব্দ মিশিয়ে জিপ্‌সি ভাষার বর্তমান রূপ। পূর্ব ও মধ্য ইউরোপে আমি জিপ্‌সিদের দেখেছি অনেকটা আমাদেরই মতন দেখতে। তাদের ভাষায় প্রচুর ভারতীয় শব্দ। আমি বুলগারিয়ার অনেক জেলায় ও গ্রামে জিপ্‌সিদের দেখেছি যাদের ওরা বলে শিগান, তাদের দেখলে মনে হবে যেন তারা উত্তরপ্রদেশ বা রাজস্থান থেকে সদ্য এসেছে। চেহারা পোশাকে রয়েছে রাজস্থানি ভাব। ওরা যখন কথা বলে তখন কতক শব্দ বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারি। এদের একজন আমায় দেখে আত্মীয়ের মতন আলাপ জুড়ে দিল। এখনও এরা চুলকে বলে 'কালো বলো', সূর্যকে বলে 'দেউ', চোখকে 'আঁখ', স্ত্রীকে 'রোমনি' এমনি আরও কত কথা। বুলগারিয়ার শিগানরা এখনও আনকোরা রয়েছে। ওদের মধ্যে আবার অনেক সামাজিক দলাদলি চলে। এক একটি উপজাতি অন্যের থেকে পৃথক। ভারত থেকে যারা এসেছে তাদের কথাবার্তায় বোঝা যায়। আরেক দল আসে ইরান-তুর্কি থেকে। এদের দল আসে গ্রীস হয়ে। তাই এদের ভাষায় গ্রীক ভাষার প্রাধান্য। এদের এবং ভারতীয় দলের একাংশ যায় উত্তর আফ্রিকা হয়ে স্পেনে। স্পেন থেকে এরা যায় বৃটেনে, একদল আসে ফ্রান্সে। ফ্রান্সে ও জার্মানীতে যে-সব 'জিতান' বা জিপ্‌সি আছে তাদের অর্ধেক এসেছে স্পেন থেকে, আর অর্ধেক পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া ও হাঙ্গারি থেকে।

আমি হাঙ্গারি ও চেকোশ্লোভাকিয়ায় শিগানদের দেখেছি মিশ্রিত চেহারায়। এরা একেবারে ফর্সা নয় আবার ভারতীয়দের মতন

স্পেনীয় জিপ্‌সি মেয়ে

তামাটেও নয়। এদের মধ্যে রক্তের মিশ্রণ হওয়ায় এরা অন্য রকমের হয়েছে। বুলগারিয়ান শিগানদের মতন নয়। হাঙ্গারিয়ান জিপ্‌সিদের অধিকাংশ এখন নাইট ক্লাবে কাবারে ও সঙ্গীত-আসরে বাজনা বাজিয়ে থাকে। বিশেষ করে বেহালা। 'শিগানার অর্কেস্ট্রা' শুধু হাঙ্গারি নয় সমগ্র মধ্য ইউরোপ জুড়ে খ্যাত।

বছর কয়েক আগে বুদাপেস্তের 'এস্টোরিয়া' হোটেলের রেস্তোরাঁয় খাচ্ছি। আমাদের টেবিলের সামনেই বাজাচ্ছিল একদল জিপ্‌সি 'শিগানার অর্কেস্ট্রা'। আমায় দেখেই ওরা অতি সহজে চিনতে পারে আমি ভারতীয়। ওদের মধ্যে দুজন ছিল একেবারে উত্তরপ্রদেশ বা রাজস্থানের অধিবাসীদের মতন দেখতে। দোভাষীর মাধ্যমে তারা এসে আমার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিল। তারা বলছিল যে, তাদের পূর্বপুরুষরা নাকি এসেছে ভারতবর্ষ থেকে। তবে অধিকাংশ ইউরোপীয়দের সঙ্গে মিশে গেছে। তাদের দেখে চেনা যায় না বটে, কিন্তু অনেকেই তাদের পুরোনো সংস্কৃতি ও ভাষা বজায় রেখেছে। আমাদের খাবার টেবিলের সামনে যে-সব জিপ্‌সি বাজনা বাজাচ্ছিল তাদের অনেকেই কিন্তু খাঁটি ইউরোপীয়দের মতন দেখতে। তারাও নাকি জিপ্‌সি। তবে তাদের মধ্যে যারা দেখতে ভারতীয়ের মতন তারাই আমার সঙ্গে পরমাত্মীয়ের মতন আলাপ জুড়ে দেয়। তারাই বলছিল যে, এতক্ষণ তারা যা বাজাচ্ছিল তাকে হাঙ্গারিয়ানরা 'শিগান' সঙ্গীত বলে বটে, কিন্তু আসল জিপ্‌সি বাজনা তারা সাধারণত বাজায় না। আমাকে খুশী করার জন্যে তারা সত্যিকারের শিগান সঙ্গীত বাজিয়ে শোনাল। শুনে মনে হল যেন আমি উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান বা পাঞ্জাবের লোকসঙ্গীত শুনছি। এদের বাজনার সুর ও তাল অনেকটা উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের মতন। এদের আদি নিবাস যে ভারতবর্ষে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বুলগারিয়ায় এমন কোনো শহর দেখলাম না যেখানে একটা দুটো জিপ্‌সি বা শিগান নেই। মেয়েদের চেনা যায় সহজে তাদের পোশাকে। তরুণী ও যুবতীদের দেখলে মনে হবে যেন ওরা পাঞ্জাব, রাজস্থান বা কাশ্মীর থেকে এসেছে। মেয়েরা এখনও খোঁপায় ফুল গোঁজে বা কখনো ফুলের মালা। পুরুষগুলো ইউরোপীয় পোশাক পরে বলে অনেক সময় তাদের চেনা যায় না।

বুলগারিয়ার রিলা পাহাড়ে রয়েছে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ 'অর্থডক্স' খৃষ্টানদের মঠ। মঠটার বয়স হবে আটশ বছর। ওখানে এখন টুরিস্টদের বেজায় ভিড়। আমিও সেখানে দিন চার ছিলাম। সেখানে দেখি এক শিগান মঠের প্রধান গেটের কাছে বসে টুরিস্টদের জুতো পালিশ করছে। যে বাক্সটার ওপরে টুরিস্টদের পা-সুদ্ধ জুতো পালিশ করছিল সেই বাক্সের দুই ধারে দুই ফটো লাগান।

একটি হল রাজকাপুরের আরেকটি নার্গিশের। আমি তো দেখেই অবাক। একে পাহাড় তার ওপর ওই মঠে দুই জনপ্রিয় ভারতীয় চিত্রতারকার ছবি দেখব বলে কোনো দিন আশা করিনি। আমার চেয়েও বেশী আশ্চর্য হল ওই জুতো পালিশকরা শিগানটি। আমি ভারতীয় জেনে তার কি আনন্দ। তৎক্ষণাৎ সে রাজকাপুরের 'হম আবারা হু' গানটি গাইতে শুরু করে দিল। শুধু ওই জুতো পালিশকরা শিগানটি নয়, বহু সংখ্যক বুলগেরিয়ান জিপ্‌সিদের মুখে শুনেছি ভারতীয় সিনেমার গান। যে-সব হিন্দি ছবি বুলগারিয়ায় যায় তাদের সব কটা ছবি শিগানরা নাকি ভিড় করে দেখে। ওরা বলে যেহেতু তাদের পূর্বপুরুষ ভারত থেকে এসেছে সেইহেতু ভারতীয় ছবি তাদেরই ছবি। ওরা নাকি হিন্দি ছবি বুঝতেও পারে। গান তো ওদের কণ্ঠস্থ। রাজকাপুর-নার্গিস ওদের সবচেয়ে প্রিয় চিত্রতারকা। বুলগেরিয়ার অনেক ছোট শহরে একা হেঁটে চলেছি। রাস্তায় হয়ত একদল শিগানের সঙ্গে দেখা হল। তাদের মধ্যে ছেলে-ছোকরার দল আমায় ঘিরে ধরত এই বুঝে যে আমি বোধহয় কোনো ভারতীয় ছবির অভিনেতা। সুতরাং ছবি ও তাতে সই দাও।

বুলগারিয়ান জিপ্‌সিরা ভারতীয় দেখলে তারা নিজেদের ভারতীয় বলে পরিচয় দিতে গর্ব অনুভব করে এই জন্যে যে, ওদের এখনও বুলগারিয়ায় একটু নিচু চোখে দেখা হয়। ভারতবর্ষ এখন স্বাধীন। ভারত-বর্ষের কথা দেশ-বিদেশে আলোচিত হয়। তাই তাদের গর্ব।

মাসখানেক আগে পূর্ব বার্লিনের 'সোফিয়া' হোটেলের দরজার সামনে দেখি এক ভারতীয় মুখ। তার কাছে যেতেই মনে পড়ল এ যে বুলগারিয়ার 'প্লোবদিব'-এ সব-চেয়ে বড় হোটেল ত্রিমন্টুমের বেহালা-

স্কোপ্‌সে জিপ্‌সি মেয়ের নাচ

বাদক। নাম তার 'রাখ্‌মান'। সে আমাকে দেখে নাম ধরে ডাকতে লাগল। আমি যেন তার কত পরিচিত। তাকে জিজ্ঞাসা করি, 'তুমি এখানে কি করছ।' সে জানায়, পূর্ব বার্লিনে সোফিয়া হোটেলে যে বুলগারিয়ান অর্কেষ্ট্রা বাদকদল এসেছে সে তাদেরই একজন। বার্লিনে থাকবে মাস চারেক। তার বাড়ীর কথা সব শুনলাম। তার সঙ্গে আমার আলাপ হয় বুলগারিয়ার দ্বিতীয় বৃহৎ শহর প্লোবদিবের ত্রিমন্টুমে হোটেলে। ওই হোটেলের অর্কেষ্ট্রা দলে সে ছিল নেতা। তারই মুখে শুনেছি শিগানদের অনেক অজানা কথা। রাখমানের পূর্বপুরুষ শ দুই বছর আগে ভারতের উত্তর প্রদেশ ত্যাগ করে পূর্ব ইউরোপের পথে বেরোয়। সেই দলের একটি অংশ এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে বুল-গারিয়ায়। এখান থেকে তাদেরই সম্প্রদায়ের একটি উপদল যায় হাঙ্গারী ও চেকোশ্লো-ভাকিয়াতে। রাখমানের ঠাকুরদা নাকি ভারতীয় ভাষা চলতে পারত। এদের সম্প্রদায় এখনও একই সঙ্গে করে সূর্যের উপাসনা ও ইসলাম ধর্ম পালন। এদের এই ছোট সম্প্রদায় হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম-ব্রতকথা এখনও পালন করে থাকে। রাখমানই বলছিল যে, বুলগারিয়ার

বুলগারিয়ার একটি জিপ্‌সি পরিবার

জিপ্‌সিদের মধ্যে রয়েছে অনেক সম্প্রদায়। একের সঙ্গে অন্যের নেই মিল। বুড়োরা আজও তাদের সেই পুরোনো আচার-সংস্কৃতি পালন করে। কোথাও এক জায়গায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চায় না। আজ এখানে কাল ওখানে এই করে। কিন্তু তরুণ ও শিশুদের শিক্ষার ভার নিয়েছে বুলগারিয়ান সরকার। তার মতন অনেক শিক্ষিত যুবক যে কোনো বৃত্তি গ্রহণ করে সভ্য-ভব্য হয়েছে। অধিকাংশ জিপ্‌সি এখনো সেই পুরোনো অবস্থায় রয়েছে। ওদের জন্যে বুলগারিয়ান সরকার অনেক প্রচেষ্টা করে চলেছে। কিন্তু সবই ব্যর্থ প্রায়। তবে তরুণ ও যুবকরা অনেকখানি এগিয়ে গেছে। সেটা আমি লক্ষ্য করেছি। হাঙ্গারী, চেকোশ্লোভাকিয়া ও পোল্যাণ্ডেও সেই অবস্থা। বুড়ো জিপ্‌সীদের নিয়ে মহা সমস্যা। এরা তাদের পুরোনো ভবঘুরে মনোভাব ত্যাগ করতে চায় না।

জিপ্‌সিরা এক দেশ থেকে আরেক দেশে অনবরত ঘুরে বেড়ায় বলে মধ্যযুগে ইউরোপময় ত্রাসের সঞ্চার হয়েছিল। জিপ্‌সিদের দেশ-বিদেশে যথেচ্ছভাবে ভ্রমণ ও নাগরিকত্ব যাতে বন্ধ হয় তার জন্যে ইংলণ্ডে এক আইন পাশ হয় ১৩৯৯ সালে আর স্পেনে ১৪৯২ সালে। এই দুই দেশের আইন প্রণয়নে বোঝা যায় যে, তাদের ভয় ও ঘৃণা ছিল অ-ইউরোপীয় জাতি সম্পর্কে। ইউরোপের অনেক রাষ্ট্র জিপ্‌সিদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল না কোনোদিন। অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্ঞী মারি থেরো ১৭৬১ সালে নতুন আইনবলে অস্ট্রিয়ায় জিপ্‌সি-সন্তানদের কেড়ে নিয়ে খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করার হুকুম দেন। ১৭৮২ সালে অস্ট্রিয়ায় আরেক আইন প্রয়োগ করে প্রায় জিপ্‌সি উচ্ছেদ করার যোগাড় হয়। আইনের প্রধান বক্তব্য ছিল এই : যারা সৎ উপায়ে জীবিকানির্বাহ করে না তাদের নিশ্চিহ্ন করা উচিত। ফলে অনেক শিগানের প্রাণ যায়। এমন সব অদ্ভুত আইন পাশ হতে থাকে ইংলণ্ডে, স্পেনে, জার্মানীতে ও রাশিয়ায়। রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথারিনের আমলে শিগান-দের কৃতদাস হিসেবে গণ্য করা হত। তাদের নিয়ে ইউক্রেনিয়া ও ক্রিমিয়া অঞ্চলে চাষ-বাসের কাজে লাগান হয়। তার পরবর্তী ইতিহাসও তেমনি রোমাঞ্চকর। পূর্ব ইউরোপের সোস্যালিস্ট দেশ ছাড়া আর কোথাও জিপ্‌সিদের নাগরিক অধিকার নেই (তারা সেখানে ভবঘুরে বলে পরিচিত)।

এক ফ্রান্সেই দুই লাখ জিপ্‌সির বাস। প্যারিসের কাছে রোম্যাঁ ভিল ও মঁৎরই-এ দেখেছি জিপ্‌সি বা জিতানদের ছাউনি। ওরা ওখানে হয় মজুরের কাজ, কারখানার শ্রমিকের কাজ, মৃত্তিকাশিল্পের কাজ, নয় তো তামার ঘটি-বাটি তৈরির কাজ করে থাকে। মেয়েদের অনেকে হাত-দেখা ও তুকতাকের কাজ করে প্যারিসে। প্যারিসের অনেক জনবহুল পাড়ায় কাফেতে দেখা যাবে জিপ্‌সি রমণী হাত দেখছে। এতে এদের রোজগার। ফরাসী জিপ্‌সিদের সমিতিও আছে। আছে এদের মাসিক পত্রিকা। পত্রিকায় নাম 'লা ভোরা মন্দিয়াল শিগান' (আন্তর্জাতিক শিগান মুখপাত্র)। এদের সমিতির সভাপতির নাম বইদা বুব্দ। দক্ষিণ ফ্রান্সের 'স্যাঁৎ মারি দ্য লা ম্যার'-এ প্রতিবছর গ্রীষ্মকালে বসে ইউরোপীয় জিপ্‌সিদের সভা। ফ্রান্স ও স্পেনের অধিকাংশ জিপ্‌সি এখন খৃষ্ট-ধর্মাবলম্বী। তারা আসে স্যাঁৎ মারি দ্য লা ম্যার-এ তীর্থযাত্রা করতে। যিশুখৃষ্টের মাতা মেরি হল জিপ্‌সিদের আরাধ্যা দেবী। তার উৎসবে এরা গান গেয়ে, গীটার বাজিয়ে যে শোভাযাত্রা বের করে তা সত্যি দেখবার মতন। আমি ওখানে দেখেছি জিপ্‌সিদের শোভাযাত্রা। তাদের ভাষায় কিন্তু খৃষ্টের বন্দনা। তাঁকে ঘিরে তাদের চলে সপ্তাহখানেক উৎসব পালন। সেই সঙ্গে চলে জিপ্‌সি সঙ্গীত ও গীটার বাজনার প্রতিযোগিতা।

ফ্রান্সে এখনও অধিক সংখ্যক জিপ্‌সী বাস করে দেখেছি কারাভান বা চলন্ত গৃহে। এখন আর তাদের ঘর ঘোড়ায় টানে না। টানে মোটরগাড়ীতে। অনেকে বাস করে তাঁবুতে।

জার্মানীতে আমি জিপ্‌সীদের চিহ্ন দেখতে পাইনি। জার্মানরাই বলেছে যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হিটলার বাহিনী পাঁচ লাখ জিপ্‌সীদের হত্যা করে। অপরাধ তারা জার্মান নয়। জার্মান জাত নয় বলে। যেমন ইহুদিরা। যুদ্ধের পরে জিপ্‌সীদের জার্মানী প্রবেশ বন্ধ করা হয়েছে। তামাটে রঙের জিপ্‌সীদের এখন জার্মানীতে বাস করা নিষিদ্ধ।

স্পেনে জিপ্‌সীদের দেখেছি অন্য রকমের। একালের স্প্যানিশ সঙ্গীত নিয়ে যাঁরা গর্ব করেন তাঁরা জেনে রাখুন যে, স্প্যানিস নৃত্য ও গানে পূর্ণ প্রভাব রয়েছে জিপ্‌সীদের। জিপ্‌সীদের নাচে ভারতীয় নাচের তাল অনুভব করা যাবে অনায়াসে। জিপ্‌সী সম্প্রদায় এখনও স্পেনে বেশ প্রভাবশালী। কারণ স্পেনে ষাঁড়ের লড়াই জাতীয় ক্রীড়া। এই ষাঁড়ের লড়াই-এ যে কজন বিখ্যাত যোদ্ধা তারা সবাই জিপ্‌সী। এরা এখনও তাদের ধর্ম ও গোঁড়ামি পালন করে চলে।

জিপ্‌সী-সমাজে বিয়ে-থা হয় তাদের মধ্যেই। ছেলে-মেয়ের বিয়ে ঠিক করে তাদের বাবা-মা। মেয়েকে ও মেয়ের বাপকে প্রচুর যৌতুক ও উপঢৌকন দিয়ে তবে বিয়ে করা যায়। তাই ভাবী স্বামীদের দিনরাত খেটে সেই অর্থ জোগাড় করতে হয়।

জিপ্‌সী-সমাজ, জিপ্‌সী জীবন ও প্রেম নিয়ে একটি ছবি কিছুদিন হল তোলা হয়েছে ফ্রান্সে। ছবিটার নাম 'ক্রিশ রোমানি'। ছবিটিতে অভিনয় করেছে প্যারিসের কাছের জিপ্‌সীর দল। এদের নিজেদের বিচারালয়ে হয় বিচার। এদের মধ্যেও আছে আছে জাত-বাতের বিচার। এদের সম্প্রদায়ের নেতার কথা এরা এক বাক্যে শোনে। নেতার মৃত্যুর পর নির্বাচিত হয় আরেক নেতা। সে সব নাকি হয় স্বপ্নাদিষ্ট।

ফ্রান্স ও স্পেনের জিপ্‌সীদের দেখলে চেনা যায় না যে এরা এককালে ছিল ভারতীয়। তবে এদের ভাষায় বোঝা যায়। এদের অনেকে এসেছে উত্তর আফ্রিকা থেকে। তাই এদের মধ্যে আরবি শব্দের চলন। উত্তর আফ্রিকায় আরব ও আফ্রিকান সভ্যতায় মিলন ঘটেছে। সুতরাং উত্তর আফ্রিকাগত জিপ্‌সীরা অনেকগুলো সংস্কৃতির মিলনে গঠিত। তাই তাদের ওপর অনেক সংস্কৃতির প্রভাব। এদের এক-একটি সম্প্রদায় এক এক রকমের ধর্ম পালন করে। তেমনি ভাষা।

পশ্চিম ইউরোপে জিপ্‌সীদের সামাজিক উন্নয়নকল্পে কোনো প্রচেষ্টা আমি দেখিনি। পূর্ব ইউরোপে সোস্যালিস্ট দেশে দেখেছি এদের পরিবর্তনের দৃশ্য। পশ্চিম ইউরোপে এখনও জিপ্‌সীদের দেখা হয় সেকালের সার্কাস খেলোয়াড়, সঙ্গে নাচানো বা জন্তু নাচানোর খেলোয়াড়, হাত-দেখা বা জোচ্চোর বলে। ভারতেও তাই। ভারতে জিপ্‌সীরা পরিচিত বেদে বা সাপুড়ে বলে। তাদের কি কোনো পরিবর্তন হয়েছে?

একটি মিশ্র মনস্তত্ত্বের পরিস্থিতি।—লজ্জা, আত্মাধিক্কার, ক্রোধ ইত্যাদির অপূর্ব মিলন।

ভূপেশবাবু মহা উত্তেজিত। তাঁর গিন্নি আরও।

স্ত্রীর কাছে স্বামী যে কত অসহায় তা এই মুহূর্তে আরও একবার প্রমাণিত হচ্ছে। গিন্নির সুর যেমন চড়া তেমনি ধারালো।—একশবার বলেছি, তুমি শুনলে না। ট্যাক্সির নম্বরটা পর্যন্ত নাওনি।

ভূপেশবাবু অস্থিরভাবে পাইচারি করছেন আর বলছেন, ব্যাগটা আমার হাত থেকে নিলেই পারতে জোর ক'রে।

আহা, কি নীতিকথাই শোনাচ্ছ এখন। তোমার উপর জোর খাটাব? বলি আমার ঘাড়ে কটা মাথা আছে শুনি? তোমার বুদ্ধির উপর আমি কথা বলব? তবেই হয়েছে। তবু, বলেছিলাম, পৈ-পৈ ক'রে বলেছিলাম ব্যাগটা তোমার কাছে রেখো না, ট্রাঙ্কে রাখ। তখন কত বড় বুদ্ধিমান সাজলে। বললে, ট্রাঙ্ক নিয়ে স্টেশনের কুলিরা স'রে পড়ে, নিজের হাতে থাকলে হারাবার ভয় নেই। অথচ সে ট্রাঙ্কে আমার যে সব গয়না আছে তার বুঝি দাম নেই?

দেওয়া নেওয়া

পরিমল গোস্বামী

সে কথাটা মনেও এলো না তখন। এখন তিন হাজার টাকার জন্য ব'সে ব'সে হায় হায় কর।

ভূপেশবাবুর সমস্ত গা কাঁপছে। তিনি গিন্নির কথার উত্তরে কি বলতে গেলেন, গলা দিয়ে কোনো কথা বেরোল না, যা বেরোল তা শুয়োরের মতো গোটাকত ঘোঁত ঘোঁত শব্দ মাত্র।

বলি, একেবারে বাক্যহারা যে! কিছু বলবে, না আমিই চেঁচাব ব'সে ব'সে?—নিজের দোষটা কি—

কথাটা শেষ হ'ল না। দরজায় জোর কড়া-নাড়ার শব্দ হ'ল, এবং অত্যন্ত বিরক্তভাবে ভূপেশবাবু গিয়ে দরজা খুলেই হঠাৎ চমকে উঠলেন। সামনে ট্যাক্সিচালক!

ট্যাক্সিচালক তার হাত থেকে ব্যাগটি ভূপেশবাবুর হাতে দিয়ে বলল, এই ব্যাগটি আপনিই ফেলে গিয়েছিলেন ট্যাক্সিতে, ফেরৎ দিয়ে গেলাম।

ভূপেশবাবু কি বলতে গেলেন, কিন্তু গলা থেকে ময়ূরের মতো শুধু একটি অর্থহীন কেকাধ্বনি নির্গত হ'ল।

গত আধঘণ্টা ধরে তিনি অসহ্য মানসিক গ্লানি ভোগ করছিলেন, থানায় টেলিফোন ক'রেও ফল হয়নি, বরং উল্টে গাল খেয়েছেন ট্যাক্সির নম্বর বলতে না পেরে। ঠিক এমনি এক দুর্দান্ত মানসিক সংকটের সময় ট্যাক্সি-ড্রাইভার ব্যাগটি ফিরিয়ে দিল।

বাড়িতে আনন্দ কোলাহল পাড়ে গেল।

ট্যাক্সি-ড্রাইভার বলল, এবারে আসি?

সে কি কথা—ব'লে ভূপেশ গিন্নি এগিয়ে এসে বললেন, একটুখানি না ব'সে যেতে পাবে না। তোমার নামটি কি ভাই?

অজিত চৌধুরী।— সংক্ষিপ্ত জবাব। অজিত চৌধুরী বুঝতে পারল, কিছুক্ষণ না বসে উপায় নেই।

ভদ্রলোকের ছেলে। খুব ভাল লাগল ভাই তোমার স্বভাব দেখে। এমন কর্তব্যজ্ঞান আজকাল আর নেই। তুমি একটুখানি ব'সে যাবে। কিছু মিষ্টিমুখ না ক'রে যেতে পাবে না। আমি এখুনি আসছি।

কিছু জলযোগের ব্যবস্থা হ'ল।

ইতিমধ্যে ভূপেশবাবু বাড়ির ভিতরে গিয়ে খবরের কাগজের অফিসে ফোন ক'রে দিয়েছেন। এই সততার খবরটা প্রকাশ করলে তিনি কৃতজ্ঞ হবেন। করবেন কি দয়া ক'রে?

বার্তা সম্পাদক শুনে বললেন, দয়া করে মানে কি মশায়, এই রকম খবরই তো চাই। নিশ্চয় ছাপব! আমি এখুনি রিপোর্টার পাঠাচ্ছি, ফোটোগ্রাফও তুলে আনবে। বছরে এমন ঘটনা একটার বেশি পাওয়াই যায় না। আপনি ড্রাইভারকে যেমন ক'রে হোক ঠেকিয়ে রাখুন, মিনিট দশেকের মধ্যে জীপে করে রিপোর্টার গিয়ে পৌঁছবে।

অজিত ইতিমধ্যে কিছু মিষ্টি খেয়ে চায়ে মুখ দিয়েছিল। এমন সময় ভূপেশবাবু এসে তার পাশে বসে বর্তমান কাল সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করলেন। তারপর পকেট থেকে দুখানা একশ টাকার নোট বার করে তার হাতে দিতে যেতেই অজিত এক লাফে উঠে পড়ল।

ভূপেশবাবু অজিতকে জানলে এমন কাজ করতেন না। কারণ অজিত আদর্শবাদী আধুনিক যুবক। তার গোঁফ-জোড়াও আধুনিকতার সঙ্গে (এবং আদর্শবাদের সঙ্গে) মিলিয়ে সরু রেখার মতো দুদিকে বিস্তৃত।

ভূপেশবাবুর পুরস্কার দেবার চেষ্টা দেখে, বলল মাপ করবেন। টাকার লোভ থাকলে ব্যাগ ফিরিয়ে দিতাম না।

তোমার সততা দেখে খুশি হয়েছি, তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়েছি, তার একটা চিহ্ন থাকবে না? সামান্য টাকা— তুমি আমার এমন উপকার করেছ।

অজিত দৃঢ়স্বরে বলল, আমি যা করেছি তার জন্য পুরস্কার নেওয়া আমি পছন্দ করি না। ভদ্রতার খাতিরে কিছু মিষ্টি এবং চা খেয়েছি। এবারে আমাকে উঠতে হবে। গাড়ি বসিয়ে রাখা মানে অনেক লোকসান।

ভাই, এটা উপকারের একটা প্রতিদান। অবশ্য খুবই সামান্য।

অজিত ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, উপকার তো আমি আপনাদের হাওড়া থেকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েও করেছি, এবং তা ক'রে আমার যা ন্যায্য পাওনা তা আমি আদায় ক'রে নিয়েছি। কিন্তু তারপরে যা করেছি তার জন্য কোনো দাম নেওয়ার আমি কোনো নির্দেশ কারো কাছ থেকে পাইনি। আর এটা আমার ব্যবসাও নয়।

তবু অনুরোধ করি—

না। আপনাকে ধন্যবাদ। আমাকে আর অনুরোধ করবেন না— বলতে বলতে অজিত বাইরের দিকে পা বাড়াল। ভূপেশবাবুও নাছোড়। তিনি একদিকে স্ত্রীর কাছে ছোট হয়েছেন, অন্যদিকে অজিতের কাছে। এই দুটি মারেই তিনি যেমন কাবু হয়েছেন তেমনি মরীয়া হয়ে উঠেছেন। অজিতকে তিনি পুরস্কার নেওয়াবেন ব'লে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন।

অজিত বাড়ির বাইরে পা বাড়াবামাত্র খবরের কাগজ থেকে জীপগাড়ী ছুটে এসে দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে ওদের পথ রোধ করল। রিপোর্টার অনিল ক্যামেরা ঘাড়ে এক লাফে নিচে নামতেই ভূপেশবাবু তাকে রিপোর্টার ব'লে চিনতে পেরে বললেন, এই যে রিপোর্টারমশায়, ইনিই ট্যাক্সি-ড্রাইভার, অজিত চৌধুরী এঁর নাম—এই যুবকটিই আমাকে ব্যাগ ফিরিয়ে দিয়েছেন।

রিপোর্টার অনিলের সকল কাজ বিদ্যুৎ-গতি। আপনি এক আশ্চর্য লোক অজিত-বাবু, আমি আপনার ছবি তুলব, রিপোর্ট ছাপব। ট্যাক্সি-চালকের সততার মহত্ত্ব বিজ্ঞাপন হয়ে যাবে।

কিন্তু অজিতের এক কথা। আমি এর মধ্যে নেই মশায়—ব'লে অজিত ওদের ঠেলে বেরিয়ে এলো।

ইতিমধ্যে বহু লোক এসে জুটেছে জীপ দেখে। তারা কিছু না জেনে এসে ভিড় করেছে, এবং যাই হোক, তাদের উপভোগে বাধা হবে না, এমনি তাদের মনোভাব। অজিত তাদের ঠেলে এগোতে লাগল। অনিলও তার পিছনে। রিপোর্টার অনিলও ছিনেজোঁক। সে চটপটে লোক, কাজ ছাড়া এক সেকেণ্ডও সে থাকে না।

এ পর্যন্ত এক রকম ছিল, কিন্তু এরপর থেকে ব্যাপারটা হাস্যকর হয়ে উঠতে লাগল।

তার মানে অজিত তার ট্যাক্সি থেকে দৌড়তে আরম্ভ করল এবং অনিলও ছুটল তার পিছনে। সে কাজ করতে এসেছে কাজ ক'রে চলে যাবে, সোজা কথা। তার হাত থেকে অজিতের মতো যুবক ছাড়া পাবে, এ তার কল্পনার বাইরে। এ তার পরাজয়।

ভিড়ের লোকেরা কিছুই বুঝতে পারছে না। বাইরে থেকে চেহারা দেখে অপরাধী কিনা বোঝা যায় না, পোষাকও অপরাধীর মতো নয়। অবশ্য ছদ্মবেশও হ'তে পারে ওটা। তবে যাই হোক, মজাটা সমানই মনে হচ্ছে। একজন মন্তব্য করল, চোরেরাই আজকাল ভদ্রলোক সেজে থাকে বেশি।

প্রায় দু মিনিট ছুটে অজিত একটি খোলা দরজা পেয়ে তার মধ্যে ঢুকে পড়ল। অনাহূত অনুপ্রবিষ্ট, অনিলও তাই।

অজিত আর কাউকে ভয় করুক না করুক খবরের কাগজকে খুব ভয় করে, বিশেষ করে রিপোর্টারকে। নইলে এই দুর্বুদ্ধি তার হত না। না ছুটে সোজা ট্যাক্সিতে বসে ট্যাক্সি চালিয়ে দিত। আত্ম-প্রচারের বিরোধী সে। তার ট্যাক্সিখানা ভূপেশবাবুর বাড়ির সামনে দূরে একটি খোলা জায়গা ছিল, সেইখানে রেখে এসে-ছিল। অত দূরে রেখেছিল কি মনে ক'রে তা সেই জানে।

এ দিকে কলকাতার দুর্লভতম বস্তু খালি ট্যাক্সি দেখতে পেয়ে তিন-চারজন লোক ছুটে এসেছিল, কিন্তু দৌড়ে যে প্রথম হয়েছে, সে সোজা গিয়ে উঠে বসেছে ভিতরে। ড্রাইভার এলে সে যাত্রী হবে, এই তার আশা। কিন্তু তার ইচ্ছার বিপরীতটাই

ঘটল। কারণ তাকে ট্যাক্সিতে ব'সে থাকতে দেখে অনিল তাকে নানা রকম জেরা করতে আরম্ভ করেছে।

কেউ ভাবছে ডাকাতের গাড়ি, কেউ ভাবছে খুনের। বলাবলি করছিল তারা। ভিতরের যাত্রীটি ভয়ে বেরিয়ে এলো, কিন্তু তৎক্ষণাৎ অন্য দিক থেকে আর একজন উঠে বসল ভিতরে। ট্যাক্সি এখন তার দখলে।

অজিত সেই যে ঢুকেছিল অপরিচিত বাড়িতে, সেখানেই লুকিয়ে ছিল, এতক্ষণে বেরিয়ে এলো। আর কোনো উপায় নেই। বেরিয়ে এসে দেখে তার ট্যাক্সির কাছে সবাই এসে জুটেছে। অতএব তার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হল, সে প্রায় হেরে গেল।

হৈ হৈ ব্যাপার। ভূপেশবাবুও বেরিয়ে এসেছেন ট্যাক্সির কাছে। তখনও তাঁর আশা আছে টাকাটা অজিতকে দিতে পারবেন। ফোটো তুলতে দিলে এটাও অস্বীকার করবে না হয়তো।

অনিল গিয়ে এবারে অজিতকে আগলে দাঁড়াল। বলল, দাঁড়ান আগে ফোটোটা তুলে নিই—ব'লে ক্যামেরায় 'ফোকাস' করতে লাগল।

অজিত এক হাতে মুখ আড়াল ক'রে অনিলকে বলল, শুনুন শুনুন, আপনি ভেবেছেন কি? আমার গোটাকত প্রশ্নের জবাব দিন আগে। আমাকে অন্য সব ট্যাক্সি-চালক থেকে আলাদা ক'রে দেখছেন কেন? অন্য সব মানুষদের থেকেও বটে। কিন্তু কেন? আপনি আমাদের কাছ থেকে কি ব্যবহার পাবার আশা করেন?

অনিল হঠাৎ ক্যামেরা থেকে চোখ সরিয়ে সে চোখ অজিতের চোখে নিক্ষেপ করল। কি আশা করি—এই আশা করি যে আপনারা চুরি করবেন। যাত্রীর ভুলে ফেলে-যাওয়া কোনো জিনিস তাকে ফিরিয়ে দেবেন না।

কেন?

কেন? দেখুন অজিতবাবু, আজ কি হাজার বছরের সভ্যতার ফলে যে জিনিস গ'ড়ে উঠেছে সেটা কি, তা কি এখনও বুঝতে পারেন নি? জানেন না সেটা কি?

না।

এত দিনের সভ্যতার ফলে কোটি কোটি লোক চোর হয়েছে। আর আপনি তার মধ্যে হঠাৎ একটি ব্যতিক্রম। আপনি সেই ঐতিহ্য ভাঙতে চান?

শুনুন রিপোর্টারমশায়, তাই যদি হয় তবে আমি একা কেন, এ রকম ব্যতিক্রম তো আগে হয়েছে, আপনারাই তা ছেপেছেন। কিন্তু তাতে কি লাভ হ'ল আপনাদের?

অনিল যেন চমকে উঠল কথাটা শুনে। লাভ! লাভের কথা কে বলেছে? এ ধরনের খবর ছাপা তো একটা স্টান্ট। কাগজে এক-ঘেয়ে চুরির কথা প'ড়ে প'ড়ে লোকে বিরক্ত হয়। মাঝে মাঝে তার উল্টো খবর ছাপাতে পারলে ওরই মধ্যে একটা বৈচিত্র্য বাড়ে। তার বেশি কিছু না। আমি রিপোর্টার, আমার কাজ নতুন খবর সংগ্রহ করা।

অজিত বলল, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আপনার কথা।

কিন্তু অনিল ততক্ষণে ক্যামেরা আবার চোখে তুলে ধরেছে।

অজিত বলেই চলেছে, আমি যা করেছি তা মানুষের সাধারণ একটি ধর্ম।

অনিল আবার চোখ থেকে ক্যামেরা সরিয়ে বলল, ও সব বাজে তত্ত্বকথা ছাড়ুন, ভাই। আপনার ছবি কাগজে বেরোবে, সততার খবর বেরোবে, এটাতেই আপাতত রাজি হয়ে যান। বড় বড় কথা আপনার মনেই থাক।

অসহায়ের মতো অজিত দাঁড়িয়ে রইল ভিড়ের মাঝখানে। তার মনে তার গড়া যাবতীয় আদর্শবাদ ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে। কাউকে সে এত দিন গ্রাহ্য করেনি। বি-এ পাস ক'রে ট্যাক্সি-ড্রাইভার হয়েছে, বহু লোকের বাধা অগ্রাহ্য ক'রে। কিন্তু এখন সে অনিলের কাছে সম্পূর্ণ কাবু হয়ে পড়ল। ছুটতে তার পায়ে একটু চোট লেগেছিল সেইখানে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, ছবি আর খবর ছাপায় যদি সমাজের উপকার হয় মনে করেন, তবে যা হয় করুন, এবং আমাকে তাড়াতাড়ি মুক্ত ক'রে দিন।

অনিল এ কথায় হো হো ক'রে হেসে উঠল। হাসি যেন থামে না। বলল, আদর্শ-বাদ বুঝি ঢুকেছে মাথায়? বুঝতে পেরেছি। সমাজের উপকার হবে বৈকি, ভাই। সমাজ একটু মজা অনুভব করবে। আপনাকে বোকা বলবে। স্কুলের দু-একজন ছাত্র আপনার ছবি কেটে ডায়ারিতে এ'টে রেখে দেবে। এই পরিমাণ উপকার হবে সমাজের। এই কি কম?

ক্যামেরার মাথার আলো জ্বলে উঠল দপ ক'রে—চোখ ধাঁধিয়ে দিল সবার। ক্লিক্ শব্দ হ'ল একই সঙ্গে। অনিল অজিতকে ধন্যবাদ জানিয়ে এক লাফে জীপে উঠে পালিয়ে গেল।

অজিত যেন আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় ট্যাক্সিতে উঠে ডান হাত স্টিয়ারিং-এ রেখে বাঁ হাত দিয়ে গিয়ার স্পর্শ করল। পিছনের যাত্রীটির কথা মনে পড়ল এতক্ষণে। স্টার্ট দিয়ে জিজ্ঞাসা করল কোন্ দিকে যেতে হবে?

ভূপেশবাবুর মনে আশা, ফোটো তুলতে দিয়েছে যখন, তিনি টাকাটাও দিতে পারবেন। অজিতকে বললেন, এবারে তা হ'লে—ব'লে পকেটে হাত দিলেন।

হাত পকেট ভেদ ক'রে বেরিয়ে এলো মুক্ত আকাশে।

পকেট নেই।

ইতিমধ্যে অজিত ও তার গাড়ি বহু দূরে চলে গেছে। স্তম্ভিত ভূপেশবাবু চমকে উঠলেন। ঐঃ যা—গাড়ির নম্বরটা এবারেও নেওয়া হ'ল না।

আর একটি কল্পনায় আরও একবার চমকে উঠলেন। বাড়ি গিয়েই শুনতে হবে, 'আগেই বলেছিলাম'—

সুখ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
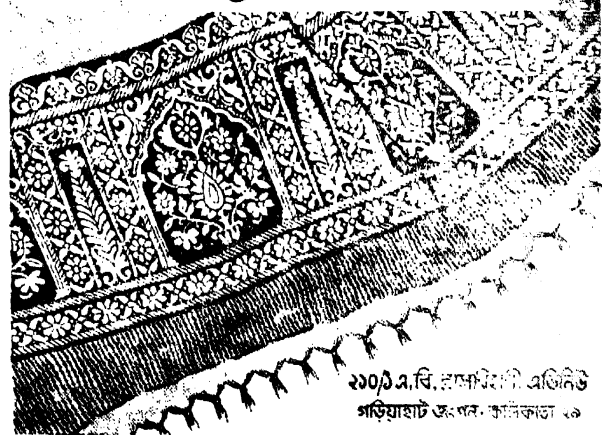
—মাছ ধরতে চান? ওভাবে হবে না।

আমি চমকে উঠলুম। আমার ধারণা ছিল বিকেলের এই নির্জন মাঠে, এই ছোট নদীটার ধারে যেখানে একটুকরো পাথরের ওপর বসে আমি শান্ত স্বচ্ছ জলের ভেতরে বঁড়শি ফেলেছি, তার আধ মাইলের ভেতরে কোনো জনপ্রাণী নেই। না—ভুল বলা হল। দু-একটা গোরু চরতে দেখেছিলুম এদিক-ওদিক, আশপাশের কাঁটা ঝোপ-ঝাড় থেকে এক-আধটা শেয়ালও বেরিয়ে আসা অসম্ভব নয়, কিন্তু—

তাকিয়ে দেখলুম, পেছনে একটি মানুষ দাঁড়িয়ে। ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে বয়েস, একটু বেশিমাত্রায় লম্বা বলে শরীরের ওপর দিকটায় অল্প একটু ভাঁজ পড়েছে। গায়ে আধময়লা হাফ শার্ট, পরণে ধুতি, পায়ে ধুলো-মাখা রবারের জুতো। কালো ফ্রেমের চশমার ওপর পশ্চিমের রোদ পড়ে মনে হচ্ছিল চোখ দুটো জ্বলছে আগুনের গোলার মতো।

ভদ্রলোক আবার বললেন, নতুন লোক নিশ্চয়। না হলে এ নদীতে ছিপ ফেলবার পণ্ডশ্রম কেউ করে না। কিছু পেলেন?

—ব্যাস-ব্যাস। যথেষ্ট পেয়েছেন। আজকের মতো খুশি হয়ে বাড়ী চলে যান। আর সত্যিই যদি দুটো-চারটে মাছ ধরতে চান, তাহলে রোমে এসে রোমান হতে হবে। অর্থাৎ [illegible], পলো নিয়ে জলে নামুন, ঘণ্টা-তিনেক পরিশ্রম করুন, তারপর দেখবেন অন্ততঃ পোয়াটাক চুনো মাছ জোগাড় হয়েছে।

বলে, হেসে উঠলেন।

ভদ্রলোক কিছু লেখাপড়া জানেন বলে মনে হল। আর ঠিক এই পরিবেশে তাঁর আবির্ভাবটা কেমন অসঙ্গত বোধ হল আমার কাছে। উত্তর বাংলার এই গ্রামটিতে কয়েকটা ছুটির দিন আমি কাটাতে এসেছি এক সপ্তাহ আগে। যে আত্মীয়টির কাছে এসেছি—তিনি সম্পর্কে আমার কাকা; তাঁর পরিচিত এবং বন্ধুবান্ধব—অর্থাৎ যে দু-চারটি মোটামুটি শিক্ষিত মানুষও এখানে আছেন, তাঁদের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেছে আগেই। দুজন পোস্টঅফিসের কেরানী, জনকয়েক স্কুল-টীচার, একজন ডাক্তার আর তার কম্পাউন্ডার, জনতিনেক ব্যবসায়ী। এঁদের বাইরে আর কেউ রোমে এসে রোমান হওয়ার প্রবাদ শোনাতে পারেন সে-কথা আমার জানা ছিল না। আর বিকেলের এই নির্জন মাঠে যেখানে আধ মাইলের ভেতরে কোনো জনপ্রাণী আছে বলে আমার মনে হয়নি, সেখানে হাওয়ায় বেনাবন সরসর করছিল, যেখানে ওপারের জঙ্গল থেকে মধ্যে মধ্যে ভেসে আসছিল লেবুঘাস আর বন-তুলসীর গন্ধ, যেখানে আমার ঠিক পায়ের নীচেই মিহি বালির ওপর খানিকটা নীলচে জল প্রায় নিথর হয়ে ছিল আর কয়েকটা ভাঙা ঝিনুকের রুপালি খোলায় লাল রোদের টুকরো মুক্তো হয়ে জ্বলছিল সেখানে এই লোকটি যেন হঠাৎ ফুটে উঠল। যেন একটু আগে সে কোথাও ছিল না—একটু পরে এই রোদ মুছে গেলে সে-ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

আমি ছিপ গুটিয়ে আস্তে আস্তে দাঁড়িয়ে পড়লুম। জলের কোল ছেড়ে উঠে এলুম পাড়ের ওপর। সেই চার ইঞ্চি বেলে মাছটা পাথরের ধারেই পড়ে রইল।

নদীর ধারের একটি মাত্র গাছ—একটা শিমুলের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বিড়ি ধরাচ্ছিলেন ভদ্রলোক।

—চললেন?

বললুম, হাঁ। ভেবে দেখলুম, আপনার প্রস্তাবটাই ভালো। কাল গামছা আর পলো এনেই চেষ্টা করে দেখব।

ভদ্রলোক একটু হাসলেন। বললেন, বাইরের লোক—না?

—এক সপ্তাহ হল এসেছি।

—কোথায় উঠেছেন?

পরিচয় দিলুম। তারপর বললুম, আমার ধারণা ছিল, এখানকার সকলের

সঙ্গেই আমার মোটামুটি চেনা হয়ে গেছে। কারণ, বিকেলে ডাক আসবার সময় সবাই-ই একবার পোস্টঅফিসে যান। কিন্তু আপনার সঙ্গে কখনো আমার দেখা হয়নি।

বিড়িতে টান দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, তার কারণ আমার কখনো চিঠি আসে না। কখনো আসবে না।

শেষ কথাটায় আর একবার চমকালুম আমি। চিঠি কখনো আসেনি এটা অসম্ভব না হতে পারে কিন্তু চিঠি কখনো আসবে না, এইটেই কানে অত্যন্ত বেসুরো ঠেকল। আর বিকেলের সেই পড়ন্ত রোদে আরো একবার তাঁর চশমার কাচদুটোকে আগ্নেয় বলে মনে হল আমার। অনুভব করলুম, এখানে আসবার পরে যাদের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে—এই মানুষটি তাদের চেয়ে অন্তত খানিকটা আলাদা।

বললুম, আপনিও বোধহয় ঠিক এখানকার লোক নন।

—এখনো এখানকার লোক হতে পেরেছি কিনা জানি না। কিন্তু আট বছর আছি এখানে। মাসের হিসেব ধরলে আরো কিছু বেশী।

—কী করেন?

—চাষবাস। মডেল ফার্মিং।

মডেল ফার্মিং। ভদ্রলোকের মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। সব যেন রূপকথার মতো শোনাচ্ছে। এই নগণ্য ছোট গঞ্জটির আশপাশে মডেল ফার্মিং-এর মতো একটা ব্যাপার কিছু আছে এ কথা তো কেউ আমাকে বলেনি।

ভদ্রলোক বললেন, বিশ্বাস হচ্ছে না—না? একদিন নিয়ে যাব আপনাকে। আছেন তো এখন?

—আর দিনচারেক থাকব।

—আচ্ছা, দেখা হবে তা হলে। নমস্কার।

বলে ভদ্রলোক পাড়ি থেকে নদীর দিকে নেমে গেলেন। জুতো খুলে হাতে নিলেন, কাপড় তুললেন, হাঁটু পর্যন্ত, তারপর প্রায়-মজা নদীটার তিরতিরে জলটুকু ছপছপ করে পার হয়ে একটা বুনো জন্তুর মতো ওপারের বনতুলসী আর লেবুঘাসের বনের মধ্যে কোথায় যেন হারিয়ে গেলেন।

একটা অদ্ভুত অস্বস্তিতে আরো কিছুক্ষণ আমি দাঁড়িয়ে রইলুম সেখানে। যেন স্বপ্ন দেখলুম—যেন একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেল চোখের সামনে। এই নির্জন মাঠ, বাতাসে বেনাবনের শব্দ, লেবু-ঘাস আর বনতুলসীর গন্ধ আর কালো হয়ে আসা রোদের রঙ সমস্ত জিনিসটাকে অদ্ভুত প্রেত-প্রত্যয়ে পৌঁছে দিতে পারত, যদি না আমি দেখতুম তখনো নদীর জলটা অনেক-খানি ধরে ঘোলা হয়ে আছে, যদি না আমার চোখে পড়ত শিমুল গাছের তলায় একটা আধপোড়া বিড়ি থেকে সুতোর মতো ধোঁয়া উঠছে তখনো।

কাকা কনফার্মড ব্যাচেলার, একটি পোস্টাল পিয়নকে নিয়েই তাঁর সংসারযাত্রা। সে-ই রান্নাবান্না করে। রাত্রে খেতে বসে আমি নদীর ধারের সেই অদ্ভুত লোকটার কথা কাকাকে বললুম।

কাকা বললেন, বুঝেছি, পাগ্‌লা চৌধুরী।

—পাগ্‌লা চৌধুরী মানে? পাগল?

—না, পাগল বলে তো মনে হয় না। একটু অদ্ভুত ধরণের এই যা।

—অদ্ভুত কেন?

তা ছাড়া কী আর। লেখাপড়া জানে মনে হয়—ভদ্রলোক. অথচ কারুর সঙ্গে বিশেষ মেশে-টেশে না। যা কিছু খাতির গ্রামের চাষাভূষোর সঙ্গে। আমি তো এই দু-বছর আছি এখানে—হাটে কয়েকবার দেখা হয়েছে, আর সামান্যই আলাপ।

—নিজের সেই মডেল ফার্মিং নিয়েই থাকেন বুঝি?

—মডেল ফার্মিং!—কাকা ভ্রূকুটি করলেন : সে সব তো কিছু শুনিনি। সামান্য কিছু জমি-জমা আছে, চাষ-বাস করে, তা ছাড়া গ্রামের লোককে জরি-বুটি দেয়, টোট্‌কা চিকিৎসা করে—এই তো জানি।

—টোট্‌কা চিকিৎসা?

—হুঁ, এইসব করেই চালায়। এখানকার ভদ্রলোকদের সঙ্গে মেলামেশায় একেবারে অ্যানসোস্যাল। শুনেছি প্রথম যখন এদিকে এসেছিল, তখন পুলিশে সন্দেহ করেছিল অ্যাবস্‌কণ্ডার, কিছু খোঁজ-খবরও নিয়েছিল। শেষে দেখেছে ওই এক ধরণের খেয়াল-খ্যাপা লোক—ঘাঁটাঘাটি করে কোনো লাভ নেই।

—কোথায় থাকেন?

—গঞ্জের বাইরে, গাঁয়ের ভেতর। ঠিক কোথায় তা বলতে পারব না।

কৌতূহল মিটল আপাতত। পৃথিবীর অসংখ্য মানুষ নিজের খেয়াল-খুশিতে দিন কাটিয়ে চলে; আমার কাছে যা নিছক পাগলামো, আর একজন তার ভেতর নিজের মতো করে যুক্তির শৃংখলা খুঁজে পায়—অতএব ও নিয়ে মাথা ঘামানো সম্পূর্ণ নিরর্থক। কিন্তু তবুও রাতে অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমার ঘুম এল না। জানলার বাইরে দূরের একসার কালো গাছপালার ওপর তামাটে রঙের বিবর্ণ চাঁদটা ডুবে যাওয়া দেখতে দেখতে আর বাদুড়ের ডানার আওয়াজ শুনতে শুনতে দুটো জিনিস আমাকে বারবার পীড়ন করতে লাগল। সেই পড়ন্ত রোদের আলোয় আগুনের মতো জ্বলতে থাকা চশমার কাচ : 'আমার চিঠি কখনো আসবে না।' আর—আর সেই আসন্ন সন্ধ্যায় অমনভাবে নদীটা পার হয়ে বন-তুলসী আর লেবুঘাসের জঙ্গলে কোথায় মিলিয়ে গেল লোকটা?

পরের দিনটা নিজের এলোমেলো কাজ নিয়ে কাটল। সারা সকাল বসে বসে অনেক-গুলো চিঠি লিখলুম। কাকার ছোট রেডিওটা গোলমাল করছিল, সেটা খুলে ঘন্টা-দুই হাতুড়ে চিকিৎসা চালালুম, কাজ চালানোর মতো দাঁড়িয়ে গেল। দুপুরে বাঁধানো পুরোন মাসিক পত্রিকা জোগাড় করে একটা ধারাবাহিক নিটোল প্রেমের উপন্যাস পড়ে ফেললুম শেষ কিস্তিটা পর্যন্ত। বিকেলে চা খাওয়ার সময় মনে পড়ল মাইল পাঁচেক দূরে একটা চমৎকার পুরোনো মন্দির আছে, সেটা নাকি দেখবার মতো। চা শেষ করে কাকার সাইকেলটা নিয়ে সেই মন্দিরটার উদ্দেশেই বেরিয়ে পড়লুম।

কাকা বললেন, দেরী কোরিসনি, রাস্তাটা খারাপ।

—না, না, সন্ধ্যের মধ্যেই ফিরে আসব।

ঘড়িতে দেখলুম সাড়ে চারটে। যেতে আসতে মাইল দশেক রাস্তা—সাইকেলে কতক্ষণই বা লাগবে? মন্দিরের জন্যে আধঘন্টা সময় ধরে রাখা যেতে পারে। সাড়ে ছ'টার মধ্যেই ফিরে আসব। তা ছাড়া পৌনে সাতটা সাতটার আগে তো ভালো করে অন্ধকারই হয় না আজকাল। ভাবনার কিছুই ছিল না।

কাঁচা মাটির পথ, গোরুর গাড়ী চলে, তবু সাইকেলের পক্ষে এমন কিছু দুরূহ দুর্গম নয়। মাঠের ভেতর দিয়ে, আম-জাম বাবলা বনের পাশ কাটিয়ে, গোটা দুই গ্রাম ছাড়িয়ে আর খুব সম্ভব সেই নদীটারই একটা লোহার সাঁকো পার হয়ে যখন মন্দিরে পৌঁছুলুম তখন আকাশে কালকের মতোই রাঙা বিকেল। কিন্তু আজ আর আমার পাগ্‌লা চৌধুরীকে মনে পড়ল না। মন্দিরটাই আমাকে মুগ্ধ করল। লাল পোড়া ইটে বিষ্ণুপুরী ধরণে তৈরী—প্রত্যেকটি ইটে কারুকার্য; এখন ফাটল ধরেছে এখানে ওখানে, নবরত্ন চূড়ার কটাই ভেঙে পড়েছে তবু দীঘির উঁচু পাড়ির ওপর যেন রাজার মহিমায় দাঁড়িয়ে আছে এখনো। ভেতরে কালো কষ্টিপাথরে গড়া অষ্টভুজা কালীমূর্তি—তাঁর গায়ে বহুদিনের জমাট সিঁদুরের প্রলেপ, চাপধরা রক্তের মতো দেখাচ্ছে। মন্দিরের চাইতেও মূর্তিটা অনেক বেশি পুরোনো বলে মনে হল।

ঘাটের সিঁড়িগুলো ভেঙে ঘাসবনের মধ্যে লুকিয়েছে, দীঘিটা মজে এসেছে আধাআধি, শ্যাওলা-পানা-পদ্মপাতায় ঢাকা মেঘরঙ জলের ওপর পদ্মের কালো শুকনো ডাঁটা সারি সারি ফণাহীন কেউটের মতো দাঁড়িয়ে। মন্দিরের সামনে বসে দীঘির দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলুম আমি আর শুনতে পেলুম হাওয়ায় হাওয়ায় দীঘির চারধারে বেল, আমলকী, রুদ্রাক্ষ আর হরীতকীর বন থেকে যেন দমচাপা দীর্ঘশ্বাস উঠছে।

যখন খেয়াল হল, তখন ফিকে নীল রেশমী শাড়ীর মতো হালকা সন্ধ্যার গায়ে তারা জরী জ্বলেছে, জোনাকির বুটি ফুটছে বেল-আমলকী-রুদ্রাক্ষের ছায়ায়। অনেক দেরী হয়ে গেল যে! ব্যস্ত হয়ে আমি উঠে দাঁড়ালুম, সাইকেলটা নিয়ে নেমে এলুম উঁচু ডাঙাটা থেকে, তারপর বাড়ীর দিকে চলতে শুরু করে দিলুম।

আম-জাম-বাবলা গাছের ওপর দিয়ে তামাটে রঙের চাঁদটা আলো ছড়াচ্ছে—মেটে পথে চলেছি সাইকেল নিয়ে। কেন জানি না, ওই মন্দিরটাই আমার মনকে আচ্ছন্ন করে ছিল। চমক ভাঙল বিশ্রী একটা হোঁচট খেয়ে। কড়াং কট করে আওয়াজ কানে এল—অর্থাৎ চেন ছিঁড়ল সাইকেলের।

সামনে এখনো পাঁচ মাইল পথ। আর যেখানটায় চেন ছিঁড়ল সে জায়গাটাও

একটু বেয়াড়া। কতগুলো বড়ো বড়ো গাছ যেন সেখানে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে রাস্তার ওপর, চাঁদ দেখা যায় না—ছাড়া ছাড়া অন্ধকারের টুকরো থমথম করছে। সাইকেলের আলোটাকে শেষ সীমানা দিয়ে বাঘের বাচ্চার মতো বাদামী রঙের কী একটা দৌড়ে গেল, আতঙ্কের ধাক্কা লাগল একবার। পরক্ষণেই বুঝতে পারলুম ওটা একটা অতিকায় ভাম বেড়াল।

কয়েক মিনিট স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে সামলে নিচ্ছি, হঠাৎ কানে এল : কী হল সাইকেলের?

আরো একবার দারুণভাবে চমকালুম আমি। পথের ধারের অন্ধকার ছায়া ফুঁড়ে একটা কুঁজো মতন লোক এগিয়ে আসছে। লোকটার হাতে ছোট একটা টর্চের আলো ঝলকে না উঠলে আমি হয়তো চিৎকার করে উঠতুম।

আমার মুখে টর্চ ফেলে লোকটা বললে, আরে—আপনি যে!

তখন চিনতে পারলুম। সেই পাগলা চৌধুরী।

জিজ্ঞেস করলুম : আপনি এখানে?—বুকের ভেতরটা ঢিপঢিপ করছিল তখনো, গলার আওয়াজ যে আমার কেঁপে উঠল, নিজেই টের পেলুম সেটা।

—একটু কাজ ছিল। কিন্তু আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?

—কপালিনীর মন্দির দেখতে।

—সেটা বুঝেছি। নতুন লোক, তাই জানেন না—দিনের বেলা ছাড়া এ-সব দিকে না আসাই ভালো।

—চোর-ডাকাত? অপদেবতা!

—না মশাই, সে সব নয়। অন্য ব্যাপার। নিন—এগিয়ে চলুন এখন। সাইকেল তো দেখছি বেকার হয়ে গেছে, টানতে টানতেই যেতে হবে। চলুন।

ভদ্রলোক সঙ্গে থাকায় মনে ভরসা এসেছিল। চলতে চলতে জিজ্ঞেস করলুম, পথে কী আছে বলছিলেন?

—সাপ মশাই, সাপ। বিরাট বিরাট গোখ্রো। পাকা গমের মতো গায়ের রঙ, এদিকে বলে গোমা সাপ। কামড়ালে আর দেখতে হবে না। খুব পুরোনো আমলের জায়গা কিনা—নবাবী ইটের পাঁজা আর ভাঙা মন্দির-মসজিদের তো অভাব নেই আশপাশে। নিশ্চিন্তে বংশবৃদ্ধি করছে।—বলেই ভদ্রলোক আমার হাত ধরে টানলেন : একটু দাঁড়ান।

—কী হল?

—শুকনো পাতার খড়খড়ানি পাচ্ছেন না? ও'দেরই কেউ যাচ্ছেন একটু দূরে দিয়ে—সাপের চলা ছাড়া ও-রকম আওয়াজ হয় না। দাঁড়িয়ে যান—এগোতে দিন মহাপ্রভুকে। সাইজে বেশ বড়োই হবেন—নিদেনপক্ষে হাত পাঁচেক মনে হচ্ছে। আর বলবার দরকার ছিল না। এমনিতেই আমার রক্ত হিম হয়ে এসেছিল।

কতক্ষণ পরে সাপটা চলে গেল জানি না। ভদ্রলোক আমার হাতে আবার একটা চাপ দিতে সভয়ে নড়ে উঠলুম আমি।

—নিন, চলুন এবার। লাইন ক্লিয়ার।

চলতে লাগলুম, কিন্তু কী ভাবে সে কেবল আমিই জানি। অন্ধকার গুলোর ভূতুড়ে জগৎটা পেরিয়ে যখন তামাটে চাঁদের আলোয় আবার মেঠো পথে এসে পড়লুম, তখনো সমানে পা কাঁপছে। চৌধুরীর টর্চ মধ্যে মধ্যে জ্বলছে নিবছে, কিন্তু আমার ক্রমাগত মনে হচ্ছিল—যে-সব ছোট ছোট অন্ধকারের টুকরোগুলোতে টর্চের আলো পড়ছে না, সাক্ষাৎ মৃত্যু কুন্ডলী পাকিয়ে অপেক্ষা করছে তাদের ভেতর। আমি পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বিদ্যুতের মতো বিষাক্ত ফণা মাথা তুলবে তার।

আরো আধ মাইল পথ নিঃশব্দে কাটল। আমার গলা অদ্ভুতভাবে শুকিয়ে গিয়েছিল, আমি কথা কইতে পারছিলুম না। চৌধুরী কী ভাবছিলেন জানি না—তামাটে চাঁদের পিঙ্গল আলোয় তাঁর একটা লম্বা ছায়া পড়েছিল পথের ওপর; কেমন যেন মনে হচ্ছিল ও ছায়াটা চৌধুরী নয়—তাঁর আগে আগে একটা ছায়ামূর্তি তাঁকে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

হঠাৎ চৌধুরী বললেন, নিন—ওই আপনার পোস্টঅফিসের আলো দেখা যাচ্ছে, গঞ্জের কাছে এসে পড়েছি আমরা। নির্ভয়ে চলে যান এবার।

—আপনি?

—আমি বাঁ দিকে যাব। ওই যে ওখানটায় একটা মিটমিটে আলো দেখছেন, ওই আমার আস্তানা—একটু হেসে বললেন, মডেল ফার্ম। আসুন না বেড়াতে বেড়াতে কাল সকালের দিকে। চিনতে অসুবিধে হবে না, একটা ডোবা দেখতে পাবেন, তার ধারে তিনটে তাল গাছ। আসবেন কাল?

বললুম, আসব।

—তা হলে এই টর্চটা রাখুন সঙ্গে। কাল সকালেই সঙ্গে করে আনবেন।

বললুম, টর্চের দরকার নেই, এমনিই যেতে পারব এখন। আর তা ছাড়া আমার চাইতে বেশি পথ যেতে হবে আপনাকে, ওটা আপনারই দরকার।

—আমার না হলেও চলে। অভ্যেস হয়ে গেছে।

কেন জানি না, ফস করে জিজ্ঞেস করে বসলুম : একটা কথা বলব? রাগ করবেন না?

—রাগ করব কেন? বলুন।

—আপনি সব জেনেশুনেও এই সন্ধ্যেবেলা ওই সাপের জাঙালে গিয়ে ঢুকেছিলেন?

—দরকার মশাই, দরকার। পিয়োর অ্যান্ড্ সিম্পল্ নেসেসিটি।—চৌধুরী হাসলেন : কয়েকটা সাপের খোলস আনতে গিয়েছিলুম।

—সাপের খোলস।—পা থেকে মাথা পর্যন্ত আমার ঝাঁকুনি লাগল।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। আজ কী তিথি জানেন? জানেন না? যাই হোক, এই তিথিতে সাপের খোলস কুড়িয়ে আনতে পারলে তা দিয়ে বাতের একটা অব্যর্থ ওষুধ নাকি তৈরী করা যায়। সেইটে পরীক্ষা করব বলেই খোলস খুঁজতে গিয়েছিলুম। একেবারে হতাশ হতে হয় নি, দুটো পেয়েছি। দেখবেন?

এতক্ষণে আমার মনে পড়ল, কাকার কাছে শুনেছি যে চৌধুরী জড়ি-বুটির ব্যবসা করেন; আরো খেয়াল হল, চৌধুরীর বাঁ হাতে ছোট একটা চটের থলি আছে বটে।

চৌধুরী থলেতে হাত ঢোকাবার উপক্রম করতেই আমি প্রায় আর্তনাদ করে উঠলুম।

—না-না, সাপের খোলস আমি দেখতে চাই না।

হা-হা করে মাঠ কাঁপিয়ে হেসে উঠলেন ভদ্রলোক। বললেন, যতই বিষধর সাপ হোক মশাই, তার খোলসে বিষ থাকে না। আচ্ছা—চললুম এখন। কাল সকালে তা হলে আসছেন আমার ওখানে—নেমন্তন্ন রইল।

বলে আর দাঁড়ালেন না—বাঁ দিকের রাস্তা ধরে লম্বা লম্বা পায়ে এগিয়ে চললেন। আর আমার মনে হল, তাঁর পাশে পাশে যেটা চলেছে ওটা তাঁর ছায়া নয়—আর একটা ছায়া-মূর্তি সহযাত্রী বন্ধুর মতো তাঁর কাঁধে হাত দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

নদীর ধারের সেই অদ্ভুত বিকেল, সন্ধ্যার অন্ধকারে সাপের জাঙাল আর ঘুরে-ফিরে সেই একটা লোক! সব মিলে একটা রহস্যময় তীব্র আকর্ষণ অনুভব করতে লাগলুম। একজন বিদেশী মানুষ, যথেষ্ট শিক্ষিত বলে মনে হয়, আট বছর ধরে উত্তর বাংলার এই নগণ্য পাড়াগাঁয়ে একটা আশ্চর্য জীবন যাপন করছে। আরো বিচিত্র এই যে এখানকার কেউ আজ পর্যন্ত তাঁকে ভালো করে চেনে না। পলাতক আসামী নয়—তা হলে পুলিশের চোখ এড়াতে পারত না। পাগলা বলে একটা বদনাম আছে, কিন্তু যেখানে যেভাবেই দেখা হোক—লোকটিকে অন্তত পাগল বলে আমার মনে হয়নি।

রহস্যের আকর্ষণে পরদিন যখন চৌধুরীর মডেল ফার্মে গিয়ে পৌঁছুলুম, তখন বেলা গোটা আটেক হবে। চৌধুরী ডোবার ধারে সেই তিনটে তাল গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আমারই জন্যে অপেক্ষা করছিলেন মনে হল। বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে এলেন।

—আসুন—আসুন।

প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝতে পারলুম কাকার কথাই ঠিক। এ আর যাই হোক—মডেল ফার্মিংয়ের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। টিনের ছোট একটি বাড়ী—বিঘে কয়েক জমিতে সামান্য কিছু তরি-তরকারি চোখে পড়ল। গুটি ছয়েক হাঁস চরছিল ডোবায়—কয়েকটা মুরগীকেও এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতে দেখলুম।

যে ঘরটায় ঢুকলুম—সেইটেই বোধ হয় বসবার ঘর। একটা তক্তপোশের ওপর মলিন ছেঁড়া মাদুর। মেটে দেওয়ালের দুটো কুলুঙ্গিতে কতগুলো শিশি-বোতল-কৌটো, কিছু শেকড়-বাকড়। বুঝতে পারলুম, মডেল ফার্মিংয়ে চৌধুরীর অন্ন-সংস্থান হয় না—এইগুলোতেই তাঁর আসল জীবিকা।

—বসুন, চা বলে আসি।

বললুম, চা আমি খেয়ে এসেছি, ব্যস্ত হবেন না।

আহা, খেয়ে তো আসবেনই, সে কি আর আমি জানিনে? কিন্তু আমার ফার্মের টাটকা মুরগীর ডিমের ওমলেট আর নিজের গোরুর দুধের মালাই চা—তার স্বাদ একটু আলাদা মনে হবে আপনার। বসুন—বসুন—

ভেতরের দিকে চলে গেলেন চৌধুরী, আমি সেই তক্তপোশটায় বসে রইলুম। মেটে ঘরের সোঁদা গন্ধের সঙ্গে সেই ওষুধপত্রগুলোর আঘ্রাণ যেন একটু একটু করে কুয়াশার মতো

আমার মস্তিষ্কের ভেতরে ঘন হতে লাগল। বাইরে থেকে হাঁসের ডাক শুনতে পাচ্ছিলুম—খোলা দরজা দিয়ে প্রকাণ্ড একটা নীল ভ্রমর এসে ঘরের ভেতরে একবার ঘুরপাক খেয়ে গেল।

চৌধুরী ফিরে এলেন—বসলেন তক্তপোশের আর এক কোনায়। বললেন, আমার মডেল ফার্ম দেখে খুব নিরাশ হয়েছেন, না?

কী জবাব দেব বুঝতে পারলুম না। একে আদৌ ফার্ম বলে কিনা আমার জানা নেই, আর এইটেই মডেল হিসেবে মেনে নেওয়া উচিত কিনা তা-ও আমার মনে সংশয় তুলল।

চৌধুরী হাসলেন: ইচ্ছে একটা সত্যিই ছিল সুকুমারবাবু। কিন্তু এই আট বছরে—

বাধা দিয়ে আশ্চর্য হয়ে বললুম, আমার নাম আপনি জানেন?

—কলকাতার একজন প্রফেসার এসেছেন আমাদের পাড়াগাঁয়ে—নাম কে না জানে বলুন। আমার নামও নিশ্চয় শুনেছেন আপনি—

হাসিটা আবার ফুটে উঠল ভদ্রলোকের মুখে: পাগলা চৌধুরী, তাই না?

কুণ্ঠিত হয়ে জবাব দিলুম: তাই শুনেছি।

—কিন্তু পাগলা আমার নাম নয়, ডাকনামও নয়। এখানকার লোকেই ওটা দিয়েছে আমাকে। আপনি নিশ্চয় চক্ষুলজ্জার খাতিরে আমাকে পাগলাবাবু বলে ডাকতে পারবেন না—আর বার বার চৌধুরীমশাই বলতেও বেয়াড়া লাগবে। আমার একটা জবরদস্ত পোশাকী নাম আছে—তুহিনাংশু দত্তচৌধুরী। সংক্ষেপে তুহিন বলতে পারেন।

তুহিনাংশু দত্ত চৌধুরী! এই মুহূর্তে ঘরের মেটে দেওয়াল আর ওষুধপত্রের গন্ধে কুয়াশা জমে ওঠা আমার মস্তিষ্কের ভেতরে বিদ্যুৎ বয়ে গেল। এই নাম একটু অসাধারণ—এ নাম একবার কানে এলে সহজে ভোলা যায় না। তৎক্ষণাৎ আমার মনে পড়ল।

সেই কবিতার বইটি। সবসুদ্ধ পঞ্চাশ পৃষ্ঠার বেশি নয়। গাঢ় হলুদ রঙের মলাটে লাল টকটকে অক্ষরে লেখা: 'খাঁচায় সকাল'। কতগুলি তীক্ষ্ণধার আধুনিক কবিতা। বিখ্যাত সমালোচকের লেখা উচ্ছ্বসিত মুখবন্ধ।

পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলুম। আর শুধু বইটিই নয়। কিছু কিছু সাময়িক পত্রিকায় এই উজ্জ্বল প্রতিভা আবির্ভাব জানিয়েছিল সেদিন। ভিড়ের মাঝখানে মিশে যায়নি—নিজের পরিচয়েই মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। তারপর হঠাৎ কবে হারিয়ে গেলেন তুহিনাংশু দত্তচৌধুরী। তাঁর আরো কিছু অনুরাগী পাঠকের সঙ্গে আমিও তাঁর কবিতার খোঁজ করেছিলুম দু-এক বছর পর—তারপরে যেমন হয়, 'খাঁচায় সকাল'-এর কবিকে আমি ভুলে গিয়েছিলুম।

কিন্তু মনে পড়ল। প্রায় দশ বছরের ওপার থেকে মনে পড়ল আবার। সেই গাঢ় হলদে মলাটের ওপর টকটকে লাল অক্ষরগুলো স্পষ্ট জ্বলে উঠল চোখের সামনে।

রুদ্ধ স্বরে বললুম, কবি তুহিনাংশু দত্তচৌধুরী?

ঠিক বুঝলুম কিনা জানি না, পাগলা চৌধুরীর মুখ শাদা হয়ে গেল একবারের জন্যে। তারপরেই হেসে উঠলেন।

—কী আশ্চর্য, সে-সব ছেলেমানুষির কথা এখনো কারো মনে আছে নাকি? আমি তো কবে ভুলে গেছি।

—ভুলে গেছেন? অথচ এত ভালো কবিতা লিখতেন আপনি?

ভালো কবিতা নয় মশাই, হাত থাকলেই বাঙালি ছেলে কবিতা লেখে, আমিও লিখতুম। তখন সবে কলেজ থেকে বেরিয়েছি, একটা ভদ্ররকমের চাকরিও জুটিয়েছিলুম—একজনের পাল্লায় পড়ে একটা কবিতার বইও ছেপে ফেলা গেল। তারপরেই দেখলুম এ-সব প্রলাপ বকবার কোনো মানেই হয় না। ভাবলুম—একটা বড়ো কাজ কিছু করা যাক—সাম্‌থিং কন্‌স্ট্রাক্‌টিভ। একটা মডেল ফার্ম করলে কেমন হয়? ছুটিতে দার্জিলিং চলেছি—এই রেলস্টেশনটায় এসে যেন ট্রেন থেমে গেল—লাইনে গোলমাল হয়েছে কোথাও। কী মনে হল—নেমে পড়লুম এখানে। চলে গেলুম গাঁয়ের ভেতরে। সেইদিনই কয়েক বিঘে জমি বায়না করে ফেললুম অসম্ভব সস্তায়। সেই থেকে আছি এখানে—কবিতা লেখার চাইতে অনেক বড়ো কাজের খোঁজ পেয়েছি। এদিকের লোকে টোট্‌কায় বিশ্বাস করে, আমি কিছু আলোচনা করেছি ও নিয়ে, নেহাৎ ফেলনা জিনিস নয় মশাই। মডেল ফার্মিংয়ে তেমন জুৎ করতে পারিনি, তবুও সব মিলিয়ে বেশ আছি। কী হবে মশাই বানানো কবিতা দিয়ে—কী মানে হয় তার?

এক নিঃশ্বাসে বলে গেলেন তুহিনাংশু। কিন্তু সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারলুম না আমি, কেমন মনে হল অনেক কথার ভিড়ে কয়েকটা ছোট ছোট কথা লুকিয়ে রইল; এমন অনেকগুলো প্রশ্ন রইল—যার জবাব তুহিনাংশু কোনোদিন দেবেন না।

আমার স্মৃতির মধ্যে কয়েকটা কবিতার লাইন জ্বলে উঠল হঠাৎ। আশ্চর্য ভালো লেগেছিল সেদিন। অন্যমনস্কের মতো আমি আবৃত্তি করলুম:

মণিকা, তোমার বাঘিনী প্রেমের
আদিম অন্ধ রাতে
নোনা সাগরের ক্ষুব্ধ নিশানে
দোলে সুন্দরবন
আমি ছুটে চলি হিংস্র কিরাত
খর-বল্লম হাতে
সাপের মণিতে বিষাক্ত-নীল
আলোর সঞ্চরণ—

—থামুন!

না, চিৎকার করলেন না তুহিনাংশু, প্রায় নিঃশব্দেই উচ্চারণ করলেন। কিন্তু তাঁর চোখে, তাঁর ঠোঁটে, তাঁর সমস্ত শরীরে যেন আর্তনাদ ফুটে উঠল একটা—যেন ঘর ফাটিয়ে একটা নীরব হাহাকার জেগে উঠল তাঁর। আতঙ্কে থেমে গেলুম আমি।

তুহিনাংশু আরো কিছু হয়তো বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু একটি মেয়ে এসে ঘরে ঢুকল। কালো, কদাকার, গায়ে ময়লা একটা শাড়ী জড়ানো—একটি সেমিজ-ব্লাউজ পর্যন্ত নেই। কপাল পর্যন্ত ঘোমটা টানা—হাতে ওমলেট আর জুলের গ্লাস।

তুহিনাংশু বললেন, আমার স্ত্রী।

আমি বললুম, নমস্কার।

ভদ্রমহিলা ফিরেও তাকালেন না আমার দিকে। তক্তপোশের ওপর আমার পাশেই প্লেট আর গ্লাসটা নামিয়ে রাখলেন, এক হাতে মাথার ঘোমটা আরো খানিকটা টেনে দিলেন, তারপর আবার যে পথে এসেছিলেন সেইদিকেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

তুহিনাংশু বললেন, কিছু মনে করবেন না মশাই। আমার স্ত্রী বোবা আর কালা—কানে শুনতে পায় না। চোখেও যে খুব ভালো দেখে তা নয়।

চকিত হয়ে বললুম, তাই নাকি?

সেই কালো ফ্রেমের চশমার ভেতর দিয়ে তুহিনাংশুর চোখ দুটো অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণতায় জ্বলতে লাগল: এই তো ভালো মশাই—যাকে বলে আদর্শ স্ত্রী। লেখাপড়া জানে না—গরিবের মেয়ে, কানে শোনে না, কথা বলতে পারে না। আমি বিয়ে করেছি বলে চির-কৃতার্থ হয়ে আছে—কী করি না করি কোনোদিন তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে না। এর চাইতে সুখ কিছু আছে বলতে পারেন আপনি? যাক গে—ওটা খেয়ে ফেলুন আগে—ঠাণ্ডা হলে আর ভালো লাগবে না।

কথা খুঁজে না পেয়ে আমি ওমলেটটাতেই মন দিলুম। স্বাদ পাচ্ছি না—একটা অজানা অস্বস্তি মনটাকে যেন চেপে ধরেছে এসে। মেটে দেওয়াল আর ওষুধ-বিষুধের সেই গন্ধের কুয়াশা আবার যেন ঘন হয়ে আসছে আমার মস্তিষ্কের ভেতরে। আমি এক হারিয়ে-যাওয়া কবি আর এই পাগলা চৌধুরীর মধ্যে একটা যোগসূত্র খুঁজে ফিরছি কোথাও—খুঁজছি সেই নির্জন বিকেলের আলোয় বনতুলসী আর লেবুঘাসের গন্ধভরা নদীর ধারে—খুঁজছি কপালিনীর মন্দির থেকে আসবার সময় সেই থমথমে অন্ধকারভরা সাপের জঙ্গলের মাঝখানে।

সেই মহিলা দুটো ময়লা পেয়ালায় করে প্রায় শাদা রঙের চা নিয়ে এলেন। তাঁকে সম্ভাষণ করবার পণ্ডশ্রম আমি আর করলুম না। শুধু দুখানি কালো কালো শীর্ণ হাতের ওপর আমার চোখ পড়ল—যেখানে চারগাছা নীল কাচের চুড়ি ছাড়া আর কোনো আভরণই নেই।

—যাই বলুন মশাই, আমি সুখী।—তুহিনাংশু যেন স্বগতোক্তি করতে লাগলেন: কবিতা—কলকাতা! কোনো মানে হয় না মশাই। তার চাইতে এই ভালো—অনেক ভালো। ভাবতে পারেন আট বছরের মধ্যে আমার নামে কোনো চিঠি আসেনি, আমি খবরের কাগজ দেখিনি—'টোট্‌কা দর্পণ' আর 'ভেষজ-রহস্য' ছাড়া কোনো বই পড়িনি? সুখ! সুখের অর্থ যে কী, কেউ বলতে পারে! বেশ আছি আমি—কারো কাছে এতটুকু নালিশ নেই আমার।

কোনো নালিশ নেই? 'খাঁচায় সকাল' কবিতার আরো কয়েকটা পংক্তি আমার মনে এল:

এক মুঠো আগুন দাও তোমার হৃদয় থেকে
হে লোহিতাক্ষ—হে জবাকুসুমসংকাশ
হে হিরণ্যপাণি!

খাঁচার এই লোহার শলাকাগুলো পুড়ে যাক
গলে যাক—চিরতরে হোক নিশ্চিহ্ন—

—চা ঠান্ডা হয়ে গেল যে মশাই!

—হ্যাঁ, খাচ্ছি।

মালাই চা-ই বটে। চায়ের স্বাদ-গন্ধ পর্যন্ত কিছুই পাওয়া গেল না তাতে। সন্দেহ নেই, তুহিনাংশু দত্তচৌধুরী সত্যি-কারের সুখের সন্ধান পেয়েছেন এখানে—জীবন থেকে শহরকে চিরদিনের মতোই মুছে দিয়েছেন। নইলে এ চা বরদাস্ত করা অসম্ভব হত।

পকেট থেকে বিড়ি বের করে তুহিনাংশু জিজ্ঞেস করলেন: চলে?

—না, মাপ করবেন।

—ওঃ, আপনার বুঝি সিগারেট? আমাদের পাড়াগাঁ মশাই, বিড়ি নইলে ঠিক জুৎ হয় না। আচ্ছা, চলুন এবার—আমার খামার একটু দেখিয়ে আনি আপনাকে। অবশ্য দেখবার মতো কিছুই নেই, সামান্য কিছু তরী-তরকারি কেবল আছে। বরং শীতকালে এলে—

বলতে বলতে আমরা বেরিয়ে এলুম ঘর

কী হবে মশাই বানানো কবিতা দিয়ে—কী মানে হয় তার?

থেকে। মাথার ওপর নীল উজ্জ্বল আকাশ, দিগন্তে পাহাড়ের রেখা। শস্যহীন মাঠ পড়ে আছে—যতদূর চোখ যায়। সেই নদীটার একফালি জল দেখতে পেলুম, এখান থেকেও সেই শিমুল গাছটা দেখা গেল যেখানে আমি মাছ ধরতে গিয়েছিলুম, আর যেখানে প্রথম হঠাৎ যেন বিকেলের আলোর ভেতর থেকে ফুটে উঠেছিলেন চৌধুরী।

আমি ওঁর মুখের দিকে চাইলুম। রগের কাছে দু-তিনটে চুল চকচক করছে রোদে, চোখের কোলে কালির রেখা, আজ দিনের বেলায়—এই রোদের ভেতরে আমার মনে হল, বয়েসের তুলনায় ভদ্রলোক যেন অনেক বেশি বুড়িয়ে গেছেন।

সামনে একটা প্রকাণ্ড গ্র্যানাইট পাথরের চাঙাড় পড়ে ছিল। হঠাৎ সেই দিকে এগিয়ে গেলেন তুহিনাংশু।

—এই পাথরটা দেখছেন?

—দেখছি।

—কী মনে হয় আপনার?

—কী আবার মনে হবে?

—খুব একটা বিসদৃশ ব্যাপার বলে বোধ হয় না? কোথাও কিছু নেই—শুধু যেন রাস্তা জুড়ে একটা অর্থহীন বাধা।—বলতে বলতে একটা উগ্র বন্য আলো তাঁর দু-চোখে ঝলকে উঠল: জানেন—এই আট বছর ধরে এটাকে রোজ আমি ঠেলে সরাতে চেষ্টা করি, অথচ একটুও নড়ে না।

আমি বললুম, কী আশ্চর্য, খামোকা ওটাকে সরাবার জন্যে কেন পণ্ডশ্রম করবেন? আর অতবড়ো একটা পাথরকে মাটি থেকে নড়ানো কি কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব?

—কী সম্ভব তা হলে বলতে পারেন?—চৌধুরীর স্বরে হঠাৎ যেন একরাশ আগুন ঝরে পড়ল: চিরকাল কি এমনি করে একটা পাথরের তলায় সব চাপা পড়ে থাকবে? কবিতা হারিয়ে যাবে—মণিকা হারিয়ে যাবে—যেখানেই যাব, এই পাথরের হাত থেকে আমি মুক্তি পাব না? আপনি বিশ্বাস করুন—এইবারে এটা সরবেই, তার সময় এসেছে।

বলতে বলতেই চৌধুরী পাথরটার দিকে এগিয়ে গেলেন। প্রাণপণে ঠেলতে লাগলেন সেটাকে। লোকটা সত্যিই পাগল কিনা বুঝতে চেষ্টা করছি, তৎক্ষণাৎ একটা তীব্র চিৎকার আমার কানে এল।

অমন জান্তব, অমন বুকফাটা চীৎকার জীবনে আমি কখনো শুনিনি। বিদ্যুৎবেগে ফিরে তাকালুম। বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে তুহিনাংশুর সেই কালো-কুৎসিত বোবা-কালা স্ত্রী। মাথার ঘোমটা খসে পড়েছে, চোখের তারাদুটো বিস্ফারিত, একরাশ রুক্ষ চুল উড়ছে ডাকিনীর মতো। তার মুখের চেহারা কল্পনা করা যায় না—যেন মৃত্যু-বিভীষিকা দেখতে পাচ্ছে সামনে।

—আঁ-গাঁ-গাঁ-গাঁ—আবার একটা জৈব আর্তনাদ বেরুল তার গলা দিয়ে।

তখন তুহিনাংশু সোজা হয়ে আমার দিকে মুখ ফেরালেন। পাথর ঠেলবার পরিশ্রমে বুকটা তখনো যেন ঢেউয়ের মতো ওঠা-পড়া করছে ভদ্রলোকের। ঝড়ের মতো নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে হেসে বললেন, ভয় পায় মশাই—পাথরটা ঠেলতে গেলেই ভয় পায়। কিন্তু এটা বুঝতে পারে না যে ওটা না সরিয়ে দেওয়া পর্যন্ত আমি মুক্তি পাব না।

চৌধুরীর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার পা-দুটো মাটির মধ্যে গেঁথে গেল।

অনেকগুলো কথার উত্তর একসঙ্গে স্পষ্ট হয়ে গেছে তখন। আত্মহত্যা করব না—এই প্রতিজ্ঞা করে তিলে তিলে আত্মহত্যার সাধনা কি এমনিভাবেই করতে হয়? এই বোবা-কালা কুরূপা স্ত্রী, এই জীবন, অকারণে বিকেলের নদী পার হয়ে সন্ধ্যার বনতুলসী আর লেবুঘাসের জঙ্গলে হারিয়ে যাওয়ার চেষ্টা, তার অন্ধকারের ভেতরে সাপের খোলস খোঁজার কী অর্থ থাকতে পারে আর? খাঁচার শলা তো নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি—তীরের ফলা হয়ে পাখির বুকে বিঁধেছে।

আমি তুহিনাংশু দত্তচৌধুরীর আত্মহত্যা দেখতে পাচ্ছি। পাথর ঠেলার পরিশ্রমে তখনো ঝড়ের মতো শ্বাস পড়ছে তার, আর—আর ঠোঁটের দু-পাশ দিয়ে দুটো সরু রক্তের ধারা রোদের আলোয় জ্বলে উঠেছে।

চৌধুরীর স্ত্রী ছুটে এল তার দিকে। কিন্তু আমি দেখলুম তার পাশে সেই ছায়াটা স্থির দাঁড়িয়ে আছে—সেই প্রেতলোকের সহচর, যে শেষ মুহূর্তের আগে তার সঙ্গ ছাড়বে না।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত —॥

এই মাত্র ফিরেছি।

সকালে উঠেই জীপ নিয়ে দৌড়তে হয়েছিল বারুইপুরে। সেখানে রাজ্যপাল কৃষি প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করলেন। বক্তৃতা দিলেন আমাদের সহযোগী সম্পাদক।

আমাকে যেতে হয়েছিল প্রদর্শনীর খবর আর ছবি সংগ্রহ করতে।

বুঝতেই পারলেন বোধ হয় যে আমি সংবাদপত্রের রিপোর্টার। অর্থাৎ সেই হতভাগ্য জীব, যার পায়ের সংখ্যা মাত্র দুখানা না হওয়াই উচিত ছিল।

যাই হক মাথায় এক থাবলা তেল ঘসে আর ঘটি দুই জল ঢেলে সবে ভাতের থালাটা সামনে টেনে নিয়েছি, আর পিঠের কাছে ক্রিং ক্রিং করে টেলিফোন বেজে উঠল।

মুখে বিরক্তিসূচক আওয়াজ করে গৃহিণী বললেন, কে আবার?

ভয়ে ভয়ে বললাম, আর কে? নিউজ এডিটর। তাঁর হুকুম বিকালে পাঁচটায় মধ্যমগ্রাম যেতে হবে মিটিং কভার করতে। দেশনায়ক গণেশ আঢ্যির সভাপতিত্বে সেখানে শহীদবাগের ভিত্তিস্থাপন হবে।

—শহীদবাগ আবার কি?

—বুঝলে না? দেশের জন্যে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদের নামে একটা বাগান বসানো হবে, সেখানে একটা স্মরণ স্তম্ভ স্থাপন হবে আর কি!

ব্যাজার গলায় গিন্নী বললেন, এই ছাইয়ের চাকরি ছেড়ে আবার প্রফেসারীতে ফিরে চলো ত। দিন নেই, রাত্রি নেই, খালি দৌড় আর দৌড়। •একটা সিনেমা দেখা নেই, একটা নেমন্তন্নে যাওয়া নেই.....এ কি ভদ্দরলোকের চাকরি?

আমতা আমতা করে বললাম, বিরক্ত হলে কি চলে? আমাদের কাজ ত চাকরি নয়, এ যে দেশ-সেবা।

—পোড়া কপাল সেবার, মুখ বিকৃত করে বললেন গিন্নী তারপর একটা ঢোক গিলে বললেন, তোমাদের ওপরওলারা নাকি্যে করে দেশ-সেবা করছেন, তোমরা তার কাহিনী কেত্তন করে, আর লম্বা লম্বা ছবি ছেপে দেশ-সেবা করছ। এত সেবায় দেশ টিঁকলে হয়!

দেখলাম কথা বাঁকা দিকে মোড় ফিরছে। আর ঝঞ্ঝাট বাড়ানো সুবুদ্ধি নয় বুঝে বললাম, তা অবশ্য ঠিক।

তারপর স্রোতটা অন্যদিকে ফেরানোর জন্যে বললাম, তা তুমিও থালাটা নিয়ে বসে যাও না। এদিকে বেলা ত প্রায় একটা বাজে।

—থাক, আর দরদ দেখাতে হবে না, বলেই একটু অর্থপূর্ণ হাসি হেসে গিন্নী রান্নাঘরে ঢুকলেন মাছ-তরকারি আনতে।

খাওয়া সেরে শরীরটা ইজি-চেয়ারে এলিয়ে দিলাম। অল্প একটু গা গড়িয়ে নিয়েই আবার ত বেরতে হবে।

কদিন হল একটা গোয়েন্দা নভেল ধরেছি, শেষই করতে পারছি না। গল্পটা এমন এক জট-পাকানো রহস্যের মধ্যে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে, যাতে হেস্তনেস্তয় না পৌঁছানো পর্যন্ত স্বস্তি নেই। কিন্তু পড়ব কখন?

ঠিক করলাম এই ফাঁকে পাতাগুলো ধাঁ-ধাঁ করে উল্টে যাই। তাতে বিশ্রামও হবে, ঘুমটাকেও এড়ানো সহজ হবে।

সামনের মোড়ায় পা দুটো তুলে দিয়ে বইখানা খুললাম।

পেশাদার বদমায়েস পিয়েত্রো কিভাবে এক সুন্দরী কিশোরীকে টোপ হিসাবে এগিয়ে দিয়ে একের পর এক যুবককে তার আপেল বাগানে ভুলিয়ে আনে, তারপর তাদের অচেতন করে গা থেকে সমস্ত রক্ত চুঁইয়ে নেয় এবং তাদের মৃতদেহগুলি আপেল গাছের আশেপাশে পুঁতে ফেলে, তার রোমাঞ্চকর কাহিনী।

এই খুনী পিয়েত্রোকে আর তার বাহন তরুণী তেরেসাকে চতুর গোয়েন্দা ফ্লেচার শেষ পর্যন্ত ধরলেন ল্যাভেন্ডারের গন্ধ অনুসরণ করে।

জমাটে গল্পের অতলে তলিয়ে গেলাম অল্পক্ষণের মধ্যেই।

কোথায় মধ্যমগ্রাম, কোথায় শহীদবাগ, কোথায় বা গণেশ আড্ডির বক্তৃতা......সব তাল-গোল পাকিয়ে ছোট্ট একটা বুদ্বুদের

"এত সেবায় দেশ টিকলে হয়!"

মতো চোখের সামনে দিয়ে দুলতে দুলতে শূন্যে মিলিয়ে গেল!

আমি যখন হাজির হলাম, সভা তখন অনেকটা এগিয়ে গেছে।

আহ্বায়ক শশবিন্দু হাজরা তখন মূল প্রস্তাবের বয়ানটা পড়া শেষ করে, প্রস্তাবিত স্তম্ভের ফলকে যে-যে শহীদের নাম খোদিত হবে, সেই তালিকা পড়ার অনুমতি চাইছেন।

প্রস্তাবটা এই রকম: জননী জন্মভূমির বন্ধন মুক্তির সংগ্রামে যে সমস্ত বীর সন্তান অকাতরে প্রাণ দিয়েছেন, জাতিধর্ম নির্বিশেষে তাঁহাদের সকলের উদ্দেশে এই সভা শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছে। তাঁহাদের নামে উৎসর্গিত এই উদ্যানের মধ্যস্থানে যে স্তম্ভ স্থাপিত হইবে, তাহাতে স্বাধীন ভারতের নর-নারী আমরা আমাদের কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য রূপে তাঁহাদের নাম উৎকীর্ণ করিতেছি।

চতুর্দিক থেকে তুমুল করতালি প্রস্তাবকে সম্বর্ধিত করল।

উৎসাহিত হয়ে হাজরা মশায় নামের তালিকা পড়া সুরু করলেন: নিত্যানন্দ হোড়, হরিহর তলাপাত্র, করালীকান্ত কর্মকার, বিপিনবিহারী সাঁপুই, সোনামুখ দেবনাথ......

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন এক ক্ষীণকায় ভদ্রলোক। গোটা চেহারাটা তাঁর তীক্ষ্ণ একটা জিজ্ঞাসার চিহ্নের মতো।

তিনি বললেন, এ-সব নাম চলবে না। এঁদের কেউ চেনেন না। এঁরা কারা? কি করেছেন এঁরা? এঁদের নাম ঘটা করে ফলকে তোলার মানেটা কি?

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন আর এক ভদ্রলোক। সপ্তমে গলা চড়িয়ে তিনি বললেন, আপনি যাঁদের নাম শোনেন নি, তাঁরা দুনিয়ায় ছিলেন না, এ কেমনধারা যুক্তি। আপনি কুরোপাটকিনের নাম শোনেন নি বলে তিনি কোন দিন ছিলেন না......এই মেনে নিতে হবে নাকি আমাদের?

তাঁর কথার লেজুড় ধরে বললেন হাজরা মশায়, এঁরা সবাই তারকেশ্বর ডাকাতিতে পুলিসের গুলীতে প্রাণ হারান। হাওড়া হুগলী চব্বিশ পরগণার বীর সন্তান এঁরা।

আর কোথায় যাবে? বিকট চীৎকার করে ডায়াসের ওপর লাফিয়ে পড়লেন এক স্থূলোদর প্রৌঢ়। গালের এক পাশে তাঁর এক ট্যাবলা পান। হাতে একটা রেশনের থলি।

তিনি বললেন, হাওড়া হুগলী চব্বিশ পরগণা......এই গুলিন তোমাগো বিপ্লবের আকড়া হইছে, চোট্টোগ্রাম, ঢাহা, বরিশাল, এগোর নাম শুনছো কখনো? বিপ্লবী দ্যাখছো কখনো? ঘটীগো স্বভাবের এই হইল মস্ত দোষ!

তাঁর হাতে একটা হেঁচকা টান দিয়ে ছোকরা গোছের এক ভদ্রলোক বললেন, এ কি বলতিছ চাঁদ? মেদিনীপুরের কাছে লাগবেক কোন শালা? ডজনে ডজনে বিপ্লবী......

—কিরে হালা, তুই আমাগো হালা কইস?

—আলবৎ বলবেক, বলবেক নি কেনে?

—শুধু চট্টগ্রাম, বরিশাল, আর মেদিনীপুর! আর কোথাও বিপ্লবী হয় নি, না? কত গণ্ডা সোনার চাঁদ ছেলে যে ফাঁসিতে জান দিল বর্ধমান, বীরভূম, আর মুর্শিদাবাদে, তার হিসাবটা কে করবে? বাঙালের দোষই ঐ, সব তাতে নিজের কোলে ঝোল টানে।

—বাঙ্গাল কইলে মারিয়া চারখানা দাঁত খুলিয়া নিমু।

বাজখাঁই গলায় এক তরুণ বলে উঠলেন, থামো না বাওয়া। অত গণ্ডগোলে কাজ কি? পুলিশের হাতে মরা নিয়ে কথা, যে মরেছে সেই শহীদ। আমার পিসতুতো দাদা চোরাই মদের বিজনেস করতে গিয়ে গুলী খেয়ে প্রাণ হারাল, সেই বা কম কি? আর একজন বললেন, আমার কাকা পুলিসের গাড়ীতে চাপা পড়ে প্রাণ হারাল, সেই বা তাহলে কম শহীদটা কি?

ওদিকে তখন মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম, বরিশাল ও হাওড়া-হুগলীর দলের মধ্যে ঠেলা-ঠেলি, গুঁতোগুঁতি শুরু হয়ে গেছে।

সভাপতি আড্ডি মশায় গলায় গাঁদা ফুলের মোটা একটি মালা নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

মাইকে মুখ রেখে তিনি কি যেন বলতে গেলেন। কিন্তু হট্টগোলের আতিশয্যে তা কারো কানে পৌঁছাল না।

হঠাৎ দেখলাম দমাদম ইট পড়া শুরু হল।

বাগানের রেলিং একটার পর একটা উপড়ে নিয়ে যে যাকে পেল, তাকে বেপরোয়া ঠেঙাতে লাগল। কিল-চড় ও চীৎকারে চতুর্দিক ধরল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের চেহারা।

পৈত্রিক প্রাণ নিয়ে নিঃশব্দে সরে এলাম, নিরাপদ দূরত্ব থেকে দু-একখানা ছবি নোট বলে।

ঘণ্টাখানেক পরে ঘটনাস্থলে ফিরে এসে দেখি, ডায়েসে তখনও গাঁদা ফুলের মালা গলায় আড্ডি মশায় বসে আছেন। আর তাঁর সামনে সমগ্র সভামণ্ডপে ছড়ানো রয়েছে ইট-পাটকেল, বোতল-ভাংগা, চেয়ার-টেবিলের ভগ্নাবশেষ এবং তারি মধ্যে ইতস্তত রক্তাক্ত মৃতদেহ গোটা কয়েক।

হতভম্ভ গ্রামবাসী, দরিদ্র রেফুজী এবং চলতি পথের সাধারণ মানুষ চারদিকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছেন অনেক। উদ্যোক্তাদের কেউ নেই।

সহসা যেন মূর্ছা ভঙ্গে জেগে উঠলেন আড্ডি মশায়। দাঁড়িয়ে মাইকে মুখ দিয়ে জলদ গম্ভীর স্বরে বললেন, বন্ধুগণ, শহীদ তালিকা প্রস্তুত নিয়ে যা হয়ে গেল, তারপর

"এরা কারা?"

আর পুরোনো শহীদদের উল্লেখে দরকার নেই। ঘটনা আমাদের এখানেই এক ডজন নূতন শহীদ তৈরি করে দিয়েছে। আসুন, এঁদের নামই আমরা ফলকে উৎকীর্ণ করে জাতীয় কর্তব্য করি।

সমবেত কণ্ঠে আওয়াজ উঠল জ-য়-হি-ন্দ!

চমকে উঠে দেখি ইজি-চেয়ারেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হাতে রয়েছে সেই গোয়েন্দা ঝেচারের কাহিনীটা!

ঘটনাটা বড় বড় সব কাগজেই বের হয়েছিল। এ নিয়ে 'দেশসেবক' আড়াই কলম এক সম্পাদকীয়ও লিখেছিল। অবশ্য আলোচনা হবার মতনই ব্যাপার।

দেশ স্বাধীন হয়েছে এ বিষয়ে মতদ্বৈধ নেই, কিন্তু স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দায়িত্বজ্ঞান কি বেড়েছে? শ্রমের মর্যাদা, কর্তব্যনিষ্ঠা এসব সম্বন্ধে আমরা কি পূর্ণমাত্রায় অবহিত? সমাজের সর্বস্তরে কি কর্তব্যপরায়ণতা সঞ্চারিত?

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

সেদিন সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এইসব প্রশ্ন ছিল। ঘটনাটা সত্যিই লজ্জাকর। যে কোন স্বাধীন দেশের পক্ষে খুবই অপমানজনক।

গোলকগঞ্জের পোস্টম্যান একটি জরুরী টেলিগ্রাম বিলি না করে সেটি মাঠের মাঝখানে ফেলে চলে এসেছে। পোস্টমাস্টারের প্রশ্নের ঠিকমত উত্তর দিতে না পারায় সন্দেহ হয়। তারপর একটু তদন্ত করতেই ব্যাপারটা বেরিয়ে পড়ে।

কিছুদিন আগে ঠিক এই ধরণের আর একটা সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। এক পোস্টম্যান বুঝি তার চিঠিসুদ্ধ ব্যাগ গঙ্গায় বিসর্জন দিয়েছে। অবশ্য চিঠির এর চেয়ে সদ্গতি আর কল্পনা করা যায় না, তবু পত্রপ্রেরকরা এবং যাঁদের পত্র পাবার কথা, তাঁরা ক্ষেপে উঠেছিলেন।

পোস্টম্যানটি নতুন, অল্পবয়সী। চাকরিতে তখনও কাঁচা গুটি। তার চাকরি গিয়েছিল। জেল হয়েছিল কিনা ঠিক স্মরণ হচ্ছে না।

কিন্তু টেলিগ্রামের ব্যাপারে জড়িত পোস্টম্যানটির বয়স প্রায় তিপ্পান্ন। অর্থাৎ আর বছর দুয়েকের মধ্যে তার অবসরগ্রহণ করার কথা। লোকটার সারা জীবনের চাকরির রেকর্ড নাকি ভাল। কি একটা সং কাজের জন্য সরকার থেকে একবার পুরস্কারও পেয়েছিল।

আশ্চর্য কান্ড, প্রবীণ বয়সে একি মতিচ্ছন্নতা।

কিছুদিন হাটে, মাঠে, ঘাটে অর্থাৎ অফিসে, ময়দানে, বাড়ীর রোয়াকে এই আলোচনা চলল। চায়ের কাপ সামনে রেখে তর্কের ঝড়। দু এক জায়গা থেকে হাতাহাতির খবরও এল।

একদল বলল, সরকার কর্তব্যনিষ্ঠা চান, কর্মপটুতা চান, অথচ সেই অনুপাতে বেতন দিতে রাজী নন। ঠিকভাবে উদরপূর্তি না হলেই, কাজে গাফিলতি আসে। কর্তব্যবুদ্ধি তলিয়ে যায়।

আর একদল ক্ষেপে উঠল।

ইংরেজ আমলে এদের মাইনে ঢের কম ছিল, অথচ এ ধরণের অভিযোগ কখনও শোনা যায়নি। তার মানে, ওপর থেকে নীচে পর্যন্ত একটা শৈথিল্য এসেছে। চালক যদি অপটু হয়, গাড়ী খানায় পড়বেই। গাড়ীর আর দোষ কি।

উত্তেজনা প্রায় মাস তিনেক ধরে চলল। তারপর অন্য সব উত্তেজনার মতন একসময়ে স্তিমিত হয়ে গেল। অবশ্য দ্রুত স্তিমিত হবার একটু কারণও ছিল। শহরে ইংলণ্ডেশ্বরী আসছেন। চারদিকে সাজ সাজ রব। তাঁর আসার সড়কের দু পাশে মুখপোড়া বাড়ীগুলোর চুনকাম হল। পাঁজরপ্রকট অট্টালিকার সংস্কার। স্থানে স্থানে বিজয় তোরণ। বাড়ীর ঝি বৌ খুঁজে খুঁজে বিয়ের বেনারসী বের করে রাখল।

এই আনন্দের প্লাবনে কর্তব্যবিমুখ পোস্টম্যানের কথা সবাই বিস্মৃত হ'ল। আমিও।

হয়তো আর কোনদিনই এ প্রসঙ্গ মনে আসত না, যদি না ভাইঝির জন্য এক সম্বন্ধ দেখতে পরাণপুরে আসতে হত।

বেশীক্ষণ ধরে আর পাত্রকে দেখতে হ'ল না। দেখবার প্রয়োজনও ছিল না।

শুনেছিলাম পাত্রের কথায় বড় বড় লোক ওঠবোস করে। কথাটা নেহাৎ মিথ্যা নয়। পাত্রের দর্জির দোকান। মাঝারি সাইজের। ফিতে হাতে পাত্র নিজেই মাঝে মাঝে দাঁড়ান। খদ্দেরকে তাঁর হুকুম তামিল করতে হয় বৈকি। প্রয়োজনে হাত তুলতে হয়, ঘাড় বেঁকাতে হয়, পাও দোমড়াতে হয়।

তাছাড়া পাত্রের ওজন সাড়ে তিন মণের কম নয়। একটা সাইকেল-রিক্সায় উঠতে পারে না। একটায় চড়ে, একটায় পা রাখে।

নমস্কার করে উঠে আসছিলাম, কিন্তু পাত্রের বাবা বাদ সাধলেন। সেকি হয়, একটু মিষ্টিমুখ করে যেতে হবে বৈকি। ভয় নেই, দোকানের কিছু নয়, সব বাড়ীর তৈরী।

প্রায় আধ ঘন্টা পর দুটো রেকাবিতে বাড়ীর তৈরি জিনিসের নমুনা এসে হাজির। একটায় স্তূপীকৃত তালের বড়া। আর একটায় অনেকগুলো গোকুল পিঠে।

হাতজোড় করলাম, কিন্তু নিস্তার নেই। এবার পাত্র নিজে রুখে দাঁড়ালেন, ফেলবেন না স্যার, অনেক কষ্টের জিনিস।

বহু কষ্টে প্রায় অর্ধেক শেষ করলাম, কিন্তু শরীরের অবস্থা কাহিল। হাঁটা সম্ভব নয়, সাইকেল-রিক্সার শরণ নিলাম। স্টেশনে এসে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই আটটা বারোর গাড়ী সদর্পে বেরিয়ে গেল। অনুসন্ধানে জানলাম, এর পরের গাড়ী, এবং শেষ গাড়ী দশটা বাইশ।

প্রমোদ ভ্রমণ ফটো : হিরণ্ময় রায়চৌধুরী

পাত্রের বাপান্ত করতে করতে প্ল্যাটফর্মের ওপর বসলাম। বারদুয়েক চোঁয়া ঢেঁকুর উঠে অবস্থা আরও সঙ্গীন করে তুলল।

কোথাও জনমানব নেই। টিকেটঘর বন্ধ। স্টেশনমাস্টারও বোধহয় অফিসঘরে তালা দিয়ে কোয়ার্টারে ফিরে গেছেন। ট্রেন আসার সময় হ'লে আসবেন। বাতির বাহার আলোর ছলনা মাত্র। অন্ধকারই কেবল বাড়ছে।

হঠাৎ মনে হ'ল পাশে কে একজন বসল। আধো অন্ধকারে ঠাওর করে দেখলাম এক-হাতে ছাতা, অন্য হাতে একটা পোঁটলা।

নমস্কার বাবু। অন্ধকার থেকেই কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

প্রতিনমস্কার করলাম।

কতদূর যাবেন বাবু?

ক'লকাতা। আপনি?

লোকটি বিব্রত হ'ল। আমাকে আপনি আজ্ঞে বলছেন কেন, আমি চাষাভুষো লোক।

কথাবার্তা কিন্তু ঠিক চাষাভুষো লোকের মতন মনে হল না। খুব মার্জিত হয়তো নয়, কিন্তু কথার ধরণ, উচ্চারণের ভঙ্গী বেশ ভদ্র।

তুমি কতদূর যাবে?

আজ্ঞে প্রসাদপুর।

নিতান্ত কথার পিঠে কথা বলার ভঙ্গীতে বললাম, সেখানেই থাক বুঝি।

আজ্ঞে হ্যাঁ, সেখানেই থাকি। এখানে মেয়েকে দেখতে এসেছিলাম।

এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি, আকাশে কালো মেঘের স্তবক জমছিল, আচমকা একেবারে মুষলধারায় নামল।

পাশের লোকটি ছাতা খুলতে খুলতেই বেশ ভিজে গেলাম।

চলুন বাবু, ওইদিকে একটা ভাঙা কামরা আছে, সেখানে গিয়ে দাঁড়াই। ছাতায় এ বৃষ্টি আটকাবে না।

ছাতির তলায় মাথা রেখে লোকটির পাশে পাশে চললাম।

আধভাঙা কামরা। সম্ভবত বিশ্রামাগার তৈরি হচ্ছিল, তারপর রেল-কর্তৃপক্ষের খেয়ালে আর সম্পূর্ণ হয়নি। টালির ছাদ, তবে অনেকগুলো টালিই নিশ্চিহ্ন। চার-দিকের দেয়াল খাড়া আছে। উন্মুক্ত জায়গার চেয়ে অনেকটা ভাল। জায়গা বুঝে দাঁড়াতে পারলে মাথা আর শরীর দুই বাঁচে।

আকাশের দিকে চেয়ে সনিশ্বাসে বললাম, আচ্ছা বিপদে ফেললে তো।

লোকটি অভয় দিল, অসময়ের বৃষ্টি বেশীক্ষণ থাকবে না বাবু। ট্রেন আসবার আগেই থেমে যাবে। কটা বাজে দেখুন তো।

রেডিয়ম ঘড়ি, কাজেই অন্ধকারেও দেখার কোন অসুবিধা হ'ল না। বললাম, পোনে নটা।

এখনও অনেক দেরী, নিন, বসুন বাবু।

দুটো খালি পেট্রলের টিন কোণ থেকে টেনে এনে লোকটি পেতে দিল। বোঝা গেল, এ স্টেশনের নাড়িনক্ষত্র তার নখদর্পণে।

ওরই মধ্যে একটু আরাম করে বসে একটা সিগারেট ধরালাম। প্যাকেট থেকে আর একটা বের করে এগিয়ে দিলাম লোকটার দিকে, নাও, ধরাও।

লোকটি হাতজোড় করল, আমার ওসব আসে না বাবু। রাতে খাওয়ার পর এক ছিলিম তামাক টানি। ব্যস, নেশা বলতে ওইটুকু।

অফুরন্ত অবসর। অজানা পরিবেশ। আকাশের অনিশ্চিত অবস্থা। এ সময়টা গল্প-গুজবে কাটানো ছাড়া আর করবার কিছু নেই। অন্তত ট্রেন না আসা পর্যন্ত।

এতক্ষণ ধরে মনের মধ্যে যে সন্দেহটা ধোঁয়ার রূপ নিচ্ছিল, সেটাই প্রকাশ করে ফেললাম, তোমার কথাবার্তা শুনে তো ঠিক চাষী শ্রেণীর বলে মনে হচ্ছে না তোমাকে।

লোকটি হাসল, জাত চাষী নই আজ্ঞে। অবস্থার বিপাকে প'ড়ে এই বয়সে লাঙল ধরতে হয়েছে।

চাষবাস আরম্ভ করেছ ক বছর?

এই বছর তিন চার হবে।

অন্ধকারের মধ্যে চোখ কুঁচকে দেখার চেষ্টা করলাম। সম্বল আকাশের বিদ্যুৎ আর মুখের সিগারেটের আগুনের স্ফুলিঙ্গ। সেই স্বল্প আলোতেই কপালের বলিরেখা, গালে, চোখের কোণে সময়ের হিজিবিজি আঁচড় চোখে পড়ল।

মাত্র তিন-চার বছর যদি মাঠে নেমে থাকে তো বেশ বৃদ্ধ বয়সেই চাষের কাজ শুরু করেছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, এর আগে কি করতে? চাষবাস আরম্ভ করার আগে?

লোকটি একটু ইতস্তত করল। ঢোক গিলল দু-একবার, তারপর কুণ্ঠা জড়ানো গলায় বলল, আগে পোস্টম্যানের কাজ করতাম।

পোস্টম্যান? বুঝতে পারলাম সেইজন্যই কথাবার্তার মধ্যে মার্জিত ভাবের রেশ রয়েছে। কিছু পরিমাণ ভদ্রলোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়। সামান্য লেখাপড়াও জানা দরকার।

হাসতে হাসতে বললাম, তাহলে, চাষ-বাস তোমার নিছক শখ বল। পেন্সন পাচ্ছ, শুধু বাড়তি রোজগারের আশায় এ বয়সে লাঙল ধরেছ। পরিবারে লোকসংখ্যা খুব বেশী বুঝি।

লোকটি আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল, না, বাবু বেশী আর কি। একটি মেয়ে ছিল তার বিয়ে দিয়ে দিয়েছি। এখন আমরা বুড়ো-বুড়ি আর বছর বারোর একটি ছেলে।

বিস্মিত হলাম।

তাহলে এ বয়সে এত খাটবার দরকার কি?

দরকার আছে বাবু, খুবই দরকার আছে। একটা অন্যায় করেছিলাম, তাই সরকার চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দিয়েছে। পেন্সনও বাতিল করে দিয়েছে। আমি না খাটলে সবাই উপোস করে মরবে।

বৃষ্টি একটু কম। কিন্তু মেঘগর্জনের বিরাম নেই। আকাশের পিঠে বিদ্যুতের অন্তহীন কশাঘাত।

মন একটু একটু করে পিছু হটে আর এক ঘটনায় ফিরে গেল। সংবাদপত্রে পড়া

আর এক পোস্টম্যানের কর্তব্যচ্যুতির কাহিনী। সম্ভবত এই ধরণেরই কি একটা সাজা হয়েছিল। বয়স বেশী হওয়ার জন্য জেলে যাওয়াটা মকুব হয়েছিল। অবশ্য ঠিক মনে পড়ছে না।

সিগারেটে কয়েকটা টান দিয়ে টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। প্রশ্নটা করা সমীচীন হবে কিনা এ নিয়ে একটু ভাবলাম। তারপর কৌতূহলই জয়ী হল। বলেই ফেললাম,

আচ্ছা, এক পোস্টম্যানের ব্যাপার খবরের কাগজে বের হয়েছিল কয়েক বছর আগে। একটা টেলিগ্রাম না কি ডেলিভারী না করার দরুণ সাজা হয়েছিল।

লোকটি একবার আমার দিকে চেয়েই চোখ নামাল, খুব মৃদু কণ্ঠে বলল, হাঁ, ওটা আমারই ব্যাপার। একটা টেলিগ্রাম ঠিক জায়গায় না দিয়ে মাঠের মধ্যে ফেলে দিয়েছিলাম, তাই শাস্তি হয়েছিল বাবু। বলতে গেলে গুরু পাপে লঘু দণ্ডই হয়েছিল। যে অন্যায় আমি করেছিলাম, সাজা আমার আরও কঠিন হওয়াই উচিত ছিল।

সমস্ত ব্যাপারটা কেমন গোলমেলে ঠেকল। দণ্ড লঘু হয়েছে এমন অভিযোগ দণ্ডিতের কাছে অপ্রত্যাশিত।

তোমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

কটা বেজেছে দেখুন তো বাবু।

ঘাড় হেঁট করে ঘড়ি দেখলাম। নটা পনেরো। আশ্চর্য, মনের গতির মতন সময়ের গতিও মন্থর। প্রহরের পর প্রহর খঞ্জপায়ে মহাকালের তোরণ পার হবার চেষ্টা করছে। কিংবা মনে হচ্ছে, এমন একটা জায়গায় এসেছি, যেখানে সময়ও বুঝি আমাদের নাগাল পায় না।

এখনও ট্রেন আসতে অনেক দেরী বাবু। শুনবেন আমার কাহিনী। যখন যে জানতে চেয়েছে, তাকেই বলেছি। এতে যদি একটু পাপ খণ্ডন হয় বাবু। মানুষের দেওয়া সাজার পালা তো শেষ হয়ে গেছে, ভগবানের শাস্তির অংশ যদি একটু কমে।

কোন উত্তর দিলাম না। বুঝতে পারলাম সত্যি মিথ্যা মেশানো একটা কাহিনীর এখনই আমদানী হবে। নিজের দোষ স্খালনের চেষ্টা।

পকেট থেকে আর একটা সিগারেট বের করে গোটা তিনেক কাঠি খরচ করে ধরালাম। টানের পর টান দিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলীর সৃষ্টি করলাম। ততক্ষণে কাহিনী শুরু হয়ে গেছে।

গাঁয়ের নাম গোলোকগঞ্জ। ঠিক গাঁও বলা যায় না বাবু, আধাশহর। রেললাইনের এপারে বিজলী বাতি আছে, পাকা শড়ক আছে, হরদম মালবোঝাই লরী চলছে। সেদিকটায় পোস্টঅফিস। আবার লাইনের ওপারে মজা ডোবা, তাল নারকেলের বন, খোড়ো চালের ঘর। দু-একটা বনেদী পাকা বাড়ীও আছে, তবে তার দৈন্যদশা প্রকট। বর্তমান মালিকদের সংস্কার করার মুরোদ নেই।

গোলোকগঞ্জে আমি ছিলাম টানা পাঁচ বছর। কাজ করতাম শহরের দিকে, কিন্তু থাকতাম লাইনের ওপারে। মাটির দেয়াল আর খড়ের চাল। আমি একলা নয়। পোস্টঅফিসের ছোকরা কেরানীবাবু আর আমি। রান্নাবান্না আমিই করে দিতাম। অল্প মাইনেয় এদিকটায় সুবিধা। সপ্তাহে তিন দিন হাট। তাজা তরিতরকারি পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে এ বাড়ী ও বাড়ী থেকে শাকপাতাটাও জোটে। শ্যামল গাছপালার মতন এপারের লোকেদের মনগুলোও সবুজ। দয়া, মায়া, মমতায় ভরাট।

সিগারেট হাতেই ধরা আছে। টানবার কথা আর মনে নেই। যে ভাবে লোকটি গৌরচন্দ্রিকা শুরু করেছে, তাতে সারাটা রাতই হয়তো কেটে যাবে।

আমাদের বাড়ীর সামনে এক চিলতে জমি ছিল বাবু, অবসর সময়ে নিজের হাতে কুপিয়ে সেখানে তরকারির গাছ লাগিয়েছিলাম। কয়েকটা ফুলের গাছও ছিল। একেবারে বেড়ার ধার ঘেঁসে কয়েকটা শিউলি গাছ। সার সার বেলফুলের চারা। ফুলের সময় পাতা দেখা যেত না। ফুলে গাছ ভেঙে পড়ত।

মেয়েটি রোজ সকালে সাজি হাতে এসে দাঁড়াত।

একটু বোধ হয় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলাম, মেয়েটি? কে মেয়েটি?

ওই ভুবনবাবুর মেয়ে। ভুবন বাড়ুজ্জে। এক সময়ে দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিল। জমিদারের নায়েব, কিন্তু জমিদারের চেয়েও প্রতাপশালী। তবে কোনদিন অন্যায় করেন নি। গরীবের মা-বাপ। দুঃখীর জন্য শুধু চোখের জলই ফেলেন নি, তাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন। এ রকম দেবতার মত মানুষ শেষদিকে পক্ষাঘাতে বিছানা নিলেন। জমিজমা যা ছিল, সবই প্রায় চিকিৎসাতেই গেল। ইদানীং যে কাছে যেত, তাকে কেবল মেয়ের কথা বলতেন।

আমার ওই মনোর জন্যই যত চিন্তা। ওর একটা ব্যবস্থা না হলে আমি মরেও শান্তি পাব না।

মনো মানে মনোরমা। অপরূপ লাবণ্যময়ী। যেমন রঙ, তেমনই গড়ন। আর স্বভাব যেন মাটির মতন। কোনদিন উঁচু গলায় কথা শুনি নি।

তার বিয়ের অবশ্য খুবই চেষ্টা হচ্ছিল। কলকাতায় এক মামা ছিলেন। তিনি বুঝি বড় বড় কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। দেখাশোনাও চলছিল। কিন্তু ঠিক যেমনটি এঁরা খুঁজছিলেন, তেমনটি পাওয়া যাচ্ছিল না।

কাছেপিঠে কোথায় বাজ পড়ল। চমকে উঠতেই হাত থেকে সিগারেটটা অন্ধকারে জ্বলন্ত অর্ধবৃত্ত এঁকে মাটিতে গিয়ে পড়ল।

লোকটি আস্তে আস্তে বলল, দুর্গা, দুর্গা। আকাশের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে আবার বলল, বড় দুর্যোগ বাবু।

খেই ধরিয়ে দিলাম, তারপর?

তারপর, লোকটি একটু বুঝি চিন্তা করল, সেই মেয়েটি, অর্থাৎ ভুবনবাবুর মেয়ে মনোরমা রোজ সকালে আমাদের বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ায়। পুজোর ফুল তুলতে। একেবারে বাড়ীর সংলগ্ন মন্দির। ভৈরবেশ্বরের বিগ্রহ। মনোরমা স্নান সেরে ফুল তুলে পুজোয় বসত।

অনেক দিন গাডালের শিউলি ফুলের নাগাল পেত না। আমাকে ডাকত। আমি এসে ডাল নীচু করে ধরতাম। কিংবা নাড়া দিতাম সজোরে, আর ঝরঝর করে ফুলের রাশ তার আঁচলে ঝরে পড়ত।

মাঝে মাঝে বলতাম, আমি ছুঁলে যে তোমার পুজোর ফুল অপবিত্র হয়ে যাবে মনোদিদিমণি, নয়তো ভোরে উঠে আমি তোমার জন্য সব ফুল পেড়ে রাখতাম, একটি মাটিতে পড়তে দিতাম না।

টানা দুটি ভ্রূ বিস্ময়ে, কৌতুহলে মনোরমা বঙ্কিম করে তুলত। বলত, কেন, তুমি ছুঁলে অপবিত্র হবে কেন? আমার ভৈরবেশ্বর তোমাদের জাত-বিচারের অনেক ওপরে। দিনরাত তো ভূতপ্রেতের সঙ্গে ফেরেন। অত বামুন কায়েত বোঝেন না। যে, ভক্তিভরে পুজো করবে, তার পুজোই তিনি নেবেন। কাল থেকে তুমি ফুল তুলে রেখ, আমি নিয়ে যাব।

বলেছিলাম বটে, কিন্তু এমন একটা কাজ করতে কখনও সাহস হয় নি। ভৈরবেশ্বর নাকি জাগ্রত দেবতা। আমি যেমন ফুল কুড়োয় নি, মনোদিদিমণিও তেমনি আর জোরও দেয় নি। নিজেই কুড়িয়ে নিয়ে গেছে ফুলের স্তূপ।

প্রত্যেকবার বিজয়ার দিন ভুবনবাবুর কাছে গিয়ে দাঁড়াতাম প্রণাম করতে।

ইদানীং আর কোন কথা বলতেন না। প্রণামের উত্তরে মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করতে করতে বলতেন, দয়াল, মনোর জন্য একটা ভাল পাত্র দেখে দিতে পার। তুমি তো নানা জায়গায় ঘোর।

শুনুন কথা বাবু। আমি গোলকগঞ্জের পোস্টম্যান। লোকের দরজায় দরজায় চিঠি বিলি করে বেড়াই। আমার চেনার পরিধি আর কতটুকু। আর বিয়ের পাত্র ঠিক করবার মতন এলেমই বা কোথায় আমার। কিন্তু তবু ভুবনবাবুর মনে দুঃখ দিতে চাই নি। ঘাড় নেড়ে বলেছি, দেখব আজ্ঞে, নিশ্চয় দেখব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

আমরা সবাই ভেবেছিলাম ভুবনবাবু বুঝি আর মেয়ের বিয়ে দিয়ে যেতে পারলেন না। খুব বাড়াবাড়ি হল অসুখ। শহর থেকে বড় ডাক্তার এল। কাজ শেষ করে মাঝে মাঝে খবর নেবার জন্য গিয়ে দাঁড়াতাম।

ঠিক এমনি সময় এক সম্বন্ধ জুটে গেল।

শহর থেকে মামাই নিয়ে এলেন। ছেলে নাকি একেবারে রাজপুত্র। যেমন রূপ, তেমনি গুণ। কোন বেসরকারী অফিসের প্রায় কর্ণধার। বছর চারেকের ওপর বিলেতে ছিল।

ভুবনবাবুর পক্ষে শহরে গিয়ে পাত্র দেখে আসা সম্ভব নয়, পাত্রের ফটো নিয়ে এলেন মনোরমার মামা। এক কথায় সবাই পছন্দ করে ফেললেন। দেনা-পাওনা নিয়ে কথা-বার্তা চলতে লাগল। ইতিমধ্যে পাত্রের বাপ আর কাকা এসে মেয়ে দেখে গেলেন। দুজনেই একবাক্যে স্বীকার করলেন, এমন মেয়ে লাখে একটা মেলে না।

আশ্চর্য কান্ড। ডাক্তারের ওষুধে বিষুধে যা হয় নি, মনোরমার বিয়ে স্থির হ'তে তাই হ'ল।

একটু একটু করে ভুবনবাবু সেরে উঠতে লাগলেন। একেবারে ওঠানামা করতে পারতেন না, কিন্তু আজকাল লাঠি ধরে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতেন। চাকরের কাঁধে ভর দিয়ে এঘর থেকে ওঘর। এদিক থেকে ওদিক।

ভুবনবাবুই মেয়েকে সম্প্রদান করলেন। সকলেই ভেবেছিলেন, উনি একটানা অতক্ষণ এক জায়গায় বসে থাকতে পারবেন না। কিন্তু ঠিক পারলেন। কষ্ট হ'লেও মুখ দেখে কিছু বোঝা গেল না। কিন্তু বললেনও না মুখ ফুটে।

মনোরমার মামা নিজে এলেন নিমন্ত্রণ করতে।

আমি তো অবাক। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গেলাম, এ কি কান্ড, আপনি নিজে কেন এলেন এত কষ্ট করে। একবার খবর পাঠালেই আমি চলে যেতাম।

মামা হাসলেন, তা কি হয়। সামাজিক ব্যাপার। কন্যাদায়। আমাদের নিজেদের স্বারস্থ হ'তে হয়। তাছাড়া, মনো বার বার বলে দিয়েছে, দেখ মামা, দয়ালদাকে বলতে যেন ভুল না হয়। আর কারো ওপর ভার দিও না। তুমি নিজে বলে এস।

দুটো চোখ জলে ভরে এল। নিজের মেয়েটার কথা মনে পড়ল। ঠিক মনোর বয়সীই হবে। তবে খুব ছোটবেলায় বিয়ে দিয়ে দিয়েছি।

বিয়ের কথাবার্তা শুরু হতেই মনো বাইরে বেরোনো বন্ধ করে দিয়েছে। আমার এখানে ফুল তুলতে আর আসে না। ভোরে একবার ভৈরবেশ্বরের মন্দিরে যায়। তাও সঙ্গে ঝি থাকে।

সমস্ত গোলোকগঞ্জের নিমন্ত্রণ। ভুবন-বাবুর বাড়ী আলো দিয়ে সাজানো হয়েছে। স্টেশন থেকে বাড়ী পর্যন্ত মাঝে মাঝে নারকেল-পাতা দিয়ে গেট। ফটকে শানাই।

বিয়ে গোধূলি লগ্নে। তাই বর যখন এল, আমি চিঠি বিলি করছি। পথের ওপরই দাঁড়িয়ে পড়লাম। মেয়ের বাড়ী থেকে পাল্কি গিয়েছিল, কিন্তু বর পাল্কিতে ওঠে নি। পায়ে হেঁটেই চলে এসেছিল।

দয়াল একটু থামল। দম নিল। চোখ কুঁচকে বর্ষণক্লান্ত আকাশের দিকে একবার দেখল।

ভাবলাম, এ একেবারে ধান ভানতে শিবের গীত শুরু হয়েছে। নিজের কর্তব্যচ্যুতির কথা বলতে গিয়ে সাড়ম্বরে এক বিয়ের বর্ণনা শুরু করেছে। হাতে কোন কাজ নেই, ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া। কর্মহীন অবকাশে এ ধরণের কাহিনী শুনতে মন্দ লাগছে না। বাধা দিতে মন চাইল না। বলুক দয়াল, কি বলতে চায়।

পথের মাঝখানেই দাঁড়িয়ে পড়লাম। অঙ্গে সরকারী খাকি পোশাক। কাঁধে ব্যাগ। হাতে চিঠির গোছা।

বর হাঁটছে বলে, বরযাত্রীদেরও হাঁটতে হ'চ্ছে। কেবল পিছনে বরের বাবা আর পুরোহিত আসছেন পাল্কিতে। সামনে বাজনদার, পিছনে গ্যাসের বাতি। তখনও আকাশ থেকে রোদ সম্পূর্ণ মুছে যায় নি। তাল-নারকেলের আগায় চিক্‌চিক্ করছে স্বর্ণচিহ্ন।

চোখের পলক পড়ল না। পুরুষমানুষ যে এত সুন্দর হয় ধারণাই ছিল না বাবু। নাক মুখ চোখ যেন তুলি দিয়ে আঁকা। কাঁচা হলুদ বর্ণ। এক মাথা কুঞ্চিত চুলের রাশ। দীর্ঘ একহারা চেহারা। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, কান্তিমান।

মনোদিদির ঠিক উপযুক্ত। একেবারে সোনায় সোহাগা।

চিঠি বিলি শেষ করে, অফিসে মনি-অর্ডারের হিসাব বুঝিয়ে যখন ছুটি পেলাম, তখন রাত হয়েছে।

ঢালা বারান্দায় খাওয়া-দাওয়ার বন্দো-বস্ত। এক কোণে চেয়ারের ওপর ভুবনবাবু বসে। সব কিছু তদারক করছেন।

আমি যেতেই ঠিক টের পেলেন। বললেন, দয়াল, এত দেরী যে?

বললাম, কাজ শেষ করে আসতে রাত হয়ে গেল।

তারপর অনেকবার দেখা হ'য়েছে মনো-দিদির সঙ্গে। বরের সঙ্গে গরুর গাড়ীতে শ্বশুরবাড়ীতে যাচ্ছেন কিংবা ফিরছেন বাপের বাড়ী।

মাস খানেকের মধ্যেই প্রথম খাম হাতে এল। ওপরে মুক্তোর অক্ষরে লেখা। শ্রীমতী মনোরমা দেবী। তলায় ভুবনবাবুর নাম। তার তলায় লেখা গোলোকগঞ্জ।

খামটা হাতে করে দেখলাম বেশ ভারী। আর একটু হ'লেই বাড়তি মাশুল লেগে যেত।

খামটা অন্য চিঠির থেকে একটু আলাদা করে রাখলাম। ব্যাগের মধ্যে নয়, আমার খাকি কোটের ভিতরের পকেটে।

ভুবনবাবুর বাড়ীর কাছাকাছি গিয়ে দেখি একেবারে সদর দরজার কাছে মনোরমা। সিঁথের লাল টকটকে সিঁদুর। হাতে শাঁখা। একেবারে নতুন রূপে, নতুন মানুষ।

আমি যেতেই মনোরমা ফটক পার হয়ে প্রায় রাস্তার ওপর এসে দাঁড়াল, দয়ালদা, আমার কোন চিঠি আছে?

হাসি সামলে গম্ভীর গলায় বললাম, তোমার চিঠি? কই না তো? তোমার চিঠি আবার কোথা থেকে আসবে?

মুহূর্তে শ্রাবণের মেঘ এসে মনোরমার মুখ ঢেকে দিল। হাসি মিলিয়ে গেল। ছলছলিয়ে এল দুটি চোখ। আস্তে আস্তে পিছিয়ে ফটকের ওধারে চলে গেল। মাথা নীচু করে খুব অস্ফুট গলায় বলল, আশ্চর্য, আজ মঙ্গলবার, আজই আসবার কথা।

ততক্ষণে কোটের পকেট থেকে আমি চিঠিটা বের করে ফেলেছি। চেঁচিয়ে বললাম, দেখো তো মনোদিদিমণি এই চিঠিটা কিনা?

মনোরমা ঘুরে দাঁড়াল। ছুটে এল আমার কাছে। প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে হাত থেকে চিঠিটা ছিনিয়ে নিল।

নিরীহ কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম, কার চিঠি গো দিদিমণি?

সিঁথের সিঁদুর মনোরমার দুটো গালে নামল। আমার দিকে চোখ তুলে একবার চেয়েই দৃষ্টি নামিয়ে বলল, ওই আমাদের কলকাতার গোমস্তার।

সেই থেকে আমিও মজা পেয়ে গেলাম। যতবার চিঠি এল, চিঠি মনোরমার হাতে তুলে দিতে দিতে বললাম, তোমার কলকাতার গোমস্তার চিঠি দিদিমণি। অনেক জমি-জমা, বিষয়-সম্পত্তির কথা নিশ্চয়, চিঠিটা যা ভারী।

মনোরমা একটা আঙুল নিজের ঠোঁটে রেখে ভ্রূ কুঁচকেছে, আঃ, একটু আস্তে দয়ালদা, বাবা ওপরের বারান্দায় বসে রয়েছেন।

মুখ তুলে দেখতাম, ভুবনবাবু সত্যিই বারান্দার কোণে চেয়ার পেতে বসে রয়েছেন। হাতে একটা বই। আমাদের কথাবার্তার শব্দ কানে গেছে এমন মনে হ'ল না।

চিঠির সংখ্যা বাড়ল। প্রথম প্রথম সপ্তাহে একটা, তারপর একদিন অন্তর। মাঝে মাঝে এ তরফের চিঠিও আমাকেই ফেলতে হ'ত। সে চিঠিও ওজনে নিন্দার নয়।

তারপর একদিন সেই সর্বনেশে খবর এল। সেই মারাত্মক টেলিগ্রাম।

কোন টেলিগ্রামে কি থাকে আগে থাকতেই আমরা তার খবর পেয়ে যাই। কোন

টেলিগ্রাম বিলি করে সেলাম ঠুকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় বকশিশের জন্য আর কোন টেলিগ্রাম দিয়ে রসিদ নিয়ে কান্না গোল ওঠবার আগেই পালিয়ে যেতে হয় সেখান থেকে তা আমাদের জানা। টেলিগ্রামবাবুর কাছ থেকেই খবর পেয়ে যাই।

এবারেও পেয়ে গেলাম।

অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারলাম না। দুটো পা-ই ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। ইচ্ছা হ'ল খাকি পোশাকটা জমা

শরীরটা বড় খারাপ লাগছে বড়বাবু। আজকের দিনটা যদি ছুটি দিতেন।

পোস্টমাস্টারবাবু নতুন। মাস তিনেক হ'ল এখানে বদলী হয়েছেন। খুব কড়া লোক। দয়া-মায়ার ধার ধারেন না। কাজ ছাড়া আর কিছু বোঝেন না। বুঝতে চান না।

গোঁফজোড়া ফুলিয়ে বললেন, তাহলে তোমার কোটটা খুলে রেখে যাও দয়াল,

প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে হাত থেকে চিঠিটা ছিনিয়ে নিল।

দিয়ে ছুটে কোথাও পালিয়ে যাই। যে দিকে দু-চোখ যায়।

কিন্তু কোন উপায় নেই। ও বীটের পোস্টম্যান আমি। এ বার্তা আমাকেই বহন করে নিয়ে যেতে হবে।

তাও একবার শেষ চেষ্টা করলাম।

পোস্টমাস্টারবাবুর কাছে হাতজোড় করে দাঁড়ালাম।

গায়ে দিয়ে আমি বেরোই চিঠি আর টেলিগ্রাম বিলি করতে।

এর ওপর আর কথা চলে না। চিঠি আর টেলিগ্রাম নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

টেলিগ্রাম প্রথম বিলি করার কথা, কিন্তু আমি ঘুরে ঘুরে চিঠি বিলি করলাম। ভুবনবাবুর বাড়ীর কাছাকাছি যখন গিয়ে পৌঁছলাম, তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল।

শরীরটা এবার যেন সত্যিই খারাপ হ'ল। কপালের দু পাশে অসহ্য যন্ত্রণা। বুকের মাঝখানটাও টনটন করে উঠছে। চোখ বন্ধ করলেই চোখের সামনে ভেসে উঠছে মনোদিদিমণির কালো চুলের মাঝখানে আয়োতির রক্তিমচিহ্ন।

দয়ালদা।

সমস্ত শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল। একেবারে সামনে মনোরমা। কৌতুকহাস্যে মুখখানি উজ্জ্বল। খিড়কীর পুকুরে গা ধুতে চলেছে। এক হাতে গামছা আর শাড়ী।

তোমার সংগে একদম আড়ি করে দেব দয়ালদা। আজ পাঁচ দিন গোমস্তার কাছ থেকে কোন চিঠি আন নি। পরশু আমি যে চিঠিটা দিয়েছিলাম, সেটা ফেলেছ কিনা কে জানে? আজও কোন খবর নেই তো?

আমি জানি না। নিজের থেকেই মাথাটা এদিক থেকে ওদিকে সঞ্চালিত হ'ল। নেতিবাচক।

তোমাদের পোস্টঅফিসটা ভাল করে খুঁজো তো দয়ালদা। কোথাও কোণে-টোণে পড়ে নেই তো? এ রকম তো হবার কথা নয়।

যখন খেয়াল হ'ল, তখন মনোরমা চলে গেছে। গাছের ফাঁকে আর তাকে দেখা যাচ্ছে না। হাত থেকে চিঠি আর টেলিগ্রামটা পড়ে গিয়েছিল। চিঠিগুলো কুড়িয়ে নিয়েছিলাম। টেলিগ্রামটা তেমনি পড়েছিল ঘাসের ওপর। হাজার চেষ্টা করেও ওটাকে আর তুলে নিতে পারি নি।

দয়াল থামল। মনে হ'ল যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ। জীর্ণ বুকটা আবেগে ওঠা-নামা করছে। অতীতের একটা দৃশ্য থেকে দয়াল নিজেকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করছে।

তারপর। শেষ হ'য়ে যাওয়া কাহিনীর শেষ শোনার অর্থহীন আগ্রহ।

তারপর ধরা পড়ে গেলুম বাবু। পোস্টমাস্টারবাবু জেরা করলেন। টেলিগ্রাম যে ঠিক জায়গায় বিলি করেছি তার রসিদ দেখাতে বললেন। কিছুই দেখাতে পারলাম না। পুলিশ এল। টেলিগ্রাম কুড়িয়ে পেল মাঠের ওপর থেকে। আমাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন। এজাহার। জবানবন্দী। কোর্টের ব্যাপার তো আপনি খবরের কাগজেই পড়েছেন। কর্তব্যে অবহেলা। আরও কঠিন সাজা হওয়া উচিত ছিল আমার, কিন্তু বয়স আর সার্ভিসের রেকর্ড দেখে লঘু দণ্ডই দিয়েছে। ওই গাড়ী আসছে বাবু। আগের স্টেশন ছেড়েছে। আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

আবার বিদ্যুতের ঝিলিক। এ বিদ্যুতের আলো নতুন করে চেনাল দয়ালকে। খবরের কাগজের পাতা যে মানুষটাকে আড়াল করে রেখেছিল, সেই দণ্ডিত, কর্তব্যচ্যুত, অন্যায়-নিষ্ঠ মানুষটার নতুন এক পরিচয় উন্মোচিত করল।

হাতটা অসংকোচে তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, অচেনা জায়গা, তার ওপর এই দুর্যোগ, তুমি আমার হাতটা ধর দয়াল। পথ দেখিয়ে টিকেটঘরের কাছে নিয়ে চল।

শেষ পর্যন্ত উড়োজাহাজের টিকিট একটা কিনেই ফেললো সুমিতা। কাউকে খোশামোদ করতে হল না, কিউ দিতে হল না, কারো কাছ থেকে সুপারিশ আনতে হল না, বুকিং-অফিসে ঢুকেই টাকা গুনে দিয়ে টিকিট-খানা কিনে ফেলল সে। সুন্দরী মেয়ের জয় সর্বত্র। ট্যাক্সি ধরবার জন্য গড়িয়াহাটার মোড়ে মাত্র মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করতে হয়েছিল। বহু লোক দাঁড়িয়েছিল সেখানে।

পলাতকার প্রত্যাবর্তন

চাতকের মতো ট্যাক্সির তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল তাদের। মিটার ডাউন করে একটি ট্যাক্সিওয়ালা চলেই যাচ্ছিল ওদের পাশ কাটিয়ে। হঠাৎ ব্রেক কষে সুমিতার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, "কোথায় যাবেন?"

গাড়িতে উঠে জবাব দিল সুমিতা, "চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনু। ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস করপোরেশনের অফিসে চলুন।"

অফিসে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে কাউণ্টারের ওপর দিয়ে গলা বাড়িয়ে দিয়ে মধ্যবয়সী বুকিং-ক্লার্ক জিজ্ঞাসা করল, "কোথায় যাবেন?"

"বাগডোগরা। সেখান থেকে দার্জিলিং। কত ভাড়া?"

"একশো দশ।"

ম্যাজিকের মতো কাজ হয়ে গেল। হ্যাণ্ড-ব্যাগের মধ্যে টিকিটখানা ভরে রেখে বেরিয়ে এল বাইরে। এবার একটা টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে মুরারীলালের কাছে। গতকাল তার অফিসে টেলিফোন করে সুমিতা জেনে নিয়েছিল যে, মুরারীলাল পাণ্ডে চা-বাগান পরিদর্শনের জন্য দার্জিলিং গিয়েছে। ফিরে আসতে আরো পনরো দিন দেরি হবে। মস্ত বড় ব্যবসায়ী। ছেলেবেলায় একবার বিয়ে হয়েছিল। এখন মৃতদার। বছর চল্লিশ বয়স হবে। সুমিতার উনিশ। বি-এ পড়ছে। বি-এ পড়তে পড়তেই দার্জিলিং যাওয়ার জন্য উড়োজাহাজের টিকিট কিনে বসল। পনরো দিন অপেক্ষা করার মতো ধৈর্য নেই আর। যত তাড়াতাড়ি পারা যায় কোটিপতির কাছে গিয়ে পেঁছুনো দরকার।

তার আগে মুরারীলালকে টেলিগ্রাম করল একটা। টেলিগ্রাম-অফিসে ঢুকেও অসুবিধে হল না কিছু। কেরানীবাবুটি বললেন, "এক ঘণ্টার মধ্যে টেলিগ্রামটা যাতে পেঁছয় তার ব্যবস্থা করছি।"

"বিশেষ ধন্যবাদ। খুবই জরুরী খবর।" কপালে হাত ঠেকিয়ে কেরানীবাবুটিকে নমস্কার করল সুমিতা।

বালিগঞ্জ অঞ্চলে পূর্ণ দাস রোডে ওরা বাস করে। বাড়িটা সুমিতার জন্মের আগেই বাড়িটা ভাড়া নিয়েছিলেন ওর বাবা নিত্যবন্ধু মিত্র। বণিক অফিসে চাকরি করেন। তখন ভাড়া ছিল মাত্র পঁয়ত্রিশ টাকা। মাইনে বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাড়াও বাড়াতে হয়েছে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পরে বিপদে পড়লেন নিত্যবন্ধুবাবু। ভাড়া-বৃদ্ধির বেড়াটা অতি দ্রুত উঁচু হয়ে উঠতে লাগল। পঁয়ত্রিশ থেকে যখন একশো পঁয়ত্রিশে এসে ঠেকল তখন বেড়া টপকাতে গিয়ে বার বার মুখ থুবড়ে পড়ে যেতে লাগলেন। দুধের পরিমাণ দিলেন কমিয়ে। প্রতিদিন আধসের করে মাছ আসত সেটা হল এক পোয়া। মাংসের দোকানের সামনে দিয়ে মুখ নিচু করে যাওয়া-আসা করতে লাগলেন। ব্রিটিশ আমলে ট্রামের প্রথম শ্রেণীতে চেপে অফিসে যেতেন। এখন তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী। সবসুদ্ধ পাঁচটি প্রাণী। তাদের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য ক্রয় করা অসম্ভব হয়ে উঠল।

তার ওপর আবার একটি হরিণ পোষেন নিত্যবন্ধুবাবু। কয়েক বছর আগে একটা বাচ্চা হরিণ উপহার পেয়েছিলেন এক শিকারী-বন্ধুর কাছ থেকে। এখন আর বাচ্চা নয়। বেশ বড় হয়েছে। গায়ে-পায়ে মেদমজ্জার সমারোহ দেখবার মতো! মাংসাশীরা কখনো কখনো খাঁচার ফাঁক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে ওর নিতম্বের মাংসে খোঁচা মারবার চেষ্টা করে। দেখতে পেলে ছুটে আসে সুমিতা। গালাগাল করতে ছাড়ে না। হরিণের নিতম্বে খোঁচা মারার অর্থ কি? উল্টোদিকের বাড়ির রোয়াকে বসে যারা আড্ডা মারে তারাই আসে খোঁচা মারতে। শাড়ীর আঁচলটা তলার দিকে ভাল করে টেনেটুনে দিয়ে ধমকে ওঠে সুমিতা, "খবরদার, নিতম্বিনীর গায়ে হাত দেবেন না। অনুমতি না নিয়ে পরের বাড়িতে ঢুকেছেন। পুলিশকে ফোন করব নাকি?"

"পুলিশ? তারা আসবে না। তা ছাড়া আমি তো আপনাদের হরিণটাকে খেয়ে ফেলি নি। একটু শুধু সুড়সুড়ি দিচ্ছিলাম।"

এই পাড়াতেই থাকে ছেলেটা। বাড়িওয়ালা অম্বিকা মজুমদারের ছোট ছেলে পটলের বন্ধু। অম্বিকাবাবু দোতলায় থাকেন। পটল কিংবা তার বন্ধুরা কেউ কাজকর্ম করে না। রোয়াকে বসে শুধু নিতম্বিনীর মেদবৃদ্ধি সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করে।

নিতম্বিনী নামটা নিত্যবন্ধুবাবুই রেখে-ছিলেন। যখন রেখেছিলেন তখন সুমিতার বয়স ছিল কম। আজকাল সুমিতা কাছে থাকলে নিতম্বিনী নামটা উচ্চারণ করতে লজ্জা পান তিনি। সুমিতার মা-ও সাবধান হয়ে গিয়েছেন। ডাকবার আগে রোয়াকের দিকে দৃষ্টি ফেলেন একবার। তাঁর বিশ্বাস

ছেলেগুলো আজকাল সুমিতার দিকে চেয়ে থাকে, হরিণের দিকে নয়।

এ-বাড়ির আনন্দের উৎস হচ্ছে নিতম্বিনী। সুমিতার ছোট ছোট দুটি ভাই সন্তু আর ভন্তু হরিণটাকে নিয়ে সারাদিন খেলা করে। অফিস থেকে ফিরে এসে প্রথমেই নিত্যবন্ধুবাবু খোঁজ নেন, নিতম্বিনী সুস্থ আছে কিনা। ঠিক সময়ে তাকে খাওয়ানো হয়েছে কিনা সে সম্বন্ধেও প্রশ্ন করেন তিনি। সুমিতারও চোখের মণি হচ্ছে হরিণটা। নৃত্যশিল্পী হিসেবে সুমিতা নাম করেছে খুব। নিতম্বিনীর সামনে নাচের মহড়া দেয় সে। তাকে নাচ শেখাবার চেষ্টা করে। কয়েক বছর চেষ্টার পরেও নিতম্বিনী আজকাল একটু আধটু কোমর দোলায়, কিন্তু নাচতে পারে না। তাই দেখেই মিত্র-পরিবারের সবাই হাসতে হাসতে লুটোপুটি খায়। বাড়িভাড়া একশো পঁয়ত্রিশ টাকা হওয়ার পর সিনেমা-থিয়েটারে যাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন নিতম্বিনীর কোমর-দোলানি দেখে আমোদ-আহ্লাদের শখ মেটায় এরা।

কদিন আগে চটিজুতোয় প্রচণ্ড আওয়াজ করতে করতে বাড়িওয়ালা অম্বিকাবাবু নেমে এলেন একতলায়। রবিবার বলে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গল্পগুজব করছিলেন নিত্যবন্ধুবাবু। নিতম্বিনীও বসে ছিল সেখানে। দাওয়ায় দাঁড়িয়ে অম্বিকা মজুমদার জিজ্ঞাসা করলেন, "বাড়ি আছেন নাকি, মিত্রমশাই?"

অম্বিকাবাবু একজন পেন্সনপ্রাপ্ত সাবজজ। যে বছর ভারতবর্ষ স্বাধীন হয় সেই বছরই কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন তিনি। দুটি ছেলে। বড়টি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য বিভাগে চাকরি করে। ছোটটি এখনও বেকার। পৈত্রিক বামপন্থী। কোনো দলের সঙ্গেই যোগ দেয় নি, কিন্তু যে কোনো বামপন্থী দলের হয়ে শোভাযাত্রায় যোগ দেয়। সভা আর শোভাযাত্রায় যোগ দেওয়ার পর বাকী সময়টুকু ব্যয় করে উল্টোদিকের বাড়ির রোয়াকে বসে।

চৌকির ওপর পা গুটিয়ে বসে অম্বিকাবাবু বললেন, "মস্ত বড় শোভাযাত্রা বেরুবে আজ। খেয়েদেয়ে একটু আগেই আমার ছোট ছেলে পটল বেরিয়ে গেল। সুমিতা বুঝি মিটিং কিংবা মিছিলে যোগ দেয় না?"

"না।" গম্ভীর সুরে জবাব দিলেন নিত্যবন্ধু মিত্র।

"কেন? এই দুর্দিনে শুধু পাড়ায় পাড়ায় নেচে বেড়ালে চলবে কেন? কাল তো দেখলাম খবরের কাগজে সুমিতার ছবি বেরিয়েছে। বেশ আছেন আপনি—"

"কি রকম?"

"তিনখানা বড় বড় ঘর, ভাড়া দেন মাত্র একশো পঁয়ত্রিশ—খবরের কাগজে মেয়ের ছবি ছাপা হয়। তার ওপর আবার হরিণ পোষেন। আপনি মশাই রাজালোক! এদিকে তো শুধু ট্যাক্স বাড়িয়ে চলেছেন দিল্লীর বড়কর্তারা। সবাইকে দিয়ে-থুয়ে যা বাঁচে তা দিয়ে আর দুটি সাদা ভাতও জুটে উঠছে না। মশাই, চল্লিশ টাকা চালের মণ! বড় ছেলেটা পেটের ব্যারামে ভুগছে বলে মাসের মধ্যে পনরো দিন বার্লির জল খায়। কিন্তু বামপন্থী পটল আমায় পথে বসাল! দু-বেলায় তিন পো চালের ভাত মারে—"

"মারবেই তো। মিছিলের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে হয় অনেক।" নিতম্বিনীর গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে মন্তব্য করলেন নিত্যবন্ধুবাবু।

"হ্যাঁ, যা বলছিলাম—" গলার সুরে দোলা দিয়ে অম্বিকাবাবু বললেন, "আসছে মাস থেকে আরো পনরোটা টাকা ভাড়া বাড়িয়ে দিতে হবে। একেবারে সোজাসুজি একশো পঞ্চাশ।"

"বলেন কি! এই তো এক বছর আগে কুড়ি টাকা বাড়িয়ে দিলাম।" হরিণটাকে খোঁচা মেরে ঘর থেকে বার করে দিলেন সুমিতার বাবা।

"দিল্লীর বড়কর্তারা যা কাণ্ড করে চলেছেন তাতে ছ মাস পর পর ভাড়া বাড়িয়ে দিতে হবে। চলি এবার—"

"কিন্তু আর তো ভাড়া বাড়ানো চলবে না।"

"কেন?" দরজার ও-পাশে ঘুরে দাঁড়ালেন অম্বিকাবাবু।

"মাইনের টাকা থেকে উদ্বৃত্ত কিছু থাকে না।"

"সে কথা বললে বাড়িওয়ালার পেট ভরবে কেন? তা মশাই এক কাজ করুন। আমি হচ্ছি গিয়ে শান্তিপ্রিয় লোক। ঝগড়াঝাঁটি পছন্দ করি না। অন্য কোথাও একটা ফ্লাট দেখে উঠে যান।"

পাশের ঘর থেকে কথাগুলো শুনতে পেয়েছিল সুমিতা। রাগের জ্বালায় সারা শরীর পুড়ে যাচ্ছিল ওর। অম্বিকাবাবুর সামনে এসে সুমিতা বলল, "একটি পয়সাও ভাড়া আর বাড়াব না আমরা। আপনার যদি সংসার না চলে তা হলে পটলদাকে চাকরি করতে বলবেন। পঁয়ত্রিশ টাকার বাড়ি একশো পঁয়ত্রিশ হয়েছে, আর কি চান আপনি? দুধ খাওয়া তো বন্ধই হয়ে গিয়েছে, আপনি কি চান সন্তু আর ভন্তু ইস্কুল থেকে নাম কাটিয়ে বাড়ি বসে থাকবে? দরকার হয় এবার আমরা আইনের সাহায্য নেব।"

"আইনের সাহায্য?" হো হো করে হেসে উঠলেন অম্বিকা মজুমদার। তারপর বললেন, "আইন আদালতের মধ্যেই তো সারাটা জীবন কাটিয়ে এলাম মা, কিন্তু—যাক গে, তুমি একজন নৃত্যশিল্পী, তোমাকে আইন-আদালতের গল্প শুনিয়ে লাভ নেই। যাদের অর্থবল আছে তারাই শুধু আইন-আদালতের সাহায্য পায়। মিত্রমশাই, পরের মাসে একেবারে দুশো টাকার একটা রাউন্ড ফিগার নিয়ে আসবেন।"

।। দুই ।।

তারপর কয়েকটা মাস কেটে গিয়েছে। নিত্যবন্ধুবাবুর কাজ বেড়েছে একটা। প্রতি মাসে রেন্ট কন্ট্রোলারের অফিসে ভাড়া জমা দিতে যেতে হয়। সুমিতার কথা শোনবার পর একশো পঞ্চাশ টাকা নিতেও রাজী হন নি বাড়িওয়ালা।

ভাড়াটে তুলে দেওয়ার জন্য আদালতেও যাননি তিনি। মাঝে মাঝে শুধু একতলার আলো আর পাখা বন্ধ করে দেন। সন্তু গিয়ে নালিশ করলে অম্বিকাবাবু বলেন, 'ওতে আমার কোনো হাত নেই বাবা। ইলেকট্রিক কোম্পানি 'লোড শেডিং' করছে।' কোনো কোনো দিন সকালবেলা কলের জলও যাচ্ছে বন্ধ হয়ে। তাড়ার মুখে স্নান করতে পারেন না নিত্যবন্ধুবাবু। সকাল সাড়ে আটটায় তাঁকে অফিসে বেরুতে হয়।

রাত্রে যখন বাড়ি ফিরে আসেন তখন শরীর আর মন থাকে ক্লান্ত হয়ে। কোনো রকম অভাব-অভিযোগের কথা শুনতে গেলে মেজাজ যায় বিগড়ে। প্রতিদিনই নতুন উৎপাতের সংখ্যা বাড়ছে। মাঝরাত্রিতে চটিজুতোয় আওয়াজ করতে করতে একতলায় নেমে আসেন বাড়িওয়ালা। দুমদাম করে দরজা বন্ধ করেন। একবার দুবার নয়, বার কয়েক নীচে-ওপরে নামা-ওঠা করেন তিনি। ঘুম ভেঙ্গে যায় নিত্যবন্ধুবাবুর। বাকী রাতটা জেগে জেগে কাটিয়ে দেন তিনি। সুমিতার ওপর রাগ হয় তাঁর। কি দরকার ছিল বুড়ো মানুষটাকে আইনের ভয় দেখাবার? লোকটা পেন্সনপ্রাপ্ত সাবজজ হলেও স্বাধীন ভারতের আইনকানুন সম্বন্ধে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল। তা ছাড়া কলকাতার যা অবস্থা তাতে তিনখানা বড় বড় ঘরের জন্য দুশো টাকা তিনি অবশ্যই দাবি করতে পারেন। শুধু তিনখানা ঘর বললেই সব কথা বলা হল না। বাড়ির দক্ষিণ দিকটা খোলা। তিনখানা ঘরেই হু-হু করে হাওয়া ঢোকে। সামনের খালি জমিটুকুর একধারে নিতম্বিনীর জন্য একটা খাঁচা তৈরী করেছেন নিত্যবন্ধুবাবু। খাঁচার জন্য আলাদা ভাড়া দিতে হয় না তাঁকে। কলকাতার ব্যাপার দেখে মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যান নিত্যবন্ধু মিত্র। ভাবেন, দেশটাকে চালাবার জন্য বোধহয় আজকাল আর লোকের দরকার হয় না, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মতো নিজে থেকেই চলে। প্রীতি ও সহানুভূতির স্পর্শবঞ্চিত যন্ত্রটার প্রকৃতি কী নিষ্ঠুর!

হ্যান্ডব্যাগ ছাড়া সঙ্গে আর কিছুই নিল না সুমিতা। ভোর ছটার মধ্যে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনুর অফিসে গিয়ে উপস্থিত হতে হবে। ভাঙা মাস্তুলের মতো কাঁপতে কাঁপতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল সে। পালিয়ে যাচ্ছে সুমিতা। আবার যখন ফিরে আসবে তখন সে কোটিপতির স্ত্রী।

সাতটার মধ্যেই দমদম পৌঁছে গেল। আগে কখনো বিমানঘাটিতে আসবার সৌভাগ্য হয়নি সুমিতার। পৃথিবীর নানা-দেশের লোক এখানে জড়ো হয়েছে। হৈ-চৈ নেই। হল্লা-চিৎকার কানে আসছে না। একটা আন্তর্জাতিক পরিবেশের মধ্যে নিরাপদে এবং নিশ্চিন্ত মনে হেঁটে বেড়াতে পারছে। বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী বলে সুমিতাকে চিনতে পারছে না কেউ। পটলদা কিংবা তার দলের একটি লোকও এখানে বসে আড্ডা মারছে না। পালিয়ে এসে ভাল করেছে। কোটিপতির বউ হয়ে পূর্ণদাস রোডের বুকের ওপর দিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে চলবে। পটলদাদের শিক্ষা দিয়ে ছাড়বে।

যাত্রীদের মুখগুলি কী আশ্চর্য সুন্দর! প্রত্যেকের মুখেই ভদ্রতা আর শিক্ষার ছাপ সুস্পষ্ট। আচার-ব্যবহার একেবারে নিখুঁত। কথা বলতে গিয়ে একে অপরকে

ধন্যবাদ জানাচ্ছে। একটু আগেই সুস্মিতার পাশ কাটিয়ে একটি ভদ্রলোক কাউন্টারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। ওর গায়ের সঙ্গে ধাক্কা খেলেন তিনি। তেমন কিছু উদ্দেশ্য-মূলক ধাক্কা নয়। কলকাতার ট্রামে-বাসে চলতে গিয়ে প্রতিদিনই ধাক্কা খায় সুস্মিতা। তার মধ্যে উদ্দেশ্য থাকে। অভদ্রতার প্রমাণ থাকে। কিন্তু এই ভদ্রলোকটি ট্রাম-বাসের যাত্রী নন। মুখ ঘুরিয়ে সুস্মিতাকে বললেন, 'দুঃখিত—'

দুঃখিত? গায়ে একটু ধাক্কা লেগেছে বলে দুঃখপ্রকাশ করছেন তিনি! কে এই বিমানযাত্রী? বাঙালী, হ্যাঁ নিশ্চয়ই বাঙালী। চেনা-চেনা বলে 'মনে হচ্ছে। এক সময়ে পূর্ণদাস রোডে থাকত। পটলদার সঙ্গে রোয়াকে বসে মাঝে মাঝে আড্ডাও মারত। হ্যাঁ, ঠিক, এই তো সেই দেবপ্রসাদ দাশগুপ্ত! সুস্মিতাকে বিয়ে করবার জন্য পটলদার মারফৎ প্রস্তাব পাঠিয়েছিল। আন্তর্জাতিক বিমানঘাটিতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকটা বদলে গেল নাকি?

কাউন্টারের উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে উল্টো-দিকের লোকটির সঙ্গে কথা বলছিল দেবপ্রসাদ। ইংরেজীতে কথা বলছিল সে। কী সুন্দর ভাষা, আর কী সুন্দর বাচন-ভঙ্গী! অবাক হয়ে গেল সুস্মিতা। পটলদার বন্ধুদের মধ্যে যে কেউ এমন সুন্দরভাবে কথা বলতে পারে, নিজের কানে না শুনলে যেন বিশ্বাস করত না সে। দেবপ্রসাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সুস্মিতা। পূর্ণদাস রোডের সেই রোয়াকটির কথা মনে রইল না আর।

ডানদিকে মুখ ঘোরাতেই সুস্মিতাকে দেখল দেবপ্রসাদ। অবাক হওয়ার সুরে জিজ্ঞাসা করল সে, 'আরে মিস মিত্র—মানে সুস্মিতা, তুমি এখানে? কোথায় চলেছ?'

'দার্জিলিং।

'এই ঘোর বর্ষায় দার্জিলিং কেন?'

'একটা জরুরী কাজ আছে। তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

'শিলিগুড়ি। বেশ ভালই হল। বাগ-ডোগরা বিমানঘাটি পর্যন্ত একসঙ্গেই যাওয়া যাবে। দার্জিলিং-এ নাচ-গানের জলসা আছে বুঝি?'

'না—অন্য কাজ আছে একটা।' খোলা বারান্দার দিকে হাঁটতে হাঁটতে সুস্মিতাই জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি আজকাল চাকরি-বাকরি করছ বুঝি?'

'হ্যাঁ। বছর তিন আগে একটা কন্টিনেন্টাল চাকরি পেয়ে গেলাম। পেট্রল কোম্পানি। শিলিগুড়িতে মস্ত বড় পেট্রল ডাম্প খোলা হয়েছে তা বোধহয় তুমি খবরের কাগজে দেখেছ—'

'না। আমি খবরের কাগজ পড়ি না। দেবপ্রসাদ, কত টাকা মাইনে দেয় ওরা?'

সব মিলিয়ে এখন বারো শো পাচ্ছি। পরে আরো বাড়বে।'

'এতো টাকা তোমায় ওরা মাইনে দেবে কেন? কথাটা বলে ফেলেই লজ্জিত বোধ করল সুস্মিতা। তারপর সংশোধনের চেষ্টা করতে করতে বলতে লাগল সে, 'রাগ করো না দেবপ্রসাদ। আমি বলতে চাইছিলাম যে, পেট্রল সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান না থাকলে এতো টাকা মাইনে কেউ পায় কিনা। পটলদা তো পঞ্চাশ টাকা মাইনেতেও চাকরি পাচ্ছে না, অর্থাৎ—'

কথাটা শেষ করতে পারল না সুস্মিতা। তার আগেই হেসে ফেলল দেব-প্রসাদ। হাসতে হাসতে বলল সে, 'পেট্রো-কেমিকেল সম্বন্ধে আমার খানিকটা জ্ঞান আছে। থিসিস লিখে ডক্টরেট পেয়েছি। অবিশ্যি সেটা কিছু বড় কথা নয়। রাশিয়ায় গিয়ে সেখানকার খনিতে দু বছর কাজ করে এসেছি। চলো, এবার আমাদের ডাক পড়েছে। প্লেনে চাপতে হবে।'

যাত্রীর ভিড় নেই। ওরা দুজন পাশা-পাশি বসল। উড়োজাহাজে এই প্রথম চাপছে সুস্মিতা। নানা রকমের কৌতূহল থাকাই উচিত ছিল সুস্মিতার। কিন্তু সমস্যার জালে মনটা ওর এতো বেশি জড়িয়ে পড়েছিল যে, অন্য কোনো দিকে দৃষ্টি দিচ্ছে না। কাঠের পুতুলের মতো দেবপ্রসাদের পাশে চুপ করে বসে রইল সে।

হঠাৎ এক সময়ে জিজ্ঞাসা করল সুস্মিতা, 'পটলদার সঙ্গে তোমার আর দেখা-সাক্ষাৎ হয় না?'

'পূর্ণদাস রোড থেকে উঠে আসবার পর আর কোনোদিনও দেখা হয়নি। কেন বলো তো?'

প্রায় বারো হাজার ফুট ওপরে উঠে এসেছে উড়োজাহাজ! মাথার ওপরে নীল আকাশ, তলায় ঘন মেঘ। দেবপ্রসাদের দিকে ঝুঁকে বসে সুস্মিতা বলল, 'পটলদা সেদিন আমাকে লক্ষ্য করে অ্যাসিড বাল্ব ছুঁড়েছিল। লাগাতে পারেনি—'

হ্যাঁ, তাই তো দেখছি'—সুস্মিতার মুখটা একবার ভাল করে দেখে নিল দেবপ্রসাদ।

'বাবা আমার পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর বা দিকের গালের চামড়া পুড়ে গেল। দিন পনরো হাসপাতালে থেকে এলেন।'

'কি চায় পটল?'

'বলেছে পেট্রল ঢেলে আমাদের সকলকে পুড়িয়ে মারবে।'

'পেট্রল? ও, হ্যাঁ পেট্রল। কিন্তু কেন?'

'আমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলছে। তুমি তো এক সময়ে পটলদাদের সঙ্গে রোয়াকে বসতে। একবার বিয়ের প্রস্তাবও পাঠিয়েছিলে। তাই না?' জবাবের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

'হ্যাঁ—তখন আমি ছেলেমানুষ ছিলাম। বুদ্ধিসুদ্ধি পাকেনি। আমার অপরাধ হয়ে-ছিল।' হাসবার চেষ্টা করল দেবপ্রসাদ। তারপর একটু থেমে সেই বলল, 'আমায় তুমি ক্ষমা করো।'

'আগে আমার কাহিনীটা শুনে নাও,' একটু জড়সড় হয়ে বসে সুস্মিতা বলল, 'আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছি। মা, বাবা, সন্তু আর ভন্তু কেউ জানে না। পটলদাদের অত্যাচার সহ্য করতে পারলাম না। বাবার উপায় নেই, নইলে তিনিও পালাতেন। সমাজের যে অংশটায় অত্যাচার নেই সেখানে গিয়ে ফ্ল্যাট ভাড়া নিতেন তিনি।'

'সমাজের কোন অংশটায় অত্যাচার নেই বলে তোমার বিশ্বাস?' আলোচনাটা ব্যক্তিগত স্তর থেকে সাধারণ স্তরে টেনে তোলবার চেষ্টা করল দেবপ্রসাদ।

একটু ভেবে নিয়ে সুস্মিতা বলল, 'সেই জন্যই আমি কোটিপতিকে বিয়ে করতে যাচ্ছি। মুরারীলালকে টেলিগ্রাম করেছি। দার্জিলিং এসেছে চা-বাগান পরিদর্শন করতে।'

'মুরারীলাল কে?'

'মুরারীলাল পাণ্ডে। বিরাট বড়লোক। নিউ এম্পায়ারে যতবার নাচতে গিয়েছি ততবারই সে সামনের সীটে বসে থাকত। টিকিট কিনত না, প্রতিবারই হাজার টাকা করে ডোনেশন দিত। তারপর ঠিক তোমার মতো বিয়ের প্রস্তাব পাঠাল।'

'বললাম তো তখন আমি ছেলেমানুষ ছিলাম'—বিব্রত বোধ করল দেবপ্রসাদ। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'মুরারীলালের বয়স কত?'

'চল্লিশ। এতকাল তো প্রস্তাবটাকে হেসে উড়িয়ে দিয়েছি। এখন নিজেই চলেছি তাকে খোশামোদ করতে।'

'ছি-ছি—খোশামোদ করতে যাচ্ছ কেন?'

'যাচ্ছি মনের দুঃখে। ও কি? কানে তুলো গুঁজলে কেন?'

'ইঞ্জিনের আওয়াজ সহ্য করতে পারি না। কাহিনীটা বলো আমি শুনছি।' কণ্ঠস্বরে সহানুভূতির আতিশয্য প্রকাশ করল দেবপ্রসাদ।

সুমিতার চোখ প্রায় ভিজে উঠেছে। কপালের ওপর হাত রেখে বলল সে, 'অ্যাসিড বালব ছোঁড়ার পরেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি। মুরারীলালের কথা মনে পড়ে নি একবারও। মনে পড়ল চারদিন আগে। প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারে টাকা তুলে দেব বলে নাচতে গিয়েছিলাম নিউ এম্পায়ারে। বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত দশটা বেজে গেল। যখন ফিরলাম তখন দেখি, একতলাটা অন্ধকারে নিমজ্জিত। কেমন একটা বিয়োগান্ত পরিবেশের চিত্র দেখলাম আমি। নিতম্বিনীর খাঁচার সামনে বসে নন্তু আর ভন্তু হাউ হাউ ক'রে কাঁদছে। ওপর। ব'সে ব'সে তাঁরাও চোখের জল ফেলেছেন। গতকাল থেকেই নিতম্বিনীকে পাওয়া যাচ্ছিল না। অফিস কামাই ক'রে সারাটা দিন বাবা নিতম্বিনীকে খুঁজছেন। দু'-তিন মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে কোনো জায়গাই খুঁজতে বাকী রাখেন নি তিনি। এমন কি নন্তু আর ভন্তু পর্যন্ত ইস্কুলে যায় নি। মায়ের মনের অবস্থাও ভাল ছিল না। রান্নাবান্না বিশেষ কিছু একটা করলেন না। তারপর ওঁরা বিশ্বস্তসূত্রে খবর পেলেন পটলদারা নিতম্বিনীকে কেটেকুটে খেয়ে ফেলেছে। খানিকটা মাংস মাটির হাঁড়িতে ক'রে কে যেন রেখে গিয়েছে খাঁচার সামনে।"

"এ তো অরাজকতা!"

"কোল্ড ব্লাডেড মার্ডার—পূর্ব পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড! সেই দিন রাতেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম, কোটিপতিকে বিয়ে করব। টাকার মুগুর মেরে কুকুরগুলোকে শায়েস্তা করব। দেবপ্রসাদ, আমার বিয়েতে সাক্ষী থাকবে তুমি?"

"সাক্ষী?—যদি বলো, থাকতে পারি। শুধু একটা কথাই ভাবছি—"

"কি কথা?"

"তোমার বাবা আর মাকে জানিয়ে-শুনিয়ে বিয়ে করলে হ'তো না?"

"জানিয়ে-শুনিয়ে কোটিপতিকে বিয়ে করা যায় না। তুমি বিয়ে করো নি, দেবপ্রসাদ?"

প্রচণ্ডভাবে নড়ে উঠল উড়োজাহাজটা। মেঘের সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছে। বাগডোগরা বিমানঘাটিতে নামবার সময় হয়েছে। যাত্রীরা সবাই কোমরে বেল্ট বেঁধে নিঃশব্দে ব'সে রয়েছে। মিনিট দশেক চেষ্টার পর ঘোষণা শুনল যাত্রীরা : "আমরা আবার দমদম ফিরে যাচ্ছি। অবতরণ করা সম্ভব হ'ল না। বিমানঘাটিতে এক হাঁটু জল জমেছে।"

দেবপ্রসাদের হাতটা খপ ক'রে চেপে ধ'রে সুমিতা বলল, "দেখলে তো আমার ভাগ্য কত খারাপ! প্রকৃতি পর্যন্ত আমার বিরুদ্ধতা করল! তা মুরারীলাল নিশ্চয়ই বাগডোগরায় এসে অপেক্ষা করছে। দেবপ্রসাদ, এখন আমি কি করব?"

"দমদমে ফিরে যাই আগে, তারপর ভাবব।"

"না, অতোক্ষণ আমি অপেক্ষা করতে পারব না। একটা পথ তুমি বাংলে দাও আমায়।" চেয়ারের গায়ে এলিয়ে পড়ল সুমিতা।

বেলা এগারোটার মধ্যেই আবার ওরা ফিরে এল দমদম বিমানঘাটিতে। খবর নিয়ে জানল, অন্ততঃ তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে যাত্রীদের।

দেবপ্রসাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সুমিতা।

দেবপ্রসাদ বলল, "তিন ঘন্টা অনেক সময়। এখানে ব'সে থেকে লাভ কি?"

"কি করতে চাও?" সুমিতার দৃষ্টিতে উৎকণ্ঠা।

"ট্যাক্সি চেপে চলো পূর্ণদাস রোড থেকে ঘুরে আসি।"

"সেখানে কেন?"

"সবার সঙ্গে দেখাশুনো, ক'রে আসবে। অতো বড় একটা খবর, শুনলে তোমার বাবা-মা খুশী হবেন। শুভ কাজে তাঁদের আশীর্বাদ চাই। পটলরাও দেখুক, ভয় পেয়ে তুমি ওদের সমাজটাকে ত্যাগ করো নি। চলো, একটা ট্যাক্সি এখনো দাঁড়িয়ে আছে।"

ট্যাক্সিতে উঠে বসল ওরা। ঝুপ ঝুপ ক'রে বৃষ্টি পড়ছিল। কখন যে শ্যামবাজারের মোড়টা পার হয়ে গেল টের পেল না সুমিতা। গভীর চিন্তায় ডুবে রয়েছে। যাত্রা শুভ হয় নি, বাগডোগরায় নামতে পারল না প্লেন। চৌরঙ্গীর মোড়টা পার হয়ে আসবার পর সুমিতা জিজ্ঞাসা করল, "আজ আমরা বাগডোগরায় ফিরে যেতে পারব তো?"

"দু একদিন পরে গেলেও তো ক্ষতি কিছু হবে না।"

"না, না তা হয় না।" দেবপ্রসাদের দিকে ঝুঁকে বসে সুমিতা বলল, "ফের যেতেই হবে। মুরারীলাল ব'সে থাকবে সেখানে। তাকে আমি কিছুতেই নিরাশ করব না। বুঝলে দেবপ্রসাদ, বিয়ের পর পটলদাদের বাড়িটা আমি ডবল দাম দিয়ে কিনে নেব। বাবার কাছ থেকে ভাড়া নেব না আমরা।"

"বিনে ভাড়ায় তিনি ওখানে থাকবেন না। কোটিপতি জামাই-এর কাছে মাথা নিচু করবেন কেন তোমার বাবা?"

"বেশ, তাহ'লে পঁয়ত্রিশ টাকা ক'রে চাইব আমরা।"

"তাঁর আত্মসম্মানবোধ প্রখর। তেতাল্লিশ সালের ভাড়ায় তিনি তেষট্টি সালে তিনখানা ঘর কিছুতেই দখল ক'রে থাকবেন না। তোমার বাবাকে আমি চিনি।" একটু হেসে দেবপ্রসাদ বলল, "আপাতত বাগডোগরায় যাওয়ার দরকার নেই। কয়েকটা দিন পূর্ণদাস রোডেই থেকে যাও—"

প্রতিবাদের সুরে ব'লে উঠল সুমিতা, "না, না—কক্ষণো না। ওখানকার অবিচার আর অত্যাচারের মধ্যে কিছুতেই ফিরে যাব না আমি।"

"তুমি শিল্পী ব'লেই তো অবিচার আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে! পালিয়ে যাবে কেন?" সুমিতার হাতের ওপর চাপ দিয়ে দেবপ্রসাদই ঘোষণা করল, "আমি থাকব তোমার পাশে।"

সেই দিনই উড়োজাহাজের টিকিটখানা ফেরৎ দিয়ে এল সুমিত্রা মিত্র। দেবপ্রসাদ্ও আর যায় নি।

অফিস থেকে এক মাসের ছুটি নিল সে।

দোঁহে ডাকে দোঁহারে

প্রাণতোষ ঘটক

অনুরাগের আবেশে যেন আত্মমগ্ন সুপ্রিয়।

কেউ যেন কখনও আর প্রেমে পড়ে না। কেউ আর কাকেও ভালবাসে না।

দিন নেই রাত নেই বিভ্রান্তিতে সুপ্রিয় যেন বিভোর সদাক্ষণ। থাকে অন্যমনে। যেন অন্য এক পৃথিবীর স্বপ্ন তার চোখে। কথা বলছে, যদিও কথায় মন নেই। অফিসের কাজ করে যেন যান্ত্রিক পদ্ধতিতে। বাঁধাধরা মামুলি রুটিনমাফিক কাজ মার্চেণ্ট অফিসের, অভ্যাসের আয়ত্তে চালিয়ে যায় সুপ্রিয়। প্রশংসা বা নিন্দার কোন মূল্য দিতে চায় না। কোথায় কাজে কেরামতি দেখিয়ে অন্যান্য সকলের অনুসৃত পথে চলবে ওপর-ওয়ালাদের তুষ্ট রাখতে, সুপ্রিয় ভিন্ন পথে চলে। মহাজনদের পথ ধরে না সে। কাজ করতে করতে কাজের কাজীকে প্রসন্ন রাখা যে কাজেরই অন্তর্গত—মানতে চায় না। ফাঁকি না দিয়ে ঘানির বলদের মত কাজ চালিয়ে গেলেই যে পদোন্নতি হয় না এ পোড়া দেশে, সুপ্রিয় দেখেশুনেও বুঝতে চাইলো না। সজ্জনের নির্ভেজাল সততার তারিফ করে না কেউ, কে বোঝাবে তাকে এই চরমতম সত্য!

প্রেমের ঠাঁই অনেক উঁচুতে। প্রথম আর প্রধান। সব কিছুর উর্ধ্বে।

সুপ্রিয়র কাছে চাকরী অফিস বড়সাহেব ফাইল লেজার মুখ্য নয় গৌণ। আগে ভালবাসা, তারপর আর কিছু। খেয়ে প'রে সুখে থেকে বেঁচে থাকার জন্য প্রেম নয়, প্রেমের জন্যই এই মরদেহ ধ'রে জীবনধারণ। অবশ্য তার সঙ্গে একমত হবে, এমন এক-জনেরও আর আজকের দিনে দেখা মেলে না।

ছুটির সময় যত এগিয়ে আসে তত যেন গতি আর চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। কেরানীদের চোখ পড়ে তখন ঘড়িতে। কত দেরী আর! আর কত দেরী পাঁচটা বাজতে! কাজের ঝামেলা মুলতুবী রেখে উঠে পড়া যায়। আজকের মত বকেয়া কাজ বাকী থাকবে। ঘড়ির ঐ চলমান কাঁটা দুটিকে যদি কোন যাদুমন্ত্রে এগিয়ে দেওয়া যায় যৎসামান্য। যেন বিজলীর শক খেয়ে খেয়ে এক পা এক পা এগিয়ে চলেছে মুহূর্তের কাঁটা!

আর মাত্র পাঁচ মিনিট! পাঁচটা বাজতে।

দেওয়াল-ঘড়ি থেকে উন্মুখ চোখ নামিয়ে টেবলের সরঞ্জাম সাজাতে শুরু করলো সুপ্রিয়। মোটা মোটা বৃহদাকার খাতা, সশব্দে মলাট বন্ধ করতে থাকে। দোয়াত, কলম, লাল-নীল পেন্সিল, পিনের কুশন যথাস্থানে রাখতে রাখতে জানুর সাহায্যে টেবলের আলমারির পাল্লাটা বন্ধ করলো। আবার এক শব্দ কাষ্ঠ-আঘাতের। সুপ্রিয় চেয়ার পেছনে ঠেলে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছে সটান। ভাব দেখায় এমন, যেন আজও সে অন্যান্য দিনের মতই সমান ব্যগ্র। অফিস ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার নিত্যনৈমিত্তিক আগ্রহ তার মুখে।

অন্য দিনের কথা জানি না, আজকের দিনটি কিন্তু ঠিক অন্যদিনের সমতুল্য নয়। আজ এক বিশেষ দিন। সুপ্রিয়র এই ব্যস্ততা সকলেই লক্ষ্য করে প্রতিদিন। যদিও সে নিজে মনে মনে জানে, আজ এসেছে সেদিন, এসেছে। আজ সারাদিন ধ'রে যেন অফিসের টাইপিস্ট-মেয়েটি টাইপরাইটারে অর্গানের সুর বাজিয়ে একটি মাত্র নামের গান শুনিয়েছে। সেই মিষ্টি একটি নাম—'নন্দিতা'। অফিসের কাগজপত্রের খস খস যেন সেই নামটি শোনায় বারে বারে, 'নন্দিতা'। খোলা জানলা থেকে ভেসে আসে রাস্তার যান-বাহনের যান্ত্রিক ধ্বনি। সেই 'নন্দিতা' নাম শুনিয়ে যায় যেন সুপ্রিয়র কানে। আর সেই সঙ্গে সুপ্রিয় মনের গহনে নন্দিতার রূপের ভিন্ন ভিন্ন আকার ভেসে ওঠে। নন্দিতার অনিন্দ্য রূপলাবণ্য, অতুল-নীয় সৌন্দর্যসুষমা। নন্দিতার ঢলো ঢলো যৌবন।

আজ যেন সারাদিন এক মধুর সুখ-স্বপ্নের মধ্যে কেটে গেছে। শ্লথগতি, মন্থর সুখের আর আরামের স্বপ্ন। জেগে জেগে যেন তৃপ্তির আস্বাদ পাওয়া যায়। ভাবতে ভাল লাগে, সুপ্রিয়র নিবিড় বাহুবন্ধনে বাঁধা নন্দিতা। দুই নিমীলিত চোখের কাছে, তার সুন্দর মুখের রাঙা অধরের কাছে একটি মধুলোভী ভ্রমর নাচানাচি করছে।

ছেলেবেলায় গুরুমশাই লোভ দমন করতে ব'লেছিলেন। আজ যেন আর স্মরণে আসছে না সেই মূল্যবাণ বাণী। মনে পড়ছে না।

মাঝে মাঝে অবিশ্বাস। নিজের ভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারে না সুপ্রিয়। তবে কি সত্যিই নন্দিতার সঙ্গে তার নিরালায় দেখা হবে আজ! এতদিন দূরে থেকে চোখে দেখতে পেয়েছে; আজ এই প্রথম কাছে পাবে নন্দিতাকে। আর সলাজ দৃষ্টি নয়। সশঙ্কায় আড়নয়নের চাউনি—আজ বাতিল হয়ে যাবে। আজ সোজাসুজি সামনাসামনি দেখবে সে নন্দিতাকে। কোথাও এক নির্জন পরিবেশে।

কি দিয়ে অভ্যর্থনা জানাবে তাকে ভেবে ঠাওরাতে পারে না সুপ্রিয়। এক গুচ্ছ শুভ্র

ফুল। এক শিশি সুগন্ধি। এক বাক্স রুমাল। কত কি মনে পড়ে একে একে। তত যেন এক সম্মোহনী যাদুতে আচ্ছন্ন হ'তে থাকে সুপ্রিয়।

ছুটির দিনে এখানে সেখানে চ'লে যায় সে।

অফিস বন্ধ থাকলেই সুপ্রিয় কলকাতার বাইরে চলে যাবে। খুব বেশী দূরে নয়, কাছাকাছি কোথাও শহরের আশেপাশে। একদিনের ফুরসৎ পেলেই বাহির যেন ডাক দেয় সুপ্রিয়কে। অজানা অচেনা সুদূরের আহ্বান আসে যেন। অলস দিনের মেঘলা আকাশ হাতছানি দিয়ে ডাকে। দিগন্ত ইসারা জানায়।

ডায়মণ্ডহারবার। শিবপুরে বোটানিকশ। আলিপুরের চিড়িয়াখানা। দমদম বিমান-বন্দর। বেলুড় মঠ। গান্ধীঘাট।

সেদিন বোটানিকশের এক দূরপ্রসারী এভিনিউ ধ'রে আনমনে এগিয়ে চলেছিল সুপ্রিয়। শীত শীত বাতাস চলেছে পৌষালী। রোদ্দুর গায়ে লাগে না। পিচঢালা প্রশস্ত পথের দুই পাশে বিভিন্ন গাছের সারি। নাম-লেখা। গাছের কুলজী। সবুজ ঘাসের চত্বরে ছড়িয়ে আছে একেক দল চড়ুইভাতির পায়রা আর চড়াই। বকবকম করছে কেউ কেউ। শিশুর দল কিচির মিচির করছে। সুখাদ্যর লোভে ঝাঁক ঝাঁক কাক সভা সাজিয়ে বসেছে গাছের ডালে ডালে।

কারা কোথায় ট্রানজিস্টার রেডিওতে গান শুনছে চলতি ছায়াছবির।

গাছের বংশ-পরিচয় পড়তে পড়তে এগিয়ে চলেছে সুপ্রিয়। হাতে একটা কমলা লেবু। হঠাৎ কোথা থেকে ক্যাম্বিশের একটি বল ছুটতে ছুটতে এসে আঘাত খায় সুপ্রিয়র পায়ে। প্রথমে অপ্রস্তুত, তারপর সচেতন হয় সে। খেলোয়াড়ী ভঙ্গীতে বলটি হাতে তুলে নেয়। তারপর চোখ ফিরিয়েই দেখতে পায় আক্রমণকারীকে। নন্দিতা দাঁড়িয়ে আছে কেমন যেন ভীরু চোখে। হাত পাতলো নন্দিতা। মুখে মৃদু নম্র হাসি।

রাগের বদলে হাসি দেখা দেয় সুপ্রিয়র মুখে। সে পাকা ফিল্ডসম্যানের মত বলটি ছুঁড়ে দেয়। নন্দিতা নিজের হাতে দেখতে পায়, বল নয় কমলালেবু। আরও যেন লজ্জা পায় সে। আবার হাত পাতে ভিক্ষা প্রার্থনার ঢঙে। সুপ্রিয় তার হাতে ধরিয়ে দেয় ক্যাম্বিশের বল। এক ঝলক প্রসাধনী সুগন্ধ ভেসে আসে নন্দিতার বুকের জামা থেকে। নয়তো মাথা থেকে ঝুলন্ত অশ্বপুচ্ছ থেকে।

—চলে আসুন দাদা। চলে আসুন।

খেলার দল থেকে একটি কিশোর ছেলে ডাক দেয় সরবে সোৎসাহে। হাততালি দিয়ে ডাকে। ছেলেটির চালচলনে যেন টেস্ট খেলার উৎকণ্ঠা আর অনিশ্চয়তা।

ডাক শুনে স্থির করতে পারে না সুপ্রিয়। সাড়া দেবে কি দেবে না।

নন্দিতা হাসছে মুক্তোসারি দাঁত দেখিয়ে দেখিয়ে। রাঙানো লাল অধরে হাসির ঝিলিক। সূর্যের আলোয় চাকচিক্য তোলে কানের ঝুমকোজোড়া। গাছ-কোমর বেঁধেছে নন্দিতা। কালো রঙ শাড়ীর আঁচল জড়িয়েছে ক্ষীণকটিতে।

তারপর কখন যে খেলে মাঠ জিতিয়ে খেলায় জমে গেছে সুপ্রিয়, তা সে নিজেই জানে না। তখন সে দলের একজন। গোটা দুই ক্যাচ লুফেছে। স্রেফ পা বাড়িয়ে দিয়ে বাঁচিয়ে দিয়েছে অব্যর্থ একটা বাউণ্ডারি।

চোখাচোখি হয় নন্দিতার সঙ্গে। ক্ষণ-স্থায়ী দৃষ্টি বিনিময় একেকবার। নন্দিতাও মাঠে নেমেছে খেলতে। ফিল্ড করছে সমান তালে। ছুটতে ছুটতে বল ধরছে। চোখে চোখ পড়লেই হাসি হাসি মুখ দেখতে পায় সুপ্রিয়। দেখাদেখি হয় বার বার, কিন্তু একটিবারের জন্য স্পর্শসুখ অনুভব করে সে। নন্দিতার হাতে হাত লেগে যায় সুপ্রিয়র। যখন তার হাতে সে খেলার বল ধরিয়ে দেয়। ঠাণ্ডা আর কোমল পরশ লাগে সুপ্রিয়র হাতে। নন্দিতার নরম নরম হাতের ছোঁয়া।

এক মুহূর্তে। তাই-ই যথেষ্ট। সুপ্রিয় কখনও ভুলতে পারবে না সেই কোমল ঠাণ্ডা প্রথম স্পর্শস্মৃতি।

আর একবার নন্দিতা যেন স্বেচ্ছায় কাছে আসে। তখন খেলা ভেঙে গেছে। সূর্য ঢ'লে পড়েছে আকাশপ্রান্তে। শুভ্র রৌদ্র সোনালী-লাল রঙ ধরেছে। চড়ুইভাতির দলে পাততাড়ি গুটিয়ে ফেলার ব্যস্ততা লক্ষ্য করা যায়। এক ঝোপের আড়ালে তখন সুপ্রিয়। খেলার শেষে ক্লান্ত। একটি সিগারেট ধরিয়েছে সে। মুখ থেকে ধোঁয়ার বল ছেড়ে ছেড়ে বাতাসে উড়িয়ে দিতে থাকে।

—হেরে গেলেন শেষ পর্যন্ত! ছিঃ!

পাশ থেকে অতর্কিতে কথা বললে নন্দিতা। কালো রং শাড়ীর আঁচলের আঁটসাঁট বাঁধন আর নেই কোমরে। আঁচল পিঠে ঝুলছে।

—আবার কবে দেখা হবে আমাদের? আবার কবে দেখতে পাবো?

বক্তব্য অব্যক্ত রাখতে পারে না সুপ্রিয়। নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না মনের আবেগ। কথা ক'টি উচ্চারণের পরে লজ্জা পায় যেন। এধার সেধার দেখে চোখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে।

—হ্যাঁ দেখা হবে। কিন্তু কবে কখন কোথায়?

নন্দিতা বললে সম্মতির মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে। তার কথায় যেন ব্যাকুলতা।

—সামনের সোমবারে বেলা সাড়ে পাঁচটায়।

ব'লতে হয় তাই যেন না ভেবেই বলে সুপ্রিয়। একটা দিনক্ষণ জানিয়ে দেয় এক কথায়।

—কোথায়? যেন রুদ্ধশ্বাসে, চাপা উদ্বেগের সঙ্গে বলে নন্দিতা।

—নিউ মার্কেটের মেইন গেটে। গ্লোব সিনেমার সামনে। শ্বাস ফেলতে পারে না যেন সুপ্রিয়। শেষ কথা না শুনিয়ে।

—বেশ তাই হবে। আমি থাকবো সেখানে। কলেজ থেকে ফিরতি পথে। মৃদু মৃদু ঘনিষ্ঠ হাসি নন্দিতার মুখে। কেমন যেন লজ্জায় অস্ফুট। প্রথম দেখার, নতুন পরিচয়ের লজ্জা।

আর একটিও কথা বলে না কেউ। অবশ্য যা বলাবলি হয়েছে সামান্য কয়েকটি কথায়, তাই যথেষ্ট। কিছু আর বলতে বাকী থাকলো না। বিদায় গ্রহণের ব্যথাভরা চোখ দুজনের। ছাড়াছাড়ি হওয়ার বাস্তব বেদনা। বিরহ-বৈরাগ্য চোখে চোখে।

অনেক পরে সুপ্রিয়র মনে পড়লো। সে জানে না তার নাম। চেনে না তার ঠিকানা। সুপ্রিয় অদম্য কৌতূহলে জানতে চাইলো না কিছুই। অজ্ঞাত পরিচয়—যেন এক অলৌকিক ঘটনার মত অদ্ভুত ঠেকে সুপ্রিয়র। না-জানার সঙ্গে প্রেমের সুসম্পর্কে অনেক বেশী মাধুর্য। বিস্ময় নয়, রোমাঞ্চের শিহর সুপ্রিয়র বুকে। চক্ষে তৃষ্ণা নন্দিতার রূপের স্মৃতি তার বুকে জুড়ে আছে।

দেওয়াল-ঘড়িতে পাঁচটা বাজলো ঠং ঠং।

ছুটি হওয়ার মধুমুহূর্ত আবার এসেছে আজ। ঘড়ির ঠং-ঠং আওয়াজ কাজ-শেষের কলগুঞ্জনে কানে যায় না কারও। ঘড়ির কাঁটার সংকেতে ঠিক পাঁচটা বেজেছে। কাঁটায় কাঁটায় পাঁচ।

উলুধ্বনি শুনবে কোথায় সুপ্রিয়! যাত্রার ঠিক আগে, অফিস ত্যাগের প্রাক্কালে আজ শুনবে কোথায় সানাইয়ের মিঠে রাগিণী—চার দেওয়ালে ঘেরা এই অফিস আজ এখন মনে হয় কেমন যেন নীরস গদ্য। ম্যাটার অভ ফ্যাক্ট।

আলনা থেকে টুইডের কোট টেনে গায়ে চাপাতে থাকে সুপ্রিয়। আর খানিকক্ষণের মধ্যে সে দেখতে পাবে নন্দিতাকে। আজ তাকে পাওয়া যাবে নৈকট্যের আহ্বানে। একান্ত গোপনে।

—আরে, এই যে সুপ্রিয়!

কার গম্ভীর ব্যক্তিত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বর গমনোদ্যত সুপ্রিয়র পিছনে। কেন কে জানে বিরক্তির রেখা ফোটে তার কপালে। ভুরু বেঁকে ওঠে।

—তোমাকেই আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি সারা অফিসে।

আবার সেই একই কণ্ঠের কথা। সেই অদ্বিতীয় গাম্ভীর্য কথার সুরে।

—আমাকে কেন আবার এখন!

সুপ্রিয় যেন হতচকিতের মত বললে না দেখেই। তারপর পিছু ফিরতেই দেখলো যাকে তিনি সুপ্রিয়র হর্তাকর্তাবিধাতা অর্থাৎ বড়সায়েব। অর্থাৎ মিষ্টার মিটার। তাঁকে দেখে সুপ্রিয় কাঁপা কাঁপা কথা আবার বলে,—ও, আপনি আমাকে ডেকেছেন।

—কথা আছে তোমার সঙ্গে। অপেক্ষা করতে হবে দু-চার মিনিট।

অফিস-কর্তা মিষ্টার মিটার কথা বলতে বলতে নিজের কামরার দুয়োর ঠেলে খুলে ফেললেন। চোখে ভেসে উঠলো ঘরের উজ্জ্বল আলো। সেক্রেটারিয়েট টেবল। ঘূর্ণায়মান কেদারা। সুপ্রিয়র চোখে যেন একটা পিঁজরাপোল। যেন একটা খাঁচা। কি বলতে যায় সুপ্রিয় প্রতিবাদের ভাষায়, কিন্তু বলতে পারে না স্পষ্টভাবে। তার মুখে শব্দ শূন্যতা। চোখে নিষ্প্রভ দৃষ্টি। ঘরের যেন চুম্বক আকর্ষণে সুপ্রিয় ঘরের মধ্যে এসে পড়ে। চোখের ইশারায়

দিনের শেষে ফটো : বীথি সরকার

মিষ্টার মিটার একখানি শূন্য চেয়ার দেখিয়ে দিলেন। সুপ্রিয়র হাতে ধরিয়ে দিলেন প্রায় দিস্তাখানেক কাগজ। কি কারণে যেন কলিং-বেল টিপে ধরলেন সজোরে। বাজিয়ে চললেন এক নাগাড়ে।

বেয়ারা দুয়োর খুলে দেখা দিতেই বললেন,—দো পেয়ালা কফি। জলদি চাই।

স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র যেন এক। পাতার পর পাতা ওলটায় সুপ্রিয়। স্বেচ্ছায় সে কিছুই করছে না কিন্তু। যান্ত্রিক পদ্ধতিতে যেন চোখ বুলিয়ে চলেছে পাতায় পাতায়। নামের পর নাম. প্রতি পাতায়। ওজন আর মূল্যমান লাইনের পর লাইন। তালিকার শেষ নেই যেন। সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য।

—ধানবাদের ব্রাঞ্চ অফিস থেকে লিখিত রিপোর্ট এসেছে আজ। মিষ্টার মিটার বললেন একটা পেন্সিল দাঁতে কামড়ে। বললেন,—সুপ্রিয়, তোমাকে একটু সময় দিতে হবে। রিপোর্ট দেখে আমাকে বাৎলে দাও মাসের পর মাস কেন আমি হাজার হাজার টাকা ঘাটতি দিয়ে যাচ্ছি? লাভ হবে না কেন?

সুপ্রিয় জানে না কতক্ষণ সময় উৎরে গেছে পাতার পর পাতা চোখ বুলাতে। হয়তো বেশ কিছুক্ষণ। পৃষ্ঠাসংখ্যা যেন শেষ হয় না রিপোর্টের।

—আমার ধারণায় ব্রাঞ্চ অফিস মালের বিলি বন্দোবস্তে তেমন নজর দিচ্ছে না। হাতে স্টক থেকে যাচ্ছে মাসের পর মাস। স্টক জমে ওঠা মানেই টাকা আর রোল করছে না।

—ঠিকই বলেছো তুমি।

পেন্সিল নাচিয়ে নাচিয়ে বললেন মিষ্টার মিটার।

—তবে আমি এখন যাই?

বলতে ইচ্ছা হয় সজোরে স্বর কাঁপিয়ে, কিন্তু বলতে পারলো না সুপ্রিয়। তার শ্বাস আটকে যায় যেন। কান্নার সুরে সোচ্চারে বলতে চায় সে। টেবিলের ঘড়ি দেখা যায় না। মিষ্টার মিটারের দিকে যেন তাকিয়ে আছে টেবিল-ঘড়ি। কল্পনায়, মানস চোখে ঘড়ি দেখতে পায় সুপ্রিয়। জানে বেশ কিছুক্ষণ, আরও এগিয়ে গেছে সময়। কেননা সময় অপেক্ষা মানে না কারও। সময় নিত্য বহমান। অফিস-কর্তার হাতের উঁচানো পেন্সিলটি যেন একখানি ছুরির মত ধরা দেয় সুপ্রিয়র চোখে। মনে হয়, যেন ঐ ছুরি তার বুকে বিঁধিয়ে দিলেন মনিব। বড় বেশী বেদনাবোধ করছে সুপ্রিয়। বিয়োগ বিচ্ছেদের আশঙ্কায়। চিরবিরহের ভয়ে।

—তোমার মাইনে বাড়িয়ে দিচ্ছি আমি। কথার সুর নামিয়ে গুপ্তকথা বলার ভঙ্গীতে মিষ্টার মিটার বললেন। একটু থেমে আবার বললেন,—তুমি মাস কয়েক ব্রাঞ্চ অফিসে চলে যাও।

—আপনার দয়া স্যার। আপনি যেমন বলবেন।

—এখনই ঠিক পাকা কথা দিচ্ছি না কত টাকা ইনক্রিমেন্ট দিতে পারবো।

—না স্যার, এখনই কে পাকা কথা চাইছে আপনার কাছে! আপনার যা অভিরুচি হয়।

প্রতিটি কথা, প্রতিটি শব্দ এখন নন্দিতাকে দূরে, আরও দূরে সরিয়ে নিয়ে চলেছে। কেমন যেন এক শারীরিক অসুস্থতা অনুভব করে সুপ্রিয়। জ্বরজ্বর ভাব। সে যেন এই মুহূর্তে আবিষ্কার করেছে, নন্দিতা আর এখন তার জন্য অপেক্ষা করবে না। হয়তো নন্দিতা এতক্ষণে ব্যর্থ মনে ক্ষুব্ধ মনে ফিরে গেছে। আর কেনই বা অপেক্ষায় থাকবে প্রতীক্ষায় থাকবে নন্দিতার মত পরমাসুন্দরী মেয়ে। একেই তো সুপ্রিয়কে আদপে চেনেই না নন্দিতা। আরও হয়তো কত কে আছে নন্দিতার, যারা তার দর্শনপ্রার্থী। তারা হয়তো অনেক বেশী প্রিয়পাত্র।

—ব্রাঞ্চ অফিসের মাসে মাসে ঘাটতি তোমাকে বন্ধ করতে হবে সুপ্রিয়। আমি তোমাকেই পাঠাবো।

—আপনি যা বলবেন তাই করবো আমি।

সুপ্রিয়র কথা যেন নিস্তেজ। যেন এক নির্জীব কথা বলছে দুর্বল কন্ঠে।

—বলাবলি নয় আর। আমি ফাইনালি বলে দিলাম। যে কোনদিন তুমি স্টার্ট করতে পারো ফর ধানবাদ।

সে আর অপেক্ষা করবে না। সুপ্রিয় ভাবলো মনে মনে। কলকাতার মত কুখ্যাত শহরের রাস্তার ধারে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করবে তেমন মেয়ে নয় নন্দিতা।

ঘরে নীরবতা। বেয়ারা দুই পেয়ালা কফি বসিয়ে দিয়ে গেল নিঃশব্দে। পেয়ালা থেকে ধোঁয়া উঠছে। ঘরের নৈঃশব্দ যেন অসহ্ ঠেকছে সুপ্রিয়র।

—ভালই হবে তুমি ধানবাদে গেলে।

কথা বলতে বলতে কফির পেয়ালা মুখে তুললেন মিষ্টার মিটার।

—হ্যাঁ, আমিও সেখানে খুশীমনে যাবো। আপনি যখন বলেছেন।

—দেখো সুপ্রিয়, আমার ইচ্ছা হয় অফিসের প্রত্যেকটি কর্মচারীর সঙ্গে আমি মেলামেশা করি। তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হই। কিন্তু বাড়ীতে যদি থাকেন গৃহিণী অপেক্ষায় ব'সে, কি করতে পারি আমি!

কথার শেষে আবার পেয়ালা তুললেন মুখে। কয়েক চুমুক পান করলেন পর পর। বললেন,—জানো না তো, মেয়েরা অপেক্ষায় থাকতে হলে কি ভীষণ চটে যায়! বিয়ে হোক, সবই জানতে পারবে একদিন।

প্রায় ছটা বাজলো।

রাস্তা লম্বমান। চওড়া। রাজপথে মিছিল বেরিয়েছে যেন। ধাতব শোভাযাত্রা ঠিক। মোটর, ভ্যান, লরী, বাসের দূরপ্রসারী পংক্তি। যাচ্ছে আর আসছে। ট্যাক্সির ভেতর থেকে দুই পাশে লক্ষ্য করে সুপ্রিয়। দোকানের শো-কেসে; অফিসগৃহের দুয়োর-শীর্ষে দেখতে পাওয়া যায় হরেক-রকমের দেওয়াল-ঘড়ি। চলন্ত মেয়েদের হাতে দেখা যায় পাথরখচা হাত-ঘড়ির ঔজ্জ্বল্য। নন্দিতা নিশ্চয়ই আর অপেক্ষায় থাকবে না। নন্দিতা হয়তো কেন অবশ্যই চ'লে গেছে কখন। রূপবতী সুন্দরী মেয়ে। সে কখনও প্রতীক্ষায় থাকতে পারে নির্দিষ্ট সময়ের বেশী! কখনও নয়।

—একটু তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে না?

অধৈর্যের সঙ্গে প্রশ্ন করলে সুপ্রিয়। তার কথার সুরে যেন অস্পষ্ট। কথা বলতেও যেন কষ্ট।

সম্মুখে দুস্তর বাধা। মোটরগাড়ীর সারি, যেন শেষ নেই। পিপীলিকার সারি চলেছে যেন লাইন বেঁধে। কোথায় শুরু আর কোথায় যে শেষ, কে জানে!

—তাড়াতাড়ি যাবো কোথা দিয়ে স্যার! দেখতেই তো পাচ্ছেন। ট্যাক্সির ডানা থাকলে উড়ে যেতে পারতুম।

গাড়ীর চালক বললে গাড়ীর হর্ণ বাজাতে বাজাতে। শম্বুকগতিতে গাড়ী এগিয়ে চলেছে।

এই তো জীবন! পদে পদে বাধা আর বিপত্তি। ঠিক এই মুহূর্তে জীবন যেন বিষময় লাগছে সুপ্রিয়র। আধ ঘণ্টার বেশী দেরী হয়ে গেছে। অনেকটা সময়। আকস্মিক কোন একটা অস্বাভাবিক কাণ্ড না ঘটলে আর দেখা হবে না নন্দিতার সঙ্গে। বার বার মনে পড়ছে সেই সুন্দর মুখ-কান্তি। নন্দিতার দীর্ঘ আর আয়ত আঁখি-যুগল। তার কোমল আর ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শ। নন্দিতার পোশাক-পরিচ্ছদ। সব-সুন্দর। নন্দিতার কণ্ঠের কথা যেন সুপ্রিয়র কানে গুঞ্জন তুলছে। মনে পড়ে তার, নন্দিতার নাম-ঠিকানাও সে জানে না। কি আশ্চর্য!

রাস্তার গাড়ী পা পা এগিয়ে চলেছে শিশুর মত পদক্ষেপে।

শহরের ঘড়িগুলিতে সময়ের অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। আগামী কালের দিকে এক বাঁধাধরা ছন্দে ঘড়ির কাঁটা ধরে চলেছে।

আর একবার দুই চোখ মেলে এধার-সেধার দেখতে থাকলো সুপ্রিয়। চতুর্দিক থেকে উপহাসের অট্টহাসি ভেসে আসছে যেন। স্বপ্ন সার্থক হ'ল না সুপ্রিয়র। হঠাৎ নিজেকে মনে হয়, সে যেন সুপ্রিয় নয়, অন্য কেউ। নিজের অস্তিত্ব যেন ভুলে যেতে থাকে আতঙ্ক আর আশঙ্কায়। ছ'টা যখন বেজে গেছে তখন আর নন্দিতার মত লাবণ্যময়ী মেয়ে আর অপেক্ষা করতে পারে না। অসম্ভব কি সম্ভব হ'তে পারে!

চলন্ত ট্যাক্সি থেকে রাস্তায় প্রায় লাফিয়ে পড়লো সুপ্রিয়। ট্যাক্সির মিটার দেখে সে তার আগেই গাড়ীর সামনের আসনে ফেলে দিয়েছে দুখানি এক টাকার নোট। হয়তো ভাড়া কিছু বেশী দিয়ে দিয়েছে। ফেরতের পয়সা নেওয়ার সময় পায় না। ফুটপাতের জনতার ভিড় ঠেলে সুপ্রিয় যেন দৌড়তে শুরু করে। সকলকেই দেখছে যেন সে। কিন্তু চোখে শূন্য চাউনি। অন্ধের চোখ যেন। ট্যাক্সির ড্রাই-ভারকে ব'লে যায়,—চলে যাবেন না যেন। একটু অপেক্ষা করুন। আমি এখুনি আসছি জানবেন।

—দেখবেন মশাই, খুব বেশী দেরী করবেন না।

গাড়ীর চালক গাড়ীর ব্রেক কষতে কষতে বললে। গাড়ী ভিড়িয়ে দিয়েছে সে রাস্তার ধারে, ফুটপাতের গায়ে।

ঐ তো দাঁড়িয়ে আছে নন্দিতা।

চার চোখের দৃষ্টি বিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গে চার চোখে যেন হীরার দ্যুতি ঠিকরে জ্বলে।

ফর্সা আর নিটোল হাতখানি এগিয়ে ধরে নন্দিতা।

ট্যাক্সি আবার যাত্রা শুরু করে ঈষৎ গর্জন তুলে।

পিছন-দেখার এক টুকরো আয়না চালকের সম্মুখে। সেই আয়নায় প্রতিফলন, প্রতিবিম্ব দেখতে পায় ট্যাক্সিচালক। দেখতে পাওয়া যায় দুজন যাত্রীকে। সুপ্রিয় আর নন্দিতাকে। একটি ছেলের পাশে একটি সুন্দরী মেয়ে—যার জোড়া দেখতে পাওয়া যায় না। নন্দিতার চুলের বাহার চোখে পড়ে চালকের। নন্দিতার হাল-ফ্যাশনের জামা আর শাড়ী।

দুজনের হাতে হাত। মুখের কাছে মুখ।

ট্যাক্সির চালক ভাবতে পারে না কি ঘটছে। ট্যাক্সির গতি সহসা বৃদ্ধি পায়। দ্রুততম বেগে গাড়ী চালিয়ে দেয় সে।

বিদ্যুত গতিতে গাড়ী ছুটেছে। সুপ্রিয় একটি শ্বাস ফেললে সশব্দে। একটি দীর্ঘ-শ্বাস। নন্দিতার ফর্সা কপালে যেন শ্বাসের উষ্ণতা লাগে। আরও নিকটে সরে যায় নন্দিতা। শুনতে পায়, সুপ্রিয়র বুকের দুরু দুরু স্পন্দন। নন্দিতা ফিসফিসিয়ে বললে,—সময় অপেক্ষা করে না, কিন্তু মেয়েরা অপেক্ষায় থাকে।

সুপ্রিয়র মুখে খুশীর প্রসন্ন হাসি। বাহুর বাঁধনে বেঁধে রেখেছে নন্দিতাকে। গাড়ী ছুটছে ঝড়ের বেগে। রেড রোডের চকচকে প্রশস্ত পথ ধরে ট্যাক্সি ছুটে

দুজনের হাতে হাত............

চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় গাড়ীর চালক। সে দেখতে পেয়েছে মেয়েটির উন্মুখ মুখ। হয়তা হাসি ফুটবে এই মুহূর্তে। হয়তো সে কিছু বলতে চায় গোপন কথা। হয়তো চুমু খাওয়াতে চায় সুখের আনন্দে। হতবুদ্ধির মত চালক যেন বিব্রত বোধ করছে দেখে দেখে। সে অনু-মানে বুঝছে একটা গোপনতম কিছু চলছে এখন। একটা কিছু অসাধারণ ঘটনা। অচেনা অজানাদের দেখবার বা জানবার কোন অধিকারই নেই।

চলেছে। পিছনের গাড়ী থেকে হেড-লাইটের আলো পড়েছে জোরালো। দেখা যায় দুটিতে এক তখন। মুখোমুখি।

মধু পান করছে যেন মৌমাছি। তাজা আর টাটকা ফুলের মিষ্টি মধু।

ছুটন্ত এক যান্ত্রিক গাড়ীর গহ্বরে এখন যেন স্বর্গ সৃষ্টি হয়েছে। দু'হুজনের মিলন-বাসর। অভিসারের নিভৃত নিকুঞ্জ।

নন্দিতার মুখে আত্মদানের খুশী খুশী হাসি। মিলনের মায়াজালে সে তখন বন্দিনী।

ছেলে বাঁচলো না! পর পর দু'বার সিজারিয়ান হলো, কিন্তু দু'বারই বিফল চেষ্টা।

ডাক্তার নিয়োগী হতাশ ভাবে বল্লেন, মেডিক্যাল সায়েন্স নিয়ে আমাদের কারবার, তাই ভাগ্য বলে কোনো কিছুকে মানা আমাদের সম্ভব নয়। তা'হলেও হিন্দুর ছেলে তো বটেই, সেই সংস্কার থেকেই বলছি, মিঃ মল্লিক, আপনার ও আপনার স্ত্রীর দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, সন্তান-সুখ বোধহয় আপনাদের কপালে নেই! নইলে পর পর দু'বারের চেষ্টাই এভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল এবং তাও আবার ডেলিভারির পর!

প্রশান্তর কানে ডাক্তারের কোনো কথাই ঢুকছিল না। ডাক্তার চ'লে গেলেন।

দুই বৌ

দক্ষিণারঞ্জন বসু
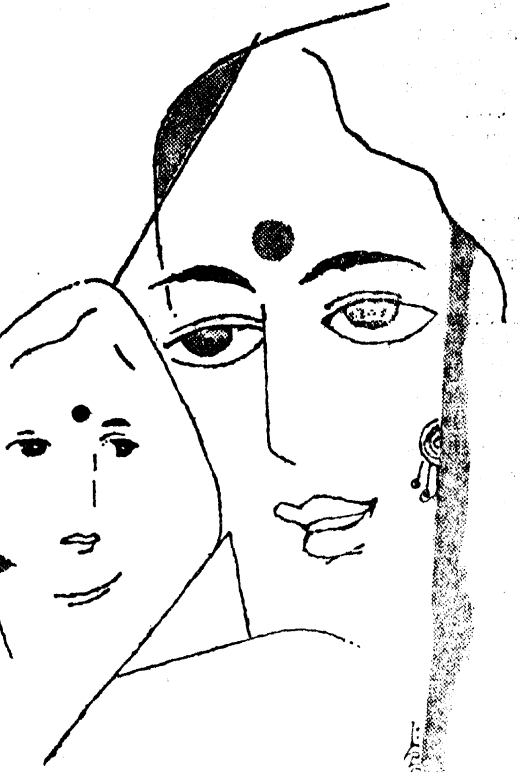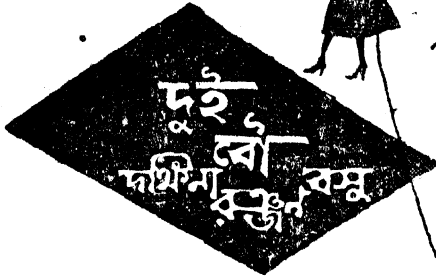
বাচ্চাটা মারা গেছে, এ খবর কি মন্দিরা এতক্ষণে পেয়েছে?—কেবিনে ঢুকে এ প্রশ্ন মনে এলেও কাউকে জিজ্ঞেস করার মতো সাহস নেই প্রশান্তর। কারণ কেবিনে তখন চোখ বুজে মরার মতো পড়েছিল মন্দিরা—একজন নার্স তার সেবা করছিল।

অনেকক্ষণ বাদে একবার চোখ মেলে চাইল মন্দিরা। পরক্ষণেই আবার সে চোখ বন্ধ হয়ে গেল। মুহূর্তের সেই দৃষ্টি লক্ষ্য করেই প্রশান্তর মনে হলো, শিশুর মৃত্যুর খবর মন্দিরা পেয়ে গেছে। না হলে শত কষ্ট সত্ত্বেও তার দিকে একটিবার অন্তত ভালোভাবে তাকাতো, একটু তৃপ্তির হাসি ওর মুখে ফুটে উঠত প্রশান্তকে দেখতে পেয়ে।

টুলের ওপর মুখ নামিয়ে বসে থেকে থেকে প্রশান্ত হঠাৎ একবার উঠে এল মন্দিরার মাথার দিকে। মাথায় হাত রাখল তার, আস্তে আস্তে হাত বুলোতে লাগল।

একটু আগেই নার্স বেশ টেনে চুল বেঁধে দিয়েছিল মন্দিরার, কিন্তু পাখার হাওয়ায় দু'টো একটা চুল বারে বারেই এসে উড়ে পড়ছিল মুখের ওপর। সেই নিস্তেজ, ক্লান্ত আর করুণ মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে নিজেকে আর সামলাতে পারছিল না প্রশান্ত।

মন্দিরা, খুব কষ্ট হচ্ছে তোমার?

প্রশান্তর প্রশ্ন কানে যেতেই মন্দিরার চোখের পাতা জোড়া যেন একটু কেঁপে উঠল। তার পরেই দু'চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে এল জল। নার্স এগিয়ে এসে চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে গেল। মন্দিরা একবার তাকিয়ে দেখল। নার্স ঠোঁটে আঙুল লাগিয়ে ইসারা করল কোনো কথা না বলতে।

চোখ না খুলেই নিঃশব্দে কাঁদতে শুরু করল মন্দিরা। বালিশ ভিজে গেল সে কান্নায়।

প্রশান্তর মনে হলো, এর চেয়ে মন্দিরা ডাক ছেড়ে জোরে জোরে কাঁদুক। এই নিঃশব্দ কান্না প্রশান্তকে যেন বেদনায় ভেঙে চুরমার করে ফেলতে থাকে। সে আর এই দৃশ্য সহ্য করতে পারছে না।

আর ঠিক সেই সময়েই প্রশান্তর মা, দু'বোন আর ছোট ভাই হাসপাতালে এসে উপস্থিত। এসেই দুঃসংবাদে সবাই সচকিত।

কেবিনে বসেই মা তাঁর মনের খেদ প্রকাশ করতে শুরু করে দিলেন। কপালে করাঘাত করে বল্লেন, একেই বলে কপাল! একটি মাত্র বৌ—পাঁচ বছর বিয়ে হয়েছে, দু' দু'বার ছেলে হতে গিয়ে ছেলে হারালো। কী অদৃষ্ট! আমার সুখের সংসারে এ কী অশান্তি!

প্রশান্ত মাকে বোঝাতে চেষ্টা করলো। বল্লে, এখানে বেশি কথা বলো না মা, ওর অবস্থা এখনো খুবই খারাপ। এত কথা-বার্তায় ওর হয়তো ক্ষতি হবে।

তুই থাম। কোথায় কতটুকু কি বলতে হয় না হয় সে আমি জানি, আমায় শেখাতে হবে না।—এক ধমকে মা থামিয়ে দিলেন ছেলেকে।

কিন্তু প্রশান্ত থামলেও মা থামলেন না। এদিকে মন্দিরার চোখের জলেরও আর বিরাম নেই। মায়েরও সেদিনের বিলাপ এর পর ক্রমে ক্রমে প্রলাপেই গিয়ে পরিণত হলো।

নাতির মুখ দেখা আর আমার অদৃষ্টে নেই। বহুজন্মের পাপের ফল আমাকে ভুগতেই হবে। আমি জানি নরকের দরজা আমার জন্যে খোলাই রয়েছে।—এমনি সব আপশোষের কথা হামেসাই শোনা যায়

প্রশান্তর মা'র মুখে। এবং তার জন্যে অনেক লোকের সমবেদনাও তাঁর জোটে।

কিন্তু মা না হতে পারার ব্যথা সে কি বড়ো কম মন্দিরার? সেই যে পর পর দু'বারের দুটো কঠিন আঘাত, তার পরেও অনেকগুলো বছর কেটে গেল। এর মধ্যে মন্দিরার আর কোনো সন্তান সম্ভাবনা দেখা দেয়নি। একদিক থেকে ভালোই হয়েছে। অন্তত মন্দিরা তাই মনে করে। আশা নিয়েই সে বেঁচে আছে, আশা নিয়েই সে বেঁচে থাকতে চায়।

ডাক্তারদের মতে মন্দিরার পেটে আর একবার মাত্র অস্ত্রোপচার করা চলতে পারে অর্থাৎ সন্তান হবার আশা সে আর মাত্র একটিবারই করতে পারে। সেই সুন্দর আশাকে মন্দিরা নির্মূল করে দিতে চায় না।

স্বাভাবিকভাবে সন্তান প্রসবের কোনো সম্ভাবনাই নাকি নেই মন্দিরার। সে কথা সে জেনেছে। এবং সে কথা সে জানে বলেই এ ব্যাপারে সে একেবারে নীরব হয়ে গেছে।

সংসার। এই সংসার নিয়েই মন্দিরা মত্ত। ভোর থেকে রাত এগারোটা অবধি সংসারের চাকা ঘোরানোই তার কাজ। সন্তান না থাক তাতে কি, শ্বশুর-শাশুড়ী আছেন, আছেন দিদিমা-পিসীমা, দেওর-ননদেরা— সেবা পাবার লোকের অভাব নেই। কিন্তু সেবাতেই কি সব সময় সকলকে খুশি রাখা সম্ভব? স্বামী মোটা মাইনের চাকরি করেন সরকারী অফিসে এবং সংসারেও মোটা টাকাই ঢালেন। তাই রক্ষে, তা' না হলে আরো কী যে কপালে ছিল ভগবানই জানেন। অথচ রূপে-গুণে মন্দিরাকে আর পাঁচটা মেয়ের তুলনায় ভালোই বলা যেতে পারে। চেহারা সুশ্রী, রং ফর্সা, গড়ন মাঝারি। লেখাপড়ার দিক থেকেও সে কোনো অংশেই খাটো নয়। তবে দুঃখের এই, ইংরেজীতে ফার্স্ট ক্লাস অনার্স পেয়েও এম-এ-টা আর তার পড়া হয়নি। ভাগ্যে বি-এ পরীক্ষাটা সে বিয়ের আগেই দিয়েছিল, তা' না হলে হয়তো তাতেও বাধা পড়তো।

মন্দিরার এম-এ পড়া হয়নি অনুমতি পাওয়া যায়নি বলে। পড়ার সুযোগ পেলে তার মতো মেয়ের ইংরেজীতে এম-এ পাশ করা মোটেই কঠিন হতো না। ইউনি-ভার্সিটিতে ভর্তি হবার প্রস্তাব করতেই শাশুড়ী বল্লেন, যথেষ্ট হয়েছে, ছেলের সমান বিদ্যে হয়ে আর কাজ নেই।

তারপর থেকে সেই যে শুরু হয়েছে হাতাবেড়ি দিয়ে রান্না, পান সাজা, ঘরদোর ঝাড়পোছ করা, লোকজনকে খাওয়ানো-দাওয়ানো এবং সংসারের আর সব খুঁটি-নাটি দেখা—তার আর বিরাম নেই।

প্রশান্ত ছোটবেলা থেকেই বাপ-মা'র ওপর বড্ড বেশি অনুরক্ত। অনেকের চোখেই সেটা দুর্বলতা বলেই ধরা পড়তো। বড়ো হয়েও সে দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি প্রশান্ত। স্ত্রীর কষ্টটা তার খুবই গায়ে লাগত সন্দেহ নেই, কিন্তু তার চেয়েও সে বেশি কষ্ট পেত তার কোনো কথায় বা কাজে বাবা-মা আঘাত পাবেন এই ভেবে।

সংসারের চেহারাটা ক্রমশই যেন কেমন হয়ে চলেছে, প্রশান্তর মনে এই চিন্তাটা এসে সময় সময় জুড়ে বসে। মন্দিরা অবশ্য কোনো অভিযোগ করার মেয়ে নয়। তা' হলেও প্রশান্তও তো অন্ধ নয়—তার স্ত্রীর অভাব কিসের, তার দুঃখ-বেদনা কোথায়, এ কি আর সে জানে না? সবই জানে। কিন্তু বাপ-মা, ভাই-বোনের মনে আঘাত দিয়ে কোনো প্রতিকারের কথাই যে সে ভাবতে পারে না। তাই প্রতিকারহীন পথেই সংসারের রথ এগিয়ে চলে।

মন্দিরার নিজেরই বা আর কী করার আছে? ছোটবেলা থেকে সে এমন একটা গণ্ডীর ভেতরে বড়ো হয়ে উঠেছে যেখানে সহজ ছিল সব কিছু। পড়াশুনো নিয়ে দিন তার ভালোই কেটেছে। কিন্তু বিয়ের পর সে তার স্বামীকে মনের যত কাছে পেল ততই দূরে মনে হতে লাগল স্বামীর মা ও ভাই-বোনদের। একালের লেখাপড়া জানা মেয়েদের প্রতি শাশুড়ীশ্রেণীর এখনো অবজ্ঞা-মিশ্রিত ভাব রয়েছে, মন্দিরা সেটা জানত। কিন্তু সেজন্যে তত দুঃখ ছিল না তার, সে দুঃখ পেত একালের মানুষ হয়ে জন্মেও এবং লেখাপড়া শিখেও সেকালের মনকে আঁকড়ে-থাকা দুই ননদের ব্যবহারে।

শাশুড়ী তাঁর নিজের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে মোটেই বিরূপ ছিলেন না, যত আপত্তি অপ্রসন্নতা পরের ঘরের মেয়ের বেলায়। মন্দিরার এম-এ পড়ার পথে সুধাময়ীই মূল বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। শ্বশুরের এতটুকু অমত ছিল না তাতে। কিন্তু কে না জানে সংসারে শ্বশুরদের অবস্থা কত অসহায়, শাশুড়ী-দের ইচ্ছেই সেখানে প্রবল। এই ব্যাপারেও সুধাময়ীর অমতের কাছে বিজয়লালকে একেবারে চুপ করে যেতে হয়েছিল। তবে শিক্ষিতা ননদদের কাছ থেকেও যে সে সমর্থন পাবে না, এ কথনো ভাবতে পারেনি মন্দিরা। সেখানেই তার বড়ো দুঃখ। তবু যে সে সকলের মনোরঞ্জনে কোথাও কোনো-দিন এতটুকু কসুর করেনি সেটাই আশ্চর্য।

সুধাময়ী সত্যি সত্যি ভেবেছিলেন, পড়তে বাধা পাওয়ায় বনেদি ঘরের একেলে মেয়ে মন্দিরা হয়তো ভীষণ রকমের একটা হটুগোল বাঁধিয়ে বসবে। কিন্তু তার যখন কোনো লক্ষণই দেখা গেল না তখন সবাইকেই অবাক হতে হলো।

বাস্তবিক পক্ষে একটু ভয়ে ভয়েই সুধাময়ী অনেক রাতে ছেলের ঘরের দিকে দু'তিনবার কান পেতেছিলেন। না, উত্তেজনার বা অভিমানের কোনো কথাই তাঁর কানে আসেনি। বরং পরদিন সকালবেলা ঠিক সময়েই বৌ তাঁর জলখাবারের থালাটি নিয়ে দিব্যি হাসি মুখে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মন্দিরার মনের নাগাল কিছুতেই যেন পান না সুধাময়ী। কাজেকর্মে একেবারে নিখুঁত, কোথাও এতটুকু দোষ ধরবার উপায় রাখে না মেয়েটা। শেষ পর্যন্ত এতদিন বাদে একটা দোষ আবিষ্কার করা গেল। দোষের মতো দোষই বটে!

মন্দিরা মা হতে পারল না। বিয়ের পর পাঁচ-ছয় বছর কেটে গেল তবুও না। দু'-দু'বার মা হয়েও সে সুখ থেকে তাকে বঞ্চিত হতে হলো। কোনো মেয়ের জীবনে এর চেয়ে দুঃখের আর কী হতে পারে?

বিয়ের পর থেকে এতগুলো বছর ধরে অনেক নির্যাতন, অনেক দুঃসহ কথার শরাঘাত সহ্য করেছে মন্দিরা। ক্রমে ক্রমে সবই তার গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। এবং এও সে ধরে নিয়েছে সন্তানধারণে অক্ষমতার জন্যে অন্য কেউ নয়, সে নিজেই দোষী, সে জন্যে দায়ী তার দৈহিক পঙ্গুতা। কাজেই শ্বশুর-শাশুড়ীকে যে নাতির মুখ দেখার আনন্দ থেকে বঞ্চিত থাকতে হচ্ছে সে অপরাধের ষোল আনাই তো তার। তাইতো নিজে মা হতে না পারার দুঃখ যে কি তা' আর সে তেমন আলাদা করে ভেবে দেখার সময় পায়নি। বিশেষ করে তার শাশুড়ীর দুঃখেই সে মরমে মরে রয়েছে।

প্রশান্তদের বাড়িতে প্রায় বিরুদ্ধ পরি-বেশের মধ্যেই এতগুলো বছর কেটে গেল মন্দিরার জীবনের, কিন্তু তার স্বভাবের বা আচরণের পরিবর্তন এতটুকু হলো না, সেও কম আশ্চর্যের কথা নয়। চেহারা তার আরো সুন্দর হয়েছে, তবে দিন দিন যেন একটু বেশিই ভারি হয়ে পড়ছে।

মন্দিরাকে তাই কাছে টেনে নিয়ে, প্রায়ই প্রশান্ত বলে, চলো না, কিছুদিনের জন্যে আমরা বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসি। বাড়িতে থেকে থেকে তুমি যেন কেমন হয়ে যাচ্ছ!

স্বামীর কথায় হাসে মন্দিরা। তারপর বলে, হবে, বাড়িতে আরেকটা বউ আসুক আগে, আমি তার হাতে সংসারের সব ভার দিয়ে তোমার সঙ্গে নিশ্চিন্তে বেড়াতে বেরোব।

উত্তরে প্রশান্ত বলে, তবেই হয়েছে।

কেন হবে না? —মন্দিরা স্নান সেরে এসে নিজের ঘরেই শাড়িটা ঘুরিয়ে পরতে পরতে জবাব দেয়। বলে, নতুন বৌ যে আসবে সেও তো একটি মেয়ে। আর সেও নিশ্চয়ই সংসার করতেই চাইবে। সংসারের দায় দায়িত্ব না নিয়ে কি আর সংসার করা চলে?

আচ্ছা, দেখাই যাক। —স্ত্রীর কথার উত্তরে আর কথা বাড়াতে চায় না প্রশান্ত। নেহাৎ নির্লিপ্তভাবেই ছোট্ট এই জবাবটুকু দিয়ে চুপ করে যায় সে।

আরও বেশ কিছুকাল পরের কথা।

প্রশান্তর ভাই সুকান্ত শীগ্গিরই পশ্চিম জার্মানী থেকে ফিরছে। প্রশান্তই অনেক ছুটোছুটি দৌড়োদৌড়ি করে ছোট ভাইকে পাঠিয়েছিল জার্মানীতে। উচ্চশিক্ষা শেষ করে চার বছর পর সুকান্ত দেশে আসছে খবর এসেছে। সে খবরে বাড়ির সবাই উল্লসিত, তবে সুধাময়ী আনন্দে একেবারে গদগদ।

ছেলে মানুষের মতো মানুষ হয়ে আসছে, সুকান্ত তাঁর দশজনের একজন হয়ে মাথা উঁচু করে চলবে—এমনি ভাবনায় কোন মা-ইবা না গর্বে-গৌরবে ফেটে পড়ে? সুধাময়ীরও সেই অবস্থাই দাঁড়িয়েছে। তাঁর একটি বাড়তি চিন্তা রয়েছে। সে হলো, সুকান্তর জন্যে আগে থেকেই মনের

মতো একটি ফুটফুটে বৌ পছন্দ করে রাখতে হবে। বৌ-এর গড়ন-পেটন খুব ভালো করে দেখে নিতে হবে, আশ-পাশের লোকজনদের কাছে থেকে মেয়েটির ভালো-মন্দ সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়ে নিশ্চিন্ত হতে হবে। একবারের শিক্ষায় সুধাময়ীর এই সতর্কতা, আগের মতো যেন আর না হয়।

লেখাপড়া অত বরং নাই বা হলো, বউ চাই সুন্দরী, গড়ন-পেটনে মজবুত আর ব্যবহারে ভালো।

এ কথা শুনে বড় মেয়ে মাধবী বল্লে, কী যে তুমি বলো মা! মেজদা বিদেশ থেকে অত বড় ডিগ্রি নিয়ে আসছেন আর বৌদি বুঝি কম লেখাপড়া জানা হলে চলে? শুনলাম তুমি নাকি তোমার দাদাদের ওপর মেজদার বৌ খোঁজার ভার দিয়েছ। ওসব সেকেলে লোকের পছন্দে চলবে না, আগেই বলে দিচ্ছি।

ঠিক বলেছিস দিদি, ঠিক বলেছিস! —ছোট মেয়ে কমলা মাধবীকে পুরো সমর্থন জানায়।

মেয়েদের এই সমালোচনায়ও মা বিরক্ত হলেন না। বরং বল্লেন, তা' তোরা যা ভালো বুঝিস তাই হবে। আমার তো এখন তিন-কাল গিয়ে এক কাল। তবে আমার আবার কপাল খারাপ, তাই ভয়।

সুকান্ত আসবার দিন সাত আগে এক-খানা চিঠি সঙ্গে নিয়ে এসে হাজির সুকান্তর পুরনো বন্ধু অপরেশ।

বেশ খুশি খুশি মুখ। সামনে দিয়ে মন্দিরাকে চলে যেতে দেখে অপরেশ বল্লে, বৌদি শুনুন, মাসীমা কোথায়? শুভ খবর আছে, মাসীমাকে শীগ্গির মিষ্টি নিয়ে আসতে বলুন।

সুখবরের বিষম নেশা। একটু জানলে আরো জানবার জন্যে আকুলতা আসবেই। বিস্তারিত না জানা অবধি সে আগ্রহের নিবৃত্তি নেই।

"চলো না, কিছুদিনের জন্যে আমরা বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসি।"

অপরেশের হাঁক শুনে সুধাময়ী তো ছুটে এলেনই, এদিক সেদিক থেকে মাধবী, কমলা এবং ছোটছেলে জয়ন্তও এসে জড়ো হয়ে গেল সেখানে। শুভ খবরটা কি তা' জানবার জন্যে সবাই অস্থির।

এই দেখুন মাসীমা সুকান্তর চিঠি। আজই পেলাম। —বলে পকেট থেকে বার করে চিঠিখানা তুলে ধরে অপরেশ। তারপরে আবার বল্লে, সুকান্ত একেবারে বৌ নিয়েই আসছে জার্মানী থেকে, আর ওদের সঙ্গেই আসছে আপনার বংশের প্রথম নাতি—পাঁচ মাসের শিশু।

কমলা একবার বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকায় মাধবীর দিকে। অপরেশদা কি সত্যি কথা বলছেন না তামাসা করছেন তাদের সঙ্গে, মনে তার সেই প্রশ্ন। শুধু তার নয়, তাদের সকলেরই। সকলেরই মুখগুলো যেন লম্বা হয়ে গেছে অপরেশের কথা শুনে। সবাই নির্বাক।

শুনুন মাসীমা, আরো কথা বলবার আছে। —একটু দম নিয়ে অপরেশ আবার বলতে শুরু করে।

হ্যাঁ, সুকান্ত লিখেছে, ওরা এসে প্রথমে হোটেলেই উঠবে, তারপরে ধীরে-সুস্থে পছন্দ মতো একটা ফ্ল্যাট ঠিক করে নেবে। আপনাদের ওর বিয়ের কথা, ছেলে হওয়ার কথা ও লজ্জায় জানাতে পারেনি। কিন্তু এ আর এমন লজ্জার কি, বলুন তো মাসীমা! আজকাল কি আর সেদিন আছে? তাছাড়া জার্মান মেয়েদের তো খুবে সুনাম!

সুনাম না হাতি! —মাধবী একটা মুখ ঝামটা দিয়ে সরে পড়ে সেখান থেকে। তার মনটা বিষিয়ে উঠেছে অপরেশদার কথা-বার্তায়। সে সটান নিজের ঘরে চলে গেল। কমলাও বলতে বলতে চলে গেল, মেজদা তাহলে বাড়িতেই আসবেন না, দিদি, হোটেলেই থাকবেন! এই কথাটুকু বলতে গিয়ে কমলার গলাটা কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

সুধাময়ীর মাথার মধ্যে তখন বিশ্ব-সংসার পাক খাচ্ছে। চোখের সামনে যেন তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন, তাঁর এত-দিনের সাজানো সংসার তছনছ হয়ে যাচ্ছে! হঠাৎ তাঁর মনে হলো, তাঁর পায়ের তলায় কোনো মাটি নেই, তিনি এখুনি পড়ে যাবেন। তাড়াতাড়ি তিনি দুহাতে জড়িয়ে ধরে ফেল্লেন তাঁর পাশেই নিশ্চল মূর্তির মতো দাঁড়ানো মন্দিরাকে।

শাশুড়ীর অসহায় অবস্থা দেখে মন্দিরাও দুহাতে তাঁকে শক্ত করে ধরে রাখলো। সুধাময়ী বড়বৌয়ের বুকের ওপর মাথাটা হেলিয়ে দিয়ে কোনো রকমে বল্লেন, চলো মা, তোমার ঘরেই আমাকে একটু শুইয়ে দেবে চলো।

বিকেলে আফিস থেকে ফিরে এসে প্রশান্ত দেখলে সারা বাড়িময় কেমন একটা অস্বাভা-বিক স্তব্ধতা। সেও অবাক হয়ে গেল।

রাত্রে যেদিন প্রথম আসে সেদিনকার কথাটা আমার মনে আছে পরিষ্কার। সামনেই বসেছিলাম, অলসভাবে কিছুটা সমুদ্র আর কিছুটা পাশের টেবিলের খেলা দেখছিলাম। কাজ কিছুই নেই। সকালের জলযোগ হজম হয়ে এসেছে, মধ্যাহ্ন-ভোজনের এখনও ঢের দেরি—সুযোগ-সুবিধা মতো কোন খাবারওলা ডেকে কিছু খেয়ে নেওয়া যায় কিনা—তখন একমাত্র সেই চিন্তা। ঠিক সেই গুরুত্বপূর্ণ সময়টিতেই অর্থাৎ বেলা দশটা নাগাদ একটি রিক্সা থেকে এসে নামলেন ভদ্রলোক।

কালো কষ্টি পাথরের মতো রং—কিন্তু লম্বা-চওড়া বেশ দশাসই চেহারা। বয়স ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে। দামী ট্রাউজার আর টেরিলিনের শার্ট—আর্থ কৌলীন্য ঘোষণা করছে, যদিচ একটি হাওয়াই-জাহাজ-মার্কা হাতে-ঝোলানো ব্যাগ ছাড়া সঙ্গে কোন মালপত্র দেখলাম না। ভদ্র-লোক যে অবাঙ্গালী সেটা তাঁর দিকে চাইলেই বোঝা যায়—কিন্তু তিনি এগিয়ে এসে পরিষ্কার বাঙলাতেই প্রশ্ন করলেন, 'দাদা, অফিস ঘরটা কোথায়?'

বাঙলা ভালই বলছেন কিন্তু বাঁকা টানটা যায় নি। টানটা দক্ষিণ ভারতীয় ঘেঁষা; অর্থাৎ হায়দ্রাবাদ কি মহীশূর কি মাদ্রাজের দিকে কোথাও বাড়ি হবে—দীর্ঘ দিন বাঙলা দেশে কিম্বা বাঙালীর সাহচর্যে থেকে এত ভাল বাঙলা শিখেছেন।

আমি উত্তর দেবার আগেই আমাদের লাউঞ্জের পিছনে অফিস ঘরটা নজরে পড়ে গেল তাঁর, 'ও পেয়ে গেছি, থ্যাংক্ ইউ অল দি সেম'—বলে সেই দিকে এগোচ্ছেন, এমন সময় সাক্ষাৎ মিঃ ঘোষালই ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন। আমি তাঁকে দেখিয়ে বললাম, 'ইনিই এখানকার ম্যানেজিং প্রোপ্রাইটার—এঁর সঙ্গেই কথা বলতে পারেন।'

ভদ্রলোক যেন একটা লাফ দিয়ে নেচে উঠলেন একবার, 'হ্যালো হ্যালো হ্যালো—আপনিই মিঃ জয়দেব ঘোষাল! ও আপনার এত কথা শুনেছি আপনার বন্ধু মহাদেব সরকারের মুখে যে আমিও আপনার বন্ধু বনে গেছি ধরে নিতে পারেন। যাক—এ সময় যে আপনার দেখা পাব তা ভাবিনি, মহাদেববাবু বলেন এটা আপনার বাজার করার সময়।'

ততক্ষণে মিঃ ঘোষালের দুটি হাতই ভদ্র-লোকের প্রায় বজ্রমুষ্টির মধ্যে গিয়ে পড়েছে। কিন্তু মিঃ ঘোষাল খুশী। মহাদেববাবু তাঁর দীর্ঘকালের বন্ধু, যখন এই হোটেলের নিজস্ব চারতলা বাড়ি হয় নি—তখন থেকেই।

তিনি বললেন, 'ঠিকই বলেছে মহাদেব, আমি এইমাত্র ফিরছি বাজার থেকে। ট্রেনটা এসে গেল দেখেই আরও হুটোপাটি করে ফিরলাম।...আপনি মহাদেব সরকার—মানে আমাদের বাঁকুড়ার মাষ্টারমশাইয়ের কথা বলছেন তো—?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ—আবার কে! ঐ যিনি রেল ইস্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন আগে!'

'আমিও তাই ভেবেছি, নইলে আমার সম্বন্ধে এত কথা আর বলবে কে! তা আসুন আসুন—আপনার আর মাল কৈ? সঙ্গে আর কেউ আছে নাকি?—অন্য গাড়িতে!'

'কেউ না, কেউ না। স্রেফ একা। মাল আর নেই ঘোষালদা। কাল রাত্রে বেঞ্চের তলায় রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম স্যুট-কেশটা—সকালে উঠে দেখি আমার কোন্ বন্ধুর দরকার পড়েছিল তাতে, নিয়ে নেমে গেছেন। স্টীপারে যে আবার এ সব উৎপাত হবে তা ভাবিনি। ভাগ্যিস এই ব্যাগটা মাথায় দিয়ে শুয়েছিলাম—নইলে বোধ হয় এটাও যেত। এটা গেলেই চমৎকার হ'ত একেবারে, ভিক্ষে করতে করতে ফিরতে হ'ত—এইতেই এথি-টেথি সব ছিল, মায় টিকিট পর্যন্ত।'

ঈষৎ কি একটু সংশয়ের মেঘ দেখা দিল জয়দেব ঘোষালের প্রসন্ন মুখাকাশে?

দিলেও সেটা ও ভদ্রলোকের লক্ষ্য করার মতো নয়। মিঃ ঘোষালও যথাসম্ভব স্মিত মুখভাব বজায় রেখে বললেন, 'তা আপনার বিছানা? সেটাও কি চোরে নিল নাকি?'

'না না—গুড হেভেন্স! বিছানা তো আনি নি। বিছানা লাগে নাকি? মিঃ

সরকারের মুখে আপনার হোটেলের যা প্রশংসা শুনেছি তাতে মনে হয়েছে—আপনার হোটেল ফার্স্ট ক্লাস মানে প্রথম শ্রেণীর পর্যায়ে পড়ে। তা-মানে ওদেশে, যা এমন কি আমাদের বোম্বে সাইডেও তো কোন ভাল হোটেলে বিছানা লাগে না—আমি তাই অতটা—। তা অসুবিধে হয় এখানে কিনে নেব। কিনতে পাওয়া যায় না?'

'না, না, সে কিছু না। আছে, সব রকম ব্যবস্থাই আছে আমাদের এখানে। সাহেব-সুবোও তো থাকে অনেকে অনেক সময়, ওদিকে জায়গা না পেলেই নেক্‌স্‌ট্‌ বেস্ট আমার এই গরীবখানা। কাজেই কিছু কিছু রাখতে হয় বই কি। আমি এমনিই জিজ্ঞেস করছিলুম। এখানে যাঁরা আসেন সবাই তো নিয়েই আসেন কিনা—। তা মহাদেববাবুর সঙ্গে আপনার কী সূত্রে—?'

'ও এই ভ্রমণ সূত্রেই। ও'রও খুব বেড়ানোর নেশা তো। গতবার সামারে উনি গিয়েছিলেন গোপালপুরে, সেখানেই প্রথম আলাপ হয় — আবার পুজোর সময় বোম্বেতে। বোম্বেতে উনি আমারই গেস্ট ছিলেন কিনা। হোটেলে উঠতে চেয়েছিলেন আমি উঠতে দিইনি। অত বড় ফ্ল্যাট পড়ে আছে আমার, মিছিমিছি হোটেলে যাবেন কেন?'

গত বছর গ্রীষ্মের ছুটিতে মহাদেববাবু যে গোপালপুর গিয়েছিলেন এবং পুজোর ছুটিতে বোম্বে—তা জয়দেব ঘোষালও জানে না। এখন জানলেন। মনে মনে হিসেব ক'রে নিলেন তখনই, সরকার কতগুলি টাকা বাঁচিয়েছে এই হঠাৎ-কুড়িয়ে-পাওয়া বন্ধুর দৌলতে। বোম্বের মাঝারী কোন হোটেলে উঠলেও দৈনিক কুড়িটি টাকা দিতে হ'ত। এতও পারে সরকার অপরের ঘাড় ভাঙ্গাতে!

'চলুন, তাহ'লে। এবার একটা ঘরটর দেখিয়ে দিন—'

ভদ্রলোক মৃদু কণ্ঠে মনে করিয়ে দেন কর্তব্যটা।

অন্যমনস্ক মিঃ ঘোষাল অপ্রতিভ হয়ে হাঁকডাক শুরু ক'রে দেন, 'ও বংশী, কোথায় গেলি রে। এ লক্ষণ্‌অ চণ্ডড় আস এইঠি, চণ্ডড়।'

'কোথায় দিচ্ছেন আমাকে মিঃ ঘোষাল?'

'ওপরে? দোতলায় দিই? না কি আপনি তেতালা প্রেফার করবেন?'

'আই'ড প্রেফার গ্রাউণ্ড ফ্লোর। আপনারা এখানেই থাকবেন তো সারাদিন, লাউঞ্জে এসে বসতে পারব—গল্পেস্বল্পে কেটে যাবে। আমি আবার মানুষের সঙ্গে দুটো কথা না বলে থাকতে পারি না।'

'সে—তা বেশ তো, এই পাশেই সঞ্জীব-বাবুর ঘরেই একটা বেড খালি রয়েছে—' মিঃ ঘোষাল আমাকে দেখিয়ে দিলেন, 'অবিশ্যি সিঙ্গল সীট একতলা দোতলায় কোথাও খালি নেই। এখানে ঘর নিতে গেলে, তেতালায় উঠতে হবে অন্তত!'

'নেই মাংতা সিঙ্গল সীট। এই দাদার সঙ্গে থাকব তো? সে তো আমার সৌভাগ্য, অবশ্য যদি ও'র অসুবিধা না হয়। ও'র সঙ্গে আমি এখানে ঢুকে প্রথমে কথা বলেছি, তাতেই মনে হচ্ছে এটা ভগবানের নির্দেশ। চলুন ও'র ঘরেই যাই।'

বলতে বলতেই এগোলেন তিনি। কারণ ঘরের দিগ্‌নির্দেশটা তিনি মিঃ ঘোষালের দৃষ্টির লক্ষ্য থেকেই ধরে নিয়েছিলেন। আমরাও এগোলুম তাঁর সঙ্গে সঙ্গে। ভালই হ'ল—একা তো থাকতে পারতুম না, কেউ না কেউ এসে বসতই জাঁকিয়ে। অনিশ্চিতের চেয়ে নিশ্চিত ভাল। এ লোকটি থাকলে ভালই কাটবে। লোকটির এই সামান্য কথাবার্তাতেই বুঝতে পেরেছি যে, ভদ্রলোক দিলখোলা ধরনের আমুদে মানুষ।

ঘর দেখিয়ে মিঃ ঘোষাল বললেন, 'আপনি কাপড় জামা ছাড়ুন, আমি বিছানা একটা পেতে দেবার ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। ব্যাগের মধ্যে কিছু কাপড় জামা আছে তো?' মিঃ ঘোষাল একটু দ্বিধার সঙ্গেই প্রশ্ন করলেন।

'আছে আছে, ডোন্‌ট্‌ ওয়ারী! আর একটা শার্ট আছে, গেঞ্জি রুমাল আণ্ডার-ভেস্ট সবই আছে—মায় রাত্রে শোবার পাজামাও, নেই কেবল এক্সট্রা ট্রাউজার। তা কী আর করা যাবে বলুন—এইতেই চালিয়ে নেব এখন যেমন ক'রে হোক। এ ট্রাউজার-গুলোর এই একটা সুবিধা আছে বুঝছেন না—দাম একটু বেশী নেয় বটে কাপড়-গুলোর—কিন্তু প্রেস মানে আয়রনিং লাগে না—শুধু একটু গুঁড়ো সাবান জলে ডুবিয়ে নিলেই হ'ল—'

মিঃ ঘোষাল বোধ করি বংশীর খোঁজেই বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, ভদ্রলোক পিছন থেকে ডাকলেন, 'দাঁড়ান ঘোষালদা, প্লীজ, এক মিনিট। এইটে একটু রেখে দেবেন আপনার সেফ-এ?'

ব্যাগের নিচে হাত গলিয়ে টেনে বার করলেন একখানি চৌকো মজবুত গোছের মোটা খাম; মুখ আঁটা, তাতে তিন-চার জায়গায় গালা-করা। বেশ পুরু-পুরু ভারী চেহারা খামখানার—অর্থাৎ ভেতরে কোন দামী কাগপত্তরপত্র কি এক গোছা নোট আছে। তবে আকৃতি দেখে নোট বলেই মনে হয়।

মিঃ ঘোষাল এতে অভ্যস্তই আছেন—তবে সাধারণত তিনি গুনেগেঁথে রসিদ দিয়ে জমা রাখেন খদ্দেরদের টাকা। তিনি শীলকরা খাম দেখে একটু বিপন্ন মুখে বললেন, 'তা এতে—মানে কী আছে, মানে কত কী তা না জানলে—'

'নাই বা জানালেন দাদা। শীলকরা তো আছেই, আমি তো আপনাকে চুরির অপবাদ দিতে পারব না—তার ওপর আমার এই দাদা সাক্ষী রইলেন। আর আমি রসিদও চাইছি না, যেমন আছে সিন্দুক খুলে এক পাশে ফেলে রেখে দিন। ধরে নিন বাজে কাগজ।...সেই যাবার দিন আবার খোঁজ করব—তার আগে নয়। তার আগে আর দরকার হবে বলে মনে হচ্ছে না।'

মিঃ ঘোষাল নিশ্চিন্ত হয়ে খামখানা নিয়ে চলে গেলেন।

হোটেলে কোন মক্কেল এসে যখন ম্যানেজারের লোহার সিন্দুকে টাকা জমা রাখে তখন ম্যানেজার যে কী রকম নিশ্চিন্ত নিরাপত্তা বোধ করেন তা সেই সময় ঘোষালদার মুখের দিকে চাইলেই বোঝা যেত। তাঁর মুখে একটা অনির্বচনীয় তৃপ্তির ভাব ফুটে উঠেছিল তখন।

এর পর ভদ্রলোকের সঙ্গে দ্রুত আলাপ জমে উঠল। নাম বললেন শ্রীকান্ত রাও, মূলত ও'রা মারাঠীই—কিন্তু কয়েক পুরুষ ধরে অন্ধ্রে থাকায় এইটেই ও'দের বাসভূমি হয়ে পড়েছে, আর তাঁর গাত্রবর্ণও নাকি সেই জন্যই এত ঘনকৃষ্ণ। তবে তিনি নিজে এখন কর্মোপলক্ষে সর্বত্রই ঘোরেন! কলকাতাতে পড়াশুনো করেছেন, বছর কয়েক আসানসোলের কাছে কোন্‌ কলিয়ারীতেও চাকরি করেছিলেন—সুতরাং বাংলা ভাষা মাতৃভাষার মতোই হয়ে গেছে প্রায়। সম্প্রতি বছর দুই বোম্বেতে ছিলেন, এখন বোধ হয় বদলি হয়ে নাগপুরে এসে থাকতে হবে।

'কী কাজ করেন আপনি?' সসঙ্কোচে এবং সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করি।

'আমি?...ও, সে খুব একটা গালভারী নাম আছে আমার চাকরীর। আমি হলুম ওআন অফ দ্য রিজিওনাল মাইরাবোলাস মার্কেটিং অফিসার। এত দিন ছিলাম ওয়েস্টার্ণ রিজিয়নে এবার সেন্ট্রাল রিজিয়নে বদলি করল।...ভালই হ'ল দাদা, অতি লক্ষ্মীছাড়া দেশ ঐ আপনাদের বোম্বাই। একে তো শরীর ভাল থাকে না একটুও, তার ওপর সবচেয়ে অসহ্য মানুষগুলো। কেউ মানুষ নয় দাদা, সব যেন দানোয় পাওয়া কী এক চীজ, দিন-রাত ধান্দায় ঘুরছে শুধু—ধান্দা আর ধান্দা; টাকা ছাড়া ওদের কোন চিন্তা নেই, কোন উদ্দেশ্য নেই জীবনে—'

রাও শুধু যে অতঃপর আমার সঙ্গেই জমিয়ে নিলেন তাই নয়, পোশাক ছেড়ে একটা পাজামা পরে সিগারেট ধরিয়ে সেই যে লাউঞ্জে এসে বসলেন দেখতে দেখতে নিচেরতলা ওপরেরতলা মিলিয়ে অন্তত কুড়িটি লোককে আটকে ফেললেন সেখানে। সিগারেট শুধু নিজেই খাচ্ছেন না—দু হাতে বিলোচ্ছেন সবাইকে, বেশ দামী সিগারেট। সুতরাং সেখানে না জমবে কে! কিছুক্ষণ পরে দেখি আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা মিঃ ঘোষালও সেখানে এসে কখন জমে গেছেন।

সেদিন আমাদের কারুরই সমুদ্রস্নানে যাওয়া হ'ল না। তা না হোক, সে ক্ষতি-পূরণ ভাল রকমই ক'রে দিলেন মিঃ রাও। বিকেলে ঘুম থেকে উঠে চা খেতে খেতে হঠাৎ জয়দেব ঘোষালকে প্রশ্ন করলেন শ্রীকান্ত, 'আজ আপনাদের রাত্রের মেনু কি মিঃ ঘোষাল?'

'রাত্রে?...এই সাধারণত যা হয়—ডাল ভাজা ভেজিটেবলস—একটা মাছ আর একটা মাংসের প্রিপেয়ারেশন। আজ বোধ

হর কোর্মা করার কথা আছে।...কেন বলুন তো?'

'বলছিলুম কি—জাস্ট এ সাজেস্শ্যান্—একটু রামপাখীর ব্যবস্থা করা যায় না?'

'ওটা—মিঃ রাও, আমরা সপ্তাহে একদিন দিই। শনিবারে শুধু। তার চেয়ে বেশী পোষায় না।'

'আচ্ছা আমি যদি কিছু সাবসিডীর ব্যবস্থা করি—? প্লীজ ঘোষালদা, এটা আমায় বড়মানষী ভাববেন না। জাস্ট একটা খেয়াল। এতগুলি ভদ্রলোকের সামান্য সেবাতেও যদি আসতে পারি। আপনি এই ত্রিশটা টাকা রাখুন। মাংসতে তো খরচা হ'তই, তার সঙ্গে এইটে যোগ করলে মুরগী হবে না? না হয় আর কিছু দেব। একটু দেখুন—!'

হাতের মধ্যে নোট কখানা গ'ুজে দেন মিঃ রাও।

ঘোষালদা ঈষৎ লজ্জিত, ঈষৎ বিব্রত ও চিন্তিত মুখে বললেন, 'না, তার জন্যে নয়—লক্ষ্মণটা বোধ হয় এতক্ষণে মাংস আনতে বেরিয়ে গেছে।...দেখি আবার হরিকে পাঠাই সাইকেলে ক'রে বারণ করতে। কেনা হয়ে গেলে কিন্তু মুশকিল হবে মিঃ রাও, তা আমি ফ্র্যাঙ্কলি বলছি।'

'কুছ্ পরোয়া নেই — সে ক্ষেত্রেও আনবেন। অল্প ক'রে—না হয় দু রকমই হবে। কী যেন বলে না মিত্তিরদা,—কী, অধিকন্তু না কি—?'

'অধিকন্তু ন দোষায়?' হেসে ফেলে জবাবই দিই।

'ঠিক ঠিক। অধিকন্তু ন দোষায়। আপনি সেই ব্যবস্থাই করুন বরং।'

এই হোটেলের বর্তমান এই কটি বাসিন্দার চিত্ত জয় করার পক্ষে এই-ই যথেষ্ট। বলতে গেলে সেই মুহূর্ত থেকেই মিঃ রাও আমাদের মুকুটহীন রাজা বনে গেলেন। কিন্তু তবু তাঁর জয়রথ সেইখানেই থামল না। দেখতে দেখতে শুধু যে আমাদের হোটেলে তাই নয়—তাঁর খ্যাতি আশপাশের হোটেলেও ছড়িয়ে পড়ল। তাঁরা ভিড় ক'রে ক'রে রাজসন্দর্শনে আসতে শুরু করলেন। কেউ কেউ রাস্তা থেকেই কৌতূহলী চোখে দেখে নিয়ে চলে যেতেন—কেউ বা সাহস ক'রে আমাদের কম্পাউণ্ডে ঢুকে পড়তেন। অবশ্য সাহসীরা চিরদিনই পুরস্কৃত হয়—যাঁরা ভরসা ক'রে ভেতরে আসতেন তাঁরা সকলেই প্রসাদ পেয়ে তৃপ্ত হয়ে ফিরতেন। কারও কোন ক্ষোভের কারণ থাকত না।

প্রসাদ ছাড়া আর কি।

শুধু কি সিগারেট, বোঝা বোঝা খাবারও উজাড় হয়ে যেতে লাগল মিঃ রাওর কৃপায়।

সেটাও শুধু হয়েছিল সেই প্রথমদিন থেকেই।

মিঃ রাও সমুদ্রের ধারে এসেছেন বটে কিন্তু দেখা গেল তিনি সমুদ্রস্নান বা সমুদ্রের ধারে বেড়ানোয় বিশ্বাসী নন। দুপুরে ও রাত্রির ঘুমের সময় ছাড়া অষ্ট প্রহরই প্রায় তিনি সামনের লাউঞ্জে বসে থাকতেন ও উপস্থিত ভক্তবৃন্দের সঙ্গে আড্ডা দিতেন।

সেদিনও সন্ধ্যার কিছু আগে একটা খাবারওয়ালা তার বাঁকের দুধারে তিন-চারটি ক'রে এলুমিনিয়ামের ডেকচি সাজিয়ে এসে পড়েছিল। আর যায় কোথায়! মিঃ রাও যেন ঝাঁপিয়ে পড়লেন তার ওপর। 'কী আছে, খোলো খোলো। সিঙ্গাড়া? রস-গোল্লা,, ছানার জিলিপী। অল রাইট—দিতে থাকো এ'দের সবাইকে।'

'...না দাদা, সে হবে না। আমি হাতজোড় করছি, গরীব ভাইয়ের অফার। প্লীজ প্লীজ। জাস্ট দুটো মিষ্টি—কিছু হবে না এখানে একটু মিষ্টি খেলে। চলুক দুটো—'

উপস্থিত সব কজনকে তো বটেই, অফিসে গিয়ে মিঃ ঘোষাল আর তাঁর হিসাব-রক্ষক মাইতিবাবুকেও দিয়ে এলেন। মিঃ ঘোষালের কোয়ার্টারটা একটু ভেতর দিকে, লোক দিয়ে সেখানেও পাঠিয়ে দিলেন। মায় বংশী হরি লক্ষ্মণ চতুর্ভুজের দলও কেউ বাদ গেল না। দেখতে দেখতে খাবারওলার বাঁক খালি হয়ে গেল, সে মহানন্দে তেরো টাকা কত নয়া পয়সা গুণে নিয়ে খালি পাত্র বাজাতে বাজাতে চলে গেল।

তারপর দিন থেকে ওদের ভিড় বেড়ে গেল। মিঃ রাও উদারভাবে সকলকার কাছ থেকেই কিছু কিছু কিনতে লাগলেন, কারুর কাছ থেকে পাঁচ টাকা কারুর কাছ থেকে চার টাকা। আমরা বিব্রত হয়ে উঠলাম, মিঃ ঘোষালেরও সঙ্কোচের অবধি রইল না—কিন্তু কে কার কড়ি ধারে! অনুনয় অনুরোধ তিরস্কার—কিছুই তিনি শুনতে চাইতেন না। শেষে মিঃ ঘোষাল কৃত্রিম কোপে বললেন, 'এরকম করলে আমি কিন্তু আপনার সব টাকা-কড়ি বাজেয়াপ্ত ক'রে নেব—কেড়ে বিগড়ে নিয়ে জমা ক'রে রাখব ক্যাশে—তা বলে দিচ্ছি।'

দুই হাতে নিজের কান নিজে ম'লে রাওসাহেবও কৃত্রিম অনুতাপের কণ্ঠে বললেন, 'কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারি না দাদা, এক্সকিউজ মি। তা, আপনি যা বলছেন সে অবস্থার আর দেরি নেই। এবার দিতে গেলে আপনার কাছেই হাত পাততে হবে। আপনি কিন্তু দেবেন না দাদা, সেই যাবার দিনের আগে। নইলে ফতুর হয়ে যাব হয়ত—ফেরবার গাড়িভাড়া-টাও থাকবে না!'

কিন্তু মুখে যাই বলুন—তখনও কিছু অবশিষ্ট ছিল হাতে নিশ্চয় কারণ যা ছিল তার ওপর আমার কাছ থেকে পাঁচটা টাকা ধার ক'রে নিয়ে সতেরোখানা সিনেমার টিকিট কাটা হয়ে গেল। সিট আর ছিল না, নইলে আরও কাটতেন বোধ হয়—এক্ষেত্রে সতেরোখানাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হ'ল। মনটা বিষম খ'ুৎ খ'ুৎ করতে লাগল মিঃ রাওর, কাকে ফেলে কাকে নেবেন—এই সমস্যায়। শেষ পর্যন্ত সপরিবার মিঃ ঘোষাল এবং নিচের তলার যে কজন আছি আমরা তাঁদের মধ্যেই ব্যাপারটা সীমাবদ্ধ রাখা হ'ল। তাও আটত্রিশ আর উনত্রিশ নম্বরে যে পরিবারটি এসেছেন তাঁদের সকলকারই শরীর খারাপ, তাঁরা রাত জেগে ছবি দেখতে যেতে রাজী হলেন না, তাই কোন মতে কুলিয়ে গেল। নইলে শেষ পর্যন্ত হয়ত আড়াই টাকায় টিকিট কেটেও সবাইকে নিয়ে যেতেন মিঃ রাও।...টাকা ফুরোল তাই বলে আতিথ্যর হাত গুটোবেন এমন মানুষ নন ভদ্রলোক। তিনি খাবারওলা-দের পরিষ্কার বলে দিলেন, 'দ্যাখো বাবারা, আমার হাতে যা নগদ টাকা ছিল ফুরিয়েছে, এখন যা আছে ঘোষালদার লোহার সিন্দুকে, ও আমি যাবার আগে বার করব না। ঘোষালদাও দেবেন না। আমি এখনও দশ-বারোদিন আছি, যদি চাও—এই কদিন একটা হিসেব রেখে মাল দিয়ে যাও, সেই শেষ দিন এসে টাকা নিয়ে যেয়ো—না চাও তো গুড্ বাই, কোন দরকার নেই খাবারের, তোমরা অন্য মশাইদের দিয়ে যেতে পারো।'

সাথী

ফটো : সুকুমার রায়

'গুড বাই' যে অবশ্য দুচারজন করল না তা নয়, কিন্তু বেশির ভাগই খাতার বন্দোবস্তে রাজী হয়ে গেল। না হবেই বা কেন, লোকটা এই দু-তিনদিন নির্বিচারে মাল কিনেছে এবং নির্বিচারে দাম দিয়েছে, কোন হিসাবপত্রের ঝামেলায় না গিয়ে। যারা এতদিন ধরে এই বহু তীর্থযাত্রী-অধ্যুষিত স্থানে ব্যবসা করছে তাদের মানুষ না চেনবার কথা নয়। এ শ্রেণীর মক্কেলকে তারা চেনে—অনায়াসে, চাই কি সতেরো টাকা পাওনা হলে উনিশ টাকা চেয়ে নিতে পারবে এদের কাছ থেকে—একবার যোগটাও 'ঠিক' দিয়ে দেখবার কষ্ট স্বীকার করবে না এরা।

সুতরাং মিষ্টি বিলোনের হুল্লোড় অব্যাহতই রইল। মিষ্টি আর সিগারেট দুইই। কারণ সিগারেটটা ঘোষালদার ষ্টোরেই বিক্রী হয়—সেটা নগদ দাম দিয়ে কেনবার কথাই ওঠে না। শুধু সিনেমা দেখানো বা মাংস কেনার হাতটাই কিছু সংযত করতে হয়েছে। আরও একদিন মুরগীর কথা তুলতে গিয়েছিলেন কিন্তু ঘোষালদা রাজী হননি। আমাকে আড়ালে বলেছেন, 'লোকটা দেখছি সত্যি-সত্যিই সর্বস্বান্ত হয়ে এখান থেকে যাবে। শুরু করেছে কি!'

আমি উত্তর দিয়েছি, 'বিয়ে-থা করেনি, কেউ কোথাও নেই—বেপরোয়া জীবন, বুঝলেন না! ছ'মাস কাজ করে হাতে যা জমে কোথাও এসে নবাবী করে উড়িয়ে যায়—সেই টাইপ, ও আমি খুব চিনে নিয়েছি!'

দিন দশেক কাটবার পর একদিন একটা টেলিগ্রাম হাতে করে এসে ঘোষালদা খবর দিলেন, 'আপনার বন্ধু যে কাল সকালে এসে পড়ছেন মিঃ রাও!'

একটু বোধ হয় অন্যমনস্ক হয়েই চা খাচ্ছিলেন রাও সাহেব, হাতটা কেঁপে চা চল্‌কে পড়ে গেল খানিকটা। কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য না করেই উজ্জ্বল সস্মিত মুখে প্রশ্ন করলেন, 'আমার বন্ধু? ও, দেয়ার আর সো মেনি—তা ইনি কে?'

'মানে আমাদের দুজনেরই বন্ধু—মহাদেব সরকার!'

'হুর্‌রে! মহাদেববাবু আসছেন! থ্রি চিয়ার্স ফর দা গুড বয়।.....কিন্তু এলেনই সেই, আর কটা দিন আগে আসতে পারলেন না! তবু দু'টো চারটে দিন একসঙ্গে হৈ-হল্লা করে কাটানো যেতো!'

'আসবার তো কথাই ছিল না। নানা ঝঞ্ঝাটে পড়েছিলেন—হঠাৎ বোধ হয় কিছু মুস্কিল আসান হয়েছে, তাই বেরিয়ে পড়ছেন। মাত্র ছ'দিন থাকবেন তাও লিখেছেন! এ ক'টা দিন তো একসঙ্গে থাকতে পারবেনই—' ঘোষালদা বলেন।

'তাই বা কই আর হচ্ছে, আমি তো পরশুই রওনা দিচ্ছি।' রাও সাহেব একটু ক্ষুণ্ণ কণ্ঠেই উত্তর দেন।

'পরশু যাচ্ছেন, সে কি?'

আমরা সকলেই চমকে উঠলাম।

'হ্যাঁ—আর থাকা যাবে না।' ঈষৎ অপ্রতিভ মুখে যেন কৈফিয়তের সুরেই বল্লেন মিঃ রাও।

'তা আপনি তো কই রিজার্ভেশানেরও কোন ব্যবস্থা করেন নি, আমি তো আপনাকে সেদিন কথাটা মনে করিয়েই দিলাম তবু' একটু বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করি: এখানে ওটা এক প্রবল সমস্যা।

'আমিও তো আপনাকে তখনই বলেছি—এখানে আমার এক বন্ধু আছে সে সব ঠিক করে দেবে। একটা তো রাত—খড়গপুর পর্যন্ত, ও হয়েই যাবে এক রকম করে।'

কথাটা সেইখানেই চাপা পড়ে গেল। কারণ খাবারওয়ালারা ইতিমধ্যেই দলে দলে আসতে সুরু করেছে—তাদের পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা, শ্রেষ্ঠত্বের দাবী এবং গরীব মানুষকে দয়া করার জন্য কাতর অনুনয়—প্রায় একনিঃশ্বাসে একসঙ্গেই শুরু হয়ে গেছে। সেই কোলাহলে ও খাওয়ার হুল্লোড়ে কথাটা মনে রইল না কারুরই।......

পরের দিন সকালের চা খাওয়া শেষ হতেই রাও সাহেব বললেন, 'চল্লিশটা টাকা দেবেন মিত্তিরদা, একবার ষ্টেশনটা ঘুরে আসি। দেখি সত্যিই—স্টুপিডটা কী করল। যদি করে থাকে কোন ব্যবস্থা তো টিকিটটা কেটে একেবারে সব পাকা করে আসাই ভাল। ......আমি আর এখন আমার ভাঁড়ারে হাত দিতে চাইছি না—বুঝলেন না, ও খাম খুললেই কী যে এলোপাতাড়ি খরচ করে ফেলব, তারপর হয়ত কালকের হিসেব মীট্ করতে চক্ষুস্থির হয়ে পড়বে। ডাকাত-বেটারা যে কে কত লিখে রেখেছে আমার নামে তা কে জানে!'

'তা লিখে থাকে তো ভালই! আপনার

ঐ রকম কিছু আক্কেল সেলামী দেওয়াই উচিত!' আমি হেসে বলি।

'তাতেই কি আক্কেল হবে দাদা ভেবেছেন? কি, ও রকম সিচুয়েশনে এই প্রথম পড়ব করছেন?......সব রকম হয়ে গেছে—তবু কি জানেন দাদা, স্বভাবটা বদলাতে চায় না কিছুতেই—ঐ যে কী বলে না সংস্কৃতে কী যেন, অঙ্গার কী একটা—? মানে কয়লা শতবার ধুলেও তা কালোই থাকে। সেই রকম আর কি!' হা-হা করে হেসে ওঠেন নিজেই।

টাকা বার করতে গিয়ে দেখলাম ব্যাগে খান দুই মাত্র দশ টাকার নোট পড়ে আছে—বাকী সব একশ' টাকার। সেই কথাই বললুম তাঁকে, 'একশ' টাকার একটা নোটই নিয়ে যান—ভাঙানো হয়ে যাবে!'

'তারপর—? ঐ ভিড়ের মধ্যে যদি কোন বন্ধু দয়া করে পকেট হালকা করে দেন—তখন? কে গচ্ছা দেবে মশাই! না-না, বরং ঐ কুড়ি টাকাই দিন, যদি আর কারুর কাছ থেকে গোটা পনেরো টাকা পাই তো দেখি—'

'হ্যাঁ, আপনাকে সব খুচরো বার করে দিয়ে আমি অচল হয়ে বসে থাকি আর কি!' আমি ধমকও দিই একটু, 'এতই বা অসাবধান হবেন কেন? ছেলেমানুষ তো নন—যে কথায় কথায় গচ্ছা দিতে হবে?'

মিঃ রাও দমবার পাত্র নন, বললেন, 'দিন নিচ্ছি—কিন্তু উইদাউট প্রেজুডিস্, খোয়া গেলে আমি জানি না। ......আজ্ঞে দাদা, অসাবধান না হলেও গচ্ছা দিতে হয় অনেক সময়—বরাতে লোকসান থাকলে কেউ ঠেকাতে পারে না। ... তা এতই যখন দিলেন, খুচরো আট আনা পয়সাও দিন, রিকসা ভাড়া। আমার পকেট আজ একেবারে নেহরুজীর পকেট—একটি কানা-কড়িও নেই।'

টাকা-পয়সা গুছিয়ে নিয়ে হাসতে-হাসতেই চলে গেলেন মিঃ রাও। ব্রেকফাস্ট খেয়ে যেতে বললাম কিন্তু তিনি রাজী হলেন না। বললেন, 'আটটায় বুকিং খোলে এখানে, তার আগে না পৌঁছতে পারলে মুস্কিল। উইনডো খোলবার আগে ভেতরে ঢুকে পড়তে হবে—নইলে ব্যাটারা বড় চেঁচামেচি করে। ......ঘোষালদার ব্রেকফাস্ট তো আটটার আগে বেরোবে না—কী লাভ এখন থেকে হাঁ করে বসে থেকে। ফিরে এসে বরং দেখা যাবে—'

কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি ফিরতে তিনি পারলেন না। সম্ভবত যতটা সহজ হবে ভেবেছিলেন রিজার্ভেশ্যান পাওয়া—ততটা হয়নি। ......কথাটা ভেবে আমি একটা কী রকম 'নৈর্ব্যক্তিক' আনন্দই বোধ করতে লাগলাম। বেশ হয়েছে, বড্ড নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছিলেন বন্ধুর ওপর বরাত দিয়ে! ঠিক হয়েছে! সার্ভড্ হিম রাইট!

আসলে আমার রিজার্ভেশ্যানের জন্য মাত্র তিনদিন আগেই একটি লোককে তিন টাকা পারিশ্রমিক দিতে হয়েছিল—সে জ্বালাটা ভুলতে পারি নি।

রাও এসে পৌঁছবার আগেই কিন্তু কলকাতার গাড়ি এসে গেল এবং ঘোষালদার বন্ধু সেই বিখ্যাত মহাদেব সরকারও এসে হাজির হলেন। ক্ষয়াঘষা একহারা চেহারা, ছোট্ট একটু ফ্রেঞ্চকাট ধরনের দাড়ি আছে, কোটের ওপর কোঁচানো চাদর ব্যবহার করেন—সরল প্রকৃতির মানুষ তা মুখের হাসিটি দেখলেই টের পাওয়া যায়।

ঘোষালদা সকলরবে অভ্যর্থনা করলেন মহাদেববাবুকে। মালপত্র চাকরকে দিয়ে ওপরে পাঠিয়ে সেইখানেই চা পানের ব্যবস্থা করে দিলেন। বললেন, 'মহাদেবদার আমার দিনেরাতে কুড়ি কাপ চা খাওয়া অভ্যেস, সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে তর সইবে না।

ষ্টেশন থেকে এইটুকু আসতেই গলা শুকিয়ে গেছে বোধ হয়।'

প্রাথমিক সম্ভাষণাদি পরিচয়ের পালা শেষ হতে মিঃ ঘোষাল বললেন, 'একটি গ্রেট সারপ্রাইজ কিন্তু আপনার জন্যে এখানে অপেক্ষা করে আছে মহাদেব দা—আপনার এক অতি প্রিয়বন্ধু এখানে এসে আছেন কদিন। প্রিয় বলছি এই জন্যে যে, তার কাছে তো আমার হাড়হদ্দ সব কিছু গল্প করেছেন বসে বসে—!'

'সে কি! সে আবার কে? .. ...যোগীন? মানে যোগীন ভটচায আমাদের—তমলুকের?'

'না না যোগীন ভট্টাযের আমি চিঠি পেয়েছি সে এবার গেছে কাশীতে—তার শ্বশুরবাড়ি। এ হলেন মিঃ রাও!'

'রাও? ......কে রাও? কৈ কোন রাও বলে আমার এমন ঘনিষ্ঠ বন্ধু নেই তো!' মহাদেববাবু অবাক হয়ে যান, ভ্রূ কুঁচকে মনে করার চেষ্টা করেন প্রাণপণে।

'আছে বৈ কি। নইলে এত কথা সে আপনার সম্বন্ধে বলবে কোথা থেকে! মনে করে দেখুন। গত বছরে এই সামার ভেকেশনে গোপালপুরে আলাপ হয়েছিল মনে নেই—? বেশ বলিষ্ঠ গোছের চেহারা, লম্বা-চওড়া—খুব ভালো বাংলা বলে। ভাল করে লক্ষ্য না করলে বোঝাই যায় না তেলেগু টান—'

'ও, রেড্ডি বলো। রাও বলছ কেন। হনুমন্ত রেড্ডী। কোথায় সে জোচ্চোরটা—লোফার হামবাগ বদমাইশ!! তাকে পেলে তো বাঁচি—দেখিয়ে দিই একবার মজাটা!'

মহাদেববাবু বিষম উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।

'কই, রেড্ডি তো নয়—রাও বলেই তো নাম লিখিয়েছে।' বলতে বলতেই কিন্তু মিঃ ঘোষালের যেন মুখ শুকিয়ে ওঠে একটু, 'আপনি বোধহয় চিনতে পারছেন না ঠিক। খুব দশাসই চেহারা আর খুব কালো, এই বাঁ চোখের নিচেটায় একটা কাটা দাগ আছে—বেশ গভীর গোছের, হয়ত ফোড়াটোড়া—'

'ব্যস ব্যস আর বলতে হবে না। তাহলে ও কোনটাই ওর আসল নাম নয়। আমাকে বলেছিল রেড্ডী। ব্যাটা মহা ঠগবাজ, আর কী ডেয়ারিং—বোম্বাইতে হোটেলের ম্যানেজারকে ঠকিয়ে আমার টাকা থেকে দুশ' টাকা বার করে নিয়েছিল গত পুজোর সময়—'

'সে কি, তবে যে বললে আপনি বোম্বাইতে ওর গেষ্ট হয়ে ছিলেন!'

'হ্যাঁ আমার খেয়েদেয়ে কাজ নেই—আমি ওর গেষ্ট হয়ে থাকব। ঐ ব্যাটাই তো—যেন গন্ধ পেয়ে পেয়ে এসে খুঁজে বার করল।'

আমারও মুখ শুকিয়ে উঠেছে ততক্ষণে। বুকের মধ্যেটায় কেমন যেন হিম হিম বোধ হচ্ছে। সেদিনের পাঁচ, পরে আর একদিন মন্দিরে দুই, আজকের এক শ' টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা। একুনে—

জয়দেববাবুর ললাটে—সেই উদ্দাম ঝোড়ো সমুদ্রের বাতাসেও—বড় বড় ফোঁটায় ঘাম ফুটে উঠেছে তখন।

'সে কি? মানে—ব্যাপারটা কী ঠিক বুঝতে পারছি না তো', অতিকষ্টে বলেন মিঃ ঘোষাল।

'ব্যাপার আমার মাথা আর মুণ্ডু! তোমাদেরও ঠকিয়ে গেল নাকি এরই মধ্যে? গেল কোথায় বেটা? তবে যে বলছিলে ধরে রেখেছ—?'

ক্রমশ সবই শোনা গেল। গতবার মহাদেববাবু গিয়ে গোপালপুরে যে মেমসাহেবের

আসতে পারেন নি—কারণ যতদিন তাঁর থাকার কথা ছিল তার বহু আগেই চলে আসতে হয়েছিল মহাদেববাবুকে, ভাইঝির খুব অসুখ এই 'তার' পেয়ে মাত্র পাঁচ থেকেই চলে আসেন। তারপর একেবারে দেখা হয় পুজোর সময় বোম্বেতে। উনি গিয়ে নিরিবিলি গেটওয়ে অফ ইণ্ডিয়ার কাছে একটা মাঝারি হোটেলে ছিলেন, বিশ্রাম নিতেই গিয়েছিলেন, তাই কারও সংগে

"রাও? ......কে রাও?"

হোটেলে উঠেছিলেন, সেই হোটেলেই ছিল রেড্ডী বা রাও (মহাদেববাবুর বিশ্বাস আসলে ও বাঙ্গালীই, ঐ রকম একটা টান অভ্যাস করেছে লোকের চোখে ধুলো দেবার জন্যে)—এমনি বেপরোয়া, খরচপত্র সম্বন্ধে এমনি উদাসীন। লোককে খাইয়ে উপহার দিয়ে মুগ্ধ করে ফেলেছিল। সে মুগ্ধ ভক্তদের দলে মহাদেববাবুও ছিলেন। কিন্তু নাটকের শেষ অঙ্কের অভিনয়টা তিনি দেখে

বিশেষ দেখাসাক্ষাৎও করেন নি। ঐ রেড্ডী একদিন পথে এসে ধরল ওঁকে। প্রথমটা তো মহাদেববাবু ঠিক চিনতেও পারেন নি—পরে ওর ঐ হৈ-চৈ চেঁচামেচিতে মনে পড়ে গেল। এমন ফুর্তিবাজ আমুদে আর গায়েপড়া লোককে ঝেড়ে ফেলা শক্ত, আর কেনই বা ফেলবেন। বিদেশে এমন একটা লোককে পেলে ভালই লাগে।

দেখতে দেখতে—বলতে গেলে একদিনের

মধ্যে—লোকটা যেন পরমাত্মীয় হয়ে উঠল। অবশ্য প্রথম দিকটা খরচও সে করেছে, তা তিনি অস্বীকার করতে পারবেন না। খুব অনেকটা ট্যাক্সিতে করে ঘুরিয়ে, নাজ্-এ নিয়ে গিয়ে খাইয়ে একদিনেই প্রায় ত্রিশ-ত্রিশ টাকা খরচ করেছে সে। এ-ছাড়া হোটেলে যখন আসত—এটা ওটা জিনিস-পত্রও নিয়ে আসত। একদিন জোর করে রাত্রের শো সিনেমায় নিয়ে গেল—সেও টিকিট গাড়িভাড়ায় সবরকমে প্রায় বারো-চোদ্দ টাকা খরচ করলে। এর পর তার অবস্থা এবং মতলব, কোনটা সম্বন্ধেই কোন সংশয় থাকা উচিত নয়। মহাদেববাবুরও ছিল না।

দুটি লোকে যদি দিনেরাতের অনেকখানি সময় একত্র থাকে তো—ইচ্ছে না থাকলেও অনেক কথা কওয়া হয়ে যায়। সেই সময়ই বোধহয় জয়দেব ঘোষালের প্রথম দিকের সেই সামান্য হোটেল থেকে এখনকার চারতলা হোটেল এবং তাঁর সঙ্গে ও'র সম্পর্ক—সবই গল্প করে থাকবেন। আর গল্প করেছিলেন ম্যানেজারের কাছে—তাঁর আটশ চল্লিশটি টাকা খামে করে গচ্ছিত রাখার ইতিহাসটা। খুব হাল্কাভাবেই বলেছিলেন রেড্ডী শুনে যাবার মনে করে রাখবে তা ভাবেন নি।

পরের দিন তিনি যখন তাঁর ভাগ্নের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন খার-এ, বিকেলে রেড্ডী এসে হোটেলের ম্যানেজারকে বলেছে যে, আঙ্কল সরকার (আঙ্কল আঙ্কলস করত সে ওঁকে) ক্রফোর্ড মার্কেটে গিয়ে একগাদা গড কভার আর শাড়ি কিনে ফেলেছেন—দুই টাকার দরকার। ম্যানেজারের আলমারীতে যে টাকা গচ্ছিত আছে তা থেকে চেয়ে নিয়ে যেতে বলেছেন।

স্বভাবতই ম্যানেজার ওর ঐ ছেঁদো কথায় টাকা দিতে চান নি। কিন্তু তার জন্য রেড্ডী প্রস্তুত ছিল। কোন পুরনো রেজেস্ট্রী খামে আট শ' একচল্লিশ টাকা রেখেছেন মহাদেববাবু, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়ে কোন খামে কার ঠিকানা লেখা আছে এবং ক 'সেণ্ডর' তা পর্যন্ত বলে বলল, 'এবার বিশ্বাস হচ্ছে তো তিনিই পাঠিয়েছেন?'

বিশ্বাস হয়েছিল ম্যানেজারের, তিনি গুনে দিয়েছিলেন। টাকা নিয়ে যাবার সময় ভুলে মনে করে একটা দামী কলম সে গচ্ছিত রেখে গিয়েছিল ম্যানেজারের কাছে, বলে-ছিল—আঙ্কল-এর সঙ্গে যখন আসবে তখন নিয়ে যাবে। বাজারে এ কলম নিয়ে ঘোরা ঠিক নয়। ম্যানেজার তাতে আরও আশ্বস্ত হয়েছিলেন।

মহাদেববাবু ফিরে এসে সব শুনে অবাক। তবু তিনি তখনও অতটা অবিশ্বাস করতে পারেন নি। একটা বড় প্রশ্ন থেকে গিয়েছিল—জোচ্চোরই যদি হবে তবে অমন দামী কলমটা ফেলে যাবে কেন?

কিন্তু দু-তিন দিন যখন কেটে গেল ওর টিকি দেখতে পাওয়া গেল না—তখন আর নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা সম্ভব নয়। খোঁজ-খবর করতেই হ'ল। তবে তখন আর কোথায় খোঁজ পাবেন? আহাম্মুকিটা আরও বেশী করে ধরা পড়ল তখনই—লোকটা কোথায় থাকে, কী ঠিকানা, কিছুই ভাল করে খোঁজ করেন নি তিনি। আঁধেরীতে কোথায় একটা নতুন ফ্ল্যাট কিনেছে—এই কথাই বলেছিল। অনেক দূরে বলেই মহাদেববাবুর যাওয়া ঘটে ওঠেনি সেটা দেখতে। এখন মনে পড়ল যে সে ঠিকানাটাও তিনি জেনে নেন নি।

আইনত হোটেলের ম্যানেজার ও-টাকা দিতে বাধ্য ছিলেন। কিন্তু তাঁর মুখ-চোখের অবস্থা দেখে মহাদেববাবুর মায়া হ'ল। তাছাড়া ওকে তিনিই নিয়ে এসেছেন। এই কদিন খুব আদিখ্যেতাও করেছেন—সুতরাং নৈতিক দায়িত্ব একটা তাঁর থেকে যায় বৈকি! তিনি সেই দায়িত্বের ফলশ্রুতি হিসেবে ঐ লোকসানটা নিজেই মেনে নিয়েছিলেন।

তবে একেবারে হাল ছাড়েন নি। গোপালপুরে মিসেস ওয়েস্ট মুরকে চিঠি লিখেছিলেন—যদি কোন পাত্তা পাওয়া যায়। তাইতেই জানতে পেরেছেন যে লোকটা জাত-জোচ্চোর। সেখানেও নাকি ঐ এক ইতিহাস। মিসেস ওয়েস্ট মুরের জামাই থাকে শিলং-এ, তার নাম করে এসেই জমিয়ে বসেছিল, আগে কিছু টাকা য়্যাডভান্সও দিতে গিয়েছিল কিন্তু জামাইয়ের সঙ্গে এমন গাঢ় অন্তরঙ্গতার পরিচয় পেয়েছিলেন মিসেস ওয়েস্ট মুর ওর কোন কোন কথা-বার্তায় যে চক্ষুলজ্জার খাতিরে হাত পেতে সে য়্যাডভান্সের টাকাটা নিতে পারেন নি। তারপর ঐ রকম দিলদরিয়া মেজাজ আর দুহাতে টাকা ওড়ানোতে তিনিও ভুলে গিয়েছিলেন, অন্তত কোন সন্দেহ মনে দেখা দেয়নি। তারপর এক বন্ধুকে বহরমপুর থেকে আনতে যাবার নাম করে হোটেলের গাড়ি চেপেই হাওয়া হয়েছে। সঙ্গে নিয়ে গেছে অন্য দু-তিনজন বোর্ডারের টাকা—তা প্রায় শ' দুইতিন হবে। এ ছাড়া যে বিপুল ঋণের বোঝা রেখে গেছে এখানে তাও ভয়াবহ। মিসেস ওয়েস্ট মুর সব খবর দিয়ে বিশেষ অনুনয় করে লিখেছেন মহাদেববাবুকে যে, যদি দৈবাৎ উনি কোন খবর পেয়ে যান তো যেন অতি অবশ্য মিসেস ওয়েস্ট মুরকে জানান। তিনি তাহলে চির-কৃতজ্ঞ থাকবেন!

কী আছে তা তো জানা কথাই—তবু মিঃ ঘোষাল সন্ধ্যা পর্যন্ত দেখে খামখানা খুলে ফেললেন গালা ভেঙে। নোটের আকারেই কাটা খানকতক সাদা কাগজ—শুধু একটাতে লেখা 'মাপ করবেন দাদা, এটাকে যদি পারেন তো ঋণ বলে মনে করবেন। যদি কোনদিন পারি কিছু একটা হিল্লে লাগাতে তো সুদসুদ্ধ শোধ ক'রে দেব। গ্রহ বিরূপ, কিছুতেই কিছু হয় না, অথচ ভগবান মেজাজখানা এমন দিয়েছেন যে নবাবী না করে থাকতে পারি না। কিন্তু ভুলিনি কিছুই, যা নিয়েছি সব মনে আছে, যদি দিন পাই তো সবই শোধ করব। নমস্কার—'

চুপ করে থাকা ছাড়া উপায় নেই। সিয়ানা ঠকলে বাপকেও জানায় না। আর জানিয়ে বা আপসোস ক'রেই বা লাভ কি, সকলে সমবেদনা জানাবার ছলে মজা দেখে যাবে দলে দলে এসে। সুতরাং চুপ ক'রেই রইলাম, একশ সাত টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সার হিসাবটাই শুধু মনে মনে খচ্ খচ্ করতে লাগল মধ্যে-মধ্যেই।

পরের দিন সন্ধ্যায় বসে হঠাৎ ঘোষাল-দাই কথাটা তুললেন, বললেন, 'দেখুন আমারও অনেক টাকা নিয়ে গেছে, খাওয়া থাকার চার্জ ছাড়াও বাড়তি অন্তত পঞ্চাশটি টাকা বিল হবে—কিন্তু তবু আমার মনে হচ্ছে—লোকটা ঠিক জোচ্চোর নয়। কে জানে কেন—কাল থেকে যত তোলাপাড়া করছি মনে মনে, ওকে ঠিক জাত-জোচ্চোরের দলে ফেলতে মন চাইছে না। কোথায় একটা কি আছে ওর মধ্যে—'

'তা ঠিক!' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন মহাদেববাবু, 'হিউম্যান কোয়ালিটিজ যে ছেলেটার মধ্যে বিস্তর, ভেরি ভেরি লাভেবল্। যদি এসব না ক'রে সৎ পথে উন্নতি করার চেষ্টা করত—!'

অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে বাইরে, তার মধ্যে সমুদ্রের ঢেউগুলো দীর্ঘ আঁকাবাঁকা বঙ্কিরেখার সৃষ্টি করে অবিরাম ভেঙে ভেঙে পড়ছে, উদ্দাম ঝোড়ো বাতাসে লেগেছে বাদলের সুর—ফলে সমুদ্রতীর হয়ে এসেছে জনবিরল। হাওয়ার সঙ্গে তীক্ষ্ণ সূচীমুখ বালুকণা এসে গায়ে বিঁধছে—তাই হাওয়ার আশা ত্যাগ ক'রে ভ্রমণবিলাসীর দল গৃহাগত হয়েছে বহুক্ষণ। আজ এ লাউঞ্জের আড্ডা জমেনি, বস্তুত রাও অন্তর্হিত হবার ফলে কাল থেকেই সে আড্ডা ভেঙে গেছে। আমরা তিনটি প্রাণী শুধু ভাবছি বসে বসে কোন্ ফন্দীতে কোথায় কাকে ঠকাচ্ছে, অথবা নিজেই ঠকছে নিজের কাছে।......ভাবছি ঠিক এই মুহূর্তটিতে সে কোথায়, হয়ত মাদ্রাজে কি ওয়াল্টেয়ারে কি কোদাইকানালের কোন হোটেলে গিয়ে উঠেছে, রাস্তায় পরিচিত অসংখ্য লোকের কথার টুকরো নিজের আশ্চর্য মেধায় বিধৃত ক'রে নিয়ে গিয়ে বিশ্বাসের বনিয়াদ পাকা করেছে সেখানেও, সেখানেও এমনি কোন লাউঞ্জে বসে দামী সিগারেট, ভাল খাবার এবং দিলখোলা হাসি বিলিয়ে যাচ্ছে। নিজের জীবনটা উড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে দু হাতে।......

স্বর্গত রাজশেখর বসু যখন 'চলন্তিকা' প্রকাশ করেন, তখন তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, বাংলা ভাষার এমন একখানি অভিধান রচনা করা,—যার মধ্যে আমাদের প্রচলিত ও প্রয়োজনীয় সমস্ত কথার শুদ্ধ ও অশুদ্ধ অর্থ এবং ব্যবহার পাওয়া যাবে। কিন্তু 'চলন্তিকা' পদটি যে দুটি অর্থ বহন করতে পারে, সে কথা অনেক সময়ে আমরা খেয়াল করে দেখি না। যখন যে জিনিষটা চলতি, তাকেই বলি চলন্তিকা। এ একটা অর্থ। আর যখন ব্যঙ্গের সুরে বলি, তখন কথাটার মানে দাঁড়ায় মেকি। অর্থাৎ চলবার নয়, তবু চলছে, চলে যাচ্ছে বা চালানো হচ্ছে।

সাহিত্যের বিষয়বস্তুর অনেকখানি অংশ জুড়ে আছে এই চলন্তিকা, বিশেষ করে, আত্মচরিত-জাতীয় রচনা। নিত্য প্রবহমান জীবনের মধ্যে বসে আপনার জীবনকে যাচাই করে দেখা,—এও চলন্তিকার একটি রূপ। আমাদের সাহিত্যে এইরকম চলন্তিকার নমুনা খুব বেশি না হলেও নিতান্ত কম নয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, শিবনাথ শাস্ত্রী, রাজনারায়ণ বসু এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যে স্মৃতিসাহিত্য রচনা করে গেছেন, তার মূল্য স্থায়ী। বাঙলাদেশের সমাজ-সংস্কৃতির এক একখানি দলিল বলাও চলে। তার পর রাসসুন্দরী, কার্তিকেয়চন্দ্র রায়, শরৎকুমারী চৌধুরী থেকে শুরু করে প্রমথ চৌধুরী ও উপেন্দ্র গাঙ্গুলি মশায় তাঁদের সময়কার অনেক চমৎকার ঘটনা ও মানুষ নিয়ে আত্মপ্রসঙ্গ লিখেছেন। আধুনিক কালে, হেমেন্দ্রকুমার রায় তাঁর চোখে-দেখা মানুষদের নিয়ে আর পবিত্র গাঙ্গুলি 'চলমান' জীবন ও সাহিত্যের সঙ্গে ব্যক্তিগত সংস্রব ও অভিজ্ঞতার কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। অচিন্ত্যকুমারও 'কল্লোল যুগ' লিখলেন স্থির ও নির্মেঘ স্মৃতিসমুদ্র মন্থন করে। আরও অনেকে লিখেছেন, যেমন তারাশঙ্কর, সজনী-কান্ত এবং পরিমল গোস্বামী। সম্প্রতি লিখছেন গোপাল হালদার, 'রূপনারায়ণের কূলে'। এর পর আরও কেউ-কেউ লিখবেন, এবং হয়তো আমারও তুচ্ছ জীবন-অভিজ্ঞতার সেই প্রাক্তন সাধনা একদিন ধরা পড়তে পারে।

বিদেশী সাহিত্যেও একাধিক শিল্পী, কবি, ঔপন্যাসিক ও সাংবাদিক,—এমন কি পুস্তকব্যবসায়ী মানুষও এ ধরণের লেখা লিখেছেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে, পাঠকচিত্তে পরলোক-তত্ত্বের পরই হ'লো 'চলমান' জীবনের আসন,—তা সে ডায়েরি হোক অথবা আত্মচরিত হোক। এই জাতীয় রচনার জনপ্রিয়তা নিঃসংশয়। তবে যিনি খাঁটি চলন্তিকা লিখতে পারেন, উপরন্তু ঠিক-ঠিক জায়গায় টীকা-ভাষ্য করতে জানেন, তাঁর মন ও চোখ দুটি পদার্থকেই যে সজীব ও সজাগ রাখতে হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মোটের ওপর, আমাদের সাহিত্যিকরা বড়ই সজ্জন। সব কিছুই সোনার চক্ষে দেখেন! সাহিত্যের মধু আস্বাদ করে যান, কিন্তু বড় একটা হুল ফোটান না। বোধ হয়, বন্ধুবিচ্ছেদ তথা সমালোচনার ভয়ে। দু-একজন নিন্দুক আছেন বটে, তবে তাঁরা সংখ্যা-লঘিষ্ঠ—এই রক্ষা।

কিন্তু আনুষঙ্গিক সাহিত্যের কথা থাক। চলন্তিকার প্রতি মৃদু শ্লেষ করবার অধিকার অন্ততঃ সকল অভিজ্ঞ ব্যক্তিরই আছে এবং থাকবে। যখন যে জিনিষটা চলতি, সেটা বোঝা, এবং বুঝে ফেলে ঠিকমত আঁকড়ে ধরার নামই হলো রিয়ালিজম। সাঁতার কাটতে গেলে হাত-পা ভেঙে যাবার আশঙ্কা। তাই বিনা আয়াসে স্রোতে গা ভাসানোর আর্ট শিখলেই চলন্তিকা হওয়া যায়। তাতে যদি আন্তরিক ভদ্রতা, শিক্ষা ও রুচিবোধের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে, বিবেকের দ্বন্দ্বকে পাশ কাটিয়ে যেতে হয়, তাতে কিছু আসে যায় না। লোক-সানের চেয়ে লাভের আশাই বেশি। কারণ যাঁরা বাস্তবপন্থী, তাঁরা চলন্তিকায় আস্থাবান। আদর্শ নিয়ে অকারণ মাথাব্যথায় তাঁরা অভ্যস্ত নন। কেন না, মনখানি তাঁদের ষোল আনা পড়ে আছে, এবং নজরও আবদ্ধ রয়েছে, সামনের বর্তমানে অথবা ঈপ্সিত অদূর ভবিষ্যতে।

লোকে বলে, উপায় নেই। এ রকমটি না করলে ভালোমত টিঁকে থাকা চলে না। বাজারে যে জিনিষটা চলছে, যে বস্তুর যখন যা রেওয়াজ, সেই অনুসারে মানুষকেও চলতে হয় এবং আত্মসমর্পণ করতে হয়। তবু এই চলন্তিকার গড্ডালিকা-স্রোতে গা ভাসিয়ে চলাটাকে আপনারা কেউ-কেউ হয়তো বরদাস্ত করতে পারেন না। তাতে হয়তো আপনার ব্যক্তিত্ব-জ্ঞান, মর্যাদাবোধ আহত হয়, [illegible] হয়। কিন্তু ভেবে দেখুন—এতে সু[illegible] কত, আরাম কত। আর 'ক্যারেন্সি', 'কারে[illegible] অ্যাফেয়ার্স' এবং নদীর ও ফ্যাশনের কারেন্ট—এদের ব্যুৎপত্তিটা কী!

আপনাকে বেশি পরিশ্রম করে অহেতুক আত্মক্ষয় করতে হবে না, জীবনীশক্তিরও অপচয় করতে হবে না। 'ন্যূনতম বাধা'র নীতিটি অনুসরণ করে চলুন, দেখবেন বিশেষ কিছু না করেই স্রোতের টানে গা ভাসিয়ে গন্তব্যে গিয়ে ঠেকে গেছেন শেষ পর্যন্ত। যাঁদের বয়স কম, তাঁরা গায়ের জোর এবং মনের জোর ফলানোর পক্ষপাতী। কেননা সহনশীলতার ফলে যে নির্বিকার মনোভাব জন্ম হতে পারে, তা তাঁদের নেই। কিন্তু আপনার-আমার বয়স বাড়ছে, উৎসাহ কমছে। স্বাস্থ্য ভাঙছে এবং টাকার জোর কমছে। ঘরে গঞ্জনা আর বাইরে লাঞ্ছনা আপনার শত গুণপনাকে অগ্রাহ্য করে' কেবল আপনার সাংসারিক এবং সামাজিক অযোগ্যতাই প্রমাণ করে। কোনও রকম ঝামেলা ও মানসিক উৎপাত সহ্য করবার মতন উদ্যম অথবা প্রবৃত্তি যখন ফুরিয়ে আসে, তখন আপনারা কি করবেন অথবা করাতে বলেন?

ফুটবল ম্যাচে অথবা সিনেমার টিকিট কাটতে গিয়ে একদা যে কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, কাউকে চিমটি কেটে, কাউকে বা কনুই কিংবা হাঁটুর গুঁতো মেরে, কিংবা সুবিধে থাকলে পিছন থেকে পাঁজরের ওপর সুড়সুড়ি দিয়ে, সামনের মানুষকে ঠেলে পাশে কাটিয়ে যেমন অনিবার্য গতিতে অগ্রসর হতেন, সেইটে একবার করে দেখুন। নয়তো নিশ্চেষ্ট ভাবে জনস্রোতের খাতে নিজেকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকুন। টিকিট-ঘরের কাঠের খাঁচার সামনে শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যাবেন অজানিতভাবে। সেই রকম আরও সবাই যেভাবে জগতে চলছে, বেশ দু' পয়সা গুছিয়ে নিচ্ছে এবং সুবিধা পেলে সুনামটুকুও কুড়িয়ে নিচ্ছে, সেইমত আমরাও যদি চলতে শিখি, দেখব আমাদেরও আর ঠকতে হবে না। কথাটা নেহাৎ হালকা নয়, হাসি-ঠাট্টায় উড়িয়ে দেওয়ার মত নয়। সীরিয়সলি ভেবে দেখুন—কোন জিনিষটা চলে তা নয়, কোনটা বরং চলে না, সেইটে!

প্রথমে ধরুন—মেকি সিকি। একে তো রৌপ্যবর্জিত, বাজনার বালাই নেই। মাটিতে ফেললে সব মুদ্রাই এক আওয়াজ ছাড়ে। তার ওপর পানওয়ালার দোকানের মতন চুম্বক থাকে না পকেটে। কাজেই বাজারে আলুর দোকান আর রাশনের দোকান থেকে থলি ও কার্ড দুটোই খালাস করে যখন ভাবছেন দিগ্বিজয়ের পর্ব শেষ হলো, তখন সেই নিশ্চিন্ততার অসতর্ক লগ্নে মেকি মুদ্রাটি এসে ঢুকলো আপনার পকেটে। এবং সেই যে ঢুকলো রন্ধ্রগত শনির মতন, তারপর থেকে আর ছাড়ান নেই। তারপর কত চেষ্টাই করলেন কিন্তু কোথাও গছাতে পারলেন না। প্রকাশ্য আলোয়, আবছায়ায়, আধো-অন্ধকারে

...র বাস্-এর কন্ডাক্টর থেকে দোকানী সকলের অসাবধান মুহূর্তটির জন্যে ...ধনা, পরীক্ষা করলেন। মুদ্রাটি তাদের উলটো করে ফেলে দিয়ে, গভীর ...মনস্কতার ভান করলেন। নয়তো হঠাৎ পাশের কোনো সঙ্গীর সঙ্গে একটা জরুরী আলোচনায় নিমগ্ন হয়ে গেলেন। কিন্তু কাজ হলো না। ভস্মকারী দৃষ্টি অথবা একটা সন্দিগ্ধ কটাক্ষপাতের অনুপাতে আপনার মনটা সঙ্কুচিত হয়ে এল। কেননা, আপনার ...নে রয়েছে পাপ, অসাধু মনোভাব।

তারপর, 'ওঃ, এটা খারাপ না কি!' বলে ...নিয়ার বিস্ময়-ভরা প্রশ্নে মুদ্রাটি ফেরৎ ...নতেই হয় এবং জগতে যাবতীয় মেকি-পনা কেমন করে নিরীহ সরল মানুষকে প্রতারিত ...রছে নিয়তই, এ সম্পর্কে গভীর আক্ষেপ সকলকে শুনিয়ে আর একটি সচল মুদ্রা ...যন অনেক খোঁজাখুঁজির পর পার্স থেকে ...ট করে বের করে দিতে হয়। এখন প্রশ্ন ...চ্ছে—মেকি সিকিটা যায় কোথায়? ...াপনি ওটাকে দেরাজের এক কোণে ...লে রাখবেন, একেবারে ফেলে দেবেন ...। নিশ্চয়ই। তারপর কোনও শুভ লগ্নে অনেস্ট অ্যাটেম্প্ট করতে গিয়ে দেখা গেল, অবশেষে সেটি 'লাউ-গড়গড় বুড়ীর' মতই নানা বিপত্তি কাটিয়ে গড়গড়িয়ে কারো... অফিসের শেষ নিশানায় কেমন করে যেন পৌঁছে গিয়েছে। কি জানেন আসলে টাকা-কড়ির নিজস্ব 'ভ্যালু' কিছুই নয়। সং সংসর্গে বাস করে সরকারের দেওয়া একটা ছাপ নিয়ে জনসাধারণের কাছে এক ধরনের ... ...লা অর্জন করে মাত্র। এটা নিতান্তই মন-গড়া মূল্য যান্ত্রিক কেরামতির সামাজিক দান।

তারপর ধরুন, মেকি ছেলে। বাজারে কি তার কাটতির কিছু অভাব আছে? যারা স্কুল-কলেজে শিক্ষকতা অধ্যাপনা করেন, তাঁরা কথাটার সত্যাসত্য বিচার করে দেবেন। কিসে মেকি, কার দোষে মেকি হয়ে পড়ল, সে আলোচনার ক্ষেত্র এটা নয়। তবে চোখের সামনে নিত্যই দেখতে পাচ্ছি নানা ধরণের মেকি যুবক। দেহে শক্তি নেই, কিন্তু অদ্ভুত মুখের জোর। ঘরে খাদ্যাভাব, তনু-মন ক্ষীণ। কিন্তু মাথায় লম্বা ধরণের ব্যাক-ব্রাশ চুলের ঝাঁকা অথবা মুড়িয়ে-চুল ছাঁটা। পরণে কিম্ভূতকিমাকার রংচঙে খাটো কুর্তা ও ফ্যাশনেবল চোঙা পাতলুন। কিছু না পড়েও অনেকেই 'ক্যালচার্ড'। চায়ের দোকানে ফুটবল ও ক্রিকেট পলিটিকস্ এবং খেলোয়াড়দের সর্বাধুনিক সংবাদ, ফিল্ম আর্টিস্টদের জীবন, জীবিকা ও আর সম্পর্কে প্রামাণিক তথ্যগুলি নখ-দর্পণে। রাজনীতি-চর্চায় বহু ক্ষেত্রেই আশ্চর্য সূক্ষ্মবুদ্ধি। আর ইতিহাস-জ্ঞান তেমন কিছু না থাকলেও যাবতীয় 'ইজম' আর সমাজতন্ত্রবাদের সাড়ম্বর আলোচনায় কোনও বাধা নেই। এদিকে বাড়ীর আর্থিক অবস্থা যদি অসচ্ছল হয়, তাহলেও ষ্টেশনারি এবং দরজির দোকানে কিছু না কিছু দেনা থাকবেই। কারণ কোনও জিনিষই আজকাল ধারে কাটে না, কাটে ধারে।

অতএব ধার থাকা চাই, নইলে ভদ্র-লোকই হওয়া যায় না। মগজে ধার না থাকলেও মুখের দাপট চাই। কলেজের ছেলে হলে তো কথাই নেই। অধ্যাপকদের বিদ্যা-বুদ্ধি, কলেজ য়ুনিয়ন আর সহ-পাঠিনীদের বেশভূষা-চর্চায় বন্ধুমহলকে চমকিত করা যায়। আর শারদীয় 'সোশ্যাল' কিংবা সরস্বতী পুজোয় নাম-করা রেডিও-আর্টিস্টদের এনে ফেলে তহবিল না মিলিয়েও আসর মাৎ করা চলে। আর কিছু না হোক, বারোয়ারী মণ্ডপে ভাড়াটে লাউডস্পীকারে মিশ্র-বেসুরো গীতি চলন্তিকা।

আর যে ছেলেটির একটিও মেয়ে-বন্ধু ...ই, যারা কফি-হাউসে বসে ক্লাশ ফাঁকি দেয় ..., ম্যাটিনীতে মেট্রোয় 'কিউ' দেয় না, উপরন্তু পরীক্ষা দূরে জেনেও যারা লাইব্রেরীতে যাতায়াত করে, তারা তো প্রাগৈতিহাসিক জীব! অতএব আধা হাতের সিল্ক হাওয়াই আর ট্রাউজার্স-মোড়া যেসব সব-জান্তা চীজ দেখা যায় খেলার মাঠে, সিনেমা হল-এ, সভা-সমিতিতে, কিংবা কলেজের বিতর্ক-আসরে, তাদের মেকি বলি কোন্ সাহসে? বর্তমানের তথা, ভবিষ্যতের ভরসা তো এরাই। পল্লীর ও সমাজের এরাই তো 'অরেক্‌ল্' এবং 'পলাটিক'।

তাহলে মোটামুটি দেখছি, বর্তমানে যেটা চলছে অথবা শীঘ্রই চালু হবার সম্ভাবনা এবং আশা আছে, সেটিকে সুবিধা-মত আয়ত্ত করে কাজে লাগানোই হচ্ছে বাস্তব-বোধের তথা শুভবুদ্ধির পরিচয়। একটা মন-গড়া আদর্শ, একটা প্রিয় সংস্কার কিংবা পুরাতন সত্যের পিছনে দৌড়ান আলেয়া ধরবার মতই হাস্যকর মূঢ়তা। তাই সাহিত্যে, রাজনীতিতে, শিক্ষায় ও সামাজিক আচরণে—প্রায় সর্বত্রই এই ধরণের রিয়ালিজমের কারবার এবং জয়-জয়কার। আর যেসব লেখক, কূটনীতিজ্ঞ, সংসারী গৃহস্থ এবং শিক্ষাভিমানী ব্যক্তি আদর্শের বালাই ঘুচিয়ে প্র্যাকটিক্যাল হতে শেখেন আর কায়দামাফিক ঝোপ বুঝে কোপ মারতে পারেন, তাঁরাই জীবনে ও জগতে প্রতিষ্ঠা পেয়ে থাকেন। যিনি যত কৌশলী, তিনি ততই সার্থক।

এক কথায়—যাঁর যত কেলেংকারি, তাঁর ততই কৃতিত্ব।
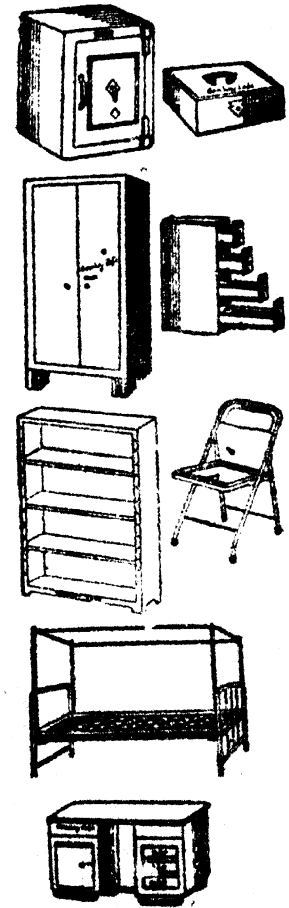
দেহ ও মন

সুমথনাথ ঘোষ

এবার পুজোয় এক কাণ্ড করে বসলো শ্রাবণী। মায়ের জন্যে সরাসরি বেনারস থেকে কেবল একশো টাকা দামের দুধে গরদের থান নয়, সেই সঙ্গে আবার একখানা পঞ্চাশ টাকা মূল্যের কাতান সিল্কের চাদরও কিনে আনালো!

অপিসের সহকর্মী অমরেশবাবু এক মাসের ছুটি নিয়ে পুজোর দু'হপ্তা আগেই কাশীতে চেঞ্জে যাচ্ছিলেন শুনে শ্রাবণী তাড়াতাড়ি ভ্যানিটি ব্যাগটা খুলে, দু'খানা দশ টাকার নোট তাঁর হাতে গুঁজে দিলে। লক্ষ্মীদাদা, ছোটবোনের এ উপকারটুকু করতেই হবে। আমার অনেকদিনের সাধ মাকে কাশী থেকে কিনে দেবো। এতদিন সুযোগ পাইনি। ভালই হলো। ঠিক সময়ে আজ আপনাকে পেয়েছি। তাছাড়া আমি ওসব ভালমন্দ কিছুই চিনি না। আপনি এসব ব্যাপারে ঘুণ। বলে একটু স্নিগ্ধ হাসি ছড়িয়ে দিলে অমরেশবাবুর মুখের ওপর।

বাস্তবিক, অমরেশবাবু কাপড়-চোপড় খুব ভাল কেনেন। কি রেশমী, কি পশমী আর কি সুতীর। অপিসের বাবুদের ওঁর ওপর অগাধ বিশ্বাস। শুধু বিয়ে-থার ব্যাপারে নয়, একটা গায়ের কাপড়, কি গরমের কোট, কিংবা কোন বেশী দামের শাড়ী কিনতে হলে, সকলেই তাই ছোটে এই অমরেশবাবুর কাছে। অভিজাত বংশের ছেলে। এককালে ওঁদের অবস্থা নাকি খুই ভাল ছিল। এখন কিছু না থাকলেও নজরটা যায়নি। কোনটা খাঁটি আর কোনটা ভেজাল—কেবলমাত্র দুটো [illegible] কাপড়ের ভাঁজের মধ্যে ঘসেই তিনি যা রায় দেন, তা একেবারে ধ্রুব বলে সকলে মেনে নেয়।

তবে ওঁ'র মনটা একটু উঁচু সুরে বাঁধা। সস্তার, কমদামের জিনিস কিনতে চান না। বলেন, তাই মিছিমিছি মনকে আঁখি ঠেরে লাভ নেই। এই বাজারে কুড়ি-পঁচিশ টাকায় যে আসল সিল্কের শাড়ী জন্মাতে পারে না যদিও আমরা সকলে তা জানি, তবু আশা করি যে দোকানদার একেবারে 'আসলী-চীজ'টা কেবল বার করে দেবে আমাকে।

তাই টাকাটা দেবার সময় শ্রাবণী বললে, দেড়শো টাকা আমার 'বাজেট', তবে দু'দশ টাকা আরো বেশী দিলে যদি জিনিসটা [illegible] হয় নেবেন। আপনাকে আর বেশ[illegible] বলবো? ভি-পি করে পাঠাতে [illegible] তবে জিনিসটা যেন ষষ্ঠীর আগে মা [illegible] অন্ততঃ সেইদিন পৌঁছয়। দোহাই [illegible] এইটুকু কষ্ট আপনাকে করতে হবে!

অমরেশবাবু সিগারেট খাচ্ছিলেন। মুখ থেকে পোড়া অংশটুকু সরিয়ে নিয়ে বললেন, ওর জন্যে আমায় কোন কষ্টই করতে হবে না। ওখানের চকে সবচেয়ে পুরনো যে বেনারসীর দোকানটা ইজ্জত আলীর, ওদের কাছ থেকেই বরাবর আমাদের 'ফ্যামিলির' সব কিছু কেনা হতো! সে বুড়ো এখনো বেঁচে আছে, তবে দোকানে বসে না। তাঁর নিজের বাড়ীতে পঁচিশ-তিরিশখানা তাঁতে কাজ হয়। সোনার-পুরার মধ্যে বিরাট তিনতলা বাড়ী। আমি ত দোকান থেকে কিনি না—সোজা বুড়োর কাছে চলে যাই সেখানে তাঁতে বোনা হচ্ছে যা, তাই থেকে বেছে ভাল জিনিস নিয়ে আসি।

ওঃ তাহলে ত কথাই নেই! কণ্ঠের উচ্ছ্বাস যেন চেপে রাখতে পারে না শ্রাবণী।

'সিটি'এ ফিরে এসে যত কাজ করতে যুরেফিরে মায়ের সেই কথাটা তার যেন বাজে। ফি বছর পুজো এলেই য়ার করে মা সেই অতি পুরনো গল্পের রাবৃত্তি করবেই করবে। আলো নিভিয়ে ছানায় শুয়ে অতীতের কাহিনী স্মরণ রতে করতে এক সময় ওরি ফাঁকে বলবে, নিস, তোর বাবা বলেছিল কাশী থেকে নারসী শাড়ী কিনে এনে দেবে। কোল-তার দোকানে নাকি সব ভেজাল। আসল নিস পাওয়াই যায় না। জেনেশুনে পয়সা য়ে ঠকার চেয়ে, না পরা ভাল। তা এমনি মার পোড়াকপাল যে তারও যেমন ন্যদিন কাশী যাওয়া হলো না। আমারও মনি জন্মের মত শাড়ী পরা ঘুচে গেল।

বাবার অবস্থা যে খুবই খারাপ ছিল, জানে শ্রাবণী। সামান্য মাইনের কেরানী ও মাড়োয়ারীর গদিতে। কি দুঃখ-কষ্টের ধ্য তাদের দিন কেটেছে কলকাতার দোপড়া গলির, সবচেয়ে সস্তার একখানা র থেকে দু'বেলা দু'মুঠো ভাতও সকলের খে সর্বদিন জোগাতে পারেন নি তিনি। দু যে মাকে বেনারসী পরাবার কল্পনা রছিলেন, এইজন্যে সে মনে মনে বাবাকে ন্যবাদ দিতো।

অমরেশবাবুকে যে বেনারস থেকে শাড়ী চাদর কিনে পাঠাতে বলেছে শ্রাবণী, কে তা জানতে দেয়নি। তাঁর হাতে নিসটা তুলে দিয়ে একেবারে চমক গিয়ে দেবে বলে গোপন রেখেছিল।

ষষ্ঠীর ঠিক আগের দিন। খাওয়া-দাওয়া রে অপিস যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল বণী। ড্রেসিং-টেবিলটার সামনে দাঁড়িয়ে লের গোড়াটা শক্ত করে বেঁধে, কালো তেটা দাঁতে কামড়ে ধরে চিরুনি দিয়ে টা টেনে টেনে লম্বা করছে, এমন সময় ওনের গলা শুনলে, দিদিমণি ভি-পি ছে। প্রসাধন ফেলে ছুটে এলো শ্রাবণী। স্টেপিন্টে কাপড়ের সেলাই করা একটা কেট, তার ওপর অসংখ্য গালার শীল নিজের নাম-ঠিকানা বড় বড় হরফে লেখা রিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে লাগল। পিওন লে, একশো পঁয়ত্রিশ রুপিয়া দিজীয়ে দিমণি!

এই যে দিই, বলে ভেতরে ঢুকতেই মা বা উঠলেন, ওটা কি রে? অতবড় বাণ্ডিল?

কিছু নয়। বলে মাকে বললে, আমার লের হাত, তুমি আলমারীটা থেকে একশো য়ত্রিশটা টাকা বার করে ওর হাতে দাও?

একশো পঁয়ত্রিশ টাকা! ওমা এত কা ওকে দিবি কেন?

বলছি মা। আগে ওকে বিদেয় করো ত?

পিওনকে যতক্ষণে টাকাটা বার করে নে দিচ্ছিলেন, তার ভেতরেই শ্রাবণী ছুরি য়ে সেলাই কেটে প্যাকেটটা খুলে ফেললে। তারপর মায়ের হাতে সেই দুটো জিনিস তুলে দিয়ে বললে, এবার পুজোর যে তিন মাসের বোনাস পেয়েছিলুম তাই থেকে তোমাকে এটা কিনে দিলুম মা। এ আমার পুজোর প্রণামী। বলে মাকে নমস্কার করলে।

ওমা, এই এত টাকা খরচ করে মিছিমিছি তোকে কে কিনতে বলেছিল।

জগৎ পারাবারের তীরে ফটো : পার্থসারথি

শ্রাবণী বলে, আমার অফিসের এক ভদ্রলোক কাশী গিয়েছেন, তাঁকে কিনতে দিয়েছিলুম। সেখানকার আসল বেনারসী। সবসুদ্ধ দেড়শো টাকা লেগেছে।

এ্যাঁ! তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে শ্রাবি? এই সাতকাঁড়ি টাকা দিয়ে আমায় কে কিনে দিতে বলেছিল।

গাঢ় হয়ে আসে শ্রাবণীর গলা। তোমার স্বামী যা পারেনি, ছেলে যা পারেনি, তোমার বিধবা মেয়ে যদি তাই করে থাকে মা, তাহলে কি সে অপরাধ করেছে! না, যাকে একদিন নুন খাইয়ে মারতে চেয়েছিলে, গলার কাঁটা, আপদ-বালাই ভাবতে, সে-ই মেয়ে যদি তাই আজ নিজে উপার্জন করে তোমার বহু-কালের ইচ্ছা পূর্ণ করেছে বলে, ওই কথা বলছো মা! তবু তোমাকে বেনারসী শাড়ী পরাতে পারলুম না, এ দুঃখ আমার মলেও যাবে না মা!

তাই বুঝি বাপ-ভাই তুলে এত খোঁটা, এত গঞ্জনা দিচ্ছিস?

বড় জ্বালা মা। সে সব দিনের কথা ভুলতে পারি না। আজো যেন কানে বাজছে। তুমি মা হয়ে, নিজে মেয়েছেলে হয়ে কোন প্রাণে ওকথাগুলো মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে মা!

ওরেঁ, দুঃখের জ্বালায় ওইসব কথা মুখ দিয়ে বেরোয়! নইলে কি মা কখনো স্বেচ্ছায় বলতে পারে! এত লেখাপড়া শিখেছিস, এত টাকা রোজগার করছিস আর এটা বুঝিস না? মেয়েছেলে হয়ে গরীবের ঘরে জন্মানো যে কত বড় অভিশাপ কোনদিন যেন তা কাউকে, এমনকি শত্রুকেও না বুঝতে হয়!

শ্রাবণী এবার জ্বলে ওঠে রাগে। বলে সেইজন্যে বুঝি চোদ্দ বছরে পড়বার আগেই আমার বয়েসটা আঠারো করে খুঁজে খুঁজে একটা তিন ডবল বয়সের পাত্রের গলায় বেঁধে দিয়েছিলে! এতই যদি গলগ্রহ মনে হয়েছিল, যদি দুমুঠো খেতে দিতে এত কষ্ট হচ্ছিল, তো কোন অনাথ আশ্রমে দিলে পারতে মা? ফ্রি স্কুলে পড়ছিলুম, থার্ড ক্লাশেও উঠেছিলুম। কেন আমার লেখা-পড়াটা এইভাবে ঘুচিয়ে দিয়েছিলে। আরো দু' চার বছর পরে যদি বিয়েটা দিতে তাহলে, চোখের সামনে হয়ত ছেলেটা বিনা চিকিৎসায় মরে যেতো না, তোমার জামাইকেও হয়তো অকালে হারাতে হতো না! বস্তীর মধ্যে শেয়াল-কুকুরের মত, জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলো, আট আটটা বছর যে কি করে কেটেছিল মা, তা যদি জানতে! উঃ। বলে ডুকরে কেঁদে উঠলো।

সস্নেহে মেয়ের চোখের জল আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিতে দিতে মা বলেন, ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যে মা! চুপ কর।

ফুঁপিয়ে ওঠে শ্রাবণী মায়ের বুকের মধ্যে, একে তুমি মঙ্গল বল? যখন টাকার দরকার ছিল, একটা পয়সার জন্যে ভিখিরির মত দোরে দোরে ঘুরেছি, আত্মীয়স্বজনের কাছে হাত পেতেও পাইনি......অথচ আজ যখন টাকার অভাব নেই, তখন......

চুপ কর মা!

আচ্ছা ভেবে দেখ তো, যদি এখনো সেই আগের অবস্থায় থাকতিস তাহলে কি হতো? তাই বলছি, ভগবান ওই দারিদ্র্য থেকে মিহিরকে তুলে নিয়ে তাকে মুক্তি দিয়েছেন, সে শান্তি পেয়েছে স্বর্গে গেছে। নইলে আজ যে তুই বি-এ পাশ করে সর্টহ্যাণ্ড শিখে অফিসে চাকরী করছিস, মাসে মাসে সাড়ে চারশো টাকা ঘরে তুলছিস, তা কি সম্ভব হতো?

চুপ করে থেকে জবাব দেয় শ্রাবণী, যেদিন তোমার জামাই চোখ বুজলো, সেই-দিন প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, যে টাকার জন্যে স্বামী-পুত্রকে খাওয়াতে পারলুম না, চোখের সামনে তাদের অকাল-মৃত্যু দেখতে হলো, সে-ই টাকা রোজগার করবো যেমন করে হোক্। তারপর লোকের বাড়ী রাঁধুনীর চাকরী করে কি কষ্টে লেখাপড়া শিখেছি, তা তো তুমি সব জানো মা......

জানি বলেই ত বলছি মা, এও ভগবানের আশীর্বাদ! তিনি বোধহয় চান না যে তোর মত মেয়ে চিরজীবন ওই অভাব-দুঃখ-কষ্টের মধ্যে জীবন কাটায়। তাই তোর পথের কাঁটা সব দূর করে এমনিভাবে রাস্তা পরিষ্কার করে রেখেছেন!

তখনো ফোঁপাচ্ছিল শ্রাবণী।

কণ্ঠে সহানুভূতি ঢেলে তিনি আবার শুরু করলেন, কি বা বয়েস তোর, বুড়ো বুড়ো মিনসে যারা অফিসে চাকরী করে চুল পাকালে তারা ক'জন তোর মত সাড়ে চারশো টাকা রোজগার করে শুনি? সামনে তোর সারা জীবন পড়ে রয়েছে, তাই বলি ভোগ করে নে যতদিন পারিস্ মা! মহা-প্রাণীকে কষ্ট দিলে ভগবান খুশী হন না কখনো!

মা ঠিক কি বলতে চান, বুঝতে পারে না শ্রাবণী! নির্বাক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে।

তিনি আপন মনে বলে চলেন, বুড়ো ধিঙ্গী মেয়েগুলো কাঁচ খুকি সেজে সব ঘুরে বেড়াচ্ছে—আইবুড়ো নাম তাদের এখনো খণ্ডায়নি—খোঁজ নিয়ে দেখগে, তাদের বয়েস তোর চেয়েও বেশী! তিরিশ-একতিরিশ বছর যে তোর বয়েস হয়েছে না বললে, কেউ কি চেহারা দেখে বুঝতে পারে? খুব বেশী হলে একুশ-বাইশ, মনে হয়। তাই বলছি কি, এবার একটা বিয়ে কর। জীবনটাকে ভোগ কর মা।

মা যে এত ভণিতা করে এই কথাটা তাকে বলতে চায়, ধারণা করতে পারেনি শ্রাবণী! তাই শিউরে উঠলো। বললে, ছিঃ। ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মায়ের দিক থেকে।

কেন ছিঃ? আজকাল ত কত বিধবা মেয়ে আবার বিয়ে থা করে কেমন সুখে-স্বচ্ছন্দে সংসারধর্ম করছে! তবে এত রোজগার-পত্তর করছিস কিসের জন্যে! ভাল ভাল শাড়ী যা কিনে দিয়েছি, একটাও ত অঙ্গে দিস না। বললেই শুনিয়ে দিস্, অফিসে চাকরী করতে এত সেজেগুজে গেলে পাঁচজনে কি ভাববে?

ঠিক-ই ত! শ্রাবণী তার পূর্বের মতকে আরো দৃঢ়কণ্ঠে সমর্থন করে।

...না, যত বুঝি তোর বেলা লোকে মনে ...! কেন এই যে রাস্তা দিয়ে দলে দলে ...মেয়েরা সেজেগুজে মুখে রঙ করে ...পসে চাকরী করতে যায়, কৈ তাদের ত ...র মত মনে হয় না?

তারা যে কুমারী মেয়ে মা। ভুলে যেয়ো না। তাদের মনে অন্য আশা যে লুকিয়ে থাকে।

মা বল্লেন, তা না হয় মানলুম। কিন্তু বিয়ে-হওয়া মেয়েরাই বা কম যায় কৈ? তাদের সাজ-গোজের বহর দেখলে মনে হয় যেন শ্বশুরবাড়ী চলেছে।

ওই সাজ-গোজের সঙ্গে তাদের স্বামীর মান-মর্যাদা জড়িত মা, এটা কেন বুঝতে পারো না? তাছাড়া তাদের স্বামী যদি ওইরকম পছন্দ করেন, তাতে কার কি বলার আছে?

ক্ষুব্ধ স্বরে মা বল্লেন, হাঁ, যত কিছু বলার, সব তোর জন্যে না?

শ্রাবণী আর কোন জবাব না দিয়ে নিঃশব্দে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আপিসে যাবার জন্যে প্রস্তুত হতে থাকে।

মা বল্লেন, জানিস সেদিনে ছকুর মার সঙ্গে ওদের বাড়ীউলি ব্যারিষ্টার অনুকুল-বাবুর স্ত্রী বেড়াতে এসেছিলেন. তোর ঘরে ঢুকে সাজানো-গোজানো দেখে বললেন, বাঃ কি সুন্দর রুচি আপনার মেয়ের? কার্পেট, সোফা, কাউচ থেকে বিছানার বেড্-কভার জানলা-দরজার ওই নেটের পর্দা—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রত্যেকটি জিনিসের প্রশংসা করলেন।

এইটেই আমি চেয়েছিলুম মা! শ্রাবণীর কণ্ঠে একটা চাপা গর্জন ওঠে। আমরা যে মানুষ, শিক্ষায়, দীক্ষায় রুচিতে কারো চেয়ে নীচে না, সেটাই আমি প্রমাণ করতে চাই মা! গরীব বলে সকলের হেনস্থার, অবজ্ঞার বস্তু নয়! জোর করে একটা মেয়েকে গরীব দুঃখীর সঙ্গে বিয়ে দিলেই সে যদি নেমে যায়, সমাজের চোখে ত সে অপরাধ কার? অথচ যে ধনী আত্মীয়রা দাঁড়িয়ে থেকে আমার বিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁরা যদি সেদিন কিছু অর্থসাহায্য করতেন তা'হলে আমার স্বামী-পুত্রের জীবনটা হয়ত রক্ষা হতো। আর আমিও সে ঋণ হয়ত শোধ করে দিতে পারতুম মা। কিন্তু তাঁরা তা করেননি। পাছে দেখা হলে টাকা ধার চাই বলে, দেখা পর্যন্ত করতেন না! কিছু ভুলিনি মা। সব এই বুকে গেঁথা আছে।

বলে নীরবে চোখের কোল আঁচলের প্রান্ত দিয়ে মুছে শ্রাবণী চাপাগলায় বললে, জানো মা, মাসের শেষে যখন সাড়ে চারশো টাকার করকরে নতুন নোটগুলো নিয়ে ভ্যানিটী ব্যাগে পুরি তখন আগে মনে পড়ে সেই রুগ্ন ছেলেটার মুখখানা, তারপর তোমার জামাইয়ের অনশনক্লিষ্ট শুকনো উপবাসী চেহারা। গরীব বলে কত তাকে তিরস্কার করেছি; বিয়ে করে একটা মেয়ের জীবন এই-ভাবে নষ্ট করার কি অধিকার আছে, বলে কত গালাগাল করেছি। সব মনে পড়ে যায় মা! অথচ তোমার ভাইয়ের কিসের অভাব। অত-বড় লোহার কারখানায় কত লোক কাজ করছে, যদি একটা চাকরী তাকে দিতো, তা'হলে আমার জীবন আজ অন্যরকম হয়ে যেতো মা! তুমি কত বলেছো, আমি কত সেধেছি কিন্তু সেই এক কথা, আমার আর লোক নেবার ক্ষমতা নেই। কর্মচারী যা আছে তাদেরি ছাঁটাই করতে হবে!

চুপ কর মা। যা হয়ে গেছে, তা নিয়ে আর দুঃখ করে কি লাভ। ভগবান তোর মনস্কামনা পূর্ণ করেছেন। টাকা চেয়েছিলি, তিনি টাকা দিয়েছেন। যথেষ্ট দিয়েছেন। তাই বলছি, ভোগ কর মা! জীবনের কোন সাধ-আহ্লাদই ত তোর মেটেনি, এইবার সেগুলো মিটিয়ে নে!

আয়নার মধ্যে হঠাৎ নিজের চোখ দু'টো দেখে নিজেই শিউরে উঠলো শ্রাবণী। কখন জল শুকিয়ে গিয়ে সেখানে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলতে শুরু হয়েছে! ভাল করে নিজের মুখটা দেখলে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। তারপর মনে মনে বললে, বাঃ চোখ দু'টো ত তার এখন আরো ভাল দেখাচ্ছে!

বিজয়ার প্রণাম করতে গেল শ্রাবণী মামার বাড়ী পাইকপাড়ায়। যাবার সময় ভীমনাগের দোকান থেকে দশ টাকার সন্দেশ বাক্সয় করে নিয়ে গেল ট্যাক্সি থামিয়ে। পুজোর সময় কখনই মামায়া কলকাতায়

থাকেন না। বিদেশে বেড়াতে যান। বোধহয় পাঁচ ছ' বছর পরে এই প্রথম কলকাতা ছেড়ে বাইরে যাননি।

মামিমাকে প্রণাম করতেই তিনি আগে সেই কথাটা শুনিয়ে দিলেন। বললেন, এবার ত কাশ্মীর যাবো সব ঠিক, প্লেনে সিট রিজার্ভ করা—ওখানের হোটেলে টাকা পাঠিয়ে ঘর নেওয়া, ছোট ছেলেটা হঠাৎ এমন সর্দি-জ্বর বাধিয়ে বসলো যে তিন দিন যেতে না যেতেই নিউমোনিয়া। এক মাস ভুগে সবে তিন দিন হলো পথ্য করেছে। কাশ্মীর ঠাণ্ডা জায়গা, ডাক্তার বারণ করছেন যেতে, তাই এবার সব বন্ধ দিলুম। তোমার মামাকে বলছিলুম, তুমি আর আমি না হয় চলে যাই, ছেলে-মেয়েরা থাক। তা উনি রাজী নন। বলেন, আনন্দ ত ওদের। ওরা-ই যদি না যায়, ত আমাদের কি হবে গিয়ে।

মামিকে প্রণাম করে ওপরে মামার ঘরে শ্রাবণী যখন উঠে গেল, তখন তার মায়ের কাপড়ের দিকে তাকিয়ে ওর মামিমা মন্তব্য করলেন, বাবা ঠাকুরঝি যে খুব জমকালো শাড়ী পড়েছো দেখছি।

হাঁ, ভাই—এটা এবার মেয়ে কাশী থেকে আনিয়ে দিয়েছে। এই কাপড় আর চাদরের দাম দেড়শো টাকা।

বাবা, দেড়শো টাকা নিয়েছে, এই সাদা সিল্কের শাড়ী ও চাদরে?

হাঁ ভাই, একেবারে খাস বেনারস থেকে আনা—সাচ্চা জিনিস!

হাত দিয়ে একবার কাপড়টা পরীক্ষা করে বললেন তিনি, তুমি ভাই বলো ঠাকুরঝি তোমাকে ঠকিয়েছে। এর দাম খুব বেশী হলে পঞ্চাশ। কেননা, গত বছর আমার ছোট বোন কাশী থেকে ঠিক এই রকমের একখানা শাড়ী কিনে এনেছে—শুধু এটা থান, আর তাতে একটু সরু পাড় আছে, এই যা তফাৎ। তার দাম পড়েছে পঞ্চাশ টাকা।

কি জানি ভাই। আমি অতশত বুঝি না। ওর অফিসের এক বাবু কাশী থেকে কিনে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

ও: তাই বলো। বুঝেছি! অফিসের বাবুই হোক আর যেই হোক, সে কিছু না রেখে কেন তোমার জন্যে কষ্ট করতে যাবে! আর বলতে হবে না।

ট্যাক্সিটা অপেক্ষা করছিল। বালিগঞ্জ প্লেস থেকে টানা ট্যাক্সি করে ওরা গিয়েছে শুনে বেশ একটু চমকে উঠলো শ্রাবণীর মামা-মামিরা। তাঁরা নিজেরা চোখে চোখে নিঃশব্দে যেন কি বলাবলি করলেন।

তারপর ওরা যখন বিদায় নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছে, তখন স্পষ্ট শ্রাবণী শুনলে ওর মামিমা মামাকে বলছেন, তোমার ছোটবোন পয়সা দেখাতে এসেছিল আমাদের। মেয়ে চাকরী করছে, সাড়ে চারশো টাকা মাইনে পায়, মাকে দেড়শো টাকা দিয়ে কাপড়-চাদর কিনে দিয়েছে। এর পরে মামা কি বললেন তার কানে গেল না। ওরা সদর দরজায় নেমে এসেছিল।

শ্রাবণী মাকে কিছু বললে না। মনে মনে শুধু খুশী হলো। হাঁ, সে এটাই চেয়েছিল তার পয়সা হয়েছে, এই কথাটা যে মামিমা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেছেন, এতেই সে যেন চরিতার্থ।

ট্যাক্সিতে বসে, মা বললে, জানলি বৌদি বলছিল, এই কাপড়টার নাকি দাম খুব বেশী হলে পঞ্চাশ—তোকে ঠকিয়েছে!

এবার খিল-খিল করে হেসে উঠলো শ্রাবণী!

হাসছিস যে?

তার মানে আমাদের টাকা এত হয়েছে যে পঞ্চাশ টাকার জিনিসটা একশো টাকা দিয়ে কিনতে পারি, এই ত? বলে আরো একটু হাসলো। বিজয়িনীর হাসি।

সেই অগ্রহায়ণ মাসের তিন তারিখে শ্রাবণীর বড়মামার ছোটমেয়ের বিয়ে। মামিমা নিজে নেমন্তন্ন করতে এলেন প্রকাণ্ড একটা বুইক চড়ে। শ্রাবণী তখন অপিসে। ওর মা খাতির করে ওপরে বসালো। বললে, কি সৌভাগ্য আমার যে, তোমার পায়ের ধুলো পড়লো আজ গরীবের বাড়ী।

শ্রাবণীর ঘরে ঢুকে চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন তিনি, বললেন, পলির বিয়ে, তাই নেমন্তন্ন করতে এলুম। তোমার দাদা বলে দিয়েছে, সকাল থেকে মেয়েকে নিয়ে যেতে হবে কিন্তু ঠাকুরঝি।

দেখি! শ্রাবণী আবার ছুটি পেলে হয়। আমার ইচ্ছায় ত হবে না!

কেন ছুটি পাবে না? ওর যদি যাবার ইচ্ছে থাকে ঠিকই পাবে। নিজের মামাতো বোনের বিয়ে বললে, ছুটি দেবে না, ... ত' বিশ্বাস করি না।

যতক্ষণ কথা বলছিলেন, ততক্ষণ ... চোখদুটো ঘুরে বেড়াচ্ছিল, সেই দুসো... ঘরটার সমস্ত জিনিসের ওপর। যেন ... দৃষ্টির ফলাকে চিরে চিরে দেখছিলেন, বা... তোমার মেয়ের শখ ত দেখছি খুব ঠাকুরঝি! বলে গলা থেকে একরকম মধুমিশ্রিত বিষ ঢেলে দিয়ে তারপর উঠে পড়লেন। ভারী দেহটা নিয়ে শেষ সিঁড়িতে পৌঁছে আবার বললেন, বিধবা তার ছেলেমানুষ, তার এত শখ দেখলে লোকে কিন্তু ভাল বলবে না ঠাকুরঝি!

কি করবো ভাই। এইসব নিয়ে যদি ভুলে থাকে, মনে শান্তি পায় ত পাক্!

না-না। হাজার হোক মেয়েছেলে! কথায় বলে "মেয়েমানুষ দশ হাতে কাপড়ে ল্যাংটা।" ওসব প্রশ্রয় দেওয়া তোমার উচিত হয়নি! আমি হক্ কথা বলবো। আমরা না হয় আপনার লোক কিছু মনে করলুম না, কিন্তু পরে শুনবে কেন?

সেদিন ছুটি হয়তো পেতো, কিন্তু ইচ্ছা করেই শ্রাবণী নিলে না। শুনতে মামাতো বোন কিন্তু পরস্পর বললেও বেশী বলা হয়। কোন সম্পর্কই ত তাঁরা রাখেননি এতকাল ওদের সঙ্গে। গরীব বলে চিরদিন ঘৃণায় দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। হঠাৎ যে মামিমা নিজে বাড়ী বয়ে নেমন্তন্ন করতে এলেন কেন—সেটাই আজ শ্রাবণীর কাছে বিস্ময়। ছেলে-মেয়ে কাউকে পাঠালেই ত পারতেন।

ভাবতে ভাবতে সহসা তার মাথায় গেল একটা চিন্তা। হয়ত মার কথাটা সেদিন বিশ্বাস হয়নি। তাই নিজের চোখে পরীক্ষা করতে এসেছিলেন। সত্যি সত্যি ওদের অবস্থা কতখানি ফিরেছে।

তাই শ্রাবণীও একটা মূল্যবান উপহার কিনে নিয়ে মাকে সঙ্গে করে সন্ধ্যাবেলায় নিয়ে বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলো। তখনো নিমন্ত্রিতের ভিড় শুরু হয়নি। অপনা-আপনি আত্মীয়-স্বজন ও অন্তরঙ্গদের সবে আনাগোনা আরম্ভ হয়েছে।

আড়াই শো টাকা দিয়ে শ্রাবণী গোপনে বড়বাবুর স্যাকরার কাছ থেকে একটা গিনি-সোনার চিক কিনেছিল। সূক্ষ্ম সোনার কাজের ওপর পান্না, চুনি ও মুক্তো সেট্ করা।

শ্রাবণী নিজে হাতে সেটা মামাতো বোনকে উপহার দিলে। মা-ই শিখিয়ে দিয়েছিল, তোর ছোট বোন হয়, তুই হাতে করে দিলে ভাল দেখাবে। প্রথমে শ্রাবণী রাজী হয়নি। পরে কি মনে করে বললে, আচ্ছা।

আজকের দিনে খাঁটি সোনার জিনিস আবার তা এমন সুন্দর কাজ-করা পেলে কোথায়! দাম ত বড় কম নয়। বেশ ভারী। আর সাচ্চা সব মুক্তো ও পাথরগুলো।

এই নিয়ে তখন মেয়ে-মহলে রীতিমতো আলোচনা শুরু হয়ে গেল। মামিমা অলঙ্কারটা হাতে করে নিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখে মুখটা বিকৃত করে বললেন, এটা একটু আলাদা রেখেদিও বা। মেয়ের যা
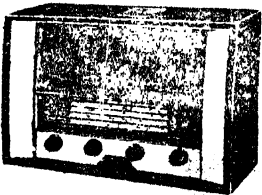
...াং বাড়িতে দেখে এসেছি, তা আর বলার নয়। কে বলবে যে বিধবার ঘর!

চাপা গলায় কে একজন বলে উঠলো, ...বে শুনেছি যে মেয়ে খুব ভাল চাকরী ...রে—অনেক টাকা নাকি মাইনে পায়।

হাঁ-হাঁ তুমি রাখো দেখি! অনেক টাকা মাইনে দেবার আর তারা লোক পেলে না! মেয়ে আমার কি রাইচাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলার যে ওকে ডেকে দিতে গেল! বলে একটু থেমে মামিমা বললেন, আজকালকার দিনে মেয়েরা অপিসে যা মাইনে পায়, অপিসের বড়সাহেবদের নজরে পড়ে গেল তার দুডবল উপরি আসে। বুঝলে না। উনি তাই সেদিন সব শুনে বলছিলেন। নইলে ঘরদোর সাজানোর বহর যদি দেখো! বড়লোকদের হার মানিয়ে দেয়। বলি এত টাকা আসে কোথা থেকে! ছ্যাঃ। ভাবতে গেলে ঘেন্না করে।

কে একজন ফোড়ন কাটলো, তা বড় বড় লোককে ঘরে এনে বসাতে গেলে তেমনি আসবাবপত্তর দরকার বৈকি? কি বলিস রে।

সঙ্গে সঙ্গে একটা অস্ফুট গুঞ্জনধ্বনি উঠলো। যে ঘরে মেয়েকে সাজিয়ে বসিয়ে রাখা হয়েছিল, সেখানেই ছিল মেয়েদের সবচেয়ে ভিড়। চারিদিকে গোল হয়ে ঘিরে বসেছিল সবাই পালিকে। নিমন্ত্রিত যারা আসছিল ওই ঘরে বসছিল।

শ্রাবণী এদের মধ্যে বসে যেন কেমন অস্বস্তি বোধ করছিল। একটু পরেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মাকে খুজতে যাচ্ছিল ভিতরে। হঠাৎ একটা ঘরের কাছে আসতেই মামিমা ও তাঁর বোধহয় বাপের বাড়ীর আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে তার সম্বন্ধে যে আলোচনা হচ্ছিল, তাই শুনে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। কে আবার ওঁর মধ্যে থেকে ফোড়ন কাটলো, তা বিয়ে দিলেই ত পারে বাপু। আজকাল ত হামেশাই হচ্ছে এরকম?

হাঁ। ওই বিধবা মেয়েকে বিয়ে করার জন্যে কার বয়ে গেছে? আর জ্বালাসনি তুই। বলে মামিমা গলায় একপ্রকার সুর টানলেন।

শ্রাবণীর দুটো কানে যেন কে গলিত সীসা ঢেলে দিলে। পায়ের তলায় যেন কি কাঁপছিল। মনে হচ্ছে বুঝি ভূমিকম্প শুরু হয়েছে। আশেপাশে যেদিকে তাকায় দেখে সব ঘুরছে। দুলছে। এখনি বুঝি ভেঙ্গে পড়বে বাড়ীঘর সব তার মাথায়। ছুটতে গিয়ে দেখে, পারছে না। অতি কষ্টে দেওয়াল ধরে ধরে সে আবার ফিরে এলো সেই ঘরে, যেখানে বধূবেশে বসে আছে পালি। একটু পরই মাকে দরজার কাছে দেখে সে বেরিয়ে এলো। বললে, মা শিগ্‌গির চলো! আমার শরীরটা যেমন করছে, বলতে পারছি না!

সে কি রে! এখনি চলে গেলে ওরা কি মনে করবে।

তুমি তাহলে থাকো মা। ওদের পৌঁছে দিতে বলো কাউকে। আমি চলে যাই। আমি আর দাঁড়াতে পারছি না।

না-না। তোর শরীর খারাপ, একলা এতটা পথ যাবি, সে কি হয়? আমি বিধবা মানুষ, আমিই বা এখানে থেকে কি করবো! আমি বৌদিকে একবার বলে চলে আসছি। আসল কাজ ত হয়ে গেছে। জামাই পরে দেখলেই একদিন হবে'খন।

সারা পথ মাথাটা টিপে ধরে ট্যাক্সিতে চোখ বুজিয়ে রইলো শ্রাবণী। মায়ের সঙ্গে একটা কথা পর্যন্ত বললে না। মামিমার সেই কণ্ঠস্বর। সেই বক্রোক্তি যেন তার কানের মধ্যে তখনো তেমনি বাজছেঃ 'বিয়ে করবে ওই বিধবা মেয়েকে...কার বয়ে গেছে...তুমিও যেমন!'

শুধু একথা নয়, আবার তার সম্বন্ধে যে কুৎসিত চিত্র অন্যদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন, সেকথা ভাবতেও ঘৃণা হয়। নেহাত বিয়েবাড়ী, আত্মীয়স্বজন চারিদিকে, নইলে এর জবাব মামিমাকে ভাল করেই দিতে পারতো শ্রাবণী! অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়েছে। আবার মামারও নাকি এতে সমর্থন আছে। ছিঃ!

যতদিন যায়, এ অপমানের জ্বালা কিছুতেই ভুলতে পারে না শ্রাবণী। দুষ্ট ক্ষতের মত ভেতরে ভেতরে যেন একটা আক্রোশ জন্মাতে থাকে মামিমার ওপর, মামার ওপর, আত্মীয়স্বজন সকলের ওপর।

সবচেয়ে মামিমার ওপর। কি করে প্রতিশোধ নেবে তাই ভাবতে থাকে। ভাবতে ভাবতে, এক একটা রাত্রি বিনিদ্র কেটে যায়। মেয়েকে ছটফট করতে দেখে মা প্রশ্ন করেন, কি হয়েছে রে, শরীর খারাপ করছে?

না। কিছু নয়। বলে পাশ ফিরে শোয় শ্রাবণী কিন্তু সারারাত তার চোখ দুটো অন্ধকারে হিংস্র শার্দুলের মত যে জ্বলতে থাকে। মেয়ের মনের খবর কিছুই জানতে পারেন না মা যদিও তারি পাশে শুয়ে থাকেন।

কয়েকদিন এইরকম ভাব দেখে শেষে একদিন গভীর রাত্রে মা প্রশ্ন করলেন, হ্যাঁরে কি কষ্ট হচ্ছে বল, কাল সকালেই তোকে

"এ্যাঁক, শ্রাবণী তুমি কাঁদছো?"

নিয়ে যাবো ডাক্তারের কাছে! আমি ত ভালো বুঝছি না!

শ্রাবণী কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর হঠাৎ যেন মনের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করতে করতে বলে ফেললে, আমি বিয়ে করবো মা। সব ঠিক করে ফেলেছি! তুমি আয়োজন করো।

সে ত খুব ভাল কথা রে। আমি ত কবে থেকে তোকে বলছি মা। ভোগ করে নে জীবনটাকে। এমনি করে আত্মপীড়ন করা পাপ।

চুপ করো মা! ওসব কথা থাক! সামনের মাসের দু তারিখে ভাল দিন আছে। তুমি চিঠি ছাপিয়ে সবাইকে নেমন্তন্ন করে এসো। মামার বাড়ীর যেন কেউ বাদ না যায়। খুব ঘটা করতে হবে কিন্তু! মনে রেখো।

হাঁ মা, তোমার মনের কোন সাধ অপূর্ণ রাখবো না আমি। ভগবান যে তোমায় সুমতি দিয়েছেন, তার জন্যে আমি কালই কালীঘাটে পুজো দিয়ে আসবো।

রমেন মল্লিক। সুন্দর পুরুষোচিত চেহারা এম-এ পাশ। ভদ্র মার্জিত রুচিসম্পন্ন যুবক। মাইনেও ভাল পায়। শ্রাবণীর চেয়ে বয়স কিছু কম হলেও বহুদিন থেকে তার নজর শ্রাবণীর ওপর। জরুরী চিঠি টাইপ করতে দিতে এসে, তার আঙুলেটা একটু স্পর্শ করার লোভ সামলাতে পারে না। তার চোখের স্থিরও গভীর দৃষ্টিতে বহুদিন শ্রাবণী দেখেছে তার কাঙাল মনের প্রতিচ্ছবি। কোনদিন তাকে আমল দেয়নি। ওর ঠাণ্ডা নীরস দৃষ্টি দিয়ে তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। বার বার। কাজেই তাকে পাওয়া আদৌ কঠিন হলো না।

বর দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল মামিমা ও মামার বাড়ীর সকলে। এমন সুশিক্ষিত সুন্দর চেহারার ছেলে কি দেখে বিয়ে করতে রাজী হলো শ্রাবণীর মত মেয়েকে, কে জানে! দামী বেনারসী ও গহনায় ফুলের মালায় মানিয়ে ছিল শ্রাবণীকে। রাণীর মত দেখাচ্ছিল তাকে রমেনের পাশে। খুব ছেলেমানুষ দেখাচ্ছিল শ্রাবণীকে তার বয়সের তুলনায়।

মামার বাড়ীর সকলে সকাল-সকাল চলে গেল। ঘরে পর্যন্ত কেউই রইলো না। শ্রাবণী শুধু মামিমাকে হাত দুটো ধরে অনুরোধ করলে, আপনি চলে গেলে লোকে কি মনে করবে? আমাদের পরিচয় দেবার মত আপনজন বলতে আপনি ছাড়া আর কে আছে।

কি জানি, কি মনে হলো! হঠাৎ মামিমার চোখ দুটো স্নিগ্ধ হয়ে উঠলো। আচ্ছা, বিয়েটা হয়ে গেলে, যাবো তাহলে। বিয়েটা ছিল গোধূলি লগ্নে, পাছে দেরী হবে, এই ওজুহাতে চলে যায় মামারবাড়ীর সব। তাই এ ব্যবস্থা শ্রাবণী নিজেই করেছিল। যেন তার বিয়েটা সে কেবলমাত্র দেখাতে চায় তার এই মামিমাকে।

মামিমা বর-কনেকে বাসর ঘরে বসিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। কিন্তু কিছু খেলেন না। শ্রাবণীর মা অনেক অনুরোধ করলে, বৌদি, একটা সন্দেশ অন্ততঃ খাও নইলে যে আমার মেয়ের অকল্যাণ হবে ভাই!

মনে মনে বললেন, বিধবার বিয়ে, তার আবার কল্যাণ অকল্যাণ! এতো বিয়ে নয়—নিকে! কিন্তু মুখে বললেন, আচ্ছা দাও একটা সন্দেশ। বলে ডিস থেকে একটা সন্দেশ নিয়ে গালে ফেলে চলে গেলেন।

সারারাত বাসরটা গান-বাজনা করে কেটে গেল। পরের দিন কালরাত্রি। একটা সম্পূর্ণ আলাদা ঘরে রাত কাটালে শ্রাবণী। রমেনের মুখ দেখলে না। মুখ দেখলে নাকি স্বামী-স্ত্রী সুখী হয় না। শ্বশুরবাড়ী যাবার সময় মেয়ের কানে বার বার করে ওই একটি কথা বলে দিয়েছিল শ্রাবণীর মা।

শ্রাবণীও মনে প্রাণে সেটা মেনে চলেছিল। কিন্তু ফুলশয্যার রাত্রে সবাই যখন শুতে চলে গেল কোলাহল-মুখরিত বাড়ীটা যেন নিমেষে জনহীন শূন্য বলে মনে হতে লাগল, তখন কাঁপতে লাগল শ্রাবণীর বুকের ভেতরটা। শয্যার প্রান্তে বসে কাঁদতে লাগল সে। দু'চোখ বেয়ে নীরবে যেন শ্রাবণের ধারা বইতে লাগল।

এ্যাঁক, শ্রাবণী তুমি কাঁদছো? কি হয়েছে বলো লক্ষ্মীটি! বলে রমেন যেমন তার বাঁ হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিতে গেল, শ্রাবণী হাতটা সরিয়ে নিলে।

ব্যাপার কি? ভ্রুকুঞ্চিত করে সরে গেল রমেন।

আমায় ক্ষমা করো। আমি ভুল করেছি! আমি কিছুতেই পারছি না মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে। তার সেই অনশনক্লিষ্ট মুখখানা যেন চোখের সামনে ভাসছে! কত তিরস্কার করেছি দারিদ্র্যের জন্যে। কত গালাগাল দিয়েছি। সব মনে পড়ছে। আমি তাকে কিছুতেই মন থেকে সরাতে পারছি না। আমার সব মনটা জুড়ে রয়েছে সে। তোমার স্থান সেখানে হবে না—না—না—না। বলে ডুকরে কেঁদে রমেনের পায়ের ওপর আছড়ে পড়লো শ্রাবণী। আমায় ক্ষমা করো। আমার দুর্বলতা মার্জনা করো। তুমি শিক্ষিত ভদ্র, তোমাকে আর বেশী কি বলবো! তুমি আমার মন চাও না দেহ চাও? বলো? বলো?

রমেন কি বলবে বুঝতে পারে না। শুধু পাথরের মত স্তব্ধ দাঁড়িয়ে থাকে। আর তেমনি ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে শ্রাবণী তার পায়ের ওপর মাথা রেখে!

কী বলেছিলে শুনি?—শোভনা মুখ ফেরালো।

কেন, হাতীবাগানের ' ওদিকে দু'খানা ঘর নিয়ে থাকলে এ সব ঝঞ্ঝাট কি হত? ভাড়াবাড়িতে থাকো, মাস-মাস টাকা ফেলে দাও। ল্যাঠা চুকে গেল!

ঘরভাড়া করার চেয়ে একি ভাল হয়নি? নিজের বাড়ির সম্মান নেই?—বাঁকা চোখে শোভনা বলল।

সম্মান এখন ধুয়ে খাও!—বামাপদ গরগর ক'রে বলল, কী আছে এখানে? না বাজার-হাট, না মুদি-মনোহারী! একখানা পানের দোকান পর্যন্ত হয়নি। রাতে-ভিতে অসুখ করলে একটা ডাক্তার নেই।

মাদুলী

প্রবোধকুমার সান্যাল

ভাগ্যবিধাতা বোধ হয় গণনা ক'রে দেখেছিলেন, শোভনার মতো মেয়ের হাতে বামাপদকে যদি গছানো না যায়, তাহলে ভবিষ্যতে দুজনের মধ্যে একজনের দুঃখ-দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী। তবে কিনা সেই বিধাতা প্রকাশ্যভাবে কারও অকল্যাণ চাইছেন,—এর প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি! সম্ভবত সেই ভরসাতেই হাতীবাগানের টোলের পণ্ডিতরা উত্তমরূপে উভয় পক্ষের ঠিকুজি-কোষ্ঠি বিচার ক'রে বছর আষ্টেক আগে বলেছিলেন, এ বিয়ে হ'ল রাজযোটক!

সেই বিয়ের ফলাফলস্বরূপ বছর ছয়েকের একটি মেয়ে এবং চার বছরের একটি ছেলে। ছেলেটা বড়ই কাঁদুনে, এবং সেই এক বছর বয়স থেকে এই কাঁদুনে স্বভাবটি তাকে পেয়ে রয়েছে। বহু চেষ্টা করেও শোভনা ওকে দুরস্ত করতে পারেনি। মেয়েটা থাকে মামার বাড়িতে।

একটু কোলেই নাওনা বাপু! সেই আপিস থেকে ফিরেছি,—কাঁদছে তখন থেকে। ছেলেটার ওপর বড্ড অযত্ন তোমার!

টুলের ওপর দাঁড়িয়ে নতুন ঘরখানার দেয়ালে শোভনা পেরেক পুঁতছিল। মুখ ফিরিয়ে বলল, সারাদিন কাঁদছে, সমস্তক্ষণ খায়না—তুমিই কেন যাওনা ওকে নিয়ে একটু বাইরে? নতুন বাড়িতে একটু নিঃশ্বেস ফেলবে তার সময় নেই!

বামাপদ চৌকির ওপরে বসেই রইল, নড়ল না এতটুকু। শুধু বলল, কী ছবি তোমার ঘর সাজাবার! মেয়েমানুষের বুদ্ধি এমনি হয়! ওখানে ছবি টাঙাচ্ছ,—মশারির দড়ি বাঁধবে তাহলে কোন্ পেরেকে? বৌবাজারে থাকতেই না বলেছিলুম, পুরনো খাটখানা বেচো না?

শোভনা পেরেকের ওপর কাটারির ফলাটা ঠুকতে ঠুকতে বলল, মুখেও উচ্চারণ করো না সেই খাটের কথা! তোমার বাপ-পিতামো ওই খাটে শুয়ে স্বর্গে গেছেন, বুড়ি ঠাকুমা মরেছেন ওই খাটে, আর তোমার মা যদি সে-বছর কাশীলাভ না করতেন, তাহলে তাঁর কপালেও থাকত ওই খাট! ওখাট এবাড়িতে আর ঢুকতে দেবো?

ছেলেটা বয়না ধ'রে কাঁদছিল।—

বামাপদ বলল, কিচ্ছু জানো না, শুধু মেয়েলি তর্ক। ওখানা ছিল আসল শেগুনের খাট একশ' বছর আগেকার। ও কি পাওয়া যায় আজকাল? শুধু কি খাট? কাঁঠাল কাঠের বাক্সটাও অমনি খয়রাতি ক'রে এলে!

শোভনা রাগ ক'রে বলল, যাক, পুরনো বালাই সব যাক। নতুন বাড়িতে এলুম, এখানে সব নতুন জিনিস আনব। আগে থামাও দেখি ছেলেটাকে? সেই থেকে শুধু তর্কই করছ!

নতুন বাড়ি? একে তুমি বাড়ি বল? দেড়খানা ত' ঘর! না আছে পাঁচিল, না রান্নাঘর!—বামাপদ বলল, তখন না বলেছিলুম?

টুল থেকে নামল শোভনা। বলল, চার-পাঁচটা গেরস্থ এখানে এসেছে, তাদের চলছে কেমন করে? ওরাও ত' আপিস-ফেরতা বাজার করে আনে। ইস্টিশানের কাছে দেখে এলে ত' মুদির দোকান। মাঝে মাঝে মাছ বিক্রি করতে আসে। চলবে না কেন শুনি? বউবাজারে চিরকাল কাটিয়ে আর বুঝি নতুন জীবন ভাবতে পার না?

সেখানে সব পেতুম হাতের কাছে!

সেইজন্যেই ত' এত আলস্য তোমার!—শোভনা বলল, না আছে সাহস, না কোমরের জোর। কষ্টকরা শেখোনি, পরিশ্রম কা'কে বলে জান না। সবাই মিলে যোগান দিয়েছে,—নিজের ক্ষমতা কিছু দেখাওনি! চাকরি-টাও জুটিয়েছিলে পিসেমশায়ের উমেদারি ক'রে। নিজের যোগ্যতায় পাওনি।

বামাপদ বলল, বেশ ত, সাউখুড়ি ক'রে এসে এই বন-বাদাড়ে জায়গা কিনেছ, এবার দেখাওনা কেমন কোমরের জোর! দেখিনা তোমার যোগ্যতাটা কেমন?

শোভনা হাসল,—আচ্ছা বল ত, এ বাড়ির কোন্ কাজটা তুমি করেছ? রাজ-মিস্তিরি কে খাটিয়েছে? বালতি-বালতি জল এনে ইঁট ভিজিয়েছে কে? সিমেন্ট-পারমিট কে যোগাড় করেছিল? জানলা-কপাটে কে রংয়ের পোঁচড়া টেনেছি[illegible]

বামাপদ স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে [illegible]ল, তুমি যে পুরুষ-মানুষ, বিয়ের আগে কি জানতুম[illegible]

আমি কি জানতুম তুমি মেয়েমানুষের হদ্দ?—শোভনা সহাস্যে বলল, শুধু সব কাজের পেছনে টিকটিক করতে জানো! তার চেয়ে কাজ খুঁজে নাওগে দিকি? পাঁচিল না থাক কঞ্চি কেটে বেড়া দাওগে। যদি পার ফুলগাছের গোড়ায় মাটি দাও। দোহাই তোমার, ঘরের চৌকি ছেড়ে বাইরে বেরোও! আলো-হাওয়ার মাঝখানে যাও। তিন কাঠা জায়গা কম নয়,—নিজের মাটিকে ভালবাসতে শেখো!

বামাপদ বলল, হুঁ, আমি তখনই জানতুম!

কি জানতে?

জানতুম আমাকে একলা পেয়ে তুমি খাটিয়ে মারবে! এই ভয়েই আমি ভাইদের সঙ্গে আলাদা হ'তে চাইনি!

শোভনা বলল, ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট যে তোমাদের ঘর-বাড়ি সব ভেঙে দিল? তাদের কাছে গিয়ে বলতে পারনি যে, আমরা একেলে পঞ্চপাণ্ডব!

ছেলেটা বায়না ধ'রে সেই অবধি কাঁদছিল। শোভনা বাইরে গিয়ে স্বামীর জন্য চায়ের জল চড়িয়ে দিল। ঝাঁটা দিয়ে ঘর-বারান্দা পরিষ্কার করল। উঠোনের টিউব-ওয়েল থেকে খাবার জল ধ'রে আনল। তারপর সন্ধ্যাবেলাকার রান্নার জন্য কয়লা ভেঙে রেখে মসলা পিষতে বসল। তর্ক করবার সময় নেই তার।

ঘরের চৌকি থেকে উঠে বামাপদ বারান্দায় এসে জায়গা নিল। বলল, এখন দেখছি যা ভেবেছিলুম ঠিক তাই! আলাদা ঘরকন্না পাতলে তোমার মন-মেজাজ যে এমনি হবে, এ আমি ঠিকই জানতুম। বড়-বৌদি ঠিকই বলেছিলেন!

তাহলে বড়বৌদির আঁচল ধরেই থাক গে? ছেলেটাকেও সঙ্গে নিয়ে যেয়ো! তোমার পুরনো বংশের আদুরে দুলাল!—শোভনা তাড়াতাড়ি মসলা বাটা শেষ ক'রে কেটলির গরম জলে চা ভিজিয়ে দিল। পরে বলল, ভাবলুম আপিস-ফেরতা মাছ-আনাজ কিছু আনবে। এবেলা রান্না কার কি দিয়ে বল দিকি?

বামাপদ বলল, এখন মজাটি বোঝ! থাকো পেটে কিল মেরে! সকালবেলা না বলে গেলুম, স্মৃতিরত্নদের ওখান থেকে বাতের মাদুলি আনতে যাব? সে কি সোজা রাস্তা? কয়লাঘাটের আপিস থেকে বেরিয়ে সেই তোমার জেলেটোলা!

কিন্তু তুমি ত' হাঁটবার মানুষ নয়?

শোনো কথা!—বামাপদ বলল, হাঁটা একেবারে বারণ! স্মৃতিরত্ন বলে দিয়েছেন, আপিস থেকে সোজা বাড়ি, বাড়ি থেকে সোজা আপিস। এক পা যদি এদিক-ওদিক গিয়েছ, মাদুলির কোনও ফল ফলবে না। হাঁটতে একেবারে মানা।

গরম চায়ের পেয়ালা স্বামীর সামনে রেখে শোভনা বলল, ছেলের গায়ে তিনটে, আর তোমার সাতটা,—আর ক'টা মাদুলি ঝুলাবে সর্বাঙ্গে শুনি? লোকের সামনে দাঁড়াবে কেমন ক'রে?

চায়ে চুমুক দিয়ে বামাপদ বলল, এঃ চিনি হয়নি যে?

ওতেই হবে। আমার মাসকাবারি ছ'সের চিনি। একটু একটু কম খাও।

হুঁ, এ আমি জানতুম! এইজন্যেই বড়বৌদি ছাড়া আর কা'রো হাতের চা আমি খেতুম না!

শোভনা বলল, বেশ ত, আপিস-ফেরতা গিয়ে বড়বৌদির কোলে ব'সে মিষ্টি-মিষ্টি চা খেয়ে এসো!—শোভনা রাগ ক'রে উঠে গেল।

পিছন থেকে বামাপদ বলল, যা আন্দাজ করেছিলুম, ঠিক তাই। তোমার মেজাজ-মর্জির জন্যেই আমাকে আরেকটা মাদুলি ধারণ করতে হবে!

ছেলেটা তখনও ঘ্যান ঘ্যান করছিল।—

ঘরের ভিতর থেকে গুছিয়ে শাড়িখানা জড়িয়ে চটিজুতো পায়ে দিয়ে শোভনা বেরিয়ে এল। বলল, দয়া ক'রে দেখো, দরজা খোলা রইল। আমি আসছি এক্ষুনি।

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে নিজের মনেই বামাপদ বলল, আমাকে লোকে স্ত্রৈণ বলে কি সাধে? কে না জানে স্ত্রীর বুদ্ধিতে চলি আমি? চার ভাই মিলে অমন সুখের সংসার,—দিলুম এক কথায় ভেঙে! আমার না ছিল খাটা-খাটুনি, না মাথাব্যথা। বাপ-পিতামোর সম্পত্তি,—পরম নিশ্চিন্ত। দুখানা ঘর নিয়ে ছিলুম, ওতেই কেটে যেত জীবনটা। দশটা-পাঁচটা আপিস,—চোখ বুজে দিন কেটেছে। এক তিল সমস্যা ছিল না।

দরজার কাছে গিয়ে থমকিয়ে দাঁড়িয়ে-ছিল শোভনা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে হাসছিল। এবার বলল, এখন বড্ড গায়ে লাগছে, না?

কেন লাগবে না?—রাগ করল বামাপদ,—আসলে তুমিই চেয়েছিলে স্বাধীনতা, আমি হলুম তার উপকরণ! ভাই-ভাইয়ের সংসারে কা'র না ঝগড়াঝাঁটি হয়? তাই বলে একেবারে কাটান-ছেঁড়ান ক'রে এলে? তার চেয়ে না হয় পায়ে ধ'রে মিটমাট ক'রে থাকতুম?

শোভনা বলল, পায়ে ধরে থাকতেই বা যাবে কেন? তুমি কি কোনও অন্যায় করেছিলে? তার চেয়ে এই ত' ভাল! ঠাঁই-ঠাঁই থাকো, সকলের সঙ্গে সদ্ভাব রাখো। কেউ কারও কড়ি ধারে না, কারও সঙ্গে কারোর স্বার্থ নিয়ে কথা ওঠে না। নিজে আনবে, নিজের বাড়িতে বসে খাবে!

বামাপদ বলল, এসব তোমার কথার কথা! আসলে তুমিই সব পুরনো ব্যবস্থাকে ঝেড়ে ফেলতে চেয়েছ। কথায়-কথায় তোমার নতুন কিছু চাই। বৌবাজারের বাড়িতে তুমি হাত-পা ছড়াতে পাওনি, তাই তোমার রাগ ছিল। ভাসুর-মামাশ্বশুর ঠানদিদি-ঠাকুমা —এদের ফাঁস থেকে তুমি পালাতে চেয়েছিলে। আমি তখনই বলেছিলুম, দ্যাখো, গৃহশুদ্ধি কবচ পরো, সব ঠিক হয়ে যাবে! কথাটা তোমার কানেই ঢুকল না। এখন নাও, এই বনবাদাড়, হু হু করছে চারদিক, —সাপ-ব্যাঙ-শেয়াল ঘুরছে পায়ে-পায়ে,—এখন ঠ্যালা সামলাও? আমি কিন্তু বলে রাখছি, দোকান-বাজার যাচ্ছ যাও, আমি অন্ধকারে এই ছেলেকে নিয়ে একলা থাকতে পারব না। চারদিক খাঁ খাঁ করছে!

শোভনা স্বামীর দিকে তা[illegible] আরেকবার হানল, তারপর বাইরে [illegible] দরজাটা ভেজিয়ে সে হনহন ক'রে চলে [illegible] মাঠের প্রান্তটা ছাড়িয়ে রাস্তাটার দিকে [illegible]

বোধহয় মাইল খানেক হবে। মাঝখ[illegible] পড়ে মস্ত এক লোহার কারখানার পাঁচি[illegible] —সেই পাঁচিল বহুদূর পর্যন্ত লম্ব[illegible] সন্ধ্যার সময় এদিকটা একটু জনবিরল[illegible] রাস্তাঘাটে আলো এখনও হয়নি, তবে কথাবার্তা চলছে। এই পাঁচিলের পাশের দীর্ঘপথটা ছাড়িয়ে গেলে তবে স্টেশনের আলো প্রথম চোখে পড়ে। আজ অবশ্য শুক্ল-পক্ষের একটু ঝাপসা আলো ছিল।

দোকান-বাজার করাটা সম্প্রতি শোভনার একপ্রকার অভ্যাস হয়ে গেছে। নতুন বাড়ি আর নতুন ঘরকন্না পাতবার দায়িত্বটা যখন তারই একার, তখন তাকেই এসব নিয়মিত করতে হবে। তা হোক, এতে আনন্দ আছে তার। দরদস্তুর, খরচপত্র, এসব তার নিজের মুঠোর মধ্যেই থাকুক। সে খুঁজে-পেতে গয়লা ঠিক করেছে, ঘুঁটে কয়লা সে এখন বাড়িতে বসেই পায়। ধোবাকে সেই ধ'রে এনেছে ওই ঘুঁটেওয়ালির সাহায্যে। আরও মাস তিনেক কাটলে ঠিকা-ঝি একজনকে রাখার কথা সে হয়ত ভাবতে পারবে।

ঝোলাটা শোভনার হাতেই ছিল। একেকটি ক'রে সে কেনাকাটা আরম্ভ ক'রে দিল। স্টেশনের ধারের বাজারটা খুবই ছোট। কিন্তু মিনিট পনেরো-কুড়ির মধ্যে শোভনা তার ছোটখাটো কেনাকাটাগুলো সব গুছিয়ে কিনে নিল। অধিকাংশই খাদ্যসামগ্রী। একখানা সাবান। মাখন এক কৌটো,—কিন্তু দাম বেড়েছে আরও দু আনা। ডিমের দর আগুন। বিস্কুট ছোট একখানি তিন নয়া! শোভনা ওরই মধ্যে যা পারল, কাল সকালের জন্য আনাজপত্র নিল। ছেলেটার জন্য কৈ কি মাগুর,—কিন্তু ছ টাকার কম কিলো নেই! নোনা ইলিশ ভালবাসে বামাপদ,—কিন্তু তাও সাড়ে তিন টাকা। চুনো-চিংড়ির ত্রিসীমানার কাছে যাবার যো নেই। শোভনা যা পারল ঘুরে ঘুরে দেখেশুনে কিনল।

হঠাৎ কে যেন ডাকল পিছন থেকে, আপনি যে সন্ধ্যেবেলা বাজারে?

মুখ ফিরালো শোভনা। তারপর হাসি-মুখে বলল, এই যে? কবে এলেন, বিনয়-বাবু? আপনার বাড়ির সামনে দিয়েই এলুম। ভাল আছেন?

সৌম্যদর্শন যুবকটি জবাব দিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, আজ দুপুরের বম্বে মেল-এ এসেছি। আপনাদের খবর ভাল? ওরে গোবিন্দ, দিদির হাত থেকে ঝোলাটা নে।

না না, এমন কিছু ভারি হয়নি, আমিই পারব।

তা হোক, দিন, ওর হাতে।

গোবিন্দ হাসিমুখে শোভনার ঝোলাটা হাতে নিল। বিনয় বলল, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমার মালপত্র একেবারে তছনছ করা ছিল। আপনার হাত না পড়লে কিছুতেই গোছগাছ হত না। সব আমি শুনেছি গোবিন্দর মুখে। নিজের ঘরদোর গুছিয়ে আপনি সময় পেলেন কখন?

শোভনা বলল, ও আর কতটুকু! আমার হাতে আরেকটু সময় থাকলে আপনাদের

...ন বাড়ি সব ভাল করে গুছিয়ে দিতুম। ...ই ত, একটু আগে দেখে এলুম, আপনার বাড়িতে তালাবন্ধ। গোবিন্দকে না দেখে ভাবলুম, কোথায় গেল! এবার বলুন, নতুন বাড়িতে কবে আসছেন?

বিনয় হাসিমুখে বলল, এই শিগগিরই—বোধহয় মাস দুয়েকের মধ্যে। রান্নাঘরটা হয়ে গেছে, এখন বাকি বাথরুম আর পাঁচিল। যত তাড়াতাড়ি পারি কাজ সারছি।

শোভনা বলল, ঘরের মেঝে মোজাইক করবেন যে বললেন?

ওটা একটু দেরি হবে। সকলের আগে দরকার ইলেকট্রিক। আপনার বাড়ির নর্দমাটা কোন্ দিকে দিলেন?

হাসিমুখে শোভনা বলল, উঠোনই এখনও হয়নি তা নর্দমা!

গোবিন্দ বলল, দিদিমণি, আপনি যদি গরু রাখার চালা করাতে চান আমাকে বলবেন, আমি ঘরামির কাজ জানি।

আচ্ছা ভাই, দুচার মাস যাক্ তখন বলব।

বিনয় বলল, আপনার কাছে আমি খুব কৃতজ্ঞ। আজ এখানে এসে দেখি, আপনার কল্যাণে আমার চারটে ঘরই ফিটফাট! আপনি ঠিকই জানেন, কোথায় কোন্‌টি ঠিকই মানাবে! আপনার চোখ কিছু এড়ায় না!

চোখ নয়, মন। শোভনা খুব হেসে উঠল।

নিশ্চয়ই। মনের আনন্দই ত গুছিয়ে তোলে। বিনয় বলল, আপনি নিজের বাড়ি নিজে দাঁড়িয়ে করালেন,—দেখলুম ত। তখনই চেয়ে-চেয়ে দেখতুম, কী শক্তি আর সাধ্য আপনার! একসঙ্গেই ত' পাশাপাশি বাড়ি আরম্ভ করেছিলুম, কিন্তু আপনার কাজ কত এগিয়ে গেল!

শোভনা কৌতুক ক'রে বলল, দেখবেন, আমার স্বামীর সামনে যেন অত সুখ্যাতি আমার করবেন না!

কেন? এর কোনটা ত' মিথ্যে নয়? তিনি ত' আনন্দই পাবেন আমার কথায়।

শোভনা তৎক্ষণাৎ প্রসঙ্গটা পালটিয়ে দিয়ে বলল, ভালই হ'ল, এখন থেকে আপনার মতন ডাক্তার একজন হাতের কাছে পাওয়া যাবে। ডাক্তার-বদ্যি কাছে থাকলে আমার স্বামী খুব খুশী হন। আপনার চেম্বার হচ্ছে কোথায়?

বিনয় বলল, সেটা এখনও ঠিক হয়নি। তবে মনে হচ্ছে সকাল দশটা পর্যন্ত এখানে থাকব। কলকাতায় যদি চেম্বার ক'রে উঠতে পারি তবে সাড়ে দশটা থেকে একটা, আর ওদিকে বিকেল পাঁচটা থেকে আটটা।

শোভনা বলল, তা হলে এখান থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারী করবেন?

নত মুখে বিনয় বলল, বোধ হয় সেটা সম্ভব হবে না। প্র্যাকটিস যদি জমে ওঠে, হয়ত গাড়ি একখানা রাখতে হবে।

শোভনা আর কিছু বলল না। বিনয়-বাবুরা যে অবস্থাপন্ন সেটি তার স্বাস্থ্য-শ্রীর সজীবতায় প্রকাশ। তা ছাড়া ওদের জায়গা-জমির পরিমাণ শোভনাদের চেয়ে ডবলেরও বেশি। ওরা চাকর-বাকরের আলাদা ঘর করবে। এর মধ্যেই গ্যারাজ তৈরি হয়ে গেছে। ওদের সঙ্গে শোভনাদের তুলনাই হয় না। শোভনারা স্বল্পবিত্ত।

আচ্ছা, তাহলে এবার যাওয়া যাক?

হ্যাঁ, চলুন। ওই যা—শোভনা থমকিয়ে দাঁড়াল। বিমর্ষ মুখে বলল, কেরোসিনের বোতলটা আনতে ভুলে গেছি। আপনাদের ওই টিন দেখে মনে প'ড়ে গেল! যাঃ—

হয় ফেরৎ দিলেন, কিন্তু তাহলে আমাকে গিয়ে আপনাদের ঘরদোরও যে গুছিয়ে দিয়ে আসতে হয়?

শোভনা বাঁকা চোখে তাকাল। বলল, এবার আপনার উদ্দেশ্য বুঝলুম। আপনার ঘরদোরের একটু কাজ করে দিয়েছি, তাই আমার বকশিস, ওই কেরোসিন! বেশ, ওই

এই যে? কবে এলেন বিনয়বাবু?

ব্যস্ত হবেন না। বিনয় বলল, আপনি একা কতই বা সামলাবেন! তা ছাড়া স্বামী আপনার অসুস্থ,—ছেলেটিরও স্বাস্থ্য ভাল নয়! ভুল অমন হয়েই থাকে। ওরে গোবিন্দ, তুই বাড়ি গিয়ে ও'র হ্যারিকেনগুলোয় তেল ভ'রে দিয়ে আসবি,—গিয়েই দিবি।

হ্যাঁ হ্যাঁ, কিছু আমার বলতে হবে না—গোবিন্দ জবাব দিল।

চলতে চলতে শোভনা বলল, কিন্তু ওতে আমার হিসেব থাকবে না, বিনয়বাবু। তার চেয়ে বোতলটাই ভ'রে দিয়ে আসবে।

ওঃ—বিনয় পথের মাঝখানে হেসে উঠল, —আপনি বুঝি ফেরৎ দেবার কথা ভাবছেন?

হ্যাঁ, নিশ্চয়। শোভনা বলল, নৈলে উনি যে রাগ করবেন!

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছিল। একই পথ দিয়ে তিনজনে হাঁটতে গেলে পৃথকভাবে আগে-পিছে যাওয়াটা একটু দৃষ্টিকটু। সুতরাং শোভনাকে সঙ্গে সঙ্গেই চলতে হ'ল। কিন্তু একসময়ে বিনয় নিজের মনেই আবার হাসল। বলল, কেরোসিন না বকশিসই আমাকে দেবেন, নিজের মাথায় ঢেলে দেশলাই জেলে দেবো!

দুজনের হাসিতে পথ মুখরিত হল। কি ভাগ্যি, গোবিন্দ শোনেনি কথাগুলো। সে আসছিল পিছনে পিছনে।

কারখানার পাঁচিলের পাশ দিয়ে সেই জনবিরল পথ ধ'রে ওরা ফিরছিল। পথে আলো নেই, কিন্তু শুক্লপক্ষের ছমছমে ছায়ালোকে খুব অসুবিধাও ছিল না। উভয়ের মধ্যে একটি আড়ষ্টতা আছে বৈকি। বিনয়ের পারিবারিক পরিচয় কিছুই শোভনার জানা নেই, এবং জানবার কারণও কিছু ঘটেনি। উভয়ের নতুন বাড়ির মাঝ-খানে হয়ত আন্দাজ পঁচিশ গজের ব্যবধান মাত্র। যাতায়াতের কালে শোভনা ওদের রাজমিস্ত্রীদের কাজ দেখে যায় মাত্র। এক-দিন দুপুরের দিকে গোবিন্দ এসে একখানা চিঠি পাঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সেইদিন শোভনা প্রথম জানল, বিনয়রা এলাহাবা[দের] লোক। এ বাড়ি তৈরি হচ্ছে ঠিকাদা[রের] হাতে। গোবিন্দ এখানে পাহারায় থাকে। তবে মাঝখানে আসবাবপত্র যেদিন এসে পৌঁছল,

সেদিন ওই গোবিন্দই এসে শোভনার সাহায্য চেয়েছিল। এর বেশি কিছু নয়। বিনয়ের সঙ্গে এই নিয়ে বোধ হয় শোভনার দিন তিনেকের দেখা-সাক্ষাৎ। সে কবে আসে, কতদিন থাকে, কবেই বা চলে যায়—এটির সম্বন্ধে শোভনা কৌতূহলও প্রকাশ করেনি। তার বিশ্বাস, বামাচরণ এসব পছন্দ করবে না।

স্টেশনের দিকে যাবার সময় এক মাইল পথ ছিল দীর্ঘ। কিন্তু ফিরবার সময় সে-পথ ফুরিয়ে গেল যেন কখন। একসময় বিনয় বলল, আপনি বাড়ি যান, গোবিন্দকে এক্ষুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

আচ্ছা— শোভনা গোবিন্দর হাত থেকে ঝোলাটা নিয়ে হনহনিয়ে বাড়ির দিকে গেল।

বাড়িতে এখনও চৌহদ্দির পাঁচিল হয়নি, সুতরাং বাইরের দিকে দরজার কথাই ওঠে না। শোভনা সোজা সেই ঘোলাটে জ্যোৎস্নার আলোয় পথ চিনে নিয়ে উঠে এলো বারান্দায়। তারপর কড়া নাড়ল।

ভিতর থেকে বামাপদ সাড়া দিল, কে?

আমি। দোরটা খোল।

বোধহয় বামাপদ খুব ভাল ক'রে স্ত্রীর কণ্ঠস্বর বুঝতে পারেনি, সুতরাং আরেকবার সাড়া দিল, কে তুমি?

বিরক্ত হয়ে শোভনা জবাব দিল, আঃ শুনতে পাও না বুঝি? বলছি যে আমি? তোমার বিয়ে-করা বৌ!

দরজাটা তৎক্ষণাৎ খুলল। বুঝতে পারা গেল ভিতর থেকে, বামাপদ কান পেতে স্ত্রীর কণ্ঠস্বর নির্ভুলভাবে শুনে তবে দরজাটা বিশ্বাস ক'রে খুলেছে। প্রথমেই সে বলল, এত দেরি যে?

এ কি, এখনও আলোটাও জ্বালতে পারনি? সব যে ঘুটঘুট্টি অন্ধকার!

আলো জ্বালব?—বামাপদ বলল, কার এমন বুকের পাটা যে, বারান্দায় বেরিয়ে দেশলাই খুঁজবে? এই এতবড় শেয়াল এসে দাঁড়িয়েছিল ওই উঠোনে! ওদিকে অন্ধকার, এ ঘরে ছেলেটা কাঁদছে, ওখানে শেয়াল দাঁড়িয়ে! আমি কি জানতুম এত দেরি হবে তোমার? তুমি যাবার আগে আলোটা জেবলে রেখে যেতে পারলে না?

তর্ক বাড়াতে শোভনার রুচি ছিল না। সে যখন গেছে তখনও রৌদ্রের আভা ছিল। দেশলাই সে সামনেই রেখে গেছে উনুনের পাশে। হাতের কাছে হারিকেন। থাকগে। শোভনা চক্ষের পলকে দুটো আলোই জ্বালল এবং হারিকেনের তলানি থেকে একটু কেরোসিন দুখানা ঘুঁটের ওপর ঢেলে নিয়ে উনুনে ধরাতে বসল। না, এ ঘর, এ সংসার, এ কচ-কচি তার একটুও ভাল লাগছে না। সে অন্য কিছু চেয়েছিল।

এমন সময় বাইরে, গলার সাড়া পেয়ে শোভনা বলল, এসো, গোবিন্দ। বোতলটা দিচ্ছি, তুমি ভাই এটা ভরে দিয়ে যাও।

আমি বিনয় গোবিন্দ নয়!

শোভনা উঠে এসে বলল, ও আপনি? আপনি কেন এলেন কষ্ট ক'রে? আসুন, আসুন—ওই যে উনি। হ্যাঁগো, তুমি এঁকে চিনলে? ইনিই বিনয়বাবু। ওই সামনের বাড়িটা এঁরই। সেই যে এঁর কথা তোমায় সেদিন বলেছিলুম?

বামাপদ নমস্কার বিনিময় করে বলল, আসুন, আসুন, কিন্তু—কোথায় যে বসাই! আহা হা, মাটিতে বসলেন যে? না না, সে হবে না, ঘরে উঠে আসুন—

হাসিমুখে বিনয় বলল, তা হোক, এই বেশ বসেছি। ভারি খুশী হলুম আপনাকে দেখে বামাপদবাবু। কাল রবিবার,—কাল সকালে চায়ের আসরে বসা যাক্। তারপর দুপুরে আমার ওখানে আপনাদের নেমন্তন্ন।

বামাপদ বলল, বেশ ত, এ আনন্দের কথা। তবে আমি নতুন একটা মাদুলি ধারণ করেছি কিনা—

মাদুলি!—বিনয় স্পষ্ট ক'রে তাকাল।

আজ্ঞে হ্যাঁ, মাদুলি। এই মাদুলির জোরেই ত' সন্ধ্যেবেলা আজ বেঁচে গেলুম, বিনয়বাবু!

বিনয় সকৌতুকে তাকাল। ততক্ষণে ঘর থেকে একখানা আসন এনে শোভনা বলল, বিনয়বাবু, আসন নিয়ে বসুন, এক্ষুনি চা দিচ্ছি। হ্যাঁ গো, শোনো, উনি কিন্তু ডাক্তার, জান ত? তোমার মাদুলির কথা একটু ভেবে-চিন্তে বলো!

বলো কি তুমি? বাঘা শিয়াল এসে দাঁড়িয়েছিল ঠিক সামনে?—বামাপদ বলল, স্রেফ মাদুলির জন্যে বাপ-বেটার ফাঁড়া কেটে গেল! তবে সর্বদিক রক্ষে হতে পারল কোথায়? তেশুন্যের হাওয়া লেগে গেল ছেলেটার গায়ে! ওই দেখুন, কেঁদে-কেঁদে একটু আগে ঘুমিয়ে পড়েছে।

বিনয় একবার তাকাল শোভনার দিকে। সেই চাহনি অথবা দৃষ্টিবিনিময়ের মধ্যে সুস্পষ্ট বক্তব্য কিছু নেই, কিন্তু সেই দৃষ্টির সঙ্গে মন যেন অনেক কিছু উপলব্ধি ক'রে নেয়।

শোভনা বলল, বিনয়বাবু, মাদুলিতে যাদের একান্ত বিশ্বাস, তাদের কিন্তু উপকারও হয়। মাদুলির মনোভাব নিয়ে জন্মালে তবেই মাদুলি কাজে লাগে। উনি গোটা দশেক জোড়া মাদুলি ধারণ ক'রে আছেন। কিন্তু ওঁর বিশ্বাস, উনি ঠকেননি!

হাসিমুখে বিনয় বলল, আপনি ঠকেছেন?

আমি?—সেই হারিকেনের আলোর দিকে তাকিয়ে শোভনা খিলখিল করে হেসে উঠল, —উনিই আমার মাদুলি! আট বছর হ'ল ওই মাদুলিটি ধারণ করেছি। ঠকলুম কি জিতলুম আজও বুঝিনি!

উচ্চকণ্ঠে বিনয় হেসে উঠল। শোভনা বলল, বসুন, চায়ের জল ফুটেছে।—এই বলে সে উনুনের দিকে গেল। তার হাতে-পায়ে যেন উৎসাহের জোয়ার এসেছে।

বামাপদ বলল, আপনার কি মনে হয়, এদিককার উন্নতি কি শিগগির হবে? ইলেকট্রিক কবে আসবে বলুন ত?

লেখালেখি ত' চলছে! মাপজোপও চলছে অনেকদিন।

আমরা মশাই বৌবাজারের লোক। কাঁচা নর্দমা, ঘাসের উঠোন, পচা পুকুর, ডুমুর গাছ,—এসব কখনো দেখিনি! ছোটবেলায় চিড়িয়াখানায় শেয়াল দেখে ছিলুম, আর এই দেখলুম আজকে। বন-বাদাড়, ধানক্ষেত, লাউমাচা,—এসব চোখেও পড়েনি কোনদিন! সত্যি বলতে কি, কলকাতার কাছাকাছি যে এসব জায়গা আছে, এর খবরই রাখিনি কোনদিন। উনি ওঁর এক মামাকে ধ'রে এই জায়গাটুকু কিনেছিলেন বছর দুই আগে। আসলে বাড়িও করলেন নিজে কোমর বেঁধে। আমরা মশাই কলকাতার মাঝখানে মানুষ!

সেখানেই কি আপনাদের নিজের বাড়ি?

হ্যাঁ, মশাই। সাতপুরুষের বাস!—বামাপদ বলল, আমাদেরই বাপ-পিতামোর সামনে কলিকাতার পত্তন! ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট যদি না ভেঙ্গে দিত বাড়িখানা, তা হলে আরও তিনপুরুষ ওই বৌবাজারেই কাটত! মুস্কিল কি হ'ল জানেন, আমার ঠাকুরদাদার তিন বিয়ে, আমার বাবার দুই! ঠাকুরদাদারা ছিলেন আট ভাই, কিন্তু তাঁর তিন ঘর মিলিয়ে তেরোটি ছেলেমেয়ে। আবার আমার বাবার শুধু ছেলেই হল নয়টি! সব মিলিয়ে জ্ঞাত-গোষ্ঠির সংসার।

ওধার থেকে সহাস্যে শোভনা বলল, আইনকানুনের কড়াকড়ি না থাকলে উনিও আরও দুএকটি সংসার করতেন, বিনয়বাবু!

বামাপদ বলল, ওই শুনুন। এঁরা নাকি এদেশেরই মেয়ে, এই জলহাওয়াতেই মানুষ! কিন্তু কেমন ক'রে যে এঁরা নাস্তিক হলেন, কিছুতেই জানা গেল না! আরে, সংসার কি আমি করতুম নিজের গরজে? কুলীন হবার কত জ্বালা তা কি জানে কেউ?

বিনয় অবাক হয়ে আগাগোড়া শুনছিল। এমন সময় একটি থালার উপরে সাজিয়ে শোভনা নিয়ে এল দুই পেয়ালা চা আর কয়েকখানি বিস্কুট। থালাটি ওঁদের সামনে রেখে সে আবার চট ক'রে গিয়ে তার কেরোসিনের বোতলটি এনে বিনয়ের টিন থেকে ঠুলির সাহায্যে তেল ঢেলে নিল। বামাপদ বলল, ব্যাপারটা ঠিক বুঝলুম না। উনি টিন আনলেন, তুমি তেল ঢেলে নিলে,—এ কেমন হল?

শোভনা বলল, ওঁর সঙ্গে স্টেশনের বাজারে আমার দেখা। উনি তেল কিনলেন দেখে আমার মনে পড়ে গেল, বোতল সঙ্গে নিইনি। আজ কিন্তু আপনাকে পয়সা দিচ্ছিনে, বিনয়বাবু। ওটা গোবিন্দের হাতে দিয়ে দেবো।

সহাস্যে বিনয় বলল, এত বড় দেনা রেখে রাত্রে ঘুম হবে আপনার?

হাসল শোভনা,—দেনাশোধ করেও যদি ঘুম না হয়, বিনয়বাবু?

বামাপদ এবং বিনয়ের চা-বিস্কুট খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। বিনয় মুখ থেকে পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে বলল, তা হলে বুঝব আপনার গায়েও তেশুন্যের হাওয়া লেগেছে,—মাদুলি আপনারও দরকার!

ওরা দুজনেই যখন হাসল, বামাপদর পক্ষে চুপ ক'রে থাকা চলে না। সুতরাং সেও হাসল। বিনয় এবার উঠে দাঁড়াল। বলল, আমি যাই। আপনাদের কত বিরক্ত ক'রে গেলুম। গোবিন্দ বেচারি একা পারে না, ওকে একটু খুঁগিয়ে দিতে হয়। আচ্ছা, নমস্কার—

শোভনা বলল, আমি কিন্তু আপনার মিস্তিরিদের দিয়ে কিছু কাজ করিয়ে নেবো, বিনয়বাবু।

বেশ ত, আপনার যখন ইচ্ছে—

শোভনা আলোটা নিয়ে বিনয়ের পিছু পিছু গেল। বিনয় পিছনে তাকাল না এক-বারও,—বোধ হয় ভালই করল। শোভনা চুপ

রে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখল, বিনয় গিয়ে কল তার বাড়ির দরজায়।

সে-রাত্রে অহেতুক কান্না কেঁদেছিল শোভনা বামাপদকে লুকিয়ে।

(দুই)

ছেলেটা সকাল থেকেই কান্না নিয়েছিল। কেন জানিনে, যতদিন থেকে এ বাড়িতে তারা এসেছে, ছেলেটা ততদিন ধরে কাঁদছে। ঘ্যানঘেনে তার কান্না অসহ্য হয়ে উঠেছে। যে কোনও একটা বায়না সে ধরেই আছে! এক এক সময় বিশ্বের সমস্ত ঘৃণা ও অসন্তোষ যেন শোভনাকে পেয়ে বসে।

ভাত নামিয়ে শোভনা উনুনে ডাল চড়িয়েছিল। একে একে নুন, তেজপাতা ও হলুদ এলুমিনিয়মের হাঁড়িতে ফেলে দিয়ে সে চায়ের বাসনগুলো ধুয়ে গুছিয়ে রাখল। তারপর ভিজা কাপড়খানা রৌদ্রে মেলে দিতে-দিতে সে বলল, কেঁদো না আদু, লক্ষ্মী-সোনা,—বিস্কুট আরেকখানা নেবে? বিস্কুট? আচ্ছা, আচ্ছা—একটুখানি আমস্বত্ব দিচ্ছি—কেমন? কেঁদো না সোনা, লক্ষ্মীটি—

শোভনা ওকে ভুলিয়ে রাখতে গেলে ও যেন আরও রেগে হাত-পা ছোড়ে। আমস্বত্ব এনে দিতেই আদু সেটা ছুঁড়ে উঠোনে ফেলে দিল। বিস্কুট এনে দিল শোভনা, আদু সেদিকে ভ্রুক্ষেপও করল না। আরেক বাটি দুধ এনে ধরল, আদু তাই দেখে চেঁচিয়ে উঠল আরও জোরে। অবশেষে যখন শোভনা তাকে একপ্রকার জোর ক'রে কোলে নিয়ে ভোলাতে চাইল, তখন সে হাত-পা ছুঁড়ে চেঁচাতে লাগল, আমি থাকব না তোমার কাছে

কেন থাকবে না সোনামণি, আমি যে তোমার মা?

আমি বুবুর কাছে যাব—! আদু এত ছটফট করতে লাগল যে, শোভনা তাকে কোল থেকে নামিয়ে দিতে বাধ্য হল।

হাতের কাজ পড়ে রয়েছে অনেক। একটু সরষে বাটা, আদা ছেঁচে নেওয়া, বামাপদর জুতো ঝেড়ে রাখা, ডাল নামিয়ে শুক্তো চাপানো, ঘরদোরের কাজ—সব বাকি। শোভনা সর্বাগ্রে গিয়ে বামাপদর স্নানের জল ধরল টিউবওয়েল থেকে। তেল-সাবান-মাজন সব রাখল হাতের কাছে। বালতির জলে গামছা চাপা দিল—কাকে না মুখ দেয়। তারই মধ্যে খপ ক'রে সে ধুয়ে নিল থালা-গেলাস। তারপর ছুটে এসে ব'সে গেল ডাল সাঁতলাতে।

হাঁড়িটা নামাতে না নামাতেই এসে পৌঁছল বামাপদ বাজারের থলি হাতে নিয়ে। কপালে তার ঘাম, অতএব মুখখানা গম্ভীর। থলিটা একপ্রকার ছুঁড়ে দিয়ে সে বারান্দায় বসে পড়ল। শোভনা হাতপাখা এনে বাতাস দিতে লাগল। উঁচু দিকে চোখ তুলে বামাপদ বলল, যেতে-আসতে দু'মাইল, তা জান?

হাসিমুখে শোভনা বলল, কষ্ট একটু হবেই ত!

একটু? এরপর আবার ওই এক মাইল ভেঙে স্টেশনে যাওয়া! ফেরার পথে আবার এক মাইল! একখানা সাইকেল-রিক্স নেই কোথাও! তুমি বলছ কষ্ট! বেঘোরে-খোওয়ারে জীবনটা যাবে, দেখে নিও।

আদু এসে বামাপদর গলা জড়াল। আবদার ধ'রে বলল, বাবা, আমি তোমার সংগে আপিস যাবো—বাবা—

পৌনে আটটা বাজে। সাড়ে নটার ট্রেনে বামাপদ আপিস যায়। হাতপাখা রেখে শোভনা গিয়ে ডাল সাঁতলালো, তারপর উনুনে চারটি কয়লা দিয়ে বসে গেল পার্সে মাছ কুটতে। ওই সঙ্গে ভাজাভুজি আর ঝোলের আনাজপত্র। রান্না মোটামুটি। বামাপদর নতুন মাদুলির পক্ষে শাক-অম্বল খাওয়া নিষেধ। বলা বাহুল্য, স্বামীর পক্ষে যেটি মানা, শোভনার নিজের পক্ষেও সেটি নিষিদ্ধ। দই এবাড়িতে ঢোকে না। মাংস, পেঁয়াজ, ইলিশ—ছুঁতে নেই!

বিনয়বাবুর কল্যাণে, রাজমিস্তিরিদের কাজ চলছিল বাড়িতে। তারা একে একে এসে পাঁচিল বানানোর আয়োজন করতে লাগল। আজ খিড়কি দরজার দিকটা গাঁথবে। আরেকখানা ঘর ঢালাই হবে দিন আষ্টেকের মধ্যে। শোভনা সেইদিকে একবার তাকিয়ে আগে মাছ ভাজতে ব'সে গেল।

ছেলেটা আবার আবদার ধরল। মাছ ভেজে ঝোল চড়িয়ে শোভনা বলল, তোমার সঙ্গে আদুকেও খেতে দেবো, বুঝেছ? ওকে দুটি খাইয়ে শান্ত ক'রে তুমি আপিস যেয়ো। আমার কথা কিছুতে শোনে না।

বটে?—বামাপদ বলল, তার চেয়ে তুমিই আপিস যাওনা কেন? আমি ওকে নিয়ে থাকি সারাদিন!

এক ঝলক হাসল শোভনা। বলল, তা হয়ত করব একদিন। রোজগার করা ত' ভালই। সেদিন থেকে আর ভাবব না কিছু।

আমি জানতুম, বেশ জানতুম আস্তে আস্তে এইসব লক্ষণ তোমার দেখা দেবে! মনে-মনে তুমি কী চাও, একি আমার জানতে বাকি আছে?

মাছের ঝোলে মশলা দিয়ে এবার শোভনা খুব হেসে উঠল। বলল, আচ্ছা, বলো ত' মনে-মনে আমি ঠিক কি চাই?

বামাপদ বিরক্তভাবে চুপ ক'রে রইল। শোভনা বলল, একটু ভয়ে ভয়েই বলি, আজ আপিস থেকে ফিরে রাজমিস্তিরিদের হিসেবটা নিয়ে তুমি একবারটি বসবে, লক্ষ্মীটি!

আমি? তবেই তোমার বাড়ি হয়েছে!—বামাপদ বলল, এবার ডেকে পাঠাও না কেন তোমার সেই মামাকে—যাঁকে ধরে এই জমি কিনেছিলে? হিসেব-টিসেব আমি পারব না, বাপু। তিনপুরুষে আমি মিস্তিরি খাটাইনি। তোমার বাড়ি তুমি বোঝগে।

শোভনা এবার একটু বিমর্ষ হল। বলল, আমি সবই পারি। তবে ছেলেটা কাঁদে, বায়না নেয়,—তাই বলছিলুম—!

বামাপদ বলল, তবু মেয়েটাকে ফেলে রেখেছ মামার বাড়িতে—তাতেই এই! এরপরে আর দু'চারটি যখন হবে, তখন আমাকে চাকর বানাবে বল?

কী বললে?—খুন্তি থামিয়ে শোভনা মুখ ফিরিয়ে বামাপদর দিকে তাকাল। পোড়া কয়লার একটা স্ফুলিঙ্গ তার চোখে ফুটল।

আমি জানতুম, ঠিক জানতুম—তুমি আমাদের বংশের বাড়-বাড়ন্ত চাও না—রাগে গরগর ক'রে বামাপদ উঠে গেল স্নান করতে। এমন সময়ে গোবিন্দ এসে উঠোনে দাঁড়াল দুটো ডাব হাতে নিয়ে। বলল, দিদিমণি, দুটোর দাম নিল আট আনা। এই নিন বাকি আধুলিটা। যখন যা দরকার আমাকে বলবেন, এনে দেবো।

ডাক্তারবাবুর চিঠি পেয়েছ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, উনি শিগগিরই আবার আসছেন। আমি যাই দিদিমণি—

এসো।—বলল শোভনা উঠে এসে ডাব এবং আধুলিটি তুলে নিল। তারপর ঘরে এসে মেঝেটা পরিষ্কার করে স্বামীর জন্য আসন পেতে ঠাঁই করে দিল। বামাপদ তখন তেলমাখা শেষ ক'রে মাথায় জল ঢালছে। টাইম-পিস ঘড়িতে আটটা পঁচিশ। বাস্তবিক, একটা মানুষের পক্ষে অতদূরে থেকে বাজার-হাট সেরে আবার ওই অতদূর গিয়ে ট্রেন ধরা একটু গায়ে লাগে বৈকি। টাটকা মাছের জন্যই যেটুকু অসুবিধা, নচেৎ আনাজ-তরকারি আগেভাগে এনে রাখা যেতো। একজন রাতদিনের ঝি কিংবা চাকর না রাখলেই চলবে না। খাওয়া-পরা-মাইনে যা হোক ক'রে দেওয়া যায়, কিন্তু শুতে দেবার জায়গা কই?

বামাপদ মাথায় চিরুনি বুলিয়ে এসে ছেলেটাকে নিয়ে খেতে বসল। কিন্তু আদু খাবে না, সে বাবার সঙ্গে আপিস যাবে! কাঁদতে গিয়ে হঠাৎ মেঝের উপর সে গেলাসের জল উলটিয়ে দিল। বামাপদর পাত থেকে আলুভাতে আর পটল ভাজা নিয়ে সে ছত্রখান করল! স্নেহান্ধ পিতা এই দুরন্তপনা গ্রাহ্য না ক'রে ছেলেকে আদর ক'রে বারম্বার খাওয়াবার চেষ্টা পাচ্ছিল। পরে বলল, আর কিছু নয়, দেখতে পাচ্ছ ওর পেটের গোলমাল বলেই মেজাজ তিরিক্কে। রোজ একটা ক'রে ডাব খাওয়ালে পেটটা সারবে।

শান্ত কঠিন কণ্ঠে শোভনা বলল, পেটের গোলযোগ ওর নেই। আর ওই সঙ্গে যেটা নেই, সেটা হল শাসন!

শাসন?—বামাপদ মুখ তুলল,—চার বছরের ছেলেকে? সেবার যে পেঁচোয় পেয়েছিল,—ঝাড়ফুঁক ক'রে সারালুম না? শাসন অমনি করলেই হ'ল? আমাকে দশ বছর বয়স অবধি পেঁচোয় পেয়েছিল, তা জান?

মাছের ঝোলের বাটি আনবার জন্য শোভনা উঠে যাবার আগে বলল, পেঁচোয় তোমাদের দু'জনকে বোধ হয় এখনো পেয়ে রয়েছে!

কি জানি, হতেও পারে! তার ওপর তুমি আবার করতে গেলে বাড়ির ওপরে উঠোন। আমি তখনই বলেছিলুম, খোলা জায়গা ছোট ছেলের পক্ষে ভয়ানক খারাপ। আমাদের বৌবাজারের বাড়ি ছিল নিরেট বাক্সর মতন,—কোনও ভয় ছিল না। শুধু সন্ধ্যেবেলায় ছাদে উঠলে মাঝে মাঝে ভূতশুনোর হাওয়া লেগে যেতো।

শোভনা চুপ ক'রে রইল। এসব কথায় অনুপ্রাণিত হওয়া দূরে থাক, ঘৃণায় ও বিরক্তিতে তার মন ভ'রে উঠল।

প্রত্যেকদিন আপিস যাবার সময় যে সমস্যাটি দেখা দেয় আজও তার ব্যতিক্রম হল না। আহারাদি সেরে জামাকাপড় পরে যতই বামাপদ বেরোবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, ঠিক তত পরিমাণেই আদুর কান্না ও চিৎকার বাড়ছিল। এ ছেলে বৌবাজারের সেই পুরনো বংশের, এর রক্তের ধারার মধ্যে রয়ে গেছে সেই সেকালের পেঁচো,—রাশি রাশি মাদুলি ছাড়া যাকে বাঁচিয়ে রাখা কঠিন। এ ছেলে বাইরেটা দেখতে চায় না, গাছপালা, ঝোপঝাড় আলো-হাওয়া—এসব দেখলে ভয় পায়। কঠিন আক্রোশে দপদপ করছিল শোভনার দুই চোখ—পিতা ও পুত্র দুজনেরই প্রতি।

আদু ককিয়ে ডুকরে চেঁচিয়ে ছটফট করে বাপের জামাটা ধ'রে যখন ঝুলোঝুলি করতে লাগল, শোভনা তাকে টেনে না নিয়ে আর পারল না। বামাপদ রাগারাগি করে বলল, এই জন্যে বরাবর তোমাকে বলে এসেছি, দেখো, নতুন বাড়ি বা নতুন জায়গা আমাদের পক্ষে সইবে না। আমি কি জানিনে, আদু কাঁদছে কেন অমন ক'রে? ওর একেবারেই ভাল লাগছে না এখানে। ও ভয় পাচ্ছে এই খোলা-মেলা জায়গায়। ওর জন্ম ইলেকট্রিক আলোয়, কেরোসিন ও জানে না। ও কাঁদছে ওর সেই সৎঠাকুমা আর বিন্দিপিসির জন্যে। যারা ওকে নিয়ে থাকত।

শোভনা বলল, আমি কি ওর কেউ না?

না, কেউ না। আমাদের পুরনো বংশে মায়ের দাম নেই!—বামাপদ বলল, মায়ের কোল আমরা চিনলুম কবে? আমাদের কালে মা মানে ত' রান্নাঘরের ঝি! আদু কি মানুষ হয়েছে তোমার কাছে? ও চেনে ওর সেই বুড়িঠাকরুণকে, সেই মিলিমাসি আর রাঙাজেঠির কোল— তোমাকে ও কেন চিনবে বল?

কাপড়ের কোঁচটা ঝুলিয়ে বামাপদ ডার্বি জুতোর ফিতেটা বেঁধে নিল। ধুতির সঙ্গে ওই জুতো যে আজকাল কেউ পরে না, এটি আজও বামাপদর কানে ওঠেনি। গলাবন্ধ ছিটের কোটের ওপর শাদা উড়ুনিখানা পাকিয়ে নিল, কেননা এই ছাঁদের পোশাকটি তার পৈতৃক।

পথে বেরোবার আগে কচকাঁচ করতে নেই! শোভনা যেমন করেই হোক, আদুকে থামাবার চেষ্টা পাচ্ছিল। বামাপদ বলল, আমি সেই-জন্যেই বলছিলুম ছেলেকে যদি সুস্থ করে তুলতে চাও, তবে এখনও সময় আছে! এ বাড়ি ভাড়া দাও, এসব উগ্র জায়গা ত্যাগ কর। এর চেয়ে চলো মুচিপাড়ার কোথাও দুখানা ঘর ভাড়া নিয়ে উঠে যাই। রাঙা-জেঠিকে এনে রাখব, আদুর জন্যে আর কিছু ভাবতেই হবে না।

শোভনা আর থাকতে পারল না। বলল, তুমি কি বলতে চাও, আবার আমি সেই কেউটে-গোখরোর গর্তে গিয়ে ঢুকব?

কিন্তু ছেলেটার জীবন? আমার কল্যাণ?

শোভনা কঠোর দৃষ্টিতে আদুর দিকে চেয়ে রইল, জবাব দিল না।

বামাপদ বারান্দা থেকে নামল। তারপর বলল, হুঁ, এ আমি জানতুম! আমি তখনই বলেছিলুম, গাংগাঠাকুমাকে, মালদা জেলা[illegible] মেয়ে আনছ ঘরে, কিন্তু সাবধান! আজ তা[illegible] ফল ফলাতে বসেছে।

বামাপদ হনহন ক'রে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। এতক্ষণ ধ'রে মেঝের উপর গড়াগড়ি দিয়ে আদু ফুঁপিয়ে ডুকরিয়ে কাঁদছিল, এবার উঠে ছুটল বাপের পিছনে পিছনে। শোভনা তাকে ধরল না,—দেখাই যাক না কী হয়! সে ঘরের জানলা দিয়ে ছেলেটার দিকে চেয়ে রইল। এক সময় দেখল, রাজমিস্তিরি-দের জনৈক সহকারী ছুটতে ছুটতে গিয়ে অনেক দূর থেকে ছেলেটাকে তুলে আনল।

রান্নাবান্নার কিছু এখনও বাকি। বাসন মাজা ধোওয়া-পাকলা আছে। সাবান কাচা একটিও হয়নি। ঘরের কাজ ফেলে রাখলে কে করবে? ছেলেটাকে স্নান করানো খাওয়ানো মস্ত সমস্যা। রাজমিস্তিরির কাজ দেখা দরকার। জল টানতে হবে টিউবওয়েল থেকে। শেলাইতে হাত না দিলে আর চলছে না। অনেক কাজ শোভনার।

ছেলেটা ঠিক তেমনি ক'রে বারান্দায় প'ড়ে প'ড়ে কাঁদছিল। শোভনা বলল, লক্ষ্মী সোনা কেঁদো না। আচ্ছা দাঁড়া, এবার ডাব কেটে দিচ্ছি, কেমন? ডাব খাবে, দুদু খাবে, ভাতু খাবে—কেমন?

কাটারিখানা নিয়ে এসে শোভনা ডাব কাটতে বসতেই আদু যেন আরও ক্রুদ্ধ হয়ে চেঁচাল। বুঝতে পারা যাচ্ছে, জননীর স্নেহ, সমাদর, যত্ন, সেবা—কোনটাই তা'র প্রিয় নয়। জননী তার কাছে ঘৃণ্য!

কেন, বেশ ত' মিষ্টি ডাব? একটু খেয়ে নাও, লক্ষ্মী ছেলে?

চিৎকার করল আদু,—না, না, খাবো না—ফেলে দেবো। কেন বাবার সঙ্গে যেতে দিলে না—খাবো না—

হাসছিল শোভনা। অন্যমনস্কে ডাবটা সে কাটছিল এতক্ষণ। এবার দেখল কাটারিখানা নতুন, বেশ ধারালো! আস্তে আস্তে সে ডাব কাটছে, ঈষৎ আত্মবিস্মৃত, কিন্তু লক্ষ্য করছিল সে আদুকে। কাটারিখানার বাঁটটা বেশ মজবুত, ফলাটা ঝকঝক করছিল! শোভনা হাসছিল অন্যমনস্ক আদুর দিকে চেয়ে। জননীর প্রতি বিজাতীয় একটা ক্রুর ঘৃণা আদুর চোখে দেখা যাচ্ছিল। শোভনা কাটারিখানা হাতে নিয়ে ফ্যালফ্যাল ক'রে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল। ডাব কাটতে সে ভুলে যাচ্ছিল। কেন ডাব কাটছিল তার মনে নেই। না, কেউ নেই এদিকে, কেউ তাকে লক্ষ্য করছে না,—সে পরীক্ষা করছিল কাটারির শাণিত ফলাটা! কী যেন সে ভাবছিল এতক্ষণ! না, কেউ কোথাও থেকে তাকে এখনও সন্দেহ করেনি; এতক্ষণ কী যেন তাকে পেয়ে বসেছিল!

হঠাৎ চোখ পড়ল আদুর দিকে। আদু আর কাঁদছে না, একটুও নড়ছে না! সহসা থেমে গেছে তার কান্না! স্তব্ধ আতঙ্কিত চক্ষে সে শোভনাকে এতক্ষণ লক্ষ্য করছিল।

কাটারিখানা সরিয়ে রেখে শোভনা তাড়া-তাড়ি উঠে ঘরে গিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিল এবং অপরিসীম ক্লান্তিতে বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজলো।

দুই লেখকের স্ত্রী

ভবানী মুখোপাধ্যায়

পঞ্চাশ বছর বয়স থেকেই টলষ্টয়ের পারিবারিক জীবনে চিড় খেয়েছিল। টলষ্টয় ধীরে ধীরে সংসার থেকে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। যে-টলষ্টয়ের স্ত্রী সাতবার War and Peace কপি করেছেন, তিনিই শেষে বলতে বাধ্য হলেন—"তেরটা ছেলেমেয়ে নিয়ে ধর্মনিষ্ঠ স্বামীর বুজরুকি আর আমার সয় না।"

টলষ্টয় বলেছেন—'যাকে ভালোবাসা যায় তাকেই বিয়ে করাটা ঠিক নয়।'

সম্ভবতঃ গৃহী টলষ্টয় এবং ঋষি টলস্টয় এই দ্বৈতসত্তার সঙ্গে সমানভাবে তাল রেখে চলা কাউন্টেস সোফিয়া টলষ্টয়ের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

গৃহত্যাগের পূর্বমুহূর্তে টলষ্টয় লিখেছেন—

"আমার সঙ্গে আটচল্লিশ বছর সংসার করেছ। তোমার নিষ্কলঙ্ক জীবনের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তোমার ওপর যা অন্যায় করেছি, তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী, আর তোমার সকল ত্রুটিও আমি ক্ষমা করলাম।"

স্বামীর গৃহত্যাগের সংবাদ পেয়ে সোফিয়া উন্মাদিনীর মত জলে ঝাঁপ দিয়েছিলেন।

Married to Tolstoy গ্রন্থে লেডী সিনথিয়া এ্যাসকুইথ বলেছেন—

"She was a great woman in her own right and that was one cause of the trouble. An adoring, completely compliant nonentity, might have lived in peace with Tolstoy."

সোফিয়া বৃদ্ধ টলষ্টয়ের শরীরের তত্ত্বাবধান করতেন। তাঁর মাঝে মাঝে স্মৃতি-ভ্রংশ হত, টলষ্টয়-জায়া সাহায্য করতেন স্বামীকে। লেভ টলষ্টয় আর স্ত্রীর সম্পর্ক যেভাবে আলোচিত হয়েছে এত বেশী আলোচনা আর কোনো লেখকের দাম্পত্য-জীবন নিয়ে হয়েছে বলে মনে হয় না।

টলষ্টয়ের স্ত্রীর প্রতি অবিচার করা হয়েছে। তাঁর স্ত্রীকে কেউ কেউ SHREW বা ব্যাপিকা পর্যন্ত বলেছেন। এমন কি টলষ্টয়ের নাকি স্ত্রীর উৎপীড়নেই মাথা খারাপ হয়ে গিছল একথাও অনেকে বলেছেন।

বার্নাড শ এক জায়গায় বলেছেন :

"He would not own property or copyrights; but he could make them to his wife and children and live in their country house at Yasnaya Polyana, and their house at Moscow very comfortably, only occasionally easing his conscience by making things as difficult as possible."

বার্নাড শ'র এই উক্তিটিও অনুদার। সোফিয়া মনে করতেন যে, তাঁর স্বামী যে ভাবাদর্শ প্রচারে ব্রতী দেশ এখনও তার জন্য প্রস্তুত হয়নি। আর সেই ভাবধারা তাঁর স্ত্রী-পুত্রের প্রতি প্রয়োগ করাটা অনুচিত। স্বামীর আন্তরিকতায় কোনোদিন স্ত্রী সন্দেহ করেন নি।

অনেক স্ত্রী স্বামীর মদ্যপানে আপত্তি করেন, তার কারণ এ নয় যে, স্বামীকে তাঁরা ভালোবাসেন না, টলষ্টয়ের স্ত্রীও স্বামীর সৃজনশীল প্রতিভায় যাতে চিড় না খায় সেদিকে সদাজাগ্রত দৃষ্টি রেখেছিলেন। 'War and Peace'-এর লেখক যদি ক্রমশঃ মনের দিক থেকে অনড় এবং অচল হয়ে পড়েন তার চেয়ে ক্ষতিকর আর কি হতে পারে? সোফিয়ার শিল্পরীতি ও শিল্পাদর্শ সম্পর্কে জ্ঞান ছিল উঁচু পর্দায় বাঁধা।

সোফিয়ার যখন সতের বছর বয়স তখন Childhood গ্রন্থের লেখক চৌত্রিশ বছর বয়সের লেভ টলষ্টয়ের তিনি প্রেমে পড়েন। এই কালের কথা তিনি ডায়েরীতে লিখেছেন, প্রস্তাব শুনেই তাঁর "Heart began to throb violently —and lost all sense of time and reality".

টলষ্টয়-প্রেরিত প্রস্তাবটি তিনি বার বার পাঠ করেছেন। আর লেভ নিকোলেংকা (সোফিয়ার আদরের ডাক নাম) তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন—

"Incredible happiness! No one has had or will have such happiness -- She is so incredibly good, so pure and harmonius. Something tortures me, — the jealousy for the man who could be fully her equal, I am not."

অবশ্য এ সবই তরুণ-তরুণীর মনের আবেগ বলা চলে।

সতের বছরের সোফিয়া মস্কো শহর ছেড়ে যাসনায়া পোলায়ানার গ্রামে স্বামীর ঘর করতে এলেন অনেক আশা আর আনন্দ মনে নিয়ে। কাউন্ট লেখা-পড়ায় ব্যস্ত, কে তাঁর জমিদারী দেখে, সেদিকে তাঁর মন নেই। তরুণী বধূ গৃহ-সংস্কার নিয়ে পড়লেন। অবহেলিত উদ্যান সংস্কার করা হল, বাড়ি-ঘর মেরামত করা হল, সবই সোফিয়া করলেন। কাউন্ট সব সময় লেখেন আর যে সময় লেখেন না তখন তিনি চাষী-মজুরদের নিয়ে ব্যস্ত। তারপর টলষ্টয়ের খ্যাতি বৃদ্ধি হতে স্ত্রীর অনেক কর্ম বেড়ে গেল। গরীব চাষীরা টলষ্টয়ের সঙ্গে দেখা করতে এলে সোফিয়া তাদের সমাদর করতেন, আপ্যায়ন করতেন।

টলষ্টয়ের পাণ্ডুলিপি অতিশয় কদর্য, স্ত্রীকে সেইগুলি সুন্দর এবং পরিষ্কার করে কপি করতে হত। একবার নয়, বার-বার। যতদিন না টলষ্টয়ের শিষ্য চার্টকোভের এই দাম্পত্য রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব ঘটেছে, ততকাল এই ছিল সোফিয়ার কাজ। চার্টকোভ আবির্ভূত হওয়ার পর জ্বালা অনেক বেড়েছে।

কাউন্ট যখন তাঁর গ্রন্থস্বত্ব ত্যাগ করলেন, তখন তেরটি ছেলেমেয়ে নিয়ে সোফিয়া বিপদে পড়লেন। তিনি বলেছেন—'বাড়িতে লোকজন গিজগিজ করছে, ছেলে-মেয়ে, গভর্নেস, শিক্ষক, চাকর, কুকুরে বাড়ি ভর্তি। প্রতিদিন সরু টেবিলটায় অন্ততঃ চোদ্দ জন খেতে বসে। ছোট ঘর, সেই ঘরে দুটি পিওনো, একটা দাবা খেলার টেবিল। প্রতিবেশী, যাত্রী, এবং ভিক্ষুক নিয়তই আসছে, আর বিরাম-বিহীন অতিথিসমাগম ও অবাঞ্ছিত লেগেই আছে।"

এর পর টলষ্টয় কিষাণের পোষাক পরে, ভারী বুট পায়ে, দাড়ি-শোভিত শরীর নিয়ে যখন চলাফেরা করতে শুরু করলেন তখন বিশ্ববিদ্যালয়-ফেরৎ সোফিয়া কিঞ্চিৎ আহত হলেন। একদিন একটা বল-নৃত্যের আসরে একটা নতুন টুপি পরে যাচ্ছিলেন সোফিয়া, স্বামী মন্তব্য করলেন—"love of flummery" বিবাহিতা স্ত্রীলোকের পোষাক বাহুল্যের অর্থ — "going naked."

আরো বিপদ বাধল, উভয়ে উভয়ের ডায়েরী পড়তেন। পারস্পারিক চুক্তি ছিল সেই রকম। এই ডায়েরীতে টলষ্টয়ের যৌবনের উচ্ছৃঙ্খল দিনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ ছিল। বিশেষ করে কিষাণ-রমণীর রূপ-লাবণ্য এবং দৈহিক আকর্ষণের বিস্তারিত বিবরণ ছিল। পরে "The Kreutzer Sonata" উপন্যাসে এই চরিত্রের প্রতিফলন করেছেন টলষ্টয়। এই ঘটনাটি সোফিয়ার মনে ঈর্ষা সৃষ্টি করেছিল। টলষ্টয়ের দেহাসক্তির প্রবল আবেগ লক্ষ্য করে সোফিয়া বুঝেছিলেন যে, টলস্টয় তাঁর অধ্যাত্মজীবনের কিছুই উপলব্ধি করেন না। সারাজীবন টলষ্টয় লিখেছেন মেয়েরা আবেগে পরিচালিত হয়, তারা শুধু সন্তানধারণের যোগ্য।

টলষ্টয়ের নির্দেশ ছিল সন্তানদের পালন করতে হবে বুকের দুধ দিয়ে, বাজারের দুধ তারা পান করবে না। একবার শারীরিক অক্ষমতার জন্য ছেলেদের জন্য 'দুধ-মা' নিয়োগ করার পর টলষ্টয় মন্তব্য করেন—নিজের দৈহিক আকৃতিটা বজায় রাখার দিকেই তোমার লক্ষ্য, ছেলেদের কল্যাণ তোমার কাম্য নয়।

টলষ্টয়ের প্রথমে নাস্তিক, পরে একেবারে রক্ষণশীল গোঁড়ামতের চার্চের প্রচারিত ধর্মে বিশ্বাসী, পরে আবার সম্পূর্ণ অবিশ্বাস, আবার পরে খ্রীষ্টের উপদেশ পাঠ ইত্যাদি বিপরীতধর্মী আচরণ সোফিয়া বুঝতে পারতেন না, তিনি লিখেছেন—

"জানি না, কিভাবে এই নিয়ত পরিবর্তনশীল মতবাদের সঙ্গে আপনাকে খাপ খাইয়ে নিতে পারব। তাঁর কাছে যা একনিষ্ঠ ঈশ্বরানুসন্ধান, আমার পক্ষে তার

অন্ধ অনুকরণ, শুধু আমার নয়, সমগ্র পরিবারের পক্ষে ক্ষতিকর।"

অধ্যাত্মবিবর্তনের মুখে টলস্টয় একদিন স্ত্রীর সঙ্গও পরিত্যাগ করলেন। সোফিয়া লিখছেন ডায়েরীতে—

"For the first time he has run away from me and is spending the night in his study. We quarrelled over mere trifles. I blamed him for not troubling about the children, for not helping me to nurse Ilya, who is ill or to make jackets to children. The fact is he is growing cold towards me and our children."

এর পর লিখেছেন—"ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, আমাকে নাও। লেভের প্রেম বঞ্চিত হয়ে জীবনধারণ করা বৃথা।"

কিন্তু টলস্টয় তখন সংস্কার-পাগল। বিবাহ সেইকালে টলস্টয়ের মতে "লাইসেন্স-প্রাপ্ত বেশ্যাবৃত্তি" মাত্র। গ্রন্থাবলীতে স্ত্রীর সম্পর্কে অনেক অন্তরঙ্গ ঘটনা তিনি লিপিবন্ধ করতে লাগলেন। তিনি তাঁর ডায়েরীতে বলেছেন—"বিবাহের পরই আমার ডায়েরী ওকে পড়তে দিলাম। আমার অতীত জীবন জানুক। অন্য লোকের কাছে শোনার চেয়ে ভালো। সেই ডায়েরী পাঠে ওর আতঙ্ক, বিতৃষ্ণা এবং অস্বস্তি আজো আমার স্মরণে আছে। আমি দেখেছি ও আমাকে ত্যাগ করতেও চেয়েছে। কিন্তু কেন ত্যাগ করেনি, কে জানে?"

দীর্ঘকাল সুখে বিবাহিত জীবন কাটানোর পর স্বামী যদি মন্তব্য করেন—'কেন আমাকে ত্যাগ করেনি, কে জানে?' কোন্ স্ত্রী তাতে বেদনাবোধ না করবেন।

সুদীর্ঘ বিবাহিত জীবনের যে একঘেয়েমি আছে, টলস্টয় সেই একঘেয়েমির জ্বালায় ভুগেছেন মনে হয়। কারণ, তিনি এক জায়গায় লিখেছেন—

"In me there often raged a terrible hatred of her. Sometimes I watched her pouring out tea, swinging her legs, lifting a spoon to her mouth, and I hated her for those things as though they were the worse possible crimes."

স্ত্রীর প্রতি এই ধরণের ঘৃণা যখন মানুষের মনে জাগে, তখন আর কি থাকে! বিবাহিত জীবনের এই বিপরীত রূপ কার অন্তরে বেদনা না জাগিয়ে তোলে! সোফিয়ার কাছে তাই এসব "hideous picture of married life" বলে মনে হয়েছে। কোনো সেণ্টিমেণ্টের বালাই নেই, রোমান্স বিদূরিত, স্নেহ নেই, প্রেম নেই, অংশীদারী মনোভাব নেই, পারস্পরিক স্মৃতির ঐশ্বর্য নিয়ে আনন্দ করার অবসর নেই।

সোফিয়া ভালোবাসেন আর্ট ও সৌন্দর্য। টলস্টয় মনে করেন, সৌন্দর্য [illegible]রের দান নয়, তা এসেছে শয়তানের [illegible] থেকে।

একবার সোফিয়ার একটি সুর পিওনোয় বাজাতে বাজাতে হঠাৎ উঠে [illegible]ড়লেন—'Ah! the animal!' এই কথা বলে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। তানিয়েভ নামক জনৈক বিখ্যাত পিওনোবাদককে শ্রদ্ধা করতেন সোফিয়া, পিওনো বাজাতেও ভালোবাসতেন। সোফিয়ার মনে হল টলস্টয় সেই সঙ্গীত-প্রীতিকে অবজ্ঞা করছেন। সোফিয়ার মনে হল—

He has lived only with his body and his love has been only physical love. This side of life is dying and with it the need for being together."

টলস্টয় তাঁর জীবনীকার এবং অনুবাদক আইলমার মাডকে লিখেছেন—"I feel with every nerve of my body the truth of the words that a man and his wife are not two separate beings, but one."

এই যদি জ্ঞান, তবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এত ভুল বোঝাবুঝি কেন, এত কলহ কেন। যখনই টলস্টয়ের অসুখ করেছে, স্ত্রী কল্যাণীবেশে শুশ্রূষা করেছেন। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত এইভাবে কেটেছে।

আটাশে অক্টোবর যখন স্বামীকে আর ঘরে পাওয়া গেল না, তখন সোফিয়া জলে ঝাঁপ দিতে গেলেন, ধরে বাড়িতে ফিরিয়ে আনার পর জানলা দিয়ে ঝাঁপ দেওয়ার চেষ্টা করলেন। তারপর স্বামীর সন্ধানে বেরোলেন। স্বামীকে পেলেন, তাঁর কাছে তাঁকে যেতে দেওয়া হল না। অস্টাপোভার রেলষ্টেশনে তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় শায়িত মৃত্যুপথযাত্রী টলস্টয়ের যে কণ্ঠস্বর তাঁর কানে পৌঁছেছিল, তা অতি বিচিত্র—

"To seek always to seek."

গোর্কী বলেছেন, "আমি সোফিয়া টলস্টয়ের প্রতি অনুকূল নই, তাই আমি তাঁর সম্পর্কে একটুকু অতিরঞ্জন না করে বলতে পারি যে, যাঁরা তাঁর স্বামীর কাছে আসতেন, তিনি তাঁদের মশা, মাছি, কীট, পতঙ্গের মত জ্ঞান করতেন। আর সত্যি তাই, এই মহৎ লেখকের কাছে দিনরাত যেন মাছির মত তাঁরা ভনভন করতেন।"

গভীর তুষারমণ্ডিত টলস্টয়ের কবরে গিয়ে সোফিয়া উন্মাদিনীর মত কাঁদতেন—"—এই কি তিনি! এই কি আমার প্রিয়তম লেভচকা মাটির নীচে।" এই ভেবে কেঁদে কেঁদে তাঁর বুকে তীব্র বেদনা হত, তখন তাঁকে জোর করে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হত। টলস্টয়ের স্ত্রী সোফিয়া স্বামীকে যে নিঃসন্দেহে ভালোবাসতেন, একথা তাঁর জীবনেই প্রমাণিত।

॥ দুই ॥

জর্জ বার্নার্ড শ শ্রীমতী সার্লোট টাউনসেণ্ডের প্রেমে পড়েছিলেন বিচিত্রভাবে। বিয়েট্রিস ওয়েব Our Partnership গ্রন্থে লিখেছেন—

"সার্লোট মেয়েটি বেশ রোম্যাণ্টিক। নিজেকে সে সিনিক্যাল মনে করে। সে একাধারে সোস্যালিস্ট ও র‍্যাডিক্যাল। সমষ্টিবাদ যে সে বেশ বোঝে তা ন[illegible] আসলে সে প্রকৃতিতে বিপ্লবী। তার ম[illegible] উন্মাসিকতা বা গোঁড়ামি নেই। ইতিমধ্যে[illegible] সে সব পদ্ধতি ও প্রকরণ গিলে খেয়েছে[illegible] কিন্তু নিজের একটা মতবাদ স্থির করতে পারেনি।... আমি ভেবেছিলাম যে, গ্রেহাম ওয়ালেসের সঙ্গে ওর মানাবে, কিন্তু তার সঙ্গে ওর বনল না। কয়েকদিনের ভেতর সে বার্নার্ড শ'র নিত্যসহচরী হয়ে উঠল।"

বার্নার্ড শ সেই সময় You Never Can Tell লিখে শেষ করেছেন। সাইকেলের টিউবের ফুটো সারছেন আর সার্লোটের সঙ্গে দীর্ঘপথ ভ্রমণ করছেন বা পায়ে হাঁটছেন।

এইভাবেই দুজনের মধ্যে গভীর প্রেম সঞ্চারিত হল। বার্নার্ড শ এই সময় একটি চিঠিতে এলেন টেরিকে লিখেছেন— "ও কিন্তু আমাকে প্রকৃত ভালোবাসে না। আসলে ও অতিচতুরা। তার এই স্বচ্ছন্দ স্বাধীনতার মূল্য ও বোঝে। বাঁধাধরা পদ্ধতির জীবন নিয়ে মার মৃত্যুকাল পর্যন্ত ও বিশেষ দুর্ভোগ ভোগ করেছে। সবকিছু জানার পূর্বে বিবাহের শৃঙ্খলে জীবনটা বাঁধা অতিশয় মূর্খতা। কয়েক বছর আগে প্রেমের ব্যাপারে সে আঘাত পেয়েছে। (The Story of San Michele রচয়িতা AXEL MUNTHE-র সঙ্গে সার্লোটের প্রথম প্রেম হয়, পরে বিচ্ছেদ ঘটে।) সেই আঘাতে সে জর্জরিত হয়। তারপর হাতে পড়ল আমার Quintessence of Ibsenism"—তার মধ্যে পেল জীবনবেদ, মুক্তি, সিদ্ধি, আত্মমর্যাদা ইত্যাদি। তারও অনেক পরে দেখলো গ্রন্থকারকে। তুমি তো জানো, পত্রলেখক হিসাবে সেই ব্যক্তিটি সহনীয়। শুধু তাই নয়, বাইসিকেল নিয়ে ভ্রমণেও সহনীয় সহচর। পল্লীপথে ভ্রমণের আর সঙ্গী কই! মেয়েটির আমাকে ভালো লেগেছে, প্রকৃতিতে সে ছলনাময়ী নয় যে বিপরীত ভান করবে। আমিও তাঁর অনুরাগী হয়ে পড়েছি।"

এর কিছুকাল পরেই বার্নার্ড শ'র শরীর হঠাৎ ভেঙে পড়ল। জুতোর ফিতা খুব টান করে বাঁধার জন্য পায়ে ঘা হয়। পায়ের ঘা পরীক্ষা করে দেখা গেল 'নেক্রোসিস অব বোন' বা অস্থিক্ষয় রোগ হয়েছে। আঠারো মাস বার্নার্ড শ' ক্রাচেস ধরে চলাফেরা করেছেন।

এলেন এই কথা জেনে বললেন—"তুমি এখনই পি, টি-কে জানাও, সে এসে নিয়ে যাক, দেখাশোনা করুক।"

সার্লোট নিজেই এলেন। এখনই তাঁকে পল্লীভবনে নিয়ে যেতে চান। বার্নার্ড শ' বললেন—"তোমার সেবাব্রতের সাধু উদ্দেশ্য কেউ বুঝবে না। তোমার বাড়ি যদি যেতে হয়, তাহলে সোজা ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছে গিয়ে বিবাহের নোটিশ পেশ কর।" ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন দুজনের বিবাহ হয়ে গেল। দুজনেরই বয়স তখন চল্লিশের কাছে।

দীর্ঘকাল স্বামীকে নজরে রেখে, তাঁর সকল কর্মে উৎসাহ দিয়ে ১৯৪৩-এর ১২ই

...টেম্বর সার্লোটের মৃত্যু হল। সেই বছর ...টের বাসা ছেড়ে লণ্ডনে এসেছিলেন। ...র্লোট বড় অলৌকিক ভয় পেতে ...গলেন। কে যেন শয্যার আশেপাশে ...য়ে বেড়াচ্ছে। তারপর একদিন তাঁকে বড় ...ন্দর মনে হল। সন্ধ্যার দিকে তাঁকে ঘরে ...খে শ' একটু বেড়াতে গেলেন।

পরদিন ভোরে এসে দাসী দেখে ...ার্লোট পড়ে আছেন, হাতে ঘড়িটা ধরা আছে, মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে। সমাধিকালে হ্যাণ্ডেলের লারগো সুরে ধ্বনিত হল—"I know that my Redeemer Liveth."

বার্নার্ড শ' বাহু প্রসারিত করে আবেগভরে গানটি গাইলেন।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর জর্জ বার্নার্ড শ কতক-...গুলি গোপন চিঠিপত্র পেলেন। এর অস্তিত্ব তাঁর জানা ছিল না। তার অনেকগুলি পড়ে ফেললেন বার্নার্ড শ, তারপর বললেন—

"I lived with Charlotte for forty years, and I see now that there was a great deal about her that I did not know. It has been a shock".

স্বামী নিজেই যখন স্ত্রীর বিষয়ে অনেক কিছু জানতেন না, তখন অপরে আর কি জানবে। সম্প্রতি জ্যানেট ডানবার নামক জনৈক মহিলা লিখিত "Mrs. G B S" নামক গ্রন্থে অনেক নতুন তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। বোঝা যায় যে, সার্লোট বার্নার্ড শ'কে জায়া অপেক্ষা জননীর মত ভালোবাসলেও আসলে তিনি যাঁকে আত্ম-নিবেদন করেছিলেন তাঁর নাম টি. ই. লরেন্স। 'লরেন্স অব এ্যারাবিয়া' নামে যিনি অধিক খ্যাত।। একজন মহৎ ও বিখ্যাত ব্যক্তির স্ত্রীর পটভূমি হিসাবে তিনি সুখে ও স্বস্তিতে আছেন এই ভাব দেখিয়েছেন। বহিরঙ্গে যিনি শ্রীমতী বার্নার্ড শ, যিনি বার্নার্ড শ'র সকল খুঁটিনাটি বিষয়ে দৃষ্টি রেখেছেন, শরীর খারাপ হলে সেবা করছেন, সকল মতামত ধীর ভাবে শুনে-ছেন, গৃহস্বামিনী হিসাবে চমৎকার। আসলে তাঁর প্রকৃতি কিন্তু ভিন্ন ধরণের।

জ্যানেট ডানবার সার্লোটের গোপন পত্রাবলী ঘেঁটে অনেক গবেষণা করে তথ্যাবলী সংগ্রহ করেছেন। সমসাময়িকদের কাছে কথাবার্তা বলে কিছু জেনেছেন। তাঁর এই জটিল চরিত্র দেখে যে প্রশ্ন মনে জাগে তা এই যে, কেন তিনি বার্নার্ড শ'কে বিয়ে করেন। আর শ'ই বা তাঁকে বিয়ে করতে রাজী হন। বিবাহ সম্পর্কে সার্লোটের মনে চাপা আতঙ্ক ছিল, কিন্তু তারুণ্যের জন্য তাঁর রূপলাবণ্যের অনেক যোগ্য পরিণয়প্রার্থী তাঁর সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে বাঁধা পড়তে রাজী ছিলেন। সার্লোটের নাকি এই আকর্ষণের কারণ She had perfectly normal ins-tincts, she was often torn by the most appalling conflicts. স্বাধীন ও মুক্ত থাকার তীব্র বাসনা ছিল তাঁর। এক্সেল মনথ্ এবং লরেন্সের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের দ্বারা বোঝা যায় যে, বিদগ্ধ এবং বিখ্যাত মানুষের ভালোবাসা অর্জনের শক্তি তাঁর চরিত্রে ছিল।

শ এবং সার্লোট দুজনেই বিবাহ-পদ্ধতি সম্পর্কে ঘোরতর বিরূপ মত পোষণ করতেন। দুজনেই অবিবাহিত থাকবেন স্থির করেন। বিবাহকালে উভয়ের বয়স চল্লিশের কোঠায়। আবার শেষজীবনে বার্নার্ড শ বলেছেন, যদি জীবনে সার্লোটের না আবির্ভাব হত, তাহলে আমি হয়ত অবিবাহিত থাকতাম। কারণ সার্লোট একমাত্র রমণী যাঁকে বিয়ে করা যায়। সার্লোট এবং শ'র বিবাহ নিছক 'প্লেটনিক' (দেহাতীত) কিনা তা বলা কঠিন। কারণ বিবাহের পূর্ব থেকে উভয়ের মধ্যে শারীরিক সংযোগ ছিল (they were on terms of physical affection) আর সার্লোট যে অক্ষত কৌমার্য নিয়ে দেহত্যাগ করেছেন, তা মনে হয় না। বার্নার্ড শ অতিশয় বিবেচক এবং সংবেদনশীল মানুষ ছিলেন। সার্লোটের যৌন বিষয় সম্পর্কে অভিমত তিনি জানতেন এবং বুঝতেন। মানুষ হিসাবে বার্নার্ড শ ছিলেন পরিপূর্ণ-ভাবে স্বাভাবিক, আর মতবাদ আঁকড়ে থাকলেও সার্লোট যে স্বাভাবিক চরিত্রের রমণী এই বিশ্বাস তাঁর ছিল। বার্নার্ড শ তাঁর বৈদগ্ধ্যের পরিমণ্ডলে বাস করতেন, তাঁর সকল উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃজনশীল ক্ষমতায় ব্যয়িত হত। আশ্চর্য মননশক্তির অধিকারী বার্নার্ড শ যে জগতে বাস করতেন তা তাঁর নিজস্ব। সার্লোট সন্তান কামনা না করলেও প্রেমে যে তাঁর অনীহা ছিল তা বোঝা যায় না। টলস্টয়কে বিবাহ করে সোফিয়ার যে দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী আকর্ষণীয় ব্যক্তি ছিলেন বার্নার্ড শ। বয়স বাড়ার সঙ্গে দুজনের অন্তরঙ্গতা নিবিড়তর হয়ে উঠেছে। সার্লোট ছিলেন ধনী রমণী। সোফিয়াকে কিন্তু নিরন্তর অর্থচিন্তায় দিন কাটাতে হয়েছে। বিপ্লবী অন্তর নিয়ে সার্লোট সর্বদা 'হেথা নয় হোথা নয়, অন্য কোনোখানে—' ঘুরে বেড়াতে চেয়েছেন। বার্নার্ড শ মাঝে মাঝে ক্ষেপে যেতেন এই ভ্রামামাণ রমণীর ভ্রমণে আগ্রহ দেখে। সার্লোট আয়ার্ল্যাণ্ডকে ভালোবাসতেন। আর স্বয়ং ধর্মশীলা না হলেও অধ্যাত্ম ব্যাপারে বিশ্বাসী ছিলেন। জেরাল্ড হাউকে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন—

I have been more or less studying all this since before I gave you the little GITA, and I soon found out all you say about its demanding everything. At first one thinks it means a quarter of an hour a day, and soon one finds it means all one's life and being and loyalty, then soon one realizes that that is not enough. There was a time when, if I had been free, I would have given up everything else for it. But I was not free."

দুজন মানুষকে সার্লোট বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, একজন গ্রহণ করেছেন যত দান ততটুকু করতে পারেন নি, তিনি এ্যাকসেল মনথ, আর দ্বিতীয় ব্যক্তি আরবের লরেন্স। এই লরেন্সও তাঁর মতই নিঃসঙ্গ। তিনি প্রকৃতিতে কঠোর ও স্বাধীন। সার্লোট তাঁর সম্পর্কে বলেছেন—

"He was an in expressibly complicated person. In a sense he was tragically sincere" —সার্লোটের জীবনে এই নাকি Strongest Contact, বার্নার্ড শ চল্লিশ বছর সার্লোটকে নিয়ে ঘর করেও তাই তাঁর গোপন পত্রাবলী পড়ে আহত হয়ে ... উঠেছিলেন— "It has been a shock!" ১৯৪৪-এর ১৮ই মে ব্যায়টে এলিনর ও'কনেলকে সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে বার্নার্ড শ বলেন—

"It takes a long time for two people to get to know each other; and from a Diary I discovered lately, and some letters which she wrote to T.E. LAWRENCE, I realise that there were many parts of her character that even I did not know, for she *poured out her soul to Lawrence.*"

স্ত্রীলোকের চরিত্র ঈশ্বরও জানতে পারেন না। এ কথাই আবার প্রমাণিত হল।

প্রভুরাম চক্রবর্তী প্রবল-প্রতাপ জমিদার ছিলেন। তাঁহার জমিদারিতে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খাইত কি না তাহা জানা নাই, কিন্তু এ কথাটা সুবিদিত ছিল যে হিন্দু-মুসলমান দুই দলই তাঁহার জমিদারিতে শান্ত হইয়া থাকিত। টুঁ শব্দ করিবার উপায় ছিল না। কোথাও টুঁ শব্দ হইলে বজ্রগর্জনে তিনি তাহা থামাইয়া দিতেন। শুধু হিন্দু-মুসলমান ব্যাপারেই নয়, সর্বক্ষেত্রেই তাঁহার প্রতাপ অপ্রতিহত ছিল। প্রভুরাম নিজের একমাত্র সন্তান প্রণতির যখন বিবাহ দিলেন তখন সদ্বংশ এবং কৌলীন্যের উপরই নজর দিয়াছিলেন বেশী। সেই জন্য অনেক দেখিয়া শেষে একটি অপেক্ষাকৃত দরিদ্র পরিবারেই তিনি জামাতা-নির্বাচন করিলেন। জামাতা বিদ্বান এবং শিক্ষক। জামাতার পিতা ছিলেন সেকালের সদরালা। প্রচুর যৌতুক এবং স্বর্ণালঙ্কার-সহ কন্যাটিকে তিনি বরেনের হস্তে সমর্পণ করিলেন। সেকালের নগদ কুড়ি হাজার টাকা পণ এবং একশত ভরি গহনা একালের লক্ষাধিক টাকারও বেশী। সদরালা সুরেন্দ্রনাথ এবং তৎপত্নী রোহিণীবালা আহ্লাদে আটখানা হইলেন। তাঁহাদের আর একটা বড় আশাও অবশ্য নেপথ্যে রূপ-পরিগ্রহ করিয়াছিল। প্রণতি যখন প্রভুরামের একমাত্র সন্তান তখন তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার অত বড় জমিদারিটাও তাঁহাদের হাতে নিঃসন্দেহে আসিয়া যাইবে। এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া তাঁহারা পুত্রবধূ প্রণতিকে সাধ্যাতিরিক্ত যত্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই দেখা গেল মানুষ অঙ্ক কষিয়া যাহা ঠিক করে অনেক সময় বিধাতার বিধানের সহিত তাহার হুবহু মিল হয় না। দুইটি ঘটনার দ্বারা এ সত্য প্রমাণিত হইল। প্রভুরাম চক্রবর্তী হঠাৎ একদিন মাথার শির ছিঁড়িয়া মারা গেলেন। দেখা গেল তিনি একটি উইল করিয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি এক ট্রাস্টির হস্তে সমর্পণ করিয়া নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন যেন সম্পত্তির সমস্ত আয় হিন্দু-মুসলমান বিরোধ-নিবারণ-কল্পে খরচ হয়। দ্বিতীয় ঘটনাটি আরও মর্মান্তিক। প্রণতির স্বামী বরেন সহসা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইল। তাহার চাকরি তো গেলই, তাহার চিকিৎসার জন্য সাংসারিক ব্যয়ও বাড়িতে লাগিল। সদরালা মহাশয় একদিন হিসাব করিয়া দেখিলেন সর্বসাকুল্যে তাঁহার বর্তমান মাসিক আয় মাত্র আড়াইশত টাকা। পুত্রের বিবাহে পণস্বরূপ যে কুড়ি হাজার টাকা পাইয়াছিলেন তাহা দিয়া কলিকাতায় একটু করা জমি কিনিয়াছেন। আশা ছিল জমিদারিটা পাইলে বাড়ি করাইবেন। কিন্তু সে আশা মরীচিকার মতো শূন্যে মিলাইয়া গেল।

প্রণতির শাশুড়ি কিন্তু ইহার জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী করিলেন প্রণতিকে। তিনি প্রচার করিতে লাগিলেন বউটা অপয়া। সমস্ত দুর্ঘটনার জন্য সে-ই দায়ী। স্ত্রীর নিকট বার-বার শুনিয়া শুনিয়া সদরালা সুরেন্দ্রনাথেরও এই বিশ্বাস জন্মিতে লাগিল। তাঁহারও মনে হইল বউটাই অলক্ষ্মী। তিনি হিসাব করিয়া দেখিলেন বউটা আসিবার পর হইতেই বাড়িতে আরও নানা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। পুরাতন বুড়ি দাইটা হঠাৎ মরিয়া গেল। ব্যাঙ্কের যে সদাশয় কর্মচারীটি নির্বিবাদে তাঁহার পেনসনের টাকাগুলি ব্যাঙ্ক হইতে বাহির করিয়া দিত সে-ও হঠাৎ বদলি হইয়া গেল। কোথাও কিছু নাই আচমকা একটা ঝড় উঠিয়া পুরাতন নিমগাছের একটা ডাল ভাঙিয়া দিল। বাড়ির গাইটা বেশ দুধ দিতেছিল হঠাৎ সে দুধ একেবারে কমাইয়া দিয়াছে। তাঁহার একমাত্র বন্ধু একচক্ষু জিতু ভট্টাচার্যও বলিলেন, 'ভায়া তোমার বউমাটির লক্ষণ ভাল দেখছি না। সাবধান হও'।

'কি করে' সাবধান হব?'—সদরালা ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন।

'আমাকে একজন তান্ত্রিক সাধক বলেছিলেন বাড়িতে অলক্ষ্মীর আবির্ভাব হলে তাকে অবহেলা করবে, যত্ন কোরো না। তাহলে কিছুদিন পরে সে নিজেই চলে যাবে'।

সদরালা খবরটি গৃহিণীকে দিলেন। গৃহিণী সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, "বেশ—"। শুনিলে বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে না কিন্তু ইহার পর হইতেই প্রণতির আহারে এবং কাপড়েচোপড়ে যাহা প্রকটিত হইল তাহা অত্যন্তই বেদনাদায়ক। প্রণতি আগে সকালবেলা কোনদিন মোহনভোগ, কোনদিন পরোটা, কোনদিন বা দু'একটা সন্দেশ খাইত —এখন তাহার জন্য বরাদ্দ হইল শুকনো মুড়ি। দাই চাকর যে মোটা চালের ভাত খাইত প্রণতির জন্যও সেই ব্যবস্থা হইল। তরকারির সংখ্যাও মাত্র একটি। তাহার মিহি শাড়িগুলি যখন ছিঁড়িয়া গেল তখন তাহার পরিবর্তে আসিল শস্তা মোটা জ্যালজেলে মিলের শাড়ি। শৌখিন সাবান তেল মাখা অভ্যাস ছিল, সমস্ত বন্ধ হইয়া গেল। এইরূপে অলক্ষ্মী-বিতাড়ন পর্ব চলিতে লাগিল। হয়তো প্রণতি না মরা পর্যন্ত চলিতেই থাকিত, কিন্তু একদিন একটা ভয়াবহ ঘটনা ঘটিয়া গেল।

সদরালা খাইতে বসিয়াছিলেন। যদিও মাছমাংসের তেমন সমারোহ ছিল না তবু শাকসবজির তরিতরকারি কয়েকটা ছিল। ভাজা, সুক্তো, চচ্চড়ি, পোস্ত, আলুপটলের দম, ডাল, অম্বল, দইও ছিল। সদরালা খাওয়া আরম্ভ করিবেন, এমন সময় ঠাস-ঠাস করিয়া তাঁহার দুই গালে কে যেন প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিল। তাহার পর শোনা গেল

যেন ঘরের ছাদ হইতে বলিতেছে, ...র মেয়েকে অনাহারে রেখে তুমি পঞ্চ- ... দিয়ে খেতে বসেছ, লজ্জা করে না ...য় শুয়োর কি বাচ্ছা। ঠেঙিয়ে লাস ...' দেব তোমাকে আজ। আমি প্রভুরাম ...র্তী, মরেছি কিন্তু মুক্তি পাইনি। কাল ... তোমার বাসায় এসেছি. আমার মেয়ের ...থা দেখে রাগে সর্বাঙ্গ রি-রি করছে ...র। শিগ্‌গির তাকে ভালো খেতে দাও, ...লো কাপড় পরতে চাও, তা নাহলে খুন ...র' ফেলব সকলকে—"

যে অদৃশ্য হস্ত সদরালাকে চড় মারিয়া- ছিল সেই অদৃশ্য হস্ত তাঁহার ভাতের ...লাকে শূন্যে তুলিয়া শানে আছড়াইয়া ...ল। ঝন-ঝন করিয়া ফাটিয়া গেল কাঁসার ...লাখানা, ভাত-তরকারি ছিটকাইয়া পড়িল ...দিকে।

"ঠেঙিয়ে লাস করে দেব সকলকে—" ...ণী পাখা হাতে কর্তাকে খাওয়াইতে ...ছিলেন, তিনি তাঁহার ব্যস্ত-ত্রস্ত ...রে অদৃশ্য পায়ের লাথি খাইয়া চীৎকার ...রিয়া উঠিলেন।

নিদারুণ ব্যাপার! মুক্তকচ্ছ সদরালা উঠানে বাহির হইয়া আসিলেন। শুনিতে পাইলেন গৃহিণী আর্তনাদ করিতেছেন— "আর মেরো না, আর মেরো না ছেড়ে দাও গো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি!"

কিন্তু পা কোথা! পা যে দেখা যায় না। প্রভুরাম চক্রবর্তীর হুঙ্কার শোনা গেল।

"শিগ্‌গির আমার মেয়েকে মিহি শাড়ি পরিয়ে পঞ্চ-ব্যঞ্জন দিয়ে ভাত খেতে দাও, তা নইলে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড করব আমি"।

"দিচ্ছি, দিচ্ছি, এখনি দিচ্ছি। আর মেরো না। কোমরটা ভেঙে গেছে—"

গৃহিণী খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে উঠিয়া বাহিরে গেলেন। বাহিরের বারান্দায় প্রণতিও ভয়ে ঠক্‌ ঠক্‌ করিয়া কাঁপিতেছিল। গৃহিণী তাহাকে বলিলেন, "আমার ওই তাঁতের কাপড়টা তাড়াতাড়ি পরে নাও। চল তোমাকে খেতে দিচ্ছি। উঃ, এ-কি কাণ্ড!"

মিহি তাঁতের শাড়ি পরিয়া প্রণতি আহার করিল।

সদরালা ও তাঁহার গৃহিণী রোহিণীবালা অতঃপর যাহা করিলেন তাহা হাস্যকর, কিন্তু ইহা না করিয়াও উপায় ছিল না। তাঁহারা উভয়ে গলবস্ত্র হইয়া ছাতের দিকে চাহিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "বেয়াই, আমাদের বড় খিদে পেয়েছে, এবার খাব? আর কখনও তোমার মেয়ের অযত্ন আমরা করব না। আমাদের মাপ কর—"

শূন্য হইতে উত্তর আসিল—"খাও। আর আমারও খাবার ব্যবস্থা কর। আমার ভাত বেড়ে তোমাদের তুলসীতলায় রেখে এস, সেখান থেকেই আমি খেতে পারব'।

গৃহিণী তাড়াতাড়ি একথালা ভাত ও সব রকম তরকারি তুলসীতলায় সাজাইয়া দিলেন।

"ওই ক'টি ভাতে আমার কি হবে? আমি একসের চালের ভাত খাই—"

"আর তো ভাত নেই। তাহলে চড়িয়ে দিই'—"

"দাও—"

কিছুক্ষণ পরে একসের চালের ভাত ও তদুপযুক্ত তরিতরকারি তুলসীতলায় রাখা হইল। নিমেষের মধ্যে তাহা শূন্যে বিলীন হইয়া গেল। খালি থালা ও বাটিগুলি পড়িয়া রহিল কেবল।

আহারান্তে প্রভুরাম চক্রবর্তী জ্ঞাপন করিলেন, "আমি এখন এইখানেই থাকব ঠিক করেছি। নিয়মিত আমার খাবার জলখাবারের ব্যবস্থা করবেন"।

শুনিয়া সদরালা-দম্পতীর চক্ষু স্থির হইয়া গেল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া শেষে তাহারা তাঁহাদের বন্ধু কানা জিতু ভট্‌চাজের শরণাপন্ন হইলেন। বাধ্য হইয়াই হইলেন, কথাটা বাহিরে প্রচার হোক এ ইচ্ছা তাঁহাদের মোটেই ছিল না।

কানা চক্রবর্তী পরামর্শ দিলেন— ওঝা ডাকা হোক। একটি ভাল ওঝার ঠিকানাও বলিয়া দিলেন তিনি। তাহার সহিত চুক্তি হইল ভূত বিদায় করিতে

...টিকি ধরিয়া টানিতে টানিতে...

পারিলে তাহাকে নগদ পঞ্চাশ টাকা এবং এক জোড়া তাঁতের ধুতি দিতে হইবে। তাছাড়া এক সের তেজপাতা চাই। তেজপাতাটা পোড়াইতে হইবে। তেজপাতা পোড়ার ধোঁয়ায় ভূত না কি পালায়। নির্দিষ্ট দিনে ওঝা আসিয়া নিজের চতুর্দিকে সিঁদুর দিয়া একটা গণ্ডি দিল এবং তাহার মধ্যে বসিয়া তেজপাতা পোড়াইতে পোড়াইতে মন্ত্র পড়িতে লাগিল। ফল যাহা হইল তাহা অতি ভয়ঙ্কর। ওঝার নাকের উপর প্রভুরাম চক্রবর্তী একটি ঘুসি মারিলেন এবং তাহার টিকি ধরিয়া তাহাকে টানিতে টানিতে আনিয়া উঠানের উপর এক আছাড় দিলেন। ওঝা উঠিয়াই চোঁ চা দৌড় দিল, আর পিছু ফিরিয়া চাহিল না পর্যন্ত। পরদিন তাহার এক পত্র আসিল—'উনি সামান্য ভূত নন। উনি দুর্ধর্ষ একগুঁয়ে দানব। আমি উহাকে ঘাঁটাইতে পারিব না। ক্ষমা করিবেন।' পরদিন প্রভুরামের নূতন আদেশও জারি হইল।

"রোজ রোজ শাক-পাতা খাওয়াচ্ছেন কেন। চালটাও খুব মোটা। আজ পেশোয়ারি চালের ভাত এবং মাংসের কোর্মা খাব। কাল ভালো রুই মাছ কিনে আনবেন।"

সদরালা করজোড়ে উত্তর দিলেন, "বেয়াই, আমি বড় গরীব হয়ে পড়েছি। মাছ মাংস খাবার পয়সা নেই। যে চাল কিনছি তারই মণ সাঁইত্রিশ টাকা। এর চেয়ে বেশী দাম দিয়ে চাল কি করে' কিনব? ছেলেটি অসুস্থ হয়ে পড়েছে—"

"ও সব কিছু শুনতে চাই না। স্ত্রীর গয়না বিক্রি করে' ফেলুন। আমি যে কুড়ি হাজার টাকা দিয়েছিলাম সে টাকা কোথা?"

"তা দিয়ে কলকাতায় একটুকরো জমি কিনেছি—"

"বিক্রি করে' ফেলুন জমি। মোটকথা কাল থেকে ওই খাবার চাই"।

সত্যই সদরালা গৃহিণীর কিছু অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন, প্রভুরামের ফরমাস অনুযায়ী খাওয়া-দাওয়া চলিতে লাগিল। মাছ মাংস পোলাও কালিয়া দই মিষ্টি ক্ষীর প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে সাজাইয়া তাঁহারা তুলসীতলায় প্রত্যহ প্রভুরামকে ভোগ দিতে লাগিলেন। বুঝিলেন, না দিলে তাঁহাদের জীবন সংশয়। দুর্ধর্ষ দানবের মায়া-দয়া নাই।

একদিন গভীর রাত্রে সকলে যখন গভীর নিদ্রামগ্ন তখন প্রণতি বাহিরের ঘরে আসিয়া ছাদের দিকে চাহিয়া ডাকিল, "বাবা—"

"কি—"

"তুমি আর আমাদের কষ্ট দিও না। তুমি এবার এদের রেহাই দাও, শ্বশুর-শাশুড়ির কষ্ট আমি আর দেখতে পাচ্ছি না। লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে—"

"তোর জন্যই তো এত সব করছি—ওরা তোকে যে অবস্থায় রেখেছিল—"

"সেই অবস্থাতেই আমি সুখী ছিলাম বাবা। এই আমার অদৃষ্ট, তুমি আর কি করবে। এখন তুমি যা করছ তাতে আমি ভালো খেতে পরতে পারছি বটে, কিন্তু আমার মনে শান্তি নেই, লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। তুমি অমন কোরো না"

"তুই বলছিস আমি চলে যাব?"

"তাই যাও"

দুম করিয়া একটা শব্দ হইল। ছাতের খানিকটা ফাটিয়া উড়িয়া গেল। প্রণতি সেই ফাঁক দিয়া দেখিতে পাইল আকাশের একটি উজ্জ্বল তারা তাহার দিকে চাহিয়া সকৌতুকে হাসিতেছে।

শব্দ শুনিয়া সদরালা ও তাঁহার পত্নীও আলু-থালু বেশে বাহির হইয়া আসিয়া- ছিলেন।

"কিসের শব্দ হল বৌমা?"

"বাবা চলে' গেলেন"।

"কি করে' বুঝলে?"

"ওই যে দেখুন না"।

নক্ষত্রটি তখনও সকৌতুকে হাসিতেছিল।

একটি শাপগ্রস্ত ঐতিহাসিক হীরকের কাহিনী

বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়

প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপরই বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা। সে কারণ, যা অতিপ্রাকৃত বা অতিমানবীয় এমন অলৌকিক ঘটনা বিজ্ঞানের এলাকার বাইরে। কিন্তু সাধারণ মানুষ বিজ্ঞানের যুক্তিনিষ্ঠায় আস্থাশীল হয়েও, সময় সময় এমন সব ঘটনার সম্মুখীন হয়, যা তার বিচারবুদ্ধিকে জড়িমার মধ্যে ফেলে বিভ্রান্ত করে—বৈজ্ঞানিকের নির্দেশিত পথে সে আর বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে না। এমনি বিভ্রান্তকর অবস্থার সৃষ্টি হয় যখন প্রত্যক্ষ বস্তু বা ঘটনার সঙ্গে তার "অন্তরালবর্তী কারণটিকে সে কিছুতেই আবিষ্কার করতে পারে না। যখন সকল যুক্তি ও বিশ্লেষণ এক দুর্ভেদ্য রহস্যের মধ্যে ঢাকা পড়ে যায়। আমাদের দেশের ঝাড়-ফুঁক, মন্ত্র-তন্ত্র, ভেল্কিবাজি প্রভৃতি যা অতি প্রাচীনকাল থেকে কুসংস্কাররূপে আজও বেঁচে আছে, তার মূলে আছে—রহস্যকে আমরা পুরোপুরি আমাদের চেতনা থেকে বিদূরিত করতে পারিনি। তাই এখনও পর্যন্ত আমরা মন্ত্রপূত বস্তুর শক্তিতে সহজে অনাস্থা প্রকাশ করতে পারি না।

কিন্তু সত্যই কি এ কুসংস্কার? সংসারে কি অলৌকিক ঘটনার স্থান নেই? মনে হয়, এ-সম্বন্ধে মানুষ কোনদিনই একটি সুস্পষ্ট সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবে না। কারণ, একের ইচ্ছাশক্তি যে বস্তু বা ব্যক্তির উপর আরোপ ক'রে বাঞ্ছিত ফললাভ করা যায়, এমন ঘটনার দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

এখানে ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে এমনই একটি অলৌকিক ও অবিশ্বাস্য ঘটনা আপনাদের কাছে উপস্থিত করছি উপর্যুক্ত বক্তব্যের পরিপোষক হিসাবে। ঘটনাটি হচ্ছে একটি হীরকের রহস্যজনক কাহিনী এবং এই কাহিনীর উপলক্ষ্য হচ্ছেন বিখ্যাত ফরাসী রত্নবণিক ও পর্যটক জাঁ ব্যাপিস্ত টাভার্নিয়ার, যিনি শাহানশাহ্ আকবরের রাজত্বকালে ভারতে এসেছিলেন। ইনি একটি মন্দিরে রাম-সীতা বিগ্রহের দেহাভরণে একটি বিরাট অত্যুজ্জ্বল হীরকখণ্ড দেখে এতই মুগ্ধ হন যে, সেটিকে অপহরণ করার জন্য বদ্ধপরিকর হন। সম্রাটের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে এই হীরকের সম্বন্ধে যখন কথা ওঠে, তখন মোগলসম্রাট আকবর তাঁকে এই বিগ্রহের অঙ্গসজ্জা সম্বন্ধে যে অলৌকিক তথ্য পরিবেশন করেন, তা হচ্ছে—"যদি বিগ্রহের অঙ্গাভরণ অশুচি হস্তে স্পৃষ্ট হয়, তাহ'লে দুষ্কৃতকারী ভয়ংকর অভিশাপে অভিশপ্ত হবে এবং এই অভিশাপের ক্রিয়া বংশপরম্পরায় সংক্রামিত হবে।" হতভাগ্য টাভার্নিয়ার পূর্বাহ্নে সম্রাটের নিকট এই তথ্যটি জেনেও তাঁর কুপ্রবৃত্তিকে দমন করতে না পেরে এই হীরকখণ্ডটি কৌশলে আত্মসাৎ করেন। ফলে, কেবলমাত্র যে তাঁর নিজের জীবন ও পরিবারবর্গই অভিশাপের অমোঘ শাস্তি ভোগ করেছিল তা নয়—এমন কি যে-কেউ এই হীরকের সংস্পর্শে এসেছিল, তাকেই চরম দণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল। কত যে অলৌকিক ঘটনা এই হীরকটিকে উপলক্ষ্য করে ঘটেছিল তার ইয়ত্তা নেই। এই কাহিনীটি সেই সকল রহস্যময় ও বিস্ময়কর বিবরণে পূর্ণ।

প্রায় দু' হাজার বৎসর পূর্বে বর্মার এক মন্দিরে অবস্থিত রাম-সীতা বিগ্রহ এমন একটি হীরকখণ্ডের দ্বারা শোভিত ছিল, যার ঔজ্জ্বল্য ও বর্ণের তুলনা হয় না! কথিত আছে, অতি প্রাচীনকালে রাজকুমারী রিস্‌বন এর অধিকারী হয়ে বিক্ষুব্ধ জনতার হাতে প্রাণ দিয়েছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এই হীরকের অলৌকিক কাহিনীগুলির সত্যাসত্য নির্ণয় করা দুরূহ। কিন্তু ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের পর থেকে এর যে সুসংবদ্ধ বিবরণ পাওয়া যায় এবং টাভার্নিয়ারের স্বলিখিত বিবরণ এই হীরকটির উপর যে আলোকপাত করে, তাতে কবির সেই কথাটিই শুধু স্মৃতির মধ্যে ভেসে ওঠে—'ডাক দেখি তোর বৈজ্ঞানিকে, ক'টা কেনর জবাব দেয়।' ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এই হীরকটি 'হোপ ডায়মণ্ড' নামে পরিচিত।

এই হীরকখণ্ডের রোমাঞ্চকর ঘটনার পূর্বে থেকেই টাভার্নিয়ার মণিমুক্তার বিশেষজ্ঞরূপে খ্যাত ছিলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পর্যটন করে নানা তথ্য সংগ্রহ করাই ছিল তাঁর জীবনের একটি প্রধান লক্ষ্য। ফলে, পর্যটক হিসাবে তাঁর নাম বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। এমনি পর্যটনের মাধ্যমে তিনি নানা দেশের নানা অদ্ভুত মণি-মাণিক্য সংগ্রহও করেছিলেন। এ-ব্যাপারে তাঁর খ্যাতি এতই বিস্তারলাভ করেছিল যে, সম্রাট চতুর্দশ লুই তাঁকে নিজের দরবারে আহ্বান জানিয়েছিলেন। সেই থেকে রাজপরিবারের মূল্যবান রত্নসমূহ সরবরাহ করাই ছিল তাঁর কাজ।

টাভার্নিয়ারের খ্যাতি এতই ব্যাপক হয়ে পড়েছিল এবং তাঁর নামের এমনি একটা আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছিল যে, ভারতে তাঁর পদার্পণের সংবাদে দিল্লীর রাজপ্রাসাদে তাঁকে আমন্ত্রিত করে আনা হয়েছিল এবং বলা বাহুল্য, এখানে রাজকীয় সম্মানে তিনি সম্মানিত হয়েছিলেন। এই সম্মানের একটি দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, তাঁকে এমন স্থানে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হ[য়েছিল] যেখানে ইতিপূর্বে কোন বিদেশীর সে সৌভাগ্য হয়নি—তা হচ্ছে, হিমালয়ে অবস্থিত সম্রাটের খনি-অঞ্চল। এ[খানে] সহস্র সহস্র ক্রীতদাস অবিরাম রত্ন-আহ[রণের] বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকত।

এক বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে স[ম্রাটের] সঙ্গে একত্রে বেশ কয়েক [দিনের] পথ অতিক্রম করে টাভার্নিয়ার এক[দিন] যখন ঐ খনি-অঞ্চলে উপস্থিত হলে[ন,] তখন সেখানকার দৃশ্যে তাঁর বিস্ময়ের আর অবধি রইল না! এত বিচিত্র ও বিপুল মণি-মুক্তার একত্র সমাবেশ জীবনে আ[র] কখনও দেখেন নি তিনি। তাছাড়া, ব[হু] বিচিত্র তাদের রঙ, কত বিভিন্ন তাদে[র] আকার, কি বিস্ময়কর তাদের সৌন্দর্য! টাভার্নিয়ারের কাছে এ-দৃশ্য স্বপ্নের [মতো] মনে হতে লাগল। কিন্তু সম্রাটের নি[কট] তিনি যখন শুনলেন যে, তাঁর অধিকৃত [এই] মণিময় অঞ্চলের কোন মণিই সেই ম[ণির] সমকক্ষ হতে পারে না, যার কথা তি[নি] জানেন, তখন টাভার্নিয়ারের বিস্ময় আর শতগুণ বৃদ্ধি পেল।

এই মণির ইতিবৃত্ত যা সম্রাটের জানা ছিল, তা তিনি বিশদভাবে টাভার্নিয়ারের কাছে ব্যক্ত করলেন।

—"কোন স্মরণাতীত কাল থেকে—হয়ত দু'হাজার বছর পূর্ব থেকেই বর্মা দেশের এক মন্দিরে রাম-সীতার একটি যুগল-মূর্তি আছে। এই মূর্তিটির বক্ষ ও কণ্ঠদেশে বহু বিচিত্র মণি-মুক্তার সমাবেশের মধ্যে এমন একটি হীরকখণ্ড আছে যা পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এমনই বিস্ময়কর তার জ্যোতি—এমনই বিচিত্র তার বর্ণচ্ছটা! শোনা যায়, বর্মার রাজকুমারী রিস্‌বন এটি পরিধান করে বিক্ষুব্ধ জনতার দ্বারা নিহত হন। এমন এক অজ্ঞাত শক্তি এর মধ্যে নিহিত ছিল তার জন্য রাজকুমারীকে প্রাণবিসর্জন দিতে হয়।"

সম্রাটের নিকট এই হীরকখণ্ডের কথা শুনে রত্নবণিকের মনে তা পাবার জন্য এমনই বাসনা জাগল যে, তিনি কিছুদিনের মধ্যেই সেই দেশের পথে যাত্রা করলেন। পথের দুর্গমতা তাঁর লোভকে দমন করতে পারল না। অবশেষে একদিন টাভার্নিয়ার তাঁর অভিলষিত স্থানে এসে পৌঁছলেন। এখানেও তাঁর নামের খ্যাতি তাঁকে সম্মানিত অতিথিরূপেই প্রতিষ্ঠিত করলে। যে মন্দিরে কখনও কোন বিদেশীর পদার্পণ ঘটেনি, সেখানে তিনি প্রবেশাধিকার লাভ করলেন। ধূর্ত টাভার্নিয়ার স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে মন্দিরে প্রবেশ করেই বিগ্রহের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলেন। তারপর নিবিষ্টচিত্তে সমস্ত বিগ্রহটি পরীক্ষা করে দেখলেন বিচক্ষণতার সঙ্গে। এরপর থেকে প্রতিদিন সকাল, দুপুর, রাত্রি তিনি বিগ্রহটি পরিদর্শন করার জন্য মন্দিরে যেতে লাগলেন। প্রতিবারই তিনি কিছু না কিছু অর্ঘ্য নিবেদন করতেন সেখানে। তাঁর নিকট অনুপমূল্যের যেসকল মণি-মুক্তা ছিল,

লক্ষ্যভেদ
বীথি সরকার

গরম গরম !

অমলেন্দু দাশগুপ্ত

...লিই তিনি অর্ঘ্য-স্বরূপ প্রদান করতে ...লেন দেবতাকে। মন্দিরের যাজকেরা ...তাঁর এই ভক্তি ও বদান্যতায় খুবই ...ত এবং অভিভূত হয়ে পড়লেন। এই-চারদিন কেটে গেল।

...র পরের দিনটি ছিল ঘোর অমাবস্যার ...। মন্দিরের পাহারায় কোন রক্ষী ছিল ... তাই টাভার্নিয়ারের হাতীর দল ও তাঁর ...কজনের উপস্থিতি কারুর নজরে পড়েনি। ...কে অমানিশার অন্ধকার, তায় পাহারার অভাব। টাভার্নিয়ার বিনা বাধায় তাঁর উদ্দেশ্য সফল করলেন। সেইদিন রাত্রেই ...গ্রহের গললগ্ন সুদীর্ঘকালের মহামূল্যে ...ণিটি অপহৃত হল,—চতুর রত্নলোভী ...দেশী পর্যটকের লোভের ইন্ধন হিসাবে।

পরদিন প্রত্যুষেই চুরির কথা জানাজানি ...য় হৈ-চৈ পড়ে গেল চতুর্দিকে। কিন্তু কে ... গর্হিত কাজ করতে পারে! মন্দিরের ...রোহিতদের মধ্যে এই নিয়ে ভীষণ ...্পনা-কল্পনা চলতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত একটি সূত্র আবিষ্কৃত হ'ল। দেখা গেল, সেই রাত্রে মন্দিরের আশেপাশে যে-সব ভিখারী নিদ্রিত ছিল, তারা সব বন্ধ অবস্থায় ছটফট করছে। তাদের বন্ধন খুলে দিতে তারা বলল যে, একদল বিদেশী গত রাত্রে এখানে এসে তাদের এই অবস্থা করে গেছে। কিন্তু টাভার্নিয়ার বা তাঁর দলের কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না। তারা তখন তাদের উদ্দেশ্য সফল ক'রে বেমালুম নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে!

এই ঘটনায় মন্দিরের পুরোহিতরা মর্মান্তিক শোকে অভিভূত হয়ে পড়লেন। বিগ্রহের সম্মুখে অবিরাম তাঁরা এই প্রার্থনা করতে লাগলেন, যেন দুষ্কৃতকারীদের উপর দেবতার অভিশাপ বর্ষিত হয় এবং এই কৃতকর্মের ফল যেন অনিবার্যভাবেই ভোগ করতে হয় তাদের।

যত শীঘ্র সম্ভব টাভার্নিয়ার ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁর এই বিজয়-অভিযান চতুর্দিকে দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল। সম্রাট লুই এই অভিনব অত্যাশ্চর্য হীরকখণ্ডের সংবাদ পেয়ে টাভার্নিয়ারকে তখুনি তলব করে পাঠালেন। টাভার্নিয়ারের এটি মোটেই বিক্রি করার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু সম্রাট লুই এটিকে হস্তগত করার জন্য এমনই জিদ ধরলেন এবং এত বিপুল অর্থের প্রলোভন দেখালেন যে, টাভার্নিয়ার সেটিকে আর না বিক্রয় করে পারলেন না। বিক্রয়ের আরও একটি কারণ হ'ল, তাঁর পুত্র ঋণের দায়ে তাঁর সমূহ সম্পত্তি বাঁধা দিয়েছিল। এই সংবাদটি পেয়ে তিনি একেবারে ভেঙে পড়েন এবং হীরকখণ্ডটি বিক্রয় করাই সমীচীন মনে করলেন।

সম্রাট এই হীরকটির সৌন্দর্যে এতই মুগ্ধ হলেন যে তাঁর সংগ্রহশালার অসংখ্য মণি-মুক্তার আর কোনটিই তাঁকে এতটা আনন্দ দিতে পারল না। তাঁর বেশ-ভূষার মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করল এই মণিটি।

কিন্তু অচিরেই মণিটির অলৌকিক শক্তি প্রকাশ পেতে লাগল। সম্রাট যাঁকেই এটি ব্যবহার করতে দিলেন, তাঁরই কোন-না-কোন রকম বিপদ ঘটতে লাগল। মাদাম দ্য মঁতেস্‌পাঁ এটি ব্যবহার করার পরই সম্রাটের ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয়ে বিরাগের পাত্রী হয়ে ওঠেন। অর্থমন্ত্রী নিকোলাস ফোকে এটি পরিধান করার পর সম্রাটের এমনই অপ্রিয় হয়ে ওঠেন যে, তাঁকে কারাগারে বন্দী হয়ে থাকতে হয় এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। তারপর ফ্রান্সের রাজতন্ত্র বিদ্রোহের কবলে পড়ে কি-ভাবে ধ্বংস হ'ল, ইতিহাসই তার সাক্ষ্য দেয়। এর পর কিছুকাল আর এই হীরকটির ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু শোনা যায়নি। শোনা যখন গেল, তখন হীরকটি নিখোঁজ। এটা হ'ল ১৭৯২ সালের কথা। তখন ফরাসী সম্রাটের মণি-মুক্তার বিরাট সংগ্রহশালাটি বিদ্রোহী সমিতির তত্ত্বাবধানে Grade Menble-এ রাখা ছিল। একদিন সন্ধান পাওয়া গেল, সেখান থেকে সঞ্চিত মণি-মুক্তা সব চুরি হয়ে গেছে।

এই দুঃসাহসিক চুরি ফ্রান্সের নব-প্রতিষ্ঠিত শাসক সমিতির মধ্যে এক বিরাট চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলে। দেশে যত চোর-ডাকাত জুয়াড়ী দুরাত্মা লোক ছিল, তাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করা হ'ল। তাদের মধ্যে একজন এই দুঃসাহসিক ডাকাতির ব্যাপারটি প্রকাশ করে দিলে। অপরাধীদের চরম দণ্ড-ভোগ করতে হ'ল—শুধু তাদের মধ্যে দু'জনের ফাঁসি না হয়ে কারাদণ্ড হয়েছিল এবং তারাও অতি অল্পকালের মধ্যেই জেলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কিন্তু রাম-সীতা সম্পর্কীয় এই হীরকখণ্ডটির কোন হদিস পাওয়া গেল না। সেটি যে কোথায়—এ খবর কোন রকমেই প্রকাশ পেল না।

অবশ্য কিছুকাল পরে এই বিস্ময়কর ক্রিয়াকলাপ বিশিষ্ট হীরকখণ্ডটির আবার খবর পাওয়া গেল। তখন তার ধ্বংসকারী ক্রিয়ার লীলাক্ষেত্র হ'ল—এমাসর্টাডাম। ডাকাতি, চুরি, আত্মহত্যা, হত্যা সবকিছুই ঘটতে লাগল এটিকে উপলক্ষ ক'রে। কি রহস্যময় উপায়ে ফলস্‌ নামে এক হীরক-ব্যবসায়ীর হাতে এটি এসে পৌঁছেছিল, সে-সংবাদ কেউ জানে না। এ ব্যাপারে শুধু এটাই প্রকাশ পেল যে, একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি এটি তাঁকে দিয়েছিল সংস্কারসাধন করার জন্য। মাসের পর মাস ফলস্‌ বিপুল পরিশ্রম ক'রে যেদিন সংস্কারের কাজটি শেষ ক'রে এর মালিককে ফিরিয়ে দিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন, ঠিক সেই দিনেই তাঁর এক আঠারো বৎসর বয়স্ক পুরোমাত্রায় অসৎচরিত্র পুত্র—সেটি চুরি করে নেয়। তারপর সেটি বিক্রি ক'রে সেই লক্ষ্মীছাড়া ছেলেটি যে-অর্থ পায়, তাতে তার কুকর্মগুলি বেশ কিছুদিন নির্বিঘ্নেই সমাপ্ত হয় এবং যেদিন সে সমস্ত অর্থ ... অপব্যয় করে রিক্ত হয়ে যায়,

......নিবিষ্ট চিত্তে সমস্ত বিগ্রহটি পরীক্ষা করে দেখলেন বিচক্ষণতার সঙ্গে।

সেদিন আত্মহত্যা ক'রে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে।

এক ফরাসী যুবক, নাম ফ্রান্সিস বোলিয়ে' হীরকটিকে অতি অল্প মূল্যেই ঐ লম্পট ছেলেটির কাছ থেকে কিনে নেয় এবং এই হীরক ফ্রান্সে বেচা যুক্তিযুক্ত নয় ভেবে সে লন্ডনে যাওয়াই স্থির করে। কিন্তু লন্ডনে যাবার মত অর্থ তার না থাকায়, সে অতি গোপনে প্যারিসের এক স্বর্ণকারকে দিয়ে এটির এক খণ্ড কেটে তার মারফতই বিক্রি করায় এবং লাভের টাকা দু'জনে ভাগ করে নেয়। বিলেতে গিয়ে সে হীরকটিকে তার পায়ের জুতোর মধ্যে লুকিয়ে রেখে নিজের জীবিকাঅর্জন করার জন্য লন্ডনের রাস্তায় ঝাড়ুদারের কাজ করতে থাকে।

কিন্তু এই সামান্য উপার্জনে গ্রাসাচ্ছাদন চালান তার পক্ষে শক্ত হয়ে পড়ায়, সে মরিয়া হয়ে হীরকটি বেচার জন্যে ডানিয়েল এলিয়াসন নামে এক ইহুদি স্বর্ণবিক্রেতার কাছে যায়। উক্ত স্বর্ণবিক্রেতা যুবকের একান্ত অনুরোধে এটা নিজের কাছে রাখতে রাজী হয় এই শর্তে যে, সে চিন্তা করে দেখবে, এটি নেবে কিনা এবং নেওয়া সাব্যস্ত হ'লে সে তাকে ভাল দামই দেবে। লোকটি মোটেই অসৎ ছিল না, সে কারণ সে এটি নেওয়া স্থির করে পরদিন যুবকের বাসায় গিয়ে দেখে, যুবক মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে—অনশনই হয়েছে তার মৃত্যুর কারণ।

এখানে বলা প্রয়োজন, ফ্রান্সের সংগ্রহশালা থেকে হীরকটি চুরি যাবার পর থেকে দু'বার এটিকে খণ্ডিত করা হয়েছিল। প্যারিসের স্বর্ণকার খুব সামান্য অংশই কেটেছিল, এবং বিখ্যাত বৃটিশ মণিকার মিঃ স্ট্রিটার-এর নিকট বিক্রি করেছিল; এর চেয়েও বেশ বড় একটি খণ্ড ডিউক অব বার্নসউইক-এর নিকট বিক্রিত হয়েছিল, আর বাকী বৃহৎ অংশটিই ইহুদি স্বর্ণবিক্রেতার হাতে এসে পড়েছিল।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই বৃহৎ অংশটি ডানিয়েলের নিকটেই ছিল এবং সেই মিঃ থমাস হেনরী হোপকে আঠারো হাজার পাউন্ডে এটি বিক্রি করেছিল—বিশেষজ্ঞদের মতে যার ন্যায্য মূল্য তিরিশ হাজার পাউন্ড। এই সময় থেকে এই হীরকখণ্ডটি 'হোপ ডায়মণ্ড' নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করে।

অল্পকালের মধ্যেই মিঃ হোপের মৃত্যু হওয়ায়, পরোক্ষ উত্তরাধিকারী হিসাবে এই শাপগ্রস্ত হীরকের মালিক হন লর্ড ফ্রান্সিস হোপ এবং এই সময় থেকেই হীরকটির ভৌতিক কান্ড অধিকতরভাবে প্রকট হয়। একটি বছর সম্পূর্ণ হতে না হতে, তিনি সর্বস্বান্ত হয়ে চরম দুর্দশায় উপনীত হন। মে ইওয়ে নামে যে অভিনেত্রীকে তিনি ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে বিবাহ করেছিলেন, ১৯০২ সালে তাকে তিনি পরপুরুষাসক্ত অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত ক'রে ত্যাগ করতে বাধ্য হন। অতঃপর হীরকটিকেও তিনি বিক্রি করে ফেলেন ঋণের দায়ে বিপর্যস্ত হয়ে।

লর্ড হোপের জীবনের দুর্গতির কাহিনী থেকেই এই অত্যাশ্চর্য হীরকের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের কাহিনী সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে।

দেখতে-দেখতে শতাধিক বর্ষ উত্তীর্ণ হয়ে যায়, কিন্তু এই হীরকটির ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানার বেগ এতটুকুও হ্রাস পায় না। ১৯০৮ সালেও সে-সব তেমনি ঘটতে থাকে যেমন একশত বৎসর পূর্বে ঘটেছিল। এবার এই হীরকটি যাঁর হাতে এসে পড়েছিল, তিনি হচ্ছেন প্রিন্স কানিটোভস্কি। ইনি ছিলেন রাশিয়ার এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং ধনকুবের। মাদামোয়াজেল লাদু নাম্নী এক মঞ্চাভিনেত্রীর রূপে রাজকুমার একেবারে আত্মহারা হয়ে পড়েছিলেন। আর শুধু তিনিই নন—প্যারিসের পথেঘাটে এঁর রূপের আকর্ষণের কাহিনী সর্বজন-পরিচিত ছিল। একদিন তিনি এই অভিনেত্রীটিকে এটি ধারণ করার জন্য দেন, এবং অভিনেত্রী সেটি ধারণ করে পাদপ্রদীপের সম্মুখে আবির্ভূত হন। কণ্ঠ-লগ্ন মণিটির অত্যাশ্চর্য জেল্লা ও রূপসী লাদু'র দেহসৌন্দর্য—এই দুইয়ের সমন্বয়ে সেদিন মঞ্চোপরি যে মোহ সৃষ্টি হয়েছিল তার তুলনা হয় না! কিন্তু অকস্মাৎ এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে যায়। রাজকুমার দর্শকদের মধ্যে থেকে তাঁর পিস্তল বের ক'রে অভিনেত্রীর প্রতি গুলি নিক্ষেপ করেন—এবং একটা করুণ আর্তনাদ করে মাদামোয়াজেল লাদু তৎক্ষণাৎ মঞ্চের উপরেই লুটিয়ে পড়েন। এই ঘটনারই দুদিন পরে, রাজকুমার প্রকাশ্য রাজপথে অজ্ঞাত আততায়ীর ছুরিকাঘাতে [illegible] হন। তাঁর মৃত্যুর সংবাদ যখন তাঁর [illegible] বিক্রেতার নিকট পেশছায়, তখন তিনিও ম[illegible] দুঃখে আত্মহত্যা করেন—কারণ রাজকুম[illegible] নিকট তাঁর তখনও প্রচুর অর্থ বাকী [illegible] হীরকটির বিক্রয় বাবদ।

এর পর এই ভীতিপ্রদ অথচ মহ[illegible] হীরকটির সন্ধান পাওয়া যায় তুর[illegible] সুলতান আবদুল হামিদ এটি এক গ্র[illegible] মণিকারের নকট হ'তে ক্রয় করেন। যেদিন এ[illegible] বিক্রয়ের ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়, সেদিন এ[illegible] মণি-বিক্রেতা সপরিবারে গাড়ি উল্টে অপঘাতে মারা যায়। আর এই ঘটনার কিছুদিনে[illegible] মধ্যেই তুরস্কে যুব-আন্দোলনের বন্যায় স[illegible] যে বিদ্রোহের বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়, তা[illegible] সুলতান শুধু সিংহাসনচ্যুতই হন না—প্রা[illegible] হারান।

এরপর এই হীরকটি সম্বন্ধে কিছুক[illegible] আর বিশেষ কিছু শোনা যায় না। কি[illegible] ১৯১১ খৃষ্টাব্দে আমেরিকাতে এর সন্ধা[illegible] পাওয়া যায় এক হীরক-ব্যবসায়ীর নিকট। এই হীরক-ব্যবসায়ী মিসেস এডওয়ার্ড বি ম্যাকলিন নাম্নী এক মহিলাকে এটি বিক্রয় করেছিল। কিন্তু এটিকে উপলক্ষ করে অচিরেই মিসেস ম্যাকলিন হীরক-ব্যবসায়ীর সঙ্গে এক দীর্ঘকালব্যাপী মকদ্দমায় জড়িত হয়ে পড়েন।

এই মকদ্দমার একমাত্র কারণ হ'ল হীরক বিক্রয়ের অদ্ভুত একটি শর্ত। হীরকটির নানা বিপজ্জনক ক্রিয়াকলাপের জন্য ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে শর্ত হয়েছিল যে, যে-দামে বিক্রয় সিদ্ধ আছে—মোট বাহান্ন হাজার পাউন্ড, তা ক্রেতা দিতে বাধ্য থাকবেন, যদি হীরকটি খরিদ করার পর তাঁর কোন বিপদ না ঘটে। কিন্তু কোন বিপদ যদি ঘটে, তাহলে হীরকটি তিনি বিক্রেতাকে ফেরত দেবেন এবং বিক্রেতা উক্ত মূল্যে বিনা দ্বিধায় ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবেন। কিন্তু বেশী বিলম্ব হ'ল না বিপদের অপেক্ষা করতে। একদিন তাঁর একমাত্র পুত্র—যে তার জননীর বিপুল ঐশ্বর্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী; সে পরিচারিকার নিকট হতে ছুটে পালাতে গিয়ে একটি মোটরগাড়ির চাকায় একেবারে পিষে গেল!

এই ঘটনার পর বর্তমানে এই হীরকটি সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছুই শোনা যায়নি। কিন্তু সত্যিই কি এর রহস্যময় ভৌতিক জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটেছে?—ভবিষ্যৎই এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে সক্ষম।

আজ বিজ্ঞানের এই নব নব আবিষ্কারের যুগে একটি হীরকের এই ভয়ংকর অলৌকিক শক্তির কথা মন যেন বিশ্বাস করতে চায় না—কিন্তু বিশ্বাস না করেই বা উপায় কি! কারণ, এই যে-সব কাহিনী এখানে লিপিবদ্ধ হয়েছে, এর একটিও তো কাল্পনিক বা আজগুবি নয়।

তবে?...

কমপ্লিমেন্টারী

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

অফিসে একটা হিসাব লইয়া হিমসিম খাইয়াও তার হদিশ মেলে নাই—তাঁবের কেরাণীদের ধমক দিয়া বলিয়াছেন, কাল সব মিলিয়ে দেওয়া চাই—সকালে ফার্ষ্ট থিং, আমাকে সব বুঝিয়ে দেবে...

এই বলিয়া নৃসিংহ বড়বাবু বাড়ী ফিরিলেন, ফিরিয়া দোতলায় উঠিলেন। উঠিবামাত্র গৃহিণী শচীবালা বলিলেন, বকবে না বলো...আজ মস্ত লোকসান করেছি !

মেজাজ এখনো ঝাঁঝে ভরিয়া আছে—তপ্ত কড়ায় তেলের মতো। গৃহিণীর একথা...লোকসান...সে যেন তেলে বেগুন পড়িল। কর্তা বলিলেন, খেটে-খুটে আসিচ বারবার বলছি, খারাপ খবর যদি কিছু থাকে জলটল খেয়ে জিরুবার পরে, একটু সইয়ে-সইয়ে বলতে হয়। তা নয়, মানুষ বাড়ীতে ঢুকতে না ঢুকতেই একবারে দুম্-পটকা।

গৃহিণী বলিলেন, কিন্তু অবশ্য শোন না... এমন কিছু মারাত্মক—

কথা শেষ হইল না। কর্তা বলিলেন, বুঝেছি কিছু ভেঙ্গেছো নিশ্চয়ই, না হয় নতুন বামুনটা চুরিচামারি করে চম্পট দেছে !

গৃহিণী বললেন,—না গো না, তা নয়।

কর্তা বলিলেন,—থাক! তা নয় যদি, তো যা হয়েছে, আমি শুনবো না শুনতে চাই না। ঘরে বসে দুদণ্ড নিশ্বাস ফেলবো তা কারো সহ্য হবে না! সব ভাবে অফিসে চেয়ারে বসে মজা করি, হুঃ।

কর্তা অফিসের পোশাক ছাড়িতে লাগিলেন।

গৃহিণী বলিলেন,—সব সময়ে মেজাজ যেন আগুন। কোন সময়ে সুখদুঃখের কথা বলবো, বলতে পারে?

—থাক আর বলতে হবে না। কর্তা হাঁকিয়া বলিলেন—নারান...

বেয়ারা নারান ছিল ঘরের বাহিরে। কর্তার সঙ্গে দোতলায় উঠিয়াছে—এখন মনিবের ডাকে তাঁর সামনে উদয় হইল।

কর্তা বলিলেন—সে প্যাকেট দিয়েছিস সতীশবাবুর বাড়ী ?

সবিনয়ে নারান বলিল—আজ্ঞে।

কর্তা বলিলেন—আচ্ছা ডাকে চিঠিটিঠি কিছু এসেছে ?

নারাণ বলিল,—না।

কর্তা চুপ করিলেন...ললাটে ভ্রূকুটি রেখা...তিনি গিয়া বাথরুমে ঢুকিলেন। গৃহিণী দাঁড়াইলেন ভিতর বারান্দায়।

তারপর জলখাবার। কর্তা আসিয়া লুচি তরকারী হালুয়া ভোজন করিলেন— চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিলেন।

গৃহিণী বসিয়া নিঃশব্দে দেখিলেন।

চায়ের শেষে একটু আরাম কর্তা চাহিলেন গৃহিণীর পানে; বলিলেন— কেউ এসেছিল ?

গৃহিণী বলিলেন,—ও বাড়ীর মেনকাদিদি এসেছিলেন।

ও—তা তিনি এলেন কি উদ্দেশ্যে ?

—মেনকাদিদির দ্যাওর থিয়েটার করে..... আমি বলেছিলুম একদিন আমাদের পাশ দিন কখানা মেনকাদি দেখে আসি—কতকাল যে থিয়েটার দেখিনি।

সেই পাশ দিতে এসেছিলেন ?

হ্যাঁ

দিয়ে গেছেন ?

দিয়েছে।

সন্ধ্যার ফুরফুরে বাতাস...চমৎকার লাগিতেছিল।

কর্তা বলিলেন, যাবে ?

গৃহিণী বলিলেন,—আজকের পাশ।

—তা বেশ তো, কে বলেছে, আজ থিয়েটার দেখবো না।

মনে প্রতিশোধের বাসনা জাগিল। গৃহিণী বলিলেন, থাকগে...আমার শখের জন্য তোমার জিরুনো শেষ হবে না।

কর্তা বলিলেন,—না, না। জিরুবার জন্য কত ঘণ্টা সময়ের দরকার? আমি খুব জিরিয়েছি। তোমার মেনকাদি মানুষটি তো

ভাল। আমি ভাবতুম যে উনি আসেন তোমার কাছে চা ধার করতে...চিনি ধার করতে।

গৃহিণীর চোখে কুটিল কটাক্ষ... বলিলেন, কবে ও তোমার চা-চিনি চেয়েছে?

কর্তা বলিলেন,—না চাইলেই ভালো তবে কিনা পাড়ার লোক—তারা যা সদ্ভাব রাখে, সে তো ঐ পাবার প্রত্যাশায়। তা যখন পাশ দিয়ে গেছে তখন তোমার যেতে আপত্তি কিসের শুনি।

—থিয়েটার সাতটায় আরম্ভ।

ও...তা, এখন বোধহয় ছটা বেজে গেছে। অফিস থেকে আসবামাত্র বলা উচিত ছিল।

গৃহিণী বলিলেন, বলতে দিলে কই? যে গোরা মেজাজ নিয়ে বাড়ী ঢুকলে, যেন

"বলতে দিলে কই? যে গোরা মেজাজ নিয়ে বাড়ী ঢুকলে, যেন বোমা"

বোমা! প্রোকসান শুনেই তুমি যেন মারতে এলে।

কর্তা বলিলেন,—এমন ভালো খবর ছিল, এ খবরটা বাড়ী ঢোকামাত্র দিলে না কেন?

—পাশের কথা তখন মনে ছিল না ভুলে গিয়েছিলুম।

কর্তা বলিলেন—মেয়েমানুষের এই দোষ! ভালো কথা ভুলে যাবে। আমি এত কাজ করি...অফিসের কত দায়িত্ব আমার কাছে... কিন্তু কোনদিন এতটুকু ভুল করি না। নারায়ণকে বলো এখনি ট্যাক্সি ডেকে আনুক। ট্যাক্সি না হলে সময়ে পৌঁছুতে পারব না।

—বেশ।

গৃহিণী উঠিতেছিলেন—কর্তা বলিলেন, পাশখানা দেখি কোন্ থিয়েটারে।

গৃহিণী পাশ আনিয়া দিলেন। দেখিয়া কর্তা বলিলেন, বেশ, ট্যাক্সির জন্য নারানকে বলে দাও—আর দেরী করা নয়, তুমি তৈরী হয়ে নাও, আমি তৈরী হই।

দুজনে বেশভূষায় সাজিয়া তৈয়ারী হইলেন...নারান ট্যাক্সি ডাকিয়া আনিয়াছে। ঘড়ির দিকে চাহিয়া কর্তা বলিলেন,—ইঃ পৌনে আটটা। এসো, এসো—

ট্যাক্সিতে বসিয়া ড্রাইভারকে কর্তা বলিলেন, জোরসে যাবে—ঠিক সময়ে যদি পৌঁছে দিতে পারো তাহলে চার আনা এক্‌স্ট্রা দেবো...মীটারের ভাড়ার উপর!

ট্যাক্সি ছুটিল··চার আনার লোভে ড্রাইভার রাশ ড্রাইভিঙের জরিমানার তোয়াক্কা রাখিল না।

থিয়েটারের সামনে ট্যাক্সি হইতে নামিয়া ভাড়া এবং বকশিশ দিয়া কর্তা আসিলেন টিকিটঘরের সামনে...

পাশে সীটের নম্বর লিখিয়া ষ্ট্যাম্পের মঞ্জুরনামার জন্য। গৃহিণী আসিলেন পিছনে ...ল্যাংবোটের মতো।

কর্তা জামার পকেট হাত পুরিলেন পাশের জন্য...এ পকেট, ও পকেট.. তারপর তাঁর ভ্রূ হইল কুঞ্চিত। তিনি নিস্পন্দ...যেন নাড়ীর স্পন্দন নামিয়া গিয়াছে।

গৃহিণী বলিলেন—কি হলো?

কর্তা বলিলেন—সর্বনাশ করেছি। আসবার সময় পাশখানা টেবিলের উপরে রেখে এসেছি। ...উপায়?

গৃহিণী একেবারে এতটুকু...ভিতরে অ্যালার্ম বাজিল...পানসিগরেটের দোকান ছুঁইয়া দর্শকের ছুটোছুটি ধাক্কাধাক্কি। তারা বলিতেছিলেন—এমন প্লে বিশ বছরের মধ্যে হয়নি।

কর্তার বুকে যেন সাইরেন বাজিতেছে—তিনি বলিলেন, নিশ্চয়ই খুব ভালো প্লে... এতদূরে এসে ফিরে যাব? দুখানা টিকিট কিনে ফেলি। এসেছি যখন, কি বলো?

গৃহিণী কোনো জবাব দিলেন না...তাঁর চোখ যেন কাঁচের ভাটা।

টিকিটঘরের সামনে আসিয়া কর্তা বলিলেন,

—দুখানা টিকিট—

সঙ্গে সঙ্গে একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিলেন।

টিকিটঘরের বাবু বলিল—আজ্ঞে, দুটাকা চার আনার সীট একটিও খালি নেই।

কর্তার মাথায় খুন চাপিল। বলিলেন—কুচ পরোয়া নেই। সাড়ে তিনটাকার টিকিট দুটো। দুখানা টিকিট, সেই সঙ্গে নগদ তিন টাকা। ফেরত লইয়া কর্তা আসিলেন গৃহিণীর কাছে। বলিলেন,—এসো.. চটপট।

দুজনে ঢুকিলেন অডিটোরিয়াম তুলিয়া প্লে শুরু.. পাতলা ন্যাকড়ার ফুল-পাতা আঁকা, তার সামনে পাখা ত্রিশজন সখী পরী সাজিয়া নাচ-গান ২ দিয়াছে।

থিয়েটার ভাঙিলে বাড়ী...

ঘরে ঢুকিয়া কর্তা সুইচ টিপি, আলো জ্বলিল না। বলিলেন,—কি আবার? ফিউজ?

গৃহিণী ছিলেন পিছনে...বলিলেন, ঐ কথাই তো বলছিলুম, বালবগুলো কা ঝুল হয়েছে দেখে খুলে নিয়ে করছিলুম, দুটো গেল নষ্ট হয়ে...লো নয়?

"সর্বনাশ করেছি......উপায়?"

কর্তা বলিলেন—কি দরকার ছিল সাফ করবার? দিব্যি জ্বলছিল! ...এখন অনর্থক এই লোকসান! দুটো বাল্‌বের দাম এখন সোনার দামের মতো। হুঁ...খেটে রোজগার করতে হয় না তো...বুঝবে কি টাকার দাম।

গৃহিণী কোনো কথা বলিলেন না।

পরের দিন সকালবেলা।

বাহিরের ঘরে একরাশ বন্ধুবান্ধব।

কর্তা হিসাব লিখিতেছিলেন। লেখা শেষ হইলে একটা নিশ্বাস ফেলিলেন।

সুরেশবাবু বলিলেন—ব্যাপার কি? এত বড় নিশ্বাস?

কর্তা বলিলেন—বেশ কিছু হয়েছে! দুর্গ্রহ!

—তার মানে?

—মানে, ফ্রী পাশে থিয়েটার দেখা!

গৃহিণীর থিয়েটার দেখবার শখ! পাশ পেয়েছিলেন! পাশ রইলো ঘরে—দুখানা টিকিটে পড়ে গেল সাত টাকা, ট্যাক্সি-ভাড়া গেল চার টাকা চার আনা! তার ওপর প্রোগ্রাম কেনা, পান, লিমনেড...বারো টাকা একদমে খরচ হয়ে গেল! হুঁ—পাশের মাথায় আরো ঝাড়ু।

গত পঞ্চাশ বৎসরের (১৯১৩-৬৩) বাংলা সাহিত্যের সর্বদিকের ইতিহাস বড় বিচিত্র। নানা সাহিত্যিকের উত্থান, পুস্তক-প্রকাশনের বিচিত্র গতি—এইসব নিয়ে একটা এলোমেলো ইতিহাস লেখা যেতে পারে। একসঙ্গে বহু সাহিত্যিকের আগমন, পুস্তক-প্রকাশনের উন্মেষ, পত্র-পত্রিকার বিস্তৃতি; তারপর দুইটি বিশ্বযুদ্ধের ও স্বাধীনতালাভের প্রচেষ্টার মধ্যে, কত যে বিচিত্র কাহিনী সাহিত্য-জগতে জড়িয়ে আছে তার কোন আভাসই আজকাল পাওয়া যায় না। সেই সময়কার নাট্য-জগতের ইতিহাসকেও উপেক্ষা করা যায় না। কারণ সাহিত্য-গঠনের ইতিহাসে তাদের স্থান কম নয়। এই সময় গিরিশচন্দ্র বা অমৃতলালের প্রতিভা ম্লান হয়ে এসেছে; বাংলার থিয়েটার নূতনভাবে প্রদীপ্ত হবার আগে যেন অস্তমিত হয়ে আসছে। শিশিরকুমার প্রভৃতি নব-নাট্য প্রতিভার যুগ তখন আগতপ্রায়। কবিদের মধ্যে যাঁরা আসর জমিয়েছিলেন, তাঁরা হচ্ছেন—অক্ষয়কুমার বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কালিদাস রায়, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। উপন্যাস ও গল্প লেখকদের মধ্যে তখন অবশ্য সর্বপ্রথমে আছেন রবীন্দ্রনাথ। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্প তখন মাসিকপত্রের বিশেষ আকর্ষণীয় জিনিস ছিল। অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবীও তখন উপন্যাস-লেখিকা হিসাবে প্রথম শ্রেণীর স্থান অর্জন করেছেন। তাছাড়া আছেন, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

এইসময়ে সাহিত্যের পথপ্রদর্শক হিসাবে একমাত্র 'প্রবাসী'ই শ্রেষ্ঠ মাসিক ছিল। বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখক-লেখিকাদের লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে প্রবাসী বাংলা সাময়িক সাহিত্যের মানদণ্ডরূপে পরিগণিত হোল। এরপরে ছিল 'ভারতী' ও 'ভারতবর্ষ'। অবশ্য সমাজপতি মহাশয়ের 'সাহিত্য'ও তখন বেশ উচ্চাসনে অবস্থিত।

এই সময় আমরা কয়েকজন তরুণ যুবক সাহিত্যক্ষেত্রে সবেমাত্র আনাগোনা শুরু করছি। মনে প্রবল আকাঙ্ক্ষা বড় সাহিত্যিক হব। এইরূপ একটা স্বপ্নময় মন নিয়ে আমরা সকলে একসঙ্গে জোট বেঁধেছি। এঁদের মধ্যে কয়েকজন তো বেশ বড় সাহিত্যিকই হয়েছেন, যেমন হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী (মহাস্থবীর), নরেন্দ্র দেব, অমল হোম চারু রায় (চিত্রশিল্পী), প্রভাত গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি। কলেজের পড়া শেষ হয় নাই, এর মধ্যে সরাই মিলে এক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক হয়ে পড়লাম। তাছাড়া, প্রত্যেক সাহিত্যসভা বা আসরে যাওয়া, পত্রপত্রিকার আপিসে ঘোরাফেরা করা, বড় বড় সাহিত্যিকদের সান্নিধ্য লাভ করা নেশার মত আমাদের পেয়ে বসেছিল।

কলেজের পড়াশোনা নষ্ট করে সাহিত্যের তর্ক-বিতর্ক—আর সাহিত্যিক আড্ডায় যাওয়া আমাদের যেন সেই সময়ে একটা প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়াল।

১৯১৩ সালের মাঝামাঝির সময়ের কথা বলছি। একদিন দুপুর বেলায় সুবোধ বালকের মত বই হাতে রিপণ কলেজে চলেছি। আমহার্স্ট স্ট্রীট দিয়ে চলতে চলতে মোড় ফেরবার সময় রাস্তার কাছে একটা একতলা ছাপাখানা থেকে ডাক এল।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

যমুনা-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পাল মহাশয় আমাকে অনুরোধ করলেন, প্রুফ দেখার কাজে তাঁকে একটু সাহায্য করতে। কয়েক ঘণ্টা ধরে প্রুফ দেখে তিনি এখন ক্লান্ত। ছোট ছোট সুন্দর অক্ষরে লেখা কপি। হাতের লেখা খুব পরিষ্কার—বেশ ঝকঝকে ও তকতকে। কপি ধরা তো দূরের কথা, আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত সেই লেখা পড়ে যেতে লাগলাম। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, রেঙ্গুনের একজন অপরিচিত ও অপরিজ্ঞাত লেখকের লেখা গল্প—রামের সুমতি। লেখকের নাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সেদিন আর অবশ্য কলেজ যাওয়া হোল না। পরপর তিনটি গল্প, যেমন রামের সুমতি, বিন্দুর ছেলে ও পথ নির্দেশ যমুনাতে প্রকাশিত হওয়ার পর শরৎচন্দ্রের খ্যাতি চারদিকে ক্রমে ক্রমে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। আমরা কয়জন সাহিত্যিক বন্ধু মিলে সকলকেই এই গল্পগুলো সবাইকে পড়ে ও শুনিয়ে শরৎচন্দ্রের প্রতিভা প্রচার করতে শুরু করে দিলাম। ইতিপূর্বে 'ভারতবর্ষে' শরৎচন্দ্রের 'বিরাজ বৌ' প্রকাশিত হয়েছে। 'বিরাজ বৌ' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শরৎচন্দ্র ধূমকেতুর মত বাংলা সাহিত্যজগতে উদয় হলেন। সাহিত্যক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের হঠাৎ আবির্ভাব ও দ্রুত বিস্তৃতি একটা অভাবনীয় ঘটনা। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শরৎবাবু ছাড়া কোন সাহিত্যিকের এত দ্রুত সম্মানলাভ হয়েছে কিনা তা বলা যায় না। অবশ্য কয়েক বৎসর আগে বেনামীতে শরৎবাবু কিছু কিছু লিখেছিলেন বটে, যেমন 'ভারতী'তে তাঁর নামহীন 'বড়দিদি' বেরিয়েছিল, কিন্তু সোজাসুজিভাবে হঠাৎ সাহিত্যক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব হয় যমুনায়।

যমুনাতে নিয়মিতভাবে শরৎচন্দ্রের লেখা বেরুতে আরম্ভ করল। কিছুদিন পরে 'ভারতবর্ষে'র উদয় হোল। প্রাচীন বন্ধুত্বের সূত্রে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগসূত্র এই সময় স্থাপিত হোল। যমুনার হিতাকাঙ্ক্ষীরা এই কারণে একটু শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। দোটানায় পড়ে শরৎবাবু কোন-দিকে ভিড়বেন—তাই আমাদের চিন্তার বস্তু হোল। সর্বসাধারণে ঘোষিত হয়েছিল, ভারতবর্ষ প্রকাশিত হবে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সম্পাদনায়; কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হবার পূর্বেই তিনি পরলোকগমন করলেন; তাঁর পরিবর্তে সম্পাদক হলেন অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। সেই সময় শোনা গিয়েছিল, শরৎবাবুর অসমাপ্ত অর্ধেক-লেখা উপন্যাস 'চরিত্রহীনে'র পাণ্ডুলিপিটা দ্বিজেন্দ্রলালকে দেখতে দেওয়া হয়েছিল—ভারতবর্ষে যদি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা যায়। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল এই উপন্যাস অনুমোদন করলেন না। এই উপন্যাস নাকি অশ্লীলতাদুষ্ট। এই অসমাপ্ত উপন্যাসটি তখন ধারাবাহিকরূপে 'যমুনায়' বেরুতে শুরু করল।

এখানে একটা ঘটনা উল্লেখ করার দরকার মনে করছি। সেটা হচ্ছে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। মনে পড়ে, সেটা যে কি জুন মাস; প্রখর রৌদ্র তাপের মধ্যে আমরা কয়েকজন সাহিত্যিক-বন্ধু কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের দোতলায় 'যমুনা'-আপিসে সমস্ত দরজা ও জানলা বন্ধ করে বসে আছি। নিজেদের মধ্যে তখন পরনিন্দা ও পরচর্চা চলছে, আর চলছে তেলেভাজা খাওয়া। যমুনা প্রকাশের ক্রমেই দেরী হয়ে পড়ছে, ঠিক সময় রেঙ্গুন থেকে 'চরিত্রহীনের' কপি আসছে না। শরৎবাবু কপি পাঠাতে প্রতি মাসে দেরী করছিলেন। আমি তখন একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছি। এই নিয়ে তখন আমরা অনুযোগ বলছিলাম—শরৎচন্দ্র নিশ্চয় 'চরিত্রহীন', তাই চরিত্রহীনের কপি পাঠাতে এতো দেরী! অবশ্য এটা ঠাট্টাচ্ছলেই বলা। যমুনা-আপিসের প্রবেশ-দরজা কখন খুলেছে ও বন্ধ হয়েছে, আমরা কেউ টের পাইনি। একটি অপরিচিত লোক ঘরে নিঃশব্দে প্রবেশ করে আমাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে, তা নজরেই আমাদের পড়েনি। নিতান্ত সাধারণ চেহারা। মাথার চুল এলোমেলো, একমুখ দাড়ি-গোঁফ, পায়ে চটি, সঙ্গে একটি দেশী কুকুর। তারপর দৃঢ়কণ্ঠে এই আগন্তুক বললেন—শরৎচন্দ্র চরিত্রহীন কিনা, তাঁর হাতেই চরিত্রহীনের কপি—যমুনা-সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করবার জন্য

তিনি এখানে এসেছেন। এই আকস্মিকভাবে শরৎবাবুকে দেখে আমরা তো হতভম্ব ও বিস্মিত হয়ে গেলাম। আমার লজ্জারও অন্ত ছিল না। আমি যা রূঢ়কথা বলেছি, তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করলাম। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়ের কাহিনী। মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর ভালবাসা ও স্নেহ সমভাবে আমি পেয়ে এসেছি।

মধ্যের কয়েক বৎসর শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমার আন্তরিকতার একটু ভাটা পড়েছিল। তার দুইটি প্রধান কারণ ছিল—প্রথম কারণ, শরৎবাবুর ছয়টি বই প্রকাশ করবার পর আমি যা মনে করেছিলাম, তার মেয়াদ ফুরিয়ে গিয়ে অন্যত্র চলে যায়; দ্বিতীয়ত, শরৎচন্দ্রের খ্যাতি ও সম্মান এত শীঘ্র ও দ্রুত প্রচারিত হোল, যে নূতন নূতন ভক্ত ও অনুরক্তরা তাঁর চারপাশে ভিড় করে জমে থাকতো; আমাদের কয়েকজন সর্বপ্রথম অনুরক্তরা আর স্থান পেল না।

এইবারে আর এক পর্বের কথা। এখন যমুনা ও ভারতবর্ষ—এই দুটো পত্রিকার মধ্যে শরৎবাবুর লেখা নিয়ে একটু মনোমালিন্যের সৃষ্টি হোল। অবশ্য এই ক্ষেত্রে যমুনাকে ক্রমে ক্রমে পশ্চাৎপদ হতে হোল। এই গোলযোগের মধ্যে আমিও অনারকমে জড়িয়ে পড়লাম। সাহিত্যিক-বন্ধুরা সকলেই পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, শরৎবাবুর যে কয়টি লেখা কাগজে বেরিয়েছে, তা আমাকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করতে হবে। এই ব্যাপারে আমাকে কয়েকটি বাধার সম্মুখীন হতে হোল। প্রথমতঃ আমরা তো মাত্র তখন আইনের বইয়ের প্রকাশক; বাংলা বইয়ের কোন ধার ধারি না। শরৎবাবুর বই ছেপে ক্ষতিগ্রস্ত হবো কিনা তাই ভাবছি। তাছাড়া অন্য প্রকাশকের তীক্ষ্ন দৃষ্টিও বইগুলির উপর ছিল; এই বই সম্বন্ধে তাঁরা একরকম নিশ্চিন্তই ছিলেন। এই দুই বিভিন্ন বাধার মধ্যে আবার অন্য বাধা এলো—রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্রের আসন্ন প্রত্যাবর্তন। নানারকম বাধা-বিপত্তির মধ্যেও আমার সুযোগ এসে উপস্থিত হোল। অন্য প্রকাশকের কলিকাতায় অনুপস্থিতির সুযোগে বই প্রকাশের পাকা বন্দোবস্ত করে ফেলতে হবে—আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুরা, বিশেষ করে যমুনা-সম্পাদক এইমত প্রকাশ করলেন।

সেই সময় আমাদের কোন আত্মীয়ের গৃহে বিবাহের অনুষ্ঠান ছিল। বিবাহ ব্যাপার চুকে গেলে বিবাহের অঙ্গস্বরূপ ষ্টার থিয়েটারে একটা অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। এই অভিনয় দেখবার জন্য শরৎবাবুকে নিমন্ত্রণ করা হোল। রাত দুটোর সময় অভিনয়-শেষে শরৎবাবু শেষে রাত্রিটুকু আমাদের বাড়ীতেই কাটিয়ে দিলেন। ভোরবেলায় পূর্বপরিকল্পিত ব্যবস্থা মত ফণীন্দ্রনাথ পাল মহাশয় আমাদের বাড়ীতে উপস্থিত হলে শরৎবাবুর হাতে কিছু অগ্রিম টাকা দিয়ে তাঁর ছয়খানা বই—চন্দ্রনাথ, নারীর মূল্য, পরিণীতা, নিষ্কৃতি, বৈকুণ্ঠের উইল ও চরিত্রহীন প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করার বই পাওয়া গেল। অবশ্য এটা কেউ ভাববেন না যে undue influence প্রয়োগ করে আমরা এই কাজ সম্পন্ন করেছিলাম। যতদূর মনে পড়ে, ছয় শত টাকা দুই তিন খেপে অগ্রিম দিয়ে তারপর পুস্তক-বিক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রাপ্য টাকা দেওয়া হয়েছিল। আজকালের দিনে শরৎবাবুর মত লেখকদের পক্ষে এই টাকা খুব সামান্য বলেই মনে হবে। সাহিত্যের বাজারে কেনা-বেচায় আমরা অনেকদূর এগিয়ে এসেছি—আজকের দিনে প্রথম শ্রেণীর লেখকদের টাকার অঙ্ক দেখলে সকলেই অবাক হয়ে যাবেন। সেই সময়ে শুনতে পেয়েছিলাম, শরৎবাবু তাঁর তিনটি বিখ্যাত গল্পের কপিরাইট নামমাত্র টাকায় ছেড়ে দিয়েছিলেন। শরৎবাবু তাঁর প্রথম লেখক-জীবনে 'সিনেমা রাইট' দিয়ে গল্পের জন্য যৎসামান্য টাকা পেতেন, সকলেই এ খবর জানেন।

এই ছয়খানি বইয়ের প্রথম সংস্করণের মেয়াদ ফুরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে অন্য প্রকাশকের হাতে এই বইগুলি চলে গেল। কিন্তু শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমার সংযোগ এই-সব কারণে ক্ষীণ হলেও যোগ একেবারে ছিঁড়ে যায়নি। তাই সেই সম যখন 'বসুমতী'তে তাঁর একখানা উপন্যা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে, তখ এই বইখানা প্রকাশের জন্য তাঁকে এ হাজার টাকা অগ্রিম দেই। কিন্তু, জানি না কি কারণে এই উপন্যাসের প্রকাশ বন্ধ হয়ে স আমিও শরৎবাবুর কাছ হতে এই টাকা পেলাম। শরৎবাবু তখন প্রতিশ্রুতি দিলে আর একখানা উপন্যাস প্রকাশনার ভার আ উপর দেবেন। বেশ কিছুদিন প 'বঙ্গবাণী'তে শরৎবাবুর 'পথের দাবী' বেরুতে আরম্ভ করলো। পূর্ব কথামত শরৎবাবু এই বই প্রকাশ করবার ভার আম উপর দিলেন, এবং তাঁকে আবার এক হাজ টাকা অগ্রিম দিলাম। সুদীর্ঘ কয়েক বৎ ধরে 'পথের দাবী' বঙ্গবাণীতে প্রকাশ হোল। এই উপন্যাস প্রকাশের ইতিহ অনেকেরই বোধহয় মনে আছে। একে শর বাবুর লেখা, তার উপর রাজনৈতি উপন্যাস। সব্যসাচী ও ভারতীর কাহিনী সেই স্বদেশী যুগে, বোমা ও গুপ্তহত্যার যুগে, বোমার মত ফেটে পড়লো। বিদেশী সরকারের কোপ এই বইয়ের উপর একেবারেই তখন আসন্ন—এটা সকলেই অনুভব করেছিলেন। আমাকেই এই বই প্রকাশ করতে হবে—আমার মত ভীরু স্বভাব লোকের পক্ষে এই জিনিসটা ভীতি সঞ্চার করলো। বইখানা তন্ন-তন্ন করে পড়ে শরৎবাবুকে জানিয়ে দিলাম, মধ্যে মধ্যে দুই একটা লাইন বাদ দিলে বই প্রকাশ করা আমার পক্ষে সহজ হয়। শরৎবাবু আমাকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিলেন, বই থেকে একটা লাইনও তিনি বাদ দেবেন না। তখন বঙ্গবাণীর কর্তৃপক্ষরা 'পথের দাবী' প্রকাশ করলেন। প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই পথের দাবীর কপিগুলো বিদেশী সরকার বাজেয়াপ্ত করে নিল। বইয়ের দাম ছিল ৩-৫০ টাকা কিন্তু গুপ্তভাবে এই বইয়ের কেনাবেচা চলেছিল—সতেরো-আঠারো টাকাতেও গুপ্তভাবে তখন এই বই বিক্রী হয়েছিল—তা অনেকেই জানেন। ১৯৪৭ দেশ স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে 'পথের দাবী' বাধামুক্ত হয়ে আবার প্রকাশিত হোল। শরৎবাবুর মৃত্যুর অনেক পরে। এখন আমরাই এই বইয়ের প্রকাশক।

শরৎবাবুর মৃত্যুর আগে তাঁর সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা আবার ফিরে এল। তখন দক্ষিণ কলিকাতায় বাস করি, শরৎবাবুর বাড়ীর কাছেই। একদিন রাত্রে বাড়ীতে এসে শুনতে পেলাম, শরৎবাবুর কাছ হতে কড়া তাগাদা এসেছে, তাঁর সঙ্গে দেখা করা বিশেষ দরকার। এই তাগাদা নিয়ে এসেছেন শরৎবাবুর মাতুল সাহিত্যিক সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

একদিন রাত্রি নয়টার সময় শরৎবাবুর কাছে আমি হাজির। তাঁর বাড়ীর একতলার বড় ঘরটায় বড় ইজি-চেয়ারে তিনি শায়িত; পাশে আলবোলা। আমি শরৎবাবুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে, আর আমার পিছনে সুরেনবাবু। কয়েক বৎসর পরে শরৎবাবুর সঙ্গে দেখা। তাঁর চেহারা ও শরীর দেখে আমি বিস্মিত ও অবাক হলাম। তাঁর মৃত্যুপাণ্ডুর মুখ ও অত্যন্ত শুষ্ক চেহারা দেখে আমি যেন বেশী ভীত হয়ে বলে ফেললাম—শরৎবাবু,

আপনার এ কি চেহারা হয়েছে! হঠাৎ আমার পিঠে শরৎবাবুর অলক্ষিতে বেশ বড় রকমের একটা আঘাত পড়লো। তখন সঙ্গে সঙ্গে কথার মোড় ফিরিয়ে নিয়ে বলতে হোল—আপনার চেহারা খারাপ হয়েছে, কিন্তু দেখে শরীর ভালই মনে হচ্ছে। ...রনবাবু পরে দুঃখপ্রকাশ করে বলেছিলেন, শরীর খুব খারাপ বললে শরৎবাবুর মনে একটা আতঙ্ক উপস্থিত হয়। তাই আমাকে সতর্ক করে দেওয়া।

অন্য বিষয় আলোচনার পর শরৎবাবু বললেন—অপারেশনের জন্য তাঁকে নার্সিং হোমে যেতে হবে। কুমুদশঙ্কর সব ব্যবস্থা করেছে। সেইজন্য এখন কিছু অর্থ দরকার। আমার কাছে তিনি এক হাজার টাকা চাইলেন। পরের দিন আমি এই টাকা দিয়ে আসি। নার্সিং হোম থেকে ফিরে এলে তিনি আমাকে একখানা বই দেবেন বল্লেন। এই তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা। এর মাস-খানেকের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়।

এর পরে রাজশেখরবাবুর কথা। যে সব বড় বড় সাহিত্যিকদের সান্নিধ্য পেয়ে ধন্য হয়েছি, তার মধ্যে রাজশেখরবাবু একজন। তিনিও শরৎবাবুর মত অল্পসময়ের মধ্যে যে রকম সাহিত্যিক স্বীকৃতি পেয়েছিলেন, তা দুই-একজনের ভাগ্যেই ঘটেছে। এই স্বীকৃতি শরৎবাবুর মত তিনি বেশী বয়সে পান। বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সে তাঁর প্রথম বই প্রকাশিত হয়। সুদীর্ঘ কয়েক বৎসর ধরে তাঁর সমস্ত পুস্তক-প্রকাশনার ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় তাঁর সম্বন্ধে কিছু কথা বলতে আমি সাহসী হয়েছি।

১৩৩২ সালে পার্শী বাগানের 'উৎকেন্দ্রে' মধ্যে মধ্যে যাতায়াত আরম্ভ করেছি। স্বর্গত বন্ধুবর ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে প্রথমে এখানে নিয়ে যান। চিত্রশিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেন উৎকেন্দ্রের একজন প্রধান কর্ণধার। তাঁকে দিয়ে 'মৌচাকে'র কভার ও অন্যান্য ছবি আঁকাবার উদ্দেশ্যেই আমার প্রথম ওখানে যাওয়া। গড্ডলিকার প্রথম গল্প 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী' লিঃ প্রথমে ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয়ে সাহিত্যজগতে বেশ একটা বিস্ময় এনে দেয়। ব্রজেন্দ্রনাথ নিজেই এই গড্ডালিকার প্রকাশক হন। কোন পেশাদার প্রকাশক এই বইয়ের প্রকাশক ছিল না। গড্ডালিকার প্রথম সংস্করণ বিক্রয়ের ভার আমার উপরেই পড়ল। প্রকাশক ও গ্রন্থকারের সম্বন্ধটা যে কত মধুর ও প্রীতিপূর্ণ হতে পারে তা যাঁরা পরশুরামের কাছে এই সূত্রে এসেছেন, তাঁরা ভাল করেই জানেন। অনেক সময় প্রকাশকরা লেখক বা গ্রন্থকারদের এত নিকটে এসে পড়তে হয় যে, তাঁরা যে দৃষ্টি দিয়ে গ্রন্থকারদের দেখবার সুযোগ পান তা সাধারণ পাঠকদের পক্ষে সব সময় সম্ভবপর নয়। তাই তাঁর লেখার কথা বাদ দিয়ে অন্য দৃষ্টিকোণ দিয়ে রাজশেখরবাবু সম্বন্ধে কিছু এখানে বলবো।

রাজশেখরবাবুর লেখা পাণ্ডুলিপি যাঁরা দেখবার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরা তাঁর নির্ভুলতা ও পরিচ্ছন্নতা দেখে বিস্মিত হবেন। আজ-কালকার দিনে গ্রন্থকার বা লেখকদের হাতের লেখা পাণ্ডুলিপি দেখলে মনে হয়, হাতের লেখা যে একটা রীতিমত 'আর্ট' তা আমরা একেবারেই ভুলে গেছি। রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখার মত খুবই
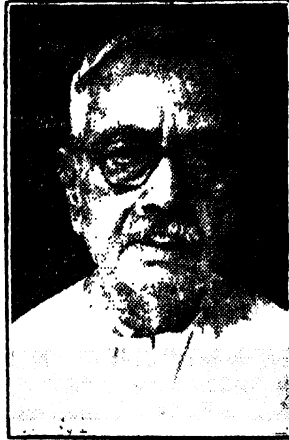
রাজশেখর বসু

ভাল। তারপর উল্লেখ করা যেতে পারে শরৎচন্দ্র, হেমেন্দ্রকুমার, অচিন্ত্যকুমার ইত্যাদি কয়েক জনের লেখা। রাজশেখর বসুর লেখাও পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতার হিসাবে আদর্শ হাতের লেখা বলা যেতে পারে। তাঁর একখানা বইয়ের সমস্ত পাণ্ডুলিপির মধ্যে কাটছাঁট, পরিবর্তন, পরিবর্জন একেবারেই দেখা যায় না। হয়তো কোথাও সামান্য একটা কথা কাটতে হয়েছে, তাও আবার আমরা যেমন করে কাটি, সেভাবে নয়। সেই শব্দের উপর একটা ছোট কাগজ লাগিয়ে নূতন কথাটা বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক গল্পের বা পাণ্ডুলিপির শেষে লেখা আছে সমস্ত লেখার শব্দ-সংখ্যা। সমস্ত শব্দ-সংখ্যা, প্রতি লাইনের মাপ, প্রত্যেক পাতার লাইন-সংখ্যা, প্রত্যেক লাইনের শব্দের মধ্যে ফাঁকের মাপ—ইত্যাদি গুনে-গেঁথে রাজশেখরবাবু এমনভাবে নিজের কল্পিত নিখুঁত হিসাব করে দেন যে, বই ছাপতে গেলে দেখা যায়, তাঁর বই তাঁর হিসাবের চেয়ে এক চুল এদিক-ওদিক হয় নাই। এ বিষয়ে তাঁর নিজের হিসাব-প্রণালী কতটা সূক্ষ্ম ও অভিনব, তা দেখলে অবাক হতে হয়। প্রত্যেক বইয়ের মুদ্রণ-খরচ তিনি এমন চমৎকারভাবে প্রস্তুত করতেন যে, পুস্তক-প্রকাশের পরে দেখা যেত যে, অনেক সময় টাকা আনা পাই পর্যন্ত সঠিক হয়েছে। অথচ পুস্তক-মুদ্রণ ব্যাপারে যতটা ব্যয়সংক্ষেপ করা যায় সে বিষয়ে তিনি প্রকাশকদের সম্পূর্ণভাবে সাহায্য করতেন। বইকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সুশ্রী করবার জন্য যা দরকার তা তিনি নিজেই সব সময় চেষ্টা করতেন। অনেকেরই বোধ হয় জানা নাই, তাঁর প্রায় প্রত্যেক বইয়ের প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা তিনি নিজেই করে দিতেন, এমন কি প্রচ্ছদপটের একটা খসড়া এঁকে দিতেন। এদিকে তাঁর প্রুফ সংশোধন করা যাঁরা দেখেছেন, তাঁর পরিচ্ছন্নতা দেখে সবাই অবাক হয়েছেন। প্যারা যোগ করা নাই, এখান থেকে ওখানে লাইন টেনে আনা নাই, লাইন কেটে নূতন লাইন বসানো নাই, নানা রকম শব্দ বদলানো নাই। এমন নির্ভুল ও সুন্দরভাবে তিনি তাঁর পাণ্ডুলিপি তৈরী করতেন।

রাজশেখরবাবুর জামাতা স্বর্গত অমরনাথ পালিতের সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তিনি একবার আমাকে বলেছিলেন, আপনি এমন একজন গ্রন্থকারের সংস্পর্শে এলেন, যাঁর নিয়ম-অনুবর্তিতা আমাদের প্রত্যেকের আদর্শ হওয়া উচিত। তাঁর এই নিয়ম-অনুবর্তিতা ও সময়-নিষ্ঠার সম্বন্ধে অনেক কথা ও ঘটনা লেখা যায়। আমি যখন সর্বপ্রথম বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে প্রতি বৎসর সাহিত্যসমাজের অনুষ্ঠান করি, তখন এই বিষয়ে রাজশেখরবাবুর অকুণ্ঠ অনুমোদন পেয়েছিলাম। প্রতি বৎসরেই তিনি একটা না একটা প্রবন্ধ সেই সমাবেশে পাঠ করে সকলকে মুগ্ধ করতেন। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সকলের মনে হোল বাংলা সাহিত্যের একটা দিক যেন অন্ধকারে ঢেকে গেল।

কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি রাজশেখরবাবু এবং তাঁর মতো মহাপুরুষদের সংস্পর্শে এসে যে সব শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত লাভ করেছি সারাজীবনই তা আমাকে অনুপ্রাণিত করবে।

পুজোর বাজনা বেজে উঠল আবার।

থেমে গেল কর্মরত কাশীনাথ। তার বিভ্রান্ত বিহ্বল চাহনির সঙ্গে পরিচিত কারখানার মালিক থেকে কুলী পর্যন্ত। একদিন নয়, এই দশ বছর ধরে তুহিনা ফ্যাক্টরীতে কাজ করছে সে। মাত্র এই চারদিন। ষষ্ঠী থেকে বিজয়া পর্যন্ত তার অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি ক্ষমার চোখে দেখেন মালিক।

ষষ্ঠীর বাজনা শোনার সঙ্গে সঙ্গে কোথায় চলে যায় দায়িত্বপূর্ণ কাশীনাথ। সব ফেলে ছুটে যায় নিজের ঘরে।

ছোট টিনের বাক্সটা খুলে বার করে সে নতুন দুটো ছোট সিল্কের জামা, একটা বড় পুতুল, একজোড়া ছোট লাল জুতো, দুটো খেলনা। কাপড়ের কোণ দিয়ে সেগুলো পরিষ্কার করে সাজিয়ে রাখে পাশাপাশি। চোখ দুটোতে ভরাজল টল-টল করে তাকে ছাপিয়ে এগিয়ে আসে একটা অতীত স্মৃতি।

মিষ্টি একখানা মুখ যেন হাসছে ওর দিকে চেয়ে।

'কাশীনাথ।'

'কে, বড়বাবু?'—

বিপন্ন কাশীনাথ খোঁজে তার ওপরওয়ালাকে বসতে দেওয়ার একটা কিছু।

'না-না, ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই। আমি এখানেই বসছি।' পাশে রাখা ছেঁড়া মাদুরটায় বসতে বসতে বড়বাবু বললেন, 'আমার একটা কথার উত্তর দেবে কাশীনাথ?'

'কি কথা বড়বাবু?'—ভয়জড়ান স্বর কাশীনাথের। 'কোনো অন্যায় করেছি?'

'না-না, অন্যায় করবে কেন?' বড়বাবু বললেন, 'আমি জানতে এসেছি, পুজোর বাজনা বেজে উঠলে তুমি এমন হয়ে যাও কেন?'

'কেন?' স্তব্ধ কাশীনাথের চোখের কোণে বড় দুফোঁটা জল কাঁপতে লাগল থরথরিয়ে। একটু বুঝি সামলে নিয়ে সে বললে, 'শুনবেন?' হঠাৎ হা-হা শব্দে হেসে উঠল কাশীনাথ। 'সবাই যে আমাকে পাগল বলে।' হাসির মধ্য দিয়ে কান্নার রূপান্তর হ'য়ে কথাগুলো বেরিয়ে এলো কাশীনাথের।

'শুনব বলেই তো এসেছি। বল বল।'

কথার মধ্যে কাশীনাথের হাতখানা কখন স্থান পেয়েছে সেই বড় পুতুলটার গায়ে। 'ঘর-সংসার সব আমার ছিল বড়বাবু'—বলতে আরম্ভ করলো কাশীনাথ। 'সে কিন্তু সত্যিই আমি এমন ছিলাম না, শক্তি সামর্থ্যে আমি ছিলাম গ্রামের সেরা। এ প্রেসে প্রুফ-রীডারের কাজ করতাম, জমিজমাও ছিল কিছু। সংসারে বুড়ো মা আমার শক্তি-সামর্থ্যে অচল হলেন, বিয়ে দিলেন আমাকে গরীবের ঘরের এক সুন্দরী মেয়ে দেখে। আনন্দে দিশেহারা মা, শুভলক্ষ্মীকে বরণ করে ঘরে তুললেন যেদিন ঠিক তার এক মাস পরে তিনি মারা গেলেন আর সেইবারেই হল দেশ-বিভাগ। আমি শুভলক্ষ্মীকে নিয়ে কলকাতায় চলে এলাম।'

হারিয়ে পাওয়ার গল্প

শেফালী চট্টোপাধ্যায়

চাপা একটা নিঃশ্বাস ফেলে কাশীনাথ বলে যেতে লাগল: 'ছোট্ট একখানা ঘরে সংসার গুছিয়ে নিলে শুভলক্ষ্মী। সুগৃহিণী ছিল সে। আমি এক প্রেসে কাজ দেখে নিলাম। সারাদিনের পরিশ্রম শেষে ঘরে আসি। হাসিমুখে এসে সামনে দাঁড়ায় শুভলক্ষ্মী। সব কষ্ট ভুলে যাই আমি।... তারপর এল একটি মেয়ে।

'ঠিক মায়ের মত তার রূপ। কি টানা চোখ। ছোট্ট হাতের মুঠি দুটো দিয়ে আমার মুখ ধরে কামড়াতে যায়। তার সে কি হাসি! —বলতে বলতে হেসে ফেললো কাশীনাথ। 'সব ভুলে যাই বড়বাবু। ঐ ছোট ঘরে বসে সারা পৃথিবীর সুখ আমার জড়িয়ে থাকে। ছুটির দিনের অপেক্ষায় থাকি সারা সপ্তাহ।

'খুকী হামাগুড়ি দিতে শিখল। শুভলক্ষ্মী বললে যে, ওর মুখে-ভাতে একটু ঘটা করবে। প্রেস থেকে টাকা কর্জ করলাম কিছু। নির্দিষ্ট দিনে নিমন্ত্রণ করলাম

মালিক-কর্মচারী সবাইকে। সে কি আনন্দ! ফুল-চন্দনে খুকী আমার যেন স্বর্গের দেব-কন্যা হয়ে গেছে। আর শুভলক্ষ্মী, কি সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে।

'এমনি সময়ে বড় গাড়ী করে কর্তা এলেন। আমার ডাকে খুকীকে কোলে নিয়ে শুভলক্ষ্মী এসে দাঁড়াল হাসিমুখে। খুকি? খুকীকে ত' দেখছেন না কর্তা, চেয়ে আছেন শুভলক্ষ্মীর দিকে। তাঁর হাতের হারছড়াটা [illegible]য়ে আছে—দুলছে লকেটটা। বাবু বলে সহজভাবে ডাকতে গিয়েও বুঝি কঠিন শোনাল আমার গলাটা।

'ওঃ!'—চমকে উঠে খুকীর গলায় হারটা পরিয়ে দিয়ে সহজ হয়ে বসলেন বাবু।

'তাঁর আর আমার, মালিক-কর্মচারীর সম্পর্ক কোথায় যেন উড়ে গেল মুহূর্তে। [illegible]দা প্রেসের একমাত্র কর্তা সেইদিন থেকে হলেন আমার বন্ধু।

'দিন যায়। সহকর্মীরা কত টিটকারী দেয়, কান দিই না। আমার মাইনে বাড়ল। বাসা পাল্টালে হালচাল গেল বদলে। কর্তার গাড়ীতে করে সারা শহর দেখে বেড়াতে লাগল শুভলক্ষ্মী. খুকীকে নিয়ে আমি ঘরে বসে খেলা করি।

'বাবা বলে খিল খিল করে হাসে খুকী, তাকে বুকে জড়িয়ে থাকি। তার কোঁকড়া রেশমের মত চুলগুলোর ঠাণ্ডা স্পর্শে ঠাণ্ডা হ'য়ে যায় আমার বুকের জ্বালা।

শুভলক্ষ্মী আর কর্তার সম্পর্কটা বড় যেন দুঃসহ হয়ে ওঠে ক্রমে। অথচ চাকরির খাতিরে সব সয়ে থাকতে হয়। দেশ নেই, ঘর নেই, চাকরি গেলে উপায় কি?

শুভলক্ষ্মী হাসে। বলে, তোমার যেমন হয়েছে অকারণ রাগ। মনে রেখো আমি তোমার বউ।'

'অনেক কথা, অনেক আদব-কায়দা তখন শিখেছে শুভলক্ষ্মী। আমার খুব কাছে এগিয়ে এসে বলে, 'কর্তা বলেছেন আমায় সিনেমায় নামিয়ে দেবেন।'

'সিনেমায়?' চমকে উঠি আমি।

'হ্যাঁ গো', সে বলে. 'অনেক অনেক টাকা আসবে, বড়লোক হব, বাড়ী-গাড়ী সব হবে।'

'কোন কথা বলিনি. শুধু চেয়ে দেখেছি আর ভেবেছি. এই কি সেই একহাত ঘোমটা-দেওয়া শুভলক্ষ্মী? এর পর সে অনেক কথা, আর নাই-বা শুনলেন।' একটু থেমে বুঝি নিজেকে সামলে নিল কাশীনাথ। তারপর বলল, 'খুকীর বয়স হল দু' বছর। আধো আধো সুরে কত কথা বলে সে। পুজো এলো। পুজোয় কি নেবে খুকী? —জিজ্ঞাসা করলাম একদিন।'

সে বলল, 'বড় পুতুল, জামা, জুতো খেলনা......।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, স-ব আমি এনে দেব।' হয়ত আমার কথা বুঝলে সে। অন্যদিনের মত তাই গলা জড়িয়ে আজ আর বললে না, যেতে দেব না। সহজেই ছেড়ে দিল। খুকীর ফরমাস মত জিনিস কিনতে বেরোলাম। 'বা—বা' পথে নেমে চেয়ে দেখি জানলায় দাঁড়িয়ে খুকী হাসছে। দোকানে গিয়ে খুকীর ফরমাসমত সব জিনিস কিনলাম। এক পরিচিত দোকানে সব রেখে বিপরীত দিকের এক দোকানে যাচ্ছিলাম শুভলক্ষ্মীর জন্যে একখানা শাড়ি কিনতে। চোখের সামনে দেখছি খুকী আমার হাসতে হাসতে পুতুলটা কোলে তুলে নিলে, এই-যে খেলনা, জামা—! একি! চারদিক থেকে গেল গেল রব। আমি চমকে ছিটকে পড়ে গেলাম একটা চলন্ত লরীর ধাক্কায়। তারপর আর কিছু জানি না। জ্ঞান ফিরল যখন, তখন আমি হাসপাতালের এমার্জেন্সীর বেডে। ডাক্তার-বাবু বললেন, 'আঘাত সামান্য, আর দুদিন পরেই ছুটি পাবেন।' 'দু'দিন? তবে ষষ্ঠীর দিন বাড়ী যাবো? আমার খুকী যে বসে আছে পথ চেয়ে। আর শুভলক্ষ্মী না জানি কত ব্যস্ত হয়েছে। একটি বেয়ারাকে ধরে ফোন করলাম কর্তাকে। তিনি জানিয়েছেন, শুভলক্ষ্মী আর খুকীকে নিয়ে বিকেলে আসবেন।

'সারা বিকেল আমার পথ-চাওয়া সার হল. কেউ এলো না। কি জানি ওদের কি বিপদ হল। ভাবনায় ছটফট করি আমি। কোনরকমে দুটো রাত কাটিয়ে যেদিন সকাল আটটায় হাসপাতাল থেকে ছুটি পেলাম, মাথায় তখনও আমার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। শরীরটা বড় যেন দুর্বল। তবুও আগে গিয়ে দোকান থেকে জিনিসগুলো নিয়ে রওনা হলাম বাড়ীর পথে।

কিন্তু একি? আমি এ কোথায় এলাম? বাড়ীর দরজায় তালা বন্ধ। নেই শুভলক্ষ্মী, নেই খুকী।'

এতক্ষণ পরে বড়বাবু প্রশ্ন করলেন, 'তোমারই খোঁজে গিয়েছিল নাকি?'

'না বড়বাবু'—ক্ষীণভাবে হাসল কাশী-নাথ। 'পাশের ঘরের এক ভাড়াটে বললে, তার ভাই এসে নাকি বাপের বাড়ী নিয়ে গেছে।'

'বাপের বাড়ী? ভাই? কই, কেউ তো নেই ওর। বিধবা মায়ের একমাত্র মেয়ে। আর সেই মা-ও মারা গেছেন কবে। তাহলে ও গেল কোথায়? প্রথম গেলাম কর্তার বাড়ী, তারপর পরিচিত, অল্প-পরিচিত সকলের বাড়ী-বাড়ী, পথে, পার্কে, স্টেশনে-স্টেশনে। পেলাম না। হারিয়ে গেল ওরা। এই কল-কাতার শহরে, এই ষষ্ঠীর দিনে কোথায় হারিয়ে গেল। শুভলক্ষ্মীর জন্যে ভাবিনি বাবু. ভাবি আমার খুকীর জন্যে। বাবাকে ছেড়ে কোথায় চলে গেল সে? আমার খুকী!'

পুতুলটার উপর মুখ গুঁজে ডুকরে কেঁদে উঠল কাশীনাথ। জামা, জুতো, খেলনাগুলো জড়িয়ে রেখেছে দুহাতে।

বড়বাবু বললেন ধীরে ধীরে, 'কাগজে দিলে না কেন?'

চোখ-ভরা জল নিয়ে মাথা তুলল কাশী-নাথ। বলল. 'কাগজে আর ইচ্ছে করেই দিইনি বড়বাবু। যা' হারিয়ে গেছে, তা হারিয়েই থাক। সেই হারাবার মধ্যে দিয়েই প্রতি বছর খুঁজে পাই আমার ছোট্ট খুকীকে। সংসারের সব ছেলে-মেয়েকেই আজ আমি খুকীর মতো ভালবাসি।'

শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ, বর্ণ—এরা কখনো কখনো ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করে স্মরণের আবরণ উন্মোচন করে দেয়—বিস্মৃত অতীত অকস্মাৎ পরিপূর্ণ সুষমায় পরিপূর্ণ বেদনায় সামনে এসে দাঁড়ায়।

স্টীমারের বাঁশীর শব্দ শুনলে ডালহৌসীর চায়তলায় অফিসে বসে কপোতাক্ষর টলটল ভরা নদী চোখের উপর ভেসে ওঠে—সারেঙ্গের ঘণ্টাধ্বনি কানে আসে—খালাসীরা তক্তার সিঁড়িখানা তুলে নিচ্ছে দেখতে পাই—পাড়ের উপর তেঁতুলতলায় দাঁড়িয়ে অনেকে—হঠাৎ......

না, প্রথম থেকেই বলি।

সময়টা খারাপই যাচ্ছিল—লোকে বলত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ডিপ্রেসন চলছে। টিউশনির তোলা এবং এক সরকারী অফিসের একটা ঠিকে কাজ করতে করতে যখন যত্রতত্র দরখাস্ত ছাড়ছিলুম তখন একজায়গায় এসে ভাগ্যক্রমে নোঙর ধরল। কো-অপারেটিভ ইনেস্পেক্টর। সবাই বললে—'সাবাস ছোকরা, এই বাজারে কাণ্ঠ হিন্দু হয়ে এমনি একটা চাকরী...' মুখে উৎসাহের ভাব রাখলেও মনে মনে একেবারে চুপসে গেলুম। কোলকাতার উপকণ্ঠে নিজের গ্রাম ছাড়া শহরের বাইরে তখনো যাইনি—কিন্তু আমায় যেতে হবে খুলনার এক ছোট গ্রামে—কোলকাতা থেকে ট্রেনে খুলনা—তারপর স্টীমার, একমাত্র বোটানিক্যাল বাগানে পারাপার হওয়া ছাড়া স্টীমারে আর চড়িনি। সময়ও চমৎকার—ভরা বর্ষা।

স্টেশন থেকে যখন ভাই-বন্ধু ও প্রিয়-পরিজনরা বিদায় নিলে তখনো মুখে হাসবার চেষ্টা করেছি—তারপর টালার বেতারকেন্দ্রের লাল আলো তিনটে যখন আড়ালে চলে গেল তখন দুচোখ ফেটে জল এলো—মনে হল স্বার্থান্ধ পরিবার আমাকে যেন গলাধাক্কা দিয়ে কোলকাতা থেকে বার করে দিলে।

রেল থেকে স্টীমার—স্টীমার থেকে রায়ের ঘাটে পৌছোলুম পরেরদিন সকাল সাড়ে এগারোটায়। বর্ষার অসোয়াস্তিকর নিরানন্দময় পরিবেশ মনটাকে আরো দমিয়ে দিল। তারপর ঘন বাঁশঝাড় ঝোপ-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বর্ষার কাদা ডিঙিয়ে যখন গ্রামের প্রাঙ্গণে এসে পৌছালুম তখন চাকরী করার উৎসাহ প্রায় লোপ পেয়েছে।

ব্যাঙ্কেরই এক কর্মচারীকে প্রশ্ন করলুম—"ফেরবার স্টীমার কখন?"

—"আজ কোথায় স্টীমার?—আসার সময় দেখেননি—একটা পার হয়ে গেল—ওই, —ওই একখানা যায়, আর একখানা আসে—"

অর্থাৎ আজ যদি আমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়ি—ধরাই যাক, যদি জোরে জ্বর আসে তাহলে কাল ১১টা পর্যন্ত ভাগ্যের হাতে নিজেকে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া করবার কিছু নেই—। একটা নড়বড় টেবিলের ধারে বেত-ছেঁড়া চেয়ারে ঝুপ করে বসে পড়লুম।

চাকরী সংক্রান্ত মানুষগুলির সঙ্গে দু-একদিনের মধ্যে পরিচয় শেষ হয়ে গেছে। তারপর একটানা একঘেয়ে রুটিনবাঁধা কাজ। সকালে উঠে চা খেয়ে কমবাইণ্ড হ্যাণ্ডকে সংসার খরচের টাকাপয়সা বুঝিয়ে দিই, তারপর আফিসের কাজ নিয়ে বসি—এগারটা বাজলেই স্টীমারের বাঁশী শুনব বলে উৎকর্ণ হয়ে উঠি—কোন একটা অছিলা করে স্টীমার ঘাটে গিয়ে দাঁড়াই—আপ-ডাউন দুখানা স্টীমার পার করে দিয়ে যেন একেবারে নিঃস্ব হয়ে বাসায় ফিরি—এক্সট্রা ডিপার্টমেন্টাল পোস্টমাস্টারের কাছে চিঠির জন্য লোক পাঠিয়ে চান করতে যাই।

খাওয়া দাওয়ার পর দুপুরে খবরের কাগজ থেকে কোলকাতায় ও তার আশপাশের খবর শুষে নেবার চেষ্টা করি—তারপর কাজ নিয়ে বসি। অনেকেই দেখা করতে আসেন—তাঁদের ম্যালেরিয়া-জীর্ণ চেহারা দেখে অস্বস্তি বোধ করি—তারপর এক ফাঁকে উঠে গিয়ে পোস্টাফিসের কুইনাইন সালফেটের বড়ি খেয়ে ফিরে আসি। এখানে দুজন মাত্র বিশিষ্ট বহিরাগত ভদ্রলোক—সাব-রেজিস্ট্রার আর হাইস্কুলের হেডমাস্টার—সাব-রেজিস্টারবাবু গানবাজনা আর থিয়েটার নিয়ে মসগুল, সেখানে পাত্তা পাওয়া শক্ত—হেডমাস্টারমশাই-এর প্রথম দৃষ্টিতে রক্ত হিম হয়ে গেল—মনে হল আবার স্কুলজীবনে ফিরে বুঝি এলুম।

সেদিন রুটিনমাফিক ব্যাঙ্কের মিটিং-রুমে বসে খবরের কাগজখানা পড়ছিলুম এমন সময় ঠক্‌ঠক্ লাঠির শব্দে কাগজ থেকে মুখ তুলে দেখি—এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। লাঠিটা বগলে রেখে হাত তুলে নমস্কার করছেন: "নমস্কার, আপনি আমাদের নতুন ইনেস্পেক্টারবাবু।"

তাড়াতাড়ি প্রতিনমস্কার করে তাঁর দিকে চেয়ার বাড়িয়ে দিয়ে বসতে বললুম।

ভদ্রলোক সযত্নে লাঠিটা এক পাশে রেখে চেয়ারে বসে অল্প হেসে বললেন: —"শুনলুম না কি আপনি বড় স্কলার।"

ভারী সুন্দর বৃদ্ধের চেহারা—রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অনেকটা মেলে—তেমনি সুডৌল নাক—সাদা সিল্কের মত বুক পর্যন্ত দাড়ী। সহজেই আকৃষ্ট হলুম। বললুম: "আপনি ভুল শুনেছেন।"

—"আমি ভুল শুনব?"—সহসা অকারণ উচ্চহাস্যে ঘর ভরে উঠল। কয়েকদিনের নিরবচ্ছিন্ন মেঘের ফাঁক থেকে হঠাৎ সূর্যদেব দেখা দিলে আমরা যেমন উল্লসিত হয়ে উঠি—বৃদ্ধের অকারণ উচ্চহাসিতে আমি তেমনি উল্লসিত হয়ে উঠলুম।

—"যাক বাঁচলুম মশাই, এ গ্রামের লোক তাহলে হাসতে জানে।"

বৃদ্ধ মাথা নেড়ে হাসতে হাসতে বললেন—"উঁহু—উঁহু—একেবারেই না, একেবারে অরসিক—বেরসিকও বলতে পারেন।"

আরো কিছুক্ষণ সহজ আলাপের পর বৃদ্ধ বিদায় নিলেন—কোন স্বার্থের কথা—প্রয়োজনের কথা বললেন না,—শুধু বললেন, "মাঝে মাঝে কিন্তু আপনাকে জ্বালাতে আসব ইন্সেপেক্টরবাবু।"

—"আসবেন বইকি?" বাইরের গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিলুম।

ফিরতেই একাউনট্যাণ্টবাবু হন্তদন্ত হয়ে এসে বললেন—"কার সঙ্গে কথা বলছিলেন স্যার, ও যে পাগল।"

"পাগল!" যেন পিঠের উপর চাবুক খেলুম।

হ্যাঁ—পাগলই। তারপর দেড় বছর বহু ভাবেই আমি তাঁকে দেখেছি—মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধি আর বিবেচনা দিয়ে যেটুকু বোঝা যায়—সব মিলিয়ে আমিও গ্রামের আর সকলের সঙ্গে তাঁকে পাগল ভেবেছি।

পাগলের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসটুকুও সংগ্রহ করেছিলুম।

১৯৩০ সনের লবণ আইন অমান্য আন্দোলনের বন্যা যখন সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল তার একটা ঢেউ এসে এ গ্রামের তটেও আঘাত করেছিল। ছেলেরদল উৎসাহে বেরিয়ে পড়ল।—এই উৎসাহের ফলে কপোতাক্ষের লোনা জল থেকে কতটা নুন তৈরী হয়েছিল জানা যায়নি—কিন্তু অনেক মায়ের চোখের জল থেকে নুন ঝরেছিল এই রাজনৈতিক দুর্যোগে। বৃদ্ধের ছোট ছেলে অসীম এই সংগ্রামে ঝাঁপ দিয়েছিল সকলের সঙ্গে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবাই ফিরে এসেছিল, আসেনি শুধু অসীম—কারাগারের মধ্যে যক্ষ্মা এসে তাকে অনন্ত সরিয়ে দিয়েছিল। আমি যখন ওখানে গিয়েছি তখন অতীত দিনের সেই সব বিস্মৃত কাহিনী নিয়ে কেউ আর রোমন্থন করে না তাস, দাবা, পাশা, গান-বাজনা, থিয়েটার, পরনিন্দা-পরচর্চা নিয়ে সবাই মত্তাব্যস্ত। কিন্তু সেদিনের সেই কাহিনীর মূর্ত সাক্ষী হয়ে যে লোকটি গ্রামের মধ্যে ঘুরতে লাগল—সে ওই পাগল।

পাগলকে নিয়ে ছেলেদের কৌতুকের অন্ত নেই, অনেক সময় বয়স্কদেরও। —কে তাকে একদিন বুঝিয়ে দিলে আমি নাকি মস্তেদার, আমার একটিমাত্র কন্যাকে মামার বাড়ীতে রেখে মানুষ করছি।

একদিন সাবরেজিস্ট্রারবাবুর বাসায় তাঁর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বসে গ্রামোফোন শুনছি এমন সময় বৃদ্ধের আবির্ভাব। বললেন: "হাঁরে, তুই নাকি আমার দলে?"

বুঝতে না পেরে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলুম।

—"বলি, বৌটাকে ত এই বয়সেই খেয়েছিস—মেয়েটাকে কেন নিজের কাছে এনে রাখ না?"

গানটা ভাল লাগছে—কথা বাড়াতে চাই না—তাই বললুম—"আনব বইকি।" লক্ষ্য করলুম বৃদ্ধ ততক্ষণে তাঁর আপন মানসলোকে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন—শূন্যদৃষ্টিতে ঘরের কড়িকাঠের দিকে চেয়ে বলছেন: "আমারই বা কি রইল, বৌ গেল, মেয়েটা চোখের উপর শাঁখা সিঁদুর ঘুচিয়ে ফিরে এলো, অসীম....." আর কিছু স্পষ্ট শুনতে পেলুম না। তারপর কোনরকম সম্ভাষণ না করেই বিড়বিড় করে বকতে বকতে বেরিয়ে গেলেন।

মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে শুনলুম বাইরের রাস্তার উপর বৃদ্ধের লাঠির শব্দ—আর "অসীম অসীম" বলে মর্মভেদী আর্তনাদ।

কত কাহিনীই বা বলব। একদিন লাঠি হাতে ঘরে চড়াও হয়ে বললেন—"তুই দাড়ী রাখিসনি কেন?"

কাজ করছিলুম, তাই অনামনস্কভাবে বললুম—"দাড়ী আবার কি রাখব।"

"কি?—রাখবি না?" বলে উত্তেজিতভাবে লাঠি তুললেন মারবার জন্য।

লাঠিটা ধরে ফেলে বললুম—"রাখব রাখব—নিশ্চয়ই রাখব কিন্তু একদিনে ত আর গজাবে না।"

বৃদ্ধ মিটমিট্ করে হাসছেন। তারপর তাঁর কাপড়ের ভেতর থেকে অনেক কাগজে জড়ান একটা অমূল্য নথি বার করলেন, কোন একটা কলেজ পত্রিকার কিয়দংশ—'দাড়ীরহস্য' নামে একটি রসাত্মক বাঁকা লেখা—"এই নে পড়—"

আমি পড়তে লাগলুম—আর তিনি লাঠির উপর চিবুক রেখে মাথা দুলিয়ে তারিফ করতে লাগলেন।

কেমন করে জানি না—আমি তাঁর একটা প্রচ্ছন্ন স্নেহের অংশ পেয়েছিলুম—প্রায়ই তিনি আমার কাছে আসতেন—হাতে কাজ ও মাথায় চিন্তা থাকলে কখনো কখনো যে বিরক্ত হয়নি তাও নয়—বৃদ্ধ ম্লানমুখে একটা চেয়ার দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে মুখের দিকে চেয়ে থাকতেন—তারপর লাঠিগাছা তুলে নিয়ে বিদায় নিতেন—"আর কোনদিন যদি তোকে বিরক্ত করতে আসি—তাহলে..." ক্ষমা চাইলেন হাতজোড় করে।

তাঁর বেদনাহত মুখের দিকে চেয়ে তাঁকে ফিরে ডাকবার খুব ইচ্ছে করত—কিন্তু তার দরকার হত না—কিছুক্ষণের মধ্যে নিজেই ঘুরে আসতেন।

অনেক সময় গাছের কলা পেঁপে নিয়ে আসতেন—এবং আবদার ধরতেন সামনে বসে খেতে হবে। আপত্তি করলে কখনো চোখদুটো ছলছল করে উঠত—কখনো বা উগ্রমূর্তি ধরতেন।

আমার বদলির খবর এসেছে।

গ্রামের প্রাইমারী স্কুলের মেয়েদের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলুম—তাদের পিকনিকের ব্যবস্থা করে দোবো। তাই একদিন স্কুলের ছুটি করিয়ে ওদের উৎসবের আয়োজন করে দিলুম—সন্ধ্যাবেলায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের গল্প বলছি—এমন সময় পাগলের লাঠি ঠকঠকানি শোনা গেল। ছেলেমেয়েরা দৌড়ে ঘরের মধ্যে পালিয়ে গেল—আমায় বললে—"পালিয়ে এসো কাকাবাবু।"

বৃদ্ধ ততক্ষণে এসে হাজির হয়েছেন—"কি গো ইনেস্পেক্টর, ওপাড়া থেকে শুনে এলুম—তুমি নাকি আজ বাচ্ছাদের খুব খাইয়েছ—"

অবিশ্বাস কি বিদ্রূপ বুঝতে পারলুম না।

—"কেন, ভাল করিনি দাদু"—শেষের দিকে তাঁকে এই নামেই ডাকতুম।

—"ভাল—ভাল—খুব ভাল—" এগিয়ে এসে তাঁর হিমশীতল হাত দিয়ে আমার হাতখানা মুঠো করে ধরে বললেন—"মাইরি বলছি ভাই, আমার চেয়ে খুশী কেউ হয়নি—কিন্তু তুই নাকি চলে যাবি?"

"বর্দাসির চাকরী—চলে ত একদিন যেতেই হবে—" তুল করে বৃত্তান্ত দিতে গেলুম।

বৃদ্ধ গর্জে উঠলেন। হাতে ঝাঁকানি দিয়ে বললেন—"কখনই না—যা দেখি কেমন করে যেতে পারিস—" বলেই হাতটা ছেড়ে দিয়ে সজোরে আমাকে দুহাত দিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন। ধৃতরাষ্ট্রের লৌহভীম আলিঙ্গনের মত সেই মর্মান্তিক আলিঙ্গনে হাঁফিয়ে উঠলুম।

"—ছাড়ুন ছাড়ুন, কি ছেলেমানুষের মত করছেন—"

—"না—না, ছাড়ব না, কিছুতেই ছাড়ব না—অসীম চলে গেছে, অনন্ত চলে যাবে—এ কিছুতেই হবে না—ধরে রাখব, বেঁধে রাখব—প্রেম দিয়ে বেঁধে রাখব—কি—ছু—তে—ই—ছাড়ব না।"

বৃদ্ধ আর্তচিৎকারে হু হু করে কেঁদে উঠলেন।

আশ্চর্য! পাগলের কান্নায় সেদিন সুস্থ লোকের চোখে জল এসে গেল। তাঁর পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললুম—"চলুন আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি—আমি কোথাও যাব না।" বৃদ্ধকে তাঁর বাড়ীর দুয়ার পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলুম।

সেই রাত্রেই রাস্তার উপর বৃদ্ধের লাঠির ঠক্‌ঠক্‌ শুনতে পেলুম—আর সেই মর্মভেদী চিৎকার "রমা শাঁখা সিঁদুর ঘুচিয়ে এসেছে—অসীম চলে গেছে—অনন্তও চলে যাচ্ছে—ওরে তোরা ধরে রাখ—বেঁধে রাখ—পালালো—পালালো—" তারপরই কান্নায় তাঁর গলা ভেঙে এলো—"পারলি না তোরা পারলি না—চলে গেলো, চলে গেল—দুয়ো দুয়ো—"

দু তিনবার আমার জানালার পাশে তাঁর পায়ের শব্দ পেলুম—অতি সন্তর্পণে চলার শব্দ। ফিসফিস করে বলছেন—"ঘুমোচ্ছে—ঘুমোচ্ছে—চলে গেলেই হল! প্রেম দিয়ে বেঁধে রাখব।" তারপর বিচিত্র এক হাসির শব্দ—নিরালা ঘরে সেই হাসির শব্দে গাঁ কাঁটা দিয়ে উঠল।

তার পরের তিনদিন আর বৃদ্ধকে কোথা দেখা গেল না—শুধু আশেপাশের গ্রাম থে খবর পাওয়া যাচ্ছে যে, বৃদ্ধ নাকি একে ক্ষেপে গেছেন। কার বাগান ভেঙেছেন, ছেলেকে ধরে খুব মেরেছেন—কাকে গালাগাি করেছেন। চতুর্থ দিনে আসার সময় তাঁদেরই পরিবারের একজনকে বললুম—"চলে যাচ্ছি আপনাদের ব্যাপারে কথা বলা বোধ হয় শোভ নয়, তবু অনুরোধ করে যাই, শোকে তা ওঁর মাথাটা ঠিক প্রকৃতিস্থ নেই—আপনা সকলের স্নেহ যত্ন পেলে ঠিক হয়ে যাবে।
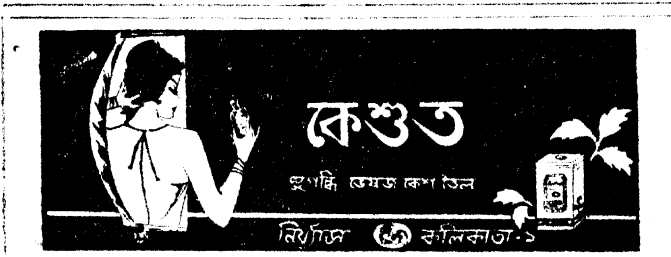
স্টীমারঘাটে গ্রামের ছোট বড় অনেকে বিদায় দিতে এসেছেন। তাঁদের সকলের কা থেকে একে একে বিদায় নিচ্ছি—এমন সময়। লাঠির শব্দে পিছনে ফিরে দেখলুম—"পাগল।" তাঁর সমস্ত চেহারায় এক নির্মম রুক্ষতা—কাপড় জামা জায়গায় জায়গায় ছিঁড়ে গেছে—ছোপ ছোপ রক্তের দাগ লেগে রয়েছে। আমার দিকে তাঁর ভাষাহীন উদাস চোখ মেলে বললেন—"কি রে, পালিয়ে যাচ্ছিলি—ভেবেছিলি বুঝি আমি জানতে পারব না।" আমরা সকলেই শঙ্কিত হয়ে উঠলুম। তবু কণ্ঠস্বরে অভিমান মিশিয়ে বললুম—"আজ তিনদিন ধরে আপনাকে কত খুঁজছি দাদু—আপনার যদি দেখা পাই।"

বৃদ্ধ এক ধরনের বীভৎস হাসি হেসে বললেন—খুঁজছ,—আমি কিছু বুঝি না না—?—আমি পাগল?"

—"ছি দাদু, যাবার সময় রাগ করতে আছে কি—আমাকে আশীর্বাদ করুন।" বলে মাথাটা নিচু করলুম।

অপূর্ব মমতায় বৃদ্ধের ভাষাহীন ঘোলাটে চোখদুটো স্নিগ্ধ হয়ে এলো।—রুদ্ধ-কণ্ঠে বললেন—"তাহলে তুই সত্যিই চললি।"

"আবার আসব দাদু—"

স্টীমার এসে ঘাটে ভিড়েছে। স্টীমারে উঠে ডেক-চেয়ারটায় বসে মনে হল—প্রথম যেদিন আসি সেদিনের কথা। সেদিনের বিবর্ণ অবসন্ন গ্রামখানা ছেড়ে যেতে আজ আর ইচ্ছে করছে না, জলে চোখদুটো বারবার ঝাপসা হয়ে উঠছে। স্টীমারের বাঁশী বেজে উঠল—সারেঙ্গের ঘণ্টা বাজল—তক্তার সিঁড়িখানা তুলে নিলো খালাসীরা। সবাই হাত তুলে অভিনন্দন জানালে—আমিও প্রত্যাভিনন্দন জানালুম। হঠাৎ পাগলের চিৎকারে চমকে উঠলুম। "জয় অনন্ত মহারাজকি জয়—হিফ হিফ হুররে!" তারপর স্টীমার ঘাটের তেঁতুলতলায় পা ছড়িয়ে বসে পাগল হো হো করে একটানা হাসি হাসতে লাগলেন—স্টীমারের চাকার শব্দ ডুবিয়ে সে শব্দ অনেক দূর পর্যন্ত আমার কানে এসেছিল—সে কথাটা আমি আজও ভুলতে পারিনি।

পশুপতি ভট্টাচার্য

আমাদের পাড়ার '—' বাবু একজন সর্বজনবিদিত ব্যক্তি। সকল রকম জনকল্যাণের কাজে তাঁকে সর্বদাই ব্যাপৃত থাকতে দেখা যায়। অনবরতভাবে সর্বক্ষণই তিনি ঘোরাঘুরি করেন একটি চুরুট মুখে নিয়ে। তাঁর মুখে চুরুট নেই, এমন কখনই দেখা যায় না। বোধ হয় খাবার ও শোবার সময় ব্যতীত অন্য সকল সময়েই তাঁর মুখে থাকে জ্বলন্ত চুরুট, আর হাতে থাকে দেশলাই, নিভে গেলেই আবার ধরান। আমরা কিছুকাল থেকে লক্ষ্য করছিলাম যে সেই '—' বাবু ক্রমশ যেন রোগা হয়ে যাচ্ছেন। একদিন দেখলাম তিনি গলায় কম্ফর্টার জড়িয়েছেন। কিছুদিন পরেই শুনলাম তাঁর গলায় ব্যথা, ক্যান্সার হাসপাতালে পরীক্ষা করে জানা গেল তাঁর গলায় ক্যান্সার হয়েছে। সেখানে তাঁকে ভর্তি করা হলো, তিন মাস যাবৎ সেখানে রেখে এক্সরে চিকিৎসা করা হলো। এখন তিনি আরোগ্য হয়ে ফিরে এসেছেন। আজকাল চুরুট আর তাঁর মুখে একবারও দেখা যায় না। কেউ প্রশ্ন করলে বলেন, ওর মতো বিষ আর দুনিয়াতে নেই। তিনি নিজে তো ওটা ছেড়েই দিয়েছেন, আর যাকেই স্মোক করতে দেখেন তাকেই বলেন, এই বিষাক্ত নেশা ছেড়ে দিতে।

বিষাক্ত, বিশেষত সিগারেট যা আজকাল সর্বজনপ্রিয়, তাই সর্বাপেক্ষা অনিষ্টকারী। এ কথা এতই সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে যে বর্তমানে পৃথিবীর সকল সভ্য দেশের কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে সিগারেট খাওয়া সাধারণ জনগণকে ছেড়ে দিতে বলা হচ্ছে, এবং এমন কি আইনের দ্বারাও নানাভাবে তা নিষিদ্ধ করে দেবার চেষ্টা হচ্ছে। ইংলণ্ডের ডাক্তারি রয়্যাল কলেজ থেকে সাধারণভাবে প্রচার করা হচ্ছে যে "সিগারেট খাওয়া ক্যানসার রোগের একটি বিশিষ্ট হেতু"। ডেনমার্কে ট্রামে, বাসে, ট্রেনে, স্কুল-কলেজে ও লাইব্রেরিতে ধূমপান করা নিষিদ্ধ, আর ষোল বছরের নিম্নবয়স্ক ছেলেদের ধূমপান করা দণ্ডনীয়। এমন কি সেখানকার সংবাদপত্রগুলিতেও সিগারেটের বিজ্ঞাপন খুব কমই প্রকাশিত হয়। আমেরিকাতেও প্রচার করা হচ্ছে যে ধূমপানের ফলে কেবল ক্যান্সারই নয়, ব্রঙ্কাইটিস, যক্ষ্মা, হার্টের দোষ এবং পেটে আলসারও জন্মাতে পারে। সাধারণের মধ্যে সর্বত্রই এর অপকারিতার কথা বিশেষভাবে ঘোষণা করা হচ্ছে। জগতে ধূমপানের বিরুদ্ধে অভিযান ইতিপূর্বে এমন কখনই হয়নি।

বর্তমানে সিগারেটের এমন নিন্দাপ্রচারের কারণ কি? সিগারেট সম্বন্ধে আজকাল রীতিমত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করা হচ্ছে এবং এই সম্পর্কে নানারূপ গবেষণার কাজ বড়ো বড়ো চিকিৎসাবিজ্ঞানীর দ্বারা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তাতে অনেক কথাই নির্ভুলরূপে প্রমাণিত হয়েছে, যা সকলের পক্ষেই জেনে রাখা উচিত।

তামাকের মধ্যে যে বিষ থাকে তার নাম নিকোটিন। বিষ অর্থে এমন জিনিস যা অল্পমাত্রাতে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করলে তার ফলে মৃত্যু ঘটতে পারে। নিকোটিনের মৃত্যুমাত্রা কতটা? পরীক্ষায় জানা গেছে যে, কেউ যদি দৈনিক এক প্যাকেট (২০টা) সিগারেট পান করে, তাহলে তার ধোঁয়া থেকে এক সপ্তাহের মধ্যে মোট ৪০০ মিলিগ্রাম মাত্রার নিকোটিন নিয়ে যদি তা জলে গুলে কাউকে ইনজেকশন দেওয়া যায় তবে তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যু হবে। সিগারেট খেলে এটা ধোঁয়া হয়ে অল্পে অল্পে ফুসফুসের মধ্যে ঢোকে এবং তার কতক আবার বেরিয়ে আসে বলেই অবশ্য অতটা বিষক্রিয়া তার হতে পারে না। কিন্তু বিষ তো বটেই, অতএব তার ক্রিয়া কিছু হবেই। সেটা স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যায় যারা নিকোটিন ব্যবহারে অভ্যস্ত নয়, অর্থাৎ যারা কখনো সিগারেট খায়নি তারা প্রথম সিগারেট খেতে শুরু করলে। যারা এ বিষয়ে আনাড়ী তারা সিগারেট খেতে শুরু করলেই প্রথম প্রথম তাদের শরীরে দেখা দেবে বিবমিষা, মাথা ঘোরা, প্রচুর ঘর্মোদ্রেক, ঝাপ্সা দৃষ্টি ও উদরাময়ের লক্ষণ। অতঃপর সিগারেট খাওয়া অভ্যাস হয়ে এলে এগুলি তখন ক্রমশ কমে যাবে।

সিগারেট প্রভৃতির ভিতরকার তামাক পুড়ে তার থেকে যে গাঁজলা বেরোয়, যাকে বলে tobacco tar, যার হলদে দাগ লাগে হাতের আঙুলে, অ্যাশট্রেতে ও হোল্ডারে, তাও বিষাক্ত। কণ্ঠের, ফুসফুসের ও পেটের ভিতরকার ঝিল্লীগাত্রে ঐ জিনিসের ছোপ লেগে লেগে তার দ্বারাও নানা রোগের সৃষ্টি হতে পারে।

সিগারেটের দ্বারা কি কি অনিষ্ট হতে পারে? তার একটি বিস্তৃত তালিকা দেওয়া হয়েছে, যথা—(১) হৃদ্‌স্পন্দন দ্রুত করে। (২) রক্তচাপ বৃদ্ধি করে। (৩) করোনারি রোগের সৃষ্টি করে, যেহেতু করোনারি ধমনীর ভিতরকার রক্তস্রোত শ্লথ হয়ে আসে। (৪) হার্টের দোষ হয় এবং বুকে একরকম কষ্ট হয়, তাকে বলে টোব্যাকো অ্যাঞ্জাইনা। (৫) হাত-পা অপেক্ষাকৃত অসাড় হয়। (৬) পেটে অম্লবৃদ্ধি ঘটে ও তার থেকে গ্যাস্ট্রিক আলসার হতে পারে। (৭) গলায় একরূপ শুকনো খক্‌খক্‌ করা কাশি হয়, যাকে বলে স্মোকার্স কফ। (৮) গলার মধ্যে ঘা হতে পারে ও পরে ক্যান্সার হতে পারে। (৯) পুনঃ পুনঃ সর্দিকাশির আক্রমণ, ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস, হাঁপানি ও টি-বি হতে পারে। (১০) ফুসফুসের ক্যানসার হতে পারে। (১১) অতিরিক্ত ধূমপানে এমন কি ত্রিশ বৎসর বয়সেই যৌনতেজ ও প্রজনন-শক্তি হ্রাস পায়। (১২) শরীরের মধ্যে গৃহীত বি-ভিটামিন ও সি-ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায়। তার ফলে দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়। বিশেষত ভিটামিন বি-১২ ও সি-এর অভাবে ঐরূপ ঘটে। পরীক্ষায় জানা গেছে যে একটি কমলালেবু খেলে যতটা সি-ভিটামিন আমরা পাই, একটি মাত্র সিগারেট খেলে তার সবটুকুই নষ্ট হয়।

ষোলো বছরের নিম্নবয়স্ক ছাত্র যারা সিগারেট খেতে অভ্যস্ত, তাদের মধ্যে অনুসন্ধান নিয়ে দেখা গেছে যে তাদের মধ্যে অধিকাংশেরই প্রায় মাথা ধরে, অনেকের মধ্যে অক্ষুধা হতে দেখা যায়, কেউ কেউ চোখে কম দেখে ও কানে কম শোনে, আর প্রায়ই তারা কাশিতে ভোগে। আর তাদের মধ্যে স্নায়ুদৌর্বল্য প্রায়ই দেখা যায়।

আলসার রোগীদের মধ্যে দেখা গেছে যে সিগারেট খাওয়া ত্যাগ করলে তাদের পেটের ব্যথা শীঘ্রই কমে যায়, আবার সিগারেট খেতে শুরু করলেই সেই ব্যথা পুনরায় দেখা দেয়। ব্লাড্‌প্রেসার রোগীদের মধ্যে দেখা গেছে যে সিগারেট ত্যাগ করলে তারা অনেকটা সুস্থ থাকে, রোগের লক্ষণগুলি অনেক কমে। আর হার্টের রোগীদের মধ্যেও সিগারেট ত্যাগ করায় যথেষ্ট সুফল পাওয়া গেছে।

যেখানে এতটাই অনিষ্টের ও জীবনহানির সম্ভাবনা, সেখানে এমন জিনিস ত্যাগ করাই দরকার। জিনিসটা যে লোভনীয় আর আপাতঃ আরামপ্রদ তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। কয়েক টান সিগারেটের ধোঁয়াতে শরীরটা তখনকার মতো চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

পাহাড়ের কোলে ফটো : শিবানী চট্টোপাধ্যায়

সেইজন্য বিশেষত যাঁরা রীতিমত অভ্যাস করে ফেলেছেন, তাঁদের পক্ষে সিগারেট না-খেয়ে স্থির থাকতে পারা খুবই কঠিন। বলা যত সহজ করা তত নয়। যাঁরা লেখক, তাঁরা সিগারেট না টেনে লিখতেই পারবেন না, কর্মীরা এক ফাঁকে সিগারেট না টেনে কোনো কাজই করতে পারবেন না। তাঁরা বললেন সিগারেট ছাড়া বাঁচাই অসম্ভব।

কিন্তু অন্তর থেকে ইচ্ছা করলে কী না করা যায়। '—' বাবু এক কথায় চুরুট ত্যাগ করেছেন জন্মের মতো। আরো অনেকেরই কথা আমরা জানি যাঁরা এক কথায় সিগারেট ছেড়ে দিয়েছেন। কেউ বা ছেড়েছেন বাজি রেখে। একজনকে জানি, তিনি হরদম সিগারেট খেতেন, সিগারেটের প্যাকেট সর্বদা তাঁর হাতে হাতে ফিরতো। একদিন এই নিয়ে তর্ক ওঠায় তাঁর বন্ধু বললে, তুই যদি সিগারেট ছাড়তে পারিস তাহলে আমি ৫০০৲ টাকা বাজি হারবো। তিনি তৎক্ষণাৎ হাত থেকে প্যাকেট ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, তারপর থেকে আর কখনই সিগারেট খাননি। এমনি ঝোঁকের মাথায় অবশ্যই এ নেশা ত্যাগ করা যায়। আরো করা যায় খরচ বাড়ছে দেখে। একজনকে জানি যিনি গোল্ডফ্লেক ছাড়া কিছু খেতেন না, একদিন অন্তর এক টিন ছিল তাঁর বরাদ্দ। এই সিগারেটের দাম ক্রমশঃ বাড়তে বাড়তে অনেক বেড়ে গেল। একদিন তাঁর ছেলে এসে তাঁকে বললে,—বাবা, মাসে পঁচাত্তর টাকা তোমার সিগারেট খরচ হচ্ছে, এটা কি কমানো যায় না? তিনি সেদিন থেকে একেবারেই সিগারেট ত্যাগ করলেন। এবং তিনি বলেন যে সেই থেকে তাঁর স্বাস্থ্যও অনেক ভালো হয়েছে।

সিগারেট একেবারে পরিত্যাগ করতে না পারলেও তার মাত্রা কমানোর নানাবিধ উপায় আছে। অবশ্য কমাবো বললেই কমানো যায় না, দুই চারদিনের জন্য কমিয়ে দিলেও অন্যমনস্কে ক্রমশ আবার বেড়েই যায়। বিশেষত যাঁরা চেইন-স্মোকার, অর্থাৎ একটার থেকে অন্যটা ক্রমাগতই ধরাচ্ছেন, তাঁদের পক্ষে কমানো খুবই কঠিন। প্রত্যহ আমি চল্লিশটা খাই, তার বদলে দশটা খাবো, এমন প্রতিজ্ঞা অনেকেই রাখতে পারেন না। তার বদলে ধূমপানের একটা সময় নির্ধারণ করে নিলে তা খুবই কাজের হতে পারে। যেমন মনে করুন, আমি স্থির করলাম যে, সকালে চা-খাবার পরে একটিমাত্র সিগারেট খেয়ে তারপর বেলা বারোটা পর্যন্ত আর একটিও খাবো না; বেলা বারোটার পর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যেমন খুশি তেমনি খাবো, তাতে কোনো বাধা থাকবে না, কিন্তু সন্ধ্যার পর থেকে পরের দিন সকাল পর্যন্ত আর একটিও খাব না। এইভাবে সময় ভাগ করে নিয়ে চলতে থাকলে তখন দেখা যাবে যে আমি খানিকটা সময় সিগারেট না-খেয়েও কাটাতে পারছি। এতেই নিজের উপর আস্থা বাড়বে এবং ক্রমশ সময়টা বাড়িয়ে এই নেশার মাত্রা অনেক কমিয়ে ফেলা সম্ভব হবে। তাছাড়া ঐ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শরীরযন্ত্র নিকোটিনের বিষ-ক্রিয়া হতে মুক্ত থাকায় তাতেও যথেষ্ট উপকার পাওয়া যাবে।

সিগারেট খাওয়া একেবারে ছাড়তে না পারেন, তার মাত্রাটা অন্ততপক্ষে যথেষ্ট কমিয়ে ফেলুন। তাতে অর্থেরও সাশ্রয় হবে, স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে, আর আরামও অনুভব করবেন। অনবরত সিগারেট খেতে থাকলে কি তেমন আরাম পাওয়া যায়? তার পরিবর্তে অনেক সময়ের ব্যবধানে বিশেষ প্রয়োজনের বা বিশেষ অবসরের সময় একটি সিগারেট ধরালে তাতে আরামটা ভালোভাবে উপভোগ করা যায়। সকালে বিকালে চায়ের পরে দুবার এবং আহারাদির পরে দুবার, এবং আরো কোনো বিশেষ সময়ে একবার—দৈনিক এই পাঁচবার মাত্র ধূমপান করবো, তার বেশী নয়, এ-সংকল্প অনায়াসেই করা যেতে পারে।

সিগারেটের বদলে চুরুট কিংবা বিড়ি খাওয়া ভালো, এমন কথা কেউ কেউ বলে, কিন্তু সে কথার বিশেষ মূল্য নেই। সবই তো সেই তামাক, সবের মধ্যেই রয়েছে সেই নিকোটিন। তবে আমাদের দেশে গড়গড়ায় বা হুঁকায় তামাক খাওয়ার যে রীতি আছে তা অনেকটা নিরাপদ, তামাকের ধোঁয়াটা জলের ভিতর দিয়ে ধুয়ে আসার কারণে। আমাদের দেশের প্রাচীনেরা এই চমৎকার ব্যবস্থাটি তাঁদের সহজাত বোধের দ্বারাই আবিষ্কার করেছিলেন। 'সিগারেট ছেড়ে গড়গড়া ধরা বরং ভালো।

দোক্তা খাওয়া, জর্দা খাওয়া, নস্য নেওয়া সবই অনিষ্টকারী তাতে সন্দেহ নেই। সবগুলির সম্বন্ধেই ঐ এক কথা, অল্পমাত্রায় ততটা অনিষ্ট না হতে পারে, কিন্তু মাত্রাধিক্য হলেই অনিষ্ট ঘটবে।

সেই কথাই আমাদের বক্তব্য। যিনি ধূমপান অভ্যাস করেছেন তাঁকে তা একেবারে পরিত্যাগ করতে আমরা বলছি না। কিন্তু মাত্রা কমিয়ে দিন, ধূমপানের কিছু অদল-বদল করুন। বাড়িতে যখন থাকেন, তখনও সিগারেট না টেনে তার বদলে হুঁকোতে বা গড়গড়াতে তামাক খান। গড়গড়াতে জল ফিরিয়ে তামাক সেজে খাওয়া হয়তো একটু কষ্টসাধ্য ব্যাপার, কিন্তু ওর মধ্যে একটা খানদানী আভিজাত্য আছে। রবীন্দ্রনাথ কখনো ধূমপান করতেন না, কিন্তু তিনিও তামাক খাওয়ার আভিজাত্য নিয়ে লিখেছেন—"এ যেন অম্বুরি তামাকের হালকা ধোঁওয়া, জলের ভিতর দিয়ে পাক খেয়ে আসছে—নিকোটিনের ঝাঁজ নেই, আছে গোলাপজলের স্নিগ্ধ গন্ধ।"

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

সবাক চিত্র বাংলাদেশের চলচ্চিত্র-জগতের শুধু বিস্ময় নয়—বিপ্লবও উপস্থিত করলো। সে সময় বাংলাদেশে একমাত্র ম্যাডান কোম্পানি স্টুডিও ক'রে নির্বাক ছবি করত। তাছাড়া বাঙালীদের মধ্যে কোনো কোনো ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টায় কখনো কখনো কয়েকজনে মিলে নির্বাক ছবিও করতেন বটে কিন্তু ছবি হিসাবে সেগুলো যাই হোক না কেন, ব্যবসা হিসাবে তাদের একটাও টেকতে পারেনি। সশব্দে সবাক ছবি উপস্থিত হ'তে বাংলাদেশে সত্যিকারের চলচ্চিত্রের ব্যবসা শুরু হয়। কিন্তু এখানে আমি সেসব কথা আলোচনা করছি না।

চলচ্চিত্রশিল্পের একটা বড় দিক অভিনেতা-সংগ্রহ। আ ম রা সেসময়ে অভিনেতা সংগ্রহ করতুম সাধারণত রঙ্গমঞ্চ থেকে। রঙ্গমঞ্চের জনপ্রিয় অভিনেতাকেই প্রায়ই নায়ক করা হতো। অভিনেত্রী অবশ্য রঙ্গমঞ্চ থেকে সংগ্রহ করা হতো না, তবে রঙ্গমঞ্চ যেখান থেকে অভিনেত্রী সংগ্রহ করতো আমাদেরও অভিনেত্রী-সংগ্রহের চেষ্টা সেইখানেই করতে হ'তো। অভিনেত্রী-সংগ্রহ করবার জন্যে আমাদের লোক থাকত। তারা প্রতিদিন নানা জায়গা থেকে অনেক রকম মেয়ের সন্ধান এনে দিত; আর সন্ধ্যের পরে আমরা জনকয়েক মিলে দেখতে যেতুম। রাত্রি এগারোটা-বারোটা অবধি সেখানে ঘুরে বাড়ী ফিরতুম।

এই প্রসঙ্গে এই রকম কাজে লিপ্ত থাকাকালে কয়েকটি মেয়ের সম্পর্কে আসতে হয়েছিল। সে সব দিনের কথা মনে হওয়ায় অনেকগুলি মুখ মনশ্চক্ষুর সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে; কিন্তু আপাতত তাদের অধিকাংশকেই বাদ দিতে হচ্ছে। আমি মাত্র চারটি মেয়ের কথা লিপিবদ্ধ করছি।

আগেই বলেছি মেয়েদের সন্ধান নিয়ে আসবার জন্য আমাদের লোক নিযুক্ত ছিল। একদিন একটি মেয়ের সন্ধান পেয়ে সেখানে আমরা তিন-চারজনে গিয়ে উপস্থিত হলুম।

সবাক চিত্র আসার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি নতুন সমস্যা এসে জুটেছিল। এ পাড়ায় নায়িকার সন্ধান না পেলে ফিরিঙ্গি মেয়েদের জোগাড় করবার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু তাদের দিয়ে বাঙালী মেয়ের ভূমিকা অভিনয় করানো ছিল কঠিন। মুখ-চোখ ও অঙ্গসৌষ্ঠব সাধারণত তাদের ভালোই হতো কিন্তু তারা বাঙালী মেয়েদের ঢঙে চলতে পারত না। সবাক ছবিতে ফিরিঙ্গি মেয়েদের কাজ করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না কারণ এ ক্ষেত্রে শুধু ঠোঁট নাড়লেই চলবে না—কথাও বলতে হবে। শুধু কথা নয়, কণ্ঠস্বরটি মিষ্ট হওয়াও দরকার। আর গান গাইতে পারলে তো কথাই নেই; কেননা তখনকার দিনে ডায়রেক্ট গান তোলা হোত, প্লে-ব্যাক সিস্টেমের প্রচলন হয়নি।

যাইহোক, এখন আরম্ভ করা যাক।

একদিন সন্ধান পেলুম—একটি সুশ্রী মেয়ে আছে, সে সিনেমায় নামতে রাজী। একদিন দেখতে চললুম; সঙ্গে চলল কয়েকজন বন্ধু—তারাও এই কাজেরই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল।

আমাদের সংবাদদাতা লোকটিও সঙ্গে ছিল। ওপাড়ার একটি বাড়ীর দোতলার একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে আমাদের বসিয়ে রেখে লোকটি গেল তাদের ডাকতে। ঘরের আসবাবপত্র দেখে মনে হলো তারা অবস্থাপন্ন লোক।

কিছুক্ষণ পরে একটি বর্ষীয়সী মহিলা এলেন। তিনি ঘরের মধ্যে ঢুকেই দরজার দিকে মুখ বাড়িয়ে বাইরে কাকে ডাকলেন—উষা, এদিকে আয়। এত লজ্জা তো ছবি করবি কি করে?

সঙ্গে সঙ্গে একটি মেয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকল জড়োসড়ো হয়ে। এক ঝলকেই দেখে নেওয়া গেল মেয়েটি বেশ সুশ্রী এবং লম্বা দোহারা চেহারা। মেয়ের মা বসতে বসতে আমাদের বললেন—ওর সিনেমা করবার ভারি শখ। বলে—এসব পেশায় আমার মন নেই। আমি বলি—সিনেমা করবি বদি তো কর—

এক নিঃশ্বাসে এতখানি বলে ফেলে তিনি বললেন—হ্যাঁ বাবা, শুনেছি সাংঘাতিক সাংঘাতিক আলো মুখের ওপর ফেলা হয়, তাতে চুল পুড়ে যায়, চামড়া কালো হয়ে যায়, চোখ নষ্ট হয়ে যায়—

আমরা তাঁকে আশ্বস্ত ক'রে বললুম—না না, ওসব কিছুই হয় না। এসব কথা কোত্থেকে শুনলেন?

মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলুম। সে সিনেমা করতে খুব রাজি—আমরা যা শেখাব, যা করতে বলব—তাই সে করবে। কথাবার্তা একরকম পাকাই হয়ে গেল। আর একদিন এসে পাওনা-কড়ির কথা ঠিক করা যাবে বলে আমরা সেদিনকার মত উঠলুম। উষাকে দেখে আমাদের সকলেরই পছন্দ হয়েছিল। তার মুখশ্রী সুন্দর, চোখদুটি টানাটানা, অঙ্গসৌষ্ঠবও ভালো। যদি অভিনয় ভালো করতে পারে তবে সে যে ভবিষ্যতে নাম করতে পারবে এ বিষয়ে আমরা সকলেই একমত হলুম। শুনলুম সে গানও গাইতে পারে। দেনাপাওনার কথাও ক্রমে ঠিক হয়ে গেল। আজকের তুলনায় তা অতি নগণ্য বললেও চলে। আজকালকার বড় অভিনেত্রীরা একটা ছবিতে একদিনে যা রোজগার করে এ তাও নয় বললেই হয়।

যাই হোক, কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের রিহার্শ্যাল শুরু হলো। আজকের দিনে রিহার্শ্যাল জিনিসটা বোধহয় উঠেই গেছে; কারণ ভদ্রঘরের লেখাপড়া-জানা মেয়েরা এ লাইনে এসেছেন; কিন্তু তখনকার দিনে তো আর তা ছিল না। আমরা যেখান থেকে যেসব অভিনেত্রী সংগ্রহ করতুম, তাদের উচ্চারণ ছিল অত্যন্ত খারাপ। আকাশকে তারা বলতো আগাস। তাছাড়া ক'এর জায়গায় খ এবং র ও ড় এর বিপর্যয় তো ছিলই। অবশ্য ওটা এখনও আছে; আর সঙ্গগুণে বোধহয় সাথে কথার মত ওটা চলেই গেল।

যাই হোক, রিহার্শ্যাল তো শুরু হয়ে গেল। উষা বেশ মন দিয়েই কাজ করতে লাগল। সে গানও শিখতে লাগল। বাড়ীতে যে সময়টুকু থাকে তারই মধ্যে গলাও সাধে। যখন কাজ না থাকে তখন একলা বসে বিড়বিড় করে নিজের ভূমিকা আবৃত্তি

করে। যে সময়টা অন্য মেয়েরা আড্ডা দিয়ে কাটায় সে সময় সে নিজের ভূমিকা আবৃত্তি করে। একদিন সেইরকম করতে দেখে আমি জিজ্ঞসা করলুম—কি হচ্ছে ঊষা?

সে বললে—নিজেকে তৈরি করছি বাবা। কোনোরকমে একবার নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারলে এ পাড়া পর্যন্ত ছেড়ে দেবো আমি—তা মা যাই বলুন।

এইরকম চলেছে, দু'-এক দিনের মধ্যেই স্যুটিং আরম্ভ হবে তার ব্যবস্থা হচ্ছে এমন সময় একদিন ঊষা কামাই করে বসল। সেদিন তো কেটে গেল। পরের দিনও সে এলো না দেখে আমরা তো শঙ্কিত হয়ে উঠলুম। সামনেই স্যুটিং। তাকে নিয়ে কাজ আরম্ভ হবে—এমন উৎসাহী সে! অথচ এই সময়েই কামাই করে বসল! সন্ধান ক'রে জানতে পারা গেল তার জ্বর হয়েছে।

অগত্যা অন্য দৃশ্যে নেবার ব্যবস্থা হলো। দৃশ্যে নিয়ে কাজ আরম্ভও হয়ে গেল। চার-পাঁচ দিন সেই ঝোঁকে কেটেও গেল—কিন্তু ঊষার দেখা নেই। একদিন রাত্তিরে কয়েকজন মিলে ঊষার বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলুম। দেখি সে বিছানায় শুয়ে আছে। এই ক'দিনের জ্বরেই অত্যন্ত কাহিল হ'য়ে পড়েছে। তার মাকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল—এখনও কোনো চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়নি। অথচ সমানে জ্বর হয়ে চলেছে। গায়ে হাত দিয়ে দেখলুম—একশ' তিনের ওপরে জ্বর হবে। জ্বর দেখবার জন্য বাড়ীতে একটা থার্মোমিটারও নেই। তার মাকে আলাদা ডেকে নিয়ে বললুম—জ্বরটা সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না, আপনি একখুনি কোনো ডাক্তার ডেকে এনে দেখান।

আমাদের কথা শুনে তার মা তো হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠল। আমরা বললুম—কান্নাকাটি করে কিছু হবে না, একখুনি মেয়ের চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন।

ঊষা সেই অবস্থাতেই আমাদের বললে—এই দু'-এক দিনের মধ্যেই জ্বরটা ছেড়ে গেলেই আমি গিয়ে পার্ট করব।

তার সঙ্গে বেশি কথাবার্তা না বলে আমরা চলে এলুম।

এদিকে ছবি তোলার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। ঊষার ছিল প্রধানা ভূমিক'র পার্ট। তাকে বাদ দিয়ে আর কতদিনই বা কাজ চলে। পনেরো-বিশ দিন তার জন্যে অপেক্ষা করে থেকে আমরা আর একটি মেয়ে জোগাড় করে তাকে তালিম দিতে লাগলুম। তখনও মনের মধ্যে ক্ষীণ আশা ছিল যে এর মধ্যে ঊষা যদি ভালো হয়ে ওঠে তবে তাকে দিয়েই কাজ শুরু করাবো।

আমাদের লোক হপ্তার মধ্যে দু'বার করে গিয়ে তার খোঁজ নিয়ে আসে; কিন্তু প্রতিবারই শুনি তার অবস্থা আগের চেয়েও খারাপ হয়েছে। আমরা নতুন মেয়েটিকে নিয়ে কাজ শুরু করে দিলুম। কাজের চাপে কিছুকাল ঊষার সন্ধানই নিতে পারিনি। একদিন শুনলুম তাকে ইনজেকসন দেওয়া হচ্ছে। কিছুদিন বাদে শোনা গেল তার দু'টি চক্ষু অন্ধ হয়ে গিয়েছে

এক রাত্রে আমরা কয়েকজন তাকে দেখতে গেলুম। দেখলুম তার হাত-পা-গুলি প্যাঁকাটির মতন সরু হয়ে গিয়েছে। চোখে একজোড়া কালো চশমা পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাকে আর সেই ঊষা বলে চেনাই যায় না। তার মা আমাদের দেখে হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠলো। আধপাগলার মত যা তা বলতে লাগলো। মেয়ের রোগের চিকিৎসায় সে প্রায় সর্বস্বান্ত হয়েছে তবুও তার রোগ সারছে না। ঊষা সেইরকম স্থির হ'য়ে বিছানায় পড়ে রইলো—একটা কথাও বললে না। দেখলুম চশমার ফাঁক দিয়ে গাল বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ছে। দৃষ্টিহীনার চোখের অশ্রু আর সহ্য করা সম্ভব হলো না। তার মাকে আশ্বাস দিয়ে এলুম সে শীগগিরই ভালো হয়ে উঠবে।

দিনকতক বাদে আমাদের লোক এসে জানালো—ঊষা মারা গিয়েছে। রাত্রিবেলা মৃত্যু কখন এসে তাকে চুপেচুপে ডেকে নিয়ে গিয়েছে—কেউ জানতেও পারেনি।

আর একটি মেয়ের কথা।

তার নাম ছিল চপলা। চপলা তো চপলাই। আমরা তাকে ডাকিনি—সে তার এক বান্ধবীর সঙ্গে স্টুডিও দেখতে এসে-ছিলো। রিহার্শ্যাল দেখতে দেখতে বোধহয় তার অভিনয় করবার শখ হলো। তার বান্ধবী আমাকে আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে—আমার সঙ্গের ঐ মেয়েটি ছবিতে নামতে চায়।

তাকে বললুম—নামতে চাইলেই তো হবে না, অভিনয় করতে পারবে?

সে বললে—তা বলতে পারিনি, তবে চমৎকার গান গায়।

রিহার্শ্যাল হয়ে যাবার পর মেয়েটিকে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম—তুমি কি ছবিতে কাজ করতে চাও?

সে এক গাল হেসে বললে—হ্যাঁ।

বললুম—দেখ, এ কাজে ভয়ানক পরিশ্রম, দিনরাত খাটতে হয়। পারবে তুমি?

মেয়েটি সলজ্জভাবে ঘাড় নেড়ে জানালো—পারবো।
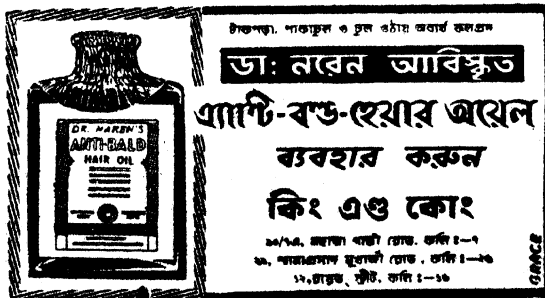
মুখ চোখ নাক তার খুব ভালো না হলেও চলনসই। প্রধানা নায়িকার ভূমিকা না হলেও অন্য পার্টে চলে যেতে পারে। মেয়েটি বেশ লম্বা, আর বেশ সপ্রতিভ। আমি জিজ্ঞাসা করলুম—শুনেছি তুমি গান গাইতে পারো?

সে বললে—সামান্য।

হারমোনিয়ামটা এগিয়ে দিয়ে বললুম—একটা গান গাও দেখি!

মেয়েটি বললে—কাল এসে শোনাবো।

একসময় তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—তুমি যে ছবিতে নামতে চাও—তা তোমার মা-বাপ কি অন্য কোনো অভিভাবক রাজি

হবেন তো? তাঁদের সংগে কথাবার্তা বলতে হবে তো!

সে কিছু না বলে চুপ করে রইলো।

সেদিনের মতো মেয়েরা চলে গেলো। পরদিন তাদের সংগে চপলাও এলো। আমাদের সে গানও শোনালে। সে নিজে হারমোনিয়াম বাজিয়ে দস্তুরমতো তান-গিটকিরি মেরে একখানি গান গাইলে। আমাদের সংগীতশিক্ষক জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কার কাছে শেখো?

সে বললে—কারো কাছে নয়। গ্রামোফোন, রেডিও আর লোকের মুখে গান শুনে আমার শেখা।

কথাটা শুনে আমরা সবাই অবাক হয়ে গেলুম। এমন সুন্দর গান গায় অথচ কারো কাছে শেখা নয়! কথাটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। যাই হোক, তাকে ছোটখাট একটি পার্ট দেওয়া হলো। আশ্চর্যের বিষয় অত্যন্ত নৈপুণ্যের সংগে সে অভিনয় করতে লাগল। জিজ্ঞাসা করলুম—এর আগে তুমি অভিনয় করেছো?

সে একটু হেসে বললে—এর আগে আমি কখনো অভিনয় করিনি—এমন কি রিহার্শ্যালও দিইনি।

একদিন ঠাট্টা ক'রে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম—চপলা, তুমি নাচতে জানো?

সে বললে—একটু একটু পারি। কিন্তু সে আপনাদের দেখাবার মতন নয়।

বললুম—দেখাও না!

সকলের অনুরোধে পড়ে সে নাচ দেখাতে রাজী হলো। তারপর ঘুঙুর পরে তবলা ও সারেংগীর সংগে খানিকক্ষণ নাচলে। চপলা বললে—এসবই আমার দেখে শেখা। সত্যিকারের তালিম কারো কাছে কখনও পাইনি।

আমাদের স্টুডিওতে তখন একটা হিন্দী বইয়ের, হিন্দী ছবির মহড়া চলছিল। তাদের ছবিতে জিপ্‌সিদের নাচের একটা দৃশ্য ছিল। চপলাকে জিজ্ঞাস্য করলুম—চপলা, তুমি জিপ্‌সি নাচতে পারো?

সে বললে—হ্যাঁ, ট্যাম্বুরিন নিয়ে তো?

বললুম—হ্যাঁ।

সে বললে—আজ একটু অসুবিধে আছে, কাল দেখাবো।

পরের দিন চপলা শাড়ীর নিচে চোস্ত পায়জামা পরে একেবারে ট্যাম্বুরিন হাতে নিয়ে উপস্থিত। যাঁরা হিন্দী ছবি কর-ছিলেন তাঁদের ডাকা হলো। সংগীতশিক্ষক এলেন তাঁর তবলা-বাঁয়া নিয়ে। সারেংগি এলো, শুরু হলো বাজনা—আর সেই সংগে চপলা লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে হাতে-পায়ে ট্যাম্বুরিন বাজিয়ে নাচতে লাগলো। নাচ দেখে তো সকলেই অবাক। হিন্দী ছবির পরিচালক বললেন—আমি আগে জানলে ওর জন্যে একটা ভালো পার্ট লিখতুম! যাই হোক—এর পরের ছবিতে দেখা যাবে।

সংগীত-পরিচালক বললেন—ঠিক আছে। তবে দু এক জায়গায় একটু-আধটু মেরামত করতে হবে আর নতুন মিউজিকের সংগে রিহার্শ্যাল দিতে হবে।

খুব তেড়ে হিন্দী ছবিতে একটা নাচের রিহার্শ্যাল চলতে লাগল। ঠিক হলো ওদের সীন আগে হয়ে যাক তারপর আমাদের কাজ হবে। তাড়াতাড়ি সেট তৈরি হলো। স্যুটিং শুরু হয় হয়—এমন সময় চপলা মেঘে মিলিয়ে গেল। অর্থাৎ আমাদের লোক এসে জানালে—কাল রাত্রে একটা ছোঁড়ার সংগে সে পালিয়েছে—কোথায় আজমগড় না ফরাক্কাবাদ সে কথা কেউ বলতে পারে না।

চপলার মা বললে—আমি তোমাদের আগেই বলেছিলুম বাবা, ও ঐ রকমেরই।

মাসখানেক ধরে অপেক্ষা করা হলো; কিন্তু নিরুদ্দিষ্টা চপলার আর কোনো সন্ধানই পাওয়া গেল না। এর পরেও প্রায় দশ বছর ধরে তার সন্ধান করেছি—তখনও সে ফেরেনি।

এবার যার কথা বলবো তার সংগে দেখা হয়েছিলো বাংলাদেশ থেকে অনেক দূরে ভারতের এক প্রান্তে।

একদিন বিকেলে বাড়ীতে বসে আছি এমন সময় একটি লোক এসে আমায় বললে—একজন লোক আপনার সংগে দেখা করতে চায়।

যে লোকটি দেখা করতে এসেছিল সে আমাদের চেনা লোক। আমাদের স্টুডিও-তেই সে কাজ করে। আমি তাকে বললুম—স্টুডিও থেকে ফিরে আমি তো কোথাও যাই না! স্বচ্ছন্দে সে এসে আমার সংগে দেখা করতে পারে।

লোকটি একটু ভণিতা করে বললে—আপনার বাড়ীতে আসার বিষয়ে তার পক্ষে কিছু বাধা আছে।

জিজ্ঞাসা করলুম—কে সে? বেটাছেলে না মেয়েছেলে?

সে বললে— মেয়েছেলে। একজন নায়িকিনী।

নায়িকিনী শব্দটি ওদেশে এক শ্রেণীর মেয়েদের নাম। এই মেয়েরা বিয়ে করে, ছেলেপিলে হলে সমাজবদ্ধ হয়ে গৃহস্থের মত বাস করে। স্বামী মরে গেলে আবার বিয়ে করতে বাধা নেই; আবার কখনো বা কারো আশ্রয়ে থেকে সারাজীবন কাটিয়ে দিলেও কোনো নিন্দে নেই। অনেকে আবার ছেলেমেয়ে ফেলে পালিয়েও যায়। এদের ছেলেমেয়ে সমাজ খুব নিন্দনীয় নয়। অনেকে সমাজে রীতিমত প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভও করেছে। এরা ক্রমেই সংঘবদ্ধ হয়ে নিজেদের সামাজিক উন্নতিতে মন দিয়েছে। এখন তারা ঢের উন্নত জীবন যাপন করে। এদেরই নাম নায়িকিন্। সংক্ষেপে তাদের সম্বন্ধে যা জেনেছিলুম তাই এখানে লিপিবদ্ধ করলুম।

যাই হোক, নায়িকিনী আমার সংগে দেখা করতে চায় শুনে আশ্চর্য হলুম না, শুধু কৌতূহলাবিষ্ট হলুম। বললুম—বেশ, বেলা বারোটার মধ্যে আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে—দুপুরবেলা যাবো, তুমি এসো। লোকটি বললে—আজ্ঞে, সে বলেছে সন্ধ্যের পর আপনাকে নিয়ে যেতে।

হেসে বললুম—কাল তো দুপুরবেলা গিয়ে দেখে আসি—তারপর সন্ধ্যের পর যাওয়া যাবে।

লোকটি বিদায় নিয়ে চলে গেল।

পরের দিন বেলা একটার সময় সে এসে আমায় নিয়ে গেল। শহরের মধ্যে একটা মাঠকোঠা। এদেশে শতকরা পঁচানব্বই জন লোক এইরকম মাঠকোঠায় বাস করে। লজ্জজে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠলুম। বেশ পরিচ্ছন্ন একটি ছোট ঘর। আসবাবপত্রের বালাই নেই, এইরকম সব বাড়ীতে ভারি আসবাব রাখাই চলে না।

দেয়ালে গোটা তিন-চার ব্রোমাইড ফোটো ঝুলছে। আমাকে বসিয়ে সে আর একটা ঘরে গেলো। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই শুনলুম সে বলছে—লজ্জা কি? ডেকে নিয়ে এসে আবার লজ্জা কি?

আমার লোকটি আবার আমি যে ঘরে বসেছিলুম সেই ঘরে এসে ঢুকলো। তার পেছন পেছন আর একজনও ঢুকলো। যে ঢুকলো তার চেহারার কিছু বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন বোধ করছি।

বলাবাহুল্য যে ঢুকলো সে স্ত্রীলোক। দীর্ঘাঙ্গী, বয়স বাইশ-তেইশের বেশি হবে না। টকটকে গৌর তার রঙ, মুখাবয়ব সুশ্রী। প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝতে পারলুম—এ ফুল এদেশে বড়-একটা জন্মায় না। এক-খানি চকচকে লাল শাড়ি সে পড়েছে—অঙ্গে ঘষা লাল রঙের কাঁচুলি, বেণীবন্ধনে টকটকে লাল একটা গোলাপফুল গোঁজা। আমাকে ছোট্ট একটি নমস্কার করে আমার সামনেই বসে পড়ল। আমাকে যে লোকটি নিয়ে এসেছিলো সেই তার হয়ে বললে—ও সিনেমা করতে চায়।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—তুমি সিনেমায় কাজ করবে?

সে একটু হাসবার চেষ্টা করে বললে—হাঁ, বাবুজি।

জিজ্ঞাসা করলুম—তোমার নাম কি?

সে বললে—গুলাব।

—তোমরা কি মুসলমান?

—না না, আমরা হিন্দু।

আমি বললুম—এদেশে মুসলমান মেয়ে-দের নাম হয় গুলাব—তাই তো শুনেছি।

সে বললে—আমার নাম ছিল সরোজ। আমি যাঁর আশ্রয়ে আছি তিনি সে নাম বদলে গুলাব রেখেছেন।

আমি লক্ষ্য করেছিলুম এদেশে হিন্দু-মুসলমান স্ত্রী-পুরুষ কেউই ভালো হিন্দী বা উর্দু বলতে পারে না—উচ্চারণের কথা তো না-বলাই ভালো! কিন্তু এ মেয়েটি দেখলুম প্রায় শুদ্ধ উর্দু বলতে পারে—উচ্চারণও সুন্দর। প্রসঙ্গান্তরে যাবার জন্যে আমি জিজ্ঞাসা করলুম—এ কার ফোটো?

সে বললে—আমার বাবার।

—আর এই দু'টি?

—আমার দুই দাদার।

জিজ্ঞাসা করলুম—কোথায় তাঁরা?

সে বললে—কালাপানি।

—আর তোমার বাবা?

—বাবার ফাঁসি হয়ে গেছে।

মনে মনে ভাবলুম—এতো এক সিনেমা-রাজ্যে এসে পড়েছি।

জিজ্ঞাসা করলুম—কি করেছিলেন তিনি?

গুলাব বলতে লাগল তারা আগে যে শহরে থাকতো সেখানে কয়েকটা কাপড়ের কল ছিল। তাছাড়া সুতোর কল চিনির কলও ছিল। এই কলে তার বাবা ও দাদারা চাকরি করতেন। তাঁরা বেশ বড় চাকুরেই ছিলেন। তাদের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল ছিলো। সমাজে তারা ধনী বলেই বিবেচিত হতো। ছেলেবেলা তাদের মা মারা গিয়েছিলেন।

মার কথা বলতে বলতে গোলাপের চোখ অশ্রুতে ভরে উঠল। সে বললে—আমি মা-বাবার একমাত্র মেয়ে ছিলুম, খুব আদরেই মানুষ হয়েছিলুম। কিছুদিন আগে এইসব কলের শ্রমিকদের সঙ্গে মালিকদের লাগল গণ্ডগোল। বাবাকে শ্রমিকরা তাদের নেতা করে মালিকদের কাছে পাঠালো। মালিকেরা কিন্তু শ্রমিকদের কোনো কথাই শুনলো না। এইসব নিয়ে ধর্মঘট, হাঙ্গামাহুজ্জোত চলতে লাগলো। ক্রমে অন্যান্য কলের শ্রমিকেরাও একজোট হয়ে পড়লো। পুলিশ গুলি চালালে। শেষকালে একদিন শ্রমিকেরা চিনির কলের দু'তিন জন সাহেবকে হত্যা করল। মিলিটারি এলো। তারা শ্রমিকদের গোলমাল ঠাণ্ডা করে দিলে। সন্ধ্যাবেলায় পুলিশে আমার বাবা ও ভায়েদের ধরে নিয়ে গেল। বিচারে বাবা, দুই ভাই ও আরো কয়েকজনের ফাঁসির হুকুম হলো। বোম্বাইয়ে আপীল করে আমার দাদারা ফাঁসি থেকে মুক্তি পেয়ে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসে দণ্ডিত হলো। কিন্তু বাবা ও আরো দুজনের ফাঁসির হুকুম বহাল রইলো। আমার বয়স তখন চোদ্দ-পনেরো বছর। আত্মীয়স্বজন যাঁরা ছিলেন তাঁরা ভয়ে আমাদের দিকে এগোলেন না। আমি এখন যে লোকের আশ্রয়ে আছি সে ছিল আমার দাদাদের বন্ধু। ছেলেবেলা থেকেই এরা আমাদের বাড়ীতে আসতো। এদের পরিবার ছিলো নামজাদা ধনী পরিবার।

গুলাব একটু থামলো। তারপর চোখ মুছে বলতে লাগলো—প্রথম প্রথম এ আমার ওপর বেশ ভদ্র ব্যবহার করতো; কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই স্বরূপমূর্তি প্রকাশ হলো। দুর্দান্ত মাতাল—তার ওপর নিয়মিত ভাবে আমাকে নির্দয়ভাবে প্রতিদিনই প্রহার করতো। দিনরাত সন্দেহ পাছে আমি অন্য-লোকের কাছে চলে যাই। শেষপর্যন্ত সন্দেহের জ্বালায় সেখান থেকে নিয়ে এসে এইখানে রেখে দিয়েছে। আর ঐ যে ঝিটা—ও সমস্ত খবর ওকে দেয়। আজকাল ও সপ্তাহের মধ্যে দু'দিন কি তিনদিন আসে, আর আমায় মারধোর করে। আপনি আপনাদের স্টুডিওতে আমার একটা কাজ ঠিক করে দেবেন? আর—

এই অবধি বলে গুলাব থামলো। আমি বললুম—আর কি?

এবার সে বেশ স্পষ্ট করেই বললে—আর এই লোকটির কবল থেকে আমি উদ্ধার পেতে চাই। আপনি আমায় আশ্রয় দিন।

আমি বললুম—দেখ, স্টুডিওতে চেষ্টা-চরিত্র করে একটা কাজ হয়তো জোগাড় করে দিতে পারি কিন্তু আমি তোমায় আশ্রয় কি ক'রে দেবো? আমি যে নিজেই আশ্রয়হীন। দু'দিনের জন্যে এখানে এসেছি, এখানকার কাজ শেষ হয়ে গেলে আবার আমায় উড়তে হবে অন্য কোনো আশ্রয়ের সন্ধানে।

মেয়েটি কোনো কথা না বলে ঘাড় নিচু করে রইলো। তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললুম—ভালো করে যদি অভিনয় করতে শিখতে পারো তাহলে তুমিই আমাকে আশ্রয় দিতে পারো। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, একটা কিছু হয়েই যাক।

পরের দিন স্টুডিওতে গিয়ে কর্তাদের কাছে গুলাবের কথা বললাম। তাঁরা তেমন-ভাবে কথাটা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলেন না। তিন-চার দিন এমনি কেটে গেল। এদিকে রোজই গুলাব খবর চেয়ে পাঠায়—আমার কি হলো?

শেষকালে একদিন তাকে নিয়ে স্টুডিওতে গিয়ে হাজির হলুম। ব্যস্—যেমনি তাকে দেখে কর্তারা তখুনি মাইনে ঠিক করে ফেললেন। একটা ছবিতে সে পার্ট পর্যন্ত পেয়ে গেল। কর্তাদের অনেকেই তার পেছু পেছু ঘুরতে লাগলেন। বাই-হোক, সামলে-সুমলে আমি তাকে বাড়ীতে ফিরিয়ে আনলুম এবং অনন্যমনা হ'য়ে কাজ করতে উপদেশ দিলুম।

কিন্তু দু'দিন না যেতে যেতেই শুনলুম—তার সেই রক্ষক লোকজন নিয়ে এসে মার-ধোর ক'রে তাকে নিয়ে কোথায় চলে গিয়েছে কেউ জানে না।

এবার আর-একটি মেয়ের কথা বলে বক্তব্য শেষ করবো।

সন্ধান পাওয়া গেলো—বৌবাজার অঞ্চলে একটি মেয়ে এসেছে—সবেমাত্র বাড়ী থেকে পালানো। অতীব সুন্দরী, হয়তো চেষ্টা করলে তাকে ছবিতে নামানো যেতে পারে।

সন্ধান নিয়ে একদিন আমরা তিন বন্ধুতে গিয়ে সেখানে উপস্থিত হলুম। খোঁজ ক'রে তার ঘরে গিয়ে দেখলুম—মেয়েটি মেজেতে বসে আছে। আমরা ঢুকতেই সে উঠে এসে আমাদের জিজ্ঞাসা করলে—কাকে খুঁজছেন?

—আমরা আপনাকেই খুঁজছি।

অতি ভদ্র ও বিনীতভাবে সে বললে—আসুন।

ঘরের মধ্যে কোনো আসবাবপত্র নেই। মেজেতে একটি মাদুর বিছোনো। একধারে চাবুস্-এর একটা মাঝারি গোছের সিন্দুক

ঝক্‌ঝক্‌ করছে। তখনকার দিনেও সে সিন্দুকটার দাম অন্তত পাঁচশ' টাকা।

মেয়েটির আর একটি বৈশিষ্ট্য দেখলুম—প্রায় কনুই অবধি গয়নায় ঢাকা। ওপর হাতেও বেশ মোটা মুগাছি অনন্ত, গলায় মোটা নেকলেস। সাধারণত এসব মেয়েরা এতো গয়না পরে থাকে না।

মেয়েটির চেহারা লম্বা, দোহারা গড়ন, রঙ উজ্জ্বল গৌর। প্রথম দৃষ্টিতে তেমন বোঝা যায় না কিন্তু দেখতে দেখতে বোঝা যায় সে রীতিমত সুন্দরী।

আমাদের সামনে এসেই সে বসলো। তার কথাবার্তার মধ্যে পূর্ববঙ্গের টান রয়েছে এবং চ-বর্গটি একেবারে বিকৃত। তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—তুমি নতুন বেরিয়ে এসেছ?

সে বললে—ঠিক নতুন নয়, প্রায় বছর খানেক হ'তে চলল।

—কোন দেশে তোমার বাড়ী?

সে বললে—আমার বাড়ী পূর্ববঙ্গে। কিন্তু এই পর্যন্ত জেনেই খুশী থাকুন কারণ কোন জায়গায় দেশ বা বাপের নাম কি—এসব জিজ্ঞাসা করলেও উত্তর পাবেন না।

দেখলুম মেয়েটি বেশ সরল। একটুখানি আলাপের পরেই আমাদের সঙ্গে বেশ সরলভাবেই কথাবার্তা বলতে লাগল। জিজ্ঞাসা করলুম—এ জীবন কেমন লাগছে?

সে হেসে উঠল। বললে—এ জীবনের জন্য তো বেরিয়ে আসিনি। তবে এ রকম ব্যাপারে সব ক্ষেত্রেই যা হয় আমার বেলাতেও তাই-ই হয়েছে। আমাকে যে বার করে নিয়ে এসেছিল কিছুদিন পরে সে পলায়ন করেছে। এখন প্রতিদিন মৃত্যু হচ্ছে।

জিজ্ঞাসা করলুম—তুমি সিনেমা করবে?

সে বললে—সিনেমা কি আমার দ্বারা হবে?

তারপর একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে—এই জীবন থেকে বাঁচবার জন্যে আমি সব কিছু করতে রাজি আছি।

আমি বললুম—তাহ'লে তুমি নিশ্চিন্তে থাকো, আমি তোমাকে এ জীবন থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবো।

সে হেসে বললে—বলেন কি? এই বাড়ীর বাড়ীওয়ালা যে একজন নামজাদা গুণ্ডা এবং অন্য সম্প্রদায়ের লোক। তারা সর্বদা আমাকে চোখে চোখে রেখেছে। মাঝে মাঝে ডেকে নিয়ে গিয়ে এমন অত্যাচার করে যে পাঁচ-সাত দিন আর উঠতে পারি না।

আমি বললুম—তুমি যদি এই পঙ্ক থেকে উদ্ধার পেতে চাও—তাহলে ওসব গুণ্ডাফুণ্ডা—সব ঠিক করে দেবো। তুমি নিশ্চিন্তে থাকো।

সে সময় বাংলাদেশে Women's Protection League নামে একটি সংস্থা ছিল। নারীহরণ, নারীধর্ষণ এবং নারীদের উপর নানান অত্যাচার তখন নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা ছিল। অপহৃতা ও ধর্ষিতা নারীদের খুঁজে দুর্বৃত্তদের কবল থেকে উদ্ধার করা এবং অপরাধীদের সাজা দেওয়া ছিল এই সংস্থার প্রধান কাজ। বাংলাদেশের—বিশেষ করে কলকাতার অনেক প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি এই সংস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সংস্থার কর্মীরা ছিলেন অবৈতনিক। দু'চারজন অতিদরিদ্র অথচ উৎসাহী কর্মী-যুবক শুধু সামান্য কিছু বেতন পেতেন। আমার পিতা ছিলেন এই সংস্থার অর্গানাইজিং সেক্রেটারি অর্থাৎ সংগঠন-সম্পাদক। তিনি মফস্বলে কখনো ফকির, কখনো দরবেশ, কখনো সাধু, কখনো বা ব্রাহ্মণ ভিখারী—এইসব ছদ্মবেশে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াতেন। ঘুরে ঘুরে অপহৃতা নারীদের সন্ধান করতেন এবং দুর্বৃত্তদের ধরে এনে সাজা দেবার ব্যবস্থা করতেন। ব্যবহারজীবীরাও বিনা পয়সায় এই সংস্থার হয়ে কাজ করতেন। পুলিশ ছিলো এদের হাতধরা। আমার পিতাকে হত্যা করবার শাসানি দিয়ে অনেক চিঠি আসতো। এমনকি তাঁকে সাবধান করাবার জন্যে আমাদের কাছেও চিঠি আসতো। আমার ভরসা ছিল—তাঁর কানে একবার এই মেয়েটির কথা তুলে দিলেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে। কিন্তু অভিনেত্রীর সন্ধানে হাড়কাটা গলিতে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করেছি—একথা বাবাকে বলবার সাহস আমার ছিল না। আমাদের বাড়ীতে বাবার দু'টি-তিনটি চেলা থাকতো। তাদের মধ্যে কেউ কেউ মাঝে মাঝে বাবার সঙ্গে মফস্বলে যেতো। তাদের মধ্যে একজনকে আমি এই মেয়েটির কথা বললুম এবং এ বিষয়ে বাবাকেও জানাতে বললুম।

দিন দুয়েক বাদে লোকটি বাবাকে জিজ্ঞাসা করে আমাকে এসে বললে—ঐ মেয়েটি পূর্ববঙ্গের কোনো শহরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে। বিবাহের পরেও সে ধনী পিতৃগৃহে বাস করছিলো। এই ফাঁকে আর একটি যুবকের সঙ্গে তার প্রণয় জন্মায়। সেই যুবকটি তাকে ফুসলিয়ে বার করে নিয়ে যায়। কন্যার পিতা Women's Protection League-এ খবর দেওয়ায় এরা খোঁজ করে কলকাতাতেই দুজনকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু আদালতে দাঁড়িয়ে এ মেয়েটি হাকিমকে বলে যে সে স্বেচ্ছায় উক্ত যুবকের সঙ্গে গৃহত্যাগ করেছে। এরপরে আদালতে কিংবা League-এর কিছুই করবার নেই।

লোকটি এই সঙ্গে আমায় জানিয়ে দিলে—মেয়েটি দেখতে যাই হোক আসলে সে অত্যন্ত বদমাইস। আপনাকে কর্তা জানাতে বলেছেন যে আপনি কোনোক্রমে ওর ত্রিসীমানায় যাবেন না।

এরপরে আমার আর কি করবার আছে! আমি ও-সম্বন্ধে আর কিছুই করিনি।

মাস তিনেক বাদে বৌবাজার অঞ্চলে এক জায়গায় নিমন্ত্রণে গিয়েছিলুম। ফিরতি মুখে একবার সেই মেয়েটির সন্ধান নিতে জানলুম—যে মাসখানেক আগে কে বা কারা তাকে হত্যা করে তার সমস্ত গহনা নিয়ে চলে গিয়েছে।

এরপর এ বিষয়ে আর আমি কোনো সন্ধান করিনি।

আগামী দিনের বাঙলা ছবি

নির্মলকুমার ঘোষ (এন-কে-জি)

গত তিরিশ বছর ধরে বাংলা সবাক্ ছবি তৈরী হয়ে আসছে। নির্বাক ছবি হিসেবে ধরলে বাংলা ছবির বয়স আরো বেশী। কিন্তু বাংলা ছবি দীর্ঘকাল ধরে কোন্ পথ বেয়ে, কোন্ পথ ছেড়ে কোন্ পথে নতুন পা ফেলে ক্রমান্বয়ে চলেছে, ভবিষ্যতেই বা কোন্ পথের সন্ধান করবে বলে অনুমান করা যায়?

এই আলোচনা সম্যকভাবে করতে গেলে নির্বাক ছবিকে বাদ দিয়ে সবাক্ যুগের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করাই সুবিধে। কারণ তার মুখে ভাষা আসবার পরই বাংলা ছবি ঠিক, পরিপূর্ণভাবে চিত্রনাটকের গন্ডীর মধ্যে উপনীত হল বলে মনে হল। নির্বাক যুগের ছবিকে শুধু সচল ভাবের মূক অভিব্যক্তি হিসেবেই দর্শক গ্রহণ করতো। তার বাক্‌হীনতার জন্য কেমন যেন একটা অর্ধ-স্ফুট ও অসম্পূর্ণ বোধ হত সেই যুগের ছবিকে। যেদিন তার ভাবের ও ভাষার সংযোগ মণিকাঞ্চন ঘটালো সেদিন এই অব্যক্ততার ত্রুটি তার কেটে গেল। একই সঙ্গে ছবি ও ভাষার সুষ্ঠু মিলন দেখে ও শুনে সত্যিকারের রস নিবিড় করে উপভোগ করবার সুযোগ এল। মঞ্চনাটক দেখে যে আনন্দ ও তৃপ্তি পাওয়া যাচ্ছিল সবাক্ চিত্রে সেই আনন্দ ও তৃপ্তির স্বাদও নতুনতর আকারের ও পরিবেশের মধ্যে পাওয়া যেতে লাগলো। সবাক্ চিত্র এলো মঞ্চের প্রভাব নিয়ে, তারই নতুন প্রতিযোগীর রূপ নিয়ে।

কিন্তু বাংলা দেশে (যেমন আমেরিকা ও ইংলন্ডেও) মঞ্চের আকর্ষণ এই নতুন আবির্ভাবের যুগেও এমন গভীর ও প্রবল ছিল যে, মঞ্চকে সবাক্ চিত্র ঠিক পুরোপুরি আঘাত করতে পারল না। সৌভাগ্যবশতঃ এই সময়ে বাংলার রঙ্গমঞ্চ শিশিরকুমার ভাদুড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী, রাধিকানন্দ, দুর্গা-দাস, নির্মলেন্দু, নরেশ মিত্র, চারুশীলা, কৃষ্ণভামিনী, নীহারবালা প্রভৃতি শক্তিমান ও শক্তিময়ী নটনটীর আবির্ভাবে ধন্য হয়েছিল। বাংলার দর্শকসমাজ মঞ্চের ওপর এঁদের অপরূপ অভিনয়-সৌষ্ঠব থেকে মুখ ফিরিয়ে নতুন একটা আঙ্গিকে নতুন বিনোদনমাধ্যমের দিকে একান্তরূপে মন দিতে যেন রাজী হল না। সেটা ছিল সীতা, কর্ণার্জুন, আলমগীর, চিরকুমার সভার যুগ। বাংলার মঞ্চাভিনেতা-অভিনেত্রীরা অসামান্য নাট্যকুশলতা দিয়ে দর্শকচিত্তকে তখন ভরিয়ে তুলেছিল। বাঙালী দর্শকসমাজ তাই এদিকে যে অন্য একটা নতুন কলাবিদ্যার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল তার দিকে তেমন একটা সোৎসাহ দৃষ্টি দিল না।

কিন্তু মঞ্চের যে গৌরবময় যুগ স্বর্ণরেখায় দেখা দিয়েছিল শিশিরকুমারের অবিসংবাদী নেতৃত্বে তার জন্য চলচ্চিত্র গতি-হীন, রুদ্ধপ্রয়াস হয়ে পড়ে থাকলো না। চলচ্চিত্রেও সৃজনী প্রতিভার নেতৃত্বের প্রয়োজন বিশেষভাবে দেখা দিয়েছিল। নির্বাক যুগের ছবির প্রথম প্রয়াসের কুহেলীটা কেটে এসেছিল এই সময়। প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী, জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ প্রতিষ্ঠিত চিত্র-পরিচালকেরা তখন সবাক্ চিত্র তুলতে আরম্ভ করেছিলেন। নিউ থিয়েটার্স ইতিমধ্যেই গঠিত হয়েছিল। সেখানে প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, নীতীন বসু, দেবকী বসু, প্রমথেশ বড়ুয়া প্রভৃতি যোগ দিয়ে-ছিলেন। ঠিক এই সময়ের পূর্বেই মূক ছবি "অপরাধীতে" বড়ুয়ারই প্রযোজনায় দেবকী বসু পরিচালনায় এমন একটা সরস নবীনতার পরিচয় দিয়েছিলেন যে, বাংলার রসিকসমাজ বুঝলেন, সিনেমাও এক অভিনব রস-শিল্প। সুন্দর ও সার্থকভাবে সেও ভিন্ন পথে শিল্পের গঙ্গায় অবগাহন করতে পারে। প্রয়োজন হল তাই চিন্তাশীল ও চিত্র-কলাকুশলী পরিচালকের। দু'একজন যাঁরা এলেন, তাঁদের দিয়েই নিউ থিয়েটার্সের প্রথম যুগে কয়েকখানি মোটামুটি উপভোগ্য ছবি তৈরী করা হল। কিন্তু সত্যিকারের ভাল ছবি বলতে কি বোঝায় তার পরিচয় তখনও পাওয়া হয়নি।

এই আনন্দলোকের পরিচয় পাওয়া গেল দেবকী বসু ও প্রমথেশ বড়ুয়ার দুখানা ছবির মধ্য দিয়ে। "চন্ডীদাস" ও 'দেবদাস" এই দুখানা ছবি। বাংলা ছবি আজ যে জগৎ-সভায় আসন লাভ করেছে সে উৎকর্ষের বীজ খুঁজতে হলে ইতিহাসের চশমা পরে এই দুখানা ছবির মধ্যেই দৃষ্টি ফেরাতে হবে। এই দুখানা ছবি সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী প্রকাশের দিক দিয়ে আনল নতুন এক শিল্পসৌন্দর্যের দ্যোতনা। চন্ডীদাসে দেবকীবাবু নরনারীর প্রেমের অন্তরের রূপকে এমন এক কাব্যিক মাধুর্য দিয়ে অভিব্যক্তি দিলেন যে, দর্শক-সমাজের মনে সেটা এক অশ্রুতপূর্ব রসের স্বর্গ রচনা করল।

দেবদাস ছবিতে প্রমথেশ বড়ুয়া প্রমাণ করলেন যে, চলচ্চিত্র তার স্বকীয় রূপ ও রসের সাহায্যে এমন একটি নাট্যমাধ্যম হতে পারে যার মধ্যে জীবনের পরম সত্য-গুলি প্রেমের গূঢ়তম সুরটি সহজভাবে রূপায়িত হতে পারে। এদিক দিয়ে বিচার

করলে 'দেবদাস' একখানি চিরন্তন ছবি। অত সুদীর্ঘ অতীতের আবহে মানুষের মনের আকাঙ্ক্ষা ও ব্যথাকে এমন এক চিরনূতন রূপ কেমন করে দিয়েছিলেন প্রমথেশ বড়ুয়া ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। "চণ্ডীদাস" বা "দেবদাস" শুধু ছবি নয়, এই দুটি ছবি বাংলা চলচ্চিত্রের ছবির যুগনির্দেশক। এই দুখানি ছবির সঙ্গে সঙ্গে বাংলার চলচ্চিত্রের কুণ্ঠিত কৈশোরের সমাপ্তি হল। এর পর বাংলা ছবি যৌবনের সজীবতা ও লাবণ্য নিয়ে নতুন পথযাত্রা শুরু করলো। অতীতের অস্পষ্টতা, আড়ষ্টতা ও অস্বাচ্ছন্দ্য কাটিয়ে উঠে বাংলা ছবি হ'ল সৃষ্টি-উন্মুখ। আত্মনিশ্চিত একটি নতুন সৃষ্টির পুলকে সে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

এর পরবর্তী পঁচিশ বছরের একটানা গতিচ্ছন্দকে ঠিক বলতে গেলে বড়ুয়া-দেবকী বসুর যুগ বলে অভিহিত করতে হয়। এঁদের দুজনের ঠিক সমসাময়িক নীতীন বসুর দানও বাংলার চলচ্চিত্রের স্মরণে রাখবার মত। তবে চিন্তার মূল্যায়ন, জীবনের সত্যসমূহের প্রতিফলন, কাব্যসৌন্দর্য প্রভৃতি গুণ-সম্পন্নতার দিক দিয়ে বিচার করলে বড়ুয়া ও বসু অনন্যসাধারণ। এঁরা প্রকৃত যুগসঞ্চালক। এঁদেরই যুগে অবশ্য আরো পাঁচ-সাত জন পরিচালক নাম করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেউ ঠিক অসামান্য হয়ে বিরাজ করতে পারেননি। তাই দীর্ঘস্থায়ী খ্যাতিলাভও কারো ভাগ্যে হয়ে ওঠেনি। নীতীন বসু যান্ত্রিক কৌশলকে এত সুন্দরভাবে ছবিতে প্রয়োগ করেছিলেন যে, নিউ থিয়েটার্সের ছবির ফোটোগ্রাফির ও আলোকের উন্নতমানের কথা সর্বত্র স্বীকৃতিলাভ করলো। নীতীন বসু কয়েকখানা খুব ভাল ছবি করলেন কিন্তু যে-অন্তর্লীন রসের সহজতা ও কাব্যাশ্রয়ী প্রকাশভঙ্গী থাকলে ছবির আকর্ষণ ও আবেদন দুর্বার হয়ে ওঠে নীতীন বসু আগাগোড়া তার পরিচয় দিতে পারেননি।

এর পর সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী' এল পরবর্তী নবীন যুগের প্রবর্তক হয়ে, যে যুগের আলো এখনো আমাদের পথ দেখাচ্ছে। বড়ুয়া, দেবকী বসুর কথা বাদ দিলে নীতীন বসু, হেমচন্দ্র, ফণী মজুমদার, নীরেন লাহিড়ী, সুশীল মজুমদার, শৈলজানন্দ প্রভৃতি পরিচালকেরা ছবিকে মোটামুটি নাট্যধর্মী, আবেগসম্পন্ন করবার চেষ্টার ওপরই জোর দিতেন। আঙ্গিকের উৎকর্ষের কথা এঁরা ভোলেননি কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের ছবি যে সম্পূর্ণ বৈপ্লবিক নতুন আকার ও প্রকৃতি নিয়ে দেখা দিল, তার সঙ্গে পূর্ববর্তী যুগের চিত্রকারদের শিল্প-শৈলীর অদ্ভুত পার্থক্য দেখা গেল। সত্যজিৎ রায়ের ছবি এলো অংকনকলার গভীর অনুভূতি ও সূক্ষ্ম প্রকৃতি নিয়ে—ধীরে, সুস্থে, প্রতিটি আবেগ, দ্বন্দ্ব, ব্যক্তিত্ব বা ভাববস্তুকে দেখিয়ে তার গূঢ় তথ্যটি দর্শকের মনের স্তরে ব্যঞ্জনাময় করে তোলা। দুর্বার গতি ও নাটকীয়তা দিয়ে মানুষের অনুভূতিকে দ্রুতসঞ্চারী করে চিত্রের উপস্থাপনাকে সুবোধ ও অতিরেখায়িত করে তোলা রায় পছন্দ করেন না, একথা বুঝতে দেরী হল না। মানুষের মনের সহজাত আনন্দ, দুঃখ, বেদনা, সহানুভূতি প্রভৃতিকে তিনি জাগিয়ে তুলতে চাইলেন ছোট ছোট, সুন্দর ভাবের ও রসাভাসের শান্ত স্ফুটনের মধ্য দিয়ে। "পথের পাঁচালি", "অপরাজিত" ও "অপুর সংসার" এদিক থেকে তাঁকে খুব সাহায্য করলো। বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপু-কাহিনীর মধ্যে এমন একটি সহজ, সরল, ধীর ছন্দ কিন্তু নিবিড় সুর আছে যা সত্যজিৎবাবু বিচিত্র সৃষ্টিভঙ্গী ও শৈলীর পক্ষে খুব সহায়ক হল। মনে হল বিভূতিবাবুর অপুর রূপায়ণের জন্য যেন সত্যজিৎবাবুরই প্রয়োজন ছিল। এর পরে তিনি অনেকগুলি ছবি করেছেন কিন্তু "তিনকন্যা" ও "অভিযান" ছাড়া কোনখানি বক্স-অফিসের দিক থেকে ততোখানি সার্থক হয়নি, যতো হয়েছে অপু-চিত্রগুলি। 'তিনকন্যা'-য় তিনি অনন্যসাধারণ কাহিনীর সাহায্য পেয়েছেন। 'অভিযান' ছবিতে কিন্তু তিনি, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বেশ একটু সরে এসেছেন। এই ছবিখানি হয়েছে দ্রুতগতি, নাট্যময় ও বাক্যপ্রধান। নিঃসন্দেহে বলা যায় সত্যজিৎবাবু একটা নতুনতর প্রকাশভঙ্গীর সার্থক

প্রয়োগ করেছেন এই ছবিতে। তিনি পূর্বাভ্যস্ত পথ অন্বেষণে ত্যাগ করেছেন কিনা সেটা অবশ্য বোঝা যাবে তাঁর আগামী "মহানগর" ছবিতে।

সত্যজিৎ রায়ের অনুবর্তী যুগ এখনও চলছে বললে মিথ্যে বলা হবে না। রায়ের অসাধারণ সাফল্য দেখেই অবশ্য একদল লোক তাঁরই অনুরূপ ভঙ্গীতে চিত্রসৃষ্টির চেষ্টা করছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় 'যার কর্ম তারেই সাজে।' অনেকগুলি প্রচেষ্টাই তাই শুধুমাত্র অনুকৃতির রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছিল। দুই-একটি ক্ষেত্রে ছাড়া এই নতুন গোষ্ঠী নিজেদের বৈশিষ্ট্যের বিশেষ কোন পরিচয় দিতে পারেননি। একথা কিন্তু অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, সত্যজিৎ রায়ের আবির্ভাবের কিছু পরেই কয়েকজন পরিচালক অনুকরণের আশ্রয় না নিয়েও রায়ের ষ্টাইলকে অবলম্বন করেও সৃষ্টিধর্মী চিন্তার পরিচয় দিলেন। বোধ হয় একই ষ্টাইলের ছবি ভিন্ন ভিন্ন লোকের করার প্রচেষ্টাকে দর্শকের খুব ভালো লাগতো না। তাই তাঁরা জনপ্রিয়তার দিক থেকে খুব সার্থক হলেন না। নদী ছেড়ে উপনদীর রসধারায় তাঁরা আপ্লুত হতে পারলেন না।

কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের ছবিই তো কালো-ত্তীর্ণ রসের ক্ষেত্রে শেষ কথা নয়! হয়তো অনেকের আজ মনে হচ্ছে পুরাতন পদ্ধতি ও সত্যজিৎ রায়-আশ্রয়ী নতুন পদ্ধতি এই দুধারার সাহায্যে আমাদের ভবিষ্যৎ ছবির অনুশীলন করতে হবে। এর বাইরে আর অন্য পদ্ধতি বুঝি নেই। কিন্তু সমকালীন ছবিগুলি দেখলে বোঝা যায় দুই-একটি তরুণ পরিচালক কিন্তু দৃঢ়ভাবে ও স্বাধীন মনোবৃত্তি নিয়ে নতুন পথের সন্ধান করে বেড়াচ্ছেন এবং এঁদের অনুসন্ধিৎসা বহু-জনের প্রশংসাও পেয়েছে। কাঁচের স্বর্গ, ছায়া-সূর্য, এমন কি শেষ প্রহর ও আরো দু-একখানা ছবির আকৃতি ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে নিছক অনু-কৃতি যে কাউকে প্রকৃত রসধর্মী করে তুলতে পারে না, বৃহতের নাগাল দিতে পারে না, এটা কিছুসংখ্যক লোক নিশ্চিত-ভাবে বুঝতে পেরেছেন। ছায়াসূর্য ছবিতে এমন একটি তারুণ্যের আভাস পাওয়া গেছে যেটা ভবিষ্যতের বাংলা ছবির সৌকর্য সম্বন্ধে নিশ্চিত আশা জাগিয়ে তোলে। ছায়াসূর্য বা কাচের স্বর্গ নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের গুণে উজ্জ্বল। এদের মধ্যে কারো প্রদর্শিত পথে হাঁটাব, এমন ইঙ্গিতের বিন্দুও ছিল না। এদিক থেকে এঁরা নমস্য।

এ ছাড়া বর্তমানে যে সব ছবি হচ্ছে তার মধ্যে মোটামুটি দু' শ্রেণীর ছবিই দেখা যাচ্ছে। এক পুরাতন পথের যাত্রী গার্হস্থ্য ছবি, যার পটভূমিকা মুখ্যতঃ পল্লীগ্রাম। গার্হস্থ্য আদর্শের নিরাপদ ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত এই ছবিগুলি মফস্বল অঞ্চলে ভাল চলে। কলকাতাতেও এর খরিদ্দারের সংখ্যা নগণ্য নয়। অবশ্য যে ছবিগুলি মফস্বলে একচেটিয়া চলতো—যেমন পৌরা-ণিক ও ভক্তিমূলক ছবি—সেগুলি আজকাল প্রায় তোলা হচ্ছে না বললেই হয়। এর দ্বারাও একটা জিনিস সূচিত হচ্ছে—বাংলার দর্শকের শিক্ষার ও রুচির মানের ক্রমোন্নতি। আর বাকী ছবিগুলিতে দেখা যাচ্ছে পুরাতন পদ্ধতির মধ্যে নব-বাস্তবতার (neo-realism) খাদ। এদের পরি-চালকেরা বোধ হয় ভাবছেন এই মিশ্র পদ্ধতিতে পুরাতন ও নূতনপন্থী উভয়কেই খুশী করা যাবে। এখন কিছুদিন বোধ হয় আমাদের এই জাতীয় ছবি বেশী দেখতে হবে কারণ অধিকাংশ পরিচালকের প্রবণতা এখন যেন এই দিকেই।

আগামী দিনের বাংলা ছবি ঠিক কেমন রূপ নিয়ে দেখা দেবে সেটা সুনিশ্চিতভাবে বলে দেওয়া এখন অসম্ভব। সত্যজিৎ রায়ের প্রভাবে রূপায়িত চিত্রশিল্প না নূতনত্বের দীপ্তিতে ঝলমল কোন তীর্থঙ্করের সৃষ্টির বেদনামুখর অভিনব প্রেরণার মধুক্ষরণ?

এর উত্তর দেবেন আগামীকালের চিত্র-কারেরা, আজকের দিনের শিল্পের উত্তর-সাধকেরা।

'উত্তর ফাল্গুনী' চিত্রের একটি মুহূর্তে সুচিত্রা সেন

ঋত্বিক ঘটক

দিন কয়েক আগে আমার এক বিশিষ্ট বন্ধু তাঁর তৈরী একটি ছবি দেখার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ করেন। ছবিটি দেখার পরে তিনি আমার সঙ্গে এক আলোচনাতে মগ্ন হয়ে যান। বিষয়টা ঠিক তাঁর ছবি ছিল না,—ছবির মধ্যের একটা ঘটনা ছিল বিষয়ের মূল আলোচ্য।

ঘটনাটি হচ্ছে এই রকম ঃ—ছবিতে দুজন লোক আছে যাদের মধ্যে মতভেদ থাকা সত্ত্বেও তারা দুজনেই বন্ধু। তারপরে একটি মেয়ে আসে। মেয়েটি এই দুইজন লোকের মধ্যে একজনের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হয়। তাতে অপর যে জন, তার কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করা যায় না প্রথমে। একদিন এ মেয়েটি আর তার বন্ধু নৌকা-বিহারে বের হয়। যখন ফিরে আসে তখন হঠাৎ দ্বিতীয় লোকটির ভাবান্তর লক্ষ্য করা যায়। এবং ঘটনাটি কোনো প্রস্তুতি ব্যতিরেকে চরমে উঠে। অর্থাৎ মারামারি হয়।

আমার কাছে ঘটনাটি যুক্তিহীন মনে হয়েছিল। কারণ সাধারণ মানুষ ঐ দৃশ্য দেখার পরে ধরে নেবে যে দ্বিতীয় লোকটিও মেয়েটিকে ভালোবাসত এবং এ দুজনকে একত্রে দেখে হঠাৎ তার হিংসা হয়েছিল। অর্থাৎ, সেই "চিরন্তন ত্রিভুজ"-এর কথা। অথচ সাধারণ মানুষ দ্বিতীয় ব্যক্তিটির এই ব্যবহারের কোনো কারণই খুঁজে পাবে না। কারণ তার প্রস্তুতিই নেই।

আমার বন্ধুটি যিনি ছবিটা করেছিলেন, তিনি আমার কথায় তীব্র প্রতিবাদ করলেন। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, তিনি ইচ্ছা করেই দ্বিতীয় ব্যক্তিটির ব্যবহারের কারণ সম্পর্কে কোন ইঙ্গিত দেননি। তিনি চেয়েছিলেন, যার যা ইচ্ছে মানে করে নিক। যদি কেউ ভাবে, লোকটা প্রেমে পড়ে হিংসে করেছিল, তবে তাই ভাবুক। অন্য কেউ যদি ভাবে যে বন্ধুর জন্যে সে চিন্তিত হয়েছিল, তা হলে তাই ভাবুক। যদি ভাবে যে বন্ধু ও মেয়েটির প্রতিপত্তি আশপাশের লোকের কাছে খেলো হয়ে যাচ্ছে সেইজন্য মেরেছিল, তাহলে তাই ভাবুক।

ছবির পরিচালক এই বিভিন্ন চিন্তার ধারাকে কোন একটা খাতে বইতে দিতে রাজি হন নি, এই ছিল তাঁর বক্তব্য।

এই তর্কের টানে টানে একটা মূল কথা এসে পড়লো। সেটা হচ্ছে এই যে, এরকম একটা আভাস দিয়ে ছেড়ে দেওয়া, যার দশ রকম মানে হতে পারে, সঙ্গত কিনা।

এই সূত্রে আমি তাঁকে যা বলেছিলাম তার হয়তো আরও ব্যাপক ব্যবহার থাকতে পারে তাই কথাগুলোকে লিপিবদ্ধ করলাম।

আমার মনে হয়েছিল, আমার বন্ধুটি একটা জায়গায় ভুল করেছেন। সেটা দশ রকম দ্যোতনা প্রকাশের ইচ্ছের মধ্য দিয়ে নয়। এ ধরনের ট্রিটমেন্ট খুবই উচ্চস্তরের ছবির জন্ম দিয়েছে অতীতে এবং ভবিষ্যতেও দিতে পারে। কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে আরও গভীরে।

'মহাতীর্থ কালীঘাট' চিত্রে
গঙ্গাদাস ভট্টাচার্য

যখনই কোন একটা ছবি (যদি অবশ্য সেটা সত্যিকারের চিন্তাশীল হয়) কোনো একটা বিশেষ রীতি বা পদ্ধতিকে আঁকড়ে ধরবে, তার সঙ্কেত দিয়ে যাবে তা প্রথম কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যে। অর্থাৎ ছন্দ এবং সুর গোড়াতেই বিন্যস্ত করবে।

কথাটাকে অন্য কিছু শিল্পের উপমা দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করছি। যেমন ধরুন সংগীতে। আপনি কোন রাগ গাইবেন, সেটা একান্ত আপনারই বিবেচ্য। কিন্তু প্রথমেই বিস্তারের মধ্য দিয়ে রাগ-রূপটি আপনাকে তৈরী করে নিতে হবে। তখন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। তখন যদি কোন বিবাদী পর্দা লাগে তাহলে সুরও কেটে যায় এবং সমস্ত আবহাওয়াটা এলোমেলো হয়ে যায়। সংগীতরসিক মাত্রেই কথাটা বুঝতে পারবেন। যেখানে রাগ মিশ্র করা হয়, সেখানেও অপ-রাধী পর্দাকে চুরি করে করে ছুঁয়ে শ্রোতার কানকে কিভাবে তৈরী করতে হয়—সেটা আমার বন্ধু আলী আকবর বা রবিশঙ্করকে জিজ্ঞেসা করলেই জানা যাবে।

পাশ্চাত্য সংগীতে Scale, যেমন Bethoven-এর Violin in D Major বাজাতে বাজাতে যদি Bach-এর কোন একটা অনবদ্য FUGUE in F লাগে (তেমন বাতুল যদি কেউ থাকে তাহলে অবশ্য), সে ক্ষেত্রে ঘটনাটা যা দাঁড়াবে—আমাদের ভারতীয় মার্গসংগীতে রাগের অর্বাচীন মিশ্রণ তারই সঙ্গে তুলনীয় হবে। বা ধরুন চিত্রাঙ্কনের কথা। Leonardo da Vinchi-র কোন ক্যানভাসের এক অংশে যদি Picasso-র Su-realist period-এর কোন ছবির একটা অংশ কেটে আঠা দিয়ে জুড়ে দেওয়া যায়,—অথবা Breughal-এর সেই perspective-প্রধান কোন [illegible] [illegible] [illegible] মধ্যখানটিতে Vangogh-এর [illegible]-এর সেই SOWER-কে যদি [illegible] দেওয়া যায়—তাহলে [illegible] [illegible] দাঁড়াবে সেই [illegible]।

আসল কথা হচ্ছে—Style। বাংলায় কথাটাকে আমরা শৈলী বলি। শব্দটা অত্যন্ত

থোঁড়া। Style-এর যে সম্পূর্ণ মানে বা দ্যোতনা, তার কোন প্রতিশব্দ বাংলায় নেই।

আমার বন্ধুকে আমি এই কথাই বলেছিলাম,—যে Style-ই আপনি ব্যবহার করুন না কেন, তার মধ্যে একটা consistency থাকা চাই। একটা একপত্র ভাব চাই। এমনকি, যেখানে আপনি পরিচ্ছেদ থেকে পরিচ্ছেদে বিভিন্ন Style বদলাবেন ঠিক করেছেন সেখানেও। আপনার Scale কোন note-এ হবে সেটা বড় কথা নয়, কিন্তু আপনার Scale-এতেই আপনাকে স্থির থাকতে হবে। সেখানে কোন বাচালতা চলবে না। একটা শিল্পীর কাছে আর একজন শিল্পীর এর বেশী চাহিদা নেই।

ঐ ভদ্রলোকের ছবির গোড়াতেই যদি আমি তেমন কোন একটা চিত্রকলা দেখতাম, যাতে করে আমার মনে তার দ্যোতনা সম্পর্কে পাঁচ-দশ রকম মানে এসে দাঁড়াত এবং আমি যদি মনস্থির করতে না পারতাম, তাহলে হয়তো শকেরকায় ঐ নিশেব ঘটনাটি আমার কাছে খুব সহজভাবেই আসতো এবং তার ব্যাখ্যা পরিপূর্ণভাবে আমার সমগ্র অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে পারতাম।

কিন্তু বিচলিত হয়েছিলাম ঐ confusion of style ব্যাপারটিতে (শৈলীতে বিপর্যয়ে।)

আমার মনে হয়, ওটা একটা রুচের ব্যাপার, অর্থাৎ আস্বাদনের, অর্থাৎ রুচিবোধের।

ওটা বোধ হয় ভিতর থেকে আসে।

'বর্ণালী' চিত্রে শর্মিলা ঠাকুর

'বাদশা' চিত্রে সন্ধ্যারাণী ও শংকর

'অশান্ত ঘূর্ণি' চিত্রে জ্যোৎস্না বিশ্বাস ও দিলীপ মুখোপাধ্যায়

'প্রতিনিধি' চিত্রে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

'সপ্তর্ষি' চিত্রে কালী ব্যানার্জী

দর্শকের দর্পণে

আশীষতরু মুখোপাধ্যায়
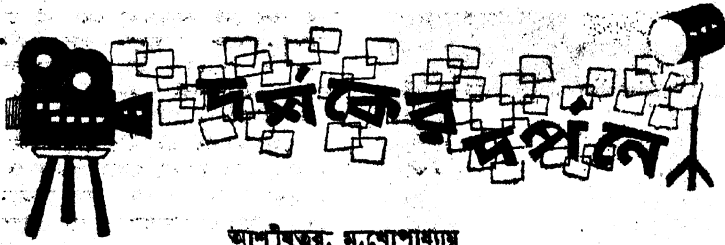
ভারতীয় চলচ্চিত্রের ষাট বছর পূর্ণ হল। উনিশ শো তেষট্টি তাই স্মরণীয়। এই সার্থক পরিক্রমায় চলচ্চিত্র আজ শিল্পকলার একটি বিশেষ অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। বিশেষ করে বাংলা চলচ্চিত্রের যে নিজস্ব আঙ্গিক, বক্তব্য এবং প্রত্যয়ের বলিষ্ঠ রূপ বিবর্তিত হচ্ছে তা অভিনন্দনযোগ্য। বিশ্বের চলচ্চিত্র জগতে একথা আজ স্বীকৃত। বাংলা ছবিতে এ ব্যতিক্রম সম্ভব হয়েছে শুধু দর্শকের মার্জিত রুচিবোধের জন্য। গতানুগতিকতার বাইরে দর্শকের মন ডানা বেঁধেছে। যদিও এ অনুভূতির পরিমাণ নগণ্য তবু অদূরে অনেক আশার আভাস সম্প্রতি পেয়েছি দর্শক-সাক্ষাৎকারের একটি বিশেষ আলোচনা-চক্রে। সাক্ষাৎকারের প্রতিনিধি ছিলেন একজন স্নাতকোত্তর ছাত্র, তরুণ চাকুরে এবং চাকুরিজীবী একজন মহিলা। প্রশ্ন ছিল—

এক : কোন ছবি আপনার মনের মতো—বাংলা না হিন্দী? এবং কেন?

দুই : সব ছবি হয়তো দেখা সম্ভব হয়ে ওঠে না। খবরের কাগজ থেকে আপনার দেখবার জন্যে ছবি বাছাই করেন কিভাবে? অর্থাৎ কি কি জিনিস বিশেষ কোনো ছবি দেখতে আপনার মনকে টানে?

তিন : 'মামুলি ছবি' এবং 'নতুন ধরণের ছবি'—এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য আপনার মতে কি?

চার : কোন ধরণের ছবি আপনার ভাল লাগে?

আলোচনা থেকে যে উত্তরগুলি পেয়েছি তা এবারে বলছি। স্নাতকোত্তর ছাত্রটির বক্তব্য—নিঃসন্দেহে বাংলা ছবি আমার মনের মতো। এ উত্তর প্রাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দিচ্ছি না, বলছি আমার বিচার-বিবেচনায় যা বলে তার থেকে। হিন্দী ছবিতে শালীনতা এবং সূক্ষ্ম চিন্তাশক্তির অভাব আছে। বেশীর ভাগ ছবিই হাল্কা নাচ-গানে ভরপুর। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে আমাকে একটু dogmatic বলা চলে। যে পরিচালকের পর পর কয়েকটি ছবি আমার ভাল লাগে নি তাঁর ছবি পরে নিজে থেকে দেখবার উৎসাহ থাকে না। সুরকার আর অভিনেতাও আমাকে কোন ছবি দেখতে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করেন। তৃতীয়টি, সাধারণ জীবনের প্রত্যেক ঘটনাই যেমন উপন্যাস বা গল্পের বিষয়বস্তু হয়ে উঠতে পারে না—তার জন্য যেমন বৈচিত্র্যের এবং বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন—ছবির বেলাও ঠিক তাই। নতুন ধরণের ছবিতে গল্প, প্রয়োগ-কলা ইত্যাদি বিষয়ে বৈচিত্র্য থাকে। মামুলি ছবিতে এ সবের নিতান্তই অভাব। 'প্রথম ভাগ'-এর 'গোপাল বড় সুবোধ বালক' আর এখনকার ছোটগল্পের যা তফাৎ 'মামুলি ছবি' আর 'নতুন ধরণের ছবি'রও অনেকটা সেই ধরণের তফাৎ। শেষ প্রশ্নের উত্তরে, যুগ এগিয়ে চলেছে। তার সঙ্গে পা ফেলে চলবার চেষ্টা যে ছবির আছে সে ছবি। পরিষ্কার ছবি। নতুন ধরণের ছবি। অর্থাৎ experimental ছবির আমি ভক্ত।

তরুণ চাকুরের অভিমত—বাংলা ছবি ভাল লাগে তার কারণ বাংলা কাহিনী আমার মনকে টানে। কাহিনীকারের নাম, পরিচালকের নাম, সংগীত-পরিচালকের নাম যদি মনের মত হয় তাহলে সে ছবি দেখবার জন্য আমি ইচ্ছুক হই। যে ছবি শুধু অলীক কল্পনা ও সস্তা রোমান্সে দর্শকের মনোরঞ্জন করার চেষ্টা, সেই ছবি আমার মতে 'মামুলি ধরণের ছবি'। আর যে ছবিতে আছে জীবনের বলিষ্ঠতা, বাস্তবতা ও সরলতা সেই ছবি 'নতুন ধরণের ছবি' মনে করি। সবশেষে বলতে পারি যে ছবির কাহিনীতে জীবনের গতি ও শক্তিকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন পরিচালক সেই ছবি আমার খুব ভাল লাগে।

চাকুরে ভদ্রমহিলা বলেন—যে ছবিতে প্রাণের উচ্ছলতা আছে, সেই ছবি মনের মতো। বাংলা কিংবা হিন্দী নয়, ইংরেজীও হতে পারে। অর্থাৎ প্রাত্যহিক জীবনের বাস্তব থেকে কিছুটা relief পেতে চাই। মধ্যবিত্ত সংসারের স্বচ্ছলতা বজায় রাখতে দশটা-পাঁচটার জীবনে বন্দী হয়ে পড়ি। প্রত্যহের এ গ্লানি দূর করতে মাঝে মাঝে ছবি দেখি। চোখের জল সইতে পারি না বলেই হাল্কা আর হাসির ছবি বেশী পছন্দ করি। বেশীর ভাগ ছবি আজকাল জনপ্রিয় উপন্যাস এবং গল্পের পটভূমিকায় নির্মিত হচ্ছে। নিয়মিত গল্প-উপন্যাস পড়ার ঝোঁক আছে। তাই প্রিয় কাহিনী চলচ্চিত্রে রূপায়িত হলে কাগজের বিজ্ঞাপন থেকে ছবি বাছাই করি। মামুলি বলতে খারাপ কিংবা গতানুগতিক বলবো কিনা জানি না, তবে 'নতুন ধরণের' ছবি সহজ এবং বোধগম্য হলে আমাকে নিশ্চয়ই খুশী করবে। রোমান্টিক এবং হাল্কা ছবি আমার ভাল লাগে। বাস্তবের সহজ-সরল পরিবেশে মিষ্টি রোমান্স ছবি আমার সবচেয়ে প্রিয়। যেমন এক কথায় মনে পড়ে পরিচালক মৃণাল সেন-এর 'পুনশ্চ' ছবি। বিশেষ করে নায়ক-নায়িকার মিষ্টি-মধুর সম্পর্কটুকু আমি আজও ভুলতে পারিনি। শুনেছি মেয়েরা করুণ রসের ভক্ত হয়। কিন্তু আমি চাই জীবনের গতির সঙ্গে মিশে যেতে। অকারণে দুঃখ দেখে যেন চোখের জল না ফেলি। সমাজের সবকিছু নিয়ে যে জীবন, তার বাস্তব চিত্ররূপ দেখতে ভাল লাগে। কারণ চলচ্চিত্র যখন সবচেয়ে বড় মাধ্যম।

প্রশ্নমালার আলোচনা থেকে আজকের চলচ্চিত্র সম্পর্কে অনেক তথ্য পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। দর্শকদের আপন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়ও প্রকাশ পায় এর মধ্যে। যদিও সরকারের তদন্ত কমিটি স্থাপনের ক্ষমতা আমাদের নেই কিন্তু এইসব মতামতগুলি য[illegible] চলচ্চিত্রের মহৎ উদ্দেশ্যে কার্যকরী [illegible] সেই কথা ভেবে পরিচালক মৃণাল সেনকে আমরা দর্শক-প্রতিনিধির প্রশ্নোত্তরে[illegible] কথা জানাই। প্রশ্ন-উত্তরগুলি দেখে শ্রীসেন অতীব উৎসাহী হয়ে তাঁর অভিমত প্রকাশ করেন ঘরোয়া এক সাক্ষাৎকারে। শ্রীসেনের সঙ্গে যে আলোচনা হয় তা থেকে সমকালীন চলচ্চিত্রের একটা বিশেষ রূপ পরিলক্ষিত হবে। প্রথমে পরিচালক শ্রীসেন দর্শকদের নিজস্ব মতামতের ওপর আলোচনা করেন। তিনি বলেন—

স্নাতকোত্তর ছাত্র ও চাকুরে যুবকের বক্তব্য মোটামুটি এক। কিন্তু ছাত্রের জবাবে বিশ্লেষণের আমেজ রয়েছে এবং তা অনেকখানি স্পষ্ট, বলিষ্ঠ এবং খানিকটা partisan-ও বটে। এবং partisan বলেই কিঞ্চিৎ উষ্মাও যেন রয়েছে ওঁর বক্তব্যে।

চাকুরে ভদ্রমহিলার জবাব অস্পষ্ট, অগভীর ও বেশ খানিকটা স্ববিরোধীও।

এবং আপাতদৃষ্টিতে ছাত্র ও চাকুরে যুবকের বিরোধী বক্তব্য পেশ করেছেন চাকুরে ভদ্রমহিলা।

কিন্তু একটু নজর করে হিসেব করলেই পাঠক বুঝতে পারবেন (অন্তত আমি তাই বুঝেছি) যে, ভদ্রমহিলা নিজের বক্তব্য সম্পর্কে যথেষ্ট জোরালো বা emphatic নন। কিছু কুণ্ঠা, কিছু বা দ্বিধা এবং কিছুটা দু-নৌকোয় পা দিয়ে চলার মতো ইঙ্গিত রয়েছে ওঁর উক্তিতে। যেন খানিকটা বিব্রত হয়ে পড়েছেন প্রশ্নগুলোর মুখোমুখি হয়ে। এবং হয়তো বা স্নাতকোত্তর ছাত্রটির সঙ্গে মুখোমুখি তর্ক হলে সহজেই হারস্বীকার করতে হোতো ওঁকে এবং শেষ পর্যন্ত হয়তো ছাত্রের মতেই মত দিতেন। মনে প্রাণে বিশ্বাসও করে ফেলতেন ছাত্রের যুক্তিগুলো।

এক কথায় বলতে গেলে, স্বভাবতই ছাত্রটির উক্তি আমাকে উৎসাহিত করছে। কারণ তিনি জানেন যে তিনি কি পছন্দ করেন এবং স্পষ্ট করেই জানেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলবো যে চাকুরে ভদ্রমহিলার উক্তিও আমাকে তেমন বিব্রত করে না। কারণ ওঁর মতামত বাহ্যিক নজরে অস্পষ্ট ও দ্বিধাগ্রস্ত হলেও আমার বিশ্বাসে ওঁকে বিশ্বাসী করাতে হয়তো আমাকে বিশেষ বেগ পেতে হবে না, যেমন বিশেষ বেগ পেতে হোতো না দর্শনের ছাত্রটির—যদি অবশ্য তর্ক করার সুযোগ পেতেন তিনি। ভদ্রমহিলার উক্তি

থেকেই ও'র সম্পর্কে এই ধারণা আমার জন্মেছে। আমি আমার দলে বা মতে হয়তো ও'কে ভেড়াতে পারবো একমাত্র ছবি করেই, ছাত্রটি যেমন পারবেন তর্ক করে।

ভেড়াতে পারবো কারণ ভদ্রমহিলা কথাপ্রসঙ্গে জানিয়েছেন যে, আমার একখানা ছবি—'পুনশ্চ'—তাঁর পছন্দমতো হয়েছে। বিশেষ করে ভালো লেগেছে নায়ক-নায়িকার প্রাক-বৈবাহিক সম্পর্ক। ছবিতে রয়েছে—নায়ক স্বল্পবিত্ত চাকুরে, আর নায়িকা সবে চাকরীতে ঢুকেছে। এবং ছবির ঘটনা যা কিছু ঘটেছে সবটাই সীমাবদ্ধ কখনো দশটা-পাঁচটার দপ্তরখানার, কখনো বা রান্নাঘরে কুটনো কুটতে কুটতে অথবা খেতে বসে, আবার কখনো বাবার ঘরে অথবা নিজেদের শোবার ঘরে। এবং ট্রামে-বাসে অফিস থেকে ফেরবার পথে গঙ্গার ঘাটে অথবা রেস্তোরাঁতে।

মজার ব্যাপার এই যে, ভদ্রমহিলা তাঁর এক নম্বর প্রশ্নের জবাবে জানিয়েছেন—দশটা-পাঁচটার বন্দীত্বে হাঁপিয়ে ওঠেন তিনি। সংসারের প্রাত্যহিক জীবনের গ্লানি থেকে মুক্তি পেতে চান তিনি। তাই সিনেমা দেখতে যান মনটাকে হালকা করতে। এবং তার জন্যে প্রয়োজন হালকা হাসির ছবির। চাই relief.

অথচ 'পুনশ্চ' ভদ্রমহিলাকে খুশী করেছে। ও'রই স্বীকারোক্তি।

আসল ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখা যাক। আসলে, বাস্তবতার নামে আমাদের দেশে বেশির ভাগ ছবি যা তৈরি হয়ে থাকে তাতে প্রায়ই দেখতে পাই জলের ভাগ অধিক। সেইসব ছবিতে রান্নাঘরও থাকে, ভাঁড়ার ঘরে চরিত্রের আনাগোনাও চলে বেশ, এবং কোথায়ও বা দপ্তরখানার কর্মব্যস্ততারও আন্দাজ পাই। কিন্তু পাই না জীবনের ইঙ্গিত। বেশির ভাগই বানানো, কল্পিত, মিথ্যে, ফাঁকি। খানিকটা দুঃখের প্যানপ্যানানি, খানিকটা অশিক্ষিত 'দর্শন' আর বাকিটা গ্যালারী-মুখীন বুলি কপচান। এবং শেষ পর্যন্ত একটা অসম্ভব বেয়াড়া ধরণের মিলনান্তক পরিণতি! একটি প্রাণান্তকর 'উজ্জ্বল দৃশ্য'!!

স্বভাবতই এই ছবি আমাদের চাকুরে ভদ্রমহিলাকে (যাঁর সঙ্গে বাস্তবের সম্পর্ক অতিনিকট) সাময়িকভাবে দলে ভেড়ালেও শেষ পর্যন্ত টানতে পারে না। পীড়িত-বোধ করেন তিনি এবং শেষ পর্যন্ত চার নম্বর প্রশ্নের জবাবে বলে বসেন, '(ছবি দেখতে গিয়ে) তেমন দুঃখ দেখে যেন চোখের জল না ফেলি।'

হালকা হাসির ছবি না হওয়া সত্ত্বেও 'পুনশ্চ' ও'র ভালো লেগেছে মনে করেন, হয়তো ঐ ছবিটার মধ্যে তিনি তাঁর বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার চেহারা খুঁজে পেয়েছেন। অথবা নিজের অভিজ্ঞতার সূত্র ধরে সামগ্রিকভাবে এক ধরণের বাস্তবতার খানিকটা আন্দাজ পেয়েছেন। দেখেছেন নায়কের সঙ্গে সিনেমা দেখার এ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকা সত্ত্বেও নায়িকাকে গুরুজনের নজরবন্দী হয়ে বাড়িমুখী ট্রামে ফিরতে

'বাধাকৃষ্ণ' চিত্রে
প্রতিমা চক্রবর্তী

হয়েছে বাড়িতেই। দেখেছেন, নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের সুখের কথা ভেবে চাকরী নিয়ে শেষ পর্যন্ত কিভাবে সে জড়িয়ে পড়েছে বাবার সংসারের আর্থিক ব্যবস্থার মধ্যে। দেখেছেন আর হয়তো মিলিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন নিজের সঙ্গে অথবা পরিচিত আর কারো সঙ্গে—পরিচিত বাস্তবের সঙ্গে।

হয়তো খানিকটা আয়নায় নিজেকে দেখার মতো। দেখেছেন আর দেখতে হয়তো ভালোও লেগেছে নিজেকে। আর পারিপার্শ্বিককে।

'পুনশ্চ' ও'র ভালো লেগেছে জেনেই ভরসা পেয়ে এতোগুলো কথা বলে ফেললাম। বলে, নিজেকে পরিষ্কার করবার চেষ্টা করলাম পাঠকের কাছে, এবং চাকরী-জীবী ভদ্রমহিলাকেও বুঝতে প্রয়াস পেলাম।

ছবির কথা বলতে গিয়ে ব্যক্তিগত মতামত এড়ানো সম্ভব নয়—ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যে মতামত গড়ে ওঠে তাই। ছবির সঙ্গে নাড়ির সম্পর্ক আমাদের তাই হয়তো এড়ানো সম্ভব নয়।

তিন নম্বর প্রশ্নের জবাবে স্নাতকোত্তর ছাত্রটির একটি কথার উল্লেখ করছি। তিনি বলেছেন, প্রথম ভাগের 'গোপাল বড় সুবোধ বালক'—শ্রেণীর গল্প নিতান্তই 'মামুলি'। অর্থাৎ তিনি বলতে চান (এবং আমিও তাই মনে করি) যে, যে-গল্পে, ঘটনায়, চরিত্রে রয়েছে শুধুই কালো এবং শুধুই সাদা, সাদায়-কালোয় মেশানো নয়—অর্থাৎ যে-চরিত্রে, ঘটনায়, গল্পে জটিলতা নেই, দ্বন্দ্ব নেই, স্ববিরোধী ধারা নেই তা নেহাৎই 'মামুলি'। 'মামুলি' বলেই তিনি নাকচ করে দিচ্ছেন। এবং শুধু মামুলি বলেই নয়—নিশ্চয়ই অবাস্তব বলেও। জীবন-ভিত্তিক নয় বলেই।

এবং ছাত্রটির এই উক্তিটিকে একটু খুঁটিয়ে বিচার করলেই বুঝতে পারবো যে, এ-থেকেই ছবি সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে একটা পরিষ্কার দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা সম্ভব, এবং সে-ক্ষেত্রে উপরোক্ত চারটি প্রশ্নের জবাব দিতেও বিশেষ অসুবিধে হবে না।

সবশেষে দাঁড়াচ্ছে এই :

ক) দর্শকের মনের মতো ভালো ছবি করতে হলে চাই বাস্তবানুগ দৃষ্টি যা বাস্তবের অন্তর্নিহিত সূক্ষ্মতম স্পন্দনেরও হিসেব রাখে, যা চরিত্র, ঘটনা, পারিপার্শ্বিকের একেবারে ভেতরকার চেহারাগুলোকে তাদের দ্বন্দ্ব, সংঘাত বা বিরোধ সমেত তুলে ধরতে সাহায্য করবে—অর্থাৎ যে দৃষ্টি বাস্তবের বাহ্যিক রূপে দেখেই ক্ষান্ত নয়—যে-দৃষ্টি বাস্তবের ভেতর থেকে খুঁজে বার করবে তার মাধুর্য, তার রস, তার সম্ভাবনা এবং নিঃসন্দেহে তার গ্লানি।

খ) এবং সেই বাস্তবকে রূপ দিতে হবে ছবির বিশিষ্ট ঢঙে, ছবিরই একান্ত নিজস্ব কুশলতায়। কারণ শুধু তো বাস্তবকে সংবাদপত্রের কায়দায় হাজির করলেই চলবে না—তাকে হাজির করতে হবে 'সশরীরে'—তাকে রক্তমাংসে জীবন্ত ক'রে—ছবির টেক্‌নিকের কুশলী প্রয়োগে।

এবং সিনেমা নামক শিল্পের সুষ্ঠু প্রয়োগের মধ্য দিয়েই দর্শক এমন এক স্বাদ গ্রহণ করতে পারবেন যাকে, স্নাতকোত্তর ছাত্রটি বলেছেন—'বৈচিত্র্য' বা সাধারণভাবে দর্শককুল বলে থাকেন—'নতুন ধরণের'।

পুনশ্চ : একটা কথা। ভদ্রমহিলা বলছেন, নিয়মিত গল্প-উপন্যাস পড়ার বাতিক আছে তাঁর। অথচ তার আগেই আবার বলছেন, সংসারের জঞ্জাল থেকে বেরিয়ে তিনি কিছু relief পেতে চান, হাসতে চান।

আমার জানতে ইচ্ছে করছে, ভদ্রমহিলা কটা কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু আর শিবরাম চক্রবর্তীর বই পড়েছেন আর কটাই বা ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত প্রমুখ 'আধুনিক' লেখকদের গল্প-উপন্যাস পড়েছেন! আমি একরকম হলফ করেই বলতে পারি, প্রথমোক্ত লেখকেরা নিশ্চয়ই তাঁর তেমন প্রিয় নন যতোটা 'আধুনিক' লেখকেরা। এবং সেই প্রিয় 'আধুনিক' লেখকেরা ভদ্রমহিলাকে শুধুই হাসান একথা জানতে পারলে তাঁরা আত্মহত্যা করতে চাইবেন নাকি?

সেন্সর ও ভারতীয় চলচ্চিত্র

পশুপতি চট্টোপাধ্যায়

সেন্সার কথাটি এসেছে ল্যাটিন *censere* থেকে, যার-একটি অর্থ হচ্ছে মূল্য-নিরূপণ এবং কর-ধার্য করা। প্রাচীন-কালে রোমরাজ্যের দু'জন ম্যাজিস্ট্রেটের মধ্যে যিনি জনসংখ্যা গণনা করতেন এবং জনসাধারণের নৈতিক চরিত্র এবং আচরণের ওপর খবরদারি করতেন, তাঁকেই বলা হ'ত সেন্সার। ক্রমে কথাটা সেই বিশেষ সরকারী কর্মচারী সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হয়, যিনি প্রতিটি পান্ডুলিপি বা মুদ্রিত পুস্তকাদি এবং চলচ্চিত্র প্রভৃতি পরীক্ষা ক'রে সেগুলি জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হবার উপযোগী কিনা, তা' বিচার ক'রে দেখেন। যুদ্ধকালে যে পদস্থ কর্মচারী চিঠিপত্র, সংবাদাদির মধ্যে এমন কোনো আপত্তিকর কথা আছে কিনা, যা শত্রুপক্ষের কানে গেলে যুদ্ধপ্রচেষ্টার পক্ষে ক্ষতিকর হ'তে পারে ব'লে বিবেচনা করবার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, তাঁকেও সেন্সার আখ্যা দেওয়া হয়।

যেদিন থেকে মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করছে এবং রাষ্ট্রীয় শাসনকে স্বীকার ক'রে নিয়েছে, সেদিন থেকেই রাষ্ট্র এবং সমাজের কল্যাণেই সে তার জনসাধারণ-সম্পর্কিত আচরণে নিয়ন্ত্রণ বা সেন্সার-ব্যবস্থাকেও মেনে নিয়েছে। দেখা যায়, যখনই কোনো ব্যক্তি রাষ্ট্র বা সমাজের প্রচলিত রীতি, ধর্মবিশ্বাস বা জন্ম, মৃত্যু, প্রাকৃতিক ঘটনা ইত্যাদি সংক্রান্ত সাধারণ বিশ্বাস ও ধারণার বিপরীত কিছু বলতে বা করতে প্রয়াস পেয়েছেন, তখনই রাষ্ট্র তাঁর আচরণের ওপর সেন্সার-ব্যবস্থা প্রয়োগ ক'রে তাঁকে নিরস্ত হ'তে বাধ্য করেছেন। ২১৩ খৃষ্টপূর্বাব্দে চীনসম্রাট শীহোয়াংটি ধর্মগুরু কনফুসিয়স্-এর সমুদয় রচনাকে ভস্মীভূত করেছিলেন এই অজুহাতে যে, মানুষ বেশী জ্ঞানী হয়ে পড়লে সে সমাজের পক্ষে বিপদের কারণ হয়ে পড়ে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কোনোরকম অগ্রগতির বিরোধিতার ফলেই ঈস্কিলাসকে এথেন্স থেকে বিতাড়িত হ'তে হয়েছিল সক্রেটিসকে দেশের যুবশক্তিকে কলুষিত-কারীর অপবাদ মাথায় নিয়ে বিষপানে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল, শেলী, কীটস্, মিলটন, জোলা, বালজাক প্রভৃতি মনীষী রাষ্ট্রের কাছ থেকে শাস্তি পেয়েছিলেন।

এই অবস্থাই আবহমানকাল ধ'রে চ'লে আসছে। আজ যে-কোনো দেশেই সাহিত্য, অঙ্কনশিল্প, নাটকাভিনয়, চলচ্চিত্র, বেতার-নাটক বা কথিকা, টেলিভিশান ইত্যাদি পদে পদে সেন্সার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে সেন্সার-ব্যবস্থায় অবলম্বিত মান সম্বন্ধে একটা দুজ্ঞেয়তা বা দুর্বোধ্যতা যথারীতি বিরাজ করলেও এর নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আমাদের মনে কোনো দ্বিধা নেই, সেটা এমনই পরিষ্কার : বরাবর যা চ'লে আসছে, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চল; আর গতানুগতিকতা বজায় রেখে না চলতে চাইলেই গোল্লায় যাও। রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্র সৃষ্ট সেন্সার সর্বদেশে সর্বকালে জন-সাধারণকে কচি খোকা এবং নির্বোধ দুর্বলচিত্ত প্রাণী ব'লে মনে করে এবং সেই কারণে প্রচলিত রীতির বিরোধী কোনো শিল্পীর 'দুর্নীতিপূর্ণ' এবং 'বিপজ্জনক' প্রভাব থেকে রক্ষা করবার আপ্রাণ চেষ্টা করে। প্রচলিত সামাজিক নীতিজ্ঞানকে কিছুতেই কলুষিত হ'তে দেওয়া হবে না, এই হচ্ছে সেন্সারের সুকঠিন পণ।

সনাতন পন্থা বলে, একটি পরিবারের ভালোমন্দ বিবেচনা করবার একমাত্র অধিকার হচ্ছে বাবার; কাজেই পরিবারের সকলের হয়ে ভালো-মন্দ-সম্পর্কিত চিন্তাটা একমাত্র বাবাই করবেন। এই মান্ধাতা আমলের বাবাপনাই আমাদের সামাজিক, নৈতিক, রাজনৈতিক, বুদ্ধিগত, এমন কি আহার্যসংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রিত

করছে। মদ্যপান কোরো না, যৌনসংক্রান্ত চলচ্চিত্র দেখো না, প্রণয়ের অভিব্যক্তি-সংবলিত প্রাচীরপত্র বর্জন কর, অর্থ-নৈতিক অসামঞ্জস্যের অপ্রীতিকর নিদর্শনকে সাহিত্য বা চলচ্চিত্রে স্থান দিও না ইত্যাদি 'নিষেধে'র বাণে আমরা জর্জরিত।

যাঁদের হাতে এই নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা তাঁরা ভুলে যান যে, মানুষ একটি সজীব পদার্থ; কোনো অজুহাতেই তার দেহমনকে বিধি-নিষেধের অক্টোপাস বাঁধনে বেঁধে স্থাণু ক'রে রাখা যায় না। মানুষ চলবেই। বেদের যুগ থেকে বৌদ্ধধর্মের যুগে এবং সেখান থেকে বাইবেলের যুগে এবং তার থেকে বিজ্ঞানের যুগে মানুষের উত্তরণকে বন্ধ ক'রে রাখা যায়নি। সমাজ নিত্য-পরিবর্তনশীল এবং সেই সঙ্গে মানুষের চিন্তাধারাও। কাল যা সত্য ছিল, আজকের নবমূল্যায়নের ফলে তাই আজ মিথ্যা প্রতিপন্ন হচ্ছে। বেগবান নদীকে বাঁধ দিয়ে রুদ্ধ করবার চেষ্টা করলে যেমন প্লাবন অবশ্যম্ভাবী, তেমনই চিন্তার গতিকেও নিয়ন্ত্রিত করার প্রয়াস সামাজিক বিস্ফোটকের সৃষ্টি করে। সৃষ্টিধর্মী শিল্পকে নিরাপদ পথে বিচরণ করতে বলার অর্থই হচ্ছে তাকে মৃত্যুবরণ করতে বলা; কারণ ঐ পথে বিচরণ করবার কথা মনে রাখতে গিয়ে তা' না হয় সৃষ্টিধর্মী এবং না হয় আর্ট।

ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রেও সমান কথাই বলা যায়। সেন্সারের উদ্যত খড়্গের পানে তাকিয়ে আমাদের অধিকাংশ ছবি নির্মিত হয় ব'লে সেগুলি না হয় সৃষ্টিধর্মী, আর না হয় সত্যিকারের কোনো শিল্পবস্তু। মানুষকে সস্তার আনন্দ দিয়ে অর্থ উপার্জন করতে হবে, এই চিন্তা দ্বারা চালিত হয়ে যতটুকু 'নিরামিষ' যৌন-আবেদন সৃষ্টি করা সম্ভব, তাকেই সম্বল ক'রে আমাদের শতকরা নব্বইখানা চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। কোনো শিল্পীকে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা না দিলে তার সৃষ্টিপ্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে সার্থকতা লাভ করতে পারে না, এই সহজ সত্য আমাদের রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ এবং তাঁদেরই সৃষ্ট সেন্সার-কর্তৃপক্ষ বেমালুম বিস্মৃত হন। তাই ওপরের চাকচিক্য এবং প্রমোদোপকরণ সত্ত্বেও আমাদের চলচ্চিত্রগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবাস্তব, শূন্যগর্ভ এবং ভালো-মন্দ প্রভাববর্জিত হয়। জীবনকে তার সর্ববিধ ব্যঞ্জনাসম্পন্ন বাস্তব রূপে চিত্রায়িত করতে অধিকাংশ প্রযোজকই ভয় পান; কারণ, বহু অর্থব্যয় ক'রে—বেশ কয়েক লক্ষ টাকা খরচ ক'রে ছবি তৈরী করার পর যদি সেই ছবি সেন্সারের ছাড়পত্র-লাভে বঞ্চিত হয়, তাহ'লে সবদিক দিয়েই ক্ষতি: অর্থ, শ্রম, সময় এবং প্রাণশক্তি, সবই বৃথা ব্যয়িত হবে। কাজেই জীবনের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন রূপকথার গল্প চিত্রায়িত করা ছাড়া অন্য উপায় কোথায়?

ভারতবর্ষ যতদিন বিদেশীর শাসনাধীন ছিল, ততদিন পর্যন্ত তবু সেন্সারের ধারাকে সহজেই বোঝা যেত। সে সময়ে রাজশক্তির অবমাননাকর বা আইনানুযায়ী প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে উত্তেজনা-সৃষ্টিকর কোনো দৃশ্য, বক্তৃতা বা রাজনৈতিক মতবাদ না থাকলেই কোনো চলচ্চিত্র সাধারণে প্রদর্শনযোগ্য ব'লে বিবেচিত হ'ত। অবশ্য রাজনৈতিক কারণ ছাড়াও পরধর্মমতে আঘাত বা অশ্লীলতার অজুহাতে চলচ্চিত্রকে কখনও-সখনও নিষিদ্ধ করা হ'ত। সকলেই জানেন, ব্রিটিশ-আমলে চলচ্চিত্রের সেন্সার-কর্তৃপক্ষ ছিলেন পুলিশ-কমিশনার; অবশ্য কাজটা চালাতেন এই বিশেষ উদ্দেশ্যে তাঁরই অধীনে নিযুক্ত জনৈক কর্মচারী। কিন্তু ভারত স্বাধীন হওয়ার কিছুদিন পরেই ভারত সরকার সর্বভারতীয় ভিত্তিতে একটি বিবাচক সংস্থা বা সেন্সার বোর্ড গঠিত করেন এবং সেই কেন্দ্রীয় বোর্ডের তিনটি আঞ্চলিক শাখা মারফত এই সেন্সারকার্য সমাধা করা হয়।

স্বাধীন ভারতে চলচ্চিত্রের সেন্সার-ব্যবস্থা অত্যন্ত জটিল রূপ ধারণ করেছে। রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ, অশ্লীলতা এবং ধর্মমতে আঘাত-সম্পর্কিত বিধিনিষেধের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের প্রশ্ন। কাহিনীটি বা কাহিনীর কোনো বিশেষ অংশ বা সংলাপ ভারতীয় সংস্কৃতি বা ঐতিহ্যের বিরোধী, এ অজুহাতেও কোনো চলচ্চিত্রকে সমগ্রভাবে বা আংশিকভাবে প্রদর্শনের অযোগ্য রায় দেবার ব্যবস্থা আছে বর্তমান সেন্সারশিপ আইনে। ১৯৫১ সালের ১৭ই নভেম্বরের বিজ্ঞপ্তিতে সেণ্ট্রাল বোর্ড অব ফিল্ম সেন্সর্স বিবাচক সংস্থার সভ্যগণকে যে নির্দেশনামা দিয়েছেন, তার সাধারণ সূত্রেই আছে, নাটক এবং আনন্দবিতরণের প্রয়োজন ছাড়া ছবির মধ্যে জীবন-যাত্রার নির্ভুল মান রক্ষা করতে হবে (correct standards of life, subject only to the requirements of drama and entertainment, shall be presented). এ ছাড়া ভারতীয় রীতি-নীতি, ঐতিহ্য, প্রথা বা সংস্কৃতিকে দুষ্টভাবে প্রদর্শন করা আপত্তিকর ব'লে বিবেচিত হ'তে পারে (showing Indian institutions, traditions, customs or culture in an odious manner may be objectionable). এই নির্দেশ দু'টির নির্ভুল প্রয়োগ অত্যন্ত বাদানুবাদসাপেক্ষ। কারণ, কোনো বিবাচক সংস্থার কে-কজন সদস্য (কমপক্ষে তিনজনকে দেখতেই হয়) কোনো চলচ্চিত্রকে পরীক্ষা ক'রে দেখবেন, জীবনযাত্রার মান,

সংস্কৃতি বা ঐতিহ্য সম্পর্কে তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত ধারণা অনুযায়ীই রায় দেবেন এবং এই ধারণা কোনো দুজনের যে এক নয়, এ-কথা হলফ ক'রে বলতে পারা যায়। নৈতিক মান সম্পর্কেও একজন যে আর একজনের সঙ্গে কার্বন কপির মতো একমত, তাও ক্বচিৎ দৃষ্টিগোচর হয়। এক্ষেত্রে নিম্নপর্যায়ের নৈতিক মান বা low moral tone-এর অজুহাতে কোনো ছবির প্রদর্শনী নিষিদ্ধ করা যে সদস্যবৃন্দের ব্যক্তিগত রুচির ওপর কত বেশী নির্ভরশীল, তা অনুমান করা কঠিন নয়। লোকসভার এস্টিমেটস্ কমিটির মতে 'উচ্চ বিচারকের পদমর্যাদাসম্পন্ন, সাধারণের চক্ষে বিশিষ্টভাবে শ্রদ্ধার পাত্র এবং গভীর সাংস্কৃতিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিই' সেন্সার রূপে নিযুক্ত হবার অধিকারী (The person should be of a high judicial status, commanding an eminent public position and pos-

'জীবনকাহিনী' চিত্রে সন্ধ্যা রায়

'একই অঙ্গে এত রূপ' চিত্রে মাধবী মুখোপাধ্যায় ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

sessing a depth of cultural background). ব্রিটিশ বোর্ড অব ফিল্ম সেন্সার্স-এর সচিব মিঃ ওয়াটকিন্স বলেছেন, যে-ভদ্রলোকের চলচ্চিত্রের প্রতি অনুরক্তি আছে এবং সেন্সারশিপের প্রতি একটি সুস্থ বিরূপতা আছে, তিনিই সেন্সার হবার যোগ্যতম ব্যক্তি। সেন্সারশিপকে সকলেই একটি অপরিহার্য মন্দ ব্যবস্থা বলে থাকেন। এই মন্দ ব্যবস্থাকেই যতদূর সম্ভব সহনীয় ক'রে তুলতে পারা যায়, যদি বিবাচক সংস্থার সভাবৃন্দ একটু উদার এবং খোলা সহানুভূতিশীল মন নিয়ে যুক্তিপূর্ণভাবে তাঁদের বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ করেন। এবং এই শুভবুদ্ধির প্রয়োগ মাত্র তাঁদেরই কাছ থেকে আশা করা যায়, যাঁরা চলচ্চিত্রশিল্পকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন।

*

'কাঞ্চনকন্যা' চিত্রে কণিকা মজুমদার ও সুস্মিতা সান্যাল

পর্দার অন্তরালে : নেপথ্য ভাষণ

ছায়াছবির জন্ম যাঁরা দেন, সেই সংগঠনকারীরা বলছেন...

[কোনো চিত্রগৃহে যখন আমরা ছবি দেখতে যাই, তখন প্রথমেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে ঐ ছবির প্রযোজক ও অন্যান্য সংগঠনকারীদের এবং ভূমিকাগ্রহণকারী শিল্পীদের নাম। কিন্তু ছবির কাহিনী আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে যখন শিল্পীদের আমরা প্রত্যক্ষভাবে দেখি, তখন তাদেরই সঙ্গে আমরা একাত্ম হয়ে যাই এবং ছবির শেষে পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করি, অমুক আর্টিস্টটি খুব ভালো অভিনয় করেছে, এবং অমুক আর্টিস্ট তেমন সুবিধে করতে পারেনি। এই আলোচনার সময়ে আমাদের মনেই থাকে না, ছবির কাহিনী এবং সেই কাহিনী থেকে চলচ্চিত্রে রূপায়ণের উপযোগী চিত্রনাট্যটি চরিত্রচিত্রণ, নাটকীয় পরিস্থিতি রচনা, ক্রমবর্ধমান কৌতূহল বা সাসপেন্সসৃষ্টি এবং নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাতের সাহায্যে চূড়ান্ত মুহূর্ত বা ক্লাইম্যাক্স রচনা প্রভৃতি বিষয়ে উৎকৃষ্ট না হ'লে শিল্পীরা তাঁদের নাট্যনিপুণতা দেখাবার সুযোগ পাবেন কি ক'রে? তার ওপর সুযোগ্য পরিচালক না হ'লে কাগজের ওপর কালির অক্ষরে লিখিত চিত্রনাট্যটিকে রূপরসে সঞ্জীবিত ক'রে প্রতিটি দৃশ্যকে সেলুলয়েড বা ফিল্মে রূপান্তরিতই বা করবে কে?

পরিচালককে চিত্রনাট্যে বিধৃত কাহিনীর চলচ্চিত্রায়ণে অকৃপণ সাহায্য করবার জন্যে যে দক্ষ আলোকচিত্রশিল্পী, শব্দ ও সঙ্গীতকে ফিল্মের ভিতর সার্থকভাবে ধরতে সক্ষম শব্দযন্ত্রী, ছবির ঘটনার অন্তর্বর্তী ভাবপ্রবাহ পরিচালকের কাছ থেকে বুঝে নিয়ে উপযুক্ত আবহসঙ্গীত রচনা এবং কাহিনীর যথাযথ বিন্যাসে সহায়ক গানগুলিকে সুরসমৃদ্ধ করতে সক্ষম সঙ্গীত-পরিচালক, কাহিনীর গতি ও নাট্যধর্মকে হৃদয়ঙ্গমক্ষম সম্পাদক এবং কাহিনীর উপযোগী দৃশ্যপট রচনা ও বহিঃপ্রকৃতি নির্বাচন করবার ক্ষমতাধারী শিল্পনির্দেশক এবং সবশেষে বহু শ্রম ও অজস্র অর্থব্যয়ে গৃহীত চিত্র ও শব্দকে উপযুক্ত যত্ন নিয়ে পরিস্ফুটন করেন এবং তার থেকে চূড়ান্ত চিত্র মুদ্রিত করেন, এমন সার্থক রসায়নাগারিকের একান্ত প্রয়োজন, এ-কথাও আমরা সবসময়ে স্মরণে রাখি না।

আমরা তাই ছায়াছবির দশজন প্রথিতযশা সংগঠনকারীকে পাঠকদের সামনে উপস্থিত করছি তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা বা বিশেষ বক্তব্যের মাধ্যমে। এই আলোচনায় প্রযোজক হিসেবে যিনি যোগ দিয়েছেন, সুখের বিষয়, তিনি কেবল অন্তরালেই নন, পর্দার পটভূমিতেও আমাদের কাছে সুপরিচিত। —নান্দীকর]

ছায়াছবির হাটে আমার তো মনে হয় কাহিনীকারের ভূমিকা নেহাৎই ছায়ামাত্র। গল্পটি নির্বাচিত হওয়ার পর কাহিনীকারের আর ভূমিকা কোথায়?

ছবির প্রয়োজনে চিত্রনাট্যকার সে কাহিনীকে কাটতে পারেন ছিঁড়তে পারেন, দুমড়ে মুচড়ে চেহারার বদল ঘটাতে পারেন, ভেঙে গালাই করে নতুন ছাঁচে ঢালাই করতে পারেন, কাহিনীকারের আপত্তির প্রশ্ন ওঠে না।

অবশ্য সব ক্ষেত্রেই এ রকম ঘটছে, বা ঘটে, বললে অন্যায় বলা হবে, কাহিনীকারের সঙ্গে পরামর্শ করেও চিত্রনাট্য লেখা হ'য়ে থাকে।

তবে অনেক ক্ষেত্রেই কাহিনী বা কাহিনীকার উপেক্ষিত।

তেমন ক্ষেত্রে ছবি যতই আর্থিক সাফল্যমণ্ডিত হোক, কাহিনীকারের মনে কিছু অভিমান থেকেই যায়।

তাছাড়া যখন কোন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকের পরিচিত গল্প, বা কোন বিশেষ সাহিত্য-মূল্য-সম্বলিত গল্প নির্বাচন করা হয়, তখন এটাই কি অনুমান করা সঙ্গত নয়, পাঠক-দর্শক সেই পরিচিত প্রিয় গল্পটিই দেখতে চায়। সে গল্পের অন্য রূপ দেখে খুশী হতে পারে না। ওটা অনেকটা আশাভঙ্গের মত লাগে। দর্শক হিসেবে এটা আমিও অনেক ক্ষেত্রে অনুভব করেছি। ছবির প্রয়োজনে কিছু পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং পরিবর্জন করতেই হয়, কিন্তু মূল সুর বা মূল আবেদনটি নষ্ট হলে কষ্ট হয়। মনে হয় ওই গল্পটি নেওয়ার সার্থকতা তবে কোথায়? কাহিনীকার হিসেবেও দু' এক ক্ষেত্রে এ অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে, অনেক পাঠক-দর্শক আমাকেই অভিযুক্ত করেছেন, 'এভাবে বদলাতে দিলেন কেন?'

উত্তর দিতে অসুবিধেয় পড়েছি, এবং মনে হয়েছে মূল কাহিনীর বক্তব্য বা সুরকে অক্ষুণ্ণ রেখেও কি প্রযোজক এই আর্থিক সাফল্য লাভ করতে পারতেন না?

(না, এটা ঠিক অভিযোগ নয়, একটা আলোচনা মাত্র। এ আলোচনা যদি সামান্যতমও অপ্রিয় হয়ে থাকে, তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করছি।)

দু-একটি বাদে আমার বাকী যে গল্প ক'টি ছবি হয়েছে, তাতে আমি খুবই সন্তুষ্ট। বিশেষ করে 'অগ্নি-পরীক্ষা', 'নবজন্ম', 'ছায়াসূর্য'।

কোন্ ধরনের কাহিনীতে ছবির সাফল্য, এ প্রশ্নের উত্তর কিছু বছর আগে সহজেই দেওয়া যেত। কারণ তখন মোটামুটি মানবিক আবেদন-সম্বলিত ঘরোয়া চিত্র, অথবা আশা-আনন্দ দুঃখ-বেদনা-সম্বলিত বিরহ-মিলন কথাই ছিল ছবির প্রধান উপজীব্য।

এখন আর উত্তর সহজ নয়।

এখন বহুবিচিত্র চিত্রকাহিনী নিয়ে পরীক্ষা চলছে, ছবি তার বাঁধাধরা পথ ছাড়িয়ে দূর-দিগন্তের সন্ধানে ফিরছে।

তবু—যদি বলতেই হয়, তো বলা চলে দু' ধরনের ছবি দর্শক-মনকে স্পর্শ করে। এক হচ্ছে সচরাচর যা দেখছি, আর এক হচ্ছে —সচরাচর যা দেখছি না।

প্রথমটি—যে চেনা মানুষ, আর চেনা সমস্যা নিয়ে ঘর করছি, তার চিত্ররূপ সহজেই মনকে আকৃষ্ট করে—অন্তরঙ্গতায় ধরা দেয়।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে চরিত্রপ্রধান। যেমন চরিত্র দেখছি না, দেখতে পাই না, তেমন একটি চরিত্র যদি ছবিতে দেখতে পাওয়া যায়, দর্শক-মন একটি পরমপ্রাপ্তির আনন্দে পুলকিত হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে ঘটনার অবাস্তবতা, পরিবেশের অস্বাভাবিকতাও উপেক্ষিত হতে পারে।

এই 'চরিত্র' আদর্শ চরিত্র হতে পারে, আবার উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রহীন বাউণ্ডুলে বেপরোয়াও হতে পারে। সে যে ছকে-বাঁধা গণ্ডীর ঊর্ধ্বে এইটাই আকর্ষণীয়। বেপরোয়ামির মধ্যে একটা বিশালতা থাকে, যা সমুদ্রের সঙ্গে তুলনীয়। সমুদ্র লবণাক্ত তবু সে মহান। বিশাল বলেই মহান।

এই সমুদ্রের স্বাদ আছে 'জীবানন্দে' দেবদাসে সতীশে'। তাই তারা চরিত্রহীন উচ্ছৃঙ্খল হয়েও বাঙালীর প্রাণের পুতুল।

অবশ্য এ সবই তুলনা মাত্র। সর্ববিধ ছবির সাফল্যই পরিচালনার উপর নির্ভরশীল, তাছাড়া আরো অনেক কিছুর উপরই। বস্তুতঃ ছবি জিনিসটা একটি সমষ্টিগত শিল্পকর্ম, কোনও একটি বিষয় নিয়ে বলা মানেই একাংশ মাত্র বলা। কাহিনীকার হিসেবে আমার বক্তব্য—কোন্ ধরনের কাহিনি সাফল্য লাভ করে—একথা বলা কঠিন। বহু-বিচিত্র অনুভূতির তারে-বাঁধা মানব হৃদয় যন্ত্রের কোনো একটি তার সত্যিকার ঘা দিতে পারলেই সে কাহিনী উত্তীর্ণ হয়ে যায়।

যদিও ছবির কাহিনীকার হিসেবে কিছু বলার অধিকার আমার আছে কিনা আমি জানি না। কারণ পুরো দশ বছর আগে ১৯৫৩ সালে আমার প্রথম গল্পের চিত্ররূপ 'যোগবিয়োগ' (আজ প্রোডাকশান—অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়) হবার পর এপর্যন্ত আমার আর মাত্র ছটি গল্পের বাংলা চিত্ররূপ—(অগ্নি-পরীক্ষা' (অগ্রদূত), 'বলয়গ্রাস' (পিণাকী মুখোপাধ্যায়), 'কল্যাণী' (নীরেন লাহিড়ী), 'নবজন্ম' (দেবকী বসু), 'শশীবাবুর সংসার' (সুধীর মুখোপাধ্যায়), 'ছায়াসূর্য' (পার্থপ্রতিম চৌধুরী) ও দুটি অ-বাংলা 'যোগ-

'স্বর্গ হতে বিদায়' চিত্রে মাধবী মুখোপাধ্যায় ও দিলীপ মুখোপাধ্যায়

বিয়োগ' (তামিল), 'অগ্নিপরীক্ষা' (তামিল) ছবি পর্দায় প্রদর্শিত হয়েছে। আর একটি 'তা' হলে' (গুরু বাগচী) প্রস্তুতির পথে।

অবশ্য একটি বাংলা ('ছাড়পত্র) (প্রভাত মুখোপাধ্যায়) ও কয়েকটি অ-বাংলা (ছাড়পত্র শশীবাবুর সংসার, যোগাবিয়োগ (এ-ভি-এম) 'অগ্নিপরীক্ষা' (উত্তমকুমার) প্রস্তুতির অপেক্ষায় আছে, কিন্তু সেগুলি কবে হবে, অথবা শেষ পর্যন্ত সবগুলি হ'বে কিনা জানি না।

কাজেই আমার কাহিনীকার হিসেবে অভিজ্ঞতা মাত্র ওই ছ'-সাতটি গল্পের। তথাপি যে আমার কাছে এ প্রশ্ন করা হয়েছে এটা আমার প ক্ষ যেমন গৌরবের, তেমনি বিস্ময়েরও। আমার বক্তব্য বলতে পাওয়ার জন্য আমি প্রশ্নকর্তার কাছে কৃতজ্ঞ।

চলচ্চিত্র-জগতে যাঁদের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ আমার হয়েছে, আমার বিশেষ সৌভাগ্যবশে তাঁদের সকলের সঙ্গেই আমার ব্যবসায়িক সম্পর্ক গৌণ হয়ে গিয়ে প্রীতির স্নেহের ও সৌহার্দ্যের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। দেবকী বসু মহাশয়ের শান্ত সহৃদয়তা ও আন্তরিকতা আমাকে অভিভূত করে, পিণাকী মুখোপাধ্যায় তো আমার ছোট ভাইদের একজন। চলচ্চিত্র-জগতের আরো অনেকের কাছেই আমি স্নেহ-ঋণে ঋণী।

বাংলা চলচ্চিত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেক আলোচনা হ'তে দেখি। আমি এ বিষয়ে খুব একটা কিছু ভেবে দেখিনি। তবে মনে হয়—এই বিজ্ঞানের উন্নতি ও চিন্তার অগ্রগতির যুগে 'ভবিষ্যৎ অন্ধকার' ভাববার কোনো হেতু নেই। বাইরের কোন বাধা বা আইনের কড়াকড়ির অসুবিধে নিশ্চয়ই কাটিয়ে উঠে উত্তরোত্তর উন্নতির পথেই এগিয়ে যাবে সে।

আর একটি কথা—যেটা হয়তো এখানে অবান্তর, তবু বলার বাসনা সংবরণ করতে পারছি না। ভারতীয় ছবি আজ আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করছে এটা আনন্দের কথা, তথাপি বিদেশে প্রেরণের সময় ছবি নির্বাচনের ব্যাপারে জাতীয় মর্যাদার প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। বিদেশী গল্পানুগ কাহিনীগুলিও যেমন বর্জনীয়, তেমনি বর্জনীয় ভারতের দৈন্য-দুর্দশা অনাচার-কুসংস্কার ইত্যাদির স্পষ্ট উদ্ঘাটনযুক্ত কাহিনী।

—আশাপূর্ণা দেবী
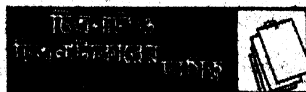
হলিউডের প্রখ্যাত প্রযোজক গোল্ড-উইনকে এক চিত্র-সমালোচক প্রশ্ন করেছিলেন—"উৎকৃষ্ট চিত্র নির্মাণের পক্ষে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কি? প্রযোজক, পরিচালক

না অভিনেতা-অভিনেত্রী?" গোল্ডউইন উত্তর দিয়েছিলেন—"গল্প ও চিত্রনাট্য। জল যেমন তার উৎসমুখের চেয়ে উচ্চে উঠতে পারে না, উত্তম চিত্রনাট্য—উত্তম পরিচালক ও অভিনেতা-অভিনেত্রী সৃষ্টি করে। চিত্র-নাট্য যদি দুর্বল হয়, তবে যত বড় পরিচালক বা অভিনেত্রী বা অভিনেতা দাও না কেন—যত টাকাই খরচ কর না কেন—ছবি কিছুতেই ভাল হবে না।"

কথাটা খুবই সত্য। বাঈজীর পক্ষে সারেঙ্গীদার যেমন, চিত্ররূপায়ণের পক্ষে চিত্রনাট্যকারও তেমনি। সারেঙ্গবাদক বাঈজীকে যেমন অনুসরণ করে, তেমনি তাকে আবার নেতৃত্বও করে—পরের সুর ও তাল দেখিয়ে দিয়ে। চিত্র-নাট্যকারের দায়িত্ব অনেকটা ঐ রকম।

সাধারণ লোকের ধারণা চিত্র-নাট্যকার বুঝি চিত্র-কাহিনীর নাট্যরূপ দেন—অর্থাৎ তার সংলাপই শুধু লেখেন। ওটা তাঁর অবশ্যকর্ম নিশ্চয়ই—কারণ সংলাপই মঞ্চ-নাটকের মত চিত্রনাট্যের কথা-অংশের মূল উপাদান। কিন্তু তা ছাড়াও তাঁর আর একটি বড় কাজ হচ্ছে চিত্র-অংশকে পরিস্ফুটন করা, সংলাপের সাহায্যে এবং চিত্র-অংশের সঙ্গে সংলাপের মনোহর সমন্বয় সাধন করা।
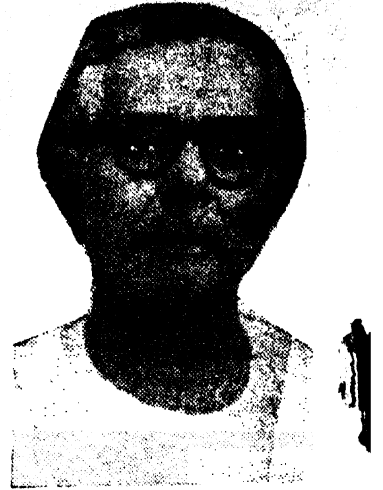
বাণীর সঙ্গে সুরের ও সুরের সঙ্গে বাণীর সার্থক মিলন ঘটানো যেমন সুরকারের কৃতিত্বের পরিচয় তেমনি চিত্রের সঙ্গে তার সংলাপ-অংশের ও সংলাপ-অংশের সঙ্গে চিত্রের সার্থক মিলন ঘটানো—চিত্র-নাট্যকারের কৃতিত্বের পরিচয়।

এইখানে আর একটা কথা জানা দরকার যে, মঞ্চ-নাটকের সঙ্গে চিত্র-নাটকের প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। মঞ্চশিল্প থেকে চলচ্চিত্রের শিল্পকলা সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র—প্রখ্যাতনামা পরিচালক পুডফকিন্‌-এর এই উক্তি অতিশয়োক্তি নয়, চিত্রের আসল গতি বা মেজাজ হচ্ছে চিত্রের মূল কথা। মঞ্চ-নাটকে যে গতি আছে চরিত্র বিকাশের ও ড্রামাটিক ক্যাটাসট্রফিকে এগিয়ে আনার জন্য—তার মূল উপাদান দৃশ্যপট, নয়......সংলাপের সংঘাতের মধ্য দিয়ে নাটকীয় চরিত্রের সংঘর্ষ। দৃশ্যপট সেখানে গৌণ। কিন্তু চিত্র-শিল্পে দৃশ্যের পর দৃশ্য সংযোগ করে এবং তার সঙ্গে ভাবপ্রকাশের জন্য—উপযুক্ত স্থানে সিম্বলিক সট্‌ ও ভিস্যুয়াল মেটাফার যোগ করে সেই সঙ্গে চিত্রানুগ সংলাপের সাহায্যে এগিয়ে আনতে হয় ঐ নাটকীয় সংঘাতকে। চিত্র-নাটকে এক কথায় বলা যেতে পারে চিত্রানুগ নাটক—যেখানে চিত্রই মুখ্য এবং সংলাপ অপেক্ষাকৃত গৌণ। এটা হচ্ছে তার দায়ভাগ। কারণ নির্বাক চিত্র থেকেই সবাক চিত্রের জন্ম।

প্রত্যেক শিল্পেরই একটা নিজস্ব শৈলী বা প্রকাশভঙ্গী আছে। আজকে চিত্রশিল্প শুধু একটা প্রকাণ্ড ব্যবসা-পর্যায়ে উন্নীত হয়নি; মানুষের আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হিসেবে শুদ্ধ শিল্পের সমস্ত গুণাবলী লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।

চিত্রশিল্প একটা কম্পোজিট্‌ আর্ট, অর্থাৎ চিত্রগ্রহণ, শব্দগ্রহণ, অভিনয়-মূকাভিনয়-নাচ-গান-আবহসঙ্গীত প্রভৃতি অজস্র শিল্পের সমন্বয় হয় চিত্রশিল্পে,—যেখানে আছে আর্ট এবং কার্পেন্ট্রির মনোহর সাক্ষাৎ। সার্থক চিত্র-নাট্যকারকে এ সমস্ত বিষয়ে অবহিত হয়ে তাঁর নৈপুণ্য প্রয়োগ করতে হয়।
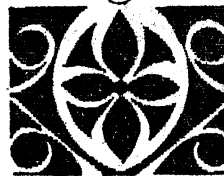
সার্থক চিত্রনাট্য তৈরী করতে হলে—চিত্রনাট্যকারকে ভাবতে হবে—চিত্রশিল্পের আঙ্গিকের দিক থেকে। কাহিনীতে যা ব্যক্ত হয়েছে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষর মধ্য দিয়ে, বলিষ্ঠ দৃশ্যের পর বলিষ্ঠ দৃশ্য যোগ করে তাই দেখাতে হবে চিত্রে প্রয়োজনমত সারবস্তু সংলাপের সাহায্যে। চিত্রগ্রহণের মূল উপকরণ হচ্ছে ক্যামেরা যা অসাধ্যসাধনে পটীয়সী। দিগন্ত-প্রসারিত আয়ত দৃশ্যপট থেকে আরম্ভ করে মানসিকতার গভীরতম—গোপনতম ক্রিয়ামূলের চিত্র প্রকাশ করা তার সাধ্যের বাইরে নয়। শব্দগ্রহণ-যন্ত্রের নৈপুণ্যও অনুরূপ। চিত্র-নাট্যকারের অন্যতম কাজ—অযথা সংলাপের চাপে যথাযথ চিত্রগ্রহণ ও শব্দগ্রহণের পথে বাধা সৃষ্টি না করা। এ-দায়িত্ব চিত্রনাট্যকারকে বহন করতে হবে সমান ভাবে পরিচালকের সঙ্গে।

প্রসিদ্ধ পরিচালক আইজেনস্টাইন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ওয়ার্ডস য়্যান্ড ইমেজেস'-এ বলেছেন শব্দের একটা অনুরূপ চিত্র আছে। শব্দচয়ন ব্যাপারে সার্থক চিত্রনাট্যকারকে সেই সকল শব্দই বেছে নিতে হবে—যা সেই বিশেষ ছবির পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী।

অবশ্য সব সময় যে চিত্রনাট্যকার আদর্শের অনুরূপ কাজ করতে পারেন বা করার চেষ্টা করলেও তা গৃহীত হয়—তা নয়।

কোন ভাল উপন্যাসের সার্থক চিত্ররূপের পরে চিত্রনাট্যকারকে শুনতে হয়—"ছবি তো ভালই হয়েছে—কিন্তু আমার বইয়ের তো কিছুই তেমন রাখেন নি।" অনেক সময় লাখ টাকা দামের নায়ক-নায়িকার কথামত চিত্র-নাট্যের পরিবর্তন করতে হয়—কারণ পাঁচ হাজার টাকা দামের কাহিনীর চিত্র-নাট্যকারের দাম খুব বেশী আড়াই হাজার টাকা মাত্র। আর পরিচালক পান নায়ক-নায়িকার অর্ধেক বা তারও কম, এবং প্রযোজকদের ধারণা লাখ টাকা দামের নায়ক-নায়িকারাই ঠিক। তাঁদের দামও যেমন বেশী এবং মোটা লাভও তাঁদের জন্যই হয়। অবশ্য বর্তমানে অন্তত একজনও পরিচালক আছেন—যিনি এই রীতি ভোলাচ্ছেন—তিনি সত্যজিৎ রায়।

এই প্রবন্ধ-লেখকের অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে একটির উল্লেখ করা হচ্ছে। আমার একটি 'বক্স-অফিস'-ধন্য কাহিনী ও চিত্রনাট্য পরিচালক ও প্রযোজক খুব পছন্দ করলেন, প্রযোজক বললেন—ঐ বিশেষ চরিত্রে আমি অমুক অভিনেতাকে নেবো, তিনি খুব ভাল মৃত্যু-দৃশ্য অভিনয় করতে পারেন। কাজেই ঐ চরিত্রকে মেরে ফেলুন!" আমি বললাম, "কাহিনীতে কেউ মরে নি—কারণ তাদের মরবার দরকার নেই। জীবনে বিনা কারণেই মানুষ মরতে পারে কিন্তু সাহিত্যে তা হয় না, মরবার যথেষ্ট নাটকীয় কারণ না থাকলে কারো মৃত্যু ঘটে না।" তিনি জেদ করলেন, আমি বললাম, "এক কলমের খোঁচায় আমি তাকে মেরে ফেলতে পারি—তবে আমার গল্প মরে যাবার সম্ভাবনা আছে।" শেষে ঠিক হ'ল ঐ চরিত্র মরবে—আর আমি তাকে মেরে ফেলার মজুরী বাবদ আরও পাঁচশ টাকা বেশী পাবো।

তাই-ই হ'ল, কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলব ঐ গোল্ডউইনের কথা। এক চিত্রনাট্যকারের সঙ্গে গোল্ডউইনের মতান্তর হয়। চিত্রনাট্যকার লিখেছেন—নায়িকা পঞ্চাশ হাজার ডলারের মালিক। গোল্ডউইন বললেন, "নায়িকাকে পঞ্চাশ লক্ষ ডলারের মালিক করো", চিত্রনাট্যকার রাজী হন না কিছুতেই—নানা যুক্তি দেখান তাঁর স্বপক্ষে। তখন গোল্ডউইন তাঁকে জানলার কাছে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন—তোমার গাড়ী কোনটি? চিত্রনাট্যকার তাঁর গাড়ী দেখিয়ে দেন। গোল্ডউইন হেসে বলেন, 'ঐ পচা ফোর্ড গাড়ীটা তোমার! আমার গাড়ী দেখ, ঐ বিরাট ক্যাডি। কাজেই আমার কথাই ঠিক আর তোমার কথা ভুল।" আমাদের দেশেও যিনি চেকে সই করেন—তিনি সম্ভ্রান্ত—আর যিনি যত বেশী মাইনে পান তাঁর কথা তত ঠিক! টাকার দাম দিয়ে বিচার হয় শিল্প-বুদ্ধি—আমেরিকার মত আমাদের দেশেও।

কাহিনী (নাটক বা উপন্যাস) এক আঙ্গিক অনুসরণ করে, চিত্র অনুসরণ করে সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিককে। সাতাশ পাতার কাহিনী চিত্রে রূপান্তরিত হয়—মাত্র বার হাজার ফুটে। আবার চার পাতার কাহিনী থেকে ষোল হাজার ফুটের চিত্র হয়। হিমালয় বা সমুদ্র বর্ণনায় লেখক যেখানে ব্যয় করছেন পঞ্চাশ পাতা—মাত্র পঞ্চাশ

ফুটের প্যানারমিক শট্-এ চিত্রে অনেক সার্থক দৃশ্যায়ন হয় সেই পর্যন্ত বা সমুদ্রের। যে মানসিক দ্বন্দ্ব বর্ণনা করতে লেখকের লেগেছে পঞ্চাশ পাতা—চিত্রে গোটা কতক সিম্বলিক শট ও ভিস্যুয়াল মেটাফার ব্যবহার করে তার যথার্থ রূপ দেওয়া যায়। কাহিনীর যে সব ঘটনা ক্রমিকধারায় বলতে লেখকের লেগেছে পাঁচশ পাতা—আর পঁচিশ বছর,—মাত্র নব্বুই মিনিটে আর পাঁচশ' শট-এ চিত্রে তা বলা যায়, একটা ক্লোজ-আপ চরিত্রের যে সংঘাত ফুটিয়ে তুলতে পারে চিত্রে তা বর্ণনা করতে লেখকের লাগে অনেক পাতা। গল্প যেমন এক যে ছিল রাজা—না বলে যেখান-সেখান থেকে আরম্ভ করা যায়—চিত্রও তাই—তবে চিত্রের একটা ঘটনাক্রম থাকা চাই। নাটক একটা কঠিন নিয়মে বাঁধা। উপন্যাসের মত এক কাহিনী বলতে বলতে অন্য কাহিনীতে যাওয়ার অবাধ স্বাধীনতা বা স্বেচ্ছাচারিতা নাটকে আসতে পারে না। চিত্রনাট্যেরও ঐ রকম একটা কঠিন নিয়ম আছে—যা নাটকের মত না হলেও কখনও স্বেচ্ছাচারী নয়। এক কথায় উপন্যাসের ঘটনার প্রকাশ—বর্ণনার মাধ্যমে, নাটকের ঘটনার প্রকাশ সংলাপের মাধ্যমে আর চিত্রে প্রকাশ চিত্র ও সংলাপের মাধ্যমে। নাটক আর চিত্রের আর একটি প্রধান পার্থক্য হচ্ছে—অভিনয়-ভঙ্গীর পার্থক্য। "ইন সিনেমা ইউ আর নট টু অ্যাক্ট, বাট টু বি"—এ উক্তি সর্বাংশে সত্য।

নাটকে, উপন্যাসে ও চিত্রে এক একটা গল্প বলা হয়। নাটকে গল্প-বলার রীতি একরকম, উপন্যাসে সম্পূর্ণ অন্যরকম। চিত্রে গল্প-বলার রীতি তার নিজস্ব। আঙ্গিক বা টেকনিক-এর বিভিন্নতার জন্যই এ-পার্থক্য। উত্তম উপন্যাস ও নাটকের উত্তম চিত্রনাট্য এর সাক্ষী দেবে। নাটকে স্থূল ও মোটা ঘটনার স্থান নেই—স্থান নেই অতি সূক্ষ্ম অভিব্যক্তির। চিত্রে দুয়েরই প্রধান স্থান আছে। হাজার হাজার লোক নিয়ে যুদ্ধও দেখাতে পারে চিত্র—পারে এক নিমিষের একটি চাহনিকে বড় করে পর্দায় ফেলে গভীরতম অনুভবকে প্রকাশ করতে। সকল চিত্র-নাট্যকারের এ-বিষয় সজাগ দৃষ্টি ও সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার।

যেহেতু চিত্রনির্মাণে পরিচালকের স্থান সবচেয়ে উঁচুতে সেইহেতু চিত্র-নাট্যকারকে রচনা করতে হয় চিত্রনাট্য তাঁর সঙ্গে সহযোগিতায়। নাট্যকার-কাহিনীকার, এমন কী পরিচালকেরও একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী থাকতে পারে। কিন্তু চিত্র-নাট্যকারকে হতে হবে সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক ও বিশেষ ফ্যাড-বিরহিত, যখন যে বইয়ের চিত্রনাট্য করার দায়িত্ব যাঁর উপর আসবে—তখন তাঁকে সেই বইয়ের মূল বক্তব্যের মধ্যে ডুবে যেতে হবে। কিন্তু তবুও থাকবে তাঁর নিজস্ব স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য। চিত্রনাট্যের সবচেয়ে বড় ত্রুটি চিত্রধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হওয়া।

একাধিক চিত্রনাট্যকারের দ্বারা একই ছবির চিত্রনাট্য করানোর রীতি পাশ্চাত্য দেশে প্রচলিত আছে। আমাদের দেশেও তা কখনও কখনও হয়ে থাকে।

চিত্রনির্মাণ ব্যাপারে চিত্র-নাট্যকারের দায়িত্ব খুব বেশী হলেও তাঁর জীবন অনেক সময় খুব সুখের নয়—যদিও চিত্র-নির্মাণ টিমের মধ্যে বিদ্যাবুদ্ধির মাপকাঠিতে তিনি প্রায় সময়ই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং শ্রেষ্ঠ দরিদ্র। অমুক মনিবের চাকর তিনি—প্রযোজক-পরিচালক তো আছেনই—তার ওপর আছেন পরিচালকের সহকারীবৃন্দ—যাঁরা প্রায়ই সবজান্তা। চিত্রগ্রহণ, শব্দগ্রহণ, পরিচালনা হচ্ছে 'এক্সপার্ট জব'। কিন্তু বহু লোকেরই ধারণা— তাঁরা চিত্রনাট্য বা গল্প-রচনা সম্বন্ধে এক্সপার্ট, ওটা এতো সহজ ব্যাপার! গল্প সকলেই বোঝে। সব চিত্রনাট্যকারকে প্রায়ই একটি কথা শুনতে হয়—"সবই হয়েছে, তবে ঠিক জমল না—বা গপ্ করে ধরল না।" "এই জায়গাটা আর একটু উঁচু করে তুলতে হবে"—কাহিনী ও উঁচু করবার কোন জ্ঞান না থাকলেও। "নায়ক এবং নায়িকার সংলাপ বলতে আটকে যাচ্ছে, তাই এ-সংলাপ বদলাতে হবে।" অনেক সময় উচ্চমূল্যের নায়িকারা পরিচালককে বলেন নিজের অক্ষমতা ঢাকার জন্য, "ও কথাগুলো ঠিক লাগছে না বা হচ্ছে না, বদলে দিন।" পরিচালকের পরিচালনায় বেচারা চিত্র-

নাট্যকারকে বদলে দিতে হয়। কারণ লাখ টাকা দামের নায়িকাকে পরিচালক চটাতে সাহস করেন না। আর আড়াই হাজার টাকার চিত্রনাট্যকার তো তুচ্ছ।

এমন ক'জন খ্যাতিলোভী পরিচালক বাংলা দেশে আছেন যাঁরা চিত্রনাট্যকারের তৈরী চিত্রনাট্যের শট ভাগ করে জানিয়ে দেন চিত্রনাট্য ও পরিচালনা তাঁদেরই নিজের। বেচারী চিত্রনাট্যকার তাঁর সামান্য খ্যাতি থেকেও অনেক সময় বঞ্চিত হন। কারণ তাঁর দায়িত্ব গুরু হলেও অধিকার নেই বললেই চলে। রাজার নন্দিনী প্যারী—যা করিস তা শোভা পায়।

আমেরিকায় 'রাইটার্স' গিল্ড' তৈরী করে চিত্র-লেখকেরা তাঁদের অধিকার বজায় রেখেছেন। কিন্তু আমাদের দেশে তা এখনো হয়নি। কারণ ব্যবসা সুপ্রতিষ্ঠিত না হলে কর্মীদের দাবীর প্রতিষ্ঠা হয় না।

চিত্রনাট্যকাররা যে সব সময় তাঁদের কাজের উপযোগী তাও না। একজন খ্যাতিমান লেখক হতে পারেন—কিন্তু চিত্রনাট্যকার হতে পারেন না, কারণ চিত্র ও চিত্রনাট্য সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ঐ সিনেমা দেখা পর্যন্ত। তার ওপরে চিত্রনির্মাণ ব্যাপারে একটা ম্যাড জিনিয়স থাকা যেমন থাকে চিত্রনাট্যকারের ও পরিচালকের;—যেটা সাধারণত লেখকদের মধ্যে অভাব;—সেটা হচ্ছে একটি অদ্ভুত স্বয়ংসিদ্ধ নাটকীয়তার জ্ঞান। স্বভাবসিদ্ধ পটুত্বে উপন্যাস বা গল্প-লেখকের চেয়ে নাট্যকার অনেক সময় বেশী ভাগ চিত্রনাট্যকার হন।

চলচ্চিত্র শুদ্ধ শিল্পের মর্যাদায় উন্নীত হলেও চিত্রনাট্য এখনও শুদ্ধ নাটকের সম্মান পায়নি, তার অনেক কারণের মধ্যে একটি কারণ ভারতীয় চিত্র-ব্যবসায় চিত্রনাট্যকার এখনও বেশীর ভাগ সময়—আজ্ঞাবহ বশংবদ হ্যাক মাত্র।

তবে বাংলা দেশের চিত্রশিল্পে আজ যে নবজাগরণ দেখা দিয়েছে তাতে আশা করা যায় চলচ্চিত্রে অগণ্য কর্মীদের সঙ্গে চিত্রনাট্যকারও তাঁর উপযুক্ত স্থান ও মর্যাদা পাবেন। অলমতি বিস্তরেণে।

—নিতাই ভট্টাচার্য

পরিচালকের দায়িত্ব

ছাত্রাবস্থায় কোনো ভালো ছবি দেখলে একটা প্রশ্ন প্রায়ই মনে জাগত। প্রশ্নটি হোল—এই ভালো ছবির কোন কোন ভালো জিনিসটির জন্য পরিচালক দায়ী? ভালো অভিনেতা ভালো অভিনয় করবেন, এতে আর আশ্চর্য কী? ভালো ক্যামেরাম্যান তাঁর কাজ ভালোভাবেই জানেন, যেমন জানেন ভালো শিল্পনির্দেশক; এখানে পরিচালকের কারসাজি কোথায়? শব্দগ্রহণের উৎকর্ষের জন্যই বা পরিচালক কোন বাহবা নিতে পারেন? আর সম্পাদনা? তার জন্যে ত অভিজ্ঞ সম্পাদক রয়েইছেন। পরিচালকের কাছে তাঁর নতুন করে দেখার কিছু আছে কি?

আমি অনুমান করি আজও হয়ত অনেকের মনে এই ধরনের প্রশ্ন জাগে। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে যে একক ভাবে এইসব কলাকুশলী যতই দক্ষ হ'ন না কেন, কোন একজন ব্যক্তিসম্পন্ন অধিনায়কের নির্দেশ না পেলে এ'দের বিভিন্নধর্মী প্রয়াসকে সুসংবদ্ধভাবে একত্র করে একটা ছবির কাজে প্রয়োগ করা অসম্ভব। উপরন্তু, কোন ছবির কাজের শেষে সমগ্র ছবির চেহারাটি কেমন দাঁড়াবে। তাঁরই মানসকল্পিত রূপটি পর্দায় প্রতিফলিত হোক, এই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য।

অভিনেতা যতই উঁচুদরের শিল্পী হন না কেন, কোন দৃশ্যে তাঁর অভিনয়ের মাত্রা কী হবে, সেটা বিচার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, যেহেতু সমগ্র ছবির কল্পনাটি তাঁর নয়, পরিচালকের। পরিচালক নিজে দক্ষ অভিনেতা না হলেও অভিনয়ের রীতি আকারে-ইঙ্গিতে প্রকাশ করার ক্ষমতা তাঁর থাকা চাই। অভিনয়ের দোষগুণও তাঁকে বিচার করতে হয়, এবং দোষ হলে সে-দোষ সংশোধনের উপায় জানতে হয়।

পরিচালকের দ্বিতীয় কাজ হ'ল, কোন্ বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে একটি দৃশ্যকে

দেখতে হবে সেটা বিচার করা। দৃষ্টিকোণ নির্বাচনের ভুলে ভালো অভিনয়ও মাঠে মারা যেতে পারে, সুলিখিত নাটকীয় দৃশ্য পর্দায় নিষ্প্রাণ মনে হতে পারে। এইখানে ক্যামেরাম্যানকে নির্দেশ দেওয়ার প্রয়োজন এসে পড়ছে। ক্যামেরাযন্ত্রের ব্যবহার হাতে-নাতে না শিখলেও, ক্যামেরার দৌড় কতখানি, তার বিভিন্ন লেন্সের কী ব্যবহার, কী বিশেষত্ব; ক্যামেরা এগোনো-পেছোনোর প্রয়োজন কখন, তার সার্থকতা কী—এইসব জানতে হবে।

শব্দযন্ত্রীর কাজও পরিচালকের নির্দেশের অপেক্ষা রাখে। শব্দগ্রহণের যান্ত্রিক সমস্যায় তাঁর কোন হাত নেই, তবে কোন দৃশ্যে কোন শব্দ কীভাবে ব্যবহার হবে সে-জ্ঞান পরিচালকের থাকা দরকার। স্টুডিওর কৃত্রিম পরিবেশে তোলা দৃশ্যকে আশ্চর্য বাস্তব ও বিশ্বাস্য করে তোলা যায় শব্দের ব্যবহারে।

সবশেষে সম্পাদনার কাজে পরিচালককে অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়, কারণ সম্পাদনাই চলচ্চিত্রে গতি ও প্রাণসঞ্চার করে। অসংলগ্ন কতগুলি শট্ ও দৃশ্যকে কীভাবে পরপর জোড়া হবে তার মোটামুটি ইঙ্গিত চিত্রনাট্যেই দেওয়া থাকে। কিন্তু সব সময়ে সেসব ইঙ্গিত অক্ষরে অনুসরণ না করে প্রয়োজন বুঝে কিছু

অদলবদল করতে হয়। পরিচালক সম্পাদকের পাশে থেকে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে সেইসব পরিবর্তন করেন।

অভিনেতা, ক্যামেরাম্যান, শিল্পনির্দেশক মেকআপম্যান, সম্পাদক—এঁদের সকলকেই যেমন পরিচালক নির্দেশ দেন, তেমনি আবার সময় সময় এঁদের ব্যক্তিগত মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্য নিতেই কসুর করেন না। এই কারণেই শেষপর্যন্ত চলচ্চিত্র-রচনায় একটা যৌথশিল্পের দিক থেকেই যায়। তাই সব সময়েই কোন ছবি ভালো হলে তার জন্য বাহবা পরিচালকের সঙ্গে সঙ্গে কলাকুশলীদেরও আংশিকভাবে প্রাপ্য।

—সত্যজিৎ রায়

আলোকচিত্রশিল্পী বলে আমি
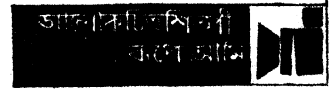
চলচ্চিত্র-জগতে আমার প্রবেশের ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত ধরণের বললেও অন্যায় হবে না। এদেশে সিনেমেটোগ্রাফী শেখাবার জন্যে কোনো ভালো স্কুল না থাকায় ক্যামেরাম্যান যাঁরা হতে চান, তাঁদের মধ্যে প্রায় সকলেই কোনো না কোনো ক্যামেরাম্যানের সহকর্মী বা সহকারী হিসেবে জীবন আরম্ভ করেন। আমিও তাই করতে চেয়েছিলুম, কিন্তু কোথাও কোনো সুযোগ পাইনি। এমনকি বিদেশে গিয়ে বিদ্যেটা আয়ত্ত করবার কথাও ভেবেছিলুম এবং যদি 'পথের পাঁচালী'র কাজে ব্রতী না হতুম, তাহ'লে হয়ত বিদেশের কোনো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়ে সিনেমেটোগ্রাফী শিখেও আসতুম। আমাদের দেশে আজ অবশ্য সিনেমেটোগ্রাফী শেখবার সুবিধে হয়েছে; কিন্তু এই সুবিধে কি অসুবিধেরই সৃষ্টি করছে না, এ প্রশ্নও মনে জাগছে।

মহানগর চিত্রে মাধবী মুখোপাধ্যায় ও অনিল চট্টোপাধ্যায়

কারণ চিত্রজগতে যাঁরা ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত ক্যামেরাম্যান, তাঁদের সবাইকেও সর্বক্ষণের জন্যে নিযুক্ত রাখার ক্ষমতা আমাদের চলচ্চিত্র-শিল্পজগতের নেই। কাজেই আরও নতুন ক্যামেরাম্যান সৃষ্টি হ'লে নতুনতর সমস্যার সৃষ্টি হয় না কি? কিন্তু এখানে সে আলোচনা অবান্তর।

ছেলেবেলা থেকেই হয় ক্যামেরাম্যান নয় আর্কিটেক্ট হবার বাসনা ছিল। কিন্তু আই-এসসি পাশ করবার পর একেবারে ঠিকই করে ফেললুম যে, চলচ্চিত্রের ক্যামেরাম্যানই হব। কিন্তু সুযোগ কোথায় শেখাবার? অতএব বাবা-মা বললেন, বি-এসসিটা পড়; পড়তে পড়তে যদি কোনো সুযোগ এসে যায়, পড়া ছেড়ে দিলেই হবে। সুযোগ জুটেও গেল। বিখ্যাত চিত্র-পরিচালক জাঁ রেণোয়া এলেন, 'রিভার' ছবি তুলতে। আমি তাঁর দলের ভারতীয় কর্তাদের সঙ্গে দেখা করলুম; তাঁরা সোজা না করে দিলেন। শেষে পরিচালক, প্রযোজক এবং ক্যামেরাম্যানের সঙ্গে দেখা করলুম; তাঁরাও সমান উত্তর দিলেন—নতুন কোনো লোককে নেওয়া সম্ভব নয়। শেষে অনেক বলা-কওয়াতে তাঁরা আমাকে ছবিখানির স্যুটিং দেখবার সুযোগ দিতে রাজী হলেন। আমি এই সুযোগটুকু পেয়েই নিজেকে ভাগ্যবান মনে করলুম। বি-এসসি পড়ায় ইস্তফা দিয়ে আমি শিক্ষার্থী ছাত্রের মত 'রিভার' ছবির স্যুটিং আগাগোড়া দেখতে লাগলুম। অত্যন্ত একাগ্রতার সঙ্গে। তবে, সকলেই জানেন, ছবিটি রঙীন ছিল কাজেই ঐ রঙীন ফোটোগ্রাফীর যেটুকু কায়দা-কানুন দেখে দেখে শিখেছিলুম বলে মনে হয়েছিল, তা' কাজে লাগাবার সুযোগ আজও পাইনি।

সত্যজিৎ রায়ের পরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিবারের অনেক দিনের পরিচয় থাকলেও সত্যজিৎবাবুর সঙ্গে আমার কোনো ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না; শুধু জানতুম, তিনি বইয়ের প্রচ্ছদপটের একজন নামকরা ডিজাইনার এবং স্বনামধন্য সুকুমার রায়ের পুত্র। শুনলুম, তিনি একটা ছবি করবেন এবং এজন্যে প্রচুর পড়াশুনো করছেন। আমি তাঁর সঙ্গে আলাপ করে তাঁর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পেলুম যে, তিনি পথের পাঁচালীর কাজ শুরু করলে আমাকে তাঁর ক্যামেরাম্যানের সহকারী হবার সুযোগ দেবেন। কিন্তু যাঁর এতে ক্যামেরাম্যান হিসেবে কাজ করবার কথা ছিল, তিনি বেশী দিন বেকার বসে থাকতে না পেরে বাংলাদেশের বাইরে চলে গেলেন। তাই যখন সত্যি সত্যিই 'পথের পাঁচালী' তোলবার ব্যবস্থা পাকা হ'ল, তখন সত্যজিৎবাবু আমাকে বললেন, তুমিই এর ক্যামেরার কাজ কর। এই প্রস্তাবটা আমার কাছে যেমন বিস্ময়কর তেমনই রোমহর্ষক মনে হয়েছিল; কারণ এর জন্যে আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলুম না। মানিকদা (সত্যজিৎবাবু) বললেন, তুমি যখন স্থিরচিত্র এত ভালো তুলতে পার, তখন চলচ্চিত্রই তুলতে পারবে না কেন—ও ত' স্থিরচিত্রেরই সমষ্টি (সিরিজ অব স্টীল পিকচার্স)। আমি তাঁর কথাতে রাজী হলাম; কিন্তু পরে বুঝেছিলাম, তফাৎ আছে বৈকি! আমার জানা নেই, পৃথিবীতে এমন কোনো পরিচালক আছেন কিনা, যিনি তাঁর প্রথম ছবি পরিচালনা করতে গিয়ে এমন একজন আনাড়ী লোককে ক্যামেরাম্যান হিসেবে নিয়ে কাজ করেছেন। অবশ্য এ সম্পর্কে তাঁর বহু শুভানুধ্যায়ীর কাছ থেকে তাঁকে সদুপদেশ শুনতে হয়েছিল; কিন্তু তিনি অবিচলিত থেকে তাতে কর্ণপাত করেননি। অবশ্য আমাকে নেওয়ার ব্যাপারে তিনি বেশী সাহসের পরিচয় দিয়েছেন, কি আমি ঐ দায়িত্বপালনে স্বীকৃতি দিয়ে বেশী সাহসের পরিচয় দিয়েছি, তা' আজও বুঝতে পারি না। প্রথম দিনের স্যুটিংয়ের 'রাশ' দেখবার আগে প্রেক্ষাগৃহের আলো যখন নিভে গেল, তখন সেই অন্ধকার কয়েকটি মুহূর্তে যে সাসপেন্স আমি অনুভব করেছিলুম, তা অবিস্মরণীয়। যাই হোক, কাজ তো চলল, কিন্তু তখন আমি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করেছি। কারণ একজন ক্যামেরা-অ্যাসিস্ট্যাণ্টেরও যে-সব জিনিস জানা আছে, আমার তাও জানা ছিল না—প্রতিটি পদক্ষেপে সমস্ত জিনিস জানতে বুঝতে হয়েছে এবং নবলব্ধ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে হয়েছে। তবে এই কিছু না-জেনে কাজ করার মধ্যেও একটি উত্তেজনা ছিল যে উত্তেজনা কোনো

ভালো সিনেমেটোগ্রাফী স্কুলে পড়ে কাজটা শিখে করলে কিছুতেই পেতুম না।

আমার অল্পদিনের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, প্রযুক্তিবিদ্যা বা টেকনিক্যাল জ্ঞান ক্যামেরাম্যানের নিশ্চয়ই থাকা উচিত এবং ভালো যন্ত্রপাতি পেলে কাজ ভালো হয়; কিন্তু ভালো ক্যামেরাম্যান হতে গেলে এই দুটো জিনিস ছাড়াও যা দরকার, সে হচ্ছে টেস্ট বা রুচিবোধ। এই রুচিজ্ঞানের পার্থক্যই একই শিক্ষায় শিক্ষিত দু'জন লোকের মধ্যে পার্থক্য ঘটায়; এইজন্যেই বাংলাদেশ—যেখানে যন্ত্রপাতি আদৌ প্রথম শ্রেণীর নয়, সেখান থেকেও ভালো ছবি বেরুনো সম্ভব, অথচ হলিউড থেকে অনেক বাজে ছবিও বেরোয়। আমার ধারণা এই রুচিবোধের পার্থক্যই ভালো বা খারাপ ক্যামেরাম্যানের সৃষ্টি করে। এই পার্থক্যের জন্যেই ফোটোগ্রাফীতে এত বিভিন্ন স্টাইল দেখতে পাওয়া যায়। কোনো ক্যামেরাম্যান হয়ত অমাবস্যার রাত্রিতেও নায়িকার মুখ কালো করতে নারাজ, আবার কেউ হয়ত' মনে করেন যে, দিনের বেলাতেও নায়িকার

মুখ অনেকখানি না-দেখানো যেতে পারে মুড সৃষ্টি করবার জন্যে। গল্প যেটা চাইছে, পরিচালক যে মুড সৃষ্টি করতে চাইছেন, ক্যামেরাম্যানের কর্তব্য তাই সৃষ্টি করতে সাহায্য করা। ভালো পরিচালক মাত্রই যেমন অভিনেতা-অভিনেত্রীদের পরিচালনা করেন, তেমনই তিনি ক্যামেরাম্যান শব্দযন্ত্রী, সংগীত-পরিচালক, শিল্প-নির্দেশক প্রভৃতি সকল কলাকুশলীকেই পরিচালনা করেন। গল্পের একটা বিশেষ দৃশ্যে পরিচালক যে মুড সৃষ্টি করতে চাইছেন, অভিনেতা-অভিনেত্রী, ক্যামেরাম্যান, শব্দযন্ত্রী, সংগীত-পরিচালক, শিল্প-নির্দেশক প্রভৃতি সকলেরই তাঁদের বিভিন্ন রাস্তায় একযোগে সেই মুড সৃষ্টি করার দিকেই লক্ষ্য রাখবার চেষ্টা করা উচিত। সিনেমা হচ্ছে একটি যৌথ প্রচেষ্টা—এখানে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের পরিপূরক। সফল ফটোগ্রাফী অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয়কেও সাফল্যের পথে নিয়ে যেতে সাহায্য করে।

আমি অনুভব করেছি, ফোটোগ্রাফীর সঙ্গে আবহসঙ্গীতের একটা নিকট-সম্পর্ক রয়েছে, অথচ দুঃখের বিষয় যে, এ দুটো কাজ একসঙ্গে করা হয় না বা করা যায় না। ক্যামেরাম্যান যখন স্যুটিং করছেন, যখন লাইটিং অর্থাৎ দৃশ্যকে সুসংগতভাবে আলোকিত করছেন, তখন সেই বিশেষ দৃশ্যে আবহসংগীত পরে কি হবে, সে-সম্বন্ধে তাঁর সঠিক কোনো ধারণা থাকে না। যদি থাকত, তাহলে বোধ হয়, তিনি তাঁর কাজ আরও উন্নত করতে পারতেন অর্থাৎ 'মুড'-সৃষ্টির সেই সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তাঁর অবদান আরও সার্থক হতে পারত। ফোটোগ্রাফী হয়ত ভালোই হয়েছে। কিন্তু আবহসঙ্গীত যোগ করবার পর যখন ছবি দেখেছি, তখন অনেক সময়ই মনে হয়েছে যে, এত সুন্দর এবং এই ধরণের সংগীত দেওয়া হবে জানলে ফোটোগ্রাফীটা হয়ত একটু অন্যরকমের হলে আরও ভালো হত। এমনকি মনে হয়েছে, পুরো স্টাইলটাই হয়ত ঠিক হয়নি। যা করলে ভালো হত, সেটা স্যুটিং-এর সময়ে করবার সাহস পাইনি। কিন্তু ছবি দেখে মনে হয়েছে সাহস পেলে ভালোই হত। দৃশ্যকে আলোকিত করবার সময়ে মনে হয়েছে যে একটি বিশেষ ধরণের আলোকরীতি গ্রহণ করলে হয়ত বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে, ক্যামেরাম্যানের যে সংযম থাকা উচিত, তা হয়ত থাকবে না। কিন্তু পরে আবহসংগীত সমেত ছবি দেখে মনে হয়েছে, করলে সংযম হারাতুম না। কোনো কোনো বিশেষ দৃশ্যের জন্যে যদি আবহসঙ্গীত আগে থাকতে তোলা সম্ভব হত, তাহলে তা ক্যামেরাম্যানকে অনেক সাহায্য করতে পারত বলেই আমার ধারণা।

অভিনয়ের ব্যাপারে আমরা যাকে ওভার-অ্যাকটিং বলি, ফোটোগ্রাফীর ব্যাপারেও ঠিক সেইরকম আছে। এবং আমার রুচি বলে যে ক্যামেরাম্যানের এই বাড়াবাড়ি বা 'ওভার' ব্যাপারটা সম্পর্কে সতর্ক থাকাই উচিত। সবাইকে ছাপিয়ে তিনি যেন নিজেকে জাহির করবার চেষ্টা না করেন। এমন অভিনয়ও হয়, যাতে দর্শক ভুলে যান যে, অভিনেতা কোনোরকম অভিনয় করছেন। এমন ফোটোগ্রাফীও দেখেছি, যাতে মনে হয়েছে যে, আমি সিনেমা দেখছি না। যেন আমি সেই জায়গাতেই রয়েছি। ক্যামেরাম্যান কোথাও নিজের প্রতি দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করছেন

না, অথচ নিজের দায়িত্ব তিনি সুষ্ঠুভাবে পালন করে যাচ্ছেন। যে-সব ছবি বাস্তব-ধর্মী হয়, সে-সব ছবিতে এই ধরণের ফোটোগ্রাফীর একান্ত প্রয়োজন।

তা বলে একথা বলছি না যে সব রকমের ছবিতেই এই ধরণের ফোটোগ্রাফী হওয়া উচিত। বিষয়বস্তুর চাহিদা-অনুযায়ী ফোটোগ্রাফীর স্টাইলেরও পরিবর্তন হওয়া দরকার। কলকাতা শহরের ওপর তোলা কোনো ছবির ফোটোগ্রাফীর স্টাইল তো আর রূপকথার রাজকুমারের গল্পের মতো হবে না।

আসলে চলচ্চিত্রের ফটোগ্রাফী সম্পর্কে শেষ কথা হচ্ছে, গল্পের বিশেষ চাহিদা-অনুযায়ী চিত্রগ্রহণ করা এবং এখানে ক্যামেরাম্যানের নিজস্ব রুচিই হচ্ছে বড়ো কথা।

—সুব্রত মিত্র

বাংলা ছবিতে শব্দ যুগের প্রবর্তন

আনুমানিক বত্রিশ বছর আগে, মুখর হয়ে উঠলো বাংলা ছবি—সংলাপে ও সংগীতে। গড়ে উঠলো স্টুডিও ফ্লোর। চারিদিকে পড়ে গেল নূতনের সাড়া—আমদানি হ'ল নানারকমের বৈদ্যুতিক আলো ও শব্দগ্রহণের সরঞ্জাম। নির্বাক যুগে বাংলাদেশে ছবি তোলা হত দিনের আলোয় কারও বাগানবাড়ীতে বা গঙ্গার ধারে কয়েকটি Reflector ও একটি চলচ্চিত্র-গ্রাহক ক্যামেরার সাহায্যে। অদম্য উৎসাহী কয়েকজন যুবকের উদ্যম ও কোনও ধনীর অর্থ ছিল তাঁদের সম্বল। ছবি তোলা ছিল তাঁদের শখ বা নেশা। পেশা বা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চলচ্চিত্র-শিল্প, বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হল, সবাক যুগের প্রারম্ভে। মঞ্চের ভাল ভাল নাটক ও কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের বহু উপন্যাস রূপায়িত হ'ল প্রাণবন্ত চলচ্চিত্রে, ভাষা ও সংগীতের মাধুর্য, দর্শকের কাছে পরিবেশন করল নূতন রসে। দর্শনেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের আনন্দে দর্শক মোহিত হয়ে গেল।

কলা-কৌশলের নূতন শাখার বাহক ও ধারক হিসাবে শব্দ-ধারক বা শব্দ-যন্ত্রীরা শিল্পে-সংশ্লিষ্ট অভিনেতা, অভিনেত্রী বা পরিচালক সকলের কাছ থেকে সম্মান ও সহযোগিতা পেলেন। তখনকার দিনে শব্দ-গ্রহণ যন্ত্র আজকালকার তুলনায় অনেক নিকৃষ্ট ছিল ও তার ক্ষমতাও ছিল অপেক্ষাকৃত সীমিত। সে সময়ে নায়ক-নায়িকা ও পরিচালকের সহযোগিতায় সুষ্ঠু শব্দ-গ্রহণ সম্ভব হয়েছিল। আগেকার কালের বেশীর ভাগ পরিচালক শব্দগ্রহণ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। (লক্ষ্য করেছি প্রমথেশ বড়ুয়া বা মধু বসুর ছবিতে শব্দ-গ্রহণকালে নিজের শব্দগ্রহণের মান অনেক উন্নীত হয়েছে।) দুঃখের বিষয় আজকাল-কার বেশীর ভাগ পরিচালকের মধ্যে এই ব্যতিক্রম দেখতে পাচ্ছি। অবশ্য শব্দযন্ত্রী যাঁরা পরিচালক হয়েছেন তাঁদের বাদ দিয়ে একথা বলছি।

নির্বাক যুগের অনেক অভিনেতাকে বিদায় নিতে হ'ল কণ্ঠস্বর ও উচ্চারণ ভাল না থাকায়। তাঁদের স্থান পূর্ণ হল মঞ্চের সুকণ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রী দিয়ে। ভাল গান গাইতে পারলে সুদর্শন বা সুদর্শনা না হ'লেও নায়ক বা নায়িকা হিসাবে মনোনীত হলেন বহু মঞ্চশিল্পী। চলচ্চিত্রে প্রমটিঙ চলে না। মঞ্চাভিনেতাদের অনেকেই বিনা প্রম্পটিংয়ে অভিনয় করতে খুব অসুবিধায় পড়লেন। এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনা মনে পড়ে—প্রায় তিরিশ বৎসর আগে দেবকী বসুর পরিচালনায় নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে একটি হিন্দী ছবি তোলা হচ্ছে—কোনও একজন অভিনেতা দু-তিন বার সংলাপ ভুলে যাচ্ছেন, ফলে বার বার সেই শট নিতে হল; চতুর্থবারে হঠাৎ সেই অভিনেতাটি পকেট থেকে এক টুকরা কাগজ বার করে দেখে তাঁর সংলাপ নির্ভুল বলে দিলেন; দেবকীবাবু ও উপস্থিত সকলে উচ্চৈঃস্বরে হো-হো করে হেসে উঠলেন, এমন কি পরিচালক স্বয়ং 'কাট' পর্যন্ত বলতে ভুলে গেলেন। তাঁদের হাসি কিছুটা রেকর্ড করে রেকর্ডিং ক্যামেরা থামিয়ে দিলাম।

আগেই বলেছি, তখনকার দিনের ছবিতে নায়ক-নায়িকা, ভিক্ষুক, বাউল সকলে নিজেই গান করতেন, গানের ডিরেক্ট রেকর্ডিং হত। বিরাট পিয়ানো, অর্গ্যান ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র বহু কষ্টে মাঠে বা পুকুরের ধারে নিয়ে যাওয়া হ'ত এবং গানের সঙ্গে সঙ্গে ছবি তোলা হ'ত। পুকুরের ধারে ছবিসহ গান রেকর্ডিং হচ্ছে, দু'তিন বার

রিহার্সালের পর "টেক" হবে; পরিচালক স্টার্ট সাউণ্ড এণ্ড ক্যামেরা বললেন, অর্কেস্ট্রা বেজে উঠল। হঠাৎ একটি গাধা চীৎকার করে উঠল; কাট্-কাট্ শব্দে ছবি তোলা বন্ধ হল। সাউণ্ড-ভ্যান থেকে নেমে বললাম, "রাইদা, আপনার আর্টিস্টের গলা আজ ভাল নেই", বিখ্যাত সঙ্গীত-পরিচালক রাইচাঁদ বড়াল বললেন, "কি বিপদে পড়েছি বলুন ত', বাণীবাবু!" এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া গেল প্লে-ব্যাক পদ্ধতির

প্রবর্তনে। যতদূর মনে পড়ে, প্রায় পাঁচ-ছয় বছর পরে নীতীন বসু পরিচালিত "ভাগ্যচক্র" বা ধূপ-ছায়া" ছবিতে বাংলা-দেশে তথা ভারতবর্ষে প্রথম প্লে-ব্যাক পদ্ধতিতে একটি কোরাস নৃত্য-সঙ্গীত তোলা হ'ল। প্লে-ব্যাক পদ্ধতিতে গান স্টুডিওতে আগেই রেকর্ড করে নেওয়া হয়; পরে শব্দ-প্রক্ষেপক-যন্ত্রের সাহায্যে গানের ছবি তোলা হয়। অর্থাৎ অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে শুধু গানের সঙ্গে ঠোঁট নেড়ে যেতে হয়। এই পদ্ধতিতে গান রেকর্ডিং অনেক সহজ ও সুন্দর

হল। প্লে-ব্যাক পদ্ধতির সবচেয়ে বড় লাভ হ'ল সু-গায়ক বা গায়িকার গান সুশ্রী ও সুঅভিনেতার মুখে সমন্বিত করা সম্ভবপর হ'ল। দর্শকের কর্ণ ও চক্ষু দুই-ই তৃপ্ত হ'ল। অভিনয়-শিল্পীর গান গাওয়ার ক্ষমতা না থাকলেও কোনও অসুবিধে ভোগ হয় না।

টকীর প্রথম যুগে ছবি তোলা ক্যামেরা থেকে প্রচুর শব্দ হত; অভিনেতাদের এই শব্দের চেয়ে জোরে কথা বলতে বাধ্য

করতেন শব্দযন্ত্রীরা। ভাল মাইক-বুম বা মাইক্রোফোন ঝুলাবার দণ্ডের অভাবে তাঁরা অভিনেতাদের বেশী চলা-ফেরা বা মাইক থেকে বেশী মুখ ঘোরানোয় আপত্তি করতেন। এই সব বাধা-নিষেধের ফলে সবাক চিত্র হয়ে উঠলো মঞ্চ-ঘেঁষা। অল্পকালের মধ্যেই দর্শকদের মঞ্চ-ঘেঁষা ছবি দেখার উৎসাহ কমে গেল। তাঁরা নির্বাক যুগের বহির্দৃশ্য-সম্বলিত ছবির মত সবাক-চিত্র দেখতে চাইলেন। দর্শক-চাহিদা মেটাবার জন্য বদ্ধপরিকর হলেন যন্ত্র-নির্মাতা ও শব্দ-যন্ত্রীরা—শব্দহীন ক্যামেরা, ভাল মাইক-বুম ও বহির্দৃশ্য গ্রহণোপযোগী "পোর্টেবল সাউণ্ড রেকর্ডিং" যন্ত্র উদ্ভাবিত হল। খোলা জায়গায় সংলাপ তোলায় সময় শিল্পীদের সংলাপের সঙ্গে কাকের ডাক বা মোটরগাড়ী ইত্যাদির যে সব অবাঞ্ছিত শব্দ মিশে যায় তা-ও ডাবিং পদ্ধতিতে দূর করা সম্ভব হল। সবাক যুগের প্রথম দিকে এই সব ব্যবস্থা ছিল না। শব্দ-গ্রহণের অসুবিধা দূর হওয়াতে সবাক-চিত্রও সত্যকার চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়ে দর্শক সম্মুখে উপস্থিত হ'ল।

প্রেক্ষাগৃহে আমরা যে সংলাপ বা যে গান শুনি তা দিয়েই আমরা বিচার করি শব্দ-গ্রহণ ভাল কি মন্দ। "সিনেমা-সাউণ্ড প্রোজেক্টর"-এর দোষে বা প্রেক্ষাগৃহের আভ্যন্তরীণ গঠন-দোষে অনেক সময়ে সুষ্ঠুভাবে গৃহীত শব্দও খারাপ শোনায়। ফলে চিত্র-সমালোচকের বিরূপ মন্তব্য শব্দ-যন্ত্রীদের নীরবে সহ্য করতে হয়। শরৎচন্দ্রের "স্বামী" মুক্তি পেয়েছিল শহরের তিনটি প্রেক্ষাগৃহে। বেশীর ভাগ কাগজে শব্দগ্রহণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা প্রকাশিত হয়েছিল: কেবল একটি কাগজে শব্দগ্রহণের নিন্দা ঘোষিত হয়েছিল। খোঁজ নিয়ে জেনে-ছিলাম, চিত্র-সমালোচকদের মধ্যে একমাত্র নিন্দাকারী ব্যক্তিই উত্তর কলিকাতার কোনও প্রেক্ষাগৃহে ছবিটি দেখেছিলেন; অপর সকলে দক্ষিণ কলিকাতার কোনও নূতন প্রেক্ষাগৃহে ঐ ছবিটি দেখেছেন। বুঝলাম, শব্দ-প্রক্ষেপণের দোষে শব্দ খারাপ শুনিয়েছে। বছরের শেষে দেখা গেল, অনেক পত্রিকার বিচারে আলোচ্য ছবির শব্দগ্রহণ শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়েছে। বেশীর ভাগ প্রেক্ষাগৃহে গদীআঁটা চেয়ার, শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত "হল" ও আলোকমালায় সজ্জিত বহির্ভাগ দেখতে পাওয়া যায়; কিন্তু ছবির কলা-কৌশলের মূল হল চিত্র ও শব্দ; এ দুটি বিষয়ে প্রেক্ষাগৃহের মালিকরা যদি আর একটু বেশী মনোযোগ দেন, তাহলে তাঁরা শিল্প-সংশ্লিষ্ট সকলের ধন্যবাদার্হ হবেন।

চলচ্চিত্র মুখ্যত দৃষ্টি-শ্রুতিবাহিত শিল্প। চলচ্চিত্রের শব্দ-বিভাগে রয়েছে সংলাপ, সঙ্গীত, আবহ-সঙ্গীত ও পারি-পার্শ্বিক ধ্বনি বা "এফেক্ট-সাউণ্ড"। এই সব ক'টির সুষ্ঠু সমন্বয়ে ছবির (mood) ভাবটি যথাযথ প্রকাশিত হয়। এগুলি সাধারণতঃ পৃথকভাবে গৃহীত হয় এবং পরে রি-রেকর্ডিং; বা শব্দ-পুনর্যোজনা-কালে একীভূত করা হয়। যিনি শব্দ-পুনর্যোজনা করেন, তাঁর কেবলমাত্র কলা-কৌশলের জ্ঞানই যথেষ্ট নয়, তাঁর ছবির নাটকীয় বা আবেগময় দৃশ্যের মর্ম-রসটিও দর্শককে নিবেদন করার ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন—অবশ্য এ বিষয়ে বিচক্ষণ পরি-চালক শব্দযন্ত্রীকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। গান রেকর্ডিং-এর ক্ষেত্রেও শুধু ভাল হলে চলবে না; শব্দযন্ত্রী সঙ্গীতজ্ঞ না হতে পারেন, কিন্তু তাঁর 'মিউজিক্যাল সেন্স' থাকা বাঞ্ছনীয়। অ-সুর শব্দযন্ত্রী দ্বারা মনোজ্ঞ সঙ্গীতগ্রহণ অসম্ভব। আবহ-সঙ্গীত গ্রহণ-কালে অভিজ্ঞ শব্দযন্ত্রী সঙ্গীত-পরি-

চালককে যথেষ্ট সাহায্য করে থাকেন; যেমন ছবির কোনও বিশিষ্ট অংশের mood বা ভাবের সঙ্গে গৃহীত কোনো সঙ্গীত ঠিক মিল খাবে কিনা, তিনি বলে দিতে পারেন।

ছবিকে প্রাণবন্ত করতে ধ্বনি বা "এফেক্ট-সাউণ্ড"-এর দান যে কত বড়, তা বলে শেষ

করা যায় না। ছবির ভাবপ্রকাশেও যথাযথ-ভাবে গৃহীত ধ্বনি খুব সাহায্য করে। যেমন জেলখানার সেলের মধ্যে তালা-দেওয়া গারদের মধ্যে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত একজন আসামী; সেখানে রক্ষীর ধীরগম্ভীর পদক্ষেপে বুটজুতার খট খট শব্দ যথেষ্ট ত্রাসের সৃষ্টি করবে। আবার ঐ একই কয়েদীর মুক্তির ক্ষণ যদি আসন্ন হয়, তখন রক্ষীর জুতার শব্দকে মৃদু রেখে তার হাতের চাবির রিনি-ঝিনি শব্দ কয়েদীর মনের ভাবটি আরও বেশী ফুটিয়ে তুলবে। 'ইলুশান' সৃষ্টি করতেও "এফেক্ট-সাউণ্ড" অত্যন্ত কার্যকর। স্টুডিওর অভ্যন্তরে একটি প্ল্যাটফরম ও ছোট গেটের পাশে টিকিট-কলেক্টর দাঁড়িয়ে—একটি রেলগাড়ী আসার শব্দ—থামার শব্দ— দণ্ডায়মান ইঞ্জিনের শব্দ—লোকের কোলাহল, মাল-বাহী কুলীসহ জনৈক যাত্রী গেটের দিকে এগিয়ে আসছে টিকেট হাতে করে—এমন সময়ে স্টেশনের ঘণ্টা, গার্ডের বাঁশী—ও ইঞ্জিনের হুইসেলের সঙ্গে গাড়ী ছাড়ার শব্দ শোনা গেল। ট্রেনটি দর্শককে না দেখালেও মনে হবে যাত্রীটি ট্রেনে করে এল। নির্জন রাত্রিতে ঝিঁঝির শব্দ ও বজ্রধ্বনিসহ ঝড়-বৃষ্টির শব্দ কেমনভাবে ছবিকে প্রাণবন্ত করে তোলে তা দর্শকরা প্রায়ই লক্ষ্য করেছেন।

বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্পে সবাক চিত্রের সব-চেয়ে বড় দান হল বাংলাদেশে চলচ্চিত্র-ব্যবসার প্রসার লাভ। বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ের প্রসার অনেকাংশে শব্দ-গ্রহণ ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলেই সম্ভব হয়েছে। ভাষাহীন চলচ্চিত্রের আবেদন ছিল সর্বজনীন। বিদেশী নির্বাক চিত্র সকল দেশের দর্শকই উপভোগ করতেন। যখন ইংরাজী সংলাপ সহ বিদেশী চিত্র এদেশে এল, তখন এদেশের ইংরাজী-অনভিজ্ঞ দর্শক সে সব ছবি দেখে আনন্দ পেলেন না, এমন কি ইংরাজী-জানা অনেক লোকও ইংরাজী অ্যাকসেন্ট ভাল না জানায় ইংরাজী সংলাপ সম্পূর্ণ বুঝতে পারলেন না। বোম্বাইয়ের হিন্দী, উর্দু ছবিও এই একই কারণে বাঙালী দর্শকের সমর্থন লাভে বঞ্চিত হ'ল।

এই সুযোগে বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্প ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হ'ল। বাংলা-দেশে একাধিক স্টুডিও গড়ে উঠল। বহু যুবক জীবিকার একটি নূতন পথ খুঁজে পেলেন। যিনি শখের যাত্রায় বেহালা বা ক্ল্যারিওনেট বাজাতেন এবং যাঁর ভবিষ্যতের আশা বাপ-কাকা ছেড়ে দিয়েছিলেন, তিনিও স্টুডিওর সঙ্গীত-বিভাগে কাজ করে, নিজ সংসারের জন্য অর্থ রোজগার করতে লাগলেন। অনেক শিক্ষিত যুবকও নূতনের মোহে ও জীবিকার জন্য স্টুডিওতে যোগ দিলেন, বিশেষ করে শব্দযন্ত্রী হিসাবে।

সাত-আট বছর পার না হ'তেই সমস্যার পর সমস্যা এসে বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্পকে এমন ভারাক্রান্ত করে তুলল যে, নবাগত ঐ সব যুবক তাঁদের অতীত ভুলের জন্য অনুতাপ করতে লাগলেন। তাঁদের অবস্থা হল অভিমন্যুর চক্রব্যূহ ভেদের মত; বার হবার উপায় নেই, ভিতরেও মৃত্যু অনিবার্য।

নৈতিক অর্থে চলচ্চিত্র-শিল্প ব্যবসায়ের সত্যকারের অংশীদার হলেন চিত্র-প্রযোজক, কলা-কুশলী (পরিচালকসহ), শিল্পী, চিত্র-পরিবেশক ও চিত্র-প্রদর্শক। এই ব্যবসায়ের প্রধান লভ্যাংশ ঘরে তোলেন চিত্র-প্রদর্শক অর্থাৎ প্রেক্ষাগৃহের মালিক। "হোল্ড-ওভার", "হাউস-প্রটেকশন", 'মিনিমাম গ্যারাণ্টি' প্রভৃতির দৌলতে চিত্র-প্রদর্শক নিশ্চিত-লাভের পথেই ব্যবসা চালাচ্ছেন।

চলচ্চিত্র-শিল্পের লভ্যাংশ যতদিন ন্যায়-সঙ্গতভাবে সকল বিভাগের মধ্যে বণ্টিত না হবে, ততদিন কলা-কুশলীর দুঃখ-দুর্দশা ঘুচবে না। বাংলাদেশের গভর্ণমেন্ট যদি আন্তরিক চেষ্টিত হন, তাহলে হয়ত এর প্রতিকার হতে পারে। প্রয়োজনবোধে এই শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করতে সরকার যেন দ্বিধা না করেন।

—বাণী দত্ত
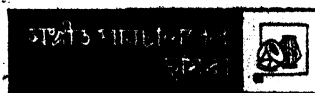
সঙ্গীত পরিচালকের ভূমিকা

সঙ্গীত-পরিচালক রূপে আমার একুশ বছরের অভিজ্ঞতার জোরে আমি আজ বলতে পারি, যে আজকের দিনের সঙ্গীত-পরিচালক হচ্ছেন ছবির পরিচালকের ইচ্ছার অনুবর্তী।

কারণ আজ যে ছবিতে গান থাকে, সে হচ্ছে বেশীর ভাগ ফরমায়েসী—এখানে পরিচালক, প্রযোজক, পরিবেশক এমন কি প্রদর্শকের ইচ্ছাটাই বড়ো হয়ে উঠেছে এবং এঁদের ইচ্ছা মেনেই সঙ্গীত-পরিচালককে চলতে হয়। অবশ্য তাঁদের ইচ্ছা ও চাহিদার অনুগামী থেকেও নিজের সঙ্গীতের বিদ্যা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে তাঁকে অনেক সময়ে

বাজিমাত করতে দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, গায়ক-গায়িকার নির্বাচন আজকাল সঙ্গীত-পরিচালকের উপর ততটা নির্ভর করে না। আগেকার দিনে একখানা গান সিচুয়েশান-অনুযায়ী সুর হয়ে কার কণ্ঠে দিলে ভালো মানাবে এবং সে কতদিন অনুশীলনের পরে রেকর্ডিং করার উপযুক্ত হবে, সেটা সম্পূর্ণ-ভাবেই সঙ্গীত-পরিচালকের উপর নির্ভর করত। কিন্তু বর্তমানে সে প্রথার লোপ পেয়েছে। আজকের দিনে ছায়াছবির গান একজন সঙ্গীত-পরিচালককে অত্যন্ত স্বল্প সময়ে তৈরী করতে হয়, অত্যন্ত স্বল্প সময়ে শেখাতে হয়, অত্যন্ত স্বল্প সময়ে রেকর্ড করতে হয়। অর্থাৎ বক্স-অফিসওলা গাইয়েদের কোনোক্রমে খাপ খাইয়ে নেওয়াই আজকাল ধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই কারণে আজ বলা যেতে পারে, সঙ্গীত-পরিচালক ঠিকমত সুর করতে পারলেন কিনা, গাইয়ে ঠিকমত সুর আয়ত্ত করতে পারলেন কিনা, গানের রেকর্ডিং আরও ভালো হতে পারত কিনা,—তা বিচার করবার যথেষ্ট সময় পাওয়া যায় না। এছাড়া দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে আজকাল সঙ্গীতমনা এবং সঙ্গীতবোদ্ধা চিত্র-পরিচালকের সাক্ষাৎ কদাচিৎ মেলে। কিংবা মনে হয়, তাঁদের শত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা সময়ের অভাবে সঙ্গীত জিনিসটাকে আলাদা করে রেখে দেন বা ও নিয়ে মাথা ঘামাতে চান না। মনে হয়, সঙ্গীত-পরিচালকের ওপর অকুণ্ঠ বিশ্বাস ও গুণগ্রাহিতা আজকাল যেন কমে যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও যে আজকাল গান এত ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করে, তার কারণও খুঁজে পাওয়া শক্ত নয়। যেখানে সঙ্গীত-পরিচালক নিজের কর্মদক্ষতা, অভিজ্ঞতা, সুরজ্ঞান কাজে লাগাবার সুযোগ পান; সেখানে তিনি আজও নিজের আসর জমাতে পারেন। উপরে লিখিত অসুবিধা সত্ত্বেও যে সঙ্গীত-পরিচালক অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে পারেন অর্থাৎ সিচুয়েশান-অনুযায়ী এবং গায়ক-গায়িকার মেজাজ ও বিশেষ রীতি-অনুযায়ী সুর তৈরী করে তাকে বাদ্যসঙ্গীত সহযোগে দর্শকের উপভোগ্য করে তুলতে চেষ্টা করেন তিনিই সাফল্যলাভ করেন, অর্থাৎ আজ-কালকার অসুবিধা তাঁর নিত্যনতুন উদ্ভাবনী শক্তিকে বাড়িয়ে তুলেছে।

কিন্তু জনপ্রিয়তা অর্জনেই সঙ্গীত-পরিচালক সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না—তিনি দেখতে চান, তিনি কতখানি সৃষ্টিধর্মী—কতখানি তাঁর শক্তিকে তিনি কাজে লাগাবার সুযোগ পেলেন,—সেইখানে তিনি হিসাব মেলাতে পারেন তাঁর শিল্পী-মনের সঙ্গে। ফাঁকির সহজ হাততালি তাঁর পকেট ভরাতে পারে, কিন্তু মন ভরাতে পারে না নিশ্চয়ই।

দর্শকদের মধ্যে সঙ্গীত পরিবেশন করা হয় তাঁদের উপভোগের জন্যে। কিন্তু এই উপভোগ-স্পৃহার মানোন্নয়ন করার অবকাশ আছে। রাজনৈতিক নেতাদের মতো সঙ্গীত-পরিচালকেরও জনসাধারণের রুচি-উন্নয়নের মহৎ দায়িত্ব পালন করা কর্তব্য এবং এই কর্তব্যপালনে তাঁকে সাহায্য করার দায়িত্ব চিত্র-পরিচালকের।

গানে সুর-যোজনাতেই সঙ্গীত-পরিচালকের দায়িত্ব শেষ হয় না। তাঁকে তার থেকে গুরুতর কর্তব্য করতে হয় এবং শক্তির পরিচয় দিতে হয় আবহসঙ্গীত রচনায়।
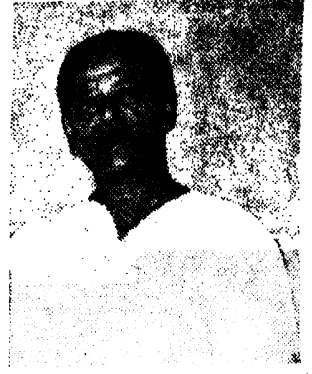
পরিচালকরা কাহিনীর সিচুয়েশান এবং সেই সিচুয়েশানে কতখানি সময় নেওয়া হয়েছে তা সঙ্গীত-পরিচালককে বুঝিতে দেন; কিন্তু যথার্থ আবহসঙ্গীত রচনা করতে হলে সঙ্গীত-পরিচালকের দৃশ্যগুলি চাক্ষুস দেখা দরকার মাত্র একবার নয়, বহুবার। তাহলেই দৃশ্যগুলির ভাব ও বক্তব্য তাঁর মনে ঠিকভাবে পরিস্ফুট হয় এবং তিনি দর্শক মনে প্রভাববিস্তারকারী আবহসঙ্গীতের সৃষ্টি করতে পারেন।

বাঙলা চলচ্চিত্রে সঙ্গীত-পরিচালকের ভূমিকা সেই কারণেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

—রবীন চট্টোপাধ্যায়

শিল্প নির্দেশকের মনের কথা

চলচ্চিত্র-প্রযোজনার বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে শিল্প-নির্দেশনা নামে যে একটি বিভাগ আছে, সেকথা বর্তমানে জন-সাধারণকে নিশ্চয়ই নতুন ক'রে ব'লে দিতে হবে না। কিন্তু শিল্প-নির্দেশক অর্থে কেবল যে ইঞ্চি, ফুট মেপে, মিস্ত্রি, কুলি খাটিয়ে কতকগুলি ঘর-বাড়ী তৈরী করা নয়, তার পেছনে যে বেশ খানিকটা শিল্পবোধ বা শিল্পচেতনার প্রয়োজন আছে, সে কথা হয়তো অনেকেই মনে রাখেন না।

গল্প বা নাটকের সুষ্ঠু রূপ দিতে হলে যেমন সুঅভিনয়ের দরকার, তেমনি তাকে সজীব চেহারায় খাড়া করতে হলে স্থান, কাল ও পাত্র অনুযায়ী দৃশ্যপটেরও দরকার হয়। এই দৃশ্যপট ও সাজ-সজ্জার পূর্ণ দায়িত্ব শিল্পনির্দেশকেরই। যুগের চাহিদা-অনুযায়ী এবং নাটকের চরিত্র-অনুযায়ী ঘটনার অকুস্থান শিল্পনির্দেশককেই তৈরি করতে হয়। এর জন্য কোন যুগে কি ধরনের শিল্পের প্রাধান্য ছিল এবং কিরূপ সাজ-পোশাক হওয়া উচিত, এসব বিষয়ে তাঁর বিশদ জ্ঞান থাকা চাই। আজকাল কাহিনীর—

বহির্দৃশ্যগুলি প্রধানতঃ বাইরেই তোলা হয়; তবু নাটকের এবং দৃশ্যগ্রহণের সুবিধার প্রয়োজনে এই বহির্দৃশ্যের অংশ-বিশেষ স্টুডিওর ভিতরেই গড়ে নেওয়া হয়।

আজকাল অনেকেরই মুখে বাস্তব-বাদিতার (realistic) কথা শুনে থাকি; কিন্তু বাস্তবের হুবহু নকল করাকেই শিল্পের চরম সার্থকতা বলা যায় না। বহুদিন আগে আমেরিকার ফিল্ম সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে পড়েছিলাম—"Director uses the camera not as an instrument of Photographic realism, but as an instrument of imaginative expression. Movie Film art instead of being realistic might be a possible reality and the mind of the audience could be brought into relation with the screen phychologically"

"শ্রদ্ধা, অনুরাগ, আকর্ষণ, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের ও সামঞ্জস্যের বোধ শিল্প-সৃষ্টির মূল কথা—সৃষ্টি হয় অনুরাগের পথে। অনুরাগ আগে; বিচার-বিশ্লেষণ পরে।" প্রকৃতির বাস্তব রূপ শিল্পীর মনে যে ভাব ও রস উদ্রিক্ত করে, সেই ভাব ও রস অন্যের মনে ধরিয়ে দেওয়াতেই শিল্প-সৃষ্টির সার্থকতা। শিল্পীর সাধনা তিনটি আধারকে ধরে: (১) স্বকীয়তা, (২) স্বভাব ও (৩) পরম্পরা। প্রথমেই স্বকীয়তা; স্বকীয়তা না থাকলে শিল্প হয় দুর্বল ও কৃত্রিম, ঐতিহ্যে অধিকার না থাকলে হয় স্থাণু ও কাঁচা; শিল্পীর নিজস্ব দান কিছু না থাকলে হয় প্রাণহীন। শিল্প শুধু স্বভাবসম্মত হ'লে হয় নকল মাত্র; শুধু পরম্পরায় দখল থাকলে হয় কারিগরি। নিছক বাস্তবকে রূপ দিলেই কোন উঁচুদরের শিল্প-সৃষ্টি হয় না। যেমন, সংবাদপত্রের বিশেষ কোন ঘটনা সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে না; কিন্তু সংবাদপত্রের সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে লেখক যখন তাঁর নিজের মনের রসমাধুর্য দিয়ে লেখেন, তখনই সেটা হয় সাহিত্য। তেমনই বাস্তবের পরিচিত চেহারার মধ্যে শিল্পীর মনের রস মিশিয়ে তাকে রসমধুর ক'রে তোলাই শিল্পীর কাজ। তা ব'লে আমি বলছি না যে, সেটা বাস্তবকে অস্বীকার করে সৃষ্টি হবে। আমরা চোখের সামনে যা প্রতিনিয়ত দেখছি, তাকেই রূপ দিতে হবে—তবে তাকে নূতন করে দেখাতে হবে—এমনটি নেই—তবে হতে পারে—হলে মন্দ হয় না, এই-ভাবে। এই নূতন ক'রে দেখতে চাওয়াই ত মানুষের অন্তরের কামনা; এই নূতন করে দেখার মধ্য দিয়েই ত নূতন ধারার আগমন।

পরিচালকেরা শিল্পনির্দেশকদের কাছে অনেক সময় অনেক কিছু চান। কিন্তু বর্তমানে সেই চাহিদা-অনুযায়ী সময় ও অর্থ আমরা পাই না এবং সেইজন্য তাঁদের চাহিদা-অনুযায়ী সুষ্ঠু সৃষ্টি না হওয়ার দরুণ আমাদের ওপর অনেক সময়ে অকৃতিত্বের দোষারোপ এসে পড়ে। এসব ক্ষেত্রে একটিমাত্র কথাই বলা যায়: দুই-পক্ষেরই কিছু আপোসরফা করা দরকার। বাংলা চলচ্চিত্রের সঙ্কীর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে সামর্থ্য-অনুযায়ী যতটুকু পাওয়া সম্ভব, ততটুকুই চাওয়াটাই প্রকৃত বিচক্ষণতার পরিচয়। এমন কোন শিল্পী আছেন কিনা আমি জানি না, যিনি তাঁর নিজের কাজ ভাল হোক, এরূপ চান না। সৃষ্টির সুষ্ঠুতাই ত তাঁর কাম্য।

চলচ্চিত্র-শিল্পে নির্বাক যুগ থেকে আমি কাজ করে আসছি. তখনকার দিনে আর আজকালকার দিনে অনেক তফাৎ হয়ে গিয়েছে। তখন প্রথমতঃ সেটটি সম্পূর্ণ তৈরী হবার পর সুটিং প্রোগ্রাম রাখা হতো। এখন আর সে সুযোগ হয় না। তার প্রথম কারণ, অভিনয়-শিল্পীদের সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী সুটিং প্রোগ্রাম রাখা হয় এবং বইয়ের সংখ্যাও পূর্বাপেক্ষা অনেক বেড়ে গেছে। তাতেই আমরা সেট্ তৈরী করবার উপযুক্ত সময় অনেক সময়েই পাই না। তখনকার দিনে বেশীর ভাগ প্রযোজক স্টুডিওর মালিকেরাই হতেন এবং
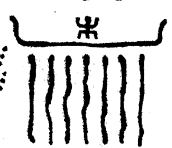
সেইজন্য স্টুডিও-কর্মীরাও তাঁদের নিজের কাজ মনে করেই কাজ করতেন। বর্তমানে প্রযোজকরা ভাড়া হিসাবে স্টুডিওতে আসেন। তাই বর্তমান কাজে আর তখনকার দিনের কাজে পার্থক্য দেখা যায়—ভাড়া-বাড়ীতে বাস করা আর নিজের বাড়ীতে বাস করার মধ্যে যে পার্থক্য, অনেকটা সেই ধরনের। কিন্তু এত বাধা থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে পূর্বাপেক্ষা অনেক উন্নত ধরনের কাজ হচ্ছে। ক্রমশঃ মানুষের অভিজ্ঞতা বাড়ছে এবং তার সঙ্গে যোগ দিচ্ছে উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি। অভিজ্ঞ প্রযোজক ও পরিচালকদের যদি পূর্ণ সহানুভূতি পাওয়া যায়, তবে আশা করি শিল্পনির্দেশনার কাজের আরো উন্নতি হবে।

সত্যেন রায়চৌধুরী

আমার জীবন এবং অভিজ্ঞতা

ছেলেবেলায় লেখাপড়া ভালো লাগত না। আট বছর বয়স যখন, তখন সোরাব মোদী তাঁর থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানী নিয়ে আমাদের জব্বলপুরের বাড়ীতে দলবলসুদ্ধ ওঠেন। তাছাড়া যে সিনেমাতে ও'রা শো করেন, সেটারও তত্ত্বাবধান করতেন আমার বাবা। আমি থিয়েটার দেখতে যেতুম; ছেলেবেলা

থেকে আমার নিজেরও অভিনয় করবার ঝোঁক ছিল। মাস দু-তিন ধ'রে জব্বলপুরের থিয়েটার শেষ ক'রে ও'রা কাটনী চ'লে যান। বাবার কাছে বকুনি ও মার খেয়ে ঐ আট বছর বয়সেই আমি কাটনী পালাই এবং সোরাব মোদীকে অনুনয়-বিনয় ক'রে তাঁর থিয়েটারে যোগ দিই। প্রহ্লাদ, রোহিতাশ্ব প্রভৃতি ভূমিকায় অভিনয় করে প্রচুর নাম কিনি। ১৯৩৪ সালে সোরাব মোদী থিয়েটার বন্ধ ক'রে দিয়ে পুণাতে "হ্যামলেট"-এর হিন্দী সংস্করণ করেন; সেই ছবিতে আমি একজন নাচিয়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হই। এর পরে উনি বোম্বাই শহরে মিনার্ভা ফিল্মস্-এর পত্তন করেন। সেখানেও তিনি আমাকে একজন আর্টিস্ট হিসেবে যোগ দেবার জন্যে তলব করেন। তখন আমি তাঁকে অনুরোধ করি, শিল্পীর কাজ ছাড়াও আমাকে কোনো হাতের কাজ অর্থাৎ টেক্‌নিক্যাল কাজ শেখবার সুযোগ দিতে। তিনি আমাকে তৎক্ষণাৎ বল্লেন, পছন্দ-অনুযায়ী কাজ বেছে নিতে। আমি এক বছর ক্যামেরা, সাউন্ড এবং প্রোজেকসানের কাজ অল্প-বিস্তর শিখি; কিন্তু এ সব কাজে খুব মন বসাতে পারলুম না। তখন এডিটিংটা কেমন যেন আমাকে আকৃষ্ট করছিল; তাই এতেই আমি লেগে গেলুম। প্রথমে একখানি ছবিতে (সিলভার কিং) আমি আমি জে এস দিওয়াড়কর-এর কাছে হাতেখড়ি নিই। কিন্তু আমার প্রকৃত গুরু হন বসন্ত বোর্কার; এটা ১৯৩৬-৩৭ সালের কথা। ১৯৩৭-এই আমি স্বাধীনভাবে সম্পাদনার কাজ করি "ঘুংঘটওয়ালী"-তে। তারপর মিনার্ভা মুভীটোনে 'জেলর', 'পুকার', 'ডাইভোর্স' প্রভৃতি ছবির সম্পাদনা করি। মাইনে বাড়ানো নিয়ে মিঃ মোদীর সঙ্গে আমার মন-কষাকষি হয়; উনি নিজে মাইনেও বাড়াবেন না, আর অন্য কোথাও কাজও করতে দেবেন না; অবস্থা এমনই হয় যে, মিঃ সুলতানী নামে একজন প্রযোজকের "ভার্জিনিয়া' নামে একখানি ছবির সম্পাদনাকে অর্ধসমাপ্ত রেখে আমি কল-কাতায় পালিয়ে আসতে বাধ্য হই। সেটা ১৯৪০ সাল। কলকাতায় প্রথমে কাউকে চিনতুম না। শুনলুম, নিরঞ্জন পাল 'ব্রাহ্মণ-

'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' চিত্রের একটি দৃশ্যে গুরুদাস ব্যানার্জি ও অমরেশ দাস

কন্যা তুলছেন; তাঁর সংগে বোম্বেতে আমার পরিচয় ছিল। তিনি আমাকে 'ব্রাহ্মণ-কন্যার' সম্পাদনা ৫০০৲ টাকা পারিশ্রমিকে করবার জন্যে অনুরোধ করেন। কিন্তু বোম্বেতে তখন ২৫০০৲ টাকায় ছবির কণ্ট্রাক্ট হয়; তাই ঐ পারিশ্রমিক বাংলা দেশের পক্ষে প্রচুর হলেও আমার মনঃপূত হ'ল না। আমি মনসাটার ফিল্মচেকারের পদ নিই মাসে ৩০৲ টাকা মাইনেয়। পরে মিঃ ভৈদ-এর স্টাণ্ট ছবি 'অবলা'-তে মাসে ৭৫৲ টাকা মাইনেয় এক বছরের কণ্ট্রাক্টে সম্পাদক-রূপে নিযুক্ত হই। ঐ স্টাণ্ট ছবির ট্রেলার দেখে ফিল্ম কর্পোরেশনে আমায় "ভক্ত কবীর"-এর সম্পাদকের কাজ হয় মাসে ৪০০৲ টাকা পারিশ্রমিকে। হেমেন গুপ্ত পরিচালিত "অভিযান" আমার প্রথম বাংলা ছবি। আজ পর্যন্ত প্রায় আশী-নব্বই খানা বাংলা ছবির সম্পাদনা আমি করেছি।

বাংলা ছবির সম্পাদনা করতে গিয়ে দেখেছি, তাতে ভালো সাহিত্য ভালো নাটক এবং ভালো অভিনয় আছে; যেমন আগেকার আমার-করা হিন্দী ছবি 'জেলর', 'পুকার' প্রভৃতিতে ছিল। পুরোদমে রসসৃষ্টির চেষ্টা আছে বাংলা ছবিতে। আজকালকার বাংলা ছবি আর হিন্দী ছবির মধ্যে তফাৎ এই যে, কথা না ব'লেও বাংলা ছবি কি বলতে চাইছে, তা' বুঝিয়ে দেয়, আর হিন্দী ছবি কথা ব'লেও বোঝাতে পারে না কি বলতে চাইছে। সব বাংলা ছবির সম্পাদনা ক'রতে গিয়ে যে সমান সুযোগ-সুবিধে পেয়েছি, তা' বলতে পারব না, তবে যত খারাপ ছবিই হোক না কেন, যে-কোনও বাংলা ছবির কোথাও না কোথাও রস খ'ুজে পাওয়া যায়ই যায়। ভালো সম্পাদনা হয়েছে—এ-কথা আলাদা ক'রে বলা যায় না; কারণ চিত্র-নাট্যকার, পরিচালক এবং সম্পাদক এই তিনজনের কাজ পরস্পরের সঙ্গে অংগাংগী-ভাবে জড়িত। যদি কোনো ছবি দেখে আলাদা

'রূপসনাতন' চিত্রে নীতীশ মুখোপাধ্যায়

ক'রে বলা সম্ভব হয় যে, এই ছবিতে সম্পা-কের কাজ ভালো হয়েছে, তাহ'লে ঐ তিন-জনই—চিত্রনাট্যকার, পরিচালক এবং সম্পাদক —একসংগে মারা পড়বেন ব'লেই আমার বিশ্বাস। একটি ওষুধ খাওয়াবার ফলে

'দেয়ানেয়া' চিত্রে তনুজা

'প্রেয়সী' চিত্রে বসন্ত চৌধুরী ও সবিতা চ্যাটার্জি

একজন রোগী মারা গেল। এই জিনিসটা সোজাভাবে দেখানো যায়; আবার আগে রোগী মারা গেছে, এবং পরে ফ্ল্যাশব্যাকের সাহায্যে কেন মারা গেছে, তা দেখানো যেতে পারে। এখন এই ফ্লাশব্যাকটি চিত্রনাট্যকার বা পরিচালক কিংবা সম্পাদকের মস্তিষ্ক-প্রসূত, এ-কথা বাইরের লোক জানবেন কি ক'রে? কিংবা বলা হ'ল, সম্পাদনা বড্ড স্লো হয়েছে। কিন্তু কে বলবে, কতখানি ফুটেজ ফেলা দেওয়া সত্ত্বেও ঐ মন্থরত্ব রয়ে গেছে? কিংবা কোন্ একটি অতি প্রয়োজনীয় কথা দর্শককে শোনাবার জন্যে কোনো জায়গা স্লো রাখতে বাধ্য হ'তে হয়েছে?

ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক প্রয়োগে সম্পাদকের যে অনেক কিছু করবার আছে এবং ছবি যে স্টারদের ওপর নির্ভর করে না, গল্প ও নাটকের ওপর নির্ভর করে, এ-কথা বলাই বাহুল্য। ছবির কোন্ বিশেষ স্থানে একটি বিশেষ রস সৃষ্টি করতে হবে, এ-কথা সব পরিচালক ঠিকভাবে বুঝিয়ে দিতে পারেন বলে মনে হয় না। এ ব্যাপারে অজয় করের সঙ্গে কাজ ক'রে আমি খুব আনন্দ পেয়েছি, এ-কথা বলার লোভ সংবরণ করতে পারছি না।

আমার মনে হয়, পরিচালকের সাফল্যের সহকারী হচ্ছেন ক্যামেরাম্যান এবং সম্পাদক। এই দু'জন সব সময়েই পরিচালককে সাহায্য করতে পারেন এবং করা উচিতও ছবির উৎকর্ষের জন্যে। দুঃখের বিষয়, বর্তমানে এই একাত্মভাবে কাজ করার প্রথা আমার চোখেই পড়ে না। অথচ বাংলা ছবিকে খুব উচ্চ পর্যায়ে তোলবার জন্যে এই সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজন।

—অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়

আমার অভিজ্ঞতা

১৯৩৪—'৬৩। ঊনত্রিশটা বছর কাটিয়ে দিলাম রসায়নাগারিক হিসেবে—অন্ধকার ঘরে। এখন তাগিদ এসেছে, কিছু লেখো তোমার ঐ অন্ধকার ঘরের কথা—পাঠক-পাঠিকারা জানুন, শুনুন (অবশ্য যদি জানতে চান—শুনতে চান) তোমার ঐ ঊনত্রিশটা বছরের সুখ-দুঃখের ইতিহাস। কী চেয়েছিলে? কী পেয়েছিলে? কী পাচ্ছ, আর কী পাবার আশা রাখ! ভেবেছিলাম, এসব কথা অলিখিতই থাক, কারণ কথায় বলে "শতং বদ মা লিখ"। কিন্তু পারলাম না, প্রিয়-অপ্রিয়, লেখার ভেতর হয়ত অনেক এসে যাবে, তবুও লিখতে বাধ্য হয়েছি, কারণ যিনি আমার এই স্বল্প অভিজ্ঞতার কথা লিখতে বলেছেন, তাঁর কাছে সহজে আমি "না" বলতে পারি না।

'৩৪ সালের কথা মনে পড়ে, শ্রীপ্রিয়নাথ গাঙ্গুলীর সেই "কালী ফিল্ম স্টুডিও"—যার লেবরেটরীতে ভর্তি হ'লাম ক্লাস ওয়ানের ছাত্র হিসেবে। মনে অদম্য উৎসাহ, উদ্দীপনা। প্রতিদিনের স্টুডিওতে তোলা নেগেটিভ-সাউন্ড, নেগেটিভ-পিক্চার, পরের দিন লেবরেটরীতে ডেভেলপ হচ্ছে। বড় বড় ১০০ গ্যালন-এর ডেভেলপিং সলিউসনের ট্যাঙ্ক, "হাইপো" ট্যাঙ্ক, ওয়াসিং ট্যাঙ্ক। ফিল্ম জড়ানোর, ১০০ ফুট থেকে ১০০০ ফুটের র‍্যাক। ফিল্ম শুকোবার জন্যে বিরাট কাঠের লাটাই। নেগেটিভ ডেভেলপ হয়ে গেলে, এডিটিং রুমে এডিটর জুড়ে দিল; তারপর প্রিন্ট আর ডেভেলপ করে প্রজেক্টারে দেখে নেওয়া হ'ল সবকিছু ঠিক আছে কিনা। কি ভালই না লাগত! দৈহিক পরিশ্রম—পরিশ্রমই বলে মনে হত না। সব থেকে ভাল ছিল "টিম্ ওয়ার্ক"। প্রত্যেকে প্রত্যেকের মতামত জানতে চাইতেন। ক্যামেরাম্যান সব সময় জানতে চাইতেন ফটোগ্রাফীর কোথাও কোন ত্রুটী হ'য়েছে কিনা।

বোধ হয় কয়েক মাস এইভাবে মোহগ্রস্ত হয়ে কাটবার পর, যখন লেবরেটরীর সব কাজ কিছুটা রপ্ত করে ফেলেছি আর লেবরেটরীবিষয়ক বইও অনেকগুলি পড়েছি, তখন বেশ হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। তাইত আমরা কোথায় আছি! যখন "অটোমেটিক ডেভেলপিং মেসিন" আবিষ্কার হয়ে কাজ চালু হয়ে গেছে তখনও আমরা র‍্যাক আর ট্যাঙ্কে ফিল্ম ডেভেলপ করে মরছি! তবুও

এর মধ্যে একটু সান্ত্বনা ছিল, যখন কোন ছবি প্রেক্ষাগৃহে দেখানর পর কেউ বলত, "বাঃ ফটোগ্রাফী বেশ সুন্দর হয়েছে।" কিন্তু ঐ সান্ত্বনার মাত্রাটা খুব বেশী ছিল না; তার কারণ অত্যধিক বই পড়া, নব নব আবিষ্কারের কথা জানা, আর সেইসব কার্যক্ষেত্রে না-লাগাতে পারা।

এমনি করে যখন হৃদয়ের মধ্যে দুঃসহ ব্যাকুলতা অনুভব করছি, তখন একটা সুযোগ এসেও হারিয়ে গেল। শ্রীদেবকীকুমার বসুর "সোনার সংসার" ছবিটা হবে। স্টুডিওতে হৈ চৈ পড়ে গেছে। গাঙ্গুলী-মশায় ব্যস্ত, স্টুডিওর সকলে তটস্থ, দেবকীবাবু তাঁর দলবল আর "তারকা"দের নিয়ে ধ্যানস্থ। মনে ভাবলাম—এই ত সুবর্ণ-সুযোগ। গাঙ্গুলীমশায়ের কাছে মনের কথাটা পাড়তে বেশ কিছুদিন কেটে গেল; তবু একদিন বলেই ফেললাম—"বাইরের প্রায় সব লেবরেটরীতে ডেভেলপিং মেসিন হয়ে যাচ্ছে, আজ্ঞে, আমাদের এখানে একটা......।" যতদূর মনে পড়ে, তিনি আমার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে ওই কথার উত্তর না দিয়ে বললেন—"দেখ ত, যে প্রিণ্টটার আজ প্রজেক্‌সান দেখব বলেছি সেটা হয়েছে কিনা।" আমি তাঁর "সোনার সংসার" নিয়ে ব্যস্ততার মানে অন্য করে নিয়েছিলাম; জানতাম না তিনি শশব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। "সোনার সংসার" হ'ল না,—চলে গেল ইস্ট ইণ্ডিয়া স্টুডিওতে। কিন্তু যদি এখানে হত', তাহলে সত্যি কালী ফিল্ম স্টুডিও সোনার সংসারের রূপ ধারণ করত।

কোডাক কোম্পানীর ডেভেলপিং মেসিনের সঙ্গে দেখা হ'ল ১৯৩৭—৩৮ সালে ওয়ালটেয়ারে অপ্সরা সিনেটোনে। এক বছর, চাক্ষুস দেখে ও কাজ করে মন ভরেনি, কারণ পুঁথিগত বিদ্যার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারলাম না। এরই মধ্যে লেবরেটরীর টেকনিক বহুদূরে এগিয়ে গেছে অন্য দেশে,—বিশেষ করে আমেরিকায়। সোসাইটী অফ্ মোশান পিকচার ইঞ্জিনীয়ার্স মাসিক পত্রিকাটি পড়তাম; এর জন্যে বিশেষ করে একজনের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। তিনি হচ্ছেন স্বনামধন্য সাউণ্ড ইঞ্জিনীয়ার শ্রীমধুসূদন শীল। শুধু কোলকাতায় থাকতেই নয়, যখন ওয়ালটেয়ারে আছি, তখনও প্রত্যেক মাসের পত্রিকাটি ডাকে পাঠাতে ভোলেন নি। তাই আমি মনের মধ্যে তাঁকেই গুরুর আসনে বসিয়ে রেখেছি। কোলকাতায় থাকতে তাঁর বাড়িতে গিয়ে উৎপাত করেছি, আলোচনায় মজিয়ে দিয়ে চুপ করে শুনেছি, আর বেগুনি-ফুলুরি ধ্বংস করেছি—বেশ মনে আছে।

ওয়ালটেয়ার থেকে কোলকাতায় ফেরার কয়েক মাসের মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেল—দ্বিতীয় মহাসমর। সব ওলটপালট হয়ে গেল। কোথায় সে কেমিক্যাল, কোথায় সে ফিল্ম। চারিদিকে হাহাকার। এই যুদ্ধের কয়েক বছরের মধ্যে আগের জীবনের সুখ-সুবিধেগুলিকে ঠিক উপলব্ধি করতে পারলাম। আগে দুঃখকেই মস্ত বড় করে দেখেছিলাম, সুখ মনে মোটেই স্থান পায়নি।

সুখ-দুঃখ, সুবিধে-অসুবিধের কথা বলতে গেলে, এইখানে লেবরেটরী ও ফিল্ম সম্বন্ধে কিছুটা সহজ ও সরল ভাষায় না

বলল, আমার বোধহয়, বক্তব্য ঠিক বোঝান যাবে না।

গোড়াতেই বলে রাখি, স্থিরচিত্রের সঙ্গে চলচ্চিত্রের লেবরেটরী টেক্‌নিক-এর আকাশ-পাতাল তফাৎ। বাহ্যত মনে হয়, এ আর এমন কি, ফিল্মের ইমালসান্-ডেভেলপিং সলিউসান, সবই ত এক রকমের, শুধু মেসিনে ডেভেলপ আর প্রিন্ট হয় চলচ্চিত্র, আর হাতে স্থিরচিত্র—কিন্তু মোটেই তা নয়।

নিখুঁত ফটোগ্রাফী নির্ভর করে, ফটোগ্রাফী নির্মাণকার্যে নিযুক্ত সমস্ত বিভাগের নিখুঁত কাজের ওপর—এটা খুবই স্বাভাবিক। চলচ্চিত্রের ফিল্ম যাঁরা তৈরী করেন, তাঁরাও আশা করেন তাঁদের ফিল্মের যথাযথ ব্যবহার ক্যামেরাম্যান ও লেবরেটরী করবেন। ফিল্মের ওপর কেমিক্যাল আছে, যেমন "সিলভার ব্রোমাইড্ আয়োডাইড" ইত্যাদি, তেমনি ডেভেলপিং সলিউসানে কেমিক্যাল আছে যথা—মিটল-হাইড্রোকুইনন, সোডা-সালফাইট ইত্যাদি। এদের দুজনের নিখুঁত মিলনে গড়ে ওঠে ভাল ফটোগ্রাফী। কিন্তু এদের মিলন ঘটবার মধ্যমণি বা তৃতীয় ব্যক্তি হ'লেন ক্যামেরাম্যান। ক্যামেরাম্যান নিখুঁত কাজ করবেন, আর লেবরেটরী তার নিখুঁত ডেভেলপ আর প্রিন্ট দেবেন—এইটাই কাম্য। শুধু লেবরেটরীর কথাই ধরা যাক্। নিখুঁত কাজ কি হ'লে দেওয়া যায়? (১) ফিল্ম যখন তৈরী হয়েছিল তখন তার যা চারিত্রিক গুণ ছিল—ব্যবহারের সময় ঠিক সেই জিনিসটা থাকা চাই। বিশেষ ধরণের ঠাণ্ডা ঘরে রাখলে, বেশ কয়েকমাস ফিল্ম ভাল থাকে। যুদ্ধের আগে ঐ রকম ঠাণ্ডা ঘরের জাহাজে করে ফিল্ম আসতো। যুদ্ধের সময় তা সম্ভব হয়নি। ফলে, "যে যা পাচ্ছে তাই নিয়ে কাজ করে যাও"। (২) যুদ্ধের আগে কেমিক্যাল সম্বন্ধে মাথা ঘামাতে হয়নি। ডেভেলপিং সলিউসানের কেমিক্যাল-গুলি ঠিক ঠিক গুণসম্পন্ন আছে কিনা,

তা "টেষ্ট" করে বা "এনালাইজ" করে দেখা কষ্টসাধ্য ও ব্যয়সাপেক্ষ, কিন্তু তা করবার দরকার হ'ত না। ট্রেড্‌মার্ক মানেই চোখ-বুজে ব্যবহার করে যাও—সব ঠিক আছে। যুদ্ধের সময় ও পরে সব গোলমাল হ'য়ে গেল। ঠিক যেন মনে হল—"সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই"। (৩) লেবরেটরী প্রসেসিং টেক্‌নিক্‌—যা হওয়া উচিত ছিল, তা আমাদের হয়নি। লেবরেটরীতে প্রচুর জল দরকার হয়। ডেভে-লপিং সলিউসানের জন্যে জল তৈরী করে নিতে হয়—তাতে থাকবে না, ক্যালসিয়াম-ম্যাগনিসিয়াম সল্ট, লোহা, তামা, চুন সালফাইড্‌—এরা সকলেই নাকি ফিল্মের ভীষণ শত্রু—আর সব থেকে বড় শত্রু ধুলো-বালি। এমনভাবে "ফিল্টার" করতে হবে যাতে এরা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র রূপেও জলের ভেতর না থাকে। লেবরেটরীর জন্যে বাতাসও তৈরী করে নিতে হয়—ধুলোর কথা ঐ জলের মত। আর সব সময় ঘর ঠাণ্ডা রাখতে হবে, তবে ঘরগুলির ঠাণ্ডার ও আর্দ্রতার তারতম্য থাকে। ডেভেলপিং মেসিনে এক্‌স্‌পোজড ফিল্ম নিখুঁতভাবে ডেভেলপ করা সত্যি সবথেকে কঠিন কাজ। প্রত্যেক ফুট ফিল্মে ষোলটা করে ছবি অর্থাৎ হাজার ফুটে ষোল হাজার ফ্রেমের ছবি। এই ষোল হাজার ফ্রেমের প্রত্যেক ফ্রেম যখন এক এক করে ডেভেলপিং সলিউসানের ভেতর দিয়ে ঢুকে বেরিয়ে যাবে, তারা যেন প্রত্যেকে ঐ ডেভেলপিং সলিউসানের কাছে এক রকম ব্যবহার পায়—তা দেখতে হবে। কারণ হাজার ফুটের প্রথম ফ্রেম যখন ডেভেলপিং সলিউসানে ঢোকে, তখন ডেভেলপিং সলি-উসানের যা শক্তি ছিল, শেষ ফ্রেম যখন ঢুকছে, তখন তার সে শক্তি থাকছে না। তাই নতুন সলিউসান কাজ চলার মধ্যেই দিয়ে দিয়ে ঐ শক্তি বজায় রাখতে হবে। এইভাবে হাজার হাজার ফুট ফিল্ম ডেভেলপ হচ্ছে। ডেভেলপিং সলিউসানের শক্তির ক্ষয়ও পূরণ হচ্ছে। সলিউসানের তাপমাত্রা এক জায়গায় রাখা—সলিউসানের মধ্যে দিয়ে ফিল্মের গতি-বেগ একরকম রাখা অবশ্য-কর্তব্য। ডেভে-লপিং সলিউসানের থেকে ফিল্ম বেরিয়ে যাবার সময় খানিকটা করে সলিউসান অন্য ট্যাঙ্কে নিয়ে যায়; সেজন্যে নতুন সলিউসান দিয়ে "ভলুম" ঠিক জায়গায় রাখতে হবে—ইত্যাদি। ডেভেলপিং রুম, যে ঘরে ফিল্ম ডেভেলপ হচ্ছে, সেখান থেকে দূরে—একটা কনট্রোল রুম থাকে, যেখান থেকে উপরোক্ত সমস্যাগুলির সমাধান করা হয়। কয়েকটা জিনিসের নাম—(১) টেম্পারেচার-রেকর্ডার কন্ট্রোল, (২) রেপ্লিনিস্‌মেন্ট ফ্লো রেকর্ডার কন্ট্রোলার (নতুন সলিউসান ট্যাঙ্ক কত যাচ্ছে)। (৩) রিমোট রাকার থারমোমিটার। (৪) রিমোট প্রেসার গেজেস্‌। (৫) রিমোট ডেপথ্‌ গেজেস্‌ (ট্যাঙ্ক-ভল্যুম দেখার যন্ত্র) ইত্যাদি।

লেবরেটরীর সাজ-সরঞ্জাম অনেক, তার মধ্যে অল্প কিছু জানান হ'ল—বিস্তারিত সব বইতে লেখা আছে। যা আছে, সব কি আমাদের দেশে করা যায়? আমি বলব যায়, এর মধ্যে কোনোটাই এটম্‌ বোমা বা হাই-

হাইড্রোজেন বোমা আবিষ্কারের মত শক্ত নয়। কিন্তু কেন করা হয়নি বা করা হচ্ছে না—আমি জানি না। ভবিষ্যতে আদৌ হবে কি না—তাও জানি না।

তবুও, হাতের কাছে যা পাওয়া গেছে, আর তাই নিয়ে মাঝে মাঝে লেবরেটরী থেকে যে ভাল কাজ বেরিয়েছে—বাহাদুরি বৈকি। বিদেশ থেকে কয়েকজন টেক্‌নিসিয়ান এসে আমাদের চিত্রশালায় স্টুডিও, লেবরেটরী ও পর্দায় ছবি দেখে অবাক হয়েছেন—কি করে এই অবস্থার মধ্যে থেকে ভাল কাজ হ'তে পারে। তাঁরা ত জানেন না আমাদের উর্বর মস্তিষ্কের কথা। আমাদের উদ্ভাবনী শক্তি কী প্রখর! শতচ্ছিন্ন দশ হাত ধুতি ও বার হাত শাড়ী এমন ঘুরিয়ে পরতে পারি, যার একটা ফুটোও কেউ দেখতে পাবে না। কিন্তু কোট-প্যান্টের দেশে কি তা হবার উপায় আছে? তাই তাঁদের সব সময়ই নিখুঁত সাজে আসরে নামতেই হবে।

ভাল ফিল্ম, ভাল কেমিক্যাল—এ সবের কথা ভুলে গেছি। আমাদের দোষ, ত্রুটি আর সমস্যার অন্ত নেই। তবু এইসব দোষ-ত্রুটি দর্শকের চোখের ওপর বড় করে গিয়ে যাতে না পড়ে, তার চেষ্টা করেই চলেছি, জানি না কোথায় গিয়ে পৌঁছব।

—শৈলেন ঘোষাল

আমার কথা

১৯২৬ থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত বাঙলা এবং হিন্দী মিলিয়ে আমি অন্ততঃ পঞ্চাশ-পঞ্চান্নখানা ছবিতে অভিনয় করবার সুযোগ পেয়েছি। ম্যাডান থিয়েটারের নির্বাক ছবি

"জয়দেব"-এর রাধার ভূমিকায় পরলোকগত জ্যোতিশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে আমার হাতেখড়ি। "জয়দেব" এবং "শঙ্করাচার্য" ছবি দু'টির পরেই সবাক যুগের আবির্ভাব হ'ল এবং আমার প্রথম সবাক ছবি হ'ল "জোরবরাত"। ম্যাডানে চারখানি সবাক ছবি করবার পরেই আমি রাধা ফিল্মসে যোগ দি এবং প্রফুল্ল ঘোষের পরিচালনায় তোলা "শ্রীগৌরাঙ্গ" ছবিতে বিষ্ণুপ্রিয়ার চরিত্রে অভিনয় ক'রে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং সুনাম অর্জন করি। "মানময়ী গার্লস্ স্কুল"-এ নীহারিকার ভূমিকায় অভিনয়ের পর আমি নিউ থিয়েটার্সে আসি এবং এখানে আমার প্রথম ছবি হ'ল প্রমথেশ বড়ুয়ার পরিচালনায় তোলা "মুক্তি"। "বিদ্যাপতি" ছবিতে প্রথম আমি দেবকী বসুর অধীনে কাজ করবার সুযোগ পাই। "পরিচয়" হচ্ছে নিউ থিয়েটার্সে আমার শেষ ছবি। এরপর এম-পি প্রোডাকসন্স-এর অধীনে শ্রীবড়ুয়া পরিচালিত "শেষউত্তর" এবং সুশীল মজুমদার পরিচালিত "যোগাযোগ" ইত্যাদি হিন্দী ও বাঙলা মিলিয়ে দশখানি ছবিতে অবতীর্ণ হই। ১৯৪৭ সালে আমি আমেরিকা যাই এবং সেখান থেকে ফিরে এসে আমার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান "শ্রীমতী পিকচার্স"-এর পত্তন করি। "অনন্যা" থেকে শুরু ক'রে "শ্রীকান্ত, ইন্দ্রনাথ ও অন্নদাদিদি" পর্যন্ত দশখানি বাঙলা ছবির প্রযোজনা আমি করেছি। চলচ্চিত্ররাজ্যে শিল্পী এবং প্রযোজক হিসেবে এই হচ্ছে আমার কাজের সংক্ষিপ্ত তালিকা।

—কানন

শিল্পি-জীবন :

প্রথম যখন চলচ্চিত্রে শিল্পী হিসেবে যোগ দিলাম, তখন কোনো কিছু বোঝবার মত বয়স বা মনের গভীরতা ছিল না। তখন আমার প্রধান লক্ষ্য ছিল অর্থ উপার্জন। প্রথম যখন 'নামের' রস পেলাম, তখন আস্তে আস্তে মনে হতে লাগল—বাঃ, এর ত' আরও একটা দিক আছে। প্রথম দিকে, মনে হয়, শখ করে কেউই আসেননি—অন্ততঃ চোদ্দ আনা লোকই—অর্থের জন্যে সিনেমায় যোগ দিয়েছিলেন। পরে যখন নাম হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে অর্থও আসতে লাগল, তখন মনে নানারকম শখ এল—মনের চাহিদা অল্পে অল্পে পূরণ হ'তে লাগল। তখন মনে হতে লাগল, আরও বেশী নাম কিসে হয়; বাঙলা দেশের খুব নামকরা অভিনেত্রী কি ক'রে হতে পারি সেই চিন্তা এল। আবার যখন বাঙলা দেশে

নাম হ'ল, তখন মনে হ'ত কি ক'রে সারা ভারতে নাম করতে পারি। এর জন্যে সাধনা বলুন আর চেষ্টাই বলুন, কোনো কিছু করবার ত্রুটি রাখিনি।

বেশীর ভাগই আমাকে দেওয়া হত ছবির রোমান্টিক নায়িকার ভূমিকা। তাতে যে শুধু হাল্কা চটুল অভিনয়ের সুযোগ থাকত, তা' নয়; খুব গভীর বেদনা-দায়ক দুঃখের দৃশ্যও ফোটাতে হ'ত। অভিনয় এবং গানের ভিতর দিয়ে আমি চরিত্রকে প্রাণবন্ত ক'রে তোলবার চেষ্টা করতুম। তাছাড়া নানা ছাঁদের কেশবিন্যাস থেকে শুরু ক'রে বিশেষ বিশেষ ডিজাইন দিয়ে কাপড়-গহনা ইত্যাদি গড়াতুম নিজেকে চরিত্রের উপযোগী সাজে সজ্জিত করবার জন্যে। চোখের চাউনিতে, অঙ্গভঙ্গীতে, হাসিতে আমি চটুলতার দৃশ্যগুলিকে জীবন্ত করবার চেষ্টা করতুম—এরই নাম নাকি যৌন-আবেদন বা গ্ল্যামারের সৃষ্টি! সে যুগের লোকেদের মুখে শুনেছি, আমিই নাকি বাঙলা চলচ্চিত্রে প্রথম গ্ল্যামার গার্ল! কিন্তু তখন নাইলনের যুগ ছিল না; তাই বহিরঙ্গ দিয়ে গ্ল্যামার সৃষ্টির কোনো প্রশ্নই ছিল না সেযুগে। যা-কিছু গ্ল্যামারের সৃষ্টি, তা' করতে হ'ত অভিনয়, গান এবং উপযোগী ভঙ্গীর মাধ্যমে। সে-গানও পরের গাওয়া গানের সঙ্গে ঠোঁট নাড়া নয়, ক্যামেরার সামনে ছবিতে অভিনয় করতে করতে সঙ্গীত-পরিচালকের নির্দেশ মতো গাওয়া এবং প্লেব্যাক-পদ্ধতি আবিষ্কৃত হবার পরে নিজের গানের সঙ্গে ঠোঁট মিলিয়ে চিত্ররূপ দেওয়া। যাই হোক, শিল্পী হিসাবে কতটা নাম পেয়েছিলাম, বা কতটা সাফল্যলাভ করেছিলাম, তার মাপকাঠি আমার কাছে নেই—সে জানেন তাঁরা যাঁরা আমার অভিনয় দেখেছেন, জানেন আপনারা (চিত্র-সমালোচকরা)।

গলা থাকলে মানুষে গান করে, কিন্তু সেই গানে যিনি কথা জুগিয়েছেন, যিনি সুর বসিয়েছেন, তাঁদের কথা গানের সাফল্যের ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই উল্লেখ করতে হবে। আমার যেটুকু নাম হয়েছে, তাতে আমার নিজের হয়ত কিছুটা অংশ আছে; কিন্তু যে পরিচালক আমাকে দিয়ে অভিনয় করিয়েছেন, যে ক্যামেরাম্যান আমার ছবি তুলেছেন, যিনি আমার মুখে আলো দিতে গিয়ে একটি বার্ণডোর (Burndoor) ব্যবহার ক'রে মুখের খানিকটা আলো কেটে দিয়ে মুখটিকে বেশী সুন্দর ক'রে দেখাতে চেয়েছেন, যিনি আমার সাজগোছ মেক-আপের ও চুলের বিন্যাসের তদারক করেছেন, তাঁরাও তো কম অংশীদার নন। ফিল্মের কনেকে সাজিয়ে-গুছিয়ে তাঁরাই তো লোকের সামনে সুন্দর ক'রে বার করেছেন।

বোম্বের ডাক আমাকে প্রলুব্ধ করেনি কখনো; কারণ টাকার জন্যে আমি কখনও পাগল হইনি। ১৯৩৮ সালে একখানি ছবির জন্যে দু' লাখ টাকাও আমাকে দিতে চাওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি বাঙালী মেয়ে; বাঙলার শিল্পকে আমি ভালোবাসি। তা ছাড়া বাঙলা দেশ আমাকে অর্থ, ভালোবাসা, সম্মান দিয়েছে অফুরন্ত—আমার যোগ্যতার

'কৃষ্ণকান্তের উইল' নাটকে ভ্রমরের চরিত্রে সবিতা বসু

চেয়ে বেশী। তাই বাঙলা ছেড়ে যেতে কোনোদিন আমার মন চায়নি।

নাম হয়েছে, টাকা হয়েছে, গাড়ী হয়েছে, বাড়ী হয়েছে, সুখৈশ্বর্য হয়েছে; তারপরে মনে হয়েছে—এরপর কি? —এরপর আর কি আছে? তখন মনে এসেছে—সংসারের চিন্তা এবং তাই শেষ-পর্যন্ত সংসার করেছি। এবং ক্রমে শিল্পজীবনে পূর্ণচ্ছেদ টেনে সংসারীই হয়ে উঠেছি।

প্রযোজক-বেশে :

যখন কতকগুলো বৈশিষ্ট্যহীন সাধারণ স্তরের ছবি ক'রে মনে বিরক্তি পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল, তখনই প্রযোজক হবার কথা প্রথমে মনে আসে; মনে হয়, নিজের ইচ্ছামত কতকগুলো ভালো ছবি তৈরী করিনা কেন? শিল্পী হিসেবে ত অনেক দিন কাজ করেছি, এইবার মনের শিল্পানুভূতিকে একটু স্বাধীনতা দিইনা কেন? ভালো ভালো গল্প, সুন্দর চরিত্রের চিত্ররূপ দেবার বাসনাকেই এইভাবেই চরিতার্থ করবার চেষ্টা করেছি। ত'ছাড়া নিজের বয়স ইত্যাদি অনুযায়ী ভূমিকা-গ্রহণের স্বাধীনতাও পেলুম। তাই ত' রাজলক্ষ্মী না সেজে অন্নদাদিদি সাজতে পেয়েছি।

প্রযোজক হিসেবে শ্রীমতী পিকচার্সের নামে যে-ছবি করেছি তা দর্শকদের কতখানি ভালো লেগেছে, তা' তাঁরাই জানেন। প্রযোজক হিসেবে অনেক সময় যখন ভেবেছি, একখানি খুব রুচিসম্পন্ন শিল্প-সম্মত ছবি জনসাধারণকে উপহার দিয়েছি, তখন হয়ত' দেখেছি, তাঁরা সে-ছবি গ্রহণ করলেন না। আবার পুরোনো ঢঙের, পুরোনো ভাবওলা ছবি, যা মনে হয়েছে অতিসাধারণ স্তরের, সেই ছবি হিট হয়েছে। অবাকবিস্ময়ে ভেবেছি, এমন কেন হয়? তাহ'লে কি দর্শকসাধারণের রুচির সঙ্গে আমাদের রুচির কোনো গরমিল আছে? এ-প্রশ্নের কোনো সদুত্তর পাইনি।

'মরুতৃষ্ণা' চিত্রে অসিতবরণ ও সবিতা বসু

'কালস্রোত' চিত্রে মঞ্জু দে

তবু রুচিহীন বা বিকৃতরুচির ছবি করতে পারিনি; মনে হয়েছে, শিল্পী হিসেবে যে-সুনামটুকু অর্জন করেছি, সেই পাথেয়টুকু যেন কখনও না হারাই। ছবির প্রযোজনা করতে গিয়ে আমি কলাকুশলী এবং শিল্পী-দের কাছ থেকে খুব ভালো ব্যবহার এবং সহযোগিতা পেয়েছি; এটিকে আমি আমার পরম সৌভাগ্য বলে মনে করি। ১৯৬০ সালে "ইন্দ্রনাথ, শ্রীকান্ত ও অন্নদাদিদি" করবার পর আমি যদিও আর কোনো ছবির প্রযোজনা করিনি, তবু ইচ্ছে আছে, আরও কিছু ছবির কাজে আমি অদূরভবিষ্যতেই হাত দেব।

—কানন দেবী

ক্রিকেটের তীর্থভূমি লর্ডস্ মাঠ। ইতিহাসের হাত ধরে ১৯২৮ সালের চাইছি। প্রাপ্তিযোগ আছে। ফিরে গিয়ে ফিরে পেতে চাই সেই মুহূর্তকটি ক্রিকেটের পরম অনিশ্চয়তার গৌরবময় ছায়াপাতে যা আকর্ষণীয় হয়ে আছে।

তাজা যৌবনের জীবন্ত ছোঁয়ায় মুহূর্তকটি ক্রিকেট-অনুরাগীদের মনের দিগন্তে রামধনু এঁকে রেখেছে। সেই বর্ণালী প্রত্যক্ষদর্শীদের চোখ জুড়িয়েছে। মন ভরিয়েছে। তাই ফিরে ফিরে সেদিকে দৃষ্টি মেলতে আজও সাধ জাগে বারেবারে।

সেদিন লর্ডসের প্রশস্ত, পরিচ্ছন্ন, শ্যামল আঙিনায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ইংলণ্ডের বিখ্যাত কাউন্টি দল মিডলসেক্স আর সফরকারী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল। আসর বড়, কিন্তু আয়োজন টেস্ট খেলার মতো বড়সড় নয়। তবু সেই উপলক্ষ্যেই যা ঘটে গেল তার চেয়ে বড় কিছু ক্রিকেট মাঠে কখনো ঘটেছে কিনা সন্দেহ।

সেদিনের সঙ্গে আজকের ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অনেক তফাৎ। দল হিসেবে তখনও তাঁদের অভিজাত ক্রিকেট-মহলে কুল্কে জোটেনি। দলভুক্ত দু-একজনের নামডাক অবশ্য কিছু হয়েছে। কিন্তু সেরা খেলা টেস্ট ম্যাচের কষ্টিপাথরে ওয়েস্ট-ইণ্ডিজের কৌলীন্য যাচাই হতে তখনও বাকী।

দল হিসেবে কুলীনের মর্যাদা যার নেই, বিদেশ সফরে অর্থভাগ্যও তার প্রসন্ন নয়। অথচ বিদেশ-পরিক্রমায় আর্থিক সঙ্গতির মূলধন হাতে না থাকলেও চলে না। ইংলণ্ডে এসে প্রথম পর্বে তেমন হাঁকডাক তুলতে না পারায় আর্থিক অনটনের প্যাঁকে জড়িয়ে থেকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল তখন রীতিমতো দুশ্চিন্তা-গ্রস্ত।

এমন দিনে তাদের খেলা মিডলসেক্সের সঙ্গে। পরের ম্যাচই প্রথম টেস্ট। মিডলসেক্সের বিরুদ্ধে ভাল খেলে যদি রীতিমতো সোরগোল তোলা যায় তবেই পরিত্রাণ। তবেই না টেস্ট-আসরে লোক উপচে পড়বে! ঘাটতি যাবে পুষিয়ে। নইলে কপালে যে কি আছে দলের কর্তারা ভেবেও তা কুলিয়ে উঠতে পারছেন না!

দলের সবচেয়ে নামী খেলোয়াড় 'কনি'। ভরসা একমাত্র তিনিই। ব্যাটে, বলে, ফিল্ডিংয়ে, সবকিছুতেই তাঁর পুরোপুরি হাত আছে। সেই হাতের নিদেনপক্ষে আধখানাও যদি তিনি লর্ডসের মাঠে মেলে ধরতে পারেন, তাহলেই যথেষ্ট। কিন্তু ভাগ্য এমনই অকরুণ যে 'কনির' হাতখানিকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখতে তার পক্ষ থেকে বিন্দুমাত্র কসুর করা হলো না।

ঠিক আগের দিন খেলা ছিল সারে কাউণ্টির সঙ্গে। 'কনি' একহাতেই লড়েছেন সে আসরে। প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরী করেছেন। দ্বিতীয় ইনিংসে অপরাজিত ষাট রাণ হাঁকিয়ে একা তিনিই সারের জয়লাভের পথ আগলে দাঁড়িয়েছেন।

কিন্তু সারের আক্রমণের মুখে মেরুদণ্ড সোজা রেখে দাঁড়াতে গিয়ে 'কনি' যে কোন ফাঁকে নিজের পায়ের পেশীবন্ধনী ছিঁড়ে ফেলেছেন তা তিনি বুঝতে দেননি অপর কাউকেই। বুঝলো সবাই যখন খেলা শেষে বিছানার এলিয়ে পড়া ছাড়া তাঁর আর অন্য উপায় রইলো না।

অবস্থা দেখে দলের কর্তাদের মাথায় হাত! তলব পড়লো চিকিৎসকের। তিনি এসেই, দেখেশুনে রায় দিলেন, 'না, এ অবস্থায় খেলা চলতে পারে না।'

মুষড়ে পড়লেন কর্তারা। 'কনি' নিজে একবার আমতা-আমতা করে বলে উঠলেন,

'কিন্তু আমাকে যে খেলতেই হবে। নইলে......'

ধমকে উঠলেন বিজ্ঞ বদ্যি।

'রোগীকে সৎ পরামর্শ দেওয়াই আমার কাজ। আমি চিকিৎসক, শোনা না-শোনা আপনার দায়িত্ব।'

তবু 'কনি' বোঝাবার চেষ্টা করলেন,

'না খেললে আমাদের যে ভরাডুবি হয়ে যাবে!'

'হোক্, তবুও না।' সুর চড়িয়ে হন্হনিয়ে বেরিয়ে গেলেন চিকিৎসক।

ব্যাপার দেখে কর্তারা নির্বাক! শুধু 'কনিই' দাঁতে দাঁত চেপে রইলেন শেষ চেষ্টা করে দেখার সংকল্পে।

রাতভোর গরম পানির থলি আর উগ্র মালিশের প্রলেপ 'কনির' আহত পা ছুঁয়ে রইলো। চোখের দুটি পাতা এক মুহূর্তও জুড়তে পারলেন না। তবুও কাক ডাকার লগ্নে 'কনি' জানালেন, লর্ডসে মিডলসেক্সের বিপক্ষে তিনি খেলবেনই!

পরের দৃশ্য লর্ডস মাঠে।

আঘাত উপেক্ষা করে, গত রাতের বিভীষিকা ভুলে 'কনি' যথারীতি ছুটে এসেই বোলিং আরম্ভ করে দিলেন। দুরন্ত গতি তাঁর বলের। আক্রমণের ধার তীক্ষ্ণ, শাণিত। দেখতে দেখতে 'কনির' কাছে মিডলসেক্সের এক ব্যাটসম্যান হার মানলেন। কিন্তু তারপর?

তারপরই পুরানো ব্যথাটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। যন্ত্রণায় গোঙাতে লাগলেন

'কনি'। শুশ্রূষাকারীরা ধরাধরি করে তাঁকে নিয়ে গেলেন মাঠের বাইরে।

'কনি' রণে ভঙ্গ দিয়েছেন। তাঁর ধারালো আক্রমণ অনুপস্থিত। মিডল-সেক্সের ব্যাটসম্যানদের আর পায় কে! গুনে গুনে অনেক রাণ জড়ো করলেন তারা। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ কোণঠাসা হয়ে পড়লো। বিশেষতঃ তাদের ইনিংসের শুরুতে যখন পাঁচ-পাঁচজন সেরা ব্যাটসম্যান তাঁবুতে ফিরে গেলেন মাত্র ৭৯ রাণের মধ্যেই।

দলের সামনে বিপর্যয়। দেখে হাত গুটিয়ে থাকতে পারলেন না 'কনি'। পায়ের ব্যাথাটা মালুম দিচ্ছে। তবুও না। মাঠে নামার ইচ্ছে ছিল না তাঁর। নামতে হলো অবস্থার চাপে। ব্যাট হাতে তিনি মাঠে ফিরলেন। সঙ্গে সঙ্গে যেন যাদুমন্ত্রের প্রভাবে মাঠের ভোলও ফিরে গেল।

দর্শকেরা ভাবছিলেন, বিপর্যয়ের মুখে কোণঠাসা ভূমিকায় 'কনি' বুঝি জান্ বাঁচানোর চেষ্টায় উইকেটে তাঁর অস্তিত্বের শিকড় নামাতেই ব্যস্ত থাকবেন। ঠুক-ঠুক করে খেলবেন, যতোক্ষণ পারেন ততোক্ষণ। কিন্তু ও'রা 'কনি'কে চিনতে পারেননি। ঠুক-ঠুকানিতে তাঁর চিরকালের অনিহা। মাঠে নেমেই তিনি একেবারে ভেল্‌কি দেখাতে শুরু করে দিলেন।

'কনির' সে চেহারার সামনে পড়ে সংযমের শাসানি সঙ্কুচিত হয়ে পড়লো। হাতের ব্যাট ঘুরলো, ব্যাটের ঘায়ে বল ছুটলো। ব্যাট-বলের সংঘর্ষে ঠকাঠক শব্দে মুখরিত হয়ে উঠলো লর্ডসের প্রসারিত পরিবেশ। 'কনি'র দুরন্ত উগ্রতার তাপে মাঠকে মাঠ যেন তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো।

'কনি' মাঠে নামার আগে মিডল-সেক্সের ফিল্ডসম্যানেরা উইকেটের কাছে হুমড়ি খেয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এবার ক্রমশঃই সরে গেলেন সভয়ে বাউণ্ডারীর ধারে। সেখানেও নিস্তার নেই। 'কনি'র মার সেখানেও তাঁদের তাড়া করছে। ফিল্ডস-ম্যানদের হাত পাততে সাহসে কুলোয় না। বল থামাতে কুণ্ঠা জাগে।

দেখতে দেখতে 'কনি' মাত্র কুড়ি মিনিটে নিজের রাণ তুললেন পঞ্চাশ। এক ঘন্টায় ছিয়াশী। আর সেই সাফল্যের সূত্রেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মোট সংগ্রহ জমা পড়লো ২৩০ এর ঘরে। যোঝবার মতো পাথেয় বটে!

তাজা রক্তের স্বাদে হিংস্র শার্দুল যেন ক্ষেপে উঠেছে। 'কনি'ও ভুলেছেন পায়ের আঘাত।

এবার মিডলসেক্সের দ্বিতীয় দফার ব্যাটিংয়ের পালা। পায়ে চোট। 'কনি' কি বল করবেন? ফুঃ! ও আবার চোট! 'কনি' নিজেই দলপতির কাছ থেকে নতুন বল চেয়ে নিলেন। আর সেই বল 'ছুঁড়ে' একে একে সাতজন ব্যাটসম্যানকে নিজেই ঘায়েল করে ছাড়লেন।

এই মানুষটির নাকি পায়ের পেশীবন্ধনী ছিঁড়ে গিয়েছে। ছিয়াশী রাণ করার পর সাতায় রাণে সাতটি উইকেট (শেষের ছটি নামমাত্র এগারো রাণেই!) পাওয়ার দৃষ্টান্ত ছেড়ে দর্শকেরা আর তখন অন্যদিকে তাকাতে চাইছেন না। তাঁদের দৃষ্টিতে তখন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ নেই। নেই প্রতিপক্ষ মিডল-সেক্সও। আছে সমগ্র চেতনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওই একমাত্র 'কনি'ই। সবাই তখন পার্শ্ব-চরিত্রে। একনায়ক 'কনি'।

কিন্তু তখনও নাটকের পঞ্চমাঙ্কের উত্তেজনা সৃষ্টি হতে আরও কিছু অবশিষ্ট ছিল।

এবার ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় দফার ব্যাটিং। চাকা ঘুরে গিয়েছে। ২৫৯ রাণ করতে পারলেই তারা এই খেলায় জিতবে। তবে জেতার আশা কম। কারণ সময় সামান্য।

এমন সময় ড্রেসিংরুমে অযাচিত এক তৃতীয় পক্ষের আবির্ভাব।

তৃতীয় পক্ষের নাম চার্লস্ ম্যাকারটনি। অস্ট্রেলিয়ার অবিস্মরণীয় খেলোয়াড় তিনি, ক্রিকেট-দুনিয়ায় যিনি 'গভর্ণর-জেনারেল' নামেই পরিচিত। টেস্ট খেলায় ঝড়ের আগে রাণ তুলে মাত্র যে তিনজন ব্যাটসম্যান মধ্যাহ্ন ভোজনের আগেই ব্যক্তিগত রাণ-সংখ্যাকে একশর সীমার বাইরে টেনে নিয়ে যেতে পেরেছেন, ম্যাকারটনি তাঁদেরি অন্যতম।

'গভর্ণর জেনারেল' এতোক্ষণ দর্শক আসনে ছিলেন। আর স্থির থাকতে পারলেন না। ছুটে এলেন ড্রেসিংরুমে। এসেই এসেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দলনায়ক নুনসকে মিনতি জানালেন,

'আপনি সবার আগে কনিকে ব্যাট করতে পাঠান। এ খেলায় আপনারা জিতবেনই।'

'না, না। তা কি করে হয়। কনি যে আহত!'

অধিনায়ক নুনসের দায়িত্বসচেতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো।

'তা হোক্। দর্শকদের ভোলাতে কনি নিজের ব্যথাও ভুলবেন। দেখছেন না, আজকের দিনটিতে কনি শুধু সর্বংসহাই নন, সর্বজয়ীও।' পেড়াপেড়ি করতে লাগলেন ম্যাকারটনি। দায় যেন তাঁরই!

তবু নুনস্ নারাজ, 'তা হয় না। দরকার না পড়লে কনি মাঠে নামবেন না।'

কি আর করেন ম্যাকারটনি। হাল ছেড়ে দিয়ে গেলেন নিজের জায়গায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর কথাই ফললো। দলের প্রয়োজনেই আবার 'কনিকে' মাঠে নামতে হলো।

দ্বিতীয় ইনিংসেও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের সংকট। পাঁচটি উইকেট গিয়েছে মাত্র একশ রাণের মধ্যে। অগত্যা ব্যাট হাতে মাঠে 'কনির' পুনরাবির্ভাব।

আবার এলেন তিনি। এলেন, দেখলেন, জয় করলেন। সেই আগের ভূমিকাতেই।

যেখানে সংযমের প্রত্যাশা সেখানে 'কনি' অসংযত বেপরোয়া। দল যখন আঘাতে কোণঠাসা, আক্রমণে সংকুচিত, তখন 'কনি' প্রতি-আক্রমণে ভয়ংকর। হাতের ব্যাট ঘোরালেন, বল ছুটলো আগুনে গোলার মতো দুরন্ত গতি।

সে গতি কখনো নিম্নগামী, কখনো উর্ধমুখী, আকাশছোঁয়া। বাউণ্ডারী, ওভার-বাউণ্ডারীর ছড়াছড়ি। রাণের আতস-বাজী যেন! মিডলসেক্সের অস্তিত্ব পুড়ে ছাই হয়ে গেলো এই এক ঘন্টায়, যে প্রহরে

অপরাজিত থেকে 'কনি' তুললেন নিজস্ব শত রাণ।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ জিতলো তিন উইকেটে ঠিক প্রথম টেস্টের আগেই। জয়লাভে সচকিত হলেন ইংলন্ডের ক্রীড়ামহল। সেই সঙ্গে সফরকারী ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ভাগ্যাকাশে লক্ষ্মীর আশীর্বাদও নেমে এলো।

পরের দিন ইংলন্ডের সাংবাদিককুল সমস্বরে রায় দিলেন।

মিডলসেক্স পরাজিত হয়েছে একজনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। কনি একাই একশো!'

একাই একশো! বহু প্রচলিত এই প্রবাদের মর্যাদা রাখায় 'কনি' যা করেছেন সত্যিই তার তুলনা নেই। একাধারে তিনি যেমন বেপরোয়া ব্যাটসম্যান, তেমনি মারাত্মক ফাস্ট বোলার। আবার তেমনি সুদক্ষ ফিল্ডসম্যান, ক্রিকেট-ইতিহাসে যে দক্ষতার তুলনা নেই।

সারা জীবনের গড়ে তিনি প্রতি মিনিটে দুখানি করে রাণ করেছেন। ফাস্ট বোলিংয়ের ছোবল তুলে বিপক্ষকে অসহায় বানিয়েছেন। আবার ক্ষণে ক্ষণে হাত বাড়িয়ে দুরূহ ক্যাচ ধরেছেন অপ্রত্যাশিতভাবে। সব মিলিয়ে 'কনি' ক্রিকেট মাঠের এক আকর্ষণীয় চরিত্র। এক বিস্ময়ও বটে!

ইয়র্কশায়ারের বিপক্ষে উনসত্তর রাণ করতে 'কনি'র আধঘণ্টাও সময় লাগেনি। ল্যাঙ্কাশায়ার লীগে পঁয়তাল্লিশ করতে সাত মিনিটই যথেষ্ট! এবং কুইন্সল্যান্ডের আদিবাসী ফাস্ট বোলার এডি গিলবার্টের বলে সর্বপ্রথম ওভার-বাউন্ডারী হাঁকড়াতে 'কনির' সাহস ও দক্ষতায় টান পড়েনি।

আর এই গিলবার্ট যে কি ছিলেন তা কি সবাই জানেন! স্বয়ং সার ব্র্যাডম্যানের কথায়,

"আমার জীবনে এডি গিলবার্টের মতো জোরে বল করতে আমি কাউকে দেখিনি। একদিনের অভিজ্ঞতা শুনুন,

'গিলবার্টের বলে যেই ব্যাট ছুঁইয়েছি অমনি ব্যাটখানা হাত থেকে ছুটে পালিয়ে গেল অন্যত্র। তাঁর ফাস্ট বোলিংয়ের কি প্রচণ্ড ধাক্কা! আর কোনো ফাস্ট বোলার আমার হাতের ব্যাট কিন্তু সামান্য নড়াতে পারেন নি কোনোদিন!"

অথচ এই বলকেই 'কনি' দড়ি টপকে মাঠের বাইরে পাঠিয়েছিলেন!

'কনি'র ফাস্ট বোলিংয়ের মূল্যায়নে সার ব্র্যাডম্যানের অভিমত শোনা যাক :

'ও'র কথা না শোনালে ফাস্ট বোলিং প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। নিউ সাউথ ওয়েলসের বিপক্ষে ৪৫ রাণে উনি যেদিন ছটি উইকেট পান সেদিনই আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, জাত ফাস্ট বোলারদের দলেও ও'র স্থান বেশ ওপরে।'

সময় সময় 'কনি'র ফাস্ট বল লাফিয়ে, ছোবল তুলে, হুঙ্কারে ফুঁসিয়ে ব্যাটসম্যান-দের সাহসের পুঁজি শূন্য করে দিতে পারতো। ১৯৩০ সালে লর্ডস টেস্টে ইংলন্ডের বিখ্যাত প্যাট্সি হেনড্রেন 'কনি'র বিপক্ষে ব্যাট করতে নেমেছিলেন মাথায় মজবুত শিরস্ত্রাণ চড়িয়ে। কপালে-কানে, পাঁজরে-উরুতে পুরু রবারের গদী এঁটে।

'কনি'র বাম্পারকে ভয় করতেন না এমন দুঃসাহসী ব্যাটসম্যান তাঁর কালে কম ছিলেন। আর এক দিনের কথা বলি।

দিল্লীতে সেদিন পাতিয়ালার মহারাজা বনাম বড়লাট লর্ড উইলিংডন দলের খেলা। দুদলেই আছেন সেকালের ভারত-শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়েরা এবং বিশেষভাবে আমন্ত্রিত ইংলন্ডের জনকয়েক পেশাদার। 'কনি' উপ-স্থিত পাতিয়ালার পক্ষে।

পাতিয়ালার খেলা সাঙ্গ হলো দুশো রাণে। তারপর বড়লাটের দল যখন শ দেড়েক রাণ কুড়িয়ে নিয়েছে তখন তাদের হাতে আরও আটটি উইকেট অবশিষ্ট। একটু আগে এক জরুরী তার পেয়ে পাতিয়ালা-রাজ মাঠ ছেড়ে চলে যাওয়ায় দলের নেতৃত্ব করছেন এক তরুণ রাজতনয়।

রাজকুমারের বয়স কম। মাথাভরা দুষ্টুমী বুদ্ধি। 'কনি'কে কাছে ডেকে তরুণ রাজতনয় বল্লেন,

'দু একটা বাম্পার ছাড়ুন না?'

প্রথমে রাজী হন নি। পরে রাজতনয়ের পেড়াপেড়িতে যখন 'কনি'র হাত থেকে বাম্পার সত্যিই ছাড়া পেলো তখন বড়লাটের দল প্রমাদ গুনলো।

বিখ্যাত ওয়াজির আলি সেঞ্চুরীর নাগালে

লিয়ারি কনস্টেনটাইন

এসে গিয়েছিলেন। 'কনি'র বাম্পার পত্রপাঠ তাঁকে ফিরিয়ে দিলো। দেখতে দেখতে আরও সাতজনকেও। শেষ পর্যন্ত সেই খেলায় 'কনি'র দল, পাতিয়ালা একাদশই জিতলো মাত্র তিন রাণের ব্যবধানে।

আর ফিল্ডিং? সে বিভাগে তো 'কনি' একেবারে অপ্রতিদ্বন্দ্বীই!

শুধুমাত্র ফিল্ডিংয়ের মূলধনেই 'কনি' সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ দলে জায়গা জুড়ে নিতে পারেন। মাঠের সব অঞ্চলেই তিনি মানানসই। উইকেটের কাছে, মাঠের মাঝে এবং দূরে, সীমানার ধারে—সারা মাঠ জুড়ে ছড়িয়ে থাকার অভূতপূর্ব নজীর গড়ে রেখেছেন এই একটি মানুষ 'কনি'। যা আর কেউ পেরেছেন কিনা সন্দেহ।

সার জ্যাক হবস, ব্যাডম্যান, জেসফ, হার্ভে, ওয়াসব্রুক ছিলেন সুদক্ষ কভার-ফিল্ডসম্যান। হ্যামণ্ড, চ্যাপম্যান, গ্রেগরি, মিলার, সি এস নাইডু, টনি লকেরা শ্লিপ বা উইকেট-সংলগ্ন অঞ্চলের বিশারদ। কিন্তু উইকেটের কাছে ও দূরে, সর্বত্রই 'কনি'র একই ভাব। কোনো ক্ষেত্রেই তিনি খাটো নন। ওঁতপাতা শিকারীর মতো সচল ও সফল তিনি। এমন 'কম্প্লিট' ফিল্ডসম্যান আর দেখা যায়নি।

এতোটুকু ছেলে যখন 'কনি' তখন বাবা একখানি ছোট্ট ব্যাট উপহার দিয়ে বলেছিলেন,

'বল পেটাবার জন্যেই এই ব্যাট। দেখো, কথাটি ভুলো না যেন কোনোদিন!'

পিতৃ-উপদেশ 'কনি' ভোলেন নি সত্যিই। মাঠে নেমেছেন যখনই, তখনই কি ব্যাটে, কি বলে এবং কি ফিল্ডিংয়ের জৌলুসে তিনি তাঁর ভূমিকার প্রাতিস্বিক অস্তিত্বকে তুলে ধরেছেন সবার ওপরে।

এই ভূমিকার হাতছানিতে একটি মানুষকে দেখতে কাতারে কাতারে লোক জমতো ক্রিকেট মাঠে। ইংরেজীতে যাকে বলে 'ড্র-কার্ড'—'কনি' ছিলেন নির্ভেজাল তাই।

তাঁকে দলে পেতে ইংলণ্ডে ল্যাঙ্কাশায়ার লীগে এক সময় কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছিল। শেষপর্যন্ত তাঁর দর ওঠে যে অঙ্কে সে অঙ্কের আমন্ত্রণ অবিস্মরণীয় ডন ব্র্যাডম্যানের ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়নি।

টেস্ট ক্রিকেটে সাফল্য এবং সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানের খতিয়ানে 'কনি'র চেয়ে বড় খেলোয়াড় অনেকেই। কিন্তু এমন প্রাণময় পুরুষের আবির্ভাব ক্রিকেট মাঠে ঘটেছে কিনা সন্দেহ।

'কনি'র উপস্থিতিই বিবিধ-বিচিত্র প্রাণবন্ত ঘটনার প্রতিশ্রুতি। সেই প্রতিশ্রুতিতেই দর্শকেরা মাঠে আসতেন। আসতেন অঘটন-ঘটনপটু জীবন্ত চরিত্রের সন্ধানে। কনি'কে পেয়ে তাঁদের সব প্রত্যাশা মিটেছে। তাই তিনি সর্বকালের ক্রিকেট-অনুরাগীদের মাথার মণি!

জীবন্ত বলেই তিনি একজন সহজ, সুস্থ, স্বাভাবিক মানুষ। দ্বীপমালা ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জিজে-জলা প্রকৃতির কোলে মানুষ হয়েছেন যিনি, যুগের কৃত্রিমতা, কেতাবী চঙটির আড়ষ্টতা, হিসেবকষা বেনিয়া বুদ্ধির বাঁধনে মাটির স্বাভাবিকতাকে তিনি বন্দী করে রাখতে চান নি। ব্যক্তিজীবনেও তিনি শ্বেতসম্প্রদায়ের অসুস্থ উন্নাসিকতাকে ধিক্কার জানিয়েছেন প্রতি পদে।

'কনি' খেলা ছেড়ে দিয়েছেন কবে, তবুও আজও তিনি ক্রিকেটের ছাত্রদের কাছে সাহস ও সুস্থতা, সহজ ও স্বাভাবিকতার দিক-চিহ্ন। তিনি অপরাজেয় যৌবনেরই প্রতীক।

'কনির' পোষাকী নাম লিয়ারি কনস্টেনটাইন। অশ্বেতকায় লিয়ারি আজ বর্ণশ্বেত রাজদরবারে 'সার' খেতাবে অভিনন্দিত। উত্তরজীবনে স্বদেশে লোকপ্রিয় জননায়ক ও মন্ত্রী। খেলার মাঠের মতোই জীবন-খেলায়ও তিনি স্বদেশকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

তিনি সবাকার আদর্শ। তিনি অনুসরণীয়ও।

কবেকার কলকাতা

কণাদ চৌধুরী

আজকের কলকাতা কল্লোলিনী। কলকাতা যাঁদের কাছে ভালবাসার ধন, কলকাতার এই কল্লোল তাঁদের কাছে ধর্ম-সঙ্গীতের মতই পবিত্র। পোড়ো শহর কলকাতা, কফি-হাউসের কলকাতা, মিছিলের কলকাতা, ইষ্টবেঙ্গল - মোহনবাগানের কলকাতা—এই শহরবাসীর স্নায়ুতে সতত স্পন্দমান। সামান্য বৃষ্টি পড়লেই রাস্তায় অশালীন জল জমে, জীবিকার প্রয়োজনে ট্রামে-বাসের হ্যাণ্ডেলে জীবনমৃত্যু সঁপে আমরা অফিস যাই, নাগরিক জীবনের হাজার অসুবিধেয় কর্পোরেশনকে শাপ-শাপান্ত করি তবু বেশী মাইনের চাকরী পেলেও কলকাতা ছাড়তে চাই না। এমনকি কয়েক দিনের জন্যে চেঞ্জে গেলেও মনে হয় কি যেন একটা ভীষণ দরকারী জিনিস ফেলে এসেছি কলকাতায়। অথচ এই শহর কলকাতা নাকি 'আগাছা-শহর—চান্স ইরেকটেড সিটি'!

কলকাতা এখন কেমন জানি, কিন্তু আগে কেমন ছিল? এই ভিড়, নিত্য দোকান ভেঙে পড়া, বাঁধাকপির পাতাকীর্ণ বাজার, নানান মুখে নানান ভাষা—এসব কি একশ' বছর আগেও ছিল? প্রাচীনেরা বলেন, কলকাতা আগে অনেক ছিমছাম ছিল। এত বাড়িঘর, ভিড় কিছুই ছিল না। বাইরে বেরোলেই নাকে গাছের গন্ধ পাওয়া যেত, ঘন ঘন ফুটপাতে বাস উঠে পড়ত না, খাঁটি দুধের জন্যে ভোরের গোয়ালাকে পাহারা দিতে হত না; আর এ্যামিবাইসিস? ও ত যুদ্ধের পরের উপদ্রব মশাই! কালিদাসের কালে জন্মানোর খেদ মানুষের মজ্জাগত, আসলে কালিদাসের কাল কলকাতায় কদাপি ছিল কিনা সেটাই প্রধান বিচার্য।

আজ থেকে অন্ততঃ একশ বছর আগে সেই কবেকার কলকাতা কেমন ছিল তার কিছু কিছু বিবরণ কয়েকজন ইংরেজ লিখে গেছেন। তার একটি বিবরণ এই প্রসঙ্গে দেয়া যেতে পারে।

সিপাহী বিদ্রোহের কলকাতা, সন ১৮৫৭ :

হুগলী নদীর নিজস্ব আকর্ষণ যথেষ্ট। পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে জাহাজ এসে ভিড় করে হুগলী নদীর ঘাটে ঘাটে। অন্ততঃ দেড়শোটা জাহাজ আর পঞ্চাশটা স্টীমার সব সময়ে জাহাজঘাটায় বাঁধা থাকে। শহরের উত্তরে লবণ হ্রদের বিপুল বিস্তার। হুগলী নদী বরাবর কলকাতা সাত মাইল দীর্ঘ — চওড়ায় এক মাইল কিংবা কোথাও তার চেয়ে কিছু বেশী। কেন্দ্রস্থল থেকে শহরের পূর্ব এবং পশ্চিম সীমান্ত সমান দূরে দূরে চলে গেছে। উত্তর এবং দক্ষিণ দিকটা বৃত্তাকার। শহরটি মোট আট বর্গ মাইল। কলকাতা সার্কুলার রোড দ্বারা সীমাবদ্ধ। তিনটে প্রধান রাস্তা উত্তর-দক্ষিণ বরাবর চলে গেছে শহরের ভেতর দিয়ে। ছোট ছোট রাস্তা এবং গলিগুলি এই তিনটে রাস্তাকে সমকোণে ছেদ করেছে। অধিকাংশ ইংরেজরা বাস করে শহরের দক্ষিণ প্রান্তে। ইংরেজদের এই পাড়াটা গঙ্গার তীর ধরে প্রায় দেড় মাইল লম্বা প্রান্তরে অবস্থিত। এবং এই অঞ্চলের দৃশ্যাবলী নয়নাভিরাম। এরই ঠিক মাঝখানে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ। গঙ্গার তীর-

কবেকার কলকাতার ডাকখরচ

৩-৩-১৭৯৫ তারিখে প্রকাশিত মূল্য-তালিকা

কলকাতা থেকে	চিঠির ওজন ২½ তোলা	 ২½—৩½ তোলা	 ৩½—৪½ তোলা	 ৪½—৫½ তোলা
	টাঃ আনা	টাঃ আনা	টাঃ আনা	টাঃ আনা
বেনারস	০ — ৭	০ —১৪	১ — ৫	১ —১২
পাটনা	০ — ৫	০ —১০	০ —১৫	১ — ৪
বারাকপুর	০ — ১	০ — ২	০ — ৩	০ — ৪
রাজমহল	০ — ৩	০ — ৬	০ — ৯	০ —১২
মুঙ্গের	০ — ৪	০ — ৮	০ —১২	১ — ০
চট্টগ্রাম	০ — ৬	০ —১২	১ — ২	১ — ৮
মাদ্রাজ	১ — ২½	২ — ৫	৩ — ৭½	৪ —১০
হায়দ্রাবাদ	০ —১২	১ — ৮	২ — ৪	৩ — ০
পুণা	১ — ৪	২ — ৮	৩ —১২	৫ — ০
বম্বে	১ — ১	৩ — ২	৪ —১১	৬ — ৪
ঢাকা	০ — ৩	০ — ৬	০ — ৯	০ —১২

বর্তী এই প্রান্তর বড় বড় গাছে ভর্তি, মধ্যে মধ্যে বড় বড় পুকুরও আছে। এই বিস্তীর্ণ সবুজ প্রান্তরের ধারে ধারে ইংরেজদের সাদা। সাদা সুন্দর প্রাসাদোপম অট্টালিকা। বড় বড় বারান্দাঅলা ভেনিশীয়ান শার্সি দেয়া এই চকমিলানো বাড়িগুলির জন্যেই কলকাতার আরেক নাম "দি সিটি অফ প্যালেসেস"। হাইকোর্ট, টাউনহল, খাজাঞ্চীখানা এবং গভর্ণমেণ্ট হাউস উত্তর-মুখে অবস্থিত। তার পূর্ব দিকে চৌরঙ্গী ঘেঁষে ইংরেজদের কিছু বাড়ি। টাউন হল এবং গভর্ণমেণ্ট হাউসের পেছনে উকিলদের চেম্বার, নানা কোম্পানীর অফিস, সাহেবদের দোকান, লাইব্রেরী, পোস্টঅফিস এবং কাস্টমস হাউস। একটা পুকুরের ধার ঘেঁষে এই সমস্ত বাড়ি। পুকুরটার নাম ডাল-হাউসী স্কোয়ার।

শহরের ছয়বর্গ মাইল জায়গা জুড়ে কলকাতার আদি বাসিন্দাদের বসতি। একেবারে উত্তরপ্রান্ত থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণ অবধি গঙ্গা-তীরবর্তী সাহেবপাড়ার পেছন-দিকের বাঙালীদের পাড়া চলে গেছে। কিছুই নেই এইসব পাড়ায়। এই ইঁটের শহরের প্রায় বাড়িগুলিই সংস্কারের অভাবে ভগ্নপ্রায়। সৌন্দর্য এবং সুষমতার দিক দিয়ে বিচার করলে বেনারস কিংবা দিল্লীর ধারেকাছে দাঁড়াতে পারে না এই শহর। উত্তর ভারতের পাথুরে শহরগুলির কোনোটির সঙ্গে কলকাতা তুলনীয় না, এমন কি বম্বের চেয়েও কলকাতা শহর হিসেবে নিকৃষ্ট। ইংরেজ-নির্মিত কয়েকটি বড় রাস্তা ছাড়া শহরের সব রাস্তাঘাটই অসম্ভব সরু। বাসগৃহগুলির দেওয়াল এবং বারান্দাগুলো গলিতে সব সময়ের অন্ধকার ছায়া জমিয়ে রাখে। কলকাতার কুড়িটি বাজারে সর্বদাই ভিড়। বড়বাজারের অবস্থা শোচনীয়। সমস্ত বাজারটাই যে কোনো সময় ভিড়ের মাথায় ভেঙে পড়তে পারে। উত্তর ভারতের সেরা বস্ত্রাদি এই বাজারে কেনাবেচা হয়। আফিমের বাজারে ভিড় করে লালপাগড়িপরা রাজপুত এবং বম্বের হিন্দুরা। রাস্তার প্রায় ওপরেই সার সার দোকান। কোনো দোকানে কাচ অথবা জানালা নেই। রাস্তার ধুলোবালি স্বচ্ছন্দে দোকানে ঢুকে পড়ে। এইসব দোকানে কাঁসাপিতলের বাসন, জুতো, কারু-কার্য-খচিত টিনের লণ্ঠন, কাপড়, মাদুর, বেতের চেয়ার, মাটির বাসন, বাঁশ খড় প্রভৃতি নানা ধরনের জিনিস সাজানো থাকে।

১৮৪৭ সালে তিনটে পৃথক হিসেবে কলকাতার জনসংখ্যা ছিল চার লক্ষ। এখন কলকাতার জনসংখ্যা বেড়ে পাঁচ লক্ষের মতন হয়েছে। শহরতলি আগের চেয়ে বিস্তৃত হয়েছে। কলকাতার সীমা থেকে এক মাইল পরিমিত স্থান ধরলে এই ষোলো "বর্গ"-মাইলের মধ্যে প্রায় দশটি ছোট ছোট শহর গড়ে উঠেছে। তাদের মোট জনসংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ। অতএব কলকাতা এবং তার শহরতলিকে ধরলে মোট জনসংখ্যা দাঁড়ায় আট লক্ষ। এই জনসংখ্যার তিশ হাজার হচ্ছে ইংরেজ, জার্মান কিংবা আর্মেনীয়। ইউরোপীয় অধিবাসীদের জন্যে মোট সতেরোটি প্রটেস্টান্ট গির্জা। একটি আর্মেনিয় গির্জা, একটি গ্রীক, এবং ছটি রোমান ক্যাথলিক গির্জা আছে। শহরের অধিবাসীদের মধ্যে অন্তত সত্তর থেকে আশী হাজার লোক মুসলমান এবং চার লক্ষ হিন্দু। শহরতলি ধরলে হিন্দুর সংখ্যা আরো কুড়ি হাজার বৃদ্ধি পাবে এবং মুসলমানদের সংখ্যা বাড়বে সামান্য কয়েক হাজার মাত্র। ১৮২২ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী কলকাতার জনসংখ্যা হল : খৃষ্ট-ধর্মাবলম্বী—১৩,১৩৮, মুসলমান—৪৮,-১৬২, হিন্দু—১১৮,২০৩ এবং চীনা—৪১৪ জন। অর্থাৎ মোট ১৭৯,৯১৭ জন।

এই হচ্ছে সেই কবেকার কলকাতা। ভেবে দেখতে গেলে সত্যি কি বদলেছে কলকাতা? সম্ভবত না। সংখ্যায় কিছু বাড়ি বেড়েছে, কিছু লোকসংখ্যা। হয়ত ট্রাম-রাস্তা হয়েছে, দোতলা বাস চলছে, বিজলা

কবেকার কলকাতার জনসংখ্যা

সাল	সূত্র		জনসংখ্যা
১৭১০			১২০০
১৭৫২	হলওয়েলের	হিসেবে	৪০৯০০০
১৭৮২	ম্যাকিন্টোসের	"	৫০০০০০
১৭৮৯	গ্র্যান্ড প্রীর	"	৬০০০০০
১৮০০	পুলিশ কমিশনারের	"	৫০০০০০
১৮০২	চীফ ম্যাজিস্ট্রেটের	"	৬০০০০০
১৮১৪	স্যার হাইডের	"	৭০০০০০
১৮১৫	ইস্ট ইন্ডিয়া গেজেটিয়ার		৫০০০০০
১৮২১	এসেসরের	হিসেবে	২৩০৫০২
১৮৩১	ক্যাপ্টেন স্টিলের	"	৪১১০০০
১৮৩৭	ক্যাপ্টেন বার্চের	"	২৩০০০০
১৮৪০	সীমসের	"	৩৬১০০০
১৮৫০	চীফ ম্যাজিস্ট্রেটের	"	৪১৩০০০
১৮৭২	সেন্সাস		৬৩৩০০০

কলকাতায় প্রথম ক্রিকেট খেলা

কলকাতা যেমন ফুটবলের পীঠস্থান, তেমনি ক্রিকেটেরও। ইডেনের মাঠে ইংল্যান্ডের ঐতিহাসিক পরাজয়ের পর স্বভাবতই ক্রিকেটের পাতায় কলকাতা একটি উজ্জ্বল নাম। কিন্তু কলকাতায় কবে প্রথম ক্রিকেট খেলা হয়েছিল? যতদূর জানা যায় কলকাতায় প্রথম ক্রিকেট খেলা হয়েছিল ১৮০৪ সালের ১৮ই এবং ১৯শে জানুয়ারী তারিখে। খেলা হয়েছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইটোনীয় সিভিল সারভেন্টসদের সঙ্গে কোম্পানীর কলকাতাবাসী অন্যান্য কর্মচারীদের মধ্যে। জয়লাভ করেছিলেন ইটোনীয়ানরা, এক ইনিংসে এবং ১৫২ রাণে। ইটোনীয়ান করেছিলেন এক ইনিংসে ২৩২ রাণ এবং অপর পক্ষ করেছিলেন দু ইনিংসে মাত্র ৮০ রাণ।

প্ল্যানেটোরিয়মে আকাশ বন্দী, কিন্তু তাতেই কি একটা শহরের চরিত্র বদলায়?

বদলায় না, লণ্ডনের মত কলকাতাও তার নাগরিকদের হৃদয়ে চিরকাল একটি ধ্রুব স্থান হয়ে থাকবে।

ভৌতিক কলকাতা

পুরোনো কলকাতার কতকগুলো প্রিয় ভূতের গল্প ছিল। কলকাতায় সেদিন সন্ধ্যে হলেই বালিগঞ্জের শেয়ালের ডাকে সাড়া দিতে ময়দানের শেয়ালরা গলা সাধত, বিউরিয়াল গ্রাউন্ড রোডের দু পাশের বড় বড় গাছের পাতায় হাওয়ার আক্রমণে ভয়ের শব্দ তৈরী হত। বেলোয়ারি নাচের আসর থেকে টমটমে বাড়ি ফিরতে ফিরতে 'নেটিভ ক্যালকাটার' ভূত দেখতেন, ভয় পেতেন, দুর্দান্ত নীলকর-সাহেবরা। সিভিল সার্ভিসের ছোকরা সাহেবরা মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে ছায়াছায়া মতন কিছু-একটা দেখলেই পাংখাওয়ালাকে ঘরে আসবার জন্যে ডাকাডাকিও শুরু করতেন কখনো কখনো। পুরোনো কলকাতার ভূতের গল্প এ'দেরই মধ্যে কেউ কেউ বিলেতের চিঠিতে, আত্মজীবনীতে অথবা ইংল্যান্ডে অবসর-জীবন যাপনকালে নাতি-নাত্নী অথবা বন্ধুবান্ধবদের কাছে ব্যক্ত করেছেন। তবে সাহেব-বর্ণিত ভূতরা সকলেই প্রায়-সাহেব। নেটিভ ভূতদের নিয়ে গল্পগাছা করতে কলকাতার সাহেবরা হয়ত বিশেষ পছন্দ করতেন না, কিম্বা পছন্দ করলেও এ বিষয়ে 'মা লিখ' নীতিকেই তাঁরা কার্যকরী করেছিলেন।

পুরোনো কলকাতার বনেদী মহলকে সবচেয়ে বেশী ভয় দেখিয়েছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস। কলকাতার বনেদী পাড়া আলীপুর প্রতি রাত্রে কাঁপতে কাঁপতে অশ্বক্ষুরধ্বনি শুনত। নির্জন নিশীথে চার ঘোড়ার গাড়ি এসে থামত হেস্টিংস হাউসের সামনে। আলীপুরের বনেদী পাড়া জানে কেন থেমেছে গাড়িটা, কে নামল গাড়ি থেকে, কোন দৃশ্য অভিনীত হবে এখন হেস্টিংস-প্রাসাদের ঘরে ঘরে, অলিন্দে। নিশীথের আগন্তুক স্বয়ং ওয়ারেন হেস্টিংস। রোজ ঠিক একই সময় তিনি আসেন ঘোড়া ছুটিয়ে। তারপর গাড়ি থেকে নেমে সমস্ত বাড়িটা তন্নতন্ন করে সেই হারিয়ে-যাওয়া কাঠের কালো বাক্সটা খোঁজেন। যতদিন কালো বাক্সটা পাওয়া যাবে না, হেস্টিংস আলিপুরে আসবেন, এমনি নিশীথে, আলিপুরকে এমনি তটস্থ করে। এই কাঠের কালো বাক্সের একটা ইতিহাস আছে। হেস্টিংস-এর প্রিয় বন্ধু এবং প্রাইভেট সেক্রেটারী নেসবীট টমসন বিলেত থেকে হেস্টিংস-এর একটা চিঠি পান। চিঠির তারিখ ২১-৭-১৭৮৫। এই চিঠির উল্লেখ গ্লীগের হেস্টিংস-জীবনীতে আছে। এই চিঠিতে প্রাক্তন বড়লাট লিখছেন টমসনকে :

পূর্ববার নিতান্ত দুঃখের সহিত সেই বাক্সটির বিষয় উল্লেখ করিতেছি। এই বিষয় অদ্যাবধি তোমার অথবা লার্কিন্স-এর

কলকাতার বনেদী পাড়া আলীপুর, প্রতি রাত্রে কাঁপতে কাঁপতে অশ্বক্ষুরধ্বনি শুনত।

নিকট হইতে কোনো সংবাদ পাইলাম না। বাক্সটির বিষয়ে আমার উৎকণ্ঠা তোমরা কেহই কল্পনা করিতে পারিতেছ না।

এই পত্রপ্রাপ্তির পর টমসন হয়ত যথাসাধ্যই চেষ্টা করেছিলেন বাক্সটা হদিশ করবার, কিন্তু বাক্সটা শেষ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। অবশেষে ১৭৮৭ সালের ৬ই সেপ্টেম্বরের ক্যালকাটা গেজেটে একটা বিজ্ঞপ্তি বেরুল :

Whereas an old black wood burean, the property of Warren Hastings Esq. containing, amongst other things, two small miniature pictures and some private papers, was about the time of his departure from Bengal, either stolen from his house on the esplanade, or by mistake sold at the auction of his effects. This is to give notice that Mr. Larkins and Thomson will pay the sum of 2000 sicca rupees to any person who shall give them such information as shall enable

them to recover the contents of the burean.

কিন্তু 'দু হাজার সিক্কা টাকার দাবী-দারের কখনো আবির্ভাব ঘটে নি, বাক্সটিও উদ্ধার হয়নি। বন্ধুদের অকর্মণ্যতায় বিরক্ত হয়ে হয়ত তাই হেস্টিংসকেই স্বয়ং আসতে হয় রোজ রাত্রে।

আবার গভর্ণর-জেনারেল থাকাকালে হেস্টিংস নিজেও একবার ভূতগ্রস্ত হয়েছিলেন। ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন ১৮৮০ সালে রেভারেন্ড বি ডবল্যু স্যাভিল তাঁর 'এ্যাপারিশন' নামক একটি গ্রন্থে। কলকাতার সুপ্রীম কাউন্সিলের সদস্যদের সঙ্গে কাউন্সিল-কক্ষে বসেছিলেন গভর্ণর-জেনারেল হেস্টিংস। মিঃ সেক্সপীয়ার নামে জনৈক সদস্য হঠাৎ কথা বলতে বলতে মুখ তুলে চেঁচিয়ে উঠলেন, "আরে, আমার বাবা এখানে?" কাউন্সিলের সমস্ত সদস্যবৃন্দ অবাক হয়ে দেখলেন যে, একটি অচেনা মূর্তি, মাথায় অদ্ভুত ধরনের একটা টুপি পরে হলঘর দিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে একেবারে মিলিয়ে গেল। অথচ পাশের ঘরে বেরোবার মত বহির্গমনের কোনো পথ ত দূরের কথা একটা জানলা পর্যন্ত ছিল না। সেই রহস্যময় আগন্তুকের মাথার টুপিটাও উপস্থিত সদস্যদের কাছে আশ্চর্য মনে হয়েছিল। হেস্টিংস ঘটনাটির রহস্যে এতই বিচলিত হয়েছিলেন, যে ব্যাপারটি নথিভুক্ত করবার আদেশ দিয়েছিলেন সঙ্গে সঙ্গে। মহাফেজখানায় সেই নথিটি খুঁজলে বোধ হয় এখনো পাওয়া যেতে পারে। কিছুদিন পরে ইংল্যান্ড থেকে জাহাজে করে মিঃ সেক্সপীয়ারের বাবার মৃত্যুসংবাদ এল এবং সেই সঙ্গে এল এক নতুন ধরনের টুপির চালান। সেই প্রথম ভারতে "চিমনী-পট" টুপি প্রবাসী ইংরেজদের শিরোধার্য হল।

কিন্তু ভূত-দর্শন কেবল আমীর-ওমারাহের মধ্যেই সীমিত ছিল না সেকেলে কলকাতায়। মফস্বলের একজন নীলকর-সাহেবও চমকে ছিলেন ভূত দেখে। ঘটনাটি ঘটেছিল এখনকার ধর্মতলা স্ট্রীটে, ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পেছনে মেথডিস্ট চ্যাপেলের একটা ফ্ল্যাট-বাড়িতে।

বাড়িটি ভাড়া নিয়েছিলেন লিউস কুপার তাঁর স্ত্রীর জন্যে। কুপার ছিলেন তখনকার দিনের বিখ্যাত ঘোড়ার সাজ-সরঞ্জাম-সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানে হান্টার কোম্পানীর হিসেবরক্ষক। বউবাজারে সেন্ট জেভিয়ার গির্জা তখন হয়নি। বউবাজার তখন সাহেবদের পক্ষে একেবারেই অনভিজাত পাড়া। কিন্তু হিসেবরক্ষকের চাকরী করে এর চেয়ে ভাল পাড়া জোটে নি কুপারের। তিনি সস্ত্রীক বাস করতেন এখানকার সেন্ট জেভিয়ার গির্জার জমির ওপর অবস্থিত একটা বাড়িতে। দুর্ভাগ্যক্রমে চার বছরের ব্যবধানে এই বাড়িতে কুপারের কুড়ি বছর এবং পনেরো বছরের দুজন ছেলে মারা যায়। কুপারের স্ত্রী পাগল হয়ে যান এবং তাঁকে ভবানীপুরের উন্মাদাশ্রমে কিছু-দিনের জন্যে রাখতে হয়। সুস্থ হবার পর মিসেস কুপার কিন্তু বউবাজারের সেই শোকাবহ বাড়িতে ফিরতে চাইলেন না। তাঁর জন্যে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পেছনে দুতলায় একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিলেন কুপার। স্ত্রী বাস করতে লাগলেন ধর্মতলা স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে, কুপার তাঁর কাজের সুবিধের জন্যে বউবাজারের বাড়িতেই রয়ে গেলেন। প্রত্যেক দিন সকালে স্বামী গির্জায় প্রার্থনা সেরে, দৈনিক বাজার করে স্ত্রীর ফ্ল্যাটে আসতেন ঘোড়ার গাড়িতে। ১৮৪৫ সালের ৬ই মার্চও যথারীতি বাজার করে স্ত্রীর ফ্ল্যাটে ঢুকতেই একটি বীভৎস দৃশ্যের সম্মুখীন হতে হল লিউস কুপারকে। দেখলেন মিসেস কুপার বারান্দায় মৃত পড়ে আছেন। গলায় গামছার ফাঁস দিয়ে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। মিসেস কুপার যে আত্মরক্ষা করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন তার অজস্র প্রমাণ চারদিকে ছড়িয়ে। বাড়ির সমস্ত মূল্যবান দ্রব্যাদি দুর্বৃত্তরা নিয়ে গেছে। পুলিশের জোর তদন্ত হল, কিন্তু ধরা গেল না কাউকে।

ধর্মতলার এই বাড়িটা কিছুদিনের মধ্যেই ভূতুড়ে বাড়ি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গেল। বেশ কিছুকাল খালিই পড়ে রইল বাড়িটা। মিসেস কুপারের হত্যাকাণ্ডের কয়েক বছর পরে দুজন নীলকর-সাহেব বাড়িটা কয়েক মাসের জন্যে ভাড়া নিলেন। কলকাতায় তাঁরা সদ্য এসেছেন ব্যবসাগত কাজে, কাজ শেষ হলেই আবার স্বস্থানে ফিরে যাবেন। তাঁরা বাড়িটার অখ্যাতির কথা কিছুই জানতেন না। একদিন বিকেলে একটি প্রমোদানুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা ছিল দুই বন্ধুর। কিন্তু একজনের হঠাৎ জ্বর হওয়ায় তিনি যেতে পারলেন না। অপর বন্ধুটি একাই গেলেন। হলঘরে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইলেন অসুস্থ নীলকর-সাহেব। পরদিন সকালে দুই বন্ধুর মধ্যে বাদানুবাদ শুরু হয়ে গেল।

—কি হে কলকাতায় আসতে না আসতে মেয়ে জোটাতে শুরু করলে?

—মেয়ে? দ্বিতীয় বন্ধুর অবাক প্রশ্ন।

অবাক হচ্ছ যে! কালকে এক মহিলাকে নিয়ে রাত্রে বাড়িতে ঢোকো নি?

—কক্‌খনো না। কালকে রাত্রে বোধ হয় তোমার জ্বর বেড়েছিল, বিকারের ঘোরে ছিলে। কিন্তু কি দেখেছিলে বল ত কালকে?

অসুস্থ সাহেব যেন বন্ধুর কথায় আরো অসুস্থ হতে আরম্ভ করলেন।

—বলো কি? আমি যে স্পষ্ট দেখলাম!

—আহা, কি দেখলে বলই না!

—জ্বরটা সত্যি আমার বাড়েনি তেমন। মানে রাত্রের দিকে ঘুমটা ভেঙে গিয়ে আর আসতে চাইছিল না, জেগেই শুয়ে ছিলাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম তোমার ঘরের দরজাটা আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে। একজন মেয়ে বেরোলো তোমার ঘর থেকে। হলঘরে আমার সামনে দিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে মূর্তিটা বারান্দার দিকে চলে গেল। মেয়েটার পোশাকটা কেমন যেন ছেঁড়াখোঁড়া,

যেন খুব একচোট ধস্তাধস্তি করেছে কারো সঙ্গে। কিন্তু আমি সবচেয়ে আশ্চর্য হয়েছিলাম, মেয়েলী মূর্তিটার গলায় একখণ্ড লম্বা কাপড় আঁটো ভাবে জড়ানো দেখে। মূর্তিটা বারান্দায় ওদিকে যেতেই আমি পেছন পেছন গিয়েছিলাম। কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলাম না। বন্ধুটির বিবরণ শেষ হওয়ার পর বাড়ির চাকরদের ডেকে, তারা কালকে কাউকে নীচে নামতে দেখেছে কিনা জিজ্ঞাসা করা হল। তারা কেউ কিছু দেখেনি জানাল এবং সেই সঙ্গে বাড়ির ইতিহাসটাও জানিয়ে দিল। আর একদিনও নীলকর-সাহেবরা সে বাড়িতে থাকেন নি; কিছুদিন পর বাড়িটাও ভেঙে ফেলা হয়েছিল।

বনেদী ভূতরা কিন্তু আলিপুর ছেড়ে নড়তে চাইত না। ওয়ারেন হেস্টিংস-এর ভূত ছাড়াও আলিপুর-পাড়ায় গা-ছম-ছম ভৌতিক কাহিনী সাহেবমহলে ভীষণ চলত। মিসেস ডি গ্ল্যাডিং এমনি একটা ভৌতিক কাহিনী বলেছেন। তবে মিসেস

একজন মেয়ে বেরোলো তোমার ঘর থেকে।

গ্ল্যাডিংএর ভূত চোখে দেখা নয়, কানে শোনা। মিসেস গ্ল্যাডিংএর বিবরণ :

আমার স্বামী ১৯২৬ সালে আলীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। আমরা ম্যাজিস্ট্রেট-হাউসে থাকতাম। ঔপন্যাসিক থ্যাকারের বাবা ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালীন এই বাড়িতেই থাকতেন। থ্যাকারের শিশুকালের কিছু অংশও এই বাড়িতে কেটেছে। বাড়িটা পুরোনো ধরনের। ভেতরে বিরাট লন, আম আর লিচুর বাগান। একদিকে টালীর নালা আরেক দিকে আলীপুর জেলের উঁচু প্রাচীর—এই হচ্ছে বাড়িটার মোটামুটি সীমানা। একদিন রাত্রে ঘুম থেকে উঠে হঠাৎ বাড়ির একটা ঘর থেকে পিয়ানো বাজানোর সুর শুনলাম। অথচ আমাদের বাড়িতেই পিয়ানো নেই, বেতারযন্ত্রও না। এর কিছুদিন পরে একজন মহিলা আমাদের বাড়িতে থাকতে এলেন। প্রথম দিন বিকেলে আমরা যখন চায়ের আসরে একত্রে হলাম মহিলাটি আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে বল্লেন যে আমার পিয়ানো বাজানো তাঁকে প্রভূত আনন্দ দিয়েছে। আমি তাঁকে সবিনয়ে জানাই যে এই বাড়িতেই পিয়ানো নেই। ১৯৩৯ সালে আমরা ইংল্যান্ডে চলে আসি। ভারতবর্ষ থেকে ফিরে একদিন আমি এবং আমার স্বামী আমাদের পারিবারিক বন্ধু স্যার জেমস এবং লেডী ডোনাল্ডের বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছিলাম। ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও নানা কথা বলতে বলতে ডোনাল্ড-দম্পতির কাছ থেকে একটা গল্প শুনে চমকে উঠেছিলাম। স্যার জেমস প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের সময় আলীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, এবং আমরা যে বাড়িতে ছিলাম, সেই বাড়িতেই থাকতেন ওঁরা। লেডী ডোনাল্ডের মা সঙ্গীতনিপুণা মহিলা ছিলেন। তিনি একবার মেয়ে-জামাইয়ের বাড়িতে এসেছিলেন বেড়াতে। সঙ্গে এনে-ছিলেন বিরাট একটা গ্র্যান্ড পিয়ানো। অবসর পেলেই পিয়ানো বাজিয়ে শ্রোতাদের আনন্দ দিতেন তিনি। যুদ্ধের পর ডোনাল্ড-দম্পতি এবং লেডী ডোনাল্ডের মা স্বদেশ অভিমুখে রওনা হন। কিন্তু জাহাজ কোম্পানী অতবড় পিয়ানো কিছুতেই নিতে রাজী হয় নি। শেষপর্যন্ত পিয়ানোটা এদেশে ফেলেই চলে যান তাঁরা। লেডী ডোনাল্ডের মা পিয়ানোটার শোক সারা জীবনেও ভুলতে পারেননি, যতদিন বেঁচে ছিলেন ভারতবর্ষে ফেলে-আসা গ্র্যান্ড পিয়ানোটার জন্যে শোকপ্রকাশ করতেন।

তাঁদের কথা শেষ হওয়ার পর আমি, ম্যাজিস্ট্রেট-হাউসে আমার অভিজ্ঞতার কথা আস্তে আস্তে বল্লাম।

দুই সাহেবের বিবি

কবেকার কলকাতা অনেক দিন মনে রাখবে দুই সাহেবের বিবিকে। না মনে রেখে উপায় নেই কলকাতার, কলকাতা কৃতঘ্ন নয়। কবেকার কলকাতায় নিয়মিত টাকা আসত দুই সাহেবের বিবির কাছ থেকে। কলকাতার বিশপই মোট এক লক্ষ টাকা পেয়েছিলেন রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসীদের ভরণ-পোষণের জন্যে। কলকাতার গরীবদের কথাও মনে ছিল বিবির, মনে ছিল কলকতার কিছু লোক দেনার দায়ে কারাগারের জন্য অপেক্ষমান। তাদের জন্যে এসেছিল মোট পঞ্চাশ হাজার টাকা। কলকাতায় এখনও বিবির সেই উইলটি আছে যার প্রতিটি লাইনই দানছত্র। শুধু কলকাতাই বা কেন, দুই সাহেবের বিবিকে মনে রাখবে, রোমের, ক্যান্টারবেরীর, বম্বের এবং মাদ্রাজের রোমান ক্যাথলিক সমাজ। তাঁর কাছ থেকে পোপ দেড় লক্ষ টাকা, ক্যান্টারবেরীর বিশপ পঞ্চাশ হাজার টাকা পেয়েছিলেন দান-খয়রাতির জন্যে।

পরিচয়, দুই সাহেবের বিবি, নাম, বেগম সমরু, আসল কুমারী নাম, জেবুন্নিসা। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় তাঁর একটি নামই গ্রাহ্য—বেগম সমরু। বেগম সমরু জন্মেছিলেন অষ্টাদশ শতকে, পরলোকগমন করেছেন উনবিংশ শতকে। দীর্ঘ ছিয়াশী বৎসর যেন রূপকথার জীবনই যাপন করেছিলেন তিনি। দুই সাহেবের বিবি, বেগম সমরু ইতিহাসের এক অলৌকিক চরিত্র। ইংরেজদের বঙ্গ-বিজয়ের আগেই তৎকালীন ইঙ্গ-ভারতীয় সমাজের মধ্যমণি হতে পেরেছিলেন তিনি। ইউরোপীয়দের মধ্যে তাঁর পাণিপ্রার্থনায় প্রতিযোগিতার অন্ত ছিল না। মুঘল সম্রাটের তিনি ছিলেন প্রিয়তম কন্যা-প্রতিমা। এক সময়ে তিরিশ জন ইউরোপীয় সেনানায়ক ঈশ্বরের নামে শপথ করে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেছেন। আবার ভাগ্যের হাতে হারতেও হয়েছে তাঁকে। নিজের সৈন্যবাহিনীর হাতেই বন্দী হয়ে সাত দিন অভুক্ত থাকতে হয়েছে যতদিন না তাঁর পূর্বপ্রণয়ী জর্জ টমাস এসে তাঁকে রক্ষা করেছেন। বিখ্যাত ইংরেজ

বেগম সমরু

সেনাপতি লর্ড লেকের চুম্বন-কাহিনীর ইনিই ছিলেন নায়িকা। লর্ড লেক প্রকাশ্যে এই বেগম সমরুকেই মুখ-চুম্বন করতে গিয়ে দারুন বিব্রত হয়েছিলেন একদা। আবার উদ্ধারও পেয়েছিলেন বেগমের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে। লেক বিদেশী শিষ্টাচারবশতই বেগমের সৈন্যবাহিনীর সামনেই তাদের কর্ত্রীর মুখচুম্বন করেছিলেন। দৃশ্যটি বেগমের মুসলমান সৈন্যরা ভালো চোখে দেখেনি। কিন্তু আসন্ন একটা বিপ্লবকে এক কথায় ফুঁয়েই উড়িয়ে দিয়েছিলেন সেদিন বেগম। 'সাহেব পাদ্রীরা মেয়েদের এই ভাবেই আশীর্বাদ করে জানো না তোমরা?' আর কিছুই বলতে হয়নি সেদিন। আরো অনেক কিংবদন্তীর আলোয় বেগম সমরু উজ্জ্বল ছিলেন। তার সবটাই যে সত্যি এ প্রমাণও যেমন কেউ দাখিল করেনি, সেগুলি সবই মিথ্যে এ হলপও কাউকে করতে শোনা যায়নি। তবে এখান-ওখান থেকে কিছু প্রমাণ জড়ো করে বেগম সমরুর ব্যক্তিগত জীবনের কিছু পরিচয় পাওয়া গেছে। বেগম সমরুর বাবা ছিলেন দিল্লীবাসী জনৈক সম্ভ্রান্ত আরব। শাহ আলম যখন দিল্লীর তখতে বসেন বেগমের পিতা লতিফ আলি খাঁন তখন দিল্লীতেই ছিলেন। সতেরো বছর বয়সে দুই সাহেবের বিবির জীবনে প্রথম সাহেবের আগমন ঘটে। উইলিয়াম রেইনহার্ট ছিলেন এক দুর্দান্ত ভাগ্যান্বেষী। ভাড়াটে সৈন্য হিসেবে রেইনহার্ট ভারতবর্ষে আসেন এবং কিছুকাল ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে কাজ করেন। ১৭৫৭ সালে লর্ড ক্লাইভ যখন ফরাসী চন্দননগর অবরোধ করেন, রেইনহার্ট ফরাসীদের চাকরী ছেড়ে দিয়ে বাংলার নবাবের সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেন। ফরাসী সহকর্মীরা রাইনহার্টকে 'লে সমব্র' নামে ডাকতেন। রাইনহার্টের গোমড়া মুখ, রস-কসহীন স্বভাবের জন্যেই এই নাম দিয়েছিলেন তাঁর ফরাসী বন্ধুরা। ফরাসী 'সমব্র' দেশী মুখে 'সমরু' হতে বেশী সময় নেয়নি।

ভাগ্যান্বেষী রাইনহার্ট ফরাসীদের যেমন প্রিয় ছিলেন, ইংরেজদের তেমনি ছিলেন ঘৃণার পাত্র। ইংরেজদের বিরুদ্ধে ফরাসীদের হয়ে প্রায়ই অস্ত্রধারণ করেছিলেন তিনি। এক সময় দিল্লী পর্যন্ত তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তৃত হয়। রাইনহার্ট ১৭৬৩ সালে বিয়ে করেন জিবুন্নিসাকে এবং সেই থেকে জিবুন্নিসা 'বেগম সমরু'। কিন্তু পনেরো বছরের বেশী প্রথম সাহেবের সংগে থাকতে পারেননি বেগম। ১৭৭৮ সালে রাইনহার্ট পরলোকগমন করেন। রাইনহার্ট স্বীয় কৃতিত্বে শিরধানা পরগণায় বিপুল জায়গীর পেয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর বেগম সমরুর হাতে আসে শিরধানা পরগণার জায়গীর। শুধু জমিদারীই না, ছোটখাটো একটি সৈন্যবাহিনীরও সর্বময়ী কর্ত্রী হন বেগম সমরু।

সমরু বেগমের শৈশব এখনো ইতিহাসের কুয়াশায়। বিশেষ কিছুই জানা যায় না তাঁর বাল্যকাল সম্বন্ধে। শুধু তাঁর বার্ধ-প্রণয়ী জর্জ টমাসের জীবনস্মৃতি থেকে তাঁর রূপ এবং জীবনযাত্রায় কিছু আভাস পাওয়া যায়। বেগম দেখতে ছোটখাটোই ছিলেন, মোটার দিকে একটু ঝোঁক ছিল। রঙ ফরসা, চোখ কালো এবং আকর্ণ-বিস্তৃত। সব সময়ে মহার্ঘ ভারতীয়

দৃশ্যটি বেগমের মুসলমান সৈন্যরা ভালো চোখে দেখেনি

পরিচ্ছদই পরতেন। পারসীক এবং উর্দু-ঘেঁষা হিন্দী অনর্গল বলতে পারতেন। এবং প্রণয়ী টমাসের মতে তাঁর কথা বলার ধরণে মাদকতা ছিল, দীপ্তি ছিল। বেগমের আলাপচারীতে যে কোনো শ্রোতাই বন্দী হতে ভালবাসত। শিরধানায় বেগমের দিন-যাপনের সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন টমাস-সাহেব।

বেগমের বাসগৃহ ছিল প্রাকারবেষ্টিত সুরক্ষিত শহরের মত। তাঁর সুদৃঢ় প্রাসাদ মূল্যবান আসবাবপত্রে সাজানো থাকত। ভারতীয় এবং ইয়োরোপীয় দুই প্রস্থ আসবাবপত্রের মিশ্রণে খারাপ লাগত না দেখতে। অতিথিবৎসলা বেগমের টেবিলে দেশী-বিদেশী নানা ধরনের জিনিস সাজানো থাকত। বিদেশী জিনিস জোগাড় হত কলকাতা থেকে। ভারতীয় রীতিনীতি বেগমের অনুচর-পরিচারিকারা কঠোর নিষ্ঠায় পালন করত। বেগম নিজে কখনো বাইরে বা দরবারে পর্দানসীন না হয়ে বেরোতেন না। তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থীরা এলে চিকের ওপারে বসতেন। বেগম থাকতেন ওপারে। বেগম তাঁর সৈন্যবাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসারদের প্রায়ই ভোজে নিমন্ত্রণ করতেন, কিন্তু দেশী কর্মচারীদের সেই সান্ধ্যভোজের আসরে কখনো নিমন্ত্রণ হত না। কুড়ি থেকে তিরিশ জন ক্রিশ্চান পরিচারিকা নিমন্ত্রিত-দের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত থাকত।

বেগম সমরু নিজে ক্রিশ্চান হয়েছিলেন প্রথম স্বামীর মৃত্যুর তিন বছর পর। আগ্রার ফাদার গ্রেগারিও বেগমকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষা দেন। এই ফাদারই ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে দুই সাহেবের বিবির সঙ্গে দ্বিতীয় সাহেবের মিলনকে বিবাহ-সিদ্ধ করেন। এই দ্বিতীয় সাহেব হলেন ফরাসী লে

ভাসন্তে। সমরু-সাহেবের মৃত্যুর পর তাঁর সৈন্যবাহিনীও বেগমের কর্তৃত্বাধীনে আসে। এই সৈন্যবাহিনীর সৈন্যরা ছিল দেশী, অফিসাররা সকলেই ছিল সাহেব। যদিও নামেই সাহেব, শিক্ষাদীক্ষায় তারা দেশী সৈনাদের মতই নিরক্ষর। কিন্তু এদের মধ্যে দুজন ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের লোক। প্রথমজন হলেন পূর্বকথিত জর্জ টমাস এবং দ্বিতীয়জন হলেন লে ভাসন্তে—বেগমের দ্বিতীয় স্বামী। টমাস ছিলেন বৃটিশ নৌ-বিভাগের জনৈক নাবিক, ১৭৮১ সালে তিনি ভারতে প্রথম পদার্পণ করেন। তাঁর নিজের বিবরণী অনুযায়ী জানা যায় যে বেগমের সংস্পর্শে আসার পরই বেগম তাঁকে তাঁর সৈন্যবিভাগে একটা উচ্চপদ দেন এবং শেষপর্যন্ত তিনি বেগমের প্রধান আমত্যের পদে উন্নীত হন। বেগমের দ্বিতীয় স্বামী ভাসন্তে ছিলেন খাঁটি ফরাসী ভদ্রলোক। টমাস এবং ভাসন্তে দুজনেই একসময়ে বেগমের প্রণয়-প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। কিন্তু টমাস ব্যর্থ হলেন, যদিও তাঁর সম্বন্ধে বেগমের ধারণা চিরদিনই উঁচুই ছিল। ভাসন্তে বিবাহের প্রস্তাব করা মাত্র গৃহীত হল এবং গোপনে আগ্রায় তাঁদের বিয়েও হয়ে গেল। ব্যর্থ-প্রণয়ী টমাস বৃটিশ সৈন্য-বাহিনীতে নাম লিখিয়ে সীমান্তে চলে গেলেন।

দ্বিতীয় নায়কও কিন্তু বেগম সমরুর জীবন-নাট্যে খুব বেশী দিন ছিলেন না। এবং তাঁর শেষ পরিণতিও বিষাদ নাটকের শেষ অঙ্কেরই মতই। ভাসন্তে-এর অন্তিম পরিণতি সম্বন্ধে ঐতিহাসিকরাও সকলে একমত নন। বিয়ের কয়েক বছর পর ভাসন্তে পরলোকগমন করেন। আর্চারের বিবরণ অনুযায়ী জানা যায় যে, ভারতবর্ষে থাকতে থাকতে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন ভাসন্তে। বেগম সমরুর সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করেছিলেন, তাঁরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই টাকাপয়সা, মূল্যবান রত্নাদি নিয়ে ইয়োরোপে চলে যাবেন। ঠিক হল গোপনে সমস্ত অলংকার এবং অর্থ একত্রিত করা হবে এবং এক গভীর নিশীথে দুজনে হাতীর পিঠে চেপে প্রথমে ইংরেজ-শাসিত রাজ্যে চলে যাবেন। সেখান থেকে সাগরপারে। কিন্তু সাগরপারের দেশ আর দেখতে পারেননি ভাসন্তে। এই প্রসঙ্গে আর্চারের বিবরণ হল :

বেগম সমরু প্রথমে স্বামীর প্রস্তাবে রাজী হলেও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল অন্য। তিনি বুঝেছিলেন যে ভিনদেশে স্বামীর কাছে তাঁর কোনো আদরই থাকবে না। স্বভাবতঃই তিনি ভেবেছিলেন যে, তাঁর স্বামীর আসল লোভ তাঁর ধনরত্নের দিকেই। বিদেশে গিয়েই সমস্ত ধনরত্ন ভাসন্তে আত্মসাৎ করবেন। বেগম তাই ভাসন্তেকে সরাবার জন্যে এক নিপুণ চাল চাললেন। তিনি তাঁর ঘনিষ্ট অনুচরদের আদেশ দিলেন তারা যেন তাদের বন্ধুবান্ধবদের গোপনে তাঁদের ইয়োরোপ-যাত্রার পরিকল্পনাটা ফাঁস করে দেয় এবং নিজের লোকজনদের ছেড়ে তাঁর যে যাবার এতটুকু ইচ্ছে নেই তাও জানায়। সুখে-দুঃখে সারা জীবন বেগম সমরু তাঁর প্রজা-বৃন্দের পাশে থাকতে পারলেই কৃতার্থ হবেন—সাড়ম্বরে এই কথাটাও কানাকানি করতে বলা হল। বেগম সমরু এবং ভাসন্তে যাতে গোপনে পালাতে না পারেন, তার জন্যে বেগমেরই পরামর্শে একটা পরিকল্পনা করা হল। এদিকে স্বামীকে বেগম জানালেন যে, তাঁদের দেশত্যাগের ষড়যন্ত্র কি করে যেন সৈন্যবাহিনীর লোকরা টের পেয়ে গেছে এবং তারা বাধা দেবার জন্যে বদ্ধপরিকর। হয়ত তারা জোর করে বেগমকে আটক করবে। সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি কথাও নিদারুণ আবেগে জানালেন বেগম যে যদি জোর করে তাঁর স্বামীর কাছ থেকে তাঁকে আলাদা করা হয়, তবে আত্মহত্যা করে মারা যাবেন তিনি। ফরাসী সাহেব গলে গেলেন স্ত্রীর একনিষ্ঠ প্রেমে। তিনিও শপথ করলেন তাঁকেও যদি বলপূর্বক স্ত্রীর কাছ থেকে আলাদা করা হয়, তিনিও জীবন রাখবেন না। স্থির হল পালাবার সময় দুজনে দুটো পিস্তল নেবেন সঙ্গে এবং দরকার পড়লে আত্মবিনাশ করবেন। এক মধ্যরাত্রে তাঁরা যথারীতি রওনা হলেন। ভাসন্তে হাতীর পিঠে, বেগম সমরু পাল্কীতে। বেগমের পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট স্থানে তাঁরা সৈন্যবাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হলেন। বেগমের পাল্কী ঘিরে ফেলল তাঁরই সৈন্যরা। গোলমাল, বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজের মধ্যে কে যেন ছুটে
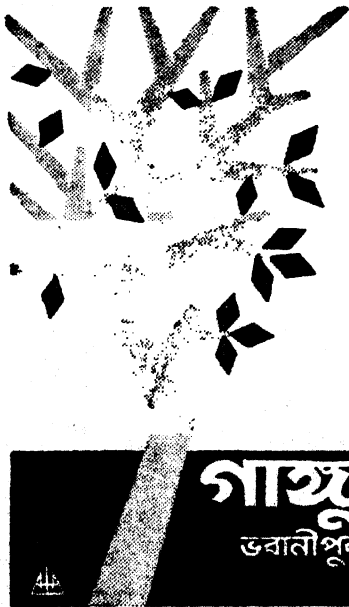
ভাসনুলেটর কাছে এসে বলল যে বেগম সমরু পিস্তলের গুলীতে আত্মহত্যা করে মারা গেছেন। ভাসনুল্ট পাগলের মতন বেগমের পাল্কীর কাছে ছুটে এলেন। বেগমের আত্মহত্যার প্রমাণ হিসেবে তাঁকে বেগমের রক্তাপ্লুত একটা বস্ত্রখণ্ড দেখানো হল। দুই সাহেবের বিবির শেষ সাহেব মাথায় পিস্তলের নল রেখে ঘোড়া টিপলেন। শেষ সাহেব তাঁর জীবন দিয়ে প্রমাণ করলেন ফরাসীরাও পত্নী-প্রেমের মর্যাদা রক্ষা করতে জানে।

কিন্তু আর্চারের এই বিবরণের সঙ্গে কর্ণেল শ্লীম্যানের সাক্ষ্য একেবারে মেলে না। শ্লীম্যানের মতে বেগম সমরু এবং ভাসনুল্ট বৃটিশ-শাসিত রাজ্যে আশ্রয় নেবার চেষ্টা করেছিলেন, বেগমের সৈন্যবাহিনীতে বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ার জন্যে। কিন্তু তাঁদের পলায়ন-পরিকল্পনা কি করে যেন সৈন্যবাহিনীর কিছু লোক জেনে ফেলে এবং তাঁদের দুজনাকে বন্দী করতে ধাবিত হয়। এরপর শ্লীম্যানের বর্ণনা ঃ

ভাসনুল্ট সৈন্যদের আগমনবার্তা আগে থেকেই টের পেয়ে যান। বেগমকে বললেন, মাঝরাতেই বেরিয়ে পড়তে যাতে সৈন্যরা তাঁদের নাগাল পাওয়ার আগেই বৃটিশ-শাসিত রাজ্যে পৌঁছে যেতে পারেন তাঁরা। যাত্রার প্রাক্কালে তাঁরা দুজনেই প্রতিজ্ঞা করলেন যে ধরা পড়লে দুজনেই আত্মহত্যা করবেন। পাল্কীতে বেগম একটা ছোরা নিয়ে উঠলেন। ভাসনুলেটর কাছে ছিল দুটো পিস্তল, একটা তরোয়াল। পাল্কীর পাশে পাশে ঘোড়ার পিঠে যাচ্ছিলেন তিনি। তাঁরা যাচ্ছিলেন মীরাটের দিকে। শিরধানা

পাল্কীর পাশে পাশে ঘোড়ার পিঠে যাচ্ছিলেন তিনি।

থেকে তাঁরা সবে তিন মাইল এসেছেন, এমন সময় বিদ্রোহী সৈন্যবাহিনীকে পাল্কীর দিকে ছুটে আসতে দেখা গেল। শেষবারের মতন সাহেব মনে করিয়ে দিলেন বিবিকে তাঁদের প্রতিজ্ঞার কথা। বিবি ডান হাতের ছুরা তুলে সাহেবকে দেখালেন। হ্যাঁ, মনে আছে তাঁর, সব ঠিক মনে আছে। ভাসনুল্ট খাপ থেকে পিস্তলটা খুলে নিয়ে পাল্কী বাহকদের জোরে জোরে যেতে বললেন। কিন্তু ততক্ষণ সৈন্যরা খুব কাছ এসে পড়েছে।

হঠাৎ এই সময় বেগমের পরিচারিকারা চীৎকার করে কেঁদে উঠল। ভাসনুল্ট পাল্কীর দিকে তাকিয়ে দেখলেন বেগমের বুকের কাপড় রক্তে ভেসে যাচ্ছে। বেগম প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবার চেষ্টা ঠিকই করেছিলেন। নিজের হাতেই নিজের বুকে ছোরা বিঁধিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু বুকের পাঁজরে লেগে ছোরা ভেতরে ঢুকতে পারেনি। দ্বিতীয় আঘাতের শক্তি বা সাহস আর অবশিষ্ট ছিল না বেগমের। ভাসনুল্ট তৎক্ষণাৎ পিস্তলের গুলীতে আত্মহত্যা করেন।

বেগমের ব্যর্থ-প্রণয়ী জর্জ টমাস কিন্তু আরেক চিত্র দিয়েছেন ভাসনুলেটর মৃত্যুর। তাঁর মতে ভাসনুল্টকে বেগমের সৈন্যরাই মেরে ফেলেছিল, তিনি আত্মহত্যা করেন নি।

লা ভাসনুলেটর মৃত্যুকাহিনীতে বেগম সমরুর ভূমিকা খল নায়িকাসুলভ দেখালেও সমস্ত বিষয়টিকে তৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করতে হবে। ঐতিহাসিকরা অনেকেই বেগম সমরুকে নিষ্ঠুর প্রতারক ও স্বার্থন্বেষী হিসেবে চিত্রিত করলেও তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলের লোকদের কাছে বেগম সর্বদাই ছিলেন দয়ালু, সহৃদয়া এবং নিষ্ঠাবতী মহিলা। বেগমের ব্যর্থ-প্রণয়ী জর্জ টমাস বেগমের কাছ থেকে অবজ্ঞা ছাড়া আর কিছুই পান নি, তবু তিনি শেষদিন পর্যন্ত বেগমের অনুরক্ত ছিলেন। তাঁরই হস্তক্ষেপে বেগম তাঁর বিদ্রোহী সৈন্যবাহিনীকে স্ববশে আনেন।

তাছাড়া বেগম সমরু যে কেমন লোক ছিলেন তার প্রগাঢ় সাক্ষী কবেকার কলকাতা। কলকাতায় রক্ষিত বেগম সমরুর দানপত্রই বলে দেবে আরব-কন্যা জিবুন-নিসা আরব-সুলভ বিরাট হৃদয়ের অধিকারিণী ছিলেন এবং জীবনও তিনি আরব্য রজনীর রাজকন্যাদের মতই যাপন করে গেছেন।

কলকেতার গোলামখানা

বৃটিশ সাম্রাজ্যে কখনও সূর্যাস্ত হয় না, এই প্রবাদটি একদা মনে রাখতে, বলতে এবং অপরকে শোনাতে ভালবাসতেন ইংরেজরা। কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় শহর সেই কবেকার কলকাতায় সভ্যতার সূর্যকে যে ইংরেজরাই বারবার ডুবিয়েছেন, একথা আজকের খুব কম ইংরেজই স্বীকার করবেন। কিন্তু সেকালের কিছু কিছু ইংরেজ অবশ্যই স্বীকার করেছিলেন। স্বীকার করেছিলেন অকপটে, যে সারা কলকাতা সেদিন এক বিরাট গোলামখানায় পর্যবসিত হয়েছিল। গঙ্গার বুকে নৌকোয় করে আরব বণিকরা কাতারে কাতারে গোলামদের ভাসিয়ে আনত, নীলামে চড়াত। আক্রা, বজবজে মগদের দাস-বোঝাই সামপান এসে ভিড়ত। দেশে দুর্ভিক্ষ হলেই কলকাতার গোলাম-ব্যাপারীরা ফেঁপে ফুলে উঠত, কারণ দুর্ভিক্ষের দরুন কলকাতায় শিশু-বিক্রীর মরশুম পড়ে যেত। ক্রীতদাসরা নৌকো বন্দী হয়ে আরব দেশের কাঁহা কাঁহা মুল্লুকে চলে

যেত রপ্তানী হয়ে, তার বদলে কলকাতায় চালান আসত আফ্রিকার কালো ক্রীতদাসরা। কবেকার কলকাতার সাহেববাজারে আফ্রিকার গোলামদের চলতি নাম ছিল 'কাফ্রি'। কলকাতায় কত ছিল তারা সংখ্যায়? তারা আদমসুমারীর যোগ্য ছিল না, কবেকার কলকাতা তাদের গুনে দেখেনি, তবে কয়েকজন মহাত্মা ইংরেজ তাদের কথা বলতে গিয়ে একটা মোটামুটি হিসেব দিয়েছেন। বম্বে, মাদ্রাজ এবং কলকাতা প্রেসিডেন্সীতে মোট আশী লক্ষ দাসের কেনাবেচা হত বছরে। তার মধ্যে কলকাতা প্রেসিডেন্সী সংখ্যার দিক দিয়ে প্রথম। সমগ্র কলকাতার জনসংখ্যার প্রায় একঅষ্টমাংশই ছিল গোলাম। এবং এর সঙ্গে অর্ধদাসদের ধরলে, কলকাতার ষোলোর ছয়ভাগ নাগরিকই দাসকুলসম্ভব।

কলকাতা ১৭৭২ সাল থেকে ১৮৪৩ সাল পর্যন্ত দাসানুদাস ছিল। এই একাত্তর বছর ধরে কলকাতা সিক্কা টাকায় মানুষ বেচেছে, অত্যাচারের আঙুলে কেনা মানুষদের গলা টিপে মেরেছে। ইয়োরোপে দাসব্যবসা মধ্যযুগে পর্তুগীজরা ফিরিয়ে এনেছিল বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু ইতিহাসের পাতা শুধু পর্তুগীজদের কীর্তিতেই অত কালো হয়নি। দাস ব্যবসায়ে ইংরেজদের হাতও কম নিপুণ ছিল না। অ্যামেরিকার বিপ্লবকালীন সময়ে ইয়োরোপের বাজারে যত দাস আমদানি হত, তার অর্ধেক আসত বৃটিশ জাহাজে। অবশ্যই দাস-ব্যবসার বিরুদ্ধে প্রথম সক্রিয় আন্দোলনও আরম্ভ হয়েছে ইংল্যাণ্ডে। ইংল্যাণ্ডের কোয়েকাররা ১৬৭১ সালে মানুষ কেনাবেচার বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ করেন। সেই প্রতিবাদ আমেরিকায় প্রতিধ্বনিত হয় ১৬৯৬। অবশেষে টমাস ক্লার্কসন এবং উইলিয়াম উইলবারফোর্স নামক বৃটিশ পার্লামেন্টের দুজন মানবপ্রেমিক সদস্যের আপ্রাণ চেষ্টায় ১৮০৭ সালে কমন্সসভায়

বিজ্ঞাপন

WANTED : Two coffrees who can play well on the French horn, and otherwise hardy and useful about a house relative to the business of consumce (khansamah) or that of a cook, they must not be fond of liquour. Any person or persons having such to dispose of will be treated with by applying to the printer.

— Hickey's gazette

দাস-ব্যবসার বিরুদ্ধে একটি বিল পাশ হয়। কিন্তু বিল পাশ হওয়ার পরও সমস্ত বৃটিশ কলোনীতে দাস-ব্যবসা নিষিদ্ধ হয় তার অনেক পরে ১৮৩৩ সালে। কিন্তু ভারতবর্ষের গোলামখানার দরজায় চাবি পড়েছে তারও দশ বছর পরে, ১৮৪৩ সালে।

কিন্তু উইলবারফোর্স-ক্লার্কসনের প্রচেষ্টাকে যতদিন পেরেছে এড়িয়ে গেছে কলকাতা। এমনকি ডেনমার্ক যখন প্রথম ১৭৯২ সালে আইন করে দাস-ব্যবসার গণেশ উল্টে দিল তখনও কলকাতার চৈতন্যদয় ঘটেনি, দাসীবাদীদের নিয়ে সে সেদিনও হুক্কা খেয়েছে, ব্যাভিচারে লিপ্ত থেকেছে। ডবলু এ্যাডামস সেকালের কলকাতায় গোলামখানার একটি তথ্যনিষ্ঠ বর্ণনা দিয়েছেন। ভদ্রলোক কলকাতার আরমেনিতলায় জনৈক আর্মেনিয় বাড়িয়ালার বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। পাড়াটাও ছিল আর্মেনিয়ানদের। সেই বাড়িটার একটা অংশ ছিল গোলামখানা। সেখানে দাসদের আটক রাখা হত। ঠিক বন্যজন্তুদের যেমন খাঁচায় আটক রাখা হয় গোলামখানার ঘরটি তার চেয়ে কোনো অংশে ভালো ছিল না। দরজায় ছিল বিরাট তালা, জানলায় ছিল শক্ত কাঠের শিক। শুধু আর্মেনিতলাই বা কেন, সারা কলকাতাই যে সেদিন একটি বিরাট গোলামখানা ছিল তার প্রমাণ অনেক ইংরেজ লেখকের লেখাতেই পাওয়া যায়। ক্যালকাটা জার্নালের ১৮২৩ সালে ১লা নভেম্বরের সংখ্যায় শ্রীল্যাণ্ডফোর্ড আরনটসাহেব লিখছেন :

ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল এই বিশাল রাজধানীতে আফ্রিকার দাসদের নিয়ে কেনাবেচা চলত গৃহপালিত জন্তুর মতই। সবচেয়ে বেশী দাম যে ক্রেতা দিতে পারত সেই মালিক হত এই দাসের। আমরা খবর পেয়েছি আরব জাহাজে দেড়শটি খোজাদাসদের আমদানি করা হয়েছে এই বছর কলকাতার বাজারে। এইসব আরব জাহাজে করে আফ্রিকার পুরুষ-দাসদের আনা হয় কলকাতার বাজারে এবং পরিবর্তে মেয়েদের জাহাজ-বন্দী করে রপ্তানি করা হয় আরবদেশের বাজারে বেচার জন্যে। একটিমাত্র উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে এইসব হতভাগা দাসদের ওপর কি অমানুষিক অত্যাচার করা হয়ে থাকে। এক ভদ্রলোক জানাচ্ছেন যে সম্প্রতি দুশজন আফ্রিকান বালককে এদেশে

বিজ্ঞাপন

TO BE SOLD — A coffree boy, that understands the business of butler, kidmntgar and cooking. Price 400 Sicca rupees. Any gentleman wanting such a servant may see him and be informed of further particulars by applying to the printer.

— Hickey's gazette

এনে খোজা করার চেষ্টা হয়। এই দুশোজনের মধ্যে একশ নব্বইজনই আনাড়ী অস্ত্রপ্রয়োগে মারা যায়।

ল্যাণ্ডফোর্ড-সাহেবের এই বিবরণটি তৎকালের সরকারী মহলে প্রচণ্ড আলোড়ন এনেছিল। কিন্তু মুখরক্ষার জন্যে সরকারী তরফ থেকে প্রথমেই বিবৃতি দেওয়া হল যে ল্যাণ্ডফোর্ড-সাহেবের বিবরণ অতিরঞ্জিত। অবশ্য পরে সরকারবাহাদুর ব্যবসানিয়ন্ত্রণের জন্যে একটা লোক-দেখানো বিধিনিষেধ জারী করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু লোক-দেখানো আইন করে কলকাতার গোলামখানাকে বন্ধ করা যায়নি সেদিন।
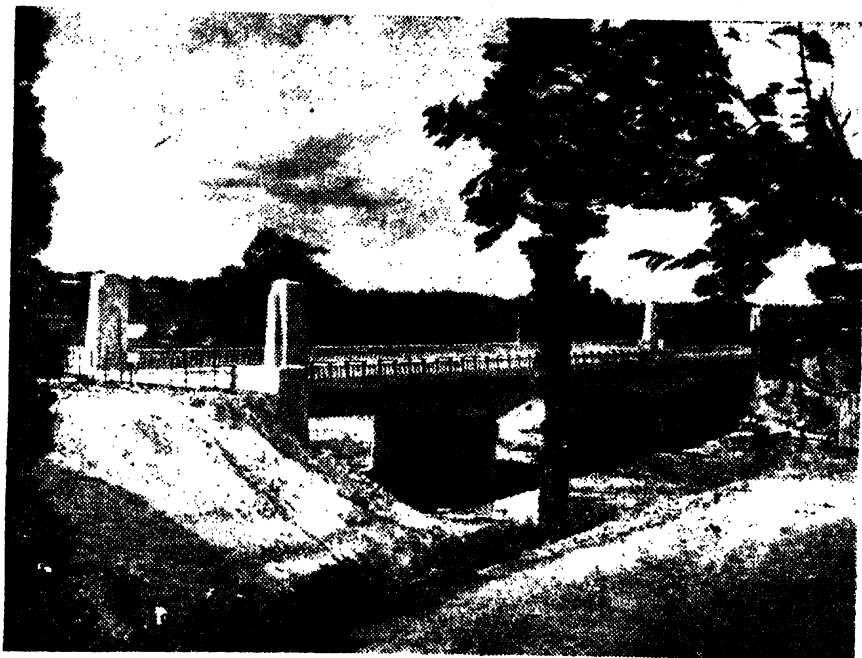
যথারীতি দাস-ব্যবসা কলকাতায় দিনের পর দিন জাঁকিয়ে বসেছে। কবেকার কলকাতায় সবচেয়ে চাহিদা ছিল 'কাফ্রি' দাসদের। তাদের জন্যে প্রকাশ্যেই হিকির গেজেটে বিজ্ঞপ্তি বেরত। হিকির গেজেটের বিজ্ঞাপনগুলি থেকে জানা যায় যে শুধু ব্যক্তিবিশেষেই না, যাজক-সম্প্রদায়ও দাসাধিপতি ছিলেন। দাসরা চার্চের 'সম্পত্তি' হিসেবেই গণ্য হত। ডাঃ বাস্টিড তাঁর 'ইকোজ ফ্রম ওল্ড ক্যালকাটা' গ্রন্থে লিখেছেন :

দাস-ব্যবসায়ীরা শুধু যে কাফ্রিদের কেনাবেচাই করত তা নয়, দাসবংশ বৃদ্ধির জন্যেও তারা সচেষ্ট থাকত। দাসবংশ বৃদ্ধির ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার কথা ডাঃ বাস্টিড বিশদ লেখেননি বটে, কিন্তু অন্যান্য ঐতিহাসিকরা তার বিবরণ দিয়েছেন। ক্রীতদাসীর মালিকরা তাঁদের অধীনস্থ দাসীদের সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর লোকদের বিয়ে দিতেন। চার পাঁচ সিক্কা টাকার বিনিময়ে লোকরা এইসব ক্রীতদাসীদের বিয়ে করত এবং সন্তানোৎপাদন করেই বিদায় নিত। এদের পেশাই ছিল ক্রীতদাসীদের সন্তানার্থে বিবাহ করা। এদের 'বাইকার' বলত লোকে এবং এই বিয়ের নাম ছিল 'পাদওয়া-সাদী'। কুলীন বিবাহের স্বামীদের মতই বাইকার স্বামীরা বছরে তাদের একেক স্ত্রীর কাছে একেকবার যেত এবং কিছু টাকা-পয়সা নিয়ে আবার চলে যেত অন্য স্ত্রীর কাছে। ক্রীতদাসীর মালিকরাই সানন্দে এদের টাকা-পয়সা দিতেন, কারণ ক্রীতদাসীর সন্তান হলে তার মালিক তাঁরাই হতেন। সস্তায় দাসসংখ্যা বৃদ্ধি, একমাত্র এই উপায়েই সম্ভব ছিল সেকালে। আরেকটি কারণেও অবশ্য ক্রীতদাসীদের বিয়ে দেয়া হত। মালিকদের জারজ সন্তানদের পিতৃ-পরিচয়ের জন্যেও ক্রীতদাসীদের বিবাহের প্রয়োজন হয়ে পড়ত।

কিন্তু এইসব ক্রীতদাসীরা মালিকদের গোলামখানায় সস্তায় দাসসংখ্যা বৃদ্ধি করলেও কলকাতায় এরাই ছিল সবচেয়ে হতভাগ্য। ক্রীতদাসীদের ওপরে কেমন যেন একটা পাশবিক ক্রোধ ছিল কলকাতার। সামান্য কারণে এদের অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করতে হত। শারীরিক শাস্তি তো ছিলই। মালিকদের যৌন বিকৃতির সমস্ত গরলই এদের শশব্যস্ত শরীরে ধারণ করতে হত। কবেকার কলকাতার অভিধান থেকে 'সহানুভূতি' শব্দটা যেন বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল ক্রীতদাসীদের প্রতি আচরণে।

বিজ্ঞাপন

WANTED by a gentleman now in Calcutta two very handsome African ladies of the true sable hue, by the vulgar commonly called Coffrees. They must not be younger than 14 years each not older than 20 to 25. They must be well grown girls of their age, straight limed and straight eyed and have rational use of all their faculties — the better of (if) a little squeamish. But beware of spot or blemish. They will be joined in the Holy Banns of Wedlock to two gentlemen of their own colour, caste and country. A dowry is not expected with them. As the master of these African gentlemen would not wish to have them disappointed, he hopes no ladies will apply but those who are really and strictly spinsters.

— Hickey's gazette

[বিজ্ঞপ্তির ভাষায় অশোভন ইঙ্গিতগুলি দ্রষ্টব্য]

এমনকি সাধারণ অপরাধীরাও যেটুকু মানবাধিকার ভোগ করত সেটুকু অধিকার থেকেও বঞ্চিত ছিল তারা। বিশেষতঃ ক্রীতদাসীদের শাস্তি দেওয়ার প্রণালীগুলি যেমন অভিনব তেমনি পৈশাচিক। যে কোনো সামান্যতম অপরাধেই ক্রীতদাসীদের বাড়ির পুরুষ-দাসদের সামনে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে অমানুষিক প্রহার করা হত। কিংবা আরেক ধরনের অভিনব প্রথা ছিল শাস্তি দেওয়ার। মাঘ মাসের প্রচণ্ড শীতের সকালে 'অপরাধী' ক্রীতদাসীকে কুয়োর পাড়ে নিয়ে যাওয়া হত। তারপরে তাকে নগ্ন করে কলসী কলসী কনকনে ঠাণ্ডা জল খুব তাড়াতাড়ি তার মাথায় ঢালা হত। যাতে নিঃশ্বাস নেবার পর্যন্ত অবকাশ না পায় সে। ফলে অনেক সময়েই দম বন্ধ হয়ে অথবা নিমোনিয়ায় মারা যেত ক্রীতদাসীটি। ১৮৩৭ সালের ৭ই জুলাই কলকাতার ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে জনৈকা আট বৎসর বয়স্কা ক্রীতদাসীর ওপর অত্যাচারের মামলার একটি বীভৎস বর্ণনা দিয়েছেন এইচ স্টার্ক। একটি আট বছরের বালিকাকে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির করা হয়। বালিকাটিকে আদালতে মুমূর্ষু অবস্থায় আনা হয়েছিল। তার সমস্ত শরীর ক্ষত-বিক্ষত, সাদা হাড় বেরিয়ে পড়েছিল থ্যাথলানো মাংসের ফাঁকে ফাঁকে। কাঁধে তার বড় বড় গর্ত হয়ে গিয়েছিল জ্বলন্ত কয়লা চেপে ধরার ফলে, মাথায় ছিল তার বিরাট ঘা প্রহারের ফলে সৃষ্ট। সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেট তাকে পুলিশ হাসপাতালে স্থানান্তরের আদেশ দেন। পরদিন বালিকাটি মারা যায়। বালিকাটির মালিক জনৈক মুঘল মহিলা। আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে ক্রীতদাসী হত্যার অভিযোগ আনা হল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হল না। মহিলাটি সসম্মানে মুক্তি পেলেন। কবেকার কলকাতা বুঝে ফেলেছিল মাছি, মশা ও ক্রীতদাসী হত্যার কোনো শাস্তি নেই, হয়ত পাপও না।

কবেকার কলকাতায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীও কম লাভ করেননি মানুষ বেচা টাকার ওপর ট্যাক্সের দাঁত বসিয়ে। প্রতিটি দাসের কেনাবেচার জন্য কোম্পানী একটা রেজিস্ট্রেশন ফি পেতেন। ১৭৫২ সালের একটি হিসেবে পাওয়া যায় গোলামপিছু ইংরেজ কোম্পানীকে চার টাকা চার আনা রেজিস্ট্রেশন ফি দিতে হত গোলামের নতুন ক্রেতাকে। ইংরেজের কাছারীতেই প্রকাশ্যে গোলাম-সেলামী নেওয়া হত।

কলকাতার সাহেবী শুভবুদ্ধির প্রথম উদয় হয়েছিল ১৭৭৪ সালে। দাসদের ওপর অত্যাচারের কাহিনী চারদিকে এমন ছড়িয়ে পড়েছিল যে শেষ পর্যন্ত ফোর্ট উইলিয়াম থেকে একটি ফতোয়া জারী করতে কোম্পানী বাধ্য হলেন। কিন্তু ফতোয়ার কাগজটিকে ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ির মধ্যেই ফেলে দিয়েছিলেন তৎকালীন দাসাধিপতিরা। ফলে ১৭৮৯ সালে কোম্পানীকে একটি 'প্রক্লেমেশন' জারী করতে হল। এই ঘোষণায় আইনের তর্জনী শাসন ছিল। পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল এই অনুশাসনে। দাস-ব্যবসা করছেন বা দাস ক্রয়-বিক্রয় করেছেন এমন লোকের যিনি সন্ধান দিতে পারবেন, তাঁকে একশ সিক্কা টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। এবং মুক্ত দাসকে দেওয়া হবে পঞ্চাশ সিক্কা টাকা। নদীবক্ষে দাস আমদানি বন্ধ করার জন্যে জাহাজের পাইলটদের ওপরেও নিষেধাজ্ঞা জারী করা হল। এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে পাইলটদের লাইসেন্স বাতিল করার হুমকিও ছিল কোম্পানীর আইনে।

কিন্তু তবু ভারতবর্ষকে, কবেকার কলকাতাকে ১৮৪৩ সালের এ্যাক্ট ফাইভ আইন পাশ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল দাস-ব্যবসার সম্পূর্ণ বিলুপ্তির জন্যে। অবশ্য কোনো কোনো পাঠক এই ১৮৪৩ সালকেও বিশ্বাস করতে চাইবেন না।

তাঁরা হয়ত বলবেন ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের আগে ভারতবর্ষের তথা কলকাতার বিশাল গোলামখানাটির পতন হয়নি।

* এই রচনার কিছু তথ্য বেঙ্গল পাস্ট অ্যাণ্ড প্রেজেণ্ট থেকে গৃহীত হয়েছে।

একটি চরিত্রহীন গল্প

মিহির আচার্য

সকালে বাবুকে চা দিতে গিয়ে চাকর ঘরের দরজা বন্ধ দেখল। দরজায় শব্দ করেও বাবুর ঘুম ভাঙল না। তাকে কলেজের রান্না তৈরি করতে হবে। তাই চা নিয়ে সে ফিরে গেল।

আহ্নিক সেরে মা এলেন ধূমায়িত চায়ের কাপ নিয়ে।

দরজা বন্ধ। কোনো সাড়া নেই। ভীষণ ঘুমোচ্ছে বিমলেন্দু। রাত জেগে পড়াশোনা করেছে বোধহয়। বউ বাপের বাড়ি গেছে কাল, তাই রাতজাগার অন্য কারণ খুঁজে না পেয়ে খুশি হলেন নিভাননী। কিন্তু, চা খেয়েও তো আবার ঘুমোতে পারে। ঘুম ভেঙে বিছানায় চা খাওয়ার অভ্যেস বিমলেন্দুর। নিভাননী কয়েকবার ডাকলেন। সাড়া পেলেন না। তারপর জানালার দিকে এগিয়ে গেলেন। জানালা বন্ধ, এই গরমে। নিভাননী জানালা ঠেললেন। বন্ধ নয়, জানালাটা ভেজানো ছিল। পাল্লা দুটো খুলে দিতেই এক রাশ বন্ধ হাওয়া বেরিয়ে এল।

আর, নিভাননী দেখলেন ওর প্রকাণ্ড শরীরটা খাটের ওপর ঝুলছে। টেবিল আর চেয়ারটা উল্টে পড়ে আছে মেঝেতে।

নিভাননী চিৎকার করতে গেলেন, পারলেন না। কাঁপতে লাগল শরীরটা, জানালার গরাদ ধরে তিনি পতনকে ঠেকালেন।

এর পর চাকর এল। ছোটো ভাই নিখিলেন্দু এল। ওরাও জানালা দিয়ে দেখল দৃশ্যটা।

দরজা ভাঙতে হবে। কিন্তু কে ভাঙবে। বাড়িঅলা ভাড়া দিয়েছে, দরজা ভাঙবার অধিকার দেয়নি।

দরজা ভাঙা হল।

নিভাননী দেখলেন নতুন-কেনা দড়িটা যেটা ওর গলায় ঝুলছে। কুয়োর পচা দড়িটা বদলে কতদিন ওকে এক গাছা দড়ির কথা বলেছেন তিনি। নিভাননী ভেবেছিলেন অধ্যাপক মানুষ ভুল হয়ে যায় দড়ি আনতে। কিন্তু এখন বুঝতে পারলেন সত্যিই ও দড়ির কথা ভোলেনি। কে জানে কুয়োর জন্যেই ও হয়ত দড়ি আনছিল, পথে আসতে-আসতে মত বদলেছে। মত-বদলানোর অভ্যেস ছিল বিমলেন্দুর। মত করল সারাজীবন বিয়ে করবে না। তারপর নিভাননী যখন দুদিন বললেন মেয়েটার খবর। কমলা, রূপেগুণে লক্ষ্মী। তিন-দিনের দিন মত বদলাতে ওর দেরি হল না। তারপর বিয়ে করতে ওর তর সইল না। বোধহয় মত বদলাবার আগেই সে কাজটা করে ফেলতে চাইল। সত্যি বলতে কি ওর বিয়ের ব্যাপারে ওর এই উচ্ছ্বাস ভালো লাগেনি নিভাননীর। কেমন ব্যথা পেয়েছিলেন। মনে মনে অসন্তোষ বোধ করেছিলেন অকৃতজ্ঞ ছেলের জন্যে। হবে না। স্বামী মারা যাবার পর ওঁর প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড আর ইনসিওরেন্স ভেঙে কত আগলে হিসেব করে মানুষ করেছেন বিমলেন্দুকে। সব হিসেবের বাইরে যাবে বিমলেন্দু কে ভেবেছিল। তবে কি সেও নিজে নিজে একটা হিসেব করত। নিভাননীর মনে হল তাঁর সারাজীবনের বিশ্বাস নিয়ে তিনি সন্তানের কাছে হেরে গেছেন। বিমলেন্দু মাতৃগর্ভের অহংকারকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে চলে গেছে। অথচ কিশোরবেলা থেকে এই ছেলেকেই গড়েপিটে মানুষ করেছেন তিনি। একমাত্র অবলম্বন বলে দরকারের বাইরেও তাকে আঁকড়ে ধরে রেখেছেন। বিমলেন্দু সব ব্যাপারেই তাঁকে নির্ভর করত। আর ওর এই নির্ভরতা নিভাননীকে একেশ্বর দেবতার মতো সর্বগ্রাসী করে রেখেছিল। তিনি এই সংসারের কর্ত্রী, তাঁর ছেলে, তাঁর পুত্রবধূ—তাঁরই সংসার। ছেলে তাঁর, একমাত্র তাঁরই রক্তমাংসে তৈরি, সেই দাবি এই বাড়ির প্রতিটি প্রাণীকে মানতে হবে। নিভাননীর মনে হল বিমলেন্দু এতদিন সেই দাবি মেনেছে, মানতে সে ভালোবেসেছে। বিয়ের পর ইদানীং সে কম কথা বলে, নানান কাজে ব্যস্ত থাকে, কী একটা গবেষণার কাজ সে শুরু করেছিল। বিয়ের পর ওর শরীর খারাপ হচ্ছিল, অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকত সে। কিন্তু সবসময়েই কি পড়াশোনা করত। একেক দিন রাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে ছেলের ঘরে ওদের দুজনের কথাবার্তা শুনতেন তিনি, হাসিকৌতুকও মেশানো ছিল তার মধ্যে। বউয়ের সঙ্গে গল্প করবে এটা অপরাধ নয়, কিন্তু পড়াশোনার ক্ষতি করে রাত জেগে শরীর নষ্ট করবে, এটা কাজের কথা নয়। ওরা দুজনেই ছেলে-মানুষ। মাঝে মাঝে ওদের সতর্ক করেছেন। তা ওদের ভালোর জন্যেই। নিভাননী বহু হিসেব করে ছেলেকে মানুষ করেছেন সে কথা ভুলবেন কি করে। বউমা তো পরের মেয়ে। তাঁর এই মনোযোগিতায় ওরা যে কেউ ভুল বোঝেনি তার প্রমাণ সংসার সুন্দরভাবে বয়ে চলেছে। বউমাকে পর্যন্ত তিনি হেঁসেলে ঢুকতে দেননি, চা বা জল-খাবার তৈরির প্রয়োজনেও তাকে কাছে ডেকেছেন কেউ বলতে পারবে না। একদিন বিকেলে বিমলেন্দু রেস্তোরাঁ থেকে কী একটা খাবার কিনে এনেছিল, নিভাননী

বকেছিলেন সেদিন। এসব কী প্রমাণ নয়, ওরা তাঁকে কতখানি মানত। আর, এখন মৃত্যু দিয়ে যে বুঝিয়ে গেল মায় এই সান্ত্বনাগুলোকে বিমলেন্দু মানেনি। তবে কি বেঁচে থাকতে ওর ওপর তিনি অত্যাচার করেছেন। একটা বিবর্ণ ভয় নিভাননীকে স্তব্ধ করে দিল। কিন্তু...বিমলেন্দু তাঁর ছেলে, তাঁর চোখের সামনে ঝুলছে ওর মৃত শরীর, তিনি কাঁদতে পারছেন না কেন। কি করে কাঁদবেন তিনি, ওর চেহারাটা তো মোটেই করুণ দেখাচ্ছে না। দাঁতের কামড়ে ঝুলে-পড়া ওর আধখানা জিভ, ঠেলে-বেরুনো চোখের মণি। ওকে কী বিশ্রী, কুৎসিত আর অশ্লীল দেখাচ্ছে। সারা জীবনের সঞ্চিত বিশ্বাসকে বিমলেন্দু দড়ির ফাঁসে ঝুলিয়ে দিয়ে ঠাট্টা করছে। এই ঠাট্টার সামনে কাঁদবেন কি করে তিনি।

নিখিলেন্দু এ-দৃশ্য সহ্য করতে পারেনি। সে বাড়ি থেকে ছুটে পালিয়েছে। কিন্তু বউমা থাকলে ওকে এই দৃশ্য দেখিয়ে সান্ত্বনা পেতেন নিভাননী। মার থেকেও বড় আপনার হয়েছিল সে বিমলেন্দুর কাছে। বউমা থাকলে এ ঘটনা কি ঘটতে পারত। তবে কি বউমার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল বিমলেন্দুর, কেন দু বছরের বিয়েতে ওদের সন্তান হল না। হাতের মুঠোয় বিশেষ কোনো কারণ খুঁজে পেলেন না নিভাননী যার জন্যে ওর মৃত্যুটা জরুরি হতে পারে।

সিঁড়িতে পদশব্দ।

নিখিলেন্দু দাদার অধ্যাপক-বন্ধুদের ঘরে নিয়ে এসেছে। পারিজাত আর বীরেশ্বর।

বীরেশ্বর ঘরে পা দিয়েই বললে, 'ইশ।'

ওর ছোট্ট অব্যয়ে কী একটা ব্যঞ্জনা ছিল, নিভাননী আরো জড়সড় হয়ে গেলেন। এই মুহূর্তে ওদের উপস্থিতি তিনি পছন্দ করেননি। তিনি ছেলের সঙ্গে একটু মনে মনে বোঝাপড়া করতে চাইছিলেন। কিন্তু...

'এমন কাজ ও কেন করল?' বীরেশ্বরের জিজ্ঞাসা যেন তীরের মতো বিঁধল নিভাননীর হৃদয়ে। ওরা কি তাঁকে সন্দেহ করছে।

নিখিলেন্দু দাঁড়িয়ে দাদার অধ্যাপক-সহকর্মীদের কথা শুনছে। দাদার মৃত্যুর সম্পর্কে এই সমালোচনা তাকে একটু-একটু করে সাহস জোগাচ্ছিল।

'আশ্চর্য—' বীরেশ্বরই বলে চলল : 'গতকালও সে কলেজ করেছে, আমাদের সঙ্গে হেসে কথা বলেছে, কলেজের পরে ছাত্রদের টিউটোরিয়েল খাতা অনেকক্ষণ বসে দেখেছে। মনে হয়নি সে নিজের জীবন সম্পর্কে এমন একটি ভয়ংকর সিদ্ধান্ত করেছে।'

পারিজাত বললে, 'ওর নিজের যে কোনো দুঃখ থাকতে পারে আমরা একদিনও জানতে পারিনি। ও আমাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে পারেনি, তাহলে হয়তো ওর দুঃখ আমাদের বলে হালকা হতে পারত।'

বীরেশ্বর বললে, 'ওর শবের দিকে চেয়ে দ্যাখো, যেন একটা ব্যঙ্গ। মানুষের ভবিষ্যতকে পর্যন্ত সে বিকৃত করে দিয়েছে। আমরা কত অসহায়, দুর্বল...। দড়ির ফাঁসটাও কেমন পাকা হাতে বানিয়েছে দ্যাখো পারিজাত, দক্ষ খুনীর মতো মনে হচ্ছে ওকে।'

পারিজাত বললে, 'আমি বুঝতে পারছিনে কেমিস্ট্রির শিক্ষক হয়ে সে দড়ির ফাঁসে মরবার মতো পুরনো অশিক্ষিত কায়দাকে বেছে নিল কেন। ল্যাবরেটরি থেকে মারাত্মক কোনো এসিড জোগাড় করা ওর পক্ষে অসম্ভব ছিল না।'

নিখিলেন্দু দাদার বালিশের তলা থেকে এক টুকরো চিঠি বের করে বীরেশ্বরের হাতে দিল।
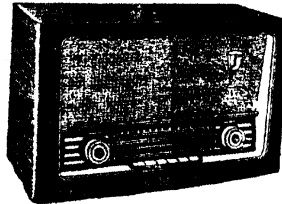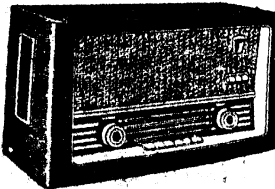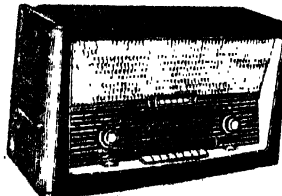
বীরেশ্বর পড়ল : 'আমি স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করলাম।' তার নিজের নামটাও পাকা হাতে স্বাক্ষর করেছে বিমলেন্দু। রাবীন্দ্রিক ছাঁদের হরফ। অক্ষর কোথাও কাঁপেনি, ঝাপসা হয়নি। তার মানসিক দৃঢ়তারই পরিচায়ক। এই পত্র-রচনা এবং মৃত্যুর মধ্যে কত সময় ব্যয়িত হয়েছে। নাকি এই চিঠি-লেখার সঙ্গেই তার মৃত্যু-দলিলকে সে স্বাক্ষর করে গেছে। বীরেশ্বর ঘটনার স্তরগুলি কল্পনা করবার চেষ্টা করছে। টেবিলের ওপর চেয়ার, ফ্যানের হুকের সঙ্গে দড়ি লটকানো, দু-একবার টেনে দড়ির কার্যকুশলতাও অবশ্য পরীক্ষা করেছে। এই সকল কাজ সে নির্ভুল মনোযোগে করে গেছে। এবং তারপর হয়তো চিঠি লিখতে বসেছে। চিঠি লিখেও কে বলতে পারে সে খোলা বারান্দার আকাশের নিচে একবার দাঁড়িয়েছিল কিনা। সম্ভবত দাঁড়িয়ে একটি সিগারেটও সে খেয়েছে। জল খাওয়ার তেষ্টা হওয়ারও অসম্ভব নয়। সেই মুহূর্তগুলিতে বিমলেন্দু কী ভেবেছিল, কিছু ভেবেছিল কিনা, অথবা ভাবনাগুলি লেপেপুঁছে গিয়েছিল! 'স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করলাম।' বরণ শব্দটায় এই মুহূর্তে ভীষণ রাগ হল বীরেশ্বরের। ওই শব্দটায় কোথায় যেন ন্যাকামো লুকোনো আছে। কাব্য করে বলা। পরিবর্তে কী কথাটা ব্যবহার করতে পারত বিমলেন্দু, এই মুহূর্তে মনে পড়ল না বীরেশ্বরের। স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করতে অবশ্যই পারে বিমলেন্দু, সে অধিকার তার নিজস্ব। একথা জানানোর বিশেষ তাৎপর্য নেই। উদারতা! এ-সংসারের দুঃখ-কষ্ট-জ্বালার যদি সে ভাগ নাই নেবে তবে এ জগৎ সম্বন্ধে তার এই শূন্য কৃতজ্ঞতা-বোধের কী দাম আছে। কে চেয়েছে তার এই ফাজিল জবানবন্দী। মাত্র দু বছর হল সে বিয়ে করেছে, কমলা, তাঁর দূর-সম্পর্কের আত্মীয়া। স্ত্রীর অস্তিত্বের সামনে তার সাহস ছিল না, তাই ওকে বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে। তার মানে একটা অপরাধবোধ ছিল তার মনে। সে ভাবল না সে দায়িত্বশীল সামাজিক জীব, তার নিজের স্বার্থে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত ছিল না। সামনে ছেলেদের পরীক্ষা, কলেজে কেমিস্ট্রির স্টাফ এম্নিতেই কম, ছাত্ররা তার ওপর কত নির্ভর করে। আজই কলেজে ছেলেরা যখন জানবে তাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকের কীর্তি, যখন মনে মনে যাচাই করবে এই মানুষটি তাদের তরুণ হৃদয়ের বিশ্বাস শ্রদ্ধা প্রীতি নিয়ে এতদিন তাদের সঙ্গে অভিনয় করেছে, সেই শ্রদ্ধাহীন মূল্যহীন অসম্মানের কথা সে একবারও ভাবল না কেন। তার মৃত্যু বারবার উপহসিত হবে, নোংরা কদর্যতায় চিত্রিত হবে। বেঁচে থাকতে যে দুঃখকে সে গোপন করতে চাইছিল মৃত্যুর পর এখন তা কিংবদন্তীর শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হবে। অধ্যাপক হয়ে বিমলেন্দু সামাজিক নৈতিকতার কথা ভুলতে পারল কি করে!

নিভাননী বিবর্ণ হয়ে ওই ছেলে-দুটির গম্ভীর চিন্তিত মুখ নিরীক্ষণ করছিলেন। নিখিলেন্দু, তাঁর একমাত্র ছেলে, সে এই পরিস্থিতিতে দাদার বন্ধুদের ওপর নির্ভর করছে দেখে মৃত্যুর মতোই আর একবার অসহায় বোধ করলেন তিনি। ওকে কি ডাকবেন তিনি, ডেকে নেবেন কাছে।

নিভাননী চমকে উঠলেন বীরেশ্বরের কথায় : 'বিষয়টা কি বলুন তো? এ কদিন সে কী ভাবছিল, কী করছিল...'

নিভাননী বললেন, 'জানিনে।'

'বা, মা হয়ে আপনি ছেলেকে বোঝেননি।'

নিভাননী মৌন। ওরা তাঁর মাতৃত্ব সম্পর্কে কটাক্ষ করছে। বিমলেন্দু বেঁচে

নিভাননী চমকে উঠলেন

থাকলে, তিনি আবার ভাবলেন। কী আশ্চর্য, বিমলেন্দু বেঁচে ছিল বলেই তিনি মা ছিলেন। বিমলেন্দু নেই, তিনি এখন স্বাধীন একটি বর্ষিয়সী মহিলা, তাকে দুর্বল দেখে ওরা তাঁর সমালোচনা করতে উদ্যত। ওদের বাড়িতে কী মা নেই, মার সঙ্গে এরকম করেই কি ওরা ব্যবহার করে!

'ও তো আজকাল আমার সঙ্গে বেশি কথা বলত না।' নিভাননী তবু বললেন : 'কাল রাত করে ও বাড়িতে ফিরেছিল, আমি পুজোয় ব্যস্ত ছিলাম। তারপর ও খেতে এল, খেতে-খেতে অনেক গল্প করল, ছেলেবেলার কথা, রাত দশটা পর্যন্ত আমার ঘরে আমার কোলের কাছে শুয়ে রইল। আমি জোর করেই ওকে শুতে পাঠিয়ে দিলাম। ও কিছুতেই যেতে চাইছিল না...'

'তারপর?'

তারপর! নিভাননী আবার স্তব্ধ হয়ে গেলেন। ওরা আর কী বলতে চাইছে, কী জানতে পারলে ওরা আশ্বস্ত হয়!

'বউকে বাপের বাড়ি পাঠাল কে? আপনি?'

'আমি! আমি পাঠাব কেন! আমিই তো কত বারণ করলাম। বউমাও যেতে

চাইছিল না। ও জোর করে ওকে রেখে এল।'

'কোনো ঝগড়া হয়নি?'

'কই, আমি তো কিছু জানিনে।'

'তবে?'

পারিজাত বললে, 'ও'কে প্রশ্ন করা বৃথা। মানুষ আত্মহত্যা করে, তার একটা আপাত কারণ হয়তো খুঁজে বার করা যায়। কিন্তু আসল কারণটা কোনোদিনও জানতে পারা যায় না। আমার তো মনে হয় বিমলেন্দুও কারণটা জানত না।'

বীরেশ্বর বললে, 'সে কি রকম? একটা কাজ ঘটছে তার কারণ থাকবে না?'

পারিজাত বললে, 'কারণটা আর কিছু নয়। বিমলেন্দু ভীষণ দুর্বল।'

'দুর্বল।' বীরেশ্বর গম্ভীর হল। 'তাহলে বলছ আমরাও ওরই মতো একদিন আত্মহত্যা করতে পারি।'

'কে বলতে পারে।' পারিজাত উদাস হাসল।

বীরেশ্বর দৃঢ়গলায় বললে, 'আমি, বীরেশ্বর বোস, পারি। জীবনটা একটা ইয়ারকি নয়। যত দুঃখ-কষ্ট থাক তাই বলে ......দ্যাখো পারিজাত, আমরা রোমান্টিক যুগ পেরিয়ে এসেছি। আজকের দিনে আত্মহত্যা একটা অ্যানাক্রনিজম্।'

নিভাননী অস্বস্তিবোধ করতে লাগলেন। ওরা এত কোলাহল করছে কেন! ওরা কী ভুলে গেছে এখানে একটা মৃত মানুষ শরীর-অস্তিত্বে শোকের ছায়া বিছিয়ে রেখেছে! তিনি কী বলবেন ওদের আস্তে কথা বলতে! তাদের সহকর্মী, তাঁর আত্মজ, মৃতের প্রতি জীবিত মানুষকে সম্মান জানাতে হবে। সম্মান! কথাটায় চমকালেন তিনি। নিজের কাছে অনুভব গভীর হচ্ছে না কেন। কান্নার মতো সহজ বস্তুটিও নিভাননীর আয়ত্তে আসছে না। এ ক্ষতি তো তাঁর একার। কান্নায় ভেসে যেতে পারলে তিনি অনেক অবিশ্বাস সন্দেহের হাত থেকে বাঁচতে পারতেন। অন্তত ক্ষতির কথা ভেবেও তো তিনি কাঁদতে পারেন! কিন্তু, কান্না আসছে না, বিমলেন্দুর কাজটা এমন হঠাৎ...। কিংবা নিভাননী আরো ফ্যাকাসে হলেন এবং নিজের সদ্য চিন্তায় এবার তাঁর গলা শুকিয়ে এল। না—তিনি প্রবলবেগে আপত্তি জানালেন: না। কখনোই না। তিনি নিজের সন্তানের মৃত্যুকামনা করেছেন, ভাবতেও পারেন না।

'থানায় খবর দেয়া হয়েছে?' পারিজাত জিগ্যেস করল।

নিখিলেন্দু বললে, 'চাকর গেছে।'

'তাহলে এসে পড়বে।'

বীরেশ্বর ঘরছিল ঘরময়। ওকে অশান্ত উত্তেজিত বিরক্ত দেখাচ্ছিল। অন্যমনস্ক সিগারেট বের করে নিভাননীর সামনেই সে ধূমপান করতে লাগল। নিভাননীর মনে হল এই ছেলেটি তাঁকে অপমান করছে। বিমলেন্দুর অভাব বোধ করলেন তিনি। বীরেশ্বর ওর টেবিল নাড়াচাড়া করছে, খাতা বই এলোমেলো করে দিচ্ছে। বিমলেন্দু অগোছাল ভাব পছন্দ করত না। ওর কলমটা সে হাতে তুলে নিয়েছে। বি-এসসি পাস করবার সময় নিভাননী এই কলম উপহার দিয়েছিলেন। থাকে ওগুলো পড়ে যেখানে যেমন আছে। বিমলেন্দু কোনোদিন আর স্পর্শ করবে না। তাই ওগুলি তাঁর স্মৃতির সঞ্চয়। এমন অনেক সঞ্চয় স্বামীর তরফ থেকে রাখতে হয়েছে। জ্যান্ত একটা মানুষের চেয়ে সঞ্চয় অনেক নিজস্ব, একান্ত। বিমলেন্দু আর কোনোদিন তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে যেতে পারবে না, কেউ তাকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।

নিখিলেন্দু কি করবে বুঝতে পারে না। সে একবার বীরেশ্বর একবার পারিজাতের দিকে চোখ রাখছে। ওদের প্রতিক্রিয়ার আয়নায় সে দাদাকে দেখছে। তার বিদ্বান দাদা, যার কথা বলতে তার বুক গর্বে ভরে আসে। দাদার চরিত্রে যে সুদূরবর্তিতা ছিল, যার কাছে আসা যায় না অথচ কাছে আসতে ইচ্ছে করে, যে-দাদা তার কাছে দেবতার মতোই বিরাট, সেই দাদা সম্বন্ধে তার বন্ধুদের কাছে সে জানতে চায়। অন্তত যে ভয়-ভক্তির মিশ্র ভাব জড়িয়ে ছিল দাদার সম্বন্ধে তাকে সে অন্ধ পূজারীর মতো ধূপধুনো দিয়ে গাঢ়

করতে চায়। দাদা চিরকালই তার কাছে বস্তুহীন আবেগ।

'ও যদি আমাদের কাছে মন খুলতে পারত...' বীরেশ্বর বিড়বিড় করে বললে।

পারিজাত বললে, 'আমরাও তো জানবার চেষ্টা করিনি।'

'কি করে চেষ্টা করবো? আমরা তো আর মনের ভেতরে যেতে পারিনে।'

'গেলেও কি হত?' পারিজাতের গলায় হতাশা: 'তোমার কি মনে হয় ওর আত্ম-হত্যার প্রবৃত্তি অনেককাল ধরে সে লালন করছিল? না, তা হতে পারে না, তা হলে কোনোদিনই সে আত্মহত্যা করতে পারত না। তার ওই সিদ্ধান্ত একেবারে আকস্মিক। অ্যাকসিডেন্টের মতোই আকস্মিক।'

'কে জানে।' বীরেশ্বর মাথা নাড়ল: 'আচ্ছা, তুমি আত্মার অবিনাশে বিশ্বাস করো? যদি আত্মার অস্তিত্ব থাকে, ভেবে দ্যাখো, তাহলে অনুভূতিও থাকে এবং কে বলতে পারে বিমলেন্দুর আত্মা এই মুহূর্তে ওর শবের চারপাশে ঘুরছে কিনা। হয়তো সে আমাদের আলোচনা শুনতে পাচ্ছে, হয়তো সে তার ভুল বুঝতে পারছে। অথচ সংশোধনের উপায় নেই। এই কষ্টের চেয়ে মনে হয় আত্মা না থাকলেই ভালো হয়।'

'আমার সবচেয়ে বিশ্রী লাগছে—' পারিজাত বললে: 'আমরা ওর বন্ধু, অথচ ওর এই অবস্থায় আমরা কিছু করতে পারছিনে। আমার সব সময় ওর কথা মনে পড়ছে, আঠার মতো ওর মুখ যেন আমার চোখের ওপর এঁটে রয়েছে। ও যে মরেছে আমি বিশ্বাস করতে পারছিনে। ভেবে দ্যাখো, গতকালও সে হেসে হেসে কথা বলেছে, কাড়াকাড়ি করে চা খেয়েছে, কলেজ-জীবনে সুখে-দুঃখে সমস্ত আন্দোলনে সে আমাদেরই সঙ্গে থেকেছে—'

বীরেশ্বর বললে, 'তার চেয়েও বড় কথা তার জীবনে একটা নীতি ছিল, ভালোমন্দ সম্বন্ধে তার ধারণা ছিল পরিষ্কার। ডিগ্রি কোর্সের ছেলেটা সেবার পরীক্ষায় নকল করে ধরা পড়লে ও কারুর কথাতেও ওর নীতিকে খাটো করল না। আমরা নিজেরাও কী পেরেছি সব সময় নীতিকে শক্ত করে ধরে রাখতে। তবে ও নিজের জীবনে এমন দুর্নীতির প্রশ্রয় দিল কি করে।'

বাইরে সকালের রোদ চাড়া দিয়ে উঠেছে। ঘরের ভেতরে ভ্যাপসা গ্রীষ্ম।

বীরেশ্বর হঠাৎ নিভাননীকে জিজ্ঞাসা করল: 'ওদের বিবাহিত জীবন কী সুখের ছিল না?'

নিভাননী দম নিলেন। কিছু বললেন না।

'আমি কমলাকে যতদূর জানি ওর মতো ভালো মেয়ে..'

নিভাননী কী উত্তর দেবেন। অন্ধকারে হাতড়াতে লাগলেন। কমলা যদি ভালো হয় তাহলে তো আর কোনো প্রশ্ন থাকে না। এবার সন্দেহটা তারই ওপর পাকা হবে। ওরা কতটুকু জানে, কী খবর রাখে। স্বামী মারা যাবার পর একা এই সংসারকে ঠেলেছেন, বিমলেন্দুকে হিসেব করে মানুষ
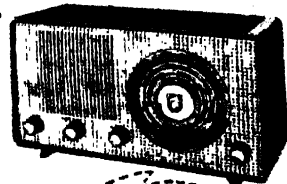
করেছেন। বিমলেন্দু সে সব জানত। তাই তাঁকে অবলম্বন করতে ও ভালোবাসত। অনেক বড় বয়স পর্যন্ত মা ছাড়া কিছু চেনেনি ও। ভালো মেয়ে কমলা তার কতটুকু জানে। বিমলেন্দু তা জানত, জেনেও ওর স্বভাবের অবিরোধী শান্তপ্রকৃতির সহনশীলতা ওকে শেষের দিকে আকৃষ্ট করে ফেলেছিল। সব কিছুকেই ও এড়াতে চাইত বড় রকমের একটা ঝড়কে নিবারণ করতে। নিভাননী এখন ভাবলেন : কমলা তাঁর ছেলেকে বুঝতে পারেনি, বুঝতে চায়নি। ও নিজস্ব একটা ঘর পেয়েছে, জানালা-দরজায় পুরু পরদা টেনে তার ঘরটাকে সে দ্বীপের মতো বিচ্ছিন্ন করেছে। নিভাননীর মনে পড়ে না এই দুবছরে তিনি কবার ওর ঘরে পা দিয়েছেন। সাংসারিক জরুরি প্রয়োজনে দরকার হলেও বিমলেন্দুকে ওদের ঘর থেকে ডেকে নিতে পারেননি। পরদাগুলিই যে বাধা ছিল তা নয়। বিমলেন্দুর নিজের থেকেও কী একবার খবর নিতে হয় না! কলেজ থেকে ফিরে সে আজকাল মার সঙ্গে কথা বলবারও ফুরসত পেত না। ও যে বাড়িতে ফিরেছে বুঝতে পারতেন যখন বউমা খাবারঘর থেকে ওর চা জলখাবার ঘরে নিয়ে যেতে আসত। নিজের একটা সংসার রচনা করেছে বউমা, করবে না কেন।

নিখিলেন্দু বললে, 'বউদি যাবার সময় কাঁদছিলেন; না মা?'

'কাঁদছিলেন! কেন?' বীরেশ্বর ভাবিত হল।

নিভাননী বললেন, 'আমি বারণ করেছিলাম বউমাকে পাঠাতে। বউমাও যেতে চাননি। ও জোর করে—'

'জোর করে!'

'নিভাননী কোনো উত্তর দিলেন না।

বীরেশ্বর বললে, 'তাহলে ও রাগ করেছিল।'

রাগ!' নিভাননী অন্যমনস্কে উক্তি করলেন।

'কিছু হয়েছিল ওদের ভেতরে। কমলা কাঁদতে কাঁদতে গেছে।' বীরেশ্বর বললে, 'কমলার কাছে সব জানতে পারা যাবে।'

'কি জানতে পারা যাবে?' নিভাননী ব'লে ক্লান্ত বোধ করতে লাগলেন।

'সব, সব কিছু।' বীরেশ্বর স্থির গলায় জানাল : 'কমলা আমাকে সব বলবে। ও অনেক কথা বলেছে আমাকে। একবার বিমলেন্দু আমার সম্বন্ধে ওর কাছে মন্তব্য করেছিল : তোমার দাদা ভীষণ বাক্যবাগীশ। কমলা আমাকে সে কথা হাসতে-হাসতে বলেছিল। আরো বলেছিল : সেদিন ও তোমার সম্বন্ধে ধারণা বদলেছে বীরুদা, তুমি নাকি ভীষণ সৎ এবং হৃদয়বান। কমলা আমাকে সব বলবে।'

'কিন্তু কি নিয়ে ওদের ঝগড়া হল?' পারিজাত জানতে চাইল।

'বীরেশ্বরদা, এখনো থানা থেকে কেউ এল না।' নিখিলেন্দু নালিশ জানাল।

বীরেশ্বর বললে, 'আসবে।'

'ওরা দাদাকে নিয়ে কী করবে বীরেশ্বরদা?'

নিভাননী ডাকলেন : 'নিখিল এদিকে এসো।'

নিখিলেন্দু মার কাছে গেল না।

নিভাননী একটা যন্ত্রণা বোধ করতে লাগলেন। বিমলেন্দুর দেহটা অনেকক্ষণ ঝুলে আছে। চোখ-ঠেলে-ওঠা, কাটা জিভ এবং শক্ত-হয়ে-আসা শরীরটা। আর, সেই রুপোর মতো ধবধবে নতুন দাড়িটা।

'দ্যাখো বীরুদা, একদিনেই দাদার গালে কি রকম দাড়ি বেড়েছে।' নিখিলেন্দু বললে।

বীরেশ্বর তাকাল ওর দিকে।

'মরা মানুষের দাড়ি বাড়ে, তাই না বীরুদা?'

'নিখিল এদিকে এসো।' নিভাননী আবার ডাকলেন।

'না।' নিখিলেন্দু দাদার মৃত্যুতে স্বাধীনতা অর্জন করেছে।

পুরনো বাড়ির বহুদিনের জং-ধরা দরজাটা খুলে ফেললে যেমন শব্দ হয় তেমন একটা জান্তব আনুনাসিক ধ্বনি শুনলেন নিভাননী। বুকভর্তি কাটা-ঝোপের তলায় দমবন্ধ-হয়ে-মরা দরজাটা এখন হাট করে খোলা। নিভাননী দুরন্ত বাতাসে হিহি কাঁপুনি বোধ করলেন।

পারিজাত বললে, 'ঝগড়া হলেই মরতে হবে তাহলে তো আমাদের রোজই মরতে হয়।'

বীরেশ্বর বললে, 'হয়তো এমন কিছু হয়েছিল যাতে বেঁচে-থাকাটাকেই ঘৃণা করেছিল সে। কমলা সব জানে।'

পারিজাত নিশ্চুপ।

বীরেশ্বর আবার বললে, 'এমনও হতে পারে নিজের জন্যে নয়, কোনো একটা সাধু কাজের জন্যে ওর মরাটা জরুরি ছিল।'

'সাধু কাজ!' পারিজাত ভ্রূ কুঁচকোলো।

বীরেশ্বর বললে, 'না। আমি অনুমান করছি। একটা কাজ হয়েছে তার কারণটা তো খুঁজে পেতে হবে।'

'কারণ না-বলে সান্ত্বনা বলতে পারো।' পারিজাত বললে।

বীরেশ্বর বললে, 'ও একই কথা।'

পারিজাত বললে, 'আমি সান্ত্বনা পাইনে। এই তো কয়েক বছর আগে পাশ করে বেরিয়েছে, কলেজের চাকরিতে চারটে ইনক্রিমেন্ট পেয়ে ঢুকেছে, একটু একটু করে সে জীবন তৈরি করছিল, এক বছর রিসার্চও চালিয়ে গেছে। তুমি বলতে চাও এতদিনের এত যত্নের জীবনটা হঠাৎ অর্থহীন হয়ে যাবে! যেন একটি কলমের খোঁচায় তার সমস্ত জীবনটা বাতিল হয়ে গেল।'

বীরেশ্বর জিগ্যেস করল : 'কমলাকে খবর দেয়া হয়েছে?'

নিখিলেন্দু বললে, 'আমি ডাক্তারবাবুর দোকান থেকে বউদিকে ফোন করে দিয়েছি।'

'তাহলে ও এসে পড়বে।' বীরেশ্বর বললে।

'বউদি এখনো কিছু জানে না। আমি শুধু বলেছি দাদা ভীষণ অসুস্থ।' বুদ্ধিমানের গলায় বললে নিখিলেন্দু।

বীরেশ্বর মোটা বেসুরো গলায় বললে, 'আমি কমলার সামনে দাঁড়াব কী করে!'

পারিজাত বললে, 'আমরা যেমন করে দাঁড়িয়ে আছি।'

'ও যখন আমাকে প্রশ্ন করবে : দাদা একী হল!' বীরেশ্বরের গলা কাঁপে : 'যখন ও জিগ্যেস করবে দাদা আমি তো কারুর ক্ষতি করিনি—আমার এমন সর্বনাশ হল কেন?'

পারিজাত বললে, 'সংসারে কারুর ক্ষতি না করলেও সর্বনাশ হয়। পাপ-পুণ্য...'

নিখিলেন্দু চিৎকার করে উঠল : ওই থানার লোকেরা এসে পড়েছে। যাই আমি ওদের নিয়ে আসি।' উত্তেজনায় জ্বলতে-জ্বলতে ছুটে বেরিয়ে গেল সে।

নিভাননী বিবর্ণ, শাদা। তাঁর চোখের সামনে দেয়াল স্থির অনড় দাঁড়িয়ে। কী-একটা বলতে চাইলেন তিনি, পারলেন না। দীর্ঘ রোগভোগে পরিশ্রান্ত মানুষের মতো দেখালো তাঁকে।

বীরেশ্বর পদচারণা থামিয়ে স্তব্ধ দাঁড়িয়ে।

পারিজাত অন্য দিকে চেয়ে। কেউ কারুর দিকে তাকাতে পারছে না। অথচ ওরা দুজনে একই ধরণের ভাবছে। জন্মের পর থেকেই মানুষ একটা নিয়তির দিকে এগিয়ে চলেছে। সকলেই অপরাধী, আজ বা কাল দণ্ডগ্রহণ করতে হবে।

ওরা দেয়ালে পিঠ শক্ত করে দাঁড়াল।।

রমণীয় যুগে যুগে

সঞ্চিতা বসু

কুরুবকের পরতো চূড়া কালো কেশের মাঝে
লীলাকমল রৈত হাতে না জানি কোন কাজে

'যাঁদের সঙ্গে হয়নি দেখা সেসব বরাঙ্গনা'রা কেমন সাজতেন কেমন চলতেন কেমন বলতেন জানবার জন্যে আজো হয়ত অনেকের মন কেমন করে। সেসব প্রাচীনারা

নর্তকী —অজন্তা

আজকের 'এই আধুনিক বিনোদিনী'দের তুলনায় কেমন ছিলেন সেটা জানবার ইচ্ছা হওয়াটা স্বাভাবিক।

প্রাচীনকালের হিন্দুরা পারমার্থিকের অন্বেষণে ঐহিকের বিসর্জন ত মোটেই দেননি বরং সে যুগের রমণীদের সাজসজ্জা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করলে এর বিপরীতটাই দেখতে পাই। কোন অপৌরুষেয় ধর্মেই দেহ এবং দেহের রূপকে অস্বীকার করা হয়নি। তাই রূপচর্চা প্রাচীনকাল থেকেই প্রায় একটি অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। অল্পদিন আগেও প্রাচীনারা বিকেল হলেই বাড়ীর বৌঝিদের নিয়ম করে সরময়দা মাখাতে বসে যেতেন। আরো লক্ষ্য করার বিষয় হল যে এই রূপচর্চা শুরু হত মেয়েদের বাল্যকাল থেকেই বিবাহের প্রস্তুতি হিসেবে।

কামসূত্র, অনঙ্গরঙ্গ প্রভৃতি বহু প্রাচীন পুস্তকে এই রূপচর্চার নানারকম বিধান, উপকরণ এবং তাদের প্রয়োগের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। চলাফেরা ওঠাবসা এবং দেহভঙ্গিমাও উপেক্ষা করা হয়নি। ময়ূর, হংস প্রভৃতি পক্ষীর গতিভঙ্গী লক্ষ্য করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। হঠযোগের নির্দেশ হল সোজা হয়ে দাঁড়ানো এবং বসবার সময় সম্পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্যে বসা, মস্তক এবং সর্বশরীরে যেন একটা উর্ধ্বগতির আভাস থাকে। অনিদ্রার বিরুদ্ধে সাবধান করা হয়েছে কারণ প্রচুর নিদ্রাও রূপবৃদ্ধির সহায়ক। যকৃতের ক্ষমতা ও রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্যে শাস্ত্রকারেরা প্রচুর জলপান করতে বলেছেন। আর বলেছেন নিয়মিত এবং পরিমিত আহার ও মাঝে মাঝে লঙ্ঘন। বাৎস্যায়ন বলেছেন, "সূর্যালোক, মুক্তবায়ু, আহার, জলপান, নিদ্রা প্রভৃতির ফলে সুস্থ শরীর লাভ করলে গাত্রবর্ণ, নখ, দন্ত প্রভৃতির যত্নে মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য।"

গাত্রচর্মের উৎকর্ষের দিকে সুপ্রাচীন কাল থেকেই আমাদের দেশে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হত। তৈল এবং বিভিন্ন স্নেহজাতীয় পদার্থ দিয়ে চর্ম পরিষ্কার করাই ছিল রীতি। ময়দা, সর, ডালবাটা, জলপাই তেল প্রভৃতি বিভিন্ন জিনিস মিশিয়ে নিয়মিত মেখে ত্বকের কোমলতা ও পরিচ্ছন্নতা বর্ধন করা হত এবং এর ফলে অবাঞ্ছিত রুক্ষ রোমাদিও দূর হত। অতি শৈশবকাল থেকেই এগুলি মাখিয়ে গাত্রবর্ণের ঔজ্জ্বল্য এবং ত্বকের কোমলতা বৃদ্ধির দিকে মন দেওয়া হত। এছাড়া কমলালেবু, লেবু, শশা প্রভৃতির খোসা, বাদাম বাটা প্রভৃতির চলন এখনো আছে। প্রাচীন ভারতে কয়েকটি বিশেষ পুষ্পবৃক্ষের মূল এবং শ্বেতসার মিশিয়ে এই ধরণের গাত্রমার্জনার ব্যবস্থা ছিল। 'অনঙ্গরঙ্গের' গ্রন্থকার বলেন, তিল, দুই প্রকার জিরে এবং শ্বেত সরিষার সঙ্গে দুধে বেটে সপ্তাহকাল মুখে প্রলেপ দিলে সবরকম দাগ উঠে গিয়ে মুখে তুষারের মত শুভ্রতা ফুটে ওঠে।

গৌরবর্ণের দিকে ভারতীয়দের লোভ চিরকাল। এদিক দিয়ে আমাদের বর্ণসচেতনতা নেহাৎ অল্প নয়। দুধ এবং বাদাম-বাটা বর্ণগৌরব বৃদ্ধি করে বলে শোনা যায়। বেশী রৌদ্র লাগালে রং কালো হয়ে যায় অতএব বিবাহযোগ্যা কন্যাদের একটু অসূর্যম্পশ্যা হওয়াই বিধি।

ললাটে যাতে কোন বলিরেখা না পড়ে সেজন্যে সদা প্রফুল্ল থাকতে বলা হয়েছে।